রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

৬১শ ভাগ, প্রথম খণ্ড, ১৩৬৮

সূচীপত্র

বৈশাখ—আশ্বিন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

বিষয়-সূচী

বিবিধ প্রসঙ্গ

চিত্রসূচী

রঙীন চিত্র

একবর্ণ চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

জন্মেজয়ের সর্প-যজ্ঞের আয়োজন
(প্রাচীন কাংড়া চিত্র হইতে)

ঃঃ ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ঃঃ

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৬৮

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী

"আজি হতে শতবর্ষ" পূর্ব্বের বৈশাখের ২৫শে, এক পুণ্যতিথিতে, কলিকাতা নগরে যে মহামানব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার জন্মবাসরের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের পূর্ণ আয়োজন চলিতেছে সারা পৃথিবীতে। কোথায়ও সে উৎসব রাজ-পুরুষদিগের ও দেশের ভাগ্যনিয়ন্ত্রাদিগের সমর্থনে সমারোহে পূর্ণ, কোথায়ও বা তাহা রবীন্দ্রনাথের ভক্তজনের অর্ঘ ও পুষ্পাঞ্জলী মাত্রে অলঙ্কৃত হইবে। আবার কোথায়ও বা তাঁহার অনুগত ও অনুরক্ত জন শান্তভাবে সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার সূর্য্যপ্রভ ব্যক্তিত্ব ও সহস্রমুখী প্রতিভার জ্যোতিচ্ছটার স্মৃতি-তর্পণ করিবে।

এই অভিশপ্ত কলিকাতা নগরেও শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন নানা দিকে নানা সভাসমিতি করিতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আড়ম্বর মুখ্য হইয়া পড়িতেছে এবং শ্রদ্ধা নিবেদন সেই কারণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। উৎসবের অধিকারীবর্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুলিয়া যাইতেছেন যে; যাঁহাকে লইয়া উৎসব তাঁহার কবি-মানস এই সকল অনুষ্ঠানকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন। সেই কারণে আজ আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন দিই তাঁহারই ২৫ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত রচনার আংশিক উদ্ধৃতি :

"যাঁরা আমার গান শুনেছেন, যাঁরা মনে করেছেন যে, হয়ত আমি কিছু আলো জ্বালিয়ে যেতে পেরেছি এই অন্ধকারে, তাঁদের পক্ষে আজকের দিন প্রাপ্তিস্বীকারের দিন। যিনি আমায় এই বিশ্বের মধ্যে স্থান দিয়েছেন তিনি প্রসন্ন হয়েছেন কি না জানি না, কিন্তু আমি প্রসাদ পেয়েছি।

"আরও একটা কারণে আজকের দিনের জয়ন্তী উৎসবের সকল অর্ঘ্যই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করতে মন কুণ্ঠিত হয়। **যে জিনিসটি সাজাবার জন্যে বহু লোক মিলে যোগ দেয়, তার সাজানোর উৎসাহটা সাজানোর উপলক্ষ্যকে ছাড়িয়ে যায়। রচনার সমারোহে রচনাকর্ত্তা গৌরববোধ করতে থাকে। সেই গৌরবের অনেকখানিই এই নাট্যের নায়কের প্রাপ্য নয়।** বারোয়ারির সমারোহে আয়তন বৃদ্ধির অহঙ্কার বিস্তর অবাস্তবের কাঠ-খড় আত্মসাৎ ক'রে স্ফীত হয়, সবটাই তার মূল্যবান নয়। অহঙ্কারের মোহে একথা ভুলতে ইচ্ছা করে না। যদি ভুলি তবে আপন বুদ্ধির প্রতি অবিচার করা হয়। বহুজনের দত্ত সম্মানে যে অপমিশ্রণ থাকে তার প্রতি যেন আমার লোভ না থাকে, এই আমি কামনা করি। যেন নিশ্চিত জানি যে, **মাথাগুণতির বহুলত্বে জনতার গৌরব নয়** এবং অতি নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমানের কণ্ঠধ্বনি দূর ভাবীকালের কণ্ঠস্বরের পরিমাপও না হতেও পারে।

"খ্যাতির কলরবমুখর প্রাঙ্গণে আমার জন্মদিনের যে আসন পাতা হয়েছে সেখানে স্থান নিতে আমার মন যায় না। আজ আমার প্রয়োজন স্তব্ধতায় শান্তিতে। দীর্ঘ-কাল সংসারের সেবা আমি করে এসেছি। সে সেবা জনতার মধ্যে। সব সময় তাতে সিদ্ধিলাভ করি নি, তা নাই হ'ল, যে মনিবের কাছে ফলের দামের চেয়ে ফলাবার চেষ্টার দাম কম নয়, তিনি আমাকে কিছু পুরস্কার দেবেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, তার বেশী আর আমি চাই নে। সংসারে যা পাওয়া যায় তা অনেক ফিরিয়ে দিতে

হয়, কেন না সে পাওনা থাকে বাইরের থলিতে, কিন্তু যে পাওনা ভিতরে, সংসারের জরিমানা সেখানে পৌঁছয় না।"*

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেকার এই বাণীর আজ কি সার্থকতা থাকিতে পারে? উৎসবই যাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য, তাঁহাদের নিকট উহার কোনই মূল্য নাই, এবং উহা তুচ্ছ বাক্যসমষ্টিমাত্র তাঁহাদের নিকট যাঁহাদের গৌরববোধ এই উৎসবের আয়তন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে অথবা যাঁহাদের নিকট এই শতবার্ষিকী বেচাকেনার বা নিজেকে সাধারণের সম্মুখে রবীন্দ্র-জ্যোতির সুদূর প্রতিফলিত রশ্মিতে উদ্ভাসিত করা সুযোগ মাত্র।

কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত শ্রদ্ধানিবেদনের আকাঙ্ক্ষাই চরম উদ্দেশ্য, যাঁহারা দীর্ঘদিন সেই মহাপুরুষের বাণী শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শুনিয়াছেন, এবং যাঁহারা জানেন যে, এই দেশের জনগণ উৎসবের উন্মাদনায় কি ভাবে শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদনের কার্য্য দক্ষযজ্ঞে পরিণত করিতে পারে তাঁহারা বুঝিবেন কবিগুরুর ঐ আন্তরিক নিবেদনের তাৎপর্য্য।

শুধু কি প্রদর্শনী ও মেলায় এবং ইটপাথর-কংক্রীটের স্তূপে রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর উদ্‌যাপন সার্থক হইবে? আন্তরিক শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য দেশের ও দশের কি আর কোনও কিছু করিবার নাই? ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পাশ দিয়া প্রতিনিয়ত কত শতসহস্র লোক যায় আসে। কয়জন ফিরে দেখে সেই দিকে, কার মনে আছে ভিক্টোরিয়ার কথা? শেষ পর্য্যন্ত কি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিও ঐ ভাবে আড়ষ্ট হইবে?

অবশ্য ইহা সত্য যে কবিগুরুর অমর লেখনী বাংলা-সাহিত্যে তথা বিশ্বসাহিত্যে যে মুদ্রাঙ্ক দিয়া গিয়াছে তাহা অক্ষয়। কবিতায়, গদ্য-রচনায়, গল্পে, উপন্যাসে, গানে, গীতিনাট্যে তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহাই তাঁহার স্মৃতিকে সৌরভময় করিয়া রাখিবে, যতদিন বাংলাভাষা ও সাহিত্যের যশসৌরভ থাকিবে। এবং ইহাও সত্য যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্ত্তির প্রচারের জন্যে তাহার মূল ও প্রাদেশিক ভাষায় তাহার অনুবাদ প্রকাশের বিপুল আয়োজন করিয়াছেন, যদিচ সেই আয়োজন ঠিক সরকারী ব্যবস্থা অনুযায়ী হইয়াছে—আগে থেকে টাকা জমা দাও তার পর সরকারের অনুগ্রহ, গোঁজামিল ও গাফিলতির ফলভোগের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া থাক।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি শুধু কবি বা নাট্যকার বা "কথা-সাহিত্যে"রই পরিবেশক মাত্র ছিলেন? তাঁহার কণ্ঠ-নিসৃত বাক্যে বা তাঁহার লেখনীমুখ-প্রবাহিত রচনায় কি তিনি দেশবাসী ও জগৎবাসী জনগণকে কোনও শিক্ষা-দীক্ষা, কোনও উপদেশ, কোনও আদর্শের সন্ধান কোনও সতর্কবাণী দিয়া যান নাই?

আজ দেশের যে অবস্থা তাহাতে শুধু ছাপার অক্ষর বা ইট-পাথর-লোহ-কংক্রীটের ইমারতে স্থায়ী কোনও কিছু হইবে না। সেই সৌধগুলির অপব্যবহার ও তাহা দখলের জন্য সরকার বাহাদুরের শিবাদলের আস্ফালন ত নিকট ভবিষ্যতেই হইবে। গ্রন্থরাজীর অধিকাংশই রসিক বা ভক্তজনের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং শতবার্ষিকীর উত্তেজনা ক্ষান্ত হইলে তাহা গ্রন্থকীটের ভক্ষ্য হইয়া থাকিবে। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ত সবে মাত্র শতবার্ষিকীর কোলাহলে চাপা পড়িয়াছে! সরকারী ঢক্কানিনাদ থামিলেই তাহা পুনর্ব্বার আরম্ভ হইবে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "কিছু আলো জ্বালিয়ে যেতে পেরেছি এই অন্ধকারে" এবং চাহিয়াছেন প্রাপ্তি স্বীকারের কথা। সে প্রাপ্তি স্বীকার কি আজ কোথায়ও শোনা যায়, না তাহার পথ এই আড়ম্বরের আয়োজন? এই সাময়িক প্রবল উত্তেজনার পর অবসাদ কিরূপ মারাত্মক হইবে সে কথা কেহ কি ভাবিতেছেন? উচিত ছিল শান্ত, সংহত ভাবে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দীক্ষায় দেশের, দশের ও বিশ্বমানবের স্থায়ী উপকারের ব্যবস্থা কিসে হয় তাহার সুচিন্তিত ব্যবস্থা করা। রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছিলেন 'অন্ধকারে আলো' জ্বালিয়া প্রগতির পথে উজ্জ্বল রশ্মিপাত করিতে—আজ তাঁহার "সোনার বাংলা" কোন্ পথে চলিয়াছে? তিনি তাঁহার "অচলায়তন", "তাসের দেশ" ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে মূর্ত্ত করিয়া ধরিতে দেশের লোকের সামনে—সেই চিত্রের কোনও লেশমাত্র ফল কি আজ দেখা যায় বাংলার সমাজের গতিতে?

তাঁহার গান ত আজ পণ্যদ্রব্য এবং অন্য পণ্যদ্রব্যের মতই এই অভাগা বাংলা দেশে তাহাতেও ভেজাল এতই অধিক যে Greshams Law অনুযায়ী সাচ্চা মাল খুঁজিয়া পাওয়া ভার। শান্তিনিকেতনেই মেকীর চালান হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পরেই ত অন্যের দোষ কে দিতে পারে?

তাঁহার Religion of Man পুস্তক এবং Crisis of Civilization জাতীয় প্রবন্ধের ব্যাখ্যা ও সমাদর বিশ্ব-জগতে হইতেছে, শুধু হইতেছে না ভারতে—বিশেষ বাংলা দেশে।

* জন্মদিন, প্রবাসী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩

উপায় কি? উপায়ের পথ এখন পাওয়া যাইবে না, কেন না এখন উত্তেজনা ও আত্মবিজ্ঞপ্তির ঝড় বহিতেছে। তার পর যদি কোনও সুযোগ-সুবিধা থাকে তখন হইবে উপায়ের কথা—যদি সেকথা বলিবার ও শুনিবার অবকাশ কাহারও থাকে। কেননা ভয় হয় তাহার পর এদেশের যে অবস্থা হইবে, তাহাতে প্রকৃত অনুরাগী জন Thomas Moore-এর ভাষায় বলিবেন :

I feel like one
Who treads alone
Some banquet hall deserted
Whose lights are fled,
Whose garlands dead
And all but he departed.

আচার্য্য জগদীশ বৃত্তি

প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এক ঘোষণায় জানাইয়াছিলেন যে, বিজ্ঞান ও জ্ঞান সম্বন্ধের অন্যান্য ক্ষেত্রে যাহাতে যোগ্য শিক্ষার্থীদিগের প্রথম হইতেই শিক্ষা ও গবেষণার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ দেওয়া হয়, সেইজন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ যোগ্য শিক্ষার্থীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য এক ব্যবস্থা করিতেছেন। যোগ্য ছাত্র ও ছাত্রীগণকে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং, ফলিতবিজ্ঞান ইত্যাদিতে পটুত্ব বা উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তা কাহার কতটা আছে দেখা হইবে। তাহার উপর ইহাও দেখা হইবে যে, তাহারা কোন্ বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য উপযুক্ত অর্থাৎ বিজ্ঞানের কোন্ শাখা বা ফলিতবিজ্ঞান ইত্যাদির কোন্ বিভাগে তাহাদের কাহার কতটা স্বাভাবিক যোগ্যতা আছে।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হয় যে, এইরূপে ছাত্রছাত্রীদিগের যোগ্যতা বিচার ও যোগ্য ছাত্রছাত্রীর জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা দিবার ব্যবস্থা ভারতে এই প্রথম হইল।

কিন্তু মন্ত্রীবরের ঘোষণার দুই বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকীতে এই ব্যবস্থার কথা প্রথমে উঠে। জামসেদপুরের লৌহ-ইস্পাৎ কারখানার সর্ব্বাধ্যক্ষ শ্রীজেহাঙ্গীর গান্ধী সেই সময়ে প্রস্তাব করেন যে, আচার্য্য জগদীশের স্মারক ব্যবস্থার মধ্যে এইরূপে বিজ্ঞানে স্বাভাবিক যোগ্যতাযুক্ত ছাত্রছাত্রীদিগের জন্য অনুসন্ধান এবং যোগ্য প্রার্থীদিগের ভবিষ্যতে শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা ও আর্থিক সহায়তা করার আয়োজন করা হউক। ঐ প্রস্তাব তখনই গৃহীত হয় এবং কি ভাবে ঐ অনুসন্ধান করা হইবে তাহার পূর্ণ তথ্য জানিবার জন্য ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের সাহায্যে আমেরিকা হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া ঐ পরীক্ষাকার্য্য চলে।

বিগত ২৮শে চৈত্র কলিকাতায় পণ্ডিত নেহরু ঐ পরীক্ষায় নির্ব্বাচিত নয়টি ছাত্র ও একটি ছাত্রীকে আচার্য্য জগদীশ বসু স্মারক বৃত্তি এবং উহার চিহ্ন (Insignia) প্রদান করেন। পণ্ডিত নেহরু স্বীকার করেন যে, তিনি জানিতেন না যে, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের স্মারক হিসাবে এই "জাতীয় বিজ্ঞানপ্রমুখত্ব সন্ধান" ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ অতি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, যাহাতে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রী, গরীব-ধনী নির্ব্বিশেষে বিজ্ঞান শিক্ষার অত্যুচ্চতম সোপানে পৌঁছাইতে পারে, তাহা কলিকাতায় প্রথম হইল অথচ সে সংবাদ দিল্লী পর্য্যন্তও পৌঁছাইল না।

অভিশপ্ত নগর কলিকাতা

কলিকাতায় বসবাস ও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে—বিশেষ এই অভাগা দেশের সন্তান-সন্ততির পক্ষে—নরকযন্ত্রণাতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

যাত্রার কথায় প্রথমতঃ পথঘাটের কথাই বলি। পায়ে চলার পথ অর্থাৎ ফুটপাথ ত হকার, ফড়িয়া, ফলবিক্রেতা ইত্যাদি যাহারা বিনা লাইসেন্সে, বিনা ভাড়ায় ও বিনা ট্যাক্সে কারবার চালাইতে দক্ষ তাঁহাদেরই এলাকা। অবশ্য শোনা যায় যে, কোন কোনও অঞ্চল কোন কোনও থানাকে ইজারা দেওয়া আছে—যথা কলেজ স্কোয়ার অঞ্চল মুচিপাড়া থানার তালুকদারীর মধ্যে পড়ে—এবং পুলিসের ছোটবড় অধিকারী সেখান হইতে স্ত্রীর গহনা এবং বেনামী বাড়ী তৈয়ারীর খরচা উসুল করেন।

ফুটপাথ ছাড়িয়া যানবাহনের পথে সাধারণ পথচারী নামিলে অনেক ক্ষেত্রেই তাহার ভবযন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়। নিম্নে শুধু ২৯শে চৈত্রের কিঞ্চিৎ নমুনা ৩০শে চৈত্রের সংবাদপত্র হইতে দেওয়া হইল :

"সোমবার এবং মঙ্গলবার কয়েকটি শোচনীয় পথ দুর্ঘটনায় ৬টি জীবন বিনষ্ট হইবার পর বুধবার পুনরায় এই দুর্ঘটনা।

"রাত্রি ৭৷৷টা নাগাদ শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ের অদূরে মহেন্দ্রলাল ইন্দু (৪৫) নামে এক ব্যক্তি পরিবহন কর্পোরেশনের একখানি বাসের ধাক্কায় গুরুতররূপে আহত হন। তাঁহাকে আর. জি. কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় সাড়ে ১০টায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাত্রি সাড়ে ৮ ঘটিকা নাগাদ শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকট এক মহিলা বাস চাপা পড়েন এবং প্রায় সঙ্গে

সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ঘটনার সময় নাকি ঐ অঞ্চলটি নিষ্প্রদীপ অবস্থায় ছিল।

যাঁহাদের যানবাহন আছে তাঁহাদেরও নিষ্কৃতি নাই, পথঘাটের দুর্দ্দশা তো চরমে পৌঁছিয়াছে, উপরন্তু মেরামতের নামে পথে খানাখন্দ কাটিয়া মাসের পর মাস ফেলিয়া রাখা আছে।

তার পর আলো বাতাস। সে ত বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর নির্ভর! তাহারও একদিনের সংবাদ দেওয়া গেল:

"কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা এরূপ অস্বাভাবিক পর্য্যায়ে পৌঁছিবার ফলে রাজ্য সরকার চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

"বুধবার অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সংবাদ লইয়া জানা যায় যে, এই দিন সন্ধ্যার দিকে শ্যামবাজার, বাগবাজার, ভুপেন বসু এভিন্যু, বেলগাছিয়া, পাইকপাড়া, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট-মিশন রো এলাকা, ধর্ম্মতলা-মৌলালি, রিপণ ষ্ট্রীট, ইণ্টালি, গোবরা, বালিগঞ্জের অংশবিশেষ, কালীঘাট ও ভবানীপুরের কিছু এলাকা, টালিগঞ্জ প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইয়া অন্ধকারের রাজত্ব নামিয়া আসে। কোন কোন অঞ্চল সর্ব্বাধিক তিন ঘণ্টকাল তমসাচ্ছন্ন থাকে।

সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকায় আর. জি. কর হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্ত্তব্যরত ডাক্তারগণকে বেশ ফ্যাসাদে পড়িতে হয়। বিভিন্ন দুর্ঘটনায় আহত কয়েক ব্যক্তি ছাড়া সাপের কামড়ে সঙ্কটাপন্ন এক ব্যক্তিও ঐ সময় জরুরী বিভাগে উপস্থিত।

শোনা যায় কলিকাতা ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই ১৯৫৫ সন হইতেই এইরূপ অবস্থার আশঙ্কা জানাইয়া বিদেশ হইতে নূতন যন্ত্রপাতি ও অত্যাবশ্যকায় যন্ত্রাংশের জন্য বিদেশী এক্সচেঞ্জ চাহিয়া হয়রাণ হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের কর্ণধারবর্গ কর্ণপাত করেন নাই। অলমিতি বিস্তারেণ!

ব্যক্তির অধিকার কোথায়?

শুনা যায়, ভারতবর্ষে কংগ্রেস পার্টি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও উক্ত সাধারণতন্ত্র সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত শাসন প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষকে দ্রুতগতিতে সেই আদর্শ পরিস্থিতির দিকে লইয়া যাইতেছে যেখানে অভাব নাই, অজ্ঞতা-নিরক্ষরতা নাই, অন্যায় নাই, অসত্য বা অধর্ম্ম নাই, এমন কি হিংসা-দ্বেষ-কলহবিবাদও নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও পণ্ডিত নেহরুর যুক্ত সারথিত্বে ভারতের মহারথ এই মহাদেশান্তর্গত সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী বিভিন্ন ভাষাভাষী ও অনন্ত বৈচিত্রপূর্ণ সামাজিক রীতিনীতি, ধর্ম্মমত, রাষ্ট্রীয় নীতিবাদ বা সুবিধাবাদ অনুসরণকারী অসংখ্য সঙ্কীর্ণ গণ্ডির লোক সকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া সেই "অন্তিম ও চরম" (কম্যুনিষ্ট প্রেরণার ভাষায়) পরিবেশের দিকে চলিয়াছে, চলিতেছে ও চলিতে থাকিবে। মহাকালের প্রাঙ্গণে কোন কিছুর শেষ নাই, সীমা নাই ও সম্ভবতঃ স্বরূপও নাই। সুতরাং এই যে মহাগতি ও ভারতীয় মহামানবের এই যে বেনামদার মারফতে প্রগতির প্রয়াস, ইহার চরম, অন্তিম অথবা শেষ পরিণাম কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? কিছু না হইলেও এমন কি কিছু দুর্গতি ঘটিলেও হয়ত "গুঁতার চোটে" মানিয়া লইতে হইবে যে, উন্নতি অন্তিম ও চরম রকম হইয়াছে। কারণ, বর্ত্তমানে ভারতীয় গোয়ালাদিগের প্রাক্তন আদর্শের অনুসরণে যে জলমিশ্রণ পদ্ধতি সর্ব্বতঃ রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুসৃত হইতেছে, তাহাতে উপস্থিত অবস্থার এক ভাগের সহিত আদর্শ মিথ্যার তিন ভাগ মিশাইলেই উন্নতি সর্ব্বঘটে শতকরা চারিশত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে বলিয়া সরকারী ইস্তাহারে প্রচার করা হইয়া থাকে। ভারতীয় মুদ্রা রূপেয়া বা টাকা বর্ত্তমানে ক্রয়শক্তিতে পূর্ব্বের তুলনায় ¼ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ এক টাকার আর্থিক অর্থ কংগ্রেসি প্রচেষ্টার ফলে চার নানা দাঁড়াইয়াছে। এই "উন্নতি"র ফাঁকে বহু রাজকর অজানা ভাবে গরীবের ট্যাঁকে প্রবেশ করিয়া তাহার দুরবস্থা আরও প্রগাঢ়তর করিয়া দিয়াছে। কিন্তু সরকারের ইস্তাহারে দেখা যায় যে, আমাদের আর্থিক অবস্থা শতকরা ১২ হইতে ১৯ ভাগ উন্নত হইয়াছে। রাজকরগুলির সমষ্টি যে শতকরা ১৯ হইতে ৪৯ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে সে কথা "ভুলক্রমে" সে ইস্তাহারে বলা হয় নাই। মানুষের আয় কত তাহার বিচার করিতে হইলে দেখা প্রয়োজন যে, তাহার নামে যে আয় কাগজে-কলমে লিখিত হইতেছে তাহার মধ্যে কতটা তাহার পকেটে বা ট্যাঁকে আসিয়া তাহার নিজের খরচ বা সঞ্চয়ের জন্য তাহার নিজের অধিকারে সংরক্ষিত হয়। যদি কাহারও কাগজে-কলমে মাসিক ৫,০০০৲ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা আয় হয় তাহা হইলে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় তাহার কতটা আর্থিক উন্নতি হইল এ কথার বিচার করিতে হইলে দেখা প্রয়োজন: (১) ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার কত টাকা আয় ছিল; (২) এক টাকার ক্রয়শক্তি এখনকার তুলনায় তখন কতটা ছিল; ও (৩) রাজকর তখন কত ছিল ও এখন কত। আলোচনা ঠিক ভাবে হইলে সম্ভবতঃ দেখা যাইবে যে, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সেই ব্যক্তির ১,৫০০৲ দেড় হাজার টাকা আয় ছিল ও সেই সময় টাকার ক্রয়ক্ষমতা টাকায় টাকা বা শতকরা একশত

প্রমাণ ছিল। রাজকরগুলি মিটাইয়া সেই ব্যক্তি নিজ ব্যয় ও সঞ্চয়ের জন্য ১,২৫০৲ সাড়ে বার শত টাকা ঘরে আনিতেন। বর্ত্তমানে তিনি "ইনকম ট্যাক্স" দিবার পরে ধরা যাউক ৩,০০০৲ তিন হাজার টাকা ঘরে তুলিয়া আনেন। সেই তিন হাজার টাকার পণ্যক্রয়শক্তি পূর্ব্বেকার ¼ এক-চতুর্থাংশ হইয়াছে বলিয়া তিনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় মাত্র ৭৫০৲ সাড়ে সাত শত টাকা ঘরে আনিতেছেন বলিয়া হিসাব হওয়া উচিত। কিন্তু "দুধে জল মিশান" নীতির তাড়নায় বলিতে হইবে যে, সেই ব্যক্তির আর্থিক উন্নতি শতকরা ১৯ ভাগ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই মিথ্যাকে "সত্যমেব জয়তে" মার্কা দিয়া প্রচার করা উচিত কি না, সে কথার বিচার ভারতের মহামানব করুন। একটা কথা বলা হয় নাই। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মানব যে সকল বস্তু ক্রয়ে অথবা অবাস্তব অভিলাষ পূরণে নিজ অর্থ ব্যয় করিতে পারিতেন, বর্ত্তমানে তাহার মধ্যে অনেক বস্তুই তিনি কংগ্রেসী "ম্যানেজিং এজেন্সি"র ব্যবস্থায় বাজারে পাইবেন না, কিম্বা মাড়োয়ারী ভাটিয়া বানিয়াদিগকে "কালো বাজারে" "চোরা-খাজানা" দিয়া তবে পাইবেন। ইহা ব্যতীত উক্ত "ম্যানেজিং এজেন্ট"দিগের নির্দ্দেশে সে ব্যক্তি ইচ্ছা হইলেও এবং অর্থ থাকিলেও বিদেশ ভ্রমণে যাইতে পারিবেন না; মরিলেও বিদেশী ঔষধ পাইবেন না, নিজের কোন মূল্যবান বিদেশী যন্ত্র বিগড়াইয়া যাইলে তাহার ভগ্ন অংশ ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করিতে পারিবেন না, ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তাঁহার যে পূর্ব্বেকার সঞ্চিত অর্থ তিনি ব্যাঙ্কে অথবা ইনসিওরেন্সে রাখিয়াছিলেন সেই অর্থেরও অবস্থা ঐ এক-চতুর্থাংশ হইয়া গিয়াছে। বাকি তিন ভাগ কে লইল? অথবা কোথায় গেল। সেই লইল, যে টাকায় "জল মিশাইয়া" টাকার ক্রয়শক্তি ক্রমশঃ এক-চতুর্থাংশে নামাইয়াছেন। যে ব্যক্তি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ১,০০০ মণ চাল বিক্রয় করিয়া ব্যাঙ্কে ৪,০০০৲ টাকা জমা রাখিয়াছিল সেই টাকা আজ সুদে আসলে ৮,০০০৲ আট হাজারে দাঁড়াইয়াছে ধরা যাউক। আজ এক হাজার মণ চাল কিনিতে ২৫,০০০৲ টাকা লাগিবে এবং ঐ ব্যক্তি ৮,০০০৲ টাকায় মাত্র ৩০০।৩৫০ মণ চাল পাইবে। চাল না হইয়া যদি গৃহ অথবা ভূমি বিক্রয় করিয়া সেই টাকা জমা করা হইয়াছিল তাহা হইলে গৃহ অথবা জমির মূল্য ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় অধিক ক্ষেত্রেই শতকরা এক হাজার দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দশ কামরার গৃহ অথবা এক বিঘা জমি বেচিয়া বর্ত্তমানে দুই কামরার কুঁড়ে অথবা দুই কাঠা জমি ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া থাকিলে ২৪৲ টাকার স্বর্ণ বর্ত্তমানে ১৪৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। সুতরাং ১২৫ ভরি স্বর্ণের পরিবর্ত্তে এই ব্যক্তি এখন ৫৫½ ভরি স্বর্ণ পাইবেন। এই ভাবে সকল সঞ্চয়ের ধনে অর্দ্ধেকের অধিক ভাগ হসাইয়াই ভারত সরকারের মালিক কংগ্রেস পার্টি খুশী হয়েন নাই। যাহা রহিল তাহার উপর মূলধন কর বসাইয়া সকল সঞ্চয়ের উপর নিজ অধিকার বিস্তার করিতে ব্যস্ত হইলেন। ব্যক্তির কোন অধিকারেই কংগ্রেসের বিশ্বাস নাই এবং ব্যক্তির অবস্থার উত্তরোত্তর হানা করিয়া কংগ্রেস স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ করিতেছেন। যে "মহামানবে"র কথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন সেই মহামানব আজ নীচ প্রকৃতির নেতাদিগের কবলে পড়িয়া ধর্ষিত, অবমানিত ও দাসত্বের কারাগারে অবরুদ্ধ। কন্‌ষ্টিটিউশনের বিভিন্ন "মূল অধিকার"গুলিতে "জল" মিশাইয়া কংগ্রেস আজ অধিকার কথাটির অর্থ বদলাইয়া দিয়াছেন। অধিকার অর্থে বুঝিতে হইবে ধর্ম্ম ও ত্যাগের অভিনয়কারী নেতাদিগের চরণসেবা। কম্যুনিষ্টগণ কংগ্রেসের এই কার্য্যে মহা আনন্দে মশগুল। এক পার্টির সিংহাসনে অপর পার্টির বসিতে সময় লাগে না। যে আমলাতন্ত্রের নাম আজ কম্যুনিজম দেওয়া হইয়াছে কংগ্রেসও সেই আমলাতন্ত্রেরই প্রবর্ত্তক। "মহামানব" আমলাদিগের চরণ সেবা করিয়া দিন গুজরান করিবেন, ইহাই কংগ্রেসী ও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রীয় আদর্শ। শিক্ষায় "জল" মিশাইয়া সেই "জলে" মানবের মস্তিষ্ক ধোলাই করিয়া সে মস্তিষ্কে কংগ্রেসী অথবা কম্যুনিষ্ট "আদর্শ" মাত্র রক্ষিত থাকিবে এবং নিজ অধিকার ও স্বাধীনতা বা স্বাধীন চিন্তার আগ্রহ মস্তিষ্ক হইতে ধুইয়া-মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া যাইবে। এই আমলাচরণসেবা নীতির ফল কি তাহা "আমাদিগের" নব-প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় কারখানাগুলিতে উত্তমরূপে দেখা যায়। যেখানে "প্রাইভেট" অথবা বেসরকারী কারখানাগুলিতে কারখানার বেসরকারী চালকদিগকে উপযুক্ত বেতন, বিভিন্ন "বোনাস", "ওভার টাইম", বেতন প্রভৃতি দিতে শ্রমিকগণ বাধ্য করিয়াছে; সেই শ্রমিকগণই সরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে সেই সকল সুখ-সুবিধা পাইতে অধিকারী নহে। অথচ সেই কারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলি "ভারতের মহামানবের" নিজস্ব বলিয়া প্রচারিত। যাহা কোনও ব্যক্তির অধিকারে নাই, যাহা হইতে কোন ব্যক্তির সুখ-সুবিধা সম্পূর্ণ হইতেছে না; শুধু লাভ হইতেছে আমলা, বিশেষ বিশেষ কনট্রাক্টর ও যন্ত্র

সরবরাহকারীদিগের কিম্বা কংগ্রেসী নেতাদিগের "ভাতিজা"দিগের; সে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান ভারতের মহামানবের নিজস্ব, একথা একটি অতি নিষ্ঠুরের প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার অভিব্যক্তি। সরকারী খরচায় খানা খাইয়া তাহাতে সাধারণের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে বলা যত বড় মিথ্যা; ইহা তাহা হইতে কোন অংশে কম মিথ্যা নহে। কারখানায় চাকুরি পাইয়া শ্রমিকদিগের শরীরের, মনের বা আত্মার উন্নতি হইতেছে, ইহাও সত্য নহে। কবির "অচলায়তন" ও "মুক্তধারা" এই প্রসঙ্গে পাঠ করা উচিত। অ

পার্টির প্রয়োজন আছে কি?

অনেক পার্টির নেতা বা অনুচর আমাদিগকে বলিয়া থাকেন যে পার্টি না থাকিলে সাধারণতন্ত্রের আদর্শ রক্ষা সম্ভব হয় না এবং তথাকথিত "ডিমক্রাসি" চলিতে পারে না। আমাদের মনে হয় যে, অপর দেশে সাধারণতন্ত্র নিজ স্বরূপ, স্বভাব ও আদর্শ বজায় রাখিয়া চলিতে হইলে পার্টি গঠন করিয়া সে কার্য্য সুসাধিত করিতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষে তাহা পারে না। ইহার কারণ এই দেশের সাধারণ বহু শতাব্দী রাষ্ট্রীয় অত্যাচার, উৎপীড়ন ও দুর্ব্বলের উপর প্রবলের আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও অপর সকলপ্রকার আধিপত্য সহ্য করিয়া ও মানিয়া লইয়া চলিতে অভ্যস্ত, এবং এই হীন অভ্যাসের সুবিধা অবলম্বন করিয়া দুর্নীতিপরায়ণ লোকে এদেশে বহুকাল হইতে জনসাধারণের শোষণ কার্য্য নিজেদের লাভের জন্য চালাইয়া আসিয়াছে। রাজপুত, মারাঠা ও শিখের আত্মবলিদানের ফলে যখন ভারত হইতে মোগলসাম্রাজ্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে আরম্ভ করিল তখনও দেখা গিয়াছিল বর্গীর, ঠগীর, পিণ্ডারির ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডাকাইত ও রাজার আবির্ভাব। আজ ব্রিটিশের ভারত সাম্রাজ্যের অবসানে দেখা যাইতেছে, প্রদেশকেন্দ্রিক ক্ষুদ্র নেতা ও তাহাদিগের অনুচরদিগের অত্যাচার ও শোষণ। এবং কেন্দ্রস্থল দিল্লীতে দেখা যায়, পরিকল্পনার নামে জনসাধারণের ভোগের বা সঞ্চয়ের অর্থ যথা ইচ্ছা রাজকর বসাইয়া পার্টির আয়ত্তে আনিযা যেনতেন প্রকারে অপব্যয় করিয়া পার্টির সহায়কদিগের সুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা। ইহা ঠগী ও বর্গীর অত্যাচারের মত হিংস্র ও বর্ব্বর ভাবে অনুপ্রাণিত না হইলেও ইহার ফলে সাধারণের ক্ষতি হইয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও গণ্ডির লাভ হইতেছে। আসামে পার্টির লোকেরা বাংলাভাষাভাষীর উপর যে অত্যাচার করিয়াছে তাহা বর্গীর আক্রমণের সহিত তুলনীয়। এই সকল কথার বিস্তৃত আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সুসংযত রাষ্ট্রীয় পার্টি গঠনে ভারতের সাধারণ অক্ষম। কংগ্রেস স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় পার্টি ছিল না, ছিল বিক্ষুব্ধ জনমত ও সার্ব্বজনীন স্বাধীনতা প্রয়াসের প্রতীক। সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, গান্ধী প্রভৃতি নেতাগণ গণ্ডিগত দল পাকাইয়া কিছু করিতেন না। তাঁহাদিগের তেজ ও উদ্দীপনা সাধারণে প্রক্ষিপ্ত হইয়া দেশব্যাপী জাগরণের সৃষ্টি করে। যাহারা সেই যুগে স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়া অস্ত্রের সাহায্যে অথবা বিনা অস্ত্রে ব্রিটিশের সহিত যুঝিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন রাষ্ট্রীয় পার্টি গঠন করিবার জন্য সে সময়ে যোগদান করেন নাই। আমেরিকার "ওয়ার অফ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স" তদ্দেশের "রিপাবলিকান" কিম্বা "ডেমোক্রাট" পার্টির দ্বারা চালিত হয় নাই। ইংলণ্ডের "ম্যাগনাকার্টা" হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ "রেপ্রিজেন্টেশন অফ দি পিপ্লস্ অ্যাক্ট" পর্য্যন্ত কোন স্বাধীনতা চেষ্টাই জনসাধারণকে বাদ দিয়া কোন রাষ্ট্রীয় দল চালান নাই। হাঙ্গেরীতে "কসুথ", ইটালিতে "কাভুর", ফ্রান্সে "জাঁন্ দার্ক" হইতে "রোবস্পিয়ের-দ্যাঁতঁ" কেহই কোথাও পার্টি গঠন করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ে পরিণত করেন নাই। পার্টি গড়িলেই যদি তাহা কম্যুনিষ্টের মত খাল কাটিয়া কুমির ঢুকাইবার চেষ্টা অথবা কংগ্রেসের মত সামান্য সংখ্যক লোকের সুবিধার অস্ত্র আমলাতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে আমাদিগের কনষ্টিটিউশন পরিবর্ত্তন করিয়া পার্টিগুলিকে বেআইনী করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কোনও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করিতে হইলে উত্তমরূপে গঠিত উত্তম ব্যক্তির দ্বারা চালিত বিচারকদিগের নিকট "ভোট" প্রার্থীদিগকে প্রথমে যাইতে হইবে। তাঁহাদিগের অনুসন্ধান ও বিচারে যদি কেহ লোকসভা অথবা বিধানসভার সভ্য হইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হন; তাহা হইলে তখন সেই সকল ব্যক্তি নির্ব্বাচনের আসরে নামিতে পারিবেন। ভারতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে দেখা যাইতেছে পার্টি জাতীয়তার ও স্বাধীনতার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রদেশগুলি ক্ষুদ্রচেতা নেতৃত্বের তাড়নায় সকল আদর্শ ভুলিয়া ঠগী, বর্গী ও পিণ্ডারির মনোভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া চলিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ভারতের সকল লোকই হিন্দিভাষাভাষী নতুবা হিন্দি "সভ্যতা" অভিলাষী এই মাতালের স্বপ্নে বিভোর। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে পার্টির বিষ ছড়াইয়া পড়িয়া এই মহাজাতিকে ধ্বংসের পথে দ্রুত লইয়া চলিয়াছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন ভারতের সভ্যতা

একটি সাজান পুষ্পগুচ্ছের মত। প্রত্যেকটি ফুল তাহাতে নিজ স্বরূপ ও সৌন্দর্য্য পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া পুষ্পগুচ্ছের সৌন্দর্য্য, বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব পূর্ণতর ভাবে প্রকাশ করিতেছে। কাহারও মাতৃভাষা হিন্দি না হইলেও হিন্দী বলিয়া মানিতে হইবে, ধর্ম্মে নিজের মত অপরের মতে মিলাইতে হইবে, আসামে বাঙালি মেয়েদের মেখলা না পরিলে অবমানিত ও ধর্ষিত হইতে হইবে ইত্যাকার "আদর্শ" বর্ব্বর পাটিবাজির মতলবে প্রচারিত। ভারতের জাতীয়তা এই সকল মতলবের দ্বারা নষ্ট ও ধ্বংসিভূত হইবে। কবিগুরু বলিয়াছিলেন :

"প্রভেদের মান যদি ঐক্য পাবে তবে,
প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদ বৃদ্ধি হবে।"
"আঁধার একেরে দেখে একাকার ক'রে,
আলোক একেরে দেখে নানাদিক ধ'রে।"
"ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা।
"ভালো যে করিতে পারে ঘোরে দ্বারে এসে
ভালো যে বাসিতে পারে সর্বত্র প্রবেশে।
"আগে খোঁড়া করে দিয়ে পরে লও পিঠে
তারে যদি দয়া বল, শোনায় না মিঠে।"
"প্রেমেরে যে করিয়াছে ব্যবসার অঙ্গ
প্রেম দূরে বসে বসে দেখে তার রঙ্গ॥"

(লেখক—১৯২৬)

পণ্ডিত নেহরু ও শ্রীমোরারজি দেশাইয়ের এই কথাগুলি পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। তাঁহাদের "জাতীয়তাবাদ" যে জাতীয়তাকে সত্যই বাদ দিয়া চলিতেছে এবং জাতিধর্ম্ম একটা মহা অন্যায় হইয়া দাঁড়াইতেছে, তাহা তাঁহাদিগের জানাইবে কে?

অ

বাংলার কৃষ্টি

বঙ্গসাহিত্যে সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটার আসা-যাওয়ার মতই একটি স্বভাবজাত পরিবর্ত্তনশীলতা লক্ষিত হয়। এই সাহিত্য কখন জীবন্ত ও উন্নতিশীল ও কখন বা অবনতির গভীরে পতনোন্মুখ দেখা যায়। ইতিহাসে বহুবার এই ওঠা-নামার খেলা হইয়া গিয়াছে এবং মনে হয় এ খেলার শেষ হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "আধুনিক সাহিত্য" আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে বলেন,

"আমরা কিশোরকালে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে ভাবের সেই নবসমাগমের মহোৎসব দেখিয়াছিলাম; সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া যে একটি আশার আনন্দ নূতন হিল্লোলিত হইয়াছিল তাহা অনুভব করিয়াছিলাম—সেইজন্য আজ মধ্যে মধ্যে নৈরাশ্য উপস্থিত হয়।...

"বঙ্কিমচন্দ্র স্বহস্তে বঙ্গভাষার সহিত যেদিন নবযৌবন-প্রাপ্ত ভাবের পরিণয় সাধন করাইয়াছিলেন, সেই দিনের সর্ব্বব্যাপী প্রফুল্লতা এবং আনন্দ-উৎসব আমাদের মনে আছে। সেদিন আর নেই।

* * * *

"এইরূপ হইয়া থাকে এবং এইরূপই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কাহার প্রসাদে এরূপ হওয়া সম্ভব হইল সে কথা স্মরণ করিতে হইবে। আমরা আত্মাভিমানে সর্ব্বদাই তাহা ভুলিয়া যাই।

"ভুলিয়া যে যাই তাহার প্রথম প্রমাণ, রামমোহন রায়কে আমাদের বর্ত্তমান বঙ্গদেশের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া আমরা জানি না। কি রাজনীতি, কি বিদ্যাশিক্ষা, কি সমাজ, কি ভাষা—আধুনিক বঙ্গদেশে এমন কিছুই নাই, রামমোহন রায় স্বহস্তে যাহার সূত্রপাত করিয়া যান নাই। এমন কি, আজ প্রাচীন শাস্ত্রালোচনার প্রতি দেশের যে এক নূতন উৎসাহ দেখা যাইতেছে রামমোহন রায় তাহারও পথপ্রদর্শক। যখন নবশিক্ষাভিমানে স্বভাবতই পুরাতন শাস্ত্রের প্রতি অবজ্ঞা জন্মিবার সম্ভাবনা, তখন রামমোহন রায় সাধারণের অনধিগম্য বিস্মৃতপ্রায় বেদ-পুরাণ-তন্ত্র হইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন।

"বঙ্গদেশ অদ্য সেই রামমোহন রায়ের নিকট কিছুতেই হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে চাহে না।

"রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জন দশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলা ভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্ব্বরা শস্য-শ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে।..."

নিজ কিশোরকালের তুলনায় পরবর্ত্তীকালে যে সাহিত্যরস ঐশ্বর্য্যের অভাব কবি রবীন্দ্রনাথ অনুভব করিয়াছিলেন; তিনি নিজেই সে অভাব বহুতরে দূর করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরে বাংলা সাহিত্য আবার অবনতির গভীরে নামিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। ইহার কারণ রূপরসভাব ও কল্পনার দৈন্য এবং কষ্টকল্পিত "প্রেরণার" অভিব্যক্তি চেষ্টা। মধ্যে মধ্যে অবশ্য সত্যকার আলোকও দেখা গিয়াছে। অকৃতজ্ঞতা, গুণীর অসম্মান ও নির্গুণের জয়গান প্রভৃতি দোষও শতাধিক

বৎসর মজুত রহিয়াছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় আমাদের তাঁহার বহুবর্ষ পূর্ব্বের কথাগুলি বিশেষ করিয়া স্মরণ করা প্রয়োজন। বিদ্যা, জ্ঞান ও সত্যের অনুসরণ না করিয়া সস্তার চালাকি ও কারসাজির সাহায্যে জাতীয় উন্নতিসাধন যে অসম্ভব, আজ তাহা স্বীকার করিয়া অনুতপ্তপ্রাণে নূতন পথে চলিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

অ

জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম

ভারতের জাতীয়তাবোধ কোন্ সময়ে প্রথম জাগ্রত হইয়া ভাষায় ও কার্য্যে ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হইল, ইহা লইয়া বহু জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি আজকাল হইতেছে। এই সকল সত্য-মিথ্যার ও মিথ্যা-সত্যের অবতারণার কারণ হইল সমষ্টিগত ভাবে জাতীয় কুল-পঞ্জিকায় অভিজাত-বংশে স্থানলাভ চেষ্টা। ভারতের জাতীয়তাবাদ কাহারা আরম্ভ করিল, জাতীয় ভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামই বা কাহারা প্রথম ঘোষণা করিল, জাতীয় স্বাধীনতা প্রয়াসের জন্য কে প্রথম আত্মবলিদান করিয়া ভারত-ইতিহাসে অমরত্বের অধিকারী হইল; ইত্যাদি বহু প্রশ্নের উত্তর ইচ্ছা ও সুবিধামত ভাবে দেওয়া হইয়াছে, হইতেছে ও হইতে থাকিবে। আমরা যাহারা উত্তর ও বিহার প্রদেশাগত পুলিসের লাঠি দুই-চারি ঘা খাইয়াছি, স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে আমাদের মনে পুলিসের সহিত উক্ত দুই প্রদেশের "মরদ"দিগের সম্বন্ধ অটুট ভাবে জড়িত রহিয়াছে। আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা উঠিলেই মনে করি স্বদেশী ও মাণিকতলার বোমার বাগানের কথা। মনে করি, শ্রীঅরবিন্দ, ক্ষুদিরাম বসু, উল্লাসকর, ধাংরা, সাভারকর ও আরও শত শত আত্মত্যাগী বীরপুরুষের কথা। পরে আরও অনেক নরনারী সেই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন, যাহাদের মধ্যে উত্তর ও বিহার প্রদেশেরও অনেক যোদ্ধা আসিয়াছিলেন। কিন্তু যদি পুস্তক লিখিয়া ও গল্প প্রচার করিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয় যে, ভারতে সর্ব্বপ্রথমে বিহার কিংবা উত্তর প্রদেশের কোনও লোকেই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে সেই পুস্তকে বা গল্পে বিশ্বাস আমাদের হইতে পারে না, কারণ আমরা সাক্ষাৎভাবে জানি যে, স্বদেশীর যুগেই প্রথম সেই সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছিল বাংলা দেশে। আমরা একথাও জানি যে, জাতীয় ভাবে চিন্তা করিতে এখনও উত্তর প্রদেশ ও বিহারের লোকেরা পারেন না—তখন ত পারিতেনই না। তাঁহারা এখনও নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অকারণ অহমিকার আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন। জাতীয়তা নাই তাঁহাদিগের; প্রাদেশিকতা অথবা ভাষার গণ্ডি সৃষ্টি করিয়া তাঁহারা নিজেদের চরিত্র, কৃষ্টি ও আদর্শবাদের অক্ষমতা ভারতের বক্ষে বিরাট্ পাথরের মতই চাপাইয়া দিয়া দেশ শাসনের ব্যবসায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশীদারের অধিকার দাবি করিতে ব্যস্ত। থাক সে কথা।

ভারতের জাতীয়তাবাদ আরম্ভ হইয়াছিল আরও পূর্ব্বে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান জনসমাজে কলিকাতায়, বোম্বাইয়ে ও হয়ত আরও কোন কোন শহরে। যাঁহাদিগের কথা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই ও যাঁহারা সকল দলাদলির উপরে থাকিতেন সর্ব্বকালে ও সকল অবস্থায়; তাঁহাদিগের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্থান সর্ব্বোচ্চে। তাঁহার কয়েকটি কথা এই স্থলে পুনরাবৃত্তি করিলে উপরে আলোচিত বিষয়টি কিছুটা পরিষ্কার হইবে বলিয়া মনে হয়। এই কথাগুলি রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ডের (বিশ্বভারতী ১৩৫২) "অবতরণিকা" হইতে উদ্ধৃত।

"আমি এসেছি যখন, এ বাসায় তখন পুরাতন কাল সদ্য বিদায় নিয়েছে, নতুন কাল সবে এসে নামল, তার আসবাবপত্র তখনও এসে পৌঁছয় নি।

* * * *

"......তখন বাড়ীর হাওয়া সেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যরস সম্ভোগে আন্দোলিত, সার ওয়াল্‌টার স্কটের প্রভাবও প্রবল। দেশ-প্রীতির উন্মাদনা তখন এ দেশে কোথাও নেই। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' আর তার পরে হেমচন্দ্রের 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' কবিতায় দেশমুক্তি-কামনার সুর ভোরের পাখীর কাকলির মত শোনা যায়। হিন্দুমেলার পরামর্শ ও আয়োজনে আমাদের বাড়ীর সকলে তখন উৎসাহিত, তার প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন নবগোপাল মিত্র। এই মেলার গান ছিল মেজদাদার লেখা 'জয় ভারতের জয়', গণদাদার লেখা 'লজ্জায় ভারত-যশ গাইব কি করে' বড়দাদার 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি'। জ্যোতি-দাদা এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন, একটি পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন, ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজ-নারায়ণ বসু তার পুরোহিত; সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলেম।

"এই সকল আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ উদ্যোগ এর কিছুই ঠেলাঠেলি ভিড়ের মধ্যে নয়। শান্ত অবকাশের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে এর প্রভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ

করেছিল। রাজ-সরকারের কোতোয়াল হয় তখন সতর্ক ছিল না, নয় উদাসীন ছিল, তারা সভার সভ্যদের মাথার খুলি ভঙ্গ বা রসভঙ্গ করতে আসে নি।"

অর্থাৎ যদি ঠাকুরবাড়ীতে ১৮৬৫-৭৫ খ্রীঃ অব্দে জাতীয়তাবাদ সবেমাত্র জাগৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; তাহা হইলে ১৮৫৭ খ্রী. অব্দে কেহ কোথাও জাতীয়তা ও স্বাধীনতা অনুভূতির প্রেরণায় গরু বা শূকরের চর্ব্বির নাম করিয়া জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন, একথা ভাবিবার কোন ঐতিহাসিক কারণ নাই। "হইলে ভাল হইত, সুতরাং হইয়াছে", এই ধরনের ন্যায় ও দর্শন অধুনা প্রবল ভাবে প্রচলিত। কিন্তু ইহার মধ্যে সত্য ও সদ্‌বুদ্ধির কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। জাতীয় ভাবে ও জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের উপযুক্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করা আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম। সাম্প্রদায়িকতা যাঁহাদের ধর্ম্ম, ভাষার, ধর্ম্মের, প্রদেশের বা জাতির যে কোনও প্রকারের তাহা হউক না কেন; তাঁহারা জাতীয়তাবাদের শত্রু। রাজনারায়ণ বসু শ্রীঅরবিন্দের আত্মীয় এবং রামমোহন রায়ের ভক্ত ছিলেন। অ

মুক্তধারা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের যন্ত্রের যুগের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব ছিল। তিনি নিছক আধ্যাত্মিকতায় অথবা শুধুমাত্র কাব্য-সুর বা সৌন্দর্য্যবাদে নির্ভর করিয়া জগতবাসীকে মানবজীবন পদ্ধতি গঠন করিতে বলেন নাই; কিন্তু তেমনি আবার অধিক মাত্রায় যান্ত্রিক বাড়াবাড়িতে জড়াইয়া পড়িতেও ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়াছেন। "মুক্তধারা" নাটকের দুই-চারিটি কথা এই স্থলে উদ্ধৃত করিতেছি; তাহার চিন্তার ধারা যাহাতে আমাদের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত না হয় সেই জন্য। বিভূতি কামার যখন "মুক্তধারা"কে নিজের দানবীয় যন্ত্রে বাঁধিয়া ফেলিল তখন তাহাকে কাঁধে উঠাইয়া তাহার বন্ধুরা গাহিল

"নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র, নমো যন্ত্র।
তুমি চক্রমুখরমন্দ্রিত,
তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ
ধ্বংস-বিকট দন্ত।
তব দীপ্ত অগ্নি শত শতঘ্নী
বিঘ্নবিজয় পন্থ।
তব লৌহগলন শৈলদলন
অচল-চলন মন্ত্র।
কভু কাষ্ঠলোষ্ট্রইষ্টকদৃঢ়
ঘনপিনদ্ধ কায়া,
কভু ভূতল-জল-অন্তরীক্ষ
লঙ্ঘন-লঘুমায়া,
তব খনি-খনিত্র-নখ-বিদীর্ণ
ক্ষিতি বিকীর্ণ-অন্ত্র
তব পঞ্চভূত-বন্ধন কর
ইন্দ্রজাল তন্ত্র।"

কবি যে যন্ত্রের পূজারী ছিলেন না তাহার পরিচয় এই গানের কথায় ও উপহাসের ভঙ্গিতে পাওয়া যায়। যন্ত্রটাকে পছন্দ করা শক্ত। যে রাজার আদেশে যন্ত্রটাকে গড়িয়া আকাশের আলোক আঁধার করিয়া বিকটভাবে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইল, তিনি নিজেই বলিলেন;

"দেখেছ, ওর পিছন থেকে সূর্য্য যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। আর ওটাকে দানবের উদ্যত মুষ্টির মত দেখাচ্ছে। অতটা বেশী উঁচু করে তোলা ভাল হয় নি।"

যুবরাজ অভিজিৎ যন্ত্রের বন্ধন অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেন। তিনি মানবের মুক্তির জন্য পাগল। বস্তুর শৃঙ্খল কঠিন ও ব্যাপ্ত করিয়া মানুষের মনের-প্রাণের, আনন্দের ও মঙ্গলের প্রসার হয় একথা তিনি মানেন না। তিনি বলিলেন, "...সইতে পারছি নে ওই বীভৎসটাকে যা এই ধরণীর সঙ্গীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য করছে। স্বর্গকে ভাল লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে।" আরও বলিলেন, "ডান-হাতের কার্পণ্য দিয়ে পথ বন্ধ করে বাঁ-হাতের বদান্যতায় বাঁচান যায় না।" যেন মোরারজীর অর্থনীতির উদ্দেশ্যেই লিখিত। ফুলওয়ালী যখন প্রশ্ন করিল বিভূতি মানুষটিকে, সাধুপুরুষ বুঝি? তখন রাজকুমার সঞ্জয় বলিলেন,

"...সাধুপুরুষ না হ'ক, বুদ্ধিমান পুরুষ বটে।
"...কি কাজ করেছেন তিনি?
"...আমাদের ঝরণাটাকে বেঁধেছেন।
"...বাঁধে কি দেবতার কাজ হবে?
"...না, দেবতার হাতে বেড়ি পড়বে।"

অর্থাৎ অসংযত দম্ভে অতিমাত্রায় যন্ত্রবৃদ্ধি দেশের পক্ষে; গরীবের পক্ষে প্রগতি ও উন্নতির রথের চক্র নির্ম্মাণ নহে, অধমর্ণের বক্ষের উপর দিয়া চক্রবৃদ্ধির চক্র চালনার মতই সে যন্ত্রবৃদ্ধি সাধারণের যন্ত্রণা ও সর্ব্বনাশের কারণ হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আজ এই দেশে থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই শিশুর দুগ্ধ, রুগীর ঔষধ, শিক্ষার্থীর পাঠ ও ক্ষুধার্ত্তের অন্ন কাড়িয়া লইয়া কারখানা নির্ম্মাণের বিরুদ্ধে

একটা অভিযান করিতেন। ডান হাতের কার্পণ্য ও বাঁ হাতের বদান্যতার চূড়ান্তও তিনি মোরারজীর কর্মকুশলতায় দেখিতে পাইতেন। অ

ভারতীয় সভ্যতা

ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ কি, সেকথা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আজ আবার বলিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। "শান্তিনিকেতন" প্রবন্ধমালার অন্তর্গত "তপোবন" প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় ও আমেরিকার অরণ্য বিক্রয় প্রচেষ্টার তুলনা করিয়া লেখেন :

"আমেরিকার অরণ্যে যে তপস্যা হয়েছে তার প্রভাবে বনের মধ্যে থেকে বড়ো বড়ো শহর ইন্দ্রজালের মতো জেগে উঠেছে। ভারতবর্ষেও তেমনি করে শহরের সৃষ্টি হয় নি তা নয় কিন্তু ভারতবর্ষ সে সঙ্গে অরণ্যকেও অঙ্গীকার করে নিয়েছিল। অরণ্য ভারতবর্ষের দ্বারা বিলুপ্ত হয় নি, ভারতবর্ষের দ্বারা সার্থক হয়েছিল, যা বর্বরের আবাস ছিল তাই ঋষির তপোবন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমেরিকার অরণ্য যা অবশিষ্ট আছে তা আজ আমেরিকার প্রয়োজনের সামগ্রী, কোথাও বা তা ভোগের বস্তুও বটে, কিন্তু যোগের আশ্রম নয়। ভূমার উপলব্ধি দ্বারা এই অরণ্যগুলি পুণ্যস্থান হয়ে ওঠে নি। মানুষের শ্রেষ্ঠতর অন্তরতর প্রকৃতির সঙ্গে এই আরণ্য প্রকৃতির পবিত্র মিলন স্থাপিত হয় নি। অরণ্যকে নব্য আমেরিকা আপনার বড়ো জিনিস কিছুই দেয় নি, অরণ্যও তাকে আপনার বড়ো পরিচয় থেকে বঞ্চিত করেছে।···

"নগর-নগরীই আমেরিকার সভ্যতার প্রকৃষ্ট নিদর্শন —এই নগর-স্থাপনার দ্বারা মানুষ আপনার স্বাতন্ত্র্যের প্রতাপকে অভ্রভেদী করে প্রচার করেছে। আর তপোবনই ছিল ভারতবর্ষের সভ্যতার চরম নিদর্শন ; এই বনের মধ্যে মানুষ নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে আত্মার মিলনকেই শান্ত সমাহিতভাবে উপলব্ধি করেছে।

"কেউ না মনে করেন ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আমি একমাত্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা করি। আমি বরঞ্চ বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে, মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্যের সীমা নেই।···

"মানুষের ইতিহাস জীবধর্মী। সে নিগূঢ় প্রাণশক্তিতে বেড়ে ওঠে। সে লোহা পিতলের ছাঁচে ঢালবার জিনিস নয়। বাজারে কোনো বিশেষ কালে কোনো বিশেষ সভ্যতার মূল্য অত্যন্ত বেড়ে গেছে বলেই সমস্ত মানবসমাজকে একই কারখানায় ঢালাই করে ফ্যাশনের বশবর্তী মূঢ় খরিদ্দারকে খুশি করে দেবার দুরাশা একেবারেই বৃথা।

"ছোটো পা সৌন্দর্য বা আভিজাত্যের লক্ষণ, এই মনে করে কৃত্রিম উপায়ে তাকে সংকুচিত করে চীনের মেয়ে ছোটো পা পায় নি, বিকৃত পা পেয়েছে। ভারতবর্ষও হঠাৎ জবরদস্তি দ্বারা নিজেকে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুগত করতে গেলে প্রকৃত য়ুরোপ হবে না, বিকৃত ভারতবর্ষ হবে মাত্র।"

দিল্লীর হিন্দুস্থানী আভিজাত্যের যে পাশ্চাত্য ঢঙের অভিব্যক্তি ; যাহার তাড়নায় সর্বত্র কিম্ভূতকিমাকার ঘরে ঘরে নকল বিদেশী প্রতিষ্ঠান ও আচরণের হাস্যকর অনুকরণ-চেষ্টা প্রকট হয়ে উঠেছে ; সে "আদর্শ" আমাদের সভ্যতার নহে এবং তাহার ফলে অফিস দপ্তর ডিপার্টমেণ্ট কমিশন, এমনি কারখানা অবধি গড়িয়া উঠিতে পারে কিন্তু ভারতবর্ষের তাহাতে মনের প্রাণের কতটা লাভ কিম্বা উন্নতি হইতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়। উৎকট অনুকরণপ্রিয়তার ফল যে অন্তরের অবনতি তাহা আজ জাতিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে কিন্তু সে অবনতির পরিবর্তে পাওয়া কি যাইবে তাহা জানা যায় নাই। কবি অতঃপর বলিতেছেন :

"এ-কথা দৃঢ়রূপে মনে রাখতে হবে, এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির অনুসরণের সম্বন্ধ নয়, আদান-প্রদানের সম্বন্ধ।···

"ভারতবর্ষ যদি খাঁটি ভারতবর্ষ হয়ে না ওঠে তবে পরের বাজারে মজুরিগিরি করা ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কোনো প্রয়োজনই থাকবে না। তাহলে তার আপনার প্রতি আপনার সম্মান-বোধ চলে যাবে এবং আপনাতে আপনার আনন্দও থাকবে না।

"তাই আজ, আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, যে-সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিত ভাবে লাভ করতে পারে সে সত্যটি কী। সে সত্য প্রধানত বণিকবৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয় ; সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা। সেই সত্য ভারতবর্ষের তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিষদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতায় ব্যাখ্যাত হয়েছে···

"প্রবলতার মধ্যে সম্পূর্ণতার আদর্শ নেই। সমগ্রের সামঞ্জস্য নষ্ট করে প্রবলতা নিজেকে স্বতন্ত্র করে দেখায় বলে তাকে বড়ো মনে হয় কিন্তু আসলে সে ক্ষুদ্র। ভারতবর্ষ এই প্রবলতাকে চায় নাই, সে পরিপূর্ণতাকেই চেয়েছিল।"

বিধানচন্দ্রর দুর্গাপুরের অরণ্য ধ্বংস, কলিকাতার ময়দান ও রাজভবনের উদ্যান বিনাশ এবং জবাহরলালের বিভিন্ন প্রচেষ্টার সহিত আজ আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইতে চলিয়াছে। ভারতের কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে ভারতীয় কৃষ্টি ও ভারতীয়ের প্রাণের আনন্দ

কতটা বাড়িবে তাহা ওজন করিয়া দেখিবার সময় শীঘ্রই আসিবে! পেটের ক্ষুধা, মস্তিষ্কের নিরেট ভাব ও মনের অশান্তি কারখানাজাত দ্রব্যে ও চাকুরীলব্ধ বেতনে কতটা দূর হইবে তাহাও দেখিবার সময় হইয়া আসিল। আমাদের মনে একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিতেছে যে, হয়ত এই সকল কর্ম্মের অভিযান যে-উদ্দেশ্যে আরম্ভ হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। আধ্যাত্মিক জগতে ভারত নিজের উচ্চস্থান হারাইয়া বহু নিম্নে চলিয়া আসিবে। কারখানার জগতে তাহার স্থান অল্প কিছু উঠিবে, কিন্তু অতি অল্প মাত্র। পেটের ক্ষুধা ইত্যাদি দূর হইবে না, বরং অল্প খাইয়া আরও বাড়িয়া উঠিবে। নকল-প্রবণতার আগ্রহে ভারতের প্রদেশগুলি নকল স্বাধীনতা সংগ্রাম নিজ নিজ মতলবে করিয়া ভারতবর্ষকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল করিয়া আনিবে। মোট কুফল যাহা হইবে তাহা অমঙ্গলের ও অশুভ। এবং ইহার জন্য দায়ী রহিবেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর পরে যাঁহারা ভারতে গুরুর আসনে বসিয়াছেন। গুরু তাঁহারা সাজিয়াছেন কিন্তু চিন্তা তাহাদিগের অশুদ্ধ।

"অচলায়তন"

মহাকবি রবীন্দ্রনাথের "অচলায়তন" নাটকে তিনি বহু পুরাতন সংস্কার, নিয়ম, পদ্ধতি, বিশ্বাস ও তথাকথিত স্বয়ংসিদ্ধ "সত্যের" উপর গঠিত রীতিনীতির অন্ধ ও কঠোর প্রয়োগের বিরুদ্ধে নিজ মত সরল ধর্ম্মবিশ্বাসের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। পঞ্চক নির্ভিক, অশান্ত, উৎসাহী ও সত্যকে সূত্রের বন্ধনে বাঁধা না রাখিয়া যাচাই করিয়া দেখিতে উৎসুক। আচার্য্য অতি মাত্রায় প্রকৃতি ও মানব চরিত্রের দমনকারক অনুশাসনের উপর নির্ভর করিয়া শেষে চক্ষু কর্ণ প্রাণ খুলিয়া মুক্তির অনন্ত প্রাঙ্গণে বিচরণ-ইচ্ছুক হইয়া পড়িলেন। মহাপঞ্চক ভাঙেন কিন্তু মচকান না। তিনি শেষ অবধি মুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজ অন্ধ বিশ্বাসের নিকট আত্ম-বলিদান দিলেন। মুক্তির দেবতাকে মানিতে হইল যে কঠোর নিয়মের ও অদম্য আত্মসংযমের যিনি শেষ সীমা অবধি পৌঁছিয়াছেন তাঁহাকে কেহ "স্পর্শ করিতেও" পারে না ও তাঁহার নিকট কাহারও "তলোয়ার পৌঁছয় না"। খোলা হাওয়ায় যাহারা পূর্ণ মুক্তির আবেগে ঘুরিয়া ফেরে; মহাপঞ্চকের নিকট তাহারা "মন্ত্রহীন কর্ম্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল।" অচলায়তন বাহিরে প্রাচীর দিয়া চতুর্দ্দিকে আবদ্ধ, ভিতরে লৌহকপাট দিয়া সুরক্ষিত, বাহিরের হাওয়া সেখানে প্রবেশ করে না। তাহার হাওয়া মন্ত্রপূত, তাহার অধিবাসীরা পূজা, প্রায়শ্চিত্ত, সাধনা ও কঠিন আত্মদমনের দ্বারা অভিভূত। উপাধ্যায় সেই অস্বাভাবিক সংগঠনের একজন প্রধান পুরোহিত। তিনি ক্ষুদ্র শিশুকে উপবাস কিম্বা পিপাসায় মরিতে দেখিলে বিচলিত হন না বিশ্বাসের শক্তিতে। তাঁহার মতে "তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মবিধি ত চিরকালের"। পঞ্চক ঐ সকল কথা গ্রাহ্য করেন না। "যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।" সত্যকে পরীক্ষা করিবার দুঃসাহস পঞ্চকের আছে। তিনি ম্লেচ্ছদিগের সঙ্গলাভে আনন্দ বোধ করেন। অচলায়তনের রুদ্ধ মন্ত্রপূত বাতাসে, তিনি দরজা-জানলা খুলিয়া বাহিরের মুক্ত হাওয়ার ভেজাল দিবার চেষ্টা করেন। কোনো মন্ত্রে তাঁহার আস্থা নাই অথচ অপরকে খুশী করিবার জন্য সেগুলি আবৃত্তি খেলাচ্ছলে করিয়া থাকেন। আচার্য্য পঞ্চককে শেষ অবধি মানিয়া লইলেন। বলিলেন, "তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য।"

অচলায়তনের প্রাচীর লৌহকপাট যখন অবিশ্বাসী মন্ত্রহীনরা হৃদয়ের রাজা ভক্তের ভগবানের সাহায্যে ভাঙিয়া ফেলিয়া সেই কারাগারে মুক্তির বায়ু সঞ্চালিত করিয়া দিল তখন কাহারও মনে হইল না যে একটা বিরাট ও মহান প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হইয়া গেল। সকলেই দেখিল যে, সেই সকল নিয়মপদ্ধতি, রীতিনীতি, যাগযজ্ঞ, পূজা প্রায়শ্চিত্ত, মন্ত্রযন্ত্র ইত্যাদি শুধু মাত্র মানব মনকে সম্মোহিত করিয়া রাখিবার একটা উপায় ও মানবাত্মার প্রগতিকে শৃঙ্খলে বাঁধিয়া অগ্রগমনের আড়ষ্ট অভিনয় মাত্র। সকলে এই ভাঙার মধ্যে মুক্তির আস্বাদ পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

আধুনিক ভারতে এই আড়ষ্ট অভিনয় একাধিক আকারে লক্ষিত হয়। ঐ যে প্রাচীনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মায়ামুগ্ধ অবসন্ন গতিহীনতা, তাহাত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত রহিয়াছেই; তাহার উপরে আধুনিক যুগের নব নব অন্ধ বিশ্বাস সকলের গতি ও মুক্তিকে নাশ করিতে সর্ব্বদাই উদ্যত। কত "ইজ্‌ম্" যে আসে ও কত "ইজ্‌ম্" যে যায় তাহার হিসাব নাই। কেহ বলেন আমরা এই উপায়ে, এই পথে, এই পন্থায়, এই মন্ত্র জপিয়া স্বর্গলাভ করিব; কেহ বলেন না ঐ উপায়, পথ, পন্থা ও মন্ত্র ঠিক নহে; সত্যপথ ও অভ্রান্ত মত ও মন্ত্র হইল অন্য প্রকার। কিন্তু কেহই নিজ প্রচারিত "সত্য" পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত নহেন। পাছে মত বা মতলব বাতিল হইয়া যায়। এমত অবস্থায় কবির মুক্তির গান শুনিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে মনে হয়।

অ

ভারত-ধর্ম্ম ও রাজনীতি

শ্রীগৌতম সেন

মানবতা অপেক্ষা পার্টি বড়। ইহাই রাজনীতির ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের অনুশাসন চলিতেছে সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া। কিন্তু ভারতবর্ষ কোনদিনই পলিটিক্যাল স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নাই। এবং হিন্দু-সভ্যতা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপরেও প্রতিষ্ঠিত নহে। সে চিরকাল সমাজকেই স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। এবং এই সামাজিক ঐক্যই তার সভ্যতার মূলে রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্র-নীতি। সামাজিক মহত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব।"

এই আর একটি শব্দ 'নেশন'—যাহার প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নাই, কোনকালে ছিলও না। আমরা ইহাকে ভালবাসিতে শিখিয়াছি ইংরেজী শিখিবার পর। অথচ উহাদের এই ন্যাশনাল মন্ত্র আমাদের জাতীয় আদর্শের মধ্যে নাই। আমাদের ইতিহাস, ধর্ম্ম, সমাজ—এমন কি আমাদের গৃহস্থালীর মধ্য হইতেও উহা গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। সেইজন্য আমাদের স্বাধীনতার অর্থও ভিন্ন। ইউরোপ যেখানে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা চাহিয়াছে, আমরা সেখানে চাহিয়াছি সামাজিক স্বাধীনতা। এই সামাজিক স্বাধীনতা হইতেই আসে আত্মার স্বাধীনতা। আজ সে আদর্শ আমাদের সমাজের মধ্যে নাই বলিয়া, ইউরোপের আদর্শকেই আমরা প্রবল ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছি।

আজকের রাজনীতি আমাদের সকল কাজকে অধিকার করিয়া আছে। পলিটিক্‌স ঢুকিয়াছে রন্ধনশালায়। আজ ছাত্রদের নৈতিক-আচরণকেও কলুষিত করিয়াছে এই পলিটিক্‌স-এর বিষ। দোষ উহাদের নহে। আমরাই আপন আপন স্বার্থে তাহাদের নিয়োগ করিয়াছি। আজ তাহাদের দোষ দেওয়া বৃথা। তাহাদের গতি-শক্তির আবেগ আজ এতটা উচ্ছ্বসিত যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনও ইহাতে বিপর্য্যস্ত। এই উচ্ছৃঙ্খলতা যে প্রগতি নহে, তাহারা জানেও না। ইহার উন্মত্ত আত্মপ্রকাশ যে আমাদেরই ঔদাসীন্যে আজ মানুষের জীবনধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিয়া তুলিতেছে, তাহা আমরাও বিস্মৃত হইয়াছি।

আজ সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতিপদক্ষেপে যে উচ্ছৃঙ্খলার আত্মপ্রকাশ ঘটিতেছে, তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে, রাজনীতির বাহিরে চিন্তা করিতে হইবে ভারত-ধর্ম্মকে জানিতে হইলে, ভারতের ইতিহাস লক্ষ করিতে হইবে। ভারত চিরকালই চাহিয়াছে, বিভেদকে জোড়া দিতে, নানা পথকে একই লক্ষ্যপথে লইয়া যাওয়াই হইল তাহার ধর্ম্ম। এই এক করার চেষ্টা এবং বহুর মধ্যে এককে প্রত্যক্ষ করার স্বভাবই তাহাকে রাষ্ট্র-গৌরবের প্রতি উদাসীন রাখিয়াছে। কারণ রাষ্ট্র-গৌরবের মূলে রহিয়াছে বিরোধের ভাব। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে চেষ্টা, তাহাই রাজনীতির ধর্ম্ম। কিন্তু পরকে যেখানে সমাজ-বন্ধনে বাঁধিয়াছি, সেখানে বিরোধের প্রশ্নই আসে না। কারণ বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা, ইহাই ভারত-ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবলেই সমাজ উন্নত হইয়াছে। রবীন্দ্র-নাথের কথায় আসি, "য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলন-মূলক। য়ুরোপীয় পলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্ব্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে।

"ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধ-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া সংযত করিয়া তবে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব।…ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর করে নাই, অনার্য্য বলিয়া কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত

বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে, সমস্তই স্বীকার করিয়াছে।"

সেখানে ইউরোপ পরকে দূর করিয়া, উচ্ছেদ করিয়া নিজেদের নিরাপদ করিয়াছে। এ পরিচয় আমরা আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলাণ্ড হইতে বহুবার পাইয়াছি। তাহারা পরকে মারিয়া বা তাড়াইয়া দিয়া বিরোধকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। ভারতবর্ষ কোনদিনই তাহা করে নাই, সে সকলকে আপনার করিবার চেষ্টা করিয়াছে—ইহাই তাহার ধর্ম্ম, ইহাই তাহার আদর্শ।

"পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভা আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসংকোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। ...পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।"

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকার্য্য এবং বিচার-কার্য্য রাজা করিয়াছেন, অন্যান্য সমস্ত কাজই সমাজ করিয়াছে। সমাজের কাজে কেহ হাতও দেয় নাই, সমাজও কাহারও নিকট হাত পাতে নাই। আজ 'নাই নাই' বলিয়া সর্ব্বত্র রব উঠিয়াছে। এ চীৎকার পূর্ব্বে ছিল না। নালিশ করিব কাহার নিকট? আমার ব্যবস্থা আমিই করিব। আসল কথা, আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। মন গিয়াছে বাহিরের দিকে। বাহির হইতে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা আমাদের সকল দিক দিয়া পঙ্গু করিয়া দিয়াছে। আমাদের সকল কাজই চাপাইয়া দিয়াছি সরকারের উপর। কিন্তু সরকার সমাজের কেহ নয়।

পূর্ব্বে মোগল আমল হইতে ইংরেজ আমল—এমন কি বর্ত্তমানেও সরকার হইতে গুণী ব্যক্তিকে সম্মানিত করা হয়। কিন্তু এমন একদিন ছিল, তাঁহারা এই রাজ-প্রসাদকে যথেষ্ট জ্ঞান করিতেন না—বরং সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদ অপেক্ষা তাঁহাদের কাছে বড় ছিল। গাঁয়ের লোকের মুখ হইতে 'মহাশয়' ডাক শুনিয়া তাঁহাদের বুক ফুলিয়া উঠিত। ইহাতেই বুঝা যায়, রাজধানীর মাহাত্ম্য, রাজসভার গৌরব ইহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই।

চারিদিক হইতে কানে আসে বিশ্ব-মৈত্রী, আন্তর্জ্জাতি-কতা, বিশ্ব-জাতিসঙ্ঘ, মানব-সভ্যতার আদর্শ, মিলনের মধুর বাণী—শুধু ক্ষণিকের জন্য। আবার তেমনি চলে বাস্তবতার বীভৎসতা, তেমনি চারিদিক হইতে কানে আসে পরস্পর পরস্পরকে খুন করিবার জন্য গোপনে অস্ত্র শানাইতেছে। বিশ্বব্যাপী অবিশ্বাস আর ঘৃণা, আর আত্মসর্ব্বস্বতার আয়োজনের বাস্তবতায় ডুবিয়া যায় আদর্শবাদীর ক্ষীণ সুর।

আজকের সভ্য পৃথিবীতে তাই চরম রহস্যের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে, মানুষের সেই চরম আদর্শ বিশ্ব-মৈত্রীর পরিকল্পনা। আদর্শের এমন নির্লজ্জ অপমান, পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও এমন ব্যাপকভাবে দেখা দেয় নাই। মানুষের মুখের কথা আর মানুষের আচরণের মধ্যে পার্থক্য আজ এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার জন্য মানুষ বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বা লজ্জা অনুভব করিবারও প্রয়োজন বোধ করে না। মিথ্যা আজ এমন সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহার মধ্যে যদি কেহ ভুলিয়া সত্য কথা বলিয়াও ওঠেন বা সত্য আচরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই লজ্জিত হইয়া আড়ালে লুকাইয়া থাকিতে হয়।

এই যে মিথ্যার বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি, এই হইল বর্ত্তমান রাজনীতি। ইউরোপ এই রাজনীতি পৃথিবীতে আনিয়াছে। এবং এই রাজনীতির কাছে সে এমনভাবে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলেও, তাঁহার বাঁধন হইতে মুক্ত হইবার পথ তাহার জানা নাই। এক মিথ্যা হইতে আর-এক মিথ্যায়, এক চুক্তি হইতে আর-এক চুক্তিতে, এক ব্যর্থতা আর-এক ব্যর্থতায় ইউরোপ সমগ্র পৃথিবীকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছে।

ভারতবর্ষে অনুসৃত এই বীভৎস রাজনীতির কল-কাঠিতে বাংলা আজ সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছে। তাই আজ বাংলার মানুষের নৈতিক-মেরুদণ্ড এমন করিয়া ভাঙিয়াছে।

আসাম-ত্রিপুরা-কুচবিহার-সিংভূম-মানভূম এবং বিহার সম্বলিত বাংলার সে-মানচিত্র বাঙালী আজও ভোলে নাই। চিরদিন আঘাতের পর আঘাত আসিয়াছে এই বাংলা দেশের উপরেই—বাঙালী জাতির উপরেই।

রাজনীতির কূটচালে বাংলার অনেকখানি অংশ যেদিন বিহারে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল—আসমুদ্র-হিমাচল সেদিন ইংরেজের এই আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, বিদ্রোহ করিয়াছিল।

আজ ইংরেজ-শাসনের অবসান হইয়াছে, কিন্তু আজও বিহার-কবলিত বাংলার অঞ্চলগুলি বাংলার অন্তর্গত হয় নাই। কেন হয় নাই, ইহার কারণ আজও সুস্পষ্ট নহে।

, বাংলার অঙ্গ-ছেদের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও সম্পূর্ণ হইল পাকিস্থানীর পাকচক্রে। পূর্ব্ববঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। বাংলা বলিতে যাহা অবশিষ্ট পড়িয়া রহিল, তাহার মূল্য কষিবার আজ আর প্রয়োজন নাই। বাংলা আজ সর্ব্বহারা। প্রার্থীর মত পাক-অধিকৃত নিজেরই অঞ্চলের দিকে আজ তাহাকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া থাকিতে হয়। বাংলার বাম হাত ও দক্ষিণ হাতকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়া এই বাঙালার উপর চরম আঘাত করিয়াও, বাঙালীকে জব্দ করিবার পরিকল্পনা আজও শেষ হইল না। ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষা হইয়াও বাংলাভাষা রাজসভায় স্থান পাইল না। আজ যে-ভাষা শুধু সমৃদ্ধই নয়—যে-ভাষা জগৎ-সভায় সম্মানের সহিত স্থান লাভ করিয়াছে, তাহাকে কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিয়া ভারতের সংস্কৃতিকে নষ্ট করা হইতেছে। রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হওয়া উচিত, কি বাংলা হওয়া উচিত—এ তর্কেরও আজ অবসান হইয়াছে, কিন্তু শেষ হয় নাই বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলের ভাগ্য-নির্দ্ধারণ।

রাষ্ট্রভাষা হিন্দী হইয়া সে-ভাষা সমৃদ্ধ হউক, ইহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না, কিন্তু মানুষের মন হইতে বাংলাভাষাকে ভুলাইয়া দিবার যে-সব অপকৌশল তাঁহারা করিতেছেন, আমাদের আপত্তি সেইখানেই। একদিন ইংরেজ যে-কৌশল করিয়া তাহাদের ভাষাকে আমাদের রান্নাঘরে ঢুকাইয়া দিয়াছিল, আজ স্বাধীন রাষ্ট্রে সেই নীতির পুনরাবৃত্তি দেখিয়া আমরা লজ্জায় মরিয়া যাইতেছি। ইংরেজ যাহা করিয়াছিল, সে তাহার জাতির স্বার্থের প্রয়োজনে করিয়াছিল, কিন্তু এখানে কাহার স্বার্থ? দেশ এক, জাতি এক, স্বার্থ এক। তবে?

প্রশ্ন আমাদের এইখানেই। সত্য বটে, বাংলা হইতে সেরূপ চীৎকার করিয়া দাবি জানান হয় নাই। কিন্তু আজও কি সেই প্রতিবাদ করিয়া, দাবি জানাইয়া আদায় করিয়া লইবার মনোবৃত্তি আমাদের যাইবে না?

শুনা যাইতেছে, বিহার স্কুল হইতে বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দীভাষা শিখাইবার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বাঙালীকে আজ তাহার মাতৃভাষা ভুলিয়া গিয়া নূতন করিয়া তাহাদেরই নির্দ্দিষ্ট ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। বহু ভাষা শিক্ষা করার বহু গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু মাতৃভাষাকে ভুলিয়া অন্য ভাষাকে আয়ত্ত করিতে হইলে আজ না হোক, দু'দশ বছর পরে না হোক, একদিন-না-একদিন তাহাকে আর বাঙালী বলিয়া চেনা যাইবে না। এই ভুলাইবার মনোভাব লইয়াই বাংলার বাহিরে এক ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হইয়াছে। বাংলার এত বড় সর্ব্বনাশ বোধহয় ইংরেজও করে নাই।

কিন্তু এ কোন্ মানুষ? এই মানুষই সাধনা করিয়াছে—হাজার হাজার বছর ধরিয়া সাধনা করিয়াছে, এ সাধনা সত্যকে জানিবার, নিজেকে চিনিবার। কিন্তু এতদিনের সাধনায় মানুষ কি পাইল? আজও দেখি, মানুষের মধ্যে দুইটি মানুষ সমানভাবে কাজ করিয়া চলিয়াছে—একটি অপরটিকে দাবাইয়া রাখিতেছে। কিন্তু কেবলমাত্র দাবাইয়া রাখিবার জন্যই কি মানুষ এতকাল সাধনা করিয়াছে? কোথায় সেই সভ্যতা, যে-সভ্যতার ঐতিহ্য লইয়া ভারতবাসী এতকাল গর্ব্ব করিয়া আসিতেছে? তাহার যুগ-যুগান্তের সংস্কৃতিকে বিসর্জ্জন দিয়া মানুষ আজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইল? ভাবিতেও কষ্ট হয়, মানুষ একই জায়গায় দাঁড়াইয়া আছে! শিক্ষার দ্বারা আমরা নিজেকে পরিমার্জ্জিত করিয়াছি কিন্তু প্রকৃতি বদল করিতে পারি নাই।

একদিন নোয়াখালির প্রতিক্রিয়া বিহারে দেখা গিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে হত্যা বন্ধ হয় নাই—ভারতের সর্ব্বত্র আগুন জ্বলিয়াও সে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল না। হিংসার বদলে হিংসায় জগতের কোনদিনই কল্যাণ আসে নাই। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সম্ভব হইয়াছে এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে।

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ হইয়াও যিনি মানবতার মূর্ত্তপ্রতীক, সেই মহাত্মা গান্ধী তাই সকলকেই উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পশুশক্তি জগতে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে, মানব-সমাজ বরাবর তাহার কুফল ভোগ করিতেছে—ইহা যে-কোন ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। ভবিষ্যতেও ইহা হইতে কোন কল্যাণের আশা নাই। যদি অন্ধকার হইতে আলোকের উৎপত্তি সম্ভব, তবেই কেবল ঘৃণা হইতে প্রেমের আবির্ভাব সম্ভব হইতে পারে।"

তিনি ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কোনদিনই রাজনীতি করেন নাই। যাহা আত্মার দৃষ্টিতে ধর্ম্ম, তাহাই নীতি। ইহা তাঁহারই কথা। তাই তো তিনি এমন জোর করিয়া বলিতে পারিতেন, "অহিংসার উপর গঠিত সমাজে অধীর হইয়া কেহ অপরের ধ্বংসের আয়োজন করিতে পারে না। কারণ দুষ্কৃতকারী নিজের সংশোধন না করিলে নিজেকেই ধ্বংস করিতে বাধ্য হয়। অন্যায় নিজের জোরে কখনও বাঁচে না।"

আমরা এমন একজন মহামানবকে কাছে পাইয়াও

তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলাম না ইহাই পরিতাপের বিষয়।

মহাত্মা গান্ধী যে-আদর্শ লইয়া ভারতবর্ষ গড়িতে চাহিয়াছিলেন, আজ কি আমরা সেই মহান আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করিব? নীতি গিয়াছে, আদর্শ গিয়াছে—বোধহয় ধর্ম্মও যাইতে বসিয়াছে। সচেতন হইবার এখনও সময় আছে, নহিলে ধর্ম্মহীন রাজনীতির বন্যায় আমরা অসহায়ের মতো একদিন ভাসিয়া যাইব। স্মরণ রাখিতে হইবে, সে-রাজনীতি আমাদের জন্য নহে—ভারতের নীতি স্বতন্ত্র, আদর্শ স্বতন্ত্র। এ আদর্শ রাশিয়ার সাম্যবাদের মধ্যে নাই, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নাই—যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার সাধারণতন্ত্রের মধ্যেও নাই এ আদর্শ।

তাই জগৎ একদিন বিস্মিত নেত্রে মহাত্মা গান্ধীকে নিরীক্ষণ করিয়াছিল—এ তাঁহার কোন্ রাজনীতি, যে-রাজনীতিকে লইয়াছেন তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের সহিত এক করিয়া?

তাঁহার এই দখিত-জীবনের এরূপ অপূর্ব্ব সম্মেলন সত্যই ইতিহাসে নূতন।

হিংসার প্রতিযোগিতায় অন্ধ-জগৎ যখন আপন মদমত্তায় তাহার সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রয়োগ করিয়া শুধু মানবধ্বংসেরই অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া চলিয়াছে, তখন একমাত্র এই মহাতাপসই জগতের সমস্ত উপহাস আর বিদ্রূপকে মাথায় লইয়া জানাইলেন—নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্য দিয়াই মানবের আত্মার পরিস্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু বিদ্বেষ ও যুদ্ধ-সজ্জার মধ্যে মানবের দেহ ও মন উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়।

তবে ভুল তিনিও করিয়াছেন। এ কথা তিনি নিজেও জানিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, মানুষমাত্রেই ভুল করিবে—আমিও করিয়াছি এবং ভবিষ্যতেও করিতে পারি। গান্ধীজী ভারত-বিভাগে সম্মতি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু জিন্নার লোক-বিনিময়ের প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন নাই। গান্ধীজীর এত বড় ভুলের পরিণামই হইল, পূর্ব্ব বাংলার বর্ত্তমান অবস্থা। আজও যাহারা মাটি আঁকড়াইয়া সেখানে পড়িয়া আছে, তাহারাও শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতে বাধ্য হইবে। অথচ, এই সর্ব্বধ্বংসী পরিণামের জন্য কেহই আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। কিন্তু ভাগ্য আমাদের সেই পরিণাম-পথে লইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু সকল দুঃখের কারণকে ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দিলেই বা চলিবে কেন! দুঃখ আমরা নিজেও সৃষ্টি করিয়াছি। স্বাধীনতার বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে আমরাই বাংলা-বিভাগের সম্মতি দিয়া রাতারাতি কাগজে-কলমে সহি করিয়া দিয়াছি। আমরাই বলিয়াছি, যেটুকু পাইতেছি—চোরের কৌপীন লাভের মত, তাহাই লাভ। তাই আপাত-লাভের প্রত্যাশায় আমরা ভবিষ্যৎ-বিচার পর্য্যন্ত করিতে ভুলিয়াছি। আমাদের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া একদল ঝুনা-রাজনৈতিক বাংলার শক্তিক্ষয়ের সহস্র ব্যবস্থা করিয়া লইলেন।

পূর্ব্ব বাংলায় বার বার আমাদের এই সঙ্কটময় অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কিন্তু বার বার চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াও, উভয় রাষ্ট্রে শান্তি আনা যায় নাই। মানুষের সহজ বুদ্ধি এ নিষ্ঠুরতা পরিপাক করিতে পারে না। কিন্তু রাজনীতি চলে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে। রাজনীতি যাহারা করে, তাহারাও মানুষ, আর যাহারা তাহা করে না তাহারাও মানুষ। রাজনৈতিক মানুষ তাহার রাষ্ট্রের প্রয়োজনকেই বড় করিয়া দেখিয়াছে। ইহার জন্য নরহত্যা, শিশুহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিতেও তাহারা এতটুকু বিচলিত হয় না। এই একই রাজনীতি আজ সমগ্র ভূখণ্ডে তাহার কাজ করিয়া চলিয়াছে। বন্ধু নয়, আত্মীয় নয়, কিন্তু রাজনীতির বাহিরে তাহারা একই টেবিলে বসিয়া, আহার করিতেছে, একই পান-পাত্র পরস্পর পরস্পরের মুখে তুলিয়া ধরিতেছে—আবার এই দুই মানুষকেই দেখি তাহার কর্ম্মক্ষেত্রে, যেখানে তাহারা ঘাতকের চেয়েও নির্ম্মম, সর্পের চেয়েও খল—এই ক্রুর মানবতাহীন মানুষই হইল, বর্ত্তমান জগতের রাজনৈতিক মানুষ।

কাশ্মীরকে লইয়া, সমগ্র বাংলাকে লইয়া যে-রাজনীতির খেলা চলিয়াছে—খেলা হিসাবে তাহার চমৎকারিতাকে কেহ অস্বীকার করিবে না, কিন্তু খেলা যাঁহারা খেলিতেছেন, তাঁহারা সাধারণ মানুষের কেহ নন। কিন্তু দুঃখ সেখানে নয়, বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষের এই নিষ্ঠুর খেলায় যে-মানবতাকে আমরা হারাইয়া আসিলাম, তাহা আর ফিরিয়া পাইব না, ইহাই দুঃখ।

এই রাজনীতির খেলায় সমগ্র জগৎ আজ বিস্মিত। ওদিকে কোরিয়া পারস্য, এদিকে তিব্বত-নেপাল-কাশ্মীর। ইহাই হইল আগামী যুদ্ধের টার্গেট। এই রন্ধ্রপথ দিয়াই যুদ্ধকামী মানুষ প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইরূপ ছিদ্রপথ দিয়াই বার বার যুদ্ধ আসিয়াছে। আজ ঘোষণা কেহ না করিলেও, যুদ্ধের প্রস্তুতি চলিতেছে সকল

পক্ষেই। অবশ্য দেশকে খণ্ডিত করিলেই তাহার প্রতিক্রিয়া আছেই। প্রাচীনকাল হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। সেই জমি লইয়া লড়াই। একই জমির উত্তর-দক্ষিণ কিংবা পূর্ব্ব-পশ্চিম-এর জ্যামিতিক রেখা। কিন্তু ইহা ত শুধু দিঙ্‌নির্ণয় নয়—এই পরস্পরবিরোধী একই দেশের মানুষ, এক আর-একর্কে করিতেছে আঘাত। যে-শকুনিদল অন্তরীক্ষ্যে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে, যাহাদের দৃষ্টি আছে পৃথিবীর নিম্নভূমির দিকে, তাহারা এই সুযোগই খুঁজিতেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইয়াছিল, একটুখানি পোলাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া। আজ কোরিয়া যত ক্ষুদ্রই হোক, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই সহস্র সম্ভাবনা গড়িয়া উঠিতেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যে যাহাই বলুন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আতঙ্ক আজও মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের যে ভয়াবহ সর্ব্বনাশ, যাহা মানুষের কৃষ্টিকে বিঘ্নিত করে নাই, মানুষের নৈতিক মেরুদণ্ডকে পর্য্যন্ত ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে, সে-মানুষ আজ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেছে যে-কোন যুদ্ধের নামেই।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পরেও, ঠিক এমনি করিয়া এক দিন জাতির প্রয়োজনে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা হইয়াছিল। এক-একটা যুদ্ধ আসিয়া শুধু লোক-ক্ষয়, শক্তিক্ষয় করিয়া দিয়া যায় না—যুদ্ধ শুধু দেশই ধ্বংস করিতে আসে না, যুদ্ধ জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিয়া যায়। তবু এই সর্ব্বধ্বংসী যুদ্ধোন্মাদনা হইতে জাতি আজও নিজেকে রক্ষা করিতে পারিল না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ক্ষয় আজও বন্ধ হয় নাই। সে-ক্ষয়, অন্তর্মুখী নয়। এক মানুষ শান্তির ললিত-বাণী লইয়া জগতের দ্বারে দ্বারে প্রার্থনা জানাইতেছে, অপর মানুষ জগতের অন্তরালে বসিয়া গোপনে অস্ত্র শানাইতেছে। আজ মানুষের প্রতি মানুষের আর সে বিশ্বাস নাই, সে প্রীতি নাই—আত্মীয় আত্মীয়কে চিনিতে চায় না, প্রয়োজন ছাড়া কথা বলিতেও মানুষ আজ ভুলিয়া গিয়াছে।

যদিও জানি, ঝড়ের রাতে ঝড়টাই সব নয়। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, স্বার্থে ও সংঘাতে, অবিচারে ও অত্যাচারে জাতির প্রাণগঙ্গা আজিও শুকাইয়া যায় নাই। ভারতবর্ষ বাঁচিয়া আছে, দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কৃষকের কুটীরে, প্রতারিত শ্রমিকের ছন্দোময় পেশীর বেগে, মানুষের আবেগে ও আকাঙ্ক্ষায়—আর বাঁচিয়া আছে সকল মানুষের বন্ধন-মুক্তির চেতনায় ও প্রেরণায়। এই জ্ঞাননিষ্ঠ তপঃক্লিষ্ট সনাতন ভারত অনুকূল পরিবেশে সাময়িক ঘুমঘোর হইতে বার বার জাগিয়া উঠিয়াছে। তার সেই জাগার পরম ক্ষণগুলি সৃষ্টির অভিনবত্বে, মৃত্যু-হীন স্থিতির দাবিতে ও সঙ্গতগর্ব্বে সঞ্চারিত হইয়াছে যুগ হইতে যুগান্তরে, কাল হইতে কালান্তরে। ইহাই হইল, ভারতবর্ষের জ্যোতির্ম্ময় রূপ।

আজ সকলেই বলিতেছে ততঃ কিম্? প্রতিদিনের জীবনের হাজার সমস্যাকে ছাড়িয়া, খাওয়া থাকা-বিশ্রামের সমস্যার বাহিরে, প্রত্যেক দেশের স্বতন্ত্র রাজনীতির সমস্যার বাহিরে, আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষের মনে এক বিরাট্ প্রশ্নের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, ততঃ কিম্? শুধু আমাদের দেশে নয়, জগতের প্রত্যেক সভ্য দেশে, সাধারণ মানুষের মনের কোণেও বিচিত্র অস্পষ্ট সব ভাবনা জাগিয়া উঠিতেছে। চারিদিকের এই বিভেদ, আর আতঙ্ক আর পুঞ্জীভূত দুর্ভাবনার মধ্যে এমন কি কিছু নাই, যাতে মানুষ—তা সে যে-দেশেরই মানুষ হোক না কেন, পরম নিশ্চয়তায় নির্ভর করিতে পারে? বিজ্ঞানের হাজার আবিষ্কার আর রাজনীতির হাজার মতের অরণ্যের মধ্যে হাঁপাইয়া উঠিতেছে মানুষের মন —কোথাও কি কোন নীতি, কোন ধর্ম্ম, কোন তত্ত্ব নাই, যাহার মধ্যে মানুষ আনন্দের পরম আশ্বাস পাইতে পারে? মানুষের ক্লান্ত-শ্রান্ত মনে অস্পষ্ট অবাস্তব ভাবনা হইতে ক্রমশঃ স্পষ্ট বাস্তবমূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে এক বিচিত্র মানসিক ক্ষুধা। ইউরোপ আর আমেরিকার সমস্ত রাজনৈতিক আয়োজনের আড়াল হইতে, যান্ত্রিক শক্তির সমস্ত আস্ফালনের পিছন হইতে, ধীরে ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস, একটা চাপা কান্না, একটা মথিত হাহাকার! সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ঠাসা বস্তুর আয়োজনের মধ্যে আজ পশ্চিমের অন্তরাত্মাও হাঁপাইয়া উঠিয়া খুঁজিতেছে, কোথায় আছে একটুখানি লীলার অবকাশ, মুক্তির স্বাদ?

—o—

মরু-বধূ

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

[প্রাচীন মারবাড়ী প্রেমগাথা "ঢোলা-মারু রা দূহা" কাব্য-পরিচয়]

(১)

ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টম দশকের কোন এক অজ্ঞাত সন্ধ্যায় আকবরের স্বপ্ন-পুরী ফতেপুর সিক্রীর বাদশাহী যথারীতি গুণীমণ্ডলীর সাপ্তাহিক মজলিস্ বসিয়াছে। মহলে দণ্ড, মুকুট ও রাজপরিচ্ছদ বর্জ্জিত স্বয়ং সম্রাট্ এই আসরের মধ্যমণিরূপে বিরাজমান। এই অন্তরঙ্গ সম্মেলনে দরবারী আড়ষ্টতা নাই, ভাষা ও ভাব বিনিময়ে সরস ভব্যতা আছে, দূরত্ব কিংবা সঙ্কোচ নাই। বিকানীর-পতি রায়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুকবি কুমার পৃথ্বীরাজ রাঠোর সম্রাটকে অভিবাদন করিতেই তিনি স্মিতহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "কুমারজী, আপনার 'বেলি' (প্রেমকুঞ্জ) ঢোলা-র উট উজার করিয়া গিয়াছে!"

ঢোলা-র উট প্রভুর বিরহিণী মরু-বধূকে আনিবার জন্য মালব হইতে পুষ্করের পথে বিকানীরের নিকটবর্ত্তী পূগল যাইবার কথা; উহা কেমন করিয়া পৃথ্বীরাজের কবিকীর্ত্তি গ্রাস করিল? তিনি বুঝিলেন, ভ্রমর উদ্যান-বল্লবী মাধবীর মায়া কাটাইয়া কাঁটাবনে কেতকীর দাহাগে মজিয়াছে অর্থাৎ কাব্য-বিচারে সম্রাটের রুচি-বিকার দেখা যাইতেছে। অভিমানী কবি নিতান্ত সপ্রতিভ ভাবে শ্লেষ আশ্রয় করিয়া নিবেদন করিলেন, "জাঁহাপনা! 'বেলি'-র জন্য আফসোস করিবেন না। অনুমতি হইলে 'বেলি'-র উজার কেয়ারীতে একটি সপুষ্প শমীবৃক্ষ শোভা পাইতে পারে!" কেহ কেহ বলেন, কবি রাজ "দোহা"-কে হার মানাইবার অভিপ্রায়ে সুদবুদ-সালংগা নামক অনুরূপ একটি "বার্ত্তা" বা প্রেম-কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, এবং উহা সম্রাটের প্রশংসাও লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কালপ্রভাবে "ঢোলা"-র উটের গ্রাস হইতে "বেলি" রক্ষা পাইলেও সুদবুদ-সালংগা কবিতা হিসাবে উটের তুলনায় খচ্চর সাব্যস্ত হইয়াছে।[১]

কবি পৃথ্বীরাজ বিদগ্ধ সমাজের জন্যই বেলি রচনা করিয়াছিলেন, আকবর উপলক্ষ্য মাত্র। তাঁহার প্রায় সমসাময়িক কবি—নন্দদাস রুক্মিণী-মঙ্গল এবং আকবরের অন্যতম দরবারী কবি নরহরি রুক্মিণী-হরণ লিখিয়াছিলেন। এই কাব্যদ্বয় অপেক্ষা বেলি নিঃসন্দেহ উৎকৃষ্টতর। ঝুলা চারণ নামক এক কবি ডিঙ্গল ভাষায় রুক্মিণী-মঙ্গল মহাকাব্য ঐ সময়ে লিখিয়াছিলেন। দোহা সম্বন্ধে কিম্বদন্তীর ন্যায় আকবর কর্ত্তৃক ঝুলা চারণের কাব্য প্রশংসারও অনুরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। কথিত আছে, বেলি-ও রুক্মিণী-মঙ্গলের কাব্য-বিচারে সম্রাট্ প্রথমে বেলি শ্রবণ করিয়া পরে দ্বিতীয় কাব্য শুনিয়াছিলেন। চারণের কবিতায় মুগ্ধ হইয়া আকবর নাকি বলিয়াছিলেন, "কুমারজী! চারণ বাবার হরিণ আপনার বেলি খাইয়া গিয়াছে।" হিন্দী আলঙ্কারিক ও কাব্য-সমালোচকগণ এই কিম্বদন্তীদ্বয়কে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; যেহেতু দোহা কিংবা রুক্মিণী-স্বয়ংবর তাঁহাদের প্রাচীনপন্থী কাব্যাদর্শে বেলির সহিত তুলনার যোগ্যই নহে। বেলির সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক টীকাকার[২] অধ্যাপক আনন্দপ্রকাশ দীক্ষিত উহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিদেশী সমালোচক টেসিটোরী কবি পৃথ্বীরাজকে ডিঙ্গল কবিতার Horace এবং এতদ্দেশীয় অর্ব্বাচীন পণ্ডিত মোতিলাল মেনারিয়া বলিয়াছেন Homer; পণ্ডিত সূর্য্যপ্রকাশ পারীখ বলিয়াছেন "ভবভূতি"।

---

১ এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে "বেলি"-র প্রতি আকবর ইঙ্গিত করিয়াছিলেন উহা পৃথ্বীরাজ রচিত 'ক্রিসন-রুকমণীরী বেলি' নামক শৃঙ্গার-রসাত্মক ডিঙ্গল ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট কাব্য। এই কাব্যের একাধিক টীকা হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় পরবর্ত্তীকালে হিন্দী সাহিত্যরসিকগণ রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং ইহা বর্ত্তমানে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠ্য। বিষয়বস্তু হিসাবে "বেলি" বাংলা ও মারাঠী সাহিত্যের রুক্মিণী-হরণ, রুক্মিণী-মঙ্গল শ্রেণীর কাব্য। নাগরী প্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ঢোলা-মারু রা দূহা" গ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রবন্ধ লিখিত। এই দুই কাব্য সংক্ষেপে যথাক্রমে "বেলি" এবং "দোহা" নামে উল্লেখ করা হইবে। "বেলি" সম্পাদক মন্তব্য করিয়াছেন সুদবুদ-সালংগা আদৌ পৃথ্বীরাজের রচনা নহে। দ্রষ্টব্য—"প্রাক্কথন" (ঢোলা-মারু) পৃঃ ৫-৮ পাদটীকা।

দীক্ষিতজীর পূর্ব্ববর্ত্তী বেলি সমালোচকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, পৃথ্বীরাজ আকবরশাহী আমলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দী কবি এবং বেলি ডিঙ্গল সাহিত্যের তাজমহল, নিষ্কলঙ্ক কাব্যশিল্পে সযত্নরক্ষিত রস এবং ভাবের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ও মাধুর্য্য! এ হেন বেলিকে বাদশাহ কেমন করিয়া ঢোলার উট কিংবা চারণ বাবার হরিণের মুখে তুলিয়া দিলেন? ইহা কি পরিহাস-জল্পিত না কাব্যের যথার্থ মূল্য-নিরূপণ? বেলির প্রতি আকবরের এই আপাতঃদৃষ্ট অবিচার কি তবে কবির দুর্ভাগ্য—"অরসিকে রসস্য নিবেদনম্?"

আকবর বাদশাহ অপাঠিত হইলেও অপণ্ডিত ছিলেন না। বহুবিধ কাব্য, দর্শন ও ব্যবহারিক বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ কাণে শুনিয়া অসাধারণ স্মৃতিশক্তির গুণে তিনি বহুশ্রুত পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। কবি পৃথ্বীরাজের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য বিচারের বিদ্যা ও রসবোধ আকবরের ছিল বলিয়াই তিনি কবিকে দরবারে এবং অন্তরঙ্গ সমাজে উচ্চাসন দিয়াছিলেন, এবং কবির মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিতর্পণে শোকের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেন। সম্রাটের শেষ জীবনে প্রাণের নিঃসঙ্গতার হাহাকার আমরা তাঁহার স্বরচিত দোহায় আজও শুনিতে পাই—

"পীথল সুঁ মজলিস গই, তানসেন সুঁ রাগ।
রীঝ বোল হঁসি খেলবো, গয়ো বীরবল সাথ॥"

(পৃথ্বীরাজের সঙ্গে মজলিসের আনন্দ, তানসেনের সহিত সঙ্গীত, বীরবলের সাথে সাথে হাসি-কৌতুক চলিয়া গিয়াছে।)

ঐতিহাসিকের পক্ষে কাব্যের উৎকর্ষতা বিচার "অব্যাপারেষু ব্যাপারং",—বিপদের সম্ভাবনা বিলক্ষণ। অথচ, হিন্দী সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ কিংবা মোহিতলাল মজুমদারের সমগোত্রীয় কোন কাব্য-সমালোচক নাই যাঁহাদের বিচার চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস মিশ্রবন্ধু-বিনোদ গ্রন্থে শ্রীযুত শ্যামবিহারী মিশ্র বেলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার মত পণ্ডিত-সমাজে গৃহীত না হইলেও অহিন্দী ভাষী আমাদের কাছে মনে হয় বেলির স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর নয়; কিন্তু দোহা যে প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য তাহা নহে। প্রাচীন কাব্যাদর্শ অনুসারে দোহা আদৌ কাব্যই নহে, লোকগীতি* মাত্র; কাব্যের শ্রেণী-বিভাগের বাহিরে, যাহার স্থান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বেলি কবিতার তাজমহল নহে, আকবরশাহী আমলে মথুরার গোবিন্দজীর মন্দির।' বেলির রূপ আছে, কল্পনার বিলাস-সজ্জা আছে, মিলনের মাধুর্য্য আছে, কিন্তু বিরহের ব্যথা নাই। "ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া"র ছিন্নকণ্ঠ কোকিলের শেষ-নিবেদনের বেদনা বেলি আমাদের প্রাণে সাড়া জাগায় না। মানব হৃদয়ের এই শাশ্বত বেদনার বাণী নারবার দুর্গের রাজপ্রাসাদে নায়ক ঢোলার দীর্ঘশ্বাসের সহিত ধূ ধূ মরুর দক্ষিণ-পবন-সঞ্চালিত হইয়া প্রতি বর্ষা-সমাগমে প্রোষিত-ভর্ত্তৃকাকে আজও আকুল করিয়া তোলে। মরুবাসী সরল যাযাবর পশুচারক, কৃষক এবং বিরহিণী পথিক বধূর প্রাণে মুসলমান যুগের পূর্ব্ব হইতে দোহার ছন্দ এই বেদনার প্রতিধ্বনি জাগাইতেছে। বেলি শাহীবাগের চামেলী; "বনজ্যোৎস্না" নহে। বেলি কুলীন; দোহা গ্রামীণ। বেলি কৌশাম্বীর মোহিনী বীণা "ঘোষবতী"; দোহা রাখালের বাঁশি কিংবা বাঁশবনে বাতাসের শানাই।

২

"ঢোলা-মারু"র প্রেমগাথা কে কিংবা কাহারা কোন্ যুগে রচনা করিয়াছিলেন কেহ নিঃসংশয়ে বলিতে পারেন না। এই কাব্যের কবি অজ্ঞাত এবং সম্ভবতঃ একাধিক সংগ্রহকর্ত্তাগণ বহু শতাব্দী পরে এই লোকগীতিকে কাব্যের রূপ প্রদান করিয়াছেন। এই লোকগীতির নায়ক-নায়িকা গতানুগতিক ভাবে রাজা-রাণী হইলেও ইহা নিতান্তই গরীবের কবিতা, রাজস্থান মরুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত করুণ হাহাকার। রাজপুতনার নিরক্ষর "ডোম" ও "ঢাঢী" জাতীয় যাযাবর গায়ক সম্প্রদায় সর্ব্বপ্রথম "ঢোলা-মারু"র লোকপ্রিয় কথাবস্তুকে অবলম্বন করিয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে গীত রচনা করিয়াছিল,—এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কারণ, ইহার অধুনা-আবিষ্কৃত পুঁথি সমূহের পাঠ স্থানে স্থানে বিভিন্ন। "ঢোলা-মারু"র কথা এখনও রাজপুতানা এবং মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গ্রাম্য কথক ও কবিগণের মুখে মুখে মূল আখ্যান কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে[৩] অন্ততঃ ৪০০-৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত উক্তরূপ পাঠান্তর,

---

২ দ্রষ্টব্য—বেলি কিসন-রুকমণীরী, গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ভূমিকা পৃঃ ১৩-১৭৩।

৩ জয়সলমীর অধিপতি হররায় আকবরের অন্যতম শ্বশুর। রাবল হররায়ের আদেশে জৈন পণ্ডিত কুশল-লাভ বা কুশল-চাঁদ দ্বারা ১৬১৮ বিক্রমাব্দে (খ্রীঃ ১৫৬২) "দোহা"র সংগ্রহ ও সঙ্কলন কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের বেলির রচনাকাল বিঃ ১৬৩৮ অর্থাৎ ১৫৮২

প্রক্ষেপ (interpolation) এবং যোগ-বিয়োগ চলিয়া আসিতেছিল। সংগ্রহকর্ত্তাগণ উহাদের স্বরচিত দোহা এই "কথা"র মধ্যে জুড়িয়া দিয়াছেন—এইরূপ সন্দেহ করিবার সঙ্গত কারণ আছে। কথকতা এবং গ্রাম্য আসরের "গাত" রূপে ইহা হয় ত প্রথমে প্রচলিত ছিল। বাংলা দেশের বাহিরে, অন্ততঃ উত্তর প্রদেশে, ছন্দোবদ্ধ পুঁথি একটানা পাঠ করা হয় না, পুঁথির খানিকটা পড়িয়া পাঠক উহাকে পল্লবিত করিয়া ব্যাখ্যা করেন। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। "ঢোলা-মারু"র দোহাও শ্রোতাগণকে পল্লী-কথক "ডোম" ও "ঢাটী" এই ভাবে শুনাইত। এই জন্য কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে "দোহা"র মাঝে মাঝে ডিঙ্গল-গদ্যে "কথা" অংশ পাওয়া যায়। কোন কোন সংগ্রহকর্ত্তা "কথা"র গদ্যাংশ বাদ দিয়াছেন। এইজন্য যাহা এককালে "বার্ত্তা" রূপে প্রচলিত ছিল, উহা "দোহা" বা কবিতায় পরিণতি লাভ করিয়াছে।

"ঢোলা-মারু"র কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না—এই মীমাংসা এখনও চূড়ান্ত হয় নাই। এই লোকগীতির রচনাকাল নির্দ্ধারিত করিবার কোন বহিঃ-প্রমাণ কিংবা অন্তঃপ্রমাণ নাই। এই লোকগীতি হয় ত কল্পনা-কুসুম নহে। এই লোকগীতির নায়ক ঢোলা নারবার (গোয়ালিয়র রাজ্যে ধ্বংসাবশিষ্ট Narwar) রাজ্যের রাজা, নায়িকা মারবনী বা মারুণী বর্ত্তমান বিকানীর রাজ্যের ২৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে জয়সলমীর সীমান্তে অবস্থিত পুগলের অধিস্বামী পিঙ্গল রায়ের কন্যা। পুগল ও নারবার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। কোন "পাথুরে প্রমাণ" (inscription) দ্বারা সমর্থিত না হইলেও রাজপুতানার "খ্যাত" (কাহিনী) অনুসারে ঢোলা রায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি, নারবার তাঁহার পিতৃ রাজ্য। ঐতিহাসিক টডের মতে নারবার রাজ্য স্থাপয়িতা নলের তেত্রিশ পুরুষে ঢোলার পিতা সোডদেব রাজা হইয়াছিলেন। সোডদেবের মৃত্যুকালে ঢোলা রায় নাবালক ছিলেন। রাজ্যাপহারক পিতৃব্যের ভয়ে শিশুপুত্রকে লইয়া তাঁহার মাতা মীনা জাতির পূর্ব্বতন রাজ্য বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রাপ্ত বয়স্ক সর্পরভাব রাজপুত সন্তান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মীনা জাতির প্রধানগণকে বধ করিলেন এবং উহাদিগকে পদানত করিয়া কচ্ছবাহ বংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজপুতকে আশ্রয় দেওয়ার দুর্ব্বুদ্ধির দরুণ ভাগ্যবিপর্য্যয়ে মীনা তদবধি তস্কর, মীনা দস্যু, রাজপুত গর্ব্বিত শাসক। ঢোলা রায় একদিন সস্ত্রীক দেবীদর্শনে গিয়াছিলেন। অতর্কিত আক্রমণে পথিমধ্যে মীনাগণ ঢোলা রায়কে হত্যা করিল। তাঁহার গর্ভবতী রাণী মারবনী কোনক্রমে রক্ষা পাইলেন।

বলা বাহুল্য, টড এই স্থানে কচ্ছবাহ বংশের সঠিক ইতিহাস বিবৃত করেন নাই। বংশাবলী ইহা অপেক্ষাও অনৈতিহাসিক। সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক নৈন্‌সী জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন, নারবার রাজ্য সংস্থাপক নলের পুত্র ঢোলা মারবনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন, টড সাহেব জন-শ্রুতিমূলক এই ঢোলার সহিত বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্যের স্থাপয়িতা দুলহ রায়ের সহিত গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। টডের হিসাবে ঢোলা রায়ের সময়কাল ১০২৩ বিক্রম সম্বত (আনুমানিক ৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)।' কিন্তু শিলা-লিপির প্রমাণে দুলহ রায়ের পূর্ব্বজ কীর্ত্তিবর্ম্মা ১০৭৮ সম্বতের পূর্ব্বে (১০২২ খ্রীঃ) রাজত্ব করেন নাই। সুতরাং কীর্ত্তিবর্ম্মার অধস্তন সপ্তম পুরুষ দুলহ রায় খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে রাজত্ব করিয়াছিলেন, অনুমান করা যাইতে পারে। ঢোলার কনিষ্ঠা রাণী মালব রাজ দুহিতা মালবনী (সংস্কৃত মালবিকা) উজ্জয়িনীর অধিপতি রাজা ভীমের কন্যা। পৃথ্বীরাজ-রাসো মহাকাব্যে রাজা ভীমকে পৃথ্বীরাজের শ্বশুর বলা হইয়াছে। সুতরাং রাজা ভীমের ঐতিহাসিকত্ব সন্দেহমূলক হইলেও রাজপুতানার জনশ্রুতি অনুসারে তাঁহার সময়কাল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদ—অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বের প্রাক্কাল।

৩

এই লোকগীতির নায়িকা মারবনী বা মারুকে বলা হইয়াছে পুগল-রাজ পিঙ্গল রায়ের কন্যা। পুগল রাজপুতানার ইতিহাসে বীররক্তপুত প্রসিদ্ধ স্থান। পূর্ব্বে ইহা জয়সলমীরের অধিকারে ছিল; বর্ত্তমানে বিকানীর শহরের প্রায় ৪০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি ধ্বংসাবশেষ থানা। পিঙ্গল রায় আমাদের মতে কিন্তু একটি মনগড়া ধ্বনি-সামঞ্জস্য মূলক নাম। পিঙ্গল রায়কে কোন কোন পুঁথিতে সিংঘল রায় করা হইয়াছে। হিন্দী কাব্য সম্পাদক-

---

খ্রীষ্টাব্দ। রাবল হররাজ মোগল দরবারে রাঠোর-কবির জাতি খর্ব করিবার উদ্দেশ্যে দোহার সঙ্কলন করিয়াছিলেন বলিয়া যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে উহা সত্য না হইলেও ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে দোহা সর্ব্বপ্রথম আকবরের দরবারে উপস্থাপিত হইয়াছিল—জনশ্রুতির এই অংশ সম্ভবতঃ মিথ্যা নয়।

দ্রষ্টব্য—দোহা প্রাক্কথন পৃঃ ৮-৯ ও পাদটীকা।

প্রণ নিতান্ত আশাবাদী। "দোহা"র সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুত সূর্য্যকান্ত পারীখ এই কাব্যের ঐতিহাসিকতা বিচারে বলিয়াছেন, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক গবেষণায় পিঙ্গল রায়ের অস্তিত্ব হয়ত আবিষ্কার হইবে! যে কোন মরু বালিকার নাম "মারু" হইতে পারে, রাজকন্যা হইবে এমন কোন কথা নাই। এক মেষপালকের মুখে "মারু" তাহার সহিত ঘরকন্না করিতেছে শুনিয়া নায় ঢোলা প্রায় অজ্ঞান হইয়াছিলেন। ঢোলার উট অ ক কষ্টে এই "মারু" যে রাজকন্যা "মারু" নহে উহা বুঝাইয়া প্রভুকে প্রকৃতিস্থ করিয়াছিল।

নায়িকা "মারুর" পিতৃকুল পরমার রাজপুত বলিয়া প্রাচীনতম পুঁথিতে উল্লেখ পাওয়া যায়, পরবর্ত্তী পুঁথিতে লা হইয়াছে, যদুবংশী ভট্টি। এই মতান্তরের কারণ কি? ঢোলাকে লইয়া টানাহিচড়া করিলে "ঢোলা-মারু"র ম্ভাব্য রচনাকাল পাওয়া যাইবে না; এই মতান্তরের রণ বিশ্লেষণ করিলে হয় ত সত্যের কাছাকাছি আমরা পৌঁছিতে পারি। পরাক্রান্ত পরমার কুল মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা বহু-বিস্তৃত ছিল। এই জন্যই সারা ভূঁ পমার-কা" জনশ্রুতির উদ্ভব। এক সময়ে রমার কুল সমস্ত মালব, রাজপুতানা এবং সিন্ধুপ্রদেশ র্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল। এই সময়ে ভট্টিকুল বিক্ষিপ্ত ভাবে পঞ্জাব এবং সিন্ধুনদীর পশ্চিম তীরে আফগানীস্তানে গজনী পর্য্যন্ত উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। সুলতান মামুদের উদীয়মান সাম্রাজ্যের চাপে ভট্টিকুল ক্রমশঃ সিন্ধুর পূর্ব্বতীরে পশ্চাদপসরণ করিয়া তুর্কী আক্রমণের গতিরোধ করিয়াছিল। ভট্টি রাজপুত কয়েক শতাব্দী পরে পরমারগণকে স্থানচ্যুত করিয়া সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জয়সল্‌মীর রাজ্য স্থাপন করেন এবং ভট্টিপ্রাধান্য ক্রমশঃ বর্ত্তমান জয়পুরের অন্তর্গত শেখাবটী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করে। "ঢোলা-মারু"র রচনাকালের শেষ সীমা সুতরাং দ্বাদশ শতাব্দীর রে হইতে পারে না। পরবর্ত্তী কালে পরমার কুলের তি যখন ভট্টিকুলের প্রভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তখনই গল রাজকুমারী মারুর পিতৃকুল জনশ্রুতিতে ভট্টি হইয়া গল। এই জন্যই ষোড়শ শতকের পরে লিখিত কোন কান পুঁথিতে ভাটি পাঠ পাওয়া যায়। গোত্রান্তর টলেও মরু-কন্যার রূপখ্যাতি আজিও অমলিন।

রাজপুতানায় কথাই প্রচলিত আছে:

> মারবাড় নর নিপজে নারী জয়সল্‌মীর।
> সিন্ধা তুরাহী সাম্রা করহল বিকানীর॥

অর্থাৎ মারবাড়ের পুরুষ, জয়সল্‌মীরের নারী, সিন্ধু-দেশের ঘোড়া এবং বিকানীরের উট স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে তুলনা-রহিত।

পরমার নন্দিনী নায়িকা মারুকে এই জন্যই পরবর্ত্তী ভাট চারণগণ পুগলের ভাটিবংশী করিয়া ফেলিয়াছে।

৪

ঢোলা-মারু-র "বার্ত্তা" ও গীত রাজস্থানে অতি প্রাচীন (ঘণা পুরাণা); কিন্তু কত প্রাচীন নির্ণয় করিতে গেলে ঐতিহাসিকের অবস্থা সাপে ছুঁচো ধরার মত হইয়া পড়ে। বাংলায় "কানু", ব্রজবুলিতে "কন্‌হৈয়া" ছাড়া যেমন গীত নাই রাজস্থানী ডিঙ্গল ভাষায় তেমনই ঢোলা ব্যতীত গীত কিংবা "গাথা" হয় না। একাদশ শতাব্দীর প্রাকৃত ব্যাকরণ প্রণেতা হেমচন্দ্র "ঢোলা", "ঢোল্ল" (সংস্কৃত "দুর্লভ") নায়ক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। রাজস্থানী ভাষায় গ্রাম্য কবিতা ও গীতে "ঢোলা" শব্দের নায়ক, পতি কিংবা বীর অর্থে প্রয়োগ প্রচলিত ছিল এবং বর্ত্তমানেও পাওয়া যায়। "ঢোলা" শব্দের ন্যায় গীত ইত্যাদিতে নায়িকা সাধারণ অর্থে "মারু"-র বহুল প্রয়োগও দেখা যায়। বর্ত্তমানে "মারু" শব্দের লিঙ্গান্তর ঘটিয়া যাওয়াতে উহা নায়িকা অর্থে প্রযুক্ত হয় না, মেড়ো (মরুবাসী) নায়ক অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।[৪]

ঢোলা এবং মারু যদি বাস্তবিক রাজারাণীর নাম বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে এই নামদ্বয় যোগরূঢ় হইতে অন্ততঃ হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে একশত বৎসর নিশ্চয়ই লাগিয়াছিল; সুতরাং ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে ঢোলা-র সময়কাল খ্রীঃ দশম শতাব্দী হইয়া পড়ে। কোন সাহিত্যে ঐতিহাসিক নাম এইরূপ যোগরূঢ়ত্ব লাভ করিবার উদাহরণ অতি বিরল। ব্যাপার কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়াও অসম্ভব নয়।

ঢোলা-মারু-র নায়ক-নায়িকাকে ইতিহাসে বেআইনি চালান দেওয়া হইয়াছে কি না কে বলিতে পারে? জনশ্রুতিরক্ষিত ইতিহাসে ইহা প্রায়ই রাজপুতানায় ঘটিয়াছে যথা—পদ্মিনী উপাখ্যান।

আমাদের সহজ বুদ্ধিতে মনে হয় প্রাচীন ঢোলা-মারু প্রেম-গাথায় ব্যক্তিবাচক নামদ্বয় অন্যান্য গীতের ন্যায়

---

৪ রাজস্থানী ভাষায় "মারু"-র রূপান্তর "মারুবী", "মারবণ" এবং "মারবী"। "মারু" পুলিঙ্গ হওয়ার পর বাঙ্গালা দেশের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে এবং কলিকাতাবাসীর মুখে বিকৃত "মেরো" বা "মেড়ো" হইয়া গিয়াছে। "ঢোলা"-র টিপ্পনী, দ্রষ্টব্য দোহা, সম্পাদকীয় পরিশিষ্ট পৃঃ ১৬৭-৯।

নায়ক-নায়িকা অর্থেই ব্যবহার করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথা, ঢোলা-মারু-র লোকগীতির কাঠামের মধ্যে যেন নিতান্ত হাল্‌কা ভাবে রাজারাণী রাজকুমারী লাগিয়া রহিয়াছেন। সনাতন কাল হইতে রাজতন্ত্র শাসিত ভারতভূমিতে রাজারাণীর প্রতি জনসাধারণের অহেতুকী ভক্তি ও অজানা মোহ ছিল, আছে এবং আরও কিছুকাল গুপ্তরূপে থাকিবে। এই জন্য রাজারাণী ব্যতীত কোন গল্প গ্রাম্য আসরে কিংবা অবোধ শিশুর কাছেও জমিয়া উঠে না, লবণ ছাড়া তরকারীর মত বিরস লাগে, সুদূর অতীতের যাদু শ্রোতাকে সম্মোহিত করে না। পুগল রাজকন্যার কিংবা তাঁহার সপত্নী মালব রাজকুমারীর বিরহবেদনায় গরীবের দরদীপ্রাণ যেমন উতলা হইয়া উঠে, ঝুনঝুনওয়ালা শেঠানীর মৌন-বিরহ ভাষা পাইলেও সেরূপ সাড়া পাইবে কি? কেহ কেহ আপত্তি করিবেন ঢোলা এবং মারু-কে বিধাতার সৃষ্টি হইতে উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নয়। যদি দোহা-র নায়ক-নায়িকা নিছক কল্পনাই হয় তবে পরবর্ত্তী কালে রাজপুতানার লোকের ঘরে উঁহাদের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হইয়া মূর্ত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পূজা পাইত কেন? হোলির শোভাযাত্রার ন্যায় আজ পর্য্যন্ত ঢোলা-মারু-র শোভাযাত্রা বাহির হয় কেন?[৫] ঢোলা-মারু মরুস্থলীর সাত্ত্বিক প্রেমের দেবতা, ব্রজভূমির কৃষ্ণ-রাধার সমতুল্য। সুতরাং ইঁহারা কি মিথ্যা হইতে পারেন? আজমীর ও পুষ্করে ঢোলা-র শোভাযাত্রায় ধাতসহ রসিক গ্রামীণ মাত্রই নায়কের অনুকল্প। এই জন্য উৎসব-মত্তা নারীগণ ঢোলা-মারু-র গীত সহযোগে মহিষচর্ম্ম-পাদুকার অবিরাম আঘাতে তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়া থাকেন। ঢোলা ছিলেন ঢিলাঢালা কাছাখোলা প্রেমিক। কি দোষে বর্ত্তমান কালে উহার এই দুর্দ্দশা কেহ বলিতে পারে না। কুব্জা-ভজা বংশীধারী যদি মথুরা হইতে বৃন্দাবনে ফিরিতেন তাহা হইলে কুপিতা গোপিনীগণ তাঁহার মাথায় ঘোলের হাঁড়ি ভাঙিয়া মনের সাধ মিটাইত কি না কে শপথ করিয়া বলিতে পারে?

মোট কথা, দোহার ঐতিহাসিকতা বিচারে আমাদের "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা! এই নীরস ভণিতায় রসজ্ঞ পাঠক নিশ্চয়ই অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন। অতঃপর আমরা কথাবস্তুর অবতারণা করিব।

৫

গোয়ালিয়র দুর্গের নিকটবর্ত্তী অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত নারবার নগরী একসময় সুবিস্তৃত কচ্ছবাহ রাজপুতকুলের আদি রাজধানী ছিল। সেখানে নল নামক পরাক্রান্ত নৃপতি বর্ত্তমানকাল হইতে প্রায় এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র সালহকুমার (ডাক নাম ঢোলা) তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করিবার পর সপরিজন রাজা নল তীর্থযাত্রা উপলক্ষ্যে আজমীরের অদূরে পুষ্কর তীর্থে আসিয়াছিলেন। পুষ্কর হ্রদ পশ্চিম-ভারতের কাশী, মরুকবলিত পশ্চিম রাজস্থানের জীবন-বাপী। বাঙ্গলা-দেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর একবার হইয়াছিল, মারবাড়ু বিকানীর জয়সল্মীরে সুদূর অতীত হইতে অদ্যাবধি প্রতিদশকে ছোট মন্বন্তর একবার প্রায়ই হইয়া আসিতেছে। অন্নের দুর্ভিক্ষ অপেক্ষা অনাবৃষ্টিজনিত জলের দুর্ভিক্ষ মরুস্থলীতে অতি ভয়ানক। অকরুণ প্রকৃতি এই অঞ্চলের অধিবাসীগণকে এখনও অর্দ্ধযাযাবর করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপ দুর্দিনে জমিদার, রায়ত, গৃহস্থ, সাধু, চোর, ডাকাত, পালিত ও বন্যপশু শুধু বাঁচিবার আশায় সুদীর্ঘ মরুভূমি অতিক্রম করিয়া পুষ্করের দিকে ছুটিয়া আসে, হ্রদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান তৃষ্ণার্থ দ্বিপদ চতুষ্পদের অস্থায়ী আশ্রয়শিবিরে পরিণত হয়। পরবর্ত্তী বর্ষায় সুবৃষ্টি হইলে সকলেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যায়, মরুর পাংশুমুখে সুদিনের হাসি ফুটিয়া উঠে।

এমন এক দু'কালে-র (সংস্কৃত দুষ্কাল) তাড়নায় পুগলের অধিস্বামী পিঙ্গল রায় স্ত্রী ও শিশুকন্যা মারু-কে সঙ্গে লইয়া পুষ্করে আসিয়াছিলেন।[৬] রাজা নলের রাণীর

---

৫ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা আলোয়ার রাজ্যের এক গ্রামে এইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন—যাহা অন্ততঃ দুই শত বৎসর প্রাচীন বলিয়া তিনি অনুমান করিয়াছেন। আজমীর ওঝা মহোদয়ের শেষ নিবাস। এইখানেই তিনি ঢোলা-মারুর শোভাযাত্রা চাক্ষুষ দেখিয়াছিলেন। "ঢোলা-মারু" গাথার ১২১ চিত্র সম্বলিত এক চিত্র-মালা যোধপুরের সর্দ্দার-মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

দ্রঃ দোহা প্রাক্কথন, পৃঃ ৭ এবং পাদটীকা

৬ নাগরী প্রচারিণী সভা প্রকাশিত দোহার সম্পাদকত্রয় বিচক্ষণ পণ্ডিত। তাঁহারা পাবশিষ্টে পুঁথির বিভিন্ন পাঠ যোগ করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। অনুবাদসহ মূল যে পাঠ তাঁহারা দিয়াছেন (মূল পৃঃ ১) উহাতে লেখা আছে পিঙ্গল রায় নারবার গিয়াছিলেন এবং রাজা নল তাঁহাকে ঘোড়া চাকর-নোকর উপহার দিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। আর একটি পাঠ তাঁহারা "অত্যন্ত শুদ্ধ" বলিয়াছেন। অথচ উহাতে লেখা আছে পিঙ্গল রায় পুষ্কর আসিয়াছিলেন। (আবি পুবি পুষ্করি উতারয়া)। পিঙ্গল রায়ের ভাট কন্যার সম্বন্ধ প্রস্তাব লইয়া নারবার গিয়াছিল এবং তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্যে রাজা নল পুষ্করে আসিয়াছিলেন (পৃঃ ২৮৩-৮০)। মূল পাঠে ভাটের কথা বাদ দেওয়া উচিত হইয়াছে।

সহিত মারু-র মাতার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইল, রাণী অনিন্দ্যসুন্দরী মারু-কে বধূরূপে প্রার্থনা করিলেন। দুরবস্থায় পড়িলে রাজপুতের আত্মাভিমান তীব্রতর হয়, সুতরাং এই সম্বন্ধ পিঙ্গলরায়ের মনঃপুত হইল না। তিনি স্ত্রীকে বলিলেন, দুঃসময়ে ধনীর ঘরে মেয়ের বিবাহ দিলে লোকে হাসিবে। গৃহিণী ধমক দিয়া কহিলেন, পাগলামি করিও না, বিবাহ আমি স্থির করিয়া ফেলিয়াছি, বর-বধূ বিধাতা স্বয়ং মিলাইয়াছেন। মহা ধুমধামে বিবাহ হইয়া গেল। বরের বয়স তিন বৎসর, কন্যার দেড় বৎসর।[৭]

বিবাহের পর বর-বধূ পিতামাতার সঙ্গে স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ঢোলা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে রাজা নল পুত্রের প্রথম বিবাহের কথা সম্পূর্ণ গোপন করিয়া মালবের অন্যতম নরপতি রাজা ভীমের পরম রূপবতী এবং অশেষ গুণশালিনী কন্যা মালবণীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। পূর্ব্ব বিবাহের কথা ঢোলা কিছুমাত্র জানিতে পারিল না, কিন্তু সুচতুরা মালবকুমারী পতিগৃহে আসিয়া এই রহস্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। আশঙ্কায় বিচলিত না হইয়া তিনি অজ্ঞাত সপত্নীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঢোলা নরবরের সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর মালবকুমারী রাজা ও রাজ্যের মালিক হইয়া বসিলেন। সরল-প্রাণ, অকপট ঢোলা রাণীর রূপ, গুণ ও একনিষ্ঠ প্রেমে গর্বিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়-সরোবরে মালব-নন্দিনী কোজাগরী পূর্ণিমার নীলাচঞ্চল কুমুদ, তিনি "কুমুদ্বতী-রেণু-বিহঙ্গ-বিগ্রহ" ভ্রমর। ঢোলা নিরুদ্বেগে ঘুমায়, মালবণী ঘুমেও যেন কিছু হারাইবার ভয়ে সজাগ থাকেন।

পিঙ্গলের মরু প্রান্তে বালিকা মরু-বধূ কৈশোর অতিক্রম করিয়া উদ্ভিন্ন-যৌবনা হইয়াছে। রাজা বার বার নরবরে দূত প্রেরণ করিতেছে। কিন্তু নরবরে যে যায় সে আর ফিরিয়া আসে না। আশালুব্ধা মুগ্ধা-মারু প্রাসাদ-শিখরে উঠিয়া তৃষ্ণার্ত্ত চাতকীর ন্যায় আকুল মনে পথপানে চাহিয়া থাকে। নিশীথে বিরহ-শয্যায় অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রিয়তম মারু-কে স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রভাতের আলোকে অন্তর্হিত হয়, দ্বিগুণ দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া মারু কাঁদিয়া উঠে। আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণে উল্লাসমুখর পাপিয়ার "পিউ পিউ" (পী আব) ডাক শুনিয়া সুদূর হইতে প্রিয়তমের আহ্বান-ভ্রমে মরু-বধূ উতলা হইয়া উঠে। শ্রাবণের ঘনবরষায় ময়ূরের কেকারব, কামাতুরা দাদুরীর প্রেমনিবেদন যেন মারু-র প্রতি নিষ্করুণ উপহাস। নব-পল্লবিত করীর গুল্মের অন্তরালে বসিয়া বিরহিনী ক্রৌঞ্চ-বধূ নৈশনীরবতা ভঙ্গ করিয়া করুণ বিলাপে মরু-বধূকে আশ্বাসিত করে। পাখীর প্রভাত আছে, কিন্তু মারু-র সুপ্রভাত কোথায়? ঋতুচক্র বহু বৎসর ঘুরিয়াছে, মারুর অদৃষ্টচক্র যেন আর ঘুরিবার নহে, কে ইহার গতি স্তব্ধ করিল?

৬

এক সওদাগর ঢোলার রাজ্যে ঘোড়া বেচিয়া ফিরিবার পথে পুগলে আসিয়াছিল। পিঙ্গল রাও তাহার কাছে শুনিলেন মালবকুমারী গোপনে এমন বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, পুগল হইতে কেহ নরবর রাজ্যে গেলেই তাঁহার চরেরা উহাদিগকে বেমালুম গুম করিয়া ফেলে। তিনি স্থির করিলেন রাজপুরোহিতকে পাঠাইয়া একবার শেষ চেষ্টা করিবেন। রাণী বাধা দিয়া বলিলেন, এই কাজ পুরোহিতের দ্বারা হইবে না। "ঢাঢী"-কেই[৮] পাঠাইতে হইবে। ঢাঢী একশ্রেণীর ভিক্ষাজীবী গায়ক, দেশে দেশে গান করিয়া বেড়ায়, ছোট বড় সকল লোকের সদরে অন্দরে সর্ব্বত্র তাহাদের অব্যাহত গতি। তাহারা ছদ্মবেশ ধারণে নিপুণ, ইঙ্গিতজ্ঞ ও বাকপটু। যাত্রার পূর্ব্বে মরু-নন্দিনী প্রিয়তমের নিকট তাঁহার বিনয়পত্রিকা "মারু"-রাগে গাহিয়া ঢাঢী-দিগকে শুনাইলেন। একবার শুনাইয়া মুগ্ধা মরু-বধূর তৃপ্তি হয় না, বার বার গাইয়া শুনায়।

৭

গীতিচ্ছন্দে এই বিনয় পত্রিকায় "মরু"-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে রাজেন্দ্র-র মতো ভাষার ঝঙ্কার নাই, শ্লেষ বক্রোক্তি নাই। নায়িকার মুখে কবি যাহা শুনাইয়াছেন উহা সরলা পল্লী-বধূর প্রাণের কথা, আকুল কাকুতি, অভিমান ও আত্মনিবেদন। নায়ক-নায়িকা

প্রবন্ধলেখক বহু অসঙ্গত কারণে পাঠ স্থানে স্থানে অন্যায় করিয়া পরিবর্তিত ছন্দে পাঠান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ জিজ্ঞাসু হইলে আত্মপক্ষ সমর্থন করা হইবে।

৭ মায়ের পেটে সন্তান থাকিতে সে কালে বিবাহের উদ্ভট ভাব ছিল যে কোনো প্রদেশে বাল্যবিবাহের দান অশোভন বিবেচিত হইত না। এই যুগেও আইন উপেক্ষা করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিবাহ সচরাচর দেখা যায়, সুতরাং ঢোলা-মারুর ব্যাপার কিছুমাত্র অবিশ্বাস্য নহে।

৮ ঢাঢী জাতির পরিচয়, দ্রষ্টব্য, "দোহা", টিপ্পনী পৃঃ ১৪

স্বামী-স্ত্রী হইলেও ইহা গতানুগতিক গার্হস্থ্য প্রেম নহে। দেড় বৎসর বয়সে তিন বৎসরের বরের চেহারা মারু-র নিশ্চয়ই মনে ছিল না, স্বামীগৃহে সে পদার্পণও করে নাই। বয়স্থা অবস্থায় মারু স্বামীর নাম শুনিয়াছিল, মা, বাপ ও সখিদের মুখে স্বামী বড়ই সুন্দর, এই কথা ছাড়া সে আর কিছুই শুনে নাই, পতির দোষ-গুণ, স্বভাব-চরিত্র এবং সপত্নী সম্বন্ধে পূগলে কেহ কিছু শুনে নাই। কৈশোরের প্রারম্ভে নায়িকার কল্পনায় নায়কের কাল্পনিক মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিয়াছিল, যৌবনে একনিষ্ঠ প্রেমের সাধনায় এই "নিরাকার" তাহার কাছে স্বপ্নেই সাকার হইয়া অভিসারে আসিয়াছিল, নিদ্রাভঙ্গে তাহাকে নিরাশার আঁধারে ডুবাইয়া লুকাইয়া গেল। বাস্তব দৃষ্টিতে যাহাকে জীবনে দেখে নাই তাহার সহিত প্রেম করা কি সম্ভব? এই কথার উত্তরে মারু সখীগণকে বলিয়াছিল—যিনি যাহার জীবন তিনি তাহার দেহভাণ্ডেই থাকেন (তন [illegible] বসন্ত)। প্রকৃত প্রেমিক সমুদ্র পারে থাকিলেও হৃদয়ে বিরাজ করেন পরন্তু কুস্নেহী কপট প্রেমিক উঠানে বসিয়া থাকিলেও মনে হয় চোখের আড়ালে সমুদ্রের পর পারেই গিয়াছে।

দূত বিদায়ের ক্ষণে মারু যে অর্ঘ্য প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়াছিল উহার ভাষা-কলি আগাছার আড়ালে স্বচ্ছন্দ-জাত কুর্চ্চী ফুল কিংবা গৃহস্থের উঠানে ভুঁই চাঁপা, সৌরভ-গর্ব্বিত স্বর্ণ-চম্পক নহে। এই অর্ঘ্যের নম্র বাঁধা-ধরা শাস্ত্রের বুলি নয়, নিষ্পাপ অবোধ মনের বিলাপ, আশার আবদার। মারু বলিয়া পাঠাইলেন, আচ্ছা ভাল মানুষ তুমি! তুমি চিঠি লিখ না কেন? যদি তুমি এই কালে ফাল্গুন মাসে না আস আমি চচরী[10] নাচের ভাণ করিয়া হোলীর আগুনে লাফাইয়া পড়িব। ফাল্গুন চৈত্রের মধ্যে তুমি না আসিলে আগামী কার্ত্তিকের ফসল কাটা হইলেই আমি যাত্রার জন্য ঘোড়ায় জিন কসিব। যৌবনের ফসল পাকিয়া গিয়াছে, বাড়ী আসিয়া তুমি তোমার প্রাপ্য অংশ (রাজস্থানী ভোগ) লইয়া যাও। প্রিয়তম! শ্রাবণ আসিয়াছে, বিরহ-বায়ু-তাড়িত যৌবনের উত্তাল তরঙ্গ রোধিবে কে? যদি তুমি শ্রাবণের শুক্ল তৃতীয়ার (প্রথম তীজ) না আস তাহা হইলে এই মুগ্ধা মেঘের ক্ষণপ্রভাকে আলিঙ্গন করিবে। যদি তুমি ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ তৃতীয়ার (কাজলিয়ারী তীজ) কাজরী পর্ব্বে না আস তাহা হইলে আমার মাথায় বাজ পড়িবে। ভরা প্রেমের ভাষা নাই। ইহা বোবার স্বপ্ন, কাহাকেও বলিবার উপায় নাই, কেবল বার বার মনে করিয়া মনস্তাপ। শেষ কথা, যদি এইখানে আসিবার অবকাশ তোমার না হয়, তবে যেন তুমি বহুদিন রাজ্য সুখ ভোগ কর। প্রণাম! প্রণাম! অসংখ্য প্রণাম!

৮

ঢাঢী যাচকগণ পূগল হইতে পুষ্কর পৌঁছিয়া ছদ্মবেশে মালবকুমারীর চরের দলে ভিড়িয়া পড়িল। সেখান হইতে রাত্রির অন্ধকারে পথ চলিয়া নরবার দুর্গে উপস্থিত হইল। দুর্গরক্ষাদিগকে নানা রাগে গান শুনাইয়া ঢাঢী-র দল পরদেশী যাচক হিসাবে রাজপ্রাসাদের নিকটেই আড্ডা করিয়া লইল। রাত্রিকালে চার প্রহর পর্য্যন্ত বাদলের ঘনঘটা, বর্ষণ গর্জ্জনের ঘোর আঁধারে পৃথিবী সন্ত্রস্তা ও উন্মনা। সুযোগ বুঝিয়া ছদ্মবেশী গায়কগণ মালবের প্রাণ মাতোয়ারা মল্লার রাগে ঢোলা-মারু-র বিরহের গান গাইতে লাগিল। ঢোলা উপর-মহলে সেই করুণ-গম্ভীর গীত শুনিয়া পূর্ব্ব রাগের চাঞ্চল্যে অভিভূত হইলেন। রাত্রি প্রভাতে তিনি গায়কদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তোমাদের গানের ঢোলা কোন ব্যক্তি, মারুই বা কে? অতঃপর নূতন প্রেমের বিষক্রিয়া আরম্ভ হইল। পতির উদাস ভাব দেখিয়া রাণী শঙ্কিতা হইলেন, বার বার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াও সদুত্তর পাইলেন না। আসল কথা গোপন করিয়া ঢোলা বলিলেন, তুমি যদি হাসিমুখে বিদায় দাও তাহা হইলে একবার বিদেশ ঘুরিয়া আসি। মালবকুমারী বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, কিসের জন্য তোমার দেশান্তর? যাহার ঘরে বীণার ঝঙ্কার, রসাল পান, সুগন্ধির সৌরভ সওয়ারে ঘোড়া এবং ঘরে সুন্দরী স্ত্রী থাকে তাহার আবার দেশান্তর কি?[11]

ঢোলার স্বতঃপ্রবণ মন। মালবকুমারীর রূপগুণ যাহার সমস্ত সত্তাকে অধিকার করিয়া আছে। নায়ক হঠাৎ দোটানা স্রোতে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া চালাকি করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু নায়িকা অধিক চতুরা। উভর রাজ্য হইতে মালবরা অনঙ্গার, মুলতান হইতে সস্তার ভাল ঘোড়া, কচ্ছদেশ হইতে অতি বেগ-গামী উট, গুজরাট হইতে দক্ষিণী সাড়ী, সমুদ্র পার হইতে একলাখ একশ এর মুক্তার দানা আনিবার লোভ দেখাইয়া স্ত্রীর

৯ ইহা রাজস্থান মরুর নিজস্ব রাগ — হইতে মহান, কোথায়ও নাই বল।

১০ হিন্দুস্থানী হোলির উৎসবে গীতসহকারে উদ্দাম নৃত্য।

১১ মূল উঁচা-নীচ ভারা ঘেরস, সুরঙ্গ সুধি জাহ।
আসন তুরি ধারা গোরড়া, ঘেসড় দেসডর তাহ॥ পৃঃ ৪১

সম্মতি চাহিলেন। মালবকুমারী বুঝাইয়া দিলেন, ঘরে বসিয়াই তিনি ঐ সমস্ত অনায়াসে কিনিতে পারেন ; কিন্তু কচ্ছদেশে উট কিনিতে গিয়া সে দেশের "হরিণাক্ষী" নারীর রূপের হাটে খরিদ্দার নীলামে উঠিবার ভয় আছে! —ঢোলা কিছুতেই নিরস্ত হইবার নহে দেখিয়া মালবকুমারী অভিমান ভরে বলিলেন, হয় ত আমার কোন অপরাধ হইয়াছে ; না হয় অন্য কোন নারী তোমার চিন্তা-সর্ব্বস্ব হইয়াছে। তোমার লক্ষণ ভাল দেখিতেছি না, উদাস চাহনি মাটিতে নখের আনমনা আঁচড়, ব্যাপার কি? স্ত্রীর জেরায় হার মানিয়া ঢোলা হঠাৎ মনের কথা ফাঁস করিয়া দিলেন। "মারু" নাম শুনিতেই "মালবনী" ধরাম করিয়া মাটিতে পড়িয়াই অজ্ঞান, অনেক কষ্টে ঢোলা গোলাপ জল ছিটাইয়া পাখার বাতাস করিয়া তাঁহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন।

৯

ঢোলা কোন্ শ্রেণীর নায়ক, "ধীরোদাত্ত" না আর কিছু, উহার বিচার আলঙ্কারিকেরা করিবেন। তবে ইহা বলা যাইতে পারে রাজা বাদশাহ ঠাকুর আমার এবং সম্প্রদায় বিশেষ বৈষ্ণব ও শাক্ত সাধক যেমন "ঘরকা মুর্গী দাল বরাবর" জ্ঞান করেন, ঢোলা-র নূতন প্রেম সে পর্য্যায়ের ছিল না। পিতার দোষে এবং নিজের অজ্ঞানকৃত অপরাধে পিতৃগৃহে নির্ব্বাসিতা মরু-বধূকে তাঁহার নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা স্বামীর মহান্ কর্ত্তব্য মনে করিয়া তিনি পূগল যাত্রার জন্য মালবকুমারীর অনুমতি চাহিয়াছিলেন। মালবকুমারী রাণী হইলেও নিতান্তই প্রাকৃত নারী, কালিদাসের নায়িকা ধারিণী কিংবা মৃচ্ছকটিক নাটকের ধূতা নহেন। কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া নবীন প্রেম যে অঙ্কুর ঢোলা-র হৃদয়ে উপ্ত করিয়াছে উহাতে মিলন-বারিসেক বিলম্বায়িত করিলে হয়ত আপনিই শুকাইয়া যাইবে,—এই আশায় মালবনী নানা ছলে ঢোলা-র বিদেশযাত্রা স্থগিত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন।

যাহা হোক, মূর্চ্ছান্তে অভিমানের অশ্রুর বেগ সামলাইতেই ঢোলা ফাঁপরে পড়িলেন, মন দোলায়মান হইল। কবি এই সুযোগে মরুস্থলীর "ঋতু-সংহার" শুনাইয়া পাঠককে আশ্বস্ত করিয়াছেন। বেলির কবি ঋতু বর্ণনায় হিন্দী সাহিত্যের কালিদাস, উঁহারা যে রস পরিবেশন করিয়াছেন উহা অতি সুপরিস্রুত, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও পাণ্ডিত্যের সৌরভে সুরভিত; অর্থাৎ শরাবে শীরাজী, গন্ধে গোলাপ, রূপে চন্দ্রমল্লিকা, স্নিগ্ধতায় শরৎ কৌমুদী। ভোজন-রসিকের নিকট বেলি ও কালিদাসের কবিতা দিল্লীর সোহন্-হালুয়া কিংবা কলিকাতার সন্দেশ। ইঁহাদের কবিতার তুলনায় দোহার রচনা মাদকতায় কাঞ্জিক (কাজি), পাঞ্জাবী সিধ্ (সং সিধু) গন্ধে মরুস্থলার অযত্নবর্দ্ধিত বর্ষায় বিকানীরের বাজ্‌রার আড়ালে, কাঁটাবনে স্বচ্ছন্দজাত বিরল বেলফুল (বেলা বা বেলী)—রূপে অকুলীন, ঠাণ্ডায় মিছরির সরবত। মোদক মধ্যে ইহার গণনা মথুরার পেড়া কিংবা সাণ্ডিলার লাড্ডুর শ্রেণীতেও নহে। ইহা পশ্চিম রাজস্থানের অবিমিশ্র মিছরির লাড্ডু, যাহা অতিথিবৎসল-সম্পন্ন গৃহস্থ হাড়ি ভরিয়া রাখে, তৃষ্ণার্ত্ত পথিক অমৃত-জ্ঞানে যাহা চিবাইয়া জল খায়। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক-বর্জ্জিত, মাটির গন্ধের সহিত অপরিচিত, মাঠের হাওয়া যাঁহাদের সখের জিনিস, মরুপ্রকৃতি যাঁহাদের ভয়-স্থান, মরুর রূপে-রসে-গন্ধে ভরা "দোহা"র কবিতা তাঁহাদের জন্য নহে

বাংলাদেশের বাহিরে ষড়ঋতু শুধু পুঁথিতেই আছে, জড়প্রকৃতিতে কেবল গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত। দোহার ঋতু-পরিচর্য্যায় পতির প্রবাসযাত্রার আশঙ্কায় আকুলিতা গৃহস্থবধূর আত্মপক্ষ সমর্থন, জড়প্রকৃতির আলোকচিত্র, এবং নায়ক-নায়িকার মনের উপর প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাই।

এক বর্ষার রজনীতে চাঢ়া-গায়কের মারু রাগে মরু-বধূর প্রেম নিবেদন শুনিয়া ঢোলা-র মন মালবকুমারীর সোনা টিয়াপাখীর ন্যায় উড়িবার জন্য ছটফট করিতেছিল। বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্তের দশ মাস কাটিয়া গেল। পুরুষের বারমাসার স্থান কাব্যরীতিতে নাই। কবি কিন্তু কৌশলে উহাও আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। গ্রীষ্ম আসিল। প্রেমে পড়িলে ঠাণ্ডা-গরম জ্ঞান থাকে না। ঢোলা প্রেয়সীকে বলিলেন, এইবার অনুমতি দাও, কিন্তু তকে স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষ কোন দিন পারিয়া উঠিয়াছে? তিনি উল্টা ধমক খাইয়া দুই মাসের জন্য ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন। ধমকে যুক্তি ছিল, দরদও কম ছিল না। মালবনী বলিলেন, মরুভূমির বালু তাতিয়া আগুন হইয়াছে, লু সামনে চলিতেছে (থল তত্তা, লু সামুহা)। পথের মধ্যে পুড়িয়া মরিবে নাকি? আমার কথা শুন, দুই মাস ঘরে বসিয়া থাক।

আবার বর্ষা আসিল। ঢোলা ও মালবনী ঝরোকায় বসিয়া বর্ষার শোভা দেখিতেছিলেন। আকাশে কুণ্ডলীকৃত আসন্ন বর্ষণ কাল মেঘের ঘটা দেখিয়া ঢোলা-র মনে

পড়িল, গৃহিণীর কথার মেযাদ ফুরাইয়াছে। প্রেয়সীর কণ্ঠলগ্ন হইয়াও তাঁহার দৃষ্টি উদাস, মন বহুদূরে মরুর মাঝে পথ হারাইয়াছে। ঢোলা মালবনীকে বলিলেন, পথঘাট জলে ভরিয়া গিয়াছে, পুকুরে পদ্ম ফুটিযাছে, বর্ষা আসিযাছে, বিদায় দাও। মালবনী বলিযা উঠিলেন, বৃষ্টিবাদলের যে দুর্যোগে বকও মাটিতে পা ফেলে না উহার মধ্যে তুমি ঘরের বাহির হইবে? এই ঋতুতে পরনের কাপড়, ঘোড়ার জীন, ধনুকের ছিলা জলে না ভিজিযাও নরম হয। কোন প্রেমিক এই ঋতুতে স্ত্রীকে একা ঘরে ফেলিযা যায না। নদী নালা ঝরণা জলে ভরপুর। উটের পা কাদায পিছলাইযা যাইবে। পথিক! পুগল দূর, বহুদূর! এমন দিনে যে প্রবাসে যায সে নাগর নহে, উজবুক্ গোঁযার!

ইহা যেন কাটা ঘাযে নুনের ছিটা। ঢোলা তবুও বলিতে লাগিলেন:

বাজরিয়া হরিযালিযাঁ, বিচি বিচি বেলা ফুল।
জউ ভবি বুঠউ ভাদ্রবউ, মারু-দেস অমুল॥
ধব নীলী ধন পুণ্ডবী, ধরি গহগহই গমাব।
মারু-দেস সুহামনউ সাঁবণি সাঁঝী বার॥

অর্থাৎ বাজরার ক্ষেত হরিত বর্ণ হইযাছে, মাঝে মাঝে বেলা ফুল।

ভাদ্রমাসে যদি ভরা বর্ষা হয তবে মরুদেশের শোভার তুলনা নাই। ধরণী (দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা শ্যাম-শস্যবাজি-) নীলা, ধনিনা (বিবহ) পাণ্ডুরা। গ্রামে কৃষক গৃহস্থের গৃহে গৃহে আনন্দের কোলাহল, আসর গম্ গম্।

মালবনী কিন্তু নিজের কথা বলিয়া চলিতেছিলেন।

পাপিযার "পিউ পিউ", কোকিলের কুহু কুহু, শ্যামাযমান বনানীর অন্তরালে ময়ূরের ষড়জ-সংবাদিনী কেকা-মুখরিত বর্ষায ভিখারী, চোর এবং পরের চাকর এই তিন শ্রেণীর জীব ব্যতীত কে ঘরের বাহিরে পা বাড়ায? বর্ষণ-বধির নিশীথে কান্ত বিনা কামিনীর রাত্রি কেমন করিযা প্রভাত হইবে? আমার মিনতি, বর্ষা ঋতুতে যাত্রা করিও না; কপালের লেখা কেহ খণ্ডাইতে পারিবে না। যখন নিতান্তই যাইবে, দশহরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর।

দশহরা (দীপালী ও পৌষ পার্ব্বণ) পার হইযা মাঘ মাসের শীত পড়িল। এই বার ঢোলা মরিযা হইযা মালবনীকে সাফ্ জবাব দিল হাসিমুখে বিদায দাও ভালই, না হয় আঁধারাতে আমি বাহির হইয়া পড়িব!

মালবনী হাল ছাড়িবার মেয়ে নয়। এই বার তিনি শীতের শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিলেন। যে শীতে পালা পড়িয়া গাছপালা ঠাণ্ডায় আধ-পোড়া হয, মোটা কম্বলের গাত্রবাস "ঠাপ"র ছাড়া ঘোড়াও যে শীত সহ্য করিতে পারে না, যে শীতে প্রোষিত-ভর্তৃকা প্রৌঢ়াও কাহিল হইয়া পড়ে, তেমন শীতে বিরহিনী নবযুবতীর কি দশা হইবে? এমন দিনে সাপও গর্ত্তের বাহির হয না। আজ উত্তরের বাতাস জোর চলিতেছে, এই হাওয়ায় পাকা তিলের কলি ফাটিবে, মনের আগুনে প্রিযা-বিরহিত প্রেমিকের গাযে ফোস্কা পড়িবে, বিরহিনী পুড়িয়া ছাই হইবে, নিঃসঙ্গ বিরহী পথিকের কলিজা ফাটিবে!

মাঘ গেল, ফাল্গুন আসিল। ঢোলা-র মন পুগলে হোলি খেলিবার জন্য উতলা হইযা উঠিল; ঢোলা ঘোড়ার জীন কষে, মালবনী খোলে। ঢোলা রেকাবে পা দিলে মালবনী লাগাম ধরিযা ঝুলিযা পড়ে, সুন্দর চোখে ফোযারা ছুটে। এই ভাবে উভয পক্ষই ধৈর্য্য-হারা হইল। একদিন মালবনী মনের দুঃখে বলিয়া ফেলিল, সর্ব্বদা "গেলাম, গেলাম" করিও না; যদি সত্য সত্যই যাইতে চাও, তবে আমি ঘুমাইযা পড়িলে উটের সাজ কষিবে—ইহাই শেষ নিবেদন।

ঢোলা "তথাস্তু" বলিযা যাত্রার উদ্যোগ আরম্ভ করিল। একদিনেই নারবার হইতে পুগল পৌঁছাইতে পারে তাঁহার এমন একটি উট চাই। অবশেষে আস্তাবলের একটা কচ্ছদেশীয উট রাজাকে বলিল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি সে এই কাজ সমাধা করিতে না পারে কচ্ছী কালি উটনীর পেটে তাহার জন্মই বৃথা। এই উট যদৃচ্ছবিহারী; মাঙ্গলোরের (দাক্ষিণাত্যের Mangalore?) বাগানে চড়ে, নাগর-বেলি (লতা বিশেষ; টীকাকারের "কদম্ব" সম্ভাব্যের অতীত) ছাড়া বাজে লতাপাতা মুখেই তোলে না; এক ঘড়ীর (২৪ মিনিটে) মধ্যে যোজন পথ চলে; মোগল সম্রাটগণের ন্যায় "গঙ্গাম্বু ভিন্নমম্বু ন পিবতি", পঞ্চাশ দিন বরং নিরম্বু একাদশী করিবে। এই দিকে মালবনীর চোখে ঘুমের কোন লক্ষণ নাই। আযোজন পাকা হওযার পর তিনি উষ্ট্রপ্রবরের শরণাপন্না হইলেন। মেজাজী উট প্রথমে বিরস মুখ আরও বিকট করিযা রাণীকে ধমক দিযা বলিল, থাম, থাম সুন্দরী, ঐ সব চলিবে না। খোঁড়াইবার ভান কবিলে রাজা পাযে গরম লোহার ছেঁক্ দিবে, তুমি দিবে সেক? আমি মারা যাই আর কি? মালবনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইযা কাঁদিল, দরদী উটের মন ভিজিযা গেল, পশু দ্বিধায পড়িল। সে ভাবিতে লাগিল, যায় কোন্ পথে? সে-সবে মাত্র উটনীকে একলা (রাজস্থানী-হেকলী,

পৃঃ ৭৮) ফেলিয়া আসিয়াছে, প্রেয়সীর চোখে জল দেখিয়াছে; মানুষের ঘরেও এই ব্যাপার! অথচ মনিবের কাছে ফাঁকি দিলে শাপ লাগিবে। মালবনীর জিত হইল, ঢোলা-র যাত্রা পিছাইয়া গেল। রাণীর ইশারায় এক দাসী রাজাকে বুঝাইল' তাহার বাপের দেশে উট খোঁড়াইলে গাধার পায়ে ছেঁকা দিয়া উটকে সারাইতে সে দেখিয়াছে! যে যাহা বলে রাজা বিবেচনা না করিয়া উহাই ঠিক মনে করেন, না হয় তিনি "দুর্লভ" (ঢোলা) হইবেন কেন?

উটের চালাকি শাশুড়ীর কাছে ধরা পড়িবার পর মালবনী আবার উটের কাছে গেলেন। উট তাঁহাকে ভরসা দিয়া একটি কাজ করিতে রাজী হইল; যথা—রাজা রেকাবে পা দিতেই উট উৎকট চীৎকার করিয়া মালবনীকে ঘুম হইতে জাগাইয়া দিবে। ইহার পর:

"পনরহ দিনহ জাগতী প্রীস্থ প্রেম করন্ত।
এক দিবস নিদ্রা সবল স্থতী জানি নিচন্ত॥
* * *
সজি কসণা, করি লাজ গ্রহি, চঢ়িয়উ সালহ কুমার।
করহ কর কউ শ্রবণ স্থনি, নিদ্রা জাগি নার॥"
(পৃঃ ৮০-৮১)

মালবনী পনর দিন দিনরাত জাগিয়া রহিল, প্রিয়তমকে প্রেম-সাগরের মাঝ তরঙ্গে ভাসাইয়া রাখিল। একদিন প্রবল ঘুমের ঘোরে তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইতে-ছিলেন। সালহকুমার (ঢোলা) উটের পিঠে, পেটে বন্ধন-রজ্জু কষিয়া লাগাম হাতে লইতেই উটের (সাঙ্কেতিক) শব্দে নারী জাগিযা উঠিলেন। কিন্তু ঢোলা তখন দৃষ্টির বাহিরে।

আগামীবারে সমাপ্য

এই গান ও শান্তিনিকেতন

শ্রীকরুণাময় বসু

এই গান, এই প্রাণ অসীমে ছড়ানো কতোকাল;
কিছু তার রোদ হয়ে, ফুল হয়ে, পাখি হয়ে
ফিরে এলো বসন্তের তরুণ সকাল।
মানুষের মনে মনে চম্পাছায়াবনে
ফিরে এলো রামধনু গাঢ় রঙে গোধূলি নির্জনে:
সেই রঙ আকাশের সুরে
ঢেউ হয়ে ভেসে গেল উঁচু নিচু লাল পথ,
সোনাডাঙা মাঠে মাঠে, কোপাই নদীর ধারে সূর্যাস্ত-
আবির মাখা
শান্তিনিকেতনে, দূরে আরো দূরে।
ওই দূর তালী বন যেখানে আকাশ-মন খুঁজে মরে কাকে,
সেখানে তোমার গান শ্রাবণের কান্না চোখে ছায়া হয়ে
কেউ যেন বুকে করে রাখে!

সেই গান আলো হয়ে শরতের পদ্মবনে কাঁপে,
হেমন্তের ঘুমচোখ মুছে দেয় করুণ আলাপে;
সেই গান কতো দূর নিরুদ্দেশ মরাল ডানায়
বসন্তের শান্ত মেঘে মিশে গেল ছায়া-অজানায়।
চৈত্র শেষে ক্ষীণস্রোতা নদীতীরে বসে

মনের প্রদীপখানি জেলে দেই কতো না স্মৃতির রঙ,
মায়াময় সুধার পরশে:
সেই মন, সেই দীপ
তোমার গানের সুরে ছুঁয়ে গেল সুদূরের এক প্রান্ত,
আকাশের দুটি ভুরু মাঝখানে সন্ধ্যাতারা মনে হ'ল
জলজলে কাঁচপোকা টিপ:
তোমার গানের সুর জেলে দিল আশ্চর্য প্রদীপ!

এই গান জলে-ওঠা চুনী পান্না ঝিলিমিলি মীনে করা হার,
আকাশের শূন্যতাকে পূর্ণ করি দিলে উপহার।
এই গান বেলা শেষে ঘরে-ফেরা পাখির হৃদয়,
এই গান ফেলে-যাওয়া বিদায়ের ফুলমালা ম্লান,
এই গান বুকে করে ঘুমায়েছি অনন্ত সময়।

শূন্য উত্তর

শ্রীরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

অ্যালজেব্রার ব্র্যাকেটগুলো আজ আর জেব্রা হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে না খাতাময়, তারাবাজির তারা হয়ে চোখের সামনে ভেসে বেড়াচ্ছে না দশমিকের ফুটকিগুলো। বরং একটু একটু করে যেন চেতনার সূক্ষ্ম তারে ঘা দিচ্ছে। একটা অজানা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিলুর মুখ। খুশির জোয়ারে পেন্সিলের শিস্ দ্রুত সরে সরে যায় সাদা পাতার ওপর।

উত্তরমালার পাতা খোলে সে। সঙ্গে সঙ্গে চক্‌চক্ করে ওঠে চোখ দুটো। পর পর তিনটে অঙ্কই এক চান্সে রাইট! বোধ করি আনন্দের আতিশয্যেই জিব দিয়ে তালুতে একটা বিচিত্র শব্দ করে বিলু। পরক্ষণেই চোখ দেয় পরের অঙ্কটায়। বইয়ের পাতা থেকে টুকতে থাকে খাতার পাতায়। কিন্তু চোখ তার হঠাৎ কেমন যেন আবার ছায়া-ছায়া হয়ে ওঠে; মুখের রঙ যায় বদলে। পারবে কি সে এই অঙ্ক? এও সরল, তবে রাজ্যের জটিলতা এর মধ্যে। অন্ততঃ তার কাছে তাই মনে হয়। এটাতে শুধু ব্র্যাকেট নয়, কিম্বা শুধু দশমিকের ফুট্‌কি, আছে তিনের চার ইন্‌টু পাঁচের চারের মাথায় লম্বা ড্যাস, আর গোড়ার দিকের অংশটায় ঘুড়ির ল্যাজের মত নেমে এসেছে কয়েকটা সাতের আট পাঁচের তিন। সিঁড়ি-ভাঙা না কি বলে যেন একে।

তবু—তবু সে একবার দেখবে চেষ্টা করে। না হয় শিখে নেবে কারো কাছ থেকে। যেমন করেই হোক, নিতাই-পটলার দলকে সে বুঝিয়ে দেবে মাথা তার নিরেট নয়। একবার-দু'বার-তিনবার—বার বার ধরে সে চোখ বুলোয় অঙ্কটার ওপর। সরলে 'BODMAS'-এর কাজ আগে। কিন্তু মাথায় ওই ছাতার মত ড্যাস-লাইনের কাজটা কখন হবে? 'BODMAS'-এর আগে না পরে? ক্লাসে যখন বুঝিয়ে দিতে গিয়ে গলা চিরে ফেলেছিলেন নিবারণবাবু, বদমায়েস ছেলে ওই নিতাই-পটলার সঙ্গে কেন সে তখন হাসি-মস্করায় মেতে ছিল? কেন সে শোনে নি তখন?

মনে মনে গাল দেয় বিলু নিতাই-পটলার দলকে, আর চেয়ে থাকে অঙ্কটার দিকে। অনেকক্ষণ ধরে কি যেন ভাবে। আন-মনেই কখন একসময় পেন্সিলের শিস্‌টা আলতোভাবে টোকা দিতে থাকে চৌকির ওপর। নিষ্পলক চোখের সামনে তেঁতুলে বিছের মতো অঙ্কের অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে আসে, ঝাপসা হয়ে আসে এক-সময় খাতাখানাও, আর তার জায়গায় যেন আবছা হয়ে ভেসে ওঠে গতকালের একটা দৃশ্য:

ক্লাস নাইনের 'সি' সেক্সন। অভিভাবকদের অনুরোধে পরীক্ষায় পাস-না-করা যে সব ছেলেকে প্রমোশন দেওয়া হয়েছিল, এ-সেক্সন শুধু তাদেরই। তারই লাষ্ট বেঞ্চের কোণায় বসে বিলু। অঙ্কের মাষ্টার নিবারণবাবুর নির্দেশ মতো হঠাৎ কেমন যেন মন দিয়ে বসল বিবিধ প্রশ্নমালার একটা অঙ্কে। অল্প সময়ে, সবার আগেই মিলে গেল অঙ্কটা হঠাৎ। অথচ এক চান্সে কেন, চার চান্সেও, তা সে যত সহজই হোক, অঙ্কটাকে চিরকাল তেল-জলের সংমিশ্রণের মত মনে হয়েছে বিলুর। নিবারণবাবু খাতা দেখলেন, নম্বর দিলেন, তার পর পিঠ চাপড়ে বললেন, ভেরি গুড্! দেখলে তো, প্রসেস জানা থাকলে কত সহজে অঙ্ক মিলে যায়!

বিলু বলতে যাচ্ছিল যে, প্রসেস সে মোটেই জানে না, নেহাৎই আন্দাজে মিলে গেছে অঙ্কটা, কিন্তু সে-অবসর সে পেলো না। তার আগেই নিবারণবাবু বলে উঠলেন, যাও, বসো গে যাও, ফার্ষ্ট বেঞ্চে বসো।

সরে সরে বসল ফার্ষ্ট বেঞ্চের ছেলেরা। বিলু গিয়ে বসল তাদের মাঝে। এদিক-ওদিক তাকাল। দেখল, অনেকগুলো চোখ তার ওপর নিবদ্ধ। আশ্চর্য, অবাক, আর কৌতুকে ভরা। কেমন একটা চাপা আনন্দ আর লজ্জা বোধ করল সে। একবার মাষ্টার মশাইয়ের ওপর চোখটা বুলিয়ে নিয়ে সে চট্ করে নিজের খাতায় মন দিল।

ঢং ঢং করে সেদিনকার মতো স্কুলের শেষ ঘণ্টা বাজল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গুঞ্জন উঠল ক্লাস থেকে। খাতা বন্ধ হ'ল কারো কারো, দাঁড়িয়ে উঠল দু-একজন, আর নিবারণবাবু বলে উঠলেন, বিলু যে বিলু—সেও করে ফেলল কত চট্ করে। আর তোমরা ঘণ্টা কাবার করে ফেললে! যাই হোক, সোমবার করে এন—ওই প্রশ্ন-মালার পরের সাতটাও করে এন।

বেরিয়ে গেলেন নিবারণবাবু। আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল চিরুণী, হাত-লাট্টু আর মাউথ অর্গান। বিলুকে ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল একটা দল। একটা হিন্দি-গানের আধখানা কলি মাউথ অর্গানে বাজিয়ে, 'কি রে, মেরে দিয়েছিস একচোট!' বলেই রমেন বাকি আধখানা কলি শেষ করল।

বিলু চুপ করে রইল দেখে, মুখে বিচিত্র একটা শব্দ করে নিতাই বলে উঠল, খুব যে ডাঁট লিচ্ছিস! বাইচান্স একটা অঙ্ক না হয় মিলিয়েই ফেলেছিস—

বিলু এবার ফোঁস করে উঠল, বাই-চান্স! বাই-চান্স হবে কেন, আমার মাথা কি তোদের মতো নিরেট নাকি?

আরে রাখ্, রাখ্! অমন ঢের দেখেছি।—ঢেউ-খেলান রুখু চুলে চিরুণীটা একবার বুলিয়ে নিয়ে পটলা বললে, আমাদের কাছে আর রঙবাজি করতে আসিস নি রে! তোর মতো—

তাকে শেষ করতে না দিয়ে, হাত-লাট্টুটা তার নাকের কাছে ছেড়ে আবার টেনে নিয়ে হাবুল বলল, চল্ চল্!

চিন্তাসূত্রটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল বিলুর। সদর-দরজায় সজোরে কে কড়া নাড়ছে। নিশ্চয়ই ভাতুয়া। পাড়ার ধাঙর। কলতলা পরিষ্কার করতে এসেছে।

আসুক গে, দরজা খুলবে না বিলু। তার কি গরজ? কলতলা তো তাদের একার নয়, আর পায়খানাও তারা একা সরে না। আবার মন দিল বিলু অঙ্কের ওপর। কিন্তু বাধা পেল পরক্ষণেই। দরজার কড়াটা বেজে উঠল দ্বিতীয় বার। এবার আরো জোরে। সেই সঙ্গে হাতের ধাক্কা। বিরক্ত হয়ে উঠল বিলু। শুধু বিলু নয়, বিলুর বাবা সত্যবাবুও। ভোরের আমেজী ঘুমের চটকা ভেঙে যাচ্ছে বলেই বোধ হয়। গজ গজ করতে করতে পাশ ফিরলেন: শুয়োরের বাচ্চা প্রতিদিন ঘুম ভাঙাবে! মেঝেয় শুয়ে নিরুপিসিও গজরাচ্ছিল, মুখপোড়া, রোজ জ্বালাবে এই ভোরে। যত বলি, সাতটার আগে আসিস্ না—!

চৌকির দক্ষিণ দিকে শুয়ে বিলুর বড় শম্ভু একবার নাকটা কুঁচকাল, জড়ান গলায় কি একটা বললও বুঝি, বোঝা গেল না। শুধু টুলু আর ভোলা মেঝেয় পিসির দু'পাশে ট্যারা-বাঁকা হয়ে যেমন অকাতরে ঘুমোচ্ছিল, তেমনিই ঘুমোতে লাগল।

আবার কড়ানাড়ার শব্দ, সেই সঙ্গে দরজায় ধাক্কা। তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে পড়লেন সত্যবাবু। জানলায় মুখ বাড়িয়ে খেঁকি কুকুরের মতো খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, শালার ব্যাটা শালা, বেলায় আসতে পার না! রাত থাকতে দরজা খুলে দেবে, তোমার বাবার চাকর আছে এখানে?

বাংলা গাল বুঝল কি না কে জানে, তবে প্রত্যুত্তর একটা দিল ভাতুয়া ম্যাথর। সত্যবাবু সে-কথায় কান দিলেন না, আবার বিছানা নিলেন। কিন্তু খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে ঘুম এল না বলেই বোধ হয় উঠে পড়লেন আবার। চৌকির পাশেই পেরেকে টাঙান ঘামে লাল ময়লা ফতুয়ার পকেট থেকে বের করলেন বিড়ির কৌটো আর পুরনো লাইটারটা। একটা বিড়ি দাঁতে চেপে ধরে জানলায় মুখ বাড়িয়ে দেখলেন ম্যাথরটা চলে গেছে কি না। তার পর নিশ্চিন্ত হয়ে বিড়ির মুখে লাইটারের আগুনটা ঠেকিয়ে তেরছা চোখে একবার তাকালেন জাপানী ওয়াল-ক্লকটার দিকে। বিলুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই এত ভোরে উঠে কি করছিস?

খাতা থেকে চোখ না তুলেই বিলু জবাব দিল, অঙ্ক।

অঙ্ক! মনে মনে একবার কথাটা উচ্চারণ করলেন সত্যবাবু। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসলেনও—কি ভেবে কে জানে। তার পর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, মনসার দোকান খুলেছে রে?

দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বিলু বলল, খুলেছে বোধ হয়।

তাহলে একবার যা দিকিন, একটু চা নিয়ে আয়। দাঁত দিয়ে বিড়িটা চেপে ধরে ফতুয়ার পকেটে আর একবার হাত ঢুকোলেন সত্যবাবু। একটা আনি বের করে বিলুর হাতে দিলেন।

ইজেরের পকেটে আনিটা রেখে, চৌকির তলা থেকে সর্বাঙ্গে টোল-খাওয়া হাতলবিহীন পোড়া কেটলিটা টেনে নিয়ে বিলু বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সদ্য-ধরানো বিড়িটা শেষ হয়েছে কি হয় নি, বিলু ফিরে এল দেখে সত্যবাবু বলে উঠলেন, কি রে, ফিরে এলি যে! দোকান বন্ধ নাকি?

দোকান বন্ধ কেন হবে—এনেছি তো চা! কেটলিটা জানলার ধারে নামিয়ে রাখতে রাখতে বিলু বলল।

সত্যবাবু মুহূর্তের জন্যে চুপ করে থেকে বললেন, তাহলে দে, গেলাসটায় ঢেলে দে।

চা ঢেলে, গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে, অনেকগুলো ইঁট দিয়ে উঁচু-করা তক্তপোষটার উপর লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল বিলু, পেছন থেকে নিরুপিসি শুয়ে শুয়েই বলে

উঠল, কয়লা না হলে উহুন ধরবে না—দোকানটা খুললেই একবার দেখিস!

কথাটা বিলু শুনল এই পর্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে তক্তপোষে উঠে মন দিল আবার অঙ্কটায়। একবার, দু'বার, তিন-বার ধরে সে কষল সেটা, কিন্তু উত্তর সেই ভদ্রলোকের এক কথার মতো শূন্যের বদলে চার-অক্ষরি হয়েই রইল।

চতুর্থ বারের জন্যে তৈরী হচ্ছিল বিলু। ভিজে কাপড়ে ঘরে ঢুকে নিরুপিসি বলে উঠল, কিরে, এখনও যাস নি? বেলা যে আটটা বেজে গেল! এমন একখানাও কয়লা নেই যে উহুনটা ধরিয়ে দিই—

ঘড়ির দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল বিলু। বেজে না গেলেও আটটা প্রায় বাজো-বাজো। গলাটা একবার ঘর্‌ঘর্‌ করে পুরনো আমলের জাপানী ঘড়িটা আর মিনিট তিনেক বাদেই সময় সঙ্কেত করবে। এক-তলায় হলেও, রাস্তার ধারের ঘর বলেই ইংরেজি 'টি' অক্ষরের আকার নিয়ে চৈত্রের রোদ কখন এসে ঢুকে পড়েছে জনলা দিয়ে, দড়ি দিয়ে ঝোলানো টিয়া পাখীর খাঁচার পাশ দিয়ে। ফতুয়া গায়ে বাবা বেরিয়ে গেছে, শম্ভুও উঠে গেছে বিছানা থেকে। টুলু মুনিয়া পাখীর খাঁচা পরিষ্কার করছে ওধারের জানলার ধারে, আর ভোলা রাস্তার দোরে বসে লেড়ী কুকুরের ছানা তিনটের সামনে মুড়ি ছড়িয়ে দেখছে খায় কি না।

কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করল বিলু। খাতা আর অঙ্কের বইখানা তক্তপোষের একপাশে সরিয়ে রেখে সে উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। বলল, দাও, পয়সা দাও পিসি। কত নেব?

জলের বালতিটা ঘরের এক কোণে জলচৌকির ধারে নামিয়ে রেখে নিরুপিসি বলল, পাঁচ সের নিবি। দেখে নিস্‌, গুচ্ছির গুঁড়ো আর কাঁচা কয়লা না দেয়।

তক্তপোষের তলা থেকে কাঠের বাক্স খুলে নিরুপিসি একটা আধুলি বের করে বিলুর হাতে দিতে দিতে টুলুকে লক্ষ্য করে বললে, ও টুলু, কাঠ ক'খানা কেটে দে না বাবা।

খাঁচার বাটি পরিষ্কার করতে করতে টুলু বলল, আমি পারব না—দাদাকে বল।

নিরুপিসি চটে উঠল। বলল, সে-রাজপুত্তুর সাত-সকালেই মাথায় চিরুণী বুলিয়ে কোথায় বেরিয়েছেন। তুই দে—

দাদা ছাদে গেছে। রাস্তার দোরের কাছ থেকে ভোলা বলে উঠল।

নিরুপিসি সে-কথায় কান দিল না। বলল, তুই-ই দে বাবা, কতক্ষণ আর লাগবে!

ঘাড় ফিরিয়ে টুলু বলল, আমি পারব না।

নিরুপিসি যেন ক্ষেপে গেল। বলল, পারবি না ত খাবার সময় আসিস, মুখে ছাই গুঁজে দেব 'খন।

গতিক সুবিধের নয় বুঝে চট্‌ করে দেওয়ালের পেরেক থেকে থলেটা টেনে নিয়ে বিলু সরে পড়ল সেখান থেকে। কে জানে, এখুনি হয়ত তারই ঘাড়ে পড়বে কাঠ কাটার দায়।

পথে যেতে যেতে হঠাৎ সুশোভনের কথা মনে পড়ে গেল বিলুর। ওদেরই সহপাঠী। ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড হয়। খানকয়েক বাড়ীর পরেই মোড়ের মাথায় হলুদে রঙের দোতলা বাড়ীখানায় থাকে। অঙ্ক খুব ভাল জানে। আটের কোঠায় নম্বর তোলে। ও হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই কষে দেবে সরলটা সঙ্গে সঙ্গে আর বুঝিয়েও দিতে পারবে তাকে।

র‍্যাশন ব্যাগটাকে ভাঁজ করে বাঁ-হাতে ধরে জোরে জোরে পা চালাল বিলু। বাড়ীটার সামনে এসে এক লাফে লাল রোয়াকের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে জানলায় উঁকি মারল; কিন্তু পরক্ষণেই মুখটা সরিয়ে নিল সে।

সুশোভন রয়েছে বটে, কিন্তু ওর বাবাও বসে আছেন সামনে খবরের কাগজ নিয়ে। ডাকব কি ডাকব না—কয়েক মিনিট ভাবল বিলু। কে জানে, যদি ওর বাবা বকে ওঠে? যা রাগি-রাগি মুখ। তার পর কি ভেবে রোয়াকের নিচে নেমে এসে আলতো গলায় ডাকলে, সুশোভন।

শুনতে পেলো কি না কে জানে, সাড়া না পেয়ে বিলু আর একবার একটু জোরে ডাকল, সুশোভন।

কে?—ভারি গলার আওয়াজের সঙ্গে জানলায় দেখা দিল সুশোভনের বাবার মোটা ফ্রেমের চশমা-পরা ভারি মুখ। বিলুর আপাদমস্তকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কাকে চাই?

গলার স্বর নামিয়ে বিলু বলল, সুশোভনকে।

ও এখন পড়ছে, পরে এসো।

চোখ নামিয়ে বিলু চলে এল। অনেকটা এগিয়ে এসেও একবার পেছন ফিরে দেখল, সুশোভনের বাবা তখনও তার দিকে তাকিয়ে। লোকটাকে কেমন ভয় করে বিলুর। কোনোদিন হাসতে দেখে নি, সর্বদাই মুখটা গোমড়া, গম্ভীর গলা, জানলা-জোড়া চেহারা। পরে

আসতে বললে, অথচ আজ রোববার, সারাদিনই বাড়ি থাকবে। তার চেয়ে—

কমলের কাছে গেলে কেমন হয়? চোখ দুটো বিলুর মুহূর্তের জন্যে একবার চক্‌চক্‌ করে উঠেই আবার ম্লান হয়ে গেল। ও ছেলেটা ভয়ানক স্বার্থপর। নিজের কাজের বেলায় সবার কাছে আসবে, কিন্তু ওর কাছে কেউ গেলে দেখা করে না পর্যন্ত। ওর বাড়ির লোকগুলোও কেমন অদ্ভুত। স্রেফ বলে দেবে, বাড়ী নেই, দোকানে গেছে, কি বাজারে গেছে, কি বেরিয়েছে কোথাও। যত সব মিথ্যেবাদী!

তবে কার কাছে যাবে সে? নিমাই? কিন্তু ও পারবে কি? ভালো ছেলে হলে কি হয়, অঙ্কেই কাঁচা। নইলে অন্যান্য সাব্‌জেক্টে যা নম্বর তোলে, অনেকে বলে, ষ্ট্যাণ্ড করতে পারত। তা ছাড়া ছেলেটা খুব মিশুকে আর সদাই হাসিখুশি। সবার সঙ্গে সমান ভাবে মেশে। বড় লোকের ছেলে বলে গর্বও নেই; লেখাপড়ায় ভাল বলে গুমোরও নেই। বিলুর খুব ভালো লাগে ওকে।

কয়লার কথাটা বোধহয় ভুলেই গেল বিলু। দোকান পরে রইল ডান দিকে, সে চলল এগিয়ে। মিনিট দশেক পর সে গোয়াবাগানের একটা বাগানওলা বাড়ির ফটকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু নিমাইকে ডাকবার আগেই দেখা হয়ে গেল তার সঙ্গে। ফটক খুলে সে সামনেই একটা অপেক্ষমান মোটরে উঠতে যাচ্ছিল, বিলুকে দেখেই এগিয়ে এসে বললে, কিরে, তুই এখানে?

বিলু কেমন একটু সঙ্কোচ বোধ করল। বলল, এই দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। তুই কোথায় যাচ্ছিস?

আমরা যাচ্ছি ভবানীপুরে, মামার বাড়ি। ওখান থেকে বাবা নিয়ে যাবেন একজিবিসন দেখাতে।

বিলুর চোখ দুটো যেন চক্‌ চক্‌ করে উঠল। বলে উঠল, একজিবিসন! কোথায় হচ্ছে রে?

ইডেন গার্ডেনে।

কত দিন হবে?

আজই শেষ দিন।

একটু মুষড়ে পড়ল বিলু। খানিক চুপ করে থেকে বলল, কখন ফিরবি?

নিমাই বলল, রাত্রে। কিন্তু কথাটা শোনার আগেই সরে এলো বিনু। নিমাইয়ের বাবা, মা, দিদি আর ছোট ভাই ফটকের দিকে এগিয়ে আসছে। বিলুর দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে নিমাই গিয়ে ওর বাবা-মার সঙ্গে গাড়িতে চেপে বসল। আর গাড়ি ছেড়ে দেবার পর যতক্ষণ না সেটা গলির বাঁকে মিলিয়ে গেল, এক দৃষ্টে চেয়ে রইল বিলু। তার পর র‍্যাশন ব্যাগটার দিকে চোখ পড়তেই দ্রুত পা চালাল সে।

দেরিতে ফেরার কৈফিয়ৎ হিসেবে অন্যদিন বেমালুম মিথ্যে কথা বলে বিলু, দোকানে ভিড় ছিল, কি দোকানদার স্নান করতে গেছল, কিন্তু আজ হঠাৎ সত্যি কথাটাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। বলল, একটা ছেলের বাড়ি গিয়েছিলাম।

নিরুপিসির অবশ্য সে কৈফিয়ৎ মনঃপূত হ'ল না। বলল, তবে আর কি, বাপ-চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে দিয়েছ ...এখন পিণ্ডি রাঁধি কখন? এখুনি তো সব খিদে বলে ছুটে আসবে। দু'দণ্ড অপেক্ষাও সইবে না—চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে। এখনও বাজার এসে পৌঁছল না। সে টুলু মুখপোড়াও গেছে সেই কখন—ওরে, ও ভোলা, দেখ না একবার বাবা, মাঠে গুলি খেলছে কি না সে হারামজাদা! দেখা হলে বলবি, বাজারের জন্যে রান্না চাপবে না—নবাব যেন একটু তাড়াতাড়ি আসে।

যাকে উদ্দেশ্য করে বলা হ'ল, সেই ভোলা তখন একটা কাঠকয়লার টুকরো নিয়ে দেওয়ালে পদ্মফুল আঁকছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, ওতো গুলি নিয়ে যায় নি।

তোকে যা বলছি, তাই কর।—নিরুপিসি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

নিরুপিসি কথাও বলছিল যেমন, দ্রুত হাতে উনুনের মাথায় বেছে বেছে কয়লা চাপাচ্ছিলও তেমনি। শেষ হলে, উনুনটা ধরে সদর দরজার ধারে রাস্তার ওপর নামিয়ে রেখে এসে চাল ধুতে বসলেন। আর, কাঠকয়লার টুকরোটা কুলুঙ্গীতে রেখে, কোমর থেকে খসে-যাওয়া ইজেরটা ঠিক করে নিয়ে ভোলা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কাঁধের ওপরকার কয়লার গুঁড়োগুলো ঝেড়ে নিয়ে বিলু আবার গিয়ে তক্তপোষে উঠল। বই-খাতা পেড়ে, সবে খাতাটা খুলবে, এমন সময় সত্যবাবু তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বিলুকে দেখে বললেন, তুই ওখানে কি করছিস? নেমে আয়, যা, বাইরে গিয়ে যা হয় কর।

মনে মনে একটু বিরক্ত হ'ল বিলু, কিন্তু প্রতিবাদ করল না। যদিও সে জানে, তক্তপোষে বসে এমন কিছু কাজের কাজ করবে না তার বাবা—দাবার ছক নিয়ে বসবে। নিঃশব্দে অঙ্কের বই আর একখানা খাতা নিয়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সোজা উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে ছাদে। সেখানটা একটু নিরিবিলি। যদিও

াদে ভরে গেছে, তবু চিলেকোঠার চতুষ্কোণ একটা ছায়া ড়ে উত্তর দিকে। কিন্তু সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছেই াকে থেমে যেতে হ'ল। ছাদের দরজা-গোড়ায় তার াদা অর্থাৎ শম্ভু দাঁড়িয়ে। কথা বলছে তাদেরই পাশের রের ভাড়াটেদের মেয়ে চন্দনার সঙ্গে। কি কথা বলছিল জানে, বিলুকে দেখেই কিন্তু বিরক্ত হয়ে উঠল। বলে ঠল, কিরে, কি দরকার এখানে? যা, নিচে যা।

বিলু কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই চন্দনা কেমন কটু থতমত খাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, আমি যাই, মা াবার বকাবকি করবে।

নার নামার আগেই বিলু নেমে এল। দোতলার ারান্দাটা ফাঁকা। বাড়িওয়ালী বুড়ি আর তার একমাত্র াইপো থাকে দু'খানা ঘরে। কিন্তু হলে কি হয়, বুড়ি াদের দেখতে পারে না দু'চক্ষে। ওর বাবা ঘরের ভাড়া াতে পারে না সময় মতো, তাই দিনরাত গাল পাড়ে ড়ি, ওদের দেখলেই খ্যাক্ খ্যাক্ করে ওঠে। ইলেক্- কের লাইনটাও কেটে দিয়েছে আজ ক'মাস হ'ল।

বিলু আবার নেমে এল নিচেয়। কিন্তু বসবে কোথায় ? একখানা ঘর ওদের। তারই মধ্যে রান্না, খাওয়া, কা, শোওয়া। ঘর বোঝাই জিনিস। ভাঙা তোরঙ্গ, টকেশ, কাঠের বাক্স। ইঁট দিয়ে উঁচু-করা তক্তপোষের চটা রাজ্যের আসবাবে ভর্তি। মেঝেয় এদিকে-ওদিকে লা-বাসন, বঁটি-খুন্তি, ধামা-চুপড়ি। জানলার পাল্লার য়ে আটকানো দুখানা খাঁচা। একটায় এক ঝাঁক মুনিয়া, র একটায় ময়না। ঘরের এক কোণে গোটা তিনেক াড়ী কুকুরের বাচ্চা। বেড়াল আছে দুটো—তাদের বশ্য নির্দিষ্ট কোন জায়গা নেই থাকবার। সারাদিন ধার-ওধার ঘোরে, খাবার সময় আসে দু'বেলা, আর াত্রে হয় তক্তপোষের ওপর কারো কোল ঘেঁষে কিংবা ঝেয় কারো পায়ের তলাটিতে কুঁকড়ে পড়ে থাকে। কে আসবাব, তার ওপর ওখানেই রান্নার দরুন ঘরখানা ান্নাঘরের মতোই অন্ধকার।

বিলু এসে দেখল আধ-জ্বলা উনুনটা নিরুপিসি ঘরের ধ্যে এনে ফেলেছে এরই মধ্যে আর তার থেকে ধোঁয়া রিয়ে ঘরখানা ভরতি হয়ে গেছে। বাবা তার বন্ধু য়ে তক্তপোষের ওপর দাবায় মগ্ন। মেঝেয় যে বসবে কটু বিলু তারও জো নেই। এধারে জলের বালতি, লনোড়া আর ওধারে বঁটি আর আধ-কুচনো রি-তরকারী।

তবু কোনোরকমে একধারে একটু জায়গা করে নিয়ে লু বসল একটা ছেঁড়া পাড়ের আসন বিছিয়ে। যেমন করেই হোক, আর যেভাবেই হোক, অঙ্ক তাকে মিলোতেই হবে। নিতাই-পটলার দলের কাছে হার সে কিছুতেই মানবে না।

উদাহরণমালায় কি নেই এই ধরনের অঙ্ক? কথাটা মাথায় আসতেই বিলু টেনে নিল অঙ্কের বইখানা, ফরফর করে উল্টে গেল পাতা, গিলে-খাওয়া চোখ দিয়ে প্রথম দিকের আধখানা বই তোলপাড় করে ফেলল, কিন্তু না, কোনো হদিসই সে পেল না।

হঠাৎ জানলার বাইরে থেকে একটা 'সিটি'র আওয়াজ তার কানে ভেসে এল। হাঁটুতে ভর দিয়ে একটু উঁচু হয়ে বিলু মুখ বাড়িয়ে দেখল, তারই বন্ধু মদ্না। চোখা-চোখি হতেই বিলু উঠে জানলার ধারে এসে বলল, এখন বেরোব না, কাজ করছি একটা।

কি এমন কাজ করছিস বে! গলায় বাঁধা টাইয়ের মতো রুমালটা বাঁ-হাতে নাড়তে নাড়তে ফিস্ফিসিয়ে মদ্না বলল, আয়, আয় শালা, আর ন্যাকামি করিস না। এগারোটা বেজে গেছে, এই সময় জায়গাটা রেখে আসি। শালার ভিড় হচ্ছে খুব ছবিটাতে। পরশু, কাল ফুল হাউস গেছে। লোটন বললে, মধুবালা নাকি কেলাস পার্ট করেছে মাইরি!

সিনেমার নামে লোভ যে বিলুর একটু না হ'ল তা নয়। তবু নিজেকে সংযত করে নিয়ে সে বলল, না ভাই, আজ সময় হবে না।

আবে, রাখ তোর কাজ! যাবি ত চল! শালা নাচ দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে!

না ভাই, আজ যাব না।

তবে জাহান্নমে যা শালা! বলে, ঘাম-চকচকে মুখ-খানা রাগে কুঁচকে মদ্না চলে গেল।

বিলু এসে বসল আবার আসনে। খাতায় মন দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। অঙ্কটায় চোখ বুলোতেই কেমন একটা অস্বস্তিতে মন তার ভরে গেল। এদিক-ওদিক চাইল, উনুন-জ্বলা গরমে আর ধোঁয়ায় মাথাটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্ করছে। তার ওপর মাঝে মাঝে ঘোড়া আর হাতী নিয়ে বাবার চীৎকার, সেই সঙ্গে কড়ার ফুটন্ত তেলে জলধোওয়া আলুর চড়বড়ানি।

বিলু একবার তাকাল ঘড়ির দিকে। সওয়া এগারোটা। আর একবার সুশোভনের কাছে গেলে কেমন হয়? এতক্ষণ আর নিশ্চয়ই তার বাবা বাইরের ঘরে বসে নেই, কিংবা বই মুখে বসে নেই সুশোভন। এখন গেলে নিশ্চয়ই সে কষে বুঝিয়ে দেবে তাকে অঙ্কটা।

অঙ্কটা একটা কাগজে টুকে নিয়ে বিলু উঠে পড়ল।

সুশোভন বাইরের ঘরে বসে তখন ক্যারাম খেলছিল তার ছোট ভাই আর দিদির সঙ্গে। বিলু রোয়াকে উঠে উঁকি মেরে দেখল একবার, কিন্তু ডাকতে পারল না। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল তার। এখুনি হয়ত সুশোভন তাকে ডাকবে ভেতরে, আর তার ছোট ভাইয়ের সামনেই জিজ্ঞাসা করবে কি চাই তার। তখন কি করে সে ওই ওদের সামনে বলবে যে, এই সহজ সরল অঙ্কটা কষিয়ে নেবার জন্যে সে এসেছে। হয়ত অবাক হয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকাবে ওই ছোট ভাইটা। হয়ত ভ্রূ কুঁচকাবে ওর দিকে তাকিয়ে ওর দিদি। তার চেয়ে—

বিলু নেমে পড়ল রোয়াক থেকে। আপন মনেই কতক্ষণ এধার-ওধার করল। ডাকবে কি না ইতস্ততঃ করল দু'একবার, যদি সুশোভন একবার জানলা-গোড়ায় আসে—এই ভরসায় তাকাল বার দুই সেদিকে ঘাড় উঁচু করে। শেষে নিরাশ হয়েই ফিরে চলল নিজের বাড়ীর দিকে।

দুপুরে শুয়ে শুয়ে কথাটা হঠাৎ মাথায় এল বিলুর। এর-ওর-তার কাছে ধর্ণা না দিয়ে নিবারণবাবুর কাছে গেলেই ত হয়! কি দরকার একে-ওকে-তাকে খোসামোদ করবার। ওঁর কাছে গেলে উনি খুশি হয়ে ভালভাবেই বুঝিয়ে দেবেন। আজ রবিবার, কোচিং-ক্লাসে যাবেন না উনি, বাড়ীতেই থাকবেন বিকেলের দিকে। সুতরাং কোনো অসুবিধেই নেই।

অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে রইল বিলু। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ঘরের কোণায় জড়ো-করে রাখা এঁটো বাসনের বোঝায়—যেখানে এক সঙ্গে তিনটে চড়ুই পাখী ফর্‌ফর্ করে ভাতের দানা ঠুকরোচ্ছিল। আজ আর কিছুতেই ঘুম আসছে না যেন তার, কিংবা একটু তন্দ্রাও। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একবার সে। প্রায় তিনটে বাজে। কাঁসারীর থালা বাজানো শেষ হয়েছে। এবার সুরু হবে কর্পোরেশনের রাস্তা ধোওয়া। সুরু হবে ঘুঘনী আর মুড়ি-বাদাম ফেরীওয়ালার চীৎকার। সেই শব্দে নিরুপিসির ঘুম ভাঙবে, বাবাও জেগে উঠবে। হয়ত ফরমাস করবে কোথাও যাবার, কিংবা আদেশ হবে পা টিপবার। তার চেয়ে আগে থাকতে সরে পড়াই ভাল।

আস্তে আস্তে বিলু উঠে পড়ল। জামাটা কাঁধে ফেলে, পা টিপে টিপে ভোলাকে ডিঙিয়ে, নিরুপিসিকে পাশ কাটিয়ে বিলু বেরিয়ে এল বাইরে। অঙ্কের সেই কাগজটা আছে কি না দেখে নিল একবার জামার পকেটটা।

পথে পড়ে নিতান্ত এলোমেলো ভাবেই সময় কাটাতে লাগল বিলু। নিবারণবাবুর কাছে যাবে সে পাঁচটা নাগাদ। এখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি। অকারণেই একবার পাড়াটার এমোড়-ওমোড় করল সে, হেদোয় গোটা তিনেক পাক দিল। 'জলি-চীপ'-এর বাক্সের সামনে এসে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। বড় রাস্তার মোড়ে একটা লাইটপোষ্টে হেলান দিয়ে ট্রাম-বাসের লোক ওঠা-নামা দেখল। তার পর বিড়ির দোকানের একটা ঘড়ি দেখে গুটিগুটি এগোল দর্জিপাড়ার দিকে। নিবারণবাবুর বাড়ীটা ঠিক সে চেনে না। একদিন ও-পাড়া দিয়ে আসতে আসতে ব্ল্যাকোয়ার স্কোয়ারের কাছে এ[illegible] অত্যন্ত সরু খোয়া-বাঁধানো গলির মধ্যে ঢুকতে দেখেছিল সে তাঁকে পরদিন স্কুলে শুনেছিল ওই গলির মধ্যেই নিবারণবাবু থাকেন।

জিগ্যেস করে করে বিলু একসময় সেই সরু গলিটার একটা ভাঙা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। নিবারণবাবু তখন বাড়ীতেই ছিলেন। বিলু কড়া নাড়তেই নেমে এলেন আলগা গায়ে। তাকে দেখে একটু অবাক হলেন। বললেন, কি ব্যাপার? তুমি? বাড়ী চিনলে কি করে?

বিলু বলল সব। তার আসার উদ্দেশ্যটাও।

শুনে নিবারণবাবুর মুখের হাসি একটু কমে এল। বললেন, এলে বটে, কিন্তু আমি যে এখন একটু বেরুবো? যাকগে, যখন এসেছ, করে দিচ্ছি। বইখানা এনেছো। কোন্ অঙ্কটা?

পকেট থেকে বিলু অঙ্কের কাগজটা বার করে নিবারণবাবুর হাতে দিল। দোরের পাশেই একটা ভাঙা রক ছিল, সেটার একধারে বসে নিবারণবাবু অঙ্কটায় একটু চোখ বুলিয়ে বললেন, এ আর এমন কঠিন কি? পেন্সিল আছে? নেই? আচ্ছা বসো, আমি আনছি।

ভেতর থেকে একটা ফাউন্টেন পেন এনে নিবারণবাবু অঙ্কটা কষলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, কি, এই উত্তর ত?

খুশী হয়ে বিলু বললে, হ্যাঁ স্যার, শূন্য উত্তর।

উঠে দাঁড়িয়ে নিবারণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পড় কার কাছে?

নিজে নিজেই। শুকনো গলায় বিলু বলল।

বাবা কি করেন?

বড়বাজারে একটা দোকানে কাজ করেন।

তুমি আমার কোচিং-এ ভর্তি হয়ে যাও না! বাবাকে বল, তোমাকে কন্‌সেসন করে দেব 'খন।

বিলু জানে বাবাকে বললে কি উত্তর পাওয়া যাবে। তবু বলল, বলব স্যার।

নিবারণবাবু একটু খুশি হয়ে বললেন, হ্যাঁ বল। আর শোন, যখনই আটকাবে, এসো আমার কাছে, বুঝিয়ে দেব 'খন।

বিলুর পিঠটা একবার চাপড়ে নিবারণবাবু ভেতরে ঢুকে গেলেন আর বিলু বেরিয়ে এল বাইরে। তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। একে একে জ্বলে উঠছে গ্যাসবাতি। সামনের পার্কটায় ছেলেমেয়েদের ভিড় কমে আসছে। বিলু সোজা এসে ঢুকল সেই পার্কটায়। একটা ফাঁকা বেঞ্চে বসে, পকেট থেকে অঙ্কের কাগজটা সে বের করল। গ্যাসের ম্লান আলোয় চোখ বুলোতে লাগল বার বার। খুশিতে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখখানা। একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল নিতাই-পটলা-রমেনের মুখ। মনে পড়ে গেল তাদের ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ কথাগুলো। কাল তাদের সে একবার দেখে নেবে। বাই-চান্স অঙ্ক যে তাদের মেলে না, মেলে আর পাঁচজন ভাল ছেলের মতোই মাথা ঘামানোর ফলে—কাল সে ক্লাসেই তা দেখিয়ে দেবে। শুধু কালই নয়, এবার থেকে প্রতিদিনই—নিয়মিত ভাবেই। তাদের সে বুঝিয়ে দেবে, এতদিন নেহাৎ মন দেয় নি বলেই ফেল করে এসেছে সে পরীক্ষায়, নইলে তাদের মতো নিরেট মাথা সে নয়। আর শুধু অঙ্কেই নয়, ইংরেজী, বাংলা সংস্কৃত—প্রতিটি বিষয়েই। আজই বাবাকে সে বলবে নিবারণবাবুর কোচিংয়ে ভরতি করে দেবার জন্যে। বাবা না রাজি হলে সে নিবারণবাবুর হাতে-পায়ে ধরবে। যেমন করেই হোক, ভালো তাকে হতেই হবে। ভোঁতা করতেই হবে নিতাই-পটলার থোঁতা মুখ। পরীক্ষায় যাতে কোনো বিষয়েই সে ফেল না করে, তার জন্যে আপ্রাণ খাটবে সে। দিনরাত পড়বে—যেমন সামনের বাড়ির শুর্প বলে ছেলেটা পড়ে। তার পর পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে, ভয়ে ভয়ে চোরের মতো নয়, বুক ফুলিয়ে বাড়িতে ঢুকবে, মাথা উঁচু করে সবাইকে দেখাবে।

হঠাৎ পরীক্ষার রিপোর্টের কথাটা মনে আসতেই বিলুর মুখে যেন মেঘ ঘনিয়ে এল। গত পরীক্ষার রিপোর্টটা এখনও সে তার বাবাকে দেখায় নি। মাঝে একদিন তার বাবা খোঁজ নিয়েছিল বটে, মাইনে বাকি থাকার জন্যে রেজাল্ট দেয় নি বলে সে ঠেকিয়ে রেখেছে। অথচ রেজাল্ট তাকে অন্য ছেলেদের দেবার দিন-দুই পরেই দেওয়া হয়েছিল। ন'টা বিষয়ের ছ'টায় সে ফেল করেছে বলে ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে রেখেছে।* ভাগ্যিস বাবা তার কোনোদিন স্কুলে যায় না খোঁজ নিতে কিংবা নিয়মিত মাইনে দেয় না, নইলে ধরা পড়ে যেত সে, আর ধরা পড়লেই পিঠের চামড়া আর পায়ের দাবনা তার লাল হয়ে উঠত ছাতার বাঁটে।

বিলু ঠিক করল, রেজাল্টটা সে তার বাবাকে দেখাবে। আর মার যদি খায়, সে তো এই শেষবারের জন্যেই। পরের বার থেকে তো সে আর ফেল করবে না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল বিলু। আকাশ অন্ধকারে ঢাকল, আশপাশের বাড়ির আলো উজ্জ্বল হ'ল, তবুও যেন তার খেয়াল নেই আজ বাড়ি ফেরার, ভুলেই গেল যে সন্ধ্যের পর আর সে বাইরে থাকে না, বিশেষ করে ছুটির বারে—বাবা যেদিন সারা দিনরাতই বাড়ি থাকে।

রেডিও-র ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজতেই ধড়-মড়িয়ে উঠে পড়ল বিলু। দ্রুত পায়ে, এক রকম ছুটেই বলতে গেলে, সে চলে এল তার পাড়ায়। কিন্তু খানতিন-চার বাড়ির আগে হঠাৎ তাদের বাড়িটা চোখে পড়তেই বুকটা তার কেমন ধড়াস করে উঠল। চলার গতি হ'ল মন্দীভূত।

ডাকাত-পড়া চিৎকারে বাড়িটা যেন তাদের ফেটে পড়বার উপক্রম হয়েছে। তার বাবার গলা, নিরুপিসির গলা, ওপরের বাড়িওলি বুড়ি আর পাশের ঘরের ভাড়াটেদের দুটো ছেলের মিহি ও মোটা গলা মিলে এক বিচিত্র ধ্বনির সৃষ্টি করেছে।

দোরের সামনে রাস্তার ওপর দু'হাতে দু'খানা থান ইট নিয়ে উলঙ্গ অবস্থায় নাড়ুগোপাল হয়ে ভোলা দাঁড়িয়ে। তার থেকে হাত চার-পাঁচ দূরে পাড়ারই গোটা দুই ছেলে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলাবলি করছে আর হাসছে। সে হাসির সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভোলাও মুচকি মুচকি হাসছে আর মাঝে মাঝে এক একবার পেছন ফিরে ঘরের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে, কিংবা থান ইটের ভারসাম্য রাখতে না পেরে টলে টলে পড়ছে।

এধারে ওধারে ওপরে নিচে একবার তাকাল বিলু। আশপাশের বাড়ির জানলা-দরজায় অসংখ্য ছোট বড় মাঝারি কৌতূহলী মুখ। চাপা হাসি আর ফিসফিসানি। বিলুর একবার ইচ্ছে হ'ল পালিয়ে যায় ওখান থেকে, কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে হ'ল, দাঁড়িয়ে পড়ল।

সত্যবাবু তখনও চেঁচাচ্ছিলেন; শুয়োরের বাচ্চাদের জন্যে খাটতে খাটতে মুখ দিয়ে আমার রক্ত উঠছে, আর ওরা কি না এক একটি কে চোর হচ্ছে, গুণ্ডা হচ্ছে,

বদমায়েস হচ্ছে। শালারা মান-সম্মান আর কিছু রাখলে না আমার। শালাদের গলায় পা তুলে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে।

পরক্ষণেই নিরুপিসির গলা পাওয়া গেল: কেন মিছিমিছি চেঁচামেচি করছো দাদা, বলছি তো শম্ভু আসুক, বিলু আসুক, ওরা নিয়েছে কি না জিগ্যেস করো—

তাকে থামিয়ে দিয়ে সত্যবাবু আবার চিৎকার করে উঠলেন, আরে, জিগ্যেস আবার করব কি, বোঝাই তো যাচ্ছে বিলু নিয়েছে। হারামজাদা বেরিয়েছে সেই দুপুরে —নিশ্চয়ই সিনেমায় গেছে। সিনেমার পয়সা সে পায় কোথায় এত? তার কোন্ বাবা তাকে রোজ রোজ সিনেমার পয়সা যোগায় শুনি?

এই সময় বাড়িওয়ালী বুড়ি তার খন্‌খনে গলায় বলে উঠল, দেখো বাপু, এটা ভদ্দর লোকের বাড়ি, খিস্তিখেউর করতে হয় রাস্তায় গিয়ে করো গে। আমার বাড়িতে বসে ওসব চলবে না।

তোর বাড়ি, না তোর বাবার বাড়ি—আবার সত্যবাবুর গলা শোনা গেল, যতক্ষণ ভাড়া দিই, ঘর আমার। আমার ঘরে বসে আমি যা-খুশি করি, তাতে কার বাবার কি!

পাশের ঘরের ভাড়াটেদের ছেলে নগেন এবার তেড়ে উঠল, এটা কি মগের মুলুক নাকি? যা খুশী তাই করবে?

নগেন বয়সে ছোট বলেই বোধ হয় সত্যবাবু ক্ষেপে গেলেন আরও। বলে উঠলেন, হ্যাঁ, তাই করব—যা খুশী আমার তাই করব। তাতে তোমার কি—তোমার বাবারই বা কি?

এর পর কয়েকটা মুহূর্ত কোথা দিয়ে আর কি ভাবে যে কেটে গেল, বুঝতে পারল না বিলু। ভোলা হঠাৎ একবার পেছন ফিরে তাকিয়েই এমন ভাবে চমকে উঠল যে, হাত থেকে তার ইট দু'খানা খসে পড়ে গেল মাটিতে, আর সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে সরে দাঁড়াল তার সামনের সেই ছেলে দুটি।

বিলু তাড়াতাড়ি ছুটে এল দরজার গোড়ায়। দেখল, নগেন একটা লাঠি নিয়ে তেড়ে আসছে তার বাবার দিকে। তাকে বাধা দেবার কোনো পথ না পেয়ে বিলু চট্ করে ঘরে ঢুকেই দরজাটায় দিল খিল লাগিয়ে। বাইরে থেকে নগেন দড়াম দড়াম করে লাথি মারতে লাগল দরজায় আর চেঁচাতে লাগল: বুকের পাটা থাকে বেরিয়ে এস বলছি, নইলে দরজা ভেঙে ফেলব!

খগেন এগিয়ে এসে বাধা দিল তার দাদাকে। হাত দুটো ধরে সজোরে টেনে নিয়ে গেল ভেতর দিকে। যেতে যেতে গজরাতে লাগল নগেন: কালই এর একটা বিহিত করব। ভদ্রলোকের পাড়ায় বসে যত সব ইতরোমি—যত সব—

সত্যবাবু তখন সমানে চিৎকার করে চলেছেন: হ্যাঁ, হ্যাঁ, কে কার বিহিত করে দেখব'খন। ভদ্রলোকের ঘর চড়াও হয়ে মারতে তেড়ে আসা—আমিও দেখে নেব'খন—

হঠাৎ বিলুর দিকে চোখ পড়তেই সত্যবাবু প্রসঙ্গ পাল্টে গলা নামিয়ে বললেন, এই শুয়োর, কোথায় বেরিয়েছিলি রে সেই দুপুরবেলা?

বিলু থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সত্যবাবু আবার বলে উঠলেন, আমার পকেট থেকে গ্যাঁড়া করে কোথায় বেরিয়েছিলি? বল্, কোন্ ভাগাড়ে গেছলি নাচ দেখতে?

কথা শেষে সত্যবাবু সজোরে একটা চড় কষিয়ে দিলেন বিলুর গালে। বিলুও গিয়ে ছিট্‌কে পড়ল জল-চৌকির ধারে।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে সত্যবাবুকে ধরতে গেল নিরু-পিসি, কিন্তু সবেগে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সত্যবাবু আবার এগিয়ে গেলেন বিলুর দিকে। রাগে মুখখানা বিকৃত করে তেমনি চিৎকার করেই বলে চললেন, বল্ হতচ্ছাড়া, কেন আমার পকেট থেকে টাকা নিয়েছিলি? চুরি করবার আর জায়গা পাও নি শুয়োরের বাচ্চা! আমি শালা এদিকে তোমাদেরই জন্মে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে খাটছি, আর তোমরা শালা এদিকে পকেটমার তৈরী হচ্ছ?

মেঝে থেকে রুটি বেলবার বেলুনটা তুলে নিতে যাচ্ছিলেন সত্যবাবু, পা দিয়ে সেটা গড়িয়ে দিয়ে গালে হাত বুলোতে বুলোতে বিলু উঠে বসে বলল, আমি চুরি করি নি—

চুরি কর নি মুখপোড়া—তবে হাওয়ায় উড়ে গেল টাকাটা! শালা, চুরিও করবে আবার মিছে কথাও বলবে!

কথাশেষে চুলের ঝুঁটি ধরে বিলুকে দাঁড় করিয়ে দিতেই হঠাৎ সে যেন কেমন ফুঁসে উঠল, তবে বেশ করেছি নিয়েছি—যা পার কর গে—

সত্যবাবু যেন ফেটে পড়লেন রাগে। গড়ানো বেলুনটা মেঝে থেকে তুলে নিতে নিতে বললেন, যা পার কর গে—আবার চোপড়া! এত দূর বয়ে গেছ—

মুখের কথা শেষ করার আগেই বেলুনটা ছুঁড়ে দিলেন তিনি বিলুর মাথা লক্ষ্য করে। কিন্তু তার আগেই

মাথাটা সরিয়ে নিয়ে বিলু দরজার খিলটা খুলে ফেলল এবং দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। আর সেলুনটা দেওয়ালে লেগে ঠিকরে এসে পড়ল জানলার ধারে-রাখা শিস্-ওঠা পুরনো হ্যারিকেনটার ওপর। দপ্ করে এক-বার জ্বলে উঠেই হ্যারিকেনটা উলটে গেল মেঝেয়।

সত্যবাবু ছুটে বেরোতে যাচ্ছিলেন ঘর থেকে, নিরু-পিসি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, কি সুরু করেছ দাদা! এখুনি যে খুন হয়ে যেত ছেলেটা—

খুন হওয়াই দরকার। সত্যবাবু রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে বললেন, অমন ছেলে থাকার চেয়ে মরাই ভাল।

সজোরে চেপে ধরে নিরুপিসি সত্যবাবুকে তক্তপোষের কাছে নিয়ে এল। বলল, আর লোক হাসিও না—বস চুপ করে—

সত্যবাবু বসলেন, কিন্তু থামলেন না। বলে চললেন, রাশ রাশ টাকা খোযাচ্ছি মাসে মাসে, আর ছেলে কি না চুরি করতে শিখছে—বাপের মুখের ওপর কথা বলতে শিখছে! কালই যাচ্ছি ইস্কুলে, নাম কাটিয়ে দিয়ে আসছি! ভস্মে ঘি ঢেলে কোনো লাভ নেই—

ঘর থেকে বেরিয়ে বিলু সোজা এসে বসল মোড়ের মাথায় ভাঙা রোয়াকটার ওপর। অনেকক্ষণ ধরে কি ভাবল, তার পর পকেট থেকে অঙ্কের কাগজখানা বার করে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দিল রাস্তার ওপর। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে সেগুলো উড়ে গিয়ে পড়ল নর্দমার ধারে।

মুহূর্তের জন্যে সেদিকে একবার তাকাল বিলু, তার পর দুই হাঁটুর মাঝে মুখ লুকিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

দুজ্ঞে'য়

শ্রীউমা দেবী

সে গিয়েছে ফিরে—
দুজ্ঞে'য় গভীরে
অশ্রুর জোনাকি জ্বেলে চোখের তিমিরে।

সে যদি বা একবার আসতো নিকটে
মলিন আখর আঁকা হৃদয়ের পটে—
ক্ষয়ে-যাওয়া মজে-যাওয়া জীবনের তটে।

বল্মীক স্তুপের মত এ মাটির জীবনের ধন—
ভিজিয়ে দিয়েছে তাকে দুর্ভাগ্যের দুর্ব্বার ক্রন্দন,
বিচ্ছিন্ন হয় নি তবু পৃথিবীর নাড়ীর বন্ধন।

এ এক আশ্চর্য্য শক্তি ফেরে ক্লান্ত বক্ষের শোণিতে—
ডুবেও ডোবে না তাই স্মৃতিগুলি ভাঙা তরণীতে,
বেদনার গুঞ্জরণ হৃদয়ের নীরব ধ্বনিতে।

সে গিয়েছে ফিরে,
অকূল তিমিরে—
হৃদয়ের দীপ তবু জ্বলে কেন আশার গভীরে।

মনে হয় যেন ঐ অন্ধকার চিরে
আর বার সুনিশ্চিত আসবে সে মনের গভীরে
শোনাবে নতুন গান নয়নের নীরে।

আজকে রাতের তরু কি আশায় জানায় মর্ম্মর
কি এক প্রত্যাশা পেয়ে তারাগুলি কাঁপে থরথর—
মৃত্যুর রহস্য-পর্দ্দা সরিয়ে দেবার যেন এই অবসর।

আসবে সে যে গিয়েছে ফিরে—
মরণের দুজ্ঞে'য় গভীরে
অশ্রুর জোনাকি জ্বেলে চোখের তিমিরে।

সঙ্গীত-স্মৃতি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আমার "ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা"র সঙ্গীতাধ্যায় শেষ হয়েছিল ১৯২৬ সনের শেষের দিকে। তার পরে আমার সঙ্গীতচর্চায় বৈরাগ্য আসে ধীরে ধীরে—কি ভাবে আমি শ্রীঅরবিন্দের প্রভাবে প'ড়ে শেষে পণ্ডিচেরি প্রয়াণ করি, সে-কাহিনী আমার "স্মৃতিচারণ"-এর দ্বিতীয় পর্বের শেষে লিখেছি। পণ্ডিচেরিতে পুরো আট বৎসর অজ্ঞাতবাস ক'রে তিন মাসের জন্যে ফিরে আসি কলকাতায়। ফিরে এখানে-ওখানে নানা নবীন সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে দেখা হয়। এঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ না করলে "দিন-পঞ্জিকা" অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই বলি। সব শেষে লিখব কীর্তন ও ভজনের কথা।

* * * *

আমি লক্ষ্ণৌ থেকে বম্বে হয়ে পণ্ডিচেরি পাড়ি দিই ১৯২৮ সনে নভেম্বর মাসে। সেখানে অজ্ঞাতবাস করি ১৯৩৭ সনের মার্চ অবধি—আট বৎসরের উপর। তার পর কলকাতায় এসে তিন মাস ধ'রে নানা গায়ক-গায়িকার গান শুনি।

এ আট বৎসরে প্রথমেই চোখে পড়ল নবযুগের অভ্যাগমে নতুন অনেক কিছু অঘটন ঘ'টে গেছে। মনে পড়ত সে সময়ে বারীনদা'র (মহামতি ৺বারীন্দ্রকুমার ঘোষ) একটি রসিকতার কথা। বারীনদা তখন পণ্ডিচেরিতে প্রায় মৌনী হয়ে একান্তে বাস করছেন। একদিন এলেন তাঁর এক আগেকার বন্ধু—১৯২৯ সনে হবে। বারীনদা তাঁকে শুধালেন: দাদা, বলো তো, কলকাতায় কি কি ঘটছে আজকাল? ছেলেরা দলে দলে সিগারেট খাচ্ছে?'

"খাচ্ছে।"

"মেয়েরা গান গাচ্ছে?"

"বিষম গাচ্ছে।"

"ট্রামে বাসে অকুতোভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে?"

"তা আর বলতে!"

"ঘোমটা খুলে?"

"স-দাপটে।"

"নাচছে প্রাণের মায়া ছেড়ে?"

"অক্ষরে অক্ষরে।"

বারীনদা হাহাকার ক'রে ব'লে উঠলেন: "ঐ দেখ, আমি বার বার সেজদাকে (শ্রীঅরবিন্দকে) ব'লে এসেছি যে, ঐ সব ঘটবেই ঘটবে। ঘটলও। কেবল—" কপাল চাপড়ে—"আমিই দেখতে পেলাম না।"

তার পর তিনি কলকাতায় এসে এসবই চুটিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন—১৯৩০ সনে। কিন্তু আমার চোখে বাংলার নওজোয়ান ও প্রগতিশালিনীদের নবকীর্তি চোখে পড়ে ১৯৩৭ সনে। দেখি, সত্যিই মেয়েরা চমৎকার গান গাইছে—আর রীতিমত ওস্তাদি গান: ঠুংরি ও খেয়াল। বিখ্যাত সঙ্গীতগুরু ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছে শিখে তিন-চারটি মেয়ে গীতশ্রী উপাধি পায়। (তাদের মধ্যে কয়েকজনকে আমি অল্প-স্বল্প গানও শিখিয়েছিলাম।) শ্রীগিরিজাশঙ্করের অসামান্য সঙ্গীতপ্রতিভার সঙ্গে আমার নিবিড় পরিচয় হয়েছিল অনেকদিন আগে যৌবনে, যখন আমি বহুবারই মুগ্ধ হয়ে তাঁর খেয়াল-ঠুংরি শুনেছি। বিখ্যাত হার্মোনিয়মবাদক গণপৎরাওর শিষ্য শ্রীশ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়ীতে বড়-বাজারে গিরিজাবাবু আমাকে সানন্দেই আপ্যায়িত করতেন তাঁর সদাশয় গীতিকৌলীন্যে। "গীতিকৌলীন্য" কথাটি ব্যবহার করছি এই জন্যে, সে-যুগে আমি আর কোনো বাঙালী গায়ককে খাস হিন্দুস্থানী চালে এমন মধুর ঠুংরি গাইতে শুনি নি। তাঁর মুখে "ননদিয়া, পান খায়ে মুখ লাল" ঠুংরিটি ভুলব না কোনোদিনও। কিন্তু বড় গায়ক হলেই বড় শিক্ষক হওয়া যায় না, যেমন বড় সাধু হলেই বড় গুরু হওয়া যায় না। ইংরেজীতে বলে, "Leaders are born, not made"; ঠিক তেমনি বলা যায়: "Gurus also are born, not made." গিরিজাবাবুর সাঙ্গীতিক গুরুশক্তি ছিল সহজাত। তাই তিনি তাঁর শেষ বয়সে বহু শিষ্য-শিষ্যাকে খাঁটি হিন্দুস্থানী চালে খেয়াল ও ঠুংরি শিখিয়ে বাংলা দেশের সঙ্গীত-আবহকে সমৃদ্ধতর ক'রে রেখে যান। বাংলার উদার মহৎ সঙ্গীতসাধকদের ইতিহাস যদি কোনোদিন লেখা হয় তবে গিরিজাবাবুর নাম তাতে স্বর্ণাক্ষরে উৎকীর্ণ থাকবে। কিন্তু যা বলছিলাম।

এই সময়ে একদিন শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় থিয়েটার

রোডে আমাদের আসরে এসে গান করেন। আমি ভীষ্মদেবের গান একবার সঙ্গীতসমাজে শুনেছিলাম। তখন তিনি গেরুয়াধারী বালক। আমি খানিকক্ষণ তাঁর অদ্ভুত স্বরসাধনা ও কালোয়াতি কসরৎ শুনে বিস্মিত তথা বিরক্ত হয়ে উঠে এলাম, ভাবলাম সদীর্ঘশ্বাসে: "এমন মেধাবী ছেলেটি এত অল্পবয়সেই পড়ল কি না ওস্তাদিয়ানার খপ্পরে! হায় রে, এর সমাধি হবে কোস্তাকুস্তির গহ্বরে!"

এ হেন ভীষ্মদেবের কি অদ্ভুত পরিবর্তন! গানে সুরের কি নিখুঁৎ শুদ্ধি! মিড়ের কি মনোহারিত্ব! তানের কি মাধুর্য! সর্বোপরি, এক সম্পূর্ণ অনন্যতন্ত্র ভঙ্গিতে সাধা অপূর্ব খেয়াল, ঠুংরি, সার্গম! বিলম্বিত আলাপের সে কি বাহার! আবার তার পরেই জলদ তানকর্তবের সে কি অদ্ভুত দীপ্তি! সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম তাঁর সার্গমে। সার্গমে এমন বিস্ময়কর প্রাণোচ্ছল কলাকারুর প্রবর্তন অভাবনীয় বৈকি! দক্ষিণী কালোয়াৎরা সার্গমের বিদ্যুৎগতিতে ভীষ্মদেবকেও হার মানাতে পারে মানি, কিন্তু কিছুক্ষণ সে-প্রাণহীন সানিধাপা সানিধাপা শুনতে শুনতে মন হাঁপিয়ে ওঠে—মনে হয় কেবল শরৎচন্দ্রের কথা: "সে-ওস্তাদ থামেন তো?" দক্ষিণীরা সত্যিই একবার গমক বা সার্গম সুরু করলে আর থামে না।

কিন্তু ভীষ্মদেবের ছিল আশ্চর্য সৌষ্ঠবজ্ঞান—sense of proportion: গাইতে গাইতে নানা তানালাপ ক'রে খানিকক্ষণ সার্গম ক'রেই তিনি পুনরায় গানের বুড়ি ছুঁয়ে চমৎকার সমাপ্তি টানতেন। কিন্তু শুধু এই থামতে জানাই নয়, তাঁর সার্গমের একটা গাঁথুনি ছিল—আর সে গ্রন্থনে ছিল প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পরিকল্পনা। অযথা সার্গমের চর্কিবাজি বহু ওস্তাদেই করতে পারে। কিন্তু ভীষ্মদেব স্তরে স্তরে সাজাতেন তাঁর প্রতিটি সার্গম-আলাপ, যার ফলে তাঁর স্বরালাপ হয়ে উঠত দীপ্যমান, জীবন্ত। সব রসগ্রহণেই চিনতে-পারার আনন্দ একটা গভীর তৃপ্তির পরিমণ্ডল গ'ড়ে তোলে যার উল্টো পিঠে থাকবে অচিনের আবির্ভাব। অর্থাৎ যা জানি তাকে উস্কে দিয়ে যা কখনো সম্ভব ভাবি নি তার প্রবর্তন—এ দুই-ই চাই। শ্রীঅরবিন্দ একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন আমাদের প্রতি মনে বিরাজ করে যুগপৎ দ্বিবিধ স্ববিরোধী চাহিদা (demand): "Novelty is difficult for the human mind, or ear, to accept, but novelty is asked for all the same in all human activities for their growth, amplitude and richer life". এক কথায়, মানুষ যুগপৎ অতীতের রক্ষণশীল দুর্গবাসীও বটে, আবার ভবিষ্যতের নব নব রাজ্যের পথিকৃৎও বটে।

ভীষ্মদেবের গানে মনের এ-দ্বিবিধ তৃষ্ণারই খোরাক মিলত। খেয়ালে তিনি রকমারি আরোহ্ অবরোহ মিড় মূর্ছনা সার্গমে প্রতি রাগের চলতি রূপটির ছবি এঁকেই সুরু করতেন নব নব সৃষ্টি: নতুন নতুন তানের বিদ্যুৎ-ঝলক, নতুন নতুন মিড়ের মঞ্জুল ব্যঞ্জনা, জানা বোল তানের পথে ঘরে ফিরেই আবার নানারঙা অজানা আকাশে সুরবিহারে মনপ্রাণ মাতিয়ে তোলা। তাঁর গান যখনই শুনেছি তখনই মুগ্ধ হয়েছি আর মনে হয়েছে অমর কবি হাফেজের বিখ্যাত পার্সী গজলের দুটি চরণ:

মুৎরিবে খুশনভা বেগু তাজাবতাজা নও বনও।
বাদয়ে দিলকুষা বেজু তাজাবতাজা নও বনও॥

তোমার কলকণ্ঠে গুণী যেন শুনি
নিতুই নব গান।
নিতুই নব রঙিন সুধা ঢেলে ক্ষুধা
মিটাও, মাতাও প্রাণ।

* * *

এই সময়েই একদা হঠাৎ বিখ্যাত দরদী বন্ধু পাহাড়ী সান্যালের ওখানে একটি নম্র যুবকের সঙ্গে দেখা। পাহাড়ী বলল: "মন্টুদা! এর নাম তারাপদ চক্রবর্তী, অদ্ভুত গায়ক···" ইত্যাদি। পাহাড়ী, স্বভাবে চির-উদার, উজিয়ে উঠতে তার কোনোদিনই বাধত না। আমাদের দেশে প্রায় প্রতি নামজাদা ক্রিটিকই কারুর প্রশংসা করবার আগে সব প্রথম ভাবেন—"রয়ে সয়ে বাপু! রসো, অপরে তারিফ করছে কি না আগে খবর নিই। ক্রিটিক নাম বজায় রাখতে হবে তো!" পাহাড়ীর মধ্যে এ-ধরণের পরিণামদর্শিতা কেউ কোনোদিন দেখে নি। কোনো গান সত্যিই ভালো লাগলে কে কি বলবে না বলবে সে ভ্রূক্ষেপও করত না। সঙ্গীতজগতে এহেন উদার সর্বভুক্ সমজদার যে বড় বেশী মেলে না ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এই ক্ষেত্রে তার সঙ্গে খ্যাতনামা সঙ্গীত-কোবিদ শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের মতিগতির গভীর স্বভাব-সাদৃশ্য আছে। এদের দু'জনকে তাই স্নেহ না ক'রে থাকতে পারা যায় না। মনের কথা বলতে বাধে না। বাউলের গানে আছে না?

মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা,
দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচে না।
মনের মানুষ হয় যে-জনা
(ও তার) নয়নেতে যায় গো চেনা,
সে দু'এক জনা।

ভাবে ভাসে রসে ডোবে,
(ও সে) উজান পথে করে আনাগোনা।

কিন্তু মনের মানুষের কথা থাক, তারাপদ-রূপী গানের ফানুষের প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীকে গানের ফানুষ উপাধি দিয়েছি, না দিয়ে উপায় নেই ব'লে। কারণ তিনি যে-ধরণের তানের দীপ্তি, মিড়ের মাধুর্য, সুরের ব্যঞ্জনা তাঁর গানে ফুটিয়ে তোলেন সে-ধরণের তানালাপ মনের অন্তরীক্ষে দেখতে দেখতে ঝিকমিকিয়ে ওঠে। তাঁর সুরে নানা স্ফুলিঙ্গের ফুলঝুরি ঝ'রে পড়ে। সার্গমও তাঁর আশ্চর্য, কিন্তু তাঁর গানে যে-রসটি আমাদের মনকে সবচেয়ে রসিয়ে তুলেছিল সে হ'ল তাঁর সুরের মাধুর্যের সাবলীলতা ও বৈচিত্র্য। নানা ওস্তাদের কাছ থেকেই তিনি নিয়েছেন নানা গ্রহণীয় সুরের অলঙ্কার। অনেকে এজন্যে তাঁকে দোষ দেন—বলেন, সাত নকলে আসল খাস্তা। কিন্তু আমি এখানে তাঁর পূর্ণ সমর্থন করি। একরকম মন আছে চলে একটি ধারায়—যেমন ছিলেন আমার খেয়াল-ওস্তাদ শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে রক্ষণ-শীলতার আদর্শ। তাই একদিন আবদুল করিমের "তূজীনবোল্" দুর্গা রাগে ঠুংরির একটি মিষ্ট তান ব্যঞ্জনার ছোঁয়াচ লাগতে না লাগতে স্থানত্যাগ করেন। আমাকে বলেন: "এ খেয়ালই নয় দিলীপ, এ খামখেয়াল।"

আমি তাঁর বক্তব্য বা বেদনা যে বুঝি না তা নয়। কাশীর ধ্রুপদী হরিনারায়ণবাবুও চন্দনচৌবের খেয়াল-ভঙ্গিম ধ্রুপদ শুনে এমনিই ব্যথিত হতেন। তাঁর মতে—তাঁর গুরু ৺রামদাস গোস্বামীর ঘরানা যদুভট্টী ধ্রুপদ ছাড়া আর সবই অ-ধ্রুপদ, সুতরাং অগ্রাহ্য। আমাদের বাংলা দেশেও এই শ্রেণীর শুচিবেয়ে সমালোচকের অভাব নেই। তাঁরা চান গতানুগতিকতা, বলেন শিষ্য শিখবে কেবল একটি মাত্র ওস্তাদের কাছে, হয়ে উঠবে তারই ঘরানা তানের উত্তরাধিকারী। তারাপদ এদের দলে নন। তিনি যে-ওস্তাদকেই ভালোবেসেছেন তার কাছেই নাড়া বেঁধে শিখতে প্রস্তুত। পাহাড়ী যে-সময়ে তারাপদর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয় সে-সময়ে গান শেখার সুযোগ ও সঙ্গতি তাঁর ছিল না—পাহাড়ীই আমাকে বলেছিল। কিন্তু তারাপদর ছিল প্রতিভা, তার উপর নিষ্ঠা—যাকে বলে মণিকাঞ্চন যোগ। উত্তরকালে তিনি গিরিজাবাবুর কাছে রীতিমত শেখেন অনেক কিছু। কিন্তু তার আগেই তিনি আবদুল করিমের ঢঙে দীক্ষা নিয়েছিলেন গ্রামোফোন থেকে। তাঁর সঙ্গীতসাধনার ইতিহাস আমার বর্ণনীয় নয়, আমি জানিও না। আমি তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করবার সুযোগ পাই নি, যেমন পেয়েছিলাম ভীষ্মদেবের, শচীন্দ্র দেব বর্মণের বা জ্ঞান-প্রকাশের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর ছিল সেই শ্রেণীর প্রতিভা যাকে প্রতিভা ব'লে চিনতে বেগ পেতে হয় না, এক আঁচড়েই চেনা যায়।

শেষ তাঁর গান শুনি কবে মনে পড়ছে না। তবে মনে আছে, তাঁর গুরুদেব ৺গিরিজাশঙ্করের জন্মোৎসবে তিনি আমাকে যখন নিমন্ত্রণ করেন তখন আমি তাঁর গান শুনে গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম। তাঁর গান শুনে আরো অনেক কিছু আনন্দ আহরণ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মানুষের সব সাধ পূর্ণ হয় না তো—তাই সুযোগ হয় নি। তবে আশা হয় আবার তাঁর কমনীয় মুখে স্নিগ্ধ নম্র হাসি দেখব ও শুনব তাঁর সুরেলা কণ্ঠের মধুর উচ্চসঙ্গীত।

এ বৎসর (১৯৬০) তাঁর জন্মদিনে আমি তাঁকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য পাঠাই। সেই অভিনন্দনটি উদ্ধৃত ক'রেই তাঁর প্রতিভার অঙ্গীকারের ইতি করব। আমি লিখে পাঠিয়েছিলাম তাঁকে:

চিরদিন যেন তুমি কলতান উৎসারি' জীবনে
সঙ্গীত-সুধায় তব আনন্দ বিলায়ে জনে জনে
কৃতকৃত্য হও, হে অক্লান্ত দীপ্ত সুরের পূজারী!
বাণীর মূর্ছনা তব কণ্ঠে নিত্য উঠুক ঝংকারি'
আরো দিনে দিনে—যেন সমাদর তব প্রতিভার
আমরা করিতে পারি কৃতজ্ঞ অন্তরে আনিবার।

* * * *

১৯৩৭ সনে কলকাতায় গিয়ে আমার আর একটি মস্ত লাভ হয়, সঙ্গীতকোবিদ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে পরিচয়। লাভ বই কি! এ-চলচঞ্চল জগতে এমন সুশীল, সুকুমার, স্নেহশীল স্থায়ী বন্ধু পাওয়া সহজ নয়। আজ মানুষ সংসারে জীবন-সংগ্রামে নাস্তানাবুদ হয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, প্রীতি-স্নেহকে সে বেশী আমল দিতে বেগ পায়। তার জীবনের মূল মন্ত্র হ'ল:

সময় যে নাই, শুধু আগে চল্ ভাই!
কি বা আসে যায় দিশা যদি রে না পাই?
তবু চলতেই হবে—ছুটিও না চাই।
শুধু কাজ—যতিহীন পন্থে সদাই।
বার্ণার্ড শ বলেন: "ব্যস্ততা চাই।
ক্লান্তি এলেও, ওরে, তুলিস্ নে হাই।
ঘুমহারা চোখে চল্ চল্ সবে ধাই,
অকূলপাথারে চল্—সুখী তো তারাই
ভাবে না ভুলেও যারা, দিয়ে তাই তাই

শিশুসম গায় :—'স্লোগানের জুড়ি নাই'।"
প্রতি পাঁচ বৎসর বাদে আরো চাই
টেক্স বসানো—সোশালিস্‌ম্ জপা-ই
গোলোকধামের পথ। কী? শস্ত নাই?
আমেরিকা দেবে ধার—শোধের বালাই?
ভাবিস নে—ভেবে পার পাবি নে রে ভাই!
শুধু আগে চল্—হাতে দিয়ে তাই তাই।

জ্ঞান কিন্তু আজও ভাবতে ভুলে যায় নি—সাক্ষাৎ রেডিওতে সরকারী চাকরি ক'রেও স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাস করে—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্? ওর মধ্যে এই চিন্তাশীলতার পরিচয় পেয়েই আমি ওকে প্রথম ভালোবেসে ফেলি। তার পর দেখি ভালোবেসে বুদ্ধির কাজই করেছি, কারণ ওর শুধু যে নানা মানসগুণ আছে তাই নয়, আছে সেই সদা সজাগ হৃদয়বত্তা যার অভাবে কেউ শিল্পী হতে পারে না। কত রকম বাজনাই যে ও বাজাতে পারে: গিটার, হার্মোনিয়ম, তবলা—আর যাই বাজাক তার স্বরের আগুন নিরন্তর ফুল কাটে—তুবড়ির মতন। পরে তারাপদর সঙ্গে রাগসঙ্গীতও ও শিখেছিল গিরিজাবাবুর কাছে। আর ও কি কম ওস্তাদের গানের সঙ্গে সঙ্গত করেছে! ফলে আজ ও রাগরাগিণীর নাড়ীনক্ষত্র জানে। একটি দৃষ্টান্ত মনে আছে—অবিস্মরণীয়। কেসর বাঈকে আমি অভ্যর্থনা করছি থিয়েটার রোডে—(তাঁর কথা পরে বলছি)—তিনি একটি অপ্রচলিত রাগ গাইলেন। আমি ধরতে পারলাম না। এক বাঙালী ওস্তাদকে শুধালাম জনান্তিকে: "কি রাগ স্বর?" "স্বর" মুখে ঘোর গাম্ভীর্যের ঘনঘটা টেনে তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন: "কত রাগ আছে!" সমসে´ট ম'ম একবার লিখেছিলেন, বয়সের অনেক দোষ আছে কেবল এই একটি গুণ আছে যে সে "জানি না" বলতে বেগ পায় না। কিন্তু ওস্তাদ "স্বরে"র তখনো তেমন বয়স হয় নি তো, তাই কেমন ক'রে স্বীকার করেন যে, কেসর বাঈ এমন রাগ গাইছে যা তাঁর অজানা? আমি তখন জ্ঞানকে শুধালাম। সে ব'লে দিল টুক ক'রে—কিন্তু সবিনয়ে: "বোধ হয় অমুক রাগ" (রাগটির নাম মনে করতে পারছি নে।) গানের শেষে কেসর বাঈকে বললাম: "অপূর্ব গাইলেন শেষ রাগটি। কিন্তু কি রাগ, বাঈ সাহেব!" তিনি বললেন হেসে: "আমি শুনেছি আপনার বন্ধুটির ফিশ ফিশ। তিনি ঠিকই ধরেছেন। কেবল আমি জানতাম না বাংলা দেশে এ-রাগটি কেউ চিনতে পারবে।"

এহেন জ্ঞানপ্রকাশের নামকে নাম না ব'লে উপাধি বল্‌তেই সাধ যায়। কিন্তু এ-ও বাহু। জ্ঞানের গুণপনা নানামুখী। তার সবচেয়ে বড় গুণ কোন্‌টি বলা কঠিন, তবে একটি মহাগুণ নিশ্চয়ই এই যে, সে স্বভাবে বিনয়ী। আর একটি—যে সে উদার। আর একটি—যে সে গুণ-গ্রাহী—ওস্তাদ তথা ওস্তাদপন্থীদের মধ্যে যে-গুণটির দেখা পেলে বলতে ইচ্ছা হয় শুধু এই নয় "বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে",—জুড়ে দিতে হয়: "কে গো ক্ষণজন্মা, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ?"

ঠাট্টা নয়। মানুষ প্রায় সব শিল্পেই সচরাচর অহংকার—এবং সব দেশেই। ঈর্ষা বা মাৎসর্য তার মজ্জাগত। পরের একটু-আধটু ভালো হোক সবাই চায় বটে, কিন্তু চেনাশোনা কারুর বেশী শ্রীবৃদ্ধি দেখলে সাড়ে পনের আনা মানুষের মনই খুঁৎ খুঁৎ করে। ঠিক যেমন রাজনীতিতে রাজনৈতিক দিক্‌পালরা চান সব দেশই বেঁচে-বর্তে থাকুক, কিন্তু অত্যধিক প্রগতিশীল না হয় যেন। "ব্যালান্স অফ পাওয়ার" মূল সূত্রটিই তাঁদের জপমন্ত্র। ওস্তাদ ও ওস্তাদপন্থীদের মধ্যে এই সংকীর্ণতা রাজনৈতিকদের মতন ব্যাপক, এতটা বললে অত্যুক্তি হবে, কিন্তু আমার "ভ্রাম্যমাণের দিন-পঞ্জিকা"-য় আমি এত বেশী ওস্তাদের বোলচাল শুনেছি যে শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়েছি: নাঃ, এ-জাতের স্বভাব হ'ল আত্মশ্লাঘা আর স্বধর্ম পরশ্রীকাতরতা।

জ্ঞান ঠিক ওস্তাদ না হোক—ওস্তাদপন্থী ও খাঁটি গুণী—মানতেই হবে। তবু কেমন ক'রে ও মন খুলে সব গুণীরই গুণপনার প্রশংসা করে ভেবে আমি বারবারই আশ্চর্য হয়েছি। বিশেষ ক'রে ওস্তাদপন্থী হয়েও ভজন গানে ও সাড়া দেয় কেমন ক'রে—আজো ভেবে কুল-কিনারা পাই নি। বহুদিন ধ'রে ভজন কীর্তন গাইছি—ওস্তাদপন্থী কাউকে বড় একটা আমার ছায়া মাড়াতে দেখি নি। ভজন কীর্তন কি আর গান? গান তো ধ্রুপদী দূন চৌদূন, খেয়ালী কালোয়াতি, হলক তান, তেলানা, চতুরঙ্গ, সার্গমের চরকিবাজি, তালিয়ানার ধুমধড়াক্কা···ইত্যাদি।

এহেন পরিবেশে যে গ'ড়ে উঠেছে তার মনে ভক্তিমূলক সরল বাংলা বাউল কীর্তন বা হিন্দি স্তব ভজনে শ্রদ্ধা এল কোত্থেকে? তাই জ্ঞানকে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ ব'লে কি আমি ভুল করেছি?

শুধু তাই নয়—বাংলা লেখারও ওর হাত আছে। সাহিত্যসাধনায় হয়ত ও কোনোদিন মন দেবার সময় পাবে না, এ-সাধনায়ও সব সাধনার মত হাড়ভাঙ্গা খাটতে হয়। কিন্তু লেখার সাধনা না ক'রেও জ্ঞান কেমন ক'রে ওর রুশদেশে সফরের কথা এমন চমৎকার ঝর্ঝরে

বাংলায় লিখল আমি ভেবে পাই নে। ওর "এলেম নতুন দেশে" বইটির ছত্রে ছত্রে ওর নম্র অথচ ভাবুক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। রুশদের স্বভাব-সহৃদয়তার যে-ছবিটি ও স্বল্প-পরিসরে এঁকে ফুটিয়ে তুলেছে—সে-ছবিটি সত্যিই মনোজ্ঞ, রসময় তথা তথ্যমূলক। এ-বইটি থেকে ওর চরিত্রের একটি চারুচিত্র রুশদেশের চিত্রের সঙ্গে পাশাপাশি ফুটে উঠেছে পদে পদে।

কিন্তু না—এ-ও বাহুই বলব। তাই এবার জ্ঞানের সাঙ্গীতিক প্রতিভার একটু তারিফ করি। ও গুণী বা চিন্তাশীল ওস্তাদপন্থী বা সমঝদার এসবই ওর ব্যক্তিরূপের এক-একটা দিক্। কিন্তু ও সব-আগে গানে সুন্দরের সাধক—যন্ত্রী, মৃদঙ্গী, গায়ক, হার্মোনিয়ম-বাদক, সুরকার, যন্ত্র-ঐক্যতান গঠক, সর্বোপরি সঙ্গীতে চিরজিজ্ঞাসু, শিক্ষার্থী। এ সব গুণের জন্যেই ওকে গুণধাম উপাধি দেওয়া চলে, কিন্তু ও সব-আগে অভিনন্দনীয় এই জন্যে যে ওর মধ্যে দেখতে পাই আমরা একটি খাঁটি বাঙালী শিল্পীপ্রাণ সুরসাধককে, সৃষ্টিকুশল ও গুণীকে। তাই আমি সর্বান্তঃকরণে চাই ও আরো বড় হয়ে ফুটে উঠুক। ওকে বলতে চাই—ব্যক্তিগত ভাবে নয়—বাংলার সুরসাধকদের প্রতিনিধি হিসেবেই:

বাণীর বরে পেয়েছ সুর-জ্ঞানের যে-প্রতিভা
প্রাণ সাধনা তোমার যেন প্রকাশে সেই বিভা।
রেডিওলোকে দোসর তব হয় ত আজ নাই,
সে-গণ্ডীর মধ্যে শুধু থেকো না হে সদাই।

* * * *

১৯৩৭-৩৮-৩৯ সনে কুমার শচীন্দ্র দেব বর্মণের সঙ্গে সংস্পর্শে আসি। সে নানা কাজে ব্যস্ত থাকত—গান শিখত ভীষ্মদেবের কাছে—নানা সভায় গাইতে হ'ত—নানা শিষ্যকেও শেখাতে হ'ত—কাজেই আমার আসরে বেশী আসতে পারত না। তবু যখনই আসত আমার মন ভরে উঠত—শুধু আমার নয় সকলেরই। বড় বংশের কুলতিলক—আভিজাত্য ছিল তার স্বভাবসিদ্ধ। যেমন মিষ্টি হাসি, তেমনি অনবদ্য শীলতা, তেমনি উদার গুণগ্রাহিতা—সর্বোপরি এমন মধুর সুরেলা কণ্ঠ বেশী শোনা যায় না। খুব বলিষ্ঠ কণ্ঠ বলব না, ধ্রুপদ খেয়ালে সিদ্ধি লাভ করতে হলে কণ্ঠের যতখানি স্থিতিস্থাপকতা থাকা দরকার ততখানি স্থিতিস্থাপকতা হয়ত তার ছিল না, যেমন ছিল কিন্নরকণ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর। ভীষ্মদেবের মতন আশ্চর্য দীপ্তিও তার গানে ছিল না, তারাপদর সুরের জাদুও মিলত না তার গানে, কিন্তু একটি জিনিষ তার ছিল যার দাম সুররসিকের কাছে অমূল্য: সরল স্নিগ্ধ গান গেয়ে শ্রোতার হৃদয়ে একটি স্নিগ্ধ সুষমার পেলব পরিমণ্ডল গ'ড়ে তোলা। এ সবাই পারে না। বলতে কি, যারা সবচেয়ে কম পারে তাদেরি নাম ওস্তাদ। তারা খুবই পারে চমকে দিতে, তাক লাগাতে, ঝড় বওয়াতে, কিন্তু মন গলাতে হলে ওস্তাদির 'পরেও আরো যে-বস্তুটি চাই তার নাম মন-গলান মাধুর্যের নির্ঝর। এই অমূল্য সম্পদটি ছিল শচীন্দ্রের সহজাত—বিশেষ ক'রে ওর ভাটিয়ালি গান শুনে মুগ্ধ হ'ত জনে জনে। নানা বাংলা গানেও ওর কলকণ্ঠ এমন সহজে প্রাণসঞ্চার করতে পারত যে বলতে ইচ্ছা হ'ত:

"যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।"

ওর আরো একটি মস্ত সম্পদ্ ছিল—বাংলা গানের সুরশৈলীতে ওর বিশিষ্ট মনোহর ঢং। ওর তান মিড় মূর্ছনা গমক কিছুই দুরূহ ছিল না, কিন্তু এমন সুকুমার ললিত গতিতে টুক টুক ক'রে ও চলাফেরা করত যে কান ও মন দুইই খুশী হয়ে উঠত দেখতে দেখতে। ওর এ-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য অল্পদিনের মধ্যেই অনেক বাংলা গায়কের ঢংকে প্রভাবিত করেছিল। তাই এ-দুঃখ রাখার আমার জায়গা নেই যে, এমন গুণী ও সৃজনী প্রতিভা গানের রাজধানী "আসর" ছেড়ে গেল গানের শ্মশান সিনেমায়। আশা করা যাক, সিনেমা থেকে ও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে পুনরায় সত্যিকার সঙ্গীত সাধনায় মনোনিবেশ করবে। কারণ সিনেমায় সে কিছুতেই দিতে পারবে না যা তার দেওয়ার আছে। সে-আবহে গান হয় না—হয় শুধু গানের নামে সস্তা সুরের ফিরি ক'রে পাঁচজনের মনস্তুষ্টি-সাধন, যে-তুষ্টির না আছে স্থায়িত্ব, না গৌরব। শচীন্দ্র দেব বর্মণ স্বভাবশিল্পী, বিশেষ ক'রে বাংলা গানে সে একটি অপরূপ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়েই ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছিল। লীলাময়ের লীলা বোঝা ভার—এহেন মানুষ গান ছেড়ে চ'লে গেল কি না গানের নামে সিনেমার হুকুমবরদার হতে! এ কাজ করুক তারা যারা গানে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারে না। শচীন্দ্র এ-শ্রেণীর অশিল্পীর দলে যোগ দিল কি দুঃখে? কৈশোরে জন মর্লির একটি লেখা পড়েছিলাম, মনে পড়েছিল ও যখন সৃজন ছেড়ে সিনেমায় প্রয়াণ করে। তিনি বলেছিলেন, যে-মানুষ সাহিত্যে বড় হতে পারত, সে যদি রাজনীতি আখড়ায় ঢোকে তবে তাকে কেবল একটি উপাধি দেওয়া যায়: "পাগল"।

আমি বলছি না সিনেমার আবহাওয়া রাজনীতির আবহাওয়ার মতন মিথ্যাজীবী। সিনেমায় ভালো
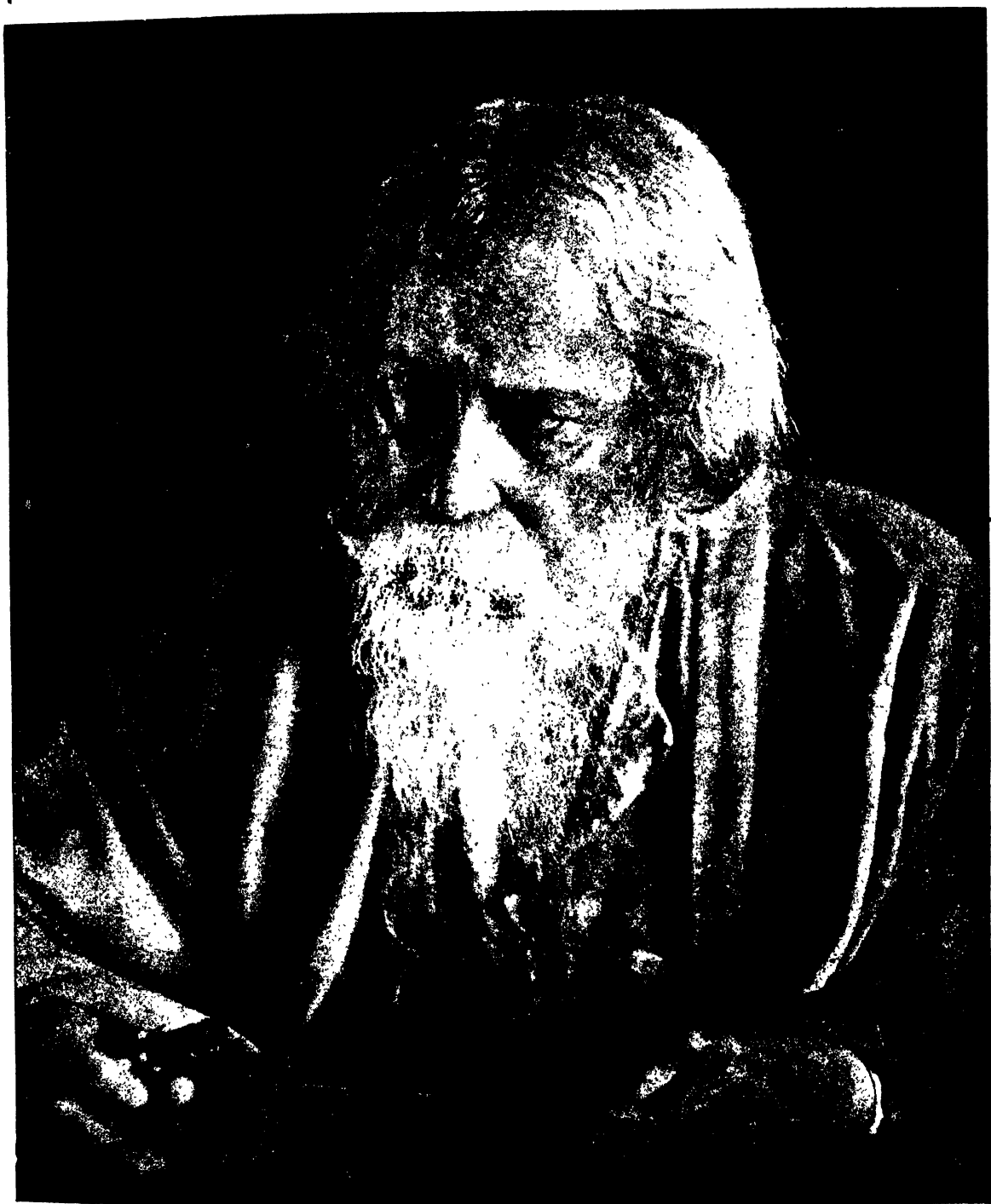
রবীন্দ্রনাথ [বোর্ন এণ্ড সেফার্ড-এর সৌজন্যে

ছবি হয়, অন্ততঃ হতে পারে কালেভদ্রে—যে-সব ছবি দেখে মন উন্নত হয়, প্রাণে পুলক জাগে। নির্মল চিত্তরঞ্জন নিন্দনীয় নয়। কিন্তু সিনেমায় বেশির ভাগ দর্শক চায় দেখতে—শুনতে নয়। কাজেই গান (বা আবহসঙ্গীত) সেখানে সস্তা শ্রুতিহিল্লোলের ঊর্দ্ধে উঠতে ভরসা পায় না—অর্থাৎ ভালো গান হয় না, যার জন্যে চাই যথাযথ পটভূমিকা ও সময়। আধুনিক সিনেমায় এ দুইয়েরই অভাব। দু'মিনিটের বেশি গাইলেই দর্শকেরা উসখুস করে। ইউরোপে আমেরিকায় যে-সব সঙ্গীতচিত্র (musical comedies) অভিনীত হয় সেখানেও কোনো গুণী উচ্চসঙ্গীতের প্রবর্তন করতে গেলেই তাতাবাতি নোটিশ পান: "ব্যস! এখানে নয়—অন্যত্র গোচারণ করো গে।" এ হেন পরিবেশে লাভ হতে পারে শুধু সবকারী মেডেল বা ভাতা কিন্তু বিশুদ্ধ গানের শিল্পী চির-প্রসাদার্থী শুধু বীণাপাণির ও সুকুমার মতি সঙ্গীতরসিকের—সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার নয়।

* * *

এই সময়ে শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অকুণ্ঠেই বলব তাঁর সমকক্ষ কণ্ঠ বাংলা দেশে এ যুগে আমি আর শুনি নি। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ত্রিবিধ সুরলোকেই তিনি অবাধে বিচরণ করতে পারতেন। তাঁর কণ্ঠে তানেরও কি আশ্চর্য দীপ্তিই যে ফুটে উঠত সে কি বলব! গানে মিষ্টতা মাধুর্য ভঙ্গি-বৈশিষ্ট্য ও ওজস্, চারটি প্রধান গুণই প্রধানতঃ মনকে মুগ্ধ করে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের গানের সব চেয়ে বড় সম্পদ ছিল তার ওজস্। মিষ্টতা বা মাধুর্য তাঁর ছিল না এমন কথা বলি না, কিন্তু ভীষ্মদেব বা তারাপদর মতন তিনি ওস্তাদি গানে মাধুর্যের অফুরন্ত নির্ঝর বয়াতে পারতেন না। কিন্তু কোনো গুণীরই প্রতি সুবিচার হয় না, তাঁর কাছে কি পেলাম না তার উপরে জোর দিলে। দেখতে হবে কি পেলাম তাঁর কাছে গানের রাজ্যে, কি কি রসের আমদানি হ'ল তাঁর প্রতিভার প্রসাদে। জ্ঞানেন্দ্র-প্রসাদের অলোকসামান্য গীতিপ্রতিভা ও ওজঃশক্তি শ্রোতার মনকে পুলকিত ক'রে তুলত মুহূর্তে। গান সুরু করবার আগে উদাত্ত কণ্ঠে যখন তিনি সা-তে দাঁড়াতেন তখন মনের মধ্যে শিহরণ জাগত সত্যিই। বাংলা দেশ সুকণ্ঠের দেশ। আমার স্মৃতিচারণে আমি একথা বলেছি নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে। কিন্তু এ যুগে সে সুকণ্ঠের উত্তরাধিকারী দেখতে পাই না যেমন মহৎপ্রাণের ও কুলতিলকের বড় একটা দেখা পাই না। এ হেন যুগে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদের পুরুষালি ওজস্বী কণ্ঠ শুনে আনন্দে অধীর হয়ে প্রার্থনা করতাম: তিনি দীর্ঘজীবী হোন—বাংলার মুখ রাখুন—গানে ওজসের পাগলা ঝোরা বইয়ে। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্য হবে?—এ-হেন অসামান্য কিন্নরের কণ্ঠও অকালেই নীরব হ'ল। আজ পর্যন্ত তাঁর শূন্য স্থান পূর্ণ করতে পারে নি আর কেউ।

* * *

এবার আমি বলব একটি সুকুমারীর কথা। সে ছিল আমার গীতিশিষ্যা—কন্যাশিষ্যা। তাই তার প্রতি আমার পক্ষপাত হওয়া স্বাভাবিক। হোক। গুণীরা তার সম্বন্ধে আমার তারিফকে বাদ-সাদ দিয়ে গ্রহণ করবেন নিজের নিজের মর্জি-মাফিক। আমি তার কথা এখানে বলতে চাই, কেননা ভদ্র শিক্ষিত সমাজে মেয়েদের মধ্যে তার মতন আশ্চর্য প্রতিভা আমি আর দেখি নি। আমার এ কথায় ভীষ্মদেব, জ্ঞানপ্রকাশ ও হিমাংশু দত্ত সায় দিতেন—আরও বহু সঙ্গীতকোবিদ সায় দিতেন—বিশেষ ক'রে তার মুখে ভীষ্মের শেখান গান শুনে। স্বয়ং ফৈয়স খাঁও তার প্রতিভায় চমৎকৃত হয়ে তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন—জ্ঞানই বুঝি এ সুখবরটি আমাকে দিয়েছিল।

কিন্তু সার্টিফিকেটের বিড়ম্বনা কেন?—যখন তার অপরূপ কণ্ঠের পরিচয় আজও পাওয়া যায় গ্রামোফোনে?

তার নাম উমা বসু। অকালে কাল তাকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে যায়, নইলে সে আজ হাজার হাজার সঙ্গীতরসিকদের তার কণ্ঠামৃত বিলিয়ে তৃপ্ত করত। তার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে তারাপদও তাকে শেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তখন সে ভীষ্মের কাছে শিখছিল ব'লে ভীষ্ম রাজি হয় নি। আমার ইচ্ছা ছিল, সে বাংলার এই দুই শ্রেষ্ঠ গায়কের কাছেই শেখে।

আমি তাকে শিখিয়েছিলাম শতাধিক বাংলা গান—বাউল, ভাটিয়ালী, কীর্তন, ভক্তিসঙ্গীত, হিন্দী ভজন, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও আমার স্বরচিত গান, ও দু'চারটি উর্দু গজল। তার অতুলনীয় ভাবকণ্ঠে সে প্রতি গানেরই রূপ দিত এমন আশ্চর্য মধুর সুরে যে, যে-ই শুনত সে-ই মুগ্ধ হ'ত। পরে ভীষ্মের কাছে বিলম্বিত চালে শংকরা, বসন্ত, জৌনপুরী, প্রভৃতি রাগও সে শিখেছিল। ভীষ্ম তাকে প্রায় এক বৎসর গান শিখিয়ে হঠাৎ পণ্ডিচেরি চ'লে আসে। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে থাকে বছর দুই। উমা আকুল হয়ে লিখত আমাকে যে, রোজ তিন ঘণ্টা ক'রে তানপুরার সঙ্গে ভীষ্মের ও আমার

শেখান গানগুলি সাধে—কিন্তু আরও শিখবে কার কাছে? ভীষ্মের সে ছিল বিষম ভক্ত।

তার গীতিপ্রতিভা সম্বন্ধে আমি আমার "ছায়ার আলো" উপন্যাসে লিখেছি যা আমার লিখবার ছিল। তাই সে-সবের পুনরাবৃত্তি করা বাহুল্য হবে। তবু ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকার দ্বিতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে তার প্রতিভার একটু তর্পণ রেখে যেতে চাই এই জন্যে যে, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত অভিজ্ঞতার যখন একটা এজাহার লিখে রাখতে যাচ্ছি, তখন তার সম্বন্ধে কিছু না লিখলে বিবরণী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

কিন্তু কি লিখব দু' কথায় এ অসামান্য প্রতিভাময়ীর সম্বন্ধে—শুধু এইটুকু ছাড়া যে, তার তুলনা এক সে-ই, আর কেউ নয়? তাকে আমি প্রায়ই বলতাম যে, মেয়েদের মধ্যে তার সমকক্ষ কণ্ঠ আমি কেবল একটিমাত্র শুনেছি, কাশীর মোতি বাঈ। সে আমার মুখ চেপে ধ'রে বলত: "কি যে বলো মন্টু দা! কার সঙ্গে কার তুলনা? কোথায় আমি—গানের ক খ শিখেছি মাত্র, আর কোথায় মোতি বাঈ! লোক হাসিও না তুমি। যাও।" ইংরেজিতে unselfconscious রূপবতী ও গুণবতীর কথা পড়েছি। উমা ছিল এই শ্রেণীর মেয়ে—"নাম্নমচেতন-প্রতিভা"।

কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই তার গান এত লোকের মন টানত। গর্বের লেশও ছিল না তার। শিশুর সারল্য ও নম্র লাজুকতা ছিল তার সহজাত কবচ-কুণ্ডল। এ সম্পর্কে মনে পড়ে কেসর বাঈয়ের একটি উক্তি। বলি-ই না কেন। এক ঢিলে দুই পাখী মারা হবে: কেসর বাঈয়ের কথাও ত বলাই চাই—তাই এইখানেই সুরু করি প্যারেন্থেসিসের ভঙ্গিতে। ফিরে খেই ধরব—উমার কথায়ই ফিরে এসে। মন্দ কি—স্মৃতিচারণে এ পদ্ধতি যখন বেমানান নয়?

কেসর বাঈয়ের নাম আমি আমার স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় পর্বে উল্লেখ করেছি। বোম্বাইতে তিনি গায়িকাদের মুকুটমণি এ কথা সর্ববাদিসম্মত। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আমাকে বলেছিলেন বহুদিন আগে যে, কেসর বাঈ যে-ঢঙে খেয়ালের দীক্ষা নিয়েছেন সে-ধরণের খেয়ালে সিদ্ধিলাভ করতে হলে বহু বৎসরের সাধনা চাই। আল-ওয়ারের বিখ্যাত গায়ক আল্লাদিয়া খাঁ ছিলেন তাঁর গুরু। তাঁর গান আমি শুনেছি, তবে বোদ্ধাদের মুখে শুনেছি যে, তিনি খেয়ালে না কি আবদুল করিমের চেয়েও বড় ছিলেন। এ কথা সম্ভবতঃ সত্য, কারণ কয়েক বৎসর আগেও এ-অশীতিপর বৃদ্ধ বোম্বাইতে এক সঙ্গীতসভায় সবাইকে চমৎকৃত ক'রে দেন তাঁর আশ্চর্য বসোচ্ছল খেয়ালে। শুধু গুণী হিসেবেই নয়, ওস্তাদ হিসেবেও তিনি খেয়ালীদের নমস্য ছিলেন—তাঁর কণ্ঠ-সাধনা না কি এমন অদ্ভুত ছিল যে, তিনি অসম্ভব অসম্ভব স্বরবিন্যাস অবলীলাক্রমে গেঁথে চলতেন—অর্থাৎ এমন সব দুর্ধর্ষ স্বরগ্রামের তান দিতেন যা কণ্ঠে পরিস্ফুট করতে পারে কেবল অঘটন-পটীয়সী প্রতিভা।

আমি নিজে এ শ্রেণীর কুস্তি-কসরতের বিরোধী। এতে মানুষকে অবাক্ করা যায় বটে কিন্তু মুগ্ধ করতে হলে চাই হৃদয়ের রসায়ন, শুধু দীর্ঘ কণ্ঠসাধনায় মেলে না মন-ভিজিয়ে প্রাণ কাড়বার শক্তি। আল্লাদিয়া খাঁর যে এ শক্তি ছিল তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—তাঁর শিষ্যা কেসর বাঈয়ের গান। অনেকে বলেন কেসর বাঈ গুরুমারা বিদ্যা আয়ত্ত ক'রে গুরুকে ছাপিয়ে গেছেন গানের মিষ্টত্বে। এহেন প্রতিভাময়ীর গান শুনতে আমি উৎসুক ছিলাম—বলাই বেশী।

পণ্ডিচেরি থেকে ফিরে ১৯৩৮ সনে যখন কলকাতার এক সঙ্গীত-সম্মিলনীতে প্রথম কেসর বাঈয়ের গান শুনি তখন গভীর আনন্দ পেয়েছিলাম। এমন আশ্চর্য শান্ত-সমাহিত অথচ বলিষ্ঠ খেয়াল ইতিপূর্বে কোনো বাঈজির মুখেই শুনি নি, এক ভাতনগরের চন্দ্রপ্রভা ছাড়া। তবে চন্দ্রপ্রভারও এমন উদাত্ত কণ্ঠ ছিল না। জয়পুরের গহর বাঈ অপরূপ খেয়াল গাইতেন বটে কিন্তু কেসর বাঈয়ের ওজস্ তাঁর ছিল না। বলতে কি, গানে যে মেয়েরা ওজস্বিনী হতে পারে এ আমি কেসর বাঈকে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। কেসর বাঈকে কিন্নর-কণ্ঠী বলব না মোতি বাঈয়ের মতন। কিন্তু খেয়ালের রসদীপ্তিতে তিনি জ্যোতির্ময়ী। তাঁর একটি অপরূপ কৃতিত্ব ছিল এই যে, তিনি স্তবকে স্তবকে দীর্ঘ তান নিতে নিতে যখন ধাপে ধাপে আরোহণ বা অবরোহণ করেন তখন সে-সব তানের মধ্যে একটি বিস্ময়কর স্থাপত্য-পরিকল্পনার (architecture) দেখা মেলে ব'লে মনে শুধু পুলকই নয়, সম্ভ্রমও জাগে, ইংরেজিতে যাকে বলে catching one's breath—বাংলায় বলা চলে, ভাব-লাগা বা থমকে যাওয়া।

তাঁর খেয়ালের বিস্তারিত বর্ণনা বাহুল্য, কেন না বহু সঙ্গীত-সম্মিলনীতেই গান গেয়ে তিনি হাজার হাজার শ্রোতাকে চমৎকৃত করেছেন। তবে এই সূত্রে একটি স্মরণীয় ঘটনার উল্লেখ করব স্মৃতিচারণী ভঙ্গিতে।

তাঁর অপূর্ব খেয়াল শুনে মুগ্ধ হয়ে আমার সাধ হ'ল তাঁকে প্রকাশ্য অভিনন্দন করার। কিন্তু শুনলাম, তিনি

পাঁচশ' টাকার কম দক্ষিণায় কোথাও গান না। দ'মে গেলাম, তবু গেলাম ম্যাজেষ্টিক হোটেলে, যেখানে তিনি উঠেছিলেন।

ঠিক দু'দিন আগেই অমৃত বাজারে আমার দীর্ঘ প্রশস্তি ছাপা হয়েছে। তাতে আমি লিখেছি, কেসর বাঈ খেয়ালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—আবদুল করিমের পর এমন খেয়াল কলকাতায় কেউ গায় নি···ইত্যাদি। কিন্তু সব শেষে লিখেছিলাম যে কেসর বাঈ খেয়ালের শেষে "দ্রৌপদী পুকারী" বলে একটি ভজন না গাইলে ভালো করতেন। গানটির বিষয় ছিল দ্রৌপদী কাতর হয়ে ডাকছেন লজ্জানিবারণকে যখন দুঃশাসন তাঁর বস্ত্রহরণে উদ্যত। কেসর বাঈ এহেন করুণ গানটি গাইছিলেন সদর্পে হাসতে হাসতে। আমি তাই ব্যথিত হয়ে লিখেছিলাম, খেয়ালের নিটোল আনন্দ পরিবেষণ করার পরে ভজনের নামে এহেন অশোভন ওস্তাদি নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে তিনি রসভঙ্গ করেছেন।

আমি ভাবিও নি যে, কেসর বাঈ আমার লেখাটি পড়বেন কষ্ট ক'রে। কিন্তু তাঁর ওখানে উমার সঙ্গে পৌঁছিয়ে দেখি তাঁর মুখে ঘনঘটা। আন্দাজ করলাম কারণটা। আপশোস হ'ল বৈকি—না লিখলেই হ'ত তাঁর অ-ভজনের কথা।

যা ভয় করেছিলাম: কেসর বাঈ বিরস কণ্ঠে আমাকে বললেন, ৫০০৲ দক্ষিণা বিনা তিনি গান করেন না। আমি সবিনয়ে বললাম, "আমরা অত মোটা দক্ষিণা দিতে পারব না, তবে আমরা করব তাঁর যথোচিত সম্বর্ধনা—কলকাতার সর্বশ্রেষ্ঠ ওস্তাদ ও বোদ্ধারা আসবেন তাঁর অপূর্ব খেয়াল শুনতে।" তিনি বিরস কণ্ঠে বললেন, "আমার অপমান ক'রে এখন সম্বর্ধনা? গোড়া কেটে আগায় জল?" আমি অবাক্ হয়ে বললাম, "অপমান? সে কি বাঈ সাহেব? আমি লিখি নি কি এ-যুগে এমন খেয়াল আবদুল করিমের পরে আর কেউ পরিবেষণ ক'রে নি কলকাতা শহরে?" তিনি একটু নরম হয়ে বললেন, "তা লিখেছেন বটে—কিন্তু তার পরেই টিপ্পনি করেছেন যে, আমি ভজন গাইতে পারি না। লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট হ'ল না এতে?" আমি বললাম, "কেমন করে? আপনার সিদ্ধি খেয়ালে, ভজনে নয়। যদি কেউ কোনো বড় কবিকে বলে, তিনি কবিতা লেখেন অপূর্ব কিন্তু গদ্য তাঁর কাঁচা, তাতে কি তাঁর মাথা হেঁট হয়?" বাঈ সাহেবের অপ্রসন্ন মুখের মেঘ আরো একটু ফিকে হয়ে এল। তিনি বললেন, "ভজন বলতে আপনি কি বোঝেন শুনি? ভজনে আদৌ তানালাপ থাকবে না?" আমি বললাম, "কেন থাকবে না? তবে ভাব বজায় রেখে। করুণ ভজনে করুণ তান, উল্লাসের ভজনে উল্লাসের তান। জমকাল ভজনে জমকাল তান। কথাটা এই যে, ভাব ও সুরের বিরোধ না ঘটে। সর্বোপরি, ভজনে ভক্তিভাবের সুর আসা চাই—নইলে সে ভজন হয় না।"···ইত্যাদি নানা কথাই বললাম—খানিক তর্ক হ'ল এই নিয়ে—সব মনে নেই, বলাই বাহুল্য—আমি শুধু সারমর্মটুকু পেশ করছি।

শেষে কেসর বাঈ বললেন, "আচ্ছা, আপনি শোনান তো একটি ভজন!" আমি তখন আগে উমাকে একটি ভজন গাইতে ব'লে পরে নিজে একটি মীরা ভজন গাইলাম। শুনে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কেসর বাঈ আমার কাছে করজোড়ে বললেন, "আপনার আহূত সভায় আমি গাইব—কিন্তু দক্ষিণা নেব না। তবে আমাকে আপনি একটি লকেট মেডাল দেবেন আপনার নাম লিখে।"

বাইরে এসে উমার সে কি উল্লাস! "মেরে দিয়েছ মণ্টুদা! উঃ, কেসর বাঈ গাইবেন থিয়েটার রোডে! কি চমৎকার!" ব'লেই হাততালি। তার সে উচ্ছল সরল আনন্দ ভুলব কি কোনোদিনও!

একটা কথা বলতে ভুলেছি। আমাদের ভজনের গানের পর উমা তাঁর কাছে "বুল বুল মন" গানটি গেয়েছিল। এ-গানটি গ্রামোফোনে গেয়ে ওর খুব নাম-ডাক হয়। এ-গানটির সুর একটি রুশ গান থেকে নেওয়া—অর্থাৎ একটি রুশ গানের সুরে গাওয়া জর্মন গান আমি শিখেছিলাম তারই সুরে বসান। জর্মন গানটির প্রথম দু' লাইন—

Nachtigal O Nachtigal!
Suesso holde Nachtigal!

(এ গানটির আমি টেপ-রেকর্ড করিয়েছি সঙ্গীত-জিজ্ঞাসুদের জন্যে—হয়ত কোনোদিন কারুর কাজে আসবে।)

এ গানটির বাংলা রূপে আমি আস্থায়ীতে—মূল সুর (ইমন ঠাটে)—রেখে অন্তরার শেষে ষড়জ-সংক্রমণ ক'রে (অর্থাৎ সা বদ্‌লে)

চল দূর বন্ধুর উদ্দেশে
চিরচরণের শরণের রেশে

চরণ দুটিতে ভৈরবী টেনে এনেছি—এ ষড়জ-সংক্রমণের সাহেবী নাম modulation, রক্ষণশীল রাগপন্থীরা এ গানটির রাগমিশ্রণকে বলবেন "গুরুচণ্ডালী"—আরও এইজন্যে যে, এতে ভৈরোঁরও আমেজ আছে। এ-গানটির মূল সুরকে ভেঙে আমি ঢেলে সাজিয়েছি। অনেকে খুব

ভালোবাসতেন এ-গানটি বিশেষ করে উমার কলকণ্ঠে। বলতেন, "ও যখন গায় 'বুলবুল মন ফুল সুরে ভেসে চল নীল মঞ্জিল উদ্দেশে'—তখন সত্যিই মনে হয় যেন বুলবুল গাইছে।" মহাত্মা গান্ধিও একে সাদরে "বুলবুল" ব'লে ডাকতেন যে-কথা আমার "ভূস্বর্গ চঞ্চল"এ লিখেছি।

সত্যিই অপরূপ গাইত ও এ গানটি—যাঁরা গ্রামোফোনে শুনেছেন তাঁরা মানবেনই মানবেন। নানা নিখুঁৎ তানের সঙ্গে ওর মুখে এ-গানটি দশ গুণ মধুর শোনাত। কেসর বাঈ এ-গানটি শুনে মুগ্ধ হয়ে ওর সুরের কান ও সুধা কণ্ঠের উচ্ছ্বসিত তারিফ ক'রে আমাকে বলেন,"ওকে গান শেখাবেন ভালো ক'রে, ওর মধ্যে আছে সুরের আলো।" এই ধরণের তারিফ তিনি সত্যিই করে, ছিলেন তবে ঠিক কি ভাষায় মনে নেই।

যাই হোক, কেসর বাঈকে আমি একটি সোনার লকেট উপহার দিই —তার মধ্যে গুরুদেবের ছবি রেখে। কিন্তু লকেটে তাঁর গুণের পুরস্কার হবে কেমন ক'রে। তিনি থিয়েটার রোডে আশ্চর্য গেয়ে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। গানের আগে তাঁকে মালা দিয়ে বরণ করল আমার মামাতো বোন ব্রজবালা। সে-আসরে কলকাতার শ্রেষ্ঠ গায়ক গুণী ও সমাজদারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন—সঙ্গীতকোবিদ অমিয়নাথ সান্যাল ছিলেন তাঁদের পুরোধা তথা প্রতিনিধি।

এর পর কেসর বাঈয়ের অনুরোধে তাঁকে নিয়ে আমি বরানগরে গিয়েছিলাম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে—শ্রীপ্রশান্ত মহলানবিশের বাড়িতে। কবিগুরু প্রথমে আমাকে বলেন তিনি ক্লান্ত। কিন্তু কেসর বাঈ গান ধরতে না ধরতে তাঁর মুখের ক্লান্তি কেটে গেল। তিনি ব'সে ছিলেন একটি আরাম কেদারায়, আমি মাটিতে তাঁর পদতলে। কি আনন্দই যে পেয়েছিলাম এভাবে ব'সে কবির নানা মুগ্ধ বিস্ময়োক্তি শুনতে। তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের যে একজন প্রকৃত বোদ্ধা ছিলেন তার প্রমাণ পেয়েছিলাম নতুন ক'রে যখন কেসর বাঈয়ের গান শুনে তিনি আমার অনুরোধে তার সঙ্গীত সম্বন্ধে তখনি তখনি এই উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি লিখে দিলেন এক আঁচড়ে (২৩-৪-১৯৩৮)

"I consider myself fortunate in securing a chance for listening to Kesar Bai's singing which is an artistic phenomenon of exquisite perfection. The magic of her voice with the mystery of its varied modulations has repeatedly proved its true significance not in any pedantic display of technical subtleties mechanically accurate, but in the revelation of the miracle of music only possible for a born genius. Let me offer my thanks and my blessings to Kesar Bai for allowing me this evening a precious opportunity of experience.

Rabindranath Tagore."

এর পরে কেসর বাঈয়ের প্রতিভা সম্বন্ধে আর কি বলার থাকতে পারে? তাই উমার প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

* * *

উমার সম্বন্ধে শুধু কেসর বাঈ নয়, কাশীর মোতি বাঈয়ের প্রশস্তিও ভুলবার নয়। মোতি বাঈয়ের কথা আমি আমার স্মৃতিচারণ দ্বিতীয় পর্বে লিখেছি। তবু রেকর্ড রাখার জন্যে এখানে সংক্ষেপে ফের বলি তাঁর কথা উমার প্রসঙ্গে।

১৯৩৮ সনে উমা, আমার বোন মায়া ও ভগিনী এমাকে নিয়ে আমি কাশ্মীরে যাই। সেখানে উমাকে গান শেখাতাম শিকারায় বসে শ্রীনগরের ঝিলম নদীতে। সে কাহিনী লিখেছি আমার "ভূস্বর্গ চঞ্চল"-এ। তাই এখানে শুধু বলি—দিনের পর দিন তাকে আমার নিত্য নতুন গান শেখানর অভিজ্ঞতা আজও আমার জীবনের একটি অবিস্মরণীয় সম্পদ্ হয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে—লাহোরে লালা লাজপৎ রায় হাসপাতালের জন্য আমাদের একটি চ্যারিটি কন্সার্ট দেওয়া। শুধু উমা ও আমি গাইলাম—শেষে এল নাচল উমার গানের সঙ্গে। উমা সে আসরে দুই সারঙ্গিয়ার মাঝে ব'সে যখন ধরল আমার শেখানো উর্দু গজল: "নিতা উলফৎকা ইন দো নাজুকোঁমে সখ্‌ত মুস্কিল হয়" তখন সারঙ্গিয়া দু'জনের মধ্যে একজন ফিস্ ফিস্ ক'রে সঙ্গীকে শুধাল: যে কৌন বাঈ হৈ ভাই?" দ্বিতীয় সারঙ্গিয়া জবাব দিল: "আরে, বাই নহী—বঙালিন্ হয়।" প্রথম সারঙ্গিয়া জবাব দিল: "ঝুট! বঙালিন-কি আওয়াজ কভি ঐসী সুরীলী হো সকৃতী?"

এহেন সুরেলা কলকণ্ঠীকে নিয়ে গেলাম কাশী। সেখানে উমা ধরল, মোতি বাঈয়ের গান শোনাতেই হবে। কি করি? খোঁজ ক'রে গেলাম মোতি বাঈয়ের রমণীয় সুরনিলয়ে। তিনি সাদরে আমাদের জলযোগ করিয়ে তাঁর কিন্নরকণ্ঠের গান শোনালেন। গানের শেষে উমা তো আনন্দে অধীর! বলে, "মণ্টুদা, এ যে সাক্ষাৎ পাপিয়া!" মোতি বাঈকে বলতে তিনিও ওকে ধরলেন গান শোনাতে। উমা ভয়েই সারা: মোতি বাঈয়ের কাছে সে গাইবে কি? মোতি বাঈ তাকে অনেক তুতিয়ে-

পাতিয়ে গাওয়ালেন দু'তিনটি গান। শেষ গানটি ছিল "বুলবুল মন"। গানের শেষে মোতি বাঈ সস্নেহে ওর চিবুক ধ'রে বললেন: "বুলবুল কভি পপীহাসে ডরতী হয় ক্যা?" (বুলবুল কি পাপিয়াকে দেখে ভয় খায়?) ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ গায়িকার প্রশংসার পর উমার সঙ্গীত-প্রতিভার সম্বন্ধে আর না লিখলেও চলে। তবু শুধু আর একটি কথা বলব এখানে যেহেতু আমার এ প্রশস্তি অপ্রাসঙ্গিক নয়।

উমার কণ্ঠের সম্পদ্ ছিল অসামান্য বটে, কিন্তু আরো অসামান্য ছিল ওর চরিত্রের অবিশ্বাস্য পবিত্রতা। ও কুমারী ছিল শুধু দেহে নয়—মনেও। ইংরেজাতে যাকে বলে vestal virgin, তাই এ একটুও বাড়ান নয়। যাঁরাই ওর সংস্পর্শে আসতেন, মুগ্ধ হ'তেন শুধু ওর কণ্ঠ-সুধা পান ক'রে নয়—সেই সঙ্গে ওর কুমারী-হৃদয়ের পবিত্রতার স্পর্শ পেয়েও বটে। ওর মুখে তিনটি গান শুনে মুগ্ধ হ'ত সবাই: "তব চিরচরণে চাই শরণাগতি", "বুলবুল মন",* "আধ ফোটা ছোট তারা।" ভক্তি বলতে যা বোঝায় তা ওর ছিল না—তবে ওর হৃদয়ের নিটোল পবিত্রতা ভক্তির রূপ নিয়েই ওর কণ্ঠে জেগে উঠত ও গান ধরতে-না-ধরতে। "আধফোটা ছোট তারা" গানটি আমি ভৈরবী সুরে বসিয়ে গ্রামোফোনে গাওয়াই ওকে দিয়ে; সে সময়ে এ গানটি খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল। একদিন ওদের বাড়ীতে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তীর অভ্যুদয় হয়। আমি ওকে বলতে ও ধরল:

ঐ তারার মালার কুঞ্জে
আমি আধফোটা ছোট তারা
ঐ চাঁদের আলোর পুঞ্জে
হই আবেশে আপনহারা।

তারাপদবাবু মুগ্ধ হয়ে "আহা আহা" ক'রে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওকে গান শেখাতে চাইলেন—যে-কথার উল্লেখ করেছি। এখানে এ-ঘটনাটির পুনরুল্লেখ করলাম শুধু এই জন্যে যে, এ-গানটি ওর কণ্ঠে যেমন মানাত তেমন আর কারুর কণ্ঠেই নয়, কারণ এই শুভ্র আধফোটা তারার ভাবানুষঙ্গ ও শুচিস্নিগ্ধ কুমারী-রূপশ্রীকে ঘিরে সত্যিই গড়ে উঠত যেন একটি বিকচ তারার আধফোটা সুষমায়। মনে পড়ে একদিন এক ভক্ত সভায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ওর মুখে "মন তুমি কৃষিকাজ জান না" গানটি শুনে সাশ্রুনেত্রে আশীর্বাদ ক'রে বলেছিলেন: "এ পুরানো রামপ্রসাদীটিকে তোমার পবিত্র হৃদয়রসে যেন তুমি ফের বসিয়ে জাগিয়ে তুললে মা—তুমি দীর্ঘজীবী হও!"

অদৃষ্টের পরিহাস: ও পরপারে প্রয়াণ করল মাত্র একুশ বৎসর বয়সে, আর ওর জন্মদিনে ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪২ সনে!

খবর পেয়েছিলাম আমি মান্দ্রাজে—যে কথা বিশদ ক'রে লিখেছি আমার "ছায়ার আলো" উপন্যাসে।

সেদিন ওর তর্পণে লিখেছিলাম:

ব্যথারে আড়ালে রাখি' আনন্দ যে বিলাত উচ্ছলি';
সুন্দরের মন্ত্র যার প্রাণে নিত্য তুলিত ঝংকার;
বসন্তের মন্দাকিনী ছিল যার হাসির উৎসার:
সুখ সে বাসে নি ভালো, সুধা ভালোবেসেছিল বলি':
টুটিল বীণার তন্ত্রী কেন তারা সুর না বাঁধিতে?
অকালে ঝরিল কেন অবিকচ আলোক-কলিকা?
আধফোটা ছোট তারা চিত্তে যার জ্বালিত দীপিকা
অবেলায় নিভিল সে কোন্ নব দিগন্তে জ্বলিতে?
জানি না। কেবল জানি—শুভ দ্যুতি ব্যর্থ কভু নয়:
অন্ধকারে অবসান কোথা তার যে চির বিলয়?

* * *

এবার এ-পরিশিষ্টের ইতি কবি কীর্তন-ভজনের প্রসঙ্গে। বলি কি ভাবে, কোন্ পথে ভক্তিসঙ্গীতে আমার মন পূর্ণ দীক্ষা নেয়।

"স্মৃতিচারণ"-এর প্রথম পর্বে আমি লিখেছি, কীর্তনের সাঙ্গীতিক মূল্য নিয়ে পিতৃদেবের সঙ্গে আমি কিরকম বাচাল তর্ক করতাম, বলতাম প্রায়ই যে, কীর্তন কানে শুনতে মিষ্টি হলেও সঙ্গীত হিসেবে রাগসঙ্গীতের মতন অপরূপ সৃষ্টি নয়। তিনি হেসে আমার কপালে টোকা মেরে বলতেন: "ওরে বাবা! আগে বড় হ, তবে বুঝবি কীর্তন কি বস্তু! জানিস্, তোর মস্ত ওস্তাদ ঠাকুর্দা শেষ বয়সে কীর্তন শুনে চোখের জল ফেলে এক মস্ত কীর্তনীকে বলেছিলেন: 'গোসাইজি, বৃথাই খেয়াল শিখে সময় নষ্ট করেছি, যদি কীর্তন শিখতাম!" একথা শুনে আমি কানে আঙুল দিতাম না বটে, কিন্তু ঘা খেতাম বৈকি! অবশ্য কীর্তন যে শ্রুতিমধুর আমিও মানতাম, তর্ক করার সময়েও ঠাট্টা ক'রে বলতাম: "যে-কান বলে যে, কীর্তন শ্রুতিকটু সে নিশ্চয়ই পূর্বজন্মের কোনো অশ্রাব্যশ্রবণের অপরাধে অভিশপ্ত।" আমি তর্কের ঝোঁকে কীর্তনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনতাম তার মোদ্দা কথা এই যে, কীর্তনের শ্রুতিমধুরতা সস্তা লাবণ্য, রাগসঙ্গীতের শ্রুতিমধুরতা মহার্ঘ সম্পদ্।

* "চিরচরণ" ও "বুলবুল" গান দুটি আমার "অনামী"তে ছাপা হয়েছে। "আধফোটা ছোট তারা" গানখানি লতিকা দেবীর লেখা—কোনো বইয়ে ছাপা হয়েছে কি না জানি না।

এ অভিযোগ যে ভিত্তিহীন বুঝতে পারি ক্রমশঃ বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কীর্তনের মধ্যে নব নব গভীরতর রসের রস গ্রহণ করার অনুপাতে। কথায় বলে, চাখতে চাখতেই চাখনদার হয়। আমারও ভাবতে ভাবতেই ধীরে ধীরে বোধোদয় হ'ল, আর অমনি আমি দেখতে পেলাম যে, কীর্তন সস্তা শ্রুতিমাধুর্যের বেসাতি করে একথা বলতে পারেন শুধু তাঁরাই যাঁরা কীর্তনের মধ্যে শ্রুতি-মাধুর্য ছাড়া আর কোনো গভীরতর মাধুর্যের স্বাদ পান নি। এই স্বাদই হ'ল ভক্তি। তাই কীর্তনের গভীরতম রসের রসিক হতে হলে ভক্তির গ্রাহক হতে হবে, শুধু তার শ্রুতিমধুরতার দর দিলে চলবে না, কারণ কীর্তনের উদ্ভব ভক্তিতে, ভরণ ভক্তিতে, অবসান ভক্তিতে। একটি বিখ্যাত সংস্কৃত স্তব আমি গাই কীর্তনের সুরে :

সুখাবসানে ত্বিদমেব সারং
দুঃখাবসানে ত্বিদমেব গেয়ম্।
দেহাবসানে ত্বিদমেব জাপ্যম্
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥

সুখের দিন ফুরালে জপি তোমারি বঁধু, নাম :
দুখের নিশি পোহালে গাই তোমারি মধু নাম :
শেষের শ্বাস মিলালে জপি তোমারি শুধু নাম :
হে গোবিন্দ, হে দামোদর, মাধব অবিরাম !

কীর্তনের সম্বন্ধেও এই কথা : তাকে সুখে-দুঃখে, বাদলে-কিরণে, জীবনে-মরণে পেলে তবেই সে হবে পরম পাওয়া। কিন্তু এ-প্রাপ্তির চাবি শুধু ভক্তির হাতে, সুরতালের কি আঙ্গিকের হাতে নয় নয়। সঙ্গীতলোকে এ-ধরণের ভক্তিবাদে নাস্তিক আর্ট্-ফর-আর্ট্স্-সেক বাদীরা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলে আমি নিরুপায়—আমার জীবনের একটি গভীরতম উপলব্ধি কীর্তন—তার কথা বলতে হলে ভক্তির আস্তিক্যকে পাশ কাটিয়ে সঙ্গীত-শৌখিনতার চাটুকার হব কিসের লোভে? তাই বলবই বলব যে, কীর্তন (তথা ভজনের) বুকের নিশ্বাস, চোখের আলো, হৃদয়ের রক্ত হ'ল ভক্তি—ভক্তিকে বাদ দিয়ে কীর্তনের প্রকৃত মূল্যায়ন খানিকটা সোনার পাথরবাটির স্বরূপ নির্ণয়ের মতনই অসম্ভব—কিম্বা সাহেবী উপমায় বলা যায় : ডেনমার্কের রাজকুমারকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট অভিনয়। আমার এ-প্রতিপাদ্যটি প্রাঞ্জল করতে আর একটি উপমা দেব।

১৯২২ সনে বিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটারের রুশ নট-নটীরা বার্লিনে কয়েকটি রুশ নাটক অভিনয় করেন। আমি আমার রুশভাষী বন্ধু শাহেদের সঙ্গে যাই ডস্টয়েভ্স্কির বিখ্যাত "ব্রাদার্স কারামাজভ" উপন্যাসটির নাট্যরূপ উপভোগ করতে। উপভোগ করেছিলাম সত্যিই, কিন্তু তাই ব'লে কি বলব যে, শাহেদ এ নাটকটি থেকে যে নিটোল রসের স্বাদ পেয়েছিল আমি সে-স্বাদের নাগাল পেয়েছিলাম রুষভাষা না জানা সত্ত্বেও? ঠিক তেমনি কীর্তনের প্রাণের কথাটি হ'ল ভক্তির ভাষা, তারি হাজারো ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে কীর্তন নিজেকে জানান দেয় : ভক্তির বীজেই তার উন্মেষ, ভক্তির রসধারায়ই তার পুষ্টি, ভক্তির আলো-হাওয়া আশীর্বাদেই তার উধ্বর্-বিকাশ। পিতৃদেব পরিণত বয়সে তাঁর স্বভাব-ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে এই গভীর সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন ব'লেই আমাকে বলেছিলেন যে, বড় না হলে বোঝা যায় না কীর্তন কি বস্তু—কেননা, ভক্তির পূর্ণ বিকাশ বয়সের ভাব ও রুচির পরিপক্কতার অপেক্ষা রাখে।

বড় হলাম বৈ কি শনৈঃ শনৈঃ। কীর্তনের সুর-লাবণ্যও কানে ঢুকল, কিন্তু মরমের নাগাল পেল কই? অত্র দোষটা ঠিক বেচারী দিলীপকুমারের নয় যে, বড় হওয়া সত্ত্বেও কীর্তন শুনে মজল না। হয়েছিল কি, আবাল্য পিতৃদেবের নানা কীর্তন ও কীর্তনাঙ্গ গান আমার ভালো লাগলেও পূর্ণ যৌবনে পদার্পণ করার আগে কীর্তনের পালাগান—ভক্তির নাট্যসঙ্গীত শোনার সুযোগ হয় নি। ফিরে এসে প্রথম মাথুর কীর্তন শুনলাম বিখ্যাত কীর্তনী গণেশ দাসের মুখে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে। মনে আছে শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কারণ গণেশ দাস ছিলেন ভক্ত তথা সুকণ্ঠ তথা পালাগানে রসস্রষ্টা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যারা দোয়ার দিচ্ছিল তারা থেকে থেকে এমন বেখাপ্পা চেঁচাল ও খোলীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খোল বাজাতে বাজাতে এমন কুশ্রী নাচানাচি সুরু করল যে, ক্রমাগতই রসভঙ্গ হওয়ার ফলে শেষটায় আমি বিরক্ত হয়েই স্থান ত্যাগ করি। কাজেই কীর্তনের সঙ্গে এই সূত্রে আমার শুভদৃষ্টি হলেও কীর্তনের ভাষায়

"দোঁহে দোঁহা দরশনে উপজিল প্রেম—
দারিদ্র্য লভিল যেন ঘটভরা হেম।"

এ প্রথম প্রেমের—first love-এর—অভিজ্ঞতাটি হয় নি। আমার ওস্তাদি-রসবিহ্বল মনকে ভক্তিরসোচ্ছল কীর্তনের নীল মোহানার মুখে যিনি রওনা ক'রে দিয়েছিলেন তিনি সে-সময়ে আমার দৃষ্টিচক্রবালের বাইরে অপেক্ষা কর-ছিলেন আমাকে কীর্তনের প্রাণ—অর্থাৎ ভক্তি-মন্ত্রে দীক্ষা দিতে। তিনি ছিলেন একটি আশ্চর্য মানুষ—একাধারে মহাকীর্তনী তথা মহাভক্ত তথা মহাগুরুর বালব্রহ্মচারী শিষ্য ও সেবক। তাঁর নাম "কোকিলকণ্ঠ" রেবতীমোহন সেন।

রেবতীবাবুর খ্যাতি শুনেছিলাম শ্রীখগেন্দ্র মিত্র প্রমুখ পিতৃবন্ধুদের কাছে, কিন্তু তাঁর কীর্তন শোনবার সুযোগ জোটে নি, কৈশোরে ও যৌবনে কীর্তনে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না ব'লেই। চাই নি তাই পাই নি, আর কি! মাঝে মাঝে মনে হ'ত: রেবতীবাবুর সঙ্গে সটাং গিয়ে আলাপ করলে কেমন হয়? কিন্তু ঐ মনে হওয়া পর্যন্তই। তখন সারা ভারত চ'ষে বেড়াচ্ছি ওস্তাদি গানের আবাদ করতে। ভক্ত কীর্তনীর সন্ধানী হবার ফুর্সৎ কই? বেদব্যাস মুনি মহাভারতে উচ্চারণ করেছেন একটি বেদবাক্য: "কালেন সর্বং বিহিতং বিধাত্রা, পর্যায়যোগেন লভতে মনুষ্যঃ"—সব কিছুরই একটা সময় আছে, মানুষের পরম প্রাপ্তি হয় যথাপর্যায়ে—অর্থাৎ কি না, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া যায় না।

এহেন ওস্তাদিমুগ্ধ অবস্থায় কাশীতে এক আসরে গাইছি অতুলপ্রসাদের বাংলা ঠুংরি, এমন সময়ে দেখি ঘরের কোণে একটি গেরুয়া-পরা মূর্তি আর একটি সৌম্য-মূর্তির পাশে আসীন। আমার গান শেষ হ'তে গৃহকর্তা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন গেরুয়াধারী কিরণচাঁদ দরবেশের ও রেবতীবাবুর সঙ্গে। এহেন দুই পরম ভাগবতকে আমার গানের শ্রোতা পেয়ে আমি পুলকিত হ'য়ে উঠলাম—সমঝদার শ্রোতা যদি 'লাখে না মিলয় এক' হয়, তবে ভক্তিমন্ত শ্রোতা মেলে কোটিকে গোটিকই বলব।

বুকের রক্তে ডঙ্কা বেজে উঠল আনন্দে—বিশেষতঃ, চাক্ষুষ ক'রে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের শিষ্য কোকিলকণ্ঠ রেবতীমোহনকে—আমার বহুদিনের অভীষ্ট ধন! রেবতীবাবুকে গিয়ে প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ ক'রে বললেন: "আহা! এমন ভগবদ্দত্তকণ্ঠ, বাবা! ঠুংরি রেখে কীর্তন গাইবে কবে?" আমি হেসে চুপ ক'রে কায়দাদুরস্ত বিনয়ে বললাম: "যেদিন আপনি শেখাবেন, ঠাকুর!" তিনি হাত জোড় ক'রে বললেন: "আমি ঠাকুর-টাকুর নই বাবা, ঠাকুরের ভক্তের দাস।" আমিও সোজা বান্দা নই, পিঠ পিঠ হাত জোড় ক'রে বললাম: "তবে ভক্তের দাসেরও দাসকে একটি কীর্তন শেখান।" তিনি হেসে বললেন: "সে তো হবার জো নেই বাবা! আমি কোনো আসরে মজলিসে কি ড্রয়িংরুমে গাই না, আমি গাই শুধু ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে। তুমি সামনের জন্মাষ্টমীতে যদি কলকাতায় থাক তবে এসো পদ্মপুকুরে হেমেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের বাড়ী। সেখানে জন্মাষ্টমীর উৎসবে আমি গাইব তিন ঘণ্টা পালাগান।"

নিরাশ হলাম বৈ কি তিনি গান গাইবেন না বলায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু চমকেও উঠলাম শুনে যে, ঠাকুরের বিগ্রহের সামনে ছাড়া তিনি আর কোথাও গান না। কেন জিজ্ঞাসা করায় তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "বাবা! কীর্তন তো শ্রুতিবিলাসের জন্যে নয়—কীর্তন হ'ল প্রভুর ভোগ।* তাকে নিবেদন না ক'রে কোনো কিছুই গ্রহণ করা চলে না। আর ভোগ তাকে নিবেদন করলে তবেই হয় প্রসাদ। কীর্তন-সাধনার লক্ষ্য কানকে খুশী করা নয় বাবা, খাঁটি-কীর্তনী কীর্তন গান ঠাকুরের লীলা-কাহিনীর প্রসাদ নিজে পেতে ও আর পাঁচজনকে পরিবেশণ করতে।"

তাঁর কথাগুলি যে অবিকল এই ছিল তা বলছি না, তবে এই ছিল তাঁর মোদ্দা বক্তব্য। আমি আরও বিস্মিত হ'লাম এ কথা শুনে। গানও যে প্রসাদ হয় কস্মিনকালেও শুনি নি। তাই হয়ত শুনেই গায়ে কাঁটা দিল: এ হল কীর্তনে দৃষ্টিভঙ্গির—যুক্তি শ্রুতিভঙ্গির—বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করবে কে?

তার পর কাশীতে রেবতীবাবুর কাছে কীর্তন শেখা সুরু করলাম। তবে মাত্র দু'খানি কীর্তন তাঁর কাছে শিখেছিলাম: চণ্ডীদাসের—"বিনোদ গলে বিনোদ মালা বিনোদ বিনোদ দোলে" ও "বঁধু কি আর বলিব তোরে, অলপ বয়সে পিরিতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে।" এ গানটি আমার খুবই ভাল লাগত কেবল ঐ "পিরিতি" কথাটি ছাড়া। ব্রাহ্মসমাজের তথা আধুনিক সাংস্কৃতিক—বৈদেশিক আবহাওয়ায় মানুষ তো—পিরিতি নাগর বর্গীয় কথা উচ্চারণ করতে বাধত। তাই করতাম কি, "পিরিতি"কে "প্রণয়"রূপ নিষ্কলঙ্ক ব্লাউস পরিয়ে সভ্যভব্য ক'রে গানটির অপূর্ব রসটির আদ্যশ্রাদ্ধ করতাম। সুধীগণ কল্পনা করুন এ গানটিতে পিরিতিকে প্রণয়-রূপ বহির্বাস পরিয়ে পেশ করলে দিদিমাকে গাউন পরানর মতন কাণ্ড হয় কি না! মনে পড়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ব্রাহ্মসমাজের 'এই শুচিবাই' নিয়ে হাসাহাসি করা। যা হোক গানটি এই:

বঁধু কি আর বলিব তোরে!
অলপ বয়সে পিরিতি করিয়া রহিতে না দিলি ঘরে॥
কামনা করিয়া সাগরে মরিব সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দ-নন্দন তোমারে করিব রাধা॥
পিরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব রহিব কদম্বতলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব যখন যাইবে জলে॥
মুরলী শুনিয়া মোহিত হইবা সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কয় তখন জানিবা—পিরিতি কেমন জ্বালা॥

গানটি আমার কি যে ভাল লেগেছিল কি বলব!

প্রেমের অভিমানের এমন অপূর্ব রূপ কি বৈষ্ণব কবিরা ছাড়া, আর কেউ দিতে পেরেছে? ইংরেজী কাব্য অতি উৎকৃষ্ট মানি, কিন্তু সে ভাষাতে কি এমন অভিমান ফোটান যায়? সে ভাষায় অভিমান-শব্দটিরই যে প্রতিরূপ নেই! বহু বৎসর বাদে পণ্ডিচেরিতে গিয়ে শুনি এ-গানটি শ্রীঅরবিন্দেরও একটি প্রিয় গান। কিন্তু পিরিতির জ্বালার সঙ্গে অভিমানের রস যে তাঁর মতন অদ্বিতীয় অনুবাদকের হাতেও ফোটে নি ইংরেজী ভাষায়, তাঁর অনুবাদের শেষ স্তবক দুটি পড়তে না পড়তে প্রতীয়মান হয় না কি?

Then I will love thee and then leave;
  Under the codome's boughs when thou goest by
Bound to the water morn or eve,
  Lean on that tree, fluting melodiously.
Thou shalt hear me and fall at sight
  Under my charm; my voice shall wholly move
Thy simple girl's heart to delight;
  Then shalt thou know the bitterness of love.

পিরিতি ও জ্বালা এই দুটি শব্দের অনুবাদ শ্রীঅরবিন্দকে করতে হয়েছে love ও bitterness দিয়ে। —"সহজ কুলের বালা" অনূদিত হয়ে রূপ নিয়েছে "the simple girl"; ফল কি হয়েছে রসিকরা মর্মে মর্মে অনুভব করবেনই করবেন।

কিন্তু আমি এ-গানটির সম্পর্কে এত বাগ্‌জাল বিস্তার করেছি শুধু এ-গানটির মধ্যে প্রেমের অভিমান-রসের তারিফ করতেই নয়—শুধু এইটুকু বোঝোতেই নয় যে, এ-গানে তর্জমা শিবেরও অসাধ্য—আমার কাছে এ-গানটি কীর্তন সঙ্গীতের একটি মর্মবাণী হয়ে আমার কানের মধ্যে দিয়ে প্রাণে পৌঁছেছিল—এই কথাটি বলতেই এত ভণিতা। আমদের সমগ্র বাংলা সাহিত্যেও এ-গানটির অভিমান-রসের জুড়ি মিলবে না।

আমাকে রেবতীবাবু খাঁটি পদাবলীর কীর্তনে দীক্ষা দিয়েছিলেন এই গানটিরই জাদুমন্ত্রে। মানুষের জীবনে এমন অঘটন কখনো কখনো ঘটে—একটি ছোট্ট ঘটনায় তার যেন চোখ খুলে যায়, কান শুনতে পায় এমন ডাক যা শোনবার কথা সে কোনোদিন কল্পনাও করেন নি। তাই রেবতীবাবুকে যদি আমার কীর্তনের আদিগুরু উপাধি দিই তাহলে অত্যুক্তি হবে না।

এর পরে আমি বৈষ্ণব পদাবলী পড়া সুরু করি। পদাবলী কৈশোরেও পড়েছিলাম একটু-আধটু, কিন্তু তার রসকোষে প্রবেশের পথ তখন খুঁজে পাই নি। রেবতীবাবুর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা নতুন জগৎ খুলে গেল: এ কি কাণ্ড! প্রেমের অন্তঃপুরের সুগোপনতম রহস্য পূর্বরাগে, অনুরাগে, আলাপে, অনুযোগে, অভিমানে, বেদনায়, আনন্দে, হাসি-অশ্রুর রামধনু-রঙে এমন ক'রে কোন্ দেশের কাব্যে ফুটে উঠেছে অবিস্মরণীয় ছবির পর ছবি এঁকে, যার পরম সমাপ্তি হয়েছে মধুর রসের চরম আত্মসমর্পণে যে লজ্জা, মান, ভয়, উদ্বেগ পিছুডাক এমনকি পাপ-পুণ্যের সংস্কারও কাটিয়ে চেয়েছে শুধু:

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত ভালো মন্দ নাহি জানি
কহে চণ্ডীদাস: পাপ পুণ্য মম তুহারি চরণখানি।

কিন্তু তখনও রেবতীবাবুর মুখে শুনি নি তো পালা-গান—তাই চোখের ঠুলি খ'সে পড়লেও যা দেখলাম তার রস চুঁইয়ে চুঁইয়ে গহন মর্মকোষে নবসুধার রসলোক গ'ড়ে তোলে নি। পূর্বরাগ এসেছে, কিন্তু সে অনুরাগ আসে নি যার কানে পূর্ণ আত্মসমর্পণের ডাক পৌঁছে সব কিছু তছনছ ক'রে দেয় ব'লেই সে বলতে পারে, আর কিছু চাই না শুধু:

অনেক সাধের পরাণ বঁধুয়া নয়নে লুকায়ে থোব।
চিন্তামণির শোভাতে গাঁথিয়া হিয়ার মাঝারে লব।
এই নিবেদন গলায় বসন দিয়া কহি শ্যামরায়।
চণ্ডীদাস কয়: জীবনে মরণে না ঠেলিহ রাঙাপায়।

তাই তো রেবতীবাবুর কাছে কীর্তন শেখার ছেদ পড়ল—অতুলদা'র ডাকে লক্ষ্ণৌ গিয়ে অচ্ছন বাঈয়ের কাছে ঠুংরিতে তালিম দেওয়া সুরু করলাম।

মানুষের মন স্বভাব-চঞ্চল—আমার মন তো আবাল্য চঞ্চলতায় নিত্যসিদ্ধ। ফলে অচ্ছন বাঈয়ের অপরূপ সূক্ষ্ম সুরে মনমাকু একেবারে হুশ ক'রে ফের ওস্তাদি সঙ্গীতের রংমহলে লাফ দিল কীর্তনের বৃন্দাবন ছেড়ে।

কিন্তু আমিই একটি কবিতায় পরে লিখেছিলাম একটি চরণ, শ্রীঅরবিন্দ যার উচ্চ-প্রশংসা করেছিলেন পণ্ডিচেরিতে: "A sigh that wakes can sleep no more". রেবতীবাবুর সাঙ্গীতিক গুরুশক্তিতে আমার মনে ছেলেবেলার দীর্ঘনিশ্বাস, ব্যাকুলতা ফের জেগে উঠেছিল—নিছক শ্রুতিমধুরতার মায়া তাকে ঘুম পাড়াতে পারবে কোত্থেকে? আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে ফের রেবতীবাবুর খোঁজ করলাম। শুনলাম তিনি মফঃস্বলে, তবে জন্মাষ্টমীতে হেমেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গাইবেন ঠিকই।

পদ্মপুকুরে জন্মাষ্টমীর দিন সকালে উপস্থিত হলাম; বিগ্রহের সামনে রেবতীবাবুকে খোল ধরতে দেখেই বুকের রক্ত উচ্ছল হয়ে উঠল। এক ঘর লোক—দু'দিকে চিকের আড়ালে মেয়েরা। আমি একদৃষ্টে রেবতীবাবুর মুখের দিকে চেয়ে। কি অপরূপ ভাবতন্ময়তা! বিগ্রহের

দিকে ঠায় চেয়ে তন্ময় হয়ে তিনি গেয়ে চলেছেন কৃষ্ণলীলা!

সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল বুকের মধ্যে—কেমন ক'রে যে কি হ'ল তার বর্ণনা দেব কোন্ ভাষায়? রবীন্দ্রনাথের একটি চরণ মনে পড়ে: "যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।" ঊর্দ্ধমুখে খোল বাজিয়ে এ ভক্ত কোকিলকণ্ঠ বালব্রহ্মচারী আঁখরের পর আখর দিয়ে নিবেদন ক'রে চলেছেন তাঁর প্রাণারাম প্রেমভক্তি যার ডাকে তিনি সংসারে থেকেও চিরদিন বৈরাগী-জীবনই যাপন করেছিলেন গুরুপদাশ্রয়ে। নইলে কি তাঁর স্বরাকণ্ঠে উচ্ছলিত হ'ত সুধাস্রোতের ডাক, যে যুগে যুগে প্রতি রাধা প্রিয়াকে ঘরছাড়া ক'রে নিজেই শোনে নিজের প্রেমনিবেদন রাধার হৃদয়ে তার প্রতিধ্বনি জাগিয়ে:

ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে কে আর আমার আছে?
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই দাঁড়াব কাহার কাছে?

তাই তো তার শুধু একটি গতি আছে:

এ-কুলে ও-কুলে দু-কুলে গোকুলে আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও-দুটি কমল পায়।

চণ্ডীদাসের এই অন্তরঙ্গ আত্মনিবেদনের গানটি গেয়ে যখন তিনি শেষ করলেন, আমি বিহ্বল হয়ে শুধু বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে। কানে ভেসে আসছিল শুধু চিতের আড়ালে বেদের চাপা কান্নার স্বর!

সেদিন বুঝলাম কীর্তন কি বস্তু—কেন ঠাকুরদা কীর্তন শুনে বলেছিলেন: "বৃথাই খেয়াল শিখে সময় নষ্ট করেছি," আর পিতৃদেব বলেছিলেন: "ওরে, কীর্তন কি বস্তু বুঝবি বড় হ'লে," কেন ঠাকুরদা ওস্তাদ হয়েও কীর্তন না শিখে খেয়াল শেখাকে নাম দিয়েছিলেন "সময় নষ্ট"।

হার মানলাম। তার পর কয়েকদিন থেকে থেকে কেবলই কানে বেজে উঠতে থাকে রেবতীবাবুর নানা আঁখর, চোখে ভেসে ওঠে তাঁর অশ্রুসিক্ত প্রেমতন্ময় মুখ আর মনে হয় এর পরে সঙ্গীতের আর কি দেবার থাকতে পারে?

* * *

এ-আশ্চর্য অনুভূতির পরে আমার মধ্যে সে যে কি এক অন্তর্বিপ্লব ঘটে গেল ভাষায় তার বর্ণনা অসম্ভব। কিন্তু এমনি মানুষের মন যে, শ্রেষ্ঠ কীর্তন শ্রেষ্ঠ ওস্তাদি গানের চেয়ে অনেক বড় স্বীকার করতে কোথায় ব্যথা বাজত। কারণ ওস্তাদি গান ছিল আমার—যাকে বলে first love: আমার কৈশোরেই ওস্তাদি গানের বহু বিচিত্র আবেদন আমি আমার প্রতি তন্ত্র দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম, শুধু গ্রহণ করা নয়, আমার বালক মনের পরম অভীপ্সা ছিল আমাকে হতে হবে একাধারে আবদুল করিম ও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। সে সময়ে যদি কেউ বলত: "একাধারে গণেশ দাস ও রেবতীমোহন হলে কেমন হয়?" তা হলে আমি নিশ্চয়ই বিজ্ঞ হেসে বলতাম: "পাগল না ক্ষ্যাপা! কোথায় মুড়ি আর কোথায় মিছরি!"

তাছাড়া আমার মধ্যে অহমিকা ছিল প্রবল: তাই ওস্তাদি সঙ্গীতকে কীর্তনের চেয়ে বড় বলায় আমার দিক্‌ভ্রম হয়েছে একথা স্বীকার করতে মন লজ্জায় মাথা কাটা যেত। কিন্তু আমার একটা বাঁচোয়া ছিল, আমি আশৈশব আত্মাভিমানের চেয়ে সত্যকে ভালোবেসে এসেছি। তাই যখনই কোনো কিছুকে সত্য ব'লে বুঝেছি তখন সে-সব উপলব্ধি যদি আমার আগেকার কোনো প্রিয় ধারণাকে খণ্ডন করত, আমি ক্ষণকাল আত্মাভিমানকে বাঁচাতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেও তার পরেই চিত্তগ্লানি আসত। মনে পড়ত পিতৃদেবের বাল্য দীক্ষা:

"ন চ সত্যাৎ পরো ধর্মস্তস্মাৎ সত্যং ন লোপয়েৎ।"
(মহাভারত, শান্তিপর্ব।)

এবার আমি উঠে-প'ড়ে কীর্তন শিখতে আরম্ভ করলাম বিখ্যাত কীর্তনশিক্ষক শ্রীনবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে। তিনি সুগায়ক ছিলেন না, কিন্তু শেখাতে পারতেন চমৎকার। তা ছাড়া খোল বাজাতেন এত সুন্দর যে, তাঁর খোলের সঙ্গে তাঁর কাছে সবে-শেখা কীর্তন গাইতে গাইতে আমার রোমে রোমে পুলক জেগে উঠত।

এই সঙ্গে আর একটি আন্তর পরিবর্তন হ'ল: হিন্দুস্থানী ভজন আমি কিছু শিখেছিলাম আমার প্রথম ভজনগুরু শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর কাছে—যার কথা বলেছি এর আগে আমার "স্মৃতিচারণ"-এর দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে। কিন্তু দু'চারটে ভজন আর কতকাল গাওয়া যায়? অথচ হিন্দুস্থানী গান গাইতেও আর তেমন প্রেরণা পাই না—অর্থহীন ভাবহীন "ননদি... ...ন আবে মুখ নাল" বা "বাজুবন্দ খুলি খুলি যা।" গাওয়া কেমন যেন বিড়ম্বনা বোধ হয়। অগত্যা ভজন সংগ্রহে মন দিলাম। আমি যা-ই করতাম চুটিয়ে না ক'রে থাকতে পারতাম না। যা-ই ধরতাম জাপটে ধরতাম—যাকে বলে বজ্র আঁটুনি। এক কথায়, উচ্ছ্বাস এসে হ'ত আমার উৎসাহকে ফাঁপিয়ে। তার উপর আমার ছিল অটুট স্বাস্থ্য ও উচ্ছল প্রাণশক্তি—ক্লান্ত হতাম না সহজে। ফলে নানা লোকের কাছেই ধর্না দেওয়া সুরু করলাম ভজন শিখতে। সবচেয়ে লাভ হ'ল ৺ক্ষিতিমোহন ঠাকুরের কাছে গিয়ে কয়েকটি মীরা বাঈয়ের ভজন পেয়ে। তিনি সরল সুরে গাইতেন, আমি তাদের ঢেলে সাজিয়ে নানা তান দিয়ে গাইতাম: "চাকর

রাখোজী, সুনি মর হরি আওন কি আওয়াজ, মেরে গিরিধর গোপাল, চিতনন্দন বিলমাঈ, ইত্যাদি। (পরে ইন্দিরার কাছে তার সমাধিতে শোনা ছ' সাতশো মীরা-ভজন আহরণ ক'রে ভজনের পুঁজি আমার টইটুম্বুর হয়ে ওঠে কিন্তু সে অনেক পরের কথা।) কিন্তু ভজনের প্রেরণা পেতে হলে শুধুই ভজন সংগ্রহ করে চললে কি হবে—ভজন-গায়কের গানও তো শোনা চাই, নইলে আদর্শ ফুটে উঠবে কি ক'রে? কিন্তু হায় রে, আমার ভজন-উন্মুখ জীবন-নাট্যের এই অঙ্কে আমি একটিও এমন কোনো ভজন-গায়কের দেখা পাই নি যাকে বলা যায় মহীয়ান্। কাজেই শেষটায় স্থির করলাম যে, হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের আওতায় ভজনের চারাগাছ বেশী বাড়তে পারে না, দক্ষিণে ত্যাগরাজের ভজন শেখা যাক। কিন্তু দক্ষিণে ত্যাগরাজের ভজন শুনতে গিয়েই চক্ষুস্থির: ওমা! ওরা সে-সব তেলেগু ভজনে ঠিক তেমনিই ওস্তাদি চবুকিবাজি আরোপ করে যেমন পরে কেসর বাঈ করেছিলেন "দ্রৌপদী পুকারী" ভজনে।

এমন সময় আমার ডাক এল পণ্ডিচেরি থেকে—একেবারে আচম্‌কা। তখন থাকল কোথায় বা রাগ-সঙ্গীত, কোথায় বা কীর্তন, কোথায় বা ভজন! আমি ১৯২৮ সনের ১৫ই তারিখে পনের মিনিটের মধ্যে মন স্থির ক'রে শ্রীঅরবিন্দকে 'তার' ক'রে পাড়ি দিলাম "অচিনের অভিসারে"। যে কথা আমার "স্মৃতিচারণ"-এর দ্বিতীয় পর্বে বলেছি। শ্রীঅরবিন্দকে উদ্দেশ ক'রে গান বাঁধলাম:

> যবে অচিনের পথ চেয়ে এ-জীবন তরী বেয়ে
> দিলাম পাড়ি এ-অকূলে,
> তুমি হে দিশারি ধ্রুবতারা, দেখা দিলে পথহারা
> এ-পাথার মরু বিপুলে।

বাকি লাইনগুলি মনে নেই। কিন্তু যা বলছিলাম—ভজনের কথা।

লক্ষ্ণৌ থেকে সোজা বোম্বাই গিয়ে উঠলাম আমার এক প্রিয় চিরসদয় বন্ধুর ওখানে, যিনি আজো আমার প্রতি তেমনি সদয় আছেন: মনীষী তথা দরদী ক্ষিতীশচন্দ্র সেন। এমন প্রফুল্ল, সংস্কৃত, তীক্ষ্ণধী অথচ শ্রদ্ধালু মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি ভূ-ভারতে। তিনি আমাকে সাদরে বরণ করলেন চিরপরিচিত দিলীপ ব'লে, যে ছিল ওস্তাদি-গান-পাগল। তাঁকে বলি নি তো আমার বৈরাগ্যের কথা, তিনি জানবেন কি ক'রে? তাই তিনি পরদিন বললেন (আমি তখন শ্রীঅরবিন্দের 'তারে'র আশায় অপেক্ষা করছি) যে, আবদুল করিম গাইছেন তাঁর এক মারাঠী বন্ধুর বাড়ী। মারাঠীরা আবদুল করিমের দারুণ ভক্ত—তাই সে অনুকূল পরিবেশে করিম সাহেব চার ঘণ্টা ধ'রে গাইলেন—রাত দুটো পর্যন্ত। অপূর্ব গান বটেই তো! কিন্তু যে-মন আবদুল করিমের গানে এক সময়ে উজিয়ে উঠত সে তখন গা-ঢাকা দিয়েছে, কাজেই আবদুল করিমের গান শুনে আমার হৃদয়তন্ত্রী আর তেমন বেজে উঠল না। কেবল মনে পড়তে লাগল রেবতীবাবুর নানা চণ্ডীদাসী পদ—একটি পদে আজও আমার বুকের রক্ত দুলে ওঠে—রাধার অপরূপ সর্বাঙ্গীকার:

> কলঙ্কিনী বলি ডাকে সব লোকে তাহাতে নাহিক দুখ,
> তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।

বাড়ী ফিরে বিষাদে মন ছেয়ে গেল—শ্রীঅরবিন্দের 'তার' তো কই এলো না "স্বাগত" জানিয়ে! এমন সময়ে বন্ধুবর বললেন, এক মন্দিরে বিষ্ণু দিগম্বরের গান হচ্ছে।

বিষ্ণু দিগম্বরের গান আমি মাত্র একটিবার শুনেছিলাম, দিল্লী কংগ্রেসে যে-বচন সভায় দেশবন্ধু ও সুভাষের টানে আমি ডেলিগেট হয়ে দেশ উদ্ধার করতে গিয়েছিলাম—রাজনীতির আম দরবারে সেই প্রথম ও শেষ ফর্ফরায়ন। (সত্যই সেখানে বহু বক্তার মধ্যে নগণ্য গায়ক হয়ে কেবলই মনে হ'ত "সফরী ফর্ফরায়তে" উপমাটি!) একমাত্র বিষ্ণু দিগম্বরের গানে আনন্দ পেয়েছিলাম, নইলে দিল্লী যাওয়া আমার ব্যর্থ হ'ত।

কিন্তু সে-গান তো ভজন নয়—কি একটা স্বদেশী গান গেয়েছিলেন তিনি মনে পড়ছে না—বন্দেমাতরম্-ই হবে। কেবল সে উদাত্ত কণ্ঠের আশ্চর্য শিহরণ অবিস্মরণীয়। অবাঙালী কোনো ওস্তাদের কণ্ঠে এমন প্রবল মাধুর্যের দেখা পাই নি—অর্থাৎ ওজস ও লাবণ্যের রাজযোটক। সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় নেচে উঠল শুনে যে, বিষ্ণু দিগম্বর ওস্তাদি সঙ্গীত ছেড়ে দিয়েছেন—শুধু ভজন গেয়ে বেড়ান মন্দিরে মন্দিরে। বিদ্যুৎ-ঝলকে মনের মধ্যে খেলে গেল খৃষ্টের বাণী—তিনি তো মিথ্যা বলতে পারেন না: Who seeketh findeth—" খুঁজলে পাওয়া যায়ই যায়। আমি তো খুঁজছিলাম আদর্শ ভজন গায়ককে: মিলিয়ে দিলেন বাঞ্ছাকল্পতরু। মন্দিরে গাইবেন ভারতের হিন্দু ওস্তাদদের মুকুটমণি বিষ্ণু দিগম্বর—গান্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এ-কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, কোনো হিন্দু ওস্তাদেরই এত গায়ক-শিষ্য হয় নি আজ পর্যন্ত। এহেন বিষ্ণু দিগম্বর ওস্তাদি-সঙ্গীত ছেড়ে দিয়ে ভজনে তাঁর অদ্ভুত কণ্ঠ ও সাধনার্জিত ওস্তাদি-নৈপুণ্য নিয়োগ করেছেন—এইই তো চাই। মনে পড়ল রেবতীবাবুর

একটি কথা : "বাবা! এমন কণ্ঠ, এত সাধনা—এ-সব ঠাকুরের সেবায় নিয়োগ না ক'রে কেন মিথ্যে পাঁচজনের চিত্তরঞ্জন ক'রে বেড়াচ্ছ? ও-পথে কোনো গোলোকধামে পৌঁছানো যায় না।"

গেলাম মন্দিরে—মন-প্রাণ উজিয়ে উঠেছে পরমানন্দে।

বেশি আশা করলে নিরাশ হ'তে হয় অনেক সময়েই, যে-জন্যে বার্ণার্ড শ' বলেছেন, আশা না করাই ভালো : He who has never hoped can never despair. ভাগবতেও আছে বিলাসিনী পিঙ্গলা আশাকে দুঃখময় জেনে বিসর্জন দিয়ে তবেই শান্তি পেয়েছিলেন—জপ ক'রে : "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।"

কিন্তু বিধাতা লীলাময়, তাই এমন অঘটনও ঘটে বৈ কি যখন বাস্তব রঙিনতম আশাকল্পনাকেও হার মানায় : যথা সমুদ্র, হিমালয়, কাশ্মীর, তাজমহল। বিষ্ণু দিগম্বরের ভজন আমার কাছে এই শ্রেণীর অঘটন হয়েই এসেছিল। যা শুনলাম, কল্পনার শিখরকেও ছাড়িয়ে গেল!

সে-মন্দিরটি আমি ভুলব না। সেখানে ছিল না ওস্তাদি-পন্থী শ্রোতা—সার সার ব'সে শুধু নম্র, ভক্ত, জিজ্ঞাসু, সাধক, শ্রদ্ধাবান্ শাস্ত্রী ও বহু ভক্তিমতী। বিষ্ণু দিগম্বর দাঁড়িয়ে ভজন করছেন একদল দোয়ার নিয়ে—খানিকটা বাংলা কীর্তনের ভঙ্গিতে। তাঁর কিন্নরকণ্ঠে তিনি যেই সুরু করলেন, বিখ্যাত তুলসীদাসী ভজন :

ভজ মন রামচরণ সুখদায়ী

জিঁহি চরণনসে নিকসী সুরসারি শঙ্কর জটা সমাঈ···

আমার মনের সব বিষাদ কেটে গেল। এ-গানটি আমি লক্ষ্ণৌয়ে বালক চন্দ্রশেখরের কাছে শিখেছিলাম, বিশুদ্ধ ভৈরবী-ত্রিতাল। কিন্তু সে কী ভৈরবী! সবে শুনে এসেছি আবদুল করিমের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভৈরবী "বাজুবন্ধ খুলি খুলি জায়—" তান-কর্তবে তিনি বিষ্ণু দিগম্বরের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিলেন না, কিন্তু সে সুরের ইন্দ্রজালে তো ভক্তির মন-মাতান, প্রাণ-জাগান আলো পড়ে নি তাই সে-সুরের মাধুর্যে আমার ভক্তি-উন্মুখ মন উজিয়ে উঠবার অবকাশ পায় নি। কারণ তখন আমি তো আর গানে চাইছিলাম না যা আগে চাইতাম। আমি যা চাইছিলাম, দিলেন বিষ্ণু দিগম্বর উজাড় ক'রে দু'হাতে ঢেলে—কিন্তু ওস্তাদ দিগম্বর নন—সাধক দিগম্বর, পূজারী দিগম্বর। সত্যিই তো দিগম্বর—ভক্তির পরমানন্দে সর্বহারা আনন্দের দিগম্বর, এ-রিক্ত শ্রীহীন শোকতাপ-গ্লানিভরা জগতে অশোক অব্যয় অমল আনন্দের জয়ধ্বনিতে উচ্ছল দিগম্বর—দু' চোখে ধারা বইছে তাঁর ভক্তবৃন্দ দোয়ার দিচ্ছে :

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
পতিত পাবন সীতারাম···

আরো কত ভজনই যে গাইলেন তিনি মনে নেই। শুধু মনে আছে যে, আমার মনের গভীর অবসাদ এক মুহূর্তে উল্লাসের জয়গানে রূপ নিল, মনে হ'ল এইই তো পরমানন্দের আলোক-আরোহিণী যিনি জীবনে :

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।

তাঁকে জীবনের যুগসঞ্চিত আবেগ-আকুতি-উচ্ছ্বাস-স্পন্দিত সঙ্গীতে নিবেদন করা—লক্ষ মানবিক অপূর্ণতাকে সেই পরমপূর্ণের স্পর্শমণি-স্পর্শে স্বর্ণায়িত করা—অধরার আশীর্বাদে এই ধূলিধরণীকে অমৃতায়িত করা—সর্বোপরি পরম তন্ময়তায় নিজেকে তাঁর চরণে নিবেদন ক'রে বিষ্ণু দিগম্বরের মতন তুলসীদাসী ভজনে গাইতে পারা :

নাথ তূ অনাথকো, অনাথ কৌন মোসোঁ?
মো সমান আরত নহী, আরতিহর তোসো।
পালক তূ—জীব হুঁ, তূ ঠাকুর—ময় চেরো
তাত মাত গুরু সখা তূ—সব বিধি হিত মেরো।

অনাথের নাথ তুমি—কে অনাথ
সংসারে নাথ, আমার মতন?
আর্ত আমার মতন কে আছে?
তোমার ম'ত কে আর্তিহরণ?
পালক ঠাকুর—তুমি, আমি—
জীব, শিষ্য, চরণদাস, পূজারী :
পিতা, মাতা, গুরু, সখা এলে
তরিতে আমারে হে কাণ্ডারী!

শুধু তাঁর ভজনে ত্রিতাপতপ্ত মানবজীবন সার্থক হ'তে পারে—শুধু সেই অমলের ঝংকৃত আবাহনে যিনি কেবল "রসানাং রসতমঃ" নন—যাঁর পাবক-স্পর্শে ধূলিম্লান জীব নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত শিব হয়, যাঁর প্রেমের আশীষে মর্ত্য জলধারা হয় "দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গা," যাঁর জলদজটা বুকে ধ'রে প্রাণচিহ্নহীন হিমমৌলি হয় কনকোজ্জ্বল কৈলাস, যাঁর করুণার প্রতি স্পন্দনে আমাদের ধূমল-জীবনযজ্ঞে জেগে ওঠে জ্যোতিরুজ্জ্বল সর্বাঙ্গীকারের হোমশিখা মন্ত্রমান্ হয়ে—ঋষি কবি শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় :

All music is only the sound of His laughter;
All beauty the smile of His passionate bliss;
Our lives are His heart-beats; our rapture the bridal
Of Radha and Krishna; our love is their kiss.

শুনি যেথায় যত গান—ধ্বনি তার উছল সুহাস্যের ;
যত মাধুরী—তার আনন্দেরি স্মিত সম্ভাষণ :
মানব জীবন—বুকের স্পন্দন তার ; পুলক আমাদের—
বাসর রাধাশ্যামের ; প্রেম আমাদের—তাদেরি চুম্বন।

*   *   *

এর পরেই এল শ্রীঅরবিন্দের 'তার' : "Welcome. Blessings...Sri Aurobindo."

বাঙ্গালোর ও মান্দ্রাজ হয়ে পৌঁছলাম ঋষিগুরু-পদাশ্রয়ে—২২শে নভেম্বর ১৯২৮।

তার পর গানে ছেদ পড়ে নি—বহু গান গেয়েছি, বেঁধেছি, শিখিয়েছি...আজো সে-প্রেরণা ম্লান হয় নি—তবে ধারা বদলে গেছে : আগে গাইতাম খেয়াল, ঠুংরি, গজল, আজ গাই ভজন, কীর্তন-স্তোত্র।

শুভ নব বৎসর ১৩৬৮ সাল

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সম্ভাবনার সোনার সুমেরু হতে,
হে নববর্ষ এসো হে অয়ন পথে।
তুমি এনে দাও সুখ সমৃদ্ধি—
শুদ্ধ বিবেক, মহৎ প্রবৃত্তি।
মানব-মিতালি গ্রহে গ্রহে পাক ঠাঁই
সব অজানারে আমরা জানিতে চাই।
বিশ্বনাথের বিপুল বিশ্ব মাঝ—
আমরা যে চাই দিব্য এক সমাজ।
অমৃত সত্রে সব হোক এক জাত—
ঘুচাইয়া দাও সেথাকার উৎপাত।

২

ভক্তি রাজ্যে কি আবিষ্কার নব—
এনে দেবে বলো শুভ আগমন তব ?
চিন্তামণির নবাবিষ্কৃত খনি—
সারা বিশ্বকে করিয়া দিবে কি ধনী ?
ধর্ম্ম ক্ষেত্রে কিছুই কি নাই আর
নূতন খপর জানিবার জানাবার ?
বহাইয়া দাও তুমিই নূতন হাওয়া—
অপ্রাপ্যকে যায় যেন যায় পাওয়া।
জীবনের পথে হেরে যেন অনুরাগ—
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নের দাগ।

৩

জ্ঞানের পরিধি আরও বেড়ে গিয়া শেষে
বিনীত বেশেতে যেন ভক্তিতে মেশে।
তিন কুড়ি পাঁচ রাত দিন তিন শত
শোভে তব হাতে মালতী মালার মত,
এক আকাঙ্ক্ষা জাগিছে আমার চিতে—
নিবেদন করে শ্রীহরির পদে দিতে।
তুমি হও এক চিহ্নিত বৎসর—
দেবের দেউল হউক প্রতিটি ঘর।
এই এক বর—এ আশীষ মোরে দিয়ো—
যাহা করি আমি হয় যেন তাঁর প্রিয়।

সে নহি সে নহি

শ্রীচাণক্য সেন

শীতের দাপটে দিল্লী শহর যখন লেজ-গোটান কুকুরের মতো জড়োসড়ো তখন নামল বৃষ্টি, আকাশ জুড়ে ঘনিয়ে এল বিষণ্ণ কালো মেঘ, উত্তর আর পশ্চিম থেকে হাড়-কাঁপুনে নির্মম হাওয়া। এ নয় সেই বর্ষাকালের মেঘ, যা ঐ আসে ওই অতি ভৈরব হরষে, আসে ক্লান্তিহর মন-মাতান কান্তিতে; এ হচ্ছে গগন-চুম্বী হিমালয়ের আসল চেহারার তুহিন পরিচয়। বরফ ঝরছে ক'দিন ধরে হিমগিরির পাদদেশে পাহাড়ী জনপদে—কাশ্মীরে হাওয়াই জাহাজ যাওয়া বন্ধ, কুলু উপত্যকা, সিমলা, আলমোড়া ঢাকা পড়েছে বরফের শ্বেত আস্তরণে। দিল্লীর নিম্নতম তাপ চল্লিশের নীচে নেমে এসেছিল, কিন্তু রোদ ছিল ঝকঝকে, আকাশ নীল। বাগানে মৌসুমী ফুলের নানা-বর্ণ জৌলুষ; পার্কে, রাস্তার চৌমাথায় গোল-চক্রে সারা দুপুর রৌদ্র-বিলাসী মানুষের অলস ভিড়। এ হিমেল শীতের নেশা আছে, আকর্ষণ আছে। শহরে মানুষ চায় নীলাকাশ, কড়া-রদ্দুর শীত, আর গমের চাষী খোঁজে মেঘের কৃষ্ণ-ছায়া, যে-মেঘ আনবে বৃষ্টি, গমের ক্ষেতে ফসল বাড়বে, সোনালি হয়ে উঠবে মাঠ শীতের শেষে। তাই তুহিন শীতে একদিন, বিধাতা বিরূপ না হলে, আকাশে কালো মেঘ জমে; বৃষ্টি নামে। একবার নামলে সহজে যেতে চায় না। দিনের পর দিন আকাশ অবিরত কাঁদে, কনকনে হাওয়া পাগলের মতো দাপাদাপি করে। শহরে মানুষ শেষ-সম্বল শীত-বস্ত্রের বর্ম ধারণ করে, চাষীর মুখে ফোটে হাসি। উঁচু মানের বাংলো ও ফ্ল্যাটে বৈদ্যুতিক আগুন জ্বলে নয় ত বসবার ঘরে ফায়ার-প্লেসে কয়লা। উত্তীর্ণ-সন্ধ্যায় আগুন ঘিরে খোস-গল্প করেন দপ্তর-ফেরৎ ড্রেসিং-গাউন-আবৃত সাহেব, হাউস-কোট শোভিতা মেমসাব, ছেলেমেয়ে; নয় ত আগুনের উত্তাপে রক্তপ্রবাহ ঠিক রেখে সাহেব চোখ বুলিয়ে যান বয়ে-আনা জরুরী ফাইলে। কেরাণীরা সন্ধ্যা নামতে আহার সেরে লেপের নিচে আশ্রয় নেয়। তাপ-নিয়ন্ত্রিত হোটেলে ওভারকোট-পরা দেশী-বিদেশী স্ত্রী-পুরুষ ভিড় জমায়, হুইস্কি পান করে, বিলিতী কায়দায় নাচে, ক্যাবারে দেখে।

ফিরোজ শা রোডের যে বাড়ীটায় সাবিত্রী আম্মা বাস করেন, অথবা প্রবাস, তা তৈরী হয়েছিল ইংরেজ আমলে, স্বাধীনতার আগে। সেকালের সেন্ট্রাল অ্যাসেম্বলির মেম্বারদের জন্যে। বড় কম্পাউণ্ডের তিন দিক ঘেরা একটানা একতলা পাঁচটি বাংলো, একের সঙ্গে অন্যের সংযোগ প্রশস্ত ঘোরান বারান্দা। বাগান করেছে সরকারী মালী, তাই যে-পরিমাণ সার দিয়েছে ততটা ফুল ফোটে নি। সাত দিন অবিরাম বর্ষণে সে-বাগান নিস্তেজ, বিষণ্ণ; ফিকে-সবুজ ঘাস জলে ভেজা, পিচ-ঢালা রাস্তার ঢালুতে বৃষ্টির জল। সাবিত্রী আম্মার বাংলোয় দু'খানা প্রশস্ত শোবার ঘর, বড় রান্নাঘর, ভেতরে প্রকাণ্ড বারান্দা, একপাশে তৃতীয় আধো-অন্ধকার অতিরিক্ত ঘর। তার পর বাঁধান উঠোন। উঠোনের একদিকে স্নানের ঘর, বাইরের পায়খানা, কয়লা, কাঠ আর ঘুঁটে রাখবার ছোট্ট ঘর; অপর দিকে বেশ বড় একখানা ঘর, অতিথি বা কর্মচারীর জন্যে নির্দিষ্ট। উঠোনের পশ্চিম-প্রান্তে এক সারি কলাগাছ, একটা ডালিম গাছ, এক গুচ্ছ নয়নতারার বন। পূব দিকে তুলসী, জবা ও সাদা ফুলের গাছ।

সাবিত্রী আম্মার ঘুম ভেঙেছে, রোজ যেমন ভাঙে, ভোর না হতে, পাঁচটা বাজবার আগে।

সামনের বারান্দায়, যেখানটায় বাংলোর প্রবেশ দ্বার, তার সঙ্গে সরু সতরঞ্চি-ঢাকা করিডর সোজা গেছে পেছনের বারান্দা পর্যন্ত। ঢুকেই বাঁ হাতে যে বড় ঘরটা, সাবিত্রী আম্মা সেখানে কাজ করেন, শয়ন করেন। ডানলপিলো বিছান সরকারী পালঙ্কে ধবধবে সাদা বিছানা। একপাশে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিলে রাশি রাশি কাগজ, কিতাব, চিঠিপত্র, লিখবার সরঞ্জাম। দেয়াল-বরাবর তিনটি সেল্‌ফে সাজান বই। টেবিলের একপাশে গদি-আঁটা চেয়ার, সাবিত্রী আম্মার নিজের; অন্য পাশে খানচারেক গদিহীন বেতের চেয়ার। পালঙ্কের পাশে আরাম-কেদারা।

দ্বিতীয় বড় শয়নঘরটা এখন খালি। ওটা সাবিত্রী আম্মার স্বামীর ঘর, যখন তিনি দিল্লী আসেন, অথবা তাঁর একমাত্র কন্যা সরোজার, যখন তার এখানে থাকার ইচ্ছে হয়। দু'খানা পালঙ্ক এ ঘরটায়, কাছাকাছি

নয়, বেশ একটু ব্যবধানে। দুটো কাঠের আলমারী, এক কোণে রেক্সিন-বাঁধান সোফা-সেট, মাঝখানে গোল টেবিল। এ ঘরের পাশে যে অতিরিক্ত ঘর, সাবিত্রী আম্মার চাকর তা ব্যবহার করে। দক্ষিণ থেকে আনা রামস্বামী।

যেহেতু সাবিত্রী আম্মা দীর্ঘকাল গান্ধীর শিষ্যা ছিলেন, তাই উষার আগে নিদ্রাভঙ্গ তাঁর প্রাচীন অভ্যেস। এককালে, আগের কালে, রজনীর শেষ যামে শয্যা ত্যাগ ক'রে চরকায় সুতো কাটতেন। এখনও, এই পরিণত বয়সেও, নিদ্রা ভাঙ্গে অন্ধকার না যেতে, কিন্তু চরকা আর কাটেন না ; সে কাল আর নেই। বিছানায় বসে শঙ্করাচার্যের শিবস্তোত্র পাঠ করেন, তার পর রামস্বামীকে তুলে দেন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা বাজিয়ে। সংবাদ-পত্র পাঠ করে স্নানে যান ; স্নান সেরে পূজায় বসেন। সাবিত্রী আম্মা শৈব, শিবপূজা করেন, গঙ্গাপূজা করেন। আরতি করেন গুণ গুণ মন্ত্র গেয়ে। রামস্বামী ধূপ জ্বেলে দেয়, চন্দন বেঁটে দেয়। পূজা সেরে কুমকুমের জ্বলন্ত ফোঁটা পরেন সাবিত্রী আম্মা কুঞ্চিত গৌর কপালে।

পূজান্তে রামস্বামী প্রাতঃরাশ নিয়ে আসে। ইডলীর সঙ্গে নারকেল ও সরষের চাটনি। আর আনে ফুটন্ত তাজা কফি। দু'গ্লাস কফি পান করেন সাবিত্রী আম্মা ; চারখানা বড় বড় নরম ইডলি। তার পর ফিরে আসেন নিজের ঘরে। তাঁর ফিরবার আগেই রামস্বামী ঘর সাফ করে রাখে, কোনও রকম নোংরা বা বিশৃঙ্খলা সাবিত্রী আম্মা সহ্য করেন না। সাবিত্রী আম্মা ঝকঝকে ঘর দেখে প্রসন্ন হয়ে দরজা খুলে বাইরে আসেন। বাগানে আধঘণ্টা পাইচারী করেন ; দেখা হলে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দু' একটা কথাবার্ত্তা হয়। আধ-পাকা কোঁকড়া ভেজা চুল পিঠে ছড়িয়ে দেন ; দামী মোটা সিল্কের রঙিন শাড়ীতে এখনও তাঁকে সুন্দর দেখায়। একে একে লোক আসতে থাকে প্রাচীর-ঘেরা পাঁচ-বাংলোর ফাটক খুলে। কেউ বা গাড়ীতে, কেউ পায়ে হেঁটে। সাবিত্রী আম্মা লক্ষ্য করেন কারা কোন্ বাংলোর বাইরের বারান্দায় চেয়ারে আসন নেয়। দেখতে পান, কেউ কেউ তাঁর দরজার সামনে বসে গেছে। কোনও দিন আসে পরিচিত লোক, কোনও দিন অপরিচিত।

প্রাতঃভ্রমণ শেষ হলে সাবিত্রী আম্মা ঘরে ফেরেন। বারান্দায় এসে জোর হাতে অপেক্ষমান ব্যক্তিদের নমস্কার করেন। ঘরে ঢুকে বসেন টেবিলের একদিকে সংরক্ষিত আসনে। রামস্বামী এসে সাক্ষাতপ্রার্থীদের স্বাক্ষরিত নামের কার্ড বা টুকরো কাগজ উপস্থিত করে। আগে একবার সবগুলিকে দেখে নেন সাবিত্রী আম্মা ; তার পর প্রথমাগতের ডাক পরে। এই ভাবে সাবিত্রী আম্মার দৈনন্দিন কর্মজীবন সুরু হয়।

সাবিত্রী আম্মা লোকসভার সদস্যা, প্রবীণা কংগ্রেস নেত্রী।

আজ বৃষ্টি-পচা শীতের সকালে ঘুম ভাঙলেও সাবিত্রী আম্মা শয্যাত্যাগ করেন নি। গত রাত্রে উপমন্ত্রী উর্মিলা থাপরের গৃহে নিমন্ত্রণ ছিল, ফেরবার সময় মনে হচ্ছিল জ্বর-জ্বর গা, রাত্রি কেটেছে অপূর্ণ নিদ্রায়। প্রভাতে ঘুম-ভাঙা দেহে একটু একটু ব্যথা, মাথা ভার। সুতরাং স্নান চলবে না। চলবে না সকাল বেলাকার পায়চারি। বাইরে সারারাত বর্ষণের পরেও টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। পূজা করতেই হবে, কিন্তু তার দেরী আছে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সাবিত্রী আম্মা আনমনে সুর করে আবৃত্তি করলেন, "দেবি সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গে…।" বুঝলেন গলাটা ধরে আছে, সামান্য ব্যথাও লাগল। ধরা-গলায় গেয়ে চললেন, "নমস্তেতু গঙ্গে তরঙ্গে ভুজঙ্গে…।" স্তোত্র শেষ করে শুধু আওড়াতে লাগলেন, "শিব, শিব, হর, হর, শিব-শিব-হর…।"

শুনতে পেলেন রামস্বামী উঠে স্নান করল, ষ্টোভ জ্বেলে কফি বানাল। এবার উঠে সাবিত্রী আম্মা দরজা খুললেন। গরম জামা গায়ে চাপিয়েই শুয়েছিলেন, উঠবার সময় তুষের আলোয়ানে দেহকে সংরক্ষিত করলেন। বাঁ হাঁটুতে বছরখানেক একটা ব্যথা, আজ বেড়েছে। উঠতে গিয়ে লাগল। একবার মুখ বিকৃতি করেই সাবিত্রী আম্মা মৃদু হাসলেন। বয়সের দাবী। তেষট্টি অতিক্রান্ত হয়েছে। মাথার অর্দ্ধেক চুল পেকেছে। গায়ের চামড়ায় ভাঁজ। ভাঁজ পড়েছে কপালে, গালে, চোখের নিচে, গলায়। দেহে মেদের প্রাদুর্ভাব। বুকে একটা মৃদু ব্যথা বোধ করে হাত রাখলেন। জোরে নিঃশ্বাস নিলেন, বুঝলেন, ব্যথাটা হাল্কা, ঠাণ্ডা লাগার ব্যথা।

রামস্বামী গরম কফি নিয়ে এল ; সাগ্রহে দু'গ্লাস পান করলেন। বললেন, "জ্বর-জ্বর লাগছে, আজ আর স্নান করব না।"

রামস্বামী টাকরায় জিভ লাগিয়ে লোভসূচক আওয়াজ করল। বলল, "ডাক্তারকে টেলিফোন করে দি ?"

"সে হবে 'খন। তুমি পূজার ব্যবস্থা কর।"

রামস্বামী জানাল তা সে করে রেখেছে।

সাবিত্রী আম্মা স্নানঘরে গেলেন। প্রশস্ত স্নানঘর, শয়নঘরের সঙ্গে। আলনায় শাড়ী-জামা রামস্বামী সযত্নে গুছিয়ে রাখে। সরকারী ড্রেসিং-টেবিলটা সাবিত্রী আম্মা স্নানঘরে স্থাপন করেছেন। বড় আয়নায় নিজেকে সম্পূর্ণ দেখতে পান। দেখলেন, গ্লানি ও নিদ্রাহীনতায় মুখখানা ক্লান্ত, চোখের নিচে কালি। শাড়ী-জামা ত্যাগ করতে গিয়ে আবার হাসি পেল। কি দেহ কি হয়েছে! ক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে, একদিন হয় ত যে-কোনদিন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাবে। হঠাৎ সেই অনেককালের পুরনো চিন্তাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল: তখন? তখন আমি কোথায় থাকব, আমি? এই 'আমি' সাবিত্রী আম্মাকে চিরদিন জ্বালিয়েছে, আজ আর জ্বালায় না। আজ শুধু এক-একবার মনের আকাশে পড়ন্ত তারার মত ঝিলিক দেয়, সাবিত্রী আম্মা জানেন, এখুনি সে বিদায় নেবে। অথচ এই 'আমি' একদিন তাকে বিদ্রোহের পথে টেনে এনেছিল, 'আমি'কে তিনি বাঁধতে পারেন নি। অতি সংরক্ষণশীল সাবেকী ঘরের মেয়ে ও বধূ হয়েও স্বাধীনতা-সংগ্রামের জনপথে বেরিয়ে এসেছিলেন। সৌন্দর্য তার বহুজন প্রশংসিত ছিল। নিজের দেহ দেখে নিজেই বিমুগ্ধ হতেন। সেই সঙ্গে মনে ছিল অপরিমিত তেজ, ভীষণ জ্বালা! সেই অতি সুন্দর দেহের আজ এই মেদবহুল, জরাক্রান্ত পরিণতি। সে তেজও নেই, জ্বালাও শেষ হয়ে এসেছে। সেদিন আর দেরী নেই যেদিন এ দেহটাও থাকবে না। "বাসাংসি জীর্ণানি" মনে মনে আওড়ালেন সাবিত্রী আম্মা। আমি থাকব না, শুধু আমার আত্মা থাকবে, অবিনশ্বর, যার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, দেহ নেই, প্রাণ নেই, যে ব্যথায় কাঁদে না, ভালবাসায় কাঁদে না; যে বিদ্রোহী নয়, যার জ্বালা নেই, সংগ্রাম নেই, মুক্তি নেই। অব্যক্ত ব্যথায় চোখ জ্বালা করল সাবিত্রী আম্মার। শাড়ী বদলে স্নানঘরের বাইরে এলেন। সোজা চলে গেলেন পূজার ঘরে।

পূজা সমাপ্ত করে সাবিত্রী আম্মা যখন শোবার ঘরে ফিরলেন, বর্ষণ ক্ষান্ত হয়েছে, পাতলা মেঘের জাল ভেদ করে সূর্যের ম্লান সঙ্কুচিত রশ্মি দেখা দিয়েছে। দেয়ালে বড় ঘড়িটায় আটটা বাজতে দেরী নেই। বাইরে এসে দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়াতে সর্বশরীর শীতে কেঁপে উঠল, দেহ অসুস্থ লাগল। বুঝলেন, একটু জ্বর এসেছে। ঘরে ফিরে টেলিফোন করলেন ডাক্তার চৌধুরীকে। দিল্লীর দক্ষিণ-ভারতীয় সমাজে তামিল, তেলুগু চিকিৎসক বেশ ক'জন থাকা সত্ত্বেও, যাঁর প্রভাব অসামান্য। ডাক্তার চৌধুরীর কাছ থেকে অনতিবিলম্বে পরিদর্শনের আশ্বাস পেয়ে সাবিত্রী আম্মা বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

রামস্বামীকে ডেকে বললেন, "ডাক্তার চৌধুরী একটু পরে আসছেন। আমার বোধ হয় জ্বর এসেছে।"

কপাল চাপড়ে রামস্বামী জানাল, কাল এই ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে যাওয়া তাঁর একেবারে উচিত হয় নি, সে বার বার বারণ করেছিল। ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয়েছে, এখন একা সে কি করবে ভগবান জানেন! সাবিত্রী আম্মা ক্লান্ত হেসে বললেন, তার কথা না শুনে অন্যায় করেছেন। কিন্তু সামান্য জ্বর নিয়ে অত ভাবনার কারণ নেই। তবে আজ আর তিনি লোকসভায় যাচ্ছেন না, অন্ততঃ বেলা ত নয়ই। আর দেখা করতে কেউ যদি আসে সে যেন বলে না, যেন বুঝিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বলে, আজ তিনি অসুস্থ, আজ কারুর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয়।

কথাগুলি বলতে বলতে কেমন ক্লান্ত লাগল, সাবিত্রী আম্মা চোখ বুজলেন।

রামস্বামী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তার পর ঘরখানা আরও পরিষ্কার করে গুছাল। সাবিত্রী আম্মা তার কর্মের সশব্দ প্রমাণ পেলেন, সে যে অবিরাম গত রাতের অশুচিত বহির্গমনের জন্য বিড় বিড় করে খেদ জানাচ্ছে তাও শুনতে পেলেন। চোখ বুজে নিঃশব্দে শুয়ে থাকতে ভাল লাগছিল, কিন্তু মন তাঁর অলস ছিল না। লোকসভার উপস্থিতি সম্বন্ধে তিনি বক্ষ করেন না, নিষ্ঠাবান সদস্যদের মধ্যে অন্যতমা বলে তার সুনাম। চোখ বুজে ভেবে নিলেন লোকসভার আজ কি কি কাজ, অনুপস্থিত ক্ষতিকর হবে কিনা। প্রধানমন্ত্রী বোম্বাই গেছেন, সুতরাং বৈদেশিক নীতি নিয়ে বড় কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। চারটে সরকারী বিল উত্থাপিত হবার কথা, কোনটাতেই সাবিত্রী আম্মার বিশেষ উৎসাহ নেই। লক্ষ্ণৌতে গতকাল ছাত্রদের ওপর পুলিস লাঠি আর কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করেছে, বিপক্ষ দল নিশ্চয় কিছু হৈ চৈ করবেন, কিন্তু স্পীকার তাঁদের মুলতুবী প্রস্তাব অবশ্যই গ্রাহ্য করবেন না। ছুটো কমিটি মিটিং রয়েছে অপরাহ্নে, না গেলে সাবিত্রী আম্মার অস্বস্তি লাগবে, কিন্তু খুব একটা ক্ষতি হবে না, একটাতে তাঁর বক্তব্য তিনি পেশ করেছেন, অন্যটাতে করার সময় এখনও আছে। নারী-শ্রমিকদের বেতন নিয়ে বেসরকারী যে প্রস্তাবটা কাল উঠবে তা নিয়ে তাঁর বলবার আছে, সেজন্যে তৈরী হবার তাগিদ রয়েছে; বইপত্র, সরকারী একগাদা

রিপোর্ট নিয়ে এসেছেন, পড়তে হবে, অথচ মাথাটা ব্যথা করছে, ভারী হয়ে আছে।

হঠাৎ মনে পড়ল চন্দ্রকান্ত দুবে ও ভগৎ সিং দুগ্গলের আসবার কথা এগারোটায় দিল্লীতে ভারত-আরব মৈত্রী সঙ্ঘ উদ্‌ঘাটনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে। তিনি এই নব-স্থাপিত সঙ্ঘের ভাইস-প্রেসিডেন্ট। একবার ভাবলেন, টেলিফোনে বারণ করে দেওয়া যাক, পরক্ষণে মনে হ'ল, আগে ডাক্তার চৌধুরী আসুন, যদি ওষুধ খেয়ে শরীরটা সহজে চাঙ্গা হয় তাহলে বারণ করবার দরকার হবে না। শুনতে পেলেন রামস্বামী দু'একজন সাক্ষাৎ-কারীকে বিদায় দিচ্ছে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে, অপূর্ব উচ্চারণে, জানাচ্ছে সাবিত্রী আম্মা অসুস্থ, আজ দেখা হবে না, দু'চার দিন পর টেলিফোন করে সময় জেনে নিয়ে তবে আসবেন।

হঠাৎ সাবিত্রী আম্মার মন সজাগ হয়ে উঠল। রামস্বামীকে ডাকলেন।

"একটি মেয়ে এসেছিল?"

"না তো!"

"ক'টা বেজেছে? ও, সাড়ে আট। একটু পরেই সে আসবে।"

"ঠিক আছে। ভাগিয়ে দেব।"

"না, না। তাকে ভাগিয়ে দিয়ো না। বাঙ্গালী মেয়ে। নামটা হচ্ছে—হ্যাঁ, রায়, মিস রায়। তাকে ভেতরে নিয়ে এসো।"

রামস্বামী বিরক্ত হ'ল। বিড় বিড় করে বলল, আজ কথা বেশী বললে জ্বর বাড়বে, তাতে বিপদ তো তারই বেশি; কিন্তু গরীব নগণ্য মানুষ সে, তার কথার কি দাম আছে?

সাবিত্রী আম্মা মৃদু হেসে বললেন, 'আগে জিজ্ঞেস করে নিয়ো নাম। অন্য কাউকে এনে ঢুকিয়ো না।"

টেবিল থেকে যে বইখানা তুলে নিয়ে সাবিত্রী আম্মা পড়তে চেষ্টা করলেন, ভারতবর্ষে নারী-শ্রমিকদের কর্ম-ব্যবস্থার ওপর বছর পনের আগে তৈরী সেটা এক সরকারী রিপোর্ট। পড়ায় মন বসল না, চোখ বুজে এল, বুঝি-বা একটু ঘুমিয়েই পড়লেন। হঠাৎ তন্দ্রা কেটে গেল, শুনতে পেলেন মোটর-গাড়ীর শব্দ, সে গাড়ী এসে থামল তাঁর বাংলোর পাশে। ভাবলেন বুদ্ধি ডাক্তার। কিন্তু পরক্ষণেই নারীকণ্ঠ কানে এল। শুনতে পেলেন, রামস্বামীর প্রশ্নের উত্তরে কোন মহিলা নাম জানালেন, মিস রায়। রামস্বামী বললে, সাবিত্রী আম্মা অসুস্থ। উত্তর হ'ল, তা হলে আজ থাক, আমি আর একদিন আসব। রামস্বামী বলল, আম্মা তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু তিনি যেন বেশী সময় না নেন; ডাক্তার আম্মাকে বেশী কথা বলতে বারণ করেছেন। হাসি পেল সাবিত্রী আম্মার। রামস্বামী চিরদিন এমন করে থাকে। তাঁকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব যেন তার নিজের।

রিপোর্ট সরিয়ে রেখে সাবিত্রী আম্মা উঠে বসলেন, সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকল দর্শনপ্রার্থিনী। জোড়-হাতে নমস্কার করল, সাবিত্রী আম্মা হেসে বললেন, "আসুন, এই চেয়ারটায় বসুন।"

"আপনার শরীর ভালো নেই," আস্তে আস্তে সে বলল, "আজ না হয় আমি চলেই যেতুম। আপনি ভালো হলে আবার আসতুম। কিন্তু আপনার চাকর বললে, আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

"ঠিকই বলেছে।" ম্লান মুখে ক্লান্ত হেসে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "একটু জ্বর হয়েছে, এমন কিছু ব্যাধি নয়। বয়স বেড়েছে তাই অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়ি। জানেনই তো ছোটখাটো জ্বরে চুপ করে শুয়ে থাকার চেয়ে মনোমত কারুর সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগে।"

"তা লাগে।" বলে হেসে ফেলল, "আমিও অসুখ হলে একা শুয়ে থাকতে পারি নে। কেমন একটা অস্বাস্তিকর আতঙ্ক হয়।"

হো হো করে হেসে উঠলেন সাবিত্রী আম্মা। যেন বারো বছরের ছোট্ট মেয়ে। হাসতে হাসতে বললেন, "তাই নাকি? আমারও ঠিক অমনি হ'ত বুড়ো হবার আগে। এখন আর হয় না। অসুখ হলেই ভয় হ'ত বুঝি মরে যাব। এখন মরবার ভয় চলে গেছে।" শেষ কথাগুলি বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন সাবিত্রী আম্মা।

নবাগতা বিব্রত হ'ল। বুঝল, এঁকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা অনুচিত হবে। অথচ কাজের কথা তুলতে অস্বস্তি লাগল। হয় ত ইনি একটু হালকা গল্প করতে চান, কাজের কথা তুলতে চান না।

তাকে নীরব দেখে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "বেঁচে থাকাটা বড় রহস্যময়, না?"

"খুব।" মৃদু স্বরে সে উচ্চারণ করল।

"যখন মরবার কথা ভাবতে ভয়ানক ভয় হ'ত," সাবিত্রী আম্মা বললেন, "তখন ভাবতুম, জীবনকে বুঝি বড় ভালোবাসি। বড় বেশী মূল্যবান মনে হ'ত জীবনকে, ভাবতুম কত কিছু করতে হবে। এখন মরতে ভয় নেই। কাজকর্ম সব যেন শেষ হয়ে গেছে।"

"ভয়টা জয় করলেন কি করে?"

"জয় করি নি তো!" সামান্য হেসে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "এমনি চলে গেছে।" একটু থেমে, "আপনি ছেলেমানুষ, তায় বৈজ্ঞানিক। অনেক বছর বিদেশে কেটেছে। তবু একদিন বুঝবেন, ভারতবর্ষে হিন্দু হয়ে জন্মাবার কতগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে।"

"এখনই যে একেবারে বুঝি না তা নয়।"

"আপনি যে পথে চলুন, কতগুলি উপলব্ধি আপনার হবেই। অবশ্য যদি আপনি মননশীল হন, আপনার মন অনুভূতিশীল হয়। তার একটা হ'ল, এই যা বলছিলাম, জীবন ও মৃত্যুর মিতালি। বয়স বার্ধক্যের কোঠায় চলে গেলে কোথা থেকে কে এসে আপনাকে বলে দেবে, তুমি বেঁচে আছ আর তুমি মরে গেছ, এর মধ্যে ব্যবধান খুব বেশি নয়।"

সে নীরবে শুনল।

"এই দেখুন, কি সব বাজে বকছি," সলজ্জ হাসির সঙ্গে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "বুড়ো হলে এমনই হয়, কথাবার্তার ঠিক থাকে না।"

"না, না, এ কি বলছেন আপনি?"

"যাক গে এসব কথা।" হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হলেন সাবিত্রী আম্মা। কপালে চারটি দৃঢ় কুঞ্চন পড়ল। গালের দু'প্রান্তে দুটি ছোট মাংস-পিণ্ড জমল। চোখ দুটি আশ্চর্য জ্যোতিতে ভরে উঠল।

"কাজের কথা বলি। আপনার প্ল্যান আমি পড়েছি।"

সে আগ্রহে নীরব রইল।

"শুধু পড়ি নি, শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে কথাও বলেছি। তিনিও দেখেছেন আপনার প্ল্যান।"

"কি মনে হ'ল আপনার?"

"আমার ত প্রথম দিন খানিকটা শুনেই ভালো লেগেছিল। পড়ে আরও বুঝলাম আপনার উদ্দেশ্য, আপনার সমস্যা।"

"আপনার সমর্থন আছে ত?"

"না থাকলেও কিছু ক্ষতি হ'ত না, তবে আছে। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি সুখীই হব।"

"অনেক সৌভাগ্য আমার! মন্ত্রী সাহেব কি বললেন?"

"মন্ত্রীরা খোলাখুলি কথা কম বলেন। তবে যা বুঝলুম, সরকারী সাহায্য পাওয়া আপনার অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। অবশ্যি, মন্ত্রীর কাছে আপনি যাবেন, এবং তাঁকে যথাযোগ্য, বা তারও বেশি, সম্মান দেখাবেন।"

"এবং দ্বার-উদ্‌ঘাটনে তাঁকে পৌরোহিত্য করবার অনুরোধ করব?"

"দরকার বুঝলে করবেন বৈকি।" গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন সাবিত্রী আম্মা। "প্রথম চেষ্টা করবেন রাষ্ট্রপতি স্বয়ং যাতে আসেন। তা নয় ত প্রধানমন্ত্রী। অগত্যা, শিক্ষামন্ত্রীকেই ডাকবেন। জানেন তা, এদেশে কোন্ রাজপুরুষ আপনার প্রতিষ্ঠান উদ্‌ঘাটন করলেন তাই দিয়ে সংবাদপত্রগুলি তার মূল্য বিচার করবে!"

দু'জনেই একটু হাসলেন। সাবিত্রী আম্মা আবার বললেন, "আপনার কাছে আমার কয়েকটা জ্ঞাতব্য বিষয় রয়েছে এই প্ল্যান বিষয়ে।"

"বলুন।"

"আপনি উচ্চতর বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র খুলতে চান। বলছেন, বাড়ী-ঘর নিয়ে পনের লক্ষ টাকা লাগবে। সরকারী সাহায্য প্রথম খাতে বেশী পাবেন না, বড় জোর লাখ-খানেক। বাকী টাকা আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে।"

"তা অসম্ভব হবে না। টাকা বা গবেষণার যন্ত্রপাতি, লেবরেটরীর সরঞ্জাম মোটামুটি জোগাড় হয়েই আছে। অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য আশ্বাস আমরা পেয়েছি।"

"আমরা কে কে? আপনার সঙ্গে আর কেউ আছেন নাকি?"

নবাগতা হঠাৎ নীরব হ'ল। মুখখানা মুহূর্তের জন্য সামান্য রক্তিম হয়ে উঠল। সহজেই নিজেকে সামলে নিল। যতটা সম্ভব নির্বিকার স্বরে বলল, "আমার একজন সহকর্মী আছেন।"

"পুরুষ না স্ত্রীলোক?"

"পুরুষ।"

"তিনি কোথায়?"

"য়ুরোপে। ভিয়েনায়।"

"এটা বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানই ধরা হবে হয়ত?" খানিকটা আপন-মনে বললেন সাবিত্রী আম্মা।

"কেন? তা কেন হবে?" একটু উত্তেজিত হ'ল সে। "আমরা দু'জন বাঙ্গালী বটে, কিন্তু অর্থ ও যন্ত্রপাতি যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা সবাই বিদেশী। তাছাড়া, গবেষণার ছাত্রী আমরা দেশের সর্বত্র থেকে নেব। প্রাদেশিকতার বিচারে একেবারেই নেব না।"

"আপনার আন্তরিকতায় আমি অবিশ্বাস করি নি। কিন্তু এদেশে কতগুলি নূতন মনোবৃত্তি দেখা দিয়েছে, অনেক দিন বাইরে থেকে আপনি তাদের সঙ্গে হয়ত পরিচিত নন। স্বাধীনতা পাবার পর জীবন-তৃষ্ণা বাড়

যেঁড়ে গেছে আমাদের, অথচ সুযোগ সে অনুপাতে বাড়ে নি। তাই যা কিছু তৃষ্ণার বারি, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি। চাকুরি নিয়ে, পার্লামেণ্টে, বিধানসভায় আসন নিয়ে, এমন কি কলেজে, য়ুনিভারসিটিতে সীট নিয়েও কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।"

"আমাদের গবেষণা কেন্দ্রকে সর্বভারতীয় করার সংকল্পই আমাকে বাংলা দেশের অনেক দূরে রাজধানী দিল্লীতে স্থান নির্বাচনে অনুপ্রাণিত করেছে। তা সত্ত্বেও যদি বাঙ্গালী-মাদ্রাজীর প্রশ্ন ওঠে তা বড় দুঃখের হবে।"

সাবিত্রী আম্মা ক্লান্ত হাসলেন। "দিনকাল কেমন যেন বদ্‌লে যাচ্ছে, বদ্‌লে গেছে", বললেন, ছোট্ট দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে। "আমরা যত ছোট্ট হচ্ছি আমাদের ছায়াগুলো তত বড় হচ্ছে। সবটা বুঝি নি, বুঝবার চেষ্টাও করি নি আর। তা যাক। কথাটা আমি এমনই তুললাম। আমার নিজের মনোভাব দিয়ে নয়; তাঁদের যাঁদের মনোভাবের দাম বেশী। শেষ পর্য্যন্ত ওতে আটকাবে না। আপনার আসল প্রয়োজন জমির। তা আশা করি পেয়ে যাবেন।"

"ধন্যবাদ"। খুশিতে মুখ উজ্জ্বল হ'ল নবাগতার। "এ আপনার অনুগ্রহের ফল। কতদিন লাগবে?"

"এ সব কাজ সহজে তাড়াতাড়ি হতে চায় না আমাদের দেশে। অনবরত পেছনে লেগে থাকতে হয়। যাদের কাছে তদ্বির করতে হয় তাদের অনেককেই হয়ত আপনার ভাল লাগবে না। কিন্তু মন বিস্বাদ হলেও দমবেন না, কারণ কাজের চাবিকাঠি এদেরই হাতে। লেগে থাকতে পারলে, মাসখানেকের মধ্যে জমিটা পেয়ে যাবেন। সরকারী সিদ্ধান্ত এক রকম হয়ে গেছে।"

"আপনি ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন। তবু লেগে থাকতেই হবে। দরকার হলে এখানে ছুটে আসব।"

"নিশ্চয় আসবেন। হ্যাঁ, আরও দু'একটি জানবার বিষয় আমার রয়ে গেছে।"

"বলুন।"

"আপনি গবেষণাগারে কেবল মেয়েদের নেবেন কেন? ছেলেরা কি অপরাধ করল?"

"কিছু না। মেয়েদের জন্যে সুযোগের অভাব বলে।"

"দুর্দশাপন্ন, ডিস্‌ট্রেষ্ট, মেয়েদের জন্য এত বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা কেন করতে চান?"

"তাদের সুযোগ আরও কম, তাই।"

"হুঁ, ঠিকই বলেছেন। এবার খুব ব্যক্তিগত দু'একটা প্রশ্ন করব। আপত্তি থাকলে উত্তর দেবেন না, আমি একটুও ক্ষুণ্ণ হব না।"

"করুন।"

"আপনার বয়স কত?"

"একচল্লিশ।"

"কে কে আছেন আপনার? তারা কোথায়?"

"মা আছেন। কলকাতায়। একটি বোন, সে ইংলণ্ডে ডাক্তারী পড়ছে।"

"বিয়ে করেছিলেন ক'বছর আগে?"

"পনের।"

"ক'দিন টিঁকেছিল বিবাহিত জীবন?"

"তিন বছর।"

"আপনার সন্তানটি কোথায়?"

বুকের কাঁপন প্রাণপণ চেপে সে বলল, "সে লণ্ডনে — কিন্তু এত সব আপনি জানলেন কি করে?"

"বুদ্ধি দিয়ে। যাক; আপনার সুস্পষ্ট জবাবে বড় সুখী হলাম। আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা আরও বড় হ'ল।"

বাংলোর বাইরে আর একখানা গাড়ী এসে থামল। হর্ণের ছোট্ট আওয়াজে সাবিত্রী আম্মা বুঝলেন ডাক্তার চৌধুরী। সেই মুহূর্তেই রামস্বামী এসে বলল, "ডাক্তার এসে গেছেন।"

"এক মিনিট বসতে বল ওঁকে।" সাবিত্রী আম্মা হেসে তাকালেন বিস্মিতা অতিথির দিকে। সে যাবার জন্য প্রস্তুত। হাত দু'খানি তুলে নমস্কার করছে। একটু ইতস্তত করে সে বলল:

"একটা অনুরোধ ছিল।"

"বলুন।"

"আমাকে এবার নাম ধরে ডাকবেন। আমি আপনার মেয়ের মত।"

গম্ভীর হয়ে গেলেন সাবিত্রী আম্মা। যেন কোনও ভাবাবেগ জোরে চাপলেন। মুখখানা কঠোর হ'ল। একবার চোখ বুজে জোরে নিঃশ্বাস নিলেন। যখন তাকালেন, চোখে প্রশান্ত হাসি; স্নেহ ঝরছে।

বললেন, "বেশ তো। তুমি বড় ভালো মেয়ে। তোমার সাহস আছে। আজই হয়ত তোমায় নাম ধরে ডাকতুম, কিন্তু, সত্যি বলতে কি, তোমার নামটি ভুলে গেছি। মনে আছে শুধু মিস রায়।"

"আমার নাম দেববাণী।"

"দেববাণী! আহা, বেশ নাম।"

ক্রমশঃ

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	হইবে না	হইবে
৫৩	২	২৫	ডানলিপিলো	ডানলোপিলো
৫৪	২	৩৭	লোভস্থচক	ক্ষোভস্থচক
৫৫	১	২৫	জীর্ণায়	জীর্ণানি
৫৬	১	৩৭	বুদ্ধি	বুঝি

টম্‌সনের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ

অধ্যাপক শ্রীগোপাললাল দে

কবি, ভাবুক, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে জগৎবাসীর নিকটে পরিচিত করিতে যে সকল বিদেশী গুণগ্রাহী সহৃদয় চেষ্টা করিয়াছেন স্বর্গত আচার্য্য এডওয়ার্ড টম্‌সন তাঁহাদের অন্যতম। ইনি মেথডিস্ট মিশনরী সোসেয়েটির (তৎকালে ওয়েস্লিয়ান মিশন) পাদরি রূপে বাঁকুড়া জেলায় কার্য্য করেন এবং প্রধানতঃ বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজে (তৎকালে ওয়েস্লিয়ান কলেজ নামে খ্যাত) অধ্যাপক, সহাধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষরূপে কার্য্য করেন। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক কবি-প্রতিভায় তিনি কিভাবে আকৃষ্ট হন আমরা জানি না, তবে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে জানিবার, বুঝিবার এবং তাঁহাকে জগৎ-সমক্ষে প্রকাশ করিবার বাসনা তাঁহার হয়। নবেম্বরের এক সন্ধ্যায় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে যেদিন কবিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে এই সংবাদ বহন করিয়া 'সামুদ্রিক তার' আসে তখন ঘটনাচক্রে অধ্যাপক টম্‌সন শান্তিনিকেতনে ছিলেন এবং তিনিই প্রথম অনাবাসিক ইউরোপবাসী, যিনি কবিকে অভিনন্দন জানান। ইহার পরেই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠে এবং অধ্যাপক টম্‌সন মিশনের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধশেষে স্বকার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে প্রথম পর্য্যায়ের পরিচয়, সমালোচনা এবং কবির বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখন এই গ্রন্থের নাম ছিল, 'Rabindranath Tagore, His life and work.'

কবি রামেন্দু দত্ত 'যুগান্তর' রবিবাসরীয় সাহিত্য অংশে (৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১) টম্‌সনের এই চেষ্টার যে সামান্য পরিচয় দিয়াছেন এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। "রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ ও তাঁহার সম্বন্ধে গ্রন্থরচনায় টম্‌সন সাহেব প্রচুর পরিশ্রম করিতেছেন ও ইংরেজি অনার্স ক্লাসের সেরা ছাত্রদের সাহায্যে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার এত ভাব যে; টেলিগ্রামে বক্তব্যের আদান-প্রদান হইতেছে এবং শান্তিনিকেতন হইতে 'অ-শান্তিনিকেতন' (টম্‌সন্ সাহেব নিজের কলেজকে কৌতুক করিয়া ঐ নামে অভিহিত করিতেন—তখন জোর স্বদেশী অসহযোগিতা চলিতেছে ১৯২১ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত অনবরত দুইজনের পত্র বিনিময় হইতেছে।" টম্‌সন তৎকালে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎকালীন ইংরেজি অনার্স ক্লাসের সেরা ছাত্র শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ, এম. এ. (কলিকাতার প্রাক্তন সমাহর্ত্তা) এবং বর্ত্তমানে বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, এম. এ. এবং আরও অনেকে টম্‌সনের এই প্রচেষ্টায় প্রচুর সহযোগিতা করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় এবং বিশ্বাস্য সংবাদ ও উচ্চাঙ্গের সমালোচনা ব্যাপারে অধুনা বিশ্ববিখ্যাত শ্রীপ্রশান্তকুমার মহলানবিশ এবং তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীনির্ম্মলকুমারী মহলানবিশ টম্‌সনকে সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য করিয়াছিলেন। স্বল্পকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে টম্‌সনের ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৯২৬) এবং বহুল সমালোচিত হয়। প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়া পুস্তকটিতে অনুবাদের এবং তথ্যে কিছু কিছু ভুল ছিল; কিন্তু টম্‌সনের মতামত অদ্যাবধি সকল সমালোচক শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছেন।

টম্‌সন অক্সফোর্ডের বাংলা অধ্যাপকরূপে বিলাতে চলিয়া যান, কিছুদিন পরে আচার্য্য (Doctor) উপাধি পান এবং অতলান্ত মহাসমুদ্রের উভয় পারে রবীন্দ্র-সমালোচক ও বাংলা-সাহিত্যবেত্তারূপে পরিচিতি ও আদর পান। আরও বহুদিন বাংলা সাহিত্য এবং রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আচার্য্য টম্‌সন তাঁহার পরিণত জ্ঞান ও বিচার-বুদ্ধি সাহায্যে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংশোধিত, পুনঃলিখিত সংস্করণ রচনা করেন। ইহা প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। আচার্য্য টম্‌সন ১৯৪৬-এর ৩রা মার্চ্চ অক্সফোর্ড অরি-এল কলেজ হইতে এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখেন এবং ওই খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল মারা যান। পুস্তকের প্রকাশ তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। এই গ্রন্থের নাম, 'Rabindranath Tagore: Poet and Dramatist, Oxford University Press-এ ছাপা।

টম্‌সনের পুস্তক রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্যকে

বহির্জগতে পরিচিত ও আদৃত করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। তাঁহার মতামত ভাবাবেগের দ্বারা, পূর্ব্ব-সঞ্চিত পক্ষপাত দ্বারা প্রভাবিত নয় এবং তাঁহার দৃষ্টি জাতীয় প্রৈতির বর্ণালীর মধ্য দিয়া ক্রিয়াশীল নয়। সুতরাং রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের যে দেশকালাতিগ মূল্য ও সারবত্তা আছে তাহা আমরা তাঁহার মতামতের মধ্য দিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে পারি।

আচার্য্য টম্‌সন তাঁহার রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শেষ মূল্যায়নে নাটকের কথা প্রথমে বলিয়াছেন। রবীন্দ্র-নাটককে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়: (১) তাঁহার রূপকভাবমুক্ত প্রথম বয়সের রচনা, যথা: 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'রুদ্রচণ্ড', 'রাজর্ষি' উপন্যাসের গল্পাংশ লইয়া রচিত 'বিসর্জ্জন', 'বৌঠাকুরাণীর হাট'-এর গল্পাংশ লইয়া লিখিত 'প্রায়শ্চিত্ত', 'চিত্রাঙ্গদা', 'বিদায় অভিশাপ', 'মালিনী' ইত্যাদি; (২) সংস্কৃত কাহিনী অথবা আর্য্য-গাথার কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাট্যকাব্য (বা কাব্য-নাটিকা) যথা: 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'সতী' ইত্যাদি এবং (৩) জীবনের শেষাংশে রচিত রূপক বা রূপকাশ্রিত, 'নাটকগুলি', যথা: 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'শারদোৎসব' নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা ইত্যাদি।

প্রথম পর্য্যায়ের নাটকগুলি সম্বন্ধে টম্‌সন্ বলেন—তৎকালে ইংরেজি এলিজাবেথায় নাটকগুলিই কবি পড়িয়াছিলেন এবং সেই সকল নাটকের বহু ব্যবহৃত পুরাতন রীতিনীতি ও আঙ্গিক তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক রুচি পরিবর্ত্তিত হওয়ার ফলে বাংলা রূপে তথা ইংরেজী অনুবাদ আকারে এগুলি প্রাচীন পন্থী এবং আধুনিক রুচিতে তেমন সম্ভোগ্য নয়। গদ্য নাটকগুলির মধ্যে তিনি এলিজাবেথীয় অথবা সংস্কৃত প্রভাব দেখেন নাই। এগুলির নির্ম্মিতি, টম্‌সনের মতে কিছুটা ত্রুটি-বিশিষ্ট। তিনি বলিয়াছেন, এগুলিকে কেবল সাহিত্য-রূপে না দেখিয়া কালোপযোগী নাটকাভিনয়ের সমস্ত চারুকলা, যথা-মঞ্চসমারোহ, দৃশ্য, নৃত্য, বেশ-বিন্যাস, গীত ইত্যাদির সহযোগে বিচার করিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে এগুলি একেবারে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আনন্দ না দিয়া পারিবে না। কবির সঙ্গীত এবং গদ্য নাটকগুলি কবির অপূর্ব্ব চারুকলাময় স্বাধীন সৃষ্টি। ইহারা অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান জগতের আধুনিক নাটকগুলির মধ্যে নিজেদের যোগ্য স্থান লাভ করিয়াছে।

নাটকগুলির প্রযোজনায় ও অভিনয়ে স্বয়ং কবি, দীনেন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শান্তিনিকেতনের শক্ষক, অধ্যাপকগণ এবং ছাত্রগণের যে স্মরণীয় সমাবেশ হইয়াছিল তাহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া টম্‌সন্ বলিয়াছেন যে এই দৃশ্য যে এই পুরুষেই হারাইয়া যাইবে অথবা তাহার স্মৃতি যে ম্লান হইয়া যাইবে—ইহা কি নিদারুণ দুঃখের। টমসনের মতে দ্বিতীয় পর্য্যায়ের নাটকগুলিতে (যথা, চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, গান্ধারার আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদ, সতী মালিনী, নরকবাস ইত্যাদি) কবির নাটকীয় শক্তির চরম বিকাশ। তাঁহার হাস্য-কৌতুকময় নাট্যগুলিরও টম্‌সন্ বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

কাব্য-সাহিত্যকে কোনো কোনো সমালোচক মহীরুহের সহিত তুলনা করিয়াছেন, ইহার মূল থাকে মাটির গভীরে, কাণ্ড শাখাদি থাকে পৃথিবীবাসীর আয়ত্তসীমায়, প্রশাখা পল্লব মুকুল ফুল ফল থাকে অভ্রভেদী উর্দ্ধ আকাশে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যের পরিবেশ ও আশয় প্রধানতঃ বাংলার মাটি জল ও মানুষ, কিন্তু ইহা ব্যঞ্জনায়, গভীর ও সুদূরপ্রসারী আবেদনে সমগ্র ভারত, সমগ্র প্রাচ্য তথা সমগ্র জগতের মানুষের চিত্তকে আয়ত্ত করিয়াছে। টমসন বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর মানুষের প্রতি একান্ত বৎসল; তিনি বাংলার মানুষ, গ্রাম, নদী, বাজার, মেলা, আম্রকাননের উপরিভাগে আকাশে ভাসমান চন্দ্র ও অপরাহ্নকালীন আকাশের তিনি শুভ্রতাকে কাব্যে সাহিত্যে পরম অপূর্ব্বতা দান করিয়াছেন। এত উৎকৃষ্ট প্রকৃতির কবি যে ফুল পাখার সূক্ষ্মতর বৈচিত্র্যগুলিও তাঁহার চোখ এড়ায় নাই এবং স্বাভাবিকতা ও বাতাবরণ সৃষ্টিতে তাঁহার অপেক্ষা অধিক পারদর্শী হয় ত আর কেহ নাই।

আচার্য্য রাধাকৃষ্ণান্ তাঁহার (The Philosophy of Robindra Nath Tagore) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের জন্য সৌন্দর্য্যকে ভালবাসেন না কিন্তু রূপকে দেখেন ভাগবতসত্তার একটি বিশেষ প্রকাশ—এই-রূপ দৃষ্টিতে।' এই সম্পর্কে টমসন্ বলেন, 'ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, স্বভাব সৌন্দর্য্যের প্রতি আর কোনোও কালে আর কোনোও কবির আরও অন্তরঙ্গ অনুভূতি ছিল না।' সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, কবির কৃতিত্ব অবশ্য ইহা অপেক্ষা আরও অনেক বেশী।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু একস্থানে* দাবী করিয়াছেন যে, জগতের মন্ময় (lyric) কবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। এ বিষয়ে মন্তব্য করিয়া টমসন বলেন: যে সব অনুবাদ তিনি পড়িয়াছেন তাহা হইতে এই দাবী স্বীকার করা অসম্ভব, তবে কবির মন্ময়তার ভাব, ভঙ্গী, ছন্দ, পর্য্যায়াদির বৈচিত্র্য, নিশ্চিত অন্তরঙ্গতা, প্রফুল্লতা,

মনোহারিত্ব, গাম্ভীর্য্য ইত্যাদিতে যে অধিকারের পরিচয় দিয়াছেন, একই বস্তুর বার বার প্রকাশে কল্পনার যে বিলাস দেখাইয়াছেন (যাহা স্বভাবপ্রকৃতির বা বিশ্ব-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যেরই অনুরূপ) তাহাতে বস্তুর মন্তব্য বিশ্বাস করিতে টমসন্ প্রবণতা অনুভব করেন।

উচ্চতম কবি পর্য্যায়ে আসন লাভের যোগ্যতার অন্যতম লক্ষণ, টমসনের মতে কোনোও দুঃখের কারুণ্য একটি শব্দগুচ্ছ অথবা একটিমাত্র শব্দে সমগ্ররূপে প্রকাশ করিবার অসামান্য ক্ষমতার, রবীন্দ্রনাথের অভাব ছিল না। তিনি দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' কর্ণের উক্তি:

'লজ্জা তব, ভেদ করি অন্ধকার স্তর
পরশ করিছে মোর, সর্ব্বাঙ্গে নীরবে,
মুদিয়া দিতেছে চক্ষু।'

এবং 'সতী' নাট্যাংশে চিতায় নিক্ষেপের প্রাক্কালে আমার 'পিতঃ' বলিয়া চীৎকার।

টমসনের মতে জগতের কাব্য-সাহিত্যে এরূপ আবেগাতিশয্যের নিদর্শন সংখ্যায় অনেক আছে কিন্তু এত উচ্চগ্রামের (pitch) প্রকাশ অতি অল্পই আছে, অন্যদিকে রবির 'বলাকা' গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলিতে যে সুমহান [illegible] আছে তাহার তুল্যমূল্য নিদর্শন জগতের কাব্য সাহিত্যে বড় বেশী নাই।

অন্তরের অন্তরতম বেদনার বিদ্যুৎ-বিলাস-বৎ প্রকাশে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে সমর্থ হইয়াছেন, তাই তাঁহার মতে রবীন্দ্র মহাকবি।

কবি প্রাচী ও প্রতীচী উভয়কেই নিজ ভাবনা-বেদনার আশ্রয় করিয়াছেন, উভয়ের প্রতিই তাঁহার অনুরাগ সমান, তিনি উভয় জগতের প্রতি গভীরভাবে ঋণী। সত্য তাহার প্রতিভা ভারত-জাত কিন্তু পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও ইংরেজি সাহিত্য সে প্রতিভাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। তিনি জাতীয়তাবাদীর মুকুটমণি হইয়াও ঊর্দ্ধে, জাতির অথচ সর্ব্ব মানবের। ভারতীয় সাহিত্য-কৃতির ইতিহাসে রবীন্দ্র-কাব্যই সর্ব্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ।

শেষ সিদ্ধান্তে টমসন্ বলেন: 'জগতের সর্ব্বোত্তম পাঁচ-ছয় জন মহাকবিকে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতির (master pieces) পাশে আমরা সচ্ছন্দে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত সাহিত্যকৃতিগুলি রাখিতে পারি। চিত্রাঙ্গদা, বিদায় অভিশাপ, উর্ব্বশী, স্বর্গ হইতে বিদায়, অহল্যা, মেঘদূত, দিনশেষে (?) (Evening), জ্যোৎস্না রাত্রে, সিন্ধুতরঙ্গ এবং অন্যান্য ভূমির উপর ঝড়ের কবিতা, (কল্পনা গ্রন্থে), সতী, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদ, নরকবাস কবিতার নরকবর্ণনা, 'কথা' কাব্যের গুরুগম্ভীর কাহিনীগুলি, 'পলাতকার' শান্তসুরের আখ্যায়িকাগুলি, 'বলাকা'র মহিমময় দীপ্তকাব্য, লিপিকা পূরবী এবং মহুয়ার কবিতা-গুলি, এবং কবির অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী অবিরত কর্ম্মময় জীবনের প্রতিপাদের নৃত্য-নাট্যের অসংখ্য গীতিগুলি। ইহার পরম মূল্য ঠিক আমাদের কালেই নিঃশেষে নির্দ্ধারিত করা চলে না, তবে ইহা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথকে কেবল 'ভারতীয় কবি' পর্য্যায়ে গণনা করা যায় না, 'জগৎ-কবিসভায়' তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত!

রবীন্দ্র-সাহিত্য যে দেশাতিশয়ী হইয়াছে তাহা বিতর্কের ঊর্দ্ধে। নানা দেশই তাহার প্রমাণ দিয়াছে। ভারত-মহাসাগরের দ্বীপ, উপদ্বীপ, আফগানিস্থান, পারস্য, আরব, তুরস্ক তাঁহাকে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছে, চীন নিজ দেশে লইয়া গিয়া 'চু-চেন্-তান্' (চৈনিক রবীন্দ্রনাথ) আখ্যা দিয়াছে। জাপানে দাস-দাসী পর্য্যায়ের ব্যক্তি পর্য্যন্ত কবির গীতাঞ্জলীর খোঁজ রাখিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রবীন্দ্র-নাথের তিন সপ্তাহ কাল পশ্চিম জার্ম্মানীতে অবস্থান কালে 'সাধনা'র জার্ম্মান অনুবাদ মুদ্রণ এবং প্রকাশ হইয়া পঞ্চাশ হাজার বিক্রীত হইয়াছে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যেদিন সন্ধ্যায় প্যারিসে শেষ এবং চরম গোলাবর্ষণ হইতেছিল, যাহার পরেই ফ্রান্স জার্ম্মাণীর নিকট পরাজয় স্বীকার করে, সেই গোলাবর্ষণের সময় প্যারিস রেডিওতে কবির 'ডাকঘর'-এর অভিনয় হইতেছিল। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি কবিকে অসীম শ্রদ্ধা ও সম্মানজ্ঞাপন করিয়াছে। কবি যে দেশে যাইতে পারেন নাই তেমন দেশও পাশের সমুদ্রপথে যেদিন কবি জাহাজ-যোগে গিয়াছেন সেইদিন জাতীয় ছুটি ঘোষণা করিয়াছে। এই সব হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে এমন কোনো আবেদন আছে যাহা একান্ত ভাবে সার্ব্বভৌম।

এ ত গেল দেশ বা পৃথ্বীর কথা! কাল? মহাকাল কি করিবে? মহাকাল কি তাহার কণ্ঠের অম্লান মালিকায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুষ্পগুলি সাদরে ধারণ করিবে? আমরা কেবল অনুমান ও আশা করিতে পারি, শেষ কথা বলিবার অধিকারী আমাদের উত্তর-পুরুষেরা। একদিন তাহারাই ইহার উত্তর দিবে।

---

* Tagore Birthday Nnmber

কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর কে ?

অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

কৃত্তিবাসের কাল-নিরূপণের জন্য বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আধুনিকতম প্রয়াস অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়ের 'কৃত্তিবাস-পরিচয়' (১৯৫৯)। ইহাতে তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কৃত্তিবাস রুকনুদ্দীন বারবক্ শাহের (১৪৫৯-৭৪ খ্রীঃ) দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাহার পূর্বেই তিনি গুরুর আজ্ঞায় রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা ইহার আলোচনা করিব।

বাস্তবিক কৃত্তিবাসের কাল-নিরূপণের জন্য তাঁহার আত্মজীবনী ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু ইহা সর্ববাদি-সম্মত যে, আত্মজীবনীটি আসলে কৃত্তিবাস-রচিত হইলেও তাহাতে পাঠবিকৃতি ঘটিয়াছে। বন্ধুবর পরলোকগত ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর অবলম্বিত পুঁথিতে এই আত্মজীবনীর প্রথম ছয় ছত্রে আছে :

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তার পুত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগ ভুঞ্জিলেক সংসারের সার॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল হইল অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥

পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের অবলম্বিত পাঠের সাহায্যে ইহার সংশোধন নিম্নলিখিতরূপ হইবে :

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁহার পাত্র আছিল নারসিং ওঝা॥
দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥

ইতিহাসে কিংবা কুলজীতে কোন স্থানে "বেদানুজ মহারাজা" পাওয়া যায় না। কিন্তু তাম্রশাসনে অরিরাজ দনুজ মাধব দশরথদেবের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পিতা দামোদর দেব অন্ততঃ ১২৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। কুলজীতে দনুজ মাধব নামক এক কুলীন ব্রাহ্মণগণের পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম পাওয়া যায়। মুসলিম ইতিহাসে দেখা যায় যে, ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁও অঞ্চলে রায় দনুজ রাজা ছিলেন এই তিন জন অভিন্ন। (সুখময় মুখোপাধ্যায়, 'রাজা গণেশের আমল', পৃঃ ১২১।) আত্মজীবনীমতে নারসিংহ ওঝা তাঁহার পাত্র ছিলেন, পুত্র নহেন। কুলজীতে নারসিংহ ওঝার পিতা শিব বা শিয়ো। সুতরাং "পুত্র" পাঠ ভ্রান্ত। প্রথম চরণের শুদ্ধ পাঠ হইবে "যে দনুজ"—"বেদানুজ" স্থানে। কুলজী-গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপপতি এক দনুজমর্দনের নাম পাওয়া যায়। তিনি বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠিপতি ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের আর এক রাজা দনুজমর্দন দেবের মুদ্রা ১৪১৭ ও ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের দনুজ মহারাজা ব্রাহ্মণ। সুতরাং তিনি চন্দ্রদ্বীপপতি কায়স্থ গোষ্ঠিপতি দনুজমর্দন হইতে পারেন না। ইতিহাসের দনুজ রায়ের সময় ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দ। তিনিই যে কৃত্তিবাসের দনুজ মহারাজা, তাহা দেখাইতেছি।

কৃত্তিবাসের কুলজী এইরূপ :

আয়িত > উদ্ধব > শিব > নারসিংহ > গর্ভেশ্বর > মুরারি > বনমালী > কৃত্তিবাস।

আয়িতের জন্ম ১১৩০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি রাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক কৌলীন্য পদ প্রাপ্ত হন। সুতরাং নারসিংহ ত্রয়োদশ শতকের শেষের বা চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকের লোক। তিনি কিছুতেই পঞ্চদশ শতকের দনুজ-মর্দন দেবের সমসাময়িক হইতে পারেন না। তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক অবশ্য ত্রয়োদশ শতকের শেষ পাদের ব্রাহ্মণ বংশীয় দনুজ রায়। তিনি পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারই সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার

১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে (১৩০১-১৩২২ খ্রীষ্টাব্দে) পূর্ববঙ্গ মুসলমান অধিকারে আসে। এই ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে :

বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥

এই সময়ে বঙ্গদেশ অর্থে পূর্ববঙ্গ বুঝাইত।

নারসিংহ ওঝা ১৩০১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে

ফুলিয়ায় আসিয়া বিবাহ করেন। তাহার ফলে তাঁহার পুত্র গর্ভেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইহা আমরা আনুমানিক ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ৩৩ বৎসরে এক পুরুষ ধরিলে মুরারির জন্ম ১৩৩৮, বনমালীর জন্ম ১৩৭১ এবং কৃত্তিবাসের জন্ম ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুমান করিতে পারি। যদি ২৫ বৎসরে এক পুরুষ ধরা হয়, তবে কৃত্তিবাসের জন্ম বৎসর হইবে ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ। পরলোকগত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির গণনানুযায়ী কৃত্তিবাসের জন্মকাল:

১৩৭৫,	৭ জানুয়ারী
১৩৭৯,	২৩ ,,
১৩৮৯,	৩ ,,
১৩৯৯,	১৩ ,,

(সা. প. প. ৪৮ ভাগ, ১০৫ পৃঃ)

এই চারি বৎসরে (কিংবা ইহাদের পরেও) হওয়া সম্ভব। তিনি রাজা গণেশের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া রামায়ণ রচনা করেন, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সকলে তাঁহার জন্মকাল অনুমান করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আমরা কোন্ তারিখ গ্রহণ করিব, তাহা বিচার করিতে হইবে।

ধ্রুবানন্দের মহাবংশে (১৪০৭ শকে=১৪৮৫।৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) দেখা যায় যে ১৪০২ শকে (=১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ) মালাধরি মেল প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই মালাধরী কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। ঐ সময়ে অবশ্য কৃত্তিবাস কিংবা তাঁহার ভ্রাতৃগণের কেহ জীবিত ছিলেন না। যদি কৃত্তিবাসের মৃত্যু ৭০ বৎসর বয়সে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে হয়, তবে তাঁহার জন্মাব্দ ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ হয়। তাঁহার আয়ু ৭০ বৎসর অপেক্ষা অল্প ধরিলে তাঁহার জন্ম ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হইবে।

কৃত্তিবাসের পৌত্রস্থানীয় সুষেণ পণ্ডিত আনুমানিক ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দের মত সময়ে জীবিত ছিলেন (ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, 'রামায়ণ', ভূমিকা, পৃঃ।/০)। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৫৬ বৎসর ধরিলে তাঁহার জন্মকাল হইবে ১৪৬০, তাঁহার পিতার ১৪২৫ এবং পিতামহের ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ। পিতামহস্থানীয় কৃত্তিবাসের জন্মকাল ইহার নিকটবর্তী সময়ে হইবে। পিতার জন্মকাল ১৪৩৫ না ধরিয়া ১৪২৫ ধরিবার কারণ আছে। সুষেণের জ্যেষ্ঠ সহোদর গঙ্গানন্দ ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফুলিয়া মেলের প্রকৃতি নির্বাচিত হন। সেই সময়ে তিনি ৩০ বৎসর বয়স্ক হইলে তাঁহার জন্মকাল হইবে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাতে তিনি সুষেণ অপেক্ষা ১০ বৎসর জ্যে হইবেন। তাঁহার পিতার জন্মসাল হইবে ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

এই সকল গণনাদ্বারা কৃত্তিবাসের জন্মকাল আনুমানিক ১৩৮০, ১৪০৪ এবং ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে ধরা হইয়াছে। ইহাদের দ্বারা আমরা বিদ্যানিধি মহাশয়ের গণিত ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী কৃত্তিবাসের জন্মতারিখ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এক্ষণে আমরা বিচার করিব, কৃত্তিবাসের আত্মজীবনীতে বর্ণিত কোন্ গৌড়েশ্বরের সভায় তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অধ্যাপক শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় স্বীকার করিয়াছেন, "গণেশই যে কৃত্তিবাস-উল্লিখিত গৌড়েশ্বর, এ কথা বলার অনুকূলে যুক্তি বিশেষ জোরালো নয়। আর এই গৌড়েশ্বর যে হিন্দু তারও কোন প্রমাণ নেই।" (কৃত্তিবাস পরিচয়, ৩৯ পৃঃ)। রাজা গণেশের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি এই যে, তাঁহার সময়ে রাজধানী ছিল পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া। তাঁহার উত্তরাধিকারী পুত্র জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ গৌড় নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। রাজা গণেশ যে কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক হইতে পারেন না, তাহার অন্য কারণ গণেশের রাজত্বের শেষ বৎসরে কৃত্তিবাসের বয়স ছিল মাত্র ১৯ বৎসর। অধিকন্তু কোনোও কুলজীতে বা জনপ্রবাদে রাজা গণেশের সহিত কৃত্তিবাসের নাম জড়িত হয় নাই।

কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯৪৮, ৩১শে ডিসেম্বর) পূর্ব পাকিস্থান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে আমি বলিয়াছিলাম: "কৃত্তিবাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এক গৌড়েশ্বর। তাঁর প্রশংসায় কবি বলেছেন—

'পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥'

এই গৌড়েশ্বর খুব সম্ভবতঃ রাজা গণেশ নন; কিন্তু তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্। রাজা গণেশের রাজত্বকাল অল্প এবং অশান্তিপূর্ণ ছিল। আমরা তাঁকে সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে কোথাও দেখি না। অন্যপক্ষে জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ দীর্ঘকাল শান্তিতে রাজত্ব করেন (১৪১৯-১৪৩১ খ্রীঃ)। তিনি ভরত মল্লিককে নানা উপহারসহ বৃহস্পতি ও রায়মুকুট এই দুই উপাধি দিয়েছিলেন। স্বধর্মত্যাগী বলে বোধ হয় কৃত্তিবাস এই গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নি।"

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় কৃত্তিবাসকে রুকনুদ্দীন বারবক্ শাহের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ) অনুগৃহীত মনে করিয়াছেন।

তিনি আত্মজীবনীতে উল্লিখিত—কেদার রায়, নারায়ণ ও গন্ধর্ব রায়—রাজসভাসদ্‌গণের সময় বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমিও নিজের বিবেচনা অনুযায়ী বিচার করিয়া দেখিব। বারবক্ শাহ ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে এক কেদার রায়কে ত্রিহুতের নায়েব নিযুক্ত করেন। তিনি রাজসভাসদ্ ছিলেন না। অন্যপক্ষে ৭১ বৎসর বয়সে কৃত্তিবাসের রাজসভায় গমন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। একজন রাজসভাসদ্ কেদার রায় সম্বন্ধে পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন যে, "তাঁহার (ধীরসিংহের) রাজ্যকালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভৈরবেন্দ্র বা ভৈরবসিংহ গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ভৈরবেন্দ্রের পরামর্শে গৌড়েশ্বরের প্রতিনিধি কেদার রায় মিথিলা রাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।" ('বাঙ্গালার ইতিহাস', ২য় ভাগ, ২০২ পৃঃ)।

ধীরসিংহের রাজত্বকালে দুইটি লিপি পাওয়া গিয়াছে। একটি লং সং ৩২১ অব্দের কার্তিকী পূর্ণিমায় আর একটি লং সং ৩২৭ অব্দে লিখিত (J. B. O. R. S. vol. X, p. 47)। প্রথমোক্ত তারিখ হইতে পরলোকগত মনোমোহন চক্রবর্তী ১৪৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখ স্থির করিয়াছেন। ইহাতে শেষোক্ত তারিখ হইতে ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দ হইবে (J. A. S. B. 1915, XI, p. 425)। ধীরসিংহের পিতা নরসিংহদেবের একটি শিলালিপির তারিখ শরাশ্বমদন। ইহা হইতে কে. পি. জয়স্বল ১৩৫৭ শক (১৪৩৫ খ্রীঃ) নির্ণয় করেন (J. B. O. R.S. vol. XX, pp 18-19)। মনে করা যাইতে পারে যে, কেদার রায় ১৪৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব হইতে গৌড়েশ্বরের সভাসদ্ ছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, তিনি জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহের (১৪১৯-১৪৩১ খ্রীঃ) সময়ে বিশ্বস্ত সভাসদ্ ছিলেন। জালালুদ্দীনের পরবর্তী সুলতান শমসুদ্দীন আহমদ শাহের (১৪৩২-১৪৩৬ খ্রীঃ) সময়ে সম্ভবতঃ হিন্দু প্রজাগণের প্রতি তাঁহার দুর্ব্যবহারের জন্য তিনি তাঁহার পক্ষ ত্যাগ করিয়া ভৈরব সিংহের পরামর্শে মিথিলারাজ ধীরসিংহের পক্ষাবলম্বন করেন। বারবক্ শাহের সময়ের কেদার রায় পূর্বোক্ত কেদার রায় হইতে ভিন্ন হওয়াই সম্ভব। এক মুসলমান বাদশাহের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হিন্দুকে অন্য মুসলমান বাদশাহ নায়েব নিযুক্ত করিবেন, ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। অধিকন্তু এই সময়ে কেদার নামটি খুবই জনপ্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়। কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বরের সভায় একজন কেদার রায় আর একজন কেদার খাঁ ছিলেন।

এক্ষণে নারায়ণের সময় বিচার করিব। ভরত মল্লিক তাঁহার পুস্তকে নারায়ণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (পূর্বোক্ত 'কৃত্তিবাস-পরিচয়', পৃ ৪২, ৪৩)। ভরত মল্লিক যে জালালুদ্দীনের সভাসদ্ ছিলেন, তাহা সর্ববাদীসম্মত। সুতরাং নারায়ণেরও জালালুদ্দীনের সভাসদ্ হওয়া সম্ভব।

এক্ষণে গন্ধর্ব রায়ের কথা। কুলগঞ্জী অনুসারে এক গন্ধর্ব খাঁ উপাধিধারী গোবিন্দ বসু 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচয়িতা মালাধর বসুর জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। মালাধর বসু ১৪৭৩ হইতে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থরচনা করেন। গন্ধর্ব রায়ের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন পুরন্দর খাঁ উপাধিধারী গোপীনাথ বসু। তিনি নাকি সুলতান হোসেন শাহের সময় (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) রাজস্ব-মন্ত্রী ছিলেন। গন্ধর্ব খাঁ সম্ভবতঃ ঐ সময়ে বর্তমান ছিলেন ('কৃত্তিবাস-পরিচয়', পৃ ৪৩, ৪৪)। তিনি যে বারবক্ শাহের সভাসদ্ ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। এখানে ইহা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, যিনি মালাধর বসুকে গুণরাজ খাঁ উপাধি প্রদান করেন, তিনি বারবক্ শাহের পরবর্তী সুলতান শমসুদ্দীন ইয়ুসুফ শাহ্ (১৪৭৪-৮২ খ্রীঃ)। এই উপাধি নিশ্চয়ই তাঁহার 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-রচনার জন্য। ঐ গ্রন্থের সমাপ্তি ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে। বারবক্ শাহের সময়ে তাহার আরম্ভ হইলেও, সমাপ্তির পূর্বে তাহার প্রসিদ্ধি এবং তজ্জন্য উপাধিলাভ অবিশ্বাস্য। গ্রন্থ শেষ করিয়াই তিনি যেমন গ্রন্থের আরম্ভ ও সমাপ্তির তারিখ দিয়াছেন, সেইরূপ আপনার গুণরাজ খাঁ উপাধিপ্রাপ্তির বিষয়ও বলিয়াছেন। গন্ধর্ব খাঁ এবং পুরন্দর খাঁ সম্বন্ধে শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় বলেন, "পুরন্দর খাঁ এবং গন্ধর্ব খাঁর সময়, এমন কি, অস্তিত্ব পর্যন্ত বিতর্কের বিষয়, কারণ কুলজী গ্রন্থগুলিকে নাতি-প্রামাণিক বলেই গণ্য করা হয়।" (ঐ) যদি গন্ধর্ব খাঁর সময় ও অস্তিত্ব বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে নিশ্চয়ই তিনি কৃত্তিবাসের প্রশংসিত গৌড়ের সুলতানের সভাসদ্ গন্ধর্ব রায় হইতে পৃথক্ ব্যক্তি।

এখন প্রশ্ন উঠে কৃত্তিবাস 'রামায়ণ' রচনা করিয়াছিলেন, গুরুর আজ্ঞায় কিংবা গৌড়েশ্বরের আজ্ঞায়। শ্রদ্ধেয় দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্ধৃত কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে আছে—

> "সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
> রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥···
> বাপ মায়ের আশীর্বাদে, গুরু আজ্ঞা দান।
> রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥"

বন্ধুবর ভট্টশালীর উদ্ধৃত আত্মবিবরণে—"সন্তুষ্ট হইয়া···

অনুবোধ" – এই দুই ছত্র নাই। শেষ দুই ছত্রের স্থানে আছে—

> বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদ গুরুর কল্যাণ।
> বাল্মীকি প্রসাদে রচে রামায়ণ গান ॥

আমার মনে হয় "সন্তুষ্ট হইয়া" ইত্যাদি শ্লোকটি খাঁটি। শেষের শ্লোকটির প্রকৃত পাঠ হইবে—

> বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরুর কল্যাণ।
> রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, "গুরু আজ্ঞা দান" ভ্রান্ত পাঠ, ইহা ডক্টর ভট্টশালীর পাঠে নাই। ডক্টর সেনের পাঠে "গুরু আজ্ঞা দান" এবং সেই সঙ্গে "রাজাজ্ঞায় রচি পুথি পরস্পর বিরোধী। সুতরাং "গুরু আজ্ঞা দান" স্থলে প্রকৃত পাঠ "গুরুর কল্যাণ।"

যে যুগে (দ্রষ্টব্য দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ৮ম সংস্করণ, ৬৬ পৃঃ)

> "অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ।
> ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥"

শ্লোক প্রসিদ্ধ ছিল এবং কৃত্তিবাসের শিরে রামায়ণ রচনার জন্য—

> "কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁসে,
> এই তিন সর্ব্বনেশে"

এই কটূক্তি বর্ষিত হইয়াছিল, সে যুগে রামায়ণ রচনা করিতে গুরু-আজ্ঞা দান কিংবা হিন্দু রাজার আজ্ঞাদান সম্পূর্ণ অসম্ভব। কৃত্তিবাসের কলঙ্ক ক্ষালনের জন্য পরবর্ত্তী কালে এই "গুরু-আজ্ঞা দান" প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং মুসলমান গৌড়েশ্বরের নাম উহ্য রাখা হইয়াছে। এই কারণেই রাজাজ্ঞার কথাও লোপ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

উপসংহারে আমি বলিতে চাই যে, খুব সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস তরুণ বয়সে গৌড়েশ্বর জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহের সভায় গমন করেন এবং তাঁহারই আজ্ঞায় রামায়ণ বাংলা ভাষায় রচনা করেন।

উড়িষ্যার ভক্তকবি শ্রীমধুসূদন

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

এ বৎসর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয়, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী বলিয়া অবশ্যই মধুসূদনের অমরকৃতি মেঘনাদবধের জন্ম-শতবার্ষিকী বলিয়াও বটে। সাক্ষাৎ ভাবে যোগাযোগ না থাকিলেও আজ অন্য এক মধুসূদনের নাম স্মরণ করি, যিনিও ভারত সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তকদের মধ্যে একজন। বর্তমান যুগের ওড়িয়া সাহিত্য যে কয়জন মনীষীর চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছে, ভঞ্জ যুগের রীতির প্রভাব অতিক্রম করিয়া যাঁহারা নবযুগের নবসাহিত্য গড়িয়া তুলিয়াছেন, নূতন ছন্দ ও নূতন পদ-বিন্যাসে সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গীকে বৃহত্তর ব্যঞ্জনা দিয়াছেন, নবভাবনাকে রূপ দিয়াছেন, মধুসূদন তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী। ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতির সম্মুখে নিত্যকার সাধারণ পাঠক অবশ্য অতীতকে ভুলিয়া বর্তমানের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, কিন্তু ইতিহাস পূর্বসূরীদের ভুলিয়া যায় না, ভুলিতে পারে না, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাঁহাদের কীর্তির কথা লিখিয়া রাখিতে চায়, বলিতে চায়—ইঁহাদের দেখ, ইঁহাদের রচনা দ্বারাই তোমাদের বর্তমান সমৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারিয়াছে। এমনি একজন সুধী ছিলেন উড়িষ্যার মধুসূদন রাও। উড়িষ্যার গ্রামাঞ্চলে এখনও পর্যন্ত লোকে ভক্তির সহিত তাঁহার কথা স্মরণ করে, ভক্তকবি নামেই তিনি পরিচিত।*

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের দেহান্তর হয়, তিন বৎসর পরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাবলীর পূর্বভাগে তাঁহার ছাত্রদের অন্যতম পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবন কথা ও সুসাহিত্যিক

---

* বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদন রাও মহাশয়ের জীবনী তাঁহার কন্যা (ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পুত্রবধূ) শ্রীযুক্তা অবন্তী দেবী রচনা করিয়াছেন তাহা শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

মধুসূদন দাশ মহাশয় তাহার ভূমিকা লেখেন। দাশ মহাশয়ের ভূমিকার শেষ ভাগে কবি যে নবযুগে সুরুচি-শিক্ষা বিষয়ে প্রকৃষ্ট আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহার বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। বিভিন্ন রচনার কালানুক্রমিক সূচীও ভূমিকাতে দেওয়া আছে।

ভক্তকবি সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন শুধু অন্তরের প্রেরণায় নয়, প্রয়োজনেরও অনুরোধে। তখনও ভারতীয় সাহিত্যে শিশুসাহিত্যের সৃষ্টি বিশেষ হয় নাই। এদেশে শিশুসাহিত্য অর্থাৎ শিশুরা যাহা বুঝিতে পারে এবং বুঝিয়া আবৃত্তি করিতে পারে, এ দেশে তাহার জন্ম ও পরিপুষ্টি আধুনিক কালেই। প্রভাত ও সন্ধ্যার সৌন্দর্য ও ঈশ্বরের সরল স্তবস্তুতি আমরা কোমলমতি শিশুদের অনায়াসে বোধগম্য বলিয়া মনে করি। তাহাদের পাঠ্য-পুস্তক এইরূপ রচনার জন্য একটা স্থানও রাখিয়া দিই, কিন্তু স্থান রাখিলে কি হইবে, বস্তুও ত চাই। তখনকার ওড়িয়া সাহিত্যে এরূপ কবিতার নিতান্তই অভাব ছিল। তিনি এ বিষয়ে পথ করিয়া দিলেন, তাই 'পথিকৃৎ' নাম তাঁহাকে বেশ মানায়। গ্রন্থাবলীর ভূমিকা লেখক মধু বাবু বলিয়াছেন, কবিতাগুলির মধ্যে নিবেদিত ভক্তি ও প্রীতি শুধু শিশু কেন, বয়স্কদেরও উপভোগ্য ও অনুভবনীয় —আমাদের মনে হয়, কবির বৃহত্তর প্রয়াসের বীজও এখানেই প্রথমে নিহিত ছিল, প্রকৃতি সৌন্দর্যে মগ্ন হইয়া বিশ্বপিতার জয়গান করার মধ্যেই।

শিশু এবং কিশোরের কাব্য পাঠ বা কাব্য শিক্ষা প্রকৃতি বর্ণনা ও স্তব ও প্রার্থনার মধ্য দিয়াই অধিকাংশ সময় অগ্রসর হয়। মধুসূদনও 'ছন্দমালা' সেই উদ্দেশ্যেই রচনা করিয়াছেন। শৈশবে যাঁহারা ছন্দমালার কবিতা কিছু কিছু কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, আজ প্রৌঢ়াবস্থায়ও তাঁহাদের সেই সকল কবিতার কয়েকটি স্তবকের বার বার আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করে, আজও সেই আবৃত্তির দ্বারা তাঁহাদের কাব্যরস আস্বাদন হয়। যেমন—

> হে আনন্দময় কোটিভুবনপালক
> অধম অক্ষম মুহিঁ অবোধ বালক,
> জ্ঞানদাতা ভগবান
> দিঅ মোতে শুভবুদ্ধি দিঅ দিব্য জ্ঞান।
> সত্য পথে ধর্ম পথে ঘেনি যাঅ মোতে,
> ভসাঅ পরাণ মোর তব প্রেমস্রোতে,
> প্রভো পরম শরণ
> এ জীবন শ্রীচরণে কলি সমর্পণ।

ছন্দমালায় অন্যান্য প্রসঙ্গের সমপর্যায়ে দেশপ্রেমকে স্থানদিয়াছেন।

> তুহি মা জনম ভূমি পবিত্র ভারত ভূমি,
> তোরে সন্তান আম্ভে অটুঁ সরবে ;
> তোর শ্রীচরণ সেবা পাঁই মন প্রাণ দেবা
> গাহিবা তোহর নাম আনন্দ রবে।
> তো আনন্দে হোইবা সুখী,
> কান্দিবা দুঃখরে তোর হোইণ দুঃখী।

দ্বিতীয়ত, কবি এখানে পূর্বাচরিত ওড়িয়া ছন্দ ও রাগরাগিণী হইতে নিজেকে বিযুক্ত করেন নাই—শিশু-গীতে যেমন করিয়াছেন। কলহংস কেদার, কেদার চক্র-কেলি প্রভৃতি বৃত্ত অবলম্বন করিয়াই রচনা করিয়াছেন। কবিতা স্বরে লয়ে গাহিবার জন্যও বটে। এক কালে গীত বা গানই ছিল কাব্যের প্রাণ। এ কালে সে প্রাণের স্থানে আসিয়াছে অন্য প্রাণ—কবিতা গাওয়া চলিবে না। আবৃত্তি হইবে, পড়া হইবে। ছন্দমালায় এই দুই প্রবৃত্তি আসিয়া মিলিয়াছে।

তৃতীয়ত, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দেখি, মহাভারতের কর্ণবধ অবলম্বনে কাব্য রচনা। কবির রচনার দিক হইতে ইহা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। নবযুগের সাহিত্য সাধনা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মেরুদণ্ড রামায়ণ মহাভারত বাদ দিয়া নয়, তাহার উপাখ্যান অবলম্বনে ভারতীয় ভাবধারার নূতন রূপ দেওয়ার একটা নিজস্ব পথ।

চতুর্থত, ঋতু বর্ণনা। বাংলায় বারমাসী বর্ণনা কবি-দের রীতি ছিল। উড়িষ্যায় বিভিন্ন ঋতু বর্ণনা সাহিত্যে নানা অধ্যায়ে বিক্ষিপ্ত আছে। তাহার পার্শ্বে ছান্দমালার বসন্ত হইতে শিশির পর্যন্ত ছয় ঋতুর সরস সুন্দর বর্ণনা শুধু শিশুদের নয়, সাহিত্যামোদী বয়স্ক পাঠকদেরও আনন্দ-বর্ষণ করিয়াছে ও করিবে।

ইহার পরবর্তী 'বালরামায়ণে' নবাধ্যায়ে বালকাণ্ড ও অসম্পূর্ণ অযোধ্যাকাণ্ড এক অধ্যায়ে রচিত। বাল-কাণ্ডের প্রতি অধ্যায়ের শেষে আছে সংস্কৃত কাব্য রচনা রীতির অনুযায়ী 'ভণিতা' বা অধ্যায় পরিচয়—যেমন ইতি শ্রীবালরামায়ণে বালকাণ্ডে অহল্যা-উদ্ধার-নাম চতুর্থ অধ্যায়, বা ইতি শ্রীবালরামায়ণে বালকাণ্ডে পরশুরাম-পরাজয়ো-নাম সপ্তম অধ্যায়, বা ইতি শ্রীবালরামায়ণে বালকাণ্ডে ভরত মাতুলালয়গমনোনাম অষ্টম অধ্যায়।

ইহার পরে দুই ভাগে সম্পূর্ণ কবিতাবলী—প্রথম ভাগে সাতটি ও দ্বিতীয় ভাগে তিনটি। **I am the monarch of all I survey** দিয়া আরম্ভ **Alexander selkirk**-এর **soliloquy** ইংরেজী কবিতার ওড়িয়া অনুবাদ প্রথম ভাগের অন্তর্গত, দ্বিতীয় ভাগের তিনটি কবিতার মধ্যে 'অযোধ্যা প্রত্যাগমন'—রঘুবংশ হইতে

অনূদিত। সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় সাহিত্যের প্রতি লেখকের অনুরাগ ছিল দেখা যাইতেছে।

'কুসুমাঞ্জলি' ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। 'অঞ্জলি' অবশ্য কবি রাধানাথ রায়ের প্রদত্ত, অর্থাৎ উৎসর্গ করা হইয়াছে—'মোর পূজ্যপাদ কৈশোর গুরু/পরমাত্মীয় যৌবন সখা/চিরজীবনের পরম হিতৈষী/পবিত্র সাহিত্য সেবাব্রতর পথপ্রদর্শক/বন্দনীয় কবি রাধানাথ রায় মহোদয় শ্রীচরণকমলরে/এ কুসুমাঞ্জলি শ্রদ্ধাভক্তিরে উৎসর্গ কলি।' কবিতাগুলি ১৮৯৪ হইতে ১৯০১ মধ্যে বিভিন্ন সময়ের রচনা। এগারটি কবিতার শেষ দুইটি শোকগাথা—একটি মহারাণী ভিক্টোরিয়াব, অন্যটি বামণ্ডাধিপতি সুচলদেবের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ। অন্য নয়টি কবিতা নূতন ভাবেই লেখা—অথবা নূতন ও পুরাতনের যোগসূত্র। 'এ সৃষ্টি অমৃতময় হে' কবিতার মধ্যে আছে সৃষ্টিতে আনন্দের ঝংকার, 'নবযুগর অভিষেক'-এ আছে নবীন যুগকে স্বাগত বিজ্ঞাপন—মানব সন্তান যে ব্রহ্মের সন্তান, সেই কথাটাই ঘোষণা করিতে হইবে, সত্যশিব সুন্দরের আলোকে চারিদিক সমুজ্জ্বল, বিশ্বকবিরা অমরবীণা লইয়া অমৃতজয়ী অভিনন্দন গাহিতেছেন, তাঁহাদের স্বরে সুর মিলাইতে হইবে।

কিন্তু কুসুমাঞ্জলির দুইটি কবিতা অবশ্যই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—একটি হইল 'ভারত-ভাবনা', দেশভক্তি বা অতীত ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, অন্যটি হইল, অপূর্বছন্দে উপনিষদের প্রসঙ্গ—'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ'। 'ভারত-ভাবনা' নয় পংক্তির একাদশ স্তবকে রচিত, প্রতি স্তবকের শেষ অর্থাৎ নবম পংক্তি অন্যগুলি হইতে কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, ইংরেজী ottava rima-র সঙ্গে যেন একটি Alexandrine জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, স্পেনসারের 'ফেয়ারি কুইনে'র ছন্দের মত। 'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ' —পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্না ধবলিত ভুবনে পবিত্র উষাকালে পবিত্র ঋষিবংশে জাত যুবকের প্রাণের অমৃতবাণী। কোথা হইতে কি করিয়া সেই বাণীর আবির্ভাব হইল, কে বলিবে। চোখ মেলিয়া ঋষি দেখিলেন, এক নির্মল জ্যোতি, ভিতরে বাহিরে সর্বত্র তাহার দীপ্তি—

> ক্ষিতি অপ্ মরুদ্ব্যোম তেজ একাকার
> নিবেসন্তি ঋষি আহা চিন্ময় সংসার।
> মৃত জয় আজি আহা! কি অমৃতময়
> ব্রহ্ম নিঃশ্বসিতে পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড হৃদয়।

এই কবিতাটির সম্বন্ধে 'সাধনায়' রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠিত প্রশংসা বাহির হইয়াছিল। 'ভারত-ভাবনা'র দৃপ্ত ছন্দের মধ্যে ও চিন্তার মধ্যে বঙ্গীয় কবি হেমচন্দ্রের কথা মনে হইতেও পারে। কিন্তু ব্রহ্মোপলব্ধির এই চিত্র বাস্তবিকই দুর্লভ, ভক্ত কবির এ যে সাধনালব্ধ অনুভূতি।

তাহার পর বসন্ত গাথা—ইহার অধিকাংশ কবিতা বসন্তকালে রচিত বলিয়া এই নাম—কতকগুলি চতুর্দশপদী কবিতার সমষ্টি। গণনায় সাতাইশটি। বিষয়ের গণ্ডি বৃহৎ, তাহা কবির কল্পনা ও আগ্রহের প্রসার সূচিত করে। ব্যক্তিবিশেষের প্রশস্তির সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে বসন্ত পূর্ণিমার অর্ধরাত্রি, একাম্রকাননের মাহাত্ম্য, নববর্ষের অভিনন্দন, যৌবনের স্বপ্ন, আরও কত কি! চতুর্দশপদী কবিতার চরণে চরণে মিল অবশ্য বহু প্রকারের আছে, কক খখ গগ, ঘঘ ইত্যাদি, চরণে চরণে, অথবা প্রথম ও তৃতীয়, দ্বিতীয় ও চতুর্থে মিল, যেমন কখ কখ গঘ গঘ; অথবা কখ কখ গগ ঘঘ, এইরূপ।

ইহার পর গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট আছে উৎকল-গাথা—সাতটি কবিতা। বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী স্বদেশী আন্দোলনের স্রোত তখনও অবরুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এগুলি বৃহত্তর ভারতভূমিকে লইয়া নয়, একমাত্র ধর্মক্ষেত্র উৎকলেরই বন্দনা। কবি নামকরণও করিয়াছেন 'উৎকল-গাথা।' শুধু একটিতে (পঞ্চম কবিতায়) ভারতকন্যাদের উদ্দেশ করা হইয়াছে।* মনে হয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে কবিতাগুলি রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে 'হিমাচলে উদয়-উৎসব' একটু অন্য ধরনের কাঞ্চনজংঘার সূর্যোদয় দেখিয়া কবির সম্মুখে বিস্তীর্ণ দৃষ্টিপটে ভাসিয়া ওঠে শংকরী-পরমেশ্বরের মিলনদৃশ্য, বর্ণের অপূর্বতায় সে দৃশ্য পরম মনোহর।

মধুসূদন রচিত শোক শ্লোক ময়ুরভঞ্জাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের পরলোকগমনে রচিত; ব্রহ্মপ্রাণ ব্রহ্মসখা তত্ত্বদর্শী ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মনন্দন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাটিরও ঐ একই উপলক্ষ্য। বামণ্ডারাজ প্রশস্তি জয়মঙ্গলাষ্টক অন্য উপলক্ষে রচিত শুভকামনার অভিনন্দন জানাইয়া।

তাঁহার সঙ্গীতমালা ১০৪টি সঙ্গীতের সমষ্টি। সমাজে ঈশ্বরপ্রীতি উন্মেষিত করিবার জন্যই এগুলির রচনা। অধিকাংশই বাংলা ও ওড়িয়া রাগিণী অনুসারে লিখিত—তিনটি সংস্কৃত ছন্দে এবং তিনটি সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের বন্দনা রীতি অনুসারে রচিত।

* এই কবিতাটি কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী রেবা রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ে'র প্রথম পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে, অনুমান ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে, রচিত ও গীত হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছিলেন, বঙ্গীয় সঙ্গীত লেখকেরা অন্যান্য ভাষার রাগিণী ও বৃত্ত প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া সেই অনুসারে নিজ ভাষায় সঙ্গীত যখন রচনা করিয়াছেন, তখন ওড়িয়া ভাষায় অন্য ভাষার রাগিণী সংস্থষ্ট সঙ্গীত লেখা আমার পক্ষে দোষের বলিয়া বিবেচিত হইবে না। সঙ্গীত মালার দুইটি সঙ্গীত বাংলা হইতে অনুবাদ বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখও করিয়াছেন। উড়িষ্যার কবি নন্দকিশোর বল এই সঙ্গীতমালা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য: "অচ্যুত অনন্ত প্রভৃতির ভজন ছাড়িয়া দিলে উৎকলে সঙ্গীত বিলাসের সামগ্রী বা আদিরসের উৎস ছিল। ভক্তকবি মধুস্থদন আধুনিক উৎকলে সর্ব্বপ্রথম সঙ্গীতকে বারনারী-আবাস ও বিকৃতরুচি নাটকের আখড়া হইতে মুক্ত করিয়া ব্রহ্ম-মন্দিরে স্থান দিয়াছেন।" অত্যুক্তি ছাড়িয়া দিলেও মধুস্থদন যে কি পরিমাণে রুচির পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত।

তাঁহার 'ভণ্ডরসায়নে' ও অন্য ব্যঙ্গ কবিতাটিতে হেমচন্দ্রের প্রতিধ্বনি অস্বীকার করা যায় না। 'সাবাস সাহিত্য চর্চ্চা সাবাস সাবাস'—হেমচন্দ্রের 'সেলাম টেম্পল চাচা সেলাম সেলাম'-এর সঙ্গে তুলনীয়। তেমনি সরলা দেবীর "বন্দি তোমায় ভারতজননী বিদ্যাবিনয়-দায়িনী'···অপমান ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ খর্পর করবালিনি" এবং রবীন্দ্রনাথের 'আট কোটি সন্তানেরে হে বঙ্গ জননি, রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি'—ইহাদের প্রতিধ্বনিও মধুস্থদনের কাব্যে দুই এক স্থানে পাইয়াছি। যথা 'বসন্ত গাথা'য় জয়গানে 'যুগযুগান্ত মোহ অন্তে জাগ মা বীর্যশালিনী, বিভুপ্রসাদে জ্যোতির্ম্ময়ী হও মা দীনপালিনী।' বলা বাহুল্য, ইহাতে তাঁহার কবিযশ ম্লান হয় নাই। ভবভূতির উত্তর-রাম-চরিতের তিনি সংস্কৃত হইতে ওড়িয়ায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। উত্তর-রাম-চরিতের শব্দ-ঝনৎকার অনুবাদ করা সহজ কথা নয়, কিন্তু কবি এই কঠিন পরীক্ষায় সুন্দর ভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহা কম কথা নয়। 'প্রণয়র অদ্ভুত পরিণাম' ও 'হেমমালা' এই দুইটি হইল তাঁহার ওড়িয়ায় কথাসাহিত্যেরও স্থত্র ধরাইবার প্রয়াস। মাতৃভাষার পথ যাহাতে সবদিকে খোলা থাকে সেজন্য তাঁহার চেষ্টার আর অন্ত ছিল না। 'প্রণয়র অদ্ভুত পরিণাম'-এর কথাবস্তু সিসিলির এক কাহিনী অবলম্বনে রচিত, আর 'হেমমালা' তেলুগু হইতে অনুবাদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা এ পর্যন্ত মধুস্থদন গ্রন্থাবলীর ক্রম অনুসারে কবির সাহিত্যসাধনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। কবির রচনার সমগ্রতা বুঝিবার জন্য ইহার প্রয়োজন আছে।

তাঁহার সাহিত্য-জীবনের তিনটি কথা এখানে বাদ পড়িয়াছে। প্রথম রাধানাথ ও ফকিরমোহনের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ। রাধানাথ রায় যখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার ছাত্র-রূপে পাইলেন মধুস্থদনকে। মধুস্থদন গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন, তাঁহার দৃষ্টি ছিল তত্ত্বান্বেষী; তিনিও অল্প বয়সেই শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। বালেশ্বরে শিক্ষকতা কালে রাধানাথ ও ফকিরমোহন উভয়েরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে তিনি আসেন। এই সাহিত্যিক বন্ধুত্ব ইতিহাসে অতি মনোজ্ঞ ঘটনা।

দ্বিতীয় কথা, মধুস্থদন শুধু কবি বলিয়া নয়, গদ্য-লেখক রূপেও পথিকৃৎ। তখনকার দিনে বালেশ্বর হইতে 'উৎকলদর্পণ' নামে এক মাসিকপত্র বাহির হইত। রাধানাথ, ফকিরমোহন, চতুর্ভুজ ও অন্যান্য লেখকদের সঙ্গে সঙ্গে মধুস্থদনের নানা প্রবন্ধ ও কবিতায় দর্পণের কলেবর পুষ্ট হইতে লাগিল। রাধানাথের মেঘদূত, ইটালীর যুবা, বিবেকী, কালিদাস প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে মধুস্থদনের নিশীথচিন্তা, নির্বাসিতের বিলাপ, অযোধ্যা প্রত্যাগমন, বুদ্ধদেব, সূর্য, উল্কাপিণ্ড প্রভৃতি পদ্য ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। মধুস্থদনের প্রবন্ধগুলি পরে প্রবন্ধমালা নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থতরাং আধুনিক ওড়িয়া গদ্য সাহিত্যের পুষ্টি সাধনে তাঁহারও কৃতিত্ব ছিল যথেষ্ট।

তৃতীয় কথা, রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা'য়, অনুকুল সমালোচনা লাভ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। ১২৯৮ সালের নব্যভারতের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হইল, পৌষ মাসেই সাধনায় এই সমালোচনা বাহির হইল। কবিগুরু লিখিলেন, ,প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বাংলার অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না।···কিন্তু 'ঋষিচিত্ত' কবিতার মধ্যে একটি প্রাচীন ধ্রুপদের স্থর বাজিতেছে।' কিন্তু নব্যভারতে যে বাংলা কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এবং ওড়িয়া কবিতাটি (গ্রন্থাবলীতে যেরূপ পাই) সর্বতোভাবে এক নয়, বাংলা কবিতায় তাহার আর এক স্তবক (ছয় পংক্তি) বাড়িয়াছে। আরও পরিবর্তন—গুরুতর পরিবর্তন হইল, 'উদ্বোধন' ও 'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ' এই দুইটি কবিতা গ্রন্থাবলীতে পাশাপাশি বা পর পর, কিন্তু পৃথক কবিতা কিন্তু নব্যভারতে উদ্বোধন দেবাবতরণেরই উদ্বোধন, আর প্রকৃতপক্ষে তাহাই তো হওয়া উচিত।

সমস্ত কবিতাগুলি একত্র দেখিলে, অথবা কাব্য-পুস্তক দেখিলে, বসন্তগাথা ও কুসুমাঞ্জলির কথাই বেশি করিয়া মনে পড়ে। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় সমালোচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন (উৎকল সাহিত্য, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, ১৩৩২ সাল) তাহার সারমর্ম এই:

"ওড়িয়া সাহিত্যে বসন্তগাথা ও কুসুমাঞ্জলির তুলনা নাই, কিন্তু এই দুইটি সংগ্রহের মধ্যে আবার কবির মনের সৌন্দর্য, চিত্তের প্রসার, হৃদয়ের অনুভূতি, কল্পনার বিলাস, প্রকাশের স্বতঃস্ফূর্ত লীলা, ভাষার ঝঙ্কার কুসুমাঞ্জলিতে যেমন সর্বত্র লক্ষিত, সুপরিস্ফুট ও সুলভ, বসন্তগাথায় তেমনটি নয়। ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণের বৈদিক মন্ত্রের মত সারল্য, সামগাথার মত গাম্ভীর্য, ভাষার ওজস্বিতা, দৃষ্টির মহামহিমতা (grandeur) শুধু বসন্তগাথায় কেন, মধুসূদনের অন্য কোনও গ্রন্থেই নাই। মধুসূদনের বাণী এতখানি উচ্চভাবপূর্ণ আর কোথাও হয় নাই। 'নব বসন্ত ভাবনা'র যে ভাবনা, তাহার তুলনা কোথায়?*** 'এ সৃষ্টি অমৃতময় হে', 'নবযুগর অভিষেক', 'আশা'—কাহাকে ছাড়িয়া কাহার নাম করিব? বস্তুত, কুসুমাঞ্জলিতে এমন কয়েকটি কবিতা আছে যাহা দেশ-কালের অতীত, যাহা সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বজনীন, চিরন্তন। 'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ' ও 'নব বসন্ত ভাবনা' যে কোনও দেশের যে কোনও কালের কবি-লেখনীর উপযুক্ত।"

১৯২৫-২৬ সনের উৎকল-সাহিত্য পত্রিকায় অন্নদা-বাবুর এই আলোচনাটি প্রকাশিত হইয়াছিল। দীর্ঘদিন পরে পড়িয়াও ঐ সকল মন্তব্য কোথাও অসঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। অন্নদাবাবু বলিয়াছেন, যাঁহারা কবি-মানসের উচ্চতম স্তর দেখিতে চান, তাঁহারা কুসুমাঞ্জলি পড়ুন, কিন্তু বৈচিত্রের সন্ধান করিতে গেলে কুসুমাঞ্জলি অপেক্ষা বসন্তগাথাই ভাল লাগিবে। আরও কিছু আলোচনার পর তিনি বলিয়াছিলেন, "যাবৎ উৎকল-সাহিত্য, তাবৎ 'বসন্তগাথা', 'কুসুমাঞ্জলি', 'হিমাচলে উদয়-উৎসব'। বিশ্বসাহিত্যে উৎকল-সাহিত্যের দান জানিতে হইলে 'ঋষিপ্রাণে দেবাবতরণ', 'নববসন্ত ভাবনা', 'হিমাচলে উদয়-উৎসব', 'বিচ্ছেদে' অবশ্যই দেখিতে হইবে।" অন্নদাবাবুর এই তালিকার সঙ্গে 'ভারত-ভাবনা' ও যোগ করিতে চাই ইহার একটি স্তবকের ইংরেজী অনুবাদ yojana পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাহা সমাদৃতও হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

মধুসূদন শিক্ষক ছিলেন, শিক্ষাকর্মী ছিলেন, পত্রকার

কবি মধুসূদন

বা সাংবাদিকও (Journalist) ছিলেন, ধর্ম-সংস্কারক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কবিপ্রাণ কোথাও চাপা পড়ে নাই। তাঁহার স্বভাবত গম্ভীর রচনার সঙ্গে ব্যঙ্গ কবিতা তেমন মানায় নাই বলিয়া আমার ধারণা। তাঁহার সঙ্গীত-মালারও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, তাহার মধ্যেও দেখিতে পাইয়াছি, 'বর্জন করিয়া নয়, গ্রহণ করিয়াই বড় হইতে পারি'—এইরূপ একটা মনোভাব। সংস্কৃত হইতে অনুবাদের পথে, রামায়ণ, মহাভারত হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া ইংরেজী, বাংলা ও তেলেগু সাহিত্যের চর্চা করিয়া তিনি মাতৃভাষার উন্নতি-সাধনে আগ্রহশীল ছিলেন।

সাহিত্যের আর এক দিকে মধুসূদনের দানের কথা স্মরণযোগ্য। সেটি হইল সংগঠনের দিক। সাহিত্য-সংগঠনের অন্যতর মাধ্যম হইল পত্রিকা। তিনি যখন বালেশ্বরে ছিলেন, উৎকল-দর্পণের সংশ্রবে আসিয়া তিনি তাহার মাধ্যমে রাধানাথবাবুর সহযোগে লেখকদের সংগঠিত করিলেন। তাঁহার সহযোগিতা উৎকল-দর্পণের পক্ষে সামান্য ছিল না। তা ছাড়া মধুসূদন বালেশ্বরে

থাকিবার সময় আরও দুইখানি মাসিকপত্র আরম্ভ করেন, দুটিই স্বল্পায়ু, একটির নাম 'শিক্ষক', অন্যটির নাম 'ধর্ম-বোধিনী'। মধুসূদনের বরাবরই শিক্ষাদানে এবং নীতির গৌরব প্রচারে আগ্রহ ও নিষ্ঠা ছিল। মৃত্যুঞ্জয় রায় মহাশয় ঊনবিংশ শতাব্দীর উৎকলীয় পত্র-পত্রিকার পরিচয় দিতে গিয়া মধুবাবুকে এই দুইটির 'জন্মদাতা' এবং 'প্রধান-পোষক' বলিয়াছেন।* 'সংস্কারক' ও 'সেবক', 'আশা' এবং 'প্রদীপ', 'ব্রাহ্ম' প্রভৃতি পত্রিকাও তাঁহার সমর্থন ও সহায়তা লাভ করিয়াছিল। 'শিক্ষাবন্ধু' এবং তৎপরবর্তী 'নবসংবাদে'র ত কথাই নাই, তিনি তাহাদের প্রবর্তক ছিলেন।

সাহিত্য-সংগঠনের আর একটি দিক হইল, সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের স্থাপন। কটকের উৎকল সাহিত্য সমাজ মধুসূদনের অন্যতম কীর্তি। আবার এই উৎকল সাহিত্য সমাজের মুখপত্র হিসাবেই 'উৎকল-সাহিত্য' পত্রিকার সৃষ্টি। উৎকল সাহিত্য সমাজের মূলে যেমন ছিল মধুসূদনের একান্ত আগ্রহ, যত্ন এবং নেতৃত্ব, উৎকল সাহিত্য পত্রিকার জন্মও তেমনই প্রধানতঃ তাঁহার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার ফলেই ঘটিয়াছিল। তাঁহার নিকট হইতেই আশা, ভরসা ও উৎসাহ লাভ করিয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য বিশ্বনাথ কর এই পত্রিকার পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ থাকাকালেই মধুসূদনের প্রতিষ্ঠিত উক্ত বিদ্যালয়ের আলোচনা সভা উড়িষ্যার প্রথম সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র ছিল। এই সভাতে পঠিত ও আলোচিত প্রবন্ধাবলীর অধিকাংশই বহুকাল পর্যন্ত উৎকল সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়াছিল। বিশ্বনাথবাবুর সম্পাদনায় এই পত্রিকা দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া উৎকলের সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। মধুসূদনের প্রতিষ্ঠিত আলোচনা সভাই প্রধানত তাঁহার উদ্যোগে প্রশস্ততর ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া ১৯০৩ সনে উৎকল সাহিত্য সমাজ নামে সমগ্র উৎকলের সাহিত্য পরিষদ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আমরণ তিনি এই সমাজের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উড়িষ্যার সাহিত্যিক মান বাড়াইতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৫৩ সনে তাঁহার জন্ম, ১৯১২ সনে তাঁহার দেহান্ত হয়। তখনকার ওড়িয়া সাহিত্যের অবস্থা স্মরণ করিলে ওড়িয়া সাহিত্যে মধুসূদনের স্থানের কথা খানিকটা বুঝিতে পারা যাইবে। তিনি শুধু সাহিত্যের ইতিহাসের সম্পর্কে স্মরণীয় নহেন, অর্থাৎ শুধু ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন। অবশ্য ঐতিহাসিক স্থানও উপেক্ষার বস্তু নয়। চল্লিশ বৎসরের বন্ধু ফকিরমোহন সেনাপতি মধুসূদনের বিয়োগে বিলাপ করিতে গিয়া বলিয়াছেন—'দরিদ্র উৎকল ভাষা মধুধারে ঋণী।' মধুসূদন দাশ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন —"আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রকে আম্ভমানঙ্কর কবিঙ্ক স্থান স্বচ্ছ, তাংাঙ্কর কবিতাগুড়িক এহি নবযুগরে সুরুচি শিক্ষা বিষয়রে প্রকৃষ্ট আদর্শ এবং সেগুড়িক লাভ করি অধুনা অতি দীন হীন উৎকল সাহিত্য যে পুষ্ট হোইঅছ এবং স্বকীয় সৌরভ চতুর্দিগরে বিস্তার করিবা লাগি কিয়ৎ-পরিমাণরে ক্ষেলে মম হোইঅছি, এহা বোলিবা বাহুল্য মাত্র।"

পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রায়ও মধুসূদন গ্রন্থাবলীতে কবির জীবনকথা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "তাঙ্কর কবিতা ও প্রবন্ধ পুণ্যশ্রীমণ্ডিত এবং মার্জিতরুচিসম্পন্ন। মধুসূদন শুদ্ধ ভাবরাজ্যর প্রধান কবি।" মার্জিতরুচি সাহিত্যের তখন খুবই অভাব ছিল। জটিল হইতে জটিলতর অলঙ্কারে প্রাচীন কাব্যলক্ষ্মী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মধুসূদনের অলঙ্কার স্বাভাবিকভাবে কাব্যলক্ষ্মীর দেহে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাতে একসঙ্গেই সমাজের সংশোধন ও সাহিত্যরুচির পরিবর্তন হইয়াছে। আজ সেই পরিবর্তনের সুফল ওড়িয়া সাহিত্য উপভোগ করিতেছেন। সাহিত্যের এই নীরব অথচ সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের মূল্য তুচ্ছ করিবার নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে ইংরেজি সাহিত্যে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটাইবার জন্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজ প্রমুখ কবি-সমালোচক-কথা স্মরণ করি, আর বিশ্বসাহিত্যের পটভূমিকায় স্মরণ করি পতঞ্জলির সেই বিপুল অর্থগর্ভিত বাক্য—একঃ শব্দঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ সুষ্ঠু প্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্‌ ভবতি। ভাষ্যকার একটিমাত্র শব্দের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মধুসূদনের কোনও কোনও কবিতা সেই কারণে অল্প পরিসরের মধ্যে থাকিয়াও স্বীয় সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতার গুণে সমৃদ্ধ হইয়া বিশ্বসাহিত্যে কি সমাদরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না?

আজকাল চারিদিকে বিষাদের, নিরাশার ঘনছায়া। কিন্তু মধুসূদন ছিলেন ধর্মপ্রাণ, ব্রহ্মনির্ভর, সুতরাং আশা-বাদী কবি। দীর্ঘকালের জড়তা, অজ্ঞান ও কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া তিনি জাতিকে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন—

প্রভাতিলা দুঃখ শর্বরী দেখ ভাই আকাশে,
স্বরগর প্রেম-আলোক চউদিগে প্রকাশে।

* উৎকল-সাহিত্য, ১৩২৭, মার্গশির সংখ্যা।

হিরণ্ময় প্রেম কিরণ দেখ ভারত শিরে
বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন ভারত এক হেউছি ধীরে।
বর্ণভেদ ধর্মভেদর দিন হেউছি শেষ,
মহাযোগে হেব ভারত মহাভারত দেশ।

পুণি শুণ নবসম্পদ সর্বে উল্লাসে মাতি
একমাত্র বিশ্ববিধাতা এক মানবজাতি।
আসিয়া য়ুরপা আফ্রিকা আমেরিকা সঙ্গতে
সম্মেলন হেউ অছন্তি প্রেম-বিধান মতে।

পূরব পশ্চিম উত্তর পুণি দক্ষিণ আশা
গাউছন্তি প্রেম সঙ্গীত কিবা অমৃতভাষা
পৃথিবী ডাকই সকলে শুণ জগতবাসী,
মো জননী তুম্ভ জননী হুঅ প্রেমে বিশ্বাসী।

প্রেমর বিজয় পতাকা উড়ুঅছি অম্বরে
জয় প্রেম জয় গাঅহে গাঅ মধুর স্বরে।
কোটি কোটি কণ্ঠ মিলাই গাঅ আনন্দে মাতি—
একমাত্র বিশ্ববিধাতা এক মানবজাতি।

সাধারণের কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅমিয়া সেন

উনবিংশ শতাব্দী বাঙালীর জাতীয় জীবনে সোনার শতক। মৃতপ্রায় পরাধীন জাতি এই শতকে নিজেদের জীবন-সাধনা নিয়োগ করেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতির হারান রহস্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টায়।

একটা জাতি বা দেশ যখন সর্ব্বদিক দিয়ে দুর্ভাগ্যের দ্বারা নিরন্তর পীড়িত হতে থাকে তখন তার বিক্ষুব্ধ হৃদয় মুক্তির জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে চায়, জীবনের কোনো না-কোনো ক্ষেত্রে একটি সাফল্যের গান সে রচনা করতে চায়। এই প্রয়াসের নামই জীবন।

উনিশ শতকে জীবনের এই লক্ষণই ফুটে বেরিয়েছিল বাংলার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে।

কিন্তু রাত্রি তখনও গভীর কালো, পদে পদে বাধা-সঙ্কট সংসারের কুজ্ঝটিকায় দিগন্ত আচ্ছন্ন। আলোকের প্রত্যাশায় শিক্ষিত জনেরা মুখ ফিরিয়ে চেয়ে আছেন পশ্চিমের দিকে।

এমনি এক বিক্ষুব্ধ যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রভাত-সূর্য্যের মতো শ্যামল বাংলার কোলে উদিত হলেন রবীন্দ্রনাথ। বন্ধুর পথ নিজের বুকের ঘর্ষণে মসৃণ ক'রে জাতিকে তুলে আনলেন সেই পথে।

দেশের আর্থিক, নৈতিক ও শিক্ষা-সংস্কারের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মনীষীর প্রখর ব্যক্তিত্ব যখন নানা দিক দিয়ে আত্মপ্রকাশ করছিল, তখন এ দেশের মূঢ় ম্লান মূক মুখগুলির দিকে তাকিয়ে কবির বেদনা-ব্যাকুল কণ্ঠ বিদীর্ণ হয়েছে—"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু" সাহস-বিস্তৃত বক্ষপটের প্রার্থনায়। বাস্তবতার সংস্পর্শশূন্য লালিত কাব্য এ নয়, সাধারণ জীবনের নিতান্ত সাধারণ চাহিদার সুর এর ছত্রে ছত্রে। তাই ছন্দোবদ্ধ হয়েও প্রাঞ্জল, মর্ম্মস্পর্শী।

বাস্তব জীবনের স্থূল প্রয়োজনগুলি যে কেবল বাঁচবার পক্ষেই অপরিহার্য্য, তাই নয়, বৃহত্তর জীবনে উত্তীর্ণ হবারও সেতু। বাস্তবের ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হলেই মানুষ বাস্তবোত্তর জীবন-মহিমার স্বপ্ন দেখতে পারে। ক্ষুদ্র প্রাণ সম্মিলিত হতে পারে বিশ্বপ্রাণে।

"এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় এই সত্যই বিধৃত হয়ে আছে। এক রক্তাক্ত অনুভূতির মধ্য দিয়ে কবির লোকোত্তর প্রতিভা ক্রমশঃ এগিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষের কাছাকছি—

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর ক'রে দাও তুমি সর্ব্ব তুচ্ছ ভয়,—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।

সকল দুর্গতির মূল ভীরুতা ও ক্লৈব্য থেকে দেশকে উদ্ধারের জন্য এ কবির ত্রাণ-মন্ত্র। "হে মোর দুর্ভাগা দেশ" কবিতায় দেশের জন্য এই ব্যাকুলতা আরও স্পষ্ট।

যুগ-যুগান্তরের অন্ধ গোঁড়ামি, দেশের যে সর্ব্বনাশ

আসন্ন করে তুলেছে, স্তম্ভিত বেদনায় কবি এসে দাঁড়িয়েছেন সেই সর্ব্বনাশের মুখোমুখি। দুঃখের আঘাতে কণ্ঠ থেকে ধ্বনিত হ'ল চরম ভবিষ্যদ্‌বাণী—

মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

অপমানিত দেশের লাঞ্ছিত চেহারাটা কবির কবিতার মধ্য দিয়ে মূর্ত্তি ধরে এসে হাজির হয়েছে সাধারণের দরবারে। আমাদের সংস্কারাবদ্ধ চেতনা কবির চৈতন্যের স্পর্শ পেয়ে এই সব পশ্চাতে ঠেলে-রাখা মানুষদের পানে পিছন ফিরে চেয়েছে।

মহৎ প্রতিভা চির নিঃসঙ্গ, চির একাকী, কারণ ধূলি-মলিন পৃথিবীর স্বল্পায়তন মাটির ঘরে তাকে আঁটে না, অসীমের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে তার নিত্য বিহার।

সেই জন্য ব্যাস বাল্মীকি কালিদাসের জগতে সাধারণ জীবনের কলরব কোলাহল স্তব্ধ।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ এর প্রকাণ্ড ব্যতিক্রম। মহাকবিদের নিভৃত কল্পকুঞ্জবন থেকে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন মাটির সমতলে, নিম্নতমদের মাঝখানে। এই সমগ্রকে ঘিরেই তাঁর সাধনা সম্পূর্ণ, উপলব্ধি পূর্ণতম। সর্ব্বত্র সর্ব্বজনের মধ্যে তিনি খুঁজে ফিরেছেন জীবন-দেবতাকে।

কবির সুন্দর কেবল সুরম্য হর্ম্ম্যে বাস্তবতার সংস্পর্শ শূন্য হয়ে কল্পনার খেয়াল-খেলায় মেতে নেই। চাষের ক্ষেতে চাষীর মধ্যে, নদীর বুকে মাঝির প্রাণে, কর্ম্মরত মুটে-মজুরের মাঝখানে সে উদ্ভাসিত প্রাণ-চাঞ্চল্যে—

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল ;
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।

স্বচ্ছ দৃষ্টি, সংবেদনশীল মনের জন্য তাই কবির প্রাণে বেদনা এত গভীর। আনন্দকে, সুন্দরকে তিনি পৌঁছে দিতে চান প্রত্যেকের দ্বারে।

স্বদেশী যুগের সর্ব্বাত্মক বিপ্লবের অনেক আগে থেকেই কবি ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন, মনুষ্যত্বের আর জাগৃতির। সংগ্রাম-মুহূর্ত্তে তাঁকে দেখা গেল জনতার হাটে, প্রকাশ্য পথের মাঝে। মুক্তির মন্ত্র জাতীয় পুরোহিত—

আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

মুক্তি ত এই ভালবাসায়। আর এ ভালবাসার জ্যোতির্ম্ময় রূপটি সাধারণের অন্তরে জাগিয়ে তোলার এর চেয়ে কোনো সহজ মন্ত্র আজ পর্য্যন্ত আর কেউ রচনা করেন নি।

ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ, ব্যাপ্তি থেকে পরিব্যাপ্তি,—স্বাধীনতা-যজ্ঞের ঋত্বিক ধীরে ধীরে আমাদের নিয়ে চলেছেন মহা-ঐক্যের মোহনায়—

পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা
উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।

সাধারণের জন্য কবির দান কতখানি, তা স্মরণ করতে গেলে আমাদের জাতীয় জীবনে তার অবিস্মরণীয় অবদানের কথাই সর্ব্বপ্রথমে মনে হয়।

"বিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝড় বয়ে যায়, তখন সেই দুর্গম পথযাত্রীদের পুরোধা স্বরূপ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

"বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে দু'জন মহাপুরুষ ভারতের ইতিহাস বিবৃত ক'রে জাতীয় জীবনের শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী।"

(ভারত সন্ধান, ৩৭৯ পৃঃ। শ্রী নেহরু।)

আর এ যুগের সৃষ্টি উজ্জ্বল হয়েছে সাধারণ মানুষের মনে আশার প্রদীপ জেলে, আত্মমর্য্যাদার মূর্চ্ছিত সুরটিকে জাগিয়ে তুলে।

কেবল দেশাত্মবোধই নয়, আমাদের সমাজবোধ, জীবনবোধের জাগৃতির মূলেও তিনি। দেশকালের গণ্ডি পেরিয়ে সে বোধ স্পর্শ করেছে সমস্ত বিশ্বসংসারকে। তাঁরি হাত ধরে আমরা আপন প্রাণকে মিলিয়ে দিতে পেরেছি মহাজীবন-প্রবাহে।

ভারত তীর্থের শঙ্খধ্বনিতে এই নতুন সমাজের উদ্বোধন গান—

এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধর হাত সবাকার,
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমান-ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা,
সবার পরশে পবিত্র-করা তীর্থনীরে।
আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে॥

এ জগতে আর কোন্ দেশের কোন্ কবি সাম্য, মৈত্রী, প্রেমের এমন মাঙ্গলিক মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে স্বদেশের মৃত্তিকায় সকল জনকে আমন্ত্রণ করেছেন জানি না। জানি না, আর কোন্ মহৎ প্রাণ বিশ্বের সঙ্গে স্বদেশকে

মিলিয়ে, স্বদেশের দ্বারে বিশ্বকে এইভাবে টেনে আনতে পেরেছেন।

কবির হাত ধরে আমরা পৌঁছে যাই বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্লোকে—

মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে বাহির হয়েছি ভ্রমণে,
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে লুটায় আমার সামনে।

এই দিগ্দর্শনের আলোকশিখাটি ভাবতীর্থকে আলো আলোময় করে দিয়েছে। বলতে পেরেছেন,

"প্রবাস কোথাও নাহিরে নাহিরে জনমে জনমে মরণে।"

আমাদের জীবনবোধকে তিনি অপ্রবাসী ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বময়।

কিন্তু যত বড় মহৎ, বৃহৎ চেতনার অধিকারী যে কবি, বাপ-মা-মরা চাল-চুলোহীন লক্ষ্মীছাড়া অসভ্য "[illegible]"ও তাঁর উপরে কি জোর-দখল! নিজের সমস্ত [illegible], সমস্ত দুরবস্থা সে অকুতোভয়ে কবিকে দেখিয়ে ছেড়েছে—

ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক,
পরের ঘরে মানুষ,
যেমন ভাঙা বেড়ার ধারে আগাছা—
মালীর যত্ন নেই,
আছে আলোক বাতাস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধূলোবালি,
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে,
কখনো মাড়িয়ে দেয় গরুতে,
তবু মরতে চায় না, শক্ত হয়ে ওঠে,
ডাঁটাটা হয় মোটা,
পাতা হয় চিকণ সবুজ—

"ছেলেটা" তার চোখের সামনেই কুল পাড়তে গিয়ে হাড় ভাঙ্গে, বুনো বিষফল খেয়ে ভির্মি লাগায়, রথ দেখতে গিয়ে হারিয়ে যায়, হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে —

মার খায় দমাদম,
গাল খায় অজস্র,
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়।

এ "ছেলেটা" নাগ-কন্যার দেখা পাবার আশায় দামে-ভরা পুকুরে ডুব দিয়ে জীবন বিপন্ন ক'রে তোলে, মাষ্টারের ডেস্কের মধ্যে এনে সাপ রেখে দিয়ে ভাবে

"দেখিই না কি করে মাষ্টারমশায়"—

চুরি করতে লজ্জা নেই, সাপে-ব্যাঙে ঘেন্না নেই, মার খেতে ভাবনা নেই, এমন ছেলেটাও কবির মনকে গভীর মমতায় বেঁধে রেখেছে।

ওর পোষা, হাড় বের-করা দেশী কুকুরটার অপঘাত মরণে, "মর্ম্মান্তিক দুঃখেও কোনদিন জল বেরোয় নি যে-ছেলের চোখে" দু'দিন যে সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে বেড়াল, অন্নজল ত্যাগ করল, কবি তার একমাত্র ব্যথিত সাক্ষী।

সকলের মনটিকে স্পষ্ট ক'রে পড়ে বলা, না-বলা কথাটিকে ভাষা দেওয়ার দায় যেন একলা কবির। জীবন-ব্যাপী এত সাধনাও [illegible] না। তাই অম্বিকা মাষ্টার যখন দুঃখ ক'রে তাঁর কাছে এলেন,

"শিশুপাঠে আপনার লেখা কবিতা[illegible] ওর মন লাগে না কিছুতেই, এমন নিরেট বুদ্ধি।"

কবি তখন সমস্ত অপরাধ নিজের ঘাড়ে নিয়ে বললেন, "সে ত্রুটি আমারই। [illegible] কথাটি ভেবেছি কি লিখতে — 'ওর সেই ন্যাড়া কুকুরের ট্র্যাজেডী।'"

এ কথা শুনলে বুঝতে পারি দেশের সমস্ত সাধারণ লোক যেন ঐ "ছেলেটা", আর কবির উপর তাদের যেমন দাবী এমন আর কারুর নয়। দুই বিঘা জমি, পুরাতন ভৃত্য, নিষ্কৃতি, পরিচয়, বিসর্জ্জন — প্রভৃতির লেখায় লেখায় তাদের দাবীই ছবির মত ফুটে উঠেছে।

বিরাট রবীন্দ্রনাথ, গুরু রবীন্দ্রনাথ, আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রনাথকে যদি আমরা ছুঁতে নাও পারি, এই [illegible] রবীন্দ্রনাথকে অনায়াসেই ডেকে এনে মাটির ঘরের অঙ্গনে আসন পেতে বসাতে পারি। এমন ব্যথার ব্যথী হিতকামী আমাদের আর কে আছে!

কেবল পদ্য রচনা নয়, কবির অপরূপ সৃষ্টি গদ্য কাব্য, ছোট গল্পগুলির শিকড়ে যে রসের ধারা প্রবাহিত, তার উৎসমুখও এই সাধারণ জীবন। এ তাঁর হাতে পৌঁছলে তার অপরূপ শক্তিতে সমস্ত জগৎসংসারকে পাগল ক'রে দিতে পারে, কাবুলিওয়ালাই তার প্রমাণ। কাবুলের সেই গ্রাম্য বালিকার হাতের ছাপ-লাগান ময়লা কাগজখানি আমাদের হৃদপিণ্ডের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেছে। জন্মজন্মান্তরেও সে হাতের ছাপ বুক থেকে বুঝি মুছে যাবে না।

বিদগ্ধ সমাজের চেতনার খোরাক জোগাবার জন্য দেশে দেশে সর্ব্বকালে জন্মগ্রহণ করেন জ্ঞানী ও পণ্ডিত-জনেরা। সাধারণ মানুষ কোনদিন তাদের [illegible] নাগাল পায় না। কিন্তু তাদের প্রচ্ছন্ন চেতনার সত্য, সুন্দরের জন্য যে অন্তহীন ব্যাকুলতা ভাষাহীন বেদনায়

বদরীটাই আমার সব। এ পেট ভরে ঘাস খেলেই আমি একটু স্বস্তি পাই। যতক্ষণ না পেট ভরে ঘাস খায় আমি ঠিক শান্তি পাই না।

সেই মুহম্মদ তেলী আজ মারা গেল। ওর মারা যাওয়ার ফলে কোন শিশু অনাথ হয় নি। কোন বধূকে মাথার সিঁদুর মুছে ফেলতে হয় নি। কোন মার বুকে বাজ [illegible] নি। পৃথিবীর কারও বাড়া-ভাত নষ্ট হয় নি। ত্রিভুবনে কেউ নেই তার। কাঁদার কেউ নেই। বুক চাপড়ে হা-হুতাশ করার নেই। পাড়ার দু'চারজন জড় হয়ে তাকে নাইয়ে কাঁধে ক'রে নিয়ে গেল গোরস্থানের দিকে।

এ ব্যাপারে আমার যা করার ছিল ক'রে খেয়ে-দেয়ে [illegible] বেরিয়ে [illegible] লাম।

[illegible] থেকে ফিরতেই নজর পড়ল মুহম্মদ [illegible] উপর। সেখানে আলো একটা টিম্‌টিম্ [illegible]। কথার অস্পষ্ট [illegible] ভেসে আসছে। ঘরে ঢুকে [illegible] শুনলাম সেখানে পঞ্চায়েত বসেছে।

— [illegible] কিসের জন্য? আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

— [illegible] থেকে হঠাৎ এসে জুটেছে মুহম্মদ [illegible] আত্মীয়। মা বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলে।

— [illegible]! আমি খুব আশ্চর্য হলাম। আজ পর্যন্ত [illegible] ওদের সম্পর্কে [illegible] নি। এখনও আমি নিশ্চিত যে, [illegible] আত্মীয় নেই। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে [illegible] কোন দিন কোন আত্মীয়কে তার ঘরের [illegible] দেখি নি। মুহম্মদ তেলীও কোন [illegible] গেছে বলে শুনি নি। আমার মতে তার আত্মীয় [illegible] ছিল শুধু তার ঘানির বলদটি—বদরী।

তাই খুব ইচ্ছে হ'ল ওদের দেখার। সত্যি ত, বাবা তারা! মরতে-না-মরতে তিন লাফে এসে হাজির হয়েছে!

মুহম্মদ তেলীর বাড়ীটা ছিল দোতলা। নীচের ঘরটার থাকে ঘানি আর বলদ—বদরী। আর উপরের ঘরটায়, যেটাকে একটা ছোট-বেড়ার মাচা বললেই ঠিক বলা হয়, সেটাই ছিল তার নিজের থাকার ঘর। সেই ঘরেই তার রান্নাবাড়া, খাওয়া—সব। ঘুমানও। শুধু তাই নয়, সেই ঘরেই তেল রাখা হয়। বিক্রি ক'রে সেই ঘরে বসেই। এই দোতলায় উঠতে আমি নীচের ঘরে ঢুকলাম। একটি বাঁশের মই বেয়ে উঠতে হয় উপরে। নীচের ঘরে ঢুকে দাঁড়ালাম কিছুক্ষণ।

বেচারী বদরী অন্ধকারে বসে বসে যেন জাবর কাটছে আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তাকে দেখে আমার মনে হ'ল সে যেন টের পেয়েছে মুহম্মদ তেলী মারা গেছে। তাই সে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। তার চোখের কোণ বেয়ে হয় ত ফোঁটা ফোঁটা জল বেরুচ্ছে। অন্ধকারে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ আমার মনে হ'ল বদরী শান্ত হয়ে গেছে। যেন আজ তার বাবা মারা গেছে! আর তার সঙ্গে কথা বলার কেউ রইল না। কেউ বলবে না, বদরী, আর, তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। যা, আচ্ছা [illegible] কি হয়েছে? ঘাস দু'মুঠো খাচ্ছিস না কেন?...

হঠাৎ এক সময় বদরী [illegible] নিঃশ্বাস ছেড়ে জোরে মাথা নাড়ল। [illegible] যেন [illegible] চাপড়াচ্ছে। তার উপর দয়া হ'ল। [illegible], আমিও মুহম্মদ তেলীর মত [illegible] খাচ্ছিস না কেন? [illegible]। কিন্তু পারলাম না। [illegible]। একটি কথাও বেরুল না। [illegible]। যদি কেউ দেখে যে! তারা [illegible] আমাকে 'মুহম্মদ তেলী, মুহম্মদ তেলী' বলে ক্ষেপাবে। তারা বলবে, 'ঐ' নামটা আমার বাপের [illegible]। আসলে আমি মুহম্মদ তেলীর উপরেই [illegible]। অন্তত একটি জীব বিশেষ। [illegible] কোন লেন-দেন নেই। কেউ তাকে কোন দিন [illegible]। সেও কাউকে বিয়ে করতে যায় নি। কারও সঙ্গে কোন যোগ নেই। বদরীই তার সব। [illegible] সঙ্গেই যত কথা। তার কাছে থেকে থেকে সেও যেন বলদ বনে গেছে। জানোয়ার কোথাকার।

ঘানিটাকে [illegible] লোকটাও ঘুরত [illegible] পিছনে পিছনে। দেখে বিস্মিত [illegible] মাঝে মাঝে আবার বদরীকে বলত যে, তাড়াতাড়ি [illegible]। এখন একটু খাটু। পরে তোর আদরযত্ন করব। [illegible] শুনে বদরী জোরে ঘুরত। চোখে তার [illegible]। একই পথ। ঘুরে ফিরে একই চক্র। [illegible] অন্ত নেই। কোন লক্ষ্যস্থল নেই। চোখে ঠুলি [illegible] ঘুরছে ত ঘুরছেই। ঘুরুক। ও ত বলদ। [illegible] কাজ সে করছে। কিন্তু মুহম্মদ? সে ত আর বলদ নয়? সেও ত ঘুরছে তার সঙ্গে, তার জীবনেও কি কোন লক্ষ্য নেই? কিন্তু আজ জানি না কেন, ওদের উপর আমার একটা সহানুভূতি জেগেছে। এই মুহূর্তে [illegible] ভাবছি। আমাকে সে ভাবিয়ে তুলেছে। কথাটা আবার

মুখে এল। বলতে ইচ্ছে করল, বদরী খাচ্ছিস না কেন? …কিন্তু পারলাম না, কোন কথা বেরুল না মুখ দিয়ে।

যাই হোক্, উপরে উঠলাম। পঞ্চায়েত বসেছে। তাদের মধ্যে তিনজন লোককে অচেনা ঠেকছে। বুঝলাম, তারাই মুহম্মদ তেলীর আত্মীয়। আমাকে দেখতে পেয়েই একজন বলল, এস ভাই এস, এদিকে বস।

অন্য একজন বলল, এখন আর দেরী করা উচিত নয়। লেখাপড়া-জানা একজন যখন এসে গেছে, মীমাংসা একটা হবেই।

কথাটা শুনে আমার মনে মনে বেশ একটা গর্ব হ'ল। কিন্তু তা প্রকাশ না করে গম্ভীর ভাবে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে একজন প্রশ্ন করলাম, কি ব্যাপার? এত লোক ত কোন দিন এখানে জড় হয় নি এর আগে।

একজন প্রতিবেশী ঐ নবাগত তিনজনকে দেখিয়ে বলল, এরা মুহম্মদ তেলীর আত্মীয়স্বজন। তার পর এক একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে দিতে বলে, ঐ যে ভদ্রলোক, পাগড়ি মাথায়, উনি হলেন মুহম্মদের জেঠতুতো ভাইয়ের শালা। আর ওঁর পাশে যিনি বসে আছেন, উনি হলেন ওর বাবার মামাতো ভাইয়ের জামাই। আর তাঁর পাশে যিনি বসে আছেন, তিনি হলেন…। আর বলতে পারল না, কারণ প্রতিবেশী নিজেই এখন ভুলে গেছে লোকটা কি সম্পর্কে মুহম্মদের আত্মীয়। হঠাৎ পরিচয় করাতে করাতে থেমে যাওয়ায় লোকটা নিজেই বলে উঠল, আমি মুহম্মদের একেবারে নিকট আত্মীয়। মুহম্মদের দাদুর দাদুর একজন ভাই ছিল। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। উনি বরজুলা গাঁয়ের রহমানভাইকে পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন। তাঁরই ছেলের ছেলে হলাম আমি নিজে।

ওদের কথা শুনে মনে হ'ল মুহম্মদের প্রত্যেক আত্মীয় সরাসরি আকাশ থেকে প্যারাসুটে করে সবেমাত্র মাটিতে নেমেছে। আর থাকতে না পেরে বললাম, আজ পর্যন্ত কোনদিন ত আপনাদের দেখি নি।

কিছুক্ষণ কাটল নিস্তব্ধতায়। তার পর তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ বলে উঠল, আর বলবেন না। রাজ্যের ঝামেলা পোয়াতে হয়। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা থাকলেও উপায় থাকে না। সময় থাকলে দেখা করা আর এমন কি কঠিন কাজ? মুহম্মদের সঙ্গে দেখা করে যাওয়ার কথা প্রায় প্রত্যেক দিন আমার বউ বলত। কিন্তু কি করব, এক মুহূর্তের জন্যেও এ মরার জীবনে ফুরসত…

আজ কি করে ফুরসত পেলেন? আমার প্রশ্নবাণে বিদ্রূপের বিষ ছিল।

—হায় খোদা, এও কি একটা প্রশ্ন। আজ আমি বিকেল তিনটের সময় শুনলাম মুহম্মদ মারা গেছে। শুনে আমি ত আর কোন কথা বলতে পারলাম না। গিন্নীকে খবরও দিতে পারি নি। তা ছাড়া বউয়ের এমনিতেই বারমাস অসুখ লেগে আছে তার ওপর এ ধরনের খবর দিলে হু হু করে আরও বেড়ে যাবে। তাই শোনার পর একছুটে এসেছি এখানে। ও! আমার প্রতি তার কি টান ছিল।

তা অবশ্য ঠিক, আপনার প্রতি তার খুব টান ছিল। কিন্তু আমার প্রশ্ন হ'ল, তার প্রতি আপনার কোন টান ছিল কি? লোকটা চুপ করে রইল। কোন উত্তর দিতে পারল না।

আমার এই ধরনের প্রশ্নে সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। অনেকে উঠি উঠি করছিল। বিরক্ত হয়ে কেউ কেউ ভাবছে, এই মহা আইনজ্ঞ আবার কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসল রে বাবা! তারা নিজেরা বিচার করলে সেই কখন রায় দিয়ে চলে যেত।

হয়ত এই অবস্থা বুঝেই ঐ তিনজনের একজন বলল, এখন আপনারাই বলে দিন ধর্মত কোন্ জিনিস কার ভাগে ফেলা উচিত।

ধর্মের নামে কি ধরনের ভাগ বাঁটোয়ারা হয় আমার তা ঠিক জানা নেই। এসব ব্যাপার একটু ঘোলাটে ঠেকে আমার কাছে। আর তা ছাড়া এ সবের কায়দা-কানুন একমাত্র মৌলবী আর পীররাই ভাল জানে। ওরা এসব এক পলকের মধ্যে ঠিক করে দিতে পারে। আমি বাবা মৌলবী নই। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বললাম, আমি ধর্মত কে কি পাবে বলতে ঠিক পারছি না। তবে হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আইন কি বলে তা একটু জানি।

—বেশ ত, আপনি আইনের কথাই বলুন না। শুনি না, আইন কাকে কি দেয়।

—আইন অনুসারে ত আপনারা কেউ কোন ভাগ পেতে পারেন না। কারণ কোনদিন আপনাদের মুহম্মদের সঙ্গে দেখি নি। আপনারা যে তার আত্মীয় তার কোন প্রমাণ নেই। কোত্থেকে সব এসেছেন ভাগ বসাতে! রাতারাতি তার আত্মীয় সেজে গেলেন।

আমার এই কথা শুনে ঐ তিনজন হো হো করে হেসে উঠল। আর আমার প্রতিবেশী দু'একজন ভাবল, আমি

ঝি ওদের ভাগ না দিয়ে ভাগিয়ে দিয়ে নিজেই সব মেরে খাওয়ার তালে আছে।

যাই হোক্, অবশেষে আমি নিজের একটা মত দিয়ে দিলাম। কিন্তু আমার মত মুহম্মদের ভাইয়ের শালার পছন্দ হ'ল না। সে এমন ভাব দেখাল যেন তার ওপর ভারি একটা অপরাধ করা হয়েছে। আমার মতের বিরুদ্ধে সে ক্ষোভ প্রকাশ করল। তিনজনের মধ্যে প্রত্যেকেই বদরী বলদটাকে নিজের ভাগে ফেলতে চায়। বেশ কোথেকে! বলদ একটা, আর ওরা তিনজন। অনেক রাত পর্যন্ত বাক্‌বিতণ্ডা চলল। তার পর সর্বসম্মতিক্রমে ঠিক হ'ল যে পরের দিন সকালে আবার পঞ্চায়েত বসবে।

আমিও ঘরে ফিরে যাচ্ছি। বদরীর দিকে তাকালাম। এমনভাবে মাথা নাড়ছে যেন কোন রোগে ধরেছে। হম্বা-হম্বা রবে ডাকল। মনে হ'ল, মুহম্মদ তেলী মারা গেছে বলে সে কাঁদছে। একবার ইচ্ছে করল বলি, বদরী, ঘাস খাচ্ছিস না কেন? আয়, আর একটু হাত বুলিয়ে দিই তোর গায়ে। পরক্ষণেই ভয় হ'ল। পাছে কেউ দেখে ফেলে। আমাকেও যদি লোকে মুহম্মদ তেলী বলে ডাকে। আমি ত আবার ও নাম শুনতেই পারি না।

সারা রাত আমার চোখে ঘুম নেই। একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় পড়েছিলাম। কিন্তু ভোর হতে না হতেই মা ডাকল, বাবা ওঠ্, উঠে পড়। লোকে তোকে ডাকছে। বিচার-টিচার কি যেন বসবে।

আমি উঠে সোজা মুহম্মদ তেলীর ঘরে গেলাম। বদরী মারা গেছে। আর তাকে ঘিরে মুহম্মদ তেলীর আত্মীয়স্বজন আর পঞ্চায়েতের লোক দাঁড়িয়ে আছে।

—ঈস্, এ কি! এ কি হ'ল! কি হয়েছিল বদরীর? বদরীকে মরে পড়ে থাকতে দেখেই আমি চিৎকার করে প্রশ্ন করলাম।

—বেচারা আজ ক'দিন কিছু খেতে পায় নি। পঞ্চায়েতের একজন বলল।

—আমি মুহম্মদের আত্মীয়দের দিকে তাকালাম অর্থপূর্ণ প্রশ্নের দৃষ্টিতে। তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওদের যেন বলার কোন কথা নেই এখন। করার মত কোন কাজও নেই।

শেষে পঞ্চায়েতেরই একজন বলল, এতদিন কে খাওয়াবে তাকে কিছু ঠিক ছিল না। তিনজনের মধ্যে কেউ ত জানত না কার ভাগে বলদটা পড়বে। কেউ কি আর আজকালকার দিনে বিনা স্বার্থে খাওয়ায়!

এ কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। রা কাড়তে পারলাম না।

—০—

মৌলিকতা

শ্রীকালিদাস রায়

নতুন অজানা বলিবার কিছু নাই।
লেখনী আমার কানে গুঁজিয়াছি তাই।
ভেবে রাখি রাতে যে কথা বলিব, শাখায় শাখায় ডাকি'
শুনি প্রতি প্রাতে সে কথা বলিছে পাখী।
আমার নিজের মর্মের কথা, ভাবি, কেহ ত না জানে।
ও মা, দেখি তাই তরুপল্লব কয় মরমর তানে
তটিনীরা কলগানে,
ভাষা নেই যার সেও বলে, শুনি মাইক লাগানো কানে।
নীরবে বলিছে শ্যামল ক্ষেত্র, মেঘচুড়পর্বত,
গগনে চন্দ্রতারাবলী ছায়াপথ।
নীরবে কহিছে আঁখিজলধারা ভাসায়ে ব্যথিত বুক,
দীন ভিখারীর ছলছল আঁখি, ক্ষুধিতের ম্লানমুখ।

শিশুর অধরে মধুর হাস্য, জননীর চুম্বন,
নীরবে সে-কথা বলিছে বধূর লাজে নত দু' নয়ন।
নীরবের ভাষা শুনিতে বুঝিতে শিখিনি কত এ কাল,
তাই বুনিয়াছি কত না বাক্যজাল।
যা-যা এতদিন জনকোলাহলে কানে পশেনি ক হায়,
আজি নির্জনে বসি' আনমনে সকলি তা শোনা যায়।
কিছুই বলার নাই।
ওরাই বলিছে সব কথা, আমি যা কিছু বলিতে চাই।
কবি বলিবলি আকুলিবিকুলি করিছে যে কথা প্রাণে,
শুনে চমকাই ওরা তা সবাই জানে।

জাতীয় শিল্প সংরক্ষণে আমাদের ভূমিকা

হীরেন মুখোপাধ্যায়

ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের পরিচয় হয়েছিল বাণিজ্যের সূত্রে। সূত্রপাতটা ভাল হয় নি। সম্পর্কটি এমনই যাতে পরস্পরকে চেনা-জানার বিশেষ অসুবিধা ঘটে। ইয়োরোপ খোঁজ পেয়েছিল ভারতবর্ষের বাইরের ঐশ্বর্যের, অন্তরের ঐশ্বর্যের খবর সে রাখে নি। তার পর একদিন বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিল। শাসকজাতি মনে করল এই অসভ্য বর্বর জাতিকে সভ্য করার নৈতিক দায়িত্ব তার। এ জাতিরও যে সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্পকলার এক দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস থাকতে পারে, এ সে ভাবতেই পারল না। এদেশের সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্পর্কে তারা কি ধারণা পোষণ করত মেকলে ও বার্ড উডের সদম্ভ উক্তিই তার পরিচয়। সাহিত্যের কথা এখন থাক, আমরা শিল্পকলা নিয়েই আলোচনা করি। এদেশের শিল্পকলার মর্মোদ্ধার করা একজন বিদেশীর পক্ষে সত্যিই দুরূহ। এক-একটা মূর্তির আট-দশটা হাত আট-দশটা মাথা, তাদের মনে রক্তসঞ্চার না করে ভীতি উদ্রেকই করত। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ ত স্পষ্টই বললেন, নটরাজের অতগুলো হাতের মধ্যে দুটো রেখে বাকি ক'টাকে 'অ্যাম্পুট' করলেই মূর্তিটি সুন্দর ও স্বাভাবিক হ'ত। স্মিথসাহেব যে ভারতবর্ষকে ভালবাসেন নি তা নয়, ভারতবর্ষের শিল্পকলা তিনি বিচার করেছেন যথেষ্ট সহানুভূতি দিয়েই, কিন্তু নটরাজ-মূর্তির শিল্পরস উপভোগ করার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তখনকার দিনে শিল্পকলার উৎকর্ষতা বিচারের মানদণ্ড ছিল গ্রীক আর্ট। মূর্তির অ্যানাটোমি, পাস-পেক্টিভ যতক্ষণ না নিখুঁত হচ্ছে ততক্ষণ মূর্তিটিকে উৎকৃষ্ট শিল্পসৃষ্টি হিসাবে গণ্য করা হ'ত না। হ্যাভেল সাহেবই সর্বপ্রথম এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করলেন (১৯০৮)। তিনি বললেন, ভারতীয় শিল্পকে বিচার করতে হবে ভারতীয় আদর্শের মানদণ্ডে, তার তুলনা অন্য কোথাও খুঁজতে গেলে চলবে না। ইতিহাসের বিচিত্র গতি— যে শাসকশ্রেণী এসেছিল ভারতবাসীকে নূতন করে শিল্প-কলা শেখাতে তাদেরই একজন তার প্রতিবাদ করলেন, তিনি বললেন, ভারতবাসীকে শেখাবার আমাদের কিছু নেই তাদের কাছেই আমাদের শিখতে হবে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে হ্যাভেলের দান যে কতখানি তা বিচার করবার দিন এসেছে, কিন্তু যোগ্যতর ব্যক্তি তা করবেন এই আশায় রইলাম। হ্যাভেলের ইণ্ডিয়ান স্কাল্পচার এ্যাণ্ড পেন্টিং (১৯০৮) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বৎসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। ইয়োরোপীয় কলা-সমালোচক রোজার ফ্রাই (Roger Fry) Quarterly Review (Jan. 1910)-এর পাতায় লিখলেন,

"These claims have got to be faced; we can no longer hide behind the Elgin marbles and refuse to look; we have no longer any system of aesthetics which can rule out, a priory, even the most fantastic and unreal artistic forms. They must be judged by themselves and by their own standards."

হ্যাভেলকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন এক ভূতাত্ত্বিক, নাম আনন্দ কেন্টিস কুমারস্বামী। হ্যাভেল ও কুমারস্বামী না থাকলে আমাদের সাংস্কৃতিক পুনর্জাগরণে কতখানি শূন্যতা বিরাজ করত তা আজ আমরা কল্পনাও করতে পারি না। ১৯০৯ সনে কুমারস্বামী এসেছিলেন ভারতবর্ষ বেড়াতে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন শিল্পকীর্তির সঙ্গে পরিচিত হতে। ভারতবর্ষে থাকাকালীন কোলকাতায় জোড়াসাঁকোয় তিন সপ্তাহ ছিলেন কবিগুরুর অতিথি হয়ে। ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (১৯০৭), অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নব্যভারতীয় চিত্রকলার চর্চা সুরু হয়েছে। কুমারস্বামী অবনীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হলেন, তাঁদের শিল্পচর্চা দেখলেন, তাঁদের উৎসাহিত করলেন। এর পরের বছর কুমারস্বামী আবার এলেন ভারতবর্ষে, সারা দেশ ঘুরে প্রচুর অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করলেন ভারতশিল্পের শ্রেষ্ঠ নমুনা। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর এই বিপুল সংগ্রহ তিনি ভারতবর্ষেই রেখে যাবেন যদি দেশবাসী তাঁকে একটি সংগ্রহশালা গড়ে দেয়। তিনি নিজে সেই সংগ্রহ-শালার অধ্যক্ষ হয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হায় রে আমাদের দেশ! দেশে তখন বিলাতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎ-সব চলছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে রাজনৈতিক

… চলামো চলছে। জাতীয়তাবাদের এই বিকার দেখে রবীন্দ্রনাথ শঙ্কিত হয়ে নিজেকে জনসাধারণ থেকে সরিয়ে এনেছেন, এজন্য তাঁকে কম নিন্দা-অপমান সহ্য করতে হয় নি। বার বার তিনি জাতীয়তাবাদের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করছেন। কিন্তু কেউ সেদিন তার কথায় কান দেয় নি, কুমারস্বামীর আহ্বানেও কেউ সেদিন সাড়া দিল না। এর পরে যা ঘটল যে-কোন সভ্য দেশ তা শুনলে লজ্জায় মাথা হেঁট করবে। কুমারস্বামী কিছুদিন অপেক্ষা করলেন তারপর ১৯১৬ সনে বোস্টন মিউজিয়ামের আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে চলে গেলেন তাঁর সমস্ত সংগ্রহ নিয়ে। বোস্টন মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ তার জন্য ভারতীয় শাখা খুলে দিলেন এবং তাকে তার 'কীপার' (Keeper) নিযুক্ত করলেন। দুনিয়ার কোথাও আজ এক জায়গায় এতবড় ভারতীয় শিল্পের সংগ্রহ নেই। কুমারস্বামী আমেরিকা নির্বাসিত হলেন এবং সেই সঙ্গে ভারতবাসী এই অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হ'ল। ভারতবর্ষ কুমারস্বামীকে জায়গা না দিলেও কুমারস্বামী ভারতবর্ষকে কোনদিন ভোলেন নি। মৃত্যুর কিছুদিন আগেও O C. Gangoly-কে লেখা এক চিঠিতে লিখেছিলেন, তার ইচ্ছে ছোট জীবনের শেষ ক'টা দিন ভারতবর্ষে ফিরে দেরাদুন বা আলমোড়ার মত কোন নিভৃত পার্বত্য অঞ্চলে কাটাবেন। আকস্মিক মৃত্যু তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ করে নি।

কুমারস্বামী-সংগ্রহ এদেশ থেকে চলে যাওয়াই প্রথম ও শেষ যাওয়া নয়। এর আগেও অনেক ইংরেজ রাজপুরুষ এবং ডাচ ও পর্তুগীজ বণিক কৌতূহলের বশে এদেশের শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে দেশে ফিরে বিক্রী করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। সে সব সংগ্রহের বেশীর ভাগই আজ পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়াম ও ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু এসব সংগ্রহের পিছনে কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না, যার ফলে শ্রেষ্ঠ শিল্পের বেশীর ভাগ অংশই দেশে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু কুমারস্বামী-সংগ্রহ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের—বিশেষ করে চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ অংশ বিদেশে চলে গেল।

ইতিমধ্যে হ্যাভেল ও কুমারস্বামীর লেখার ভিতর দিয়ে ভারত শিল্পের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যবাসীর পরিচয় হয়েছে। পাশ্চাত্ত্যবাসীদের মধ্যে তখন ভারতীয় শিল্প-সংগ্রহের প্রতিযোগিতা সুরু হয়েছে। এদেশী শিল্পের ভাল ভাল নমুনা তারা অত্যচ্ছ মূল্যে ক্রয় করে জাহাজে চাপিয়ে দেশে নিয়ে যাচ্ছে। বাধা দেবার কেউ নেই, তার কারণ ভারত পরাধীন এবং রাজনীতিক নেতা ও শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে শিল্প-সচেতনতা জাগে নি। তা ছাড়া যেসব ইংরেজ রাজপুরুষ এদেশে ছিলেন তাঁদের অনেকেই শিল্প-সংগ্রাহক ছিলেন, যেমন, স্মিথ, উড্রফ, ব্রাণ্ট রোনাল্ডশে, বর্ণটন, রাবমাইকেল, ফ্রেঞ্চ আর্চার প্রভৃতি। শিল্প-সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষতঃ প্রাচীন চিত্রকলা-সংগ্রহে এঁদের সুবিধাও ছিল অনেক। এঁদের অনেকেই সিভিল সার্ভিসের লোক হওয়ায় দেশীয় রাজন্যবর্গ ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসতেন। এইসব রাজন্যবর্গ ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সংগ্রহে ভারতীয় চিত্রকলার একটা বৃহৎ অংশ রক্ষিত ছিল যা তারা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। রাজনৈতিক ওলট-পালটে এঁদের অনেকেরই অবস্থা খারাপ হয়ে যায় যার ফলে অনেকেই তাদের পারিবারিক সংগ্রহ বিক্রী করে দিতে বাধ্য হন। এই বিক্রী করে দেওয়ার ব্যাপারে ইংরেজ রাজপুরুষরা তাঁদের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় নিয়োগ করে ঐ সব সংগ্রহ নিজেরা কিনে নেন। এঁরা এ দেশ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার একটা বৃহৎ অংশ দেশান্তরী হয়। যে দ্রুতহারে এই সব অমূল্য সম্পদ এদেশ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিল তাতে কিছুদিনের মধ্যেই এদেশ প্রাচীন চিত্রকলা সম্পদে নিঃস্ব হয়ে যেত যদি না জনকয়েক ভারতীয় সংগ্রাহক সমস্ত প্রতিবন্ধকতা তুচ্ছ করে ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা সংগ্রহ করে যেতেন। এদের মধ্যে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তারা হলেন কলকাতার ঠাকুর-ভ্রাতৃদ্বয়, পাটনার পি, সি, মাণুক, কলকাতার অজিত ঘোষ, বোম্বাই-এর বি, এন, ট্রেজারীওয়ালা, আমেদাবাদের এন, সি, মেটা, কাশীর রায়কৃষ্ণদাস, সীতারাম শা, পাটনার আর, কে, জালান, কলকাতার পূরণচাঁদ নাহার, গোপীকৃষ্ণ কানোরিয়া এবং ও, সি, গাঙ্গুলী। এদের সংগ্রহের পরিমাণ আলোচনা করলেই বুঝতে পারব জাতীয় শিল্প-সংরক্ষণে আমাদের কতখানি আগ্রহ।

এ শতকের তৃতীয় দশকে অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ে পড়ে ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয় তাদের সংগ্রহ বিক্রী করে দিতে মনস্থ করেন। তখনকার দিনে এই সংগ্রহের মূল্য ছিল চার লক্ষ টাকা, এই থেকেই ধারণা করা যেতে পারে এই সংগ্রহ কি বিপুল ছিল। শ্রদ্ধেয় ও, সি, গাঙ্গুলী 'রূপমে'র পাতায় জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন সংগ্রহটিকে দেশে রক্ষা করার জন্য। কুমারস্বামী-সংগ্রহ দেশ থেকে চলে যাওয়ার পর ঠাকুর-সংগ্রহই ছিল বৃহত্তম, এখন এ সংগ্রহটি যদি দেশের বাইরে চলে যেত তাহলে দেশ সত্যিই শিল্পসম্পদে নিঃস্ব হয়ে পড়ত। স্বর্গীয়

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চেষ্টা করেছিলেন সংগ্রহটিকে কলকাতায় রাখবার জন্য কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হয় নি। শেষে আমেদাবাদের কস্তুরভাই লালভাই সংগ্রহটিকে কিনে নিয়ে কুমারস্বামী-ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করেন।

ঠাকুর-সংগ্রহের পরেই ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে যে-দুটি সংগ্রহের কথা সর্বপ্রথম মনে পড়ে তা হচ্ছে ঘোষ-সংগ্রহ এবং মাহুক-সংগ্রহ। ঘোষ-সংগ্রহের বেশীর ভাগই আজ সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে গেছে এবং মাহুক-সংগ্রহ মাহুক মারা যাওয়ার পর তাঁর উত্তরাধিকারিণী মিস্ কোল্স বিলাতের সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামে দিয়ে দেন। এদিক দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কাশীর রায়কৃষ্ণদাস। তিনি তাঁর সমস্ত সংগ্রহ দিয়ে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সংগ্রহশালা গড়ে দিয়েছেন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যে সারা ভারতে তা অনন্য। এর পরেই যে সংগ্রহ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে বোম্বাই-এর ট্রেজারীওয়ালা-সংগ্রহ। কিছুদিন আগে শ্রীযুক্ত ট্রেজারী-ওয়ালা মারা গেলে তাঁর পরিবারবর্গ প্রায় দু লক্ষ টাকা মূল্যের এই সংগ্রহ বিক্রী করে দিতে উদ্যোগী হন। এই সংগ্রহটিও বাইরে চলে যেত, যদি না শ্রদ্ধেয় ও, সি, গাঙ্গুলী সময়মত গিয়ে পড়ে ন্যাশানাল মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষকে দিয়ে সংগ্রহটিকে কিনিয়ে নিতেন। আজ ন্যাশানাল মিউজিয়ামের প্রাচীন চিত্র-সংগ্রহের একটা বৃহৎ অংশ হ'ল ট্রেজারীওয়ালা-সংগ্রহ। সম্প্রতি মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ ও, সি, গাঙ্গুলীর সংগ্রহ কিনে নিয়ে তাঁদের সংগ্রহ আরও বৃদ্ধি করেছেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ যেমন এন, সি, মেটা-সংগ্রহ, সীতারাম শা-সংগ্রহ, রামকৃষ্ণ জালান-সংগ্রহ, গোপীকৃষ্ণ কানোরিয়া-সংগ্রহ আজও পারিবারিক সংগ্রহভুক্ত হয়েই রয়েছে।

ব্যক্তিগত সংগ্রহের ভাল মন্দ দুটো দিকই আছে। ভাল দিকের আলোচনা আমরা আগেই করেছি, এঁরা না থাকলে দেশের এই অমূল্য সম্পদ কিছুই আজ আর অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু এর একটা মন্দ দিকও আছে, সংগ্রহ গুটিকয়েক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় দেশের সাধারণ লোক এ সম্পদের অংশভাগী হতে পারে নি। অবশ্য সাধারণ লোক আজও শিল্প-সচেতন হয় নি, কিন্তু তাদের শিল্পসচেতন করতে হবে। এ ছাড়া অনুসন্ধিৎসু ও গবেষকরা এসব সংগ্রহ দেখতে না পাওয়ায় ভারতীয় প্রাচীন শিল্পকলা—বিশেষতঃ চিত্রকলা সম্বন্ধে গবেষণা ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় দেশের শিল্পসম্পদের উপর প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে কিন্তু তাই বলে এই নয় যে, দেশের আপামর জনসাধারণ তাদের খেয়াল-খুশী মত এই সমস্ত জিনিস ব্যবহার বা অপচয় করবে। তাদের হাতে পূর্বপুরুষের সঞ্চিত সম্পদ ছেড়ে দেওয়ার আগে বুঝিয়ে দিতে হবে এ সমস্ত জিনিসের উপযুক্ত ব্যবহার করার অধিকারই তাদের আছে, নষ্ট করার অধিকার তাদের নেই। এই বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং শিক্ষিত জন-সাধারণের।

প্রত্যক্ষভাবে সরকারী তত্ত্বাবধানে যেখানে এই সমস্ত শিল্পদ্রব্য সংরক্ষণ করা হয় তাকে বলা হয় গবর্ণমেণ্ট আর্ট-গ্যালারী। শিল্পদ্রব্য কেনা এবং সংরক্ষণ ব্যাপারে সেখানে সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব, যদিও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটি বোর্ড অফ ট্রাষ্টির হাতে সংগ্রহশালার পরিচালনা ভার ন্যস্ত থাকে। কিন্তু টাকাকড়ির ব্যাপারে সরকারের মুখাপেক্ষী হওয়ায় এই সমস্ত বোর্ড অফ ট্রাষ্টির বেসরকারী সভ্যদের করবার কিছু থাকে না। তা ছাড়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অযোগ্য লোক সভ্য মনোনীত হন, যাঁরা শিল্পকলার কিছুই বোঝেন না। দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই সমস্ত সংস্থার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। অবশ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী নিয়ম-নীতিকে জন-সাধারণ প্রভাবিত করতে পারে কিন্তু লালফিতা ও আমলাতন্ত্রের দৌরাত্ম্যে তা সম্ভব হয় না। পাশ্চাত্যে প্রতিটি মিউজিয়ামে জনসাধারণকে শিল্প-সচেতন করার জন্য পপুলার লোকাচারের ব্যবস্থা আছে। বিলাতে সাউথ কেনসিংটন বা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বছরে অন্ততঃ ছ'টি লেকচার দেওয়া হয় কেবলমাত্র ভারতীয় শিল্পকলার উপর, আর সে জায়গায় আমাদের ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে এ বছর একটি লেকচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ভারতীয় চিত্রকলার উপর। সেখানের প্রতিটি মিউজিয়ামে প্রতি বছর নতুন নতুন শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করা হয় আর আমাদের ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে গত বিশ বছরের মধ্যে একখানি প্রাচীন ছবি কেনা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সেখানে জনসাধারণকে মিউজিয়ামের কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত করার জন্য নিয়মিত বুলেটিন ও ক্যাটালগ প্রচার করা হয়, তাতে এত তথ্যবস্তু থাকে যা আমাদের দেশের ছাত্র ও গবেষকরা কল্পনাও করতে পারবেন না। তা ছাড়া জনসাধারণের শিল্পদৃষ্টিকে জাগ্রত করার জন্য 'পিকচার পোষ্টকার্ড' নামমাত্র মূল্যে বিলি করা হয় যাতে প্রাচীন চিত্র বা ভাস্কর্যের নিখুঁত প্রতিলিপি থাকে। আমাদের দেশে একমাত্র বোম্বাই-এর প্রিন্স অফ ওয়েলস মিউজিয়াম ছাড়া কোথাও রঙীন 'পিকচার পোষ্টকার্ড'-এর ব্যবস্থা নেই।

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

ব্যাধ-বধূ

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রবাসী—১৩৩০, ভাদ্র হইতে পুনর্মুদ্রিত)

লণ্ডনস্থ কমনওয়েলথ শিল্প প্রদর্শনী।
ট্যাঙ্গানাইকার জনৈক শিল্পীর চিত্র-দর্শনরত লেডী ক্যারিংটন

কলিকাতায় কৃষি প্রদর্শনীর পশ্চিমবঙ্গ শাখা—দর্শনরত রাণী এলিজাবেথ

সম্প্রতি সরকার দিল্লীতে ন্যাশানাল মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করেছেন। কয়েক বছরের মধ্যে ন্যাশানাল মিউজিয়াম যে ভাবে গড়ে উঠেছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু কেবলমাত্র কতকগুলি পাথর ও শিলালিপি নিয়ে একটি মিউজিয়াম খাড়া করা যায় না। সাধারণ মানুষের কাছে এ সমস্ত জিনিসের কোন আবেদন নেই, তাদের যা সহজে আকৃষ্ট করে তা হচ্ছে ছবি। যতক্ষণ না প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সংগ্রহ গড়ে উঠছে ততক্ষণ জাতীয় মিউজিয়ামকে সম্পূর্ণ বলা যায় না। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ গোড়া থেকেই একটু অসুবিধায় পড়েছেন তার কারণ ভাল ছবির বেশীর ভাগই বাইরে চলে গিয়েছে। এর ওপরে সরকার যে নীতি অনুসরণ করেছেন তাতে ভাল ছবি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য। এ দেশী মুষ্টিমেয় যে ক'জন সংগ্রাহক এ শতাব্দীর সুরু থেকে ছবি সংগ্রহ করেছিলেন তাঁদের কাছে কিছু সংখ্যক ভাল ছবি আজও অবশিষ্ট আছে এবং অবস্থা বিপর্যয়ে পড়ে যাঁরা আজ তাঁদের সংগ্রহ বিক্রী করে দিতে উৎসুক কিন্তু সরকার তার বিনিময়ে উপযুক্ত দাম দিতে রাজী নন। ফলে হচ্ছে কি এই সব সংগ্রহ আজ ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, কিছু বা অর্থদম্ভী বণিকের হাতে গিয়ে পড়ছে, যাঁরা আজ শুধু অর্থ সঞ্চয় করেই তৃপ্ত নন সেই সঙ্গে শিল্প-সংগ্রাহক হিসাবেও নাম কিনতে চান। এতে যা ক্ষতি হচ্ছে তা জাতীয় ক্ষতি। ইয়োরোপের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একটি করে সংগ্রহশালা থাকে। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় শিল্প-সংগ্রহ পৃথিবী বিখ্যাত। আমাদের দেশে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত কলাভবন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম ছাড়া আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব সংগ্রহশালা নেই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্তন করেছেন কিন্তু সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা গড়ে তোলার মতো কোন পরিকল্পনা আছে বলে আমাদের জানা নেই। আসলে এসব বিষয়ে এ দের কোন উৎসাহ নেই, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এরা বিল্ডিং তুলবেন কিন্তু বিশ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটা সংগ্রহশালা গড়ে তোলাকে এরা ভাবেন অর্থের অপচয়মাত্র।

এ ছাড়া পাশ্চাত্যের প্রতিটি শহরে একটি করে মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারী এবং সেই সঙ্গে এক বা একাধিক পাবলিক আর্ট গ্যালারী থাকে। আমাদের কলকাতার মত শহরে যেখানে কর্পোরেশনের বাজেট একটা ছোটখাট রাজ্যের বাজেটের সমান, এবং যার একটা বৃহৎ অংশ অপচয় হয় সেখানে আজ অবধি একটা মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারী তৈরি হ'ল না। শুধু তাই নয় কলকাতার মতো এত বড় শহরে শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীর সংখ্যা কিছু কম নেই, কিন্তু তাঁরাও আজ অবধি একটা আর্ট গ্যালারী তৈরি করে দিতে পারলেন না (অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের নতুন বাড়ী তৈরি হবার সময় অনেক কিছুই আশা করেছিলাম কিন্তু আজ আর সে সম্বন্ধে কোন মোহ নেই)। এঁদের চোখ খুলে দিতে পারে বোম্বাইয়ের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারী। অথচ শুনি এই কলকাতাই নাকি সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের চর্চায় অন্য সব প্রদেশ থেকে এগিয়ে গেছে। এখানকার জনসাধারণ এত 'কালচার্ড' হওয়া সত্ত্বেও এই কলকাতা থেকেই একে একে ঠাকুর-সংগ্রহ, ঘোষ-সংগ্রহ এবং গাঙ্গুলী-সংগ্রহ কলকাতার বাইরে চলে গেল। ধন্য আমাদের কালচার-বোধ!

স্তব্ধ প্রহর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আলোগুলো অনেক আগে জ্বলে উঠেছে এপারে-ওপারে।

দিনের আলোয় কালাপানির নোনাজলের ঢেউ-এ টোল-খাওয়া রঙ-চটা যে জাহাজটাকে একান্ত ক্লান্ত-রুগ্ন হাঘরের মত দেখাচ্ছিল সেটা হঠাৎ আবছা অন্ধকারের যাদুতে যেন নিরাময় হয়ে গিয়েছে। ওপারের আলোর ফোঁটা-সাজান আকাশ আর নগর-শিখরের পটভূমিকায় তার গোটা চেহারাটার কালচে ছোপ যেন নিরুদ্দেশ গতির প্রতীক।

নদীর জল আর দেখা যাচ্ছে না। দুটো বিরাট্ গাধাবোট দু'পাশে নিয়ে একটা ছোট লঞ্চ্ হাঁফাতে হাঁফাতে আর্তনাদের মত মাঝে মাঝে ধরা গলার ভেঁা ছেড়ে যেন দু'পারের সকলের করুণা ভিক্ষা করে চলেছে।

দূরের হাওড়ার পুলটা যেন স্বপ্নের সেতু, হাওড়া-কলকাতার মত দুটো নোংরা ঘিঞ্জি কুশ্রী এ-যুগের শহর নয়—কল্পনার দুই অজানা পুরী জুড়ে দেবার জন্যে বাহু বাড়িয়েছে।

আশ্চর্য! এ সব কথা এখনও ভাবতে পারছে: পারছে পর পর সাতদিন এই জেটির ধারে বসে বৃথাই অপেক্ষা করার পর!

প্রথম দিন সত্যিই আর ফিরে যাওয়ার ক্ষমতাটুকুও ছিল না। মনে হয়েছিল, তিন বছর আগেকার শোভনা হলে হয়ত সত্যিই ওই জেটির শেষ প্রান্তে গিয়ে জীবনের সমস্ত দায় ওই কালো-শীতল জলের তলায় নামিয়ে দিতে পারত নিঃশব্দে।

কিন্তু তিন বছরে সে-শোভনা আর নেই। আর কিছু না হোক, এই তিন বছর মৃত্যুর সঙ্গে প্রতি মুহূর্তের সংগ্রামে জীবনের মূল্য বুঝতে তাকে শিখিয়েছে। দিয়েছে চরম হতাশাকে উপেক্ষা করবার অনমনীয় সঙ্কল্প।

তাই প্রথম দিনের সেই হতাশ বিহ্বলতাও সে জয় করে ফিরে গিয়েছিল।

তখনও মনে হয়ত ক্ষীণ একটু আশাও ছিল যে, কোন রকম একটা অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বাধাতেই অনুপম এসে পৌছতে পারে নি।

আজ না হোক কাল সে আসবেই। আর এলে ওই নির্দিষ্ট জায়গায় ছাড়া সে দেখা করতে পারে কোথায়?

আশায় ভর করে পর পর সাতদিন এখানে এসে অপেক্ষা করছে সেই দিন থেকে। দুপুর থেকে সন্ধ্যা পার হয়ে যত রাত পর্যন্ত সম্ভব।

কিন্তু অনুপম আসে নি। একটা চিঠিও লেখে নি।

চিঠি সে লিখবে না, অবশ্য বোঝাই উচিত ছিল। ধরবার-ছোঁবার কোন চিহ্ন রাখবার মত আহাম্মক সে নয়।

কিন্তু আহাম্মক না হোক, সে এমন নির্মম নির্বিকার হতে পারে এ কি কল্পনাও করতে পেরেছিল কখনও!

কখনও, মানে সেই পাঁচ বছর আগে প্রথম যখন পরিচয় হয়েছিল, তখন।

তাদের আধাবস্তির গলিটা দিয়ে বেরুবার পথে কাপড়-ধোলাই-এর একটা দোকান।

গলিটা যেমন খোলা আর টিনের চাল ফেলে শহরে থেকেও এখনও ভদ্র হয়ে উঠতে পারে নি, সেখানকার মানুষগুলোরও তাই। মিস্ত্রি মজুর দোকানের চাকরে উদ্বাস্তুই সব। কিন্তু কলকাতা শহরে তাদেরও ভব্য হবার দরকার হয়। তাই খোলার চালের কাপড়-ধোলাই-এর দোকান চলে।

সেই দোকানের দিকে দু'বেলা যেতে-আসতে চোখ দুটো বুঝি আপনা থেকেই যেত।

কিন্তু এ সব কথা কি ভাবছে?

নদীর ধারের বেঞ্চিটা থেকে শোভনা উঠে পড়ল। সত্যিই বেশ রাত হয়েছে। এতক্ষণ এখানে বসে থাকাও নিরাপদ্ নয়।

কথাটা মনে করে হাসিও পায়। নিরাপদ্ কথাটার মানে তার কাছে এখনও আছে।

একলা অল্প-বয়সী একটি মেয়েকে একটি বেঞ্চিতে বসে থাকতে দেখে কৌতূহলী কেউ যে হয় নি তা নয়।

সাহস যাদের কম তারা দু'চারবার ঘুরে ঘুরে গেছে সামনে দিয়ে।

দু'একজন সাহস করে এসে বসেছে বেঞ্চিটার আরেক ধারে।

সবাইকার উদ্দেশ্য হয়ত খারাপও নয়। বসবার জায়গা এদিকটায় বড় কম। একটি মেয়ে একটা ৫

বেঞ্চি দখল করে থাকলে অন্যায় হয়। তা ছাড়া মেয়েদের সে দুস্তর দূরত্ব এ যুগই ঘুচিয়ে দিয়েছে ট্রাম-বাসের নিরুপায় ঘনিষ্ঠতায়।

এ সব কথা তখন অবশ্য ভাবে নি। বেঞ্চির ওধারে কেউ এসে বসবার পর উঠে পড়ে কাছাকাছি কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়েছে। তার পর আবার বেঞ্চি খালি হলে এসে বসেছে।

বসেছে কোন আশা না নিয়েই। এ যেন অনুপমকেই একবার শেষ সুযোগ দেওয়া তার কথা রাখবার। সে যে অমানুষ হয়ে যায় নি তা প্রমাণ করবার।

অনুপম আর আসবে না। জীবনে হয়ত আর তার সঙ্গে দেখাও হবে না, শোভনা মনে মনে নিশ্চিত ভাবেই এখন জেনে নিয়েছে।

কিন্তু আজ পা দুটো ভারী লাগছে না বেঞ্চি থেকে উঠে প্রায় নির্জন-হয়ে-আসা ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের ধার দিয়ে হাঁটতে।

হতাশার সীমা ছাড়িয়ে একটা কেমন নির্লিপ্ত শূন্যতায় সে গিয়ে পৌঁছেছে। যেখানে চেতনা শুধু বর্তমান মুহূর্ততেই সীমাবদ্ধ।

প্রত্যেকবার পা ফেলার সঙ্গে একটা জুতোর ষ্ট্র্যাপ যে প্রায় ছেঁড়বার উপক্রম তা টের পাচ্ছে। ডান পা-টা একটু টেনে চলতে হচ্ছে তাই।

হাইকোর্টের কাছে এসে ট্রামে উঠবার সময় ষ্ট্র্যাপটা ছিঁড়েই গেল।

ট্রামটা এখানে একেবারে খালি। জুতোটা মাটি থেকে তুলেই নিলে অসঙ্কোচে। লোকজন থাকলে কি সঙ্কোচ হ'ত? বোধ হয় না। এ সব সঙ্কোচ সত্যিই চলে গেছে অনেক দিন। শুধু সঙ্কোচ যে হয় সেই স্মৃতিটুকু আছে।

ডালহাউসী স্কোয়ার পর্যন্ত ট্রামটা প্রায় খালিই গেল।

সেকেণ্ড ক্লাশের ট্রামেই উঠেছে।

ভাড়া দিতে গিয়ে দেখা গেল একটা নুতন পয়সা কম হচ্ছে। হিসেব মত কম হবার কথা নয় মনে হ'ল। সস্তা ছোট চামড়ার ব্যাগটার কোণে কোথাও হয়ত আটকে থাকতে পারে ভেবে বার বার সেটা খুঁজে দেখলে। তার পর বাধ্য হয়েই পাঁচ টাকার নোটটা বাড়িয়ে দিতে হ'ল কণ্ডাক্টারের হাতে।

কণ্ডাক্টার এতক্ষণ বিদ্রূপের হাসি নিয়েই ব্যাগ-খোঁজা দেখছিল, এবার অপ্রসন্ন মুখেই বললে, পাঁচ টাকার ভাঙানি হবে না। খুচরো দিন।

পাঁচ টাকার নোট দেওয়া যে ভাড়া ফাঁকি দেওয়ার ফিকির, কণ্ডাক্টারের রূঢ় স্বরে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত।

এই নোট ছাড়া খুচরো আমার কাছে নেই!—শোভনা কণ্ডাক্টারের মুখের দিকে তাকাল। সে দৃষ্টিতে বা স্বরে কাতরতা থাকলে, বিশ্বাস করুক না করুক, কণ্ডাক্টার হয়ত অত কর্তব্যপরায়ণ হ'ত না। কিন্তু শোভনার চোখে বা গলায় স্পর্ধাও যেমন নেই তেমনি দয়াভিক্ষাও নয়।

তা হলে নেমে যেতে হবে।—কণ্ডাক্টার নিজের কর্তব্যই করল নির্বিকার ভাবে।

পাঁচ টাকার ভাঙানি আপনি দিতে পারেন না!—প্রশ্ন নয়, শুধু একটু তিক্ত বিস্ময় শোভনার গলার স্বরে।

না।—কণ্ডাক্টার অবজ্ঞাভরে বলে অন্য যাত্রীর কাছে চলে গেল।

ডালহাউসী স্কোয়ারে এসে তখন ট্রাম থেমেছে।

শোভনা নীরবে নেমে গেল।

রাত কম হয় নি। অফিসের ছুটি হয়ে গেছে অনেক আগে। তবু ডালহাউসী স্কোয়ার একেবারেই নির্জন নয়।

ট্রাম থেকে নেমে দীঘিটার পাড়ের কাছে শোভনা এগিয়ে গেল। এ ট্রাম থেকে নামতেই যখন হয়েছে তখন এইখানে একটু অপেক্ষা করবে। গঙ্গার ধারের চেয়ে এ জায়গাটায় অন্ততঃ নির্ভাবনায় অনেক বেশীক্ষণ থাকা যায়।

বাসায় অবশ্য তাকে ফিরতেই হবে। পাঁচ টাকার নোটের ভাঙানি তার জন্যে দরকার। কিন্তু সে ভাবনা এখন নাই ভাবল।

মনের শূন্য অসাড়তাতেও কণ্ডাক্টারের অহেতুক অপমানটা একটু বুঝি লেগেছে।

কিন্তু সেই সঙ্গে মনে হয়েছে, আজকের দিনের সুরের সঙ্গে এই অপমানটুকুও যেন মেলান। ট্রাম থেকে লাঞ্ছিত হয়ে নামতে বাধ্য হওয়ার মধ্যে যেন তার জীবনের কি একটা রূপক রয়েছে, যা সে ধরতে পারছে না।

পারছে নাই বা কেন? অনেক স্বপ্ন আশা সাধ দিয়ে যে জীবন গড়ে তুলতে চেয়েছিল, বিনা অপরাধে তা থেকে নির্বাসন মেনে নিতেই হবে, এই ত এ রূপকের ইঙ্গিত।

কিন্তু তার পর? নির্বাসন মেনে নিলেই কি সব ফুরিয়ে গেল? না। কিছুতেই নয়। মৃত্যুর কাছে সে হার মানে নি। জীবনের কাছেও মানবে না। শুধু সাধপূরণের বাঁচার চেয়েও বড় কিছু আছে। অন্ততঃ আছে

কি না তারই সন্ধান তার মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া-পরমায়ুর অবশিষ্টটুকুকে উদ্বেল করুক।

আজ সে ডালহাউসী স্কোয়ারের গৌরব-হারান দীঘিটার ধারে ছেঁড়া জুতো হাতে আধময়লা পোশাক-পরা নগণ্য একটা মেয়ে।

নগণ্য, কিন্তু নিরর্থক নয়।

এই জটিল দুর্বোধ বহু মানুষের বাসনা কামনা প্রবৃত্তির সংস্পর্শে সজ্ঞাতে মূর্ত ও বিবর্তনশীল মহানগরের একটি প্রাণকেন্দ্রে তার সমস্ত অতীতের বাহুপাশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একলা দাঁড়িয়ে থাকাও একটা রূপক হোক নতুন ভবিষ্যতের। বাঁ দিকে বিরাট্ উজ্জ্বল টেলিফোন ভবনের আয়তনটায় তারই আশ্বাস ভাবতে ক্ষতি কি?

ভাবতে বাধা নেই। কিন্তু এ ভাবনাও একরকম বিলাস, শোভনা বোঝে।

চরম হতাশা ও অবসাদের শূন্যতাও নেশার মত মনে একটা ঘোর লাগায়। দিগন্তে যা সাজায় তা হয়ত শুধু কল্পনার মরীচিকা ছাড়া কিছু নয়।

শোভনাকে ফিরে আসতে হয় একেবারে নির্মম বাস্তব বর্তমানে। যেখানে পাঁচ টাকার নোট ভাঙিয়ে বাসায় ফিরে যাওয়ার তুচ্ছ ব্যাপারটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

এই নোট ছাড়া খুচরো আমার কাছে নেই।—বলেছিল কণ্ডাক্টারকে।

সত্য কথাই বলেছিল কিন্তু তার সঙ্গে উহ্য ছিল অনেক কিছু। সে কথা কণ্ডাক্টার বুঝবে কেমন করে!

এই পাঁচ টাকার নোটটি ছাড়া তার কোন সম্বল আর কোথাও যে নেই সে কথা কাকে বলবে?

চলে যাবার দিন অনুপম উদারভাবে যে কুড়িটা টাকা দিয়ে গিয়েছিল তা এতদিন অতি সাবধানে খরচ করেও এই পাঁচ টাকায় ঠেকেছে।

সাবধান হবার দরকার ছিল না অবশ্য প্রথমে। অনুপম ত এক হপ্তা বাদেই আসবে। এখানকার পাট চুকিয়ে তাকে নিয়ে চলে যাবে।

কোথায় নিয়ে যাবে তা তখন বলে নি। জিজ্ঞেস করলেও বলতে চায় নি। সেই একটু মিষ্টি মিষ্টি লাজুক হাসি হেসেছিল, যে হাসিই একদিন তার কাল হয়েছিল বলা যায়।

বিয়ের পর পাশের বাড়ীর সোনাবৌদি এই নিয়েই একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল,—শেষকালে ওই একটা মেনিমুখো বর তুই পছন্দ করলি!

সোনাবৌদির জিভটা ছিল আল্‌গা। মুখে কিছু আটকাত না। মনটা নেহাৎ গঙ্গাজলের মত বলে তা কথায় ফোস্কা পড়ত না কারুর কোথাও। কিন্তু এ ঠাট্টা ভেতরে কিছু সত্য ছিল না এমন নয়।

আধাবস্তি পাড়ার মধ্যে শোভনার একটু আলাদ মূল্য ছিল। যেখানে বাংলা অক্ষর-পরিচয়ও সকলে নেই, সেখানে সে পড়াশুনা-করা মেয়ে। সে পড়াশুন যে কলেজের দরজার চৌকাঠ পেরোতে না পেরোতেই শেষ হয়েছে তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। সুন্দরী না হোক, চেহারাতেও সুশ্রী বলা যায়। সেই মেয়ের ঘরবর একটু অন্য রকম হবে আশা করা সোনাবৌদির মত পাড়াপড়শির পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কেন অমন পছন্দ তার হয়েছিল শোভনা কি নিজেই বোঝে! ওই লাজুক মেয়েলি হাসিটুকুই যে তার সব চেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল একথা ভাবতেই তার অবাক্ লাগে। মনের হদিস্ কে কবে পেয়েছে?

কাপড় ধোলাই-এর দোকানেই প্রথম দেখা। ডাইং ক্লিনিং-এ কাপড় কাচাবার মত অবস্থা তাদের নয়। কিন্তু বাধ্য হয়ে সেদিন শাড়ীটা নিয়ে যেতে হয়েছিল। ধুতে দিতে নয়, শুধু ইস্ত্রি করাতে। যে কলেজে কিছুদিন পড়েছিল সেখানকার এক সহপাঠিনীর বিয়ের নিমন্ত্রণ। তাদের তুলনায় বড়লোকের মেয়ে। এই আধাবস্তিতে নিজে এসে সেধে গেছে যাবার জন্যে। সুতরাং না গেলেই নয়।

পোশাকী শাড়ী একটাই। কাজের জন্যে উমেদারী করতে যাবার সময় সেইটেই পরে যায় বাড়ীতে কেচে নিয়ে ইস্ত্রি করে। শাড়ীটা ইস্ত্রি করাই ছিল তোরঙ্গের মধ্যে তোলা। মা যে ইতিমধ্যে কি খুঁজতে তোরঙ্গ ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তা জানে না। বার করতে গিয়ে দেখা গেল শাড়ীটা লাট হয়ে গেছে। বাড়ীতে বিকেলে সব দিন উনুন ধরান হয় না, কয়লা বাঁচাতে। ইস্ত্রি করবার জন্যে তাই ডাইং ক্লিনিং-এ যেতে বাধ্য হয়েছিল।

দোকানে যে কাজ করে, সে-ছেলেটিকে আগেও হয়ত দেখেছে এ পথে যেতে। এত কাছাকাছি থেকে নয়। লক্ষ্যও করে নি তাই। লক্ষ্য করার মত কিছু নয় অবশ্য সাধারণের চোখে।

কিন্তু শোভনার কি তখনই মনে কোথাও একটু দুর্বোধ সাড়া জেগেছিল?

ঠিক মনে পড়ে না।

শাড়ীটা ইস্ত্রি করবার ভাবনাই তখন প্রধান। তাতে অপ্রত্যাশিত বাধা এসেছে।

ছেলেটি সঙ্কুচিত ভাবে একটু হেসে বলেছে, এখন ত

ইস্ত্রি হবে না। রেখে গেলে কাল দিতে পারি।

আজ রাত্রে আমার দরকার, কাল নিয়ে কি করব? অধৈর্যের স্বরে বলেছিল শোভনা। ডাইং ক্লিনিংএ একটা ইস্ত্রি হয় না!

আবদারটা যে অযৌক্তিক, কথাটা বলেই শোভনার মনে হয়েছিল। বলামাত্র ইস্ত্রি করে দেবার দায় ডাইং ক্লিনিং নেবে কেন? কিন্তু তখন যুক্তির কথা ভাববার সময় নেই।

ছেলেটি কিন্তু অপরাধীর মতই বলেছিল, এখন লোকজন কেউ নেই কি না!

নেই মানে? ওই ত পেছনেই আপনাদের সব কাজ হয়, আমি জানি না। শুধু ইস্ত্রি বলে নিতে চান না, তাই বলুন।

বেশ একটু তিক্ত স্বরেই কথাগুলো বলে শাড়ীটা নিয়ে চলে আসার সময় ছেলেটি কুণ্ঠিত মৃদু স্বরে বলেছিল—যাবেন না। দাঁড়ান। শাড়ীটা রেখে যান।

ফিরে দাঁড়িয়ে কাউণ্টারের ওপর শাড়ীটা রাখবার সময় ছেলেটির মুখের দিকে চেয়ে শোভনার একটু অনুশোচনাই হয়েছিল অকারণে তার ওপর তিক্ত হবার জন্যে। ছেলেটির সত্যি কি দোষ? দোকানের মালিক নিশ্চয় নয়। কর্মচারী মাত্র। খদ্দেরের অন্যায় আবদার রাখতে দোকানের নিয়মভাঙা তার পক্ষে সত্যিই শক্ত। দোকানের নিয়ম আর খদ্দেরের বায়নার মধ্যে পড়ে এমন একটা কাতর অসহায় চেহারা তার মুখের, যে দেখলে মায়া হয়।

কিন্তু মায়া করে শাড়ীটা ফিরিয়ে নিয়ে যাবার অবস্থা তার নয়।

এক ঘণ্টার মধ্যে চাই কিন্তু। বলে শোভনা চলে গিয়েছিল।

বাড়ীর কাজকর্ম সেরে নিমন্ত্রণে যাবার তৈরী হতে এক ঘণ্টার কিছু বেশীই লেগে গিয়েছিল বোধ হয়।

শাড়ীটা আনবার জন্য বেরুবে, এমন সময় বাইরের সরকারী উঠোনে সোনাবৌদির গলা শুনতে পেয়েছিল, কে গা তুমি? রেতের বেলা গেরস্ত বাড়ী ঢুকে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে আছ?

উঠোনটা যদিও তিনদিকের টিনের ও খোলার চালের ভাগ ভাগ করা ঘরগুলির বাসিন্দাদের এজমালি, তবু অনধিকার প্রবেশের দায়ে অভিযুক্ত লোকটি বোধ হয় ভয়ে ভয়েই স্পষ্ট করে তার কৈফিয়ৎ দিতে পারে নি। কৈফিয়ৎটা অন্ততঃ শোভনা শুনতে পায় নি।

সোনাবৌদির পরের কথায় ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছিল।

শাড়ী ইস্ত্রি করতে দিয়েছে! তোমাদের সাজোর দোকানে? কেন, এখানে সব গতরে পোকা পড়েছে না কি? যাও যাও, ভাল মানুষের বাছা। পথ দেখ।

সোনাবৌদি মুখ ছুটিয়ে আরও কিছু বলার আগে শোভনা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আগন্তুককে বিপদ্ থেকে উদ্ধার করেছিল।

হেসে গিয়ে বলেছিল, মিছিমিছি বকাবকি করছ কেন সোনাবৌদি? আমিই শাড়ী ইস্ত্রি করতে দিয়েছিলাম।

ও মা, তুই দিয়েছিলি!—সোনাবৌদি তখনই জল হয়ে গিয়ে উল্টো সুর ধরে রসিকতা করেছিল—কিছু মনে করো না বাপু! আমি ভেবেছি, শাড়ী দেবার ছুতোয় কে কি মতলবে না জানি ঢুকেছে! পাপ মন ত, রাত বিরেতে উট্‌কো কেউ খামোখা শাড়ী দিতে এলে সন্দ হয়!

ছেলেটি তখন শাড়ীটা শোভনার হাতে তুলে দিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

তার অকারণ লাঞ্ছনা একটু লাঘব করবার জন্যেই শোভনা বলেছিল, আপনি আবার নিজে আনতে গেলেন কেন? আমি ত এখুনি যাচ্ছিলাম!

ছেলেটি অপরাধীর মত বলেছিল, আজ মানে একটু সকাল সকাল দোকান বন্ধ করতে হ'ল কি না। আপনিও এক ঘণ্টার মধ্যে এলেন না। জরুরী দরকার বলেছিলেন, তাই নিজেই দিয়ে গেলাম।

ছেলেটি যাবার জন্যে ফিরে পা বাড়াতে শোভনা হঠাৎ অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, এখানে চিনে এলেন কি করে? আমি ত ঠিকানা দিয়ে আসি নি!

না, মানে এইখানেই থাকেন জানতাম! কোন রকমে কৈফিয়ৎটা দিয়ে ছেলেটি আর দাঁড়ায় নি।

সোনাবৌদি হেসে বলেছিল তার পর, বেশ সাজো-ধোপাটি পেয়েছিস্ ত, ঠিকানা খুঁজে বাড়ী বয়ে শাড়ী দিয়ে যায় আবার ইস্ত্রির পয়সাও নেয় না!

শোভনার খেয়াল হয়েছিল এতক্ষণে। সত্যি, ইস্ত্রির পয়সা ত দেওয়া হয় নি। ছেলেটি চায়ও নি।

ট্রাম থেকে যখন নামল তখন বেশ রাত হয়েছে।

পাঁচ টাকার নোটের ভাঙানির জন্যে এবার আর কোন অসুবিধা হয় নি। সমস্যাটার অত সহজ সমাধানের কথা গোড়ায় মাথায় আসে নি। ট্রামে উঠবার আগে ডালহাউসীর কণ্ডাক্টারদের ঘাঁটিতে গিয়েই ভাঙানি পেয়েছিল।

ট্রামেই ভাবতে ভাবতে আসছিল সেদিনের কথাগুলো।

ট্রাম স্টপে মাটিতে পা দিয়েই একেবারে বর্তমানে নামতে হ'ল।

এবার ঘরে ফিরতে হবে। মাত্র দু'মাস আগে যে ঘরে অনুপম হাসপাতাল থেকে এনে তুলেছিল, প্রথম মাসের পর দ্বিতীয় মাস যে-ঘরের ভাড়া এখনও দেওয়া হয় নি, যে ঘরে প্রথম তিনদিন এক সঙ্গে থাকবার পরই কাজের ছুতোয় অনুপম দু'চার দিন বাদ দিয়ে দিয়ে আসতে সুরু করেছে। তার পর ওই নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করবার গোপন পরামর্শ করে একেবারেই নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। দেখা করবার কথা সাতদিন আগের শনিবারে। অনুপম গিয়েছে তারও এক হপ্তা আগে।

ট্রাম থেকে অনেকখানি হাঁটতে হয়। বড় রাস্তায় বেশ খানিকটা গিয়ে তার পর গলি। সে গলি এঁকে-বেঁকে বহু দূর গিয়ে যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে শহরের শেষ বেগ গাঁয়ের গ্লানির সঙ্গে মিশেছে। নতুন পাকা-বাড়ী আছে একটা-আধটা, সেই সঙ্গে কাঁচা নর্দমা, নোংরা ডোবা, টিনের চালের মাটকোঠা, প্রায়-ধ্বসে-পড়া পুরণো ভাঙগোড় বেরুন ভিটে।

এমনই একটি পুরণো ভিটের এক কোণের একটি ঘরই পৃথিবীতে এখন তার একমাত্র আশ্রয়।

ডোবাটার ধার দিয়ে সরু কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে যেতে বাড়ীওয়ালার নিজের থাকবার দিকটা পেরিয়ে যেতে হয়।

একটু বুঝি নিশ্চিন্ত হ'ল বাড়ীওয়ালার ঘরের দরজাটা বন্ধ দেখে। না, ভয়—বাড়ীওয়ালার তাগাদার নয়। সত্যি কথা বলতে গেলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক এ পর্যন্ত একদিন বাড়ীভাড়ার কথা তোলেনও নি, ভয় তাঁর প্রশ্নকে। সে প্রশ্নের পেছনে উদ্বিগ্ন মমতাই হয়ত সত্যি আছে। কিন্তু সেই জন্যেই তা আরও অস্বস্তিকর। আজ সকালেই বাগানের একটা লাউ নিজে হাতে তার ঘরে নিয়ে এসে বলেছিলেন, এই নাও মা, একেবারে ফুল-কচি লাউ। দুটো হয়েছিল। তা দুটো ত আর আমার লাগে না।

শোভনা বিনা আপত্তিতেই লাউটা নিয়েছিল, আপত্তি করে কোন লাভ নেই সে জানে। বৃদ্ধ ইতিমধ্যে অনেকবার নিজের বাগানের ফলমূল, এটা-সেটা তাকে দিয়ে গেছেন। আপত্তি করলে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়েছেন।

বৃদ্ধ লাউটা দিয়ে চলে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলেছেন, চিঠিপত্র কিছু পেয়েছ নাকি!

শোভনা মৃদুস্বরে বলেছে, না।

চিঠি দেয় নি? তাহলে আজ, আজ নিশ্চয়ই আসবে। তুমি কিছু ভেবো না মা। চিঠি যখন দেয় নি তখন নিশ্চয়ই আর আসতে দেরী করবে না। কিছু একটা অসুবিধা নিশ্চয় হয়েছে, বুঝেছ কি না—আজকাল মানুষ ত আর মানুষ নয়, কলের চাকায় বাঁধা কল। নিজের ইচ্ছেয় কিছু করবার স্বাধীনতা কি কারুর আছে?

সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় নিজেই যেন অস্থির হয়ে বৃদ্ধ চলে গেছেন। আজ এত রাত্রে দেখা হলে অবস্থাটা অস্বস্তিকরই হ'ত।

পেছন দিকের ভাঙা বারান্দা দিয়ে তালা খুলে নিজের ঘরটায় ঢুকে শোভনা তাড়াতাড়ি দরজায় খিল এঁটে দিলে।

এই একটা অন্ধকার ঘর আর একটা রাত তার নিজের একলার। এত ক্লান্তিতেও ঘুম হয়ত আসবে না, তবু আলো সে জ্বালবে না। পেছনের সব বন্ধন-ছেঁড়া অজানা অনিশ্চিত সম্ভাবনার এক নতুন সকাল তার জীবনে কাল আসছে। একটা বিনিদ্র রাত শুধু মাঝখানে থাক তার জন্যে প্রস্তুতির।

ক্রমশঃ

—•—

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

দোতলা বাস। একটি বছর-চল্লিশের লোকের পাশে গিয়ে বসলাম। সুন্দর চেহারা। বিজ্ঞাপনে যেমন শান্তশিষ্ট পোশাক-পরা ছাঁচে-ঢালা ইংরেজের চেহারা দেখতে পাওয়া যায় তেমনি সৌম্য অথচ কাজ-করিয়ে চোখা চোখা চেহারা। কণ্ডাকটর টিকিট দিতে এসেছে। ইচ্ছে করে বাজে কথা বললাম—"টেট গ্যালারি।"

"টেট গ্যালারির বাস তো এটা নয়।"

ভদ্রলোক আড় চোখে চেয়ে একটু নড়ে-চড়ে বসলেন।

আমি যেন ভাবছি।

"তবে একটা মোটামুটি ভদ্রগোছের জায়গার টিকিট দাও।"

কণ্ডাকটর দাঁড়িয়ে থাকে।

ভদ্রলোক বলেন, "অল্‌ড উইচের টিকিট দাও—ইণ্ডিয়া হাউস্‌।"

আমি মাথা নীচু করে বলি "থ্যাঙ্কস্‌।"

টিকিট নিয়ে কণ্ডাকটর চলে যায়।

আমি বলি, "যখন সাহায্য করলেন তখন আর একটু সাহায্য করুন।"

"বলুন।"

"ইণ্ডিয়া হাউসের কাছে কোথাও লাঞ্চ পাওয়া যাবে?"

"নিশ্চয়। ইণ্ডিয়া হাউসেই পাওয়া যাবে। ওদের একেবারে ওপর তলায় ভারতীয় খানা দেওয়া হয় শুনেছি।"

"আপনি তো বেশ খবর রাখেন! যান নাকি ইণ্ডিয়া হাউসে?"

"না। কবে এসেছেন?"

"কয়েকদিন হ'ল। লণ্ডন বেশ লাগছে।"

"নতুন জায়গা ভালো লাগবেই।"

"কেন? তা ছাড়া ভালো লাগার কিছু নেই নাকি?"

"লণ্ডন তো ইংলণ্ড নয়। ইংলণ্ড লণ্ডনের চেয়েও সুন্দর। লণ্ডনে পণ্ডিতরা, ব্যবসায়ীরা আর রাজনৈতিকরা থাকে; তাদের ভালো না লাগলেও তাদের মুখ চেয়ে ভালো বলতে হয়।"

"ভালো কি তবে?"

"গাঁ-দেশ। ছোট ছোট নদীর ধার, বনের ধার, পাহাড়। ডেভনশায়ার, কাম্বার ল্যাণ্ড এমনকি যদি হাম্পশায়ার কিডরসেটও যান ইংলণ্ড দেখবেন, ইংলণ্ডের সৌন্দর্য দেখবেন?"

আমি বলি,—

Wide is the world, to rest or roam,
And early 'tis for turning home:
Plant your heel on earth and stand,
And let's forget our native land.

When you and I are spilt on air
Long we shall be strayers there;
Friends of flesh and bone are best;
Comrade look not for the West.

ভদ্রলোক পাশ ফিরে বসেন। Houseman—হ্যাঁ-হ্যাঁ—

By bridges that Thanes run under
In London, the town built ill,
'Tis sure small matter for wonder
If sorrow is with one still.

সুন্দর হাসতে থাকেন।

অল্‌ড উইচ এসে গেছে। নেমে পড়তে হবে। ভদ্রলোক বললেন, "আমি যাব ন্যাশনাল গ্যালারিতে। তা এখনও প্রায় উনিশ মিনিট সময় আছে। চলুন, আমিও নামি।"

একটা মিল্ক বারে আইসক্রীম খেতে খেতে যখন শুনি রিচার্ড রষ্টকোষ্ট স্কুলের শিক্ষক নয়, একটা ওষুধের কারখানার পাব্লিসিটি অফিসার, তখন মনে মনে বুঝি এ দেশের পাব্লিসিটিতে কত ধুরন্ধর পণ্ডিত থাকেন। রষ্টকোষ্ট তখনকার মত চলে যায়, কিন্তু বলে যায় যে, বিকেলটা আমার সঙ্গে কাটাবে।

"আমি তোমায় আধঘণ্টার মধ্যে টেলিফোন করব। কি বললে, হেমরজনী? বেশ। ফোন করব।"

হেমরজনী অপেক্ষাই করছিল।

ও বলল, "হ্যাঁ, আমিও ঠিক করে রেখেছি তোমায় ইণ্ডিয়া হাউসে খাওয়াব। চল।"

দেখলাম লিফট্‌ম্যান সকলকে চেনে, তাই শুধু নয়, কোন্ যুবকের সঙ্গে কোন্ তরুণীটি সচরাচর যাতায়াত করে সে খবর রাখে। প্রত্যেকের সঙ্গেই দু-একটা বলার মত কথা ওর আড়তে মজুত।

হেমরজনী বলে—"ভারতবর্ষের বন্ধু? উনিও মাষ্টার বোধ করি। বেশ, বেশ,—লণ্ডনে একটা চাকরি জোগাড় করে নিন..."

ইণ্ডিয়া হাউসের ওপর তলায় যে মাদ্রাজের আস্ত্রা ভোজনালয় দেখতে পাওয়া যাবে কে জানত? সেই রস্‌সম্, ওয়াডভা, ভারতের ডাঁই আর পেঁয়াজ কুমড়ো আলুর একটা লদকা-লদকি।

বুফে, সেল্‌ফ-সার্ভিস। মাদ্রাজী কনট্রাকটর চালায়। দিব্যি ভিড়। মেনু টাঙ্গানো আছে। দেখে চেয়ে নাও। পয়সা জমা কর। টিকিট কেনো। টিকিটের দাম মাফিক খাবার নাও; মাংস ইচ্ছে মাংস, ভাত ইচ্ছে ভাত, নৈলে রসম, তরকারি, ইডলী, দোসা—যা চাও। দই আছে, কফি, চা—লণ্ডন যেন চিদাম্বরম্।

মস্ত বড় হল। সকলেই প্রায় ভারতীয়। সর্ব-ভারতীয় মেল। রাষ্ট্রভাষা কেউ বলছে না। পররাষ্ট্র ভাষাতেই ভারত সেবা করছে। আমি আর হেমরজনী একটা টেবিলে বসি। পাথরের টেবিল। আমাদের ধারেই একটা টেবিলে গুটি-ছয়েক যুবক বসে আছেন। দিব্যি খোশগল্প চলছে।

মনে হচ্ছে সদ্য একজন ভারতবর্ষ হয়ে এসেছেন। তিনি অদ্ভুত রকম ইংরেজ-মারা ইংরেজীতে খোকা-হাকিমদের দেশ শাসন খেলার ফিরিস্তি দিচ্ছেন। শিশু-রাষ্ট্র ভারতের নানা ছেলে খেলার বর্ণনা দিচ্ছেন।

"মিঃ—র সঙ্গে দেখা করেছিলি, তার সংবাদটা বল্—, বল্ বল্ ভারি মজার।"

অন্য একজন বলে, "বলিস কি?"—র সঙ্গে দেখা হয়েছিল? কি বললে, কি বললে?"

"বলবে কি? আমিই খবর নিয়ে নেমন্তন্ন করি জিমখানায়। এলো। নাচতে ত খুব ওস্তাদ! মিস্—কেও যথারীতি—"

সকলে একদফা হেসে নিল।

"আমিই লাভ কুড়লাম। আনন্দও; নাচলাম আমি। অবশ্য ইণ্ডিয়ায় মদের দাম অসভ্য রকম।"

"পরে তোকে নেমন্তন্ন করে নি?"

"করবে না আবার? তখুনি। পরের বুধবারেই নেমন্তন্ন গে-লর্ডে। বুধবারে গে-লর্ডে গিয়ে আবার কিছু খসল। কিন্তু শ্রীমান আর এলেন না।..."

আবার এক তোড় হাসির হর্‌রা।

বোঝা যাচ্ছে, লণ্ডনে এটা ভারতীয় খানাঘর।

"...বার বার। একটি বার একটি পয়সা গলাতে পারলাম না হে! এইটাই সেরা দুঃখ রয়ে গেল।"

"এই সব লোক শিশুরাষ্ট্রের শাসক। ভালোই করেছিস্, চলে এসেছিস।"

"আগে তবু যা মান-ইজ্জত রাখা যেতো, এখন যদি হোটেল, রেস্তরাঁ, কাবারেগুলোতে যাও—একেবারে বসা যায় না। ভারতবর্ষ ত দেউলে হ'ল বলে। এই ফরেন পলিসি নিয়ে কি আর দেশ-শাসন চলে?

অন্য জন যোগদান করেন, "আর কি যে জার্নালিসম্ জানি না। একখানা কাগজ হাতে নেবার যুগ্যি নয়।"

"বম্বেতে কি হয়েছিল—ফিল্ম কোম্পানীতে—বল্ না।"

ওরা আবার নড়ে-চড়ে বসে।

বেদব্যাস আবার মহাভারত শোনাতে থাকেন।

হেমরজনী চুপি চুপি বলে, "অতো মন দিয়ে কি শুনছো?"

"বিলেত দেখছি।"

"সে কি?"

"সূর্যের আলোয় বালি তাতলে কি অসহ্য হয় দেখছি। সকলেই ইণ্ডিয়া আপিসে ইণ্ডিয়ার পয়সাই খায়?"

হেমরজনী তাড়াতাড়ি আমায় তুলে নিয়ে আসে ওখান থেকে।

নীচে নামতেই হেমরজনীর সহকর্মী জগদীশ সিং বলে তোমার টেলিফোন আছে।"

হেমরজনী টেলিফোন ধরে আমার হাতে দিয়ে বলে, "তোমার।"

রষ্টকোষ্ট টেলিফোন করছিল।

রষ্টকোষ্ট আমায় নেমন্তন্ন করছে। ওল্‌ড ভিক্-এ রিচার্ড থার্ড অভিনীত হচ্ছে। ও তিনখানা সীটের ব্যবস্থা করতে পারে।

তখনকার মতো 'হ্যাঁ' বলে হেমরজনীকে রষ্টকোষ্টের কথা বললাম।

হেমরজনী বলে, "রষ্টকোষ্ট? সে ত ভারি দিল-দরিয়া বৈঠকী লোক হে। মস্ত নামী পাবলিসিটি অফিসার। ভাগ্য ভাল তোমার। নইলে বাসের মাথায় কবিত্ব আওড়ালে সোজা পাগল বলে পুলিসে জমা করে দিত।"

হেমরজনীর তখনও অফিস। তবে ঘণ্টাখানেক অবকাশ তখনও আছে।

রষ্টকোষ্ট, ওল্ড ভিক্ আর রিচার্ড থার্ড ছাপিয়েও মনে মনে তখনও রাগ ওপর তলার ঐ মহিষাসুরগুলোর কথা মনে করে।

উঠে আসি। কিন্তু মনে কথা; বলি,—"ইণ্ডিয়া হাউস দেখাচ্ছ হেমরজনী, গেটের ধারে গান্ধী আর টাগোরের পাথর-জমা পিণ্ডি, দ্যালে দ্যালে আঁকা-বাঁকা অজন্তার ঢংয়ের আলপোনা, সিলিং অবধি উঁচু ফাইল, আর পালিশ করা মেঝে কি করব। ওতে চিড়ে কত ভিজবে? এর অবয়বে, অঙ্গে, শিরায় শিরায় ঐ সব পারিবারিক আর বংশগত ফেরঙ্গ রোগ যতদিন আছে ততদিন ত সুস্থ-সবল জাতিগড়া অসম্ভব হে!"

হেমরজনী মিতবাক্ সুশীল কর্মী। মুচ্‌মুচিয়ে হাসে, যেন দাঁতের চাপে ভাজা চিড়ে। বলে,—"সত্যি বলতে কি, তোমার এই মধুর রাগের বৈচিত্র্যই তোমার চরিত্র। তোমায় ভালবাসি তোমার অনুরাগে নয়, রাগে।"

"কর্তা-গিন্নী রাগ আর অনুরাগ ভাগাভাগি করে নিয়েছ আর কি!"

"বুদ্ধিমান্ স্বামী গিন্নার অনুরাগের রিসার্চ করে না হে। সে বলতে পারি না। রাগ তোমার চিনি। প্রথম প্রথম আমারও রাগ হ'ত। এখন সয়ে গেছে।

"ওরা ছ' জন। তিনজন পড়তে এসে স্রেফ সট্‌কে পড়েছে। এক-একটা মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে দকে আটকে গেছে। যদিও মনে মনে আপশোস, বাড়ী ফিরতে পারে না। দুটো এখনও পড়ছে, তবে ওদেরও খাঁচা তৈরী হচ্ছে। আর ঐ যে লাউডস্পীকারটি দেখলে, ও-ই মজার ছেলে। ওর জ্বালায় যন্ত্রণায় ইণ্ডিয়া অফিস সসেমিরে। যে মেয়েটার সঙ্গে স্বামী সম্পর্ক পাতিয়ে আছে সে ওকে দু' চক্ষে দেখতে পারে না ওর অদ্ভুত মেজাজ আর স্বার্থপরতার জন্য। অফিসে প্রতিটি মেয়ে ওর ঠাট্টার জ্বালায় অস্থির। অথচ এদেশী মেয়েমহলে ওর জনপ্রিয়তা অসামান্য। এরা লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের পোষ্যপুত্র।

"এই ত আজই একটা কেস্ করলাম। বোম্বের ধনীর একমাত্র ছেলে। ছেলেটাও ভাল। পড়তে এসেছিল এঞ্জিনীয়ারিং। এসে একটা কোন খপ্পরে পড়েছে। ইংরেজও নয়, ইংলণ্ডেও নয়। ওর টাকা ত আমাদের মারফৎ আসে। প্রতি বার টাকাটা আসার আগে খরচ করে। তার পর কি ভোগান্ ভোগে। এক্স্‌চেঞ্জের এমন কড়াকড়ি চলেছে এখন যে, টাকা দরকার মত আনাতে পারছে না। প্রতি বার চলে যায় জার্মানীতে। সব টাকা খরচ করে এসে আবার আমায় বিরক্ত করে। অথচ এত ভাল ছেলেটা যে আমারও মায়া পড়ে গেছে।

আমি বলি,—"বিয়ে করে না কেন?"

"ঐ ত ব্যাপার। বাপের এক ছেলে। বাপকেও ভালবাসে। অন্ততঃ বাপকে ছাড়তে পারবে না। এদিকে মেয়েটাকে পেয়ে বসেছে। এক এক সময়ে নিজেই ঘাবড়ে যায়। আমি ত খুব চেষ্টা করছি যাতে ও ভারতবর্ষে ফিরে যায়। আজ ধমক দিলাম যে আর টাকা দেব না। দেখি কি হয়।"

"এদের দায় তোমাদের কেন?"

হাসে হেমরজনী। "আমার দায়, তোমার দায় না হতে পারে। ভারতীয়ের দায় ভারতেরই দায়। ভারতের দায় বলেই ইণ্ডিয়া অফিসের দায়। আর তাই আমাদের দায়। বিদেশে ভারতীয়দের ব্যবহার সমীচীন হোক্ এ কি কাম্য নয়?"

আমায় এমনি আর এক ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল ব্যক্তিগত ভাবে।

গোলেমালে দিল্লীর লয়েডস্ ব্যাঙ্ক আমার ট্রাভলার্স চেকের পেছনে যে To be encashed in British Guiana লিখে দিয়েছিল তা লক্ষ্য করি নি। একে ত পিছনে লিখেছিল তাতে ট্রাভলার্স চেকে ও কথা লেখার কোনো মানেই হয় না।

লণ্ডনে টাকার দরকার। কি করি। পথেও দরকার হবে। ঘুরতে ঘুরতে যাবার ইচ্ছে। হেমরজনীকে বলি।

লণ্ডনে লয়েডস্ ব্যাঙ্কে গেলাম। ভদ্র ব্যবহার। সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। বলল, যদি ইণ্ডিয়া কমিশন লিখে দেয় এখানে এটা ভাঙ্গানো যাবে আমরা বাকী ব্যবস্থা করে দেব।

হেমরজনী ফোন করে দিলেন। ইণ্ডিয়া অফিসের ফিনান্স দপ্তর অল্‌ড উইচে নেই। সেজন্য আবার হে মার্কেটের তল্লাটে যেতে হবে। যাক, গেলাম।

প্রধান পুরুষ মদ্রদেশীয়। দপ্তরী দস্তাবেজের ঘুণ। আর দু'চার বছরেই রিটায়ার করবেন। অষ্ট্রিক মাথা-নাড়া এবং মূর্ধণ্য বর্ণের ওপর অস্বাভাবিক (স্বাভাবিক?) ব্যাকুল আলিঙ্গন-পিপাসা ত্রিশ বছরের লণ্ডনবাসে কাটে নি।

খুব ভদ্র ব্যবহার।

আমার কোটের ওপর একটা ছোট্ট নীল ব্যাজ ছিল। ওটা আমার স্কুলের ব্যাজ। কোন কারণে বা অকারণে ওটা রয়েই গিয়েছিল। খোলা হয় নি।

নজর পড়েছে সেটার ওপর।

"ওটা কি?" অস্ট্রীক অনুসন্ধিৎসা, যার জন্ম সন্দেহ ও একোলসেঁড়েমী থেকে। ও দুটো অস্ট্রীক ধারার বাহক। মোটেই মানানসই নয় লণ্ডনে।

লজ্জিত হয়ে বলি, "স্কুল ব্যাজ!"

"স্কুল? এখনও স্কুল?"

"ওটা আর ছাড়তে পারি নি গত চল্লিশ বছরেও।"

"চল্লিশ?—বয়স কত?"

"বছর দশেক পরে পেন্সন বন্ধ করতে গেলে বিশেষ আবেদন করতে হবে।"

"আচ্ছা। তবে এই বয়সে এতদূরে যাওয়া কেন?"

"কপালের দণ্ড, খণ্ডাবে কে?"

"ভাগ্যসেবী?"

"কে নয়? ডিস্‌পেপ্‌টিক আর অন্ধ ছাড়া কেবল প্লানে বিশ্বাস করে কে?"

"কেন, আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী।"

"আপনার কাছ থেকে আমায় কাজ আদায় করতে হবে বলেই ঐ মোক্ষম কথাটা বলি নি।"

খুব জোরে হাসেন ভদ্রলোক।

"মাষ্টার? স্কুল মাষ্টার? স্কুল মাষ্টার এত চতুর?"

"তবু মানায়। স্কুলে সব চলে যায়। কিন্তু বোকা ফিনান্স ডিরেক্টর একেবারে অচল।"

খুব হেসে ওঠেন কর্তা।

"আপনাকে ওরা ডাকছে কেন? খোঁজ পেল কি করে?"

সেও দুর্ভোগ। প্রথম যৌবনের স্বপ্নে এক বন্ধুকে কথা দিয়েছিলাম এককালে ভারতের বাইরে যদি যাইও ইণ্ডোরূড় ভারতীয় সমাজে গিয়ে ভারতের হয়ে কাজ করব। কে জানত সেই বন্ধু কলাগাছ হয়ে দাঁড়াবে। আমায় ডাকবে কলাবাগানের ভোজে। এখন তো আর দেওয়া কথা ফেরৎ নিতে পারি না।

"বিয়ে থা? সংসার?" ভদ্রলোক উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

"সে সবই করতে হয়েছে। পাপকর্মের কোনটা বাদ দিই নি। যেটা বাদ ছিল তাও করতে চলেছি।"

"কোন্‌টা।"

"লোক ঠকিয়েছি, লোক সমাজ ঠকাই নি। অর্থাৎ লীডার হতে পারি নি। এখন তাই হতে চলেছি। ওরা জবরদস্ত একজন প্রিন্সিপ্যাল চায়।"

"জবরদস্ত? কে জবরদস্ত? আপনি জবরদস্ত প্রিন্সিপ্যাল? ভয় পেতে হবে নাকি জবরদস্ত প্রিন্সি-পালকে?" এবারকার হাসিতে এত তাচ্ছিল্য আর উপহাস যে, কটু না লেগে পারে না।

"যাদের দেখতে ভয়ঙ্কর নয় তাদের ভয়ঙ্কর সত্যি ভয়ঙ্কর জানেন তো? রাবণের সাধুবেশই সবার চেয়ে ভয়ঙ্কর হয়েছিল।"

"জবরদস্ত প্রিন্সিপ্যাল তার পরিবারবর্গকে ছেড়ে এলেন?"

"হ্যাঁ। গতি কি?"

"ভাগ্যবান্। যদি আমরা পারতাম।"

দীর্ঘশ্বাস পড়ল ভদ্রলোকের। কথা ক'টার মধ্যে কোথায় যেন সত্যিকার একটু বেদনার ছোঁয়া ছিল।

ঐ কথা হেমরজনীকে জানাতে ও বলেছিল—"ওর জীবনও তাই। এখানে ছাত্রাবস্থায় এসে বিয়ে করে সংসার করেছে। এখন ছেলেরা যে-যার কাজকর্ম করছে। মনটায় ভারতের পারিবারিক শান্তির স্বপ্ন। জীবনে ইংরেজ বণিকতন্ত্রের দোকানদারী মাখান স্বৈরতা। এ দুটোর সামঞ্জস্য করতে পারছে না। মনে মনে ভাঙা মানুষ। রিটায়ার্ড হয়ে এখানে থাকার কথা। এখনও ভাবে না। কিন্তু করবেই বা যে কি জানি না।

"জান, একজন ডাক্তার আছেন এখানে, বাঙালী ডাক্তার—ঘোষ। প্রায়ই আসেন আমার কাছে। এমন কি গিন্নীর জন্য সব ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন যাতে সে সুখে থাকে। কেবল দেশে গিয়ে মরতে চায়। বলে 'জানি যে দেশ থেকে এসেছি পঞ্চাশ বছর আগেকার সে দেশ আর পাব না। আমার দিকে চাইবার লোকও নেই। তবু দেশ, দেশই। মরতে এখানে চাই না। মরার আগে দেশে যেতে চাই।' এখন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করছে কি করে ডিভোর্স করা যায়। আমার কাছে প্রায়ই এসে কান্নাকাটি করে। ওর বুড়ী কালা-আদমীর দেশে সাপের কামড়ে মরতে নিতান্ত নারাজ। পাথর আর গাছ আজও যারা পুজো করে তারা কি মানুষ? বুড়ী যেন হাঁফায় ভারতের নামে, আর বুড়ো লাফায়।"

"এদের নয় টাকা আছে। ব্যবস্থাও হয়, আবার দেশে ফেরার পয়সাও জুটে যায়। এমন তো কত আছে যারা এসেছে এখন ফেরার পয়সা নেই।"

"বহু বহু। কত আবেদন আছে। আমরা আস্কারা দিই না। বড় গাছের শেকড় ছিঁড়ে অন্যত্র লাগাতে গেলে অনেক বিপদ আছে ভাই। কিন্তু এ একটা বড় সমস্যা আমাদের।"

লণ্ডনে ভিখিরীর কথা বলছিলাম। এমনি একদিন

যাচ্ছি পিকাডেলীর বড় পথ দিয়ে। হাঁটতে হাঁটতে রীজেণ্ট ষ্ট্রীট দিয়ে পার্ক ক্রীসেণ্ট-এর দিকে চলেছি। পথে বুড়ো একজন ভারতীয় এসে মধুর আলাপ সুরু করে। ভাবখানা, "দেশের লোক; দেখলেও বুক জুড়োয়।" তার পর গল্প। কবে জাহাজে রান্নাঘরের কাজ করতে করতে আসে। পরে রান্নাকরার কাজই করে। তার পর জামা সেলাই। পরে কোন্ দুর্বৃত্তের পাল্লায় পড়ে জেল। তার পরে ষ্ট্রোক, পক্ষাঘাত। তার পরে—তার পরে—তার পরে। কথা ও দুর্ভাগ্যের নানা গলি পেরিয়ে যখন ও মাত্র দু' শিলিং-এর সীমানায় এসে থামল তখন দিতে দিতেও মনে হ'ল সোহোর কোন ভাঁটিখানায় এই ভারতপ্রেম, স্বদেশ ছলছল চিত্ত, এমন শাঁসালো গল্প বীয়ারের স্রোতে আর জুয়ায় ভেসে যাবে। হেমরজনী বলে—"এখানে ভারতীয় ভিক্ষুক না থাকে এ চেষ্টা আমরা খুব করি। কিন্তু অসাধ্য। শেষ অবধি মাঝে মাঝে দু' একটা এমন রিপোর্ট পেয়েই যাই। যার কথা বলছ তাকে হয়ত চিনি। লোকটার নাম শম্ভুনাথন্ আর জর্জ্জও কখনও কখনও। ভীষণ মাতাল। তবে কাজ জানে। রাঁধতে ভাল জানে। খুব ভাল। কিন্তু ওর মাতলামির জন্যই ওর কাজ জোটে না।"

হেমরজনীকে তার অফিসে ছেড়ে পাঁচটায় লণ্ডন ব্রীজের মোড়ে দেখা হবে বলে তখনকার মত টহলদারীতে বেরুলাম। আমার আর কি? কেবল ত ঘুরে ঘুরে বেড়ান আর মৌকামতো গালগল্প করা।

আমি ভাবছি দুপুরের দিকটা হাইড পার্ক আর বাকিংহাম প্যালেসের দিক হয়ে চলি। হঠাৎ একটা বাসে উঠি। বাস আমায় নামিয়ে দিল ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে। ক্রমশঃ

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সনের মধ্যে অনুশীলন সমিতির প্রকাশ্য শাখা বাংলা দেশের সমস্ত জিলায় বিস্তৃত হয়। প্রতি শহর, বন্দর, ব্যবসায়কেন্দ্র এবং অধিকাংশ গ্রামেই সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে হাজার হাজার যুবকই সমিতির সভ্য হয়। অনেক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ ব্যক্তি সভ্য-তালিকাভুক্ত হয়েছিল।

সমিতির প্রতি বিরুদ্ধাচরণ না করলেও সাধারণত বড় বড় ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি ধনীরা খুব বেশী সমিতির সভ্য হয় নি। তাদের মধ্যেও আবার সরকারী দমননীতি সুরু হওয়ার পর অনেকে আস্তে আস্তে সরে পড়ে। ব্যতিক্রম যে হয় নি তা নয়। ভাগ্যকুলের রায়বাবুরা সেকালে বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। রাজা জানকীনাথ রায়ের পুত্র রমেন্দ্রনাথ রায় সমিতির কাজে উৎসাহী ছিলেন। তিনি ভাগ্যকুলে সমিতির শাখা স্থাপনের জন্য ও শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঢাকা কেন্দ্র থেকে লোক নিয়েছিলেন। পরে রায় পরিবারের প্রায় সমস্ত যুবকগণই সমিতির সভ্য হয়েছিল। রমেন্দ্রবাবু তার একটা বন্দুকও দিয়েছিলেন। বিপদের সম্ভাবনা ঘটার পর তিনি বিলেত চলে যান। মুর্শিদাবাদ জিয়াগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র সিংহও সমিতির উৎসাহী সভ্য ছিলেন। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি ঢাকা থেকে লোক আনিয়ে জিয়াগঞ্জে সমিতির শাখা স্থাপন করান।

শ্রমজীবী শ্রেণীর জনগণ—কুলী, মজুর, মাঝি-মাল্লা প্রভৃতি সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত সাধারণত হয় নি। দেখেছি, সমিতির প্রতি কোন বিদ্বেষ মনোভাব ছিল না বরং তারা শ্রদ্ধাই করত। এদেরকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করার উপর যদিও কোন নিষেধ ছিল না কিন্তু এদের মধ্য থেকে সমিতির সভ্য করার কোন চেষ্টাও হয় নি।

যে সমিতি একদিন সহস্র-সহস্র কেন লক্ষ যুবকের সংস্থায় পরিণত হয়, তার প্রতিষ্ঠার দিনটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। পি. মিত্র এবং বিপিনচন্দ্র পাল ঢাকায় গিয়ে অনুশীলন সমিতিতে যোগদানের জন্য প্রকাশ্য সভায়

এবং ব্যক্তিগত আলোচনার মধ্য দিয়ে যুবকদের কাছে আবেদন করেন। তখন তাঁদের বক্তৃতায় উত্তেজিত হয়ে চুয়াত্তর (৭৪) জন যুবক সমিতির সভ্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে নাম লেখান। কিন্তু পুলিনবাবু যখন সমিতির কাজ আরম্ভ করেন তখন প্রথমদিনে মাত্র একজন উপস্থিত হয়। পরে পুলিনবাবু এদের বাড়ী গিয়ে বোঝালেন, তর্ক করলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের যুক্তিযুক্ততার কথা বললেন। ফলে চৌত্রিশ (৩৪) জন সমিতিতে উপস্থিত হয়। ক্রমে তারা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে এবং ঢাকায় তথা পূর্ববঙ্গে সমিতি স্থাপিত হয়।

ন্যাশানেল স্কুলের ছাত্রসংখ্যা পুলিনবাবুর চেষ্টায় বাড়তে থাকে এবং তিনি তাদেরকে অনুশীলন সমিতির সভ্য করে নেন। বিলিতি মাল পিকেটিং করতে যারা যেত তাদের মধ্য থেকেও বাছাই করে সমিতির সভ্য করা হতে সুরু হয়। জগন্নাথ কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপক সমিতির সভ্য হলেন এবং ঐ কলেজ হোষ্টেল থেকেই পুলিনবাবু একশত সভ্য সংগ্রহ করেন। শহরের সর্বত্র, পাড়ায় পাড়ায় এবং বাড়ী বাড়ী ঘুরে এবং ছোট ছোট সভায় বক্তৃতা করে সমিতিতে যোগদানের জন্য সকলকে আহ্বান করতে লাগলেন। কলেজ হোষ্টেল আর মেস-গুলিতে ঘুরে ঘুরে ছাত্রদের সঙ্গে মেলামেশা করে অধিকাংশকেই সভ্য করলেন। যদিও পুরাতন সভ্য কেউ কেউ ভাগতে লাগল কিন্তু নতুন সভ্যসংখ্যা এত দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল যে, মোটের উপর সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে চলল।

স্বদেশী আন্দোলনের সুরুতেই যে ছাত্রদলন আরম্ভ হয় তারই প্রতিবাদে ঢাকায় নানা স্কুলে বিশেষ করে সরকারী ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ধর্মঘট হয়। এই ধর্মঘট সংগঠনে পুলিনবাবু নেতৃত্ব করেন এবং জাতীয় বিদ্যালয় (National School) স্থাপনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। নিজে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষক হন এবং যারা শুধুমাত্র দেশসেবা হিসেবে কাজ করতে প্রস্তুত বিনা বেতনে, তেমন শিক্ষক নিযুক্ত করে জাতীয় বিদ্যালয় চালাতে থাকেন। ঢাকার নেতৃস্থানীয় উকিল ত্রৈলোক্যনাথ বসু, রসিকলাল চক্রবর্তী, আনন্দ চক্রবর্তী (পাকড়াশী) ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ লোকের আন্তরিক সাহায্য লাভ করেন পুলিনবাবু।

তখন পূর্ববঙ্গে স্কুলসমূহের কর্তা ষ্টেপলটন সাহেব (Stepleton) খুব কড়া, জবরদস্ত ও অত্যাচারী ছিলেন। স্কুলের বাইরেও যাতে ছেলেরা সর্বদা খেলাধূলা, বিশেষ করে ফুটবল খেলায় মত্ত থাকে সেদিকে নজর দিলেন। কারণ তাহলেই তারা বিকেলবেলা সমিতির ড্রিল ইত্যাদিতে যোগ দিয়ে বিপ্লবী মনোভাব জাগ্রত হওয়ার সুযোগ পাবে না। আমরাও এসব কথা ভেবেই আমাদের স্কুলে ফুটবল খেলার প্রচলন করতেই দিই নি: ছাত্রদের একমত করে কর্তৃপক্ষকে জানালাম যে, আমরা ফুটবল খেলব না এবং আমরা দেশীয় খেলা খেলতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে নানা খেলার প্রচলন হ'ল। সমিতি বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পর কাণ্ট্রী স্পোর্টস্ এসোসিয়েশন নাম দিয়ে একটা সংঘ স্থাপিত করে 'দাড়িয়া বান্ধা' খেলার লিগ প্রথায় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলাম।

তা ছাড়া আমাদের স্কুলের ড্রিল মাষ্টার ছিলেন অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য এবং স্থানীয় পরিচালকদের অন্যতম। স্কুলের ড্রিল সমিতির ড্রিলে পরিণত হ'ল। আবার ছাত্রদের মধ্যে যারা সমিতির বিশিষ্ট সভ্য হওয়ায় স্কুলেও ড্রিল প্যারেড করাত তাদের প্রভাবেও ছেলেরা নানাভাবে সমিতির প্রতি প্রভাবান্বিত হতে লাগল।

নারায়ণগঞ্জ সমিতির কেন্দ্র হিসেবে কোন ভাড়াটিয়া বাড়ী ছিল না। পরিচালকের বাড়ীতেই অফিস হ'ত। আর ড্রিল প্যারেড ইত্যাদি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় করা হয়েছে। নারায়ণগঞ্জের অধীনে যে সমস্ত শাখা-সমিতি ছিল সেখানে লাঠি-ছোড়া, খেলা ও ড্রিল শেখাতে নারায়ণগঞ্জ থেকে লোক প্রেরিত হ'ত। আমিও অনেক-বার গিয়েছি এমনি কাজে। এ কাজ করতে গিয়ে অনেক সময় স্থানীয় নমশূদ্র, গোয়াল ব্যবসাদার লাঠিয়ালদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বানে সমিতির মানরক্ষার্থে সাড়া দিতে হয়েছে। লাঠি খেলা জানলেও আমার এ বিষয়ে তেমন কোন সুনাম ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনের জোরে ওদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়েছি।

সমস্ত পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের সমিতির কেন্দ্র ঢাকায় স্থাপিত হয়, উয়ারীর পঞ্চাশ নম্বর বাড়ীতে। পরে দক্ষিণ মৈশন্তরীর একটা বড় বাড়ীতে কেন্দ্র স্থানান্তরিত হয়, প্রশস্ত আঙ্গিনাসহ এই বাড়ীটা বহুকাল ভূতের বাড়ী বলে কুখ্যাত ছিল। ভয়ে কেউ সে বাড়ীতে যেত না। সমিতির কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ার পর সে বাড়ীতে আর কোনদিন ভূতের উৎপাত হয় নি। এখানে পুলিনবাবু সপরিবারে থাকতেন এবং সর্বক্ষণের গৃহত্যাগী সভ্যরা থাকতেন। এ বাড়ী সর্বক্ষণের জন্য সমিতির সভ্যদের প্রহরাধীন ছিল এবং বিনা অনুমতিতে কেউ প্রবেশ করতে পারত না।

সমিতির এই কেন্দ্রকে বলা হ'ত বজ্রপুরী আর গৃহত্যাগী সভ্য যারা এখানে থাকত তারা হতেন বজ্রী। দধীচির অস্থিতে যে বজ্র তৈরি হয় তার সাহায্যে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করে স্বর্গরাজ্য উদ্ধার করেছিলেন। দেশের উদ্ধার কামনায় যারা সর্বস্ব উৎসর্গ করে সর্বক্ষণের কর্মী হয়েছে তাদের পবিত্র অস্থিতেও বজ্রের শক্তি নিহিত আছে, যার বলে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে—তাই তারা বজ্রী।

প্রথমদিকে অল্প কয়েকজন গৃহত্যাগী সভ্য হন, যেমন শচীন বাঁড়ুজ্যে, মতি সেন প্রভৃতি। তারা প্রথমে উয়ারীর শ্রীউপেন্দ্র নাগের বাইরের দিকে একটা ছোট খড়ের ঘরে আশ্রয় পায়। ছোট্ট ঘরের একপাশে দুটো তক্তপোশ আর একদিকে রান্নার জন্য উহুন ইত্যাদি। সভ্যদের নিজেদেরই রান্না করে খেতে হ'ত। পরে যখন সভ্যসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং বজ্রপুরীতে এদের থাকার ব্যবস্থা হয় তখন সেই বড় বাড়ীতেও স্থান সঙ্কুলান হ'ত না।

আশু দাশগুপ্ত, সুরেন নাগ প্রভৃতিকে নিয়ে পুলিনবাবু প্রথমে সমিতি স্থাপন করে। শশী সরকার, শচীন ব্যানার্জি, মতি সেন, সুরেন ঘোষ, উয়ারীর বোচাবাবু, অমলা ঘোষ, প্রভাত দে, হেমেন্দ্র রায় সর্বক্ষণের কর্মী (whole timer) হন।

প্রথমে যাঁরা গৃহত্যাগ করে আসেন তাঁদের বয়স ষোল থেকে বাইশ বৎসরের মধ্যে ছিল। অনাবশ্যক কাহাকেও গৃহত্যাগ করান হ'ত না। যে সমস্ত সভ্যের বাড়ীর সকলেই সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল তারা বাড়ীতে থেকেই গৃহত্যাগী সভ্যের মতো কাজ করতে পারত। ঢাকায় এ রকম সভ্য হন প্রথম শশাঙ্ক হাজরা, শান্তিপদ মুখার্জি, শিশির গুহরায় প্রভৃতি। বীরেন চ্যাটার্জি এবং লালমোহন দেও প্রথম যুগেই গৃহত্যাগ করে আসেন। নারায়ণগঞ্জের সভ্য সীতানাথ দাশ, আদিত্য দত্ত, বাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি ও আরও কয়েকজন গৃহে থেকেই গৃহত্যাগী সভ্যের পর্যায়ভুক্ত ছিলাম।

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল আনন্দ পাকড়াশী প্রথম যুগেই সমিতিতে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন ঢাকার প্রসিদ্ধ ত্রিপুরালিঙ্গের শিষ্য। এর সঙ্গে সমিতির খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। স্বামী ত্রিপুরালিঙ্গের আশ্রমে প্রথম শিব-লিঙ্গই স্থাপিত ছিল। সমিতির সম্পর্কে আসবার পর সেখানে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা উৎসবে সমিতির সভ্যরা উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করে, এবং শ্বেত ছাগ বলি দেওয়া হয়—শ্বেতকায় ইংরেজদের মনে করে।

স্বামী ত্রিপুরালিঙ্গ ঢাকার স্বামীজী নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। শুধু স্বামীজী বলেই সমিতির সভ্যরা স্বামী ত্রিপুরালিঙ্গকে বুঝতেন।

তাঁর অতীত বা বয়স সম্বন্ধে ঢাকায় কেউ কিছু জানত না। চেহারা দেখে তাঁর বয়স অনুমান করা যেত না। বহু বৎসর যাবৎ যারা তাঁকে দেখেছেন তাঁরাও বলতেন যে, একই চেহারা তারা দেখে আসছেন। তার সম্বন্ধে নানা গুজব ছিল। প্রচলিত ছিল যে তিনিই নাকি সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক প্রসিদ্ধ নানাসাহেব। তাঁর চেহারা ও বয়সের অনুমান অনেকটা এ গুজবের সমর্থন সূচক ছিল। নানা সাহেবের শেষ কি হয়েছিল তা কেউ জানে না। ইংরেজরাও তাঁকে বন্দী করতে পারে নি। মানুষের মনে এমনি বিশ্বাস হওয়ার কারণ ছিল, তাঁর স্বদেশ প্রেমের কথায় এবং ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবে।

তাঁর কাছে যে সমস্ত লোক নানা স্থান থেকে আসত তাদের গতিবিধি অত্যন্ত রহস্যজনক বলে মনে হ'ত। তৎকালীন ভারতীয় সৈন্যদলের এবং সশস্ত্র পুলিস বাহিনীর অনেক সুবেদার জমাদার স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করত। অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কোন সৈন্য বিভাগীয় সুবেদার হয়ত জানতে পেরেছে যে, সরকার মুসলমান নেতাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তার আশ্রম ও হিন্দু বাড়ী লুঠ করবার বন্দোবস্ত করেছে। সুবেদার পূর্বেই স্বামীজীকে এ খবর পৌঁছে দিয়েছে এবং রাত্রিতে আশ্রমে প্রহরায় নিযুক্ত থেকেছে। এমনি ঘটনার সঙ্গে সমিতির আদি সভ্য সুরেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয় জড়িত হয়েছিলেন এবং অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এ কাহিনী তাঁর কাছেই শুনেছি।

তিনি ঢাকা এসে প্রথমে আশ্রয় পান ডালপট্টিতে, হিন্দুস্থানী দরিদ্র ডাল বিক্রেতাদের কাছে। ডালপট্টিতে তখন বাস করত কয়েক ঘর দরিদ্রশ্রেণীর হিন্দুস্থানী যাদের স্ত্রীপুরুষ মিলে নিজের চাকিতে ডাল ভেঙে তা বিক্রয় করত।

সমিতির প্রধান সভ্য এবং ঢাকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকিল আনন্দ পাকড়াশী মহাশয় ছিলেন স্বামীজীর শিষ্য। ক্রমে ঢাকার অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক স্বামীজীর শিষ্য হন। পুলিনবাবু অনেক সময় স্বামীজীর সঙ্গে সমিতি-বিষয়ে আলোচনা করতেন ও তার পরামর্শ চাইতেন।

স্বামীজীর আশ্রম ছিল সমিতির একটা প্রধান আড্ডা এবং তিনি সেখানে সমিতির কাজের নানা সুবিধা করে দিয়েছিলেন। আশ্রম এবং নিকটবর্তী জমিতে কয়েকবার আমাদের কৃত্রিম যুদ্ধের মহড়া হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার যখন সমিতি ধ্বংস করতে উদ্যত এবং ধরপাকড় আরম্ভ করে তখনও তিনি ভীত হন নি। তাঁর আশ্রম যে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত তা আজও স্বামীবাগ নামে পরিচিত।

এদিকে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির পরিচালনায় অস্ত্র সংগ্রহের কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। হেমচন্দ্র দাস ফ্রান্স থেকে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত-প্রণালী শিখে আসেন এবং বোমা প্রস্তুত আরম্ভ করেন। মাণিকতলায় মুরারীপুকুরের বাগানে বোমা তৈরীর বিরাট কারখানা স্থাপিত হয়। কলিকাতা, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে গুপ্ত কাজকর্ম খুব জোরের সঙ্গে চলে এবং কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটে। প্রথমদিকে সরকার এগুলিকে রাজনৈতিক ঘটনা বলে মনে করতে পারে নি। মেদিনীপুর নারায়ণগড় ষ্টেশনের কাছে লাট-সাহেবের ট্রেন ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা হয় তার জন্য রেল-রাস্তা সারাইয়ের কাজে নিযুক্ত কতগুলি কুলীর কারাদণ্ড হয়। পুলিসের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে নির্দোষ কুলীরা অপরাধ স্বীকার করে। এমনই আরও কয়েকটা ঘটনা ঘটে।

এত গেল বারীনবাবুদের কথা। অপর দিকে পি. মিত্রের নেতৃত্বে ও সতীশবাবুর ও পুলিনবাবুর পরিচালায় ঢাকায়, পূর্ব-উত্তরবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গে, যেমন, মুর্শিদাবাদে অনুশীলন সমিতির কাজ খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে লাগল। সমিতির প্রকাশ্য কাজকর্ম সরকারের বিস্ময় ও আশঙ্কা উদ্রেক করল। আর দেশের লোকের মনে জাগিয়ে তুলল শ্রদ্ধা ও আশা। সতীশ-বাবু ও পুলিনবাবু উভয়েই অস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং কাজকর্মের জন্য আদান-প্রদানও করতেন। সভ্যরা ড্রিল, প্যারেড, নৌকা চালনা, মোটর চালনা প্রভৃতির সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র চালাতে ও শিখতে লাগল। এজন্য কয়েকজন সভ্য নৌকায় কয়েক সপ্তাহের জন্য বেরিয়ে পড়ত। জঙ্গলে গিয়ে হরিণ, পাখী, বন্য-শূকর প্রভৃতি শিকার করত। অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সুরেন নাগ ও আরও কয়েকজনকে বিদেশ যেতে নির্দেশ দিলেন পুলিনবাবু। ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যা শিখবার জন্য কয়েকজন ছাত্র সভ্যকে বিদেশ যেতে উৎসাহিত করলেন। এই সময় থেকেই প্রকৃতপক্ষে সভ্যদের গৃহত্যাগ সুরু করান পুলিনবাবু।

অমৃত হাজরা এবং আর কয়েকজন মিস্ত্রীর কাজ শিখলেন পুলিনবাবুর নির্দেশে। ঢাকা শহরের অন্তর্গত বেচারামের দেউড়ি অঞ্চলে এক হিন্দুস্থানী লোহার মিস্ত্রী থাকত এবং তার একটা দোকানও ছিল ক্ষুদ্র ধরনের। সে বন্দুক, রিভলভার, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র সারাবার কাজ খুব ভাল করেই জানত। এই ছিল এক রকম এর ব্যবসা। এই লোকটি সমিতির গুপ্ত বিষয় সমস্তই জানত এবং স্বামী ত্রিপুরালিঙ্গের কাছে যাতায়াত করত। অমৃত হাজরা এর দোকানে বসতেন ও কাজ শিখতেন। সমিতির অস্ত্রসস্ত্র সারাই, পরিষ্কার, ব্যবহার করার উপযুক্ত করে দেওয়া সব কাজই এ মিস্ত্রী করত। সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পরও আমরা এই হিন্দুস্থানী মিস্ত্রীর কাছে অনেক সাহায্য পেয়েছি। আমি নিজেও মেরামতের জন্য এর কাছে গেছি। অমৃত হাজড়া ছাড়া মণীন্দ্র রায় (মনা রায় নামে সমিতিতে পরিচিত) দীগেন মুখুটি প্রভৃতি খুব ভাল ভাবেই আগ্নেয়াস্ত্র মেরামতের কাজ শিখেছিল। কিছুকাল পরে অমৃত হাজরা বোমার শেল (shell) নির্মাণে খুব নিপুণতা অর্জন করেছিলেন।

ক্রমশঃ

—o—

নির্মোক

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

না, একই পাড়ায় বাড়া নয় দু'জনের, একসঙ্গে পড়েও নি কখনো। একজনের বাড়ী লেক্ রোডে, আর একজনের ত পাইক পাড়ায়। তবু সেই ছেলেবেলা থেকে দু'জনের দেখা হবার কামাই ছিল না। হরদমই দেখা হ'ত। তার কারণ দু'জনের মামার বাড়ী ছিল একই পাড়ায়, আর দু'জনেই বছরের প্রায় সব ছুটিগুলোই তাদের ঝাঁসিররাণী রোডের মামার বাড়ীতে কাটিয়ে যেত।

পাঞ্চালীর বাপ নেই, কাকা-জ্যেঠাদের সংসারে থাকতে হয়, কাজেই তার বিধবা মা মেয়েটার ছুটি হলেই, দু'এক দিনের জন্যে হলেও ভাইয়ের সংসারে পালিয়ে আসতেন। আর শিবাজীর ত বরাবরই নিজেদের লেক্ রোডের পাড়াটা এত বাজে আর বিশ্রী লাগত যে ছুটি হলেই ছুটত মামার বাড়ীতে হাঁফ ফেলতে।

শিবাজী হচ্ছে ওই ঝাঁসির রাণী রোডের বটু ডাক্তারের ভাগ্নে, আর পাঞ্চালী ওখানকার উপানন্দ উকিলের ভাগ্নী। তবে পাড়ার আর সব লোককে ভেবে তবে ঠিক করতে হ'ত কে কার ভাগ্নে-ভাগ্নী। দেখতে গেলেই দেখা যেত, হয় বটু ডাক্তারের বারান্দায় শিবাজী আর পাঞ্চালী, নয় উপানন্দ উকিলের ছাতে পাঞ্চালী আর শিবাজী। উকিল বাড়ীতে বারান্দা নেই কাজেই বাধ্য হয়ে তাঁর ভাগ্নীকে এবাড়ী ছুটে আসতে হ'ত রাস্তা দেখবার ইচ্ছেটা তীব্র হলে। আর ডাক্তার বাড়ীতে নেই ছাতে ওঠার সিঁড়ি, কাজেই শিবাজীর ঘুড়ি ওড়ানোর বাসনাটা অদম্য হয়ে উঠলে তার গতি কোথায় পাশের উকিলবাবুর ছাত ছাড়া?

তা সে সব ত সেই ছেলেবেলাকার ছেলেমানুষী। তখন 'মৌচাক' আর 'শিশুসাথী' নিয়ে কাড়াকাড়ি করে ঝগড়াও হ'ত কম নয়, 'আড়ি'র পিরিয়ডটা কোনও কোনও বার আপন আপন বাড়ী ফিরে যাওয়া পর্য্যন্ত চলত, এবং ফিরে গিয়ে অনুতাপানলে দগ্ধ হলেও চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যে সেই অনুতপ্ত হৃদয়কে মেলে ধরা যায় তা তখন তাদের বোধের জগতে ছিল না। অতএব আবার সেই মামার বাড়ীর ভরসা, আর পরবর্ত্তী ছুটির আশায় দিন গোণা।

তার পর অবশ্য যখন নাবালকত্বের গণ্ডি কাটল, তখন আর মামার বাড়ীর গণ্ডিটুকুই একমাত্র ভরসা রইল না। অলিখিত নিয়ম, আর অলক্ষিত নিষেধের গতি ভেঙে নিজেরাই নিয়মিত দেখা হবার মতো জায়গা সৃষ্টি করে নিল। অর্থাৎ বাল্যের 'ভাললাগা'টা যৌবনের 'ভালবাসা'য় পরিণত হলে আদি অন্তকালের প্রেমিক-যুগল যা যা কল-কৌশল করে থাকে ওরা তার কোন কিছুতেই ত্রুটি করল না। অভিভাবকদের সামনে সরল সাজল, অবোধ সাজল, সময় সময় কাণ্ডজ্ঞানহীনের ভূমিকা অভিনয় করে কপাল চাপড়াল, জিভ কাটল, এবং আড়ালে অনেক বাহাদুরীর হাসি হাসল সেই অভি-ভাবকদের নির্ব্বোধ, অবোধ আর অন্ধভেবে।

অবশ্য অভিভাবকদেরও ত অন্ধ, অবোধের ভান আর অভিনয়ই করতে হয়! এযুগে কেউ চট করে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেমে আসে না। আসায় যে বিপদ আছে সে কথা কোন্ বিজ্ঞ অভিভাবক না জানেন? জানাই ত কথা, যারা নেহাৎ কাণ্ডজ্ঞানহীনের ভূমিকা অভিনয় করছে, একবার তাদের দিকে ভ্রুকুটি নিক্ষেপ করে জ্ঞান প্রদান করতে গেলেই, মুহূর্ত্তে তারা লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে বসতে দ্বিধা করবে না।

কাজেই ওরা যখন হয়ত পোষ্টকার্ডেই দু'ছত্র প্রশ্ন করে, "শিবাজীদা অমুক বইটা কি তোমার আছে? না থাকলে জোগাড় করে দিতে পারবে?" আর এক ছত্রে তার উত্তর যায়, "বইটা আমার নেই, চেষ্টা করব," তখন অভিভাবকরা সেই নির্দ্দোষ পোষ্টকার্ডখানি নেড়েচেড়ে ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলেন "হুঁ"।

তবে এক্ষেত্রে অন্তত: তেমন সংগ্রামী মনোভাবও তাঁদের নেই, কারণ পাত্র হিসেবে শিবাজী অতীব উত্তম, আর পাত্রী হিসেবে পাঞ্চালী হেলা করবার মতো নয়। ঈশ্বর আনুকূল্যে আবার জাতে কুলে এক।

তবে আর বাধা দেবার কি আছে? ভালই ত হয়েছে।

নানানখানা ঝঞ্ঝাট পুইয়ে উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী জোগাড় করে বিয়ে দিলেই ত হ'ল না শুধু, জটিলতা যে অনেক!

কে বলতে পারে অভিভাবকের নির্ব্বাচিত সেই জীবন-সাথীকে তাদের মনে ধরবে কি না! কে বলতে পারে পরে সারা জীবন তাই নিয়ে মা-বাপকে খোঁটা দেবে কি না!

এ বাপু তোমাদের নিজেদের কাঁটা-খাল, নিজেদের ডেকে-আনা কুমীর, অতএব ভাল-মন্দের দায় তোমাদের। ভাগ্যে সুখ-দুঃখ যা আছে তাই ভুগবে তোমরা। একালে ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়ে বিয়ে করে ওপর-ওলাদের কাজ অনেক কমিয়ে দিচ্ছে বৈকি। তাই বাইরে একটু রাগ-রাগ ভাব দেখালেও ভিতরে ভিতরে একরকম হাঁপ ছেড়ে বাঁচছে মা-বাপেরা।

সবের মধ্যে সব, 'মেয়ের বিয়ে' বলতেই যে মোটা খরচের অঙ্কটা চোখে ভেসে ওঠে, প্রেমঘটিত বিয়েতে ত সেটা তেমন ভীষণাকৃতি হয়ে দাঁত বসাতে আসে না। এতে কন্যাপক্ষ পারল পারল, না পারল না পারল! মেয়ে-জামাইকে যৌতুক দিলে ত উত্তম, না দিলে বলার কিছু নেই।

পাঞ্চালীর বিধবা মায়ের মেয়ের বিয়ের ভরসা ত দ্যাওর-ভাসুর, ভাই-ভাজ, কাজেই মেয়ে নিজেই সুরাহা করে নিচ্ছে দেখে ভিতরে ভিতরে তিনি খুশী বৈ অখুশী হন নি।

অতএব?

অতএব প্রেমের তরণীতে দিব্যি পাল তুলে মন্দমধুর হাওয়ায় এগিয়ে যাচ্ছিল পাঞ্চালী আর শিবাজী। অবিশ্যি 'প্রেম' বলতে দৃশ্যতঃ 'গেলাম গেলাম মলাম মলাম' কিছু নেই, কারণ প্রেমের প্রকাশটা অনুক্তই আছে। চিরদিনের চেনা মানুষটার সঙ্গে ত আর নতুন করে আবেগ, মধুর রোমাঞ্চ ইত্যাদি ভাল ভাল কিছু হয় না? প্রিয়ার হাতটা যদি নিতান্তই একবার ধরতে ইচ্ছে করে শিবাজীর ত ট্রাম থেকে নামতে কি দোতলা বাসে উঠতে, "পড়ছিলে যে!" ব'লে নেহাৎই যেন ওকে পড়ে যাওয়া থেকে সামলাতে চেপে ধরে হাতখানা, হয় ত বা সে হাতটি প্রয়োজনীয় সময়ের থেকে একটু বেশীক্ষণই রাখে হাতের মধ্যে। হয় ত বা প্রিয় স্পর্শসুখ অনুভব করবার বাসনাটা প্রবল হলে পাঞ্চালী কথা বলতে বলতে শিবাজীকে অহেতুক ঠেলা মারে, "কোন দিকে মন রেখে বসে আছ? শুনতে পাচ্ছ?"

শুধু এই। বাহ্যিক প্রকাশ এর বেশী নয়। দু'জনের কেউ কোনদিন গদগদ ভাবণে বলে নি "তোমায় নইলে আমার জীবন বৃথা, আমার আকাশ মাটি চন্দ্র সূর্য্য অর্থহীন।" কিন্তু 'নইলে' যে জীবন বৃথা, চন্দ্রসূর্য্য অর্থহীন, সেটা চন্দ্রসূর্য্যের মতোই স্বীকৃত হয়ে আছে।

বিয়েটা অবধারিত, কাজেই ও নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, উচাটন নেই। ও ত হবেই। জল্পনা-কল্পনা শুধু ভবিষ্যতের যুক্ত-জীবন নিয়ে। নিত্যদিন বোকাটে চাতুরী আর জোলো জোলো কৈফিয়ৎ রচনা করে করে দু'জনে একত্রে এসে জুটে সেই ছবিতেই নতুন নতুন রং চড়ায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে। বিয়েটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে না শুধু সামান্য একটু বাধায়।

শুধু শিবাজীর একটু ভালমতো কাজ পাওয়ার ওয়াস্তা! অবিশ্যি পাবেই যে সেটাও অবধারিত। গুণী ছেলে, পিছনে বাপ-কাকা দু'দুটো খুঁটির জোর, স্বাস্থ্য ভাল, চেহারা ভাল। অতএব তার রাজধানী বাস মারে কে? তবে যেমন তেমনে ঢুকে পড়ায় বাপের আপত্তি, তার চেয়ে আপত্তি কাকার। বেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলেন ওঁরা। ইত্যবসরে খুঁটিহীন বাপ-মরা মেয়েটা ভাবল, বসে না থাকি, বেগার খাটি। হেলায়-খেলায় করি না একটা কিছু, কতদিন আর কাকা-জ্যেঠার অন্ন ধ্বংসাব?

'দমদম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে' সহকারী প্রধানা শিক্ষয়ত্রীর একটা পোষ্ট খালি ছিল, সেটা আর খালি থাকল না।

তা প্রথম প্রথম কম ক্ষেপাত না শিবাজী, যখন-তখন দেখা করত আর বলত, "এই যে সহকারিণী, কি খবর?" পাঞ্চালী বলত, "সহকারের খবরটা শোনার আশায় হাঁ করে আছি, এই খবর।"

"খুঁটি পেকে এসেছে। কাকা বলছেন, 'মারি ত গণ্ডার লুঠিত ভাণ্ডার! একেবারে মিনিষ্ট্রীতে ঢুকিয়ে তবে ছাড়ব।"

"বলছেন ত অনেকদিন থেকে।. হচ্ছে কই? তার চাইতে মোটামুটি গেরস্থালী গোছের একটায় ঢুকে পড়লে এতদিনে—"। এতদিনে যে কি হতে পারত সেটা আর ভাষায় নিজে ব্যক্ত করে না পাঞ্চালী। ব্যক্ত করে তার রুদ্ধ হয়ে আসা স্বর, অভিমানাহত ছলছলে দৃষ্টি।

শিবাজী বাড়ী এসে নতুন করে আবার কাকার কাছে আক্ষেপ আর বাপের কাছে অভিযোগ জানায়, "কি হচ্ছে ছাই? কতদিন আর বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াব?"

"বেড়াচ্ছিস ত কি? খেতে পাচ্ছিস না?" কাকা বলেন।

"খাওয়াটাই বুঝি সব?"

"হবে বাবা, সবই হবে, এই দেখ—" একদিন এক চিঠি দেখাল. কাকা। তাঁর দিল্লীর এক হোমরা-চোমরা

বন্ধু লিখেছেন, "ভাইপোকে পাঠাও চট্‌পট্, পার ত প্লেনে। মনে হচ্ছে লাগাতে পারলাম।"

প্লেনেই গেল শিবাজী। যাবার আগে 'দমদম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে'র দরজায় গিয়ে ধর্ণা দিয়ে খবর দিয়ে গেল "সহকার চললেন। সংবাদ শুভ।"

সে রাত্রে আর ভাল করে ঘুম হ'ল না পাঞ্চালীর, আবেগে প্রত্যাশায় মন কেমন করার জন্যে। মনে মনে নিজেকে দিল্লী পৌঁছে দিল, তার না-দেখা না-দেখা রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল শিবাজীর সঙ্গে, আর একখানি ভালবাসায় গড়া সংসারের স্বপ্ন দেখতে লাগল সরারাত জেগে জেগে।

এ সংসার ত আজকের গড়া নয়! এর নক্সা আঁকা হয়েছে সেই কোন বাল্যকালে, আর ঘর গড়া হয়েছে তিলে তিলে প্রতিদিনে। বাল্য থেকে কৈশোরে, কৈশোর থেকে যৌবনে! তা ছাড়া! হ্যাঁ, তা ছাড়াও একটা কথা আছে বৈকি। আবাল্যের সাহচর্য্যে যে তৃষ্ণা বাসনা কোনদিনই তেমন তীব্র হয়ে ওঠে নি, সেটাও যেন আজকাল প্রায়ই ভিতরে ভিতরে মাথা তুলছে। বলছে, 'আর কতদিন? আর ত পারা যায় না।'

সারারাত্রি প্রায় জেগে কাটিয়েও সকালবেলা খোলা জানলায় তাকিয়ে পাঞ্চালার মনে হ'ল আকাশ বুঝি আজ নীলের পরশ সাজিয়ে বসেছে। মনে হ'ল সূর্য্যের সব রং বুঝি রূপোর জল হয়ে গলে গলে ছড়িয়ে পড়ে ঝকঝকে করে তুলেছে সেই নীলকে। মনে হ'ল পৃথিবীর সমস্ত শব্দ একটিমাত্র সঙ্গীত হয়ে সেই রূপোমাজা নীল আকাশের গায়ে তরঙ্গ তুলে তুলে বেড়াচ্ছে। সে সঙ্গীতের সুর "আর হবে না দেরী, আর হবে না দেরী!"

দেরী নেই, আর দেরী নেই, এখন আর দিন গোণার পালা নয়, গোণা দিনের পালা।

চা খেতে বসে আজ পাঞ্চালীর ছোট খুড়ির অতি তীক্ষ্ণ মুখটা বেশ যেন মোলায়েম মনে হ'ল। ভাত খেতে বসে জ্যেঠির চিরবিরক্ত মুখখানা স্নেহমণ্ডিত লাগল। এ সংসারে যে কুশ্রীতা আর যে অসৌন্দর্য্য অবিরত চোখকে আর মনকে পীড়িত করেছে, আজ যেন মনে হ'ল সেগুলোর উপর একটা সুষমার আবরণ বিছান। প্রতি মুহূর্ত্তে যেখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে হয়, আজ সেখানটা ছেড়ে চলে যাবার সময় আসন্ন হয়ে এসেছে ভেবে মনটা একটা মনকেমনে টনটন করে উঠল।

এই কোমল হয়ে আসা মনটায় পাঞ্চালীর ইচ্ছে হ'ল সামনের বারে মাইনে পেলেই শুধু বাড়ীর কুচোকাচাদের টফি লজেন্স দিয়ে না সেরে বড়দেরও কিছু কিছু উপহার দেবে। 'জ্যেঠিকে একটা চওড়া লাল-পাড় তাঁতের শাড়ী, খুড়িকে ছাপা-পাড়ের সিল্ক। মাসের টাকাটা প্রায় সবই সংসার খরচ বলে জ্যেঠার হাতে তুলে দিতে হলেও এই উপহারের ইচ্ছেটা প্রবল হ'ল।

স্কুলে গিয়েও বাজতে লাগল একটা মধুর সুরের রেশ। বিষণ্ণ মধুর।' এদেরও ত ছেড়ে যেতে হবে। এই ক'মাসেই বেশ ভালবাসা পড়ে গেছে স্কুলটার উপর। মনে মনে ঠিক করল ভবিষ্যতে যখনি কোন সময় দিল্লী থেকে আসবে, স্কুলে দেখা করে যাবে। হয় ত বা টুকটাক কিছু উপহার আনবে বাংলার টিচার উমার জন্যে, অঙ্কর টিচার সুনন্দার জন্যে।

তখন নিশ্চয়, মনে মনে হাসল পাঞ্চালী শিবাজী ওর ভালবাসার ভাগীদারদের নিয়ে ঠাট্টা করবে। পাঞ্চালীও ঠাট্টা করবে, "তবু ত ওরা মেয়ে, ছেলে হলে না জানি—"

চিন্তায় ব্যাঘাত পড়ল।

স্কুলের সেক্রেটারী ভবেশবাবু এসেছেন, অফিস ঘরে ডাক পড়েছে।

কি ব্যাপার!

ব্যাপার বোঝালেন ভবেশবাবু। হেডমিষ্ট্রেস্ তিন মাসের ছুটি নিচ্ছেন, এই সময়টা পাঞ্চালী, তাঁর কাজটা চালিয়ে নিতে পারবে কি না!

কাজ চালিয়ে নিতে! হেড মিষ্ট্রেসের সেটা হয় ত অসম্ভ নয়, কিন্তু কই? ছুটি নেওয়ার কথা ত শোনে নি পাঞ্চালী! কালও কতক্ষণ কথা হয়েছে।

শোনে নি, তার কারণ হেড মিষ্ট্রেসেরও এটা আকস্মিক সিদ্ধান্ত। অসুস্থ মাকে নিয়ে চেঞ্জে যেতে হবে তাঁকে। সঙ্গে আর কার যেন যাবার কথা ছিল, তার যাওয়া হ'ল না তাই! ভবেশবাবুর কথায় মনে হ'ল এই নিয়ে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে তাঁর কিছু কিঞ্চিৎ বচসা হয়ে গেছে। মহিলাটি বোধ করি বাধা পেলে কর্মত্যাগেও পশ্চাদ্‌পদ নন।

রাজী হতেই হ'ল পাঞ্চালীকে। সকালের হাল্কা মনটা আর রইল না। কিন্তু কর্ম্মের ভারের একটা মোহও আছে, সে মোহ মানুষকে কঠিনের দিকে, দুরূহের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

রাজধানীতে মোটা একটা চাকরি বাগিয়ে এল শিবাজী। ক'দিন পরেই জয়েন করতে হবে, দশদিনের কড়ারে কলকাতায় এসেছে গোছগাছ করতে। "কিন্তু শুধু জামা, কাপড়, বিছানা, বাক্স গুছিয়ে আর কি ফল হ'ল", বলল শিবাজী হতাশ-নিশ্বাস ফেলে, "জীবনটাকে যদি এর মধ্যে গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে যেতে

পারতাম তবে না! কে জানত পাঁজী আর পুরুতকুল এমন ভাবে আমার শত্রুতা করবে?"

অবশ্য এটা শিবাজীর মিথ্যা আক্রোশের কথা। পাঁজী আর পুরুতকুলের সাধ্য কি যে শত্রুতা করে যদি বাড়ীর লোকেরা তাঁদের সহায় না হ'ন। শিবাজীর বাবা আর পাঞ্চালীর মা যদি ঘোষণা করতেন, "হোক ভাদ্র মাস, এই মাসেই হোক বিয়ে।" ওরা কি করতে পারত!

কিন্তু তাঁরা তা করলেন না, কাজেই শিবাজীর এই হতাশ নিশ্বাস। শুধু ভাদ্র নয়, আশ্বিন কার্ত্তিক আরও দু'মাস বন্ধ। পাঞ্চালী ভাবল তা এক হিসেবে ভালই হ'ল, মাত্র ক'দিন আগে সেক্রেটারীকে কথা দিয়েছি তিন মাসের দায়িত্ব নিয়ে, এর মধ্যে হঠাৎ বিয়ের সানাই বেজে উঠলে বিশ্রী একটা অবস্থার সৃষ্টি হ'ত। লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারতাম না তাঁর কাছে, কারও কাছে। শিবাজীকে বলল মৃদু হেসে, "এতদিনই যখন ধৈর্য্য ধরতে পারলে!"

অঘ্রান মাসে বিয়েটা হবে ঠিক হ'ল।

অগত্যাই শুধু জামাকাপড় গুছিয়ে নিয়ে চলে যেতে হ'ল শিবাজীকে। গিয়ে লম্বা একখানা চিঠিও লিখে ফেলল। মনে হচ্ছে ধৈর্য্যের বাঁধ বুঝি আর থাকছে না।

কিন্তু বিধাতা নিষ্করুণ!

পাঁজী-পুঁথি যখন ঘোষণা করল বাধামুক্ত করে দিলাম, তখন অফিসে ছুটি মিলল না শিবাজীর। তার উপর আর এক বিভ্রাট, চাকরিটা যত সহজে জুটে গিয়েছিল, তত সহজে আস্তানা জুটছে না। কোয়ার্টার্স নেই। কাকার বন্ধুর বাড়ীতেই এখনও কাটাতে হচ্ছে। অবশ্য আশ্বাসের কথা—শিবাজীর এবং শিবাজীর অনুরূপ পদমর্য্যাদা সম্পন্ন কতিপয়দের জন্য সরকার বাহাদুর উপযুক্ত আস্তানা গড়াচ্ছেন! লাখ লাখ টাকা ঢেলে কিছুসংখ্যক ভেতর-ফাঁপা, ওপর-চটক, বাড়ী হচ্ছে, তারই একটা শিবাজীর অধিকারে আসবে আশা পাওয়া গেছে।

পাঞ্চালীকে আশ্বাসলিপি পাঠায় শিবাজী 'সবুরে মেওয়া ফলে' এই নীতিবাক্য স্মরণ করে বসে আছি।"

তা সবুরটা পাঞ্চালীর পক্ষে শাপে বর হচ্ছে। কারণ পাকাপাকি ভাবে প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর পোষ্টটাতেই বসতে হয়েছে তাকে এখন। সেক্রেটারীর সঙ্গে বনি-বনাও না হওয়ায় প্রধানা পদত্যাগ করেছেন।

ইত্যবসরে স্কুলটাও পরিসরে বেড়ে চলছে, কাজের ভিড়ে পাঞ্চালীর হাঁফ ফেলবার সময় নেই। মোটা গোছের একটা গবর্ণমেণ্ট 'এড' পাওয়া গেছে স্কুল-বিল্ডিঙের জন্য, তাই নিয়ে নিত্য স্কুল কমিটির মিটিং বসছে, পাঞ্চালীকেও তাতে যোগ দিতে হচ্ছে অগত্যা। আগের প্রধানা ছিলেন একটু এক-বগ্‌গা গোছের, বনত না প্রায় কারো সঙ্গেই, পাঞ্চালীর জেদ কম, ধৈর্য্য বেশী। বিবেচনা বুদ্ধি আছে, কর্ম্মক্ষমতাও প্রচুর। সকলেই সম্ভ্রমের চোখে দেখে তাকে, পরামর্শ নেয় তার। কাজেরও তার তাই অবধি নেই। ঠাণ্ডামাথা আর কর্ম্মশক্তি, এই থাকা মানেই তো জগতের যত কাজ এসে ঘাড়ে চাপা।

তবু, স্কুলে আসার পর স্কুলের এই বাড়-বাড়ন্তয় বেশ একটু নেশা এসে গেছে পাঞ্চালীর। কাজের নেশা, ভাল কাজ দেখাতে পারার নেশা। নিজের উপর আস্থা বেড়ে গেছে অনেকটা। স্কুলটাকে সর্ব্বার্থসাধক করে তোলা যায় কি না তাই নিয়ে নিজেই আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে।

সেক্রেটারী যখন তখন কৃতজ্ঞচিত্তে জানাচ্ছেন ভাগ্যিস আপনাকে পেয়েছিলাম!"

এদিকে নতুন বিদ্যালয় ভবনের সংলগ্ন প্রাঙ্গণে শিক্ষয়িত্রীদের জন্য আবাস তৈরি হচ্ছে।

মাঘ মাসটাও যেতে বসল?"

হতাশ নিশ্বাস ফেলেন পাঞ্চালীর মা।" "অতবড় চাকরি-হ'ল শিবাজীর অথচ থাকবার বাড়ী জুটছে না, কি হতচ্ছাড়া কালই পড়েছে বাবা!" ইস্কুল ইস্কুল আর কাজ কাজ করে এত মেতেছে যে তার সঙ্গে দুটো সুখ দুঃখের কথা কইবারও সময় নেই। বাড়ীতে আসে তাও কাগজপত্র খাতা ফাইল কত কি নিয়ে।

মেয়েকে মাঝে মাঝে বকেন তিনি, "মাইনে দিচ্ছে কাজ করছিস এইত সম্পর্ক, তবে আবার তা নিয়ে এত মাথা ঘামানো কেন তোর? ইস্কুলটা কি তোর নিজের হয়ে যাবে?"

মেয়ে তর্ক করে না, প্রতিবাদ করে না, শুধু মার দিকে চেয়ে একটু অনুকম্পার হাসি হাসে।

মাঘ গেল, সঙ্গে সঙ্গে সহসাই দীর্ঘ এক টেলিগ্রাম এসে হাজির হ'ল শিবাজীর। কোয়ার্টার্স মিলেছে, ছুটিও। তবে অল্পদিনের জন্যে। সামনের সপ্তাহেই আসছে সে, সমস্ত কিছু যেন প্রস্তুত থাকে, সে এসেই যাকে বলে একেবারে ছাঁদনাতলায় এসে দাঁড়াবে।

মুহূর্তে লেক রোড আর পাইকপাড়া প্রায় একপাড়া হয়ে উঠল।

এবাড়ী ওবাড়ী দু বাড়ীতে নাপিত, পুরুত স্যাকরা, ময়রা, হালুইকর, ডেকরেটার একযোগে সকলের তলব পড়ল, মার্কেটিঙের সমারোহ সুরু হয়ে গেল বীর-বিক্রমে। পাঞ্চালীর মা দিন পেয়ে মেয়েকে গঞ্জনা দিয়ে উঠলেন, "নাও এবার চাকরিতে দাঁড়ি টানো? গায়ে হলুদ মাখা পর্য্যন্তও কি ইস্কুলে ছুটবে?"

চাকরিতে দাঁড়ি।

পাঞ্চালী বিচলিত স্বরে বলে, "দাঁড়ি আবার কি, ছুটির জন্যে দরখাস্ত করছি।"

"ছুটি! ছুটির জন্যে দরখাস্ত? বিয়ে করে তোকে এখানে রেখে যাবে শিবাজী? না কি রোজ একবার করে প্লেনে চড়ে এসে ইস্কুল সামলে যাবি?"

পাঞ্চালীর চাকরি হয়ে ইস্তক দ্যাওর-ভাসুরের সংসারে মান-সম্মান বেড়েছিল ভদ্রমহিলার, ইচ্ছে মত দু'পাঁচ টাকা খরচ করেও বাঁচছিলেন হাত মেলে, কিন্তু আপাততঃ তাঁর বাক্য-বিন্যাসের ভঙ্গিতে মনে হ'ল, পাঞ্চালী যেন গোঁয়াতুঁমির বশে খুব একটা কিছু গর্হিত কাজ করছিল, এতদিনে তিনি শাসনের সুযোগ পেয়েছেন।

দেড়হাজারী জামাই পেয়ে মেজাজ গরম হয়ে গেল ভদ্রমহিলার, না কি মেয়ের উপর সন্দেহের আতঙ্কে আগে থেকেই রণসাজে সাজছেন? পাছে পাঞ্চালী তার 'স্কুল-স্কুল' করে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, তাই সেই স্কুলকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতে চান?

তা নস্যাৎ তো শিবাজীও করেছে। গোড়া থেকেই করে, আজতো করবেই। টেলিগ্রামের পরবর্ত্তী যে চিঠি এসেছে তার, সে চিঠি পাঞ্চালীর নামে। এতদিনের প্রতীক্ষা, এতদিনে সফলতার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে বলে বেশ একটু কবিত্বই করে ফেলেছে প্রথমটায়, তার পর উচ্ছসিত বর্ণনা দিয়েছে সদ্যপ্রাপ্ত সরকারী আস্তানার। পাঞ্চালী যে বাড়ী পেয়ে একেবারে বিভোর হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নাস্তি। ভয় হচ্ছে ঘর, সংসার পেয়ে শিবাজীকেই না শেষ পর্য্যন্ত অবান্তর বলে অবহেলা করে। লিখেছে শিবাজীর সহকর্মী বন্ধুমহল শিবাজীর চিরপরিচিতা এবং নবপরিণীতাকে দেখবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে। আর অবশেষে লিখছে 'তোমার' দমদম উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবার আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়বে আর কি! এমন একখানি একাধারে সর্ব্বগুণ-সম্পন্নাকে কি আর পাবে?"

পাঞ্চালী স্কুল থেকে ফিরে মায়ের বকুনি খেতে খেতে চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়েছিল, তার পর ঠেলতে ঠেলতে গিয়ে ঠেকলো একেবারে সেই অনেক রাত্রে। হাতমুখ ধুতে না ধুতে এল স্যাকরা, এল বেনারসীওয়ালা, এলেন বটু ডাক্তার, এলেন উপানন্দ উকিল, তাঁরা পাঞ্চালী আজকে পর্য্যন্তও স্কুলে গিয়েছিল শুনে ভর্ৎসনা করলেন, বিস্ময় প্রকাশ করলেন, এবং কালই কাজে ইস্তফা দিয়ে দেবার জন্যে নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করলেন। উপানন্দ উকিল তো ইস্তফাপত্রের খসড়া পর্য্যন্ত ছকে দিলেন, এবং উদাত্তকণ্ঠে আশ্বাস দিলেন, "আচমকা ছেড়ে দিলে তোর ওই 'দমদম উচ্চ' যদি কেস্ করতে আসে আমি আছি।"

অনেক কথা, অনেক গোলমাল, অনেক হিজিবিজির পর অনেক রাত্রে চিঠিখানা ফের চোখের সামনে মেলে ধরে বসলো পাঞ্চালী। "দীর্ঘকাল ধরে এ যাবৎ দুজনে যে সংসার গড়েছি, এবার একা তোমার সে সংসার গুছোবার পালা এসেছে বুঝলে হে প্রধানা? বিশ্বজগৎ থাক বিশ্বের বাইরে, তোমার, আমার মাঝে আর কিছু নাইরে! অবস্থাটা মন্দ নয়, কি বল?"

সমস্ত চিঠিটা নতুন করে পুঙ্খানুপুঙ্খ পড়বে বলে বসেছিল পাঞ্চালী, যেন কেমন আলিস্যি এল, মুড়ে রেখেছিল বালিশের তলায়, আলো নিভিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে বসে রইল চুপচাপ। তাকিয়ে রইল নক্ষত্রগাঁথা অনন্ত আকাশের দিকে।

কিন্তু যতই নক্ষত্র খচিত হউক আকাশ ত শূন্য মাত্রই। চিরদিনের জানিত সত্য। তবু হঠাৎ আকাশটা এত বেশী শূন্য লাগছে কেন?

শূন্য আর অস্পষ্ট!

যেন আকাশটা হঠাৎ কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে—অনন্ত ধূসরতায়।

উপানন্দ যে ইস্তফাপত্রের খসড়া করে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা দেখেশুনে ঠিকমতো করে লিখে রাখলে ভাল হ'ত, সকালে সময় হবে না। অথচ আর দেরী করা চলে না। উঠে ফের আলো জ্বালাল পাঞ্চালী, খসড়া-কাগজটা খুঁজতে লাগল।

আশ্চর্য্য, কোথায় যে গেল!

এই ত স্কুলের এই ফাইলগুলোর সঙ্গে রেখেছিল! সেও খসড়াপত্র। মেয়েদের হাফইয়ার্লির পরীক্ষাপত্র তৈরি হচ্ছে, তারই খসড়ার ফাইল।

এ পরীক্ষা যখন হবে, তখন আর পাঞ্চালী এখানে থাকবে না। বিশ্বজগৎ রবে বিশ্বের বাইরে! কল্পনা করল, একখানি নিভৃত নির্জ্জন নীড়, সেখানে বিশ্ব-বিস্মৃত হয়ে যাওয়া দুটি প্রাণী। আর দু'জনের "মাঝে আর কিছু নাহি রে!"

সমস্ত বিশ্বের বিনিময়ে সেই একখানি নীড়, সেই একখানি ঘর। যে-ঘর আবাল্যের স্বপ্নছবি। কিন্তু স্কুলের এই কাগজপত্রের গোছার সামনে বসে হঠাৎ আগাগোড়া ব্যাপারটাই কেমন অদ্ভুত অসম্ভব লাগল পাঞ্চালীর।

ইস্তফাপত্রের খসড়া খুঁজছিল সে?

পাগল হয়ে গেছে না কি?

এই গতকালই না শিক্ষাবিভাগ থেকে টাকা মঞ্জুর করে প্রতিশ্রুতি-পত্র দিয়েছে? বলেছে না স্কুলকে উপযুক্ত উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে সরকার থেকে উপযুক্ত সাহায্য মিলবে?

এই সময় স্কুল-বোর্ডের একান্ত ভরসাস্থল, বলতে গেলে যার চেষ্টাতেই এতটা সম্ভব হয়েছে, সেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আচমকা স্কুলটাকে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে লালচেলির আঁচলে মুড়ে বরের পিছন পিছন গুটি গুটি গিয়ে ঢুকবে বাসর-কক্ষে?

এত বড় একটা বিসদৃশ ব্যাপারের হাস্যকর অযৌক্তিক দিকটা কিছুতেই কারও চোখে পড়ছে না কেন?

সকালে উঠে বলল, "মা, তোমার ওই সব তারিখ-টারিখ পিছিয়ে দাও, এখন অসম্ভব।"

"তারিখ পিছিয়ে দেব? বিয়ের তারিখ?" মা ঝেঁকে উঠে বললেন, "তুমি পাগল হয়েছ বলে ত আর সংসার-সুদ্ধু লোক পাগল হয় নি? পরশু সকালেই শিবাজী আসছে, তা মনে রেখ।"

"ওকে নয় আসতে বারণ করে—তার করে দাও না?" অসহায়, অসহায় ভাবে বলল পাঞ্চালী, "এখন যে বড় শোচনীয় অবস্থা।"

"ওকে বারণ করে—তার করে দেব? কি কৈফিয়ৎটা দেব শুনি?"

"বল যে, স্কুলের ব্যাপারে আমার এখন মরবার সময় নেই—"

মা কথা শেষ হতে দিলেন না, মেয়েকে ধিক্কার দিয়ে উঠলেন, "তা সেটা বরং তুমি নিজেই দাও গে। ছি ছি পলি, স্কুল-স্কুল করে এমন অজ্ঞান হয়ে গেছিস্ তুই যে, এতদিনের এত ভাব-ভালবাসা ভুলে যাচ্ছিস্?"

"ভুলে আবার কি যাব? বলছি আর দু'তিনটা মাস সবুর করতে। অবস্থাটা একটু—"

"দু'তিন মাস? বলতে তোর একটু আটকাল না পলি? শিবাজী না জানিয়েছে সাত-আট মাসের মধ্যে আর ছুটি পাবে না!"

"তা বেশ, না হয় তাই-ই। এতদিন যদি গেল—!"

"এতদিন গেছে বলেই—আর একদিনও যাবে না।" মা ক্রুদ্ধমুখে রায় দেন, "তুই কি মনে করছিস, জগৎসংসার তোর ইচ্ছায় চলবে?"

"আমার ইচ্ছায় নয় মা," একটু বুঝি গম্ভীর হ'ল পাঞ্চালী, "জগতে একটা কর্ম্মচক্র আছে, তার ইচ্ছায় সংসার চলে।"

"ভারী তোর কর্ম্মচক্র! ক'টা টাকা রোজগার করতে শিখে দেখছি ভারী অহঙ্কার হয়েছে তোর।"

"টাকাটাই আসল নয় মা।"

"বেশ নয়, টাকা নয় মানুষই হ'ল। খুব মানী হয়েছিস তুই। কিন্তু এতদিন পরে তুই যদি এখন বায়নাক্কা তুলিস, শিবাজীর মন ঘুরে যেতে পারে—সে ভয় নেই?"

"মন ঘুরে যাবে!" পাঞ্চালী হেসে ফেলে বলে, "কি যে বল! এতদিন ওযে এত বায়নাক্কা করল, কই আমার ত মন ঘোরে নি?"

মা প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে বললেন, "তুই-ই এক হ'ল?" তার পর দৃঢ়স্বরে বললেন, "পাগলামি খেয়াল ছাড়, বিয়ে তোমাকে ওই তারিখেই করতে হবে।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, বিয়ে ওই তারিখেই হবে।" বলে নিজের ঘরে গিয়ে কাগজপত্রে মন দিল পাঞ্চালী।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শিবাজী এল, শুনল—পাঞ্চালীর আবেদন। তার পর হেসে উঠে বলল, "আমার শালী নেই বলে কি তুমি সে পোষ্টটাও ক্রীয়েট্ করছ?"

"তার মানে?"

"তার মানে, 'বিয়ের পর অন্ততঃ তিন-চার মাস' তুমি এখানে পড়ে থাকবে, এ প্রস্তাবের মতো জোরাল-তামাসা শ্যালিকার পক্ষেই সম্ভব।"

"জিনিসটাকে এতই বা অযৌক্তিক ভাবছ কেন?"

"একেবারে অযৌক্তিক বলেই।"

"বলছি ত, স্কুলটাকে অনেক চেষ্টায় দাঁড় করাচ্ছি—"

"নিকুচি করেছে তোমার স্কুল! 'দমদম বালিকা-

বিদ্যালয়' দাঁড়াল কি ঘাড় ভেঙে পড়ল তাতে তোমার কি এসে যাচ্ছে?"

মায়ের দিকে মাঝে মাঝে যেমন অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকায় পাঞ্চালী, তেমনি দৃষ্টিতে একবার তাকাল।

শিবাজীর অবশ্য এখন এ সব দৃষ্টির কারুকার্য্য বোঝবার মতো মনের অবস্থা নয়, তাই সরবে হেসে প্রবল স্বরে বলে, "কত মাইনে দেয় তোমায় দমদম? আমি সেটা পুষিয়ে দেব।"

"মায়ের মতো তুমিও ওই টাকার কথাটা তুল না, দোহাই তোমার!"

"তবে কোন কথাটা তুলব?" শিবাজী হতাশ ভাবে বলে, "তোমার ওই ভবেশ-বুড়ো যদি অত টেকো বুড়ো না হ'ত, তা হ'লেও না হয় তোলবার মতো একটা বিষয় পাওয়া যেত। হতভাগা দমদম বিদ্যালয়কে 'সর্ব্বার্থ সাধক' করে তুলতে পারলেই তোমার পরমার্থলাভ হবে, এইটাই কি বিশ্বাস করতে হবে?"

"তা কথাটা এতই কি অবিশ্বাস্য? মানুষের জীবনে পরমার্থ ত একটা থাকবেই।"

"তা হলে এইটাই তোমার সঙ্কল্প?"

"এতক্ষণ ধরে তাই ত বোঝাচ্ছি।"

"অর্থাৎ, বিয়ে করেও স্বামীর ঘর করবার ফুরসৎ তোমার হবে না?"

"কি মুস্কিল চিরকালের মতো বলছি কি? ক'টা মাসের জন্যে—"

হঠাৎ ভারী রুক্ষ গলায় বলে উঠে শিবাজী, "আর আমি যদি বলি আমার আর কোন দিনই ফুরসৎ হবে না?"

সত্যি মেজাজকে আর ঠাণ্ডা রাখতে পারছে না বেচারা। কিন্তু পাঞ্চালী নিজেকে আশ্চর্য্য রকম ঠাণ্ডা রাখে। খুব শান্ত গলায় বলে, "তা হলে মেনে নিতে হবে বিয়েটা এ জন্মের মতো স্থগিত রাখতে হবে।"

শিবাজী কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে ক্ষুব্ধ গলার বলে, "আমার চাইতে তোমার ওই স্কুলের কাজটাই বড় হ'ল?"

"তোমার চাইতে নয়!"

"তবে?"

"সে তুমি বুঝবে না!"

না, সত্যিই বুঝবে না।

বোঝানোর চেষ্টাও বৃথা। এ-সমাজের পুরুষ সমাজ কবে আর মেয়েদের জীবনের পরমার্থকে বুঝেছে? বুঝতে চেয়েছে? বুঝলে ত অনেক সমস্যা আর সংঘর্ষের সমাধান হ'ত!

—:—

ময়না

(ত্রিঅঙ্ক নাটক)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

পাত্র-পাত্রী

ইশাক — পার্ক সার্কাসের অধিবাসী প্রৌঢ় ভদ্রলোক। গৌরবর্ণ দীর্ঘায়ত দেহ, উন্নত সুগঠিত নাসিকা, সযত্নে ছাঁটা কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফ।

আজিজ — ইশাকের যুবক পুত্র। পিতার চেয়ে মাথায় খাটো, কিন্তু সুপুরুষ। দাড়িগোঁফ রাখে না।

সুললিত — পার্ক সার্কাসের অধিবাসী প্রৌঢ় ভদ্রলোক। কিঞ্চিৎ স্থূলকায়, সদাহাস্য মুখ দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন।

সুমোহিত — সুললিতের যুবক পুত্র, আজিজের সমবয়সী বন্ধু এবং তার সঙ্গে একই অফিসে কাজ করে। ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফের রেখা। প্রিয়দর্শন।

ভূপেন — বালিগঞ্জ রেফুজীক্যাম্পের যুবক কর্ম্মী।

আশু — ভূপেনের সহকর্ম্মী।

অনিমেষ — ”

পীযূষ — ”

নির্ম্মল — ”

নারায়ণ — পার্ক সার্কাসের অধিবাসী অপর একটি ভদ্রলোক, বয়স পঁয়তাল্লিশের কোঠায়। রোগা ছিপছিপে গড়ন, গম্ভীর-প্রকৃতির লোক। গোঁফদাড়ি রাখেন না।

কার্ত্তিক — সুমোহিতের ভৃত্য।

বলাই — বালিগঞ্জ ডিফেন্স পার্টির একজন কর্ম্মী।

এ ছাড়া পার্ক সার্কাস রেফুজী ক্যাম্পের একজন মুসলমান যুবক কর্ম্মী, আট নয় বৎসর বয়সের একটি রেফুজী হিন্দু বালক, একজন পাচক ঠাকুর, বালিগঞ্জ ডিফেন্স পার্টির আরও চার-পাঁচজন কর্ম্মী।

নিরুপমা — সুমোহিতের স্ত্রী, ৪৫এর মত বয়স। করুণা-মাখানো মুখশ্রী।

পদ্মা — নারায়ণের স্ত্রী, চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, সুশ্রী কিন্তু কিঞ্চিৎ রুক্ষ ধরনের চেহারা।

ললিতা — নারায়ণের কন্যা, বয়স উনিশ, রূপসী।

সাঈদা — ইশাকের ভগিনী, পঞ্চাশের মত বয়স, গৌরবর্ণা, দীর্ঘ-দেহা, অভিজাত বংশীয়া বলে সহজেই চেনা যায়।

দৌলৎ — সাঈদার কন্যা, বছর ত্রিশেক বয়স, ক্ষীণাঙ্গী রূপসী।

রোশন — দৌলতের ক্ষীণাঙ্গী সুন্দরী কন্যা, বছর আষ্টেক বয়স।

একটি রেফুজী হিন্দু তরুণী, শ্যামবর্ণা সুন্দরী, কবরী-ভার-পীড়িতা।

স্থান — কলিকাতা।

কাল — ১৬ই, ১৭ই, ১৮ই এবং ১৯শে আগস্ট, ১৯৪৬।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(১৬ই আগস্ট রাত সাতটা। পার্ক সার্কাসে ঝাউতলা রোডে ইশাকের বাড়ীর একতলার একটি ঘর। পেছনে ডানদিক্ ঘেঁষে একটি খড়খড়িওয়ালা জানালা, খড়খড়িগুলো বন্ধ। বাঁদিকে আধ খোলা দরজা, সেইখানে দাঁড়িয়ে ইশাক মাঝে মাঝে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখছেন, মুখে চোখে উদ্বেগের ভাব। ইশাকের পরণে শাদা ঢোলা ইজের, শাদা জোব্বা। ঘরের মধ্যে দরজা আর জানালার মাঝখানে, পেছনের দেয়াল ঘেঁষে একটি তক্তপোশ। সামনের দিকে ডানপাশে একটি সাধারণ টেবিল, তার তিন পাশে গুটি পাঁচেক হাতাবিহীন চেয়ার। নেপথ্যে পেছনে দূরে বহু কণ্ঠে আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর! দরজা ঠেলে ত্রস্তপদে আজিজের প্রবেশ। আজিজের পরণে শাদা ঢোলা ইজের, শাদা ঢোলা পাঞ্জাবী। বাপের পাশে এসে দাঁড়িয়ে দরজার পাল্লা দুটো খুলে দিয়ে)

আজিজ। এই যে এদিকে। চ'লে এস সুমু! মা, আসুন। আসুন স্যার!

(নেপথ্যে পেছনে, অপেক্ষাকৃত কাছে, আল্লাহু আকবর!. আল্লাহু আকবর!…লড়কে লেঙ্গে

পাকিস্তান, মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান।···পাকিস্তান জিন্দাবাদ···কংগ্রেস মুর্দাবাদ···আল্লাহু আকবর··· আল্লাহু আকবর! আটপৌরে পোশাকে সুললিত ও নিরুপমা বাদামী রংএর কর্ডুরয়ের ট্রাউজার্স ও সাদা হাফ শার্ট পরা সুমোহিত ও একটা এলোপাথাড়ি ক'রে বাঁধা মস্ত বড় বোঁচকা কাঁধে নিয়ে অল্প একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে কার্ত্তিকের প্রবেশ। কার্ত্তিক দরজার কাছে থেমে বাইরে ঝুঁকে কিছু একটা দেখবার চেষ্টা করছিল।)

ইশাক। (চাপাগলায় ধমক দিয়ে) এই বেওকুফ! কি দেখছ? ভেজিয়ে দাও দরজাটা।

(আজিজ দরজাটা ভেজিয়ে দিলে)

বোঁচাকাটা রাখো এই তক্তপোশের ওপরে। তার পর (ডানদিক্ দেখিয়ে) ঐ করিডরে গিয়ে দাঁড়াও বা বোস, যা তোমার খুশি।

(কার্ত্তিক ভয়ে ভয়ে বোঁচকাটাকে তক্তপোশের ওপর রেখে, একটু খুঁড়িয়ে খুড়িয়ে ডানদিক্ দিয়ে বেরিযে গেল।)

আদাব! আদাব! আপনারা এসে পড়েছেন, থাকুন আমার বাড়ীতে। তক্‌লিফ খুব হবে আপনাদের, কিন্তু কি করব, আমি নাচার। আমি হলে আপনাদের বলতাম, বেরিয়েই যখন পড়েছেন বাড়ী থেকে, চ'লে যান পাড়া ছেড়ে, মারধোর এখনো ত কিছু হচ্ছে না···হয়ত এর পর সুরু হবে। কিন্তু আজিজ কি বুঝল তা সে-ই জানে।

সুললিত। চ'লে যেতে হয়ত পারতাম। কিন্তু আপনারই ভরসাতে ত থেকে গেলাম। (হাসলেন।)

ইশাক। ভরসা খুব বেশী আর দিতে পারছি কই? সে যাক, এসে যখন পড়েছেন, থাকুন। একতলার তিনটি কামরাই আপনাদের জন্যে রইল। দুটো কামরাতে শোওয়া চলবে, একটাতে রসুই করবেন। করিডরের ওদিকে গোসলখানা। আপনাদের চাকরটা করিডরে শুতে পারে, নয়ত রসুইখানাতেই শোবে। ওকে একটু তালিম দিয়ে রাখবেন, বোকামি ক'রে ধরা প'ড়ে না সব বরবাদ করে।

সুমোহিত। ও ত ভয়ে আধমরা হয়ে আছে, আপাততঃ সব ভালমন্দের বাইরে।

ইশাক। ভীতু লোককেই ত ভয় বেশী।···আর আপনারা কথাবার্তা কিন্তু খুব আস্তে কইবেন। আমরা সবাইকে বলব ঠিক করেছি, আজিজের ফুফু, বোন আর ভাগ্নী ভবানীপুর থেকে পালিয়ে এসে এখানে রয়েছে।··· কিন্তু আপনাদের ঐ চাকরটাকে আমার ভয়।

সুমোহিত। ওকে আমি সামলাব স্যার!

ইশাক। তা বেশ! সামলিও। তবে আজিজ, এদের ত এখানে এনে তুলেছ, এখন যেন বুড়ো আব্বার ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিজে স'রে প'ড়ো না। ওঁদের তদ্বির-তদারক তোমাকেই করতে হবে, সেটা মনে থাকে যেন।

আজিজ। সে ত আমি করবই। আমি হামেশাই হাজির থাকব সেজন্যে।

(নেপথ্যে খুব কাছে, আল্লাহু আকবর!··· লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান। নিরুপমা ছেলের হাতটা চেপে ধরলেন।)

ইশাক। ভয় পাচ্ছেন, ভয়ের কারণ ত রয়েছেই।

আজিজ। না সুমু, তোমরা মোটেই ভয় করবে না। আফতাব আজিজকে তুমি ত জানো। আমাদের বাড়ীতে তোমরা যতক্ষণ রয়েছ, জান কবুল, তোমাদের কেউ কিছু করতে পারবে না।···আচ্ছা, এখন তোমরা হাতমুখ ধুয়ে একটু আরাম কর। আমি ওপর থেকে তোমাদের জন্যে কিছু সেদ্ধ আণ্ডা, রুটি, মাখন, এই সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর কিছু ত জুটোতে পারব না আজ রাত্তিরে?

ইশাক। এর পরেও জুটোতে পারবে না। তক্‌লিফ এঁদের খুব বেশীই হবে।

আজিজ। আর, দুটো শতরঞ্জি আর গুটিকয়েক কুশন পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাই দিয়ে বিছানার কাজ চালিয়ে নেবেন। পাখা খুলে রাখলে মশা কামড়াবে না।··· আপনাদের তক্‌লিফ খুব হবে, সে ত ঠিকই কথা, কিন্তু কি উপায়? (বেরিয়ে গিয়ে পেছনের দরজাটা টেনে বন্ধ ক'রে দিল।)

ইশাক। আমিও যাই, আপনারা বিশ্রাম করুন।

(বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় ডানদিক্ থেকে কার্ত্তিক ঢুকল খোঁড়াতে খোঁড়াতে, একটু উচু গলাতেই ডাকল, মা!)

এই বুদ্ধু! এত জোর গলায় কথা বলা চলবে না এখানে। আহাম্মক!

(কার্ত্তিক ভয় পেয়ে একটু বেশী খুঁড়িয়েই বেরিয়ে গেল আবার ডানদিক্ দিয়ে। পেছনের দরজাটা খুলে ইশাক বেরিয়ে গেলেন, বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ ক'রে।)

নিরুপমা। (একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে) আমাদের ব্যবস্থা ত একরকম ভালই হ'ল, কিন্তু ঐ

কার্ত্তিক বাঁদরটা ত ওদের ছোঁওয়া কোনো জিনিষ খাবে না।

সুললিত। (আর একটা চেয়ারে ব'সে) খুব ভাল কথা। ওর খাবারের ভাগটা আমায় দিও।

নিরুপমা। দেব, যদি ওর কাজগুলো তুমি সব ক'রে দাও।

(বাইরে কোলাহল। নিরুপমা উঠে গিয়ে পেছনের জানালাটার খড়খড়ি তুলে বাইরে দেখছেন।)

নিরুপমা। উঃ, ঐ লোকটাকে কি ভীষণ মারছে! লোকটা মনে হচ্ছে যেন আমাদের লছমন গোয়ালা।··· ও যে প'ড়ে গেল···ও কি ম'রে গেল?···ওগো!

সুমোহিত। (পোঁটলা খুলে কাপড়-চোপড়, তোয়ালে, ইত্যাদি বের ক'রে ক'রে রাখছিল, ছুটে গিয়ে খড়খড়ি টেনে বন্ধ ক'রে দিয়ে) মা! তুমি ওদিকে চ'লে যাও। এসব ছাইভস্ম তোমাকে দেখতে হবে না।

(নিরুপমা ফিরে এসে চেয়ারটাতে বসলেন।)

সুললিত। দুধ ব'লে কত জল এদের খাইয়েছে, আজ এরা তার শোধ নিচ্ছে আর কি?

(বাইরে কোলাহল। পাকড়ো, মারো, লড়কে লেঙ্গে, মারকে লেঙ্গে, আগ লাগা দেও, আগ লাগাও, ইধর, ইধর, পাকড়ো ইস্‌কো, পাকড়ো, ভাগতা হ্যায়, পাকড়ো, ইত্যাদি। সুমোহিত দরজার হুড়কো এটে দিল। ডাইনে করিডরের দিক্ থেকে লাল আলোর ঝলক আসছে মাঝে মাঝে, একটা বস্তি জ্বলছে অদূরে কোথাও।)

নিরুপমা। শব্দটা এইদিকেই আসছে মনে হচ্ছে না? ওরা নিশ্চয় আমাদের এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে। (উঠে গিয়ে সুমোহিতের পাশে দাঁড়িয়ে) সুমু! কি হবে?

সুললিত। কি আবার হবে?

(কোলাহল খুব কাছে এসে প্রচণ্ড হয়ে উঠে আবার দূরে যেতে যেতে ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেল। নিরুপমা আবার ছুটে যাচ্ছিলেন খড়খড়ি তুলতে।)

সুমোহিত। (চাপা গলায়) মা!

নিরুপমা। (ফিরে এসে) ওরা চ'লে গেল, না?

সুললিত। ফিরে ডাকব?

নিরুপমা। ওরা কিন্তু আমাদের বাড়াটার দিকেই গেল, বাড়ীটা বোধ হয় লুট হয়ে গেল এতক্ষণে।

(দরজায় টোকার শব্দ। নিরুপমা চেয়ারে বসেছিলেন, উঠে দাঁড়ালেন, সুমোহিত গিয়ে দরজাটার পাশে দাঁড়াল। দরজায় আবার টোকার শব্দ, এবারে বেশ একটু জোরে।)

নিরুপমা। নিশ্চয় ওরা জানতে পেরেছে। কি হবে?

সুললিত। কি আবার হবে?

সুমোহিত। (সুললিতের দিকে ফিরে) দরজা খুলব?

(দরজায় আবার টোকার শব্দ, ঘন ঘন এবং জোরে জোরে।)

সুললিত। (হেসে) যদি মনে হয়, না খুলে থাকতে পারবে ত খুলো না।

সুমোহিত। আচ্ছা, খুলছি। কিন্তু তুমি মাকে নিয়ে পাশের ঘরটাতে চ'লে যাও। সাবধান হতে ত দোষ নেই?

সুললিত। তা অবশ্য নেই। (নিরুপমার কাঁধে হাত দিয়ে তাঁকে নিয়ে বাঁদিক্ দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সুমোহিত দরজা খুলে দিয়ে এক পাশে স'রে দাঁড়ালে ইশাক ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।)

সুমোহিত। (বাঁদিকের নেপথ্যের কাছে গিয়ে একটু ঝুঁকে) বাবা! ইশাক সাহেব!

(কে এল, দেখবার জন্যে কার্ত্তিক ঢুকেছিল ডানদিক্ থেকে, ইশাক তার দিকে কট্‌মট্ ক'রে তাকাতেই সে আবার খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেল।)

ইশাক। দরজায় খিল দিয়ে রেখেছিলেন, ভালই করেছিলেন, হামেশা তাই রাখবেন। আমি বা আজিজ যখনই তদ্বির করতে আসব, দুটো ক'রে টোকা দিয়ে একটু ফাঁক দেব, তার পর আরও দুটো টোকা দেব, তখন দরজা খুলবেন। মোট চারটে টোকা, মনে রাখবেন।

সুললিত। রাখব।

ইশাক। হ্যাঁ, আর একটা কথা আপনাদের ব'লে রাখা দরকার।···বসতে পারি?

সুললিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়। এই যে, বসুন, বসুন!

(সুললিত একটা চেয়ার টেনে এগিয়ে দিলে ইশাক বসলেন। সুললিত বসলেন অন্য একটা চেয়ারে।)

ইশাক। এ্যালেনবি রোডে আমার এক বোন তাঁর মেয়ে-জামাই আর নাতনীকে নিয়ে থাকেন।···এই যাদের এখানে এনে রেখেছি বলছি আর কি। শুনলাম, ভবানীপুরে ঐ এলাকাতে শিখরা খুব উৎপাত করছে, তাই মনে হচ্ছে, ওরা হয়ত পালিয়ে আসবারই চেষ্টা

করবে। তা যদি আসে ত আপনাদের—তার পর ত এখানে আর আমি রাখতে পারব না।

নিরুপমা। আমরা ঘরগুলো ছেড়ে দেব, ঐ করিডরটাতেই না হয় মাথা গুঁজে থাকব।

ইশাক। ভবানীপুরে যা কাণ্ড হচ্ছে ব'লে শুনতে পাচ্ছি, সেখান থেকে এসে এ বাড়ীতে আপনাদের দেখলে ওরা খুশী হবে কি? আমার বোনটিকে নিয়ে মুশকিল তত নেই, কিন্তু আমার ভাগ্নীটি একটু অন্য ধাতের মানুষ। সে খুবই গোলমাল করবে।

সুললিত। ওঁরা নিতান্তই যদি এসে পড়েন, আমরা যেখানে হয় চ'লে যাব, আপনার কোনো অসুবিধা ঘটাব না।

ইশাক। (উঠে দাঁড়িয়ে) আমার অসুবিধা আর কি, ওরা এলে আপনাদের লুকিয়ে রাখা ত যাবে না, তখন আপনারাই খুব অসুবিধায় পড়বেন।...আচ্ছা, চললাম। মনে কিছু করবেন না। আজিজের উচিত ছিল, এ সব কথা আগে ব'লে তবে আপনাদের এখানে আনা। লেখাপড়াই শিখেছে, আক্কেল ত কিছু হয় নি?

(ইশাক দরজটা ভেজিয়ে দিয়ে প্রস্থান করলে সুমোহিত হুড়কো এঁটে দিল।)

নিরুপমা। তুমি ত বেশ বললে, যেখানে হয় চ'লে যাব, কিন্তু পথে বেরোলেই কচুকাটা হব যে!

সুললিত। আরে না, না, কচুকাটা হব না।

(বাইরে অস্পষ্ট কোলাহল, নিরুপমা ছুটে গিয়ে জানালার খড়খড়ি ফাঁক ক'রে বাইরে দেখছেন।)

সুমোহিত। মা!

নিরুপমা। (খড়খড়ির ফাঁকে চোখ রেখে) ওরে, মিত্তিরদের বাড়ীর সেই ছোকরা নেপালী চাকর বাহাদুরটাকে ধরেছে। মারতে মারতে নিয়ে চলেছে। ...মিত্তিররা ত বিকেল না হতেই গাড়ী চ'ড়ে সব চ'লে গেল, ঐ চাকর ছোঁড়াটার আর জায়গা হ'ল না গাড়ীতে।...উঃ, কি ভীষণ মারছে!

সুমোহিত। (ছুটে গিয়ে খড়খড়ি টেনে বন্ধ ক'রে দিয়ে) মা! এই রকম যদি কর ত এই তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, আমি এখুনি ঐ দরজা খুলে বেরিয়ে যাব ওদের মধ্যে।

নিরুপমা। না, আর করব না। (সুমোহিতের হাতটা চেপে ধ'রে জানালার পাশের তক্তপোশটাতে বসে) ওরে, ঐ নেপালী ছোঁড়াটা...ফাঁক পেলেই আসত, কত গল্প করত! জ্বর হলে প্রথমেই ছুটে এসে একগাল হেসে আমাকে বলত, জানেন মা, আমার জ্বর হয়েছে। বলতাম, তা জ্বর হয়েছে ত বাড়ী যা না। বলত, আমার বাড়ী, সে ত বহুৎ দূর মা, এখানে আমার বাড়ী কোথা? সত্যিই ত, এই পোড়া দেশে ওর বাড়ী ত নেই, তাই না আজ এমন ক'রে মরছে? (আবার খড়খড়ির ফাঁকে বাইরে তাকিয়ে) সত্যিই মরছে... ছটফট করছে পথে প'ড়ে। ওরে, ওরে, তোরা কেউ—

সুললিত। নেপাল ছেড়ে এসেছিল কেন এখানে মরতে? কে বলেছিল?

দৃশ্যান্তর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(১৬ই আগস্ট রাত ন'টা। বালিগঞ্জ ফার্ণ রোডে অন্নপূর্ণা গার্লস্ স্কুলের বাড়ীতে রেফুজী ক্যাম্প। স্কুলের একটা ক্লাস-ঘর। একটা টেবিল, একটা চেয়ার, পেছনে জানালার ধারে ব্ল্যাক-বোর্ড একটা কোণাকুণি ভাবে, গুটিকয়েক জোড়া-বেঞ্চি। ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে বড় বড় ক'রে একটা ভগ্নাংশের অঙ্ক কষা রয়েছে। শাঁখ বাজছে দূরে, নেপথ্যে জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্। ডানদিক্ থেকে ভূপেন, আশু আর নির্ম্মলের প্রবেশ, তাদের সকলেরই পরণে শাদা ট্রাউজার্স আর শাদা হাফ-শার্ট। ভূপেন চেয়ারটাতে বসলে আশু টেবিলটার এক কোণে শরীরের আধখানার ভার রেখে এক পা ঝুলিয়ে আর এক পা মাটিতে রেখে তার দিকে ঘুরে বসল। নির্ম্মল দাঁড়িয়েই রইল।)

আশু। ভূপেন, তুমি এখান থেকেই কিছু খেয়ে যাও, রাত্রে এরপর কোথায় কি জুটবে?

ভূপেন। হবে এখন।

আশু। ওদের ডেকে ব'লে দিই। (উঠে বাঁদিকের নেপথ্যের কাছে গিয়ে) ঠাকুর! ঠাকুর!

(একহাতে একটা পিতলের বালতি, অন্যহাতে পিতলের একটা হাতা, কোমরে গামছা জড়ানো একজন ঠাকুর ঢুকল।)

ঠাকুর। ডাকছিলেন?

আশু। হ্যাঁ, শোন, ভূপেনবাবু এখানে খেয়ে যাবেন। কম পড়বে না ত?

ঠাকুর। কম পড়বে কি বাবু? লোক ত অবিশ্যি বাড়ছেই, কিন্তু আমরাও সেই বুঝে হাঁড়ির পর হাঁড়ি চড়াচ্ছি। এদিকে আবার এরা কিছু খাবে না বলছে।

আশু। কাদের কথা বলছ, কারা খাবে না?

আশু। কেন, ওরা আবার কি বলছে?

ঠাকুর। বলছে ত খাবে না।

নির্ম্মল। যে-অবস্থার মধ্যে সব পড়েছে...একটু সুস্থ হোক, খাবে এখন পরে।

ঠাকুর। ওরা এখানে জলস্পর্শ করবে না বাবু!

আশু। সে কি? কেন?

ভুপেন। আশু, একটু খবর নাও।

নির্ম্মল। কতদিন এখানে এখন ওদের থাকতে হবে কে জানে? কিছু না খেয়ে, জল না খেয়ে ক'দিন থাকবে?

ঠাকুর। সঙ্গে সাত-আট বছরের একটা কচি মেয়ে গো বাবু। জল খাব, জল খাব ব'লে কাঁদছে, মাটির ভাঁড়ে ক'রে জল দিতে গেলুম, তা ওর মা দিতে দিলে না।

আশু। কি বিপদ্! কোথায় আছে তারা?

ঠাকুর। (বাঁদিকে দেখিয়ে) ঐ যে গো, ঐ ওপাশের বড় ঘরটায়।

ভুপেন। আর কে আছে সেখানে?

ঠাকুর। আমাদের হিন্দু মেয়েছেলে জনা পাঁচ-সাত আর আছেন আর কি।

ভুপেন। আশু, ওদের একসঙ্গে রাখাটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি নিয়ে এস ওদের এখানে, দেখা যাক ব্যাপারটা কি।

(বাঁদিক্ দিয়ে আশু ও তার পেছন পেছন ঠাকুর বেরিয়ে গেল। বাইরে আবার কিছুক্ষণ কোলাহল, বন্দেমাতরম্, জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্, শাঁখ বাজছে।)

ভুপেন। ওরা কখন এল, কি ক'রেই বা এল?

নির্ম্মল। এ্যালেনবী রোডে ওদের বাড়ী। কর্ত্তাটি গোলমালের জন্যে বাড়ী ফিরতে পারেন নি, বিকেল থেকে পাড়ার শিখরা ওদের বাড়ী লুট করবে আর ওদের মারবে ব'লে শাসাচ্ছিল। মেয়েটার চেঁচামেচি শুনে আমাদের এল্‌গিন রোডের আখড়ার ছেলেরা গিয়ে প'ড়ে অনেক কষ্টে ওদের উদ্ধার ক'রে এনেছে।

(আশুর পেছন পেছন বাঁদিক্ থেকে প্রথমে ঢুকলেন সাঈদা, আপাদমস্তক কালো বোরখায় ঢাকা, কেবল মুখের খানিকটা খোলা। তাঁর পেছনে সালোয়ার-কামিজ পরা রোশনের হাত ধ'রে ঢুকলেন দৌলৎ, পরণে হলদে ব্লাউজ, লাল রঙের শাড়ী, গা-ভরা জড়োয়া গহনা, পায়ে জরীদার নাগরা। তিনজনই অত্যন্ত সুশ্রী দেখতে। ভুপেন ও নির্ম্মল উঠে

ভুপেন। (নমস্কার ক'রে) বসুন আপনারা।

(সাঈদা ও দৌলৎ একটা বেঞ্চিতে বসলে রোশন তাঁদের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। মাঝে মাঝে সে রুমাল দিয়ে চোখ মুছছে।)

ভুপেন। একে জল খেতে দিচ্ছেন না কেন?

(কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ ক'রে কাটল।)

সাঈদা। দৌলৎ, বল, কি বলবে!

(রোশন ফুঁপিয়ে কাঁদছে।)

দৌলৎ। গিয়ে দেখ্ না ছুঁড়ী, কল কোথায় আছে, আঁজলা ক'রে জল খেগে যা।

আশু। এস তুমি আমার সঙ্গে, তোমাকে কলতলাতেই নিয়ে যাচ্ছি।

(আশুর পেছন পেছন মেয়েটি, ও তার হাত ধ'রে দৌলৎ বেরিয়ে গেলে বাঁদিক্ দিয়ে)

ভুপেন। আপনি জল খাবেন?

সাঈদা। এখন খেতে পারি।

(নির্ম্মল বাঁদিকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে একটা মাটির ভাঁড় আর পিতলের jug-এ ক'রে জল নিয়ে এলে সাঈদা দু'বার জল নিয়ে খেলেন।)

ভুপেন। আপনারা কি হিন্দুর ছোঁয়া খাবার খান না?

সাঈদা। গোস্ত হলে খাই না, অন্য খাবার খাব না কেন, খাই। আজকাল সবাই ত খাচ্ছে।

ভুপেন। এখানে কিছু কেন খাচ্ছেন না?

সাঈদা। সে আমার মেয়ে জানে, তাকেই জিজ্ঞেস কর, সে ফিরে আসুক।

নির্ম্মল। উনি আপনার মেয়ে, আর ছোটটি বুঝি তাঁর মেয়ে?

সাঈদা। হ্যাঁ।

নির্ম্মল। কি নাম মেয়েটির?

সাঈদা। (একটু হেসে) রোশন।

(আশুর সঙ্গে দৌলৎ আর রোশনের প্রবেশ।)

ভুপেন। নির্ম্মল যাও, এঁদের খাবারটা এইখানে আনতে বল।

দৌলৎ। আনতে হবে না, আমরা খাব না, আমাদের খিদে নেই।

রোশন। আমার খুব খিদে পেয়েছে, খুব—

দৌলৎ। চুপ, বেতরিবত, বেতমিজ!

(রোশন রুমালে ঘন ঘন চোখ মুছছে।)

সাঈদা। আচ্ছা দৌলৎ, যদি আমি খাই ত তোমরা

দৌলৎ। তোমার খুশি হয়, তুমি খাও। রোশনকে কিছুতেই এখানে আমি কিছু খেতে দেব না।

(রোশন মুখে রুমাল চাপা দিল।)

সাঈদা। ও কতদিন না খেয়ে থাকবে, যদি গোলমাল শীগ্‌গির না মেটে? মানুষ ত বিষ খেয়েই কেবল মরে না, না খেয়েও মরে।

ভুপেন। ও, এই কথা!

নির্ম্মল। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলব? আপনাদের মেরে ফেলাই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হবে, ত শিখদের সঙ্গে এত ঝঞ্ঝাট ক'রে আপনাদের এখানে আনব কেন আমরা? এ্যালেনবী রোডে আপনাদের ছেড়ে রেখে এলেই ত সে কাজ খুব সহজে সমাধা হয়ে যেত?

সাঈদা। দৌলৎ! বল্, এবারে কি বলবি।

দৌলৎ। আপনাদের অনেক মেহেরবানি। আর একটু মেহেরবানি ক'রে পুলিশে খবর দিয়ে দিন্, আমাদের কোনো একটা মুসলিম মহল্লায় ছেড়ে দিয়ে আসুক। আমাদের জন্যে আর কোনো তকলিফ তাহলে আপনাদের পোয়াতে হবে না।

ভুপেন। (হেসে) পুলিশ? পুলিশ কোথা?

আশু। কবে পুলিশকে খবর দিতে পারব, তারা আসবে, ততদিন এই বাচ্চা মেয়েটা না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে—এ হতে পারে না, এ অসম্ভব কথা।

(রোশন ফুঁপিয়ে কাঁদছে।)

নির্ম্মল। নতুন বিস্কুটের টিন একটা কিনে আনতে পারলে হয়ত এঁরা নিশ্চিন্ত মনে খেতে পারতেন, কিন্তু দোকানপাট ত দুপুর থেকেই বন্ধ, কবে যে খুলবে তারও ঠিক নেই কিছু।

(রোশন আশান্বিত মুখ ক'রে নির্ম্মলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল, এইখানটায় আবার রুমালে মুখ গুজল।)

ভুপেন। কোথাও কারও বাড়ী থেকে কিছু ফল জোগাড় ক'রে এনে দাও।

দৌলৎ। এখানে আমরা কিছুতেই কিছু মুখে দেব না।

(রোশন আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।)

আশু। ঢের ঢের মা দেখেছি, কিন্তু—

ভুপেন। আঃ, আশু! তুমি চ'লে যাও এখান থেকে।

আশু। চ'লে যেতেই ত চাইছি। এ অসহ্য।

(দ্রুত বেরিয়ে গেল ডানদিক্ দিয়ে।)

ভুপেন। ওকে কোনো কাজে কিছুক্ষণ এখন পাওয়া যাবে না। নির্ম্মল, তুমি যাও এঁদের কোনো একটা আলাদা ঘরে শোবার ব্যবস্থা ক'রে দাও গে।

নির্ম্মল। আসুন আপনারা।

(সকলের বাঁদিক্ দিয়ে নিষ্ক্রমণ। পাড়া কাঁপিয়ে রব উঠল, জয় হিন্দ্, জয় হিন্দ্, বন্দেমাতরম্ ...ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট কানে আসছে, লড়কে-লেঙ্গে পাকিস্তান, মারকে-লেঙ্গে পাকিস্তান, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, আল্লাহু-আকবর, ইত্যাদি।)

দৃশ্যান্তর।

তৃতীয় দৃশ্য

(১৬ই আগস্ট, রাত এগারোটা। ইশাকের বাড়ীর একতলার ঘর। টেবিলটার তিনদিকে ব'সে সুললিত, নিরুপমা ও সুমোহিত খাচ্ছেন।)

সুললিত। সেই কখন থেকে বলছি ক্ষিদেয় পেট জ্ব'লে যাচ্ছে, তা তুমি রাত এগারোটা না ক'রে আর পারলে না!

নিরুপমা। যা হয়েছিল ঘরদোরের অবস্থা, একটু ঝাঁটপাট না দিইয়ে এর মধ্যে ব'সে খাওয়ার কথা ভাবতেও পারি নি।

সুললিত। খাওয়ার সঙ্গে ঘরদোরের কি সম্পর্ক! রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি লোকে খায় না?

নিরুপমা। বাবা রে বাবা! খাচ্ছ ত! এখন আর এত কথা কেন? তাও বলি, ধন্যি তোমার ক্ষিদে বাপু। এই যে নারকীয় কাণ্ড চলেছে চারদিকে, তারও মধ্যে তোমার ক্ষিদেটি ঠিক আছে।

সুললিত। আমার আহারে অরুচি হলে এই নারকীয় কাণ্ড বন্ধ হয়ে যাবে কি?

(বাইরে অস্পষ্ট কোলাহল। নিরুপমা উঠে খড়খড়ি খুলতে যাচ্ছিলেন।)

সুমোহিত। (উঠে দাঁড়িয়ে) মা!

নিরুপমা। আচ্ছা, আচ্ছা, দেখব না, কাজ নেই।

(ফিরে এসে বসলে সুমোহিতও বসল। হঠাৎ পেছনের দরজায় দুটো টোকা, একটু ফাঁক, আবার দুটো টোকা।)

নিরুপমা। চাপা গলায় মেয়েরা কথা বলছে মনে হ'ল বাইরে। নিশ্চয় আজিজের ফুফুরা এসেছেন। এইবারেই হবে আমাদের মুশকিল। কি হবে?

সুললিত। কি আবার হবে? খাওয়াটা শেষ ক'রে নাও। দেখি, আর একটা ডিম দাও ত আমাকে।

নিরুপমা। আমাদের ত বেরিয়ে যেতে বলবে। তখন আমরা কোথায় যাব, ওগো!

সুললিত। দেখতেই পাবে কোথায় যাই। খাওয়াটা আগে শেষ ক'রে নাও ত? (নিরুপমার হাত থেকে ডিম একটা নিয়ে খাচ্ছেন। দরজায় আবার টোকার শব্দ, এবারে একটু জোরে জোরে।)

সুমোহিত। (উঠে দাঁড়িয়ে) এখন ত দরজাটা খুলতেই হয়।

সুললিত। একটু দাঁড়াও। (রুটিতে মাখন মাখাচ্ছেন।)

নিরুপমা। একটু দাঁড়া রে! ওরা ভাবুক না যে, আমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠতে দেরি হচ্ছে। একটু স্থির হয়ে ভেবে নে, কোথায় যাবি, কি করবি।···ওগো খাওয়াটা রাখো না এবারে।—ঢের ত খেয়েছ।

সুললিত। খেতে খেতে কি ভাবা যায় না? (খাচ্ছেন।)

নিরুপমা। বল না, কি ভাবছ? কোথায় যাব আমরা? আমাদের বাড়ীটাতে ত শুনেছি গুণ্ডাদের আস্তানা হয়েছে।

(দরজায় এবার খুব জোরে টোকার শব্দ। সুললিতের খাওয়া শেষ হয়েছে, তিনিও উঠে দাঁড়িয়েছেন। নিরুপমা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সুমোহিতের মাথায় হাত বুলোলেন, তার পর স্বামীর হাতটা চেপে ধরলেন। সুললিত তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্যে তাঁর পিঠে আর একটি হাত রাখলেন। সুমোহিত গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে এক পাশে সরে দাঁড়ালে আজিজ ঢুকল ত্রস্তপদে।)

আজিজ। আপনাদের ঘুম ভাঙালাম, মাফ করবেন। কিন্তু (বাইরের দিকে দেখিয়ে) এই এঁরাও এসে প'ড়েছেন, এঁদেরও জায়গা দিতে হবে, উপায় নেই। এই যে এদিকে। আসুন, আসুন আপনারা।

(প্রথমে নারায়ণ, তারপর পদ্মা এবং সর্ব্বশেষে ছোট্ট একটি খাঁচা হাতে ললিতার প্রবেশ। খাঁচার ভিতর একটি ময়না। সকলের পরণে আটপৌরে সাধারণ পোশাক। আজিজ দরজাটা ভেজিয়ে দিল।)

নিরুপমা। আসুন, আসুন বোন, এসো মা। কি ভাগ্যি। আমরা আরো ভাবছিলাম—

সুললিত। আসুন নারায়ণবাবু।

(সুমোহিত পদ্মাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল বসতে, নিরুপমা ললিতাকে বসালেন, তার পর নিজেও একটা চেয়ার নিয়ে পদ্মার পাশে বসলেন। সুমোহিত পাখীর খাঁচাটা সরিয়ে রাখবে ভেবে ললিতার হাত থেকে সেটা নিতে যাচ্ছিল, ললিতা ছাড়ল না। ডানদিকের নেপথ্যের পাশ ঘেঁষে নিজে যেখানে বসেছিল সেইখানে পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল খাঁচাটা।)

পদ্মা। ওটাকে ও ছাড়বে না। ওটার দাম ওর নিজের প্রাণের চেয়ে, আমাদের সকলের প্রাণের চেয়ে ঢের বেশী ওর কাছে।···তিন দিক্ থেকে বাড়ী ঘেরাও করেছে, যত বলছি, ওরে চ'লে আয়, শীগ্‌গির চ'লে আয়, কে কার কথা শোনে? সেই তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠল, দক্ষিণের বারান্দার ঐ ধার অবধি দৌড়ে গিয়ে পাখীটাকে নিয়ে তবে নামল। আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে কি যে হ'ত জানি না।

আজিজ। আচ্ছা, আমি যাই তাহলে? আপনাদের অসুবিধা খুব হবে, কিন্তু ভয় পাবেন না! আমি দরজার বাইরেই ব'সে থাকব আজ সারারাত। শিখরা হয়ত পাড়ায় হামলা করতে আসতে পারে, তাই রাত জেগে পাহারা দিচ্ছি আমরা।

নিরুপমা। তুমি সারারাত জাগবে বাবা? কষ্ট হবে না?

আজিজ। কোনো কষ্ট হবে না মা। রমজানের মাস ত? রাত আমাদের এমনিতেই জাগতে হয় খানিকটা। আচ্ছা চলি।

(আজিজ চ'লে গেলে সুমোহিত দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।)

সুললিত। কিছু বুঝি নিয়ে আসতে পারেন নি, নারায়ণবাবু?

নারায়ণ। ঐ যে শুনলেন, একটা পাখী এনেছি। প্রাণে বেঁচে এসেছি সেই ঢের।

সুললিত। আপনাদের রাত্রের খাওয়া?

নারায়ণ। সেরে এসেছি। আপনাদের···

সুললিত। এই পিত্তিরক্ষা হয়েছে কোনো রকম ক'রে।

নিরুপমা। তোমরা এবার একটু ও ঘরে যাও দেখি। সুমু, তুইও যা। আমরা এই ঘরেই রাত্রে শোব ত তিনজনে? এবারে একটু শোবার জোগাড় করি, ঘুম পাচ্ছে। তোদেরও ঐ ঘরে তিনজনকে শুতে হবে কোনো রকম ক'রে, তা ত জানিস? কাত্তিক রান্নাঘরে শোবে এখন।

(পুরুষ তিনজন ডানদিক্ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ খাঁচার ভেতর থেকে পাখীটা ডেকে উঠল, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।* বেশ জোরালো পক্ষীকণ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে সুমোহিত, তার পরে নারায়ণ ফিরে এলেন নেপথ্যের কাছ থেকে, সুললিতও ফিরে দাঁড়িয়েছেন। ললিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে খাঁচাটাকে নিয়ে ঘরের দূরতম প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল। সবাই যে গোল হয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছেন তা নয়, কিন্তু মনে হচ্ছে সেই রকম। কারণ, যিনি যেখানে দাঁড়িয়েছেন সেখান থেকেই উদ্বিগ্ন দৃষ্টি নিয়ে পাখীটাকে দেখছেন।)

পদ্মা। হ'ল ত? দেখলে ত? আমি জানতাম, এই হবে। এখন সামলাও পাখীটাকে।

সুমোহিত। বাইরে থেকে কেউ শুনতে পেলে খুব মুশকিল হবে।

নারায়ণ। কেউ শুনতে পায় নি আশা করি।

সুমোহিত। এখন হয়ত পায় নি, পরে পেতে পারে।

নারায়ণ। কি করা যাবে তা হলে?

পদ্মা। তুমি আর ব'লো না; তুমিই ত আস্কারা দিয়ে দিয়ে মেয়েটার মাথা খেয়েছ। নইলে গয়নার বাক্স রইল প'ড়ে, রইল প'ড়ে ব্যাঙ্কের চেকবুক, লকারের চাবি—

নারায়ণ। আহা হা, ওসব কথা ব'লে আর এখন হবে কি? পাখীটাকে কি ক'রে সামলে রাখা যায় তাই না হয় ভাবো।

ললিতা। (এ'দের দিকে প্রায় পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, এক ঝটকায় মুখ ফিরিয়ে) কাউকে কিছু ভাবতে হবে না পাখীটাকে নিয়ে।

সুমোহিত। ভাবনাটা আসলে নিজেদের নিয়ে, পাখীটা ত উপলক্ষ্য।

(ললিতা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তাকাল সুমোহিতের দিকে। ওদের দুজনের দিকে দেখে একটু হেসে সুললিত প্রস্থান করলেন।)

নিরুপমা। সুমু! পাখীটাকে পুষেছে যত্ন ক'রে, তাই মায়া প'ড়ে গেছে। ওটাকেও নিজেদের একজন আত্মীয়ের মত মনে হচ্ছে তার।

সুমোহিত। এখন তা মনে হচ্ছে, এর পর আর মনে হবে না।

(পাখীটা আবার বলতে যাচ্ছিল হরেকৃষ্ণ)

পদ্মা। (ছুটে গিয়ে) এই, চুপ কর্, চুপ!

(পাখীটা থেমে গেল, বোধ হয় হকচকিয়ে।) এখানে এসে ওর ডাকবার উৎসাহ যেন আরো বেড়ে গেছে!

নারায়ণ। এই কি চলতে থাকবে সারাক্ষণ? ওটা হরিনাম করবার চেষ্টা করবে, আর তুমি ধমকে ওকে থামাবে?

পদ্মা। কি করব, তোমরা না হয় ব'লে দাও।

ললিতা। কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি বলছি। দরজা-জানালাগুলো যেরকম ক'রে বন্ধ করা আছে, তাতে বাইরে থেকে ওর গলা কেউ শুনতে পাবে না।

সুমোহিত। দরজা-জানালার একটু কাছে কেউ এসে যদি দাঁড়ায়, ঠিক শুনতে পাবে।

পদ্মা। না বাবা, শুনতে এমনিতেও পেতে পারে, বিশেষতঃ রাত্রে। আর যদি শোনে, আমাদের দশাটা কি হবে তখন? তুমি বাবা এর উপায় একটা ভেবে ঠিক কর।

(ললিতা কোলের ওপর হাত রেখে অত্যন্ত বিমর্ষ মুখ ক'রে বসে আছে।)

সুমোহিত। আচ্ছা, দেখছি ভেবে। আপনারা এখন শোবার জোগাড় করুন ত, রাত অনেক হ'ল। পাখীটাকে এ ঘরে রাখবেন না, রাস্তার উপরকার ঘর ত? বাইরে করিডরে বাথরুমের পাশে রেখে দিন, আওয়াজ কম যাবে কিছু বাইরে।

পদ্মা। চল বাবা, আমিই ওটাকে রেখে আসছি।

(সুমোহিতের সঙ্গে পদ্মা ডানদিক্ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলে, ললিতার মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নারায়ণও চ'লে গেলেন সেদিক্ দিয়ে।)

ললিতা। আমি জানি, উনি এখন পাখীটার পেছনে লাগবেন।

নিরুপমা। কে, সুমোহিত? না, না,—

ললিতা। হ্যাঁ লাগবেন, আপনি দে'খে নেবেন।··· অবিশ্যি আমি হলেও লাগতাম।

নিরুপমা। (হেসে, চেয়ারটাকে ললিতার একটু কাছে টেনে নিয়ে) তুমি নিজে একথা বলছ?

ললিতা। পাখীটাকে নিয়ে সত্যিই ত মুশকিল।

নিরুপমা। বুঝেও তুমি কিছু করতে পারছ না, না মা?

ললিতা। ওকে মেরে ফেলতে দিতে পারব না তা ঠিক।

---

* পাখীর খাঁচাটাকে সর্ব্বদা দৃশ্যপটের বা নেপথ্যের কাছ ঘেঁষে রাখতে হবে। বাইরে অনতিদূরে ব'সে কেউ একজন পাখীর গলা অনুকরণ করবে।

নিরুপমা। না, না, মেরে কেন ফেলতে হবে? সুমু একটা-কিছু উপায় ভেবে বের করবে।

ললিতা। পারবেন না। ওকে ওঁরা মেরে ফেলবেন, দেখবেন আপনি।

(পদ্মা ঢুকছিলেন, ললিতার শেষ কথাটা শুনতে পেয়ে দাঁড়ালেন একটু।)

পদ্মা। ওকে ত কেউ মারবে না, ওই সবাইকে মারবে।…কি হ'ত ওকে বাড়ীতে রেখে এলে? কি হ'ত? কেউ একজন ওকে দেখতে পেয়ে নিজের বাড়ী নিয়ে যেত, খেতে দিত পুষত, পাখীটাও বাঁচত, আমরাও বাঁচতাম। (এসে ব'সে) না হয় হরিনাম আর করত না, আল্লা আল্লা বলত, তা সেও ত বলতে গেলে ভগবানেরই নাম, না বোন্?

নিরুপমা। হ্যাঁ, সে ত ঠিক কথা।

ললিতা। সবাই মিলে তাই কর না, সব গোল তাহলে ত মিটে যায়।

পদ্মা। কি তুই বলিস্? পাখী আর মানুষ এক কথা হ'ল?…আমার এখন এক এক সময় ইচ্ছে করছে, পাখীটার ঘাড় মটকে দিই। মানুষ হলে পারতাম?

ললিতা। (হেসে) তাও ত অনেকে বেশ পারছে।

(তিনজনে এর পর কিছুক্ষণ চিন্তান্বিতভাবে চুপ ক'রে রইলেন।)

ওকে কোথায় রেখে এলে মা তোমরা? একটু দেখে আসি ওকে।

(ডানদিক্ দিয়ে বেরিয়ে গেল।)

নিরুপমা। আপনার ঐ একটিই বুঝি?

পদ্মা। তা হ'লই বা একটি, তাই ব'লে কি আস্কারা দিয়ে মাটি করতে হবে?

নিরুপমা। বয়স কত হ'ল?

পদ্মা। সেদিকে ত্রুটি কিছু নেই, উনিশে পড়ল। কেউ বলবে দেখে? কেউ বলবে, ও মেয়ে বি-এ পাশ? দেখলেন ত ওর রকম-সকম? ওর বাপ ওকে খুকী বানিয়ে রাখতে চায়, তাই খুকীর মতই থেকে গেছে ওর বুদ্ধিসুদ্ধি।

নিরুপমা। বিয়ে দেবার কথা ভাবছেন না বুঝি?

পদ্মা। বিয়ে! বিয়ের কথা বললে ওর বাপ যে তেড়ে মারতে আসে। এইটুকুন মেয়ের আবার বিয়ে কি?

নিরুপমা। একটা মানুষের ওপর মন পড়লে পাখী আর মানুষে যে কি তফাৎ, সেইটে বুঝতে পারত।

(ললিতার পুনঃপ্রবেশ।)

নিরুপমা। পাখী ঠিক আছে ত মা?

ললিতা। কতক্ষণ ঠিক থাকবে কে জানে? (এসে

নিরুপমা। না না, ও ঠিকই থাকবে। তুমি ঐ তক্তপোশটাতে শোও ত মা, দুই বুড়ীতে আমরা মেজেতে কম্বল বিছিয়ে শোব। এমন ভীষণ ঘুম পেয়েছে! ইশাক সাহেবের বোন ভাগ্নীরা এসে পড়লে আমাদের তখখুনি চ'লে যেতে হবে জানেন ত বোন? আজ রাত্তিরেই যদি তাঁরা আসেন, ত তার আগে যতটা ঘুমিয়ে নেওয়া যায় ততটাই লাভ।

(অনেক দূর থেকে অস্পষ্ট হয়ে কানে আসছে, বন্দেমাতরম্, জয় হিন্দ্। এ পাড়ার থেকে তুমুল শব্দ উঠল, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর! ললিতা আলো নিবিয়ে দিল, করিডর থেকে একটুকরো আলো এসে পড়েছে ঘরে।)

পদ্মা। (নিরুপমা শুয়ে, তাঁর পাশে মেজেতে ব'সে) ইশাক সাহেবের বোন-ভাগ্নীরা এলে আমাদের কি গতি হবে বোন? কোথায় আমরা যাব? আপনার কপাল ভাল বোন, আপনারটি ছেলে। ঐ মেয়েটাকে নিয়ে যে আমার কি ভাবনা!

নিরুপমা। (সশব্দে হাই তুলে) কথায় বলে, মরার বাড়া গাল নেই। ঐ ছেলেটাকে নিয়েই আমার ভাবনা কিছু কি কম? তবে হ্যাঁ, তফাৎ একটু ত আছেই।

পদ্মা। আর ভাবতে পারি না বোন, ভাবতে পারা যায় না। কেবল মনে হচ্ছে, এ যেন সত্যি নয়, যেন ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছি।

নিরুপমা। তাই যেন হয় বোন, দুঃস্বপ্নই যেন হয়, তার বেশী কিছু না হয়। (হাই তুললেন) আমার কর্ত্তা বলেন, কি আবার হবে, কিছুই হবে না, আর ওঁর কথার উপর নির্ভর ক'রে জীবনে আমি কখনো ঠেকি নি বোন। তাই, ভয়ের কথা ভাবছি, ভয়ের কথা বলছি, কিন্তু ভয় যেন পাচ্ছি না সত্যিই।

(বাইরে থেকে স্পষ্ট শোনা গেল পাখীটার ডাক, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।)

পদ্মা। এ যে স্পষ্ট শোনা গেল বোন, এতটা দূর থেকেও! কি হবে বোন? ও বোন, শুনছেন? ও বোন? ঘুমিয়ে গেলেন?

(নিরুপমা গভীর ঘুমে অচেতন। ললিতা উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিল ডানদিক্ দিয়ে)

এই, তুই আবার কোথায় চলেছিস্?

ললিতা। তোমরা ঘুমোও মা, আমি করিডরটাতে একটু ঘুরব। আমার ঘুম আসছে না।

(বেরিয়ে গেল।)

পটক্ষেপ।

ক্রমশঃ

প্রতিহনন

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

স্টেশনের লোকস্রোতের মধ্যে লোকটিকে দেখে চমকে উঠলুম, সাত বছর আগে যেমন বিস্ময়াতঙ্কে শিহরিত হয়েছিলুম, সেরকম নয়; যাত্রীদলের আড়াল হতে করুণ বিস্ময়ে তার দিকে চাইলুম।

এ সহরে আবার আসা ত শুধু দুঃসাহস নয়, এ যে নির্ম্মম নির্ব্বোধ স্পর্দ্ধা। সেদিন সে ছিল হিংসোন্মত্ত জনতার পুরোভাগে, জনতার আশ্রয়ে আক্রমণের নেতা, আজ যাত্রীজনতার সে একপাশে, একা, অপরিচিত; আজ আক্রান্ত হলে কে তাকে রক্ষা করবে!

সে কি ভাবছে, সবাই ভুলে গেছে, সে আর আক্রমণীয় নয়; নগরের লোকচলাচলের আড়ালে সে গুপ্ত রইবে। কিন্তু সহরে প্রবেশ ক'রেই সে যে আমার চোখে পড়ল!

সে কি জানে না, লোকে ভালবাসা ভুলে যেতে পারে, প্রেমবর্ত্তিকার দীপ্তশিখা ধুমোদ্গার ক'রে নির্ব্বাপিত হয়ে যায়, কিন্তু প্রতিহিংসানল যে একেবারে ভস্মিত হয় না, ভস্মাবৃত অঙ্গারের মত ধিকিধিকি করে, সুপ্ত আগ্নেয়গিরির অতর্কিত অগ্নিস্রাবের মত কখন বাহির হবে কে জানে!

সে কি ভাবছে, বেশ পরিবর্ত্তন করলেই তার রূপ পরিবর্ত্তন হবে, সে অপরিচিত হয়ে উঠবে! কিন্তু বিশেষ সাজ ক'রেই যে সে বিশেষিত হয়ে উঠেছে। মাথায় কালো ভেলভেটের মলিন টুপি, ঘন নীল গাবারডিনের ট্রাউজার, ছাইরঙের জ্যাকেট, কাচকড়ার মোটা চশমা, কালো কাচে চোখের দৃষ্টিপাত লুকিয়েছে, যেন কোন নবাগত বিদেশী।

সেদিন ছিল কৃষ্ণকেশগুচ্ছের ওপর লাল রুমাল বাঁধা, গায়ে হলদে-কালো ডোরা-কাটা কোট, বাঘের চামড়ার মত। আজ শান্তির স্নিগ্ধরঙের সাজ। এ ছদ্মবেশে যে কপটতা প্রকট হয়ে উঠেছে! এক নিমেষে তাকে চিনে নিলুম।

সাত বছর আগে, সে ছিল সুপরিচিত প্রতিবেশী, সখ্যস্থাপনে তার বিশেষ উদ্যোগ ছিল, কিন্তু আমার অন্তরমহলে বান্ধবরূপে তাকে বোধ হয় স্থান দিই নি। তার পর বিপ্লবাগ্নিতে দ্বার ভেঙে সে প্রবেশ করলে, এ সাত বছর অন্তর্দ্দাহের মত মনের এক কোণ দখল করে ব'সে আছে। সে কি ভাবে, বিচিত্র কালস্রোতে সে দহনজ্বালা প্রশমিত, নিরাময় হয়ে যাবে? হয়ত কিছু হয়। শীতের শবাকীর্ণ রক্তসিক্ত রণক্ষেত্র নব শরতে আবার স্বর্ণশীর্ষ শস্যভারে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

লিখেছিল বটে, বন্ধুকে রক্ষা করবার জন্যে শত্রুর বেশে যেতে হ'ল।

এক বছর পরে যদি দেখা হ'ত, হয়ত খুনোখুনি হ'ত; দু'বছর পরে দেখা হলে, মারামারি হ'ত; তিন বছর পরে হয়ত শুধু বকাবকিতেই শেষ হ'ত; তার পর নির্ব্বাক্ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে যেতুম।

কিন্তু আজ তাহাকে দেখে ত দূরে চ'লে যেতে পারছি না, অথচ তার নিকটেও যেতে পারছি না, কাছে গিয়ে বলতে ত পারছি না, কি বন্ধু, কেমন আছ?

মৌন তাপে দাঁড়িয়ে আছি। হয়ত হাত ধরতে গিয়ে মুখে এক ঘুঁসি বসিয়ে দেব, কালো চশমা ধূলিময় কংক্রিটের মেজেতে খান্ খান্ হয়ে যাবে।

কি অভিপ্রায়ে সে এসেছে? বাড়ী ত বহুদিন বিক্রি ক'রে দিয়েছে। তবে সব টাকা ক্রেতার কাছ থেকে পায় নি, দশ হাজার টাকা বাকী আছে। সে টাকা পাবার আশায় কি এসেছে? অথবা অন্য কোন চক্রান্ত?

বোতাম-আঁটা পকেট হতে হলদে নোট-বুক বাহির করছে। যে ঠিকানা মুখস্থ ছিল, নগরের জনতাকল্লোলে সে গলির নাম স্মরণ করতে পারছে না।

আমি সে অধমর্ণ ক্রেতার দিশা দিতে পারি, টাকা হয়ত পেতে পারে, রসিদ সই ক'রে দেবে। কিন্তু সে টাকা নিয়ে ওই সর্পিল শঙ্কিল গলি হতে বাহির হয়ে আসতে পারবে কি? টাকা দিয়েই গুণ্ডা দেনদার তার দলকে জানিয়ে দেবে। আর আমিও ত আছি। কে তাকে এ সহরে রক্ষা করে!

হন্‌হন্ ক'রে চলেছে, ট্রামসঙ্গমের অভিমুখে চলেছে। আমিও হন্ হন্ ক'রে চলেছি। অফিসের কাল বয়ে যায়, হনুমানপ্রসাদ অপেক্ষা ক'রে ব'সে আছে, কনট্রাক্ট সই হবে, টাইপিস্ট হয়ত বাড়ীতে টেলিফোন করবে, মিথ্যা কারণ বলতে হবে। আজ আমার অফিস বন্ধ।

আফসগামা কেরাণীকুলে ট্রামে বাসে গাদাগাদি। শেষের দিকে এক স্বল্পযাত্রীপূর্ণ ট্রামে উঠে এক কোণে সে বসল, মাঝে মাঝে যেন চমকে কেঁপে উঠছে, নিশ্চয় আমাকে দেখেছে! তাহার ত্রাসের স্পর্শে আমিও ত্রাসিত। ট্রামে উঠতে সাহস হ'ল না, সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম, ভিড়ের আড়ালে ভিড়ের মধ্যে উঠে থাকতে হবে। ট্রাম চলতেই দুটো লোককে ঠেলে লাফিয়ে উঠে পড়লুম। এমন অসাবধানে ওঠা উচিত ছিল না।

ট্রাম চলেছে; আমার বুক দুরু দুরু কাঁপে কেন! নীল চশমাটা প'রে নিলুম, মাথায় কালো beret-টা লাগালুম; চেনাতেই ত চাই, তবু ভয় পাই।

অফিস-পাড়ায় ট্রাম থামতেই লোকটি তাড়াতাড়ি নেমে গেল। আমিও ভেবেছিলুম, এখানে সে পালাতে চেষ্টা করবে; কোন অফিসে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ ক'রে পেছনের কোন গলির পথে পালাবে। জানে না ত, এ পাড়া আমার সব জানা!

ধীরপদে সে চলেছে, আমিও চলেছি। দু'ধারে অভ্রংলিহ অট্টালিকাশ্রেণী চিত্রপটের মত স্থির, এ জনারণ্যে শুধু আমরা দু'জনে সজীব গতিমান। মনে পড়ে, একবার মধ্যভারতের অরণ্যে অস্ত্র হাতে এক শিকার অনুসরণ ক'রে ঘুরেছিলুম; কখনও দীর্ঘ বৃক্ষ-ছায়াঘন সঙ্কীর্ণ পথ দিয়ে, কখনও উপলসঙ্কুল জলধারা পার হয়ে, কখনও কাঁটার ঝোপে আঁচড় খেয়ে, শিকার শিকারীতে সে লুকোচুরি খেলা শিকার বধের চেয়েও অধিক সুখের, অপূর্ব্ব উত্তেজনাময়!

এক চলন্ত বাসে সে লাফিয়ে উঠল। সেই গতিমান যাত্রীবাসের পেছন পেছন ছুটলুম, যখন থামল দ্রুতবেগে উঠলুম। একতলায় কোন সিটে সে নেই। দোতলার সিঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলুম, ঝাঁকুনি খেতে খেতে মনে হ'ল যেন নাগরদোলায় চলেছি। দু'ধারে হলদে সাদা বাড়ীর সারি সিনেমার ছবির মত প্রবাহিত।

থামতে থামতে বাস্ চলেছে, সে লোকটা কোথাও নামছে না, আমাদের পাড়া নিকটতর হয়ে আসছে। অভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করছি; শিকার ধ'রে খাঁচার দ্বারে ব'সে শিকারী বোধ হয় এইরূপ আনন্দ পায়।

শেষ স্টেশনে এসে বাস্ থামল। নেমে এক থামের আড়ালে দাঁড়ালুম। বাস্ খালি হয়ে গেল। সে ত নামল না। সে কি অতর্কিতে মাঝপথে কোথাও নেমে গেছে? বুক দুরু দুরু ক'রে উঠল। বাস্ নড়ে উঠেছে। এবার সিঁড়ি দিয়ে সশব্দে যেন নামছে।

এবার কোন্ দিকে?

একটা ট্যাক্সি পাশ দিয়ে চ'লে গেল।

মনে হ'ল ইসারায় সে ডাকলে, কিন্তু ট্যাক্সি থামল না।

আবার সেই হলদে নোট-বই বাহির করেছে।

ধীরপদে চলেছে ফুটপাথ দিয়ে; কখনও দোকান-গুলির সাজান জানলাগুলির দিকে চেয়ে দাঁড়াচ্ছে। শ্রান্ত না ভয়ার্ত্ত! বারবার চারিদিকে চাইছে আর চলেছে।

এক পানের দোকানের সামনে সে থামল। পিপাসার্ত্ত। লাল সবুজ সোনালী—নানা বর্ণের বোতলের সারি মাণিক্যের মত ঝিকিমিকি করে। অনুভব করলুম, আমারও দারুণ পিপাসা। সম্মুখে "চা-সখা", প্রবেশ করতে ভরসা হ'ল না, ওই দোকানে গিয়েও একটা ডাব চাইতে পারছি না। খর রৌদ্রে জ্বালা-ভরা চোখে তাম্বুল-বিপণির দিকে চেয়ে আছি। লোকটি একটি হলদে জল-ভরা বোতল হাতে নিয়েছে, খড়কাঠি ফেলে দিয়ে মুখ দিয়ে পান করছে, এক নিমেষে বোতল শূন্য ক'রে দিলে।

কালো চশমা খুলে মুখ মুছছে। আমার দিকে তাকাল, স্থির নয়নে চেয়ে আছে, দৃষ্টিতে কোন বিস্ময় নেই; তার পর ম্লান হেসে চশমা পরল। বিস্ময়ে আমিও চেয়ে আছি। চিনতে সে কি পেরেছে? মনে হ'ল, কোন গোপন স্নিগ্ধরসে আমার কণ্ঠ সিক্ত হয়ে গেছে, তৃষ্ণার জ্বালা নেই।

এবার সে দ্রুতগতিতে চলেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে পা কাঁপছে, বুঝি সহসা পথে প'ড়ে যাবে।

বাম পাশে এক চওড়া গলিতে সে প্রবেশ করলে, রৌদ্রতাপময় জনবিরল পথ শানিত কাস্তের মত বক্র। আমার অনুমান ভুল নয়। সেই ক্রেতা খাতকের বাড়ীর দিকে সে চলেছে—গলির পর গলি।

সে গলি হতে আরও সরু গলি সরীসৃপের মত এঁকে-বেঁকে গেছে। বাঁকের পর বাঁক। কখনও তার কালো টুপি হারিয়ে যায়, আর মলিন জ্যাকেট চোখে পড়ে।

একবার সে পিছন ফিরে থমকে দাঁড়াল, আমি থামলুম না, প্রতিহিংসা-নাগিনী বুঝি উদ্যত-ফণা। পকেটের ওপর হাত চাপড়ালুম। একটা ছুরি সব সময়ে থাকে।

আর এক মোড়, তার পর নিরালা সরু পথ, সোজা চ'লে গেছে, থাম-ওয়ালা এক লোহার দরজায় শেষ হয়েছে। ওই তার অধমর্ণ ক্রেতার বাড়ী, সহরের এক কুখ্যাত গুণ্ডা, দিনের বেলায় বাড়ীর সব দরজা-জানালা

বন্ধ, অন্ধকার ঃ সন্ধ্যার মিটিমিটি আলোয় চোরাই মালের কারবার চলে, গভীর রাতে নাচঘরে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলে, জুয়াখেলা হয়।

একবার সে পিছনে ফিরে তাকাল, দেখে কি নিল আমি পিছনে আছি কি না? সে কি নিশ্চিন্ত হতে চায়! সে কি ভাবে আমি তাহার প্রতিহারী রক্ষক!

ছায়াময় সুড়ঙ্গের মত গলি দিয়ে লোকটি বেগে চলেছে, মন্ত্র-চালিতের মত ওই লৌহ-দ্বারের দিকে ছুটেছে।

আশ্চর্য্য, আঘাত করতেই দরজা খুলে গেল, অন্ধ গহ্বরে সে নিমেষে হারিয়ে গেল।

বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে রইলুম। এক কোণে আঁস্তাকুড়, মাছের কাঁটা, মাংসের হাড়,উনানের ছাই, মরা আরসোলা, দুর্গন্ধের গ্যাস উঠছে, অপর দিকে লোহার গরাদ-ভাঙা রান্নাঘর হতে পচা তেলে মাছ-ভাজার গন্ধ আসছে।

শুধু জল-পিপাসা নয়, ক্ষুধাও অনুভব করলুম। মনকে বললুম, তুমি ত দুর্ব্বল, হননশক্তি তোমার নেই, দাঁড়াও দেখবে তোমার শক্রর প্রতিহনন।

তিমির বিবর হতে এত শীঘ্র সে বাহির হয়ে আসবে, ভাবি নি। হয়ত কালের গতিবোধ মন্দীভূত হয়ে গিয়েছিল। চকিত পদে এগিয়ে গেলুম সামনের দিকে, এবার যেন আমিই অনুসরণীয়।

চতুর্থ বাঁকে দাঁড়াতে হ'ল। ত্রস্ত-চরণে সে ছুটে আসছে, চোখে আর চশমা নেই, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যদীপ্তিতেও সে পথ খুজে পাচ্ছে না, দিশাহারার মত আসছে। তার পেছনে দুইটি যুবক বেগে আসছে, একটি দীর্ঘাকৃতি, আর একটি হ্রস্বকায়, খাকী প্যাণ্ট ও রঙীন নক্সা-আঁকা বুশশার্ট-পরা, গুণ্ডার অনুচরের কপট-সজ্জা;

ঋজুদেহ যুবকটি প্রায় সামনা-সামনি এসেছে, হস্তে লৌহ-ফলক চিক্‌চিক্ করছে, স্থূলকায় দূরে পেছনে হাঁপাচ্ছে।

বাঁকের মুখে পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালুম। পথরোধ বললে ভুল হবে, সেই লোকটি ও লম্বা গুণ্ডার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালুম।

খবরদার! এ আমার শিকার! Hands off!

নিরালা নিঝুম গলি আমার ক্রুদ্ধ কণ্ঠধ্বনিতে কেঁপে উঠল। লম্বাটে হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। এ গলির পাড়ায় তাদের ক্ষমতা অপ্রতিহত। এ কে!

লোকটা থমকে দাঁড়িয়ে চমকে চাইলে, ভয় ও ভরসায় শিহরিত, কালো চোখ দুটি জ্বল্ জ্বল্ করছে, যেন ধূম-কুণ্ডলীর মধ্যে দীপশিখা।

তুমি! তুমি বন্ধু! এ কি চেহারা! তোমার সঙ্গে যে অনেক কথা আছে!

কে বন্ধু? এ নির্ব্বান্ধব পুরী—পালাও, পালাও!

না, না, শোন।

পালাও! পালাও!

লম্বোদরটি এতক্ষণে এগিয়ে এসেছে। ব্যঙ্গ স্বরে ব'লে উঠল, এ শালা কে আমাদের পাড়ায়? কি করছিস্ তুই!

কথাগুলি শুনে লম্বাটে বোধ হয় অপমান বোধ করলে, এগিয়ে গেল আমার দিকে।

মনে নেই, দেহের কোন্ অংশে মুষ্টিপ্রহার হ'ল, শুধু প্রাচীরের মত অবরোধ ক'রে দাঁড়ালুম।

শুধু মনে পড়ে, খোওয়া-ওঠা পথের ধূলায় বেদনায় মাথা নত ক'রে বসে পড়েছিলুম আর সে লোকটির ক্ষিপ্র পদধ্বনি শুনেছিলুম।

মাথা তুলে যখন শূন্য গগনে চাইলুম, সে পদ-শব্দ মিলিয়ে গেছে, অন্যদিকে দীর্ঘ ও হ্রস্ব মূর্ত্তিযুগল অন্তর্দ্ধান করেছে।—

শুধু কানে এল, শালা, পালাবে কোথায়, আবার আসতে হবে।

কোন অসুখ নয়, তবু এক মাস শয্যায় বিশ্রাম নিতে হ'ল।

সে সত্যি পালাতে পারল কি না জানি না, শুধু অনুভব করছি, অন্তরের সে অন্তর্দ্দাহ শুধু প্রশমিত নয়, অন্তর্হিত হয়েছে। মনের সে ভার নেই।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী

দেখিতে চোখে পড়িবার মত ছিলেন না, শুনিতেও এমন কিছু ছিলেন না যে কথার চমৎকারিত্বে মনে চমক লাগিত, তবু বাহিরের সাধারণত্বের সহিত ভিতরের অসাধারণত্ব মিলিয়া স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্তের মধ্যে এমন একটা অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, তাঁহার সম্পর্কে কেবলই মনে হইত এই মানুষটির দোসর সমকালীন বাংলা দেশে কেহ নাই। যাঁহারা তাঁহার নিকটে যাইতে পারিয়াছিলেন, যাঁহারা দূর হইতে তাঁহার কর্ম্মমাত্র দেখিতে পাইতেন এবং যাঁহারা তাঁহার স্বল্পকায় সাহিত্যকীর্ত্তিটুকুই জানিতেন, সকলেরই মনে হইত, যেন চারিদিকের সামান্যতার মধ্যে একটা অসামান্য চরিত্র ও অতুলসম্পদশালী চিত্তের প্রকাশ দেখিতেছেন।

১৮৮৭ সনে রংপুরে তাঁহার জন্ম হয়। এই পরিবারের আদিনিবাস ছিল ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমা, কিন্তু পিতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত ওকালতি ব্যবসা করিতে রংপুরে গিয়া সেখানকারই বাসিন্দা হইয়া যান। অতুলচন্দ্র তাই উত্তরবঙ্গের সন্তান। এই কথাটা স্মরণ রাখিবার প্রয়োজন আছে, কারণ যে প্রবল ন্যায়ানুরাগ ও নিষ্কম্প সাহসিকতা অতুলচন্দ্রের চরিত্রে দীপ্যমান দেখা যাইত, তাহা বহুকালাবধি উত্তরবঙ্গে পরিব্যাপ্ত ভাবজগৎ হইতে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী জীবনে বিরাট্ পুরুষ হইয়া উঠিলেও ছাত্রজীবনে অতুলচন্দ্র অন্য দশজন মেধাবী ছাত্র হইতে পৃথক্ কিছু ছিলেন না, কর্ম্মক্ষেত্রে যে পথপরম্পরায় চলিয়াছিলেন তাহাও সাধারণ বুদ্ধিজীবি বাঙ্গালীর চিরচলিত পথ। কখনও উচ্চ, কখনও সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার পর শিক্ষকতার বৃত্তি লইয়া তিনি কর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন। কিন্তু অধিকদিন শিক্ষক থাকেন নাই। অল্পকালের মধ্যেই ব্যবসা পরিবর্ত্তন করিয়া রংপুরেই ওকালতিতে প্রবেশ করেন এবং কিছুদিন পর হাইকোর্টে চলিয়া আসিয়া কেবলমাত্র বিপুল সাফল্যই অর্জ্জন করেন নাই, ব্যবহারশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ এবং তত্ত্বদর্শী ব্যাখ্যাতা বলিয়া অশেষ সম্মান ও বিস্তৃত খ্যাতির অধিকারী হন।

এইটুকু পরিচয়েই যদি অতুলচন্দ্রের সত্য ও সম্পূর্ণ পরিচয় হইত, তাহা হইলে সাধারণের তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিবার মত কিছুই থাকিত না এবং তাঁহার তিরোধানে একটা বিরাট্ শূন্যতাবোধও এমন করিয়া দেশের সুধীসমাজের মন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত না। দৈনন্দিন কার্য্যে প্রচুর দক্ষতা প্রকাশ করিতে পারে, এমন লোক দেশে নিত্যই জন্মাইতেছে, তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কেহ লোকপ্রশংসার উদ্রেক করিবে অথবা জাতির অন্তরে সম্মানের আসন লইয়া স্থিত হইবে, এমন সম্ভাবনা কিছুমাত্র নাই। অতুলচন্দ্র যে তাঁহার দেশবাসীর সম্মুখে এক মহোচ্চমূর্ত্তিতে প্রকাশিত ছিলেন, তাহার কারণ যে তিনি জীবিকা অর্জ্জনের কর্ম্মে নিঃশেষ হইয়া যান নাই। সেই কর্ম্মেও তিনি যে মননশক্তি প্রয়োগ করিতেন, তাহা ছিল যেমন মৌলিকতায় অপরূপ, তেমনই অগ্রসর-প্রবণ, কিন্তু ব্যবসাকর্ম্মের প্রয়োজন সম্পূর্ণ মিটাইয়াও সেই শক্তির একটা বৃহৎ অংশ উদ্বৃত্ত থাকিত। সেই উদ্বৃত্ত অংশ লইয়া তিনি দেশের সর্ব্বপ্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণচেষ্টার সহায়তায় অগ্রসর হইয়া আসিতেন এবং তাহাতেও নিঃশেষ না হইয়া স্বয়ং অনুপম রসঘন সাহিত্য রচনা করিতে করিতে বয়ঃকনিষ্ঠদের সর্ব্বপ্রকার সাংস্কৃতিক প্রয়াসের পোষকতায় নিজের চিত্তের ও অর্থের দাক্ষিণ্য চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিয়া দিতেন। একাধারে অসামান্য প্রতিভাধর ন্যায়শাস্ত্রী, অকুতোভয় চিন্তানায়ক, বিশিষ্ট সাহিত্যশিল্পী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যরসবেত্তা এবং তরুণ-শিল্প ও সাহিত্য-সাধকদের আশ্রয়স্থল হইয়াই এই বসনে ভূষণে নিতান্ত সাধারণ ও আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিরভিমান ব্যক্তিটি সকলের হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিলেন।

প্রাচীন ও পরিণত অতুলচন্দ্রের যে মূর্ত্তি দেখিতে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, তাহা ছাড়াও তরুণ অতুলচন্দ্রের আর একটা মূর্ত্তি ছিল। কালের ব্যবধানে কিছুটা অন্তরালে পড়িয়া গেলেও তাহা কখনই বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার সেই মূর্ত্তির কথা অনেকের অজ্ঞাত, কিন্তু উহাকে দেখিয়া না লইলে তাঁহার সমগ্র পরিচয় পাওয়া যাইবে না এবং যে সর্ব্বাত্মক দেশপ্রেম ও অনমনীয় দৃঢ়তা তাঁহার

সকল চিন্তায় ও কর্ম্মে প্রকাশ পাইত, তাহার সুদূর উৎসের সন্ধানও মিলিবে না। যে উত্তরবঙ্গে অতুলচন্দ্রের উদ্ভব, সেই উত্তরবঙ্গ সন্ন্যাসীবিদ্রোহের দেশ, দেবীচৌধুরাণীর দেশ, সেখানকার মাটিরই যেন গুণ যত অসমসাহসিক অভিযান ও কঠিন প্রয়াসের জন্ম দেওয়া। ইংরাজ রাজত্বের শেষভাগে বহুদিন ধরিয়া সেই উত্তরবঙ্গের আকাশে বাতাসে বিপ্লবের ভাবনা ঘূর্ণিত হইতেছিল এবং সেই ভাবনার উত্তাপে এমন সব অতিতেজস্বী মানুষের সৃষ্টি হইতেছিল যাহারা স্বদেশের মুক্তিব্রতে নিজেদের সম্পূর্ণ উৎসর্গ করিয়া দিয়া মন্ত্রের সাধন অথবা শরীর পাতন করিতে অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন। কার্জ্জন কর্তৃক বঙ্গবিভাগের পূর্ব্বেই উত্তরবঙ্গে বহু গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে 'বান্ধব সমিতি' অগণিত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বহু দৃঢ়চরিত্র বালক ও যুবককে তাহার ছায়ান্ধকারের মধ্যে সমবেত করে। বঙ্গবিভাগের পর যখন 'বন্দেমাতরম্' বলিবার অথবা রাজনৈতিক সভায় যোগদান করিবার অপরাধে দলে দলে ছাত্রেরা সরকারী বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইতে লাগিল, তখন দেশের প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় রংপুরে এবং সেই বিদ্যালয়ের অক্লান্তকর্ম্মা শিক্ষকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন তরুণ অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তিনি তখন কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া রংপুরে সদ্য ফিরিয়াছেন। তখন একদিকে গুপ্তসমিতির নেতারা তরুণ যুবকদিগকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন এবং অন্যদিকে কি করিয়া যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে নানা দেশের মুক্তিসংগ্রামীদের ইতিহাস শোনাইয়া ও জাতীয়তাভাবাপন্ন সাহিত্য পড়াইয়া দেশসেবার শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমি একজন প্রাক্তন বিপ্লবীর রচিত একটি অপ্রকাশিত পুস্তকে পড়িয়াছি। প্রফুল্ল চাকী ইত্যাদি অনেক সুবিদিতনামা বিপ্লবী অতুলচন্দ্রের নিকট পাঠস্বীকার করিয়াছিল। তিনি নিজে কোন বিপ্লবী সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট না হইয়াও অন্য প্রকারে উত্তরবঙ্গের বিপ্লবীদের সর্ব্বক্ষণ সহায়তা করিয়াছেন। যে তেজস্বিতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষ ভূষণ ছিল এবং সকল দুঃসাহসী ও সঙ্কটযাত্রায় যাত্রীদের প্রতি যে মমতা তাঁহার মধ্যে সর্ব্বদাই দেখা যাইত, তাহার অন্ততঃ কিছুটা অংশ উত্তরবঙ্গের ভাবপরিমণ্ডল ও জাতীয়তা আন্দোলনের সহিত তাঁহার প্রথম জীবনের সংস্রব হইতে আসিয়াছিল, এমন অনুমান করা বোধ করি অসঙ্গত হইবে না। ইদানীং তাঁহার প্রশান্ত আননে যে মৃদু হাস্য মাঝে মাঝে দেখা যাইত, তাহার আড়ালে যে কত আগুন ঢাকা ছিল, তাহা জানিতে না পারিলে তাঁহার পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

তাঁহার প্রথম জীবনের এই রাজনৈতিক কর্ম্মের কথা অনেকে না জানিলেও পুলিস জানিত। তাই যখন একবার তাঁহাকে হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয়, তখন তাহারা তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস উদ্ধার করিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেয়। ফলে তাঁহার জজ পদে নিয়োগ ঘটে নাই। যে পুলিস কর্ম্মচারীটি এই গবেষণাকার্য্য করিয়াছিলেন, তিনি বোধ হয় জানিতেন না যে, বাংলা দেশের কি মহোপকার তিনি করিতেছেন। অতুলচন্দ্র জজ হইলে আমাদের পরিচিত অতুল গুপ্তকে দেশ পাইত না।

কি ব্যবহারজীবী, কি রাজনৈতিক, কি সাহিত্যিক, সকল ভূমিকাতেই অতুলচন্দ্র সমকর্ম্মী অন্য সব মানুষ হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন। কি গুণ তাঁহার ছিল সে সকল কর্ম্মে সকলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া যাইতেন না এবং সকলেরই মনে হইত যে, এত মেশামিশির মধ্যেও তিনি জনতার ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া নিজের উন্নত মহিমার স্থির হইয়া আছেন? আমি যতটা বুঝিতে পারি, তাঁহার প্রধান বিশেষত্ব ছিল মননশক্তির প্রাচুর্য্য ও চিন্তের অপরের কর্তৃত্বমুক্ত অনন্যতন্ত্রতা। ব্যবহারজীবীরূপে তাঁহার যে স্বকীয়ত্ব ছিল, তাহার কথা দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। তাঁহার সহিত সহকারী হইয়া কাজ করিয়াছি, তাঁহার বিরুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছি, বিচারকের স্থান হইতে অসংখ্য ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যাখ্যান শুনিয়াছি এবং তাঁহার চিন্তার মৌলিকতা ও শৃঙ্খলা দেখিয়া উত্তরোত্তর আমার বিস্ময় বাড়িয়াছে। স্বীকার করিতে আমাদের আত্মসম্মানে যতই আঘাত লাগুক, একথা নিদারুণ সত্য যে, আদিকালে নব-নব-উন্মেষশালিনী বিচিত্র প্রতিভার পরিচয় দিয়া আমাদের দেশের মন বহু শতাব্দী যাবৎ সম্পূর্ণ অবসাদগ্রস্ত ও জড়ত্বপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে—এমনই এক অজন্মার অভিশাপ এই দেশের উপর পড়িয়াছে যে, এখানে নূতন ফসল আর ফলে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রে ত স্বাধীন চিন্তা অথবা উদ্ভাবনী শক্তির চিহ্ন দেখা যায়ই না, কোন বিষয়ে মনঃস্থির করিতে হইলেও আমরা পুরাতন বিধি ও নিষেধ খুঁজিয়া বাহির করি এবং বিধিটি পালন করিয়া ও নিষেধটিকে স্বীকার করিয়া কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিলাম ভাবিয়া সুখী হই। চারিদিকে কেবলই ঋণ করিয়া পরের

কথার পুনরাবৃত্তি অথবা নিজেদেরই পুরাতনের নিশ্চেষ্ট অনুসরণ। আইনের ক্ষেত্রে, যাঁহারা আইন প্রযোগ করেন, তাঁহারা যদি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও শক্তিশালী মনের অধিকারী না হন, তাহা হইলে এই গতানুগতিকতা বিশেষ প্রশ্রয় পায, অনুরূপ অবস্থায় গৃহীত কোন পূর্ব্বতন সিদ্ধান্ত যদি আবিষ্কার করা যায, তাহা হইলে তাহাকে অনুসরণ করিবার একটা চিরাচরিত প্রথা সেখানে বর্ত্তমান আছে। এই প্রথা পালন করিবার প্রবৃত্তি অতি ব্যাপক, কিন্তু অতুলচন্দ্রের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতাম। তিনি নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়া প্রচলিত ধারণাকে পরীক্ষা করিয়া লইবার শক্তি ও সাহস রাখিতেন এবং তাঁহার মন পুরাতন প্রথা ও অভ্যাসকে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন চিন্তার মুক্ত আকাশে পক্ষ বিস্তার করিয়া দিত। তাই তাঁহার কণ্ঠে নূতন দিনে সমাজের অগ্রসর চিন্তার অনুবর্ত্তী হইয়া পুরাতন প্রশ্নেরও নূতন উত্তর দিবার আহ্বান শুনিতাম, আর যে সব সমস্যার অন্ধকার কোণ পূর্ব্বগামীরা তেমনই রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও দেখিতাম যে, তাঁহার প্রখর বুদ্ধির দীপ্তিতে আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। আমার ব্যবহারজীবী ও বিচারক-জীবনে কেবলমাত্র তাঁহারই মধ্যে মৌলিক চিন্তাশক্তি ও একটা অপরবশ সম্মুখাভিমুখী মন দেখিয়াছিলাম এবং ইহাই তাঁহাকে অন্যদের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিল।

আর দেখিয়াছিলাম তাঁহার কর্ম্মরীতির আভিজাত্য। তিনি সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পড়িয়া নিজের গভীর জ্ঞান ও প্রখর বুদ্ধির সাহায্যে যথার্থ বিচার্য্য বিষয়টি কি ও তাহার সম্পর্কে সত্যই কি বলা যায, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া লইতেন এবং বিচারালয়ে গিয়া কেবলমাত্র ঐটুকুই বলিতেন। যাহা তাঁহার বিবেচনায অবান্তর অথবা ভ্রমাত্মক, তেমন কিছু বলিয়া নিজের বুদ্ধিবৃত্তি ও চারিত্রিক সাধুতার অবমাননা করিতে তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইতেন না, যাহা বলিবার যোগ্য কেবলমাত্র তাহাই বলিবার ন্যায়সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে বিচলিত করা অসম্ভব ছিল। ইহার ফল সব সময় তাঁহার মক্কেলের পক্ষে ভাল হইত না। নিতান্ত মূর্খ না হইলে অথবা চালাকী করিয়া কার্য্যসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায় না থাকিলে যে কথা কেহ বলিতে পারে না বলিয়া তিনি ভাবিতেন, কার্য্যকালে প্রতিপক্ষ হয়ত ঠিক সেই কথাটাই বলিত এবং বিচারক তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী না হইলে তিনিও হয়ত প্রতিপক্ষের সেই কথাটাই গ্রহণ করিতেন। এইরূপ বিপর্য্যয়ে তাঁহাকে নির্ব্বিকার দেখিয়াছি, এমনকি বিশেষ জেদের সহিত প্রতিবাদ করিতেও তিনি অবজ্ঞাবোধ করিতেন। যেন ভাবিতেন যে, যথার্থ সমস্যাটা বুঝিয়া লইয়া সুবিচার করিতে হইলে যে সকল বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন তাহার পর্য্যালোচনাতেই তিনি সহায়তা করিতে পারেন, অযথা কুতর্কের চক্রে ঘুরপাক খাইয়া মরা অথবা ফাঁকি-বাজির দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া তাঁহার কর্ম্ম নয়।

ব্যবহারজীবী অতুলচন্দ্রের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে দুই দুই বার দেশের পরমসঙ্কটের দিনে তাঁহার অশেষ পরিশ্রম ও অকুণ্ঠ সেবার কথাও বলিতে হয়। প্রথমে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গেই বাংলা দেশ বিভাগের সময় অসংখ্য দলিলপত্র মানচিত্রাদি ঘাঁটিয়া পশ্চিবঙ্গের বক্তব্য প্রস্তুত করিবার ও বাটোয়ারা আদালতের সম্মুখে দীর্ঘকাল ধরিয়া সেই বক্তব্য পেশ করিবার গুরুভার তিনি সাগ্রহে ও সানন্দে বহন করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় বার ব্যাগে-ট্রাইবিউন্যাল কর্ত্তৃক কতকগুলি সীমানা নির্দ্ধারণের সময় তিনি নিজে উপস্থিত না হইলেও পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য প্রস্তুত করিবার ও উহা শিখাইয়া দিবার ভার তাঁহার উপরই পড়িয়াছিল। দুই দুই বার বহুশ্রমসাধ্য সেবার জন্য তাঁহার নিকট পশ্চিম বাংলার ঋণ অপরিসীম।

অতুলচন্দ্রের আইন-ব্যবসা বহু বিস্তৃত হইলেও উহা তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে নাই এবং তাঁহাকে দেখিলে কাহারও সন্দেহমাত্র থাকিত না যে, তাঁহার অন্তরজীবনের অবলম্বন অন্য কিছু। এমনকি তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনায প্রকাশই পাইত না যে, তিনি আইন-ব্যবসায়ী। ব্যবসার কার্য্যে হয়ত তাঁহার মনীষার অনুশীলন হইত, কিন্তু তাঁহার প্রাণবান্‌ ও জনসেবাপরায়ণ মনুষ্যত্ব ঐ ক্ষুদ্র কর্ম্মে তৃপ্তি পাইত না। বার বার দেখা যাইত যে, তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন এবং দেশের অমঙ্গল হইবে এমন কিছুর সূচনামাত্র দেখিলেই তাঁহার কণ্ঠ প্রবল প্রতিবাদে গর্জ্জন করিয়া উঠিত। গভীর রাজনীতিজ্ঞান, নিষ্কলুষ দেশপ্রেম ও তাঁহার উন্নত চরিত্রের গৌরব বহন করিয়া আনিত বলিয়া ঐ সকল প্রতিবাদ, কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হউন বা না হউন, দেশবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করিত। কিন্তু সব সময়ে তিনি বিবৃতি অথবা বক্তৃতায প্রতিবাদ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন পশ্চিম বাংলা ও বিহার একত্রিত করিয়া একটি যুক্তপ্রদেশ গঠন করিবার উদ্ভট কল্পনা স্থানীয় রাজনৈতিক কর্ত্তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তিনি উত্ত্যক্ত হইয়া ঐ প্রস্তাবে বিক্ষুব্ধ দেশবাসীদের নেতৃত্বে স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রবল জনমতের এমন এক দুর্ভেদ্য

প্রাচীর তুলিয়া সরকারী বহিনীর পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন যে, কল্পনাটির উদ্ভাবক উহাকে লইয়া আর অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। যেমন আইনের ক্ষেত্রে, তেমনই রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি সম্পূর্ণ অনন্যতন্ত্র ছিলেন। যে রাজনীতি কেবলমাত্র দল গড়িয়া ক্ষমতার আসন অধিকার করিবার চেষ্টা, তাহাতে তিনি কোনদিন লিপ্ত হন নাই, চিরাভ্যস্ত রাজনৈতিক বুলিগুলির পুনরাবৃত্তিও কেহ কখনও তাঁহার মুখে শোনে নাই। তিনি সকল দল হইতে দূরে থাকিয়া এবং কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার কামনা না করিয়া কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে ও প্রয়োজনবোধে দেশের সেই বিরাট্‌ জনসাধারণের পক্ষ হইয়া কথা কহিতেন, যাহারা কোন দলের মানুষই নয়, অথচ যাহাদের ভাগ্য লইয়াই খেলা। তাঁহার এই রাজনীতি ছিল একমাত্র দেশকল্যাণনিষ্ঠ রাজনীতি এবং যে সকল কথা তিনি বলিতেন, তাহা শুনিয়া মনে হইত যে, কোন এক জ্ঞানীজন গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেশের বর্ত্তমান ও দূরদৃষ্টি দিয়া দেশের ভবিষ্যৎ সযত্নে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার দেশবাসীকে সাবধান করিতেছেন অথবা কোন নূতন পথের সন্ধান দিতেছেন। তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মের আর একটা প্রণালী ছিল যাহাকে পরোক্ষে রাজনীতিচর্চ্চা বলিতে পারি। কোন একটা চেষ্টা করিতেছে জানিতে পারিলেই তিনি রাজনৈতিক কর্ম্মীদিগকে অকাতরে অর্থসাহায্য করিতেন। তাঁহার অনুমত পথ অনুসরণ করুক আর নাই করুক, কত রাজনৈতিক কর্ম্মী ও সংস্থা যে তাঁহার অকৃপণ দাক্ষিণ্যে উপকৃত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। একটা ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক জীবন বাঁচাইয়া রাখাও যেন তিনি একটা রাজনৈতিক কর্ত্তব্য ও সৎকর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন।

আইন ব্যবসাতে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা হইত, রাজনীতির চর্চ্চায় নাগরিকের কর্ত্তব্যপালনের তৃপ্তি হয়ত লাভ হইত, কিন্তু স্পষ্টতঃই এই সকল কর্ম্মে অন্তরের আনন্দপিপাসা মিটিত না। অতুলচন্দ্রের মননজীবী অন্তঃকরণ তাই তাঁহাকে সাহিত্যকর্ম্মে উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিল। ভাগ্যে করিয়াছিল, নহিলে কিছুদিন পর তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তসম্পদের কোন চিহ্নই আর থাকিত না। যত বড় মনস্বীই হউন, কোন ব্যবহারজীবী বিচারালয়ে যে প্রতিভা দিনের পর দিন মুখের কথায় বিচ্ছুরিত করিয়া যান তাহা নিতান্তই নশ্বর, কয়েকজনের স্মৃতিতে অল্প কিছুদিন মাত্র বাঁচিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। অতুলচন্দ্র আইনের অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যান নাই, এদেশের আইনপত্রিকায় ব্যবহারজীবীরা বিচারালয়ে আইনের যে ব্যাখ্যান করেন, তাহার কোন বিবরণও মুদ্রিত হয় না, সুতরাং ইহা নিশ্চয় যে, কিছুদিন পর অতুলচন্দ্রের আইন ও রাজনীতিজ্ঞানের স্মারক আর কিছুই থাকিবে না। কিন্তু তাঁহার সাহিত্যকর্ম্ম বাঁচিয়া থাকিবে। উহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু সেই স্বল্পপরিসরের মধ্যেই যে মনীষার দীপ্তি, ভাবের বিভূতি, ভাষার সৌষ্ঠব ও রচনার শ্রী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেই থাকে। চলিত কথায় বলা যায় যে, এই লেখা একেবারে 'জাত লেখা'।

একটিমাত্র সাহিত্যবিচার গ্রন্থ, 'কাব্যজিজ্ঞাসা'; একটিমাত্র পত্রগুচ্ছ, 'নদীপথে'; একটিমাত্র বক্তৃতামালা, 'ইতিহাসের মুক্তি'; এবং মাসিকপত্রে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটিমাত্র প্রবন্ধ—এই দৃষ্টতঃ স্বল্পসম্বলটুকু লইয়া কি করিয়া তিনি একেবারে সাহিত্যশিল্পীদের শীর্ষশ্রেণীতে উঠিয়া গেলেন এবং সেখানেও এমন একটি আসন পাইলেন যাহার দক্ষিণে ও বামে আর কাহারও আসন আজ পর্য্যন্ত নাই? আসলে কিন্তু ইহা কিছু আশ্চর্য্য ঘটনা নয়, কারণ মূল্যবান্‌ হইতে হইলেই বৃহৎ হইতে হয় না। হীরা-জহরতাদি পৃথিবীর মূল্যবান্‌তম বস্তুগুলি সবই অকারে ক্ষুদ্র। তাঁহার রচনার গুণ বিশ্লেষণের স্থান এটা নয়, তবে এইটুকুমাত্র বলিব যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি গতানুগতিকতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, যাহা লিখিয়াছেন, তাহার বিষয় ও ভঙ্গি উভয়ই তাঁহার স্বকীয়তার দ্যুতিতে ভাস্বর। 'কাব্যজিজ্ঞাসা'তে তিনি অভিনবগুপ্ত ও আনন্দবর্দ্ধনের সাহিত্য বিচার ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু গ্রন্থখানি একটু যত্ন করিয়া পড়িলেই দেখা যাইবে, ঐ দুই আলঙ্কারিককে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া কি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যের সহিত তিনি প্রকৃত কাব্যের নিত্যলক্ষণগুলি তাঁহার নিজস্ব চিন্তা ও রসানুভূতি দিয়া পরিস্ফুট করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার কোন রচনার ধ্বনিই অন্য কাহারও প্রতিধ্বনি নয়, যদিও বুঝিতে পারা যায় যে, এই রচনা কেবলমাত্র সহজাত ক্ষমতাতে সৃষ্ট হইতে পারিত না—অনেক চিন্তা, অনেক অধ্যয়নের দ্বারা চিত্তসংস্কারের পঙ্ক অনেক সমুদ্র মন্থন করিয়া এই অমৃত উঠিয়াছে। ভাবের গভীরতা ও ভাষার মনোহারিত্বের সহিত যে পরিমিতি জ্ঞান ও চিন্তার শৃঙ্খলা তাঁহার রচনায় দেখা যায়, তাহাও অপূর্ব্ব, ঐ গুণ লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, মাথা ও হাতের তাল রক্ষা করিয়া এমন লেখা লিখিবার ক্ষমতা দুর্লভ। তিনি প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছু রচনা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার রচনাতে বাংলা-সাহিত্যের

অন্যথা দরিদ্র প্রবন্ধ-ভাণ্ডারে মহার্ঘ ধনরত্ন সঞ্চিত হইয়াছে।

যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনই সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তিনি নিজের কর্ম্মের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখিতেন না। হৃদয়ের দাক্ষিণ্য চতুর্দ্দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া অপরের সাহিত্য-চেষ্টার আনুকুল্য করিতে তাঁহার বড় আনন্দ ছিল। লেখক-সমাজে তিনি যেন ছিলেন সমাজপতি। ছোট, বড়, সাহিত্যের সহিত নিকট এবং দূর-সম্পর্কীয় সকল লেখক মিলিয়া যে বিরাট যৌথ-পরিবার, তিনি তাহার যেন সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় সকলের প্রতি প্রসন্ন কর্ত্তা। অত বড় প্রতিষ্ঠান শিখরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া এবং অত সর্ব্বদা ব্যস্ত মানুষ হইয়াও যে যাহা পড়িতে দিত, তিনি সযত্নে পড়িতেন এবং প্রশংসার যোগ্য হইলে প্রশংসা করিতেন নতুবা পরম সহিষ্ণুতার সহিত উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিতেন। সভা, সমিতি, নাট্যাভিনয় প্রমোদ-ভ্রমণ অথবা অন্য কোন অনুষ্ঠান, যাহা কিছুর আয়োজন করিলেই লেখক সাহিত্যিকেরা তাঁহাকে ডাকিত, তিনি আগ্রহ করিয়া উপস্থিত হইতেন এবং তাঁহার উপস্থিতি দ্বারা অনুষ্ঠানের মর্য্যাদা বাড়াইয়া দিতেন। সকলেই যেন ছিল তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর।

ব্যবহারজীবী, রাজনীতিক, সাহিত্যিক—এ সকল ত তিনি ছিলেনই, কিন্তু তাহা ছাড়াও ছিলেন দেশপ্রেমিক—কেবলমাত্র সাধারণ অর্থে নয়, বাংলা দেশ, বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁহার অসামান্য দরদ ছিল বলিয়া। 'অন্ন-চিন্তা' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লইয়া তিনি 'সবুজ-পত্রে'র পৃষ্ঠায় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ করেন, তাহাতে চতুর্দ্দিকে অবহেলিত ও সকলের নিন্দায় লাঞ্ছিত আদর্শ-পাগল বাঙালী তরুণ-সমাজের প্রতি যে গভীর মমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। আমাকে একাধিকবার বলিয়াছিলেন যে, যেদিন হাই-কোর্টে তিনি বাংলা ভাষায় আমাদের নিকট তাঁহার বক্তব্য বলিতে পারিবেন এবং জজেরা বাংলা ভাষাতেই আমাদের অভিমত দিবে, সেই দিনই ওকালতি ব্যবসায়ে তিনি তৃপ্তি লাভ করিবেন।

[illegible] হৃদয়ের শুভ্র সাধারণত্বে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, মনন-শক্তির প্রাচুর্য্যে, হৃদয়ের উদারতায়, চরিত্রের সাহসিকত্বে এবং অন্তরের অদম্য আশাপরায়ণতায় আমার নিকট তাঁহাকে উচ্চতম বাঙালীর মূর্ত্ত বিগ্রহ বলিয়া মনে হইত। বিগত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি অকস্মাৎ আমাদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। অনেকে বলিয়াছেন যে, তাঁহার মত আর কেহ রহিল না, তাহা শুধু কথার কথা নয়, অতি নিদারুণ ও শোচনীয় সত্য।

মাটির গন্ধ—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য চার টাকা মাত্র।

শহর ছাড়িয়া গ্রামে বাস করিবার চেষ্টা আজ মানুষের মনে নূতন করিয়া জাগিয়াছে। সারাজীবন শহরের বদ্ধ বাতাসে তাহাদের প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, তাই চায় মুক্ত বাতাসে হাত-পা মেলিয়া একটা সহজ-জীবন যাপন করিতে। সভ্যতা তাহাদের পল্লী ছাড়াইয়াছে বহুদিন। আজ পল্লীর কথা নূতন করিয়া তাহাদের মনে পড়িতেছে। কিন্তু বহুদিনের পরিত্যক্ত পল্লী—মানুষের অভাবে দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। যেমন কদর্য্য পরিবেশ তেমনি কুৎসিত আবহাওয়া। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এখনও আছে, কিন্তু মানুষের প্রকৃতি বদলাইয়াছে। শহর ছাড়িয়া মানুষ বার বার আসিয়াছে, বার বার ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

এমনি একটি চিত্র আঁকিয়াছেন গ্রন্থকার তাঁহার 'মাটির গন্ধ' উপন্যাস-খানিতে। তিন সরিকের বাড়ী। আগে দূরে থাকায় ভ্রাতৃ-প্রীতি যেমন ছিল, কাছে আসায় তাহা আর রহিল না। জগদীশ ছিল দেশের বাড়ীতে। সেই জমি-জমা দেখাশুনা করিত। এখন সকলে আসিয়া ভিড় করায় তাহার স্বার্থে ঘা পড়িল। কৌশল করিয়া সে-ই পৃথক হইবার কথা পাড়িল। বড় ভাই, বৃহৎ স্বপ্ন লইয়া যিনি গাঁয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহার স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। ভাইরা পাছে অসন্তুষ্ট হয়, তাহাদের অংশে সব কিছু ছাড়িয়া দিয়া নিজে চর-হিজুলিতে আসিয়া ঘর বাঁধিলেন—শহর হইতে দু' মাইল দূরে গঙ্গার কিনারায়। "আগে বর্ষাকালে গঙ্গায় জল বাড়লে প্রায় প্রতি বারই এর চার ধারের জমি জলে ডুবে যেত—মাঝখানে দ্বীপের মতো জেগে থাকত চর-হিজুলি; পাঁচ-সাত ঘরের বসতি নিয়ে বিস্তীর্ণ আবাদের মাঝে ছোট একটি গ্রাম। প্রতি বছরের বন্যায় পলি-মাটির আস্তরণ জমে জমে চার পাশের নাবাল জমিগুলো ভরাট হয়েছে ক্রমে।" গ্রন্থকার চর-হিজুলির মোটামুটি বর্ণনা দিয়াছেন এইরূপ। সনাতন ভাগে জমি চাষ করিত। তাহারই ভরসায় তিনি ঘর বাঁধিলেন। এই চর-হিজুলির চিত্র আঁকিতে অনেকগুলি বিভিন্ন চরিত্র ভিড় করিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। যেমন আসিয়াছে হলধর, সাধুবাবা, বিষ্টু, ভৈরবী বা মঙ্গলা। এই সাধুবাবাকে কেন্দ্র করিয়া আর একটি কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ভৈরবী ও বিষ্টুকে ঘিরিয়াও আর একটি গল্প দানা বাঁধিয়াছে। এই চরিত্র-চিত্রণে গ্রন্থকারের যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়।

কয়েক বছর বন্যা না হওয়ায় চর-হিজুলি বেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু ভগবানের অভিপ্রেত অন্যরূপ। গত বন্যা মানুষকে পথে বসাইয়া

সব ভাসাইয়া লইয়া গেল। চর-হিজুলিতে হাহাকার উঠিল। বন্যার জল নামিল বটে, কিন্তু পলির এ°টেল কাদা শীঘ্র শুকাইবার কোনো সম্ভাবনাই নাই। তবু হলধররা প্রায় সকলেই কোমর বাঁধিয়া ঘর বাঁধিতে ফিরিয়া আসিল। শুধু আসিলেন না তিনি, যাঁহাকে তাহারা ঠাকুরমশাই বলে। গ্রন্থকারের কয়েকটি কথায় ইহার মর্ম্মার্থ পরিস্ফুট হইয়াছে।

"হলধর এসে বলল, ঠাকুরমশাশয়, আমরা চর-হিজুলিতে কাল ফিরে যাব। আপনি যাবেন ত ?

আমি ! চম্‌কে উঠলাম। আর একটু জল-কাদা না শুকোলে—

হলধর আমার মুখের-পানে তাকিয়েছিল একদৃষ্টে লক্ষ্য করছিল, ভাব পরিবর্ত্তন। আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে হেসে বলল, না ঠাকুরমশায়, ও জল-কাদা কোনো জন্মে শুকোবে না। যার যা দেশ—সেই তার সগ্‌গ। কোটা-বালাখানার মানুষ আপনারা—জল-কাদার দেশে যাবেন কি দুঃখে !

তোমাদের সব লোকই কি ফিরে যাবে ?

যাবে—নিশ্চয় যাবে। কথায় বলে :

আপন ঘরখানা আঁধারে আলো,

ঢুস করে পড়ে মরি—সেও গিয়ে ভালো।"

এ আকর্ষণ, কিসের আকর্ষণ কেহ জানে না। দুঃখ পায় তবু ছাড়তে পারে না। জানে, "এর মধ্যে সুর যত না আছে, আছে প্রচুর কোলাহল। তুচ্ছ, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি, হাসি, কান্না, কলহ, উষ্মা, প্রেম, সোহাগ, সান্ত্বনা—সব কিছুই প্রতি দিন আর প্রতি রাত্রির দণ্ড প্রহরের অবিচ্ছিন্ন ধারায় মিশে বয়ে চলেছে। অথচ দূর থেকে নারিকেল গাছের ঐ সঙ্কেত দেখলেই মনটি নেচে ওঠে।"

ঐ সঙ্কেতই তাহাদের আকর্ষণ করিতেছে। সে আকর্ষণ ছাড়াইবার কাহারও সাধ্য নাই। 'গ্রন্থকার ইহাকেই বলিয়াছেন, 'মাটির গন্ধ'। আজকের দিনে এরূপ বই-এর প্রয়োজন আছে।

শ্রীগৌতম সেন

কাঙ্গলা বিলের পাগলা—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য – পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

গ্রন্থখানি আটটি কবিতার সমষ্টি। প্রথম কবিতার নাম অনুসারে বইখানির নামকরণ করা হইয়াছে। কবি স্বর্ণকমলের নাম পাঠক-সমাজে অপরিচিত নয়। তবে দীর্ঘদিন তাঁহার লেখা বড় একটা চোখে পড়ে নাই। কবিতাগুলির অধিকাংশই গ্রাম্যচাষী বা নিম্নস্তরের লোকদের লইয়া লেখা। ইহাদের কথা প্রায়ই কেহ বলেন না। আজ কয়জন কবিই বা তাঁহাদের খবর রাখেন। অথচ ইহাদের কথাই সবচেয়ে বেশী বলার ছিল। এবারে সত্যিকার কবির হাতে পড়িয়া যে চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা পড়িতে পড়িতে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। একটি কবিতার কয়েকটি লাইন তুলিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

> সমাধিতে তার প্রদীপ জ্বালায়ে দিতে
> "উল্লাসী একদিন,
> দেখিল এক জামরুল গাছ
> উঠেছে সমাধি চিরে।
> কৌতুকে আর উল্লাসে উল্লাসী—
> ভাবিল তাহার স্বামী—
> উঠেছে সত্যি বেঁচে
> জামরুল গাছ হয়ে।
> তখন থেকে নিত্য যে ঢালে জল,
> জামরুল গাছ পান করে বুঝি বসে,
> "কত না রৌদ্র কত না জলেতে ভিজে
> ক্লান্ত হয়েছিল সে।"

দরদি কবি এমনি করিয়াই মালার পর মালা গাঁথিয়া গিয়াছেন। দরদ না থাকিলে যেমন গান হয় না, দরদ না থাকিলে তেমনি কবিতাও হয় না। তাই দরদি-কবির এই এক্সপেরিমেণ্টকে আমরা অভিনন্দিত করি।

শ্রীগৌতম সেন

এপার গঙ্গার গল্প—হাওড়া জেলা যুবসঙ্ঘ—১০, ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেন, শিবপুর, হাওড়া। মূল্য—২৲ টাকা।

বইয়ের নাম পড়ে মনে হবে—এপার গঙ্গার গল্পগুলি বুঝি ওপার গঙ্গার গল্পের চেয়ে ভিন্নতর। জেলার বৈশিষ্ট্য, গ্রাম্য আমেজ, কলকারখানার জীবন অথবা নবীন লেখকদের চিন্তাধারা কোনটি বা প্রধান হয়ে উঠেছে গল্প বলার রীতিতে। ব্যবধান আগে ছিল এককালে—গঙ্গার এপার ওপারের ব্যবধান। ইদানীং একটি মাত্র সেতুর সংযোগে সংস্কৃতি কেন্দ্র কলকাতা আর শিল্পপ্রাণ হাওড়া এক হয়ে গেছে। যানবাহন আর গতির টানাপোড়েনে দু'ধারের শহর মিলিয়ে ফুল শোভিত চমৎকার একখানি শাড়ীই তৈরী হয়েছে। এই বুননে শ্রম ও শিল্প…কার কতটুকু—সে হিসাব মিলিয়ে নেওয়া আজ কঠিনই। বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে কথা-সাহিত্যের খ্যাতির মূলে—গ্রাম শহর বা জেলা কোনটির দানই কম নয়। পৃথিবীর কথা-সাহিত্যেও এর মূল্যমান স্বীকৃত। এপারের গঙ্গার কয়েকটি এই মূল্যমান নির্ণয়ে কিছু সহায়তা করেছে।

একুশটি ছোট গল্পের সঙ্কলন এটি। এর লেখকমণ্ডলী সাহিত্য জগতে নবাগত। গ্রন্থের মুখবন্ধে প্রসিদ্ধ কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন …তাদের সবগুলিই প্রাথমিক প্রয়াস, কোন কোনটি হয়ত একেবারেই প্রথম গল্প। কিন্তু তা সত্ত্বেও লেখক-লেখিকাদের আন্তরিকতা, জীবনবোধ, মনোসমীক্ষণের অনুসন্ধান, দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য, টেকনিকের নূতনত্ব এবং বেশ কয়েকটি গল্পে প্রতিভার উজ্জ্বল চিহ্ন সম্ভবতঃ পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। সর্ব্বোপরি যে সতেজ তারুণ্য সমস্ত গল্পগুলিকে একটি ভাবগত ঐক্য-সূত্রে বেঁধেছে সেটিও সমগ্রভাবে আগামী কালের নতুন লেখক-লেখিকাদের মানস-প্রস্তুতি ও শিল্পচেতনার পরিচয় পরিস্ফুট করে তুলবে।

আলোচ্য গল্প সংগ্রহ প্রকাশের ব্যবস্থাটিও লক্ষণীয়। কোন অর্থবানের অনুগ্রহে বা পুস্তক প্রকাশকের আনুকূল্যে বইটি প্রকাশিত হয় নি। একুশ জন লেখকলেখিকা ও সাহিত্যরসিক শুভানুধ্যায়ীর সামান্য অর্থ সাহায্য সম্বল করে এটি আত্মপ্রকাশ করেছে। এর পিছনে রয়েছে একটি শিশু প্রতিষ্ঠান—হাওড়া জেলা যুবসঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের বহুমুখী কার্য্যকরী সূচীর মধ্যে সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ অন্যতর। পরিকল্পনাটি সমবায় ভিত্তিক। এইভাবে দশেমিলে কর্ম্ম পরিচালনার নমুনা যত্রতত্র মেলে না। নূতন সাহিত্যব্রতীদের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

কাব্যচয়নিকা—দেবেন্দ্রনাথ সেন। বঙ্গভারতী গ্রন্থালয়। সাঁতরাগাছি, হাওড়া। মূল্য ৫৲ টাকা।

এই সঙ্কলন গ্রন্থের কবিতাগুলি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন ৺কবি মোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি। রবীন্দ্রপ্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া যে সকল কবি বাংলা সাহিত্যের কাব্যধারাকে ভাবসুন্দর ও ছন্দমুখর করিয়া তুলিয়াছিলেন, কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন যে তাঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সে কথা এখন আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। কবিবর দেবেন্দ্রনাথ সেন মূলতঃ গীতিকবি ; তাঁহার কাব্যগুলিতে সহজ সরল ভাবধারার স্বাভাবিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার বিস্মৃতপ্রায় কবিতাগুলির যাঁহারা রসাস্বাদন ও আলোচনা করিতে চান তাঁহাদের কাছে এ গ্রন্থ বিশেষ মূল্যবান্। শ্রীশ্যামসুন্দর মাইতি লিখিত ভূমিকা "কাব্যপরিচিতি" এই সঙ্কলন গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী

প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী

শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীপার্থ বসু

এই সূচীতে উল্লিখিত রচনাগুলি পরে রবীন্দ্রনাথের কোন্ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, রচনার নামোল্লেখের পর তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেগুলি এখনও রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেগুলি 'অপ্রকাশিত' বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের যতগুলি গানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সবই গীতবিতান তিন খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে; সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের নির্দেশ স্বতন্ত্র দেওয়া হইল না; গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। ছোটগল্পগুলির অধিকাংশ গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত, তাহারও গ্রন্থাকারে প্রকাশ-নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। অধিকাংশ স্বরলিপিও স্বরবিতানে সংকলিত হইয়াছে।

এইরূপ তালিকায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া যাইবার প্রভূত সম্ভাবনা; কেহ যদি কোনো ভ্রম লক্ষ্য করেন তবে তাহা সংকলয়িতাদের গোচরীভূত করিলে তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন।

১৩০৮

বৈশাখ

প্রবাসী। "সব ঠাঁই মোর ঘর আছে।" ৩ ফাল্গুন, ১৩০৭

উৎসর্গ

১৩০৯

বৈশাখ

প্রবাসের প্রেম ১-২। "সে তো সেদিনের কথা", "নব নব প্রবাসেতে"

উৎসর্গ

মাঘ ও ফাল্গুন

সুদূর। "আমি চঞ্চল হে"

উৎসর্গ

১৩১০-১৩

এই কয় বৎসর রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা প্রকাশিত হয় নাই। ১৩০৮-১২ সালে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের এবং ১৩১২-১৩ সালে ভাণ্ডার পত্রের সম্পাদক।

১৩১৪

আষাঢ়

মাষ্টারমশায়, ভূমিকা ও ১-৭

গল্প

শ্রাবণ

মাষ্টারমশায় ৮-১১

অনুবৃত্তি

ব্যাধি ও প্রতিকার

রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পরিশিষ্ট

ভাদ্র

গোরা ১-৩[১]

আশ্বিন

"ব্যাধি ও প্রতিকার"

দেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত পুস্তিকার আলোচনা

অপ্রকাশিত

মাঘ

যজ্ঞভঙ্গ

রবীন্দ্র-রচনাবলী ১০, পরিশিষ্ট

ফাল্গুন

পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনী উপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতা

সমূহ

---

১ 'গোরা' উপন্যাস এই সংখ্যায় আরম্ভ ও পরবর্তী সংখ্যাসমূহে ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়া ১৩১৬ ফাল্গুন সংখ্যায় সমাপ্ত হয়। পরবর্তী সংখ্যাগুলির সূচীতে 'গোরা' স্বতন্ত্র উল্লিখিত হইল না।

১৩১৫

বৈশাখ

ভেরা সেজোনোভা প্রবন্ধ প্রসঙ্গে, দেশের রাষ্ট্রীয় অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য।

অপ্রকাশিত

আষাঢ়

সমস্যা

রাজা প্রজা

শ্রাবণ

সদুপায়

সমূহ

ভাদ্র

পূর্ব্ব ও পশ্চিম

সমাজ

ফাল্গুন

নবযুগের উৎসব

শান্তিনিকেতন ৫

১৩১৬

জ্যৈষ্ঠ

স্বরলিপি। "বাঁচান বাঁচি মারেন মরি" ও "তিমির দুয়ার খোলো।"

স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আষাঢ়

স্বরলিপি। "আরো আরো প্রভু"

স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রাবণ

একটি দৃষ্টান্ত

'সংকলন ও সমালোচন'[২] বিভাগে 'র' স্বাক্ষরে মুদ্রিত।

পাঠসঞ্চয়, "আমেরিকার একটি বিদ্যালয়"

রচনায় অপূর্বতা

'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগে 'র' স্বাক্ষরে মুদ্রিত।

অপ্রকাশিত

স্বরলিপি। "আজি শ্রাবণঘন গহনমোহে" ও "মেঘের পরে মেঘ জমেছে"

স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাদ্র

স্বরলিপি। "হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই"

স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্বিন

স্বরলিপি। "জগত জুড়ে উদার সুরে"

স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্তিক

স্বরলিপি। "গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ"

স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অগ্রহায়ণ

লামার প্রাণদণ্ড

'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগে মুদ্রিত। স্বাক্ষরবিহীন। রবীন্দ্রনাথের পাঠসঞ্চয়ের অন্তর্গত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের রচনা হওয়া সম্ভব, এই অনুমানে বর্তমান তালিকাভুক্ত। কিন্তু ইহা নিশ্চিত প্রমাণ নহে।

স্বরলিপি। "অমল ধবল পালে"

স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৌষ

তপোবন

শান্তিনিকেতন ৯। শিক্ষা ১৩৪২ ও পরবর্তী সংস্করণ

ফাল্গুন

বিশ্ববোধ

শান্তিনিকেতন ১০

চৈত্র

ভাগলপুর সাহিত্যসম্মিলনে রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতা

অপ্রকাশিত

শিবাজি ও গুরুগোবিন্দ সিংহ

ইতিহাস

১৩১৭

বৈশাখ

বিরহ কাব্য

মেঘদূত সম্বন্ধে বঙ্গদর্শন ১৩০৮ শ্রাবণ সংখ্যায় "মেঘদূত" নামে প্রকাশিত ও "নববর্ষ" নামে বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধের পরিপূরক।

অপ্রকাশিত

---

২ "তিনি [রবীন্দ্রনাথ] স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দীর্ঘকাল প্রবাসীর 'সংকলন' বিভাগের পরিচালক ছিলেন। আমি তাঁহাকে ইংরেজী অনেক মাসিক পত্র পাঠাইয়া দিতাম। তিনি তাহা হইতে ভাল ভাল প্রবন্ধ বাছিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগকে তাহার সারসংগ্রহ ও অনুবাদ করিতে দিতেন। অনুবাদগুলি তাঁহার হাতে পৌঁছিবার পর সংশোধনের পালা আরম্ভ হইত। সংশোধন ও সংক্ষেপণ ত হইতই, অনেক স্থলে প্রায় সমস্তটাই তিনি নিজে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বাঁদিকের খালি জায়গায় লিখিয়া দিতেন।"—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক পত্র", শান্তিনিকেতন পত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

আষাঢ়

গুহাহিত

শান্তিনিকেতন ১১

শ্রাবণ

অপমান। "হে মোর দুর্ভাগা দেশ"

গীতাঞ্জলি

মাতৃ-অভিষেক। "হে মোর চিত্ত"

গীতাঞ্জলি

ভাদ্র

প্রণতি। "যেথায় থাকে সবার অধম"

গীতাঞ্জলি

সাধনা। "ভজন পূজন সাধন আরাধনা"

গীতাঞ্জলি

রাজবেশ। "রাজার মত বেশে তুমি"

গীতাঞ্জলি

শ্রাবণ - সন্ধ্যা

শান্তিনিকেতন ১১

আশ্বিন

গ্যেটের উক্তিসংগ্রহ

'সংকলন ও সমালোচন' বিভাগে মুদ্রিত। স্বাক্ষর-বিহীন। রবীন্দ্রনাথের পাঠসঞ্চয়ের অন্তর্গত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের রচনা হওয়া সম্ভব, এই অনুমানে বর্তমান তালিকাভুক্ত।

পূর্ণ

শান্তিনিকেতন ১২

গান। "জীবনে যত পূজা"

গীতাঞ্জলি

কার্তিক

মাতৃশ্রাদ্ধ

শান্তিনিকেতন ১২

মাঘ

জাগরণ

শান্তিনিকেতন ১২

ফাল্গুন

আত্মবোধ

শান্তিনিকেতন ১৩

মঞ্জুলা

'Stephen Philips এর Marpessa কাব্যের অনুবাদ।' মূলত: শ্রীইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী কৃত এই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথ সংশোধনকালে অধিকাংশই নূতন করিয়া লিখিয়া দেন। এই পাণ্ডুলিপিটি শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র-সদনে আছে। প্রবাসীর জন্য রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে যে-কপি করিয়া পাঠান তাহা প্রবাসীর সহকারী সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র, শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট রক্ষিত আছে।

প্রবাসীতে অনুবাদকের নাম উল্লিখিত নাই, রচনা-শেষে 'শ্রী' মুদ্রিত।

১৩১৮

বৈশাখ

ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা

শান্তিনিকেতন ১৩

জ্যৈষ্ঠ

নববর্ষ

শান্তিনিকেতন ১৪

আষাঢ়

বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ৩

বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৩৪২)

ভাদ্র

জীবনস্মৃতি

অতঃপর ধারাবাহিক প্রকাশিত হইয়া ১৩১৯ শ্রাবণ সংখ্যায় সমাপ্ত ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (১৩১৯)। প্রবাসীর পরবর্তী সংখ্যার কিস্তিগুলি স্বতন্ত্র উল্লিখিত হইল না।

বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য

বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৩৪২)

---

৩ সূচী হইতে দেখা যাইবে, এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল ধারাবাহিকভাবে শব্দতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধ প্রবাসীতে প্রকাশ করেন; এইগুলি লইয়া বিদ্বৎসমাজে কিছু আলোচনাও হয়, রবীন্দ্রনাথ তাহার কোনো-কোনোটির প্রত্যুত্তরও দেন; নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের আলোচনা—সতীশচন্দ্র বসু, "বাংলা ব্যাকরণে তির্যক্‌রূপ"। ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত "বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য" প্রবন্ধের পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথ ইহার উত্তর দেন। যোগেশচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথের "বাংলা ব্যাকরণে তির্যকরূপ" প্রবন্ধের আলোচনা করেন ১৩১৮ ভাদ্রের প্রবাসীতে "বাঙ্গালা ব্যাকরণের বিচার" প্রবন্ধে; রবীন্দ্রনাথ যোগেশচন্দ্রের বক্তব্য বিষয়ে আলোচনা করেন আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার "বাংলা নির্দেশক" প্রবন্ধের 'নোট'-এ। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের উত্তর যোগেশচন্দ্র দেন মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁহার "বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিচার" নিবন্ধে।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় "বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ বিশেষ্য" ও "বাংলা নির্দেশক" প্রবন্ধের আলোচনা করেন যথাক্রমে তাঁহার "বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" (প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৮) এবং "'বাংলা নির্দেশক' সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" (প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৮) শীর্ষক আলোচনায়।

১৩১৮ ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের "বাঙ্গলা ভাষার সংস্কার" প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্বঘটিত' কোনো কোনো মন্তব্যের আলোচনা আছে।

আশ্বিন

অচলায়তন

সম্পূর্ণ নাটকটি এক কিস্তিতে মুদ্রিত ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত (১৯১২)।

বাংলা নির্দ্দেশক

বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৩৪২)

কার্তিক

বাংলা বহুবচন

বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৩৪২)

অগ্রহায়ণ

স্ত্রীলিঙ্গ

বাংলা শব্দতত্ত্ব (১৩৪২)

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ৪

পরিচয়

ভগিনী নিবেদিতা

পরিচয়

পৌষ

রূপ ও অরূপ

সঞ্চয়

ফাল্গুন ৫

ধর্মের অধিকার ৬

প্রথমে পুস্তিকাকারে (১৯১২) পুনর্মুদ্রিত, পরে সঞ্চয় গ্রন্থভুক্ত

১৩১৯

বৈশাখ

ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা ৭

পরিচয়। ইতিহাস

না-জানা। 'ভাগ্যে আমি পথ হারালেম'

গীতিমাল্য

জ্যৈষ্ঠ

সাপুড়িয়া। 'কে গো তুমি বিদেশী'

গীতিমাল্য

বিদায়। 'পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই'

গীতিমাল্য

তীর্থযাত্রা। 'এমনি করে ঘুরিব দূরে বাহিরে'

গীতিমাল্য

আষাঢ়

যাত্রা। 'ওগো পথিক দিনের শেষে'

গীতিমাল্য

অবসান। 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী'

গীতিমাল্য

শ্রাবণ

নিকটের যাত্রা। 'অনেক কালের যাত্রা আমার'

গীতিমাল্য

ঝড়। 'ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো'

গীতিমাল্য

জলস্থল

পথের সঞ্চয় ৮

দুই ইচ্ছা

পথের সঞ্চয়

ভাদ্র

লণ্ডনে

পথের সঞ্চয়

লীলা। 'আমায় আমি করব বড়'

গীতিমাল্য

সুন্দর। 'সুন্দর বটে তবে অঙ্গদখানি'

গীতিমাল্য

---

৪ 'চৈতন্য লাইব্রেরি অধিবেশন উপলক্ষে রিপন কলেজের ২৯শে অক্টোবর [১৯১১] তারিখে পঠিত।'

৫ ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সৌদামিনী দেবী লিখিত "পিতৃস্মৃতি" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই রচনায়, পূর্বোক্ত "মঞ্জুলা"র ন্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রভূত সংস্কার করিয়াছিলেন, রচনাপাঠে এইরূপ অনুমান হয়। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে লিখিয়াছেন —"বড়দিদির লেখাটি পাঠাই।"

সম্প্রতি দেখিয়াছি যে, প্রবাসীতে প্রেরিত পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণই রবীন্দ্রনাথের হস্তলিখিত; শ্রীসীতা দেবী এটি রক্ষা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রসদনে উপহার দিয়াছেন।

৬ মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১২ মাঘ ১৩১৮ সায়ংকালে পঠিত হয়।

৭ 'চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশন উপলক্ষ্যে ওভারটুন হলে ৩ চৈত্র [১৩১৮] তারিখে পঠিত।'

৮ পথের সঞ্চয় ১৩৪৬ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩১৯ সালে বিলাতযাত্রার সময় ও বিলাত-প্রবাসকালে রচিত প্রবন্ধাবলী এই গ্রন্থে সংকলিত হয়; এই সংকলনে পরবর্তী বিলাতযাত্রাকালে (১৯২০) লিখিত পত্র, এবং পরিশিষ্টে কতকগুলি চিঠি সংগৃহীত হয়, কিন্তু ১৩১৯ সালে বিলাতযাত্রাকালে লিখিত অনেকগুলি প্রবন্ধ এই সংকলনে সংগৃহীত হয় নাই। গৃহীত রচনাগুলির অনেক পরিবর্তন, যেমন সাধুভাষায় লিখিত প্রবন্ধের চলতি ভাষায় রূপান্তর, ইত্যাদি সাধিত হয়। ১৩৫৪ সালে প্রকাশিত 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলিও সংগৃহীত হয়, এবং সব প্রবন্ধই মূলানুগরূপে মুদ্রিত হয়।

এই সূচীতে উল্লিখিত পথের সঞ্চয় ঐ গ্রন্থের উক্ত দ্বিতীয় সংস্করণ বুঝিতে হইবে। ব্যতিক্রমক্ষেত্রে প্রথম সংস্করণ বিশেষ ভাবে উল্লিখিত।

বিকাশ। 'যেদিন ফুটল কমল'
গীতিমাল্য
আশ্বিন
শিক্ষাবিধি
পথের সঞ্চয়
কাছের সাথী। 'নামহারা এই নদীর পারে'
গীতিমাল্য
শরৎ-প্রভাতে। 'আজিকে এই সকালবেলাতে'
গীতিমাল্য
কার্তিক
বিলাতের চিঠি
পথের সঞ্চয়, "স্টপফোর্ড ব্রুক" নামে
কবি য়েট্‌স
পথের সঞ্চয়
সন্ধ্যা সংকীর্তন। 'এই যে এরা আঙিনাতে'
গীতিমাল্য
অপূর্ব্ব। 'এই দুয়ারটি রেখেছ খোলা'
গীতিমাল্য

১৩২০

বৈশাখ
বিনামূল্যে। 'কে নিবি গো কিনে আমায়'
গীতিমাল্য
জ্যৈষ্ঠ
জাতি-সংঘাত

নিউইয়র্ক রচেস্টারে আহূত উদারধর্ম্মমতাবলম্বিগণের মহাসভায় (The Congress of the National Liberal Federation of Religious Liberals) পঠিত Race Conflict প্রবন্ধের অজিতকুমার চক্রবর্তী কৃত অনুবাদ।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ (১৮৩৫ শক) সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও প্রকাশিত।

অপ্রকাশিত
শ্রাবণ
রবীন্দ্রনাথের পত্র

১ "দেবাসুরে মিলে যখন" [১৩ কার্ত্তিক, ১৩১৯]
২ "আমেরিকার বিদ্যালয়ে অধ্যাপনার প্রণালী"
৩ "চিকাগোয় থাকতে সেখানকার একটি ভালো বিদ্যালয়"

১-সংখ্যক চিঠিখানি পথের সঞ্চয়ের প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত। অপর দুইটি অপ্রকাশিত।

আশ্বিন
বিলাতের চিঠি

"আমাদের বিদ্যালয় দেখবার জন্য ইংরেজ অতিথির"। আশ্বিন ১৩২০ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও মুদ্রিত

অগ্রহায়ণ
দ্বিপদী ১-২০

৫, ১৩ ও ২০ সংখ্যক দ্বিপদী স্ফুলিঙ্গ গ্রন্থে, অপরগুলি লেখন গ্রন্থে প্রকাশিত

পৌষ
মণিহার। 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে'
গীতিমাল্য
ফাল্গুন
ছোট ও বড় ৯
শান্তিনিকেতন ১৫
চৈত্র
গান

১ ভোরের বেলায় কখন এসে
২ গাব তোমার সুরে
৩ বাজাও আমারে বাজাও
৪ জানি গো দিন যাবে
৫ তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
৬ আমার মুখের কথা তোমার
৭ প্রাণে খুসির তুফান উঠেছে
৮ প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
৯ প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
১০ তোমারি নাম বলব
১১ আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
১২ অসীম ধন তো আছে তোমার
১৩ লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
১৪ নয় এ মধুর খেলা
১৫ আমার যে আসে কাছে
১৬ এ হরি সুন্দর

১-১৫-সংখ্যক গান গীতিমাল্যে প্রকাশিত। ১৬-সংখ্যক গান অমৃতসর গুরুদরবারে গীত আরতি-সংগীতের অনুবাদ, গীতবিতান তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত।

একটি মন্ত্র[১]
শান্তিনিকেতন ১৬

---

১ আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোৎসবে সন্ধ্যাকালে পঠিত।

দোল। 'বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা'
গীতিমাল্য

১৩২১

বৈশাখ

গান। 'রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি'
গীতিমাল্য

জ্যৈষ্ঠ

[**কবিতা**] 'শ্রীমান্ নন্দলাল বসু পরম কল্যাণীয়েষু।' 'তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে'। কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ ১৫৩। অপ্রকাশিত

আশ্বিন

[**অভিনন্দনপত্র**] 'সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী'র প্রতি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা উপলক্ষে পঠিত। কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ ৬৩১

অপ্রকাশিত

হাতের লেখা। "লিখন তোমায় রঙীন পাতায় কোন্ বারতা", ১১ আষাঢ় ১৩২১

[ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের] স্বাক্ষরসংগ্রহ-পুস্তকে লিখিত।

গীতরূপ 'তোমার রঙিন পাতায় লিখব প্রাণের কোন্ বারতা।'

গান। 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই'
গীতালি

নূতন গান ও স্বরলিপি

[১] ওদের কথায় ধাঁদা লাগে ১০
[২] ভোরের বেলা কখন এসে ১০
[৩] ওরে ভিখারী সাজায়ে

তিনটি গানই গীতিমাল্যে প্রকাশিত
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্তিক

শরতের গান

[১] আলো যে যায়রে দেখা
[২] এই শরৎ আলোর কমলবনে
[৩] তোমার মোহন রূপে
[৪] আমার গোপন হৃদয় প্রকাশ হল ১১
[৫] শরৎ তোমার অরুণ আলোর
[৬] কোন্ বারতা পাঠালে
[৭] তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ
[৮] আলো যে আজ গান করে

গীতালি

চরম নমস্কার। 'ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল'
গীতালি

শেষের দান। 'ফুল তো আমার ফুরিয়ে গেছে'
গীতালি

গান। 'শ্রাবণ হয়ে এলে ফিরে'
গীতালি

স্বরলিপি সহ। স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অগ্রহায়ণ

গীতিগুচ্ছ

১ দুঃখের বরষায়
২ আমি হৃদয়ে যে পথ কেটেছি
৩ পথ চেয়ে যে কেটে গেল
৪ আমি যে আর সইতে পারি নে
৫ যখন তুমি বাঁধছিলে তার
৬ আগুনের পরশমণি
৭ এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
৮ ঐ যে কালো মাটির বাসা
৯ যে থাকে থাক্ না দ্বারে
১০ শুধু তোমার বাণী নয় গো
১১ মোর মরণে তোমার হবে জয়
১২ না বাঁচাবে আমায় যদি
১৩ মালা হতে খসে-পড়া
১৪ সামনে এরা চায় না যেতে১২
১৫ শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে
১৬ এই কাঁচা ধানের ক্ষেতে যেমন
১৭ তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ১৩
১৮ তোমার অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
১৯ কাণ্ডারী গো, এবার যদি
২০ মেঘ বলেছে যাব যাব
২১ আমার সুরের সাধন
২২ পুষ্প দিয়ে মারো যারে
২৩ এবার কূল থেকে মোর
২৪ তোমার কাছে এ বর মাগি

গীতালি

[ক্রমশঃ

---

১০ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভাদ্র ১৩২১ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত

১১ পরিবর্তিত —'হৃদয় আমার প্রকাশ হল'

১২ পরিবর্তিত—'যেতে যেতে চায় না যেতে'

১৩ কার্তিক সংখ্যাতেও মুদ্রিত, 'শরতের গান'

বাংলা ১৩৬৮ সালের বৈশাখ মাস থেকে প্রবাসীর প্রকাশনার একষষ্টিতম বর্ষ সুরু হবে। এই সুদীর্ঘকাল ধ'রে বাংলা সাময়িক পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রবাসী যে গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে, শিক্ষিত দেশবাসী তার সঙ্গে সুপরিচিত। নূতন বৎসর থেকে প্রবাসী যাতে অধিকতর চিত্তাকর্ষক ও সর্ব্বজন-মনোরঞ্জক হয় তার আয়োজন করা হয়েছে। এ বৎসর প্রবাসীর মাধ্যমে পরিবেশিত হবে তিনটি উপন্যাস—লিখবেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় ও শ্রীচাণক্য সেন। বৈশাখ থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে দুটি উপন্যাস।

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

এ ছাড়া উৎকৃষ্ট গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা এবং অন্যান্য বিচিত্র রচনাসম্ভারে প্রতিটি সংখ্যা প্রবাসীকে সমৃদ্ধ করবার সঙ্কল্পও আমাদের আছে। এই উদ্দেশ্যে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ইত্যাদির প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। গল্প-প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার ১০০৲ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫৲ এবং তৃতীয় পুরস্কার ৫০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত না হলেও যে সকল গল্প প্রবাসীতে প্রকাশযোগ্য ব'লে বিবেচিত হবে তাদের রচয়িতাদের প্রত্যেককে ৩০৲ টাকা ক'রে দক্ষিণা দেওয়া হবে।

উৎকৃষ্ট কবিতা প্রকাশেও প্রবাসীর কৃতিত্বের কথা সুবিদিত। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অজস্র শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে প্রবাসীতে। কবিতাকে যথোচিত মর্য্যাদা-দানের উদ্দেশ্যে উৎকৃষ্ট কবিতার জন্যও নিম্নলিখিত হারে পুরস্কারেরব্যবস্থা করা হয়েছে: প্রথম পুরস্কার ১০০৲ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৫০৲ টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ২৫৲ টাকা। যে-সকল কবিতা পুরস্কার পাবে না, কিন্তু প্রকাশযোগ্য ব'লে বিবেচিত হবে, তাদের প্রত্যেকটির জন্য ১০৲ ক'রে দক্ষিণা দেওয়া হবে।

শুধু রসসাহিত্য নয়, মননসাহিত্য পরিবেশনও প্রবাসীর লক্ষ্য। চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকদের উৎসাহবর্দ্ধনের উদ্দেশ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধের জন্যও পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাঁচটি পুরস্কারের হার যথাক্রমে: প্রথম পুরস্কার ১০০৲, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫৲, তৃতীয় পুরস্কার ৫০৲, চতুর্থ পুরস্কার ৪০৲, পঞ্চম পুরস্কার ৩০৲টাকা। এই সকল রচনার সঙ্গে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি ফোটোর জন্যে লেখকরা পাবেন অতিরিক্ত আরো পাঁচ টাকা।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতামূলক সত্য ঘটনা অনেক সময় গল্প উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক হয়। পাঠকগণ যাতে নিজ নিজ জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা অথবা অভিজ্ঞতার কথা লিখতে উৎসাহিত হন সেই উদ্দেশ্যেও আমরা পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছি। মনোনীত প্রত্যেকটি রচনার জন্য ২৫৲ টাকা করে দক্ষিণা দেওয়া হবে। রচনা যাতে প্রবাসীর দু' পৃষ্ঠার বেশী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। লেখার সঙ্গে প্রেরিত যে সকল ছবি প্রবাসীতে ব্যবহৃত হবে তাদের প্রত্যেকটির জন্য ৫৲ টাকা ক'রে দেওয়া হবে।

উপরিউক্ত প্রতিযোগিতাগুলির জন্য প্রেরিত রচনা ১৩৬৮ সালের ৩২শে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত গৃহীত হবে। **"প্রতিযোগিতার জন্য"** এই কথাটি রচনার উপর লিখিত থাকা প্রয়োজন।

পুনরুজ্জীবিত ভারতীয় চিত্রকলার ধারক ও বাহকরূপে এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ পদ্ধতির চিত্র পরিবেশনে জন্মকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রবাসী শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের সাময়িক পত্রিকা-জগতে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে। চিত্রশিল্পীদের উৎসাহদানও প্রবাসী তার একটি প্রধান কর্ত্তব্য ব'লে মনে করে। স্থিরীকৃত হয়েছে যে, যে সকল চিত্র প্রবাসীতে গ্রহণযোগ্য ব'লে বিবেচিত হবে তাদের প্রত্যেকটির জন্য ১০০৲ টাকা ক'রে মূল্য দেওয়া হবে।

নূতন বৎসর থেকে প্রবাসীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নবীন প্রবীণ সকল শ্রেণীর লেখক-লেখিকা এবং পাঠক-পাঠিকার আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথ
শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মতিলাল নেহরু

বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ ভারতের ইতিহাসে এক আশ্চর্য্য শুভদিন। ঐ দিনে ভারতের দুইটি অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে দুইটি শিশুর জন্ম হয় কয়েক ঘণ্টা আগে-পরে, যাহাদের পরবর্ত্তী জীবন আমাদের দেশের ও দশের জন্য অশেষ কল্যাণপ্রদ হয়। এই দুই জনের একজন জন্মগ্রহণ করেন কলিকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে, যাঁহার লোকোত্তর প্রতিভা, অলোকসামান্য ব্যক্তিত্ব এবং বিস্ময়কর ভাষা ও ভাবের উপর অধিকার তাঁহাকে জগৎবরেণ্য করে! এবং সেই কারণে আজ তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী দেশ-দেশান্তরে মহোৎসবের রূপে পালিত হইতেছে।

কিন্তু ভারতের জাতীয়তার ইতিবৃত্তে দ্বিতীয় জনের আসনও অনন্য-সাধারণ। ঐ ২৫শে বৈশাখে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, আগ্রায় এক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের পরিবারে। ঐ শিশুর নাম দেওয়া হয় মতিলাল। মতিলালের পিতা গঙ্গাধর নেহরু মুঘল বাদশাহের নিযুক্ত দিল্লীর শহররক্ষক (কোতোয়াল) ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর তাঁহার পরিবার-পরিজনের পক্ষে দিল্লীতে বসবাস অসম্ভব হওয়ায় উঁহাদের দিল্লী ছাড়িয়া আগ্রায় চলিয়া আসিতে হয়। ঐ পরিবারে শিক্ষার উপর আগ্রহ খুবই ছিল এবং সেই জন্যই আরবী, ফারসী, উর্দ্দু, ইত্যাদি ভাষার সহিত ইংরেজী শিক্ষাও ঐ পরিবারের একজন আয়ত্ত করেন এবং ঐ ইংরেজী জানার কারণে গঙ্গাধরের বংশ নিশ্চিহ্ন হইবার বিপদ্ হইতে রক্ষা পায়। যে সময় ঐ পরিবার দিল্লী হইতে পলাইয়া [illegible] তখন পথঘাট বিঘ্নবিপদ্‌সঙ্কুল। [illegible] বিদ্রোহী দল ছড়াইয়া আছে, তাহাদের লুটপাট তখনও চলিতেছে, এবং সেই সঙ্গে তাহাদের খুঁজিয়া ফিরিতেছে প্রতিহিংসায় উন্মত্ত কোম্পানীর ইংরেজ সেনা।

পথের মধ্যে এক জায়গায় ঐরূপ এক সৈন্যদল নেহরু-পরিবারকে ধরিয়া তাহাদের ইংরেজ সেনাধ্যক্ষের সম্মুখে লইয়া যায়। নেহরু-পরিবারের এক তরুণীর উজ্জ্বল রক্তিমাভ গৌরবর্ণ এবং মুখ, চক্ষু, ইত্যাদি দেখিয়া ইংরেজ অফিসার স্থির করে যে, সে ইংরেজ-কন্যা এবং বিদ্রোহের মধ্যে তাহাকে হরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। ঐ কল্পিত অপরাধে সৈনিকপ্রবর সরাসরি ঐ পরিবারের সব কয়টি পুরুষের উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। বলা-বাহুল্য এই ভাবে অসংখ্য নিরপরাধীর ফাঁসী বা গুলীতে মৃত্যু তখন চলিতেছিল, কেন না ইংরেজ সেনানায়ক সাধারণ ভাবে গোমূর্খতা ও হঠকারিতার জন্যই কুখ্যাত ছিল। ভাগ্যক্রমে নেহরু পরিবারে একজন ভাল ইংরেজী জানিতেন। তিনি ঐ মেয়েটি যে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ তাহার নানা প্রমাণ দেওয়ায় উঁহারা রক্ষা পাইয়াছিলেন।

এই শিক্ষার পথেই পণ্ডিত মতিলাল পরের জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন। ব্যবহারাজীব রূপে তিনি অসাধারণ খ্যাতি এবং অশেষ সম্পদ্ অর্জ্জন করেন। ঐ বিষয়ে তাঁহার নামযশ সমস্ত উত্তর-ভারতে ছড়াইয়া যায়। জমিদারী সংক্রান্ত আইনে তাঁহার দখল অসাধারণ ছিল এবং আদালতে জেরার বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ খুবই কম ছিল।

[illegible] ধন তিনি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং [illegible], ইত্যাদিতেও তিনি [illegible] [illegible] তাঁহারই [illegible]

বিজলীবাতি জ্বলে, তাহার পরে লাটসাহেবের প্রাসাদে বিজলী আসে। মতিলালের মৃত্যুর পর "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" লেখে যে, "তিনি লাট-বড়লাটকেও নিজের সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন না এবং সত্য সত্যই মতিলালের গৃহসজ্জায় এবং তাঁহার ভোজনাগারে 'খানাপিনা'র বিষয়ে তিনি যেরূপ রুচির পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ রুচিসম্পন্ন লাট-বেলাট এদেশে অতি অল্পই আসে।"

বস্তুতই যে দুইজন ঐ ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের কেহই ক্ষুদ্রত্বের অভিশাপগ্রস্ত (Inferiority Complex) ছিলেন না। মতিলালের চলাফেরা, আদান-প্রদানে সেটা সুস্পষ্ট ছিল। লাটভবনে তাঁহার একসময় খুবই সমাদর ছিল, কিন্তু তিনি সে সমাদর কখনও চাহিয়া ফিরেন নাই। অন্যদিকে তাঁহার শিকার, ব্যায়াম ইত্যাদিতেও যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। এই শতাব্দীর গোড়ায় প্যারিসে যে বিশ্ব-প্রদর্শনী হয়—যে প্রদর্শনীর জন্য বিখ্যাত আইফেল টাওয়ার নির্ম্মিত হয়—তাহাতে মতিলাল গিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ কুস্তিগীর গোলাম রুস্তম ও তাঁহার ভ্রাতা কাল্লুকে লইয়া, এবং সেই সঙ্গে তিনি লইয়া গিয়াছিলেন বিখ্যাত সেতার ও সরোদবাদক ভ্রাতাদ্বয় কউকব খাঁ ও কেরামৎউল্লা খাঁকে।

গোলাম রুস্তম ঐ প্রদর্শনীতে জগতের কুস্তি "চ্যাম্পিয়ান" মাদর আলি নামক তুর্ককে পরাজিত করিয়া জগতে ভারতীয় কুস্তিগীরদিগের খ্যাতি স্থাপন করেন।

কিন্তু এই অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাস, সবকিছুই তুচ্ছ করিয়া মতিলাল দেশের মুক্তি ও কল্যাণের ব্রতে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমাদের দেশ সে বিষয়ে লাভবান্‌। তিনি স্বাধীন ভারত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই, কিন্তু ভারতকে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করাইতে যে পথিকৃৎগণ জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, মতিলাল নেহরু তাঁহাদেরই একজন। ভারতের সংবিধানের প্রথম প্রয়াস, "নেহরু রিপোর্ট" তাঁহারই চেষ্টায় ১৯২৮ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে প্রকাশিত হয়। সেই কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন মতিলাল নেহরু।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এই রিপোর্টের গুরুত্ব অসাধারণ। ১৯২৮ সনের ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ্চ মাসে দিল্লীতে সর্ব্বদলীয় সম্মেলনে স্থির হয় যে, ভারতের সংবিধানের প্রশ্নটি "পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকারের" ভিত্তিতে আলোচিত হইবে। দ্বিতীয় বিষয় ছিল সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ও অনুপাতের প্রশ্ন। মে মাসে ডক্টর আনসারীর সভাপতিত্বে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে এক কমিটি নিযুক্ত করা হয়, সংবিধানের নীতি নিয়মের খসড়া রচনা করার জন্য।

জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে ও ভারতীয়তার ক্ষেত্রে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর চেষ্টা শেষদিন পর্য্যন্ত ছিল। তাঁহার মধ্যে প্রাদেশিকতা ছিল না। ক্ষুরধার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সমস্যা-বিচারে অসীম ধৈর্য্য এবং তাহার প্রতিটি দিক নিখুঁত ভাবে নিরীক্ষণ করার ক্ষমতা এবং পন্থা নির্ণয়ে দ্রুত ও নির্ভুল বিচার, এ বিষয়ে বোধ হয় পণ্ডিত মতিলালের সমকক্ষ আর গান্ধীজীর মণ্ডলীতে কেহই ছিলেন না। সেই জন্যই বোধ হয় ১৯৩১ সনের ৭ই ফেব্রুয়ারী, মতিলালের মৃত্যুতে গান্ধীজী বলিয়াছিলেন "মতিলালজীর মৃত্যুতে আমি যা হারাইলাম তাহা চিরকালের জন্যই হারাইলাম।"

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই রণনায়ককে আমরা ভুলিতে বসিয়াছি, ইহা আমাদেরই কলঙ্ক।

পণপ্রথা নিবারণ বিল

বিগত ২৬শে বৈশাখ পার্লামেণ্টের উভয় অংশের মিলিত অধিবেশনে ঐ বিলটি গৃহীত হয়। নূতন আইনে পণগ্রহণ, আইনবিরোধী এবং দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। বিলের ৪ নং ধারায় পণ দাবী করাও দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে।

এই বিল কিছুদিন যাবৎ পার্লামেণ্টের বিবেচনাধীন ছিল। ইহা লইয়া নানা বিতর্ক ও নানা মতামত উচ্চারিত হয়। যাঁহারা ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বর্ত্তমান লোকাচার-চালিত সামাজিক ব্যবস্থাকে সচল রাখা। সেই লোকাচারের ফলে সমাজে কিরূপ কুফল ফলিয়াছে তাহার বিচার করায় তাঁহাদের বোধ হয় বাধা ছিল এবং সেই বাধার মূলে আছে ভোট। অবশ্য কয়েকজন হয়ত সামাজিক প্রথাকে সমাজকল্যাণ চিন্তার উপরে স্থান দিয়াছেন, শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাসের খাতিরে। তবে তাঁহাদের মধ্যে কোন কপট উদ্দেশ্য ছিল মনে হয় না। বিতর্ককালের মন্তব্যের মধ্যে দুইটি অনুধাবনযোগ্য।

শ্রীজয়পাল সিংহ (ঝাড়খণ্ড—বিহার) বলেন, শুধু আইন করিয়া পণপ্রথা বন্ধ করা সম্ভব নয়। যাহারা পণ দিতে চায় এবং নিতে চায়, তাহারা আইনকে ফাঁকি দিবার উপায় আবিষ্কার করিতে পারিবে। বিবাহ যতদিন নারীর পক্ষে একমাত্র নিরাপত্তা, পণপ্রথা একভাবে না একভাবে ততদিন বজায় থাকিবে।

তিনি বলেন যে, এই বিল আদিবাসীদের সামাজিক ব্যবস্থা ওলট-পালট করিয়া দিবে।

আচার্য্য কৃপালনী বিলটির বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, বিলের বিধানসমূহ কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নয়। এই আইনের সাহায্যে দুষ্ট ব্যক্তিগণ বিবাহের দুই পক্ষকে অসুবিধায় ফেলিবার চেষ্টা করিবে। যদি দেখা যায় যে, পণ দাবি করা হইয়াছে এবং দেওয়া হইয়াছে, তবে আদালতের ব্যবস্থার ফলে বিবাহ ভাঙ্গিয়া যাইবে।

তিনি বলেন, আমি এই বিলের বিরোধিতা করিতেছি, ইহা দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি পণপ্রথার উচ্ছেদ চাহিতেছি না। দেশে বহু সম্প্রদায় আছে, বহু খণ্ডজাতি আছে। তাহাদের সামাজিক প্রথাও বিভিন্ন। কিন্তু প্রধানতঃ নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর কথা মনে করিয়াই এই বিল করা হইয়াছে। পার্লামেন্টের মহিলা সদস্যগণ চাহিতেছেন যে, বিলটি গৃহীত হউক। কিন্তু সকল নারীই পণ চাহেন না—ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। আচার্য্য কৃপালনী নারীজাতিকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করিতে বলেন। তিনি বলেন যে, আইন অপেক্ষা ইহাতে সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী। তিনি বলেন যে, বিল যদি আইনে পরিণত করিতেই হয়, তবে ইহার বিধানসমূহের কঠোরতা যথাসম্ভব হ্রাস করা বাঞ্ছনীয়। উপহার যেন পণ বলিয়া গণ্য না হয়। পণ পাইবার ইচ্ছা অথবা পণ চাওয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহা আইনের নীতিবিরোধী।

পণপ্রথার ফলে বাংলায় কি হইয়াছে তাহার নূতন বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। শুধুমাত্র এই কথা বলা প্রয়োজন যে, আইন ও দণ্ডবিধি ছাড়া এই প্রথা দূর করার চেষ্টা যে কিভাবে ব্যর্থ হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত এই বাংলা দেশ। শ্রীজয়পাল সিংহের মত যে, অবিবাহিতা নারী অসহায় যতদিন থাকিবে ততদিন পণপ্রথাও থাকিবে, ইহাও কিন্তু সত্য।

এ রাজ্যের রাজা কে বা কাহারা?

কিছুদিন যাবৎ ভারতের প্রদেশগুলিকে নূতন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ "প্রদেশ" এখন "রাজ্য"। এই নূতন আখ্যার তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা সকলে বোধ হয় সম্যক্ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। পথঘাটও এখন রাজপথ নাম পাইয়াছে যদিও কোন্ রাজা কখন সেই পথে চলাচল করেন তাহা সাধারণের অজ্ঞাত। এই রাজ্যগুলির রাজাই বা কে সে কথাও আমাদের জানা নাই। তবে কালের গতিতে দেশে যে প্রকার অরাজকের সৃষ্টি হইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, একাধিক রাজা এই রাজ্য দখলের জন্য চেষ্টিত এবং আমরা যারা "জনসাধারণ" বলিয়া অবহেলিত, দলিত ও শোষিত হইতেছি, আমরা উলুখড়েরই মত তাঁহাদের মতিগতি, দয়া-দাক্ষিণ্যের বা অন্যায়-অনাচার ও অত্যাচারের নির্জ্জীব ভুক্তভোগী মাত্র। বিশেষ যদি আমরা এই অভিশপ্ত পশ্চিমবঙ্গের সন্তান হই। কেননা সারা ভারতে "গতগৌরব হৃতআসন, নতমস্তক লাজে" যদি কেউ হয় তবে সেই জড়ভরতের শিষ্যবর্গ!

এখানে একদল মহাশয়ব্যক্তি আছেন যাঁহারা শোষণ কার্য্যে ভেল্কি দেখাইতে জগতে অতুলনীয়। খাদ্যে ভেজাল, কাপড়ে রদ্দিসুতা, সিমেন্টে গঙ্গামাটি, ইত্যাদির মিশ্রণে ইঁহারা যেরূপ সিদ্ধহস্ত, আবার ঐ অপরূপ ইন্দ্রজাললব্ধ বিপুল ঐশ্বর্য্যের স্রোতকে পাতালগামিনী করিয়া সরকারী শুল্ক ও আয়কর বিভাগকে দগ্ধকদলী প্রদর্শনেও ইঁহারা সমানে দক্ষ। এই রাজ্যে—তাঁহাদের মতে—অধিকার পূর্ণমাত্রায় তাঁহাদেরই। কারণ হিসাবে তাঁহারা বলেন যে; পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ যেরূপে "পাঁচজুতি" মূল্যে কোহিনুর ক্রয় করিয়াছিলেন উঁহারাও "চাঁদিকি জুতি" প্রয়োগে এই দেশ—খুড়ি, রাজ্য—অধিকার করিয়াছেন। পথেঘাটে ইঁহাদের সেই আস্ফালন প্রতিনিয়তই চক্ষুগোচর ও কর্ণগোচর হয়, কিন্তু ঐ "চাঁদিকি জুতি"র মহিমা কিছুদিন যাবৎ আমাদের জ্ঞান-চক্ষুর গোচরীভূত হইয়াছে। আমাদের ধারণা ছিল, রাজ্যের শাসনতন্ত্রের অধিকারীবর্গই বুঝি সেই রৌপ্য-পাদুকা নিঃসৃত অমৃত সিঞ্চনের পাত্র। কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের এক বন্ধু সে ভুল ধারণা দূর করিয়া দিয়াছেন। তিনি সে সময় ঐ রাজন্যবর্গের চালিত এক বিরাট্ কর্ম্মশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেখানের কর্ম্মীগণ প্রকৃতই শ্রমিক—অর্থাৎ তাঁহাদের কর্ম্মশালায় যথার্থই পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকার অর্জ্জন সম্ভব। কিন্তু সেই কঠোর পরিশ্রমও অধিকারীবর্গের মনঃপূত না হওয়ায়, আমাদের এই বন্ধুর উপর আদেশ হয় যে, আরও অধিক সময় শ্রমিকদিগকে খাটাইতে হইবে। তিনি তাহাতে প্রশ্ন করেন যে, "ওভারটাইম" যে-হারে দেওয়া নিয়ম তাহাতে কি উৎপন্ন দ্রব্যের পড়তা পোষাইবে? উত্তর হয় যে, "ওভারটাইম কে দিতে বলিতেছে? সাধারণ মজুরির হিসাবেই টাকা দেওয়া হইবে।" বন্ধু তাহাতে বলেন যে, ঐরূপ কার্য্যের ফলে ধর্ম্মঘট ইত্যাদি হইতে পারে। অধিকারী মহাশয় তাহাতে উচ্চহাস্যে প্রশ্ন করেন, "ষ্ট্রাইক চালাইবে কে?" এই বলিয়া তিনি অধ্যক্ষকে নিজের খাস কামরায় লইয়া এক খাতা প্রদর্শন করিয়া চমৎকৃত করেন। ঐ খতিয়ানে

রৌপ্যপাত্রকামৃত বণ্টনের মাসিক ও সাময়িক বিবরণ ছিল। যাঁহারা সে প্রসাদ লাভে কৃতার্থ তাঁহাদের নাম দেখিয়া বন্ধুবরের মনে হয়, এ যেন শ্রীক্ষেত্র; জনগণের নেতা, গণজনের নেতা, শ্রমিকের চালক, মজদুরের মুর্শিদ, সবাই সেখানে আছেন। তবে অধিকার-ভেদে প্রসাদের পরিমাণে তারতম্য আছে।

আমাদের এই কাহিনী শুনিবার পর ধারণা জন্মাইল যে,এই রাজ্যের রাজন্যবর্গ ঐ "চাঁদিকি জুতি" প্রয়োগকারী গোষ্ঠী এবং অন্যেরা ভুয়া। কিন্তু কিছুদিন পরে আরেকটি বিশাল প্রতিষ্ঠান, যাহার অধিকারী ঐ গোষ্ঠীরই এক প্রতিদ্বন্দ্বীদল, হঠাৎ ধর্ম্মঘটে বানচাল হইতে চলে। আমরা খোঁজ লইয়া জানিলাম যে শ্রমিকদিগের দুই দলের দলপতিবর্গ, দলগত স্বার্থে, একচ্ছত্র অধিকার প্রাপ্তির জন্য যুদ্ধে নামিয়াছেন এবং অমৃতভাণ্ড ঠেলিয়া ফেলিয়া প্রতিষ্ঠান "দখল" করিতে প্রমত্ত। তখন বুঝিলাম, ঐ রাজন্যবর্গেরও রাজত্ব একেবারে নিষ্কণ্টক নহে এবং ঐ "অমৃত" ও "সর্ব্ব রোগহর" নয় এবং "চাঁদিকি জুতি" সকল অবস্থায় আশু-ফলপ্রদ নহে। রাজ্যে সামন্ত-রাজও আছেন অনেক এবং তাঁহাদের কৃপা করুণা কখন কোন্ পথে যায় তাহা "দেবা ন জানন্তি।"

ইহার উপর আছেন আমাদের শাসনতন্ত্রের অধিকারী-বর্গ ও তাঁহাদের অনুগ্রহভোগী মহাশয়গণ এবং সর্ব্বোপরি আছেন আমলাতন্ত্র ও পুলিশ। এই শেষোক্তগণ যে সকলেই দুরাচার, দুষ্ট বা অত্যাচারী তাহা নয়। বরঞ্চ এ কথা সত্য যে, ইহাদের অধিকাংশই সৎ, দেশের ও দশের জন্য সুব্যবস্থা ও সুবিচার করিতে উৎসুক—এবং অসহায়। অসহায় এই কারণে যে, এই দেশ এখন হিন্দী প্রবাদবাক্য অনুযায়ী "অন্ধেরি নগরী বেবুঝ রাজা। টকা সের ভাজী, টকা সের খাজা।" অর্থাৎ উচ্চ অধিকারীদিগের রন্ধ্রে চাটুকার রূপ শনি প্রবেশ করায় সজ্জন ও কর্ম্মঠ কর্ম্মচারীর অনাদরই বেশী এবং ফাঁকিবাজ, দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরই সমাদর, ফলেন সৎকর্ম্মচারী অসহায় ও ক্ষুব্ধ।

সম্প্রতি কলিকাতায় হাসপাতাল "কর্ম্মী"দিগের ধর্ম্মঘট হইয়াছিল। রোগীর সেবা শুধু ন্যায়ধর্ম্মের অঙ্গ নয়, উহা জাতির প্রগতির একটি প্রধান অংশ। এই হাসপাতালের কর্ম্মীগণ "কর্ম্মী" আখ্যার কতটা যোগ্য তাহা যে অভাগাকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছে, নিজের জন্য বা আত্মীয়স্বজনের জন্য, সেই জানে। এই বিষয়ে "যুগান্তর" যাহা লিখিয়াছেন তাহা এইরূপ:

'রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের উপরতলায় দলাদলির সংবাদ সুবিদিত। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যে, পশ্চিমবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন এবং পশ্চিমবঙ্গ হাসপাতাল ও ম্যালেরিয়া কর্ম্মী ফেডারেশন যে সকল দাবী পেশ করিয়াছেন, উহাদের প্রথম দফাই হইল— "দুর্নীতিপরায়ণ জয়েন্ট হেলথ ডিরেক্টর কর্ণেল চ্যাটার্জ্জির অবিলম্বে অপসারণ চাই।" ইহার পরে কর্ম্মচারীদের দাবী স্থান পাইয়াছে।

'অথচ, স্বাস্থ্য-দপ্তরের যে সকল দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে দুর্নীতি দমন বিভাগের রিপোর্ট চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, সেই বিষয়ে এই ইউনিয়ন হইতে কোন উচ্চবাচ্য করা হইতেছে না।

'১৯৫৮ সনের অক্টোবর মাসে হাসপাতাল কর্ম্মচারী-দের এই ইউনিয়ন দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়। দুই ইউনিয়ন তদবধি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত হইয়াছে। অভিযোগ এই যে, স্বাস্থ্য-দপ্তরের একটি শক্তিশালী মহল এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ লইয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার চেষ্টা করিতেছেন এবং ইউনিয়নটিও নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য স্বাস্থ্য-দপ্তরে তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে কাজে লাগাইতেছে।

'প্রকাশ, এই ইউনিয়নের কর্ম্মীরা বলিয়া বেড়াইতে-ছেন যে, তাঁহারা রাইটার্স বিল্ডিং হইতে অনায়াসেই চাকুরী আদায় করিয়া লইয়া আসিতে পারেন, বরখাস্ত কর্ম্মচারীকে পুনর্বহাল করাইয়া দিতে পারেন, এক কথায়, যে কোন কাজই স্বাস্থ্য-দপ্তরকে দিয়া করাইয়া আনা তাঁহার পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ নহে।

'তাঁহাদের এই কথা যে অসার দম্ভমাত্র নহে, কতক-গুলি ঘটনায় সম্প্রতি সেই সন্দেহ দেখা দিতেছে। যেমন, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চারজন কর্ম্মচারী আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হইয়া বরখাস্ত হওয়া সত্ত্বেও রহস্যজনকভাবে পুনরায় বহাল হইয়াছেন। মফঃস্বলের একটি ম্যালেরিয়া হাসপাতাল হইতে বরখাস্ত আর একজন কর্ম্মচারীকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে চাকুরী দেওয়া হইয়াছে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে গত ১৯৫৮ সালে একজন ডাক্তারকে প্রহার করার ব্যাপারে যে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল, তাহাও কিছুদিন পরে প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয়।

'পশ্চিমবঙ্গ সরকার হাসপাতালগুলিতে ধর্ম্মঘটের বিরোধী এবং গত মাসে আর. জি. কর. হাসপাতালের কর্ম্মচারীরা যখন ধর্ম্মঘটের নোটিশ দেওয়া হয়, তখন মুখ্য-মন্ত্রী ধর্ম্মঘট না করার জন্য নিজে আবেদন জানাইয়া-ছিলেন। অথচ, গত মাসের শেষের দিকে সামান্য একটা

ছুতায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে যে ধর্মঘট করা হয়, তাহার জন্য ধর্মঘটি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় নাই।'

যদি এই মন্তব্যগুলি যথার্থ হয়, তবে প্রথমত: ঐ "শক্তিশালী মহলের" বিরুদ্ধে রীতিমত শাস্তির ব্যবস্থা প্রয়োজন। এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন হাসপাতাল-"কর্মী"দিগের এই যথেচ্ছাচারের প্রতিকার।

রাজ্য সরকারের উচ্চ অধিকারীবর্গ পাঁচ বৎসর অন্তর ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আসেন। কার্য্যসিদ্ধি হইলে তার পর তাঁহারা যে মূর্ত্তি ধারণ করেন—এবং শুধু উঁহারাই কেন, আমাদের মুখপাত্র ও কর্ণধার সাজিতে ব্যস্ত অন্য সকলেও যে রূপ ধারণ করেন—তাহা ভুলিয়া যাই আমরা ক্ষণিকের আত্মপ্রসাদন লাভে বা অপরিণত-মস্তিষ্কদের উদ্দাম গণ্ডগোলে। এবারেও যদি তাহা হয় তবে আমাদের পরিত্রাণ বিধাতার ঈপ্সিত নয় বুঝিতে হইবে।

কলিকাতার পথঘাট

কলিকাতার পথঘাট যাঁহারা প্রথমে গঠন করেন, তাঁহারা বোধহয় কল্পনাও করেন নাই যে, সেই সকল পথে এক বিশাল মহানগরীর জনস্রোত প্লাবনের প্রবাহের মত চলাফেরা করিবে। আমাদেরই মনে আছে, এই সকল রাজপথে পাল্কী, ছ্যাকড়া, বগি ও ফেটিং গাড়ী দুইটি-চারিটি গদাই-লস্করীচালে চলিতেছে, মাঝে মাঝে ট্রামযুক্ত পথে, ধীরমন্থর গতিতে জোড়া ওয়েলার ঘোড়ায়-টানা ট্রামও চলিতেছে। যানবাহনের পথের দুই পাশে ফুটপাথে লোকও চলিতেছে, তাহাদের সংখ্যা কম ও গতিও মৃদুমন্দ। দ্রুতগতিতে চলিত সাহেবদিগের "অফিস যান" এবং সৌখীন বাবুদের সখের টম্‌টম্, জুড়ি চৌঘুড়ি। এই ভাবেই গত শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতার পথঘাটে লোকজন ও যানবাহন চলিত। রাস্তা খুব পরিষ্কারও ছিল না, আবার লোকের বসতি সেরূপ ঘন না হওয়ায় আবর্জ্জনাও বেশী পড়িত না। ভোরের মুখে ষাঁড়ে-টানা স্কাভেঞ্জারের গাড়ীতে বোঝাই করিয়া (পরে ঘোড়ায় টানা গাড়ী) ঝাড়ুদারের দল তাহার চৌদ্দআনা তুলিয়া ফেলিত।

ক্রমে জনসংখ্যা বাড়িল, এবং কলকারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সেই সকল ব্যাপারে নিযুক্ত লোকজনের যাতায়াতে পথের জনস্রোতও দ্বিগুণ হইল। ট্রাম চালনে বিজলীর শক্তি নিযুক্ত হইল, তাহার গতিও বাড়িল। পথিকদের মধ্যে যাহারা সেই গতিবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখিতে পারিত না, তাহাদের মধ্যে দুর্ঘটনা হইল অনেক। ফুটপাথেও পথিকসংখ্যা কিছু বাড়িল, পথে যানবাহনের সংখ্যাও দ্বিগুণ হইল। কিন্তু পথঘাটের পরিসর একই রহিল এবং তাহার নির্মাণ ও সংস্কার একই ভাবে চলিল। ফলে পথঘাট বে-মেরামত ও অপরিষ্কার হইতে থাকিল। নূতন রাজপথ নির্মাণের কথা তখনও উঠে নাই।

প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর কাজকারবার, কলকারখানার বৃদ্ধির দরুণ কলিকাতার জনসংখ্যা ফুলিয়া উঠিল এবং পথের জনস্রোত প্রায় দশগুণ বাড়িল। রাজপথে মোটরের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কিন্তু বাস গাড়ী দেখা দিল অনেক পরে। পথঘাটের পরিসর পুরানো কলি-কাতায় একই রহিল, শুধুমাত্র উত্তর-দক্ষিণের যোগপথ-রূপে একটি বড় রাজপথ শ্যামবাজার অঞ্চল হইতে টালি-গঞ্জের মুখ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইল। দক্ষিণ কলিকাতার নগর বিস্তারের সঙ্গে অনেকগুলি পথ নির্ম্মিত হইল, কিন্তু তাহা সেখানের বাসিন্দাদিগেরই কাজে আসে, কেননা ঐ অঞ্চলে নূতন কোনও কর্মকেন্দ্র গড়িয়া তোলা হয় নাই। তাহার পর আসিল দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ। ঐ সময়ে কয়টি ঘটনায় কলিকাতার পথঘাটের চরম দুর্গতি হয়। প্রথমতঃ, জাপান যুদ্ধে নামিলে পরে কলিকাতা মহাযুদ্ধের আওতায় আসিল। বোম্বাই ও দিল্লী যুদ্ধের অঢেল খরচের দৌলতে নানাভাবে জাঁকিয়া ফুলিয়া উঠিল, কিন্তু কলিকাতায় একদিকে দেখা দিল চরম বে-বন্দোবস্ত—শঙ্কিত ব্রিটিশ সরকারের বিচলিত অবস্থার জন্য—এবং তাহারই ফলে সময় মত টাকার ও রাস্তা মেরামতি মালের অভাব এবং অন্য দিকে সামরিক বাহিনীগুলির বিরাট্ আটচাকা, বারোচাকা ও আঠারোচাকা লরীর দিবারাত্র চালনের দরুণ পথের অবস্থাও ক্রমেই খারাপ হইয়া চলিল। তাহার পরে ব্রিটিশ বাহাদুরেরা আরাকানের পথে বর্মা পুনরধিকার করার জন্য উদ্যোগ করেন। আরাকানে পথঘাট নাই সুতরাং কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠান এবং ইম্‌প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের যাবতীয় পথ নির্ম্মাণের সরঞ্জাম তাঁহারা বে-ওজর আরাকানে লইয়া যান। কিন্তু জাপানীরা পাল্টা আক্রমণ করায় সেই সব যন্ত্রপাতি জঙ্গলে ফেলিয়া ব্রিটিশসিংহ, ভালো ছেলেরই মত, ঘরে ফিরিয়া আসেন—তবে ফিরে নাই সেই যন্ত্র-পাতি। নূতন পথঘাট তৈয়ারী বন্ধ রহিল, মেরামতি কাজও বন্ধ, মিলিটারী লরী, ট্রাক্টর, ও ট্যাঙ্কের উৎপাত বাড়িয়াই চলিল। পথঘাটের হিসাবে কলিকাতা মহা-নগরী যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিল।

যুদ্ধোত্তরকালে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আসিল বাংলার নিদারুণ দুঃসময়। প্রথমে হইল দেশ বিভাগ

এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্ব-পাকিস্তানে মাৎস্যন্যায়, যাহার ফলে অগণিত বাস্তুহারায় কলিকাতা ছাইয়া গেল। তাহার পর জনস্ফীতি প্রায় প্রলয়ের জলস্ফীতির মতই নগরকে প্লাবিত করিল। কলিকাতার কর্ম্মকেন্দ্রগুলি জ্যামিতিক অনুপাতে বাড়িয়া চলায় বৃহত্তর কলিকাতা, সহরতলী ও মফঃস্বল হইতে লক্ষ লক্ষ নূতন কর্ম্মী জীবিকার্জ্জনের জন্য এখানে দৈনিক চলায় পথঘাটের জনস্রোত শতগুণ বাড়িল এবং সেই সঙ্গে বাড়িল মোটর এবং বিরাট্ বাসের সংখ্যা। বাড়িল না শুধু পথঘাটের পরিসর এবং হইল না কোনও নূতন জনস্রোত চালনের নূতন প্রণালী।

উপরন্তু আছেন পৌরপ্রতিষ্ঠানে নিষ্কর্ম্মার দল এবং—"গোদের উপর বিষ ফোড়া" রূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। যানবাহন চলার পথ মেরামতের অছিলায়, বা ট্রামের লাইন ঠিক করার অজুহাতে, সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর করা হইতেছে পথের মাঝে সুদীর্ঘ খাল কাটিয়া। খাল কাটিবার পর দীর্ঘকাল নিদ্রায় কাটে, তাহার পর যদি বা দশ গজ পথ মেরামত হয় ত আরও ত্রিশ গজ খানাখন্দ কাটা হয়। সেই খানাকাটার রাবিশ ঢালা হয় ফুটপাথে, যাহাতে পায়েচলা পথিক ফুটপাথ ছাড়িয়া যানবাহন-চলা রাজপথে নামিতে বাধ্য হয়, যেখানে রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রায় দিবারাত্রই চলিতেছে—স্টেটবাস-চালক ও লরী-চালকের কৃপায়!

শোনা যায় যে, কলিকাতার পথেঘাটে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া "কর্ত্তৃপক্ষ" চিন্তিত হইয়াছেন। আমরা ত আশ্চর্য্য হই যে, ঐ সকল পথে যাহারা চলে তাহাদের মধ্যে এত লোক অক্ষত শরীরে ঘরে ফিরিয়া যায় কেমন করিয়া—কোন্ দেবতার কৃপায়? অবশ্য একথা আমরা জানি যে, ঐ পথিকের জনস্রোত এবং ঐ মহারথী-দিগের দানবীয় পরিবহনযন্ত্রবাহিনীকে যথাযথ ভাবে শৃঙ্খলার মধ্যে আনিবার জন্য পুলিসের "ট্রাফিক" নামে বিভাগ আছে। এবং ইহাও সত্য যে, কলিকাতার রাজপথের দুই-চারটি যোগস্থলে ট্রাফিক পুলিস দেখা যায়—বিশেষে যে সকল স্থলে মন্ত্রীজাতীয় ব্যক্তিদের যাতায়াত আছে। কিন্তু যানবাহনের যথেচ্ছ উদ্দাম গতিতে ডাহিনে-বাঁয়ে চলাফেরার নিয়ন্ত্রণ কেহই করে না। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রায় সকল প্রধান চৌমাথায় এই ট্রাফিক পুলিস দিনের আলোকে দেখা যাইত। সম্প্রতি প্রায়ই সে সকল স্থান হইতে তাঁহারা অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন।

খবরের কাগজে দেখিতেছি যে, "কর্ত্তৃপক্ষ" ছাড়াও আর একদল এই পথের পথিকদিগের দুর্গতিতে চিন্তিত হইয়াছেন। "যুগান্তর পত্রিকা" তাঁহাদের বিবৃতি দিয়াছেন এইভাবে:

"আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, কলকাতার পথ-দুর্ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দুর্ঘটনার একটা বড় অংশ আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিবহন বিভাগের বাসগুলি দ্বারা সঙ্ঘটিত হচ্ছে। দুর্ঘটনার একটি কারণ ড্রাইভারদের ও পথচারীদের অসাবধানতা; কিন্তু তাহাই একমাত্র কারণ নয়। ইতি-মধ্যেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এই সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা মারফৎ এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, রাজ্য পরিবহন বিভাগের পরিচালনার ত্রুটির ফলে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

"এই অবস্থায় আমরা দাবী করছি যে, অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি মারফৎ (যে কমিটিতে যান-বাহন বিশেষজ্ঞ, সরকারী প্রতিনিধি, জন-প্রতিনিধি এবং শ্রমিক-প্রতিনিধি থাকবেন) অনুসন্ধান করা হউক। কলিকাতায় সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থার জন্য, দুর্ঘটনা কমানোর জন্য, রাজ্য পরিবহনের মত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য এই তদন্ত অতীব প্রয়োজনীয়।"

অবশ্য এই বিবৃতির যুক্তিসূত্র আমাদের বোধগম্য হইল না। ঐ তদন্তের সঙ্গে পথঘাটের জন-চলাচল বা যানবাহন-চলাচলের কি সম্পর্ক আমরা বুঝিলাম না। কেননা ঐরূপ তদন্তের সহিত জনকল্যাণের কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। সেকথা আরও বিশদভাবে দেওয়া উচিত।

নেহরু ও রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বভারতীতে ২৬শে বৈশাখে যে বিশেষ সমাবর্ত্তন তাহাতে পণ্ডিত নেহরুর ভাষণ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিম্নরূপে দিয়াছেন:

আচার্য্য শ্রীনেহরু তাঁহার ভাষণে বলেন, পৃথিবীব্যাপী রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের মধ্যেও শান্তিনিকেতনে এই উৎসব পালনের গভীর তাৎপর্য্য আছে। এই প্রতিষ্ঠান গুরুদেবেরই স্থাপনা এবং এইখানেই তাঁহার বাণীর ও আদর্শের মূর্ত্ত প্রকাশ। এখানকার ছাত্রছাত্রী ও কর্ম্মীদের উপর তাই বিশেষ দায়িত্ব বর্ত্তাইয়াছে। কারণ বিশ্বভারতীকেই গুরুদেবের আদর্শের মূল উদ্দেশ্য প্রচার করিতে হইবে।

শ্রীনেহরু বলেন, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় যে নূতন চিন্তা-ধারা আনিতে চাহিয়াছিলেন, যে ভাবে মানুষ গড়িতে চাহিয়াছিলেন, বর্ত্তমান অশান্তির যুগে তাহার এক বিশেষ মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি আন্তর্জ্জাতিকতাবাদী হইয়াও ছিলেন গভীরভাবে

জাতীয়তাবাদী এবং মহৎ বাঙালী হইয়াও মহৎ ভারতীয় হইতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীনেহরু বলেন, ভারতে এখন শত শত ভেদ। জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, ভাষাভেদ। এইগুলি আমাদের জাতীয় ঐক্যের অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ ঐ সকল ক্ষুদ্র ভেদজ্ঞান হইতে চিরকাল মুক্ত ছিলেন বলিয়া বর্ত্তমানে তাঁহার আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরার অত্যন্ত প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিজ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আবেগ-জড়িত কণ্ঠে উল্লেখ করিয়া তিনি আরও বলেন, বিশ্বভারতীর প্রতি তাঁহার একটা কর্ত্তব্য ছিল এবং আছে। সেই কর্ত্তব্য কতদূর পালন করিতে পারিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না; তবে কামনা করেন এই প্রতিষ্ঠান যেন বিশেষ ধরনের এক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র হইয়া ওঠে।

ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়

২৫শে বৈশাখ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি-স্থাপন উপলক্ষে ডাঃ রায়ের বিবৃতি সম্পর্কে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ২৭শে বৈশাখে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন:

রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার অপরাহ্ণে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী প্রাঙ্গণে ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান হয়।

এই অনুষ্ঠানে দুইটি বিষয় উপস্থিত অনেকের মনে বিস্ময় ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। একটি হইতেছে, কবিগুরুর স্মৃতিপূত যে স্থানটিতে আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন সেই স্থানটিকে রক্ষা করিবার পিছনে যে বিরাট কর্ম্মপ্রচেষ্টা ছিল সরকারী মুখপাত্রের মুখে তাহার অনুল্লেখ। অপরটি হইতেছে, ভীড়-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনায় কলিকাতা পুলিসের শোচনীয় ব্যর্থতা।

যে স্থানটিতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, সে স্থানটি রবীন্দ্র-ভারতীরই অবদান বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পর ঠাকুরবাড়ীর বেশ কিছু অংশ উত্তমর্ণের হাতে চলিয়া যায়। তখন উহাকে রক্ষা করিবার জন্য নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। প্রথম দিকে এই কমিটি তেমন অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন না। পরে ১৯৪৫ সনে আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ঐ কমিটিতে যোগদান করেন। ইহার পর হইতে প্রধানত তাঁহার কর্ম্মতৎপরতায় এবং আনন্দবাজার পত্রিকার সক্রিয় সহযোগিতায় জনসাধারণের নিকট হইতে দান হিসাবে বহু টাকা সংগ্রহ করা হয়; ঐ টাকা হইতে ঠাকুরবাড়ার বিক্রিত অংশগুলি পুনরুদ্ধার করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে ঐ জায়গা দখল করা হয়। ঐ মেমোরিয়্যাল কমিটিই পরে 'রবীন্দ্র-ভারতী' নামে রেজেষ্ট্রি হয়।

সোমবারের অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার বক্তৃতায় ঠাকুর বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে রাজ্যসরকারের কর্ম্মপ্রচেষ্টাই শুধু বিবৃত করেন।

৩০শে বৈশাখের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নিম্নে উদ্ধৃত সংবাদ দিয়াছেন:

কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে সরকারী প্রচেষ্টাসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে ডাঃ রায় বলেন যে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে সময়াভাবে তিনি সব কথা বলিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রভারতী ও বিশ্বভারতীর প্রচেষ্টার কথা তিনি বলিতে পারেন নাই। বস্তুতঃপক্ষে রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বাসভুমি গ্রহণের ব্যাপারে সর্ব্বপ্রথম আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই উদ্যোগী হন। যে সব বাড়ী সংরক্ষণের প্রয়োজন সেগুলি রক্ষার জন্য তিনি উদ্যোগী হন। তিনি জন-সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং জোড়াসাঁকো বাসভবনের একাংশ ক্রয় করেন। সবখানি ক্রয় করিতে পারেন না। অবশিষ্টাংশ রাজ্য সরকার ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন এবং সমগ্র বাসভবন ও জায়গা-জমি জুড়িয়া রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (ঠাকুর বিশ্ব-বিদ্যালয়) নির্ম্মিত হইবে।

বিশ্বকবির ভাষা

সভ্য জগতের প্রায় সকল দেশেই কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিভিন্ন মত, বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন কৃষ্টি ও ভাষা, ২৫শে বৈশাখে ক্ষণিকের জন্য নিজেদের বিভেদ ভুলিয়া এক প্রাণে ও এক সুরে সেই ঋষিতুল্য মহাকবির মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার জয়গানে মিলিত হইয়া, পৃথিবীতে এক অপরূপ সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ের ছন্দ ধ্বনিত করিয়াছিল, যাহার তুলনা মানব-সভ্যতার ইতিহাসে কোথাও পাওয়া যায় না। অতীতকালের বহু বিশ্ববিজেতার জয়ধ্বনি ধর্ষিত ও বিজিত জাতির লোকেরা ভীতকণ্ঠে বহুবার করিয়াছে, কিন্তু সে বিজয়ের বিজ্ঞপ্তির মধ্যে মানবাত্মার লাঞ্ছনার ও অবমাননার সুরই সর্ব্বদা জাগিয়া উঠিয়াছে। হিংসা, লালসা ও প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা

যে প্রাবল্যের সৃষ্টি করে তাহার প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা হইতে পারে না, ভালবাসার কথা ত উঠিতেই পারে না। যে মহাশক্তি নিজেকে বায়ুর মত, জলের মত, আলোকের মত পৃথিবীর বক্ষে ছড়াইয়া দিয়া চরাচরে প্রাণ সঞ্জীবন করিতে পারে, তাহার সহিত বিকটদশন হিংস্রতার যে ভয়ানক শক্তি তাহার কোনও সাদৃশ্য নাই। চন্দ্র সূর্য্যের উদয়কালের প্রভার সহিত দেশ-অধিকারে আগত শত্রুসেনার উদ্যত আয়ুধের ঝলক এক প্রকার বলা যায় না। উৎকট প্রাবল্যের সম্মুখে মানুষ ভীত আড়ষ্ট অবস্থায় আত্মসমর্পণ করে। যে মহাশক্তি মানব-প্রাণকে উদ্দীপিত করে, মানবাত্মাকে উদ্বুদ্ধ করে ও মানব-মনকে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত করে ; তাহার নিকট মানুষ শ্রদ্ধাভক্তি অনুরাগে সম্মোহিত হইয়া ধরা দেয়। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সেই মাধুর্য্যের সম্ভারে ঐশ্বর্য্য-শালী ছিল, যে মাধুর্য্য মানবপ্রাণ ও আত্মাকে পুষ্ট বলিষ্ঠ করিয়া তোলে ও যাহার মধ্যে আকর্ষণীশক্তি আছে, আবেগ, বিহ্বলতা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা আছে। ভ্রূকুটি, ভর্ৎসনা বা ভয়ের ব্যবহার সে আবাহনে নাই। ছন্দে, সুরে, ভাষায় ও বর্ণে তিনি যে সত্য ও সুন্দরের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন, সে মন্ত্র স্বভাবতঃই মানবমনকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে মিথ্যা ও কুৎসিতকে বর্জ্জন করিতে। এই মূল অনুপ্রাণনা হইতেই মানব-কৃষ্টির সকল আদর্শের জন্ম। শিক্ষা, সমাজসংস্কার, অর্থনৈতিক উন্নতি, জনকল্যাণ, শিল্পকলার প্রচার ও বিস্তার, স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা ও আধ্যাত্মিক প্রগতির কথা ক্রমশঃ ঐ একই উৎস হইতে উৎপত্তি লাভ করে। জগতের ইতিহাসে মানব-মন ও মানব-প্রাণকে এইরূপে সকল ভাবে ও সকল দিক্ দিয়া আর কোনও মহাপুরুষ আকর্ষণ করিয়া নিজের অতি-নিকটে টানিয়া লইতে পারেন নাই। বিশ্বমানবকে পূর্ণ আগ্রহে কোন এক মহাপুরুষের বাণী এত গভীর ভাবে অন্তরে গ্রহণ করিতে আর কখনও দেখা যায় নাই। কেননা মহাকবির বাণী তাহার সত্যতা ও অপরূপ সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা দিয়া বিশ্বজনের মনকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়া-ছিল ও সেই মন্ত্রমুগ্ধ ভাব আজিও কবির নাম করিলে সকল মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ও বাংলা দেশের মহা সৌভাগ্য যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই দেশে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। আমরা সকলে সে কথা মনে রাখি না সকল সময়ে। আমরা ভুলিয়া যাই যে, তাঁহার জন্যই আজ ভারত জগতের চক্ষে এক মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। বাংলা ভাষা আজ এক নূতন গৌরবে স্নাত-অভিষিক্ত হইয়া জগতে সকল ভাষার মধ্যে শোভমান হইয়াছে। সে গৌরব আমরা যদি বোধ করিতে অক্ষম হই তাহা হইলে আমাদের হীনতাই তাহাতে প্রমাণ হইবে। সেই জন্যই আমরা বলি, বাংলা ভাষা শিক্ষা আজ আমাদের জাতীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রধান কর্ত্তব্য।

অ

পণ্ডিত নেহেরুর রবীন্দ্র-প্রশস্তি

বিগত কয়েক সপ্তাহ হইতে পণ্ডিত নেহেরু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা, মহত্ব ও আদর্শবাদের বিচারে শত-মুখ হইয়া শুধু কবিগুরুর জয়গানে আত্মনিয়োগ করিয়া-ছেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলিতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, তাঁহার ন্যায় রবীন্দ্রভক্ত অতি বিরল এবং তিনি রবীন্দ্র-নাথের সকল আদর্শ রক্ষা ও প্রচার করিতে অতিশয় আকুল। পণ্ডিত নেহেরুর বিগত কয়েক বৎসরের কার্য্য-কলাপে আমাদের মনে হয় নাই যে, তিনি রবীন্দ্রনাথের মহাভক্ত। তাঁহার স্বভাব বাংলা ও বাঙ্গালীর সুবিধা ও উন্নতির বিপরীত কার্য্য করা। আমরা বাঙ্গালীরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই ও বুঝি যে, পণ্ডিত নেহেরুর বাঙ্গালী জাতি, বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা বা বাংলার কৃষ্টির প্রতি বিদ্বেষই পূর্ণমাত্রায় আছে, প্রীতি কিছুমাত্র নাই। তিনি রবীন্দ্র-নাথকে ভাঙ্গাইয়া জগত সভায় নিজের ও নিজ চাটুকার-বর্গের স্থান সুরক্ষিত করিবার জন্য ব্যস্ত। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ, "বিশ্বমৈত্রী" মাত্র পণ্ডিত নেহেরুর প্রাণে কোন প্রকার একটা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর অনুরণনের সৃষ্টি করে। তাহার কারণ তিনি বিশ্বসভায় একজন কেওকেটা হইয়া বিচরণ করিতে কামনা করেন। বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশ, বাঙ্গালী জাতি, বাংলার কৃষ্টি ও বাংলা ভাষাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। যে তাঁহার এই সকল অনুভূতিকে অগ্রাহ্য বা ঘৃণা করে তাহার পক্ষে রবীন্দ্রভক্ত হওয়া সম্ভব নহে। রবীন্দ্রনাথ মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি বাংলাকে যেমন মর্ম্মে মর্ম্মে ভালবাসিতেন তেমনই তিনি ভারতকে ও ভারতীয় কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকেও নিজ প্রাণের অন্তরতম করিয়া রাখিয়াছিলেন। বেদ-উপনিষদের ঋষিরা তাঁহারই অন্তরের ও একান্ত নিজের উপদেষ্টাগুরুর স্থানে অবস্থিত ছিলেন। কালিদাস হইতে বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতি কবিরা, ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীর রচনাকারীরা, ভারত শিল্প-ভাস্কর্য্য-স্থাপত্যের পথপ্রদর্শকগণ সকলেই রবীন্দ্র-নাথের একান্ত আপনার জন ছিলেন। তাঁহার মনের ও

প্রাণের প্রসার তাঁহাকে আরও দূরে লইয়া যাইত। অমর কবি হোমার, কিম্বা ইউরিপিডিস, সফোক্লিস, ভার্জ্জিল, দান্তে, সেক্সপিয়র, গয়টে, মলিয়ের প্রভৃতি সকলেই তাঁহার আপনার জন ছিলেন। বাংলার মাঝি যেমন তাঁহার নিজের বন্ধু, বাংলার বাউল যেমন তাঁহার নিজের সুর গাহিত, নেপলসে কিম্বা ভল্গা নদীর নৌকায় তেমনি তাঁরই বন্ধুরা সুরের জাল বুনিত। ওয়াল্ট হুইটম্যান, মাক্সিম গর্কি, লিয়োনার্ডো ডা ভিঞ্চি, রোদ্যাঁ রোম্যাঁ রোলাঁ, রুপার্ট ব্রুক কিম্বা ভারতের ত্যাগরাজ, তুলসিদাস, কবীর তাঁহারই গান গাহিতেন, তাঁহারই রঙে তুলি ডুবাইতেন ও তাঁহার হৃদয়ে হৃদয় মিলাইতেন।

পণ্ডিত নেহরুর দৃষ্টি তাঁহার ও তাঁহার পার্টির স্বার্থের প্রাকারের পরপারে যায় না। তাঁহার প্রাণের আবেগ রাষ্ট্রনৈতিক আগ্রহ ও মতলব দিয়া বাঁধা। তিনি এই মহাকবি, মহাঋষি ও মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিলে আমরা মনে করি, তিনি নিজ প্রবৃত্তিজাত অধিকারের সীমা ছাড়াইয়া অনধিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের আত্মা আজকালকার মতলববাদের বহু উর্দ্ধে, অনন্ত জ্ঞানলোকে। অ

বাংলা ভাষা

ভাষা ও চিন্তার ইতিহাসে যে সকল ভাষা বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্যের অধিকারী; যথা সংস্কৃত, লাটিন, গ্রীক ও পরে ইংরেজী, ফরাসী কিংবা জার্ম্মানী; সেই উচ্চ স্থান ও কৌলীন্য আহরণ করিতে ঐ সকল ভাষা শুধু মাত্র বহু সংখ্যক মহাশক্তিশালী রচয়িতার গুণেই পারিয়াছিল। ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ যাঁহারা বেদ-বেদান্তের রচনা করিয়াছিলেন ও পরে মহাকবি কালিদাস ও অপরাপর অমর কবি সকলে সংস্কৃতের এই উচ্চস্থান লাভের কারণ। সোক্রাটিস আরিসটটল, প্লেটো, ইউরিপিডিস, সফোক্লিস প্রভৃতি দার্শনিকদিগের গৌরবে গ্রীক ভাষার গৌরবময় ইতিহাস গঠিত ল্যাটিনও তেমনি অসংখ্য ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও কবির প্রতিভায় উদ্ভাসিত ও বিশ্বের নিকটে এক মহাভাষা বলিয়া পরিচিত। এই সকল দার্শনিক চিন্তাশীল লেখক, কবি, নাট্যকার প্রভৃতিরাই পুরাতন ভাষাগুলির গৌরবের কারণ। মধ্যযুগে ও বর্ত্তমান কালেও ঐরূপে, সেকস্পীয়র, ভিক্টর হিউগো, গয়টে, শোপেন হাউয়ের হেগেল, কান্ট, স্পিনোৎসা, মলিয়ের ও অপরাপর মহামানবের কর্ম্মগৌরবে তাঁহাদিগের মাতৃভাষার প্রসার ও পরিচয় স্থির ও নিশ্চয়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ বাংলা ভাষাও জগতে অমরত্ব লাভ করিতে চলিয়াছে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার জন্য। বাংলা ভাষা যদিও ভারতে কোন কোন প্রদেশে অপমানিত ও লাঞ্ছিত; তাহা হইলে মানব ভাষার দরবারে প্রসিদ্ধ, প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা সকলের মধ্যে তাহার স্থান। এমন কি পাকিস্থানেও বাংলা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বহু বিদেশী আজ বিশ্বকবির নিজের ভাষায় রচনা উপভোগের ইচ্ছায় বাংলা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আত্মসম্মানজ্ঞানহীন কিছু ভারতবাসী কিন্তু নিজেদের এই সুন্দর ভাষার সম্মান রাখিতে চাহে না।

অ

উন্নতির পরিকল্পনা

সঙ্গীত, শিক্ষা, নৃত্য, অভিনয়, রস উপলব্ধি, সুরুচি প্রচার ও জ্ঞানের বিস্তার: এই সবই ছিল কবিগুরুর জীবনধর্ম্ম। ইহার সহিত তিনি যোগ করিয়াছিলেন মানব সমাজ ও মানব জীবনের আদি কেন্দ্র গ্রামগুলির সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধি সাধন। গ্রামগুলি সবই পরিবেষ্টিত থাকিবে কর্ষিত ক্ষেত্র, উদ্যান, সরোবর ও অনন্ত বনানী দিয়া। কবিগুরু শহর, কারখানা, বাণিজ্য প্রভৃতিকে অস্বীকার করেন নাই। তিনি বিজ্ঞানের প্রচারকে বড় করিয়াই দেখিয়াছিলেন এবং বৃহৎ বৃহৎ সভ্যতার কেন্দ্রগুলিকেও মানবপ্রাণের অভিব্যক্তি বলিয়াই মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু মন ও আত্মার দিক দিয়া ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন আছে জানিয়া, তিনি ভারতের চিরন্তন সভ্যতার অবস্থিতি অধিকাংশে গ্রাম ও আশ্রমগুলির মধ্যেই দেখিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের আদর্শ ও বনমহোৎসব প্রভৃতির প্রচার তিনি সেই জন্যই করিয়াছিলেন যাহাতে মানবমন ভোগ ও জড়বাদক্লিষ্ট হইয়া নিজের আত্মাকে হনন করিয়া সেই পথে পূর্ণ আগ্রহে না চলিয়া যায়, যে পথে গিয়াছে পাশ্চাত্ত্যের জাতি সকল ও যাহার ফলে একটির পর একটি মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইয়া মানবজাতি ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। পাশ্চাত্ত্যের দান বিজ্ঞান মানব জীবনকে সুখময় করিয়াছে কিন্তু অপর পক্ষে তাহারই উন্নতিতে মানবমন আজ আতঙ্কে অধীর। কবিগুরু দুইয়ের, অর্থাৎ, বিজ্ঞান ও সত্যজ্ঞানের যে সমন্বয়ের কথা ভাবিয়াছিলেন, আজ সর্ব্বত্র তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বনানী ধ্বংস করিয়া ও গ্রাম উচ্ছেদ করিয়া বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নিজ দানব দেহ ধারণ করিয়া উৎকট ভঙ্গিতে সর্ব্বত্র বিচরণশীল। ভারতবাসীর সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

অ

বাংলার রাজস্ব বাজেয়াপ্ত

বাংলা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত ক্রমাগত তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত আছেন যাহাতে কেন্দ্রীয় ভাবে আদায়কৃত রাজস্বের অংশ বাংলা সরকার যথাযথ পরিমাণে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। বাংলা সরকারের মতে অপরাপর প্রদেশ যে পরিমাণে কেন্দ্রীয় আদায়ের রাজস্বের অংশ পাইয়া থাকেন—সে আদায়ের প্রদেশগত পরিমাণের অনুপাতে—বাংলা সরকার বাংলা দেশ হইতে কেন্দ্রীয় সরকার যতটা রাজস্ব আদায় করেন, তাহার মোট পরিমাণের অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ন্যায্য পরিমাণ ফেরৎ পাইতেছেন না। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা সরকারের ন্যায্য পাওনা বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই অর্থের সাহায্যে অপরাপর প্রদেশগুলিকে সুবিধাদান করিতেছেন। এই তর্কবিতর্কের দুইটি দিক আছে। আজকালকার প্রচলিত বিভেদের আদর্শ অনুসারে প্রত্যেকটি প্রদেশ নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলিয়া মনে করিতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারা সকলে প্রায় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য বলিলেই চলে। ইহাই যদি রাষ্ট্রীয় নীতি বলিয়া গ্রাহ্য হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রাজস্ব আদায় দপ্তর বা কর্ম্মচারী প্রদেশগুলিতে থাকা উচিত নহে। উচিত সকল রাজস্ব প্রাদেশিকভাবে আদায় করা ও আদায় হইলে পর প্রদেশের জনসংখ্যা অথবা মোট রাজস্বের পরিমাণ অনুপাতে কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজকর ধরিয়া দেওয়া। এইরূপ ব্যবস্থা হইলে প্রাদেশিক সরকারের নিজ দেশে কেন—কাহারও নিকট ছোট হইতে হইবে না। যে সকল লোকের একাধিক প্রদেশে রোজগার আছে, তাঁহারা প্রত্যেক প্রদেশে নিজ নিজ জগতব্যাপী রোজগার অনুপাতে প্রাদেশিক রোজগার হিসাবে ট্যাক্স দিবেন। সমুদ্রপথে আমদানী-রপ্তানির মালের উপর যে শুল্ক ধরা হয়, সেই শুল্কের অংশ সমুদ্র বন্দর যে প্রদেশের সেই প্রদেশ আদায় করিলেও, যে প্রদেশ হইতে মাল আসিয়াছে অথবা যে প্রদেশে শেষ পর্য্যন্ত যাইবে সেই সকল প্রদেশকেই খরচ বাদে নিজ নিজ অংশ দিবার ব্যবস্থা করা অসম্ভব হইবে না। অপরপক্ষে আমরা যদি ধরি যে, প্রদেশগুলি প্রদেশ-মাত্র; ভিন্ন ভিন্ন অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজ্য নহে, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার সর্ব্বত্র আরও অধিক শক্তি ও রাজকার্য্য নিজেদের তরফে রাখিলে মন্দ হয় না। এবং সে ক্ষেত্রে কোন্ নীতি বা পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য ও রাজস্বের ভাগ-বাট হইবে সেই সকল নীতি ও পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির ও পদ্ধতির পর্য্যায়ে লিখিত ভাবে ন্যস্ত ও বিজ্ঞপ্তি করিতে হইবে। তাহা যতক্ষণ না করা হইবে ততক্ষণ অন্যায় ও অবিচারের শেষ হইবে না। অপর প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে এ কথা বলা যায় যে, তিনি শুধু রাজস্বের ভিতর দিয়া বাংলার অর্থ অপরের ভোগে লাগিলেই যদি আপত্তি করেন; কিন্তু ব্যবসাদার, চাকুরে লোক, মাল রপ্তানিকার প্রভৃতি লোকেরা যদি অপর প্রদেশ হইতে দলে দলে এ দেশে আসিয়া বাংলা ও বাঙালীর সর্ব্বস্ব গ্রাস করিবার ব্যবস্থা ছলে বলে কৌশলে সুপ্রতিষ্ঠিত করে; ডাক্তার রায় সে ক্ষেত্রে মুখ বন্ধ রাখেন কেন? দুই জাতীয় "লুঠ"ই লুঠ এবং বাংলার লোকে ডাক্তার রায়কে গদিতে বসাইয়াছে সব অন্যায় ও সকল প্রকার লুঠ ও প্রবঞ্চনা হইতে আত্মরক্ষার জন্য, শুধু রাজস্বের অংশ আদায়ের জন্য নহে। তিনি নিজ কর্ত্তব্য পূর্ণরূপে কেন করেন না?

অ

বিমলচন্দ্র সিংহ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি-রাজস্বমন্ত্রী, সুপরিচিত সাহিত্যিক, কান্দী রাজ-পরিবারের সন্তান বিমলচন্দ্র সিংহ গত ১৭ই এপ্রিল পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪২ বৎসর হইয়াছিল।

পরলোকগত রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার বিমলচন্দ্র, ১৯১৮ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ছাত্রজীবন প্রতিভার দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল ছিল। অর্থনীতিতে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯৪৭ সনে তিনি ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মন্ত্রীসভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৪৮ সন হইতে ১৯৫২ সন পর্য্যন্ত ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের প্রথম মন্ত্রীসভায় পূর্ত্ত ও রাজস্ব-মন্ত্রীরূপে এবং পুনরায় গত ১৯৫৭ সনের ২৩শে এপ্রিল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজস্ব-মন্ত্রীরূপে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রী-মণ্ডলীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। মধ্যবর্ত্তী পাঁচ বৎসরে অন্যান্য কাজের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির রাজ্যপুনর্গঠন কমিটির সদস্যরূপে প্রভূত পরিশ্রম করেন ও সবিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন।

মন্ত্রীরূপে ও কংগ্রেস-নেতারূপে বিমলবাবুর রাজ-

নৈতিক পরিচয়টিই যদিও অনিবার্য্যভাবেই জনসাধারণের নিকট বড় হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সুপণ্ডিত, সুলেখক ও মার্জ্জিত বুদ্ধি ও রুচিসম্পন্ন সুরসিক ব্যক্তিরূপেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল এবং অন্তরঙ্গ মহলে তাঁহার এই দ্বিতীয় পরিচয়ই অনেক সময় বড় ছিল। শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহার কয়েকখানি প্রবন্ধ-পুস্তক আছে। বস্তুতঃপক্ষে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধকারদের পুরোভাগে তাঁহার স্থান ছিল। তিনি রবীন্দ্র-ভারতীর সম্পাদক ছিলেন।

বিমলচন্দ্র বাংলার এক কীর্ত্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। বাংলার সাংস্কৃতিক পুনর্জ্জাগরণে তাঁহার দান অসীম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাংলার বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনসাধনেও চিন্তাশীল এই তরুণ প্রায় কুড়ি বৎসরকাল পূর্ব্বে এক অসামান্য স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। অবিভক্ত বাংলার ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে তদানীন্তন সরকার কর্ত্তৃক গঠিত কমিশনের সমক্ষে যখন বাংলার ভূম্যধিকারিবৃন্দ একযোগে জমিদারী অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সাক্ষ্যদান করেন এবং স্মারকলিপি পেশ করেন, তখন তরুণ ভূম্যধিকারী বিমলচন্দ্রই একমাত্র জমিদার ছিলেন, যিনি বাংলার সমাজ-ব্যবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য জমিদারী প্রথা বিলোপের দাবি জানাইলেন। জমিদারগোষ্ঠীর সম্মিলিত সংস্থা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে ধুরন্ধর ও প্রবীণ বহু জমিদার বিমলচন্দ্রকে এইজন্য সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নিজস্বার্থ বা একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থের চেয়ে বিমল-চন্দ্রের নিকট বাংলার দুর্গত জনসমাজের স্বার্থই সেদিন বড় বলিয়া মনে হইয়াছিল।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সমক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে ১৯৫৫ সনে যে দীর্ঘ স্মারকলিপিটি পেশ করা হয়, ঐতিহাসিক নজীর হিসাবে উহা একটি মূল্যবান দলিলরূপে পরিগণিত। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তাহারও পূর্ব্বে নবাবী আমল হইতে ইংরেজ আমলের শেষ পর্য্যন্ত বাংলার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণ চিত্র ঐ স্মারকলিপিতে লিপিবদ্ধ ছিল। অসংখ্য দলিল, পুঁথিপত্র সংগ্রহ করিয়া তিনি উহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বিহারের, আসামের এবং উড়িষ্যার অংশবিশেষ বাংলারই অঙ্গ। বিহারের কতকগুলি জেলা আবহমানকাল সুবা বাংলার অন্তর্গত ছিল এবং রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত সর্ব্বদিক দিয়াই ঐগুলি বঙ্গদেশের এলাকা! এই স্মারকলিপি রচনার কৃতিত্ব বিমলচন্দ্রের।

আজ বাংলার অতিবড় দুর্দ্দিনে বিমলচন্দ্রের মত ব্যক্তির জীবিত থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। দুর্ভাগ্য বাংলা দেশের!

ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জি অধ্যাপক ও খ্যাতনামা সাংবাদিক ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন মস্তিষ্কে রক্তমোক্ষণের ফলে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে গত ২রা মে পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৯০২ সনে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি সাংবাদিকতায় যোগ দেন। অধুনালুপ্ত সার্ভেন্ট, ফরোয়ার্ড, এড্‌ভান্স এবং পরবর্ত্তীকালে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও অমৃতবাজার পত্রিকার প্রধানতম সম্পাদকীয় লেখকরূপে একদা ডঃ সেন প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন দৈনিকপত্রে ইংরেজী ভাষায় তাঁহার সম্পাদকীয়গুলি যেমন স্বচ্ছ ও সাবলীল ছিল, তেমনি তথ্যে, তীক্ষ্ণতায় ও বিশ্লেষণে সেই সমস্ত সম্পাদকীয় সমসাময়িক কালের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার অভাবে কলিকাতার ইংরেজী ভাষার সাংবাদিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং তাঁহার স্থান আর শীঘ্র পূর্ণ হইবার নহে। কেবল প্রতিষ্ঠাবান্ সাংবাদিকরূপেই নহেন, একজন খ্যাতিমান্ অধ্যাপকরূপেও ছাত্র, যুবক ও শিক্ষকমহলে তাঁহার মর্য্যাদার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে, সাংবিধানিক আইনের বিদ্যায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল সুগভীর এবং এই দিক দিয়া তিনি বহু কৃতিত্বেরও পরিচয় দিয়াছেন।

ডঃ সেন কয়েকটি মূল্যবান্ গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—'প্রোবলেম্‌স্ অব মাইনরিটিজ', 'হুইদার ইণ্ডিয়া', 'রিভোলিউশন বাই কন্‌সেণ্ট', 'ফ্রম রাজ টু স্বরাজ' এবং 'প্যারাডক্স অব্ ফ্রীডম' ইত্যাদি। প্রথম গ্রন্থটির জন্য ১৯৩৬ সনে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে 'ডক্টরেট' লাভ করিয়াছিলেন এবং 'ফ্রম রাজ টু স্বরাজ' গ্রন্থটি স্বাধীনতার পরবর্ত্তী ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে রাজনীতির যে কোন ছাত্র উপলব্ধি করিবেন যে, ডঃ ধীরেন সেনের দৃষ্টিভঙ্গি কত স্বচ্ছ এবং দেশের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান কত গভীর ছিল।

প্রচার-মাহাত্ম্য

শ্রীগৌতম সেন

এমন একদিন ছিল যেদিন আত্ম-প্রশংসা শুনলে, মানুষ লজ্জায় ম'রে যেত। কিন্তু আজ সেদিন আর নেই, নিজের ঢাক নিজে না পেটাতে পারলে, সমাজে কোন প্রতিষ্ঠাই পাওয়া যাবে না। গুণিজনকেও সম্মান আদায় ক'রে নিতে হয়। এটা কালের ধর্ম্ম। এই কাল-ধর্ম্মেই রাজা ফকির হচ্ছে, ফকির রাজা হচ্ছে। প্রচারের এমনি মাহাত্ম্য, তুমি যা নও তাই হচ্ছো, আবার যা তুমি—প্রচার-মাহাত্ম্যে তাও হয়ত থাকছ না। এ ব্যবস্থা শুধু ব্যক্তিকেই নিয়ে নয়—জগতের সবকিছুই এই প্রচার-প্রসাদে ওঠা-নামা করছে। সেই জন্যেই এ কালকে কেউ কেউ পাবলিসিটির যুগ ব'লে থাকেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রেও এর প্রভাব কম নয়। প্রচার-ধর্ম্মে শুধু ছোট-বড়ই নিরূপিত হচ্ছে না—ভেজাল-সাহিত্যও খাঁটি ব'লে চলে যাচ্ছে। আজ আসল-নকল হারিয়ে গেছে প্রচারের সুষ্ঠু পরিবেশনে। বনস্পতির তৈলজাত পদার্থকেও এই প্রচার-কৌশলে 'ঘি' বলে আমরা গলাধঃকরণ করছি। কলা-বিদ্যা হিসেবে এ প্রচার শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতে এক বিশিষ্ট মর্য্যাদা পেয়েছে। শিল্প হিসেবে এর স্থান পূর্ব্বে ছিল না। এতে ভালও যেমন হয়েছে, ক্ষতিও তেমনি হয়েছে। শিল্পের চাকচিক্যে আমাদের বস্তুজ্ঞান লোপ পাচ্ছে। বড় বড় প্রতিষ্ঠানকেও দেখেছি, বিজ্ঞাপনের খাতে একটা মোটা টাকার অঙ্ক তাঁরা নির্দ্দিষ্ট ক'রে রাখেন। ব্যবসা চালু রাখতে হলে এর প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এর মন্দ দিকটাও আছে—অর্থাভাবে অনেক ভাল প্রতিষ্ঠানও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাল্লা দিতে গিয়ে অনেক সৎকেও অসৎ হতে হচ্ছে। আমি এমন এক শিক্ষিত ব্যক্তিকে জানি, যিনি সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে একটা তেলের মিল কিনেছিলেন। তিনি জানতেন, অ-বাঙালীর হাতে পড়ে মানুষ তেলের স্বাদ ভুলে গিয়েছে—তিনি প্রায় প্রতিজ্ঞা করেই কাজে নেমেছিলেন, তেলে কোনদিন ভেজাল দেবেন না। কিন্তু কাজে নেমে দেখলেন, সরিষা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রদেশের হাতে। তারাই ইচ্ছামত বাজারকে নিয়ন্ত্রিত করছে। যে দামে তাদের হাত দিয়ে সরষে কিনতে হয়, তাতে তেলের পড়তা পড়ে না। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা সেই পড়তা রাখতে ভেজাল মিশাতে বাধ্য হয়। বন্ধুটি দুই বৎসর লোকসান দিয়েও সঙ্কল্প স্থির রেখেছিলেন। তাঁর এই নির্ব্বুদ্ধিতা দেখে অন্যান্য ব্যবসায়ীরা মুখ টিপে হাসে। শেষে একজন বললে, এ বাবুজি, তুমি এত বোকা কেন আছ! সরষেসে কেৎনা তেল মিলে—কারবার রাখতে হলে, হামলোক-সব কা ক'রে, দেখো।

সত্যি, ওরাই ঠিক। বন্ধু অনেক টাকা লোকসান দিয়ে এ তথ্য পরে বুঝেছিলেন। তাই বলছিলাম, তুমি সৎ থাকতে ইচ্ছা করলেও, সৎ থাকতে পারবে না। কাল-ধর্ম্ম তোমাকে বিপথে নিয়ে যাবেই। প্রচারের যূপকাষ্ঠে মানুষ নিয়তই বলি হচ্ছে। এই আজকের দিনের প্রচার-বিজ্ঞান!

প্রচার চিরকালই ছিল। চৈতন্যদেবও তাঁর মতবাদ কীর্ত্তনের সাহায্যে প্রচার করেছিলেন। জগতে ধর্ম্মান্দোলন প্রায় অনুরূপ ভাবেই সংঘটিত হয়েছে। তবে আজকের প্রচার-রীতি স্বতন্ত্র। এর চটকে মানুষের বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। তবু মানুষ এর সাহায্য নিয়েছে এবং এখনও নিচ্ছে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবেরও প্রচারের প্রয়োজন হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরের এক নিরক্ষর পুরোহিতকে কে চিনত যদি না ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন প্রথমে ভারতবর্ষে এবং স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ঐ নামকে ভারতে ও ভারতের বাইরে ঐভাবে প্রচার করতেন।

আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় গান্ধীজী একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সত্যাগ্রহের মত একটা সংবাদ—যে সংবাদ ঘটা ক'রে সাধারণ্যে প্রচার হওয়া উচিত ছিল, তা হ'ল না। বরং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে তাঁরা এই আন্দোলনকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। গান্ধীজী চেষ্টা ক'রেও খবরের কাগজওয়ালাদের মন গলাতে পারেন নি। শেষে 'ইংলিশম্যান' একটা পাবলিসিটি দেওয়ায়, অন্যান্য কাগজওয়ালাদের চৈতন্য হয়। পরে এই গান্ধীজীরই একটা 'অতি তুচ্ছ' খবর ছাপবার জন্যে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি প'ড়ে গিয়েছে, এও দেখা গিয়েছে। তাই হয়, প্রচারই প্রচারিত ব্যক্তিকে বাহবা দিচ্ছে! ভারতের প্রধানমন্ত্রী জবাহরলালের আত্ম-

প্রতিষ্ঠার মূলে এই প্রচার যে কতটা কাজ করেছে তা সকলেই জানেন।

আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে সংবাদ-পরিবহনের কাজ কত দ্রুত সমাধা হচ্ছে। এই যে সংবাদ-পরিক্রমণ, এর মঙ্গল-দিকও যেমন আছে, তেমনি মানুষকে 'এক্সপোজ'ও করে দিচ্ছে। এ মানুষের কিন্তু স্বভাবের মধ্যে নাই। সে আত্ম-গোপন করতেই ভালবাসে। কিন্তু যুগধর্ম্ম তাকে অন্য মানুষে পরিণত করছে। তবে প্রচার আজ অসাধ্য সাধন করছে, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। উদাহরণ স্বরূপ, গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথাই ধরা যাক্। লণ্ডন শহর তখন একেবারে অন্ধকারে আচ্ছন্ন। হিট্‌লারের বোমারু বিমান প্রহরে প্রহরে হানা দিচ্ছে টেম্‌স নদীর তীরে। রাজপ্রাসাদের ভিৎ কেঁপে উঠছে, পার্লামেণ্ট হাউস এবং আকাশচুম্বী সব বাড়িগুলো গুঁড়িয়ে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে—লণ্ডনবাসীরা সরীসৃপের মত মাটির গহ্বরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। এই ভীতিকাতর অবস্থায় জীবন রক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে তখন তারা প্রচার-কলার আশ্রয় গ্রহণ করল। একদিকে গোয়েবলসের মত সুদক্ষ প্রচার-বিশারদ আর অন্যদিকে লণ্ডনের অন্ধকার দেওয়ালে, আর দৈনিক কাগজের পাতায় কয়েকটি ইস্তাহার, নির্দ্দেশনামা ও সাবধানবাণীর বলিষ্ঠ ইঙ্গিত। দেশে যুদ্ধ বাধলে কি করতে হয় আর কি করতে হয় না, তারই সরকারী আর বে-সরকারী বিবৃতি বিজ্ঞাপন-মারফৎ জানিয়ে দেওয়া হ'ত। এতেই কাজ হ'ল—যুদ্ধের গতি ফিরল। কে বলতে পারে, শুধু এই বিজ্ঞাপনের জোরেই ইংরেজের জয় হয়েছিল কি না?

এই বিজ্ঞাপন ও প্রচার-শিল্পকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ এ-যুগের। প্রচার পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু সে ছিল নিছক ব্যক্তি-গত রুচির ওপর নির্ভরশীল এবং তার দায়িত্বও এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বিজ্ঞাপনের পয়সা লোকসান বলেই ধারণা ছিল ব্যবসায়ীদের। তবে তাঁরা দিতেন, নিজে-দের নাম ও মাল জাহির করার জন্যেই। সেই কারণেই, আগেকার দিনে বিজ্ঞাপনের চেহারা ছিল অমার্জ্জিত। দু'ইঞ্চি বাই দু'ইঞ্চি আকারে ক্ষুদ্রতম টাইপে মহাকাব্যের ভাষায় বেনো ভাষা মিশিয়ে বর্ণনা করা হত মালের গুণা-বলী এবং তারই পাশে এককোণে ছোট্ট একখানি ফটো থাকত মালিকের।

কিন্তু আজ সে ধারণার বদল হয়েছে। এই বদল দেখা গিয়েছে, প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে। অর্ব্বাচীনদের কামারশালা থেকে আজ প্রচার উঠে এসেছে শিল্পীদের প্রয়োগশালায়। সেখানে প্রচারকে শিল্প ও বিজ্ঞানের যৌথ দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। শিল্পের সুষমা এবং বিজ্ঞাপনের সুসমতা।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পৃথিবীর এক একটা অংশ ছিল এক একটি শক্তির অধীন। দাসত্ব ছিল ব্যাপক ও কুৎসিত। আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য বলতে কয়েকটি রাষ্ট্রের একচেটে অধিকারকেই বোঝাত, আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা কম থাকার জন্যে বিজ্ঞাপনের ভঙ্গীও ছিল অতিসাধারণ।

কিন্তু এসব হ'ল অ-সামরিক মাল সরবরাহের ক্ষেত্রে। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে একটিমাত্র প্রচার-পত্র চালু হয়েছিল এবং তার নির্দ্দেশও ছিল এক-মুখা—'ব্যবসা চালু রাখ'। এ কথা বলার উদ্দেশ্যই হল, ব্রিটিশ নৌবহর আজও সমুদ্রের রাজা। আমাদের বৃহৎ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র মাল রপ্তানি হতে পারে। দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় রাখতে হলে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল বন্দর থেকে পয়সা লুঠে আনা চাই। 'রপ্তানি চালু রাখ'—'ঘরে খরচ কম কর, বিদেশে আরও মাল পাঠাও।'

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রায় অনেক দিনই, ইংলণ্ডে দুটি মাত্র প্রচার-পত্র জনসাধারণকে টেনে রেখেছিল। প্রথমটিতে ছিল, তর্জ্জনী উদ্যত লর্ড কিচেনারের ছবি—'দেশ তোমাকে চায়।' আর দ্বিতীয়টি হ'ল—'ব্যবসা চালু রাখ।' যুদ্ধের গোড়ার দিকেই ইংলণ্ডে এই প্রচার-দপ্তর গঠিত হয়। সেই দপ্তরের প্রথম মন্ত্রী ছিলেন লর্ড বীভারব্রুক। সে সময় সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহ-যোগিতা আদায় করেছিল সেই প্রচার ও স্তোক।

প্রচার-দপ্তরের কাজ বড় মারাত্মক। প্রথমতঃ জন-সাধারণের কাছে যে প্রচার তার মধ্যে হুমকি দেওয়া চলে না। সেই জন্যে প্রচারের ভাষা যত সোজা তত তীক্ষ্ণ এবং তার মধ্যে তত আবেদন থাকা চাই। দেশের চেতনাকে জাগাতে হবে, সকলকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করতে হবে। আর এই দেশপ্রেম এমন এক আশ্চর্য্য জিনিস যে, তার পরিবেশে মানুষ ন্যায়-অন্যায়কে চিনতে পারে না। তাই ত এই দেশপ্রেমের ধুয়া তুলে নিরীহ মানুষকে হত্যা করার উন্মত্ততায় মাতিয়ে তোলা যায়। পৃথিবীতে দাসপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে দেশপ্রেম, অন্য দেশের নরনারীকে শোষণ ক'রে রক্তহীন করার জন্যে দেশপ্রেম, নিজের দেশে ক'টি মাত্র লোকের হাতে শাসন ও শোষণ ক্ষমতা চিরস্থায়ী রাখার ষড়যন্ত্র এই দেশপ্রেম। আর তার মধ্যে অর্দ্ধ-সত্যটাই প্রধান বলে, তার ভঙ্গিতে বলিষ্ঠ নির্লজ্জতা থাকা প্রয়োজন।

ফ্যাসিষ্ট দেশের প্রচারের মধ্যে এই আবেদনটুকুর অভাব অত্যন্ত। সেখানে জনসাধারণকে হুকুম করা হয় এই প্রচারের সাহায্যে—তা সে কি নিজের দেশে, কি অধিকৃত এলাকায়। সেই জন্যেই জার্মানি এবং জাপান যেখানেই সামরিক কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করেছে, সেখানেই প্রচার-পত্র নির্দ্দেশ বহন করেছে—'পুলিশকে মেনে চলাই জনসাধারণের কর্ত্তব্য।' পুলিশ যে জনসেবক, সে বোধ তাদের না দিলে, তাদের পক্ষে পুলিশ ও মিলিটারীর কুৎসিত কর্ত্তৃত্ব মেনে চলা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

শক্রর বিরুদ্ধে অন্যতম অস্ত্র হিসেবে প্রচারকে অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের অনেক আগে থেকেই কার্য্যকরী করা হয়েছিল। লোকমুখে অর্দ্ধ-সত্য প্রচারের দ্বারা শক্র-সৈন্যের এবং শক্র-রাষ্ট্রের অসামরিক জনসাধারণের মনোবলকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা ইতিহাসের মতই প্রাচীন। প্রচার-পত্র সাহায্যে এই অভিযান অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক। নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে লর্ড ককরেন ফরাসী উপকূলে জাহাজ ভিড়িয়ে ঘুড়ির সাহায্যে শক্রব্যূহের পিছনে প্রচার-পত্র ছড়িয়ে দিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধে বিমান থেকে এই ভাবে প্রচার-পত্র বিলি করা হয় এবং এর প্রত্যক্ষ ফল এই সময়েই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন সেনাপতিরা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিতে যখন ইউরোপের আকাশে প্রাক্ ঝটিকা শান্ত, তখন জার্ম্মানীতে ঘরোয়া প্রচারের একটি মাত্র বাণী ছিল—'মাখনের বদলে বারুদ।' প্রথম মহাযুদ্ধের আত্ম-সমর্পণের প্রতিশোধকল্পে এর চেয়ে উত্তেজক আর কোন বাণী সেদিন চায় নি জার্ম্মানীর যুবচেতনা রাষ্ট্রের কাছে। এই প্রতিশোধের নেশায় তারা চরম ত্যাগের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল গোপনে গোপনে। কিন্তু ব্রিটিশ রাষ্ট্র-রথীরা তখন ঝড়ের পূর্ব্বাভাষকে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই যুদ্ধ যখন লাগল তখন তারাও 'সব ঠিক হ্যায়' বলে প্রচার চালাতে লাগলেন।

কিন্তু ভুল ভাঙ্গতে তাদের দেরী হ'ল না। এবারের যুদ্ধ যে আর রণাঙ্গনেই আট্‌কা থাকবে না, তা গোড়াতেই বোঝা গিয়েছিল। বরং এবার যুদ্ধক্ষেত্রের তৎপরতার চেয়ে যেন বে-সামরিক নর-নারীর ক্ষতি-সাধন করাতেই তার ঝোঁক বেশী, এ বোঝা গেল। তার প্রতিকার হিসেবে নিষ্প্রদীপ সুরু হ'ল সর্ব্বত্র।

এই নিষ্প্রদীপ ব্যাপকভাবে প্রথম প্রথম প্রচারের কাজ করেছিল। প্রথম যখন অন্ধকার-আকাশে আলোয় লিখে প্রচারের কাজ হ'ত, তখন জনসাধারণের বেশ উৎসাহ ছিল, কিন্তু এ বেশী দিন করা চলল না। কারণ অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠল। দোকান, সিনেমা—এমন কি বাড়ীর বাতায়নে অতি অল্প আলোর ব্যবস্থা হওয়ায়, রাত্রে প্রচারের কাজ প্রায় বন্ধ করতেই হ'ল। তার ওপর ছিল সাইরেন ও বোমাবর্ষণ। আকাশে শক্র-বিমানের হানা—জলপথে ডুবো-জাহাজের রাহাজানি, এরাও প্রচারকে ব্যাহত করেছে পদে পদে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে—সংবাদ চলাচলের ব্যাঘাত ঘটেছে। কিন্তু ধ্বংস যত ব্যাপক হয়েছে এবং বাণিজ্য যত ব্যাহত হয়েছে, ততই বেশী প্রয়োজন হয়েছে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে প্রচারের। সর্বচেয়ে বেশী কাজ করেছে চার্চ্চিলের দুটি আঙুল। দুই আঙুল তুলে ধরলেই 'V'-এর মত দেখায়। 'ভি' হ'ল 'ভিক্‌টিম।' অর্থাৎ জয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী। এই দুটি আঙুল তুলে ধরা ছবি—তিনি শেষ পর্য্যন্ত রেখেছিলেন।

যে দেশ যেভাবে যুদ্ধকে দেখেছে তার প্রচারের ভঙ্গিও যে তেমনি হবে তা স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের স্বাধীন আত্মার আওয়াজ উঠেছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে, তার সুর ছিল—'ভারত ছাড়।' কিন্তু যে ভারতবর্ষকে ইংরেজরা জোর ক'রে যুদ্ধে নামিয়েছিল—বিশ্বাসঘাতক আর লোভীদের ভারতবর্ষে ইংরেজের সাহায্যের জন্যে প্রচার-দপ্তর তখন বিপুল কাজ করেছিল। ইংলণ্ডের রীতি ও নীতি সম্পূর্ণ অনুসৃত হয়েছিল ভারতবর্ষে, কিন্তু তার আবেদন জন-সমাজের কাছে সফল হয় নি। তার কারণ-বিশ্লেষণ এখানে অবান্তর। এবার অধিকাংশ দেশের আইন-সভা যুদ্ধের সুরুতেই জনসাধারণের ধন ও জন-যৌবনকে রাষ্ট্রের করায়ত্ত করায় গতবারের মত সামরিক ও বে-সামরিক প্রয়োজনীয়তা নিয়ে এবার রেষারেষি হয় নি।

'চালু রাখ'—এই একটি মাত্র নির্দ্দেশ ছিল যুদ্ধের গোড়ার দিকে। শুধু যুদ্ধের ছাপ পড়েছিল তাদের বিজ্ঞানের ঢঙে। সৈনিক, গোলন্দাজ ও এ-আর-পি মেয়েরা বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় নানা ভাবে আসা-যাওয়া করত। যে পুরুষ কোট-প্যান্টে একটি মেয়ের মন জয় করতে পারে নি, সে যে নেভির পোশাকে সহজেই মেয়েটিকে বধূ হিসাবে পেয়েছিল—এ প্রচারও চলত বিজ্ঞাপনের পাতায়। যুদ্ধ যতই ঘোরাল হয়ে উঠতে লাগল, ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারলেন যে, এবার আর সহজে নিষ্পত্তি হবে না, তখন এলো বিরাট্ পরিবর্ত্তন। সামরিক কারণে প্রায় সমস্ত কারখানাই যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হতে লাগল। এ ছাড়া জনসাধারণ যাতে

মিতব্যয়ী হয়, সে নির্দ্দেশও ছিল সরকারের। সুতরাং এমন ভাবে প্রচার হতে লাগল, যাতে লোকে সৌখীন ভাল জিনিসের বদলে সাধারণ দ্রব্য নিয়ে কাজ চালাতে অভ্যস্ত হয়। অভাবে পড়ে মানুষেরও তখন আর এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু স্বভাব অনেকে ছাড়তে পারলেন না। তখনই প্রয়োজন হ'ল প্রচার-বিজ্ঞানের সাহায্য। এই সময় থেকেই প্রচারের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

'যুদ্ধে গেছে শীগ্‌গির ফিরবে'—এই রকম নির্দ্দেশ থাকত কতকগুলি বিজ্ঞাপনে। যেসব মালের বাজারে চাহিদা ছিল প্রচুর অথচ একেবারে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল ঘরে এবং বাইরে, সেইসব কোম্পানী তাদের জিনিসের নামকে লোকের স্মরণে রাখবার জন্যে এই পদ্ধতি নিলেন।

যুদ্ধ এবং অভাব এই ভাবে লোকের চাহিদার ভঙ্গিই বদলে দিয়ে গেল। পুরনো অভ্যাস ত্যাগ ক'রে লোকে তখন নতুন অভ্যাস ধরতে সুরু করেছে।

কাজের অভাব ছিল আর এক অন্তরায়। অবশ্য এবারের যুদ্ধে ব্যাপক দায়িত্ব নিয়েছিল অনেকে। যেমন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রচার-পত্র, প্রচার-পুস্তিকা, শুভদিনের পত্রলিপি, প্রাচীর-পত্র, সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও প্রেস। মাইক্রোফোন, বেতার, চলচ্চিত্র এবং সরকারের নিজস্ব প্রচার-দপ্তরও অনেক কাজ করেছে। সবাই মিলে এই দায়িত্ব নেওয়ায়, কাগজের দায়িত্ব অনেকটা কমে যায়।

দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংলণ্ডের বেতার রীতিমত কাজ করে-ছিল। বেতার ষ্টেশন থেকে যারা পৃথিবীর দূরতম অংশের শ্রোতার জন্যে যুদ্ধের সংবাদ পরিবেশন করতেন, তাদের মধ্যে অনেকেরই বাচনভঙ্গি ও বক্তব্য-বিষয়কে বিশ্লেষণ করার কৌশল বেশ মর্ম্মস্পর্শী হ'ত। কিন্তু জাপানী ও জার্ম্মান-অধিকৃত বেতার কেন্দ্রগুলি থেকে যে প্রচার হ'ত, তার মধ্যে আস্ফালন ও নিছক মিথ্যার আশ্রয় থাকত অতিমাত্রায়।

প্রচারের মধ্যে নিছক সত্যও থাকে না, নিছক মিথ্যাও থাকে না। সত্য-ঘেঁষা প্রচারকে নিপুণ শিল্পী দরদ দিয়ে যে ভাবে উপস্থাপিত করেন, তার মধ্যেই প্রচারের কর্ম্মকারিতা নির্ভর করে। নইলে রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে যত জার্ম্মান-সৈন্য মরেছিল প্রচার-দপ্তরের নিত্য সংবাদপত্রে, তাতে আজ জার্ম্মানীতে মানুষ থাকবার কথা নয়। প্রচারের এই আতিশয্যে প্রচার-দপ্তরই জনসাধারণের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছিল এবং তার ফলে জনসাধারণের মনে যে বিভ্রান্তির জন্ম হয় তাতে সরকারের মূলতঃ ক্ষতিই ঘটতে থাকে। অবশ্য এ হ'ল ঘরোয়া প্রচারের ক্ষেত্রে। বিদেশী সৈন্য-ব্যূহের মধ্যে অথবা শত্রুরাষ্ট্রে এই ধরনের প্রচারের ফলে কিছুটা কাজ হয়ই—বিশেষ করে, যখন সরকারের শক্তির ওপর দেশের লোকের আস্থা হ্রাস হতে থাকে নানা কারণে। সেই সময়েই প্রচার মারাত্মক অস্ত্রের কাজ করে। যে শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে, তাকে যেমন নিঃশব্দে রোগ এসে দখল করে—প্রচারও তেমনি ভাবে দখল করে দেশকে, যেখানে মনোবল ক্ষুণ্ণ।

আমরা একলা নই। বিমান আক্রমণ ও যুদ্ধের অনিশ্চয়তার মধ্যে এই একটি কথা আমাদের মনে অপরিসীম ধৈর্য্য ও সাহসের সঞ্চার করে। আমরা সবাই দুঃখী, এই বোধ জাগাতে পারলে সমষ্টিগত ভাবে জনসাধারণ অনেক ক্লেশ নির্ব্বিঘ্নে বহন করতে পারে। গত মহাযুদ্ধে এই ধরনের কয়েকটি মাত্র প্রচার বা নির্দ্দেশ সার্থকতার সঙ্গে কাজ করেছিল। 'খাদ্য যুদ্ধের রসদ—অপচয় করবেন না। সর্ব্বত্র শত্রুর কান—কানাকানি করবেন না। বাসে দুটি মেয়ে গল্প করছে, আর তাদের পিছনের সীটে বসে আছে হিটলার।'

এ বিজ্ঞাপনের মূল্য অনেক গালভরা বক্তব্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। গুজবে কান দেবেন না। অর্থাৎ আপনি যখন বাজারে গেছেন, সিনেমায় গেছেন, পার্টিতে গেছেন আপনার মুখ বিবর্ণ—এ ছবি মনে রাখা সহজ। 'লাঙল চালাও—ফসল ফলাও'—এ প্রচার ভারতবর্ষে নিরর্থক, কিন্তু ইংলণ্ডে এ প্রচার সার্থক হয়েছিল। 'মাল খালাস করতে যাচ্ছি—দাঁড়াবার অবসর নেই।' লরী-ড্রাইভার পুলিশের নির্দ্দেশ ডিঙিয়ে চলে যাচ্ছে। আঁকার কৌশলে এ ছবি অনেক বেশী মর্ম্মস্পর্শী।

'অনাথ গৃহহারা ছেলেমেয়ে—এদের দিকে তাকান।' বোমা-বিধ্বস্ত ইংলণ্ডে বহু পরিবার এমনি ধরনের হাজার হাজার ছেলে-মেয়েকে খাইয়েছে, পরিয়েছে। মৃত সৈনিকপিতার ঊর্দ্ধগামী আত্মা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আপনার দিকে—আপনি শিশুকে কোলে করে দুধ খাওয়াচ্ছেন। এর মধ্যে অনুভূতির চেয়ে তাগিদের দাবী আগে।

এবারের যুদ্ধে বিশেষ ভাবে মেয়েদের ও গৃহিনীদের জন্যেও প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শান্তির সময় যে-মেয়ে অভিজাত সমাজের বৌরাণী—যুদ্ধের কাজে সে অক্লান্তকর্মী। গৃহিনীরা এ যুদ্ধে বিশেষ সাহায্য করেছেন। খাবার টেবিলে এবং পরিচ্ছদে তাদের বিচক্ষণতা যে-ভাবে অপচয় নিবারণ করেছে এবং মিতব্যয়িতার সঙ্গে

প্রয়োজনীয়তার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে যেভাবে গৃহের ও জাতির স্বাস্থ্য রক্ষা করেছে, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

অত বিমান-আক্রমণ এবং অভাব-অনটনের মধ্যেও ইংলণ্ডের মনোবল যে অক্ষুণ্ণ ছিল তার পিছনে ইংরেজ মেয়েদের ও গিন্নীদের স্বার্থত্যাগ বা নৈপুণ্য কম নয়।

অবশ্য ভারতবর্ষের কথা আলাদা। যুদ্ধকালীন ভারতবর্ষের একমাত্র দায়িত্ব ছিল ততটুকু প্রচারের, যার মধ্য দিয়ে শোষণনীতি অব্যাহত থাকতে পারে। জনসাধারণের খাদ্য ও স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব সে নেয়নি—নিতে চায়ও নি। তার জন্যে যুদ্ধের মধ্যেও আমরা ভুগেছি—এখনও ভুগছি।

ন্যাশনাল সেভিংস কমিটি এই সময় অনেক কাজ করেছে। যেমন প্রচারের সাহায্যে সে মুঠো মুঠো টাকা নিয়ে এসেছে জনসাধারণের পকেট থেকে সরকারী তহবিলে। কাগজে প্রচার ছাড়াও ভ্রাম্যমান চলচ্চিত্রের সাহায্যে সে দূরতম গ্রামেও অনেক খবর পৌঁছে দিয়েছে। এমনি করেই সে জনসমাজের কাছ থেকে সহযোগিতা আদায় করেছে। আর গাড়া করে বক্তারা যখন প্রচারে বেরোতেন, তখন প্রথমেই বাজাতো তারা গান বা যন্ত্র-সংগীত—যার ফলে লোক জমে যেত। এমনি করে লোক-আকর্ষণ করবার ব্যবস্থা আজও চালু আছে। পল্লীর হাটের ধারে বসত চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সাময়িক আস্তানা। এই ভাবে প্রচার ভারতবর্ষেও চালানো হয়েছিল। এতে চমক্ থাকার দরুন লোকের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে পারত না। এই ধরনের প্রচারের সাহায্যে ইংলণ্ডে ১৯৪০ সনেই জাতীয় তহবিলে সংগৃহীত হয়েছিল আটচল্লিশ কোটি পাউণ্ড।

যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অসুবিধাগুলির মধ্যেও জন-সাধারণ মনটাকে হাল্‌কা করতে চেয়েছে। তার মানে, যখন লোকে বুঝতে পারল, এর থেকে পরিত্রাণ নেই কিছুতেই তখন তার মধ্যে থেকেই লোকে বাঁচার আনন্দ খুঁজে নিল। আমাদের দেশেও, যুদ্ধের খবর, বিমান-আক্রমণ, খাওয়া-পরার দরুন অনটনের প্রসঙ্গ নিয়ে লোকে হাসাহাসি করেছে। এতে জাতির মনোবলকে ভিতর থেকে ধ্বসে যেতে দেয় নি। এর মধ্যে জাতির জীবনীশক্তির অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। আর যাই হোক, আমরা ঠিক আছি—এ কথা বলার মধ্যে অন্ততঃ হেরে যাওয়ার মনোবৃত্তি প্রকাশ পায় না। সরকার পক্ষ থেকে এই ধরনের হাস্যরসকে সে সময় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল।

ঘৃণা হ'ল প্রচারের আর এক অস্ত্র। শত্রু-সৈন্য ও শত্রু-নায়কদের ব্যভিচার এবং অমানুষিকতার বিরুদ্ধে দেশের জন-সমাজের মধ্যে তীব্র ঘৃণাবোধ জাতিকে প্রেরণা দেয় কষ্টসহিষ্ণুতার। জাতি তখন কঠিন হয়ে ওঠে আক্রোশে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকরা বাড়ী থেকে যে-সব চিঠি পায়, সেগুলির গুরুত্ব অনেক। একজনেরও চিঠি এলে তাদের মধ্যে উৎসব লেগে যায়। সকলকে সে চিঠি দেখায়—তাদের মধ্যেও কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। একের আনন্দ তারা সকলে মিলে ভাগ করে নেয়। এই সব চিঠির আবেদন, প্রচার-পত্রের চেয়েও বেশী মর্ম্মস্পর্শী। যুদ্ধকালীন রাশিয়ার মেয়েদের লেখা, এই রকম কতকগুলি চিঠি জার্মান-বিরোধী মনের এমন প্রত্যক্ষ ছবি তুলে ধরে, যা ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

প্রত্যেক দেশে শ্রেষ্ঠ লেখক ও শিল্পীরা এই প্রচারের জন্যে কলম বা তুলি ধরেন। এ তাঁদের ধরতেই হয়। কখনও দেশের তাগিদে, কখনও বা লোভ ও বাধ্যতার তাগিদে। নিজের দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে লেখা বা ছবি আঁকাই অনেকের মতে নিছক প্রচার, কিন্তু মৃত্তিকা যখন কলঙ্কিত এবং মানুষ যখন বিপন্ন তখন এ দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে নিতেই হয়। তখন প্রচারের ভাষা ও ভঙ্গি সব সময় মার্জ্জিত পথে নাও চলতে পারে। যুদ্ধের সময় প্রচারের ভাষায় সেটা বার বার লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

'এই যুদ্ধ আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে দেয়।' এ কথা প্রচারেরও মূল্য আছে। তখন বিজ্ঞাপন শুধু 'বিজ্ঞাপন' থাকে না, বিজ্ঞাপনের সঙ্গে লোকে সহজ ভাষায় জানতে শেখে অনেক কিছু। শিক্ষাদপ্তর যা বহুদিন ধরে করতে পারে না, যুদ্ধের প্রচার-দপ্তর তার জমি তৈরী করে দেয় বহুলাংশে। শান্তির সময়ই হোক বা যুদ্ধের সময়ই হোক, প্রচার সব সময়ই নিপুণ অস্ত্র। তাকে ব্যবহার করার কৌশল জানলে তা অসাধ্যসাধন করার ক্ষমতা রাখে। আসলে প্রচার বাদ দিয়ে আজকের দুনিয়ায় এক পা নড়তে পারে না রাষ্ট্র।

—০—

রবীন্দ্রনাথ ও গায়ত্রী

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাসি স জীব শরদঃ শতম্॥

"আমার প্রতি অঙ্গ হতে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ। আমার হৃদয় হতে তোমার আবির্ভাব হয়েছে। তুমি আমার দ্বিতীয় সত্তা। হে পুত্র, আমার নবরূপায়িত আমিত্ব তোমার মধ্যে। তুমি শতবর্ষ জীবনধারণ করো।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পৃথিবীর অন্যতম সৌভাগ্যবান্ পুরুষ। তাঁর সুগঠিত অঙ্গ এবং জ্যোতির্ময় হৃদয় থেকে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

রবীন্দ্রনাথ বিধাতার বরপুত্র। তাঁর আনন্দময় রাজ্যের যুবরাজ। বিশ্বের অসীম রূপসাগরে ডুব দিয়ে তিনি অরূপরতনের স্পর্শ পেয়েছিলেন। সেই স্পর্শে তাঁর সকল ভাবনা সোনা হয়ে গিয়েছিল। তারই বিচিত্র প্রকাশ তাঁর কাব্যে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কাছ থেকে উত্তরাধিকারস্বরূপ যে আধ্যাত্মিক সম্পদ রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন—গায়ত্রীমন্ত্র তার অন্যতম। এই মন্ত্র মহর্ষির জীবনে কী স্থান অধিকার করেছিল —সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"যাঁরা মহর্ষির আত্মজীবনী পড়েছেন, তাঁরা সকলেই জানেন, তিনি তাঁর দীক্ষার দিনে এই গায়ত্রীমন্ত্রকেই বিশেষ করে তাঁর উপাসনার মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। ······এই গায়ত্রীমন্ত্রটি আমাদের দেশের অনেকেরই জপের মন্ত্র, কিন্তু এই মন্ত্রটি মহর্ষির ছিল জীবনের মন্ত্র। এই মন্ত্রটিকে তিনি তাঁর জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে-ছিলেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের ভিতর থেকে প্রকাশ করেছিলেন।

"এই মন্ত্রটিকে তিনি যে গ্রহণ করেছিলেন এবং রক্ষা করেছিলেন, লোকাচারের অনুসরণ তার কারণ নয়। হাঁস যেমন স্বভাবতই জলকে আশ্রয় করে, তিনি তেমনি স্বভাবতই এই মন্ত্রটিকে অবলম্বন করেছিলেন।" "ভক্ত"—শান্তিনিকেতন, ২য় খণ্ড, ৪-৫ পৃষ্ঠা।

কত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে, কবে কোন্ মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গায়ত্রীমন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন! সেই অজ্ঞাত প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে, যুগে যুগে, দেশে, দেশে, কত সাধক সেই মন্ত্র জপ করে সিদ্ধিলাভ করেছেন—কত তপস্বীর জীবন সার্থক হয়ে গেছে। কত মনীষী, কত জ্ঞানী, কত বিদ্বান, কত ভাবুক, নানা দেশে, নানা ভাষায় সেই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন!

আজও অগণ্য ভারতবাসীর জপমন্ত্র গায়ত্রী। ধ্যানের মন্ত্র সাবিত্রী।

চারবেদের সার এই সাবিত্রী—এই গায়ত্রী। রবীন্দ্র-নাথ পিতৃদত্ত এই মন্ত্র জপ করতে করতে তাকে দর্শন করেছিলেন।

"মন্ত্রকে দর্শন করেছিলেন"—কথাটা অনেকের কাছে অদ্ভুত ঠেকতে পারে, কিন্তু কথাটা সত্য। একই মন্ত্র হাজার হাজার ব্যক্তি জপ করছে, কোনো ফল হচ্ছে না। আবার একজন সেই মন্ত্র জপ করেই সিদ্ধিলাভ করলেন। মন্ত্রের স্বরূপ তিনি দর্শন করলেন।

ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করতে হয়, তবে ত বীজ অঙ্কুরিত হবে! তবে ত ফসল ফলবে! তেমনি মনকেও প্রস্তুত করতে হয়। তবে ত মন ত্রাণ লাভ করবে! তবেই ত মন্ত্র সার্থক হবে!

অদ্ভুত শক্তিশালী এই মন। বৈদিক ঋষি বলেছেন:

যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরংগমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শুভসংকল্পমস্তু॥

"যে দিব্য মন জাগ্রত অবস্থায় দূরে, দূরান্তরে, মুহূর্তে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্তে গমন করে, সুপ্ত অবস্থাতেও যার সেই গতি তেমনি অব্যাহত থাকে, সেই দূরংগম সকল জ্যোতির একমাত্র জ্যোতি আমার মন শুভসংকল্পযুক্ত হোক।"

"সকল জ্যোতির একমাত্র জ্যোতি" এই মন! মন না থাকলে এই জ্যোতির্ময় সূর্যও অন্ধকারে পরিণত হয়। মূর্ছিত মানবের কাছে জগতের সমস্ত জ্যোতি লুপ্ত। সমস্ত জ্যোতির জ্যোতি আমার এই মন শুভ ভাবনায় নিমগ্ন হোক!

শুভ ভাবনায় নিমগ্ন হলে এই মনই অসাধ্য সাধন করতে পারে। জগতের মহামানবগণ তার দৃষ্টান্ত।

আবার অশুভ ভাবনায় নিমগ্ন হলে সৃষ্টি সে ছারখার করে দিতে পারে। এযুগে এও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

তাই বিধাতার অপূর্ব দান—এই পরম শক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করে সমস্ত প্রাণীজগতের কল্যাণ করাই মানবজীবনের লক্ষ্য।

মনকে মুক্ত করতে হবে, মনকে মুক্ত করতে পারে যে, ত্রাণ করতে পারে যে, সেই হলো মন্ত্র! গায়ত্রীমন্ত্র সর্বমন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মন্ত্র।

দেহকে সুস্থ রাখতে হলে উন্মুক্ত প্রান্তরে, আকাশের নীচে, আলোকে ও বাতাসের মধ্যে প্রতিদিন প্রভাতে ভ্রমণ করতে হয়। মনের সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "স্বাস্থ্যকামী যেরূপ রুদ্ধগৃহ ছাড়িয়া, প্রত্যূষে একবার উন্মুক্ত মাঠের বায়ু সেবন করিয়া আসেন, সেইরূপ আর্যসাধু, দিনের মধ্যে একবার নিখিলের মধ্যে, ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে নিজের চিত্তকে প্রেরণ করেন। তিনি সেই অগণ্য জ্যোতিষ্কখচিত বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কী মন্ত্র উচ্চারণ করেন,

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

'এই বিশ্বপ্রসবিতা দেবতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি।'

"এই বিশ্বলোকের মধ্যে, সেই বিশ্বলোকেশ্বরের যে-শক্তি প্রত্যক্ষ তাহাকেই ধ্যান করি। একবার উপলব্ধি করি, বিপুল বিশ্বজগৎ একসঙ্গে, এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাঁহা হইতে অবিশ্রাম বিকীর্ণ হইতেছে। আমরা যাহাকে দেখিয়া শেষ করিতে পারি না, জানিয়া অন্ত করিতে পারি না, তাহা সমগ্রভাবে নিয়তই তিনি প্রেরণ করিতেছেন।

"এই বিশ্বপ্রকাশক অসীম শক্তির সহিত আমার অব্যবহিত সম্পর্ক কী সূত্রে? কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব?

'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ'—

"যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার প্রেরিত সেই ধীসূত্রেই তাঁহাকে ধ্যান করিব।"

"সূর্যের প্রকাশ আমরা প্রত্যক্ষভাবে কিসের দ্বারা জানি? সূর্য নিজে আমাদিগকে যে-কিরণ প্রেরণ করিতেছেন—সেই কিরণেরই দ্বারা। সেইরূপ বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে-ধীশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে-শক্তি থাকাতেই আমি নিজেকে ও বাহিরের সমস্ত প্রত্যক্ষ ব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি, সেই ধীশক্তি তাঁহারই শক্তি—এবং সেই ধীশক্তি-দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে অন্তরতমরূপে অনুভব করিতে পারি।

"বাহিরে যেমন ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের সবিতৃরূপে তাঁহাকে জগৎচরাচরের মধ্যে উপলব্ধি করি, অন্তরের মধ্যেও সেইরূপ আমার ধীশক্তির অবিশ্রাম প্রেরয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অব্যবহিতভাবে উপলব্ধি করিতে পারি।

"বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে ধী, এই দুই-ই একই শক্তির বিকাশ, ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চিত্তের এবং আমার চিত্তের সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া, সংকীর্ণতা হইতে, স্বার্থ হইতে, ভয় হইতে, বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি। এইরূপে গায়ত্রীমন্ত্র বাহিরের সহিত অন্তরের এবং অন্তরের সহিত অন্তরতমের যোগসাধন করে।

"ব্রহ্মকে ধ্যান করিবার এই-যে-প্রাচীন বৈদিকপদ্ধতি, ইহা যেমন উদার তেমনি সরল। ইহা সর্বপ্রকার কৃত্রিমতা-পরিশূন্য। বাহিরের বিশ্বজগৎ এবং অন্তরের ধী, ইহা কাহাকেও কোথাও অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতে হয় না—ইহা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নাই। এই জগৎকে এবং এই বুদ্ধিকে, তাঁহার অশ্রান্ত শক্তি-দ্বারা তিনিই অহরহ প্রেরণ করিতেছেন। এই কথা স্মরণ করিলে, তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ, যেমন গভীরভাবে, সমগ্রভাবে, একান্তভাবে হৃদয়ংগম হয়, এমন আর কোন্ কৌশলে, কোন্ আয়োজনে, কোন্ কৃত্রিম উপায়ে, কোন্ কল্পনানৈপুণ্যে হইতে পারে, তাহা আমি জানি না। ইহার মধ্যে তর্কবিতর্কের কোন স্থান নাই, মতবাদ নাই; ব্যক্তিবিশেষগত প্রকৃতির কোন সংকীর্ণতা নাই।" "ধর্মের সরল আদর্শ"—ধর্ম; ৩৫-৩৭ পৃষ্ঠা।

এই ধ্যানের জন্য কোন কৃত্রিম প্রতীকের প্রয়োজন নাই। তাঁর আনন্দরূপ এই জগৎই এই ধ্যানের স্বাভাবিক প্রতীক। এই রূপকে অবলম্বন করে সেই অরূপের ধ্যান করি।

তাঁরই প্রদত্ত আমার এই চিৎশক্তির দ্বারা সেই চিন্ময়ের ধ্যান করি।

"তাঁহার প্রেরিত এই জগৎ দিয়া সেই জগদীশ্বরকে উপলব্ধি করি, তাঁহার প্রেরিত এই বুদ্ধি দিয়া, সেই চেতনস্বরূপকে ধ্যান করি।" "নববর্ষ"—ধর্ম, ৮৫ পৃষ্ঠা।

রবিকরে যেমন কমল প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি সেই সচ্চিদানন্দের চিৎশক্তি আমার চিত্ত-কমলকে বিকশিত করছে। বীণার মূল তারটির সঙ্গে অন্য তারগুলি যদি একসুরে বাঁধা থাকে, তবে একটিতে আঘাত করলে, অন্য তারগুলিতে অনুরণন ওঠে, ঝংকার ওঠে—আমার

এই চিৎশক্তিকে যদি সেই চিৎশক্তির সংগে একসুরে মিলাতে পারি, তা হলে সেই চিৎশক্তির অনুরণন হবে আমার হৃদয়ে, আমার হৃদয়-বীণায় ঝংকার উঠবে। জীবন আমার মধুর সুরে, সুললিত সংগীতে ভরে উঠবে।

"গায়কের প্রাণের সঙ্গে, শক্তির সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে গানের সুর একেবারে চিরমিলিত হয়েই প্রকাশ পায়।... এই বিশ্বসংগীতটিও তার গায়ক থেকে এক মুহূর্তও ছাড়া নেই। তাঁর বাইরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই চিত্ত তাঁরই নিশ্বাসে তাঁরই আনন্দরূপ ধরে উঠছে। এ গান একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অন্তরে রয়েছে, অথচ ক্রমাভিব্যক্তরূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রত্যেক সুরই সেই সম্পূর্ণ গানের আবির্ভাব—এক সুরকে আর এক সুরের সঙ্গে আনন্দে সংযুক্ত করে চলেছে। এই বিশ্বগানের যখন কোন বচনগম্য অর্থও না পাই তখনও আমাদের বিত্তের কাছে এর প্রকাশ কোন বাধা পায় না। এ যে বিত্তের কাছে চিত্তের অব্যবহিত প্রকাশ।

"গায়ত্রীমন্ত্রে তাই তো শুনতে পাই সেই বিশ্বসবিতার ভর্গ, তাঁর তেজ, তাঁর শক্তি, ভূর্ভুবঃস্বঃ হয়ে কেবলই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে এবং তাঁরই সেই এক শক্তি কেবলই ধীরূপে আমাদের অন্তরে বিকীর্ণ হচ্ছে। কেবলই উঠছে, কেবলই আসছে সুরের পর সুর, সুরের পর সুর।"

"শোনা"—শান্তি, ১ম খণ্ড, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ—গায়ত্রীর এই অংশটুকুর নাম ব্যাহৃতি। ব্যাহৃতি শব্দের অর্থ—চারিদিক হইতে আহরণ করিয়া আনা। প্রথমত ভূলোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বজগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হয়; মনে করিতে হয়, আমি বিশ্বভুবনের অধিবাসী—আমি কোন বিশেষ প্রদেশবাসী নহি, আমি যে রাজ-অট্টালিকার মধ্যে বাসস্থান পাইয়াছি, লোকলোকান্তর তাহার এক-একটি কক্ষ। এইরূপে, যিনি যথার্থ আর্য, তিনি অন্তত প্রত্যহ একবার চন্দ্রসূর্যগ্রহতারকার মাঝখানে নিজেকে দণ্ডায়মান করেন, পৃথিবীকে অতিক্রম করিয়া, নিখিল জগতের সহিত আপনার চিরসম্বন্ধ একবার উপলব্ধি করিয়া লন।" ধর্ম, ৩৫ পৃষ্ঠা।

শব্দে স্পর্শে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে, এই বিশ্বপ্রকৃতি মানব-চিত্তকে অনবরত আকর্ষণ করছে। এই দুয়েরই মধ্যে যিনি সমানভাবে, ওতঃপ্রোতভাবে মিলিয়ে রয়েছেন, যিনি অগ্নি, জল, ওষধি, বনস্পতি, বিশ্বপ্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন, আবার যিনি নয়নের নয়ন, শ্রবণের শ্রবণ, প্রাণের প্রাণ, মনের মন, সমস্ত ইন্দ্রিয়ে, সমস্ত অস্তিত্বের অণুতে পরমাণুতে বিরাজ করছেন, বাহির ও অভ্যন্তর এই দুইয়েরই উৎস যিনি—এই দুইয়েরই সাহায্যে তাঁকে ধ্যান করবার উপদেশ দিয়েছেন গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

"একদিকে ভূলোক, অন্তরীক্ষ জ্যোতিষ্কলোক, আর একদিকে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি। আমাদের চেতনা—এই দুইকেই যাঁর এক শক্তি বিকীর্ণ করছে, এই দুইকেই যাঁর এক আনন্দ যুক্ত করছে, তাঁকে, তাঁর এই শক্তিকে, বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার বুদ্ধির মধ্যে ধ্যান করে উপলব্ধি করবার মন্ত্র হচ্ছে এই গায়ত্রী।"

"ভক্ত"—শান্তি, ২য় খণ্ড, ৪ পৃষ্ঠা।

বাহিরের এই আনন্দরূপ আমার অন্তরে আনন্দ পরিবেশণ করে। কিন্তু অন্তর আমার শুষ্ক নীরস হলে বাহিরের এই আনন্দরূপের অস্তিত্ব অনুভূত হয় না। অন্তর ও বাহির এই দুই-এর মধ্যেই আনন্দ সৃষ্টি করছেন যিনি, তিনি সেই রসস্বরূপ সবিতা। তাঁরই যোগে বাহিরে আনন্দরূপের বিকাশ এবং অন্তরে আনন্দের সঞ্চার।

সেই রসস্বরূপের ধ্যান বাহির ও অন্তরকে সরস ও আনন্দময় করে, উজ্জীবিত করে।

যে ধীশক্তির সহায়তায় অন্তরে সেই রসস্বরূপকে ধ্যান করব, সেই ধীশক্তি তাঁর থেকেই অনবরত আমার অন্তরে প্রেরিত হচ্ছে, যে ভূর্ভুবঃস্বর্লোককে অবলম্বন করে তাঁকে ধ্যান করব—সেই ভূর্ভুবঃস্বর্লোক সতত তাঁর থেকেই উৎসারিত হচ্ছে এই কথা স্মরণ করে—

"আমাদের ধ্যানের দ্বারা সৃষ্টিকর্তাকে তাঁর সৃষ্টির মাঝখানে ধ্যান করি। ভূর্ভুবঃস্বঃ তাঁ হতেই সৃষ্টি হচ্ছে। সূর্যচন্দ্রগ্রহতারা প্রতি মুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রকাশ হচ্ছে, আমাদের চৈতন্য প্রতি মুহূর্তেই তাঁর থেকে প্রেরিত হচ্ছে, তিনিই অবিরত সমস্ত প্রকাশ করছেন—এই হচ্ছে আমাদের ধ্যান।

"এই দেখাকেই বলে সত্য দেখা। আমরা সমস্ত ঘটনাকে কেবল বাহ্য ঘটনা বলেই দেখি। তাতে আমাদের কোন আনন্দ নেই। সে আমাদের কাছে পুরাতন হয়ে যায়, সে আমাদের কাছে দম-দেওয়া কলের মতো আকার ধারণ করে।...

"যখন কেবল ঘটনার দিকে তাকিয়ে দেখি তখন এইরকমই হয়। সে আমাদের রস দেয় না, খাদ্য দেয় না। সে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়কে, মনকে, হৃদয়কে

কিছুদূর পর্যন্ত অধিকার করে; শেষ পর্যন্ত পৌঁছয় না। এইজন্যে তার যেটুকু রস আছে তা উপরের থেকেই শুকিয়ে আসে; তা আমাদের গভীরতর চেতনাকে উদ্বোধিত করে না।...

"কিন্তু সত্যকে যখন জানি, তখন আমাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হয়। সত্য চিরনবীন, তার রস অক্ষয়। সমস্ত ঘটনাবলীর মাঝখানে সেই অন্তরতম সত্যকে দেখলে দৃষ্টি সার্থক হয়। তখন সমস্তই মহত্ত্বে, বিস্ময়ে, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

"এইজন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্রে আমরা প্রতিদিন অন্তত একবার সমস্ত বিশ্বব্যাপারের মাঝখানে বিশ্বের যিনি পরমসত্য তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করে থাকি। ঘটনাপুঞ্জের মাঝখানে যিনি এক মূলশক্তি, তাঁকে দর্শন করবার জন্যে দৃষ্টিকে অন্তরে ফেরাই। তখন দৃষ্টি থেকে জড়ত্বের আবরণ ঘুচে যায়; জগৎ একটা যন্ত্রের মতো আমাদের অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে পড়ে থাকে না। প্রতি মুহূর্তেই এই অনন্ত আকাশব্যাপী প্রকাণ্ড প্রকাশ একটি জ্ঞানময় সত্য হতে নিঃসৃত হচ্ছে, বিকীর্ণ হচ্ছে, ইহাই অনুভব করে আমাদের চেতনা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন অগ্নি, জল, ওষধি, বনস্পতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্ম, সর্বত্রই আনন্দরূপে, অমৃতরূপে তাঁর প্রকাশ।

"অগণ্য ঘটনাকে অগণ্য ঘটনারূপে দেখেই চলে যাব না; তার মাঝখানে অনন্ত সত্যকে স্থির হয়ে স্তব্ধ হয়ে দেখব, এইজন্যেই আমাদের ধ্যানের মন্ত্র গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ। তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

"ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক—ইহাই যিনি নিয়ত সৃষ্টি করছেন, সেই দেবতার বরণীয় শক্তিকে ধ্যান করি—যিনি আমাদের ধীশক্তিকেও নিয়ত প্রেরণ করছেন।"

"সত্যকে দেখা" শান্তি, ১ম খণ্ড, ২৭১-৭৩ পৃষ্ঠা।

রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ করতে করতে মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর স্পর্শ লাভ করি। রবীন্দ্র-কাব্যের ছত্রে ছত্রে তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করি। "শান্তিনিকেতন" ভরে তাঁর অলৌকিক সত্তা বিরাজমান। সেখানে তিনি পথহারাদের পথ দেখাচ্ছেন, অন্ধজনে আলো দিচ্ছেন, মৃতজনে প্রাণ দিচ্ছেন। বরষার বারিধারার ন্যায় তাঁর আশিস বর্ষিত হচ্ছে। তিনি নাই—একথা বিশ্বাস হতে চায় না; কখন যদি অবিশ্বাস আসে—তখনি তাঁর সুমধুর সংগীতে আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হয়:

"কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—"

চোখের আলোয় তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। তাই বলে কি তিনি নাই?

চোখের দেখাই কি একমাত্র দেখা? যে বায়ু, প্রতি নিঃশ্বাসে গ্রহণ করে আমরা জীবনধারণ করছি—সে বায়ুকে ত চোখে দেখি না? তার অস্তিত্ব কি অস্বীকার করতে পারি? যে কাব্যামৃত, যে সংগীতসুধা প্রতিনিয়ত পান করে, মানব আমরা আমাদের মানবজীবন ধারণ করছি, সেই অমৃতের অধিকারী, অমৃতপরিবেশনকারীর মৃত্যু হয়েছে—একথা কেমন করে বিশ্বাস করি?

এই ত তাঁর অপূর্ব গায়ত্রী-ভাষ্যের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভূর্ভুবঃস্বর্লোকে সূর্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্রখচিত বিশ্বজগতে বিচরণ করলাম—যেখানে বাতাস মধু বহন করে, আকাশ মধু বর্ষণ করে, স্রোতস্বিনীগণ মধু ক্ষরণ করে, যেখানে রাত্রি মধুময়, দিবস মধুময়, ওষধি মধুময়, বনস্পতি মধুময়।

চক্ষে কি অমৃতাঞ্জন তিনি পরিয়ে দিলেন জানি না, তাঁর সংগে সুর মিলিয়ে আমিও বলতে পারলাম:

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি।...
সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।

"মধুময় পৃথিবীর ধূলি"—আরোগ্য।

—*—

সূর্য্যপ্রণাম

শ্রীসুবোধ বসু

গাড়ী ধরিবার জন্য এমন ছুট আগে কখনও লাগাই নাই। খবর পাইয়াছিলাম দেরিতে। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলাম ট্রেন প্ল্যাটফর্ম্মে পৌঁছিয়াছে, তবে তখনও থামে নাই। আমি আগে-পিছে না চাহিয়া সমানে সামনের দিকে দৌড় লাগাইলাম। অনুভবে বুঝিলাম, আরও অনেকে আমার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে। কিন্তু দৌড়ের প্রতিযোগিতায় অপরাপর সকলকে পরাজিত করিয়া আমি ঠিক কামরাটির পা-দানিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

শরৎচন্দ্র তাঁর এক উপন্যাসে থার্ডক্লাস প্যাসেঞ্জারদের এই মরিয়া-দৌড়ের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই দৌড় প্রথমশ্রেণীর কামরার জন্য। তা ছাড়া, আমি প্যাসেঞ্জার নই। প্যাসেঞ্জার রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ জানালার ধারে বসিয়াই ছিলেন। আমার ব্যগ্র প্রণাম সহ্য করিয়া, হয়ত আমার উচ্ছ্বসিত বদন-মণ্ডল লক্ষ্য করিয়া স্মিত সস্নেহ হাস্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'এটা কোন্ ষ্টেশন ?'

কলিকাতার কলেজে পড়ি। পূর্ব্ব বাংলার এক মহকুমা শহরে বাবা বদলি হইয়া আসিয়াছেন। ছুটিতে মা-বাবার কাছে আসিয়াছি। সহসা একদিন খবর পাইলাম, সন্ধ্যার গাড়ীতে রবীন্দ্রনাথ এখান দিয়া যাইবেন। এত বড় চাঞ্চল্যকর ব্যাপার এই গণ্ডময় শহরটায় আমার সারা ছুটির মধ্যেও ঘটে নাই। সব কাজকর্ম্ম খেলাধূলা ফেলিয়া রেল ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া আসিয়াছি।

'তোমাকে কোথায় দেখেছি।' তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমার প্রশ্নের জবাব দিবার পর তিনি কহিলেন।

রীতিমত গর্ব্বিত বোধ করিলাম। আমার পায়ের নিচে প্ল্যাটফর্ম্মে যারা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কবি তাঁহাদের প্রতি সৌজন্য নমস্কার জানাইয়াছেন। কিন্তু আমি তাঁহার আরও নিকটবর্ত্তী। আমাকে তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছি। এসব গর্ব্ব তো ছিলই। তার উপর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিলেন, আমাকে যেন কোথায় দেখিয়াছেন !

'কয়েক হপ্তা আগে আপনি ইডেন হিন্দু হষ্টেলের উৎসবে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন। ডেইসে আপনার কাছে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। তখনই দেখে থাকবেন।'

এই দুর্লভ মুহূর্ত্তের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য আর কি কি কথা বলিয়াছিলাম মনে নাই। তবে মনে আছে তরুণ কিশোরের কৌতূহল তিনি সহানুভূতির সঙ্গেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন সময় অরসিক গার্ড হুইসিল দিয়া বসিল। গাড়ী নড়িয়া উঠিল। 'মনোপলীর' আসন হইতে অত্যন্ত অনিচ্ছাসহকারে গণ্ডময় প্ল্যাটফর্ম্মে লাফাইয়া পড়িতে হইল।

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ তখন আমাদের কাছে দেবতা। আমাদের প্রেসিডেন্সী কলেজের রবীন্দ্র-পরিষদ দার্শনিক পণ্ডিত ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে অল্প দিন আগে মাত্র গঠিত হইয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যপ্রীতি ও রবীন্দ্র-ভক্তির সেটা একটা কোরাম্ মাত্র। বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের আধিপত্য ইতিপূর্ব্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গানে, গল্পে, কবিতায়, নাট্যকলায়, দার্শনিক চিন্তায়, সামাজিক চিন্তায় রবীন্দ্র অবদান তখন সারা দেশের চিত্ত জয় করিয়াছে।

খুব ছেলেবেলা হইতেই রবীন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া আসিয়াছি। আমার এক মামা শ্রীসুধীরকান্ত মিত্র শান্তিনিকেতনের একেবারে প্রথম দিকের ছাত্র। তাঁর মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্যের কিছু ছাপ আমাদের বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছায়। বাড়ীর বড়োরা কেউ কেউ সে সব লইয়া হাসি-মস্করা করিতেন। কিন্তু শান্তি-নিকেতনের রকম-সকম যে অ-সাধারণ এটা আমরা সেই বয়সেই বুঝিয়া লইয়াছিলাম। ইহাও সহজেই বুঝিয়া-ছিলাম যে, এসব কায়দাকানুনের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একজন বিশেষ ব্যক্তি যাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নানা রকম নতুনত্ব আমদানী করিয়া তিনি একটা প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।

মফস্বলের এক শহরের এক জিলা স্কুলে ম্যাট্রিক পড়িতাম। সেখানেও কাউকে কাউকে রবীন্দ্র-সাহিত্য লইয়া কৌতুক করিতে শুনিয়াছি। টুলো পণ্ডিত ছোট-

খাট ব্যাকরণের ত্রুটি লইয়া ঠাট্টা করিয়াছেন। তা যে কত অবান্তর তা বড় হইয়া বুঝিয়াছি, কিন্তু ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রের বুদ্ধি সব সময়ে তার উর্দ্ধে উঠিতে পারিত না। আমার প্রাইভেট টিউটর সুপণ্ডিত লোক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কোন্ কবিতার কোন্ লাইনে ব্যাকরণের কোন্ ত্রুটি আছে তাহা দেখাইতে গিয়া তাঁর কাছে খুব বকুনি খাইয়াছিলাম, মনে আছে। তবু কিশোর মনে একটা বিরূপ সমালোচনার মনোভাব ছিল। নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে এই কুসংস্কার একদিন অকস্মাৎ ভাসিয়া গেল।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পর পিতার কর্ম্মস্থল হইতে কলিকাতায় আসিতেছি। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইব। খুলনায় ষ্টীমার হইতে নামিয়া ট্রেনে চাপিয়াছি। কামরাটা ছোট। আরও তিন জন ছাত্রশ্রেণীর ছেলেও উঠিয়াছে সেই কামরায়। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গাড়ী। তিন বন্ধু খাওয়া-দাওয়া ও গল্প-গুজবে মশগুল আছে। আমি একাকী। গরম ও অধৈর্য্যে অস্থির হইয়া উঠিয়াছি। গাড়ী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া আমাকে আরও ভোগাইয়া সহসা নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া চলিতে সুরু করিল। যেন মুক্তির আনন্দ বোধ করিলাম। মন ছুটিয়া চলিয়াছে কলিকাতায়, অথচ গাড়ী আলস্য করিয়া দেরি করিতেছে, এ কি কম যন্ত্রণা! ষ্টেশন, শহর ও শহরতলী পার হইয়া গেল। কাচের জানালা দিয়া উন্মুক্ত প্রান্তর চোখে পড়িল জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত। মাঠে মাঠে যেন রূপার জোয়ার আসিয়াছে:

"আজিকে প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত-পাখীর গান…"

চমকাইয়া উঠিলাম। বন্ধুত্রয় কখন গাড়ীর অবশিষ্ট তিনটি বার্থ অধিকার করিয়াছেন লক্ষ্য করি নাই। আমি নিচের দুটি বার্থের অন্যতমের অধিকারী। আমার বিপরীত দিকের উপরের বার্থ হইতে প্রায় মন্ত্রোচ্চারণের মত উপরোক্ত পংক্তিগুলির আবৃত্তি ভাসিয়া আসিয়া যেন আমার চৈতন্যের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। সুন্দর কণ্ঠস্বর। স্পষ্ট উচ্চারণ। ছন্দের দোলায়, শব্দের ঐশ্বর্য্যে, রামধনু-আঁকা কল্পনার প্রবাহে যেন মনের ভিতরকার অবরুদ্ধ নির্ঝর সত্যই বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ইহারই জলের উচ্ছ্বাস জ্যোৎস্না হইয়া মাঠে মাঠে প্লাবনের সৃষ্টি করিয়াছে।

ইহার পর 'তাজমহল'। কবিতার সঙ্গে সঙ্গে মন ছুটিয়া চলিল মুঘলযুগে। সত্যই যেন শাজাহানের রাজত্বে পৌঁছিয়া গিয়াছি। প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি সমাসবদ্ধ পদের ঝঙ্কার, প্রতিটি আলেখ্য যেন আকার গ্রহণ করিল।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে জয় করিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হইবার পর পাগলের মত রবীন্দ্র-সাহিত্য পড়িতে লাগিলাম। সবই যে সম্যক বুঝিতাম তাহা নয়, কিন্তু উহাতে অপূর্ব্ব রসের স্বাদ লাভ করিলাম। কথার ভঙ্গিতে, বক্তব্যের নতুনত্বে, একটা উচ্চশ্রেণীর রুচির ছাপে যেন এক নতুন জগত! কলিকাতার সামাজিক জীবনেও রবীন্দ্রনাথ তখন অদ্বিতীয়। তাঁর প্রভাব পোশাকে, গানে, আসবাবে, শিক্ষিত লোকের কথাবার্ত্তায়, তাদের নৈতিক জীবনে। রবীন্দ্রনাথ যদি কোনও নবজাতকের নামকরণ করেন, তবে তা প্রকাণ্ড-তম অনুগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ যদি চিত্রগৃহের নাম ঠিক করিয়া দেন, তবে তাহা সবচেয়ে বড় প্রচার। রবীন্দ্রনাথ যদি কোনও সভায় উপস্থিত হন, তবে তাহাতে প্রবেশের অধিকার পরম সৌভাগ্য। কাহারও অটোগ্রাফ খাতায় যদি দুই লাইন কবিতা লিখিয়া দেন, তবে সে সকলের ঈর্ষার বস্তু।

রবীন্দ্রনাথের কাছে যাইবার কথা তখন ভাবিতেও পারিতাম না। কিন্তু ঠাকুরবাড়ীতে বা অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা কোনও অভিনয় করিলে আমরা তাড়াতাড়ি তার টিকিট কিনিয়া আনিতাম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর অঙ্গনে, এম্পায়ার (বর্ত্তমান রক্সি), ম্যাডান থিয়েটার্স এণ্ড প্যালেস অব ভ্যারাইটিজ (বর্ত্তমান এলিট) এবং নিউ এম্পায়ারে বহুবার রবীন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিয়াছি। ঋতরঙ্গশ্রেণীর অনুষ্ঠানে তিনিই অধিকাংশ আবৃত্তি করিতেন। একক বা মিলিত সঙ্গীত করিত তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা। কিন্তু কখনও কখনও তিনি নিজের উচ্ছ্বাস দমন করিতে না পারিয়া গান গাহিয়া উঠিতেন। তাঁর গলা বাঁশীর মত মিঠা ছিল। সুস্পষ্ট উচ্চারণ। অপূর্ব্ব modulation। রবীন্দ্রনাথ-পরিচালিত সে-সকল অনুষ্ঠানে যে-সব ছাত্রছাত্রী সঙ্গীতে বা নৃত্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইত তাহারাও ছাত্রসমাজের আলোচনার বস্তু হইয়া উঠিত। প্রথম বার যখন ঠাকুরবাড়ীতে অভিনয় দেখিতে যাই, তখন উড়নি চাদর সংগ্রহ করিয়া পাঞ্জাবির উপর চড়াই ও নাগরা জুতা পায়ে দিয়া যাই। বস্তুতঃ রবীন্দ্র-নাথের সান্নিধ্যে যাইতে হইলেও সুরুচিপূর্ণ ও প্রাচ্য প্রীতির সাজপোশাক করিয়া যাইতে হইবে, আমাদের

মনে এই বিশেষ সম্ভ্রম প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্ট হইয়াছিল। অডিটোরিয়মের দর্শকেরাও কলিকাতার সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর। দেওয়ালে বিলম্বিত প্ল্যাকার্ডে পড়িলাম: "হাততালি দিবেন না।" সম্ভ্রমবোধ আরও বাড়িয়া গেল। সহসা জয়ঢাকের গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল। যবনিকা উঠিল। প্রথম বার বোধহয় "তপতী"র অভিনয় দেখিয়াছিলাম। অভিনয়ের সম্মানে রবীন্দ্রনাথ শাদা দাড়ি কালো করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তি, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গীত ও নৃত্য, অভিনয়কলা ও মঞ্চরীতির অভিনবত্ব একটা নতুন রসজগতের সন্ধান দিল।

রবীন্দ্রনাথকে আরও কাছে দেখিলাম আমাদেরই কলেজে। রবীন্দ্র-পরিষদের অধিবেশন উপলক্ষ্যে পরিষদের সভাপতি দার্শনিক অধ্যাপক ডা: সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত যেন স্বয়ং বাল্মীকিকে সঙ্গে লইয়া সভাকক্ষ প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার লেবরেটরীর ফিজিক্স্ থিয়েটারে প্রবেশ করিলেন। পূর্ণ গ্যালারীর প্রত্যেকটি দর্শক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান দেখাইল কবিকে। গরদের আলখাল্লা-পরা, মাথায় টুপি, চওড়া উজ্জ্বল কপাল, দীর্ঘ চোখ, রেশমের মত শাদা দাড়ি। যেন পুরাকালের ঋষি। ধীর, সৌম্য, প্রশান্ত, দীর্ঘাকার পুরুষ।

রবীন্দ্রনাথ মুখে মুখেই একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। বোধহয় সাহিত্যের রূপ সম্পর্কে। 'কল্লোল' পত্রিকাকে ঘিরিয়া তখন "তরুণ" লেখকেরা "বিদ্রোহে"র নিশান খাড়া করিয়াছে। এই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ তাদের নতুনত্ব সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন করিলেন কিন্তু অনাচার সম্বন্ধে তাদের হুঁসিয়ার করিলেন। কি সুন্দর বলিবার ভঙ্গি! কোনও অস্পষ্টতা নাই, আড়ষ্টতা নাই, ঠিক শব্দটি খুঁজিয়া পাইতে কোনই কষ্ট হইতেছে না, বক্তব্য এক প্রতিপাদ্য হইতে পরের প্রতিপাদ্যে যুক্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হইতেছে। এই বক্তৃতাটি অনুলিখিত হইয়া পরের সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের মৌখিক বক্তৃতা যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য তাহার জলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল।

আজকাল ব্ল্যাকমার্কেট সর্ব্বজনবিদিত। চাল-ডাল, কাপড়-কয়লা, সিমেন্ট-লোহা, ওষুধপত্র সব কিছুই ন্যায্য ও নির্দ্ধারিত দরের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হয়। কিন্তু কোনও বাংলা বই বেশি দামে বিক্রি হইতেছে এমন শুনি নাই। বহু বছর আগে নিজের অভিজ্ঞতাতে একবার সাহিত্যে ব্ল্যাকমার্কেটের পরিচয় পাইয়াছিলাম।

'প্রবাসী'তে সেবার রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" নাটকটি সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর দাম তখন প্রতিসংখ্যা আট আনা। এই বিশেষ সংখ্যাটির দামও তাই ছিল। তখন ইডেন হিন্দু হষ্টেলে থাকি। কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ের মাসিক পত্রিকার ষ্টল হইতে আট আনা ব্যয় করিয়া এক কপি 'প্রবাসী' সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। ইহার কিছুদিন পরে আমার স্কুল-জীবনের প্রাইভেট টিউটর মহাশয়ের কাছ হইতে এক চিঠি পাইলাম: "আমার জন্য এক কপি বর্ত্তমান সংখ্যা 'প্রবাসী' কিনিয়া পাঠাইবে—যাহাতে রবীন্দ্রনাথের "রক্তকরবী" নাটকটি আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথোচিত সম্মান না দেখানোয় ইনিই একদিন আমাকে ধমকাইয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি আরেক কপি 'প্রবাসী' কিনিতে গেলাম। এবার আর তাহা এক টাকার কমে সংগ্রহ করা গেল না।

রবীন্দ্রনাথের খুব কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ হইয়াছিল আরও কিছুদিন পরে। ইডেন হিন্দু হষ্টেলে প্রায় প্রতি বৎসরই রবীন্দ্রনাথের কোনও না কোনও নাটক অভিনীত হইত। দুই-একবার রবীন্দ্রনাথ অভিনেতাদের নিজের বাড়ীতে ডাকিয়া তাদের অভিনয় সম্পর্কে উপদেশও দিয়াছেন। কিন্তু আমি এদের দলে ছিলাম না। তবে অন্য একবার তাঁর নিমন্ত্রণে হষ্টেল হইতে আমরা তাঁর কোনও লেখার পাঠ শুনিতে যাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখা পড়িয়া শুনাইবার পর আমাদের সহপাঠী সুনীল সরকার তাঁর সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহিত্য সম্পর্কে তর্ক সুরু করে। আমরা তার এই "ঔদ্ধত্যে" শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ তার সঙ্গে তর্ক করেন এবং সম্ভবতঃ তার যুক্তিপ্রয়োগক্ষমতা দেখিয়া সন্তুষ্ট হন। "ঝর্ণা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছধারা" এই কবিতার পাদটীকায় রবীন্দ্রনাথ সুনীলের যুক্তিধারার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। সুনীল সরকার বর্ত্তমানে বিশ্বভারতীতে অধ্যাপক। এই নিয়োগের মূল সেদিনের তর্ক হইতে উদ্ভূত, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। কিন্তু সেদিন আমরা তার সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যা বোধ করিয়াছিলাম এই জন্য যে, সে নিজের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের সাথে পরিচিত হইয়াছে। আমরা নামহীন দর্শকমাত্র ছিলাম। রবীন্দ্রনাথের কাছেই বসিয়াছিলাম, কিন্তু তার বেশী নয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ হয় ইডেন হিন্দু হষ্টেলের এক উৎসবে। রবীন্দ্রনাথ উৎসবের সভাপতি। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র মান্য অতিথি। আরও বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি উপস্থিত। আমি ডেইসে রবীন্দ্রনাথের কাছে দণ্ডায়মান। বর্ত্তমান উৎসব সম্পর্কে তাঁর কি করণীয় এসব তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া

লইলেন। উৎসবের অন্যতম অনুষ্ঠান পুরস্কার-বিতরণ। গান, খেলাধূলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতা হইত হষ্টেলে। সবচেয়ে কৃতী অধিবাসীদের পুরস্কার দেওয়া হইত। এবার রবীন্দ্রনাথ পুরস্কার বিতরণ করিলেন। ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে পালোয়ান বলিয়া গোপালদা-কে পুরস্কার দেওয়া হইল। বক্তৃতা দিতে উঠিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, 'সবচেয়ে শক্তিশালী পুরস্কার নিয়ে গেল, আর সবচেয়ে যে দুর্ব্বল, সে আপনাদের কাছে বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছে।' বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের শরীর তখন ভালো ছিল না। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ইডেন হিন্দু হষ্টেলের ছেলেদের প্রতি স্নেহবশতঃই তিনি এই উৎসবে উপস্থিত হইতে রাজি হন। সভার কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই শরৎচন্দ্রকে সভাপতির আসনে বসাইয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্র অত ভালো লিখিলে কি হয়, ভালো বলিতে পারিতেন না। ছেলেদের আগ্রহাতিশয্যে তিনি উঠিয়া দুই-এক কথা বলিলেন। বার বার থামিয়া যাইতেছেন। এর পর কি বলিবেন, যেন খুঁজিয়া পাইতেছেন না। অবশেষে তিনি বক্তৃতার নিম্নলিখিত উপসংহার টানিয়া আনিলেন: 'এখন অন্য কথা থাক। এবার মণ্টু একটা গান করুক।'

মণ্টু অর্থাৎ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীদিলীপকুমার রায়। তিনিও সে সভার আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর নানা দেশের আমন্ত্রণে প্রায়ই বাহিরে যাইতেন। শুধু ইউরোপ ও আমেরিকা নয়, চীন জাপান ইন্দোনেসিয়ায় তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে ভ্রমণ করিয়াছেন। একবার তাঁহার বিদেশ যাওয়া উপলক্ষ্যে একটি সস্তাশ্রেণীর বাংলা দৈনিক টিপ্পনী কাটিয়া লিখিল: "ঘরে কি গো নাই নবনী!" খুব রাগিয়া গেলাম। ইহার একটা উপযুক্ত জবাব দিবার জন্য মন উসখুস করিতে লাগিল। সম্পাদকের কাছে প্রতিবাদ পত্র লিখিব কি? আর কি উপায়ে প্রতিবাদ জানান যায়? সে সময় শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কাগজের পরবর্ত্তী সংখ্যার জন্য ছাত্রদের কাছ হইতে রচনা আহ্বান করিয়া তিনি স্কুল নোটিশ বোর্ডে নোটিশ টানাইয়াছেন। ইহাই আমার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সুযোগ! রাত জাগিয়া এক প্রবন্ধ খাড়া করিলাম। রবীন্দ্রনাথের বিদেশভ্রমণ যে ভারতকে বিদেশে সুপরিচিত করিতেছে, ভারতের সংস্কৃতি প্রচারে সহায়তা করিতেছে এবং দেশে দেশে ভারতের বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে তাহা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলাম। যাহারা এই সফরের বৃহত্তর তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম মাত্র তারাই উক্ত সংবাদপত্রটির মত খেলো টিপ্পনী করিতে পারে; ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য, আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রীর জন্য রবীন্দ্রনাথের বিদেশযাত্রা বিশেষ সমর্থনীয়—এই সব কথা বিশেষ আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটসুলভ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সেই প্রবন্ধে লেখা হইল। সম্পাদকের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া তবে শান্তি। ভাবিলাম, গুরুদক্ষিণা দেওয়া হইল।

অল্প কয়দিন পরেই প্রবন্ধটি ধন্যবাদের সঙ্গে ফেরৎ আসিল। সাহিত্যসেবায় ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রত্যাখ্যান। মনে বড় ব্যথা লাগিল। ব্যথা আরও স্থায়ী হইত যদি না কবীর-মহাশয় নিজেও শীঘ্রই সমালোচনার সম্মুখীন হইতেন। কলেজেরই এক সাহিত্য-সভায় ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় সভাপতি ছিলেন। প্রবন্ধ পাঠক শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর। শ্রীযুক্ত কবীর অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর চরিত্রমাধুর্য্যে তিনি কি অধ্যাপক, কি ছাত্র সকলেরই প্রিয় ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় কলেজের রাজনীতিতে তাঁর বিপক্ষতা করিয়াছি, কিন্তু কখনই তাঁর মধ্যে হৃদ্যতা ও সৌজন্যের অভাব দেখি নাই। স্টেট্‌স্ স্কলারশিপ লইয়া তিনি অক্সফোর্ডে যান ও সেখানে "মডার্ণ গ্রেটস্"-এ ফার্ষ্ট ক্লাস পান। আমাদের সেই সাহিত্যসভায় রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কোনও কাব্যরচনা আলোচ্য বিষয় ছিল। শ্রীযুক্ত কবীর মেধাবী ছাত্রের উপযুক্ত এক প্রবন্ধ লিখিয়া সে-সব কবিতার অন্তর্নিহিত দার্শনিক তাৎপর্য্য সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার পর সভাপতি দাসগুপ্ত মহাশয় উঠিয়া কহিলেন, 'হুমায়ুন, রবীন্দ্রনাথ কি দাড়ি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন?'

দাশগুপ্ত মহাশয় নিজেও একদিন পরিহাসের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন তিনি। য়ুরোপ ও আমেরিকায় তিনি আমন্ত্রিত হন] এবং তাঁর ভারতীয় দর্শনের বই আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিলাভ করে। ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের সমপর্য্যায়ের খ্যাতি ছিল তাঁর। আগেই লিখিয়াছি, আমাদের রবীন্দ্র-পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের তিনি বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাঁর কন্যা শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে মংপুতে রবীন্দ্রনাথ কয়েকবার থাকিয়াছেন। সেই অবস্থানের বহুমূল্য স্মৃতি মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর "মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" নামক বইয়ে ধরিয়া রাখিয়াছেন। মৈত্রেয়ী দেবীও পিতার সঙ্গে প্রায়ই রবীন্দ্র-পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে আসিতেন। সন্ধ্যাবেলায় অধিবেশন বসিত পরিষদের। টেবিলের উপর সর্ব্বদাই রজনীগন্ধার গুচ্ছ

থাকিত বড় বড় ফুলদানিতে। ধূপের ধোঁয়া উঠিয়া একটা প্রাচ্য আবহাওয়ার সৃষ্টি করিত। উপসংহারের বক্তৃতাটি সর্ব্বদাই দাসগুপ্ত মহাশয় দিতেন। সংস্কৃত কাব্য হইতে, দর্শন হইতে কত যে উদ্ধৃতির উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতেন, তার ইয়ত্তা নাই। এমন পাণ্ডিত্য সচরাচর দেখা যায় না।

শব্দের অলঙ্কারের মোহে কখনও কখনও তিনি একটু বেশী বলিতেন। আবার কৌতুক সৃষ্টির জন্যও সালঙ্কার শব্দের আমদানী করিতেন। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-পরিষদের এক সভায় উপস্থিত হইয়া সাহিত্যের স্বরূপ সম্পর্কিত একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তা আগেই বলিয়াছি। এই সভায় রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি একাধিক বার রসিকতা করিয়া কবিকে "কবিরাজ" বলিয়া উল্লেখ করেন, অর্থাৎ কবি-শ্রেষ্ঠ! বক্তৃতা দিতে উঠিয়া রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'দাসগুপ্ত মশায় আমাকে বার বার কবিরাজ বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি বৈদ্যবংশসম্ভূত। এ সম্বোধন তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক!'

সমস্ত অডিটোরিয়ম হাসিতে ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম। কিন্তু গম্ভীরমুখে রবীন্দ্রনাথ বলিয়া চলিলেন। এই সূক্ষ্ম রসিকতা তাঁর বৈশিষ্ট্য!

ইহার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎকার হয় বেশ কয়েক বৎসর পরে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে সর্ব্বভাবেই প্রভাবান্বিত হইয়াছি; তাঁর সাহিত্য ভাষাজ্ঞান দিয়াছে, চিন্তা করিবার, কল্পনা করিবার পথ সুগম করিয়াছে। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয় প্রায়ই বলিতেন, 'লোক দেখিলেই বুঝা যায়, এ লোকটা রবীন্দ্রনাথ পড়েছে আর এ লোকটা পড়ে নাই।' বস্তুতঃ রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠ করিয়া মনের পরিধি যতটা বাড়িয়াছে ততটা আর কিছুতে বাড়ে নাই। তাঁর নিকটে যাইবার সুযোগ না হইলে কি হয়, সাহিত্য রচনার প্রথম পাঠ এবং শেষ পাঠ তাঁর কাছ হইতে লইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ এ সময় প্রধানতঃ 'প্রবাসী' ও 'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকাদুটিতে লিখিতেন। তাঁর সঙ্গে একই সংখ্যায় ঐ কাগজদুটিতে আমিও লিখিয়াছি—'বিচিত্রা'য় ত বহুবার একই সংখ্যায় লেখা বাহির হইয়াছে। এটা আমার একটা গর্ব্বের বিষয়। বর্ত্তমান কালের নবীন লেখকেরা এ বিষয়ে নিশ্চয়ই আমাদের ঈর্ষ্যা করিবেন। ইহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য্যের কথা অবশ্য তখন ভাবি নাই, ভাবটা ছিল: "আমরা দু'জন একটি গাঁয়ে থাকি, সেই আমাদের একটিমাত্র সুখ।" মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে হয়ত লেখকের নামটা এবং রচনা রবীন্দ্রনাথের নজরে পড়িয়া থাকিবে।

'প্রবাসী'তে একবার 'মামার মোটর' নামক আমার একটি হাসির গল্প বাহির হয়। তার পর হইতে সকৌতুক গল্প লেখার জন্য ছোটখাট একটা প্রসিদ্ধি জন্মাইল। 'বিচিত্রা'য়ও হাসির গল্প অনেকগুলি লিখি। একবার যখন 'বিচিত্রা'-সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় পরবর্ত্তী সংখ্যার জন্য হাসির গল্পের জন্য অনুরোধ জানাইলেন তখন প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, 'আমি সিরিয়স গল্প লিখতে চাই, আপনারা আমাকে হাসির গল্পের লেখক তৈরি করছেন!' এ অভিযোগ আগেও ক'বার করিয়াছি। এবার তিনি কহিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে এই আপত্তির কথা তুলেছিলাম; তিনি বললেন, 'ওকে বলো কান্না আংশিক সত্য, হাসি পূর্ণ সত্য।' রীতিমত পুলকিত বোধ করিলাম। আমার লেখা লইয়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা হইয়াছে এবং তিনি আমার আপত্তির জবাব দিয়াছেন! কতটা আলোচনা করিয়াছেন এবং উপরোক্ত মন্তব্য করার জন্য আমার লেখাপড়া মোটেই দরকার হয় কি না তাহা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিলাম না। লেখক হিসাবে আমার নামটা লক্ষ্য করিয়াছেন ইহাই যথেষ্ট সম্মানজনক মনে হইল। 'বিচিত্রা'য় আরও একটি হাসির গল্প প্রকাশিত হইল!

পূজায় দার্জ্জিলিঙে আমাদের পরিবারের সবাই চেঞ্জে গিয়াছিলাম। বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে দু'দিনের জন্য কলিকাতায় আসিতে হয়। প্রয়োজন শেষ হইবার পর আবার দার্জ্জিলিং ফিরিতেছি। আমার এক আত্মীয় আমাকে ট্রেনে তুলিয়া দিতে শিয়ালদ ষ্টেশনে আসিয়াছেন। তখন পাকিস্তান হয় নাই। দার্জ্জিলিং মেল সারা ব্রিজ পার হইয়া পার্ব্বতীপুর হইয়া সরাসরি শিলিগুড়ি যাইত। এক রাতের রাস্তা মাত্র দার্জ্জিলিং। আমার আত্মীয়টি কিছুক্ষণের জন্য অন্তর্দ্ধান করিয়া দু'টি ইলিশ মাছ হাতে করিয়া হাজির হইলেন। বলিলেন, 'শিয়ালদ বাজার থেকে কিনে আনলাম। ওদের জন্য নিয়ে যা। এখানে অঢেল পাওয়া যাচ্ছে। ওখানে ওরা হয়ত মোটেই পায় না।' আপনার জনের জন্য এঁর স্নেহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্বীকার করিলাম, কিন্তু পিছনে পিছনে এক জোড়া ইলিশ মাছ ঝুলাইয়া কেতাদুরস্তশহর দার্জ্জিলিঙে হাজির হইয়া কেতাদুরস্ত ভিজিটরদের নাসিকায় অবজ্ঞার কুঞ্চন তুলিতেছি ভাবিয়া ভীত ও বিব্রত বোধ করিলাম। কিন্তু তিনি পয়সা খরচ করিয়া

মাছ আনিয়া হাজির করিয়াছেন, না লইয়া উপায় কি? গাড়ীর বেঞ্চের তলায় তাহা লুক্কায়িত রাখিয়া নিজের ফ্যাশান অব্যাহত রাখিলাম ও গাড়ীর জানালা দিয়া প্ল্যাটফর্মে নতুন নতুন দার্জ্জিলিং যাত্রীকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম :

আরে! এ কে? বড় বড় করিয়া চোখ মেলিয়া চাহিলাম। দেখিলাম, আলখাল্লা-পরা এক প্রশান্তমূর্ত্তি ধীরে ধীরে সামনের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। এ মূর্ত্তিকে ভুল করিবার উপায় নাই। হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যে এ মূর্ত্তি চোখে পড়িবে! এ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ!

উভয়েই দার্জ্জিলিং চলিয়াছি। এত বড় চাঞ্চল্যকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? কিন্তু ইলিশ মাছ দু'টির কি করি! রবীন্দ্রনাথ এ কামরার আরোহী নন। সকালে শিলিগুড়িতে নামিয়া তিনি যদি আমাকে দেখেনও তবু চিনিতে পারিবেন না। দু'তিন বার গায়ে পড়িয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিয়াছি বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার মনে থাকিবার কথা নয়। আমি জনতার একজন মাত্র। কিন্তু তবু পরবর্ত্তী প্রভাতের কথা ভাবিয়া অস্বস্তিতে সারা হইলাম।

সকালবেলা শিলিগুড়ি ষ্টেশনে মুটে আমার অন্যান্য মালের সঙ্গে ইলিশদ্বয়কেও প্ল্যাটফর্মে নামাইয়া আনিল। রাতে বড় গরম গিয়াছে। মাছ দুইটি পচিয়া যায় নাই ত! কেমন যেন লাল লাল দেখাইতেছে। কুলির মতামত জিজ্ঞাসা করিলাম। বলা বাহুল্য, সে আমার ধারণার সমর্থন করিল। পচা মাছ লইয়া গিয়া লাভ কি? কেহ ত আর খাইতে পারিবে না! বিবেক মুক্ত হইল। কুলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে মাছ দু'টি উপহার হিসাবে গ্রহণ করিতে রাজি আছে কি না? সে সহজেই রাজি হইল। ছুটিয়া গিয়া কোনও বন্ধুর জিম্মা করিয়া আসিল। আমি ইলিশবিমুক্ত হইয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হইলাম।

রবীন্দ্রনাথ অন্য কোনও গেট দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁর সঙ্গে আর দেখা হইল না। কিন্তু ইলিশ বিসর্জ্জনের জন্য কোনও অনুতাপ বোধ হইল না। বরঞ্চ প্যারোডী-লেখক আমার মনোভাবকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিতে পারিতেন :

তবু রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সম্মুখপথে
ইলিশ মৎস্য না ফেলিয়া দিয়া রহিব বল কি মতে ;

পাহাড়ীপথে চড়িতে চড়িতে রাজার দুলালের সঙ্গে দেখা হইল। বস্তুতঃ, পৃথিবীর কোথাও কোনও রাজার দুলাল ভগবদ্দত্ত এত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন কি না সন্দেহ। প্রবন্ধ, ধর্ম্মালোচনা, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, সঙ্গীত, চিত্রকলা, সংগঠন যাহাতেই তিনি হাত দিয়াছেন, তাঁর প্রতিভায় তাহাই বিশেষ হইয়া উঠিয়াছে। পরশমণি দিল তাঁর হাতে।

আমি ষ্টেশন-ওয়াগনের যাত্রী। রবীন্দ্রনাথের মোটর বার বার আমাদের অতিক্রম করিয়া সমুখে আগাইয়া গেল, আবার আমরাও তাঁকে, অর্থাৎ তাঁর মোটরগাড়ীকে বার বার হারাইয়া ছাড়িলাম। শাল ও পাইনশোভিত ফলে আবৃত বঙ্কিম শৈলপথে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বহুক্ষণ লুকোচুরি খেলা ও ছুটের পাল্লা চলিল। একবার তিনি অনেকটা আগাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কার্শিয়ঙে পৌঁছিয়া তাঁকে ধরিয়া ফেলিলাম।

তখন দার্জ্জিলিং কার্ট রোডে একদিকে মাত্র ট্রাফিক চলিতে দেওয়া হইত। কিছুটা পর্য্যন্ত উপরের ট্রাফিক নিচে নামিতে দেওয়া হইত, কিছুটা পর্য্যন্ত নিচের ট্রাফিককে উপরে চড়িতে দেওয়া হইত। তার পর এক জায়গায় উভয় দিকের মোটরগাড়ী ইত্যাদি পৌঁছিলে আবার নির্দ্দিষ্ট দূরত্ব পর্য্যন্ত তাহাদের নামিতে বা উঠিতে দেওয়া হইত। এই নিয়ন্ত্রণের ফলে রবীন্দ্রনাথের গাড়ীকে কার্শিয়ঙ ষ্টেশনের কাছাকাছি কার্ট রোডের উপর লাইন-ক্লীয়ারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া পড়িতে হইয়াছিল।

সুযোগ বুঝিয়া আমি আমার বাহন হইতে নামিয়া পড়িলাম এবং চকিতে কবির রুদ্ধগতি বাহনের কাছে হাজির হইয়া তাঁর পায়ের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলাম। কবি গাড়ীতে একাই ছিলেন। চোখ মেলিয়া তাকাইলেন। আমি সবিনয়ে নিজ নাম বলিলাম এবং বলিলাম, কিছুদিন আগে তাঁর ঠিকানায় আমার সদ্য-প্রকাশিত সর্ব্বপ্রথম বইটি ডাকযোগে পাঠাইয়াছি। তাঁর মুখে প্রসন্ন স্বীকৃতির একটা আভাস ফুটিয়া উঠিল। সস্নেহ কণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমারই নাম সুবোধ?'

ভারি গর্ব্বিত বোধ করিলাম। যত হোক, আমার এখন একটা পরিচয় আছে!

'এখানেই থাক?'

'আজ্ঞে না, দার্জ্জিলিং যাচ্ছি আপনার পেছনের গাড়ীতে।'

'আমি কিছুদিন থাকব দার্জ্জিলিঙে। যেও একদিন। গ্লেন ইডেন।'

আমার সাগ্রহ ঘাড় নাড়াতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র ছিল না যে, এই আমন্ত্রণে ধন্য হইয়াছি। এই সময় দার্জ্জিলিঙ হিমালয়ান রেলওয়ের ডি. টি. এস-র আপিস হইতে প্রায় এক ডজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ভারতীয় কর্ম্মচারী এই পথে আসিতেছিলেন। কবির গাড়ীর

দিকে নজর পড়ামাত্র প্রত্যেকে মাথা হইতে টুপি তুলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন জানাইলেন।

বলা বাহুল্য, দার্জ্জিলিঙের অবশিষ্ট পথ সেদিন আমার কাছে আরও মনোরম হইয়া উঠিয়াছিল।

মাত্র দু'তিন দিন তাঁকে পথশ্রম অপনোদনের সময় দিলাম। তার আগেই "গ্লেন ইডেন" খুঁজিয়া বাহির করিয়া রাখিয়াছি যাতে নিৰ্দ্দিষ্ট দিনে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে সামান্যমাত্র দেরী না হয়।

মাউন্ট এভারেষ্ট হোটেল হইতে অনতিদূরে ম্যাকিন্টস রোড (বর্ত্তমান আচার্য্য জগদীশচন্দ্র রোড) ও অকল্যাণ্ড রোডের (বর্ত্তমান গান্ধী রোড) মাঝামাঝি জায়গায় একই সীমানার মধ্যে গ্লেন ইডেন নম্বর ওয়ান ও গ্লেন ইডেন নম্বর টু—এই দুটো বাংলো বাড়ী অবস্থিত ছিল। কয়েক বছর আগে দার্জ্জিলিঙে গিয়া এ বাড়ী দুটি আর খুঁজিয়া পাই নাই, অথচ এবারে আচার্য্য জগদীশ রোডের "রথা-মে" নামক যে বাড়ীটিতে ছিলাম, গ্লেন ইডেন ঠিক তার নীচে থাকিবার কথা। কাছাকাছি ঐ ধরনের আর দুটি বাংলো ছিল যারা একই নামের বাড়ীর এক নম্বর ও দুই নম্বর। কিন্তু সে বাড়ীর নাম গ্লেন ইডেন নয়। আমার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, রবীন্দ্রনাথ যে বাড়ীতে ছিলেন তার নাম "গ্লেন ইডেন নম্বর ওয়ান।" হয় সে বাড়ী দার্জ্জিলিঙে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে বা অন্য কোনও কারণে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে অথবা আমার স্মৃতি আমাকে লইয়া বড় রকম একটা পরিহাস করিতেছে। নাম শুনাইয়া দিয়াছি। কিন্তু সে যাই হউক, একদিন সকাল ৮৷৯টার সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভয়ে ভয়ে সেই বাড়ীর সিঁড়ির কাছে হাজির হইলাম। সামনের বারান্দায় মধ্যবয়স্ক এক নেপালী বেয়ারা বসিয়াছিল, আমাকে দেখিয়া কাছে আগাইয়া আসিল।

'কবি আছেন?'

'বড়া সাব্?'

একটু যেন ধাক্কা লাগিল। দার্জ্জিলিঙে সবাই সাহেব। কবিও কি 'বড়া সাহেব' হইয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিলাম, নেপালী বেয়ারার কাছে কবির পরিচয় বড় নয়, মনিব পরিচয়ই বড়। সুতরাং রাগ করা চলে না।

অমিয় চক্রবর্ত্তী মহাশয় তখন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি উপস্থিত হইলেন এবং আমার আগমনের উদ্দেশ্য শুনিয়া ভিতরে নিয়া বসাইলেন। কহিলেন, কয়েক মিনিট দেরি হইবে, রবীন্দ্রনাথ স্নানে গেছেন। ভিতর হইতে বার বার জোরে গলা সাফ করিবার আওয়াজ আসিল। অনুসন্ধান করিলাম, ইহা রবীন্দ্রনাথের। শূন্য ঘরে একা বসিয়া বেশ একটু নার্ভাস বোধ করিলাম। অর্ব্বাচীন আমি আসিয়াছি জগৎ-বিখ্যাত মনীষীর সঙ্গে দেখা করিতে। কি বলিব তাঁকে? কি আমার বলিবার আছে? স্বভাবতই আমি কুনো। অপরিচিতের কাছে যাইতে সর্ব্বদাই দ্বিধা করি। বিখ্যাত লোকের কাছ হইতে শত হস্ত দূরে থাকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আমার কাছে দুর্ব্বার আকর্ষণ। মনোজগতে যিনি এত পরিচিত, সুযোগ পাইলে তাঁর কাছে আগাইয়া না আসিয়া থাকিতে পারি নাই। মনে হইয়াছে, একান্ত আপনার লোক। দূরে থাকার জন্যই পরিচয় নাই। এই দূরত্ব দূর করিতে হইবে।

মিনিট পাঁচ-সাত পরেই কবি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। প্রণাম সারিয়া দাঁড়াইবার পর তিনি আমার মুখের দিকে চাহিলেন। কহিলেন, 'এসেছ। বসো।'

তিনি লেখার টেবিলে নিজের চেয়ারে বসিবার পর আমিও টেবিলের বিপরীত দিকের চেয়ারে বসিলাম।

কতক্ষণ সাধারণ আলাপের পর তিনি কহিলেন, 'তোমার বই পড়েছি।'

চুপ করিয়া পরবর্ত্তী মন্তব্যের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

'সেন্টিমেন্ট একটু বেশী আছে।'

রবীন্দ্রনাথ আমার কাঁচা হাতের প্রথম লেখার প্রশংসা করিবেন এমন আশা লইয়া আসি নাই, তবু দমিয়া গেলাম।

'নতুন লেখকের পক্ষে এ কিছু অস্বাভাবিক নয়।' তিনি হয়ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া সহানুভূতি বোধ করিয়া কহিলেন। 'তবে মনে রাখতে হবে, সাহিত্যে সংযমের বিশেষ প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিকদের সায়ান্স পড়া উচিত মনে করি। সায়ান্সের বই লেখার জন্য নয়, একটা সায়ান্টিফিক মনোভাব তৈরীর জন্য। আমি নিজে হাক্সলির বায়োলজির সবগুলো ভলুম পড়েছি।' এই প্রসঙ্গে তিনি আরও কতগুলি বইয়ের নাম করিয়াছিলেন, কিন্তু তাদের নাম আমার মনে নাই। কোনও একটি বই অরিজিন্যালে পড়িতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়া জানাইয়াছিলেন, 'ফ্রেঞ্চ আমি ভাল জানি নে।'

'নিজে যা দেখেছ, জেনেছ, যা সম্বন্ধে তোমার

অভিজ্ঞতা আছে শুধু তাই লিখবে। তবে তা সত্য এবং স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 'গল্প-গুচ্ছে'র গল্পগুলি লিখে আমি খুব তৃপ্ত বোধ করেছি। ওর সবই আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে। তাই অত সহজে তা বেরিয়ে এসেছিল…'

গুরু-শিষ্য সংবাদের কথা পড়িয়াছি। জগতের সাহিত্য-গুরু অপরিচিত শিষ্যের জন্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবেন, এমন অভিজ্ঞার সৌভাগ্য আশাও করিতে পারি নাই।

তাঁর মুখের দিকে বিনীত সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে লাগিলাম।

গায়ে গরম আলখাল্লা। রেশমের মত সাদা দাড়ি। টুপির বন্ধনহীন শাদা চুল। দুধের মত শাদা গায়ের রং। চওড়া কপাল। দীর্ঘ চোখ গভীরতায় পূর্ণ। সৌম্য দেবমূর্ত্তি! বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের কাছে যাইয়া যত উন্নীত বোধ করিয়াছি অন্য কোনও বিখ্যাতের কাছে গিয়া তেমন বোধ করি নাই। সে ব্যক্তিত্বের তুলনা নাই।

'নতুন কিছু লিখছ?'

'সামান্যই।'

'নতুন জিনিস তোমরাই লিখবে। আমাদের যা দেবার তা তো আমরা দিয়ে ফেলেছি।'

সপ্রতিবাদে তাঁর দিকে চোখ তুলিলাম। কহিলাম, 'এ বয়সে যিনি 'শেষের কবিতা' লিখতে পারেন, নতুনত্ব সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় কে তাঁর সঙ্গে পারবে? এখনও তিনি অনেক কিছু নতুন সৃষ্টি করতে পারবেন…'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল। কবির বড় বড় দুটি চোখ আরও বড় হইয়া উঠিল। এই দীর্ঘ চোখের উপর খুশির যেন স্রোত বহিয়া গেল। গভীর সমুদ্রের উপর দিয়া যেন হিল্লোলিত জ্যোৎস্না গড়াইয়া গেল। সেই দৃশ্য জীবনে ভুলিতে পারিব না। খুশির সেই রূপ চোখ বুজিলে এখনও দেখিতে পারি।

'জীবনস্মৃতি'তে পড়িয়াছি, এক বি-এ পাস কবির বইয়ের বিরূপ সমালোচনা করিয়াছেন শুনিয়া কবি ভয়ে তটস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক অর্ব্বাচীনের প্রশংসা শুনিয়া বিশ্ববরেণ্য কবি যে এতটা খুশি হইতে পারেন, তাহাও উহার চেয়ে কম আশ্চর্য্য ঘটনা নয়।

এর পর আরও কতক্ষণ নানা বিষয়ে আলাপ হয়। নেতৃত্বলাভের জন্য বাংলা দেশে তখন যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তিনি তাহাতে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন।

সকালবেলা কবির লেখার সময়। সামনের টেবিলে কাগজ। তার উপর বড় সাইজের একটা ফাউণ্টেন পেন অপেক্ষা করিতেছে। তাঁর প্রায় আধঘণ্টা সময় নষ্ট করিয়াছি। নিজেকে অপরাধী বোধ হইতেছে। উঠিবার জন্য উসখুস করিতেছি। অথচ তাঁর অনুমতি ছাড়া উঠি কি করিয়া? কবি এই অস্বস্তি লক্ষ্য করিলেন। কহিলেন, 'আচ্ছা, আরেক দিন এসো।'

একুশ বছরের এক তরুণের সঙ্গে তিনি যে এত সব বিষয় আলোচনা করিবেন, ভাবিতেও পারি নাই। অনেক সহানুভূতি থাকিলে তবেই ইহা সম্ভব হয়। বড় বলিয়া অহঙ্কারে নিজেকে তিনি কখনও দূরে রাখেন নাই।

যখন ম্যাকিণ্টশ্ রোডে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আনন্দে ও গর্ব্বে ডগমগ করিতেছি। মনে হইল, দার্জ্জিলিং শহরের সর্ব্বোচ্চ স্তর জলাপাহাড়ে চড়িয়া সারা দার্জ্জিলিঙের কাছে ঘোষণা করি, 'আমি এইমাত্র স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বনামে দেখা করিয়া আসিয়াছি, তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছেন, আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, ছোক্‌রা বলিয়া তাচ্ছিল্য করেন নাই, এমন কি আরেক দিন যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত করিয়াছেন!'

সে নহি

শ্রীচাণক্য সেন

দুই

গাড়ী স্টার্ট দিয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে দেববাণী ঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা কুড়ি। অনেকগুলো কাজ সারাদিনের জন্য লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, একে একে তাদের দাবী মেটাতে হবে। সাবিত্রী আম্মার সঙ্গে কথাবার্তায় মনটা খুশী হয়েছে। কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা তার একমাত্র কারণ নয়; প্রথম সাক্ষাতকারেই এই বর্ষীয়সী মহিলার প্রতি দেববাণীর মন আকৃষ্ট হয়েছিল। এঁর সুনাম শুনেই অবশ্য সে গিয়েছিল সাহায্যের প্রয়োজনে; দ্বারস্থ হয়ে কেবল যে শূন্য হাতে ফেরে নি তাই নয়, কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করেছে। সাবিত্রী আম্মার জীবনের কোনও বিশেষ কিছুই তার জানা নেই; তবু মনে হয়েছে, কোথাও ঐ ভাঁজ-পড়া মসৃণ উজ্জ্বল ত্বকে লুক্কায়িত কোনও স্তরে, তার নিজের জীবনের সঙ্গে কিছু একটা মিল রয়েছে। তিনি প্রথম আলাপে দেববাণীকে আপনার ক'রে নিয়েছেন। হঠাৎ বেঁকে-আসা এক সাইকেল-আরোহীর সামনে গাড়ীকে ব্রেক চেপে দাঁড় করাতে গিয়ে দেববাণীর মনে হ'ল, যেমন তার প্রায়ই মনে হয়, জীবন কী বিচিত্র, কী রহস্যময়। একদিন, এই ত যেন সেদিন, দ্বারে দ্বারে আমার জন্যে কিসের ভাণ্ডার সাজান ছিল? লাঞ্ছনা, অপমান, গ্লানির। জীবনে মার খেয়ে কোনও দিকেই যেন আলোর সন্ধান ছিল না, পদে পদে পুঞ্জীভূত অন্ধকার। আজ যেন সব দুয়ার খুলে গেছে, জীবন আমায় স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এ স্বীকারে পরিতৃপ্তি আছে, খানিকটা মাদকতাও; কিন্তু ব্যথায়-ভরা, দুঃখের স্মৃতিতে জড়ান এ স্বীকার। পরাজয় সহজে মানে নি নিষ্ঠুর পৃথিবী, অনেক দাম দিয়ে তাকে জয় করতে হয়েছে। তবু কি সত্যিই আমি জিতেছি? তবু কি মাঝে মাঝে মনে হয় না বড় বেশি দাম দিতে হ'ল, আর যা মিলল, যেটুকু সার্থকতা, পূর্ণতা, পরিতৃপ্তি, তার সঙ্গে র'য়ে গেল অনেকখানি ব্যর্থতা, শূন্য, অতৃপ্ত তৃষ্ণা! পূর্ণিমার চাঁদও কি তার জ্যোৎস্না দিয়ে কলঙ্ক ঢাকতে পারে?

বৃষ্টি এখন আর নেই। বরং মেঘ ফিকে হয়ে এসেছে। চাপা, লাজুক রোদ উঠেছে। জোর কন্‌কনে হিমেল হাওয়া বইছে, ডান হাতের দরজা দিয়ে সে হাওয়ার স্পর্শ লেগে শীতের পোশাকে আবৃত শরীর বার বার কেঁপে উঠছে। দেববাণীর মনে তখনও সাবিত্রী আম্মার স্পর্শ। প্রথম দিনের সাক্ষাতকারে সাবিত্রী আম্মা যেসব প্রশ্ন করেছিলেন তার জবাব দিতে তার একটুও বিব্রত লাগে নি। বরং বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর সুস্থ অনুসন্ধিৎসা ভালই লেগেছিল। আরও ভাল লেগেছিল গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন প্রস্তাবে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ। আমি ছিলাম একেবারে অপরিচিত; আমার মত অনেকেই নিশ্চয় নিয়ত সাবিত্রী আম্মার সাহায্যপ্রার্থী। তথাপি তিনি নির্ভেজাল উৎসাহের সঙ্গে প্রস্তাবটি গ্রহণ করে-ছিলেন: দু'ঘণ্টা ধ'রে নানা রকম প্রশ্নে তাঁর যা জানবার সব জেনে নিয়েছিলেন। বিদেশে আমি কি কি কাজ করেছি জানতে তাঁর আগ্রহের সীমা ছিল না। আমার প্ল্যানটা মনোমত হয়েছিল বলেই, কাজের এত চাপ সত্ত্বেও, নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতায় তা নিয়ে তদ্বির করেছেন, কাজ সাফল্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে রেখেছেন। আজ অসুস্থতা নিয়েও আমায় সযত্নে কাছে ডেকেছেন; কথাবার্তায় বার বার আমার প্রতি দরদ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তবু সাবিত্রী আম্মা স্ত্রীলোক: নারীর জীবন সম্বন্ধে নারীর কৌতূহল তিনি এড়াতে পারেন নি। বেশি কিছু জানতে চান নি, কিন্তু সামান্য ক'টি প্রশ্নে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি জানেন, আমি স্বাভাবিক সাধারণ নই। অবাক্ লাগছে, কি ক'রে তিনি আমাকে চিনলেন, কি ক'রে তাঁর দৃষ্টি আমার বর্তমান ভেদ ক'রে অতীতে পৌঁছল, যে অতীত অর্থহীন হয়েও মিথ্যে নয়, সারা জীবন ঘষেও যা নিশ্চিহ্ন হবে না। হঠাৎ মনে পড়ল দেববাণীর, হিমাদ্রি একদিন বলেছিল, "তুমি যতদিন অতীতকে ভয় করবে, ততদিন সে তোমার পেছনে লেগে থাকবে।" ভয়? হিমাদ্রি আজও, এতদিনেও, জানে না কি গভীর অন্ধকার অরণ্যের মত সে ভয়। হিমাদ্রি পুরুষ তাই সে জানে না। দেববাণী নারী, তাই সে জানে। তাই তার মুক্তি নেই।

গাড়ী মথুরা রোড ধ'রে নিজামুদ্দিনের দিকে ছুটেছে।

আপিসের সময় হয়ে এল। যানবাহনের ভিড় বেড়েছে, আর দেখা দিয়েছে সেই অসংখ্য সাইকেলের দপ্তর-গামী মিছিল, ভারতবর্ষের রাজধানীর যা বোধ করি সবচেয়ে বড় পরিচয়। এত সাইকেল দেববাণী আগে কোথাও দেখে নি, না কলকাতায়, না বিদেশের কোনও শহরে। সাইকেল সম্বন্ধে তার একটা অর্থহীন ভয়, সেই মৃত্যুহীন অতীতের বিরাটতর ভয়ের একাংশ। অনেকদিন আগে বার বার একটা সাইকেল জীবন্ত সর্বনাশ বহন ক'রে শূন্য থেকে আচমকা ধূমকেতুর মত দেববাণীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বার বার দেববাণীর পায়ে-চলা জীবনের ছন্দপতন ঘটিয়েছে। আজ সে অতীত অনেক দূরে, বহু বহু দূরে। তবু সে মিথ্যে হয়ে যায় নি। হায় ভগবান্, সে আছে।

সে আছে। এই দুটো শব্দ উচ্চারিত হতেই দেববাণীর শরীর কেঁপে উঠল। শীতে নয়। সেই পুরাতন ভয়ে। দু'মাস হ'ল সে ভারতবর্ষে ফিরেছে দীর্ঘ দশ বছর বিদেশে কাটিয়ে। মাত্র আট দিন কলকাতায় কাটিয়ে বাকী সময়টা সে দিল্লীতেই রয়েছে। ভারতবর্ষের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে এ দুটো শব্দ বার বার তার মনে মেঘ-গর্জনের মত নিনাদিত হয়েছে। নিজের অজ্ঞাতে বার বার তার ভয়ার্ত চকিত চক্ষু রাস্তার অচেনা-অজানা মানুষের ভিড়ে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে, বুঝি বা আবার একটা সাইকেল এসে হঠাৎ তার গতিরোধ করল, বুঝি বা পৃথিবী কাঁপিয়ে ঘোষণা করল: আমি আছি।

একটু ন'ড়ে চ'ড়ে বসল দেববাণী নরম আসনে। বিরাট আমেরিকান গাড়ী, পাখীর পালকের মত নরম আসন, চলে নিঃশব্দ গতিতে, রাস্তায় ভেসে। বিদেশে বড় গাড়ী চালিয়ে আরাম, কিন্তু দিল্লীর রাস্তায় বড় অসুবিধে, বার বার গতিবেগ কমাতে হয়, রাস্তা ছেড়ে দিতে হয় সাইকেলকে, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ীকে। মুহূর্ত আগের অহেতুক ভয়ের কথা ভেবে দেববাণী নিজেকে সাহস দিল, বোঝাল; এই শহরে দশ বছর পরে, এই বিরাট চলমান গাড়ীতে সে সম্পূর্ণ নিরাপদ্।

নিজামুদ্দিনে একটা বড় বাংলো বাড়ীর ফটকে দেববাণী গাড়ী নিয়ে ঢুকল। এখানে তার সাময়িক বাসস্থান। এক মার্কিন ভদ্রলোকের গৃহে দেববাণী স-খরচায় অতিথি। মার্কিন ভদ্রলোক, ডাক্তার এডোয়ার্ড পোস্ট দিল্লীতে নতুন স্থাপিত আমেরিকান মিশন হাস-পাতালে স্পেশালিস্ট ডাক্তার। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে দেববাণী যখন গবেষণা করত, তখন এই পোস্ট পরিবারের সঙ্গে তার আলাপ হয়; আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। যে কয়জন বিদেশী দেববাণীর গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনে আন্তরিক উৎসাহী, এডোয়ার্ড পোস্ট তাদের একজন। বয়স তাঁর পঞ্চাশ উত্তীর্ণ, দেখে বরং একটু বেশিই মনে হয়। ছ'ফুট চার ইঞ্চি লম্বা দেহে মাংসের অভাব, তাই সামান্য বাঁকানো। গাল গর্তে, চোখ কোটরগত; প্রকাণ্ড বঁড়শির মতো নাকের নীচে চাপা পাতলা ওষ্ঠাধর। মাথায় চুল প্রায় নেই বললেই চলে। বলা বাহুল্য, এডোয়ার্ড পোস্ট সুদর্শন নয়। কিন্তু এমন অসামান্য ব্যক্তিত্ব দেববাণী খুব বেশি দেখে নি। কথা কম বলে, সে অনুপাতে বরং হাসে একটু বেশি; হাসে একেবারে বালকের মত। কাজে তার অখণ্ড একাগ্রতা। কোন অসুবিধা তাকে দমায় না; বরং উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। নিজের কাজ ক'রেও পরের কাজে সাহায্যে তার আলস্য নেই।

এডোয়ার্ড পোস্টের স্ত্রী আইরীণ দেববাণীর বন্ধু। স্বামীর পাশে ছোট দেখালেও দেববাণীর চেয়ে সে বেশ খানিকটা লম্বা। একটু মোটা; তা নিয়ে ক্ষোভের শেষ নেই। তিনটি সন্তানের সে জননী; দুটি ছেলে, দেশে স্কুলে পড়ছে; একটি মেয়ে, বছর সাতেক বয়স, তাকে ওরা সঙ্গে এনেছে ভারতবর্ষে। কাজের তাগিদে স্বামীকে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে হয়। আইরীণ প্রথম প্রথম সঙ্গে যেত, এখন যাবার উৎসাহ নেই। এত বড় বাড়ীতে তাকে একা থাকতে হয়। তাই দেববাণী যখন আইরীণকে লেখে সে দিল্লী আসছে গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়ে, ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই অতিথি হবার সাদর নিমন্ত্রণ জানায়। দেববাণীরও বেশ চিন্তা ছিল, ভারতবর্ষ ছাড়ার আগে দিল্লী সে আসে নি, শহরটা তার অপরিচিত। মার্কিন বন্ধু দম্পতির আমন্ত্রণ খুশী হয়ে সে গ্রহণ করেছিল। এডোয়ার্ড পোস্ট তার কাজে সাধ্যের অতিরিক্ত সাহায্য করছে, দুতিনজন বিদেশীর সঙ্গে পরিচয় ক'রে দিয়েছে, যাদের কাছেও দেববাণী সাহায্য পাচ্ছে। পোস্টদের গাড়ী সে ব্যবহার করছে। বাড়ীর দোতলায় তাকে ওরা দু'খানা ঘর দিয়েছে, একখানা শোবার, অন্যখানা কাজকর্মের। এমন কি একটা আলাদা টেলিফোনের ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে চেয়েছিল, দেববাণী রাজী হয় নি। আহার ও বাসস্থানের জন্য টাকা অবশ্যই সে দিচ্ছে, কিন্তু যে আরামে যত্নে আছে তার তুলনায় কম।

গাড়ী থেকে নেমে দেববাণী দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে আইরীণের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

"বাণী!"

"বল।" নেমে এল দেববাণী।

"তোমার ছুটো চিঠি আর একটা তার এসেছে।"

"কেব্‌ল্?"

"না। ইন্‌ল্যাণ্ড।"

"দেখি।"

চিঠি ছু'খানাই বিদেশ থেকে। একখানা হিমাদ্রির। অন্যখানা দেবযানীর। কিন্তু তার? চিঠি ছুটো সরিয়ে রেখে সে তারটা আগে খুলল। আইরীণ তাকিয়ে আছে। তার প'ড়ে দেববাণীর মুখ হাসিতে ভ'রে গেল। আইরীণের দিকে তাকিয়ে বলল:

"কালই আসছেন।"

"কে?"

"মা।"

"তাই নাকি? কালই! খুব ভালো!"

হাসতে হাসতে দেববাণী গম্ভীর হ'ল। বলল, আইরীণ, এখনও সময় আছে, ভেবে দেখ।"

"আবার তোমার মাথায় ভুত চাপল!"

"সত্যি বলছি, এখনও অন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব।"

"তোমার পক্ষে সব সম্ভব তা জানি। কিন্তু ওকথা আবার কেন? যা ঠিক হয়ে আছে তা নিয়ে এই শেষ-মুহূর্তে কেন অস্থির হচ্ছ? তার চেয়ে বল, আজ সকালে কি কাজ হ'ল।"

"কাজ অনেকটা এগিয়েছে। সাবিত্রী আম্মা মন্ত্রীকে দিয়ে কিছুটা কাজ করিয়েছেন। বললেন, মাস-খানেকের মধ্যে জমিটা পেয়ে যাব।"

"খুব ভাল। এবার বাড়ীর প্ল্যানটা পাশ কর, আর ভাল একটা কন্‌ট্রাকটর দেখ।"

"তা করব। এড্ কবে আসছে জান? পরশু?"

"হুঁ।"

"এ সপ্তাহেই ছুটো কাজ ক'রে রাখতে হবে।"

"সাবিত্রী আম্মা আর কি বললেন?"

"গাল গল্প হ'ল। ঠাণ্ডা লেগে ওঁর একটু জ্বর ছ। তা সত্ত্বেও অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন।"

"তোমার সেই চিরন্তন চার্ম।"

"তাই বটে। বয়স্কাদের ওপর প্রতিক্রিয়া তার শী। মিসেস ডোনাটের কথা মনে নেই?"

"নেই আবার!" ছু'জনেই হেসে উঠল।

"হেসো না।" দেববাণী বলল, "বুড়ী বিগলিত না আজকের কাজে হাত দিতুম কি ক'রে?"

"তা বটে।" আইরীণ হাসতে হাসতে বলল।

মণিবন্ধে ঘড়ির দিকে নজর নিক্ষেপ ক'রে দেববাণী বলল, "গল্প করার সময় কি আমার আছে, হে ঈশ্বর? সারাদিন আজ ঘুরে বেড়াতে হবে।"

"শোফার এসে যাবে আধ-ঘণ্টার মধ্যে। আমিও এক্ষুণি বেরুব। ফোর্ডটা আমি নিচ্ছি। তুমি শোফারকে নিয়ে বেরিয়ো।"

"চারটে নাগাদ ফিরে মার জন্য ঘর গুছিয়ে রাখতে হবে। তুমি কি তার আগেই ফিরবে?"

"নিশ্চয়। তোমাকে আমার সঙ্গে চায়ের নিমন্ত্রণ করছি।"

ছু'জনে হেসে উঠল।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যেতে যেতে দেববাণী বুঝল, মনে এখনও সংশয় জমে আছে। মা আসছেন কালই। মা'র কথা মনে হতেই অপূর্ব অনুভূতিতে দেববাণীর অন্তর ভ'রে যায়। আনন্দ, ভয়, ভালবাসা, ভক্তি ও ব্যথা, সব এর সঙ্গে একতারে বেজে ওঠে। মা যে আসবেন তা ঠিকই ছিল; দেববাণী নিজেও চায় মা আসুন। কিন্তু এই বিদেশী গৃহে তিনি আতিথ্য নেন, সে চায় নি। মা-কে নিয়ে আলাদা ফ্ল্যাটে থাকবে ঠিক করেছিল; কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাট দেখেও রেখেছিল। কিন্তু আইরীণ ও এডোয়ার্ডের ভীষণ ইচ্ছে মা এখানেই থাকুন। অন্তত কিছুদিন। তাঁর অসুবিধা হলে অন্য ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে, করা যাবেও। দেববাণী সহজে রাজী হয় নি। মা'র কোনও তুলনা হয় না, কিন্তু তবু তিনি বয়স্থা, নিজস্ব জীবন-রীতিতে অভ্যস্ত। সকালে পূজো করেন। নিজের হাতে রান্না ক'রে খান। এ বিদেশী পরিবেশে হয়ত তিনি সংকুচিত হবেন। কিংবা হয়ত এই মার্কিন-দম্পতি তাঁর আচার-বিচার নিয়ে হাসবে, কৌতুক করবে। দেববাণী তা সইতে পারবে না। অথচ মা-কে দেখবার, মা'র সঙ্গে পরিচিত হবার, আগ্রহ যেমন এদের তীক্ষ্ণ, এদের জানবার আকাঙ্ক্ষা তেমনি তাঁর অসামান্য। তা ছাড়া এ বাড়ীতে বাস করায় দেববাণীর অনেক সুবিধা। গাড়ী পাওয়া যায়। সারাদিন দেববাণীকে শহর চ'ষে বেড়াতে হয়। কোথায় সে য়ুনিভারসিটি, সেখানে আজই তার এক্‌স্‌টেনশন লেকচার সুরু। গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন নিয়ে ঘোরাঘুরি ত আছেই। টেলিফোন ছাড়াও ত দেববাণী পঙ্গু হয়ে পড়বে। এ সব দিক্ থেকে এক্ষুণি এ বাড়ী ত্যাগ করা তার পক্ষে বড় অসুবিধা। অথচ মা'র আরামের কাছে তার অসুবিধা তুচ্ছ। তাই সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল দেববাণী অন্য ফ্ল্যাট যেতে। কিন্তু আইরীণ এডোয়ার্ড পথরোধ

করে দাঁড়াল ; ওদিক্ থেকে মা এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

কাল মাকে আনতে স্টেশনে যেতে হবে।

ঘরে ঢুকে টেলিগ্রামটা দেববাণী লিখবার টেবিলে কাঁচ চাপা দিয়ে রাখল। তার ঘর দু'খানা বেশ বড়। চকচকে মোসেক-করা মেঝে, বড় বড় ফরাসী-জানালা দিয়ে প্রচুর আলো-বাতাস ঘরে আসে। কাজের ঘরে একটা সুন্দর সোফা সেট, দুটো আলমারী, বই-এর শেল্ফ, লিখবার টেবিল, বসবার চেয়ার, আরাম-কেদারা। আইরীণ মালীকে দিয়ে ফুলদানীতে সপ্তাহে দু'বার নতুন ফুল রাখায়। পাশেই শোবার ঘর। প্রশস্ত পালঙ্ক, ডানলোপিলোর আচ্ছাদনে নরম। মেঝেয় কার্পেট। এক পাশে ওয়ার্ড্রোব, অন্য দিকে চেস্ট অব ড্রয়ার্স। পালঙ্কের মাথার কাছে সুন্দর ছোট্ট টেবিলে রেডিও। অন্য পাশে আর একটা টেবিল, তাতে বই, কলম, ফুলদানী। শোবার ঘরের সঙ্গে স্নানের ঘর, বিদেশী কায়দায়। কল থেকে ঠাণ্ডা, গরম জল পাওয়া যায়। এক প্রান্তে, প্রশস্ত ঘরটার এক কোণ জুড়ে, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, লিনেন বক্স।

মনে মনে দেববাণী মা'র জন্যে কি ব্যবস্থা করা হবে ভেবে নিল। এ বড় পালঙ্কটা, আইরীণ বলেছে, সরিয়ে দুটো ছোট খাট পেতে দেবে। সুতরাং শোবার কোনও অসুবিধে হবে না। মার সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পারলে দেববাণী খুশী হ'ত। কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে বলতে লজ্জা হ'ল। মা'র এ বাড়ীতে থাকা নিয়ে আইরীণ-এডোয়ার্ডের সঙ্গে যখন অনেক আলোচনা হ'ত, তখনই আইরীণ ব'লে রেখেছিল, বাড়ীতে দুটো বাড়তি খাট রয়েছে, বড় পালঙ্কটা সরিয়ে পেতে দেওয়া হবে। বলেছিল একটু রঙ্গ-রস ক'রে, আইরীণের যা স্বভাব। এডোয়ার্ড যেমন গম্ভীর, আইরীণ তেমন প্রগল্ভা।

"ছোট খাটদুটো ওঘরে পাঠাতে হবে। বাণীর ত আবার একা শোবার অভ্যেস। অন্যের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে বোধকরি ও ভুলেই গেছে।"

দেববাণীর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

"সব ব্যাপারেই তোমার মুখ-খারাপ না করলে চলে না?"

"আহা, আহা, বেচারা লাল হয়ে গেল। সত্যি বল, বাণী—"

"তুমি মার খাবে।" বাণী উঠে পড়েছিল। "আমি চললুম।"

"না, না। আর বলব না। তাহলে এই ঠিক হ'ল। দুটো খাটের ব্যবস্থা করা হবে।"

অনেক দূরের বিস্মৃতি থেকে একটা দৃশ্য দেববাণীর চোখের ওপর ভেসে উঠল, বাথরুমে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে।

সেই গ্রাম, সেই নিরালা, নির্জীব, নিস্তব্ধ গ্রাম। যার নাম সে এত কষ্ট ক'রেও ভুলতে পারল না। সেই গ্রাম। আর সেই মাটির-মেঝে, টিনের-দেয়াল সেই ঘর। সেই ঘর আর সেই মানুষগুলি, আর সেই লোক। দেববাণী চোখ বুজল। আমি দেখব না, দেখব না, দেখব না। তবু তারা ছবির মত স্থির হয়ে দাঁড়াল দৃষ্টির অন্ধকারে। সেই ছোট্ট স্যাঁতসেতে ঘরে পুরানো কালের অসম্ভব ভারী পাথরের মত শক্ত চৌকি। মা'র পাশে সারারাত দেববাণী জেগে। মাও জেগে, সেও জেগে। কত কথা হ'ল, এত কথাও তখন জীবনে ছিল! শীর্ণ গরুতে টানা ছ্যাকড়া গাড়ী চ'ড়ে সারাদিন খুঁজে খুঁজে মা তাকে বার করেছিলেন সেই গণ্ডগ্রামের জীর্ণ গৃহে। রাত্রিতে দেববাণীই তাঁকে ফিরতে দেয় নি। মা'র দেহে ক্লান্তির পাহাড়। তবু নিদ্রাহীন তাঁর চোখ। শ্রান্তিহীন তাঁর মন। মা-কে জড়িয়ে ধ'রে কত কান্নাই দেববাণী কেঁদে-ছিল। সে কি দুঃখের কান্না? আজ আর মনে নেই।

"বাণী! বড় ভুল করলি!" বার বার একই কথা বলেছিলেন মা। "বড় ভুল করলি রে, বাণী।"

রাত্রি যখন ভোর হয়ে এল, দেববাণী শুধু বলেছিল : "মা, যদি সত্যিই ভুল ক'রে থাকি, ভুল যেদিন ভাঙবে, সেদিন ত বড় নিঃস্ব, বড় দুর্বল, বড় একা হয়ে যাব। সেদিন তোমাকে পাব ত?"

মা তক্ষুণি উত্তর দেন নি। বেশ খানিকক্ষণ ভাবনায় ডুবে ছিলেন। দেববাণী শুনতে পেল, তিনি অতি মৃদু স্বরে বিষ্ণু-স্তোত্র পাঠ করছেন। জানলার ফাঁক দিয়ে প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো দেখা দিল। মা উঠে বসলেন। ডান হাত বুলিয়ে দিলেন দেববাণীর মাথায়, মুখে, শরীরে। যেন তার হৃদয়ের মধ্যে মুখ রেখে বললেন, "বাণী, বড় ভুল করেছিস। এ ভুল তোর ভাঙবে। কিন্তু তুই ভেঙ্গে পড়িস্ নে। তোকে আমি নরম ক'রে তৈরী করি নি। সর্বদা মনে রাখিস, জীবনে পরাজয় যে মানে না, সে হারে না। একদিকে রাস্তা বন্ধ হলে, দশদিকে রাস্তা খোলে। আর মনে রাখিস, তোর মা আছে। এ কথাটা এক মুহূর্তের জন্যে ভুলিস নে! অন্তত দুঃখের সময়, বিপদের দিনে কখনও ভুলিস নে।"

তোমায় আমি কোনওদিন ভুলি নি, মা। দেববাণী

গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে বলল। ভুলব কি ক'রে? তুমি ত মা শুধু নও, তুমি যে জননী! তুমি হিমালয়ের মত কঠিন, সমুদ্রের মত অতল, শরতের আকাশের মত উদার, বর্ষার মেঘের মত স্নেহসিক্ত। আমি আজ যে বেঁচে আছি, মানুষের মত বেঁচে আছি, সে গৌরব তোমার। জাহাজে চ'ড়ে সমুদ্র পাড়ি দিতে বার বার তীরহীন সীমাহীন সুনীল জলধির পানে তাকিয়ে তোমাকে মনে পড়েছে। তোমার কথা মনে হয়েছে প্রত্যেক সাফল্যে, প্রত্যেক ব্যর্থতায়। আজ আমার যতটুকু গৌরব, সব তোমার।

আজও আমার যেটুকু লজ্জা, যা কিছু ভয়, তোমার জন্যে।

দুটো খাট থাকবে শোবার ঘরে, বুঝলে মা, কিন্তু শোব আমি তোমার সঙ্গে, তোমার পেটের মধ্যে গুটিসুটি মেরে। এই বসবার ঘরটায় বাকী সব আসবাব সাজিয়ে নেব। বাথরুমে তোমার কোনও অসুবিধে হবে না, কিন্তু 'কমোড' তুমি ব্যবহার করবে কি ক'রে। হয়ত সহজেই পারবে, কি-ই বা তুমি না পার, না পেরেছ? তুমি ত আমাকে আগলে থাকবার জন্যে একবার আমেরিকা পর্য্যন্ত যেতে তৈরী হচ্ছিলে! তোমার পূজো? এই শোবার ঘরেই এক কোণে তোমায় সারতে হবে। তুমি যখন নিজের ইচ্ছেয় আইরীণের আতিথেয়তা স্বীকার করেছ, আমায় অন্য ফ্ল্যাট নিতে দাও নি, তখন এরই মধ্যে তোমায় মানিয়ে নিতে হবে, মা। যদি না পার, অন্য ব্যবস্থা করব।

স্নান সেরে দেববাণী আবার বেরুবার জন্যে তৈরী হল। চুল ভেজায় নি, শুধু মাথায় একটু জল দিয়েছে। ফিকে সবুজ রংএর মাদ্রাজী সিল্কের শাড়ী পরেছে, তার সঙ্গে পুরো হাতার কালো কার্ডিগান। ওয়ারড্রাব খুলে ওভারকোট তুলে নিয়েছে। উলের মোজা পরেছে পায়ে আর সামান্য উঁচু হিল জুতো। ব্যাগ হাতে বাইরে এসে দেববাণী দেখল, শোফার সুজন সিং উপস্থিত। ছোট ফিয়াট গাড়ীটা ঘসে-মেজে চকচকে করছে। এই ছিপ্‌ছিপে বলিষ্ঠ শিখ যুবকটিকে দেববাণীর বড় পছন্দ; কথা বলে কম, সর্বদা সেবা-পরায়ণ, সতর্ক, মুখে চোখে ধারাল ব্যক্তিত্বের ছাপ। মাথায় গোলাপী কাপড়ের পাগড়ি, গালে সবেমাত্র নতুন দাড়ি গজিয়েছে। দপ্তর থেকে পাওয়া কালো পশমী উর্দি পরিষ্কার, পরিপাটি। এমন কি জুতো পর্যন্ত নতুন পালিশে চকচকে। দেববাণীকে বাইরে দেখতে পেয়ে সুজন সিং হাত তুলে নমস্কার করল। বলল, "এখুনি বার হবেন, না একটু দেরী আছে।"

দেববাণী হাতের ঘড়ি দেখল। প্রশ্ন করল, "মেমসা'ব বেরিয়ে গেছেন?"

"জী হাঁ।"

"তোমার কি কোনও কাজ বাকী আছে?"

"না মাঈজি। পালিশ একটু বাকী আছে, পরে ক'রে নেব। আপনি আসুন।"

চটপট্ সে গাড়ীর দরজা খুলল। দেববাণী বসল ভেতরে। মিনিটের মধ্যে সুজন সিং গাড়ী স্টার্ট্ দিল।

দেববাণীর কিছু মনে পড়ল। বলল, "সুজন সিং, খানসামাকে একবার ডাক।"

গাড়ী বন্ধ ক'রে সুজন সিং খানসামাকে ডেকে আনল।

এ লোকটিও পঞ্জাবী, নাম লছমন সিং। একে দেববাণীর তেমন পছন্দ নয়। রান্না করে ভাল, বিলিতি রান্না জানে অনেক রকম। অবশ্যি আইরীণ রাঁধতে ভালবাসে, খেতেও, তাই বুঝি ওর দেহে সামান্য মেদাধিক্য। কিন্তু লোকটা যেন বড় বেশি চালাক, প্রায় ধূর্ত। দেববাণীর সন্দেহ নেই, সে আইরীণের সংসার থেকে বেশ দু'পয়সা গুছিয়ে নিচ্ছে। বিদেশী সংসারে দেশী এক মহিলার আবির্ভাব সে ভাল চোখে দেখে নি, প্রথমে দেববাণীকে খানিকটা অবহেলা করতে চেষ্টা করেছে। পারে নি, কেননা দেববাণী অবহেলার পাত্রী নয়, যে কোনও অবস্থাতেই তার ব্যক্তিত্ব সুপ্রকাশ। পারে নি, তাই দেববাণীর কাছ থেকে সে দূরে দূরে থাকে। সহজে সামনে আসতে চায় না, যদি এসে পড়ে চটপট্ পালাতে চায়। সুজন সিং দেববাণীকে প্রথম দিন মেমসা'ব বলেছিল, সেলাম করেছিল, যেমন আইরীণকে করে। ছেলেটিকে প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছিল, তাই দেববাণী বলেছিল 'মেমসা'ব', বা 'সেলাম' তার পছন্দ নয়, সে যেন তাকে 'মাঈজি' বলে, 'নমস্তে' করে। লছমনকে দেববাণীর ভাল লাগে নি। তার কাছে সে মেমসা'বই থেকে গেছে।

লছমন এসে বলল: "মেমসা'ব!"

"শোন। আমি লাঞ্চ্ খেতে আসব না, চায়ের আগে ফিরব। বিকেলে একটু কাজ আছে। তুমি, ইব্রাহিম আর মোহন, তোমরা তিনজন তৈরী থেক।"

গাড়ীতে ব'সে দেববাণী বলল, "আজ অনেক কাজ আছে, সুজন সিং। তোমাকেও দোকানে খেয়ে নিতে হবে। বাড়ী যেতে পাবে না।"

"তাতে কোনও বাৎ নেই মাঈজি।"

"প্রথমে চল সেক্রেটারিয়েট্।"

স্বদেশের রাজধানীতে সেক্রেটারিয়েট্ ব্যাপারটা দেববাণীকে খানিকটা অভিভূত করেছে। ছাত্রী জীবন কেটেছিল কলকাতায়। রাইটার্স বিল্ডিং-এর নাম শুনেছিল অনেক, কিন্তু সেই একবার ছাড়া, কোনদিন তার সংস্পর্শে আসতে হয় নি। কোম্পানী আমলের ওই লাল ইঁটের বাড়ীটাকে ভাল ক'রে দেখে নি পর্যন্ত কোনওদিন। শুধু একদিন, জীবনের এক চরম দুর্দিনে, একবার তাকে সেই লাল বাড়ীটার গহ্বরে ঢুকতে হয়েছিল। অন্ধকার পথ, অন্ধকার ঘর, আর মোটা একজন সহানুভূতিহীন মাঝবয়সী মানুষ ছাড়া কিছু এখন আর মনে নেই। শুধু মনে আছে সেই লোকটির কর্কশ কণ্ঠস্বর, আর, হ্যাঁ, আর ডান গালে বড় কাল আঁচিলে দুটি পাকা চুল।

কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিং না জেনে থাকা গেছে, কিন্তু দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট্ না জেনে, না মেনে, বাঁচবার উপায় নেই। এ শহরের প্রাণকেন্দ্র হ'ল 'বড়া দপ্তর', সে এত বড়, এত তার দাপট, তার কাছে মানুষের মূল্য তুচ্ছ। সে চলে নিজের অমোঘ নিয়মের দীর্ঘসূত্র বেতালে; আপন মাহাত্ম্যে মাতাল। দেববাণী ভেবেছিল, সেক্রেটারিয়েটের বড় সাহেবরা বুদ্ধিমান্, কর্মকুশল, দেশের কল্যাণ তাঁদের একমাত্র না হোক্, প্রধান কাম্য। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে, প্রয়োজনের তাগিদে, যাঁদের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়েছে তাঁরা অন্য জাতের মানুষ। তাঁরা নিজেদের দাম বড় বেশি বোঝেন, অন্যের দাম বড় কম। তাঁরা বাস্তব থেকে দূরে বাস করেন, পৃথিবীটাকে দেখেন নিজস্ব এক কৃত্রিম দৃষ্টিতে, তাই দেখেন বিকৃত ক'রে। তাঁরা দায়িত্ব এড়াতে চান, সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পান। বলেন বেশি, শোনেন খুব কম। সর্বদা বুঝিয়ে দেন, তাঁরা যা ভাবেন তাই ঠিক, যা করেন তা নির্ভুল। দেববাণীর রাগ হয়, মজাও লাগে। পশ্চিমে তার দশ বছর কেটেছে, কিন্তু ব্যুরোক্র্যাট্দের মাহাত্ম্য বোঝবার সুযোগ হয় নি। য়ুরোপ আমেরিকায় সিভিল সার্ভেন্টদের চেয়ার ছেড়ে দিতে সমাজ অভ্যস্ত নয়। ভারতবর্ষেই উপন্যাসের আদর্শ নায়ক আই. সি. এস.। ভারতবর্ষে রাজপুরুষের মর্যাদা আকাশ-উঁচু। পাশ্চাত্ত্যে সরকারী চাকুরেদের প্রতি বেসরকারী মানুষের বরং একটু প্রচ্ছন্ন অবহেলা। ওদেশের সিভিল সার্ভেন্ট সেবক। এদেশে তারা শাসক।

এই ক' সপ্তাহে বহুবার যে তিক্ত অভিজ্ঞতা দেববাণীকে পীড়া দিয়েছে, সেক্রেটারিয়েটের উত্তর ভবনে রিসেপ্শন আপিসে দাঁড়িয়ে আজ তারই পুনরাবৃত্তিতে সে রুষ্ট হ'ল। পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার পর রিসেপ্শনিস্ট্ তার দিকে তাকাল। দেববাণী বলল, মিঃ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা করতে চায়। প্রশ্ন হ'ল, অ্যাপয়েন্ট্মেন্ট্ আছে? দেববাণী বলল, আছে। রিসেপ-শনিস্ট বিরাট্ তালিকা থেকে শ্রীবাস্তবের টেলিফোন নম্বর বার করল। ডায়াল ক'রে যাকে পেল সে শ্রীবাস্তবের সেক্রেটারী। শুনতে পেল, শ্রীবাস্তব মিটিং-এ ব্যস্ত।

"মিটিং কখন শেষ হবে?"

"তা জানি নে।"

"তিনি আমাকে এ সময়ই আসতে বলেছিলেন।"

রিসেপশনিস্ট্ তখন অন্য সাক্ষাৎপ্রার্থীকে 'স্বাগত' করছে।

"আপনি মিঃ শ্রীবাস্তবের সেক্রেটারীকে জিজ্ঞেস করুন মিটিং কখন শেষ হবে, এবং আমি ওপরে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারি কিনা।"

একটু উষ্মার সঙ্গে কথাগুলি বলায় রিসেপশনিস্টের দৃষ্টি দেববাণী আবার আকর্ষণ করল। আরও একটু জোর দিয়ে এবার দেববাণী বলল, "আমার সময় অত্যন্ত মূল্যবান্, একেবারেই অপচয়ের নয়।"

ঘর-ভরা লোক এবার দেববাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে। দেববাণী বুঝল, সে রেগে গেছে। নিজেকে সে সামলে নিল।

"আপনি অনুমতি করলে আমি একটু বসতে পারি। আগন্তুকদের বসতে বলার নিয়ম বোধ হয় এখানে নেই।" এবার একটু হেসে কথাগুলি বলল দেববাণী।

"বসুন, বসুন", টাক-মাথা ভদ্রলোক ব্যস্ত হলেন।

"ধন্যবাদ। আপনি টেলিফোন করলে বড় বাধিত হব।"

"টেলিফোনের দরকার নেই। আপনি ওপরে চ'লে যান। আমি স্লিপ তৈরী ক'রে দিচ্ছি।"

শ্রীবাস্তবের সেক্রেটারী দেববাণীকে বসতে দিল। মিনিট দশেকের মধ্যেই তিনি এসে যাবেন। দেববাণী ব'সে ব'সে এলোমেলো অনেক কিছু ভেবে নিল। ট্রেন লেট আসে কিনা, স্টেশনে টেলিফোন ক'রে কাল সকালে জেনে নিতে হবে। সুজন সিং-কে আসতে বলব, না নিজেই যাব গাড়ী নিয়ে? শ্রীবাস্তব যদি বলে আরও মাসখানেক দেরী হবে তাহলে কি মাদ্রাজের কাজটা সেরে আসব? হিমাদ্রির চিঠি এসেছে দু'দিন হ'ল, আজ তাকে লিখতে হবে। হিমাদ্রির লেখা কয়েকটা কথা

মনে বেজে উঠল। "তুমি ভারতবর্ষে, আমি ভিয়েনায়, এও যেমন সত্য, তেমনই সত্য যে আমরা দু'জনে একই পৃথিবীতে, একই সৌর-জগতে। দূরত্ব ও নিকটত্বের কোনও মাপ নেই, রাণী। দুটো মানুষ পাশাপাশি শুয়ে থেকেও অনেক, অনেক দূর; আবার নর্থ পোলে দাঁড়িয়ে সাউথ পোলের বন্ধুকে মনে হ'তে পারে বড় কাছে।..." হিমাদ্রি বৈজ্ঞানিক হ'লে কি হবে, ওর মন শিউলি ফুলের ইসারায় যত সহজে সাড়া দেয়, গ্র্যাভিটেশনেও তত নয়। হিমাদ্রি বলে, "পদার্থবিদ্যা নিয়ে মাথা ঘামালে কি হবে, মানুষটা আমি অপদার্থই রয়ে গেলাম।"

দেববাণীর মন থেকে তিক্ততাটুকু বুঝি কেটে গিয়েছিল; কৌতুকস্নিগ্ধ একটি হাসি ওর সুগঠিত চিবুকে খেলা করছিল। ললিতপ্রসাদ শ্রীবাস্তব মিটিং শেষ ক'রে নিজের কামরায় ফিরবার সময় দেখলেন, বেশ খুশী মনেই দেববাণী অপেক্ষা করছে। তাই আরও দশ মিনিট পরে তাঁর কামরায় দেববাণীর ডাক পড়ল।

ললিতপ্রসাদ শ্রীবাস্তব ফাইলে চোখ রেখেই বললেন, "বড় দুঃখিত। আপনাকে অপেক্ষা করতে হ'ল।"

দেববাণী কণ্ঠে সামান্য শ্লেষ এনে, মুখে হাসি রেখে, বলল, "আধ ঘণ্টা। এখনও যদি আধখানা মন দিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে আজ না হয় থাক।"

"না, না। পুরো মন দিয়েই কথা বলছি।" শ্রীবাস্তব সোনা-বাঁধান দাঁত বার ক'রে হাসলেন। দেববাণী দেখতে পেল, হাসলে তাঁর চোখ প্রায় পুরোপুরি বুজে যায়। "আমাদের জীবন ত আপনারা জানেন না! আমরা মনুষ্যসমাজের একেবারে বাইরে।"

"অতি-মানুষের সমাজে।"

"অতি কিম্বা নেতি জানি নে।" চোখ বুজে শ্রীবাস্তব পুনরায় হাসলেন। "তবে মানুষ যে আর নই, তা বেশ বুঝতে পারি। এখন বলুন, কি আপনার জন্য করতে পারি।"

"এমন ভাবে কথা বলছেন যেন আমি এই প্রথম আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।"

"তাই নাকি?" চোখ বুজে আবার হাসলেন শ্রীবাস্তব। "অভ্যেস, বুঝলেন ডাঃ রায়, অভ্যেস। বাড়ীতে গিন্নী কাছে এসে দাঁড়ালেও ব'লে ফেলি, হোয়াট্ ক্যান্ আই ডু ফর ইউ?"

"আমার প্ল্যানটার কি হ'ল? বলেছিলেন আজ খবর নিতে, তাই এসেছি।"

"ও, হ্যাঁ, আপনার রিসার্চ সেণ্টার? দেখুন, ডাঃ রায়, প্ল্যানটা ত ভালই মনে হচ্ছে, কিন্তু ওটা প'ড়ে কতগুলি ডিফেক্ট্ যেন দেখতে পেলাম।"

"ডিফেক্ট্? কি ধরণের?"

"আমি একটা নোট দিয়েছি ওগুলো দেখিয়ে; মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে এখনও ফেরত আসে নি। অন্তত এসেছে ব'লে আমি জানি নে।"

"অর্থাৎ, ব্যাপারটা যাতে আরও জটিল হয়ে যায়, আরও দেরী হয় তার ব্যবস্থা আপনি ক'রে রেখেছেন।"

"কি করব, বলুন। আমাদের সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে হয়। দেশের স্বার্থ, পাব্লিকের অর্থ যেখানে জড়িত, সেখানে চট্ ক'রে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নয়।"

"কি ধরণের ডিফেক্ট্ আপনার চোখে পড়ল?"

"তা ত আপনাকে বলা যাবে না, ডাঃ রায়। ওটা হ'ল সরকারী ব্যাপার। আমাদের অনেক কিছু ভেবে দেখতে হবে। ধরুন, ভেবে দেখতে হবে, এমন একটা রিসার্চ সেণ্টার, যার প্রয়োজনীয়তা আমরা সবাই স্বীকার করি, কোনও ব্যক্তিবিশেষের কর্তৃত্বে না হয়ে সরকারী কতৃত্বেই হওয়া উচিত কিনা। প্রাইভেট ম্যানেজমেণ্ট থাকলেও সরকার যদি জমি ও অর্থ সাহায্য দেন, তাহলে কতখানি নজর তার ওপরে রাখা দরকার হবে। তা ছাড়া আরও কথা আছে, যা আপনাকে বলা যায় না।"

শুনতে শুনতে দেববাণীর গা জ্ব'লে গেল। শ্রীবাস্তব থামলে সে শান্ত কঠিন স্বরে বলল, "দেখুন মিঃ শ্রীবাস্তব, আপনি যদি ভেবে থাকেন এ রিসার্চ সেণ্টার স্থাপন করার পেছনে আমার কোনও দুষ্ট স্বার্থ আছে, বড় ভুল করছেন। আমি একটি ভারতীয় নারী, নিজের চেষ্টায় বিদেশীদের সাহায্যে, য়ুরোপে ও আমেরিকায় কিছু কাজ করেছি। ভারত সরকার আমায় কোনও সাহায্য করেন নি। কষ্ট ক'রে কিছু অর্থ আমি সঞ্চয় করেছি। তার সঙ্গে আমার বিদেশী সুহৃদ্‌রা বেশ কিছু অর্থ যোগ করতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের প্রসার নিয়ে আপনারা অনেক কথা ব'লে থাকেন। আমরা কত পেছনে প'ড়ে আছি, এগোবার আমাদের কি ভীষণ দরকার, আপনিও জানেন, আমিও। দিল্লীর সর্বত্র প্রচুর খোলা জমি। আমি কয়েক একর জমি ও সামান্য অর্থ আপনাদের কাছ থেকে চাইছি। সেণ্টারের পরিচালনার ভার আমি একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টির হাতে দেবার প্রস্তাব করেছি, তাতে আপনাদের মনোনীত সদস্যও থাকবেন। যদি আপনারা রিসার্চ সেণ্টার না চান, আমাকে পরিষ্কার ব'লে দিন। আমার দুঃখ হবে, কিন্তু স্বার্থহানি হবে না। যদি কারুর হয়, হবে দেশের, কিন্তু এই ত আপনি এক্ষুণি বললেন,

দেশের কল্যাণ আপনারা বেশি বোঝেন, আমরা হয়ত একেবারে বুঝি নে।"

শ্রীবাস্তব যেমন ভাল বক্তা তেমন ভাল শ্রোতা নন, কিন্তু দেববাণীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ উপস্থিতি, তার শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠস্বর, তার ঐকান্তিকতা, এত দীর্ঘ কথাগুলিও তাঁকে চুপ ক'রে শুনতে বাধ্য করল। দেববাণী থামতেই তিনি বললেন, "আপনার উদ্দেশ্য বা আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের সন্দেহ নেই। আমাদেরও ত বিষয়টা বিচার ক'রে দেখতে হবে! যে-সব বিদেশী আপনাকে অর্থ সাহায্য করছেন, তাঁদের কোনও অন্য উদ্দেশ্য আছে কি না ভেবে দেখার মত। আপনি বলেছেন, এক মার্কিন মহিলা আপনাকে দু' লক্ষ ডলার দিতে রাজী আছেন।"

"আমাকে নয়। রিসার্চ সেণ্টারকে।"

"একই কথা। যদি সেণ্টারটা আমি স্থাপন করি তিনি নিশ্চয় এক পয়সা দেবেন না।"

"একটা ভাল কাজে দান করতে রাজী হয়ে তিনি অপরাধী?"

"নিশ্চয় নয়। কথাটা আমি এমনিই তুললাম। এসব বিদেশী সাহায্য-প্রস্তাবগুলি আমাদের ভেবে দেখতে হবে।"

দেববাণী প্রায় হতাশ হ'ল। "ভেবে দেখতে কত সময় নেবেন আপনারা?"

"তা সময় ত একটু লাগবেই। এসব কাজ তাড়াতাড়ি হয় না।"

"কিন্তু আমার হাতে সময় যে বড় কম। আমি দু' মাসের বেশি থাকতে পারব না, যদি আপনারা রিসার্চ সেণ্টার খোলবার অনুমতি না দেন।"

"এর মধ্যেই আমাদের সিদ্ধান্ত আপনি জানতে পারবেন আশা করছি।"

"একটু দয়া করবেন।" দেববাণী উঠল। "আমি দু' মাসের ছুটিতে দেশে এসেছি। দিল্লী ও মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আমার কয়েকটা এক্‌স্‌টেন্‌শন লেক্‌চার আছে কিন্তু আসল কাজ আমার এই সেণ্টার স্থাপনের ব্যবস্থা করা। যদি আপনারা অনুমোদন করেন, হয়ত থেকে যাব বছর দু'এক। তা নইলে চ'লে যাব।"

শ্রীবাস্তবও চেয়ার ছেড়ে একটু উঠি-উঠি করলেন।

এমন সময় টেলিফোন বাজল।

দেববাণী পা বাড়াতে গিয়ে শ্রীবাস্তবের মুখে নিজের নাম শুনে দাঁড়িয়ে গেল। বুঝতে পারল শ্রীবাস্তব উর্দ্ধতন কোনও অফিসারের সঙ্গে তারই বিষয়ে কথা বলছেন:

"আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর; ডাঃ রায় আমার ঘরেই আছেন।...ফাইলটা ত আপনাকে গত সপ্তাহে পাঠিয়ে দিয়েছি...না, স্যর, এমন কোনও ডিফেক্ট নেই যা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে...হ্যাঁ, স্যর, আপনি খুব ঠিক কথা বলছেন...না, স্যর, এ ধরণের কোনও রিসার্চ সেণ্টার আমাদের নেই...হ্যাঁ, স্যর, মেয়েদের পক্ষে খুব সুবিধে হবে...নিশ্চয়, স্যর, অবশ্য..."

টেলিফোন নামিয়ে রেখে শ্রীবাস্তব দেখতে পেলেন দেববাণী চেয়ার জুড়ে ব'সে আছে। মুখে তার সহাস্য কৌতুক।

"আমার সম্বন্ধেই কথাটা হচ্ছিল যেন, মিঃ শ্রীবাস্তব।"

"তা ত শুনতেই পেলেন। আপনি আগামী সপ্তাহে সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করবেন। মঙ্গলবার ফোনে এ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট্‌ করবেন। এর পরে যা বলবার তিনিই আপনাকে জানাবেন।"

"নমস্তে। আপনার সাহায্যের জন্য আমি সত্যি কৃতজ্ঞ।"

দেববাণী এবার উঠে দরজার দিকে এগোল। শ্রীবাস্তব উঠবার চেষ্টা না ক'রে ফাইলে ঝুঁকে রইলেন।

লিফটের জন্যে অপেক্ষা করল না দেববাণী। লঘুপদে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। কাজ এগোচ্ছে। সে বুঝল, সাবিত্রী আম্মা কাজ এগিয়ে দিচ্ছেন। হিমাদ্রিকে আশা-জনক কিছু লিখবার মত তাহলে পাওয়া গেল। রিসার্চ সেণ্টারের স্বপ্ন আসলে তার নয়, হিমাদ্রির। হিমাদ্রির উৎসাহ দেববাণীকে টেনেছে। আমেরিকা ছেড়ে যাবার আগের দিন হিমাদ্রি বার বার এরই কথা বলেছে। "বাণী, তুমি নিজে বড় হয়েছ, এবার দেশের দিকে তাকাও। সুযোগ পেলে অনেক মেয়ে তোমার মতো হতে পারবে।"

"আমার মত হওয়াটাকে কোনও মেয়ের পক্ষে সৌভাগ্য মনে কর তুমি?" বিষণ্ণ সুরে জবাব দিয়েছিল দেববাণী।

বোস্টন শহরে একটা ছোটখাট রেস্তোঁরায় দু'জনে কফি পান করছিল। গম্ভীর হয়ে হিমাদ্রি বলেছিল, "সৌভাগ্য ব্যাপারটা কি, আজও বুঝলাম না, বাণী। ধন নয়, মান নয়, শুধু সুখের বাসা? শুধু ভালবাসা?"

"তাই বা নয় কেন?"

"এই দেখ, তুমিও জানো না। তোমার ভাগ্য তোমাকে যেখানে টেনে এনেছে তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারলে অনেক মেয়ে ধন্য হবে।"

"তাতে এটুকু বোঝা গেল যে মেয়েদের সম্বন্ধে তুমি কিচ্ছু জান না।"

"আমি তোমাকে জানি।"

"আমাকেও তুমি জান না, হিমাদ্রি। আর জান না ব'লেই তুমি কাল ভিয়েনা চ'লে যাচ্ছ।"

"তা নয়।" কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে হিমাদ্রি বলেছিল। "তা নয়, বাণী। তোমাকে জানি ব'লেই আমি যাচ্ছি। তোমরা ভাব, ভাবতে ভালবাস, আমরা তোমাদের জানিনে। কিন্তু আমরা যে তোমাদের জানি তা তোমরা জান না। তোমাকে আজ ষোল-সতর বছর দেখে আসছি, একা দীর্ঘকালের চেষ্টায় তোমাকে আমি জানি। জানি কোথায় তোমার দ্বিধা, কোথায় দ্বন্দ্ব; কোথায় তোমার শক্তি, কোথায় দুর্বলতা। অনেক বড় হয়েও কেন তুমি মাথা নীচু ক'রে থাক। সব আমি জানি। তোমার কথা, যা অনেক কিছু তুমিও জান না, তাও আমি জানি।"

কেমন ক'রে তুমি আমায় এমন ভাবে জানলে, হিমাদ্রি? সিঁড়ি শেষ ক'রে দেববাণী বাইরে এল। আমি নিজেই যে নিজেকে জানি নে! বুঝি নে কেন মন হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে, কেন সে পালাতে চায়। এই ত এক্ষুণি সে আবার পালাতে চাইছে। বলছে, কি হবে এ সব রিসার্চ সেণ্টারে, চল, চ'লে যাই অন্য কোথাও। চল লণ্ডনে যাই। দেবকুমার, দেবু, আছে ওখানে; দেবযানী আছে। চল ভিয়েনা যাই, হিমাদ্রি আছে। চল বোস্টনে, তোমার কত কাজ বাকি রয়েছে। দেশে আসবার জন্যে অস্থির হয়েছিলাম, এসে ভালই লাগছে, কিন্তু হঠাৎ যেন কিছুই ভাল লাগে না, মনে হয় চ'লে যাই, একদিন, অনেকদিন আগে, যেমন চ'লে গিয়েছিলাম। কিন্তু তেমন যাওয়া জীবনে আর হবে না। সে ছিল মুক্তির ডানায় ভর দিয়ে অনন্ত অজানা আকাশে উড়ে যাওয়া, সত্যিকারের পালান,পাখী যেমন পালায় বন্ধ ঘরের দরজা হঠাৎ খোলা পেয়ে, নদী যেমন পালায় সমুদ্রে।

বাইরে দাঁড়িয়ে গাড়ী খুঁজছিল দেববাণী। হঠাৎ দেখতে পেল, সুজন সিং গাড়ী নিয়ে তার সামনে। দরজা খুলে দিল। ভেতরে ব'সে দেববাণী বলল, "য়ুনিভারসিটি যেতে পারবে?"

"জী হাঁ।" গাড়ী চলল।

নতুন দিল্লীর প্রশস্ত রাজপথ পেরিয়ে, পুরাতন দিল্লীর জনাকীর্ণ রাস্তা ছাড়িয়ে, অনেক দূরে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়। শহরের একেবারে বাইরে নতুন উপশহর। নির্জন, নিঃশব্দ ছায়াশীতল পরিবেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বক্তৃতা দিতে হবে ভেবে দেববাণীর রক্ত কিঞ্চিৎ চঞ্চল হ'ল। বিদেশে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পড়িয়েছে, কিন্তু ভারতবর্ষে, নিজের দেশে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রণ এই তার প্রথম। ধাবমান গাড়ীতে ব'সে দেববাণী নিজের জীবনের সুদীর্ঘ ছবি দেখতে পেল। সেই আমি কি এই আমি? এই ত সেদিন, সব কিছু অন্য রকম ছিল, এই ত সেদিন! হাতিবাগানে সরু নোংরা গলির পুরাণো দোতলা ফ্ল্যাটে দু'খানা ঘরে ছোট্ট সংসার: মা, আমি, দেবযানী। সেখানে যাদের ভিড়, তারা কেবল ভবিষ্যতের রং-বেরং স্বপ্ন। সে স্বপ্ন-জগতে আকবর বাদশা আর হরিপদ কেরাণীর ছিল না কোনও তফাৎ। তার পর এল ঝড়। কোথা থেকে কি ক'রে এল আজও জানি নে। সব তচনচ হয়ে গেল। ভেঙ্গে গেল আমাদের অনেক আশা-দিয়ে-ঘেরা বাসা, আমি ছিটকে পড়লাম অন্ধকার গহ্বরে। যেদিন মূর্চ্ছা ভাঙ্গল, কি ক'রে সেদিনও বেঁচে ছিলাম? মা নিয়ে এলেন অর্ধচেতন আমাকে। তার পর শুরু হ'ল নতুন ক'রে বাঁচবার লড়াই। কি ভীষণ সে সংগ্রাম! একটি নির্যাতিতা বাঙ্গালী মেয়েকে জীবনের রাজপথে দাঁড়াতে দিতে এত মানুষের এত আপত্তি যে কেন দানা বেঁধে উঠল, আমি কোনও দিন বুঝতে পারি নি। তাকে রাস্তায় মুখ থুবড়ে প'ড়ে থাকতে দেখে তারা সবাই কি সুখী হ'ত? সে সংগ্রামেও আমি জিতলাম। না, আমি নয়, মা জিতলেন। তার পর? তার পর এক অঘন ঘটল। আমার আশে-পাশে, ঘোরতর দুর্দিনে, একজোড়া সতর্ক স্নেহশীল চোখ যে এতদিন বিচরণ ক'রে এসেছে তা কি আমি জানতাম? কোথা থেকে কোন্ যাদুতে কলেজে চাকরি পেলাম, রিসার্চের সুযোগ পেলাম। তখন কোথায় আমার সময়? সকাল না হতে যে পরিশ্রম শুরু হ'ত মধ্যরাত্রি পেরিয়ে তার শেষ। একজোড়া বন্ধু চোখ একদিনও আমি দেখতে পেলাম না। যেদিন ডক্টরেট পেলাম, মা, তুমি আনন্দে কাঁদলে, দেবযানীর খুশির শেষ নেই, আর আমার কি গভীর, অতল শ্রান্তি, কি নিষ্প্রাণ নির্বোধ ঘুম! এর পরে একদিন হঠাৎ পৃথিবী আমায় ডাকল। আটাশ বছর বয়সে যে মেয়ে বাংলা ছেড়ে একবার মাত্র জব্বলপুর গিয়েছিল, সে চ'লে গেল লণ্ডন। নতুন, নতুন, সব কিছু নতুন। শুধু শহর নয়, পথ-বাজার নয়, মানুষ নয়, সমস্ত জীবনটাই যে নতুন! দশ-বার বছর য়ুরোপ-আমেরিকা ঘুরে যে দেববাণী তৈরী হ'ল সে কে? সে কি সেই মেয়েটি? দেববাণীর নাম হ'ল। তার গবেষণা আন্তর্জাতিক সম্মান পেল। বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় চাকরি পেল সে। এই দেববাণী কি সেই দেববাণী? এখন সে আশি মাইল বেগে গাড়ী চালাতে পারে; পৃথিবীর যে

কোনও প্রান্তে একা হাজির হতে পারে; কাউকে তার ভয় নেই। না, কাউকে নয়। সেই অতীতের দুশমন ছায়াকে পর্যন্ত নয়। সেই দেববাণী ছিল পরাধীন লাজুক, ভীরু ভারতবর্ষের মেয়ে। এই দেববাণী আণবিক যুগের পৃথিবীর নারী বৈজ্ঞানিক।

আণবিক যুগ! হাসি পেল দেববাণীর। এই আজকের দেববাণী কেবল আণবিক যুগের নারী নয়, বৈজ্ঞানিক। আন্তর্জাতিক সুনাম তাকে ডেকে এনেছে, সাদর নিমন্ত্রণে এনেছে ডেকে, স্বদেশের দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আজ, আধ ঘণ্টা পরে, সে প্রথম বক্তৃতা দেবে ভারতবর্ষের য়ুনিভারসিটিতে। কি বলবে? বিষয় ত নির্বাচিত। সায়ান্টিফিক্ ম্যান, বিজ্ঞানযুগের মানুষ। এখানে 'ম্যান' মানে যে পুরুষ নয় দেববাণীই তার প্রমাণ। কিন্তু দেববাণী ত কেবল মানুষ নয়, সে যে মেয়ে মানুষ। এক-দিন সে ছিল মেয়ে, এখন নারী! শুধু নারী নয়, ভারত-বর্ষের নারী। সাবিত্রী আম্মা আজই সকালে বলছিলেন, ভারতবর্ষে হিন্দু হয়ে জন্মাবার একটা দুরপনেয় দায়িত্ব আছে। দেববাণী জানে। ভারতবর্ষ দেশ নয়, সংস্কার। আমাদের রক্তের স্রোতে ধমনীতে ধমনীতে ভারতবর্ষ প্রবাহিত। তাই এই আণবিক যুগেও বিদেশে গিয়ে আমরা একা। পশ্চিম আমাদের শিক্ষা দেয়, দীক্ষা দেয় না; সভ্যতা শেখায়, সভ্য করে না। ভারতবর্ষে জন্মাবার দায়িত্ব সর্বক্ষণ আমাদের বুকের ওপর বোঝা হয়ে থাকে। দশ বছরের বিদেশ-প্রবাস দেববাণীকে হাড়ে হাড়ে এ সত্য বুঝিয়ে দিয়েছে। অনেক কিছুই আমরা করতে পারি নে, জানতে পারি নে, দিতে বা নিতে পারি নে, যেহেতু আমরা ভারতবর্ষের মেয়ে। অনেক কিছু আমরা বুঝতে পারি, জানতে পারি, দেখতে পাই, যা ওরা জানে না, বোঝে না, দেখে না, কারণ আমরা ভারতবর্ষের মেয়ে!

ভারতবর্ষে জন্মাবার দায়িত্ব যে কত বড়, বিদেশে যাবার আগে দেববাণীর একদিনও মনে হয় নি। বিদেশে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে এ দায়িত্ব সে অনুভব করেছে। শুধু বিদেশী পুরুষ-বন্ধুদের সান্নিধ্যে নয়, একান্ত ভারতীয় হিমাদ্রি বসুর কাছেও। হিমাদ্রির কাছে যেন আরও বেশি, কেন না, হিমাদ্রি ভারতবর্ষের প্রাণশক্তির জীবন্ত টুকরো, তাকে জানবার আগে দেববাণীর ভারতবর্ষ-জ্ঞান অপূর্ণ ছিল। তাই ত বার বার দেববাণী হিমাদ্রিকে বলেছে, এটা বিদেশ, দেশ থেকে অনেক দূর। এখানে আমরা স্বাধীন। বিজ্ঞান আমাদের পাথেয়, আমাদের পথ। কিন্তু তবু তুমি আর আমি, ভারতবর্ষের দুটি সন্তান। আমাদের মধ্যে যা সবচেয়ে বড় ব্যবধান, তার নাম ভারতবর্ষ।

কি বিচিত্র এ দেশ, এ ভারতবর্ষ! কোথাও এর সংহতি নেই, সমন্বয় নেই, মিল নেই। কি দুস্তর ব্যবধান, কি ভয়ংকর অমিল। জীবনের ঝড়ে টুকরো টুকরো ভারতবর্ষ। য়ুরোপ আমেরিকা তাই আমাদের জানে না, বোঝে না। ভারতবর্ষের মেয়েরা ওসব দেশের পুরুষদের কাছে রহস্য। ওরা ভাবে, শাড়ীর ভাঁজে ভাজে আমরা গোপন যাদু লুকিয়ে রাখি। জানে না, যা লুকিয়ে রাখি তা আমাদের হাজার হাজার বছরের প্রাচীনতা। শত শত বছরের অভিজ্ঞান লুকিয়ে নিয়ে আমরা চলি। ওরা আমাদের বৈষম্য দেখে অবাক্ হয়। ওরা বৈষম্যকে জয় করেছে, ধ্বংস করেছে, আমরা আরও বিষম করেছি। আমাদের দেশে মেয়েরা মন্ত্রী, রাজদূত, বৈজ্ঞানিক; আমাদের দেশে মেয়েরা নোংরা, মূর্খ, পর্দান-শীন, শত অপমানে, নির্যাতনে ধরিত্রীর মত নির্বাক্। ভারতবর্ষ কার পরিচয়ে পরিচিত? যে নারী মন্ত্রী, যে অর্ধ-বিদেশিনী, যে আমার মত গাড়ী চালায়, আজ রোম কাল নিউইয়র্ক করে, তার? না, যে এখনও সকাল থেকে মাঝ রাত্রি পর্যন্ত দরিদ্র স্বামী, একপাল সন্তানের সেবা ক'রে দু'মুঠো অন্নের সঙ্গে সহ্য করে অশেষ গঞ্জনা, অজস্র অপমান, তার? না, আমার মা'র মত যারা বহু শতাব্দীর বিপ্লব নিজের জীবনের মধ্যে হজম ক'রে নিয়ে-ছেন, যাঁদের জ্ঞান অপরিসীম অথচ শিক্ষা সামান্য, বল অতুলনীয় অথচ সম্বল তুচ্ছ, ক্ষমা ও সহনশীলতা যাঁদের অক্ষয়, তাঁদের? এ আণবিক যুগে ভারতবর্ষের প্রতীক মেয়ে কারা, পুরুষ কারা? দেববাণী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমি জানি নে।

গাড়ী ঢুকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফটকে। দেববাণী সতর্ক হ'ল। দেখতে পেল কয়েকজন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ী থামল। তারা সবাই এল এগিয়ে। দরজা খুলে বাইরে আসতে তারা দেববাণীকে স্বাগত করল।

জীবনের এক বড় ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে দেববাণীর মন হঠাৎ বহুদূরে চ'লে গেল। সহর কলকাতা। সার্কুলার রোড। সায়ান্স কলেজের বিরাট সাদা অট্টালিকা। ক্লান্ত, ক্লিষ্ট একটি মেয়ে, শুধু জীবনে হার-না-মানার সংকল্প সম্বল ক'রে, ধীরে ধীরে, প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে উঠছে। হ্যাঁ, সে উঠেছিল। অনেকের অনেক বাধা সত্ত্বেও সে উঠেছিল।

তুমি যে তাকে উঠতে দেখেছিলে, হিমাদ্রি, সেই প্রথম দিন থেকে, তা সে জানত না। আজ জানে। তাই আজ সে দেখতে পাচ্ছে, ভিয়েনা য়ুনিভারসিটির গবেষণাগারে ব'সে, তুমি খুশির হাসি হাসছ। ক্রমশ:

পথিকৃৎ শ্রীমধুসূদন

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

১

পাশ্চাত্ত্য ভাবের সংঘাতে বাংলার জীবন-তরণীতে কি ভাবে দোলা লাগিয়াছিল, সে কথা যতই বলা যায় সহজে শেষ হয় না। নূতন শিক্ষার নেশা যেদিন তরুণ বাঙ্গালীকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিল, যাহা কিছু প্রাচীন তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাহার সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য হাব-ভাব, রীতিনীতি দাঁড় করাইয়া নিজেকে সভ্য বলিয়া জাহির করিতে চাহিয়াছিল। নিষিদ্ধ মাংস নিষিদ্ধ কেন, মদ্যপান গর্হিত কেন, ইয়ং বেঙ্গল এ প্রশ্ন করিয়া বসিল। ডিরোজিও এই জিজ্ঞাসার প্রবৃত্তি জাগাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার শিক্ষাদান অতি অল্পকালব্যাপী হইলেও ইয়ং বেঙ্গলের সহিত তাঁহার নাম জড়িত আছে। কিন্তু মধুসূদনের জীবনকে ইয়ং বেঙ্গলের পর্যায়ে ফেলিলে চলিবে না, তাঁহার সারস্বত জীবন তাঁহাকে যে দৃষ্টি দিয়াছিল তাহার বলেই তিনি ছিলেন এ সবের উর্ধ্বে। তাই তাঁহার প্রহসনে তিক্ততা নাই, দুঃখের ছায়া নাই, মর্মান্তিক দৃশ্যেও আছে লঘু পরিহাস—পশ্চিমের farce-এ যাহা আছে তাহা হইতে স্বতন্ত্র। সধবার একাদশীতে যে চোখের জলের পরিচয় তাহা মধুসূদনের প্রহসনে নাই।

নাটক হইল জীবনের প্রতিচ্ছবি; আবার শুধু প্রতিচ্ছবি নয়, ভুল-ভ্রান্তির ছবি দেখাইয়া তাহা হইতে বাঁচিবার পথও বলিয়া দেয়—আত্মসমীক্ষার একটা প্রকার। ইংরেজ কবি বেন জনসন তাঁহার কোনও কোনও মিলনান্ত নাটকে মানুষের মূর্খতা লইয়া খেলা দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। Sport with human follies, not with crimes—জনশিক্ষার উপায় হিসাবেই এরূপ নাটকের সৃষ্টি। মধুসূদন তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া' এই দুইটি প্রহসনের মধ্য দিয়া তরুণ ও প্রাচীন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহা কিছু নিন্দনীয় তাহাকে উপহাসাস্পদ করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই দুইটি প্রহসনের লক্ষ্যীভূত হইয়াছেন মনে করিয়া, পাইকপাড়া রাজবাড়ীর আত্মীয় বা অন্তরঙ্গেরা অভিযোগ করেন বলিয়া, প্রহসন দুইটি রাজবাড়ীতে অভিনয়ের জন্য রচিত হইলেও রাজবাড়ীতে অভিনীত হইতে পারে নাই—শেষে রাজবাড়ী হইতে অভিনয়ই উঠিয়া গেল। সংস্কারের আবর্ত দেশে যে কি বিপর্যয় আনিয়াছে, মধুসূদন তাহা বুঝিতে পারিলেন, এবং বিশুদ্ধ হাস্যরসও যে গায়ে লাগে বা বেঁধে তাহার পরিচয় পাইয়া অবাক হইয়া থাকিবেন। ইহার পর তিনি আর প্রহসন রচনায় হাত দেন নাই কেন, তাহা কে বলিবে? এই কারণেই নয় তো? সাহিত্য রচনার এই উৎকৃষ্ট ধারায় এরূপ সার্থকতা লাভ করিয়াও তাঁহাকে থামিতে হইল।

কিন্তু তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুসরণ করিয়া বহু নাটক রচিত হইয়া থাকিবে, নবীন সভ্যতার অন্ধভাবে অনুকরণে কিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা লইয়া কয়েকটি মাত্র মুদ্রিত নাটকের পরিচয় দিতেছি।

২

'একেই কি বলে বাবুগিরি?' ইহা যে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র ছাঁচে ঢালা, নাম হইতেও তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। প্রচ্ছদপটে ছিল:

একেই কি বলে বাবুগিরি?
নামক নাটিকা।
শ্রীকালাচাঁদ উকীল
ও
শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়
বিরচিত।
কলিকাতা
নিমতলা ৩২ সংখ্যক ভবনে
সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।
শকাব্দাঃ ১৭৮৫। ভাদ্র।
মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

লেখকেরা মহেশপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারা "হঠাৎবাবু"দের অবস্থা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। হঠাৎবাবু, নকলবাবু, ফুলবাবু ও গুটকেবাবু—ইহাদের স্বরূপ বর্ণনাই নাটকের উদ্দেশ্য। সংস্কৃত নাটকের প্রবেশকের ধারা ইহারা টানিয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন,

তাই কবিতার দ্বারাই 'মালিনীর প্রবেশ' করাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের প্রভাব সুস্পষ্ট :

সূর্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।
হেন কালে তথা এক আইল মালিনী ॥
"কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।
দাঁতে মিসি মাজা ছোলা হাস্য অবিরাম ॥
গাল ভরা পান তার পাঁচনলী গলে।
কানে ঢেঁড়ি, কড়ে রাঁড়ি, কথা কয় ছলে ॥"
ফ্রিঙ্গী ভাবে বাঁধা চুল পরা জল ডুরে।
তা দেখে যুবার মন বদ্ধ প্রেমডোরে ॥ ইত্যাদি।

কিন্তু ভারতচন্দ্র ও মধুসূদনের মধ্যে যে ব্যবধান, শুধু সময়ের দূরত্ব নয়, ভাবের ও আদর্শেরও দূরত্ব—তাহার কথা পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না। সংস্কৃতি বিপর্যয় বা সভ্যতার সংঘাত ভারতচন্দ্রের যুগে তো এমন করিয়া দেখা দেয় নাই, তাঁহার আদিরস নিতান্তই আদিরস।

নাটিকাটি চার অঙ্কে সমাপ্ত, হিতকথা বলিয়াই শেষ হইয়াছে। শেষে বড় বড় হরপে 'ইতি' ছাপা হইয়াছে— লেখকেরা দীর্ঘচ্ছন্দে বাবুদের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা করিতে গিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন মনে করিলে অসঙ্গত হইবে না।

৩

'এঁরাই আবার বড় লোক!'

ইহাও প্রহসন, অঙ্কে ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত, এবং ১২৭৪ সালের কার্তিক মাসে (ইংরাজী ১৮৬৭) প্রকাশিত, স্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রহসনের নান্দীতে আছে—

'সময় দোষ বর্ণনে, করি নাই হেন মনে, কটাক্ষ
বিশেষ জনে,
করিব সন্ধান।
একত্র স্বভাব সব করি রচি ছবি নব, দেখিলে তাহে স্বভাব,
সে দোষ আপন জেনো ॥'

দুশ্চরিত্র জমিদারপুত্র "রাজাবাবু" ও ডাক্তারের কুলীন রমণীদের কথাই প্রহসনের উপজীব্য। রাজাবাবু বাহিরে ভাল, দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়াছেন, সংস্কারকদের দলে মেশেন, বলেন, "ব্রাহ্মসভায় খানিক সময় কাটাই গে"—কিন্তু ভিতরে তিনি অসার। মাষ্টারের female emancipation জন্য তাঁহার স্ত্রী গৃহত্যাগ করেন। রাজাবাবুর স্ত্রী নির্মলার মৃত্যুর পরে নাট্যকার বলিতেছেন :

"এঁরাই আবার সমাজের ভূষণ! এঁরাই আবার দেশের লোকের প্রতিনিধি! এঁরাই আবার বড় লোক!" প্রহসনে এইভাবে মুখে মিষ্ট অন্তরে গরল ভণ্ড ধর্মধ্বজীদের নিন্দা করা হইয়াছে।

৪

অন্য একটি প্রহসনের উল্লেখ করি :

'একেই কি বলে বাঙ্গালী সাহেব?'
প্রহসন।
কস্যচিৎ
বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য প্রণীত
এবং
বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির অধ্যক্ষ
শ্রীযুত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত।
কলিকাতা।
স্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।
ইং ১৮৭৪ সাল।

নাটকে ছয়টি অঙ্ক আছে। ইহা আধুনিকতার বিরোধী, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের বিদ্বেষী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্বিতীয় অঙ্কে ভারত আশ্রমের বিরুদ্ধে কটাক্ষ আছে।

"সে Calcutta শহরের কাছে একটা বাগানে আসে, সেখানে Bengalee স্ত্রিলোকদের মেমসাহেব বানায়— সেখানে reformation এবং সভ্যটা মেয়েলোকডের শিক্ষা ডেয়।" তৃতীয় অঙ্কে সর্বধর্মে সমানত্ব সম্বন্ধে প্রতিবাদ জানানো আছে—"হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয়ান, ব্রাহ্ম, positivist, millite, utilitarian, আস্তিক, নাস্তিক, ইত্যাদি পৃথিবীতে যত রকমের ধর্ম বা সেই সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে সে কথা থাক।" বিশেষ করিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে কটাক্ষ আছে, তাঁহার নামকরণ হইয়াছে শম্ভুনাথ—"শম্ভুনাথ ভারি ভাল ছেলে, ভারি বুদ্ধিমান, সংস্কৃত কলেজে ভাল, তবে উপবীত-ত্যাগী!"

ব্রাহ্মসমাজের সংস্কারচেষ্টা নাট্যকার ভাল চোখে দেখেন নাই—"দেবতা মানে না, জাত জানে না, ছত্রিশ জেতের সঙ্গে বসে ভাত খায়" ইত্যাদি। "কে একজন পূব্ব দিশি বাঙ্গাল বদ্যি সে নাকি একজন বড় বেহ্মা"— প্রহসনটি ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত নিন্দার উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই।

৫

'একেই বলে বাঙ্গালী সাহেব' নামের একটি প্রহসন —ইহা নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত এবং ১৯৩৩ সম্বতে

রবীন্দ্রনাথ

রম্যাঁ রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ

অর্থাৎ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। লেখকের নাম 'শ্রীগিরি গোবর্ধন'। বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের মত ইহাও যে ছদ্মনাম তাহা বলার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বিদ্যাশূন্য যেমন কটাক্ষপাত করিয়াছেন, সংস্কার চেষ্টা ও ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি বিদ্রূপবাণ ছাড়িতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তেমনি গিরি গোবর্ধন আবার সংস্কারের চেষ্টাকে সমর্থন করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও তাঁহার সহায়ক-মণ্ডলীর প্রশংসা করিয়াছেন। বড়ল গ্রামের গদাধরবাবু প্রহসনটির নায়ক। কিন্তু যদি কেহ ইহাকে বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্যের পালটা জবাব বলিয়া মনে করেন, সেই আশঙ্কায় লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন—

"এই প্রহসন পাঠ করিয়া যদি আপনাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়, তবে দেশের পরম সৌভাগ্য। আমি পাঁচালি দলভুক্ত নহি যে, অন্যের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইব। অনেকেই এই পুস্তকের নাম পাঠ করিয়া মনে করিতে পারেন যে, ইহা ইহার সদৃশ অপর এক প্রহসনের উত্তর-স্বরূপ। আমি তাঁহাদিগকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, কোন প্রকার জনরঞ্জনকারী পুস্তক পাঠে ইহা লিখিত হয় নাই। আমি সে পুস্তক কি প্রকার এবং তাহার বিষয় কি, অদ্যাপি অবগত নহি। এ প্রহসনের উদ্দেশ্য কেবল দেশের হিত-সাধন।

শ্রীগিরি গোবর্ধন।"

বিজ্ঞপ্তি হাস্যকর, অনেকটা 'ঠাকুর ঘরে যে আছে সে কলা খায় না'-র অনুরূপ

৬

আর একটি মাত্র নাটি র নাম করিয়া প্রসঙ্গ শেষ করি, 'এই এক প্রহসন হহা ১২৮৭ সালে লেখা, বিজ্ঞাপনের তারিখ ১২৮ ১৭ই আষাঢ়। সরস্বতী যন্ত্রাধিকারী ক্ষেত্রমোহনবাবু নাকি আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দপথে চলার যে কি দোষ তাহা নাটিকায় যথাযথ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। রামপদবাবু শেষটায় হাতে-পায়ে ধরিয়া প্রাণে বাঁচেন ও "সত্য-নারায়ণের" গান করিয়া মাতালবাবুকে শোধরান। প্রেরণা বা নূতনত্ব কিছু না থাকিলেও নাম ও বিষয়বস্তুর জন্য ইহা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে।

•

মধুসূদনের লেখা প্রহসন পড়িয়া এই দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয় যে, কি অদ্ভুত ভাবে তিনি জীবনের হাল্‌কা সুর ও তাহার সঙ্গী চোখের জল মিশাইয়া প্রহসন দুইটি রচনা করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধের মেঘনাদ বা জীমূত-ন্দ্র আবার অন্য জগতের কথা, কল্পলোকের কাহিনী। কিন্তু আমাদের চারিদিকে সমাজে নূতনবাবুদের অভ্যুদয়, যাঁহারা ইংরেজী ঢং দোরস্ত ও দু'পাতা ইংরেজী পড়িয়া সমাজের আমূল সংস্কারের চেষ্টায় বে-সামাল হইয়া-ছিলেন, তাঁহাদের অভ্যুদয় স্পষ্ট অক্ষরে লিখিয়া নাটক বা প্রহসনের আকারে বঙ্গভূমির উপযোগী করিয়া নূতন পাঠক-সমাজের সম্মুখে ধরিতে পারাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। সেদিন হইতে এ পর্যন্ত বহুবার নবীন সভ্যতার উদ্দামতার বিরুদ্ধে বাণী শোনা গিয়াছে, স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সন্দর্ভে, রবীন্দ্রনাথের বেশভূষায় ও অন্য সকল প্রকারে উদারতার ভিত্তিতে জাতীয়তার সমর্থনে, আজও 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রশ্ন জাগ্রত আছে। মধুসূদন বাংলা প্রহসনের মাধ্যমে যে চিত্র তখনকার পাঠকদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, তাহার অনুকরণে যেসব প্রহসন রচিত হইয়াছিল, কালের বিস্মৃতি-গর্ভে তাহার অনেকগুলিই নিশ্চয়, লীন হইয়া গিয়াছে কিন্তু উপরে প্রদত্ত বিবরণী হইতে তখনকার সাহিত্যিক আলোড়নের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়—অমিত্রাক্ষর ছন্দে, নূতন ধরনের পদবন্ধে, ভাষার শিথিলতা বর্জনে, নাটক রচনায় মধুসূদন যে নূতন ভঙ্গির প্রবর্তন করিয়া-ছিলেন প্রহসনের দিকেও তিনি তখনকার লেখকদের প্রেরণা জোগাইয়াছিলেন, সেই নূতন ভঙ্গির সূত্রপাত করিয়াছিলেন এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ আছে।

—০—

ময়না

(ত্রিঅঙ্ক নাটক)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(১৭ই আগস্ট্ সকাল আটটা। ইশাকের বাড়ীর একতলার ঘর। তক্তপোশটার ওপর সুললিত ও নারায়ণ দাবার ছক পেতে বসেছেন, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে খেলা তেমন জমছে না। অত্যন্ত নিরাসক্ত ভাবে, বেশ কিছুক্ষণ পরে পরে, অন্য কথার ফাঁকে ফাঁকে এক-একটা ঘুটি চালছেন। ঘরের দরজা-জানালা দুই-ই বন্ধ। মেঝেতে একটা কম্বলের ওপর সুমোহিত শুয়ে আছে, একটা গুটনো পায়ের হাঁটুর ওপর আর-একটা পা তুলে। যে-পোশাকে এ বাড়ীতে এঁরা এসেছিলেন, সেই পোশাকেই সবাই রয়েছেন।)

নারায়ণ। (সুললিতের হাতটা চেপে ধ'রে) উহু, ওটা ভুল হবে, ও চালে আপনার পিল যাবে যে।

সুললিত। ও, তাই বুঝি? আচ্ছা, আচ্ছা। (অন্য একটা ঘুটি চাললেন।)

নারায়ণ। (একটা চাল চেলে) রাত্তিরে ঘুম হয়েছিল?

সুললিত। গোড়ার দিক্‌টায় হয়েছিল, তার পর হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল, দেখলাম খুব ক্ষিদে পাচ্ছে, তার পর থেকে ছট্‌ফট্ ক'রে কেটেছে বাকী রাতটা।

নারায়ণ। পাখীটা রাত্রে আর ডাকাডাকি বেশী করে নি, না?

সুললিত। বোধ হয় খাইয়ে এনেছিলেন ভাল ক'রে, পেটটা ভরা ছিল, তাই ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি। (একটা ঘুটি চাললেন।)

নারায়ণ। (একটা চাল চেলে) আমার ঐ মেয়েটা জানেন, একেবারে পাখীঅন্ত প্রাণ।

সুললিত। (হেসে) সুমু বোধ হয় বলবে, পাখীটাও প্রাণান্তকর পাখী।

(সঙ্গে সঙ্গে বাইরে হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরে-কৃষ্ণ। সুমোহিত উঠে বসল।)

নারায়ণ। কি মুশকিল। মানুষ ভয় পেলে হরিনাম করে, আর আমাদের কপালে, দেখুন, হরিনামকেই আমাদের এখন ভয়।...খুব কি স্পষ্ট শোনা গেল এখান থেকে?

সুমোহিত। (দাঁড়িয়ে) খুব স্পষ্ট। এখনই এর একটা বিহিত করা দরকার।

নারায়ণ। কি বিহিত করবে?

সুললিত। ময়না না হয়ে হাঁস বা পায়রা যদি হ'ত ত বিহিত খুব সহজে হয়ে যেত।

(বাইরে আবার হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।)

সুললিত। বুলিটি আওড়াচ্ছে কিন্তু পরিষ্কার!

সুমোহিত। কিছুতেই আল্লাহু আকবর ব'লে ভুল করবার জো নেই।

(ডানদিক্ দিয়ে দ্রুত প্রস্থান।)

নারায়ণ। কি করা যায় বলুন ত?

সুললিত। যা করবার সুমুই করবে।

(ডানদিক্ থেকে এসে কার্ত্তিক টেবিলের ওপর দুটো ডেকৃচি রেখে চ'লে গেল, যেমন যায়, একটু খোঁড়াতে খোঁড়াতে। সুমোহিতের পুনঃপ্রবেশ। সুললিত তক্তপোশ থেকে নামবার উপক্রম করছেন।)

সুললিত। দেখা যাক কি আছে ডেকৃচিদুটোতে।

নারায়ণ। কিন্তু আমি আপনার রাজা নিচ্ছি যে।

সুললিত। (নেমে দাঁড়িয়ে) নিন, নিন, নিয়ে রাজা হোন্। আমি এখন দু'মুঠো খেতে পেলেই খুশী। সারা রাত উপোস ক'রে আছি মশায়!

(ডেকৃচির ঢাকনা খুলতে যাচ্ছিলেন, নিরুপমা ও পদ্মা ঢুকলেন ডানদিক্ থেকে।)

নিরুপমা। আর তর সইছিল না, না?

সুললিত। সারা রাত না খেয়ে আছি। বল না, কি আছে ডেকৃচি দুটোতে?

নিরুপমা। আপনিই না হয় বলুন বোন।

সুললিত। বলতে বুঝি কষ্ট হচ্ছে তোমার? বেশ, আপনিই বলুন, কি আছে ডেকচিতে?

পদ্মা। ভাত।

সুললিত। তা ভাত ত বেশ ভাল জিনিষ। (নিরুপমার দিকে ফিরে) ওটা বলতে বাধছিল কেন তোমার? (পদ্মার দিকে ফিরে) শুধু ভাত বুঝি?

পদ্মা। না, কুমড়ো ভাতে, আলু ভাতে আছে সঙ্গে। মাখন দিয়ে মেখে খেতে ভাল লাগবে।

সুললিত। ভাল লাগবে? এ যা ব্যবস্থা আপনারা করেছেন, এ ত চমৎকার, অপূর্ব্ব! আর দেরী না ক'রে তাহলে—

(ডানদিক্ থেকে হন্তদন্ত হয়ে ললিতার প্রবেশ।)

ললিতা। মা, আমার ময়নার খাঁচার দরজাটাকে কে খুলে রেখেছিল? চান ক'রে বেরিয়ে এসে দেখি, হাঁ ক'রে খোলা। যদি পালিয়ে যেত?

পদ্মা। আপদ্ যেত, কিন্তু যায় নি ত? ও যাবে না আমাদের সকলকে শেষ না ক'রে, ভাবিস নে তুই।

(দরজায় দুটো টোকা, তার পর একটু ফাঁক দিয়ে আবার দুটো টোকা।

সুমোহিত গিয়ে দরজা খুলে দিলে ইশাক প্রবেশ করলেন।)

ইশাক। আদাব! আদাব! আপনারা নাস্তা করতে বসেছেন? বেশ, বেশ, ক'রে নিন।···বাইরের খবর খুব খারাপ। আমার বোনরা যে পাড়ায় থাকে সেখানে বিশ্রী সব কাণ্ড হচ্ছে। শুনছি নাকি কয়েক শ' মুর্দা প'ড়ে আছে রাস্তায়। বেঁচে যদি থাকে ত যে কোন সময় ওরা এসে পড়তে পারে। তাই বলতে এলাম, আপনারা তৈরি হয়ে থাকুন, ওরা আসছে শুনলেই যেন চ'লে যেতে পারেন।

নিরুপমা। চ'লে কোথায় যাব আমরা, ইশাক সাহেব? চারদিকে ত লোক ঘুরছে, পথে বেরুলেই টুকরো টুকরো ক'রে কেটে ফেলবে।

ইশাক। নসিবে সে রকম কিছু থাকলে কি হবে জানি না, কিন্তু এ পাড়ার থেকে পালিয়ে অনেকে ত গেছে, এখনও যাচ্ছে। খোদাতালার ওপর ভরসা রেখে চ'লে যাবেন।

(কার্ত্তিক কয়েকটা প্লেট নিয়ে ঢুকছিল, ইশাককে দেখে round about turn ক'রে ফিরে গেল।)

সুললিত। এই, কি হ'ল? কার্ত্তিক?

ইশাক। আপনাদের বিপদ্ যদি কিছু হয়, ঐ উজবুকটার জন্যে হবে। আচ্ছা চলি।

(ইশাক বেরিয়ে গেলে সুমোহিত দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে এল।)

নিরুপমা। কি হবে?

সুললিত। তোমার ঐ এক কথা, কি হবে, কি হবে। কিছু যে হতেই হবে তার কি মানে আছে? এটা কেন ভাবছ না, যে, আজিজের ফুফুরা হয় ত আসবেন না শেষ পর্য্যন্ত। আমরা যেমন এখানে এঁদের আশ্রয়ে নিরাপদে রয়েছি, ওঁরাও হয়ত তেমনি ওখানে কোন হিন্দুর আশ্রয়ে নিরাপদে রয়েছেন।

(বাইরে হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।)

সুমোহিত। নিরাপদে রয়েছি, বলতে পারতাম, যদি ঐ পাখীটা না থাকত।

ললিতা। যত দোষ ঐ পাখীটার।

নারায়ণ। পাখীটার হয়ে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, নিশ্চিত বিপদ্‌টা নিয়ে যে ফুফুরা আসছেন, তাঁরা এর ডাক শুনে আসছেন না।

সুমোহিত। তাঁরা এসে পৌঁছবার ঢের আগে এর ডাক শুনে অন্য যাঁরা এসে পড়তে পারেন, তাঁরাও নিশ্চিত বিপদ্ নিয়েই আসবেন। তা ছাড়া আজিজের ফুফুরা ত নাও আসতে পারেন।

নারায়ণ। তা হলে বাবা, তোমার যা ইচ্ছে হয় কর পাখীটাকে নিয়ে।

ললিতা। (দৃঢ়স্বরে) না।

সুমোহিত। না! না মানে কি? ঐ একটা পাখীর জন্যে কি এতগুলি মানুষকে প্রাণ দিতে হবে? ছেলে-মানুষির একটা কোথাও সীমা থাকা দরকার।

নিরুপমা। সুমু, তুই রাগ করছিস, কিন্তু এই মেয়েটির দিক্‌টাও তোর দেখা উচিত।

ললিতা। আমার দিক্‌টা কাউকে দেখতে হবে না। কিন্তু আমি জানতে চাইছি, এই পাখীটারও নিজের দিক্ কি একটা নেই? ও ত জেনেশুনে কোন অন্যায় করছে না? কেন তাহলে ওকে মেরে ফেলা হবে?

সুমোহিত। (একটু নরম হয়ে) ওকে মেরে ফেলা হবে, এমন কথা কেউ বলে নি। আর, ও যা করছে তা জেনেশুনে করছে কি না সেটা কোন কথা নয়। জানব শুনব ত আমরা।

ললিতা। সে যাই হোক, আমার পাখীর গায়ে আপনারা কেউ হাত দেবেন না, ব'লে দিচ্ছি।

(ডানদিক্ দিয়ে দ্রুত প্রস্থান।)

সুললিত। আমার মনে হয়, কালবিলম্ব না ক'রে খেয়ে নেওয়া কর্ত্তব্য। আর, সকলে একসঙ্গে ব'সে পড়াই ভাল, কার্ত্তিক দেবে এখন। ভাতে ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর মুখে দেওয়া যাবে না।

নিরুপমা। কিন্তু টেবিলে ত সব ক'জনকে ধরবে না?

সুললিত। তোমার যত সব! টেবিলটা কি অপরিহার্য্য? খাচ্ছি ত কুমড়ো ভাতে আর আলু ভাতে

ভাত, পাশের ঘরে মেজেতে খবরের কাগজ বিছিয়ে ব'সে খেলে পেট ভরবে না ?

নিরুপমা। তাই ভাল। আসুন বোন, কার্ত্তিককে গিয়ে বলি, ডেকৃচি দুটো নিয়ে যাবে ওঘরে।

(সুললিত, নারায়ণ ও পদ্মার প্রস্থান ডানদিক্ দিয়ে।)

নিরুপমা। (যেতে যেতে সুমোহিতকে) কই, আয়।

সুমোহিত। তুমি যাও মা, আমি যাচ্ছি একটু পরে।

নিরুপমা। সত্যি, পাখাটাকে মারিস না রে।

সুমোহিত। না মা, না, মারব না, ভেব না তুমি।

(নিরুপমার প্রস্থান। ডেকচি দুটো নিতে কার্ত্তিকের প্রবেশ।)

সুমোহিত। ওরে শোন্। একটা কাজ করতে পারবি ? বকশিস পাবি, কিন্তু খুব সাবধানে করতে হবে।

কার্ত্তিক। ঐ ইশেক-সায়েবটির কাছে যেতে ব'লোনি দাদাবাবু। (মুখে ভীতির ভাব স্পষ্ট।)

সুমোহিত। না রে না, না। কারুর কাছেই তোকে যেতে হবে না।—শোন্! স্নানের ঘরের পাশে খাঁচাতে ময়নাটা আছে না ?

কার্ত্তিক। হ্যাঁ, দাদাবাবু।

সুমোহিত। আমরা সবাই যখন খেতে বসব, তুই এক ফাঁকে সেটাকে নিয়ে, স্নানের ঘরের জানালাটা খুলে, হাতটা একটু গলিয়ে বাইরে উড়িয়ে দিবি। পারবি না ?

কার্ত্তিক। এ আর একটা কি শক্ত কাজ দাদাবাবু, কেন পারব না ? কিন্তু এই গরুখোর মেলেচ্ছদের বাড়ীতে ঐ পাখাটা একটু তবু ঠাকুর-দ্যাবতার নাম শোনাচ্ছেল—

সুমোহিত। আরে বোকারাম, প্রাণে বেঁচে থাকলে তবে না ঠাকুর-দেবতার নাম শুনবি ? ওর গলায় ঠাকুর-দেবতার নাম শুনলে সবাই যে জেনে যাবে, আমরা এখানে রয়েছি। তখন ?

কাত্তিক। আচ্ছা দাদাবাবু, করব যা বলছ আপনি।

(নেপথ্যের কাছে এসে সুললিত—কার্ত্তিক !)

কার্ত্তিক। যাই বাবু।

(ডেকৃচি দুটো নিয়ে ডানদিক্ দিয়ে প্রস্থান। নেপথ্যের কাছে নিরুপমার কণ্ঠে, সুমু ! সুমু !)

সুমোহিত। যাই মা।

(বেরিয়ে যাচ্ছিল, ললিতা ঢুকল ডানদিক্ থেকে।)

সুমোহিত। আপনি খেতে বসলেন না ?

ললিতা। যাচ্ছি ; আপনিও যান, ওঁরা ব' আছেন, কিন্তু যাবার আগে আমার একটা কথার জব দিন।

সুমোহিত। বলুন, কি কথা ?

ললিতা। খাঁচার দরজাটা আপনি খুলে দি ছিলেন ?

সুমোহিত। খাঁচার দরজা ?

ললিতা। হ্যাঁ, খাঁচার দরজা। যে কথা হচ্ছি একটু আগে। খাঁচা একটা আছে এ বাড়ীতে, জা না ? এমন ভাব দেখাচ্ছেন, যেন আকাশ থে পড়লেন।

সুমোহিত। না, না, আকাশ থেকে পড়ব কেন আকাশ থেকে পড়িনি। খাঁচার দরজাটা খুলে ময়নাটা একটু আদর করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু হাতের আঙু এমন ঠুকরে দিল—এই দেখুন, যদি বিশ্বাস না হয়।- তার পর সে কি যন্ত্রণা আঙুলে। খাঁচার দরজাটা খো আছে, না বন্ধ করেছি তা ভাববার মত্তন কি আর অব ছিল তখন ?

ললিতা। অন্যের ময়নাকে আপনি আদর কর গেলেন কেন ? বেশ করেছে ঠুকরেছে। দেখি আঙুল —ইস্, সত্যিই ত ! লাল হয়ে আছে জায়গাট আচ্ছা হাঁদা ত ঐ পাখীটা। দাঁড়ান, ওকে দেখা মজা। (যাচ্ছিল)।

সুমোহিত। আহা, থাক্ থাক্। একটা পাখী, কিই বা বোঝে ? শুনুন।

(দু'পা এগিয়ে গেল ললিতার দিকে, কি ললিতা বেরিয়ে গেল ডানদিক্ দিয়ে এবং এ পরেই—সুমোহিত যখন মাথা চুলকোতে চুলকো ফিরে আসছে ঘরের মাঝখানটির দিকে—ছুটে ফি এল।)

ললিতা। আমার ময়না কি হ'ল, আমার ময়ন শীগ্গির বলুন, কি করেছেন আমার ময়নাটাকে নি নয়ত রসাতল করব।

সুমোহিত। আপনার ময়না কোথায়, আমি জানি ?

ললিতা। নিশ্চয় জানেন, মিথ্যে কথা বলবেন ন লজ্জা করে না, মিথ্যে কথা বলতে ? খাঁচার দরজা খো পাখীটা নেই। আপনি ওকে মেরে ফেলেছেন, নয় সরিয়েছেন।

সুমোহিত। আমি ত এই ঘরেই রয়েছি সকাল থে

পাখী কি ক'রে আমি সরালাম, কখন সরালাম, আর মেরেই বা ফেললাম কেমন ক'রে?

ললিতা। তা আমি জানি না। আমি আমার পাখী ফিরে চাই। ভাল চান ত দিন ফিরিয়ে, এক্ষুনি, এই মুহূর্তে। আমার এতদিনকার পোষা, এমন সুন্দর ময়না!

সুমোহিত। Riot থেমে যাক, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে হোক, লোক লাগিয়ে হোক, আপনার পাখী আপনাকে আমি ফিরে এনে দেব। দেবই, কথা দিচ্ছি।

ললিতা। এ সব কথার কারচুপিতে আমি ভুলছি না। আমার পাখী আমি চাই, এখুনি চাই।

(বাইরে হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।)

ললিতা। ঐ, ঐ, ঐ ত আমার ময়না।...যাই আমি।

(ছুটে বেরিয়ে গেল ডানদিক্ দিয়ে।)

সুমোহিত। ধেত্তেরি!

(কার্ত্তিকের প্রবেশ।)

কার্ত্তিক। দাদাবাবু গো, হলনি।

সুমোহিত। তা ত দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কেন হলনি শুনি?

কার্ত্তিক। উড়িয়ে দিছলুম গো দাদাবাবু, জানলাটা বন্ধও ক'রে দিছলুম, কিন্তু ঐ যে চিলেকোঠার দরজাটা, সেটা ত খোলাই ছেল, তাই দিয়ে ফিরে এসে ঢুকেছে। আপনি দেখবে এস, এমন মুখখানি ক'রে ব'সে আছেন খাঁচাতে, যেন কিচ্ছুটি জানেন না।

(বাইরে হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ। নেপথ্যের কাছে এসে নিরুপমা—সুমু! সুমু! আর কত দেরি করবি?)

সুমোহিত। যাচ্ছি মা।

(কার্ত্তিক ও সুমোহিত উভয়ের প্রস্থান।)

দৃশ্যান্তর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(১৭ই আগস্ট, রাত দেড়টা। ঈশাকের বাড়ীর একতলার করিডর। পেছনে ডানদিকের নেপথ্য ঘেঁসে একটা ও বাঁদিকের নেপথ্য ঘেঁসে একটা দরজা। দরজা দুটো ভেজান। স্টেজের একপ্রান্তে বাঁদিকের নেপথ্যের খুব কাছে একটা জলচৌকির উপরে খাঁচাটা রয়েছে দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকের দরজাটা সন্তর্পণে খুলে পা টিপে টিপে সুমোহিতের প্রবেশ, তার হাতে একটা কম্বল। খাঁচাটার পাশে উবু হয়ে ব'সে সে কম্বল দিয়ে বেশ ভাল ক'রে ঢেকে দিল সেটাকে। পাখীটা ডেকে উঠল, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ। ততটা জোরে না হলেও শোনা গেল স্পষ্ট। সুমোহিত এবার কম্বলটাকে দুভাঁজ ক'রে খাঁচাটাকে ঢাকছে। তার পেছনে ডানদিকের দরজাটা খুলে ললিতা দাঁড়িয়ে দেখছে, তারপর এগিয়ে আসছে পা টিপে টিপে। সুমোহিত কম্বলের চার ধারটা বেশ ভাল ক'রে টেনে টেনে দিচ্ছে, যাতে কোনদিকে কোন ফাঁক না থাকে। সেটা হয়ে গেলে খাঁচার কাছে মুখ নিয়ে মৃদুকণ্ঠে বলল, ময়না, বল, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ। ময়না বলল, হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ! এবারে বেশ অস্পষ্ট, প্রায় শোনাই গেল না। তৃপ্তিতে দুহাত কচলাতে কচলাতে উঠে ফিরে যাবে, দেখল ললিতা পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। সুমোহিত অপ্রস্তুতি ঢাকবার জন্যে হাসল একটু।)

ললিতা। এর চেয়ে ওর গলাটা টিপে দিলে ত ঢের ভাল হ'ত। একটা নিরীহ প্রাণীকে ওরকম আস্তে আস্তে দম বন্ধ ক'রে মারবার কি দরকার?

(ক্ষিপ্রহস্তে কম্বলের ঢাকার একটা দিক্ খুলে দিল।)

সুমোহিত। (এক ঝটকায় কম্বলটা তুলে নিয়ে) একে আপনি বলছেন নিরীহ প্রাণী!

ললিতা। তা না ত কি, ও বাঘ না ভালুক?

সুমোহিত। (গলার সুর বদলে) আচ্ছা, এই সহজ কথাটা কেন বুঝতে পারেন না? সামান্য একটা পাখীর জন্যে এতগুলি মানুষের জীবন বিপন্ন হতে দেওয়া কি উচিত? আপনি বড় হয়েছেন, লেখাপড়া শিখেছেন—

ললিতা। বড় হলে আর লেখাপড়া শিখলে কি মায়ামমতা বিসর্জ্জন দিতে হয়?

সুমোহিত। মায়ামমতা কি শুধু পাখীটার জন্যেই থাকতে হবে, মানুষগুলোর জন্যে থাকতে নেই?

ললিতা। আচ্ছা, ওটা পাখী না হয়ে যদি আমার একটা ছোট এতটুকু ভাই হ'ত, আর দুষ্টুমি ক'রে খেলা ক'রে এইরকম হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ বলত, বোঝালেও যদি না বুঝত, বারণ করলে না শুনত, তাকে নিয়ে আপনারা কি করতেন? তাকে কি কম্বল চাপা দিয়ে মেরে ফেলতেন, না তাড়িয়ে দিতেন বাড়ী থেকে?

সুমোহিত। এ কিন্তু আপনি অত্যন্ত বাজে কথা বলছেন; একটা ছোট ছেলে আর একটা পাখীর দাম এক হতে পারে না।

ললিতা। দামটা ঠিক ক'রে দেবার মালিক কে? আপনি?

(ডানদিকের দরজাটা খুলে পদ্মার প্রবেশ।)

পদ্মা। লতা!

ললিতা। কি মা?

পদ্মা। রাত কত হ'ল খেয়াল আছে? সেই কখন থেকে শুনছি, একটানা বকবক্ করছিস্। আজ আর শুতে-টুতে হবে না?

ললিতা। এই যে, যাচ্ছি।

(সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দুজনকে দে'খে নিয়ে পদ্মার প্রস্থান।)

সুমোহিত। আপনার মা হয়ত ভাবলেন—

ললিতা। যা খুশি ভাবুন গিয়ে। আমার ভাবনা এখন কেবল ঐ পাখীটাকে নিয়ে।

সুমোহিত। আমারও তাই।

ললিতা। দুজনের ভাবনার গতিটা কেবল উল্টো-দিকে।

সুমোহিত। কিছু যদি মনে না করেন, সত্যি কথা বলব। পাখীটা থাকতে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

ললিতা। তা বেশ, আমি হার মানছি। বলুন, কি করতে চান। ওর গলাটা টিপে দিতে চান?

সুমোহিত। উঁ? না, তবে তাই করলেই বোধ হয় ভাল হয়।

ললিতা। ভাল হয় ত দিচ্ছেন না কেন, দিন গলা টিপে। না কি ও কাজটা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিতে চান?

সুমোহিত। না, না, ছিঃ, কি যে বলেন! আর পাখীটার ওপর আপনার এতই যখন মায়া, তখন ওটাকে মেরে ফেলার কথা ত উঠতেই পারে না।

ললিতা। আর কি তাহলে করবেন? উড়িয়ে দিয়ে ত দেখেছেন, ফিরে এসেছে। আবার উড়িয়ে দিয়ে দেখতে পারেন, লাভ কিছুই হবে না। আমরা দরজা জানালা এঁটে থাকলেও দোতলার কোন জানলা দিয়ে করিডরে এসে ঢুকবে। না, দিন্ ওটাকে শেষ ক'রে। আমি দুঃখ পাব, তা না হয় পাব। আমার কথাটা না ভাবলেই হ'ল।

সুমোহিত। না, না, আপনার কথাটা ভাবতে হবে বই কি?

(বাঁদিকের দরজা খুলে সুললিত ঢুকে এলেন।)

সুললিত। তুমি এখানে রয়েছ? রাত কিন্তু অনেক হয়েছে। শোবে না?

সুমোহিত। এই পাখীটার ভাবনায় আমার ঘুমটু সব উবে গেছে বাবা!

সুললিত। তোমাদের নিয়ে ঐ ত মুশকিল তোমরা খাও না পেট ভ'রে তাই ঘুম পায় না, আর ঘু না হলে যত রাজ্যের ভাবনা এসে পেয়ে বসে, তখ ভাবো, ভাবনার জন্যে ঘুম হচ্ছে না। (প্রস্থান।)

সুমোহিত। বলুন ত, ভাবনার সত্যিকারের কারণ থাকলেও কি না ভেবে কেউ পারে?

(হাঁটু মুড়ে, দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে মেঝেতে বসল।)

ললিতা। (একটু দূরে মেঝের ওপর সুমোহিতের আনা কম্বলটার ওপর ব'সে) কিন্তু ভেবেই বা কি করবেন? করবার কিছু যে নেই!

সুমোহিত। (দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে) আচ্ছা, আপনাদের বাড়ীর সদর দরজার চাবিটা কার কাছে আছে?

ললিতা। হয়ত মা'র কাছে আছে, কেন?

সুমোহিত। ওটা আমাকে এনে দেবেন?

ললিতা। কেন, সে চাবিটা নিয়ে কি করবেন আপনি? আর ওরা ত সদর-দরজা ভেঙে বাড়ীতে ঢুকে-ছিল, চাবিটা এখন কোন্ কাজে লাগবে?

সুমোহিত। (উঠে দাঁড়িয়ে, খাঁচাটা তুলে নিয়ে) তাহলে আর কথা নেই, আমি চললাম।

ললিতা। (উঠে দাঁড়িয়ে) সে কি, কোথায়?

সুমোহিত। আপনাদের বাড়ীতে এটাকে রেখে আসব, যেখানে এটা থাকত।

ললিতা। সে কি? (এগিয়ে এসে খাঁচাটা ধ'রে) না, না, কিছুতেই না।

সুমোহিত। সবকিছুতে আপনি যদি কেবল না না করেন, তাহলে ত আর পারা যায় না। চাল কয়েক-মুঠো, আর বেশ বেশী ক'রে খাবার জল রেখে দিয়ে আসব খাঁচাতে, গোলমাল যে ক'টা দিন চলবে, ও খেয়ে-দেয়ে ভালই থাকবে। আপনি ভাববেন না।

ললিতা। না, আপনি যাবেন না।

সুমোহিত। এ আপনার অন্যায় আবদার। আমি যাব।

(যাচ্ছিল, ললিতা খাঁচার একটা দিক্ শক্ত ক'রে চেপে ধরল।)

ললিতা। আমি আপনাকে যেতে দেব না।

সুমোহিত। (খাঁচা থেকে ললিতার হাত সরিয়ে দিয়ে) আমি যাবই, আমাকে বাধা দেবেন না আপনি।

ললিতা। (সুমোহিতের হাতটাকে চেপে ধ'রে) আপনি যেতে পাবেন না। আপনি কি পাগল হয়েছেন?

(সুমোহিত সে-হাতটা ছাড়িয়ে নিতে ললিতা তার অন্য হাতটা চেপে ধরল। সুমোহিত সে হাতটাও ছাড়াতে চেষ্টা করছে, কিন্তু ললিতা ইতি-মধ্যে সেটাকে দু'হাতে চেপে ধরেছে আর নিজের এক হাতে খাঁচাটা রয়েছে ব'লে ছাড়াতে পারছে না।)

সুমোহিত। আচ্ছা, আপনি এমন অবুঝের মত ব্যবহার কেন করছেন বলুন ত?

ললিতা। অবুঝ কি আমি, না আপনি? (হাত কাড়াকাড়ি চলছে) ওরা রাত জেগে পাড়া পাহারা দিচ্ছে, আপনাকে পথে পেলে আস্ত রাখবে?

সুমোহিত। পাশের ঐ পোড়ো জমিটার ওপর দিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে চ'লে যাব, কেউ দেখতে পাবে না। ছেড়ে দিন আমাকে, ছেড়ে দিন।

ললিতা। কিছুতে ছাড়ব না।

সুমোহিত। ছাড়ুন, ছাড়ুন বলছি। (খাঁচাটা রেখে দিয়ে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে।)

ললিতা। না, না, না, ছাড়ব না। আপনি বেশী জেদ করলে এখখুনি চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকব।

(বাঁদিকের দরজা খুলে সুললিত ও নারায়ণ, আর ডানদিকের দরজা খুলে নিরুপমা ও পদ্মা প্রায় একই সঙ্গে ঢুকলেন। চার জোড়া চোখের দৃষ্টি ওদের দু'জনের দিকে এবং পরস্পরের দিকে পর্য্যায়-ক্রমে পড়ছে। ওরা দু'জন পরস্পরের হাত ছেড়ে দিয়ে একটু স'রে দাঁড়াল।)

নিরুপমা। সুমু!

পদ্মা। লতা!

নিরুপমা। সুমু, কি হয়েছে রে?

পদ্মা কি হয়েছে রে লতা?...কথার জবাব দিচ্ছিস্ না কেন? এ আবার কি ঢঙ? কি হয়েছে বল্ না?

ললিতা। কি আবার হবে? কিছু ত হয় নি?

পদ্মা। কিছু আবার হয় নি! কি হলে তোদের কিছু হয়?

নারায়ণ। আঃ, চুপ কর ত তুমি। কিছু না জেনে না বুঝে গুচ্ছের কতগুলি বাজে কথা বলতে সুরু করেছ।

পদ্মা। তুমি চুপ কর। ঐ ক'রে মেয়েটার মাথাটা ত চিবিয়ে খেয়েছ, আবার আমাকে কথা শোনাতে এসেছ, লজ্জাও নেই।...ছি, ছি!...লতা, ঘরে চল্।...চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি যে? ঘরে চল্!

ললিতা। তুমি যাও, আমি একটু পরে যাচ্ছি।

পদ্মা। না, একটু পরে-টরে না, এখুনি চল্।

ললিতা। এখন আমার যাবার উপায় নেই। যেতে পারব না।

পদ্মা। তার মানে?

নিরুপমা। আমি যাই, শুয়ে পড়ি গে। (হাই তুলে) এত বেশী ঢুলছি যে হঠাৎ হয়ত কখন প'ড়ে যাব।

পদ্মা। আপনি ত শুতে যাবেনই বোন, আপনার আর কি?

নারায়ণ। নাঃ, এ ধরণের সব মন্তব্য দাঁড়িয়ে শোনাও এক যন্ত্রণা। আমিও চললাম।

(নিরুপমা হাই তুলতে তুলতে চ'লে গেলেন। নারায়ণ যাচ্ছেন বুঝেই মাথাটাকে একবার একটু চুলকে সুললিত ঢুকে গেলেন বাঁদিকের দরজায়, নারায়ণ তাঁর অনুসরণ করলেন।)

সুমোহিত। আপনি অকারণ এঁর ওপর রাগ করছেন। আমি এই পাখীটাকে আপনাদের বাড়ীতে রেখে আসতে যাচ্ছিলাম, উনি কিছুতেই আমাকে যেতে দেবেন না, আমি যাবই, উনি যেতে দেবেন না, আমি যাবই, উনি যেতে দেবেন না, এই থেকে ক্রমশঃ—

(পাখীটা হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ!)

পদ্মা। (তেড়ে গিয়ে) চুপ, চুপ, চুপ কর্, মুখপোড়া পাখী কোথাকার। জ্বালিয়ে খেলে একেবারে সবদিক্ দিয়ে। (সুমোহিতের দিকে ফিরে) আর তুমিও চুপ কর বাপু। ওর হয়ে ওকালতি করতে তোমাকে ত আমি ডাকি নি?...এই বজ্জাত পাখীটাই যত নষ্টের গোড়া। আজ রাত্রেই কাটারি দিয়ে কেটে ওকে দু'খানা ক'রে না রাখি ত কি বলেছি। তুই তাহলে যাবি না এখন লতা?

ললিতা। না।

পদ্মা। বেশ, যাস নে, কিন্তু আমিও ব'লে দিয়ে যাচ্ছি, আজ থেকে আমি তোর ভালতেও নেই, মন্দতেও নেই। থাক্ তুই তোর পাখী নিয়ে।...ছি, ছি!

(ডানদিকের দরজায় ঢুকে সেটাকে জোরে বন্ধ করতে গিয়ে করলেন না। আস্তে বন্ধ করলেন।)

সুমোহিত। কি একটা কাণ্ড বাধালেন, বলুন দেখি?

ললিতা। আমি বাধালাম?

সুমোহিত। তা নয় ত কি? আমাকে যদি যেতে দিতেন, আমার জন্যে আপনার দরদ যদি হঠাৎ এমন উথলে না উঠত, তাহলে ত এসব কিছু হতে পারত না।

ললিতা। ময়নাটাকে বাঁচাবার জন্যে আপনি মারা

পড়বেন, কি ক'রে সেটা বরদাস্ত করি বলুন। ওটা যেমন কেষ্টর জীব, আপনিও ত কেষ্টরই জীব ?

সুমোহিত। আমি কেবল ময়নাটাকে বাঁচাবার কথা যে ভাবছি না, তা আপনি বেশ ভাল ক'রেই জানেন। আমি আপনাদের কথাই বেশী ক'রে ভাবছি, আপনাদের প্রত্যেকের কথা। আর তাই আমি ঠিক করেছি, আমি যাবই, এটাকে রেখে আসব আপনাদের বাড়ী। এ নিয়ে আপনি যেন আবার একটা scene করবেন না।

ললিতা। এর অন্যথা বুঝি কিছুতে হবে না ?

সুমোহিত। কিছুতে না।

ললিতা। ঠিক ?

সুমোহিত। ঠিক।

ললিতা। বেশ, তাহলে চলুন।

সুমোহিত। (সন্দিগ্ধ ভাবে) চলুন ? চলুন মানে কি ?

ললিতা। চলুন মানে, চলুন, আমিও যাচ্ছি আপনার সঙ্গে। একলা যেতে আপনাকে আমি দেব না। যাই, আর একটা কম্বল নিয়ে আসি গে, মুড়ি দিতে হবে।

সুমোহিত। কি মুশকিল !

ললিতা। হ্যাঁ, তা মুশকিল মনে করলে মুশকিল ত বটেই, কারণ আমি যেমন আপনাকে আটকাতে পারছি না, আপনিও পারবেন না আমাকে আটকাতে।

সুমোহিত। তার মানে যেতে আমাকে কিছুতেই দেবেন না ? আপনাকে সঙ্গে যেতে আমি দেব না সে আপনি বেশ ভাল ক'রেই জানেন।

ললিতা। হ্যাঁ, সেরকম সন্দেহ মনে একটু আছে বই কি ? (মৃদু একটু শব্দ ক'রে হাসল।)

সুমোহিত। আমার কিন্তু হাসি পাচ্ছে না মোটেই।

(ললিতার কাছ থেকে স'রে গিয়ে অন্যদিকে মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।)

ললিতা। (তার কাছে গিয়ে) আপনি মিথ্যেই ভাবছেন। মা যেরকম চটেছেন পাখীটার ওপর, ওর সদ্‌গতি একটা আজ হয়েই যাবে। আমার মাকে ত আপনি জানেন না ? তাঁর যে কথা সেই কাজ।

সুমোহিত। আপনি বলছেন, উনি এটাকে, ঐ যে ব'লে গেলেন, কাটারি দিয়ে—

ললিতা। ঠিক তাই ! তাই বলি কি, পাখীটাকে তাঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

সুমোহিত। আপনার খুব কষ্ট হবে যে !

ললিতা ! তা হোক। চলুন, ঠিক ক'রে ফেলা যাক, বাড়ী ছেড়ে কেউ বেরুব না, কাউকে কারুর আর আটকাতেও হবে না তাহলে, দু'জনেই ঘুমোতে যেতে পারব। বেশ ঘুমও পেয়েছে।

সুমোহিত। তাই চলুন।

(বাঁদিকের দরজাটা ঠেলে সুমোহিত, আর ডানদিক্‌কার দরজা দিয়ে ললিতা ঢুকে গেল, তার পর দুটো দরজা ভেজিয়ে দিল দু'জনে। কয়েক মিনিট স্টেজ খালি রইল। তার পর একটা দরজা সন্তর্পণে খুলে সুমোহিত এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দরজাটা খুলে ললিতা এল স্টেজে।)

সুমোহিত। ও কি ? আপনি না ঘুমোতে গেলেন, আবার উঠে এলেন কেন তবে ?

ললিতা। আপনিও ত শুতেই গিয়েছিলেন। আপনিই বা উঠে এলেন কেন ?

সুমোহিত। যদি বলি, বিশ্বাস করবেন ?

ললিতা। বিশ্বাসযোগ্য কথা যদি হয়, কেন বিশ্বাস করব না ?

সুমোহিত। একটু মায়া প'ড়ে গিয়েছে আমারও ঐ, ঐ পাখীটার ওপর। আপনার মা সত্যিই যদি ওটাকে···ঐ যে ব'লে গেলেন, কাটারি দিয়ে—

ললিতা। কেটে দু'খানা ক'রে রাখবেন।

সুমোহিত। ওটা হতে দিতে চাই না। তাই ভাবছি, রাত জেগে পাহারা দেব। আর খাঁচাটার ঠিক পাশেই ব'সে থাকব এই কম্বলটা নিয়ে। ও যখনই ডেকে উঠতে যাবে, দু'ভাঁজ করা কম্বল দিয়ে খাঁচাটাকে চাপা দেব, থেমে গেলেই কম্বল সরিয়ে নেব।

ললিতা। সারারাত এই রকম ক'রে জাগবেন ?

সুমোহিত। তাতে আর কি হয়েছে ? ঘুমোনোটা বড়, না সকলে মিলে নিশ্চিন্ত মনে বেঁচে থাকাটা বড় ?

(সুমোহিত খাঁচাটার পাশে হাঁটু মুড়ে বসলে ললিতাও একটু দূরে বসল মেঝেতে, একটি হাতের ওপর শরীরের ভার রেখে।)

সুমোহিত। ও কি ? বসলেন যে ?

ললিতা। থাকি ব'সে। আর ত কিছু করতে পারব না।

সুমোহিত। (যেন বেশী খুশী হয় নি) আবার কি করতে হবে ?

(পদ্মা ডানদিকের দরজাটা সন্তর্পণে খুলে গলাটা একটু বাড়ালেন, তার পর এদের দেখতে পেয়ে এবারে দড়াম্‌ ক'রে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন। এরা দু'জনেই চমকে উঠল একটু, তার পর দু'জনেই চোখ-চাওয়া-চাওয়ি ক'রে মুখ টিপে হাসল।)

দৃশ্যান্তর।

তৃতীয় দৃশ্য

(১৮ই আগস্ট, সকাল ন'টা। অন্নপূর্ণা গার্লস্ স্কুলের ক্লাস ঘর। ভুপেন ব'সে আছে চেয়ারটায়, আর একটা জোড়া বেঞ্চির উঁচু বেঞ্চিটার উপর পা ঝুলিয়ে ব'সে নির্ম্মল সিগারেট ধরাচ্ছে। আট-নয় বৎসরের একটি ছেলের কান ধ'রে টানতে টানতে আশুর প্রবেশ। ছেলেটার হাতে একটা জিভে গজা, কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সে সেটাতে কামড় দিচ্ছে। জোড়া বেঞ্চিগুলোর আর একটাতে এসে বসল আশু, তার পর ছেলেটার কানটা ধ'রে থেকেই)

আশু। বল্, আর কখনো করবি না এরকম, নয়ত ছাড়ব না।

ছেলে। আর করব না···আঁ···আঁ···(জিভে গজায় কামড়) আঁ···আঁ—

আশু। এখন বলছিস করবি না, কিন্তু জানি করবি।

ভুপেন। কি হয়েছে, মারছ কেন ওকে?

নির্ম্মল। আশু যে আবার কারুর গায়ে হাত তুলতে পারে তা ত জানা ছিল না!

আশু। দেখ না, সব ক'টাকে বললাম এত ক'রে, তোমরা খাবার হাতে ক'রে রোশনের ঘরের সামনে কেউ যাবে না, তা একটু কি কথা শুনল? ওকেই দেখিয়ে দেখিয়ে ওদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গজা খাচ্ছে!

(ছেলেটা চুপ ক'রে এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল, এইখানটায় আবার আগের কান্নার জের টেনে গজায় কামড় দিল।)

আশু। (শেষ একবার ওর কানটায় ভাল ক'রে মোচড় দিয়ে) যাঃ, পালা, লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। আর যদি কখনো দেখি ওরকম করতে ত মেরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেব।

(গজায় আর একটা কামড় দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছেলেটার পলায়ন।)

নির্ম্মল। এ নিয়ে আবার ক্যাম্পে না হুলুস্থুল হয়।

আশু। হোক, কি করব? পারলাম না নিজেকে সামলাতে।

ভুপেন। বদ্‌মাইসি করলে মার খাবে বই কি; বিয়েবাড়ীতে বরযাত্র আসেনি, সেটা এদেরও মনে রাখা ভাল।

নির্ম্মল। কোথায় আর মনে রাখে? কর্ম্মীরা যে নিজেদের টাকায় ক্যাম্প চালাচ্ছে না, সেটা তাদেরই সারাক্ষণ মনে রেখে চলতে হয়।

ভুপেন। রোশন, না কি নাম মেয়েটির, তাকে পারলে না খাওয়াতে?

আশু। না। মেয়েটাকে যে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে এক ফাঁকে খাইয়ে দেব, তারও জো নেই; ওর স্নেহময়ী মা সারাক্ষণ ওকে চোখে চোখে রাখছে।

ভুপেন। কিন্তু মেয়েটা না খেয়ে মরবে এও ত হতে পারে না? উপায় একটা ভেবে বের কর।

আশু। অনেক ভেবেছি। জোরজুলুম করা ছাড়া অন্য উপায় কিছু ত দেখতে পাচ্ছি না।

ভুপেন। খবর্দ্দার, অমন কাজও ক'রো না। ওরা বড়ঘরের মেয়ে, প্রাণের চেয়ে মানের দাম ওদের কাছে বেশী। উল্টো উৎপত্তি হয়ে একটা অত্যন্ত বিশ্রীরকমের অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

আশু। তবে আর আমার দ্বারা হবে না। ক্যাম্পের ভার তোমারা আর কাউকে দাও।

ভুপেন। আর কেউ যদি পারে, তুমিও পারবে।

আশু। আমি পারছি না।

নির্ম্মল। আচ্ছা, আশু। ভট্‌চায্যি বামুনের ছেলে হয়েও তুমি ওদের দলে ভিড়লে কেন বল ত? শুনছি, কাল রাত থেকে তুমিও নাকি হিঁদুর ছোঁওয়া খাচ্ছ না?

ভুপেন। তুমি খাচ্ছ না কেন?

আশু। খেতে পারছি না। তোমরা ত বাইরে বাইরেই ঘোর বেশী, আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা ক্যাম্পে থাকতে হয়। ঐ মেয়েটার গোঙানির শব্দ যখন কানে আসে, নিজে খাব কি, ঐ রেফুজীগুলো খাচ্ছে দেখলে তাদেরও থালাসুদ্ধ ভাত বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। হয়ত বেসামাল হয়ে কখন সেইরকমের কেলেঙ্কারি কিছু ক'রে ফেলব, তাই বলছিলাম, তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও।

ভুপেন। ছেড়ে দেব মানে? তোমার মুখে এ ধরণের কথা শুনব, আশা করিনি।

আশু। আমি সত্যিই পারছি না ভুপেন। আমাকে না হয় ডিফেন্স্ পার্টিতেই তোমরা দাও, আমি সেইখানে কাজ করব, এই ক্যাম্পে আর নয়।—মেয়েটার একটু জ্বরও হয়েছে রাত থেকে। অবন ডাক্তার বললেন, ডিস্‌পেন্সারি ত সব বন্ধ, তাঁর বাড়ী থেকে ওষুধ পাঠিয়ে দেবেন, কিন্তু মেয়েটার রাক্ষসী মা তাও ওকে খেতে দেবে না।

নির্ম্মল। খাবারে যখন বিষ মেশানো তখন ওষুধ ত আনকোরা বিষ!

ভূপেন। কথা হচ্ছে, মেয়েটার জ্বরও বোধ হয় হয়েছে শক্ আর ক্ষিদের ছট্ফটানি থেকে। ওকে খাওয়াতে হবে। কি ক'রে সেটা সম্ভব হয়, ভেবে ঠিক কর। আশু ক্যাম্পের কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে গেলে সমস্যাটা ত মিটছে না?

আশু। চ'লে আমি যাবই ভূপেন। যদি জোর কর, পালাব।

ভূপেন। ভাবতাম, তোমার মধ্যে পদার্থ কিছু আছে, এখন দেখছি সেটা ভুল।

আশু। ···ঐ শোন···কাঁদছে!

নির্ম্মল। ···কই, কিছু শুনতে পাচ্ছি না ত? ভূপেন, তুমি শুনতে পাচ্ছ?

ভূপেন। কই···না!

আশু। আমি শুনতে পাচ্ছি। শুনে শুনে মুখস্থও হয়ে গিয়েছে।···মা, আমায় খেতে দাও, নানী, আমায় খেতে দাও। ঐ ত ওরা খাচ্ছে, ওরা ত খাচ্ছে। এইটুকু খেতে দাও, বেশী না, এইটুকু। আমার যে বড্ড কষ্ট হচ্ছে, আমি যে আর পারছি না, আমি যে ম'রে যাচ্ছি, মা, নানী।···উঃ! (দু'হাতে দু'কান চাপা দিয়ে) এ আর শোনা যায় না।

নির্ম্মল। (আশুর পিঠে একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে) ক্যাম্পের কাজ আশুকে দিয়ে সত্যিই আর হবে না ভূপেন। শেষটা কি ক্ষেপে যাবে? ওকে ছেড়ে দাও তুমি। ডিফেন্স্ পার্টিতে কাজ করতে চাইছে, তাই করুক গিয়ে।

ভূপেন। ঐ মুরোদ নিয়ে করবে ডিফেন্সে কাজ? মারপিট দেখলে ত মূর্চ্ছা যাবে!

নির্ম্মল। কিন্তু এখানে না খেয়ে কাজ করবেই বা কি ক'রে? ক'দিন করবে? অসুখে পড়বে যে!

ভূপেন। আচ্ছা যাও।···যাও আশু। অনিমেষকে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে চ'লে যাও।

আশু। বিকেলে এসে কাজ বোঝাব, এ বেলাটা তোমরা আমাকে একটু বিশ্রাম করতে দাও।

ভূপেন। আচ্ছা, যাও, বিশ্রাম কর গে।

(আশুর ডানদিক্ দিয়ে প্রস্থান।)

একদম বাজে মার্কা। নিউরটিক।

নির্ম্মল। মনটা বড্ড নরম ওর।

ভূপেন। এসব লোক দিয়ে সত্যিকারের কোন বড় কাজ হয় না কখনও।

(একটা খাতা হাতে ক'রে বাঁদিক্ থেকে ক্যাম্পের সেক্রেটারী অনিমেষের প্রবেশ।)

অনিমেষ। এইমাত্র আরো সতেরজন এল। (খাতার পাতায় চোখ বুলিয়ে) পার্ক সার্কাস থেকে পাঁচ, এণ্টালী থেকে সাত, বেলেঘাটা থেকে দুই, আর তিনজন এসেছে, তিনজনই স্ত্রীলোক, তারা নিজেদের নাম পর্য্যন্ত বলতে পারছে না, এমনিই তাদের অবস্থা! এখন এত লোকের জায়গা হয় কি ক'রে ক্যাম্পে। আশু কোথা?

ভূপেন। আশু গেছে ডিফেন্সের কাজে, বিকেলে তোমায় কাজ বুঝিয়ে দেবে। ক্যাম্প্ এখন তোমাকেই চালাতে হবে।

অনিমেষ। আশু ক্যাম্পের কাজ ছেড়ে দিলে কেন?

ভূপেন। সেকথা পরে হবে।

অনিমেষ। কিন্তু এত লোককে আমি এখন ধরাই কোথায়? (প্রস্থান।)

(নেপথ্যে বাঁদিকে অস্পষ্ট কোলাহল। ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী পীযূষের প্রবেশ।)

পীযূষ। আরও একুশজন এল এইমাত্র। কি এর পর করব আমরা? ক্যাম্পে গোলমাল সুরু হবে এর পর।

(বাইরে বাঁদিকে অস্পষ্ট কোলাহল।)

নির্ম্মল। গোলমাল সুরু বোধ হয় হয়েছে।

(বাঁদিক্ থেকে ১৭।১৮ বৎসর বয়সের একটি তরুণীর প্রবেশ। কুসুমফুলী রঙের শাড়ীটার আঁচল কোমরে জড়ান।)

তরুণী। আইচ্ছা, কন্ দেখি, আপনাগো কিরকম বিবেচনা? অত বড় ঘরডা তিনডা মাইয়া মানুষরে দিয়া রাখছেন, আর এইদিগে আমাগো বসনের জাগা নাই। তবু যদি হিন্দু হইত ত বুঝতাম। ওগো মুসলমান ক্যাম্পে পাঠাইয়া দেন না ক্যান্?

ভূপেন। কে নিয়ে যাবে?

নির্ম্মল। যারা যাবে তারা ফিরে আসতে পারবে প্রাণ নিয়ে?

ভূপেন। হিন্দু ছেলেরা মুসলমান জেনানা ফিরোতে এসেছিল, না নিয়ে পালাচ্ছিল, বুঝিয়ে বলবার সময় পাবে না।

(বাইরে বিভিন্ন কণ্ঠে: থোন্ ফালাইয়া···ওদের আমরা কেন এখানে থাকতে দেব?···এইরকম কইরা থাকন যায়?···আরে, ঘাড় ধইরা বাইর কইরা দেও···খতম কিজিয়ে, খতম কিজিয়ে। দু-একটা টেবিল চেয়ার ওল্টানোর শব্দও কানে এল। পীযূষ আর সেই মেয়েটি ছুটে বেরিয়ে গেল বাঁদিক দিয়ে।)

ভুপেন। নির্ম্মল, আমরাও যাই চল। এদের এক্ষুণি থামিয়ে দেওয়া দরকার। ছোট্ট অসুস্থ মেয়েটা ভীষণ ভয় পাবে, যদি বুঝতে পারে।

(যাচ্ছিল,—বেগে অনিমেষের পুনঃ প্রবেশ।)

অনিমেষ। ভুপেন, ভাই! একটা বড় রকমের গোলমাল পাকিয়ে উঠছে মনে হচ্ছে।

ভুপেন। কি রকম?

অনিমেষ। দুটো লোক এসেছিল এইমাত্র, গুণ্ডা-ধরণের চেহারা, একজন রাজস্থানী আর একজন শিখ। খুব শাসিয়ে গেল। বললে, আপনারা কি মুসলমান রেখেছেন এই ক্যাম্পে? বললাম হ্যাঁ, রেখেছি, তাতে কি হয়েছে? বললে, কি যে হয়েছে তা মালুম হয়ে যাবে একটু পরেই। তার পর ঘুরে ঘুরে চোখ পাকিয়ে চারদিক্‌টাকে ভাল ক'রে দেখে নিয়ে চ'লে গেল।

ভুপেন। চল, যাচ্ছি, দেখি।

(সকলের প্রস্থান।)

দৃশ্যান্তর।

চতুর্থ দৃশ্য

(১৮ই আগস্ট, বেলা সাড়ে এগারোটা। অন্নপূর্ণা গার্লস্‌ স্কুলে রোশনদের ঘরের সমুখকার চওড়া বারান্দা। পেছনে এবং বাঁদিকে অস্পষ্ট কোলাহল। ভুপেন, নির্ম্মল, অনিমেষ ও পীযূষের প্রবেশ ডানদিক্ থেকে। সকলেরই হাঁটাচলা ধরণ-ধারণে উদ্বেগের ভাব। পেছনে রোশনদের ঘরের দুটো দরজা, ভেজান।)

ভুপেন। বাইরের দুটো দরজাই বন্ধ আছে?

পীযূষ। বন্ধ আছে। পাহারাও রেখেছি দরজাতে।

(বাঁদিকে, একটু দূরে একটা দরজায় করাঘাত, সঙ্গে সঙ্গে একাধিক পুরুষ কণ্ঠেঃ দরজা খোল, দরজা খোল, কে আছ ওখানে, দরজা খোল শীগগির। একটু পরে সম্ভবতঃ পদাঘাত এবং তার চেয়েও জোরালো আঘাতের শব্দ তার পর আবার দরজা খুলে দাও, শীগ্‌গির দরজা খুলে দাও, নয়ত আমরা দরজা ভেঙে ঢুকব। রোশনদের ঘরের ভেতর থেকে ভয়-ব্যাকুল চাপা আর্ত্তনাদের শব্দ কানে এল।)

ভুপেন। সকালে গোলমাল সুরু হতেই ডিফেন্স পার্টির কয়েকটা ছেলেকে এখানে এনে রাখা উচিত ছিল।

নির্ম্মল। আমি বলেছিলাম ওদের কয়েকজনকে। সবাই বললে, আমাদের ক্যাপ্‌টেন এখন নেই, টহল দিতে বেরিয়েছে, তার হুকুম না পেলে ত আমরা যেতে পারব না? মুসলমান ঠ্যাঙানোর ব্যাপার হলেও বা কথা ছিলঃ মুসলমানের হয়ে হিন্দু ঠ্যাঙানোর কাজে নিজের দায়িত্বে যেতে সাহস হচ্ছে না।

(দরজায় আঘাতের শব্দ ক্ষিপ্রতর ও প্রচণ্ডতর হয়ে উঠল। মনে হল, এবারে আরও একটা দরজায় করাঘাত ইত্যাদি চলছে। বাঁদিকে এবং পেছনে কোলাহল। ঘরের ভেতরে মৃদু আর্ত্তনাদ।)

ভুপেন। দরজা দুটো—

অনিমেষ। দরজা দুটো খুব মজবুত, ভাঙতে পারবে না।

ভুপেন। তাহলে তুমি যাও পীযূষ, দেখে এস, ওগুলোকে আরও মজবুত করা যায় কি না।

(পীযূষ বেরিয়ে গেল বাঁদিক্ দিয়ে। কোলাহল ক্রমে বাড়ছে। কোলাহল ক্রমে কাছে আসছে। পীযূষ ছুটে ফিরে এল।)

পীযূষ। ভুপেন! ওরা ঢুকে পড়েছে। ভেতর থেকে কে দরজা খুলে দিয়েছে ওদের!

ভুপেন। কি কাণ্ড! (রোশনদের ঘরের একটা দরজার কাছে গিয়ে) আপনারা দরজায় খিল দিয়ে দিন, দুটো দরজাতেই খিল দিয়ে দিন। কিছুতেই খুলে দেবেন না দরজা। আমরা এইখানেই আছি, ভয় পাবেন না।

(সঙ্গে সঙ্গেই বাঁদিক্ থেকে চারজন গুণ্ডা চেহারার ছেলে ঢুকল। তাদের একজনের হাত চেপে ধ'রে)

ভুপেন। বলাই, তুমি?

বলাই। (এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) স'রে দাঁড়াও!

(ওরা রোশনদের ঘরের দিকে যাচ্ছিল, ভুপেনের দল বাধা দিতে গেলে দুই দলে প্রচণ্ড হাতাহাতি বাধল। ক্রমে ঘুঁষোঘুঁষি, জড়াজড়ি, ধ্বস্তাধ্বস্তি। কেউ কেউ প'ড়ে যাচ্ছে, আবার তখুনি উঠে লড়ছে। হঠাৎ ধোঁয়ায় স্টেজ ভ'রে গেল, আর, আগন্তুক দল চীৎকার ক'রে বলতে সুরু করল, "আগুন, আগুন, আগুন!" তাদের দলের লোক আরও ছিল আশেপাশে, তারাও তারস্বরে চেঁচাতে লাগল, "আগুন, আগুন!" সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল, "বেরিয়ে আসুন, বেরিয়ে আসুন, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসুন সবাই! আগুন, আগুন, শীগ্‌গির বেরিয়ে

আসুন।" ব্যাপারটা যে কি তা বুঝতে ভূপেনের দলের একটু সময় লাগল। যখন বুঝল, "না, বেরুবেন না, খবর্দ্দার বেরুবেন না" ব'লে তাদের চীৎকার সে অট্টরোলের তলায় চাপা প'ড়ে গেল। বেরিয়ে আসতে যারা দলছে তারা শত্রুপক্ষ না মিত্রপক্ষ বোঝাও সহজ ছিল না। দরজা খুলল, অস্ফুট আর্ত্তনাদের শব্দ কানে এল, আর চক্ষের নিমেষে মণ্ডামার্কা ছেলেদের একজন বিদ্যুৎবেগে ঢুকে রোশনকে পাঁজাকোলা ক'রে নিয়ে তেমনি বেগে বেরিয়ে গেল ডানদিক্ দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ দলের অন্য ছেলেরাও বেরিয়ে গেল তার পেছন পেছন। নির্ম্মল, পীযূষ, অনিমেষ, ভূপেন ছুটে গেল সেইদিকে। ঘরের ভেতর থেকে আর্ত্তকণ্ঠের চীৎকার, "খোদা! খোদা! এ কি করলে? এ কি হ'ল? রোশনকে কেন নিয়ে গেল ওরা, কোথায় নিয়ে গেল? রোশন, রোশন, রোশন!" দৌলৎ ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সাঈদা এসে তাকে ধ'রে ফেললেন। দৌলৎ "ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও" ব'লে চীৎকার করছে, প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে। "কি হ'ল, কি হয়েছে" বলতে বলতে রেফুজীরাও এসে জড় হচ্ছে।*

পটক্ষেপ।

ক্রমশঃ

* গত সংখ্যা প্রবাসীর ১০২ পৃষ্ঠায় পাত্রপাত্রী পরিচয়ে 'নিরুপমা ওলিতের স্ত্রী' পড়তে হবে।

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ

শ্রীবিভা সরকার

ভারতের এই পুণ্যভূমিতে সেই কোন্ গত যুগে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের কণ্ঠে, উদাত্তস্বরে সামগান ধ্বনিত হ'ত। আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে আরণ্যকের স্নিগ্ধ ছায়াতল থেকে উত্থিত হয়ে সে ধ্বনি দিকে দিগন্তে উদ্বেলিত হয়ে ছুটে যেত। সেই পুণ্য যুগ যে-মহামানব আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত রূপে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন, সেই বিরাট্ প্রাণপুরুষ, পরিপূর্ণতার পুরোহিত মহামানবটিকে স্মরণ করি। তিনি ছিলেন মহতো মহীয়ান, নিত্যশুদ্ধ রাজর্ষি। যিনি আমাদের জন্য যুক্তকরে প্রার্থনা করে গেলেন----

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়"

সমস্ত জাতিকে তিনি অসত্য থেকে সত্যে, অন্ধকার থেকে আলোয়, অজ্ঞানতার তমসা থেকে জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্য সত্তায় উত্তীর্ণ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন তাঁকে নিবেদন করি প্রাণের প্রণাম।

একটি মানুষের মধ্যে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বহু রূপ। কখনও তিনি সাধারণ নগণ্য নরনারীদের সুখ দুঃখে রত। মাটিমায়ের কোলের ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট খেলার সমসাথী, সমব্যথী তিনি। আবার কখনও দেখি রাজবেশে রাজসভায় বিদগ্ধ জন-সমাজের তিনি শীর্ষস্থানে। আবার কখনও পরম বৈরাগী। বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙে রাঙা তাঁর অঙ্গের আঙরাখা। আবার দেখি বাউলের একতারা হাতে পরম উদাসী তিনি। একাধারে তিনি ঋষি, তিনি যুগস্রষ্টা পরম ঋত্বিক, আবার স্নেহে করুণায় পরম কারুণিক। কাব্যকলায় জগৎসভায় পরম রসিক।

রবীন্দ্রনাথ অভিজাত কবি। তাঁর সহজাত সংযম, তাঁর সমস্ত ভাব, রস ও বৈচিত্র্যকে আতিশয্য থেকে সকল সময় সযত্নে রক্ষা করে এসেছে। তাঁর কাব্যকলা গভীর শান্ত রসে মগ্ন। তিনি চিরসুন্দরের উপাসক এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁর সৃষ্টি কখনও সংযমের ছন্দ ভেঙ্গে অসুন্দরের উপাসনা করেনি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ, বৈষ্ণব-সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য, বিশেষ করে কালিদাস ভবভূতির কাব্য ছায়ায় ওতপ্রোত হয়ে আছে কিন্তু কোনখানেই তাঁর স্বকীয়তা বা মৌলিকতা হারায় নি। জগৎ কবি সভায় তিনি তাই "একমেবাদ্বিতীয়ম্"।

যৌবনের, চিরনবীনের উপাসক তিনি—সরসতায় ভাবরসের সজীবতায় তাঁর কাব্য কানায় কানায় ভরা। কিন্তু এ সবই যেন তাঁর বাহ্যরূপ। এ বিশ্বে বিরল পুরুষ তিনি, তিনি আজন্ম ব্রহ্মজিজ্ঞাসু। যদি বলি ব্রহ্মবিদ্যা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন অত্যুক্তি হবে না। এ তাঁর জন্ম-

জন্মান্তরের পুণ্য সংস্কার। সব চঞ্চলতা, সব ব্যাকুলতাকে ছাপিয়ে একটি একক ধ্যানমৌন নিঃসঙ্গ বৈরাগীকে আমরা আবাল্য রবীন্দ্র-চরিত্রে খুজে পাই। জগৎসভায় তাঁর আসন পাতা, তিনি বিশ্বসভায় সভাকবি এ কথা সত্য কিন্তু সে যেন তাঁর বাহ্যরূপ—আসলে তিনি অন্তরের নিভৃত লোকে বিশ্বরাজের চিরউপাসক আনন্দময়ের নিত্য সহচর, অন্তরে তাঁর বাউলের ঘর-ভোলানো একতারা চিরন্তন বেজে চলেছে। জীবনের চলার পথে চিরপথিক তিনি। মানুষের তিনি ব্যথার ব্যথা, তিনি চিরমরমীয়া। তিনি যে জন্ম-সাধক, জন্ম-উদাসী এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আমরা তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত জীবনস্মৃতি থেকে তুলে ধরতে পারি। এ কথা আমরা সকলেই জানি, তাঁর সংযত-বিদগ্ধ মন চিরদিনই আত্মকথা প্রচারে কুণ্ঠিত হয়েছে শুধু কথার ফাঁকে ফাঁকে মনের অনবধানতায় যে সামান্য টুকিটাকি কথা তাঁর আত্ম সম্বন্ধে প্রকাশিত হয়েছে, আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট, তাই অনেক।

অতি শৈশবের কথাই বলি। তিনি তখন দশ এগার বছরের বালকমাত্র। সবে তাঁর উপনয়ন সংস্কার হয়েছে। এমনি এক দিনে একান্তে তিনি গায়ত্রী মন্ত্র জপে বসে এক অদ্ভুত অপরূপ অনুভূতি পেয়েছিলেন। এটি তাঁর সাধক-জীবনের প্রথম ব্রহ্ম উপলব্ধি বলা যায়। তিনি বলছেন, "একদিনের কথা মনে পড়ে—আমাদের পড়িবার ঘরে সান-বাঁধান মেঝের এক কোণে বসিয়া গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই জল পড়িতে লাগিল।" গায়ত্রীর তত্ত্ব বোঝবার বয়স তখন তাঁর নয়। এটি বলব তাঁর জন্ম-সংস্কারের প্রভাব। ব্রহ্মর্ষি পিতার তিনি প্রিয় পুত্র। অতি বালক অবস্থাতেই তাঁর হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর রূপ দর্শনের সৌভাগ্য ঘটেছিল। অতি শৈশবেই তিনি সেই মহাত্মপুরুষের স্পর্শ অন্তরের গভীরে উপলব্ধি করেছিলেন। আত্মসাক্ষাৎকারের বীজটি নিয়েই তিনি জন্মলাভ করেছিলেন, তাই তিনি আজন্ম নির্জনতা-প্রিয় নিঃসঙ্গ একক মানুষ।

জীবনস্মৃতির আর এক পাতায় আমরা তাঁর কাছে শুনি যখন বয়স হয়েছে আঠারো কি উনিশ "সদর স্ট্রীটের রাস্তাটা যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে বোধ করি ফ্রী-স্কুলের বাগানের গাছ দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমি সেই দিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল, তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল।" এই যে তাঁর উপলব্ধি, এ উপলব্ধির প্রভাব তাঁর জীবনে আজন্ম তরঙ্গায়িত ছিল। তাই উদিত সূর্য্য তাঁর নিত্য সহচর। যেদিন সূর্য্যোদয় তাঁর দর্শন হ'ত না সেদিনটাই তাঁর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছে বলে মনে হ'ত। নবারুণের কিরণ ছটায় তিনি সেই পরম জ্যোতির্ম্ময়কেই আভাস পেতেন। তাঁর কাব্যে তাই সূর্য্য বন্দনার অন্ত নেই। মহতের ঘরে তাঁর জন্ম। মহর্ষির মত পিতার আবাল্য সংসর্গ লাভ জন্মান্তরের সুকৃতি বিনা সম্ভব নয়।

সেই অতি বাল্যকালে তপস্বীদের বিচরণভূমি অধ্যাত্ম মহিমায় ধ্যানমগ্ন নাগাধিরাজ হিমালয়ের বুকে বসে ব্রহ্মর্ষি পিতার কাছে গীতামৃত পান করেছিলেন তিনি—পাঠ করেছিলেন মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ। তিনি বলছেন, "আর আমি পিতার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্টুভ ছন্দের রামায়ণ পড়িয়া আসিয়াছি, এই খবরটাতে মাকে সকলের চেয়ে বেশী বিচলিত করিতে পারিয়াছিলাম।" তিনি আরও বলেছেন, "প্রায় প্রতিদিনই বিশুদ্ধ উচ্চারণে অনর্গল আবৃত্তি করেছি। উপনিষদের শ্লোক।" সেই অতি শৈশবেই তাঁর বেদ উপনিষদে দীক্ষা হয়েছিল যোগ্যতম মানবশ্রেষ্ঠ গুরুর কাছে এ তাঁর জন্মান্তের শুভ সংস্কার ছাড়া আর কি বলব।

রবীন্দ্রনাথ ঋষি কবি। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক। আপন আত্মসাধনায় সেই পরমাত্মার একাত্ম হয়ে তিনি আজন্ম দীপ্তিমান। আবাল্য তিনি একান্তপ্রিয় নিঃসঙ্গ লাজুক মানুষটি ছিলেন। বিশ্বের কোলাহলে তাঁর ঠাঁই ছিল না। তাই ত তিনি মহৎ পিতার নির্জ্জন নিরালা আশ্রমের ছাতিম ছায়ায় বসে পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ লাভ করতেন। তাই ত তিনি বন্ধুর রুক্ষ রাঢ়ভূমিতে শান্তির আশ্রম রচনা করে হারিয়ে যাওয়া বৈদিক যুগের মত উদার নীলাকাশের চন্দ্রাতপের নীচে মাটিমায়ের মুক্ত কোলে মানবশিশুদের মুক্তির আস্বাদন, পরম আনন্দের আস্বাদন দিতে প্রাণপণ করে গেছেন। একক একলা মানুষ একটি যুগ সৃষ্টি করে গেছেন। একটি বিশ্ব-নিকেতন রচনা করে গেছেন।

এই বিশ্বে বিরল মানুষটিকে ভাল করে উপলব্ধি করার জন্যও জন্মান্তের সুকৃতির প্রয়োজন। আজ তাঁর শতবার্ষিকীর দ্বারে এসে এ প্রশ্ন জোর করে করতে পারি, আমাদের মধ্যে কয়জন তাঁকে উপলব্ধি করতে পেরেছি? কয়জনে তাঁর রচনা সত্যকার পাঠ করার মত করে

পড়েছি? এত বড় একটি বিরাট্ প্রতিভাকে আমাদের মধ্যে পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেও আমরা তাঁকে গ্রহণ করতে পারি নি। তিনি আমাদের অনেক উর্দ্ধেই রয়ে গেছেন। মহৎ কিছু গ্রহণ করার যে মহিমা, সে কৃতিত্ব মনে হয়, আমরা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি, নিজেদের বঞ্চিত করেছি। দিলেই নেওয়া যায় না—গ্রহণ করতে পারার জন্যও একটা সুকৃতি থাকা চাই।

একদিন এই তপোনিষ্ঠ ভারতভূমি থেকে ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—তমসার পারে সেই জ্যোতির্ময় মহান্ পুরুষকে আমি জানিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠেও সেই একই ধ্বনির প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই, "দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।"

"অনন্ত মৌনের বাণী" তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। এ বাণী সেই পরম ব্রহ্মেরই আহ্বান।

"রূপের পদ্মে অরূপ মধুপান" তিনি প্রাণভরে করেছেন, তিনি বলেছেন,—

"আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ মধুপান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে—"

আজন্ম তিনি সূর্য্য কিরণের মতই নিজেকে বিশ্বের গোচরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন "বিশ্ব মানবের মহাযজ্ঞে আনন্দের হোমহুতাশনে আমার জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ লাভ ক্ষতিকে পূর্ণ আহুতির মত সমর্পণ করে দেবার জন্যে আমার অন্তরের মধ্যে কোন তপস্বিনী মহা-নিষ্ক্রমণের দ্বার খুঁজে বেড়াচ্ছে" আজন্ম তিনি নিজেকে রিক্ত করে উজাড় করে বিশ্বের দরবারে বিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ নিষ্ক্রমণ তাঁর সত্যের পথে, জ্ঞানের পথে, অমৃতের পথে চিরযাত্রা। তমসা থেকে মহাজ্যোতিতে ওতপ্রোত হয়ে যাওয়ার অনমনীয় আকাঙ্ক্ষা।

তিনি বলছেন, প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্য যে, যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্ত্বাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি যিনি সকল সত্ত্বার আত্মীয় সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুশীতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে বিচিত্র ভাবে আমার প্রাণ খুশী হয়ে উঠেছে—বলে উঠেছে,'কোহ্যে বানাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দ ন স্যাৎ॥'

এই পৃথিবীকে তিনি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। ভালবেসেছিলেন, তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে বলে যেতে পেরেছেন, "সমস্ত আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভাল বেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। আমি এসেছি ধরণীর মহাতীর্থে—" এ জীবন তাঁর তীর্থযাত্রা, এ পৃথিবী তাঁর মহাতীর্থ। এ তীর্থে আসা তাঁর সফল হয়েছে, সার্থক হয়েছে, তাই জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখে আমরা শুনেছি তাঁর অদ্ভুত আত্ম উপলব্ধির কথা—তিনি বলছেন, 'নিজের ভিতরকার এই প্রাণময় রহস্যকে, তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং, সেই অদৃশ্যকে, সেই নিগূঢ়কে কি নাম দেব জানিনে।—কিন্তু আমি তাঁকে বার বার অনুভব করেছি। বিশেষ ভাবে আজ যখন আয়ুর প্রান্ত সীমায় এসে পৌঁছেচি তখন তাঁর উপলব্ধি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।"

তিনি ছিলেন চিরচঞ্চলের উপাসক। এ জগতের সঙ্গে পরম ব্রহ্মকে, আপন আত্মাকে, একই আনন্দ রসধারায় তিনি ওতপ্রোত দেখেছেন। তাই জীবন সায়াহ্নে শান্ত নিঃসংশয় কণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করতে পেরেছেন, "এই সত্তর বৎসর নানাপথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আমার আর সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলাসহচর।··· আমি তত্ত্বজ্ঞানী শাস্ত্রজ্ঞানী গুরু বা নেতা নই—শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত, তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্ম্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্ত্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়েনি। কিন্তু সেই এক শুভ্রজ্যোতি যখন বহু বিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত।···তাঁর খেলাঘরের যদি কিছু খেলনা জুগিয়ে দিয়ে থাকি, মাটির ভাঁড়ে যদি কিছু আনন্দরস জুগিয়ে থাকি, সেই যথেষ্ট। এই ধুলো-মাটি-ঘাসের মধ্যে আমি হৃদয় ঢেলে দিয়ে গেলাম বনস্পতি ওষধির মধ্যে। যারা মাটির কোলের কাছে আছে, যারা মাটিতে হাঁটতে আরম্ভ ক'রে শেষকালে মাটিতেই বিশ্রাম করে, তাদের সকলের বন্ধু আমি, আমি কবি।'

ধন্য হয়েছে তাঁর মুখে

"সত্যের আনন্দ রূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মূরতি
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।"

আমিও প্রণাম জানাই এই মহাসত্তার অধিকারীকে।

তাঞ্জোর

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

ত্রিবান্দ্রাম থেকে তাঞ্জোর দীর্ঘপথ। মাঝখানে মাদুরা আর ত্রিচিনাপল্লী ছুঁয়ে যেতে হয়। আরও অনেক নাম-করা শহর বা তীর্থভূমি রয়েছে এর মধ্যে—সেগুলি কোনটা রাত্রির অন্ধকারে কোনটা বা দিনের আলোয় পার হয়ে এসেছি। রাত আটটায় ত্রিবান্দ্রামে ট্রেনে চেপে বেলা দশটায় মাদুরা আর দুটো আন্দাজ ত্রিচি ছুঁয়ে গোধূলির আলোয় আমরা তাঞ্জোর পৌঁছলাম। ট্রেনের দু'ধারে শস্যশ্যামল মাঠ ত ছিলই—ত্রিচি থেকে তাঞ্জোর পর্য্যন্ত পথের দু'ধারে কদলী কুঞ্জের সংখ্যাও যেন বেড়ে গেল। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম সম্পদ এই কদলী কানন। যেমন কেরলের নারিকেল কুঞ্জ আর কাজু-বাদামের বন। আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের প্রাচুর্য্যও এদেশে কম নয়—বাংলার মাটির সঙ্গে এখানকার মাটি একাত্মতা লাভ করেছে এই দিক দিয়ে।

ষ্টেশনে পৌঁছানর আগেই বৃহদীশ্বর মন্দিরের চূড়া নজরে পড়ে। দক্ষিণের অন্য মন্দিরের সঙ্গে এর পার্থক্যটাও অমনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাদ্রাজ থেকে রামেশ্বরম্ মাদুরা পর্য্যন্ত যত তীর্থভূমির সন্নিকটবর্ত্তী হয়েছি—দূর থেকে চোখে পড়েছে মন্দির চূড়া নয়—গোপুরম্। এদিককার মন্দির-বিমানগুলি নজর-ধরা নয়—যত বিশাল করে আর শিল্পসম্ভারে ভরিয়ে রেখে গোপুরম্গুলিকে মানুষের চোখে তুলে ধরার চেষ্টা দেখা যায়। তাঞ্জোরে দেখলাম এর ব্যতিক্রম। দূর থেকে গোপুরম্ দেখা যায় না—বৃহদীশ্বরের চূড়াটিই সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পথেই ঠিক করে নিয়েছিলাম তাঞ্জোরের রাজছত্রমে আশ্রয় নেব। প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম অট্টালিকা। তিন শ্রেণীর ঘরের জন্য তিন রকম ভাড়ার ব্যবস্থা। জল, আলো, শৌচাগার, স্নানাগার—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় একটি আদর্শ বাসভবন। নিশ্চিন্ত মনে মজুরের মাথায় মালপত্র চাপিয়ে পদব্রজেই ছত্রমের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। রেল ষ্টেশনের খুব কাছেই ছত্রমটি, গাড়ীর দরকার হয় না।

ছত্রমে পৌঁছে যেন অকূল পাথারে পড়লাম। কোথাও তিলধারণের স্থান নাই। তিনটি শ্রেণী মিলিয়ে প্রায় চল্লিশখানা ঘর—একখানিও খালি নাই। বারান্দাতেও আশ্রয়-সন্ধানী অনেকগুলি যাত্রী দেখলাম। সামনে রাত্রিকাল—অজানা জায়গায় কোথায় যে আশ্রয় পাব এই দুশ্চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠল।
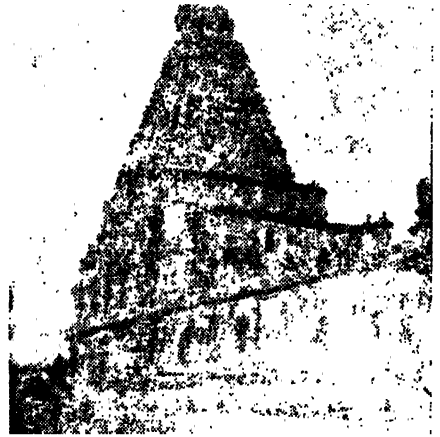
বৃহদীশ্বর মন্দির—তাঞ্জোর

ম্যানেজার বললেন, মিউনিসিপ্যাল রেষ্ট-হাউস আছে, হোটেলও আছে, ওইখানে চেষ্টা দেখুন। যদি রাতের গাড়ীতে কোন যাত্রী চলে যায় এখানে অবশ্য জায়গা হতে পারে, কিন্তু কেউ যে যাবেনই—তেমন খবর এখনও পর্য্যন্ত পাই নি।

মালপত্র ও মেয়েদের ছত্রমে রেখে মজুরকে নিয়ে চললাম আশ্রয়ানুসন্ধানে। বিজলী আলো ও দোকান-পাটে জমজমাট শহর; ভোজনাগারগুলিতে লোক গিজ্ গিজ্ করছে। একে একে তিন-চারটি হোটেলে খবর নেওয়া গেল, কোথাও স্থান নাই। স্থানীয় কোন পর্ব্ব-দিন নয়—অথচ মানুষের এত ভিড় কেন?

একজন হোটেল-মালিক বললেন, বাস-ষ্ট্যাণ্ডের

কাছে মিউনিসিপ্যাল রেষ্ট-হাউসে খবর নিন—ওখানে নিশ্চয় আশ্রয় পাবেন।

কাবেরী খাল পার হয়ে মিউনিসিপ্যাল রেষ্ট-হাউসে এলাম। সেখানেও স্থানাভাব। বৃহদীশ্বর আবার আমাকে ঠেলে দিলেন রাজছত্রমের দিকে। মাইলটাক পথ বৃথা অনুসন্ধানে কাটিয়ে ফিরে এলাম সেইখানেই। এবার স্থির করলাম, ষ্টেশনের রেষ্টরুমে অথবা বিশ্রামাগারে গিয়ে আস্তানা পাতব। রাতটা ত কাটুক এই ভাবে—সকালে বৃহদীশ্বরকে দর্শন করে রওনা হব চিদম্বরমের দিকে।

এতক্ষণে বৃহদীশ্বর হয় ত আমাদের মনোবেদনা বুঝলেন। ফিরে আসতেই ম্যানেজার বললেন, একটি ঘর খালি হবে এক ঘণ্টার মধ্যে—একটু অপেক্ষা করবেন কি? যদি পছন্দ হয়, ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আমার তখন সেই অবস্থা—মধু, ভাত খাবি? না—হাত ধোব কোথায়! বললাম, নিশ্চয়।

অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছি, মজুর তাগাদা দিল তাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। এই অকূল সমুদ্রে সেই একমাত্র ধ্রুবতারা। যদি একান্তই রাজছত্রমে আশ্রয় না পাই তাকে ধরেই ষ্টেশনের আশ্রয় খুঁজে নেব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু সে বেচারাকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আটকে রাখাও ত অন্যায়। যা থাকে কপালে বলে ওদের বিদায় করে ম্যানেজারের ঘরে এসে বসলাম। দেখলাম সেখানে আরও জন দুই ওদেশীয় যাত্রী আশ্রয়-প্রার্থী হয়ে অপেক্ষা করছেন। সন্দেহ হ'ল, সম্পূর্ণ বিদেশী আমি—স্বজাতি-প্রীতির উৎসমুখে না ভেসে যাই! কিন্তু তেমন দুর্ঘটনা হ'ল না—শেষ পর্য্যন্ত আমিই আশ্রয় পেয়ে গেলাম।

চমৎকার একটি বাসা—বিজলী আলোযুক্ত শোবার ঘর, রান্নার বারান্দা, পাঁচীল-ঘেরা একফালি উঠোন—সম্পূর্ণ আলাদা ব্যবস্থা। আসল ছত্রম্ থেকে সামান্য দূরে আলাদা ব্লকের ঘর। মাছ-মাংস প্রভৃতি যা খুসী রান্না করে খাওয়ার অসুবিধা নাই। রাজছত্রমের এই উদার ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে থাকেন অনেকেই—আমরাও নিয়েছিলাম।

দেব-দর্শনের ক্ষেত্রে আর একটি উদার ব্যবস্থার কথা শুনে চমৎকৃত হলাম। সকলেই জানেন—ছুঁৎমার্গের বাড়াবাড়িটা এই দক্ষিণ দেশে কত অনর্থপাতের হেতু হয়েছে। এক কালে মন্দিরে প্রবেশ করে দেব-দর্শন ত দূরের কথা—যে পথে বর্ণহিন্দুরা চলাফেরা করতেন সে দিকে অস্পৃশ্যদের পদপাত ছিল নিষিদ্ধ। গভীর ঘৃণা-বোধে হিন্দু সমাজেরই এক অংশ আর এক অংশকে নির্ম্মম ভাবে অস্বীকার করে চলত। সেই দুর্দ্দিনে দেব-মন্দিরের শুদ্ধাচার বজায় রাখতে এবং এই সব অন্ত্যজকে সান্ত্বনা দিতে হয় ত বা গোপুরম্-গাত্রে নানা পুরাণ থেকে দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করার ব্যবস্থা ছিল। এর বহু পরে মন্দির প্রবেশ নিয়ে সুরু হয় আন্দোলন। সে আন্দোলন সর্ব্বভারতব্যাপী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোথাও মন্দির দুয়ার বন্ধ করে, কোথাও বা মন্দিরের সামনে শক্ত বেড়া তুলে শুচি রক্ষার প্রহসন চলেছিল এবং অত্যন্ত লজ্জার কথা, স্বাধীন ভারতেও এ প্রহসন কোন কোন মন্দিরে আজও চলছে। সম্প্রতি-কালে ভারতীয় সংবিধানে মন্দির প্রবেশের বাধা অপসারিত হয়েছে। কিন্তু বৃহদীশ্বর মন্দির বহু পূর্ব্বেই এই কলঙ্কভার থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। মন্দির-সংবিধান তৈরী হবার আগে ১৯২৯ সনে তাঞ্জোর-মন্দিরের স্বামী রাজা শ্রীরাজারাম রাজা সায়েব হরিজনদের জন্য এই মন্দির-দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়ে-ছিলেন। এই রাজবংশের বদান্যতার আরও বহু দৃষ্টান্ত আছে। উদার শিক্ষার আলোকে হিন্দু সংস্কৃতির মর্ম্ম-কথাটি এঁরা বংশ পরম্পরায় অনুধাবন করেছেন।

যেমন মাদুরাতে তামিল সঙ্গম তেমনি তাঞ্জোরের সরস্বতী মহল। এই বিরাট গ্রন্থাগারেরও তুলনা নেই দক্ষিণ দেশে। নায়ক এবং মহারাষ্ট্রীয় নৃপতিরা তাঁদের সংগ্রহের দ্বারা এই সাংস্কৃতিক আলয়টিকে পরিপুষ্ট করেছেন। মহারাষ্ট্ররাজ দ্বিতীয় সারফোজি ছিলেন একাধারে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিকিৎসা ও কলা বিদ্যানুরাগী, বারাণসী থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভুমিখণ্ডের পরিব্রাজক, বৃহদীশ্বর মন্দিরের কুম্ভাভিষেক উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁর সময়ে সরস্বতী মহলে হাতে-লেখা পুঁথির সংখ্যা ছিল আটাশ হাজারেরও বেশী। তার মধ্যে সংস্কৃত পুঁথির সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার। পণ্ডিতজনেরা বলেন—হাতে লেখা পুঁথির সংগ্রহে সরস্বতী মহল হ'ল পৃথিবীর বৃহত্তম গ্রন্থাগার। এইভাবে সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে প্রায় সাড়ে ছ' হাজার পুঁথি এ পর্য্যন্ত ছাপা হয়েছে। যেমন সারস্বত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিকে উজ্জ্বল করে রাখতেন এ দেশের রাজা ও বণিকবৃন্দ, দেবমন্দিরে তেমনি তাঁদের দানেরও লেখাজোখা ছিল না। দানটা দেব-অর্থে উদ্দিষ্ট হলেও মন্দিরের সেবায়েত, কর্ম্মচারী ও শিল্পীগোষ্ঠী এর থেকে পরিপালিত হ'ত। মন্দির ছিল সর্ব্বসাধারণের মিলনাগার। এর মধ্যে বা কাছেপিঠে

থাকত বিদ্যালয়, আরোগ্যশালা; ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা হ'ত বিস্তীর্ণ মণ্ডপগুলিতে; সামাজিক বৈঠক, সাহিত্য-সভা, নৃত্য-গীতের আসর প্রভৃতির অনুষ্ঠান ত এই স্থানেই প্রশস্ত। এক কথায় আধুনিক টাউন হলের ভূমিকা ছিল সেকালের মন্দিরের।

কি পরিমাণ অর্থ দান করতেন অর্থবানেরা আর কিভাবে পুরোহিত, গায়ক-গায়িকা, নর্ত্তকী, সুপকার, ভৃত্য, মালী ও বাদ্যকরেরা দেবতার প্রসাদে পরিজনবর্গের ভরণপোষণ করত তার একটি দৃষ্টান্ত রাজ রাজ প্রতিষ্ঠিত বৃহদীশ্বর মন্দিরের ইতিহাস থেকে নেওয়া যেতে পারে।

বৃহদীশ্বর মন্দিরে রাজ রাজ দান করেছিলেন—যুদ্ধে লুণ্ঠিত যাবতীয় মণি-মাণিক্য। তার মধ্যে ছিল ৪১,০০০ স্বর্ণ কালাঁজু (২॥ কালাঁজুতে এক ভরি। 'কাসু' কালাঁজুর অর্দ্ধেক। তবে এর ওজনের কোন স্থিরত্ব ছিল না।) ১০,২০০ কাসু মূল্যের মণি-মাণিক্য, ৫০,৬৫০ কালাঁজু রৌপ্যাদি যা নাকি ৬০০ পাউণ্ড ট্রয় ওজনের সমতুল্য। এর সঙ্গে উৎসর্গ করেছিলেন লঙ্কাদ্বীপের ও আর কয়েকটি বিজিত রাজ্যের বার্ষিক আয় যার পরিমাণ ১,১৬,০০০ কালাউস অর্থাৎ ৫৮,০০০ কাসু মুদ্রার সমান। নগদ টাকাও ১,১০০ কাসু। রাজভগ্নী কুন্দবাঈ ১০,০০০ কালাঁজু স্বর্ণ ও ১৮,০০০ কাসু মূল্যের তৈজসপত্র দান করেছিলেন। আরও বহু দানের কথা মন্দিরের স্তম্ভে, দেওয়ালে ও নানাস্থানে উৎকীর্ণ রয়েছে।

এই মন্দিরে বৃত্তিভোগী ছিল ৪০০ দেবদাসী; এরা ভরণপোষণের জন্য জমি পেত, ধান পেত, বাস করবার জন্য পেত গৃহ। ২১২ জন ছিল নৃত্যশিক্ষক, গায়ক, বাদক, পোষাক প্রস্তুতকারক, স্বর্ণকার, হিসাবরক্ষক, ইত্যাদি। পঞ্চাশ জন গায়ক প্রতিদিন দেবস্তোত্র আবৃত্তি করত।

মন্দিরের অর্থভাণ্ডার থেকে গ্রাম-পঞ্চায়েৎকে টাকা ধার দেওয়া হ'ত শতকরা ১২৲ টাকা হার সুদে। আবার অর্থ ছাড়াও কর্পূর, খসখস, চাঁপাফুল, এলাচদানা প্রভৃতি দান হিসাবে গৃহীত হ'ত। চোলেদের রাজত্বকালে কি ভাবে মন্দিরের আয়বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবসায় হ'ত তাঞ্জোর মন্দির তার একটি দৃষ্টান্ত।...শুধু তাঞ্জোর মন্দির নয়—এখানকার প্রায় প্রতিটি নাম-করা মন্দিরকে কেন্দ্র করে আবর্ত্তিত হ'ত রাজ্যের সংস্কৃতি, সমাজ-জীবন, ধর্ম্মধারা, লোকহিতৈষণা প্রভৃতি। মন্দির-দেহের সঙ্গে দেশের জীবন ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

তাঞ্জোরের ইতিহাসখ্যাত মন্দিরটি চোলরাজ রাজ রাজের সময় তৈরি হয়। চোলেরা নিজেদের সূর্য্যবংশীয় বলে দাবি করেন। তাঁরা নাকি কুরুক্ষেত্র সমরে যুধিষ্ঠিরের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। এই বংশের সবচেয়ে প্রতাপশালী রাজা ছিলেন রাজেন্দ্র চোল। ধর্ম্মপরায়ণ বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল। চিদম্বরম্ নটরাজ মন্দিরের সুপরিচালনার জন্য তিনি বহু বিষয় সম্পত্তি দান করেছিলেন। এই কারণে ব্রাহ্মণরা তাঁকে রাজরাজেশ্বর এবং শিবপদশেখর উপাধি দান করেন। তাঞ্জোরের রাজরাজেশ্বরম্ দেউলটি ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয় রাজ রাজ চোলেরই রাজত্বকালে।
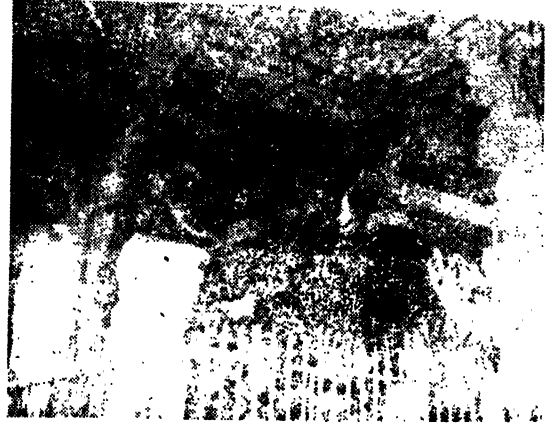
নন্দীকেশ্বর মন্দির—তাঞ্জোর

অনেকের অনুমান রাজরাজেশ্বরম্ একটি পুরাতন নগরী ছিল। বিস্তীর্ণ এক ভূমিখণ্ডের চারিদিকে ভগ্ন প্রাচীর, ইষ্টক স্তূপ, পাহাড়ের মত উঁচু জমি, ঘন লতাগুল্ম বেষ্টিত বনভূমি এবং পরিখা প্রভৃতি থেকে প্রমাণিত হয়েছে এককালে দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে অবস্থিত ছিল এই বিরাটকায় প্রাসাদ। এখনও ভগ্নস্তূপের নিঃসঙ্গ সৌন্দর্য্য দর্শনার্থীর দৃষ্টিকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য আকৃষ্ট করে।

পরিখা ও অর্দ্ধভগ্ন প্রাচীর বেষ্টনী পার হয়ে খাটো একটি গোপুরমের সামনে দাঁড়ালেও এই মন্দিরের মহিমাকে ঠিক মত উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু গোপুরম্ সীমা পার হয়ে মন্দিরের বিশাল-বিস্তৃত অঙ্গনে পৌঁছান মাত্র যেন এক বিরাটের সাক্ষাৎকার ঘটে। অতি প্রশস্ত অঙ্গন চারিদিকে তার শিব শক্তি কার্ত্তিকেয় গণপতি প্রভৃতির অসংখ্য মন্দির—সামনে নন্দীকেশ্বর বৃষের মণ্ডপ—তার সামনে অপরূপ কারুকার্য্যখচিত গগনস্পর্শী শিব মন্দির। সারা ভারতবর্ষে এই একটি মাত্র মন্দির, যা নাকি আগাগোড়া গ্রানাইট পাথরে তৈরি। মন্দিরের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করলেন পথি-প্রদর্শক। সূর্য্য পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে দিক পরিবর্ত্তন করলেও—প্রাঙ্গণে মন্দির-বিমানের ছায়া

পড়ে না—এটি মন্দির তৈরির প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর মন্দির-শীর্ষে আমলকীবৎ যে কলসটি রয়েছে, ওটি একটি অখণ্ড পাথরে তৈরি—ওজন আশী টন। চৌদ্দতলা সমান উঁচু (২১৬ ফিট) বিমানে কি কৌশলে ঐ কলসটি স্থাপিত হয়েছিল—ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে বৈকি! তখন ত আর শক্তিশালী ভার-উত্তোলক যন্ত্রের (ক্রেনের) চলন ছিল না! তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল ৫০০ ফুট লম্বা ও ২৫০ ফুট চওড়া মন্দির প্রাঙ্গণে গঠন-রীতি। নায়ক আর মারাঠি দুই বংশের রাজত্বকালে এর বিভিন্ন অংশ নির্ম্মিত হয়েছে—যা এর গঠনরীতি থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়।

এই চৌদ্দতলা সমান উঁচু বিমানের গায়ে অসংখ্য মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। তার মধ্যে দক্ষিণের সর্ব্বনিম্ন ভাগে শ্রীবিনায়ক, মহাবিষ্ণু, শূল দেব, দক্ষিণা মূর্ত্তি, মার্কণ্ডেয় ও নটরাজ মূর্ত্তি—বামদিকের নীচের লিঙ্গোদ্ভব ও অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি এবং উত্তর ভাগে গঙ্গাধর, কল্যাণ-সুন্দর আর মহিষাসুরমর্দ্দিনী মূর্ত্তি—দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই উত্তর দিকের বাম প্রান্তে বহু নরমূর্ত্তি দেখা যায়—তার মধ্যে তিন তলায় একটি ইউরোপীয় বেশধারী দর্শকের কৌতূহল সঞ্চার করে। হিন্দু মন্দিরগাত্রে এই বিধর্ম্মীর মূর্ত্তি কেন উৎকীর্ণ হল—এ নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। এক মতে—কাঞ্চীপুর থেকে এক ধর্ম্মপ্রাণ শিল্পী এসেছিলেন মন্দির নির্ম্মাণ করতে। জ্যোতিষ শাস্ত্রেও তাঁর নাকি অসামান্য দখল। তাঞ্জোরের মন্দির-গাত্রে আরও কয়েকটি মনুষ্য মূর্ত্তির সঙ্গে এই বিধর্ম্মী মূর্ত্তিটি উৎকীর্ণ করে ইনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—চোল, পাণ্ড্য, নায়ক, মারাঠী এবং ইংরেজরা যথাক্রমে এই রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করবেন। অন্য মতে, সপ্তদশ শতাব্দীর কোন নায়ক রাজার বিদেশী বন্ধু ডেনমার্কের অধিবাসী রোলাণ্ড ক্রেপের মূর্ত্তি এটি। তৃতীয় মতে—এটি বিখ্যাত ভ্রমণকারী মার্কোপোলোর মূর্ত্তি। অনুমান যাই হোক—চোল রাজাদের সময় থেকে ইউরোপীয় বণিকদের প্রভাব যে এখানে বৃদ্ধি পেয়েছিল—তার প্রমাণ এই হ্যাটকোটধারী মূর্ত্তি।

মন্দির প্রাঙ্গণের বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে রয়েছে রন্ধনশালা, ভোজনা-গার, যজ্ঞশালা, ভাঁড়ার ঘর প্রভৃতি, উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বহু শিব মন্দির। মন্দির প্রবেশ মুখে গণেশ, দুর্গা, ভৈরব, শনি প্রভৃতি ছাড়াও দুটি অতিকায় দ্বারপাল মূর্ত্তি চোখে পড়ে। এই মূর্ত্তি দু'টি আঠার ফুট উঁচু আর পরিধিতে আট ফুট, এক একটি অখণ্ড গ্রানাইট পাথর থেকে তৈরি। দ্বারপালকে অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, নৃত্য ও সঙ্গীতশালা, স্থাপনা মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অর্দ্ধমণ্ডপ প্রভৃতি। এগুলিকে বেষ্টন করে ভিতরের পরিক্রমা পথ। এর পর মূল বিমানে পৌঁছে বিরাট লিঙ্গমূর্ত্তির মুখোমুখি দাঁড়ালে তিলমাত্র সংশয় থাকে না—এঁর বৃহদীশ্বর বা রাজরাজেশ্বর নামটি কেন সার্থক। এত বড় লিঙ্গমূর্ত্তি ভারতবর্ষের আর কোন মন্দিরে আছে কি না জানি না। মূর্ত্তির নিম্নভাগের বেড় হল ৫৪ ফুট, উচ্চতায় ৬ ফুট, উর্দ্ধ ভাগের বেড় সাড়ে তেইশ ফুট, আর নয় ফুট উঁচু। এই থেকে মোটামুটি এর বিপুলত্বের ধারণা করে নেওয়া চলে। কিন্তু মূর্ত্তির সামনে এসে দাঁড়ালে সে হিসাববোধও তুচ্ছ হয়ে যায়। দুগ্ধশুভ্র উত্তরীয় আচ্ছাদিত শুচিরম্য বেদী আর স্বর্ণরেখা-উজ্জ্বল ত্রিপুণ্ড্রশোভিত শিরোদেশ যেন জ্যোতির্ম্ময় দিনকর মন্দিরের গর্ভগৃহ আলো করে রয়েছেন। সেদিক থেকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনা কঠিনই। বিরাটের পায়ের তলায় দাঁড়িয়ে নিজেকে কত তুচ্ছ বলে মনে হয়। পলকে সৃষ্টির আদিপ্রান্তে ছুটে চলে যায় মন—সেখানে জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ ধারায় জীবনের ফুলগুলি স্মরণাতীত কাল থেকে ভেসে চলেছে, পরিপুষ্ট করছে সৃষ্টিলীলাকে, রস-আনন্দে পাগল মানুষ অন্বেষণ করছে পরম-সত্তাকে আর প্রার্থনা করছে, তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মা-মৃতং গময় আবীরাবীর্ম এধি।

বহুক্ষণ আবিষ্টের মত চেয়ে রইলাম মূর্ত্তির পানে। পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে পূজা করলেন—আরতি করলেন—বিভূতি প্রসাদ দিলেন যাত্রীদলকে। যাত্রীরা অস্ফুট কণ্ঠে দেবতার জয়ধ্বনি করলেন। একটি বৈশিষ্ট্য দেখেছি দক্ষিণ-তীর্থে—যাত্রীরা প্রাণ-মাতানো উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে না। পূজা, আরতি, দর্শন, দেবতার স্তবগান বা জয়ধ্বনি সমস্তই প্রায় নিঃশব্দে চলে, একটি শান্ত রসাস্পদ ভাব মন্দিরের সর্ব্বত্র জড়িয়ে থাকে।

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সকলেই বার হয়ে এলাম। এবার মন্দিরের চারধারে দেবাদিদেবের পরিজনবর্গকে দর্শন করার পালা। এঁদের মধ্যে রয়েছেন উমা পরমেশ্বরী (পেরিয়া নায়াগি), মহাগণপতি, কার্ত্তিকেয় (মুরুগা), নন্দীকেশ্বর প্রভৃতি। এঁদের মন্দিরগুলি বৃহদীশ্বর মন্দিরের চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি হলেও শিল্পকর্ম্মে অতুলনীয়। বিশেষ করে উত্তর সীমানায় অবস্থিত মুরুগা-মন্দিরের গঠন নৈপুণ্য—দু'দণ্ড চেয়ে দেখবার মত। স্তম্ভ বা অলিন্দ গাত্রের কারুকার্য্য দক্ষিণের প্রতিটি মন্দিরে কম-বেশী চোখে পড়ে, কিন্তু সূচীছিদ্রময় দেওয়ালের এমন

অপূর্ব্ব বিন্যাস দক্ষিণের আর কোন মন্দিরে দেখি নি। ষড়ানন মুরুগা-মূর্ত্তি। তাঁর বাহন ময়ূর এবং শিরোদেশের জ্যোতিচক্র সবটাই একখানি অখণ্ড পাথর খুদে তৈরি হয়েছে। এই মূর্ত্তিকে ঘিরে অতি সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম্মের সৌন্দর্য্যজাল বুনেছেন শিল্পী যা পাষাণ-অক্ষরে একটি নিখুঁত কবিতার ছন্দে রূপ নিয়েছে।

উমার (পেরিয়া নায়াগি) বিগ্রহও চমৎকার। শোনা যায়, এই রণ-ভঙ্গিমা দৃপ্ত বৃহৎ বিগ্রহটি আগে শিব-গঙ্গার উদ্যানে ছিল, নায়ক-বংশের কোন রাজা নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়ে এটিকে স্থানান্তরিত করেন। চোল, নায়ক, মারাঠী প্রভৃতি বিভিন্ন রাজবংশের শাসনকালে এই মূর্ত্তির কুম্ভাভিষেক হয়।

মূল মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রয়েছে মহাগণপতি মন্দির। মারাঠা-রাজ দ্বিতীয় সারফোজির রাজত্বকালে এটি নির্ম্মিত হয়। এই মূর্ত্তিটিও সুন্দর। এ ছাড়া উত্তর-পূর্ব্ব কোণে নটরাজ মূর্ত্তিটিও দেখবার মত। দক্ষিণের প্রায় প্রতিটি শিব-দেউলে নটরাজও নবগ্রহের মূর্ত্তি দেখা যায়। চিদম্বরমের আদি নটরাজের প্রভাব দক্ষিণের সর্ব্বত্র। দেবদেউলের সীমায় ভরত নাট্যমের নৃত্য-স্থগুলি উদাহরণের দ্বারা সহজবোধ্য করার প্রচেষ্টা এদেশের প্রাচীন নৃত্যানুরাগেরই পরিচয় বহন করছে। পূর্ব্বে প্রতিটি মন্দিরে দেবদাসীর নৃত্যগীত ছিল দেব-অর্চ্চনার অঙ্গ-বিশেষ; এখন সেদিন আর নাই।

মূল মন্দিরের পশ্চিমে আর একটি মন্দির আছে ঋষি শ্রীকারু-ভুযারে'র। এই ঋষি নাকি চিদম্বরমের বিখ্যাত নটরাজ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছিলেন। ইনি প্রথম রাজেন্দ্র চোলের সমসাময়িক।

বৃহদীশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণের সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি হ'ল নন্দীকেশ্বর বৃষ। বৃহদীশ্বরের যোগ্য বাহন এই নন্দীকেশ্বর। যেমন আকার অবয়বে বিপুল, তেমনি শিল্প-নৈপুণ্যে অসাধারণ। রামেশ্বরমের বৃষটিও বিপুলকায়—কিন্তু তাঞ্জোরের নন্দীকেশ্বরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শয়ন-ভঙ্গিমা শিল্পীর নিখুঁত বাস্তব-জ্ঞানের পরিচয় বহন করছে। এমন শিল্প-সুন্দর সুবৃহৎ মূর্ত্তি—সারা ভারতবর্ষে দু'একটি হয় ত আছে। মহিসুরের নন্দীর কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। সেটির উচ্চতা ষোল ফুট। বৃহদীশ্বরের নন্দী তৈরী হইয়াছে পঁচিশ টনের বৃহৎ একটি কালো পাথর কেটে। উচ্চতায় বার, লম্বায় সাড়ে উনিশ আর চওড়ায় সওয়া আট ফুট ষাঁড়টি হাঁটু মুড়ে শুয়ে আছে। সামনের মোড়া হাঁটু দু'টি ঈষৎ তোলা। যা দেখলেই মনে হবে এখনই হয় ত বা উঠে দাঁড়াবে। রৌদ্র-বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য একটি সু-উচ্চ মণ্ডপের মধ্যে এটি সংস্থাপিত হয়েছে। অদ্ভুত একটি প্রবাদ আছে এর সম্বন্ধে। প্রতিষ্ঠার পর বৃষ নাকি দিন দিন বেড়েই চলেছিল। সেই বৃদ্ধি রোধ করার জন্য এর পৃষ্ঠদেশে একটি লোহার পেরেক পুঁতে দেওয়া হয়েছে।

তাঞ্জোর নগরী চোল বংশের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধি লাভ করে—নায়ক এবং মারাঠী রাজারাও এর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। কাবেরী নদী থেকে কয়েকটি খাল টেনে এনে এর ভূমিকে শস্য-শ্যামলা করার চেষ্টা হয়েছে। ধর্ম্ম, সংস্কৃতি কিংবা রাজনীতি সর্ব্বক্ষেত্রেই এর অবদান উল্লেখযোগ্য।

পৌরাণিক কাহিনী বলে এ নগরীর নাম ছিল অলকাপুরী। দেবতাদের ধনাধ্যক্ষ কুবের এই পুরীতে বসে দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চ্চনা করেছিলেন। এই ক্ষেত্রেই তপস্যায় বসেছিলেন ঋষি পরাশর। দানবদের উৎপাতে তপস্যার বিঘ্ন ঘটাতে তিনি বিষ্ণু এবং উমার কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তাঞ্জো এবং দণ্ডক দৈত্যকে নিধন করেন, উমার হাতে নিহত হয় তারক দৈত্য। মৃত্যুকালে তাঞ্জো দৈত্য মিনতি জানান, যেন তাঁর নামে এই পুরীর নামকরণ হয়। সেই থেকে এই পুরীর নাম হয় তাঞ্জোর।

ইতিহাসের ইঙ্গিত দিয়েছি আগেই। নবম শতাব্দীতে চোলেরা তাঞ্জোর থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। একাদশ শতাব্দীতে আরব কোবিদ আল বেরুণি এখানে এসে হতশ্রী তাঞ্জোরকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাণ্ড্য-রাজারা তাঞ্জোরের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়ে আনেন। মালিক কাফুরের আক্রমণের বেগটা ভিন্নমুখী হওয়ায় তাঞ্জোর ধ্বংস মুখ থেকে রক্ষা পায়। নায়ক-রাজাদের সময় তাঞ্জোর খ্যাতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে ওঠে। আবার নায়কবংশের গৃহ-বিবাদের ফলে একোজী ভোঁসলের নায়কত্বে তাঞ্জোর আসে মারাঠীদের হাতে। এঁদের সময়ে তাঞ্জোরের সাংস্কৃতিক দ্যুতি বহু দূরপ্রসারী হয়। পূর্ব্বেই বলেছি রাজপ্রাসাদের একাংশে সরস্বতী মহলেই প্রথম জ্ঞানবর্ত্তিকা জ্বালান নায়ক রাজারা, তাঁদের অনুসরণ করেন মারাঠি ভূপতিরা। সেই শিখা তিনশ' বছর ধরে উজ্জ্বল হয়েছে সারস্বত অবদানে। এই মহলের তুলনা ছিল না বিশ্বে। আজও বিস্ময় জাগিয়ে রেখেছে।

আটতলা সমান উঁচু প্রাসাদটি নানা অংশে বিভক্ত। এর একটি অংশে দরবার গৃহ। দরবারে প্রবেশ করার

আগে দু'পাশের দালানে গুপ্ত ও পাল যুগের বৌদ্ধ মূর্ত্তির সংগ্রহশালা। দূর দক্ষিণে বৌদ্ধ প্রভাব কি ভাবে বিস্তৃত হয়েছিল এই সংগ্রহশালার নানা ধরনের মূর্ত্তিগুলিতে তা পরিস্ফুট।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে দরবার গৃহে প্রবেশ করার মুখে। এই জনহীন প্রাসাদে এত মানুষ কোথা থেকে এল? এরা শুধু রাজ-অনুচর বা তাঁর পরিজনবর্গ নয়—আধুনিককালের পুলিস, পেয়াদা, বেহারা, আরদালিরাও ভিড় জমিয়েছে। কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে দরবার গৃহকে জীবন্ত করে রেখেছে। এত লোকজন—কিন্তু কোলাহল নাই, চলাফেরার বিশৃঙ্খলা নাই। আরও নিকটে এলে দৃষ্টির ভ্রম ঘোচে, কিন্তু বিস্ময় কমে না। মৃৎশিল্পের নৈপুণ্যে বাংলার একটি অখ্যাত গ্রাম ঘূর্ণী যেমন ভারতবর্ষে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে—তেমনি শিল্প-চাতুরী তাঞ্জোরের মৃৎশিল্পীদের কাজেও। বাংলার সঙ্গে এই দূর দক্ষিণের কোথায় যেন মিল রয়েছে। রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করে, ভাষার প্রাচীর ভূমিসাৎ করে, ভাবের ভূমিতে দ্রাবিড় আর বাংলা দাঁড়িয়েছে একাত্ম হয়ে। এই সত্য আর একবার ভাল করে অনুভব করেছিলাম পরের দিন—তাঞ্জোর থেকে চিদম্বরমে আসবার পথে।

ট্রেন-কামরায় এক দীর্ঘদেহ গৌরবর্ণ সুরশিল্পীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাঁর বাড়ী হ'ল কুম্ভকোণামে। আমরা কুম্ভকোণামে নামব না শুনে আক্ষেপ করলেন ভদ্রলোক। এমন সুন্দর মন্দির দেখবে না তোমরা? আমার অনুরোধ নেমে পড়, কিছু অসুবিধা হবে না।

মনে হ'ল আমরা কুম্ভকোণামে নামলে উনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। ওঁর হৃদ্যতায় দু' পক্ষের আলাপ জমে উঠল। অনেক কথা জেনে নিলেন উনি, জানালেনও অনেক কথা। অবশেষে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ব্রাহ্মণ? পদবী কি?

বললাম পদবী।

ব্রাহ্মণ শুনে আর একবার আনন্দে উদ্ভাসিত হ'ল ওঁর সর্ব্বদেহ। জিজ্ঞাসা করলেন, মুখার্জ্জী—তোমার গোত্র?

বললাম—ভরদ্বাজ।

যেমন বলা ভদ্রলোক লাফ দিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন আমায়। নিবিড় আলিঙ্গনে বেঁধে আনন্দ-গদ্‌গদ্ স্বরে বললেন, মুখার্জ্জী তুমি আমার আত্মীয়। আমিও ভরদ্বাজ। তুমি থাক বাংলায় আমি মাদ্রাজে—কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা ছিলেন অভিন্ন। একই রক্ত বইছে তোমার আমার দেহে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল পণ্ডিত জনের একটি অনুমানের কথা। একদা দক্ষিণ দেশে এসেছিলেন আর্য্য ঋষি অগস্ত্য। দ্রাবিড় রাজসভায় বহু সম্মান লাভ করে আর্য্য সংস্কৃতির মেল বন্ধনে বেঁধেছিলেন দ্রাবিড়-ভূমিকে। এঁর পরেও বহু আর্য্য এসেছিলেন এ দেশে—তখন দ্রাবিড়ভূমি আর অনার্য্যভূমি থাকে নি। এই যে পুরাণ তন্ত্র, মহাভারত-রামায়ণ কাহিনী—এই যে উপনিষদ,গীতা আর বৈষ্ণব তত্ত্বের মর্ম্মোদ্ঘাটন, এই যে ভাস্কর্য্য শিল্প, নৃত্য বা নাট্যশাস্ত্র, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ নিয়ে সাংস্কৃতিক পরি-মণ্ডল রচনা—এর উৎসমূল কোথায়? অখণ্ড ভারতবর্ষের সমস্ত ভূমি মিলিয়ে উদ্গত করেছিল যে অঙ্কুরকে, কালে সে হয়েছিল বিরাট বনস্পতি, এবং তারই ছত্র-ছায়ায় এসে দাঁড়িয়েছিল একটি জাতি—হিন্দু। এ জাতি কোন একজন ধর্ম্মপ্রচারকের তৈরি বিধিবিধানে কায়ালাভ করে নি। এর মধ্যে ত্রিকালদর্শী ঋষিদের প্রভাব ছিল—তাঁদের কণ্ঠে ছিল বহু সঙ্গীত, ছন্দে ছিল ধ্বনি-বৈচিত্র্য, দৃষ্টিতে ছিল সর্ব্বরূপময় এক সত্তার অনুভূতি যা সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্। শিব, শক্তি, বিষ্ণু, গণেশ আর সূর্য্য—এই পাঁচটি আদি দেবতাকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল ধর্ম্মসম্প্রদায়—কি আর্য্যভূমি কি দ্রাবিড়ভূমি এঁদের গোত্র অভিন্ন। নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে প্রচুর বিবাদ-বিসম্বাদ হয়েছে, কিন্তু অখণ্ড এক পরমসত্তাকে কেউ অস্বীকার করেন নি। যাঁরা সম্প্রদায়ের স্রষ্টা তাঁদের দৃষ্টিতে আবিলতা ছিল না—পরবর্ত্তী চেলা-চামুণ্ডারা নিজ নিজ প্রভুত্ব স্থাপনায় ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করে কলহের সূত্রপাত করেছিল। রাজ-শক্তির আশ্রয় লাভ করে উগ্র হয়ে উঠেছিল কোন কোন সম্প্রদায়। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পর্ব্বত-প্রমাণ গ্লানির কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে ইতিহাসের পাতায়। অতঃপর নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে কল্যাণবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে মানুষের মনে। সে বুঝেছে সমস্ত রূপের মূলে একই বস্তু—সেই পরম ব্রহ্মের সঙ্গে প্রতিটি জীবনের যোগ অচ্ছেদ্য। চৈতন্য রূপে সেই শক্তি সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত, তাকে নস্যাৎ করে দিলে জীবের মঙ্গল নাই। উদার ছন্দে পরমানন্দে সেই নরদেবতাকে বন্দনা করার আয়োজন আজ সর্ব্বত্র।

ভালই লাগল তাঞ্জোর। একটানা দীর্ঘ ভ্রমণে কিছু ক্লান্তি জমেছিল—দু'টি দিন বিশ্রাম নেওয়া গেল। রাজ-ছত্রমে যেমন জাতিবর্ণ ও খাদ্যাখাদ্যের গোঁড়ামি নাই, তেমনি উদার প্রসন্নভাব শহরের সব জায়গাতেই লক্ষ্যণীয়।

কাবেরী থেকে একটি খাল টেনে এনে শহরকে কর্ম্ম-

চঞ্চল সজীব করার চেষ্টা হয়েছে—যদিও সেচকর্ম্মের প্রয়োজনই এ ক্ষেত্রে মুখ্য উদ্দেশ্য। খালের জল ময়লা হলেও স্রোত প্রখর। সেই স্রোতময়ী নদীশাখার এপারে ওপারে নূতন পুরাতন দুই অংশ মিলিয়ে তাঞ্জোর। পুরাতন অংশের পথঘাট আঁকাবাঁকা সঙ্কীর্ণ, বাড়ীঘর দোকান-পসার যে-কোন প্রাচীন শহরের সমতুল্য। নূতন অংশের সর্ব্বত্র আধুনিকতার ছাপ। পীচমণ্ডিত প্রশস্ত পথ, বিদ্যুৎআলো বিলসিত দোকান-পসার, হোটেল-রেস্তরাঁ, সিনেমা, বাসষ্ট্যাণ্ড মায় পাঁচমাথা রাস্তার মোড়ে সেকালের প্রকাণ্ড গীর্জ্জাটা পর্য্যন্ত ঝকৃঝকৃ তকৃতকৃ করছে। যানবাহনেও দু'কালের সমন্বয় সাধন চেষ্টা। অসংখ্য বাস নানা দিকে দূরদূরান্তরে ছুটোছুটি করছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়েছে মোটর আর সাইকেল রিক্শা। সাইকেলের ত সীমাসংখ্যা নাই। পুরাতন দিনের গো-শকট বাইণ্ডিগুলির (এখন অবশ্য অশ্ব-শকটই) কোন কোনটিতে আবার রবার টায়ারের চাকা জুড়ে নূতন কালকে স্বাগত জানাচ্ছে। সিনেমা পোষ্টারে ও স্বরবর্দ্ধক যন্ত্রে শহর সর্ব্বক্ষণই ধ্বনিমুখরিত।

শুধু তরিতরকারির বাজারটায় ঢুকে মনে হ'ল পুরাতন কালটা যেন যাই যাই করেও যেতে পারে নি। পণ্যদ্রব্য ও ওজনের চেহারা সেই ত্রিশ বছর আগে যেমন দেখেছিলাম, তেমনই। এক সের আলু কিনতে গিয়ে খানিকটা হতভম্বই হয়েছিলাম। তার চারগুণ ওজনের আলু কিনে তবে বাংলাদেশের সের পূরণ করতে হয়েছিল। কুড়ি তোলাতেও সের হয়—এ যেন গজক্ষয়ে মূষিকমূর্ত্তি! স্বাধীন ভারতে রাষ্ট্রভাষা সমস্যায় যত সঙ্কটই প্রকট হোক—অধুনা প্রবর্ত্তিত নয়া মুদ্রার সঙ্গে কিলোর কিলটা দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লে কড়ি ও ওজনের মানটা সকল মানুষকে অন্ততঃ আশ্বস্ত করতে পারবে।

সমন্বয়-সন্ধানা কর্ম্মব্যস্ত শহর তাঞ্জোর। এটি কিন্তু তার বাহ্যিক রূপ। এই শহরের অন্তরের সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে বৃহদীশ্বরের দেউল সীমানায়। সেই সুবিস্তীর্ণ দেউল প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালে—কয়েক শতাব্দীর পিছনে ঠেলে নিয়ে যাবে মানুষকে। অবশ্য সেই মানুষই পিছনে চাইতে পারে—যার মনে ওঠে ভাবতরঙ্গ, যে ভালবাসে ভারতবর্ষকে, ভালবাসে তার ইতিহাস, ঐতিহ্য, ধর্ম্মবোধ, সমাজচেতনা মিলিয়ে সংস্কৃতির একটি অখণ্ড রূপকে। নতুবা শুধু চোখ বুলিয়ে বর্ত্তমানের জীবন-যন্ত্রণাকে আর অতীত দিনের বৃহদীশ্বরকে স্ব স্ব রূপে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিনই।

—*—

রবীন্দ্রকাব্যধারার ইতিহাস

শ্রীভূপেশ দাস

রবীন্দ্রকাব্যধারাকে তুলনা করা যায় বিচিত্রগতি স্রোতস্বিনীর সঙ্গে। পর্বতশিখরের হিমানীনির্ঝর থেকে উৎপত্তি লাভ করে বহু অরণ্য-উপত্যকা-জনপদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদী যেমন সাগরসঙ্গমে নিজেকে বিলীন করে দেয় রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহও তেমনি বিচিত্র ভাবানুভূতি ও রূপকল্পনার মাঝে প্রকাশিত হয়ে বিশ্বজনীন সত্যের অখণ্ড রসমূর্তির মধ্যে নিজেকে ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা আধ্যাত্মিক সাধনারই নামান্তর। রূপ-রস-গন্ধ প্রভৃতি পঞ্চতন্মাত্রের মধ্যে এর বহিরঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হলেও সব শেষে আধ্যাত্মিক আনন্দের পূর্ণ অবগাহনের মধ্যেই তার চূড়ান্ত পরিণতি। সেখানে কবির কাব্যজীবন ও ব্যক্তিজীবন এক হয়ে মিশে গেছে।

রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান সুর সৌন্দর্য ও আনন্দ। সৌন্দর্য ও আনন্দের মধ্যে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নেই। যা সুন্দর, তাই আনন্দকর—a thing of beauty is a joy for ever—সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্। এই সুন্দরকেই কবি আজীবন কাব্যমূর্তি দিয়ে গেছেন। আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি। আনন্দের লীলাখেলাই এ জগতের সর্বত্র। আনন্দের এই অলোকসুন্দর দ্যোতনাই কবিচিত্তকে চিরদিন অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্যে দেখি একটা তীব্র উন্মাদনা ও উচ্ছাসবাহুল্য ক্রমপরিণতির দিকে ধেয়ে চলেছে। এ উন্মাদনায় রয়েছে বাঁধ ভাঙ্গার স্পৃহা, সৌন্দর্যোপভোগের বাসনা। সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত,

ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল কাব্যগুলি তখনকারই রচনা। কবির সৌন্দর্যমুগ্ধ মন নিখিল বিশ্বকে নিবিড়ভাবে উপভোগ করতে চায়, নিঃশেষে তাকে পেতে চায়। কবির যৌবনস্বপ্ন তাঁর কল্পনার মানসীকে খুঁজে বেড়ায়। এই সময়ে রবীন্দ্রকাব্যে দেহবোধ কিছুটা প্রাধান্য পেলেও পরবর্তী কাব্যসমূহ থেকে তা সাপের খোলসের মত আলগা হয়ে গেল।

মানসী থেকে রবীন্দ্রকাব্য একটি বিশিষ্ট মোড় নিয়েছে এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে পূর্ণ পরিণতির দিকে—বাস্তব সৌন্দর্য ও প্রেমকে তিনি ভাবলোকে উন্নীত করতে প্রয়াসী হয়েছেন, বস্তুজগতের সমস্ত সৌন্দর্যকে এক অখণ্ড সত্তারূপে কল্পনা করে সেই রূপকল্পনার ভিত্তিতে প্রেম ও সৌন্দর্যের জয়গান গেয়েছেন, রূপমুগ্ধ চোখে এই অনন্ত রহস্যপূর্ণ জগতের দিকে চেয়ে চেয়ে আনন্দচেতনায় লীন হয়েছেন। মানসী থেকে চিত্রা পর্য্যন্ত চলেছে এই রূপাভিসার।

এই অভিসারযাত্রা পূর্ণতা পেল জীবনদেবতার সঙ্গে আত্মার নিবিড় মিলনে। জগৎ ও জীবন, সৌন্দর্য ও প্রেম—এর মধ্যে তিনি মিশিয়ে দিলেন এক প্রেমময় সত্তার অনির্বচনীয় মাধুরী। চৈতালি থেকে ক্ষণিকা পর্যন্ত দেখি এই অনুভূতিরই জয়যাত্রা। সৃষ্টির মধ্যে অনুস্যূত রয়েছেন যে প্রেমময় ও সৌন্দর্যময় স্রষ্টা, সেই চিদানন্দ সত্তার উদ্দেশ্যে তাঁর কাব্যকৃতি এখন থেকেই ভোগবিরহিত। কবিমনের এই ভাবঘন অবস্থা লীলায়িত হয়েছে আরও বিশদভাবে খেয়া থেকে গীতালি পর্যন্ত।

তার পরে এল বলাকার যুগ। এবারে কবি প্রকৃতি-মানব-ভগবান সম্বন্ধে এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপবিষয়ে চিন্তা করেছেন, উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন এই নিগূঢ় তত্ত্বকে। এখন থেকেই কাব্যের সঙ্গে দর্শন ও ও তত্ত্ব এসে যুক্ত হওয়ায় রবীন্দ্রকাব্যসাধনা এক বিশেষ প্রকাশে সমুজ্জ্বল হতে লাগল। রবীন্দ্রকাব্যধারা সাগর-সঙ্গমে পৌঁছবার পূর্বমুহূর্তে মোহানার নিকটবর্তী হ'ল।

বলাকা-যুগে কবি যে দার্শনিক চিন্তাধারার সূত্রপাত করলেন সেই চিন্তন-মননই তাঁর পরবর্তী কাব্যসৃষ্টিকে বিশেষ একটি স্বাদের চমকে অনুভূতিনিবিড় ও অধিকতর সংহত করেছে। সৃষ্টিরহস্যের যথার্থ স্বরূপ, মানবের অন্তর্গূঢ় সত্তার জটিলতা, অনিত্য প্রকৃতির মধ্যে নিত্যের অখণ্ড লীলা, নিজের ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ উপলব্ধি প্রভৃতি নানা দার্শনিক ভাব ও চিন্তার আলোকে বলাকা-পরবর্তী কাব্যসমূহ বিশিষ্টতা পেয়েছে। পরিশেষ, বীথিকা, পত্রপুট পর্যন্ত চলেছে এই দর্শনচিন্তার ব্যাপক সমারোহ।

জীবনপ্রান্তে এসে কবির ভাবজীবন তথা কাব্যজীবন আরও একমুখী হয়েছে। শেষযুগে তিনি কবি রবীন্দ্রনাথ থেকে ঋষি রবীন্দ্রনাথে রূপায়িত হলেন। তাঁর শেষ-জীবনের কাব্যে অধ্যাত্ম-সত্যদর্শনের তীব্র আবেগে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্যের যে সংমিশ্রণ হয়েছে তাতে তিনি কবির চেয়ে সত্যদ্রষ্টার অভিধায়ই ভূষিত হবার যোগ্য। রবীন্দ্রকাব্যধারা এখানে এসেই মহাজীবনের সঙ্গে মিলিত হয়েছে, যুক্ত হয়েছে অনন্তের সঙ্গে, অসীমের সঙ্গে।

অতি সংক্ষেপে এই হচ্ছে রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহের ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ কখনও যুগসমস্যাকে খুব বড় করে দেখেন নি। কোন একটি বিশেষ জাতিরও গুণকীর্তন করেন নি। তাঁর কাব্যসাধনা দেশ-কাল-জাতিকে অতিক্রম করে বিশ্বমানব ও বিশ্বপ্রকৃতির শাশ্বত সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। এর অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছেন এক অতি-লৌকিক সৌন্দর্যানুভূতি থেকে যা বিশ্বজনীন সত্যের রহস্যোপলব্ধির সর্বাতিশায়ী আনন্দে উন্মুখর। আগেই বলেছি তাঁর কাব্য সুন্দরের অনুধ্যানে অন্তর্লীন। এই সুন্দরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্বদেবতা। এবং এইখানেই রবীন্দ্রকাব্যের পরিপূর্ণতা।

—০—

দাগ

শ্রীউমাপদ নাথ

কপালের নীচে পিট্‌পিট্‌ করে ছোট্ট দুটো চোখ, মাছের চোখের মত গোল। বয়সের ছোঁয়ায় তাতে কেমন একটা ফ্যাকাশে খয়েরী রঙের ছোপ। কিন্তু তার ভিতর থেকেই ধারাল দৃষ্টির দুটো রোশনাই বেশ চিনে নেওয়া যায়। তার এক সময়ের ক্ষিপ্র চাতুর্যের বিজ্ঞাপন রয়েছে এখনও।

আরও আছে। রামপ্রসাদ রায়ের ছোট কপালের মাঝখানে আছে ছোট একখানা উলকি। ছোট্ট একটা ফুলের নক্সা। সবুজ রংটা প্রাচীন হয়ে ফিকে হয়ে গিয়েছে একটু। আর নাকের নীচে আছে একজোড়া মোচ। রামপ্রসাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে চতুর মোচের লেজদুটো নীচের দিকেই ঝুলে থাকে। তথাপি রামপ্রসাদের গোঁফগর্ব আছে। ঊর্ধ্বমুখী না হলেও গোঁফজোড়া লম্বায় আছে। আর গোঁফের চুল যে শক্ত, রামপ্রসাদ বলে, সেটা শক্ত পৌরুষেরই লক্ষণ।

আরও একটা বস্তু আছে। সেইটার ইতিহাসই রামপ্রসাদ সেদিন বলল।

তার কপালে ডান চোখের ভুরুর উপরে একফালি আড়াআড়ি দাগ। ফোঁড়াফাড়ার দাগ নয়। রামপ্রসাদ কখনও হাসপাতালে যায় নি। ডাক্তারের ছুরির নীচে নিজের বদন পেতে দেয় নি। ডাক্তারের দাওয়াই খায় নি কোন দিন। তবে? সেইটার কথাই সে বলল সেদিন।

সে একটুখানি দাগ নয়, অনেকখানি। একখানা ভুরুর থেকেও লম্বা। রামপ্রসাদের কপালে এই দাগটাই হ'ল সবচেয়ে জোরদার জিনিস। সবচেয়ে স্থায়ী আর স্মরণীয় উলকি।

"হ্যাঁ বাবুজি, ঠিক, উলকিই বটে।" রামপ্রসাদ বলে "উলকিই পিনিয়েছে বটে!"

সে আজকের কথা নয়। রামপ্রসাদ কপালে তখনও উলকি পরে নি। তখন গোঁফ ছিল সরু, নাকের নীচ দিয়ে কালো রঙের দুটো অসি-চিহ্ন। আজকের ফ্যাশন আর তখনকার ফ্যাশন ছিল আলাদা। তখন কাজ করত বাংলা দেশে আর বনে' গিয়েছিল একেবারে খাঁটি বাঙালী।

প্রথমে জুটমিলের দারোয়ান ছিল রামপ্রসাদ। তার পরে স্বাধীন ব্যবসা। ভাটপাড়ার মিল-এরিয়ার মধ্যে ভাল জায়গা দেখে খুলে ফেলল একখানা সুন্দর পানের দোকান। রামপ্রসাদ এখনও বলে, "বাবু, সে রকম পানের দোকান কোথায় আজকাল? দেখি না ত আমি। পানের আদরই উঠে যাচ্ছে ক্রমে—"

বলতে বলতে নিজের ডিবে থেকে এক জোড়া পানের খিলি মুখে পুরে আর তার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা দোক্তা-কিমাম জিভের উপর ছিটিয়ে দিয়ে দোকানের বর্ণনা দিতে থাকে রামপ্রসাদ।

সে দোকানের নমুনাই আলাদা। আঁটোসাটো টুঙ্গি-ডিজাইনের ছোট্ট একটা ঘর। কোন শিক্ষিত পান-রসিকের সুপারিশে দোকানের নাম রেখেছে বীটেল কেবিন। ঝক্‌ঝকে পিতলের থান দিয়ে মোড়া মঞ্চখানা। সামনে ছ'আঙুল উঁচু কার্নিশ। আর তাতে কি নক্সা! রামপ্রসাদের মতে সে সব জিনিস দেখা যায় না আজকাল। পানের সঙ্গে সঙ্গে পানের দোকানের সাজও উঠে যাচ্ছে এখন। সেই পিতলের ফরাসে চক্‌চকে রূপোর পানদানে পানের খিলি। আর তিন পাশ দিয়ে রেলিং দেওয়া পিতলের তাকে যত পানের মশলা।

"খয়ের সুপুরি থেকে আরম্ভ করুন।" কড়ে-আঙুলের প্রথম রেখায় বুড়ো আঙুলের মাথাটা চেপে ধরে রামপ্রসাদ। তার পরেই আঙুলের মুদ্রার সঙ্গে কথার সুর পালটায়, বলে, "সে সুপুরি কি আজ্ঞে, চিকি সুপুরিকে বলে তফাত। সে সব জিনিসই আলাদা।" এবার তর্জনীর প্রান্তে বুড়ো আঙুলটা ঠেকিয়ে দিয়েছে ঘনিষ্ঠ করে।—"এই চিকন চিকন করে কাটা। একেবারে জিরে জিরে। কাঁচের বয়ামে সাজান সব সারবন্দী তাকে। তার পরে চলল খয়ের—আজ্ঞে, খাঁটি জৌনপুরী খয়ের সে, তার পরে ধরুন কিমাম, মুস্কি পাতি জর্দা, বাদশাহী আতর, গুলাবী মিঠা, দিলবাহার সুর্তি, পিয়াসের আরাম পিপারমিন্টি। আবার ধরুন সাদা-ভাজা মশলার বহর—ধনেরচাল, মৌরী এক আনি…"

এক দুই করে রেখা ছুঁয়ে ছুঁয়ে বুড়ো আঙুলটা এগিয়ে আসে অনেক দূর।

এ-সব ছাড়া আর একটা জিনিস ছিল রামপ্রসাদের দোকানে। ছিল একটা মস্ত বড় আয়না। রামপ্রসাদের এখনও মনে আছে, চার আঙুলের কম পুরু ছিল না তার কাঁচ। একেবারে আস্লি বিলিতি চিজ।

তার পর একটু থেমে, একটু ভেবেচিন্তে আবার গল্প আরম্ভ করে রামপ্রসাদ।

ঐ আয়নাখানা! ঐ আয়নাখানাই ডেকে এনেছিল তাকে। দোকানের সামনে দিয়ে তার যাতায়াতের রাস্তা ছিল কি না!

রাজলক্ষ্মীর কথা বলছে রামপ্রসাদ। কানিংহাম রোড থেকে পা চালিয়ে একটা গলি ধরে এই রাস্তায় পড়ে হন্‌হন্‌ করে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান জুটমিলের হাসপাতালের দিকে এগিয়ে যায় যে রাজলক্ষ্মী দিনের পর দিন।

রাজলক্ষ্মী ছিল হাসপাতালের ধাই। পাসকরা নার্স বা ধাত্রী না হলে কি হয়, হাতের গুণের জন্যে ওর যথেষ্ট খাতির ছিল। হাত ত নয়, যাকে বলে একেবারে মেশিন।

বছর তিরিশের ভারিক্কিচালের শরীর তখন রাজলক্ষ্মীর। গোলগাল মুখে নাকের ফুলখানা মানিয়েছিল কি! রামপ্রসাদ মোচে পাক দিয়ে খুদে চোখছুটো খেলিয়ে নেয় একটু। প্রাচীন স্মৃতির উত্তাপে মনটা উষ্ণও হয়ে ওঠে বুঝি একটুখানি। বলে, "গুলাবের ওপর যেন বোলতা বসে আছে।"

হঠাৎ একদিন রামপ্রসাদের চোখে ধরা পড়ে গেল, হাসপাতালে যাবার সময় গোছালো শরীরটাকে একটু আয়নায় দেখে নিচ্ছে রাজলক্ষ্মী। তার দোকানের বিরাট্ আয়নায় রাজলক্ষ্মীর গোটা দেহের ছবি ফুটে ওঠে। আর সেই আয়নার মধ্যে চকিতে একবার তাকিয়ে নিচ্ছে রাজলক্ষ্মী। নিজের সাজবেশের সাফল্যটা বুঝে নিচ্ছে রামপ্রসাদের আয়নায় কসে। কখনও শাড়ীর আঁচলটা আরও জড়িয়ে টেনে নিচ্ছে। কখনও পায়ের গতি বাড়াতে বাড়াতে দু-হাতের তালু দি:য় বাঁধা খোঁপাটা এ-পাশ ও-পাশ করে পিটে দিচ্ছে একটুখানি।

হাতে পানের শির ছিঁড়তে ছিঁড়তে চোখ দুটোকেও চালু করে দিত রামপ্রসাদ। রাজলক্ষ্মীর ভারী বাঁধা দেহটা তার দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যেত, যেন বাঁধা অবস্থায়।

"মাইরি বলছি, বাবু," কথা বলতে বলতে হলপ্ করে নেয় রামপ্রসাদ। "তখন বয়সও ছিল আজ্ঞে, দিনও ছিল আলাদা।"

ক্রমে একদিন নিজের দিকটাও আবিষ্কার করল রামপ্রসাদ। ছ'টা কিংবা দশটা কিংবা দুটো বাজার একটু পূর্বেই মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে তার। সঙ্গে সঙ্গে একটা হিসাব করে ফেলে মনে মনে। হাঁ ঠিক, সাত দিনে একবার ডিউটি বদল হয় রাজলক্ষ্মীর। আজ আর বেলা দশটায় যাবে না, আজ থেকে এক হপ্তা দুটোয় যাবার পালা। দোকানের ঘড়ির দিকে একবার তাকায় রামপ্রসাদ। দুটো বাজতে এখনও মিনিট পনের। আর একটু পরেই ভোঁ বাজবে কারখানার। একটু পরেই ডিউটি চালু হয়ে যাবে রাজলক্ষ্মীর। তবে কই সে? চঞ্চল দৃষ্টিতে রাস্তার ওমোড় থেকে খানিকটা এদিক পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে রামপ্রসাদ। নেতি-নেতি করে এক-একটা পথিককে বেছে ফেলে দেয় মনে মনে। তবে কি! না না, ঐ যে, ঐ যে বুঝি আঁচল দেখা গেল, ঐ ভারী-ভারী আঁটোসাঁটো দেহটাই তো। ও দেহ কখনও ভুল করতে পারে না রামপ্রসাদ। একটু স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজলক্ষ্মীর ভারী চালের গজমন্থর গতি। কোন দিন আর একটু জোরেও পা চালাতে দেখেছে তাকে। হয়ত সেদিন, হয়ত না ঠিকই, সেদিন একটু দেরিতে বেরিয়েছিল রাজলক্ষ্মী।

সেদিনও মিনিট পনের আগে বেরিয়েছিল ও। কিছু দূর আগে থেকেই দোকানের দিকে দু-একবার তাকিয়েছিল। রামপ্রসাদ তা দেখেছিল। তার পর গোছালো শরীরটাকে আয়নার সামনে দিয়ে রাস্তার এ-পাশ-বরাবর সম্মুখগামী না করে রাস্তার সীমানা ডিঙিয়ে এগিয়ে দিল একেবারে আয়নার সামনে। দোকানের ঝাঁপের নিচে এসে গেল একেবারে রাজলক্ষ্মী। যেখানে খদ্দেররা দাঁড়িয়ে পান কেনে, একেবারে সেইখানটায়। ভাগ্যি তখন দোকানে খদ্দের ছিল না। কিংবা তখন খদ্দের ছিল না বলেই হয়ত ও এসে দাঁড়িয়েছিল। ঐ অত কাছে, একেবারে আয়নার সামনে। একেবারে নিশ্বাস-সীমানার মধ্যে। লুকোবার কিছু নেই, রামপ্রসাদের বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের কাজ চলছিল তখন খুব জোরে জোরে। হয়ত তার নিশ্বাসের হাওয়া গিয়ে লেগেছিল রাজলক্ষ্মীর টানটান বুকের কাপড়ে।

"হায়রে রাজলক্ষ্মী! সেই রাজলক্ষ্মী—"

গল্প বলতে বলতে কথার মাঝখানে গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা মহড়া দিয়ে নেয় রামপ্রসাদ। হয়ত সত্যিই এখনও পুষে রেখেছে রাজলক্ষ্মীর স্মৃতিটাকে তার ঐ প্রাচীন বুকের মধ্যে। মুহূর্তের মৌনের পর আবার গল্প চলতে থাকে। আবার আরম্ভ হয় রাজলক্ষ্মীর কথা।

রাজলক্ষ্মী এসে দাঁড়াল একেবারে পানদানের কাছা-

কাছি। শুধু দাঁড়াল না, কথাও কইল। রামপ্রসাদের চোখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি কথার সুর লাগিয়ে বললে, "একটা পান দেবে—এক খিলি পান?"

হায়রে হায়, তা আর দেবে না রামপ্রসাদ! পান দেবার জন্যেই তো দোকান। এতদিন পানের দোকান খুলে বসে আছে, তার মধ্যে এই একটি দিন তার মনপছন্দের মানুষটি নিতে এসেছে এক খিলি পান। এ কি যে-সে কথা! এক খিলি কেন, হাজার খিলি পান খাওয়াবে তাকে রামপ্রসাদ।

বললে, "দেব না পান!" ছোট ছোট চালাক চোখ দুটোকে একটু এ-পাশ ও-পাশ চালিয়ে মোচের নিচে পান-খাওয়া ঠোঁটে এক ঝলক্ আবেগের হাসি খেলিয়ে নিল রামপ্রসাদ। তার পর বড় দেখে, তাজা দেখে, একখানা আস্ত ছাঁচি-পান তুলে নিল বেছে। সাবধানী হাতে কাঁচি চালিয়ে শিরটা কেটে বার করে দিল। তার পর আর একখানা কাটা-পান উপরে বসিয়ে দক্ষ হাতে চুন-খয়ের লাগিয়ে সরু সরু সুপুরির কুচি রাখল তার উপরে। তারপরে হাত বাড়াল মাজা-পিতলের ডাকের দিকে। ছোট ছোট বয়াম থেকে নানাবিধ সুস্বাদু মশলা নিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগল সেই পানের উপরে। তার উপরে পড়ল সুগন্ধি আতরের ছিটে। প্রাণ দিয়ে পানের খিলি তৈরি করল রামপ্রসাদ। এ তো পানের খিলি নয়, এ তার প্রাণের খিলি।

"আর কী দেব? দোক্তা, কিমাম, জর্দা?"

রামপ্রসাদের মুখে মিষ্টি হাসি। দোকানীর সৌজন্যের হাসি নয়, ভালবাসার হৃদয়ঢালা হাসি। আর চোখে সেই আবেগের তড়িৎ।

"দাও একটু দোক্তা, দোক্তার নেশাটা আছে।"

বাঃ! রামপ্রসাদের হৃদয় ভরে গেল। এত কথা! এত কথা বলল নিজের থেকে!

সব থেকে ভাল জর্দা, কিমাম, দোক্তা বার করল রামপ্রসাদ। রাজলক্ষ্মীর সুস্পষ্ট হাতের তালুর উপরে ঝুরঝুর্ করে ঝরিয়ে দিল সেগুলো। আহা, রামপ্রসাদের এখনও মনে পড়ে, সুন্দর হাতের উপরে কী সুন্দর গড়িয়ে পড়ল রঙ-বেরঙের পাতমোড়া জর্দার দানাগুলো! একখানা খিলির চেয়ে অনেক বেশি মশলাই ঢেলে দিল রামপ্রসাদ।

"আর কী চাই?"

"না, আর কিছু না।"

তবু ছাড়বে না রামপ্রসাদ। সব দেওয়া হলেও আর একটু বাকি আছে দেওয়ার। বোঁটায় করে একটুখানি চুন এগিয়ে দিল রামপ্রসাদ। হাত বাড়িয়ে দিতে দিতে একটু হাসল—"চুন।"

এ তো চুন দেওয়া নয়, নিজেকে চূর্ণ করে দেওয়া মনপছন্দের হাতে।

সেই থেকে রোজ পান খেয়ে যায় রাজলক্ষ্মী। প্রথম প্রথম ভোর ছটার ডিউটিতে যাবার পথে। কিন্তু সে কদিন? ভোর-ভোর করে দোকানের ঝাঁপ তুলে পিতলের ফরাস মুছতে মুছতে নিচু সুরে গান ভাঁজে এখন রামপ্রসাদ—মেরা দিলর্বা প্যারী। বন্ধু-বান্ধবদের বলল, "ভাই, ডিউটির লোক নিয়েই আমার কারবার। ছ'টার যানেবালাদের তো পান খাওয়াতে হবে আমাকে।" মানে, কারখানার এ-শিফটের জন্যেই যেন তার ছটার আগে দোকান খোলা। কিন্তু ঐ দিন সাতেক, তার পর আবার পিছিয়ে পড়ত রামপ্রসাদ।

এগোনো আর পিছোনো, দুই চলছে তখন। কিন্তু এক কদম পিছোয় তো দশ কদম এগিয়ে যায়। না এগিয়ে উপায় নেই। রাজলক্ষ্মীর জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে রামপ্রসাদ। একটা বাঙালী মেয়ে-মানুষের সঙ্গে সত্যিই যদি মহব্বৎ হয়ে যায়! ভাবতেই কত আরাম।

কিন্তু শুধু ভাবলেই তো আর ভাব হয় না। ভাবার পিছনে করা চাই। আর সে করাটুকু সে করতে পারবে না? সে মর্দ মানুষ, রাজপুতের বাচ্চা। বাঙালী মরদের থেকে বেশি মরদ সে। বাঙালী ছাঁটের গোঁফের উপরে অটো দিলবাহারের হাত ঠেকিয়ে একটা নিরর্থক তা মেরে একদিন বেরিয়ে পড়ল রামপ্রসাদ।

সাত দিন পরে ডিউটি বদলের মুখে ছুটির দিন সেদিন রাজলক্ষ্মীর। ঘরের দাওয়ায় বসে তখন বাটনা বাঁটছিল।

নাতিস্থূল দেহটাকে নাচিয়ে নাচিয়ে যে বাট্‌না বাঁট্‌ছিল, তার ছবি এখনও মনে আছে রামপ্রসাদের। চিত্রার্পিত হয়ে আছে চিত্তে।

"পুরুষ রূপেয়া চায় না বাবুজি, চায় রূপ।" দার্শনিকের মতো কথা বলে এখনও রামপ্রসাদ। কথা বলে বসান দেয়।

একটু গলা খাঁকারি দিতেই চোখাচোখি হয়ে গেল রামপ্রসাদের সঙ্গে। না, সব ঠিক আছে, চটে নি রাজলক্ষ্মী। অন্তত তাই মনে হ'ল। নড়ন্ত দেহটাকে একটু থামিয়ে গোল মুখের গালে এক জোড়া টোল

খাইয়ে পানপোক্ত দাঁতের উপর দিয়ে এক ঝিলিক্ হাসি খেলিয়ে দিয়েছে রাজলক্ষ্মী।

দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেল রামপ্রসাদ। ভাবের আতিশয্যেই বুক দুর্ দুর্ করছে বলতে হবে। একটা বাঙালী মেয়েমানুষের হাসির ইশারায় এগিয়ে যাচ্ছে সে, এই অনুভূতিতে শিউরে শিউরে উঠছে শরীর। একটু কাছে গিয়ে ঠোঁট খুলল সব শক্তি প্রয়োগ করে, "আপনি —মানে তুমি—পান খেয়ে কেন অমনি করে পয়সা ফেলে দাও? তুমি পান কিনবে কেমন কথা! তুমি যে পান-অলাকেই কিনে বসে আছ গা!"

একচোটে বলে ফেলে হাঁপাতে লাগল রামপ্রসাদ। হাঁপাচ্ছে আর তাকাচ্ছে রাজলক্ষ্মীর দিকে। কথাগুলোর ফল কি দাঁড়াচ্ছে কে জানে! দিল্লাগি হচ্ছে, না, দিলে দিলে লেগে যাচ্ছে।

না, ঠিক আছে। খুশীই মনে হ'ল রাজলক্ষ্মীকে। তা খুশী হবে না? পানের সঙ্গে আগেই যে পান করিয়ে দিয়েছে হৃদয়ের পেয়ালা।

বারান্দায় উঠে বসল রামপ্রসাদ। বসতে বসতে চাদরমোড়া বগলের নিচে থেকে বার করল একখানা শাড়ী। বাঙালী মেয়েছেলের উপযুক্ত একখানা চোখে-লাগা শাড়ী। অনেক খুজে-পেতে দেখেশুনে কিনেছে।

"এইখানা—এইখানা যদি নাও—"

"শাড়ী!" সত্যিই হাত পেতে গ্রহণ করল রাজলক্ষ্মী। যেন হাত পেতে দেবতা গ্রহণ করলেন ভক্তের নিবেদন।

আহা! খুশীতে ভরে উঠল রাজপুতনন্দনের মন। আজ সে ষোল আনা বিজয়ী। এতদিনের প্রবাস সার্থক হ'ল আজ। মনে মনে হাজার সাবাস দিল নিজেকে।

এক থেকে দুই, দুই থেকে তিন। এমনি করে বহু। এক পা দু-পা করে বহু পা এগোলো রামপ্রসাদ। এগিয়ে, আপনারা বিশ্বাস করুন আর না করুন, নির্বিঘ্নে গন্তব্যে হাজিরও হ'ল সে। অর্থাৎ, গৃহ বাঁধল রামপ্রসাদ। আর সে গৃহের লক্ষ্মী হ'ল রাজলক্ষ্মী।

"কিন্তু তার পর কি হ'ল রায়জি? এখন ত রাজলক্ষ্মীকে দেখি না?" আমরা যারা রামপ্রসাদ রায়কে জানি, তাদের সকলেরই এই প্রশ্ন।

"হুজুর", রামপ্রসাদের কণ্ঠে এবার অন্য সুর বাজে। এখন সে যেন হারজিতের বাইরে। হেরেছে, না জিতেছে, তার পক্ষে বলাই মুস্কিল।

বলে, "হুজুর, সব ভেঙে গেল একদিন। বড় মহব্বৎ হয়েছিল কিন্তু। খুব হাসত, তামাসা করত, গায়ের ওপরে গলে পড়ত আহ্লাদে! পানের পিক্ লাগিয়ে দিত কুর্তায়।"

"তবে কি হ'ল? ছাড়াছাড়িটাই ঠিক, না, মারা গেল রাজলক্ষ্মী?"

ঝুলে-পড়া গোঁফ জোড়াকে নিচের দিকেই সাট করে ধরে রামপ্রসাদ। মুখখানাও নিচু করে দেয় মাটির দিকে। বলে, "মারা গেল না ত, মেরে গেল।"

"কেন, কেন?"

"চলে গেল—আমি হিন্দুস্থানী বলে।"

বিমর্ষ মুখে একটু মৌন থেকে আবার কথা বলে রামপ্রসাদ। "আমার দেশেরই একজন মাথা খেয়ে গেল একদিন। ফাঁস হয়ে গেল সব। সেদিন রাজলক্ষ্মীর কি মেজাজ! ফঁস্ ফঁস্ করতে লাগল গোখ্‌রো সাপের মত। দেশের লোকটি বেরিয়ে যেতেই গর্জন করে উঠল বিলাসপুরী শালা, হারামি কাঁহাকার! বলেই, হাতের কাছে পানের রেকাবি ছিল, তাই দিল অমনি ছুঁড়ে।"

"তার পর?"

"তার পর এই যে!" অভিমানীর মত কপালে হাত ছোঁয়ায় রামপ্রসাদ। "এই যে রেকাবি দিয়ে উলকি পরিয়ে দিয়ে গেল হারামজাদী।"

"কিন্তু, এত বড় একটা মহব্বৎ হাওয়া হয়ে গেল এক মুহূর্তে! শুধু তুমি হিন্দুস্থানী বলে!"

"তা হবে না? ও ভেবেছিল, আমি বাঙালী। আর আমি ভেবেছিলাম ও বাঙালী। নইলে, আমি ভেবেছিলাম, বাঙালীর মেয়ে—মেরেছে বেশ করেছে। বাঙালীর মেয়ে মারবে না? রেকাবি ত দূরের কথা, পয়জার-বি মারতে পারে।" রামপ্রসাদের ছোট ছোট গোল গোল চোখ পিট্ পিট্ করে নেচে ওঠে।—"পরে জানলাম, শালীও ছিল এক বিলাসপুরীয়ানীর বেটী। ওর বাপ ছিল বাঙালী। মানে, বুঝলেন না, হিন্দুস্থানীর ভেজাল ছিল শালীর রক্তে। আর ঐটাকে রাখব আমি? আমি রাজপুতের বাচ্ছা, বিলাসপুরী মরদ। দিলাম একদিন আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে।"

"তার পর?"

"আর তার পর নেই। দিন কয়েক পরেই একদিন হাওয়া হয়ে গেল। শুনলাম চলে গেছে এক বাঙালী ছোকরার সঙ্গে।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা জোরালো হাওয়া বেরিয়ে এল রামপ্রসাদের বুকের ভিতর থেকে।

তাকিয়ে দেখি, সেই ভাবটাকে ঢাকবার জন্যে শিরা-ওঠা হাত দিয়ে ঝুলেপড়া মোচ দুটোয় ঘন ঘন চাড়া দিয়ে যাচ্ছে লোকটা।

শিল্পী-দরদী রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমহীতোষ বিশ্বাস

প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশন শেষ হয়েছে আর ঐ সময় গুডফ্রাইডের ছুটিও পড়েছে। কবি রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে। কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানের পর অনেক সদস্য ফিরতি পথে কবিকে দেখতে শান্তিনিকেতনে এসেছেন, আবার দেশের অনেক স্থান থেকে অনেকে ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন। বহু লোকের সমাগম সেবার শান্তিনিকেতনে।

অতিথিশালায় আর ঠাঁই নেই, কাজেই কর্তৃপক্ষ সংবাদপত্রে ঘোষণা করলেন, যেন এই সময় আর কেউ এখানে না আসেন। এই ঘোষণার পূর্বেই আমি অতিথিশালার কর্মকর্তাকে চিঠি দিয়েছি, কাজেই হয় ত ঠাঁই পাব এই ভরসায় তল্পিতল্পা নিয়ে রওনা হলাম। সঙ্গে আরও দু'জন বন্ধু। তিনজনই আমরা একই স্কুলের শিক্ষক।

বর্ধমান এসে গাড়ীতে উঠে দেখি বহু লোক শান্তিনিকেতনের যাত্রী। আবার ঐ ট্রেনেই স্যার যদুনাথ সরকার, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি কবিকে দেখতে চলেছেন। মন বড় খারাপ হয়ে গেল। মাভাবল কবির সঙ্গে সাক্ষাত ত দূরের কথা অতিথিশালায় থাকার স্থানও পাব না। যাই হোক্, স্থান না পাই অন্য কোথাও থেকে কবির যাতে দর্শন পাই সেই কামনা মনে মনে শ্রীভগবানের কাছে নিবেদন করলাম।

বেলা এগারটা নাগাদ আমরা শান্তিনিকেতনে ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালাম। পূর্বে যখন একবার এসেছিলাম তখন এখানে কোন ফটক ছিল না। উন্মুক্ত মাঠ, এদিক-ওদিক ঘর বাড়ী।

ভাগ্যক্রমে ফটকের সামনে দেখি আমার পরিচিত বন্ধু ভক্তলাল মণ্ডল। ছেলেটি তখন ওখানে বি. এ. পড়ছে। ভক্তকে দেখে খুব খুশী হলাম। আমাদের আসার হেতু তাকে জানালাম। ভক্ত আমাদের নিয়ে অতিথিশালার দিকে চলতে লাগল। তবে যেতে যেতে সে যা বলল তাতে আশা হ'ল কম, সে বললে, "বহু লোক এসেছে।" তবুও চেষ্টা করা যাক্ বলে ভক্ত
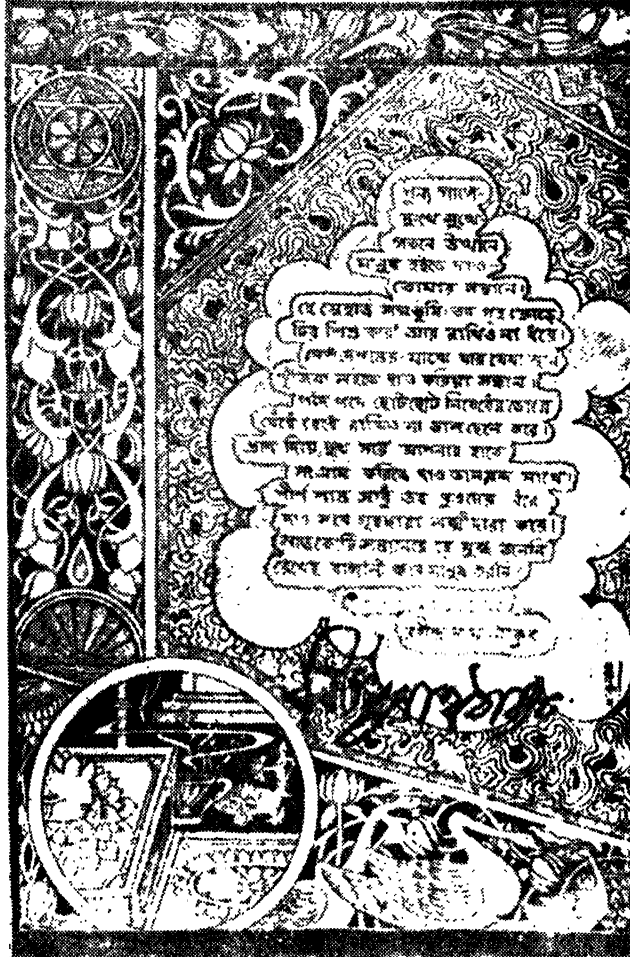
বিশ্বকবির স্বাক্ষরিত উপহার লিপির আলোকচিত্র

একেবারে অতিথিশালার কর্মকর্তার (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ?) কাছে নিয়ে এল। কিন্তু তিনি আমার পরিচয় পেয়ে বললেন, "এইমাত্র আপনার চিঠি পেলাম। দাঁড়ান দেখি কি করতে পারি।"

একটু পরে ফিরে এসে জানালেন, একজনের ঠাঁই তিনি দিতে পারেন, তিনজনের হবে না। তখন পরামর্শ করে স্থির করলাম, আমরা বোলপুরে থাকব। আমার কাছে একটা ঠিকানা ছিল। আমার এক বন্ধুর আত্মীয় বোলপুরের বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারিকানাথ ঘোষ তাঁর বাড়ীর। প্রভাতবাবু এ প্রস্তাবে খুব খুশী হ'লেন, এবং কবির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবেন এই আশাও দিলেন। আমরা আবার তল্পিতল্পা নিয়ে বোলপুরের দিকে রওনা দিলাম।

দুপুর গড়িয়ে চলেছে। ক্ষিদেয় সকলেই অস্থির, কাজেই আগে ডাক্তারবাবুর বাড়ীর সন্ধান না করে একটা হোটেলে ওঠা গেল। যতদূর মনে হয় এক উড়িয়ার হোটেল। মাটকোঠা, দোতলায় আমাদের থাকবার এক ঘর দিল। কিন্তু হোটেলে খাওয়ার ব্যবস্থা ঘরের আর হোটেল-ওয়ালার চেহারা দেখে আমাদের বেশ ভাল লাগল না। তাই সন্ধ্যার আগেই আমরা বিছানা-পত্র নিয়ে পথে নেমে ডাঃ ঘোষের বাড়ীর সন্ধানে বেরুলাম। কিছু পরেই বাড়ীর সন্ধান মিলল। ডাক্তার দ্বারিকানাথ ঘোষ মশাই আমাদের থাকবার স্থান ত দিলেনই খাওয়ার ব্যবস্থা কয়েকদিন করলেন। তাঁর সেই আদর-আপ্যায়নের কথা ভোলবার নয়।

পরের দিন সকালে আমরা আবার শান্তিনিকেতনে গেলাম। অতিথিশালায় গিয়ে পূর্ব কথামত প্রভাতবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। স্থির হ'ল ঐদিন বৈকালে কবির দর্শন পাওয়া যাবে। সাক্ষাতের সমস্ত ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন, অবশ্য যদি কোন রকম বিশেষ অন্তরায় না ঘটে।

আমরা একটু এদিক-ওদিক ঘুরে আচার্য নন্দলাল বসুর বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। পূর্বদিনে ভক্তকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছিলাম তাঁর বাড়ী শান্তিনিকেতনের শেষ প্রান্তে শ্রীনিকেতনের পথে। কিন্তু ঐ দিন তিনি কোপাই নদীর ধারে বনভোজনে গিয়েছেন জেনে আমরা আর সাক্ষাতের জন্য যাই নি। কিন্তু আজ সকালে তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। তাঁর বাড়ীর সামনের বারান্দায় একটি খাটিয়া ছিল, তাতে ব'সে তিনি কিছু কথা বললেন, আমার বন্ধু দু'জন কিন্তু রাস্তায় তাঁর বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রণাম করার পর তিনি পরিচয় জেনে আমাদের "সোসাইটি" (আর্ট স্কুল) সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। দু'একজন ছাত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। সাধারণ ভাবে চিত্রকলা সম্বন্ধে দু'এক কথা বললেন। আমার কাছে আমার স্কেচ বই ছিল। কয়েকটি স্কেচ তিনি দেখলেন। গাছের পাতা আঁকা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন। ঐ দিন ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দর্শন পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। বৈকালে কবিগুরুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমরা প্রস্তুত হ'লাম। কিন্তু একটা ব্যাপারে বন্ধু দু'জনের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল, নিজের নাম ছাপা কার্ড তাঁদের নেই। বললাম, বেশ ত যদি প্রয়োজন হয় হাতে লিখে দেব ছাপার মত করে। বন্ধু দু'জন আমার কথায় আশ্বস্ত হ'লেন।

শান্তিনিকেতনের পথে আবার আমরা রওনা হ'লাম। যতদূর মনে হয় তখনও পিচের রাস্তা হয় নি। পথের ধারে তেমন দোকান-পসারীও নেই। মাঝে সাঁওতাল পল্লী।

পথে আর একজন আমাদের সঙ্গী হলেন। ইনি তখন ব্যারাকপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। ছিলাম তিনজন হলাম চার। বন্ধু একজন বললেন, তিনের চেয়ে চার ভাল, যাত্রা শুভ হয়। কিন্তু প্রভাতবাবুকে বলেছি আমরা তিনজন সুতরাং আবার একজন বেশী হ'লে কোন অসুবিধা হবে কিনা সেটাও একটা আমাদের ভাবনার কথা হ'ল। কিন্তু ভদ্রলোকের অনুরোধে আমরা তাঁকে দলে নিলাম। বিশেষ ক'রে তিনি যখন বললেন যে, সাত-সাতবার চেষ্টা ক'রেও তিনি পূর্বে কবির সাক্ষাৎ পান নি।

শান্তিনিকেতনে পৌঁছে দেখি সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। কত দেশের যে কত লোক এসেছে তার আর ঠিক নেই। একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা সুন্দর নীল রংয়ের শাড়ী পরেছেন আর তাঁর স্বামী পরেছেন ধুতি ও পাঞ্জাবী। এই বেশে তাঁদের বেশ মানিয়েছে। আমার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, এই পোশাক পরার উদ্দেশ্য। ইংরাজ ভদ্রলোক সহাস্যে উত্তর দিলেন যে, কবির সঙ্গে সাক্ষাতের সময় তাঁরা ভারতীয় পোশাক পরে সাক্ষাৎ করতে চান। কথাটা বেশ লাগল।

পূর্ব বন্দোবস্ত মত উত্তরায়ণে কবির সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা হ'ল। কোন কার্ড দেখানর প্রয়োজন কি নূতন সঙ্গীর জন্যও কোন অসুবিধা হ'ল না। সকলে একে একে উত্তরায়ণে প্রবেশ করলাম। উত্তরায়ণের বারান্দায় একখানি বেতের চেয়ারে ব'সে আছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্র-

নাথ তাঁকে কেন্দ্র ক'রে সামনে পাশে ছোট-বড় শ্বেত পাথরের ও কাঠের চৌকি। তাতে অনেকে বসে আছেন। আমাদের চৌকি দেওয়া হ'ল। বন্ধু তিনজন বসলেন। আমি এক পাশে দেব-দর্শনের মত দাঁড়িয়ে কবিকে দেখতে লাগলাম।

কবি স্থির হয়ে বসে আছেন। পরনে গরুয়া রংয়ের পায়জামা, গায়ে কালো রংয়ের লম্বা পাঞ্জাবী বা তাকে আলখাল্লাও বলা চলে। সেই কালো রংয়ের জামার উপর কবির শুভ্র শ্মশ্রুগুলি শোভা পাচ্ছিল। মাথার সাদা চুলগুলি এদিক্-ওদিক্ ছড়িয়ে পড়েছে। খালি পা। কবি এক একজনের কথার উত্তর দিচ্ছেন। প্রথমে তিনি কথা বললেন, মনে হল তিনি কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান ক'রে এখানে এসেছেন। বাপুজী, জহরলাল সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। ভদ্রলোক সাধারণতঃ কথা বলছিলেন। কবি খুব ধীরে ধীরে সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছিলেন। দু'একটি তিনি প্রশ্নও করছিলেন।

একে একে অনেকে তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, অনেকে তাঁর ফটো তুললেন। যে যা জিজ্ঞাসা করলেন কবি সংক্ষেপে তার উত্তর দিলেন। ছবিও তুলতে দিলেন। অনেকে কথা শেষে বিদায় নিলেন, আবার দু'একজন বসেও থাকলেন। সবশেষে আমাদের কথা বলার পালা। ভিড় কমেছে দেখে এবার কবির সামনে এসে তাঁকে প্রণাম করলাম। বন্ধুগণও উঠে দাঁড়ালেন। এক বন্ধুর ইচ্ছা কবির লেখা "বলাকা" সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেন।

কিন্তু কবির সেক্রেটারী শ্রীযুত চন্দ-মশাই আমাদের কাছে এসে জানালেন, কবি বড় ক্লান্ত, বহুক্ষণ বসে আছেন। চন্দ-মশায়ের ইচ্ছা, আমরা আর কোন কথা না বলি। কিন্তু কবি সে কথায় কান না দিয়ে আমি প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই জিজ্ঞাসা করলেন।

"কোথায় বাড়ী?"

বললাম, "কালনা, বর্ধমান জেলা।"

"কি করা হয়?" কবির প্রশ্ন।

বীরভূমের পল্লী

এর উত্তর আগে না দিয়ে টপ্ ক'রে আমার যে ছোট্ট ছবিখানা কাছে ছিল আর স্কেচ বই ছিল তা কবির হাতে দিলাম। তার পর বললাম, "ছবি আঁকি, আর একটি স্কুলে ড্রইং মাষ্টারের কাজ নিয়েছি।"

কবি এবার আমার মুখের দিকে চাইলেন। তার পর ছোট্ট ছবিখানার মধ্যে যা লেখা ছিল তা পড়বার চেষ্টা করলেন। ছোট যে ছবিখানা ছিল তাকে "উপহার লিপি" নাম দিয়েছিলাম। চারদিকে নক্সা বা ডিজাইন এঁকে মাঝখানে কবির একটি কবিতা লেখা ছিল। "পুণ্য পাপে, সুখে দুঃখে পতনে-উত্থানে, মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।" এই কবিতাটি।

কবি পড়তে পারছেন না দেখে শ্রীঅনিলকুমার চন্দ মশাই বললেন, "আপনার একটি কবিতা"—

কথা শেষ না হতেই কবি তখন চশমা বার ক'রে ফেলেছেন। এবার চশমা পরে দেখে বললেন, "বা; বেশ খুদি খুদি লিখেছ তো, কি করে লিখলে?"

এ কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কবি এবার বললেন, "কাজটি তো বেশ হয়েছে, কোথায় শিখেছ?"

বললাম, "আমি সোসাইটির ছাত্র। ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মশাই আমার শিক্ষক।"

কবি এবার সহাস্যে বললেন, "বটে? আরে তবে তো আমাদেরই দলে, কি নাম তোমার।"

নাম বললাম। কবির মধুর কথায় কেমন যেন অভিভূত হয়ে পড়লাম। কি বলব, যেন কোন কথা ভেবে পাচ্ছি না। হঠাৎ বলে ফেললাম, "আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার আশীর্বাদ পেলাম, পায়ের ধুলো পেলাম।"

কবি সহাস্যে রসিকতা করে বললেন, "সে কি! আশীর্বাদ তোমায় কৈ করলাম! আর পায়ে দেখ আমার ধুলোই নেই।"

উপস্থিত সকলে এ কথায় হেসে উঠলেন। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কবি একটু পরেই আবার কথা বললেন, কিন্তু বলার আগে হঠাৎ কেমন গম্ভীর। দৃষ্টিও যেন অনেক দূরে প্রসারিত, কেমন উদাস ভাব তাঁর মনে, কি যেন ভেবে নিলেন।

বললেন, "তোমাদের 'সোসাইটির' পুরো নাম কি?"

বললাম, "ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট।"

"এর প্রতিষ্ঠাতা কে জান?" কবির প্রশ্ন।

বললাম, "শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

কবি আবার বললেন, "ওখানে কি শেখান হয়?"

বললাম, "ভারতীয় চিত্রকলা আর ভাস্কর্য।"

"ভারতীয় চিত্র বলতে কি বোঝ?"

কবির এই প্রশ্নে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলাম। কিন্তু বিশেষ না ভেবে যা মনে এল উত্তর দিলাম। "ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকলা।"

কবি বললেন, "ভারতীয় পদ্ধতি কাকে বলে?"

বললাম, যেমন অজন্তা, মোগল, রাজপুত, কাংড়া চিত্র পটুয়াদের "পটচিত্র"কেও বলা চলে। তাছাড়া অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত যে পদ্ধতি আমরা শিখেছি, একেও ভারতীয় চিত্র বলব।"

কবি আবার বললেন, "পটুয়াদের ছবি তুমি দেখেছ?"

বললাম, "আমি স্কুলে পড়ার সময়ে কালনায় পটুয়াদের কাছে অবসরে কাজ শিখতাম, তাদের সাকরেদি করেছি।"

কবি এবার যেন আনন্দে উপচে উঠলেন। বললেন, "বটে, বেশ বেশ, এবার আমি আশীর্বাদ করছি। কিন্তু একটি সর্ত, যে ব্রত গ্রহণ করেছ তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে।"

কবির এমন দরদের কথা শুনে কেমন সঙ্কোচ কেটে গিয়েছে। আপনজনের মত মনে হচ্ছে। হঠাৎ বলে ফেললাম, "দুঃখ-কষ্ট, বিশেষ করে, অর্থাভাবের জন্যই আমাদের চর্চার অসুবিধা।"

কবি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "সে ত পরীক্ষা, সাধনায় কত কঠিন পরীক্ষা আসে। কিন্তু দারিদ্র্য কি, যে-কোন বাধা জয় করতে হবে।"

কবি এতগুলি কথা বলে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেলেন। তাঁকে ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। শ্রদ্ধেয় অনিল-কুমার চন্দ মশায় আমাদের আর কিছু বলতে নিষেধ করলেন। বন্ধুর "বলাকা" সম্বন্ধে আর বলা হ'ল না। ইতিমধ্যে কবি আমার স্কেচ বই আর ছবিটি ফিরিয়ে দিলেন। তার আগেই তিনি তাঁর স্বাক্ষর দিয়েছেন সেই ছবিতে আর একটি স্কেচে।

এবার বিদায়ের পালা। নত হয়ে আমরা সকলেই তাঁর চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করলাম। উত্তরায়ণ হতে বেরিয়ে এসে চারদিকে একবার চেয়ে দেখলাম। রবীন্দ্র-নাথের সৃষ্ট এই শান্তিনিকেতন যেন মনের মধ্যে একটা মহাশান্তি এনে দিল। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করে চারজনে আবার পথে নেমে পড়লাম।

—০—

মেঘের দৌত্য

শ্রীকালিদাস রায়

কোন' রাজা যদি বলিত তোমারে—"শোন দেখি বলাহক,
শ্রীমন্তসেন সামন্তরাজ সীমান্তরক্ষক,
তার কাছে এই বার্তা জরুরি
নিয়ে যাও দেখি, মিলিবে মজুরি !
জান আমি রাজা, কোটি মানুষের অদৃষ্ট নিয়ামক।"—

তা শুনি তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতই নিশ্চয় !
ভুবনবিদিত বংশে জনমি এত অপমান সয় ?
একে যে প্রণয়ী তাতে যে বিরহী—
তাহার করুণ আবেদন বহি'
ধন্য হইলে, তুমি যে দরদী বিদগ্ধ রসময়।

ধন্য হইয়া যাত্রা করিলে তাই ত গর্বভরে,
বিজুরি চমকে গুরু গুরু তানে মাতাইয়া চরাচরে,
বারিকণা সহ তৃষিত ধরাতে
প্রণয়ানন্দ ছড়াতে ছড়াতে
নাচায়ে শিখীরে ফুটায়ে কুটজ কদম্ব থরে থরে।

শুধু তাই নয়, যক্ষবধূর শুনেছিলে বর্ণনা,
তারে নিজ চোখে হেরিতে রসিক হয়নি কি বাঞ্ছনা ?
ম্লান মুখে তার ফুটাইতে হাসি
ছিলে না কি, দূত, তুমি প্রত্যাশী ?
ছিল না কি লোভ পাইতে তাহার আতিথ্য-বন্দনা ?

ফুলের আলোয়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

গাছ-ভরা সব শুভ্র বেলী, রং-বেরঙের নাইক সাজ,
সর্ব্ব-শুক্লা-সরস্বতীর স্নিগ্ধ জনের এই সমাজ !
আজকে আমার মনের মাঝে,
কোন ত্রিদিবের ন'বৎ বাজে।
শোনার চেয়ে মধুরতর অশোনা যে সেই আওয়াজ।

২

বাগান না এ চিত্রশালা ?—অবাক চেয়ে যাই চাহি,—
অলখ্ হাতের আঁকা ছবি—পটে রেখা রঙ নাহি।
মিলন-দেহী অদেহীতে—
অরূপ এল রূপ দেখিতে
গন্ধ কহে সকল কথা—ফুলের দেশে এই রেওয়াজ।

৩

কই শুনিনি ফুলের ভাষণ—আজকে প্রথম শুনছি ত,—
কত বড় সম্পদ হতে ছিলাম আমি বঞ্চিত।
এ যে সুরের সৃষ্টি সম,—
অভিরাম ও অনুপম
ও অনুভব-দূরের বাণী করতে প্রকাশ তাই নারাজ।

৪

মনে আমার লেগেই আছে—বেলীফুলের স্নিগ্ধতা—
ফুলের পরশ শুচি করে নূতন গড়ে ঠিক কথা।
স্পর্শ গীতি পুণ্য আলো—
এক সাথেতে বুক জুড়ালো,
ভাল আমার লাগছে না আর ছন্দ কথার কুচকাওয়াজ।

৫

অনেক কঠিন তপস্যাতে হওয়া বুঝি যায় রে ফুল,
দেহ হৃদয় বিভিন্ন নয় রূপে রসে দুই অতুল।
দেখছি বদল ভাবে রূপে
বিস্ময়েতে চুপে চুপে
ভাবছি শুধু ধ্যান করা আর পূজা করাই শ্রেষ্ঠ কাজ।

মৃত্যুর প্রতি

'It is a bad habit of man to die.'
—Sri Aurobinda

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

এ-পারের যত আলো সোমসূর্য্য-গ্রহতারকায়
বিম্বিত প্রতিটি ক্ষণে নানা রূপ নানা রঙে ভরি
অজস্র প্রাণের স্রোতে উর্ম্মিময় সত্তা-আলোড়নে,
জড়ের নিশ্চেষ্ট হ'তে কম্পমান অক্ষি-মণিকায়
জাগায় নিরুক্ত স্বাদ, ততই-সে কালের-প্রহরী
অন্ধ অমা-যবনিকা ঈষিকায় আঁকে সঙ্গোপনে !

বেতস ভঙ্গুর-দেহী মোরা শীর্ণ এ-পৃথ্বীর জীব
মৃত্যুভয়ভারাক্রান্ত আর্ত্ত-মুখে স্মরি নচিকেতা,
সুবিশাল আয়ুষ্মান ঐহিকের বিপুল বিস্ময়,
দেহে যার দিব্য জ্যোতি জাগরূক কালজয়ী শিব—
মৃত্যুর সম্মুখে স্থির অবিচল অনপেক্ষ-চেতা,—
যে-মৃত্যু দেখাল রূপ উন্মোচিয়া তমিস্রা-বলয় !

হিমাদ্রি শিখরে দোলে ভূকম্পন-বিপাটন রোষ
প্রমূর্ত্ত পয়োধি-বক্ষে প্রব্যাদিত হুঙ্কার পাংশুল,
উন্মাদ বৈশাখী ঘূর্ণি নির্ঘোষে-যে লয়-শঙ্খনাদ,
বাধাবন্ধহারা সে-কী-মূর্ত্তিমান রুদ্র-অসন্তোষ,—
মরণ প্রকটভঙ্গি, বিদ্রূপ-বিভঙ্গ অনুকূল—
উদ্বেলিত এ-ফেনিল জীবনের তীব্র বিসম্বাদ !

প্রলম্ব-সে আঁধারের ছিন্ন ব্যূহ দীর্ণ মায়াজাল,
নয়ন-উৎখাত দ্যুতি, রক্তচ্ছটা আশ্চর্য্য-সম্ভব—
নিয়তি-নিয়মতন্ত্রে বদ্ধগতি মৃত্যুর-দেবতা,
সুচির শ্যামল-নীল-কৃষ্ণ-কদ্রু-তিমির-তমাল
জ্বালায় ঈপ্সার-দীপ,—প্রদীপ্ত-সে আয়ুর অর্ণব,
নশ্বরের দীপিকায় দেয়ালির সে-কী সমগ্রতা !

দুর্গম দুরতিক্রম তোমার অখণ্ড আবর্ত্তন,
জীবন-সংঘাত নিত্য জীবনের পশ্চাতের দিকে,
যেথা ভয়-দুঃখ-শোক নিরাশার নিরেট সন্তাপ
পুঞ্জিত যুগান্ত হ'তে, যেথা তব শ্যাম-আলিঙ্গন
ব্যাধির প্রচ্ছায়ে দংশে নিয়ত নিঠুর নির্নিমেখে,
তবুও কী তুমি 'শ্যাম', ওগো মৃত্যু,—মৃত্যু-অপলাপ ?

তবুও তোমার ব্যাপ্তি মৃত্তি-মরু এ-প্রাণ-সৈকতে
উদয়-অস্তের মাঝে অপ্রকাশ্য সংবেদ নিথর,
দিনহারা ক্ষণহারা নিমেষের আবেগ-বুদ্বুদে
সহসা জাগিয়া ওঠে,—লীন হয় মহাকাল-স্রোতে,
যে-কাল পূর্ণতা আনে যুগ হ'তে যুগ-যুগান্তর—
গভীর-এককে বদ্ধ, নহে ব্যাপ্ত অযুতে-অর্ব্বুদে !

'কেন নয় ?'—এ-প্রশ্নের আমরণ পরমা জিজ্ঞাসা
খুঁজেছে বেদান্ততলে অন্তহীন রহস্যের মাঝে,
প্রাকৃত নিয়ম-উর্দ্ধে সৃষ্টি-লয় যেথা পরস্পর
একের পূরক হয়ে জাগায় যে অনন্ত পিপাসা,—
মৃত্যু-অনুগত মোরা শুষি প্রাণ প্রত্যহের কাজে,
অন্তে তাই ভুলে যাই, ওগো মৃত্যু, প্রাণ-সহচর !—

তবুও প্রচেষ্টা রবে, রবে নব সন্মার্গ-প্রয়াস,
আগামী-কালের-গর্ভে ভ্রূণ যার বুঝি অনুদ্গত,
সার্ব্বিক সাকুল্যে তার পাবে রূপ সমষ্টির-চিতে
স্তর হ'তে স্তরান্তরে মননের অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস
মানস-মণ্ডলে হবে চিদানন্দে তন্ময় তদ্গত,
সে-দিন, হে মৃত্যু, তুমি হবে ঋত নৈর্ঋত-পৃথ্বীতে !

এ-সত্তায় যদি বুঝি অমৃতের মোরা অধিকারী,
অসংখ্যের মাঝে নহে উপলব্ধ একের-চেতনা—
আছে আয়ু, আছে আলো, অনন্তের মত অফুরান্
অগাধ ঐশ্বর্য্যসুখ চিদ্রূপের, সর্ব্বভয়হারী ;—
ভাঙিবে-যে দেহতটে এ-প্রাণের বিচ্ছেদ-বেদনা,
ধ্বনিবে সেদিন চির-জীবনের জয়-ঋদ্ধ গান !

এই মাটি, এই জল, এ-মরুর ঊষর স্মারক
হবে না আক্রান্ত কভু অকারণ তোমার তুহিনে,
মরণ ঐচ্ছিক তবে দেশ-কাল-পাত্রের মাঝার,—
সৃষ্টির সরল গতি, সম্মুখের মোরা মানবক
অনন্ত-পথেরযাত্রী, এ-গ্রহের অনুচ্ছিন্ন দিনে
তোমারে পশ্চাতে রাখি উত্তরিব কালের-পাথার !

গল্পগুচ্ছে প্রেমের গল্প

শ্রীশান্তা দেবী

আজ বাংলা দেশ ছোটগল্পে প্লাবিত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প এবং বিখ্যাত লেখকের সংখ্যাও কম নয়। আশ্চর্য্য মনে হয় যে, এই বাংলা দেশেই সত্তর বৎসর আগে ছোটগল্প বলতে কিছু ছিল না। রবীন্দ্রনাথই প্রথম পথ দেখালেন ছোটগল্প রচনায়।

তিনি কবি, এবং যে বয়সে তিনি ছোটগল্প রচনার মধ্যে ডুবে ছিলেন, সে বয়সটা আধুনিক লোকে তরুণ বয়সই বলবে। কিন্তু তাঁর মানসিক পূর্ণতা তখনই এমন সর্ব্বতোমুখী হয়ে গড়ে উঠেছিল যে, তরুণ লেখকদের মত কেবলমাত্র প্রেমের গল্প লিখে তিনি খাতার পাতা ভরাতেন না। তাঁর সুবিখ্যাত গল্প কাবুলিওয়ালা, খোকাবাবু, দিদি, ছুটি, অতিথি কোনোটিই প্রেমের গল্প নয়। বাস্তবিক বলতে গেলে অল্প বয়সে প্রেমের গল্পের চেয়ে অন্য গল্পের উপরেই তাঁর ঝোঁক বেশী ছিল। মানবজীবনকে তিনি সব দিক দিয়ে দেখেছিলেন।

প্রেমের গল্প বলতে যদি প্রেমোন্মত্ততা বা প্রেমের জন্য বৃহৎ ত্যাগ অথবা প্রেমের মনস্তত্ত্বকে চুল চিরে বিশ্লেষণ করা বোঝায় তবে সে রকম গল্পের দেখা আমরা বেশী পাই না গল্পগুচ্ছে। দুরাশা, বিচারক, কঙ্কাল, মহামায়া, একরাত্রি, ত্যাগ, অধ্যাপক, দালিয়া, প্রভৃতি গল্প কোনো না কোনো দিক্ দিয়ে প্রেমের গল্পই বটে; কিন্তু 'দুরাশা'র মত রোমাণ্টিক প্রেমের গল্প অন্যগুলি নয়। রোমান্সের ছোঁয়া একটু-আধটু আছে হয়ত; কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তা বসন্তরাত্রির বনপুষ্পের সুরভির মত শুধু দূর থেকে ভেসে এসে মনকে নাড়া দিয়ে যায়। পুষ্প-সুরভির মতই তা কায়াহীন ও স্থূলতা-বর্জ্জিত।

'দুরাশা' রোমাণ্টিক গল্প বটে; কিন্তু এ রোমান্স একটি মুসলমান বালিকার মনেই গড়ে উঠেছিল, বাহ্যতঃ তার প্রকাশের উপায় ছিল না। এর সমাপ্তিও তার মনেই হয়।

বদ্রাওনের নবাবের কন্যা মুসলমানী হয়েও হিন্দু-ব্রাহ্মণ কেশরলালের ধর্ম্মাচারে মুগ্ধ হয়ে ক্রমে "ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মত" এই ব্রাহ্মণ-কুমারের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বালিকার মনে স্বাভাবিক ধর্ম্ম-পিপাসা ছিল। কেশরলালের পূজার্চ্চনা-দৃশ্য তার মনে যে ভক্তি-মাধুর্য্য জাগিয়ে তোলে তাই প্রেমে রূপান্তরিত হ'ল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় রণক্ষেত্রে বেরিয়ে এসে কেশরলালকে বদ্রাওনকুমারী মৃত মনে করেছিলেন। তাঁর পিতা কেশরলালের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন। এই বেদনায় বদ্রাওনকুমারী গৃহত্যাগ করেন। তিনি রণক্ষেত্রে মৃতপ্রায় কেশরলালকে খুঁজে বার ক'রে যখন সেবায় শুশ্রূষায় তাঁকে নূতন জীবনে জাগিয়ে তুললেন, তখনই কেশরলালের সঙ্গে তাঁর প্রথম এবং শেষ পরিচয়। যবনীর হাতে জল পান করেছেন জেনে অকৃতজ্ঞ কেশরলাল বদ্রাওনকুমারীকে "বেইমানের কন্যা" বলে কপালে প্রবল আঘাত করে বিদায় ক'রে দিলেন। "বহিঃ সংসারে পদক্ষেপ করিবামাত্র সংসারের নিকট হইতে—তাহার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ।" বালিকার মন নির্লিপ্ত ব্রাহ্মণকে মনে মনে সম্বোধন করে বললে, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান, যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কর না। তোমাকে আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই।"

কেশরলাল যমুনার জলে নৌকা ভাসিয়ে চলে গেল। বালিকা কিন্তু তার ব্যর্থ জীবন যমুনার জলে বিসর্জ্জন দিতে পারল না। সে আটত্রিশ বৎসর ধরে কেশরলালের সন্ধানে ফিরল। গল্পে প্রেমলীলার কোনো ছবি নেই, প্রেমের জন্য মুসলমান কুমারীর ব্রাহ্মণত্ব লাভের তপস্যার ইতিহাসই আসল। যবনী বলে যাকে কেশরলাল অপমান করেছিল সেই যবনী কি করে দিনে দিনে পলে পলে ব্রাহ্মণী হয়ে উঠতে পারে—এই হ'ল তার সাধনা। ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে সে কেশরলালকে জয় করবে। যবনী সত্যই ব্রাহ্মণী হয়ে উঠল কায়মনোবাক্যে। কিন্তু বহু দিনের সাধনায় যখন সে বিশুদ্ধ শুচিতা লাভ করেছে, যখন সে জেনেছে "জীবনের চরমতীর্থ অনতিদূরে", তখনই একটি ফুৎকারে তার জীবনব্যাপী হোমশিখা নিভে গেল। সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে দার্জ্জিলিঙে এসে বদ্রাওনকুমারী আবিষ্কার করল কেশরলালকে, দেখল "বৃদ্ধ কেশরলাল তাহার ভুটিয়া স্ত্রী এবং পৌত্র-পৌত্রী লইয়া ম্লান বস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।" "যে ব্রাহ্মণ্য বালিকার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল"

এত দিনে বার্দ্ধক্যের প্রান্তে এসে নবাবকুমারী জানলেন, তা অভ্যাস, তা সংস্কার মাত্র!

গল্পটি আগাগোড়াই কল্পনার লীলা; তবু প্রেমমুগ্ধ ভক্তিনম্র রমণীর তপস্যা ও ব্রাহ্মণ্যগর্ব্বিত শুদ্ধাচারী পুরুষের নিষ্ঠাভঙ্গের এটি যেন একটি তুলনামূলক সমালোচনা। প্রেমের আগুনে পুড়ে মুসলমান নবাব-নন্দিনী তপস্বিনী ব্রাহ্মণী হয়ে উঠল আর তার ভক্তিবেগ-কম্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে যে জলদগ্নিতুল্য নিষ্কলুষ ব্রাহ্মণ অবজ্ঞাভরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সুকুমারী বালিকার কপালে শুধু দুঃসহ অপমানের কঠিন আঘাত দিয়েছিল, সে কিনা ম্লেচ্ছ হয়ে ধূলিম্লেচ্ছদের মধ্যে নিশ্চিন্ত আরামে তার অনাদি অনন্ত ধর্ম্ম ভুলে বার্দ্ধক্য যাপন করছে।

বদ্রাওনকুমারী বললে, "হায় ব্রাহ্মণ, তুমি ত তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্ত্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন, এক জীবনের পরিবর্ত্তে আর এক জাবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব?"

কবির শেষ বয়সের লেখা "তপস্বিনী" গল্পেও স্ত্রী-পুরুষের সাধনার কতকটা এইরূপ চিত্র আছে। পুরুষকে তিনি যেন সুবিধাবাদী বলে ব্যঙ্গ করেছেন। রমণীর প্রেম তপস্যায় জ্বলে জ্বলেও সার্থক হয়। পুরুষের প্রেমে তপস্যার অবসর নেই। অথচ তপস্যাই এই দুটি নারীর প্রেম। বদ্রাওনকুমারীর জীবন যৌবন গেল প্রেমলাভের তপস্যায়, তপস্বিনী "ষোড়শী"র ধন জন যৌবন সন্ন্যাসী স্বামীর যোগ্য সন্ন্যাসিনী স্ত্রী হবার সাধনায় কাটল। বদ্রাওনকুমারী জীবনপ্রান্তে এসে ব্রাহ্মণ্যচ্যুত কেশরলালকে আবিষ্কার করলেন; ষোড়শীর সাধনা অন্তে দেখা দিল কাপড়কাচা কলের এজেন্ট আমেরিকা-ফেরত স্বামী। রমণী প্রেমের মর্য্যাদা এই পেল এ দু'টি গল্পে। "তপস্বিনী" গঠন-পারিপাট্যে, প্লটের গতিভঙ্গি ও পরিণতিতেও অপূর্ব্ব, "পয়লা নম্বরের মত এতেও আর্টের পরিপূর্ণ স্ফুরণ দেখা দেয়। 'পয়লা' নম্বর ট্রাজিক গল্প, তপস্বিনীতে দুঃখের মধ্যেও হাস্যরস উচ্ছলিত হয়ে ওঠে।

পুরুষের প্রেমানুভূতির গল্প যে একেবারে নাই তা বলা যায় না। "একরাত্রি" একটি বিখ্যাত প্রেমের গল্প। কিন্তু হিমালয়ের মেঘলোকে অকস্মাৎ আবির্ভূত তপস্বিনী বদ্রাওনকুমারীর গল্পের মত ইহার আবহাওয়া কল্প-লোকের নয়। একেবারেই বাংলা দেশের স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার তাঁর বাল্য ও যৌবনের গল্প বলছেন। এক সময় শৈশবে সুরবালা তাঁর সঙ্গিনী ছিল; তার উপর নায়কের বাল্যকাল হতেই একটা বিশেষ দাবী ছিল তার সঙ্গে বিবাহ হলেও হতে পারত; কিন্তু একদিন নায়কেরই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে সেই সুরবালা হয়ে দাঁড়াল তাঁর প্রতিবেশীর স্ত্রী। আর নায়ক তখন আজীবন বিবাহ না করে স্বদেশের জন্য মরবার প্রতিজ্ঞা করছেন। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁর গ্যারিবল্ডি হওয়া হয় নি, নায়ক হলেন ইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার। প্রতিবেশী উকিলের বাড়ীতে তাঁর স্ত্রীর মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং শুনে যৌবনকালে একদিন তাঁর "শৈশবের সেই সুরবালার জন্য বেদনায় মনটা টন্‌টন্ করিয়া উঠিল।" মনে পড়ে গেল "বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশবপ্রীতিতে ঢলঢল দুখানি বড়ো বড়ো চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থির স্নিগ্ধ দৃষ্টি।" মনকে শাসন করে বলা হ'ল "সুরবালা তোমার কে?"

মন বলিল, "সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কী না হইতে পারিত?" আজ সুরবালাকে চোখে দেখা যায় না, কিন্তু মনে সেই সব ঠাঁই জুড়ে বসে আছে—এমনি ভাবেই দিন কাটছিল। অকস্মাৎ এক প্রলয়রাত্রিকালে ঝড় ও বৃষ্টি ক্রমে বন্যার প্লাবনকে গৃহ-দ্বারে এনে উপস্থিত করল। প্রতিবেশী উকিলবাবু বিদেশে গিয়েছেন, সুরবালা ঘরে একা; ইস্কুল মাষ্টারও তার ঘরে একা। মাষ্টারের মনে হল সুরবালাকে স্কুল ঘরে ডেকে আনে। কিন্তু পথে বাহির হতে না হতে হাঁটু পর্য্যন্ত জল। পথে পুষ্করিণীর পাড় এগারো হাত উঁচু। "পাড়ের উপর আমিও যখন উঠিলাম, বিপরীত দিক হইতে আর একটি লোক উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।"

"আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল হাত পাঁচ-ছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম। ...কেহ কাহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না। কেবল দুজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।"

"আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই।... জন্মস্রোতে সেই নব বালিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে—এখন কেবল আর একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে।

বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে, খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।"

কিন্তু সে মিলন হ'ল না। ঝড় থেমে গেলে, জল নেমে গেলে, দুজনে কোনো কথা না ব'লে, নিজ নিজ ঘরে চলে গেল। একটি কথাও কেহ বলে নাই।

এ গল্পে প্রেমের মাতামাতি নেই, ত্যাগের আস্ফালন নেই, সামান্য ভাঙা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারের জীবনে কোনো দিন কোনো দিক্ দিয়ে কোনো বিরাট সার্থকতাই আসে নি। তার "সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্ত রাত্রির উদয় হইয়াছিল—আমার পরমায়ুর সমস্ত দিন-রাত্রির মধ্যে সেই একটিমাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।"

অত্যন্ত সাদাসিধা গল্প অকস্মাৎ শেষ প্রান্তে এসে জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনার একটি অক্ষয় সঙ্গীত মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়াল। এত সহজ গল্প একটি রাত্রির প্রলয়ে উভয় পক্ষের নীরবতার মধ্যেও এমন ক'রে রূপান্তরিত হ'য়ে উঠল। এইখানেই এর অভিনবত্ব।

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গল্প 'একরাত্রি', 'মহামায়া' ও 'পয়লা নম্বর' নীরবতার ভিতর দিয়েই গল্পের চরম সৌন্দর্য্যটি ফুটিয়েছে।

'বিচারক' একটি নারীর প্রেম ও একটি পুরুষের প্রমোদমত্ততার কাহিনী।

কলঙ্কিনী ক্ষীরোদা যৌবনপ্রান্তে অন্নমুষ্টির জন্য বারে বারে পুরুষের মন ভোলানোর খেলায় বীতস্পৃহ হয়ে শিশুপুত্রটিকে কোলে নিয়ে কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছিল। মৃত্যু হ'ল শিশুটির, কিন্তু ক্ষীরোদা বেঁচে গিয়ে জজের বিচারে ফাঁসির হুকুম পেল। তার দুঃসহ জীবনের প্রতি মায়া দেখিয়ে উকিলেরা তাকে ক্ষমা করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু জজ মোহিতমোহন রাজী হলেন না। "তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।"

তাঁর যৌবনের ইতিহাসই এই বিশ্বাসের কারণ।

তাঁর কলেজজীবনের সময় পাশের বাড়ীর একটি বিধবা বালিকা তাঁর সোনার চশমা ও সাহেবী পোশাক-আশাকে আকৃষ্ট হয়ে মনে মনে তাঁকে পুরুষশ্রেষ্ঠ ভেবে পূজা করত। "বৈধব্যের বেষ্টন অন্তরালে হেমশশী সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল, সেই দূরত্বের বিচ্ছেদবশত সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্ত্তী পরম রহস্যময় প্রমোদভবনের মত ঠেকিত।" হেমশশী মনে করত, এই বৈধব্যের ব্যবধানটুকু দূর করতে পারলেই সংসারে স্বর্গসুখ পাওয়া যাবে, দেবতা ত অদূরেই আছেন।

মোহিতমোহন বিনোদচন্দ্র ছদ্মনামে একদিন স্বর্গ হাতে ক'রে এই বালিকার দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। একদিন গভীর রাত্রে পিতামাতাভ্রাতা গৃহ সব ছেড়ে হেমশশী মোহিতের সঙ্গে এক ঘোড়ার গাড়ীতে উঠে বসল। যখন তার চেতনা হ'ল তখন দেবতা মোহিত তার ক্রন্দনে কর্ণপাত করলেন না। "ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণরথে আর এক পথে প্রস্থান করিলেন—রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।"

মোহিতমোহনের পূর্ব্ব ইতিহাসে এরূপ আরো ঘটনা বিরল নয়। এখন তিনি শুদ্ধাচারী হয়েছেন, "আহ্নিক তর্পণ করেন···এবং বাড়ীর মেয়েদিগকে সূর্য্যচন্দ্র মরুদ্‌গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এককালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আজ রমণীর সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন।"

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার পর মোহিত বন্দিনীশালায় তার অনুতাপ হয়েছে কি না দেখতে যান। দূর থেকে ঝগড়ার শব্দ শুনে কাছে গিয়ে শোনেন ক্ষীরোদার চুলের ভিতর একটি সোনার আংটি লুকানো ছিল, প্রহরী সেটি কেড়ে নেওয়ায় কলহ বেধেছে। ক্ষীরোদা বলিল, "ওগো জজবাবু, দোহাই তোমার। উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।"

মোহিত গহনাসর্ব্বস্ব মেয়েদের কথা মনে করে মনে মনে হাসলেন। বললেন, "দেখি আংটি"।

আংটি হাতে ক'রে "তিনি যেন জলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটির একদিকে হাতীর দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি গুম্ফ-শ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে এবং অপর দিকে সোনার গায়ে খোদা রহিয়াছে 'বিনোদচন্দ্র।'

"তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভালো করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জ শঙ্কিত মুখ মনে পড়িল। সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।"

"আজ মোহিতের চোখে "কলঙ্কিনী পতিতা রমণী

একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।”

এখানে যদিও কবি পতিতা রমণীর বালিকাজীবনের প্রথম নিষ্কলুষ প্রেমের স্মৃতিরক্ষার সঙ্গে কামোন্মত্ত পুরুষের পরজীবনের শুদ্ধাচারের তুলনামূলক সমালোচনা করে পুরুষকে কঠিন কশাঘাত করেছেন, তবু এক মুহূর্তের জন্য ঐ পতিত পুরুষকেও তিনি মনুষ্যত্বের ও প্রেমের উচ্চলোকে তুলে ধরেছেন। হেমশশীর যুবক বন্ধু ‘বিনোদচন্দ্র’ তার যে রূপ কোন দিন দেখে নি, আজ পরিণতবয়স্ক বিচারক মোহিত ফাঁসীর হুকুম দেবার পর তার সেইরূপ আবিষ্কার করল।

‘পোষ্টমাষ্টার’ গল্পটি সুবিখ্যাত। এটিকে প্রেমের গল্প নাম দিলেও প্রেমের কথা গল্পের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে সহজ কথায় একে ভালবাসার গল্প বললে মানায় বেশী।

কলিকাতার ছেলে উলাপুরে পোষ্টমাষ্টার হয়ে গিয়েছেন। উলাপুরে কথা বলার মত কোন লোক নেই, হাতেও কোন কাজ নেই। পোষ্টমাষ্টার নিজে রেঁধে খান আর গ্রামের একটি অনাথ বালিকা তাঁর কাজকর্ম্ম ক'রে দেয়। দিনান্তে অন্ধকার দাওয়ায় ব'সে যখন পোষ্ট-মাষ্টারের মনে নানা ভয় এসে জড়ো হ'ত তখন এই রতনকে ডেকে তিনি উভয়ের জীবনের গল্প জুড়তেন। পায়ের কাছে মাটির উপর ব'সে রতন তার মা-বাপ-ভাইয়ের গল্প করত। তার পর রুটি সেঁকে এনে বাবুকে খেতে দিত এবং নিজে খেত।

ক্রমে রতন ‘দাদাবাবু’র কাছে পড়াশুনা সুরু করল। রতনের দিন সুখেই কাটছিল। কিন্তু একদিন ঘনবর্ষায় বাবুর জ্বর হল। “এই ঘোর প্রবাসে রোগ-যন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারী-রূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের ইচ্ছা ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না।” সে মায়ের মত সব কর্ত্তব্য ক'রে সেবায় ঔষধে পথ্যে বাবুকে সারিয়ে তুলল। কিন্তু পোষ্টমাষ্টারের মনে রোগের ভয় হ'ল। তিনি অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করে বদলির দরখাস্ত করলেন। শুধু নিজের কথাই ভাবলেন। কিন্তু রতন আবার তার পুরানো জীবনের মধ্যে ফিরে যাবে আশা করেছিল। তবু রতনের আর ডাক পড়ে না। দরখাস্তের উত্তরের চিন্তায় বাবু তখন ডুবে আছেন। রতন কাজ সেরে পুরানো পড়া প'ড়ে দিন আর কাটাতে পারে না। অবশেষে একদিন ডাক পড়ল। বাবু বললেন, “রতন, কালই আমি যাচ্ছি।”

রতন বলিল, “আবার কবে আসবে?”

পোষ্টমাষ্টার, “আর আসব না।”

রতন কাজ সেরে শুধু একবার বলল, “দাদাবাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাবে?”

পোষ্টমাষ্টার হেসে বললেন, “সে কি ক'রে হবে?”

যাত্রাকালে পোষ্টমাষ্টার বললেন, “রতন আমার জায়গায় যে লোকটি আসবেন তাঁকে ব'লে দিয়ে যাব, তিনি তোকে আমারই মত যত্ন করবেন।”

রতন এইবার কাঁদিয়া কহিল, “না, না, তোমার কাউকে কিছু বলতে হবে না, আমি থাকতে চাই না।” পোষ্টমাষ্টার তাকে যথাসাধ্য টাকা দিতে গেলে সে ধুলায় প'ড়ে তাঁর পা জড়িয়ে বললে, “তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাবতে হবে না।” এই বলে রতন “এক দৌড়ে পলাইয়া গেল।”

নিতান্তই সাধারণ গল্প। কিন্তু নারীর ভালবাসারই গল্প। রতন বালিকা ছিল। কখন মনে মনে নারীত্বের বয়সে জেগে উঠেছিল, “যে বয়সে ভালবাসা দেওয়া এবং ভালবাসা পাওয়াই রমণীর সকল সুখ এবং অন্য সকল কিছুর চেয়ে স্বভাবতই বেশী মনে হয়।”

দাদাবাবু যখন চলে গেল তখনও সে পোষ্ট আপিসের চারিধারে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল, যদি দাদাবাবু আবার ফিরে আসে।

পোষ্টমাষ্টারের মনে তখন তত্ত্বকথা জেগেছে, “পৃথিবীতে কে কাহার?” রতন পোষ্টমাষ্টারের কাছে কোন আদর-যত্ন পায় নি, কোন প্রেমের কথা শোনে নি, শুধু সেবার অধিকার পেয়েছিল এবং সেবার ভিতর দিয়েই নিজেকে পরিপূর্ণরূপে দান করেছিল। সে শুধু সেইটুকুকে চিরস্থায়ী মনে ক'রে ধ'রে রাখতে চেয়েছিল। মূঢ় বালিকা!

পোষ্টমাষ্টারের নিঃসঙ্গ দিনগুলিকে সব দিক্ দিয়ে ভ'রে তুলবার জন্য যে বালিকা মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিল পোষ্টমাষ্টার তাকে অন্নের বিনিময়ে সেবিকামাত্র ভেবে-ছিলেন। সে যে নূতন প্রভু চায় না, অর্থ চায় না শুধু দাদাবাবুকেই চায়, এটি পোষ্টমাষ্টারের যেন আকস্মিক আবিষ্কার। নৌকায় ওঠার পর তাই তার করুণ মুখচ্ছবির মধ্যে যে মর্ম্মব্যথা বিশ্বব্যাপী হয়ে দেখা দিল তার জন্য ইচ্ছা হ'ল “ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি।” কিন্তু ‘পৃথিবীতে কে কাহার’ এই তত্ত্বকথা সেই শুভবুদ্ধিকে ডুবিয়ে দিল। “কিন্তু রতনের মনে কোনো তত্ত্বকথার উদয় হইল না।” তার মনে তখনও ‘আশার কুহক ঘুরিতেছিল।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটির সৌন্দর্য্য অপরূপ; "এস হে ফিরে এস" গানটি তার মাধুর্য্য আরও বাড়িয়েছে। এটিও ভালবাসারই গল্প। কিন্তু নায়িকা আট বৎসরের বালিকা গিরিবালা। আট হতে দশ বৎসর বয়সে যুবক শশিভূষণ এম-এ, বি-এল-এর সঙ্গে গিরির বাল্যলীলা চলত। আঁচলে বাগানের জাম নিয়ে শশিভূষণকে দিতে আসা তার দৈনিক কাজ ছিল। একাজে শশীর চেয়ে গিরিরই উৎসাহ বেশী ছিল। তবু শশীর অমনোযোগ দেখলে গিরিবালার অভিমানের শেষ ছিল না।

শশীর কাছে গিরিবালার পড়াশুনাও সুরু হয়। শুধু অক্ষর আর বানান নয়, শশিভূষণ কাব্য পড়েও গিরিকে তার ব্যাখ্যা শোনাত। গিরি বুঝত না, অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে চ'লে যেত। তবু তাতে শশিভূষণের দুঃখ ছিল না। কারণ এ গ্রামে গিরিবালাই তার একমাত্র সমজদার বন্ধু। তাই তার সাহিত্যচর্চ্চাও গিরির সঙ্গে।

শশিভূষণ একদিন গিরিবালার জাম ও কথামালা ফেলে, তার বকুলফুলের মালা উপেক্ষা ক'রে যেন গিরিবালার অস্তিত্ব ভুলেই মামলা-মোকদ্দমা ও আইনচর্চ্চায় ডুব দিলেন। এদিকে গিরিবালার বিবাহ হয়ে গেল। আইনঘটিত ব্যাপারটি দীর্ঘ এবং এই সুমিষ্ট গল্পটির রস ভঙ্গ করে। তবু তার মাঝে মাঝে শশীর মনকে সুকোমল বন্ধনে যে বালিকা বেষ্টন ক'রে ধরেছিল তার কথা সেই বাল্যলীলাভূমিতে পাঠককে টেনে নিয়ে যায়।

শশিভূষণের জেল হ'ল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর জেলবাসের পর যখন "গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজহীন" শশী এত বড় জগৎ-সংসারে একলা এসে দাঁড়ালেন তখন তাকে এক বৃহৎ জুড়িগাড়ী ক'রে কেউ একজন নিজ গৃহে নিয়ে গেল। পথে বৈষ্ণব ভিখারীদের গান

"এসো এসো ফিরে এস
নাথ হে ফিরে এস
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,
বঁধু হে ফিরে এসো!"

শশিভূষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলে দিল, শশিভূষণও গান গেয়ে চললেন।

যে বাড়ীতে এসে পৌঁছলেন তার সুসজ্জিত লাইব্রেরী ঘরের টেবিলে গিরিবালার বিদীর্ণ স্লেট, পুরাতন খাতা, কথামালা ইত্যাদি সযত্নে সাজান। কোথায় এসেছেন বোঝা গেল।

ক্ষুদ্র ছাত্রী গিরিবালা একদিন স্নেহের পাত্রী ক্ষুদ্র ছাত্রী মাত্র ছিল। সেখানে প্রেম বা রোমান্সের কোন ছায়া পড়ে নি। কিন্তু আজ দীর্ঘদিন পরে বালিকার সেই মুখখানি তার "অনাদৃত ব্যথিত অভিমানমলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতারচিত এক অসাধারণ আশ্চর্য্য অপরূপ অতি-গভীর অতি-বেদনা পরিপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মত তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।" জেল-প্রত্যাগত শশিভূষণ তাঁর ক্ষুধিত তাপিত তৃষিত চিত্ত নিয়ে এই গৃহহীন জগতে যদি গিরিবালার গৃহে একা এসে না দাঁড়াতেন, হয়ত পুরানো দিনের শিশু ছাত্রীর বাল্যলীলা, তার অভিমানজড়িত ম্লানমুখ আজ বিশ্ব-হৃদয়ের সমস্ত দুঃখ ও বিরহের রূপ ধ'রে তাঁর সম্মুখে প্রতিভাত হ'ত না। সেদিনকার তুচ্ছ ঘটনা তুচ্ছই থাকত, তাকে প্রেমাশ্রুজলে নূতন রূপ দেওয়া হ'ত না। বালিকা বালিকাই থাকত চিরন্তনী বিরহিণী নারী হয়ে উঠত না। "শশিভূষণ যখন দুইবাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই স্লেট বই খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেককাল পরে অনেক দিনের সুখ-দুঃখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন" তখন মৃদুশব্দে সচকিত হয়ে মুখ তুলে দেখলেন, নিরাভরণা বিধবা গিরিবালা তাঁকে প্রণাম করছে। ক্ষুদ্র বালিকা তাই আরও অনায়াসে অবহেলিতা ব্যথিতা নারীর রূপ ধ'রে দাঁড়াল। বালিকা গিরিবালা যখন বালিকা ছিল তখন তার প্রতি যে প্রেম তিনি অনুভব করেন নি, আজ বিধবা গিরিবালা সেই প্রেম অতীতে প্রসারিত ক'রে নিয়ে গেল।

'অধ্যাপক' পুরুষের ব্যর্থ প্রেমের গল্প। কবি স্বয়ং পুরুষ বলেই বোধ হয় পুরুষের প্রতি করুণা তাঁর কম। 'একরাত্রি' গল্পটিতে পুরুষের প্রেমানুভূতিকে তিনি মহীয়ান্ করে তুলেছেন। কিন্তু 'অধ্যাপকে' যেন কবি অন্তরাল হতে সকৌতুকে নায়কের প্রেমবেদনা নিরীক্ষণ করছেন। যেন বেচারীর প্রেমে পড়ায় কবির একটা হাসির জিনিষও আছে।

বামাচরণ ব্রাহ্ম অধ্যাপক। মহীন্দ্র ছাত্র, বক্তৃতা দেয়, কবিতা লেখে, সাহিত্য-সমালোচনা করে। ছেলে-মহলে নাম আছে। কিন্তু বামাচরণ তার ভাগ্যাকাশে শনিরূপে দেখা দিলেন। একদিন তর্কসভায় মহীন্দ্রর একটি লেখা সম্বন্ধে তিনি বললেন, "আমেরিকার সুলেখক সুবিখ্যাত লাউয়েল সাহেবের প্রবন্ধ হইতে প্রবন্ধটির যে অংশ চুরি, সে অতি চমৎকার এবং যে অংশ লেখকের সম্পূর্ণ নিজের, সেটুকু পরিহার করিলেই ভাল হইত।"

এইভাবে বারে বারে মহীন্দ্র অপদস্থ হ'তে লাগল। স্থির করল কোন সুন্দর নির্জ্জন জায়গায় গিয়ে বিশ্বপ্রেম বিষয়ে "সাব্লাইম" গোছের কিছু একটা লিখবে। বি-এ

পরীক্ষার পর, গঙ্গার ধারে ফরাসডাঙ্গায় অমর কীর্ত্তি রচনার উদ্দেশ্যে মহীন্দ্র চলে গেল। কিন্তু সেখানে "শরীর মাটি হইল, বিশ্বপ্রেমের কোনো অস্থি-সন্ধি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।"

বামাচরণের উপর রাগে তাঁরই নামে একটি প্রহসন লিখে কলিকাতা যাত্রার উদ্যোগে মহীন্দ্র প্রস্তুত হলেন। এমন সময় যাত্রায় ব্যাঘাত হ'ল।

গঙ্গার ধারের বাগানের উত্তর দিকে আর একটি বাগানবাড়ী সহসা একদিন চোখে পড়ল। সেখানে একটি পাঠরতা ষোড়শী যুবতী মহীন্দ্রের হৃদয় হরণ করলেন। এই প্রতিবেশিনীর আর একটু দর্শনলাভের আশায় গঙ্গায় নৌকা-ভ্রমণে মহীন্দ্র বাহির হলেন। হৃদয়ের যেটুকু নিজের হাতে ছিল ক্রমে সবটুকুই সেই শকুন্তলারূপিণীর পদতলে অর্পিত হ'ল। মহীন্দ্র পাশের বাড়ী গিয়ে সেই কুমারীর পিতার সঙ্গে পরিচয় করলেন। ভবনাথবাবুর বাড়ী মহীন্দ্র এখন নিত্য অতিথি। ভবনাথ-বাবুর সঙ্গে দর্শন আলোচনার তান চলল। মহীন্দ্র মনে করতেন কিরণবালা এসব বোঝেন না তাই নানা ছলে, হয় উঠে যান, নয় মহীন্দ্রকে দেয়ালে পেরেক মারতে অথবা বাগানে লেবু পাড়তে ডেকে নিয়ে যান। মহীন্দ্র মনে করতেন এমনি নানা ছলেই কিরণ বুঝি তার ভালবাসা জানাচ্ছে। কিরণ যদি সহজ স্বরে বলত, "মহীন্দ্রবাবু কাল সকালে আসবেন ত?" তবে মহীন্দ্র তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে শুনত :

"কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান!
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।"

তাহার "সমস্ত দিন রাত্রি অমৃতে পূর্ণ হইয়া গেল।"

এদিকে ছুটি শেষ হয়ে এল। পরীক্ষার ফল বাহির হ'ল। মহীন্দ্র পাশ হয় নাই, কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তবু মহীন্দ্র মনে মনে বলিল, "আমার রচনাবলী আমার জয়স্তম্ভ।" সে অকস্মাৎ ভবনাথবাবুর বাড়ী গিয়ে "দম্ভের ভাবে রুক্ষহাস্য হাসিয়া কহিল—ভবনাথবাবু আমি পরীক্ষায় ফেল করিয়াছি। যে সকল বড় বড় লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল করিয়া জীবনের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়?" নিজেকে আজ তাঁহাদের মধ্যে গণ্য করল। ভবনাথ বিস্মিত হলেন। "এমন সময় আমাদের কলেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সহিত কিরণ সলজ্জ সরসোজ্জ্বল মুখে বর্ষাধৌত লতাটির মত ছলছল করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুই আর বুঝিতে বাকি রহিল না। রাত্রে বাড়ীতে আসিয়া রচনাবলীর খাতাখানা পুড়াইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।"

যদিও মনে হয় মহীন্দ্রর প্রেমকাহিনীর পিছনে লেখকের একটি প্রচ্ছন্ন সকৌতুক হাস্য যেন তার প্রেম-বিহ্বলতাকে একটু হাল্‌কা ক'রে দিচ্ছে, তবুও তা কবির "আমি" জবানীতে লেখা ব'লে সেই প্রেমানুভূতির বর্ণনা-গুলি অপূর্ব্ব গদ্যকবিতার মত। কিরণবালা তাঁর বৃদ্ধ পিতার হাত ধরে মৃদু বিশ্রম্ভালাপের সঙ্গে বাগানে পদ-চারণা করছেন, অন্তরাল থেকে মহীন্দ্র তা দেখে বলছেন, "আমার অস্তিত্ব যেন প্রসারিত হইয়া সেই ছায়ালোক বিচিত্র ধরণীতলের সহিত এক হইয়া গেল, আমি যেন আমার বক্ষঃস্থলের উপর ধীর বিক্ষিপ্ত পদচারণা অনুভব করিতে লাগিলাম, যেন তরুপল্লবের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়া আমার কানের কাছে মধুর মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্ব্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল; আমি যেন বুঝিতে পারিলাম, ধরণী পায়ের নীচে পড়িয়া থাকে, অথচ পা জড়াইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ভিতরে ভিতরে কেমন করিতে থাকে, নতশাখা বনস্পতিগুলি কথা শুনিতে পারে অথচ কিছুই বুঝিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শাখায় পল্লবে মিলিয়া কেমন ঊর্দ্ধ-শ্বাসে উন্মাদ কলশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিতে চাহে।"

পাঠরতা বা কর্ম্মরতা কিরণের নানা শব্দচিত্রে গল্পটি সাজানো।

'মহামায়া' একটি ছোট্ট গল্প। কিন্তু তার গঠন-পারিপাট্য ও ঘটনা-সন্নিবেশ অপূর্ব্ব। নামটিও যেন সার্থক। প্রেমের গল্প, কিন্তু প্রেমের কথা নাই। নায়িকা মহামায়া যেমন নীরব ও গম্ভীর, লেখকের লেখনীও সেইরূপ নীরব ও গম্ভীর। অথচ গভীর প্রেমই গল্পটিকে গড়ে তুলেছে।

গল্পগুচ্ছে বয়স্কা কুমারীর গল্প দেখা যায় না। এক-মাত্র 'মহামায়া' কুলীনকন্যা, চব্বিশ বৎসর বয়সেও অবিবাহিতা। রাজীব অল্পবয়সে গ্রামান্তর হতে মহা-মায়ার গ্রামে আসে। তারা বাল্যসঙ্গী, ক্রমে যৌবন-প্রাপ্ত হয়েও পরস্পরের সখ্য ছিল। রাজীব একদিন অনেক চেষ্টা ক'রে মহামায়াকে এক ভাঙা মন্দিরে ডেকে এনে মনের কথা বলবে ঠিক ক'রে। কিন্তু মহামায়ার গম্ভীর মুখ দেখে তার মনের সব সাজানো কথা গোলমাল হয়ে যায়। সে শুধু বললে, "চল আমরা পলাইয়া গিয়া বিবাহ করি।" মহামায়া কুলীনকন্যা, সে বললে, "সে হতে পারে না।" দূর হতে মহামায়ার দাদা তাদের

দেখে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। রাজীবকে মহামায়া পালাতে দিল না, হাত ধ'রে আটক ক'রে রাখল। এবং বললে, "রাজীব তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।"

মহামায়ার দাদা নিঃশব্দে চলে গেলেন, কিন্তু সেই রাত্রেই এক শ্মশান-যাত্রীর সঙ্গে মহামায়ার বিবাহ দিলেন। পরদিনই মহামায়া বিধবা হ'ল। শোনা গেল সে সহমৃতা হবে। রাজীব পাগলের মত ছুটে কিছু একটা করার উদ্দেশ্যে বাহির হচ্ছে এমন সময় প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। সহসা কে দরজা ঠেলা দিল। দরজা খোলামাত্র ঘোমটায় মুখ ঢেকে মহামায়া ঘরে এল। সে চিতা হতে উঠে এসেছে। সে রাজীবের ঘরে আসবে বলেছিল, রাজীব যদি রাজী হয় তবে সে সেখানেই থাকবে। কিন্তু একটি কথা আছে—রাজীব যদি কোন দিন তার ঘোমটা না খোলে তবেই সে থাকবে, নতুবা চিতায় ফিরে যাবে।

মহামায়াকে ফিরে পাওয়াই রাজীবের পরম ভাগ্য, সে রাজী হ'ল। কিন্তু জীবনে তার সুখ হ'ল না। দু'-জনের মাঝখানের এই ঘোমটার অন্তরাল "মৃত্যুর মত চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক।"

একদিন নিস্পন্দ জ্যোৎস্নারাত্রে চন্দ্রাহত রাজীব মহামায়ার শয়নকক্ষে ঢুকে পড়ল, সে যেন স্বপ্নচালিত, সব নিয়ম ভুলে গেছে। "আজ বর্ষারাত্রি তার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মত নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একবেগে ধাবিত হইল।"

রাজীব মুখ নত ক'রে দেখল, ঘুমন্ত মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। কিন্তু হায়! চিতানল-শিখা তার মুখের একাংশের সৌন্দর্য্য একেবারে লেহন করে নিয়ে গেছে।

রাজীবের মুখের অস্ফুট ধ্বনিতে মহামায়ার ঘুম ভেঙে গেল। মহামায়া উঠে দাঁড়াতেই রাজীব বলল, "আমাকে ক্ষমা কর।" কিন্তু মহামায়া নিরুত্তরে ঘর ছেড়ে বাহির হয়ে গেল। "সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।"

এই গল্পটিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাজীব ও মহামায়ার মুখে অনেক প্রেম ও ত্যাগের কথা দিয়ে বড় করা যেত। কিন্তু মহামায়ার 'নিস্তব্ধ গম্ভীর সৌন্দর্য্য' তার 'নীরব ক্রোধানল' ও রাজীবের হৃদয়ের 'দগ্ধচিহ্ন' তাতে ম্লানই হয়ে যেত, আরও ফুটে উঠত না।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে মাঝে মাঝে দেখি কতকগুলি চিত্রমালার সমষ্টি। সেখানে নায়ক-নায়িকারা বক্তৃতা করে না; তারা কবির অঙ্কিত শব্দের রেখা ও রঙে ফুটে ওঠে এবং সেই শব্দচিত্রের অন্তরালে কবির কণ্ঠ হতে একটি গানের সুর ধ্বনিত হতে থাকে। সেই গানই চিত্রগুলিকে প্রাণ দেয়। নায়ক-নায়িকার অব্যক্ত কথা কবির গানের ভিতর দিয়ে পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে।

যে যুগে রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছ লেখেন সেটা ষাট থেকে সত্তর বৎসর পূর্ব্বে। তখন মেয়েদের বিবাহ হ'ত আট থেকে দশ বৎসরের মধ্যে। সুতরাং প্রেমের গল্পের নায়িকাদের বয়স আট-দশ হওয়া ছাড়া আর যা উপায় ছিল তা বিধবা, কুলীনকন্যা, মুসলমানী, পরস্ত্রী, নিজস্ত্রী বা অগত্যা ব্রাহ্ম-কন্যাকে নায়িকা করা। গল্পগুচ্ছে সব রকম নায়িকাই আছে। 'পয়লা নম্বর' গল্পের নায়িকা বিবাহিতা পরস্ত্রী। কিন্তু এই গল্পটি লেখা ১৩২৪ সালে। পুরাতন গল্পগুচ্ছে এ গল্পটি নেই। গল্পটির প্লট ও গঠন-পারিপাট্য সুন্দর। 'একরাত্রি'র সুরবালা বাল্যকালে যার বধূ হবে ধরা ছিল তার দেশপ্রেমের উৎসাহে পরের ঘরে বিবাহিত হতে বাধ্য হয়। সুরবালার মনের কথা গল্পে জানা যায় না, সবটাই স্কুলমাষ্টারের মনের কথা। যে সব গল্পে মেয়েদের মনের কথা আছে সর্ব্বত্রই তা সংযত বাঁধনের মধ্যে, কোথাও বা শুধু একটু ইঙ্গিতে কথাটুকু জানা যায়। 'পয়লা নম্বরে' নায়িকা ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন; কিন্তু তিনি স্বামীকে বা প্রণয়াকাঙ্ক্ষীকে কিছুই জানান নি। শুধু প্রেমপত্রগুলি রঙীন ফিতায় বেঁধে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং উভয়েরই হাতের বাইরে চলে যান। 'কঙ্কাল' গল্পে বিধবা নায়িকার মনের কথা অল্প কয়েকটি কথায়ই ফুটে উঠেছে।

পাঠক যদি রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছে' অসংযত কোন চিত্রের দর্শন পাবেন আশা করেন তবে তাঁর আশা পূর্ণ হবে না। প্রেম এখানে "নিকষিত হেম"; পুষ্পসুরভির মত সূক্ষ্ম। অতৃপ্ত প্রেমের বেদনা বিরহ-সঙ্গীতের মত গল্পের ভিতর দিয়ে বেজে উঠেছে, কোথাও স্নিগ্ধ করুণ, কোথাও রুদ্র গম্ভীর। যেখানে ট্রাজেডি হয় নি, সেখানে মাধুর্য্যের নির্ঝর অল্প ক'টি কথায় ঝ'রে পড়েছে। প্রথম যুগের গল্পগুচ্ছের এই করুণ বা মধুর সুর পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পরে রচিত গল্পগুলিতে ঠিক অমন ভাবে পাই না; মনকে আকুল-করা সে সুর অনেকখানিই নিস্তব্ধ।

রবীন্দ্র-তাল

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দান শুধু কাব্য, উপন্যাস নাটকেই সীমাবদ্ধ নয়। সঙ্গীত, নৃত্য ও তাল সৃষ্টিতেও তাঁর দান অপরিসীম। পৃথিবীর কোন কবি এত অধিক সংখ্যক গান রচনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

সুরসৃষ্টিতে কবির দান অপরিমেয়। তাঁর কবি-জীবনের প্রথমদিককার গানগুলি প্রাচীন ধ্রুপদ ও খেয়ালের তালমান অনুসারে গীত হবার জন্যে রচিত হলেও পরবর্তীকালে তিনি মার্গ-সঙ্গীতের সঙ্গে তৎকালে প্রচলিত বাংলা-গানের কতক তাল ও সুর মিশ্রিত করে নূতন সুর সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সঙ্গীত সাধনা চলেছিল সুদীর্ঘ ষাট বছর ধরে ১৮৮০ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে তিনি রচনা করেছেন বিচিত্র রসে ভরপুর বিচিত্র সুরে হিল্লোলিত আড়াই হাজার গান, অসংখ্য গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য। কোন জাতির সঙ্গীত-সাহিত্যে এক কবির এত দান নেই।

ভারতীয় সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অবদান তাঁর নূতন তাল-রচনা। তবলা ও পাখোয়াজের জন্য তিনি কয়টি নূতন অভূতপূর্ব তাল সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তাদের নূতন নামও দিয়েছেন তিনি। সে কয়টি তালের নাম—ঝম্পক, রূপকড়া, নবতালক, একাদশী, ষষ্ঠী, নবপঞ্চক ইত্যাদি।

ঝম্পক দশ মাত্রার তাল, বোল হচ্ছে—

ধাগে না ধাগে। ৩+২
ধাগে না তেটে। ৩+২

অনেকে ভাবতে পারেন ওস্তাদ কবি বোধ হয় ঝাঁপতাল থেকে ঝম্পক সৃষ্টি করেছেন। এমন মনে করা নিতান্তই ভুল। কারণ যদিও ঝাঁপতালের মত ঝম্পকেও দশ মাত্রা তথাপি বাজনার দিকে একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে ঝাঁপতাল থেকে ঝম্পক সম্পূর্ণ ভিন্ন। তার গতি আর ছন্দ সম্পূর্ণ আলাদা। এ তালটি কবিকে বড় প্রয়োজনের তাগিদে রচনা করতে হয়েছিল। কবি দেখলেন প্রচলিত তালের সাহায্যে তাঁর, 'বিপদে মোরে রক্ষা কর', 'দুখের বেশে এসেছ বলে' প্রভৃতি গানগুলিতে সুষ্ঠু প্রস্ফুটিত করা যায় না, তাই তিনি সৃষ্টি করলেন এ কয়টি গানের যোগ্য তাল—সম্পূর্ণ অভিনব তাল—ঝম্পক।

আট মাত্রার তাল রূপকড়ারও সৃষ্টি কবির প্রসিদ্ধ গান, "কত অজানারে জানালে" এর সুর-সঙ্গতির উদ্দেশ্যে। তার বোল হচ্ছে—

ধাগে তেটে তেটে। ৩
তাগে তেটে। ২
কেটে তাগে তেটে। ৩
—
৮

তার পর নবতাল হচ্ছে নয় মাত্রার তাল। তার বোল হচ্ছে—

ধা দেন্ তা। ৩
তেটে কতা। ২
গদি ঘেনে। ২
ধাগে তেটে। ২
—
৯

এ তালটিও অতি-অভিনব। এর সঙ্গে আর দুই মাত্রা যোগ করে কবি সৃষ্টি করেছেন একাদশী তাল।

ধা দেন তা। ৩
তেটে কতা। ২
গদি ঘেনে। ২
ধাগে তেটে ধাগে তেটে। ৪
—
১১

প্রত্যেকটি তাল নিয়ে রচিত হতে পারে অজস্র গদ্-গদ্ কায়দা, রেনা, মোহরা। যেমন ঝম্পকের অনুযায়ী গদ্ হতে পারে—

ধাগে নেধা তেরে কেটে ধিনা।
ধাগে নেধা তেরে কেটে। ৩+২
ধাগে নেধা তেরে কেটে ধিনা।
ধাগে নেধা তেটে তেটে। ৩+২

তবলাশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে মনোযোগী হলে রবীন্দ্রতাল নিয়ে অনেক সাধনার ও চর্চার সুযোগ পেতে পারেন।

রবীন্দ্র-প্রতিভা যে কত বহুমুখী ও বহু বিস্তীর্ণ ছিল এর থেকেই অনুমিত হতে পারে। এই প্রতিভা-পর্বত-মূলে এসে শুধু মাথা নত করে অবাক হয়ে দাঁড়াই আর কবির ভাষাতেই বলি,

"তুমি কেমন করে গান করহে গুণি,
আমি অবাক হয়ে শুনি।"

গুরুদেব

বনারসীদাস চতুর্বেদী

অনুবাদক—শ্রীকৃষ্ণধন দে

রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকো ভবনে যখন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ কিছুদিন ছিলেন সেই সময়ে, তারিখটা ৩রা মে ১৯১৮, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি আমাকে প্রশ্ন করে' বসলেন, "কি, আপনি শান্তিনিকেতন দেখেন নি?"

আমি উত্তর দিলাম, "শান্তিনিকেতন আমাদের তীর্থ-ক্ষেত্র। নিশ্চয়ই যাব সেখানে।"

তেতাল্লিশ বৎসর আগেকার কথা, সেই প্রথম শান্তিনিকেতনে যাই। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন ছিল বুধবার, আর সেখানে প্রত্যেক বুধবারে রবীন্দ্রনাথের বাণী শোনা যেত সেখানকার প্রার্থনামন্দিরে। ছাত্রের দল, অধ্যাপকের দল, অতিথির দল সকলেই সেই দিনটিতে গুরুদেবের বাণী শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে থাকতেন। আমিও ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তাঁর বেদীর কাছে বসলাম। দেখলাম, কি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব তাঁর। সেই দিব্য মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে সকলে মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় বসে রইলেন। দীনুবাবু তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে গুরুদেবের রচিত একখানি গান গাইলেন। তারপরে আরম্ভ হ'ল রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে ভাষণ। তেজোগর্ভ কথা, কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্য, শব্দ বিন্যাসের কৌশল সব যেন মিলিত হয়েছে তাঁর সেই বাণীতে। আমার মনে হ'ল আমি যেন উপনিষদের যুগে কোন ঋষিকণ্ঠের বাণী শুনছি। বাংলা ভাষা খুব কমই বুঝতাম, কিন্তু তাঁর ভাষণের সারাংশ বুঝতে কষ্ট হয় নি।

পরদিন আমি গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর চরণে প্রণাম জানিয়ে আমি বসলাম তাঁর পদতলে। তিনি আমার দিকে চেয়ে ইংরেজীতে প্রশ্ন করলেন—"আমার গতকল্যকার ভাষণ আপনি বুঝেছেন কি? আমার মনে হয় আমার বাংলা ভাষায় ভাষণ আপনার পক্ষে বোঝা একটু শক্ত হয়েছিল।"

আমি বিনীত ভাবে বললাম: গুরুদেব, বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের বাংলা বুঝতে ত আমার কোন কষ্টই হয় না, আপনার বাংলা ভাষণের সারাংশ আমি তখনি বুঝে নিয়েছি।

গুরুদেব কৌতুকভরে বললেন, "তাঁদের ভাষা ছিল সংস্কৃত-ঘেঁষা আর আমার ভাষা হোল কথ্যভাষা।"

কথাপ্রসঙ্গে আমি গুরুদেবকে গভীর দুঃখের সঙ্গে জানালাম যে কবি সত্যনারায়ণ কবিরত্ন আর ইহজগতে নাই। শুনে তিনি বললেন: "তরুণ বয়সে তাঁর মৃত্যু হ'ল। তিনি "রবি" ও "ইন্দ্র" কথা দুটি দিয়ে কি চমৎকার একটি কবিতা লিখেছিলেন, এখনও সেটি আমার স্মরণ আছে। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমি দুঃখিত।"

ইংরেজী ১৯১৪ সনে যখন রবীন্দ্রনাথ আগ্রায় গিয়ে-ছিলেন তখন কবি সত্যনারায়ণ কবিরত্ন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য "রবীন্দ্র বন্দনা" নামে এক কবিতা লেখেন। সেই হিন্দী কবিতার একস্থানে লেখা ছিল—

যেথা 'রবি'-'ইন্দ্র' মেশে, আশ্চর্য্য সে ভাষা,
হিন্দী-চাতকীর তাই বেড়েছে পিপাসা।

সে সময়ে আমি গুরুদেবের শান্তিনিকেতনে তিন চার দিনের বেশী থাকতে পারি নি। কিন্তু দু'বছর পরে, ইংরেজী ১৯২০-২১ সনে, চোদ্দ মাস ধরে সেখানে থাকবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার ফলে প্রায় প্রতিদিন আমি গুরুদেবের দর্শন পেতাম। এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলবারও অনেক সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। আমার সবচেয়ে পরিতাপ এই যে, সে সময়ে আমি গুরুদেবের বাণীগুলি লিখে রাখি নি। অবশ্য, পরে কিছু কিছু লিখে রেখেছিলাম।

শান্তিনিকেতনের বেণুকুঞ্জে থাকতেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ। সেখানে গুরুদেবের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা চলত। একদিন আমাকে ডেকে গুরুদেব বললেন—"তোমার কাছে আমি হিন্দী শিখতে চাই। হিন্দী ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের যে ব্যবহার, সেটাই আমার কাছে কঠিন বলে মনে হয়। তুমি কি এর জন্যে কিছু সময় দিতে পারবে?"

আমি বিনীত ভাবে জানালাম "আপনার সেবা করবার সুযোগ পেলে আমি ধন্য হব।"

গুরুদেব বললেন, "শান্তিনিকেতন-পুস্তকমালা থেকে

আমি নিজে কিছু অনুবাদ করতে চাই। আশা করি, একটু চেষ্টা করলেই আমি পারব।"

আমি বললাম, "আমি হিন্দী-ভাষাভাষী। আপনার রচনা থেকে কিছু অনুবাদ করবার সুযোগ পেলে ধন্য হব। অবশ্য এর জন্য আমার গর্বেরও সীমা থাকবে না।"

শালতরুকুঞ্জে গুরুদেব পদচারণা করছিলেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করছিলাম। আমি তাঁর সঙ্গে ইংরেজীতে দু'একটি কথা বলবার পর তিনি হেসে বললেন, "আমার সঙ্গে তুমি ইংরেজীতে কথা বলতে চাইছ কেন? আমি হিন্দী শিখতে চাই, তুমি হিন্দীতে বল। না হয়, বাংলাতে বলতে পার।"

আমি বিনীত ভাবে বললাম, "আমি বাংলা বুঝতে পারি, কিন্তু বলতে পারি না।"

গুরুদেব বললেন, "বেশ ত, বাংলা শিখে ফেলো।"

আমি বললাম, "নিয়মিতরূপে বাংলা পড়াশুনার সুযোগ আমার হয় নি। ছ'সাত বছর আগে আমার হিন্দী-বাংলা শিক্ষকের কাছ থেকে যেটুকু শিখেছিলাম, সেটুকু দিয়েই কোন রকমে কাজ চালিয়ে নি।"

গুরুদেব বললেন, "তা হলে নিয়মিতরূপে বাংলা শিখতে আরম্ভ কর। আমি নিজেই তোমাকে পড়াব।"

নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও গুরুদেব আমাকে আর আফ্রিকা প্রত্যাগত মিঃ প্যাটেল নামে এক ভদ্রলোককে বাংলা শেখাতে লাগলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বেশীদিন আমি তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ পাই নি। কিছুদিন পরেই আমাকে শান্তিনিকেতন ছেড়ে বোম্বাই চলে যেতে হ'ল। সেখান থেকে কাঁচা বাংলায় তাঁকে একখানি চিঠি লিখি। সেই চিঠির উত্তরে গুরুদেব আমাকে লিখলেন, "আপনার বাংলা চিঠিখানি সুন্দর হইয়াছে। দুই একটি যা ভুল আছে তাহা যৎসামান্য।"

গুরুদেবের এক জন্মদিনের সমারোহ আজও আমার মনে পড়ে। যখন আম্রকুঞ্জের নীচে গুরুদেবের বসবার জন্য বেদী প্রস্তুত হয়েছিল। আম্রপত্রের মালায় পদ্মফুল বাঁধা। রবীন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য (শাস্ত্রী) মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় প্রশস্তি কবিতা পড়লেন,

তার পর গুরুদেবের হাতে রাখী বেঁধে তাঁর ললাটে চন্দনরেখা এঁকে দিলেন।

বহু হিন্দী লেখক ও কবিকে আমি গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। নানা কাজে খুব ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে কখনও অস্বীকার করেন নি। সারাদিন কাজ করবার পর তিনি যখন বিশ্রাম করতেন তখন তাঁর কাছে গেলে তিনি অন্ততঃ পনের কুড়ি মিনিট আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। যখন দেখতাম কোন হাসির কথা এসে পড়েছে আর তিনি বেশ কৌতুক বোধ করছেন, তখন আর তাঁর কাছে বেশীক্ষণ থাকতাম না, তাড়াতাড়ি নমস্কার করে চলে আসতাম। 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' এই নীতিবাক্য আমি তাঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের সময় মেনে চলতাম। তবে গুরুদেবের কাছে সে কথা প্রকাশ করতাম না।

গুরুদেব কৌতুক করবার সুযোগ পেলে সহজে ছাড়তেন না। একদিন একদল হিন্দী লেখকের সামনে তিনি বললেন, "হিন্দী না বলতে পারার জন্যে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, আমিও বনারসীদাসকে বাংলা না বলার জন্যে ক্ষমা করে থাকি।" পৌণে এক ঘণ্টা কথাবার্তার পর তিনি আবার আমাকে দেখিয়ে কৌতুক করে বললেন, "পঞ্চাশ বছর আগে যখন আমি হিন্দী শিখতে চেয়েছিলাম, তখন আমার দক্ষিণ দিকে উপবিষ্ট এই ভদ্রলোকটি জন্মগ্রহণই করেন নি।

তাঁর একথায় সকলে হেসে উঠলেন।

অবশ্য আমি এটা বলতে চাই না যে, গুরুদেব হিন্দী জানতেন না। উনি অনেক হিন্দী গ্রন্থ পড়েছিলেন। যখন হিন্দী শব্দসাগর প্রকাশিত হ'ল, তিনি তার অনেক পাতা চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। নানা হিন্দী পত্রিকার লেখাও তিনি সযত্নে পড়তেন। আমার বেশ স্মরণ আছে যখন "বিশাল ভারতে"র প্রথম সংখ্যায় প্রেমচন্দ্‌জীর গদ্যকাব্য নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তখন তিনি তার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছিলেন। ঐ রচনার লেখক শ্রীরামদাস গৌড়। পরে যখন আমি শান্তিনিকেতনে যাই তখন গুরুদেব উক্ত লেখাটির প্রশংসা করেন ও শ্রীপ্রেমচন্দ্‌জীর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমারও অভিলাষ ছিল এই দুই মহান্ কলারসিকের কথোপকথন শুনি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এ মিলন সম্ভব হয় নি।

একবার আমার এই ব্যর্থ চেষ্টার কথা গুরুদেবকে জানালে তিনি বললেন, "প্রেমচন্দ্‌জী বোধ হয় আসতে সঙ্কোচ বোধ করলেন, তাই শান্তিনিকেতনে এলেন না।" তারপর গুরুদেব হাস্য করে বললেন, "এ কথা ভুলে যেও না যে, কবি হলেও আমি স্বভাবতঃ লাজুক। তবে আমি সারা পৃথিবী ঘুরেছি।"

গুরুদেব হিন্দী ভাষার শক্তিতে মুগ্ধ ছিলেন ও তাঁর

"চোখের বালি" উপন্যাসটির হিন্দী অনুবাদ "আঁখকী কিরকিরী" পড়ে প্রশংসা করেছিলেন। একবার তিনি বন্ধুবর শ্রীহজারীপ্রসাদ ত্রিবেদীকে বলেন, "তোমার হিন্দী ভাষা বেশ শক্তিশালী; তোমার মত শক্তিশালী লেখক এ যুগে বিরল।"

গুরুদেব হিন্দীভাষার শুভকামনা করতেন। শ্রীহজারীপ্রসাদ ত্রিবেদী ও শ্রীভগবতীপ্রসাদ চংদোলাকে হিন্দিভাষায় বই লেখবার জন্যে নানা বিষয়বস্তু বলে দিতেন। হিন্দী কথা বলবার সময় তিনি এই ভেবে সঙ্কোচ বোধ করতেন যে, পাছে হিন্দী ভুল হয়ে যায় বা অশুদ্ধ হিন্দী বলতে তাঁর অন্তরাত্মা সায় না দেয়।

গুরুদেব হিন্দীর প্রচার খুব চাইতেন। তাঁর কার্যপদ্ধতি ছিল আলাদারকমের। একবার তিনি বলেছিলেন, "হিন্দী ভাষাভাষী লোকসংখ্যা দেখে মনে মনে খুশী হয়ো না। হিন্দীতে বড় সাহিত্য সৃষ্টি করে লোকের মন আকৃষ্ট কর।"

পারস্পরিক সহযোগ চিন্তা

যখন শ্রীচন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালঙ্কার ও তাঁর সমিতির সভ্যেরা শান্তিনিকেতনে আসেন তখন ৪০-৫৫ মিনিটকাল আমি তাঁদের সঙ্গে গুরুদেবের কথোপকথন শুনি। সেই সময়ে আমি তাঁকে নিবেদন করি—"আমরা পরস্পরকে কম জানি। একে অপরের মনের ভাব বুঝতে পারি না। নিকট সম্পর্কের মধ্যে আমরা আসি না, আর অপরকে পৃথক করে রাখি। এতে পরস্পরের মধ্যে একটা বিরূপ ধারণা জন্মে আর প্রাদেশিকতা বৃদ্ধি পায়। এই প্রাদেশিকতা শুধু মূর্খতাপ্রসূত নয়, ধূর্ততাপ্রসূতও বটে। অজ্ঞানতাই এর মূল। আমি আপনার সঠিক পরিচয় পাই না, আমার কাছে আপনি যেন বিদেশী। পরস্পরের মধ্যে আমরা পরিচিত হতে চাই।"

যখন কবিবর শ্রীমাখনলাল চতুর্বেদী ওরফে জৈনেন্দ্রজী গুরুদেব সন্দর্শনে শান্তিনিকেতনে আসেন তখন গুরুদেব বলেছিলেন, "আমি হিন্দী ভাষাভাষীর খুব নিকট সম্পর্কে থাকবার জন্য উৎসুক হয়ে আছি। এখানে আমরা সংস্কৃতি প্রচারের জন্য যা কিছু চেষ্টা করবার তা করছি। আমি চাই হিন্দী ভাষাভাষীরা এখানে আসুন। আমরা ভাষা ভাগাভাগি করে লাভবান্ হই।"

তাঁর এ কথা শুনে আমি বললাম, "আমাদের এখানে তীর্থস্থান ভেবে আসা উচিত।"

গুরুদেব সুন্দর উত্তর দিলেন, "আমি চাই হিন্দী লেখক ও কবিরা আমার কাছে আসুন। শুধু এখানে আসাটা তীর্থযাত্রা ভেবে কি হবে? আমার আশ্রমে আমি হিন্দী ভাষাকে এক সজীব ভাষারূপে পেতে চাই। আমার ইচ্ছা, শান্তিনিকেতন নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির এক কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হোক। আমার অভিলাষ, শান্তিনিকেতনে ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা আর সমগ্র এশিয়ার সংস্কৃতির মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগ ও ভাবের আদান-প্রদান চলুক।"

গুরুদেবের এ কথায় শান্তিনিকেতনে "হিন্দীভবন" প্রতিষ্ঠা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। তিন বৎসরের চেষ্টার ফলে আমার সে স্বপ্ন সফল হয়েছিল। ট্রাষ্টিদের অনুমোদনে হিন্দীভবন নির্মিত হ'ল। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ হলেন তার রক্ষক আর পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু তার দ্বারোদ্ঘাটক। এ সম্বন্ধে বিশেষ পরিশ্রম করেছিলেন শ্রীভগীরথজী কানোড়িয়া আর সীতারামজী সেকসরিয়া।

শান্তিনিকেতনতীর্থে হিন্দী ভাষাভাষীদের আনয়ন ও গুরুদেবের সঙ্গে তাঁদের মিলন ঘটাবার ভার আমি নিয়েছিলাম। একদিন রহস্য করে তাঁকে বললাম. "গুরুদেব, আমি শান্তিনিকেতন আর ওয়ার্ধা, এই দুই জায়গারই পাণ্ডা হয়ে গেছি।"

গুরুদেব তখনি উত্তর দিলেন, "আপনার এ ব্যবসা আজকাল ভালই চলছে তা হলে।"

কারণ এই, সেদিন আমি অনেক হিন্দী সাহিত্যিককে গুরুদেবের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম।

ভাই হজারীপ্রসাদজী ত্রিবেদী শুধু আমার সহকারী পাণ্ডা ছিলেন না, হিন্দীভবনের আত্মাস্বরূপও ছিলেন।

একদিন আমি গুরুদেবকে বললাম, "আপনি দয়া করে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজকে স্বাগত জানিয়ে যে কবিতাটি ১৯১৩ অথবা ১৪ সনে লিখেছিলেন, সেটি নিজের হস্তাক্ষরে লিখে দিন।"

গুরুদেব বললেন, "ও কবিতা আপনি কোথায় পেলেন?"

আমি বললাম, "এক পুরানো হস্তলিখিত পত্রিকা থেকে।"

গুরুদেব বললেন, "আচ্ছা নিয়ে আসুন, আমি আবার লিখে দিচ্ছি।"

গুরুদেবের নিজের হাতের লেখা সেই কবিতাটি আজও আমার সংগ্রহালয়ের শোভা হয়ে আছে।

প্রতীচির তীর্থ হতে প্রাণ রসধার
হে বন্ধু, এনেছ তুমি করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার
হে বন্ধু, গ্রহণ কর, করি নমস্কার।

খুলেছ তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
হে বন্ধু, প্রবেশ কর, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তার করি নমস্কার।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গুরুদেবের দর্শনলাভ নানা পরিস্থিতির মধ্যেও আমার ঘটেছিল। তাঁকে শান্তিনিকেতনের জন্য আর্থিক চিন্তায় চিন্তিত দেখে আমার মনে খুব কষ্ট হত। একবার কথাবার্তার মাঝে উনি বললেন, "দেশের একজন বড় নেতা আমাকে প্রশ্ন করলেন, শান্তিনিকেতনের জন্য আপনার কত টাকা চাই?"

আমি বললাম, "পাঁচ-ছয় লাখ টাকা হলেও চলবে।"

তিনি বললেন, "শুধু এতেই হবে?"

"এর পরে কত রকম ছোট-খাট ব্যাপারেও তাঁর সহায়তা চেয়েছিলাম, কিন্তু পাই নি।"

উক্ত নেতামহোদয় শান্তিনিকেতনে কোন অর্থ সাহায্য না করলেও তিনি মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা অনেক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করে গুরুদেবকে ঐ সময়ে চিন্তামুক্ত করেছিলেন। এ কথা এখানে বলা আবশ্যক যে, রাষ্ট্রপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেছিলেন। তিনি পাটনা থেকে মহাত্মা গান্ধীর কাছে গিয়ে শান্তিনিকেতনের আর্থিক সংকটের কথা বলেন।

চিরদিন গুরুদেব মাতৃভাষা, স্বদেশ আর জগতের জন্য কি না দিয়েছেন? নিজের বই থেকে যা কিছু আয় সবই তিনি দিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। আর কতই না পরিশ্রম করেছেন তিনি। বৃদ্ধ বয়সেও চাঁদা সংগ্রহের জন্য তিনি দেশ-বিদেশে ঘুরেছেন। শত সহস্র বিদ্যার্থীর জীবন বিকশিত করবার জন্য তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। ঘি, কালি প্রভৃতি অনেক জিনিসেরই তাঁকে প্রশংসাপত্র দিতে হত। একবার আশ্রমের এক ব্যক্তি গুরুদেবের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করলে গুরুদেব বললেন, "যা কিছু জিনিসেরই প্রশংসাপত্র দিই না কেন, সেফ্‌টি রেজারের কোন কালেই দেব না।"

একবার লোকমান্য তিলক গুরুদেবকে বলেছিলেন, "আপনি বিলাত যান।" গুরুদেব বললেন, "আমি ত রাজনৈতিক নেতা নই, এতে আমার লাভ কি?" লোকমান্য তিলক তখনি উত্তর দিলেন, "আপনি বিলাত গেলে আমাদের স্বরাজ্য সংগ্রাম যথেষ্ট সাহায্য পাবে।"

এ ক্ষেত্রে গুরুদেবের প্রীতিভাজন স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা মনে পড়ে। শান্তিনিকেতনের জন্য তিনিও যথেষ্ট কাজ করেছেন। তিনি বলেছিলেন "গুরুদেবের ৬৭।৬৮ বৎসরের সব লেখা ছাপানো হলে বড় রয়েল আটপেজী সাইজের ১৭-১৮ হাজার পৃষ্ঠার বই হবে। গুরুদেব ইহধাম পরিত্যাগ করলে তিনি বলেছিলেন, "আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কবির মৃত্যুর আগেই আমার মৃত্যু হোক্। রবীন্দ্রহীন জগতের কল্পনা আমি করতেই পারি না।" তিনি যে কত বড় রবীন্দ্রভক্ত ছিলেন, এতেই তার প্রমাণ। একথা দীনবন্ধু সী, এফ্, এণ্ড্রুজ সম্বন্ধেও বলা যায়। তিনিও শান্তিনিকেতনে তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে গেছেন।

গুরুদেব, দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ আর বড় দাদার কথা মনে হলে অভিভূত হয়ে পড়ি। এই তিনজনকে একসঙ্গে শান্তিনিকেতনে প্রায়ই দেখতে পেতাম।

১৯৪০ সনে গুরুদেবের অন্তিম সময়ে তাঁর দর্শন লাভ আমার ভাগ্যে ঘটেছিল। সে সময়ে তাঁর চক্ষু দুটি প্রায় নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। তিনি বললেন "তোমার লম্বা দেহ দেখে আমি অনুমান করেছি যে তুমি বনারসী দাস।

এ কথা আমি আমার বন্ধুবর, সিয়ারামশরণজী গুপ্তকে লিখলে তিনি জানিয়েছিলেন, যে চক্ষু দুটি জগতে কত কি দেখেছেন, আর আমাদের কত কি দেখিয়েছেন, তার জ্যোতি যে কমে গিয়েছিল, এটা কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা!

শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের চরণতলে বসে কত যেদিন কাটিয়েছি, এখনও তার মধুর স্মৃতি সর্ব্বদা মনে পড়ে। গুরুদেব তাঁর 'সেকাল' শীর্ষক কবিতায় 'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে' পড়ে যেতেন, আর শ্রোতৃগণ তাঁর বাণী শোনার আনন্দ উপভোগ করতেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকলেও প্রতিশব্দের ধ্বনি আমাকে মুগ্ধ করত। বাংলা ভাষায় যতটুকু বুঝতাম, তাতেই সন্তোষলাভ করতাম। জানি না গুরুদেবের সেই আবৃত্তির টেপ-রেকর্ডিং হয়েছিল কি না।

একবার আমার কয়েকজন মাড়োয়ারী বন্ধু নিয়ে শান্তিনিকেতনে গেলে, তাঁদের মধ্যে একজন গুরুদেবকে অনুরোধ করলেন,—"গুরুদেব, আপনি গায়ত্রীমন্ত্র আবৃত্তি করে শোনান।" গুরুদেব মৃদু হেসে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন। এই সময় আমি ধৃষ্টতাবশতঃ এম্. সেনের একখানি ইংরেজী জীবনচরিত স্বাক্ষরের জন্য তাঁর সামনে ধরলাম, আর গুরুদেব তার উপরে এক বৈদিকমন্ত্র লিখে দিলেন।

তখন অসহযোগ আন্দোলনের দিন। গুরুদেবও আমেরিকা থেকে সবেমাত্র ফিরেছেন। কোন কোন উৎসাহী ব্যক্তি তাঁকে ধরে বসলেন, সেই আন্দোলনে

তাঁকে যোগ দিতে হবে। ঐদিন এক বিদেশী অতিথি শান্তিনিকেতনে এসেছেন। গুরুদেব তাঁকে বললেন, "এই দেশে যখন একদিন ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ এসেছিলেন তখন সকলেই যথাশক্তি তাঁকে শ্রেষ্ঠ উপহার দিয়েছিল। সেইরকম আজ মহাত্মা গান্ধীর এদেশে আগমন উপলক্ষে আমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার—এই শান্তিনিকেতন—তাঁর হাতে দিলাম। কেউ এটা চায় না যে গোলাপগাছে যুঁইফুল আর গাঁদাগাছে চামেলি ফুল ফুটুক। আমার কাছে আর কি আশা করা যেতে পারে?" আমি অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে এই কথোপকথন শুনেছিলাম।

একদিন দুপুরবেলায় আমার অভ্যাসমত একটু বিশ্রাম করছি, এমন সময় একজন এসে আমাকে বলল—"গুরুদেব আপনাকে ডাকছেন।" আমি উঠে গুরুদেবের কাছে যেতেই তিনি বললেন,—"আমি আপনার মাড়োয়ারী বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করতে চাই যেন তাঁরা মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসের দু'একখানা ঘর তৈরী করিয়ে দেন। এ রকম অনুরোধ কি ঠিক হবে?"

আমি আগ্রহভরে বললাম,—"আপনার হিন্দী ভবনের জন্য অনুরোধ করাটাই ঠিক হবে।"

আমার কথানুসারে গুরুদেব ঐ রকম অনুরোধই করলেন। সে দৃশ্য এখনও আমি যেন দেখছি, যখন মাড়োয়ারী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে নিয়ে শ্রীসীতারাম সেকসরিয়া তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, তখন গুরুদেব তাঁকে হিন্দী ভবনের জন্য সাহায্য করতে অনুরোধ করলেন। সেইদিনই যেন হিন্দী ভবনের ভিত্তিস্থাপন হ'ল।

সেইরাত্রের কথা এখনও আমার মনে আছে। আমি তখন আমার পুস্তক "ভারতভক্ত এণ্ড্রুজ" লেখা শেষ করেছি। এর ভূমিকা অনেকদিন আগেই মহাত্মা গান্ধী লিখে দিয়েছিলেন, তার পরে গুরুদেবের কাছ থেকেও এর ভূমিকা লিখিয়ে নি। শান্তিনিকেতনের মুক্ত আকাশের নীচে আমি তখন এই প্রার্থনাই করেছিলাম, যেন এই রকম মুক্ত আকাশ আর মুক্ত অবসর পাই। চল্লিশ বৎসর পরে এই দুটিকেই আমি প্রচুর মাত্রায় পেয়েছি আর তাকে শান্তিনিকেতনের আশীর্বাদ বলেই মেনে নিয়েছি।

শান্তিনিকেতনের সেই সুন্দর প্রভাতের কথা আমার এখনও মনে পড়ে। বিহগকাকলীর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থীরা গান গাইতে গাইতে আপন আপন কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসত। আশ্রমের শালতরু, অশোকতরু, লতাকুঞ্জ, আর চারিদিকের পারিজাতের মত প্রস্ফুট কুসুমগুলি আশ্রমকে যেন স্বর্গধাম করে তুলত।

১৯২০ সনের ১৫ই জুন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ আমাকে জানালেন আপনি দিল্লী কলেজের চাকরী ছেড়ে দিয়ে আমার কাছে আসুন। আমি তাঁর সেই আদেশ মান্য করে শান্তিনিকেতনে এলাম। এখানে নিত্য গুরুদেবকে দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। এটা আমি আমার মাতাপিতার আশীর্বাদ আর আমার পূর্বজন্মের পুণ্যফল বলেই মনে করি।

—•—

"শিশুদরদী রবীন্দ্রনাথ"

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র

প্রবন্ধটি আরম্ভ করার আগে রবীন্দ্রনাথের "শিশু" ও "শিশু ভোলানাথ", কবির জীবনে কতকগুলো ঘটনা এবং তখনকার সময় কবির মনের অবস্থা কিছুটা বলা প্রয়োজন—আমার মনে হয় তাতে মূল বক্তব্যটির আলোচনার পথ সুগম হবে।

"স্ত্রী-বিয়োগের পর এক বৎসর যাইতে না যাইতেই মধ্যমা কন্যার মৃত্যু হইল। তাহাকে বায়ু পরিবর্তন করাইবার জন্য যখন তিনি আলমোড়া পাহাড়ে ছিলেন, তখন একটি নূতন কাব্য সেখানে রচনা করিয়াছিলেন তাহার নাম 'শিশু'। পীড়িত কন্যা, মাতৃহীন শিশুপুত্র শমী, কবির কাছে মাতার ও পিতার উভয়ের স্নেহলাভ করিয়াছিল। সেই একটি গভীর স্নেহ হইতে উৎসারিত এই কাব্যটি বাৎসল্য রসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। পুত্রের মধ্যে আপনার কল্পনা-প্রবণ বালক হৃদয়ের সুখ-দুঃখ জাগিয়া এই কাব্য শিশু-জীবনের আনন্দলোককে উদ্ঘাটিত করিয়াছে।"

যখন তিনি "শিশু" কাব্যের রচনাগুলি লিখছিলেন, সেই সময় শ্রীমোহিতচন্দ্র সেন কবির কাব্য-সংগ্রহ ছাপছিলেন। তিনি কবিকে কতকগুলি শিশু-পর্যায়ের কবিতা লিখতে অনুরোধ করেন। মোহিতবাবুর ঐ অনুরোধ কবিকে অনুপ্রেরণা জোগায়। কিন্তু কেবলমাত্র বাইরে থেকে এই অনুপ্রেরণাই সবটা নয়, আসলে অন্তরের মধ্যে থেকে প্রেরণা না পেলে শুধু বাইরের ঐ অনুপ্রেরণা কার্যকরী হয়ে উঠত না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অন্তরের ঐ প্রেরণার মূল উৎস কোথায়?

"কবি অল্প বয়সেই মাতৃহীন হন, মাতৃস্নেহ-সুধা তিনি পান নি, ভবিষ্যতে পাবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। মাতৃস্নেহ-সুধার বুভুক্ষা কবির অন্তরের ক্ষুধা, এই ক্ষুধার তাড়নায় তাঁর অন্তর হাহাকার করে উঠত। তাই পত্নী-বিয়োগের পর মাতৃহীন শিশু-কন্যা ও পুত্রের দিকে তাকিয়ে কবি মানস-চক্ষে দেখতে পেলেন আপন ক্ষুধাকে পুত্রকন্যার মধ্যে, নিজেকে অনুভব করলেন এক শিশুরূপে।"

নিজেকে শিশুরূপে কল্পনা করা ও শিশু-সুলভ মনোবৃত্তি লাভ করা কবির পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

এর অনেক পরে কবি "শিশু-ভোলানাথ" কাব্য রচনা করেন।…"সে-ও লোকরঞ্জনের জন্যে নয়, নিজের গরজে।"

কবি সেই সময় আমেরিকায় ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কর্মব্যস্ততার মধ্যে কবি স্পষ্ট করে বুঝেছিলেন যে, মানুষের এই জমিয়ে তোলার মোহ, সঞ্চয়ের লোভ, এ সবই মিথ্যা—একদিন সবই শেষ হবে। মানুষের এই জমাবার মোহ যত বাড়ছে, ততই সে নিজের চারিদিকে একটা আবরণের জাল সৃষ্টি করছে—যা চিরচঞ্চলতাকে দিচ্ছে বাধা। এই জালের আবরণের মধ্যে নিজেকে বদ্ধ রেখে মানুষ মুক্তির প্রকৃত স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না। কবির ভাষায় বলি—"আমেরিকার বস্তু গ্রাস থেকে বেরিয়ে এসেই 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে বসেছিলুম, বন্দী যেমন ফাঁক পেলেই ছুটে আসে সমুদ্রের ধারে হাওয়া খেতে তেমনি করে। দেয়ালের মধ্যে কিছুকাল সম্পূর্ণ আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট করে আবিষ্কার করে, তার চিত্তের জন্যে এত বড়ো আকাশেরই ফাঁকাটা দরকার। প্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আমি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অন্তরের মধ্যে যে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোক-লোকান্তরে বিস্তৃত। এই জন্যে কল্পনায় সেই শিশুলীলার মধ্যে ডুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঙ্গে সাঁতার কাটলুম, মনটাকে স্নিগ্ধ করবার জন্যে, নির্মল করবার জন্যে, মুক্ত করবার জন্যে।"

"ওরে শিশু ভোলানাথ, মোরে ভক্ত ব'লে
নে রে তোর তাণ্ডবের দলে;
দে রে চিত্তে মোর
সকল-ভোলার ঐ ঘোর,
খেলেনা-ভাঙার খেলা দে আমারে বলি।
আপন সৃষ্টির বন্ধ আপনি ছিঁড়িয়া যদি চলি
তবে মোর মত্ত নর্তনের চালে
আমার সকল গান ছন্দে ছন্দে মিলে যাবে তালে।"

এই দুই কাব্যের দুই শিশুর মধ্যে একটা পার্থক্য চোখে পড়ে। "শিশু" কাব্যে কবি একটি বিশিষ্ট শিশুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন। কিন্তু "শিশু ভোলানাথে"র শিশু কবির

কাছে একটি আদর্শ শিশুরূপে প্রতীয়মান হয়েছে—তাই কাব্যটির মধ্যে একটি তত্ত্বের সুর বেজে উঠেছে। পৃথিবীতে যে সৃষ্টি হয়ে আসছে—সৃষ্টির সেই লীলাশক্তির মধ্যে কোন লোভ নেই, কোন আসক্তি নেই, নেই কোন কৃপণতা। এই শিশু সংসারের ভালোমন্দ, ভুলভ্রান্তি, তুচ্ছ হিসাব-নিকাশের বহু উর্দ্ধে, এই শিশু আপন খেলাকেই আপনি ভাঙে—এইখানেই তার বিশেষত্ব। এই শিশুর মধ্যে কবি মুক্তির একটি আদর্শ রূপ দেখতে পেলেন, নিজেও মুক্তির আস্বাদন পেলেন।

"আবার ওগো শিশুর সাথা
শিশুর ভুবন দাও ত পাতি
করব খেলা তোমায় আমায় একা।
চেয়ে তোমার মুখের দিকে
তোমায়, তোমার জগৎটিকে
সহজ চোখে দেখব সহজ দেখা।"

কথায় বলে শিশুর সঙ্গে মায়ের নাড়ীর সম্পর্ক, সেখানে পিতার কোন স্থান নেই। কারণ শিশুর জগৎ রূপকথার—এই রূপকথা-জগতের যে সীমানা, সেই সীমানার মধ্যে মাতার আনাগোনা চলে—পিতার সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তাই শিশুর কাছে পিতা পরবাসী। শিশুর যত কথা সব মাতার সঙ্গে, আবার সে-কথা চোখে চোখে, হাসিকান্নায়, আদরে সোহাগে।

"জন্মকথা" শিশুর কাছে রহস্যময়। এই রহস্যের বিস্ময় কেবল শিশুর কাছেই নয়, মাতার কাছেও বটে। শিশুর প্রশ্ন—

"এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্ খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।"

মাতা কী উত্তর দেবেন এ প্রশ্নের? তিনি জানেন না এ রহস্যের কথা। তাই মাতার কাছ থেকে সঠিক কোন উত্তর পাওয়া যায় না। খোকা যে তাঁর মনের মধ্যে, মা-দিদিমার ইচ্ছার মধ্যে তাঁর যৌবনের রূপ-লাবণ্যে, প্রেমে, পুতুল খেলার মধ্যে।

"সব দেবতার আদরের ধন
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী।"

তাই মা বললে—

"নিমিষে তোমায় হেরে,
তোর রহস্য বুঝি নে রে,
সবার ছিলি আমার হলি কেমনে।"

পরিণত বয়স্কারা সাংসারিক জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা একটা স্বতন্ত্র জগৎ গড়ে তুলেছেন। এখানে প্রমাণের কাঁটা বেছে বেছে পথ চলতে হয়। কিন্তু শিশু যে জগতে বাস করে সেই রূপকথার জগৎ-ই আলাদা, এখানে প্রমাণের দোহাই দিয়ে পথ চলতে হয় না—এখানে বাস্তব ও কল্পনার কোন সীমানা নেই। তাই বাস্তব জগতে যা অসম্ভব, এই রূপকথার জগতে তা সম্ভব হয়ে ওঠে। মাতা সীমান্ত-রাজ্যের অধিবাসী, তাই খোকা যে মা'র সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে এতে আশ্চর্য হবার কি-ই বা আছে। দুষ্টু খোকা চাঁপা গাছে চাঁপা হয়ে ফুটে ওঠে, ফুলের গন্ধের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেয়, কখনো বা দুপুর বেলা ছায়া হয়ে মা'র চোখের সামনে খেলে বেড়ায়, আবার সন্ধ্যেবেলায় প্রদীপ জ্বালাবার সময় ফুল হয়ে টুপ করে ঝরে পড়ে মা'র পায়ের কাছে। সারাবেলার খেলাশেষ হলে—

"আবার আমি তোমার খোকা হব,
'গল্প বলো' তোমায় গিয়ে কব।
তুমি বলবে, 'দুষ্টু, ছিলি কোথা'
আমি বলব, 'বলব না সে কথা'।"

এই রূপকথার জগতে কোন ভেদাভেদ নেই। এখানে গুণী নির্গুণ, বিদ্বান মূর্খ, ধনী দরিদ্র—সকলেই সমান। এই জগতের অধিবাসী শিশুর কাছে বাস্তব ও কল্পনার সীমা স্পষ্ট নহে। তাই তার কাছে যা ইচ্ছে তা হওয়া অসম্ভব নয় এবং বয়স্ক মানুষের মতো পশুপক্ষী, জীবজন্তু ও মানুষের মধ্যে সীমান্তকে নিশ্চল মনে না করাই সম্ভব। শিশু বুঝতে পারে না—

"যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম কুকুর-ছানা।"

তবে কেন তার মা দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন।

"যদি খোকা না হয়ে
আমি হতেম তোমার টিয়ে।"

কেনই-বা তার মা শিকল কাটার জন্যে গালি দিতেন।

নির্জন মাঠের মধ্যে দিয়ে খোকা মা'কে নিয়ে চলেছে বিদেশে। এমন সময় "হারে রে রে রে রে" শব্দ করতে করতে দস্যুদল তেড়ে এল। মা বললে, "যাসনে খোকা ওরে।" খোকা বললে, "দেখো না চুপ করে।"

"কী ভয়ানক লড়াই হল মা যে
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে,
কত লোকের মাথা পড়ল কাটা।"

মা বল্লে, "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল!
কী দুর্দশাই হ'ত তা না হলে।"

কিন্তু খোকার রূপকথা-জগতের ঘটনা আমাদের

বাস্তব-জগতের ঘটনার সঙ্গে মিলবে কেন? তাই খোকা আক্ষেপ করে—

"রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয় না আহা।"

খোকা কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না দাদা খোকাকে বোকা বলে কেন। খোকা শুধু বলেছিল, সন্ধ্যেবেলায় কদম গাছের ডালে আটকে-পড়া চাঁদকে কি কেউ ধরে আনতে পারে? তাই না শুনে দাদা বল্‌লে, দূর বোকা চাঁদ যে অনেক দূরে থাকে। খোকা দাদার কথা মানতে চায় না, বলে "কেন মা যখন জানলার ফাঁক দিয়ে হাসে, তখন কি মাকে অনেক দূরে মনে হয়? এ ত ছোট চাঁদ, আনতে পারি ওকে দুটি মুঠোয় ধরে। দাদা হেসে—

"বললে আমায়, খোকা
তোর মতো আর দেখি নাই তো বোকা।
চাঁদ যদি এই কাছে আসত
দেখতে কত বড়ো।"

খোকা বললে—

"কি তুমি ছাই
ইস্কুলে যে পড়ো।
মা আমাদের চুমো খেতে
মাথা করে নিচু,
তখন কি মার মুখটি দেখায়
মস্তো বড়ো কিছু।"

এতক্ষণ আমরা শিশুকে দেখলাম শিশুর মাতার এবং কবির দৃষ্টি দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ নিজে কি দৃষ্টি দিয়ে শিশুকে দেখেছেন সেই বিষয়ে আলোচনা করব। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি বিশ্বলোক-দৃষ্টি। খণ্ড ও অসম্পূর্ণতাকে তিনি অখণ্ড সম্পূর্ণতার মাঝে দেখতে পান। তাই "খোকা থাকে জগৎমায়ের অন্তঃপুরে।"

খোকার মা'কে জগৎমায়ের কাছে না নিয়ে গিয়ে, কবি জগৎমাতাকে নামিয়ে এনেছেন খোকার মায়ের কাছে।

"মায়ের প্রাণে তোমার লাগি
জগৎমাতা রয়েছে জাগি।"

মেঘে মেঘে রংয়ের বৈচিত্র্য, ফুলে ফুলে গন্ধের মাদকতা, পাতায় পাতায় মর্ম্মরধ্বনি, ঢেউয়ে ঢেউয়ে কলহাস। নদীবারি এত স্বাদু কেন, ফল এত মধুর কেন, এ কিসের আলো আকাশে বাতাসে? পরিণত বয়স্কেরা বুঝতে পারে না, এর কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর মেলে —"রঙিন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে।"

শিশুর রাজ্য ছড়িয়ে আছে প্রকৃতির মাঝে, শিশুর খেলা ভরিয়ে তুলেছে প্রকৃতির রাজ্যকে, সাজিয়ে রেখেছে প্রকৃতি দেবীকে রূপ-রস-গন্ধে। তাই মনে হয় রূপকথা —জগতের সঙ্গে কল্পনা-জগতের নিশ্চয় কোন যোগসূত্র আছে। তা না হ'লে এক জগতের কম্পন অন্য জগতে আলোড়ন তোলে কেন?

খোকার গায়ে "যে কচি কোমলতা" এতদিন তা কোথায় লুকিয়ে ছিল?

"মা যবে ছিল কিশোরী মেয়ে
করুণ তারি পরাণে ছেয়ে
মাধুরী রূপে মুরছি ছিল—
কহেনি কোন কথা—"

তাই যদি হয় তবে খোকা আশিস্ পায় কোথা হতে?

"ফাগুনে নব মলয় শ্বাসে
শ্রাবণে নব নীপের বাসে
আশিনে নব ধান্য দলে
আষাঢ়ে নব নীরে—"

স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে খোকা যে জগতে থাকে, সে জগতে যাবার পথ কোথায়? পরিণত-বয়স্করা ত ভিন্ন জগতের লোক। সেখানে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই যদি হয় তা হলে এই খোকার ভার কে নেবে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আমাদের সে বিষয়ে চিন্তা করার কোন প্রয়োজন নেই। বিশ্বভুবনই খোকার ভার নেবে।

"হিরণময়-কিরণ-ঝোলা
যাঁহার এই ভুবন-দোলা
তপন শশী তারা কোলে
দেবেন এরে রাখি—"

শিশুদরদী রবীন্দ্রনাথ তাই এদের আশীর্বাদ করছেন—

"ইহাদের করো আশীর্বাদ
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি,
নন্দনের এনেছে সংবাদ—
ইহাদের করো আশীর্বাদ।"

—০—

রাজস্থানী পটের অনুসরণে
শিল্পী—রামগোপাল বিজয়বর্গী

(ডঃ শ্রীকালিদাস নাগের সৌজন্যে)
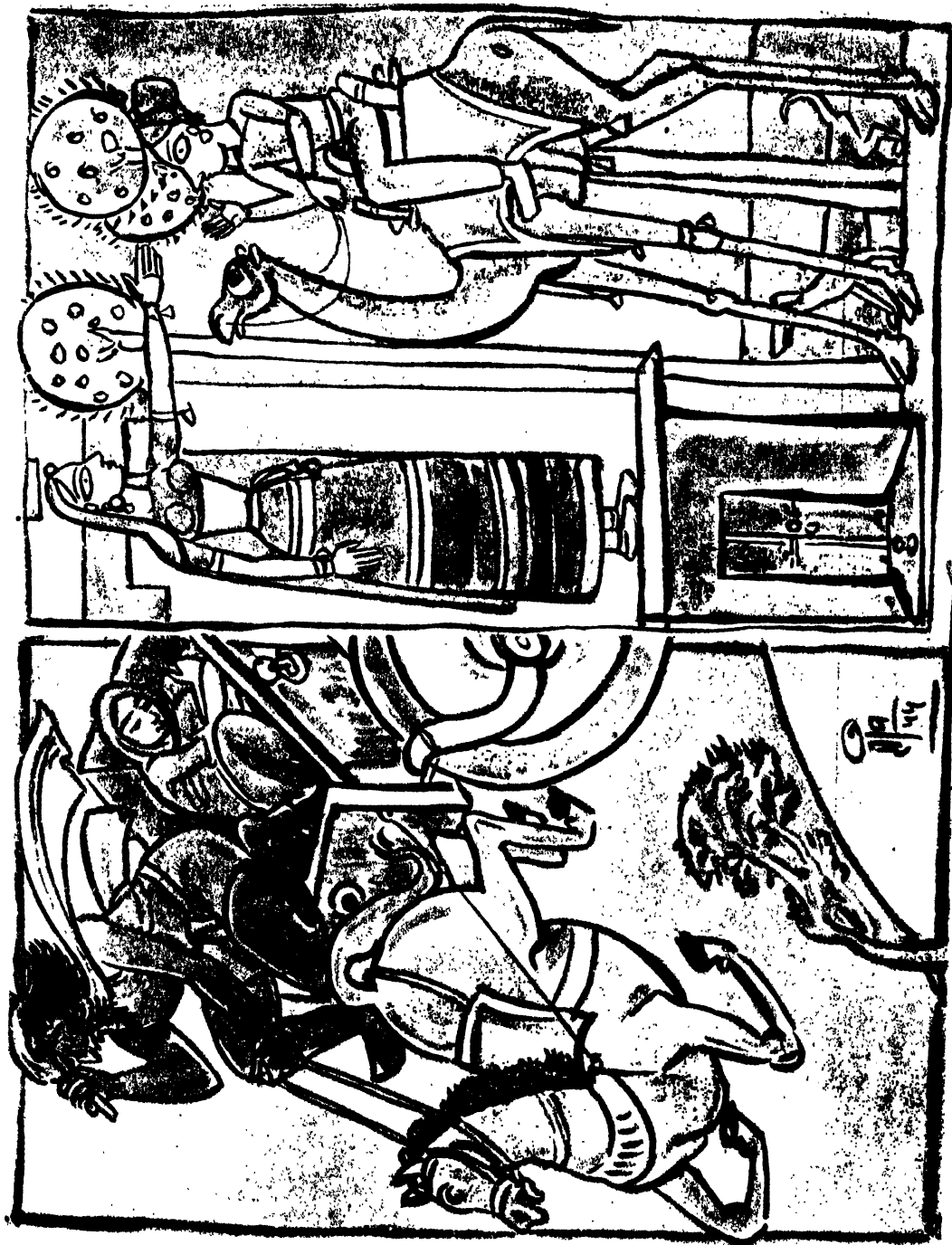
মরু-বধূ

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

[প্রাচীন মারবাড়ী প্রেমগাথা "ঢোলা-মারু রা দূহা" কাব্য-পরিচয়]

১০

কাব্যরসিকগণের বিচারে "মালবনীর বিলাপ" দোহার সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী অংশ। পরবর্ত্তী কালেও হিন্দী সাহিত্যে কবি মালিক মহম্মদ জ্যায়সীর পদ্মাবত কাব্যে "নাগমতীর বিরহ-বর্ণনা" ব্যতীত ইহার সহিত তুলনার যোগ্য অন্য কিছু নাই। মারুর দুঃখের সহিত মালবনীর দুঃখের তুলনা হয় না। যাহার স্বামী-সন্দর্শন মনেই ছিল না, ধ্যানে পতির মানসমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া যে নায়িকা বাস্তবের উপাসনা করিতেছিল, তাহার দুঃখ তীব্র হইলেও মালবনী-র দুঃখের তুলনায় উহা ভাব-বিহ্বলতা মাত্র; রুক্মিণীর হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ! করিয়া রোদন,—সত্য-ভামার প্রাণে ষোড়শ কিংবা ষোল শত সপত্নী শল্যের ব্যথা উহাতে কোথায়? দুঃখান্তে মারুর সুখের মাধুর্য্য ঘোরান্ধকারে দীপ দর্শন—যে দীপ অবশিষ্ট জীবনের অখণ্ড-প্রদীপ। দুঃখের সহিত মালবনীর পূর্ব্ব পরিচয় নাই; স্বামীগৃহে-তিনি অধিশ্বরী, স্বামীর যৌবন-সঙ্গিনী, স্বামীর প্রেম তাঁহার সঞ্জীবনী-সুধা। মারুর বিলাপ মনোজ-বিরহের অস্থিরতা; উহাতে মিলনে ছেদ-ঘটিত বাস্তব বিরহের তীব্রতা এবং সহস্র সুখ-স্মৃতির বৃশ্চিক দংশন কোথায়? মালবনীর বিলাপে কামনা নাই, ক্রোধ নাই, দ্বেষও নাই। ইহাতে আছে স্মৃতির দীর্ঘশ্বাস, এবং স্বামীর মঙ্গল কামনা। স্বামীর স্পর্শ গৃহসজ্জার মধ্যে প্রত্যক্ষবৎ নিরীক্ষণ করিয়া ক্রন্দন, তিলক কাজল তাম্বুল ত্যাগ, অর্দ্ধোন্মত্ততার অসংলগ্ন প্রলাপ—অতি সাধারণ, অথচ অনন্যসাধারণ সহৃদয়তা ও করুণ অনুভূতির বস্তু।

ঢোলা-র সঙ্গে সঙ্গে মালবনীর শ্বাসবায়ু ছাড়া সবই গিয়াছে, মায়াবিনী আশা তবুও তাঁহাকে মাথায় বুদ্ধি ও কর্ম্মে প্রেরণা যোগাইতেছে। ভ্রাতৃকল্প আদরে প্রতি-পালিত তাঁহার এক তোতাপাখী ছিল। নারবার দুর্গ হইতে অরুণোদয়ে মুক্ত হইয়া সুচতুর শুক চন্দেরী ও বুন্দীর মধ্যবর্ত্তী কোনস্থানে রাজার কাছে পৌঁছিল। তখন তিনি গাছের কচি ডাল ভাঙ্গিয়া দাঁতন করিতে-ছিলেন। শুক ব্যস্ত হইয়া বলিল, রাণী মালবনী আপনার যাত্রার পর গতায়ু হইয়াছেন, আপনি ফিরিয়া চলুন।

প্রিয়ার মুমূর্ষু অবস্থা শুনিলে ঢোলা হয়ত বাড়ী ফিরিতেন, কিন্তু মৃতের জন্য শোক ও প্রারব্ধ কার্য্য হইতে বিরতি তিনি অনুচিত মনে করিলেন। তাঁহার শেষ কর্ত্তব্যের ভার তিনি শুককে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, নয় মণ চন্দন এবং এক মণ অগুরুর চিতা সাজাইয়া মালবনী-র দাহকার্য্য সম্পন্ন করিবে: আমার স্থলবর্ত্তী হইয়া তুমিই যথারীতি মৃতার জন্য সাই (শ্মশানে বুক চাপড়াইয়া মারোয়াড়ী শোক-কৃত্য) করিবে।

চাল বান্চাল হইল দেখিয়া শুক সত্য গোপন করিল না। রাজাকে আশীর্ব্বাদ দিল, আপনার সিদ্ধিলাভ হৌক। মালবনী আপনার দাসী; হতভাগিনীকে ভুলিবেন না। "দোহা"-র টিয়াপাখী পদ্মাবত কাব্যের "হীরামন" তোতার পূর্ব্বপুরুষ; তবে ঘর-ভাঙ্গানী প্রেমের মন্ত্রদাতা রাজ-গুরু নহে, পাখী ঢোলা ও মালবনী উভয়ের সমান হিতাকাঙ্ক্ষী। শুক রাজার কথাগুলি গোপন রাখিয়া কৃত্রিম ক্রোধের ভান করিয়া মালবনীকে শুনাইয়া দিল, যাহার রেকাবে পা, হাতে লাগাম্ তাহার মর্জ্জি না হইলে কে তাহাকে ফিরাইবে? মালবনী-র আশার আলো নিবিল, পুরুষের প্রেমের উপর তাঁহার আর আস্থা রহিল না। তিনি শোকের আবেগে একবার ঢোলাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, তুমি ঠগ, তুমি কপট প্রেমিক। দুর্জ্জনের ভালবাসা এবং পাহাড়ী নালার স্রোত,—দুইটাই প্রথমে কুল ভাসাইয়া পাগলের ন্যায় ছুটিয়া আসে, পরক্ষণে শুধু বালু ও পাথর। তোমার প্রেম সুরাভাণ্ডের[১] সহিত শরাবীর সোহাগ, মাল ফুরাইলেই ঘাড় মটকায়। জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুলিলেই ছট্‌ফট্ করিয়া মরে, জল মনের আনন্দে তর্ তর্ করিয়া বহিয়া যায়।

মালবনী আবার গলিয়া জল হয়, আকাশে কাল মেঘ হইতে চায়; কেননা সে মেঘ হইলে ঢোলা-র মাথায়

১। রাজপুতানায় সেকালে মদের বোতল ছিল না। ঐ দেশে হাঁসের আকৃতি মাটির সুরাই সুরাদেবীর বাহন ছিল। এই জন্য রাজস্থানে ইহার প্রচলিত নাম বতক (হিঃ বত্তক্)। মূলে আছে ·····মতবালা রো বতক জ্যউঁ প্রিয় নইঁ পরহরিয়াহ। (পৃঃ ৯৭)

রোদ পড়িতে দিত না। তাহার স্থূলদেহ শূন্য পতি-গৃহে, মন সূক্ষ্ম শরীর আশ্রয় করিয়া প্রিয়তমের অনুসরণ করিতেছে, মনশ্চক্ষুতে দেখিতে পাইতেছে যেন যে পথে ঢোলার উট চলিয়াছে সে পথের ধারে ধারে বৃক্ষলতা অনাবৃষ্টিতেও সবুজ হইয়াছে। এক সতেজ "জাল"-গুল্মকে মালবনী (মোহ অবস্থায়) জিজ্ঞাসা করিল, তোমার গোড়ায় কেহ কি জল ঢালিয়াছে? বায়ু-তাড়িত পত্রহীন "জাল" জানাইয়া দিল—কেহ জল ঢালে নাই; তবে ঢোলা আমার ছায়ায় উট বাঁধিয়াছিল।

১১

সেইদিন "বলেবা"-র (প্রাতরাশ, ছোটা হাজিরী, নাস্তা) সময় ঢোলার উট পুষ্কর পৌঁছিয়া গেল। পুষ্করের কিছুদূর হইতেই রাজপুতনার থল বা মরুস্থলী। ঢোলা এইখানে বিশ্রাম করিয়া উটকে কাঁটা ঘাস উট-কাটরা ও করীল গাছের ডালপালা খাইতে দিলেন। অখাদ্য দেখিয়াই রাজার উটের পিত্ত জলিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া উট সাফ জবাব দিল, পঞ্চাশ দিন উপবাস করিলেও এই জিনিস সে কিছুতেই খাইবে না। ঢোলা অনেক সাধাসাধি করিয়া বলিল, যে তোকে নিত্য কিশমিশ খাইতে দিত সে এখন বহুদূরে। এইখানে নাগর-বেলি কোথায়? উট জবাব দিল, কপালে দুঃখ আছে। এই দেশ অতি বিরংগা [বাজে জায়গা]। শ্বশুর বাড়ীর নিন্দা নূতন জামাতা বাবাজীর প্রাণে লাগিল:

করহা দেস সুহামনউ, জে মূঁ সাসরবাড়ি।
আব্ সরীখউ আক্ গিনি, জালি করীরাঁ ঝাড়ি॥
(পৃঃ ১০০)

(আরে উট! এই দেশ বড় সুন্দর, বড়ই মধুর। ইহা আমার শ্বশুরবাড়ী। এই দেশের আকন্দ? আহা! অন্য জায়গার আম। এই দেশের করীরের ঝাড় যেন (ছায়া-ঘন) জালবৃক্ষ!)

কথায় উটের পেট ভরিল না, যেহেতু সে জামাই নহে; ঢোলা-র চোখে মনে "রং" ধরিয়াছে, ধূ ধূ বালু সে রাঙ্গা দেখিবেই।

ঢোলার উট ঝড়ের বেগে আরাবল্লী পর্ব্বতের সানু-দেশ পার হইয়া চলিয়াছে। ঐখানে একটা টিলার উপর বিশ-বাইশটা ছাগল লইয়া এক গড়রিয়া পশুচারক বসিয়াছিল। সে পথিক-কে লইয়া রসিকতা করিবার মতলবে হাঁক দিয়া বলিল, সাবাস্ জোয়ান্! ঘরে কি কোন মুগ্ধা তোমার পথ চাহিয়া আছে, যাহার আশায় দারুণ ঠাণ্ডা হাওয়ার মুখে উঠ হাঁকাইয়া চলিয়াছ? গ্রামীণের সহিত কবিত্ব করিতে গিয়া ঢোলা ভাষা পাইল না।[২]

"মারু" শব্দটা শুনিয়া গাড়লের বুদ্ধি ঠাওরাইল পরদেশী মারু ছোকড়ীর তালাশে আসিয়াছে, হালের খবর জানে না। সে বলিল, "মারু এখন আমার ঘরকন্না করিতেছে, কালই ছাগল চড়াইতে আসিয়াছিল।" প্রেমে পড়িলে মানুষ কি কার্য্য না করে, অজা-র অভক্ষ্য উদ্ভিদ্ কি আছে? এই জন্য প্রেম-গাথার কবিগণ নায়কদিগের জন্য একটা "গুরু" খাড়া করিয়া সঙ্কট-মোচন করেন। জ্যায়সীর নায়ক রতন সেনের "গুরু" ছিল সুবিজ্ঞ "হীরামন" তোতা। দোহা-র মরুবাসী কবি উটকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালরকম জানেন; সুতরাং ঢোলা-র উট প্রভুর নিভৃত সুহৃদ, উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক।

পশুচারকের কথা শুনিয়া ঢোলা বজ্রাহতের মত নিশ্চল ও অসাড় হইয়া পড়িলেন। উট ধমক দিয়া বলিল, "চল চল, রাস্তা ধর। এই বেটা উজবুক্ (গঁমার, পাড়া-গেঁয়ে) মিছা কথা বলিতেছে; তাহার স্ত্রী অন্য কোন মারু হইবে।" একটা ফাঁড়া না কাটিতেই অন্য একটা উপস্থিত। নিকটে একজন চারণ ঢোলা-র জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। চারণবাবা নিতান্ত হিতৈষীর ন্যায় তাঁহার সহিত আলাপ জমাইল। চারণের মুখে শুনা গেল, যে "মারু"-র জন্য তিনি চলিয়াছেন, সে মারু এখন অথর্ব্ব বুড়ী হইয়া গিয়াছে। ঢোলা দিশাহারা হইয়া উটের কাছে বিলাপ করিতে লাগিল, হায়! হায়! ফিরিয়া গিয়া দেশে কি বলিব? উট প্রভুকে অনেক বুঝাইল। চারণ যে ঠগ, মিথ্যাবাদী—এই কথা ঢোলার প্রত্যয় হইল না। ঐ ব্যক্তি আসলে উমরাসুমরা নামক লম্পট রাজপুত দস্যু সর্দারের গুপ্তচর ছিল।

দোলায়মান চিত্তে ঢোলা আরও কিছুদূর চলিলেন। পথে আর একজন চারণ "মহারাজের জয় হৌক" (শুভ-রাজ) বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিল। চারণের নাম বিশু, বোধ হয় পুগল হইতে আসিতেছিল। ব্যাপার জানিতে পারিয়া বিশুচারণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইল; কিন্তু ঢোলার সন্দেহ ঘুচিল না। অবশেষে বিশুচারণ বলিল, রাজকন্যা মারু-র বয়স যখন মাত্র দেড় বৎসর এবং

২। "জই রুঁখা মারু হুই ছবড়উ পড়িয়উ তাস।
তই হুন্তা চন্দউ কিয়ই, লই রচিয়উ আকাস॥
(পৃঃ ১০২)
[যে গাছ হইতে মারু উৎপন্ন হইয়াছিল (?) উহার এক টুকরা ছাল মাটিতে খুলিয়া পড়িয়াছিল। বিধাতা উহাকে চন্দ্রমা করিয়া আকাশে স্থাপন করিয়াছেন]

আপনার তিন বৎসর তখন আপনাদের বিবাহ হইয়াছিল। ইতিমধ্যে মারু যদি বিগতযৌবনা শুক্লকুন্তলা হইয়া গিয়া থাকেন তবে আপনার এই নবীন যৌবন কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এইবার ঢোলার ভ্রম ঘুচিল। তিনি বিশু-চারণকে পাইয়া বসিলেন এবং মারুর রূপগুণের যথাযথ বর্ণনা তাঁহার মুখে শুনিতে চাহিলেন।

১২

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দোহা-রচয়িতা গ্রাম্য আসরের কথক; গ্রামের আসরে মরুবাসী সাধারণ লোকের রস-তৃপ্তির জন্যই তাঁহার উদ্যম। কবি-র কিছু পুঁথিগত বিদ্যা থাকিলেও উহার দৌড় বেশীদূর নহে। তাঁহার চিত্তহারী কল্পনাশক্তি নাই, ভাষায় শব্দসম্পদ নাই; সৃজনী-প্রতিভার অন্তরালে নিপুণ ললিতকলা অপরিস্ফুট। মারু-র রূপবর্ণনার উপমায় গতানুগতিক খঞ্জন, কোকিল, হরিণ, সিংহ, হাতী ইত্যাদি ব্যতীত মৌলিক কিছুও পাওয়া যায়। উপমার দ্বারা বুঝাইতে অপারগ হইয়া কবি সোজা বলিয়াছেন সিংহিনীর ন্যায় সুমধ্যমা মারু-র কোমর দুই আঙ্গুল মোটা![৩] উপমার মধ্যে উদ্ভটতা ও নূতনত্ব দুইটারই সমাবেশ হইয়াছে। যথা—মারু আম্র মকুলের ন্যায় স্পর্শ-কাতর, ছুঁইলেই শুকাইয়া যায়; এমন সুকুমারী, যেন হাওয়া লাগিলে পাকা আমের মত টুপ করিয়া মাটিতে পড়িবে। নায়িকার নাক সরু শলাকার মত সরল তীক্ষ্ণাগ্র। মারু "কর্ণিকার" স্তবকের ন্যায় দীর্ঘাঙ্গী (সোঁদাল ফুলের থোকা? কণয়র-কম্বু)। তাঁহার সুঠাম দেহ ঋজু, বিশেষতঃ দীর্ঘ পদদ্বয় তীরের মত সোজা। তিনি গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় গৌরাঙ্গিনী এবং উজ্জ্বল হীরক-দশনা, তাঁহার মুখ-মণ্ডল আদিত্য-মণ্ডলের ন্যায় উজ্জ্বল কিংবা উজ্জ্বলতর (আদীতাহুঁ উজ্জ্বলী); হরিণী নয়না হইলেও কবুতরের চোখের মত লালিমাযুক্ত, ঠোঁট এবং চোখ দুইটি মধুভরা, "মারু" মাধুর্য্যে যেন কিশমিশ (দাখ)! মারু-র রূপের উপমাস্থল নাই, বিশুচারণ তাদৃশ দেখে নাই;—তবে সূর্য্যোদয়ে প্রভাত-রবির প্রথম কিরণচ্ছটা মারু-র রূপের ঝলক বলিয়া কিঞ্চিৎ ভ্রম জন্মাইতে পারে—

থোড়ো সো ভোলে পড়ই দণয়র উগহন্তাহঁ।

প্রেমগাথার অপরিহার্য্য অঙ্গ শৃঙ্গার (নখশিখ-নিরূপণ, রূপ-সজ্জা) এই অংশ দোহার কবি বিশু চারণের মুখে এবং অন্যত্র বাসরসজ্জায় শুনাইয়াছেন এই বর্ণনায় চমৎকারিতা আছে, ইহার ঐতিহাসিক মূল্য আছে এবং উপমায় কিঞ্চিৎ হাসির খোরাকও আছে। রূপসজ্জায় বেলি-কাব্যের রুক্মিণী যেন "যোধপুরী" বেগম—রূপ-সজ্জায় মারোয়াড়ী পদ্ধতির সহিত মোগলাই ভেজাল। দোহার নায়িকা মারুর রূপসজ্জায় কোন বিজাতীয় ভেজাল নাই; ইহা আদি এবং অকৃত্রিম; মরুস্থলীতে যে রূপসজ্জা মরুকন্যারা সে যুগে করিত, এ যুগেও করে, এবং যাহা জয়সল্মীর রাজ্যের "ঠাকুরাণী"-র (সামন্ত-গৃহিণী) কিংবা কলিকাতায় নবাগতা শেঠানীদের পায়ে সোনার নূপুর ব্যতীত অঙ্গে অন্য অলঙ্কার অন্দরমহলে দেখা যায়। যথা—মাথায় সিস্‌ফুল (অলকে "নব-কুরবক" নহে); সিঁথির ঝাঁপা (?)। ভুরুর উপরে কপালে সোহিলী[৪]; কানে কুণ্ডল; নাকে নক্‌ফুলি (বাংলা নাক-ফুল)[৫]; গলায় টকাবল[৬] হার। দুই বাহুতে বাউটি (বহরখা; বেলি-র বাজুবন্ধ), কনুই হইতে মনি-বন্ধ পর্যন্ত হাতীর দাঁতের পেঁচদার এবং আঁটাআঁটি চুড়া বা চুড়ি (প্রোচি; পইঁছার বিকল্প)। মণিবন্ধে "স্রস্তং স্রস্তং" কনক-বলয়ের স্থানেও মামুলী ঢিলা চুড়ির গোছা। কটিবন্ধে মেখলা (রাজস্থানী করধনী), পায়ে ঝনক্‌ ঝনক্‌ "ঝাঁঝর"[নুপুর],পরিধেয় বস্ত্র সাড়ী কি ঘাঘরা বুঝা যায় না, তবে কাঁচুলী ঠিক আছে। উহা কোন মাপের জানা যায় না; যেহেতু প্রকাণ্ড কিছু না হইলে মারোয়াড়ীর মন উঠে না। বিদ্যাপতি যে প্রত্যঙ্গের "কনক-কচৌরা" উপমা দিয়াছেন মারোয়াড়ী কবি সেস্থলে কল্পনা করিয়াছেন করী-কুম্ভ! বেলির নায়িকা রুক্মিণীর কাঁচুলি যেন মত্ত হস্তীর দৃষ্টিসঙ্কোচক সচঞ্চল প্রাবরণ!

৩। মূল মারু-লংক দুই অংগুল (পৃঃ ১০৯)। বেলির নায়িকা রুক্মিণীর কটিও মুষ্টিগ্রাহ্য।

৪। দোহা ভুহুঁহা উপরি সোহলো পরিঠিউ জাঁণি কা চংগ। (পৃঃ ১১০)

[মারু ভুরুর উপর সোহলী ধারণ করিলে মনে হয় যেন আকাশে ঘুড়ি উড়িতেছে!]

বেলির কবি লিখিয়াছেন মুখ ও মাথার সন্ধিস্থলে রত্নমণ্ডিত "তিলক"। (পৃঃ ১২)

৫। দোহা পৃঃ ১০৮। নথ, বেসর, আংটা ইত্যাদি উল্লেখ নাই। এইগুলি দোহার রচনাকালের পরেই সম্ভবতঃ প্রচলিত হইয়াছিল। বেলির কবি লিখিয়াছেন, রুক্মিণীর নাসাগ্র হইতে মুক্তাফল দুলিতেছিল, যেন শুক-দেব ভাগবত পাঠ করিতেছেন! (পৃঃ ২১)।

৬। দোহা পৃঃ ১০৪। দোহার শ্রোতাগণের চিরপরিচিত টঁকাবল, আজও প্রচলিত। ইহা রূপার আধুলি ও পুরাণো টাকার সূতায় গাঁথা ছড়া। মারু-র পিতা নামে মাত্র রাজা। তাঁহার কন্যার গায়ে মামুলী রূপার গহনা; তবে কন্যার বর্ণের আভায় রূপাও সোনা বলিয়া মনে হইত। [সোহ ঋাঁখউ সোবন্ত জো গলি পহিরউ রূপকউ]

বেলির নায়িকার গলায় মুক্তার বহু-লহরী মালা; কোথাও রূপার স্থান নাই (পৃঃ ২০)।

১৩

বিশুচারণের কথা শুনিতে শুনিতে দেশ-ছাড়া প্রেমের পাগল ঢোলা আত্মবিহ্বল হইয়া পড়িলেন, উটের অসহিষ্ণুতা, অস্তাচলগামী সূর্য্য, পূগলের অফুরন্ত পথ যেন তিনি ভুলিয়া গেলেন। চারণ আবার শুনাইল :

"গতি গঙ্গা মতি সরসতী সীতা সীল সুভাহ।
মহিলা সরহর-মারুই অবর ন দুজী কাহ॥
নমনী, খমনী, বহুগুণী, সুকোমলী, জু সুকচ্ছ।
গোরী গংগা-নীর জ্যু, মন গরবী, তন অচ্ছ॥

*　　*　　*

মৃগনয়নী, মৃগপতি-মুখী, মৃগমদ তিলক নিলাট।
মৃগরিপু-কটি, সুন্দর বাণী, মারু অইসই ঘাট॥

*　　*　　*

থল ভুরা, বন ঝংখরা, নহী সুচম্পউ জাই।
গুণো সুগন্ধী মারবী, মহকী সহু বনরাই॥

*　　*　　*

তেতা মারু মাহি গুণ, জেতা তারা অভ্র।
উজ্জল-চিত্তা সাজনা, কহি ক্যউ দাখউ সভ্র॥

অর্থাৎ—(মারুর) গতিভঙ্গী গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় ধীর-গম্ভীর। তিনি জ্ঞানে সরস্বতী, সীতার ন্যায় সুশীলা। মহিলামণ্ডলে তিনি অদ্বিতীয়া। তিনি বিনয়শীলা, ক্ষমা-শালিনী, সুকুমারী, "সুকক্ষা" (of handsome bust) বহুগুণসম্পন্না, গঙ্গানীর-গৌরী, মানিনী, তন্বী। (মারু) মৃগনয়নী, মৃগপতি-মুখী,৭ ললাটে মৃগমদ-তিলকধারিণী ক্ষীণকটি, সুমধুরভাষিণী, দেহসৌষ্ঠবশালিনী।

মরুস্থলী (থল) বালুকাধূসর, অরণ্যানী শ্যামশ্রীবিহিনা (হিন্দী ঝংখাড়); এখানে চাঁপাফুল ফুটে না; কিন্তু মরুদুহিতার গুণসৌরভে মরুদেশ সুরভিত। আকাশে যত তারা মারুর তত গুণ। হে উচ্ছল-চিত্ত ভালমানুষ, উহার সমস্ত গুন বর্ণনা করা কেমন করিয়া সম্ভব?

এইবার ঢোলার চৈতন্য হইল, বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে। তিনি বিশুচারণকে এক মোহর বকশিস দিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার আগমন সংবাদ পূগলে পৌঁছাইবার জন্য বিদায় দিলেন। নায়কের "ঘড়ী" অর্থাৎ ২৪ মিনিটে যোজনগামী উষ্ট্ররত্ন অপেক্ষা দ্রুততর-গতি কোন্ বাহনে চড়িয়া চারণ পূগলে গেল কবি আমাদিগকে বলেন নাই। এই দিকে ঢোলা উটে চড়িয়া এক এক বারে দশ দশ ছড়ি মারিয়া, গালাগালি করিয়া বেচারা উটকে অস্থির করিলেন। গালাগালি ও প্রহারে উট উড়িল না দেখিয়া তিনি তোসামদ আরম্ভ করিলেন :

করহা, বামন রূপ করি চিহ্ চলণে পগ পূরি।
তু থাকউ উসনউ ভূঁই ভারী, ঘর দূরি॥

[হে করভ, তুমি ত্রিবিক্রম রূপ ধারণ করিয়া চরণ চতুষ্টয় দ্বারা পথ অতিবাহিত কর। তুমি ক্লান্ত হইয়াছ, আমিও অবসন্ন; বিলম্ব অসহ্য হইয়াছে। পথ সুদীর্ঘ, গৃহ বহুদূর]

গৃহমুখী পথশ্রান্ত পথিক তথা প্রেমসাধনায় সিদ্ধির সমীপবর্ত্তী সাধকের এই মর্ম্মবাণী, (ভূঁই ভারী, ঘর দূরী)-ঢোলার দীর্ঘশ্বাসের সহিত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া মানবের জীবন-মরুর বুকে প্রতিধ্বনি জাগাইতেছে।

ঢোলার উট ক্ষণজন্মা পশু। সে কথা দিয়াছিল মরু-বধূ ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্ব্বেই যাত্রার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মালিককে পূগল পৌঁছাইয়া দিবে। উট ঢোলাকে আগতপ্রায় সন্ধ্যায় আশ্বাস দিয়া বলিল, ছড়ি মারিও না, লাগাম ছাড়িয়া দাও, পাগড়ি ঠিক রকম কষিয়া বাঁধ। মধ্যরাত্রিতে নারবার পশ্চাতে রাখিয়া পরের দিন সন্ধ্যা-বাতির সময় অর্থাৎ বিশ ঘণ্টার কম সময়ে উট পূগলের কাছে পৌঁছিয়া গেল।৮ নিকটে একজন চাষা প্রাণান্ত-কর পরিশ্রম করিয়া "থল" দেশের "বাঠ-পুরুষ" (প্রায় ৩৬০ ফুট) গভীর কূপ হইতে জল টানিতেছিল। ঢোলা

৭। মৃগপতি-মুখী, ও পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যমুখী [আদীতাহ উজলো] পরস্পরবিরোধী উপমা। কবি ও সাহিত্যিকের উক্তি "ভদ্রলোকের এক কথা" নয়। কবির কল্পনা সমালোচকের অঙ্কুশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। আমাদের প্রাথমিক স্কুলের নমস্য কাব্যরসিক পণ্ডিত মহাশয় একবার কবি নবীনচন্দ্রের উপর দারুণ ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন। "তপ্ত লোষ্ট্রসম ধমনীতে রক্তস্রোত হয় প্রবাহিত।" ইহা কেমন কথা? রক্তের সহিত মাটির গরম ঢেলার উপমা? উহাকে আবার ধমনীতে প্রবাহিত করা? আমরা বুঝিলাম নবীনচন্দ্র নিষ্কলঙ্ক নহেন! যাহা হৌক্, কাব্য সমালোচনার এই রীতি বর্ত্তমানে অচল বলিয়া মহাপুরুষগণ বলেন।

৮। "দোহা" সম্পাদক হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন নারবার দুর্গ হইতে পূগলের দূরত্ব প্রায় ২২৫ ক্রোশ (৪৫০ মাইল) এবং এই বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ হইয়াছেন যে, ঢোলার উটের পক্ষে কুড়ি-একুশ ঘণ্টায় এই রাস্তা অতিক্রম করা কঠিন হইলেও অসম্ভব নয় (ভূমিকা পৃঃ ১০৪)। এইরূপ বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় বঙ্গ সন্তানের সমালোচনায় আমরা অদ্যাবধি পাই নাই। ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছয় মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ॥

দুর্ভাগ্যের বিষয়, ম্যাপে পথ মাপিয়া ঘড়ি ঘণ্টা হিসাব করিয়া ছয় দিনে নায়ক সুন্দরের ঘোড়ার পক্ষে বর্দ্ধমান পৌছান সম্ভব কিনা কোন বাঙালী প্রমাণ করিলেন না!

কবি এরূপ বিবেকপরায়ণ সমালোচককে কি পুরস্কার দিতেন অনুমান করা কঠিন নয়।

চাষার দুঃখে গলিয়া সহানুভূতি দেখাইয়া ভাল কথা বলিলেন। জল-টানা গোঁয়ার ইহাতে রাগ করিয়া ধমক্ দিল—ঘরে যাও, আমার জন্য তোমার কি দুশ্চিন্তা? মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত জল টানিয়া আমি জলাধার ভরাইয়া থাকি! গায়ে পড়িয়া নীচের প্রতি দরদ দেখাইতে যাওয়া মানব-প্রেম নহে; আকাট মূর্খতা।

১৪

শুভসংবাদ বিশুচারণ পূর্ব্বেই আনিয়াছিল। গরীবের দেশে জামাতার অভ্যর্থনা এবং ভোজন ব্যাপার অত্যন্ত গন্ধময়; এই জন্য কবি নীরব। যাঁহার পথ চাহিয়া চাহিয়া এতদিন মরু-বধূর চোখ জলে ভাসিয়াছিল—তিনিই আসিয়াছেন। প্রিয়তমের আগমনে কবি-পরম্পরাগত নায়িকার হর্ষ, পুলক স্বেদ রোমাঞ্চ ইত্যাদি ভাব-বিলাস মরুবাসী গ্রামীণ শ্রোতার অনুভূতি ও কল্পনা বিভ্রান্ত করিতে পারে, এই আশঙ্কায় বোধ হয় দোহার কবি কিছু মোটা অথচ অতি মৌলিক উৎপ্রেক্ষার দ্বারা প্রিয়সমাগমে মারুর আনন্দের আতিশয্য আমাদিগকে শুনাইয়াছেন; উহার কবিত্ব ভোঁতা মনের উপরও দাগ কাটে। আনন্দে অর্দ্ধোন্মাদিনী মারু সখীকে বলিতেছেন:

সোই সজ্জন আবিয়া, জঁহিকী জোতী বাট।
থাঁভা নাচই, ঘর হঁসই, খেলণ লাগী খাট॥

অর্থাৎ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সুজন বঁধু আসিয়াছেন। (দেখ, দেখ, দালানের) থাম নাচিতেছে, ঘর হাসিতেছে, খাট (চার-পাই) খেলা জুড়িয়া দিয়াছে!

ঢোলা শ্বশুর বাড়ীতে ১৫ দিন ছিলেন, তিনি মারুর জন্য মুক্তার মালা আনিয়াছিলেন। বাসরঘরে মারু উহা হাতে লইয়া হাসিয়া ছুড়িয়া ফেলিলেন। অজুহাত, তাঁহার হাতের মেহেদীর রং ও চোখের কাজল নির্ম্মল (?) মুক্তার উপর প্রতিবিম্বিত হইয়া গুঞ্জাফল (কুঁচের বীজ) ভ্রম জন্মাইয়াছিল। দিন রাত্রির অষ্ট প্রহরের দাম্পত্য-ক্রীড়া কবি উৎসাহের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন! এই বর্ণনা মরুদেশের অমৃততুল্য অজা-দুগ্ধপক্ব পায়সান্ন, যাহা দেবতার ভোগে লাগে না, পাঠক-পংক্তিতে পরিবেশন করা যায় না।

. বহুমূল্য যৌতুক, বিস্তর উট-ঘোড়া, দাস-দাসী লোক-লস্কর সঙ্গে দিয়া পিঙ্গল রায় কন্যাকে পতিগৃহে বিদায় দিলেন। পুগল হইতে যাত্রা করিবার পরের দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক জায়গায় ঢোলা তাঁবু ফেলিয়াছিলেন। রাত্রিতে নিদ্রিতা মারুর মুখে কস্তুরীর গন্ধে আকৃষ্ট মরুভূমির এক পীহনা সাপ মোহনলতা ভ্রমে সুন্দরীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া প্রভাতে তাঁহার প্রাণবায়ু নিশ্বাসের সহিত টানিয়া লইয়া অদৃশ্য হইল। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে ঢোলার তখন ইন্দুমতী-হারা অজ রাজের অবস্থা; তবে দোহা দূরের কথা, ভূভারতে অন্য কেহ কবি কালিদাসের অজ-বিলাপের সহিত তুলনীয় বিলাপ লিখেন নাই। শ্বশুর-বাড়ীর শোকার্ত্ত লোকজন ঢোলাকে গ্রামীণ শ্মশানবন্ধুর ন্যায় প্রবোধ দিয়া বলিল, বাড়ীতে ফিরিয়া গেলে তাহারা মারু অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় এবং তিন গুণ অধিক সুন্দরী আর এক রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়াইবে। ঢোলা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না; অল্পমাত্র কয়েকজন লোক ব্যতীত অধিকাংশ লোকজন পাগলের সঙ্গ ত্যাগ সুবুদ্ধির কাজ বিবেচনা করিয়া পুগলে ফিরিয়া গেল। ঢোলা প্রিয়ার সহিত সহমৃত হইবেন স্থির নিশ্চয় করিয়া চিতা সাজাইতেছিলেন এবং প্রায় অগ্নিপ্রবেশ করিবেন এমন সময় এক যোগী ও যোগিনী সেখানে উপস্থিত হইলেন। ঢোলাকে বাধা দিয়া যোগী বলিলেন:

নর নারীসুঁ ক্যঁ জলই, নরসুঁ নারি জলন্ত।
সাল্হকুঁবর, জোগী কহই, অহলউ কেম মরন্ত॥

[যোগী বলিলেন, পুরুষ নারীর সহিত কেন পুড়িয়া মরিবে? নারীই পুরুষের সঙ্গে জ্বলিয়া মরে। সাল্-হ্-কুমার, প্রাণটা বৃথা বিসর্জ্জন দিও না।]

শুদ্ধ প্রেমে পতঙ্গ-বৃত্তি প্রেমিক ঢোলা যোগীকে ধমক্ দিয়া বলিল, ওহে যোগী! আমি পুড়িয়া মরিব, তাতে তোমার দুঃখ কি? পথিক তুমি, নিজের রাস্তা দেখ; পরের কথা লইয়া মাথা ঘামাইও না। যোগী বিমনা হইলেন; কিন্তু যোগিনী তাঁহাকে শাসাইলেন, হয় মৃতা নারীকে বাঁচাইয়া দাও, না হয় আমি ইঁহাদের সহিত চিতায় ঝাঁপ দিব। যোগী ফাঁপড়ে পড়িলেন; যেহেতু যোগিনী সুন্দরী, তাঁহার কাছে প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী। তিনি কমণ্ডলুর জল মন্ত্রপূত করিয়া মৃতা মারুর মুখে ছিটাইয়া দিলেন; অমানিশার ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া সহসা শরৎচন্দ্রমা হাসিয়া উঠিল; যোগী-দম্পতী (হর-পার্ব্বতী) লীলা শেস করিয়া অদৃশ্য হইলেন!

ঢোলা নিজের উটে মারুকে উঠাইয়া অনুচরবর্গকে লটবহর লইয়া পশ্চাতে আসিবার হুকুম দিলেন। পথ চলিতে চলিতে মনের আনন্দে তাঁহার হুঁস্ রহিল না। রক্ষীদিগকে ছাড়িয়া তিনি বহুদূর আসিয়া পড়িলেন। মারুর নাকে ধূলার গন্ধ লাগিল, কানে ধাবমান অশ্বপদ-ধ্বনি ভাসিয়া আসিল। ইহা দুর্লক্ষণ অনুমান করিয়া মারু উটকে সাবধান করিয়া বলিলেন, হয় কাহারা প্রাণভয়ে

পলাইতেছে, না হয় আমাদের অচিন্ত্য হানি আছে (কাঁই অচন্তী হাঁন)। এমন সময় পথিমধ্যে এক অশ্বারোহী পিছন হইতে ডাকিল : ঠাকুর হো, একাকী এইভাবে কোথায় চলিয়াছ ? আমরা নারবার যাইতেছি। একটু বিশ্রাম করিয়া অম্মল-পানি (আফিম্ জলযোগ) করা হৌক !

নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে অসন্দিগ্ধচিত্ত ঢোলা উটকে বসাইয়া দুই জনেই নামিয়া পড়িলেন। উটের দুই পা দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, লাগাম ও ছড়ি মারুর হাতে দিয়া ঢোলা আতিথেয়তা গ্রহণ করিতে গেলেন। মজলিসে আফিম শরাব গীতবাদ্য চলিতেছিল, ঢোলার মন উহাতে ডুবিয়া রহিল। ঐখানে মারুর পরিচিতা পুগলের এক ডোম্‌নী (নীচ জাতিয়া গীতবাদ্যনিপুণা পেশাদার নর্ত্তকী) সারেঙ্গী বাজাইতেছিল। আসল ব্যাপারের আঁচ সে পূর্ব্বেই পাইয়াছিল। মারুকে সাবধান করিবার জন্য তাহার তন্ত্রীর তানে ঝঙ্কার উঠিল :

তত তণক্কই, পিউ পিয়ই, করহউ উগালেহ।
ভল বউলাবো দীহড়া, দই বলাবণ দেহ
থল মথ্‌থই উজ্জাসড়উ, থে ইন কেহই রংগ।
ধন লীজ্জই, প্রী মারিজ্জই, ছাঁড়ি বিউনউ সংগ ॥৯

[তন্ত্রী ঝন্ ঝন্ বাজিতেছে, প্রিয়তম শরাবের পেয়ালায় চুমুক বসাইয়াছে, উট বসিয়া বসিয়া জাবর কাটিতেছে। দৈব যদি প্রতিকূল না হয় দিন ভালই কাটাও। থলের মধ্যে ইহা জনশূন্য উজার জায়গা। তোমার এই কেমন রঙ্গ (ঢংগ) ? এখনই স্ত্রীকে ধরিয়া লইয়া যাইবে, স্বামীকে মারিয়া ফেলিবে ; (ধূর্ত্ত লম্পট) বিটলের (বিউনউ) সঙ্গ ত্যাগ কর···(অবশিষ্টাংশে) আরে পাড়াগেঁয়ে আনাড়ী মারুণী ! স্বামীকে বাঁচাইতে চাস্ ত উটকে ছড়ি মার্]

আশঙ্কা ভারাক্রান্তা মারুর কান অতি সজাগ ছিল। ছড়ির ঘা খাইয়া দুই পা-বাঁধা উট হুড়মুড় করিয়া দৌড়িল ; মারু লাগাম ছাড়িল না। উট পলাইল দেখিয়া ঢোলাও দৌড় দিল, কাহারও কথা গ্রাহ্য করিল না। কিছু দূরে চোখের আড়াল হইবার পর মারু ঢোলাকে বলিলেন, উম্‌রাসুম্‌রা (সুমরাহ্ রাজপুত, নাম উমরা) আমাদের পাছ, লইয়াছে, লড়াই করিবে। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া ঢোলার মনে হইল স্ত্রী বাস্তবিক ঠিক কথাই বলিতেছে। উটকে বসাইয়া দুই জনে উঠিয়া পড়িল, কিন্তু ভোলামন ঢোলা রায় উটের দুই পায়ের দড়ি খুলিতে ভুলিয়া গেলেন। শিকার হাত ছাড়া হইল ভাবিয়া দুর্দ্ধর্ষ উম্‌রা ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটাইল। পা-বাঁধা বাহাদুর উট দস্যুদলকে অনেক পিছনে ফেলিয়া আরাবল্লী পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইল।

১৫

পথিমধ্যে আর একজন চারণ ঢোলাকে "শুভরাজ" (ব্রাহ্মণের "জয়োস্তু") জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, উপরে দুইজন সওয়ার, অথচ উটের দুই পা বাঁধা, ব্যাপার কি ? ঢোলা এইবার অতিরিক্ত সাবধানী ; উট হইতে না নামিয়া চারণকে একখানা ছুরি আগাইয়া দিয়া দড়ি কাটিয়া দিতে বলিলেন। পরের দিন ভোরবেলা উম্‌রার সহিত চারণের দেখা হইল। চারণ বলিল, ঢোলার পা-বাঁধা উটকে তুফানের বেগে "আরাবলা"র টিলা-টক্কর অতিক্রম করিয়া বড় "ঘাট" (গিরিবর্ত্ম) পার হইতে আমি দেখিয়াছি, এবং এই হাতে ঢোলার ছুরি দিয়া উটের পায়ের দড়ি কাটিয়াছি। তিনি এতক্ষণে নারবারের কাছাকাছি পৌঁছিয়া গিয়া থাকিবেন। উহার পিছনে ঘোড়া দৌড়াইয়া মিছামিছি ঘোড়া খুন করিও না।

ঢোলা নিরাপদে নারবার দুর্গে ফিরিয়া আসিলেন। স্ত্রীলোকেরা মঙ্গলগীত গাইয়া বর-বধূর সম্বর্দ্ধনা করিল, নগরী উৎসবে মাতিয়া গেল।১০

৯। দোহা, মূল পৃঃ ১৪২-৩। কবি অজ্ঞাতসারে মরুভূমির প্রায় দৈনন্দিন দুর্ঘটনা এবং মারোয়াড়ী চরিত্রের একটা দিক ইঙ্গিতে এই স্থলে জানাইয়াছেন। বরযাত্রীদের উপর হামলা করিয়া নূতন বৌকে ছিনাইয়া লওয়া ঐ দেশে প্রায় শুনা যায়। এমন কি জয়পুরের বাহিরেও বড় বড় শেঠজীর ছেলের বিবাহে একটি রাজপুত বালককে বরের বহুমূল্য জমকাল পোশাক পরাইয়া ঘোড়ায় চড়ান হয়। বেচারা আসল বর সাধারণ পোশাকে ঘোড়ার পাশে পাশে চলে। দশ বিশ জন রাজপুত রক্ষী ব্যতীত দূরের জায়গায় কেহ "বরাত" যায় না। "গোহ্‌না"র (দ্বিরাগমন) দীর্ঘ ঘোমটা-পরা বৌকে লইয়া স্বামী যাইতেছে ; পথে বাহ্যে করিবার জন্য বোচ্‌কা ও বৌ রাখিয়া জঙ্গলে গেল; ইতিমধ্যে নিঃশব্দে দু-ই গায়েব ! রেলে দেখা যায় কাছা খুলিয়া শেঠজী প্লাটফরমের বাহিরে লঘুশংকা করিতেছেন, ট্রেন ছাড়িয়া গেল। একবার মধ্যরাত্রে গন্তব্যস্থানে নামিয়া এক শেঠজী দ্বিতীয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকের গাড়ীতে তাঁহার তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীকে ঠাহর করিতে পারিলেন না ; একজন হিতৈষী বন্ধু বলিল, "আরে ! একঠো লেহি লে !"

১০। প্রকৃতপক্ষে এইখানেই দোহার সমাপ্তি হওয়া উচিত ছিল। কোন তৃতীয় শ্রেণীর কথাশিল্পীও আজকাল এই রকম কাহিনীর উপসংহার লিখিতে সাহসী হইবেন না। ইহার পরবর্ত্তী অংশে কাব্য "কেচ্ছা"র দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সুপণ্ডিত সম্পাদকগণ যাহা গ্রন্থ মনে করিয়াছেন অর্ব্বাচীন অহিন্দীভাষী সমালোচক উহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোভাবের পর তাঁহার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাগণের বাকী জীবনে কি হইল ভাবিয়া ভাবিয়া উনবিংশ শতাব্দীতে যখন বঙ্কিম-ভক্তগণের সুনিদ্রা হয় নাই, তখন তাঁহার অন্ততঃ ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে দোহার কবি আধুনিক সাহিত্য-শিল্পের অগ্রদূত হইবেন এমন আশা করাও অন্যায়।

কবি বলিয়াছেন, এক মহলে দুই রাণী লইয়া ঢোলা রায় সুখেই ছিলেন। অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই; যেহেতু সে যুগ ছিল স্ত্রী-পক্ষে পুরুষের যুগ—নিতান্ত পরুষ, কঠোর, স্বার্থকলুষিত ও নির্মম। সে যুগে দাম্পত্য-সুখের সংজ্ঞাই ছিল একতরফা; নারীর মনের বেদনা পুরুষকে বিচলিত করিত না। নূতনের মোহে পুরাতনের প্রতি সর্বত্র নিত্য এই অবিচার আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। যাহা হৌক, মারোয়াড়ী হিসাব বড় পাকাপোক্ত। কবি বলিয়াছেন, ঢোলা নিয়ম করিয়াছিলেন প্রতি তিন রাত্রির এক রাত্রি মালবনীর, দুই রাত্রি মারুর। যিনি বিবাহ-জীবনের প্রারম্ভ হইতে এতদিন ঢোলার উপর ষোল আনা ভোগদখলের সত্ত্ব জারী করিয়া আসিয়াছেন, এখন তিনি পাইলেন পতির সোহাগ ও সাহচর্য্যের পাঁচ আনা চার পাই অংশ। তাঁহার মনের আগুন কিছুদিন ধূমায়িত ছিল। একদিন তিনজন একত্র বসিয়াছেন; হঠাৎ দুই সতীনের ঝগড়া বাধিয়া গেল। ঢোলাকে উপলক্ষ্য করিয়া মালবনী মারুর বাপের দেশের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িলেন। তাঁহার বক্তব্য:

বাবা! (ভগবান অর্থে) আমি এমন দেশের মুখে আগুন দিই যে দেশের লোক আধা-রাতে উঠিয়া (কুয়ার জল টানিতে টানিতে) এমন "কুহ্‌ক্কড়া" (শ্রমলাঘব ধ্বনি) আওয়াজ দেয় যেন কেহ মরিয়া গিয়াছে! সে দেশের মুখে আগুন, যে দেশে জলের কষ্ট; যে দেশে স্ত্রীকে আধা-রাতে বিছানায় ফেলিয়া পুরুষ জল তুলিবার জন্য দৌড়ায়। বাবা! আমাকে মোটা-বুদ্ধি মারুয়া গড়রিয়ার (মেষ ছাগল যাহারা চড়ায়) হাতে দিও না, যেখানে মাথায় জলের ঘড়া ও কাঁধে কুড়ালি (জ্বালানী জঙ্গল কাটিবার জন্য টাঙ্গি) লইয়া ঘুরিতে হয়, থলের উজ্বার বালুর মধ্যে বাস করিতে হয়···বরং কুমারী থাকিব তবুও মারুয়ার দেশে বিবাহ দিও না; মাথায় জলের ঘড়া, হাতে কটোরা (রাজস্থানী "কচোলা", মৈথিলী কচৌরা অর্থাৎ গোষ্পদ হইতে জল কাটিয়া ঘড়া ভরিবার বাটি) লইয়া জল সিঁচিতে সিঁচিতে মরিয়াই যাইব।

পরে মারুকে সোজা শুনাইলেন:

"মারু, থাকই দেসড়ই এক ন ভাজই রিড্ড।
উচালউ ক অবরসনউ, কই কাকউ কই তিড্ড।
জিন ভুই পন্নগ পীয়না, কয়র-কঁটালা রূখ।
আকে-ফোগে ছাঁহড়ী, হুছাঁ ভাজই ভুখ॥
পহিরণ-ওড়ণ কম্বলা, সাঠে পুরিসে নীর।
আপন লোক উভাখরা, গাড়র-ছালী খীর॥

অর্থাৎ ওহে মারুণী, তোমাদের দেশে লোকের বড় কষ্ট। কখনও উচালা (অন্নজলের দুর্ভিক্ষে দেশত্যাগ), কখনও বা অনাবৃষ্টি, না হয় পঙ্গপালের উপদ্রব, যেখানে পীহুনা সাপের বাস, যে দেশে করীলের ঝোপ ও উট-কাঁটারা ঘাস গাছের সামিল (এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে!), যেখানে লোক আকন্দের ঝোপ কিংবা ফোগের (কুল-জাতীয় কাঁটা ঝাড়) নীচে ছায়া তালাশ করে, ভুরট ঘাসের কাঁটা ফল খাইয়া ক্ষুধার জ্বালা মিটাইয়া থাকে। যে দেশের স্ত্রীলোকেরা মোটা কম্বল পরিয়া থাকে এবং ওড়নার জন্যও মোটা কম্বল ছাড়া আর কিছু পায় না, যে দেশে "ষাঠ পুরুষ" (প্রায় ৪২৫ ফুট) জমির নীচে জল, যে দেশের লোকেরা ভিটামাটি ছাড়া যাযাবর বেদে, যে দেশের লোক ছাগল ভেড়ার দুধকে ক্ষীর (ঘন দুধের পায়েস) জ্ঞান করে—এমনই তোমাদের দেশ![১১]

১১। ইহাই মরুস্থলীর জীবনযাত্রার আলোকচিত্রতুল্য অতি বাস্তব বর্ণনা—যাহা এখনও অবাস্তব নহে। মারবাড়ের নিম্ন শ্রেণীর দারিদ্র ও মোটা চালচলন সে যুগে রাজপুতানায় হাসির খোরাক জোগাইত। মহারাজা যশোবন্ত সিংহকে অন্য রাজারা বলিতেন—

আক্‌রী ঝোপড়া ফোগ্‌রী বাড়
রাজরারী রোটি মোট্‌রা দাড় [ল]
দেখো হো রাজা তেরী মারবাড়।

ঘরে আকন্দ পাতার ছানি, চারিদিকে ফোগের (জঙ্গলী কুলকাঁটার) বেড়া। বাজরার রুটি "মট" নামক নিকৃষ্টতম ডাল—ইহাই মারবাড়।

ভুরট এক রকম বন্য ঘাস বা আগাছা, এক হাত দেড় হাত উঁচু। উহাতে একরকম কাঁটা ফল ধরে। উহার ভিতরের শাঁস গুঁড়িয়া গরীবেরা রুটি তৈয়ার করে। ফোগ বা ফোক্ একপ্রকার জঙ্গলী কুল, ঝোপ তিন হাতের বেশী উঁচু হয় না, উহাতে আঁটি সর্বস্ব ছোট ছোট ফল হয়। দিল্লীতেও আমরা উহা সখ করিয়া খাইয়াছি, কোঁচা ভরিয়া গরীব মেয়েদের কুড়াইতে দেখিয়াছি। দিল্লীর পাহাড়ী এলাকা হইতে বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত ফোগের ঝোপ ছাড়া প্রায় অন্য কিছু দেখা যায় না। ঊষর ভূমিতে পাহাড়ের গায়ে বনে-জঙ্গলে উহাই মানুষ ও পশুর আহার।

মহাভারতের যুগে মদ্র (পশ্চিম পঞ্চনদ প্রদেশ) দেশে "স্থূলশংখাম্বিতা কম্বল পরিবৃতা" নারীর নমুনা পশ্চিম রাজস্থানে এবং হরাপ্পার গ্রামাঞ্চলে দেখা যায়।

জয়পুরিয়ারা বলে মারবাড়ের লোকেরা শাক খাইয়া ঘিয়ের ঢেকুর তোলে, ঘরে শুক্‌না রুটি খাইয়া বাহিরে যাওয়ার সময় গোঁফে ঠোঁটে প্রচুর ঘি মাখায়, নিজের দেশের সব কিছুর অতিরিক্ত বড়াই করে। জয়পুর রাজ্যের আশ্রিত কবি সুরসিক বিহারী মাড়োয়ারবাসীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

মরুধর পায়ো মতীরহু মারুকহত পয়োধি।

[মারবাড় নৃপতি একটা মতীরা (তরবুজ জাতীয় বিখ্যাত ফল) পাইয়াছেন। মরুবাসী বলাবলি করে, গোটা সাগর পাইয়াছেন]

ইহার মধ্যে ইতিহাস আছে। মতীরা শব্দের দ্বারা মারবাড় রাজ্য বুঝিতে হইবে—যাহা মোগল সম্রাট Wat জায়গীর হিসাবে যোধপুরের মহারাজকে দিয়াছিলেন। রাঠোর বড়াই করিতেন যেন তিনি সসাগরা পৃথিবীই ইনাম্ পাইয়াছেন।

মারু ইহার জবাবে মালব দেশের নিন্দা ও মরু দেশের প্রশংসা শুনাইয়া দিলেন, যথা :

"বাবা! এমন দেশের মুখে আগুন যে দেশের জলের উপর শেওলা (সেবার) ভাসে, যেখানে গৃহস্থ বধূগণ দল বাঁধিয়া জল আনিতে যায় না, যেখানে (গভীর কূপ হইতে) জল টানিবার সময় পুরুষের লয়তান-মধুর "কুয় কুয়" ধ্বনি শুনা যায় না; যে দেশের পুরুষের রস্‌কস নাই (ফীকরিয়া), স্ত্রীলোকেরা সব "কালী", এবং যেখানে স্ত্রীলোকের পরণে কাল ('নীলার্থে') সাড়ী দেখিয়া মনে হয়) সর্ব্বদা ঘরে ঘরে শোক-প্রকাশ যেন লাগিয়াই আছে (ঘরি ঘরি দীসই সোগ)।...হরির নিতান্ত কৃপা হইলেই দক্ষিণ দেশের (রাজপুতনার দক্ষিণ, দাক্ষিণাত্য নহে) লোকের ঘরে মরুকামিনী পা বাড়ায় (মারু কাঁমিনী দিখনি ঘর হরি দীয়ই তউ হোই)।

ঢোলা মধ্যস্থ হিসাবে বিবাদ মিটাইতে গিয়া মরু-দেশের প্রশংসা এবং নিজের দেশ মালবের নিন্দা করিয়া নাকি মারুর কাছে প্রেমের পরীক্ষায় পাশ হইয়া গেলেন![১২]

দোহার অজ্ঞাতনামা কবির অধিক বিদ্যা ছিল না, এবং তাহার কল্পনাশক্তি সমকালীন সামাজিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া নূতন কিছু নির্ম্মাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না। সুপণ্ডিত কবি এবং নিপুণ সাহিত্য-শিল্পী অপেক্ষা এই জন্যই দোহার কবি ইতিহাসের দিক হইতে অতীতের অধিকতর নির্ভরযোগ্য সাক্ষী। কুমার পৃথ্বীরাজের "বেলি কাব্য" পরিপাটি নারায়ণের ভোগ। ইহার রূপ রস গন্ধ শাস্ত্রভাণ্ডারের পবিত্র বস্তু হইতে আহৃত; কোনটির মধ্যে মাটির গন্ধ নাই, মাটির সহিত স্পর্শ নাই, যেহেতু ঐ ভোগ রাজরাজেশ্বরের মর্য্যাদার উপযুক্ত কল্পনাদীপ্ত রত্নাধারে সুবর্ণ বেদিকার উপর স্থাপিত হইয়াছে। "দোহা" মরুভূমির বুকে বালুকাগহ্বরে অযত্ন বর্দ্ধিত রাজস্থানের মতীরা ফল, গন্ধে রসে অনুপম, রূপে আভিজাত্যহীন। রাজস্থানের দরিদ্রনারায়ণের উপহার-রূপে দিল্লীশ্বর উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মরুস্থলীর মাটির গন্ধ ও স্পর্শ রসগ্রাহী সম্রাট দোহার কথাবস্তুর মধ্যে হয়ত পাইয়াছিলেন। দোহার গ্রাম্যকণ্ঠে মরুর মহাগীত ভাষা পাইয়াছে, মরু-প্রকৃতি ইহার মধ্যে দর্পণ প্রতিবিম্বের ন্যায় ধরা পড়িয়াছে।

১৬

উপসংহার

দোহার প্রতি সম্রাট্ আকবরের পক্ষপাতিত্ব-সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার মনের পরিচয় পাইবার দুরাশায় বিভ্রান্ত হইয়া আমরা রাজস্থান-মরুর চোরা-বালিতে পড়িয়া গিয়াছি, অথচ দিল্লীশ্বরের মন পাশ কাটাইয়া গেল, কেন এই সরল নিসর্গ-সুন্দর পল্লীগীতিকা তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছিল, বুঝা গেল না। কবিতা রসের ব্যাপার, কাব্যের রসস্থান নির্ণয় ঐতিহাসিকের কর্ম্ম নয়। যিনি যথার্থ "রস-বেত্তা" তিনি বলিবেন রসই ব্রহ্ম, সুতরাং উভয়ই বাক্য এবং মনেরও গোচরীভূত নহে; জগৎ রসময়; শুষ্ক কাষ্ঠেও নিশ্চয়ই রস আছে না হয় আজীবন কুটকুট্ করিয়া মুষিক দন্তক্ষয় করে কেন? মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ ইঁদুরকে গালাগালি করে। রস ও রুচির ব্যাপার অতি জটিল। দোহা সম্বন্ধে স্বয়ং আকবরকে এই প্রশ্ন করিলে তিনিও হয়ত ইহার জবাব খুঁজিয়া পাইতেন না, বিব্রত হইয়া ধমক্ দিতেন, "শাহান্‌শাহর মর্জ্জি"!

ইতিহাসের কিন্তু কঠোর নির্দ্দেশ, "কেন" (Why) এবং "কিরূপে"র (How) উত্তর ঐতিহাসিককে দিতেই হইবে। জাহাঙ্গীর বাদ্‌শাহর মুখে বিকানীরের বাজরার খিচুড়ি অপূর্ব্ব লাগিয়াছিল কেন? নবাব হায়দর আলী মোগলাই খানা ফেলিয়া মাঝে মাঝে দিন দুদিন ছোলা-ভাজা চিবাইতেন কেন? লক্ষ্ণৌর শাহী বাবুর্চ্চীখানার ব্যঞ্জনাদি, বিশেষতঃ মাষকলাইয়ের দাল নিত্য নূতন মাটির খুরিতে কেন পরিবেশন করা হইত? ঐতিহাসিক ইহার কি সদুত্তর দিবে?

সম্রাট্ আকবরের রাজসত্তা (Akbar as a king) এবং লোকসত্তা (Akbar as a man), উভয়ই দুর্জ্ঞেয় রহস্য-সঙ্কুল এই জন্যে তাঁহার ইতিহাসে "কেন"-র বহর অফুরন্ত; মাঝে মাঝে সাংঘাতিক "কেন"-র চোরা কবাটে মাথা ঠুকিয়া ঐতিহাসিকের প্রাণান্ত হইলেও উত্তর সহজে মিলিবার নহে। যথা:

তিনি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন কেন? যদিই বা প্রহ্লাদ হইলেন আধখানা হিরণ্য-কশিপু উঁহার মধ্যে কেমন করিয়া রহিয়া গেল? "চণ্ডাশোক" এবং প্রিয়দর্শী "ধর্ম্মাশোক", রাজ-রাক্ষস

১২। এই প্রবন্ধের কথাবস্তু মূল কাব্যের ছায়া অবলম্বনে লিখিত, আক্ষরিক অনুবাদ নহে। ডিঙ্গল কবিতা স্বল্পভাষিণী, জ্বালাময়ী, উহার গতি ধীর-সমীর নহে; মরুর বাতাসের মত চঞ্চল, ঝড়ের মত উহার বেগ অপ্রতিহত। বাংলা ভাষায় মূলের সৌন্দর্য্য বজায় রাখিয়া আক্ষরিক অনুবাদ অর্ব্বাচীন লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

তৈমুর-চেঙ্গিজ ও রাজর্ষি জনকের "সহাবস্থান" একই চরিত্রের মধ্যে কিরূপে সম্ভব হইল? রাজা তথা মানুষ হিসাবে ভালমন্দ উভয় দিকেই আকবর অপ্রমেয়, ভোগ এবং ত্যাগে তুল্যরূপ অপরাজেয়। বন্ধুবাৎসল্যে তিনি বালক, জিঘাংসায় দানব। ইবাদত-খানার ধর্মসভায় তিনি সংস্কারমুক্ত, স্থিরবুদ্ধি, দৃঢ় যুক্তিবাদী; কিন্তু নিজ ধর্মসংঘ (Din-i-Ilahi) স্থাপনায় তিনিই আবার বিশ্বাসপ্রবণ, অন্ধসংস্কারপূর্ণ "সৌর", জ্যোতিঃ ব্রহ্মের উপাসক; কখনও বা গ্রাম্য মোল্লার মত রোগ নিরাময়ের জন্য "জলপড়া" দিতেও দ্বিধাহীন। তিনি বাহিরে ভোগী, ভিতরে বীতস্পৃহ সন্ন্যাসী, দীন-দুনিয়ার মালিক হইয়াও তাঁহার মন মুসাফিরের মত চঞ্চল ও উদাস; জ্ঞানে প্রবীণ হইয়াও তিনি নূতনত্বের মোহে বালকের ন্যায় কুতূহলী। ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণে দিল্লীশ্বর দেশ ধর্ম জাতি ও কালনিরপেক্ষ নিষ্ঠাবান্ সুশিষ্য, রসের অনুশীলনে তিনি আরণ্য মধুকর। তিনি ধর্মের ব্যাপারে সব ঘাটের জল খাইয়াছেন, সকল নৈবেদ্যে ঠোকর মারিয়াছেন, সকল ফাঁদকে ফাঁকি দিয়া অবশেষে স্বখাদসলিলে ডুবিলেন। নেশার ব্যাপারে আমীরী শিরাজী, পাঁজি ফিরিঙ্গী (শরাব) এবং গরীবের তাড়ি তাঁহার কাছে সমান উপাদেয় ছিল; ফিরিঙ্গী তামাক তাঁহার কাছেই-হিন্দুস্থানে কলকে পাইয়াছে।

এহেন ব্যক্তির কার্য্য "কেন"-র অপেক্ষা করে না; অথচ ঐরূপ কার্য্য নিছক খেয়াল কিংবা বাতিক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও যায় না। "কার্য্যের" সম্ভাব্য "কারণের" মধ্যে "কর্ত্তার" ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য প্রচ্ছন্ন থাকে। সৃষ্টির ক্রম বিকাশের সহিত স্রষ্টার স্বরূপ মানস-দৃষ্টির গোচরীভূত করিতে না পারিলে ইতিহাসের স্বার্থকতা কোথায়? ইতিহাস লিখিতে বসিয়া কোন্ ঝোপে বাঘ লুকাইয়া আছে ঐতিহাসিক সঠিক বলিতে পারে না; এই জন্য সব ঝোপ ঠেঙ্গাইতে হয়, যাঁহারা বাঘ দেখিবার আশায় মাচানের উপর বসিয়া থাকেন, তাঁহারা কেহ ল্যাজ কেহ ডোরার বেশী দেখিবার প্রত্যাশা করিতে পারেন না। নর-শার্দূল সম্রাট আকবরের পক্ষেও উহার অধিক ঐতিহাসিকগণও আজ পর্য্যন্ত কিছু দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

যাহা হৌক, দোহার মামলা-মীমাংসার জন্য আকবর-চরিত্রের "কেন?"-র জঙ্গলে না ঢুকিয়া উপায় নাই? "দোহা" কেন আকবর-কে মোহিত করিল?—ইহার উত্তরের আভাস পাল্টা প্রশ্নে পাওয়া যাইবে। গরীব চাষীর খোলার ঘরের উপর স্থপতি-সৌন্দর্য্য-পিপাসু সম্রাটের শুভদৃষ্টি পড়িল কেন? ফতেপুর সিক্রীর যোধবাই-মহলের দ্বিতলে বারান্দার ঢালু ছাদে পাথর খোদাই করিয়া সামান্য বস্তুকে তিনি অসামান্য অনুকরণের অর্ঘ্য কেন নিবেদন করিয়াছেন? সিক্রীর রাজান্তঃপুরে জগন্নাথের রথ কিংবা বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে তিনি পাঁচ-মহল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন কেন? তাঁহার চোখে মুসলমানী মেহ্‌রাব (Arch) অপেক্ষা প্রাচীন হিন্দুস্থাপত্যের খিলান (Lintel) অধিক সুন্দর লাগিয়াছিল কেন? লোকবিশ্রুত ইরান-তুরানের চিত্রশিল্পের সহিত যাহার শৈশবেই পরিচয় হইয়াছিল পরিণত বয়সে তিনি পালকি-বাহক কাহার জাতীয় দসবন্তের আঁকা-পটে তাহার অশিক্ষিত পটুত্ব আবিষ্কার করিয়া মোগল দরবারে চিত্রশিল্পে যুগান্তর আনয়ন করিলেন কেন? তিনি ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতিকে ইসলামের রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিবার পরিকল্পনা করিয়া দারুণ বিপদের ঝুঁকি লইয়াছিলেন কেন?

এই সমস্তের পশ্চাতে যে বিরাট সত্তার প্রেরণা রহিয়াছে, কাব্যবিচারেও আমরা আকবরের সেই লোক-সত্তার মধ্যে সহজাত অনন্যসাধারণ রসবোধের ক্ষমতার পরিচয় পাইতে পারি। বেলির প্রতিস্পর্দ্ধী দোহার চমৎকারিতা সম্বন্ধে সম্রাটের প্রশংসা নিতান্তই প্রাণের কথা। "দোহা"-র ঝঙ্কারে মরুর করুণ গীতি আবহমান কাল পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইতেছে, যাহার কান আছে সে বর্ষানিশীথে আজও সেই গীত শুনিতে পাইবে।

—০—

অতিথি

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মাইতি

রাত্রি শেষের স্টেশনে দাঁড়িয়ে কেন যেন আমার জীবনটাকে সে মুহূর্তে কেবল অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, আমি যেন এক নির্বাক পটভূমি, যার সম্মুখে নানান মানুষের বিচিত্র অভিনয় চলছে রাত্রির সমগ্র প্রহর ধ'রে।

এইমাত্র নীলাকে নিয়ে ট্রেনটা চ'লে গেল।

আম নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে রইলাম বোবা শিরীষ গাছটার পাতার অন্ধকারে।

স্টেট বাসটা মোড় পেরিয়ে এসে স্টপেজে দাঁড়াল। অন্যমনস্ক চোখ মেলে পথের এক পাশের দোকানের সারি, লোক চলাচল দেখছিলাম। এক সময়ে হঠাৎ দেখলাম, যে মেয়েটি একটি লেডীজ সীটের সামনে এসে দাঁড়াল, সে নীলা। প্রথমে আবছা দেখায় ওকে চিনতে কষ্ট হয় নি। কারণ কলেজ ছাড়ার পরও কখনও কখনও আমাদের দেখা হ'ত কোন রেষ্টুরেন্টের অপরিসর কেবিনে। আর তখন ভাল লাগত ওর এই সঙ্গটুকু। না, ওকে ভালবেসেছিলাম কি না বা প্রেমে পড়েছিলাম কিনা—এসব আটপৌরে প্রশ্নের কাছ দিয়েই যেতে চাইনে আমি। আমার ভাল লাগত ওর চোখ দুটি, ভাল লাগত ওর অগোছালো ভাবে ছুঁয়ে-যাওয়া সুন্দর দীর্ঘ আঙুল-গুলোর স্পর্শ। নীলা জানত আমি কি গভীর ভাবে স্বাদ নিই ওর এই ঐশ্বর্যের। ভাব, ভাষা, ছন্দ, সব নিয়েই নীলা যেন একটি সুন্দর গীতি-কবিতা।

নীলা একটা লেডীজ সীটে বসল।

আমি দেখলাম ওর সুন্দর কবরীটি, এমনি আলতো-ভাবে বাঁধা।

নীলা ব্যাগ খুলে টিকিটের পয়সা বের করল। ওর পয়সার মধ্যে দূরের ঠিকানার আভাস। ভাগ্য ভালই বলতে হবে, আমার সামনে সীট থেকে দুটি ভদ্রমহিলা উঠে গেলেন। আমি ওর নাম ধ'রে আস্তে ডাকলাম।

নীলা ফিরে তাকাল, এ কি? রমেন তুমি। হঠাৎ ভালো লাগার খুশিতে ওর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নির্মেঘ ভোরের আলোর হাসি, ও ছড়িয়ে দিল সারা মুখে। সামনে খালি সীটটায় নীলা সরে এল, বলল, আমি ভাবতেই পারি নি যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এমনি 'ড্রামাটিক' ভাবে।

তুমি কদ্দুর যাবে?

আমি দেশপ্রিয় পার্কের কাছে যাব।

কেন, তোমরা শিয়ালদায় থাকতে না?

তাই ব'লে কি বালিগঞ্জে যেতে বাধা আছে নাকি?

না, তা থাকবে কেন, বরং আমার লাভ, এক সঙ্গে অনেকদূর যাওয়া যাবে।

নীলা সুন্দর হেসে তাকাল, বলল, তুমি বাড়ী যাচ্ছ নিশ্চয়ই?

হাঁ, কিন্তু তুমি, অর্থাৎ তোমরা আমার নতুন বাড়ীতে একদিনও এলে না?

কেন? চল আজই যাই।

আমি একটু অবাক হলাম, বললাম এই রাত্রে, মানে, এখন আটটা বাজে। ফিরতে সেই প্রায় এগারটা।

হোক না চল যাই। আর নাই বা ফিরলাম রাত্রে। তোমার বেশি ঘর আছে তো?

ও, হাঁ, একটা সর্ত আছে কিন্তু, অনেক গান শোনাতে হবে, কতদিন তোমার গান শুনি নি!

কিন্তু তোমার সেই দেশপ্রিয় পার্কের কাছের বাড়ীতে যেতে হবে না?

না, ওটা মামার বাড়ী, যাব বলে তো আগে বলি নি। কাজেই না গেলেও চলবে।

বাস থেকে কতখানি হেঁটে যেতে হবে তোমার বাড়ী যেতে হলে?

একটুও না, কারণ আমরা রিক্সা ক'রেই যাব।

বেশ লাগবে, তোমার শহরতলীর আবছা অন্ধকার রাস্তায় রিক্সা ক'রে যেতে তাই না?

হাঁ ভালই লাগবে। তা হলে তুমি যাচ্ছ?

সত্যি যাচ্ছি। কিন্তু তোমার সর্তটা মনে আছে ত?

আছে।

. .

দেশপ্রিয় পার্ক ছেড়ে বাসটা এগিয়ে এল।

শেষ স্টপে এলে বাসটা দাঁড়াল।

শহরতলীর বন্ধুর পথে পাশাপাশি একটি রিক্সায় কাছ ঘেঁষে ব'সে আমরা যেন পুরনো বন্ধুত্বের স্বাদ নতুন ক'রে পাচ্ছিলাম।

আমরা দুজনেই চুপ ক'রে ছিলাম।

এক সময়ে আমি বললাম, তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি নীলা, আমার স্ত্রী কিন্তু বাড়ীতে নেই। তোমার কোন অসুবিধে হবে না তো?

তুমি আমাকে ভেবেছ কি বলতে পার? তোমাদের সরকারের একটা গার্লস কলেজের একজন প্রফেসর আমি। বুঝতে পেরেছ?

এতক্ষণে পারলাম।

আমার ছোট্ট বাড়ীটা দেখে নীলা সত্যি খুসি হয়ে উঠল। সামনের বাগানটায় অন্ধকারে একটু এসে দাঁড়াল। বুক ভরে নিশ্বাস নিল, যেন মুক্ত হাওয়ার প্রথম স্পর্শ সে পাচ্ছে। সবুজ ঘাসে খালি পায়ে সুন্দর দুটি পা ফেলে ফেলে হাঁটল একটু।

আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

ইজিচেয়ারটা বাইরে দিতে বলব কি?

না, না, দরকার নেই, এই বেশ ভাল আছি। আচ্ছা বাথরুমে জল আছে ত হাত-মুখ ধোবার।

আছে। তুমি স্নান করবে কি?

স্নান করার কথা শুনে নীলা যেন লাফিয়ে উঠল। বলল, এতো জল, সত্যি বিকালের স্নান আমার হয় নি।

কাপড়টা বদলানো দরকার বোধ হয়। চাকরকে ট্রাঙ্ক থেকে একটা ধোয়া শাড়ি বের করে দিতে বললাম।

বাথরুম থেকে ফিরে এল নীলা। তাঁতের সাদা শাড়িটি পরেছে ও। কালো পাড়। বেশ লাগছে দেখতে।

নীলা আমার সামনে এসে তার দীর্ঘ কবরীটি খুলল। আমি দেখলাম সারা পিঠে চুলগুলো ছড়িয়ে পড়ল কোমর ছাড়িয়ে। বেশ ঘন। কালো দীর্ঘ চুল। ও আমার চিরুণিটা দিয়েই চুল আঁচড়াচ্ছিল। আমি বললাম, দেখ চিরুণিটা যেন ভেঙে না যায়, যা চুল এখনো তোমার মাথায়।

চিরুণির শোকটা কি তুমি আমার এই চুল দেখে ভুলতে পারবে না?

তোমার চুল দেখে অনেক শোক ভুলতে পারি, কিন্তু পরম শোক হ'ল, তোমার এই চুলগুলোকে আমি কখনও ছুঁতে পারলাম না।

এই নাও না, ছোঁও, নীলা তার চুলের গোছাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল।—ধন্যবাদ, দরকার নেই।

দেখলে? পারলে না। তোমার চারিদিকে মর‍্যালিটির বেড়া দেওয়া। অথচ এই বেড়া না ভাঙলে আনন্দের স্বাদ তোমার কাছে আসবে না, বুঝলে কবিবর।

নীলা কবি ব'লে আমাকে কলেজে ঠাট্টা করত। অথচ আমি জানি, নীলা নিজেই খুব ভাল কবিতা লিখত লুকিয়ে লুকিয়ে।

আমি চুপ করে রইলাম। নীলা চুলগুলো কেন যেন বাঁধল না। হয়ত ভেজা ছিল, হয়ত ওর মনে হয়েছিল, এই রাত্রির ছায়ায় আমার ঘরে বসে, দেয়ালে-রাখা অনেকগুলো সুন্দর পেন্টিংস্ এবং শেলফে-রাখা রবীন্দ্রনাথের কবিতার জগতের মাঝখানে ও একটি জীবন্ত ছবির মত বসবে এবং বসে থেকে আমার মনে গন্ধ ছড়াবে।

নীলা বলল, এবার তোমার গান সুরু হোক।

খেয়ে নিলে হয় না? চাকরটিকে আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখব।

হাঁ, তুমি খেয়ে নাও, আমি খাব না, খেয়ে বেরিয়েছি।

সে কি, তুমি আমার অতিথি, আমার বাড়ীতে খাবে না, এটা কেমন যেন দেখায় না? আর তা ছাড়া একটু মাংস ছিল।

আচ্ছা ছেলেমানুষ! এমন ক'রে লোভ দেখাচ্ছ কেন?

দেখাচ্ছি, যদি তোমার ক্ষিধেটা হঠাৎ বেড়ে যায়।

নীলা হাসল, বলল, এমনি ফাজলামো করলে ঘুঁষি মারব কিন্তু। নীলা আমার প্লেট থেকে চামচে দিয়ে দু'টুকরো মাংস তুলে নিল।

খাওয়া শেষ করে আমরা পড়ার ঘরে এলাম। নীলা একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে আমার খাটের কাছে বসল। বলল, আচ্ছা, এখন একটা কাজের কথায় আসা যাক্। ভোর রাতে তোমার এমন কোন ট্রেন আছে যে ট্রেনে গিয়ে শেয়ালদায় ভোর সাড়ে চারটের ট্রেন পেতে পারি?

এত রাত্রে চলে যাবে? সে কি?

যেতেই হবে, তুমি টাইম-টেবলটা একটু দেখ না?

দেখা গেল চারটায় একটা ট্রেন আছে। নীলা বলল ঐ ট্রেনে আমি যাব। আমায় ডেকে দিও। ভুলে যেও না কিন্তু।

নীলাকে কেন যেন গম্ভীর দেখাচ্ছিল, অচেনা মনে

হচ্ছিল এই মুহূর্তে। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটি পুরনো কবিতার পাণ্ডুলিপি যেন উদ্ধার করছিলাম।

নীলা উঠে ঘরের উজ্জ্বল আলোটা নিবিয়ে দিয়ে টেবল-ল্যাম্পটা জ্বালল। সারা ঘরের অন্ধকারের মাঝখান থেকে একটু আলোর আভাস পাচ্ছি শুধু। রাত্রি গভীর হয়ে আসছে।

একটু পরে এক পশলা বৃষ্টি নামল ঘরের চারিধারে।

তুমি আমি এই বৃষ্টির মাঝখানে বসে আছি। কেমন ভাল লাগছে না? আমি জিজ্ঞেস করলাম নীলাকে।

নীলার চোখ দুটো নরম হয়ে এল।

ঘরের আলোয় ঘুমের বেদনাগুলো বৃষ্টি-বিন্দুর মত ছড়িয়ে পড়ছে। নীলা আস্তে আস্তে বলল ওর নরম গলায়, সত্যি ভাল লাগছে, আজ ইচ্ছে করছে তোমার ঘরে যদি আমার এই রাত্রির কোন চিহ্ন রেখে যেতে পারতাম। ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে তুমি দেখতে যে অতিথি এসেছিল, এ যে তারি চলে-যাওয়ার চিহ্ন।

আমি ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

থাক। এবার গান শুনি তোমার।

গানের কথাটি ভোল নি দেখছি।

কেন ভুলব? বাইরের রাত্রির সব সংগীতের চেয়ে তোমার গলার সংগীত অনেক ভাল।

কি? মেয়েদের স্তুতি তোমার এখনও ভাল লাগে ত? না, বিয়ে ক'রে সব হারিয়ে ফেলেছ?

না, না, সে রকম বয়েস আজও হয় নি। আচ্ছা, দাঁড়াও। আমি এস্রাজ নিয়ে বসলাম।

গভীর রাত্রি নামছে আকাশ থেকে। চাকরটি তার ঘরে ঘুমিয়ে গেছে। কেবল দূরে দূরে রাস্তার বিনিদ্র আলোগুলো একাকী জ্বলে আছে।

আমি থামলাম।

নীলা চোখ বুজে শুনছিল সেই গান, "জানি বন্ধু জানি, তোমার আছে ত হাতখানি।"

গান শেষ হতে নীলা চোখ মেলল।

আমার মনে হ'ল, নীলা যেন কোন দূরান্তের দেশ থেকে স্মৃতির সমুদ্র সাঁতরে সাঁতরে এইমাত্র তীরে এসে নামল। ওর চোখে-মুখে সেই যাত্রাপথের গ্লানি।

রমেন, সত্যি তোমার গান বড় ভাল লাগে। সারা জীবন তাই তোমাকে ভুলতে পারলাম না। কত বন্ধু হারিয়ে গেল। না, এ হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ নেই, যাদের বেঁচে থাকার মত কোন সম্পদ নেই তাদের মৃত্যুই ভাল। তাই না? তুমিই বল।

নীলা থেমে থেমে বলছিল, আর আমি শুনছিলাম।

আচ্ছা, নীলা তোমার সে কথা মনে আছে। একটা 'কালচারেল ফাংসানে' কীর্তন শুনতে শুনতে তুমি কেঁদে ফেলেছিলে। আখর দিয়ে গাইছিল লোকটি—বলছিল, 'মাত্র দুটো চোখ আমায় কেন দিলে তোমার এত রূপ আমি দেখব কি ক'রে।' তোমার চোখ থেকে জল নেমেছিল। আমি তোমার দিকে চেয়েছিলাম। তুমি লজ্জা পেয়েছিলে, হেসে আঁচল দিয়ে মুখ মুছে উঠে গিয়েছিলে।

সত্যি, আমি যেন বড় বেশী রোমান্টিক, তাই না রমেন? এই দেখ না, তোমার সংগে চলে এলাম। একবার ভেবেও দেখলাম না, এই রাত্রে যাওয়া উচিত হবে কি না, থাকা উচিত হবে কি না? অথচ আমাদের জীবন কত পাল্‌টে গেছে। তুমি বিয়ে করেছ আর আমি দু'টি ছেলের মা, এক নিরীহ নির্ভরশীল ভদ্রলোকের স্ত্রী।

এবং একটি নারী, এখনও যার কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল হয়ে ওঠে, আমি বললাম।

আঃ, থাম, থাম, আমার স্তুতি তোমার না করলেও চলবে।

একটা তৃপ্তির আনন্দ দিয়ে নিজেকে ঢেকে দিল নীলা।

দু'একবার হাই তুলল। আমার মনে হ'ল ঘুমের ছোঁয়া লেগে নীলার চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠেছে।

এই মুহূর্তে ওর জন্য আমার করুণা হ'ল। বাড়ীর পরিবেশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে, যেন ওর সাহচর্যের স্বাদটুকু জোর করে আমি একা নেব বলেই, নীলাকে পথ থেকে ধ'রে এনেছি ব'লে আমার মনে হতে লাগল। এতক্ষণে বাড়ীতে থাকলে ছোট ছেলে দুটিকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে বিজনের কাছটিতে শুয়ে পড়ত; কি চুপিচুপি গল্প করত, কি অভিমানের অভিনয় করে বিজনের হাত থেকে বেশী ক'রে আদর আদায় করত।

অথচ এখানে আমার ঘরে, এই গভীর রাত্রে, এই অস্পষ্ট আলোর দ্বীপে, চেয়ারে হেলান দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে নীলা একটা ছবির মত চোখে ঘুমের স্বাদ বিছিয়ে নিয়ে।

বৃষ্টি থেমে গেছে কখন। তবু মেঘে, অন্ধকারে সারা আকাশটা ঢেকে আছে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে বাইরে থেকে।

এবার শুয়ে পড় নীলা, ওঘরে বিছানা করা আছে।

নীলা আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠল। ওঘরে গিয়ে আলোটা জ্বালল।

আমি আমার ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিলাম।

অনেক সময় পেরিয়ে এলাম। আমার চোখ থেকে ঘুম হারিয়ে গেছে। কেবল এক অদ্ভুত মৃদু চঞ্চলতা ঘুমের বিশ্রাম থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে এই অন্ধকারে ডুবিয়ে রাখল।

ওঘরে নীলা ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়। কারণ, আলোটা কখন যেন নিবে গেছে। তবে কখন যেন তন্দ্রা নেমেছিল। এখন কেবল বিছানায় শুয়ে শুয়ে রাত্রির গান শুনছি। দূরের দেয়ালঘড়িতে দুটো বাজল।

নীলার ঘর থেকে কোন শব্দ আসছে না।

আমি বিছানা থেকে আস্তে আস্তে উঠে এলাম, নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়ালাম। নির্জীব রাত্রির জগৎ আমার সংগে কথা ব'লে উঠল।

রাত্রির প্রহরগুলো নিশান্তের মোহনার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ক্রমশঃ। আমি বিছানায় ফিরে এলাম। ভাবলাম, নীলাকে ডেকে এনে আবার দু'জনে যদি তেমনি ক'রে বসি? জীবনে আর কোন রাত্রি কি এমনি করে আসবে, যখন সমস্ত পরিবেশ, পরিজন ও প্রয়োজনের সীমানা পেরিয়ে আমরা দু'জন আদিম মানুষের মত জেগে থাকব। না, নীলা ঘুমিয়ে আছে। ওকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ ক'রে দিতে বলেছি, কারণ, জানালা দিয়ে জোর বাতাস এলে দরজাটা খুলে যায়।

দূরের ঘড়িতে সাড়ে তিনটা বাজল। এখন না উঠলে নীলা চারটের ট্রেন পাবে না। আমি উঠে পড়লাম, জামা পরলাম, টেবিলের আলোটা জ্বাললাম। তার পর নীলার ঘরের দরজায় 'নক্' করলাম। দরজাটা খুলে গেল। নীলা কি তবে ওটা বন্ধ করতে ভুলে গেছে! আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আবার 'নক্' করলাম। নীলা উঠল। আমি বললাম, এখন না বেরুলে ট্রেন পাবে না।

আবার আমরা দু'জনে সেই পথে চলেছি পাশাপাশি। রাস্তার বাতিগুলো সারা রাত আলো দিয়ে দিয়ে এখন ঝিমিয়ে পড়েছে। নীলা কখন চুল বেঁধে নিয়েছে; কাপড়টা পাল্‌টেছে। কিন্তু চোখে অনিদ্রার ক্লান্তি। আমরা নীরবে পথ হাঁটছি। দু'জনের পায়ের শব্দগুলো দু'ধারের গাছের কোলে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

আমি একবার বললাম, আবার কবে দেখা হবে?

এক রাত্রিতে মায়া প'ড়ে গেল? নীলার গলায় পরিচিত পরিহাস বেজে উঠল। স্টেশনে পৌঁছলাম। ডাউন দিয়েছে। একটা ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কিনে এনে ওকে ট্রেনে উঠিয়ে দিলাম। নীলা ব্যাগটা 'সীটে' রেখে আবার দরজায় এসে দাঁড়াল। 'কিছু মনে কর না রমেন, তোমায় কষ্ট দিয়ে গেলাম'—নীলার গলায় সেই এক চিরন্তন রহস্য, যে রহস্য হঠাৎ এইরাত্রে আমার বাড়ী আসার মধ্যে লুকিয়ে ছিল।

আমি বললাম, কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার আসাটা যেন একটা "মিষ্ট্রি"। ঝগড়া করেছ বিজনের সংগে?

না, পাগল নাকি? নীলা চাপা গলায় বলল, আমি "এ্যাবস্কণ্ড" করে আছি। পুলিস কেবল 'ফলো' করছে। ক'দিন আদৌ বিশ্রাম নেই। তুমি দামী সরকারী অফিসার। একটা রাত্রির বিশ্রামের পক্ষে তোমার বাড়ীটা 'সেফেস্ট প্লেস'। তাই না? আচ্ছা 'গুড বাই'।

ট্রেনটা ছেড়ে দিল। আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। নীলার হাতের একাংশ এখনও ট্রেনের জানালায় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে সেই সুন্দর আঙুলগুলো, যেগুলোর ছোঁয়ার স্মৃতি নিয়ে আমি সারারাত্রি না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি।

মুগ্ধ অন্ধকারগুলো মুছে মুছে ভোরের আকাশটা দিনের আলোর জন্য তৈরী হচ্ছে এখন। রাত্রির স্মৃতিটাকে পুরনো টিকিটের মতো স্টেশনে ফেলে দিয়ে আমি বাড়ীর পথে পা বাড়ালাম।

—•—

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

২৩

মনে করা যাক্ নয়া দিল্লী দেখতে গেছি। আর আমায় সেকালের কুইনস্ওয়ে আজকালের জনপথ আর কার্জন রোড ধরে সেণ্ট্রাল ভিস্তা ঘুরিয়ে কুইন্‌মেরীজ এভিন্যু ঘুরিয়ে সোজা পালম্ এয়ারড্রোমে তুলে দেওয়া হ'ল—তাতে কি দেখলাম নয়া দিল্লী। যদি লোদী কলোনীই না দেখলাম, বিনয় নগর না দেখলাম, কোট্‌লা না দেখলাম,—না দেখলাম মান, শান, সেবা মার্কা নগর কখানার চৌয়াল ঘেঁসে চাপরাশীদের থাকার বস্তী, ইমারৎ গোড়নেওলাদের ঝোপড়ীর স্তূপ, যদি না দেখলাম রাবসিনা রোডের মোড়ের বেওয়ারিশী টিফিন খাবার নরককুণ্ড, তবে নয়া দিল্লী কি দেখলাম। যে ডাক্তার রুগীর জিভ না দেখে, রক্ত থুতু আরও আরও পরীক্ষা না করে কেবল ব্যাঙ্কের খাতা, মোটরের নম্বর, বয়স আর সৌন্দর্য দেখেই রোগীনীর রোগ নির্ণয় করার চেষ্টা করেন, তাকে রুডলফ ভ্যালেন্টিনো বলে খাতির করতে পারি, কিন্তু বিধান রায় বলে ভুল করব না।

লণ্ডনে গেছি, লণ্ডন "দেখেছি" বলতে গিয়ে যদি এ তল্লাট বাদ দিয়ে যাই, লোকে অবশ্যই বাঙ্গাল বলবে। হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে—লণ্ডনে বাঙ্গালীর সংখ্যার মধ্যে বাঙ্গালের সংখ্যাই বেশী দেখেছি। তবে কেউ গুপ্ত বাঙ্গাল, কেউ সুপ্ত বাঙ্গাল, কেউ লুপ্ত বাঙ্গাল আর কেউ চুপ্ত বাঙ্গাল। দীপ্ত বাঙ্গাল দু'চারজনই দেখেছি। গুপ্তরা বেশীর ভাগই সেনে, দাশে ধরা পড়ে যান; নৈলে ধরা দিতে চান না; সুপ্তরা জানেন যে তাঁরা পদ্মার ওপারে ছিলেন। কিন্তু কথায়-বার্তায় এমন একটা আদায় করা চাল, সে বোঝা যায় যে সিংহের চামড়াটাকে সিংহ বলে মেনে নিলেই খুশী। ওঁরা জেগে ঘুমুচ্ছেন—সুপ্ত। লুপ্ত বাঙ্গালেরা বেচারী। এতকাল বাংলাদেশের বাইরে যে ওঁরা পদ্মার এ-পার ও-পার একাকার করে বোমভোলা হয়ে বাঙ্গালী সেজেই খুশী। মজা লাগান চুপ্ত বাঙ্গালরা। বাঙ্গালকে বলেন, অবশ্য চুপি চুপি—'আমি বাঙ্গাল।' বেশ ভরসা রেখে বলেন। আবার অবাঙ্গালদের—ঘটিদের বলেন—মানে স্রেফ কিছুই বলেন না—সেও চুপি চুপি। বেশ সময় কেটে যায়। খাসা লাগে দীপ্ত বাঙ্গালদের। যাঁরা এখনও কোনও কমপ্লেক্সে তাঁদের ভাষা ও মাটির দীপ্তির স্বাক্ষর না ভুলেছেন, না ভুলতে চেয়েছেন। ওয়েলসম্যান বা আইরিশ বা স্কচ—কখনও ভুলেও লণ্ডনে এসে লণ্ডনার বনতে চায় না, দেখেছি। কোলকাতায় থেকে ভাইগনার থোউ আর বুইন্‌ঝির জামাইরে বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে নাউ খেতে আর নেবু গিলতে দেখেছি। নোকেদের সঙ্গে দেখা সাইখখাৎ করার সময়ে কাঁখালে নিয়াপাতি বাচ্চা আর হাতে ঝুনো বাচ্চা নিয়ে চলতেও দেখেছি। ইংরেজ বলে কোনো জাত নেই, যেমন কোলকাতাইয়া বলে কোনো জাত নেই। কাজেই আইরিশ হবার পরম গর্বকে আইরিশ লণ্ডনে এসে ভুলতে চায় না; ওয়েসেক্সের কবি আর শ্রপশায়ারের কবি নিজের নিজের ভাষার প্রতিভার পরিচয় নিজের নিজের কাব্যে রেখে গেছেন। মিল্‌টন যেমন লণ্ডনের, বার্ণস তেমনি স্কটল্যাণ্ডের, শ' তেমনি আয়র্ল্যাণ্ডের বা ডিকেন্স তেমনি লণ্ডন-ডোভারের লেখক বলে পরিচয় দিতে লজ্জা পান নি। এটা কাব্যে সাহিত্যেই নয় শুধু, সমাজে, ব্যবহারে, ভাষায়, কায়দায় একেবারে পাকাপাকি।

লণ্ডনে গিয়ে বাঙ্গালপনা জাহির করার ইচ্ছে যতই থাক, দেশের ছাওল দেশে ফিরে আসার পর কেউ বাঙ্গাল বলুক এটা সত্যিই চাইনি। তাই—লণ্ডনের বেয়াকুব মহল ছেড়ে ইয়াকুব মহলটাও দেখতে আসা গেল। মেরিলবোন্, গ্রসভিনর, পল্‌মল্ এলাকা না দেখে লণ্ডন দেখার জাঁক আমার টিকবে না।

অথচ কি যে দেখার আছে জানি না। ধনীরাই সত্যিকারের ইণ্টারন্যাশন্যাল। ওদের বিলাস, ব্যসন, ভোজন, পরণ—সবই একটা প্রবল স্রোতে লটপটয়মান। ও-পাড়া, ও-মুখ নাড়া, ও-চোখ সাড়া বুনোসেয়ার্সে, কাপ্রীতে, মনাকোতে আর পল্‌মলে যেমন—তেমনিই মালাবার হিল্‌সে, কার্জন রোডে, পুসা রোডে, নিউ বালিগঞ্জে আর পার্ক সার্কাসেও। ওর মধ্যে পাইনা তফাৎ বাহরিণের তেল-কুলির, মালায়ার রবার-চাষীর, শিলংয়ের চা-কুলির, লণ্ডনের ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডকের মাল্লা-মিস্ত্রীর। গরীবির স্তরে স্তরে, দেশে দেশে নানান্ রূপ। বর্তমান য়োরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশের গরীবি মুণ্ড-

খুনের মতো মজেদার; বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের গলির মতো চীনাতঙ্কে গম্ভীর। কিন্তু জাঁক, নিওন্, সিফন আর নাইলনের চেহারা—সর্বত্র এক। অর্কেষ্ট্রা, নাইট ক্লাব, রেসকোর্স আর ক্লাবের রূপ সর্বত্র এক।

বাস এসেছে হোয়াইট্ হল পার্লামেণ্ট স্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট ধরে। বেবাক তল্লাটটাই সরকারী দপ্তরে ছয়লাপ। হোয়াইট্ হল প্যালেস, ওয়ার অফিস, হর্স গার্ডস্ এভিন্যু, এডমিরাল্টি, এমন কি মিন্‌মিনে ডাউনিং স্ট্রীটটি পর্যন্ত, তা ছাড়া ফরেন অফিস, সবই এই পাড়ায়, পর পর, সারি সারি। এধারে এই পথ থেকে, পশ্চিমে স্লোন স্ট্রীট আর উত্তরে নাইট্‌স ব্রীজ অর্থাৎ হাইড পার্কের সীমানা হয়ে গ্রীণ পার্কের উত্তরে পিকাডেলীর পথ ঘুরে সেণ্ট জেম্‌স্ স্ট্রীট, মাল্, পল্‌মল্, সেণ্ট জেম্‌স্ পার্ক, বাকিংহাম প্যালেস—এই হলো লণ্ডনেরই নয় শুধু, সারা য়ুনিয়ন জ্যাক প্রভাবিত ইতর-ভদ্র দেশের নন্দন-কাননই বলা যাক্ বা মোক্ষধামই বলা যাক। এর বড় আর আছে কচু। এই সবার বড়।

এই সবার বড় স্থানে সবার ছোট আমার ঘুরতে এ্যটম বোমার গায়ে গুঁড়ো পিঁপড়ের মতো না ছিল কষ্ট, না ছিল বৈশিষ্ট্য। তবু ঘুরছি। এখানে ট্যাক্সি খুব, আর ট্যাক্সিয়ালগুলো ধেড়ে ধেড়ে খ্যাঁকশিয়াল। আমায় যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ জিনিস কি? আমি একটা ঢোঁক অবধি না গিলে, পাপের ভয় না রেখে বলব—লণ্ডন-পুলিশ। ওর আর দোস্‌রা নেই। তা বড় তা বড় গল্প আছে লণ্ডন-পুলিশ নিয়ে। সবসে সেরা গল্প শুনেছি মিস্—সির কাছে। বলে, "সেকালে তো ওসব ঘরের ওই ধরনের বাচ্চা জমা করার জন্য বিশেষ বিশেষ মনাষ্টরি থাকত। প্রটেষ্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড মনাষ্টরি তুলে দিয়ে কিছুদিন ভারি কষ্ট পাবার পর এই লণ্ডন-পুলিশ সৃষ্টি করেছে। ওরা ও সব ছেলে এমন অবলীলা ভরে জমা নেয় যে, মনে হয় এই জন্যই ওদের আবিষ্কার।" যত বুঝিয়ে বলি—"আরে মনাষ্টরি তো সেই হেনরী এইট্‌থের সময়ে গেল, লণ্ডন-পুলিশ তো সিদ্দনের ব্যাপার। স্যর রবার্ট পীল—" ও তত বলে—"রাখো তো তোমার হিস্ট্রী। সব কথায় হিস্ট্রী। যা বললাম, মনে রেখো। বুদ্ধি হলে বুঝতেও পারবে। হবেই না এমন তো কোনো কথা নেই।" এই তো লণ্ডন-পুলিশ! পথ বলে দেয়। ভাঙ্গা গাড়ী ধাক্কা দেয়। রাতের বেঘোরের ঘোরা থামায়; ভবঘুরেকে ঘরমুখো করে। মোট বয়, মার সয়, কথা কয়, কি না হয়! জানে না এমন জ্ঞান নেই, চেনে না এমন পথ নেই, শোনে না এমন কথা নেই, মানে না এমন কানুন নেই। সর্বজ্ঞতায় ওরা ঈশ্বরকে ছেলেমানুষ ভাবে; সমদর্শিতায় ওরা আকাশ-চারীদের কানা ভাবে; সর্বব্যাপকতায় ওরা দিল্লীর ধুলোকে নস্যাৎ করেছে; সার্বভৌমতায় ওরা সোভিয়েৎ-দর্শনকে পকেট-ধারাপাত বানিয়ে ছেড়েছে। রাণী না থাকলে ইংরেজ থাকবে; ওরা না থাকলে ইংলণ্ড থাকবে না।

অষ্টম হেনরীর সময়কার ফ্যাশানেবল্ পাড়া আজও ফ্যাশানেবল্। হাইড পার্ক কর্ণারের বিখ্যাত আর্চ আর মার্বল আর্চ—এই দুটোই প্রধান প্রবেশ পথ। হাইড পার্ক কর্ণারের মতো জমজমাট জায়গা লণ্ডনে খুবই কম। গাছের তলায় তলায় দু'চার শ' ফোল্ডিং চেয়ার দেখলাম। তাতে মেয়ে-পুরুষ সবাই পড়ে আছে না মরে আছে, বোঝার জো নেই! কারুর মুখে খবরের কাগজ চাপা; কারুর মুখে কাপড়। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ও নাকি সূর্যের আলোয় স্নান করা হচ্ছে, রংকে ট্যানালো করার জন্য। পালিশ করা চামড়ার রং মানুষের চামড়ায় এলে নাকি তার ডাকসাইটে খোলতাই হয়, চেক্‌নাই বাড়ে। কত বিপত্তিই যে আছে সংসারে। যাদের রং পালিশ-করা তারা ঘষা-মাজা করে কি করে তাকে মরা-মানুষের গায়ের রং করে তুলবে, সেই চেষ্টায় ফতুর; আর যাদের গায়ে রং শাদাই, তারা মরছে ঘাড় কাৎ করে করে দুনিয়ার চোখের ওপর ন্যাংটার অধিক হয়ে কি করে দু-পোঁচ চড়ানো যায় সেই সাধনায়।

হাইড পার্কের অন্য এক মজাদার ঘটনা প্যাকিং বক্স ওরেটর। কে-না ছিল? কবডেন, পীল, গ্লাডষ্টোন, বার্ণার্ড শ, লাস্কি, এ্যটলী, বিভান্, বেভিন—প্রত্যেককেই ঘাড়ে বাক্স বয়ে এনে হাইড পার্কের গাছের তলায় গলা হাঁকড়াতে হয়েছে। এখনও দুনিয়ায় দুটো জায়গা আছে যে কোনো সন্ধ্যেয় গিয়ে ফোকোটে ঘণ্টা দুই বক্তৃতা শুনে আসা যায়। এক কাশীর দশাশ্বমেধ অহল্যাবাঈ ঘাটে, অন্য লণ্ডনের হাইড পার্কে। এ ব্যবস্থা অন্যত্র দুর্লভ। কারণ এখানে বক্তৃতার মান অত্যন্ত উঁচু দরের। আর তা না হলে পচা ডিম আর টম্যাটো আছে।

জিম রোপায়ের বক্তব্য—কিছুদিন আগেও লণ্ডনের থিয়েটারের সামনে আর হাইড পার্ক কর্ণারের পাশে ঠেলাগাড়ীতে ডিম আর টম্যাটো যা বিক্রী হতো তাতে তিন ভাগ থাকত। তিন ভাগের তাৎপর্য তিনটি টুকরো কাগজে লেখা থাকত। এক ভাগে লেখা For kitchen; অন্যটায় লেখা থাকত For table; আর তৃতীয়টায় লেখা থাকত For throwing!

হাইড পার্কে যাবে ট্যাক্সি করে অথচ ওয়েলিংডন পেনিনসুলার এবং ওয়াটার্লুর যুদ্ধে যে সব ফরাসী-কামান বাজেয়াপ্ত করেছিল সেই সব কামান গলানো ধাতু দিয়ে গড়া একিলিসের মূর্তি দেখবে না, এমনটা হয় না। এও একটা স্মৃতি চিহ্ন আর W. H. Hudson-এর স্মৃতিতে গড়া এপষ্টিনের Rima-ও একটা স্মৃতিচিহ্ন। কত প্রভেদ। সার্পেন্টাইনের জল দেখে কালিঘাটের গঙ্গা বলা যেত যদি ঐ নোংরামী দেখতাম। দেখলাম হাঁস ভাসছে। নৌকা বিহার চলছে। কেনসিংগটনে ভিক্টোরিয়ার প্রথম জীবন কেটেছে। তাই কেনসিংগটন গার্ডেনও বিখ্যাত। সবই দেখি, কিন্তু জেনেভার সেই রোজ গার্ডেন আর কোথাও দেখি না। কেনসিংগটন গার্ডেনের ফিজিক্যাল এনার্জির মর্মর মূর্তির চেয়েও পীটার প্যানের মূর্তিটি অনেক ভাল লাগল। তবে সত্যি কথা বলতে রোম ছেড়ে এসে অন্য কোনো মূর্তি আর ভাল লাগে নি।

একজিবিশন রোডের দু'ধারে ভিক্টোরিয়া-আলবার্ট ম্যুজিয়ম, সায়েন্স গ্যালারি আর ইম্পিরিয়ল ইনষ্টিট্যুট। বাইরে থেকে চলে আসা ছাড়া তখন উপায় নেই। আলাকজাণ্ড্রা গেট দিয়ে ঢুকে ওয়েলিংটন মেমোরিয়াল আর রয়্যাল আর্টিলারি মেমোরিয়ালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে কনষ্টিট্যুশন হিল দিয়ে বাকিংহাম প্যালেসে এসে পড়েছি। সামনেই ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত মূর্তি। কতবারই কত ভাবে এ মূর্তি দেখেছি। আজ একেবারে সামনে। মনে পড়ে যায় নয়া দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবন। সামনেই 'মাল্'—সেণ্ট জেম্সের পার্ক।

এদিকে ভীড় হাল্কা। কিন্তু হাইড পার্ক কর্ণারে গাড়ীর পর গাড়ী। সকাল আটটা থেকে বিকেল আটটার মধ্যে একাশী হাজার গাড়ী এখান থেকে যায় অর্থাৎ মিনিটে—একশো তেরোখানা গাড়ী, ঘণ্টায় ছ' হাজার সাতশো সাতাশীখানা।

ঘড়ি দেখছি আর জিম রোপারকে বলছি "আর ঘোরাতে হবে না। ওয়াটার্লু ব্রিজে চল। কেবল এক জায়গায় একটু চা খেয়ে নেব। তুমি নয় অন্য কিছু খেও।"

ও এল্ খেলো। আমি চা খেলাম। আসল তখনও যে দশ মিনিট ছিল জিম রোপারের সঙ্গে গল্প করে কাটল। গল্পও শোনাল জিম রোপার।

"কি না করতে হয় বলুন। রোজগার, রোজগারই। মানুষের মুখ দেখেই ধরতে হয় কেমন লোক, কি দেবে, কোথায় যাবে। মাঝে মাঝে ছ্যাঁচড় লোকও তো পাই। গত জানুয়ারীর কথাই বলি। তখন লণ্ডনে ট্যাক্সি সে-ই চালাচ্ছে যার নেহাৎ দরকার।..."

বাধা দিয়ে বলি, "মাসিক জানতে চাই না, দৈনিক কত আয় হলে তোমরা বেশ খুশী থাক।"

ও বলে, "তিন পাউণ্ড হলে খুশী থাকি। পাঁচ পাউণ্ডও হয়। ট্যুরিষ্ট পেলেই অত ওঠে।" আমার হাসি দেখে ও নিজেও হেসে বলে, ঠকিয়ে নয়। লণ্ডনের ট্যাক্সিওলা সাধারণতঃ ঠকায় না। সে পারে পারিসে, রোমে। সত্যিকার রোজগারে। ট্যুরিষ্টরা ঘোরে খুব, আবার দাঁড়ায়ও খুব। নৈলে দু' পাউণ্ডের কম হলে মনমরা হয়ে থাকি। বেশীটাই গাড়ীর মালিক, সোসাইটিকে দিতে যায়। ট্যাক্সির মালিক বেশীর ভাগই অন্য লোক। তাকে দৈনিক একটা বেলায় দশ শিলিং দিতেই হয়।

"তা জানুয়ারী বলে তো আর কাজ বন্ধ থাকে না। লণ্ডন ছুটি চায় মে, জুনে। লণ্ডন খেটে নেয় জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীতে। লোকটা ট্যুরিষ্ট। সারাদিন দেখালাম। এমন বিপদে পরে, বলে পয়সা নেই। আমি পুলিশে দিতাম। কিন্তু দেখেই বুঝলাম মিছে বলছে। বাধ্য হয়ে একটা নিরালা জায়গায় নিয়ে একটু গুণ্ডামির প্যাঁচ দেখালাম। পয়সা পেলাম। এমন ছ্যাঁচড়ামো দরকার হয় না এশিয়ার আর ইজিপ্টের লোকের কাছে। বিশেষ তো ভারতীয়। ওদের বেশ ভদ্র ব্যবহার। গরীব ভারতীয়ও আছে দেখেওছি; ইতর ভারতীয় দেখি নি।"

"বল কি? ভারতীয়েরা তো জন্মে ইতর, অকুলীন।"

"হতে পারে কেতাবে বা বড়ো পাড়ায়। গালভরা গালাগাল দেওয়া শান-জমানোর একটা সহজ কায়দা। আমি কেন, সারা ট্যাক্সি-সমাজে ভারতীয় মক্কেলের খুব খ্যাতি। গল্প করতেও অমন লোক নেই।"

"ট্যাক্সিওলাদের খ্যাতি কিসে? লোক চেনায়?"

হাসে রোপার। "ক'দিন আগে রাতে একটা অল্প-বয়সী ভারতীয় ছোকরাকে নিজেই ডেকে গাড়ীতে বসালাম। কতক্ষণ লাগল? ঘণ্টা তিনেক। লণ্ডন ঘুরিয়ে দেখালাম। জানতাম ওর কাছে পয়সা নেই। ছাত্র, গরীব। তবু ভাল লাগল ঘুরতে। সেদিন দু' পাউণ্ড অনেকক্ষণ ছাড়িয়েও গেছে, তা ছাড়া অমন কাঁচা-বয়সী মক্কেল আজ ঘোরালে কালে লণ্ডন ট্যাক্সি-সমাজের খ্যাতি বাড়বে। কিন্তু মাঝে মাঝে আমাদের পুলিসের কাজ করতে হয়। আমার এক বন্ধু, আজ তার ঢের ডাক-নাম; উলিয়াম চার্লস্ হাউয়েস্, নিজেই বুড়ো, প্রতি সপ্তাহে স্কটল্যাণ্ড
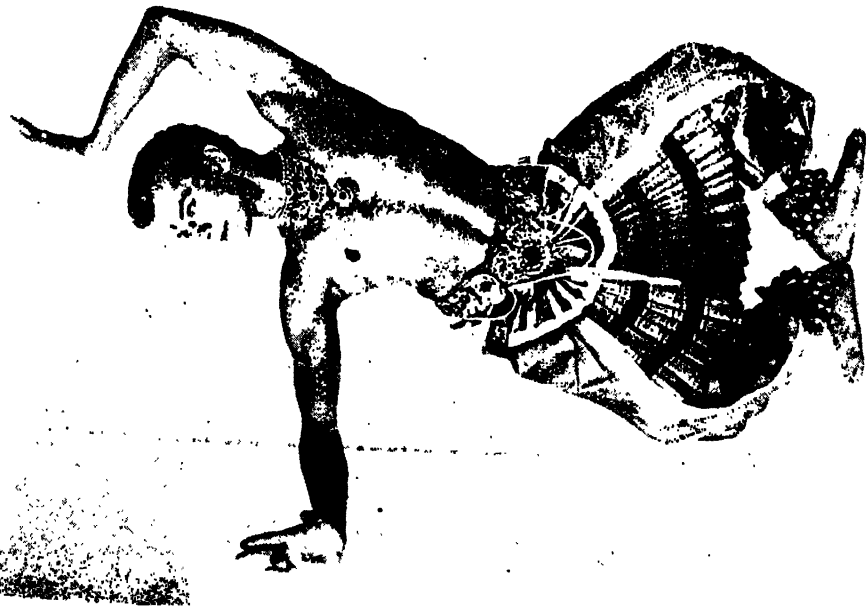
ত্রিভঙ্গ নৃত্যভঙ্গিতে ভাস্কর

ভারতীয় নৃত্য রূপায়ণে ভাস্কর ও অন্যান্য শিল্পী

মুদ্রা রচনায় ভাস্কর ও তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী

ইয়ার্ডে যায় বুকের পরীক্ষা দিতে—পঞ্চাশ পেরুলেই প্রতি ট্যাক্সিওলাকে ঐ সাপ্তাহিক পরীক্ষা দিতে যেতে হয়। হাউয়েস্ তার গাড়ী নিয়ে রাত এগারোটা চেরিংক্রশের ধার দিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ নারী-কণ্ঠের চীৎকার শোনে "হেলপ্, হেলপ্।" হাউএস্ যাচ্ছিল গাড়ী নিয়ে। শুনতে পেয়ে ঘাড় বার করে ব্যাপারটা জানতে চায়। ঘটনা শুনে জানে বেচারার বাক্সটি নিয়ে কোনও এক ত্বরিতমতি, ত্বরিতগতি হয়ে সটকান্ মারছে। "ঐ যে, ঐ যে পালাচ্ছে। আমার সাধ্যি নেই আমি ধরি।" বুড়ী বলে। "আমার আছে।" বলে হাউয়েস তাকে ধরে। গাড়ী চালিয়ে পেভমেণ্টের ওপরে ঘ্যালের সঙ্গে তাকে ঠেসে ধরে। পুলিশ কোর্টে ম্যাজিষ্ট্রেট হাউয়েস্‌কে যথেষ্ট প্রশংসা করেছে। আমাকেই একবার কি যে দারুণ বিপদে পড়তে হয়েছে। দুটি মহিলা পথে চলছে। একজন পীড়িতা, অসুস্থা। অন্য জন বুড়ী। আমায় ডাকল, আমি গেলাম। বলল, মাতৃসদনের কেস। দিব্যি নিয়ে চলেছি। একটা মাতৃসদনের দোরে এলাম। বুড়ী বলে ওর বাড়ীতে ওকে প্রথম নিয়ে যেতে। গেলাম। সেখান থেকে কি সব জিনিসপত্র নিয়ে ঠিকানা দিল এক ডাক্তারের। ডাক্তারের ঘরে সেই যে গেল আর এল না। উঠি ওদের খোঁজ নিতে। বাড়ীর মধ্যে গিয়ে দেখি মস্ত বাড়ী। অন্য ধার দিয়ে অন্য দরজা। সময় নষ্ট না করে সোজা গাড়ীতে এলাম। তবে গাড়ীর ভেতরটা পরীক্ষা করা সঙ্গত বোধ করলাম। যা ভেবেছি তাই। একটা ঝোড়ায় একটি সদ্যজাত সন্তান—"

"বল কি! গাড়ীতেই বাচ্চা হয়ে গেল টেরও পেলে না? একি গপ্পের গোরু?"

"সে কি?" অবাক্ হয় রোপার।

ওকে গপ্পের গোরুর কীর্তিকলাপ বলতে ও হেসে বাঁচে না। "না, না; তোমায় গুলতাপ্পা মারতে বসি নি। বাচ্চাটা আগেই হওয়া। জায়গা খুঁজছিল রেখে যাবার। বোধ করি বড়ো ঘরের মেয়ে। যাক্—ও সব তো তখন মাথায় নেই। মাথায় তখন ঐ বোঁচকা। তাকে জমা করা, পুলিশ করা এবং অবশেষে তার গড্‌ফাদার হওয়া সব আমার কপাল। এখন ছেলেটা স্কুলে পড়ছে। তার নামও দিয়েছি রোপার। তবে প্রথম নামটা রোপার রেখে শেষের নামটা 'নাইট্' রেখেছি। রাতে পেয়েছি তাই।"

"ছাড় নি বাচ্চাটাকে।"

রোপার বলল, "পরেরটা এলে ছাড়ব। প্রথমটা ছাড়ি নি। রোপার খুব ভাল লেখাপড়ায়। স্কলারশিপ পেয়ে পড়তে পারবে বোধ হয়। গত যুদ্ধের মধ্যে ট্যাক্সি-ওলাদের যারা দেখেছে তারা সবাই জয় জয় করেছে। বোমা পড়ছে, সহর ভাঙছে পুড়ছে। সাইরেন বাজল, গাড়ী থামাও; সাইরেন ছাড়ল অল ক্লিয়ার তো ফের চল। যেন পথ চলতে ট্রাফিক সিগন্যাল। একবার অমনি সাইরেনে সার সার গাড়ী দাঁড়িয়ে। সাইরেন অল ক্লিয়ার দিল। একখানা গাড়ী বিগড়ে সামনে দাঁড়িয়ে বিকট শব্দ করতে লাগল আর রাশি রাশি ভাপ ছাড়তে লাগল। রেডিয়েটার তেতে লাল! কোন্ মানুষের মাথার ঠিক থাকে বল? তখনও ট্যাক্সিওলা— পেছনের ট্যাক্সিওলাটা নেমে বিপন্ন ভায়াকে গালাগাল না দিয়ে বলল, "দাদা, সবই তো জোগাড় করেছিস মাণিক; চা আর চিনিটুকুও কি বার করবি এবার? রাতটা এখানেই কাটিয়ে দিই।"

হাসি আমি—"তোমার ঘটনা?"

"নাঃ জানা ঘটনা। গপ্প শুনেছি। এত গপ্প, কত শুনবে? অনেক বলতে পারি। বরং চল ওয়াটার্লু ব্রীজে চলা যাক্, তোমার তো সময় পার হয়ে গেছে।"

তা গেছে। কিন্তু জিম্ রোপারকে ছাড়া কঠিন। বলি, "জিম্ কাল তোমাকে কোথায় পাব?"

"যেখানে চাও। পয়সা পেলে আমরা নরকেও যাই।"

"অনেককে নিয়ে গেছ বুঝি?"

"তা গেছি। পয়সা পেয়ে অবশ্য। পয়সা দিয়ে নয়।"

"তফাৎ কোথায়?"

"অনেক। পয়সা দিয়ে যারা যায় তারা গিয়ে ফেরে না। নিয়ে যারা যায়, যেমন জিম রোপার, ফেরে, যেমন এই দেখছ। কাল সকালে যদি আমায় ন'টার সময়ে ট্রাফালগার স্কয়ার ষ্ট্যাণ্ডে না পাও ওখানেই খবর পাবে।"

ওয়াটার্লু ব্রীজে হেমরজনী দাঁড়িয়েই ছিল।

জিম রোপার ওয়েটিং চার্জ নিচ্ছিলেন।

কিন্তু নিতে বাধ্য করলাম। ক্রমশঃ

—o—

নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরী

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

১

ভারতের ক্লাসিক্যাল নৃত্যের চারিটি রূপ : ভরত নাট্যম্, কথাকলি, কথক ও মণিপুরী। সুদূর অতীতে দক্ষিণ-ভারতের তীর্থমন্দিরসমূহকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত হয়েছিল ভরত নাট্যম্ নামক নাট্যশাস্ত্রসম্মত নৃত্যকলা, কেরালা দেশে হয়েছিল মুখোশপরা নৃত্যনাট্য কথাকলি আর মোহিনী আত্তম্-এর অপূর্ব্ব উন্নতি। মোগল যুগে উত্তর-ভারতে পারস্য এবং তুরস্কের নৃত্যকলার সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনীর সংমিশ্রণে সঞ্জাত হ'ল কথক নৃত্য, আর পূর্ব্ব-ভারতে মণিপুর রাজ্যে রূপোজ্জ্বল মহিমায় বিকশিত হয়ে উঠল অপূর্ব্ব মনোহর মণিপুরী নৃত্যকলা।

উপরোক্ত চার শ্রেণীর নাচের মধ্যে ভরত নাট্যম্-এর আসন হচ্ছে সকলের পুরোভাগে এবং শীর্ষস্থানে। ভরত নাট্যম্-এর সঙ্গে যে সকল পৌরাণিক কাহিনী এবং ঐতিহ্য বিজড়িত তৎসম্বন্ধে আলোচনা করলে মনে হয় যে, ভারতের মাটিতে এই নৃত্যকলারই উদ্ভব হয়েছিল সকলের আগে।

ভরত নাট্যম্ মূলতঃ পরিকল্পিত হয়েছিল নারীদের জন্য এবং নারীরাই এর অনুশীলন করতেন। কোন স্মরণাতীত-কালে নৃত্যপরা দেবদাসীর দেহভঙ্গিতে দক্ষিণ-ভারতের দেবমন্দিরে প্রথম হয়েছিল দেবতার বন্দনা, তা আজ সঠিক করে বলবার উপায় নেই। কিন্তু একথা সত্য যে, যুগযুগান্তর ধরে দেবদাসীরাই বাঁচিয়ে রেখেছে প্রাচীন ভারতের এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৃত্যকলাকে।

যে পদ্ধতি অনুসারে আজকের দিনে ভরত নাট্যম্ অনুষ্ঠিত হয় তা নির্দ্ধারিত হয়েছিল শতবর্ষ পূর্ব্বে পাণ্ডানাল্লুর পন্নাইয়া, ভাডি-ভেলু এবং শিবনন্দন এই তিনজন প্রখ্যাত নৃত্যকুশলীকর্ত্তৃক। এঁদের পরবর্ত্তী আমলে আমরা পাচ্ছি শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী এবং এই নৃত্য-কলার সুনিপুণ ব্যাখ্যাতা গুরু মীনাক্ষী-সুন্দরম্ পিল্লাইকে। বর্ত্তমানকালে যে কয়জন নৃত্যশিল্পীর চেষ্টায় এই নৃত্যের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, এবং যাঁরা একে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সাংস্কৃতিক ভিত্তির ওপর তাঁদের মধ্যে দু'জন হচ্ছেন মহিলা—বালা সরস্বতী ও রুক্মিণী দেবী। আর বাঙ্গালোরের রামগোপাল হচ্ছেন প্রথম পুরুষ নৃত্যশিল্পী যিনি আধুনিক মঞ্চে এই নৃত্যকলা প্রদর্শন করে দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করেন। রামগোপালের পরে ভরত নাট্যম্-এ সাফল্য অর্জ্জন করেছেন আর একজন পুরুষ নৃত্যশিল্পী। নাম তাঁর ভাস্কর রায়চৌধুরী। ভারত-বিখ্যাত শিল্পী এবং ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর একমাত্র পুত্র এই তরুণ নৃত্যশিল্পী অল্প বয়সেই স্বদেশে এবং বিদেশে ভারতের ক্লাসিক্যাল নৃত্যকলায় যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর অধিকতর গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যৎই নয়, বিদেশেও ভারতীয় নৃত্য-কলার প্রসার সম্বন্ধে আশা পোষণ করবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান।

২

আজ থেকে এগার বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া পাব্লিক হলে মাদ্রাজের চিফ জাষ্টিস রাজমান্নার, রাজস্ব-মন্ত্রী সীতারাম রেড্ডি প্রমুখ গুণী-জ্ঞানীদের উপস্থিতিতে বিংশতি বৎসর-বয়স্ক তরুণ নৃত্যশিল্পী ভাস্কর রায়চৌধুরী যেদিন 'সূর্য্যনৃত্য' 'নাগনৃত্য' প্রভৃতির রূপবৈচিত্র্য প্রদর্শন করেন, সেই দিনটি তাঁর শিল্পী-জীবনে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। ভারতের ক্লাসিক্যাল নৃত্য ভরত নাট্যম্-এর শাস্ত্রানুমোদিত নব রূপায়ণ দেখে দর্শকমণ্ডলী সেদিন মুগ্ধ বিস্ময়ে জানিয়েছিলেন তাঁকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন। সমবেত দর্শকদের এই ভ্রান্ত ধারণাও অপনোদিত হয়েছিল যে, ভরত নাট্যম্ শুধু মেয়েদেরই একচেটে একক নৃত্য। ভাস্করের অঙ্গসৌষ্ঠব, লীলায়িত দেহভঙ্গি, শোভন ভঙ্গিতে দ্রুত অঙ্গ সঞ্চালন এবং ছন্দোময় পদক্ষেপ এইটেই অকাট্য ভাবে প্রমাণিত করল যে, ভরত নাট্যম্-এর প্রকৃত রূপকে পরিপূর্ণ ভাবে বিকশিত করে তুলতে পারেন পুরুষ নৃত্য-শিল্পীই। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নৃত্যবিদ্ এবং ভারতীয় নৃত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা প্রজেশ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

—..."Bharata Natyam, is now performed by males as well, and is better executed by them. Because the type being very

technical sometimes becomes very difficult for the women to be executed at its highest perfection. The time measurements in it are so very difficult that too much of hardship, practice and labour is required to master them, and at the same time agility and flexibility of the body is utterly needed. A male person at times can make a swifter movement than the females." ('Dance of India'- by Projesh Banerji, P. 134-35)

সহজাত সৃজনী প্রতিভার অধিকারী ভাস্কর কঠোর পরিশ্রম এবং সাধনা দ্বারা আয়ত্ত করেছেন ভরত নাট্যম্-এর দুরূহ আঙ্গিককে। আলারিপ্পু, তিলানা এবং পদম্-সমূহে তাঁর কুশলতা নৃত্যসমালোচককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল ভরত নাট্যম্-এর আর একজন নিপুণ শিল্পী রামগোপালের কথা। কিন্তু নৃত্যচ্ছন্দে ভরত নাট্যম্-এর ভাবগাম্ভীর্য্য রূপায়ণে রামগোপালকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন ভাস্কর। 'সূর্য্যনৃত্য' এবং 'নাগনৃত্য' তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ভরত নাট্যম্-এ পুরুষ নৃত্য-শিল্পীর দেহভঙ্গিমা এবং চরণছন্দে যে কি অনুপমেয় ভাব-রসের সৃষ্টি হতে পারে, মাদ্রাজের নৃত্য-আসরে বিশেষ ভাবে এই দুটি নৃত্য সাধারণ দর্শক ও বিদগ্ধ সমালোচক সবাইকে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলেছিল।

ভগবদ্দত্ত প্রতিভাবলে এবং দীর্ঘ দিনের নিরলস সাধনা দ্বারা ভাস্কর আজ দেশে এবং বিদেশে খ্যাতির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু এ কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, তাঁর প্রতিভা-বিকাশে বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়েছে তাঁর গৃহের পরিবেশ। বিশ্রুতকীর্ত্তি শিল্পীর পুত্র তিনি, পিতার নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন সৃজনী প্রতিভা। ভাস্কর্য্য এবং চিত্রকর্ম্মের মাধ্যমে পিতা স্বগৃহে যে রূপলোক সৃষ্টি করে রেখেছেন তা পুত্রের মনে অল্পবয়সেই সঞ্চার করেছিল রূপসৃষ্টির প্রেরণা। কৈশোরেই নৃত্যকলার প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন তিনি, তা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর ছেলেবেলাকার উচ্চাভিলাষ ছিল ভারতের কোন বিশাল আরণ্য অঞ্চলে ফরেস্ট রেঞ্জার হওয়া। পিতা কিন্তু পুত্র যাতে নিয়মিত ভাবে দেহানুশীলন দ্বারা শক্তি অর্জ্জনে সমর্থ হয় সে বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠলেন। ফলে মাত্র পনের বৎসর বয়সেই ভাস্কর হয়ে উঠলেন প্রোফেশনাল মুষ্টিযোদ্ধা।

এমনিভাবে বছর দুই কাটবার পর অকস্মাৎ একটি মুভি ষ্টুডিওতে কাজ করবার সুযোগ পেয়ে গেলেন ভাস্কর। পিতা ছিলেন পুত্রের এই বৃত্তি অবলম্বনের ঘোরতর বিরোধী, ভাস্কর কিন্তু তাঁর সঙ্কল্পে অবিচলিত রইলেন। জেমিনি ষ্টুডিওর কর্তৃপক্ষ তখন প্রাচ্য দেশসমূহে প্রদর্শনের জন্যে চলচ্চিত্র নির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে নৃত্যশিল্পীরূপে যোগ দিলেন ভাস্কর। যদিও তখন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে কোনপ্রকার নৃত্য-শিক্ষা তাঁর হয় নি, তথাপি বক্সিং রিং-এ তিনি যে গতিভঙ্গি আয়ত্ত করে-ছিলেন, উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তা দেখেই পরিতৃপ্ত হলেন, কেননা ঠিক এই জিনিষটিই চেয়েছিলেন তাঁরা।

এমনি ভাবে জেমিনির প্রায় ত্রিশটি চলচ্চিত্রে কাজ করলেন ভাস্কর। সেখানে প্রথমে ছিলেন তিনি নৃত্য-শিল্পী, তার পরে হলেন অভিনেতা, অভিনেতা থেকে হলেন যৌথনৃত্য উপস্থাপনার ভারপ্রাপ্ত Choreographer.

চলচ্চিত্রে নৃত্যশিল্পী রূপে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত গুরুর নিকট ক্লাসিক্যাল নৃত্য শিখবার সঙ্কল্প ভাস্করের মনে উদিত হয়। ভাস্কর-জননী চারুশীলা দেবী নৃত্যকলার প্রতি পুত্রের অনুরাগ দেখে তাকে শুধু উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, উপযুক্ত গুরুর নিকট যথাযথ ভাবে ভাস্করের নৃত্যকলা শিক্ষার ব্যবস্থা—করবার জন্যেও তৎপর হয়ে উঠলেন। প্রকৃতপক্ষে নৃত্য-কলার অনুশীলনে এই শিল্পীর শ্রেষ্ঠ উৎসাহদাত্রী হচ্ছেন তাঁর জননী এবং এত অল্প বয়সে ভাস্কর যে ক্লাসিক্যাল নৃত্যে এতটা পারঙ্গম হতে পেরেছেন সেজন্যে সর্ব্বাগ্রে অভিনন্দন জানাতে হয় তাঁর জননীকে, কেননা পুত্রের নৃত্যশিক্ষার পথ সুগম হয়েছিল তাঁরই আয়াসের ফলে।

খুব অল্প বয়সে মাদ্রাজের খ্রীশ্চান কলেজে ভাস্করের যে নৃত্যানুষ্ঠান হয় তাতেই পাওয়া গিয়েছিল তাঁর ভাবী সাফল্যের পূর্ব্বাভাস। কেরালা দেশের কথাকলি নৃত্য শিক্ষা করেন তিনি গোপীনাথ এবং উদয়শঙ্করের নিকটে। তার পর ভরত নাট্যম্ শিখবার জন্যে তাঁর মনে প্রবল আগ্রহের সঞ্চার হয়। তার সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হবার সুযোগও অচিরেই ঘটে গেল। ভরত নাট্যম্-এ ক্রিয়াসিদ্ধ গুরু বিদ্বান্ এলাপ্পার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ভাস্কর একাগ্র নিষ্ঠায় ঐ নৃত্যকলায় নৈপুণ্য অর্জ্জনের জন্য কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত শ্রেষ্ঠ গুরুর উপযুক্ত শিষ্যরূপে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন। প্রকাশ্য মঞ্চে যেদিন এই নৃত্যশিল্পীর প্রথম আবির্ভাব হয় সেদিনকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছিলেন স্বয়ং তাঁর গুরু। নৃত্যের আনুষঙ্গিক তাঁর কান্তকোমল সুললিত সঙ্গীত প্রেক্ষাগৃহে সে রাত্রিতে যেন সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করেছিল।

নৃত্যশিল্পী ভাস্করের অতুলনীয় সম্পদ তাঁর কমনীয় মুখশ্রী এবং অনিন্দ্য দেহসৌষ্ঠব। নিয়মিতভাবে দেহানুশীলনও করে থাকেন তিনি। তিনি নিপুণ শিকারী এবং বক্সিং-এ যে তাঁর বিশেষ পটুতা আছে সেকথা আগেই বলা হয়েছে। এই সার্থক শিল্পীর মধ্যে দেহলাবণ্যের সঙ্গে শক্তির যে সমন্বয় হয়েছে তা দুর্লভ এবং আকৃতিগত এই বৈশিষ্ট্যের জন্যে মঞ্চে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দর্শকদের মন জিতে নেন। তারপর নৃত্য আরম্ভ করবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আননে যে ভাবাবেশের অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে তা দর্শকদের যেন মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে। তাঁর নৃত্য যে কেবল আঙ্গিকের দিক দিয়েই নিখুঁত তেমন নয়, নৃত্যরত অবস্থায় তাঁকে দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যেন ডুবে গেছেন কোন এক অতলস্পর্শ ভাবলোকে। শিল্পের জন্যেই শিল্পকে ভালোবাসেন ভাস্কর এবং এর জন্যে যে-কোনো ত্যাগস্বীকার করতে প্রস্তুত তিনি।

৩

১৯৫০ সনের শেষের দিকে বাইশ জন নৃত্যশিল্পী এবং সঙ্গীতশিল্পীর সহযোগিতায় মাদ্রাজের ভিক্টোরিয়া পাব্‌লিক হলে ভাস্করের নৃত্যানুষ্ঠানের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের সাফল্য তাঁকে নব প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে এবং নিজের দল নিয়ে ভারত-পরিক্রমায় তিনি বের হন। এই সম্প্রদায়কর্ত্তৃক ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় একশত নৃত্যানুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়।

ভারত-পরিক্রমান্তে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তনের পর ভাস্করের মনে হ'ল যে, নৃত্যকলার ক্ষেত্রে প্রথাগত বন্ধনের মধ্যে শুধু গতানুগতিকার পুনরাবৃত্তি করলে চলবে না, এ পর্য্যন্ত তিনি যে ধরনের অনুষ্ঠান করে এসেছেন তাতে পরিতৃপ্ত না থেকে তাঁকে নূতন পথের সন্ধান করতে হবে। নিজের হাতে গড়া সম্প্রদায়টি তিনি ভেঙে দিলেন এবং পরবর্ত্তী প্রচেষ্টার পরিকল্পনায় ব্যাপৃত হলেন। নব নৃত্য-পরিকল্পনায় তিনি ক্লাসিক্যাল হিন্দু-নৃত্যের আঙ্গিক অবলম্বন করলেন বটে, কিন্তু বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করলেন অ-ভারতীয় কাহিনী। এ ক্ষেত্রে তাঁর একেবারে প্রাথমিক প্রচেষ্টার ভিত্তি হ'ল মেরি ম্যাগ্‌ডালীন্‌-এর কাহিনী।

জনসাধারণের অভিনন্দন ছাড়া দুটি শ্রেষ্ঠ সম্মান জুটেছে ভাস্করের ভাগ্যে। ১৯৫২ সালে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃত্য-সমালোচক ই. কৃষ্ণ আয়ার কলম্বো প্ল্যান এগ্‌জিবিশনে হিন্দু-নৃত্যের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে নৃত্যকলা প্রদর্শনের জন্যে তাঁকে সিংহলে নিয়ে যান। ১৯৫৫ সালে এক বিরাট রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে নৃত্য-প্রদর্শনের জন্যে তাঁকে নির্ব্বাচিত করা হয়। অনুষ্ঠান-শেষে প্রধানমন্ত্রী নেহরু তাঁকে পদক দ্বারা ভূষিত করেন।

ভাস্কর শুধু যে পরম্পরাগত-ভরত নাট্যম্‌-এর অন্যতম ধারক,বাহক, ক্রিয়াসিদ্ধ এবং ব্যাখ্যাতা তাই নয়, আধুনিক কালে ভারতীয় নৃত্যকলার ভাণ্ডারে তাঁর একটি নিজস্ব দানও আছে। তিনিই হচ্ছেন প্রথম হিন্দু নৃত্যশিল্পী যিনি ক্লাসিক্যাল নৃত্যের ত্রিভঙ্গ শৈলীকে আধুনিক কালে কার্য্যকরী ভাবে প্রয়োগ করবার উপযোগী ক'রে পুনরুজ্জীবিত করেছেন।

ভাস্করের একটি স্বপ্ন ছিল ভারতের সীমানার বাইরে হিন্দু-নৃত্যের প্রচার ও প্রসারসাধন। এই উদ্দেশ্যে বৎসর ছয়েক পূর্ব্বে প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় তিনি চলে যান আমেরিকায়। নিউ ইয়র্কে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রথম নৃত্যকলা প্রদর্শন করেই তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অতঃপর পার্ল বাক কর্ত্তৃক 92nd St. Y. A.-তে আয়োজিত একটি প্রোগ্রামে অপর একজন হিন্দু নৃত্য-সঙ্গীর সহযোগিতায় তাঁর একটি কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে একক নৃত্য প্রদর্শন করে ভাস্কর নিউ ইয়র্কে ফিরে আসেন এবং হিন্দু-নৃত্যে অনুরাগী জনকয়েক আমেরিকান নৃত্য-শিল্পী নিয়ে একটি সম্প্রদায় গঠন করেন। নৃত্যমঞ্চে এই সম্প্রদায়ের প্রথম আবির্ভাব হয় ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে ব্রুকলীন একাডেমি অব মিউজিক-এ। তার পর নিউ ইয়র্কে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুবার এঁদের নৃত্যানুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়েছে।

আমেরিকায় শেল অয়েল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দুটি শিল্প-বিষয়ক চলচ্চিত্রেও ভাস্কর নৃত্যশিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৯৬০ সালের গ্রীষ্মকালে চিকাগো মেলাতে নৃত্যকলায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে তিনি তাঁর সম্প্রদায় সহ জেকবস পিলো নৃত্য-উৎসবে এবং কেনে-বাঙ্কপোর্ট, মেইন, সামার থিয়েটারে নৃত্যপ্রদর্শন করেন। আমেরিকার বিখ্যাত পত্রপত্রিকাগুলিতে ভাস্করের নৃত্য-কুশলতা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রকাশিত হয়। তাঁর 'থালনৃত্য' এবং 'নাগনৃত্য' সম্বন্ধে The New Yorker (May 7, 1960) লেখেন:

..."The cast includes a dancer named Bhaskar, whose astounding physical elasticity enables him to gambol with gold plates balanced on the palms of his hands and to flex his torso with an oiled, arched abandon

that makes him resemble a king cobra preparing to strike."

আমেরিকায় ভাস্কর-সম্প্রদায়ের অঞ্জলি, জয়তিশা, গৌরী, মাই-লান এবং দীনোও বেশ সুনাম অর্জ্জন করেছেন। এই সম্প্রদায় কর্তৃক ভরত নাট্যম্, কথাকলি, কথক এবং মণিপুরী ভারতীয় ক্লাসিক্যাল নৃত্যের এই চারটি রূপই আমেরিকায় প্রদর্শিত হয়ে প্রশংসা অর্জ্জন করেছে।

আমেরিকায় ভাস্কর অত্যন্ত কর্ম্মব্যস্ত জীবনযাপন করছেন। ওদেশে ভারতীয় নৃত্য, বিশেষভাবে ভরত নাট্যম্ যাতে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করে সেজন্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত নেই। Ballet Arts-এ তিনি নিয়মিত ভাবে হিন্দু-নৃত্য শিক্ষার ক্লাস নিচ্ছেন।

ভাস্কর মনে মনে এই আশা পোষণ করেন যে, অনতিদূর ভবিষ্যতে তিনি তাঁর আমেরিকান নৃত্য-সম্প্রদায় সহ এক শুভেচ্ছা মিশনে ভারতবর্ষে যেতে পারবেন এবং ফেরবার সময় একদল সঙ্গীতশিল্পীকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারবেন আমেরিকায়। তাতে করে ভারতীয় নৃত্য অধিকতর উপভোগ্য হবে আমেরিকাবাসীদের নিকট। নৃত্যকলার মাধ্যমে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপনই শিল্পী ভাস্করের জীবনব্রত। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজ সম্প্রদায় সহ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল পরিক্রমা করছেন। "শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ"—'তোমার পথ মঙ্গলময় হোক', এই ঋষিবাক্য উচ্চারণ ক'রে উদীয়মান ভাস্করকে আমরা স্বাগত জানাই।

—৫—

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

অনুশীলন সমিতির সর্বদিকের কাজের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত-বিভাগের কাজও খুব দ্রুত বেড়ে গেল। কিন্তু দেখা দিল আর্থিক অনটন। পুলিনবাবুর নিজস্ব কয়েক সহস্র টাকা ফুরিয়ে গেল। সরকারী অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক সাহায্যকারী ভয় পেল। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত গৃহস্থরাই সাহায্য করত। কিন্তু নিজের পরিবার-পরিজনকে বিপন্ন করে সমিতিকে সাহায্য করতে ভীত হ'ল। গৃহত্যাগী সভ্যদের অন্নবস্ত্র সংগ্রহই কঠিন হ'ল। অনেকে একবেলা খেয়ে দিন কাটাতে শুরু করল। আশ্রয়ও তথৈবচ। তখন ঠিক হ'ল যে দেশের লোক যাদের সাহায্য করবার ক্ষমতা আছে তারা যখন স্বেচ্ছায় টাকা দেবে না তখন বলপূর্বক অর্থ সংগ্রহ না করে আর উপায় কি। তবে ডাকাতি এমনি ভাবে করতে হবে যেন সরকার এগুলিকে স্বদেশী ডাকাতি বলে সাব্যস্ত করতে না পারে। হ'লও তাই। কোন কোন ডাকাতিতে নির্দ্দোষ গ্রাম্য লোকের শাস্তি হয়।

টঙ্গি, শেখের নগর, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ডাকাতি হ'ল। নারায়ণগঞ্জ শহরের জনাকীর্ণ রাস্তায় যেখানে ডাকাতি হয় সেখানে একপাটি জুতা পাওয় যায়। অনুসন্ধানে মুচি সাক্ষ্য দেয় যে, ঐ জুতা নারায়ণগঞ্জ স্কুলের ড্রিল মাষ্টারের। অবশ্য এই প্রমাণেই তার কোন সাজা হয় নি, যদিও তিনি নারায়ণগঞ্জ শাখায় নেতৃস্থানীয় ছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে বাড়রা ডাকাতি হওয়ার পর থেকেই সরকার ও দেশের লোক বুঝতে পারে যে বিপ্লব-সমিতি অর্থ সংগ্রহের জন্য ডাকাতি করছে। বাড়রা ঢাকা জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ডাকাতি করে ফেরার পথে পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। স্বল্প পরিসর নদীর দুই তীর থেকে তাদের নৌকার উপর আক্রমণ হয়। ধলেশ্বরী নদীর উপর একটা পুলিস ষ্টিমলঞ্চও অনুসরণ করে নৌকো ধরার চেষ্টা করে। এই সংঘর্ষে উভয়পক্ষেই গুলি চলে এবং হতাহত হয়। সশস্ত্র পুলিস অপর পক্ষের পাল্টা আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে দ্রুত পলায়ন করে এবং ষ্টিমলঞ্চ-আরোহী সশস্ত্র পুলিসও পরাজিত হয়।

এই যুদ্ধে ক্ষীরোদ ঘোষের হাতে মণিবন্ধের নীচে

গুলি একদিক দিয়ে বিদ্ধ হয়ে অপরদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। আরও লোক আহত হয়েছিল। গোপাল সেন গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করে। পুলিস জীবিত, মৃত বা আহত কোন বিপ্লবীকেই ধরতে পারে নি।

এই ডাকাতির পরিকল্পনা ও নির্দেশ পুলিনবাবুর। পরিচালনা করেন আশুতোষ দাসগুপ্ত। তখন পুলিন-বাবুর পরেই ছিল তার স্থান সমিতিতে। পরিচালনা-কার্যে আশুবাবুর প্রধান সহকারী ছিলেন শিশির রায় ও শান্তিপদ মুখার্জি। এই ডাকাতিতে ত্রৈলোক্যবাবু এবং সতীশ দাশগুপ্তও (স্বামী সত্যানন্দ) যোগদান করেন।

বাড়রা ডাকাতির সংবাদে সমগ্র দেশে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার করে। সকলেই বুঝতে পারল যে, এরা সাধারণ ডাকাত নয়। যুবকদের সঙ্গে তিন-চারিটার বেশী বন্দুক ছিল না। বহু সংখ্যক পুলিস। সকলের হাতেই রাইফেল। যুবকগণ ছিল নৌকায়। পুলিস তীরে এবং ষ্টিমলঞ্চে। প্রবল পরাক্রমশালী ব্রিটিশ আজ মুষ্টিমেয় বাঙালী যুবকের কাছে পরাজিত হ'ল। সকলেই গর্ব অনুভব করল। নদীর দুই তীরের গ্রামের অগণিত অধিবাসীরা হতবাক্ বিস্ময়ে যুবকদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেছিল।

এই সময়ই পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নড়িয়া গ্রামের প্রকাণ্ড বাজার আক্রান্ত হয় এবং বহু সহস্র টাকা লুণ্ঠিত হয়। সরকার ও দেশবাসী সকলেই অনুমান করল যে, অনুশীলন সমিতির সভ্যরাই এ কাজ করেছে

পি. মিত্র মহাশয়ের অনুমোদন ও জ্ঞাতসারে এ সমস্ত কাজ সংঘটিত হয়। ডাকাতি-দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের হিসাব-সহ কাগজপত্র এবং সমিতির গুপ্ত কার্যাবলী সংক্রান্ত চিঠিপত্র তার নিকট প্রেরিত হয়েছিল। অনুশীলন-সমিতির গুপ্ত কার্যাবলীর সঙ্গে মিত্র মহাশয়ের সম্পর্ক প্রমাণিত করবার জন্য যখন পুলিস তার বাড়ী খানাতল্লাসী করে, তখন এই সমস্ত কাগজপত্র ও চিঠি তার বাড়ীতেই ছিল। কিন্তু অত্যন্ত সুকৌশলে গোপনে সেগুলি সরিয়ে ফেলা হয়। এ ব্যাপারে আলিপুরের সরকারী উকিল হেমেন্দ্র মিত্রের অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল বলে শুনেছি।

এতেই বোঝা যাবে যে, ব্রিটিশ সরকার সমিতির কার্যাবলীর জন্য বিশেষ চিন্তিত ও শঙ্কিত হ'ল। সহস্র সহস্র যুবকের ড্রিল, প্যারেড ও কৃত্রিম যুদ্ধ সবই যে বিপ্লবের আয়োজন, এ কথা তারা বুঝতে পারল। এরা সুশিক্ষিত এবং সুগঠিত হয়ে অপরাজেয় হওয়ার পূর্বেই এদেরকে অঙ্কুরে বিনাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে সরকার ব্যাপৃত হ'ল। কিন্তু সমিতির সভ্যদের মধ্যে যেই বিশ্বাসঘাতক হত তাকেই সরকার আর খুঁজে পেত না। সুকুমার রমনায় এবং বীরেন গাঙ্গুলী পদ্মানদীর চরে এই অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সুকুমারের মৃতদেহ ওদের হস্তগত হওয়ায় বুঝতে পারল এ সমস্ত লোক কোথায় যায়। অনুশীলন সমিতিকে ধ্বংস করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার দেশব্যাপী আয়োজন করল।

ঢাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বি. সি. এলেন। অনুশীলন সমিতি ধ্বংসের কার্যে অগ্রণী হলেন। সমিতির কার্যাবলী সম্বলিত কাগজপত্র-সহ উচ্চতম কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট পাঠালেন যে অবিলম্বে সমিতি বিনাশ না করলে অনিষ্ট ভয়ানক হবে। অবিলম্বে দমন-নীতি চালাবার অনুমতি চাইলেন। নিজেই কর্তৃপক্ষকে সব বুঝিয়ে বলার জন্য কলকাতা রওনা হলেন। পথে গোয়ালনন্দ ষ্টেশনে বিপ্লবী কর্মীদের দ্বারা গুলিবিদ্ধ হন, আক্রমণকারীরা যাত্রীর ভিড়ে মিলিয়ে যায়। এর পর এলেন সাহেবের নাম আর কেউ শুনতে পায় নি। ব্রিটিশ সরকারও এলেন সাহেব জীবিত কি মৃত তা প্রকাশ করে নি।

মেদিনীপুরে বিপ্লবী সমিতির কাজ পূর্ণোদ্যমে চলছিল। পরলোকগত জ্ঞান বসু মহাশয় ছিলেন পরিচালক এবং সত্যেন বসু, হেম দাস প্রভৃতি প্রধান কর্মী। ক্ষুদিরাম বসু ছিলেন তখন বালক কর্মী।

১৯০৮ সনেই মজঃফরপুর বোমা বিস্ফোরণের ফলে সব কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, দেশের উদ্ধারের জন্য এদেশের যুবকরা বোমা-বন্দুক নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কলকাতার অত্যাচারী প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড তখন মজঃফরপুরে বদলী হয়েছে। সেখানে তাকে হত্যা করবার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী প্রেরিত হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা যে গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করেন সেখানে কিংস্‌ফোর্ডের বদলে জজ কেনেডির পরিবারের দুজন মহিলা ছিলেন। তারা দুজনেই মারা যায়। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী ঘটনাস্থল থেকে পলায়ন করতে সমর্থ হন। কিন্তু প্রফুল্ল চাকী মোকামা ঘাট ষ্টেশনে ইনস্‌পেক্টর নন্দলাল বাঁড়ুজ্যে কর্তৃক ধৃত হওয়ার উপক্রম হলে রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বিদেশী শাসকের ফাঁসি কাঠে না ঝুলে নিজ হাতেই মৃত্যু বরণ করা শ্রেয় মনে করেন।

ক্ষুদিরাম বসুও প্রায় চব্বিশ মাইল দূরবর্তী এক

রেলওয়ে ষ্টেশনে গ্রেপ্তার হন। বিচারে তার ফাঁসি হয়। তিনি ছিলেন মৃত্যুভয়রহিত। হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন। শত শত বৎসরের পরাধীনতাজনিত ভীরুতার অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। বাংলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর নির্ভীক আত্মদান দেশের যুবকদের মন থেকে ভীরুতা, হীনতা, দুর্বলতা দূর হয়ে গেল।

আমি তখন নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ি। ক্ষুদিরামের ফাঁসির দিন আমরা খালি পায়ে শুধু চাদর গায়ে দিয়ে স্কুলে গিয়ে সমস্ত ছাত্রদের একত্র করে স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে শোভাযাত্রা করে নীরবে শহর প্রদক্ষিণ করলাম।

মাণিকতলার বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হ'ল। সুকিয়া ষ্ট্রীটেও এক বাড়ীতে বোমা আবিষ্কৃত হ'ল। সারা দেশব্যাপী ধরপাকড় ও খানাতল্লাসীর বন্যা বয়ে গেল। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র দাস, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলেশ, অবিনাশ ভট্টাচার্য, সত্যেন বসু, কানাইলাল দত্ত, নরেন গোস্বামী প্রভৃতি আরও অনেকে গ্রেপ্তার হ'ল।

অনুশীলন সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হ'ল। সমিতির সমস্ত সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করল। প্রকাশ্য সমিতি ভেঙ্গে গেল বটে, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সমিতি সম্পূর্ণ গুপ্ত ভাবে আবার জেগে উঠল।

১৯০৮ সনের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় পুলিনবাবু ও ভুপেশ নাগ ১৮১৮ সনের তিন আইনে গ্রেপ্তার হলেন। সারা বাংলায় আরও সাতজন তিন আইনে গ্রেপ্তার হলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, সতীশ চট্টোপাধ্যায় ও সুবোধ মল্লিক। এদের মধ্যে পুলিন দাস, ভুপেশ নাগ ও সুবোধ মল্লিক বিপ্লবী দলের সঙ্গে সম্পূর্ণ ভাবে যুক্ত ছিলেন। বাকি কয়জন কমবেশী সহানুভূতিশীল ছিলেন।

ঢাকায় সমিতির কেন্দ্র বজ্রপুরী উঠে গেল। সেখানে যে সমস্ত গৃহত্যাগী সভ্য থাকতেন তারা চারদিকে ছড়িয়ে গেলেন। এদের অনেকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল।

সমিতি বে-আইনী ঘোষণা করার পর অমৃত হাজরা এবং আর কয়জন ময়মনসিং গোলোকপুরের জমিদার কুমার উপেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীর কাছে আশ্রয় পান। তিনি ছিলেন সমিতির গৃহী সভ্য। সমিতির পূর্ণ সমর্থক দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ উকীল সতীশ রায় মহাশয় অনেককে আশ্রয় দেন। কয়েক বৎসর পর আমি তখন পলাতক। আমার নামে যুদ্ধোদ্যম-ষড়যন্ত্র মামলার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। তখনও দিনাজপুর গিয়ে সমিতি পুনর্গঠনের কাজে সতীশবাবুর পূর্ণ সমর্থন লাভ করেছি।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার প্রসিদ্ধ মোক্তার রজনী বসাক মহাশয় ছিলেন সমিতির সভ্য। তিনি তার উপার্জিত অর্থ সৎকার্যে দান করতেন। নিজ গৃহে বহু ছেলেকে রেখে তিনি থাকা-খাওয়া এবং লেখা-পড়ার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতেন। এও আমাদের একটা প্রধান আশ্রয়স্থান হয়ে উঠেছিল। মাণিকগঞ্জে আমাদের খুব সুবিধে ছিল এই যে, ওখানকার হাইস্কুলের হেডমাষ্টার রজনীবাবু, ষ্টীমার ষ্টেশনের মাষ্টার, পোষ্ট-মাষ্টার; অনেক গণ্যমান্য উকীল-মোক্তার এবং ব্যবসায়ী, সমিতির সভ্য ছিলেন। মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত তিল্লির প্রতিভাশালী ব্যক্তি যোগেন্দ্র রায় মহাশয়ও সমিতির ছত্রভঙ্গ সভ্যদের আশ্রয়স্থলে ছিলেন। এ ছাড়াও আর যারা সমিতির সভ্য এবং আশ্রয়দাতা ছিলেন তাদের মধ্যে—মাদারীপুরের অন্তর্গত বাজিতপুরের জমিদার মণীন্দ্র মজুমদার, গৌরীপুরের (ময়মনসিং) চারি আনার জমিদার-ম্যানেজার অন্নদাবাবু, নোয়াখালীর অন্তর্গত দেবপাড়ার প্রসিদ্ধ ধনী, সম্মানী ঠাকুর বংশের বড় কর্তা সারদা ঠাকুর মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

যারা কলকাতা এসে পড়ল তাদের আশ্রয়ের জন্য পি. মিত্র মহাশয় সতীশ বসুকে নির্দেশ দিলেন। তিনি ৪৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সমিতির কেন্দ্রে পলাতকদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিছুদিন অবশ্য আশুতোষ দাসগুপ্ত ও বীরেন চ্যাটার্জি শ্যামবাজারে ঘর ভাড়া করে থাকতেন। পরে সকলেই সমিতির কেন্দ্রে গিয়ে ওঠেন। আশুবাবুই পলাতক সকলকে খোঁজ-খবর করে একত্রিত করেন। পি. মিত্র মহাশয় সমিতির সভ্যদের মনোবল-বৃদ্ধি ও সুশৃঙ্খল করার জন্য এই সময় প্রাণায়াম, যোগ-সাধনা এবং চাতুর্মাস্য করাতেন। মিত্র মহাশয়ের এ-সবে বিশ্বাস ছিল এবং নিজে ভালভাবেই জানতেন।

১৯১০ সনে কানাই ধর লেনে যখন একটা বাসা করে সমিতির গৃহত্যাগী সভ্যরা বাস করছিলেন, তখন আর্থিক দুরবস্থা এমন হয়ে পড়েছিল যে, সভ্যরা মাঝে মাঝে অনাহারে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হয়েছেন। আশু দাশগুপ্ত মাঝে মাঝে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে আহার্য সংগ্রহ করে সবাই মিলে আহার করতেন। কিছুদিনের মধ্যেই ফরিদপুর শহরের কাছে একটা ডাকাতিতে কিছু অর্থলাভ হয়।

বে-আইনী ঘোষিত হওয়ায় আমাদের নারায়ণগঞ্জ

শাখা-সামাতও বিচ্ছিন্ন হয়। আমরা এর অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলাম। কালীরবাজার আমলাপাড়ার প্রধান রাস্তায় কয়েকখানা ঘরের পেছনে একটা বড় ঘর ভাড়া করলাম। প্রকাশ্য সমিতিতে যারা যোগ দিয়েছিলেন পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের মধ্যে থেকে নিষ্ঠাবান বিশ্বাসযোগ্য সভ্যগণকে বাছাই করতে আরম্ভ করলাম। এদের মধ্যে ছিল---রজনীকান্ত রায়, সীতানাথ দাস, গুণেন্দ্র সেন, আদিত্য দত্ত, বাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র ধর, নগেন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি। এই ভাড়া-করা ঘরে আমরা বিশ্বাসী সভ্যদের নিয়ে ব্যায়াম, ছোরাখেলা, যুযুৎসু, বক্সিং চালিয়ে যেতে লাগলাম। তরবারি ও বড় লাঠি-খেলা এখানে প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নি। তা ছাড়া সমিতির আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা, স্বদেশ প্রেমোদ্দীপক পুস্তক, নানা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, স্বামী বিবেকানন্দ, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির পুস্তকাবলী গোপনে পড়ানো ও আলোচনার ব্যবস্থা হ'ল। এই গুপ্ত আড্ডায় সমিতির বিশিষ্ট সাহসী কর্মী শান্তিপদ মুখোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন এসে বাস করেন।

নারায়ণগঞ্জে আমরা কিছু অস্ত্রও সংগ্রহ করলাম। এম. ডেভিড কোং-এর ম্যানেজার মরগ্যান সাহেবের বাংলো থেকে তার সমস্ত অস্ত্র আমাদের হাতে এসে পড়ল। আরও কয়েক জায়গা থেকেও রিভলবার সংগৃহীত হয়। জার্মানী থেকে রিভলবার আনার চেষ্টা করতে গিয়ে আমার সহপাঠী ব্রজবল্লভ দাস কারাদণ্ড লাভ করে। কয়েকটা রিভলবার ডাকে আসে। পুলিশ টের পেয়ে ডাক-পিওনকে দিয়ে বিলি করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজবল্লভকে গ্রেপ্তার করা হয়। তখন এর বয়স পনেরো বৎসরের বেশী নয়।

তখন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ছিলেন নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সাটিরপাড়া গ্রামে হাইস্কুলের ছাত্র। তিনি, যদুনাথ চক্রবর্তী ও বিনোদ কিছু অস্ত্রসহ নারায়ণ-গঞ্জ নদীতে একটা নৌকায় গ্রেপ্তার হয়। পরে পুলিশ তাদের নামে নৌকা চুরির মিথ্যা মামলা দায়ের করে এবং দণ্ডিত করে। পুলিশের সহায়ক মুসলমান গুণ্ডার সঙ্গে মারামারিতে একজন নামকরা গুণ্ডা আহত হয়। তার ফলে মামলায় আদিত্য দত্ত প্রভৃতির সাজা হয়।

১৯০৯ সনে রাজেন্দ্রপুর ট্রেন-ডাকাতি হয়। নারায়ণ-গঞ্জ থেকে কিছু টাকা ময়মনসিংহ যাওয়ার কথা ছিল। ট্রেন রাজেন্দ্রপুর ষ্টেশনের কাছাকাছি আসতেই টাকা নিয়ে আক্রমণকারীরা গাড়ী থামিয়ে রেল-লাইনের দু'পাশের শালবনের মধ্য দিয়ে পালিয়ে যায়। ইহাই আমাদের দেশে প্রথম ট্রেন-ডাকাতি। দেশে খুবই উত্তেজনা হয়। এ প্রসঙ্গে সুরেশ সেনের নাম খুব প্রসিদ্ধি লাভ করে। নারায়ণগঞ্জে রজনীকান্ত রায়, সীতানাথ দাস এবং সম্ভবত গুণেন্দ্র সেন গ্রেপ্তার হয়। যদিও এরা ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করে। পরে পূর্ববঙ্গ সরকার সীতানাথ দাসকে ঢাকা কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এর পরেই নারায়ণগঞ্জের নিকট গোপচরে ধলেশ্বরী নদীর উপর ডাকাতি হয়। এবারও রজনীকান্ত রায় এবং গুনেন্দ্র সেন প্রভৃতি গ্রেপ্তার হয় কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করে।

এই সময়েই সমিতির পুনর্গঠন হয়। মাখনলাল সেন সমিতির প্রধান নেতা হন। তিনি ছিলেন তার নিজ-গ্রামে বিক্রমপুরের সোনারং গ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এই বিদ্যালয় ও স্কুল-বোর্ডিং হয় সমিতির প্রধান কেন্দ্র। কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে অনেক পলাতক বিচ্ছিন্ন সভ্য ফিরে এলেন সোনারং কেন্দ্রে। স্কুলের সব শিক্ষকই সমিতির বিশ্বাসযোগ্য গৃহ-ত্যাগী সভ্য ছিলেন এবং ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে। ঢাকা কেন্দ্রের বজ্রপুরীর মতই আবার সোনারং কেন্দ্র গড়ে উঠল।

তখন নেতৃত্ব-স্থলে মাখনবাবুর পরেই স্থান ছিল নরেন্দ্রমোহন সেনের। তার দক্ষতা, উৎসাহ এবং দৃঢ়সঙ্কল্পতার ফলে সমিতি পুনরায় নব-জীবন লাভ করে। নরেনবাবুর নেতৃত্বেই রাজনগর, মোহনপুর বাজার, ঘড়িসার এবং আরও কয়েকটা ডাকাতি সাফল্যলাভ করায় সমিতি কিছু অর্থলাভ করে। সোনারং-এ সমিতির কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় নারায়ণগঞ্জের শাখা তার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং সোনারং-এর নেতৃত্বাধীনে চলতে থাকে। কিছু-দিনের মধ্যে পুলিনবাবু মুক্তিলাভ করে ঢাকায় এসে সমিতির সভ্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে সমিতির নানা জেলার সভ্যগণকে সোনারং কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করতে নির্দেশ দেন।

নারায়ণগঞ্জে পুলিসের উৎপাত ভীষণ বৃদ্ধি পেতে লাগল। কয়েকজন সভ্য বিশেষ করে, সীতানাথ দাস ও আদিত্য দত্তের অবস্থা এমন হ'ল যে, ওদের কাজ-কর্ম একেবারে বন্ধ হওয়ার উপক্রম। বাধ্য হয়ে সোনারং কেন্দ্রকে খবর দিলাম, যদি গৃহত্যাগী সভ্যের প্রয়োজন

থাকে তবে ওদেরকে অবিলম্বে পাঠা'তে পারি। যদিও আমরা কয়েকজন সভ্যই গৃহত্যাগ করার জন্য সদাসর্বদা প্রস্তুত ছিলাম তথাপি আমি এবং আরও জনকয়েক তখনও পুলিসের তেমন সন্দেহের পাত্র হয়ে দাঁড়াই নি। সুতরাং আরও কিছুদিন আমাদের এখানে থেকেই কাজ-কর্ম চালান সম্ভব ছিল। এমনি অবস্থায় একদিন নলিনী-কিশোর গুহ মহাশয় সন্ধ্যার সময় আমাকে সংবাদ দেন সীতানাথ দাসকে গৃহত্যাগ করিয়ে অবিলম্বে সোনারং পাঠাবার জন্য। সীতানাথ দাসকে ডেকে কেন্দ্রের নির্দেশ জানালাম। সে সানন্দে সেদিন শেষ রাত্রির অন্ধকারে পিতামাতা, ভাইবোন, শয্যায় শায়িতা যুবতী স্ত্রী সব পরিত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের অতি কঠিন জীবন-যাপনের জন্য গৃহত্যাগ করলেন। তিনি ছিলেন তার পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, সংসারের ভরসাস্থল। ছাত্র হিসেবেও তিনি ছিলেন মেধাবী। সোনারং কেন্দ্রে কিছুদিন থেকে তিনি গেলেন ফেণী মহকুমা শহরের স্কুলের শিক্ষকতা কার্য নিয়ে সমিতির কাজ করবার জন্য। সেখানে তিনি পরিচয় দিয়েছিলেন তার ঢাকা কলেজের সহপাঠী সুরেন্দ্র-কিশোর দাসের নামে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় দুজনেই পাস করেছিলেন। সুতরাং সেখানে অনুসন্ধান করলে হঠাৎ প্রকাশিত হওয়ার ভয় ছিল না। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সীতানাথ দাসের পক্ষে পলায়ন করাও খুব সহজ কাজ ছিল না। পুলিস যে শুধু তাকে সারাদিন অনুসরণ করত তা নয়, রাত্রিতেও মাঝে মাঝে এসে জাগিয়ে দেখে যেত, ঠিক বাড়িতে আছে কিনা।

কিছুদিনের মধ্যেই পুনরায় খবর পেয়ে আদিত্য দত্তকে সোনারং কেন্দ্রে পাঠাই সীতানাথ দাসের মত। ক্রমে রমেশ আচার্য, রবীন্দ্র সেন, রমেশ চৌধুরী প্রভৃতি গৃহত্যাগ করে সোনারং গমন করেন।

সোনারং বোর্ডিং-এ ঠাকুর-চাকর রাখবার নিয়ম ছিল না। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদেরই সব কাজ করতে হ'ত। গৃহত্যাগ করে সোনারং বোর্ডিং-এ গিয়ে অনেক সভ্যকেই প্রথমে পাচক ও ভৃত্যের কাজ করতে হত। আহার, বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদে বিলাসিতা থাকতে পারত না। গৃহত্যাগী সভ্যদের সোনারং কেন্দ্রে কিছুদিন থাকবার পর মফঃস্বলে সমিতির কাজে পাঠান হ'ত।

১৯১০ সনের এপ্রিল মাসে আমার পিতৃদেব পরলোক গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের এক অধ্যায় শেষ হয়ে যায়। যদিও আমার বয়স তখন মাত্র ষোল, কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে আমার উপরই সব এসে গেল। যদিও মাতৃদেবী সংসার চালাবার মত বুদ্ধি ও ক্ষমতা রাখতেন কিন্তু একজন পুরুষ তত্ত্বাবধায়কের একান্তই প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায় কখনও জানতে পারি নি কি আছে আর নেই।

সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করে এবং যাদের সঙ্গে লেন-দেনের সম্পর্ক ছিল তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলাম যে, বুদ্ধি করে চলে পিতৃদত্ত অর্থ ঠিকভাবে খাটাতে পারলে শুধু পরিবার প্রতিপালনই সম্ভব হবে তা নয়, প্রচুর ধন-সম্পত্তির মালিক হয়ে সুখে দিনযাপন করতে পারব। আর একটা কথা বুঝতে পারলাম এই যে, কেবল শোচনীয় দারিদ্র্যই বিপ্লবী-জীবনের অগ্রগতির প্রতিবন্ধক নয়, প্রচুর ধন-সম্পত্তিও সমভাবে বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়।

পিতৃদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমি জ্বরাক্রান্ত হয়ে বহুদিন শয্যাশায়ী ছিলাম। শুয়ে শুয়ে সংসারের ভবিষ্যৎ, নিজের কর্তব্য ভেবে স্থির করলাম কোন প্রলোভনেই বিপ্লবী-জীবনের যে ব্রত গ্রহণ করেছি তা থেকে বিচ্যুত হব না। এ বিষয়ে আমার মাতৃদেবীর কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি। তিনি বললেন, "তুমি তোমার কর্তব্য করতে থাক। কোন কিছুর জন্যই তোমাকে ব্রত পরিত্যাগ করতে হবে না। আমাদের দিন একরকমে চলে যাবে।" এমনি করেই তিনি আমায় চিরকাল সাহায্য করেছেন এবং উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি সমস্ত বিপ্লবী যুবকদেরই নিজের সন্তানের মত দেখতেন। সেকালের বিপ্লবীরাও তাকে মায়ের শ্রদ্ধা দান করেছেন। পরবর্তী জীবনে যখন আমি বছরের পর বছর কারাগারে দিন কাটিয়েছি তখনও আমার অনুপস্থিতিতে তিনি বিপ্লবীদের আশ্রয়, আহার ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কোনদিনই তাকে আমি ভীত হতে দেখি নি। পুলিশের অত্যাচার তিনি উন্নতশিরে বহন করেছেন। তার চারিপুত্রের মধ্যে যখন তিন পুত্রই কারাগারে তখনও তিনি দিশেহারা হন নি। কয়েক বার এমন হয়েছে যে, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়ার কাজে ট্রেনে ষ্টীমারে যাতে বিপদ না ঘটে সেজন্য মা রিভলবার, পিস্তল ইত্যাদি আমাদের কাছ থেকে নিজের কাছে রাখতেন—"মেয়েদের ত সন্দেহ করবে না, আমার হাতে দে।"

শুধু মা ও ভাইরা নয়, আমার ভগ্নিপতি ঢাকার উকীল মনোরঞ্জনবাবু অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং তার বাসা সমিতির একটা আশ্রয় কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ঢাকার শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার আপন পিসতুত ভাই। ছেলেবেলা থেকেই দেশপ্রেমের মধ্য

দিয়ে অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। মনোরঞ্জনবাবুর বাসায় একজন বোবা থাকত। সে কলকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় থেকে কিছু কথা বলতে শিখেছিল। সে অনেককেই চিনত, কিন্তু গোয়েন্দা-পুলিশ যখন তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে নানা প্রলোভন ও ভয় দেখাত, সে কোনদিনই বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। আমাদের বাড়ির ভৃত্যদের বিশ্বস্ততার কথা উল্লেখ করেছি। একবার কেবল আমাদের এক ভৃত্যের গতি-বিধিতে মা সন্দিহান হয়ে এক ঘরে আবদ্ধ করে বললেন —"সমস্ত সত্যি করে বল, নইলে এখনই তোকে মেরে ফেলা হবে। আমি হুকুম দিয়ে তোকে হত্যা করাব।" ভয়ে সমস্ত স্বীকারোক্তি করে বলে যে, সে পুলিশের ডেপুটি-সুপার মনোমোহন চক্রবর্তীর নিযুক্ত লোক। অনেক চেষ্টা করে সে এ বাড়িতে নিযুক্ত হয়েছে। সে গোয়েন্দা-পুলিশের নির্দিষ্ট বেতন ও ভাতা পায়। আর বিপজ্জনক কাজে নিযুক্ত আছে বলে কিছু অতিরিক্ত টাকা পায়। পরে আমার মায়ের পা জড়িয়ে ধরে বলে —"আমায় রক্ষা করুন, প্রাণে মারবেন না। জীবনে আমি আর এমন কাজ করব না। সব ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে যাব।" বাড়ির সকলকে সতর্ক করে দিয়ে মা তাকে তার প্রাপ্য বেতন দিলেন ও চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন।

ঢাকায় আমাদের পাড়ায় আশে পাশের সকলের সঙ্গে আমরা সৌহার্দ বজায় রেখে চলতাম। মা ও ভগ্নিরাও এ সমস্ত বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে রাখতেন যাতে বিপদের সময় সাহায্য পাওয়া যায়। আমাদের বাড়ীর সামনে যাতে অবাঞ্ছনীয় ভাড়াটে না আসতে পারে, তার ব্যবস্থা দেখতেন মনোরঞ্জন বাবু। পাড়ায় কয়েক ঘর মুসলমান গাড়োয়ান বাস করত। এদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা অত্যন্ত অশ্লীল ও বিরক্তিকর ছিল। পাড়া ত নোংরা করে রাখতই, সুবিধে পেলে ছোটখাট জিনিসও চুরি করত। আমাদের বাড়ি থেকেও দু'একবার করেছে। পাড়ার লোক এদেরকে তুলে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে নানা ভাবে চেষ্টা করেছে। কিন্তু মনোরঞ্জন বাবুর চেষ্টায় এ সমস্ত দরিদ্র মুসলমান বাস্তুহারা হয় নি। পুলিশ এদেরকে হাত করে আমাদের বাড়ির তথ্য জানবার চেষ্টা করেছে। বাড়ি এবং আস্তাবলে বসে গোয়েন্দারা আমাদের বাড়ীর উপর নজর দিতে প্রচেষ্ট হয়েছে, কিন্তু কোন দিনই এরা বিশ্বাসঘাতকতা করে নি। যদিও এরা সাধারণত অপরাধ-প্রবণ লোক ছিল, চুরির দায়ে প্রায়ই থানায় যেতে হ'ত এবং পুলিশের কুনজরে পড়লে রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যেত কিন্তু কোনদিনই আমাদের গতিবিধির খবর পুলিশকে দেয় নি। বরং তাদের খবরই আমাদের কাছে অনেক সময় পৌঁছে দিয়েছে। সেকালে এত মোটর ছিল না। বড় রকমের খানা-তল্লাসীতে বহু পুলিশের যাতায়াতের জন্য অনেক ঘোড়ার গাড়ির প্রয়োজন হত। এ জন্য ভাড়াটিয়া গাড়ির গাড়োয়ানরা পুলিশের গতি-বিধি কিছু কিছু টের পেত। অনেকবার অনেক খবরই তাদের কাছ থেকে পেয়েছি। মনোরঞ্জন বাবুর গ্রেপ্তারের আয়োজনের খবর এক গাড়োয়ানই এসে প্রথম দিয়ে যায়। কাদির, লালু মিঞার কথা আজও ভুলতে পারি নি।

বহু বৎসর পরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় যখন এই সমস্ত মুসলমানের বাসস্থান, গাড়ি প্রভৃতি ভস্মীভূত হওয়ার খবর কারাগারে বসে পাই তখন বাস্তবিক পক্ষে মনে ব্যথা পেয়েছিলাম। ১৯৪৬ সনে কারামুক্তির পর ঢাকা ও কলকাতায় যে কুখ্যাত গ্রেট্ কিলিংয়ে হাজার হাজার লোক নিহত হয় সেই আগষ্ট মাসে উক্ত লালু মিঞা—সে তখন বৃদ্ধ—তার নাতিকে কোলে নিয়ে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার মুক্তি সংবাদ পেয়ে। সেদিন আমি আমার মনের আবেগ রুদ্ধ করতে পারি নি। লালু মিঞাকে বুকে জড়িয়ে ধরে গভীর পরিতৃপ্ত হলাম। কিন্তু হিন্দুপাড়া থেকে সে আজ আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না ভেবে ব্যাকুল হলাম। শেষে নিজেই তাদেরকে মুসলমান পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে দিলাম।

আমাদের বাসা নারায়ণগঞ্জ থেকে উঠে এসে ঢাকায় আমার ভগ্নিপতি মনোরঞ্জন বাবুর পাশাপাশি হয়। খাওয়া-দাওয়া বহুদিন পর্যন্ত একসঙ্গেই হ'ত। দলের অনেক সভ্য প্রতিদিন আমাদের বাড়ি আহার করতেন। একটা নিয়মই ছিল যে, প্রতিদিন অতিরিক্ত চারজন লোকের আহার্য প্রস্তুত থাকত। সমিতির লোকের জন্যই এ ব্যবস্থা হয়। যদি চারজনের বেশী আসত এবং মেয়েদের পূর্বে আসত তবে অতিথির আহার শেষ হওয়ার পর পুনরায় রান্না হত। আমরা জেলে যাওয়ার পরও মা ও ভগ্নী এ নিয়ম রেখেছিলেন। দলের অনেক বিশিষ্ট সভ্য ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রমেশ চৌধুরী, আশু কাহিলী প্রভৃতি আরও অনেকে ঢাকায় এলে সরাসরি আমাদের বাসায় এসে উঠতেন—আমরা বাড়ি থাকি না থাকি তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না।

ক্রমশ:

রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী

প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী ॥ পূর্বানুবৃত্তি

শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীপার্থ বসু

এই সূচীতে উল্লিখিত রচনাগুলি পরে রবীন্দ্রনাথের কোন্ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, রচনার নামোল্লেখের পর তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেগুলি এখনও রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেগুলি 'অপ্রকাশিত' বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের যতগুলি গানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সবই গীতবিতান তিন খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে, সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের নির্দেশ স্বতন্ত্র দেওয়া হইল না, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। ছোটগল্পগুলির অধিকাংশ গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত, তাহারও গ্রন্থাকারে প্রকাশ-নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। অধিকাংশ স্বরলিপিও স্বরবিতানে সংকলিত হইয়াছে।

এইরূপ তালিকায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া যাইবার প্রভূত সম্ভাবনা, কেহ যদি কোনো ভ্রম লক্ষ্য করেন তবে তাহা সংকলয়িতাদের গোচরীভূত করিলে তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন।

১৩২১

[illegible]

গান। 'পোহাল পোহাল বিভাবরী'

স্বরলিপি

[১] শুধু তোমার বাণী নয় গো(১)

[২] পোহাল পোহাল বিভাবরী

স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]

মুক্তি। 'যখন আমায় হাতে ধরে'

বলাকা

স্বর্গ। 'স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই'

বলাকা

চৈত্র

প্রেমের বিকাশ। 'জানি আমার পায়ের শব্দ'

বলাকা

১৩২২

বৈশাখ (১০)

পল্লীর উন্নতি

'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলীর প্রথম অধিবেশনে কথিত ও তৎপরে বক্তামহাশয়ের দ্বারা প্রবাসীর জন্য লিখিত।'

অপ্রকাশিত

অগ্রণী। 'ওরে তোদের ত্বর সহে না আর'

বলাকা

যাত্রাগান। 'আনন্দগান উঠুক তবে বাজি'

বলাকা

স্বরলিপি ও গান। 'ওগো দখিন হাওয়া', ফাল্গুনী

স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যৈষ্ঠ

স্বরলিপি। 'ধীরে বন্ধু গো ধীরে', ফাল্গুনী

স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আশ্বিন

দেওয়া-নেওয়া। 'তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে'

বলাকা

কার্তিক

পথভোলা। 'কোন্ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ'

গান

ডাক। 'তোমার নয়ন আমায় বারে বারে'

গান

---

(১১) পৌষ সংখ্যা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত

(২) এই সংখ্যায় হারামণি নামে নূতন বিভাগ প্রবর্তিত হয়— 'এই বিভাগে আমরা অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাচীন কবির বা নিরক্ষর স্বল্পাক্ষর গ্রাম্য কবির উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিব।'

নিম্নে প্রকাশিত গানটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জমিদারী শিলাইদহের পোস্ট অফিসের ডাক-হরকরা গগন গাহিয়া ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিত। এই গানটি ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা সংগৃহীত। এই সঙ্গে গানটির স্বরলিপি ও চিত্র প্রকাশিত হইল, সে দুটিও দিনেন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দেরই রচিত।'

গানটি 'আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।' জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পূর্ণতর পাঠ মুদ্রিত।

আশ্বিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত লালন ফকিরের ছয়টি গান প্রকাশিত হয়।

অগ্রহায়ণ

নিশীথ রাতের বাদলধারা
গান

রাতে ও সকালে। 'কাল রাতের বেলা গান 'এল মোর মনে'
গান

পৌষ

ঝড়ের খেয়া। 'দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন'
বলাকা

চৈত্র

খোলা জানালায়। 'আমার মনের জানলাটি আজ'
বলাকা

মাধবী। 'কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে'
বলাকা

১৩২৩

বৈশাখ

যৌবন। 'যৌবন রে তুই কি রবি'
বলাকা

বাংলা বানান।

'আমাদের এই যে দেশকে মুসলমানেরা বাঙ্গালা বলিতেন তাহার নামটি বর্ত্তমানে আমরা কিরূপ বানান করিয়া লিখিব' এ বিষয়ে ১৩২২ চৈত্র সংখ্যা প্রবাসীতে প্রকাশিত বীরেশ্বর সেনের আলোচনার 'জবাবদিহি'।
অপ্রকাশিত

গান ও স্বরলিপি। 'তুমি কোন্ পথে যে এলে'
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩২৪

বৈশাখ

চির-আমি। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন'
গান

গান ও স্বরলিপি। 'এমনি করেই যায় যদি দিন'
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাদ্র

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম
কালান্তর। পূর্বে স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রচলিত ছিল।

গান। 'দেশ দেশ নন্দিত করি'

কার্তিক

[গান ও] স্বরলিপি। 'এই তো ভালো লেগেছিল'
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাজা রামমোহন রায়

২৭ সেপ্টেম্বর রামমোহন মৃত্যু-বার্ষিকীতে রামমোহন লাইব্রেরিতে সভাপতির অভিভাষণ। তত্ত্বকৌমুদী ও সঞ্জীবনী পত্রিকা হইতে বক্তৃতার তাৎপর্য বিবিধ প্রসঙ্গে (পৃ ১১৪-১৫) পুনর্মুদ্রিত। সঞ্জীবনীতে প্রকাশিত তাৎপর্য ভারত-পথিক রামমোহন রায় (১৩৬৬ সংস্করণ) পুস্তকের গ্রন্থপরিচয়ে মুদ্রিত।

রাজনারায়ণ বসু

বার্ষিক স্মৃতিসভায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা।
সঞ্জীবনী হইতে বক্তৃতার চুম্বক বিবিধ প্রসঙ্গে (পৃ ১১৬-১৭) পুনর্মুদ্রিত।
অপ্রকাশিত

অগ্রহায়ণ

ছোট ও বড়
কালান্তর

স্বরলিপি। 'আমি চঞ্চল হে'
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পৌষ-মাঘ

মঞ্চাকে **ন**। 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন'
ন্দুপাড় জ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রচিত গান।
[illegible]নপত্র হইতে কবির হস্তাক্ষরের পুনর্মুদ্রণ।
পৃ ২৩০

মাঘ

স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
কালান্তর ১৩৫৫ সংস্করণ

বাণী। 'বল বল বন্ধু বল'
গান

ফাল্গুন

[গান ও] স্বরলিপি। 'কেন সারাদিন ধীরে ধীরে'
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

চৈত্র

বিজয়ী
পূরবী

[গান ও] স্বরলিপি। 'ওহে সুন্দর মরি মরি'
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩২৫

বৈশাখ

'সে কোন্ বনের হরিণ ছিল আমার মনে'
গান (১৬)
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিরুদ্দেশ (১৬)
পলাতকা, 'পলাতকা'

জ্যৈষ্ঠ

যেনাস্যাঃ পিতরো যাতাঃ
পলাতকা, 'নিষ্কৃতি'

আষাঢ়

মালা
পলাতকা

শ্রাবণ

আসল
পলাতকা

অগ্রহায়ণ

ভূমিলক্ষ্মী
ভূমিলক্ষ্মী। আশ্বিন ১৩২৫ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত। (১৭)
অপ্রকাশিত

১৩২৬

আষাঢ়

গান। 'এই বুঝি মোর ভোরের তারা'

বাতায়নিকের পত্র
কালান্তর

কালবৈশাখী। 'ঐ বুঝি কালবৈশাখী'
গান

[রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]
পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ-লিখিত অভিনন্দনপত্র। বিবিধ প্রসঙ্গে (পৃ ২৯১) পুনর্মুদ্রিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র
নাইটপদবী পরিত্যাগপত্র (ইংরেজি) বিবিধ প্রসঙ্গে (পৃ ৩০১) পুনর্মুদ্রিত

শ্রাবণ

কর্তার ভূত
লিপিকা

আশ্বিন

পায়ে-চলার পথ
লিপিকা

কার্তিক

মেঘদূত
লিপিকা

শক্তিপূজা
কালান্তর

অগ্রহায়ণ

শিবনাথ শাস্ত্রী
অপ্রকাশিত

একটি চাউনি
লিপিকা

একটি দিন
লিপিকা

পৌষ

ভাষাতত্ত্ব আলোচনা
১৩২৬ আশ্বিন-কার্তিক শান্তিনিকেতন পত্রে লিখিত ও প্রবাসীতে উদ্ধৃত 'বাংলা কথ্যভাষা', 'অনুবাদচর্চা' প্রভৃতি প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির মন্তব্য প্রসঙ্গে আলোচনা।
অপ্রকাশিত

বাঙালীর সাধনা
'শ্রীহট্ট টাউনহল প্রাঙ্গণে জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে বক্তৃতা—৬।১১।১৯১৯
অপ্রকাশিত

ফাল্গুন

সাহিত্য-বিচার
রবীন্দ্ররচনাবলী ৮, 'ঘরে-বাইরে'র গ্রন্থপরিচয়

১৩২৭

বৈশাখ

গল্প বল
লিপিকা, 'গল্প'

মাধবী। 'মাধবী হঠাৎ কোথা হতে'
গান

---

(১৬) দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোষা হরিণ পলাতক অবস্থায় নিহত হইলে লিখিত। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ এই তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য তাঁহার রবীন্দ্র-সংগীত গ্রন্থ, ১৩৬৫ সংস্করণ পৃ ১৭। নিরুদ্দেশ গল্পটির মূলেও এই ঘটনা।

(১৭) প্রবাসী পত্রে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিভিন্ন পত্র হইতে রবীন্দ্রনাথের রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকল পত্রিকার অনেকগুলি এখন বিলুপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য। সে-সকল পত্রের স্বতন্ত্র সূচী প্রস্তুত করা এখনই সম্ভব নহে, সেই সকল উদ্ধৃত রচনার উল্লেখ এই সূচীতে করা হইল। সবুজপত্র, শান্তিনিকেতন পত্র প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত রচনার উল্লেখ করা হইল না। সেগুলির স্বতন্ত্র তালিকা অন্যত্র মুদ্রিত হইয়াছে বা শীঘ্রই হইবে।

ভাদ্র

গান। 'আমার বোঝা এতই করি ভারী'
আষাঢ় সংখ্যা মোসলেম ভারত হইতে উদ্ধৃত।

আশ্বিন

মীমাংসা [নাটক ও উপন্যাসে প্রভেদ] (১৮)
অপ্রকাশিত

স্বাবলম্বন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত
বিবিধ প্রসঙ্গে (পৃ ৫০৭) মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের পত্র। অপ্রকাশিত।

১৩২৮

বৈশাখ

স্বরলিপি [ও গান]। 'বসন্ত তোর শেষ করে দে রঙ্গ'
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি। 'এবার তোমাদের ছুটি কবে আরম্ভ', ২৪ ফাল্গুন, ১৩২৭। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের উদ্দেশে তথাকার সর্বাধ্যক্ষকে [জগদানন্দ রায়কে] লিখিত। (১৯)

আষাঢ়

রবীন্দ্রনাথের পত্র

১ 'দেশের থেকে একজনের চিঠিতে'। ৬ মে ১৯২১

২ 'অনেকদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে'
'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কোনো শিক্ষককে লিখিত।' (২০)

স্বরলিপি 'এসো এসো দিয়ে এসো বঁধু হে!'
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিলাতে রবীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ
The Venturer মাসিক পত্রের প্রতিনিধির সহিত অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা। শ্রীসীতা দেবী কর্তৃক অনূদিত।

শ্রাবণ

স্বরলিপি। 'বড় বেদনার মত'
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাদ্র

নতুন পুতুল
লিপিকা

আশ্বিন

শিক্ষার মিলন
কালান্তর ১৩৫৫ সংস্করণ

গান ও স্বরলিপি। 'হায় গো ব্যথায় কথা'
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্তিক

সত্যের আহ্বান
কালান্তর

ভুল স্বর্গ
লিপিকা

গান। 'হৃদয়ে ছিলে জেগে'

খেলা ভোলা
শিশু ভোলানাথ

নামের খেলা
মোসলেম ভারত ভাদ্র ১৩২৮ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।
লিপিকা

অগ্রহায়ণ

গান। 'সারা নিশি ছিলেম শুয়ে'
মোসলেম ভারত আশ্বিন ১৩২৮ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

মাঘ

শিশু ভোলানাথ
শিশু ভোলানাথ

গান। 'আকাশে আজ কোন্ চরণের'
প্রভাতী শীত সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত।

গান। 'শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন'
বেতাল মাঘ ১৩২৮ সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত

চৈত্র

ফাগুন পূর্ণিমা। তিনটি গান

১ ফাগুনের সুরু হতেই
২ এনেছে ঐ শিরীষ বকুল
৩ রাতে রাতে আলোর শিখা

[ক্রমশঃ]

---

(১৮) প্রবাসীতে ১৩২৭ বৈশাখ সংখ্যা হইতে 'বেতালের বৈঠক' নামে একটি বিভাগ প্রবর্তিত হয়- 'এই বিভাগে চিকিৎসা ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর ছাড়া সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর ছাপা হইবে।'

ভাদ্র সংখ্যায় শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকের একটি 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশিত হয়—'নাটক ও উপন্যাসে প্রভেদ কি?' আশ্বিন সংখ্যায় বেতালের বৈঠকে রবীন্দ্রনাথ ইহার 'মীমাংসা' করেন।

(১৯) পত্রখানি অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে লিখিত। এই পত্রের বক্তব্য প্রসঙ্গে তৎকালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর আলোচনা ও ঐ আলোচনা সম্বন্ধে "সম্পাদকের মন্তব্য" আষাঢ় সংখ্যায় (পৃ ৪৩০-৩২) দ্রষ্টব্য।

(২০) এই চিঠি দুটিও অসহযোগ আন্দোলন প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথের পত্রলেখা

শ্রীনিখিলকুমার নন্দী

'আমারি আঁকা পত্রলেখা, আমারি মালা বুকে।' রবীন্দ্রনাথ যখন কবিতার চরণে এ কথা বলেন, গদ্যে তখন তারও চেয়ে বেশি বলেন। এখানে কবিতার ব্যঞ্জনাধর্মে আশ্রিত আছে দেশে-দেশে সাংস্কৃতিক মাল্য-বিনিময়ের ছবি, যা ইতিহাস। এবং গদ্যে এই ইতিহাস-বর্ণনার বাহুল্য স্বপ্রকাশ। জাভাযাত্রীর পত্রে ১০, ১১, ১২ সংখ্যক তিনটি বিস্তৃত চিঠির বিশদ বিবৃতিতে উক্ত চরণাশ্লিষ্ট 'সাগরিকা' কবিতাটির মর্ম নিহিত। যেহেতু কবিতার প্রাণস্পর্শে যা সংকেতে সাধ্য, পত্রপ্রবন্ধের মনস্বিতায় তা বিশ্লেষণসাপেক্ষ।

এখানেই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্যের, আমি যাকে পত্রলেখা বলতে চাই, দুই-কালবর্তী মেরু-পর্যায় ও মেরুস্বভাব স্বচ্ছ হয়ে আসে। একপ্রান্তে প্রাণের সহজ প্রবর্তনা, অন্যপ্রান্তে মনের সংগ্রামী পথনির্মাণ। একপ্রান্তে মূলত কবির লেখা 'ছিন্নপত্র,' অন্যপ্রান্তে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লেখা 'কন্‌গ্রেস' (১৯৩৯) নামাঙ্কিত কবিকর্মীর পত্রপ্রবন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ জন্মাবধি বাঙালী কবি, ভারতীয়; অথচ বিশ্বসভায় তাঁর নিত্যনিমন্ত্রণ, নিত্যবসতি। তাঁর চিঠি-পত্রে আগাগোড়া যখন ও যেখানে যতটুকু দেশপ্রীতি, জাতীয়তা ও অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠেছে, তা যত উদ্বেল ও গভীরই হোক, তাকে জড়িয়ে ও ছাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছে অস্ফুট আত্মবিস্মৃতি-সাধনার সুদূর আকাঙ্ক্ষা এবং কোথাও বা স্পষ্টত আত্মমূলকতার অস্বীকৃতি, স্বদেশ-স্বকাল যাবতীয় সব স্বল্পতার চূর্ণিত পরাহত ধ্যানমূর্তি, ভূমাসন্ধান ও সন্দর্শন। এবং এই প্রমায় পৌঁছতে তিনি যেমন জীবনের বাঁকে বাঁকে বহুবার দেশসীমা পেরিয়ে প্রবাসতীর্থ তর্পণে মনোযোগী হয়েছেন, তেমনি প্রবাসে গিয়ে স্বদেশভূমির ব্যাকুল আহ্বানকে, যার জন্ম তাঁর স্বদেশদরদী মনের অতুলনীয় উদার ভালোবাসায়, বার বার আলোড়িত করেছেন আপন অস্তিত্বে। দেশে দেশে ঘর খুঁজলেও আপন দেশেই তাঁর শাশ্বত বাসাটিকে পুনর্বার অধিকার করতে যেন চিরদিনই ভারতপথিক-মন উদাস ও উন্মুখ হয়েছে। এমন বহু নজিরের মধ্যে একটিকে এখানে উপস্থিত করা যাক:

'এখান থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে মনে মনে ভাবছি, দ্বীপটি সুন্দর। এখানকার লোকগুলিও ভালো, তবুও মন এখানে বাসা বাঁধতে চায় না। সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষের আহ্বান মনে এসে পৌঁছচ্ছে। শিশুকাল থেকে ভারতবর্ষের ভিতর দিয়েই বিশ্বের পরিচয় পেয়েছি বলেই যে এমন হয় তা নয়; ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে আলোতে, নদীতে প্রান্তরে, প্রকৃতির একটি উদারতা দেখেছি; চিরদিনের মতো আমার মন তাতে ভুলেছে। সেখানে বেদনা অনেক পাই, লোকালয়ে দুর্গতির মূর্তি চারিদিকে; তবু সমস্তকে অতিক্রম করে সেখানকার আকাশে অনাদিকালের যে কণ্ঠধ্বনি শুনতে পাই, তাতে একটি বৃহৎ মুক্তির আস্বাদ আছে। ভারতবর্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্রতর বন্ধন, তুচ্ছতার কোলাহল, জীর্ণতার বিড়ম্বনা, যত বেশি এমন আর কোথাও দেখি নি; তেমনি উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসন-বেদী, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ। অতি দূরকালের তপোবনের ওঙ্কারধ্বনি এখনো সেখানকার আকাশে যেন নিত্য-নিশ্বসিত। তাই আমার মনের কাছে আজকের এই প্রশান্ত প্রভাত সেই দিকেই তার আলোকের ইঙ্গিত প্রসারিত করে রয়েছে।' 'জাভাযাত্রীর পত্রে'র এই ১২ সংখ্যক চিঠিতে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে ১৯২৭, ৮ই সেপ্টেম্বর যে-কথাগুলি ইতিলেখার আগে বলে গেছেন, রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনে এর ভূমিকা এক সদর্থক আলোকিত সমন্বয়ে পরিব্যাপ্ত। বিশেষত তাঁর পত্রসাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর একটি গভীর ঐক্য সুনিবিড় বিচিত্র ভূমিকা-বতরণকেও যেন মুহূর্তে আমাদের গোচরে এনে দিতে এই অংশটি সবিশেষ সক্ষম। যদি বলি 'ভারতবর্ষের আকাশে বাতাসে আলোতে, নদীতে প্রান্তরে, প্রকৃতির একটি উদারতা' যে তিনি দেখেছিলেন অথবা 'লোকালয়ে দুর্গতির মূর্তি' দেখে বেদনাহত চিত্তেও যখন 'সেখানকার আকাশে অনাদিকালের যে-কণ্ঠধ্বনি শুনতে পান' তাতে 'একটি বৃহৎ মুক্তির আস্বাদ আছে' মনে করেন তখন কি তাঁর এ-অভিজ্ঞতার পরিচয় তাঁর আদি ও অকৃত্রিম 'ছিন্নপত্রে'র পদ্মা-নদী-তীরবাসী প্রকৃতি-মানুষ-সঙ্গম-সাক্ষী দিন-রাত্রিগুলি বহন করে না? এবং এই সঙ্গে, দূরান্বয়ী

আরোপ বলে যদি না মনে হয়, বলতে ইচ্ছে করে, তাঁর 'চিঠিপত্র' পর্যায়ী বিভিন্ন সময়ের দেশচিন্তা, সাহিত্য ও সমাজসমীক্ষা, আধ্যাত্মিক রূপারূপধ্যান সমস্তকে নিংড়ে নির্জলা আবকের মত টলটল্ করছে পরের বাক্যটির নির্মোহ সত্যকথন: ভারতবর্ষের নীচে যে ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও জীর্ণতা তার ওপারে আছে 'বিরাটের আসনবেদী, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ'; আর 'অতি দূর-কালের তপোবনের ওঙ্কারধ্বনি এখনো সেখানকার আকাশে যেন নিত্য-নিশ্বসিত।' এই সংযোগসাধন যে কষ্টকল্পিত নয় তার সমর্থনে আমি সমকালবর্তী 'চিঠিপত্র' ধারার বিভিন্ন প্রাপকসাপেক্ষ খণ্ডরচনা আস্বাদনে পাঠক-দের একসঙ্গে মনোযোগী হতে বলি। তাতে পত্রলেখকের যে বিভক্ত ও অখণ্ড পরিচয় পাওয়া যাবে, তা আমার উপরি-উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথকে সুনিশ্চিত লক্ষ্য করবে বলেই মনে করি। 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে' যাঁর অঙ্কুর সেই পত্র-লেখক রবীন্দ্রনাথ তাঁর তাৎপর্যময় দীর্ঘ পরমায়ুতে বহু লক্ষ্যে-উপলক্ষে যে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখেছেন তাতে তাঁর এই খণ্ডব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি-অতিক্রমী অখণ্ড মানবচরিত্র-প্রকাশের মূল নীতি তিনি কদাপি বিস্মৃত হন নি, জীবনের কেন্দ্র থেকেই যেহেতু তার স্বতঃ উৎসার। 'ছিন্নপত্র' বা 'চিঠিপত্রে' আশ্রিত রবীন্দ্রনাথ ও পরিণত বয়সের 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি আশ্রিত রবীন্দ্রনাথ এই মহৎ নৈতিকতায় অভিন্ন। কিন্তু পত্ররচনার রীতি ও প্রকৃতি-লক্ষণে তারা এতই আলাদা যে, আমরা প্রায়শই ভুলে যাই যে, পত্ররচনাধারার পূর্ব ও উত্তর যুগে এই বিপুল রীতিগত ব্যবধান আসলে তাঁর জীবনশিল্পরচনার সাধনা ও সিদ্ধি অধ্যায়ের ফলাফল।

বিষয়টা আরো পরিষ্কার করতে গেলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটি বিরোধের মধ্যে যেতে হয়। অনেকে এমন মত পোষণ করেন বা বলেন যাতে লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের গ্রথিত চিঠিপত্র বলতে বোঝায় ও বোঝানো উচিত ছিন্নপত্র (বর্তমান ছিন্নপত্রাবলী), চিঠিপত্র ১ম-৭ম পর্যায়, ভানুসিংহের পত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তে। জাভা-যাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি, প্রভৃতি তাঁর অন্ত্যজীবনের পত্রাকার লেখাগুলি আসলে পত্র নয়। হয়ত তাঁরা বলতে চান পত্রাকার প্রবন্ধ বা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। কিন্তু 'পত্রাকার' কেন? অথচ এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের এককালীন সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, প্রবন্ধের বিষয় কখনো পত্রে বিন্যস্ত করা যায় না, উচিতও নয়। চিঠিপত্রের ৭ম খণ্ডে শ্রীমতী নির্ঝরিণী সরকারকে তিনি লিখেছেন: 'তুমি যে দুরূহ প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিয়াছ পত্রের মধ্যে তাহা বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করা অসম্ভব। আমি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছি, তাহাতে আমার মত যথাসম্ভব স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।' এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্তও তিনি পত্রমাধ্যম ব্যতিরেকেই লিখেছেন। যেমন জাভাযাত্রীর পত্র, সমকালীন পশ্চিম-যাত্রীর ডায়েরী ও তাৎপূর্বিক জাপানযাত্রী, পারস্যে, প্রভৃতি।

আসলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে স্পষ্টত পৃথক্ দুই পর্যায় আমাদের এই অস্বস্তিবোধের জনক, যেহেতু, 'ছিন্নপত্র' ও 'চিঠিপত্র' ইত্যাদির পাশে রাশিয়ার চিঠি জাতীয় পত্ররচনার প্রকৃতি-বৈলক্ষণ্য কিঞ্চিৎ হতবুদ্ধিকর। রবীন্দ্রনাথ আবাল্য গভীর পরিণতিসন্ধানী। কেবল তিনি কবি বা ভাবুক নন, তিনি যুক্তিজিজ্ঞাসু ও কর্মী। এবং জীবনের বৃহত্তর পরিণাম অন্বেষায় অসামান্য উদ্যমশীল উদ্যোগী জীবন-শিল্পী। চিঠিপত্রে সেই জীবনশিল্প রচনার প্রথম প্রগাঢ় পরিচয় ছিন্নপত্রের সজ্জয় হৃদয়-সংবাদ, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর প্রাপকভূমিকার অনুপস্থিতিতে যা অকল্পনীয়। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি শিরোধার্য:

'তোর অকৃত্রিম স্বভাবের মধ্যে একটি সরল স্বচ্ছতা আছে, সত্যের প্রতিবিম্ব তোর ভিতরে বেশ অব্যাহত ভাবে প্রতিফলিত হয়।...সহজে সত্য আকর্ষণ করে নেবার ক্ষমতাটি তোর আছে।...বায়রন মূর'কে যে-সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছিল তাতে কেবল বায়রনের স্বভাব প্রকাশ পায় নি, মূরের স্বভাবও প্রকাশ পেয়েছে—সে-সব চিঠি যত ভালোই হোক তাতে বায়রনের আন্তরিক স্বভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় নি, মূরের স্বভাবের উপর প্রতিহত হয়ে সে এক বিশেষ মূর্তি ধারণ করেছে। যে শোনে এবং যে বলে, এই দুজনে মিলে তবে রচনা হয়—তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ, তবে সে কলতান উঠে।...' ইত্যাদি (ছিন্নপত্রাবলী ১৬০)।

প্রাপকের সত্যাকর্ষক-শক্তিসাপেক্ষ এই পত্ররচনা স্বতই চিঠিপত্র সম্পর্কে আমাদের অভ্যস্ত ধারণাকে বিপর্যস্ত করে। 'সত্য মানে হচ্ছে অকৃত্রিম ভিতরের কথাটি, যে-কথাটি সব সময়ে আমরা নিজেও জানতে পারিনে—কেবল গল্প-গুজব আলাপ-পরিচয় হাসি-তামাসা নয়।' সুতরাং রবীন্দ্রনাথের চিরাচরিত পত্ররচনায় শেষোক্ত-ত্রিকূটির পরিচয় অনুপস্থিত না হলেও কখনোই যে মুখ্য হতে পারে নি তার সহেতুকতা এখানে বোধগম্য। এবং বলা বাহুল্য গল্প-গুজব আলাপ-পরিচয় হাসি-তামাসার ক্লান্তি আছে, ছেদ আছে, অবসান আছে, হয়ত অবসাদও আছে, কিন্তু অকৃত্রিম ভিতরের সত্য কথাটির কোনো বিরাম নেই,

বিচ্ছেদ নেই; সে ফিরেফিরেই নতুন, বারেবারেই নতুন।

তাই রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন প্রাপক সাপেক্ষ পত্ররচনায় তাঁদের সত্যাকর্ষক শক্তির জোরে যে অকৃত্রিম ভিতরের কথাগুলি ওজন করেছেন তাদের প্রকৃতি তাই ক্ষণে ক্ষণে বদলেছে, পরস্পর-দূরকালবর্তী রচনাই কেবল নয়, সমকালবর্তীরাও সে-সাক্ষ্য পরিচ্ছন্নভাবে বহন করে চলেছে।

এটা ঠিকই যে 'ছিন্নপত্র' ছাড়া আর কোথাও আষাঢ়ের বনবর্ষণের মাতামাতি রবীন্দ্রনাথকে এমনভাবে কখনো উদ্‌ভ্রান্ত করেনি যে, ছাপা সাড়ে তিন পৃষ্ঠার পয়লা-আষাঢ়ী বর্ষাসম্ভোগের আনন্দসংবাদ-জ্ঞাপনের পর তাঁকে পুনশ্চতে লিখতে হয়েছে, 'আসল যে কথাটা বলতে গিয়েছিলুম সেটা বলে নিই—ভয় পাস্‌নে, আবার চার পাতা জুড়ব না—কথাটা হচ্ছে পয়লা আষাঢ়ের দিন বিকেলে খুব মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। ব্যস।'

সম্পন্ন আবেগের এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে 'ছিন্নপত্রে'র কতিপয় পত্রই কেবল ধরে রেখেছে। পত্রপ্রাপকের স্বভাবগুণ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের এ সময়োচিত মনস্বিতার ভাববিহীন প্রাণবাদিতার, যা তাঁর তাৎকালিক গল্পগুচ্ছে, কবিতায়, এমন কি সাময়িকীর জন্যে প্রবন্ধ রচনায়ও নির্বিরোধে ফুটিয়ে তুলেছে, এর জড়। সতেজ যৌবনের উন্মুখ দিন-রাত্রিগুলিকে যে স্বচ্ছন্দ মুক্ত প্রসন্ন প্রকৃতিচেতনা তখন অতন্দ্র রেখেছিল তার আলো পড়েছে সেদিনকার কবিতাছত্রে: 'মনে হয় সুখ অতি সহজ সরল।' আবার পাশাপাশি সেদিন বৃহৎ দিগন্তের আলিঙ্গনে মানুষী জীবনের অচিরতা অনিত্যতা অপ্রাবিত্ৰ-জ্ঞানের আলোকশিখায় মানবভাষার, বিশেষতঃ কবিতার, সাধ্যসীমাও তিনি প্রজ্বলিত করেছেন: 'এক এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড় বড় প্রবাহ আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, তার যে একটা ধ্বনি হতে থাকে সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য। সেই জন্যে দেখেছি আমার মনের অনেক সুতীব্র সুগভীর ভাব কবিতায় লেখা হয় নি। হয়ত আমার লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে আভাসের মত প্রকাশ পেয়ে থাকবে' (ছিন্নপত্রাবলী ১২৮)। ছিন্নপত্র হ'ল রবীন্দ্রনাথের এই সূক্ষ্ম অনুভূতি-নির্ভর সুগভীর সুতীব্র ভাবের আভাসিত সমন্বয়।

কেবল কবিতা সম্পর্কে নয়, নিখিল অস্তিত্বের সমস্ত অর্থ, অনর্থ ও পরমার্থ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তদবধি অতি-প্রখর জিজ্ঞাসায় চঞ্চল হয়েছেন; ক্রমে ক্রমে সচেতন ও স্থিতপ্রজ্ঞ হয়েছেন আপন শক্তি ও দুর্বলতায়, ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত, সংসার সমাজ স্বদেশ ও জগতের ভালমন্দ ছন্দগতের সন্ধান এনেছেন, ক্ষুদ্র-বৃহতের ব্যর্থতা ও সার্থকতা বুঝেছেন, সতর্ক পদক্ষেপে গিয়ে পৌঁছেছেন স্বদেশসামা পেরিয়ে বিশ্ব ইতিহাসে, জৈব জন্ম উন্মাদনা ছাড়িয়ে মানব-জীবনের উল্লাসে। এবং পর্ব থেকে পর্বান্তর ভ্রমণে এ সত্যই স্মরণ করিয়েছেন যে, তাঁর এ ভ্রমণ দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ নয়, দূরাকাঙ্ক্ষীর অব্যর্থ পরিক্রমা। আর সে বিষয়ে তিনি নিজেও এত নিশ্চিত ছিলেন, বিচারপ্রবণ, প্রস্তুত যে, মুলতঃ হয়েও সেই ছিন্ন-পত্রের প্রকৃতিভাবুক নির্জনতার 'মেঘদূতে'র সংসর্গসাপেক্ষ হওয়ার পরমলগ্নে কেয়ার্ডের Philosophical Essays সঙ্গী করেছেন, বিতর্কবহুল রামমোহনের রচনাবলী পাঠে পদ্মাতীরের ইন্দ্রিয়-উত্তেজক আবহাওয়াকে কাজে লাগিয়েছেন এবং সমকালেই, তাঁর চিঠির সাক্ষ্যে জানা যাচ্ছে যে, বোলপুরে বর্ষণ-ব্যাকুল মনে তিনি 'সাধনা'র জন্যে 'পোলিটিক্যাল প্রবন্ধটা' লেখার তাগিদ অনুভব করছেন।

এবং এ ভাবেই দেখা গেল, অনায়াসে একদিন রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের একলা-জগৎ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে এনেছেন। একটি নির্বাচিত শ্রোত্রীর জায়গায় এখন অনেক শ্রোতা, অনেক কাজ, অনেক কর্তব্য। 'চিঠিপত্র'-পর্যায়ী দশের স্পষ্ট-সঙ্গাতুর বিচিত্ররেশ চিঠিগুলি তারই অভিজ্ঞান। এখানে তিনি কখনও সাবধানী সাংসারিকের ভূমিকায় নিজের, আত্মীয়বান্ধবের উপকার-বিধানে অধীর (মৃণালিনী দেবীকে লেখা চিঠিপত্র প্রথম; রথীন্দ্রনাথ, বেলা দেবী, প্রভৃতিকে লেখা পঞ্চম, জগদীশচন্দ্র, অবলা দেবীকে লেখা ষষ্ঠ খণ্ড দ্রষ্টব্য), কখনও সামাজিক ও সাহিত্যিক দায়িত্ব পালনে চিন্তিত, উন্নিদ্র, উদ্যোগী (চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ডের পারিবারিক ও প্রমথ চৌধুরী উদ্দিষ্ট চিঠিগুলির প্রায় সবটা পাঠ্য, ভানুসিংহের পত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তের কতকাংশ), আবার কখনও-বা আচার্যের শ্রদ্ধাসন থেকে অর্ধপরিচিতার প্রতি কল্যাণী বাণীবহনেও তিনি অকৃপণ (চিঠিপত্র সপ্তম দ্রষ্টব্য), এমন কি মৃণালিনী দেবীর সাংসারিকা সহধর্মিণী দায়িত্বের বাঞ্ছিত অটলতাকে সুখ-দুঃখ নিস্পৃহ নিষ্কাম কর্মীর আত্মিক সমুন্নতি-সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে বার বার প্রাঞ্জল ও প্রোজ্জ্বল করে তুলতেও অক্লান্ত (চিঠিপত্র প্রথম দ্রষ্টব্য)। এবং সর্বত্র তাঁর মুখেচোখে অপরাজেয়ের সুস্মিত লাবণ্য ছড়ানো, ভাষণে অবিচলিতের পরাক্রমী গৌরব, জীবনে জগতে সর্বাত্মক কৌতূহল ও অঙ্গীকারে

প্রহরারত স্থিতধী পুরুষের বিষণ্ণতালেশহীন নিশ্চল দূরদৃষ্টি।

'ছিন্নপত্রে' তিনি অনেকটাই প্রাকৃতিক ছিলেন, অপ্রয়োজনের আনন্দে ভরপুর। ক্রমে ক্রমে বাস্তব-মাহুষী প্রয়োজনের জাগতিক জটিলতায় জড়িয়ে জড়িয়ে নিজেকে করে তুললেন সাংসারিক, ব্যবহারিক 'কেজো' ভূমিকাটি আর অগোচর রইল না, অহুষঙ্গী হয়ে এল নিশ্ছিদ্র জনাকীর্ণ কর্মজীবনের ফাঁকে ধর্মজীবনের নিরালা আশ্বাস, তিনি আধ্যাত্মিক হয়ে উঠলেন। শেষ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক প্রাণবাদে ব্যবহারিকতা, বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতার সহজ সংযোগে পুরোপুরি মানবিক, বিশ্বমানবিক মনস্বিতায় উত্তীর্ণ হলেন, তাঁর মনীষা-সংসর্গে ব্যাকুল হ'ল বিশ্ববাসী। তার ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে তিনি নতুন করে লাভ করলেন নিজেকে, স্বদেশকে, শতাব্দীর সভ্যতাকে, শাশ্বত মানবতাকে। তার ইতিহাস রচনা করল, তাঁর অন্যান্য ভাবলেখার পাশে, সে জাতীয় চিঠিপত্র যাকে এতাবৎকালবাহিত চিঠিপত্রের সুরসঙ্গতিতে হয়ত হঠাৎ মেলানো যায় না, কিন্তু গভীর অভিনিবেশে ধরা পড়ে যে, সে-চিঠির চরিত্র আসলে স্বতন্ত্র-প্রাপক ভূমিকা-নির্ভর চিরাভ্যস্ত চিঠির সত্যচেহারা থেকে প্রকৃতই খুব দূরস্থিত নয়। যেমন, 'রাশিয়ার চিঠি' চিঠির ক্রম-অহুসারে স্বতন্ত্র-প্রবন্ধ-নামাঙ্কিত হয়ে একে একে যখন প্রবাসীতে বেরিয়েছিল তখন তাকে প্রবন্ধ বলে মনে হওয়ায় হয়ত ভ্রান্তি নেই, কিন্তু আজ তার গ্রন্থিত রূপে চিঠির অন্তরঙ্গ ধ্বনিনির্মাণ কি আদৌ অনুপস্থিত? তা নয়।

'তোমার মত ভদ্রমহিলাকে সাধারণ ভদ্রগোছের চিঠি না লিখে এ রকম চিঠি যে কেন লিখলুম তার কারণ চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে, দেশের দশা আমার মনের মধ্যে কি রকম তোলপাড় করছে। জালিয়ানওয়ালা-বাগের উপদ্রবের পর একবার আমার মনে এই রকম অশান্তি জেগেছিল। এবার ঢাকার উপদ্রবের পর আবার সেই রকম দুঃখ পাচ্ছি। সে ঘটনার উপর সরকারী চুণকামের কাজ হয়েছে, কিন্তু এ রকম সরকারী চুণকামের যে কি মূল্য তা রাষ্ট্রনীতিবিৎ সবাই জানে। এই রকম ঘটনা যদি সোভিয়েট রাশিয়ায় ঘটত তা হলে কোন চুণকামেই তার কলঙ্ক ঢাকা পড়ত না। সুধীন্দ্র, আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যার কোন শ্রদ্ধা কোন দিন ছিল না, সেও এবারে আমাকে এমন চিঠি লিখেছে যাতে বোঝা যাচ্ছে সরকারী ধর্মনীতির প্রতি ধিক্কার আজ আমাদের দেশে কতদূর পৌঁছেছে। যা হোক, তোমার চিঠি অসমাপ্ত রইল—কাগজ এবং সময় ফুরিয়ে এসেছে, পরের চিঠিতে এ চিঠির অসম্পূর্ণ অংশ সম্পূর্ণ করব।'

১৯৩০, ২৮শে সেপ্টেম্বর এই চিঠির শেষাংশে শ্রীরাণী মহলানবিশকে যা তিনি লিখছেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় 'সাধারণ ভদ্রগোছের চিঠি' বলতে লোকে যা মনে করে, এমন কি তিনিও, তা আর তাঁর লেখা সম্ভব নয়। স্থানকাল অবস্থার চাপে পড়ে ভঙ্গিকে বদলাতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু কেবল কবি নন। কোনদিনই দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল-চিন্তা তাঁকে ছেড়ে যায় নি, পরিণত বয়সে স্বভাবতই আরো পেয়ে বসেছে। তথাকথিত ধুরন্ধর 'রাষ্ট্র-নীতিবিৎ' তিনি না হোন, রাষ্ট্রনীতি চিন্তায় তাঁর মতামতের, অংশগ্রহণের একটি অমেয় মূল্য চিরস্বীকৃত। বিশ্বরাজনীতির ঘূর্ণাবর্তকালে তারই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁকে যে বার বার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তা কেবল তাঁর কবিত্ব-স্বীকৃতি নয়, সেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও সক্রিয়। এবং রবীন্দ্রনাথ এ-সুযোগ গ্রহণে কার্পণ্য না করে জাতির, দেশের, বৃহত্তর মানব-সম্পর্কের অবিশ্রান্ত কল্যাণসাধন করে গেছেন। সেক্ষেত্রে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মত রাজনীতিবিমুখ আধুনিক বাঙালী কবিকে যে ঘটনা ভাবায়, রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্বপ্রবণ অথচ ভারতপ্রাণ পুরুষকে যে তা উদ্বিগ্ন করবে তাতে আর আশ্চর্য কি! এবং উক্ত উদ্বেগের ছায়া এই চিঠিতে ও পরবর্তী অনেক-গুলিতে বিস্তৃত ভারতপরিক্রমায়, বিশ্বজিজ্ঞাসায়, উপস্থিত রাশিয়া সমালোচনায় উপলক্ষ্যানুগ ভাবে ভঙ্গীতে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। ১৪ সংখ্যক চিঠির ভারতপরিক্রমা লক্ষ্য করা যাক:

'দেখলুম কিছু দুঃসংবাদ পাঠিয়েছ, শরীরের এ অবস্থায় পড়তে ভয় করে পাছে ঢেউয়ের ঘায়ে ভাঙন লাগে। বিষয়টা কি তার আভাস পূর্বেই পেয়েছিলুম—বিস্তারিত বিবরণের ধাক্কা সহ্য করা আমার পক্ষে শক্ত। তাই আমি নিজে পড়ি নি, অমিয়কে পড়তে দিয়েছি।

'যে বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে টান মেরে মেরে সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখের তারা উল্টে যায়। কিন্তু এ ছাড়া বন্ধনমুক্তির অন্য উপায় নেই। ব্রিটিশরাজ নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁড়ছে, তাতে আমাদের তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার তরফে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড় লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিকৃকৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।'

এবং পরেই রাশিয়ার আলোকে স্বদেশের অন্ধকার রঞ্জিত করেছেন :

'সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি—দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট করে দেখলুম। যে অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিসের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বোলো, এখনও অনেক বাকি আছে—তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে শুরু না করে যে বড় লাগছে—সে কথা বললেই গুণ্ডার লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।'

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের তিক্ততা ১৯৩০ সনেই 'সভ্যতার সঙ্কট' প্রবন্ধের জন্ম দিতে পারত, কিন্তু তা হ'ল না, এখানে যেহেতু রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ সম্পর্কে অতিসম্পর্কিত, এতই গভীর ব্যক্তিগতভাবে, যা প্রায় আর্তনাদের মত শোনাচ্ছে। তৃতীয় অনুচ্ছেদে 'দেশের ছেলেদের বোলো' ইত্যাদি সম্ভাষণে ল্যান্সডাউন থেকে পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ যেন স্বদেশের তরুণরক্তরঞ্জিত রাজপথে সশরীরে নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন। সংবেদনশীল পত্রদৌতগুণেই এ'টি সম্ভব হয়েছে।

এবং এহেন শক্ত কথার শক্ত ভাবনার জগতেও রবীন্দ্রনাথকে যে, সকৌতুক ঘনিষ্ঠ সুদূর ভাবভঙ্গি একেবারে ছেড়ে যায় নি তার প্রমাণ এই চিঠিরই আরম্ভভাগ, যা এক হিসেবে পত্র রচনানৈপুণ্যেরই গৌরব :

'ইতিমধ্যে দুই-একবার দক্ষিণ-দরজার কাছ ঘেঁসে গিয়েছি। মলয়-সমীরণের দক্ষিণ দ্বার নয়, যে দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ু বেরোবার পথ খোঁজে। ডাক্তার বললে, নাড়ার সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের মুহূর্তকালের যে বিরোধ ঘটেছিল সেটা যে অল্পের উপর দিয়েই কেটে গেছে এটাকে অবৈজ্ঞানিক ভাষায় মিরাক্‌ল্‌ বলা যেতে পারে। যাই হোক, যমদূতের ইশারা পাওয়া গেছে, ডাক্তার বলছে এখন থেকে সাবধান হতে হবে। অর্থাৎ, উঠে হেঁটে বেড়াতে গেলেই বুকের কাছটাতে বাণ এসে লাগবে—শুয়ে পড়লেই লক্ষ্য এড়িয়ে যাবে। তাই ভালো মানুষের মতো আধশোওয়া অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি। ডাক্তার বলে, এমন করে বছর দশেক নিরাপদে কাটতে পারে, তার পরে দশম দশকে কেউ ঠেকাতে পারে না। বিছানায় হেলান দিয়ে আছি, আমার লেখার লাইনও আমার দেহ-রেখার নকল করতে প্রবৃত্ত। বোসো একটু উঠে বসি।'

এই শারীরিক অকুশল সংবাদজ্ঞাপনের অভিব্যক্তিগত বৈঠকী চালের কথাগুলিতে, চল্লিশের পারে যারা আমরা এসেছি তারা জানি, একটা নিষ্ঠুর আবরণও ছাইচাপা আগুনের মত রয়ে গেছে, শেষ দুটি বাক্যের আগেরটিতে 'বছর দশেক নিরাপদে কাটতে পারে' অংশে যা কান্নার মত নিহিত, আগেই বলেছি এ চিঠির লিপিকাল ১৯৩০।

জাভাযাত্রীর পত্রও সুনিশ্চিত পত্রলেখা। কিন্তু সমকালীন পশ্চিমযাত্রীর ডায়েরী কেন ডায়েরী হয়ে রইল তার উত্তরে রবীন্দ্রনাথের ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৪-এর যে-দিনলিপি পাওয়া যাচ্ছে তার শেষাংশ উদ্ধৃতিযোগ্য :

'বিশেষ কোন একজনকে চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা যদি সামনে পাওয়া যেত তাহলে তারই নিভৃত ছায়ার ভিতর দিয়ে আমার নিরুদ্দেশ বাণীকে অভিসারে পাঠাতুম। কিন্তু সে বীথিকা আজ নেই। তাই অপরিচিত ক্যাবিনে আলো জ্বেলে নিজের কাছেই নিজে বকতে বসলুম। আলাপের এই অদ্বৈতরূপ আমার পছন্দসই নয়। সংসারে যখন মনের মতো দ্বৈত দুর্লভ হয়ে উঠে তখনই মানুষ অদ্বৈত সাধনায় মনকে ভুলিয়ে রাখতে চায়। কারণ, সকলের চেয়ে দুর্বিপাক হচ্ছে অ-মনের মত দ্বৈত।'

কথাগুলিতে যে-বেদনা ধ্বনিত তা ক্লিষ্ট মনে স্বীকার করেই বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ সময়ে এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না। 'বিশেষ কোন একজনে'র অভাব তাঁকে যে বোধ করতে হচ্ছে, এ তাঁর ভবিতব্য। অবস্থাবীর্ণ জনারণ্যের তাপে, বৃহত্তর জীবনের সংঘর্ষে, মহত্তর উপলব্ধির সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে তিনি আজ যেখানে উপনীত, সেখানে তিনিও বিশেষ কারও নন, 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'রাশিয়ার চিঠি'র উপলক্ষ সুনির্বাচিত বিদগ্ধমণ্ডলীর পোষ্টা। গুরুদেব ছাড়া, নিখিলমুক্তির আয়োজনে যেহেতু তিনি একে একে সব জীর্ণ বন্ধনই খসিয়ে দিয়েছেন, আপন সাধনার সিদ্ধার্থ—তিনি একরকম স্বেচ্ছানির্বাসিত, নির্বিশেষ মনস্বী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সুতরাং 'চিঠি লেখবার একটা প্রচ্ছন্ন বীথিকা' সন্ধানের পরে এবারের মত বলতে গেলে তাঁর অনাবদ্ধই থেকে গেছে। তা ছাড়া দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সামগ্রিক বিশ্ব-সংকটে তিনি একটি কঠিন দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন। যখন তিনি স্বদেশের তখন তিনি সর্ব দেশের। তিনি যখন প্রবাসের তখন তিনি স্বদেশের। এবং সময়ের স্নায়ুযুদ্ধ তাঁকেও আক্রমণ করেছিল। তাই চিঠিকে

প্রবন্ধাত্মক করে তুলে সমসাময়িক অনেকটা সমভারাক্রান্ত সোদরপ্রতিমদের সামনে তা ধরে দিয়েছেন, যেন বৃহৎ দেশের কাছে, বিশ্বের কাছে দিলেন। যেমন পদ্মাতীরের মেঘ ও রৌদ্র জড়ানো জীবনোত্তাপ গল্পগুচ্ছের গল্পেই রয়ে গেল, তিন সঙ্গীতে সংক্রমিত হতে পারল না, চোখের বালির সামাজিক সহানুভূতি চার অধ্যায় শেষের কবিতার বুদ্ধিচর্চায় রুদ্র রূপ নিল, সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালি-খেয়ার নিরুদ্দেশযাত্রা পুনশ্চ থেকে শেষ লেখার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে উদ্দেশ্যবাহিনীর সাজ বদলাল, আনন্দের কবিতা কাটাকুটিপূর্ণ ছবির আদল বিষাদের অন্ধকার মূর্তিরঞ্জনে অবসিত হ'ল, ইংরেজ ভারতবাসী প্রবন্ধের সপ্রাণতা 'সভ্যতার সংকটে' এসে বৈদগ্ধ্যে পর্যবসিত হ'ল, তেমনি 'ছিন্নপত্র'-'চিঠিপত্রা'দির প্রাণপ্রবল মানবমূর্তি 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতিতে মনস্বী-রৌদ্র বিচ্ছুরণে নিযুক্ত হ'ল। যে জন্য 'কালান্তরে'র সময়লাঞ্ছিত প্রবন্ধগুলির অন্তত তিনটি রচনা যথা: ক্ষুদ্রাকার 'হিন্দুমুসলমান', 'রায়তের কথা' ও 'কন্‌গ্রেস' (১৯৩৯) মূলত পত্রলেখা হয়েও প্রবন্ধ রূপেই গণ্য হয়ে রইল। অথচ এখানকার প্রথম ও তৃতীয় চিঠি বিশেষতঃ আঙ্গিক ও আত্মিক উভয় পরিচয়েই চরিত্রবান চিঠি। জাভাযাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠির পরিশিষ্ট হিসেবে তারা মান্য। দেশকালের কঠিন সীমানা মেনে নিয়েও তদতিশায়ী বসতি বানাবার যে লোকোত্তর-মনস্বী বাসনা রবীন্দ্রনাথ এযুগে বিশেষত করে গেছেন, তার চিহ্ন এ রচনাগুলি বহন করছে সত্য, তৎসঙ্গে প্রাপকের ভূমিকা সাপেক্ষতা, এমন কি স্বতন্ত্র-সাহচর্য-নির্ভরতা এই রচনা ক'টিকেও যে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং প্রভাবিত, প্রীতি পত্রপ্রস্তাবনায় তার প্রমাণ আছে।

রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য, তাঁর অন্যান্য রচনার মতই, যথানির্দিষ্টপথে পরিণতিসন্ধান করেছে ও পরিণত হয়েছে। 'ছিন্নপত্রে'র প্রাকৃত লাবণ্যে যে রবীন্দ্রনাথ আর প্রত্যাবৃত্ত হবেন না তা তিনি সেদিনই জানতেন, তিনি লিখেছিলেন: 'কিন্তু যদি কালক্রমে আমার কল্পনার এই সজীবতা চলে যায়, বাহ্যপ্রকৃতি আমার মনেরই জড়ত্ব-বশতঃ জড়বৎ প্রতিভাত হয়, তা হলে আজ যে কথাটাকে এমন অন্তরঙ্গ সত্য বলে জানছি সেইটেকে যৌবনকালের এক সময়ের একটা খেয়াল বলে মনে হবে—মনে হবে, বেশ একটা সুন্দর থিয়োরি—হয়ত প্রবীণ বয়সের শুষ্ক হাস্য উদ্রেক করবে। কিন্তু আমার এই প্রত্যক্ষ-অনুভূত গভীর আনন্দ তোর অনেক চিঠিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, সেইগুলো দেখলে বোধ হয় শুষ্কচিত্তের মধ্যে সরসতার সঞ্চার হতে পারবে—আমার প্রকৃতিনিহিত ধর্মটি ফিরে পাব।'

কথাগুলি মনোরম, কিন্তু অবিসম্বাদী নয়। হয়ত রবীন্দ্রনাথও তাঁর পরিণতির চূড়ায় দাঁড়িয়ে একে পুরোপুরি স্বীকার করতেন না। সেদিনের 'প্রত্যক্ষ-অনুভূত গভীর আনন্দ' আর ফিরে আসে নি, আসবার কথাও নয়, যৌবনের সজীবতা সরসতা প্রৌঢ়ত্বে লভ্য নয় তাও সত্য, কিন্তু চিত্তের যে শুষ্কতা রবীন্দ্রনাথ বয়োধর্মের কথা ভেবে আশঙ্কা করেছিলেন তা তাঁর জীবনে কোনদিনই আসে নি। সর্বোপরি 'প্রকৃতিনিহিত ধর্মটি তাঁর বরাবর অবিকল থেকেছে, পরিণতির সদভিপ্রায়ে সাড়া দিতে যৌবনের 'অন্তরঙ্গ সত্য' কেবল প্রবীণতার নতুন 'অন্তরঙ্গ সত্যে' রূপান্তরিত হয়ে গেছে, স্থানকালের মাপে অভীষ্টের সিদ্ধিলাভে প্রতিনিয়ত সে সাজ বদলেছে। দীর্ঘকাল যাঁদের বাঁচতে হয়, এবং যাঁরা উৎসুক, উন্মুখ, জাগ্রত, যাঁরা পরম পরিণামে পৌঁছতে অক্লান্ত অব্যবসায়ী, তপস্বী, বিশেষত যাঁরা নিখিল পরিচর্যার সুমহৎ কর্তব্যব্রতে দেশকালসীমাকে চূর্ণিত করতে নিয়ত প্রস্তুত, তাঁদের পক্ষে এ রূপান্তরসাধনের পালা অনিবার্য।

রবীন্দ্রনাথেও তা হয়েছে, সব বিষয়ে, সর্বক্ষেত্রে। চিঠিপত্রও অব্যতিক্রম। তবে তাঁর অন্ত্যপর্যায়ী চিঠিগুলি যাতে বিশ্বব্যাপী মনস্বিতায় উজ্জ্বল তন্নিষ্ঠতা, যুক্তি ও বুদ্ধি-গ্রাহ্যতা, বিশ্লেষিত উপলব্ধি প্রধান, প্রাণবত্তা, কল্পনা বিস্তার, সংহত অনুভব গৌণ, তাদের সমান্তরালবর্তী পথে ও পথের প্রান্তের ক্ষুদ্রায়তন সলাস্য আটপৌরে মন্ময়-ভাবের চিঠিগুলি একটু আশ্চর্য মনে হতে পারে। ১৯২১-৪১ এই কুড়ি বছরের মধ্যবর্তীকালে সর্ববিধ্বংসী নিখিল মূল্যবোধ বিপর্যয়ী সর্বনাশ মানবযজ্ঞের যে ভয়াবহ ট্রাজেডি ঘনীভূত হয়ে উঠছিল এবং যার ছায়া তাঁর চিঠিপত্রসমেত এ সময়কার সব রচনায় ধূমজাল বিস্তার করেছে সেখানে এই কতিপয় পত্রের স্নিগ্ধ হাসি ও বিকিরিত কথা যেন অনেকটা তৈরি জিনিস, ভারসাম্যের জন্যে প্রয়োজনীয় রিলিফ, রবীন্দ্রনাথের অবসন্ন প্রহরের অবকাশরঞ্জন।

বয়োপরিণতি, অবস্থা-পরিবর্তন ও সময়তাড়নাকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্র রচনার বিভিন্ন পর্যায়ে যেন চলচ্চিত্রবাঁধনে বেঁধেছেন, লিপিগ্রন্থনে কোথাও অবিবেক প্রকাশিত হয় নি, কিম্বা কোনরূপ অবিবেচনা। সচেতন শিল্পীর সুনিপুণ প্রয়োগে, প্রত্যয়ে, অভ্যাসে পত্রগুলিকে তিনি যে মহিমা দান করেছেন তা 'পত্রলেখা'র মতই

সৌন্দর্যভাবিত, শিল্পচর্চিত, একনিষ্ঠ। তাই এগুলি শুধু পত্র নয়, পত্রলেখা।

এবং লেখক-প্রাপক সম্পর্কে স্থানকালপাত্র বয়স অভিজ্ঞতা উদ্দেশ্য দায়িত্ব প্রভৃতির প্রকারভেদে যতই তাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বদলাক, পত্রলেখাসুলভ চরিত্র তাদের বরাবর অক্ষুণ্ণ রেখেছে, রূপান্তরে রবীন্দ্রনাথের ভাবান্তরকেই গেঁথে তুলেছে, নিয়তপরিণামী সঙ্গতপরিণত রবীন্দ্রমহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করে বন্দনা করেছে। এ বন্দনা কখনও প্রাণপ্রতপ্ত সৌহার্দ্যের, কখনও স্নায়ুপীড়ক মননের। কিন্তু উভয়তই তা বন্দনা। ছিন্নপত্রাবলীর ২০৪ সংখ্যক পত্রে যে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, '···মন নামক পদার্থটি শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু ভালবাসার পাত্র নয়···' তাকেই সহযোগী করে এখানে বলা যায়, প্রথম ষাট বছরের সীমাঙ্কিত তাঁর পত্রলেখা প্রধানত ভালবাসা-নির্ভর, পরের কুড়ি বছরের ফসল, এই 'মন নামক পদার্থ' সমবায়ে, শ্রদ্ধাজাত। তাই হয়ত তাদের পূর্বাংশ ভালবাসার সামগ্রী, উত্তরাংশ শ্রদ্ধার বস্তু। প্রণয়ে যেমন প্রসাধনকলা ও সাধনবেগ (মহুয়ার ভূমিকা দ্রষ্টব্য) দুইই আছে, চিঠিপত্রেও এই ভালবাসা ও শ্রদ্ধা উভয়ই বাঞ্ছিত। দুই কালপ্রান্তের রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রলেখার সেতুবন্ধনে এই উভয়ত্রসিদ্ধির মাত্রায় লব্ধকাম পুরুষরূপে ঈর্ষাযোগ্য ভাবে চিরউৎকীর্ণ থাকবেন।

—০—

সাধ

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আলতা দিদি, বোন,
চালতা বনে চাঁদ উঠেছে, আমার কথা শোন।
পাল তুলে ঐ নৌকো চলে লাল্‌তা গাঁয়ের হাটে,
বল্ তো এখন মন কি লাগে গোয়াল ঘরের পাটে?
এই তো এলেম সেঁজেল দিয়ে—বুক-ভরা তার ধোঁয়া,
তুলসীতলায় পিদিম জেলে এক্ষুণি চাই থো'য়া?
শিকের ফাঁকে জ্যোৎস্না ডাকে জানলা দিয়ে ওই!
শান বাঁধানো ঘাট কোথা যে মনের কথা কই?
আলতো হাতে সকুড়ি নিকোই, জল নিতে হয় ভুল,
হেঁসেল ঘরে জ্বালতে উনুন বোল্‌তা ফোটায় হুল।
কাঁঠাল ফুলের গন্ধ ভাসে ঐ যে উঠোনময়,
নাল্‌তে পাতার চচ্চড়ি আজ না রাঁধলে কি নয়?
বোকনোতে জল দিতেই হবে—বালতিতে চাল ধুয়ে?
আজও কি ফেন গালতে হবে নামিয়ে হাঁড়ি ভুঁয়ে?
পিস্‌শাশুড়ীর বাতের মালিস নইলে দেবেন গালি?
খুড়শ্বশুরের পানের ডিবে রয় যদি আজ খালি—
সেজঠাকুরের পোরের ভাত আর বড়ঠাকুরের রুটি
একটা দিন আজ না হয় যদি—খুব কি হবে ত্রুটি?

তলতা বাঁশের ঝোপের ধারে তালবাগানের কোলে
ঝিলমিলিয়ে আলোছায়ার আলপনা যে দোলে,
দুলতে কি নেই ওদের মতন দাঁড়িয়ে খানিক সোজা?
ভুলতে কি নেই একটা দিন এই ফালতু কাজের বোঝা?
আকাশ পাতাল মাতাল হ'ল চাঁদের সুধা খেয়ে—
উতল হাওয়া মাঠের পথে চলেছে গান গেয়ে—
জলে স্থলে ফুল ফুটেছে—আলতাদিদি বোন,
কাৎলামাছের সাঁৎলে মুড়ো কাটবে এমন ক্ষণ?

আলতাদিদি মোর,
এমন দিনে ঠাকুরজামাই পলতা গেছেন তোর।
কাল নাকি তাঁর সালতামামীর হিসাব দিবার দিন;
চৈতী চাঁদের কে দেয় হিসাব? কে শুধবে তার ঋণ?
ঘরের মানুষ তোমার আমার কারোই ঘরে নাই,
লক্ষ্মীছাড়া রান্নাবাড়া কিসের তরে ভাই?
চল্ দু'জনে বেরিয়ে পড়ি কলসী নিয়ে কাঁখে।
শোন্ তো কেমন দূরের গাঁয়ে 'চোখ গেল' ঐ ডাকে!
দ্যাখ্ তো কেমন ঝাউএর পাতা ঝিরঝিরিয়ে কাঁপে!

এমন রাতে কেউ কখনো বোক্‌নোতে দুধ মাপে ?
গরাদ-ঘেরা গারদ ঘরে হাঁপিয়ে ওঠে মন।
আজ নদীতে বান ডাকাল চাঁদের নিমন্ত্রণ—
প্রাণেতে বাণ ডাকবে না কি ? জাগবে না কি লোক ?
খুলবে না কি আল্‌সে কুড়ের চাল্‌সে-ধরা চোখ ?
শ্বশুর ভাস্থর সামনে পিছে মানব না আর কিছু ;
ঢের থেকেছি ঘরের কোণে চোখটি করে নীচু।
চাঁদের আলোর ঢল নেমেছে কালকাসুন্দে বনে,
কনক চাঁপার বাস ছুটেছে তাল পুকুরের কোণে।
মাদার তলায় আলো-আঁধার লাগায় যেথা ধাঁধা—
ঐ ওখানে শানের ঘাটে সাল্‌তি কাদের বাঁধা—
দুই পাশে তার ঝিলিক হানে রূপোর বরণ জল—
দুই বোনেতে আজ সেখানি ভাসিয়ে দিগে চল্‌।
বিলের জলে বাইব তরী আজকে দখিন বায়
আমরা দু'টি রাজার মেয়ে ময়ূরপঙ্খী নায়।
আলতা-গোলা রঙ আমাদের—মেঘের বরণ কেশ,
চাঁদের আলোয় খুঁজতে যাব রূপকুমারের দেশ।

বলিস্‌ কি ভাই, ছি !
বরকে মনে ধরছে না আর ? তাই কি বলেছি ?
আজ শুধু এই রাতের মতো রূপোর কাঠি লেগে
সত্য যা তা ঘুমিয়ে পড়ুক—স্বপ্ন উঠুক জেগে।
'ঘনির বিল' আজ সাত সাগরের নিক্‌ না কেন পাঠ ?
তেপান্তর আজ হোক্‌ না কেন দিগ্‌বেড়ের ঐ মাঠ ?
আকাশেতে সাত ঋষি হোক সাতটি চাঁপা ভাই,
পারুল বোনের ডাকে তাদের আজকে জাগা চাই।
ময়ূর-পেখম শাড়ী হোক এই হাবড়া-হাটের ডুরে,
দুধ পাথরের রাজপুরী হোক মোদের মাটির কুঁড়ে।
আলুবোলা বোল কাঁকাল মোদের কুসুম ফুলের ঝাঁতা—
চামরপারা ঝামর-চুলে মুক্তো মাণিক গাঁথা—
গলায় দোলে শতেক নহর গজমোতির মালা—
পায়ে সোনার চরণচক্র—হাতে হীরের বালা—
আমরা যেন কিসের খোঁজে চলেছি কোন্‌ দেশে ;
মাণিক ঝরে ঝরঝরিয়ে যখন উঠি হেসে ;
কাঁদলে পরে মুক্তো ঝরে ; রূপে ভুবন ভরে ;
দেখলে মোদের পথের ধারে মালঞ্চে ফুল ধরে।

মন পবনের নৌকো মোদের সোনালি পাল তুলে
সাত সমুদ্র তেরো নদীর ফিরবে কুলে কুলে।
যমযমুনার দেশ পেরিয়ে অছিন-ভছিন পুর—
কড়ির পাহাড় দুধ-সরোবর ছাড়িয়ে অনেক দূর—
তরতরিয়ে পেরিয়ে যাবে রাত না হ'তে শেষ—
চন্দ্রকলা, কলাবতী, নিদ্রাবতীর দেশ।
রূপোর বৈঠা আমার হাতে পড়বে তালে তালে,
রূপকুমারী থাকবে তুমি বসে হীরের হালে।

আলতাদিদি, ভাই,
মনপবনের নৌকাখানি কোথায় গেলে পাই ?
সেইটি পেলে আজকে বোধ হয় সাধ মিটিয়ে ভাসি,
হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিতে আবার ঘুরে আসি।
আবছা-আলোর স্বপ্ন যত আবার দাঁড়ায় ঘিরে,
কমলাপুলির সোনার টিয়া আবার আসে ফিরে।
নাই বা পেলাম মুক্তোমাণিক সাত মহলা বাড়ী,
নাই বা হলাম রাজকুমারী—আগুন পাটের শাড়ী,
ডঙ্কা নবৎ সাতশ' দাসীর কিসের প্রয়োজন—
অরুণ বরুণ ভাই যদি পাই—কিরণমালা বোন ?
আমকাঁঠালের ছায়ায় দোলা দুলত বারোমাস,
হট্টমালার দেশে হ'ত গাইবলদে চাষ ;
এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা, মধ্যিখানের চরে
শিবসদাগর আমায় কাছে ডাকত আদর করে।
ডাকত আমায় চাঁদের বুড়ি আকাশ থেকে ওই,
ধরত বুকে দেখন-হাসি নয়নতারা সই।
কাপাস বনের মাসীপিসী—আতা গাছের তোতা—
দেখতে পেতাম ডালিম গাছে পিরভু নাচে কোথা।
আকাশ জুড়ে মেঘ ঘনালে সুর্য্যি গেলে পাটে
যে খুকু যায় কলসী-কাঁখে পদ্মদীঘির ঘাটে—
হাঁটুর নীচে ঢেউ খেলে যার চিকন কালো চুলে—
আমিই তো ভাই, সেই খুকু সেই পদ্মদীঘির কূলে।
আজও দেখি দোলায়-শোয়া ননীর পুতুল ভা'য়ে,
ঝামুর ঝুমুর ঘুঙ্গুর বাজে দামুস দুমুস পায়ে।
তিল ঝুরঝুর তিলতলাতে কাজলা নদীর বাঁকে
লক্ষ্মী পিদিম জ্বালিয়ে যে মা আজও আমায় ডাকে,
সকল জ্বালা জুড়োয় যদি তার বুকে পাই ঠাঁই।
আলতা দিদি, বল্‌ না সেথা কেমন করে যাই ?

—০—

ভারত-ভাস্করম্

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী
অনুবাদ—ডক্টর রমা চৌধুরী

বালক-কবি প্রতিভা প্রকরণ

স্থান—কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর মহর্ষি ভবন।

কাল—১৮৬৯। প্রভাত।

রবীন্দ্রনাথ (বয়স ৮), বালক ভৃত্য শ্যামচন্দ্র, বয়স্ক ভৃত্য ঈশ্বর, নেয়ামৎ আলি দরজি, তারা গোয়ালিনী।

শ্যামচন্দ্র। আমার খুব ভাগ্যি ভাল যে বালক রবীন্দ্রনাথ, আমি যে গণ্ডি তার চারদিকে কেটে দিই, তার মধ্যেই চুপ করে বসে থাকে, বাইরে পালিয়ে চলে যায় না। সে ত প্রায় সব সময়ই আমাদের কাছেই থাকে; কিন্তু কাউকে জ্বালাতন করে না। মায়ের কাছে না থেকেও মা'র জন্য কখনও কান্নাকাটি করে না। সে জন্য, আমার খেলা করবারও অনেক সময় থাকে।

(উচ্চস্বরে) ও ছোট ঠাকুর! এদিকে এস।

(অষ্টম বর্ষীয় রবীন্দ্রনাথের প্রবেশ)

রবীন্দ্রনাথ। এই ত আমি এসেছি। আমি ত খেলা করছিলাম। কেন আমাকে ডাকাডাকি করছ?

শ্যামচন্দ্র। বেলা বেড়ে চলেছে। আমরাও সকলে কাজে-কর্ম্মে ব্যস্ত। সে জন্য, ছোট ঠাকুর, অন্যান্য দিনের মত, তুমি আজও এই গণ্ডির মধ্যে চুপচাপ বসে থাক, যতক্ষণ আমি না আসি। (গণ্ডি কেটে দিল)

রবীন্দ্রনাথ। (সজোরে আপত্তি জানিয়ে)—বাঃ! বেশ মজা ত! তুমি চলে যাবে, আর আমি একা একা এখানে সারাদিন বসে থাকব। আমি যে এখন খেলা করছি।

শ্যামচন্দ্র। (তর্জ্জনী তুলে) চুপ! কোন কথা আর বল না। জান না কি, এই গণ্ডির মধ্যে থাকলে তোমার আর কোন বিপদ ঘটবে না। কিন্তু বাইরে গেলেই খুব বিপদ হবে—মনে থাকে যেন।

(প্রস্থান)

রবীন্দ্রনাথ। (স্বগত)—(সভয়ে গণ্ডির ভেতর বসে)—সত্যই ত, রামায়ণে আছে যে, সীতা দেবী যতক্ষণ লক্ষ্মণের গণ্ডির মধ্যে বসে ছিলেন, ততক্ষণ তার কোন বিপদ হয় নি। কিন্তু তিনি যখনই বাইরে চলে আসেন, তখনই রাবণ তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। কাজ নেই আমার বাইরে গিয়ে, এখান থেকেই সব দেখি।

(বয়স্ক ঈশ্বর ভৃত্যের প্রবেশ)

ঈশ্বর। (গম্ভীর ভাবে) ছোট ঠাকুর! তুমি এই স্থানে স্থির হয়ে আছ দেখে আমি অতিশয় আনন্দিত হলাম। কখনো বাইরে যেয়ো না।

রবীন্দ্রনাথ। (সহাস্যে-স্বগত)—বাঃ! ঈশ্বর যেমন সব সময়ে বইয়ের ভাষায় কথা বলতে ভালবাসে, এবং যা নিয়ে বড়রা হাসাহাসি করেন—সে রকম ভাবেই ত আজও কথা বলছে।

(প্রকাশ্যে) না, না, ঈশ্বর আমি কোথায়ও যাব না। এখানেই থাকব।

ঈশ্বর: (আরও গম্ভীর ভাবে)—তুমি কি আরও দুগ্ধ ও লুচি খেতে ইচ্ছুক?

রবীন্দ্রনাথ। (স্বগত)—আমি দুধ ও লুচি আর খেতে চাই শুনলে ঈশ্বর চটে যাবে, তার নিজের ভাগে যে কম হয়ে যাবে।

(প্রকাশ্যে) না, না, ঈশ্বর, আমি এখন আর কিছু খেতে চাই না।

ঈশ্বর। (সন্তুষ্টচিত্তে) সত্যই, অধিক খেলে শরীর নষ্ট হয়।

ছোটবাবু লক্ষ্মী হয়ে থাক। তোমাকে রাত্রে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে অনেকক্ষণ শুনাব বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম।

রবীন্দ্রনাথ। (স্বগত) আর অনেকক্ষণে কাজ নেই। কত রাত হয়ে যায়, আমরা ঘুমে ঢুলে পড়ি, তবুও ত ঈশ্বরের পড়া শেষ হয় না। ভাগ্যিস, বাবার লোক কিশোরী চাটুজ্জে মাঝে মাঝে এসে দাশু রায়ের পাঁচালী পড়ে শেষ করে দেয়, তাই রক্ষা।

(প্রকাশ্যে) তা, বেশ।

(ঈশ্বরের প্রস্থান)

রবীন্দ্রনাথ। (জানলা দিয়ে প্রাচীন দীঘি দেখে, সোল্লাসে) আর বাইরে গিয়েই কি হবে! কি সুন্দর এই দীঘি। তার পূর্ব্বদিকে দেওয়ালের গা ঘেঁসে একটি পুরাণো বটগাছ; দক্ষিণদিকে সারি সারি নারকেল গাছ আঃ কি সুন্দর দেখাচ্ছে। আর আমার মনে কোন দুঃখ নেই।

(হাততালি দিয়ে)

বাঃ, কি মজা! কতজন কত রকমেই না স্নান করছেন। কেউ কেউ তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিচ্ছেন, কেউ বা আস্তে আস্তে। কেউ কেউ কান বন্ধ করে, কেউ বা হুস্ করে ডুব দিচ্ছেন। কত রাজহাঁস, পাতিহাঁসও দূরে ভাসছে।

আমার সবচেয়ে ভাল লাগছে এই প্রকাণ্ড, আকাশ ছোঁয়া বটগাছটি। তার ঘন পাতার মধ্যে কি যেন মায়া লুকিয়ে আছে।

বড় বড় জটা ছাওয়া এই যে মহাবট।
তারি তলায় লুকিয়ে আছে মায়া রাজ্য পট ॥
ঝির ঝির ঝির বহে হাওয়া দুলিয়ে পাতা।
সবুজ জলে মুখ দেখে বট ঝুঁকিয়ে মাথা ॥
দেওয়াল বুকে আদরেতে দাঁড়িয়ে আছে বট।
ঝর্ ঝর্ ঝর্ পড়ে পাতা বেয়ে কত জট ॥
জটার জালে গুঁড়ি ছাওয়া অন্ধকারে ভরা।
কোন্ ওরে এক স্বজনপুরী পাগলকরা ॥
গাছের তলে বসেছে আজ অদ্ভুত মেলা।
না-জানা সব লোকের সনে একি মজার খেলা ॥

আরো দেখ দেখ!

নীল পাতা নীল মেঘ নীল দীঘি জল।
নীলে নীলে এক হল নীল ধরাতল ॥

(নেয়ামৎ আলি দর্জির প্রবেশ)

নেয়ামৎ আলি। ছোট ঠাকুর! তোমার জন্য একটা জামা করে এনেছি। প'রে দেখ দেখি, ঠিক হয় কিনা। প'রে নিশ্চয় তোমার ভাল লাগ্‌বে।

রবীন্দ্রনাথ। (জামাটি পরীক্ষা ক'রে) দূর! এর পকেট কোথায়! আমার যে অনেক জিনিস আছে—মার্বেল, লাট্টু, এই সব। সে সব রাখব কোথায়?

নেয়ামৎ আলি। (সস্নেহে হেসে)—আহা! আমার ছোট ঠাকুরের কতই না জিনিসপত্র আছে! তা থাক্! বড় হলে নিশ্চয় তোমার পকেট হবে।

(প্রস্থান)

রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর কিই বা করি।

(তারা গোয়ালিনীর প্রবেশ)

তারা। (সস্নেহে) দাদাভাই! কি করছ তুমি, একলা এখানে, কেন তোমাকে দুঃখিত দেখাচ্ছে?

রবীন্দ্রনাথ। দীঘি দেখে আমি যে পৃথিবীকেই দেখছি।

(উচ্চহেসে)

দিদি! আমার আর কোনো দুঃখ নেই। আহা! কি সুন্দর এই বট গাছটি যা পৃথিবীকে শীতল করেছে, কোলে ক'রে রেখেছে। এর নীল পাতা আমাকে পাগল করেছে। দেখ! এই যে সামনের পথটি, তা কি স্বর্গ-মর্ত্য ছেয়ে চলে গেছে?

দিদি! হঠাৎ মনে হচ্ছে—কোথা থেকে আমি এলাম, কোথাই বা যাব?

তারা। বাছা! তোমার দাদাদের এসব কথা জিজ্ঞাসা কর। তারা ত খুব লেখাপড়া জানেন। তারাই তোমাকে এর উত্তর দিয়ে দেবেন। তবে আমি এইমাত্র জানি যে, আমরা সকলে ত এক জায়গা থেকেই এসেছি, এক জায়গাতেই যাব। কেবল জন্মের সময়ে উচ্চনীচ ভেদ করা হয়, কিন্তু মৃত্যুর পরে সব সমান।

থাক্, আমি কিই বা জানি। কেন এসব কথা এই ছোট ছেলেকে বলে তাকে ব্যস্ত করছি:

দাদু দুধ খাবে তুমি?

রবীন্দ্রনাথ। না, না, আমি দুধ চাই না। এখন আমার মনে খুব আনন্দ হচ্ছে।

তারা। গোপাল আমার! মাকে ছেড়ে এখানে কেন একলা বসে আছ?

রবীন্দ্রনাথ। না, না, আমি ত একা নই। আমার ত এখানে অনেক সঙ্গী আছে; আমি একলা কেন হব? 'তাকিয়ে দেখ না—সব জায়গাতেই ত আমার বন্ধু আছে; দেখছ না, এই দীঘি, এই তালের শ্রেণী, এই বট, এই আকাশ, এই বাতাস, এই পৃথিবী—এরা ত সবই আমার বন্ধু; আমার সঙ্গে কত কথা বলে, কত খেলা করে, কত মজা করে। সেজন্য আমার মন সুখে ভরা।

তারা। আহা! আমার আদরের গোপাল! জগৎ জয় কর। আহা তুমি যে আমার নিজের ছেলেমেয়ের চেয়েও আমার মনকে বেশী টানছ। তুমি জগতের প্রাণের আনন্দ হও। ভগবান তোমাকে একশ' বছর বাঁচিয়ে রাখুন। হরি! হরি!*

(প্রস্থান)

---

* রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত সংস্কৃত নাটকের এক দৃশ্য।

নিশাকরোজ্জ্বল

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

শরতে হেমন্তে গ্রীষ্মে শীতে আর বসন্তে বর্ষায়
প্রতিটি ঋতুর রঙ্গে বুকভরা রূপময় সুর
বাজায় রূপসী বাংলা। কোন এক রবীন্দ্র ঠাকুর
পৃথিবীর আলোর শরিক হয়ে তন্ময় নিষ্ঠায়
যদি না সুরের গঙ্গা বহাতেন প্রাণের প্রবাহে,
তা হলে বাংলার ওই জলেস্থলে মাঠ-নদী-বনে
এত যে সুরের মায়া রূপায়িত মনের গহনে
হতো কি ! আবার দেখো, আমাদের ব্যাকুল উৎসাহে···

কে দিত তন্নিষ্ঠ দৃষ্টি, দৃশ্য হতে দৃশ্যের ওপারে
অলৌকিক বীজমন্ত্র, বীতস্পৃহ সময় সংশয়
পাড়ি দিতে ! নিশাকরোজ্জ্বল আত্মা ঘন অন্ধকারে
প্রাণের প্রবাহে নামে, জাগতিক অপার বিস্ময়
গানে গানে খুঁজে ফেরে দুঃসাহসী তীব্র অন্বেষায়
বাংলারই ঘাসফুলে, শস্যশূন্য মাঠের হাওয়ায় :

ঝোড়ো জাহাজ

শ্রীমালিনী বসু

নিশির ডাকেরা মত্ত বাতাসে লবণ-জলের
হাহাকার বয়ে ছুটাছুটি করে কালো জাহাজের
ঝোড়ো মাস্তুলে ; কোথা উড়ে যায় সাগর-ঘোড়ার
ফেনিল কেশর দুই হাতে চেপে ; উধাও-হাওয়ার
নিশির ডাকেরা এ ঝোড়ো জাহাজ কোথা নিয়ে যায়।
নিমেষে নিমেষে এ জাহাজ বুঝি ডুবে যেতে চায়।—
নিমেষের তরে ডুবে যায়,—দেখে দু'চোখ বুজে
অতল ঢেউয়েরা জানালার গায়ে বেড়ায় খুঁজে,—
আর্ত্ত কি এক আনন্দে শোনে কে যেন বাজায়
তাদের কান্না বেহালার সুরে নিবিড় কথায়—
অতলান্তিক বেহালার সুর। দূর মাস্তুল
থর থর কাঁপে উন্মাদ রাতে, শূন্যের চুল
উদ্বেল হয় ঝোড়ো জাহাজের বিজন ডেকের
ক্ষুব্ধ রেলিঙে ; আকাশে ঝাঁপায় গাঢ় বাতাসের
আবেগের ঝাঁক ; কালো হাওয়া ছিঁড়ে কখনো আবার
ধূসর জ্যোৎস্না মৎস্যনারীর চক্ষুতারার
মৃতহিম মোহঘূর্ণি সে রচে সাগরে ; জাগায়
মৃত্যুর লোভ, ডোবার বাসনা ! তবু ছুটে যায়,
তবু উড়ে যায় স্বপ্নজাহাজ ! লবণ-জলের
প্রাণের কান্না উড়ন্ত ঢেউয়ে নিশির ডাকের

মত মায়া করে ; মায়ায় ভুলিয়ে কোথা নিয়ে যায়—
কোথা কূল, কোথা তল নেই, বাধা নেই যে কোথায়
সিন্ধুপ্রেমিক ঝোড়ো জাহাজের। কোথায় সুদূর
বোবা স্বপ্নেতে বাজে কথা বলে বেহালার সুর।
মুহ্যমান সে ঢেউ ভাঙে। হায়, প্রাণ, তুমি আর
ঘুরে ফিরিয়ো না অস্থির ক'রে ডেকের আঁধার
পথিক-জাহাজে। ছোটে তো ছুটুক শেষহীন ঝড়
রুদ্ধ মনকে অস্থির ক'রে ; রেলিঙের 'পর
হাতে মুখ রেখে স্থির হও তুমি। ওড়ে তো উড়ুক
কালো হাওয়া হয়ে উদ্দাম চুল ; হাতে রেখে মুখ
তুমি স্থির হও। ভেঙে হারায়ো না ঢেউয়ের মতন।
শুনিবারে দাও। অনুভব করি—যেই নির্জন
মীড় শুনিবারে বাসনা-আর্ত্ত ঘুরেছিল প্রাণ,
হু হু ক'রে বাজে অস্ফুট সেই বেহালার গান
আকাশে সাগরে। পাগল ঢেউয়ের বুকের ভিতর
সাগরেরে খুঁজে কাঁদিছে বেহালা। আর তারপর
মীড় হয়ে এসে গড়ায়ে অশেষ সাগর-ঢেউয়ের
প্রেম সে ডুবাবে ঢেউগুলি সব আমার বুকের,
বুক ফেটে যবে ছাড়া পাবে মোর হাজার পাথার—
"আমরা তোমার, হে ঝোড়ো হৃদয়, আমরা তোমার !"

রবীন্দ্র-বিদূষণের প্রহেলিকা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

আমরা জাতি হিসাবে বরাবরই একটু বেশি রকম রক্ষণশীল। পুরাতন কিছুকে যেমন চট্ ক'রে ছাড়তে চাই না তেমনি নূতন কিছুকে সহজে গ্রহণ করতেও চাই না। তা সে কি ধর্মে, কি রাষ্ট্রে, কি সমাজে, কি শিক্ষায়, এমন কি সাহিত্যেও। বৌদ্ধধর্মের গলা টিপে হিন্দু-ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি নি। সমুদ্রযাত্রা নিষেধ ক'রে দিয়ে বাইরের সংস্পর্শ থেকে আমাদের শুচিতা রক্ষার চেষ্টা ক'রে এসেছি। যতদিন না সতীদাহ আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ ব'লে গণ্য হয়েছে ততদিন আমরা শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়ে সতীদাহ ক'রে এসেছি। বিধবা-বিবাহ বিধিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সমাজ তাকে সেদিন প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারে নি। শিক্ষার ব্যাপারেও নূতন পদ্ধতির প্রচলনকে আমরা সাধ্যমত বাধা দিয়েছি এবং এখনও দিচ্ছি। সাহিত্যক্ষেত্রেও দেখা যায়, পয়ার ত্রিপদী ও লঘু ত্রিপদীর বাঁধা রাস্তা ছেড়ে নূতন পথে যাত্রা করতে বাংলা কাব্যকে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। মাইকেল মধুসূদন যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদবধ কাব্য রচনা ক'রে আমাদের কাব্যজগতে এক নব যুগের সৃষ্টি করেছিলেন তখন রক্ষণশীল সমালোচকের দল তাঁকে প্রবল আক্রমণ করেছিলেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের অনুকৃতিতে 'ছুছুন্দরীবধ' নামে এক ব্যঙ্গ কাব্য রচনা ক'রে সেই প্রতিভাবান্ কবিকে অপদস্থ করবার হীন প্রচেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে অভিনব সৃষ্টির যে অতুলনীয় সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে তাকে উপহাস ক'রে উড়িয়ে দেওয়া অন্ধ সংস্কারাবদ্ধ রক্ষণ-শীলদের পক্ষেও সাধ্যাতীত। পদ্মের সুগন্ধকে কটু বললেই শতদলের স্নিগ্ধ সৌরভ কখনো বিকৃত হয় না। তাই 'মেঘনাদবধ' কাব্য সাহিত্য-সাগরের এক নূতন 'দিগ্‌দর্শন' হয়ে মধুসূদনকে অমরত্ব দান করেছে।

হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতি শক্তিশালী কবিদের প্রবর্তিত পথ অনুসরণ না ক'রে আর একজন প্রতিভাবান্ কবি এক নূতন পথ ধ'রে কাব্যলোকে যাত্রা করেছিলেন। সাধারণ পাঠকদের মধ্যে তাঁর খ্যাতির প্রসার ঘটে নি বটে, কিন্তু অল্প কয়েকজন প্রতিভাবান্ তরুণ কাব্যরসিক তাঁর ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর বৌঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবী এবং কবি অক্ষয়কুমার বড়াল। তিনি সেকালের নূতন কবি - বিহারীলাল চক্রবর্তী। কাদম্বরী দেবী এঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্য পাঠে মুগ্ধ হয়ে কবিকে নিজের হাতে একখানি আসন বুনে উপহার দিয়েছিলেন। কবি এই স্বীকৃতি পেয়ে এত খুশী হয়েছিলেন যে, 'সাধের আসন' নাম দিয়ে একখানি কাব্যই রচনা ক'রে ফেলেছিলেন।

কবি অক্ষয়কুমার বড়াল তাঁর গুরুর ছন্দানুবর্তী পথ অতিক্রম ক'রে নূতন পথে অগ্রসর হতে সাহস করেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আপন অসামান্য প্রতিভার প্রভাবে নিত্য নব-নব পথ আবিষ্কার ক'রে কাব্যলোকে এক নূতন অমরাবতী সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন।

কিন্তু অমরাবতীর আনন্দ উপভোগের যোগ্যতা আমরা অর্জন করতে পারি নি তখনও। সংস্কারের মোহান্ধকারে নিমজ্জিত আমরা তখনও জীবনের ও সমাজের সকল ব্যাপারেই ছিলাম রক্ষণশীল। তাই রবীন্দ্রনাথের সেই অভূতপূর্ব সৃজন-মহিমাকে আমরা তার প্রাপ্য গৌরব না দিয়ে বরং কঠোর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উপহাস ক'রে কবিকে আঘাত করেছি দীর্ঘকাল।

রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্য গ্রন্থখানি প্রকা-শিত হবার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে হিতবাদী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'রাহু' এই ছদ্মনাম নিয়ে একখানি ব্যঙ্গকাব্য প্রকাশ করেছিলেন, যার নাম দিয়েছিলেন 'মিঠেকড়া'! কবিকে উপহাস করবার এ দুঃসাহস হয়েছিল তাঁর তদানীন্তন পাঠক-সমাজের বিকৃত রুচির প্রশ্রয় পেয়ে। কিন্তু, সে রাহু 'রবি-দ্যুতিকে' একটুও ম্লান করতে পারে নি। রাহুকে লোকে আজ ভুলে গেছে। 'মিঠেকড়া' বিস্মৃতির অতলে বিলুপ্ত। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে'র সম্মিলিত পর্দায় যে অনবদ্য সুর সেদিন ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল, রসিক-জনের কানে ও প্রাণে আজও তা সুধাবর্ষণ করছে।

'রাহু'গ্রাসের সেই ব্যর্থচেষ্টার বহুকাল পরে, রবীন্দ্র-নাথের যশোরশ্মি যখন দিগন্তবিস্তৃত হয়েছে, এমন সময়

এদেশের রসিক-সমাজে এক অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সৃষ্টি ক'রে কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দুর্নীতি ও অশ্লীলতার অভিযোগ নিয়ে এলেন—রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কাব্য 'চিত্রাঙ্গদা'র বিরুদ্ধে। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'কাব্যে দুর্নীতি' নাম দিয়ে এই রচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল। 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর পত্রিকায় প্রতি মাসেই প্রায় রবীন্দ্রনাথের কোনও না কোনও রচনার অতি-কঠোর বিদ্রূপপূর্ণ বিরুদ্ধ-সমালোচনা প্রকাশ করতেন। পাঠকেরা সেই জঘন্য বিদূষণ একটা বৈচিত্র্য হিসাবে উপভোগ করলেও অন্তরের সঙ্গে সমর্থন করতেন না কেউই।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যখানির বিরুদ্ধে 'অশ্লীল' ও 'রিরংসাদ্যোতক' ইত্যাদি অভিযোগ এনে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন 'কাব্যে দুর্নীতি' প্রবন্ধটি সাহিত্যে প্রকাশ করলেন, মৌচাকে ঢিল মারার মতই দ্বিজেন্দ্র-লালের সেই রচনা রবীন্দ্রানুরাগী কবি ও সাহিত্যিকগণকে বিশেষ উত্যক্ত ক'রে তুলেছিল। তাঁরা সদলে 'মানসী ও 'ভারতী' পত্রিকা দু'খানিতে দ্বিজেন্দ্রলালের সমালোচনার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তাঁদের মতে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর কাব্যে ও নাটকে এবং হাসির গানে যে কত বেশি নগ্ন অশ্লীলতা ও দুর্নীতি প্রচার করেছেন তাঁর রচনাবলী থেকে মাসের পর মাস সেই সেই অংশ উদ্ধৃত ক'রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করেন। বিশেষতঃ তাঁর 'পাষাণী' নাটকখানিতে তিনি যে যে স্থানে শ্লীলতার সীমা অতিক্রম ক'রে গিয়েছেন সেই অংশগুলি তুলে তুলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি এই দুর্নীতির ব্যাপারে কত বেশি অপরাধী।

এর ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভক্ত অনুরাগাবৃন্দকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ক'রে 'আনন্দবিদায়' নামে নন্দবিদায়ের এক 'প্যারডি' প্রহসন লিখে ফেললেন এবং 'ষ্টার' থিয়েটারে সেই বিদ্রূপাত্মক প্রহসনখানির অভিনয়েরও ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু প্রথম অভিনয়-রজনীতেই দর্শকদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের ঝড়ে অভিনয় শুরু হতে না হ'তেই বন্ধ হয়ে যায়, এবং দ্বিজেন্দ্রলালকে ক্রুদ্ধ দর্শকদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য রঙ্গালয়ের পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে হয়।

অথচ আশ্চর্য হয়ে যাই যখন একথা ভাবি যে, দ্বিজেন্দ্র-লালের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের এত বড় গুণগ্রাহী কবিবন্ধু অল্পই ছিল। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভার প্রতি বিদগ্ধ-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর নবপ্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা'র প্রশংসা-সূচক সমালোচনা ক'রে। পরে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্র' কাব্যেরও এক বিস্তৃত প্রশস্তিবাচক বিচার-বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা করেন। একটি স্মরণীয় দিনের কথা আজও আমার মনে আছে। নন্দকুমার চৌধুরী লেনে (বর্তমানে ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট) দ্বিজেন্দ্র-লালের 'সুরধাম' গৃহের প্রাঙ্গণে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই একটি সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিকদের ছোটখাটো মজলিশ বসত। এখানে উপস্থিত থাকতেন কবি অক্ষয়-কুমার বড়াল, রসময় লাহা, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দেবকুমার রায়চৌধুরী, বরদাচরণ সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, পাঁচ-কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের পুত্র ললিতমোহন মিত্র এবং আরও অনেকেই। আমরাও কয়েকজন তরুণের দল সেই আসরের আশেপাশে সসম্ভ্রমে হাজির হতাম। আমাদের প্রধান আকর্ষণ ছিল তাঁর বিচিত্র হাসির গান, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং নব নব নাটক ও প্রহসনগুলির প্রথম আস্বাদ পাবার লোভ। দ্বিজেন্দ্রলাল এই আসরে প্রায়ই তাঁর নূতন রচনা প'ড়ে শোনাতেন। এ ছাড়া তাঁর সেই লনে আমাদের টেনিস ও ব্যাডমিণ্টন খেলার সুযোগও পাওয়া যেত। চায়েরও খোলা ভাণ্ডার ছিল। অমৃতলাল বসু ও ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদও মধ্যে মধ্যে আসতেন। এই সব মনীষী-দের সঙ্গে পরিচয়ের লোভও আমাদের কম আকর্ষণ ছিল না।

'সুরধামে'র সেই সবুজ প্রাঙ্গণে এমনিই এক সান্ধ্য-আসরে আমরা একদিন শুনলাম দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধুগণের মধ্যে কেউ কেউ স্পর্দ্ধার সঙ্গেই বলছেন, দ্বিজুরায়ের সঙ্গে রবিঠাকুরের কোনদিক্ দিয়েই তুলনা করা চলে না। এমন প্রাণমাতানো হাসির গানের হর্‌রা, এমন দেশ-মাতানো নাটক, আর দেশপ্রেমের সঙ্গীত রবিঠাকুরের কাছে কখনও আশাও করা যায় না।

দ্বিজেন্দ্রলাল চুপ ক'রে ব'সে স্তাবক-বন্ধুদের এই সব মন্তব্য শুনছিলেন এবং ঠোঁটের একপাশ দিয়ে মুচকে মুচকে হাসছিলেন। শেষে বন্ধুদের এই প্রশস্তির বাড়াবাড়ি যখন তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল, তিনি তাদের ভর্ৎসনার সুরে ডেকে 'সুরধামের' প্রাঙ্গণস্থ একটি আকাশ-ছোঁয়া তালগাছ দেখিয়ে বললেন, শোনো বলি: এ কথাটা তোমরা কোনও দিনই ভুলো না যে, রবীন্দ্রনাথের আসন যদি হয় ঐ তালগাছটির মাথার চুড়োয় তবে আমার আসন পড়বে ঐ গাছের তলায় মাটির ওপর।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদার' অশ্লীলতা নিয়ে এই মানুষটিই একদিন যখন মাতামাতি করছিলেন, তাঁর হাতে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত 'গোরা' উপন্যাসখানি। 'গোরা' প'ড়ে তিনি এতই মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, অযাচিত ভাবে 'গোরা' উপন্যাসের এক সুদীর্ঘ প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা প্রকাশ ক'রে কবির প্রতি তিনি যে অন্যায় করেছিলেন তার কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করেন। তার পর দেখতে পাই মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছিলেন যে, আমাদের দেশ যদি স্বাধীন হ'ত তবে রবীন্দ্রনাথ এতদিনে peerage পেয়ে সম্মানিত হতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল দেখে যেতে পারেন নি যে তাঁর অন্তিম ইচ্ছা কতকটাপূর্ণ হয়েছিল; বিদেশী সরকারই রবীন্দ্রনাথকে 'নাইটহুড' দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

একদা এহেন রবীন্দ্রভক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনী 'রবীন্দ্রবিদূষণে' নিযুক্ত হয়েছে দেখে আমরা যেমন বিস্মিত হয়েছিলাম, ততোধিক বিস্মিত হয়েছিলাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 'নারায়ণ' পত্রিকা পরিচালনা কালে যখন মাসের পর মাস 'রবীন্দ্রবিদূষণ' শুরু করেছিলেন। অথচ এই চিত্তরঞ্জন দাশ যেদিন কবিযশঃপ্রার্থী হয়ে 'সাগর-সঙ্গীত' রচনা করেছিলেন এবং তাঁর সেই প্রথম কাব্য-গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথকে উপহার পাঠিয়ে সবিনয়ে তাঁর সদয় অভিমত প্রার্থনা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেই নবাগত কবির বিনীত অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। 'সাগরসঙ্গীতে'র তিনি একটি সুদীর্ঘ সমালোচনা ক'রে সেই রচনার অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও রসপরিবেশনের মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন। 'সাগরসঙ্গীতে'র কবি ছিলেন সেদিন কাব্য-জগতে এক অখ্যাত, অজ্ঞাতনামা আগন্তুক। রবীন্দ্রনাথই তাঁকে প্রথম সাহিত্যের রসলোকে বরণ ক'রে নিয়েছিলেন যথাযোগ্য সমাদরে। সেই মানুষকে সহসা একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ ক'রেই লেখায়, রেখায় ও ব্যঙ্গচিত্রে রবীন্দ্রনাথকে সর্বলোকচক্ষে হেয় ও হাস্যাস্পদ করতে সচেষ্ট দেখে আমরা হেসেছি এবং দুঃখও পেয়েছি। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে সে, মিথ্যা প্রচারের ভিত্তি-মূলে কোনও সত্যের শক্ত মাটি না থাকায় তা অল্পদিনের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছিল। রবীন্দ্র-প্রতিভার দীপ্তিকে তা কিছুমাত্র ম্লান করতে পারে নি।

রমাপ্রসাদ চন্দ একজন ঐতিহাসিক ব'লেই পরিচিত ছিলেন। তাঁর কারবার ছিল পুরাতত্ত্বের অনুশীলন। হঠাৎ দেখা গেল, 'বসুমতী' মাসিকপত্রে তিনি 'রবীন্দ্র-বিদূষণে' অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁকে এই অনধিকার চর্চা করতে দেখে অনেকেই সেদিন অবাক্ হয়ে ভেবেছিলেন এই ঐতিহাসিক হস্তীটি অকস্মাৎ কাব্যের কমলকুঞ্জেও প্রবেশ করলেন কেন? পিছনে কি কোনও মাহুত আছে লুকিয়ে?

রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। বহুদিন বহু সময় তাঁর বসবার ঘরে নানা আলোচনায় কাটিয়েছি। পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রত্নতত্ত্বে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। 'ভারতীয় মূর্তিতত্ত্ব' তাঁর একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ। সর্বত্র প্রশংসিত। কাব্য-নাটক বা সঙ্গীত-শাস্ত্র তাঁর অনুশীলনের বিষয় না হলেও তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থ-সংগ্রহের মধ্যে এ সব পুস্তকেরও কিছু কিছু ছিল দেখেছি। রবীন্দ্র কাব্যের বিরুদ্ধ কোনও সমালোচনা আমরা তাঁর মুখে কখনও শুনি নি। অবশ্য সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অনেক হোম্‌রা-চোম্‌রার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের অন্ত ছিল না!

যাই হোক, প্রত্ন-তাত্ত্বিক রমাপ্রসাদ চন্দের সে "রবীন্দ্র-বিদূষণ" মৃতবৎসার সন্তানের ন্যায় সূতিকাগারেই পঞ্চত্ব পেল; তাঁর এ অনধিকার-চর্চাকে পাঠকেরা কেউ আমলই দিলেন না।

ইতিমধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-প্রিয় পত্রিকা "শনিবারের চিঠি" রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ ক'রে প্রায় প্রতি সংখ্যায় তাঁর নানা রচনার বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশ করতে লাগলেন। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, 'শনিবারের চিঠি' কাগজখানিতে যে সব আধুনিক তরুণ লেখকের রচনার অতি আপত্তিজনক সমালোচনা প্রকাশ হচ্ছিল প্রতি সংখ্যায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের সাহিত্য-প্রতিভাকে স্বীকার ক'রে তাঁদের কণ্ঠে কবির জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছিলেন।

সম্ভবতঃ এই অপরাধের জন্যই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও তাঁরা নামিয়ে আনতে চেয়েছিলেন তাঁদের নিন্দাবাদের কাঠগড়ায়। তাঁদের প্রধান অভিযোগ যা উপস্থিত করেছিলেন কবির বিরুদ্ধে সে হ'ল তাঁর 'শেষের কবিতা' বইখানি লেখা। ওতে নাকি আগাগোড়াই অতি আধুনিকতার জয়ধ্বনি। কবির এ ধৃষ্টতা তাঁদের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। কবিগুরু ছিলেন চিরদিনই নবীনের পূজারী, তারুণ্যের নিত্য চারণ তিনি। শনিবারের চিঠির চোখে এইটেই হয়ে উঠেছিল কবির অমার্জনীয় অপরাধ, তিনি কিনা কচি কাঁচা অবুঝ-সবুজদের পুচ্ছ তুলে নাচতে আহ্বান করেছেন! এইখানেই তিনি দেশের ও জাতির নাকি সমূহ সর্বনাশের পথ খুলে দিয়েছেন।

পূর্বেই বলেছি শনিবারের চিঠির কবির উপর

রাগের কারণ, তিনি কয়েকজন প্রতিভাবান্ তরুণ সাহিত্যিককে আগামীকালের ঋত্বিক রূপে বন্দনা করেন। এ একটা রেষারেষির ব্যাপার। কবি যদি শনিমণ্ডলের নিন্দাভাজন তরুণ লেখকদের অমন প্রশংসাপত্র না দিতেন তাহলে সম্ভবতঃ তাঁরা রবীন্দ্র বিদূষণে অবতীর্ণ হতেন না। কবির 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে তিনি নাকি ভারত-পূজ্যা মহীয়সী নারী-চরিত্র সীতাকে 'অসতী' আখ্যা দিয়ে নিন্দিতা ক'রে তোলবার প্রয়াস পেয়েছেন এ অভিযোগ 'শনিবারের চিঠি'ই প্রথম কবির বিরুদ্ধে নিয়ে এসে-ছিলেন। আমাদের দেশের অনেক অল্প-শিক্ষিত পাঠক শনিবারের চিঠির ধুয়া ধ'রে কবির প্রতি এই সীতা-অমান্যের জন্য খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

কবিকে শেষে এক দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিয়ে সকলকে বোঝাতে হয় যে, লেখকের রচনার মধ্যে পাত্র-পাত্রীদের মুখে যেসব সংলাপ দেওয়া হয় সেগুলি সেই চরিত্রের আসল রূপটি পাঠকদের সামনে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই সেই চরিত্রোপযোগী কথাই তার মুখে দিতে হয়। তার অর্থ এ নয় যে, গ্রন্থকারও নিজে সেই মত পোষণ করেন। কতকগুলি দেশী-বিদেশী লেখকের নজির তুলেও দেখাতে হয়েছিল কবিকে তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে।

সবচেয়ে অবাক্ করেছিলেন আমাদের কবির একান্ত অনুরাগী ভক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কবির প্রত্যেকটি কবিতা, প্রত্যেকটি গান শরৎচন্দ্রের কণ্ঠস্থ ছিল। অনেক সময় প্রসন্নচিত্তের আনন্দ মুহূর্তে তাঁকে আবৃত্তি করতে শুনেছি কবির কত না কবিতা। সুমধুর কণ্ঠে তন্ময় হয়ে গাইতে শুনেছি কবির কত শ্রেষ্ঠ গান। বিশেষ ক'রে কীর্তনের ঢঙে রচিত কবির এই গানখানি শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। প্রায়ই তাঁর কণ্ঠে ঝংকৃত হয়ে উঠতে শুনেছি "আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই, তুমি তাই গো!" আমাদের কানে শরৎচন্দ্রের সে সুধাকণ্ঠ যেন আজও বাজছে!

শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'একলব্য' শিষ্য। গুরু-শিষ্যে যখন দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয় নি, তখন থেকেই তিনি মনে মনে সংকল্প করেছিলেন, যতদিন না রবীন্দ্রনাথের মত লিখতে পারব ততদিন কোনও লেখাই আমার প্রকাশ করব না। এ প্রতিজ্ঞা তিনি পালন করেছিলেন শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনা ছাপার হরফে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় যখন, শরৎচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় ৩৬ বৎসর, অর্থাৎ প্রৌঢ়ত্বের পথে প্রায় পা বাড়িয়েছেন।

'বঙ্গশ্রী' মাসিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে যখন মাসের পর মাস রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনাবলীর কুৎসা প্রকাশ হচ্ছিল সে সময় শরৎচন্দ্রকে খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখতাম। মূঢ় সীতাকে রবীন্দ্রনাথ 'অসতী' বলেছেন এ দুর্নামের বঙ্গশ্রীও একজন দোহার ছিলেন। শরৎচন্দ্রের মুখে এমন কথাও শোনা গিয়েছিল যে, এই দুর্নামকারীদের গুলি ক'রে মারা উচিত।

কিন্তু পৃথিবীতে কত আশ্চর্যই না ঘটে। শরৎচন্দ্র ব্রহ্মদেশ ছেড়ে কলিকাতায় আসার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ আলাপ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। রবীন্দ্র-নাথ শরৎচন্দ্রকে খুবই স্নেহ করতেন। শরৎচন্দ্রের প্রতিভার অনুরাগী ছিলেন কবি। কিন্তু, মুশকিল বাধল শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' বইখানি নিয়ে। ইংরেজ সরকার বইখানিকে রাজদ্রোহমূলক ঘোষণা ক'রে বাজেয়াপ্ত ক'রে দিলেন।

এই রাজরোষে পড়বার আশঙ্কাতেই 'পথের দাবী' বইখানি তদানীন্তন কোনও মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করতে সাহস করে নি। তখন, দুঃসাহসী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে উপন্যাসটি প্রকাশ করেন। এ সময় সরকার পক্ষ থেকে কোনও বাধা পাওয়া যায় নি। কিন্তু পুস্তকাকারে 'পথের দাবী' প্রকাশ হবার পরই তা 'নিষিদ্ধ গ্রন্থ' ব'লে পরওয়ানা জারি হয়। শরৎচন্দ্র এ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন খাড়া করতে চান। তিনি তখন হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি। এ আন্দোলনে কংগ্রেসও তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন।

শরৎচন্দ্র এসে রবীন্দ্রনাথকে ধরলেন, আপনাকে এ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বললেন, বইখানি তুমি আমায় দিয়ে যেও। প'ড়ে দেখে কর্তব্য স্থির করব। বইখানি আদ্যোপান্ত সযত্নে প'ড়ে কবি শরৎচন্দ্রকে যে পত্র লিখেছিলেন তার সারমর্ম কতকটা এই রকম, "এ বইখানির প্রচার বিদেশী সরকার নিষিদ্ধ করেছেন ব'লে তাঁদের সে কাজের প্রতিবাদ করা চলে না। তুমি তাঁদের বিরুদ্ধে যে সব কথা লিখেছ তা সত্য হ'লেও, অপর কোনও সরকারের শাসনাধীনে থাকলে তোমাকে এর চেয়ে অনেক কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হ'ত। ইংরেজ সভ্য জাত, তুমি তাই অল্পেই পরিত্রাণ পেয়েছ

কবির এ পত্র শরৎচন্দ্রকে এত বেশি আঘাত করেছিল যে, কবির প্রতি দারুণ অভিমানে তিনি শেষ পর্যন্ত একজন ঘোরতর রবীন্দ্র-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। কবির পত্র-খানি তাঁর পকেটে পকেটেই ঘুরত। পরিচিত লোক,

বন্ধু-বান্ধব এবং বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রানুরাগী ভক্তদের তিনি সেই পত্র দেখিয়ে অত্যন্ত উত্তপ্ত কণ্ঠেই বলতেন, এই দেখ তোমাদের গুরুদেবের কাণ্ড! ইংরেজের মহিমায় তিনি একেবারে মুগ্ধ! ব্রিটিশের গুণগানে একেবারে পঞ্চমুখ! সরকার যখন 'পথের দাবী'কে নিষিদ্ধ ব'লে ঘোষণা করেছেন, তখন সে রাজাদেশের বিরুদ্ধে কি তোমাদের কবি কথা বলতে পারেন?

কবির প্রতি শরৎচন্দ্রের যখন এই বিরূপ মনোভাব উদগ্র হয়ে উঠেছে, সেই সময় একজনের 'অটোগ্রাফ' খাতায় লিখে দিয়েছেন দেখি—"নিয়ত দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াবারও একটা বয়স আছে। এক সময় থামা দরকার। যখন তখন কোনো প্রবীণ মানুষের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা শোভন নয়, সমীচীনও নয়।"

বিচিত্রায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের এই সময় শরৎচন্দ্র এক সুদীর্ঘ ও সুতীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু এই বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের মনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি কোনদিনই নিঃশেষ হয়ে যায় নি। নিদারুণ অভিমানেই যে তিনি প্রিয়জনকে আঘাত করেছিলেন এতে কোনও ভুল নেই। কারণ, আমি জানি এই সময় একজন বিশিষ্ট যশস্বী অধ্যাপক একদিন শরৎচন্দ্রের কাছে এসে হয়ত তাঁকে তোষামোদে তুষ্ট করবার জন্যেই বলছিলেন, "রবীন্দ্রনাথ কি যে লেখেন আমরা কিছুই বুঝতে পারিনে। কেমন যেন একটা রহস্যাবৃত ধোঁয়াটে ভাব। ভিতরে প্রবেশ করা যায় না। তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাও তাই আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু আপনার লেখা ভারি চমৎকার। কেমন সুন্দর, প্রাঞ্জল, মর্মস্পর্শী। কোথাও বুঝতে আমাদের একটু বেগ পেতে হয় না।"

শরৎচন্দ্র গড়গড়ার নলে লম্বা একটা টান দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, তার কারণ কি জানেন অধ্যাপক মশাই? রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের পড়বার জন্য। আমরাই হলুম তাঁর সমঝদার পাঠক। আর আমি যা লিখি—তা আপনাদের পড়বার। আমার পাঠকশ্রেণী হলেন আপনারা।

শরৎচন্দ্রের এই উক্তি থেকে একথা সহজেই বোঝা যায় যে, তাঁর মনে যে রবীন্দ্রবিদ্বেষ এসেছিল তা সাময়িক অভিমান বশেই। ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনা মাত্র। সুখের বিষয় যে, অচিরে এ বিরূপ মনোভাব শরৎচন্দ্রের মন থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি এই হঠকারিতার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন। মহাকবির চরণতলে আবার তিনি পূর্বের ন্যায় গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ, কোনও আক্রমণেরই কখনো জবাব দিতেন না। নিঃশব্দে সকল দহন সহ্য করতেন। বরং আক্রমণকারীদের স্বর্গারোহণের পর তিনি তাঁদের প্রত্যেকেরই উদ্দেশে একাধিক প্রশস্তি রচনা ক'রে গিয়েছেন।

স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

দুই

অন্ধকারেই তক্তপোশটা খুঁজে নিয়ে শোভনা তার ওপর গিয়ে বসল।

বসবার সময় পায়ে লেগে কি একটা ঝনঝন শব্দ করে উল্টে গেল। কাঁসার গেলাসটাই হবে। বিকেলে বেরুবার সময় জল খেয়ে মেঝেতেই রেখে বেরিয়ে গেছল তাড়াতাড়িতে।

হাতড়ে গেলাসটা খুঁজে সোজা করে রাখতে গিয়ে মনে পড়ল, খাবার জল ঘরে নেই। যাবার আগে তুলে রাখবার সময় হয় নি। ছেঁড়া ব্লাউসটা সেলাই করে নিতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল। ব্লাউস আর নেই তা নয়। কিন্তু ওইটেই পরে যেতে চেয়েছিল। হাসপাতাল থেকে এখানে নিয়ে আসবার দিন অনুপম ক'বার তার দিকে চেয়ে হেসেছিল। তার সেই লাজুক মিষ্টি হাসি।

হাসছ কি? জিজ্ঞাসা করেছিল শোভনা,—ছেঁড়া ব্লাউসটা দেখে?

না, না। কেমন একটু কুণ্ঠিতভাবে বলেছিল অনুপম। ছেঁড়া কোথায়? বেশ ত মানিয়েছে।

আ আমার কপাল! এই পুরণো পচা ব্লাউসটাতেই মানিয়েছে? তাহলে ছেঁড়াখোঁড়া পুরণোতেই আমায় মানায়!—শোভনা হাল্কা সুর একটু রাখতে চেয়েছিল আলাপে।

কিন্তু একটু হাসা ছাড়া অনুপম আর কিছু বলে নি। কেমন যেন অপ্রস্তুতের মত মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

কথা সে আগেও খুব কমই বলত। কিন্তু এতদিন বাদে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে আবার ঘর-বাঁধবার প্রথম দিনটায় আর একটু মুখর কি হওয়া যেত না!

হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ট্রেনে এসে ওঠা, ট্রেনে ক'টা স্টেশন বাদেই শিয়ালদায় এসে নামা ও তার পর বাসে উঠে যতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় গিয়ে রিক্শায় ওঠা পর্যন্ত ক'টা কথাই বা সে বলেছে।

পথ যে ফুরোয় না! কোথায় যাচ্ছি আমরা বল ত? জিজ্ঞেসও করেছিল একবার শোভনা।

প্রথম অনুপম শুধু একটু হেসেছিল।

পেড়াপীড়িতে ও বলেছিল—দেখ না!

শোভনা আর তার পর কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। তা বলে সেদিন ক্ষুণ্ণও হয়নি একটুও। অনুপমের স্বভাব সে জেনে মেনে নিয়েছে। ওই চাপা স্বভাবেরও কিছু একটা আকর্ষণ আছে তার কাছে।

আজ বিকেলে বার হবার সময় কিন্তু অনুপমের পছন্দ মনে করেই ওই ছেঁড়া ব্লাউসটা পরবার জন্যে সেলাই করতে বসে নি। বসেছিল কিরকম একটা আহত অভিমান থেকে। তখনই যেন মন থেকে অনুপমের সঙ্গে দেখা হবার আশা সে প্রায় মুছে ফেলেছে। যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে শুধু একটা জেদের খাতিরে।

কিন্তু জলের ব্যবস্থা বুঝি না করলে নয়।

সারা রাত কিছু না খেয়েই থাকবার জন্যে প্রস্তুত ছিল। এখন বুঝতে পারে, তেষ্টা কিন্তু অনেক আগে থাকতেই পেয়েছে। নির্জ্জলা উপবাস করবার কোন মানে হয় না। সেরকম আত্মপীড়নের কোন অভিলাষ অন্ততঃ তার নেই।

আলোটা তবু সে জ্বালে না। জানা জায়গা। কলসিটা অন্ধকারেই খুঁজে পায়। সেটা নিয়ে খিল খুলে আবার তাকে বার হতেই হ'ল।

টিউব-ওয়েলটা সামনের দিকে। তার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে ঘুরে যেতে হয়। বাড়িওয়ালার বুড়ো বয়সের পাৎলা ঘুম। পাম্প করার শব্দে হয়ত জেগে উঠতে পারেন। কিন্তু সে ভয় করা আর চলে না।

বারান্দার ভাঙা ধাপ ক'টা একটু সাবধানে নেমে সে সামনের দিকে টিউব-ওয়েলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কৃষ্ণপক্ষের বিলম্বিত চাঁদ পূব দিকের কাদের নারকেল সুপারী বাগানের ওপর দিয়ে ঘোলাটে লালচে চোখ নিয়ে উঠছে। যেমন একটা রুগ্ন জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম করছে চারিধার। ডোবার ধারে ধারে বুনো কি একটা গাছের ঝোপ। হুরহুরে না কি নাম। হলদে শাদাটে ফুলগুলোর রূপ নেই, শুধু কটু একটা গন্ধ। দিনের বেলা চোখেই পড়ে না, বা মনেই থাকে না। এখন যেন মৃতের মুখের বিকৃত হাসির মত দেখাচ্ছে।

শোভনা পাম্পের হাতলটা ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এ সব অনুভূতিতে হয়ত তার নিজের মনেরই ছায়া।

এই জ্যোৎস্নাই হয়ত অন্য কোন মনের অবস্থায় ভালো লাগত। ভালো লাগত এই আচ্ছন্ন নিস্তব্ধতা অন্ততঃ।

আজ আর অনিশ্চিত আগামী কালের মাঝখানে একটা প্রস্তুতির বিনিদ্র রাত সে চেয়েছিল।

সে প্রস্তুতি মানে কি, ভালো করে নিজের মনেও বোঝে নি নিশ্চয়।

কিন্তু সে প্রস্তুতির মাঝখানে খাবার জল তুলতে জলের পাম্পেও আসতে হয়।

শোভনা কলসিটা নিচে রেখে জল তোলবার জন্যে হাতলটা এবার নাড়তে সুরু করলে।

জল উঠল না। অনেকক্ষণ অব্যবহারে জল নিচে নেমে গেছে। পাম্প কাজ করছে না। এখন ওপর থেকে কিছুটা জল ঢালা দরকার।

কিন্তু এখন জল পাবে কোথায়? তার কলসি ত খালি।

পাম্প করা বন্ধ করতেই বাড়িওলার ঘরে কাশির শব্দ শোনা গেল। টানা টানা কাশির শব্দ বুড়ো বয়সের হাঁপানির।

বাড়িওয়ালা তাহলে জেগেছেন। এখুনি হয়ত বেরিয়ে আসবেন।

তা আসুন। শোভনা তাঁর কাছেই জল চাইবে পাম্পে ঢালবার।

কিন্তু বাড়িওয়ালা বার হল না।

শোভনা খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে পাম্পে ঢালবার জল কোথায় পাওয়া যায় তাই ভাবল।

জল না খেয়েই আজ রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায় অবশ্য। কিন্তু কেমন একটা জেদ চেপে গিয়েছে এখন।

কিংবা শূন্য ক্লান্ত হতাশ মন এমনি একটা ছুতো চায় নিজেকে ভুলে থাকবার।

কিন্তু কোথায় জলের জন্যে যাওয়া যায়? বাড়িওলার কাছে যেতে চায় না।

সে ছাড়া আর এক ঘর ভাড়াটে আছে মাত্র। বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরটায়। এক বৃদ্ধা আর তাঁর ছেলে। বাড়িতে আরো ঘর অনেক ছিল, কিন্তু সেগুলি ভেঙেচুরে কোথাও দেওয়াল কোথাও কড়িকাঠ ধ্বসে পড়ে অব্যবহার্য। বাড়িওয়ালার সেগুলো সারাবার সঙ্গতি হয়ত নেই কিংবা ইচ্ছে।

ছেলে বলতে ছোকরা কেউ নয়, বেশ বয়স্ক ভদ্রলোক।

ভদ্রলোককে একবার-আধবার দেখেছে মাত্র। আলাপ হয়েছে সামান্য দু'চারবার তাঁর মার সঙ্গে। সে ইচ্ছে করেই ঘনিষ্ঠ হয় নি। ঘনিষ্ঠতা সে এখানে আসার পর সকলের সঙ্গেই এড়িয়ে চলতে চেয়েছে। প্রথম হয়ত নিরুপদ্রবে সংসার পাতবার উৎসাহে, তার পর অনুপমের আসা-যাওয়া অনিয়মিত হতে সুরু করবার পরই অস্বস্তিকর প্রশ্নের ভয়ে।

ভদ্রলোক কি করেন, কখন থাকেন কিছুই জানে না। জানবার সুযোগও নেই। ওঁদের ঘর থেকে আলাদা একটা রাস্তায় বার হওয়া যায়। টিউবওয়েলটি ছাড়া দুই ভাড়াটের সংযোগের সুযোগ আর কোথাও নেই।

এত রাত্রে ওঁদের কাছেই যাবে নাকি জল চাইতে? তা ছাড়া উপায় কি?

তাকে যেতে কিন্তু হয় না। কলসিটা রেখে দু'পা বাড়াতেই বাড়ীওয়ালা আশুবাবুর ঘরের দরজা খুলে গেল।

কাশতে কাশতে বেরিয়ে এসে আশুবাবু একটু কর্কশ কণ্ঠেই হাঁক দিলেন—কে ওখানে?

আর চুপ করে থাকা চলে না। সামনে একটু এগিয়ে গিয়ে শোভনা বললে,—আমি কাকাবাবু! খাবার জল তুলতে এসেছিলাম!

খাবার জল তুলতে! এত রাত্রে!—আশুবাবুর কণ্ঠে বিস্ময় থাকলেও কর্কশতা আর নেই।

আজ তুলতে ভুলে গিয়াছিলাম!—শোভনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হ'ল।

কিন্তু এখন জল পাবে কি করে? তোলার ত অনেক হাঙ্গাম। মধু আবার আজই ছুটি নিয়ে গাঁয়ে গিয়েছে!

মধু আশুবাবুর সব কিছু করবার একমাত্র চাকর। বৃদ্ধের কেউ কোথাও আছে বলে শোভনা জানে না। এই পোড়ো বাড়ীটি আর ওই চাকরটি নিয়েই তিনি থাকেন।

থাক তাহলে! কাল সকালেই তুলব!—শোভনা কলসিটা তুলে নিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাবার চেষ্টা করলে।

সে কি কথা!—আশুবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—খাবার জল না হলে চলে না কি! কলে না গিয়ে আমাকেও ত ডাকতে পারতে! আমার ঘরে কি জল নেই! কাশির আর একটা টান না এলে আশুবাবু হয়ত আরও কিছু বলতেন।

শোভনা আর বাক্যব্যয় না করে কলসিটা নিয়ে তাঁর ঘরের দিকেই গেল।

কাশিটা সামলে আশুবাবু আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন,—এস এস মা! আচ্ছা বোকা মেয়ে ত তুমি!

আশুবাবুর ঘরে এর আগে কখনও ঢোকে নি। ঘরটা

প্রকাণ্ড। এককালে এইটেই এ বাড়ীর বৈঠকখানা ছিল বোধ হয়।

জিনিসপত্রে ঠাসা হয়ে সে প্রশস্ত চেহারাটা এখন আর তেমন বোঝা যায় না। জিনিসপত্র খুঁটিয়ে দেখবার সময় না থাকলেও বোঝা যায়, জীবনের পথের প্রায় সব সঞ্চয় দিয়েই আশুবাবু নিজেকে ঘিরে রাখতে চেয়েছেন। এক নজরেই লোহার সিন্দুক, দেরাজ-আলমারী, পর পর সাজানো তোরঙ্গ, ওপর ওপর চুড়ো করা ভাঙা টেবিল-চেয়ার, গড়গড়া, মায় তক্তপোশের নিচে রাখা পিকদানটা পর্যন্ত চোখে পড়ে প্রথমটা যেন কোন নিলেমের ঘরে ঢুকেছে মনে হয়। ঘরের কেমন একটা বন্ধ হাওয়ায় ওষুধ ওষুধ গন্ধেও অস্বস্তি লাগে।

তাড়াতাড়ি এখান থেকে বার হবার জন্যেই শোভনা বললে, ব্যস্ত হবেন না। আমার শুধু এক গ্লাস জল হলেই চলবে!

বিলক্ষণ! এক গ্লাসের জায়গায় দু'গ্লাস নিলে কি আমি ফতুর হয়ে যাব নাকি! তুমি নিজেই গড়িয়ে নাও মা ওই ঘড়াটা থেকে! আমার আবার রাত্রে হাত-পা-গুলো একটু কাঁপে, নইলে আমারই দেওয়া উচিত।

সে কি বলছেন?—শোভনা সত্যিই কুণ্ঠিত ভাবে গিয়ে জল গড়াতে গেল। কোন রকমে জলটা নিয়ে এখন সে বেরিয়ে যাবার জন্যে ব্যাকুল। বৃদ্ধ এখুনি নিশ্চয় অনুপমের কথা তুলবেন।

আশুবাবু কিন্তু সে কথা তুললেন না।

জল গড়ানো যখন প্রায় শেষ হয়েছে তখন হঠাৎ বললেন,—জল ত নিয়ে যাচ্ছ। খাওয়া হয়েছে আজ রাত্রে?

এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত থাকলে শোভনা অতটা থতমত বোধ হয় খেত না। একটু দেরীই হয়ে গেল তার উত্তরটা দিতে, হ্যাঁ মানে—আজ আর খাওয়ার দরকার নেই। আচ্ছা আপনাকে খুব কষ্ট দিলাম।

দাঁড়াও!

শোভনা তখন প্রায় দরজার চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, অপরাধীর মত পালিয়ে যাবার আগ্রহে।

আশুবাবুর গলার স্বরে তাকে থামতে হ'ল।

গলার স্বরটাও আলাদা।

শোনো, ঘরে এসে একটু বোসো।—আশুবাবু আবার বললেন শোভনার কানে অনভ্যস্ত গলায়।

শোভনাকে ফিরে এসে দাঁড়াতে হ'ল। আশুবাবু ততক্ষণে একটি চৌকির ওপর রাখা জালের ঢাকনা দেওয়া একটা রেকাবি বার করেছেন। রেকাবিতে কটি সন্দেশ, কটি কাটা ফল।

শোভনার দিকে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে আশুবাবু বললেন,—যাও, নিয়ে যাও। বেশী কিছু নয়, কিন্তু রাত-পিত্তি পড়াটা বাঁচবে!

এবার শোভনা সত্যিই অভিভূত বিমূঢ়। ধরা গলায় বলবার চেষ্টা করলে,—কিন্তু আপনার—

তাকে বাধা দিয়ে আশুবাবু বললেন,—না, আমার কোনো অসুবিধা হবে না। রাত্রে ওই একটু মিষ্টিটিষ্টি ছাড়া আর কিছু খাই না। আজ সন্ধ্যের দিকেই টানটা বাড়ায় আর খেতে ইচ্ছে হয় নি। অত রাত্রে খেতেও পারব না। কোন রকম কিন্তু না হয়েই সুতরাং নিয়ে যেতে পারো। ছোঁয়াছুঁয়ির বালাই থাকলেও ভাবনার কিছু নেই। ওগুলো এঁটোটেঁটো নয়, তাছাড়া আমি ব্রাহ্মণ।

শেষ কথাগুলো একটু হেসে বলতে গিয়ে আশুবাবু আবার কাশতে সুরু করলেন মুখ ফিরিয়ে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এত কথা বলার মধ্যে আশুবাবুরও কি একটা অস্বস্তি যেন লুকোন থাকছে না।

শোভনা এ ঘর থেকে পালিয়ে যাবার জন্যেই ব্যগ্র হয়েছিল। কিন্তু রেকাবিটা হাতে নিয়ে পা দুটো যেন তার অচল হয়ে গেছে মনে হল।

মুখে যা বলতে চেয়েছিল তা আর বলা হ'ল না। শুধু চোখদুটোই তার সজল হয়ে উঠল। কিন্তু শুধু কৃতজ্ঞতায় বুঝি নয়, এই অযাচিত করুণার দান নিতে হওয়ার একটা অসহায় দীনতাতেও।

ঘরে একটি মাত্র হ্যারিকেনের আলো। আলো বেশ উজ্জ্বল হলেও তাতে বার্দ্ধক্যের ক্ষীণ দৃষ্টিতে তার চোখের জল দেখতে পাওয়ার কথা নয়। দেখতেও আশুবাবু নিশ্চয় পান নি; কিন্তু তাঁর পরের কথায় মনে হল সেটা যেন তিনি কেমন করে অনুমান করে ফেলেছেন।

এবারও তাঁর পক্ষে অস্বাভাবিক স্বরে আশুবাবু বললেন—ভাবছ তোমার মত একটা ভাড়াটে মেয়ের ওপর এত অহৈতুক মায়া কেন। তোমার মত আমার একটি মেয়ে ছিল বলতে পারলে বোধ হয় ভালো হ'ত! কিন্তু সে রকম কেউ কখনো আমার ছিল না। তোমার ওপর ঠিক মায়া পড়েছে কি না তাও জানি না। কারণ, ও জিনিসটার সঙ্গে আমার পরিচয়ই নেই। সুতরাং বুড়ো হওয়ায় অন্য লক্ষণের মত এটা একটা দুর্বলতাই মনে করে নাও।

আশুবাবুর এ ধরনের কথার প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁর

পরিচয়টাই যেন বদলে যাচ্ছে। তাঁকে এ কয়দিনে যা জেনেছে, সে মানুষ যেন তিনি আর নন।

রুদ্ধকণ্ঠটা কোনরকমে এতক্ষণে যেন মুক্ত করতে পেরে শোভনা বললে, আপনাকে যা বলা উচিত তা কি করে বলব আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের সম্বন্ধে ঠিক খবর কিছুই আপনি জানেন না। জানেন না যে…

জানি। আশুবাবু আবার গম্ভীর স্বরেই বাধা দিলেন, অন্ততঃ সবচেয়ে যা জানা দরকার তা বোধহয় জানি।

শোভনা সবিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকাল। কি জানেন এ প্রশ্নটা শুধু তার মুখ দিয়ে যেন বেরুতে চাইল না।

আশুবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন, আজ তুমি কখন ফিরেছ আমি জানি। ইচ্ছে করলে তখনই তোমায় ডাকতে পারতাম। তুমি ফিরলেই ডাকব বলে তৈরী হয়েও ছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও পারি নি। ভেবেছিলাম কাল সকালেই তোমায় যা জানাবার জানাব। জানি তুমি ক্লান্ত হয়ে কি মন নিয়ে ফিরেছ। আজ রাতটুকু তাই তোমায় বিশ্রাম করতে দিতে চেয়েছিলাম।

এ সব কি হেঁয়ালি? না, মনের মধ্যে এ সব কথা কোথায় পৌঁছোবে সে আগে থাকতেই বুঝতে পেরেছে।

আশুবাবু যেন দ্বিধাভরে একটু থেমে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, আজ বিকেলে তুমি যখন ছিলে না তখন একটা চিঠি এসেছে।

কি চিঠি, কার তা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজনও শোভনা অনুভব করলে না।

আশুবাবু বলে চললেন, অন্যায় আমি নিশ্চয় করেছি, বুড়ো বয়সের কৌতূহল দমন করতে পারি নি। চিঠিটা পড়েছি।

শোভনা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কোন মন্তব্যই করল না।

আশুবাবু যেন তারই জন্যে অপেক্ষা করলেন কয়েক মুহূর্ত। তার পর বললেন, পোষ্টকার্ডে লেখা তোমার নামে চিঠি। নিচে কোন নাম সই নেই। কিন্তু চিঠি যে অনুপমবাবুর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আশুবাবু বিছানার ওপর বালিশের তলা থেকে পোস্ট-কার্ডটা বার করে শোভনার হাতে দিলেন। বললেন, এখানেই পড়ে দেখ।

শোভনা পড়বার চেষ্টা করল না। সন্দেশের রেকাবীটা ডান হাতে ধরা ছিল। বাঁ হাতে সেটা বদল করে চিঠিটা নিজের অজ্ঞাতসারেই ডান হাত বাড়িয়ে যে নিয়েছে সেটুকু লক্ষ্য করবার খেয়াল থাকলে সে বোধহয় নিজেই অবাক্ হ'ত।

কই, পড়লে না? শোভনাকে নীরবে রেকাবী আর চিঠি নিয়ে ফিরে যেতে দেখে আশুবাবু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

থাক। ঘরে গিয়ে পড়ব। শোভনার ভাবলেশহীন যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর।

কিন্তু যার জন্যে এ ঘরে ডাকলাম সেই জল নিতেই ত ভুলে যাচ্ছ? আশুবাবু কণ্ঠটা সহজ করবার চেষ্টা করলেন।

যেতে গিয়ে শোভনা আবার ফিরে দাঁড়াল। সত্যিই জলের কলসিটাই ত ফেলে যাচ্ছে! কিন্তু চিঠি খাবারের রেকাবী, জলের কলসি এক সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় কি করে!

জীবন যে কি স্থূল ব্যঙ্গরসিক তা লক্ষ্য করবার মত মনের অবস্থা তার নয়। থাকলে হয়ত বুঝত, যা পরম, যা নিদারুণ, তাতে অবান্তর অকিঞ্চিৎ উপদ্রব ছিটিয়ে পরিহাস করাতেই জীবনের নির্মম কৌতুক।

আশুবাবুই সমস্যা মেটাতে চাইলেন।

বললেন,—চল, কলসিটা আমিই দিয়ে আসছি।

আপত্তি জানিয়ে অনর্থক কথা কাটাকাটি করতে শোভনার ভাল লাগল না। শুধু বললে,—না আপনি বরং এই রেকাবীটা নিন। কলসিটা আমিই নিচ্ছি।

সেই ব্যবস্থাই হ'ল।

আশুবাবু ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে অন্ধকার দেখে বললেন,—তুমি ত আলোও জ্বাল নি দেখছি।

এইবার জ্বালব।—আশুবাবুর হাত থেকে রেকাবীটা নিয়ে দরজাটা বন্ধ করার ভঙ্গিতে যেভাবে পাল্লা দুটো ধরে সে দাঁড়াল তার ইঙ্গিত বুঝেই কি না বলা যায় না, আশুবাবু আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না। ফিরে যাবার আগে শুধু বলে গেলেন,—খাবারটা খেয়ো কিন্তু।

মনের যে কোন অবস্থাতেই যান্ত্রিক কাজগুলো বোধ হয় আপনা থেকে সারা হয়ে যায়।

শোভনা দরজা বন্ধ করে প্রথমে লণ্ঠনটা জ্বালল। তার পর গ্লাসটা একটু ধরে নিয়ে জল গড়িয়ে মেঝের ওপরই রেকাবীটা নিয়ে খেতে বসল।

চিঠিটা তক্তপোশের ধারেই রেখেছে। রাখবার সময় ঠিকানার দিক্‌টাই ওপরে পড়েছে এটাও বোধ হয় ভাগ্যের কৌতুক।

কিন্তু চিঠি পড়বার জন্যে কোন আগ্রহ যেন আর

তার নেই। কি আছে ও চিঠিতে তা মনের গভীরে জানে বলেই কি! না-ও যদি জানে, আশুবাবুর কথায় চিঠিটার আসল মর্ম তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে ত বাকী নেই!

অপ্রত্যাশিত যদি কিছু থাকে তার জন্যেও সমস্ত রাত আছে। না জানলেই বা কি হয়?

শোভনার মনের এই অবস্থায়, হয়ত এই অবস্থার দরুণই অদ্ভুত একটা খেয়াল মাথার মধ্যে খেলে যায়। কি হয় চিঠিটা একেবারেই না পড়ে ফেলে দিলে?

ওই অনিশ্চিত জিজ্ঞাসার চিহ্নটুকুই থাক্ না যে জীবন তার শেষ হয়ে যাচ্ছে তার অন্তে!

অনুপমের শেষ বক্তব্যটুকু অবজ্ঞায় জানতে না চাওয়ার মধ্যে যেন প্রতিশোধের একটা তৃপ্তি আছে।

কিন্তু সত্যিই প্রতিশোধের কোন ইচ্ছে তার মধ্যে তীব্র হয়ে আছে কি? তীব্র না হোক, একেবারে নেই তাও নয়। আশুবাবুর কাছে চিঠির কথাটা শোনবার সময়ই হঠাৎ একটা জ্বালা অন্ততঃ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করেছিল। সে জ্বালা তার পরই অনেক শান্ত হয়ে গেছে। তার জায়গায় এখন একটা তিক্ত অবসাদের আচ্ছন্নতা।

জোর করে খেতে বসলেও একটার বেশী মিষ্টি শোভনা খেতে পারল না। জলের গ্লাসটা শেষ করে সে তক্তপোশের ওপরই উঠে বসল।

চিঠিটা বাঁ হাতে ধরে একটু নাড়া-চাড়াও করলে। ঠিকানার লেখাগুলো গোটা গোটা স্পষ্ট, প্রায় নিখুঁত। অনুপমের হাতের লেখা সত্যিই ভাল।

প্রথম সে লেখা দেখার পর ঠাট্টা করে বলেছিল একদিন,—তুমি ছেলেবেলা কত কপিবুক মক্স করেছিলে বল ত?

কেন?—অনুপম একটু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল,—হাতের লেখা কি খারাপ?

খারাপ বলছি! না হিংসে করছি! এটুকুও বোঝ না!—বলে শোভনা হেসেছিল।

সে কবেকার কথা! অনুপম ঠিক যাকে প্রাণোচ্ছল বলে তা যে নয় তা সে তখনই জানে, কিন্তু তার জন্যে অনুপমের মাধুর্য তার কাছে বেড়েছে বই কমে নি। অনুপমের সঙ্কুচিত ঈষৎ অসহায় ভাবটাই তার ভাল লেগেছে।

কবে অনুপমের প্রথম লেখা দেখেছিল?

একটা মেয়েদের স্কুলে কাজ পেয়ে মফঃস্বলের এক পাড়াগাঁয়ে গিয়ে কিছুদিন থাকবার সময়।

কি লিখেছিল সে ভালো করেই মনে আছে। বেশী কিছু নয়। তার কথাও যেমন সংক্ষিপ্ত, চিঠিও তেমনি।

লিখেছিল, তোমার চিঠির আগে চিঠি দিতে পারি নি, সত্যি কথা বলতে গেলে সাহস পাচ্ছিলাম না। তোমার চিঠি পেয়ে ভরসা পেলাম। তোমার গ্রীষ্মের ছুটির ত আর দেরী নেই। আসার তারিখ জানিও।

ব্যস ওইটুকুই। কিন্তু ওইটুকুই সেদিন কি ঝঙ্কার তুলেছিল মনে। 'আসার আগে জানিও!' ওই কটা অক্ষরের মধ্যেই লাজুক স্বল্পবাক্ মনের সমস্ত ব্যাকুলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

সে কি তখনই তার মনের ভুল?

কিন্তু এ সব কি ভাবছে!

চিঠিটা এরই মধ্যে কখন উল্টে ধরেছে জানে না। কয়েকটা মাত্র লাইন। ইচ্ছে করলে অনায়াসেই পড়ে ফেলা যায়।

কিন্তু শোভনা চোখের সঙ্গে মনটাও ফিরিয়ে নিতে চায়।

কেন এ চিঠি না পড়ে সে ফেলে দিতে পারবে না? এইটেই তার নতুন জীবনের সঙ্কল্পের প্রথম পরীক্ষা মনে করতে দোষ কি!

ক্রমশঃ

সুজিতচন্দ্রের সমস্যা

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

মা তুমি শুনছ না।

শুনছি বাবা।

না, তুমি রাগ করে আছ।

ফুঃ, রাগ করতে আমার বয়ে গেছে।

না, আমি ত টেলিফোন করেছিলুম, আমার গলা শুনতে পেয়েছিলে?

হুঁ, কে তোকে টেলিফোন করতে বলেছিল?

না, আমি নিজেই করলুম। বাবা, টেলিফোন করলেও দোষ, না করলেও দোষ।

অতই যদি বোঝ ত সোজা বাড়ী চলে আসলেই পারতে।

না, আমি কি করব, স্কুল থেকে বের হয়ে দেখি গেটের কাছে বাবা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

কি জন্যে দাঁড়িয়ে রে?

কি জানি মা, সার্টের বোতাম খোলা, কোট নেই, বোধ হয় আমার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তা তুমি দেখলে কেন? এমনি ত চোখ-বোজা খেলা হয়—আমি এখন কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

না, রাস্তায় বুঝি চোখ বুজে চলতে হয়, তুমি ত বারণ করে দিয়েছ।

আমার সব বারণ শুনে উল্টে যাচ্ছ!

না, আমার কি দোষ। বাবা বললেন, খোকা!

ও, নাম ধরেও ডাকে নি, বললেন, খোকা! ফুঃ!

কেন, খোকা বুঝি আমার নাম নয়? শোন না—

তোমার এ কাহিনী শুনে আমার কি হবে?

কেন, এই ত বলছিলে, কি হ'ল সব বল্। বাবা বললে, খোকা, চল্ তোকে বাড়ী পৌঁছে দি। আমি বললুম, আমি ত রোজ একাই বাড়ী যাই, ওই ত গলির শেষে আমাদের বাড়ী।

তার পর হন্‌হন্ করে চলে এলি না কেন।

না, বাবা যে আমার হাত ধরলে, বললে, এই গাড়ী করে তোকে পৌঁছে দেব। কি সুন্দর গাড়ী মা! নতুন ঝকমক করছে, আমাদের সেই পুরানো গাড়ীটার মত ছাই কালো নয়, কি সুন্দর সোনালী রূপালী সবুজ রং।

তাই দেখে তুই ভুলে গেলি।

না মা, আমি কি সহজে ভোলবার ছেলে? বাবা বললে, চল্ তোকে নতুন গাড়ী করে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

আর তুই হ্যাংলার মত উঠে পড়লি।

কি করব, বাবা শোফারকে বললে, ভেতরে গিয়ে বোস। তারপর দরজা খুলে আমাকে উঠিয়ে দিলে, আর নিজে চালাতে বসল। আর কি জান মা, একটু আগে বিষ্টি হয়ে গেছল ত, তারপর আলোয় চারিদিক্ এমন ঝিকমিক্ করছিল, আকাশে মেঘের কি বাহার হয়েছিল, ইচ্ছা করছিল, অনেক দূর চলে যাই।

তাই বাপের সুপুত্রের মত উঠে হাঁ করে বসলে।

সুপুত্র কি মা?

যেমন তুমি একটি!

আমি! কি করেছি? বললুম না, বাবা আমাকে জোর করে তুলে নিল গাড়ীতে। আবার তুমি রেগে যাচ্ছ।

তোমার বাবার কোন্ অধিকার আছে নিয়ে যাবার? কোর্টের অর্ডারে তিনি মাসে একবার দেখা করতে পারেন, আমি বা তোমার ঠাকুমা উপস্থিত থাকব—সে ত আসতে সাহস হয় না।

ও, তাই বোধ হয় বাবা এসেছিল।

আমি ছেলে চুরির অপরাধে জেল দিতে পারি।

না, মা, বাবাকে জেলে পাঠিও না। সেখানে ত চোর-ডাকাতেরা থাকে।

তোমার বাবা কি তাদের চেয়ে ভাল নাকি?

কি জানি মা, এসব আমি বুঝতে পারি না।

বাড়ীতে নিয়ে যাবার কি মৎলব ছিল কে জানে!

না, আমি ত বললুম।

কি বললে তুমি, খুব লায়েক হয়েছ, না?

বাবা বললে, খোকা, নতুন বাড়ী দেখতে যাবি? বাবা এমন মিষ্টি করে বললে, যেমন চেঁচিয়ে বাবা কথা বলে, সে রকম নয়।

আর তুমি গলে গেলে।

না মা, বলছি ত, দেখলুম, বাবার খুব ইচ্ছে আমি তাঁর নতুন বাড়ী দেখে আসি। আচ্ছা, কেউ নতুন বাড়ী করলে সবাইকে দেখাতে ইচ্ছে করে ত? আমি

বললুম, আচ্ছা, চলো বাবা, কিন্তু আমি বেশী দেরী করতে পারব না—সেখান থেকেই ত তোমায় টেলিফোন করলুম।

আচ্ছা, খুব করেছ, এখন চুপ কর।

মা, তুমি আবার রেগে গেছ। অমন ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে আলু কুটছ কেন—সেদিন আঙুল কেটেছিলে, মনে নেই?

তুমি দয়া করে একটু চুপ করবে!

বা, নতুন বাড়ীর কথা শুনবে না বুঝি। টেলিফোনে ত তুমি বলেছিলে, ভাল করে নতুন বাড়ী দেখে আসিস, আমাকে এসে বলবি। কি সুন্দর মেজে মা, মোজেইক সব, লাল, নীল সবুজ বেগুনি, কত রকম যে রং, কত ফুল লতাপাতা আঁকা। আর একএক ঘরের দেওয়াল এক-এক রঙের। আর শোবার ঘরের জানলায়, জান মা, সব সিল্কের পর্দ্দা, তোমার যেমন সব শাড়ীর পাড়। আচ্ছা, শাড়ীর পাড় মা পর্দ্দায় লাগায় কেন?

শোবার ঘরে তোকে কে যেতে বললে!

কেন, ওই যে বাবা বললে, চল্ তোর নতুন-মা'র কাছে নিয়ে যাই।

নতুন-মা! তুই তাকে বললি নতুন-মা!

বাঃ, আমি বলব কেন? বাবা ত বললে।

বাবা! বাবা! বাবা সব বললেন! উনি ন্যাকা খোকা! হতচ্ছাড়া!

বাঃ, আমায় বকছ কেন? আমি ওপরে উঠতে চাই নি। শুধু সিঁড়ির রেলিং দেখছিলুম, রুপোর মত ঝক্‌ঝক্ করছে। বাবা ত দোতলার ঘরে নিয়ে গেল। কি সাজান ঘর মা। চারিদিক্ ঝিক্‌মিক্ করছে, বড় বড় আয়না, কাঁচের টেবিল, সে যে কত রঙের কত ঢঙের শিশি, সব পাউডার সেন্ট। আর জান মা, আমি ত প্রথমে চিনতেই পারি নি। আচ্ছা, বাড়ীতে এমন রঙীন বেনারসী পরে কেউ থাকে জানি না—যেন ঝিল্‌কি মারছে। তার পর দেখি, ওমা, লিলি-মাসী! মনে আছে মা, লিলি-মাসী একবার থিয়েটার করেছিল, কি সুন্দর সেজেছিল, ঠিক সেই রকম সাজ পরে বসে আছে।

আর তুই হাঁদার মত চেয়ে রইলি। হতভাগা!

কেন আমায় শুধু বক্‌ছ। আমি কিন্তু রেগে যাব। শোন মা, তার পর কি হ'ল জান, বাবা ঘরে ঢুকতেই

লিলি-মাসী যেন ক্ষেপে গেল, বাবাকে বকৃতে আরম্ভ করলে, ওঃ সে কি বকুনি !

হা ! হা ! কি বকৃলে রে, কি বললে ?

সে আমার মনে নেই মা। আমার কেমন ভয় হ'ল, দুঃখও হ'ল বাবার জন্যে।

ও, ওঁর দুঃখ হ'ল ! কি দরদী ! কি বকৃলে বল্ না।

হেসো না মা, সে সব আমার মনে নেই।

ও, অত কথা মনে আছে, আর বকুনির কথা মনে নেই, তোর বাবা নিশ্চয় বলতে বারণ করে দিয়েছে।

ওই নতুন গাড়ী নিয়ে ফিরতে দেরী হয়েছে বলে বকুনি। লিলি-মাসীর কোথায় পার্টি, দেরী হয়ে গেছে।

তোর বাবা চুপ করে দাঁড়িয়ে বকুনি খেলে ত ? বেশ হয়েছে।

হাঁ মা, আমার কেমন কষ্ট হ'ল। ভাবলুম, বাবা রেগে বকৃছে না কেন। ভাবলুম, আমিই রেগে বলি, কেন বাবাকে বকছ, কেমন ভয় হ'ল। কিন্তু লিলি-মাসী কেমন মজার জানো—তার পর আমার দিকে চেয়ে হেসে উঠল, তার পর বাবার গালে এক ঘুসি মেরে কি হাসি !

তোর দিকে চেয়ে হাসতে লাগল ত !

হাঁ, মা। লিলি-মাসী পাগল নাকি !

পাগল ! খুব হয়েছে !

এই দেখ, মা, সেই তুমি আঙুল কাটলে। বললাম, অমন ঘ্যাঁস্ ঘ্যাঁস্ করে আলু কুটো না, টিনচার-আইডিন এনে দিই।

খুব আদিক্ষেতা হয়েছে, এখন চুপ করে দুধ খেয়ে নে।

দুধ ! আমি ত খেয়ে এসেছি, এখন খেতে পারব না।

আবার খেয়েও এসেছ !

হাঁ মা। লিলি-মাসী এক ঘণ্টা টিপলে, ডাকলে, বয় ! বয় ! আচ্ছা Boy মানে ত বালক, দেখি দাড়ি-ওয়ালা পাজামা-পরা এক বুড়ো এসে হাজির। লিলি-মাসী বললে, বয়, এই খোকা-বাবুর জন্যে এক আইস্-ক্রীম আর কেক্ লে আও। আচ্ছা, বল না মা, দাড়িওয়ালা বুড়ো বয় কেন হল ?

দেখ্ খোকা, আর জ্বালাস্ নে চুপ কর্। সারাক্ষণ তোর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না।

আমি জিজ্ঞাসা করি, আর তোমরা কেউ উত্তর দাও না, আমি যে কিছু বুঝতে পারি না। আচ্ছা, মাষ্টার-মশাইকে জিজ্ঞাসা করব মা ?

না, আর দয়া করে এ সব কথা মাষ্টার-মশাইকে বলো, না।

তবে কাকে বলি! ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করি?

দেখ্, বড় বাড় বাড়ছিস্। বল্‌ছি না, কাউকে এ সব কথা বলবি না? জেনো তোমার বাবা নেই।

কি যে বল বুঝি না। কিন্তু জান মা, বাবা আমায় ঠকিয়েছে।

ঠকাবে না, একটা শঠ, বঞ্চক, প্রতারক, তার কাছ থেকে কি আশা করতে পার!

বঞ্চক কি মা?

জানি না, চুপ কর্।

ঠকিয়েছে কেন, বলি। যখন রবীন্দ্র-মেলার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলুম, আমি বললুম, আমি ত মেলা দেখি নি। বাবা বললে, আচ্ছা, তোকে মেলা দেখাব। আমি জিজ্ঞেস করলুম, আজই? বাবা বললে, হাঁ, আজ ফেরবার পথে মেলা দেখাব, নাগরদোলায় চড়াব। তার পর ফেরবার সময়, ওমা, আমাকে এক পুরানো কালো গাড়ীতে শোফার দিয়ে পাঠালে, নিজেও এল না, আর সেই নতুন চকচকে গাড়ী করে লিলি-মাসী সেজে বেড়াতে গেল। বাবা কিন্তু গেল না।

অত লিলি-মাসী লিলি-মাসী করিস না। বেশ হয়েছে!

কে জানে!

দেখ সুজিতচন্দ্র, তোমার এ সব বদ্‌মাইসি আর চলবে না। আমি কাল স্কুলে লিখে পাঠাব, রোজ দরওয়ান তোমাকে বাড়ীতে দিয়ে যাবে। না হয়, আমিই গিয়ে নিয়ে আসব।

সে-ই ভাল হবে মা। যদি বাবা আসে নিতে, তোমরা বোঝাপড়া করো!

চুপ, ফাজিল ছেলে! বাবা যদি মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তুই কি করবি?

চোখ বুজে দেখব না।

রাস্তায় চোখ বুজতে বারণ করেছি না? তুমি দেখেও দেখবে না। কি করবে?

আমি দেখেও দেখব না। আর যদি হাত ধরে?

হাত ছিনিয়ে নেবে!

আমি জোরে পারব কেন?

যদি হাত না ছাড়ে, বলবি, পুলিশ ডাকব।

বাবার সঙ্গে ত পুলিশের মিনিষ্টারের ভাব, তুমি বলেছিলে।

মুখ ফিরিয়ে চলে আসবি। কি করবি?

মুখ ফিরিয়ে চলে আসব।

যদি বলে, গাড়ী করে বেড়াতে নিয়ে যাব, কি বলবি?

বলব, মা বারণ করেছেন যেতে।

দূর! বলবি, তুমি আর আমার বাবা নেই, আমি অজানা লোকের সঙ্গে যাই না।

আর একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি মা। বাবা জিজ্ঞেস করছিল কি জানো, বললে, তোর শ্যামল-মামা আসে?

জিজ্ঞেস করছিল! কি আস্পর্দ্ধা! কি অধিকার তার! বললিনি কেন, হাঁ আসে, বেশ করে আসে। হাজার বার আসবে।

আমি ও সব বলিনি মা। বললুম, হাঁ, মাঝে মাঝে—

ও, ভয়ে মরে যাব।

তার পর বাবা বললে, আমি যদি কোর্টে দরখাস্ত করি, তুই আমার কাছে থাকবি, নতুন বাড়ী নতুন-মা সব পাবি—আমি যাব না মা।

আবার নতুন-মা! বেশ, তোমার এক নতুন বাবা আনছি।

নতুন বাবা! সে কি মা! বাবা বলছিল, তুমি নাকি শ্যামল-মামাকে বিয়ে করবে—তখন।

বেশ, আমার খুশি, আমি করব।

ও ত শ্যামল-মামা।

ও ত সত্যিকার মামা নয়।

তবে, মিথ্যে-মামা মা? নকল মামা! আমি কিছু বুঝতে পারি না, মামা কি করে নতুন বাবা হবে? ওই ঠাকুমা, দেখ, কি রকম ছুটে আসছে, বোধ হয় মালা জপ্‌তে জপ্‌তে পাশের ঘর হতে সব শুনছিল।

কি! কি হবে বৌ-মা? অমি বেঁচে থাকতে ও সব হবে না, হবে না।

কেন হবে না! আপনার ছেলে আবার বিয়ে করতে পারেন—আর আমি—জানেন, আপনার ছেলে আজ আমার ছেলেকে চুরি করতে এসেছিল।

চুরি করতে! দেখতে বোধ হয়, কোর্টের ত হুকুম আছে।

ছাই হুকুম! হাঁ, দেখতে, তবে ছেলেকে দেখতে নয়।

কিন্তু, আমি হাত জোড় করে বলছি বৌ-মা, এখন কিছু কোরো না, আমি মরে গেলে যা খুশি কোরো।

আর সারাজীবন এক হাঁপানি বুড়ী আর এক বদমাইস ছেলেকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে!

বলছি ত! আমি আর ক'দিন। সব বুঝি বৌ-মা।

তোমাকে আমি পছন্দ করে ছেলের বৌ করেছিলুম, তোমাকে আমি বরণ করে এই ঘরে এনেছি, তুমি দত্ত-বাড়ীর কুললক্ষ্মী, তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না, পারব না—আমার সব সম্পত্তি তোমাকে দিয়ে যাব—আজ সুজিতের কল্যাণের দিকে চাও।

ও সব বক্তৃতা অনেক শুনেছি, আর চিঁড়ে ভেজে না। আমি যে জলে-পুড়ে মলুম।

মা!

কি! তুমি আবার বক্তৃতা দেবে নাকি!

আমার কেমন গা বমি-বমি করছে, বমি পাচ্ছে।

ওকে নর্দ্দমার ধারে গিয়ে বমি করতে বল, বৌ-মা।

না, খোকা, এইখানেই বমি কর্, ওরা বিষ খাইয়েছে, এখানে বমি কর্, বমি কর্।

বিষ খাইয়েছে?

হতে পারে, আশ্চর্য্য কি?

এই ভরসন্ধ্যায় তুমি আর অলুক্ষুনে কথা সব বোলো না।

মা!

আয় বাবা আমার বুকে আয়।

ছাড় মা, যদি বমি করি তোমার গায়ে করে দেব।

সেই ভাল রে, সেই ভাল, সব বিষ আমার গায়ে ঢেলে দে।

তুমি অমন করে কেঁদো না মা, আমার একসঙ্গে বমি আর কান্না পাচ্ছে।

একটু চুপ কর, বাবা।

আমি যে কিচ্ছু বুঝতে পারি না। আচ্ছা, বড় হ'লে বুঝতে পারব?

বড় হলে—তখন আরও সঙ্কট, আরও সমস্যা, আরও কাঁদা।

কিন্তু আমি যে বড় হতে চাই, ওইরকম বড় বাড়ী করব, বড় গাড়ী কিনব, তুমি বেড়াতে যাবে—আমরা বাবার গাড়ী চড়ব না। তুমি—অমন কেঁদো না মা, ঠাকুমাও যে কাঁদতে আরম্ভ করল, আমরা সবাই মিলে তাহলে কাঁদি—

আমায় কাঁদতে দে, তুই কিন্তু কাঁদতে পাবি না, সোনা আমার।

কে যেন বেল বাজাচ্ছে, শ্যামল-মামা বোধ হয়।

বাজুক বেল, আমরা শুনব না, দরজা খুলব না।

কেন, মা? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

কিছু বোঝবার দরকার নেই, কিছু বোঝা যায় না রে, শুধু বোঝা বাড়ে—আপনি আবার কি বিড় বিড় করে মন্তর পড়ছেন—আয় বাবা শুধু আমার বুকে আয়—ঠাকুর, আর পারি না—

মাগো!

—•—

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮	২	৩৪	পন্থে	ছন্দে
৪৫	২	১৯	বিলয়	চিন্ময়
৪৯	২	৩৯	ক্ষিতিমোহন ঠাকুর	ক্ষিতিমোহন সেন

গত বৈশাখ সংখ্যায় বোম্মানা বিশ্বনাথমের 'মোহম্মদ তেলী ও বদ্‌রী' গল্পটি কাশ্মীরী গল্প হইতে অনূদিত। ইহার উল্লেখ নাই বলিয়া জ্ঞাতার্থে জানাইলাম।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা
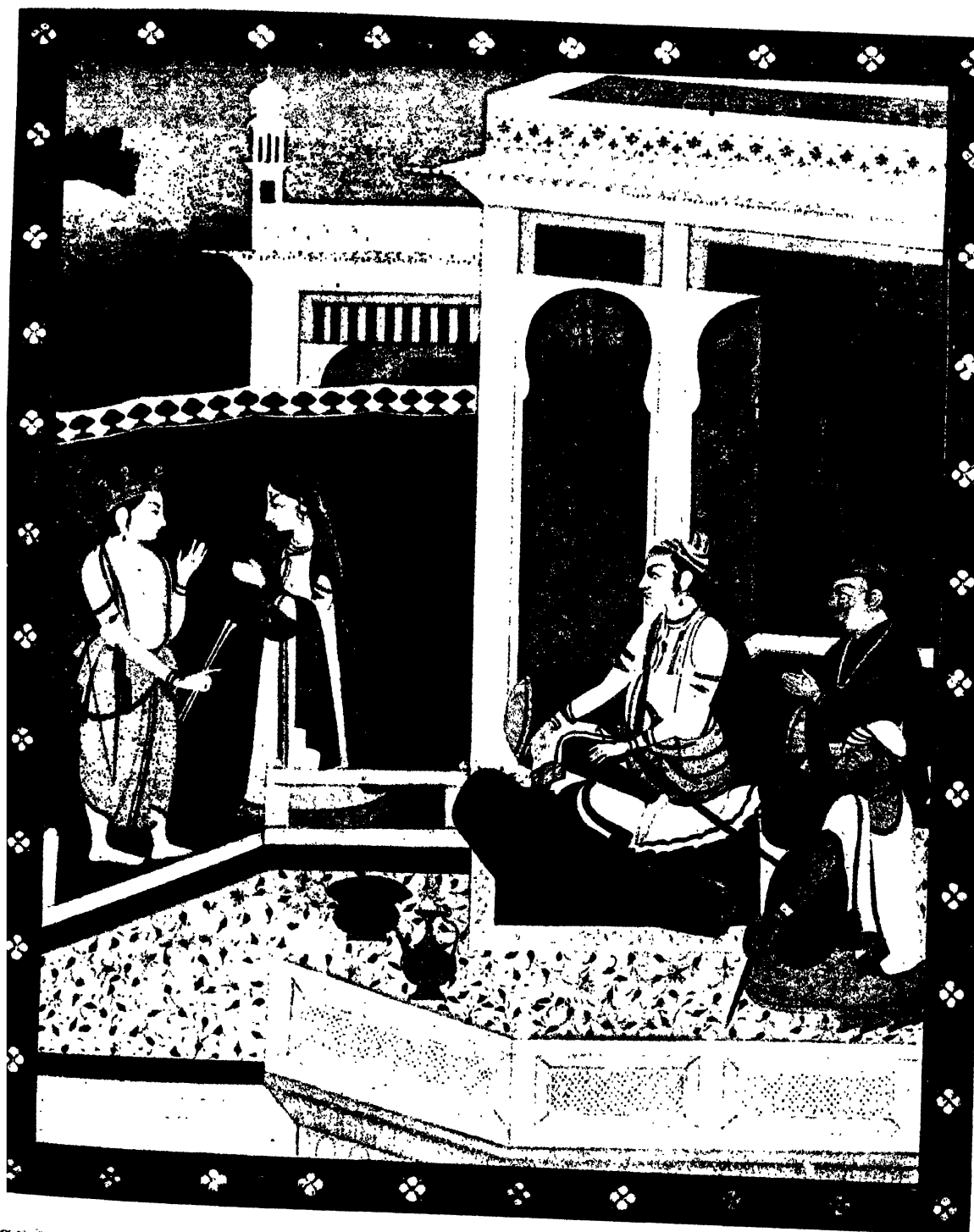
প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অভ্যর্থনা

প্রাচীন কাংড়া চিত্র—শ্রী অশোক চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

:: ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ
১ম খণ্ড } আষাঢ়, ১৩৬৮ { ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলায় শিক্ষা সমস্যা

খবরের কাগজে বিগত কয়দিনের মধ্যে শিক্ষা সম্পর্কিত কয়েকটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই প্রদেশের যে কয়টি জটিল সমস্যা জটিলতর হইতেছে তাহার মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বেকার-সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। সুতরাং এই সংবাদগুলির গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়।

প্রথম সংবাদে বলা হয় যে, পশ্চিম বাংলা সরকার স্থির করিয়াছেন যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে দ্বিতীয় স্তরের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শতকরা ৭৫টিকে উচ্চতম মানে তোলা হইবে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, ইতিমধ্যেই ২,০৩৬টি দ্বিতীয় স্তরের বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৩৩টিকে উচ্চতম মানে তোলা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে পশ্চিম বাংলার স্কুল-যাওয়ার বয়সপ্রাপ্ত ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে শতকরা ২৪টি ছেলে ও শতকরা ১৪টি মেয়ে স্কুলে পড়িতেছে। ইহাদের বয়স দেওয়া হইয়াছে ১১ হইতে ১৪ বৎসর এবং ১৪ হইতে ১৭ বৎসর, সুতরাং ইহারা দ্বিতীয় স্তরে উঠিয়াছে। বলা হইয়াছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার সময়ের শেষে শতকরা ৪০ জন ছেলে ও শতকরা ২৫ জন মেয়ে স্কুলে যাহাতে পড়িতে পারে সেই ব্যবস্থাই করা হইতেছে। মেয়েদের শিক্ষার জন্য, বিশেষে মফঃস্বলে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে বলা হইয়াছে। প্রতি জেলায় মেয়েদের বোর্ডিং-স্কুল স্থাপিত হইবে। সেখানে শিক্ষয়িত্রীদিগের (শিক্ষিকা শব্দটি অতি বাজে) থাকিবার ব্যবস্থা করা হইবে। আরও বলা হইয়াছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনা সময়ের শেষে পশ্চিম বাংলায় ৮৭,০০০ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী নূতন বিদ্যালয় ও উন্নীত বিদ্যালয়ে লওয়া হইবে।

দ্বিতীয় সংবাদটি দিয়াছেন যুগান্তরের ষ্টাফ রিপোর্টার। এবারের বি-এ পরীক্ষায় বাংলা প্রশ্নপত্রের অপরূপ উত্তরের নানা হাস্যকর উদাহরণে এই দীর্ঘ রিপোর্ট ভর্ত্তি। রিপোর্টের আরম্ভেই বড় অক্ষরে (ঐ পরীক্ষার্থীদিগের সম্পর্কে) মন্তব্য করা হইয়াছে,"বাংলা ভাষায় লজ্জাকর অজ্ঞতা", "শোচনীয় বানান ভুল", "হাস্যকর বাক্যগঠন", এবং উহাদের বিষয় বলা হইয়াছে যে (উহারা) "পাঠ্য বইও পড়ে না" ও "পাঠশালারও অযোগ্য"। যুগান্তর রিপোর্টার লিখিতেছেন :

> বিশেষজ্ঞদের মতে এ-বছরের বি-এ পরীক্ষার আবশ্যিক বাংলা প্রশ্নপত্রের বিরুদ্ধে কঠিনতার অভিযোগ উঠতেই পারে না, কিন্তু বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীর লেখা উত্তর অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক।
>
> এই অভিজ্ঞ পরীক্ষকদের সুস্পষ্ট ধারণা—অনেক পরীক্ষার্থী পাঠ্যবইগুলো ভাল করে পড়েন নি। অনেক পরীক্ষার্থী আবার এমন সব অদ্ভুত উত্তর লিখেছেন যে, তাতে মনে হয়, তাঁরা ভাল করে পড়া দূরে থাক বই-এর পাতাই বোধ হয় একেবারে ওল্টান নি, আর খাতায় বোধ হয় কলম ছোঁয়াবার অভ্যাস হয় নি। না হলে এমন উত্তর লিখবেন কেন তাঁরা : "শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্ত

কতৃক প্রত্যাখিত হইয়া মরিচের বনে তপস্যা করেন। তারপর কুমারসম্ভব শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যান।...(বানান ভুলগুলি দ্রষ্টব্য)।

"চন্দ্রশেখর অতঃপর দলনীকে বিবাহ করিয়া লইয়া গেলেন।"...

"কর্ণ অধিরথের গর্ভে জন্মাইয়া ছিলেন বলিয়া সূত্রধর পুত্র বলিয়া বিখ্যাতি হইয়াছিলেন। সেইজন্য পাণ্ডবদের মনে হিংসা উঠাইবার জন্য রাজা দুর্জোধন কর্ণকে অঙ্গদের রাজ্যে অভিসিক্ত করিলেন।"...

"পঞ্চপাণ্ডবের জন্মের পর কর্ণের জন্ম হওয়ায় কুন্তী তাঁকে চক্ষুলজ্জায় বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তাই এক সূত্রধরের কন্যা স্বীয় স্তন্যপান করিয়া কর্ণকে মানুষ করিয়া তুলিলেন, যার জন্যে কর্ণের খুব নিন্দা হইল। কিন্তু দুর্যোধোন তাহাকে কুরুক্ষেত্রের রাজা দিলেন। এমন দুর্যোধোনকে কর্ণ বিশ্বাসঘাতক করেন নাই।"...

আরও বহু উদাহরণ ঐ রিপোর্টে আছে, সে সকল এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, তবে এ কথার উল্লেখ প্রয়োজন যে, রিপোর্টারকে এক পরীক্ষক বলিয়াছেন যে, কয়েক বৎসর যাবৎ এই প্রকার উত্তর তিনি পাইতেছেন।

তৃতীয় সংবাদ দিয়াছেন আনন্দবাজারের ষ্টাফ রিপোর্টার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ সুবোধ মিত্র ঐ রিপোর্টারকে বলিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ও নৃতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ গঠনে অভিভাবকদিগের ভূমিকা, ছাত্রছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য, পড়াশুনার অভ্যাস, শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদিগের লক্ষ্য চাকুরি বা কারিগরি কিংবা পেশাগত কাজ, এই সকল বিষয়ে এক দীর্ঘদিনব্যাপী সমীক্ষা করা হইয়াছে। দশ হাজার ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক সম্পর্কে তথ্য ঐ সমীক্ষায় সংগ্রহ করা হইয়াছে। রিপোর্টারকে উপাচার্য্য বলিয়াছেন :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন, অভিভাবকদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষালাভের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীরা উত্তর-জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না এবং তাহাদের মধ্যে আশাভঙ্গের গভীর বিষাদ নামিয়া আসে।

ঐ সমস্যাটির গভীরতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা সংক্রান্ত একটি সর্ব্বাত্মক সমীক্ষার কাজ শেষ করিয়াছেন। আগামী জুলাই মাসে সরকারীভাবে এই সমীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশ করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডাঃ সুবোধ মিত্র সম্পর্কে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে নানারূপ তথ্য সংগ্রহ ছাড়াও অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আর্থিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান ঐ সমীক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। কলেজে অধ্যয়ন কালে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের অভিভাবকদের কাছে পড়াশুনা এবং ভবিষ্যৎ গঠনের ব্যাপারে কতটুকু সাহায্য পায়, তাহাও উহাতে যাচাই করা হইয়াছে।

উপাচার্য্য আরও বলেন যে :

ঐ সমীক্ষায় বর্ত্তমান শিক্ষাধারা সম্পর্কে হতাশার ছাপই নাকি পরিস্ফুট হইয়াছে। অভিভাবক যে তাহাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে চিন্তাশীল নহেন, এ বিষয়ে ঐ সমীক্ষার রিপোর্টে বিশেষ উল্লেখ থাকিবে বলিয়া নির্ভরযোগ্যসূত্রে জানা যায়।

উপাচার্য্য আরও বলেন, অনেক সময় দেখা যায়, অভিভাবকগণ নিজেদের আর্থিক সঙ্গতির কথা বিবেচনা না করিয়াই ছেলেমেয়েদের ব্যয়সাধ্য কোর্সে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ইহার পরিণাম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশুভ হইয়া থাকে। অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রদানের ফল সাধারণভাবে ভাল হইতে পারে না। সুতরাং এক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনার নিতান্ত প্রয়োজন।

ডাঃ মিত্র জানান, স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে অভিভাবকদের সাহায্য করা সম্পর্কে কি করা যায়, সে বিষয়ে তাঁহারা এখন ভাবিয়া দেখিতেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি কলেজে-কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের উপর জোর দেন।

উপরোক্ত তিনটি সংবাদই বাংলার ও বাঙালীর জীবনযাত্রার বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেন না বাঙালীর প্রধান ভরসা তাহার শিক্ষালব্ধ সম্পদের ব্যবহারে। এই শিক্ষারই গুণে বাঙালী শুধু শিক্ষক বা অধ্যাপক নহে, ডাক্তারি, ওকালতি এঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি পেশাগত ও কারিগরি বিদ্যায়, খ্যাতি প্রতিপত্তি ও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। ঐ পথে সহজে জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় হয় বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের চাইতে এই দিকেই আমাদের ঝোঁক হইয়াছে প্রায় এই বিংশ শতকের আরম্ভের সময় হইতে। ঐ ঝোঁকের ফলে এখন শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একমাত্র সম্বল এই শিক্ষা।

কিছুদিন যাবৎ এই শিক্ষার ব্যাপারেই পশ্চিম বাংলায় শঙ্কাজনক বিপর্য্যয় দেখা দিয়াছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায়, কারবারী বা ব্যবহারিক কর্ম্ম-

কেন্দ্রে বাঙালী ছেলেমেয়ে যে হটিয়া যাইতেছে, তাহার কারণ শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের নিদারুণ অবনতি। আমাদের নিজের অভিজ্ঞতায় আমরা বলিতে পারি যে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ছাত্র-ছাত্রীদিগের প্রতিযোগিতা হয় সেখানে সাধারণ ভাবে বাংলার সন্তানগণ দাঁড়াইতে পারে না। এই অযোগ্যতার মূলে তাহাদের যে কোনও জাতিগত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দোষ বা দৌর্ব্বল্য আছে, সে কথা আমরা বিশ্বাস করি না, কেন না আমাদের জীবনকালের প্রথম ও মধ্যভাগে আমরা দেখিয়াছি বাঙালী কিরূপ প্রগতিশীল ও জ্ঞানপিপাসু ছিল এবং কি ভাবে সে বিদ্যার্জ্জন করিয়া জগতের গুণীজন মধ্যে—শত বাধা সত্ত্বেও নিজের স্থান নিজশক্তিতে করিয়া লইতে সমর্থ ছিল। তবে এখন তাহার আজ এই দুর্দ্দশা কিসের কারণে?

আমাদের একটা দোষ আছে। কোনও দুরবস্থা বা দুর্দ্দশার জন্য আমরা কাহারও স্কন্ধে দায়িত্ব রোপণ করিয়াই সন্তুষ্ট হই। প্রতিকার কিভাবে ও কাহার দ্বারা হওয়া সম্ভব সে বিষয়ে আমরা চিন্তা করিতেও প্রস্তুত নই, কেন না তাহাতে হয়ত আমাদের নিজেদেরই কোনও দায়িত্বের ভার লইতে হইবে। এই যে পরকে দোষী করিয়া নিজে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা, এইটিই আমাদের সন্তানগণ শিক্ষা করিয়াছে আমাদের কাছে। সন্তানদিগের এ বিষয়ে কোনও দোষ নাই একথা বলিতে চাহি না, কেন না তাহারা এ বিষয়ে "গুরুমারা বিদ্যা" আয়ত্ত করিয়া নিজেদের জীবন অভিশপ্ত করার ব্যবস্থাই করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশকেও রসাতলে দিবার আয়োজন করিতেছে।

কিন্তু গুরুতর দায়িত্ব গুরুজনের—এবং কর্ত্তৃপক্ষের। শিক্ষায় দীক্ষায় বাঙালী অধোগামী হইয়াছে ইঁহাদেরই—অর্থাৎ আমাদেরই—দায়িত্বজ্ঞানের অভাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষায় অভিভাবকদিগের ত্রুটি ও দায়িত্বজ্ঞানশূন্যতার বিষয় প্রকাশিত হইবে। কিন্তু তাহার প্রতিকার কোথায়? বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্ব্বেকার ব্যবস্থা ত বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে নাই। সে দিকে ত সরকারী ব্যবস্থা অন্যরূপ। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিকে বাধ্য করিতে পারেন যে, অযোগ্য ছাত্রকে ভর্ত্তি না করিতে। কিন্তু যেখানে শিক্ষার মান এইভাবে গোড়ায় অবনত সেখানে যোগ্য ছাত্র কয়টি পাওয়া যায় এবং কলিকাতা তথা বাংলার বিরাট কলেজগুলি ঐ কয়টি লইয়া চলিবে কেমনে?

যে গাছ চারা অবস্থায় সার, জল পায় নাই, সে যে খর্ব্ব ও অন্তঃসারশূন্য হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? যে ছাত্র বা ছাত্রী প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের বিদ্যালয়ে ফাঁকি দিয়া পার হইয়াছে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া যে, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইবে তাহা আশা করাই বাতুলতা। সুতরাং প্রতিকারের পথের সন্ধানে প্রথমেই খোঁজ লইতে হয় প্রাথমিক ও দ্বিতীয় স্তরের বিদ্যালয়ের চালান দেওয়া ছাত্রছাত্রীদিগের শতকরা ৯৫টি এই অপরূপ ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি পায় কিরূপে এবং ঐ প্রবৃত্তির সংশোধন ঐ সকল বিদ্যালয়ে হয়, না সমর্থন হয়।

প্রাথমিক বা দ্বিতীয় স্তরের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীদের উপর দোষার্পণ করার উদ্দেশ্য আমাদের নাই। আমরা বহুবার লিখিয়াছি ও প্রকাশ্য সভায় বলিয়াছি যে, যে দেশে বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর ভদ্রস্থ রক্ষার সঙ্গতি জোটে না সে দেশ সভ্যতা বা ভদ্রতার বিষয়ে অজ্ঞ। কিন্তু এ কথার অন্যদিকও আছে।

আমাদের দেশে গুরুশিষ্য সম্পর্কে প্রাচীন একটা সংস্কার ও প্রথা ছিল। গুরু শিষ্যকে সন্তানের ন্যায় লালন পালন ও শিক্ষাদান করিতেন। বিদ্যার্পণ বা টাকা-পয়সার প্রশ্ন সেখানে ছিল না। শিষ্য অবশ্য গুরু ও গুরুপত্নীকে পিতামাতার মত দেখিত এবং গৃহস্থ সন্তান পিতৃগৃহে যে সকল কাজ করে সেই ভাবে সেও দেখাশুনা, গৃহকার্য্য ইত্যাদি করিত। সম্পর্ক ছিল একদিকে স্নেহের ও দায়িত্বের অন্যদিকে ছিল শ্রদ্ধাভক্তির এবং সেবার। গুরুদক্ষিণা বলিয়া একটা দেয় ছিল শিষ্যের, তবে সেটা ছিল শ্রদ্ধা ও সঙ্গতি অনুসারে, সেখানেও মূল্যদান বা বেতন ও পারিশ্রমিকের কোন প্রশ্ন ছিল না। গুরুর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন ভূস্বামী বা অন্য অধিকারী, উপরন্তু ছিল অধ্যাপকবিদায় ইত্যাদি শ্রদ্ধার দান বা পাণ্ডিত্যের পারিতোষিক।

পাশ্চাত্ত্য দেশের যেখানে যেখানে শিক্ষা ও সভ্যতার মান উচ্চ, সেখানে ঐ গুরুশিষ্য সম্পর্ক আজও অটুট আছে, প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্র পর্য্যন্ত। এদেশের গুরু যেমন শিষ্যের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন—যেমন সেদিনও করিয়া গিয়াছেন রসময় মিত্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ—সেইরূপে ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আগ্রহশীল ও চেষ্টিত এবং তাহার সাফল্যে নিজেকে অভিনন্দিত মনে করেন আজও পাশ্চাত্ত্য অনেক দেশের শিক্ষক ও অধ্যাপক, প্রাথমিক স্তর হইতে উচ্চতম বিভাগ পর্য্যন্ত। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী "School marm"কে শ্রদ্ধা

ও ভালবাসার সহিত স্মরণ করে না এরূপ লোক পাশ্চাত্ত্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে অতি অল্প। এই সম্পর্কের শোচনীয় ব্যতিক্রম হইতেছে শুধু আমাদের দেশে। ছাত্রের বা ছাত্রীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে-দায়িত্বজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা দিয়াছে। উপরন্ত আসিয়াছে, ছলে, বলে, কৌশলে ছাত্রকে শোষণের চেষ্টা, বহুক্ষেত্রে এবং বহুবিষয়ে।

শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী হইয়া আজিকার দিনে সংসার-যাত্রা কিরূপ দুর্ব্বহ তাহা আমরা জানি। এবং এই কারণে আজ যাহার অন্য কোন পথ নাই সেই-ই শিক্ষা-ব্রত গ্রহণ করে, ইহাও আমরা দেখিতেছি। এইজন্য শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগের অভাব, অভিযোগ, আন্দোলন সব কিছুই আমরা সমর্থন করিয়াছি এবং এখনও করিতে প্রস্তুত। কিন্তু এই অভাবের কারণে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে পিতামাতা ও সন্তানের অনুরূপ স্নেহময় ও দায়িত্বপূর্ণ সম্পর্ক, তাহার ব্যতিক্রম আমরা ভাল চোখে দেখিতে অসমর্থ। ছাত্র বা ছাত্রীকে শোষণ করিয়া অর্থা-গম করা বা ফাঁকিবাজীকে প্রশ্রয় দিয়া তাহাদের মস্তক-চর্ব্বণ করা, ইহা শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর চরম অযোগ্যতার পরিচায়ক আমাদের মতে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, শোষণ বলিতে আমরা অন্যায় উপায়ে অর্থাগমের কথাই বলিতেছি। শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী যদি নিজ দায়িত্ব পালন করেন তবে তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহের দায়িত্ব সরকারকে এবং অন্য অধিকারীবর্গকে লইতেই হইবে। অভাবে ক্লিষ্ট শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাদানের দায়িত্ব কি করে পালন করিবেন সেই প্রশ্ন সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ উদাসীন হওয়ার ফলে আজ বাংলার শিক্ষার বিষয়ে এই অধঃপতন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকার গান গাহিতেছেন তৃতীয় পরিকল্পনায় দেশের কিশোর-কিশোরীদিগের শতকরা ৪০ ও ২৫ জনকে শিক্ষাদানের পালায়। সেই সঙ্গে ৮০,০০০ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীর কর্ম্মসংস্থানের কথাও বলিতেছেন। কিন্তু কিরূপ শিক্ষা এবং কি কাজের শিক্ষা, সে বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। বোধ হয় সে বিষয়ে শিক্ষাদপ্তরে কেহ ভাবেও নাই।

যে শিক্ষার গুণে এবং যে শিক্ষা পদ্ধতির কৃপায় অভি-শপ্ত বাংলার এই হতভাগ্য ছাত্র-ছাত্রীদল, মাতৃভাষার বিনা যুক্তাক্ষর পরিচয়ে পাঠ্য পুস্তকের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখিয়া বি-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত পৌঁছাইতে পারে সে শিক্ষার মূল্যই বা কি এবং সেই শিক্ষা যাহার, তাহার যোগ্যতাই বা কি? এ বিষয়ে বাংলা সরকারের শিক্ষা দপ্তরই বা কি ভাবেন, সে কথা আমাদের জানিতে ইচ্ছা করে।

সবশেষে অভিভাবকদিগের কথা। মনে পড়ে কিছু দিন পূর্ব্বে বাঙালী ছাত্রের লেখাপড়ায় অবহেলা এবং শিক্ষাদীক্ষায় অধোগতির আলোচনায় আমাদের এক রসিক বন্ধু বলেন, "আমড়া গাছে কি ল্যাংড়া ফলে? যাদের বাপ সকাল সন্ধ্যায় আড্ডা দিয়ে রাজা উজীর মারে, যাদের মা পাড়া বেড়িয়ে, গালগল্প নিয়ে, এর ওর কুষ্ঠী কেটে বেড়ায়, তারা আকাট-অনড়ান হবে না কেন?" বন্ধুবরের এই কথা বর্ত্তমানে বাংলার শিক্ষা সমস্যার বিষয়ে কি শেষ কথা? আমরা এই প্রশ্নের উত্তর এখন জানি না, হয় ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা বিবরণ প্রকাশিত হইলে তাহাতে পাইব। সমীক্ষা বিবরণে কি তথ্য পাওয়া যাইবে সে খবর সঠিক জানা যায় নাই, কিন্তু "অভিভাবকের ভূমিকা" বলিতে যাহা বুঝিতে পারি তাহাতে মনে হয় অভিভাবকের কর্ত্তব্য যাহা উহা সেই কথা এবং সেই কর্ত্তব্য পালনে বাংলার অভিভাবকগণ কতটা কি করিয়াছেন তাহার বর্ণনা পাওয়া যাইবে সমীক্ষার বিবরণে।

বাংলার ভবিষ্যৎ যে এই শিক্ষার সমস্যা পূরণের মধ্যে নিহিত, সে কথা পুনর্ব্বার বলার প্রয়োজন নাই। সারা ভারতে আজ শিক্ষার মান নামিয়া যাইতেছে এ কথা প্রত্যেক বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন। এবং সেই অধোগতির মধ্যে কে কোথায় যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখার কি কেহই নাই? আমাদের অবহিত হওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে যাহাতে বাংলা ও বাঙালী সর্ব্বনিম্নে নামিয়া না যায়। সে বিষয়ে দেশের লোকের দৃষ্টি যদি আকর্ষণ করিতে পারে তবেই এই সমীক্ষা সফল হইবে।

বাংলা দেশে ত ভেজাল ও মেকীর রাজত্ব। অন্ন-বস্ত্রের ব্যাপারে ত ভেজালের চোটে বাঙালীর দেহমন অবসন্ন হইয়াছে—সরকার সেদিকে প্রতিকার কিছুই করিতে সক্ষম নহেন। শিক্ষায় মেকী চালানর ব্যাপারেও কি আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ সেইরূপ অক্ষমতাই জানাইবেন?

পথের বিপদ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টনক নড়িয়াছে যে, পশ্চিম বাংলায় পথে চলা বা গাড়ী চালানো বিপজ্জনক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণে মোটর চালাইবার লাইসেন্স দেওয়ায় কিছু কড়াকড়ির ব্যবস্থা হইবে শোনা যায়। ট্রান্সপোর্ট কমিশনারের দপ্তর মোটর চালানো শিক্ষার প্রকরণ নূতন ভাবে করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ইচ্ছা কলিকাতার অলিগলিতে যে

অসংখ্য "মোটর ট্রেনিং স্কুল" গজাইয়া উঠিয়াছে সেগুলিকে ঐ শিক্ষা প্রকরণ ও নিয়মাবলী যথাযথ ভাবে শিখাইতে বাধ্য করা।

ঐ শিক্ষা প্রকরণ অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে ছয় মাস শিখিতে হইবে। সরকার ঐ সকল মোটর চালানো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ছাত্র ও শিক্ষকের রেজিষ্টার এবং হাজরি, শিক্ষাদানের সময় ইত্যাদির কাগজপত্র মোটর ভেহিকলস্ আইন অনুযায়ী ঠিকমত রাখিতে বলিয়াছেন। ট্রান্সপোর্ট দপ্তরের এক মুখপাত্র ষ্টেটস্‌ম্যানের রিপোর্টারকে বলেন যে, ঐ সব "মোটর ট্রেনিং স্কুল" মোটর ভেহিকলস্ আইন অনুযায়ী কাজ কদাচিৎ করে এবং তাহাদের শিক্ষকদের মধ্যে অল্প লোকই আছে যাহারা উক্ত আইন জানে বা বুঝাইতে পারে।

বিহার, উত্তর প্রদেশ বা পাঞ্জাব হইতে আগত দেহাতি চাষা মোটা টাকা দিয়া এই সব স্কুলে ঢোকে এবং কয় মাস ঝড়ঝড়ে লরীতে মাস দুই চলাফেরা করিয়া মোটর ভেহিকলস অফিস হইতে লাইসেন্স পায়। যথাযথ তদ্বির (অর্থাৎ পুলিশ অফিসারকে ঘুষ দিবার ব্যবস্থা) হইলে ঐরূপ অল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোকের পক্ষে লাইসেন্স পাওয়া শক্ত নয়, একথাও রিপোর্টারকে বলা হয়।

মোটর লাইসেন্স বিভাগে সম্প্রতি কিছু নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরীক্ষকদিগের মধ্যে পুরাণো দলের কেহই নাই এবং বেসরকারী দক্ষ লোককে এই পরীক্ষার ব্যাপারে পুলিশ সার্জেন্টের বদলে নিযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও "তদ্বির" দ্বারা লাইসেন্স আদায় করার সম্ভাবনা একেবারে যায় নাই। ঐ সকল মোটর স্কুলের মধ্যে অনেকগুলিই অত্যন্ত অনাচার করে কিন্তু সেগুলির পিছনে প্রতিপত্তিশালী লোক থাকায় তাহাদের ছাঁটাই করে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়।

ঐ সকল স্কুলের একদল প্রতিনিধি ট্রান্সপোর্ট কমিশনার শ্রী ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করিয়া নূতন শিক্ষা প্রকরণের নিয়মাবলী বেশ কিছু "ঢিলা" করিবার অনুরোধ জানাইতে শ্রী ব্যানার্জি তাহাতে রাজী হন নাই। তিনি বলেন যে, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষকে মানিতেই হইবে। পথেঘাটে দুর্ঘটনা যে বাড়িয়া চলিতেছে তাহার প্রধান কারণ ঐ অশিক্ষিত মোটরচালকের দল। তিনি আরও বলেন, গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এখন মানুষ-মারা ফাঁদে পরিণত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, সরকার এইরূপ বিপজ্জনক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া মানিয়া লইতে রাজী নয়। মোটর স্কুলগুলিকে নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে।

এখানের সরকারী মতামত ও নিয়মকানুন বুঝা গেল। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন এই যে, ভিন্ন প্রদেশে দেওয়া লাইসেন্স যাহাদের, তাহাদের বিষয় কি করা হইবে? গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এবং কলিকাতার অঞ্চলের পথে দেখা যায় বিরাট লরী পর্ব্বতপ্রমাণ বোঝা লইয়া ৪০।৫০ মাইল বেগে পথের মাঝখান দখল করিয়া ছুটিতেছে। দিনের আলোতেই তাহাদের পাশ কাটাইয়া যাওয়া বিপজ্জনক। রাত্রে আবার কখন দুইটি কখন একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল হেড লাইট জ্বালাইয়া ঐ সব দুর্বৃত্ত লরী চালায়। একটি হেড লাইট থাকিলে বুঝা যায় না যে সেটি বাঁদিকের বা ডানদিকের, সুতরাং পথ ছাড়িয়া দাঁড়ানো ভিন্ন উপায় থাকে না। এইরূপ ঠিকারা লরীচালকই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের মালিক। ইহাদের শায়েস্তা করার কি ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন?

এ বিষয়ে আমরা বহুবার লিখিয়াছি। দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র এ বিষয়ে উদাসীন। ট্রান্সপোর্ট বিভাগের নূতন ব্যবস্থা সম্পর্কিত আলোচনা যেদিন ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা দিয়াছেন, পরদিন দুইটি প্রধান বাংলা সংবাদপত্রের মধ্যে একটি মোটর স্কুলের হইয়া সাফাই গাহিয়াছেন (জানি না "তদ্বিরের" ফলে কিনা) অন্যটি চুপ। অথচ এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ মাত্র নাই যে, বাংলার পথঘাট এখন বাঙালীর আয়ত্তের বাহিরে যাইতেছে এইভাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সকল ব্যবস্থা ধোপে টিঁকিবে কি না জানি না। বাংলার জনসাধারণ ক্রমেই সকল বিষয়ে অসহায় হইয়া পড়িতেছে এবং বাংলার সংবাদপত্রও এখন বাংলার বাহিরে হাস্যাস্পদ—যাহার কারণ বাংলার সাংবাদিক।

ফল যাহাই হউক, সরকার যে এতটুকুও অগ্রসর হইয়াছেন, ইহাই শুভ লক্ষণ—যদি না অন্য অনেক সুব্যবস্থার মত ইহা পরিশেষে তদ্বিরের গুণে বাজে কাগজের টুকরিতে যায়।

কলিকাতা পৌরসভা

সম্প্রতি এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, কলিকাতা পৌরসভার বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিতে ইউ-সি-সি দলের সদস্যদিগকে না লওয়ায় তাহারা শেষ পর্য্যন্ত পৌরসভার বিরুদ্ধে "কর দেওয়া বন্ধ" আন্দোলন আরম্ভ করার আয়োজন করিতেছেন। যে ৩১টি কেন্দ্র হইতে ইউ-সি-সি দল নির্ব্বাচিত হইয়াছেন সেইগুলিতেই ঐ আন্দোলন সুরু করা হইবে বলা হইয়াছে। ইউ-সি-সি দলের একজন সুপরিচিত সভ্য তাঁহাদের এক বৈঠকে সম্প্রতি বলিয়াছেন

যে, কংগ্রেসী দলের "একমুখী" (এক চোখো?) ভাবের দরুণ ইউ সি-সি দলের এলাকায় নাকি কোনও উন্নয়নমূলক কাজ হইতেছে না। ইউ-সি-সি দলের কোনও নির্দেশই বিভাগীয় কর্মকর্ত্তাগণ পালন করিতেছেন না এবং ইহার ফলে করদাতাদিগের নিকট ইউ-সি-সি সদস্যদিগের "নাকানি-চুবানি খাইতে" হইতেছে। উক্ত সদস্য বলেন যে, প্রতিকার হিসাবে কর বন্ধ আন্দোলন সুরু করা প্রয়োজন এবং তাহার ঐ প্রস্তাব ঐ বৈঠকে গৃহীত হয়। তবে আন্দোলন এখনই আরম্ভ করা হইবে না বলা হয়, কেন না ইউ-সি-সি-র পক্ষ হইতে ডাঃ রায়ের কাছে নালিশ লইয়া গিয়াছেন এক বামপন্থী নেতা। নালিশে কি হয় দেখিয়া আন্দোলনের বিষয় বিচার করা হইবে।

উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ হওয়ায় ইউ-সি-সি দল ক্ষুব্ধ এবং কর বন্ধ করা আন্দোলন চালাইতে উদ্যত, এই খবর ছাপার অক্ষরে না দেখিলে বিশ্বাস হইত না। আমরা ত জানি পৌরসভা শুধু উন্নয়নমূলক নয়—জরুরী নিত্যকার কাজে অবহেলা করিতেছে আজ প্রায় ছয় বৎসর যাবৎ এবং কাজ বন্ধ করার বিষয়ে গতবারের পৌরসভার সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী ছিলেন এই ইউ-সি-সি দলের সভ্যগণই। অবশ্য আমাদের ধারণা ভুল হইতে পারে, এবং সেই জন্য আমরা জানিতে চাই যে, বিগত তিন বৎসরে ইউ সি-সি দল এই "উন্নয়নমূলক কাজ" চালাইবার জন্য কয়বার মুখ ফুটিয়া প্রস্তাব আনিয়াছিলেন। নানা অজুহাতে পৌরসভার এবং তাহার বিভিন্ন ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির কাজ বন্ধ করায় উৎসাহ অবশ্য সকল সভ্যই দেখাইয়াছেন, কেহবা প্রত্যক্ষভাবে কেহবা পরোক্ষভাবে, তাহার মধ্যে ইউ-সি-সি-র দল যেন বেশী উৎসাহী ছিলেন মনে হয়। তবে আজ কেন "উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ" হওয়ায় এই বিরূপ ভাব?

পৌরসভার উপযুক্ত দোসর জুটিয়াছে কলিকাতা ট্রাম কোম্পানী। রাস্তাঘাটের অবস্থা পৌরসভা ত "উন্নয়ন" যাহা করিয়াছেন তাহা সকলেই জানে। ট্রাম কোম্পানী রাস্তা খুঁড়িয়া লণ্ডভণ্ড করিয়া ফুটপাথে রাবিশের স্তূপ চালিয়া পথযাত্রীকে নরকযাত্রার সামিল করিয়াছেন। পৌরসভাকে এই অবস্থার প্রতিকার করিতে বলায় পৌরসভা নাকি ট্রাম কোম্পানীকে "মৈত্রী রহিন" বলিয়া মনে দুঃখ দিতে চাহেন না। কি অপূর্ব্ব ভগ্নীপ্রেম!

স্বদেশ, প্রদেশ ও মহাদেশ

ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। এই মহাদেশে বহু জাতি অতীতকাল হইতে মূলতঃ একই কৃষ্টির অনুসরণ করিয়া বাস করিয়া আসিতেছেন, ভারতবর্ষে যে সকল বিদেশীরা কখন কখন আসিয়া যুদ্ধে দেশ জয় করিয়া রাজত্ব করিয়াছেন তাহারাও ক্রমশঃ ভারতীয় কৃষ্টির সহিত নিজ কৃষ্টির সমন্বয় স্থাপন করিয়া ভারতীয় কৃষ্টিকে আরও বিচিত্র ও পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা অধিক ক্ষেত্রেই নিজ দেশে আর ফিরিয়া না গিয়া ভারতের "মহামানবের" চরিতে নিজ চরিত্র ও গুণাগুণ মিশাইয়া দিয়া ভারতীয় বলিয়াই পরিচিত হইতে থাকেন। একমাত্র ব্রিটিশ জাতি নিজ দেশ ও কৃষ্টির সহিত বরাবর পূর্ণ সংযোগ রাখিয়া ভারতীয় মানবের সহিত পূর্ণযোগ স্থাপন না করিয়া চলিয়াছিলেন ও ভারতের কৃষ্টির সহিত সহযোগিতা করিলেও তাহার সহিত নিজ কৃষ্টির সমন্বয়ে নূতন কোন সভ্যতা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাহা হইলেও ভারতীয় সভ্যতা ব্রিটিশের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে এক নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে যে "হিন্দি" সভ্যতা দিল্লী ও অন্যান্য শহরে প্রভাব বিস্তার করিতেছে তাহাও নিম্নস্তরের ব্রিটিশ ও আমেরিকান। ব্যবহার ও চিন্তার ধারার সহিত গভীর ভাবে জড়িত রহিয়াছে। মোগল অথবা পাঠান কিংবা ব্রিটিশ কেহই কিন্তু কোন সময় ভারতের জাতি সকলের নিজ নিজ ভাষা ও আচার-ব্যবহার লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া সেই সকল ভাষা ও জীবনযাত্রা পদ্ধতির বিবর্ত্তন প্রচেষ্টা করেন নাই। আরব ও পারস্য অথবা তুর্ক দেশের ভাষা ভারতে কোথাও রাজ দরবার ব্যতীত অপর স্থলে প্রয়োগ বা আরোপ করিবার চেষ্টা করা হয় নাই। রাজ দরবার তৎকালে প্রজাগণের শিক্ষা, গ্রাম-উন্নতি বা অন্য কোন পরিকল্পনার নাম করিয়া জাতীয়জীবনে নিজ প্রভাব বিস্তার চেষ্টা করিত না। মাশুল ও খাজনা আদায়, শাসন, বিচার, দেশরক্ষা, দুষ্টের দমন প্রভৃতি রাজকার্য্যেই তৎকালের রাজাবাদশাহগণ আত্মনিয়োগ করিতেন। ব্যবসা, বাণিজ্য শিক্ষা, মত প্রচার, সামাজিক রীতিনীতির সংস্কার ইত্যাদি রাজকার্য্যের অন্তর্গত ছিল না। ব্রিটিশ রাজত্বে নানা উপায়ে ভারতীয়দিগকে মূর্খ ও দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়া এবং বিভিন্ন ভাবে ভারতের শিল্পকলাগুলিকে নষ্ট করিয়া ব্রিটিশের স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করা হইত এবং ঐ ভাবে ভারতের ঐশ্বর্য্য ক্রমশঃ ব্রিটেনের হস্তগত হইয়া যায়। কিন্তু ভাষা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কখনও ভারতীয়দিগকে ব্রিটেনের ভাষা ও কৃষ্টিকে মানিয়া লইয়া নিজ সভ্যতা ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করে নাই। এমন কি এ কথা বলা যায়

মোগল পাঠান বাজাবাদশাহগণ যেরূপে ভাবতীয় সংস্কৃত ভাষাগুলিব উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ কবিয়া বাংলা ও অন্যান্য ভাষাব বহু উপকাব কবিয়াছিলেন, ব্রিটিশ আমলেও তেমনি ভাবতেব প্রাদেশিক ভাষাগুলিব বহু উন্নতি হইয়াছিল। বাংলা ভাষাব ইতিহাসে ব্রিটিশ রাজত্বেব সময় তাহাব বিশেষ উন্নতিব যুগ আসিয়াছিল বলিলে ভুল হয় না। ইংবেজী ভাষাব প্রচাব ও ব্যবহাব ভাবতব্যাপী কবিবাব জন্য ইংবেজ কখনও কোন ভাবতীয় ভাষাব সর্ব্বনাশ চেষ্টা কবে নাই।

ভাবত যতদিন পবদাসত্ব কবিয়াছে ভাবতীয় সভ্যতাব বৈচিত্র্য ততদিন বৃদ্ধি লাভ কবিয়া জগতসভ্যতাব ইতিহাসে নূতন নূতন সৃষ্টিব পথ খুলিয়া বাখিয়াছিল। পাবস্য, আবব, তুবমান দেশ, চীন প্রভৃতিব সভ্যতাব ভাণ্ডাব হইতে ভাবত যথাইচ্ছা রূপ, বস, কলাকৌশল ইত্যাদি আহবণ কবিয়া নিজ সভ্যতাব শক্তি ক্রমশঃ বাড়াইল। তাহাব গৌবব এমন কবিয়া তুলিয়াছিল যাহাব তুলনা হয় না। ভাস্কর্য্য, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, পোশাক, আসবাব, বন্ধন, উদ্যান গঠন প্রভৃতিব ক্ষেত্রে ভাবত অপবাপব সভ্যতাব মালঞ্চেব বিভিন্ন সৃষ্টি-কুসুম চয়ন কবিয়া আনিয়া অপরূপ মাল্য বচনা কবিয়া জগতকে দেখাইয়াছিল যে, সুচিন্তিত ও সুরুচিত সমন্বয়েব ফলে যাহা আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন তাহা হইতে কেমন কবিয়া নব নব ছন্দে, বর্ণে, বসে ও রূপে মনেব নতনতব অভিব্যক্তি হইতে পাবে। এক কথায় বলা যায় যে, অতীতেব যে দাসত্ব ভাবতকে কখন কখন বিনাশেব অতি নিকটে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল সেই দাসত্বেব ভিতবেই ভাবত নবজীবনেব প্রাণশক্তি আবিষ্কাব কবিয়া ধ্বংসেব প্রবাহ উল্টা মুখে ঘুবাইয়া দিয়া তাহাব মধ্যেই নতন সৃষ্টিব তবঙ্গ উচ্ছলিত কবিয়া তুলিয়াছিল। চিন্তাব ক্ষেত্রে, ধর্ম্মবিশ্বাসেব ক্ষেত্রে, সমাজ গঠনেব পবিকল্পনায়, মুসলমান খৃষ্টানেব আগমনে, ভাবতেব ধর্ম্ম ও দর্শনেব বিশুদ্ধতা যেমন একদিকে নষ্ট হইয়াছিল, তেমনি আবাব সেই সংঘাতেব ফলে তাহাব জাতীয় মনেব প্রসাব ও বিস্তাব কল্পনাতীত ভাবে বাড়িয়া উঠিতেও সক্ষম হয়। আমাদেব যতগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ ভাষা ও কৃষ্টিব দ্বাবা সীমাবদ্ধ জাতি ছিল, ভাবতেব যে যে অঞ্চলে, সেইগুলি উপবোক্ত বিজাতিব ও বিধর্ম্মীব সহিত সঙ্ঘাতে আবও সবল হইয়া নিজ নিজ স্বরূপ পূর্ণতব রূপে সুবক্ষিত কবিয়া বাড়িয়া উঠিতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক জাতিই নিজ নিজ স্বদেশ ও প্রদেশেব সভ্যতাব আদর্শ বজায় বাখিয়া এই মহাজাতি ও মহাদেশেব গৌবব অক্ষুণ্ণ বাখিতে সক্ষম হইয়াছিল।

আজ আমবা স্বাধীন হইয়াছি। বাহিবেব শত্রু ও বাহিবেব শাসন, কৃষ্টি, বাজশক্তি অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ আমাদিগকে বিব্রত কবিতে বিশেষ কবিয়া কোথাও উদ্যত নহে। কিন্তু এই নবলব্ধ স্বাধীনতাব সহায়তায় আজ আমবা পবস্পবকে গ্রাস ও বিনাশ কবিতে উদ্যত। হিন্দি ভাষাভাষী ও তথাকথিত হিন্দি ভাষাভাষী গণ্ডিব ভাবতবাসীদেব নেতাদিগেব চক্রান্তে আজ আমাদেব ছোট ছোট "স্বদেশ" ও প্রদেশগুলি বিনাশেব অতলে প্রবল ভাবে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। হিন্দীকে ক্রমশঃ ইংবেজী ভাষাব "উচ্চ" আসনে বসাইয়া তাহাব প্রতিফলিত আলোকে নিজেদেব আর্থিক অবস্থা ও প্রতিষ্ঠা উজ্জ্বল ও উন্নত কবিয়া তুলিবাব আগ্রহে হিন্দি "সাম্রাজ্যবাদেব" শক্তিলোলুপ ভাবতশত্রুগণ আজ সর্ব্বত্র বীভৎসভাবে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ইহাবা যেমন একদিকে গবীবকে গবীব বাখিয়া,যাহাবা গবীব নহে তাহাদিগেব অর্থ নানা উপায়ে কাড়িয়া লইয়া এক দাবিদ্র্যক্লিষ্ট সাম্যেব সৃষ্টি কবিতে ব্যস্ত, তেমনি অপবদিকে নানা উপায়ে ভাবতেব অপেক্ষাকৃত উন্নত ভাষা ও কৃষ্টি নিচয়েব সর্ব্বনাশ সাধন কবিয়া নিকৃষ্ট অপবিণত ভাষা, কৃষ্টিব প্রচাব ও প্রসাবেব অভিনয় কবিয়া অল্পে অল্পে হিন্দীকে প্রবল ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভাষাব আসনে বসাইয়া হিন্দিভাষীদিগেব প্রভুত্ব ভাবতে চিবস্থায়ী কবিবাব চেষ্টা কবিয়া চলিয়াছে। হিন্দীবোলনেওয়ালে আজ নিজেদেব বীতি, নীতি, আচাব-ব্যবহাব ও জীবনযাত্রা পদ্ধতিব শ্রেষ্ঠত্ব প্রচাব কবিতেও লজ্জা অনুভব কবিতেছে না। দিল্লীব বাষ্ট্রপতি ভবনেব আসবাব ও গালিচাব অবস্থা দেখিলেই সহজে বুঝা যায় যে, সে জীবনযাত্রাব ধবন ধাবণ কি প্রকাব। এবং কলিকাতাব ফুটপাথ ও খোলা বোয়াকগুলিতে যে সকল উক্ত জাতীয় ব্যক্তিবা বসবাস কবেন তাঁহাদিগেব চালচলন হইতেও কিছুটা বুঝা যায় যে, মোগল, পাঠান কিংবা ইংবেজেব সহিত তুলনায় তাঁহাবা কি পবিমাণ উৎকৃষ্টিব আধাব। ইহা সকলেব জানা প্রয়োজন। কাবণ অপবেব ভাষা নিজেব কবিয়া লইলে ক্রমশঃ ভাষাব সহিত অপবেব চবিত্র ও মনোভাবও শিক্ষার্থীব মধ্যে সংক্রামিত হয়। এই কাবণে ফাবসী ও ইংবেজীব দ্বাবা ভাবতেব জনসাধাবণেব মধ্যে যে সুরুচি ও কর্ম্মকুশলতা সঞ্চাবিত হইয়াছিল, হিন্দী শিক্ষা কবিলে তাহাব বিপবীত হইবাব সম্ভাবনাই অধিক। কাবণ হিন্দীভাষাভাষীদিগেব চিন্তা, রুচি, চালচলন, খাদ্য, বস্ত্র, কোনও কিছুই অতি উৎকৃষ্ট নহে। তাঁহাদিগেব ভাষা অবলম্বন কবিয়া তাঁহাদিগেব অনুকবণে নিজেদেব জীবনযাত্রা পদ্ধতি, চিন্তা ও রুচিব

ধারা গঠিত করিলে ভারতের অধিক জাতির লোকেদেরই বিশেষ ক্ষতি হইবে। এবং ইঁহারা হিন্দিকে শুধু আদালত, দপ্তর ও দরবারের ভাষা করিয়া ছাড়িবেন না, ইঁহারা চাহিবেন যে, ভারতের সাধারণ হিন্দিকে সকলের মাতৃভাষার উপরে স্থান দিয়া হিন্দিবোলনেওয়ালেদিগকে প্রভু ও গুরুর পদে অধিষ্ঠিত করিবেন। বড় বড় চাকুরি, ভাল ভাল ব্যবসা, লাভজনক সরকারী কণ্ট্রাক্ট প্রভৃতিও নজরানা কিংবা দক্ষিণা হিসাবে তাঁহাদেরই প্রাপ্য হইবে।

অ

রাষ্ট্রভাষা

রাষ্ট্রভাষা বলিয়া হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিতে যখন কংগ্রেসের নেতাগণ স্থির করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা একথা পরিষ্কারভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন যে, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করিবার অজুহাতে তাঁহারা হিন্দীভাষা জনসাধারণের কোন বিশেষ আর্থিক বা অপর প্রকার সুবিধা করিয়া দিবেন না। ভারতের কংগ্রেস রচিত রাষ্ট্রীয় নীতি ও পদ্ধতির মধ্যেও মূলনীতি বলিয়া এই কথা মানিয়া লওয়া হইয়াছে, যে কোন বিশেষ ভাষা জানা অথবা না জানার জন্য কোনপ্রকার রাষ্ট্রীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার হইতে কোন ভারতবাসী বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু বস্তুত: উভয় বিষয়েই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয় নাই। যেখানেই কোন প্রদেশে একাধিক ভাষা ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন, সেই সকল প্রদেশেই সংখ্যাগুরু ব্যক্তিরা অথবা হিন্দীভক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছে এবং যাহারা সংখ্যায় অল্প অথবা হিন্দীপন্থী-দিগের সুনজরে নাই, তাহাদের সকলভাবে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে সকল অঞ্চলে হিন্দী অথবা সংখ্যাগুরুদিগের ভাষা ব্যবহার হয় না, সেই সকল অঞ্চলে সাধারণের অর্থে স্কুল প্রভৃতি গঠিত করিয়া এবং অন্যান্য উপায়ে সংখ্যালঘু অথবা হিন্দীপ্রীতিহীন লোকেদের শিক্ষাতে, কর্ম্মনিযোগে, ব্যবসাতে, সরকারী কণ্ট্রাক্ট ও মাল সরবরাহে ও বহু অপর উপায়ে বিপর্যস্ত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যথা, জামসেদপুরের ন্যায় অহিন্দীভাষী অঞ্চলে ভোজপুরীদিগের উৎপাতে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী প্রভৃতির শান্তিতে বাস অথবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সিংহভূমি জেলা বিষ্ণুপুর রাজ্যও চিরকাল বাংলার অন্তর্গত ছিল। এই জেলার বাসিন্দাগণ হয় বাঙ্গালী নয়ত আদিবাসী ছিলেন। বৃটিশ রাজত্বের অবসানকালে এই জেলা বিহার প্রদেশের সহিত যুক্ত হইয়াছিল অন্যায় ভাবে। এই অন্যায় কংগ্রেসের সভায় বহুবার স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পরে ভোজপুরীদল হিন্দীর প্রসার ও নিজেদের আর্থিক সুবিধার জন্য এই অন্যায় চালাইয়া যাইতেছেন। উপরন্তু ঐ অন্যায়কে আরও বর্দ্ধিতভাবে চিরস্থায়ী করিবার ব্যবস্থা করা হয়, অর্থাৎ শুধু বিহার প্রদেশের অন্তর্গত রাখিয়াই তদ্দেশবাসীদিগের শাস্তি সম্পূর্ণ হইল না, তাহারা আরও অধিক সংখ্যায় হিন্দী-ভাষী বিহারীদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বাস করিতে বাধ্য হইল। বর্ত্তমানে সিংহভূমিতে ভোজপুরী, মাগধি ও মৈথিলি জাতীয় লোকেদের প্রভুত্ব অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত। মনে হয় বাঙ্গালী অথবা আদিবাসীগণ এই সকল নকল হিন্দীভাষীদিগের অভিভাবকত্বে এই অঞ্চলে বাস করিতেছেন। শতকরা পাঁচজনও হিন্দীভাষী এই জেলায় বাস করে না এবং ইতিহাসে বাংলায় মুসলমানশক্তি প্রসার বন্ধ করিতে একমাত্র এই অঞ্চলের মল্লরাজারাই সক্ষম হইয়াছিলেন। আজ স্বাধীনতার দরবারে যেখানে যে অতীতে বা বর্ত্তমানে দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণপাত করিয়াছিল, সকলেরই অপমানের ও দুর্দ্দশার চূড়ান্ত করা হইতেছে। ইহার মূলে রহিয়াছে সেই বিরাট মিথ্যা, যাহার দ্বারা হিন্দী ভাষার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া সত্যকার ও নকল হিন্দীভাষাদিগের সুবিধার ব্যবস্থা সর্ব্বত্র করা হইতেছে। আমাদের জাতীয় মন্ত্র হইয়াছে "সত্যমেব জয়তে" কিন্তু দিল্লীর ও অপরাপর দরবারে সত্যের স্থান কোথায় তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অ

শাস্ত্রীর বিধান

আসাম প্রদেশের কত সংখ্যক অধিবাসী আসামী ভাষাভাষী এবং কত লোকে পার্ব্বত্য জাতির অন্তর্গত সে বিষয়ের সত্যকার খবর সরকারী গণনার বিবরণ হইতে পাওয়া যায় না। আসামে বাংলা ভাষাভাষী কত লোকের বাস তাহার সত্য খবর কিছুই পাওয়া যায় না। কারণ আসাম এবং অপরাপর প্রদেশেও জনসংখ্যা গণনার কার্য্য বৈজ্ঞানিক নিশ্চয়তার সহিত করা হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। মতলব সিদ্ধির জন্য জন-সংখ্যা-সংক্রান্ত বিবরণগুলি মিথ্যা করিয়া সাজাইয়া প্রস্তুত করা হয় বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। ১৯৫১ হইতে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আসামের আসামী ভাষাভাষী জনসংখ্যা এত অধিক হারে বাড়িয়া গিয়াছে, যাহা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে হইতে পারে না। অর্থাৎ আসামে আসামীর সংখ্যা বাড়াইয়া দেখান হইয়াছে, আসামীদিগকে উক্ত

প্রদেশে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া বসাইবার জন্য। আসামীরাও এই মিথ্যা ও সাজান পরিস্থিতিতে নিজেদের অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে ও তাহারই পরিচয় আমরা গত বৎসর "বাঙ্গাল খেদা" আন্দোলনের মধ্যে পূর্ণভাবে পাইয়াছি এবং বর্ত্তমানেও সেই প্রচেষ্টারই প্রকাশ দেখা গিয়াছে শিলচরে বাঙ্গালী সত্যাগ্রহীদিগের উপর অকারণে গুলী চালানর মধ্যে। এই ব্যাপারে বহু নর-নারী ও বালক-বালিকার প্রাণহানি হইয়াছে এবং আরও অনেকে জখম হইয়া মরণাপন্ন হইয়াছেন। কাছাড বাংলার অন্তর্গত এবং রাষ্ট্রীয় ঘোরপ্যাঁচ ও ফন্দিবাজির ফলে আজ আসামের সহিত সংযুক্ত। আসামীরা চাহেন যে, জনসাধারণের মাতৃভাষা নির্ব্বিচারে সকলকে আসাম প্রদেশে কেবলমাত্র আসামী ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালী আসামবাসিগণ ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন এবং তাঁহাদিগের ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য হওয়াতে তাঁহারা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। এই সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ ভাবে চালিত হয় এবং তৎসত্ত্বেও আসামের বন্দুকধারী পুলিশগণ সত্যাগ্রহীদিগের উপর নির্ম্মম ভাবে গুলি চালাইয়া এক দ্বিতীয় জালিওয়ানওয়ালাবাগের সূচনা করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে সত্যাগ্রহ চালিত রহিয়াছে এবং ভাষা কি হইবে এই কথা লইয়া বহু প্রকার আলোচনা চলিতেছে।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী জ্ঞান ও বিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ নহেন। তিনি পণ্ডিত নেহরু কর্ত্তৃক আসামে প্রেরিত হন এই ভাষা সমস্যার সমাধান করিবার জন্য। শাস্ত্রী মহাশয় অচিরাৎ বুঝিয়া লইলেন যে, আসামের জনসাধারণ নিজ নিজ মাতৃভাষার চর্চ্চা করিতে চাহেন এবং আসামীরা চাহেন গায়ের জোরে সকল আসামবাসীকে আসামী করিয়া দিতে। শাস্ত্রী মহাশয় এই সমস্যার সমাধান অতি সহজেই করিয়া দিলেন। বলিলেন সকলে এখন ইংরেজী বল ও পরে হিন্দী বলিও তাহা হইলেই আর কোন ঝগড়া থাকিবে না। ঝগড়াটা হইল বাংলা বলিবার অধিকার আসামের বাঙ্গালীর রাষ্ট্রীয় দরবারে থাকিবে কি না এই কথা লইয়া। বিচার হইল যাহা, তাঁহার অর্থ দাঁড়াইল যে, বাংলা ভাষা চলিবে না। চলিবে ইংরেজী ও পরে হিন্দী। এই বিচার শুনিয়া কংগ্রেসের অন্দরমহলে ধন্য ধন্য রব উঠিল। শাস্ত্রী "ফরমুলা" নাম হইল এই উদ্ভট মীমাংসার। বিড়ালের পিঠা ভাগের সময় যেমন বাঁদর বিড়ালদিগের দাবীর সত্য-মিথ্যা ভুলিয়া নিজে পিঠা খাইয়া শেষে সরিল, এ ক্ষেত্রে শাস্ত্রী মহাশয়ও সেইরূপ ভাবে আসামী ও বাংলা ভাষার ঝগড়া মিটমাট করিয়া দিলেন হিন্দীকে এই সুযোগে উচ্চে উঠাইয়া ধরিয়া। অ

কংগ্রেসরাজ, স্বরাজ বা অরাজ

বিগত ১৪ বৎসর আমরা স্বাধীন হইয়াছি, কিন্তু স্বাধীন দেশের মানুষের যে সকল সুখ-সুবিধা অধিকাংশ সভ্যদেশে থাকিতে দেখা যায় ভারতবর্ষে সে সকল সুবিধা ত নাই-ই, বরং পরাধীন অবস্থায় যে অল্প পরিমাণ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুযোগ ছিল তাহাও আর নাই বলিয়া বর্ত্তমানে বহু লোকের সন্দেহ হয়। কারণ কংগ্রেসের রাজত্বে দেশের গরীব, মধ্যবিত্ত বা ধনী সকলেরই অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হইয়া চলিয়াছে এবং ব্যক্তির অধিকার ক্রমশঃ খর্ব্ব হইতে হইতে প্রায় লোপ পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গরীবেরা পূর্ব্বে যে ভাবে সহজে মালমশলা জোগাড় করিয়া বিভিন্ন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া দিনগুজরান করিতে পারিত, অথবা ছোট-বড় কারখানাতে (যেখানে আমদানী মালমশলা যন্ত্র ও যন্ত্রের অবয়ব সর্ব্বদাই প্রয়োজন হইত) মজুরি করিয়াও চালাইত; বর্ত্তমানের বাঁধাবাঁধি অর্থনীতির ধাক্কায় তাহাদের কার্য্য বা মজুরির অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কংগ্রেসরাজের পরিকল্পনা ও মতলবজাত কার্য্য ব্যতীত অপর কোন প্রচেষ্টার বর্ত্তমান ভারতে কোন মূল্য অথবা ইজ্জত নাই বলিয়াই বুঝা যায়। কত লক্ষ গরীবের যে এই কংগ্রেসী অর্থনীতির আক্রমণে চরম দুর্গতি হইয়াছে তাহা কে গণিয়াছে? অনেকের চাকুরি গিয়াছে, ছোট বড় কারখানা হইতে মালের অভাবে উৎপাদন বন্ধ হইয়া যাওয়াতে। অনেক স্থলে কয়লা বা অপরাপর স্বদেশজাত মোটা মাল রেলে আসিয়া না পৌঁছানর কারণে কাজ বন্ধ ও ছাঁটাই প্রভৃতি হইয়াছে। অথবা মাল থাকিলেও বৈদ্যুতিক শক্তির অভাবে কাজ চলে না। কারণ, সর্ব্বক্ষেত্রেই কংগ্রেসী অর্থনীতির নিজ পরিকল্পনার খাতিরে সাধারণের সকল অসুবিধা ও ক্ষতি নির্লজ্জ ভাবে ঘটাইয়া চলিবার অভ্যাস। যাহা কিছু বিদেশে ক্রয় করিবার ক্ষমতা অর্জ্জিত হয় সাধারণের কর্ম্মশক্তির দ্বারা ও রপ্তানী কারবার হইতে তাহার প্রায় প্রত্যেকটি কাণাকড়ি অবধি নিজেদের মতলব সিদ্ধির জন্য ব্যয় করিয়া, সাধারণের জন্য প্রায় কিছুই না রাখিয়া বিদেশী অর্থের থলি শূন্য করিয়া ফেলাই কংগ্রেসী অর্থনীতি। কিন্তু সকল ব্যক্তিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া সে সরকারী মালিকানাবাদের পূর্ণত্বের দায়িত্ব গ্রহণ

করিবার সাহস বা শক্তি কংগ্রেসের নাই। রাষ্ট্রীয় কোন ক্ষুদ্র গণ্ডির যথেচ্ছাচারকে যদি সমষ্টিবাদ বা সোসিয়ালিজম বলিয়া মানিতে হয় তাহা হইলে কংগ্রেসের এই জনকল্যাণ-বিরুদ্ধ স্বেচ্ছাতন্ত্র ন্যায় ও গায়ের জোরে সোসিয়ালিষ্ট বলিয়া চলিতে পারে। কিন্তু যে রীতি বা পদ্ধতির ফলে অধিকাংশ লোকের আর্থিক ক্ষতি হয় এবং স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে জীবনের সকল ক্ষেত্র হইতে লোপ পাইয়া অন্তর্হিত হয়, সেই রীতি ও পদ্ধতিকে সোসিয়ালিজম বলা অতি বড় মিথ্যা। কংগ্রেসী অর্থনীতি অনুসরণ করিবার বহু স্বার্থপর, প্রবঞ্চক ও প্রতারক ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছে। সৎ ও ভদ্রলোকের পক্ষে কোনপ্রকার ব্যবসাবাণিজ্য করা বর্ত্তমান ভারতে অসম্ভব। কেনা, বেচা, গৃহনির্ম্মাণ, কণ্ট্রাক্ট পাওয়া, মাল সরবরাহ করা, লাইসেন্স পারমিট প্রভৃতি জোগাড় করা বা অপর কোন রাজকারবার করিয়া রোজগার করাও সৎপথে থাকিয়া অসম্ভব। চাকুরিতে যোগ দিলে মালিকের জালজুয়াচুরির সহায়তা পূর্ণরূপে না করিলে, অথবা তাহার মনে চাকুরির প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত করিতে না পারিলে, চাকুরি হইতে বহিস্কৃত হওয়া একান্ত নিশ্চয়। বহু বাঙালী ভদ্রলোকের চাকুরি এই কারণে অবাঙালীর দপ্তর হইতে খারিজ হইয়া গিয়াছে। কারণ চোরে চোরেই ভ্রাতৃভাব সুরক্ষিত থাকে, এবং অসৎ ব্যবসায়ী নিজ ভাই বেরাদারি ব্যতীত কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না। এই কারণে বাংলা দেশে ক্রমশঃ লক্ষ লক্ষ অবাঙালী আসিয়া ঢুকিতেছে কারণ তাহাদিগকে প্রবঞ্চক মালিকেরা বিশ্বাস করিতে পারে। গরীবের রোজকর্ম্ম নাই, তাহারা না খাইয়া মরিতেছে। কারিগর সকলেই সর্ব্বনাশের পথের পথিক এবং অনেকেই কোদাল চালাইয়া দুই মুঠা ভাত খাইতে পাইতেছে ও অনেকে অন্নের অভাবে মরিতে বসিয়াছে। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, শিক্ষায় সভ্যতায় জাতিকে সজীব করিয়া রাখিতেন, তাঁহাদিগের অবস্থা শোচনীয়। চাকুরি হইতে বিতাড়িত, পুত্র কন্যার শিক্ষার ব্যয় বহনে অসমর্থ। পূর্ব্বপুরুষের জমিজমা গৃহাদি হইতে উৎপাটিত এবং সর্ব্বত্র অপমানিত হইয়া ইঁহারা ধ্বংসের পথে বহুদূর অবধি পৌঁছিয়া গিয়াছেন। কংগ্রেসী সরকার ইঁহাদিগের নিগ্রহের কারণ হইলেও ইঁহাদিগকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক, কেননা তাহা করিতে হইলে নিজ দলপতিদিগের অপ্রিয় কার্য্য করিতে হয়। ধনী যাহারা তাহাদিগের মধ্যে শঠ ও প্রবঞ্চকদিগের কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের সহিত সদ্ভাব রহিয়াছে। ইহারা রাজকর ফাঁকি দিয়া ও সমাজকে ঠকাইয়া টাকা করিয়া কালোবাজারে টাকা লইয়া ছিনিমিনি খেলিয়া বেড়াইতেছে। যদি কোন ধনী সৎপথে থাকেন তাহা হইলে তাঁহাকে আয়ের উপর শতকরা কুড়ি টাকা অধিক রাজকর দিয়া ক্রমশঃ দেউলিয়া হইয়া যাইতে হইবে। কংগ্রেসী রাজকর নির্দ্ধারণ পদ্ধতি এমনই উৎকৃষ্ট যে, সে পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কোন জাতি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। মিথ্যা, অন্যায়, অধর্ম্ম, প্রবঞ্চনা, ছল, চাতুরী, প্রতারণা প্রভৃতিই এই পরিস্থিতিতে বাঁচিয়া থাকিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। কংগ্রেস মিথ্যা ও অধর্ম্মের উপর জীবনের বাজারে সত্য ও ন্যায়ের তুলনায় অধিক মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। মিথ্যা ও অধর্ম্মের এই মূল্যবৃদ্ধির জন্য ভারতে সততার আর কোনও স্থান নাই। হাটে, বাজারে, রাজদরবারে সর্ব্বত্র অন্যায়, অধর্ম্ম ও মিথ্যার প্রকোপ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে এবং ভারত জগতে আধ্যাত্মিকতার জন্য যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিয়াছে, আজ তাহার সুনাম গতপ্রায়। এই ভাবে চলিলে অদূর ভবিষ্যতে ভারত কেবলমাত্র চরিত্রহীনতার প্রতীক বলিয়াই জগতে পরিচিত হইবে। এবং এই সঙ্গে ভারতের অধিকাংশ নিষ্পাপচরিত্র লোকের অপসরণও সমাপিত হইয়া যাইবে।

অ

বাংলা ও বাঙালী

বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির এমন কোন বিশেষত্ব আছে যাহার জন্য বাংলা ও বাঙালীকে অপর ভারতবাসীরা একটা বিভিন্নতার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করেন। কেহ নিজের ইচ্ছামত এই বিভিন্নতার মধ্যে বাঙালীর শুধু দোষই দেখিতে পান, কেহবা তাহার মধ্যে কিছু কিছু গুণও লক্ষ্য করিতে পারেন। আমাদের ভারতীয় জনসাধারণের যে সকল দোষগুণ আছে, বাঙালীর সেই দোষগুণগুলি পূর্ণ মাত্রায় আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। বাঙালী বিশেষ করিয়া আরামপ্রিয় ও অলস এবং অপরাপর জাতি তাহা নহেন। পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়েরা এক সময় বাংলা দেশে কর্ম্মসূত্রে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা বহু ঐশ্বর্য্য অর্জ্জন করিয়া "বাঙালী" হইয়া গেলেন ও নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট করিয়া সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা, আদালতে গিয়া পরস্পরের সহিত ঝগড়া ও অবস্থাপন্নের উপযুক্ত অপরাপর সখ ও বদ অভ্যাসে ক্রমশঃ সে স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া অর্থের ক্ষেত্রে নীচে নামিয়া গেলেন। কৃষির ক্ষেত্রে অনেকে আবার সেইরূপ খ্যাতি ও যশ অর্জ্জন করিলেন যাহা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ কখন অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।

মাড়বারী আসিলেন তাহার পরে। প্রথমত, মাড়বারী-গণ বিশেষ ভাবে শ্রম করিয়া নিজেদের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পরিশ্রম ভুলিয়া, শুধু জুয়া খেলিয়া, কালোবাজার চালাইয়া ও কিছু কিছু ধনীকগোষ্ঠির অংশীদারের দরবারে মতলব ও চাতুরীর খেলা খেলিয়া, সমাজে নিজেদের স্থান বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকিলেন। বর্ত্তমানে আরাম, অলসতা, চরিত্রহীনতা, মদ ও বিলাসে মাড়বারী ডুবিয়া আছেন, মনে হয় শীঘ্রই তাহাদিগের অবস্থা, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের বাঙ্গালী ধনপতি ও তৎপরের যুগের পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়ের অনুরূপই হইয়া দাঁড়াইবে। এখন আসিতেছে ভাটিয়া, মান্দ্রাজী, শিখ ও অন্যান্য ভারতবাসীরা, যাহারা এখনও পরিশ্রম করিতে নারাজ নহেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে অল্প ব্যয়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা এখনও চলিত আছে। তবে ঐশ্বর্য্য ও তথাকথিত ইউরোপীয় কায়দার বদ অভ্যাস তাঁহাদিগের স্কন্ধেও ক্রমশঃ চড়িয়া বসিতেছে এবং মনে হয় তাঁহারাও শীঘ্রই সেই পথেরই পথিক হইবেন, যে পথে চলিয়া বাঙ্গালী এককালে নিজেদের ধন সম্পত্তি হারাইয়া বিকল্পে চাকুরির সন্ধানে ঘুরিতে আরম্ভ করেন।

বাহির ভারতের লোকে প্রথমতঃ বাংলা দেশে আসিয়াছিলেন বাঙ্গালীর সহিত সহযোগিতা করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে। পরে তাঁহারা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে শিখেন, কিন্তু বাঙ্গালীর সহিত বন্ধুত্ব তাঁহাদিগের মধ্যে অটুট থাকিয়া যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বাজারে যখন ইংরেজ ও আমেরিকানদিগের শিক্ষায় ভারতীয় ব্যবসাদারেরা ন্যায়ের পথ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া জাল, জুয়াচুরি, প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার আসরে নামিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাদিগের অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল যে, তাঁহারা বাঙ্গালী নহেন; শুধু কলিকাতার বক্ষে বসিয়া ইংরেজের সহিত মিলিয়া অধর্ম্মের পথে অর্থ উপার্জ্জনের অধিকারী। অবসর সময়ে ইংরেজ, মাড়বারী, ভাটিয়া প্রভৃতি মহাগুণশালী ব্যক্তিরা বাঙ্গালীর নিন্দা করা এবং পরস্পরের চিত্তবিনোদন নিয়মিতভাবে করিয়া চলিতেন আর সেই নিন্দার অর্থ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ক্লাবে মদ্য পানান্তে পূর্ব্বকালে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা যে সকল বাঙ্গালীবিরুদ্ধ কথা বলিয়া সুখ পাইতেন, পরে তাঁহারা সেই সকল কথাই নিজেদের চুরির সহায়ক ভারতীয় "ব্যবসাদার"দিগকে শিখাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে সেই কথাগুলিই অবাঙ্গালী ব্যবসাদারদিগের মধ্যে চলে; এবং চলে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা চাকুরির বাজারে বাঙ্গালীর প্রতিদ্বন্দ্বী। যখন হইতে হিন্দি ভাষার প্রচার লইয়া দিল্লী সরকার ভারতীয় জনসাধারণের খরচে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন তখন হইতে বাংলা ও বাঙ্গালীর উপর কংগ্রেসী গণ্ডির শ্যেনদৃষ্টি আরও অধিক তীক্ষ্ণভাবে নিবদ্ধ হইয়াছে। এককালে বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের ৩০ কোটির মধ্যে সংখ্যায় ৮ কোটি ছিলেন ও ভাষায় কৃষ্টিতে ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় তাঁহারা ভারতে বহু উচ্চস্থানেই ছিলেন। আজ কংগ্রেসের দুষ্কর্ম্মের ফলে ভারত ও পাকিস্থানে বাংলা ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা নিশ্চয়ই ১০ কোটির অধিক, কিন্তু স্বাধীন ভারতে আমরা শুনি যে, বাঙ্গালী বলিতে হয়ত মাত্র তিন কোটি লোকই আছে। বাকি বাংলা ভাষাভাষীদিগের উপর জুলুম করিয়া তাহাদিগকে হিন্দি, আসামী অথবা ওড়িয়া ভাষাভাষী করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইতেছে এবং এই চেষ্টার মূলে রহিয়াছে কংগ্রেস গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসকগোষ্ঠীর লোকেরা। বাঙালীরা অলস হইতে পারেন কিন্তু কলিকাতার পশ্চিমা দ্বারবান, চাপরাসী, আরদালি ও পেয়াদাদিগের তুলনায় তাঁহাদিগের সে আলস্য কিছুই নহে। কারণ কলিকাতার যে ২০২৫ হাজার ঐ জাতীয় ব্যক্তি টুলের উপর বসিয়া দিনে আট ঘণ্টা হাই তুলেন ও কখন কখন এক আধজন উপরওয়ালাকে সেলাম অথবা আরও অধিকসংখ্যক সাধারণ লোকেদের অপমান করিয়া মাসে ১০০।১৫০ মুদ্রা অর্জ্জন করেন; সেই সকল লোকের স্থান আজ পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চে। কারখানা প্রভৃতিতে দেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের তুলনায় চার-পাঁচ জন অবাঙালী মজুর একজন ইউরোপীয়ের সমান কাজ করে। ইহা কঠিন শ্রমের পরিচায়ক নহে। ভারতবর্ষের সকল জাতির লোকেরাই অল্পবিস্তর অনির্ভরশীল। কাহাকেও বিশ্বাস করিয়া কোন কিছু ঠিকমত চালান সম্ভব হয় না। কিন্তু খুচরা অবিশ্বস্ততা, অর্থাৎ বাজারের পয়সা চুরি, দুধে জল মিশান, চাউলে কাঁকড় মিলান, ওজনে কম দেওয়া ভেজালদুষ্ট বা নিকৃষ্ট মাল চালান ইত্যাদি কাজ অবাঙালীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বেশী আছে বলিয়াই মনে হয়। এই সকল বাঙালী-বিরুদ্ধ নিন্দাবাদ প্রথমত ইংরেজ কর্তৃক প্রবোচিত এবং পরে হিন্দি "সাম্রাজ্যবাদী"দিগের দ্বারা প্রচারিত। ইহার মূলে রহিয়াছে বাঙ্গালীকে অপদস্থ করিয়া সর্ব্বত্র শঠ, প্রবঞ্চনা ও প্রতারক "রাজ" প্রতিষ্ঠিত করা। ধর্ম্মহীন দেশশত্রু বণিক সম্প্রদায়ের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পথে আদর্শবাদী বাঙ্গালীরা একটা প্রবল অন্তরায়।

আচার্য্য বিনোবা

শ্রীগৌতম সেন

গত জুন মাসে সমগ্র আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বে-সরকারী গুণ্ডারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যে হাজার হাজার বাঙালী পরিবারকে উচ্ছেদ করিয়াছিল, তাহার ভয়াবহ স্মৃতি আজও কেহ ভুলিতে পারে নাই। আসামীর এই বাঙালী-বিদ্বেষ আজ নূতন নহে। যে আগুন এতকাল ধূমায়িত ছিল, তাহা যে একদিন অগ্ন্যুৎসবে মাতিয়া উঠিবে, ইহা সকলেই বুঝিয়াছিল। কারণ, সে আগুন নির্ব্বাপিত হয় নাই—নিভাইবার চেষ্টাও করা হয় নাই। ভবিষ্যতে আরও কিছু ঘটিবার আশঙ্কায় বাঙালীরা শ্রীবিনোবাকে আহ্বান করিয়াছিল। কারণ তাহারা চোখের উপর দেখিয়াছিল, চম্বল উপত্যকার তিন-পুরুষী দস্যুদের আত্মিক পরিবর্ত্তন। যাহাদের ধরিবার জন্য পুলিশ হয়রান হইয়া গিয়াছে, যারা অত্যাচারে অত্যাচারে সমগ্র অঞ্চলকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছে, সেই দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদল একটি লোকের আহ্বানে মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের মত বিনোবার নিকট আত্মসমর্পণ করিল, ইহা কোন শক্তি? যে-শক্তিই হোক, সকলে অভিভূত হইয়া পড়িল।

এই জন্যই সকলে চাহিতেছিল, বিনোবা একবার আসামে আসুন। যিনি দস্যুদলের মন গলাইতে পারেন, তিনি অতিঅবশ্য আসামীদেরও মনের পরিবর্ত্তন আনিতে পারিবেন। আচার্য্য বিনোবা যখন জানাইলেন, তিনি আসাম পরিদর্শনে আসিতেছেন, তখন সকলেই আশা করিয়াছিল, এই সর্ব্বজনপূজ্য মহদাশয় ব্যক্তির উপস্থিতি ও নৈতিক প্রভাবই আসামের জনজীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবে। গত জুন মাস হইতে আসামের অবস্থা তখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আসে নাই। এই জন্যই আশঙ্কা ছিল, ঐ অস্বাভাবিক অবস্থাই একদিন বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিবে। গত বৎসর ভাষা-আন্দোলনের সূত্র ধরিয়া আসামের বাংলাভাষী অধিবাসীদের উপর যে অবর্ণনীয় অত্যাচার হইয়াছিল, তাহার তদন্ত পর্য্যন্ত হয় নাই। কেন্দ্রীয় সরকার কিংবা আসাম রাজ্যসরকার কেহই বাঙালী-বিরোধী হাঙ্গামার গূঢ় কার্য্যকারণসূত্র আবিষ্কার করাও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন নাই। অথচ কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না যে, এই হাঙ্গামায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সম্পূর্ণ নির্ব্বিরোধ ও শান্তিপ্রিয় বাংলা-ভাষীরা—কেবল বাঙালী বলিয়াই অসমীয়াগণ কর্ত্তৃক অমানুষিকভাবে লাঞ্ছিত, নিগৃহীত এবং গৃহচ্যুত হইয়া-ছিল। আসামে এই বাঙালী-উৎসাদন-নিধন-অভিযানের ফলে প্রাণহানি, সম্ভ্রমনাশ এবং অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি যাহা ঘটিয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, প্রতিবাদ হোক না হোক, শেষ পর্য্যন্ত অসমীয়া নেতারাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, আসামের হাঙ্গামায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বাঙালীরাই একেবারে একতরফা মার খাইয়াছে। স্বাধীন ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ইহার পূর্ব্বে কখনও এরূপভাবে নির্য্যাতিত হয় নাই। ঘটনা অভূতপূর্ব্ব বলিয়াই আচার্য্য বিনোবা আসাম পরি-ভ্রমণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেইসঙ্গে একথাও তাহারা নিঃসন্দেহে অনুমান করিয়াছিল, বাংলা ভাষা-ভাষীরা যাহাতে আসামে নির্ব্বিবাদে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে বসবাস করিতে পারে, সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেই আচার্য্য ভাবে আসাম সফর করিতেছেন।

আচার্য্য বিনোবা আদর্শনিষ্ঠ উদার হৃদয় এবং প্রগাঢ় জ্ঞানী। তিনি যে-উদ্দেশ্যে আসাম সফর করিতেছেন, তাহাও সুমহৎ সন্দেহ নাই। তবে একথা সত্য, বাঙালীরা—যাহারা আসামের হাঙ্গামায় নির্য্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত, তাহাদের শুধু সান্ত্বনা দিতে বিনোবা আসিবেন, ইহা তাহারা চাহে না। কারণ, সান্ত্বনা ও সহানুভূতির বাক্য আসামের হতভাগ্য বাঙালীরা অনেক শুনিয়াছে এবং তাহা শুনাইবার লোকেরও অভাব নাই। আসামের জনজীবনে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে বিদ্বেষ-বিষ সঞ্চিত হইয়াছে, আচার্য্য ভাবের মত মহৎ ব্যক্তি তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিবেন ইহাই আশা করা গিয়াছিল।

কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল, তিনি বাঙালীকেই তিরস্কার করিয়া আসিলেন। আসামে যে-অত্যাচার-অনাচার ঘটিয়াছে, তাহার জন্য বাঙালীদের চরিত্র এবং আচরণই প্রধানতঃ দায়ী—এমন উদ্ভট অভিযোগ কোন অসমীয়া বা রাজনীতি-ব্যবসায়ী করিলে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু ছিল না। কিন্তু আচার্য্যের মুখে এই কথা!

আসাম একটি বহুভাষী রাজ্য। অসমীয়াগণের মত বাংলাভাষী এবং উপজাতীয় অধিবাসিগণ নির্ব্বিবাদে ও সসম্মানে বসবাস করিতে চায়। ইহা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। আসামের বাংলাভাষীরা এক শতাব্দীকাল ধরিয়া আসামেরই সন্তান। তাহারা যে বাংলাভাষী এবং বাংলা ভাষা ব্যবহারের চিরাচরিত অধিকার রক্ষা করিতে চায়, ইহাও কখনই তাহাদের আচরণের ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যেও

ভাষাগত সংখ্যালঘুরা নির্ব্বিবাদে সসম্মানে বসবাস করিতেছে—তাহারা অধিকারচ্যুত বা নির্য্যাতিত হয় নাই। আসামে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছে, সেজন্য দায়ী ভাষামোহান্ধ অসমীয়াগণের উৎকট বাঙালী-বিদ্বেষ।

গান্ধীজীর মন্ত্রশিষ্য আচার্য্য ভাবে এই উৎকট বিদ্বেষ-বিষ দূর করিতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিবেন, ইহাই আমরা আশা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা না করিয়া, তিনি যদি বলেন, বাঙালীদেরই দোষ, কেন না, প্রতিবেশী রাজ্য-সমূহে কেহই বাঙালীদের পছন্দ করে না, তবে দুঃখের সহিত বলিতে হয়, আচার্য্য ভাবে গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ না করিয়া প্রকারান্তরে অন্ধ বিদ্বেষকেই স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য বলিয়া মানিয়া লইতেছেন। অসমীয়ারা বাঙালীদের পছন্দ করে না ইহা সত্য হইলেই কি অমনি প্রমাণিত হইল, দোষ বাঙালী-চরিত্র ও আচরণের? আভিজাত্যগর্ব্বী বর্ণহিন্দুরাও হরিজনদের পছন্দ করে নাই, কিন্তু সে-কারণে গান্ধীজী কখনও বলেন নাই যে, হরিজনরাই তাহাদের সামাজিক দুর্গতির জন্য দায়ী।

মাতৃভাষা রক্ষার জন্য বাঙালী প্রতিবাদ করিয়াছে—ইহা কি তাহার অপরাধ? অথচ এই বিনোবাজীই একদিন নিজের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, 'শব্দের অর্থবোধ না হইলে ভাষা চিত্ত স্পর্শ করিবে কেন? এইজন্য আপন আপন মাতৃভাষার সাহায্যে সকল শিক্ষা হওয়ার প্রয়োজন। প্রার্থনাও মাতৃভাষায় হওয়া উচিত। চিত্তে ছাপ না পড়িলে জীবন-শুদ্ধি হইবে কোথা হইতে?'

এই বিনোবাকেই আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, মানুষের সেবা করিবার জন্যই মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি গৃহ-ত্যাগ করেন। মহাত্মা গান্ধীর তিনি মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার নির্দ্দেশেই তিনি চালিত হইয়াছেন। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্যকেই আমরা দেখিব ভাবিয়াছিলাম, এবং ইহাও জানিতাম, গান্ধীজীর যোগ্য উত্তরাধিকার তিনিই। এই বিনোবাজীকে আমরা সাধু-সন্ত বলিয়াই জানিয়া আসিয়াছি। কারণ এ-পর্য্যন্ত তাঁহার চরিত্রে বা আচরণে সেই ভাবই প্রকাশ পাইয়া আসিয়াছে। তিনিই একদিন বলিয়াছেন, "কতিপয়ের 'উদয়' আমাদের লক্ষ্য নয়। অধিক লোকের উদয়ও আমাদের লক্ষ্য নয়। বহুসংখ্যক লোকের উদয়েও আমরা তুষ্ট নই। আমরা চাই সকলের উদয়। একমাত্র তাতেই আমাদের তুষ্টি। ছোট-বড়, বুদ্ধিমান-অবোধ সকলের উদয় আমরা চাই। আর তবেই আমাদের স্বস্তি।"

বিনোবা নূতন পথের যাত্রী, বিনোবা বিপ্লবী। গান্ধীজীর পরে এমন লোকেরই দরকার ছিল। কর্ম্ম-জীবনেও দেখিয়াছি গান্ধীজীর মতই তিনি অক্লান্ত কর্ম্মী। পদব্রজে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন, আর্থিক সমতা রক্ষা করিতে ভূ-দানের প্রবর্ত্তন করেন। বিনোবাজী যাহা করিতে-ছেন, একদিক দিয়া দেখিতে গেলে গান্ধীজীর কাজ হইতে তাঁহার কাজ কঠিন। তখন ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন ছিল। পরাধীনতার লাঞ্ছনা লোকে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিল। যাহাদের হৃদয়ে এই পরাধীনতার জ্বালা ছিল না বা তীব্র আকারে ছিল না, তেমন লোকও গান্ধীজীর পরোক্ষভাবে সহায়তা করিয়াছে। অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর স্বার্থ ছিল, ইংরেজ চলিয়া গেলে, ইংরেজের হস্তস্খলিত শাসনসূত্র তাহাদের হাতে আসিয়া পড়িবে। আর ব্যবসায়ীশ্রেণী দেখিয়াছিল, ইংরেজ চলিয়া গেলে, বণিক-ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্য তাহাদের হাতে আসিবে। এইরূপে পরাধীন ভারতে ত্রিবিধ মনোভাব গান্ধীর স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুকূলে কাজ করিতেছিল। তাই গান্ধীজীর পিছনে প্রায় সমগ্র ভারতের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ও সহায়তা ছিল।

আজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিয়াছে। শাসন-ক্ষমতা মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের হস্তগত হইয়াছে। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, ভারতীয় ব্যবসায়ী-দের মনস্কাম অনেকখানি পূর্ণ হইয়াছে। আজ তাহারা প্রভূত অর্থের মালিক। প্রভূত অর্থ মানেই প্রভূত প্রভাব। আর প্রভূত প্রভাব মানে প্রচুর ক্ষমতা। তখন ইংরেজ বণিকের ইঙ্গিতে ইংরেজের রাজদণ্ড পরিচালিত হইত। আজও ঠিক সেই পথেই ভারতীয় বণিক-প্রধানদের পরোক্ষ প্রভাবে ভারতের রাজদণ্ড নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। বিনোবা চাহিয়াছিলেন এই অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটাইতে। ভূ-দান তাঁহার প্রথম পদক্ষেপ।

নেতা সময়োপযোগী কাজ খোঁজেন, আর কাজ খোঁজে যুগোপযোগী নেতা। এবং বিপ্লব অনুকূল-সময় বাছিয়া লয়। এই তিনের যখন সমন্বয় হয়, তখন বিপ্লব পূর্ণাঙ্গ হয়, সাফল্যের দিকে সহজগতিতে অগ্রসর হয়।

অন্নের প্রতিশ্রুতি যাহারা দেয়, অন্নহীন লোকে তাহাদের পিছনে চলে। ভারতের অগণিত লোক অন্নহীন। একদিকে নিদারুণ দারিদ্র্য, আর একদিকে চরম ভোগবিলাস। এই অবস্থাকে শান্ত করার উপায়—অন্নাভাব দূর করা, আর্থিক বৈষম্যের অবসান ঘটান। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু এ দেশের অধিকাংশ কৃষক ভূমিহীন। অতএব অন্নাভাবকে দূর করিতে হইলে

চাষীকে ভূমির মালিক করিতেই হইবে। মালিক বলিলে ভুল বলা হইবে—আসলে, মালিকানা বলিয়া কিছু থাকিবে না—জমি হইবে গ্রামের সম্পত্তি। আর গ্রাম হইবে এক বৃহৎ পরিবার। এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলেই, আর্থিক অসমতা আপনা হইতে দূর হইয়া যাইবে।

গ্রামের জমি দিন দিন মহাজন ও জমিদারের হাতে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বিনোবা একদিন বলিয়াছিলেন, আমি এক সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিব। প্রত্যেকে কতটা জমি রাখিতে পাইবে তাহা বাঁধিয়া দিব। তাহা হইবে বিশ বা ত্রিশ একরের মত। অতিরিক্ত জমি কাড়িয়া লওয়া হইবে, আর যাহাদের জমি কম বা আদৌ নাই তাহাদের বাঁটিয়া দেওয়া হইবে।

এই সৎ উদ্দেশ্যে জমি তিনি অনেকের নিকট হইতেই পাইয়াছেন—যদিও জানি না, সে জমিগুলির কি সদ্‌গতি হইয়াছে।

১৯৪০ সনে গান্ধীজীও বলিয়াছিলেন, "মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে যতটা জমি চাই তাহার বেশী কাহারও থাকিবে না। জনসাধারণের হাতে জমি নাই। আর তাহাই হইতেছে তাহাদের নিদারুণ দারিদ্র্যের হেতু।"

আমাদের প্রশ্ন সেইখানেই—এ দারিদ্র্য কি দূর হইয়াছে?

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, বিনোবা চরিত্রে কোথাও স্খলন নাই। স্থিতপ্রজ্ঞ, অধ্যাত্ম-শক্তিতে শক্তিমান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং আজন্ম ব্রহ্মচারী থাকিয়া অহিংস ও সংযত। চরিত্রের এই বড় গুণগুলি হইতেই তিনি লোক আকৃষ্ট করিয়াছেন।

জন্মাবধিই বিনোবার শরীর দুর্ব্বল। যে-কারণেই হউক, চোখও তাঁহার খারাপ ছিল। চশমা অভাবে কিছুই দেখিতে পাইতেন না। অবশেষে গান্ধীজী তাঁহাকে চশমা করাইয়া দেন। চশমা পরিয়া তিনি একদা বলিয়াছিলেন: "আশ্রমে যে ঘরে থাকিতাম, সে ঘরে অসংখ্য লাল পিঁপড়ে ছিল। দেখতে পেতাম না। চশমা এল। আর যেখানে সেখানে পিঁপড়ে দেখতে লাগলাম। মনে হল, আজ পর্য্যন্ত কত পিঁপড়ে যে পায়ে দলেছি, তা ভগবান জানেন। বহিশ্চক্ষুর সম্বন্ধে যে কথা, বুদ্ধি সম্বন্ধেও সে কথা। চিন্তা যদি স্বচ্ছ না হয়, জ্ঞানচক্ষু যদি অন্ধ হয়, তবে আমাদের দ্বারা কত অনুচিত কর্ম্ম যে অনুষ্ঠিত হয়, তার সীমা সংখ্যা নেই।"

এই বিনোবাজীর আসামে বাঙালী-নিধন দেখিয়াও জ্ঞানচক্ষু অন্ধ হইয়াই রহিল ইহাও ত আশ্চর্য্য! গীতা-প্রবচনে যাঁহার জীবন প্রতিফলিত, তাঁহাকে আমরা গীতার পুরুষরূপেই দেখিতে চাহিয়াছিলাম।

গান্ধীজীর স্বরাজ্য কল্পনাকে বিনোবা যে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার মূল বিভাজন ছিল এই: (১) সর্ব্ব-রাষ্ট্রীয় ভ্রাতৃভাব, (২) রাষ্ট্রের সকল লোকের সজ্ঞান ও যথাশক্তি এবং স্বতঃস্ফূর্ত্ত আন্তরিক সহযোগিতা, (৩) সমর্থ অল্প সংখ্যকের ও সর্ব্বসাধারণ বহু সংখ্যকের হিতৈক্য, (৪) সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ ও সমান বিকাশের দৃষ্টি, (৫) রাজসত্তার ব্যাপকতম বিভাজন, (৬) অল্পতম শাসন, (৭) সুলভতম শাসন ব্যবস্থা, (৮) ন্যূনতম ব্যয়, (৯) যথাসম্ভব কম খবরদারি, (১০) সার্ব্বত্রিক অব্যাহত নিরপেক্ষ অথবা মুক্ত জ্ঞান প্রচার।

কিন্তু বিনোবার এই রূপ-কল্পনার সহিত কাজের কোথাও মিল খুঁজিয়া পাইতেছি না, ইহাই দুঃখ। তবে কি বুঝিব, তাঁহার মনের গভীরে রাজনীতি ক্রিয়া করিতেছে? অথচ এই বিনোবাজীই একদিন বলিয়াছেন, "রাজতন্ত্রের যুগ গিয়াছে, অভিজাত-তন্ত্রের যুগও গিয়াছে, প্রজাতন্ত্রের দিনও ফুরাইয়াছে। সর্ব্ব-রাজের দিন আগত। সর্ব্ব-রাজের অর্থ সকলের ভোটাধিকার মাত্র নয়, আন্তরিক সহযোগ।"

বিনোবাজীর একথাও আজ রাজতন্ত্রের সহিত তাল-গোল পাকাইয়া গিয়াছে। সাধারণ মানুষের মত তিনি ভুল করিয়া বসিবেন, একথা ভাবিতেও কেমন লাগে! তবে কি বুঝিতে হইবে, সাধু-সন্তের ছদ্মবেশে তিনি সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন? কারণ একথা ভাবিবার পক্ষে তিনি অনেক আচরণ ইহার পূর্ব্বে করিয়াছেন। ভাষা-ভিত্তিক সংগ্রামের সময় বিনোবা বাছিয়া বাছিয়া ঠিক পুরুলিয়ায় গিয়া ডেরা গাড়িলেন এবং সুরু করিলেন হিন্দী বক্তৃতা। লোকসেবক সঙ্ঘ আপত্তি করিয়াছিল, বিনোবা শুনেন নাই—শুনিতে পারেনও না। এবং ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতজীকে শুনাইয়াছিলেন, সমগ্র মানভূমে তিনি হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়াছেন ও সেখানকার লোকেরা তাহা মন দিয়া শুনিয়াছে। এই বিনোবাই বেরুবাড়ী হস্তান্তরে নেহরুর সমর্থন করিয়াছিলেন।

তথাপি তিনি বাঙালীর নিকট শ্রদ্ধা পাইয়া আসিয়া-ছেন। সে শ্রদ্ধা তিনি রাখিতে পারিলেন না। এক বৎসর ধরিয়া আসামে যে কাণ্ডটা ঘটিতেছে, তাহা চোখে দেখিয়া, কানে শুনিয়াও বিনোবা কিছু বলেন নাই। যখন বলিতে আসিলেন তখনই তাঁহার মুখোস সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া গেল। ভুলিয়া গেলেন, এই কিছুদিন আগেও তিনি বলিয়াছিলেন, "এত বড় দেশের ঐক্যের জন্য চাই একদিকে উদার অভেদ-বুদ্ধি, আর অন্যদিকে চাই অহিংসায় নিষ্ঠা।"

নিখিল আসাম বঙ্গ ভাষাভাষী সমিতির সভ্যগণ

শ্রীবিনোবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া দশ মাস পূর্ব্বে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল—সেই বাঙালী নির্য্যাতনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সম্বন্ধীয় পুস্তিকাদি তাঁহার হাতে দেন। আশা ছিল বিনোবাজী সৎ ব্যবস্থাই করিবেন। কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে কোন আশ্বাসের বাণী বাহির হইল না। বরং বলিলেন, আসামের একমাত্র সরকারী ভাষা হইবে অসমীয়া এবং বাঙালী-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে বাংলা ভাষাকে স্বীকার করার জন্য তাঁহারা রাষ্ট্রপতির নিকট যে আবেদন করিয়াছেন, তাহা যদি তাঁহারা প্রত্যাহার করেন তবেই তিনি রাষ্ট্রপতিকে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে সুবিবেচনার জন্য অনুরোধ করিবেন। নতুবা তাহা যাহাতে বাতিল হয়, সেইরূপ চেষ্টাই তিনি করিবেন। বাঙালীরা নিজ দোষেই আজ সর্ব্বত্র অনভিপ্রেত। বিহারে, উড়িষ্যায়, আসামে সর্ব্বত্র তাঁহারা আপদ-বিশেষ। আত্মশোধন যদি তাঁহারা না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নিশ্চিহ্ন হওয়া কেহই ঠেকাইতে পারিবে না।

আশ্চর্য্য, এই কথা বলিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিলচরে নিরীহ বাঙালীদের উপর সরকারী গুলী চলিল! এই শিলচরের ঘটনা জুলাইয়ের ঘটনার দ্বিতীয় অধ্যায়, অর্থাৎ আসামে বাঙালী উৎসাদনের দ্বিতীয় পর্ব্ব। যে হিংসা জুলাইয়ে চরিতার্থ করা যায় নাই, ১৯৬১ সনের মে মাসে সেই হিংসা চরিতার্থ করা হইল পুলিশের ও সৈন্যবাহিনীর বন্দুকের দ্বারা। অহিংস কংগ্রেস-সরকার হিংস্র হইয়া উঠিল।

এখন কথা হইতেছে, বিনা প্ররোচনায় শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর আসাম সরকার এই বর্ব্বরতা অনুষ্ঠানে সাহসী হইল কেন? সাহসের একমাত্র কারণ, অসমীয়া নেতৃবৃন্দ ও আসামের সরকার জানেন যে, নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকার এবং কংগ্রেস হাইকমাণ্ড নারীঘাতী, শিশুঘাতী এই বর্ব্বরতাকে আড়াল করিবে। হত্যাকারীর পিতা যেমন তার খুনে-সন্তানকে আশ্রয়দান করে, অহিংসার ব্রতধারী কংগ্রেসী হাইকমাণ্ড তেমনি এই দুর্বৃত্তদলের পৈশাচিকতাকে উচ্চাঙ্গের তত্ত্বের দ্বারা আড়াল করিবে। ভারতীয় সংবিধান, মৌলিক অধিকার, মাতৃভাষার অধিকার এবং ন্যায়বিচার ও নিয়ম-শৃঙ্খলা বাঙালীর জন্য নহে, উহা সর্ব্বত্র অ-বাঙালী-শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখিবার জন্য।

আবার ধর্ম্মের দিক হইতে বিনোবাজী একদিন নওগাঁয়ের দাঙ্গার হত্যাকাণ্ডকে বেদান্তের মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। বেদান্তের দৃষ্টিতে জীবন ও মৃত্যু পরস্পরের পরিপূরক মাত্র। সুতরাং বৈদান্তিক বিনোবার মুখ হইতে বেফাঁস কিছু বাহির হইয়া পড়িলেও, বিস্মিত হইবার কিছু নাই। তবে বিস্মিত হইয়া গিয়াছি যে-মুহূর্তে এই বৈদান্তিকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইল, বাঙালীকে বাংলা ভাষার দাবী ছাড়িতেই হইবে, বাঙালী যদি তাহার মতিগতির পরিবর্ত্তন না করে, তবে সমস্ত প্রদেশ হইতে সে নিশ্চিহ্ন হইবে। ইহার পরেই কাছাড়ে নিরীহ সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চলিল। হত্যার উদ্দেশ্য লইয়াই পুলিশ গুলী চালাইয়াছে। ব্রিটিশ সরকারের গাড়োয়ালী সৈন্যরাও পাঠান সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী চালায় নাই—তাহারা কারাবরণ করিয়াছে, তবু অন্যায় ভাবে গুলী চালাইতে সম্মত হয় নাই। জালিয়ানওয়ালা-বাগ হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতাকেও ম্লান করিয়া দিয়াছে এই হত্যাকাণ্ড। সবচেয়ে আশ্চর্য্য, এই হত্যাকাণ্ডের সময় স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেখানে উপস্থিত থাকিয়া, আসাম সরকারের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতেছিলেন। গত জুলাই মাসের দাঙ্গার পর এই গৌহাটিতে দাঁড়াইয়াই প্রধানমন্ত্রী সংখ্যালঘুদের প্রতি যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত পালিত হয় নাই। এবং উদ্বাস্তুদের পুনর্ব্বাসনের দ্বারা আসাম তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে নাই। দাঙ্গার সামগ্রিক তদন্ত সম্বন্ধে শ্রীনেহরু পার্লামেণ্টে দাঁড়াইয়া যে-প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহাও রক্ষিত হয় নাই। এমন কি ভাষা সমস্যা সমাধানের জন্য পন্থের যে আপোষ ফরমুলা ছিল, আসাম কংগ্রেস তাহার উপরও ছুরিকাঘাত করিয়াছেন। কিন্তু এই ঘটনাগুলির কোনটি নেহরুজীর নিষ্পাপ বিবেককে বিচলিত করে নাই। সমগ্র আসামে—শুধু কুড়ি লক্ষ বাঙালী নয়, পাঁচটি পার্ব্বত্য জেলার অধিবাসীরাও যে বিক্ষোভে এবং অন্তর্দাহে জ্বলিতেছে, কেন্দ্রীয় সরকার সেদিকেও চোখ বন্ধ করিয়া আছেন। এমন কি নেহরুজী এবং কেন্দ্রীয় সরকার এ সহজ সত্যটি ভুলিয়া যাইতেছেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই চিরকাল অপমান ও অবিচার মাথা পাতিয়া সহ্য করিবে না। কাছাড় বর্ত্তমানে যে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করিতেছে, তাহার স্মারকলিপি আন্দোলনের পূর্ব্বে গত ১২ই মে দিল্লীতে শ্রীনেহরুকে দেওয়া হইয়াছিল। এই স্মারকলিপিতে কাছাড়ের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছিল, পার্ব্বত্য জেলাগুলির ন্যায় কাছাড়কেও স্বায়ত্তশাসনমূলক জেলার মর্য্যাদা দিতে হইবে, নতুবা তাহারা আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে রাজী নন। বিকল্প হিসাবে তাঁহারা একথাও বলিয়াছিলেন যে, মণিপুর ও ত্রিপুরারাজ্য মিলিয়া একটি বৃহৎ সংযুক্ত আসামরাজ্য সৃষ্টি করা হোক এবং তাহার মধ্যে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলকে স্বায়ত্তশাসনের মর্য্যাদা দেওয়া হোক, তাহাতেও তাঁহারা সন্তুষ্ট আছেন।

বলা বাহুল্য যে, নেহরুজী এই দাবী মানিয়া লন নাই। কিংবা অপর দিকে তিনি একথাও জোর গলায় আশ্বাস দিতে পারেন নাই, আসামের সংখ্যালঘুদের অধিকারের তিনি একটা ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহাদের অধিকার যাহাতে খর্ব্ব না হয়, ভাষা আইনের যাহাতে সংশোধন ঘটে এবং আসামে যাহাতে ন্যায় ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, শ্রীনেহরু তাহার ব্যবস্থা করিবেন, এরূপ কোন সঙ্কল্পেরই পরিচয় দেন নাই।

ইংরেজ সরকার ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে যখন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ঘটাইয়াছিলেন, নিরস্ত্র নরনারী ও শিশুকে পাইকারী হারে যখন খুন-জখম করিয়াছিলেন, তখন সেই দানবীয় নরঘাতনের, সেই উলঙ্গ বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে এই বাংলারই কবি রবীন্দ্রনাথ বজ্রকণ্ঠে ধিক্কারধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিলেন—যাঁহার জন্ম-শতবার্ষিকীতে নেহরু সাহেব এই সেদিনই কলিকাতায় যোগ দিয়া গেলেন, সেই নেহরু সাহেবের সম্মুখে আজ কাছাড় জেলায় বাঙালীদের উপর জালিয়ানওয়ালাবাগের স্বদেশী সংস্করণ অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল একটি কথাও বলিলেন না। একদিন রবীন্দ্রনাথ সেই পশ্চিমী বর্ব্বরতাকে 'নারীঘাতী', 'শিশুঘাতী' বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন, আজ সেই অভিশাপ কাহার শিরে বর্ষিত হইবে? অবশ্য নেহরু সাহেব কোন অভিশাপকেই গ্রাহ্য করেন না, তাই নিহত শবের উপর দাঁড়াইয়া এবং হতাহতদের রক্ত ও অশ্রুসিক্ত মাটির উপর পা রাখিয়া প্রধানমন্ত্রী তাঁহার ভারতীয় গণতন্ত্রের অশোক মহিমাকে নূতন করিয়া উপলব্ধি করিয়া গেলেন।

কিন্তু এই নেহরু সাহেবই অন্যত্র ভিন্নমূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন ইহাও দেখিতে পাই। সেরাইকেল্লা, খারসোয়ান, অন্ধ্র, গুজরাট প্রভৃতি যখন যেখানেই ভাষার দাবীতে আন্দোলন হইয়াছে, সেখানেই তিনি তাহা সমর্থন করিয়াছেন এবং যেখানেই গুলী বা লাঠি চালনা হইয়াছে, তিনি উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। আর বিনোবা? এতবড় একটা কাণ্ড হইয়া গেল, তিনি কিন্তু নির্ব্বিকার। অহিংসার পূজারী, বৈদান্তিক বিনোবা—পিঁপড়া মারিতে যাঁহার প্রাণ কাঁদে, এতবড় হত্যালীলায় তাঁহার প্রাণে সামান্য একটা রেখাপাতও করিল না!

তবে কি বুঝিব, তিনিই মায়া? এবং মায়ারূপী বিনোবাকে সম্মুখে রাখিয়া নেহরু-সরকার অপরূপ খেলা দেখাইয়া বেড়াইতেছেন?

—০—

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ৩রা জুন তাঁহার দেরাদুনের বাসায় অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে আন্ত্রিক গোলযোগের দরুণ পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৩ বৎসর হইয়াছিল।

রথীন্দ্রনাথ ১৮৮৮ সনের ২৯শে নবেম্বর জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন। শান্তিনিকেতনে তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। পিতা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের প্রথম পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি ১৯০৪ সনে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে আমেরিকা যাত্রা করেন। ১৯০৯ সনে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, শ্রীমতী প্রতিমা দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পিতার ইচ্ছায় তিনি সুরুলে বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতির পরীক্ষা আরম্ভ করেন। পরে ইহাই শ্রীনিকেতনের গ্রাম সংগঠনে পরিণতি লাভ করে।

পিতৃনামেই সমধিক পরিচিত হইলেও রথীন্দ্রনাথ নিজে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। বাংলা ভাষায় তিনি প্রাণতত্ত্ব ও অভিব্যক্তিবাদ নামে দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ইংরেজী গ্রন্থ 'অন দি এজেস অব টাইম' একখানি সুখপাঠ্য স্মৃতিকথা। দুই খণ্ডে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধ চরিত'-এর তিনি যে বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার রচনা-নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

চামড়ার উপর যে শিল্প-কার্য্য আজ সারা ভারতে বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই দেশে প্রবর্ত্তন করেন। ইউরোপ ও মিশর হইতে তিনি এই বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। কাঠের কাজেও তিনি তাঁহার দক্ষতা ও শিল্প-রুচির স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন চিত্রকরও ছিলেন।

এই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কবিগুরুর বংশধারাতে একটা ছেদ পড়িয়া গেল। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের কথা। কারণ রবীন্দ্রনাথ অপুত্রক ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের তপোবন

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটির ঠিক বাস্তবরূপ কি তার স্পষ্ট ধারণা আজ অসম্ভব।···কিন্তু তপোবনের যে-চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাস-মোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা, আবিলতা, অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা ঐ কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল, ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে।

পরবর্তীকালের কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসনদুঃখের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রঘুবংশে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন, তপোবনের উপকরণবিরল, শান্তসুন্দর যুগের থেকে ভোগৈশ্বর্যজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।

কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন একসময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁছেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল, আধুনিককালের কোন একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে-প্রেরণা কাব্যরূপ রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল, কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ ক'রে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্র-জীবনের সজীব ভূমিকা।

তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে। কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্যসাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে, সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্য-জাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়।···গুরুর মন প্রতিমুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে।···

আরও একটি কথা আমার মনে ছিল। গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, তাহলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন।··· যিনি জাতশিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়, প্রাণে-ভরা কাঁচা হাসি।

···আর একটা গুরুতর কথা আমার মনে ছিল। ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরাম কেদারায় তারা আরাম চায় না; গাছের ডালে তারা চায় ছুটি।

ভারতের তপোবন রবীন্দ্রনাথের মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল, ভাববিলীন তপোবন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে কিভাবে আকার গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ"[১] পুস্তিকায় প্রকাশ করেছেন। আমরা তারই এক অংশ প্রবন্ধের ভূমিকারূপে ব্যবহার করলাম।

১৯০১ সনের ২২শে ডিসেম্বর (১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ) রবীন্দ্রনাথের মানস তপোবন "ব্রহ্মচর্যাশ্রম" (বা ব্রহ্মবিদ্যালয়) নামে প্রত্যক্ষরূপ গ্রহণ করল।

ঋষিগণ তপোবনে তপস্যা করতেন। তাঁদের তপস্যাতেই তপোবন গড়ে উঠত। তপস্যা সুখের নয়, দুঃখের। কঠোর ক্লেশ, অপরিসীম দুঃখতাপ, এবং বিরাট ত্যাগের দ্বারাই তপস্যা সম্ভব হ'ত।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর তপোবন সৃষ্টির সুরু হতেই তপস্যার কঠোরতাপে পরিতপ্ত হতে থাকেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই (২৩শে নবেম্বর, ১৯০২, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩০৯) তাঁর সহধর্মিণী মৃণালিনী দেবী পরলোকগমন করলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র রথীন্দ্রনাথের বয়স তখন চোদ্দ, কন্যা মীরার বয়স দশ, এবং কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের বয়স আট।

---

১ বিশ্বভারতী Bulletin No 29. "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আষাঢ়, ১৩৪৮।

পত্নীবিয়োগের নিদারুণ ব্যথা বুকে নিয়ে তিনি মাতৃহীন শিশুকে আনন্দদান করবার জন্য "শিশুর" কবিতা (১৯০৩ সনে) রচনা করলেন। তপস্বীর তপস্যার ফল সমস্ত পৃথিবী উপভোগ করে। রবীন্দ্রনাথের তপোলব্ধ 'শিশু'ও পৃথিবীর সকল শিশুর আনন্দের সামগ্রী হ'ল।

রথীন্দ্রনাথ ও শমীন্দ্রনাথের মত আর যে-ক'টি বালক তখন রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে এসেছিল তারাও সন্তানবৎ নিবিড় স্নেহে পরিপালিত হতে লাগল।

আঘাতের উপর আঘাত। কবির পত্নীবিয়োগের নয় মাসের মধ্যেই তাঁর কন্যা রেণুকার মৃত্যু হ'ল।

অতঃপর ১৯০৫ সনের ১৯শে জানুয়ারী (৬ই মাঘ, ১৩১১) রবীন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দেহত্যাগ। পিতা যে রবীন্দ্রনাথের কাছে কি ছিলেন, তা যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্য পড়েছেন তাঁরাই জানেন।

পিতৃবিয়োগের দু' বছরের মধ্যেই ১৯০৭ সনের নবেম্বর মাসে (৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৪) কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মুঙ্গেরে আকস্মিকভাবে মৃত্যু ঘটল।

পত্নীবিয়োগ, পিতৃশোক, পুত্রকন্যার মৃত্যু, মনুষ্য-জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত, সবচেয়ে হৃদয়বিদারক দুঃখ, তিনি তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পেয়ে গেছেন।

এরও উপরে ছিল বন্ধুবিয়োগের ব্যথা। পরম প্রীতি-ভাজন শিষ্য এবং সহকর্মীর মৃত্যু।

১৯০৪ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী (১৩১০ সালের মাঘী পূর্ণিমায়) রবীন্দ্রনাথের একান্ত স্নেহের পাত্র, সহকর্মী এবং সহধর্মী কবি সতীশচন্দ্র রায়ের অকালে শোচনীয়-ভাবে মৃত্যু হয়।

১৯০৮ সনের ৯ই নবেম্বর (২৩শে কার্তিক, ১৩১৫) রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সমবয়সী বন্ধু সাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার পরলোকগমন করেন।

উপর্যুপরি এই শোকের সময় রবীন্দ্রনাথের অন্তরে কি বিচিত্রভাবের লীলা চলেছিল—তা তাঁর ভাষাতেই বলি :—

"উপনিষৎ বলিয়াছেন—

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ।

তিনি তপ করিলেন, তিনি তপ করিয়া এই যাহা-কিছু সমস্ত সৃষ্টি করিলেন।

"সেই তাঁহার তপই দুঃখরূপে জগতে বিরাজ করিতেছে। আমরা অন্তরে-বাহিরে যাহা-কিছু সৃষ্টি করিতে যাই, সমস্তই তপ করিয়া করিতে হয়—আমাদের সমস্ত জন্মই বেদনার মধ্য দিয়া, সমস্ত লাভই ত্যাগের পথ বাহিয়া, সমস্ত অমৃতত্বই মৃত্যুর সোপান অতিক্রম করিয়া। ঈশ্বরের সৃষ্টির তপস্যাকে আমরা এমনি করিয়াই বহন করিতেছি। তাঁহারই তপের তাপ নব নব রূপে মানুষের অন্তরে নব নব প্রকাশকে উন্মেষিত করিতেছে।"

এ কথা, কেবল কথার কথা নয়, পরম দুঃখের ভিতর দিয়ে, অপরিসীম শোকে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হতে এর প্রত্যেকটি শব্দ উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

১৩১৪ সালের মাঘ-ফাল্গুন মাসে পুত্র শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দু' মাস পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই "দুঃখ"২ শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখেন :—

"সেই তপস্যাই আনন্দের অঙ্গ। সেইজন্য আর-একদিক দিয়া বলা হইয়াছে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে

আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে।

"আনন্দ ব্যতীত সৃষ্টির এত বড়ো দুঃখকে বহন করিবে কে।

কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাদ্ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ

"কৃষক চাষ করিয়া যে ফসল ফলাইতেছে, সেই ফসলে তার তপস্যা যত বড়ো তাহার আনন্দও ততখানি। সম্রাটের সাম্রাজ্যরচনা বৃহৎ দুঃখ এবং বৃহৎ আনন্দ, দেশভক্তের দেশকে প্রাণ দিয়া গড়িয়া তোলা পরমদুঃখ এবং পরম আনন্দ—জ্ঞানীর জ্ঞানলাভ এবং প্রেমিকের প্রিয়সাধনাও তাই।

"খ্রীষ্টানশাস্ত্র বলে, ঈশ্বর মানবগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদনার ভার বহন ও দুঃখের কণ্টক-কিরীট মাথায় পরিয়াছিলেন। মানুষের সকলপ্রকার পরিত্রাণের একমাত্র মূল্যই সেই দুঃখ।...

"বিপদের কঠোর পরীক্ষায় আমাদের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করিলে তবেই, হে রুদ্র, তোমার দক্ষিণমুখ আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবে।...

"হে ভয়ংকর, হে প্রলয়ংকর, হে শংকর, হে ময়স্কর, হে পিতা, হে বন্ধু, অন্তঃকরণের সমস্ত জাগ্রত শক্তির দ্বারা, উদ্যত চেষ্টার দ্বারা, অপরাজিত চিত্তের দ্বারা, তোমাকে ভয়ে, দুঃখে, মৃত্যুতে, সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিব—কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হইব না—এই ক্ষমতা আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর বিকাশলাভ করিতে থাকুক—এই আশীর্বাদ করো।"

কবির প্রার্থনা অন্তর্যামী শুনেছিলেন। তাঁর আশীর্বাদ অঝোর ধারায় কবির উপর বর্ষিত হয়েছিল। দুঃখে,

২ "দুঃখ", ধর্ম—৯৮-১১২ পৃষ্ঠা (প্রথম প্রকাশ, বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ ফাল্গুন)।

শোকে, বিপদে, তিনি কিছুতেই কুণ্ঠিত অভিভূত হন নাই।

"দুঃখ আমাদের শক্তির কারণ হোক, শোক আমাদের মুক্তির কারণ হোক—" রবীন্দ্রনাথের এই প্রার্থনাও তাঁর জীবনে সার্থক হয়েছিল।

"দুঃখ ছাড়া আর কোনো উপায়েই আপন শক্তিকে আমরা জানিতে পারি না।"

বীণার তন্ত্রীতে আঘাত করলে যেমন বিচিত্র সুরের ঝরণা বয়ে যায়, দুঃখের আঘাতে রবীন্দ্রনাথের হৃদয় হতেও তেমনি কাব্য ও সঙ্গীতের অমৃতধারা প্রবাহিত হ'ল। পঞ্চাতপ তপস্যার অগ্নি হতে বহির্ভূত রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় মূর্তিতে বিশ্বের সম্মুখে দণ্ডায়মান হলেন। ১৯১৩ সনে সেই তপঃসিদ্ধ রবির রশ্মি সমস্ত জগৎকে আলোকিত করল।

যখন জগৎজোড়া তাঁর খ্যাতি, বিশ্ব যখন তাঁর প্রতিভামুগ্ধ, তখন কবি নিভৃতে, একান্তে, নিঃশব্দে, নিতান্ত অখ্যাত এক ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ে সামান্য কয়েকজন বালককে সন্তানের ন্যায় অপরিসীম স্নেহে পালন এবং শিক্ষাদান করচেন। শিশু-শিক্ষা এবং কাব্যসাধনা সমান নিষ্ঠায়, একইসঙ্গে তিনি নীরবে চালিয়ে যাচ্ছেন।

"তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তপস্যার গতিমান্ ধারায় শিষ্যদের গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে, সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান। অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়।"

রবীন্দ্রনাথের ঐ আদর্শ গুরুকে আশ্রমবাসিগণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেন—তাই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের গুরুদেব।

১৯১৭ সনের মাঝামাঝি ১১ বৎসর বয়সে, আমি যখন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রবেশ লাভ করি, তখন হতে আমার দীর্ঘ ছাত্র-জীবনে আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি—প্রভাতে শয্যাত্যাগ হতে, রাত্রে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত, বিদ্যার্থিগণ তাঁর "অব্যবহিত সঙ্গ" পেয়েছে।

পিতা এবং পিতামহকে শিশুগণ যে ভাবে পেয়ে থাকে রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনের শিশুগণ সেই ভাবে পেয়েছে। তিনি ছিলেন একাধারে পিতা এবং পিতামহ। এমন এক গুরু যাঁর মধ্যে পিতা এবং পিতামহের সত্তা লীন হয়েছে।

তিনি যখন দেশে থাকতেন, তখন তাঁর অধিকাংশ সময় শান্তিনিকেতনেই কাটত। আবার শান্তিনিকেতনেও তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় ছাত্র ও শিক্ষকদের নিয়েই কাটাতেন।

ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ ও তৃতীয়বর্গে (Class V, VI, VII, VIII) তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। ছেলেদের পড়াবার জন্যে তিনি "ইংরেজি সোপান" প্রথম (১৯০৪-এ) এবং দ্বিতীয় (১৯০৬-এ) ভাগও রচনা করেছিলেন। সেই পদ্ধতিতেই (direct method-এ) তিনি এবং আশ্রমের ইংরেজি শিক্ষকগণ ইংরেজি পড়াতেন। আমার বেশ মনে আছে, সকাল সাতটা হতে বেলা দশটা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ক্লাস নিয়ে চলেছেন। ইংরেজি ভাষারই বিভিন্ন শ্রেণীর ক্লাস। সেই সব ক্লাসে ইংরেজি-শিক্ষকেরা এবং অন্য শিক্ষকগণ, যাঁদের তখন ক্লাস থাকত না, যোগ দিতেন।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপদ্ধতি এমন চিত্তাকর্ষক ছিল যে, যে সব ছাত্রেরা ক্লাস ফাঁকি দিতে ওস্তাদ, তারাও তাঁর ক্লাসে নিয়মিত আসত। অনেক সময় আগে-ভাগে আসত। তিনি ক্লাস নিচ্ছেন, না গল্প বলছেন, না আমাদের সঙ্গে খেলা করছেন, বুঝবার উপায় ছিল না। ক্লাসের ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কখন শেষ হয়ে যেত তা জানতেও পারতাম না। পরের ঘণ্টায় ক্লাস না থাকলে, অনেক সময় আমরা তাঁর পরবর্তী ক্লাসেও বসে থাকতাম।

"আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" পুস্তিকায় অন্যত্র কবি লিখেছেন—

"সবশেষে বলব আমি যেটাকে সবচেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সবচেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত, যাঁরা ধৈর্যবান। ছেলেদের প্রতি স্নেহ যাঁদের স্বাভাবিক।"

তাঁর এই শিক্ষকের আদর্শ তাঁর জীবনেই মূর্তিগ্রহণ করেছিল।

আমি স্কুলে তিন বছর এবং কলেজেও দু' বছর তাঁর কাছে পড়েছি। তাঁর অসীম ধৈর্য এবং অফুরন্ত স্নেহ প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করেছি।

আমার শান্তিনিকেতনে আসার দু'এক বছর পূর্বে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি এমনই অদ্ভুত যে, তার উল্লেখ এখানে না করে পারছি না।

৩ শিশুদের ইংরেজি শিক্ষার জন্যে যেমন তিনি "ইংরেজি সোপান", "ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা (১৯০৯)", "অনুবাদ চর্চা (১৯১৭)" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন, তেমনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্যেও "সংস্কৃত শিক্ষা" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯৬ সনে তিনি রচনা করেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের গোড়ার দিকে (১৯০৮-৯ সন পর্যন্ত) সংস্কৃতের ক্লাসও তিনি নিয়েছিলেন।

পূর্বে বলা প্রয়োজন, অনেক অভিভাবকের ধারণা হয়েছিল, দুষ্ট-দুর্দান্ত ছেলেদের সংশোধন করবার জন্যে রবিবাবু তাঁর স্কুল করেছেন। সেজন্যে যে সব ছাত্র কোথাও বেশীদিন আশ্রয় পেত না, অভিভাবকগণও যাদের বাগাতে পারতেন না, তাদের "বোলপুরে" পাঠিয়ে দিতেন।

এরূপ ছাত্রদেরই শীর্ষস্থানীয় এক ছাত্র সুদূর আসাম হতে এসেছিল। সে অবশ্য অসমীয়া ছিল না—ছিল বাঙ্গালী। নাম তার এখানে না দেওয়াই ভাল, শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনদের নিকট সে স্বনামধন্য।

একদিন ক্লাসে তার অশোভন ব্যবহার রবীন্দ্রনাথের ধৈর্যকেও গভীরভাবে নাড়া দিল। তিনি তাকে সামনে ডেকে কান মলে দিলেন। তৎক্ষণাৎ যা ঘটল, তা যেমন অভাবনীয় তেমনি অপ্রত্যাশিত। নিকটেই ছিল কিছু থান ইট। চক্ষের পলকে সেই দুর্দান্ত বালক তার থেকে একখানা ইঁট তুলে নিল। সেটি সে গুরুদক্ষিণার জন্যেই নিয়েছিল, কিন্তু গুরুদেবের আশ-পাশের গুরুগণ তৎক্ষণাৎ সেই 'অসাধারণ দক্ষিণাটি' তার হাত থেকে কেড়ে নিলেন। একটা মহা বিপদ থেকে রবীন্দ্রনাথ রক্ষা পেলেন।

তিনি কিন্তু নির্বিকার, প্রশান্ত, গম্ভীর! ছাত্রটিকে লেশমাত্র ভর্ৎসনা তিনি করেন নি। শিক্ষকদেরও তাকে শাসন করতে নিষেধ করে দেন। সেই অতি-দুর্দান্ত ছাত্রটিও অবশেষে গুরুদেবের বশীভূত হয়।

আমি যখন শান্তিনিকেতনে এলাম তখন সেই অসাধারণ বালকটি আশ্রমে স্বনামধন্য। তার ঐ কীর্তি তাকে আরও সুচিহ্নিত করেছে। তার সঙ্গে ভাব হওয়ার পরে, একদিন সঙ্গোপনে তাকে প্রশ্ন করি—"আচ্ছা ভাই, তুমি ত গুরুদেবকে খুবই ভালবাস। তিনিও দেখি তোমায় বড় ভালবাসেন, তবু নাকি তুমিই একদিন তাঁকে থান ইঁট দিয়ে মারতে গেছলে?"

বালকটি নিতান্ত অনুতপ্তচিত্তে উত্তর দিল—"আরে ভাই, আমি কি জানতাম উনি গুরুদেব! আমি ভেবেছিলাম—মা-ষ্টা-র।"

তখনকার দিনে আমাদের দেশে মাষ্টারের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক কেমন ছিল, এবং আমাদের গুরুদেবই বা ছাত্রদের কাছে কেমন ছিলেন সেই অসাধারণ দুর্দান্ত বালকটির এই উক্তিই তার সাক্ষ্য রেখে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

"আজ পর্যন্ত মনে আছে, চরমশাসন থেকে এমন অনেক ছাত্রকে রক্ষা করেছি, যার জন্যে অনুতাপ করতে হয় নি।"[৪]

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে গুরুদেব সকালে ক্লাস নিতেন, দুপুরে পাঠ তৈরি করতেন, সন্ধ্যায় আবৃত্তি অভিনয়াদি শিক্ষা দিতেন এবং রাত্রে আহারের পর শোবার আগে পালাক্রমে ছেলেদের ঘরে বসে গল্প বলতেন। ছাত্রেরা নিদ্রা গেলে, তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতেন—কোন ঘরের জানালা বন্ধ আছে কি না। শীতকালেও জানালা খোলা রাখতে হ'ত।

শিক্ষা ত রবীন্দ্রনাথের কাছে কেবল ক্লাস নেওয়াতেই পর্যবসিত ছিল না।

"নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই (গুরু-) সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান"—তাঁর নিজেরই এই আদর্শ অনুসরণ করে প্রভাতের জাগরণ হতে রাত্রের বিশ্রাম পর্যন্ত শিশুদের তিনি "অব্যবহিত সঙ্গ" দিয়েছেন।

জ্যোৎস্না রাত্রে পারুল বনে, ছাত্রদের নিয়ে তিনি ও দিনেন্দ্রনাথ গানের ঝরণা বইয়ে দিতেন। বর্ষার অবিশ্রাম বর্ষণের মধ্যে সুরের ধারার সঙ্গে খোয়াই-এর ধারা বেয়ে শিষ্য-পরিবৃত গুরুদেবের অভিযান চলত।

আশ্রমের ষড়-ঋতুর নব নব রূপ রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রতিফলিত এবং সঙ্গীতে রূপায়িত হয়ে, নববর্ষ, বর্ষামঙ্গল, শারদোৎসব, বসন্তোৎসব প্রভৃতি ঋতু-উৎসবে, নৃত্যে, গানে, অভিনয়ে ছাত্রদের মাতিয়ে তুলত।

গুরুদেবের "হাস্যকৌতুক", "ব্যঙ্গকৌতুক" প্রভৃতি প্রহসনগুলি সন্ধ্যায় "বিনোদনপর্বে" ছেলেদের আনন্দদানের জন্যেই (১৯০৭ সনে) রচিত হয়েছিল। আমরা তাঁর সেই সব প্রহসন ও নাটক অভিনয় করতাম। বেশ মনে আছে, গুরুদেব একদিন আমাদের বললেন, "তোমরা কেন নিজেরা প্রহসন রচনা কর না? নিজেরা প্রহসন ও নাটক রচনা করে অভিনয় কর—সে আরও মজার হবে।"

প্রথমটা সকলেই ভড়কে যাই। কিন্তু তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। মনে আছে, ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে তিনি আমাদের দিয়েই নাটক তৈরি করিয়েছেন। আমাদের নিজের রচিত প্রহসনাদি আমরা অভিনয়

৪ "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ"—পৃষ্ঠা, ৮।

করেছি, সে যে সাপ-ব্যাঙ কি হয়েছিল কে জানে, কিন্তু গুরুদেব তাই দেখেই মহা উৎসাহ প্রকাশ করেছেন।[৫]

এই ভাবে তাঁর ছাত্রদের তিনি কবি, লেখক, সাহিত্যিক করবার চেষ্টা করেছেন। ছাত্রদের রচনা প্রতি সপ্তাহে "সাহিত্য সভায়" পড়া হয়েছে। "সাধারণের বক্তব্যে" ছাত্রগণ কর্তৃক তার প্রশংসা হয়েছে—নিন্দাও হয়েছে।

স্কুলে শিশুদের, বালকদের, কিশোরদের পৃথক পৃথক "সাহিত্য সভা" হ'ত। আজও সে ধারা চলে আসছে।

প্রত্যেক ছাত্র বা ছাত্রী যাতে তার মনোভাব ভাষায় প্রকাশ করতে পারে, তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ অশ্রান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর কল্যাণে আমরা অনেকেই আজ কলম ধরতে শিখেছি। আমাদের মধ্যে থেকেই প্রমথনাথ বিশি, সৈয়দ মুজতবা আলি, রাণী চন্দ, মহাশ্বেতা (ঘটক) ভট্টাচার্যের উদ্ভব হয়েছে।

শিক্ষা বলতে 'শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ'—রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শকে তাঁর বিদ্যালয়ে প্রথম থেকেই রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

"আশ্রমের রূপ ও বিকাশে" তিনি লিখছেন—

"আমাদের দেশে ছেলেদের আত্মকর্তৃত্বের বোধকে অসুবিধাজনক, আপদজনক ও ঔদ্ধত্য মনে ক'রে সর্বদা দমন করা হয়। এতে ক'রে পরনির্ভরতার লজ্জা তাদের চলে যায়, পরের প্রতি দাবির আবদার তাদের বেড়ে যায়, ভিক্ষুকতার ক্ষেত্রেও তাদের অভিমান প্রবল হোতে থাকে; আর পরের ত্রুটি নিয়ে কলহ ক'রেই তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করে।...

"এই বিদ্যালয়ের প্রথম থেকেই আমার মনে ছিল আশ্রমের নানা ব্যবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব পরিমাণে ছাত্রদের কর্তৃত্বের অবকাশ দিয়ে অক্ষম কলহপ্রিয়তার ঘৃণ্যতা থেকে তাদের চরিত্রকে রক্ষা করব।"[৬]

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে তিনটি বিভাগ ছিল—আদ্য, মধ্য, শিশু। প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রদের জন্য এক বা একাধিক ছাত্রাবাস ছিল। প্রত্যেক ছাত্রাবাসের জন্যে একজন নায়ক, প্রতি পনের দিন অন্তর নির্বাচিত হ'ত। ছাত্রেরাই তাদের নির্বাচন করত।

এইভাবে প্রত্যেক বিভাগেরও একজন নায়ক নির্বাচিত হ'ত। সর্বোপরি থাকতেন একজন সর্বাধিনায়ক (general captain)। তিনিও ছাত্র, এবং ছাত্রদের দ্বারাই তাঁরও নির্বাচন হ'ত। তাঁর কার্যকলাপ হ'ত এক মাস। বৎসরের প্রথমে বারোজন সর্বাধিনায়কের একটি প্যানেল (panel) তৈরি হ'ত।

যে-কোন নায়কের আদেশ ছাত্রদের নির্বিচারে গ্রহণ করতে হ'ত। তার সম্বন্ধে তখন কোন তর্ক চলত না। পরে অবশ্য তার বিরুদ্ধে উপরওয়ালার কাছে বিচার প্রার্থনা করা যেত।

সর্বাধিনায়কের আদেশের বিরুদ্ধেও বিচার প্রার্থনার অবকাশ ছিল। কেন না, সর্বোপরি ছিল এক "বিচার সভা"। বিচার সভার সভ্যগণও ছাত্র এবং তাঁরাও ছাত্রদের দ্বারাই নির্বাচিত হতেন। "বিচার সভা"র ক্ষমতা ছিল খুব বেশি। কোনো ছাত্রকে আশ্রম হ'তে বিদায় দেবার অধিকার পর্যন্ত এই সভাকে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য সভার এইরূপ চরম সিদ্ধান্ত ছাত্র-পরিচালক (শিক্ষক) এবং গুরুদেবের সমর্থনের জন্যে পাঠান হ'ত।

পাকশালাতেও ছাত্রদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছাত্র থাকতেন। পাকশালার পরিচালক (বেতনভোগী কর্মী) তাঁর পরামর্শ নিতেন। এ ছাড়া দু'জন "ডেলি ম্যানেজার" (daily manager) ছাত্র পাকশালার কাজে সাহায্য করতেন। প্রতিনিধি তাদের নির্বাচন করতেন।

রান্নাঘরের প্রতিনিধি, আশ্রম সম্মিলনীর সম্পাদক সাহিত্য সভার এবং সাহিত্য পত্রিকার (হাতে লেখা) সম্পাদকগণ সাধারণতঃ এক বছরের জন্য নির্বাচিত হতেন।

এই ভাবে আশ্রমের সমস্ত বিভাগের পরিচালনায় ছাত্রদের আশ্চর্য রকমের অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

ছাত্রদের মধ্যে এরূপ স্বায়ত্তশাসন রবীন্দ্রনাথই ভারতে প্রবর্তন করেন। তার পূর্বে পৃথিবীর অন্যত্র এরূপ স্বায়ত্তশাসন আর কেউ প্রবর্তন করেছিলেন কি না জানি না।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম দিকেই এই স্বায়ত্তশাসন চালু হয়েছিল।

---

৫ ছেলেমেয়েদের আনন্দদানের জন্য গুরুদেব, হেঁয়ালি কৌতুক-নাট্য রচনা করেছিলেন। যেমন "হাস্যকৌতুকের" "রোগের চিকিৎসা।" হেঁয়ালির মধ্যে - "হাঁস", "পা" ও "তাল (তাল বড়া)" এর বারংবার উল্লেখ আছে। সর্বশেষে নাটকের নায়ককে হাঁসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এখানে হেঁয়ালির উদ্ভব হ'ল—"হাঁসপাতাল।"

আমার মনে আছে গুরুদেবের পীড়াপীড়িতে আমরা "পাগোল" নামে এইরূপ একটি হেঁয়ালি কৌতুক-নাট্য রচনা করি। নাটকটির প্রথম দৃশ্যে ছিল—"পা" এর কথা দ্বিতীয় দৃশ্যে "গোল (ফুটবল)" এর কথা। তৃতীয় দৃশ্যে হয়েছিল এক "পাগোল (=পাগল)" এর আবির্ভাব।

এখন সেই পাগলামির কথা মনে হলে হাসি পায়। গুরুদেব কিন্তু মহা উৎসাহে সেই নাটক দেখেছিলেন।

৬ "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ"— পৃষ্ঠা ৫-৬।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পরও রবীন্দ্রনাথ ক্লাস নিয়েছেন। তাঁর কাছে আমরা Wordsworth, Shelley প্রভৃতি পড়েছি। বাংলা বলাকা পড়েছি। বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Lévi) তাঁর বলাকা ক্লাসে যোগ দিতেন। লেভি বাংলা জানতেন না। রবীন্দ্রনাথের সংসর্গ, তাঁর কণ্ঠস্বর, প্রকাশভঙ্গি ও বাচনভঙ্গি তাঁকে আকৃষ্ট করত। সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষার যৎকিঞ্চিদ্ অর্থাগম, উপরি পাওনা হিসাবেই তিনি গ্রহণ করতেন। আজও আমার চক্ষের সম্মুখে ভেসে আসছে তাঁর ছবি। গুরুদেবের পাশে বসে' পাশের কানটিতে হাতের আঙ্গুলগুলিকে চোঙার মত করে ধরে ঝুঁকে পড়ে তিনি গুরুদেবের পাঠ ও ব্যাখ্যা শুনছেন। "লোচনৈঃ পীয়মানঃ"—বলে গেছেন কালিদাস। আমরা সেদিন দেখি—"লোচনৈঃ শ্রবণৈঃ সর্বেন্দ্রিয়ৈঃ পীয়মানঃ" চক্ষু কর্ণ এবং সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথের রূপ, কণ্ঠস্বর, ভাষা ও ভাষণ।

উত্তরায়ণ নির্মিত হবার পূর্বে গুরুদেব দেহলীতে৭ বাস করতেন। দেহলীর উপর তলায় আমি প্রথম তাঁর ক্লাশে যাই।

উত্তরায়ণে প্রথমে দুটি খড়ে-ছাওয়া মাটির বাড়ী তৈরী হয়, একটি গুরুদেবের জন্যে, অন্যটি এণ্ড্রুজের জন্যে। এণ্ড্রুজের বাড়ীটিতে পরে পিয়ার্সন বাস করতেন।

উত্তরায়ণে বাসকালীন গুরুদেব ক্লাশ নিতেন পুরাণো ঘণ্টাতলার এবং বর্তমান "সন্তোষালয়ে"র (শিশুবিভাগের) মধ্যবর্তী স্থানে। সেখানে একটি "উটজ" নির্মিত হয়। তাঁর ক্লাশের জন্য। কয়েকটি খুঁটির উপর একটি গোলাকৃতি চালা। গোলাকৃতি অনতি-উচ্চ মাটির বেদীর তিনদিকে ছাত্রেরা বসতেন, গুরুদেব মাঝখানে। স্কুল ও কলেজের দুইয়েরই ক্লাশ রবীন্দ্রনাথ এখানে নিয়েছেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্গে (Class VI, VII, VIII), তিনি আমাদের প্যাণ্ডোরার কাহিনী, আনটিয়াস, হারকিউলিস ও বামনদের গল্প, ম্যাথিউ আরনল্ড এর "সোরাব রোস্তাম" এবং রাসকিন (Ruskin) এর কিছু অংশ পড়ান।

আমার মনে আছে তৃতীয় বর্গে (class VIII এ), Matthew Arnold-এর "সোরাব রোস্তাম" কাব্য কেমন করে তিনি পড়িয়েছিলেন। তাঁর সেই পড়ানোর কিঞ্চিৎ বিবরণ এখানে দিই :—

"সোরাব রোস্তাম" কাব্যে ব্যবহৃত বাক্যের অনুরূপ বাক্য তিনি তাঁর খাতাতে লিখেছিলেন। আবার সেই বাক্যের অনুরূপ অপেক্ষাকৃত সহজবাক্যও তাঁর সেই খাতায় লেখা ছিল। এইরূপ চার দফা, ছয় দফা, কখনো বা আট দফা বাক্য তিনি রচনা করতেন। ইংরেজি বাক্য এবং তার বিশুদ্ধ বাংলা প্রতিবাক্য।

প্রথমে সর্বশেষ দফার সহজ ইংরেজি বাক্য তিনি আমাদের খাতায় লেখাতেন। আমাদের তার বাংলা করতে হ'ত। সকলের বাংলা করা হ'ল তিনি আমাদের তাঁর নিজের অনুবাদ করা বাংলা বাক্যটি শোনাতেন এবং তাও খাতায় লিখে নিতে বলতেন। আমাদের নিজেদের করা বাংলা বাক্যটির সঙ্গে, তাঁর তৈরি বাংলা বাক্যটি মিলিয়ে দেখতে বলতেন।

এর পর খাতা বন্ধ করিয়ে, মুখে মুখে ঐ বাংলা বাক্যটির ইংরেজি অনুবাদ করাতেন। শেষে যে যার ইংরেজি অনুবাদ খাতার অপর পৃষ্ঠায় লিখত। তিনি তা সংশোধন করে দিতেন। এর পর "প্রথমে খাতায় লেখা" তাঁর সেই ইংরেজি বাক্যের সঙ্গে আমাদের নিজেদের করা ইংরেজি অনুবাদ মিলিয়ে, উভয় ইংরেজি বাক্যের দোষগুণ বিচার করতে হ'ত। আমাদের বাক্যের দোষ এবং তাঁর বাক্যের গুণ আমরা একবাক্যে স্বীকার করতাম।

এইভাবে মাসাধিক ধরে', তিন, চার থেকে, আট দশ দফা ইংরেজি ও বাংলা বাক্যের রচনা আলোচনা এবং তুলনা করতে করতে যখন আমাদের বুদ্ধিতে কিঞ্চিদ্ ধার এবং বিদ্যাতেও কিঞ্চিদ্ ভার হোতো, তখন "সোরাব রোস্তাম" কাব্যটির তাঁরকৃত প্রাঞ্জল গদ্যরূপ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করতেন।৮ তারও পরে পদ্যরূপী মূল "সোরাব রোস্তাম" গ্রন্থখানি আমাদের সামনে ধরতেন।

---

৭ রবীন্দ্রনাথের পুরানো আবাস "দেহলী" জীর্ণ ও ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছিল। তার সংস্কার করতে গিয়ে দেখা গেল সমস্তই খসে পড়ছে। তখন দেহলীকে সম্পূর্ণ নতুন করেই নির্মাণ করতে হ'ল। দেহলীর মাঝখানের ঘরটি, কয়েকটি দরজা জানালা এবং দুটি সিঁড়ি পূর্বের চিহ্ন বহন করছে। দেহলীর আকৃতি অবশ্য পূর্বেরই মত। প্রধানত বর্তমান উপাচার্য মহাশয়ের উদ্যোগেই দেহলীকে আমরা ফিরে পেলাম।

৮ "সোরাব রোস্তাম (Sohrab and Rustam)" blank Verse-এ রচিত :

"And the first grey of morning fill'd the east,
And the fog rose out of Oxus stream.
But all the Tartar camp along the stream
Was hush'd, and still the men were plunged in sleep:
Sohrab alone, he slept not : all night long
He had lain wakeful, tossing on his bed ;"

উপরোক্ত ঐ বাক্যগুলি হ'তে 'grey" 'fill" 'out of" "along"

অতঃপর সেই কাব্যগ্রন্থখানি আমাদের কাছে আর পাণিনি ব্যাকরণের মত ভয়ঙ্কর লাগত না। তার রস গ্রহণ তখন কঠিন হ'ত না।

"সবশেষে বলব, আমি যেটাকে সবচেয়ে বড়ো মনে করি এবং যেটা সবচেয়ে দুর্লভ। তাঁরাই শিক্ষক হবার উপযুক্ত, যাঁরা ধৈর্যবান।"৯

তাঁর এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে চরিতার্থ দেখেছি তাঁর নিজের মধ্যে।

এই সবেরই মূলে ছিল ছাত্রদের প্রতি তাঁর অপরিসীম বাৎসল্য।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থে পড়েছিলাম—পণ্ডিতমশাই-এর পুত্রের কলেরায় মৃত্যু হ'ল। সংসারের সমস্ত দীপ্তি তাঁর কাছে লুপ্ত হয়ে গেল। নিদারুণ সেই শোকের মধ্যেই, একদিন সকলের সন্তানের মধ্যে তিনি নিজের সন্তানকে ফিরে পেলেন।

শরৎচন্দ্র কি "পণ্ডিত মশাই"-এ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষক জীবনই চিত্রিত করেছেন?

শমীন্দ্রনাথকে হারিয়েও রবীন্দ্রনাথ তাঁকে পুনরায় ফিরে পেলেন। পেলেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে।

বছরের পর বছর অক্লান্ত পরিশ্রমে, নীরবে নিঃশব্দে, লোকচক্ষুর অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে, তাঁর ছাত্রদের পুত্রবৎ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁদের জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে এইভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন। এতই নিঃশব্দে তিনি এই কাজ করে গিয়েছিলেন যে, বাংলা দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্দের অনেকেরই তা অগোচর ছিল।

১৯৩৩ সনে, শিক্ষা সমাপ্ত করে আমি যখন বাইরে যাই, তখন পূর্ববঙ্গে, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে একবার এক নৌকায় সারাদিন অতি অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হবার সৌভাগ্য হয়। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতির কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তিনি বলে ওঠেন: "বলো কি হে, বলো কি। এইভাবে তাঁর অমূল্য সময় তিনি তোমাদের দিয়েছেন। এই সময়ে তিনি কত অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি করতে পারতেন। তোমরা তাঁর ছাত্রেরা সমস্ত জগৎকে বঞ্চিত করেছ।"

আপাতদৃষ্টিতে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এমন হিসাব রবীন্দ্রনাথ কখনো করেন নি। বস্তুতঃ বেহিসেবি মন নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া অফুরন্ত যাঁর ঐশ্বর্য তিনি হিসেব করবেন কোন্ দুঃখে? অজস্র ফেলিয়ে ছড়িয়েও তিনি অজস্র দান করে গেছেন।

এত সময় শিশুদের পরিচর্যায় দান করলেও তাঁর কাব্য সৃষ্টির সময়ের অভাব হয় নি। তিনি ছিলেন জিতনিদ্র পুরুষ। রাত্রি এগারটার পূর্বে তিনি নিদ্রা যেতেন না। অথচ তিনটার পরই তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন। দিবানিদ্রা তাঁর ছিল না।

যাই হোক, কবির ঐ সময়ক্ষেপের হিসেব-নিকেশের সময় আমরা যেন স্মরণ রাখি—কাব্য রচনা ও তপোবন রচনা, দুই-ই তিনি প্রাণের আবেগে করে গেছেন।

তিনি নিজেই বলেছেন:

"যে-প্রেরণা কাব্যরূপ রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল।"

জগতে এমন কবি আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেছেন কি, যিনি একই সঙ্গে যুগপদ্ দুই মহাকাব্য সৃষ্টি করে গেছেন?

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মহাকাব্য।১০ ভবিষ্যজগৎ এর জন্যেও তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবে।

'hush" "plunge" "lie wakeful" "toss on"—এই শব্দ ক্রিয়া, preposition ইত্যাদি ব্যবহার করে', ছাত্রদের পরিচিত এবং কৌতুক-জনক বিষয় অবলম্বনে তিনি বাক্য তৈরি করতেন।

এইভাবে মূলের একটি বাক্যের জন্য, কোথাও বা তিন-চারটি, কোথাও বা পাঁচ-ছয়টি কোথাও বা সাত-আটটি বাক্য তাঁকে তৈরি করতে হ'ত। এইরূপ দশটি পর্যন্ত বাক্য কখনো কখনো তাঁকে তৈরি করতে হয়েছে- মূলের একটিমাত্র বাক্যের জন্যে।

প্যাণ্ডোরার পেঁটরার কাহিনী (Pandora's Box), অ্যান্টিয়াস (Antaeus) হারকিউলিস্ (Hercules) ও বামনদের (Pygmies) গল্পেও তিনি এইরূপ একটি বাক্যের জন্যে, চার থেকে দশ দফা পর্যন্ত অনুরূপ বাক্য তৈরি করেছিলেন।

৯ "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" - পৃষ্ঠা ৭।

১০ ". . . . . when he (poet) brought together a few boys, one sunny day in winter, among the warm shadows of the *sal* trees strong, straight and tall, with branches of a dignified moderation, *he started to write a poem in a medium not of words,* (italics are ours)."

A Poet's School: by Rabindranath Tagore, p. 1. (*Visva-Bharati Bulletin*, No. 9.).

—o—

স্থিরচিত্র

শ্রীসৌমেন সেন

লণ্ঠনের আলোতে অন্ধকার একটু ফিকে হয়েছে। আকাশে মেঘ জমেছে বলে দরজা পেরোলেই অন্ধকার। অনন্ত একবার চোখ তুলে টিনের চালার নিচে বরগার দিকে তাকাল। চালাটা ঢালু। টিনের ঢেউ-এ আলো-ছায়া পাশাপাশি, সমান্তরাল।

এই ঘরটাতে অনন্ত বসে। রোজ। একলা। গোপাল যখন ডিস্‌পেনসারিতে তালা লাগিয়ে লণ্ঠনের দোলায় নিজের ছায়াকে নাচাতে নাচাতে ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায়, অনন্ত তখন এ-ঘরে এসে বসে। অনেক রাত অবধি কেউ ওকে বিরক্ত করবে না। রাত এগারোটার পর সনাতন জানিয়ে যাবে, খাবার সময় হ'ল। অনন্ত উঠতেও পারে, নাও উঠতে পারে। রোজ খাবার প্রবৃত্তি থাকে না ওর।

আটটার পর অনন্তকে কেউ বিরক্ত করতে আসে না। রোগী দেখা, ওষুধ লেখা সব ঐ আটটা অবধি। নেহাৎ মরোমরো রোগী না থাকলে ওর দরজার কড়া নাড়বে না কেউ। এ-অঞ্চলের লোকেরা সকলে এ-হিসেবটুকু রাখে। ওদের জানা আছে, এ-সময় ডাক্তারবাবু একটু নেশা করেন।

পিঠ সোজা করে চেয়ারে বসে অনন্ত। ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দেয়। গ্লাসের রঙ দেখে। সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছড়িয়ে দেয়। আবছায়া অন্ধকারে ওর নিজের চারপাশে একটি স্বতন্ত্র পরিমণ্ডল তৈরী হয়। পরে তা ব্যাপ্তি লাভ ক'রে ছড়িয়ে যায়। অন্ধকার ঘন হয়। জলন্ত সিগারেট থেকে যে ধোঁয়ার সুতো প্রথমে ধীরে তার পর দ্রুত উপরে উঠতে থাকে, ওর দৃষ্টি সেটাকে লক্ষ্য করে। আবার গ্লাসের রঙ দেখে। টেবিলের উপর লণ্ঠনের শিখার দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ। অনন্ত লক্ষ্য ক'রে দেখেছে এ-ভাবে কিছুক্ষণ সেই শিখার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রাখলে, তীব্র ক'রে রাখলে, সম্পর্কিত শিরাগুলি সক্রিয় হয়ে পড়ে। কম্পিত আলো ওর চোখের মণিকে ক্রমশঃ উজ্জ্বল করে। চোখের পাতা উন্মুক্ত হয়, দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়; চেতনা কেন্দ্রাভিমুখী হয়। তার পর অন্ধকারে কিছুক্ষণ চোখ রাখলে দৃষ্টি পুনর্বার স্তিমিত হয়। তখন গ্লাসের রঙ আরও ভাল লাগে। ঘনিষ্ঠ অন্ধকারে নিজেকে কেমন অন্তরঙ্গ বোধ হয়।

একসময় ইজিচেয়ারে শরীর এলিয়ে দিয়ে উপরের অন্ধকারকে তাক করে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে। কিছু কি ভাবে ও? কিছুই না। ঘরের আবছায়া রূপে মুগ্ধ হয়ে যায়। টিনের চালা, চালার ঢেউ, ঢেউ-এ আলোছায়া পাশাপাশি; তখন টেবিলে লণ্ঠন, লণ্ঠনের শিখা, কম্পিত আলো, বোতল, গ্লাস, অ্যাসট্রে, কোন নিরাসক্ত স্থির-চিত্রের রঙ-এর বিষাদের মত মনে হয়। স্থির অথচ ছন্দোবদ্ধ। লণ্ঠনের শিখা অনেক দূরে বলে, অনন্তর দৃষ্টি প্রশস্ত হয় না, ঘরের আবছায়ার মত নিজের স্তিমিত চোখ দুটো ও যেন দেখতে পায়। এই অদ্ভুত বিমূর্ত অন্তরঙ্গতা ওকে আচ্ছন্ন করে, আবিষ্ট করে।

কখনও বাতি নিবিয়ে দেয়। তখন বাইরের অন্ধকার একছুটে ভিতরে চলে আসে। ভিতর-বাহির একাকার হয়ে যায়। সেই অন্ধকার ঘরে আপন অন্তরঙ্গতায় মুগ্ধ অনন্ত ডাক্তার স্থির হয়ে বসে থাকে।

আজ চেয়ারে তেমনি বসেছে অনন্ত। সনাতন যথারীতি টেবিলে বোতল, গ্লাস সাজিয়ে রেখে গেছে। কিন্তু আজ ও গ্লাসে মদ ঢালতে পারছে না। মদ খেলে অনন্ত ভাবতে পারে না। এটা ওর অভ্যাস। বেশ খানিকটা নেশা হওয়ার পর শুধু নিষ্ক্রিয় চেতনায় বসে থাকে। ডাক্তার হিসেবে অনন্ত জানে, মানুষের স্নায়ুর ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অনেকটা অভ্যাস-নিয়ন্ত্রিত। স্নায়বিক ব্যায়াম পদ্ধতিতে স্নায়ুকে সাময়িক ভাবে স্তিমিত করে রাখাও সম্ভব। ইচ্ছাশক্তির তীব্রতার ফলে স্নায়ুশক্তিকে একমুখী করে তোলা কঠিন নয়। অনন্ত শুধু চিন্তা-প্রক্রিয়ার কবল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। অন্তত এ-সময়টুকু। মদ এবং চেষ্টার ফলে এই সময় এক আচ্ছন্ন চেতনায় ও প্রীত থাকে। সারাদিন রোগ, ওষুধ আর টাকা নিয়ে ব্যস্ত থাকে অনন্ত। ওকে ঘিরে মানুষের সাধ-আহ্লাদ, বাঁচবার ইচ্ছা একটু একটু করে বাড়ে, কমে। কাউকে আশ্বাস দেয় অনন্ত ডাক্তার, কারও মৃত্যু সম্ভাবনার কথা তাকে নিষ্ঠুর ভাবে তুচ্ছ কণ্ঠে শোনায়, কাউকে বাঁচাবার জন্যে আহার-নিদ্রা ভুলে যায়। কিন্তু এই আধা-অন্ধকার ঘরে এলে বাঁচা-মরার কোন তফাৎ বুঝতে পারে না ও। অন্ধকারের ত আসলে

কোন মানে নেই। এই অর্থহীন অন্ধকারকে সঙ্গী ক'রে নীরবে বসে থাকে অনন্ত।

কিন্তু আজ ওকে ভাবতে হবে। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় নিজেকে মোটামুটি একটা অভ্যাসের আওতায় এনেছিল। এখানে আসার আগে যে-ছক ও তৈরী করেছিল, তা ধীরে ধীরে যথেষ্ট রপ্ত হয়েছে। কিন্তু সমীরের চিঠি ওর অন্ধকার ঘরে মশাল ছুঁড়ে দেওয়ার মত। কোন আড়াল রইল না কোথাও। এই নগ্নতার ভিতর নিজেকে কোথায় লুকোবে?

বোতলের ছিপিটা এখনও খোলা হয় নি। গ্লাস শূন্য। চেয়ারে তেমনি টানটান বসেছে অনন্ত। সিগারেট থেকে ধোঁয়ার সুতো তেমনি উপরে চালার নিচে অন্ধকারে আশ্রয় খুঁজছে। ধাক্কা খেয়ে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, স্তূপীকৃত অবয়বহীন। বোতলের ছিপি খুলতে গিয়ে সমীরের চিঠিটা আর একবার খুলল অনন্ত।

তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল, জীবনের কোন চরম মুহূর্তে তোমাকে একবার জানাব। তোমার কথায় সেদিন হেসেছিলাম। ভেবেছিলাম, জীবন থেকে যে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে, তার কাছে কোনদিন ভরসার লোভে আমাকে দাঁড়াতে হবে না। অথচ—

হাসতে ইচ্ছে করছে অনন্তর। ধা ধা করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছে। সমীর সামনে থাকলে তার কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনন্ত হাসত। অন্ধকার কাঁপিয়ে, ওর হাসিতে অন্ধকারের মানে দাঁড়াত অদ্ভুত।

কিন্তু ও একলা। একলা এই ঘরে, এই আধাগ্রাম আধাশহরে, ঢালু ছাদের নিচে, আধা অন্ধকারে, ও, অনন্ত ডাক্তার বসে আছে। রাত আটটার পর যে মদের নেশায় বুঁদ হয়ে যায়, সে সমীরের চিঠি হাতে, শূন্য গ্লাস সামনে, ভাবতে হবে এই কথা ভেবে শূন্যমনে বসে আছে।

যাকে সমীর বলেছিল, এর চেয়ে তোমার আত্মহত্যা করা ভাল।

অর্থাৎ সমীর বলতে চেয়েছিল, অনন্তর সিদ্ধান্তর কাপুরুষতার তুলনায় আত্মহত্যার জোর অনেক বেশি।

অনন্ত হেসে বলেছিল, অত জোর পাব কোথায়!

আজ এই মুহূর্তে, এই ঘরে, এই অন্তরঙ্গ নির্জনতাকে একটা দমকা হাসিতে বিশৃঙ্খল করে দিতে ইচ্ছে হ'ল অনন্তর। কিন্তু ক্রমশ সেই ইচ্ছা এক হয়ে গেল এই আলোছায়ার সঙ্গে। ম্লান হয়ে এল। টেবিলের উপর শূন্য গ্লাস, ছিপি বন্ধ বোতল, লণ্ঠনের কম্পিত শিখার চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে, ঘুরতে ঘুরতে ওর ইচ্ছার তীব্রতার মৃত্যু হ'ল। যেন এই আত্মিক যোগাযোগের বিষাদ সহ্য করতে না পেরে, মদের বোতলের ছিপি খুলতে গিয়ে, না খুলে আলো নিবিয়ে বসল অনন্ত। কিন্তু পরমুহূর্তে ভীত হয়ে পড়ল ও, এমনি ক'রে নিজের সঙ্গে মুখোমুখি বহুদিন বসে নি। আজ সমীরের চিঠি ওর নিজের কাছ থেকে নিজের সযত্নে গড়া আড়ালটুকু অপসারিত করেছে। এখন এই অবলম্বনহীন অন্ধকার যেন তার পূর্ণ অবয়ব নিয়ে অনন্তর সামনে দাঁড়াল। যেন কোন অস্পষ্ট দর্পণে নিজের ছায়া পড়ছে। অনন্ত আপনাকে কিছুতেই চিনতে পারছে না। একটা উলঙ্গ দৈন্য ওকে বিদ্রূপ করছে কি? দর্পণের প্রতিবিম্ব?

সমীরও ওকে বিদ্রূপ করেছিল। অনন্ত যখন হঠাৎ-ই স্থির করেছিল, এখানে আসবে যেখানে ক'টা রেলের কেরাণী, দুটো-চারটে দোকানদার আর কিছু দেহাতীর বাস, তখন সমীর হেসে উঠেছিল। হাসতে হাসতে উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, একটা মেয়ে তোমাকে তেমন করে ভালবাসতে পারল না বলে, নিজের জীবনটাকে এ ভাবে নষ্ট করতে হবে, এমন মধ্যযুগীয় ভাববিলাসিতা কেন?

অনন্ত একটা জলন্ত চুরুটের আড়ালে আত্মগোপন করে ঠাণ্ডাগলায় বলেছিল, গোটা ব্যাপারটা তুই বানিয়ে তুলছিস সমীর। জীবন নষ্ট করার ন্যাকামির কথা তোর মনে আসছে কেন? সব কথা তুই বুঝিস তাই বা ভাবলি কি করে? একজনকে ভালবাসতাম, তাকে নিয়েই ত ক'দিন কাটল হৈ চৈ করে, এখন দু'দিন বিশ্রাম করতে ভাল লাগছে।

একটু থেমে বলেছিল, বাবার তৈরী একটা বাড়ী যখন আছে, আর ডাক্তারিটা যখন শিখে ফেলেছি, ক'দিন কাটিয়ে আসি না। এতে জীবন নষ্ট করার ভাবালুতা তুই দেখছিস কোথায়।

অনন্তর ঠাণ্ডাগলাকে যেন বিদ্রূপ করেই গলা খুলে হেসে উঠেছিল সমীর। টেবিলে চাপড় মেরে বলেছিল, ব্রাভো।

দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ এই মুহূর্তে নিজেকে এমন ভাবে আবিষ্কার করে বিব্রত হয়ে পড়ল অনন্ত। যেন কোন অপ্রস্তুত অভিনেতাকে অকস্মাৎ মঞ্চের একরাশ আলোর মাঝখানে দাঁড় করিয়ে তাকে হতবাক ক'রে দিয়েছে। কোন্ পালায় সে সম্প্রতি নায়ক, এই বিজ্ঞাপিত সত্যটিও যেন তার মনে পড়ছে না। পাদপ্রদীপের আলো তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছে, মনে হয় সম্মুখে অগণিত অশরীরী ওর অসহায়ত্ব দেখে অট্টহাসি হাসছে, তেমনি অনন্তর মনে

হ'ল, এই নিরালম্ব অন্ধকারে যেন ওর চার পাশে অনেক-গুলো প্রতিবিম্ব ওকে দেখে অট্টহাসি হাসতে গিয়ে বিষাদের শিকার হয়ে পড়ল।

ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাতে গিয়ে সচেতন হ'ল অনন্ত ডাক্তার। ওর মাথা ধরেছে, একটা শিহরণ অনুভব করছে মাথায়। কানের পাশে একটানা একটা শব্দ, ঝিঁঝিঁর ডাকের মত। অনন্ত ডাক্তার জানে মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন হলে মানুষের এমন হয়। দীর্ঘকালের নেশার অভ্যাসের উগ্রতা ওকে দখল করেছে। মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি এই মুহূর্তে ওঁর নেই। সারা-দিন যখন রোগী দেখে, মুমূর্ষুকে আশ্বাস দেয়, মৃত্যুর নিদান হাঁকে, তখন যেমন সহজে এ কাজটা সম্পন্ন হয়, এখন তা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। এখন অন্তত এক গ্লাস মদ ওর দরকার।

লণ্ঠন জ্বালিয়ে বোতলের ছিপি খুলে গ্লাসে খানিকটা মদ ঢালল অনন্ত। সোডা মিশিয়ে নিল।

তার পর ঐ গ্লাসের রঙ দেখতে দেখতে অকস্মাৎ ওর মনে হ'ল, যেন এই ঘরে অনেক লোক, তারা সব চীৎকার করে কাঁদতে চাইছে, কিন্তু সেই কান্না গলায় আটকে ওরা বিকৃত মুখ হয়ে গেল। দু'হাতে মাথা চেপে বসে রইল অনন্ত।

প্রণতি একটা গান শোনাত ওকে, প্রায়ই। যেহেতু গানটির অনন্তর বড় প্রিয় ছিল। ওর এই বাড়ীতে যখন অনন্ত প্রথম এল, সময়টা তখন দুপুর। ট্রেন থেকে নেমে স্নান-খাওয়া সেরে একটা সিগারেট ধরিয়ে যখন ওর ঘরের জানালায় দাঁড়াল অনন্ত, তখন মাঠে রোদ ছুটছে। ঐ উজ্জ্বলতায় বেশীক্ষণ চোখ রাখা যায় না। শক্ত মাটিতে প্রতিহত হয়ে এক হাত উপরে উঠে রোদ্দুর কাঁপছে। যেন রোষে তাকাচ্ছে মাটির দিকে। কিন্তু দূরে একটা নিঃসঙ্গ গাছ যেন সমতা রক্ষা করল, অনন্তর দৃষ্টিকে শান্তি দিল। এই অবারিত আলোয় আপ্লুত হয়ে গেল অনন্তর দেহমন। আকাশে চোখ তুলল সে, চিলের শান্ত ডানায় সমতুল শান্তি। গানটি যদিও গাইত প্রণতি, কিন্তু এই রোদের অনুষঙ্গে গানটি মনে পড়ল অনন্তর, মধ্যদিনের বিজন বাতায়নে, ক্লান্তিভরা কোন বেদনার মায়া স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে মনে···এই মধ্যদিনের ব্যাপ্তিতে অসময়ে বেহাগের সুরে অনন্তর মনে যেন এক দ্বিতীয় বিষাদের জন্ম হ'ল। প্রীত বিষাদ। গানটি গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগল অনন্ত। মনে পড়ল সমীর বলেছিল, দুঃখ ভোলার জন্যে মানুষ নির্জনতা চায়। কিন্তু তা হয় না। তখন দুঃখটাই সঙ্গী হয়। মানুষ কি কখনও একা আনন্দ উপায় করতে পারে?

অনন্ত কোন জবাব দেয় নি। হেসেছিল মাত্র। সমীর তখন উত্তেজিত হয়ে প্রেমের ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছিল। কিছু শোনে নি অনন্ত। আসলে ও জানে, ভালবাসার মানে একটাই হয়, ভালবাসা। এর কোন দ্বিতীয় অর্থ নেই। ব্যক্তির মানসিক গঠনে তার যে চেহারাটা গড়ে ওঠে, তাই সত্য। দ্বিতীয় ব্যক্তি কি তার ব্যাখ্যা করবে?

গোপনে একটি উগ্র বেদনা বুকে করে এখানে এসেছে অনন্ত। সমীরের সঙ্গে আলাপে যতই চালাকি করুক না কেন, নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে পারে নি। ভালবাসাকেই ভালবাসতে চাওয়ার এক তীব্র ইচ্ছা নিয়েই এখানে সে এসেছে। ডাক্তার হিসেবে অনন্ত জানে সে ইচ্ছার তীব্রতা ওকে একদিন বিকারগ্রস্ত করে তুলতে পারে। তবু নিজেকে নিজের কাছে ছাড়া আর কোথাও সম্পন্ন স্বস্তিতে আশ্রয় দিতে পারল না। ছুটে এসেছে এখানে।

ইজিচেয়ারটা টেনে জানালার পাশে বসল অনন্ত। এবার ওর চোখের সামনে জানালার মাপের এক টুকরো আকাশ আর তার সুনীল গভীরতা। জানালার নীচে অযত্নলালিত বাগানের একটি অংশ। অনন্ত ডাক্তার, ডাক্তারী শিখে যার বুদ্ধি সাধারণ অনেক মানুষের তুলনায় প্রবীণ তারও কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যেতে ইচ্ছে করল। ঐ যে কাঁটা-তারের বেড়ায় দুটো শালিক বসেছে, তাদের মত। কিছুতেই ওরা বসছে না, লাফাচ্ছে। এই দুপুরের সবটুকু আনন্দ যেন ওদেরই। চারদিক থেকে শব্দ আসছে। আবছা। ঐ যে আকাশের চিলটা তার ডানা মেলার শব্দ কি আসছে এতদূর? সামনের গাছে ঐ যে ফড়িং, সাদা-পাখা প্রজাপতি, তাদের ওড়ার শব্দ ওর কানের কাছে। খুব মজা লাগল যেন অনন্তর, পাশের মাঠে একটা গরু ঘাস ছিঁড়ছে, তার শব্দ আসছে এতদূর।

চিলটা শান্ত ডানায় ঘুরে ঘুরে আসছে। রোদে ভাসছে যেন। মধ্যদিনের বিজনবাতায়নে কোন বেদনার মায়া স্বপ্নাভাসে ভাসে মনে মনে। শুদ্ধ নিখাদের বিষাদে। সুনীল শান্তিতে সেই সুর দিগন্তবিস্তৃত হয়ে গেল। অনন্ত মুক্তির মাঝে। এই অবারিত আলোয় যেন এক সুবর্ণরেখার জন্মসাক্ষী হ'ল অনন্ত। যার শীতল পলিমাটির আশ্রয়ে তার এই নবলব্ধ দ্বিতীয় বিষাদের প্রীতি।

ওদের বাড়ী এতদিন যে দেখাশোনা করেছে সে

বিষ্টুপদ এসে বলল, এখন আর কিছু দরকার আছে আপনার? বাইরের ঘরটা আমি সাজিয়ে রেখেছি, ইচ্ছে করলে আজ থেকেই বসতে পারেন। এখানকার লোকজন এর মধ্যেই জেনে গেছে আপনি আসছেন। অবশ্য দোষটা আমারই। দেখবেন আজই হয়ত ছুটতে ছুটতে আসবে। প্রতাপকে খবর দিয়েছি, বিকেলে আসবে, ওকে সাইনবোর্ড কি লিখতে হবে বলে দেবেন।

অনন্ত বলল, বস বিষ্টুপদ। তোমাদের এই জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগছে। এমন রোদ্দুর আমি বহুদিন দেখি নি।

বিষ্টু একটু অবাক হয়ে তাকাল, বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। জায়গাটা ভাল। দেখতে ভাল আর স্বাস্থ্য ভাল বলেই ত বাবুরা এখানে বাড়ী করেন, ছুটিছাটায় ছুটে আসেন। কিন্তু আমি আর বসছি না, কাছাকাছিই থাকব, দরকার হলে ডেকে পাঠাবেন।

কিন্তু সব ভুলে এই জানালার পাশেই বসে রইল অনন্ত। একটু একটু করে ছায়া জমল আকাশে। একটু একটু করে দুপুরের সব শব্দ মিলিয়ে এল। উজ্জ্বল রৌদ্রের প্লাবনের পর প্রসন্ন বিকেল এল ধীরে ধীরে। অনন্তর অনুভবের ভিতর।

বিকেলটাকে যখন ওর ভাললাগা কোন গানের সঙ্গে মেলাতে চাইছে, তখন সনাতন এক কাপ চা এনে বলল, আপনার জন্যে এরা সব বসে আছে। আপনি এসেছেন খবর পেয়ে ছুটে এসেছে সব।

এক উজ্জ্বলতা থেকে আর-এক উৎসবে যেন উপস্থিত হ'ল অনন্ত। রুগ্ন, কুৎসিত, নোংরা লোকগুলো একজোট হয়ে বসে আছে বারান্দায়। এ ওর গায়ে লেগে। অনন্ত যখন ওদের মধ্যে এল, তখন কেউ ওকে প্রণাম করল গড় হয়ে, কেউ হাত তুলে নমস্কার করল। একটা ভারি চেহারার লোক, আলাপে জানা গেল এখানে বাজারে একমাত্র পাইস হোটেলের মালিক সত্যহরি, উপস্থিত সকলের প্রতিনিধিস্বরূপ, জোড়হাতে, নাতিদীর্ঘ ভূমিকা সমেত অনন্তকে অভ্যর্থনা জানাল। হাসিমুখে অনন্ত শুনল। কেউ বা কুন্ঠিত স্বরে বোঝাতে চাইল, এতদিন এখানে ডাক্তারের অভাবে ওদের কতজনা মরে গেছে।

সত্যহরি বলল, আপনি এয়েছেন, তবু একটা ভরসা হ'ল।

একটা গুঞ্জন উঠল, ঠিক ঠিক। ডাক্তারবাবু আসাতে ওদের বুকে বল আসছে।

ও কে, কেন এখানে এসেছে, সব যেন ভুলে গেল অনন্ত ডাক্তার। এই অসহায় লোকগুলো এখন থেকে ওর হাতে ওদের প্রাণ সঁপে দিল। পরম নির্ভরতায় ওরা ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকবে। হাসিমুখে ওদের সঙ্গে কথা বলল অনন্ত। মিথ্যে করেই বলল, তোমাদের জন্যই ত শহর ছেড়ে এখানে এলাম আমি।

ঠিক এই কথাটি একটু ঘুরিয়ে, অন্যভাবে বলল, বলতে ভাল লাগল, এখানকার কেরাণীবাবুদের, এরা চলে যাওয়ার পর যারা এসেছিল। তখন সন্ধ্যা নামছে ধীরে ধীরে। বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে বসেছিল অনন্ত। অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যার মাঝখানে এই অসীম শূন্যতার স্বল্প সময়টুকুও অনন্তর সদ্যপ্রাপ্ত শান্তির প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। যে-মুহূর্তে নিজেকে একা কোথাও আশ্রয় দেওয়া যায় না, সেই মুহূর্তে এই রুগ্ন, অসহায়, দীর্ঘশরীর মানুষগুলোর জটলার কেন্দ্রে নিজেকে আবিষ্কার করল অনন্ত।

চোখ কোটরে বসা রোগা টিকিটবাবু, একটু ভুঁড়ি-সমেত স্টেসনমাষ্টার আর নিতান্তই মামুলি চেহারার আরও দু'জন সন্ধ্যাবেলা শেষ আপ-ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর এল অনন্তর সঙ্গে দেখা করতে। স্টেসনমাষ্টার ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, বাঁচালেন মশাই, ডাক্তার-বদ্যি করতে ত সেই সদরে ছুটতে হ'ত। এখন ঘর থেকে হাঁক দিলে আপনাকে পাওয়া যাবে। রোগ-শোক ত আছেই; আর তাস-দাবা আসে ত? বাঃ বাঃ। তা হলে সময় করে মাঝে মাঝে বসবেন আমাদের সঙ্গে। নইলে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে মানুষ বাস করতে পারে?

ওরা চলে যাওয়ার পর অন্ধকার নামল। সনাতন বাইরের ঘরে একটা লণ্ঠন রেখে গেল। বারান্দায় ইজি-চেয়ারে অনন্ত যেখানে বসেছে, তার পায়ের কাছে একফালি আলো এসে পড়ল। এই নিস্তব্ধ অন্ধকারে নিজেকে একবার দেখে নিল অনন্ত। ভাল লাগল, মনে হ'ল, একটা প্রীতির আবহাওয়া ওকে ঘিরে আছে। একটু আগে এই যে লোকগুলো একজোট হয়ে ওর কাছে এসেছিল, এদের শোকতাপ, শঙ্কাভয়ের অনেকটাই এখন ওর একান্ত আপন হয়ে গেল। তার পরিবর্তে এরা দেবে ওকে প্রীতি, শ্রদ্ধা। আবছা অন্ধকারে নিজেকে একটা স্বতন্ত্র চেহারায় গড়ে তুলল অনন্ত। স্পন্দিত দুপুর থেকে প্রসন্ন বিকেল উত্তীর্ণ সন্ধ্যার এপারে আপনগড়া এই রূপে ও নিজেই মুগ্ধ হয়ে গেল।

পরদিন বিকেলে রেলের কেরাণী বিভূতি এসে বলল, চলুন ডাক্তারবাবু। এখানকার নদীটা দেখে আসবেন। ভাল লাগবে।

এই ভদ্রলোক কালও এসেছিল। আজ ওর চোখে এক স্তিমিত মুগ্ধতা লক্ষ্য করল অনন্ত। পরে সেই নদার তীরে, সন্ধ্যার আবছা আলোয় এক বিস্ময়ের আভাস পেল। নাকি সবটাই অনন্তর আপনগড়া, কে জানে। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোয় সরু সুতোর মত নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দূর পাহাড়ের গায়ে পুঞ্জীভূত মেঘ দেখল অনন্ত। এই নদীর তীরে এর পর বহুবার হেঁটেছে ও। নদী যখন সরু সুতোর মত পড়ে থাকে তখন হেঁটে এপার-ওপার করেছে। কোনদিন বা তার ঠাণ্ডা জলে পা ফেলে হেঁটেছে খানিকটা। পায়ের নিচে বালি সরে সরে এক শীতল ঘরে ওকে পৌঁছে দিয়েছে।

বিভূতিকে জিজ্ঞাসা করল অনন্ত, নদীটার নাম কি?

বিভূতি বলল, ডলুং। সাঁওতালি নাম। নামটা আমার খুব ভাল লাগে। কোন কাব্যগন্ধ না থাকলেও, একটা গানের সুর যেন বাজে, তাই না?

অনন্ত হেসে বলল, আসবার সময় সুবর্ণরেখার কথা শুনছিলাম বলেই হয়ত আমার কেমন ধারণা হয়েছিল, হয়ত এর নাম সুবর্ণরেখা হতে পারে।

বিভূতিও হাসল, তাতে কি আছে, আপনার ভাল লাগলে সেই নামই থাকুক না। ভৌগোলিক ভুল সত্বেও। আমার কিন্তু ডলুং নামটা বেশি ভাল লাগছে।

অনন্ত বলল, বিভূতিকে উপলক্ষ করে যেন নিজেকেই বলল, সুবর্ণরেখার উৎসে যেমন একটা ঐশ্বর্যের আভাস মেলে, এখানে এই নদী যেন তেমন কোন ঐশ্বর্যের উৎস-মুখ। অন্ততঃ তেমন ভাবতে ভাল লাগছে, কি বলেন?

কাল দুপুরে যে শব্দ গন্ধ স্পর্শ ওকে এক দ্বিতীয় বিষাদের কূলে নিয়ে গিয়েছে আজ সায়াহ্নের প্রায়ান্ধকারে সেই বিষাদ ওকে উপস্থিত করল এক প্রীতনদীর উৎসে। এই অনুভবের জগতে কখন হারিয়ে গেল অনন্ত। এই নদীর গতিধারায় শীতল জলে পায়ে পায়ে ও যেন ঠিক সেই দেশে পৌঁছতে পারে, যেখানে এক অতুল ঐশ্বর্যের আভাস।

তার পর বহুদিন এই নদী, দুপুর, অন্ধকার আর লালমাটির সড়কে হেঁটে নিজের কথার অর্থ নিজেই আবিষ্কার করতে চেয়েছে অনন্ত। এখানকার নিস্তরঙ্গ জীবনস্রোতে আপনাকে মিলিয়ে দিয়েছিল। সাইকেলের পেছনে চামড়ার বাক্স বেঁধে পাদ্রীসাহেবের মত ঘুরে বেড়াত ও। অন্যমনস্ক পথে অকস্মাৎ কোন দুষ্টু ছেলের 'হেই গো ডাক্তারবাবু' শুনে ঘাড় ফিরিয়ে খুসি হয়ে উঠেছে, ছেলেটার খিল খিল হাসি শুনে। লোলচর্ম বৃদ্ধের পাশে বসে তার যৌবনের কাহিনী শুনেছে; কোন স্বয়ম্বরার বিবাহোৎসবে মহুয়া খেয়ে মাতাল হয়েছে। মেয়েটিকে ঠাট্টা করে খুসির কণ্ঠে শুনেছে, 'হেই গো ডাক্তারবাবু'। তার পর যেন কোটি কণ্ঠের হাসি ওকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে ওর সেই প্রীতনদীর তীরে।

ওকে ঘিরে বাঁচবার ইচ্ছা জাগল মানুষের, ক'টা খালিগায়ের মানুষ, শালগাছের মত দেহ, মহুয়ার গন্ধ শরীরে। ওর হাতে মরল কতজনা, বাঁচল কেউ কেউ। কিন্তু প্রণতি মরে গেল। জন্ম হ'ল সুবর্ণরেখার। গভীর নিচে বালি সরল ধীরে ধীরে। সেই শীতলতা ওকে আশ্রয় দিল।

কিন্তু মুক্তি দিল না। একসময় হঠাৎ আবিষ্কার করল অনন্ত, এই জটলায় নিজেকে সে কোথায় হারিয়ে বসেছে। ওর একাকী অস্তিত্বের মায়া কখন কোন অন্যমনস্ক মুহূর্তে ওকে ত্যাগ করে গেছে। নিস্তব্ধ দুপুরের বিশ্রামে এখন কই সেই শুদ্ধ নিখাদের আনন্দ-বেদনা? যার সূত্রে ওর প্রিয় স্রোতধারার জন্ম? বিভূতির চোখে বিস্ময়ের যে-স্তিমিত আভাস ও দেখেছিল, তেমনি স্তিমিত আলো আবিষ্কার করল নিজের চোখে। প্লাবিত রৌদ্রের সুনীল ব্যাপ্তিতে যে-চোখ আর ডানা মেলে ভাসতে পারে না। কোন স্বপ্নাভাসেও নয়। দুপুর থেকে বিকেলে উত্তীর্ণ সন্ধ্যার রঙবদল ওর দৃষ্টির আড়ালে ঘটে গেল! সারাদিনের কর্তব্যের পর অপরাহ্নের শূন্য একাকীত্ব ওকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করল। গোটা অঞ্চলের দুস্থ, পীড়িত, অসহায় মানুষগুলোর শোকতাপের দায় ক্লান্ত মহিষের মত নিজের ঘাড়ে তুলে নিল অনন্ত আর আসন্ন অন্ধকারে যেন পলির কোমলতায় সব জ্বালা জুড়োবার লোভে গোটা শরীরটা কাদায় ডুবিয়ে রাখার মত, অন্ধকারেই আশ্রয় নিল ও। যেখানে ওর সঙ্গী কেউ নেই। যেখানে মানুষের জটলা গাঢ় অন্ধকারের কীটের মত অবয়বহীন, পীড়াদায়ক। যেখানে আপন বিমূর্ত অন্তরঙ্গতায় ও মুগ্ধ হতে পারে। যে-অন্তরঙ্গতা ওকে পুনর্বার নিয়ে যাবে সেই বিষাদের ঘরে, যে-বিষাদের জন্ম কোন এক আশ্চর্য দুপুরে, আকাশে চিলের ডানা মেলার শান্তিতে। ওর এই রাত্রির অন্ধকার আর সেই অবারিত আলোর দুপুরের সুবর্ণরেখা যেন পরস্পরকে বলে, আমি প্রেম, তুমি দূর প্রীতি।

ওর রোগীদের একটা নূতন হিসেব রাখতে হ'ল, রাত আটটার পর ডাক্তারবাবুকে বিরক্ত করা চলবে না।

আজ এই ঘরে, এই নিরালম্ব অন্ধকারে, নিজের মুখোমুখি বসে বিমূঢ় অনন্ত ওর এতদিনের গড়ে-তোলা আপনাকে কোথাও লুকোতে পারছে না। ওর সামনে

লণ্ঠনের শিখা তেমনি কাঁপছে, টিনের ঢেউ-এ সমান্তরাল আলোছায়া, ঘরে প্রিয় আবছায়া অন্ধকার—মদভর্তি গ্লাসে এখনও চুমুক দিতে পারে নি। রঙিন বুদবুদগুলো মৃত। অথচ এক তীব্র অভাববোধে ওর মস্তিষ্কের ক্রিয়া শিথিল হয়ে পড়েছে। মাথায় এখনও তেমনি শিহরণ, কানের পাশে একটানা ঝিঁঝিঁর শব্দ। অনন্ত বুঝতে পারছে, যে অবলম্বনে ইতিপূর্বে সক্রিয় চিন্তাসূত্রের পরিবর্তে প্রিয় আচ্ছন্নতায় কোন দূর প্রীতির সুর ও শুনতে পেয়েছিল, এখন সেই অবলম্বনের অভাবে, অন্ধকার দর্পণে নিজের ভিন্ন প্রতিবিম্ব ওকে বিদ্রূপ করছে। সেই সুর ত আর কানে বাজে না। ভীত হ'ল অনন্ত, যেন একসময় সে তলিয়ে যাবে।

সমীর ওকে লিখেছে, ভাবতে পারি নি, তোমার কাছে এমন দীন মূর্তিতে কোনদিন আমাকে দাঁড়াতে হবে। আমার টেবিলে একটা চিরকুট চাপা দিলাম, তুমি আমার এই চিঠি যখন পাবে, তখন ওরা খুঁজে পা[ইবে] এই চিরকুট, যেখানে আমি প্রসন্ন কণ্ঠে উচ্চারণ করলা[ম] আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

সমীরের আত্মহত্যার কারণ অনন্ত জানে না। কি[ন্তু] এখন এই মুহূর্তে তার অনুভব ওর শিরায়। গভীর নিচে[র] থেকে বালি সরছে ক্রমশ, কোথায় পা রাখবে অনন্ত একটা তীব্র বিদ্রূপের যখন এই অন্ধকারকে বিশৃঙ্খল ক'[রে] দিতে চাইছে, তখন কোন এক উলঙ্গ বিষাদ যেন পা[য়ে] পায়ে এগিয়ে আসছে, ওর নক্তনীল আলোয় উদ্ভাসি[ত] শীতল পলির ঘরে। এক তীব্র আঘাতে যখন বদ্ধ অর্গল মু[ক্ত] হয়ে যাবে, তখন কোথায় নিজেকে আড়াল করবে ও!

বধ্যভূমির অশরীরী আত্মার মত এক উলঙ্গ হাসি অনন্তর শিরাগুলিকে শিথিল ক'রে দিতেই, কান্নার তীব্রতায় ও বিকৃতমুখ হয়ে গেল। অস্পষ্ট দর্পণে ওর প্রতিবিম্বর মত।

—•—

ইতিহাসে পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের প্রশ্ন

অধ্যাপক শঙ্কর দত্ত

ইতিহাসের গতি এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে পথ এবং মতের পার্থক্য আজ বহুল-প্রচারিত এবং সর্ব্বজনবিদিত। ইতিহাসের স্বরূপ সম্পর্কে গতানুগতিক তথ্য, অর্থাৎ, "ইতিহাস অতীতের ঘটনার অনুবৃত্তি মাত্র"—আজ একাধিক সঙ্গত কারণেই অযৌক্তিক ব'লে উপেক্ষিত। উপেক্ষিত এই সাধারণ তথ্যের সমাধির ওপর আদর্শবাদী, বস্তুবাদী, আদর্শ ও বস্তুর সমন্বয়বাদী বিভিন্ন ব্যাখ্যার বীক্ষণ আজ চিন্তাশীল মহলে সুপ্রচারিত এবং সুপরিচিত। ইতিহাসের গতি এবং প্রকৃতিসম্বন্ধে উপরোক্ত বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণ এবং সেই বিশ্লেষণ-জাত যুক্তি-বিতর্কের জটিলতার মধ্যে থেকে যে প্রশ্ন আজ ইতিহাসবিদ্ মহলে প্রধান হয়ে উঠেছে, তা হচ্ছে, ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন, ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণের প্রশ্ন। কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে ও কোন্ পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিহাস রচনা করা অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞানসম্মত, অথবা, বিজ্ঞান এবং যুক্তিসম্মত ইতিহাস রচনার জন্য ঐতিহাসিকের কোন্ দৃষ্টিকোণ এবং পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন—বিতর্কবাহুল্যের মধ্যে এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিভ্রান্ত। বহুবিতর্কিত এই প্রশ্নের সরল এবং সহজতর পথনির্দ্দেশের বিনীত প্রচেষ্টাই এ আলোচনার উপজীব্য।

ঐতিহাসিকের যথার্থ দৃষ্টিকোণ ব্যাখ্যায় পণ্ডিতমহল বহুমুখী মতামত প্রকাশ করেছেন। প্রথমতঃ, আদর্শবাদী চিন্তাশীলদের মতে ঐতিহাসিকের প্রকৃত দৃষ্টিকোণ মন অথবা চেতনা-প্রধান হওয়া উচিত। আদিমকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের ইতিহাসের বিবর্ত্তনে প্রধান এবং প্রাথমিক অবদান হচ্ছে মন এবং চেতনার, বস্তু এবং বাস্তব পরিস্থিতির অবদান অপেক্ষাকৃত গৌণ—আদর্শবাদীদের এই ত বিশ্বাস। দ্বিতীয়তঃ, বস্তুবাদী চিন্তাশীলদের মতে ইতিহাসের প্রকৃত দৃষ্টিকোণ এবং ঐতিহাসিকের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুপ্রধান হওয়া উচিত। মানব সভ্যতার বিবর্ত্তনে বস্তু এবং বাস্তব পরিস্থিতির পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের ঘাতসংঘাতই প্রধান কথা, মন অথবা চেতনা সেই বাস্তব পরিস্থিতির প্রতিফলন মাত্র—বস্তুবাদীদের এই

তথ্যে স্বীকৃতি। তৃতীয়তঃ, আদর্শ ও বস্তুর সমন্বয়বাদীদের মতে মানুষের ইতিহাসের বিবর্তনের পিছনে যদি পরস্পর-বিরোধী দুই বৈশিষ্ট্যের দ্বন্দ্ব থাকে তা হ'লে, সেই বৈশিষ্ট্য-দ্বয়ের প্রতিটিতেই মন এবং বস্তু পারস্পরিক নির্ভর-শীলতার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। বাস্তব পরিস্থিতি থেকেই জন্ম নেয় গতিশীল মনে এক চলমান আদর্শোজ্জ্বল ছবি, আবার গতিশীল মনের সেই আদর্শোজ্জ্বল ছবি থেকেই পরিবর্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হয় বাস্তব পরিস্থিতি। মন এবং বস্তুর পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যেই তাই চলমান জগৎ ও গতিশীল জীবনের উৎসমুখ—সমন্বয়বাদীদের এই ধারণায় অভ্রান্ত বিশ্বাস। অন্তর্নিহিত পার্থক্যও স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে একাধিক যুক্তিসত্ত্বেও উপরোক্ত ত্রিবিধ মতামতের মধ্যে একটি ঐক্যের সন্ধান সম্ভব। ইতিহাসের প্রকৃত দৃষ্টিকোণ অথবা ঐতিহাসিকের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে উপরোক্ত মতামতাশ্রিত ঐক্যের সেই সূত্রটি হচ্ছে ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কিত। দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য স্বচ্ছতা নিয়েই এ কথা বলা যায় যে, আদর্শবাদী, বস্তুবাদী এবং সমন্বয়বাদী—এঁরা প্রত্যেকেই ইতিহাস রচনার অবরোহ অথবা "ডিডাকটিভ" পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। কথাটি বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

যুক্তিবিজ্ঞানে অবরোহ বা "ডিডাকটিভ" পদ্ধতি বলতে আমরা সাধারণ সত্য থেকে একক সত্যে উপনীত হওয়ার কথাই বুঝি। এ ক্ষেত্রে যুক্তিবিজ্ঞানের সহজতম উদাহরণটি হচ্ছে: "সব মানুষ মরণশীল, রাম মানুষ, রামও মরণশীল"—অর্থাৎ, "সব মানুষ মরণশীল"—এই সাধারণ সত্য থেকে "রাম মরণশীল"—এই একক সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য আশ্রিত পদ্ধতিটি হচ্ছে অবরোহ পদ্ধতি বা "ডিডাকটিভ অ্যাপ্রোচ"। যুক্তি-বিজ্ঞানের এই প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে আদর্শবাদী, বস্তুবাদী এবং সমন্বয়বাদী—এই ত্রিবিধ তথ্যের শ্রুতিপাদ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিলে বিভিন্নমুখী এই সব তথ্যের অবরোহ পদ্ধতিতে ঐক্যবদ্ধ স্বীকৃতির কথাই স্বীকার করতে হয়। আদর্শবাদীদের মন এবং চেতনা-প্রধান পৃথিবীর তথ্য প্রকারান্তরে এক সাধারণ সত্যের স্বীকৃতি। বস্তুবাদীদের বস্তুপ্রধান এবং সমন্বয়বাদীদের সমন্বয়প্রধান পৃথিবীর তথ্য অনুরূপভাবেই এক একটি সাধারণ সত্যের স্বীকৃতি। আদর্শবাদী, বস্তুবাদী অথবা সমন্বয়বাদী দৃষ্টিকোণে বিশ্বাস নিয়ে যিনি ইতিহাস রচনা করবেন, স্বভাবতঃই, তিনি প্রতিটি মতের বিশেষ বিশেষ সাধারণ সত্যে স্বীকৃতি জানিয়েই ইতিহাস রচনার কাজ সুরু করবেন। দুঃখের কথা, সাধারণ সত্যে স্বীকৃতি জানিয়ে ইতিহাস রচনার এই অবরোহ পদ্ধতিটিকে ত্রুটিবিহীন বলা যায় না। ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও ঐতিহাসিকের প্রকৃত দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সুসঙ্গত সিদ্ধান্তে আসার জন্যে অবরোহ পদ্ধতির ত্রুটিগুলির বিশদ্ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস রচনা করতে বসলে অথবা সাধারণ কোন সত্যের ভিত্তিতে ঐতি-হাসিকের অনুসন্ধানপর্ব্ব সুরু হলে, ইতিহাস সেই বিশেষ দৃষ্টিকোণ-জাত এবং ঐতিহাসিক সেই সাধারণ সত্য-অন্তর্গত পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, অবরোহ পদ্ধতিতে ইতিহাস রচনায় ঐতি-হাসিকের ব্যক্তিত্ব, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাঁর সাধারণ সত্যে বিশ্বাসের গভীরতা ইতিহাসের যথার্থ ঘটনাবলীকে বহু ক্ষেত্রেই প্রভাবিত করতে পারে এবং এই ব্যক্তি-প্রভাবিত ইতিহাসে সত্যের অপলাপের সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। তৃতীয়তঃ, কোন বিশেষ সাধারণ সত্যে অখণ্ড বিশ্বাস থাকার ফলে ইতিহাসের বাস্তব ঘটনার যথাযথ মূল্যায়ন প্রতি পদেই বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অ-বিজ্ঞানসম্মত এই মূল্যায়ন ইতিহাসের যথার্থ গতি এবং প্রকৃতি নির্দ্দেশে বিশেষ সহযোগী হয় না। চতুর্থতঃ, এই অবরোহ পদ্ধতি এবং বিশেষ বিশেষ সাধারণ সত্যে স্বীকৃতি ইতিহাসের কঠোর সত্যের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির এক অন্তর্দ্দলীয় সংঘাতের সূচনা করে এবং সেই সংঘাত ইতিহাসকে প্রকৃত সংগঠনের বেষ্টনী থেকে বিভাজনের দিকে, সংহতি ও ঐক্যের পথ থেকে বিভেদ এবং অনৈক্যের পথে আনীত করে। উল্লিখিত একাধিক কারণে ইতিহাস রচনায় অবরোহ পদ্ধতিকে যুক্তি এবং বিজ্ঞানের দিক্ থেকে তাই, আজ সমর্থন করা যায় না। ইতিহাস রচনার প্রকৃত পদ্ধতি প্রসঙ্গে, ইতিহাসের ঘটনাবলীর যথাযথ মূল্যায়নের জন্যে আজ নতুন পথানু-সন্ধানের প্রয়োজন।

এই "নতুন পথ" কি হতে পারে? এ প্রশ্নও আজ চিন্তাশীল মহলে আলোচিত হচ্ছে এবং বিশিষ্ট চিন্তাশীলেরা অবরোহ পদ্ধতির পরিবর্ত্তে আরোহ বা "ইন্‌ডাকটিভ" পদ্ধতির নির্দ্দেশ দিয়েছেন। "ডিডাকটিভ" অথবা অবরোহ পদ্ধতির মূল কথা যেমন সাধারণ সত্য থেকে একক সত্যে উপনীত হওয়া, আরোহ অথবা "ইনডাকটিভ" পদ্ধতির মূল বক্তব্য হচ্ছে একক সত্য থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া। "ইনডাকটিভ" পদ্ধতির সমর্থকেরা "ডিডাকটিভ" অথবা অবরোহ পদ্ধতির বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন, তা হচ্ছে, অবরোহ

পদ্ধতির সর্ব্বস্বীকৃত এবং অবিসংবাদিত সাধারণ সত্যের অভ্রান্ততা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা। এঁরা তাই বলেন যে, অবরোহ পদ্ধতিতে সত্যানুসন্ধানের পূর্ব্বে অবরোহ পদ্ধতিতে সমর্থিত সাধারণ সত্যের যৌক্তিক প্রমাণের প্রয়োজন আছে এবং সেই যৌক্তিক প্রমাণ আরোহ অথবা "ইনডাকটিভ" পদ্ধতির মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ, অবরোহ পদ্ধতিতে সমর্থিত "সব মানুষ মরণশীল"—এই সত্যের যৌক্তিক প্রমাণের জন্যে আরোহ পদ্ধতির প্রয়োজন। আরোহ অথবা "ইনডাকটিভ" পদ্ধতির প্রধান ভিত্তি হচ্ছে বাস্তব জগতে প্রতিটি ঘটনার কার্য্য-কারণ সম্পর্ক (Causality) এবং সমপরিবেশে বস্তু-জগতের ঘটনাবলীর সমধর্ম্মিতা (Uniformity of Nature)। বাস্তবজগতের ঘটনাবলীর এই কার্য্যকারণ সম্পর্ক এবং সমধর্ম্মিতা নির্দ্ধারণের নিশ্চিত পথ হিসাবে আরোহ পদ্ধতিকে নিরীক্ষণ (Observation), বীক্ষণ (Experiment), অনুমান (Hypotheses) ইত্যাদি বিভিন্ন আনুসঙ্গিকের আশ্রয় নিতে হয়। অর্থাৎ, আরোহ পদ্ধতিতে "সব মানুষ মরণশীল"—এ তথ্য প্রমাণের জন্য প্রথম একাধিক মানুষের জন্ম-মৃত্যুর দিকে লক্ষ্য রেখে, সেই জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে কার্য্যকারণ সম্পর্কে নির্দ্ধারণ করে, সেই কার্য্যকারণ সম্পর্কের সমধর্ম্মিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে এবং এই নিশ্চয়তা সাপেক্ষেই "সব মানুষ মরণশীল" —এই সিদ্ধান্তকে "সত্য" হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আরোহ যুক্তিবিজ্ঞানের এই প্রাথমিক পরিচিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস রচনায় এই আরোহ অথবা "ইনডাকটিভ" যুক্তিবিজ্ঞানের প্রয়োগের বিভিন্ন দিক্ আলোচনা করা যেতে পারে।

আরোহ যুক্তিবিজ্ঞানাশ্রিত ইতিহাস রচনার প্রথম কথা হচ্ছে ত্রুটিবিহীন তথ্যানুসন্ধান। প্রস্তাবিত বিষয়ের ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিককে প্রথম দৃষ্টি দিতে হবে প্রস্তাবিত বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্নমুখী ঘটনার অনুসন্ধানে। দ্বিতীয়তঃ, সংগৃহীত ঘটনাবলীর ভিত্তিতে বিশ্লেষণের বিভিন্ন দিক নির্দ্ধারণ করতে হবে ঐতিহাসিককে। তৃতীয়তঃ, বিশ্লেষিত ঘটনার সুসংগত পরিবেশনের দায়িত্ব নিতে হবে ঐতিহাসিককে। সঞ্চয়ন ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আহরিত এবং রূপায়নের ভিত্তিতে প্রতিফলিত তথ্যকে আশ্রয় করে ঐতিহাসিককে দৃষ্টিকোণ স্থির করতে হবে। আরোহ যুক্তিবিজ্ঞানের দিক থেকে সেই দৃষ্টি-কোণই একমাত্র যুক্তি এবং বিজ্ঞানের সম্মতি দাবি করতে পারে। চতুর্থতঃ, এই দৃষ্টিকোণ নির্দ্ধারণকে ঐতিহাসিকের ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উর্দ্ধে রাখতে হবে। অর্থাৎ ঘটনার নিরপেক্ষ অনুধাবন থেকে অবিসংবাদিত সত্যে উপনীত হওয়ার মধ্যে কোন তৃতীয় প্রভাবের উপস্থিতি থাকবে না। ইতিহাসের বাস্তব ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণবিহীন ক্ষমতা দিতে হবে সত্যসন্ধানের এবং সত্য নির্দ্ধারণের।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ইতিহাস রচনায় অবরোহ অথবা আরোহ—"ডিডাকটিভ" অথবা "ইনডাকটিভ"—কোন পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত বেশী স্বীকৃতির দাবি করতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরে আজ চিন্তাশীল মহল দ্বিধাবিভক্ত। অবরোহ পদ্ধতির সমর্থকেরা আরোহ পদ্ধতিকে "জটিল", "যান্ত্রিক" ও "উদ্দেশ্যবিহীন সত্যানু-সন্ধানের পন্থা" বলে এক দিকে উপেক্ষা করেন, অপর দিকে আরোহ পদ্ধতির কর্ণধারেরা অবরোহ পদ্ধতিকে "মধ্যযুগীয়", "অযৌক্তিক" এবং "অ-বিজ্ঞানসম্মত" বলে অবহেলা করেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্থির ভাবে চিন্তা করলে ইতিহাস রচনায় এই উভয়বিধ পদ্ধতির প্রয়োজনকে স্বীকার করতে হয়। শ্রেষ্ঠ যুক্তিবিজ্ঞানীদের মতে :

"The difference between Deduction and Induction is not one of principle, but one of starting point"—

—অবরোহ এবং আরোহ যুক্তিবিজ্ঞানের মধ্যে নীতিগত কোন পার্থক্য নেই, পার্থক্য শুধু পথের। অর্থাৎ, অবরোহ যুক্তিবিজ্ঞানের মত আরোহ যুক্তিবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে সত্যানুসন্ধান, এই সত্যানুসন্ধানে উক্ত দুটি যুক্তিবিজ্ঞানের মধ্যে যদি কোন পার্থক্য থাকে তা হচ্ছে পথ নির্দ্দেশের পার্থক্য। একটির স্বীকৃতি সাধারণ সত্য থেকে একক সত্যে আসার, অপরটির বিপরীত অর্থাৎ একাধিক একক সত্য থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়ার। ইতিহাসের প্রধান কথা যদি সত্যানুসন্ধান এবং সত্যপ্রতিষ্ঠা হয়, সংস্কার এবং পক্ষপাতহীন সত্যে অকুণ্ঠ স্বীকৃতিই যদি ঐতিহাসিকের প্রকৃত কাম্য হয়, তা হলে, সেই ঐতিহাসিককে ক্ষেত্র-বিশেষে অবরোহ এবং আরোহ উভয়বিধ পদ্ধতিকেই গ্রহণ করতে হবে। দৃষ্টিকোণ স্থির করে সত্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা অথবা ত্রুটিবিহীন তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে দৃষ্টি-কোণ স্থির করা—এই দ্বিবিধ পন্থাই ইতিহাসের উপাদান আহরণ ও প্রতিফলনে বিশেষ সহায়ক। কোন্ পদ্ধতি কোন্ ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হতে পারে—এ স্থিরীকরণের গুরুদায়িত্ব নিতে হবে ঐতিহাসিককে। সুপ্রাচীনকালের ইতিহাস রচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবরোহ অথবা

"ডিডাকটিভ" পদ্ধতি বিশেষ সহায়ক হয়। ইতিহাসের ঘটনা যেখানে অস্পষ্ট, ক্রটিবিহীন তথ্যানুসন্ধানের অবকাশ যেখানে অল্প, বিশ্লেষণের সিংহদ্বার যেখানে অস্পষ্ট আলোকপ্রাপ্ত—সেই প্রাচীনকালের উন্নত ইতিহাসবোধ-বিহীন মানুষের ইতিহাস রচনায় অবরোহ পদ্ধতি বিশেষ সুফলপ্রসূ হতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণ স্থির থাকলে ঘটনা অনুসন্ধান সুসংগঠিত হতে পারে এবং ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত ঘটনার জালে ঐতিহাসিককে বিভ্রান্ত হতে হয় না।

সুপ্রাচীনকালের ইতিহাস রচনায় অবরোহ পদ্ধতি যেমন বিশেষ ফলপ্রদ, অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের ইতিহাস রচনায় আরোহ পদ্ধতির প্রয়োগ অনুরূপ ভাবে ফলপ্রদ এবং সার্থক হতে পারে। ইতিহাসের উপাদান এবং উপকরণ যেখানে প্রচুর, উন্নত ইতিহাসবোধ যেখানে প্রতি পদক্ষেপে ইতিহাসের ঘটনাকে সুস্পষ্ট আঙ্গিক এবং পরিচিতি দিয়েছে, সেখানে নিরীক্ষণ, বীক্ষণ, কার্য্যকারণ সম্পর্ক নির্দ্ধারণ এবং সমধর্ম্মিতা—অর্থাৎ, আরোহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন পথ সন্দেহাতীত ভাবেই সুপ্রশস্ত। সংক্ষেপে তাই এ কথা বলা যায় যে ইতিহাস রচনাকে বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গি অথবা দৃষ্টিকোণ, পথ অথবা পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা চলে না। ইতিহাসের বিষয়বস্তু অনুযায়ী ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণ নির্দ্ধারণ করতে হবে ঐতিহাসিককে এবং সেই নির্দ্ধারিত পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী প্রতিফলিত করতে হবে ইতিহাসের স্বরূপকে। সত্যানুসন্ধানের প্রথম কথাই দৃষ্টির ব্যাপকতা। বিস্তীর্ণ, ব্যাপক, উদার এবং সর্ব্বাশ্রয়ী দৃষ্টির ছত্রতলে জ্ঞান আহরণের বিভিন্ন পথ। জ্ঞান আহরণের এবং সত্য-সন্ধানের পথিককে কোন বিশেষ মত, পথ, পদ্ধতি অথবা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সীমিত করা ঔচিত্যবোধের পরিচয় নয়। সত্যানুসন্ধানের আলোকোজ্জ্বল পথে "রেজিমেন্টেশনের" কোন স্থান থাকতে পারে না।

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকের কি তা হলে নিয়ন্ত্রণবিহীন অধিকার আছে? নির্দ্দেশের উর্দ্ধে নিয়ন্ত্রণবিহীন এই স্বাধীনতা কি ইতিহাস রচনায় অরাজকতা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অনুগামী নয়? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে এ প্রবন্ধের শেষ করা যেতে পারে। জ্ঞান আহরণের পথিককে বিশেষ মত, পথ, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির উর্দ্ধে রাখার কথা সমর্থন করা প্রসঙ্গে আমরা এ কথা স্বীকার করি না যে, ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিক সব কিছু দায়িত্বের উর্দ্ধে। ঐতিহাসিকের মূলগত কয়েকটি দায়িত্ব আছে, তবে সেই দায়িত্ব কোন বিশেষ মত, পথ, পদ্ধতি অথবা দৃষ্টিকোণের প্রতি অন্ধ আনুগত্য নয়—সে দায়িত্ব চিন্তাজগতের মূলগত কয়েকটি সত্য স্বীকারের। প্রথমতঃ, প্রকৃত ঐতিহাসিককে বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণায় নামতে হবে। ইতিহাসের খণ্ডাংশকেও বিশ্ব-ইতিহাস এবং মানব-সমাজের বিবর্ত্তনের বিস্তৃত পটভূমিকায় উপস্থাপিত করার মত দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা রাখতে হবে। ইতিহাস বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ঘটনার সমাবেশ-বিশেষ নয়, ঘটনার অন্তরালে ইতিহাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ঘাত-সংঘাত; সেই ঘাত-সংঘাতের স্বরূপকে উপলব্ধি করার মত দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা রাখতে হবে। অধ্যাপক বিউরির মন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

"I cannot imagine the slightest theoretical importance in a Collection of facts or sequences of facts, unless we can hope to determine the vital connection with the whole system of reality."(১)। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃত ঐতিহাসিককে ক্রটিবিহীন তথ্যানুসন্ধানে নামতে হবে অকৃপণ ভাবে। পরিশ্রম ও আয়াসসাধ্য হলেও প্রকৃত ঐতিহাসিক এ দায়িত্ব উপেক্ষা করতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, যথার্থ ঐতিহাসিককে সংগৃহীত তথ্যাদি বিশ্লেষণে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এবং বর্ণনায় মার্জ্জিত পরিবেশনের দায়িত্ব নিতে হবে। Philip Bagby-র ভাষায় : "For most historians, the presentation of facts in an easily digestible literary form is an essential aspect of their understanding·········The patient and humble labours of those who merely grub in archives are rarely dignified with the name historiography they are historical researchers, not historians, and the results of their efforts lie buried in a thousand learned journals until they are unearthed and vivified by the skilful pen of the true, the artist-historian."(২)। সর্ব্বোপরি প্রকৃত ঐতিহাসিকের হাতে যুক্তির স্থান হবে সব কিছু, বিশেষ করে অন্ধ বিশ্বাসের উর্দ্ধে এবং চিন্তায় যথার্থ ঐতিহাসিককে

(১) J. B. Bury : Selected Essays (1930).
(২) Philip Bagby : Culture and History, (p. 43-44).

হতে হবে সহনশীল। অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের সাম্প্রতিককালের লেখা একটি প্রবন্ধাংশ এখানে প্রণিধানযোগ্য। "ব্যক্তিকে স্বাধীন করার জন্য উদারতন্ত্রের প্রধান নির্ভর ছিল মানুষের সংজ্ঞাত যুক্তিশীলতা। মধ্যযুগীয় শাস্ত্রকারদের মতে 'অথরিটিকে' বরবাদ করলে মানুষের চিন্তায়, নীতিবোধে এবং জীবনযাত্রায় ঘোর বিশৃঙ্খলা ঘটা অবশ্যম্ভাবী। ধর্মশাস্ত্র এবং রাজশক্তির নির্দেশ যদি অনির্ভরযোগ্য প্রতিপন্ন হয়, তবে সাধারণ মানুষ কি ভাবে সত্য-মিথ্যা, উচিত-অনুচিত নির্ণয় করবে? এই প্রশ্নের উত্তরে উদারতন্ত্রী মনীষীরা দেখালেন যে, বিচিত্র, বহুবাচনিক এবং নিয়ম-পরিবর্ত্তনশীল অভিজ্ঞতার জগতে যুক্তিই নির্ভরযোগ্য ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করে এবং এই ঐক্যের ওপর ভিত্তি করে জ্ঞান, নীতিবোধ, আইনকানুন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান ইত্যাদি গড়ে তোলা সম্ভবপর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুক্তির প্রয়োগের ফলে এটাও স্পষ্ট যে, সংসারে কোন সিদ্ধান্তই চরম সত্য নয়, প্রতিটি ধারণা, ব্যবস্থা, রাজনীতি পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ। ফলে উদারতন্ত্রী ব্যবস্থায় কোন একটি মতবাদ বা বিধানকে জবরদস্তি করে সকলের ঘাড়ে চাপানো হয় না; বিভিন্ন বিকল্প চিন্তাধারাকে সহ্য করা হয়, প্রশ্রয় দেওয়া হয়—যাতে নানা ধারণার ঘাত-প্রতিঘাত এবং বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে প্রকৃষ্টতর ধারণা এবং ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে"(৩)। আলোচিত এই একাধিক মূলগত দায়িত্ব সম্পর্কে ঐতিহাসিকের সংশয়বিহীন স্বীকৃতির মধ্যেই প্রকৃত ইতিহাস রচনার সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি এবং আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। মত ও পথ, পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের বেষ্টনীতে ইতিহাস ও ঐতিহাসিককে সীমিত করার অর্থ সেই সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতির অপকর্ষ, সেই আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের অপমৃত্যু। প্রকৃত চিন্তাশীলেরা তাই ইতিহাসকে বিশেষ মত ও পথ, বিশিষ্ট পদ্ধতি ও দৃষ্টিকোণের মধ্যে সীমিত করার তথ্যে স্বীকৃতি জানাতে পারেন না। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক-সমালোচক Fritz Stern যথার্থই বলেছেন: "There are abundant signs at the end of the post-war decade that we are on the threshold of another period of reconsidering the purposes and methods of history." (৪)।

(৩) শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন, ১৩৬৬, "উদারতন্ত্রের অবক্ষয়"।

(৪) Fritz Stern : Varieties of History, Introduction.

ময়না
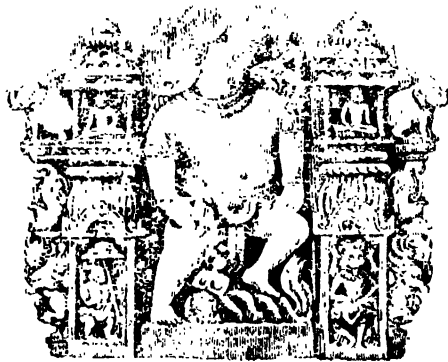
(ত্রিঅঙ্ক নাটক)

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(১৮ই আগস্ট, সন্ধ্যা ছ'টা। অন্নপূর্ণা গার্লস্ স্কুলের ক্লাসঘর। ব্ল্যাকবোর্ডে পুরনো ভগ্নাংশটাই কষা রয়েছে, কেবল তার নীচে চক্ দিয়ে কাঁচা হাতে কেউ লিখে দিয়েছে: খড়কে ভেঙে পাকিস্তান, ফাঁকিস্তান নিন্দাবাদ। টেবিলটার এক কোণে এক পা মাটিতে রেখে আর একটা পা ঝুলিয়ে ব'সে নির্ম্মল পেন্সিল কাটছে, তার পাশে মাটির ভাঁড়ে চা। জোড়া বেঞ্চির একটাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ভূপেন। তার হাতে মাটির ভাঁড়ে চা। বাঁদিক্ থেকে কাৎলি হাতে ঠাকুরের প্রবেশ।)

ঠাকুর। আর চা চাই বাবু?

ভূপেন। দাও আর একটু একটু।

(ভাঁড়দুটো চা দিয়ে ভ'রে দিয়ে ঠাকুরের প্রস্থান।)

আর একটা দিন আগে যদি এঁকে টেলিফোনে পেতাম!

নির্ম্মল। কার কথা বলছ? কাকে পেয়েছ টেলিফোনে?

ভূপেন। টালিগঞ্জ থানার ও-সিকে।

নির্ম্মল। ভগবানের রসিকতা! কি বললেন ও-সি?

ভূপেন। বললেন ত আজ রাত্রে একটা লরী আর বন্দুকধারী পুলিস দু'জন আমাদের পাঠিয়ে দেবেন।

নির্ম্মল। মুসলিম রেফুজিদের উদ্ধার করা হচ্ছে ত? লালবাজারে কদর বাড়বে।

ভূপেন। সে যাই হোক, আমি এখন এদের বিদায় করতে পারলে বাঁচি। আবার কখন কি হয়। এমন একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘ'টে গেল!

নির্ম্মল। আচ্ছা পেন্সিল রে বাবা! যত কাটছি, শিস ভেঙে ভেঙে প'ড়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আধখানা হয়ে গেছে, এই দেখ!

ভূপেন। মেয়েটার কি হ'ল কিছু বুঝতে পারছ?

নির্ম্মল। (ছুরী পেন্সিল পকেটে রেখে) না, তবে এইটে বুঝতে পারছি, বেশ ভালরকম তৈরি হয়েই ওরা এসেছিল। (চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে) দেখলে না, গাড়ীটা আগে থেকেই স্টার্ট্ দিয়ে দরজা খুলে অপেক্ষা করছিল? রোশনকে নিয়ে একজন ঢুকে গেল গাড়ীতে, অন্য তিন জন আমাদের সঙ্গে আরও খানিক ঘুঁষোঘুঁষি ক'রে যেই লাফিয়ে উঠে পড়ল, অমনি প্রচণ্ড স্পীড দিয়ে বেরিয়ে গেল গাড়ী।

ভূপেন। সব ব্যাপারটা কেমন যেন চক্ষের নিমেষে ঘ'টে গেল।

নির্ম্মল। তার মানে খুব ভালরকম তোড়জোড় ক'রেই ওরা এসেছিল। এখন ত বুঝতে পারছ, ঐ আগুন-ফাগুন কিছু না? ও রকম ক'রে ভয় না পাওয়ালে রোশনের মা-দিদিমা দরজা খুলবে না এটা জানত, তাই পিচ্ জেলে ধোঁওয়া ক'রে আগুন আগুন ব'লে চেঁচিয়েছিল।

ভূপেন। বলাই হতভাগাটাকে ধরা দরকার। ওর বাড়ীতে কয়েকবারই খোঁজ করেছি, নাইতে খেতেও যায়নি আজ। আরও যেখানে যেখানে তার থাকবার কথা সব জায়গায় খবর নেওয়া হয়েছে—সকালের ঐ ব্যাপারের পর থেকে কেউ তাকে দেখেনি।

নির্ম্মল। (চায়ের খালি ভাঁড়দুটোকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসে) ওকে ধরতে পেলে ব্যাপারটার একটা হদিশ মিলবে ভাবছ?

ভূপেন। তাই ত ভাবছি।

নির্ম্মল। নাও মিলতে পারে। ও যদি বলে, মেয়েটাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া অবধি জানে, তার পরের কথা তার জানা নেই?

(বাঁদিক্ থেকে খাতা হাতে অনিমেষের প্রবেশ।)

অনিমেষ। ভাই ভূপেন! ওরা ত যাবে না বলছে।

ভূপেন। যাবে না বলছে? তার মানে?

অনিমেষ। বলছে, আমাদের রোশনের যে গতি হয়েছে, আমাদেরও তাই হোক, ওকে না নিয়ে আমরা এই ক্যাম্প ছেড়ে যাব না।

ভূপেন। এই রে, এই আর এক ফ্যাসাদ বাধল দেখছি। পুলিশের লরী এলে তাদের বলব কি আমরা?

নির্ম্মল। লরী না হয় ফিরে যাবে, সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু ফিরে গিয়ে ওরা বলবে ত সব? তোমাদের নিয়ে তখন না টানা-হেঁচড়া হয়।

ভূপেন। কি মুশ্‌কিল!

নির্ম্মল। কি করছে ওরা, অনিমেষ?

অনিমেষ। কি আর করবে, বুকফাটা কান্না কাঁদছে সারাক্ষণ। তা দিনরাত ওরকম কান্না আরও অনেকেই ত কাঁদছে ক্যাম্পে?

নির্ম্মল। ক্যাম্পের বাইরেও অনেকে কাঁদছে।

অনিমেষ। অনেক জায়গায় এমনও হয়েছে শুনছি, কাঁদবার জন্যে কেউ বাকি নেই।

নির্ম্মল। কান্নাটার হিসেব ঠিকই থাকবে, কারণ সেটা আসছে এর পরে, পাইকারি হিসেবে।

(এই সময় হঠাৎ বাইরে ডানদিক্‌ থেকে পীযূষের গলায়,—'নির্ম্মল, অনিমেষ, কে আছ ওখানে? শীগ্‌গির এস, শীগ্‌গির!' নির্ম্মল ও অনিমেষ ছুটে বেরিয়ে গেল ডানদিক্‌ দিয়ে। ভূপেন এগিয়ে গিয়ে দেখছে। একটু পরেই বলাইকে টানতে টানতে পীযূষ, ও তাকে পেছন থেকে ঠেলতে ঠেলতে নির্ম্মল ও অনিমেষ এসে ঢুকল। বলাইয়ের গালে প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে দিল পীযূষ।)

বলাই। (গালে হাত বুলোতে বুলোতে) এই, এই —মারছিস্‌ কেন?

পীযূষ। না, মারবে না, গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করবে! শালা! বল্‌, কোথায় নিয়ে রেখেছিস্‌ মেয়েটাকে। (আবার মারল।)

অনিমেষ। (বলাইয়ের পিঠে একটা কীল মেরে) বল্‌ শীগ্‌গির।

বলাই। আরে, আরে, একটা লোককে দু'জনে মিলে মারছিস্‌ কেন?

অনিমেষ। তোরা মারিস্‌ নি তখন তিনজনে মিলে আমাকে, শালা? কথা বলছে, যেন ধর্ম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির। আর আস্পর্দ্ধা দেখ। সকালে এই কাণ্ড ক'রে গিয়ে এরই মধ্যে ফিরে এসেছে তামাসা দেখতে, আমরা কি করছি। দেখাচ্ছি তামাসা। (কানের কাছে একটা ঘুঁষি মারল।)

বলাই। (কানের কাছটায় হাত বুলিয়ে) ভূপেনদা, এরা আমাকে মারছে!

ভূপেন। নির্ম্মল, ও আমার মাসতুত ভাই হয়। তা হোক, আমি বলি কি, এমন একটা মওকা মিলেছে, তুমিই বা বাদ যাবে কেন? হাতের সুখ একটু ক'রে নাও!

বলাই। ভূপেনদা, তুমিও শেষে—

পীযূষ। শেষ কি রে শালা? এই ত কলির সন্ধ্যে। (মারছে।)

ভূপেন। পীযূষ, ওকে প্রাণে মেরো না, কারণ তা হলে যা ওর কাছে তোমরা জানতে চাইছ, তা আর জানা হবে না।

পীযূষ। প্রাণ একটু রেখে দেব, যাতে জবান না বন্ধ হয়ে যায়। বল্‌ শালা, কি করেছিস্‌ মেয়েটাকে নিয়ে? (মারছে।)

(এবারে পীযূষ যত ওকে মারছে ততই বলাই হাসছে।) শালার সব বদ্‌মাইসি। নয়ত মার খেয়ে কেউ হাসে?

(বলাই হাসছে।)

ভূপেন। পীযূষ, অনিমেষ, তোমাদের হাতের সুখ যদি হয়ে গিয়ে থাকে ত এবারে ছেড়ে দাও ওকে। ছেড়ে দাও মানে, ধ'রে থাকো, মেরো না। এত মার খেয়েও যখন হাসছে, তখন কিছু একটা আছেই এর ভিতরে। সেটা বদ্‌মাইসি, না আর কিছু, তা বুঝবার চেষ্টা করা যাক।

পীযূষ। এই শালা বদ্‌মাস, বল্‌, কোথায় নিয়ে গিয়েছিস্‌ মেয়েটাকে, কেন নিয়ে গিয়েছিস্‌, কি করেছিস্‌।

(অনিমেষ আর পীযূষ বলাইয়ের দুপাশে দাঁড়িয়ে তার দুটো হাত শক্ত ক'রে ধ'রে আছে। তাদের ভাবে মনে হচ্ছে, হাতের সুখ তাদের পুরোপুরি হয় নি। নির্ম্মল এরই মধ্যে এক সময় ভূপেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলাই যেখানে যেখানে কীল, চড়, ঘুঁষি পড়েছিল সে জায়গা-গুলোতে হাত বুলোচ্ছে আর মধ্যে মধ্যে হাসছে।)

ভূপেন। বলাই, ভাঁড়ামি রেখে তোমাকে যা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তার জবাব দাও।

বলাই। (হাসতে হাসতে) জবাবটা আমার চেয়ে ঢের বেশী ভাল ক'রে যে দিতে পারবে, ঐ যে সে আসছে।

(ডানদিক্‌ থেকে আশুর প্রবেশ।)

নির্ম্মল। আরে, আশু!

ভূপেন। আশু, তুমি এই ব্যাপারে…

আশু। কি করব ভাই, kidnap না করলে ঐ ফুলের মত মেয়েটাকে বাঁচাতে পারতাম না।

(অনিমেষ ও পীযূষ বলাইয়ের হাত ছেড়ে দিলে সকলে অর্দ্ধ গোলাকার হয়ে ঘিরে দাঁড়াল আশুকে।)

সোজাসুজি জোরজুলুম করলে উল্টো উৎপত্তি হতে পারে, তুমি বলেছিলে, তাই বাঁকা পথ ধরতে হ'ল।

নির্মল। সাবাস্! ডিফেন্স পার্টির ছেলেগুলোও বোধ হয় জানত সব, তাই এত ক'রে বলা সত্ত্বেও কেউ আসতে রাজী হ'ল না, না?

আশু। (হেসে) রাজী হল না মানে? যারা এসেছিল তারা সব ডিফেন্স পার্টিরই ত লোক।

ভূপেন। আসল কথাটাই শোনা হল না। রোশন কোথায় আছে, কেমন আছে?

আশু। ভাল আছে, আর আছে অবন ডাক্তারের বাড়ী, এই পাশের গলিতে। সমস্ত ভবানীপুর আর বালিগঞ্জ ঘুরিয়ে নিয়ে এসে ওকে এখানে নামানো হ'ল।

নির্মল। খেয়েছে?

আশু। দুবার। মহা তোযাজে। ওষুধের আর দরকার হয় নি।

ভূপেন। খুশী?

আশু। খুব। বুঝে নিয়েছে ত ব্যাপারটা? মা-দিদিমাকে এমন চমৎকার গল্পটা কতক্ষণে এসে বলবে, তাই কেবল ভাবছে এখন।

বলাই। কিন্তু আশুদা, এরা আমাকে বড্ড বেশী মেরেছে। যখন হাসছিলাম, তখনও মেরেছে।

পীযূষ। ভাই, তোরাও আমাদের কিছু কম মারিস নি। যদি মনে করিস আমাদের ভাগে কম পড়েছে, ত নে, মার্। হিসেবটা বরাবর বরাবর ক'রে নে। (গালটা বাড়িয়ে দিল। বলাই হেসে তার হাতটা ধ'রে ঝাঁকাচ্ছে, পীযূষও হাসছে। অন্যেরাও যোগ দিল সে হাসিতে।)

ভূপেন। (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) রোশনের দিদিমা আসছেন, হাসিটা থামাও।

(বাঁদিক্ থেকে সাঈদার প্রবেশ। তাঁর বজ্র-কঠিন মুখ, কাঁচাপাকা একগোছা চুল অসতর্কে বেরিয়ে পড়েছে বোরখার ফাঁকে, চোখের দৃষ্টি লক্ষ্যহীন, কিন্তু স্থির। সকলে সসম্ভ্রমে তাঁকে নমস্কার করল।)

সাঈদা। বাবা, তোমরা আমার নাতিনটির একটু খোঁজও কেউ করলে না? দুষমণরা ঐ কচি বাচ্চাটাকে কোথায় নিয়ে গেল, কেন নিয়ে গেল—

নির্মল। মা, আপনার নাতনীকে দুষমণরা নিয়ে যায় নি।

সাঈদা। নিয়ে যায় নি? নিয়ে যেতে পারে নি বুঝি বাবা? তোমরা রুখেছ? কোথায় সে? রোশন কোথায়, আমাদের রোশন?

নির্মল। মা, আপনি জানেন, মেয়েটা দুদিন না খেয়ে ছিল, আপনাদের কাছে রেখে তাকে খাওয়ানো যাচ্ছিল না। আমাদের ক্যাম্পের ম্যানেজার এই আশুবাবু, তার ক্ষিদের ছট্‌ফটানি আর দেখতে না পেরে ক্যাম্পের কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে যান, পরে তিনিই আবার দলবল জুটিয়ে এসে ওকে নিয়ে গিয়ে পাশের গলিতে আমাদের খুব চেনা এক ডাক্তারের বাড়ীতে রেখেছেন। রোশন সেখানে গিয়ে এরই মধ্যে দুবার খেয়েছে, ভাল আছে।

সাঈদা। বল কি বাবা? এ কি সত্যি? এ যে কিস্‌সার মত শোনাচ্ছে বাবা।

আশু। কিস্‌সা নয় মা, সত্যি। রোশন আসছে একটু পরেই।

সাঈদা। (দুটি হাতকে জোড় ক'রে বুকের কাছে অঞ্জলির মত ক'রে ধ'রে) খোদা মেহেরবান, খোদা মেহেরবান! আমি যাই, দৌলৎকে বলি গে বাবা।

(দ্রুত প্রস্থান।)

নির্মল। রোশনকে নিয়ে আবার এদের পাগলামি সুরু হবে না ত?

আশু। রোশন খেয়েদেয়ে ভাল আছে সেটা চোখে দেখেও পাগলামি করবে?

নির্মল। করতে পারে। চারদিকে যা কিছু হচ্ছে তার সবই ত পাগলামি। চোখে দেখে কেউ কি কিছু শিখছে?

(বাঁদিক্ থেকে সেই রুক্ষভাষিণী মেয়েটির প্রবেশ।)

তরুণী। আইচ্ছা, কন্ দেখি, আপনেরা কোন্ জাইতের মানুষ? এই যে মাইয়াডারে ধইরা লইয়া গেল — কে লইয়া গেল, কই লইয়া গেল, একটু দেখন লাগে না? বইসা বইসা গপ্পাইতে আছেন, আপনাগো লাজ নাই?

ভূপেন। আমাদের দলের লোকদের খেয়াল আছে এ সমস্ত বিষয়েই, আপনি ভাববেন না।

তরুণী। হ, দলের লোকগো খেয়াল আছে। তাগো কথা আর কন্ ক্যান্? নির্বাইংশারা মাইয়াডারে যখন ধইরা লইয়া গেল, দলের লোকগো খেয়াল আছিল না? চোখ আছিল না তাগো? চোখ বাড়ীত্ থুইয়া আইছিল, না, মুসলমান মাইয়া বইলা কইল না কিছু?

(প্রস্থান।)

ভূপেন। দেখলে, কেমন সুর পাল্টেছে!

নির্ম্মল। আসল সুরটা ঠিকই আছে। তা ওকে বললে না কেন সব কথা?

ভূপেন। একটু পরে রোশনকেই দেখতে পাবে।

অনিমেষ। তা ছাড়া, ব'লে দিলে ত ওর মুখের ঐ মিষ্টি গালগুলো শুনতে পাওয়া যেত না?

নির্ম্মল। বেশ মিষ্টি লেগেছে শুনতে, না? জানো ভূপেন, মেয়েটিকে দেখলেই অনিমেষের মুখটা যেন কেমন এক রকম হ'য়ে যায়।

(সকলে হাসল, অনিমেষ সুদ্ধ। হাসি থামলে)

ভূপেন। বাজে কথা রাখো। শোন আশু। তোমার সকালবেলাকার mock raid-এর পরে টালিগঞ্জের পুলিশকে টেলিফোনে পেয়ে গেলাম। তারা আজ রাত্রে একটা লরী আর দুজন armed পুলিশ আমাদের দিতে রাজী হয়েছে। তুমি রোশনকে নিয়ে এলেই আমি এদের পাক সাকাসে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারি।

আশু। ওদের ঐ দুটো পুলিশের হেপাজতেই পাঠাবে ভাবছ?

ভূপেন। তাই ত ভাল।

আশু। উঁহু! ওদের বিশ্বাস নেই। হয়ত ভুল ক'রে শিখদের কোন্ গুরদোয়ারায় নামিয়ে দিয়ে আসবে। ভুল না ক'রেও সেটা করতে পারে। আমি ওদের সঙ্গে যাব।

অনিমেষ। আমিও যাব, যদি সঙ্গে নাও আমাকে।

পীযূস। আমিও যাব।

আশু। বেশ ত, চল না, the more the merrier.

নির্ম্মল। আমি যদি কিছু করতে পারি ত বল।

আশু। তুমি ভাই এই কাজটার ভার নাও। জানো ত, war-এর সময় এ পাড়ার অনেক বড়লোকের ছেলে special constabulary-তে নাম লিখিয়েছিলেন। তাঁদের খোকায় কাটা খাকী পোষাক, বেল্ট, টুপী যতগুলি পারবে জোগাড় ক'রে আন। যাতে আমাদের গায়ের মাপের, মাথার মাপের তিনটে সেট্ অন্ততঃ তার থেকে বেরোয়।

(সাঈদার পুনঃ প্রবেশ। সকলে উঠে দাঁড়াল।)

সাঈদা। বাবা, রোশন ত কই এখনো এল না?

আশু।. এই যে মা, আমি এখুনি তাকে আনতে যাচ্ছি।

সাঈদা। আর বাবা!

আশু। বলুন মা।

সাঈদা। দৌলৎ এতক্ষণে খেতে রাজী হয়েছে। কিছু খাবার যদি আমাদের পাঠিয়ে দাও।

(ছেলেরা সব ক'জন মহা ব্যস্ত হয়ে উঠল।)

ভূপেন। ঠাকুর! ঠাকুর!

অনিমেষ। ঠাকুর!

নির্ম্মল। এই যে আমি যাচ্ছি। ঠাকুর! ঠাকুর!

আশু। আমি যাচ্ছি।

(সকলে বেরিয়ে যাচ্ছে বাঁদিক্ দিয়ে।)

দৃশ্যান্তর

দ্বিতীয় দৃশ্য

(১৮ই আগস্ট্, রাত দশটা। ইশাকের বাড়ীর একতলার ঘর। ললিতা ও সুমোহিত।)

ললিতা। যাক, এমন মানুষ এখনো আছে তা হলে পৃথিবীতে, যে একটা পাখীর জন্যে প্রাণ দিতে চাইতে পারে।

সুমোহিত। ঐ পাখীটার জন্যে আমি কিছু করতে যাইনি তা আপনি বেশ ভাল ক'রেই জানেন।

ললিতা। পাখীটাও আপনার মনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল, আমি জানি। আচ্ছা, এ বিষয়ে পরে কথা হবে, এখন চলি, আপনার মা আসছেন।

(ললিতা ডানদিক্ দিয়ে বেরিয়ে গেলে নিরুপমা ঢুকলেন বাঁদিক্ থেকে। এসে তক্তপোশটায় বসলে সুমোহিত বসল তাঁর পাশে।)

নিরুপমা। হ্যাঁ রে সুমু, কি হয়েছিল রে কাল রাত্তিরে? লতার মা আজ সারাটা দিন রেগে এমন টং হয়ে আছে কেন?

সুমোহিত। ঐ পাখীটাকে জিজ্ঞেস কর মা। ঐটেই যত নষ্টের গোড়া। ঠিক করেছিলাম ওটাকে লতাদের বাড়ীতেই রেখে আসব। গলির মোড়টা পেরুলেই ত ওদের বাড়ী? পাশের পোড়ো জমিটার ওপর দিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে চ'লে যাব, রাত্রের অন্ধকারে কেউ লক্ষ্য করবে না। কিন্তু লতা আমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না। সুরু হ'ল খাঁচা নিয়ে কাড়াকাড়ি, তার পর হাত ধ'রে টানাটানি, আর ঠিক সেই সময়—

নিরুপমা। ছিঃ।

সুমোহিত। (উঠে দাঁড়িয়ে) তুমিও ছি বলছ? কিন্তু মা, ওর দিকটাও একটু ভাবো। ও সত্যিই খুব ভয় পেয়েছিল, ভেবেছিল, আমি মারা পড়ব।

নিরুপমা। ওরে, আমি কি সেই জন্যে ছি বলছি? ও মেয়েটা ত ওরকম করবেই, ওর মনটা যে বড্ড নরম। তা না হলে একটা পাখীর জন্যে ছটফট্ ক'রে মরে? তোরা যখন রাগ করিস্, একবারও কি ভাবিস্—ঐ পাখীটার

জন্যে বিপদ্ যদি কিছু হয় ত সেটা ঐ মেয়েটারই সকলের চেয়ে বেশী হবে? তবু যে পাখীটার হয়ে তোদের সকলের সঙ্গে সারাক্ষণ ঝগড়া করে, কেন করে?

সুমোহিত। তা যদি বোঝ মা, তবে তুমি ছি বললে কেন?

নিরুপমা। ছি বললাম তোকে। তুই এসব কথা পরিষ্কার ক'রে বলিসনি কেন তখন সবাইকে? কেন মেয়েটাকে লজ্জায় ফেললি?

সুমোহিত। (পায়চারি করছে) জীবনে ওরকম অবস্থায় ত আগে আর পড়িনি মা? কি ব'লে সুরু করব ভাবছিলাম, দেখলাম তোমরা সবাই স'রে পড়েছ, ওর মা ছাড়া। ওঁকে সব বলতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছু শুনতে চাইলেন না।

নিরুপমা। ভীষণ রেগে আছে, আর রাগটার সমস্তটাই গিয়ে পড়েছে এখন ঐ পাখীটার উপরে।

সুমোহিত। (হেসে) জানো মা? কাল রাত্তিরে তিনবার বেরিয়ে এসেছিলেন করিডরে, বোধ হয় ত পাখীটার একটা সদগতি করবার জন্যেই। আমি জেগে বসেছিলাম সারারাত পাখীটাকে আগলে, তাই সুবিধা হয় নি।

নিরুপমা। সারারাত জেগে ছিলি? (হেসে) পাখীটার ওপর তোরও একটু মায়া প'ড়ে গেছে, না রে?

সুমোহিত। (একটা চেয়ারে ব'সে) নিরীহ একটা প্রাণী। নিজে সত্যিই ত কিছু বুঝতে পারছে না? আর—

নিরুপমা। মেয়েটা বড্ড ভাল রে! চারদিক্‌কার এই মারামারি, খুনোখুনি, এর মধ্যে কোথাও কারও মনে অন্য কারও জন্যে দরদ একটু আছে দেখলে মনটা খুশী হয়। তাও আবার একটা পাখীর জন্যে। এটা আসলে যে কত বড় জিনিস, তা বুঝিস্ না?

সুমোহিত। গোড়ায় বুঝি নি মা, এখন একটু একটু ক'রে বুঝছি।

নিরুপমা। সামান্য একটা ময়নাকে যে এত ভালবাসে, সে ভাল না হয়ে যায় না।

সুমোহিত। সত্যি কথা।

নিরুপমা। দেখ্, এই বিপদটা যদি কেটে যায়, যদি সুদিন আবার ফিরে আসে, ঐ মেয়েটার খোঁজ একটু রাখিস্।

সুমোহিত। (নিরুপমার পাশে ব'সে একটু হেসে) এবারে মা, তুমি আমাকে মোটেই সদুপদেশ দিচ্ছ না।

নিরুপমা। থাম্, পাকামি করিস্ নে। যা বললাম, মনে রাখিস্।

(ডানদিক্ থেকে সুললিত ও নারায়ণের প্রবেশ। তাঁদের পাশ কাটিয়ে সুমোহিতের ডানদিক্ দিয়েই প্রস্থান। সুললিত ও নারায়ণ এসে দুটো চেয়ার নিয়ে বসলেন।)

সুললিত। আলু-কুমড়োর ছোঁকাটা আজ কিন্তু খাসা খেতে হয়েছিল। কাল দুপুরে ঐ সঙ্গে কুমড়ো ভাজা আর আলু ভাজাও ক'রো। আলুর দমও একটা হতে পারে।

নিরুপমা। তোমার কথা শুনলে মনে হয়, বেশ একটা পিক্‌নিকের মত ব্যাপার কিছু এখানে হচ্ছে।

সুললিত। (হেসে) মশাই, শুনলেন ত? কত দুঃখে যে কথাগুলো বলেছি, বুঝল না। যাক গে। এবারে বলুন, আজিজ কি বলছিল আপনাকে এতক্ষণ।

নারায়ণ। খিদিরপুরে, ওড়িয়া মিস্ত্রিদের নাকি সার দিয়ে বসিয়ে কচুকাটা করেছে।

সুললিত। হিঁদুরা কোথাও বিশেষ কিছু করতে পারছে না, না?

নারায়ণ। তারাও চেষ্টা করছে শোধ নেবার, তবে ঐ আর কি! গয়লারা যখন খবর না দিয়ে নিজেরাই সাত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল, তখন আমরা ধোপারা তাদের সঙ্গে যাব কেন? লড়তে হয়, আমরা আলাদা লড়ব। লড়তে আমরা জানি না নাকি? এই ধরণের সব ব্যাপার।

সুললিত। মুসলমানরাই জিতবে, দেখে নেবেন। ষাঁড়ের ডালনা খায় ত?

নিরুপমা। ক' গোলে জিতবে গো? তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, যেন মোহনবাগান আর মোহামেডান স্পোর্টিং-এর ফুটবল খেলা হচ্ছে।

নারায়ণ। ফুটবল ছাড়া আর কি? মানুষের মুণ্ডুগুলো নিয়ে ফুটবল।

(পদ্মার প্রবেশ ডানদিক্ থেকেই।)

পদ্মা। আচ্ছা, আজও কি সারারাত এই রকমই চলতে থাকবে?

নারায়ণ। কিসের কথা বলছ? কি চলতে থাকবে?

পদ্মা। ঐ অন্ধকার করিডরটার একধারে এঁদের ছেলেটি পাখীটাকে আগলাতে ব'সে থাকবেন, আর তোমার মেয়েটি ব'সে থাকবেন তাঁকে আগলাতে?

নারায়ণ। আহা হা, তাতে হয়েছেটা কি? তোমার ইচ্ছা হয়, তুমিও ব'সে থাকো গে না, তাদের আগলে।

পদ্মা। আমার বয়ে গেছে। তার চেয়ে ঢের সহজে
যেটা হয় সেইটে কর না? চার দিকে এত মানুষ খুন
চ্ছে, তোমরা কেউ একজন পারো না ঐ পাখীটাকে—

(দরজায় দুটো টোকা, ফাঁক, তার পর আবার দুটো টোকা। সুললিত দরজা খুলে দিলে ইশাকের প্রবেশ।)

ইশাক। (ঘরের ভেতরকার মানুষগুলোকে একবার দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে) সুমু কোথা?

সুললিত। আছে এইদিকে, ডাকব?

ইশাক। ডাকুন।

(সুললিত ডানদিকের নেপথ্যের কাছে গিয়ে ডাকলেন, সুমু! তার পর ফিরে এলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুমোহিত এল। তার একটু পরেই ললিতাও এসে দাঁড়াল নেপথ্যের কাছে।)

ইশাক। সুমু! মহল্লার রেফুজী ক্যাম্প থেকে খবর দিয়ে গেল, আমার বোন-ভাগ্নারা ক্যাম্পে এসে গেছে ভবানীপুর থেকে। আজ রাত্রেই তাদের নিয়ে আসতে গেছিল, কিন্তু আজিজ ব'লে দিয়েছে, কাল ভোর ভোর তাদের আনতে লোক যাবে। তোমাদের ত এখন তাহলে—

(নিরুপমা সুমোহিতের হাতটা চেপে ধরলেন। নারায়ণ উঠে এগিয়ে গেলেন ললিতার কাছে, মনে হ'ল কিছু তাকে বলছেন, হয়ত বলছেন, ভয় পেও না মা, আমরা রয়েছি। পদ্মাও একটু পরে সেই দিকেই গেলেন। সুললিত কখনো নিরুপমাকে কখনো বা ইশাকের দিকে দেখছেন।)

সুমোহিত। উঁরা পুলিশ escort নিয়ে এসেছেন ত?

ইশাক। জানি না। কেন?

সুমোহিত। তাহলে ঐ পুলিশরা ফিরে যাবার সময় আমাদের নিয়ে যেতে পারে।

ইশাক। কিন্তু ক্যাম্পের লোকেরা ত জানে না তোমরা এখানে রয়েছ? মহল্লার কেউ জানে না। আর ওদের এখন সেটা বলতে যাওয়াও ভুল হবে। ধর পুলিশরা যদি চ'লে গিয়ে থাকে,—এতক্ষণ কি আর ব'সে আছে? তাহলে ঝুটমুট লোক জানাজানি হয়ে তোমরা খুবই মুশ্‌কিলে পড়বে।

নিরুপমা। আমাদের চ'লে যাওয়া ছাড়া কি আর কোনো উপায়ই নেই ইশাক সাহেব?

ইশাক। আমার ভাগ্নাটি এলে আপনারা থাকতে পারবেন না এখানে। তাছাড়া আরও একটা ঝামেল জুটেছে। কাল সকালে মহল্লায় একটা সভা হচ্ছে, সেখানে আমাদের কয়েকজনকে কোরাণশরীফ মাথায় ক'রে বলতে হবে, আমরা কোনো হিন্দুকে বাড়ীতে লুকিয়ে রাখি নি।

সুললিত। অবস্থা এত খারাপ হয়েছে?

ইশাক। আপনাদের বলিনি আগে সে কথা। পাড়ার বাঙালী ভদ্রলোকদের কেউ কিছু বলবে না, এইটেই গোড়াতে ঠিক ছিল, কিন্তু চার নম্বর পুলের কাছে একটা বাড়ী থেকে কাল দু-তিনবার বন্দুকের আওয়াজ হওয়াতে সবাই বিগড়ে গিয়েছে।

সুললিত। বন্দুকের আওযাজ ভয় পেয়ে করেছে। হিন্দু পাড়াতে মুসলমানরাও ভয় পেয়ে এ রকম বোকামি করেছে নিশ্চয়।

ইশাক। এ সব কথা কে কাকে বোঝাবে? তবে আসল কথা হচ্ছে, দৌলৎ আসছে, সে এমনিতেই একটু গোঁড়া রকমের মানুষ, তার ওপর শুনছি তিনদিন তার সোয়ামীর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। হয়ত তার কিছু হয় নি, কিন্তু পাড়ার লোকেরা গরম হয়ে আছে। এর পর এ বাড়ীতে আপনাদের কি ক'রে আর রাখা চলে?...আচ্ছা, আপনারা তৈরি হয়ে নিন। না হয় একটু রাত ক'রে বেরুবেন। যাবার সময় দেখা হবে।

(ইশাকের প্রস্থান। সুমোহিত দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।)

নিরুপমা। কি হবে? ওগো!

সুললিত। কিছু হবে না।

নিরুপমা। তোমার ভরসা ছিল আজিজের ফুফুরা আসবেন না। এখন ত শুনলে তাঁরা আসছেন, আর এও শুনলে ওরা ভীষণ ক্ষেপে রয়েছে, পথে বেরুলেই ত আমাদের মেরে ফেলবে।

সুললিত। আরে দূর। মেরে ফেললেই হ'ল?

(নারায়ণ, পদ্মা, ললিতা, সুমোহিত সবাই এসে এঁদের কাছাকাছি বসলেন। দরজায় আবার টোকার শব্দ। সুমোহিত দরজা খুলে দিলে একটা পুঁটুলি হাতে আজিজের প্রবেশ।)

সুললিত। এসো আজিজ। আমরা চ'লে যাচ্ছি আজ, জানো ত?

আজিজ। তাই শুনেই এলাম।

সুললিত। বড়ই আরামে কাটিয়ে গেলাম এই তিন দিন তোমাদের বাড়ীতে।

আজিজ। সে কথা ব'লে আর লজ্জা দেবেন না।

(পুঁটুলিটা তক্তপোশের ওপর রেখে) এর মধ্যে তিনটে বোরখা আর তিনটে পাজামা আছে। এই প'রে যদি আপনারা চ'লে যান, হয়ত হঠাৎ কেউ লক্ষ্য করবে না। মুস্লিম মহল্লা পার হয়ে গিয়ে বদ্‌লে ফেলবেন। গড়িয়াহাটের দিক্ দিয়ে চ'লে যান, তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবেন।

(সুমোহিতের দিকে না তাকিয়ে তার হাতটা একবার ধ'রে, তাতে একটা টিপুনি দিয়ে বেরিয়ে গেল।)

নিরুপমা। তোমার ভয় করছে না, ওগো?

সুললিত। ভয়? উঁহু!

নিরুপমা। কেন যে তোমার ভয় করছে না—

সুললিত। ঐ কেনর উত্তরটি দিতে পারব না। আমার ভয় করছে না, তা কি করব?

নিরুপমা। আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে। কি হবে?

পদ্মা। (হাত জোড় ক'রে) ভগবান্! ভগবান্! ভগবান্!

নারায়ণ। (হাসতে চেষ্টা ক'রে) ও নামটা মুখে এনো না, যতক্ষণ না হিন্দুপাড়ায় গিয়ে পৌঁছচ্ছ।

পদ্মা। ভালয় ভালয় পৌঁছতে যাতে পারি, তার জন্যেই ত ডাকা। ভগবান্, রক্ষা কর! ভগবান্, রক্ষা কর! হে ভগবান্!

নিরুপমা। (চোখ মুছে) ভগবান্!

সুললিত। না, আপনারা বড় বেশী ভয় পাচ্ছেন। আমরা তিনটে পুরুষমানুষ থাকব ত সঙ্গে!

সুমোহিত। (আজিজের দেওয়া পাজামা, বোরখাগুলো খুলে খুলে দেখছিল, একটা বোরখা ললিতার হাতে দিয়ে) অভিনয় করার অভ্যেস নেই, না?

ললিতা। শিখে রাখলে আজ কাজে লাগত।

সুমোহিত। ভয় করছে খুব?

ললিতা। করছে না, বলি কি ক'রে?

সুললিত। আমরা ত থাকব সঙ্গে, আর তোমাদের আমরা ফেলেও পালাব না। তা হ'লে ভয় কিসের?

নারায়ণ। ভয় পেয়ে লাভই বা কি? মুসলমান সেজে যদি পালাতে হয় তা হলে ত ভয়ের ভাব দেখালে একেবারেই চলবে না।

পদ্মা। আমার এই ক'দিন খুব বেশী ভয় করছিল না। জানতাম, যে কোনো সময় ঘরে হুড়মুড় ক'রে লোক ঢুকতে পারে, মেরে শেষ করতে পারে, তবুও আজ পথে বেরুতে হবে শুনেই হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে আসছে। পথে কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, আমি হয়ত চেঁচিয়ে উঠব ভয় পেয়ে।

ললিতা। দোহাই তোমার মা, এত বেশী ভয় পেও না। ময়নাটার চেয়েও তুমিই তাহলে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

পদ্মা। ময়না? ময়নাটাও যাচ্ছে নাকি আমাদের সঙ্গে?

ললিতা। নিশ্চয়।

পদ্মা। তুই বলিস্ কি লতা? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? ও ত আমাদের হাতে-নাতে ধরিয়ে দেবে। মুসলমান সেজে আর কি লাভ তাহলে? ফোঁটা তেলক কেটে বোষ্টম সেজে সবাই বেরুই।

দৃশ্যান্তর।

তৃতীয় দৃশ্য

(১৮ই আগস্ট, মধ্য রাত্রি। ইশাকের বাড়ীর সামনেকার রাস্তা। সদর দরজা থেকে তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে এসেছে ফুটপাথে। খাকী শার্ট আর শর্টপরা, visor-ওয়ালা খাকী টুপী মাথায় আশু, অনিমেষ ও পীযুষের ডানদিক্ থেকে প্রবেশ। পীযুষ সিগারেট বের ক'রে আশু আর অনিমেষকে দিলে, অনিমেষ লাইটার জেলে অন্য দু'জনেরটা ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরাল। তার পর রাস্তার বাতির আলোয় হাত-ঘড়িটা দেখে)

অনিমেষ। সওয়া বারোটা প্রায় বাজল। কতক্ষণ যে ওদের টায়ার বদ্‌লাতে লাগবে।

পীযুষ। ক্ষিদে যা পেয়েছে! আশুর না খেয়ে থাকার অভ্যেস আছে, আমার নেই।

অনিমেষ। আমারও নেই। ভেবেছিলাম, এদের ক্যাম্পে আদর ক'রে বিরিয়ানী কাবাব খেতে দেবে, তা সে ত দূরস্থান, কথাই কইল না ভাল ক'রে!

পীযুষ। তোমাকে বললাম আশু, যে, এ পাড়াতে হিন্দু আর নেই, থাকতে পারে না: হয় মরেছে নয় পালিয়েছে। এদের ক্যাম্পের লোকরাও বলল তাই, কিন্তু তুমি শুনলে না। কি লাভটা হ'ল? এতক্ষণে নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে খিঁচুড়ি খেতে ব'সে যেতাম।

(সিঁড়ির ধাপে বসল।)

আশু। দেখে না যাওয়াটা উচিত হ'ত না। মনটা খুঁৎ খুঁৎ করত। এখন হাল্‌কা মন নিয়ে ফিরতে পারছি। এই একটা লাভ ত হ'ল?

(সিঁড়ির ধাপে বসল।)

অনিমেষ। কিন্তু এদের ক্যাম্পের লোকগুলোর ব্যবহার দেখলে ? এই পরিবারটার জন্যে তুমি যে এত করলে আশু, তুমি দেখো, এটা ওরা মনে রাখবে না।

আশু। আর কেউ মনে না রাখুক, রোশন মনে রাখবে। যতদিন বেঁচে থাকবে, মনে রাখবে। নিজের ছেলেমেয়েদের গল্প শোনাবে, নাতি-নাতনীদের শোনাবে।

অনিমেষ। আর পাকিস্তান হয়ে যদি দু'জন দুটো আলাদা দেশে না প'ড়ে যাও ত তুমি যখনই যাবে ওর কাছে, বিরিয়ানী কাবাব খাওয়াবে। খালি আমাদের কপালেই কিছু জুটল না। রোশনের জন্যে মার যদিও আমরা প্রচুর খেয়েছি।···কে একজন আসছে।

(পাড়ার রক্ষীদলের একজন যুবকের প্রবেশ। নীরবে অভিবাদন করল, অন্যেরা নীরবে প্রত্যভিবাদন জানাল।)

যুবক। আপনাদের টায়ার পাংচার হয়েছে, বদ্‌লাতে দেরি হবে। এ বাড়ীর চাকরটাকে ডাকি, ভেতরে গিয়ে বসুন। পাশের এই ঘরটাতেই সে শোয়।

পীযূষ। না, না, এত হাঙ্গাম করবার দরকার কিছু নেই, আমরা এখানেই ত বেশ ব'সে আছি।

আশু। (উঠে এসে) আচ্ছা, আপনি ত রক্ষীদলের লোক, আপনারা সব খবরই রাখেন। এ পাড়ায় হিন্দু কেউ কি কোথাও আছেন, যাঁদের আমরা নিয়ে যেতে পারি rescue ক'রে ?

যুবক। না। থাকা সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়, সেটা ত বুঝতেই পারছেন ?

আশু। হ্যাঁ. সে ত ঠিক। সিগারেট ?

(যুবক আশুর সিগারেট-কেস্ থেকে একটা সিগারেট নিলে অনিমেষ লাইটার জ্বেলে সেটা ধরিয়ে দিল।)

যুবক। Thanks ! যদি কাউকে পান,—পাবেন না,—তবে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। নানা রকমের উদ্ভট আজগুবি গল্প সব ছড়াচ্ছে চারদিকে, আর মানুষের মেজাজ ক্রমে বেশী ক'রে খারাপ হচ্ছে।

আশু। কারা ছড়াচ্ছে এ সব গল্প ?

যুবক। জানতে পারলে এই riot কেন বেধেছে, কারা বাধিয়েছে, তাও পরিষ্কার হয়ে যেত। যারা মারছে আর মরছে, তারা এটা বাধায় নি সেটা নিশ্চিত। ···আচ্ছা, বসুন আপনারা, আমি চলি। আদাব।

আশু। আদাব !

(যুবকের প্রস্থান। নেপথ্যে, ডানদিকে, খুব কাছেই, তিনবার হর্ণের শব্দ।)

পীযূষ। (উঠে দাঁড়িয়ে) টায়ার বদ্‌লানো হয়ে গেছে, চল, চল !

আশু। চল।

(অন্য দু'জন এগিয়ে যাচ্ছে ডানদিকে, পীযূষ নিজের হাফ্‌প্যান্টের seat ঝাড়ছে, এমন সময় সদর দরজার বাঁদিক্‌কার দেয়ালের আড়াল থেকে স্পষ্ট শোনা গেল,—হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।)

আশু। (আওয়াজটা যেদিক্ থেকে আসছিল সে-দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে) আরে !

অনিমেষ। (সেদিকে ফিরে আসতে আসতে) পাখী ? নয় ?

আশু। (ফিরে আসতে আসতে) হলেই বা পাখী, হিন্দু পাখী।

অনিমেষ। বাড়ীটা ত নিশ্চয়ই মুসলমানের, এখানে হিন্দু পাখী ?

পীযূষ। হয় ত লুটের মাল, নয়ত কেউ পালাবার সময় গছিয়ে দিয়ে গেছে। চল, চল, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

অনিমেষ। চল।

(যাচ্ছিল। আবার শোনা গেল, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।)

আশু। ওহে, দাঁড়াও। আর ত কিছুই হ'ল না, এই হিন্দু পাখীটাকে rescue ক'রে নিয়ে যাই। তবু ত ফিরে গিয়ে বলতে কিছু পারব ?

পীযূষ। তোমার যত সব আজগুবি খেয়াল।

অনিমেষ। একটা পাখী নিয়ে এই রাত দুপুরে শত্রু-পুরীর মধ্যে আবার কি ঝঞ্ঝাট বাধাবে ?

আশু। যদি লুটের মাল হয়, পুলিশ-লরী দেখলে দিয়ে দিতে পথ পাবে না। আর যদি কেউ গছিয়ে দিয়ে গিয়ে থাকে ত তাদের পৌঁছে দেব বললে খুব খুশী হয়েই দিয়ে দেবে।

(সদরদরজার কড়া নাড়ল। সাড়া নেই। আরও জোরে কড়া নাড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ডানদিক্ থেকে প্রচণ্ড হর্ণের শব্দ পাড়া প্রকম্পিত ক'রে।)

অনিমেষ। চল, চল, আশু, আর দেরি নয়। এরা এবার আমাদের হয়ত ফেলে রেখেই চ'লে যাবে।

আশু। (একটুও উৎসাহ না দেখিয়ে) আচ্ছা, চল।

(সবাই চ'লে যাচ্ছিল, সদর দরজা খুলে আজিজ

নেমে এল রাস্তায়। সকলে ফিরে দাঁড়াল। নেপথ্যে আবার হর্ণের শব্দ।)

আজিজ। কি ব্যাপার? হর্ণের শব্দে পাড়া তোলপাড় হয়ে গেল যে?

আশু। ব্যাপার এমন কিছু নয়। লরীর টায়ার বদ্‌লানো হচ্ছিল, সেটা হয়ে গেছে ব'লে হর্ণ দিয়ে আমাদের ডাকছে। কিন্তু এদিকে আমরা একটা পাখীর ডাক স্পষ্ট শুনতে পেলাম ভেতর থেকে।

আজিজ। পাখীর ডাক?

আশু। আজ্ঞে হ্যাঁ, পাখীরই ডাক।

আজিজ। এ বাড়ীর ভেতর থেকে?

আশু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

আজিজ। ভুল করেছেন।

আশু। কিন্তু স্পষ্ট শুনতে পেলাম যে!

আজিজ। কি পাখী? মোরগ? তাও ত আমরা রাখি না বাড়ীতে।

আশু। আজ্ঞে না, মোরগ নয়।

(বাইরে আবার হর্ণের শব্দ।)

পীযুষ, যাও ত ভাই। বল, আমরা ছ'মিনিটের মধ্যে আসছি।

(পীযূষ বেরিয়ে গেল ডানদিক্ দিয়ে।)

আজ্ঞে না, মোরগ নয়। আমরা গলা শুনেছি একটা— একটা হিন্দু পাখীর।

আজিজ। হিন্দু পাখী? (হেসে) মোরগ না হয় মুসলমান পাখী, কিন্তু হিন্দু পাখী? ও কি হিন্দু পাঁঠার মাংসের মত কোনো ব্যাপার?

আশু। হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ ব'লে ডাকছিল।

আজিজ। ও! এ বাড়ীর থেকে? Absurd!

আশু। তা হবে। আমরাই ভুল শুনেছি। (যাচ্ছিল)

আজিজ। আচ্ছা শুনুন।···আপনারা কি নেশাটেশা করেছেন?

আশু। (ফিরে দাঁড়িয়ে) কেন আপনার তা মনে হচ্ছে?

আজিজ। তা যদি করেন নি, ত এই রাত দুপুরে এ পাড়াতে একটা পাখীর খোঁজ করতে এসেছেন, একটা হিন্দু পাখীর? কে আপনারা?

আশু। আমরা হিন্দু পাড়ার রেফুজী ক্যাম্প থেকে একটি মুসলমান পরিবারকে আপনাদের পাড়ার রেফুজী ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে এসেছিলাম।

আজিজ। কি কাণ্ড! আপনারা, আপনারাই তা হলে কি···এই ঘণ্টা দুয়েক আগে?

আশু। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ঘণ্টা দুয়েক হ'ল বই কি?

আজিজ। আসুন, আসুন আপনারা। ভেতরে এসে বসুন।

অনিমেষ। না, না, রাত অনেক হ'ল, আমরা এবার যাই।

আজিজ। আপনারা যাঁদের পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা কি এ্যালেনবী রোডে থাকতেন? এক বৃদ্ধা, তাঁর মেয়ে আর নাতনী?

আশু। নাতনীটির নাম রোশন, তাকে আর একবার দেখে যেতে পারলে হ'ত।

আজিজ। আপনারা ভেতরে আসুন। আসতেই হবে।

আশু। আজ আমাদের যেতে দিন। এইসব গোলমাল মিটে যাক, তার পর, কথা দিচ্ছি, একদিন এসে চা খেয়ে যাব।

অনিমেষ। বিরিয়ানী কাবাব।

আজিজ। না, না, আপনারা যেতে পাবেন না। শুনুন। আমরা এই ক'দিন দুটি হিন্দু পরিবারকে লুকিয়ে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলাম বাড়ীতে, আর তাঁদের রাখতে পারছিলাম না। আজ রাত্রেই বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যাবার কথা তাঁদের, পথে বেরিয়ে কি যে তাঁদের হবে, তা কেবল আল্লাই জানেন। যাঁদের নিয়ে এসেছেন তাঁরা আমার আত্মীয়া। সুন্দর বদ্‌লা হয়ে যাবে, এ'দের আপনারা নিয়ে যান।

আশু। কি আশ্চর্য্য। চ'লেই যাচ্ছিলাম, হঠাৎ পাখীটার ডাক শুনলাম। যদি না শুনতাম, কিছুই জানতে পারতাম না। আপনাদের সিঁড়িতে ব'সে এক-একটা সিগারেট পুড়িয়ে গল্প ক'রে ফিরে যেতাম।

অনিমেষ। আর তাহলে দেরি করবেন না। যাঁদের নিয়ে যেতে বলছেন, তাঁদের পাঠিয়ে দিন তাড়াতাড়ি।

আজিজ। আচ্ছা, তাই দিচ্ছি।

(সদর দরজায় ঢুকে গেল।)

আশু। ওহে অনিমেষ। তোমরা ত ভগবান্ মানো না। দেখলে নামের মাহাত্ম্য? যদি একটা পাখীর গলায় হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ ডাক না আজ শুনতাম ত দুটো হিন্দু পরিবারের কি গতি হ'ত বলতে পার?

(ইশাক ও আজিজ সদর দরজার দু'পাশে দাঁড়ালে, ললিতা, নিরুপমা, পদ্মা, নারায়ণ, সুললিত, এবং সর্ব্বশেষে খাঁচা হাতে সুমোহিত বেরিয়ে এল। অল্প কিছুক্ষণ সরব ও নীরব অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদনে কাটল।)

ললিতা। খাঁচাটা আমায় দিন।

সুমোহিত। আমি এটাকে এত ক'রে বাঁচালাম!

আশু। ওটাকে আপনারা কে বাঁচিয়েছেন জানি না, কিন্তু ও যে আপনাদের বাঁচিয়েছে সেটা আমি হলপ ক'রে বলতে পারি।

দৃশ্যান্তর।

চতুর্থ দৃশ্য

(১৯শে আগস্ট্, বিকেল পাঁচটা। বালিগঞ্জে নারায়ণ ঘোষের ভাইয়ের বাড়ী। দু'তলার লম্বা ঢাকা বারান্দা, পেছনে দুটো খোলা দরজায় পরদা ঝুলছে। বাঁ ধারে কয়েকটা বেতের চেয়ার ও ছোট-বড় টিপয়। দুটো চেয়ারে মুখোমুখি ব'সে আছেন নারায়ণ ও পদ্মা, চায়ের সরঞ্জাম রয়েছে মাঝখানে। ডানদিকে সিঁড়ির রেলিং-এর খানিকটা দেখা যাচ্ছে। তার একপাশে একটা দরজার কাছে দেয়াল ঘেঁষে, একটা টিপয়ের ওপর ময়নার খাঁচাটা রাখা আছে। সেখানে একটা ঈজি-চেয়ার ও গোটা তিনেক চামড়া-ঢাকা মোড়া।)

নারায়ণ। এত যে ময়নাটার পেছনে সবাই লেগে-ছিলে, কাটারি দিয়ে কাটতে চেয়েছিলে দু'খানা ক'রে, এখন দেখ। ওরই কল্যাণে প্রাণরক্ষা হ'ল সবাইকার।

পদ্মা। তা সে যাই হোক, তুমি বাপু মেয়ের সামনে ঐ ময়নাটাকে এত বাড়িও না। এসে অবধি ত বিশ্ব-সুদ্ধর কাছে ঐ ময়নারই গল্প সারাক্ষণ করছ, আর দেমাকে মেয়ের মাটিতে পা পড়ছে না!

নারায়ণ। আহা হা, তাতে হয়েছেটা কি?

পদ্মা। (নারায়ণের শূন্য পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে) আচ্ছা গো, আচ্ছা, হয়নি কিছু। ও মেয়েকে তুমিই তৈরি করছ, তুমিই ওকে সামলিও।

নারায়ণ। অকারণ গুচ্ছের বাজে কথা বলা তোমার স্বভাব। সামলাব আবার কি? কোথায় ওর কি বেসামাল দেখছ?

পদ্মা। এই তিনটে দিন কি চোখ বুজে ছিলে? কিছু দেখতে পাও নি? ছেলেটা ঠিক আবার এসে জুটবে দেখো। ওখানে ত ময়নাটাকে নিয়ে হ'ল, এবারে কি নিয়ে হয় দেখা যাক।

(ময়না: হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।)

পদ্মা। যত খুশি ডাক তুমি এখন, তোমার দিকে আর কেউ ফিরেও দেখবে না। বজ্জাত পাখা কোথাকার। জ্বালিয়ে মেরেছে এই ক'দিন।

(একটি ভৃত্য উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে।)

ভৃত্য। একজন বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

নারায়ণ। কে বাবু? নাম জিজ্ঞেস করেছিলে?

ভৃত্য। আজ্ঞে হ্যাঁ। সমুহ না কি নাম বললেন।

পদ্মা। ঐ দেখ, ঠিক এসে হাজির হয়েছে, একটা দিনও তর সয় নি। বলেছিলুম কিনা? বিদেয় কর, বিদেয় কর, বিদেয় ক'রে দাও নীচে থেকেই। কিছুতেই যেন ওকে ওপরে নিয়ে এস না।

নারায়ণ। তাই হবে।

(চটিতে পা ঢুকোচ্ছেন, এমন সময় হাসিতে মুখ ভ'রে ললিতা উঠে এল সিঁড়ি দিয়ে, তার পেছনে সুমোহিত। ভৃত্যটি নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।)

ললিতা। বাবা, সুমোহিতবাবু এসেছেন ময়নাটার সঙ্গে দেখা করতে।

(সুমোহিত ললিতার মা-বাবাকে নত হয়ে নমস্কার করল।)

নারায়ণ। বেশ, বেশ! তা ত আসবেই। ময়নাটাই ত বলতে গেলে বাঁচাল আমাদের সকলকে শেষ পর্য্যন্ত। এস বাবা এস, বোস।

(সুমোহিত বসলে পদ্মা একটু উস্‌খুস্ ক'রে, ডানদিক্‌কার দরজাটার পরদা সরিয়ে চ'লে গেলেন পরদার ওপাশে।)

নারায়ণ। তোমরা কোথায় এসে উঠেছ এ পাড়ায়?

সুমোহিত। ফার্ণ রোডে আমার এক বোনের বাড়ীতে।

নারায়ণ। কোন অসুবিধে নেই ত সেখানে?

সুমোহিত। তা একটু আছে বই কি?

নারায়ণ। কতদিনে যে এ গোলমাল মিটবে!

সুমোহিত। যতদিনেই মিটুক, আমরা আর পার্ক সার্কাসে ফিরে যাচ্ছি না। এই পাড়াতেই বাড়ী খুঁজছি।

নারায়ণ। শুনলুম নাকি বাড়ীওয়ালারা দু'গুণ ভাড়া হাঁকছে?

সুমোহিত। চারগুণ হাঁকছে। আজই দুপুরে একটা বাড়ী দেখলাম, পঁয়ষট্টি টাকা ভাড়া ছিল, আড়াই শ' চাইছে। তাই দিয়েই আপাততঃ বাড়ীটা আমরা নেব ঠিক করেছি। আপনারা কি করবেন?

নারায়ণ। জানি না, কিছু ঠিক করি নি এখনও। মুসলমান ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এসে হিন্দু ডাকাতদের হাতে বধ হবার স্পৃহা খুব বেশী আছে তা নয়। ফিরে যেতেই হয়ত চেষ্টা করব।

সুমোহিত। না, না, ফিরে আর যাবেন না ও পাড়ায়।

(ময়নাটা ডাকল, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।)

ললিতা। ওর খুব রাগ হয়েছে। ওর সঙ্গে দেখা করতে এসে সুমোহিতবাবু একবারটি ওর দিকে ফিরেও দেখেন নি এতক্ষণের মধ্যে!

সুমোহিত। Sorry! (খুব ইতস্তত: করছে।)

নারায়াণ। (হেসে) হ্যাঁ, রাগ ত ওর হতেই পারে। এত করল তোমাদের জন্যে! ওর কাছেই প্রথমে তোমার যাওয়া উচিত ছিল। আচ্ছা যাও, কথা বল ওর সঙ্গে, আমি একটু আসছি। (বাঁদিকের পরদাটা সরিয়ে পেছনে চ'লে গেলেন।)

ললিতা। আসুন।

(ললিতা ময়নাটার একপাশে একটা মোড়া টেনে বসলে সুমোহিত আর একপাশে আর একটা মোড়ায় তার মুখোমুখি বসল।)

সুমোহিত। ময়নাটাকে বলতে এলাম, ওকে কি ভীষণ miss করছি আমি।

ললিতা। ময়না! ও ময়না! শুনছ?

(ময়না: হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।)

শুনছে। এবার বলুন।

সুমোহিত। ক'ঘণ্টাই বা ওকে দেখি নি, মনে হচ্ছে যেন এক যুগ! ওকে না দেখে আর থাকতে পারব ব'লে মনে হচ্ছে না।

ললিতা। (শব্দ ক'রে হেসে) সে কি? এ ত তাহলে বড় মুশকিলের কথা হ'ল! কি করব বলুন ত? ওর একটা ছবি তুলে আপনাকে পাঠিয়ে দেব?

সুমোহিত। ছবি নিয়ে যারা কবিত্ব করে, আমি তাদের দলে নেই জানবেন। আসল মানুষটাকে তারা সেই পরিমাণে কম চায় আর কম ভাবে।

ললিতা। বলুন, আসল পাখীটাকে।

সুমোহিত। আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আজিজদের বাড়ীর একতলার অন্ধকার করিডরটার জন্যেও আমার মন কেমন করছে। ভয়ানক মন কেমন করছে। চোখ বুজে সারাক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করছি, যেন সেই করিডরটাতে ব'সে রাত জাগছি আর ময়নাটাকে আগলাচ্ছি। যেন বিপদ্‌টা এত তাড়াতাড়ি না কাটলেই ছিল ভাল।...স্বর্গ কাকে বলে জানি না, কিন্তু জীবনে এই ক'টা দিন যেন তার একটু আভাস পেয়েছি। ঐ দরজা-জানালা আঁটা একতলা বাড়ীটার অন্ধকার করিডরটাই হয়ে উঠেছিল আমার স্বর্গ।

ললিতা। (গম্ভীর মুখে) ময়না ঠিকই শুনছে, কিন্তু মনে হচ্ছে, এই পরদাটার ওপাশ থেকে আরও কেউ একজন শোনবার খুব চেষ্টা করছে।

সুমোহিত। কি হয়েছে শুনলে? আমি ত ময়নাটার সঙ্গে কথা বলছি, আর বলবার অনুমতিও পেয়েছি আপনার বাবার কাছ থেকে।

ললিতা। তা বাবার অনুমতি যখন পেয়েছেন, তখন ময়নার সঙ্গে কথা বলতে কোনো বাধা নেই, বলতে পারেন।

(সুমোহিত তার মোড়াটাকে ময়নাটার আর একটু কাছে সরিয়ে নিল। ললিতারও আর একটু কাছে এল সেই সূত্রে।)

সুমোহিত। ময়না! জানো, তুমি ঠিক কতখানি এখন আমার কাছে?

(ময়না নিরুত্তর।)

আলাপটা খুব জমবে ব'লে মনে হচ্ছে না।

ললিতা। (একটু হেসে) কথা না ব'লেও আলাপ জমানো যায়।

সুমোহিত। তা যায়, কিন্তু কথা কতগুলো গলার কাছে এসে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছে, না বলতে পেলে দম আটকে ম'রে যাব।

ললিতা। ওরে বাবা, তাহলে ব'লেই ফেলুন। দম আটকে মরাটা ভাল নয়।...তুমিও কিছু একটু ব'লো ময়না, নইলে আমার মান থাকবে না।

সুমোহিত। ময়না! তুমি জানো, তোমাকে কি রকম ভালবেসে ফেলেছি আমি?

(ময়না নিরুত্তর।)

কিছু বলল না ত?

ললিতা। ভাবল বোধ হয়, ও ত জানাই কথা, বলবার ওতে আর আছে কি?

সুমোহিত। (খুশী মুখে) তা হতেও পারে।... আচ্ছা ময়না। আচ্ছা...আচ্ছা...(গলাটাকে একটু পরিষ্কার ক'রে নিয়ে) আচ্ছা ময়না! রাগ ক'রো না জানতে চাইছি ব'লে। তুমি...তুমি কি একটুও ভালবাসো আমাকে?

(ময়না: হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।)

এবারেও আমার কথার জবাব দিল না ত?

ললিতা। কেন, ঐ যে দিল। বলল, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।

সুমোহিত। কি তার মানে?

ললিতা। ভেবে দেখছি।

সুমোহিত। ও যখন 'না' বলতে চায়, কি বলে?

ললিতা। হরেকৃষ্ণ।

সুমোহিত। (মুখটা কালো হয়ে গেল, এবং সেই রকম রইল কিছুক্ষণ। তার পর হঠাৎ সাগ্রহে) আর যখন 'হ্যাঁ' বলতে চায়, তখন?

ললিতা। (মুখটাকে খুব গম্ভীর ক'রে) হরেকৃষ্ণ।

সুমোহিত। দুযেতেই হরেকৃষ্ণ? হ্যা বলছে, কি না বলছে, কি ক'রে তাহলে সেটা বুঝব?

ললিতা। আপনি বুঝতে পারবেন না, কিন্তু আমার পোষা ময়না ত? আমি হয়ত বুঝতেও পারি চেষ্টা করলে।

সুমোহিত। (ব্যগ্রভাবে) একটু চেষ্টা ক'রে বুঝে বলুন না, ও কি বলল!

ললিতা। সেটা কি এখনই করা দরকার?

সুমোহিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখনই।

ললিতা। অন্ততঃ একটা দিন ভাববার সময় দিন আমাকে। ওর কথা বুঝতে আমার সময় লাগে একটু।

সুমোহিত। না, না, আমি আজই জানতে চাই, আজই, এখনই।

ললিতা। (একটু শব্দ ক'রে হেসে) এই মুহূর্ত্তে?

সুমোহিত। হ্যাঁ, সম্ভব হলে এই মুহূর্ত্তে।

ললিতা। কেন, এত তাড়া কিসের? পাখীটা ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না?

সুমোহিত। (একটুক্ষণ নতমস্তকে চুপ ক'রে থেকে) আকণ্ঠ যার তৃষ্ণা, তার সামনে অমৃতনির্ঝর বইছে, আর আপনি জানতে চাইছেন তাড়া কিসের?

ললিতা। অত্যন্ত সাধারণ একটা ময়না, কি এমন আপনি দেখলেন তার মধ্যে?

সুমোহিত। দেখেছি আমার একটি আলোয় ভরা, আনন্দে ভরা, চরিতার্থতা ভরা ভবিষ্যৎকে।

ললিতা। ও সব কেতাবী কথা আমার ময়না বুঝতে পারে না।

সুমোহিত। আমি তোমাকে দেখেছি, একমাত্র তোমাকে, যে তুমি একান্তই আমার। সেখানে আর কি দেখেছি সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

ললিতা। থামুন, থামুন! কথাটা ময়নার সঙ্গে হচ্ছিল।

সুমোহিত। তাই ত হচ্ছে। আমাকে একটুও ভালবাসে কি না, আমার এ প্রশ্নের উত্তরে ময়না কি বলল, সেটা আপনার কাছ থেকে শুনব ব'লেই ত ব'সে আছি।

ললিতা। ময়না বলল, কথা দিয়েই সব কথা বলতে হবে কেন?

সুমোহিত। (আনন্দোজ্জ্বল হাসিতে মুখ ভ'রে, ময়নাটার দিকে আরও একটু ঝুঁকে) ময়না, তোমায় আমি নিয়ে যাব, তুমি যাবে আমার সঙ্গে? আর একটা নাম তোমাকে শিখিয়ে দেব, ললিতা! এত যত্ন তোমাকে আমি করব, এত ভালবাসব, যা পৃথিবীর কোনো মানুষ আর কোনো মানুষকে—

ললিতা। পাখীকে।

সুমোহিত। পাখীকে বাসে নি। যাবে ত আমার সঙ্গে?

(ময়না নিরুত্তর।)

কই, এবারে হ্যাঁ বা না কিছুই বলল না ত?

ললিতা। কথাগুলো যে ওর সঙ্গে হচ্ছে না, সেটা হয়ত এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে।

(এক সঙ্গে অনেকগুলি শাঁখ বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জয় হিন্দ, জয় হিন্দ! আবার শাঁখ বাজছে।)

ললিতা। (উঠে দাঁড়িয়ে) শাঁখ বাজছে! এ শাঁখ বাজার মানে জানো ত?

সুমোহিত। (উঠে ললিতার পাশে দাঁড়িয়ে) জানি। মানে, যুদ্ধের জন্যে তৈরি হও।

ললিতা। ঠিক তাই। আমরা পারব ত?

সুমোহিত। পারব না, এমন কিছু পৃথিবীতে আছে ব'লে এখন মনে হচ্ছে না।

(ময়না: হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ।)

কি বলল ময়না?

ললিতা। বলল, আমরা নিশ্চয় পারব। তুমি আমার কতটুকু জানো, আমিই বা তোমার কতটুকুকে জেনেছি, কিন্তু তাতে কিছুই এসে যাবে না। আমরা পারব। জেনে মানুষকে বোঝা যায় না, ভালবেসে বুঝতে হয়, সেই ভাবে পরস্পরকে আমরা বুঝেছি। আর ঐ ময়নাটা আমাদের বুঝিয়েছে, এমন একটা জায়গায় আমাদের মিল, আমরা পারব।

(পদ্মার প্রবেশ, পেছনের পরদা ঠেলে।)

পদ্মা। লতা!

সুমোহিত। (উঠে) আমি এখন যাই তা হলে।

পদ্মা। আচ্ছা, এসো। এর পর আবার যদি এস ত মা আর বাবাকে নিয়ে এস সঙ্গে ক'রে।

সুমোহিত। তাঁদের ত একবার আনতেই হবে এখন।

(পদ্মাকে নত হয়ে নমস্কার ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।)

পদ্মা। আচ্ছা, লতা!

ললিতা। মা।

পদ্মা। ময়নাটাকে তুই দিয়ে দিলি?

ললিতা। দিয়েই দিলুম মা। তুমি শুনছিলে বুঝি আমাদের কথা?

পদ্মা। শুনছিলাম মানে কি আর শুনছিলাম? একটু একটু কানে আসছিল। তা, তুই পারবি ময়নাটাকে ছেড়ে থাকতে?

ললিতা। না।

পদ্মা। তবে?

ললিতা। পারব না জেনেও দিয়ে দিলাম।

পদ্মা। তা বেশ করেছিস্ দিয়েছিস্। হাড়-জ্বালানে একটা পাখী। আর ছেলেটাও বড্ড ভালবেসে ফেলেছে পাখীটাকে। না দিলে দুঃখ পেত।

ললিতা। দুঃখ যে আমি কাউকে দিতে পারি না, তা ত তুমি জানোই।

যবনিকা।

মানুষের মন

শ্রীসুখলতা রাও

নিজের অনুভূতির ভিতর দিয়ে আমরা জগতকে জানি। আমাদের সব অনুভূতি, বিশেষতঃ স্পষ্ট অনুভূতিগুলি, ঘটনা পরম্পরা একটা ছাপ রাখে আমাদের মনে। এই ছাপটি পড়ে স্মৃতি রূপে। জড় মস্তিষ্কের উপরেও প্রভাব বিস্তারিত হয় নিশ্চয়ই।

এই যে মন, এ কেমন জিনিস, দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট কোনও শক্তির আবরণ, কি দেহের ভিতরে সূক্ষ্ম দেহ, কি আর কিছু—তা মানুষ আজও জানে না। এই মনে সঞ্চিত স্মৃতির উপকরণ নিয়ে মানুষের বুদ্ধি কাজ করে মন ও দেহের ভিতর দিয়ে। মনকে ব্যাপকতর অর্থে ধরতে গেলে বুদ্ধি ও মনের অন্তর্গত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীরা এ সম্বন্ধে যে জ্ঞান দান করেছেন, সেই জ্ঞানের আলোকের ক্ষীণ রশ্মি যতটুকু পেয়েছি, তারই সাহায্যে জীবনের অভিজ্ঞতাসকল যেটুকু বুঝতে পেরেছি, সেই বিষয়ে কিছু বলবার ইচ্ছা।

মানুষের মনের প্রধানতঃ দুইটি স্তর আছে। যে স্তর সাক্ষাৎ ভাবে দেহের ভিতর দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে যুক্ত সেটিকে সচেতন মন বলা হয়। আরও গভীরে যে স্তর আছে, যেখানে স্মৃতি সঞ্চিত থাকে, তাকে বলা হয় অবচেতন মন। মনের গভীরতম প্রদেশে আর একটি চেতনার আভাস পাওয়া যায়। এই স্তরগুলির সীমারেখা নির্দ্ধারণ করা যায় না। একটি অন্যটির সঙ্গে এমন ভাবে মিশে আছে যে, প্রান্তদেশে একটির ভাব অন্যটিতে সংক্রামিত হয়, বা গড়িয়ে পড়ে। অবচেতনা, এক প্রান্তে বাহ্য চেতনা, ও অপর প্রান্তে গভীরতম চেতনার সঙ্গে যুক্ত।

এই প্রসঙ্গে সাধারণতঃ নিদ্রা ও স্বপ্নাবস্থার কথা আলোচনা করা হয়। স্বপ্নে, সুপ্ত মনের কোনও অংশ, কোনও কারণে উত্তেজিত হলে, স্মৃতিতে সঞ্চিত ছাপগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, এবং মনের এই ক্রিয়া স্বপ্নরূপে প্রতিভাত হয়। এ কাজ অনিয়মিত ভাবে হয়।

এ বিষয়ে উল্লেখ করা গেল, আর একটি বিষয়ের অবতারণার জন্য। মানুষের মন যে কেবল নিজের উপর আধিপত্য করে তা নয়। একজনের মন অন্যজনের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, অর্থাৎ তাকে নিজের ভাবনায় ভাবিত করতে পারে। তার সাধারণ দৃষ্টান্ত আমরা অনেকেই দেখেছি 'হিপ্‌নটিজ্‌ম্' বা সম্মোহন বিদ্যায়। সে ক্ষেত্রে, এক মন অন্য মনের বাহ্য চেতনাকে সুপ্ত করে তবে তাকে প্রভাবিত করে। 'থট্ রীডিং' বা পরের মনের চিন্তা অনুধাবনের কথাও আমরা জানি। এ ক্ষেত্রে, বাহ্য চেতনা জাগরিত থাকে, যা ঘটে, স্ব-ইচ্ছায়, সচেতন অবস্থায় ঘটে। দুই মনেরই সম্পূর্ণ সহযোগ থাকে।

কদাচিৎ দেখা যায়, এক মনের ইচ্ছার অপেক্ষা না

রেখে, অন্য মন তার উপরে প্রভাব বিস্তার করে, তাকে কিছু দেখায় বা বলে। তখন মানুষ নিদ্রায় এবং জাগ্রত অবস্থায়ও এরূপ স্বপ্ন দেখে, অথবা অকথিত বাণী শোনে। এই ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ মন-জানাজানির ব্যাপারকে ইংরেজিতে 'টেলেপ্যাথি' বলা হয়।

এ কি করে সম্ভব হয়? মনোবিজ্ঞান যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা বলেন, যেমন শব্দ-তরঙ্গ এক কেন্দ্রে ঘোষিত হয়ে, ঘরে ঘরে 'রেডিও' যন্ত্রে ধরা পড়ে, কতকটা সেইরূপ, মানুষের চিন্তা-তরঙ্গও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং উপযুক্ত আধারে ধরা পড়ে।

ইচ্ছা নিরপেক্ষ যে বার্তা অন্য মন থেকে এক মনে এসে পৌঁছায়, তা নানা ভাবে আসতে পারে। কিন্তু আসে যে, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দূর দূরান্ত অতিক্রম করে, বিশেষ প্রয়োজনে আসে। দু'একটি উদাহরণ এখানে দিই। সবগুলিই বিশ্বস্তসূত্রে শুনেছি, বন্ধুবান্ধবের জীবনে দেখা দিয়েছে।

আমাদের এক বন্ধুর স্ত্রী উৎসবে যোগ দিতে কটক থেকে কলকাতায় আসেন। তাঁর শরীর সুস্থই ছিল। কলকাতায় একদিন তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই সময়ে কটকে তাঁর স্বামী ঘুমের ভিতরে স্বপ্ন দেখলেন, স্ত্রী যেন তাঁর কাছে আসছেন, কিন্তু বাধা পড়ল, তাঁদের দু'জনের মাঝখানে একটা সাপ মাথা তুলে দাঁড়াল। স্ত্রীও অমনি যেন একটা আলোর মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। বন্ধুটি বুঝলেন, তাঁর স্ত্রীর চিরবিদায়ের বাণী এমনি ভাবে পৌঁছাল তাঁর কাছে। পরে কলকাতায় খবর এল।

এক রাতে, একটি যুবকের আকস্মিক মৃত্যু হ'ল। তার দিদি তখন দূরে অন্য বাড়ীতে ঘুমিয়ে। একই সময়ে দিদি স্বপ্ন দেখল, তাদের পরলোকগতা জননী অধীর ব্যাকুলতায় ছুটে আসছেন আর বলছেন, "বাঁচাতে পারলি না? তোরা বাঁচাতে পারলি না?"

কোথায় পার্বত্য প্রদেশে একটি স্নেহের পাত্র দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাল, কলকাতায় থেকে সে বিপদের ছবি দেখলেন তার প্রতি স্নেহশীলা মহিলা!

জড় জগতে অবস্থিত আমাদের আত্মা, জড় জগতের নিয়মই অনুসরণ করে। অপরের মন থেকে আমাদের মনে যে বার্তা এসে পৌঁছায় তা প্রকৃতির নিয়ম সূত্র ধরেই আমাদের চেতনায় সঞ্চারিত হয়। ঠিক কি এ নিয়মগুলি আমরা আজও মানি না। তবে জানবার চেষ্টা হয়েছে, এবং এই চেষ্টার ফল দেখে মনে হয় অন্তত: কিছু জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব নয়। দেখা যায়, এক মনের বাহ্য চেতনা লুপ্তপ্রায় থাকলে, তবে তার অবচেতনায় অন্য মনের বার্তা এসে পৌঁছতে সক্ষম হয়। অথবা, কারও মনের অবচেতনায়, ইন্দ্রিয় নিরপেক্ষ কোনও বার্তা গ্রহণ করতে হলে, সেই মনকে আত্মবিস্মৃত হতে হবে। এইটি হল মন-জানাজানির প্রধান সর্ত।

ঘুমের ভিতরে যখন স্বভাবতঃই বাহ্য চেতনা সুপ্ত থাকে তখন ঐরূপ বার্তা পৌঁছতে পারে স্বপ্নের আকারে। কিন্তু সে স্বপ্ন সাধারণ স্বপ্ন নয়। সে ছবি সৃষ্টি করে অন্য কোনও মন, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। সৃষ্টি করে গ্রহিতার অবচেতনায়, তার বাইরের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে নয়, অন্তরের কোনও গভীরতম প্রদেশ হতে, এবং স্মৃতিতে সঞ্চিত উপকরণ নিয়ে। আমাদের চেতনাকে ঘিরে যে মনোময় জগৎ রয়েছে, তার পরিচয় আমরা মাঝে মাঝে এমনি করে আমাদের মন মনাতীত আধ্যাত্মিক মতের প্রতি উন্মুখ হয়।

আগে বলেছি, জাগ্রত অবস্থায়ও মানুষ ঐরূপ অসাধারণ দৃশ্যও দেখতে পারে। কেউ ছবি দেখে, কেউ বাণী শোনে, কারও কাছে বা রূপকে বার্তা জানান হয়। এর একটি দৃষ্টান্ত আমার বিবৃত প্রথম ঘটনাটিতে পাওয়া যায়। বলা হয়, যার মনের গঠন যেমন তার কাছে সেই ভাবে খবর আসে। সব সময়ে যে পরলোকযাত্রী আত্মা বাণী প্রেরণ করে তা নয়। কেউ কেউ মনে করেন, পরলোকবাসীর কাছ থেকে ও খবর আসে। দুর্ঘটনার দৃশ্যটি যেখানে ফোটে, কার মনের চিন্তা প্রবাহ ধরে এসে অন্য মনে পৌঁছায়, ঠিক বলা যায় না, অনুমান করা যায় মাত্র। মনস্তত্ত্ববিদ্‌ 'মায়ার্স' এর বই থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে দিই। একজন ইউরোপীয় মহিলা, চা পানের পর বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে একটি ছবি ভেসে উঠল। তিনি দেখলেন, তাঁর ভাই, যিনি, জাহাজে কাজ করতেন, জাহাজের রেলিং-এর কাছে কি করছেন, হঠাৎ কেমন করে উল্টে সমুদ্রের জলে পড়ে গেলেন। মহিলাটি দেখতে পেলেন, ভাইয়ের প্যান্টের নীচের দিক গুটিয়ে গুটিয়ে তোলা রয়েছে। এই যে ছবিটি তিনি দেখলেন, এ ছবি তাঁর ভাইয়ের মন পাঠিয়েছিল বলে মনে হয় না। তিনি তো নিজের পড়বার দৃশ্য দেখেন নি, বা পড়বার সময়ে প্যান্টের কথা ভাবেন নি। সেখানে উপস্থিত কোনও লোকের মনের চিন্তা থেকে ছবিটি এসে থাকতে পারে। কিন্তু সেই লোকটির

সেই মুহূর্তে ওই মহিলাকে খবর পাঠাবার কথা ভাবাও সম্ভব নয়। অথচ বোন খবর পেলেন! সমুদয় ছবিটি যখন একজনের মনে এসে পৌঁছায় তখন ঠিক কি ঘটে জানা নেই। নানা রকম ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু অতীব বিস্ময় এই যে, খবর এসে "পৌঁছায় তারি কাছে, যার আছে প্রয়োজন জানবার" যার প্রিয়জন সঙ্কটাপন্ন! দেখা গেছে, যদি কোন বার্তা পাঠাবার দরকার হয়ে পড়ে, অথচ গ্রহিতার মন যদি তখন শান্ত না থাকে, নিষ্ক্রিয় না থাকে, বার্তা গ্রহণ করবার উপযুক্ত না থাকে, তবে তার মনকে যেন বার্তা গ্রহণ করবার জন্যই কোনও উপায়ে আত্মবিস্মৃত করে প্রস্তুত করে নেওয়া হয়। কে প্রস্তুত করেন কে বলবে? যাঁরা আত্মিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন, তাঁরা বর্ণনা করেছেন, কেমন ভাবে অপ্রত্যাশিত মনোময় ছবি দেখা দেয় গ্রহিতার কাছে; অতর্কিতে তার বুকের মধ্যে কোথা থেকে একটা ধাক্কা এসে লাগে, তার চোখের সামনে প্রতিভাত হয় অনুজ্জ্বল আলো এবং সেই আলোতে জেগে ওঠে ছায়াময় ছবি।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা এ বর্ণনার সাক্ষ্য দেয়। আমার পরিচিত একটি ইংরেজ মহিলার কাছেও অনুরূপ বর্ণনা পেয়েছি। যার জীবনে এমনি ঘটনা ঘটেছে, সে কখনও এর রোমাঞ্চ ভুলবেন না। আমার জীবনে কয়েকবার আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, ইচ্ছা হয় আত্মীয় স্বজনকে সে সব কথা জানাতে। সেইজন্য, 'পথের আলো' ও 'Leading Lights' নামে আমার দু'খানা স্মৃতিকথার বইতে ঘটনাগুলির উল্লেখ করি।

বাস্তবিকই বিশ্বসংসার প্রেমের ডোরে বাঁধা। যেখানে স্নেহ প্রেমের সম্বন্ধ আছে, সেখানে এখন অযাচিত আকস্মিক অচিন্তনীয় ভাবে মন জানাজানি সম্ভব। এ রহস্যের কূল পাওয়া যায় না। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন যিনি, তাঁর করুণার অন্ত নেই।

সম্পূর্ণ অপরিচিত যারা, এমন লোকেদের ভিতরে মন-জানাজানি হয়, যদি এই জানাজানিতে কারও কোন উপকার হবার সম্ভাবনা থাকে। যাঁরা কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মজীবনী পড়েছেন, তাঁরা এই রকম ব্যাপারের দৃষ্টান্ত পেয়েছেন। কৃষ্ণকুমারবাবু স্কুলে ছেলে পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর বোধ হল, তাঁর মনে কে বলল, "বাড়ী যাও।" প্রথমে গ্রাহ্য করেন নি, অসম্ভব বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার এত প্রবল ভাবে এ বাণী ঘোষিত হল যে, তিনি তখনি উঠে বাড়ীর পথে রওনা হলেন। বাড়ীর কাছাকাছি যেতে, তিনটি বিপন্না বিদেশিনী তরুণীর দেখা পেলেন। দুষ্ট লোক কয়েকজন তাদের অনুসরণ করছিল। কৃষ্ণকুমার বাবুর প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব সাহস ও সাহায্যের বলে তারা রক্ষা পেয়ে গেল। তিনি অন্তরে বাণী শুনেছিলেন, এবং সেই বাণী অনুসারে কাজ করেছিলেন বলেই, তিনটি অসহায়া বালিকা মৃত্যু-দূতের হাত থেকে বাঁচতে পেরেছিল। বালিকাগুলির সন্ত্রস্ত চিন্তার তরঙ্গ এসে আঘাত করল তাঁরই মনে, যিনি তাঁদের উদ্ধার করতে বিশেষ ভাবে উপযুক্ত ছিলেন। কেন-না তাঁর বাড়ীর কাছেই ঘটনাটি হয়েছিল, এবং তাঁর মন ছিল উন্নত পরদুঃখকাতর ও তেজস্বী।

অন্য এক আশ্চর্য ব্যবস্থা আছে মানুষকে বিপদের কথা জানাবার। যেন, মানুষের একটি ইন্দ্রিয় আছে। যেন, আমাদের মন তার অবচেতনায় আসন্ন বিপদের আভাস পায়, যে আভাস পাওয়ার জন্য, বিপদকে এড়িয়ে যেতে পারে।

একটি বিদেশী ভদ্রলোক আমাকে এই ঘটনার কথা বলেছিলেন, তিনি সাইকেলে চড়ে খুব বেগে যাচ্ছিলেন একটা রাস্তা ধরে। কিছুদূর গেলে, একটা পুল পার হতে হবে তাঁকে। পুলের কাছাকাছি যেতে হঠাৎ তাঁর কি হল, তিনি গন্তব্য পথে না গিয়ে, পাশের একটা সরু রাস্তা ধরে সাইকেল চালিয়ে দিলেন। ফিরে এসে যখন পুলের দিকে গেলেন, দেখলেন পুলটা ভেঙ্গে পড়ে গেছে! যদি অমন আশ্চর্য ভাবে, অন্য পথে তাঁর সাইকেল না যেত, যদি যেমন আসছিলেন তেমনি একরোখা বেগে পুল পার হতে যেতেন, তবে সামলাবার অবসর থাকত না, সাইকেল শুদ্ধ ভাঙ্গা পুলের উপর থেকে নীচে পড়ে যেতেন।

ঠিক এমনি ঘটনা আমার জীবনেও হয়েছিল, যার জন্য বিষধর সাপের কবল হতে রক্ষা পাওয়া গিয়েছিল। মানুষের জীবনে বিপদের দিন আসে, নিদারুণ দুঃখের অন্ধকারে সব কিছু ঢেকে যায়। তবু সেই অন্ধকারের পারে আমরা আলোর রেখা দেখতে পাই, অন্তরে অভয়-বাণী শুনতে পাই, মুহ্যমান প্রাণে বল লাভ করি। খুব অল্পই এমন ব্যাপার হয়। কিন্তু যখন হয়, তখন তা আমাদের মনকে গভীর ভাবে নাড়া দেয়।

কি অপূর্ব আশ্বাস! এই অপার রহস্যের অন্তরালে যে এক পরম স্নেহময় মঙ্গল ইচ্ছা বিরাজমান, তাতে কি সন্দেহ আছে? বাক্য মনের অতীত সেই উপস্থিতি। প্রসিদ্ধ লেখক এমার্সনের একটি কথা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি":

As there is no screen or ceiling between our heads and the infinite heavens, so there is no bar or wall is the soul, where man the effect, clases, and God the cause, begins, We lie open on one side to the deeps of spiritual nature, to the attributes of God.

যেমন আমাদের মস্তকের ও অনন্ত আকাশের মাঝখানে কোন আড়াল বা ছাদ নেই, তেমনি আত্মাতেও এমন কোন বাধা বা প্রাচীর নেই, যেখানে কার্যফল মানুষ শেষ হয়েছে, এবং কার্যের কারণ ভগবান আরম্ভ হয়েছেন। এক ধারে' আমরা আধ্যাত্মিক প্রকৃতির গভীরতার প্রতি-ভগবানের স্বরূপের কাছে, উন্মুক্ত।

রামপ্রসাদ ও লোচনদাসের একটি বিশিষ্ট ছন্দ

শ্রীআনন্দমোহন বসু

কবি লোচনদাস ও কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—দুই যুগের দুই কবি। উভয়ের মাঝে দু'শ বছরের ব্যবধান, কিন্তু বাংলা ছন্দ রচনার ক্ষেত্রে এঁদের দু'জনকেই স্মরণে রাখবার মত। এঁরা উভয়েই কথ্যভাষার বাগ্‌ভঙ্গিবিশিষ্ট 'ছড়ার ছন্দ' অর্থাৎ 'দলমাত্রিক (syllabic) ছন্দ'-কে কাব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলেন। লোচন এক্ষেত্রে পথিকৃৎ, কিন্তু রামপ্রসাদও নিতান্ত ন্যূন নন; তিনি এ-ছন্দকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন তাঁর শাক্ত-পদাবলীতে।

১

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সাধক রামপ্রসাদ সেন। কবিত্বের দিক দিয়ে সমসাময়িক কবি ভারত-চন্দ্রের পরেই তাঁর স্থান। সাধক-কবি রামপ্রসাদ বাঙালীর নিকট প্রধানত শ্যামাসংগীত বা শাক্তপদাবলী-রচয়িতা হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু তিনি শুধু শাক্ত-পদাবলীই রচনা করেন নি, যুগপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে কয়েকখানি কাব্যও লিখেছিলেন। তিনি কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন, সীতাবিলাপ কাব্য ছাড়া বিদ্যাসুন্দর কাব্যও রচনা করেছিলেন।

ভারতচন্দ্রের ন্যায় রামপ্রসাদও কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদভাজন হয়েছিলেন। মহারাজ তাঁকে ভূসম্পত্তি দান ত করেছিলেনই, তা ছাড়া দিয়েছিলেন 'কবিরঞ্জন' উপাধি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক কালে দুই জন রামপ্রসাদ শ্যামাসংগীত রচনা করেছিলেন,—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ও দ্বিজ রাম-প্রসাদ। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, আর দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী। 'প্রসাদ'-ভণিতাযুক্ত যে-সব পদে পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায় সেগুলি যে পূর্ববঙ্গবাসী দ্বিজ রামপ্রসাদের রচনা, একথা অনুমান করলে ভুল হবে না।

রামপ্রসাদ ক'জন ছিলেন, তাঁরা কি কি কাব্য রচনা করেছিলেন, এসব বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নয়; আমাদের আলোচ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামপ্রসাদ-রচিত শাক্তপদাবলীর ছন্দ। তাই সমসাময়িক দুই কবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও দ্বিজ রামপ্রসাদের শাক্তপদাবলী নির্বিশেষে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। রামপ্রসাদ-ভণিতাযুক্ত অসংখ্য পদ নানাস্থানে ছড়িয়ে আছে। সেই সব পদ সংগৃহীত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশের অপেক্ষা রাখে। রামপ্রসাদের ভণিতাযুক্ত সর্বাপেক্ষা অধিক শাক্তপদাবলী সংগ্রহ করে একত্র প্রকাশ করেছেন ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাঁর 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' গ্রন্থের পরিশিষ্টে এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁর 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' গ্রন্থে। এই দুই গ্রন্থে রামপ্রসাদের ভণিতাযুক্ত যে তিন শতাধিক শাক্তপদাবলী সন্নিবিষ্ট হয়েছে আমার এই ছন্দালোচনায় সেইগুলিকেই সমধিক ব্যবহার করেছি।

রামপ্রসাদ তাঁর পদাবলীর মধ্য দিয়ে তাঁর উপাস্য-দেবীকে একান্ত আপনার ভেবে সুখ-দুঃখ ও মনের কথা বলেছেন। তাঁর এই গানের মধ্যে ভাষার অলংকরণ একপ্রকার নেই বললেই চলে। তিনি তাঁর পদাবলীতে যে-সব বাগ্‌ভঙ্গি ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন তা কথ্য-

ভাষায়। তাঁর পদাবলীর বাক্যগঠনরীতিও কথ্যভাষার ঢঙে। রামপ্রসাদ তাঁর অধিকাংশ পদাবলী রচনা করেছেন 'ছড়ার ছন্দ' অর্থাৎ 'দলমাত্রিক (syllabic) ছন্দে'। রামপ্রসাদী শাক্তপদাবলীর মধ্যে যেগুলির 'প্রসাদী সুর—একতালা' তার অধিকাংশই এই দলমাত্রিক ছন্দে রচিত। এই সব পদাবলীর ছন্দোপংক্তি বা চরণগুলি অসমান—দুই বা চার পর্বের। অনেক চরণেই আদিতে ক্ষুদ্রাকার অতিরিক্ত পর্ব আছে। কোন কোন চরণের মধ্যে ও শেষেও অনুরূপ অতিরিক্ত পর্ব লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত,—

আদিতে অতিরিক্ত পর্ব—

(ক) লবে) কড়ার কড়া | তস্য কড়া |
এড়াবে না | রতি মাসা |
ওরে) মনের মতন | কর যতন |
রতন পাবে | অতি খাসা |
['ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ', ৯৫ নং পদ]

মধ্যে অতিরিক্ত পর্ব—

(খ) প্রসাদ বলে | বলবো কি মা |
বলতে কিছু | চায় রসনা |
ঐযে) জোরকা লাঠি | শিরকা উপর | **(আমার)**
মন বুঝেছে | প্রাণ বুঝে না |
[তদেব, ১৯১ নং পদ]

(গ) মুখে) জয় দুর্গা শ্রী | দুর্গা বল |
এই) ভবের চড়ায় | তনুর জাহাজ |
ডুবে বুঝি | **(প্রায়)** গরত হ'ল |
[তদেব, ২২৬ নং পদ]

চরণের শেষে অপূর্ণ বা অতিরিক্ত পর্ব—

(ঘ) মা,) নিম খাওয়ালে | চিনি বলে |
কথায় করে | ছলো |
ওমা) মিঠার লোভে | তিত মুখে |
সারা দিনটা | গেলো |
[তদেব, ৯১ নং পদ]

(ঙ) প্রসাদ বলে | নির্জঞ্জালে |
যদি যাবি | চলি |
সকল ছেড়ে | হৃদ্ মাঝারে |
ভাবরে মুণ্ড | মালি |
[তদেব, ১৮৪ নং পদ]

রামপ্রসাদের ছন্দের আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একই প্রকারের অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল ব্যবহার। এই অন্ত্যানুপ্রাস দিতে গিয়ে বহুস্থলে তিনি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত,—

এবার আমি সার ভেবেছি।
এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি॥
ভাবীর কাছে ভাব পেয়ে মা,
সকল ভাবকে এক করেছি।
ত্রিশির মঙ্গলার মাঝে
শুদ্ধমন তায় রেখেছি॥
[তদেব, ১৭৪ নং পদ]

রামপ্রসাদ তাঁর পদাবলী রচনায় যে 'ছড়ার ছন্দ' অর্থাৎ 'দলমাত্রিক ছন্দ' ব্যবহার করেছেন তার পর্বে আছে চারটি করে দল (syllable)। মাঝে মাঝে এই চতুর্দল পর্বের সঙ্গে ত্রিদল পর্বও ব্যবহৃত হয়েছে। এই সব ত্রিদল পর্বে অন্তত একটা রুদ্ধদল (closed syllable) থাকা দরকার, না হলে ছন্দপতন অনিবার্য। চতুর্দল পর্বের সঙ্গে যে-সব ত্রিদল পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে তার অধিকাংশই মধ্যের কোন পর্বে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে শেষেও ত্রিদল পর্ব লক্ষ্য করা যায়। ত্রিদল পর্ব ছাড়াও মাঝে মাঝে আবার পঞ্চদল পর্বের ব্যবহার পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর চতুর্দল 'ছড়ার ছন্দে' কখনও কখনও পঞ্চদল পর্ব ব্যবহার করেছেন। দৃষ্টান্ত,—

ভয়কে যারা | ভয় করে সব |
জাগিয়ে রাখে | ভয় |

রামপ্রসাদের পঞ্চদল পর্বের দৃষ্টান্ত,—

মনরে আমার | যতন করে |
চুটিয়ে ফসল | কেটে নে না |

চতুর্দল ছড়ার ছন্দে উক্তরূপ পঞ্চদল পর্ব থাকলে তাকে সঙ্কুচিত করে ('জাগ্যে রাখে', 'চুট্যে ফসল') চতুর্দল পর্বের ন্যায় পড়তে হবে।*

নিম্নে উদ্ধৃত গানটিতে রামপ্রসাদের 'দলমাত্রিক ছন্দের' অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে বিধৃত হয়েছে।

তারা! তোমার | আর কি মনে | আছে |
মা,) এখন যেমন | রাখলে সুখে |
তেমি সুখ কি | পাছে |
শিব যদি হয় | সত্যবাদী | তবে কি তো | মায় সাধি |
মাগো, ও মা,) ফাঁকির উ | পরে ফাঁকি |
ডান চক্ষু | নাচে |
আর যদি থা | কিত ঠাঁই |
তোমারে সা | ধিতাম নাই |
ওগো, ওমা,) দিয়ে আশা | কাটলে পাশা |
তুলে দিয়ে | গাছে |

* ১৩৬৭ সালের আশ্বিন মাসের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত লেখকের বাংলা ছন্দের দ্বিজাতি ও ত্রিজাতিবাদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রসাদ বলে | মন দড় | দক্ষিণায় | জোর বড় |
মাগো, ওমা,) আমার দফা | হলো রফা |
দক্ষিণা হ | য়েছে |
[তদেব, ১৬৯ নং পদ]

এই গানটিতে এই সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

ক) চরণের আদিতে 'মা', 'মাগো, ওমা' প্রভৃতি অতিরিক্ত পর্ব।

খ) চরণের শেষে অপূর্ণ পর্বের ব্যবহার—আছে, পাছে, নাচে, গাছে প্রভৃতি।

গ) দুই, তিন ও চার পর্বের চরণ।

ঘ) তিন পর্বের চরণ মাত্র একটি—প্রথম চরণটি। ওই চরণটির প্রথম পর্বটিকে—(তারা! তোমার)—অতিরিক্ত পব হিসাবে ধরলে শুধু দুই ও চার পর্বের চরণই লক্ষ্য করা যায়। দুই ও চার পর্বের চরণের মিশ্রণে গান রচনা রামপ্রসাদের একটা স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য।

ঙ) কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি পর্বের মধ্যে শব্দের ফাঁক নেই, বা হলন্তদল ব্যবহার করেও ফাঁক সৃষ্টি করা হয় নি। এই সব ক্ষেত্রে শব্দের মধ্যকার স্বরান্তদলের উপর যতি পড়েছে এবং একটি শব্দকে ভেঙে দুই দলে চালান করতে হচ্ছে। দৃষ্টান্ত—ফাঁকির উ | পরে ফাঁকি |, আর যদি থা | কিত ঠাঁই |, দক্ষিণা হ | য়েছে |, ইত্যাদি।

চ) ত্রিদল পর্বের ব্যবহার—মন দড় | দক্ষিণায় | জোর বড় |, ইত্যাদি।

ছ) রামপ্রসাদের দলমাত্রিক ছন্দ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বেশীর ভাগ গানেই কিছুটা করে ধীর লয় এসে যাচ্ছে। **'দলমাত্রিক ছন্দ' স্বভাবতঃ দ্রুত-লয়ের ছন্দ হলেও রামপ্রসাদের গানে এই ধরনের প্রাপ্তির কারণ অধিকতর মুক্তদল পর্বের ব্যবহার।**

জ), চতুর্দল দলমাত্রিক ছন্দের প্রতিটি পূর্ণ পর্বে চার মাত্রা থাকে।*
রামপ্রসাদের চতুর্দল দলমাত্রিকে রচিত গানগুলির পর্বও তাই চতুর্মাত্রিক। বর্তমান প্রবন্ধে দেখান হয়েছে যে, কবিরঞ্জন তাঁর চতুর্মাত্রিক চতুর্দল পর্বের চরণে মাঝে মাঝে ত্রিদল ও পঞ্চদল পর্ব ব্যবহার করেছেন। এতে করে মাঝে মাঝে ছন্দপতন ঘটা অসম্ভব নয়, তবে ক্ষেত্র বিশেষে যে বৈচিত্র্য এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি—তাঁকে মধ্যযুগের কবি বলা চলে। তাঁর সময়ে বাংলা গদ্য সুষ্ঠুরূপ ধারণ করেনি, পদ্য রচিত হ'ত সাধুভাষার বাগ্‌ভঙ্গিতে। সেই কালে তিনি গান রচনার ক্ষেত্রে কথ্যভাষাকে পূর্ণ সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়ে যেরূপ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছিলেন, তার তুলনা আধুনিক কালেও বিরল। তাঁর কালে বাংলা ছন্দশাস্ত্র ছিল না, একমাত্র মহাকবি ভারত-চন্দ্র রায়গুণাকর ছাড়া আর কেউ ছন্দ প্রয়োগের দিকে যথার্থ নজর দেন নি। সেই যুগে কথ্যভাষার বাগ্‌ভঙ্গি ও 'ছড়ার ছন্দ (দলমাত্রিক)'কে কাব্যে পূর্ণ মর্যাদা দিতে গিয়ে রামপ্রসাদের যেসব স্খলন-পতন-ত্রুটি ঘটেছিল, তা অবশ্যই মার্জনীয়। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথ যে-ছন্দকে পূর্ণ সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়েছেন, যে-ছন্দে মহাকাব্য রচনার সম্ভাবনা আছে বলে স্বীকার করেছেন, তার দেড়শ' বছর পূর্বে রামপ্রসাদ সেই ছন্দকে সত্যকার সাহিত্যিক মর্যাদা দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেলেন।

২

শাক্তকবি রামপ্রসাদের পূর্বে বৈষ্ণবকবি লোচনদাস তাঁর গানে এই ছন্দের প্রথম ব্যবহার করেন। তবে লোচনদাস এ-ছন্দ রামপ্রসাদের মত এত ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেন নি। লোচনদাস ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য-ভাগের কবি। রামপ্রসাদের প্রায় দু'শ বছর (এখন থেকে চারশ' বছর) পূর্বে লোচন কবিতা রচনায় কথ্য-ভাষার যে বাগ্‌ভঙ্গি ব্যবহার করেছিলেন, তারই সার্থক অনুবর্তন করেন রামপ্রসাদ তাঁর পদাবলীতে। লোচনের 'চৈতন্যমঙ্গল' কাব্যের 'নদীয়া-নাগরী' বিষয়ক পদে এবং তাঁর 'ব্রজলীলা রসোদ্গার'-এর পদগুলিতে কথ্যভাষার বাগ্‌ভঙ্গি প্রযুক্ত হয়েছে এবং গতানুগতিক পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দের পরিবর্তে লঘুগতি ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। লোচনের এই শ্রেণীর পদগুলি 'ধামালীর পদ' নামেও প্রসিদ্ধ।

লোচনদাসের উক্ত কথ্যভাষার বাগ্‌ভঙ্গিতে রচিত পদাবলীর ছন্দ সম্বন্ধে ৺সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁর সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী'র ভূমিকায় লিখে-ছিলেন, "লোচনদাস এই ধামালীর পদগুলিতে ওজোগুণ-পূর্ণ সালংকার সাধুভাষার পরিবর্তে স্ত্রীজাতির সরল ও স্বাভাবিক কথ্যভাষার এবং পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি গুরু-গম্ভীর অক্ষরবৃত্ত ছন্দের পরিবর্তে চমৎকার সতেজ ও লঘু-গতি মাত্রাবৃত্তের ব্যবহার করিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালী কবিদিগের অনেকেই আজকাল বাঙ্গালা কবিতায় এই মাত্রাবৃত্ত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কিন্তু আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, প্রায় চারিশত

* লেখকের 'বাংলা ছন্দের দ্বিজাতি ও ত্রিজাতিবাদ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বৎসরের প্রাচীন পদকর্তা লোচনদাসই বাঙ্গালা মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ প্রবর্তক।"

লোচনদাসের ধামালীর পদগুলির ছন্দ যে গতানুগতিক 'পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি গুরুগম্ভীর অক্ষরবৃত্ত ছন্দ' নয়, এটা সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ঠিকই ধরেছেন, তবে তিনি যে "লঘুগতি মাত্রাবৃত্ত' ছন্দ বলে এটাকে উল্লেখ করেছেন সে বোধ করি এই জন্য যে, তখনও বাংলা-ছন্দের প্রকৃতি নির্ণয় বর্তমান কালের মত এরূপ উন্নত পদ্ধতিতে হয় নি বলে।

লোচনদাসের 'নদীয়া-নাগরী' বিষয়ক পদ ও 'ব্রজ-লীলা রসোদ্গার' অর্থাৎ 'ধামালীর পদ' যেগুলি 'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী'তে সংগৃহীত হয়েছে সেগুলির ছন্দ বিশ্লেষণ করে আমাদের যে ধারণা হয়েছে তা বিবৃত করছি।

লোচনদাসের কথ্যভাষার বাগ্‌ভঙ্গি ব্যবহৃত পদের ছন্দ প্রধানত 'ছড়ার ছন্দ' বা 'দলমাত্রিক (syllabic) ছন্দ'। এই দলমাত্রিক ছন্দ রচনায় লোচনদাসের পারদর্শিতা রামপ্রসাদ অপেক্ষাও অধিক। রামপ্রসাদ তাঁর পদাবলীতে পর্বমধ্যে অধিকতর মুক্তদল (open syllable) ব্যবহার করায় যেখানে ছন্দের লঘুগতি শ্লথ হয়ে পড়েছে, লোচন সেখানে ছন্দোপংক্তি ও পর্বমধ্যে যথোপযুক্ত পরিমাণে রুদ্ধদল (closed syllable) ব্যবহার করার ফলে দলমাত্রিক ছন্দের লঘুগতি যথাযথ বজায় আছে। লোচনের একটি ধামালীর পদে দলমাত্রিক অর্থাৎ ছড়ার ছন্দের সুষ্ঠু প্রয়োগ লক্ষণীয়:

যুবা মায়্যা | পথে পায়্যা |
মধ্যে কিসের | কথা |
হেন বুঝি | দাদার আমার |
হেট্ট করিবি | মাথা |
কিসের তর্জ্জন | কিসের গর্জ্জন |
কিসের হেট্ট | মাথা |
কখন কৈতে | ছিলাম নন্দের |
পোয়ের সনে | কথা |
নন্দের পোয়ের | সনে কথা |
কৈতেছিলাম | যদি |
তখন কেনে | ধরিস নাই লো |
থুবড়া গরুবা | ভগী |
['পদ-রত্নাবলী', ২১৭নং পদ]

এখানে লক্ষণীয় যে পংক্তিগুলিতে চার সিলেবলের পর্ব ব্যবহৃত হয়েছে; ছন্দোপংক্তির শেষ পর্বটি অপূর্ণ—দুই সিলেবলের। এতগুলি পংক্তির মধ্যে মাত্র একটি পর্বে (ষষ্ঠ পংক্তিতে 'কিসের হেট্ট') চার সিলেবলের স্থানে তিন সিলেবলের পর্ব ব্যবহৃত হলেও বেশ মানিয়ে গেছে। লোচনের অনুরূপ দলমাত্রিক চতুর্দল পর্বে রচিত পদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পদ 'নদীয়া-নাগরীর উক্তি (গৌরাঙ্গের রূপ)'; পদটি প্রসিদ্ধ। প্রথম দুই পংক্তি এইরূপ:

আর শুন্যাছ আলো সই
গোরাভাবের কথা।
কোণের ভিতর কুল-বধূ
কান্দ্যা আকুল তথা॥

পদটিতে ছন্দের দিক দিয়ে যেমন উপরে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তেমন এই পদটি 'গৌরাঙ্গ-বিষয়ক' পদের মধ্যেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, এই পদটিতে নদীয়ার কুলনারীগণ গৌরাঙ্গরূপে মোহিত হয়েছে, তার বর্ণনা পাই। এই শ্রেণীর 'নদীয়া-নাগরী'-পদ একমাত্র লোচনই চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেছেন।

লোচনের ধামালীর পদগুলির মধ্যে আলোচ্য কতকগুলি পদে দেখতে পাই তিনি চতুর্দল পর্ব ব্যবহার করেছেন ৪+৪+৪+২—এই পর্বগঠন রীতিতে। এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পর্বভাগ সুস্পষ্ট 'যতি'-দ্বারা চিহ্নিত। কিন্তু তাঁর এই পদাবলীর মধ্যে এমন কতকগুলি পদ পাই, যেগুলির কোন কোন ক্ষেত্রে পর্বভাগ উক্তরূপ নয়। যেমন 'অপ্রকাশিত পদ-রত্নাবলী'র ২১৮নং পদে:

একই নগরে ঘর | কৃষ্ণ খেলার সাথী।
সেই পিরিতে নাগর কানাই | আইসে নিতি-নিতি |
লোচন বোলে আগো দিদি | ভয় করিছ কারে |
ভুবন যাহার বশ | বশ কর্যাছ তারে |

এখানে প্রথম এবং চতুর্থ পংক্তির 'একই নগরে ঘর' ও 'ভুবন যাহার বশ' অঙ্গ দুটি লক্ষণীয়। এই দুই স্থলে যতিস্থান এইরূপ:

একই ন | গরে ঘর |
ভুবন যা | হার বশ |

সতীশবাবু তাঁর 'পদ-রত্নাবলী'তে অনেকগুলি অনুরূপ পদকে ত্রিপদী আকারে সাজিয়েছেন। কিন্তু এগুলিকে ত্রিপদী বললে রবীন্দ্রনাথের:

দিনের আলো | নিবে এল | সুয্যি ডোবে | ডোবে |
আকাশ ঘিরে | মেঘ জুটেছে | চাঁদের লোভে | লোভে |

—রচনাকেও ত্রিপদী বলতে হয়। কিন্তু যথার্থ এগুলি ত্রিপদী নয়, ৪+৪+৪+২ (অর্থাৎ ৮+৬) ভাগের 'দলমাত্রিক (syllabic) পয়ার'।

লোচন উপরে আলোচিত 'দলমাত্রিক পয়ার' ছাড়াও

আটমাত্রার 'দলমাত্রিক একাবলী'ও রচনা করেছেন—(এখানে চরণের মাত্রা সংখ্যা আট):

রূপে রইল | আখি লাগি |
হিয়ায় ভরল | প্রেম আসি |
শ্রবণ হরিয়া (হর্যা ?) | নিল বংশী |
মন মন্‌মথ- | অহি দংশি | ইত্যাদি।
['পদ-রত্নাবলী', ২১৫নং পদ]

এছাড়া লোচনের একটি দলমাত্রিক ছন্দে রচিত দীর্ঘ ত্রিপদী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ত্রিপদীটির ৮+৮+১০-এর ভাগ দলমাত্রিক ছন্দে দাঁড়িয়েছে—৪+৪ | ৪+৪ | ৪+৪+২ | । ত্রিপদীটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা সম্ভব নয় তাই মাঝের খানিকটা বাদ দিতে বাধ্য হলাম এবং বিশেষ কারণে একটু ভিন্নভাবে সাজিয়ে দিতে হল। ত্রিপদীটি ৺সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু গ্রন্থের ২১৪১নং পদ। পদটি এইরূপ :

ধবল পাটের | জোড় পর্যাছে |
রাঙ্গা রাঙ্গা | পাড় দিয়াছে |
চরণ উপর | ঢুল্যা যাইছে | কোচা ॥
বাঁকামল | সোনার নূপুর |
বাজ্যা যাইছে | মধুর মধুর |
রূপ দেখিয়া | ভুবন মু | রছা |

* * *

এমন কেউ | বেথিত থাকে |
কথার ছলে | খানিক রাখে |
নয়ন ভর্যা | দেখি রূপ | খানি | |
লোচন দাসে | বলে কেনে |
নয়ান দিলি | উহার পানে |
কুল মজালি | আপনা আ | পনি | |

এইবার দলমাত্রিক ছন্দে রচিত লোচনদাসের পদাবলীর সঙ্গে রামপ্রসাদের পদাবলীর তুলনা করলে দেখতে পাব লোচনদাস দলমাত্রিক ছন্দে পয়ার, ত্রিপদী ও একাবলী রচনা করেছেন, কিন্তু রামপ্রসাদের দলমাত্রিক ছন্দে রচিত পদাবলীতে যথার্থ ত্রিপদী ও একাবলী দেখতে পাই না, তবে পয়ায়ের নিদর্শন বিরল নয়। যেমন :

(ক) মা,) নিমখাওয়ালে | চিনি বলে |
কথায় করে | ছলো |
ওমা) মিঠার লোভে | তিত মুখে |
সারা দিনটা | গেলো |
(খ) প্রসাদ বলে | নির্জঞ্জালে |
যদি যাবি | চলি |
সকল ছেড়ে | হৃদ্‌মাঝারে |
ভাব্‌রে মুণ্ড | মালি |

রামপ্রসাদের পদাবলীর ছন্দোপংক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম—দ্বিপর্বিক ও চতুর্পর্বিক মিশ্রণ, কিন্তু লোচনের ছন্দোপংক্তিগুলি সমানসংখ্যক পর্ববিশিষ্ট। রামপ্রসাদে অতিরিক্ত পর্ব অত্যধিক, লোচনে বিরল। লোচনের শেষপর্ব অনেক ক্ষেত্রেই অপূর্ণ, রামপ্রসাদের প্রায় সবক্ষেত্রেই পূর্ণ। এইভাবে উভয়ের ছন্দ তুলনা করলে দেখব তাঁরা একই ঢঙে (দলমাত্রিক) কথ্যভাষার বাগ্‌ভঙ্গি-বিশিষ্ট ছন্দ রচনা করলেও পংক্তিগঠন ও সজ্জার ক্ষেত্রে নিজ নিজ পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। আর একটি বিষয়ও এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, লোচন এ-ছন্দ অধিকতর ব্যবহার করেছেন লঘু ও চটুল ভাবের পদ রচনার ক্ষেত্রে, আর রামপ্রসাদ তাঁর ভক্তিরসাত্মক ভাব-গম্ভীর পদ রচনা করতেও এ-ছন্দ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে লোচনদাস ও রামপ্রসাদ ছাড়াও কৃত্তিবাস, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কোন কোন কবি এ-ছন্দ ক্ষেত্রবিশেষে অতি সামান্য প্রয়োগ করেছেন এবং সে নিতান্তই নগণ্য। 'ছড়ার ছন্দ'কে ব্যাপকভাবে কাব্যরচনায় প্রথম ব্যবহার করলেন লোচনদাস এবং ব্যাপকতরভাবে প্রয়োগ করলেন পরবর্তী কবি রামপ্রসাদ।

সে নহি

শ্রীচাণক্য সেন

৩
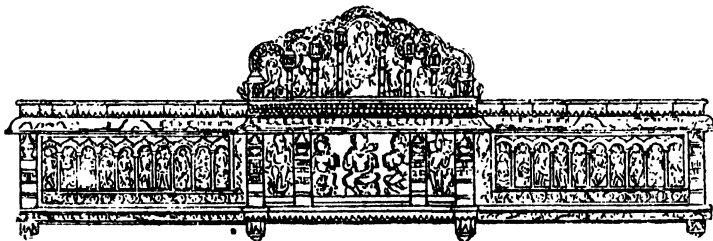
চায়ের বেশ খানিকা আগে দেববাণী বাসায় ফিরল।

ক্লান্ত হ'লেও মনে প্রচ্ছন্ন প্রশান্তি। সার্থকতার মোলায়েম মলয় দিনের সঞ্চিত অনেকখানি গ্লানি মুছে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিনের বক্তৃতা আশাতীত ছাত্রপ্রিয় হয়েছিল। বক্তৃতার শেষে অধ্যাপকদের বিশ্রাম-কক্ষে দেববাণীর জন্যে ঘরোয়া একটি ছোট্ট স্বাগত-অনুষ্ঠানের আয়োজন হ'ল। ভাইস-চ্যান্সেলার চেয়েছিলেন অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ দেববাণীর সঙ্গে খোলা মনে কথাবার্তা বলবেন। কিন্তু ছেলেমেয়েরা এসে ভিড় জমাল; অনুষ্ঠান দখল ক'রে বসল। দেববাণীকে ঘিরে দাঁড়াল তারা, দলবদ্ধ কচি, কোমল, অনুভূতি-কাতর মুখ, চোখে ঔৎসুক্য, জিজ্ঞাসা, আনন্দ, সংশয়। বড় ভাল লাগল দেববাণীর। বক্তৃতা দেবার সময় শ্রোতাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বিলীন; বহু ব্যক্তির বদলে বক্তার চোখের সামনে জমাট হয়ে থাকে নৈর্ব্যক্তিক সমষ্টি, কঠিন, ক্ষমাহীন, যেন বহু দূরের কোন বিজাতীয় পরিবেশ। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সে-বাতাবরণ গ'ড়ে ওঠে না যা সংলাপ-প্রসূ। যে সব মুখগুলি প্রকাণ্ড হল-ঘরের গ্যালারীতে দেববাণীর দিকে সারি সারি দৃষ্টিবদ্ধ হয়েছিল, তাদের মধ্যে কোথায় ছিল এই অতি-ঘনিষ্ঠ প্রাণ-প্রাচুর্য, যা অধ্যাপকদের কমন-রুমে দেববাণীর চতুর্দিকে ঘন হয়ে দাঁড়াল! ওদের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ল দেববাণীর, সে নিজেও একদিন এমনি ছিল। আমিও ছিলাম তোমাদেরই একজন, কিন্তু সে ত আজকে নয়, সে আজকে নয়, সে বহুদিনের পুরাণো ইতিহাস। তবু সে জীবন্ত। এই যে তুমি, কি নাম তোমার?—কমলা চৌহান, তোমারই মত সেদিন ছিলাম আমি, এমনি বেশবাসে উদাসীন, অবিন্যস্ত চুল, হাতে বই-খাতার বোঝা, চোখে অসংযত জিজ্ঞাসা, বুকে সমুদ্রের গর্জন। সে গর্জন কেবল আমিই শুনতে পেতাম; অন্য সবাই বহু দূর থেকে সমুদ্র দেখে ভাবত, আহা, কি মহা-শান্ত, কি মহা-তৃপ্ত!

কোন দুর্দম্য বাৎসল্যে দেববাণী মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে প্রশ্ন করল, "বিজ্ঞান পড়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ফিফ্‌থ্‌ ইয়ার।"

"ফিজিক্স?"

"না। অ্যাপ্লায়েড কেমিস্ট্রি।"

"খুব ভাল। পাশ ক'রে চাকরি, না গবেষণা, না বিয়ে?"

"চাকরি।"

"গবেষণা নয়?"

"চাকরির দরকার আছে," মেয়েটি মৃদু, ঈষৎ ম্লান স্বরে বলল।

"বেশ ত, চাকরি ক'রেও গবেষণা চলে। বিদেশে হাজার হাজার লোক তাই করে। তাদের মধ্যে মেয়ের সংখ্যা কম নয়।"

"আপনার বক্তৃতা আমাদের খুব ভাল লেগেছে," সরল খুশীর উচ্ছ্বাসে মেয়েটি বলল।

"যদি জিজ্ঞেস করি, কেন ভাল লাগল?" দেববাণীর মুখে হাসি। সবার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে।

"বিজ্ঞানের কথা এমনি ক'রে আমরা আগে শুনি নি। এত প্রাণ দিয়ে কেউ আমাদের বলেন নি। বিজ্ঞানকে এমন ভাবে আমাদের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে আমরা আগে দেখি নি।"

মুখের হাসি মিলিয়ে গেল দেববাণীর। শুনতে পেল, আবার সেই সমুদ্রের গর্জন। কোথায় সমুদ্র রাজে, বুঝি আমার হিয়ার মাঝে। ব্যথায় চোখ ভ'রে এল। দেববাণী বলল, ধীরস্বরে, প্রত্যেকটি কথা এক টুকরো বেদনা; "আমরা ব'লে থাকি, সবার উপরে মানুষ সত্য। কিন্তু কথাটা একবারও ভেবে দেখি নি। ভাবলে বিস্ময়ের শেষ থাকে না। মানুষকে সবার উপরে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে বিজ্ঞান। জীবনের সম্ভাবনা-সীমানা এত বেড়ে গেছে যে, তার নাগাল আমরা লাগাম-ছাড়া কল্পনাতেও পাই নি। এক মহা আশ্চর্য যুগে আমরা বাস করছি। দেশ, কাল, পাত্র সব বদ্‌লে একাকার হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের শুধু একটা কথা বলব, ভাবতে শেখ, বড় ভাবনা, অনেক

বড়, আকাশের চেয়ে উঁচু, পৃথিবীর চেয়ে বড়। মানুষ ত আজ তাই। পৃথিবী তাকে ধরতে পারছে না। আকাশ তাকে বাঁধতে পারছে না। সমস্ত পৃথিবী এসে দাঁড়িয়েছে তোমাদের প্রাঙ্গণে।"

বাড়ী ফিরে দেববাণী কাপড় বদলাল। লোকজন ডেকে আসবাব-পত্র বদ্‌লে ঘর দু'খানাকে মা'র আসন্ন আগমনের জন্য নতুন ক'রে সাজিয়ে নিল। স্নান-ঘরে গিয়ে মুখ-হাত-পা ধুয়ে আইরীণের চায়ের বৈঠকে যাবার জন্যে তৈরি হ'ল। পরল ফিকে নীল রং-এর কাশ্মীরী সিল্ক, ওপরে গাঢ় নীল গরম কার্ডিগান। সামান্য একটু প্রসাধন করল। পাউডারের ক্ষীণ প্রলেপ, চুলে চিরুণীর সযত্ন সঞ্চরণ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, কিছু সময় এখনও আছে। বসল হিমাদ্রিকে চিঠি লিখতে। এখন শেষ হবে না, অনেক কথা আছে লিখবার ; কিন্তু আরম্ভটা ক'রে রাখা যাক।

নীচে নেমে দেববাণী যখন আইরীণের বৈঠকখানায় ঢুকল, তখন ছোট্ট একটি চা-পায়ী সমাবেশ ঘরখানাকে মুখর ক'রে তুলেছে।

দেববাণীকে দেখে আইরীণ অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল। অন্তত ভয়ানক বিস্ময়ের ভান করল। "বাণী! তোমার হয়েছে কি?"

সমবেতদের মধ্যে একজন ছাড়া সবাই দেববাণীর পরিচিত। তাদের সংক্ষিপ্ত অভিবাদন ক'রে সে হাসতে হাসতে বলল, "কি হয় নি তাই বল।"

"প্রেমে পড় নি নিশ্চয়," দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আইরীণ জবাব দিল।

"ভুল। আজ ভয়ঙ্কর প্রেমে প'ড়ে গেলাম।"

"কার প্রেমে?"

"এক পাল ছেলেমেয়ের।"

হেসে উঠল সবাই। দেববাণী বসল। আইরীণের চোখে চোখ রেখে বলল, "হতাশ হলে?"

আইরীণ কাঁধ আর বাহুর ভঙ্গি ক'রে বলল, "তোমাকে নিয়ে আশা করলাম কবে, যে হতাশ হব?"

এক টুকরা কেক খেতে খেতে দেববাণী বলল, "সত্যি আজ প্রেমে প'ড়ে গেলাম। তাই মনটা খুশী-খুশী। অনেক দিন এমন খুশী লাগে নি।"

আমন্ত্রিতদের মধ্যে সুদর্শন, সুচতুর, সুবেশ একটি যুবক, সুভাষ প্যাটেল। আইরীণদের বাড়ীতে প্রায়ই আসে। ফুলব্রাইট বৃত্তি পেয়ে আমেরিকা গিয়েছিল ; ফিরে এসে সরকারী কাজ পেয়েছে। দেববাণী তাকে চেনে। খুব একটা পছন্দ করে না। আইরীণ সুভাষ প্যাটেলকে বলল, "আজ বাণীর বক্তৃতা শুরু হ'ল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে।"

নিরুৎসাহ কণ্ঠে সুভাষ প্যাটেল মন্তব্য করল, "বক্তৃতা করতে পারলেই অধ্যাপকগণ নিদারুণ খুশী হয়ে ওঠেন।"

"ঠিক বলেছেন," মানল দেববাণী। "কিন্তু অধুনা এদেশে তাঁদের একটু অসুবিধা দেখা দিয়েছে।"

"কি রকম?"

"শুনতে পাই, এদেশে বক্তৃতা করবার একচেটিয়া অধিকার বর্তমানে পলিটিশিয়ানরা দখল ক'রে নিয়েছেন। অধ্যাপকদের আর কোনও সুযোগ মিলছে না।"

"তাঁদের জন্যে ক্লাসরুম আছে। আর আছে দলে দলে অমনোযোগী ছাত্রছাত্রী, যারা কাণ দিয়ে দেখে, চোখ দিয়ে শোনে।"

"তাই বা আর পুরো রইল কোথায়? শুনতে পাই, স্কুল-কলেজেও অনুষ্ঠান হলেই রাজনৈতিক নেতাদের পদস্পর্শে তাকে পবিত্র করতে হবে। ক্লাসরুমে ত বক্তৃতা হয় না, মিঃ প্যাটেল, পড়াশুনা হয়। অন্তত হওয়া উচিত। পড়াশুনা হ'লে কিছু কিছু ভাল ছেলেমেয়ে তৈরি হয় ; তাদের কেউ কেউ আবার বৃত্তি পেয়ে বিদেশেও যেতে পারেন।"

একটি মেয়ে ছিল উপস্থিত, দেববাণী তাকে আগে দেখে নি। ছিপছিপে চেহারা, বেশ লম্বা, মুখখানা সুন্দর। ডান গালে বড় একটি কালো আঁচিল। বব-করা চুল। ওষ্ঠাধর রঞ্জিত। শীতকালেও সে পাতলা চোলি পরেছে, কোমরের বহুলাংশ অনাবৃত ; শিফনের শাড়ীর প্রগল্‌ভ আড়ালে স্তন দুটি সুপরিস্ফুট। ঠোঁটের রং বাঁচিয়ে সযত্নে সে বিস্কুট, কেক আর স্যাণ্ড-উইচ দাঁত দিয়ে কেটে খাচ্ছিল। এবার সরু কণ্ঠে বলল, "আপনি বুঝি দিল্লী য়ুনিভারসিটিতে পড়ান?"

দেববাণী সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, "না।"

আইরীণ ব'লে উঠল, "মাপ কর, বাণী ; ভুলে গিয়েছিলুম তোমাদের পরিচয় নেই। ইনি হচ্ছেন প্রমীলা থাপর। সুভাষের সুয়াইট-হার্ট। আমেরিকান এক্সপ্রেসে কাজ করেন। আর, যদি কাউকে না বল, কবিতা লেখেন।" প্রমীলার দিকে তাকিয়ে যোগ দিল, "দেববাণী আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ায়। ইংলণ্ডেও পড়িয়েছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ওকে এক্সটেনশন লেকচারের জন্যে ডেকে এনেছে। এর পর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়েও ওর বক্তৃতা আছে।"

এই গুরুগম্ভীর ভূমিকা প্রমীলা থাপরের মনে বিশেষ

রেখাপাত করল না। শুনতে শুনতে তার হাই উঠল, রক্তিম-নখ সরু-আঙ্গুল হাত তুলে জৃম্ভণ চাপল। তার পর বলল, "হাউ ওয়াণ্ডারফুল।"

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে এক ইংরেজ দম্পতি, একটি তুর্কী যুবতী, এক মার্কিন ভদ্রলোক। ইংরেজ জন্ কোল ও মার্গারেট কোল পোষ্ট-দম্পতির বন্ধু, সে সুবাদে দেববাণীর পরিচিত। জন কোল ইংরেজ দূতাবাসের মাঝারি কর্মচারী, স্কটল্যাণ্ডের লোক। ছ'ফুট লম্বা, তেমনি চওড়া; মাথা-ভরা চকচকে টাক, চতুর্দিকে লালচে চুলের ক্ষীণ সীমারেখা। ঘাড়ে মাংসের তিন ভাঁজ। কানে গুচ্ছ গুচ্ছ কাঁচা-পাকা চুল। কথা বলে কম জন কোল; চুপ ক'রে থাকে ব'লে সে যে মনোযোগী শ্রোতা তাও নয়। এক সময় নিশ্চয় চোখদুটি গভীর নীল ছিল; এখন ফিকে নীল আর ফিকে লাল মিলে এমন মিশ্র বর্ণ ধারণ করেছে যে মনে হয় না, জন কোলের কোন কিছুতে উৎসাহ আছে, কোন ব্যাপারে সে উত্তেজিত। জীবন নিয়ে সে বরং বিরক্ত, তিক্ত-স্বাদ। যে কথা সর্বদা তার মন জুড়ে থাকে তা হচ্ছে সে রাষ্ট্রদূত। তার প্রতিটি কথার সঙ্গে পৃথিবীর ভাগ্য অদৃশ্য সূতায় বাঁধা। তাই কথা বলে কদাচিৎ, যখন বলে খুব সাবধানে, ওজন ক'রে। মাংসল গলার মধ্য থেকে কয়েকটি বিচিত্র শব্দ সে বার ক'রে আনে। কথার বদলে তার ব্যবহারে জন কোল পটু।

মার্গারেট কোল ঠিক উল্টো। সেও দীর্ঘাঙ্গী। হাড়-প্রধান দেহ, নাক বড় বেশি উঁচু ও তীক্ষ্ণ, ওষ্ঠাধর একটু অতিরিক্ত চাপা। মার্গারেট কোল সুদর্শনা নয়, সুহাসিনী। হাসলে তাকে অকারণ সুশ্রী দেখায়; তাই সে কেবল হাসে, হাসে আর কথা বলে। ডিপ্লোমাটিক সমাজের গেজেট, সবাকার শেষ-সংস্করণ সংবাদ তার সুবিদিত। এ বিষয়ে মুখরোচক আলোচনায় তার উচ্ছল উৎসাহ রাষ্ট্রদূত স্বামী জন কোলের বিষণ্ণ উচিত-বোধের তোয়াক্কা করে না। তবে, মার্গারেটের নিজেরও যে দায়িত্ববোধ সজাগ, তার প্রমাণ দিয়ে অনর্গল সুস্বাদু ভাষণের মাঝে মাঝে শ্রোতাদের সতর্ক ক'রে দেয়, "যা বলছি তা সবই কিন্তু অফ্ দ' রেকর্ড; আমাকে আবার 'কোট' ক'রো না..."।

তুর্কী মেয়ের নাম তানিয়া। তুর্কী দূতাবাসের প্রথম সেক্রেটারীর কন্যা। ধব্‌ধবে ফর্সা, প্রায় ছ' ফুট লম্বা, সুঠাম-সুগঠিত দেহ। য়ুরোপীয় কায়দায় চুল ছাঁটা, চলন-বলন সব য়ুরোপীয়, তবু কোথায় রহস্য-ইংগিতে লেগে আছে প্রাচ্যের লালিত্য। আইরীণের কাছে মাঝে-মধ্যে সে আসে; দেববাণীর তানিয়াকে ভাল লাগে। সুস্থ সবল সহজ সচেতন স্বকীয় সব কিছু দেববাণীর মনে সাড়া দেয়। তানিয়ার মধ্যে এসব গুণ কিছু আছে; ভাগ্যক্রমে যা নেই তাকে সোজা বাংলায় বলা হয় ন্যাকামি।

আমেরিকান ভদ্রলোক এ বাড়ীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। লিওনার্ড হোপ। এডোয়ার্ড পোষ্টের জুনিয়র অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। বেঁটে খাটো ছোট্ট মানুষ; মার্কিন সমাজে হঠাৎ কেমন বেমানান। চওড়া কপালের ওপর ভীষণ আত্ম-প্রচারক এক জোড়া ঘন কালো দীর্ঘ ভ্রূ; বড় বড় সদা-বিস্মিত চোখ। লম্বাটে মুখখানা চিবুকের দিকে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ঠিক চিবুকের মাঝখানে বড় কালো তিল। গুরু-গম্ভীর কিছু বলবার আগ্রহ লিওনার্ড হোপের বেশি। সব কিছু মিলে মানুষটা কেমন কৌতুকময়; স্বচ্ছ, নির্ভেজাল, কিন্তু আত্মাভিমানী। লিওনার্ড হোপ মনে করে সে মস্ত বুদ্ধিবাদী, ইনটেলেকচুয়াল। দেববাণীর প্রতি তার সজাগ আগ্রহ পোষ্ট পরিবারে রহস্য-কৌতুকের বিষয়। মাঝে মাঝে দেববাণীকে নিজের গাড়ী ক'রে সে কর্মস্থলে পৌঁছে দেয়, বেড়াতে নিয়ে যায়। গম্ভীর ভারিক্কী চালে কথাবার্তা বলে লিওনার্ড। দেববাণীর হাসি পায়, কিন্তু আসলে মানুষটা ভদ্র ও আত্ম-সচেতন ব'লে, হাসে না।

জৃম্ভন চেপে প্রমীলা থাপর বলল, "হাউ ওয়াণ্ডার-ফুল।"

তানিয়া দেববাণীর গা ঘেঁষে বসল। দেববাণী সস্নেহে হাত রাখল তার পিঠে। তানিয়া প্রশ্ন করল, "কি বিষয়ে বক্তৃতা হ'ল?"

"সে ভারী গম্ভীর ব্যাপার," উত্তর করল আইরীণ। "দ্' সায়ান্টিফিক্ ম্যান। বুঝতে পারি নে, শুধু ম্যান্ কেন? বিজ্ঞান কি পুরুষদেরই একচেটিয়া? বিশেষ ক'রে বক্তা যখন নারী এবং বৈজ্ঞানিক, তখন বিষয়-বস্তুর নাম হওয়া ছিল 'দ্' সায়ান্টিফিক্ ম্যান অ্যাণ্ড উয়োম্যান্!"

"ম্যান মানে পুরুষ নয়, মানুষ," বলল লিওনার্ড হোপ।

"হোপ মানে হতাশা," ফোড়ন কাটল আইরীণ।

"সুভাষ যখন ষ্টেট্স-এ ছিল," কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে বলল প্রমীলা, "ওকে প্রায়ই অনেক বড় বড় সভায় বক্তৃতা করতে হ'ত। না, সুভাষ?"

সুভাষ প্যাটেল বিব্রত হ'ল। "রেখে দাও ওসব পুরাণো কথা।" জন কোলের দিকে তাকিয়ে সুভাষ বলল, "ইরাকের ব্যাপারটা কি রকম বুঝছেন, মিঃ কোল?"

পুত্র কন্যা সহ রবীন্দ্রনাথ
(বামে রথীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণে বেলা)

সোভিয়েট শিক্ষার্থীদের মাঝে রবীন্দ্রনাথ

সোভিয়েট দেশে শ্রমিক ও কৃষকদের সহিত রবীন্দ্রনাথ

পাইপ-মুখে জন কোল ঘোঁৎ ক'রে আওয়াজ তুলল। তার মানে, আমার কি কিছু বলার উপায় আছে? যা বলব তাতে ইতিহাসের চাকা ঘুরে যায় যদি?

তানিয়া বলে উঠল, "ব্যাপার বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না।"

জন কোল তার পানে কুঞ্চিত-ভ্রূ দৃষ্টি হানল। পরক্ষণেই মনে হ'ল, নির্বোধ বালিকার নির্বুদ্ধি মন্তব্যে বিরক্তি দেখানোরও ভয়ানক কদর্থ হতে পারে। পাইপ টেনে সে নিরুৎসাহে নিমজ্জিত হ'ল।

আইরীণ মার্গারেট হোপকে প্রশ্ন করল, "পরশু অশোকায় ফ্যাশন প্যারাডে তোমাদের দেখলাম না কেন?"

"হায় হায়, সে কথা আর ব'লো না," প্রবাহিত হ'ল মার্গারেট হোপ। "যাবার জন্যে সব তৈরি। কলকাতা থেকে নতুন ড্রেসটা পর্যন্ত এসে গেছল—আমি কলকাতা স্যামুয়েল ফ্রিট্‌সে ড্রেস করাই তা জানই ত, যদি হোম্ থেকে না আনাতে পারি, দিল্লীর এ সব নির্বোধ দরজির কাছে তুমি কিছু নিজেকে সঁপে দিতে পার না—(আইরীণ অর্থসূচক হাসি হাসল)—কিন্তু তা হলে কি হবে, বাধার পরে বাধা। প্রথমে ত সেই চিরন্তন সমস্যা, চাকর-নোকর-খানসামা। আমি সত্যিই বুঝতে পারি নি এরা কোন্ ধাতুতে তৈরি। জনের ভ্যালেট, সেই যে পাগড়ি-মাথা ছোকড়া, ডারম সিং, হঠাৎ উধাও···"

"কিছু না জানিয়ে?" ক্রুদ্ধ স্বরে হাসল প্রমীলা থাপর। "পুলিশে ফোন করলেন না কেন?"

"প্রায় তাই। হঠাৎ সকালে ব'লে বসল, বিকেলে সে গ্রামে যাবে। গ্রামে যাবার মানে জান ত, মাই ডিয়ার—মানে হ'ল, নোকরি করব না। অর্থাৎ আর কেউ তাকে ফুসলে নিয়েছে! লোকটা কাজকর্ম বেশ শিখেছিল, স্মার্ট ছিল মন্দ না, চেহারাও প্রেসেণ্টেব্‌ল্; আমি আগেই জনকে বার বার বলেছি, ও পালাল বলে, ওকে কিছু মাইনে বাড়িয়ে দাও। দেওয়াও হ'ত, জন সব কাজ খুব ভেবে চিন্তে করে, এ ব্যাপারটাও তুমি যে ভাবছিলে ডার্লিং, আমি তোমার মুখের দিকে চেয়েই বুঝছিলাম। কিন্তু লোকটার একটু তর সইল না! বিদেয় হ'ল পরশু বিকেলে। গ্রামে যাবার নামে কোথায় উঠল গিয়ে জান? জানবে কি ক'রে! এ যে আমাদের কল্পনারও বাইরে! উঠল গিয়ে কোপেনহাগানে। বুঝতে পারছ ত? কোপেনহাগানে!! ওখানকার মহিলার শিখ যুবক দেখলেই জিবে জল আসে। এ সব কিন্তু ভাই অফ্ দ্' রেকর্ড, আমাকে আবার 'কোট্' ক'রো না। মন-মেজাজ বড় বিগড়ে গেল। একটা ভ্যালেট চ'লে গেল সে জন্যে নয়—একটা গেল, দশটা আসবে, এ ত আর য়ুরোপ নয়; কিন্তু ভেবে দেখ ত, আমরা যদি এ সব সামান্য ব্যাপারেও একে অন্যের পেছনে ছুরি চালাই, তাহলে কোথায় আমাদের পশ্চিমী একতা, এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমরা কম্যুনিজম্‌কে রুখবো কি ক'রে? এই প্রশ্নই আমি জনকে করলাম, তার উত্তর এখনও পাই নি। উচিত ছিল না কি কোপেনহাগানে একটা প্রতিবাদ পাঠান? অবশ্য এ সবই অফ্ দ্' রেকর্ড, ইউ মাষ্ট নট কোট মি। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, পোলিশ ফার্ষ্ট সেক্রেটারীর চাকর কি পালিয়ে গিয়ে হাঙ্গারীয়ান ট্রেড কাউন্সিলরের ঘরে নোকরি পাবে? এক সঙ্গে সবাই ওরা ব'লে উঠবে, স্পাই!···"

"ডারম সিং তাহলে তোমার যাওয়াটা মাটি করল? বড় দুঃখের কথা।"

"ডারম সিং মাটি করবে কেন? মন মেজাজ খারাপ ছিল, সন্ধ্যা হতেই বড় মাথা ব্যথা শুরু হ'ল। তাও যেতাম, কিন্তু জন রাজী হ'ল না। বলল, তোমার কষ্ট হবে, তার চেয়ে শুয়ে থাক।"

"আদর্শ স্বামী জন," আইরীণ মুচকি হেসে টীকা করল। "এক দিকে পত্নীর প্রতি প্রশংসনীয় মনোযোগ, অন্য দিকে সম্ভাব্য ব্যয় থেকে আত্মরক্ষা।"

জন কোল গলার মধ্যে পায়রা-ঠোকা শব্দ করল। অর্থ, তোমার বুদ্ধি আছে, আইরীণ পোষ্ট, তাই তোমার বাড়ী এসে তোমার কাছে ব'সে থাকতে আমার ভাল লাগে।

দেববাণীর কিন্তু ভাল লাগছিল না। কোনও দিন সে এ ধরণের লঘুকর বৈদগ্ধ্যের অংশীদার হতে পারল না। সে জীবন তার অজ্ঞাত রয়ে গেল সেখানে কেবল হাল্‌কা মেঘের দায়িত্ব-বিহীন সঞ্চরণ, না বর্ষে, না পুঞ্জীভূত হয়। যে আলাপের অর্থ নেই তার অভ্যাবৃত্তি দেববাণীর দুঃসহ। যে বন্ধুতায় আন্তরিকতা নেই তার লঘু ভার দেববাণী বইতে পারে না। যে আকাঙ্ক্ষায় আগুন নেই তার নির্বাপিত ভস্ম দেববাণীর কুৎসিত লাগে। এ কারণে বিদেশে বিদগ্ধ-সমাজে চালু হবার টিকেট দেববাণী কোনও দিন পায় নি। তার বন্ধু-বান্ধবীরা বলেছে, সে বড় বেশী সীরিয়স, হালকা হবার অনর্গল আনন্দে বঞ্চিত। অথচ দেববাণী জানে, তা নয়। আমি যে কত হাল্‌কা হতে পারি, ওরা জানে না। ওদের জীবন এত ভারী, বাইরের নেশা না হলে ওরা হালকা হতে পারে না। আমার জীবন ভারী নয়, পূর্ণ। পূর্ণতা যে ভার নয় ওরা

কেমন ক'রে বুঝবে? যে আনন্দে ব্যথা নেই, যে তৃপ্তি অতৃপ্তি আনে না, যে সাফল্য স্মরণ করিয়ে দেয় না তুমি কত ক্ষুদ্র, কত দুর্বল, তা ত জীবনকে পূর্ণ করে না, ভারী করে। আত্ম-সুখের ভারে এই জন কোল ন'ড়ে বসতে পারছে না, আত্ম-তৃপ্তির ভারে মার্গারেট কোল পিষ্ট; শ্লাঘা চেপে মারছে সুভাষ প্যাটলকে, দুর্বল কামনা তার স্যুইটহার্ট প্রমীলাকে। বেচারা লিওনার্ড হোপ, অহমিকার আঙুল চুষতে সদা-ব্যস্ত। অন্ধকার পৃথিবীতে, 'দীপশিখাটি বাঁচিয়ে একা চলছে ধীরে ধীরে।' এর মধ্যে আইরীণ আলাদা; নকল জানে না, মেকীকে তাচ্ছিল্য করে। আইরীণ সহজ, স্বাভাবিক। আইরীণের কাছে আমি হাল্‌কা। ওদের সান্নিধ্য আমার বড় ভারী লাগে।

তানিয়া দেববাণীর সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলছিল; লিওনার্ড এসে পাশে দাঁড়াল।

"কেমন হ'ল আপনার লেকচার," লিওনার্ড প্রশ্ন করল দেববাণীকে।

"ভাল।"

"আবার কবে হবে?"

"কাল।"

"আমার কাছে কিছু বই আছে, আপনার কাজে লাগতে পারে; যদি চান, দিয়ে যাব রাত্রিবেলা।"

"ধন্যবাদ। আর বই দিয়ে কি হবে? আমি এমন কিছু জ্ঞান-গম্ভীর বলছি না যে, বই-এর ঝুলাই না হলে চলবে না।"

"বুঝলাম না।" অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে বলল লিওনার্ড। অর্থাৎ, তোমার কথার কোনও মানে হয় না।

"এটা কোনও বিশেষজ্ঞ থীসিস নয়। পপুলার লেকচার। বিজ্ঞান মানুষের জীবনকে কি ভাবে, কত ভাবে প্রভাবিত করেছে। তার কাহিনী। ভারী ভারী কেতাব দেখিয়ে ছেলেমেয়েদের ভড়্‌কে দিয়ে কি হবে? আমি যতটা সম্ভব সহজ ক'রে বলতে চেষ্টা করছি যাতে সবাই বুঝতে পারে, সবার মনে একটু দাগ লাগে।"

"আমার কাছে অনেক পপুলার সায়েন্সের বই আছে। ওটা আমার হবি। সেগুলো আপনাকে দিয়ে যাব।"

"বেশ ত, দেবেন। অনেক ধন্যবাদ।"

"আজ সন্ধ্যেয় কি করছেন?" পাশের চেয়ারে বসল লিওনার্ড।

"অর্থাৎ কোথাও যাচ্ছি কি না?" মৃদু হেসে দেববাণী পাল্টা প্রশ্ন করল।

"যাচ্ছেন কোথাও?"

"না।"

"চলুন না, কোথাও যাওয়া যাক।"

"কোথায় যাবেন?"

"এই ধরুন সিনেমায়।"

"রুচি নেই।"

"তা হ'লে এমনি ঘুরে আসব। ওখলা চলুন, অথবা রীজে।"

সারাদিন একটানা কাজের পর দেববাণীর ক্লান্ত লাগছিল। একটু বেড়াতে পারলে মন্দ হয় না। বেশ শীত নেমেছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, যদিও বৃষ্টি আর নেই। ইলেকট্রিক হীটারে ঘর গরম; এ গরমে আরাম, কিন্তু দেববাণীর মাথা কেমন ব্যথা করছে, মনে হচ্ছে খোলা হাওয়ায় ভালো লাগবে।

"আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।" পরোক্ষে সম্মতি দিল সে।

"কেউ আসছে?"

"হ্যাঁ। আমার মা। কাল সকালে আসছেন।

"সে ত কাল সকালে। অনেক দেরী।"

"অনেক দেরী নয়। ওটা কথা বলার কায়দা। আজ রাত্রির পরেই কাল সকাল।"

"মাঝখানে পুরো একটা রাত্রি।"

"সামান্য একটা রাত। এক ঘুমে শেষ।"

"আপনি খুব ঘুমোন?"

"আমি ভাল ঘুমোই। শোবার সঙ্গে সঙ্গে সুনিদ্রা। নিঃস্বপ্ন প্রায় সুষুপ্তি। যখন জাগি, তখন প্রভাত।"

"নো স্লিপিং ডোজ?"

"রক্ষে করুন! কখনও নয়। তাহলে বোধ হয় আর জাগবই না।"

"আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ নন।" গম্ভীর রায় দিল লিওনার্ড হোপ।

"জানি।" হাসতে হাসতে বলল দেববাণী।

"কখন বেরোবেন?"

"পাঁচটা বাজে। ধরুন আধ ঘণ্টার মধ্যে?"

"ফিরতে চান কখন?"

"সাতটায়।"

"এত তাড়াতাড়ি?" বিমর্ষ হ'ল লিওনার্ড।

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছু মনে করবেন না। কয়েকটা কাজ প'ড়ে আছে।"

"তার মধ্যে সবচেয়ে বড় নিশ্চয় পরের লেকচার?"

"হয়ত তাই।"

মনে মনে দেববাণী বলল, তা নয়। হিমাদ্রিকে চিঠি লিখতে হবে।

সাতটা বাজবার কিছু পরে দেববাণী ফিরে এল। লিওনার্ড তাকে নামিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। ভেতরে আর এল না।

বৈঠকখানার পাশে সিঁড়ির দিকে যেতে দেববাণী দেখল, এডোয়ার্ড ও আইরীণ আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এডোয়ার্ডকে দেখে দেববাণী খুশী হ'ল। হঠাৎ ফিরে এসেছে সে। তাই আইরীণ তাকে ছাড়তে চাইছে না।

দেববাণী সিঁড়িতে উঠতে যাবে, আইরীণের গলা ভেসে এল :

"বাণী !"

দাঁড়িয়ে গেল দেববাণী।

"ঘরে এস, ডার্লিং।"

ঘরে ঢুকল দেববাণী। আইরীণ তখনও স্বামীকে ছাড়ে নি।

"এই দেখ, বাণী, এড্ এসে গেছে। হোয়াট অ' সারপ্রাইস !"

"তাই তোমার খুশীর শেষ নেই," হাসল দেববাণী।

"নিশ্চয়। আঃ, কি আনন্দ !" সজোরে এডোয়ার্ডের মুখে সে চুম্বন চাপল। এডোয়ার্ড স্নেহভরে তাকে আলাদা ক'রে দিতে গভীর আবেগে আইরীণ ব'লে উঠল, "বাণী, স্বামী না হলে কি মেয়েদের চলে ?"

করুণ হ'ল দেববাণীর মুখখানা। মুখের হাসি বজায় রেখে বলল, "না। গাড়ী একেবারে অচল।"

"কোথায় গিয়েছিলে, বাণী ?" এডোয়ার্ড প্রশ্ন করল। এর মধ্যে রুমাল দিয়ে সে ওষ্ঠাধর থেকে পত্নীর অধরোষ্ঠের রক্তিম প্রলেপ সাফ করেছে।

"বাণীর আজ ডেট ছিল," ব'লে উঠল আইরীণ।

"হোঃ !" সিগারেট ধরাতে ধরাতে শব্দ করল এডোয়ার্ড। "কে সেই ভাগ্যবান্ ?"

"লিওনার্ড হোপ।" দীর্ঘ উচ্চারণে নামটিকে রমণীয় ক'রে বলল আইরীণ।

"হাঃ হাঃ", হেসে উঠল এডোয়ার্ড।

"লিওনার্ড কিন্তু বাণীর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে," আইরীণ নাছোড়বান্দা।

"খেতে দাও। পেট ফুলে উঠলে আর খাবে না।" এবার তিনজনেই হাসল।

এডোয়ার্ড প্রশ্ন করল, "তোমার কাজ কতদূর এগোল ?"

"কিছুটা এগিয়েছে। জমি বোধ করি দিন দশেকের মধ্যে পেয়ে যাব।"

"গুড। তোমার ত আজ বক্তৃতা ছিল ! কেমন হ'ল।"

"আই 'য়াস মব্‌ব্‌ড", বলল দেববাণী।

"চমৎকার ! সব তা হলে ভালোই চলছে।"

"তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল, এড্," দেববাণী মৃদুস্বরে বলল।

"বল।"

"কাল সকালে মা আসছেন।"

"ওঃ, এই কথা ? আমি আধ ঘণ্টা হ'ল এসেছি। তুমি কি ভাবছ, আইরীণ প্রত্যেকটি নতুন খবর আমাকে দেয় নি ? মাই ডিয়ার গার্ল, সব ঠিক আছে। তাঁকে নিয়ে এসো। যদি তাঁর অসুবিধে হয়, তোমার জন্যে অন্য ব্যবস্থা ক'রে দেব।"

এর পরে আর কথা চলে না। দেববাণী ওপরে গেল। যাবার আগে আইরীণকে বলল, "আমার খাবারটা যেন ঘরে পাঠিয়ে দেয়।"

আজ ওরা একা একা থাক্। দেববাণী মনে মনে বলল। অপ্রত্যাশিত স্বামীকে পেয়ে আইরীণ আনন্দে অধীর। আজ বাইরের লোকের ছায়া না পড়ুক্ ওদের আহারে-বিহারে।

৪

সকাল সকাল উঠে পড়ল দেববাণী। চট্ ক'রে ঘর গুছিয়ে চ'লে গেল স্নানঘরে। গরম জলের কল খুলে বাথ-টব ভ'রে নিল। ঠাণ্ডা জল মিলিয়ে সহনীয় করল। তারপর আরামে অবগাহন।

স্নান সেরে স্টেশনে যাবার জন্যে তৈরী হ'ল দেববাণী। মা আসছেন। সারা রাত ঘুমের মধ্যে খুশির মত এ চিন্তা জড়িয়ে ছিল আমায় ; বার বার স্বপ্ন দেখেছি, মা'র রেলগাড়ী চলছে,নিঃশব্দে, পাছে আমার ঘুম ভাঙে। এক একটা স্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়েছে, আর মা আমার খোঁজ করছেন। অনেক, অনেক দূর থেকে আমি তাই দেখছি, আর হাসছি, আর চেঁচিয়ে বলছি, মা, এই ত আমি এখানে, দিল্লীতে। কোথাও যেন নেমে প'ড়ো না, সোজা চলে এস দিল্লীতে। স্বপ্নের কথা মনে পড়ায় ছোট্ট মেয়ের মত হেসে উঠল দেববাণী। কড়া শীত ; দেববাণী বিদেশ থেকে আনা উলের অন্তর্বাস পরেছে, তার ওপর হাল্‌কা বেগুনি রঙের তাঁতের সাড়ী। কালো

কার্ডিগানে সংরক্ষিত দেহ। হাতে পশমী দস্তানা। পায়ে মোজা। সিক্ত চুল ছড়িয়ে দিল পিঠে। ক্রীম মেখে মুখখানাকে স্নিগ্ধতর করল। একটু সুর্মা লাগাল চোখে।

মন গুন গুন গান গেয়ে উঠল দেববাণীর। মা অনেক যত্নে দু' বোনকে গান শিখিয়েছিলেন। দেববাণীর গলা ভারী, মধুর; দেবযানীর পাতলা, মিঠে। দেববাণীকে তাই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে শিক্ষা দিয়েছিলেন; দেবযানীকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে। ওস্তাদ আসতেন সপ্তাহে দু'দিন। দেববাণী ঘণ্টার পর ঘণ্টা কসরত করত। সুরের ঢেউ দেববাণীকে অমৃতের অতলে নিয়ে যেত, সে দেখতে পেত ঝরণা নেমে আসছে, মেঘে আকাশ কালো হয়ে এল, বিরহ-বিধুর নববধূ নীরবে কাঁদছে, সমুদ্র করছে উন্মত্ত গর্জন, তাণ্ডব তালে শ্মশানে নৃত্য করছেন মহাদেব, গাছে গাছে হঠাৎ ফুল ফুটে উঠল, দীপ জ্বলল, লক্ষ শিশু একসঙ্গে উঠল হেসে। রাগ-রাগিণী গ্রাস করত দেববাণীকে, মনে হ'ত, আমি নেই, আমি দেহহীন সুরের মূর্ছনা, মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের নেশায় মাতাল।

সুর একদিন অসুর হয়ে দেববাণীকে মারল। অমৃতের জন্যে হাত পেতেছিল দেববাণী। পেল পাত্রভরা গরল।

অনেক দিন, কতদিন তার হিসেব নেই, দেববাণী গান করে নি। অসুরের মধ্যেও সুর দেখে সে সম্মোহিত হয়েছিল, দুঃসহ আকর্ষণে মৃত্যুর অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যখন মুক্তি পেল, তখন জীবনের নিষ্ঠুর কঠোর দাবীতে সঙ্গীতের সুর ছিল না। সে সুদীর্ঘ নিরবকাশ সংগ্রামে গান ছিল না।

তার পর একদিন আবার গান ফিরে এল। দেববাণী কিছুতেই সেদিনের কথা ভুলতে পারে না।

তুমি আমায় আবার গান করালে, হিমাদ্রি। আমার ভাঙা-জীবনের টুকরোগুলি সযত্নে সাজিয়ে তুমি চাইলে দেববাণীকে আবার গ'ড়ে তুলতে। পারলেও অনেকখানি। দেববাণী লণ্ডন য়ুনিভারসিটি থেকে ফিজিক্সের ডক্টরেট পেল। তার গবেষণায় অধ্যাপকরা এত খুশী যে, তাকে শুধু স্বর্ণপদকই দেওয়া হ'ল না, রয়াল আকাডমিতে তার থীসিস প্রেরিত হ'ল, আকাডমির জার্নালে ছাপাও হ'ল। অক্সফোর্ড থেকে আহ্বান এল দেববাণীর। সে আরও পড়বে, আরও গবেষণা করবে।

টেম্‌স্ নদীর তীরে সন্ধ্যাবেলা, হিমাদ্রি, তুমি দেববাণীকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলে। পরের দিন সে চ'লে যাবে অক্সফোর্ডে। কথায় কথায় রাত এগিয়ে গেল। অমন জনাকীর্ণ স্থানও জনবিরল হল। নিরিবিলি আধা-অন্ধকার বেঞ্চিতে ব'সে, হিমাদ্রি, তুমি আর দেববাণী কত কথাই না বলেছিলে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, পরিবর্তনশীল পৃথিবীর কথা, বহু দূরের ভারতবর্ষের কথা, আরও দূরের ভবিষ্যতের কথা।

হঠাৎ তুমি ব'লে বসলে, "বাণী, একটা কথা রাখবে?"

দেববাণী বলেছিল, "তোমার কোন কথা কি আমি রেখেছি?"

"রেখেছ বৈ কি?"

"কৈ? মনে পড়ছে না ত!"

"এই যে তুমি আজ এত বড় হয়েছ, তাতে কি আমার কথা রাখা হ'ল না?"

দেববাণী হাসল। "খুব বড় হয়েছি? বাবার মত বড়? যা হয়েছি, হিমাদ্রি, তা শুধু তোমার কথা রাখব ব'লে নয়।"

হিমাদ্রি, তুমি চুপ ক'রে গেলে।

দেববাণী বলল, "তুমি অনেক আশা দিয়েছিলে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক প্রেরণা দিয়েছিলে। তবু, তোমার কথা রাখতে হবে বলেই আমি এই দশ বছর নেশাগ্রস্তের মত একটানা পরিশ্রম করি নি। তার আরও কারণ ছিল।"

দেববাণী ব'লে চলল, "কারণগুলি আজ তোমাকে বলি। ম'রে গিয়েও যখন মরলাম না, তখন সংকল্প করলাম, বাঁচার মত বাঁচব। হার মানব না, মানব না, মানব না। শুরু হ'ল আমার লড়াই। তার রসদ পেলাম কার কাছে? অনেকের কাছে। মা'র কাছে। তোমার কাছে।"

"তোমার নিজের কাছেই সবচেয়ে বেশি।"

"মা, তুমি, আরও একজন আছে। জান সে কে?"

"খোকন।"

"খোকন। মনে হ'ল, আজ আমি নিঃস্ব, লুণ্ঠিত; অপমানে, গ্লানিতে, অশ্রদ্ধায় দীনহীন। আমাকে নিয়ে গর্ব নেই কারুর। আছে শুধু লজ্জা।"

তুমি, হিমাদ্রি, আমার হাত চেপে ধরলে।

"স্থির করলাম, এ লজ্জা আমায় দূর করতে হবে। এমন কিছু হতে হবে যাতে মা দেববাণী বলতে গর্ব বোধ করেন। আমার ছেলে তার মায়ের কথা ভেবে গর্বিত হয়। আর তুমি—।"

"আমি কী?"—মৃদু হাসলে তুমি, হিমাদ্রি।

"আর তুমিও একটু গর্ব অনুভব কর। না ভাব, যা গড়লে, ভাঙা টুকরো জোড়া দিয়ে, তা নিতান্তই কাঠের পুতুল।"

হাল্কা হলে তুমি, হিমাদ্রি। হেসে বললে, "তাহলে কোন কথাই তুমি আমার রাখ নি। আজ তার ব্যতিক্রম হোক। আজ একটা কথা রাখ।"

"তোমার ব্যাপার কি, হিমাদ্রি? এত ব্যাকুল ত তোমাকে সহজে হতে দেখি নি? কি কথা বল?"

"একটা গান ক'র।"

গান!! দেববাণী আকাশ থেকে পড়ল। হিমাদ্রি, গান? গান কোথায়? কোনও দিন কি ছিল তার মধ্যে? বিষণ্ণ নির্জীব টেম্‌স্‌ মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। দেববাণী ভেসে চলল দেশ পেরিয়ে, সমুদ্র, মরুভূমি, জনপদ পেরিয়ে। কলকাতা শহরে হাতিবাগানের কাছাকাছি সে ছোট্ট ফ্ল্যাটে এসে সে পৌঁছল, সেখানে সপ্তস্বরের ঐক্যতান যেন একসঙ্গে বেজে উঠল। বিস্মিত দেববাণী স্বরের পরশ পেল যুগান্তের ব্যবধানে। কি আশ্চর্য, হিমাদ্রি, দেববাণীর বুকে গান বেজে উঠল।

"একটা গান কর, বাণী।"

"কেন? গাইতে বলছ কেন?"

"তুমি পূর্ণ হবে না গান না গাইলে। তোমার জীবনের ইমারৎ উঠেছে, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নি। অদম্য উৎসাহে, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়, অক্লান্ত পরিশ্রমে তুমি কর্মে সার্থকতা পেয়েছ, এবার তোমার পথ খোলা। কিন্তু জীবনটা ত শুধু শ্রম নয়, জীবন আনন্দ। তুমি যেদিন অহরহ হঠাৎ-খুশিতে গান গেয়ে উঠবে, সেদিন জীবনে তুমি আনন্দ পাবে।"

হিমাদ্রি, তুমি জান না, আমার হঠাৎ কি হল, নদীর নিস্তরঙ্গ জল থেকে, হাল্কা শীতল হাওয়া থেকে, ধূম-জাল-ম্লান অন্ধকার হ'তে এমন কি অনতিদূরের স্তিমিত ল্যাম্প-পোষ্ট থেকে, অগণিত বিচিত্র ধারায় সুরের লহরী আমার মনে সঞ্চারিত হ'ল। শিউরে উঠলাম আমি, তোমার হাতের মধ্যে হাত আমার ঠাণ্ডা হয়ে এল। চোখে জল এল ঘনিয়ে।

আমি বললাম, "বয়েস কত হ'ল খেয়াল আছে, হিমাদ্রি? অহরহ খুশিতে গেয়ে উঠবার কথা বলছ, হায় রে হায়, সেদিন কি আর আছে?"

"বুদ্ধিমতী নারীর কথা হ'ল না, বাণী। রবি ঠাকুর সত্তর বছর বয়সেও গাইতেন। বিদেশে এত বছর কাটল, দেখছ না, জীবন এদের কী অফুরন্ত, কী অপরাজেয়? তুমি বাঙালী মেয়ে বলেই কি তিরিশে নিঃশেষ?"

"না। আমিও আশিতে খুশী হয়ে গলা ছেড়ে গান গাইবো। তাতে জীবনের জয় ঘোষিত হ'তে পারে, কিন্তু প্রতিবেশীদের আয়ু কমবে।"

"কথা রাখ। গান কর।"

"বলতে লজ্জা করছে, হিমাদ্রি। গাইতে আমার ইচ্ছে করছে। কিন্তু কি গাইব? কতকাল গাই নি। সুর কি গলায় উঠবে?"

"উঠবে, উঠবে। তুমি সুরু কর।"

"এখানে?" ইতস্ততঃ করলাম আমি। "এই বিজাতীয় পরিবেশে বাংলা গান? যদি পুলিসে ধ'রে নিয়ে যায়?"

"বাজে ব'কো না। আস্তে গান ধর।"

"কি গাইব?"

"যা তোমার মন চায়।"

অনেক, অনেক বছর পরে, আবার আমি গান গাইলাম, হিমাদ্রি। কেবল তোমার কথা রেখেই গান গাইলাম। গাইলাম, গান আমার মনে বেজে উঠল ব'লে। গান বাছতেও মুহূর্তের বেশি সময় লাগল না। খুঁজতেই অনেকদিন আগে শেখা মার অতি প্রিয় একটা গান গলায় অপেক্ষা করছে দেখতে পেলাম। কী আশ্চর্য, হিমাদ্রি, আজ এখন আবার আমি সে গানটাই গাইছি: 'নীরব আলোকে জাগিল হৃদয়-প্রান্ত, অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া, জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।'

হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেববাণী তৎপর হল। লিখবার টেবিলে হিমাদ্রিকে লেখা চিঠিটা প'ড়ে ছিল। তুলে নিল। বেশ ভারী মনে হল খামটা। মৃদু হাসল দেববাণী। মনে এখনও সুর বাজছে: জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া। অনেক বড় চিঠি লিখেছি তোমাকে, হিমাদ্রি; তুমি পেয়ে অবাক্ হবে। কাল রাত্রে যেন তোমার সঙ্গে কথা বলার নেশা আমায় পেয়ে বসল। লিখলাম, লিখে চললাম, থামলাম না। তার পর এক সময় দেখি কলমে আর কালি নেই। খেয়াল হল, এ ত চিঠি নয়, রীতিমত পাণ্ডুলিপি। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। কাজের মানুষ তুমি, হিমাদ্রি, এত বড় চিঠি জীবনে কোনদিন পাও নি, পড়তে তোমার অনেক সময় লাগবে। তোমাকে লিখতে গিয়ে খোকনকে আমার আর লেখা হল না। ঘুমে তখন চোখ ভ'রে এসেছে। আজ লিখব খোকনকে। মাম্মা এসেছেন দিল্লীতে, জেনে সে খুব খুশী হবে।

চিঠিটা ব্যাগে রেখে দেববাণী নীচে নেমে এল।

পোষ্ট পরিবারের তখনও প্রভাত হয় নি। হলেও, শয়ন ঘরেই আবদ্ধ। দেববাণী গ্যারাজ থেকে গাড়ী বার করবার কথা ভাবতে ভাবতে নীচে নেমে বিস্মিত পরিতোষের সঙ্গে দেখতে পেল, সুজন সিং গাড়ী বার করেছে, তার গাত্রমর্দনে ব্যস্ত। দেববাণীকে দেখে সে নমস্তে করল।

"নমস্তে, সুজন সিং। তোমাকে ত আসতে বলি নি।"

"আমি নিজেই এলাম, হুজুর।"

"এই শীতের সকালে—"

"কোন বাৎ নেই, হুজুর। আপনি একা গাড়ী নিয়ে স্টেশনে যাবেন, তা কেমন ক'রে হয়?"

"সুক্রিয়া, সুজন সিং। এবার চল। গাড়ীর সময় হয়ে এল।"

শীতের সকাল। রাস্তা জনবিরল। কুয়াসা পড়েছে। পাতলা ধোঁযাটে কুয়াসা, দৃষ্টি-রোধী নয়। গাড়ী বেশ বেগে চলল। হাওয়া আটকাবার জন্যে দেববাণী দরজার কাচ তুলে দিয়েছে। গাড়ী ফরেন পোষ্ট দপ্তরে দাঁড় করিয়ে দেববাণী নিজেই নেমে গিয়ে চিঠিখানা ছাড়ল। দশ মিনিটে গাড়ী স্টেশনে পৌঁছল।

গাড়ী আসবার তখনও মিনিট আটেক দেরী।

দেববাণী নেমে গেলে সুজন সিং প্রশ্ন করল: "কোন্ গাড়ী হুজুর?"

"জনতা। কলকাতার জনতা।"

সুজন সিং যে অবাক্ হল, দেববাণীর নজরে ধরা পড়ল। সুগঠিত মুখে বড় বড় চোখ দু'টির ওপরে তির্যক ভ্রূ ঈষৎ বাঁকল, পরক্ষণেই স্বাভাবিক হ'ল। দেববাণীর মজা লাগল। সুজন সিং ভাবতে পারে নি দেববাণীর মা জনতায় আসবেন। আরও পরিষ্কার ক'রে দেববাণী দ্বিতীয়বার বলল: "আমার মা আসছেন কলকাতার জনতায়।"

মা বেশি পয়সার আরামপ্রদ রেলযাত্রার বিরোধী। সারা জীবন দারিদ্র্য ও অভাবের সঙ্গে সংগ্রামে দু'পক্ষে কেমন মিতালি হয়ে গেছে। দারিদ্র্য হেরেছে—এ জন্যে নয় যে আজ দেববাণী যথেষ্ট রোজগার করে, মাকে সে অনেক আরামে রাখতে চায়; এ জন্যে যে মার অভাব বোধ নেই। দারিদ্র্যকে তিনি আজীবন তুচ্ছ করেছেন, মাথা ঘামাবার সম্মানটুকু পর্যন্ত তাকে দেন নি। অল্প বয়সে দুটি মেয়ে নিয়ে বিধবা হবার পর থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁর লড়াই। মেয়েদের মানুষ করতে হবে এ সঙ্কল্প যেদিন তিনি অন্তরে গ্রহণ করলেন, সেদিনই জন্ম নিল অন্য এক সঙ্কল্প: দারিদ্র্যের কাছে হার মানলে চলবে না। হার কোনও দিন মানেনও নি। দেববাণী ও দেবযানী সব পেয়েছে, যা তাদের পাওয়ার কথা তার চেয়ে বেশি। শিক্ষার কোনও ত্রুটি মা করেন নি। শুধু স্কুল কলেজে পড়ান নি, গান শিখিয়েছেন, ছবি আঁকা শিখিয়েছেন। দেববাণী-দেবযানী ছেঁড়া সাড়ী পরে নি, ছেঁড়া জুতো ব্যবহার করে নি। আবার তেমনি যা নিতান্ত প্রয়োজন, তার বেশি তারা পায় নি। গৌরব ও দুঃখের সঙ্গে মা বলেন, তোরা কত কষ্ট করেছিস। স্কুলে ফার্ষ্ট হতিস, কোনও দিন মাইনে লাগে নি; কলেজে বৃত্তি পেয়েছিলি, মাইনে লাগে নি। তোদের জন্যে আমি আর কি করেছি। যা করেছেন, মঙ্গলময় ভগবান্। এই হল মার স্বভাব। কোন কিছুর জন্যে কৃতিত্ব নেবেন না। আজও, অভাব যখন বিগত, তিনি প্রয়োজনের বেশি কিছু নিতে রাজী নন। দেববাণী বলেছিল, বড্ড শীত হবে রাস্তায়, তুমি ফার্ষ্ট ক্লাসেই যেয়ো লেপ গায়ে দিয়ে আরামে ঘুমিয়ে। মা হেসে বললেন, তোর যা কথা! কে না কে থাকবে কম্পার্টমেণ্টে, আমি অমন ক'রে চলতে পারব না, তাছাড়া আমি যাব জনতায়।

"জনতায়? সে যে দু' রাত্রির পথ!"

"বেশ র'য়ে-স'য়ে যাব, দেশ দেখতে দেখতে। থার্ড ক্লাসে গেলে একটা মস্ত সুবিধে, জানিস? কত বিচিত্র মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। পকেট-কাটা থেকে সাধু-সন্ত পর্যন্ত। বরযাত্রী, নতুন বৌ থেকে থুড়থুড়ে বুড়ো-বুড়ী।"

"তাদের শরীরের বিচিত্র সুবাস। বিড়ির গন্ধ। চিনেবাদাম খোসলের ছড়াছড়ি। বহু মানুষের কফ্, কাশি, থুতু। শিশুর কান্না। যাত্রীদের বুক-ফাটানো চেঁচামেচি। মালপত্র নিয়ে ঝগড়া।"

হাসতে হাসতে মা বললেন, "বল ত! এমন নাটক ফেলে ফার্ষ্ট ক্লাসে কি কেউ যায়?"

"ঘুম চাই নে তোমার দুটো পুরো রাত?"

"বার্থ রিজার্ভ ক'রে নেব। আরামে ঘুম দেব। তুই ভাবিস নে। শুধু ঘুম নয় রে, ভাল ভাল স্বপ্নও দেখব।"

এর পরে আর কিছু বলার থাকে না। মা আসছেন জনতায়। দূরে, বোধ করি যমুনা-পুলের এপারে, গাড়ীর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। সিগন্যাল নামল। জ্বলল সবুজ আলো। কুলিরা ব্যস্ত-সমস্ত। যাত্রীদের নামিয়ে নিতে যারা এসেছে, দেববাণীর মত, তারা তৎপর। ট্রেন এবার আসছে। দেববাণীর মন নেচে উঠল। মা এসে গেছেন।

ঐ এগিয়ে-আসা গাড়ীর উন্মুখ যাত্রীদের মধ্যে একজন আমার মা। ব্যাকুল-দৃষ্টি দেববাণী এগিয়ে গেল। গাড়ীর গতি মন্থর। গাড়ী থামল। যাত্রীরা হুড়োহুড়ি ক'রে নামছে। কুলিরা মাল টানাটানি করছে। এই দুরন্ত ভিড়ে মা নামবেন কি ক'রে? কোথায় দেববাণী তাঁকে খুঁজে পাবে? দেববাণী একবার এগিয়ে গেল। মাকে পেল না। পেছনে ফেলে আসি নি ত? তাড়াতাড়ি আবার উল্টোদিকে ছুটল। পেল না। আশঙ্কায়, উত্তেজনায় দম ফুরিয়ে এসেছে। এবার সে একটু গুছিয়ে নিল নিজেকে। ধীরে ধীরে চলি, প্রত্যেকটি কামরা দেখে, প্রত্যেক দরজায় থেমে। মা নিশ্চয় আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

একটা কম্পার্টমেণ্টের দরজায় দাঁড়িয়ে দেববাণী ভেতরে উঁকি দিয়ে খুঁজছে, পেছন থেকে কে তাকে জড়িয়ে ধরল।

দেহ ভেঙে পড়ল দেববাণীর। ভাল ক'রে না তাকিয়েই বলে উঠল : মা।

মা'র মুখে মিষ্টি সুশান্ত হাসি।

"কি রে, খুঁজে পেলি না ত?"

দেববাণীর কথা বলার শক্তি নেই। মার বুকে মুখ রাখল।

"উঃ! এর মধ্যে কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়?"

"এই ত তোকে আমি পেলুম।"

"তোমার জিনিষপত্র কোথায়?"

"ঐ ত, ওখানে।"

"কুলি পেয়েছ?"

"পেয়েছি। বাব্বা, বড় শীত রে তোদের দিল্লীতে!"

"দিল্লী আবার আমার হ'ল কবে থেকে?"

"এবার হবে। তোর গবেষণাগার তৈরী হবে দিল্লীতে, তুই-ও হয়ে যাবি দিল্লীর।"

"চল, এগোই।"

"চল্।"

"রাস্তায় কষ্ট হয় নি ত?"

"একটুও না।"

"ঘুমিয়েছিলে?"

"যত খুশি।"

"কিছু খেয়েছ?"

"না, দু'দিন উপোস রয়েছি। তুই কি আমার গার্জেন হলি? চল্, এগিয়ে চল্।"

ওদের বেরিয়ে আসতে দেখে সুজন সিং গাড়ী নিয়ে এগিয়ে এল। বিরাট মোটর গাড়ী দেখে মা বললেন, "ওরে বাবা, এ যে বিরাট! কার রে?"

"ডাঃ পোষ্টের। ড্রাইভারও তার।"

"আমি ত ভাবলাম তুই একাই গাড়ী নিয়ে আসবি।"

"তাই করছিলাম। ওকে বলিও নি আসতে। সকালে দেখি নিজেই এসে গেছে। ছেলেটাও বড় ভাল।"

"আমি ভাবলাম, তুই বুঝি গাড়ী চালিয়ে আমায় নিয়ে যাবি।"

"আঃ, তুমি ছাড়ো। দেখো কত গাড়ী চালাই তোমাকে নিয়ে।"

"কেমন চালাস?"

"দেখোই না।"

"হ্যাঁ রে, তোর আমেরিকান বন্ধুরা বাংলা জানে ত?"

"চমৎকার জানে।"

"তাও ভাল। তা নইলে কথা বলব কি ক'রে?"

"কেন? তুমি কি ইংরেজী জান না?"

"ও মা, ওকে জানা বলে? ঘরে ব'সে শেখাকে কি জানা বলে?"

"বলে। তুমি যতটা ইংরেজী জান, হাজারে একজন আমেরিকান কোনও বিদেশী ভাষাও ততটা জানে না।"

"এসে প'ড়ে বড় ভাবনা হচ্ছে রে। এলাম ত উৎসাহ ক'রে। ওদের আতিথেয়তাও নিলাম। কিন্তু কথা যদি না কইতে পারি?"

"চুপ ক'রে শুধু হাসবে।"

"তা পারব। কিন্তু আমার সময় কাটবে কি ক'রে। তুই ত তোর কাজ নিয়ে ব্যস্ত।"

"একটা দোভাষী রেখে দেব তোমার জন্যে।"

"রক্ষে কর। এ কি রাজনীতি, যে দোভাষী দিয়ে কাজ চলবে? আমরা নিজেরাই নিজেদের কথা ঠিকমত বলতে পারিনে, দোভাষী কি করবে?"

"তা হলে উপায়?"

"তোর বন্ধু আইরীণকে বাংলা শেখাস নি কেন?"

"তার চেয়ে তোমাকে ফরাসী শেখানো সোজা।"

"হ্যাঁ রে বাণী, ওরা কোন অসুবিধায় পরবে না ত?"

"এক-আধটু কি আর হবে না অসুবিধা? কিন্তু ওরা স্বীকার করছে না। তোমার কথাই ভাবছে। তোমার পাছে অসুবিধা হয়।"

"তোর কি মনে হয়? হবে?"

"কোনদিন কোথাও তোমার অসুবিধে হয়েছে ব'লে ত জানিনে, মা।"

"কিন্তু এখানে যে ভয়ানক সুবিধার ছড়াছড়ি, তাতে অসুবিধা বিলক্ষণ হতে পারে। যাক-গে, সাহসে বুক বাঁধি, কি বল!"

গাড়ী এসে গেল নিজামুদ্দিনে। ঢুকল বাড়ীর ফটকে। দেববাণী নামল। মাকে নামাল।

মা দেখতে পেলেন, সুদর্শনা হাসি-খুশী একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। হাত জোড় ক'রে নমস্কার জানাল। ভাঙ্গা বাংলায় বলল, "আমার নাম আইরীণ। আসুন।"

মা তার পিঠে হাত বুলালেন। ভাঙ্গা ইংরেজীতে বললেন, "তোমাকে দেখে বড় সুখী হলাম। তোমার কথা অনেক শুনেছি।"

আইরীণ আবার বলল, "আসুন।"

ক্রমশঃ

—o—

'পলাতকা'র নারী

শ্রীছায়া চৌধুরী

আলো আর আঁধার নিয়েই একটি দিনের পুরোপুরি সার্থকতা। এর কোন একটিকে বাদ দিলে আর তার কোন মাধুর্য্যই থাকে না। তেমনিই পুরুষ আর প্রকৃতি মিলেই এই জগৎ সুন্দর—সার্থক—মধুময়। একের অপমানে অন্যে পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তাই পুরুষ যখন আপন শক্তিমত্তার অহঙ্কারে স্ফীত না হয়ে নারীর কোমল মাধুরিমাকে তার অনাবিল পবিত্রতাকে বরণ করে—করে আবাহন, তখনই কবি বলেন:

এ দ্যুলোক মধুময়—মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।

আর নারী যখন এ সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়, তার প্রাপ্য যখন সে পায় না, তখন সংসার হয়ে ওঠে ধূলিমলিন, জীবনের সকল সোনা-গলান-আলোর হয় অবসান।

আগের দিনের নারী তার স্বাধিকারকে জোর ক'রেই প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই স্বীকৃতি পেয়েছে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। আর নারীর হাতের স্পর্শের পরশমণির ছোঁয়ায় তাই বীর্য্য আর পৌরুষ মাধুর্য্যের মোড়কে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেও এই বাংলা দেশের নারীকে কি পরিমাণে অবলা, শক্তিহীনা, আত্মস্বাতন্ত্র্যহীনা ছিল তার পরিচয় পলাতকার পাতায় পাতায়।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই নারীসমাজের স্বপক্ষে। তিনি কবি—তাই অন্তরের তৃতীয় নেত্র দিয়ে যা তিনি দেখতে পেতেন, অন্যের পক্ষে তা দুরধিগম্য ছিল। নারী কবির কাছে কোনদিনই তাই অবলামাত্র ছিল না। তার মাঝে যে আত্মশক্তির অমিত সম্ভাবনা নিহিত আছে, সে সম্বন্ধে নারী অচেতন বলেই, অবলা হয়ে সে সমাজের অবহেলা আর নির্য্যাতন কুড়িয়ে ফেরে। আর এরই সুযোগে পুরুষ তাকে আজ্ঞাবহ দাসী ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। এদেরই লক্ষ্য ক'রে তাই কবির দীর্ঘশ্বাস:

হায় রে সামান্য মেয়ে
হায় রে বিধাতার শক্তি অপব্যয়!

পলাতকায় নারীর এই 'সামান্য-মেয়ে' রূপেরই প্রকাশ। পাতায় পাতায় শুধু তাদের ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস—আর সজল সহনশীলতা।

ন' বছরের এক ভীরু মেয়ে তার সরল ডাগর ডাগর চোখ দুটো মেলে দেখেছিল—দশের-ইচ্ছা-বোঝাই-করা এক সংসার।

তার পর দীর্ঘ বাইশ বছর কোন্ এক ফাঁকে চলে গেছে তার বদ্ধ জানলার পাশ দিয়ে, তা সে জানতেও পারে নি। তবু, মনের অতি গহন গভীরে সে সংগোপনে নাড়া দিত—হেঁকে বলত:

খোল্‌রে দুয়ার খোল্।

কিন্তু হায়রে, সংসারের চাকায় বাঁধা পড়েছে তার দেহ মন। অবাধ্য মনকে তাই সংসারের কঠিন নিষ্পেষণে জুড়ে দিতে সে বাধ্য হয়েছে। সংসার তাকে শুধু শিখিয়েছে:

রাঁধার পরে খাওয়া
আবার খাওয়ার পরে রাঁধা—।

এ জীবনটা ভালো কিংবা মন্দ, কিংবা যা হোক একটা কিছু, এ কথাটা বোঝার অবসরও তার ছিল না। তাই দীর্ঘ বাইশ বছর পরে মৃত্যু যখন শিয়রে এসে বসল—যখন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল, তখন আর সে বদ্ধ জীবনে বন্দী হয়ে থাকতে পারল না। এতদিনকার অসহ্য বেদনা তাই আজ গুমরে উঠল। অবলা-মনে আজ তাই অবলা-নারী বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আজ সে [illegible]:

আমি নারী, আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে
জ্যোৎস্না বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হ'ত কাননে ফুল-ফোটা।

কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। মহামরণ এসেছে তার বাসর সাজিয়ে। সংসারের আর তার কাছে কোন পাওনা নেই—থাকলেও আর বিদ্রোহিনী তা নেবে না। অবহেলিতা নারী এতদিনে বুঝেছে:

মরণ-বাসর ঘরে আমায়
যে দিয়েছে ডাক—
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে,
নয় সে কেবল প্রভু
হেলা আমায় করবে না সে কভু।

এই অবহেলা-হীন ভালবাসাই ছিল তার জীবনের সারা কামনা। তাই বাইশ বছরের দীর্ঘ জীবন তাকে যা দিতে পারল না—মৃত্যু তাকে হাত ধরে সেই মহান সম্মানের আসনে বসিয়ে দিল—সে অন্তর দিয়ে অনুভব করল:

মধুর ভুবন, মধুর আমি নারী।

বিনুর বয়স তেইশ। কিন্তু সংসার তার বিবাহিত জীবনের সকল রস—সকল সৌন্দর্য্যসম্ভার—সকল সৌরভ কেড়ে নিয়েছিল। নানান-জোড়াতাড়া-দেওয়া জীবনটা যখন আর চলতে না পেরে থমকে দাঁড়াবার উপক্রম করল—শুধু তখনই সংসার তাকে ছুটি দিল। কেন না সে যে অন্তঃসারশূন্য—সে থাকলেও আর সংসার তার কাছে কোন উপকার পাবে না। সে শুধু ভার—শুধু বোঝামাত্র। কিন্তু বিনুর মনে আজ একটি কথাই অসহ্য সুরে বার বার রিণিঝিনি করে বাজছে:

নিখিলে আজ একলা শুধু
আমিই কেবল তার
কেউ কোথা নেই আর
শ্বশুর ভাশুর সামনে পিছে
ডাইনে বাঁয়ে—।

তাই জীবনের এই পরম পাওয়ার আনন্দে পার্থিব ঐশ্বর্য্য তার কাছে অতি তুচ্ছ। জীবনের যত ঐশ্বর্য্য আছে চারদিকে তা ছড়িয়ে, ছিটিয়ে না দিতে পারলে—এই বহু বছরের ব্যর্থ বন্দী-জীবনকে সে ভুলতে পারবে না। তাই ঝামরু কুলির বউ রুক্মিনিকে এক কথাতেই পঁচিশ টাকা দিতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করল না। কিন্তু আগের নারীটির মতোই বিনুও আর ফিরে আসে নি। জীবনে যা সে পায় নি—জীবনের শেষবেলায় এসে সেই সুধার সন্ধান পেয়েও সে মরণের মাঝে পালিয়ে গেল।

শুধু সংসারের যাতনা—শুধু স্বামী-বিচ্ছেদই অবহেলিতা নারীর কাছে সব বেদনা নয়। মিথ্যা কুসংস্কারের মিথ্যা জাতি-গরবের জাঁতাতেও সে নিষ্পেষিতা। এরকম এক মেয়ের সাক্ষাৎ পাই পলাতকার মঞ্জুলিকার মাঝে।

মঞ্জুলিকার বিয়ে ঠিক হ'ল পাঁচ গুণ বয়সে বড় পঞ্চাননের সঙ্গে। বাপের সমর্থন এতে ষোল আনা। কেন না, মস্ত কুলীন ও যে! তার নিজের জীবন তার কথায়:

অষ্টাবক্র জমদগ্নি প্রভৃতি সব
ঋষির সঙ্গে তুল্য
মেয়ে মানুষ বুঝবে না তার মূল্য।

তাই উপায়হীনা মঞ্জুলিকার মা—মেয়ের বেদনার সঙ্গে আপন বেদনার স্রোত এক করে নেন নিঃশব্দে, নিবাক্যে:

—অন্তঃশীলা অশ্রুনদীর নীরব নীরে
দুটি নারীর দিন বয়ে যায় ধীরে।

—তবু মঞ্জুলিকার বিয়ে হ'ল সেই পঞ্চাননের সঙ্গেই। বাংলা দেশের অসহায়া শতকরা নিরানব্বইটি মেয়ের মতোই তাই, সেও দু'মাস না যেতেই—

বাপের ঘরে ফিরে এল
সিঁদুর মুছে শিরে—

অভাগিনী মায়ের একটিমাত্র উপায় ছিল। তিনি সেই মহাশান্তি মহামরণের কোলে আশ্রয় নিলেন।

মঞ্জুলিকা প্রাণপণে বাপের সেবা করে। বাপের পায়ে যখন বাত প্রবল, তখন তার শৈশবের খেলাঘরের সাথি, যৌবনের একান্ত আপন-করে-চাওয়া পুলিনকে ডাকা হ'ল। নিষ্ঠুর সংসার তার সব অলঙ্কার, সব ঐশ্বর্য্য নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু—

অন্তর তার বাড়িয়ে ওঠে সুরে সুরে—সে বুঝতে পারে না :

যে ছিল তার ছেলেবেলার
খেলাঘরের সাথি
আজ সে কেমন করে
জলস্থলের হৃদয়খানি দিল ভরে—
পুলিনের কাছে ধরা পরার ভয়ে—
ভয়ে মরে বিরহিণী—

*   *   *

শুনতে যেন পারে কেউ
বক্ষে যে তার বাজে রিণি-রিণি—

তবু ধরা পড়ে মঞ্জুলিকা।—

এদিকে স্ত্রীর মৃত্যুর পরে এগার মাস না যেতেই, মার স্মৃতি মুছে যাওয়ার আগেই বাপ চললেন বিয়ে করতে। কেন না বিয়ে করাই ধর্ম। একের পর এক স্ত্রী মরতে পারে—কিন্তু বাংলা দেশের কুলীন হয়ে বিয়ে না করাটাই অধর্ম! তাই মেয়ের জিজ্ঞাসার জবাব এল—কিন্তু গৃহধর্ম :

স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়
মনু হতে মহাভারত—
সকল শাস্ত্রে কয়—

শুধু তাই নয়—এর পর উপদেশ :

যে করে ভয় দুঃখ নিতে
দুঃখ দিতে
সে কাপুরুষ কেনই আসে পৃথিবীতে—

তাই মঞ্জুলিকা বাপের উপদেশই শিরোধার্য্য করে পুলিনের সঙ্গে পলাতকা হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই নারীর সবলা-মূর্তি-প্রেমিক। তিনি চান চিত্রাঙ্গদার মতো নারী—যে বলবে দীপ্তকণ্ঠে :

যদি পার্শ্বে রাখ…
আমার পাইবে তবে পরিচয়।—

তাই তার বিপ্রদাস বলেছে কুমুকে—

কুমু, অপমান সহ্য করে যাওয়া শক্ত নয়, কিন্তু সহ্য করা অন্যায়।

—এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথেরই। তাই পলাতকায় নারী ক্রমশঃই আত্ম-স্বাতন্ত্র্য লাভের পথে জয়যাত্রা করেছে—যার পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাই নন্দিনীর সবল বীর্য্যবান প্রেমের মধ্যে।

ছেলে-বেচা কোণ

প্রতিযোগিতায় মনোনীত গল্প

শ্রীআর্য দেব
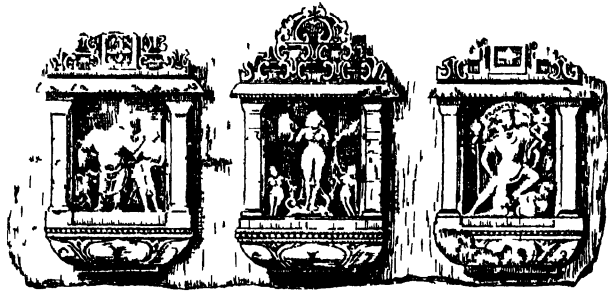
সারা দিনরাত কেমন এক বিশ্রী হাওয়া বইছে। এ-হাওয়ায় গা শিরশির করে, ধুলো ওড়ে, মনের মধ্যে ভয় জন্মায়। হাওয়ায় দু'এক টুকরো মেঘ ভেসে আসে আকাশে। মনে হয় বৃষ্টি হবে ; কিন্তু চাষী জানে এ-হাওয়া সর্বনেশে হাওয়া, এ-হাওয়ায় মেঘ দাঁড়ায় না, জল হয় না—এ এক ফাঁকা, বাঁজা হাওয়া। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পূব কোণের এ-হাওয়া নিরর্থক, শক্তিহীন, বিভ্রান্তকারী। সবাই আকাশের দিকে তাকায়, সেখানে মেঘ আর হাওয়ায় ভিজে গন্ধ প্রত্যাশা করে—মনে মনে প্রার্থনা করে, ঘুরে যাক, ঘুরে যাক এই হাওয়া, দক্ষিণ-পূব কোণ থেকে ঘুরে যাক দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, আর ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ঘিরে ভিড় করুক কালো ঘন মেঘ, বৃষ্টি পড়ুক অঝোর ধারায়, বৃষ্টি পড়ুক নদীনালা, খানাখন্দ, মাঠ-ঘাট ভরিয়ে দিয়ে।

মুক্তি হাড়ী ওরফে মুক্তি দাস হা-হা করে ওঠে, ই শালা ছেলে-বেচা কোণের হাওয়া বইছে, ইয়াতে সব্বনাশ হয়ে যাবেক আমাদের—

আকলু খাঁ ফুড়ুক ফুড়ুক বিড়ি টানতে টানতে বলে, গত সন অজম্মা গেল, তার আগের সন বান গেল, আবার ই সন জল নাই—না খাতি পায়ি আমরা মরি যাব—

দক্ষিণ-পূবের এ-হাওয়ার নাম ছেলে-বেচা কোণের হাওয়া। যে নিষ্ফল হাওয়ার ব্যর্থতায় চাষীকে হালের গরু পর্যন্ত বেচে ফেলে নিজের অন্ন-সংস্থান করতে হয়, সে হাওয়া ছেলে-বেচা কোণের হাওয়া। মাঠের ওপর যতদূর চোখ চলে শুধু প্রচণ্ড রোদ জ্বলছে, তার সঙ্গে মিশে আছে এলোমেলো নিষ্ফল এই ছেলে-বেচা কোণের হাওয়া।

মুক্তি হাড়ীর অনেকগুলো ছেলেপিলে, চাষ না হলে ও কি করে চালাবে? তবু ওর ভাগ্য ভাল যে, ও ইউ-নিয়ন বোর্ডের চৌকিদার, মাস গেলে দশটা টাকা মাইনে পায় ; কিন্তু ওরই মত অন্যান্য চাষীরা, যারা অনন্যসম্বল তারা কি করবে! আকলু খাঁ, হারু বাগ, খন্তা বাগদি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, ওদের মন বলে মুক্তি একটা উপায় বলে দেবে, হাজার হোক মুক্তি একজন চৌকিদার ত বটে!

মুক্তি বলে, আর চাষ কি করবে গো মিঞা, বীজ ত সব খরায়ে যাতিছে। বোশেখ মাসে ধুলোর বীজ পাতলাম, তা সব খরায়ে যাতিছে—আবার কি নেয়াজ বীজ পাততি হবেক ই আষাঢ় মাসে?

আকলু খাঁ ফাঁকা হাসি হাসে, তর আষাঢ় মাসও ত কাটি গেল—নেয়াজ পুতবি কখন?

মুক্তির মুখটা চুপসে যায়—তা ঠিক, তা ঠিক, আষাঢ় মাস গেল, শ্রাবণ মাস চলে যাবে, বৃষ্টি নেই। মাঠের চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। বোশেখ-জষ্ঠিতে যারা ধানের বীজ পুঁতেছিল এবং সেই সব বীজের চারা বেরিয়েছিল তারা এখন হা-হা করছে—চারাগাছের সবুজ পাতাগুলো জল না পেয়ে শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে, রোদে ঝলসে গেছে।

মুক্তি হঠাৎ এক মজার কথা বলে আকলুকে, জানলি মিঞা, আজ এক সরকারী বাবু আইছিল—

—ত কি?

—দেখতা আইছিল ই যে চতুর্দিকে বীজ খরায়ে যাওয়ার কথা উঠছে উটা সত্যি কিনা—ত উ বোয়ালি ধান দেখা কইলো 'বাঃ, ই ত বেশ বীজ হইছে, খরাইল কৈ'—

মুক্তি হাড়ী আর আকলু খাঁ হেসে উঠলো। মাঠময় জায়গায় জায়গায় সবুজ ধান বেরিয়ে আছে। কিন্তু সে-গুলো বীজতলা নয়। গত বছরের ঝরাধান থেকে ফুটে বেরোয় ঐ চারাগুলো। দেখলে অজানা লোকের ভুল হয় নতুন বীজ বলে।

সবাই এদিক-ওদিক ঘুরঘুর করে। কোথাও কোন কাজ নেই। মাঠে নেই, ঘরে নেই, খামারে নেই। মুক্তি, আকলু আরও কে কে যেন ঘরামির কাজ জানে, কিন্তু জানলে কি হবে—এখন ত কেউ কাজ করায় না—কাজ করাবে বর্ষার পরে। ওরা আশায় আশায় আছে বাবু-দের বড় বৈঠকখানাবাড়িটা কবে সারানো হয়। ও-বাড়ী কি আজকের!—ওর ছাটামো, পাড়, শাঁরকের

ওপর উই লেগেছে, কাবাড়ি আর কোনাচে কাঠগুলো হেলে পড়েছে—চাল খুলে সব বদলে ফেলতে হবে, নতুন করে বাঁধতে হবে, জায়গায় জায়গায় মেরামত করতে হবে।

ওদিক থেকে শিবু বাউরি আসছিল সারারাত মাছ ধরে। ক্যানেলে যে অল্প অকেজো জল রয়েছে তাতে ছোটখাট মাছ থাকে। লণ্ঠনের তেল পুড়িয়ে, না ঘুমিয়ে শিবু সারারাত মাছ ধরেছে।

মুক্তি জিগ্যেস করে, কি রে, কি পালি ?

শিবু তার ঝাঁপি খুলে দেখায় সরু সরু কয়েকটা শাদা চিংড়ি, চারটে ছোট কৈ, তিনটে ছোট লালচে রঙের মাগুর।

মুক্তি হেসে উঠল, লে, লে ইবার তু রাজা হবি—তর মাছ বিক্রি করে অনেক টেকা হবেক—শিবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় ওর দিকে তারপর কানিমুড়ে মাছগুলো আবার পুরে ফেলে ঝাঁপিতে। ওরা হাটের দিকে যায়। হাট এখনো ঠিকমত জমে নি, আর জমবেই বা কি নিয়ে—আনাজপাতি কিছুই পাওয়া যায় না এ-সময়ে, মাছের কথা ছেড়েই দেওয়া গেল। হাঁড়ি, কলসী আর রোজ রোজ কে-ই বা কিনছে, আর কেনবার পয়সাই বা কোথায়! হাটের ওদিকে রমজান সেখের গরুর গাড়ী তৈরির একটা ছোট কারখানা আছে :

—আরে, আসো চৌকিদার, বিড়ি খাও—বিড়ি এগিয়ে দেয় রমজান।

খন্তা বাগদি বলে, ত অবস্থা দেখছ ই হাওয়ার।

—হাঁ দেখছি ত—উত্তর দেয় রমজান।

মুক্তি বলে, কিন্তুক তুমার গাড়ী কিনবে কেডা, প্যাটে ভাত নাই, পরনে কানি নাই—বাবুদের অবস্থাও ত খারাপ হইছে।

—হাঁ ঠিক বটে—বলতে বলতে রমজান একটা চাকার লা-যের ওপর ঠুকে ঠুকে আড়া বসায়, তার পর লায়ের ভেতর ঠুকেঠাকে দেখে নেয় লোহার উলোটা ঠিকমত বসেছে কিনা। সে-সব হয়ে গেলে দুটো চাকার দুই লায়ের ভেতর ধুরো ঢুকিয়ে রোল্দখিল এঁটে দেয়। তার পর নিজেও একটা বিড়ি ধরায়।

আকলু খাঁ চাকা দুটোর দিকে তাকিয়ে বলে, হাঁ খুব ভাল হতিছে মনে লিচ্ছে—ই বীরমাটির দেশে চাকা শক্ত না করলি ভাঙি যায়, ই পেনোমাটি লয়, বীরমাটি—ই আমাদের দেখো না বীরমাটির লোক বলি এখনো দাঁড়াই আছি।

ক্রমে ক্রমে আরো ভিড় জমতে লাগল। রাম বাউরি, হাবু বাউরি পায়ে পায়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। রাম বাউরি বেশ আস্তে আস্তে কখন একেবারে মুক্তি চৌকিদারের প্রায় পাশে এসে বসে পড়েছিল। ওর মুখ দেখেই যেন বোঝা যাচ্ছিল ও কি একটা কথা বলব-বলব করছে। এটা-ওটা সাত-পাঁচ কথার মধ্যে ও এক-আধবার চেষ্টাও করছিল কি একটা বলতে, কিন্তু বোধ হয় সাহসে কুলোচ্ছিল না, তাই থেমে থেমে যাচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় প্রায় মরিয়া হয়ে ও মুক্তিকে জিগ্যেস করল, শুনতেছি গুরুপ লোন আসছে।

মুক্তি সবজান্তার মত রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল, হাঁ, প্রিসিডেন সাহেব আর মেম্বরবাবুরা কইছিলেন চিঠি আসছে গুরুপ লোনের। কিন্তুক কম টেকা মঞ্জুর হইছেই ইউনিয়নে, ত উয়ারাই ঠিক করবেন কারে কারে লোন দেওয়া লাগবেক।

মুক্তি গ্রামের চৌকিদার—সে ত সমস্ত কিছুর খবর রাখবেই, রাত্তিরে সে রোঁদ পাহারা দেয়, পুলিস বা অন্য কোন কর্মচারী এলে প্রথমে তাকেই খোঁজে, সে গ্রামে জন্ম-মৃত্যুর হিসেব রাখে, মাঝে মাঝে লোকজন সনাক্ত করে

ওর সবজান্তা ঈশ্বরের ভূমিকা দেখে আকলু খাঁ আর রমজান মিঞা আর রাম বাউরি এ ওর মুখের দিকে তাকায়।

রাম বাউরি জিগ্যেস করে, ত কারা কারা পাবেক ?

মুক্তি বলল, যাদের জমি আছে তারা পাবেক, যারা ভাগে চাষ করে তারাও পাবেক যদি জমিওয়ালারা উয়াদের জামিনদার হয়, গুরুপে লিতে রাজী হয়—

রাম বাউরিরা আবার পরস্পর মুখের দিকে তাকায়। তাদের কে নেবে গুরুপে! প্রথমতঃ, কেউই তাদের নাম দিতে চাইবে না; দ্বিতীয়তঃ, কেউ দিলেও তাদের এত ধারদেনা যে, অন্য কেউ তাদের জামিন হয়ে নিজেদের গ্রুপে নিতে চাইবে না। কৃষিঋণ বটে, কিন্তু অন্য অনেক কাজ হত রাম বাউরির যদি সে ঋণটা পেত। অন্ততঃ কুড়িটা টাকা পেলেও ওর পুরণো ধারদেনা খানিকটা শোধ করত, জামাকাপড় কিনত। কিন্তু কুড়িটা টাকাই কি পেত! নেবার লোক অনেক, শেষকালে হয়ত পাঁচ টাকা ছ'টাকা করে ভাগে পড়ত!

মুক্তি হাসল, ত টেকা লিয়ে করবি কি, জমিতে জল না পড়লি টেকায় কি হবেক, আর অত কম টেকা লিয়ে করবি কি ?

আকলু খাঁ দুম করে এক সময় বলে ফেলল, ই ত

গরীব মানুষের টেকা, ত প্রতিবছরই বাবুরা শুরুপ করে কিছু কিছু লিযে লেন।

মুক্তি আবার হাসে, ও বাবুরা লিবে না কেন কও, ইযার মত সুবিধার ঋণ ত আর নাই, সুদ কম পড়ে, আর একজন অন্যজনের জামিনদার থাকে।

কিন্তু টাকা যা পাওয়া যাবে তাতে এখন যদি বৃষ্টি হয় তাহলেও কোন লাভ নেই, এখন সার কিনে ছড়িয়েও বিশেষ লাভ হবে না। আর ও টাকা ত ওরা খেযেই ফেলবে, চাষের কাজে ব্যয় করবে না।

আবলু খাঁ হাই তোলে, এক সময় উঠে পড়ে আর বলে, যাই দেখি, কিছু ধান যদি পাওয়া যায, বাবুরা ত দিতি চায না, বলে শুধতি পারবি না।

তা শোধ করা ত কম কথা নয়। এখন যদি পঁচিশ টাকা মণে একমণ ধান নেবে, তাহলে ধান কাটার পর যখন ধান সস্তা হবে—ধরা যাক দশটাকা মণ হলে—তখন আড়াই মণ ধান ফিরিয়ে দিতে হবে, তাছাড়া সুদ ত আছেই। তাহলে যে দশমণ ধান তোলে তার পাঁচমণ যায় জমির মালিকের কাছে, আড়াই মণ যায় দেনা শুধতে, বাকি আড়াই মণে কদিন চলে! এ সবই কষা অঙ্ক, সোনা হিসেব।

কিন্তু মুখে মুখে হাজার হিসেব কষলেও প্রত্যেকের মুখ শুকিয়ে যায় আকাশের দিকে চাইলে, মেঘ উঠছে দক্ষিণ-পূব দিক থেকে, হাওয়াও উঠছে ওদিক থেকে, কিন্তু কিছুই দাঁড়াচ্ছে না, সব নষ্ট, সব ব্যর্থ—হেলে-বেচা কোণের হাওয়া, অর্থহীন হাহাকারের হাওয়া! কথায় বলে—পূবে বাতাস, পশ্চিমে মেঘ, উত্তরে ধ্বনি আর দক্ষিণে বিদ্যুৎ—এই চারটি অবস্থার মিল হলে জোর বৃষ্টি হয়, যেন চারটি সমর্থ পুরুষ মিলিত হলে একটা ভারী সংসার জোড়া লাগে—কিন্তু কোথায় তার চিহ্ন, কোথায় তার আভাস, চারিদিক শুকনো খট্‌খটে।

জল নেই, বৃষ্টি নেই কিন্তু নদী আছে। এঁকেবেঁকে চলে গেছে একফালি নদী। নদীতে জলধারা ক্ষীণ. তাছাড়া জমি থেকে অনেক নীচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী, আর ঐ মাঠের পর মাঠ কি নদীর জল টেনে চষা যায়! তবু শীতকালে তিলি-চাষীরা সাতঝেনে জলে ক্ষেত বাঁচিয়ে রাখে। পর পর সাতটা ঝাল তৈরি করে। সাতখানা ডুনিতে সাতজন লোক জল টেনে টেনে ওপরে তোলে। কিন্তু ধানের জমি ত বেগুনের ক্ষেত নয়!

ওদিকে ইউনিয়ন বোর্ড অফিসের সামনে ভিড় জমে যায়। প্রেসিডেন্ট, মেম্বর, সেক্রেটারি যে যা পারছে বোঝাতে চেষ্টা করছে সকলকে। কেউ থামে না, সবাই চ্যাচায়:

—এখন আমাদের অবস্থা কি হবেক কয়ে দেন বাবুমশায়…

—আপনার ঘট্টেরবাড়ীতে (গৃহস্থঘরে) আমাদের একটা কিছু কাজ দেন।

—আমরা খাতি না পারি মরব, আমারে ধান ধার দেন.

ওর মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় পুলিসের মাথা দেখা গেল। কি ব্যাপার? মেঘ নেই, জল নেই, রোদ খাঁ খাঁ করছে—এই অসময়ে পুলিস কেন?

সবাই একে একে ওদিকে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে খবর চাউর হয়ে গেছে, আরে, ভোরবেলা ক্যানিলের জল নিয়ে যে ঝগড়াটো হয়ে গেল সিটির তদারক করতি আইছে—

—ও বেপারখানা কি?

মনা রাগে চেঁচিয়ে উঠল, উ ক্যানিলের জল আমাদের মাঠে না দিয়ে অন্য মাঠে ছাড়ি দিছিল। উ শালার ক্যানিলের পাহারাদার—ও উখানে খুব মারছে।

সিধু দাস মাথা নাড়ল, আগো না, কথাডা কি জানো—উ পাহারাদারটো সব গাঁয়ের লোকদের কাছ থেকা পয়সা লিবে, কিন্তুক যারে খুশি তারে জল দিবে। সিধুর ঘাড়ের কাছে একগাদা ঘামাচি হয়েছিল; সেগুলো চুলকোতে চুলকোতে এবং পুটপুট করে মারতে মারতে কথাগুলো বলল সিধু।

ওরা সবাই আবার পায়ে পায়ে বোর্ড অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল—যেন তাদের এই বৃষ্টি, জল না হওয়ার জন্যে দায়ী সেই পাহারাদারটি—তাকে একবার পেলে! ওদের মাথার ওপর চন্‌মন্ করছে রোদ কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। কালো কালো গা বেয়ে ঘাম ঝরছে কিন্তু ক্লান্তি নেই। জলের জন্যে সবাই অধীর, আর সেই জল নিয়ে ছেলেখেলা! হোক না এতটুকু জল, যা প্রায় সবটাই মাঠের ফাটলে চলে যাবে, সেই জল ঠিকমত বিলি করবে না কেন পাহারাদারটা! এই এটেল মাটি বা বীরমাটির দেশের লোকগুলির মুখ কঠিন ভয়ঙ্কর হয়ে আছে। ঐ শক্ত মাটি জল পেলে নরম হয়, তাতে ধানের চারা ফোটে, আর ঐ শক্ত, রূঢ় মুখগুলোতেও তখন হাসি ফোটে, গলায় গান বাজে। না, না, জল নিয়ে খেলা করে, পয়সা নিয়ে জল দেয় না ও রকম লোককে খুন করে ফেললেও রাগ কমে না। ক্রমে জল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঝগড়া লাগে।

—না, আমরা আমাদের জমির উপর দিয়া ক্যানিলের জল উয়াদের গাঁয়ে যাতি দিব না—পাশের গ্রামের একজন গণ্যমান্য লোক মধ্যস্থতা করতে এসেছিলেন, তিনি বলে ফেললেন, তরা আর কস না, তদের আমি চিনি, কিছু পয়সা পালি তরা জল ছাড়ি দিবি তদের মাঠের উপর দিয়া

আকলু খাঁ চেঁচিয়ে ওঠে—বাবুমশায়, মুখ সামলায়ে কথা কইবেন। আমরা পয়সা লিই না, নিব না, কিন্তুক পশ্চিমের জমির উপর দিয়া আপনাদের জমিতে জল যাতি দিব না। উয়াতে আমাদের ক্ষেতি হব, আমাদের জমির সার নষ্ট হয়, উপরকার মাটি খারাপ হয়ে যায়—

গণ্যমান্য ভদ্রলোকটি বেশ রেগে যান, কিন্তু ক্রুদ্ধ চাষীদের সামনে মুখ খোলা সমীচীন না মনে করে চুপ করে থাকেন, তখন এদিকের এক মেম্বার বলেন, আরে, খালি ত পশ্চিমের মাঠেই জল পাবে, তা আপোসে মিটমাট করে নাও—

আকলু খাঁ বলে, আপোস কিসের কত্তাবাবু? দেখেন হেলে-বেচা কোণের হাওয়া বইছে, আকাশে মেঘ নাই, বীজতলা খাক হয়ে যাতিছে, ক্যানিলে যেটুক জল পেছি তাতে কতটুক জমিতে জল থাকেক, ত উয়ার ভেরা দিলে ··

—না, না, সবাই ভাগ করে নাও—বললেন মেম্বারবাবু।

অবশেষে ঠিক হ'ল একদিন এরা জল নেবে, একদিন ওরা। মাঠের ওপর দিয়ে যে জল যাবে সে জল কেউ বেঁধে দেবে না। যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই লাভ, কিন্তু এতে আর কি হবে? বিরাট মাঠ মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে। বৃষ্টি পড়লে, জল থৈ থৈ করলে এই জায়গাটাই সুজলা-সুফলা শস্যভূমিতে পরিণত হয়। ধানের সবুজে চারিদিক ঝলমল করে, বুক ভরে ওঠে আনন্দে—কিন্তু যা সর্বনেশে হাওয়া বইছে এবার, তাতে ও সব কি আর হবে!

ওদিকে হারু বাউরি তার লাঙলের জোয়াল, আঁকড়ো, আড়ৎ, বিদ, বোগার কাঠ সব কিছু টেনেটুনে ঠুকেঠাকে দেখছিল।

মুক্তি ওকে দেখতে পেয়ে বলল, কি গো বাউরির পো, কি করছ?

হারু কাণে খাটো বলে কোন উচ্চবাচ্য করল না।

মুক্তি চ্যাচায়, আরে ও হারু লাঙলপূজা করছিস নাকি?

হারু হাসল, আগো না গো, একটা ছেলা উদিক থেকা টিকেল (উঁকি) দিছিল, ভাবলাম লাঙলটা জখম করল কি না দেখা লই।

—আর জখম হইলেই বা কি না হইলেই বা কি—তর ভিতরডা ত জখম হইছে, মেঘ নাই, জল নাই—

হারুর চোখ দুটো যেন জলে ভরে উঠল। বোশেখ মাসে মুচির মেঘে যেটুকু জল হয়েছিল তাতে ও একবার জমি চষে রেখেছিল, তখন ভেবেছিল যে দোয়ারের সময় যখন চাষার মেঘের জল হবে এবং তার পর কাদানের সময় আরও ভাল করে চষবে। পেকে গায়ে দিয়ে জলে ভিজবে। পাঁজালি থেকে আগুন নিয়ে বিড়ি ধরাবে। আর সারা দিনরাত সময় নেই অসময় নেই শুধু খাটবে। তারপর নিড়োবার সময় এঁটেছেড়া, পাতিঘাস, জোয়ানে ঘাস ইত্যাদি আগাছাগুলো ছিঁড়ে ফেলবে। হারুর দু' চোখ জলে ভরে থাকে। পরিশ্রম করার জন্যে ত ও তৈরি, হাড়ভাঙা কঠোর পরিশ্রমের জন্যে, কিন্তু পরিশ্রমে ঘামই বেরোয়, জল ত আর বেরোয় না—জমি ঠিক খটখট করতে থাকে। আর ওরা বলে কি না খাদ কেটে জল বার করে দিতে, কেন না, অন্যের জমিকে ভেজাতে হবে।

আর শুধু কি বৃষ্টিই হচ্ছে না! এই গরমে কত লোক যে মারা গেল তার ঠিক কি! চুপীডাঙা থেকে শিমলন পর্যন্ত ঐ যে বিস্তৃত ধানাজমির মাঠ, যেখানে অন্য কোন গাছ নেই, ছায়া নেই, এক ঘটি জল পর্যন্ত পাওয়া যায় না, সেখান দিয়ে আসতে আসতে দু'দিন আগে মনা ফকির মারা গেছে।

—কি হ'ল ব্যাপারটো?

—উ যে ফকিরটো ছিল না, ঐ যে চুপীডাঙার পীরের আস্তানায় জেয়াপুতগাছের তলায় বসি থাকতো, উ বোধয় ভিক্ষা করতি বাইর হইছিল, ত বিকালে হক বাগ যখন ফিরতাছিল চুপীডাঙার দেখে কি আলের কিনারে একটা মানুষের মত পইড়ে আছে—উঠইতে দেখে আমাদের ফকিরটো—

—আহা, বড় ভাল ছিল ফকিরটো, আমার বেটাটার অসুখে তাগা দিছিল—

—ঠিক কইছ, ইবকম ভাল লোক আর দেখি নাই—

—ত আমাদের শুশুনীতে কি হ'ল শুন

—কি হ'ল?

—উ রতন চৌকিদারের খুব ভেদবমি হইছিল, ত উয়ার বেটাটো গেল দেড় কোশ দূরের মধু ডাক্তারকে ডাকতি—ত মধু ডাক্তার যখন দু' ঘণ্টা বাদ ঘোড়ায় চড়ি আসছিল দেখলো মাঠের মধ্যি একটা মানুষের মত—

কাছে গিয়া দেখলো উ বেটাটো বটে, মরি পড়ি আছে ··

সবাই উহু-আহা করে উঠল। সত্যি, ব্যাপার কি! এ রকম চলতে থাকলে ত সমস্ত জায়গাটা শ্মশান হয়ে যাবে। জমিতে ধানের কথা দূরে থাক, মানুষের প্রাণ বাঁচানোই দুরূহ হয়ে উঠবে।

এরই মধ্যে একদিন ঢোল-সহরৎ করে জানানো হ'ল অমুক দিনে গ্রুপ লোন দেওয়া হবে। জল না থাকলেও গ্রুপ লোন নেবার দিন ভিড়ে ভিড়ে আর তিলধারণের জায়গা রইল না বোর্ড আপিসে। ওপাশ দিয়ে আঁকা-বাঁকা ছোট নদীর কালো জল বয়ে যাচ্ছে। তার পাড়ে বাবলা-কাঁটার ঝোপ। ওদিকে একটা বকুল গাছ, একটা বট আর একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার তলায় তলায় ভিড় জমে আছে। আট-দশ মাইল দূর থেকে হেঁটে হেঁটে লোক এসেছে। যত রাতই হোক লোনের টাকা নিয়ে ফিরবে ওরা। বিভিন্ন বোর্ডের সেক্রেটারীরা নির্দিষ্ট ফর্ম ভরে দিচ্ছে—ওদিকে টিপসই দিচ্ছে লোকেরা। দশ টাকা, কুড়ি টাকা যা হোক কিছু ঋণ পেয়েই অনেক লোক গ্রামের প্রান্তে দোকানগুলোর দিকে যেতে লাগল। চাষ ত আছেই, কিন্তু ভালমন্দ দু'একটা সখের জিনিসও ত দরকার! মুক্তি চৌকিদার ভিড় সামলায়, ওর চেনাজানা লোকদের সঙ্গে গল্প করে, আর বলো না তে লোন ত লিছ, কিন্তক ই ত তমার তিনদিন খাইতেই ফুরঃ যাবেক—

ত কি করবো? আগে ত খাতি হবেক, তার পর তমার চাষবাস—

—কিন্তক বীজ যে খরাযে যাতিছে উয়ার কি করবেক?

—হা মজা দেখো, মাঠের সিচের পুকুরগুলা পর্যন্ত শুকাই গেল—ই ধুলার বীজ ছাড়ি দাও, জল নামলি আবার নেয়াজ বীজ পাইতে'

সবাই আকাশের দিকে তাকায়, হাওয়ার গন্ধ শোঁকে, হাওয়া অনুভব করে। কিন্তু ঠাণ্ডার স্পর্শ কৈ, মেঘের আভাস কোথায়? আকাশে গন্ গন্ করছে সূর্য, নীচে গরম, ঘাম, ধুলো, ক্লান্তি, ক্লান্তি! গরুগুলো ধুঁকছে, পাড়ার কুকুরগুলো পাগল হয়ে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছে। কেউ মানত করছে দেবতাস্থানে, কেউ পূজো দিচ্ছে এখানে-ওখানে! বৃষ্টি নেই, চাষ নেই, অন্য কাজও নেই। কাজ কে দেবে? যারা ভাগে জমি পায় না, তারা মুনিষ খাটে, কিন্তু সে কাজও কি আর পাওয়া যাবে! আজকাল বাবুরা দুমকা, সাঁওতাল পরগণা আরও কত জায়গা থেকে গাড়ীভাড়া দিয়ে সাঁওতাল মুনিষ এনে চাষ করান—ওরা নাকি কাজ করে ভাল, খরচ কম পড়ে। তা এরা যাবে কোথায়? জল নেই, জল নেই এই ধুয়োতে অত শত কথা কারুর মাথায় এখন খেলে না।

মুক্তি ঘুম থেকে উঠে যথারীতি একবার জন্ম-মৃত্যুর খোঁজ করে। হ্যাঁ, সিধু বাউরির একটা বেটাছেলে হয়েছে—এই নিয়ে ওর সাতটি! দাশু বাগের একটা মেয়ে হয়েছে—হাতচিঠার ওপর লিখতে লিখতে মুক্তির মনটা চুপসে যায়—এই ছেলেমেয়েগুলো আবার ওদেরই অন্নে ভাগ বসাবে! তার পর মুক্তি খোঁজ নেয় কেউ মরলো কি না—না, যে যে বুড়োগুলের মরা উচিত ছিল তারা এখনও কেউ মরে নি, কেউ রোগশয্যায় আছে, কেউ ধুকছে! সর্দিগর্মীতে মারা গেছে সেই বুড়ো ফকিরটা—কিন্তু ও কোন্ ইউনিয়নের লোক, ও ত সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়ায়! তার পর এ-ও-তার সঙ্গে দেখা হয় ওর। সকলেরই সেই এক কথা—জল নেই, জল নেই!

সেদিনই বিকেলে কিন্তু দারুণ গুমট করেছিল। ছেলে-বেচা কোণের সেই সর্বনাশা হাওয়াটা থেমে গেল বলে মনে হ'ল, কিন্তু গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হতে সুরু করলো। ওরা অনেকে বড় রাস্তার কাছে ছোট চায়ের দোকানটিতে বসেছিল। বেশ রসিক দোকানীটি। রসিয়ে রসিয়ে সে মুক্তিকে বলছিল, কি গো চৌকিদার—শেষে চায়ের দোকানে আইলে?

—কেন, আসতে নাই?

—আহা, তমরা ইখানে আইলে উ গুডিখানা আমায় গালি দিবে—

মুক্তি হাসল, তা ঠিক কইছ—এখন পয়সা নাই, প্যাটে ভাত নাই—এখন উ সব থামি আছে।

ওরা সবাই হো-হো করে হাসল। দাশু বাউরি হঠাৎ দেয়ালের একটা কোণ দেখাল—কি? কি?—উ দ্যাখো কেনে, কালো পিঁপড়ারা মুখে ডিম লিয়ে চলছে—

সবাই যেন তাজমহল দেখছে এমন অবাক হয়ে দেখতে লাগল! আশ্চর্য, আশ্চর্য! তাহলে কি সত্যিই এবার জল হবে! একটু পরেই হাওয়া উঠল ··

মুক্তি বলল, দূর, ই সব্বনেশে হাওয়া ·

পঞ্চানন বলল, আরে না, না, দেখো না কোন দিকের হাওয়া—বলেই পঞ্চানন এক মুঠো ধুলো উড়িয়ে দিল। দেখা গেল হাওয়াটা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বইছে। হ্যাঁ ত, হ্যাঁ ত, ওর কোঁচার খুঁটটা খুলে গিয়েছিল, সেটাও

হাওয়ার অনুকূলে পত্ পত্ করে উড়তে আরম্ভ করল। ওদের বুক ভরে গেল হাওয়ায়, মুখ ভরে উঠল হাসিতে।

—ওরে চল রে, লাঙল ঠিক করি রাখ···

—কি ব্যাপার ?

—জল হবেক।

পঞ্চাননই দেখাল, হুই দেখো—সত্যিই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের আকাশে কালো মেঘ উঠেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

ওরা সবাই ছুটল ঘরমুখো। লাঙল, গরু ঠিক করে রাখল। শ্রাবণ মাসে অনেক দেরিতে জল হচ্ছে। সময় নেই, কিন্তু আশা আছে। হাওয়া উঠেছে, সোঁদা সোঁদা গন্ধ ভাসছে—ওদিকে নিশ্চয় কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। রাত্তিরে ঝিম্ ঝিম্ করছে চারদিক। তেল-নুনের ছোট-খাট দোকানগুলো ঝাঁপ বন্ধ করছে। কোথাও এক-আধটা লণ্ঠন জ্বলছে। অধৈর্য চাষীরা যেন আর অপেক্ষা সইতে পারে না।

তার পর দেখা গেল গ্রামের প্রান্তে সেই রাত্তিরেই অনেকগুলো মাথা জড়ো হয়েছে। তখন আকাশ ঢেকে গেছে মেঘে। আস্তে আস্তে বৃষ্টি সুরু হয়ে গেল—জোরে ঝেঁপে বৃষ্টি এল। ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই বৃষ্টিতে ভিজতে লাগল, বৃষ্টি দেখতে লাগল। বৃষ্টির মধ্যেই ফিরে যেতে যেতে মুক্তি বলল, কাল আবার নেয়াজ পাততি হবেক—

—ভয়ের কি আছে—উ চাপান দিলি সব ঠিক হয়ে যাবেক—

মুক্তি হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, সাপ, সাপ—

পঞ্চানন হাসল, আরে ছাড়ি দে, উ জলঢোড়া বটে—

সবাই হাসল, হো-হো করে।

মুক্তি বলল, হাঁ এতদিন উ আমাদের মতন শুকাই ছিল, এখন জল মাখতি বাইর হইছে।

—:—

আন্তর্জাতিক প্রাচ্যবিদ্যা-কংগ্রেস ও সোভিয়েট সংস্কৃতি

শ্রীকালিদাস নাগ

মস্কো থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম গত বৎসর। আমার Discovery of Asia পেয়েই U S S R Academy of Scienoes নিমন্ত্রণ পাঠান, ১৯৬০ আগষ্ট মাসে তাঁদের অতিথি রূপে মস্কো প্রাচ্যবিদ্যা-কংগ্রেসে (XXV International Congress of Orientalists) যোগ দিতে। আমাকে India Govt Delegates-দের সঙ্গেই মস্কো যেতে হ'ল তার মধ্যে বন্ধুবর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় (নেতা) আগেই ইউরোপ হয়ে সস্ত্রীক মস্কো পৌঁচেছিলেন। সস্ত্রীক সিকিমের মহারাজকুমার, শ্রীমতী কমলারত্নম্, প্রত্নতাত্ত্বিক অমলেন্দু ঘোষ (Director General of Archeology), অধ্যাপক Nizamuddin (Hydorabad), Dr. A. Saroor (Aligarh), অধ্যাপক ক্ষেত্রেশ চট্টোপাধ্যায় (কাশী), অধ্যাপক R. Dandekar ও পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী জোশী (Poona), Dr. A. C. Chattiar (Madras), শ্রীইন্দুশেখর এবং Principal Gaurinath Sastri (সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ) ও আমি। সদস্য আমরা Soviet Aeroflot জেট্ প্লেনে চড়লাম। ভগ্না ইলা পাল-চৌধুরী, ভোর ৫টার মধ্যে তাঁর গাড়ীতে দিল্লী Aerodrome পৌঁছে দিলেন, কিন্তু প্লেন উড়ল প্রায় ৬৷৷০ টায়। দিল্লীর দিগন্তে তখন অরুণ-রাগ দেখা দিয়েছে, কিছুক্ষণ উড়তেই, Soviet Land পত্রিকার সম্পাদককে নিয়ে প্রসিদ্ধ রুশ সাংবাদিক Efimov আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তাঁদেরই জন্য স্বয়ং Captain তাঁর Airmaps আমাদের দেখিয়ে বোঝালেন : এক দিকে আমাদের সব চেয়ে বড় প্রতি-বেশী চীনরাষ্ট্রের Kuen-lung পর্ব্বত-মালা, মধ্যে নেপাল-লাডাক-তিব্বত, সব পার হয়ে, Karakoram-এর উপর দিয়ে Aeroflot ছুটেছে; পশ্চিমে গান্ধার ও Afghan দেশ ফেলে, তাজিক, Khirghizistan হয়ে Uzebekistan-এর তাশকেন্দ শহরে (Tashkent)-এ নামিয়ে দিল। নেমে দেখি সেই মরুভূমি এখন সরগরম ১০৷১২টা জেট্-প্লেনের আসা-যাওয়ায়।

উজবেক-শিশু বাবর (ওঁদের ভাষায় Baboor) ছিলেন তৈমুরলঙ্গের প্রপৌত্র অর্থাৎ তুর্ক-মোঙ্গল বংশীয়। ভাগ্যান্বেষী বাবুর (১৪৮৩-১৫৩০) এই অঞ্চল থেকে পদব্রজে সসৈন্যে কেমন করে সুদূর ভারতে এসে, সংগ্রাম-সিংহ প্রমুখ রাজপুত বীরদের হারিয়ে সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন সে সব কথা মনে এল। এই আফগান রাজধানী কাবুলের গোলাপ-বাগিচায় তাঁর সমাধি আজও দেখা যায়। সব কথা ও কাহিনী, বিশেষ বাবুর-রচিত "তুর্কী" ভাষায় লেখা তাঁর মনোজ্ঞ জীবনী, মনে পড়ে গেল। মসগুল হয়ে তাশকেন্দ নামতেই এক বিদুষী মহিলা এসে অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের পাঞ্জাবী ঠাকুমা-দিদিমার মত মুখখানি। তিনি আবার Uzbeck আকাদেমীর প্রতিনিধি হয়ে আমাদের মতনই Moscow যাচ্ছেন; তার কাছ থেকে Samarkand, Bokhara-র সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব (যা পারশিক সাহিত্যে পাই) ছাড়া তুর্কী Uzbeck দেশ তার ভাষা ও সংস্কৃতির অনেক নূতন খবর পেয়ে সুখী হলাম।

মধ্য এশিয়া মানেই ভীষণ Gobi মরুভূমি, এমন ভুল ধারণা মানুষের কেন হয়ে গেছে জানি না। কিন্তু তার প্রতিবাদ করেছে সোভিয়েট রাষ্ট্র এই মরুভূমিতে শস্য ফলিয়ে ও ফুল ফুটিয়ে, তা স্বচক্ষে দেখলাম। মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে টেনে মানুষের আধুনিক যুগে Soviet এনে ফেলেছে: Uzbeck, Tajik Khirgiz, Turcoman ও Kazakstan-এর মানুষদের সবাই নিজ নিজ ভাষায় সাহিত্য গড়ছে ও (২০০ রকম প্রাদেশিক ভাষা থাকলেও) কেন্দ্রীয় রুশ ভাষার সাহায্যে ২১২ মিলিমন মানুষের সোভিয়েটকে ঐক্যবন্ধনে বড় করে তুলছে; সেই প্রাণের স্পন্দন ও জীবন-তরঙ্গ এই সব মরুভূমির বুকেও পেলাম। বিশাল (Volga) ভল্গা নদীর জল দেখতে দেখতে বিকালে Moscow Aerodrome-এ নামা গেল। এই পথ দিয়েই পদব্রজে ভারতে এসেছিলেন প্রথম রুশপর্য্যটক Nikitin (1468-74) Vasco-da-Gama-র আগে।

আমাদের ভারত-রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা প্রায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের দ্বিগুণ হবে কিন্তু ঐক্য চেতনায় আমরা কত পিছিয়ে রয়েছি তার প্রমাণ ভারতে আজও ভাষার "কুরুক্ষেত্র" পাঞ্জাব ও আসাম তার প্রমাণ; এটা না থামলে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। এর প্রতিষেধক অনেক প্রণালী সোভিয়েট থেকে আমরা শিখতে পারি, ক্রমশঃ সে সব আলোচনা করা যাবে।

কেন জানি না—হয়ত রবীন্দ্রনাথের অযোগ্য শিষ্য বলেই আমাকে ১৫ই আগষ্ট সভাপতি পদে বরণ করা হল কংগ্রেসের সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্ব (Aesthetics) বিভাগে। এর মধ্যে শুধু প্রাচ্যের শিল্প ও ভাষাতাত্ত্বিক নয়, প্রতীচ্যের (ইউরোপ ও আমেরিকা) অনেক বিশেষজ্ঞেরা ছিলেন। সভাপতির ভাষণে আমি স্মরণ করলাম যে আগষ্ট ৭ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে যেমন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারিয়েছি, তেমনি এশিয়ার বিশাল ভারতরাষ্ট্র (১৫ আগষ্ট) স্বাধীনতা লাভ করেছে। তাই প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ভারতবাসী, আজ সোভিয়েট-বন্ধু। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও মাননীয় ক্রুশ্চেভের যুগ্ম-নেতৃত্বে, বিশ্ব-শান্তির প্রতিষ্ঠায় তাঁরা প্রয়াস করছেন। আমার প্রারম্ভিক ভাষণ শেষ হতেই এক রুশ-পণ্ডিত আমাকে আলিঙ্গন করে সারা সোভিয়েটের তরফে ভারত-মৈত্রী ঘোষণা করলেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কার্য্যারম্ভ করা গেল দুটি ভাল প্রবন্ধ (রচয়িতাদের অনুপস্থিতিকে) "taken as read" হল: শ্রীমতী হেমলতা জনস্বামী, ১৬।১৭ শতকের—তেলেগু ও হিন্দী কাব্যের—তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। আরো Eastern Theory of Literary Criticism প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন আলিগড়ের জনাব এম. হোসেন এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে অধ্যাপক ডাঃ এ. স্যারোর উর্দ্দু ভাষায় সমাজ ও সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ পড়লেন। ইনি, আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে, 'উর্দ্দু সাহিত্যে রবীন্দ্র প্রভাব বিষয়ে গবেষণার সূত্রপাত করবেন জানিয়ে, আমাদের কৃতার্থ করলেন। নানা ভাষায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রভাব কি ভাবে পড়েছে তার যাচাই করার উদ্দেশ্যে আমি মস্কো কংগ্রেসে প্রস্তাব পাস করাই যে রবীন্দ্র "গ্রন্থপঞ্জী", বা International Tagore Bibliography সঙ্কলন সুরু করা হোক। আরো জানাই যে বিশ্বভারতীর নেতৃত্বে, শ্রীপুলিনবিহারী সেন এক্ষেত্রে কাজ করে চলেছেন। ডাঃ ওয়ালটার রুবেন (পূর্ব্ব জার্ম্মানী) এবং Prof Norman Brown (ইউ. এস. ঠাকুর-শতবার্ষিকীর সভাপতি) প্রভৃতি আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। এই প্রস্তাব আমি আবার এনেছিলাম দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া বৈঠকে।

শ্রীশিবদান সিং চৌহান (সস্ত্রীক) দুটি পৃথক প্রবন্ধে হিন্দী সাহিত্যে মানবিকতা Humanism বিষয়ে সুচিন্তিত আলোচনা করেন ও উত্তর-প্রদেশের শ্রীমতী কমলা রত্নম তাতে যোগদান করেন। চৌহানজীর গবেষণার বিষয় Classification of Indian Alamkaras or Indian Poetics its origin develop-

ment and modern relevance—স্বভাবতঃই নানা জটিল মতবাদ ও তর্ক বিতর্কে পৌঁছায়। আমি রবীন্দ্র রসায়ন প্রয়োগে আপাত বিসম্বাদকে মৈত্রী-সহযোগে পরিণত করি ও নিবেদন করি যে—অমিল দূর করে—মিলের যাদুকর রবীন্দ্রনাথের শতাব্দী উপলক্ষ্যে, শিল্প সাহিত্য অলঙ্কারাদি শাস্ত্র মন্থন করে একটি ভারত রস-সাহিত্যের গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography of Indian Art and Aesthetics) অবিলম্বে সুরু করা হোক্। সবাই আমাকে এ ক্ষেত্রে সমর্থন করেন।

তুর্কী আনকারা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাঃ ওয়ালটার রুবেন (অধুনা পূর্ব্ব-বারলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে) Modern Indischen Romanen আধুনিক ভারতের উপন্যাস-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান তিনি দেন বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সহযোগী রমেশ দত্ত প্রভৃতি কথা-শিল্পীদের। জার্ম্মানে এ প্রবন্ধ পরে ছাপা হবে। শেষে রুশ গবেষক ই. সেলিসেভ (মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়) এক সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়েন ও হিন্দীতে আলোচনা করেন, তার বিষয় ছিল "On the Evolution of Ideologial and Aesthetic Ideals in modern Hindi Poetry"। সেই আলোচনায় বঙ্গ ভাষাবিদ্ অধ্যাপিকা ভেরা নবিকোবা, শ্রীগোপাল হালদার প্রভৃতি যোগদান করেন। শ্রীমতী নবিকোবা তাঁর রচিত ছুখানি ভাল বাংলা গদ্য ও পদ্যের "সঞ্চয়িতা" (anthology) আমাকে উপহার দেন। মস্কো ও লেনিনগ্রাদে বহু নরনারী বাংলায় আমাদের সঙ্গে কথা বলেন। অধ্যাপক নীরেন রায়ের কাছে শুনি একজন বাঙ্গালী লেনিনগ্রাদে বহুদিন বাংলা পড়িয়ে সার্থক প্রচার করে গেছেন। Indian Delegation নেতা অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মঙ্গোলিয়ার উলান্ বাটের সফর সেরে, মস্কো অধিবেশনে আমাদের সঙ্গে যোগ দেন ও তাঁর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সবাই বিস্মিত হন। তিনি আমার Discovery of Asia-র ভূমিকা লেখেন ও দ্বিতীয় খণ্ড সদ্য প্রকাশিত আমার 'Greater India' বইখানি 'ওরিয়েন্টালিষ্ট কংগ্রেস'কে আমার হয়ে উপহার দেন। উক্ত ছুখানি বই আমি বিশ্ববিখ্যাত লেনিন লাইব্রেরীতেও উপহার দেওয়ায়, তাঁরা আমাকে "সদস্য" নির্ব্বাচিত করে সম্মান দেন ও Nikitin-এর "ভারত ভ্রমণ" (১৪৬৮-১৪৭২) প্রভৃতি অনেক অমূল্য পুঁথি (manuscripts) আমাকে দেখান। মধ্য-এশিয়া ঐতিহ্যের খনি, কত পুঁথি ও শিল্পনিদর্শন যে ওখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে তা Moscow ম্যুজিয়ামে দেখে চমৎকৃত হয়েছি ; এখানে এসে সব না দেখলে কল্পনা করাও কঠিন হ'ত।

লেনিনগ্রাড

তাই মস্কো ম্যুজিয়াম (পরে লিখব) দেখা শেষ করে, বন্ধুবর পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আগের রাজধানী লেনিনগ্রাড (প্রাচীন Petrograd) পরিদর্শনে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম। মস্কো থেকে যাওয়া-আসায় দুটি রাত্রি ট্রেনেই কাটাতে হল। কিন্তু রুশরাষ্ট্রের কৃপায় শুধু প্রথম শ্রেণী নয়—অ-বর শ্রেণীর যাত্রী আমরা দুজনে কি আরামে ও সুনিদ্রায় কাটিয়েছি ও দুজনে ফলাহার করে কত মজার গল্পও করেছি সে সব সুরসিক বন্ধু গৌরীনাথ হয়ত লিখবেন। আমি তাঁকে দিয়ে সুপ্রাচীন লেনিনগ্রাড অকাডেমির খাতায় দেবভাষা সংস্কৃতে, ভারতের শুভেচ্ছা ও মঙ্গলকামনা লিপিবদ্ধ করালাম। তাঁরাও খুব সুখী হয়ে বহু প্রাচীন অমূল্য গ্রন্থ ও পুঁথি পত্র আমাদের দেখালেন। তার মধ্যে অবাক হলাম দেখে এক বাঙালী পণ্ডিতের হাতে-লেখা পুঁথি ও "বিবাদার্ণব" পর্য্যায়ের এক ১৮ শতকের পুঁথি (হিন্দু-ব্যবহার শাস্ত্র বিষয়ে) যেটি হয়ত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের গোষ্ঠীর কোন পণ্ডিত Sir William Jones (1746-1894) উদ্দেশ্যে নকল করেছিলেন ; এ খবর Jones Bi-Centenary Volume সম্পাদকরূপেও আমি জানতাম না ; এখানে স্বচক্ষে দেখে অবাক হলাম। ১৭৯৬ সনে রুশ মনীষী H. Lebedev কলিকাতায় প্রথম বাংলায় নাট্য যোজনা করেন জানা ছিল। কিন্তু তারও আগে বাংলা থেকে পুঁথি সংগ্রহ হয়েছে পেট্রোগ্রাডে। তাই ১৮৫৫-১৮৭৫ এই কুড়ি বছর ধরে পৃথিবীর বৃহত্তম সংস্কৃতের অভিধান (worterbuch), St. Petersburg Dictionary নামে প্রকাশিত হয়। তখন রাধাকান্ত দেব তাঁর 'শব্দকল্পদ্রুম' রচনায় বহু পণ্ডিত নিয়োগ করেছেন। সেই বাঙালীর গৌরব "শব্দকল্পদ্রুম" ও তারানাথ তর্ক-বাচস্পতির "বাচস্পত্য" অভিধান দুটি সংস্কার করে পুনর্মুদ্রণ করা হোক্ এ আবেদনও আমি জানাই যেদিন সুপণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইনি বহু আলোচনায় যোগ দেন) ও শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী তাঁদের সুচিন্তিত ভাষণগুলি দেন কংগ্রেস সভায়। সুকণ্ঠ গৌরীনাথের সংস্কৃত ভাষণ ও আবৃত্তি শুনে অনেকেই মুগ্ধ হন দেখে গর্ব্ব অনুভব করেছি ; আশা হয় যে ভারতের মূলভাষা সংস্কৃতের প্রসার সর্ব্বত্র অচির ভবিষ্যতে বাড়িবে।

লেনিনগ্রাড একদিকে জার বংশের অতীত গৌরবের শ্মশান। রুশ সম্রাটদের Summer ও Winter Palace-

গুলি এখন জনশিক্ষাকেন্দ্রও বিরাট ম্যুজিয়াম হয়ে উঠেছে। সারা রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র হার্মিটেইজ ম্যুজিয়াম যেন শিল্পের এক বিরাট বিশ্বকোষ। তার উপর (Hermitage) পৃথক সচিত্র প্রবন্ধ লেখা দরকার। রাশিয়ার রাজবংশের গোড়াপত্তন হয়, না Petrograd, না মস্কোতে, কিন্তু প্রাচীন Kiev (Ukraine রাজধানী) সহরে। এখান থেকে Byzantine শিল্পপ্রভাব ও Greek Oxthodox গির্জ্জা সারা রাশিয়ায় এক লিপি (seripp) ও সংস্কৃতি এনেছিল। El. Greco (1541-1614) ঐতিহাসিক Crete-এ জন্মে Spain দরবারে আশ্রয় নেন। তাঁর মৌলিকতা এমনি অসাধারণ যে, একদিকে মধ্যযুগের তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী আবার অতি-আধুনিক (Futurist) চিত্রীদের আরাধ্যগুরু। স্পেন ভ্রমণের সময় Toledo সহরে আমি যাই চিত্রকর Greco শিল্পকীর্ত্তি দেখতে। তাঁর কিছু চিত্র Hermitage মিউজিয়মে আসে (Peter ও Paul যুগ্মমূর্ত্তি) তাঁরই সমসাময়িক স্পেনের শিল্পী Velasques (1599-1660) ও তাদেরও আগেকার বিশ্ব-বিখ্যাত ইতালীর ওস্তাদ Titian (1485-1576) এবং Michael Angelo (1475-1564) Leonardo (1452-1519) প্রভৃতিতে সবাই Hermitage গ্যালারীতে আছেন। Raphael (1483-1520) এর ছবি দেখার জন্য অনেকে Paris, Dresden, Rome ঘুরে বেড়ান; অথচ তাঁরা জানেন না Hermitage-এ কিছু অপূর্ব্ব ছবি রাফেলের আছে। Remdrandt (1606-1669) Rubens (1577-1640) প্রভৃতির বহু ছবি আছে। Europe-Americaর প্রায় সব গ্যালিরী দেখেও আমি এবার Russian Collection দেখে অবাক হয়েছি। শুধু classical ওস্তাদরা নয় ঊনিশ শতকের শিল্পবিপ্লবী সেজান্ (Cezanne) (1839-1905) গোগাঁ Gaugain (1848-1903) আঁরি 'মাতীস্ Heari Matisse (1864-1954) এবং আধুনিক ও অতি-আধুনিক বহু শিল্পীদের এই লেলিনগ্রাদের Hermitage শিল্প-সংগ্রহ দেখে বিস্মিত হয়েছি।

সোভিয়েট শুধু অর্থনৈতিক সমস্যায় মেতে আছে ও রাজনৈতিক উত্তেজনায় উন্মত্ত—এই সব "প্রোপাগাণ্ডা" ভারতবাসীরা যেন হজম না করে তাই ছোট প্রবন্ধে সতর্কবাণী শোনালাম। পৃথিবীর Stratosphere পার হয়ে Sputnik প্রথম মানব-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অভিনব আবিষ্কার রুশ বৈজ্ঞানিকরাই করেন। আমি Moscow ছাড়ার আগেই প্রথম দুটি প্রাণী—শাদা ও কালোমানিক, জীবন্ত কুকুর দুটি পৃথিবীতে তারা ফিরিয়ে এনেছেন দেখে এলাম Major Gagarin স্বশরীরে উড়ে এলেন তার পরে। চন্দ্র-গ্রহের স্পর্শ মানুষ প্রথম পেয়েছে এই রুশ-বৈজ্ঞানিকদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে। গ্রহ থেকে Mars, Venus প্রভৃতি সুদূর উপগ্রহে মানুষ যখন Major Gagarin-এর মত যাবে, তখন সোভিয়েট শিল্পও বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ জগতে হবে। মাত্র ৪০ বছরের (১৯১৭-৫৭) মধ্যে গাণিতিক ও প্রয়োগবিজ্ঞানক্ষেত্রে এমন "যুগান্তকর" আবিষ্কার যে জাতি ও দেশ করতে পেরেছে, তাদের শিক্ষা ও সমাজ-বিধি নিয়ে ভারতে আমাদের একান্ত আলোচনা করা আশু প্রয়োজন। গত ৪০ বছরে ভারতে আমরাই বা কি করেছি ও কেন অগ্রসর হতে পারি নি সে প্রশ্নও স্বভাবতই মনে জেগেছে। হয়ত আমার মত অনেকে একথা ভাবছেন। তাঁদের মতামত ও সংযোগ লাভের আশায় আমি আলোচনা সুরু করলাম। "প্রবাসী"র মাধ্যমে সোভিয়েট-ভারত মৈত্রী বন্ধন দৃঢ় হবে এই আশায় লেখা সুরু করা গেল।

—০—

নৈদাঘ

শ্রীসীতা দেবী

নারায়ণ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের ছেলে। এই বর্ণনা শুনিলেই আজকালকার দিনে যে ছবিটি মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠে, নারায়ণ ঠিক সেই রকম নয়। শরীর তাহার ভালই, দেখিলে অনাহারক্লিষ্ট একেবারে মনে হয় না। মুখশ্রীও মন্দ নয়। লেখাপড়া করিয়াছে, এম্. এস্-সি. পাস। ঘরে বসিয়াও নাই বেকার অবস্থায়।

এ হেন নারায়ণ যদি বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রে দ্রুতপদে হাঁটিয়া আসিয়া বাড়ীতে ঢোকে এবং স্নানের ঘরে গিয়া দেখে যে বড় জলের ড্রামটি খালি এবং বালতি দুইটির একটিতে খানিকটা সাবান-গোলা জল, অন্যটি শিশুর ছাড়া জামা ও জাঙ্গিয়ায় ভর্ত্তি, তাহা হইলে রাগ করিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। সজোরে বড় বাল্‌তিটায় এক লাথি মারিয়া সে বেশ উচ্চকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, "এই বুটুলি, আমি স্নান করব কিসে? বেলা বারোটায় তেতে-পুড়ে এলাম, তা মুখটা ধোবার সুদ্ধ জল নেই?"

পাশের ঘর হইতে মিহি নারীকণ্ঠ ভাসিয়া আসিল।

"আজ বুটুলি আর টুটুলি মিলে জল নষ্ট ক'রে ফেলেছে, ওদের কাপড়-জামাও কাচা হয় নি।"

নারায়ণ গলাটা আরো চড়াইয়া বলিল, "ওরা যখন জল নষ্ট করছিল, তখন তুমি কোথায় ছিলে শুনি?"

অন্তরালবর্ত্তিনীরও কণ্ঠে এবার একটু ঝাঁঝের আবির্ভাব হইল। বলিল, "থাকব আবার কোন চুলোয়, বাড়ীতেই ছিলাম। সবে একটা পান মুখে দিয়েছি, একটু ঢুলুনি এসেছে, তারই মধ্যে এই কাণ্ড ক'রে ব'সে আছে। তা আমারও ত রক্ত-মাংসের শরীর?"

নারায়ণ বলিল, "হ্যাঁ, তোমারই এক রক্ত-মাংসের শরীর, অন্যদের সব লোহার শরীর। তা লোহার তাত কমাতে মাঝে মাঝে জল ঢালতে হয়। আমি রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল আন্‌ছি,, এখুনি সরাও তোমার নোংরা কাপড়ের রাশ, না হলে মেঝেতে ফেলে দেব।"

দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া সে নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। বাহিরের পোশাক ছাড়িয়া সে এদিক-ওদিক চাহিয়া একটা ময়লা লুঙ্গি পরিয়া লইল। একেবারে খালি গায়ে বাহির হইতে ভাল লাগিল না, যদিও সে বাঙালীর সন্তান। একটা লাল চৌখুপি গামছায় দেহ আবৃত করিয়া আবার সে স্নানের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। একজন শ্যামাঙ্গিনী বধূ মুখে রাজ্যের রাগ ও দুই হাতে কাঁড়িখানেক নোংরা কাপড়-জামা বহন করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। পারিলে চোখের দৃষ্টিতে দেবরের গায়ে খানিকটা আগুন ছড়াইয়া দিতেন, তবে কৃতী দেবর, স্বামীর চেয়ে বেশীই উপার্জ্জন করে, কাজেই বধূ ঠাকুরাণীকে একটুখানি সামলাইয়া চলিতে হয়। তবু একেবারে বেমালুম হজম করিতে পারিলেন না, আপন মনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন, "ইঃ, তেজ দেখনা? আমাকে অত কথা শোনান কেন রে বাপু? আমি কি কারো খাই না পরি? না কারো কেনা কালের বাঁদি? আমি কি ওদের শিখিয়ে দিয়েছি জল নষ্ট করতে?"

ঘরের অপর কোণ হইতে ক্লান্ত বার্দ্ধক্যজড়িত কণ্ঠে কে একজন বলিল, "হ'ল কি লা নাত বৌ? কে আবার তোকে কি বল্‌ল?"

বধূ বলিল, "ওমা, তুমি জেগে রয়েছ ঠাকুমা?"

"না জেগে করি কি ভাই? যা কালবৈশাখীর গর্জ্জন!"

বধূ উষা রাগটা একটু সংযত করিয়া বলিল, "তা যা বল বাপু। আমার অত কথা সয় না। ইচ্ছে ক'রে ত কাউকে জ্বালাতে যাই না? তোমরা সবাই বিদ্বান মানুষ, আমি না হয় মুখ্যু, তাই ব'লে মান-অপমানজ্ঞান ত সকলেরই আছে?"

দিদিশাশুড়ী বলিলেন, "তা ত থাকবেই। তা মান করবার লোকটি ত আপিসে, অপমানটা কে করল? নারায়ণ? ও ত কারো সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।"

উষা বলিল, "এমনিতে ত চুপ। থাকেই বা কতক্ষণ বাড়ীতে? কিন্তু বাক্যি যখন ছাড়বেন, একেবারে হুল ফুটিয়ে দেবেন। বুট্‌লি টুট্‌লি আজ চানের জল নষ্ট ক'রে ফেলেছে, তা একেবারে রেগে টং। পারলে আমাকেই দু ঘা বসিয়ে দেয়।"

ঠাকুরমা সবচেয়ে অন্ধকার কোণটি বাছিয়া শুইয়া ছিলেন। দিনের বেলা এই ঘরেই তিনি আসিয়া আশ্রয়

গ্রহণ করেন, কারণ এইটিই সবচেয়ে ঠাণ্ডা। রাত্রে তাঁহার স্থান ভাঁড়ার ঘরে। তা নাতিদের দোষ দেওয়া যায় না, সে ঘরখানিও ভাল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তিনি এখন উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "ওমা, তা হলে ও চান করবে কি ক'রে? এই দারুণ গরম! ঘরের মধ্যে ব'সে আছি, তাতেই মনে হচ্ছে যেন আঁচে গ'লে যাচ্ছি। এই রোদ্দুরে আসে বাড়ীতে।"

উমা এইবার একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল। বলিল, "কি আর এখন করব বল? এই দুপুর বারোটা সাড়ে বারোটায় কোথায় জল পাব? কলের জল কোথাও কোনো বাড়ীতে নেই। রাস্তায় ত আর আমি যেতে পারি না জল আনতে? তেমনি হয়েছে মেয়ে দুটো পাজি! একটু চোখে-পাতায় এক করেছি ত অমনি রাজ্যের অকর্ম্ম ক'রে ব'সে আছে। উঠুক আজ, ঠেঙিয়ে হাড় এক ঠাঁই, মাস এক ঠাঁই করব।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "থাক বাপু, অত বীরত্বে এখন কাজ নেই। চোখ রাখনা কেন মেয়েদের উপর? রাঁধুনী রয়েছে, ঝি রয়েছে।"

"চোখ রাখি না মানে? চোখ না রাখলে থাকত তোমাদের সংসারে একখানা আস্ত জিনিষ? যা পাজির পাঝাড়া। এক মিনিটের মধ্যে গিয়ে সব নষ্ট ক'রে এল। আসুক তোমার নাতি। বলব এখন মেয়েদের জন্যে সেপাই রেখে দিতে। তাও বলি বাপু, একদিন একটু জল ফেলেছে মাত্তর। ঘরে আগুনও দেয় নি, হাত পা কেটে রক্তগঙ্গাও হয় নি।"

নারায়ণ এদিকে হন্ হন্ করিয়া টিউবওয়েলের কাছে হাজির হইল। ফুটপাথে পা রাখে কার সাধ্যি? যেন তপ্ত অঙ্গারের উপর দিয়া হাঁটা। ভাগ্যে টিউবওয়েলটা বাড়ীর কাছেই। এক মিনিট হাঁটিলেই পৌঁছান যায়। সকাল-বিকাল সেখানে স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা মিলিয়া ভিড় জমাইয়া রাখে। কথা কাটাকাটি, গালাগালি সমানে চলিতে থাকে। মারামারিও বাধিয়া যায় মাঝে মাঝে। এখন জল লইতে বিশেষ কেহ আসে নাই, তবে চার-পাঁচটা ছেলে মিলিয়া শুধু শুধু জল নষ্ট করিতেছে এবং পরস্পরকে মুখ ভ্যাঙাইতেছে ও গালি দিতেছে।

নারায়ণ বিরক্ত হইয়া বলিল, "এই, স'রে যা ওখান থেকে, জল নেব।"

একটা ছেলে বলিল, "ইঃ, মস্ত বাবু এলেন। সরব না, কল কি তোমার একলার নাকি?"

নারায়ণ তাহার কানটা ধরিয়া সজোরে সরাইয়া দিল। দূরে একটা পাহারাওয়ালা দেখা যাইতেছে। নারায়ণের নিজের চেহারাটাও নিতান্ত ফ্যাল্না নয়। মারামারি আরম্ভ করিলে তাহারা চারজন এই দুইজনের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। তাহা ছাড়া, পাহারাওয়ালা জিনিষটা ভাল নয়। এই ক'দিন আগে জল নষ্ট করা এবং মারামারি, গালাগালি করার অপরাধে তাহাদের দলের কয়েকজন পুলিসের হাতে বেশ লাঞ্ছিত হইয়াছে। সে স্মৃতি এখনও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। সুতরাং তাহারা কয়জন একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া নীচু গলায় পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। নারায়ণ বাল্‌তি দু'টা ধুইয়া ফেলিয়া জল ভরিতে আরম্ভ করিল। উঃ, মাথাটা যেন ফাটিয়া যাইতেছে। গায়ের গামছাটা খুলিয়া সে মাথায় জড়াইয়া লইল।

হঠাৎ পিছন হইতে কে বলিল, "আমাকে একটু জল দেবেন?"

নারায়ণ চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইল। তাহার পিছনে একটি মেয়ে আসিয়া কখন দাঁড়াইয়াছে, সে জানিতে পারে নাই। বেশ লম্বা, ফরসা রং, তবে বড় রোগা। দেখিলে ত মনে হয়, অন্ততঃ চৌদ্দ-পনেরো বৎসর বয়স হইয়াছে, অথচ একটা গোলাপী রঙের ময়লা ফ্রক পরিয়া আসিয়াছে। ভদ্রঘরেরই মেয়ে নিঃসন্দেহ, কিন্তু এরকম বেশ কেন? নিজের বেশভূষাও যে খুব উৎকৃষ্ট দরের নয়, সে বিষয়েও সে সচেতন হইয়া উঠিল।

মেয়েটি উত্তরের প্রত্যাশায় তখনও তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছে দেখিয়া বলিল, "এই যে, এখুনি আমার হয়ে যাবে। তার পর তুমি নিও।"

ফ্রক পরার সুবিধা লইয়া, "তুমি"ই বলিল। এই মেয়ে শাড়ী পরিয়া সাজিয়া-গুজিয়া আসিলে, "আপনি" বলা ছাড়া উপায় থাকিত না।

মেয়েটি তপ্ত পথের উপর দাঁড়াইয়া ক্রমাগত পা বদল করিতেছে। শাদা পা দুটি গরমে প্রায় পুড়িয়া উঠিয়াছে, বেশ লাল দেখাইতেছে। নারায়ণের কথার উত্তরে সে বলিল, "আপনি চ'লে গেলেই ও ছোঁড়ারা এসে কল ঘিরে দাঁড়াবে। আমাকে জল নিতে দেবে না।"

নারায়ণ দেখিল কথাটা মিথ্যা নয়। ছেলে চারিটা এখনও যায় নাই। তাহার চলিয়া যাইবার অপেক্ষায় ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

নারায়ণ নিজের বাল্‌তিটা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "আচ্ছা, জল দিয়ে দিচ্ছি আমি, কিসে নেবে?"

সঙ্গের একটি কুঁজা ও একটি ছোট বাল্‌তি অগ্রসর করিয়া দিয়া মেয়েটি বলিল, "এইতে নেব।"

নারায়ণ বালতি ও কুঁজায় জল ভরিয়া দিয়া বলিল, "কতদূর থেকে এসেছ?"

মেয়েটি গলির মোড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ লাল বাড়ীটার একতলার থেকে।"

নারায়ণ নিজের বাল্তি ভরিতে ভরিতে বলিল, "তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চ'লে যাও। যা গরম! ছটো একসঙ্গে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে?"

"পারতেই হবে," বলিয়া মেয়েটি কুঁজা ও বাল্তি লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বাল্তির জল উছ্লাইয়া কিছু কিছু পড়িয়া যাইতে লাগিল।

নারায়ণ নিজের বাল্তি দুইটি ভরিয়া লইল। তাহার পর যথাসম্ভব দ্রুতপদে হাঁটিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া গেল। স্নানের ঘরে গিয়া জল রাখিয়া আসিল, তাহার পর কাপড়-চোপড় লইয়া স্নান করিতে চলিল। আজ স্নানটা খুব আরামের হইল। অন্যদিন এক বাল্তি জলে তাহাকে স্নান সারিতে হয়। ঠিকা ঝি ইহার বেশী জল তুলিতে রাজী নয় বোধ হয়। সে জলও কোনদিন খুব পরিষ্কার থাকে না। ভাইঝিরা সারাক্ষণ তাহাতে হাত ডোবায়, পুতুল চান করায়। আজ নিতান্ত সাবান গোলা করিয়া ফেলায় ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তাহাদের মা বেশীর ভাগ দিন এ সময়ে নিদ্রাসুখ উপভোগ করেন, মেয়ে সামলাইবার চেষ্টা করেন না।

স্নান করিয়া আজ নারায়ণের দেহ-মন যেন জুড়াইয়া গেল। অল্প একটু কষ্ট স্বীকার করিলে যদি পরে এতটা আরাম পাওয়া যায় ত তাহা করাই ভাল।

তাহার ঘরে খাবার চাপা দেওয়া থাকে। রাঁধুনীটি ঠিকার কাজ করে, রান্নাবান্না সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়। ছেলেপিলে ও স্বামীকে বৌদি ভাত বাড়িয়া দেন, নিজেও খাইয়া লন। ঠাকুরমা স্নান করিয়া নিজের জন্য ভাতে ভাত কোন রকমে সিদ্ধ করিয়া লন। রাত্রিতে রান্না-করা কোন জিনিষ খান না। কাজেই বধূ উষাকে যে খাটিয়া সারা হইয়া যাইতে হয় না, তাহা বলা বাহুল্য। তবে যেটুকু করিতে হয়, তাহাতেই তিনি কাতর হইয়া পড়েন। মেয়েদের দেখাশোনাটা সকালের দিকে কিছু কিছু হয়, কারণ তাহা না হইলে স্বামীর কাছে বকুনি খাইবার ভয় থাকে। তাহার পর বেশীর ভাগ ভগবানই তাহাদের দেখেন। বুটুলির বয়স ছয় এবং টুটুলির বয়স চার, সুতরাং খুব যে সাবালিকা তাহা বলা যায় না।

খাইয়া-দাইয়া নারায়ণ একঘুম ঘুমাইয়া লইল। ইহাই তাহার নিয়ম। সে পরের চাকরি করে না, নিজে ও এক বন্ধু মিলিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়াছে। দুজনেই সৎ ও পরিশ্রমী হওয়ায় উন্নতি হইতেছে ক্রমে ক্রমে। নারায়ণ নিজের বুদ্ধির তারিফ করে। ভাগ্যে সে অন্য ছেলেদের মত কেরাণীর চাকরির খোঁজে ফ্যা ফ্যা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় নাই। তাহা হইলে ঐ ঘোরাই সার হইত, একটা একশ টাকার চাকরিও পাইত কিনা সন্দেহ। এখন ত অন্ততঃ সাড়ে তিন শ, চার শ টাকা ঘরে আনিতেছে মাসান্তে। সে ভোরবেলা ওঠে, ইহাই তাহার অভ্যাস। চা খাইয়া বাহির হইয়া যায়, গিয়া দোকান খুলিয়া বসে। সাড়ে এগারটা বা পৌনে বারটায় তাহার বন্ধু ফণী খাইয়া-দাইয়া আসে। তখন নারায়ণ বাড়ী ফেরে। স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া সে সাড়ে চারটা পাঁচটার সময় ফিরিয়া যায়। রাত আটটার পর দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী আসে।

আজও চারটা আন্দাজ সে জাগিয়া উঠিয়া বসিল। আকাশে যেন মেঘের সঞ্চার হইয়াছে মনে হয়, দিনের আলো ম্লান দেখাইতেছে। তখনি বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে ইচ্ছা করিল না, ঘুমের ঘোর তখনও কাটে নাই।

কিন্তু পথে আবার ঝড়বৃষ্টির পাল্লায় পড়িবার ভয় আছে। অনেকটা দূর তাহাকে যাইতে হয়। উঠিয়া দাঁড়াইয়া জামা-জুতা পরিতে আরম্ভ করিল, চুলটা একবার আঁচড়াইয়া লইল। সদর দরজার কাছে আসিয়া দেখিল দরজা খোলা, বৌদি কপাট ধরিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছেন, "বুটুলি, ও বুটুলি! কি মেয়ে বাবা, গেরাহ্যিই নেই!"

নারায়ণ বলিল, "কতক্ষণ হল বাড়ীতে নেই? এই দারুণ রোদে ঐটুকু মেয়ে কোথায় গেল?"

উষা বলিল, "কে জানে বাবা!"

নারায়ণ আর কথা না বাড়াইয়া হন্ হন্ করিয়া রাস্তা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। বাচ্চাগুলি অতি দুরন্ত, মা তাহাদের একেবারেই দেখে না। এখন পর্য্যন্ত যে মারা পড়ে নাই বা একেবারে হারাইয়া যায় নাই, সেই ঢের। এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে বোধ হয়। তাহার পর ট্রামে উঠিল এবং কাজকর্ম্মের চিন্তায় ভাইঝিদের ভাবনা ভুলিয়া গেল।

পরদিন সকালে বাহির হইবার আগে ঠাকুরমাকে ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুরমা, ঝিকে ব'লো, আমার জন্যে স্নানের জল রাখবার দরকার নেই। জল এনেই স্নান করব, ওতেই সুবিধে।"

উষা ঠোঁট উল্টাইল, তবে কথা বলিল না। ঠাকুরমা

বলিলেন, "ব'লে দেব ভাই। আমি এই জন্যে সাত সকালে চান সেরে নিই বাপু। ঐ একঘটি জলে চান ক'রে কি আরাম হয়?"

আজও দুপুরে ফিরিয়া আসিয়া, কাপড়-চোপড় বদ্‌লাইয়া সে জল আনিতে যাইবার জোগাড় করিতে লাগিল। তবে আজকার বেশভূষাটা কালকের মত অমন সঙ্গীন হইল না। ধুতিটা মালকোঁচা মারিয়া পরিল, গায়ের গেঞ্জিটা রাখিয়াই দিল। গামছাটা অবশ্য আজও কাঁধে ফেলিল, যা রোদ, মাথায় কিছু একটা চাপা না দিলে দুমিনিটের বেশী দাঁড়ান যায় না।

আজ কলের কাছে দাঁড়াইয়া দুইজন স্ত্রীলোক জল ভরিতেছে। বস্তীরই স্ত্রীলোক, গলা ছাড়িয়া আশে-পাশের ছেলেগুলোকে গালি দিতেছে। তাহারা একটু দূরে দাঁড়াইয়া সেই রকম ভাষায়ই উত্তর দিতেছে, বোধ হয় স্ত্রীলোকগুলির আত্মীয়ই হইবে।

নারায়ণকে দেখিয়া স্ত্রীলোক দুটি গলাবাজি থামাইয়া জল ভরার দিকে মন দিল। কলের পাশে বাঁধান জায়গায় বালতি দুইটা নামাইয়া রাখিয়া নারায়ণ গলির মোড়ের দিকে তাকাইল। মেয়েটি বাহির হইয়া আসিতেছে। হয়ত নারায়ণের জন্যই অপেক্ষা করিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল।

আজ কিন্তু আর ফ্রক পরে নাই। জীর্ণ একখানি ডুরে শাড়ী পরিয়া আসিতেছে। ইহাতে তাহাকে আরও বছর দুইয়ের বড় দেখাইতেছে, এবং নারায়ণ নিজের কাছে স্বীকার করিল, বেশ ভাল দেখাইতেছে। কাহাদের মেয়ে এটি? বাড়ীতে আর কি মানুষ নাই? এই দারুণ রোদে একলা জল লইতে আসে, এবং এই মর্কট শিশুকলির উৎপাত সহ্য করে?

নিজের বালতিতে সবে জল ভরা আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় মেয়েটি আসিয়া পৌঁছিল। নিজেই বলিল, "আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কতক্ষণে আপনি আসেন।"

নারায়ণ হাত বাড়াইয়া বলিল, "দাও আগে তোমার জলটা ভরে দিই, তুমি তাড়াতাড়ি চ'লে যাও। যা ভীষণ গরম, খালি পায়ে বেরিয়েছ কেন? চটি পর না?"

মেয়েটি রাঙা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "নেই-ই।"

নারায়ণ একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেল। পোশাক দেখিয়াই তাহার বোঝা উচিত ছিল যে গরীবের ঘরের মেয়ে। মিনিট খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বাবা কি করেন?"

মেয়েটি বলিল, "বাবা কি আর আছেন যে কিছু করবেন? তিনি ত মারা গেছেন এই ছ' বছর হ'তে চলল। যখন ছিলেন তখন কলেজের লেক্‌চারার ছিলেন।"

নারায়ণ অল্পক্ষণ নীরবে জল ভরিতে লাগিল। মেয়েটির কুঁজা ও বাল্‌তি ভর্ত্তি করিয়া দিয়া বলিল, "এই নাও। আচ্ছা, তোমার নাম কি?"

মেয়েটি বলিল, "মালতী। আপনার নাম কিন্তু আমি জানি।"

নারায়ণ বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি ক'রে জানলে?"

মালতী বলিল, "আপনি বুট্‌লি-টুট্‌লির কাকা ত? ওরা যে ঐ বাড়ীতে থাকে তা ত জানি। ওদের কাছে বাড়ীর সকলের গল্প শুনি।"

নারায়ণ বলিল, "বুট্‌লি-টুট্‌লি যায় বুঝি তোমাদের বাড়ী? তোমাদের বাড়ীতে ওদের বয়সী কেউ আছে নাকি? কিন্তু তুমি এই ভিজেটায় একটু স'রে এস, পা যে একেবারে পুড়ে গেল।"

মালতী ভিজা সানের উপর সরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "যায় ত, প্রায়ই যায়। এক-একদিন দুপুর বেলা ওখানে ঘুমিয়েও পড়ে। ছোট মা'র তিনটে ছেলে-মেয়ে আছে না? তাদেরই সঙ্গে খেলে।"

নারায়ণের বেশ লাগিতেছিল মালতীর সঙ্গে গল্প করিতে। কিন্তু রাস্তার কলের ধারে দাঁড়াইয়া আর কত কথা বলা যায়? 'ছোট মা' বলিতেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই সৎমা। বেচারীর কপাল এ দিক দিয়া বেশ দরাজ দেখা যাইতেছে।

মালতী বলিল, "যাই এখন, সদর দরজাটা খোলা রেখে এসেছি," বলিয়া কুঁজা ও বাল্‌তি লইয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। ইহার পর নারায়ণের জল ভরা তাড়াতাড়িই হইয়া গেল। বাল্‌তি লইয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। বাড়ী এখন একেবারে নিস্তব্ধ। স্নান সারিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে অন্য দিনের মতই বিছানাটা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

অন্য দিনের মত চট্ করিয়া কিন্তু ঘুম আসিল না। শুইয়া শুইয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। পাড়ায় তাহারা আছে ত ঢের দিন। কিন্তু যেমন কলিকাতার নিয়ম, প্রতিবেশীরা বেশীর ভাগই তাহার অপরিচিত। কেহ যাচিয়া আসিয়া আলাপ করে না, সেও আলাপ করিতে যায় না। মালতীরা এতদিন এখানে আছে, কে জানে? বুট্‌লিটা আরো কিছু বড় হইলে তাহার

কাছে কিছু কিছু খবর পাওয়া যাইত। এমনিও হয়ত পাওয়া যাইতে পারে।

বেশ মেয়েটি। বাঙালীর ঘরে মালতীর মত সুন্দরী মেয়ে কদাচিৎ দেখা যায়। আর কেমন সপ্রতিভ। কিন্তু বড় অভাবের সংসার বলিয়া বোধ হয়। হাতে শুধু প্ল্যাষ্টিকের চুড়ি, গলায় বা কানে কোনো গহনা নাই। আর ঐ ত শাড়ী-জামার শ্রী!

হঠাৎ কি মনে করিয়া নারায়ণ নিজের মনেই হাসিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের আলাপটা অনেকটা "চণ্ডালিকা"র আনন্দ ও প্রকৃতির আলাপের মত না? "জল দাও" বলিয়া আলাপ। অবশ্য সাদৃশ্য ঐটুকু মাত্র। এক্ষেত্রে জল চাহিয়াছে মেয়েটি এবং জল দিয়াছে ছেলেটি। দুজনের একজনও চণ্ডাল নয় বা হরিজন নয়। সে নিজে ব্রাহ্মণ, মালতীরও চেহারা দেখিয়া যা মনে হয়, সে উচ্চ শ্রেণীরই মেয়ে। সন্ন্যাসীও কেহ নয়। কাহারও প্রয়োজন হইবে না "রসাতলবাসিনী নাগিনী"কে আহ্বান করিবার। অন্য মন্ত্রেই আনা যায়। হাসিতে হাসিতে সে শেষে ঘুমাইয়াই পড়িল।

আজ ঘুম আসিতে দেরি করিয়াছিল, কাজেই ঘুম ভাঙিতেও দেরি হইল। উঠিল যখন, তখন বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। টুটুলিকে তাহার মা ঠ্যাঙাইতেছেন, সে তার-স্বরে চীৎকার করিতেছে। বুটুলিকে ধরা যাইতেছে না, সে সারা বাড়ী ছুটিয়া বেড়াইতেছে।

একবার ছুটিয়া তাহার ঘরে আসিবাত্র, নারায়ণ খপ্ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল, "এই, কি করেছিস, যে এত মারপিট্ লেগে গেছে?"

বুটুলি বলিল, "গন্তিদের বাড়ী গিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম।"

নারায়ণ বলিল, "গন্তি আবার কে?"

বুটুলি বলিল, "আঃ, জান না যেন? ঐ যে প্রথম বাড়ীটায় থাকে। ওরা ত চেনে তোমায়।"

নারায়ণ বলিল, "কে কে আছে, ওদের বাড়ীতে?"

বুটুলি বলিল, "গন্তি আছে, তার দিদি মালতী আছে, ওদের মা আছে আর ন্যাড়া আর বোঁচা আছে।"

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, "পুরুষ মানুষ নেই কেউ ওদের বাড়ী?"

"নাঃ, পুরুষমানুষ ত ম'রে গেছে", বলিয়া বুটুলি উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, কারণ তাহার মা দরজার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

নারায়ণ অতঃপর বাহির হইয়া পড়িল কর্ম্মস্থানের উদ্দেশে। বুটুলিটা জানে বোধ হয় সব কিছুই। কাল শনিবার আছে, দুপুরের পর আর তাহাকে বাহির হইতে হইবে না, তখন বুটুলিকে কিছু ঘুষ দিয়া তাহার কাছ হইতে কথা বাহির করিতে হইবে।

আজ দুপুরে জল ভরিতে গিয়া কলতলায় কাহাকেও দেখা গেল না। কি হইল? আজ মালতীর জলের দরকার নাই বুঝি? না কিছু অসুখ-বিসুখ করিয়াছে? যা চমৎকার পরিবার, অসুখ করিলে ত চিকিৎসা হইবারও কোনো আশা নাই।

নিজের বাল্তি দুইটা যখন ভর্ত্তি হইয়া আসিয়াছে প্রায়, তখন দেখা গেল মালতীকে। আস্তে আস্তে আসিতেছে। হাতে আজ আর বাল্তিটা নাই, শুধু কুঁজা লইয়াই আসিয়াছে। নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত দেরি যে? আর একটু হ'লেই ত চ'লে যাচ্ছিলাম।"

মালতী বলিল, "শরীরটা আজ ভাল নেই। আসব কি না ভাবছিলাম। তাইতে দেরি হ'ল। তা জল না খেয়ে ত থাকা যায় না, কাজেই আসতেই হ'ল শেষ পর্য্যন্ত।"

নারায়ণ দেখিল সত্যই মালতীর মুখ অত্যন্ত শুষ্ক দেখাইতেছে। বলিল, "কি অসুখ করল? জ্বর নাকি?"

মালতী বলিল, "জ্বর হতেও পারে। দেখি নি।"

নারায়ণ বলিল, "তোমাদের বাড়ী ঝি-চাকর একজনও কি নেই যে অসুখ করলেও তোমাকেই জল নিতে আসতে হয়?"

মালতী বলিল, "ঝি-চাকর আবার কোথা থেকে আসবে? ছোটমা বাড়ীর লোকদের খেতেই দিতে চায় না, তা ঝি-চাকর রাখবে? অবিশ্যি তারই বা কি দোষ? কিছু নেইও ত?"

নারায়ণ বলিল, "তোমার নিজের ভাইবোন কেউ নেই?"

মালতী বলিল, "না।"

নারায়ণ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ছোট মায়ের ছেলেমেয়েরা কত বড় বড়?"

মালতী বলিল, "গন্তিটা বছর দশের হবে। ন্যাড়া আপনাদের বুটুলির বয়সী, বুঁচিটা ছোট।"

নারায়ণ বলিল, "গন্তি এক কুঁজো জল নিতে পারে না?"

মালতী আজ আসিয়াই ফুটপাথের উপর বসিয়া পড়িয়াছিল। এখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুঁজাটা তুলিয়া লইল। বলিল, "গন্তিকে ওর মা রোদে বেরোতে দেয়

না। যাই এখন," বলিয়া ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিল।

নারায়ণের ইচ্ছা করিতে লাগিল, সেই গিয়া কুঁজাটা পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। কিন্তু কিছু মনে করে যদি? অবশ্য মালতীদের পরিবার ও তাহাদের পরিবার একেবারে অপরিচিত নয়, ছেলেমেয়েদের মধ্যে আলাপ আছে। তবু সেটা গৃহকর্ত্রী যথেষ্ট মনে না করিতে পারেন। তাহার ভাবনা শেষ হইতে না হইতে মালতী নিজের বাড়ী পৌঁছিয়া গেল।

দুপুরের ঘুম সারিয়া আজ নারায়ণ একটু বেলা করিয়াই উঠিল। আজ আর কাজে যাইতে হইবে না। আজ বাড়ীতেই চা খায়। দাদার সঙ্গে চায়ের আসরে সপ্তাহের ভিতর শনি-রবিবারেই তাহার দেখা হয়। এ দু'দিন বাড়ীতে কিছু জলখাবার তৈরি হয়, চাটাও গরম গরম পাওয়া যায়। নারায়ণের দাদা ত্রিলোচন আবার একটু বেশী রাগী মানুষ, কাজেই পত্নী-উমা এই দু'দিন ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে না।

চা খাইতে বসিয়াই ত্রিলোচন বলিল, "তুই নাকি আজকাল নিজে টিউবওয়েল থেকে জল বয়ে এনে চান করিস? কেন রে?"

নারায়ণ বলিল, "ঢের বেশী আরাম পাওয়া যায় বাপু। ঐ মোক্ষদা ঝিয়ের তোলা আধ বাল্‌তি ময়লা জলে স্নানের কাজটা হয় না ভালভাবে।"

ত্রিলোচন বলিল, "তা জল ত আরো বেশী তুলিয়ে রাখা যায়? আর জল ময়লা হবে কেন?" শেষের কথাটা বলিল স্ত্রীর দিকে চাহিয়া।

নারায়ণ দেখিল বৌদিদি এবার বিপদে পড়িবে। তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বলিল, "এটা একটু physical exercise-এর কাজও দেয়। সারা দিন ত ব'সে থাকার পাট। শেষে ত্রিশ পার হ'তে না হ'তে ভুঁড়ি গজাতে সুরু করবে।"

ত্রিলোচন অতঃপর লুচি-তরকারি শেষ করার দিকে মন দিল। বুট্‌লি-টুট্‌লিও আজ বাবা ও কাকার সঙ্গলাভের ইচ্ছায় আসিয়া চা খাইতে বসিয়াছে। নারায়ণ বলিল, "এই, চা খেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে, ভাল ফ্রক প'রে নে ত। তোদের লেকে বেড়াতে নিয়ে যাব।"

কাকার সঙ্গে বেড়াইতে যাওয়ার যা অভিজ্ঞতা ইহাদের আগে হইয়াছে, তাহা উপভোগ্য। দু'জনেই লাফাইয়া উঠিল, "যাব, যাব মা, এক্ষুণি ফ্রক পরিয়ে দাও।"

স্বামী ঘরে উপস্থিত, কাজেই ফ্রক পরানটা খুব চট্ করিয়া হইল না। হাত-মুখ মুছাইয়া দিতে হইল, পরনের ময়লা সব কাপড় ছাড়াইয়া পরিষ্কার কাপড় পরাইতে হইল। মাথা আঁচড়াইতে হইল, মুখে পাউডার দিতে হইল।

বুট্‌লি-টুট্‌লি, মহোৎসাহে বেড়াইতে চলিল। কাকার সঙ্গে বেড়ান ত শুধু বেড়ানই নয়? বেলুন পাওয়া যায়, লজেন্স পাওয়া যায়।

পার্কের ভিতর ঢুকিয়াই বুট্‌লি চীৎকার করিয়া উঠিল, "ঐ গন্তি এসেছে।"

নারায়ণ চাহিয়া দেখিল একটি বছর নয়-দশের মেয়ে ও একটি বছর সাত-আটের ছেলে দোলনায় চড়িবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে। মালতীর মত সুন্দর দেখিতে কেহই নয়। তবে কাপড়-চোপড় কিছু ভাল।

বুট্‌লিকে জিজ্ঞাসা করিল, "গন্তির সঙ্গে ও কে?"

"ঐ ত ন্যাড়া।"

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, "অন্য ভাইবোনেরা বেড়াতে আসে না?"

বুট্‌লি বলিল, "বুঁচীটা আসে ত, আজ আসে নি। আর খুব যদি দেরি করে তা হলে ওদের দিদি এসে কান ধ'রে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যায়।"

নারায়ণ ভাবিল আজ আর আসিবে না, শরীরটা তাহার মোটেই ভাল নাই। ভাইঝিদের সে গন্তির সঙ্গে খেলিতে দিয়া কাছাকাছি ঘুরিতে লাগিল। একবার চারজনকে বেলুন কিনিয়া দিয়া আসিল, আর একবার ঝাল মুড়ি কিনিয়া দিল। তাহাদের খেলা আর শেষই হয় না, কাকার সঙ্গে আসিয়াছে, কোনো ভাবনা চিন্তা নাই। দিনের আলো দেখিতে দেখিতে ম্লান হইয়া সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

হঠাৎ নারায়ণ মালতীকে দেখিতে পাইল। সেই প্রায়-ছেঁড়া কাপড়খানি পরিয়াই সে দ্রুতপদে বাচ্চাদের খেলার জায়গার দিকে আসিতেছে। নারায়ণকে সেও দেখিতে পাইল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আপনিও এসেছেন বেড়াতে?"

নারায়ণ বলিল, "শনিবারে বিকেলে কাজে যেতে হয় না, তাই এই দুটোকে নিয়ে এসেছি। ঐ যে, তোমার ভাইবোনদের সঙ্গে খেলছে।"

মালতী বলিল, "এত দুষ্টু এগুলো। দেখে এল বাড়ীতে অসুখ, তবু ফিরবার নাম নেই সন্ধ্যে পর্য্যন্ত আমাকে আবার ছুটে আসতে হ'ল।"

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, "এ বেলা তুমি কেমন ?"

মালতী বলিল, "আমি আছি একরকম, ওবেলার থেকে কিছু ভাল। তা আবার বুঁচীটার খুব জ্বর এসেছে। কে যে কাকে দেখে তার ঠিক নেই।"

নারায়ণ বলিল, "তোমার মা ত আছেন? গন্তিও একেবারে কিছু ছোট নয়?"

মালতী বলিল, "ছোটমা একবার রান্নাঘরে ঢুকলে একেবারে কাজ শেষ না হ'লে বেরোয়ই না, তায় যার যা হোক। আর গন্তির কথা আর বল্‌বেন না। ওর মত দুষ্টু মেয়ে ভূভারতে নেই।"

নারায়ণের ইচ্ছা মালতীকে ধরিয়া রাখিবার, কিন্তু অসুস্থ মানুষকে তাহা বলা যায় কিরূপে? তবু বলিল, একটু খোলা হাওয়ায় তবু ত বেরোতে পারলে? সারাদিন ত ঘরেই ব'সে থাক, না? স্কুলে বোধ হয় যাও না?"

মালতী ম্লানভাবে হাসিয়া বলিল, "না, স্কুলে যাওয়ার পর্ব্ব বাবা মারা যেতেই শেষ হয়েছে। খোলা হাওয়ায় বেরোবারই বা সময় কোথায়? বাড়ীর সব কাজ ত আমার ঘাড়ে। একখানা বই খুলে পড়বারও সময় পাই না। বাবা থাকতে কত পড়তাম।"

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, "কতদূর পড়েছিলে?"

মালতী বলিল, "ক্লাস ফাইভে উঠেই ত ছেড়ে দিতে হ'ল। সব কিছু ভুলে গিয়ে আকাট মুখ্যু হয়ে যেতাম, যদি না সতীদি থাকতেন।"

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, "সতীদি মানে সতী চৌধুরী নাকি? যিনি য়ুনিভার্সিটিতে first হয়েছিলেন?"

মালতী বলিল, "তিনিই। আমাদের বাড়ীর উপর-তলায় থাকেন যে? তিনি রোজ রোজ আমায় খানিক খানিক পড়িয়ে দেন, তাই বাংলাটা আর ইংরিজিটা ভুলে যাই নি। আর কিছু ত শেখা হয়ে উঠল না।"

নারায়ণ বলিল, "আমার কাছে বই আছে ঢের, যদি পড়তে চাও ত দিতে পারি।"

মালতী বলিল, "সময় কোথায়? আচ্ছা, সময় পেলে চেয়ে নেব। গন্তি কখনও কখনও যায় আপনাদের বাড়ী, তাকে বলব।"

এইবার একেবারেই অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, বাড়ী না ফিরিলে নয়। মালতী তাহার ভাইবোনকে গ্রেপতার করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। নারায়ণও ভাইঝিদের লইয়া বাড়ী ফিরিয়া চলিল। পার্কে আলো জ্বলিতে সুরু করিল, এখনও লোকজনের ভীড় পরিপূর্ণ। এক ঝাঁক মেয়ে, রঙীন সাজে ঝলমল্ করিতে করিতে নারায়ণের পাশ দিয়া চলিয়া গেল। বাতাসও যেন এসেন্সের গন্ধে ভার হইয়া উঠিল। নারায়ণ চাহিয়া দেখিল। এই ত সব চেহারা। কিন্তু সাজের ত্রুটি নাই। আর যাহাকে এমন করিয়া সাজিলে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী বলিয়া মনে হইত, তাহার অঙ্গে জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড ছাড়া কিছু আর জোটে না।

বাড়ী ফিরিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। আকাশ পাতাল কত কি ভাবিল তাহার ঠিকানা নাই। রান্না হইতেও আজ বড় দেরি হইতেছে। খাইয়া-দাইয়া যখন শুইল, তখন রাত দশটা বাজিয়া গিয়াছে।

পরদিন রবিবার। আজ আগে আগে স্নান করিতে পারিত সে। রৌদ্র অত প্রখর হওয়া অবধি অপেক্ষা না করিলেও চলিত। কিন্তু তাহা হইলে ত মালতীর সঙ্গে দেখা হইবে না? এমনিতেই হইবে কি না সন্দেহ, যদি না খানিকটা আরো সুস্থ হইয়া উঠিয়া থাকে।

তবু বারোটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া সে জল আনিতে চলিল। আজ টিউবওয়েলের পাশ হইতে ভীড় এখনও সম্পূর্ণ সরিয়া যায় নাই। নারায়ণ দাঁড়াইয়া রাস্তা দেখিতে লাগিল। দূরে মালতীর মূর্ত্তি দেখা গেল, আস্তে আস্তে আসিতেছে।

কাছে আসিতেই নারায়ণ বলিল, "আজও ত ভাল দেখাচ্ছে না, জ্বর ছাড়ে নি?"

মালতী আজও শুধু কুঁজা লইয়া আসিয়াছে। একটা ইটের উপর বসিয়া বলিল, "খুব ভাল নেই। বুঁচীর জ্বালায় ঘুমোতে পাই নি রাত্রে। স্নানও করি নি আজ, তাই এরকম দেখাচ্ছে।"

নারায়ণ বলিল, "জল নিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে যাও, এই গরমে আর দাঁড়িও না।"

কলের পাশে ভীড় এখন হালকা হইয়া আসিয়াছে। নারায়ণ মালতীর হাতের কুঁজাটা লইয়া জল ভরিতে আরম্ভ করিল। তাহার পর বলিল, "আমি দিয়ে আসি না? এক মিনিট মাত্র লাগবে।"

মালতী বলিল, "না, না, থাক্। কে আবার কি বলবে, আর ছোটমা তাই নিয়ে ক্যাঁটর ক্যাঁটর করবে।"

হাত বাড়াইয়া কুঁজাটা নারায়ণের হাত হইতে লইল। ভাল করিয়া ধরে নাই হয়ত, অথবা হাত দুর্ব্বল ছিল, কুঁজাটা হঠাৎ তাহার হাত হইতে পড়িয়া সশব্দে ভাঙিয়া গেল।

মালতী একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, "কি হবে? কিসে জল নেব? ছোটমা ভয়ানক রেগে যাবে!" তাহার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

স্থানকালপাত্র সব ভুলিয়া গিয়া নারায়ণ সান্ত্বনা দিতে

ব্যস্ত হইয়া উঠিল। মালতীর মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল, "কেঁদ না, কেঁদ না। আমি এখনি কুঁজো এনে দিচ্ছি আর একটা। আমার ঘরে আছে ঠিক এইরকম দেখতে। কেউ তফাৎ বুঝবে না। এক মিনিট দাঁড়াও।" সে একছুটে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সত্যই মিনিট দেড়ের মধ্যে সে ফিরিয়া আসিল কুঁজা হাতে করিয়া। একইরকম দেখিতে বটে, তবে সামান্য একটু বড় হইতে পারে। তাহাতে জল ভরিয়া নারায়ণ বলিল, "চল, আমি এটা পৌঁছে দিয়ে আসি!"

মালতী ব্যস্ত হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, "আপনাকে নিয়ে যেতে হবে কেন? আমাকে দিন।"

নারায়ণ কুঁজা দিল না। বলিল, "এই অসুস্থ শরীরে, এই দারুণ রোদে তোমাকে আমি জল নিয়ে যেতে দেব না। এর একটা ব্যবস্থা করা দরকার।"

মালতী ম্লানমুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "ব্যবস্থা আর আপনি কি করবেন? যার যেমন কপাল!"

নারায়ণ বলিল, "কপাল ত সারা জীবন একরকম থাকে না, মাঝে মাঝে বদলায়ও। তুমি চল দেখি, এই রোদে আর দাঁড়িয়ে থাকে না। আবার জ্বর এসে যাবে।"

মালতী বলিল, "আপনার বালতি দুটো কে আগ্‌লাবে? যা চোরের পাড়া।"

নারায়ণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। একটি বৃদ্ধা কাঁসার কলসী কোমরে লইয়া জল ভরিতে আসিতেছে। তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "বুড়ো মা, তুমি কি এখানে একটু বসবে এখন?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "এই ঘড়াটা মেজে জল নিয়ে যাব বাবা।"

নারায়ণ বলিল, "তাহলে পাঁচ মিনিট এই বালতি দুটোর উপর নজর রেখো ত? আমি এখনি আসছি। এসে তোমায় বখসিস্‌ দেব কিছু।"

বৃদ্ধা বলিল, "আচ্ছা, বাবা।" সে কলতলায় বসিয়া কাদা দিয়া কলসী মাজিতে আরম্ভ করিল।

নারায়ণ কুঁজাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "চল মালতী।"

মালতীকে চলিতেই হইল। যাইতে যাইতে বলিল, "ছোটমাটা দেখে যদি, তাহলে বক্ বক্ ক'রে আর রাখবে না কিছু।"

নারায়ণ বলিল, "গস্তিকে দিয়ে একটু খবর দিও ত আমাকে। ওরা ত আজও পার্কে যাবে খেলতে? খবর পেলে আমি ব্যবস্থা ক'রে দেব এমন যে, কোনোকালে আর বক্ বক্ করতে হবে না।"

মালতী তির্য্যক্ দৃষ্টিতে একবার তাহার দিকে তাকাইয়া দেখিল, কিছু বলিল না।

বাড়ীর কাছে আসিয়া নারায়ণ বলিল, "ঐ সদর দরজার ভিতর আমি কুঁজোটা নামিয়ে রাখছি, তারপর তুমি ঘরে নিয়ে যাও। গোলমাল কিছু হলে নিশ্চয় আমায় খবর দিও কিন্তু।"

মালতী বলিল, "আচ্ছা", তাহার গলার স্বরটা একটু অন্যরকম শোনাইল।

নারায়ণ আবার কলতলায় ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধা তখনও কলসীতে জল ভরিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে চার আনা বখসিস্‌ দিয়া সে নিজের বালতি দু'টিতে জল ভরিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

স্নানাহার করিয়া শুইয়া পড়িয়া আবার নানা ভাবনা ভাবিতে লাগিল। সোজা রাজপথ ত রহিয়াছেই একটা, মালতীকে উদ্ধার করিবার। সে পড়াশুনাও শেষ করিয়াছে, বয়সও হইয়াছে সংসারে ঢুকিবার, উপার্জ্জনও মন্দ করে না। কিন্তু এতটা হট্ করিয়া কাজ করা ঠিক হইবে কি?

বিকালে চা খাইয়া আবার সে বাহির হইল বুটুলি টুটুলিকে লইয়া। উমা ইহাদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় তাড়াতাড়ি উহাদের সাজাইয়া-গুজাইয়া বিদায় করিয়া দিল।

পার্কে আসিবার অল্পক্ষণ পরেই গস্তিকে সে দেখিতে পাইল। আজ সে একলাই। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ একলাই যে? ন্যাড়া-বোঁচার দল কি হ'ল?"

গস্তি বলিল, "দু'টোরই যে জ্বর। মা আসতে দিল না।"

নারায়ণ বলিল, "আচ্ছা গস্তি, তোমার বাবার নাম কি জান?"

গস্তি বলিল, "জানি ত। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।"

বালিকারা খেলা করিতে আরম্ভ করিল। দোল্‌নায় দোল খাওয়া, আর তাহাদের ভাষায় 'স্লিপ' খাওয়া, ইহাতেই তাহাদের আনন্দ বেশী। নারায়ণের মধ্যে মধ্যে ভয় করিতে লাগিল, পাছে ইহারা হাত-পা ভাঙিয়া বসে। কিন্তু ইহারা ত রোজই এই গুণ্ডামি করে, আজ না হয় নারায়ণ সঙ্গে রহিয়াছে। সে কাছাকাছিই ঘুরিতে লাগিল, পার্কের প্রবেশ-দ্বারের দিকে চোখ রাখিয়া।

মালতী আসিল খানিক পরে। নারায়ণ অগ্রসর হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি, বাড়ীতে গণ্ডগোল হ'ল নাকি কিছু?"

মালতী বলিল, "না, দেখতে পায় নি আপনাকে। তবে কুঁজোটার দিকে দু' তিনবার তাকাল।"

নারায়ণ বলিল, "তা তাকাক্। যতক্ষণ না বকাবকি

করছে, তুমিও কিছু ব'লো না। আছ কেমন এ বেলা? বাড়ীতে ত আরো সব জ্বরে পড়েছে শুনছি?"

মালতী বলিল, "হ্যাঁ, ছোট দু'টোরই জ্বর। সামলে ওঠা দায়। ছোটমা-ও হয়রাণ হয়ে গিয়েছে। বলছে দিন কতকের জন্যে বাপের বাড়ী যাবে।"

নারায়ণ ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি থাকবে কোথায়?"

মালতী তাচ্ছিল্যভরে ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "যাক ত আগে। যা ছিরির সব ছেলেমেয়ে, কোন বাড়ীতে ওদের বেশী দিন রাখতে চায় না। আমি বাড়ী আগলে থাকি আর কি!"

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, "একলা থাক নাকি?"

"একলাই প্রায়। তবে অন্য ভাড়াটেরা খুব ভাল ত, প্রায় আত্মীয়ের মত হয়ে গেছে। রাত্তিরে সতীদির দিদিমা এসে আমার কাছে শুয়ে থাকেন।"

এমন সময় বিকট চীৎকারে দুইজনেই চমকাইয়া উঠিল। টুটুলি দোলনা হইতে ছিট্‌কাইয়া খোওয়া-বিছান পথের উপর চিৎপাৎ হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রাণপণে চেঁচাইতেছে। নারায়ণ ছুটিয়া গিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিল। দুইটা হাঁটু কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। নাকে-মুখেও আঁচড় পড়িয়াছে কতকগুলি। নারায়ণ বলিল, "এখন এটাকে নিয়ে যাওয়া যায় কি ক'রে? রক্তারক্তি হয়ে গেছে একেবারে।"

মালতী বলিল, "রুমাল দিয়ে একটা পা বেঁধে দিন। আর একটা পা, আচ্ছা," বলিয়া ফড়্‌ফড়্‌ করিয়া নিজের শাড়ীর আঁচল হইতে খানিকটা কাপড় ছিঁড়িয়া টুটুলির পা নিপুণভাবে বাঁধিয়া দিল। বলিল, "সারাক্ষণ বাড়ীতেও এই হচ্ছে। বুটুলি-টুটুলিরও ত প্রায় দু' একদিন ছাড়া হাতে-পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দেখি। থাম্ না বাপু, অত কাঁদে না। দিন্ ত ওকে একটা চকোলেট কিনে।"

যাহার পা কাটিয়াছে, তাহাকে এবং যাহাদের পা কাটে নাই, সকলকেই নারায়ণ চকোলেট কিনিয়া দিল। মালতী বলিল, "আমাকে আবার কেন? আমি কি ওদের সমান নাকি?"

নারায়ণ বলিল, "কতই বা আর বড়? কিন্তু শাড়ীটা ছিঁড়ে ফেললে যে, তোমার ত কাপড় বেশী নেই?"

মালতী বলিল, "ছিঁড়তেই হ'ল, না হলে আপনি ওকে নেবেন কি ক'রে? এত রক্ত গড়ালে ত রিক্‌শাতেও উঠতে দেবে না। আমি ছেঁড়া দিকটা কোল-আঁচলের দিকে দিয়ে পরব।"

তিনটি বালিকাই তখন লোহার বেঞ্চিতে বসিয়া চকোলেট খাইতে ব্যস্ত। তাহাদের নিকট হইতে কয়েব পা পিছাইয়া আসিয়া নারায়ণ বলিল, "মালতী।"

মালতী বলিল, "কি, বলুন?"

নারায়ণ বলিল, "আমি যদি তোমাকে কয়েকটা শাড়ী-জামা উপহার দিই, নেবে না তুমি?"

মালতীর মুখটা লাল হইয়া উঠিল, বলিল, "আপনি কেন দিতে যাবেন?"

নারায়ণ বলিল, "বন্ধুতে দেয়ও ত বন্ধুকে?"

মালতী একটু থামিয়া বলিল, "তা দেয় ত। আপনার কাছে নিতে আমি যদিই বা রাজী হই, ছোটমা নিতে দেবে কেন? যা তা বলবে!"

"ছোটমা-কে যদি রাজী করা যায়?"

মালতী বিস্মিত হইয়া বলিল, "তাকে কি ক'রে রাজী করবেন?"

নারায়ণ এক মিনিট ভাবিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "বলব যে এখন থেকে এইটেই নিয়ম হ'ল। তোমার যা কিছু দরকার সবই আমি দেব। ক'দিন পরে থাকতেও যাবে আমারই ঘরে।"

ব্যাপারটা এতক্ষণ পরে মালতীর ভাল করিয়া বোধ-গম্য হইল। সে খানিকক্ষণ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নারায়ণ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যবস্থাটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না বুঝি?"

মালতী মুখ তুলিয়া বলিল, "আমার কেন পছন্দ হবে না? কিন্তু আপনি ত ঠ'কে যাবেন।"

নারায়ণ বলিল, "ঠকবার ছেলে নারায়ণ শর্ম্মা নয়। সকল দিক দিয়েই জিতব বুঝেই না এগোচ্ছি?"

মালতী বলিল, আমরা ভীষণ গরীব, কিচ্ছু দেবার ক্ষমতা নেই।"

নারায়ণ বলিল, "তোমাকে ছাড়া আর 'কিচ্ছু' আমি চাইছি নাকি?"

মালতী সত্য কথা বলিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়া-ছিল, বলিল, "আমি কিন্তু মুখ্যু, আপনি ত এম. এস-সি. পাস।"

নারায়ণ বলিল, "তুমিও পাস ক'রে নেবে। আমি নিজে পড়াব। দেখ, সব আপত্তি খণ্ডন করলাম ত? না আর কিছু আছে? আমাকে অপছন্দ নয় ত?"

মালতী আরক্ত মুখে বলিল, "যাঃ, আপনাকে নাকি অপছন্দ করা যায়?"

নারায়ণ বলিল, "বাঁচা গেল। এখন এখানে একটু দাঁড়াও ত লক্ষ্মীটি, আমি একটা রিকৃশ ডেকে আনি। এটাকে খোঁড়া পায়ে হাঁটান যাবে না ত?"

মালতী বাচ্চাদের আগলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নারায়ণ রিক্‌শ আনিয়া তাহাতে দুই ভাইঝিকে তুলিল। মালতীর দিকে তাকাইয়া বলিল, "আজ ত যেতেই হচ্ছে। কাল আবার দেখা হবে ত?"

মালতী বলিল, "হ্যাঁ জল, আনতে ত যাবই।" রিক্‌শ চলিয়া গেল।

বাড়ীতে আসিয়া বুটলি-টুটলিকে তাহাদের মায়ের হাতে ফিরাইয়া দিয়া নারায়ণ চলিল ঠাকুরমার সন্ধানে। তিনি তখন মালা জপ করিবার আয়োজন করিতেছেন। নারায়ণকে দেখিয়া বলিলেন, "এ যে দিনে তারা দেখছি গো? কি খবর?"

নারায়ণ বলিল, "খবর একটু গ'ড়ে তুললেই ত হয়? তোমার যে খেয়ালই নেই?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "এই কথা? আমি নিশ্চিন্ত আছি যে, তুমি আমাকে নিয়েই খুশী।"

নারায়ণ বলিল, "তা ত আছিই। মন ত তোমাতেই ভ'রে আছে। কিন্তু রেঁধে-বেড়ে দেবার জন্যেও একটা দরকার যে?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "তা কোন্ বাড়ীতে ভাল রাঁধুনীটি থাকে একটু ঠিকানা দাও, তবে ত?"

নারায়ণ বলিল, "ঐ যে গন্তি আসে খেলতে—"

ঠাকুরমা কপালে একটা চড় মারিয়া বলিলেন, "আ কপাল, শেষে গন্তিকে পছন্দ হ'ল? ওর চেয়ে যে আমিও ভাল রে!"

নারায়ণ বলিল, "কি যে বাজে বকো। গন্তি কেন হতে যাবে? ওর একটি দিদি আছে মালতী ব'লে। এত সুন্দর দেখতে যে ভাল রাঁধুনী না হয়ে যায় না।

ঠাকুরমা বলিলেন, "সে ত নিশ্চয়। ভাল ত রাঁধবেই, তোমার মুখে ত খুবই ভাল লাগবে। তা সুন্দরীকে দেখলে কোথায়?"

নারায়ণ বলিল, "ঐ যে জল আনতে যেতাম, টিউবওয়েলে, সেও আসত জল নিতে।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "ভাল ভাই, ভাল। আধুনিক যুগ, যমুনাপুলিন ত জুটবে না, তা টিউবওয়েলই সই। জলের সঙ্গে সম্পর্ক আছে একটা পিরীতের।"

নারায়ণ বলিল, "আচ্ছা, রসিকতা ত ঢের হ'ল। এখন ওদের ওখানে কথাটা তোলা যায় কি ক'রে তাই বল না?"

"তার আর কি ভাবনা? আমিই ব'লে আসব, একটা রিক্‌শর ভাড়া রেখে যেও। সদাশিববাবু থাকেন ত ওদের পাশের বাড়ীতে, তাঁর গিন্নীকে নিয়ে যাব। খুব চেনে ওদের।"

নারায়ণ বলিল, "এখন রাজী হ'লে হয়।"

ঠাকুরমা বলিলেন, "ও ক্যাংলা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়। কাল দুপুরেই দেখবে ওদের ছাদে শামিয়ানা খাটাচ্ছে।"

ঘটিলও তাই। মালতীর ছোটমা ত প্রথম বিশ্বাস করিতেই চান না, যে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে। তা থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখার যুগ, সবই সম্ভব এখন। আহা, মালতী না হইয়া যদি গন্তি হইত! কিন্তু নিজের পেটের মেয়ে হইলে কি হয়, পোড়া মেয়ের না আছে রূপ, না আছে গুণ। উহাকে কি আর কেহ দেখিয়া পছন্দ করিবে?

যাহা হউক মালতীর বিবাহটা কোনমতে চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই হইয়া গেল। আয়োজন করার সামর্থ্য নাই, কাজেই সেই অজুহাতে দেরী হইল না। সত্য সত্যই রাঙাশাঁখা ও লালপেড়ে শাড়ী পরিয়াই কন্যা বিবাহের আসরে নামিল, এবং পরদিন ট্যাক্সি চড়িয়া বরের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। তবে শ্বশুরবাড়ীতে পদার্পণ করিয়াই দু'তিনখানা ভারি ভারি গহনা পাইয়া তাহার অলঙ্কারের অভাব মিটিয়া গেল। নারায়ণ আড়চোখে চাহিয়া দেখিয়া ভাবিল, গহনাগুলোরই যেন জন্ম সার্থক হয়ে গেল, এর গায়ে উঠে।

বিবাহের পর দু'টো দিন ত সে নিভৃতে একটা কথাও বলিতে পাইল না মালতীর সঙ্গে। সারাক্ষণ ভিড়, সারাক্ষণ তাহাদের ঘিরিয়া কোলাহল, আর আড়িপাতা।

বৌভাত হইয়া যাওয়ার পর বাহিরের লোক যাহারা আসিয়াছিল, সব প্রস্থান করিল। বাড়ীটাকে আবার বাড়ী বলিয়া বোধ হইল। চিরাচরিত প্রথায় আবার স্নানাহার, রন্ধন, নিদ্রা প্রভৃতি চলিতে লাগিল।

ঠাকুরমা সকাল সকাল স্নান সারিয়া বলিলেন, "নাও, আবার এখন জলের ভাবনা ভাব। যতক্ষণ জল থাকে ততক্ষণ কেউ ন'ড়ে বসবে না, তার পর চলবে বকাবকি, গালাগালি। তা ভাই ছোটনাতি, এবার টুকটুকে বৌয়ের জন্যেও কি তুমিও জল তুলে আনবে?"

টিউবওয়েলের জল সম্বন্ধে নারায়ণের সব উৎসাহ চলিয়া গিয়াছিল। সে বলিল, "আমার বয়ে গেছে। পা পুড়ে, মাথা পুড়ে কি কম হয়রাণি? কেন, এ ক'দিন চলল কি ক'রে? আমি ত জল তুলি নি?"

উমা অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "এ ক'দিন বাড়তি ঠাকুর-চাকর ছিল, তারা এনেছে, আজ ত তারা নেই? কেন,

এতদিন পা-মাথার ভাবনা ত ছিল না? তুমি যে দু' বাল্‌তি আনতে, তাই আন না হয়। ছোট বৌকে পাশের বাড়ীর থেকে চান করিয়ে আনব না হয়, মাসীমাকে বলা আছে।"

মালতী ঘরের এককোণে মাথায় কাপড় দিয়া বসিয়াছিল। উষার প্রস্তাব শুনিয়া সে সজোরে মাথা নাড়িল। উষা অবশ্য ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, সে দেখিতে পাইল না।

নারায়ণ ভ্রুকুটি করিয়া বলিল, "কেন, ঘরের বৌ পরের বাড়ী যাবে কেন স্নান করতে? এমনি সংসার যে, বাড়ীতে স্নানের ব্যবস্থাও হয় না?"

উষা রাগিয়া বলিল, "তবে ভাল ব্যবস্থাটা তোমরা দু' ভাইয়ে মিলে কর। এদিকে ত চার পয়সা খরচ বাড়লে খ্যাঁচাখেঁচি বেধে যায়।" সে সশব্দে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল।

মালতী উঠিয়া নারায়ণের পাশে আসিয়া বসিল। তাহার একটা হাত ধরিয়া বলিল, "আর সবই ত বদ্‌লে গেল, খালি জলের কষ্টটা থেকে গেল।"

নারায়ণ পত্নীর কোমল গণ্ডে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "ওটাও থাকবে না।"

মালতী বলিল, "কি ব্যবস্থা করবে? লোক রাখবে?"

নারায়ণ বলিল, "লোক কেন রাখতে যাব? তাতে আর মজাটা কি?"

মালতী বলিল, "আবার মজা কোথা থেকে আসবে এর মধ্যে?"

নারায়ণ বলিল, "আজ লোক ভাড়া ক'রেই জল আনিয়ে নিচ্ছি। কাল থেকে কি করব জান? তুমিও ভোরে ওঠ, আমিও ভোরে উঠি। দু'জনে মিলে গিয়ে লেক থেকে চান ক'রে আসব। বেশ হবে, না?"

মালতী খুশীমুখে বলিল, "বেশ হবে। কিন্তু কেউ কিছু বলবে না ত?"

নারায়ণ বলিল, "ইস্, বললেই হ'ল। আমার বৌ আমি নিয়ে যাব, তাতে কার কি বলবার আছে? তবে ঠাকুরমা বলবেন বটে যে, জলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক বড় গভীর। টিউবওয়েলটা যমুনাপুলিন নয় বটে, তবে লেকটা অনেকটা সেইরকম।"
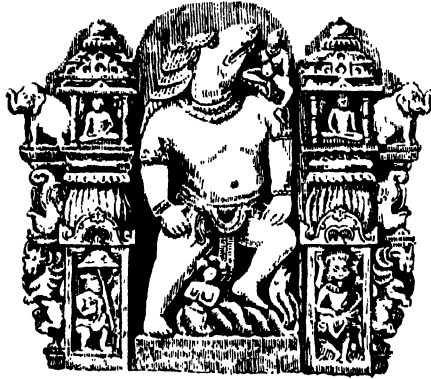
প্রমথ চৌধুরী ঃ বীরবল

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

একাধারে ক্রিটিক, কবি ও প্রাবন্ধিক এবং বীরবলী ঢংয়ে রস-প্রবক্তা—এই সমুদয় গুণের একত্র সমন্বয় লক্ষ্য করা যায় প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে। বীরবল ছিলেন মোঘল সম্রাট আকবরের দরবারের বিখ্যাত হাস্যরসিক; তিনি রসিকতা করতেন মানুষকে হাসাবার জন্যে, কাউকে আঘাত দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। এদিক থেকে বিচার করলে মনে হয়—প্রমথ চৌধুরীর 'বীরবল' ছদ্মনাম যথোপযুক্তই হয়েছে। অথচ তিনি যেমন ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপণ্ডিত, তেম্‌নি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রও তাঁর সমান অধিগত ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী সাহিত্যে যেমন ব্যুৎপত্তি এবং বার্গস প্রমুখ দার্শনিকদের তিনি যেমন ভাববাহী, তেমনি কালিদাস, ভাস, বাণভট্ট ও ভর্তৃহরিরও তিনি ভাববাহী। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি অনুরাগই প্রমথ চৌধুরীকে আলঙ্কারিক করে তোলে। কাব্য ও সাহিত্যে রস ও অলঙ্কার সম্পর্কে তিনি ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্য তুলনা করে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'কাব্য-বিচার' ও অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'র ভিত্তিতে বলেন: " 'উপমা' প্রভৃতির নাম অলঙ্কার; ইংরাজিতে যাকে বলে Figure of Speech। অলঙ্কারকে প্রাচীনেরা কাব্যের প্রাণ বলেন নি, এইমাত্র বলেছেন যে, অলঙ্কার কাব্য-শোভা বাড়ায়। সে যাই হোক্‌, অলঙ্কার সম্বন্ধে তাঁরা বহু তর্ক করেছেন আর তাদের শ্রেণী বিভাগ করেছেন। অলঙ্কার-শাস্ত্রীরা অবশ্য রসের সন্ধান পেয়েছেন ও কাব্যকে 'রসাত্মক বাক্য' বলেছেন। আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন কবি জয়দেব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি এবং উক্ত কাব্যের ব্যাখ্যা করি। অবশ্য সেকালে আমি অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলুম, সুতরাং অ-শাস্ত্রী হিসেবে নিজের মত ব্যক্ত করি।—রস কথাটি ক্রমে নেহাৎ বাজারে হয়ে গিয়েছে, সুতরাং নব্য অলঙ্কার-শাস্ত্রীরা রস বলতে কি বুঝতেন, তা পরে বলব। এখন অন্য কথায় যাওয়া যাক্‌। রীতি অলঙ্কার-শাস্ত্রের একটি বড় কথা এবং দাশগুপ্ত মহাশয় কাব্য-বিচারের একটি অধ্যায়ে তার সম্যক্‌ বিচার করেছেন। রীতির অর্থ কি? —Style। দাশগুপ্ত মহাশয় বলেন যে, তা নয়। কোন ভাষারই একটি কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়, এমন কথা অন্য ভাষায় পাওয়া যায় না। কারণ কালে কথাটির অর্থ বদলায়। Style ব্যতীত অন্য কোন কথায় রীতির পরিচয় দেওয়া যায়, বলা কঠিন। কথাটি প্রাচীন অলঙ্কার-শাস্ত্রীর কথা। Keith বলেন, কাব্যাদর্শই অলঙ্কার-শাস্ত্রের আদি গ্রন্থ। এ গ্রন্থে দুটি বিভিন্ন রীতির উল্লেখ আছে:— বৈদর্ভী রীতি ও গৌড়ী রীতি। দণ্ডী কাব্যের ভাষার দশটি গুণের ফর্দ্দ দিয়েছেন। সে গুণগুলির মধ্যে প্রসাদ-গুণ হচ্ছে প্রধান গুণ ও সমাধি (metaphor)। যে কাব্যে এ সমস্ত গুণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সেই কাব্যই বৈদর্ভী রীতিতে রচিত। তাঁর পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক বামন বলেছেন যে, এ রীতি 'সমগ্রগুণা'। আর তার বিপরীত সকল দোষের আকর হচ্ছে গৌড়ী রীতি। তিনি এ রীতির যে উদাহরণ দিয়েছেন, তা আমাদের মতে—nonsense। অন্য আলঙ্কারিকরা অপর অনেক রীতির কথা বলেছেন। তার ভিতর কুন্তক নামে কোনও অর্ব্বাচীন আলঙ্কারিক 'সুকুমার রীতি' নামক একটি রীতির উল্লেখ করেছেন। কালিদাসের কাব্য নাকি এই রীতিতে রচিত। কুন্তকের নাম আমি পূর্ব্বে কখনও শুনি নি। কুন্তকের এ রীতির সোদাহরণ বিচার চমৎকার ও আমাদের আধা-বিলেতি মনকেও প্রসন্ন করে। কুন্তক অবশ্য নব্য আলঙ্কারিক নন। ভামহ নামক একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন আলঙ্কারিকের একটি কথা 'বক্রোক্তি' হচ্ছে তাঁর আলোচনার অবলম্বন। বক্রোক্তি বলতে তিনি কি বোঝেন, আমরা তা বুঝিনে।—রসের বিচার প্রাচীন আলঙ্কারিকরা করেন নি। করেছেন নব্য আলঙ্কারিকরা। কাশ্মীরের আনন্দবর্দ্ধন ও অভিনব গুপ্তই যথার্থ রসের বিচার করেছেন এবং তাঁদের পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকরা তাঁদের মতই অঙ্গীকার করেছেন। কুন্তক যদিচ অভিনব গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন, তবুও তিনি রসের বিচার করেন নি; যে রস আমাদের নব্য সমালোচকদের একমাত্র বুলি হয়েছে।—রসের বিচার করেছিলেন একমাত্র ভরত। ভরত অলঙ্কার-শাস্ত্র লেখেন নি, লিখেছিলেন নাট্যশাস্ত্র। সেই সঙ্গে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কোন রস প্রকাশ করতে হলে মুখচোখের কি ভঙ্গি

করতে হয়, সেই বিষয়েও উপদেশ দিয়েছিলেন।—অভিনব গুপ্ত ভরতের রস-অধ্যায়ের টীকা করেন। এবং সেই সূত্রে রসের বিচার করেন। তাঁর কথা হচ্ছে এই—'রস অর্থে সাধারণ ভাব (emotion) বোঝায়। শিল্পের দ্বারা অভিব্যক্ত emotion ভাবকেই রস বলে।' সংক্ষেপে শীত হলে মনে যে ভাবের উদয় হয়, তার নাম রস নয়। রস বস্তুতেও নেই, মনেও নেই। কবিরা রসের সৃষ্টি করেন ও আমাদের মনে তা সংক্রামিত করেন। অভিনব গুপ্তের রস-বিচার পড়লে কান্টের দর্শনের কথা মনে পড়ে।"

এ পাণ্ডিত্য সাধারণ পাণ্ডিত্য নয়। দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেন: 'আমার মতে পৃথিবীতে শুধু দুই জাতীয় দর্শন আছে—এক আধিভৌতিক অদ্বৈত-বাদ, আর এক আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদ। এ দু'য়ের একটি না একটির যিনি প্রচারক, তিনিই দার্শনিক। আর আমরা যারা এর কোনোটিরই বশবর্ত্তী নই—আমরাই সাহিত্যিক। আমরা অবশ্য কখনও জড়ের দিকে ঝুঁকি, কখনও আত্মার দিকে। এই দু'য়ের ভিতর ইতস্তত: করাই সাহিত্যের সহজ ধর্ম্ম।'

যদি কোন ইংরেজ শিল্পী বা দার্শনিকের সঙ্গে তাঁর তুলনা করতে হয়, তবে বলতে হয়—রচনাদর্শের দিক থেকে প্রমথ চৌধুরী অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ প্রাবন্ধিক এডিসনেরই শিষ্য, কবি পোপ বা গলিভার-রচয়িতা সুইফ্‌টের নয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাঁর মত হচ্ছে: 'লোকে বলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয় লোকের মনোরঞ্জন করা, নয় শিক্ষা দেওয়া। আমার বিশ্বাস, সাহিত্যের উদ্দেশ্য দুই নয়, এক। এ ক্ষেত্রে উপায়ে ও উদ্দেশ্যে কোনও প্রভেদ নেই। এই শিক্ষার কথাটাই ধরা যাক্: সাহিত্যের শিক্ষা ও স্কুলের শিক্ষা এক নয়। সাহিত্যে লেখক ও পাঠকের সম্বন্ধ গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ নয়—বয়স্যের সম্বন্ধ। সুতরাং সাহিত্যে নিরানন্দ শিক্ষার স্থান নেই। অপর দিকে যে কথার ভিতর সত্য নেই, তা ছেলের মন ভোলাতে পারে, কিন্তু মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারে না। রহস্য করে যাঁদের মনোরঞ্জন করতে পারলুম না, স্পষ্ট কথা বলে যে তাঁদের মনোরঞ্জন করতে পারবো, এ হচ্ছে আশা ছেড়ে আশা রাখা। আর, কথায় যদি মানুষের মনই না পাওয়া যায়, তা হ'লে সে কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র।'

'বীরবল' ছদ্মনামে মানুষের মনকে তিনি সেই রহস্যে বেঁধেছিলেন। কথা-সাহিত্যে বক্তব্যের চেয়ে রীতি তাঁর কাছে প্রিয়। কি বলা যায়, তার চাইতে কেমন করে বলা যায়, তার দিকেই তাঁর অধিক প্রবণতা লক্ষ্য করবার মতো। তাঁর রচনায় সর্ব্বত্রই একটা প্রচ্ছন্ন রসিকতা থাকায় পাঠকের মনকে স্বভাবতঃই রসাপ্লুত করে। থিয়োফিল গ্যাটিয়ারের শিল্প প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেছেন যে, তাঁর আর্ট যেন বিভিন্ন রঙের সমন্বয়ে একটি অখণ্ড 'opal song', প্রমথ চৌধুরীর গল্পও তেমনি নিরেট, নিটোল, তা যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, তেমনি আপন দ্যুতিতে ঝলোমলো।

দুঃখের বিষয় যে, তাঁর শিল্প-পরিচয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে এখনও আমাদের দেশের পাঠকশ্রেণী সচেতন নয়। তার জন্য অবশ্য তাঁর শিল্পের প্রকৃতিই কিছুটা পরিমাণে দায়ী। তাঁর শিল্পের চরিত্র এবং এক হিসেবে তার বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তাকে শিল্প বলে চেনা কঠিন। বুদ্ধি এবং রুচি হ'ল তাঁর শিল্পের টানা-পোড়েন, তার উপর বিদগ্ধ মননের সূক্ষ্ম ফুলকাটা পাড় বসান। এই গুণ-ত্রয়ের সমন্বয় যে কতখানি সযত্ন নৈপুণ্যের ফল, আমাদের চোখকে তা এড়িয়ে যায়। তার কারণ, বীরবলের শিল্প এত বেশী আত্মসচেতন যে, তিনি কিছু একটা সৃষ্টি করে তুলছেন—এ সন্দেহ করবারও আমরা অবকাশ পাই না। ইতিমধ্যে শ্লেষ, বিদ্রূপ, চতুর-ক্ষুরধার বক্রোক্তি, হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ, চমক ধরান প্যারাডক্সের তীব্র তীক্ষ্ণ স্রোতে আমরা ভেসে গেছি। ফলে প্রমথ চৌধুরীর রচনা সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই শেষ ধারণা হ'ল এই যে, বুদ্ধিমার্গের এ এক অত্যাশ্চর্য্য তারের খেলা। এ ধারণা দৃঢ়তম হয় তাঁর প্রবন্ধ পড়লে—যা সাধারণের মতে সবচেয়ে বীরবলী। বীরবলের শিল্পের সঙ্গে এই তারের খেলার অবশ্য বিচ্ছেদ নেই, কিন্তু তাঁর রচনায় এই তারের খেলাই যিনি দেখবেন, অন্ধের হাতী দেখার মতোই সে দেখা তাঁর ব্যর্থ। বীরবলের মধ্যে যে নির্ভুল রূপকার আছেন, তাঁরই যদি আমরা দেখা না পাই, তবে আর যা দেখব, কেবল ভুলই দেখব। আর এই রূপকারের মুখোমুখি পরিচয় আমরা পেতে পারি তাঁর ছোট গল্পে।

তিনি একটি বিশেষ জাতীয় গল্পের আদি স্রষ্টা। সে-জাতের গল্প—তাঁরই নিজের কথায় বলতে গেলে—'শোন্‌বার জিনিষ, কিন্তু বিশ্বাস করবার জিনিষ নয়।' অর্থাৎ বালজাকের অথবা রবীন্দ্রনাথের গল্প যে চরিত্র, ঘটনা অথবা পরিবেশ সৃষ্টি করে, পাঠকের পক্ষ থেকে তাকে স্বীকার করে নেবার জন্য শিল্পীর আমন্ত্রণ থাকে উহ্য। The Atheist's Mass অথবা 'পোষ্ট-মাষ্টার' নামক গল্পে সে আমন্ত্রণ স্বীকৃত, সুতরাং বালজাক অথবা

রবীন্দ্রনাথের শিল্পও সার্থক। প্রমথ চৌধুরীর গল্পে যে এ-আমন্ত্রণ অনুপস্থিত এমন নয়, তবে গৌণ এবং খানিকটা পরিমাণে রূপান্তরিত। তাঁর শিল্প ঘোরতর আত্মসচেতন : তার ফলে একটা সাদাসিদে গল্প সোজাসুজি ব'লে পাঠকের মনে illusion সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বীরবলের গল্পে গল্পটাই থাকে পিছনে। অথবা বলা যায়, তাঁর পাত্র-পাত্রীদের অনর্গল, দ্যুতিময় কথার জালে গল্প ধরা পড়ে পাখীর মত। বীরবলের গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হ'ল এই যে, তাঁর পাত্র-পাত্রীরা নিজেরাই নিজেদের ব্যাখ্যা করে; বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা ঘটনাংশের চেয়ে গৌণ ত নয়ই, বরং মুখ্য। উদাহরণ হিসেবে তাঁর 'চার ইয়ারী কথা' ও 'ঘোষালের ত্রিকথা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ঘোষালের ত্রিকথা'র 'ফরমায়েসি গল্প' ধরা যাক্; এ গল্পে গল্পের চেয়ে কথা বড়। লেখকের কথা হ'ল, গল্প এগোবার দরকার নেই, আলাপটাই আসল। 'চার ইয়ারী কথা'র গল্পগুলিতে অবশ্য গল্প অনুপস্থিত নয়, এবং পদ্ধতির দিক্ থেকে তারা মোপাসাঁর গল্পের অনুরূপ। অনেক সময় পাঠককে তিনি কিছু বিশ্বাস করাতে চান না, তাঁর গল্পে তাই গল্পাংশটি কেবলই অবলম্বন। গল্পের নগণ্য উপলখণ্ডকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে তাঁর অপূর্ব্ব সংলাপ; কখনও তা হাস্যচ্ছটায় দ্যুতিময়, কখনও ব্যঙ্গের তির্য্যক্ রশ্মিতে ভাস্বর, কখনও বা নাটকীয় সংহতিতে অপরূপ। এ সংলাপকে হয়ত তারের খেলা ব'লে অভিযুক্ত করা চলত—যদি না এই সংলাপের মধ্য দিয়েই লেখক ঘোষালের মত, নীল লোহিতের মত, চার ইয়ারী কথার পাত্রদের মত চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হতেন। নীল লোহিত সম্বন্ধে লেখক বলেছেন যে, সে একটি জ্যান্ত গ্রামোফোন যাতে ভগবান্ স্বয়ং দম লাগিয়ে দিয়েছেন। এ কথা অল্পবিস্তর বীরবলের সব চরিত্র সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, কিন্তু বীরবলের শিল্পের বিশেষত্বই এইখানে যে, তাঁর গ্রামোফোনগুলি কথা বলতে বলতে কখন কোন্ অত্যাশ্চর্য্য উপায়ে জীবন্ত মানুষ হয়ে উঠেছে। যে শিল্পের দ্বারা এটা সম্ভব হ'ল, তাকে শুধু অসাধারণ বললে যথেষ্ট বলা হয় না।

বীরবলের শিল্প সম্বন্ধে অনেকের অভিযোগ এই যে, শাস্ত্রোক্ত সংসারের মত তা ঊর্দ্ধ-মূল অবাঙ-শাখ। অর্থাৎ বুদ্ধির উজ্জ্বল শূন্যে তাঁর শিল্প বিলম্বিত। মাটির সঙ্গে তার সংযোগ নেই। এ অভিযোগকে সরল বাংলায় তর্জ্জমা করলে এই দাঁড়ায় যে, বীরবল কেবল রসিকতাই করেছেন, ব্যঙ্গই করেছেন, পৃথিবীর যাবতীয় বিষয় উপলক্ষ্যে কেবল শাণিত প্রবচনই শুনিয়েছেন, কিন্তু মানুষের চিরন্তন হৃদয়াবেগের খবর তাঁর কাছে পাওয়া যায় নি। প্রথম কথা, হৃদয়াবেগ বলতে যদি সস্তা চোখের জল বুঝতে হয়, তা হ'লে অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, প্রমথ চৌধুরী হৃদয়াবেগের কারবার কোনদিন করেন নি। করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। কেননা তাঁর শিল্পের মূলে রয়েছে সেই বিশুদ্ধ রুচি যা আতিশয্যের শত্রু। কিন্তু 'আবেগ' কথাটিকে যদি আমরা প্রকৃত অর্থে বুঝি, তা হলে বলতে হয় উক্ত অভিযোগ বীরবলের প্রতি মারাত্মক অবিচার। কেন না, আবেগ যে শুধু তাঁর গল্প-সাহিত্যে বর্ত্তমান, তা নয়, উপরন্তু আর্টের যাদুস্পর্শে তা অমর রূপকল্পে বিশুদ্ধিকৃত। উদাহরণ স্বরূপ 'বীণাবাঈ', 'আহুতি', 'সেনের কথা' ও 'মেরি ক্রিস্‌মাস'-এর নাম করা যেতে পারে। 'বীণাবাঈ' বিশেষ ক'রে সংহত সৌন্দর্য্যের জন্য প্রেমের গল্পে শীর্ষস্থান অধিকার করবার যোগ্য। যাঁরা বুদ্ধি ও রুচির ভক্ত, যাঁরা সচেতন শিল্প-বোধের পরিমার্জ্জনায় নিটোল নীরন্ধ্র সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে পারেন, বীরবলের শিল্পের আমন্ত্রণ একমাত্র তাঁদেরই জন্য।

এই প্রসঙ্গে ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'প্রমথবাবুর গল্প পড়তে পড়তে আমার মনে হ'ল যে, বীরবলী ভাষা প্রবন্ধে উপযোগী, কিন্তু ছোটগল্পে অনিবার্য্য। প্রধান কারণ এই, ছোটগল্প কেবল ছোট ও গল্প হলেই সার্থক হয় না, তার ছোটাও চাই; এবং ছোটবার জন্য কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবীর পরিবর্ত্তে শর্ট ও শার্টই সুবিধার। ভাষা যদি অযথা বিশেষণে, উপসর্গ কৃ-ধাতুর নাগপাশে আটকে যায়, তবে গতি ও পরিণতি রুদ্ধ হতে বাধ্য। কি অদ্ভুত কৌশলে, অথচ কত সহজে কৃ-ধাতুর ও অনাবশ্যক বিশেষণের ব্যবহার প্রমথবাবু পরিত্যাগ করেন, দেখলে আশ্চর্য্য লাগে। প্রমথবাবুর হাতে মুখের বর্ণনা বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিস। টানা চোখ, টিকলো নাক আর পাতলা ঠোঁট সকলেই লিখতে পারে, কিন্তু টানা টিকলো ও পাতলা শব্দ বাদ দিয়ে ঐ রকম নাক, মুখ ও চোখের বর্ণনা এবং তাদের অধিকারীর জীবন্ত স্বরূপ প্রকট করা কত শক্ত, তা একবার লেখকবৃন্দ নিজেরা চেষ্টা করলেই বুঝবেন। আমার বক্তব্য এই যে, বীরবলী ভাষাতেই সে বর্ণনা খানিকটা সম্ভব, পুরোটার জন্য অবশ্য প্রমথবাবুর প্রতিভার প্রয়োজন। এত কথা লেখবার উদ্দেশ্য এই যে, বাঙ্গালী গল্প-লেখক ঘটনাকে করায়ত্ত করতে পারেন না বলেই বিশেষণের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন, সেই জন্য গল্প বর্ণনাবহুল হয়; এবং গতি সম্বন্ধে এক প্রকার

অচেতন ব'লে কৃ-ধাতুর অপব্যবহারে জড়িয়ে পড়েন, ফলে কথোপকথন দীর্ঘ ও অবান্তর হয়। প্রমথবাবুর গল্পে বর্ণনা ও কথোপকথন একটুও অতিরিক্ত নয়, যতটা পরিণতির জন্য দরকার, যতটা গতিকে সাহায্য করে, তার অধিক ব্যবহারে তিনি কৃপণ।'

ফরাসী সমালোচক জুবেয়ারের সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীকে তুলনা করলে বোধ করি শোভন হবে। জুবেয়ার তাঁর নিজের সম্বন্ধে লিখেছেন—

'If there is a man upon earth tormented by a cursed desire to get a whole book into a page, a whole page into a phrase, that phrase into one word,—that man is myself.'

প্রমথ চৌধুরী ও তেমনি বিরাট ক্যান্‌ভাসের পক্ষপাতী নন, তাঁর আর্টের প্রথম ও শেষ কথা মিতাক্ষরতা।

ভাষার দিক্‌ দিয়ে তেমনি বাংলা সাহিত্যে তিনি কথ্যভাষার নব-প্রবর্ত্তক। তাঁর পূর্ব্বে যে বাংলা সাহিত্যে কথ্যভাষার আদৌ প্রচলন ছিল না, এমন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে এবং বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পর ১৮৫৭ সনে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং ১৮৬২ সনে প্রকাশিত কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' মূলতঃ কথ্যভাষায় রচিত হয়। কিন্তু ভাষার নবরূপায়ণের চেষ্টা তাঁদের মধ্যে বড় একটা দেখা যায় নি, দেখা গেলে তৎকালীন ও তৎপরবর্ত্তী বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উপর তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী ছিল। বিদ্যাসাগরীয় রীতিতে বঙ্কিমী-ভাষা এদেশে বহুকাল চলে এসেছে—যার প্রভাব দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের প্রথমকালীন রচনায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি যখন তাঁর ছোটগল্প রচনার কাল (১২৯১) থেকে নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত হতে সুরু করে, এবং সাধুভাষা যখন তার নিজস্ব দ্যুতিতে প্রকাশমান, এমনি সময় ১৩২১ সালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্রে'র আবির্ভাব—যার মাধ্যমে কথ্যভাষার উত্তাল স্রোত মন্দাকিনীর ধারায় প্রবাহিত হতে সুরু হয়। সবুজপত্রের জন্ম সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরী লেখেন :···'রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাবার কিছুকাল পরে যখন শিলাইদহের কাছারিতে ছিলেন, তখন আমি ও মণিলাল গাঙ্গুলী সেখানে যাই, উদ্দেশ্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাবনা সাহিত্য-সম্মিলনে যাওয়া। দু' তিন দিন আমরা পদ্মার উপর বোটে থাকি। রবীন্দ্রনাথ রোজ সন্ধ্যেয় পদ্মার চরে বেড়াতে যেতেন ; আমি সে সময় বোটেই থাকতাম। কথায়-বার্ত্তায় আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি নব মনোভাব লক্ষ্য করি। তিনি বলতেন, তিনি আর লিখবেন না, কারণ বহুকাল ধরে অনেক লিখেছেন, আরও লিখলে পুনরুক্তি করবেন মাত্র। আমি অবশ্য তাঁর এ অভিমতের ঘোর প্রতিবাদ করতুম। একদিন সন্ধ্যেয় তিনি ও মণিলাল চরে চক্র দিয়ে ফিরে এলেন, মণিলাল ফিরে এসে আমাকে বললে যে, রবীন্দ্রনাথ লিখতে রাজী আছেন, যদি আমি একখানা নতুন মাসিকপত্র বার করি ও তার সম্পাদক হই। তা হলে তিনি তাঁর সব লেখা সেই পত্রেই প্রকাশ করবেন। আমি হেসে বললাম—আমি এই পত্রিকার বেনামদার সম্পাদক হতে রাজি আছি। আমি প্রস্তাব করলাম, পত্রের নাম দেব সবুজপত্র এবং সে নাম তিনি গ্রাহ্য করলেন।'···

রবীন্দ্রনাথের সপ্তম উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' কথ্যভাষাতেই সবুজপত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কথ্যভাষায় লিখিত উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'। তার মূলে প্রমথ চৌধুরীর কথ্যভাষার আন্দোলন লক্ষ্য করবার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যেও যে এ উদ্যম ছিল না, এমন নয় ; কিন্তু লিখন অভ্যাসের ফলে লেখকমাত্রেরই যেমন একটি নিজস্ব রীতি দাঁড়িয়ে যায়, এবং সেই রীতি থেকে সহসা বেরিয়ে আসতে গিয়ে নিজের কাছেই একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, লোকে একে সহজভাবে গ্রহণ করবে কিনা, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। 'সবুজপত্রের' মধ্য দিয়ে প্রমথ চৌধুরী এই সংশয়ের নিরসন করলেন। প্রমথ চৌধুরীর ভাষা যেমন এসময় ক্রমে বীরবলী ঢংএ প্রতিষ্ঠার উত্তুঙ্গ শিখরে উঠল, রবীন্দ্রনাথের হাতেও সাধুভাষার স্থলে ক্রমে তাঁর স্বকীয় কথ্যভাষা আত্মমর্য্যাদায় অভিব্যক্তি পেল। বাংলা সাহিত্যে বীরবলী ঢংটি কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর প্রচলিত রচনারীতিকেও ছাড়িয়ে গেল। অনেক লেখক তার অনুকরণ করতে গিয়েও এই ঢংটি করায়ত্ত করতে পারেন নি। এই ভাষা প্রচলন করতে গিয়ে রক্ষণশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাঁকে বাধাও কম পেতে হয় নি। কিন্তু সে বাধায় হার স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। ১৩১৯ সালে 'কথার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বললেন : 'আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় কোন তফাৎ নেই? ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত, যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত

কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে কালি পড়ে।'

এ ভাষা যদি প্রচলিত না হ'ত, তবে বাংলাভাষার সুললিত প্রকাশ যে আরও দীর্ঘকালের জন্য ব্যাহত হ'ত, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর সম্পাদিত 'সবুজপত্র', 'অলকা' ও পরে 'রূপ ও রীতি'র মাধ্যমে যে সকল লেখক পরবর্তী কালে বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছেন, তাঁরা প্রায় সকলেই কম-বেশী প্রমথ চৌধুরীর প্রচলিত গদ্য ও স্টাইলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলা যায়। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় বলেন: 'প্রমথ চৌধুরী বাংলাভাষা ও সাহিত্যে অভেদাত্মক অৰ্দ্ধনারীশ্বরের পূজারী।...তাঁহার উপর ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব একসময় খুব অধিকই ছিল। এই প্রভাবের ফলে আমরা পাই বীরবলকে বাংলার মনটেনের মত শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক হিসাবে। ফরাসী রচনার মত তাঁহার সমস্ত লেখায় ফুটিয়া রহিয়াছে একটা আন্তরিক ব্যক্তিমুখিতা। পৃথিবীতে শালীন, বিদগ্ধ দৃষ্টিতে যাহা তিনি দেখিয়াছেন, সমাজের সঙ্কীর্ণতা, রাজনৈতিক ভণ্ডামি, নীতিজ্ঞের একদেশদর্শিতা, রায়তের ক্লেশ বা শিক্ষিত যুবকের ভাবপ্রবণ দৌর্ব্বল্য—সকলের মধ্যেই আমরা পাই একটা নূতন রঙের চশমার ভিতর দিয়া বাঙালী জীবনের কল্পলোকবিস্তৃত চলচ্চিত্র। শুধু তাই নহে। তাঁহার প্রবন্ধ রচনার প্রাণই হইতেছে অত্যুক্তি বর্জ্জন, একটা সমতা ও সৌষ্ঠব।'

এক কথায় বলা যায়—তাঁর গদ্যভঙ্গী Neither poetic, nor prosaic। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: 'Paradox-এর খোঁচা দিয়া তিনি আমাদের সহজেই ভাবাবেশপ্রবণ, সংস্কারাচ্ছন্ন, নিদ্রালু মনকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—খাঁটি সত্যানুসন্ধিৎসা অপেক্ষা জড়ভাবের প্রতিষেধক উত্তেজনা সঞ্চারই তাঁহার আসল উদ্দেশ্য। তিনি আমাদিগকে ভাববিহ্বলতার মোহ হইতে সচেতন করিয়া আমাদের চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় আত্মানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে, তাহা তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বকই অতিরঞ্জন-বিকৃত করিয়া আমাদের প্রতিবাদস্পৃহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, এবং এই উপায়ে বাদ-প্রতিবাদমূলক এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছেন, যেখানে আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তি মুক্তবায়ুর ন্যায় অবাধে বিচরণ করিতে পারে। আমাদের ভক্তিরসমদির ও আনুগত্যমন্থর মনোরাজ্যে তিনি ফরাসী দেশসুলভ লঘু চপল ব্যঙ্গপ্রিয়তা ও শ্রদ্ধাবিমুখ অথচ মার্জ্জিত-রুচি শ্লেষাত্মিকা মনোবৃত্তির আমদানী করিয়াছেন।'

প্রমথ চৌধুরী তাঁর নিজের কালে জনপ্রিয় না হবার দু'টি কারণ প্রধান। প্রথমতঃ তাঁর লেখনী বহুপ্রসবিনী ছিল না, এবং দ্বিতীয়তঃ তাঁর রচনায় সাধারণ পাঠক-ঈপ্সিত ভাববিলাসিতা বা সস্তা উচ্ছ্বাস নেই; ফলে সাধারণ পাঠক তাঁর প্রতি সহজে আকৃষ্ট হতে পারে নি। তারা বরং অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছে শরৎ-সাহিত্যে—যা অতি সহজেই মানুষের মনকে এসে স্পর্শ করে। এদিক্ থেকে বলা যায়, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন writer of writers।

তাঁর বিশেষ লিখনভঙ্গির মধ্যে বাংলা দেশের সমস্যাবলীও নিতান্ত চাপা ছিল না। 'দুই ইয়ার্কি'তে যেমন তিনি পত্রাকার প্রবন্ধে গণতন্ত্রের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন, তেমনি 'রায়তের কথা'তেও পত্রাকারে তিনি এদেশীয় কৃষকদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যদিও এ বর্ণনায় তিনি বুর্জ্জোয়া ডিমোক্রেসির ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন নি, তবু তাঁর আলোচনা যে স্বচ্ছ ও প্রাণবন্ত, তাতে ভুল নেই। আলোচনা-সাহিত্যের দিক্ দিয়ে তেমনি তাঁর 'নানা কথা' ও 'নানা চর্চ্চা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, শিল্প, জীবনী, ভূগোল, কাব্য, সমাজ-জিজ্ঞাসা, রাজনীতি প্রভৃতি সবকিছুই এর মধ্যে আছে। 'নানা চর্চ্চা'র প্রথম প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষের জিওগ্রাফী' তাঁর এক অত্যাশ্চর্য্য রচনা। অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা সত্ত্বেও এটি হয়ে উঠেছে এক অপূর্ব্ব সরস সাহিত্যিক রচনা। ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেও প্রমথ চৌধুরীর যে কতখানি কৃতিত্ব, এ জাতীয় রচনা তার উজ্জ্বল প্রমাণ। Lytton Strachyর রচনার সঙ্গে তাঁর এই ধরণের প্রবন্ধগুলিকে একমাত্র তুলনা করা চলে। তিনি শুধু নব ভাবেরই রসিক নন, প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের তিনি যুক্তিবাদী প্রবক্তা।

কাব্যরচনা তাঁর সাহিত্যের আর এক মহত্তর দিক্। সেখানে Rhyme ও Reasonকে কেন্দ্র ক'রে এক উদার ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। 'পদচারণ'-এর উৎসর্গপত্রে বিনয়ের সঙ্গে বীরবল লিখেছেন যে, কবিতাগুলিতে আর কিছু থাক্ আর না থাক, 'আছে Rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ Reason।' কথাটা যত সহজে বলা গেছে, আসলে তাদের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তারা তত সহজ নয়। তেমনি সহজ নয় 'আহুতি'র Fantasy আর

'চেরিপুঞ্জের' উপর ছন্দবদ্ধ সনেট। তেমনি পেত্রার্কীয় আদর্শে তাঁর 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর কাঠামোটি তাঁর নিজস্ব লিখনভঙ্গীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে বাংলা সাহিত্যের এক অত্যুজ্জ্বল সম্পদে পরিণত হয়েছে। পরবর্ত্তীকালে যেসব কবি বিশুদ্ধ আঙ্গিকে সনেট রচনায় কলম ধরেছেন, বীরবলের সনেট থেকে তাঁরা যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছেন। বীরবলের মন ও রুচির সঙ্গে সনেট যেন খাপে খাপে মিলে গিয়েছিল, 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম কবিতাতেই তাই তিনি লিখেছেন —

'ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।'

ভাবপ্রাধান্যের পরিবর্ত্তে চিন্তার প্রাধান্যই এই কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। নিজের কাব্য সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন—

'কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,
মনোঘুড়ি বুঁদ হলে ছাড়িনে লাটাই।'

নিছক কল্পনাবিলাসে তিনি ডুবে থাকতে রাজি নন, কল্পনাবিলাসীদের দলে নিজেকে ভিড়াতে তাঁর যথেষ্ট আপত্তি আছে। তাদের প্রতি তাঁর অনুকম্পাও অসীম। ফলে জনপ্রিয়তার পরিবর্ত্তে তাঁকে সীমিত পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যেই আজীবন কাটাতে হয়েছে। কিন্তু তাতে তিনি বিচলিত হন নি। বলেছেন—

'পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব,
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব।'

সাহিত্যবৃত্তিতে এ বড় কম দুঃসাহসের কথা নয়। এদিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর মত দুঃসাহসী চারিত্রিক আভিজাত্য তাঁর সমসাময়িক কালে বা উত্তরকালেও বহু লেখকের মধ্যে দেখা যায় নি। তাঁর সম্পর্কে প্রকৃতই তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'...আমি অনেক সময় খুঁজি, সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে বাঁয়ের ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না। একজনের নাম খুব বড় ক'রে আমার মনে পড়ে, তিনি হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথর নাম আমার বিশেষ ক'রে মনে আসবার কারণ এই যে, আমি তাঁর কাছে ঋণী। সাহিত্যে ঋণ গ্রহণ করবার ক্ষমতাকে গৌরবের সঙ্গে স্বীকার করা যেতে পারে। অনেককাল পর্য্যন্ত যারা গ্রহণ করতে এবং স্বীকার করতে পারে নি, তাদের আমি অশ্রদ্ধা ক'রে এসেছি। তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে, সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্যবর্জ্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়,—এই মননধর্ম্ম মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে, যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন। তাঁর মনের সচেতনতা আমার কাছে আশ্চর্য্যের বিষয়। তাই অনেকবার ভেবেছি—তিনি যদি বঙ্গসাহিত্যের চালকপদ গ্রহণ করতেন, তা হলে এ সাহিত্য অনেক আবর্জ্জনা হতে রক্ষা পেতো। এত বেশী নির্ব্বিকার তাঁর মন যে, বাঙালী পাঠক অনেকদিন পর্য্যন্ত তাঁকে স্বীকার করতেই পারে নি; মুশ্‌কিল এই যে, বাঙালী কাউকে কোনো একটা দলে না টান্‌লে তাকে বুঝতেই পারে না।...রসের অসংযম প্রমথ চৌধুরীর লেখায় একেবারেই নেই। এই সকল গুণেই মনে মনে তাঁকে জজের পদে বসিয়েছিলুম।...'

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

২৪

হেমরঞ্জনী বলল, "নতুন শহর। তার ওপর তোমার তো বন্ধু জোটাবার আর জ্ঞানগম্যি নেই। পেলেই হ'ল। জানতাম দেরী করবে। কিন্তু বেশী দেরী কর নি। তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিলাম একটা চমৎকার জায়গায় নিয়ে যাব বলে।"

"সময় নেই? যাবে না সে জায়গায়?"

"জায়গায় যাব; চমৎকারটা পাবে না।"

চমৎকার পাব না কি! সবই চমৎকার! লণ্ডন! ভর্ত্তি তাতে নানা রকমের চমৎকার। চমৎকার ইণ্ডিয়া হাউসের ধুরন্ধর সায়েবরা; চমৎকার মাদ্রাজী ফিনান্স অফিসার; চমৎকার রষ্টকোষ্ট; চমৎকার জিম্ রোপার। কাণাকড়িতে খেলতে জানার অনেক সুবিধা আছে।

এই যে ঢলে পড়া অপরাহ্ণের মধ্যে একটি নির্বিঘ্ন শূন্যতা থেমসের তীরেতেও তো তা মালুম হচ্ছে। এ নদীর ঘোলা জলেও তো গঙ্গার ছল্‌ছলানি; এই পুলের স্থান থেকেও তো দিবসের কর্মব্যস্ততার উত্তাপ এসে লাগছে আমার মনে। আকাশ ভরা একটা পরিচিত ব্যাকুল সঙ্গ, যার সঙ্গে আমার মনের মিল খুঁজে পেতে কষ্ট হয় না। চমৎকার তো এর অঙ্গে অঙ্গে। বিলেতে যেটুকু লণ্ডন তাও চমৎকার দেখলাম; লণ্ডনে যেটুকু বিলেত পেলাম তাও চমৎকার দেখলাম।

রোদের ইশারা চমকাচ্ছে তখনও। মিঠে লাগে সব। হেমরঞ্জনীর একটা ছবি নিই। রষ্টকোষ্টের কথা বলতে বলতে এগিয়ে যাই ওয়াটার্লুর ব্রীজ ধরে। দূরে দেখা যায় লণ্ডন গিল্‌ভস্ হল। ডান ধারে, দক্ষিণ পাড়ের ঐ প্রবল প্রতাপান্বিত ইমারৎটায় চোখ না পড়েই পারে না অনেকটা জায়গা দিব্যি খালি। তার মধ্যে নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের ছাদ। ইস্পাত আর কাঁচে তৈরি বিশাল একটা হল। সারা তীরভূমিকে যেন খুশীতে উচ্ছল করে রেখেছে।

কৃষ্ণসাগরের বাঁধ থেকে বৃন্দাবন-উপবন দেখতে যেমন মনটা খামোকা অস্থির হয়ে ওঠে তেমনি অস্থির হয়ে ওঠে অমন ফুলে লতায় ঘেরা বাড়ীখানা—বাড়ীখানা তো নয়, হলখানা সম্বন্ধে জানতে। পা যেন এগিয়ে যায় নিজে নিজে।

হেমরঞ্জনী বলে ওটা রয়াল ফেষ্টিভ্যাল হল। যুদ্ধের পরে জাতীয় উৎসবের জন্য ওখানে বিরাট একটা একজিবিশন হয়। সব তার সরে গেছে। ঐ হলটা রয়ে গেছে।

"ওর মধ্যে একটা সেল্‌ফ-সার্ভিসিং রেষ্টুরান্ট আছে। একটু খাদ্য নিয়ে আর চা নিয়ে দুখানা চেয়ার টেনে ঐ লনে বসে গল্প করার মজাই আলাদা।"

সে আলাদা মজা চাখা গেল। আসতে ইচ্ছে করে না। যখন বলি, "উঠতে ইচ্ছে করে না যে!" হেমরঞ্জনী জবাব দেয়, "তাই তো বলছিলাম জায়গাটা পাবে, চমৎকারটা পাবে না। চমৎকার বসে-থাকা-টুকুনির মধ্যে।"

উঠে যাব। হেমরঞ্জনীর মুখে স্পষ্ট হাসি দেখে পিছনে তাকাই। রষ্টকোষ্ট। রষ্টকোষ্ট হেমরঞ্জনীরও বন্ধু। তাই এই যোগাযোগ ঘটেছিল ওদের উভয়ের মিলিত চেষ্টায়।

অনেকক্ষণ দেখেছি। আমি একটু ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপারে আটকে ছিলাম। কয়েকজন আর্টিষ্টকে নিয়ে বোঝাচ্ছিলাম আমার ঠিকমত দরকার কি। টার্মস্ ঠিক করছিলাম।

বাধা দিয়ে বলি—"আর্টিষ্ট! আমার সঙ্গে আলাপ করালেন না!"

"আমি বলেছিলাম ওদের। কিন্তু ওরা এখন কোথায় নাচের জলসায় যাচ্ছে। সময় নেই। আমি পেড়াপিড়ী করলাম না। একরকম সরেই পড়ল।" হেমরঞ্জনীর দিকে চেয়ে বলল—"লণ্ডন থেকে ওল্‌ড ভিক আসতে গেলে এখানে না আসাটা যেন পাপ! নয় মিষ্টার হেমরঞ্জনী?"

ওয়াটার্লু ষ্টেশনটা খুব বড়ো। একপারে ইয়র্ক রোড অন্যধারে ওয়াটার্লু রোড। ওয়াটার্লু রোডের ওপরেই "ওল্‌ড ভিক্"—লণ্ডনের অন্যতম প্রাচীন নাট্যশালা। লণ্ডনের দক্ষিণ তীরেই সেকালে নাট্যশালা ছিল। কলকাতায় যেমন শ্যামবাজার-হাটখোলা অঞ্চলটাতেই শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ মার্কা নাট্যমঞ্চের সদর কাছারি আর তার আশেপাশেই যেমন আরও নানারকমারি পেশাদারী আমোদ-প্রমোদ ও মোদ্‌ধাতুর নানাবিধ সরঞ্জাম তেমনি

সে-কালের দক্ষিণ লণ্ডন, থেমস্-পারের ডাকসাই নাম। গ্লোব, ব্লাকফ্রায়ার্স, সোয়ান সবই এ পারের ব্যাপার। ওয়াটার্লু ব্রীজ থেকে নিয়ে মোটামুটি লণ্ডন ব্রীজ পর্যন্ত, বিশেষতঃ ব্লাকফ্রায়ার্স বা সাউথওয়ার্ক ব্রীজ পর্যন্ত পোরশীটারটিকে সাউথওয়ার্ক পাড়া বলা হত ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। এখনও ঐ নাম চালু। এরই মধ্যে ইংরেজ রঙ্গমঞ্চের তীর্থ। ছুতোর মিস্ত্রী জেমস্ বার্বেজ প্রথম থিয়েটার গড়ে। সে আর তার ছেলে রিচার্ড বার্বেজই গ্লোব, ব্লাকফ্রায়ার্স এই সব নাট্যমঞ্চে প্রথম নাটক পরিবেশন করে। লণ্ডনের রেপার্টরি থিয়েটার সম্প্রদায় আজও এখানেই আড্ডা গেড়ে বসে আছে। ওল্ড ভিক্ তার অন্যতম।

একালের শ্রেষ্ঠ নটদের অন্যতম রিচার্ড বার্টন এখানেই অভিনয় করেন। যদিও রিচার্ড বার্টনের মত নাম নয়, তবুও শেক্সপীয়ারিয়ন অভিনয়ে লণ্ডনে গর্ডন হীথের নাম খুব। মিস্ রোজমেরী হ্যারিস্, পল রজার্স, হ্যারল্ড কাসকেট, জন উড্ভাইন্ এদের নামডাক বেশ।

আমি গেছি রিচার্ড থার্ড দেখতে। বার্টনই রিচার্ড থার্ড করছে। ইংলণ্ডে ন্যাশন্যাল থিয়েটার নেই, যেমন ফ্রান্সের থিয়েটার ফ্রাঁসেয়। কিন্তু লণ্ডনে থিয়েটারের সংখ্যা চল্লিশের ওপর। খালি ৬ থেকে ১২ বছরের বাচ্চাদের জন্য নিরালা থিয়েটার যেমন আছে তেমনি স্রেফ নাচ-গানের থিয়েটারও আছে।

ওল্ড ভিক্ হল আর ষ্টার থিয়েটার হল প্রায় এক-রকম। কিন্তু এ মঞ্চ বড়ো সহজ আর অনাড়ম্বর। রিচার্ড বার্টনের ব্যবস্থাপনা আর নিয়োগ খুবই স্পষ্ট আর সাধারণ। প্রথম দৃশ্যে রিচার্ড বার্টনকে প্রেক্ষা-গৃহের মধ্য থেকেই আবৃত্তি করতে করতে সিঁড়ি বেয়ে মঞ্চে উঠে যেতে দেখেছিলাম।

সেক্সপীয়ারিয়ন এ্যাক্টিং দেখতে গিয়েছিলাম। দেখে এলাম। সেই সব পোষাক-আশাক, তেমনি চীৎকার আর কবিতা পাঠের মধ্যে তেমনি করে জীবন্ত করে তোলার চেষ্টা। আমার ঢের ভাল লেগেছিল একালের অভিনয় গ্যাস্-লাইট। তবে হাসতে হাসতে সব ভুলে গেছিলাম শেরিডানের স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল্স্ দেখে। লণ্ডনের রেপার্টরি প্রতি সপ্তাহেই প্রায় বই বদলায়। পুরোণো নাটক থাকেই।

রষ্টকোষ্ট আর আমি সেই নাটকের মাধ্যমে এমন কাদা-মাটি গোলা হয়ে গেলাম যে, পর পর ক'দিনই বিকেলে ও আর আমি এক হয়েই থাকতাম। রষ্টকোষ্ট নিজেও ইংরেজী কবিতা লিখত। ওর কবিতাও শুনলাম। একটা লক্ষ্য করলাম। আমাদের দেশে হলে অমন আলাপী বন্ধুকে বাড়ী আনতাম, বা কবিতা শোনানোটাও অন্ততঃ বাড়ীতে করতাম। কিন্তু ও সবটাই করেছে বাইরে। কবিতা শুনিয়েছে সেই রয়্যাল ফেষ্টিভ্যাল হলে।

রষ্টকোষ্টের সঙ্গে সবচেয়ে ভাল কেটেছে একটা সকাল টেট গ্যালারীতে। সে সকালটা আমার বেশ মনে আছে ও থাকবে অনেকগুলো কারণে।

বিদেশে মানুষকে অনেক উৎপাতের সমুখে পড়তে হয়। কিছু বা তার এমন জায়গা থেকে আছে, নিজেকে খুব উঁচু মনে হয়; অনেক সময় উৎপত্তি স্থানের মাহাত্ম্যে নিজেকে বড়ই দীন অসহায় মনে হয়। কোন খানাঘরে বাটলারের সঙ্গে আলাপে বিপদ ঘটলে নিজেকে যেমন ভারী ভারী বোধ হয়, তেমনি আবার কোন বড় ক্লাবে ডক্টর ক বা পার্লামেন্ট সেক্রেটারী মিষ্টার খ-য়ের সঙ্গে আলাপে নিজেকে হাল্কা বোধ হওয়া আশ্চর্য নয়। ও দুটোই মারাত্মক শক্র। বিদেশে প্রবাসী ও পর্যটক হিসেবে মজা করার অমন ছিঁচকে চোর হোটেলের ম্যানেজারও নয়। আসল ব্যাপার সব সময়েই মিশে যাবার জন্য উন্মুখ থাকতে হবে। সহজ ব্যবহারের মত এমন মিশিয়ে দেবার সলুশান আর নেই।

মনে আছে ওয়েষ্টমিন্ষ্টার এ্যাবেতে আমার ঘোরা।

সেদিন ইচ্ছে করেই খুব ভোরে উঠেছি। দেবস্থানে যাব। ভোরের বাতাসই ভাল লাগে। হাজার কেন অন্য দেশ ভাবি না, হাজার ঠগ-জোচ্চোরের জায়গা হউক না, এও ত ভুলতে পারি না যে এখানেই বহু সাধু-সন্ত মহাত্মাও বাস করে গেছেন। এ্যাবে কথাটাই ত বাসস্থান বলে ব্যবহার করা হয়। সাধু-সন্তরা থাকতেন, সে ত এই সে দিনের কথা নয়। সেন্ট বেনেডিক্টের মতে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করার ব্রত নিয়ে আয়র্লণ্ড থেকে প্রথম যে ধার্মিক খ্রীষ্টানরা আসেন, স্থান করে নেন ক্যাণ্টারবারিতে। তার পরে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষাশেষি শার্লমেনের সময় থেকে আরম্ভ হয় ইংলণ্ডের সত্যিকার সংস্কার। পোপ গ্রেগরি সেন্ট অগষ্টিনকে ইংলণ্ডে পাঠান। এই সময়ের কাছা-কাছি বেনিডিক্টের সম্প্রদায়ই একটু জায়গা নিয়ে এখানে বসবাসের স্থান করে আশ্রম গড়ে তোলেন। তার পরে যুগে যুগে কালে কালে ওয়েষ্টমিনষ্টর পাড়ার সেই এ্যাবে আজ সমৃদ্ধশালী। এখন তার কলেবর বৃদ্ধি ঘটেছে। টাওয়ার দুটোই ২২৫ ফুট করে লম্বা; ৫৩০ ফুট লম্বা চার্চ। সেই হ্যারল্ডের কাল থেকে ইংরেজদের প্রতিটি রাজা-রাণীর অভিষেক হয়েছে এখানে; এডোয়ার্ড

প্রথমের ব্যবহৃত সরু মত চেয়ারখানার উপরে বসেই আজও অভিষেক করা হয়। তার তলায় থাকে স্কোণের পাথর। কালো পাথর। স্কটল্যাণ্ড থেকে জিতে আনা। বলে বাইবেলে বর্ণিত সেই জ্যাকবের-বালিশ এটাই। এমন বদ্ধমূল ধারণা এই কয়েক বছর আগেই পাথরখানা দেশপ্রেমী কোন স্কট স্রেফ চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। আবার তা ফেরৎও এসে গেছে। এমন তারিফ সে চুরির যে না নেওয়ারকালে না দেওয়ারকালে শ্রীমানকে কেউ ধরতেই পারে নি। স্কটল্যাণ্ড বলে বর্তমান এলিজাবেথকে ওরা এলিজাবেথ-দ্বিতীয় মানবে না, কারণ ওদের সঙ্গে ইংলণ্ডের মেলমেলাপ ত মাত্র জেম্‌সের সময় থেকে।

ঝগড়াটা মোক্ষম। স্কটরা আর ইংরেজরা যেন বাঙ্গাল আর ঘটী, মিশ খেয়ে খেয়েও খায় না। এখনকার দিনের দ্রবিড় খাজাধমদের তর্জন গর্জন আর উত্তর-ভারতের তর্জন গর্জনের সঙ্গে তুলনাও ঠিক জমে না; অনেকটা জমে সেকালের পাঠান আর মুঘলদের আগসা-আপসী। স্কটল্যাণ্ড ভারি গোঁড়া আর গম্ভীর দেশ; যেমন চেনে সুদ, তেমনি চেনে তলোয়ার। রাজপুতদের মত গোঁ আর সেই রাজপুতানার মাড়োয়ারীদের মতই অর্থ-টন্‌টনে ব্যবসায়ী বুদ্ধি।

ঐ দেশের তোফা সুন্দরী মেরী! রাণী মেরীকে রাম-তাড়ান তাড়িয়ে স্কটেরা যে দেশ থেকে তাড়িয়ে ছাড়ল এতে ওদের ধিক্কার নেই। কিন্তু এলিজাবেথ যে সেই স্কট রাণী মেরীকে কোতল করলেন এ রাগ ওরা ভোলে নি। ওরা ভোলে নি ফ্লডেন ফিল্‌ড, কিনি ক্রাঙ্কীর হার। ইংরেজদের ওরা স্রেফ অন্য একটা সম্প্রদায় বলে ভাবে। ওদের রাজপুত্র জেম্‌সই ইংলণ্ডের গদীতে চেপে বসেন, এলিজাবেথ মারা যাবার পর। সেই থেকে ইংলণ্ডে স্কটেদের রাজত্ব সুরু এই ওরা স্বীকার করে। তাই ওদের মতে এই এলিজাবেথ ওদের এলিজাবেথ প্রথম। ইংরেজ বলে, "কে বললে এলিজাবেথ প্রথম। এলিজাবেথ দ্বিতীয় ইনি।" মেরীর হত্যাকারিণী এলিজাবেথকে স্কটেরা কিছুতেই আমল দেবে না। এই নিয়ে ভীষণ ফ্যাসাদ। সে সব ফ্যাসাদেরই অন্যতম এই পাথর চুরি। এখনও স্কটল্যাণ্ডের কাগজে-পত্রে এই রাণী এলিজাবেথ একমাদ্বিতীয়ম্‌ হয়ে আছেন।

ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবের যেমন সুনাম প্রাচীন গির্জাঘর বলে, তেমনি ওর সুনাম হেনরী এইট্‌থের প্রবর্তিত নতুন গির্জা-সংস্কারের ঘাঁটি বলে। ইংরেজের রাজ-পুরিবারের ধর্মের ঘাঁটি এটা। এখানেই উল্‌সী, ক্রমওয়েল, মুর, লড এঁরা সব থেকে গেছেন। এখানে যিনি বিশপ তিনি ইংরেজদের সর্বে সর্বা। তবে অভিষেক করার জন্য আসেন ক্যান্টারবারির আর্কবিশপ। তাঁর হাতই পবিত্রতম আর আইনগত হাত।

দেখতে যাবু সেই ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবে। একালের ওয়েষ্টমিনষ্টার ক্যাথিড্রাল নয়। সেটা ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের পথে এ্যাশ্‌লে প্লেসে তৈরি হচ্ছে। অনেক খরচ হচ্ছে, হবে; শেষ হতেও অনেক দিন লাগবে। বিশাল ক্যাথিড্রাল হচ্ছে তৈরি। ওয়েষ্টমিনষ্টার এ্যাবে যেমন প্রটেষ্টান্টদের ওয়েষ্টমিনষ্টার ক্যাথিড্রল হবে তেমনি ক্যাথলিকদের।

আমার মন বিশালতায় নেই। প্রাচীনতায়। ভোর-বেলা চলেছি সেই চার্চে। সোমবার। তালাও ব্যবস্থা যেখানে খুশী যাবার। অন্য দিনে নিষেধও আছে, আবার পয়সা খরচও আছে।

ভোরের বাতাস আর সদ্য জাগা সূর্যের আলোর মধ্যে কে বেশী মিষ্টি ভাবতে ভাবতেই দেখি লোহার ছড় দিয়ে ঘেরা সবুজলনের ওপর গির্জা। সামনেই গেট।

ভারতবর্ষে বিশাল বিশাল মন্দিরে বিশাল বিশাল গোমুখম্‌ দেখে অভ্যস্ত। গেটটা নর্মান পদ্ধতির তোরণ। বড়ই মামুলি বলে বোধ হ'ল। তা ছাড়া রোদটা ওপাশে। ঢোকবার দিকটায় যেন অন্ধকার-অন্ধকার লাগল।

মাঠে দেখি কালো পোষাক পরে এক এ্যবট বা মঙ্ক বা কেউ—জানি না পাদ্রী বলাই ভাল ঝাঁট দিচ্ছেন লন্‌। তৎক্ষণাৎ মনে পড়ল দুটো কথা। লণ্ডনের দু' তীরে থাকত হোয়াইট-ফ্রায়ার্স আর ব্লাক-ফ্রায়ার্স। আর বেনেডিক্টাইন আশ্রমবাসীদের জন্য বেঁধে দেওয়া নিয়ম—পরিশ্রম। সেণ্ট বেনেডিক্ট বলতেন সন্ন্যাসীর পক্ষে বসে খাওয়া পাপ। খুব কঠিন পরিশ্রম করবে। সেই ট্রাডিশনের ফলে হয়ত কালো পোষাকে আবৃত সন্ন্যাসী ভোরে অঙ্গনে ঝাড়ুদারের কাজ করছেন। দেখে ভালই লাগল এ দৃশ্য।

যাক্‌, চলে গেলাম ভেতরে।

খুব সুন্দর লাগল। বোধ হয় দেবস্থান মাত্রেই আমার ভাল লাগে যদি দুটো জিনিস পাই—এক শান্তি, অন্ততঃ শান্ত গম্ভীর নিঃশব্দতা; এবং শুচিতা, মানে পরিষ্কৃতি। ফুল-পাতার ডাঁই, কাদায় কাদায় পেছল, ঘামের গন্ধ আর ঘি-ধুনো মালা-চটকানো একটা গন্ধ, সর্বোপরি রাম-চেঁচান চেঁচানো যেন ভগবৎভক্তিকে শূলটঙ্কেশ্বর করে ছাড়ে। এর ওপরে যদি থাকে পাঁঠার ব্যা-ব্যা, কথাই

নেই। মসজিদের ভেতরটা বরাবর ভাল লাগে। গির্জাও ভাল লাগে। শঙ্কর মঠ, কাশীর তুলসী ঘাট, দক্ষিণের ত্রিচুন্দুরেতে সুব্রহ্মণ্যমের মন্দির কাশ্মীরের মার্তণ্ডস্বামীর মন্দির এই জন্য এত ভাল লাগে। আগ্রাফোর্টে মোতি মসজিদের চাতালে বসে কত অপরূপ সন্ধ্যা কেটেছে।

কিন্তু ভেতরটায় বড় বেশী মখমল, সোনা, রূপো—সাজসজ্জা। তা হোক। নিস্তব্ধ। ভোরবেলা, কেউ নেই। যে পাদ্রী ঝাড়ু দিচ্ছিলেন একবার ঘাড় তুলে দেখলেন ; সেই মাত্র।

আমার পরনে কালো সার্জের ট্রাউজারের ওপর কালো সার্জের আচকান। হঠাৎ দেখে মিশনারী মনে হওয়া বিচিত্র নয়। সামনেই পাথরের গায়ে গায়ে লেখা। মাঝে মাঝেই মেঝের পাথরের গায়ে কারুর না কারুর নাম লেখা। পা যেন আড়ষ্ট হয়ে যায় ওর ওপর হাঁটতে। সাবধানে চলি। একটা জায়গা পেতলের থাম আর লাল-হলদে সিল্কের মোটা দড়িতে ঘেরা। লেখা পড়লাম। অজ্ঞাত সৈনিকের স্মৃতিচিহ্ন। গত মহাযুদ্ধেরও একটা আছে। ওপরে ফুল রাখা ; প্রদীপ জ্বলছে।...ভাবি, যারা মরেছে তারা কিসের আসায় মরেছে ? সে আশা কতখানি পূর্ণ আজ। ঐ আত্মা যদি আজ বিগবেনের ওপর থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"এত প্রাণ যে যৌবনেই শেষ হয়ে গেল, বিনিময়ে এই ফুল আর প্রদীপ, আর পাথরের বোঝা ছাড়া আর কি দিলে ?"—জবাব কি ?

যে দিকে তাকাই কেবল স্মৃতি। কেমন যেন নেশায় পেল। ডান হাতি ছোট্ট দরজাটা দিয়ে সুড়ুক করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম। কেউ দেখে নি।

সে-ও একটা প্রশস্ত অঙ্গন। নিচু নিচু সেকেলে ছাদ। সরু সরু পাথরের থাম। মাঝখানটায় খোলা। চারধারের ঘেরা ছাদের তলায় কেবল সমাধি আর সমাধি।

নোবেল প্রাইজ না-পাওয়াই যেমন সাহিত্যের উৎকর্ষতার অস্বীকৃতি নয়, ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার এব্যেতে সমাধিস্থ না হওয়াও তেমন শ্রেষ্ঠ মানবতার অস্বীকৃতি নয়। নোবেল প্রাইজ পাওয়া যেমন সাহিত্যের চরম পরিচয়পত্র নয়, তেমনি ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার এব্যেতে সমাধিস্থ হওয়াও শ্রেষ্ঠ ইংরেজের চরম পরিচয় নয়। বহু বহু নাম পেলাম যাদের আজ কেউ জানেও না। বোঝাই যায় এমন সময় ছিল যখন একটু টাকা-পয়সা খরচ করলেই এখানে জায়গা জুটত।

পুরনো পুরনো নাম, পুরনো পুরনো অক্ষরে লেখা, কেউ পাদ্রী, কেউ ডাক্তার, কেউ ওস্তাগর, কেউ বা আবার গাইয়ে, নানা ধরনের নাম। দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে গেছি। একজন এসে বললেন, "এদিকে ত আসা যায় না।"

হাসলাম। "যায় না নাকি ? গেল কি করে ?"

অতি বিনীত হাসি। "দেখা হয়ে গেলে চলে যাবেন।"

আবার হেসে বললাম। "নিশ্চয়, দেশে পরিবার রেখে এসেছি।"

পাদ্রীর সে কি হাসি !

চলে যায়, ফিরে চায়, আর হাসে।

বাইরে তখন পূবের দোর আর রঙীন শার্সী-ঘেরা জানলা দিয়ে একরাশ রোদ এসে পড়েছে। রাজাদের সমাধি দেখছি। গ্লাডষ্টোন্ ডিজরেলী, ড্যুক অব ওয়েলিংটন্, বালফুর, ভিক্টোরিয়া—সব দেখছি। এসে গেলাম পোয়েটস্ কর্ণারে। দেখে ঘেন্না ধরে গেল। শেক্সপীয়র, জন্‌সন্, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সাদে,—এঁরা আছেন সত্যি ; আবার সেই সঙ্গে আছে স্যর উইলিয়ম ডেভ্‌নাণ্ট, নিকোলাস্ রো।

কেউ শুনেছেন এঁদের নাম ? অথচ এঁরা সকলেই ইংলণ্ডের জাতীয় কবি, 'পোয়েট্ লরিয়েট' ছিলেন !!! টেনিসন, ব্রাউনিং-এর পাশে এ সব নাম কেমন লাগে ?

একটা নিরালা কোণে চুপ করে বসে একটু প্রার্থনা করছি। চোখ ছিল বোঁজা।

চোখ খুলে বিস্ময় ! একজন পঞ্চাশোর্দ্ধ পাদ্রী। সুস্মিত ও শুচিস্মিত চেহারা। আমায় বলেন,—"তুমি কি করছিলে ?"

সকালটা ভালই কেটেছে। মনে গান এসেছিল। চুপ করে বসে গানও গেয়েছি শব্দ না করে। তৃপ্তিতে ছেয়ে আছে চেতনা। একটুও তখন বচসা করার মেজাজ নেই। বলি,—"প্রার্থনা করছিলাম।"

গম্ভীর উত্তর আসে,—"কিন্তু এটা কৃশ্চান চার্চ !"

ভারী বিশ্রী লাগল। বললাম, "তাই নাকি ? ভেবেছিলাম ভগবানের মন্দির ! তা নয় বুঝি ?"

সেই গম্ভীর চোখ, চশমার ফাঁকে স্তিমিত হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে ভদ্রলোক আমার পাশে বসলেন। অনেকক্ষণ অন্তরঙ্গ কথা হ'ল, ভারতের দর্শনতত্ত্ব নিয়ে, মূর্তি পূজা, শ্রাদ্ধাদি কর্ম, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ নিয়ে।

অতিবৃদ্ধ একজন পাদ্রীকে প্রায় বহন করে দু'জন এনে বসালেন একটা উঁচু আসনে। তিনি প্রার্থনা করে চলে গেলেন। যাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তাঁরাই আবার

ওকে নিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেলেন। এটা শুধু মন্দির নয়, এ্যবে। আশ্রম। এ্যবটের, এ্যবটদের থাকবার জায়গা। মন্দিরই নয় শুধু, মঠও।

বাইরেটায় ঝলমলে সকাল।

ওয়েষ্টমিনষ্টার গির্জার ওপরে বসে একটা সোয়ালো পাখা নাড়ছে। চেয়ে দেখি একটা নয়, অনেকগুলো।

এগিয়ে চলি। পার্লামেণ্ট হাউসের দিকে। ক্রমওয়েলের মূর্তির পাশ দিয়ে পুবদিকে আরও খানিক গিয়ে দেখি হাউস অব লর্ডসে ঢোকার পথ। ছেড়ে দিয়ে আরও এগোই। একটা দরজা, ছোট দরজা খোলা।

ঢুকে পড়ি।

যা কিছু ভাগ্যে ঘটবে তাও ত জীবনের অঙ্গ হয়ে থাকবে। ঢুকে পড়ি।

পর-পর পর-পর কত ঘর, কত হল, কত বারান্দা, পার হই আর পার হই। কোর্ট অব স্টার চেম্বার, যে ঘরে পার্লামেণ্ট মেম্বারদের নাম লেখা খাতাখানা আছে, যে ঘরে ইংলিশ নোবিলিটীর পরিচয় লেখা খাতা আছে, যে ঘরে হাউস অব লর্ডস্ বসে, যে ঘরে—ঘর ত নয় বিশাল হল, উইলিয়াম রুফসের গড়া হল, ওয়েষ্টমিন্ষ্টার হল বলে, যে হলে বড় ইম্পীচ্মেণ্ট হয়ে গেছে, ষ্টাফোর্ড, চার্লস্ ফার্ষ্ট, ওয়ারেন হেষ্টিংস; যে হলে ক্রমওয়েল, বার্ক, শেরিডন, পিট্—বক্তৃতা করেছেন—সে হল, সব দেখছি, কিন্তু একা একা। জনমনিষ্যি নেই। যেন সব ভুতুড়ে। অবশেষে একটা প্যাসেজে এসে বিখ্যাত কয়েকটা প্রাচীর-চিত্র দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে যাই।

তখন একটা কোলাহল শুনি। একরাশ সাহেব-মেম সমেত গাইড আসছে বক্তৃতা করতে করতে। আমি একটু গা ঢাকা দিতে চাই তখন। কোথায় যাই। একটু এগুতেই দেখি পার্লামেণ্ট পোষ্টাপিস। গোল একটা হল। তার চারধারে পথ। একটা পথ নেমে গেছে সোজা ভিক্টোরিয়া এমব্যাঙ্কমেণ্টে। একটা পথ দিয়ে ত আমিই বেরুলাম। অন্য পথটা গেছে হাউস অব কমন্সের দিকে। অন্যটা কোন্ হল হবে জানি না। জানার সুযোগ হয় নি। কেন হয় নি সেটাই মজার কথা।

ভিড়টা চলে যাক, এই আশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পোষ্টাপিসের কাউণ্টারেই দু'খানা চিঠি লিখলাম। ভিড়ও চলে গেল আমিও হাউস অব কমন্সের হলে ঢুকেছি।

একটিও লোক নেই লাল কার্পেটে মোড়া আগা-গোড়া মেঝে। কিন্তু ছোট, খুবই ছোট মনে হ'ল। বসার ব্যবস্থাও ভারতীয় পার্লামেণ্টের মত সুন্দর নয়। ভারতীয় পার্লামেণ্ট এ তুলনায় অনেক বড় হল। কিন্তু এর ঐতিহ্য? হাউস অব কমন্স—যেখান থেকে মানব সভ্যতার এক বিস্ময়কর প্রতিষ্ঠান জন্ম নিয়েছে। হেনরী এইট্থ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মানুষের অধিকার নিয়ে লড়াই ঝগড়া হয়েছে এখানে; এখানেই প্রথম অষ্টার-লিজের পতন, ওয়াটারলুর বিজয়, দাসপ্রথা নিরোধ, ডানকার্কের গ্লানি, আলা-মীন আর বার্লিনের জয়ের ঘোষণায় এই বদ্ধঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। বোমার ভেতরেও রাত রাত কেটে গেছে এখানে বসে বিতর্ক করতে। হাউস অব কমন্সের ইতিহাস কেবল ইংরেজের ইতিহাসই নয়, বর্তমান যুগের সভ্যতার ইতিহাস।

বাইরে বেরিয়ে অন্যধারে যাব, পুলিস ধরেছে।

"আপনি কে?"

"পর্যটক!"

"কোন্ দলের সঙ্গে এসেছেন?"

"কোন দলই নয়। একাই ঘুরছি।"

"একা? একা ঘোরা এখানে নিষেধ যে!"

"জানি না ত ভাই! জানলে নিয়ম-শৃঙ্খলা ভাঙ্গতে যাব কেন, বিশেষতঃ নিয়ম-শৃঙ্খলার আঁতুড়ঘরে?"

কনেষ্টবলও হাসে! "এলে কি করে?"

দুই পায়ে দু' হাত দিয়ে বড় রকম শব্দ করে বলি, "এই পা দুটোয় করে। আরও উপায় আছে নাকি?"

ইংরেজ জাতের মধ্যে রসিকতা প্রিয়তা এত প্রখর যে অনেকবার মধুর বিস্ময়ে অনুতাপ করেছি আমাদের দেশে যদি এই সহজ রসিকতা বোধটুকু থাকত। আমরা কেমন যেন সহজেই ক্ষেপে যাই; ওরা কেমন যেন সহজে ক্ষেপতে জানেও না, চায়ও না।

ও হেসে বলে, "তা ত হ'ল, ঢুকলে কি করে? গাইড ছাড়া ত ঢোকা যায় না।"

"কি করে জানব বল। ঢুকলাম। সোজাসুজি, না লুকিয়ে, ভদ্রলোকের বাড়ী ভদ্রলোক যেমন ঢোকে, তেমনই ঢুকলাম। কেউ ত বারণ করে নি।"

আশ্চর্য হয়ে যায় কনেষ্টবল।

"কোন্ পথে ঢুকেছ?"

"সে ত বলা মুশকিল। আমি নয়া-আদমী। কেমন করে বোঝাই। তবে এই বাড়ীর একেবারে পূবের দিকে ছোট্ট যে দরজাটা আছে—"

"—যার পরেই পার্লামেণ্ট গার্ডেনস্?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। এক জোড়া ফুর্তি-হাসিখুশী দেখেছিলাম ফুটে গাছের তলায় বসে টেবিলের ওপর কি সব রেখে

খাচ্ছে আর নদীর শোভা দেখছে। নেহাৎ বেড়া দেওয়া ছিল, তাই ওধারে যেতে পাই নি।"

"সেই দরজা দিয়ে ঢুকেছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"কেউ এতক্ষণ তোমায় দেখেও নি, বারণও করে নি ?"

"কেউ দেখেছে কিনা কি করে বলব; আমি কারুকে দেখি নি; এবং বারণ করলে না শোনার মত অসভ্য বলে আমায় মনে হচ্ছে কি ?"

ভদ্রলোক আবার হাসে।

আমিও খুশী হই। মনে মনে জোর পাই।

যদি আমাদের দেশের পুলিসের সঙ্গে আমায় এতক্ষণ কথা বলতে হ'ত, বিশেষ পার্লামেন্টের সেই খাকী-পোশাকের ওপর 'তুর্‌রা ফৈলানো সাফা' বাঁধা পেশোয়ারী পুলিসের 'তুস্‌সী, তুয়াডিড' সামলাতে হ'ত, কি দশাই হ'ত আমার। এ দেশের পুলিসের বাইরে যাই থাক ভেতরটা ভদ্র, সিভিলিয়ান। আমাদের দেশের পুলিস ধুতি-পাঞ্জাবী পরলেও ভেতরে ভেতরে হুলো-বেড়াল।

দু'জনের হাসি-গল্পের মধ্যে ব্যাপারটার তত্ত্ব শেষ অবধি জানা গেল।

সবেমাত্র ঐ ছোট দরজাটা খোলা হয়েছে। ওটা সার্ভিস্ ডোর। বিল্ডিংয়ের খবরদারী করনেওয়ালারা আসা-যাওয়া করবে বলে সকালে ঘণ্টাখানেক খোলে। এদিককার বড় দরজাগুলো খোলার সঙ্গে সঙ্গে ওটা বন্ধ হয়ে যায়। দু' চার মিনিটের, কি এক মিনিটের ফারাকে হয়ত আমি ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুধু ও দিকটাই বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়, ও তল্লাটেই কেউ আর ছিল না। সকলেই সামনের দিক পাহারা দিচ্ছে। পর্যটকেরা এ সময়ে খুবই আসে। তাই গাইডদের নিয়ে তারা যেমন যেমন এগুতে থাকে তেমনি তেমনি সব সচেতন হয়ে ওঠে। আমায় কেউ লক্ষ্য করবে কি ? আমি পর্যটকদের বাঁধাধরা রুটের উল্টো ধার দিয়ে চুপি চুপি একলাটি গড়িয়ে গড়িয়ে দেখতে দেখতে আসছি। আমায় কেউ দেখেও নি, রোখেও নি। তা ছাড়া জানা না থাকায়, আর মতিটা শুদ্ধ থাকায় চলন-চালনে কোনই আড়ষ্টতা ছিল না, তাই কেউ টেরও পায় নি।

"এখন ?"

"এখন আর কি, যতক্ষণ জানতাম না যা খুশী করেছ, এখন জেনে ত আর নিয়মভঙ্গ করতে পারি না। সোজা পথ ধরে নেমে যাও।"

সেই বেরিয়ে এলাম।

বার বার মনে হতে লাগল পুলিস ভদ্রলোকের সৌম্য, বিনয়ী, সদালাপী ব্যবহার। সেই কথাই আবার মনে হয়। লণ্ডনের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী কি ?—লণ্ডন পুলিস !

রষ্টকোটের সঙ্গে দেখা হবার কথা টেট গ্যালারিতে। আজ টেট গ্যালারী ছিল মিলব্যাঙ্কের বিশ্রী কারাগার। স্যর হেনরী টেট্ আশী হাজার পাউণ্ড খরচা করে বিল্ডিং করান সেই কারাগার ভেঙ্গে। জীবনের অমূল্য সম্পদ বহু তৈলচিত্র দিয়ে সে বাড়ী সাজিয়ে দান করেন জাতিকে। ন্যাশনাল গ্যালারি থেকে খাঁটি ইংরেজী রীতির ছবিগুলো এনে এই টেট গ্যালারির প্রতিষ্ঠা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে।

টেট গ্যালারির শ্রেষ্ঠ সম্পদ টার্ণারের কাজ! আর নবকালীন বর্ণোন্মত্ততার বৈচিত্র্য। রষ্টকোষ্টের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল খানিক পরে।

মাঝে আমি ফেঁসে গিয়েছিলাম এক দুর্বিপাকে। পার্লামেণ্ট বাগানটা তেমন কিছু সাজানো নয়। তারি মধ্যে গাছের তলায় বা রঙীন ছাতার তলায় জোড়া জোড়া খুশীর ঢেউ সামনে চায়ের টেবিল সাজিয়ে বসে তোফা-সকালটাকে তোফাতর করে দেখ্‌নেওলার হাড় জ্বালাচ্ছে।

অনেকটা কাটিয়ে উঠেছি ঐ উন্মনা ভাব। যদিও পাখী ডাকছে আর বুঝতে পাচ্ছি উনি আর কেউ নন্ শ্রীমান্ রেন্ বা শ্রীমতী নাইটিঙ্গেল (কে বলে রাতে ছাড়া উনি গান গান না। আমি নিজে শুনলাম—তবু ঐ কথা ?) তবুও নানা রকম কথা ভাবছি যাতে মনটা অমন ছল্ ছল্ করে না ওঠে। ভাবছি জগতে কত দুঃখ কষ্ট; হেনরী এইট্‌থ্ কেমন কুচ কুচ করে বৌয়ের গলা কাটত, মেরিট্যুডরের সময়ে স্মিথ ফিল্ডের বাজারের সামনে গর্ভবতী মেয়েকে টাঙ্গিয়ে জ্বালানো হয়েছিল। বাঁধতে গিয়ে তার বাচ্চা হয়ে গেল। তা হোক। বাচ্চাটাকেও আগুনে দেওয়া হল। যত রকম অভাবনীয় ভাবনায় মনকে ভারী করার চেষ্টা করে, পাগলা হাতীর পায়ে শেকল বেঁধে কায়দায় এনে ফেলেছি, আর এক ফাঁড়া।

টেট গ্যালারি সংলগ্ন এক তোফা উদ্যান বাটিকা আছে। সেখানে গিয়ে মনে পড়ে যায় ব্যাকরণ কৌমুদীর সেই "দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকায়াং আলাপ ইব শ্রূয়তে!"—তৃতীয়া করণে। তৃতীয়াটিই বা কে, আর করণটিই বা কি প্রকার। যত বলি—"তোর বাপু কি! গ্যালারি দেখ্‌বি, গ্যালারি দেখ। এ সব যেতে দে।" ততই পন্থ্যাং পঙ্গু না হয়ে পন্থ্যাং যেন বিহঙ্গু !! একটা একাসিয়া

গাছের তলায় চাপ চাপ মখমলের মত ঘাস। তার ওপর আর এক জোড়া। পৃথিবীতে ওরা একমাত্র দম্পতী তখন। টেট গ্যালারি ব্যাক গ্রাউণ্ডে।

অন্য মনে চলি পথে। তবুও তাহারা প্রাণের নিঃশ্বাস বায়ু করে সুমধুর। ভুলের শূন্যতা মাঝে ভরি দেয়—শেষ অবধি রষ্টকোষ্ট। রষ্টকোষ্টকে কে চাইছিল।

রষ্টকোষ্ট হাসে। "জুনের লণ্ডনে সকালের গাছের ছায়া, নরম ঘাস। ও তুমি দেখ না—দেখ না। এখন এসব আকৃচার দেখবে। কণ্ট্রি থেকে কত লোক আসছে যাচ্ছে, কেবলমাত্র ফুর্তি করতেই আসে। আমরা দেখিও না।"

"আমি দেখতে চাই না, কিন্তু দেখি। আমাদের চোখে যেন দেখার জিনিসই।"

"একটু আধটু দেখ। ওরা খুশীই হবে। বেশী দেখ না। তুমি খুশী হবে না।"

"বেশী না দেখেই অখুশী হয়ে উঠেছি!"

হো হো করে বিরাট হাসি হাসল রষ্টকোষ্ট।

ও থাকায় টেট গ্যালারি ত ভাল দেখা হলই, সঙ্গে সঙ্গে নবকালীন আর্টের অনেক আঙ্গিক তত্ত্ব শোনা গেল এবং বোঝার ভাণ করা গেল। কত আর না বুঝে থাকে সুস্থ সবল একটা মানুষ!

বলি, "শিল্প কি কার্য না কারণ?"

"মানে বলতে চাও আওজার না করণ।"

"না আরও সূক্ষ্ম কায়দা না ফায়দা? যা ওস্তরালো তার স্বাদ না কেমন করে ওতরালো সেই পাক প্রণালী?"

"সত্যি বলতে কি মাথা দিয়ে বুঝে চুমু খাওয়া আমার হল না। মনের স্পর্শই ঠোঁটে জড়ো হলে তা চুমু হয়ে ফুটে ওঠে।"

"সাবাস্ রষ্টকোষ্ট! চল আমরা ওই ভেলাৎ কোয়েৎ, ব্রাবেন্স, কনষ্টেবল্, টার্ণার, এমন কি দেগাস্, ইনগ্রেস্, মানে, মোনে অবধি দেখে সরে পড়ি। এবৃসট্রাকট্ আর সারিয়ালিষ্ট এখন মাথায় থাকুক ভাই। প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে পাঁক ঘাটাও সইবে, কিন্তু আকাশে চড়ে জিমন্যাষ্টিক সইবে না। এটাই টেষ্টের কথা।"

"এ তো টার্ণার ভক্ত তুমি, কনষ্টেবল্‌কে এত ভালবাস, ডাচ-মাষ্টারস্ তোমার প্রিয়, ত চল না ইংলিশ কাণ্ট্রি সাইড ঘুরে আসি।"

"সময় কই ভাই?"

"ওরই মধ্যে সময় কর। হাম্পশায়ারে এ্যালডারশটের কাছে ছোট গাঁ—ফ্লীট। আমাদের বাড়ী সেখানে। এক বোন আছে। আর কেউ নেই। চল যাই। দিব্যি লাগবে। ইংলণ্ড দেখতে চাও, ইংলণ্ডের অন্ধি-সন্ধি দেখ। লণ্ডন আবার দেখবে কি? লণ্ডন নিজেই এক বিরাট্ চরিত্র। বিশ বছর দেখেও একে শেষ করতে পারবে না, অথচ ইংরেজ জাতকে চিনতে পারবে না।"

ঠিক হয়ে গেল যাব এ্যালডারশট্। ক্রমশঃ
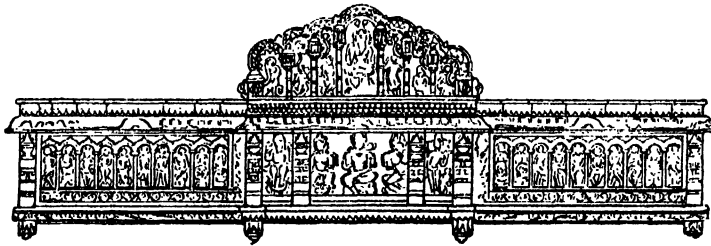
কলিকাতার সেনেট হল

শ্রীকালিদাস রায়

ব্যথা যে অবুঝ বড় যুক্তি সে না মানে।
এই যে সেনেট হল এর অঙ্গে গাঁইতি যে হানে
শত শত শ্রমিকেরা, মর্ম্মে শুধু সে আঘাত নয়,
মর্ম্মে পায় সে আঘাত সহস্র হৃদয়।
দানবীয় শক্তি দিয়ে এই যে ভাঙন
যাতে আজি চূর্ণ হয় সুপ্রাচীন দেব আয়তন,
এরো মূলে যুক্তি আছে, নয় অকারণে—
এ বোধে প্রবোধ তবু কই পাই মনে?

সিমেণ্টের যুগ এটা, ফুরায়েছে সুরখীর দিন,
উহার স্থাপত্য-রীতি নিতান্ত প্রাচীন,
যা কিছু প্রাচীন তারে ভাঙিবারই কথা,—
জরাজীর্ণে বুকে ধরি অশ্রুপাত মুগ্ধ দুর্বলতা।
শতজীব জরদ্গব জীর্ণ পিতামহে
পৌত্রগণ কত দিন সহে?
প্রাচীনের অপসার সুসঙ্গত নব্যে দিতে ঠাঁই,
নিজে না ভাঙিয়া গেলে গাঁইতি চালানো তাই চাই।

বিশাল অঙ্কটি যার পুণ্য পীঠস্থান,
দীর্ঘ শত বর্ষ ধরি বাঙ্গলার যত সুসন্তান
জ্ঞান ধর্ম্মে দীক্ষা লভি যারে নিত্য করেছে প্রণাম—
—একাধারে চৈত্য, মঠ, বিহার, মন্দির, সংঘারাম—
সে আজিকে চূর্ণ হয়। হেরিতেছি পরিণাম তার
প্রত্যেক আঘাতে কাঁপি পৌরভূমি করে হাহাকার।
পূর্ণ হইবার আগে আয়ুষ্কাল—তাহার পতন,
বিলম্ব সহিবে কত যুগের জরুরি প্রয়োজন?
যুক্তি আছে তাহা মানি, বেদনাও অহেতুক নয়,
বিরাটের এ পতনে কাঁদেনাক কাহার হৃদয়?
পূর্ণ নাহি হতে আয়ুষ্কাল
প্রয়োজন-তাড়নায় অর্জুনের খর শরজাল
জরাজীর্ণ পিতামহে করেছিল মৃত্যুশয্যাগত;
শত্রু মিত্র কার নেত্রে অশ্রুচ্ছাস হয়নি উদ্গত;
অর্জুনের শরদীর্ণ পৃথ্বী ভেদি শীত প্রস্রবণ
গাঙ্গেয়ের তৃষাহারী-ভোগবতী-ধারার মতন।

স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিনে

শ্রীকৃষ্ণধন দে

তোমারে স্মরণ করি তব পুণ্য জন্মতিথি ক্ষণে
হে মনীষি, কর্ম্মবীর—বাঙ্গালীর মুমূর্ষু জীবনে
তুমি দিয়েছিলে আশা, দিয়েছিলে শক্তি চেতনার।
তোমার লেখনী হতে নব প্রাণ করেছ সঞ্চার
আত্মবিস্মৃতের মাঝে, চিরপূজ্য তুমি মহনীয়,
তোমার কীর্ত্তির বুকে রবে তুমি চির বরণীয়।

সাহিত্যের পুণ্যাঙ্গনে সর্বদিক করেছ মুখর
তব শুভ শঙ্খনাদে—শুচি, শুদ্ধ, সত্য ও সুন্দর।
নির্জ্জিতের মৌন ব্যথা, দুর্বলের নীরব ক্রন্দন
তুমি শুনায়েছ বিশ্বে; রক্ত-ক্ষরা নির্মম শাসন
তোমারি লেখনীমুখে লভিয়াছে সহস্র ধিক্কার;
নির্ভীক সন্তান তুমি উৎপীড়িতা দেশমাতৃকার।

আজি বাংলার বুকে নেমে আসে তিমির রজনী,
বিভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ চিত্তে কে শোনাবে বাণী জাগরণী
লেখনীর অগ্নিমন্ত্রে? তব সম জ্ঞান-তপস্বীর
কোথা দেখা পাব আর? নিপীড়ন-আতঙ্ক-অধীর
জাগিছে বাঙ্গালী-কণ্ঠে দিকে দিকে ক্ষুব্ধ হাহাকার-
"ফিরে এস রামানন্দ, দাও শক্তি অজেয় দুর্বার।"

আজি তব জন্মদিনে, হে উদার, লোকহিতব্রতি,
এ দীন কবির লহ অন্তরের একান্ত প্রণতি।

—০—

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

পুলিনবাবু কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে সমিতির পুনর্গঠনে মনোযোগ দিতে না দিতেই একদিন নানা জেলায় ব্যাপক ভাবে খানাতল্লাসী গ্রেপ্তার হয়। ঢাকায় সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের এক ষড়যন্ত্র মামলার আয়োজন হয়। পুলিনবাবু, আশু দাসগুপ্ত, শান্তিপদ মুখোপাধ্যায়, গোপীবল্লভ বসাক, অক্ষয় দত্ত (পরে যিনি গোরক্ষনাথের আসনে অধিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী শান্তিনাথ নামে পরিচিত হন), নলিনীকিশোর গুহ, রজনী সরকার, সুশীল সেন, উকিল ললিতমোহন রায়, দীনেশ মুস্তফী, মাণিক্য মুস্তফী, টাঙ্গাইলের মোক্তার অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার ঘোষ, শশী সরকার, বঙ্কিম সেন প্রভৃতি অনেকে গ্রেপ্তার হন। অনেকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ছিলেন ঐ মোকদ্দমার একজন পলাতক আসামী।

এই মোকদ্দমা বহুদিন চলে। সরকার পক্ষ সমর্থন করতে কলকাতা থেকে আসেন ব্যারিষ্টার গার্থ (Garth) পি. এল. রায়, এন. গুপ্ত প্রভৃতি। আসামী পক্ষে ছিলেন ব্যারিষ্টার সি. আর. দাশ এবং শ্রী শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় সহ ঢাকার অনেক উকিল।

অধিকাংশ খরচ সমিতিকেই বহন করতে হয় এবং অর্থ সংগ্রহ করতে কয়েকটা ডাকাতি সংঘটিত হয়।

প্রচারের দিক থেকে এই মোকদ্দমায় সমিতির লাভই হ'ল। দেশবাসী সমিতির উদ্দেশ্য জানতে সুযোগ পেল। যদিও কেউ কেউ ভীত হয়ে সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল, কিন্তু মামলার প্রচারের ফলে সমিতির সভ্য ও সমর্থকের সংখ্যা মোটের উপর বৃদ্ধি পেল।

পুলিনবাবু, আশুবাবু প্রভৃতি অনেকেই দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং অনেকে মুক্তিলাভও করেন।

এই সময়েই মাখনবাবুর সঙ্গে সমিতির অধিকাংশ সভ্যের মতদ্বৈধ হয়। ১৯১০ সনে তিনি কলকাতা গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সমিতির সম্পূর্ণ দায়িত্ব নরেন্দ্র-মোহন সেনের উপর ন্যস্ত হয়। মাখনবাবুর মত ছিল সমিতি নতুন আকারে গড়ে তুলতে হবে। বলপ্রয়োগ, ডাকাতি প্রভৃতি বর্জন করতে হবে যারা গৃহত্যাগ করে এসেছে তাদের গৃহে ফিরে গিয়ে ধর্ম, শিক্ষা, সেবাকার্যের মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে মিশে গিয়ে কিংবা তাদের অনুরূপ কাজ করে যেতে হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ঢাকা সমিতির বজ্রপুরীতে এবং সোনারং বোর্ডিং-এ যে, দশাবতার স্তোত্র পাঠের নিয়ম ছিল। তার মধ্যে আ'র প্রিয় শ্লোক ছিল—

"ম্লেচ্ছঃ নিবহঃ নিধনে, কলয়সি করবালম।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম॥
কেশব ধৃত-কল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে॥"

কারণ, আমরা মনে করতাম যে পৃথিবী থেকে ম্লেচ্ছ অর্থাৎ যারা শক্তির দম্ভে জনগণের উপর অত্যাচার করত, তাদের ধ্বংসের জন্য ভগবান দেহ ধারণ করবেন, আমাদেরই মধ্যে যারা শুদ্ধাচারী, নিষ্ঠাবান, পরহিতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ। আমাদের দ্বারাই ভগবান তাঁর অভিপ্রেত কার্য সম্পন্ন করবেন।

সোনারং বোর্ডিংয়ে একটি ঠাকুরঘর ছিল। সেখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পূজা হ'ত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথে আমাদের আত্মগঠন করতে হবে। মাখনবাবুর নির্দেশ এবং প্রভাবেই আমাদের মধ্যে এই পরিবর্তন দেখা দিল। আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী পঠন-পাঠন এবং প্রচারের ব্যবস্থা করলাম।

কিন্তু মতদ্বৈধ আসল উপদেশের ব্যাখ্যা নিয়ে। মাখনবাবু ও তাঁদের সমর্থকবৃন্দ বললেন যে, আগে ধর্ম, ব্রহ্মোপলব্ধি তার পর সব। আগে ঈশ্বর দর্শন করে চাপরাস লাভ কর, তার পর জীবহিতে লেগে যাও। আমাদের মত হ'ল যে, ব্রহ্মোপলব্ধি যদি মনুষ্য-জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয় এবং তা যদি আগেই লাভ করি, তবে অন্য কাজ করার কোন অর্থই থাকে না। আমাদের মতে আগে কর্ম। কর্মদ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হলেই তবে ব্রহ্মোপলব্ধি হবে। ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্মই হ'ল শ্রেষ্ঠ কর্ম। এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং কোটি কোটি জনগণের দুঃখ-দুর্দশার অবসানই ঈশ্বরাভিপ্রেত। সুতরাং আমাদের আশু কর্তব্য বিপ্লবায়োজন করে বৃটিশ নিধন এবং এ জন্যই সমিতি গঠন। বলপ্রয়োগের পথ আমরা পরিত্যাগ করব না, কারণ তা ছাড়া অত্যাচারীর ধ্বংস সাধন হবে না। গীতা-নির্দিষ্ট পথই আমাদের।

মাখনবাবু একবার পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন জেলায় নিজের মত সভ্যদের কাছে প্রচারের জন্য ভ্রমণে বার হলেন—অবশ্য অত্যন্ত গুপ্তভাবেই। আমাদের সঙ্গে অনেক তর্ক হ'ল! কিন্তু তিনি স্বমতে অটল রইলেন এবং দলাদলি এবং দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষতিকর কার্য থেকে দূরে থাকবার জন্য কলকাতায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, মাখনবাবু বা তাঁর মতাবলম্বীদের কারুর সঙ্গেই কোন মনোমালিন্য, দলাদলি, বিদ্বেষ কিছুই হয় নি।

তখন যে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলেছিল তাতে নরেনবাবু ইচ্ছে করেই প্রধান অংশ গ্রহণ করেন নি। তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল পাছে লোকে মনে করে যে, তিনি নেতৃত্বের লোভেই এ সমস্ত করছেন। আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক, চিঠি লেখালেখি আমি ও ত্রৈলোক্যবাবু করতে লাগলাম: ত্রৈলোক্যবাবু চিঠির একটা ধারাবাহিক অনুলিপি লিখে ফেললেন। ঐ চিঠিগুলি থাকলে সন্ধিক্ষণে বিপ্লবী-চিন্তাধারার একটা সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যেত। মাখনবাবু দায়িত্বভার পরিত্যাগের প্রাক্কালে নরেনবাবু তাঁহাকে বারে বারে তাগিদ দেন যেন তিনি নিজ হাতেই সমিতির সমস্ত কার্যভার রাখেন ও পরিচালনা করেন।

উপরে উল্লেখ করেছি যে, নরেনবাবু তর্ক-বিতর্কে যোগ দেন নি। ও কাজ বেশীর ভাগ আমিই করেছি। তার কারণ এই যে, তার কিছু পূর্ব থেকেই নরেনবাবু আমার সঙ্গে খুব মিশতে থাকেন এবং সমিতি সম্পর্কে সমস্ত কাজের সঙ্গে আমাকে ওয়াকিবহাল করতে লাগলেন। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র এবং নারায়ণগঞ্জ-ঢাকার দৈনিক যাত্রী। তিনি কলেজে আসতেন প্রতিদিন দুপুরবেলা। যে সময় ক্লাশ থাকত না তখন দলের সভ্য, যাদের সভ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং সহানুভূতিশীল, চরিত্রবান ও পরোপকারী যুবকদের নিয়ে কলেজ-প্রাঙ্গণের কোন গাছের তলায় বসে নানা আলোচনায় কাটাতাম।

সে যাই হোক, মাখনবাবুর কলকাতা যাওয়ার পর সমিতির সব কিছুই যখন নরেনবাবুর উপর এসে পড়ল এবং আমি তাঁর সহকারীরূপে পরিচিত হয়ে গেলাম তখন নরেনবাবু আমায় বললেন, "মাখনবাবু ত গেলেন। এখন সমিতি বাস্তবিক আমাদিগকে চায় কি না তার একটা পরীক্ষা করা দরকার। কায়দা করে আমরা দলপতি হয়ে পড়লাম এমন একটা কথা কেউ মনে না করতে পারে।" আমরা দু'জনে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, কিছুদিন আমরা কতকটা গা ঢাকা দেওয়ার মত থাকব। লোকের যদি বিশ্বাস থাকে তবে আমাদের ডেকে নেবে। অবশ্য এতে সমিতির ক্ষতি না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গের মধ্যে জনপ্রিয় ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী তখন ত্রিপুরা ষ্টেটের উদয়পুরে। এ সম্বন্ধে পরে বলছি।

উপরি উক্ত পরামর্শক্রমে সমিতির অস্ত্র-শস্ত্র ও সম্পদ নিরাপদ স্থানে রেখে আমি গেলাম আমাদের গ্রামের চুড়াইনের বাড়ী এবং নরেনবাবু গেলেন তাঁদের গ্রামের বাড়ী নারায়ণগঞ্জের অন্তর্গত সোনারগাঁর আমিনপুরে।

তখন সমিতির মধ্যে একটু দিশেহারা ভাব আসে। লোকে চিঠি লিখলে জবাব পায় না, দেখা করতে এসে ফিরে যায়। সমিতির অনুরাগী সভ্যগণ নরেনবাবুও আমার খোঁজ করতে থাকেন। সে সময় উদয়পুর থেকে ত্রৈলোক্যবাবুর লেখা একটা কৌতুকপূর্ণ চিঠি মনে আছে। তিনি লিখলেন, "আমি এখানে গাঁজার চাস আরম্ভ করেছি। আপনি ও নরেনবাবু যে ভাবে সমস্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ করে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী গিয়ে বসে আছেন তাতে আপনাদের এখন এই জিনিসটারই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। বাড়ী ছেড়ে শীঘ্র চলে আসুন।" অনুরূপ চিঠি তিনি নরেনবাবুকেও লেখেন। তখন আমি ও নরেনবাবু পত্রালাপ করে দু'জনেই ঢাকায় ফিরে এসে পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করলাম।

এখানে উদয়পুরের একটু পরিচয় দিয়ে রাখি। উদয়পুর ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত একটি মহকুমা। তখনকার দিনে যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা না থাকায় উদয়পুর অতি দুর্গম স্থান বলে পরিচিত ছিল। আগরতলা কিংবা কুমিল্লা শহর থেকে ত্রিশ মাইল পাহাড় অঞ্চলের পথ হেঁটে যেতে হ'ত। সেখানের জমি ছিল সস্তা। আমাদেরই এক গৃহী-সভ্য দ্বারিক রায়ের নামে বহু জমি সংগ্রহ করেছিলাম সমিতির টাকায়। তিনি ছিলেন আমাদের বিশ্বাসী গৃহী-সভ্য।

সেখানে আমাদের কাজের একটা পরিকল্পনা ছিল এবং দলের কয়েকজন পলাতক ও গৃহত্যাগী কর্মী থাকতেন। চাষের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যরা বন্দুক চালনা শিক্ষা করবে। অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি ও রক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। ত্রিপুরা দেশীয়রাজ্য হওয়ায় সেখানে ব্রিটিশ পুলিশের ততটা যাতায়াত ছিল না। এ স্থানে একটা ঘাঁটি স্থাপন করে নিকটবর্তী পাহাড়ীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবার সুযোগ পাব। ঘাঁটি সুদৃঢ় করতে পারলে উদয়পুরকেই কেন্দ্র করে আমরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কার্য পরিচালনার সুযোগ পাব। যদি সমতল ক্ষেত্র থেকে

হটেও যেতে হয়, তথাপি বহুদিন পর্যন্ত পাহাড় অঞ্চলে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারব।

সভ্যরাই সেখানে চাষীদের মত চাষের কাজ করতেন। ত্রৈলোক্যবাবু মাঝে মাঝে গিয়ে কাজ-কর্ম দেখে আসতেন। ব্রজেন্দ্র চক্রবর্তী সেখানে অনেক দিন স্থায়ীভাবে বাস করেছিলেন। তাঁর ডাক নাম বসন্ত ও দলীয় নাম শর্বরীকান্ত। তিনি ছিলেন বিক্রমপুর নিবাসী এবং সমিতির খুব বিশ্বাসভাজন ও নিষ্ঠাবান কর্মী।

তখন নানা কাজের মাধ্যমে আমি ও নরেনবাবু এমন ভাবে মিশে গিয়েছিলাম যে, ঢাকায় তাঁদের নিজস্ব বাড়ী থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আহার করতেন। আমিও তাঁদের বাড়ীতে আহার করেছি। নরেনবাবুর বাড়ীর সকলেই, মায় ভৃত্যগণ সকলেই সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ঐ সময়েই সমিতির কেন্দ্র সোনারং থেকে ঢাকায় এসেছে। নরেনবাবুরও আমাদের বাড়ী ছিল প্রধান আড্ডা।

• চাঁদসীর ডাক্তার মোহিনীমোহন দাশ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশব দাশ সমিতির সভ্য ছিলেন। এ'দের ঢাকার বাড়ী আমাদের একটা গুপ্ত আড্ডা ছিল। পলাতক সভ্যগণ প্রায়ই এই বাড়ীতেই আহারাদি এবং শয়ন করতেন। বিপ্লবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে তাঁরা কখনও পুলিসকে ভয় করেন নি।

নরেনবাবুর সঙ্গে আমার মেলামেশার মধ্যে একটা সমিতিগত বৈশিষ্ট্য ছিল। কেন না, যে সমস্ত সভ্যের মধ্যে ভবিষ্যত নেতৃত্ব গ্রহণের সম্ভাবনা সমিতির কতৃপক্ষ দেখতে পেতেন, গোড়া থেকেই তাঁরা এই সমস্ত সভ্যকে সমস্ত কার্যের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতেন। সমিতির কাজের জন্য ছোট বড় কাজের কোন তারতম্য ছিল না। সমিতির মঙ্গলার্থে সবই বড বলে গণ্য হ'ত। সশস্ত্র অভিযানে অংশ গ্রহণ আর ডাক বাক্সে চিঠি ফেলা সমান দায়িত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হ'ত। কারণ সামান্য কাজেও ক্রটি থাকলে বৃহৎ অনিষ্টের সম্ভাবনা থেকে যেত। সর্ববিধ কাজই নিষ্ঠা এবং সতর্কতার সঙ্গে করতে হ'ত। সমিতি সংক্রান্ত সমস্ত কাজে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে না পারলে ভবিষ্যতে নেতৃস্থানীয় হতে পারত না।

প্রসঙ্গত-অনুশীলন সমিতির নেতা নির্বাচনের আসল মর্ম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমিতির নেতা বিশেষত গুপ্ত-সমিতির যুগে নির্বাচিত বা মনোনীত (nominated) হত না। নানাবিধ কাজ, কুশলতা, ত্যাগ, বুদ্ধিমত্তা ও নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নেতৃত্ব যেন পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে থাকত। নেতা নির্বাচনের কোন রীতি-অনুষ্ঠান সম্পন্ন না করে সকলেই পূর্ব হতেই যেন সভ্যরা নিজের মনে স্বীকার করে রাখত। মাখনবাবুর পর নরেনবাবুর নেতৃত্ব লাভ কোন রীতিগত অনুষ্ঠান বা ভোটের মাধ্যমে হয় নি। সকলে অন্তরের দিক থেকেই সহজে তাঁকে নেতারূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন।

নরেনবাবু ভবিষ্যতের জন্য আমাকে গড়ে তুলতে শুরু করলেন। সর্বকার্যে আমাকে তাঁর সহকারী করে অভিজ্ঞতা অর্জন করাতে লাগলেন। সমিতির বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র থেকে আগত সমস্ত চিঠিপত্র আমাকে দিয়ে পড়াতেন। পরামর্শ করে কি উত্তর দিতে হবে তা বলে দিতেন। চিঠি লিখে আমিই 'সেন' দস্তখত করতাম। কিছুদিন পর নরেনবাবুর নির্দেশে আমিই একা পত্রাদি পড়ে উত্তর দিতাম। যদিও দস্তখত 'সেন' বলেই থাকত। নরেনবাবু যখন পুলিশের বিশেষ সন্দেহভাজন হয়ে পড়লেন এবং নানা জায়গায় পুলিশ গোপনে পত্রাদি পড়ে দেখতে শুরু করল এবং আটক করে দিতে লাগল তখন নরেনবাবুর নির্দেশেই আর 'সেন' দস্তখত করতাম না। আমার নিজস্ব দস্তখতই করতাম। নরেনবাবু বলেছিলেন, "আমি আর বেশীদিন বাইরে থাকতে পারব না। কাজেই, বুঝে আপনি নিজেই সমস্ত কাজকর্ম চালাতে থাকুন।" পত্রদ্বারা তিনি সব জায়গায় জানিয়ে দিলেন যে, চিঠিপত্রে প্রতুলবাবুই দস্তখত করবেন এবং লেখা থাকবে "গাঙ্গুলী"। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় রাজসাক্ষী প্রিয়নাথ আচার্য তার সাক্ষ্যে এই কথাই বলিয়াছিল।

আমাদের সমিতির আর একটা বিশেষ নিয়ম ছিল যে, যার ওপর বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ কার্যের ভার থাকবে তার একজন সহকারীও রাখতে হবে, যাতে একজন গ্রেপ্তার হ'লে কাজকর্মের ক্ষতি না হয়। একই কারণে প্রধান ও তার সহকারী দুজনই কোন বিপদজনক কার্যে একসঙ্গে যাওয়ার নিয়ম ছিল না।

এই সমস্ত কারণেই নরেনবাবু গ্রেপ্তার হওয়ার পূর্বেই আমাকে সমিতি পরিচালনায় প্রস্তুত করে রাখলেন। এমন কি তিনি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও আমাকে কার্য পরিচালনা করতে হ'ত এবং নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হ'ত। মফঃস্বল থেকে কোন লোক এলে অনেক সময় আমিই আলাপ করে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিতাম। অবশ্য আগে কিংবা পরে যখনই হউক নরেনবাবুকে সমস্ত জানিয়ে রাখতাম।

১৯১০ সনে একদিন সন্ধ্যেবেলা নরেনবাবু আমাকে ডেকে পাঠালেন। ঢাকার মাহুতটুলীতে মণীন্দ্র রায়ের

বাড়ীর বাইরে বসবার ঘরের সিঁড়ির উপর বসে আলাপ হয়েছিল। বিষয়বস্তু একটু বিশেষ ধরনের ছিল বলে আজও সব মনে আছে। নরেনবাবু আমায় বলেছিলেন—"দেখুন, সমিতির সবরকম কার্যের দায়িত্বভার ক্রমশঃ আপনাকেই নিতে হবে। কে কখন আমরা ধরা পড়ি, মারা যাই, তার ঠিক নেই। নতুন লোক অগ্রসর হয়ে না এলে সমিতি টিকবে না। ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। আপনি নিজেকে প্রস্তুত করুন। সবরকম কাজে যোগদান করলেই সমিতি পরিচালনায় যোগ্যতা বাড়বে।"

আমি বললাম—"সমিতির কাজের জন্য আমি সর্বক্ষণ প্রস্তুত আছি। উপযুক্ত মনে করে যদি কোন দায়িত্বভার দেন তবে তা নিশ্চয়ই গ্রহণ করব।"

নরেনবাবু -"সশস্ত্র অভিযানে যেতে হবে। পরিচালকরূপে অন্যকে এ কাজে পাঠাতে হবে। সুতরাং প্রয়োজন মত আপনার নিজেকেও যেতে হবে। তবেই শিক্ষা দিতে পারবেন—শুধু পরিচালক নয় সভ্য সকলকেই রাজদ্রোহাত্মক পুস্তকা বিতরণ হতে খুন-ডাকাতি পর্যন্ত সমস্ত কাজের জন্য তৈরী থাকতে হবে। কোন কাজেই ভীত হবেন না। ধীর, স্থির ও কর্তব্যে অটল থাকতে হবে। সফলতায় বিফলতায়, জয়ে পরাজয়ে, কিছুতেই চিত্ত-চাঞ্চল্য বা বুদ্ধিভ্রংশ হতে পারবেন না।"

আমার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সম্মতি পেয়ে নরেনবাবু আমাকে একটা ডাকাতিতে যাওয়ার কথা জানালে আমি আমার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে দিলাম।

এই ডাকাতি সংঘটিত হয় ১৯১১ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী। আমি, বিমলা গাঙ্গুলী (পরে তিনি কিছুকাল কলেজে প্রফেসরি করে ১৯২০ সনে কংগ্রেসের কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন), বাণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে তিনি রাজশাহী গভর্ণমেণ্ট কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক হয়েছিলেন) আমরা এই ক'জন রাত এগারটার পর নারায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে গোয়ালন্দ মিক্‌সড ষ্টিমারে (Mixed steamer) তৃতীয়শ্রেণীর ডেকে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে শুয়ে পড়লাম। ঢাকা থেকে আরও কয়েকজন এসেছিল। রাজাবাড়ী ষ্টেশন থেকে উঠলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, রবীন্দ্র সেন, অমৃত সরকার ও কলকাতা থেকে অমৃত হাজরা প্রভৃতি কয়জন।

পরে আমরা তারপাশা ষ্টেশন থেকে ষ্টিমার বদল করে চাঁদপুরগামী ষ্টিমারে উঠে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত সুরেশ্বর ষ্টেশনে নামলাম। তখন বেলা পড়ে আসছে। আমরা হেঁটে ঘড়িসার হয়ে ঘুরে ফিরে এক মাঠের ভিতরের রাস্তায় পৌঁছলাম। চলতে চলতে ত্রৈলোক্যবাবু গান ধরলেন—"নিশি অবসান প্রায়, আর কত দেরী, প্রাণ যে সহে না।" সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে নিকটবর্তী জঙ্গল থেকে এক ব্যক্তি একটা শব্দ করে এসে আমাদের সকলকে এক জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার স্থানে বসাল। আরও লোক সেখানে আগে থেকেই জমায়েত ছিল।

যথাসময়ে আমরা অভিযানে চললাম। অপরপক্ষের প্রবল বাধা এবং অন্যান্য নানা বিপদের মধ্যেও নির্দিষ্ট কর্ম সমাধা করে আমরা যে যার গন্তব্যস্থানে ফিরে গেলাম। বাড়ী ফিরে গিয়ে খবরের কাগজে দেখলাম, যে গ্রামে ডাকাতি হয়েছে তার নাম পণ্ডিতসার।

এই কার্যের পরিচালনার ভার ছিল ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর উপর। ত্রৈলোক্যবাবুর নিজের দায়িত্ব ও পরিচালনায় ইহাই প্রথম সশস্ত্র অভিযান। এই কার্যের পরই সকলের মনে প্রত্যয় জন্মিল যে, ত্রৈলোক্যবাবুর নেতৃত্বে এমনি অভিযানে সাফল্য অর্জন করা যায়। নরেনবাবু উপস্থিত না থাকলেও চলে। তাঁকে ছাড়াও কাজ চলতে পারে এমনি পরীক্ষা করবার জন্যও নরেনবাবু ইচ্ছাপূর্বক এ কার্যে অনুপস্থিত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। নরেনবাবু সমিতির নেতৃত্ব এমনি ভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন যার ফলে সমিতির গঠন সংক্রান্ত কাজকর্মের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয় আর সশস্ত্র কার্যের দায়িত্ব অর্পিত হয় ত্রৈলোক্যবাবুর উপর। কর্মক্ষমতা, দক্ষতা, দৃঢ়সঙ্কল্প এবং ধৈর্যে ত্রৈলোক্যবাবুর উপর সশস্ত্র কার্যে আস্থা স্বতঃই সকলের মনে স্থান পেয়েছিল। সংক্ষেপে বলতে গেলে, তার মধ্যে আদর্শ বিপ্লবী চরিত্রের সমস্ত গুণরাশি এমন ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল যে, তিনি অনুশীলন-সমিতির এক অমূল্য সম্পদরূপে পরিগণিত হলেন।

পরবর্তী যুগে অনেক সশস্ত্র কার্য দেশে সংঘটিত হয়েছে। অনেক চমকপ্রদ ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় তখনকার দেশের জনসাধারণের অবস্থা এবং কর্মীসাধারণের মনোবিকাশ বিবেচনা করলে বোঝা যাবে, সে সময় এসমস্ত সশস্ত্র কার্যে সফলতা অর্জনের দ্বারা কর্মীগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জন্মানো কত কঠিন কাজ ছিল। ত্রৈলোক্যবাবুর নেতৃত্বে ডাকাতি এবং প্রাণদণ্ড দেওয়ার কাজ ক্রমাগত সাফল্যমণ্ডিত হতে লাগল।

পণ্ডিতসার ডাকাতির কিছুদিনের মধ্যেই বিক্রমপুরের অন্তর্গত গাওদিয়া গ্রামে ডাকাতি সংঘটিত হয়। পরিচালক ছিলেন ত্রৈলোক্যবাবু। অংশ গ্রহণকারীর মধ্যে

ছিলাম আমি এবং আরও অনেকে যাদের মধ্যে আছেন —সতীশ দাশ গুপ্ত, রমেশ আচার্য, বীরেন চ্যাটার্জি, দীগেন মুখুটি, শশধর দত্ত, অমৃত হাজরা, নগেন সরকার, বিমলা গাঙ্গুলী, নলিনী মুখার্জি (পরে তিনি বৃন্দাবনের প্রেম মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছিলেন। সমিতির কাজেই তিনি বৃন্দাবনে ছিলেন), এবং উৎপল সরকার (তিনি পরে সরকারী কৃষি বিভাগের অফিসার হন)।

ষ্টিমার থেকে তারপাশা ষ্টেশনে নেমে নৌকোয় ধানকুনির খাল দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে বাকী পথ পদব্রজে যাই। খালের মুখে জলপুলিশ আমাদের নৌকো থামিয়ে—অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে। কিন্তু বীরেন চ্যাটার্জির সহজ ও স্বাভাবিক গাম্ভীর্যপূর্ণ কথায় পুলিশ কোন সন্দেহ করতে পারে নি—যদিও আমাদের সঙ্গে কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং লোহার সিন্দুক ভাঙ্গার যন্ত্রপাতি ছিল।

আমরা যখন গ্রামের কাছে এসে নামলাম তখন রাত হয়ে গিয়েছে। নিকটেই এক বিশাল মাঠের মাঝখানে দণ্ডায়মান এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের নীচে এসে মিলিত হলাম আরও অনেকের সঙ্গে, যারা বিভিন্ন স্থান থেকে এসেছে। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী কে কোন কাজ করবে, কে কোথায় দাঁড়াবে তা সকলকে জানিয়ে দেওয়ার পর তদনুযায়ী লাইনবদ্ধ হয়ে আমরা কার্যে অগ্রসর হলাম।

এই ডাকাতিতে একটা ঘটনা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। যে ঘরে লোহার সিন্দুক ছিল বিভলবার হস্তে সে ঘরের প্রহরায় নিযুক্ত ছিলাম আমি। সেই ঘরে ছিল এক বৃদ্ধ এবং যুবতী স্ত্রী—বোধ হয় বাড়ির মালিক এবং তার পুত্রবধূ। বলামাত্র মহিলাটি তাঁর দেহের প্রচুর স্বর্ণালঙ্কার একে একে খুলে দিলেন। থেকে গেল কাণের দুটি গহনা। আমাদের মধ্যে একজন তা হাত দিয়ে দেখিয়ে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন সিনিয়র সভ্য তাকে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করলেন এবং আমরা সকলেই তাকে ধমক দিলাম। কারণ মহিলাদের অঙ্গ স্পর্শ করা সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। গায়ে হাত দিয়ে জোর করে নেওয়া অপরাধ বলে গণ্য হ'ত। বাড়ির লোক বা মহিলা কারুর উপরই অত্যাচার নিষেধ ছিল। শুধু অনুরোধ এবং ভয় দেখিয়ে যতটা সম্ভব হ'ত।

ঘরে একটা মাটির প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছিল। একটা হারিকেন আলো দেখিয়ে ওটা জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম বৃদ্ধকে। সে ত ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। কিছুতেই আর জ্বালিয়ে উঠতে পারছে না। তখন মহিলাটি আমাদের দিকে ভালভাবে একবার তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন—"বাবা, দিন আমি আলোটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি। আপনি কিছু ভয় করবেন না। এরা সে ডাকাত নয়। আমাদের কোন ভয়ের কারণ নেই।" যুবতীর সেই দৃপ্ত ভঙ্গি আজও চোখে ভাসে। আমাদের সকলের মুখেই মুখোস ছিল।

কার্য শেষ হওয়ার পর আমরা হেঁটে সোনারং ন্যাশনাল স্কুল বোর্ডিংয়ে এলাম। রমেশ আচার্য তখন স্কুলের পরিচালক ও প্রধান শিক্ষক। তিনিও যে ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

এর পরের ডাকাতি সংঘটিত হয় নোয়াখালির চৌপল্লী গ্রামে। দত্তপাড়ার দেওয়ানজীর বাড়িতে ডাকাতির কথা ছিল। বাড়ি খুব বড় এবং প্রহরীর সংখ্যাও অধিক। সুতরাং প্রবল বাধার আশঙ্কা করে আমাকেও যেতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল—যদিও পূর্বে আমার যাওয়ার কথা ছিল না। একে ত আমার কলেজের পরীক্ষা অতি সন্নিকটে (যার জন্য সঙ্গে পাঠ্য পুস্তকও নিয়েছিলাম) তদুপরি প্রয়োজন ছিল এমন একজন সাহসী বুদ্ধিমান সভ্য যে বন্দুক চালনায় সমর্থ। আমি তৎপূর্বে কখনও বন্দুক চালাই নি, কার্টুজ খোলা, ভরা, কিছুই করিনি। সবাই বলল, একবার দেখে নিলেই চলবে। শেষ পর্যন্ত ঢাকাতে মনোরঞ্জনবাবুর বাসায় দোতলায় গুলি ভরা, খোলা, চালনা ইত্যাদি কিছুক্ষণ শিখে নিলাম। আর এই বিদ্যা নিয়েই চললাম দায়িত্ব পূর্ণ কাজে।

নোয়াখালীর অন্তর্গত দেবপাড়ার ঠাকুরবাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম রাত্রিতে। সেখানে পরের দিবাভাগ কাটিয়ে সন্ধ্যার পর ডাকাতির জন্য বার হতে হবে। ঠাকুরবাড়ির বড়ঠাকুর সারদা চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন সমিতির সভ্য। ঠাকুরবাড়ি আবার আমার মাতুল বংশেরও আত্মীয়। মুস্কিল হ'ল যে, আমার এক সম্পর্কে মামাত ভাই তখন ঠাকুরবাড়ির টোলে পড়ত। আমার অবস্থান সম্পূর্ণ গোপন রাখবার জন্য সারাদিন এক ঘরে আবদ্ধ থাকলাম। সন্ধ্যার পর শুনতে পেলাম যে, দত্তপাড়ার দেওয়ানজী বাড়ির পুরোহিত বংশের যে ছেলেটি আমাদের পথপ্রদর্শক ও সংবাদদাতা হয়েছিল সে গা ঢাকা দিয়েছে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন আর কি করা যায়। একেবারে ফিরে না গিয়ে চৌপল্লী গ্রামে গিয়ে ডাকাতি করলাম। ক্রমশঃ

রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী

প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী ॥ পূর্বানুবৃত্তি

শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীপার্থ বসু

এই সূচীতে উল্লিখিত রচনাগুলি পরে রবীন্দ্রনাথের কোন্ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, রচনার নামোল্লেখের পর তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেগুলি এখনও রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেগুলি 'অপ্রকাশিত' বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের যতগুলি গানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সবই গীতবিতান তিন খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে: সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের নির্দেশ স্বতন্ত্র দেওয়া হইল না; গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। ছোটগল্পগুলির অধিকাংশ গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত, তাহারও গ্রন্থাকারে প্রকাশ-নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। অধিকাংশ স্বরলিপিও স্বরবিতানে সংকলিত হইয়াছে।

এইরূপ তালিকায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া যাইবার প্রভূত সম্ভাবনা; কেহ যদি কোনো ভ্রম লক্ষ্য করেন তবে তাহা সংকলয়িতাদের গোচরীভূত করিলে তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন।

১৩২৯

বৈশাখ

মুক্তধারা। সম্পূর্ণ নাটকটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত।
পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

জ্যৈষ্ঠ

পুনরাবৃত্তি
লিপিকা

আষাঢ়

ঘাস। 'কখন বাদল-ছোঁওয়া লেগে'
গান

বর্ষা-প্রাতে। 'আজ বর্ষারাতের শেষে'
গান

প্রাণশক্তির রসস্রোত
নব্যভারত, ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ হইতে পুনর্মুদ্রিত
অপ্রকাশিত

শ্রাবণ

আসা-যাওয়ার মাঝখানে। ১৮ আষাঢ় ১৩২৯
গান

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
পূরবী

ভাদ্র

ভাসে। 'জলে ডোবা চিকণ শ্যামল'। ৩১ আষাঢ়
আত্রাই নদী
গান

গোপনবাসী। 'কান পেতে রই'
গান

গান। 'বহুযুগের ওপার থেকে'
অলকা, আষাঢ় [১৩২৯] হইতে পুনর্মুদ্রিত

গান। 'আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে'
'বুধবার' পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত

বিদ্যাসাগর
কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাসাগর স্মরণসভায় বক্তৃতা। ১৭ শ্রাবণ ১৩২৯
বিদ্যাসাগরচরিত, ১৩৬৫ সংস্করণ

আশ্বিন

বৃষ্টি-রৌদ্র
সন্দেশ, ভাদ্র [১৩২৯] হইতে পুনর্মুদ্রিত

কার্তিক

শেলি
অভিভাষণ
ভারতী আশ্বিন [১৩২৯] হইতে পুনর্মুদ্রিত।

অপ্রকাশিত
গান। 'সেদিন আমায় বলেছিলে'
ভারতী, আশ্বিন [১৩২৯] হইতে পুনর্মুদ্রিত
খেলা। 'কোন্ খেলা যে খেলব কখন'
গান। বিজলী হইতে পুনর্মুদ্রিত
অগ্রহায়ণ
গান। 'এল যে শীতের বেলা'
ভারতী, কার্তিক [১৩২৯] হইতে পুনর্মুদ্রিত
ফাল্গুন
প্রথম আলোর চরণধ্বনি। ১০ পৌষ ১৩২৯
গান
চৈত্র
গান। 'তোর গোপন প্রাণে একলা মানুষ যে'
প্রবর্তক, মাঘ ১৩২৯ হইতে পুনর্মুদ্রিত

১৩৩০

জ্যৈষ্ঠ
দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
গান
বিদায়। 'ভরা থাক্ স্মৃতিসুধায়'
গান
পাখী ও চাঁপা। 'পাখী বলে চাঁপা'
গান
শ্রাবণ
সংহতি
সংহতি, জ্যৈষ্ঠ [১৩৩০] হইতে পুনর্মুদ্রিত
অপ্রকাশিত
ভাদ্র
গান। 'পুব হাওয়াতে দেয় দোলা'
গান। 'পথিক মেঘের দল জোটে ঐ'
প্রাচী
প্রাচী, আষাঢ় [১৩৩০] হইতে পুনর্মুদ্রিত
রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, 'পরিশেষ'-এর সংযোজন। স্বতন্ত্র পরিশেষ (১৩৫০ ও পরবর্তী সংস্করণ) গ্রন্থেও মুদ্রিত
আশ্বিন
নূতন গান। 'ভেবেছিলেম আসবে ফিরে'
প্রাচী, শ্রাবণ [১৩৩০] হইতে পুনর্মুদ্রিত
কার্তিক
গান
১ 'আমার আঁধার ভাল'
২ 'কোন্ ভীরুকে ভয় দেখাবি'
উপাসনা, ভাদ্র [১৩৩০] হইতে পুনর্মুদ্রিত

গান। 'আকাশতলে দলে দলে'
প্রাচী, ভাদ্র [১৩৩০] হইতে পুনর্মুদ্রিত
অগ্রহায়ণ
সমস্যা
কালান্তর
সমাধান
কালান্তর
উইলিয়াম্ পিয়ার্সন
অপ্রকাশিত
অগ্রহায়ণ
রাখী। 'তোমার হাতের রাখীখানি'
গান। প্রাচী আশ্বিন [১৩৩০] হইতে পুনর্মুদ্রিত
কৈফিয়ৎ
প্রবন্ধ। বিজলী, ২০ আশ্বিন ১৩৩০ হইতে পুনর্মুদ্রিত। যাত্রী গ্রন্থের "পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারির" ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ তারিখ-চিহ্নিত রচনার প্রধান অংশ ("কবি হোন··· ···বেলা বয়ে না যায়।") রূপে গ্রন্থান্তর্ভুক্ত।
রথযাত্রা
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২, 'কালের যাত্রা'র পরিশিষ্ট
বিশ্বভারতী নারীবিভাগ
পত্র, বিবিধ প্রসঙ্গে (পৃ ২৬৬) মুদ্রিত। অপ্রকাশিত
ফাল্গুন
"যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি"
প্রবাসীর ক্রোড়পত্র
পূরবী, 'তপোভঙ্গ'
চৈত্র
"মাঘের বুকে সকৌতুকে কে আজি এল ?"
পূরবী, 'আগমনী'
গান [ও স্বরলিপি]। 'দিনশেষের রাঙা মুকুল'
স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩৩১

বৈশাখ
লীলাসঙ্গিনী
পূরবী
জ্যৈষ্ঠ
বকুল-বনের পাখী
পূরবী
গান। 'যখন এসেছিলে অন্ধকারে'
প্রাচী, ফাল্গুন ১৩৩০ হইতে পুনর্মুদ্রিত
বর্ষশেষ
গান। 'রজনীর শেষ তারা'

তরুণ, চৈত্র ১৩৩০ হইতে পুনর্মুদ্রিত

সাহিত্যের মূলতত্ত্ব

পরিচারিকা, ফাল্গুন ১৩৩০ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার (১ মার্চ) অনুলিপি।

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে 'সাহিত্য' নামে এই বক্তৃতার স্বতন্ত্র লিপি মুদ্রিত—এই পাঠ বঙ্গবাণীতে (১৩৩১ বৈশাখ) প্রকাশিত হইয়াছিল।

সাহিত্যের রসতত্ত্ব

পরিচারিকা, ফাল্গুন ১৩৩০ হইতে পুনর্মুদ্রিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার (২ মার্চ) অনুলিপি

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে 'তথ্য ও সত্য' নামে এই বক্তৃতার স্বতন্ত্র লিপি মুদ্রিত। এই পাঠ বঙ্গবাণীতে (১৩৩১ ভাদ্র) প্রকাশিত হইয়াছিল।

চীনে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের ১ বৈশাখ [১৩৩১] তারিখের চিঠি। বিবিধ প্রসঙ্গে (পৃ ২৮৫) মুদ্রিত।

অপ্রকাশিত

আষাঢ়

বেঠিক পথের পথিক

পূরবী

সাহিত্য

পল্লীশ্রী, বৈশাখ ১৩৩১ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার (২০ ফাল্গুন ১৩৩০) অনুলিপি।

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থে 'সৃষ্টি' নামে এই বক্তৃতার স্বতন্ত্র লিপি মুদ্রিত—এই পাঠ বঙ্গবাণীতে (১৩৩১ কার্তিক) প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভাদ্র

বধূমঙ্গল

গান। 'ওগো বধূ সুন্দরী'

'শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত "সাতভাই চম্পা" নামক চিত্র-সহযোগে পরিণয়-উপহাররূপে রচিত। চিত্রটি বিশ্বভারতী পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫২ সংখ্যায় পরে মুদ্রিত হয়।

গান। 'নাই যদি বা এলে তুমি'

আশ্বিন

রক্তকরবী

সম্পূর্ণ নাটকটি সংখ্যারম্ভের পূর্বে স্বতন্ত্র ক্রোড়-পত্রের ন্যায় মুদ্রিত। পরে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

কার্তিক

যাত্রার পূর্ব্বকথা

দক্ষিণ আমেরিকা যাইবার পূর্বে শান্তিনিকেতনে কথিত। ১৭ই ভাদ্র ১৩৩১

বিশ্বভারতী, ১১ সংখ্যক প্রবন্ধ

চীন ও জাপানে ভ্রমণবিবরণ

পূর্ব এসিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে বক্তৃতা। ৭ শ্রাবণ [১৩৩১]

অপ্রকাশিত

অগ্রহায়ণ

দক্ষিণ-আমেরিকা যাত্রার পূর্বদিন

শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত। ১৮ ভাদ্র ১৩৩১

অপ্রকাশিত

পূর্ণতা

পূরবী

যাত্রারম্ভ

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ২৪-২৯ সেপ্টেম্বর ১৯২৪

যাত্রী

[সাবিত্রী] পৃ ২০:

পূরবী

"উপায়" পত্রিকার প্রস্তাবনা

উপায়, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৩১ হইতে পুনর্মুদ্রিত

অপ্রকাশিত

ভূমিলক্ষ্মী

ভূমিলক্ষ্মী নবপর্যায় প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, 'বিবিধ প্রসঙ্গে' (পৃ ২৮০) উদ্ধৃত।

পৌষ

আহবান

পূরবী

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ৩০ সেপ্টেম্বর-২ অক্টোবর ১৯২৪

যাত্রী

ছবি

পূরবী

গান [ও স্বরলিপি] 'গানের ঝরণাতলায়'

স্বরলিপি শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

মাঘ

পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ৩-৭ অক্টোবর ১৯২৪

যাত্রী

লিপি

পূরবী

[**ক্ষণিকা**] পৃ ৪৩৬
পূরবী
খেলা
পূরবী
ফাল্গুন
ভাবীকাল
পূরবী
অপরিচিতা
পূরবী
[**গান ও স্বরলিপি**] পৃ ৬৩৫
'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার'
স্বরলিপি শ্রীসাহানা দেবী
আন্‌মনা
বিচিত্রা ১৮ মাঘ ১৩৩১ হইতে পুনর্মুদ্রিত
পূরবী গ্রন্থে ইহার পাঠান্তর মুদ্রিত।
চিঠি
পূরবী
চৈত্র
ঝড়
পূরবী
আক্রন্দ
পূরবী
কঙ্কাল
পূরবী

১৩৩২
বৈশাখ
পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩
ফেব্রুয়ারি ১৯২৫
যাত্রী
পরে পূরবীর অন্তর্ভুক্ত নিম্নলিখিত কবিতাগুলি প্রবাসীতে এই ডায়ারিতে মুদ্রিত—
[**না-পাওয়া**] পৃ ৬
প্রবাসীতে প্রকাশিত কবিতাটির পাঠ পূরবীতে মুদ্রিত কবিতার পাঠ হইতে স্বতন্ত্র।
[**আন্‌মনা**] পৃ ৯
[**মধু**] পৃ ১০
[**আশা**] পৃ ১৩
[**অন্ধকার**] পৃ ১৫
[**বনস্পতি**] পৃ ২০
এই সংখ্যায় ডায়ারির অন্তর্গত (পৃ ৩) অপর একটি কবিত 'যাত্রী' গ্রন্থে 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি'র অন্তর্গত আছে; পরে '**লক্ষ্যশূন্য**' নামে পঞ্চদশ খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের সংযোজন-রূপেও মুদ্রিত।
রক্তকরবী
অভিভাষণ
রক্তকরবীর প্রথম সংস্করণে 'প্রস্তাবনা' রূপে মুদ্রিত, বর্তমানে 'গ্রন্থপরিচয়'ভুক্ত।
গান। স্বরলিপি
'তোমায় চেয়ে আছি বসে', ৬ ফাল্গুন ১৩৩০
স্বরলিপি শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার
গান। স্বরলিপি
'আজ কি তাহার বারতা পেল রে'
স্বরলিপি শ্রীঅরুন্ধতী দেবী
জ্যৈষ্ঠ
পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ১৫ ও ১৪ [১-২]
ফেব্রুয়ারি ১৯২৫
যাত্রী
প্রবাহিনী
পূরবী
প্রাণ-গঙ্গা
পূরবী
সৃষ্টিকর্ত্তা
পূরবী
মুক্তি
পূরবী
তৃতীয়া
পূরবী
ফোটোগ্রাফের উত্তরে
পূরবী, বিরহিণী
বিশ্বদুঃখ
পূরবী, 'ঝড়' কবিতার সূচনাংশ
মৃত্যুর আহ্বান
পূরবী
দুঃখসম্পদ
পূরবী
বেদনার লীলা
পূরবী
[**গান**]। 'মরুবিজয়ের কেতন উড়াও'

বিবিধ প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব' প্রসঙ্গে মুদ্রিত "নূতন গান"

আষাঢ়

একখানি চিঠি। "এখন আমরা যাকে সায়ান্স বলি"

শ্রাবণ

ভারতবর্ষীয় বিবাহ

সমাজ, চৈত্র ১৩৪৪ সংস্করণ

আনন্দলহরী

"এনেছিলে সাথে করে"

এই কবিতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একটি চিত্রের সহিত স্বতন্ত্র মুদ্রিত হয়। এই কবিতা ও চিত্র এই সময়ে অন্য অনেক পত্রিকাতেও মুদ্রিত হইয়াছিল।

অপ্রকাশিত

ভাদ্র

মরমিয়া

ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের দাদূ গ্রন্থের ভূমিকারূপে লিখিত

অপ্রকাশিত। দাদূ গ্রন্থে প্রকাশিত।

আশ্বিন

গৃহপ্রবেশ। সম্পূর্ণ নাটকটি এই সংখ্যায় মুদ্রিত। পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

অরূপ রতনের গানের স্বরলিপি

১ তোমার প্রেমে হব সবার

২ এখনো গেল না আঁধার

স্বরলিপি শ্রীসাহানা দেবী

কার্তিক

চিঠি

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত

[১] "তোমার রাখী সাদরে দক্ষিণ হস্তে।" ২ কার্তিক ১৩১৬

[২] "তোমাকেই চিঠি লিখব বলে।" ১৬ কার্তিক ১৩১৬

[৩] "আমার লেখা সম্বন্ধে কিছু না লিখলেই ভাল করতে।" ২৯ ভাদ্র ১৩১৭

[৪] "আমি এখানে একটা লেখাতে হাত দিয়েছি।" [৩ নবেম্বর ১৯১০]

[৫] "কিছুদিন পূর্বে।" ২৬ ফাল্গুন ১৩১৭

[৬] "বাঃ তুমি ত বেশ লোক।" [১৬ মে ১৯১১]

[৭] আমার জীবনের প্রতি দাবি করে।" ৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮

অপ্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথ ও রম‍্যাঁ রলাঁ

রম‍্যাঁ রলাঁর ষষ্টিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ। উক্ত প্রবন্ধটি রলাঁ-অভিনন্দনগ্রন্থ "Liber Amicorum Romain Rolland" হইতে বিশ্বভারতী-প্রকাশিত "Rolland and Tagore" গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ

নামঞ্জুর গল্প

ছোটগল্প

চিঠি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

[৮] "শেষকালে নাটকটা" [১৪ জুলাই ১৯১১]

[৯] "তোমার চিঠি পেয়ে খুসি হলুম।" [৭ আগষ্ট ১৯১২]

[১০] "বারম্বার আমার সম্মান-সম্বর্ধনার কথা" [১৩ সেপ্টেম্বর ১৯১২]

[১১] "চারু আসল কথা আমার আদবে আর লিখতে ইচ্ছা করে না।" ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ (২১)

[১২] "চারু, অনেক দিন পর তোমার চিঠি পেলুম।"

[১৩] "তুমি চেয়েছ তাই পাঠাচ্ছি।" [৫ মার্চ ১৯১৪]

শূদ্রধর্ম

কালান্তর

"গড্ডলিকা"

পরশুরাম-রচিত গড্ডলিকা গ্রন্থের আলোচনা।

অপ্রকাশিত

পৌষ

চিঠি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

[১৪] "চারু দুটো নূতন কবিতা।" ২৩ মাঘ ১৩২১

[১৫] "চারু, ক্ষিতিমোহনবাবুকে মোক্তার করে" [৭ এপ্রিল ১৯১৭]

[১৬] "কবিকঙ্কণ এবং অন্নদামঙ্গল" [১৭ মে ১৯১৯]

[১৭] "শোনা গেল, জগদানন্দ।" ১১ অগ্রহায়ণ ১৩২৬

---

(২১) চিঠিখানির পরবর্তী একটি অংশ—

"...প্রবাসীর সঙ্গে আমার লেখনীর একটা যোগ সাধন হয়ে গেছে এবং তার প্রতি আমার অন্তরের স্নেহ আছে—সেই মমতাবন্ধনে হয়তো আবার কোন্ দিন জড়িয়ে পড়ব, কিন্তু মুক্তি লাভের জন্যেই চেষ্টা করতে হবে। আমার হাটের বেসাতি হয়ে গেছে বোধ হচ্ছে যেন—এবার ভিড় ঠেলাঠেলি এবং লাভ-লোকসানের হিসাব চুকিয়ে বুকিয়ে দিয়ে ঘরের মুখে রওনা হতে হবে—নইলে রাত্রি এসে পড়বে—আর পথ দেখতে পাব না।..."

এই চিঠিতে যাহাই লিখিয়া থাকুক, "মমতাবন্ধন" হইতে যে রবীন্দ্রনাথ ইহজীবনে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই, এই তালিকার অবশিষ্টাংশ তাহারই নিদর্শন।

[১৮] "গল্প লেখবার মতো।" ২২ ফাল্গুন ১৩২৬
[১৯] "চারু, ছুটিতেও কি তোমায় দেখা।" [১০ মে ১৯২৫]
[২০] "আমার ব্যাকরণ এবং বড়দাদার গীতাপাঠ।"
[২১] প্রবাসীর জন্য রেজেষ্ট্রিডাকে

অপ্রকাশিত

মাঘ

গান। 'ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর'

ভারতবর্ষীয় দার্শনিক সঙ্ঘের সভাপতির অভিভাষণ

ইংরেজি অভিভাষণের অনুবাদ। অপ্রকাশিত

যেতে যদি হয়। গান। 'যাবো যাবো যাবো তবে'

ভারতী বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৩২ হইতে উদ্ধৃত

ফাল্গুন

জলের রাণী

গান। 'ওগো জলের রাণি'

ভারতী কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩৩২ হইতে উদ্ধৃত

শুভ ইচ্ছা

৭ পৌষ ১৩৩২ শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপদেশের অনুলিখন

অপ্রকাশিত

চৈত্র

[গ্রামে শিল্প-শিক্ষা প্রবর্ত্তন]

পত্র। দেশবিদেশের কথা বিভাগে (পৃ ৮৭১) মুদ্রিত

অপ্রকাশিত

[কুমিল্লা অভয়াশ্রমে অভিভাষণ]

দেশ-বিদেশের কথা বিভাগে মুদ্রিত। পৃ ৮৭৪

অপ্রকাশিত

১ ঢাকা ম্যুনিসিপালিটির অভিনন্দনের উত্তরে
২ ঢাকা করোনেশন পার্কে অভিনন্দনের উত্তরে
[৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬]

অপ্রকাশিত [ক্রমশঃ

ঢেউ

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

মোটা লাল পেন্সিলটা আঁকড়ে ধরে মালতী সেন খস খস করে খাতার ওপরে কয়েকটা আঁচড় কাটল। স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে রচনায় শতকরা ষাট জন মেয়ে যোগ দিয়েছে চাকরি-বাকরির ব্যাপারে। শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন অর্থোপার্জন। শিক্ষার আর নিজস্ব কোন গুণ নেই।

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে মালতী যেন কিছুক্ষণ বিড় বিড় করল। কাল ক্লাসে গিয়ে ভাল করে বোঝাতে হবে বিষয়টা। আর বুঝিয়েই বা কি হবে। বৃথাই শুধু চীৎকার করে মরবে মালতী। এক বর্ণও মেয়েদের মাথায় ঢুকবে না। লেখাপড়ায় আজকাল কারও মন আছে নাকি, যে কান দেবে তার কথায়! অধ্যয়ন তপস্যা। শুদ্ধচিত্তে, একাগ্রমনে শুনতে হয়। গ্রহণ করার মন নিয়ে বসতে হয় ক্লাসে।

মেয়েদের মন যে কোথায় থাকে তাও অজানা নয় মালতীর। পড়ার বইয়ের তলায় নিষিদ্ধ বই রেখে নিবিষ্টচিত্তে পড়ে যাচ্ছে, ঠিক ধরে ফেলেছে মালতী সেন। ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঘের মতন। নিতান্ত ফার্স্ট ক্লাসের মেয়ে, তাই আর গায়ে হাত তুলতে পারে নি। কিন্তু ঝাড়া আধ ঘণ্টা বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলেছে। ভীত লোমকূপে বিষাক্ত তীরের ফলার স্পর্শের মতন। মেয়েটি চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে দাঁড়িয়ে।

সারা ক্লাসে মালতী সেনের নামই ছিল মালতী-বাঘিনী। অবশ্য এ নামকরণ চালু ছিল শুধু ছাত্রীদের মধ্যে। মাঝে মাঝে অসতর্ক ঠোঁট থেকে এ নাম মালতী সেনের কানেও পৌঁছেছে। কান থেকে মরমে। বলা বাহুল্য মধু বর্ষণ করে নি। কিন্তু হাতে-নাতে ধরতে না পারলে কিছু করবার উপায় নেই, এই আপশোস অন্তরে চেপে মালতী সেন সারা ক্লাসের ওপর কড়া নজর রেখেছিল।

সজনে গাছের মতন দীঘল চেহারা। লাবণ্যের বালাই নেই। চোখে কড়া পাওয়ারের চশমা, টান করে চুলগুলো বাঁধা। রং হয়ত একসময়ে গৌর ছিল, এখন তামাটে। বেশ বোঝা যায় এ দেহ নিয়ে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সবই আবর্তিত হয়েছে, কেবল বসন্ত ছাড়া।

এ সব অবশ্য ছাত্রীদের কথা। স্কুল কম্পাউণ্ডের বুড়ো বটগাছটার মতন। বিশেষ একটা বয়সের পরে মালতী সেন আর একটি পাও এগোয় নি। দিনের পর দিন একই নীরস কাঠামো, একই তিক্ত মন।

প্রগলভা মেয়েরা অন্য কথাও বলে। দোষ মালতী সেনের নয়, তার মায়ের। জন্মের সময় মধুর বদলে নিম ঠোঁটে ঠেকানোতেই এই বিপত্তি। জের চলেছে নিরীহ ছাত্রীদের ওপর। তিক্ত নিমের সঙ্গে বয়সের তিক্ততা মিশে সবকিছু আরও বিস্বাদ করে তুলেছে।

সহশিক্ষিকারাও মালতী সেনকে এড়িয়ে চলে। লঘু পরিহাস ত দূরের কথা, কোনদিন মন খুলে তাকে কেউ হাসতেও দেখে নি। প্রয়োজন ছাড়া কথাও বলে না, এবং সে প্রয়োজনও লেখাপড়াকে কেন্দ্র করে।

এ সব মালতী সেন জানে। জানে বলেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে শামুকের মতন। বিদ্রূপ, পরিহাস, বক্রোক্তি সবকিছু তার নিস্পৃহতার খোলসে লেগে ভোঁতা হয়ে যায়। ঠুলি বাঁধা ঘোড়ার মতন দিনের পর দিন মালতী সেন বাঁধানো সড়ক ধরে চলে। একটু এদিক-ওদিক নয়।

খাতাগুলো সরিয়ে রেখে মালতী উঠে দাঁড়াল। কোণে রাখা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল এক গ্লাস, তার পর আবার খাতাগুলো টেনে নিয়ে বসল। মিনিট দশেক। গেট খোলার একটা শব্দ আগেই একটু কানে এসেছিল, মালতী মুখ তোলে নি। এবার মুখ তুলতেই হ'ল।

একেবারে দরজার সামনে একটি তরুণী। বয়স বছর কুড়ি। আঁট-সাঁট গড়ন। শ্যামাঙ্গী। মাথার আঁচল কোমরে জড়ানো। মালতী সেনকে দেখেই একটু থতমত খেয়ে গেল।

চশমাটা চোখের ওপর চেপে ধরে মালতী কঠিন গলায় জিজ্ঞাসা করল, কে? কি চাই এখানে?

তরুণীটি হাসার একটু চেষ্টা করছিল, কিন্তু মালতীর কথার ধরনে হাসি নিভে গেল। আমতা আমতা করে বলল, আমরা পাশের বাড়ীতে এসেছি।

এটা পাশের বাড়ী নয়, আমার বাড়ী। প্রত্যেকটি কথা মালতী সেন চিবিয়ে চিবিয়ে বলল।

তরুণী আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। দ্রুতপায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। বসে বসে জানলা দিয়ে মালতী দেখল, গেটের কাছে সুবেশ একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিল। তরুণী তার কাছে গিয়ে হাত-মুখ নেড়ে কি বলল। ভদ্রলোক আড়চোখে কিছুটা ভয়মেশানো দৃষ্টিতে মালতী সেনের দিকে দেখেই মাথা নিচু করে চলে গেল।

সদর রাস্তায় উঠে তরুণী ভদ্রলোকের একটা হাত আঁকড়ে উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ল।

খাতায় নম্বর দিতে দিতে মালতী চমকে উঠল। অসভ্য, বর্বর। এমন মাত্রাছাড়া হাসি হাসে মানুষে। লোকের কাজ ভুলিয়ে দেয়, হিসাবের গোলমাল করে।

খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে মালতী আবার নতুন করে যোগ দিতে আরম্ভ করল।

রাত্রে খেতে বসে মালতী সেন চমকে উঠল। খিল খিল হাসির শব্দে। বামপিয়ারী প্লেটে তরকারি ঢেলে দিচ্ছিল, মালতীর দিকে চেয়ে হেসে বলল, এতদিনের পোড়ো বাড়ীটায় ভাড়াটে এসেছে দিদিমণি। ভারি আমুদে মানুষ দু'জনে।

বামপিয়ারী আর কথা শেষ করতে পারল না। তীক্ষ্ণ, জ্বলন্ত দু'টি দৃষ্টির সামনে পড়ে থেমে গেল।

খাওয়া শেষ করে রোজকার মতন ইজিচেয়ারে শুতে যাবার মুখেই বাধা। আবার সেই হাসির শব্দ, সেই সঙ্গে দুমদাম আওয়াজ। মালতী ঠিক করল উঠে জানলাটা বন্ধ করে দেবে। দক্ষিণ দিকের জানলা। ফুর-ফুরে বাতাস এই সময় এইদিক দিয়েই আসে। জানলা বন্ধ করে দিলে ঘরে একটু গুমট হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু উপায় নেই। এই মারাত্মক হাসির চেয়ে হাওয়া বন্ধ হওয়া ঢের বেশী কাম্য।

উঠে জানলার পাল্লাটা টানতে গিয়েই মালতী থেমে গেল। একেবারে পাশাপাশি বাংলো। মাঝখানে শুধু একটা শ্বেত করবীর ব্যবধান। ওদিকের জানলা খোলা থাকলে স্পষ্ট সবকিছু দেখা যায়।

জোর বাতি। কোথাও ছিটেফোঁটা অন্ধকার নেই। সারা ঘরে দু'জনে দৌড়াদৌড়ি করছে। ব্যাপার দেখে মনে হ'ল, তরুণীকে তরুণটি ধরার চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে ছুঁতে গিয়ে পারছে না, তাই তরুণীর খিল খিল হাসি।

মালতীর অনেক দিনের দেখা এক দৃশ্য মনে পড়ে গেল। হাজারীবাগের কথা। মোটরে বনভোজনে করতে যাচ্ছিল। কিছু ছাত্রীও সঙ্গে ছিল। মোটরের হর্ণের শব্দে চমকে উঠে এক কুরঙ্গী তীরবেগে ছুটেছিল মোটরের পাশ দিয়ে। তার পর এক সময়ে অরণ্যে আত্মগোপন করেছিল। তরুণীটির চঞ্চল গতির মধ্যে সেই কুরঙ্গীর লালিত্য আর ক্ষিপ্রতা।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল মালতী। চোখ তুলেই লজ্জা পেল। ভদ্রলোকটি তরুণীকে আঁকড়ে ধরে তার খোঁপায় বেলফুলের মালাটা জড়িয়ে দিচ্ছে। আশ্চর্য, তরুণীটির ধরা পড়ার ভঙ্গী দেখে কিন্তু একটিবারের জন্যও মনে হচ্ছে না যে, এই মালা পরানোর ব্যাপারটা এড়াবার জন্যই সে এতক্ষণ ছুটোছুটি করছিল।

জানলাটা বন্ধ না করেই মালতী নিজের জায়গায় ফিরে এল। হাতের বইটা সে বহু কষ্টে জোগাড় করেছিল। আমেরিকায় স্ত্রী-স্বাধীনতার গতিপ্রকৃতি। প্রথম পাতা দশেক খুব ভাল লেগেছিল। কিন্তু আজ তিন-চার পাতা পড়ে যাওয়ার পর খেয়াল হ'ল, পাতার পর পাতা কেবল চোখ বুলিয়েই গেছে, মগজে কিছুই ঢোকে নি। বরং অক্ষরগুলো তালগোল পাকিয়ে কেবল ছুটে বেড়িয়েছে পাতার ওপর। মাঝে মাঝে কালো হরফগুলো চমৎকার এক কবরীর রূপ নিয়েছে।

বিরক্ত হয়ে মালতী উঠে দাঁড়াল।

শোবার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চিরুণী দিয়ে চুলগুলো আঁচড়ে নেয়। চুলের ক'টাই বা অবশিষ্ট আছে! কানের পাশে পাশে রুপোলী ঝিলিক। মাঝে মাঝে মুঠো মুঠো চুল ওঠে। এভাবে চললে আর বছর দুয়েকের মধ্যেই চুল ক'টা শেষ হয়ে যাবে।

আয়নার সামনে বসে মালতী নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। রোজই বসে, কোনরকমে কাজ সেরে উঠে পড়ে। আজ কিন্তু নিজের প্রতিচ্ছবির দিকে নিরীক্ষণ করে ফেলল। কপালে, গালে অজস্র হিজিবিজি রেখা। সময়ের স্বাক্ষর। জ্যোতিহীন, নিষ্প্রভ চোখ। সারা মুখে আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান ছায়া।

শরীর শুধু শরীরের ছলনা। কোথাও লাবণ্যের সামান্য আভাসও নেই।

বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বের হতেই মালতী উঠে পড়ল। রাত হয়েছে। এখন না শুলে, ভোরে উঠতে পারবে না।

শুতে যাবার আগে আর একবার জানলার গরাদে বুক ঠেকিয়ে দাঁড়াল। ওদিকের বাংলো অন্ধকার। চোখ কুঁচকেও কিছু দেখার উপায় নেই। আর হাসির কোন হিল্লোল ভেসে আসছে না। সব নিস্তব্ধ। কেবল

কাঁঠালিচাঁপার মৃদু গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। মাতাল-করা সুবাস।

শোবার ঘরে ঢুকে নীল বাতিটা মালতী জ্বালিয়ে দিল। রামপিয়ারী বিছানা করে রেখেছে। পরিপাটি বিছানা। একজনের।

বাতি জ্বালা থাকলে মালতীর ঘুমের অসুবিধা হয়, কিন্তু আজ ইচ্ছা করেই মালতী বাতিটা জ্বালিয়ে রাখল। পাশাপাশি দুটো বাংলোই অন্ধকারে ডুবে থাকবে এটা ঠিক নয়।

ওপাশের বাসিন্দারা বুঝুক। সারারাত পাহারা দেবার মতন সদাজাগ্রত চোখ এপাশে রয়েছে। হৈ চৈ বেলেল্লাপনা চলবে না। নিজেরা অন্ধকারে মুখ ঢাকলেও নিস্তার নেই।

কথাগুলো ভাবতেও মালতীর অদ্ভুত লাগল। কোথায় কে পড়শী এল, তার জন্য তার এত কি মাথাব্যথা। আজ ছাত্রীদের আরো কয়েকটা খাতা দেখে রাখা উচিত ছিল। বইটা অর্ধেকের বেশী শেষ হয়ে যেত। কর্তব্যে অবহেলা করেছে মালতী, নিরেট নীরন্ধ্র জীবনযাত্রার মধ্যে তার অলক্ষ্যে বিচ্যুতি প্রবেশ করেছে।

পাতলা চাদরটা আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে মালতী শুয়ে পড়ল। বাইরের পৃথিবীকে ঢাকতে পারলেই যেন অন্তরের সব দৈন্য ঢাকা পড়ে যাবে।

খুব ভোরে ওঠা মালতীর চিরকালের অভ্যাস। সকালে উঠে সামনের ছোট্ট বাগানটায় একটু পায়চারি করে। গাছপালার তদারক। মাঝে মাঝে শান বাঁধানো বকুল গাছের তলায় বই নিয়ে বসে।

সেদিনও তাই করল। বেলফুলের গোড়াগুলো একটু খুঁড়ে দিল। শ্বেত অপরাজিতার লতাটা মাচা ছেড়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল, মালতী সেটাকে ঠিক করে দিল। তারপর বকুলগাছের তলায় বসল। বই নিয়ে নয়। এমনিই।

বসে বসেই দেখল, পাশের বাংলো থেকে তরুণ-তরুণী বের হল। তরুণীর আঁচল মাটিতে লুটাচ্ছে। তরুণটি বারদুয়েক আঁচল তুলে দেবার চেষ্টা করল কিন্তু সফল হ'ল না। তরুণীটি ইচ্ছা করে বেঁকে বেঁকে চলতে শুরু করায় বার বার আঁচল খসে পড়ল।

মালতী মুখ ঘুরিয়ে বসল। এমন নির্লজ্জ দম্পতি সে জীবনে দেখে নি। চক্ষুলজ্জার সামান্য বালাই নেই।

স্পষ্ট দেখতে পেল মালতী, পাশের রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে তরুণীটি ভদ্রলোকের হাতে চিমটি কেটে বকুল-তলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। ভদ্রলোক একবার দেখে মুখ টিপে হাসল। ব্যস, ওই পর্যন্ত। দু'জনের কেউ আর মালতীর দিকে ফিরেও দেখল না। একমনে গল্প করতে করতে এগিয়ে গেল। শুধু কি গল্প? মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ।

আশ্চর্য লাগল মালতীর। মানুষ এত হাসতেও পারে। পৃথিবীতে এত হাসবার মতন ওরা কি এমন পেল।

স্নান-খাওয়া সারার ফাঁকে ফাঁকে মালতী বার দুই-তিন উঁকি দিল। না, ওরা ফেরে নি। সম্ভবতঃ ষ্টেশন ছাড়িয়ে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে, কিংবা এদিকের বনের পাশে ছোট্ট ঝরণার ধারে হয়ত দুজনে বসেছে। এক রাশ নুড়ির ওপর। মেয়েটির সঙ্গে ঝর্ণার কোথায় যেন মিল রয়েছে। দু'জনের অবিকল এক হাসির শব্দ।

স্কুল যাবার পথেও মালতী ফিরে ফিরে দেখল। চড়া রোদ উঠেছে। এই রোদে এত বেলা পর্যন্ত বেড়ায় মানুষে! দুজনেই ছেলেমানুষ। সংসারের ব্যাপারে বোধ হয় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কে ওদের বোঝাবে, জীবন শুধু হাসির ফুলঝুরি নয়। দায়িত্ব, কর্তব্যজ্ঞান, সাধারণ শিষ্টাচার এ-সব না থাকলে অনন্ত কষ্ট পেতে হয় উত্তরকালে।

ক্লাসেও মালতী এই সব কথাই বলল। রচনার পিরিয়ড ছিল। মানুষের ভদ্রতাবোধ সম্বন্ধে মালতী নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিল। ক্লাসের মেয়েদের উপলক্ষ্য করে কথাগুলো বলল বটে, কিন্তু আসল লক্ষ্য ছিল প্রগল্ভ দম্পতি। শিষ্টাচারবর্জিত, ভদ্রতারহিত। যাদের কারণে অকারণে হাসির শব্দ এখনও মালতীর কানে লেগে রয়েছে।

অন্যদিন স্কুলের পরে মালতী লাইব্রেরি-রুমে কিছুক্ষণ কাটায়। নিজে বসে বসে বই পড়ে, কিংবা অন্য মেয়েরা যারা সেখানে থাকে, তাদের সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আজ কিন্তু ছুটির পরে মালতী একটুও অপেক্ষা করল না। প্রায় শেষ ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই পথে পা দিল।

বাড়ীর কাছাকাছি গিয়েই মালতী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভাগ্যে হাতের বইগুলো একটু শক্ত করেই ধরেছিল, নয়ত হাত থেকে ছিটকে সেগুলো পথের নুড়ির ওপরই পড়ে যেত।

রোদের তেজ নেই, তবু মালতী হাতের ছাতাটা খুলে নিজেকে আড়াল করল। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না।

পেয়ারা গাছের নীচু ডালে দোলনা টাঙানো হয়েছে। কাঠের তক্তা আর দড়ি দিয়ে সাময়িক ব্যবস্থা। তরুণাটি মনের আনন্দে দোল খাচ্ছে আর ভদ্রলোকটি ঠেলে দিচ্ছে। যত বার দোলনাটা ওপরের দিকে উঠছে, তরুণীটি খিল খিল হাসিতে ভেঙে পড়ছে।

মালতীর স্কুলের মেয়েরা এ ধরনের বেয়াড়াপনা করলে কি শাস্তি পেত, ভাবতেও মালতীর সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু সকলে তার ছাত্রী নয়, এমন একটা দুঃখ বুকে চেপে রাখা ছাড়া উপায় নেই।

খুব জোরপায়ে মালতী বেড়ার পাশ দিয়ে নিজের ফটকের সামনে এসে দাঁড়াল। ওদের দুজনের কারোরই ভ্রূক্ষেপ নেই। একটা মানুষ নয়, কোন জন্তু কিংবা কাঠপুতুলই বুঝি রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেল। সঙ্কোচ বা সমীহের কোন প্রশ্নই যেন ওঠে না।

একটা শুধু সান্ত্বনা। সম্ভবতঃ এরা স্থায়ী বাসিন্দা নয়। বায়ু-পরিবর্তনের জন্য কয়েকটা দিন থাকবে কিংবা বড় জোর কয়েকটা মাস। তারপর নিশ্চিন্তে মালতী চলা ফেরা করতে পারবে। নিরুপদ্রবে। হাসির বারাণো ফলার বার বার মালতীর মন ক্ষতবিক্ষত হবে না।

হাসির নানা ধরনের মতন আমোদেরও রকমফের আছে।

কোন কোন ভোরবেলাই আবৃত্তি শুরু হয়। দু'জনে কণ্ঠ কণ্ঠে মিলিয়ে। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, মোহিতলাল। হাতের বইটা মুড়ে মালতী চুপচাপ বসে বসে শোনে। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, একেবারে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। কঠিনকণ্ঠে বলে, আবৃত্তি তো খুব করছ, প্রথম পংক্তি দুটোর মানেটা কি বল তো? কবি কোন্ সময়ে কি অবস্থায় লিখেছিলেন কবিতাটা? কবির জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে এর মিল কতটুকু?

ফল কি হবে তাও মালতীর অজানা নয়। ক্লাসের উত্তর দিতে না পারা মেয়েদের মতন সারা মুখ আবির-রাঙা হয়ে উঠবে। ছল ছল দুটি চোখ। আনতমুখে শুধু মাটির দিকে চেয়ে থাকবে। নিঃশেষে শুকিয়ে যাবে হাসির উৎস।

আবার কোনদিন মালতীর চোখে পড়েছে। বাংলোর পাশের বাগানে ইঁট দিয়ে উনান তৈরী হয়েছে। তার ওপর মাটির হাঁড়ি। মেয়েটি আঁচল কোমরে বেঁধে রান্নার কাজে ব্যস্ত। ভদ্রলোক একটা বঁটি নিয়ে বাগানে বসে অনিপুণ হাতে তরকারি কুটছে। আড়চোখে বার বার সেদিকে চেয়ে মেয়েটি হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে।

মালতী বেশ শব্দ করেই জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছে। ওইটুকু তো মেয়ে, কতটুকুই বা শরীর, অথচ বুকের জোর কম নয়। জানলা বন্ধ, তাও ইট, কাঠ ভেদ করে হাসির শব্দ এ বাড়ীতে আসছে। ঝালাপালা করছে মালতীর দুটি কান।

নিজের মনেই মালতী আওড়াতে থাকে। সবস্তুতঃ মা-বাপের অর্থের পরিসীমা নেই। মালতীর মতন সব ছেড়ে, সবাইকে ছেড়ে, এত দূর দেশে, এত কষ্ট করে খাদ্যের দানা সংগ্রহ করবার প্রয়োজন নেই। তাই এত হাসি, এত উচ্ছলতা। শরীর ছাপিয়ে উপচে পড়ছে আনন্দের স্রোত। দুঃখের আঁচে পুড়তে হয় নি কোন-দিন, কোন জ্বালায় জ্বলতে হয় নি।

দিন তিন-চার মালতী নিজের কাজে ডুবে রইল। ছাত্রীদের খাতা দেখা, নিজের পড়াশোনা, সংসারের খুঁটিনাটি। জানলার দিকে পারতপক্ষে এল না। খুললও না জানলার কপাট। তবু হাসির টুকরো ছিটকে এল এপাশে, কিংবা বলা যায় না হাসির স্বরটুকু হয়ত ওর মনেরই সৃষ্টি।

দিন তিন চার পরে ইচ্ছা করেই মালতী জানলাটা খুলে দিল। আর ভয় নেই। মনকে কঠিন করে নিয়েছে। নিস্পৃহতার আবরণ জড়িয়ে একেবারে বৈরাগী। ছোট হাসি, ছোট আনন্দ এসবের ঊর্ধ্বে।

জানলা খুলেই মালতী অবাক্‌। ওপাশের জানলা আধভেজানো। কোন সাড়া শব্দ নেই। মালতী অনেকক্ষণ উঁকিঝুঁকি দিল। কেউ কোথাও নেই। বাড়ী ছেড়ে সব চলেই গেল নাকি? না, তাও ত নয়। বাইরের তারে শাড়ী কাপড় শুকাচ্ছে।

রামপিয়ারীও নেই যে খবরটা নেবে। সে কদিন ছুটিতে গেছে। একদিন সব কাজ মালতীকেই করতে হবে। শুধু স্কুলের ঝি এসে সকাল বিকাল ঝাঁটপাট দিয়ে যায়।

সারা দিন কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে মালতী বেশ একটু অন্যমনস্ক রইল। চলতে, ফিরতে কান পাতল জানলার কাছে। হাসির শব্দ দূরে থাক, কোন আওয়াজই কানে এল না।

খাওয়াদাওয়ার পর একটা পত্রিকা হাতে নিয়ে মালতী বাগানে গিয়ে বসল। এখান থেকে পাশের বাড়ীর ভিতর দিকের কিছুটা দেখা যায়। হাতে পত্রিকা কিন্তু নজর রইল সেই দিকে।

না, কেউ কোথাও নেই। এমনও হতে পারে, বেরিয়েছে দুজনে। কিন্তু এভাবে দরদোর খুলে রেখে কি বাইরে যাবে! ঝি-চাকরের হাতে সর্বস্ব সঁপে দিয়ে!

কি জানি কি মনে হল মালতীর। নিজের বাড়ীর দরজাটা টেনে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। একেবারে পাশের বাড়ীর লোক। সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী। একটু খোঁজ নিতে আর দোষটা কোথায়। ওরা দুজনে বাড়ীতে না থাকলেই ভাল। না থাকাই সম্ভব। থাকলে এতক্ষণ হাসি চীৎকারে পাশের বাড়ীর লোককে অতিষ্ঠ করে তুলত। ঝি কিংবা চাকরের কাছে খবর নিলেই হবে।

খুব সন্তর্পণে মালতী গেটটা খুলল। একটু শব্দ না করে। তার পর পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে চাতালে দাঁড়াল। কারুর দেখা নেই। ঝি-চাকর হয়ত ঘুমাচ্ছে। দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবল, কলিং বেলের শব্দ করবে কি না, এমন সময় একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে বাইরে আসছিল, মালতীকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল। দুচোখে ভীতির ছাপ। তার স্ত্রীকে আপ্যায়নের ধারা যে মধুর হয় নি, সে কথা ভদ্রলোক এখনও ভোলে নি। ভোলার কথাও নয়।

মালতী একটু অসুবিধায় পড়ল। বলা নেই, কওয়া নেই, সেও একেবারে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

তবু মালতী নিজেকে সামলে নিল। হাতের পত্রিকাটা দেখিয়ে বলল, বসে বসে কাগজটা পড়ছিলাম, হঠাৎ চোখ তুলে খেয়াল হল আপনাদের দরজা হাট করে খোলা, আর ধারে কাছে আপনারা কেউ নেই। এখানে বড্ড চুরিচামারি হয়, তাই ভাবলাম একবার খোঁজ নিয়ে যাই। সাবধান করে যাই চাকরবাকরকে।

ভদ্রলোক খুব ক্লান্ত, নিস্তেজ গলায় বলল, ওর কদিন খুব অসুখ।

কার? মালতী প্রয়োজনের অতিরিক্তই গলা চড়াল।

আমার স্ত্রীর।

কি অসুখ?

মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যায়।

কতদিন থেকে এমন হয়েছে? শিক্ষিকা মালতী ডাক্তারের ভূমিকা নিল।

আমাদের মেয়েটা মারা যাবার পর থেকে। তা প্রায় বছর আড়াই। সেই থেকে ডাক্তার বলেছেন ওকে সবদা হাসিখুশী রাখতে। একলা রাখা বারণ। আমি সব সময়েই সঙ্গে থাকি। এখানে এসে বেশ ভালই ছিল। সব সময় হৈ চৈ করত। কদিন আগে কি স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠল, ব্যাস তারপর থেকেই শরীর খারাপ।

আমি একটু ভিতরে যেতে পারি। খুব করুণ কণ্ঠ মালতীর। প্রায় অশ্রুভেজা। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি সরে গেল সামনে থেকে। বলল, আসুন, আসুন, এ দিকে।

একেবারে বাগের দিকের অপরিসর ঘর। ছোট একটা খাট। তার ওপর মেয়েটি শুয়ে আছে। মাথার চুল বালিশে ছড়ানো। বাসি শ্বেতপদ্মের মতন ম্লান, বিষণ্ণ মুখ।

একটু ইতস্ততঃ করে মালতী খাটের একপাশে বসে পড়ল। হাত বাড়িয়ে মেয়েটির গায়ের তাপ অনুভব করল। গা বরফের মতন ঠাণ্ডা। রক্তহীন, ফ্যাকাশে ঠোঁট। চেয়ে চেয়ে মালতী অনেকক্ষণ ধরে দেখল।

হঠাৎ-নিভে-যাওয়া এক অগ্নিশলাকা। দীপ্তিহীন, উত্তাপহীন। আবার কোনদিন জ্বলে উঠতে পারবে, এ যেন ভাবাই যায় না।

ডাক্তার দেখছিলেন নিশ্চয়?

হ্যাঁ, ডাক্তার রায়চৌধুরী রোজই একবার করে আসছেন।

ডাক্তার রায় চৌধুরী খুবই ভাল ডাক্তার। এখানে ওঁর খুব নাম। মালতী ঘাড় নাড়ল, ওঁকে কল দিয়ে ভালই করেছেন।

ভদ্রলোক আর একটু এগিয়ে এল খাটের দিকে। মেয়েটির কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বলল, সু, সু, কে এসেছেন দেখ।

মেয়েটির দু'টি ভ্রূ একটু কুঁচকে গেল। কেঁপে উঠল চোখের দুটো পাতা। ঠোঁট দুটো নড়ল—আস্তে আস্তে চোখ খুলেই চোখ বন্ধ করে ফেলল। মিনিট দুয়েক, তার পর আবার চোখ খুলল। এবার দু' চোখে অস্বস্তির রেশ।

বেশ বুঝতে পারল মালতী, প্রথমবারের অভ্যর্থনার কথাটা বুঝি মনে পড়ে গেছে মেয়েটির, তাই এ ঘরে মালতীকে দেখে অসুবিধাই বোধ করছে।

সামনে ঝুঁকে পড়ে মালতী একটা হাত রাখল মেয়েটির মাথায়। চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, চোখ খুলতে হবে না, ঘুমোবার চেষ্টা কর।

মেয়েটি চোখ বুজল।

মালতী কতক্ষণ যে বসেছিল, নিজেও জানে না। চেতন হ'ল ডাক্তার রায় চৌধুরীর পায়ের শব্দে।

ডাক্তারও মালতীকে এখানে দেখে একটু অবাক হ'ল। রায় চৌধুরীর মেয়েও পড়ে মালতীর স্কুলে, কাজেই এই শিক্ষিকার ধরন-ধারণের সঙ্গে তার কিঞ্চিৎ পরিচয় ছিল। মেয়ের মারফৎ। উপযাচিকা হয়ে মালতী সেন কারও বাড়ীতে সেবা-শুশ্রূষা করতে আসবে এ ডাক্তারের ধারণারও অতীত।

তবু ডাক্তার হাত তুলে নমস্কার করল, এই যে ভাল আছেন মিস সেন?

মালতী হাত তুলে নমস্কার ফেরত দিল, তার পরেই মনে পড়ে গেল, অনেকক্ষণ সে বাড়ী ছেড়ে এসেছে। এবার ফেরা দরকার।

দিন তিন-চার পরেই মেয়েটি অনেকটা সেরে উঠল। আর এই চার দিন সকাল বিকাল দু'বেলা মালতী মেয়েটির কাছে গিয়ে বসত। স্কুল রওনা হবার আগে, স্কুল ফেরত।

মেয়েটির নাম সুলেখা। একদিন তাকে মালতী বলেই ফেলল, তুমি তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ সুলেখা তোমার সেই প্রাণখোলা হাসি না শুনতে পেয়ে আমার দম আটকে আসছে।

সুলেখা একটু সেরে উঠতেই কিন্তু মালতী আবার গম্ভীর হয়ে গেল। জানলা দিয়ে সুলেখা বার দুই ডাকল, মালতী এড়িয়ে গেল কাজের ছুতোয়। দেরী করে স্কুলে থেকে ফিরল। আরও সকালে বেরিয়ে পড়ল স্কুল। যাবার পথে সক্রেটারির বাড়ী কিছুক্ষণ সময় কাটাল। শিক্ষিকাদের আর্থিক উন্নতি, স্কুল কমিটির ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থা নিয়ে চায়ের কাপে তুফান তুলল। লাইব্রেরি— ক্রমে অযথা সময়ক্ষেপ করল। একটি একটি করে ব্যস্ততার ফুকো ইঁট সাজিয়ে নিজেকে ঘিরে প্রাচীর গড়ে তোলার চেষ্টা। বাইরের ঝাপটা হাওয়ায় হৃদয় যাতে ভারসাম্য না হারায়, বানচাল না হয়।

কিন্তু নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারল না মালতী। যে দুঃস্বপ্নের ভয়ে সে চোখ বুজতে ইতস্তত করত, সেই দুঃস্বপ্নই প্রখর দিনের আলোয় তার সামনে এসে দাঁড়াল।

ছুটির দিন। এক রাশ বই নিয়ে মালতী প্রশ্নপত্র তৈরী করছিল, দরজার শব্দ হতে উঠে দাঁড়াল। মনে হ'ল অনেকক্ষণ ধরে কে যেন দরজায় করাঘাত করছে। খুব মৃদু করাঘাত।

দরজা খুলেই মালতী দু'পা সরে এল। সুলেখা আর তার স্বামী। সুলেখা ফেটে পড়ল, কি ব্যাপার বলুন ত মালতীদি, আজকাল আমাদের বাড়ী মাড়ান না? কি করেছি আমরা?

একটু সময় নিয়ে সংযত-গলায় মালতী উত্তর দিল, মেয়েদের পরীক্ষা নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি। একেবারেই সময় পাচ্ছি না।

মালতীর নিরুত্তাপ, নিরুচ্ছ্বাস কণ্ঠস্বরে একটু বুঝি আহত হ'ল সুলেখা। উত্তর দেবার চেষ্টা করেও পারল না।

উত্তর দিল সুলেখার স্বামী।

আমরা কাল সকালে চলে যাচ্ছি। তাই ভাবলাম একবার দেখা করে যাই।

কাল সকালে? মালতীর গলার স্বর অনেকটা আর্তনাদের মতন শোনাল।

হ্যাঁ সকাল ছ'টা তিপ্পান্নর গাড়ীতে।

কিন্তু এই সময় সীজনটা এখানে ভাল। সুলেখার উপকার হ'ত।

এত কথা মালতী বলতে চায় নি। কার কিসে উপকার হয় তার জন্য ওর কি মাথা ব্যথা। কিসের অন্তরঙ্গতা। পাশের বাংলোয় ক'দিনের জন্য ভাড়া এসেছিল। পরিচয়ের পরিধি ত এইটুকু। কিন্তু সব সময় নিজের মনকেও মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। নিজের অন্তরও বিশ্বাসঘাতকতা করে।

উপায় নেই, সুলেখার স্বামী মৃদুগলায় বলল, আমার অফিস খুলে যাচ্ছে। যেতেই হবে।

সুলেখা এগিয়ে এসে মালতীর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। সুলেখার স্বামী হাত তুলে নমস্কার করলেন।

ওরা দু'জনে বেরিয়ে যেতে মালতী নিজের ওপরই বিরক্ত হ'ল। অযথা দরদ দেখাবার তার কোন প্রয়োজন ছিল না। কার শরীরের উন্নতি বা অবনতি হবে সে দায়িত্ব ওর নয়। ভালই হ'ল। পরীক্ষার আগেই ওরা চলে যাচ্ছে। দিনরাত হাসির হুল্লোড়ে কাজের বরং অসুবিধাই হ'ত। বলা যায় না, সময় নেই, অসময় নেই, দমকা হাওয়ার মতন হুট করে সুলেখা হয়ত এ বাড়ীতে এসে পড়ত। কাজ ভুলিয়ে দিত। সময় নষ্ট করত।

শুধু আজকের রাতটা। কাল ভোরের পরে আর ওদের দেখা যাবে না। মালতীর শান্তি নষ্ট হবার আর কোন সম্ভাবনা নেই।

সারারাত মালতী বিছানায় ছটফট করল। ঘুমোবার অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু ঘুম এল না। একটু চোখ বুজলেই খিল খিল হাসির শব্দ। বিছানা থেকে উঠে মালতী পায়ে পায়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। না, নিঃঝুম, নিসাড়। সারা বাংলো অন্ধকার। তবে সুলেখার হাসির উচ্ছ্বাসটুকু বুঝি মালতীর বুকের পাঁজরেই আটকে

গেছে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এমনি করেই তাকে চঞ্চল করে তুলবে।

খুব ভোরে মালতী বিছানার উপর উঠে বসল। তখনও আবছা অন্ধকার। ভোরের ট্রেন ধরতে হলে এই সময়ই এখান থেকে বেরোতে হবে। রাস্তার ওপরে একটা সাইকেল-রিক্সা এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে দু' একটা ছায়াকে ঘোরাঘুরি করতেও দেখা গেল।

সাইকেল-রিক্সার ঠুন ঠুন শব্দ ছাপিয়ে উদ্দাম হাসির শব্দ। শুধু সুলেখা নয়, দু'জনেই হাসছে। মালতীর মনে হ'ল অনেক বছরের পুরাণো ঝাড়-লণ্ঠন যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। গাছের ডালে পাখীর কাকলী আর ভোরের বাতাসের আওয়াজ ছাপিয়ে হাসির আবর্ত।

এই হাসি মালতীর অন্তরের সবটুকু আনন্দও যেন নিংড়ে নিয়ে গেল।

জানলার গরাদে বুক চেপে মালতী চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। যতক্ষণ হাসির শব্দ কাণে গেল, নড়ল না একটুও।

এক সময় সব থেমে গেলে মালতী কোণের ঘরে ফিরে এল। এ ঘরে অব্যবহৃত টুকিটাকি জিনিস। বাতিল করা ট্রাঙ্ক, ছেঁড়া কাগজপত্রের রাশ।

একেবারে নীচেয় রাখা ট্রাঙ্কটা টেনে বের করল। মেঝের ওপর বসে ডালাটা খুলল। পুরাণো কাপড়, ছেঁড়া কাগজ, সেলাইয়ের সরঞ্জাম।

সব টেনে বাইরে ফেলল। হাতড়ে হাতড়ে একেবারে তলা থেকে জিনিসটা বের করল। কাঁচটা ফেটে গেছে। মরচে ধরেছে ফ্রেমে। ছবিটাও অস্পষ্ট, তবু তারই ওপর মালতী হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

এখনও দেখা যায়। আয়ত দুটি চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল তরুণ। কিছুদিন পর এটুকুও দেখা যাবে না। পোকা আর কাল সমস্ত নষ্ট করে দেবে।

ছবিটা একেবারে ঝাপসা হয়ে যেতে মালতীর চেতনা হ'ল। আঁচল দিয়ে চোখ দুটো চাপা দিল। ফটোটা রেখে দিল ট্রাঙ্কের মধ্যে।

আশ্চর্য, মালতীর ধারণা ছিল সব বুঝি নিঃশেষে মুছে গেছে। মনের অন্দরেও কিছু অবশিষ্ট নেই, কিন্তু এতকাল পরে ওই ছন্নছাড়া হাসির শব্দ বালি খুঁড়ে খুঁড়ে জল বের করার মতন সময় খুঁড়ে খুঁড়ে পুরাণো স্মৃতি তুলে ধরেছে চোখের সামনে। বুঝি বা মনেরও সামনে।

ডালাটা সশব্দে মালতী বন্ধ করে দিল। আর ভয় নেই। বাইরের হাসির শব্দ আর তাকে মাতাল করতে পারবে না। পিছন দিকে চোখ ফেরাবার অবকাশও হবে না।

একটি নূতন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

শ্রীনরেন ভট্টাচার্য্য

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সেখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীজি. আর. শর্মার অধীনে কৌশাম্বীতে যে সাম্প্রতিক খননকার্য চালান হয়, তার ফলাফল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পক্ষে সুদূরপ্রসারী। সুপ্রাচীন সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে এই নতুন খননকার্যপ্রসূত নিদর্শনগুলির অদ্ভুত সাদৃশ্য রীতিমত তাৎপর্যপূর্ণ। সুপ্রাচীন এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে কৌশাম্বীতে। এলাহাবাদের বত্রিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে যমুনা নদীর পাশে অবস্থিত কৌশাম্বী (বর্তমান কোশাম) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ অভিনয় করেছিল। এই কৌশাম্বীরই একজন বিখ্যাত রাজা উদয়নের উল্লেখ পাই ভাসরচিত প্রতিজ্ঞা—যৌগন্ধরায়ন গ্রন্থে। বৌদ্ধগ্রন্থ দিব্যাবজানেও তাঁর উল্লেখ আছে। তিনি নাকি প্রথম জীবনে বুদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী মাগন্ধিয়ার প্ররোচনায় তিনি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নির্যাতন করতেন এমনও প্রমাণ আছে। বহু রোমান্টিক আখ্যায়িকার নায়ক এই উদয়ন রাজা শতানীকের পুত্র ছিলেন। কৌশাম্বী সম্বন্ধে আমাদের এটুকু জেনে রাখা ভাল যে, এই কৌশাম্বীতেই কুরুকুল হস্তিনাপুর ত্যাগ করে এসে বাস করছিল। পৌরাণিক মতানুযায়ী পরীক্ষিতের পর জন্মেজয়, শতানীক, অভিপ্রতারিন, অশ্বমেধদত্ত ও নিচাক্ষু হস্তিনাপুরে রাজত্ব করেন। তার পর একটি সর্বনাশা বন্যায় হস্তিনাপুর প্লাবিত হয়ে যায় এবং কৌরবকুল যমুনার কূলে কৌশাম্বী দেশে চলে আসে। পুরাণে নিচাক্ষু থেকে ক্ষেমক অবধি অনেকগুলি রাজার নাম দেওয়া আছে। এই ক্ষেমকেরই বংশধর হচ্ছেন শতানীক এবং উদয়ন। এ হেন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানেই বর্তমান প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। তত্ত্বান্বেষীরা হয় ত হস্তিনাপুরে বন্যা এবং কুরুকুলের স্থানান্তর গমনের সঙ্গে এই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের একটা যোগসূত্র খুঁজে পেতে পারেন। এই কারণেই কৌশাম্বীর প্রাচীন ইতিহাসের কিছু অবতারণা করেছি।

কৌশাম্বীতে যা পাওয়া গেছে তার একটা তালিকা সংক্ষেপে দেওয়া প্রয়োজন। দুর্গ-সমন্বিত শহরের যে কাঠামো পাওয়া গেছে তার সঙ্গে সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত নিদর্শনের যথেষ্ট সাদৃশ্য বর্তমান। ইটের বাড়ী ও জল-নিকাশের সুব্যবস্থার চিত্র সিন্ধুসভ্যতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কয়েকটি বেদিকা এবং যূপকাষ্ঠের সন্ধান পাওয়া গেছে। বেদিকাগুলি সম্ভবতঃ যজ্ঞের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হ'ত। যে সকল মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে সৌকর্যের দিক থেকে সেগুলির সঙ্গে অনায়াসে সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শনগুলির সঙ্গে তুলনা করা যায়। ষ্টিয়েটাইট এবং লাইম-ষ্টোনের যে জিনিসগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি সাধারণতঃ লাল এবং কালো রঙ দিয়ে চিত্রিত। ধূসরবর্ণের এবং সম্পূর্ণ লাল রঙের কিছু সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মৃৎশিল্পের নমুনাগুলিকে খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বছর পূর্বেকার বলে দাবী করা হচ্ছে। সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির এমন অদ্ভুত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি জায়গার কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও আছে, যেমন দুর্গ নির্মাণের পদ্ধতির ক্ষেত্রে এবং বেদিকাগুলির ক্ষেত্রে।

এখন, এই আবিষ্কারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি? হরপ্পা ও মহেন-জো-দারো নগরের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হবার পর থেকেই প্রাগার্য সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হবার সুযোগ পাওয়া গেছে। কালক্রমে প্রায় গোটা বেলুচিস্তানের বিভিন্ন অংশে আর্য-পূর্ব গ্রামীন সংস্কৃতির বহু নিদর্শন পাওয়া গেছে যেগুলিকে ষ্টুয়ার্ট পিগট প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রাচীন সুমের থেকে আবিষ্কৃত কিছু নিদর্শন, সেখানে প্রাপ্ত কিছু হরপ্পীয় শীলমোহর ইত্যাদি থেকে এটুকু অনুমান করা সম্ভব হয়েছে যে, সুমের, নিলেভ, ব্যাবিলন, লাগাম, উর, সুমা, পার্শিপোলিশ হয়ে একই জাতীয় একটি সভ্যতার ধারা সিন্ধু তীর অবধি বিস্তৃত হয়েছিল। এই সভ্যতাগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল এবং এদের মধ্যে সংযোগ ছিল মুখ্যতঃ বাণিজ্যিক এবং আংশিক সাংস্কৃতিক। সম্প্রতি সিন্ধুসভ্যতার আরও নিদর্শন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। যথা—দক্ষিণ গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বক্সার, রূপার, পশ্চিম বাংলার চন্দ্রকেতুগড়। কৌশাম্বীর এই আবিষ্কারের ফলে এটুকু অনুমান করা এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়

যে, সুমের থেকে যে প্রাগার্য সভ্যতার ধারার শুরু হয়েছিল তার শেষ হয়েছিল পশ্চিম বাংলায়। মধ্যদেশে কৌশাম্বীর এই নবাবিষ্কৃত ধ্বংসস্তূপ সিন্ধু উপত্যকার হরপ্পা মহেন-জো-দারো এবং পশ্চিমবাংলার চন্দ্রকেতুগড়ের মধ্যরেখা।

সিন্ধুতীর প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির সঙ্গে বৈদিক আর্যসভ্যতার সম্পর্ক কি তা নিয়ে মোটামুটি দু'রকম মত প্রচলিত আছে। একটি মত হচ্ছে, সিন্ধুসভ্যতা প্রাক্-বৈদিক ও অনার্য। মার্শাল সাহেব এই মতের প্রথম প্রবক্তা। তাঁর মতে সিন্ধুসভ্যতা থেকেই বৈদিক আর্যরা রুদ্র উপাসনা শিখেছিল কারণ অন্যান্য বৈদিক দেবতার থেকে রুদ্র স্বতন্ত্র, তাঁর উপাসনা-বিধিও স্বতন্ত্র। প্রথমে আর্যরা সিন্ধুসভ্যতার ঐতিহ্যবাহী শিশ্ন অর্থাৎ লিঙ্গোপাসনাকে ঘৃণা করত। পরে তা আর্যসমাজে স্থান পায়। সংস্কৃতির দিক থেকে সৈন্ধব এবং আর্য সংস্কৃতির সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয় ঋগ্বেদের তারিখ নির্ণয় এবং সিন্ধুসভ্যতার কালনির্ণয় নির্ধারিত হবার পর। মোক্ষমুলর ঋগ্বেদের তারিখ ধরেছিলেন ১২০০-১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই হিসাবেই অনুমান করা চলে যে, ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে বৈদিক আর্যরা ভারতে আসেনি। এবং ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দকে আর্যদের ভারতে আগমনের তারিখ ধরলেই ক্যাপাডোসিয়ার বোগাজকুই শিলালেখের তাৎপর্য এবং ব্যাবিলনীয় কুনেফর্ম লিপিতে লেখা তেল-এল-আমর্ণতে প্রাপ্ত ইন্দো-ইউরোপীয় নামগুলির তাৎপর্য ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা যায়। ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেই যে বৈদিক আর্যগণ কর্তৃক সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল তার প্রমাণ ঐ সময়েই আর্যজাতির অপর এক শাখা হিট্টাইটদের দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যের সিন্ধুসভ্যতার সমগোত্রীয় সভ্যতাগুলি ধ্বংস হয়েছিল। হুইলর এবং পিগটের মতানুযায়ী ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আর্যগণ কর্তৃক সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের নজির রয়েছে ঋগ্বেদে। দিবোদাস ইন্দ্রের সহায়তায় নব্বইটি পুর ধ্বংস করেন। এই 'পুর' নিশ্চয়ই সিন্ধুসভ্যতার নগরাবলী ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না। এ ভিন্ন সিন্ধুসভ্যতা যে বৈদিক-যুগের পূর্ববর্তী তার প্রমাণ হচ্ছে সিন্ধুসভ্যতার কাল-নির্ণয়। উর এবং কিস্-এ হরপ্পার অনুরূপ যে শীলমোহরগুলি পাওয়া গেছে ঐতিহাসিক গবেষণায় তার ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বলে বিবেচিত হয়েছে। এ ভিন্ন সুমেরে ২৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হরপ্পার সঙ্গে বাণিজ্যের যোগাযোগের প্রমাণ সুমের থেকে পাওয়া গেছে। এই কারণেই সাংস্কৃতিক দিক থেকে সৈন্ধবগণ আর্যদের থেকে পৃথক এবং পূর্ববর্তী।

দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে যে, আসলে সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে আর্যসভ্যতার মৌলিক ঐক্য আছে। উভয়ের সম্পর্ক অতি নিবিড়। এঁদের মধ্যে আবার একদল মনে করেন যে, সিন্ধুসভ্যতা আসলে বৈদিক আর্যদের সৃষ্টি। এঁদের পক্ষে প্রধান যুক্তি হচ্ছে যে, স্থানান্তর গমনকারী জাতিরা কখনোই তাদের পিতৃভূমিকে ভুলে না। যদি আর্যরা আসলে বাইরে থেকে আসত তা হলে তাদের অ-ভারতীয় পিতৃভূমির উল্লেখ তাদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে করত। তা যখন তারা করে নি তখন তারা বাইরে থেকে আসে নি। এঁদের দ্বিতীয় দল মনে করেন যে, যদিও আর্যরা সিন্ধুসভ্যতার স্রষ্টা নয়, তবুও সৈন্ধব জনসমাজে তারা উল্লেখযোগ্য ভাবেই উপস্থিত ছিল। এঁদের মূলতঃ দুটি যুক্তি। একটি হচ্ছে আর্যদের ভারতে আগমনের যে তারিখ ধরা হয়েছে সে তারিখের পক্ষে এমন কোন সবল ঐতিহাসিক যুক্তি নেই যা দিয়ে বলা চলতে পারে আর্যরা ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এখানে এসেছিল। দ্বিতীয়তঃ সিন্ধুসভ্যতায় প্রাপ্ত যে ক'টি মাথার খুলি পাওয়া গেছে সেগুলিকে চারটি নৃতাত্ত্বিক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রটো-অষ্ট্রালয়েড, আল্পিনয়েড, মঙ্গোলয়েড এবং মেডিটেরেনীয়ান্। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে, সৈন্ধব নাগরিকগণ মিশ্র ছিল এবং যদি সিন্ধুসভ্যতা মিশ্রসভ্যতা বলেই স্বীকৃত হয় তাহলে স্বীকার করতে বাধা নেই যে, সৈন্ধব জনতার মধ্যে আর্যরাও ছিল।

এই দু'রকম মতবাদের মধ্যে প্রথমটিকেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করাই সঙ্গত। কারণ প্রথম মতবাদটি প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রমাণের দ্বারা বহুলাংশে সমর্থিত হয়েছে। এই হিসাবে বলা চলতে পারে যে, সিন্ধুসভ্যতা বৈদিকসভ্যতার পূর্ববর্তী উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষ যোগাযোগ নেই। তবে স্থানীয় অধীন সৈন্ধবদের কাছ থেকে আর্যরা তাদের সংস্কৃতির কিছু পরবর্তীকালে গ্রহণ করে থাকবে যেমন রুদ্রোপাসনা ইত্যাদি।

এখন, কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি থেকে আমরা কি সিদ্ধান্তে আসতে পারি? সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে নানান বিষয়ের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে এটা অনুমান করা খুবই সম্ভব যে, সেখানে প্রাগার্য অনার্য সভ্যতার বসতি ছিল। মহেন জো-দারো, কৌশাম্বী এবং চন্দ্রকেতুগড় একই বংশের। তবে কৌশাম্বীর দুটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে কৌশাম্বীতে বিশুদ্ধ অনার্য সংস্কৃতির অধিকার

ছিল। পরবর্তীকালে আর্য অনুপ্রবেশের ফলে ধীরে ধীরে কৌশাম্বীর নতুন রূপান্তর ঘটল। আর্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের নিদর্শন হিসাবে আমরা কৌশাম্বীতে প্রাপ্ত যজ্ঞবেদিকার উল্লেখ করতে পারি। কৌশাম্বী উদ্ঘাটনের প্রাথমিক পর্যায়ে নরবলির নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। নরবলিদান আদিম আর্য সংস্কৃতির একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল। পুরুষমেধ যজ্ঞ আসলে নরবলিদান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেফ প্রসঙ্গ, পুরাণ ও মহাকাব্যে বহু নরবলির নিদর্শন এই কথাই প্রমাণ করে। তাহলে একথা স্বীকার করতে হয় যে, কৌশাম্বী সভ্যতায় আর্যদের দান আছে। ঐতিহাসিক কালানুক্রমের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এ অনুমান অযথার্থ নয়, কারণ যদি ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আর্যগণ সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে বসবাস করে থাকে তাহলে খুব স্বাভাবিক নিয়মে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যেই তাদের মধ্যদেশে বসতি বিস্তার সম্ভব হয়ে থাকবে। এ ভিন্ন আরও একটা কথা আছে। মধ্যদেশে কুরু-পঞ্চাল রাজত্ব বৈদিক যুগে গড়ে উঠেছিল এবং আর একটু পূর্বে গড়ে উঠেছিল কোশল এবং বিদেহ-রাজ্য। সপ্তসিন্ধু অঞ্চল থেকে বৈদিক সভ্যতার রাজধানী ক্রমশঃ মধ্য ও পূর্ব দেশে সরে এসেছিল বৈদিক যুগের মাঝামাঝি। অর্থাৎ কৌশাম্বীতে পাওয়া ধ্বংসাবশেষ দেখে এটুকু ধারণা করা খুব সম্ভব যে, এই সভ্যতা এমন একটা জায়গায় গড়ে উঠেছিল যেখানে বৈদিক সভ্যতার বিকাশ পুরোমাত্রায় ঘটেছিল। এখন, এটা একটা সার্বজনীন স্বীকৃত সত্য যে, পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা অনার্যদের কাছ থেকে অনেক কিছুই গ্রহণ করেছিল। এর প্রমাণ অথর্ববেদ। কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত সূত্র থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এই আর্য-অনার্য সভ্যতার মিশ্রণ মধ্যদেশেই সুরু হয়েছিল।

সিন্ধুসভ্যতা যে সকল আর্য কর্তৃক ধ্বংস হয়েছিল তারা প্রকৃতির দিক থেকে ছিল পরবর্তী আর্যদের তুলনায় যথেষ্ট বর্বর। এর প্রমাণ পাওয়া যায় ঋগ্বেদের কয়েকটি স্থানে ইন্দ্রদেবের ভয়াবহ চরিত্র-চিত্রণে। গ্রীকদের তুলনায় রোমকগণ যেমন বর্বর ছিল, রোমকদের তুলনায় গথ, হুণ, ভ্যাণ্ডাল, স্যাক্সন, লম্বার্ড প্রভৃতিরা যেমন বর্বর ছিল, ঠিক তেমনি সিন্ধুসভ্যতার অধিবাসীদের তুলনায় আদি বৈদিক আর্যরা বর্বর ছিল। এই কারণেই তারা সিন্ধুসভ্যতার শিল্প-সৌকর্যের মূল্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি। সামনে যা পেয়েছে ভেঙে-চুরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। নগরজীবন ছিল তাদের কাছে অপরিচিত, কাজেই হরপ্পা-মহেন-জো-দারোর নগরসম্ভার ভেঙে চুরমার করে দিতে তাদের বিন্দুমাত্র হাত কাঁপে নি। দিবোদাস প্রকৃতির দিক থেকে ছিল হুণ অ্যাটিলারই অপর পিঠ। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন এই দুর্ধর্ষ আর্যরা স্থিতিশীল হ'ল তখন তারা সভ্যতা গড়ে তোলার প্রয়োজন বোধ করল। ত্রিৎসু বংশীয় দিবোদাস এবং সেই বংশীয় সুদাসের পার্থক্য যেন চেঙ্গিজ খাঁ ও কুবলাই খাঁ-এর পার্থক্যের মত। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে স্থিতি হবার পর তারা যখন পূর্বদিকে যাত্রা করল সে যাত্রায় তখন আর পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যহীন দুর্বারতা ছিল না। তাতে ছিল স্থিতিশীল মানুষের সন্ধানী পদচারণা। এই কারণেই যখন তারা মধ্যদেশের উন্নততর অনার্যসভ্যতার সংস্পর্শে এল তখন তারা তাদের দুর্ধর্ষ পূর্বপুরুষদের মত সেই সভ্যতাকে ধ্বংস করল না। সেই সভ্যতার পদ্ধতি তারা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করল এবং তারই রীতিতে নিজেরা অনেকাংশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিল। দুর্গের প্রয়োজন তারা উপলব্ধি করতে পারল এবং এই কারণেই তারা কৌশাম্বীর দুর্গগুলিকে ধ্বংস না করে নিজেরাই সেগুলির ব্যবহার করতে লাগল এবং সেগুলিকে আরও উন্নত করে তুলল।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কৌশাম্বীর দুর্গগুলির চারিদিকে যে উচ্চ প্রাচীর ও প্রহরীকক্ষ খুঁজে পাওয়া গেছে সিন্ধুসভ্যতায় তা অনুপস্থিত। এ ভিন্ন প্রাচীন দুর্গের সামনে ৪০০ ফুট চওড়া এবং ২৮ ফুট গভীর খাল পাওয়া গেছে। এর সঙ্গে কৌটিল্যকথিত দুর্গ নির্মাণ প্রণালীর মিল আছে। অর্থশাস্ত্রের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে কৌটিল্য উদক দুর্গ অর্থাৎ জলপরিখাবেষ্টিত দুর্গের কথা বলেছেন। ঐ অধ্যায়েরই ৫২ অনুচ্ছেদে তিনি দুর্গ-প্রাচীরের উল্লেখ করেছেন। দুর্গগুলি কৌটিল্যের নক্সার মধ্যে পড়লেও সেগুলিকে কৌটিল্য পরবর্তী বলা যায় না, কারণ কৌটিল্যের আগেও অনেক রাষ্ট্রনীতিবিদ জন্মেছিলেন যাঁদের গ্রন্থ থেকে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। কৌটিল্য তাঁদের কথার উল্লেখও করেছেন অর্থশাস্ত্রের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। এঁদের মধ্যে কৌটিল্য বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন মনু, বৃহস্পতি ও উশনা সম্প্রদায়ের। এঁদের কথা মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্মও উল্লেখ করেছেন।

সম্পূর্ণ কৌশাম্বী উদ্ঘাটন এখনও হয় নি। হয়ত কৌশাম্বীর আরও অনেক তথ্য শীঘ্রই গোচরীভূত হবে। তবে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে এটুকু অনুমান করা সম্ভব যে, কৌশাম্বীতেই আর্য এবং অনার্য সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য সংমিশ্রণ হয়েছিল।

—০—

স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

৩

'সু,

আমি নিরুপায়। তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না, এই কথাটা দু'জনকেই মেনে নিতে হবে। আমার জন্যে বৃথা অপেক্ষা ক'রো না। খোঁজবারও চেষ্টা ক'রো না।'

হ্যাঁ, চিঠিটা শেষ পর্যন্ত শোভনা পড়ল। না পড়ে পারল না, পড়ল, না পড়ার জেদটাও ছেলেমানুষী অভিমানের নামান্তর মনে হ'ল বলে।

চিঠি ওইটুকুই।

স্বাক্ষর নেই, নেই কোনও ঠিকানা।

যে তিক্ত অবসাদ মনটা আচ্ছন্ন করেছিল, এ চিঠি পড়ার সঙ্গে সেটা আবার একটু নাড়া পেল নাকি?

চিঠিটা পড়েই নির্লিপ্ত ভাবে মন থেকে মুছে দেওয়া গেল কই!

সামান্য সংক্ষিপ্ত চিঠি। যতদূর সম্ভব সহজ করে লেখা। কিন্তু ওই ক'টা ছত্রের মধ্যেই কি নির্বিকার নির্মম আঘাত যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, যে লিখেছে সে নিজেও কি তা জানে?

এ চিঠি অনুপম অবশ্য না লিখলেই পারত। লেখাটা তার পক্ষে অস্বাভাবিকই বলা যায়। নিজেকে যে এমন করে অসঙ্কোচে সরিয়ে নিতে পেরেছে কি দরকার ছিল তার এই চিঠিটুকু লিখে সম্পর্কের দাঁড়ি-টানাকে স্পষ্ট করতে যাবার!

চিঠির ভাষায় শোভনার মনের দিকটা সম্বন্ধে কতখানি অবজ্ঞা ভরা ঔদাসীন্য ফুটে উঠেছে তা কি অনুপম নিজেও বোঝে!

দেখা হবে না এই কথাটা মেনে নিতে হবে! হবে কি না হবে তা স্থির করবার অধিকার শুধু অনুপমের!

শোভনার কোন বক্তব্য থাকতে পারে কি না তা গ্রাহ্য করবার নয়।

শেষ দুটো কথাতেই অনুপমের এ চিঠি লেখার উদ্দেশ্য এতক্ষণে যেন বোঝা যায়।

'আমার জন্যে বৃথা অপেক্ষা ক'রো না। খোঁজবারও চেষ্টা ক'রো না।'

খোঁজবার চেষ্টাকেই তাহলে অনুপমের ভয়। যেন চিঠি লিখে বারণ করলেই শোভনা এ আদেশ শিরোধার্য বলে মেনে নেবে-ই।

কিন্তু খোঁজবার চেষ্টা সত্যিই যদি শোভনা করে? ঠিকানা দেওয়া নেই চিঠিতে। কিন্তু যেখান থেকে ফেলা হয়েছে সে পোষ্টাফিসের ছাপ হয়ত পড়াও যেতে পারে। পোষ্টাফিসের ছাপ দেখে কারুর সন্ধান পাওয়া প্রায় অসম্ভব নিশ্চয়ই। নিজের এলাকার বাইরে কোথাও থেকে চিঠি ফেলতেও কোন বাধা নেই।

তবু খোঁজ করবার চেষ্টা করলে কিছুই কি করা যায় না?

শোভনা ত পুলিশে গিয়েও খবর দিতে পারে, দেখতে পারে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করার দায়িত্ব শুধু নিরুপায় বলেই এড়িয়ে যাওয়া যায় কি না।

'নিরুপায়!'

শুধু ওই একটা শব্দের মধ্যেই সব দায় থেকে নিষ্কৃতির মন্ত্র যেন লুকোন আছে!

কেন নিরুপায় তা জানবার দরকার নেই? জানবারও দাবী নেই শোভনার?

সব সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলা যার উদ্দেশ্য, তার পক্ষে এ চিঠিটুকু লেখাও ত মারাত্মক ভুল। এই চিঠি নিয়েই কাল সকাল থেকে শোভনা স্ত্রীর অধিকার আদায় করবার চেষ্টা করতে পারে না কি?

পুলিশে গিয়ে নালিশ জানালে হয়ত কিছুই হবে না। কিন্তু হতেও ত পারে!

দেশ ছেড়ে কোথাও অনুপম পালিয়ে যাবে বলে মনে হয় না। নিজের পেট চালাবার জন্যেও কোন না কোন কাজ তাকে করতে হবে। তার প্রথম হাসপাতালে যাবার সময় অনুপম কোথায় কাজ করত শোভনা জানে। সে কাজ অনুপম ছেড়ে দিয়েছে অবশ্য। কিন্তু কিছু একটা হদিস আগের ঠিকানায় গেলে কি মিলবে না? তা ছাড়া এখনও তার কাছে বিয়ের পরের তোলা তাদের দু'জনের ছবিটা ত আছে। সে ছবির চেহারা অনুপমের এখনও বদলায় নি। ওই ছবি আর এই চিঠি নিয়ে কাল সে সত্যিই যদি কোন থানায় গিয়ে তার অভিযোগ জানায়?

কিছুই কি তাতে হবে না! বাড়িওয়ালা আশুবাবুর সাহায্যও সে ত এ ব্যাপারে পেতে পারে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুপমকে খুঁজে পাওয়া গেলেও কি হবে?

ভাবতে গেলেই আদালতের একটা অস্পষ্ট ঘোলাটে ছবি ভেসে আসে মনে। প্রথম মফঃস্বলের স্কুলে পড়াতে যাওয়ার সময় একবার মহকুমা আদালতে যেতে হয়েছিল সাক্ষ্য দিতে। পাড়াগাঁয়ের স্কুল। একটি ছাত্রীর বাবা মেয়ের পরীক্ষায় ফেল করা নিয়ে ঝগড়া করতে এসে রাগের মাথায় অফিসঘরের কাগজপত্র ছিঁড়ে হেড মাস্টারের গায়েই একটা বাঁধানো খাতা ছুঁড়ে মেরেছিল। সে সময় সে ঘরে উপস্থিত থাকার দরুন শোভনাকেই সাক্ষী দিতে যেতে হয়েছিল।

আদালতের ছবিটা খুব স্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে না। সেই ভয় ভয় অস্বস্তির আড়ষ্ট ভাবটা মনে আছে।

অনুপমকে তেমনি আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে বোধ হয়। আর তাকে তার জবানবন্দী দিতে হবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উকিল তাদের বিবাহিত জীবনের গভীর গোপন সব খবর জিজ্ঞাসা করবে, সকলের সামনে তা নির্মম ভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণের জন্যে মেলে ধরবে!

শোভনা নিজের মনেই শিউরে উঠল। হাসিও পেল সেই সঙ্গে। নিজের ওপরেই করুণার হাসি। মনের ভেতর কোথাও একটা ক্ষোভের জড় এখনও আছে নিশ্চয়। নইলে এসব কথা ভাববে কেন?

কিন্তু অনুপম কি এখন ভাবছে? কি আছে তার মনে?

হাসপাতালে থাকার সময় অনুপমের মনের এই পরিবর্তনের কোন আভাস পেয়েছিল? ঠিক বুঝতে পারে না। অনুপম বরাবরই কেমন একটু চাপা। ভেতরে যাই থাক বাইরে তার প্রকাশ বড় ক্ষীণ। কিন্তু ভেতরে কিছু ত ছিল! যা ছিল তা কেমন করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? নিশ্চিহ্ন কি সত্যিই হয়ে গেছে? তা কি সম্ভব?

শেষের দিকে হাসপাতালে অনুপমের দেখা করতে আসা অনিয়মিত হয়ে এসেছিল। খারাপ লাগলেও তা নিয়ে অনুপমের সঙ্গে মান-অভিমানের ঝগড়া করে নি শোভনা। নিজেকেই বুঝিয়েছিল কাজকর্ম ফেলে তার কাছে বেশী হাজিরা দেওয়া অনুপমের পক্ষে সহজ নয়। তা ছাড়া ট্রেনে যাতায়াতের ভাড়াটাও, ধরতে হয়। কিই বা তার রোজগার যে হপ্তায় তিন দিন ওই ভাড়া অনায়াসে বহন করতে পারে? শেষ দিকে অবশ্য হপ্তাকে হপ্তাই কেটে গেছে। অনুপম আসতে পারে নি।

রাগ অভিমান করার বদলে শোভনা উদ্বিগ্নই হয়েছে বেশী, অনুপমের কোন অসুখ-বিসুখ বা বিপদ্ হয়েছে ভেবে।

এই যদি তার মনে ছিল তাহলে অনুপম ত হাস-পাতাল থেকে তাকে না নিয়ে এলেই পারত!

হাসপাতালে তার সঙ্গিনী ক'টি মেয়ের বেলাই ত তাই হয়েছে। সেরে ওঠবার পর কেউ তাদের নিতে আসে নি। হাসপাতাল আর রাখবে না অথচ বাইরে কোথাও যাবার জায়গা নেই। হাসপাতালের লোকেরাই বিপদে পড়েছে এদের নিয়ে। দু'একজনকে হাসপাতালে ছোটখাট কাজ দিয়েছে। কিন্তু সকলকে ত আর কাজ দেওয়া যায় না। নিরাশ্রয় মেয়েরা অকুলপাথারে পড়েছে।

তাদের একজন নিজে থেকেই মরিয়া হয়ে একদিন আশ্রয়হীন সংসারে বেরিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসেছিল মাসকয়েক বাদে। আবার সাংঘাতিক ভাবে অসুখ বাধিয়ে।

আরেক জন অমনি বেরিয়ে গিয়ে আর ফেরে নি। মাইল দুয়েক দূরের একটা ঝিলে তার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল দিনসাতেক বাদে।

অনুপম তাকে কিন্তু অমন ভাবে পরিত্যাগ করে নি তখন।

কেন করে নি?

নিরুপায় বলে সে যাই বোঝাতে চাক্, সব উপায় কি এখানে বাসা বাঁধবার পরই তার শেষ হয়ে গেছে!

না, কি এই তার চরিত্রের স্বাভাবিক প্রকাশ, যে চরিত্র গোড়া থেকে বুঝতে পেরেও শোভনা তার মধ্যে সর্বনাশের সঙ্কেত কখনও দেখতে চায় নি। চরিত্রের এই দৃঢ়তার অভাবই বরং কোন দুর্জ্ঞেয় কারণে ভালবেসেছে।

চিঠিটা আবার অন্যমনস্কভাবে তুলে ধরতে প্রথম সম্বোধনটাই যেন নিস্তব্ধ ঘরে গুঞ্জিত হয়ে ওঠে।

'সু'

এই তার আদরের ডাক নাম। এ নাম শোভনাই শিখিয়েছিল অনুপমকে। ঠিক শেখায় নি, কথায় কথায় একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, শোভনা নামটা আমার ভালো লাগে না। কেমন যেন পোষাকী পোষাকী। বিশেষ তোমার মুখে ভালো লাগে না।

অনুপম সেই সুরেই বলতে পারত, সে তাহলে আমার

মুখের দোষ: সেই রকম কিছুই শোভনা আশা করে-ছিল। কিন্তু সে কথা অনুপম বলে নি। কেমন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেছিল, কি বলে ডাকব তাহলে?

কেন? আর একটা ভালো নাম ভাবতে পার না? সকৌতুকে অনুপমের দিকে তাকিয়ে শোভনা খুনসুড়ি করে বলেছিল, একটা আদরের নাম বুঝি মাথায় আসে না!

অনুপমের মুখ দেখে মনে হয়েছিল, সে যেন সত্যিই গভীর ভাবে ভাবতে সুরু করেছে।

শোভনা তার মুখের চেহারা দেখে হেসে ফেলে বলেছিল, তুমি বরং একটা অভিধান নিয়ে এসো, খুঁজে-পেতে নাম বার করবে!

অভিধান! এবার অনুপমও হেসেছিল, অভিধান. দেখে নাম বার করতে হবে!

নইলে তোমার মাথায় ত আসবে না! শোভনা আদরের স্বরে বলেছিল, শোন, তোমার অত আর ভাবতে হবে না। আমায় সু বলে ডেকো। তাহলেই আমি খুশী!

সু! অনুপমকে কেমন একটু বিমূঢ় দেখিয়েছিল।

হ্যাঁ, সু! খারাপটা কি? ডাকবার পরিশ্রমটা কমবে তোমার। আর আমিও তোমায় কু বলে ডাকব, কেমন?

এবার দুজনেই হেসেছিল নিজেদের ছেলেমানুষীতে।

কত সামান্য কিছুতেই সেদিন তাদের খুশির জোয়ার উথলে উঠেছে।

এক কামরার সেই ভাড়াটে ঘরে তখন থাকে শহর-তলীর এক প্রান্তে। ছোট একতলা বাড়ী। তিনটি মাত্র ঘর। তিনটিতেই আলাদা আলাদা ভাড়াটে। এখানকার মতই এজমালী জলের কল। তবে টিউবওয়েল নয়, সরকারী কল।

সেই একটি ঘর আর তার সামনের বারান্দাটুকু নিয়ে তাদের প্রথম সংসার সুরু। এর চেয়ে ভালো বাসা ভাড়া নেওয়ার সঙ্গতি কোথায়?

কিন্তু একখানা সঙ্কীর্ণ ঘরই তাদের কাছে আনন্দের দিগন্ত ছড়িয়ে রাখে নি কি?

অভাব অসুবিধেগুলোই আনন্দের উত্তেজনার খোরাক জুগিয়েছে।

কলের জলের ধারা ওই অঞ্চলে অত্যন্ত ক্ষীণ। সকালে বিকেলে দু'বার কিছুক্ষণের জন্যে এসেই বন্ধ হয়ে যায়। ভোরে উঠে প্রথম কলের জল ধরবার জন্যে রীতিমত লড়াই করতে হ'ত। কে কত ভোরে উঠে আগে গিয়ে বালতি ধরতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। একটু দেরী করলে রান্না-খাওয়ার জল যদি বা জোটে স্নানের জলের আশা নেই।

সেই জল ধরার ব্যাপারেই প্রতিদিন কি উল্লাস উদ্বেগ উত্তেজনা!

কতদিন স্নান না করেই কাটাতে হয়েছে প্রথম প্রথম। তার পর বাড়ীর কলের জল না পেলেও স্নানের সুবিধে করতে পারায় সে কি দিগ্বিজয় করার আনন্দ।

সুবিধে আর কিছু নয়, পাশের বাড়ীর সেই দুখী বৌ-এর সঙ্গে ভাব।

দুখী বৌ নামটা কে দিয়েছিল মনে নেই। পাশের ঘরের ভাড়াটে বুড়ীর সেই ফাজিল মেয়েটার কাছেই শুনেছিল বোধ হয়।

নামটা হিংসে করেই দেওয়া মনে হয়েছিল প্রথম। দুখী বৌ-এর দুঃখের কিছু আছে বলে মনে হয় নি। তাদের পাড়ার সবচেয়ে বড় সাজানো-গোছানো ছবির মত বাড়ী। আঙুল নাড়লে হুকুম তামিল করবার মত ঝি চাকর দারোয়ান। কখনও কখনও যেতে-আসতে স্বামীটিকেও দেখেছে। থিয়েটার বায়স্কোপেও অমন চেহারা ফেলনা নয়। বৌটি নিজেও সুন্দরী না হোক কুৎসিত বলা যায় না। বিকেলে বারান্দায় কি ছাদে যখন ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, তখন সাজ-পোশাকে গহনায় অন্ততঃ রাজকন্যে রাজকন্যেই দেখায়।

তাহলে দুঃখী কিসে? স্বামী বদখেয়ালী? তাও শোনে নি কারুর কাছে। নিঃসন্তানও নয়। একটি ছেলে আছে শুনেছে, দার্জিলিং না কোথায় স্কুলে পড়ে।

কিসে দুঃখী, জেনেছিল মেয়েটির সঙ্গে ভাব হওয়ার অনেক পরে, প্রায় তাদের ওবাড়ী ছেড়ে চলে আসার সময়। দুখী বৌ নাম যারা দিয়েছিল তাদের তা জানবার কথা নয়। না জেনেই তারা মেয়েটির গোপন ব্যথা অনুমান করেছিল কি করে কে জানে।

বৌটির সঙ্গে দু'দিন আলাপ-সালাপ হতেই স্নানের জলের সমস্যাটা মেটাতে আনন্দের আর সীমা ছিল না।

জলের কষ্টের কথা কি প্রসঙ্গে শুনে বৌটি নিজেই বলেছিল, দরকার হলে তাদের বাড়ীতে এসে স্নান সেরে যাবার। সে বাড়ীতে জলের অভাব নেই। টিউবওয়েলের ইলেকট্রিক পাম্প করা অঢেল জল। নিচে ওপরে তিন তিনটে স্নানের ঘর। ঝি চাকর বাদে মানুষ বলতে তারা ত মাত্র স্বামী-স্ত্রী দু'জন; স্বামীও সেই সকালে বেরিয়ে রাত্রের আগে বাড়ী ফেরেন না। শোভনার সুতরাং কোন সঙ্কোচের কারণই ছিল না।

সঙ্কোচের কারণ না থাক নেহাৎ অসহ্য না হ'লে শোভনা সে বাড়ীতে স্নান করতে যেত না। যেত না, বড়লোকের অনুগ্রহ নিতে অনিচ্ছার জন্যেই নয়, যেত না জলের দুর্লভতাটুকু ভুলে না যাবার জন্যে। দুখী বৌ-এর প্রশস্ত হালফ্যাশানের স্নানের ঘরের অফুরন্ত জলে স্নান করতে করতেই একদিন তার একথা মনে হয়েছিল। মনে মনে সেই দিনই গভীরভাবে যেন বুঝতে পেরেছিল, অভাব না থাকলে কোন পাওয়াই সত্যিকার পাওয়া হয় না।

সত্যিই অভাব-অনটন ও সেদিন যেন উপভোগ করেছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে নির্ভীক সংগ্রামের ভেতর দিয়ে দু'জনে আরও যেন কাছাকাছি এসেছে বলে মনে হয়েছে।

অনুপমের মনে সেসব দিনের স্মৃতি কি একেবারেই আর নেই?

'সু' বলে সম্বোধন লেখবার সময়ও কি একবার বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে নি!

না, তা ওঠে নি, সে জানে।

তার নিজের বুকেও এসব স্মৃতি তেমন করে আর মোচড় দেয় কি? মনে হয় না, যে এসব যেন আর কার অনেকবার পড়া গল্প, নতুন করে প্রতিবার পড়বার সময় যার সাড়া ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসে?

বাইরে কোথায় অনেকগুলো কুকুর একসঙ্গে ক্রমাগত ডাকছে। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের কুকুরের পাল তার ধুয়ো ধরল।

কিছুক্ষণ আর এ উপদ্রব থামবে না। কত রাত হয়েছে কে জানে। শোভনা লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। ঘুম না আসুক, একটু বিশ্রাম আর না করলে নয়। সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে হতাশায় ভেঙে পড়ছে।

সকালে ঘুম যখন ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়েছে। খোলা জানলা দিয়ে কড়া রোদ্দুর মুখে এসে পড়াতেই ঘুমটা ভেঙেছিল। কিন্তু শোভনার ঘুমের মধ্যে মনে হয়েছে কে যেন হঠাৎ রূঢ় কঠিন হাতে তাকে স্পর্শ করে জাগিয়ে দিলে।

তক্তপোশটার ওপর উঠে বসতেই কি একটা নিচের মেঝেয় পড়ে গেল। অনুপমের সেই চিঠিটাই।

যাক্। ওটার আজ আর কোন দামই না থাকা উচিত তার কাছে।

তীব্র রোদের আলো নয়, জীবনই তাকে রূঢ় স্পর্শে আজ জাগিয়ে দিয়েছে মনে করতে পারে।

উঠে গিয়ে দরজাটা খুলতে চোখটা প্রথম একটু ধাঁধিয়ে গেল। জানলা দিয়ে রোদের একটি তীক্ষ্ণ রেখাই এসেছিল। এ একেবারে আলোর প্লাবন। খুব গভীর ভাবে ঘুমিয়েছে নিশ্চয়। শরীরটা বেশ স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছে। সেই সঙ্গে মনটাও নয় কি! সমস্ত গ্লানি অবসাদ যেন কেটে গেছে এক রাত্রেই।

ওদিকের বারান্দা ঘুরে আশুবাবু আসছেন। তার কাছেই নিশ্চয়। হাতে বাগানের ক'টা আনাজ।

শোভনা ভেবেছিল, তাকে বুঝি তার কিছু দিতে এসেছেন। কিন্তু দেখা গেল তা নয়। কাছে এসে দাঁড়িয়ে আশুবাবু বললেন, আগে একবার এসেছিলাম। ঘুমোচ্ছিলে বলে আর ডাকি নি।

শোভনা চুপ করে রইল। বোঝাই যাচ্ছে আশুবাবু অন্য কিছু একটা বলবার ভূমিকা করছেন। কথাটা কালকের প্রসঙ্গ নিয়ে হওয়াটাকেই তার ভয়। সে প্রসঙ্গ আজ এই উদার আলোর সকালবেলায় সে মনেও আনতে চায় না। আকাশের মত মনটাকে একটা বেলা অন্ততঃ নির্মল রাখতে চায়।

আশুবাবু সে প্রসঙ্গ তুললেন না। যা বললেন তা একেবারে অপ্রত্যাশিত না হলেও কিছুটা অভিভূত করবার মত।

বললেন, মধু ত আজও আসবে না। তুমি আজকের রান্না-বান্নাটা যদি আমার করে দাও!

সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠ। অনুপমের মিথ্যে ভাণ নেই, অনুগ্রহের সুরও না।

আশুবাবু তার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা পর্যন্ত করলেন না, এইটুকুর জন্যেই বুঝি শোভনা সব চেয়ে কৃতজ্ঞ।

দরজা ধরে শোভনা কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার মনে নেই।

কি ভাবছিল, সে নিজেই ভাল করে বলতে পারবে না। ভাবছিল খানিকটা বোধ হয় এই যে, সংসার অকারণে হয় নিষ্ঠুর নয় অহৈতুক দয়ালু। দুই রূপই তার সমান অস্বস্তিকর কি না তাই বোধ হয় বুঝতে চেষ্টা করছিল মনের মধ্যে তলিয়ে।

নমস্কার! শুনে তার চমক ভাঙল।

ওদিকের ঘরে যে ভদ্রলোক বৃদ্ধা মাকে নিয়ে থাকেন তিনিই সামনের উঠোনে দাঁড়িয়ে।

ভদ্রলোককে এর আগে দু'একবার দেখেছে মাত্র। আলাপ হয় নি।

আজ তিনি নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, আমি ওই ওদিকের ঘরে থাকি, জানেন বোধ হয়?

শোভনা মাথা নেড়ে যথাবিহিত একটু হাসবার চেষ্টা করলে।

ভদ্রলোক নিজেই নিজের পরিচয় দিলেন—আমার নাম নিখিল, নিখিল বক্সী। প্রতিবেশী হিসেবে আগেই অবশ্য আলাপ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এতদিন প্রায় প্যাঁচা হয়ে ছিলাম কি না? রাত-জাগার কাজ সেরে দিনের বেলা এসে বিছানা ছাড়া আর কারুর সঙ্গে আলাপের সময় পাই নি।

নিখিলবাবু একতরফা কথার তোড় একটু থামিয়ে তার আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে হঠাৎ হেসে বললেন, প্রতিবেশী হবার দাবিতে আপনার ওপর একটু অত্যাচার করতে এলাম। ক্রমশঃ

—০—

ভ্রম সংশোধন

প্রবাসী জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথের পত্রলেখা : শ্রীনিখিলকুমার নন্দী

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৪৭	২	১৩	ক্ষুদ্রতর	ক্ষুদ্রতার
২৪৮	,,	৫	জাভাযাত্রীর পত্র, সমকালীন	জাভাযাত্রীর পত্র-সমকালীন
,,	,,	১০	মূলত হয়েও	মূলত কবি হয়েও
,,	,,	২৩	স্পষ্ট-সঙ্গাতুর	স্পর্শসঙ্গাতুর
২৫১	১	২১	পত্রদৌতগুণেই	পত্রদৌত্যগুণেই
,,	১	৩৩	সিদ্ধার্থ—তিনি	সিদ্ধার্থ তিনি অতঃপর
,,	,,	৩৬	পরে	এর পরে
,,	,,	১১	ইংরেজ ভারতবাসী	ইংরাজ ও ভারতবাসী
,,	২	১৬	অব্যবসায়ী	অধ্যবসায়ী
২৫৩	১	১	একনিষ্ঠ	সনিষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথ : মনন ও শিল্প—শ্রীসুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত। অয়নায়তন প্রকাশনী। পরিবেশক ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পৃঃ ২০৮। দাম পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্র-চর্চার ব্যাপকতা সুস্বাগত। বলা বাহুল্য এর সবটা নিছক সাহিত্য-প্রীতি নয়। এর মধ্যে ব্যবসা-বুদ্ধি যেমন কিছু আছে, তেমনি আছে বাহবা পাওয়ার ক্ষমনীয় আকাঙ্ক্ষা। তথাপি, এ বিরাট রবীন্দ্র-অনুশীলনের পরিণত প্রভাব শুভ হতে বাধ্য। সেক্সপীয়র খুব বেশি সংখ্যক নাটক লেখেন নি; দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বোধ করি বেশি লিখেছেন। অথচ সেক্সপীয়র-চর্চা বহু শতাব্দীব্যাপী, পৃথিবী-প্রসারিত; ডি. এল. রায়ের নাট্যাবলীর একখানা উপযুক্ত অনুশীলন আছে কিনা সন্দেহ। (অপ্রাসঙ্গিক হলেও মনে রাখি, বাংলা সাহিত্যের দ্বিজেন্দ্র-ঔদাসীন্য অমার্জনীয় অপরাধ)। রবীন্দ্রনাথ সেক্সপীয়রের মত নাটক লিখতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর সৃজনী প্রতিভা, সৃষ্টি-ব্যাকুল ব্যক্তিত্ব, সেক্সপীয়রের চেয়ে অনেক মহান্; পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে তিনি পৃথিবীর আট-দশজন মহামানবের অন্যতম। সে-বিচারে, রবীন্দ্র-চর্চা মাত্র শুরু হয়েছে, এ বছর তা অনেকখানি এগিয়ে গেল। এই সেদিনও, বাংলা-ভাষায় রবীন্দ্র-চর্চা স্নাতকোত্তর পরীক্ষা পাশের ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। রবীন্দ্র-অনুশীলন স্বকীয় দাবীতে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম আকর্ষণীয় ক্ষেত্র সবে মাত্র গড়ে উঠছে। কালে তা বহু পল্লবিত হবে। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী সুদূরপ্রসারী জীবন ও তাঁর সমুদ্র-প্রমাণ সৃষ্টি আমাদের সমালোচনা-দৃষ্টিকে আরও গভীর ভাবে টানবে। তাতে রবীন্দ্র-পূজকগণ যত না কেন শঙ্কিত হন, বাংলা-সাহিত্য তথা ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতীয় সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্য লাভবান্ হবে। বস্তুতপক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী করে রাখার অপচেষ্টা বহু দিন আগে পরিহৃত হওয়া উচিত ছিল। 'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কে বা?'

আলোচ্য গ্রন্থ জন্মশতবার্ষিকীতে রবীন্দ্র-চর্চায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোগ। এর প্রধান বিশেষত্ব, এর লেখকগণ তরুণ, মননশীল। এঁদের দৃষ্টি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। একদা বঙ্গদেশীয় তরুণ লেখকদের মধ্যে রবীন্দ্র-বিদ্রোহের নিঃসার অনুশীলনা ছিল। তা থেকে এঁরা মুক্ত। আবার, প্রাচীন রবীন্দ্র-ভক্তদের অন্ধ অর্চনার শৃঙ্খলও এঁদের মনন-শীলতাকে ব্যাহত করে নি। রবীন্দ্র অর্চনা ও রবীন্দ্র-বিদ্রোহ এই দুই সমান ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এঁরা প্রত্যেকে কবিগুরুর সৃষ্টি ও ব্যক্তিত্বের নানা দিক শ্রদ্ধা, অনুসন্ধিৎসা, তথ্য ও তত্ত্বানুরাগ, অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা বিচার করতে সক্ষম হয়েছেন। পত্র-পত্রিকার "বিশেষ সংখ্যা"গুলিতে কতিপয় "প্রতিষ্ঠিত" রবীন্দ্র-টীকাকারদের এক কথার অভ্যাবৃত্তিতে পাঠকের চিত্ত যখন ক্লান্ত, তখন এই গ্রন্থটি অনেকখানি সতেজ, নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করে। রবীন্দ্র-চর্চায় উৎসাহী পাঠকদের পক্ষে বইখানার প্রধান মূল্য এখানে।

সম্পাদক সুধীর চক্রবর্তী বলেছেন, "লেখকবৃন্দ সর্বদাই রবীন্দ্রনাথের প্রকট মহিমার কথা স্মরণে রেখে নবীন মনীষায় পুনর্বিচার করেছেন। কোথাও কোথাও তাঁদের অস্ত্র আমাদের আবহমান রবীন্দ্রধারণাকে আহত করবে। কিন্তু সে অস্ত্রাঘাত, ভীষ্মের প্রতি অর্জুনের মত, শ্রদ্ধার প্রকাশ।" এ মন্তব্যকে আমি সমর্থন করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে 'ভক্তি'র যেমন বন্যা, শ্রদ্ধার তেমনি অভাব। যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভক্তিবাদের শৃঙ্খল বার বার ভেঙেছেন, আজ তাতেই তিনি বহুলাংশে বন্দী। এমন প্রবন্ধ এই মহা-বৎসরে পড়েছি, বড় বেদনায়, যাতে রবীন্দ্র-কবিতায় ওড়িয়া, অসমীয়া, তামিল বা হিন্দী ভাষান্তর নিয়ে কঠিন বিদ্রূপ করা হয়েছে, যেন বাংলা ভাষাই একমাত্র তাঁকে ধরে রাখার চিরন্তন অধিকার দাবী করে!

আলোচনার জন্য লেখকবৃন্দ রবীন্দ্র-প্রতিভার যে কয়টি দিক নির্বাচন করেছেন, তাতে বেশ কিছু মৌলিকতা আছে। কবির রাজনীতিক দর্শন আলোচনা করতে গিয়ে হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের রাজ-নৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর প্রবহমান কাব্যচিন্তা ও মননের সুন্দর সংযোগ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাতে কবির রাজনৈতিক চিন্তার পূর্ণতর বিকাশ সম্ভব হয়েছে। দেবীপদ ভট্টাচার্য লিখেছেন, 'রবীন্দ্র-সাহিত্যে ধর্মবোধ ও শিশুচিত্ত' বিষয়ে; রবীন্দ্রনাথ যে 'মানবধর্মের' উদ্বোধনের ক্ষেত্রে শিশুচিত্তকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছেন "তার প্রধান কারণ শিশুচিত্ত প্রভাতের নির্মল আলোকের মত, ঝরণাধারার মত, বসন্তোদ্গমে কচি কিশলয়ের মত সকল মালিন্য, সকল আবিলতাহীন।" রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে রাজ্যেশ্বর মিত্রের নিবন্ধ আলোকসম্পাতী; তার "পূর্ণতার মহত্ত্ব" তিনি বিশেষ করে দেখিয়েছেন। স্থানাভাবে প্রত্যেকটি প্রবন্ধের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চা, ইতিহাসচিন্তা (বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ), সনেট (কবির বিচিত্রমুখী প্রতিভা সনেট রচনায় উৎসুক হল কেন, ও কতখানি সাফল্যে?), গদ্য-কবিতা (কবির "তিনটি দাবী"র সূক্ষ্ম আলোচনা), রবীন্দ্র-নাটকে গানের স্থান (এ নিবন্ধটি অনেকাংশে মৌলিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ), নৃত্যনাট্য, চিত্রকলা, কবির গদ্য-রীতি (নিখিল নন্দীর এ প্রবন্ধ আস্বাদনযোগ্য), ইত্যাদি। হিন্দীকাব্যে রবীন্দ্রপ্রভাব বিষয়েও একটি প্রবন্ধ সঙ্কলনে স্থান পেয়েছে। প্রত্যেক লেখক তাঁর নির্বাচিত বিষয়কে রবীন্দ্র-মনীষার সামগ্রিক প্রকাশের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন। তাতে পুস্তকের মূল্য বেড়েছে।

এই সুবেশ সুমুদ্রিত গ্রন্থটি সম্বন্ধে আমার কেবল দুটি সামান্য আপত্তি। প্রথম, লেখকদের মধ্যে কেউ কেউ আরও সহজ গদ্যে, বাক্য-রীতিতে লিখলে পাঠকের পক্ষে সুবিধে হত। কোথাও কোথাও কষ্ট-কল্পিত রচনারীতি পীড়াদায়ক। বিষয়বস্তুগত জটিল হোক, লেখক যত মননশীল হন, ভাষা তত সুবহ, স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া দরকার; তা নইলে পাঠকের মনে সাড়া জাগে না। আমার দ্বিতীয় আপত্তি, বর্তমান কালে বাংলা লেখকদের emphasis দেওয়ার অনিয়ন্ত্রিত প্রবণতা নিয়ে। ইংরেজী ভাষার অন্যতম প্রধান তেজ হচ্ছে তাতে জোর-করা emphasis এর অভাব। ইংরেজীকে সেজন্য বলা হয় language of under-statements বাংলা যাঁরা সত্যিকারের ভাল লেখেন বা যত্ন করে লেখেন, তাঁদের এ কথাটা ভেবে দেখতে বলি। আজকাল 'ই' 'ও' 'টা' ইত্যাদির দাপটে বাংলা গদ্য নিপীড়িত। অথচ এতে কোন effects তৈরী হয় না। উদাহরণ দি। প্রথম দৃষ্টিতে চোখে পড়ল নিম্নের কয়েকটি বাক্য:

যে-যুগে রোমান্টিক কল্পনার উদ্বেল স্রোতে তিনি অনর্গলিত ঠিক সেই সময়েই পত্রিকা-সম্পাদকের তীক্ষ্ণ বিবেচক দায়িত্বও নিয়েছেন।" এ ধরনের বাক্য সুখপাঠ্য নয়। "ঠিক সেই সময়েই" নিষ্প্রয়োজনীয় emphasis।" স্বদেশীতে রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি শৈশবেই, হিন্দুমেলায়"। "ই"-র প্রয়োজন আছে? "এই যে গান এতে অন্তরাটুকুর বেশি আমরা আশা করি না—এইটুকুতেই গানটি সম্পূর্ণ হয়েছে।" এক বাক্যে দুবার

"টুকু" ভাল শোনায় না, "এইটুকুতেই" না বলে এইটুকুতে" লিখলে বেশি জোর হয়: "পরিশেষে একথা বলব রবীন্দ্রনাথ কবি-দার্শনিক, এটুকু মনে রেখেই তাঁর ইতিহাস-চেতনার সম্যক বিশ্লেষণ সম্ভব।" দুটি অনাবশ্যক উদ্ধৃতি-চিহ্ন বাদ দিলাম, কিন্তু "রেখেই" কথার মানে কি? "সেইজন্যেই আমি রবীন্দ্র নৃত্যনাট্যগুলি পড়ি এবং গীতিনাট্য পাঠের আনন্দ পাই।" 'সেইজন্যেই' কেন? 'সেইজন্য' বলে কি সবটা বলা হল না? 'রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যগুলি' কুরূপ শব্দ; রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য স্বরূপ। এ ধরনের উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। যে কোন বাংলা রচনায় এদের মর্মান্তিক ছড়াছড়ি! কমবেশি আমরা সকলে এই রোগে ভুগছি। অথচ বাংলা ভাষাকে এ রোগ কি ভাবে পঙ্গু, দুঃশ্রাব্য, পঠন-কঠিন করে তুলছে ভেবে দেখছি না। বর্তমান গ্রন্থে বরং এ রোগের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম। শ্রীঅশ্রুকুমার সিকদারের সনেট সম্পর্কে নিবন্ধে প্রায় নেই বললেই হয়। যে মননশীল লেখকবৃন্দ সমবেত প্রচেষ্টায় এমন সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁরা আমার এ আপত্তি বিবেচনা করে দেখবেন আশা করি।

চাণক্য সেন

কাব্যচয়নিকা—অক্ষয়কুমার বড়াল। সঞ্চয়নী গ্রন্থালয়, সাঁতরাগাছি, হাওড়া। মূল্য ৫, টাকা।

এই গ্রন্থে কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্য হইতে নানা বিষয়ক কতকগুলি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। কবিতাগুলি চয়ন করিয়াছেন ৺কবি মোহিতলাল মজুমদার ও শ্যামসুন্দর মাইতি। বাংলা সাহিত্যের কাব্যবিভাগ কবি অক্ষয়কুমারের প্রতিভালোকে কি ভাবে একদিন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত তাঁহার কবিতা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিলোক হইতে নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া কিরূপে বাঁচিয়া আছে, তাহার সন্ধান এই কাব্যচয়নিকার মধ্যে পাওয়া যায়। কবিতাগুলি অক্ষয়কুমারের কাব্যগ্রন্থ প্রদীপ, কনকাঞ্জলি, ভুল, শঙ্খ, এষা ও শঙ্খ হইতে সংগৃহীত এবং কবি-মানসের বিবর্তন অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ। এই সঙ্কলন গ্রন্থপাঠে বাংলা-কাব্য সাহিত্যের এক দিকে অনেকেরই চোখে পড়বে ও অক্ষয়কুমারের কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ ঘটিবে। শ্যামসুন্দর মাইতির লিখিত ভূমিকা "কাব্য পরিচিতি" এই গ্রন্থের আকর্ষণীয় সংযোজন। এরূপ গ্রন্থপ্রকাশ দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের একটি বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় যে পুনরায় আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আলোয় আঁধারে—মণি গঙ্গোপাধ্যায়, ১৬।বি মদন দত্ত লেন, কলিকাতা-১২। দাম সাড়ে তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানির বিষয়বস্তু নেওয়া হইয়াছে একটি ফরাসী গল্প হইতে। বিদেশী হইলেও লেখক ইহাকে আত্মস্থ করিয়া এমন সহজ সরল ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, কোথাও বিদেশী পোশাকের অশোভনতা নাই।

কলিকাতা হাইকোর্টের পঁচিশ বছরের প্রবীণ ব্যারিষ্টার বিপ্রদাস। বিপ্রদাস চরিত্রের ভূমিকা লেখক এইরূপ দিয়াছেন "...সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে চলেছে বিপ্রদাস। হাইকোর্টে মামলা মেলে নি। বন্ধুও তার নেই, কি হাইকোর্টে বা হাইকোর্টের বাইরে। পুরাতন ব্যারিষ্টারের দল তাকে চেনে কিন্তু এড়িয়ে চলে। ভাবুক ভবঘুরে লোকের সঙ্গে পরিচয় রাখায় লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী। তাই নির্বান্ধব বিপ্রদাস ধীরমন্থর পায়ে হাইকোর্টে আসে, ঘরের পর ঘর ঘুরে বেড়িয়ে, গাউন খুলে রেখে ঠিক পাঁচটার সময় টাউনহলের সামনে ফুটপাত বেয়ে, ময়দানের সবুজ ঘাস মাড়িয়ে, নীল আকাশের তলা দিয়ে ফিরে যায় লোয়ার সার্কুলার রোডের নির্জন ফ্ল্যাটে। এই সপ্তাহের তিন দিনের রুটিন। বাকী তিন দিন কাটে আলিপুরের জাতীয় পাঠাগারের শীতল, শান্ত কোণে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের গবেষণায়।"

এ হেন বিপ্রদাসের জীবনে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি মামলা আসিয়া জুটিল। জুটিল, কোন ব্যারিষ্টারই এই মামলাটি লইতে রাজী হয় নাই বলিয়া। আসামী মূক-বধির এবং বিকলাঙ্গ যাহার চরিত্রের কোন দিকটাই পরিষ্কার নহে। তাহার উপর আসামীর খুনের স্বীকৃতি, মামলাটিকে আরও জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

"লণ্ডন হইতে কলিকাতাগামী 'জলযাত্রা' জাহাজে ইংরাজযাত্রী মিঃ রবার্ট বিচাম তাঁহার কেবিনে খুন হইয়াছেন। পঁচিশ বৎসর বয়স্ক তরুণ যুবক মিঃ বিচাম ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রবীণ সদস্য মিঃ হেনরী বিচামের একমাত্র পুত্র। ঐ জাহাজেই প্রথম শ্রেণীতে যাত্রী ছিলেন দীপক দত্ত ও তাঁর স্ত্রী।

"অন্ধ-বোবা এবং কালা দীপক দত্ত কয়েক বৎসর পূর্বে 'নির্বাসিত আত্মা' উপন্যাস লিখিয়া আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। উপন্যাসটির ইংরাজী সংস্করণ বিলাতে বিশেষ সাড়া তুলিয়াছিল।

"ইংলণ্ডের এক সংস্থার উদ্যোগে একাধারে অন্ধ কালা এবং বোবাদের সমস্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য শ্রীদত্ত পাঁচ বৎসর পূর্বে তথায় গমন করেন। গত পাঁচ বৎসর ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে তিনি বক্তৃতা এবং অধ্যাপনা করিয়াছেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার স্ত্রী। বস্তুতঃ স্ত্রীর সাহচর্য্য এবং সাহায্যেই শ্রীদত্তের এই ভ্রমণ সার্থক হইয়াছিল।"

এই দীপক দত্তই রবার্ট বিচামকে হত্যা করিয়াছে আইনতঃ না হইলেও, ইহা একরূপ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া দীপকের স্বীকৃতি এই মামলাটিকে আরও ঘোরালো করিয়াছে।

বিপ্রদাস মামলা গ্রহণ করিয়া, প্রথমেই দীপকের পূর্ব-জীবনের তথ্য-গুলি সংগ্রহ করিলেন। যতই তাঁহার চরিত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল, দীপক এ-কাজ করিতে পারে না। তবে হত্যা করিল কে? এবং কি-ই বা তাহার কারণ?

উভয়পক্ষের সাক্ষীর জবানবন্দীতে জটিলতা থাকিলেও, উহারই মধ্য হইতে সত্যকার অপরাধী বাহির হইয়া পড়ে। এই জবানবন্দীগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া লেখক এক অপূর্ব গল্প ফাঁদিয়াছেন। এক নিশ্বাসে পড়িবার মত বই। ঘটনাগুলি যেন পর পর ছায়া-ছবির ন্যায় পরস্পর সংলগ্ন হইয়া আছে। কেবলমাত্র জবানবন্দীর মাধ্যমে এতবড় একটি জটিল গল্পকে আগাইয়া লইয়া যাওয়া, লেখকের কম কৃতিত্বের কথা নয়! লেখকের ভাষা স্বচ্ছ এবং সাবলীল; পাঠক-সমাজে ইহা আদৃত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তবে বইখানির ভ্রম-প্রমাদ এবং ছাপা মনকে বড়ই পীড়িত করে। ভবিষ্যতে লেখককে এদিকে দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করি।

গৌতম সেন

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ
১ম খণ্ড

শ্রাবণ, ১৩৬৮

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন ও প্রার্থী মনোনয়ন

অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিম জার্ম্মানীর এক বিখ্যাত দৈনিকের ভারতীয় সংবাদদাতা আমাদের কাছে কিছু প্রশ্ন লইয়া আসেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বে জানাইয়াছিলেন তাঁহার সকল প্রশ্নের তিনি সোজা উত্তর চাহেন। যেগুলির সোজা উত্তর আমরা দিতে চাহি না বা পারি না সেগুলিতে শুধু "উত্তর দিতে পারিব না" বলিলেই হইবে। আমরা তাহাতে সর্ত্ত করি যে, প্রশ্নোত্তর দুই তরফা হইবে এবং ঐ ভাবে সোজা উত্তর বা উত্তর দিতে অস্বীকার করিতে হইবে। কোনও প্রশ্ন এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা কেহই করিবেন না।

ঐ প্রশ্নোত্তরের পালা দীর্ঘক্ষণের জন্য চলে। সে সকল প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্নের ধারা অনেকক্ষণ চলে। সেটির বিষয়বস্তু ছিল, আমাদের অধিকারিবর্গ দেশের ও জাতির দূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও চিন্তা করেন কিনা এবং যদি তাহা করেন তবে সেরূপ দূরদর্শিতার কি পরিচয় আমরা পাইতেছি। এই প্রশ্নের পিছনে কি কারণ আছে জিজ্ঞাসা করায় জার্ম্মান সাংবাদিক বলেন যে, আমাদের মন্ত্রীবর্গ ও বিভিন্ন দলের অধিকারিবর্গ তাঁহাদের জীবনের—অর্থাৎ কর্ম্মজীবনের মেয়াদ ফুরাইলে পরে কে বা কাহারা তাঁহাদের কার্য্যের ধারা চালাইয়া যাইবে, সে বিষয়ে যে কোনও চিন্তা করা বা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন, তাহার কোনও নিদর্শন তিনি খুঁজিয়া বা জিজ্ঞাসা করিয়া পান নাই। তিনি গত দুই বৎসর যাবৎ নয়া দিল্লী, কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই ও মাদ্রাজ ঘুরিতেছেন এবং সকল উচ্চ অধিকারীর নিকট এই এক প্রশ্ন করিয়াছেন যে, তাঁহাদের পরে তাঁহাদের কাজ-কর্ম্ম কে বা কাহারা চালাইবে সে বিষয়ে তাঁহারা কি চিন্তা ও কি ব্যবস্থা করিতেছেন। সকলেই সেই প্রশ্নের জবাব হয় ঘুরাইয়া, নয় সোজাসুজি এড়াইয়া গিয়াছেন। মনে হয় সকলেই ভাবেন যে, তাঁহারা অজর, অমর ও অপরাজেয়। যদি দৈবাৎ কিছু হয় তবে "After me the Flood—"আমার অবর্ত্তমানে প্রলয় আসিবে। জার্ম্মান সাংবাদিক সেই সঙ্গে বলেন যে, এরূপ মনোবৃত্তি কোনও প্রগতিশীল সাধারণতন্ত্রের ভবিষ্যতের পক্ষে আশাপ্রদ নয়। এবং পাশ্চাত্ত্য দেশের কোনও সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী দল তাহাদের কোনও নেতার এরূপ মনোবৃত্তি বরদাস্ত করে না, কেননা উহা প্রগতি-বিরোধী।

সত্য সত্যই এরূপ মনোবৃত্তি সাধারণতন্ত্রের পরিপন্থী, উহা একনায়কত্বের সমর্থক। সেকথা স্বীকার করিয়া আমরা ভবনগরে কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের দশ বৎসর ক্ষমতার মেয়াদের নির্দ্দেশের বিষয় বলি। জার্ম্মান সাংবাদিক তাহাতে প্রশ্ন করেন যে ঐ নির্দ্দেশ কার্য্যতঃ কতদূর চলিবে। সে কথার উত্তর আমরা দিতে অসমর্থ এ কথা বলিলে তিনি মৃদু হাস্য করিয়া বলেন, "তা হলে সেটা নিশ্চিত নয়।"

ঐ কথাবার্ত্তার পর দুর্গাপুরে কংগ্রেসী দলের অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি সেই প্রসঙ্গই কিছু মোলায়েম করিয়া বলেন। আরও কিছু দিন পরে উড়িষ্যায় মধ্যকালীন নির্ব্বাচনে দেখা গেল যে, জোয়ানের দল বুড়াদের চাইতে ঐ কাজে বেশী সক্ষম ও সফল। সেই সাফল্যের পিছনে টাকার খেলা আছে এইরূপ মন্তব্য অবশ্য বিরোধী (ও বিফলকাম) দলের অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু যে ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক

ভাবে নির্ব্বাচনের কাজ করা হইয়াছে দেখা গেল, তাহাতে শুধু টাকার জোরে উহা হইয়াছে বলা বাতুলতা। কর্ম্মীদের ও ভোটারদিগের মধ্যে নূতন দলের উপর বিশ্বাস ও আশা-ভরসা না থাকিলে কুবেরের ভাণ্ডার লুটাইলেও উহা সম্ভব হইত না।

আমাদের আশা হইল যে, উড়িষ্যার নির্ব্বাচনের ইঙ্গিত কংগ্রেসী মহারথাদিগের কাছে ব্যর্থ হইবে না। কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, পুরাতন পাপীদিগের চাপে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিই সুর আরও নরম করিতে বাধ্য হইতেছেন। যুগান্তরের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন :

'নয়াদিল্লী, ১৩ই জুলাই—আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে প্রার্থী মনোনয়নকালে মহিলা ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়কে উৎসাহদানের নীতি অনুসরণ করা হইবে বলিয়া কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনী কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্থির হইয়াছে যে, শতকরা ১৫টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইবে। সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের জন্য যদিও কোন শতকরা হার নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তথাপি তাহাদেরও যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধিকে মনোনয়ন দেওয়া হইবে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে এই সংবাদ ঘোষণা করেন।

'তিনি আরও বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে দশশালা ফর্ম্মুলা (অর্থাৎ দশ বৎসর কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর অবসর গ্রহণ করার নীতি) বাধ্যতামূলক নয় এবং এ সম্পর্কে হাইকমাণ্ড প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলিকে কোন নির্দ্দেশও দেন নাই।

'ভবনগর ও দুর্গাপুর অধিবেশনে কংগ্রেস দলের নিকট তিনি "কথা প্রসঙ্গে যে প্রস্তাব" করিয়াছিলেন, তাহার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীরেড্ডি বলেন, "আমি শুধু ইহাই চাহিয়াছিলাম যে, যাঁহারা দশ বৎসর বা আরও অধিককাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, তাঁহারা স্বেচ্ছায় আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে নিবৃত্ত হইবেন এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্মনিয়োগ করিবেন।"

'শ্রীরেড্ডি জানান যে, তাঁহার প্রস্তাবটি কংগ্রেস দল, বিশেষতঃ দলের কেন্দ্রীয় নির্ব্বাচনী কমিটি কর্ত্তৃক বিবেচিত হইয়াছে এবং এই নীতি কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হইবে না বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। শ্রীরেড্ডি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলেন, "দশ বৎসর বা ততোধিককাল যে সকল কংগ্রেস-কর্ম্মী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন যতদূর সম্ভব স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া কংগ্রেস দলকে শক্তিশালী করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।"

'রেড্ডি আরও বলেন যে, রাজ্য বিধানসভাসমূহ ও সংসদের বর্ত্তমান সদস্যগণের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের অবসর গ্রহণ করা উচিত বলিয়া হাইকমাণ্ড মনে করেন।

'প্রশ্ন। যাঁহারা কিছুদিন রাজ্য-সরকারে এবং কিছুদিন কেন্দ্রে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রেও কি "দশ বৎসরের" নীতি প্রযুক্ত হইবে ?

'শ্রীরেড্ডি। হ্যাঁ।'

বলা বাহুল্য "অনুরোধ" বা আবেদনের কোনই ফল হইবে না। শুধু যাঁহাদের বাদ দিলে "পুরাতন পাপী" দল আরও নিশ্চিন্ত হইতে পারে তাঁহাদের নামই কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের তালিকায় থাকিবে না। রাজ্যগুলির বিধানসভা ও সংসদের এক-তৃতীয়াংশের অবসর গ্রহণ নীতিও ঐ ভাবে চালিত হইবে এই আশঙ্কাও আছে।

মহিলা ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের জন্য আসনের সংখ্যা বাড়ানো হইতেছে এই সংবাদও অবিমিশ্র সুসংবাদ নয়। আমরা দেখিতেছি যে, ভারতের প্রায় সকল দলের নেতৃবর্গই দুই প্রকার প্রার্থীকে পছন্দ করেন। প্রথমতঃ অতি অল্পসংখ্যক সুদক্ষ ও চক্রান্তে সিদ্ধহস্ত। ইহারাই নেতৃবর্গের ভয় ও ভরসা, দুইয়েরই আধার। দ্বিতীয়তঃ, সেইরূপ অনুগত জন যাহারা নেতার ইঙ্গিতে লম্ফ-ঝম্প করিয়া, চিৎকারে আকাশ ফাটাইয়া দলের ও দলপতির জয়ধ্বনি করে, আবার অন্য ইঙ্গিতে মূক-বধির ও জড়ভাব আশ্রয় করে, এরূপ লোকের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ বলিয়া—দেশের ও দশের প্রতিনিধি হিসাবে—কিছু পার্থক্য অথবা সংখ্যাল্প বা সংখ্যাগুরু কিছু নাই। অবশ্য সংখ্যাল্পদিগের সম্প্রদায়গত অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করার সুযোগ ভালভাবেই দেওয়া প্রয়োজন—তবে সেখানেও যোগ্যতার প্রশ্ন আসে। কেননা দেশের স্বার্থ সকলের উপরে, যে কথা আমাদের রাজনৈতিক দলপতিগণ ভুলিয়া গিয়াছেন।

ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থচিন্তাই এখন আমাদের দেশের ও জাতির দুর্গতির চরম কারণ দাঁড়াইতেছে। এ বিষয়ে কংগ্রেসী দল কোন অংশেই দোষমুক্ত নহেন। যেটুকু ভরসা আমরা শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির ভবনগরের ভাষণে পাইয়াছিলাম তাহা ক্রমেই উবিয়া যাইতেছে।

বিদেশীদিগের চক্ষে আমাদের ভবিষ্যতের আশা কিরূপ আচ্ছন্নপ্রায় দেখায় তাহার পরিচয় এখন ধীরে ধীরে বিদেশী সংবাদপত্রে ও বিদেশী পর্য্যটক ও প্রত্যক্ষদর্শীদিগের বিবরণে দেখা যাইতেছে। শুধুমাত্র ইট-পাথর,

লোহা-কংক্রীটের আবরণে তাহাদের কাছে আমাদের ভিতরের দৈন্য, নেতৃত্বের অবনতি ও দূরদর্শিতার অভাব ঢাকা যায় না। তাহাদের দেশে বাহিরের উদ্যোগ-আয়োজন, আড়ম্বর ও কলকারখানা এখানের চাইতে বেশীই আছে, উপরন্ত এখন ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ও জাতিগঠনের মূলগত নীতিতে প্রগতির চিন্তা ও চেষ্টা প্রায় সকল বর্দ্ধিষ্ণু জাতেই দেখা যাইতেছে। সেখানে তাহারা ভাবিয়াছিল যে, এদেশ অনেক বিষয়ে অন্তরের ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ দেখাইতে পারিবে।

যেখানে আমরা মুখে বলিতেছি বিশ্বপ্রেম, কাজের বেলায় ব্যক্তিগত, দলগত ও জাতিগত অতি নীচ স্বার্থের উপরে উঠিতে আমরা অসমর্থ, এবং তাহার নিদর্শন আমাদের ঘরের ভিতরেই দেখা যাইতেছে—যেমন আসামে।

কংগ্রেসী নেতৃবর্গ কি দেশের ভবিষ্যতের কথা আদৌ চিন্তা করেন না? তাঁহারা কি সত্য সত্যই মনে করেন যে তাঁহাদের গঙ্গাপ্রাপ্তির সঙ্গে দেশের ভবিষ্যৎও গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া উচিত?

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও জেলা কংগ্রেস কমিটি

বর্ত্তমান সময়ে যেভাবে কংগ্রেসের দ্রুত অধোগতি চলিয়াছে তাহার কারণ অনেক। কিন্তু সূক্ষ্ম কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান-গুলি শুধু নামেমাত্র স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের ও শাসনতন্ত্রের অধিকারীদিগের প্রভাব হইতে মুক্ত, কার্য্যতঃ সেগুলি ঐ অধিকারিবর্গের আজ্ঞাবহ ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, কোনও প্রদেশে বিশেষ সমস্যা উঠিলে, বা বিভিন্ন প্রদেশবাসীদিগের মধ্যে কোনও কারণে বিবাদ বাধিলে, সেখানে সালিশ বা মধ্যস্থরূপে বিচার না করিয়া হয় প্রবলতম পক্ষের সমর্থনের জন্য উদ্ভট, বিপরীত বা অবান্তর যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন বা উট পাখীর মত বালিতে মাথা গুঁজিয়া উপস্থিত সঙ্কটকে না দেখিবার চেষ্টা করেন। অবশ্য এই দ্বিতীয় কারণটি নূতন নহে—বিশেষ যেখানে বাংলা বা বাঙ্গালীর সমস্যা পূরণের প্রশ্ন আসে। কিন্তু আগেকার দিনে কংগ্রেসের একটা সংবিধান ছিল, যাহার কিছু অংশ লিখিত এবং বাকী অংশ মৌখিক আলোচনায় গৃহীত ও কার্য্যতঃ সক্রিয়। উপরন্ত ঐ সংবিধানের একজন প্রকৃত সত্যকাম, ন্যায়-ধর্মজ্ঞানযুক্ত ও দৃঢ়চেতা রক্ষক ছিলেন যিনি ঐরূপ সমস্যায় সহজে পিছাইয়া যাইতেন না, যাঁহার নাম ছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী।

বহুদিন পূর্ব্বেকার এক ঘটনা উদাহরণরূপে দেওয়া যায়। তখন বিগত মহাযুদ্ধ চলিতেছে এবং প্রেসের ও সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের যুদ্ধকালীন বিধিব্যবস্থা তখন সচল ছিল। ঐ সুযোগে ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইয়া, পূর্ব্বাঞ্চলের বাঙ্গালী-হিন্দুর সর্ব্বনাশের ব্যবস্থা হয়। সংবাদ প্রকাশের বিরুদ্ধে নির্দ্দেশ সেই সঙ্গেই দেওয়া হয়, যাহাতে ভারতে উপস্থিত বিদেশী সাংবাদিকেরা সেই খবর না পায় এবং স্বচক্ষে দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার ও তাহার অনুগত ভৃত্যবর্গের কার্য্যাবলীর মুখোস না খুলিয়া দেয়।

স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নিজে গিয়া স্বচক্ষে সবকিছু দেখিয়া ও শুনিয়া আসেন কিন্তু সে খবরাখবর প্রকাশিত হয় কি করিয়া? একমাত্র উপায় ছিল বিধান-সভায় ঐ কারণে অন্যূন ৫০ জন সভ্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া সভার কার্য্যক্রম স্থগিত করার প্রস্তাব আনিয়া বিষয়টি বিধানসভায় বাধ্যতামূলক ভাবে আলোচনা করাইবার ব্যবস্থা করা। বিধানসভার আলোচনা প্রকাশ করার কোনও বাধা ছিল না। শ্যামাপ্রসাদ সেই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস দলের কাছে সমর্থনের চেষ্টা করায় তাঁহারা কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের (তখন রাজেন্দ্রবাবু প্রেসিডেন্ট) অনুমতি চাহেন। প্রেসিডেন্ট সরাসরি সত্যাগ্রহের ব্যবস্থা দিয়া কংগ্রেস দলকে নিষেধ করেন বিধানসভায় প্রস্তাব সমর্থন করিতে। প্রেসিডেন্ট ছিলেন পাটনায় এবং অতি কষ্টে তাঁহাকে পুনর্ব্বার টেলিফোনে ডাকিয়া শ্যামাপ্রসাদ নিজে অবস্থা কিরূপ সঙ্গীন এবং বিধানসভায় ঐ প্রস্তাব অতি শীঘ্র আনা কত প্রয়োজন সে কথা বলিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু রাজেন্দ্রবাবু শুনিতে চাহেন না। শ্যামাপ্রসাদ তাহাতে তাঁকে অনুরোধ করেন যে, তিনি কলিকাতায় আসিয়া সব শুনিয়া যেন বিচার করেন। তাহাতে রাজেন্দ্র-বাবু বলেন যে, তিনি ওয়ার্দ্ধা যাইবেন ও সেখান হইতে সিন্ধিয়া শিপ্ বিল্ডিং কোম্পানীর নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য ভিজাগাপটাম যাইয়া ফিরিবার সময় তিনি "চেষ্টা করিবেন" কলিকাতায় আসিতে—অর্থাৎ দিন পনেরো-কুড়ি পরে, বিধানসভা বন্ধ হইবার পর!

আমরা এই সংবাদ পাইয়া শ্যামাপ্রসাদকে পরামর্শ দিই যে, তিনি যেন সকল বৃত্তান্ত সবিশেষে লিখিয়া গান্ধীজীকে প্রেরণ করেন। দলের লোকের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও শ্যামাপ্রসাদ রাজী হওয়ায় আমাদের বন্ধু, আগ্রার পণ্ডিত শ্রীরাম শর্ম্মার মারফৎ উহা ওয়ার্দ্ধায় প্রেরিত হয়। গান্ধীজী শ্যামাপ্রসাদের পূর্ণ বিবরণ পাইবা মাত্র পড়িয়া সকলের সমক্ষে রাজেন্দ্রবাবুকে এ বিষয়ে

জিজ্ঞাসাবাদ করেন। শর্ম্মাজী উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার কাছেই আমরা শুনি। গান্ধীজী প্রশ্ন করেন :

"রাজেন্দ্র, ঢাকায় দাঙ্গার কথা তুমি শুনিয়াছ জানিলাম। এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা করিয়াছ এবং বিধান-সভায় শ্যামাপ্রসাদের প্রস্তাব সমর্থনের অনুমতি কিরণশঙ্করকে দাও নাই কেন?"

"আমি সত্যাগ্রহে বিশ্বাসী সুতরাং সেই পথই লইবার ব্যবস্থা দিয়াছি।"

"উত্তম কথা। সত্যাগ্রহ চালু করিবার কি ব্যবস্থা তুমি নিজে কংগ্রেসের সভাপতি রূপে করিয়াছ?"

রাজেন্দ্রবাবু নিরুত্তর। গান্ধীজী বলেন :

"তুমি কলিকাতা ও ঢাকা যাইয়া, সরেজমিনে তদন্ত করিয়া, এ বিষয়ে ব্যবস্থা কর নাই কেন?"

"আমার এখানের কাজ ও ভিজাগাপটমের নিমন্ত্রণ সারিয়া যাইব মনস্থ করিয়াছি।"

"তুমি সেইগুলি বেশী জরুরী মনে করিলে কি করিয়া? কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসাবে সারা দেশের মঙ্গল চিন্তা তোমার কর্ত্তব্য এ কথা তোমার মনে আসে নাই কেন? তুমি এই মুহূর্ত্তেই নাগপুরে যাইয়া কিরণশঙ্করকে বিধান-সভার প্রস্তাব সমর্থনে অনুমতি, তার ও টেলিফোন যোগে দাও এবং প্রথম ট্রেনে কলিকাতা যাও।"

বলা বাহুল্য, রাজেন্দ্রবাবু তাহা করেন ও পরের ঘটনাবলী সাধারণে জানে কেননা সে-সবই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

আজ কাছাড়ে যে অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে, ইহার সূত্রপাত বেশ কিছুদিন পূর্ব্বেই হয়। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার সে বিষয়ে কি করিয়াছেন সে কথা এখানে বিচার করা প্রয়োজন নাই। আমরা জানিতে চাহি যে, নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, তাহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও স্বয়ং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে কি করিয়াছেন ও করিতেছেন। সংবাদপত্রে নিম্নস্থ সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে :

'শিলং, ১২ই জুলাই—"সাংঘাতিক রকম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হইয়াছে" অতএব কেন জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি বাতিল করা হইবে না? ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদ করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি ও শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটি-ত্রয়ের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীসিদ্ধিনাথ শর্ম্মার সভাপতিত্বে আজ কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির যে অধিবেশন সমাপ্ত হয়, তাহাতে এই কৈফিয়ৎ তলবের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'জেলা কংগ্রেস কমিটিত্রয় যাহাতে ১৫ দিনের মধ্যে তাঁহাদের কৈফিয়ৎ দাখিল করেন, সেই মর্ম্মে তাঁহাদের উপর নির্দ্দেশ দিয়া বলা হয় যে, যে সব কার্য্যের ফলে কংগ্রেসের তথা আসাম সরকারের ইজ্জৎ নষ্ট হইতে পারে, তাঁহারা এমন কোন কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিবেন না।

'রাজ্য কংগ্রেস যদিও জেলা কংগ্রেস কমিটিত্রয়ের বিরুদ্ধে গুরুতর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনিয়াছেন, কিন্তু যে সব অধস্তন কংগ্রেস কমিটি বা কংগ্রেসকর্ম্মী জেলা কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়াছে বা জেলা কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া স্বাধীন মত ব্যক্ত করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জেলা কংগ্রেস কমিটিত্রয় কোন প্রতিকার ব্যবস্থা করিতে পারি-বেন না বলিয়া প্রদেশ কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির প্রস্তাবে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

'প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য যে, করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি ও শিলচর কংগ্রেস কমিটিত্রয় তাঁহাদের সকল সদস্যকে আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি এবং আসাম বিধানসভা হইতে পদত্যাগের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন।

'প্রদেশ কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির এই অধি-বেশনে গৌহাটির গুলী চালনা এবং গোরেশ্বরের দাঙ্গা তদন্ত কমিটির রিপোর্টও আলোচনা হয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

'শুধু কাছাড়ের জেলা কংগ্রেস বাতিলের হুমকি দিয়াই আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করে নাই। উপরন্তু তাহারা শিলচর জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীনন্দকিশোর সিং, করিমগঞ্জ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাশ, বিধানসভার সদস্য শ্রীমতী জ্যোৎস্না চন্দ এবং সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি শ্রীআব্দুল রহমান চৌধুরীকে কংগ্রেস হইতে সাসপেণ্ড করিয়াছে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে এখন অভিযোগনামা তৈয়ারী হইতেছে। ইহা ছাড়াও, হাইলাকান্দি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীসন্তোষকুমার রায়, শিলচর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীমহীতোষ পুরকায়স্থ, শিলচর সহর কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীপ্রণবকুমার চন্দ প্রভৃতি আরও ১৩ জন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের কাহাকেও সাসপেণ্ড করা হয় নাই।'

আমরা জানিতে চাহি যে, এই কৈফিয়ৎ তলব ও আদেশজারী কংগ্রেসের সংবিধান অনুযায়ী কিনা, বিশেষ আসাম সরকারের "ইজ্জৎ নষ্ট" বিষয়ে যে আদেশ আছে। আমরা আরও জানিতে চাহি যে, এই জবাব-

দিহি, তলব ও আদেশ ইত্যাদি কংগ্রেসের হাইকমাণ্ডের অনুমোদিত কিনা।

আমাদের সম্মুখে শুধু আসন্ন নির্ব্বাচন নাই সেই সঙ্গে আছে জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা। আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আদেশ-নির্দ্দেশের পরিণতির উপর আমাদের বিচার করিতে হইবে কংগ্রেসে সৎলোক ও ভদ্রজনের আদৌ স্থান আছে কিনা।

পশ্চিম বাংলায় বেকার সমস্যা

সম্প্রতি (সোমবার, ১০ই জুলাই) পশ্চিম বাংলার শ্রমমন্ত্রী শ্রীআব্দুস সাত্তার স্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যাপারী-দিগের নিকট এই প্রদেশের সন্তানদিগকে কাজেকর্ম্মে নিয়োগ করার জন্য এক আবেদন করিয়াছেন। এই আবেদন তিনি লালদীঘির মহাকরণে, জনাপঞ্চাশ শিল্প-পতি ও স্থানীয় চেম্বার্স অফ কমার্সগুলির প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলনে করেন। এই সম্মেলনে তিনি নানা তথ্য ও সংখ্যাবলী দেখাইয়া বলেন যে, বেকার সমস্যা এখন এমনই সঙ্গীন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে, বলা যাইতে পারে আমরা বোমার উপর চাপিয়া বসিয়া আছি। এই রাজ্যের চাকরির আবেদনকারীদিগের সরকারী রেজিষ্টারে এখন প্রায় ৩ লক্ষ লোকের নাম আছে। মন্ত্রী বলেন যে, তিনি সকল কাজেই স্থানীয় লোক নিয়োগের দাবি করিতেছেন না। তবে যতদূর সম্ভব স্থানীয় লোক নিযুক্ত করিতে তিনি বলিতেছেন।

তিনি বলেন যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখানের কর্ম্ম-নিয়োগ দপ্তরের সুপারিশের অনুযায়ী লোক ভর্ত্তি মাত্র শতকরা ২৫টি কর্ম্মখালির বেলায় করা হয়, যেখানে সরকারী প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৫০টি কাজে ঐরূপ লোক নিয়োগ সম্ভব হইতেছে। কর্ম্ম-নিয়োগ দপ্তর প্রেরিত লোকের যোগ্যতা সম্বন্ধে বিচারে এই প্রভেদের কারণ তিনি বুঝিতে অসমর্থ। এবং ইহাতে বেকার সমস্যা সমাধানে জটিলতা বাড়িতেছে কেননা কর্ম্মখালি বেশী হয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে তিনি বলেন, ১লা জুন, ১৯৬০ হইতে ৩১শে মে, ১৯৬১ সনের মধ্যে কর্ম্মখালির বিজ্ঞপ্তি গিয়াছিল ৫০ হাজারের অধিক এবং তাহার মধ্যে প্রায় ২৭,০০০ ছিল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে।

ঐ সম্মেলনে উপস্থিত কর্ত্তা-ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন বলেন যে, সরকারী নিয়োগ দপ্তর সব সময় ঠিক লোককে প্রেরণ করেন না, অর্থাৎ কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যোগ্যতাযুক্ত লোক তাঁহারা পাঠান না। আবার একজন মহাশয় ব্যক্তি বলেন যে, "স্থানীয় লোক" এই শব্দ তাঁহার পছন্দ নয় যেহেতু উহাতে এক ভারতীয়ের সহিত অন্য ভারতীয়ের পার্থক্য জানানো হইতেছে।

ঐ দিনই "বাঙালী জাগো" এই আন্দোলনের আরম্ভ জানাইবার জন্য একটি মিছিল, পোস্টার ইত্যাদি লইয়া লালদীঘি অঞ্চলের ১৪৪ ধারায় নিষিদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করার চেষ্টা করে। বৌবাজার ও চিৎপুর রোডের মোড়ে পুলিশ মিছিলকে আটকায়। প্রথমে ঐ দলের পাঁচজন মহাকরণে গিয়া শ্রমমন্ত্রী শ্রীআব্দুস সাত্তারের নিকট তাঁহাদের দাবি জানান। এই পাঁচজন ফিরিলে পরে মিছিলের লোকেদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা যায় এবং পাঁচজন পুলিশ ব্যূহ ঠেলিয়া অগ্রসর হইলে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বৌবাজার ষ্ট্রীটে পথ চলাচল ঐ সময়ে দেড় ঘণ্টা বন্ধ থাকে।

ইহাদের দাবি ছিল যে, পশ্চিমবঙ্গের কর্ম্মখালির শতকরা ৮০টিতে বাঙালী নিয়োগ করিতে হইবে।

সমস্যা যে ভাবে ক্রমেই জটিলতর হইতেছে তাহাতে শ্রমমন্ত্রীর "বোমার উপর চাপিয়া" বসিবার কথা বলা ঠিক, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যার সমাধান কি এই ভাবে হইবে? কর্ম্মকর্ত্তারা কেন বাঙালী লইতে চাহেন না সে বিষয়ে আরও তলাইয়া দেখা প্রয়োজন। যদি তাহা শুধু স্বজাতি পোষণ ও বাঙালী বিদ্বেষের দরুণ হয় তবে সে ক্ষেত্রে আরও দৃঢ় ভাবে ছেদ করা উচিত, শুধু আবেদনে চলিবে না। পশ্চিম বাংলা ছাড়া আর সকল প্রদেশেই ভিন্ন প্রদেশীয়ের বিষয়ে বর্জ্জন ব্যবস্থা সক্রিয় আছে। প্রাদেশিকতা শুধু বাঙালীর বেলায় দোষ, অন্যদের বেলায় তাহা স্বজাতি প্রেম। এখানে কঠোর ব্যবস্থা প্রযুক্ত না হইলে অ-বাঙালী শিল্পপতি ও বাণিজ্য-ব্যাপারী মহলে বাঙালীর অসহায় অবস্থা সম্পর্কে যে ধারণা আছে তাহা দূর হইবে না।

অন্য দিকে ইহাও বিচার করা প্রয়োজন যে, কি কারণে বাঙালী কর্ম্মীকে সাধারণ ভাবে অযোগ্য বা অবাঞ্ছনীয় মনে করা হইতেছে। এখানের (পশ্চিম বাংলার) কয়েকটি বিদেশী প্রতিষ্ঠান—যাহাদের নিকট বাঙালী-অবাঙালী সমান—অন্য প্রদেশে উঠিয়া গিয়াছে, যথা একটি বিরাট বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কারখানা বাঙ্গালোরে গিয়াছে। অন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও এখানের কারখানা ইত্যাদি গুটাইবার চেষ্টা ধীরে ধীরে করিতেছে। এইরূপ করার কারণও খুঁজিয়া দেখা প্রয়োজন। যদি কিছু কারণ পাওয়া যায় তবে তাহা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করিয়া তাহা শোধরাইবার চেষ্টা প্রয়োজন। গণ-বিক্ষোভ বা আন্দোলনের কারণ যথেষ্ট রহিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু

কর্ম্মী-নিয়োগ কেন্দ্রগুলি উঠিয়া গেলে বা বন্ধ হইলে হিতে বিপরীত হইবে।

সমস্যা পূরণ একজন মন্ত্রী ও তাঁহার দপ্তর করিয়া উঠিতে পারিবেন না, তাঁহাদের অন্য কাজও আছে। এই বেকার সমস্যা বিষয়ে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ও প্রতিকারের পথ দেখার জন্য বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ একাধিক লোকের প্রয়োজন।

কলিকাতার পৌর-প্রতিষ্ঠান ও "পৌর-পিতৃকুল"

অল্প কয়দিন পূর্ব্বে এই মহানগরীর পৌরসভায় আবার বিশৃঙ্খলা ও তুমুল গোলযোগ হয়, যাহার ফলে মেয়র সভার কার্য্য স্থগিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তার পরদিনই সংবাদপত্রে দেখা গেল যে, সরকার পৌরসভাকে বাতিল করিয়া কিছুদিনের মত সরকারী ভাবে পৌর-প্রতিষ্ঠানকে চালিত করার কথা ভাবিতেছেন। জানি না ব্যাপার কতদূর গড়াইয়াছে, কিন্তু সত্য সত্যই যদি তাহা ঘটে তবে বাঙ্গালীর মুখে চুণকালি পড়িবার আর কিছুই বাকী থাকিবে না। যদি ঘটে তবে অবশ্য একে অন্যের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া নিজের আত্মগ্লানি দূর করার চেষ্টা করিবেন এবং কলিকাতার খবরের কাগজের মহলে তুবড়ির অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বালাময়ী বাক্যের ফোয়ারা ছুটিবে। তাহা কার্য্যতঃ নিষ্ফল আস্ফালন হইবে—অবশ্য কাগজের বিক্রী লেখার উষ্মার অনুযায়ী বাড়িয়া যাইবে।

কিন্তু এখন কলিকাতা নগরের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে পৌরসভার কার্য্যক্রম যদি সুশৃঙ্খল ও দ্রুত না হয় তবে নাগরিকদিগের স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের যে সকল অন্তরায়, দীর্ঘদিনের অবহেলার ফলে, এইখানে দেখা দিয়াছে, সেগুলির প্রতিকার ত হইবেই না, উপরন্তু দিনে দিনে আরও ভয়ানক হইয়া পড়িবে।

এই অন্তরায়গুলি সকলেরই জানা এবং আমাদের বিশ্বাস যে কোনও পৌরসভার সভ্যই—তিনি যে দলেরই হউন—চাহেন না যে সেইগুলি চিরস্থায়ী হইয়া কলিকাতার পৌরসভা ও তাহার সভ্যগণের নাম কলঙ্কিত করুক। একদিকে জলের অভাব, অন্যদিকে বৃষ্টির জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থার অভাব, পথঘাটে আবর্জ্জনার স্তূপ কোথাও লোকজনের চলাফেরার ও স্বাস্থ্য রক্ষায় বাধা দিতেছে, অন্য জায়গায় রাস্তা ও ফুটপাথ, দুইই, মেরামতের অভাবে খানাখন্দে ভর্ত্তি। রাত্রে পথচলায় একদিকে আলোর অভাব অন্যদিকে পচা আবর্জ্জনার স্তূপ সমানে বিপদের আকর হইয়া দাঁড়াইতেছে। সোজাসুজি বলা যায় যে, এই অবস্থা আরও কিছুদিন চলিলে কলিকাতা মহানগরীর নাম কলিকাতা মহানরকে দাঁড়াইবে।

বিগত তিন বৎসর কলিকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের কার্য্যক্রম যেরূপে ব্যাহত হইয়াছিল তাহাতে এই নগরের অবস্থা ও নাগরিকদিগের সুনাম দুই বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হয়। উহার জন্য কে দায়ী আমরা সে কথার বিচার নিরর্থক মনে করি কেননা দায়ী আমরাই—অর্থাৎ কলিকাতার নাগরিকগণ। আমরা এই পৌরসভা নির্ব্বাচনের বিষয়ে এতই কম গুরুত্ব আরোপ করিয়াছি যে, যাঁহারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা আমাদের বিষয়েও সমানই উদাসীন। পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্ব্বেও পৌরসভার সভ্যগণ নিজ নিজ কেন্দ্রের সাধারণ অধিবাসীগণের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে যেরূপ সচেতন ছিলেন আজ সেরূপ নাই, একথা আজ আমরা সকলেই জানি, এবং সকলেই নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করি কেননা প্রায় সকলেরই ধারণা যে, ইহার প্রতিকার নাই। আমরা ইহাও জানি যে, আমাদের মধ্যে অনেকেরই নাম ভোটারের তালিকা হইতে "উধাও" হইয়াছে কেননা সেই সেই অঞ্চলের নির্ব্বাচনে যিনি স্থায়িত্ব চাহেন এইরূপ প্রভাবশালী সভ্য মনে করেন যে, ঐ নাম থাকিলে তাঁহার নির্ব্বাচনে বাধা পড়িতে পারে। কিন্তু ইহার প্রতিকার ত আমাদেরই হাতে ছিল। সময় মত নিজের নাম তালিকায় আছে কিনা দেখিলে নাম তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইত না।

সে যাহা হউক, এখন বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার প্রয়োজন। কলিকাতা পৌরসভার অকর্ম্মণ্যতা বাঙ্গালীর কলঙ্কের কারণ দাঁড়াইতেছে। এই সেদিন এক মন্ত্রী মহাশয় এই নগরকে ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ময়লা ও ক্লেদপূর্ণ নগর বলিয়া গিয়াছেন এবং সেজন্য আমাদের অনেকে রুষ্ট হইয়া আমাদের স্বভাবমত তাঁহাকে গালিগালাজ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছি। বিদেশের কাগজে এদেশে ভ্রমণ কাহিনীর বিষয়ে যাহা লেখা হয় তাহাতে দিল্লীর দেওয়ানই-খাস, আগ্রার তাজমহল ও বেনারসের গঙ্গার ঘাট এবং মন্দিরমালার সঙ্গে কলিকাতার ময়লা, দুর্গন্ধ ও বস্তির কথা উল্লেখ করা হয়, কেননা উহাই বিদেশীর চক্ষে ও নাসিকায়—কলিকাতার বিশেষত্ব। উহা ত গালিগালাজ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আমাদের বুঝা উচিত যে, শুধু কটুবাক্যে কোনও কাজ হয় না বরং যে করে সে বিদ্রূপ ও অবহেলার পাত্র হয়।

সরকার যে পথে প্রতিকারের কথা ভাবিতেছেন

তাহা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের অংশ সন্দেহ নাই। কিন্তু কলিকাতা মহানগরীর পৌরসভাকে বাতিল করিয়া যদি সরকারকে পৌর-প্রতিষ্ঠান নিজের হাতে লইতে হয় তবে আমাদের সারা ভারতে হাস্যাস্পদ হইতে হইবেই —"কুঁদুলে" স্ত্রীলোকের মত গালিগালাজে তাহার প্রতিকার হইবে না।

কলিকাতার সংবাদপত্রগুলির এ বিষয়ে দায়িত্ব আছে। নগর ও নাগরিকদিগের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে যাহা করা প্রয়োজন সেরূপ বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া পৌরসভার সকল সভ্যকেই সে বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন।

মহাযুদ্ধের পরে

ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মানবের আত্মসম্মান রক্ষার কথা যাহা পূর্ব্ব প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে তাহার আরও বিশদ ব্যাখ্যা করা যায় বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে কোন কোন দেশে মানবতার অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল ও তাহার জাতীয় ফল বিচার করিয়া। অর্থাৎ যেরূপ রুশ, চীন, হাঙ্গেরী বা ভারত অতি মাত্রায় সমষ্টিবাদ চালাইয়া প্রায় সকল ব্যবসা-বাণিজ্য রাষ্ট্রের করায়ত্ত করিয়া জাতীয় অর্থনীতির সফলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছে, সেইরূপ অপরাপর কোন কোন দেশ নিজ জাতির ব্যক্তি ও মানবের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখিয়া কি করিয়াছে তাহা দেখিলে এই দুই বিপরীত অর্থনীতির মূল্য বিচার উপযুক্তরূপে করা যাইতে পারে। সমষ্টিবাদের প্রধান দোষ তাহার নীতি ও রীতির পরস্পর বিরুদ্ধতা। নীতিতে সকল ব্যক্তিই সমষ্টিবাদে সমান শক্তি ও সম্মানের অধিকারী—রীতিতে সে অধিকার মাত্র সমষ্টি নেতাদিগের দাসত্বে পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ যদিও সকল ইমারত, অট্টালিকা, গাড়ী, ঘোড়া, জলুস খানা ও অপরাপর সম্ভোগ ও হুকুমত সকল ব্যক্তির সমান অধিকারে ন্যস্ত, তাহা হইলেও বস্তুতঃ শুধু দলের পাণ্ডাদিগের ভাগেই উত্তম যাহা কিছু তাহা পড়িয়া থাকে—লোকসমষ্টির অপর সকলে আদর্শের অঙ্গুলি লেহন করিয়াই তৃপ্ত হইতে বাধ্য হইয়া থাকেন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অধিকমাত্রায় বৃদ্ধিলাভ করিলে নেতৃত্ববাদ চলা অসম্ভব হইয়া উঠে। এই কারণে নেতাগণ সর্ব্বদাই ব্যক্তিমহলে যাঁহারা বিশিষ্ট তাঁহাদিগকে কোণঠাসা করিয়া রাখাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া ধার্য্য করেন। ফলে জাতির দরবারে ক্রমশঃ বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ ও শক্তিশালী ব্যক্তির অভাব হইতে আরম্ভ হয় ও তাঁহাদিগের স্থান চাটুকার ও বিজ্ঞাপনের জোরে—উন্নত জাতির লোকের দ্বারা পূর্ণ করা হয়। এই ভাবে কিছুকাল চলিতে পারে কিন্তু কোন না কোন সময় এই কারণে জাতীয় অবনতি আরম্ভ হয়। সত্য গুণের অসম্মান যে শুধু সমষ্টিবাদের জন্যই হইতে পারে তাহা নহে, ইতিহাসে বহুবার দেখা গিয়াছে যে, সম্রাট্, রাজা অথবা অন্য জাতীয় শাসকদিগের চাটুকার-প্রীতির ফলেও একই ভাবে দেশের অবনতি হইয়াছে। ভারতের ইতিহাসে শিশুনাগ ও নন্দ অথবা মোগল ও ব্রিটিশ আমলে চাটুকার ও অনুচর পোষণের কুফল দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ডে জর্জ্জদিগের ও ফ্রান্সে লুইদিগের সভাসদ-অভিজাত-চাটুকার-পোষণ জাতীয় অবনতির কারণ হইয়াছিল। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানের সম্মান যে দেশে যে কারণেই না হয় সেই দেশের অবনতি কেহ নিবারণ করিতে পারে না। দল ও গণ্ডি গঠন করিয়া জাতির সকল সম্পদ্ ও শক্তি নিজ করায়ত্ত করিয়া যে সকল নেতাগণ জাতীয় জীবনে উন্নতি আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান শত্রু তাঁহাদিগের দলের পাণ্ডা ও চাটুকারগণ। এই সকল ব্যক্তি স্বভাবতই নিকৃষ্ট মনোভাবের বশ এবং ইঁহাদিগের একমাত্র উন্নতির পথ চাটুকারিতা ও নিজ অপেক্ষা প্রবলতর ব্যক্তির পদলেহন। এই জাতীয় ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই প্রকৃত গুণশালী লোকদিগকে দরবার হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করিতে তৎপর হন; কেননা সত্য গুণের অধিকারী যাঁহারা, তাঁহারা যদি দরবারে যাওয়া-আসা করিতে পারেন তাহা হইলে অপনেতাদিগের নেতৃত্ব অল্পক্ষণই থাকিতে পারে। সমষ্টির নামে দল গঠন এবং সকলের অধিকার দলের করায়ত্ত করা ও দলের প্রধান পাণ্ডার ক্রমশঃ একচ্ছত্র সম্রাটের শক্তি অর্জ্জন প্রভৃতি সমষ্টিবাদ নামক রাষ্ট্র গঠন নীতির ক্রমবিকাশের কথা। কতদিনে এই জাতীয় সমষ্টিবাদ ব্যক্তিত্বের অবমাননার চরমে পৌঁছিয়া উত্থানের পথ হইতে সরিয়া পতনের দিকে চলিতে আরম্ভ করে, তাহা নির্ভর করে নেতৃত্ব ও পাণ্ডা-চাটুকারবাদ কতটা রাষ্ট্রের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকে তাহার উপর। বহু রাষ্ট্রই প্রথমে ব্যক্তিত্বের হানি করিয়া পরে সদ্গুণের আদর করিতে আরম্ভ করে ও ধীরে ধীরে অপনেতা গণ্ডি সকলের বিনাশ করিয়া প্রকৃত গুণবান্ লোকেদের উপযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে সমষ্টিবাদের দাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়া ক্রমশঃ জাতির দেহে উপযুক্ত ভাবে জীবনীশক্তি বহমান হইতে আরম্ভ করে। যে সকল জাতির অদৃষ্টে ইহা ঘটে না সেই সকল জাতি কোন না কোন অবস্থায় পতনের চরমে চলিয়া গিয়া

নূতন বিপ্লবের পথে নিজ স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরাইয়া পায়।

গত মহাযুদ্ধের পরে পশ্চিম জার্মানী ও জাপান শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া ধ্বংসের চরমে পৌঁছিয়াছিল। যুদ্ধ অবসানে কিছুকাল সেই অবস্থা একই ভাবে থাকিয়া যায় এবং শত্রুপক্ষ চেষ্টা করে যাহাতে জাপান ও জার্মানী চিরতরে শক্তিহীন হইয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের পরস্পর বিরোধের ফলে এই দুই জাতি ক্রমশঃ নিজ শক্তি ফিরাইয়া পাইয়া নিজ চেষ্টায় যাহা করিয়াছে তাহার সহিত তুলনায় রুশ, চীন অথবা ভারতের অর্থ নৈতিক প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা ওজনে কিরূপ দাঁড়ায় তাহা বিচার্য্য। রুশের কর্মশক্তি ও আর্থিক উন্নতি চীন ও ভারতের তুলনায় বিশেষ ভাবে উন্নত। সত্য সত্যই রুশ জগতে নূতন কিছু করিয়া দেখাইয়াছে। তাহা হইলেও পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের পুনর্গঠনের ইতিহাস উপন্যাসের মত শুনায়। যুদ্ধের পরেও এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোক পূর্ব্ব জার্মানী হইতে পলাইয়া পশ্চিম জার্মানীতে 'বাস্তুহারা' অবস্থায় প্রবেশ করে। আজ পশ্চিম জার্মানী তাহার আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনার মধ্যে এই সকল লোকগুলিকেই পূর্ণ অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম করিয়া জাতির আর্থিক কাঠামোর মধ্যে অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছে। পশ্চিম জার্মানীতে এক-জন ঝাড়ুদারেরও বেতন মাসিক ৯০০।১,৫০০ টাকা পরিমাণ। সকল জার্মান সে দেশে কাজ করিয়া খাইতেছে এবং তদুপরি বাহির দেশের কয়েক লক্ষ লোক সে দেশে কর্ম্মে নিযুক্ত আছে। প্রায় ৫০ লক্ষ সুবৃহৎ বহুলোকের বাসোপযুক্ত গৃহ সে দেশে নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্ব জার্মানী আজ ধ্বংসের গহ্বর হইতে উত্থিত হইয়া আর্থিক উন্নতির উচ্চতম স্তরে আসিয়া বসিয়াছে। অপরাপর জাতিরা আজ এই পুনর্গঠনের ইন্দ্রজাল দেখিয়া বাক্যহীন, পশ্চিম জার্মানীর কারখানা হইতে অবিরাম স্রোতে দ্রব্যসম্ভার জগতের সর্ব্বত্র বহিয়া চলিয়াছে এবং তাহার উৎপাদন ক্ষমতা ইংলণ্ড, আমেরিকা কিম্বা রুশের তুলনায় কিছুমাত্র কম ত নহেই—অধিকই হইতে পারে।

জাপান আজ যুদ্ধ অবসানের পরে পৃথিবীর বাণিজ্য-পোত নির্ম্মাণ কার্য্যে সকল দেশকে পিছনে রাখিয়া প্রথম স্থান দখল করিয়াছে। অপরাপর কারখানা ও বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু উৎপাদনে জাপান কোন জাতির পশ্চাতে পড়িয়া নাই। যতদূর বোঝা যায় জাপানের শ্রমজীবীগণ পৃথিবীর সকল জাতির শ্রমজীবীদিগকে টেক্কা দিয়া এক বৎসরের বেতন উপরি পাওনা বা বোনাস হিসাবে পাইয়াছে। এই অবস্থায় জাপানের সহিত তুলনায় সমষ্টিবাদী মহাচীনের অবস্থা দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পশ্চিম জার্মানী ও জাপানের এই অসাধারণ উন্নতির মূলে বিশেষ দ্রষ্টব্য হইতেছে পুনর্গঠনের পন্থা। এই দুই দেশেই কোন পঞ্চ, সপ্তম অথবা অন্য সংখ্যক বার্ষিকী সরকারী পরিকল্পনা এবং সরকারী ও জাতীয় অর্থে গঠিত কারখানা ইত্যাদি গড়িয়া তোলা হয় নাই। ব্যক্তির অধিকার পূর্ণরূপে সংরক্ষিত রাখিয়া ব্যক্তির অর্থকরী প্রচেষ্টায় কোন বাধা না দিয়া এবং কেবলমাত্র স্বাস্থ্যবান্ পরস্পর প্রতিযোগিতা জাগাইয়া রাখিয়া ও অন্যায় উপায়ে অপরকে শোষণ করা বন্ধ করিয়া এই দুই জাতি নিজ নিজ উন্নতি সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতের সকল পরিকল্পনা সত্ত্বেও ভারত নিজ লোকসংখ্যার শতকরা তিনজন বাস্তুহারাকে ঠিক করিয়া উপযুক্ত স্থানে বসাইতে পারে নাই। পশ্চিম জার্মানী তাহার লোক-সংখ্যার শতকরা ২৩জন উদ্বাস্তুকে উচ্চ রোজগারের উপায় করিয়া দিয়া নিজ দেশে পূর্ণরূপে নিজের করিয়া বসাইয়া লইয়াছে। জাপানের কথাও সেই একই প্রকার। ইহার মধ্যে জাপানের জনসাধারণ পূর্ব্বকালের নরদেবতা মিকাডোকেও নিজ মানবীয় স্থানে বসাইয়া লইয়া একটা বিশেষ সমাজ সংস্কার কার্য্যও করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু জাতীয় ভাবে মূলধন ও তাহার ব্যবহার ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টামাত্রই জাতীয় ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টা বলিয়া অগ্রগমন চেষ্টা জাপানীরা করেন নাই।

অপরাপর জাতির অর্থনীতির ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড, আমেরিকা, সুইডেন, হলাণ্ড, ইটালি, ফ্রান্স প্রভৃতি বহু দেশেই যুদ্ধের পরবর্ত্তী যুগে সমষ্টিগত প্রচেষ্টা না করিয়া ব্যক্তিত্বের স্থান বজায় রাখিয়া উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এবং চীন ও ভারতের তুলনায় খুবই অধিক উন্নতি হইয়াছে। ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা বিচারে রুশের অপেক্ষাও এই সকল দেশে আর্থিক উন্নতি বহু অংশে অধিক হইয়াছে। এই অবস্থায় আমাদিগের নেতা জহরলালের পরিকল্পনাগুলিকে যেরূপ অভ্রান্ত আকারে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত করা হইতেছে তাহা আমাদিগের সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিয়া তৎপরে গ্রাহ্য করা উচিত। জহরলালের চিন্তার ধারা বিদেশীদিগের প্রেরণায় বহিয়া চলে। বিদেশীরা এবং জহরলালের দল ও গণ্ডির লোকেরা আমাদিগের বন্ধু বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। আমরা নিজেদের ভবিষ্য নিজেদের হাতে রাখিলেই মঙ্গল। অ

ব্যক্তিত্ব ও মানব প্রগতি

সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির অধিকার লইয়া বহু আলোচনা মানব সভ্যতার ইতিহাসে বহুবার হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন যে, ব্যক্তির অন্তরেই প্রাণবান্ ও বোধশক্তির আধার সেই আত্মা আছে, যে আত্মা সম্ভবতঃ সকল চেতনার আকর পরমাত্মার অংশ, যাঁহার আত্মপ্রকাশ এই অনন্ত বিস্তৃত সৃষ্টির ভিতর দিয়া বিচিত্র ভাবে হইয়া রহিয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং ব্যক্তির মনের অনুভূতি এবং সেই অনুভূতির নির্দ্দেশে ব্যক্তি যাহা নিজে করেন অথবা অপরাপর ব্যক্তিদিগের সাহায্যে করিবার ব্যবস্থা করেন, সেই সকল কার্য্যই সৃষ্টির মূলনীতি-অনুগত এবং সেই সকল কার্য্য ও ব্যবহারের প্রবাহই মানবতার ক্ষেত্রে ন্যায্য ও স্বাভাবিক। অপর জাতীয় সকল প্রচেষ্টাই মানবের কষ্ট-কল্পনার ফল ও মানব প্রাণের পূর্ণ পরিণতির সহায়ক নহে; কারণ শুধু ব্যক্তির অনুভূতি, চেতনা ও প্রাণই সকল প্রগতির পথ-প্রদর্শক এবং সেই ক্ষেত্রে উচিত-অনুচিতের বিচারে পূর্ণরূপে সক্ষম। মানুষ দলবদ্ধ ভাবে যাহা করে, সকলের মিলিত চিন্তা ও বিচারের নির্দ্দেশে তাহার প্রকৃত মূল্য বিশেষ নাই; এই কারণে যে,সমষ্টিগত ভাবে মানুষ যে চেতনা, অনুভূতি, বিচারশক্তি দেখাইতে পারেন তাহা মানুষের বাহ্যিক সম্বন্ধ রক্ষা চেষ্টার ফলমাত্র।

অন্তরের অনুভূতি ও প্রকৃতিগত বিচারশক্তির ব্যবহার তাহার মধ্যে থাকে না কেননা, প্রাণ, চেতনা ও অনুভূতি ব্যক্তির নিজস্ব ও তাহার আত্মার অন্তর্গত এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টা অথবা মতামত প্রকৃত ভাবে অন্তর হইতে চালিত ও উদ্ভূত নহে, বাহিরের প্রভাবে সঞ্চারিত মাত্র। যাঁহারা মনে করেন মানুষের সাক্ষাৎ অনুভূতি ও আত্মবোধের মাপকাটিতে মাপিয়া পারিপার্শ্বিকের মূল্য নির্দ্ধারণ মানব জাতির উন্নতির সহায়ক নহে এবং বিচার ও সত্যপথ খুঁজিয়া লইবার জন্য মানুষের সমষ্টিগত প্রচেষ্টাই অধিক নির্ভরযোগ্য, তাঁহারা স্বভাবতঃই ব্যক্তিকে নিজ অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্রের হস্তে তুলিয়া দিয়া সেই সমষ্টিগত শক্তির নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে দাসত্বে নিযুক্ত করিতেই শিক্ষা দিয়া থাকেন। অর্থাৎ এই সকল চিন্তাশীলদিগের নিকটে মানুষের ব্যক্তিত্ব শক্তিহীন এবং সমাজ, দল অথবা রাষ্ট্রই সর্ব্ব শক্তিমান্ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। অনেকের মতে এই প্রকার চিন্তা করাটা একটা অতি বড় আধুনিক ব্যাপার এবং মানব ইতিহাসের অতীত যুগে এই ধরণের চিন্তা কেহ করিত না। শুধু ব্যক্তির অধিকার লইয়াই পূর্ব্বকালের লোকেরা মত্ত থাকিতেন। বস্তুতঃ এ কথাটি কিছুমাত্র সত্য নহে। কারণ, মানব ইতিহাসে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভাব ও শক্তি সকল যুগেই পূর্ণরূপে দেখা গিয়াছে! রামচন্দ্র লোকমতের খাতিরে সীতার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যুগে যুগে বহু মানব সমাজের, রাষ্ট্রের এবং দলের তাড়নায় নিজ মত বিসর্জ্জন দিয়া অপর সকল ব্যক্তির মতে চলিতে বাধ্য হইয়াছে। গ্রীক মহাপণ্ডিত সোক্রাটিস অপর লোকেদের অসন্তোষ হেতু আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সুতরাং বহুসংখ্যক লোকের মত যে ব্যক্তির মতের তুলনায় অধিক মাননীয় এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে। অধিক সংখ্যক লোক ঐশ্বর্য্যহীনতার জন্য কখন কখন নিজ শক্তি ব্যবহারে অক্ষম থাকেন কিন্তু সে অক্ষমতা চির-স্থায়ী হয় না। থাকিয়া থাকিয়া সুপ্ত জনশক্তি জাগ্রত হইয়া প্রবল ভাবে নিজেকে সংখ্যালঘিষ্ঠদিগের ধর্ষণে নিযুক্ত করে। ফরাসী বিপ্লবের কিম্বা তাহারও পূর্ব্বে ক্রমওয়েল ও অপরাপর রাজধর্ষকদিগের কাহিনী সকলের বিদিত আছে। মানবশক্তি সততই বহু মানবের দলবদ্ধ হওয়ার উপর নির্ভর করে, কিন্তু ইহাতে একথা প্রমাণ হয় না যে, ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতি, চেতনা ও চিন্তাশক্তি কোন মানবসমষ্টির সমবেত ও মিলিত চিন্তার ধারা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও মানব প্রগতি ও উন্নতির পক্ষে অল্প সাহায্যকর। মানুষ দলবদ্ধ হইয়া কার্য্যে অথবা চিন্তায় নিযুক্ত হইলে সচরাচর এক বা ততোধিক ব্যক্তির নেতৃত্বেই চালিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ সমষ্টিবাদ ও সমষ্টি-গত প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও ব্যক্তির ব্যক্তিত্বই সেই শক্তি আনিয়া দেয়, যে শক্তির বলে আদর্শ অথবা আদর্শ-অনুগত কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক যুদ্ধে সমবেত ভাবে অনেক সৈন্য যোগদান করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধজয়ের যশ ও সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে সর্ব্বক্ষেত্রেই কোন সেনাপতি কিম্বা মহারথী। বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য কিম্বা অন্য কোনও ক্ষেত্রে বৃহৎ কোন কর্ম্ম-প্রচেষ্টা অথবা গূঢ় কোনও তথ্য আবিষ্কার ও অপরূপ কোন রচনা কি গঠন কার্য্য সিদ্ধ করা ব্যক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে, বহু ব্যক্তির মিলিত চেষ্টায় "লাস্ট সাপার" অঙ্কন, তাজমহল নির্ম্মাণ, বাষ্প কিম্বা বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের উপায় আবিষ্কার কিম্বা "ইলিয়ড" রচনা সম্ভব হইত না। কার্ল মার্ক্স, লেনিন ও স্টালিন কিম্বা মাও-ৎসে-টুঙ্গ ব্যক্তিগত জ্ঞান, বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির দ্বারাই নিজ নিজ কার্য্য উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এ কথা বিচার সাপেক্ষ যে, এই সকল মহামানব যদি পূর্ণরূপে নিজ দলভুক্ত সকল মানবের সহিত পরামর্শ করিয়া চলিতে ও চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেন তাহা হইলে তাঁহারা কর্ম্ম-

ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন কি না। এই কারণেই বোধ হয়, যে সকল রাষ্ট্রে সর্ব্ব মানবের সমাধিকারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া সেই সকল রাষ্ট্রেই অল্প সংখ্যক লোকের কথা মানিয়া সকল ব্যক্তিকে চলিতে বাধ্য করা হইয়া থাকে। কারণ বহু লোকের মিলিত চেষ্টায় যেমন রন্ধন অথবা চিত্রাঙ্কন সম্ভব হয় না, রাজকার্য্যও সেই প্রকার বহু লোকের সমবেত চিন্তা ও মতের উপর নির্ভর করিয়া অবাধে ও উত্তমরূপে সাধিত হইতে পারে না। বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে বহুলোকের হস্তপদ সঞ্চালন প্রয়োজন হয়, কিন্তু চিন্তা ও মতের জন্য অল্প লোকের মস্তিষ্ক হইতেই কিছু গ্রহণ করা লাভজনক হয়। এই জন্য যত অল্পসংখ্যক লোকের পরামর্শ লইয়া যে কার্য্য করা যায় সেই কার্য্যের সাফল্য ততই সহজলভ্য হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের পরিকল্পনা যদি বহুলোকের মতের উপর গঠিত হয় তাহা হইলে সেই পরিকল্পনার পরিণতি সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়াই স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। চলিত প্রবাদ বাক্যে কথিত আছে যে, "ভাগের মা গঙ্গা পায় না" সে কথার সত্যতা অবশ্যস্বীকার্য্য। মানব-সমাজে যে সকল প্রতিষ্ঠান, প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা বহু মানবের সুখ-দুঃখের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত হইয়া পড়ে, সেইগুলির প্রচলন, সংস্থাপন প্রভৃতির নীতি, রীতি ও পদ্ধতির গঠন ও নিয়মন অল্প সংখ্যক মানবের দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ব্যক্তির মত, চিন্তা ও বিচার নির্ভরযোগ্য হয় এবং উপযুক্তরূপে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি খুঁজিয়া পাওয়া সর্ব্বদেশেই সম্ভব হয়। কিন্তু কোন বিরাট্ সঙ্ঘের সকল মানব একত্র হইয়া সুচিন্তার পরিচয় দিবেন এ আশা সকল সময় পূর্ণ না হওয়াই সম্ভব। সুতরাং দলবদ্ধভাবে চিন্তা করিতে যাওয়া বিপদ্‌জনক এবং সঙ্ঘ বা দলের নেতাদিগের উপর চিন্তার ভার পূর্ণরূপে দিয়া দেওয়াই সুবুদ্ধির কার্য্য, যদি নেতাগণ বুদ্ধিমান্ ও সৎ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

আধুনিক কালে দেখা যায় যে, জাতীয় নেতাদিগের মধ্যে জনশক্তিকে চাটুকারিতার দ্বারা নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করিবার চেষ্টাই সাধারণতঃ প্রচলিত রীতি। সকল নেতাই প্রায় সকল কথায় জনসাধারণকে টানিয়া আসরে নামাইয়া বসাইবার চেষ্টা করেন। সর্ব্বগুণ ও সর্ব্বশক্তির আধার মানব-সমাজের সর্ব্বজনই সম্মিলিত ভাবে, এই কথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে কোন জননেতার কিছুমাত্র লজ্জা হয় না। এবং সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নিজেদের বিচারশক্তির উপর বিশ্বাস এই কারণে ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। ফলে বিচার্য্য বস্তুর উৎকর্ষ ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে এবং ব্যক্তির যে পূর্ণগুণশালী ব্যক্তিত্ব পূর্ব্বে মানুষকে উত্তরোত্তর উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছিল, আজ সে সতেজবুদ্ধি, ব্যক্তিত্বও লোপ পাইতে বসিয়াছে। বিশেষজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তিরাও আজ আর নাই বলিলেই চলে। সঙ্ঘবদ্ধ মানব কোন প্রকারে "মনকে চোখ ঠেরাইয়া" নিজেকে বুঝাইতেছে যে, তাহার সকল প্রচেষ্টা ঠিক পথেই চলিতেছে ও তাহার উন্নতি পূর্ব্ব যুগের ব্যক্তিপ্রধান সমাজের তুলনায় অতি দ্রুতগতি অগ্রগামী হইয়া ধাবমান। বস্তুতঃ এই ধারণা অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রসূত এবং বর্ত্তমান সমষ্টিবাদ-বিশ্বাসী সমাজ ও রাষ্ট্রগুলির অবস্থা শুধু বিজ্ঞাপনের মধ্যেই উন্নত। ক্রমশঃ অল্পবুদ্ধি ও দুর্নীতিপরায়ণ লোকেদের উপর নির্ভর করিয়া এই জাতীয় রাষ্ট্রগুলি অবনতির পথে আজ বহু দূরে নামিয়া আসিয়াছে।

রুশ মহারাষ্ট্র ইহাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিন্তু তাহারও যতটা আত্মমহিমা প্রচার হয়, কর্ম্মে ততটাই সক্ষমতা সত্য সত্যই আছে কি না সন্দেহ। চীন বিশেষ করিয়া ফাঁকা আওয়াজে শব্দায়মান। সে দেশে বহুলক্ষ লোক আজিও অনাহারে মরিতেছে কিন্তু চীন দেশের নিজ মাহাত্ম্য প্রচারকার্য্য অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে। আমরা ভারতবাসীগণ ঠিক পূর্ণ সমষ্টিবাদে বিশ্বাসী নহি। কিন্তু আমাদিগের নেতা জহরলাল নেহরু সেই পথের পথিক। তিনি সকল কার্য্য এই মহাজাতির নামে নিজ করায়ত্ত করিতে একান্ত ভাবে উদ্যোগী। তাঁহার রাজ্যের বিরাট্ বিরাট্ শহরগুলিতে লক্ষ লক্ষ ভিক্ষুক পথে ভিক্ষা চাহিয়া ঘুরিতেছে, বহু কোটি লোক বেকার অথবা প্রায়-বেকার। যাহাদিগের রোজগার আছে তাহারা অতি অল্প বেতন বা লাভে কাজ করিয়া কোন প্রকারে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া বাঁচিয়া আছে। প্রতি ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় বার্ষিক ৩০০ শত টাকারও কম এবং এই টাকা মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ক্রমাগত বৰ্দ্ধিত হারে মুদ্রিত হইয়া ক্রমশঃ ক্রয়শক্তি হারাইয়া ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের তুলনায় বর্ত্তমানে মূল্যে চার আনা প্রমাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক টাকায় এখন সাধারণতঃ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে চার আনার মাল মাত্র খরিদ করা যায়। সুতরাং ভারতীয় মানবের সমষ্টিগত স্বাধীনতা জহরলালের অধীনে অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গিয়া থাকিলেও ভারতের প্রায় সকল ব্যক্তির স্বাধীনতাই অন্ন-বস্ত্র-গৃহ-শিক্ষা-ঔষধ, দৈহিক-বৈষয়িক নিরাপত্তা—বাহিরের শত্রু হইতে আত্মরক্ষা—রাষ্ট্রীয়

অধিকার ইত্যাদি বহু ধারার অভাবে নিরাকার অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে। সমষ্টিগত ভাবে জহরলালের খাজনা ও মাশুলের দাবি ক্রমাগত মিটাইয়া ও তাঁহার আবদারে আমদানি-রপ্তানি ও অন্যান্য প্রকার ব্যবসা ক্রমাগত তাঁহার তাঁবেদারদিগের কব্জায় তুলিয়া দিয়া ভারতবাসীর অধিক লোকেরই অবস্থা অভাবের গভীরে নামিয়া চলিয়াছে। তাঁহার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দেশ-বিদেশের বহু তথাকথিত বিশেষজ্ঞের দ্বারা রচিত-সজ্জিত-বর্দ্ধিত-কর্ত্তিত হইয়া নিত্য নবরূপে ভারতবাসীর স্বাধীন প্রয়াসের পথে নূতন নূতন বাধার সৃষ্টি করিয়া ব্যক্তির জীবনযাত্রা ক্রমশঃ অসহ্য অভাবের তাড়নায় দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিতেছে। রুশ তাহার জাতীয় গৌরববৃদ্ধি করিয়া ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক অভাবের কিছু প্রতিদান দিয়াছে। চীন তাল ঠুকিয়া এক সময় অভিযানের অভিনয় করিয়া ব্যক্তিকে গতির আবেগে অভাববোধশূন্য অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে। ভারত-নেতা জহরলাল অন্তরে কম্যুনিস্টবাদ ধারণ করিয়া বাহিরে ব্যক্তির স্বাধীনতা মানিয়া লইয়া দুই নৌকায় পদ রক্ষা করিয়া অতি ধীরে গতিমান। কোন্ পথের যাত্রী তিনি তাহা কেহ বলিতে পারে না। অনেকগুলি কারখানা তিনি স্থাপন করিয়াছেন অতিরিক্ত ব্যয় ও বিদেশে বহু অর্থ কর্জ্জা করিয়া। অনেকগুলি খাল কাটিয়াছেন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা বিদেশীর সাহায্যে কিছু কিছু হইয়াছে। কর্জ্জার তুলনায় কার্য্য তত টা হয় নাই এবং পন্থা ও পদ্ধতির ধাক্কায় দেশের পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য ক্ষুদ্র, বৃহৎ কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে ও আরও যাইতেছে। মোট লাভ-লোকসানের হিসাব কেহ করে নাই এবং ভারত সরকারের ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নীতির পরিস্থিতিতে হিসাব সম্ভবও নহে। সাধারণ ভাবে মনে হয় জহরলালের রীতিনীতি ব্যক্তি-স্বাধীনতা-বিরোধের উপরই ক্রমশঃ সুগঠিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে এবং আর কিছুকাল এই ভাবে চলিলে সকল ব্যক্তিই ভারত সরকারের যে কয়টি চাকুরির সৃষ্টি হইবে, সেই কয়টি ভাগ বাট করিয়াই দিন গুজরান করিতে বাধ্য হইবেন। অধিকাংশের ভাগেই কিছু জুটিবে না— সরকারী, ভিক্ষার অন্ন ব্যতীত। প্রাইভেট বা ব্যক্তিগত ভাবে যাহা গড়িয়া উঠিবে তাহা মূলতঃ লোক দেখাইবার জন্যই থাকিবে এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মালিক হইবে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি, যাঁহারা দেশনেতার সাহায্যে অতি গোপনে আত্মনিয়োগ করিবেন। "প্রাইভেট" কথাটির অপর অর্থ "গুপ্ত"। ভারতের অর্থনীতি প্রকাশ্য ও গুপ্ত এই দুই ধারায় চলিবে বলিয়া মনে হয়। গুপ্ত কারবার ও ব্যবসায় বাছাই করা ব্যক্তিদের হস্তে রাখা হইবে এবং তাহারা কালো-বাজার ও অপরাপর বেআইনী উপায়ে গুপ্ত উপায়লব্ধ অর্থে নিজেদের ও রাষ্ট্রীয় দলের পুষ্টি সাধন করিবে। ভারতের দেশরক্ষা—ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা—মানবের সম্মান রক্ষা প্রভৃতি কোন কিছুর গৌরবই আজ নাই। আর্থিক অবস্থা টলায়মান। কিসের আগ্রহে কোন্ আদর্শের প্রভাবে জহরলাল চলিতেছেন তাহা কেহ দেখিতে পাইতেছে না। অসম্মান ও অভাব সকলের ভাগ্যে পূর্ণ মাত্রায় জমা হইতেছে। ভারতীয় মানব স্বাধীনতা, সম্মান, সচ্ছলতা হারাইয়া পঙ্গু অবস্থায় পড়িয়া আছে।

অ

জার্ম্মানীর ফেডারাল রিপাবলিক

পশ্চিম জার্ম্মানীর অর্থসচিব ডাঃ লুডভিগ এরহার্ট তাঁহার "প্রসপেরিটি থ্রু কম্পিটিশন" (প্রতিযোগিতা অবলম্বনে ঐশ্বর্য্য আহরণ) পুস্তকে তিনি কি ভাবে ও কোন্ আদর্শে পশ্চিম জার্ম্মানীর জনসাধারণের বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যের পরিকল্পনা করিয়া অসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই অপরাপর অর্থনৈতিক পণ্ডিতগণ যে-সকল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেন, সেই সকল ধারণা যাচাই করিয়া দেখিলেন যে, সকল ব্যক্তির সমান আয় অথবা অধিক রোজগারী ব্যক্তিদিগকে ট্যাক্স বাড়াইয়া তাহাদিগকে গরীবের সমান সমান করিয়া দেওয়া; এবং রাষ্ট্রীয় ভাবে সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও অধিকাংশ মূলধন করায়ত্ত করিয়া জনসাধারণের জীবন ঐশ্বর্য্যময় হইতে পারে না। সুতরাং তিনি তথাকথিত "সোসিয়ালিজম্" বর্জ্জন করিয়া সেই সত্যকার "সোসিয়ালিজম্"এর দিকে নিজ জাতিকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন যে সোসিয়ালিজম্ প্রতিযোগিতাকে পূর্ণরূপে জাগ্রত রাখিয়া এবং শ্রমজীবী শোষণ বন্ধ করিয়া দিয়া, সকল মানবের হস্তে জাতীয় ক্রয়শক্তি উপযুক্ত ও ন্যায়তঃ অর্জ্জিত ভাবে তুলিয়া দিয়া সকলের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ সচ্ছল হইতে সচ্ছলতর করিয়া তোলে। যাঁহারা ধন উৎপাদনের ক্ষেত্রে মালিকের পদে রহিলেন তাঁহাদিগের অসামাজিক ও অন্যায় কার্য্য করা পশ্চিম জার্ম্মান রাষ্ট্রে ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিল। ন্যায় ও ধর্ম্ম পূর্ণরূপে মানিয়া চলিয়া এবং সকল কর্ম্মীকে নিজ নিজ অর্জ্জিত সম্পদ্ যথাযথভাবে দিয়াও যে ব্যক্তিগত বেসরকারী ধননীতি চলিতে পারে পশ্চিম জার্ম্মানী জগৎকে তাহা দেখাইয়া দিল। সকল মূলধন

রাষ্ট্রের হইবে এবং কর্মীগণ রাষ্ট্রের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যমাত্র হইয়া হুকুম তামিল করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিবে; ভোগে, ব্যবসায়ে, বৃত্তিচয়নে অথবা সাধারণ ভাবে চিন্তায়, কর্ম্মে ও ব্যবহারে রাষ্ট্রের নিয়ম মানিয়া নিজ ব্যক্তিত্বকে বলিদান দিয়া সকলকে চলিতে হইবে; এই জাতীয় চিন্তার ধারা ও আর্থিক বিলিব্যবস্থা আজ পুরাতন পন্থা বলিয়া পশ্চিম জার্ম্মানী প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড, জাপান ও অপরাপর জাতিদিগের জীবনেও আদর্শ-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে এবং সকলেই প্রায় ট্যাক্স, খাজনা, চাকুরি, তলব ও লম্বা লম্বা নিষেধের ইস্তাহার ভুলিয়া স্বাধীন ও মুক্ত ভাবে কর্ম্ম ও ভোগকে সমান ওজনে সম্মুখে রাখিয়া ঐশ্বর্য্য লাভের নূতন পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্টালিন, হিটলার অথবা নেহরুর অর্থনীতি আজ বাতিল হইতে চলিয়াছে এবং উচ্চ আয়-কর, মূলধনকর, এবং নিষেধ ও ছাড়পত্রের যুগ আজ পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

পশ্চিম জার্ম্মানী আজ যাহা দেখাইয়াছে তাহার একটু সহজ পরিচয় ডাঃ এরহার্ট তাঁহার পুস্তকে দিয়াছেন। ১৯৪৯ হইতে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহারা জার্ম্মানীর জাতীয় আয় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মূল্যে বিচার করিয়া দেখাইলেন যে, জাতীয় আয় কিভাবে বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাহা নিম্নে দেখান হইল:

মোট জাতীয় আয় (১৯৩৬ সনের মূল্যের হিসাবে)
(শতকোটি ডিঃ এম এ)

১৯৩৬	১৯৪৯	১৯৫০	১৯৫১	১৯৫২	১৯৫৩	১৯৫৪	১৯৫৫	১৯৫৬
৪৭.৯	৪৭.১	৫৪.৮	৬২.৭	৬৬.৭	৭১.৬	৭৭.৫	৮৫.৮	৯১.৯

ভারতীয় টাকার হিসাবে পশ্চিম জার্ম্মান জাতি ১৯৩৬ হইতে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত আয় হ্রাস সহ্য করিয়া তৎপরে ৭ বৎসরে আয় দ্বিগুণ করিয়া ৫,০০০ কোটিকে ১০,০০০-তে পরিণত করিল। অর্থাৎ সংখ্যায় ভারত অপেক্ষা কম-বেশী এক সপ্তমাংশ হইলেও আয়ের দিক্ হইতে এই জাতি ভারত অপেক্ষা বহুগুণ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছে। ১০,০০০ কোটি ১৯৩৬-এর মূল্যে যাহা হয়, ভারতীয় মূল্যের হিসাবে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাহা প্রায় ৩০,০০০ কোটিতে দাঁড়ায় বলা চলে। অর্থাৎ লোকসংখ্যার অনুপাতে পশ্চিম জার্ম্মানীর জনসাধারণের গড়পড়তা আয় ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জনসাধারণের তুলনায় প্রায় ২১ গুণ হইয়াছিল। ভারতের এক ব্যক্তি যে স্থলে এক বৎসরে ২৫০৲ টাকা লইয়া অর্দ্ধাহারে ধুঁকিতে থাকিত পশ্চিম জার্ম্মান মানব সেই স্থলে ৫,২৫০৲ পাইত।

ডাঃ এরহার্ট বলিতেছেন, "এই অবস্থা দেখিয়া বুঝা যাইবে যে, আমাদিগের অর্থনৈতিক আদর্শ আমাদিগকে যে ভাবে সফলকাম করিয়াছে, তাহাতে কেহই কোনরূপ খুঁত বাহির করিতে পারিবেন না। জাতীয় আয় ক্রমাগত বাড়াইয়া চলাই আর্থিক ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ পন্থা। যেটুকু আয় হইতেছে তাহার ভাগ-বাট লইয়া কচ্‌কচির কোনই সার্থকতা থাকে না, যদি না জাতীয় সম্পদ্ যথেষ্ট হয়।" অর্থাৎ পণ্ডিত নেহরুর যে ঐশ্বর্য্যের সমবিভাগের আদর্শ, তাহাতে ঐশ্বর্য্য না থাকাতে, দারিদ্র্যের সমবিভাগ বলিয়া ঘোষণা করিলে ভুল হয় না। ভারতের বর্ত্তমান অর্থনীতিতে বৃহৎ বৃহৎ যে সকল গলদ আছে তাহার মধ্যে জুয়াচুরি-সংরক্ষণ ও সত্যকর্ম্মী-ধর্ষণ দুইটি অতিকায় গলদ। ভারত যতদিন দুষ্টের ও ধৃষ্টের দমন না করিয়া শুধু শিষ্ট ও শ্রমশীল কর্ম্মীদিগকে তাড়াইয়া রাজকার্য্য চালাইবে, ভারতের ততদিন কোন উন্নতি হইবে না। অ

নেহরুর ভোট অভিযান

কিছুকাল পূর্ব্বে পণ্ডিত নেহরু রাঁচিতে কংগ্রেসের গুণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছিলেন। এক বিরাট্ সভার ব্যবস্থা করা হয় রাঁচির "প্যারেড" ময়দানে। এইখানে প্রায় ৩,০০০ পুলিশ গোয়েন্দা সাদা খদ্দরের জামা, কাপড়, টুপি পরিয়া কংগ্রেসীর ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। আরও বহু সহস্র আদিবাসী ও অপরাপর সাধারণ পণ্ডিতকে দর্শন করিতে উক্ত স্থানে গমন করেন। যথার্থ কংগ্রেস কর্ম্মীগণ নিজেদের তৈলাক্ত টুপি ও ঘর্ম্মাক্ত-অপৌত বস্ত্রশোভিত হইয়া বিলাসিতা বর্জ্জনের বিজ্ঞাপন-রূপে সেই স্থলে বহু সংখ্যায় হাজির হইয়াছিলেন। গোয়েন্দাদিগকে সহজেই সনাক্ত করা সম্ভব ছিল কেননা তাঁহারা অত্যন্তই পরিষ্কার বস্ত্রে সজ্জিত ছিলেন। পণ্ডিত নেহরু যখন আসিলেন তখন সেখানে জনতা প্রায় ৫০,০০০ হাজার। তিনি ইতস্ততঃ হস্ত উত্তোলন করিয়া সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া "মাইকের" নিকটে গিয়া হিন্দী ভাষায় অভিভাষণ দিতে যখন আরম্ভ করিলেন, জনতা তখনই উঠিয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। গোয়েন্দা ও কংগ্রেস কর্ম্মীগণ সকলকে বসিতে বলাতে তাহারা উত্তর দিল, "দর্শন তো হো গয়া, বাত শুনকে ক্যা হোগা—সমঝতা ভি নেহি।" পণ্ডিত হতাশ হইয়া বসিয়া রহিলেন; তাঁহার বাণী অনুচ্চারিত রহিয়া গেল।

অ

ভাবেজীর ভাবান্তর

শ্রীনরেন্দ্র দেব

শ্রদ্ধেয় বিনোবাজী ভাবে সন্ন্যাসী মানুষ। কিন্তু উদাসী নন। তিনি সর্বত্যাগী। কিন্তু প্রেমকে ত্যাগ করেন নি। স্বজাতির প্রতি মমতা থেকেও মুক্ত হ'তে পারেন নি। সর্বোদয় আন্দোলনের নেতৃত্ব করছেন। বিবিধ যাচনার আবেদন নিয়ে সারা ভারতে পদযাত্রা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বলছেন, যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভূমির মালিক, ভূমিহীনদের জন্য দাও তার কিছু অংশ ছেড়ে। যারা প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক, নিঃস্ব ভাইদের জন্য দাও কিছু ধনরত্ন দান। অলস বিলাসে দিনযাপন করছ যারা, এস এগিয়ে, দেশের কল্যাণের জন্য শ্রমদান কর। কে আছ অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক, দেশের জন্য জীবন দানে এগিয়ে এস। বিধাতার দেওয়া এই আলোক ও বাতাস যেমন কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, নদনদীর জল যেমন কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সূর্য-কিরণ এবং চাঁদের আলো যেমন কারুর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তেমনি ভগবানের সৃষ্ট এই পৃথিবীর মাটির উপর সকলেরই সমান অধিকার। ভূমিতে কারুর একচেটে স্বত্ব স্বামিত্ব স্বীকৃত হ'তে পারে না।

বিনোবাজী আশা করেন, ভূস্বামীরা এ আবেদনে অবশ্যই সাড়া দেবেন। অর্থের স্তূপের উপর যাঁরা ব'সে রয়েছেন, দুর্ভাগা দেশবাসীদের দারিদ্র্য ও দুর্দশা প্রত্যক্ষ ক'রে এগিয়ে আসবেন তাঁরা গরীবের অপহৃত ধন ফিরিয়ে দিয়ে তাদের দুঃখ দূর করতে। বিনোবাজী চান, উন্মার্গ-গামী মানব-হৃদয়ের পরিবর্তনসাধন করতে। এ পরিবর্তন রাষ্ট্রশক্তির বলপ্রয়োগের দ্বারা হবে না। অস্ত্রাঘাতের ভয় দেখিয়ে হবে না, আইনের সাহায্যেও হবে না। হবে—একমাত্র মানুষের মনে করুণা, মৈত্রী ও প্রেমভাব উদ্রিক্ত করতে পারলে।

বিনোবাজী মানুষের উপর বিশ্বাস হারান নি। তাদের বিলুপ্ত মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের চেষ্টায় তিনি গ্রামে গ্রামে, নগরে, জনপদে অক্লান্ত ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সন্ন্যাসীর আবেদন যাদের মর্ম স্পর্শ করছে, তারা নির্বিচারে নিয়ে আসছে এই ভিক্ষুর চরণতলে তাদের সাধ্যমত দানের অর্ঘ্য। কিছু ভূমি, কিছু অর্থও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু 'শ্রম' ও 'জীবন' দানের অভাব।

বহুলোক এ ব্যাপার দেখে বিস্মিত হচ্ছে। ভাবছে, দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা অনেকেই এই বৈরাগীর কথা মেনে নিচ্ছে কোন্ যুক্তিতে? এটা কি তবে কেবলমাত্র একটা সাময়িক হুজুগের বন্যা? না, এর মধ্যে যথার্থই কিছু সত্য আছে? কিংবা সাধুর সন্তোষসাধন ক'রে চতুর্বর্গ লাভের লোভ নয় ত?

এই বিজ্ঞান-অধ্যুষিত বর্তমান প্রগতিশীল জগতে, বিশ্বব্যাপী এই অর্থনীতির কঠিন সমস্যাসংকুল যুগে, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ধাক্কায় সারা পৃথিবীর মানুষের পা যখন অস্থির মাটির বুকে টলমল করছে, ভীরু দৃষ্টি মেলে তারা যখন চেয়ে দেখছে বিরুদ্ধ শক্তির হাতে ঝোলানো ভার-সাম্যের তুলাদণ্ডের কাঁটার হেলে পড়ার গতির দিকে, তখন দেখা যাচ্ছে এই পূর্বাঞ্চলে সাধু বিনোবাজীর সেজন্য কোনও দুশ্চিন্তা নেই। তিনি সর্বোদয়ের কল্পনায় অগ্রসর হয়ে চলেছেন। ভারতে শাসনহীন, শোষণহীন, দণ্ড-নিরপেক্ষ, বিকেন্দ্রীভূত সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার ব্রত গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, খেটে খাও। অন্যের শ্রমলব্ধ অন্নে অন্যায় ভাগ বসিও না।

এদিকে অহিংসাবাদী মহাত্মা গান্ধীর নাম নিয়ে কংগ্রেস আজ রাজদণ্ড হাতে পেয়ে গান্ধী-আদর্শ-বিরোধী রাষ্ট্রনীতি অনুসরণ ক'রে চলেছেন। গান্ধী-শিষ্য বিনোবাজী এদের স্বপক্ষে আপন বিবেকের সমর্থন খুঁজে পাচ্ছেন না। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ভুল সংশোধনের চেষ্টা ক'রে তাঁদের বিরাগভাজন হ'তেও চান না। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রধানমন্ত্রী নেহরুর শ্রদ্ধাবিনম্র প্রণতি পেয়েই তিনি পরিতুষ্ট। কংগ্রেস ও সর্বোদয়ের ভিন্নমুখী কর্মাদর্শের প্রতিযোগিতামূলক সহাবস্থান তিনি মেনে নিয়েছেন।

বাংলা দেশের অধিকাংশ চিন্তাশীল সংস্কৃতিবান উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায় বিনোবাজীর এই সর্বোদয় আন্দোলনকে নিতান্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে তাচ্ছিল্য না করলেও ওটা যে দেশকে বর্তমান যুগে এগিয়ে নিয়ে যাবার একটা কার্যকরী উপায়, এটা তাঁরা কোনও যুক্তি দিয়েই বিশ্বাস করতে পারছেন না। একমাত্র এদেশের গ্রাম্য-পরিবেশে বর্ধিত, স্বল্পশিক্ষিত, প্রাচীনপন্থী, এবং অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসী

ধর্মভীরু মানুষ ছাড়া আর কেউ বিনোবাজীর এই আন্দোলনকে এক কল্পনাবিলাসী রাজনৈতিক সাধুর দিবাস্বপ্ন ভেবে কোনও আমলই দিতে চাইছেন না।

বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় কল্পনাবিলাসী যতটা, বাস্তবানুরাগীও ততটা। অসম্ভবের রাজ্যে যেটুকু সম্ভাব্য সেইটুকু মাত্র তাঁরা মানতে চান। তার বেশি অগ্রসর হওয়াকে তাঁরা রূপকথার রাজ্যে ঘুরে বাতাসে দুর্গ রচনার অসার্থক চেষ্টা ব'লে মনে করেন। অল্প কয়েকজন অন্ধবিশ্বাসী আদর্শবাদী শিক্ষিত লোক ছাড়া, এই মহা-ভিক্ষুর দেশব্যাপী যাচন-যজ্ঞের ভিক্ষাপাত্র বহন ক'রে ঘুরে বেড়াবার আন্তরিক প্রেরণা অনুভব করছেন না কেউ।

বছর পাঁচ-ছয় আগে বিনোবাজী একবার পদযাত্রা ক'রে যখন বাংলায় এসেছিলেন, বাংলা দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে তিনি আমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন এবং সর্বোদয় আন্দোলনের স্বপক্ষে তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদের কাছে ভূমিদান চাই না। সম্পত্তিদান চাই না। গ্রামদানও চাই না। আমি চাই তোমাদের 'কলম'। সাহিত্যেরই প্রভাব মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের বিশেষ সহায়ক। সাহিত্য মানুষকে নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করছে। বিশ্বের বহু বিপ্লবের মূলে সাহিত্যই দেশে দেশে মানুষকে প্রেরণা যুগিয়েছে। শাসকদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহিত্যিকেরাই চিরদিন সাহস ক'রে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। তোমাদের কলম যদি আমার এই আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে আসে, আমার বিশ্বাস সর্বোদয়ের আদর্শ সহজেই সার্থক হয়ে উঠবে।

বাংলার সাহিত্যিকবৃন্দ বিনোবাজীকে সেদিন কোনও প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নি। তাঁরা বলেছিলেন, কারও অনুরোধে-উপরোধে কখনও সাহিত্যসৃষ্টি হ'তে পারে না। সর্বোদয় আন্দোলন যে পর্যন্ত না তাদের মনকে নাড়া দিতে পারছে, সে পর্যন্ত তাঁদের কলম এতে সাড়া দেবে ব'লে মনে হয় না। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাংলা দেশের কোন নেতাকেই সাহিত্যিকদের ডেকে বলতে হয় নি তোমরা তোমাদের কলমের দ্বারা এ আন্দোলনকে দেশময় প্রচারে সাহায্য কর। নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের দুর্বার আকর্ষণে দেশ জুড়ে সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন কত গান, কত কবিতা, কত কাহিনী, কত প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, গাথা ও নাটক যা আজও বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। প্রচারের মুখাপেক্ষী হ'তে হয় নি সে আন্দোলনকে। কারণ বিপ্লব দেশের মর্মমূল থেকে স্বতোৎসারিত হয়েছিল।

বিনোবাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ফিরে এসে সাহিত্যিকেরা কেউই সর্বোদয় আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নি। কবি ও সাহিত্যিকেরা সাধারণতঃ একটু ভাবালু হন বটে, কিন্তু এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমই দেখা গেল। একমাত্র শ্রীতারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন পরে তাঁর একটি রচনায় এ বিষয়ে কিছুটা বলবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে অনুরোধের লেখা পাঠকের মন স্পর্শ করতে পারে নি।

যা অতি-মানবীয় তা অতিমানস-সম্পন্ন লোকেরাই গ্রহণ করতে পারেন। ভগবান্ গৌতমবুদ্ধের পদাংক অনুসরণ ক'রে করুণা, মৈত্রী ও প্রেমের বার্তা নিয়ে দেশে দেশে ভ্রমণ করছেন, কিন্তু প্রশ্ন জাগে, প্রভু বুদ্ধের সে কল্যাণ প্রবর্তনা স্থায়ী মঙ্গল আনতে পারলে না কেন? অর্হতের 'অহিংসা পরমোধর্ম' মন্ত্রে দীক্ষা নেবার পরও ভারতে যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যা ও হিংসা ত বন্ধ হয় নি! ভগবানের পুত্র প্রেমাবতার যীশুখ্রীষ্টের পরম ভক্ত অর্ধেক পৃথিবীর মানুষ, কিন্তু, সদা প্রভুর 'দশটি আজ্ঞার' কোনটিই প্রায় আজ আর তারা মেনে চলছে না। বেশিদিনের কথা নয়। মাত্র সাড়ে চারশ' বছর আগে প্রেমের ঠাকুর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাংলা দেশে আদর্শ প্রেমধর্ম প্রচার ক'রে গিয়েছিলেন, 'মেরেছ কলসীর কানা তা ব'লে কি প্রেম দিব না?' কিন্তু কোথায় আর আমাদের মধ্যে সেই 'তৃণাদপি সুনীচেন' বৈষ্ণব ভাব?

শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়েদের শেখান হ'চ্ছে, সদা সত্য কথা বলিবে, কদাচ মিথ্যা বলিও না। না-বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয়। তবু, দেশসুদ্ধ লোক আজ চোর হয়ে উঠল কেন? দিন দিন বালক ও বয়স্ক অপরাধীর সংখ্যা সর্বত্র বেড়েই চলেছে। ভারতবর্ষে যুগে যুগে মহাপুরুষ ত বড় কম আবির্ভূত হন নি? কিন্তু কোথায় মিলিয়ে গেল তাঁদের দৈবী প্রভাব? পৃথিবী আজ দ্রুত বদ্লে চলেছে। মানুষের সামনে আর বিশ্বাস করবার বা নির্ভর করবার মত উচ্চ আদর্শ কিছু নেই। হিরোশিমা ও নাগাসাকির নরমেধ যজ্ঞ তাই আজও সম্ভব হচ্ছে। গীতাপ্রবচনের প্রবক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্ররোচনাতেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সম্ভব হয়েছিল। মানুষ অর্জুন জ্ঞাতিবধে সম্মত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অন্ধভক্তির বশেই শেষ পর্যন্ত হত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এঁর কূটবুদ্ধির প্রভাবে সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরও

দ্বিধাগ্রস্ত চিত্ত নিয়ে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে অন্ধ ভক্তি ও বিশ্বাস মানুষকে অনভিপ্রেত পথেও পরিচালিত করতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার ও আমেরিকার বর্ণবিদ্বেষ সাদা-কালো মানুষের মধ্যে এমন প্রচণ্ড বিভেদ আনতে পারত না, যদি 'প্রতিবেশীকে ভালবাস' এ সদুপদেশ মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তনসাধনে সক্ষম হ'ত।

বিনোবাজী তাঁর ভাষণে পুরাণ প্রভৃতি থেকে প্রায়ই অতীতের দৃষ্টান্ত তুলে তুলে দেখান। কিন্তু,তিনি ত জানেন, অতীতকে আর ফেরান যায় না। চলমান কালস্রোতে যা ভেসে চলে যায় তাকে পুনরায় ফিরে পাবার আশা দুরাশা মাত্র। বিনোবাজীর দীর্ঘ দশ বৎসরের নিরলস চেষ্টায় দেখা যাচ্ছে, তাঁর দেশ-দেশান্তর ঘুরে যাচনা ক'রে বেড়ানটা আংশিক সাফল্য লাভের গৌরব অর্জন করতে পেরেছে। এ কথা বহু সভায় উচ্চকণ্ঠে তিনি ঘোষণাও করেন। ধ'রে নেওয়া গেল, অনেক ভূমি তিনি পেয়েছেন, বেশ কিছু মোটা টাকাও তাঁর হাতে এসেছে। অনুরাগী ভক্তরা তাঁর কাজে শ্রমদানেও কাতর নন। হয়ত কোনও কোনও 'ফ্যানাটিক' বা উৎকট গোঁড়াভক্ত আচার্যের আদেশে জীবনদানেও প্রস্তুত! কিন্তু, এতে হ'ল কি? সর্বোদয়ের উদয় এ পূব আকাশে আজও লোকচক্ষুর অগোচর!

কোনও বিরাট্ কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনায় এ ধরনের মত সাফল্য নিতান্ত সাময়িক উত্তেজনার উত্তাপ মাত্র! সুতরাং ক্ষণস্থায়ী। বারো বছরের কংগ্রেস শাসন আমাদের কি দিয়েছে তার সঙ্গে তুলনা ক'রে দশ বৎসরে বিনোবাজীর 'সর্বোদয়' আমাদের কি দিয়েছে দেখলে বোঝা যায়, 'এক ভস্ম ছাই আর, দোষ-গুণ কব কার?' তবু 'কংগ্রেস' কয়েকটা বড় কাজ আমাদের চক্ষের সামনে খাড়া ক'রে তুলেছেন। কিন্তু, বিনোবাজী দেখি শুধু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল ব'সে স্বাক্ষর দিয়ে দিয়ে হাজারে হাজারে 'গীতা প্রবচন' বিক্রয় করছেন এবং ভূদান, সম্পত্তিদান ও শ্রমদান সম্পর্কে দণ্ড কালের জন্য জনসাধারণকে অতি মনোরম জনপ্রিয়-ভাষণ উপহার দিচ্ছেন। তার পরেই ছুটচেন আর এক জনপদে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে।

এই ভারতবর্ষের উর্বর মাটিতেই দেখি, একদা যাঁরা মহাপুরুষদের চেলা বা চারা রূপে দেখা দেন, তাঁরাই কালক্রমে হয়ে ওঠেন মহীরুহ বা বনস্পতি। জনসাধারণের মধ্যে এঁরাই প্রচার করেন ন্যায়, ধর্ম, সত্য, সুনীতি। সৎপথে সাধু জীবনযাপনের প্রেরণা পায় মানুষ এঁদেরই কাছে। তাই সাধুসন্ত দেখলেই এদেশের মানুষেরা তাঁদের পিছু পিছু ছোটে। তাদের আশা যদি সাধুর কৃপায় বরাতটা ফিরে যায়। সাধুকে প্রসন্ন করবার চেষ্টায় প্রাণপণে তাঁর সেবায় লাগে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সব সাধুদের দেহত্যাগের পর তাঁদের পুণ্যপ্রভাব জনসাধারণের মধ্যে ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কয়েকজন দীক্ষিত শিষ্যের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে, এই সব সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গলাভের কিছুটা সার্থকতা আছে। এঁদের পুণ্যপ্রভাব স্থায়ী না-হলেও, মানব-সমাজের কিয়দংশের সাময়িক কল্যাণসাধনে এঁদের আবির্ভাব নিরর্থক নয়।

অবশ্য এ প্রশ্ন অনেকে তুলতে পারেন যে, এদেশের অধিকাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় তর্ক, বিচার ও যুক্তির মানদণ্ডে মহাপুরুষদের উক্তির সত্যাসত্য বিশ্লেষণ ক'রে, সম্যক্‌ভাবে ভেবে ও বুঝে তা গ্রহণ করতে পারেন না বা চান না। কারণ তাঁদের ধারণা, 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর!' আবার জনকয়েক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকেও দেখা যায়, কোনও কোনও সাধুর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখে তাঁরা সেই মহাপুরুষদের একান্ত অনুগত হয়ে পড়েন। তাতে, আপাত কল্যাণ কিছু দেখা গেলেও শেষ পর্যন্ত তা শুভফল প্রসব না ক'রে কেবল কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসকেই বাড়িয়ে দিয়ে যায়। এর প্রমাণ পাই আমরা পরবর্তীকালের মানব-সমাজের মধ্যে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও শোচনীয় নৈতিক অধঃপতনের প্রসার দেখে।

আজ ভারতের এই অতিবড় দুর্দিনে ইতিহাসের কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিনোবাজীকে একজন দৈবপ্রেরিত ত্রাণকর্তা ব'লে নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারি? অন্ধবিশ্বাস মানুষকে শেষ পর্যন্ত অন্ধকূপের মধ্যেই টেনে নিয়ে যায়। যুক্তি তর্কের বাইরে দাঁড়িয়ে অনেক সময় যে বস্তুকে আমরা মেনে নিই তা শেষ পর্যন্ত এক মরীচিকা বলেই প্রমাণিত হয়। যা পাবার জন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে মরণের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়, সেখানে পৌঁছবার সহজ পথ কিছু নেই। তর্কে যেটা বহুদূর, সেটাকে সঠিক ভাবে জানতে হলে বহু দূরেই আমাদের যেতে হবে। মহৎ-প্রাপ্তি সুলভ নয় এবং তা অর্জনের কোনও সুগম উপায়ও নেই। সাগর পার হ'তে হ'লে অর্ণবপোতে পাড়ি দিতে হবে। সাঁতার দিয়ে সমুদ্র পার হওয়া যায় না।

কিছুদিন থেকে বিনোবাজীর নানা উক্তির মধ্যে এমন কিছু দায়িত্বজ্ঞানের অভাব প্রকাশ হয়ে পড়ছে যা মানুষকে

শুধু বিস্মিতই নয়, রীতিমত শঙ্কিত করেও তুলছে। তিনি বলছেন, ভারতের প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ছুটি দাও। সামরিক বিভাগ বিলোপ কর। সিপাহীরা সব হাতিয়ার ফেলে দেশে ফিরে গিয়ে আনন্দে চাষ-বাস করুক, কুটির-শিল্প প্রসারে নিযুক্ত হোক। কিন্তু যে দেশের সীমান্তে এসে পাকিস্তানী সেনারা ঘন ঘন উৎপাত করছে, কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ প্রায় জবরদখল ক'রে ব'সে আছে; চীন সৈন্য যেখানে ভারতের উত্তর সীমান্তের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে কয়েক হাজার বর্গমাইল ভূমি অধিকার ক'রে নেপাল সিকিম ভুটানের দিকে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করছে; সেখানে বিনোবাজীর এই উপদেশ মেনে চলা যে কতবড় বিপজ্জনক, একথা একটা স্কুলের ছেলেও বোঝে। বিনোবাজীর মুখে একথা শুনে তাই অবাক্ লাগে আমাদের। ধর্মোন্মাদনা অনেক সময় দেশের ও জাতির সর্বনাশই ডেকে আনে। বিনোবাজীর প্রতিরক্ষাবাহিনী তুলে দেওয়ার কথা শুনে একটা শোচনীয় ঘটনা মনে পড়ছে। কোনও একটি প্রচণ্ড গুরুভক্ত শিষ্য অকস্মাৎ সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসক এসে বললেন, রোগ কঠিন। এখনি হাসপাতালে নিয়ে যান। শিষ্য বললেন, জয়গুরু! হাসপাতালে যাব না! গুরুদেবকে খবর দাও। সাধ্বী পত্নী ছুটলেন গুরুদেবের কাছে। গুরুদেব বললেন, ভয় নেই, সেরে যাবে। এই পাদোদক নিয়ে যাও। দিনে চারবার ক'রে বিল্বপত্রে ভিজিয়ে খাওয়াবে। ঔষধপত্র ও চিকিৎসার কোনও প্রয়োজন নেই। পত্নী দৈবশক্তিতে গভীর বিশ্বাসী। পরম ভক্তিভরে 'জয়গুরু' ব'লে সেই পাদোদক দিতে লাগলেন। রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে এল। অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় তিনদিনের দিন তাঁর অকালমৃত্যু ঘটল। যাবার সময় একবার 'জয়গুরু'ও উচ্চারণ হ'ল না মুখে। সেনাবাহিনী সম্বন্ধে বিনোবাজীর আদেশ পালন করলে, অবস্থা এইরকম সঙ্কটাপন্ন হবারই আশঙ্কা আছে।

বিনোবাজী বলেন, দেশে যে দিন দিন বেকার সংখ্যা বেড়ে চলেছে এর কারণ দেশসুদ্ধ লোককে উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। উচ্চশিক্ষা বন্ধ ক'রে দিয়ে সকলকে শুধু বুনিয়াদী শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দাও। 'নঈয়া তালিম' নিয়ে তারা দৈহিক শ্রমের কাজে লেগে যাক। কৃষি, কুটীর-শিল্প, কায়িক মজুরি, ছোটখাটো ব্যবসায় আত্মনিয়োগ ক'রে সকলে আত্মনির্ভরশীল হোক। চাকরির মোহ থেকে সকলকে মুক্ত ক'রে দাও। নিজেরা নিজেদের প্রতিপালন করতে শিখুক।

বিনোবাজীর এ আদেশ পালন করলে শিক্ষা সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বর্তমান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় শুধু যে অনেক পিছিয়ে পড়বে তাই নয়, সারা দেশটাই চাষী মজুর কারিগর আর বেনে ব্যাপারির বাসস্থান হয়ে উঠবে। তার ফলে আজকের পৃথিবীতে কি আমাদের সম্মান ও গৌরব কিছু বাড়বে? শিক্ষার আলোয় অজ্ঞানতার অন্ধকার যদি দূর না হয় তবে আরও বহুবিধ কুসংস্কারের অস্বাস্থ্যকর প্রভাব আমাদের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠবে না কি?

বিনোবাজী বলেন, 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' মহাপাপ। এ পাপকে প্রশ্রয় দিলে নাকি জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরেরা দুর্বল ও ক্ষীণজীবী হয়ে পড়বে। শুধু তাই নয়, আগামী-কালের নরনারীরা স্বাস্থ্যহীন ও স্নায়ুবিকারগ্রস্ত হয়ে উঠবে।

ভাবেজীর এই উদ্ভট আশঙ্কা বর্তমান বৈজ্ঞানিকদের বিচারে সম্পূর্ণ কুসংস্কারপ্রসূত। সুতরাং সমর্থনযোগ্য নয়। ভাবেজীর গুরুদেব গান্ধীজী নিজে যদিও বহু সন্তানের জনক ছিলেন, তথাপি বহু সন্তানের জন্মদানের বিরোধী ছিলেন তিনি। তবুও কিন্তু জন্মনিয়ন্ত্রণপ্রথা তিনিও সমর্থন করেন নি। তিনি মানুষের সৎবুদ্ধি ও সুবিবেচনাপ্রসূত সংযম ও ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা প্রজনন বন্ধের পক্ষপাতী ছিলেন। গুরু-শিষ্য উভয়েরই উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্যত এ উপদেশ প্রতিপালিত হওয়া যে সম্ভব নয়। কারণ প্রকৃতির ধর্ম এড়িয়ে চলা যৌবনের পক্ষে সহজসাধ্য নয়। আয়াসের দ্বারা মন্দ জৈব স্বভাব মানুষের মধ্যে সুপ্ত থাকলেও একেবারে লুপ্ত হয় না। মহামুনি পরাশর তাই মৎস্যগন্ধাকে দেখে আত্ম-সম্বরণ করতে পারেন নি। মহাভারত এর সাক্ষ্য দিচ্ছে।

কঠোর দৈন্য ও অভাবের এই যন্ত্রণাময় জীবনযাত্রার যুগে মানুষ যখন দু' একটি সন্তানের মুখেই অন্ন যোগাতে পারছেন না, তখনও সে যদি স্ত্রী-সহবাসে সংযত হ'তে না পারে, কারণ ঐটুকুই তাদের বঞ্চিত-জীবনের বিনাব্যয়ে একমাত্র উপভোগ্য আনন্দ, তার ফলে যদি সাত-আটটি পুত্র-কন্যার জনক হয়ে বসে, তাদের ক্ষুধার অন্ন, পরিধেয় এবং শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়, দারিদ্র্য দুঃখ তাদের বেড়েই চলে, এক্ষেত্রে তাদের ব্রহ্মচর্য পালনের সদুপদেশ না দিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের বৈজ্ঞানিক সুযোগ নিতে বলাই কি বিচক্ষণতা ও সুবিবেচনা নয়? অথচ দেখতে পাই, বিনোবাজী বিজ্ঞানকে জাতীয়-জীবনের উন্নতির পক্ষে একটি প্রয়োজনীয় উপায় বলেও স্বীকার করেন।

তার এই 'শ্যাম' ও 'কুল' দুই রাখার নীতি তাই আমাদের বিভ্রান্ত করে।

কিন্তু এ দেশটা ভারতবর্ষ। এর মাটিতে ভক্তির পরমাণু ছড়ানো রয়েছে। সাধুসন্তের উপদেশ নির্বিচারে নির্ভুল ব'লে মেনে নেবার জন্য এদেশের মানুষেরা উন্মুখ হয়ে থাকে। পাঁজিতে 'যোগের' খবর দেখলে বা চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণের লগ্ন পেলে এদেশের লক্ষ লক্ষ নর-নারী গঙ্গাস্নান করতে ঘটি-বাটি বেচেও ছুটে আসে। 'গোবিন্দ-দ্বাদশীর' খবর পেলে শ্রীক্ষেত্র ছুটে যায় সমুদ্র-স্নানে। মকর-সংক্রান্তির দিন হাজির হয় সাগর-সঙ্গমে একটা ডুব দিয়ে জন্ম-জন্মান্তরের সঞ্চিত পাপ ধুয়ে ফেলবার আশায়। তীর্থস্নান সেরে ফিরে এলে, তাদেরই যখন দেখি পূর্বের মতই নানা অভ্যস্ত পাপে আবার অসঙ্কোচে লিপ্ত হয়েছে, তখন বুঝি মানুষের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসও তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

পাপ-পুণ্যের সূক্ষ্ম বিচার ক'রে চলা সংসারক্ষেত্রে সকলের পক্ষে ইচ্ছা থাকলেও কার্যত সম্ভব হয়ে ওঠে না। সর্বোদয়েরও তাই। কারণ, মানুষ অনেকখানি পারিপার্শ্বিক অবস্থার দাস। বিবেকের দংশন ব'লে একটা কথা মানব-সমাজে বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে। কিন্তু, এই বিবেক বস্তুটি কি মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে সঙ্গে নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়? না, তার আশৈশবের শিক্ষাদীক্ষা, পারিপার্শ্বিক সৎ পরিবেশ, নৈতিক আদর্শবাদী গুরুজনদের উপদেশ এবং নিজের সহজাত দয়া, মায়া প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রভাব ও পারিবারিক সত্যনিষ্ঠ জীবনের আবহাওয়ায় ধীরে ধীরে এই বস্তুটি তার মনের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারেই আশ্রয়লাভ ক'রে ক্রমে জাগ্রত হয়ে ওঠে? মানুষের চরিত্রগঠনের প্রধান সহায়ক এটি। কিন্তু, এও দেখা যায় যে, জীবনযাত্রার একান্ত প্রয়োজনে এবং সাংসারিক দুরবস্থার চাপে মানুষ এর সংকেতমূলক নির্দেশকে অস্বীকার করতেও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না।

সর্বোদয়ের একজন প্রধান পাণ্ডা এবং বিনোবাজীর একজন ভক্ত-সহকর্মীকে একবার প্রশ্ন করা হয় যে, ভূমিহীন নিঃস্ব মানুষকে ভূমিদান ও সম্পত্তিদান ক'রে আপনারা কি ভাবীকালের জন্য আবার এক ভূস্বামী সম্প্রদায়ের বীজ বপন ক'রে যাচ্ছেন না? আপনারা কি মনে করেন যে, এরা পুরুষপরম্পরা ওই পাঁচ একর জমি নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকবে—না, আপনাদের এ সর্বোদয় আন্দোলন দেশে একটা সুদিন ফিরিয়ে আনার স্বপ্নমাত্র? এ অবাস্তব আন্দোলনের ফলে দেশের কোনও স্থায়ী কল্যাণ হওয়া সম্ভব নয়। আর, তাছাড়া এই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ছুটে চলা রকেটের প্রচণ্ড গতিবেগের যুগে আপনাদের এই ধীরমন্থর পদযাত্রায় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে বোধ করি আরও এক মন্বন্তর লেগে যাবে। এবং আমরা আজ যেখানে আছি হয়ত সেদিনও সেখানেই থেকে যাব।

ভদ্রলোক এই অপ্রিয় সত্য এমন নগ্নভাবে বোধ করি কাঁরুর কাছে আগে শোনেন নি। সর্বদাই ত এরা স্তাবক ও সুবিধাবাদী ভক্তের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। এই রূঢ় মন্তব্য শুনে তিনি আমার উপর একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু নিজেদের সমর্থনে কোনও যুক্তিই দিতে পারলেন না। ওদের মাথার মণি বিনোবাজীকেও প্রশ্ন করা হয়েছিল, প্রভু! অতঃপর কোনপথ ধ'রে আমরা চলব—একটু ব'লে দিন। ক গ্রেস কথায় কথায় মহাত্মার নামের দোহাই দিয়ে বলেছেন, 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার' সাফল্য আমাদের সকল দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে। সাম্যবাদীরা কথায় কথায় কার্ল মার্ক্স আর এংগেলের নাম ক'রে বলছেন, রুশ চীনের পদাঙ্ক অনুসরণ কর, সেই ভাবে দু'টো খেয়ে বাঁচবে। আর আপনি বলছেন, আমাকে তোমরা জমি দাও, টাকা দাও, শ্রম দাও, জীবন দাও, তবেই তোমাদের দুঃখ ঘুচবে। এখন কোন্ দলের কথা মেনে চললে মুক্তি পাব আমরা—ব'লে দিতে পারেন?

বিনোবাজী বললেন, কংগ্রেসের এখন অধঃপতন হয়েছে। সে ধনতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী হয়ে পড়েছে। বিলাস ও ঐশ্বর্যের ক্ষারসমুদ্রে ভাসছে। তাদের কাছে আশা করবার আমাদের আর কিছু নেই। নেহরুজী নিজে লোকটা খাঁটি মানুষ হ'লেও তিনি স্বাধীন নন। দলীয় চক্রান্তের ফাঁসে তাঁর হাত-পা বাঁধা। রাষ্ট্রীয় কূটনীতির চাপে সত্যকথা বলবার সাহস নেই ভদ্র-লোকের। আর এদেশের ওই সব তথাকথিত সাম্যবাদী বামপন্থার দল? ওরা সমাজতন্ত্রবাদের কোনই ধার ধারে না। মুখস্থ বুলি আওড়ায়। দাদারা অর্থাৎ রুশ-চীন যা বলছে তাই বেদবাক্য। ওদের নিজেদের বলবার কিছু নেই। সাম্যবাদী সমাজতন্ত্র আদর্শের দিক্ দিয়ে খুবই ভাল। একমাত্র সাম্যবাদের প্রভাবেই সর্বসাধারণের উন্নতি হওয়া সম্ভব, কিন্তু, ওদের ওই জবরদস্তির পথ নিষ্ঠুর অত্যাচার ক'রে, ভয় দেখিয়ে, গুলী চালিয়ে এবং মিথ্যার জাল বুনে নানারকম ধোঁকা দিয়ে মানুষকে দলে টেনে আনার চেষ্টা শ্রেয়ঃ পথ বলা যায় না। আমার বিশ্বাস এই সর্বোদয়ের সোজা পথই শ্রেষ্ঠ পথ। প্রেম,

করুণা, মৈত্রী ও ত্যাগের দ্বারা মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করতে পারলে সেটা হয় স্থায়ী কল্যাণের সহায়ক।

এই রকম উত্তরই আমরা আশা করেছিলাম। কারণ, সবদলই ব'লে থাকেন 'মামেকং শরণং ব্রজ, আমাদের পথটাই ঠিক। তা সে কি ধর্মপ্রচারকের দল, কি রাজনৈতিক দল, কি সমাজতান্ত্রিক দল। কিন্তু, একটা কথা আমরা বুঝি না, যিনি সাধু মানুষ, যিনি শান্তিবাদী ও শান্তির প্রচারক, তিনি শান্তিপ্রিয় স্বেচ্ছাসেবকদের নাম রেখেছেন 'শান্তিসেনা' কেন? সেনা বা সৈনিক তাদেরই বলা হয় যারা সশস্ত্র যোদ্ধা। 'সেনা' শব্দটি সামরিক শব্দকোষেরই অন্তর্গত। বিনোবাজী শান্তিপ্রিয় মানুষ, তিনি এদের 'শান্তিসেবক' বা 'শান্তিপালক' না ব'লে 'শান্তি সৈনিক' নামে অভিহিত করলেন কেন? এও এক প্রহেলিকা! মনঃসমীক্ষকেরা হয়ত বলবেন, তাঁর মধ্যে মহারাষ্ট্র শোণিত প্রবাহিত। আজ মসিজীবী হ'লেও একদা তারা অসিজীবীই ছিলেন। তাই শান্তির ক্ষেত্রেও তাঁরা 'সৈনিক' সংজ্ঞাটাই পছন্দ করেন বেশি। অবশ্য মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের কথার উপর আমরা তেমন কিছু গুরুত্ব আরোপ করতে চাই না। কারণ, তাঁরা কোনও মানুষের সম্মান রেখে কথা বলেন না। তাঁরা বলেন বিনোবাজীর এই পদযাত্রা অসাধ্যসাধন কিছু নয়। জৈন সাধুরাও দেশ-দেশান্তরে যেতে কোনও যানবাহন ব্যবহার করেন না। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে বিনোবাজীর পদযাত্রাটা এখন ব্যসনে দাঁড়িয়ে গেছে। ওর পদযাত্রা যদি আজ বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়, উনি নিঃসন্দেহে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। মানবজাতির কল্যাণ একমাত্র আমার দ্বারাই হবে, এ বিশ্বাস ওঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে! নইলে কুৎসিত সিনেমার ছবিগুলি সব চালু রেখে কেবল তার বিজ্ঞাপনে পোস্টারগুলি ধ্বংস করবার জন্য তাঁর সর্বোদয়ী কর্মী নিযুক্ত করতেন না। ভারতীয় যুবকদের নৈতিক চরিত্র রক্ষার কত সহজ উপায়ই না তিনি উদ্ভাবন করেছেন, ভেবে বিস্মিত হ'তে হয়!

সবচেয়ে কৌতুকের ব্যাপার হচ্ছে, বিনোবাজী বাংলা দেশে এসে বাঙালীর গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। আবার আসামে গিয়ে বলছেন, বাঙালীর দোষেই বাংলার প্রতিবেশীরা কেউ তাকে দেখতে পারে না। বাঙালীরা যদি নিজেদের সংশোধন করতে না পারে, তবে সে লুপ্ত হয়ে যাবে। অবশ্য তাঁর এ কথার উপর তেমন গুরুত্ব দেবার প্রয়োজন নেই। কারণ, মহারাষ্ট্র ও সৌরাষ্ট্রের কলহের সময় তিনি স্বজাতির পক্ষই অবলম্বন করেছিলেন। থাক সে সব কথা। উপসংহারে শুধু এই কথাটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বিনোবাজীকে দেখা যায়, প্রয়োজন মত তিনি কখনও গান্ধীবাদী, কখনও শান্তিবাদী, কখনও বা সমাজবাদী, কখনও বা সর্বোদয়-বাদী, সম্প্রতি আবার নিজেকে 'বেদান্তবাদী' ব'লে প্রচার করেছেন। কিন্তু বেদান্তবাদী ভূমি চায় কেন? বিত্ত চায় কেন? শ্রম চায় কেন? জীবনই বা চায় কেমন ক'রে? বেদান্তবাদীর কাছে ত জগৎ মিথ্যা। তবে সে কেন বলে "জয় জগৎ!"

তবে কি ইনি সুবিধাবাদী? ওর নীতি কি তবে 'যখন যেমন তখন তেমন?'
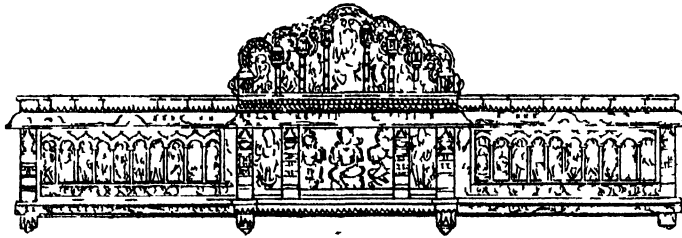
দ্বন্দ্ব

অধ্যাপক শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বালিগঞ্জ নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত জিলা ও দায়রা জজ শ্রীযুত শশিশেখর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সপরিবারে ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন—ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, নানা পত্রিকায় এই অদ্ভুত চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। পথে, পার্কে, ট্রামে বাসে, ক্লাবে, রেস্তরাঁয়, স্কুলে, কলেজে, আদালতে, বৈঠকখানায় সর্বত্র এই সংবাদ পঠিত ও শ্রুত হইতেছে। যে পড়িতেছে এবং যে শুনিতেছে, সেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে। আজকের দিনে কোন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ধর্মান্তর গ্রহণ বাস্তবিক বিস্ময়কর। বিশেষতঃ কলিকাতার ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার স্মৃতি সমুজ্জ্বল থাকিতে থাকিতেই এইরূপ এক ঘটনা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যন্ত চাঞ্চল্য আনিয়াছে।

বাঙ্গালী, বিহারী, মারাঠী, পাঞ্জাবী সকল প্রদেশের হিন্দু দলে দলে তাঁহার বাড়ীর দ্বারে ভিড় জমাইতেছে। বাড়ীর সামনের রাস্তায় জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য বিশেষ পুলিশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দীর্ঘকালের জন্য প্রাক্তন জজ সাহেব স্বগৃহে অন্তরীণ হইয়াছেন। তাঁহার বাড়ীর বাহির হইবার উপায় নাই।

শুদ্ধি-সংগঠনের উদ্যোক্তাগণ অনবরত তাঁহার বাড়ী যাইতেছেন। তাঁহাকে স্বধর্মে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কোন ফল হইতেছে না। শশিশেখরবাবুর এক উত্তর "আমি সজ্ঞানে, সুস্থচিত্তে মুসলমান হইয়াছি। আমার পক্ষে এখন আর হিন্দু হওয়া অসম্ভব। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।"

শশিশেখরবাবু আমার বহুকালের পরিচিত। এককালে আমি তাঁহার অন্তরঙ্গ এবং স্নেহভাজন ছিলাম। তিনি যখন ফরিদপুরে সাবজজ ছিলেন তখন আমি তাঁহারি কোর্টে ওকালতি শুরু করি। তিন বছর সেখানে আমাদের একত্রে কাটে। ভাটপাড়ার বিখ্যাত পণ্ডিতবংশে তাঁহার জন্ম। তিনি অতি ধার্মিক এবং আচারনিষ্ঠ হিন্দু ছিলেন। ফরিদপুরে বিচারক হিসাবে যেমন তাঁহার সুনাম ছিল—মানুষ হিসাবেও তেমনি তাঁহার সুখ্যাতি ছিল।

বয়স তখন তাঁহার অল্প। বোধহয় ত্রিশও তখন পার হয় নাই, নবপরিণীতা স্ত্রীকে লইয়া তিনি তাঁহার কর্মস্থলে যান। সেখানে থাকিতে থাকিতেই তাঁহাদের একটি সন্তান হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বছর দেড়েকের মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটে। এই আঘাতে তাঁহারা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। তাই যথাসম্ভব সত্বর ফরিদপুর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা রংপুর চলিয়া যান। সেখান হইতে বাংলা ও আসামের নানা জিলায় ঘুরিতে ঘুরিতে সর্বশেষ কলিকাতায় আসেন এবং আলিপুরের জজ হন। মাত্র মাস কয়েক হইল অবসর লইয়াছেন। এখন তিনি কলিকাতাতেই বাড়ী করিয়া বাস করিতেছেন। আমিও উদ্বাস্তু হইয়া কলিকাতায় আশ্রয় লইয়াছি।

শশিশেখরবাবু কলিকাতায় আসার পরেও তাঁহার সহিত আমার বহুবার দেখা হইয়াছে। মাস কয়েক আগেও আমি তাঁহার বাড়ী গিয়াছিলাম। সামাজিক আচার-ব্যবহারে এখন তিনি উদারপন্থী হিন্দু। কিন্তু তাঁহার ধর্মমতের কোন পরিবর্তনই লক্ষ্য করি নাই। সুতরাং সহসা তাঁহার এই ধর্মান্তর গ্রহণে আমি যেমন বিচলিত তেমনি বিস্মিত হইয়াছি। এই ঘটনার পর, তাঁহার সহিত দেখা করিবার আগ্রহ ও কৌতূহল আমারও কম হয় নাই। তথাপি এই চাঞ্চল্যের মধ্যে তাঁহার বাড়ী যাওয়া আমার সমীচীন মনে হইল না। আমি উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

আমরা বাঙ্গালী, ভাবপ্রবণ জাতি। বন্যার বেগের ন্যায় আমাদের আবেগও প্রবল ভাবে আসে আবার শীঘ্রই শান্ত হইয়া যায়। এ বিষয়েও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। মাস দুই-তিন পরেই শশিশেখরবাবুকে লইয়া আর বিশেষ কেহ মাথা ঘামাইল না। তিনিও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

এই সময় একদিন সন্ধ্যার দিকে আমি তাঁহার বাড়ী গেলাম। বহুদিন পর আমাকে দেখিয়া তিনি খুব খুশি হইলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মুসলমানের ঘরে চা-পানে আপত্তি আছে নাকি?"

আমি বিনীত ভাবে বলিলাম, "আজ্ঞে না।"

নানা উপকরণসহ চা আসিল এবং নানা হাসিগল্পের

মধ্য দিয়া আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করতে লাগিলাম। একটু পরে শশিশেখরবাবুর সহধর্মিণী সুরমা দেবী আসিলেন। তিনিও হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এবং খুশি হইয়া আমাদের বিনোদনপর্বে যোগ দিলেন। তাঁহাদের উভয়ের আচরণে মনেই হইল না যে, এত বড় একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অন্তরে যেন তাঁহাদের আনন্দের হিল্লোল জাগিয়াছে। ব্যাপার কি? ইসলামধর্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের যৌবন ফিরিয়া আসিল নাকি?

বহু প্রশ্ন মনের মধ্যে ভিড় জমাইতেছিল। জজ সাহেব তাহা বুঝিতে পারিয়া হাসিমুখে বলিলেন, "ব্যস্ত হইও না। তোমাকে আমাদের মুসলমান হইবার কারণ বলিতেছি। সে এক আশ্চর্য কাহিনী। ধৈর্য ধরিয়া শোন।

কলিকাতায় তখন ভয়ানক দাঙ্গা চলিতেছে। সেই দাঙ্গার মধ্যে পত্র পাইলাম আমার এক পরিচিত ব্যক্তি শ্রীবীরেশ্বর দত্ত সস্ত্রীক বরিশাল হইতে আসিতেছেন। তাঁহারা আমার বাড়ীতেই উঠিবেন। বরিশালের লোক। কলিকাতায় কখনও আসেন নাই। তাহার পর এই অস্বাভাবিক অবস্থা। আমার ষ্টেশনে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন। খবর লইয়া জানিলাম—সেদিন সকাল হইতে অবস্থা অনেকটা শান্ত আছে। আমার শিখ ড্রাইভার অমৃত সিংও অভয় দিল। সুতরাং 'যা থাকে কপালে' ভাবিয়া বাহির হইয়াছি, এমন সময় "পরিবার তার সাথে যেতে চায়" পুরুষের সেই চিরন্তন ফ্যাসাদ। আমাকে তিনি একা এই বিপদের মধ্যে ছাড়িয়া দিবেন না। তিনিও সঙ্গে যাইবেন। তিনি সঙ্গে না যাইলেই যে বিপদ কমে—এ কথা তাঁহাকে বোঝান গেল না। সুতরাং তাঁহাকেও সঙ্গে লইতে হইল।

নির্বিঘ্নে শেয়ালদা পৌছালাম। কিন্তু ফিরিবার সময় বিপদে পড়িলাম। হঠাৎ ধর্মতলায় একদল মুসলমান আমাদের মোটরের হেডলাইট, সামনের কাঁচ ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিল। ঘাড়ে এক লাঠি পড়িতেই শিখ ড্রাইভারের সমস্ত বীরত্ব উবিয়া গেল। বরিশালী বীরেশ্বর কিন্তু রুখিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একজনের হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইয়া দমাদম মার দিতে লাগিলেন। তাহাতেই কিন্তু বিপদ বাড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে আরও বহু মুসলমান সেখানে জড় হইল। সকলের হাতেই মারাত্মক অস্ত্র। একা বীরেশ্বর কি করিবেন। ড্রাইভার অজ্ঞান। আমি অপারগ। চিরকাল দাঙ্গাকারীদের বিচারই করিয়াছি, দাঙ্গা কখনও করি নাই। এদিকে স্ত্রীলোক দুইজন ভয়ে কাঁপিতেছেন। তাঁহাদের গুণ্ডাগণ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। কেহ কেহ তাঁহাদের টানিয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিয়া বীরেশ্বর তাহাদের দিকে ধাবিত হইলেন। আমিও তাঁহাকে অনুসরণ করিলাম। কিন্তু বেশিদূর যাইতে হইল না। মাথায় এক সড়কির খোঁচা খাইয়া বীরেশ্বর পড়িয়া গেলেন। আমার সমুখে এক রুদ্রমূর্তি যুবক। তাহার প্রকাণ্ড ছোরা আমার বক্ষের উপর লক্ষ্য করিয়াছে। আমি ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। এমন সময় "মহাসিন, মহাসিন, করিস কি—থাম থাম" বলিতে বলিতে এক শুভ্রশ্মশ্রু মুসলমান পিছন হইতে ছুটিয়া আসিয়া যুবকের হাত ধরিয়া ফেলিলেন। মুহূর্তের জন্য আমি বাঁচিয়া গেলাম।

বৃদ্ধ যুবকের হাত হইতে ছোরাখানা কাড়িয়া লইয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পলকের মধ্যে আক্রমণকারী জনতা শান্ত হইয়া গেল। বৃদ্ধ যুবকের হাত ধরিয়া আমার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে আদেশ দিলেন। যুবক সে আদেশ পালন করিল। আবার যুবকের দেখাদেখি সেই দণ্ডায়মান জনতা আমাকে সেলাম দিল।

এইরূপ অপ্রত্যাশিত ঘটনাপরম্পরায় আমি ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। এ কি সত্য? না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। কে এই বৃদ্ধ। কেনই বা ইনি আমার প্রাণ বাঁচাইলেন। কেনই বা ঐ যুবককে আমার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিতে বলিলেন—সমস্তই আমার নিকট প্রহেলিকার ন্যায় মনে হইতে লাগিল।

আমার এইরূপ বিমূঢ় অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন—"হুজুর আমায় চিনিতে পারিলেন না। আমি তমিজুদ্দিন। ফরিদপুরে আপনার কোর্টে পেস্কার ছিলাম।"

এতক্ষণে চিনিলাম। তমিজুদ্দিনই বটে। আমি তাহাকে আহ্লাদে বুকে জড়াইয়া ধরিলাম। বলিলাম —"সাহেব, কি বলিয়া তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাব। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

তমিজুদ্দিন যুবককে দেখাইয়া বলিল, "হুজুর, এই আমার ছেলে মহসিন। আমার একমাত্র ছেলে। ইহাকে আপনি মাপ করুন। নতুবা আখেরে ইহার খারাপ হইবে।" এই বলিয়া সে তাহার পুত্রকে আবার আমার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে বলিল। সেই প্রণত-যুবকের মাথায় হাত দিয়া সত্যই আমি মনেপ্রাণে তাহাকে আশীর্বাদ করিলাম।

ইহার পর সেখানে সমবেত ঐ আততায়ীদের

ফিরিয়া আসিয়াছে এবং আসিয়াই বাড়ীতে মিস্ত্রী লাগাইয়াছে। তাহার একতলার উপর দোতলা উঠিতেছে। তমিজুদ্দিন মহাব্যস্ত। চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাজের তদারক করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই ছুটিয়া আসিল। হাতে ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। বলিল, "ফরিদপুরের বিষয় সম্পত্তি সমস্তই বিক্রয় করিয়া আসিলাম। সেই টাকাটা কাজে লাগাইতেছি।"

আমি বলিলাম, "বেশ করিয়াছ। এখন তোমার দোটানাভাব দূর হইল। এবার ছেলের বিবাহ দিয়া বৌ আন। ঘর ভরিয়া উঠুক।"

তমিজুদ্দিন বলিল, "আমার মনের কথাই বলিয়াছেন। পাত্রীর সন্ধান করিতেছি। এখন খোদার দয়া।"

তমিজুদ্দিন কর্মিতকর্মা। দোতলা তাহার সম্পূর্ণ হইয়াছে। এবার সে মহসিনের জন্য পাত্রীর সন্ধানে ঘুরিতেছে। মাঝে মাঝে আমার বাড়ী আসে; কোথায় কেমন মেয়ে দেখিয়া আসিল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার পরিচয় দেয়। একমাত্র ছেলে—তাই পাত্রী আর তাহার কিছুতেই পছন্দ হয় না।

সেদিন সন্ধ্যায় তমিজুদ্দিন ঘরে ঢুকিয়া নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বসিয়া পড়িল। অন্যদিন চৌকাঠ পার হইলেই তাহার কথার তুবড়ি ছুটিতে থাকে। আর আজ মুখে কথা নাই। কেমন যেন অন্যমনস্ক।

প্রশ্ন করিলাম—"কি মিঞা, পাত্রী বুঝি পছন্দ হইল না!"

তমিজুদ্দিন উত্তর দিল, "পাত্রী পছন্দ হইবে কি? আমি যাহা চাই ফতেমা তাহা চায় না। আবার ফতেমা যাহা চায় আমি তাহা চাই না।"

ব্যাপার বুঝিলাম। বিবির সঙ্গে বিবাদ। তাই এমন গোমড়া মুখ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা ফতেমা বিবি কি বলেন, আর তুমিই বা কি চাও?"

তমিজুদ্দিন বলিল, "আমি চাই সম্ভ্রান্ত ধনীগৃহের রূপসী কন্যা।"

"আর ফতেমা বিবি কি চান—ভিখারীর ঘরের কুরূপা কন্যা?"

"না, অতদূর নয়। সেও সুন্দরী মেয়ে চায়। তবে তাহার হুকুম, সেই মেয়ে গরীবের ঘর হইতে আনিতে হইবে।"

"তা গরীবের ঘরের হইলে ক্ষতি কি? মেয়ে সুন্দরী ও সুশীলা হইলেই হইল। তোমার তো আর টাকার অভাব নাই। যৌতুক নাই বা লইলে।"

তমিজুদ্দিন উত্তেজিত হইয়া বলিল, "যৌতুকের দাবি আমার নাই। কিন্তু তাই বলিয়া হাঘরের বাড়ীর মেয়ে আমি কিছুতেই আনিব না।"

গরীবের উপর তমিজুদ্দিন সাহেবের দেখি বড়ই বিরাগ।

প্রশ্ন করিলাম, "মহসিন কি চায়, তাহার মত কি, তাহা কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ?"

তমিজুদ্দিন বলিল, "এতদিন তো সে বিবাহই করিতে চায় নাই। এখন কোনোরূপে মত করাইয়াছি। সে বলে, 'মেয়ে যে-কোনো ঘরেরই হউক, যেমনই দেখিতে হউক, আপত্তি নাই। কিন্তু শিক্ষিতা হওয়া চাই।"

"তুমি কি শিক্ষিতা মেয়ে চাও না। ফতেমা বিবি এ বিষয়ে কি বলেন?"

"আমি শিক্ষিতা চাহিব না কেন? কিন্তু ফতেমার শিক্ষিতা মেয়ে পছন্দ নয়। তবে মহসিনকে সে এত ভালবাসে যে, তাহার ইচ্ছাতেই সে রাজি হইবে।"

অবশেষে তমিজুদ্দিন বলিল, "সাহেব, তুমি নামজাদা বিচারক। এই বিষয়ের এমন একটা মীমাংসা কর যাহাতে সকল পক্ষই খুশি হয়।"

ভাল বিপদেই পড়া গেল। সাহেব-বিবির বিবাদের এখন সোলেনামা করিতে হইবে। একটু ভাবিয়া নিয়া বলিলাম, "আচ্ছা! পূর্বে ধনী এবং সম্ভ্রান্ত ছিলেন, এখন দরিদ্র হইয়া গিয়াছেন, এমন লোকের শিক্ষিতা সুন্দরী কন্যা পাওয়া যায় না?"

তমিজুদ্দিন লাফাইয়া উঠিল। "হাঁ হাঁ। মুর্শিদাবাদ হইতে ঠিক এমনি একটা সম্বন্ধ আসিয়াছে। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও ধনীর সন্তান। মুর্শিদকুলী খাঁর বংশধর। সে-বাড়ীর মেয়েরা ডাকসাইটে সুন্দরী।"

এবার আর তমিজুদ্দিন নিজে পাত্রী দেখিতে গেল না। বোধ হয় তাহার অভিমান হইয়াছিল। ফতেমা বিবির উপর পাত্রী দেখিবার ভার পড়িল। তিনি আবার আমার বিবিকে সঙ্গে লইয়া গেলেন।

পাত্রী পছন্দ হইল। মেয়ে নাকি ডানাকাটা পরী। সুরমার মতে এমন সুন্দরী কন্যা 'লাখে এক'ও দেখা যায় না। মেয়েটি স্কুলের পড়া সাঙ্গ করিয়া কলেজে পড়িতেছে। ফতেমা বিবির তাহাকে এত ভাল লাগিয়াছে যে, একেবারে পাকা কথা দিয়া আসিয়াছেন।

কিছুদিন পরের কথা। বিবাহের দিনস্থির ও ভাবী পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করিবার জন্য তমিজুদ্দিন ও ফতেমা বিবি উভয়েই মুর্শিদাবাদ গিয়াছেন। সন্ধ্যায় ফিরিবেন। সুরমার আগ্রহাতিশয্যে সেই রাত্রেই তাঁহাদের বাড়ী

গেলাম। কিন্তু তাঁহাদিগকে পাইলাম না। তমিজুদ্দিনের সরকার হবিবুল্লা বলিল—"আজ সন্ধ্যাতেই ত তাঁহাদের ফিরিবার কথা। কেন যে ফিরিলেন না—বুঝিতে পারিতেছি না।"

বাড়ী ফিরিবার জন্য গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছি, সুরমা ধরিয়া বসিলেন—আর একটু থাকিয়া যাইবেন। বলিলেন, "মহসিনের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইব। রাত দশটায় দোকান বন্ধ করিয়া মহসিন বাড়ী ফিরে—সুতরাং এখনই সে আসিবে।"

মহসিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি—হঠাৎ একদল লোক মহা হল্লা করিতে করিতে বাড়ী ঢুকিল। ইহার পর যাহা চোখে পড়িল, তাহা যেমন লোমহর্ষক, তেমনি হৃদয়-বিদারক।

রক্তস্নাত, চেতনাহীন মহসিনেরই অসাড় দেহ লোক-গুলি বহিয়া আনিয়াছে।

এসপ্ল্যানেড হইতে মহসিন বাড়ী ফিরিতেছিল। পাড়ায়, প্রায় বাড়ীর কাছে আততায়ী আচম্বিতে তাহাকে ছোরা মারে। তৎক্ষণাৎ সে পড়িয়া যায়। আর্তনাদ শুনিয়া কয়েকজন প্রতিবেশী ছুটিয়া আসে। তাহারাই মহসিনের দেহ রাস্তা হইতে তুলিয়া আনিয়াছে।

জখম গুরুতর ! মর্মস্থলে আঘাত করিয়াছে। সংজ্ঞা-হীন সেই দেহ গাড়ীতে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ মেডিকেল কলেজের এমারজেন্সি ওয়ার্ডে লইয়া গেলাম।

সে-রাত্রি যে আমাদের কেমন করিয়া কাটিল—তাহা আর কি বলিব ? সমস্ত রাত ধরিয়া যমে মানুষে টানা-টানি চলিল। সকালেও ডাক্তারগণ আশা দিতে পারিলেন না।

রাত্রেই তমিজুদ্দিনকে টেলিগ্রাম করিয়াছি। মুর্শিদা-বাদে হবিবুল্লাকে পাঠাইয়াছি। কিন্তু তাহারা বিকেলেও আসিয়া পৌঁছাইল না। এদিকে মহসিনের এই অবস্থা।

আমাদের মানসিক অবস্থা বর্ণনাতীত। যাহাদের ছেলে তাহারা কেহই কাছে নাই। আত্মীয়ও কেহ নাই। একি গুরু দায়িত্ব আমাদের উপর আসিয়া পড়িল।

সন্ধ্যার দিকে কিছুক্ষণের জন্য, মহসিনের চেতনা হয়। কিন্তু মানুষ চিনিবার মত নয়। আমাদের চিনিল বলিয়া মনে হইল না। খানিক পরেই সে পুনরায় জ্ঞান হারাইল।

তমিজুদ্দিন ও ফতেমা রাত্রে ফিরিলেন। টেলিগ্রাম তাঁহারা পান নাই। হবিবুল্লার সঙ্গেও দেখা হয় নাই। মুর্শিদাবাদ হইতে তাঁহারা বহরমপুর চলিয়া গিয়াছিলেন। আচম্বিতে বজ্রাঘাতের ন্যায় এই শোকাবহ ঘটনা তাঁহা-দিগকে মর্মে মর্মে দগ্ধ করিতে লাগিল।

ভোর চারটার সময় মহসিন চোখ মেলিল। এবার সে আমাদের চিনিতে পারিল। মনে হইল, কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছে। ডাক্তারগণ বলিলেন, "বিপদ কাটিয়াছে—তবে এখন পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। সামান্য উত্তেজনাতেও এখনও ইহার মৃত্যু ঘটিতে পারে।"

দশ দিন পর হাসপাতাল হইতে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। সে তখন কিছুটা সুস্থ হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার তাহাকে দিবারাত্রি শুইয়া থাকিতে বলিয়াছেন। আমরা রোজ দুইবেলা দেখিয়া আসি। সুরমা প্রতিদিন তাহার জন্য নানা প্রকারের ফল লইয়া যান। কোনদিন বা খাবার তৈরি করিয়া লইয়া যান।

মাস দুয়েক পরে—মহসিন যখন বেশ সুস্থ হইয়াছে, তখন একদিন তমিজুদ্দিন গাড়ী করিয়া সপরিবারে আমার বাড়ী আসিল। সঙ্গে প্রচুর মিষ্টান্ন, দই, মাছ এবং নানা জাতীয় ফল। সুরমার জন্য দামি শাড়ী এবং আমার জন্য তাহারা ধুতি-চাদর আনিয়াছে।

আমাদের প্রতি তাহাদের কৃতজ্ঞতার আর অন্ত নাই। বার বার নানা ভাবে তাহারা তাহা প্রকাশ করিতে লাগিল।

সেদিন তাহাদের ধরিয়া রাখিলাম। সমস্তদিন হৈ-হল্লা করিয়া কাটিল। সন্ধ্যায় জলসা এবং ভোজের আয়োজন হইল। বড়ই আনন্দে আমাদের দিন কাটিল।

রাত তখন প্রায় এগারটা। আহার সমাপ্ত করিয়া আমরা পুরুষেরা বাহিরের ঘরে বসিয়া আছি। এমন সময় তমিজুদ্দিন হঠাৎ আমার হাত দুটি ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"সাহেব! আমি মহাপাপী। সেই পাপেই আমি মহসিনকে হারাইতে বসিয়াছিলাম। তোমাদের কাছে আমার অপরাধের অন্ত নাই। আমার মত নিষ্ঠুর, বিশ্বাসঘাতককে তুমি মাপ করিতে পারিবে কি ?"

আমি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

তমিজুদ্দিন তাহার ছেলেকে দেখাইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"এই মহসিন আমার নহে, তোমার। তোমার একমাত্র সন্তানকে আমি চুরি করিয়াছি। মনে পড়ে সাহেব—ফরিদপুরে তোমার সেই শিশু সন্তানটির মৃত্যুর কথা।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায়, এক জরুরী কাজে আমি শহরের বাহিরে গিয়াছিলাম। গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিতেছি—পথে তোমাদের শ্মশান পড়ে। তোমাদের শিশুর শ্মশান।

হঠাৎ দেখিলাম—নির্জন শ্মশানে একটি শিশু কাঁদিতেছে। কয়েকটা শৃগাল তাহার চারিপাশে দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমটা আমি ভয় পাইয়া যাই। পরে সাহস সঞ্চয় করিয়া কাছে গিয়া দেখি—"সে যে তোমারই ছেলে!" শেয়ালে খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে। আমি কাছে যাইতেই শেয়ালেরা পলাইয়া গেল। শিশুও আমার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আমি তাহাকে ঘরে আনিলাম। ইচ্ছা ছিল পরদিন প্রভাতেই তোমাকে তোমার সন্তান ফিরাইয়া দিব। কিন্তু তাহা আর হইল না। আমার সন্তান ছিল না। আমার স্ত্রী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিল না। আমারও কেমন একটা দুর্বলতা আসিল। সেই রাত্রেই অতি সঙ্গোপনে শিশুর সহিত আমার স্ত্রীকে বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিলাম। তাহার কিছুদিন পর তুমিও বদলী হইয়া চলিয়া গেলে।"

আমি বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অস্বাভাবিক উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপিতেছিল। তথাপি নিজেকে সংযত করিয়া প্রশ্ন করিলাম—"তুমি ইহা প্রমাণ করিতে পার?"

সে উত্তর দিবার পূর্বেই কিন্তু এক অঘটন ঘটিয়া গেল। সুরমা ঝড়ের মত ছুটিয়া আসিয়া মহসিনকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"নন্দন! নন্দন! বাপ আমার!" পরক্ষণেই জ্ঞান হারাইয়া তিনি পড়িয়া গেলেন।

সে রাত্রে তাঁহার মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি আমরা জাগিয়া কাটাইলাম।

পরদিন বিকেলের দিকে তিনি কিছু সুস্থ হইলেন। কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিল। তিন মাস ধরিয়া নানারূপ চিকিৎসা করাইয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়াছি।

এই সময় মহসিনকে প্রায় দিবারাত্রি তাঁহার নিকট থাকিতে হইয়াছে। এই তিন মাস সে সুরমার জন্য যাহা করিয়াছে নিজের সন্তান ভিন্ন আর কেহ সেরূপ করিতে পারে?

এই অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ঘটনার বিষয় অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ব্যতীত কাহাকেও বলিবার নয়। তাই যতদূর সম্ভব সকলের নিকট ইহা গোপন করিয়াছি।

আমি দেখিলাম আমার স্ত্রী সুরমার যেমন অবস্থা, তাহাতে মহসিন আসলে তাঁহার গর্ভজাত সন্তান হউক বা না হউক, তিনি তাঁহাকে সন্তান বলিয়া গ্রহণ করিবেন। এরূপ অবস্থায় প্রমাণ লইয়া হইবে কি?

সুরমার একমাত্র যুক্তি—'তমিজুদ্দিন তাহার নিজের সন্তানকে আমাদের বলিয়া চালাইতে চাহিবে কেন? নিজের একমাত্র যোগ্য সন্তানকে কেহ কি স্বেচ্ছায় অপরকে দান করে?'

এই যুক্তিতে আমার বিচারক মন সন্তুষ্ট হইল না। আমি প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এখন আমি বহু অনুসন্ধানে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে আমার আর কোন সন্দেহ নাই যে, ও আমাদের ছেলে।

আমার শিশু সন্তানের হাতে একটি কবচ ছিল। উহাতে তাহার জন্মলগ্ন, রাশিচক্র ও নাম ইত্যাদি লেখা ছিল। সেই কবচ তমিজুদ্দিনের নিকট পাওয়া গিয়াছে। আমার ছেলের পিঠের বাম দিকে প্রায় চার আঙুল স্থান জুড়িয়া একটি লোমশ 'জড়ুল' ছিল। ইহারও তাহা আছে। চেহারাতেও আমার সহিত ইহার আশ্চর্য সাদৃশ্য।

ফরিদপুরেও আমি যথেষ্ট অনুসন্ধান করাইয়াছি। তমিজুদ্দিনের নিজের কোন সন্তান হয় নাই। আমরা ফরিদপুর পরিত্যাগ করার কয়েক মাস পরে তাহার স্ত্রী ঐ শিশুটিকে লইয়া বাপের বাড়ী হইতে শহরে আসে। সেখানে বলে—সে ঐ শিশুটিকে রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছে। তাহার বাপের বাড়ী খবর লইয়া জানিয়াছি, শহর হইতেই শিশুটিকে সে সেখানে লইয়া যায়, সেখানেও বলে, 'কুড়াইয়া পাইয়াছি।'

এইরূপ অবস্থায় ও যে আমাদেরই সন্তান—তাহাতে আর সন্দেহ আছে কি?

মৃত্যুর সবপ্রকার লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পাইলেও অনেক সময় ভিতরে প্রাণ থাকে, এরূপ বহু ঘটনার কথা আমরা পুস্তকে পড়িয়াছি এবং লোকমুখেও শুনিয়াছি। মনে হয়, শেয়ালেরা উহাকে মাটী খুঁড়িয়া বাহির করিতেই উহার জ্ঞান হয়, আর ঠিক সেই সময়েই দৈব-প্রেরিতের ন্যায় তমিজুদ্দিন সেখানে যাইয়া পড়ে। ইহাকেই বলে পরমায়ু।

আজ দীর্ঘ বাইশ বছর পরে অদ্ভুত অত্যাশ্চর্য ঘটনা-চক্রে আমরা আমাদের মৃত সন্তানকে এই ভাবে ফিরিয়া পাইলাম। কিন্তু সত্যই কি তাহাকে ফিরিয়া পাইলাম? না। আজ পাইয়াও আমরা তাহাকে পাইলাম না। পিতা যদি বা তাহার দাবি ছাড়িতে চায়—মাতা ছাড়ে না। সর্বোপরি তাহাকে পাইবার প্রধান বাধা সে নিজে।

সে বলে—ছেলেবেলা হইতে সে যাহাদের পিতামাতা বলিয়া জানিয়াছে, যাহাদের স্নেহে বর্ধিত হইয়াছে, যাহা-

দের অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কিছুতেই সে ছাড়িয়া আসিতে পারিবে না। বিশেষতঃ যে নিঃসন্তান তাহার অন্তরের সমস্ত স্নেহসুধা উজাড় করিয়া তাহাকে পান করাইয়াছে, তাহাকে সে এত বড় আঘাত দিবে কেমন করিয়া?

তাহার উপর সে অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান। ধর্ম ত্যাগ, তাহার নিকট প্রাণ ত্যাগের ন্যায়। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হইয়া হিন্দুগৃহে বাস করিবে—ইহা তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

সন্তানকে পাইবার জন্য আমার স্ত্রী সুরমা মুসলমান হইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহাকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। সুতরাং আমাকেও মুসলমান হইতে হইল। কিন্তু এত করিয়াও সন্তানকে সম্পূর্ণ পাইলাম না। সে কেবলমাত্র মাঝে মাঝে আমাদের এখানে থাকে। তাঁহার পালক পিতা এবং মাতা জীবিত থাকিতে সে তাহাদের ছাড়িবে না। তাহাদের মৃত্যুর পর সে আমাদের হইতে পারে। কিন্তু তাহাদের মৃত্যুর পূর্বেই আমাদেরও ত মৃত্যু হইতে পারে—"

শশিশেখর বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই বাড়ীতে একটা অদ্ভুত চাঞ্চল্য দেখা গেল। সুরমা দেবী "মহসিন! মহসিন আসিয়াছে" বলিয়া ঝড়ের বেগে ছুটিয়া গেলেন। শশিশেখরবাবুও দ্রুতবেগে তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন।

তাহার পর সে এক দৃশ্য। একটি তেইশ, চব্বিশ বছরের যুবককে তাঁহারা প্রায় পাঁজাকোলা করিয়া ঘরে ঢুকিলেন। তাহাকে লইয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এমন মাতিয়া উঠিলেন যে, আমার অস্তিত্বের কথা তাঁহারা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।

আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে চলিয়া আসিলাম।

—০—

রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীভবেশচন্দ্র মাইতি

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যত মনীষী ও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সারা ভারতবর্ষ এমন কি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে, আর কোন শতাব্দীতে, তাহা সম্ভব হইয়াছে, বলিয়া মনে হয় না। এই গত ২৫শে বৈশাখ (ইং ৮ই মে ১৯৬১) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মদিবস দেশবাসীর দ্বারা পালিত হইয়াছে, আর আগামী শ্রাবণ মাসেই (ইং ২রা আগষ্ট) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের শত-জন্মদিবস আসিতেছে, ১৯৬১ সালে মনীষীদ্বয়ের জন্মশত-বার্ষিকীর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে।

শ্রদ্ধেয় রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাঁহার এক প্রবন্ধে লেখেন "যাহা নাই রবীন্দ্রনাথে, তাহা নাই ভারতে।" রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার বিশ্লেষণ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বিশ্বকবি আখ্যা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেমন খাটে, পৃথিবীর অন্য যুগে অন্য দেশের কোন কবির পক্ষে তেমন খাটে না।

কবি তাঁহার কাব্যজীবনে মহাকাব্য রচনা করেন নাই, বিশ্বভারতীই তাঁহার মহাকাব্য, নিজমুখে বলিয়া গিয়াছিলেন, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন রেখে গেলাম বিশ্বভারতীর মধ্যে অঙ্গীভূত করে। সে ধনভাণ্ডারের উত্তরাধিকার সমগ্র জাতির, কারও একলার নয়।

ঋষি বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র রায় আধুনিক ভারতীয় রসায়নাগারের স্রষ্টা। মারকিউরাস নাইট্রাইট বা পারদ সংক্রান্ত মিশ্রধাতুর আবিষ্কার করিয়া রাসায়নিক জগতে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহার আর এক প্রধান কীর্তি 'হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস।'

বাংলা দেশের দারুণ দুর্দিন, বেকারে দেশ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। প্রফুল্লচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, বাংলার যুবক-সম্প্রদায় অভিমানী, সংগ্রাম-বিমুখ, পরিশ্রমকাতর এবং পরমুখাপেক্ষী। অতি সামান্য মূলধন সম্বল করিয়া তিনি এক ঔষধ কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বাঙালী যুবকগণকে ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী হইবার জন্য নানা ব্যবসায় ও নতুন নতুন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে পথ করিয়া দিলেন। বর্তমানে বেঙ্গল কেমিকাল এণ্ড ফার্মাসিউটি-কাল ওয়ার্কস ভারতের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম। বাঙালী আজ জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া, শ্রদ্ধা জানাইবার প্রয়াস করিলাম।

প্রথমেই প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত জানাইবার চেষ্টা করা হইল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সত্তর বছর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অভি-নন্দনে বলেন—

"আমরা দু'জনে সহযাত্রী!

"কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁচেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

"আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর আসনে অভিবাদন জানাই যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, ও কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।

"বস্তুজগতে প্রচ্ছন্নশক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত-অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ পাওয়া যায়।

"উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন, আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণ ভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনও সম্ভবপর হ'ত না। এই যে আত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবীশক্তি, আচার্য্যের এই শক্তির মহিমা জরাগ্রস্ত হবে না, তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির মধ্য দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে। দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে জয় করবে নব নব জ্ঞানের সম্পদ। অবশ্য নিজের জয়কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে, আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।"

এখানে আচার্য্যদেবের এক উক্তির উল্লেখ করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না,—"সর্বত্র জয় অনুসন্ধান করিবে কিন্তু পুত্র এবং শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া সুখী হইবে।"

এইবার রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্রের অভিমত জানাইবার প্রয়াস করা যাক। কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রফুল্লচন্দ্রের রচনা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"রবীন্দ্রনাথ কবি। আমি রাসায়নিক হইলেও অরসিক। আমার সহিত পরিচয় তাঁহার রসলোকের নয়, তাঁহার ব্যক্তিত্বের। রবীন্দ্রনাথকে মানুষ হিসাবে আমি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, তাঁহার রচনা পড়িয়া আনন্দে অভিভূত হই। সমালোচক আমি নই, সে-স্পর্ধাও নাই, তথাপি এই কবির প্রতি আমার সকল শ্রদ্ধা আজ হৃদয়ে উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে।

"মনে হয়, বাংলা দেশের যে কি সম্পদ রবীন্দ্রনাথ, তাহা বিদেশী কেহ বুঝিবে না। বাংলার পথে ঘাটে হাটে মাঠে এমন কি সুদূর পল্লীর ঘরে-প্রাঙ্গণে তাঁহার গানের সুর বাজিয়া উঠিতেছে। বাংলার চাষার ছেলে-মেয়েরাও রবীন্দ্রনাথের গান গায়। তাদের অধিকাংশই কবির নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, তাহারা জানে না এ গান কাহার লেখা, কি ইহার সুর, কি-ই বা ইহার তালমান; কিন্তু তাহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে সে-গান অতি সহজে আপনা-আপনি ধ্বনিয়া উঠে। বাংলার নাড়ীর স্পন্দনে তাঁহার সুরের তাল শোনা যায়। আজ আমরা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়া বাংলাদেশের কথা কল্পনাও করিতে পারি না।···

বঙ্গমাতার গভীর প্রেমে তাই তিনি গাহিয়াছিলেন—

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।

আর

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালবেসে।

"মনে হয় যে, সারা বঙ্গ সাহিত্য একদা লোপ পাইলেও এই গানগুলি কখনও বাংলার কণ্ঠ হইতে লুপ্ত হইবে না।

"১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ লাভ করিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার চারণ-কবি, ভারতীয় জাতীয়তার উদ্গাতা, তিনি হইলেন বিশ্ব-মানবের মিলন যজ্ঞের ঋষি,···বিশ্ব প্রেমের হোতারূপে তাঁহার আবির্ভাব—ইতিহাসের অনন্ত আকাশে সপ্তর্ষি-মণ্ডলে তাঁহার স্থান চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল··· ভাবিতেছি দেশের এই অসহায় দুর্ভাগ্যের দিনেও ব্যাস—বাল্মীকি—কালিদাসের জননী ভারতভূমি রবীন্দ্রনাথের মত আর একটি বরপুত্র লাভ করিয়াছেন

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করা যাক, রবীন্দ্রনাথের গান সম্বন্ধে, কবি নিজে কি বলেছেন উদ্ধৃত করিয়া:

"···জীবনের আশী বছর অবধি চাষ করেছি অনেক, সব ফসলই যে মরাইতে জমা হবে তা বলতে পারি না, কিছু ইঁদুরে খাবে—তবুও বাকী থাকবে কিছু। তবে সব চেয়ে স্থায়ী হবে আমার গান—এটা জোর করে বলতে পারি। বিশেষ করে বাঙালীর শোকে-দুঃখে, সুখে-আনন্দে আমার গান না গেয়ে উপায় নেই, যুগে যুগে এই গান তাদের গাইতে হবেই।"

যবে কাজ করি,
প্রভু দেয় মোরে মান,
যবে গান করি,
ভালবাসে ভগবান্।

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে সমাজচিত্র

শ্রীআশা দাশ

কবির সৃষ্টির প্রকৃতি সমাজের সীমারেখার গণ্ডিতে আবদ্ধ। চলমান জগতের ঘাত-প্রতিঘাত কবিমনের সংবেদনশীল তারে স্পন্দন জাগায়। সেই স্পন্দনকে কবি নিজের আত্মা দিয়ে অনুভব করে নবতমরূপ প্রদান করেন আর এই সৃষ্টিকে তিনি বিলিয়ে দেন সমাজের কাছে। সাহিত্য সমাজের হুবহু চিত্রচিত্রণও নয়। কবি তাঁর প্রাণপাত্রে সমাজের সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনাকে গ্রহণ করে তাকে আপন প্রাণের রসে সঞ্জীবিত করে পাঠক-সমাজের কাছে পরিবেশন করেন। তখন শুধু সুখই নয়, দুঃখও আনন্দের কারণ হয়ে চিরন্তন কালের দুয়ারে অমরতার দাবী নিয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তির দুঃখ, ব্যথা, বেদনা তখন ব্যক্তিরূপ ছেড়ে সার্বজনীন ও সামাজিক রূপ নিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে। সার্থক কবিকৃতি যে সমাজের পাঠকদের আনন্দ বিতরণ করে, সে-পাঠকবর্গের সঙ্গে কবিও একই সামাজিক সত্তায় মিলিত হন। এখানেই সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক শুধু দৃঢ়ই নয়, অবিচ্ছেদ্যও।

যুগ চাহিদা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্য

সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি কালজয়ী। কালের বিবর্তনের পথে স্বাভাবিক ভাবেই আসে কালের পর কালান্তর—একটি যুগের শেষ হয়ে যায় আর সে যুগের অন্তর্ধানের লগ্নে সৃষ্টি হয় আর একটি নতুন যুগ। প্রতিযুগের সার্থক পরিচয় বহন করে সে-যুগের শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি। যুগের পরিবেশ, সামাজিক শক্তির পারস্পরিক সংঘাত, যুগের চাহিদা, আশা-আকাঙ্ক্ষা সেই সৃষ্টির মাঝে আপনাকে চিরন্তন কালের জন্য সাক্ষী রেখে যায়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন তেমনি এক সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যের মধ্য-যুগের ইতিহাসে বিরাট পুরুষ বড়ু চণ্ডীদাসের ভূমিকা কোন তর্কের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর যুগের লেখকদের মধ্যে অনিবার্যরূপে তিনি একক ও অদ্বিতীয় প্রতিভাধর স্রষ্টা। বড়ু চণ্ডীদাসের প্রতিভা বাংলা দেশের এক বিশেষ যুগের, বাঙালীর এক বিশেষ মানসবৃত্তির অস্তিত্বের সম্পূরক। জীবনের প্রকাশনার ক্ষেত্রে মধ্য-যুগের ঘোর অন্ধকার রাজ্যে উষারুণ প্রত্যূষের ঘোষণা করেছেন তিনি। জীবন-পিপাসার অতৃপ্ত আকুলতা আর মানুষের অন্তরের সহজ আবেদনের স্বাকৃতি রয়েছে তাঁর কাব্যে। কবি তাঁর কালের চিন্তাধারা, ধর্মবিশ্বাস আর সমাজবিন্যাস প্রভৃতি তথ্যের কাঁটাকে কাব্যের ফুলডোরে সাজিয়ে দিয়েছেন। দেবী নয়, কোন অপ্রাকৃত নারী নয়, চিরন্তনী নারী—"তিন ভুবনজনমোহিনী, রতিরস-কামদোহিনী" মানবীই তাঁর কাব্যের নায়িকা। স্বর্গীয় অপ্রাকৃত প্রেম বর্ণনার পরিবর্তে পৃথিবীর নরনারীর দেহমনের মন্থনে জাত যে অমৃতধারা তারই জয়গান গেয়েছেন বড়ু চণ্ডীদাস। বহু প্রাচীনকাল থেকেই জনসাধারণের মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলাকে উপজীব্য করে নানা কাহিনী লোকমুখে চলে আসছিল। পল্লীকবির মুখে মুখে রচিত হ'ত নানা কবিতা, গান, ছড়া ও কাহিনী। এ সমস্ত রচনায় রাধাকৃষ্ণলীলার অপ্রাকৃত রসতত্ত্ব অপেক্ষা গ্রামীণ জীবনের স্থূল পরিবেশ ও দেহাত্ম-বাদই প্রাধান্য পেত বেশী করে। আসামের 'কুশল' রাঢ়ে প্রচলিত 'ঝুমুর' এবং উত্তরবঙ্গের 'ধামালী' বা 'জাগের গান' এ শ্রেণীর রচনা। পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে রচিত কৃষ্ণধামালী হাস্যকৌতুকার্থক পালাগান বিশেষ, যেমন রাধার শাক তোলার পালা, কৃষ্ণের বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরার পালা, গ্রাম্যকবি মুখে মুখে এই পালা রচনা করত। পল্লীর অশিক্ষিত জনসাধারণ দিনান্তে কর্মশেষে আসরে জমা হ'ত কৃষ্ণধামালী শুনবার জন্য, মাঠে রাখাল বালকের কণ্ঠেও ধামালী গান চলত। সমস্ত রাত জেগে এই গান করা হ'ত বলে একে জাগের গানও বলা হয়। স্বভাবতই ধামালী পালাসমূহের মধ্যে গ্রাম্য শব্দ, অসংস্কৃত রুচিবিরোধী ভাব, দেহকামনা এবং ব্যঙ্গকৌতুক প্রাধান্য পেত। কৃষ্ণধামালীর রাধাকৃষ্ণ পল্লীর সাধারণ নাগর-নাগরী মাত্র। গ্রাম্যকবি পল্লীর পথে পথে গৃহস্থের বাড়ীতে বাড়ীতে যেমন দেখতেন তেমন রচনা করতেন। বিরাট সৃজনশীল কাব্য-প্রতিভার অভাবে এ সমস্ত উপকরণ শুধু পল্লীর আকাশে-বাতাসে সঞ্চরণশীল ছিল। বড়ু চণ্ডীদাসের ব্যক্তিপ্রতিভা যুগ-মানসের এই প্রচণ্ড সৃজনশীল দাবীকে স্বীকৃতি জানাল ভাগবত ও পুরাণ বহির্ভূত অথচ পল্লীর ধূলামাটিতে ছড়ানো বহু নগণ্য উপাদান—পসারিণী রাধার কৃষ্ণকে

মজুরিয়া নিয়োগ, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের জলকেলি, রাধার হার লুকানো ও যশোদার কাছে রাধার নালিশ, যশোদা কর্তৃক কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা, রাধাকে জব্দ করার জন্য পুষ্পবাণ মারা, কৃষ্ণের বাঁশী চুরি, প্রভৃতি বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে সগৌরবে ঠাঁই পেয়েছে। তাঁর কবিকল্পনা, বাস্তববোধ ও দেহাশ্রয়ী প্রেমের বিজয়-ঘোষণা তাঁরই যুগের গভীর মর্মবাণীর অভিব্যক্তি। বড়ু চণ্ডীদাস বাঙালী জাতির মহত্তম যুগচেতনার ব্যক্তিরূপ, তাঁর সৃষ্টি যুগচাহিদার সৃষ্ট, সংহত কাব্যরূপ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রচনাকাল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থখানা বাঁকুড়া অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত। গ্রন্থটি পরীক্ষা করে স্থিরীকৃত হয়েছে, ইহা চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মধ্যে রচিত। এ সময়টা বাংলা দেশের ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ' নামে পরিচিত। বাংলায় তখন সেনযুগের অবসান ঘটেছে, কিন্তু মুসলিম শাসনব্যবস্থাও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ইলিয়াসশাহী শাসনব্যবস্থায় বাঙালীর শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সহজ জীবনযাত্রা নানাদিক থেকে ব্যাহত হয়েছিল। কিন্তু সেই শাসনব্যবস্থা বাংলার সুদূর পল্লী অঞ্চলের কবি বড়ু চণ্ডীদাসকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তা বলার মত কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে মুসলিম শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব বাঙালীর কাব্যে ও সাহিত্যে শ্রদ্ধাসহকারে গৃহীত হচ্ছিল একথা ঠিকই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে ব্যবহৃত আরবী ও ফার্সী শব্দ এবং আরবী শব্দের বিকারে জাত শব্দসমূহ তার নিদর্শন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে উল্লিখিত জীবিকা

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে প্রধান চরিত্র তিনটি—আয়ানবধূ রাহী, গোপপুত্র কাহ্নাঞি ও পরিচারিকা বড়ায়ি। এদের অশন-বসন, বিলাস-ব্যসন চলন-বলন ও আমোদ-উৎসবের যেটুকু চিত্র এ কাব্যে অঙ্কন করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে মধ্যযুগের পল্লী-বাংলার দৈনন্দিন জীবনের জীবন্ত রূপ—তাদের অভ্যাস ও সংস্কার, মনন ও কল্পনা এবং দৈনন্দিন জীবনচর্যার নানাদিক ও ক্ষেত্র। রাষ্ট্রব্যবস্থার কিছু কিছু পরিচয়ও রয়েছে করপ্রথায় এবং রাজার শাসনব্যবস্থায়। বড়ু চণ্ডীদাসের নায়ক-নায়িকা যে সমাজব্যবস্থায় লালিত তাদের প্রধান জীবিকা গোপবৃত্তি। শ্রীরাধা গোপবধূ, কাহ্নাঞি নন্দগোপের পালিতপুত্র, বড়ায়ি ও শ্রীরাধার সখীরা সবাই গোপ-রমণী। গোপালন ও নানাবিধ দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ের উপর পল্লীর জীবিকা নির্ভরশীল। পল্লীর অদূরে বাজার। বাজারে পশারিণীরাও বিকিকিনি করত। পশারিণীর কাজ গোপরমণীদের একান্ত প্রিয় ছিল। গৃহ-কর্মের অবসানে সুবেশিনী গোপবধূগণ মাথায় দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের পশরা নিয়ে বিক্রয়ের জন্য হাটে যেত। নিম্নশ্রেণীর মেয়েরাও জীবিকা নির্বাহের জন্য হাটেবাজারে যাতায়াত করত, পথে সওদা কেনাবেচা করত। রাধার উক্তিতে আছে—

ঘরের বাহির হৈঁতে তেলিনী তেল বেচিতেঁ…

পশারিণীর কাজ গোপসমাজে অবহেলিত বা অসম্মানের ছিল না। সম্পন্নঘরের বধূগণও এ কাজ করত, তবে অনেক সময় বড়ঘরের সুন্দরী বধূগণের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সঙ্গে একজন প্রৌঢ়া অথবা বৃদ্ধা পরিচারিকা থাকত। বড়ু চণ্ডীদাস লিখেছেন :

দেখি রাধার রূপ যৌবনে।
মাঅক বুঝিল আইহনে॥
বড়ায়ি দেহ এহার পাশে।…
হাটে বাটে রাধা রাখিবারে॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে বড়াই বুড়ীর তত্ত্বাবধানে রাধা তার ষোল শত সঙ্গিনী গোপবধূর সঙ্গে পশরা মাথায় হাটে যেত। সরল চলন, বলন, অকপট ব্যবহার ও মনোরম সাজসজ্জায় পশারিণী গোপসুন্দরীগণ নিশ্চয় পথিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এ কাব্যে আরও কয়েকটি বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বিরহব্যাকুলা রাধা বলছে :

বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পনী॥

মাটির বাসন প্রস্তুত-শিল্প পল্লী বাংলার নিজস্ব সম্পদ। মধ্যযুগের বাংলা দেশে এ শিল্প এতটা উন্নত ও জনপ্রিয় ছিল যে, পল্লীর সাধারণ নারীও আপন মর্মবেদনার পরিচয় দিতে গিয়ে কুম্ভকারের আগুনের উল্লেখ করেছে। গ্রন্থের মধ্যে বহু জায়গায় কলসীর উল্লেখ পাওয়া যায় :

যমুনার তীরে বড়াই কদমের তলে।
পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহি ত মঙ্গলে॥

মঙ্গলের প্রতীক পূর্ণঘটরূপে মাটির কলসীই ব্যবহৃত হ'ত। অন্যত্র : শুন কলসী লই সখা আগে জাএ। এবং,—পূন্ন কলস কিবা ভরিলোঁ হাথে। তেলী বা তৈল-বিক্রেতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তেলীগণ কাঁধে তৈলের ভার নিয়ে পল্লীর পথে অথবা গৃহস্থের

বাড়ী বাড়ী গিয়ে তৈল বিক্রয় করত। বড়ু চণ্ডীদাসের অভিসারিকা রাধা কৃষ্ণের দর্শন না পেয়ে বলেছে, সে নিশ্চয় পথে তেলী দর্শন করে এসেছে। নাপিতের বৃত্তির উল্লেখও পাওয়া যায়। সক্ষোভে রাধা বলেছে :

আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাগিতের পো।
কানাড়ী খোপা বড়ায়ি মুণ্ডাযিবোঁ মো ॥

রাজা মহাদানী বা মোহাদানী নামে একশ্রেণীর রাজকর্মচারী নিযুক্ত করতেন। এদের কর্তব্য ছিল শুল্ক সংগ্রহ করা। পল্লী-জনসাধারণ নানাবিধ শিল্পকাজ করেও জীবিকা নির্বাহ করত। বাঁশ বেত ইত্যাদির সাহায্যে একপ্রকারের আধার প্রস্তুত হত। এই আধারে বা চুপড়ীতে করে হাটেবাজারে সওদা করে নিয়ে যাওয়া হ'ত। হাটে যাবার পথে রাধার মাথায় এরূপ সওদা পূর্ণ চুপড়া মাঝে মাঝে চোখে পড়ে :

ওলাহা হা   রাধা চুপড়ী

দেহ মো আমার পসরা।

বাঁশ, বেত পাট, তৃণ ইত্যাদি দিয়ে 'বাহুক' 'শিকিয়া' বেতের বিঁড়ে ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরী করা হত। মজুরেরা বাঁশের বাঁক কাঁধে করে পথে জিনিস বয়ে নিয়ে যেত। হাতির কাঁধে স্থাপনের জন্য তৃণের বা বেতের মাদারের আসন তৈরি করা হত। পাটের তৈরী সিকের মধ্যে দধিদুগ্ধের পসরা সাজিয়ে রাধা চলত। শ্রীরাধা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী সন্দেহ। কিন্তু তার বদনকে উজ্জ্বল্যে ও চন্দ্রবিন্দুতে আবরণ করবার করে তুলেছে বাংলার শিল্পকারগণ—

মিশি দেহকরগণে বান্ধিয়া আতি যতনে
যেন কম্বু বতনাক রতনে ॥

বাংলা দেশের মণিকার ও স্বর্ণকারগণ কারুশিল্পে কতখানি দক্ষতা অর্জন করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীরাধার ব্যবহৃত বিচিত্র অলঙ্কারের বর্ণনায়। শাঁখার কাজ ও হস্তীদন্ত শিল্পের উল্লেখও পাওয়া যায়। বাংলা দেশের মেয়েরা হাতে শাঁখার বলয় এবং গলায় গজমুক্তার মালা পরত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে কৃষ্ণবিরহিণী রাধা বলছে :

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঙ্গ আমার।
ছিণ্ডিআ পেল ইবোঁ গজমুকুতার হার ॥
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর ॥

অন্যত্র রাধার রূপবর্ণনায় :

গিএ গজমুতি হার   মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচযুগল উপরে।

বাংলার বস্ত্রশিল্পও অত্যন্ত উন্নত ছিল। সূতী, পাট ও সূক্ষ্ম রেশমীবস্ত্র উৎপাদনে বাঙালী তাঁতীর নৈপুণ্য প্রাচীন যুগ থেকেই স্বীকৃত।

সাধারণ শিক্ষা

পল্লীগ্রামের সাধারণ লোক লিখতে পড়তে ও হিসাব করতে পারত। বালক কাহ্নাঞি বৃন্দাবনের মাঠে মাঠে গরু চরায়, রাস্তায় রাস্তায় লগুড় নিয়ে খেলা করে, আবার অঙ্ক কষে কড়া গণ্ডা হিসাব করে রাধার কাছ থেকে মহাদান দাবী করে—'লেখা করে কাহ্নাঞি আপনে খড়ী পাতী।' আবার গাছ কেটে সংখ্যা দ্বারা মাপ নিয়ে পাঁচ পাটের ছোট্ট নৌকা তৈরি করে। মধ্যযুগের বাংলা দেশের সাধারণ লোকও নিরক্ষর ছিল না বলা চলে।

প্রণয়োপহার

সামাজিক আচার-আচরণের মধ্যে প্রণয়-নিবেদনের উদ্দেশ্যে স্ত্রীপুরুষ পরস্পর পরস্পরকে কর্পূর-সুবাসিত তাম্বুল প্রেরণ করত। সমাজে এ প্রথাটি এত প্রচলিত ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে কবি 'তাম্বুলখণ্ড' নামে একটি স্বতন্ত্র খণ্ড সংযুক্ত করেছেন। ফুল এবং নেতপাটোল—রেশমী শাড়া প্রণয়োপহাররূপে আদৃত ছিল। কাহ্নাঞি বড়ায়ির মারফতে শ্রীরাধার কাছে কর্পূর-সুবাসিত তাম্বুল ও ফুল পাঠিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে কাহ্নাঞির প্রেমনিবেদন রাধা সরোষে প্রত্যাখ্যান করেছে :

তো নানা ফুল   পান করপুর
সব পেলাইল পায়।

তাম্বুলের এবং মশলারূপে কর্পূরের ব্যবহার প্রাচীন বাংলায়ও ছিল। বৌদ্ধগান ও দোহায় তাম্বুলের ও কর্পূরের উল্লেখ আছে।

বিবাহ ও যৌনজীবন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে দেখা যায় শ্রীরাধা কখনও একাদশ বর্ষীয়া, কখনও বা চতুর্দশী। সম্ভবতঃ এগার বৎসরের মধ্যে অথবা তারও আগে মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত। এরূপ বৈবাহিক জীবনের ফলে বালিকা জীবন বিড়ম্বিত হ'ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে বালিকাবধূ শ্রীরাধা তার কামকলা অনভিজ্ঞতার কথা বারে বারে বলেছে :

আম্মার কোমল দেহে।
না জানো দূতী পর পুরুষের নেহে ॥

অন্যত্র :

লবলীদল কোঁমল আম্মার দেহে।
এবেঁ নাহি সহে পর পুরুষের নেহে ॥

এগার বৎসরের বালিকা-দেহের উপর কৃষ্ণের

অত্যাচার ঘটেছে। রাধার তখনও মন জাগে নি, কিন্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে দেহদান করতে হয়েছে। অপরিণত বয়স্ক নরনারীর মধ্যে এরূপ দেহমিলন সমাজ-জীবনে কলুষিত যৌনসম্পর্কের পরিচায়ক। বড়ায়ির ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়েও সে যুগের শিথিল যৌনজীবনের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। বড়ায়ি মধ্যযুগের সমাজের বিশেষ একশ্রেণীর নারীর প্রতিনিধি। কাব্যে তার আবির্ভাব— 'বিকটদন্ত, কপটবাণী, কুটিল গমন ঘনকাশে'—ক্রূর ষড়যন্ত্রের জাল পেতে অসামাজিক প্রেমের দূতিয়ালী করে সে পল্লীর সরলা নারীদের অশুচি কর্মের পথে নামিয়ে আনে। সগৌরবে এ কাজে সে তার কৃতিত্বের কথা কৃষ্ণকে বলেছে :

আযোড় যোড়ন আম্মে করিবাক পারি।
সে কি রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী ॥

অসামাজিক পথে জোড়া বাঁধানো তার কাজ। এ কাজে সে এমনই দক্ষ যে সীতার ন্যায় সতীসাধ্বী নারীকেও পাপের পথে নামিয়ে আনতে পারে। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত বড়ায়িকে 'দালাল' বলে অভিহিত করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে যথার্থই সে মেয়ে-যোগানদারের ভূমিকা অভিনয় করেছে। বৃন্দাবনে কাহ্নাঞিঁ লগুড় হাতে খেলা করছে। বড়ায়ি আস্তে আস্তে গিয়ে তার কাছে রাধার রূপ বর্ণনা সুরু করেছে। নারীদেহের বর্ণনা করে কৃষ্ণের অন্তরে প্রবৃত্তির নীচুমহলের জাগরণ ঘটানই তার ইচ্ছা। একটু পরেই দেখা গেল, ঔষধের কাজ সুরু হয়েছে—কৃষ্ণ রাধাকে পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। রাধার কাছে সে-ই কৃষ্ণের ফুল ও তাম্বুল বয়ে নিয়ে গেছে। বারে বারে কৃষ্ণের গুণব্যাখ্যা করে রাধার মনে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ জাগাতে চেষ্টা করেছে। বিদ্যাপতি ও জয়দেবের সখী বা পরিচারিকার সঙ্গে বড়ায়ির বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। বড়ায়ি রাধাকৃষ্ণের মাতামহীস্থানীয়া ও শ্রীরাধার অভিভাবিকা। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে অসামাজিক সম্ভোগের ও পরস্ত্রী-গমনের দূষিত আদর্শের পক্ষে সে দূতিয়ালী করেছে :

যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে
দেখিলে হএ মুকুতী।
সে দেব সনে নেহা বাড়াইলেঁ
হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতী ॥

যৌনজীবন কতখানি পঙ্কিল হলে তবে এরূপ অগম্যাগমনের আদর্শকে শাস্ত্রসম্মত ও পুণ্যকার্য বলে ধরে নেওয়া হয় তা চিন্তনীয়। রাধাবিরহখণ্ডে কবির অন্তর-দৃষ্টি যেন তাঁর যুগের সমাজের শিথিলতর যৌনজীবনের উপর তির্যকভাবে পতিত হয়েছে। কবির অভিজ্ঞতা প্রবাদবাক্যের গুরুত্বের দাবী রাখে :

সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ
জুড়িয়ে আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলেঁ
জুড়িএ কাহার বাপে।

এবং পুরুষ ভ্রমর দুইহো এক মান।
নানা থান ভ্রমি ভ্রমি করএ মধুপান।

নারীসমাজ

গৃহকর্মনিপুণা সাধ্বী নারীগণ পরিবারের শ্রী ও কল্যাণরূপিণী ছিলেন। আপন বৈশিষ্ট্যে ও ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যে সগৌরবে তাঁরা সংসারে অবস্থান করতেন। শ্রীরাধা বহুবার সগর্বে ঘোষণা করেছে :

বড়ার বহুআরী আম্মে বড়ার সভাএ।
কার কাঁচ আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ ॥

সতীত্বের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠাবোধ গৃহবধূদের এই অহঙ্কারকে কমনীয় সৌন্দর্যে মধুর ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সমাজে স্ত্রী-শিক্ষার কি ব্যবস্থা ছিল এবং পল্লী বাংলার সাধারণ মেয়েরা লেখাপড়া জানতেন কিনা জানা যায় না। তবে অজ্ঞ তাঁরা ছিলেন না। রাধাকৃষ্ণের পরস্পর উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্যে রাধার পুরাণ-ভাগবত ইত্যাদি শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। দানখণ্ডে শ্রীরাধা পরস্ত্রীগমনের পাপ সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রীয় উদাহরণ প্রয়োগ করেছে :

গুরুপত্নী তারাক হরিল শশধরে।
অদ্যাপিহো অপযশ তার পরচরে ॥
কপটে আহল্যাক রমিল সুরবরে।...
সুন্দ উপসুন্দ আছিলা দুঈ ভাই।
তিলোত্তমা হেতু দুঈ মরিলা এক ঠাই ॥
সুম্ভ নিসুম্ভ দুই আসুর আছিলা।
পার্বতীর কারণে দুঈ জন মৈলা ॥
চৌদ চৌ যুগ আয়ু লঙ্কার রাবণ।
তেহোঁ যে মজিআঁ গেল সীতার কারণ ॥

কাহ্নাঞিঁর অবাঞ্ছিত প্রেমকে অস্বীকার করে শ্রীরাধা পুরাণোক্ত সতীধর্মের মহিমা ঘোষণা করেছে :

ধিক জাউ নারীর জীবন
দহেঁ পসু তার পতী।
পর পুরুষের নেহাএঁ যাহার
বিষ্ণুপুরে হএ স্থিতী ॥

অন্যত্র :

সেসি নারী যে হএ সতী।
যাক উপভোগে নিজ পতী ॥
রস নাহি পরার পুরুষে।
যার উপভোগে কুল নাশে ॥

নারীত্বের এই উদার মহিমায় বিশ্বস্তা, লক্ষ্মীর মত কল্যাণী, শান্তি ও আনন্দের উৎসস্বরূপা নারীগণ যে বাংলার ঘরে ঘরে আদৃতা হতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। গৃহবধূগণ সীমন্তে সিন্দুর ও বাহুতে বলয় ধারণ করতেন। জন্মখণ্ডে :

কেশপাশে শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দুর।

এবং :

চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে সিন্দুর
বাহুতে বলয় শোভে···

বাণখণ্ডে :

রতনে জড়িত তোর দুই বাহু শঙ্খল।
সিশে তোর শোভএ সিন্দুর ॥

সধবা মেয়েদের সিন্দুর ধারণের প্রথা বাংলা দেশের অতি প্রাচীন রীতি। গোবর্ধনাচার্যের একটি শ্লোকেও তার নিদর্শন আছে :

বন্ধনভাজোঽমুষ্যাঃ চিকুরকলাপস্য মুক্তমানস্য।
সিন্দুরিতসীমন্তচ্ছলেন হৃদয়ং বিদীর্ণমেব ॥

অবগুণ্ঠনের ব্যবহারও গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না। গোকুলের পথে বা কালিন্দী নদীর তীরে কাহ্নাঞি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বার বার শ্রীরাধার দেহবর্ণনা করেছে। রাধার অনবদ্য মুখচ্ছবি অবগুণ্ঠনের অন্তরালে ঢাকা থাকলে তার রূপের অমন নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব হ'ত না। পল্লীর সাধারণ মেয়েরা যারা হাটে-বাজারে বিকিকিনি করে জীবিকা অর্জন করে পুরুষকে সাহায্য করে, নানা কাজকর্মে শারীরিক পরিশ্রম করা যাদের পক্ষে অনিবার্য, অবগুণ্ঠনের প্রয়োজনবোধের বালাই তাদের না থাকাই স্বাভাবিক। গৃহবধূরা হাটে-বাজারে যাতায়াত করলেও তাদের গতি-বিধি ও হালচাল প্রৌঢ়াদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল। শাশুড়ী-গণের বধূনিপীড়নের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। দুর্জন শাশুড়ী-গণ অনেক সময় চঞ্চলমতি বধূদের গৃহমধ্যে অত্যন্ত কড়া-শাসনে রাখত। বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা বড়ায়িকে বলছে :

আম্মার সাসুড়ী বড়ায়ি বড় খরতর।
সবখন রাখে মোরে ঘরের ভিতর ॥

বিশ্বাস ও সংস্কার

আয়ান-জননীর কাছ থেকে শ্রীরাধার হাটে যাবার অনুমতি আদায় করতে বড়ায়িকে বহু বেগ পেতে হয়েছে। মানুষের বহু অভ্যাস ও কল্পনায় এখনও জড়িয়ে আছে সেই আদিম যুগের মানুষের সংস্কারাচ্ছন্ন মন। মানুষ জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যখন কোন অসম্ভাবিত ঘটনাকে উপলব্ধি করতে পারে নি তখনই অলক্ষিতে তার মনে এসে ঠাঁই পেয়েছে নানাবিধ সংস্কার। সৃষ্টির আদিযুগের মানুষের ভয়, ভাবনা ও বিশ্বাস এ যুগের মানুষ আমরা আজও মনের মধ্যে পুষে রেখেছি। পল্লী বাংলার জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বহু সংস্কারের উল্লেখ এ কাব্যে রয়েছে। অবস্থা-বিপর্যয়ে প্রপীড়িত নানাবিধ সংস্কারের দোহাই দিয়ে সান্ত্বনা পেতে চেষ্টা করেছে। যাত্রাকালে হাঁচি পড়লে অথবা চরণাগ্রে আঘাত পেলে যাত্রা অশুভ হয়, বাঁদিক্ থেকে শিয়াল ডানদিকে পালিয়ে যায় অথবা নরকপাল হস্তে ভিক্ষারতা যোগিনী যদি চোখে পড়ে অমঙ্গল ঘটে। কাঁধে তৈলাধারসহ তেলী, ব্যাধ এবং শূন্য কলসী কাঁখে রমণী অশুভ দর্শন। শুকনা গাছের ডালে কালো কাকের ডাক অমঙ্গল সংবাদ বহন করে,—এমনি বহুবিধ সংস্কার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে পাওয়া যায়। মথুরার পথে বিপন্না রাধার মনে জেগেছে :

কোন আসুভ খনে পাঅ বাঢ়ায়িলোঁ।
হাঁছী জিঠী আয়র উঝট না মানিলোঁ ॥
শুন কলসী লই সখী আগে জাএ।
বাএঁওর শিআল মোর ডাইনেঁ জাএ ॥···
কাথা দূর পথে মোঁ দেখিলো সওনী।
হাথে খাপর ভিখ মাঙ্গএ যোগিনী ॥
কান্ধে কুরুআ লআঁ তেলী আগে জাএ।
সুখান ডালত বসি কাক কাঢ়ে রাএ ॥

বংশীখণ্ডে কৃষ্ণ রাধার বিরুদ্ধে বাঁশী চুরির অভিযোগ এনেছে। রাধা এই অভিযোগের উত্তরে তৎকাল প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারের দোহাই দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছে :

ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতী।
জলমাঝেঁ দেখিলোঁ মো কি নিশাপতী ॥
পুন্ন কলসে কিবা ভরিলোঁ হাতে।···
গুরুর আসনে কিবা চাপিআঁ বসিলোঁ।
জলের আখর কিবা ভুমিতে লেখিলোঁ ॥
খণ্ড বিচনীর কিবা বাঅ তুলী লৈলোঁ গাএ।
···চান্দ সুরুজ রাত সাখী।
যে তোর বাঁশী নিল সে খাউ:তুমি আখী।

যবেঁ মো চুরী কৈলোঁ হআঁ নারী সতী।
তবেঁ কালসাপ খাইএ আজিকার রাতী॥

ভাদ্র মাসের শুক্লা-চতুর্থীর চন্দ্রমা নষ্টচন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। এই চন্দ্র দর্শন করলে, মাটির উপর জলের আঁক কাটলে অথবা ভাঙা কুলার বাতাস শরীরে লাগলে অযথা অপবাদ ঘোষিত হয়। হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করে সে হাত কানে লাগিয়ে শপথ উচ্চারণ করার রীতি প্রচলিত ছিল—"ভূমি ছুইআঁ হাথ পরসওঁ দুই কানে।" নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য রাধা চন্দ্র, সূর্য, বরুণকে সাক্ষী মেনেছে এবং নিজের সতীত্বের দোহাই দিয়েছে।

অদৃষ্টনির্ভরতা ও পূর্বজন্মের কর্মফলে বিশ্বাস মানুষের জীবনের উপর গভীর রেখাপাত করত। বর্তমান জন্মের ভালমন্দ সবটাই অতীত কর্মকৃতির অবদান। তাম্বুলখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের কামপিপাসার আকণ্ঠ আকুলতার কাছে 'এগার বৎসরের বালী' শ্রীরাধার সমস্ত আকুতি স্রোতের তৃণের মত ভেসে গেছে। অবশেষে ব্যথিত হৃদয়ে কৃষ্ণের সমস্ত অশুচিকর্মের জন্য সে তার নিজের কর্মফল ও অদৃষ্টকেই দায়ী করেছে:

অনন্ত জরমেঁ গুরু ব্রাহ্মণেরে
দিলোঁ নানা দুখভার।
তেকারণে বিধি যত দুখগণ
লেখিল সাঠীহারে॥
কইলোঁ খণ্ডব্রত আর জরমত
তেঁ বা দুখিনী মোএঁ।
ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ
না ছাড়ে নান্দের পোএ॥
জরম গেল করমের খণ্ড
কাল কাহ্নাঞিঁর হাথে॥

দানখণ্ডে কাহ্নাঞিঁর অভব্য আচরণে তার নিজের নামটির উপর পর্যন্ত বিতৃষ্ণা জেগেছে। কিন্তু এখানেও সেই নিয়তিকেই দায়ী করেছে:

কালিনী মাত্র মোর নাম থুইলো রাধা,
হাছি জিঠী কে হো তাত না দিল বিরোধা॥

তিথি-নক্ষত্র দেখে শুভক্ষণে বিদেশযাত্রা অথবা কোন শুভকর্মের অনুষ্ঠান করা হ'ত। শুভ-উৎসবে নানা দেবতার পূজা ও নানা আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হ'ত। বড়ায়ি রাধার কাছে কৃষ্ণের প্রণয়োপহার ও প্রেমনিবেদন জ্ঞাপন করতে চলেছে:

শুভ তিথি বার শুভক্ষণে, অতিশয় উল্লসিত মনে।
বন্দিআঁ সব দেবগণে, বড়ায়ি শ্রীরামচরণে॥

নৌকাখণ্ডেও কাহ্নাঞিঁ শুভক্ষণ দেখে নৌকা নির্মাণ শুরু করেছে। বিদেশ যাত্রাকালে শুভানুষ্ঠানের কোন ব্যতিক্রম ঘটলে যাত্রা অশুভ হয় বলে সাধারণের বিশ্বাস ছিল:

আযাত্রাএঁ গোকুল কইলোঁ গমনে।
শিয়রত বাঁশী হারায়িল তেকারণে॥

অন্যত্র: কমন আসুভক্ষণে বাঢ়ায়িলোঁ পা…

পুণ্যলোভ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল ছিল, সাগর সঙ্গমে গায়ের মাংস কেটে কেটে মকর ভোজ দেওয়ার মত কঠোর মানত করতেও তারা কুণ্ঠিত হ'ত না মোটেই। কাহ্নাঞিঁকে পাবার জন্য রাধা মানত করেছে:

সাগর সঙ্গমে গিআঁ গাএর মাঁস কাটিআঁ
আপনা মগর ভোজ দিআঁ।…

চণ্ডীদেবীর পূজা তখন সমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। বর্তমান যুগে বাংলা দেশে যে সব দেবদেবীর অর্চনা করা হয় তাদের প্রায় সবাই পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গে মঙ্গলচণ্ডীর গানের লোকপ্রিয়তা দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে কাহ্নাঞিঁকে পাবার জন্য রাধাও মানত করেছে:

বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ
তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে।

চণ্ডীপূজা ও ষষ্ঠীপূজা

পল্লী রমণীরা হাটের পথে চলতে চলতে মঙ্গলগীতি গান করত। নৌকাখণ্ডে রয়েছে:

ষোল শত গোপীজন করি কোলাহল।
জায়িতেঁ হরষিত মনে গায়িতে মঙ্গল॥

নদীতীরে অথবা পল্লীর পথে বৃক্ষমূলে পূর্ণঘট স্থাপন করে মঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পূজা করা হ'ত। দেবী আনন্দরূপিণী ও সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী। গোপরমণীরাও কাহ্নাঞিঁকে লাভ করার কামনা করে দেবীর পূজা করেছে:

যমুনার তীরে বড়াই কদমের তলে।
পূর্ণ ঘট পাতী বড়ায়ি চাহি ত মঙ্গলে॥
মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সোআথে।
তবেসি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে॥

বাঙালীর জীবনে নদীর প্রভাব—নদীপূজা

সন্তানদাত্রী ও সন্তানের কল্যাণকারিণী শক্তিরূপে ষষ্ঠীদেবী নারী সমাজে আপন স্থান করে নিয়েছে। শিশু জন্মের ষষ্ঠ দিবসে বিধাতাপুরুষ অলক্ষিতে নিদ্রিত শিশুর ললাটে তার ভাবী অদৃষ্টলিপি লিখে দিয়ে যান—('লেখিল সাঠীহারে')। এই অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়।

নদীমাতৃক বাংলা দেশের অধিবাসীদের জীবনের উপর নদীর প্রভাব সুদূর-বিস্তৃত। যে নদী বাংলা দেশকে শস্যশ্যামলা করে তুলেছে, সারা বছর শান্ত স্নিগ্ধ সেবা-লক্ষ্মী মূর্তিতে যার প্রকাশ, বর্ষা ঋতুতে তার রূপ যায় বদলে—প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে এগিয়ে এসে গ্রাস করে নেয় গ্রামের পর গ্রাম। পল্লীবাংলা অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে নদীর এই ভয়ঙ্করী মূর্তিকে পূজার অর্ঘ্য নিবেদন করে। নৌকাখণ্ডে নদীপূজার ইঙ্গিত পাওয়া যায়:

নাঅ খেআইলোঁ রাধা না পায়িলোঁ কূল।
যমুনাক মান রাধা ফুল সিন্দূর॥
বাতকোঁঅরক মান সাতেসরী হার।···

ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত প্রধান প্রধান হিন্দু তীর্থভূমির সঙ্গে বাঙালীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেদিনও পুণ্যলোভাতুর বাঙালী সুদূর তীর্থযাত্রায় বাহির হয়ে পড়ত। গঙ্গাবতার স্থান, আজমীরের নিকট অবস্থিত পুষ্কর নামক ব্রহ্মাপ্রতিষ্ঠিত তীর্থ, হিমালয়ের মন্দাকিনীতটে প্রতিষ্ঠিত কেদারতীর্থ, কুমায়ুন প্রদেশের অন্তর্গত অলকানন্দাতটের বদরিকাশ্রম বা ব্যাসতীর্থ এবং কাশ্মীরের অন্তর্গত লিঙ্গতীর্থ বটেশ্বরের গৌরব ও মাহাত্ম্য পল্লীবাংলার নারীসমাজের কাছেও সুবিদিত ছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে কৃষ্ণসঙ্গসুখবঞ্চিতা গোপরমণীদের বিলাপের মধ্যে বহু পুণ্যতীর্থের নাম পাওয়া যায়:

কেনা কুশক্ষেত্রে বিশ্বিমতেঁ কৈল দান।
কাহার ফলিল পুষ্কর পুণ্য সিনান॥···
কেনা কেদার শির পরসিল করে।
কেনা তপ তপিল বদরী বটেশ্বরে॥
কে গাঅ তেজিল গঙ্গা সঙ্গত সাগরে।···

গঙ্গাসাগরও বাঙালীর অতি পরিচিত তীর্থ। লোকের বিশ্বাস ছিল, গঙ্গাসাগরে দেহত্যাগ করলে অনন্ত পুণ্যলাভ হয়। আবার কেহ কেহ পরজন্মে কামনা সিদ্ধির অভি-প্রায়ে গঙ্গাসাগরে জীবন বিসর্জন করতেন। বারাণসীও ধর্মপ্রাণ বাঙালীর একান্ত পরিচিত তীর্থভূমি (যাইবো বারাণসী কিবা গোদাবরী)। কৃষ্ণপরিত্যক্তা রাধার বিলাপের মধ্যে তীর্থস্নানের মাহাত্ম্য শোনা যায়:

কেনা সুতীথে স্নান কৈলা ধন্য নারী।
যা লঞাঁ সুখরতি ভুঁজয়ে মুরারি॥

বাঙালীর নিত্য ভোজ্য তরকারি

মধ্যযুগের বাঙালীর নিত্য ভোজ্য তরকারি এবং গৃহিণীদের রন্ধন-প্রণালীর কিছু আভাস ইঙ্গিত এ কাব্যে পাওয়া যায়। গোপবধূ রন্ধনশালায় কর্মনিরতা। হঠাৎ দূরে কাহাঞিঁর বাঁশী বেজে উঠল। বাঁশীর আহ্বানে তার রন্ধন-ব্যবস্থার যে বিপর্যয় ঘটেছে তা লক্ষণীয়:

আম্বল ব্যঞ্জন মো বেশোআর দিলোঁ।
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পানী।
···তা সুনিআঁ ঘৃতে মো পরলা বুলিআঁ
ভাজিলোঁ এ কাঁচা গুআ॥
ছোলঙ্গ চিপিআঁ নিমঝোলে খিপিলোঁ।
বিনি জলে চড়াইলোঁ চাউল॥

সুক্তো, পটল ভাজা, ঝোল, শাক আর অম্বল বাঙালীর নিত্যব্যবহার্য তরকারি। রন্ধনকার্যে গৃহিণী-গণ ঝাল, বাটনা ও মশলা ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। বাঙালী চিরকালই ভোজন-রসিক। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যেও এ ব্যাপারে বাঙালীর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ভাত ও মৎস্য বাঙালীর প্রিয় খাদ্য। ভাজা ও অম্বলের মত মুখরোচক ব্যঞ্জনের সঙ্গে বাঙালীর রসনা অনেককাল আগে থেকেই পরিচিত। প্রাকৃত পৈঙ্গল নামক অপভ্রংশ ভাষায় রচিত গ্রন্থের একটি শ্লোকে বাঙালীর ভোজন-বিলাসিতার সুন্দর বর্ণনা আছে:

ওগ্গর ভত্তা রম্ভঅ পত্তা
গাইক ঘিত্তা দুগ্ধ সজুক্তা।
মোইলি মচ্ছা নালিচা গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা খাই পুণবন্তা।

শ্লোকটি মৎস্য ও উদ্ভিজ্জ ব্যঞ্জনে প্রাচীন বাঙালীর বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক।

যানবাহন ও মাশুল

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে পাওয়া যায় সাধারণ লোক পদব্রজে পল্লীর পথে যাতায়াত করত। জলপথে নৌকাই ছিল পারাপারের উপায়। নদ-নদী, খাল-বিলে ভরা বাংলা দেশে নৌকা ও খেয়াঘাটের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় আদিমতম যুগ থেকেই। চর্যাগীতিতে বাঙালীর আত্মিক-জীবনের সঙ্গে নৌকার ঘনিষ্ঠ সংযোগ দেখান হয়েছে। খেয়াঘাট পারাপারের মাশুল দেওয়া হ'ত কড়ি অথবা কবড়ী দ্বারা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে খেয়াঘাট পার করার জন্য যাত্রীদের দান দিতে হ'ত। রাজসরকার হতে হাট-কর, পথকর ইত্যাদি আদায় করা হ'ত। ("বাটদান হাটদান লইলোঁ রাজঘরে") বিনিময়ের মাধ্যম ছিল কৌড়ী বা কড়ি।

তদানীন্তন রাষ্ট্রব্যবস্থার সামান্যতম ইঙ্গিতও গ্রন্থে রয়েছে। রাজা প্রবল প্রতাপান্বিত—অপরাধীকে তিনি কঠোর হস্তে দমন করেন। রাধা বলছে:

রাজা বড় খরতর নাহিঁ শুন কথা।
লঘু নটক পাইলে কাটে তার মাথা॥

গ্রামগুলি রাজার অধীন ছিল। রাজকর্মচারীগণ রাজকর আদায় করত।

পোশাক-পরিচ্ছদ

সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র, বিচিত্রবর্ণের সূতীর কাপড়, ওড়না সে-যুগের সুন্দরীদের দেহাবরণরূপে ব্যবহৃত হ'ত।

রেশমবস্ত্র ও সূতীবস্ত্র উৎপাদনে বাংলাদেশ সুপ্রাচীন যুগ থেকেই ভারত ও বহির্বিশ্বে গৌরব অর্জন করেছিল। অর্থশাস্ত্র ও পেরিপ্লাস গ্রন্থে বাংলার সূক্ষ্মবস্ত্রের উল্লেখ আছে। পঞ্চদশ শতকে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বাঙালীর সূক্ষ্মবস্ত্রের প্রশংসা করে গেছেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীরাধার পরণেও কখনও সুরঙ্গ পাটোল, কখনও সূতীর শাড়ী ও ওড়না।

অলঙ্কার ও অঙ্গরাগ

বঙ্গললনাদের আভরণের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। মাথায় মুকুট, কণ্ঠে গজমতির মালা ও সাতলহরী হার, বাহুতে বলয় আর কঙ্কন, কানে রতন কুণ্ডল, হৃদয়ে কাঞ্চুলী, পায়ে নূপুর এমনি কত কি! রাধাবিরহখণ্ডে শ্রীরাধার রূপসজ্জার বর্ণনায় সে যুগের নারীদের ব্যবহৃত অলঙ্কারের ও অঙ্গরাগের পরিপূর্ণ একটি তালিকা পাওয়া যায়:

গিএ গজমতী হার মণি মাঝে শোভে তার
উচ কুচ যুগল উপরে॥···
মণি কিরণ উজলে আঙ্গদ ভুজ যুগলে
পহ্নায়িল আতি কুতূহলে॥
বাহুতে কনক চুড়ী মুকুতা রতনে জড়ী
রতন কঙ্কন করমূলে।···
কনক মল্ল তোর আর পাসলী নিকর
জংঘ পদ আঙ্গুলিত সাজে॥
কর্পূর কস্তুরী যোগে আতর তাম্বুল রাগে
গন্ধ রাংগে রচিল বদন॥

পুষ্পরেণু, কুঙ্কুম চন্দন, আতর ও রং অঙ্গরাগ হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। পল্লীবধূরা বিচিত্র প্রক্রিয়ায় চুল বাঁধতেন। শ্রীরাধা কখনও কানাড়া ছাঁদে—কর্ণাট দেশীয় রীতিতে ঘাড়ের উপর লোটানো—ললিত ছাঁদে কবরী রচনা করত। তার কবরী বেষ্টনেও কখনও দেখি দোলঙ্গ মালিকা, কখনও চম্পাকলি, কখনও লবঙ্গমালতী। পল্লীরমণীরা চোখে কাজল, নখে লাল রং এবং মুখে সুবাসিত মুখাবলেপন ব্যবহার করত। পল্লীর পথে পথে দলে দলে গোপবধূগণ চলেছে। তাদের মাথায় বিকিকিনির পসরা। চলনে উল্লসিত আনন্দের প্রকাশ। এদের কাহারো পরণে বিচিত্র রঙের সূতীর শাড়ী, কাহারও রেশমী বস্ত্র। বধূদের সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুর রেখা অধরে তাম্বুলরাগ, বাহুতে বলয় আর কনক চুড়ী, গলায় কাহারও গজমোতির কণ্ঠভূষণ, কাহারও সাতলহরী হার কবরীতে বিচিত্র পুষ্পস্তবক আর সুগন্ধি পুষ্পমালিকা চরণযুগলে কাহারও তোড়া, কাহারও নূপুর। বাতাসে সুদর্শনাদের অঙ্গরাগ কুঙ্কুম চন্দনের গন্ধ। গোপরমণীদের এই অনবদ্য রূপ নিশ্চয় পান্থজনের গমন মন্থর করে তুলত।

মধ্যযুগে পুরুষেরাও মাথায় সুবিন্যস্ত লম্বা চুল রাখতেন। কখনও কুঞ্চিত কেশদাম স্কন্ধের উপর থোকায় থোকায় ঝুলত, কখনও বা মাথার উপর উঁচু করে ঝুঁটি বাঁধা হ'ত। মাথার উপর উঁচু করে বাঁধা চুলকে ঘোড়াচুলা বলা হয়েছে:

পাএ মগর খাড়ু
হাতে বলয়া
মাথে ঘোড়া চুলা

বাঙালী পুরুষেরাও যে অলঙ্কার পরত তার নিদর্শন প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও রয়েছে। এমন কতকগুলি অলঙ্কার ছিল যা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ধারণ করত। কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়ক, কণ্ঠহার, কঙ্কন, বলয়, কেয়ূর, মেখলা, আঙ্গদ বাঙালী পুরুষের কঠোর দেহকেও অলঙ্কৃত করেছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কাহ্নাঞির কানে রতন কুণ্ডল, হাতে বলয়, পায়ে মগর খাড়ু, মাথায় চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, কালো দেহে সুগন্ধ চন্দনের রেখা। নেত ধাড়ী পরিধানে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকাব্যে মধ্যযুগের বাঙালী সমাজের যে চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন, খুব বিস্তৃত না হলেও দু'একটি রেখার টানে তা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নবাগত বিদেশী রাজশক্তির স্বেচ্ছাচার ও উৎপীড়নের তপ্ত স্ফুলিঙ্গ সুদূর পল্লী-বাংলার জনগণের জীবনধারাকে আলোড়িত করে তুলতে পারে নি। গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীগণের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সেই রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রত্যক্ষ কোন সংযোগ ছিল না। পল্লী-সমাজে জীবনচর্যার সরল, শান্ত, সহজ আদর্শ সক্রিয় ছিল। সমাজে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। মধ্যযুগের অরাজকতার অন্ধকারে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ছিন্নসূত্রের সংযোজনার তাৎপর্যে মহিমান্বিত বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে এ সমস্ত খণ্ড খণ্ড ছবি অখণ্ড কাব্যসৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়েছে।

সে নহি

সে নহি

শ্রীচাণক্য সেন

পাঁচ

দেববাণীকে দেখে খুশিতে উচ্ছল হলেন সাবিত্রী আম্মা। মুখের ভাঁজে ভাঁজে হাসি জমে রইল অনেকক্ষণ। আজ আর মিস রায় নয়। আজ শুধু দেববাণী। দেববাণীর পিঠে হাত রেখে তাকে বুকে টানলেন সাবিত্রী আম্মা।

"এসো, দেববাণী, এসো। তুমি আজ আসতে পারবে কি না ভয় করছিলাম।"

"বাঃ। আপনি নেমন্তন্ন করেছেন, আর আমি আসব না!"

"তোমার মা এসেছেন কিনা! মাকে ফেলে তুমি হয়ত—" হাসি দিয়ে বাক্য পুরো করলেন সাবিত্রী আম্মা।

"মা আরও জোর করে আমায় পাঠালেন।"

"পাঠাবেন বৈ কি? তাঁর শরীর সুস্থ আছে ত?"

"মাকে খুব একটা অসুস্থ কোনও দিন দেখি নি। সব অবস্থায়, সর্বত্র, সব সময় তাঁকে স্বাভাবিক দেখতেই আমরা অভ্যস্ত। এখানে এসে দিব্যি জমে গেছেন। আমার বন্ধু মিসেস্ পোষ্টের সঙ্গে তাঁর ভাব দেখলে অবাক হবেন।"

"শুনে আনন্দ হ'ল, দেববাণী। এসো, এ-ঘরটায় এস। তোমাকে দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।"

"আপনি কি অনেককে নেমন্তন্ন করেছেন?" সামান্য সংকুচিত হ'ল দেববাণী।

"অনেককে নয়। পাঁচ-ছয়জন, আর তুমি।"

"চলুন।"

"আরও একজনকে দেখবে, দেববাণী।" হঠাৎ গম্ভীর হলেন সাবিত্রী আম্মা। "আমি চাই, সে তোমাকে ভাল করে জানুক, তুমিও তাকে ভালভাবে চেন।"

উৎসুক চোখে তাকাল দেববাণী।

তার চোখে চোখ রেখে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "সে আমার মেয়ে, সরোজা। এসো।"

শয়ন-ঘরের বিপরীত বড় ঘরে দেববাণীকে নিয়ে সাবিত্রী আম্মা ঢুকলেন। তিনজন ভদ্রলোক, এক মহিলা ও একটি মেয়েকে দেখতে পেল দেববাণী। পুরুষরা দাঁড়ালেন। দেববাণী লক্ষ্য করল, মেয়েটি উঠবার কৃত্রিম ভঙ্গি করল, উঠল না, চেয়ারে চেপে বসল; দেববাণীর প্রতি একবার বক্রদৃষ্টি হানল।

সাবিত্রী আম্মা পরিচয় করিয়ে দিলেন। চারজনই পার্লামেন্টের সদস্য। "এই হ'ল মিস্ রায়," তাঁদের কাছে দেববাণীর পরিচয় দিলেন সাবিত্রী আম্মা, "ওকে আমি দেববাণী বলেই ডাকি, ওর কথা একটু-আধটু আপনাদের বলেছি, এবার আপনারা নিজেরাই ওকে জানবেন। দেববাণী, ইনি এম. শ্রীনিবাসম্। লোকসভার সদস্য। মাদ্রাজের বড় এক কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে এঁর আগ্রহ অসামান্য। ইনি ভি. প্রসাদ রাও, অন্ধ্র প্রদেশ থেকে লোকসভায় এসেছেন, সাচ্চা কংগ্রেস-সেবী, গান্ধীজী স্নেহ করতেন এঁকে। আর ইনি হলেন ওয়াই. পি. সনাতনম্। কেরল থেকে এসেছেন রাজ্যসভায়। মিঃ সনাতনম্ কেরলে কিছুদিন মন্ত্রিত্ব করেছেন, শিক্ষা-মন্ত্রিত্ব। লোকসভায় ইনি একজন শিক্ষা-সমস্যা-বিশেষজ্ঞ; মন্ত্রী অনেক সময় এঁর পরামর্শ ও সদুপদেশ নিয়ে থাকেন। ইনি, দেববাণী, ইনি সুরেশ্বরী ভার্গব, আমার সহকর্মী ও বন্ধু। তুমি যখন জন্মাও নি তখন থেকে সুরেশ্বরী ভার্গব উত্তর ভারতে সুবিখ্যাত। এঁর জীবনের পাতায় পাতায় ভারতবর্ষের এক সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল ইতিহাস।"

দেববাণী প্রত্যেককে সসম্মানে নমস্কার করছিল। শ্রীনিবাসম্ গম্ভীর, বেঁটে, রোগা মানুষ, মাথা-ভরা টাক, দাড়ি-গোঁফ কামান, হাড় বার করা মুখ। তামিল কায়দায় ধুতি পরেছেন, সঙ্গে পশমের পাঞ্জাবী, ছাই রংএর আলোয়ান। প্রসাদ রাও ঘন কৃষ্ণবর্ণ, মজবুত, বলিষ্ঠ মানুষ; মাথায় একরাশ তুষার-শুভ্র চুল, হাসি-খুশী, চঞ্চল ব্যস্ত-সমস্ত। ধুতির ওপর গলাবন্ধ মোটা পশমী কোটে শীতে আত্মরক্ষা করছেন। সনাতনম্ বিপুলকায়; বিরাট মুখে তিন ভাঁজ চিবুক; বড় বড় চোখে মোটা

কাঁচের চশমা। তাঁর নাসারন্ধ্রের দিকে তাকিয়ে দেববাণীর হাসি পেল, মনে পড়ল কথামালার গল্প: ঘুমন্ত সিংহের নাকে ইঁদুরের প্রবেশ। ঘাড় প্রায় নেই; প্রকাণ্ড মাংসল কাঁধে সুবৃহৎ মাথা। একখানা সোফা পরিপূর্ণ করে উপবিষ্ট সনাতনম্; উঠে দাঁড়ালেন বেশ কষ্টে। গলাবন্ধ কোটে তাঁকে অতিকায় গোলাকার কোনও বস্তু মনে হ'ল, অথচ দেববাণী দেখল, বড় বড় চোখে সনাতনম্ তাকে খুঁটিয়ে দেখছেন। সুরেশ্বরী ভার্গবকে দেববাণীর প্রথম দৃষ্টিতে ভাল লাগল। বয়স নিশ্চয় সত্তর পার হয়েছে; কিন্তু বার্ধক্য যে স্ত্রীলোককে এত প্রশান্ত, সুন্দর করতে পারে, দেববাণী আগে খেয়াল করে নি। ধবধবে ফর্সা রং এখনও উজ্জ্বল। চোখের দীপ্তি এখনও অম্লান। অপ্রচুর শুভ্র কেশ অযত্নে বিন্যস্ত। ছোট-খাটো ছিমছাম দেহ, সাদা উলের ব্লাউজ ও মোটা সিল্কের শাড়ীতে সুশোভন। বাঁধান দাঁতে ভাঙ্গা চিবুক সামান্য অসহায়; পাতলা অধরোষ্ঠে বাসিফুলের ক্লান্ত কোমলতা, সারা মুখে শান্ত হাসির দীপ্তি চিবুক বেয়ে যেন ঝরছে। দেববাণী এসে দাঁড়াতে সুরেশ্বরী ভার্গব স্নেহের হাসিতে বললেন, "সাবিত্রী আম্মার কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি, মা। বড় কাজে নেমেছ। ভগবান্ তোমার ভাল করুন।"

দেববাণীর ইচ্ছে হ'ল পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। এ পরিবেশে বেমানান হবে তাই মাথা নত করে প্রণতি জানাল। মনে মনে বলল, আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন।

মনে মনে দেববাণী আরও অনেক কিছু ভেবে নিল। সাবিত্রী আম্মা বলেছিলেন পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে দেববাণীকে পরিচয় করিয়ে দেবেন। তাঁরা শিক্ষা প্রসারে, বিশেষত বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, উৎসাহী। তাঁদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলে শুধু যে দেববাণীর গবেষণাগার স্থাপনে সুবিধে হবে তাই নয়, নতুন ভারতবর্ষে প্রথম সারির লোকেরা কি চিন্তা করেন তার আন্দাজও সে পাবে। প্রস্তাবটা দেববাণীর আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। নিমন্ত্রিতগণের সঙ্গে পরিচিত হবার সময় দেববাণীর মনে হচ্ছিল সাবিত্রী আম্মা এমন ক'জনকে একত্রিত করেছেন, যাঁরা তাকে খুঁটিয়ে দেখবেন, যাঁদের সহানুভূতি তাকে অর্জন করতে হবে। শীতের দুপুরে সাবিত্রী আম্মা এঁদের আহারে আমন্ত্রণ করেছেন প্রধানত দেববাণীকে পরিচয়ের সুযোগ দিতে। তাঁর এই অনুগ্রহে যেমন দেববাণীর মন কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল, তেমনি কাঁপল অজ্ঞাত শঙ্কায়, আসন্ন পরীক্ষার আতঙ্কে। তিনজন পুরুষের একজনকেও তার বিশেষ আশ্বাসবহ মনে হ'ল না; বরং খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে সে বুঝল, তিনজনই বহু দূর থেকে কঠিন নজরে তাকে যাচাই করছেন। প্রসাদ রাওয়ের হাস্যচঞ্চল মুখেও কঠিন ঔদাসীন্যের সংকেত। একা সুরেশ্বরী ভার্গবই তাকে অনেকখানি আত্মবল ও বিশ্বাস দিলেন। সবার ওপরে, সে বার বার মনে মনে বলল, রয়েছেন সাবিত্রী আম্মা। তবু তার অস্বস্তি ভাবটা একেবারে কাটল না।

"দেববাণী, এ আমার মেয়ে সরোজা।"

দেববাণী সরোজার মুখোমুখি দাঁড়াল। প্রথম দৃষ্টিতে সরোজাকে ভালবাসল না দেববাণী। মনে হ'ল মুখখানা কঠিন; চোখে ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন। মনে হ'ল, ওষ্ঠে ক্ষীণ গোঁফ-রেখা ঘনিষ্ঠ পরিচয়কে দৃঢ় নিষেধ জানাচ্ছে। ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখল দেববাণী। সরোজা সাবিত্রী আম্মার চেয়ে লম্বা, কিন্তু মানানসই; দেহ মাংসল নয়, কিন্তু সুগঠিত। গালের চোয়াল চওড়া, চিবুক কোমল। সামান্য চাপা নাক কপাল থেকে নেমে এসেছে; প্রশস্ত মসৃণ কপাল। সরু ঈষৎ-বাঁকান ভ্রূ। ওষ্ঠের মাঝখানে সুন্দর ছোট্ট একটি তরঙ্গ। অসমান দাঁতের সারি। সরোজার মুখে প্রধানতম অঙ্গ তার চোখ। এত সুন্দর, এত বড় ভাষাময় চোখ দেববাণী আগে দেখে নি। নাকের পাশ থেকে কানের প্রায় যেন কাছাকাছি সরোজার কালো প্রদীপ্ত নয়ন। চোখের তারা যত কালো, পরিবেশ তত শুভ্র। সে যখন পরিপূর্ণ তাকায় কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগে; ধবধবে অনেকখানি সাদার মধ্যস্থলে ঘনকৃষ্ণ চকচকে চোখের মণি জ্বলজ্বল করে। এ চোখের সামনে সহজে দাঁড়ান যায় না। যেন অনেক বেশী দেখে নেয় সরোজা। কিন্তু সহজে সে কিছু যেন দেখতে চায় না। বেশীর ভাগ সময় সুবিস্তৃত নয়নে ঔদাসীন্যের পর্দা ঝুলিয়ে রাখে সরোজা। তখন কেউ তার সঙ্গে কথা বলতেও সাহস পায় না। কদাচিৎ তার চোখ যখন নিদ্রা-ভঙ্গে জেগে ওঠে, যে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে তাতে, তার মধ্যে বিদ্রূপের ঝলকানি। কথা বলে সরোজা কম; বলার দরকার হয় না। যা মুখে বলে না, দৃষ্টিতে জানিয়ে দেয়। তার দৃষ্টির সামনে মানুষের বাইরের পর্দা খুলে যায়, সরোজা দেখতে পায় ভিতরের মানুষকে। দেখে খুশী হয় না। চোখে কঠিন বিদ্রূপের চাবুক মারে।

পরস্পরের সামনে দাঁড়িয়ে দেববাণী ও সরোজা দু'জন দু'জনকে দেখল। দেববাণীর মনে পড়ল মেয়ের কথা উঠলেই সাবিত্রী আম্মা বিচলিত হন। একটু আগে

উচ্চারিত তাঁর কথা দেববাণীর কানে বাজল: আমি চাই, সে তোমাকে ভাল ক'রে জানুক, তুমিও তাকে ভালভাবে চেন।

জোড়হাতে নমস্কার করল দেববাণী।

"কবে এসেছেন আপনি?" মৃদুস্বরে প্রশ্ন করল।

প্রশ্নের উত্তর দিল না সরোজা। বড় বড় চোখ পুরোপুরি মেলে দেববাণীকে বার বার দেখল। চোখের ঔদাসীন্য কেটে গিয়ে বিদ্যুৎ খেলল, বিদ্রূপের বাণ হেনে সরোজা বলল:

"আচ্ছা! আপনিই মা'র শেষতম পাগলামি।"

"ঠিক বলেছেন," চাপা কলকণ্ঠে হেসে উঠল দেববাণী। "পাগলামিই বটে। কবে এলেন আপনি?"

দেববাণীর একান্ত স্বাভাবিক সপ্রতিভতায় বিস্মিত হ'ল সরোজা। তার ব্যঙ্গবাণের কাছে প্রায় সবাই পরাস্ত, নিপীড়িত হয়। সো ইউ আর মাদার্স লেটেস্ট ক্রেজ—কথাগুলির মধ্যে বিশ্ব-বিষ সে মিশিয়ে দিয়েছিল। দেববাণী তা একেবারে গায়ে মাখল না। বিষের বিষ দেববাণীর দেহে লাগল না। প্রথম সংঘাতে সরোজা হারল। অনভ্যস্ত অনুভূতি তার মন্দ লাগল না। এবারও দেববাণীর প্রশ্নের উত্তর দিল না সরোজা।

নিমন্ত্রিত পুরুষ তিনজন উত্তেজিত আলোচনায় নিমগ্ন। সাবিত্রী আম্মা হেসে হেসে কথা বলছেন সুরেশ্বরী ভার্গবের সঙ্গে। তিনি যে সবক্ষণ তনয়ার দিকে মন নিবিষ্ট রেখেছেন, তার চোখ যে বার বার আত্মজাকে নিরীক্ষণ করছে, সরোজা তা পরিষ্কার জানতে পেল। দেববাণীর চোখে সবটুকু দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সে প্রশ্ন করল, "মাকে আপনি প্রভাবিত করলেন কোন যাদুতে?—হাউ ডিড্ য়ু স্প্রেড্ য়র চার্ম্ অন্ মাদার?"

হাসতে হাসতে দেববাণী জবাব দিল, "ঠিক তার উল্টো। তিনিই আমাকে প্রভাবিত করেছেন। আমার আর যাই থাক, চার্ম নামক বস্তুটির পূর্ণ অভাব।"

"অর্থাৎ আপনি জানেন ওটা আপনার প্রচুর রয়েছে।"

"আপনাকে আমার অনেক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কিন্তু বাধছে।"

"কেন? আপনার তো সহজে বিশেষ বাধে ব'লে মনে হয় না।"

হেসে উঠল দেববাণী। সরোজা আবার বুঝল, বিষে কাজ হ'ল না।

দেববাণী বলল, "আমার চার্ম কাজ করছে না। ধন্যবাদ দি' কি ক'রে?"

ক্ষীণ হাসির বক্র রেখা ওষ্ঠের তরঙ্গে ঈষৎ খেলে গেল সরোজার। চোখে ভ'রে নিয়ে এল রাশি রাশি ঔদাসীন্য। চোখ বুজল বিরক্তির ভঙ্গিমায়, যখন মেলল তখন সে যেন বহুদূরে, বর্তমানে তার সামান্য মনোযোগ পর্যন্ত নেই। দেববাণী যা আছে, তার সামনেই আছে, তারই মায়ের সম্মানিত অতিথির মর্যাদায়, আরও চারজন গুণী-মানী ব্যক্তির উপস্থিতিতে প্রাধান্য-প্রাপ্ত দ্বি-প্রাহরিক আহার-আমন্ত্রণে, সব বিস্মৃত হ'ল সরোজা, সব তুচ্ছ, সামান্য, স্তিমিতার্থ হয়ে গেল সরোজার কাছে; নিজেকে সে সরিয়ে নিয়ে গেল ঔদাসীন্যের গহ্বরে।

অপ্রতিভ, বিস্মিত, মুগ্ধ হ'ল দেববাণী।

আমন্ত্রিত আরও দু'জনের আগমনে সবার মন অন্যত্র সঞ্চারিত হ'ল। সাবিত্রী আম্মার অভ্যর্থনায় বিগলিত হয়ে ঘরে ঢুকলেন গণপৎ গৌতম ও চতুর্নারায়ণ মালব্য। দু'জনই উত্তর প্রদেশ থেকে নির্বাচিত পার্লামেন্টের সদস্য। গৌতমের বয়স ষাট উত্তীর্ণ, লম্বা, সরু দেহ, পাকা চুল কদম-ছাঁটা। পায়জামা চুড়িদার ও আচকানে আভিজাত্য দেখাচ্ছে। দেববাণীর সঙ্গে পরিচয় হতে বললেন, "আপনি তো দেখছি ছোট্ট মেয়ে। আমি ভেবে-ছিলাম, বুঝি-বা সাবিত্রী আম্মারই সমবয়সী কেউ হবেন।" মালব্য মাঝারি সাইজের মাঝারি-দর্শন মাঝারি-বুদ্ধি মাঝ-বয়সী মানুষ, মোটা খদ্দরের কুর্তা ও পায়জামা ছাড়া এত শীতেও কিছু তিনি ধারণ করেন নি। দেববাণীকে 'নমস্তে' ক'রে সোজা তিনি সনাতনমের পাশের চেয়ারে বসলেন। পরক্ষণেই দু'জনের মধ্যে বাক্-বিতণ্ডা শুরু হ'ল। সাবিত্রী আম্মা মৃদু হেসে সুরেশ্বরী ভার্গবকে বললেন "মালব্য ও সনাতনম্ কোনও বিষয়ে একমত নন। একসঙ্গে হলেই তর্ক।"

সুরেশ্বরী মন্তব্য করলেন, "দু'জনের চেহারাই যে একেবারে আলাদা।"

"আলাদা চেহারার লোকেদের বুঝি মিল হয় না?" বিস্মিত হাস্যে প্রশ্ন করলেন সাবিত্রী আম্মা।

"অনেক ক্ষেত্রেই তো হয় না দেখে আসছি। খুব মোটা আর খুব সরু দু'জন লোকের সাচ্চা বন্ধুত্ব সহজে কখনও দেখতে পাবে না। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা মানুষের সঙ্গে পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি পুরুষের মিতালি অস্বাভাবিক।"

দেববাণী দাঁড়িয়েছিল ওদের পাশে। সে বলল, "স্বামী-স্ত্রী হলে কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম।"

তিনজনেই হেসে উঠলেন। সাবিত্রী আম্মা বললেন, "স্ত্রী যদি দারুণ মোটা হন, আর স্বামী টিনটিনে সরু, তা হলে স্ত্রীর মধ্যে বাৎসল্য ভাব বেশী দেখা যায়। মাদ্রাজে

এমনই এক দম্পতিকে আমি জানি। স্ত্রী দশাসই তিন মণ, স্বামী এক মণ দশ সের। মহিলা মহাশয়কে এমন দেখাশোনা করেন যেন তিনি তাঁর চিররুগ্ন সন্তান।"

"ভদ্রলোকও নিশ্চয় পত্নীতে মাতৃদর্শনে পরিতৃপ্ত।" সুরেশ্বরী ভার্গব টিপ্পনী করলেন।

"প্রথমে তিনি রীতিমত বিদ্রোহী ছিলেন। কিন্তু যত স্ত্রীর দেহ বিপুলাকার হ'ল, ততই যেন তাঁর বিদ্রোহ ফুরিয়ে গেল। এখন যদি স্ত্রী তাঁকে কাছে ডেকে কোলে বসিয়ে ধোসে খাইয়ে দিতে চান, অমান্য করার মত সাহস তাঁর আছে কি না সন্দেহ।"

সুরেশ্বরী ভার্গব হাসতে হাসতে বললেন, "ফিরোজপুরে এক স্বামী-স্ত্রী ছিল; সবাই তাদের চিনত। স্বামী ছ' ফুট চার ইঞ্চি, যেমন দীর্ঘ তেমন প্রশস্ত। মাথায় বিরাট পাগড়ি। না, শিখ নয়; পেশোয়ারী হিন্দু। রাস্তায় চললে মনে হ'ত একটা চেনার গাছ হেঁটে যাচ্ছে। তার স্ত্রী ছিল ঠিক উল্টো। ছোট্ট মানুষটি, চমৎকার দেখতে। পাঁচ ফুটেরও কম লম্বা, ক্ষীণ দেহ। দু'জনে রাস্তায় চললে সবার দৃষ্টি পড়ত তাদের ওপর। অথচ স্ত্রীর এমন ভয়ানক দাপট ছিল যে, ভদ্রলোক একেবারে কেঁচো হয়ে থাকতেন।"

"অসম্ভব।" হেসে প্রতিবাদ করলেন সাবিত্রী আম্মা।

"সত্যি বলছি। অমন ছোট্ট সুন্দর মেয়েটির মেজাজ যে অত প্রখর হতে পারে, না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। রাগলে সে স্বামীকে মারতে পর্যন্ত ছাড়ত না।"

"আর ঐ চেনার বৃক্ষ নীরবে স্ত্রীর প্রহার সহ্য করত?"

"প্রকৃতির পরিহাস ত সেখানেই। লোকটি রীতিমত ভয় করত স্ত্রীকে।"

দেববাণী দেখতে পেল সরোজা নিতান্ত অমনোযোগে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে; চোখে-মুখে তার থমথমে বিরক্তি। পুরুষদের মধ্যে সোৎসাহ রাজনীতি-চর্চা চলছে। কান পেতে যেটুকু দেববাণী শুনতে পেল তাতে বুঝল, একই সঙ্গে একাধিক প্রসঙ্গ আলোচিত হ'চ্ছে। সনাতনম্ ও মালব্য কংগ্রেসের সমাজবাদ নিয়ে খণ্ডযুদ্ধে অবতীর্ণ। মালব্য বলছেন, কংগ্রেস সমাজবাদ গ্রহণ করে নি, করতে পারে না তার শ্রেণী-চরিত্র বিসর্জন না দিয়ে; সনাতনম্ জাহির করছেন, মালব্য আসলে কম্যুনিষ্ট, তাই তিনি গণতান্ত্রিক সমাজবাদ যে কত বড় তা বুঝতে পারছেন না। শ্রীনিবাসম্ ও প্রসাদ রাও কোনও মন্ত্রীর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সরস আলোচনায় নিমগ্ন; একে অন্যের পরিবেশিত তথ্য ও তাৎপর্য পরমানন্দে আস্বাদন করছেন। গণপৎ গৌতম, দেববাণী দেখল, কোনও আলোচনায় বিশেষ অংশ নিচ্ছেন না। দৃষ্টি তাঁর সরোজার প্রতি নিবদ্ধ।

রামস্বামী দ্বারপথে উদিত হয়ে সাবিত্রী আম্মাকে কি বলল। সাবিত্রী আম্মা একবার ভেতরে গেলেন। অবিলম্বে ফিরে এসে বললেন, "আহার তৈরী। আপনারা আসুন।"

সবার সঙ্গে দেববাণী বারান্দায় এসে দাঁড়াল। প্রশস্ত টেবিলে আহারের আয়োজন দেখে দেববাণী বিস্মিত, চমৎকৃত হ'ল।

সাবিত্রী আম্মা আগেই সবাইকে বলেছিলেন, তামিল প্রথায় তামিল আহারের আয়োজন করা হয়েছে। এ নিয়ে দু'চারটে রসিকতাও হয়েছিল। সুরেশ্বরী ভার্গব বলেছিলেন, "আমার বাড়ীতে তোমাকে একদিন তা হলে পাঞ্জাবী খানা খেতে হবে।"—সাবিত্রী আম্মা জবাব দিয়েছিলেন, "যে খানা তুমি খাও তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তোমার ছেলেরা যা খায়—"। গণপৎ গৌতম মন্তব্য করেছিলেন, "ভারতবাসী যখন সবাকার খানা একসঙ্গে খেতে শিখবে তখন আমাদের জাতীয় ঐক্য নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।" প্রসাদ রাও যোগ দিয়েছিলেন, "খাদ্য-মন্ত্রীকে তা হলে একটা 'ন্যাশনাল ডিশ' প্রস্তাব করতে বলা হোক। পাঞ্জাব-মারাঠা-গুজরাট-বঙ্গ-তামিল - উৎকল - আসামের দৈনিক খাদ্য থেকে বাছাই করে তৈরী হবে 'ন্যাশনাল ডিশ'। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীরা যখনই পার্টি দেবেন, এই 'ন্যাশনাল ডিশ' পরিবেশিত হবে।" শ্রীনিবাসম্ বলেছিলেন, "ব্যাপারটা মন্দ হবে না কিন্তু। মাছের ঝোল দিয়ে ইডলী খেয়ে তামিল ব্রাহ্মণের জাত যাবে। তণ্ডুরী মুর্গি দর্শনে মারাঠা ব্রাহ্মণ মূর্চ্ছা যাবেন।"

দেববাণী দেখল, টেবিলে নিমন্ত্রিতদের জন্যে কদলীপত্র পেতে দেওয়া হয়েছে, সদ্য-ধোওয়া, চকচকে পরিষ্কার মসৃণ সবুজ জলসিক্ত কলাপাতা। প্রত্যেক কলাপাতার পাশে ষ্টেন্-লেস্ ষ্টীলের গ্লাস। প্রত্যেক কলাপাতায় প্রাথমিক খাদ্য পরিবেশিত। মাঝখানে সরু সুগন্ধি চালের সাদম্, তার ওপর তাজা 'নাই', অর্থাৎ ঘি। সাদমের ওপরে ডান কোণে উপ্পু (নুন), পাশে পাচরি। পাচরি থেকে পর পর বাঁ দিকে আভিয়াল, পরুপ্তোয়াল, কুটু, ভাজা, বড়া, পাপড়ম্, পিকু। সাদমের নীচে ডান দিকে সামান্য পায়সম্। দেববাণী কখনও তামিল গৃহে আহার করে নি, নিয়ম-কানুন তার অজানা। বিদেশে বহুবার তাকে অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হয়ে সে আর সবাই কি করেন তার অপেক্ষায় রইল।

সবার দেখাদেখি দেবযানী প্রথম একটু পায়সম্ মুখে দিল। অনেকটা বাঙ্গালী ঘরের পায়েস, কিন্তু চাল বেশি, দুধ কম। সাদম্ (ভাত), ডাল ও পাচরি অল্প পরিমাণে মিশিয়ে আহার শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে এল সাম্বার। পাচরি, দেবযানী দেখল, সজী, দই ও কাচা-লঙ্কার মিশ্রণ, খেতে মন্দ লাগল না। সাম্বারে অড়হর ডাল, তেঁতুল, দু'চার টুকরো সজ্জী, আর মরুঙ্গকায়—সজনের ডাঁটা। তিনরকমের তরকারী বার বার পরি-বেশন করল রামস্বামী। কারী—কাঁচাকলার ঝোল; আভিয়াল—নানা তরকারীর সংমিশ্রণ, করেলা-সংযোগে সামান্য তিক্তস্বাদ; পরুত্তোয়াল—অনেক রকম তরকারী দিয়ে শুকনো করে রাঁধা। সাম্বারের সঙ্গে এল দুরকমের পাঁপড়—পাপড়ম্, আপড়ম্, প্রথমটা ডালের, দ্বিতীয়টা চালের। তারপর রসম্। দক্ষিণ-ভারতীয় নিমন্ত্রিতগণ যথেষ্ট পরিমাণে রসম্ খেলেন; অড়হর ডালের জুসের সঙ্গে তেঁতুল, টমাটো, ধনে ও অধিক মাপের জল দিয়ে তৈরী তাঁদের এই অতি প্রিয় খাদ্য দেবযানীর পছন্দ হল না। রসমের পর পাল-পায়সম্, অর্থাৎ দুধের পায়েস। তার পর এল মরু—বাংলায় যার নাম ঘোল। বাটি ভরতি মরু পান করলেন দক্ষিণ দেশের অতিথিগণ; অন্য সবাই সামান্য গ্রহণ করলেন, দেবযানী ভদ্রতার খাতিরে একটু নিল। সর্বশেষে ফল নিয়ে এল রামস্বামী। ওয়ারেগরম্—কলা, আর মাম্বড়ম্—আম। দক্ষিণ-ভারতীয়গণ আচমন করে আহারে মনোনিবেশ করে-ছিলেন, গণ্ডুষে ভূরি-ভোজন সমাপ্ত করলেন।

দেবযানী বুঝল, তামিল রীতিতে এলাহি আয়োজন করেছিলেন সাবিত্রী আম্মা। দক্ষিণী নিমন্ত্রিতেরা বার বার আহার্য্য ও রন্ধন-নিপুণতার সরব প্রশংসা করলেন। উত্তর ভারতের গণপৎ গৌতমও খেলেন বেশ তারিফ করে। চতুর্নারায়ণ মালব্য বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারলেন না; সম্ভবতঃ রুটির অভাব তাঁর আহারকে অপূর্ণ রেখে দিল। সুরেশ্বরী ভার্গব সামান্য খেলেন। দেবযানীর খিদে পেয়েছিল, খেতে তার মন্দ লাগল না। কিন্তু বেশ একটু অস্বস্তির সঙ্গে খেতে হল তাকে। সাবিত্রী আম্মা বার বার জিজ্ঞেস করে চললেন, তার ভাল লাগছে কিনা; খেতে বসে এমনি জবাবদিহি করা দেবযানীর অনভ্যাস। তা ছাড়া, দেবযানী লক্ষ্য করল, সরোজা অতি-সামান্য আহারের বাকী সময়টা শুধু তাকেই দেখল, সহজ চোখে নয়, অপাঙ্গে, বক্র-দৃষ্টিতে, যাতে অনেকখানি সন্দেহ, খানিকটা কৌতূহল, কিছুটা ঈর্ষা।

এক ঘণ্টার বেশি সময় আহারে কাটল। সঙ্গে সঙ্গে আলাপ আলোচনা। সাবিত্রী আম্মাই কথাবার্তার পথ-নির্দেশ করলেন। আচমন করে অতিথিগণ আহারে প্রবৃত্ত হলে তিনি দেবযানী-প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। দেবযানী বিব্রত হল, কিন্তু পরীক্ষার জন্যে তৈরীও হল।

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "দেবযানীকে আজ ডেকেছি আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করাতে। দু'দিন হ'ল ওর মা এসেছেন কলকাতা থেকে; তাঁকে একা ফেলে এখানে খেতে আসায় ওর অসুবিধা ছিল। তবু দেবযানী এসেছে, বিশেষ করে এ জন্যে যে আপনাদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পাবে।"

"সেজন্যে ওঁকে আমাদের সবার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত", কণ্ঠস্বরকে সুমধুর করে বলে উঠল সরোজা।

দেবযানীর কান গরম হল, চোখ জ্বালা করল। সাবিত্রী আম্মা সরোজার মন্তব্যে মন দিলেন না। সুরেশ্বরী ভার্গব একবার দেবযানীর মুখের পানে তাকিয়ে একটুকরো ভাজা আলু চিবোতে লাগলেন। গণপৎ গৌতম বলে উঠলেন, "নিশ্চয়। নিশ্চয়।"

প্রসাদ রাও দেবযানীকে বলল, "আপনার কথা সাবিত্রী আম্মার কাছে শুনেছি। আপনি দিল্লীতে রিসর্চ সেণ্টার খুলতে চান? কি কি বিষয়ে রিসর্চ হবে আপনার সেণ্টারে?"

দেবযানী উত্তর দিল, "এপ্লায়েড ফিজিক্স আর ইন্ডাষ্ট্রীয়াল কেমিষ্ট্রি।"

"কোন পর্য্যায়ের রিসর্চ?"

"আমাদের ইচ্ছে কেবলমাত্র উন্নত পর্য্যায়ের। এম. এস-সি পাশ করার পর সেণ্টারে ছাত্র-ছাত্রীরা যোগ দিতে পারবেন। অধ্যাপকরাও আসতে পারবেন। যাঁরা কিছু রিসর্চের কাজ ইতিমধ্যে করেছেন, আরো উন্নত মানের রিসর্চ করতে চান, তাঁদের জন্যেও ব্যবস্থা থাকবে।"

"রিসর্চ করে লাভ কি হবে?" জানতে চাইলেন সনাতন।

হঠাৎ দেবযানী জবাব খুঁজে পেল না। বুঝতে পারল সরোজা মৃদু হাসছে। দেবযানী বলল, "বিজ্ঞান নিয়ে উন্নতমানের রিসর্চে যা যা লাভ হয়ে থাকে তার সবটাই হবে।"

"একটু বুঝিয়ে বলুন", দাবী করলেন সনাতন।

"আমাদের ইচ্ছে যাঁরা রিসর্চ করবেন তাঁরা দেশী বা

বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগিতার যোগসূত্র রেখে কাজ করবেন। ডক্টরেট পাবার জন্যে বেশির ভাগ রিসর্চ কনডাক্ট করা হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গেও আমরা সহযোগিতা করব।"

"বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী হবে?"

দেববাণী গৃণপৎ গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেন হবে না? আমেরিকায় দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথাবার্তা কিছুটা আমার হয়েছে। এ দেশের ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকদের পক্ষে বিদেশে গিয়ে রিসর্চ করা কত কঠিন আপনাদের জানা আছে। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগসূত্র এখনও অত্যন্ত ক্ষীণ। দেশী-বিদেশী অধ্যাপকদের দ্বারা পরিচালিত উন্নতমানের রিসর্চের ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি তা হলে এখানকার থিসিসের ওপরেই বাইরের ডক্টরেট পাওয়া সম্ভব হবে। তা ছাড়া ডক্টরেট পাওয়াটা বড় কথা নয়। বৈজ্ঞানিক রিসর্চের প্রমাণ নব নব আবিষ্কারে। আমাদের রিসর্চ সেণ্টারে যদি সত্যিকার ভালো কাজ হয়, যদি আমরা বিজ্ঞানের পথে চলে প্রকৃতিকে নূতন পথে পরাস্ত করতে পারি, পৃথিবীতে আমাদের মূল্য নিশ্চয় স্বীকৃত হবে।"

চতুর্ণারায়ণ মালব্য বললেন, "আমাদের দেশে ইতি-মধ্যেই কয়েকটি জাতীয় লেবরেটরী স্থাপিত হয়েছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা তাদের কর্ণধার। কিন্তু রিসর্চ বা আবিষ্কার যে বিশেষ হচ্ছে তা ত নয়।"

দেববাণী বলল, "এ কথা আমিও শুনেছি। বৈজ্ঞানিক রিসর্চ সময় ও কষ্ট সাপেক্ষ। চট করে সার্থকতা পাওয়া অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব। আজীবন গবেষণা করেও অনেকে সার্থকতার ছোঁওয়া পান না। তাই, রিসর্চ লেবরেটরী খুললেই তাতে সোনা ফলবে এমন আশা সব সময় অবাস্তব। অবশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ফল তাড়াতাড়ি পাওয়া উচিত। আমাদের দেশে বিজ্ঞান সবে মাত্র জাতীয় জীবনে প্রবেশ করেছে। শিল্প-প্রসারের পদে পদে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা। বিজ্ঞান আমাদের দেশের যতটা সেবা করতে পারে পাশ্চাত্য দেশগুলির ততটা নয়। ধরুন, ঘানির তেল। ঘানি টানে গরুতে। মোটর লাগিয়ে ঘানি টানাতে পারলে অনেক বেশি তেল তৈরী হয়। তেমনি, আমাদের গ্রামে ক্ষেতে জল দেওয়া। সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রতীক্ষায় আমাদের দেশবাসী বসে আছে। বিজ্ঞান এসে তার ঘরে বিজলী বাতি জ্বালবে, তার উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবে, তাকে অতীত যুগের দৈহিক মেহনতের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে। বিজ্ঞান বন্যা আটকাবে, মাঠের ফলন বাড়াবে, জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি করবে। সর্বত্র বিজ্ঞানের প্রয়োজন। সরকারী প্রচেষ্টা কোথায় কতটুকু কি করতে পেরেছে না পেরেছে আমার জানা নেই।"

"আপনার রিসর্চ সেণ্টারকে বেসরকারী রাখতে চান?"

দেববাণী বলল, "ঠিক বলেছেন। তার কারণ অনেক। প্রথমতঃ, সরকারী উদ্যোগে যা হচ্ছে তা হোক, তার অপেক্ষায় বসে না থেকেও আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় যা করতে পারি তা করব। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী প্রতিষ্ঠানের যেমন অনেক ভাল, তেমনি অনেক কিছু ভাল নয়। সরকার হচ্ছে বিরাট পাহাড়ের মত, বিপদের সময় ছাড়া মন্থরগতি। অসংখ্য নিয়মের বেড়াজালে বাঁধা। শুনেছি, ন্যাশনাল লেবরেটরীতে একটা সস্তা যন্ত্র বিকল হলে মাসাধিক কাল কাজ বন্ধ হয়ে থাকে। আমরা আর একটু ক্ষিপ্রগতি হতে চাই।"

"আপনি বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিক আনবার কথা ভাবছেন?"

"কয়েকজন বিদেশী বৈজ্ঞানিকের দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে। বিদেশে অনেক গুণী ও নামী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক আছেন। তাঁদের মধ্যেও উপযুক্ত লোকের সন্ধান করতে হবে।"

"তাঁরা দেশে ফিরতে চান না কেন?" শ্রীনিবাসম্ প্রশ্ন করলেন। "তাঁদের ফেরা উচিত।"

"কেন বলুন ত?" সহাস্যে পাল্টা প্রশ্ন করল দেববাণী।

"দেশপ্রেম বলে একটা জিনিস ত আছে! তাঁরা না হয় মাইনে কমই পাবেন, তবু দেশে তাঁদের যখন এত প্রয়োজন, তখন তাঁদের ফিরে আসা কর্তব্য।"

"মাপ করবেন, মিঃ শ্রীনিবাসম্", দেববাণী উত্তর দিল। "আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি নে। দেশ-প্রেম নিশ্চয় বড় জিনিস; ওটা শুধু রাজনৈতিক নয়। বিদেশে যারা আছে তাদের সকলের মন দেশের জন্যে ব্যথিয়ে ওঠে। দেশ তাদের সর্বদা টানে। আদর্শের বড় বুলি তারা আওড়ায় না। দেশের কাজের টান নয়, মাটির টান, জল-হাওয়ার টান, আত্মীয়-বন্ধু-পরিজনের টান। কিন্তু তবু তাঁরা ফিরতে চান না। কেউ কেউ ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে ব্যথা-ভরা মন নিয়ে পুনরায় দেশত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।"

"কেন? দেশ তাঁদের কাছে কি অপরাধ করেছে?"

"তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমেরিকায় ও য়ুরোপে আমার কথা হয়েছে। তাঁরা অর্থলিপ্সু নন, অন্ততঃ সবাই নিশ্চয় নন। দেশে অনেক কম মাইনের কাজ করতে তাঁরা রাজী। কিন্তু যেখানে তাঁদের আঘাত লেগেছে সবচেয়ে বেশি, তা হচ্ছে মানুষ হিসাবে প্রাপ্য সম্মানের অভাব। আমরা এখনও বড় বেশি পলিটিক্যাল। বিদেশে বৈজ্ঞানিক, লেখক, বুদ্ধিজীবি অধ্যাপকদের যে সম্মান, এদেশে তার অভাব। সরকারী কর্ম নিয়ে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক দেশে ফিরে এসে দেখেছেন তাঁর চেয়ে প্রশাসনিক অফিসারদের সম্মান ও ক্ষমতা অনেক বেশি। বিদেশে বিদ্যা ও কর্মের পুরস্কার হিসেবে যেটুকু খাতির, মান, যশ তাঁরা পান, তার অংশও দেশে আমরা তাঁদের দিতে চাই নে। মানুষ হিসেবে কাউকে মেপে দেখতে এখনও আমরা শিখি নি। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, এই হল তাঁদের প্রধান অভিযোগ।"

"কিন্তু আপনি ত প্রচুর খাতির পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি," বলে উঠল সরোজা।

তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দেবরাণী বলল, "তা পাচ্ছি। কিন্তু তার মূলে আমার নিজের অর্জিত কর্ম নয়, আপনার মার স্নেহ।"

মাধব্য বললেন, "আপনি অনেক দিন বাইরে ছিলেন?"

দেবরাণী হেসে বলল, "এখনও আছি। আমি কয়েক মাসের ছুটিতে আছি।"

"আবার চলে যাবেন?"

"যেতে ত হবেই একবার। যদি রিসার্চ সেণ্টার স্থাপিত হয় তা হলে কর্মস্থানও দেশেই হবে। যদি না হয়, আরও কিছুদিন বিদেশে কাটাতে হবে।"

"আপনার সঙ্গে এ উদ্যোগে আর কে কে আছেন?"

"আছেন কয়েকজন। বিদেশে দশ-বারো জন বন্ধুর উৎসাহ ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আমরা পেয়েছি।"

"আপনারা কে কে?"

"আমি ও আমার এক বন্ধু।"

"তাঁর নাম জানতে পারি কি?"

"ডাঃ হিমাদ্রি বসু।"

"এখন তিনি কোথায়?"

"ভিয়েনায়।"

"কি করেন?"

"ওখানকার য়ুনিভারসিটিতে পড়ান।"

"আপনি বিয়ে করেন নি?" প্রশ্নকর্ত্রী এবার সরোজা।

দেবরাণী তার চোখে চোখ রেখে উত্তর দিল, "করেছিলাম। স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও হয় নি। বিয়ে ভেঙে দিয়েছি। আমার একটি ছেলে আছে। সে ইংলণ্ডে পড়ে।"

সকলে একটু অপ্রস্তুত হলেন। সরোজা হার মানল না।

প্রশ্ন করল, "বিয়ে ভেঙে গেল কেন?"

দেবরাণী মৃদু হেসে বলল, "ঐ যে বললাম। বনিবনাও হল না।"

"আপনার ভূতপূর্ব স্বামী কি করেন?"

"খোঁজ রাখি নি।"

হাই তুলে সরোজা বলল, "একটা ব্যাপার আজকাল প্রায়ই আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। বড় কাজ, দেশের কাজ, সে-সব মেয়েদের দ্বারাই সম্ভব যারা হয় বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন, নয় বিবাহিত স্বামীর জন্যে বড় একটা কেয়ার করেন না। ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়।"

সাবিত্রী আম্মা চঞ্চল হলেন। মেয়েকে লক্ষ্য ক'রে কিছু একটা বলতে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে দেবরাণী সরোজাকে জবাব দিতে সুরু করেছে:

"তাই যদি হয়ে থাকে, তাহ'লে বিষয়টাকে মন দিয়ে বিবেচনা করা দরকার বৈ কি?"

"দেখুন না," সরোজা আরও বলল, "মেয়েরা মন্ত্রী হচ্ছে, রাষ্ট্রদূত হচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেট, ইঞ্জিনীয়র, ডাক্তার, পাইলট, ডেপুটি সেক্রেটারী, এম. পি.—কি না হচ্ছে? অথচ—"

"এঁদের সবাই নিশ্চয় স্বামীকে ডিভোর্স করেন নি, বা আপনি অন্যায় ইঙ্গিত করলেন, সে পথে পা দেন নি!" দেবরাণী পাল্টা বলে উঠল।

"কিন্তু স্বামীকে এঁরা যে বিশেষ মেনে চলেন তাও ত মনে হয় না।"

এতক্ষণ পরে সুরেশ্বর ভার্গব কথা বললেন, সরোজার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে: "স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক এমন জিনিস, সরোজা, যা নিয়ে সাধারণ মন্তব্য অনেক সময় অচল। অনেক কিছু আমরা বাইরে থেকে খণ্ড দৃষ্টিতে দেখি, দেখে যে-বিচার করি, তা অবিচার। স্ত্রী ও পুরুষ ক্রমে ক্রমে জীবনক্ষেত্রে সমপর্যায়ে দাঁড়াচ্ছে, তাদের সাবেকী সম্পর্কের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আমার নিজের কথা বলি। আসলে একমাত্র নিজের কথাই আমরা পরিষ্কার ক'রে বলতে পারি, অথচ প্রায়ই তা বলতে চাই নে। আমার স্বামী

যখন স্বদেশীতে যোগ দেন, সে গান্ধী-যুগেরও আগে, লোকমান্য তিলকের যুগে। তখন আমি নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে বালিকা-বধূ। সামান্য লেখাপড়া শিখেছিলাম বাড়ীতে বাবারকাছে। স্বামী দেশের কাজ করেন, দেশের কথা ভাবেন,আমি তার বিন্দু-বিসর্গও বুঝতে পারি নে। আরও লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মেয়ের মত আমার স্থান সংসারে, স্বামীর স্থান তাঁর বিচিত্র বিরাট কর্মক্ষেত্রে। সে সময় আমাদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছিল একরকম। তারপর একত্রিশ সালে আমিও যখন গান্ধীজীর চেলা হলাম, জেলে গেলাম, জেলে ব'সে পড়াশোনা করলাম, ম্যাট্রিক পাশ পর্যন্ত দিলাম, মুক্তি পাবার পর আমাদের সম্পর্ক অন্য স্তরে এসে দাঁড়াল। মুখে তিনি যাই বলে থাকুন, বাস্তবক্ষেত্রে স্ত্রীকে রাজনীতির সঙ্গমে ছেড়ে দিতে সহজে রাজী হ'লেন না। কিন্তু একবার যে ঝরণা বইতে শুরু করেছে, পাহাড়ের গায়ে তুমি তাকে বাঁধবে কি করে? আমি কংগ্রেসে ভিড়ে গেলাম, বেশ কিছু মান-সম্মানও হল, সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট প'ড়ে বি. এ পাশ করলাম। তখন আমাদের সম্পর্ক অনেকখানি নতুন ধরণের হল। যে মানদণ্ডে যৌবনে আমার বিচার চলত সে মানদণ্ড মিথ্যে হয়ে গেল। একদিন পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা আমার নিষেধ ছিল; আর এখন আমি বহু পুরুষের সঙ্গে অবাধে মিশতে লাগলাম। অনেক কথা রটল আমার নামে। তার প্রায় সবটাই ঘুরে ফিরে ফেরৎ আসত আমার কাছে। কিন্তু, এই বৃদ্ধ বয়সে আমি বলছি, স্বামীর সঙ্গে আসল সম্পর্কে আমার কোনওদিন একটুও ছেদ পড়ে নি। একথা তিনিও জানতেন, আমিও জানতাম।" সকলে নীরবে সুরেশ্বরী ভার্গবের কথা শুনলেন। আহার মন্দগতি হল। তিনি থামলেও নীরবতার রেশটুকু রয়ে গেল। তখন গৌতম বললেন, "একটা কথা আপনাদের মানতেই হবে। পুরুষদের আপনারা অনেক দোষ দিয়ে থাকেন। কিন্তু এ দেশে পুরুষরা স্বেচ্ছায় স্ত্রীজাতির উন্নতির পথ তৈরী করেছেন। স্বাধীন হবার পরই স্ত্রীলোকদের যে পূর্ণ ভোটাধিকার দেওয়া হল, তার জন্যে আপনাদের একটুও আন্দোলন করতে হয় নি। এমনকি এদেশে যে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন, তাও বলতে গেলে, পুরুষদেরই তৈরী। অথচ য়ুরোপের নানা দেশে মেয়েদের অনেক সংগ্রাম ক'রে পূর্ণ নাগরিক অধিকার পেতে হয়েছে।"

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "কথাটা ঠিক। আমাদের পুরুষরাই মেয়েদের লাঞ্ছনা, অপমান, দুঃখ ও দাসত্বের দুর্বিষহ দুর্ভাগ্য বুঝতে পেরে তা দূর করবার জন্যে এগিয়ে এসেছেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের কথা কোনও ভারতীয় নারী বিস্মৃত হবে না। তেমনি ছিলেন তিলক, গোখলে, রানাডে। এর সঙ্গে বাংলার বিবেকানন্দ, মাদ্রাজে অ্যানি বেসান্ত. পাঞ্জাবে দয়ানন্দ। তারপর এলেন মহাত্মা গান্ধী। পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদেরও ডাক দিলেন দেশের মুক্তি-যুদ্ধে। ত্রিশ বছর সংগ্রামের নেতৃত্ব ক'রে গান্ধীজি স্ত্রী-পুরুষের অনেক প্রাচীন ব্যবধান. ভেঙ্গে দিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে মেয়েরা পুরুষদেরই সমান রাষ্ট্রীয় অধিকার পেল। তারা মন্ত্রী হল। বিদেশে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রদূত হল। বিশ্বের দরবারে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করল। পার্লামেণ্টে, বিধান সভায়, কর্পোরেশনে মেয়েরা আসন পেল। স্বাধীনতার আগেও কংগ্রেসের সভাপতি পদে তিনটি নারী বসতে পেরেছিলেন, যদিও তাঁদের দুজন ছিলেন ইংরেজ—অ্যানি বেসান্ত ও নেলী সেনগুপ্তা। আজ জীবনের বহু পথ মেয়েদের কাছে খোলা। কিন্তু তাই বলে ভাববেন না, মেয়েদের সংগ্রাম করতে হয় নি, বা আজও হয় না। যে বিভিন্ন যুগের বিরাট ব্যবধান আমরা এক জীবনে অতিক্রম করে এসেছি, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির খুব বেশি নেই। আমাদের পুরুষরা বাইরে মেয়েদের অধিকার প্রচার করেছেন, কিন্তু বাস্তবে স্বীকার করেন নি সহজে। খোঁজ করলে দেখতে পাবেন আজ যে সব স্ত্রীলোক জাতীয় জীবনে কিছুটা মর্যাদা পেয়েছেন তাঁরা বেশির ভাগ বড় ঘরের মেয়ে। তাঁদের পরিবারে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব এত বড় ছিল, কোন অধিকারের জন্যে তাঁদের সংগ্রাম করতে হয় নি। কিন্তু যাদের হয়েছে, —সংখ্যায় তারা বেশি নয়—তাদের জীবনের অলিখিত ইতিহাস ভারতবর্ষের বহুযুগের ইতিহাস। আমি যখন অতীত জীবনের কথা ভাবি, বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন বছরের অতিক্রান্ত ইতিহাসকে স্মৃতিপথে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করি, মনে হয় এ আমার একার ইতিহাস নয়, অনেক যুগে জন্ম নেওয়া, অনেক মেয়ের ইতিহাস। আমি যেন এক সাবিত্রী আম্মা নই, আমার মধ্যে অনেক সাবিত্রী বিলীন। অথচ তারা সবাই অর্ধ-পরিস্ফুট; অর্ধেক বেঁচেই তারা মরে গেছে।"

দেববাণী বলল, "আমার মাও তাই বলেন। বলেন, আমার মধ্যে অনেকগুলি মেয়েমানুষের জন্ম হল; অথচ তাদের একজনও পূর্ণ বিকশিত হল না।"

সাবিত্রী আম্মা বললেন, "গত পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশে মেয়েদের জীবনে কি নিদারুণ বিপ্লব বয়ে গেছে

তার খবর বড় কেউ রাখে না। আজ দ্রুত পরিবর্তনে আমরা এত অভ্যস্ত যে কি এল, কি গেল ভেবে পর্যন্ত দেখি নে। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন কিছু নেই যে আসে-যায় অথচ মনে, চেতনায়, দাগ রেখে যায় না। সামাজিক পরিবর্তন তামিলনাদে ঘটেছে সব চেয়ে কম, সব চেয়ে ধীরে। তথাপি তার পরিব্যাপ্তি দেখে আমি বিস্মিত হই। আমি যা বলছি তার মানে এই নয় যে, সাবেকী জীবন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষ তার অনেক প্রাচীনতা এখনও বজায় রেখেছে, বহুদিন রাখবে। কিন্তু নতুনকে যে-ভাবে সে গ্রহণ করেছে তার তুলনা বোধকরি বিরল। নতুন যে পুরাতনকে ভাঙ্গে নি তার কারণ আমরা। আমরা ভারতবর্ষের মেয়েরা। আমরা নতুনকে পুরাতনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এমন ভাবে গ্রহণ করেছি যে সমুদ্র নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে।"

প্রসাদ রাও দেববাণীকে বললেন, "আপনারা আধুনিকারা কি মনে করেন?"

মৃদু হেসে দেববাণী বলল, "আমি ঠিক আধুনিকা নই। এ প্রশ্ন আপনি মিস সরোজাকে করুন।"

সরোজা বলে উঠল, "আমাকে আধুনিকা ভেবে বসলেন কি ক'রে? আমি বিজ্ঞানের ধারে কাছে নেই। বিজ্ঞানই হল আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।"

দেববাণী বলল, "আধুনিকা কাকে বলে জানি নে। এবার কলকাতায় একজনের দেখা পেলাম, তাঁর কথা বলি। আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া তিনি। পূর্ববঙ্গে চল্লিশ বছর আগে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। ছিলেন নিতান্ত শরীরের অনূঢ়া কন্যা। বাবার কঠিন অসুখ হ'লে ভিন গাঁয়ের নামকরা ডাক্তার ডাকা হয়েছিল চিকিৎসার জন্যে। বাবা রক্ষা পেলেন, কিন্তু ডাক্তার পেলেন না। রুগী ডাক্তারের পা জড়িয়ে ধরল। প্রায়-বৃদ্ধ ডাক্তার, বহুদিন বিপত্নীক। তাকে দায়মুক্ত করতে হবে। দয়াপরবশ হয়ে ডাক্তার একটি কচি গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে ফিরলেন। তাঁর বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ, নববধূ মাত্র তের। পত্নীকে ঘরে এনে বড় লজ্জিত, সংকুচিত হলেন তিনি। ভাইরা, ছেলেরা সব বড় বড়, নাতি-নাতনীতে পরিপূর্ণ সংসার। লজ্জা তাঁর আরও বাড়ল যখন সেই তের বছরের মেয়ে কিছুতেই শয়নঘরে যেতে রাজী হল না। দিনভাগে তিনি তাকে কাছে ডেকে বললেন, তুমি আমার ভ্রাতৃ-বধূদের ও পুত্রবধূদের মধ্যে জীবন কাটাতে পারবে? সে বলল, পারব। তিনি বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন, যে ভুল হয়ে গেছে আর তার সংশোধন হতে পারবে না। ভালো করে ভেবে বল, তুমি কি সন্তান চাও না? দৃঢ়স্বরে সে বলল, না। স্বামী বললেন, যদি আমার অবর্তমানে এরা তোমায় না দেখে? উত্তর হ'ল, আমি নিজেই নিজেকে দেখতে পারব। স্বামীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক সে মেয়েটির কোন দিন হ'ল না। কয়েক বছরেই তিনি গত হলেন। কেবলমাত্র পরের সেবা করে যুবতী বিধবা, জা ও বধূদের সংসারে নিজের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করলেন। লেখাপড়া সামান্য জানতেন। কালে দেখা গেল তিনি ছাড়া সংসার অচল। সবাকার সব বিপদে তিনি, সব সম্পদে সর্বাগ্রে তাঁর স্থান। নিত্য নতুন হাওয়া এল সংসারে। সব কিছু টলল, কেবল টললেন না তিনি। ছোট ভাই প্রেম করে অসবর্ণ বিবাহ করল, বড় ভাই, দাদারা সব রেগে আগুন। সে নীচু জাতের বৌকে সাদরে গ্রহণ করলেন তিনি। সেজ ছেলে বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করল। সবার কত রাগ! আঁকা বাঁকা বাংলা অক্ষরে মেম-বধূকে আশীর্বাদ পাঠালেন তিনি। সেজ ছেলের মেয়ে প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে পালিয়ে গেল। তাদের ফিরিয়ে এনে শাস্ত্রীয় মতে বিবাহ দেওয়ালেন তিনি। তার পর দেশ ভাগ হয়ে গেল। এঁদের বাড়ী-ঘর সব পড়ল পূর্ব-পাকিস্তানে। গ্রাম থেকে একে একে সবাই কলকাতা চলে গেল। পড়ে রইলেন স্বামীর ভিটে আঁকড়ে একমাত্র তিনি। আমি এবার তাঁকে দেখলাম আর এক রূপে। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষদের নানা প্রকার জুলুমের বিরুদ্ধে আশ্চর্য সাফল্যের সঙ্গে বার বার লড়েছেন তিনি, অনেক জুলুম তাঁরই জন্যে শেষ হয়েছে, বা কমে গেছে। বছরে তিন চার বার তিনি একা গ্রাম আর কলকাতা যাওয়া-আসা করেন, একবার 'ভিসা' নিয়ে সামান্য গোলমালে এক সপ্তাহ তাঁকে পাকিস্তানী জেলে পর্যন্ত কাটাতে হয়েছিল। তবু তিনি গ্রামের অনেক অস্থাবর সম্পত্তি, টাকা, গহনা, বাসনপত্র, প্রাচীনকালের নানা রকম নিদর্শন, কলকাতা নিয়ে এসেছেন। শুধু তাই নয়, শহর থেকে পনের মাইল দূরে রিফিউজি হিসেবে একখণ্ড জমি আদায় করে নিজের তত্ত্বাবধানে ছোট্ট একটি বাড়ী তৈরী করছেন। এঁর চেয়ে বড় আধুনিকা আমি কোথাও দেখি নি।"

সপ্রশংস মনোযোগে সকলে দেববাণীর কথা শুনছিলেন। সে থামতেই সরোজা বলে উঠল, "কিন্তু এ আধুনিকায় মিঃ প্রসাদ রাওয়ের মন ভরবে না। তিনি চান অন্য আধুনিকা।"

সনাতনম্ যোগ দিলেন, "যে আধুনিকারা সবদা আমাদের চোখের সামনে বিচরণ করেন।"

সরোজা বলল, "যাঁরা কংগ্রেসী সরকারের উপমন্ত্রী হয়ে স্লিভলেস্ ব্লাউজ পরেন, বব-ছাঁট চুল রাখেন, ঠোঁটে লিপষ্টিক লাগান, যাঁরা রাষ্ট্রদূতের পত্নী হয়ে বল ড্যান্স করেন ও হুইস্কি খান; যাঁরা পার্লামেন্ট বা বিধান-সভার সদস্যা হয়ে…"

বড় একটা হাই তুলে সরোজা বাক্য অসমাপ্ত রাখল।

আহার শেষ হয়ে এসেছে। মরু পান করে নিমন্ত্রিতগণ ওয়াড়েপরম্ ও আপ্পড়ম্ খাচ্ছেন। সাবিত্রী আম্মা প্রসাদ রাওকে বললেন, "দেববাণীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় হ'ল। এবার আশা করি আপনারা ওকে সাহায্য করবেন।"

প্রসাদ রাও বললেন, "নিশ্চয়! আপনি যখন বলছেন—"

"আমি বলছি বলে নয়। ও বড় কাজে নেমেছে। সে কাজের দাবীতেই আপনারা ওকে সাহায্য করুন, আমি তাই চাই।"

সবাই সম্মতিসূচক আওয়াজ বা অঙ্গভঙ্গি করলেন। সনাতনম্ বললেন, "আপনি যখন ওঁর পেছনে রয়েছেন, সাহায্যের নিশ্চয় অভাব হবে না।"

মালব্য মন্তব্য করলেন, "দরকার বোধ করলে আপনি আমাদের কাছে আসবেন। যা পারি আমরা নিশ্চয় করব।"

সরোজা বলল, "তাতে দেববাণী খুশী হতে পারেন, কিন্তু মা হবেন না। মার ইচ্ছে আপনারাই ওঁর কাছে গিয়ে যা যা দরকার তার ব্যবস্থা করে দিন।"

গৌতম বললেন, "বেশ ত। তাই করা যাবে।"

"মুশকিল কি জানেন?" সরোজা আরও বলল, "উনি মোটর গাড়ীর পারমিট চান না, চাল গম বিক্রীর লাইসেন্স না, নিজের জন্যে চাকরী পর্যন্ত না। তবে রিসর্চ সেন্টার স্থাপিত হলে চাকরী দেবার ক্ষমতা ওঁর নিশ্চয় থাকবে, তা ছাড়া ছাত্রছাত্রী ভর্তি করার ব্যাপার ত আছেই।"

আহার সমাপ্তির সীমায় পৌঁছেছিল। সরোজা উঠল। বলল, "মাপ করবেন। আমাকে এক্ষুণি একবার বেরুতে হবে। দুটো বেজে গেছে।"

সরোজা সোজা কলঘরে ঢুকল।

একে একে সকলে বিদায় নিলেন। সনাতনম্, প্রসাদ রাও ও শ্রীনিবাসম্ একসঙ্গে গেলেন প্রসাদ রাও-এর গাড়ীতে। গৌতমকে মালব্য সঙ্গে নিলেন কোনও মন্ত্রীর ভবনে। সুরেশ্বরী ভার্গব ট্যাক্সীতে ঘরে ফিরলেন। যাবার বেলা দেববাণী তাঁকে আনত হয়ে নমস্কার করল। তিনি বললেন, "বেটি, আমার বাড়ী একবারটি এস। তোমার সঙ্গে আরও ভাল করে আলাপের ইচ্ছে রইল।"

দেববাণীকে নিয়ে সাবিত্রী আম্মা শোওয়ার ঘরে ঢুকলেন। নিজে বিছানায় বসে দেববাণীকে আরাম কেদারায় বসালেন। বললেন, "তোমার কি তাড়াতাড়ি আছে?"

"না।"

"মা একা একা আছেন। তোমাকে আটকে রাখা উচিত হবে কি?"

"আপনার অসুবিধে না হলে আমি একটু বসতে চাই।"

"আমার অসুবিধে?" হাসলেন সাবিত্রী আম্মা। "তুমি তা হলে একটু বস। তোমার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগে।"

দেববাণী বলল, "আপনি শুয়ে পড়ুন। শুয়ে শুয়ে গল্প করুন। এতক্ষণ বড় ধকল গেছে আপনার।"

"শোবার অভ্যেস নেই দুপুরে," সাবিত্রী আম্মা বালিস টেনে নিয়ে বসলেন। "বেশ শীত পড়েছে আজ।"

দেববাণী উঠে কম্বল এনে তাঁর পায়ে জড়িয়ে দিল। কম্বল টেনেটুনে দেহ এলিয়ে বসলেন সাবিত্রী আম্মা।

"কেমন লাগল এঁদের তোমার?"

"মন্দ কি?" সংকুচিত হাস্যে বলল দেববাণী।

"এঁরা সবাই পলিটিশিয়ান। তুমি ঠিকই বলছিলে, আমাদের দেশে এখন পলিটিশিয়ানদের যুগ চলছে।"

"আপনি এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, তাতে লাভ হ'ল আমার অনেক। কিন্তু এঁরা কি সত্যিই আমায় সাহায্য করবেন?"

"তুমি রাজনীতি বোঝ, দেববাণী?"

"না।"

"রাজনীতির জারজ সন্তান হ'ল লবি। মার্কিন দেশে তুমি নিশ্চয় কথাটা শুনেছ।"

"শুনেছি।"

"আমাদের দেশেও লবির প্রতাপ শুরু হয়েছে। এ এক আশ্চর্য বস্তু। সুতায় সুতায় অনেক স্বার্থ জড়িয়ে এক-একটা লবি তৈরী হয়। শেষ পর্যন্ত কে কোথায় বসে যে সুতা টানে বোঝা যায় না। শুধু দেখা যায়, কোন একটা বিষয় নিয়ে হঠাৎ বেশ প্রচণ্ড 'জনমত' তৈরী হয়ে বসে আছে। নানা প্রকার রহস্যময় প্রভাব বিস্তার করা হয় কর্তাদের ওপর।"

"জনমত তৈরী হয় কি করে ?"

"সেও এক রহস্যময় ব্যাপার। অন্যতম প্রধান পথ সংবাদ পত্র। হঠাৎ দেখবে কোনও এক বিষয়ে সংবাদ-পত্রগুলি বড় বেশি মুখর। কোথা থেকে কোন গোপন সূত্রে তারা সব তথ্যের সন্ধান পায়। তথ্যের সঙ্গে স্বার্থের তত্ত্ব মিলিয়ে তৈরী হয় প্রচার। তাকেই চালান হয় জনমত বলে।"

"আপনি কি আমার জন্যে 'লবি' তৈরী করছেন ?"

"না। লবি আমি তৈরী করতে জানিনে। আমি শুধু কয়েকজন এম. পি. কে তোমার প্রচেষ্টার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে, পরিচিত করিয়ে রাখলাম। যদি কখনও এ নিয়ে কথাবার্তা আলোচনা ওঠে, এঁরা কাজে লাগবেন। ব্যক্তিগত জীবনে এঁরা যাই হোন, রাজ-নীতিতে এঁদের মতামত অগ্রাহ্য নয়।"

"আপনি আমার জন্য অনেক করছেন," কৃতজ্ঞতায় বিগলিত স্বরে দেববাণী বলল, "কেন করছেন জানি না। শুধু এটুকু জানি, আপনার স্নেহ আমার অমূল্য সম্পদ। কিন্তু আমি ত রাজনীতি করছি না। বিজ্ঞান-কেন্দ্র স্থাপনের মধ্যে রাজনীতি আসবে কেন ?"

সাবিত্রী আম্মা ম্লান হাসলেন। "তুমি তা বুঝবে না, দেববাণী। যুগটাই যদি রাজনীতির, তাহলে সব কিছুর মধ্যেই রাজনীতি আসবে।"

"তাতে শিক্ষার ক্ষতি হবে। রাজনীতিরও লাভ হবে না।"

"সত্যি কথা। কিন্তু আজ আমরা তা বুঝতে পারছি না। বুঝতে সময় লাগবে। এখন সব কিছু আমরা রাজনীতির মানদণ্ডে মেপে দেখছি। তুমি রিসর্চ সেণ্টার খুলতে চাইছ। এর মধ্যে অনেক রাজনীতি এসে পড়বে।"

"না, আসবে না।" দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল দেববাণী।

"শত চেষ্টা করেও তুমি তাকে আটকাতে পারবে না।" মৃদু, মলিন হেসে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "প্রত্যেক পদে পদে দেখবে রাজনীতির কাঁটা। এ বিষয়ে কোনও কল্পনা-বিলাস তোমার থাকা উচিত নয়, তাহলে তুকি হারবে।"

"কিন্তু আমি যে রাজনীতির কিছু জানি না।"

"স্বাধীন ভারতবর্ষে ত কোনও কাজে আগে হাত দাও নি, তাই জান না। এবার হাত দিয়েছ, এখন জানবে।"

"আমার ধারণা রাজনীতি বড় নোংরা জিনিষ। কোন নোংরা কাজ আমি করতে পারি না।"

"রাজনীতি নোংরা তাতে সন্দেহ নেই। তুমি নিশ্চয় চেষ্টা করবে যাতে কোনও নোংরা কাজ তোমায় করতে না হয়। সবদা পারবে কি না তা নির্ভর করবে তোমার চরিত্র-বলের ওপর।"

"কি ধরণের রাজনীতি আসতে পারে রিসর্চ সেণ্টারের কাজে, আমায় বুঝিয়ে বলুন।"

"সবটা ত এখন বলা যাবে না, দেববাণী। তবু এক-আধটু তোমায় বলছি। প্রথম যে প্রশ্ন উঠেছে, তা হ'ল তোমার বিদেশী সাহায্য পাবার ব্যাপারে।"

"তার আভাস আমি পেয়েছি।"

"তুমি সাহায্য পাচ্ছ আমেরিকা, জার্মেনী ও ইংলণ্ড থেকে। তিনটি দেশই এক বিশেষ দল বলে বর্তমান পৃথিবীতে পরিচিত।"

"কিন্তু আমি ত কোনও দেশের গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পাচ্ছি না। এমন কি কোনও ফাউণ্ডেশানেরও না। নিতান্ত কয়েকজন বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি আমায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।"

"সে জন্যেই তুমি জিতে গেছ। কিন্তু দেখবে, এক দল লোক এখনি বলতে সুরু করবে তুমি মার্কিন দেশের এজেণ্ট হয়ে কাজে নেমেছ।"

"মিথ্যে কথা।"

"তবু তারা বলবে। আর এ কথা ওঠার মানেই ত রাজনীতি। পার্লামেণ্টে তারা প্রশ্ন করবে। সরকারকে সে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তুমি যদি আমেরিকা থেকে অধ্যাপক আনাও, তা নিয়েও রাজনীতি হবে।"

দেববাণীকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখে সাবিত্রী আম্মা আবার বললেন, "তা ছাড়া, ওরাই কি তোমাকে রেহাই দেবে ? দেখবে এখানকার মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলি নানা ভাবে তোমার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চাইবে।"

"এসব কথা আমি ভেবে দেখি নি।"

"এবার তোমাকে সব কথাই ভাবতে হবে দেববাণী। বিজ্ঞান বস্তুটাই ত বর্তমান জগতে সবচেয়ে বড় রাজ-নীতি। যে দারুণ সংগ্রাম চলছে বিশ্ব-জুড়ে তার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। তোমাকে ভেবে দেখতে হবে, তুমি কোন দেশের বিজ্ঞান ভারতবর্ষে আনবে। মার্কিন বিজ্ঞান ? না, রুশ বিজ্ঞান ?"

"বিজ্ঞানের কোনও দেশকালপাত্র নেই।" দেববাণী দৃঢ় প্রত্যয়ে বলল, "বিজ্ঞান সমস্ত মানুষের।"

"দেখতে পাচ্ছ না বিজ্ঞানকেও আজ দেশজ রূপ দেওয়া হয়েছে ? স্পুটনিক যখন মহাকাশে উঠল, সোভিয়েট নেতারা বললেন, এ জয় সোভিয়েট

বিজ্ঞানের। হাইড্রোজেন বোমা তৈরি ক'রে আমেরিকানরা বলল, জয়, মার্কিন বিজ্ঞানের জয়।"

"বৈজ্ঞানিকরা তা বলেন না। বলে রাজনৈতিক নেতারা। আর, খবরের কাগজে যারা লেখে তারা।"

"বৈজ্ঞানিকদের আলাদা সত্ত্বা কোথায়, দেববাণী? তাঁরা ত সবাই গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব করেন।"

"সবাই করেন না।"

"বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেন, সে আবিষ্কারের ব্যবহার করে কারা? এ্যাটম বোমা যাঁরা তৈরি করলেন তাঁরা কি তার অপব্যবহার বন্ধ করতে পেরেছিলেন? তাঁরা ত জানতেনই, কি ভয়ানক মারণাস্ত্র তাঁরা পলিটিশিয়ানদের হাতে তুলে দিচ্ছেন! এমন বৈজ্ঞানিকের নাম কর, দেববাণী, যিনি আণবিক শক্তিকে মানুষ-মারা পৃথিবী ধ্বংসের কাজে লাগানর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন।"

"অনেকের নামই আপনাকে বলতে পারি", দেববাণী আস্তে আস্তে বলল, "মার্কিন দেশেও এমন অনেক বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁরা আণবিক শক্তিকে পৃথিবী ধ্বংসের কাজে অপ-নিয়োগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যে সমাজকল্যাণ চেতনা ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে। আপনি হয়ত জানেন না, কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আণবিক শক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজে বিনিয়োগ করার সম্ভাবনা বুঝতে পেরে উর্ধ্ব স্তরের রিসর্চ পর্যন্ত করতে রাজী হন নি। তাঁরা মার্কিন কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হয়েছেন; কারুর কারুর চাকরী পর্যন্ত গেছে। বিলাতে আণবিক-অস্ত্রসজ্জার বিরুদ্ধে যে গণ-আন্দোলন গড়ে উঠছে তারও পুরোভাগে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক।"

সাবিত্রী আম্মা কিছুক্ষণ ভাবলেন। তার পর বললেন, "শুনে কিছু ভরসা হ'ল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, যদি একবার লড়াই বেধে যায়, সব বৈজ্ঞানিকই রাষ্ট্রের সেবার জন্যে তাঁদের জ্ঞান ও শ্রম সম্পূর্ণ বিনিয়োগ করবেন।"

"লড়াই লাগলে কি হবে জানি না। লড়াই যাতে না লাগে তার চেষ্টা পৃথিবীতে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক করছেন।"

"বুঝতে পারছি, বৈজ্ঞানিকদের নিন্দা তুমি সহ্য করবে না", হেসে বললেন সাবিত্রী আম্মা। "কিন্তু তুমি যা বললে তাতেও প্রমাণ হ'ল যে বিজ্ঞান রাজনীতির জালে জড়িত।"

দেববাণী চুপ করে রইল।

"ভারতবর্ষের কথা অবশ্য আলাদা", বলে চললেন সাবিত্রী আম্মা। "এ দেশে, যা তুমি একটু আগে বলছিলে, বিজ্ঞানের যুগ সবেমাত্র সুরু হয়েছে।"

"এখনই তাকে রাজনীতির জালে বেঁধে রাখা তাই আরও বেশী অনুচিত।"

"অনুচিত তা মানি। কিন্তু অনেক অনুচিতই চালু হয়ে যায়। মুশকিল কি জান? এ দেশে সবকিছু উদ্যোগের উৎস সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পর্যন্ত সরকারী প্রভাবে এসে গেছে। ন্যাশনাল লেবরেটরীগুলি সরকারী প্রতিষ্ঠান। লেখকদের অধিকাংশ নানা রকম সরকারী দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশী। অধ্যাপকরা সরকারী কৃপার জন্যে সর্বদা হাত পেতে থাকেন। সরকার মানেই রাজনীতি। আমাদের বুদ্ধি-মুখী জীবনে রাজনীতির ব্যাপক অনুপ্রবেশ বড় ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, দেববাণী।"

"আপনাকে একটা কথা খোলাখুলি বলা দরকার।" দেববাণী সসঙ্কোচে বলল, "বলতে আমার লজ্জা হয়, কিন্তু সত্যকে স্বীকার করতেই হবে। ভারতবর্ষ আমার কাছে প্রায় অচেনা। কলকাতায় আমার ছাত্রীজীবন কেটেছে পড়াশুনায়। তখন নিজেকে দিয়েই, সবার মত, আমিও মত্ত ছিলাম। তার পর, পড়া শেষ না হতে, আমার জীবনে উঠল বিরাট ঝড়। আমি বিয়ে করে বসলাম। তিন-চারটা বছর কি করে যে কাটল তা আমিও এখন ঠিকমত বুঝতে পারি নি। সব কিছু তোলপাড় করে সে ঝড় যেদিন শান্ত হ'ল, আমি তখন পঙ্গু, নির্জীব, জীবন্মৃত। যিনি আমাকে গভীর পাঁক থেকে টেনে তুলে আবার জীবনের সন্ধান দিলেন, তিনি আমার মা। কিন্তু জীবন তখন ভয়ঙ্কর কঠিন; তার দাবী মিটিয়ে পৃথিবীর বুকে একটু মর্যাদার স্থান তৈরি করতে আরও ছ'সাত বছর কেটে গেল। এ ছ'সাত বছরেও আমি কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। আমার একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। দেশের ওপর দিয়ে অনেক বিপ্লব বয়ে গেল এ ক' বছরে, কিন্তু আমি আমার নিজের বিপ্লব নিয়ে এত ব্যতিব্যস্ত, অন্য কোনও কিছুই যেন আমায় স্পর্শ করল না। আজ ভাবতে অবাক্ লাগে, কি করে আমি চতুর্দিকের এত বড় বড় ঘটনার প্রতি অমন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। যুদ্ধ শেষ হবার কিছু পরেই আমি বিদেশে চলে গেলাম। দশ বছর কাটল বিদেশে, তার পর এই প্রথম আমি ভারতবর্ষে ফিরে এসেছি। ছিলাম কলকাতায় একটি সাধারণ মেয়ে, এখন আমি অভিজ্ঞতায় বড়; গোটা পৃথিবীর চেতনা আমার অন্তরে। অথচ নিজের দেশকেই আমি জানি না, চিনি না, বুঝি না। সব কিছু, তাই আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকছে, রহস্যময় লাগছে।"

সহানুভূতির স্পর্শ এনে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "তোমার দোষ নেই। আমরাই বা ভারতবর্ষের কতটুকু

জানি? আমাদের জীবন প্রধানত আঞ্চলিক। হঠাৎ আমরা গোটা দেশের সমস্যার মুখোমুখি। তাই চারদিকে এত বেশী গোলমাল। যে লোকটার সমস্ত জীবন কেটেছে নিজের জেলায়, বা বড় জোর প্রাদেশিক রাজধানীতে বর্ণ, গোত্র, আত্মীয়গোষ্ঠী ও গ্রাম-জেলা ছাড়া আর কিছু যে ভাবতে পারে নি, ভাবার দরকার হয় নি, আজ সে হঠাৎ দেশের নেতা হয়ে বসেছে। ভারতবর্ষ যত বিরাট, এত প্রাচীন, তাকে জানা বা চেনা মোটেই সহজ নয়, দেববাণী।"

"পাঁচ বছর আমেরিকায় কাজ ক'রে আমার কিছু সুনাম হয়েছে," দেববাণী বলল। "দুটো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অধ্যাপনা করেছি। রিসার্চ ক'রে যে সুখ্যাতি পেয়েছি তারই জোরে য়ুরোপেও আমি অধ্যাপনা ও রিসর্চের সুযোগ পেয়েছি। আজ যদি বিদেশে বৈজ্ঞানিক মহলে আপনি খোঁজ করেন, দেখবেন আমার নাম অনেকেই জানেন। আমার কিছুটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি হয়েছে, বলা যেতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও যেমন আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে আমার জীবনের আসল সমস্যার সমাধান হয় নি।"

"সে সমস্যাই তোমাকে দেশে ফিরিয়ে এনেছে?"

"অনেকটা তাই। একমাত্র ভারতবর্ষে ছাড়া সে সমস্যার সমাধান হতে পারে না। আমি কে, কোথায় আমার স্থান, আমার জীবনের প্রকৃত অর্থ কি, এ সব প্রশ্নের জবাব না পেলে সে সমস্যার শেষ হবে না।"

"অর্থাৎ ভারতবর্ষেই তুমি তোমাকে খুঁজে পেতে চাও?"

"আর কোথায় পাব, বলুন।" কাতর কণ্ঠে বলল দেববাণী। "বিদেশে সব পাওয়া যায়—বিদ্যা, মান, যশ, অর্থ, বন্ধু,—শুধু নিজের স্থানটুকু, নিজের আসল পরিচয়টুকু পাওয়া যায় না। বিদেশে আরম্ভ হতে পারে, সমাপ্তি হতে পারে না। আমার জীবন আরম্ভের পথে এগোবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন পরিপূর্ণতার ক্ষুধা জেগেছে। সে ক্ষুধা মেটাবার আগে আমার জানতে হবে আমার সমাপ্তি কোথায়। পরিপূর্ণতা কোথায়।"

সাবিত্রী আম্মা সরে এসে দেববাণীর মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, "তোমার অন্বেষণ বড় কঠিন, দেববাণী। ভারতবর্ষেও মাত্র জীবনের আরম্ভ। এখানে আজ সবকিছু অসমাপ্ত। বহু ধারায় বহু-জনের বহু-আকাঙ্ক্ষার কোলাহল। তুমি যে সমাপ্তির, যে পরিপূর্ণতার সন্ধানে এসেছ তা পাবে কিনা কে জানে।"

দরজায় লঘু-পদশব্দে দু'জনে তাকিয়ে দেখলেন, সরোজা দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে গিয়েছিল সরোজা, সবেমাত্র ফিরেছে। সাবিত্রী আম্মা কন্যাকে দেখে বিব্রত হলেন। দেববাণী উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল, "আসুন না।"

দ্বিধাগ্রস্ত পদে ঘরে ঢুকল সরোজা।

গাঢ় সবুজ বাঙ্গালোর সিল্কের সাড়ী পরেছে সরোজা। ক্ষীণ দেহে সাড়ী ভাঁজে ভাঁজে তরঙ্গিত। লাল রংয়ের ব্লাউজের ওপর কালো কার্ডিগান। সরু কোমর, সুগঠিত দেহ সরোজার। বর্ণ গৌর না হলেও উজ্জ্বল। বড় বড় চোখে ঘনকৃষ্ণ পল্লব। প্রশস্ত কপালে চূর্ণ কুন্তল। দেববাণীর চোখে বড় সুন্দর লাগল সরোজাকে। জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে সরোজা। ছাট্ট পরিপূর্ণ স্তন দুটি উঠছে, নামছে।

ঘরে ঢুকে একবার চতুর্দিকে তাকাল সরোজা। বোধ হয় ভাবল বসবে কিনা, কোথায় বসবে।

দেববাণী এগিয়ে এসে সরোজার হাত ধরল। বলল, "এ চারপাইয়ে বসুন।"

হাত ছাড়িয়ে নিল সরোজা। মা'র দিকে তাকাতে ঠোঁটের তরঙ্গে বাঁকা হাসি খেলে গেল। কিন্তু দেববাণীর এগিয়ে দেওয়া চারপাইয়ে সে বসল না।

সাবিত্রী আম্মা প্রশ্ন করলেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

চট ক'রে উত্তর দিল না সরোজা। একটু পরে বলল, "বাইরে।"

কিছু বলতে গিয়ে সাবিত্রী আম্মা নিজেকে সামলে নিলেন।

বড় বড় চোখের পূর্ণ দৃষ্টি মেলে সরোজা দেববাণীকে দেখল।

অস্বস্তিকর নীরবতা ঘর ভ'রে দিল।

সরোজা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। দেববাণীকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠল, "আপনি কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন এদেশে?"

"কার সময়?" আশ্চর্য হ'ল দেববাণী।

"আর কার? আপনার নিজের। আশা করি আপনার কাজকর্ম বিদেশে কিছু এখনও আছে!"

দেববাণীর মুখে কথা এল না।

"যদি কিছু কাজকর্ম থাকে তো চ'লে যান। এদেশে ব'সে সময় নষ্ট করবেন না।"

দরজার দিকে পা বাড়াল সরোজা। এগিয়ে যেতে পিছু ফিরে আবার দাঁড়াল। দেববাণীর চোখের সামনে এসে বলল, "এদেশে কিছু হবে না। রিসার্চ সেন্টার

গড়তে গিয়ে দেখবেন মন্দির গড়েছেন, সেখানে মোহান্তের রাজত্ব। এখানে কিছু হবার জো নেই। এদেশে সব ভেজাল, সব পঙ্গু, সব ব্যাধিগ্রস্ত। বিরাট অনুর্বর বন্ধ্যা এ দেশ; কিছু ক'রে উঠতে পারবেন না এখানে। হয় একেবারে ভেঙ্গে যাবেন, নয় ভেজালে ভেজালে আপনিও নাদুস-নুদুস সার্থক দেশসেবকে পরিণত হবেন। তার আগেই পালান, পালিয়ে বাঁচুন।"

বলে সে নিজেই পালাল।

দেববাণী স্তম্ভিত হ'ল। সাবিত্রী আম্মা মাথা নীচু ক'রে রইলেন। যখন মাথা তুলে তাকালেন, বার্ধক্য-নম্র চোখদুটি তাঁর ব্যথায় কাতর।

আস্তে আস্তে দেববাণী উঠল। বলল, "আমি আজ আসি।"

সাবিত্রী আম্মা ইঙ্গিতে তাকে বসতে বললেন। দু'চার মিনিট দেববাণী নীরবে বসে রইল।

বালিশে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সাবিত্রী আম্মা বললেন, "সরোজা আমার একমাত্র মেয়ে।"

দেববাণী চুপ ক'রে রইল।

"ওকে নিয়েই আজ আমার সবচেয়ে বড় সমস্যা।"

দেববাণী নীরবে শুনল।

"আজ নয়, আর একদিন ওর কথা তোমায় বলব।"

দেববাণী চুপ ক'রে ব'সে রইল।

"আমার একটা উপকার করবে, দেববাণী?" সাবিত্রী আম্মা কাতর কণ্ঠে বলে উঠলেন।

"বলুন।"

"সরোজাকে তুমি বন্ধু ক'রে নাও।"

"নেব।"

এবার তার দিকে তাকালেন সাবিত্রী আম্মা। "কাজটা সহজ হবে না। বার বার ও তোমায় আঘাত করবে।"

"সে আঘাত আমার লাগবে না।"

বাইরে এসে গাড়ীতে বসল দেববাণী। স্টার্ট দিয়ে ধীর গতিতে গাড়ী ফটকের সামনে নিয়ে দেখল, সরোজা দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দিকে মুখ করে। গাড়ী থামাল দেববাণী। সরোজার নজর তার দিকে পড়তে পাশের দরজা খুলে দেববাণী বলল:

"আসুন।"

বিস্মিত সরোজা বলে উঠল, "কোথায়?"

"আসুন না।"

"আপনি যান।"

দেববাণী আবার বলল, "আসুন।"

দেববাণীর চোখে স্থির দৃষ্টি রাখল সরোজা।

তার পর গাড়ীতে উঠে তার পাশে বসল।

ক্রমশঃ
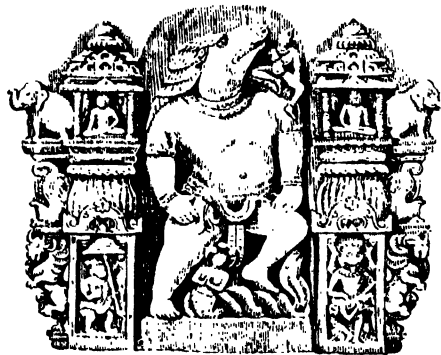
প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা

শ্রীউষা বিশ্বাস

ভারতে ইংরেজ শাসন প্রবর্তিত হবার পূর্বে এখানে যেমন টোল চতুষ্পাঠি মাদ্রাসা উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল তেমনি বহু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও ছিল। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পাঠশালা ও মক্তব নামেই অভিহিত হ'ত। যারা ব্যবসা, বাণিজ্য, ও কৃষিকর্মাদির দ্বারা জীবিকানির্বাহ করত তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনের বৃত্তি ও কর্মের উপযোগী করে তুলবার জন্যেও কিছু শিক্ষার প্রয়োজন হ'ত। তাদের সেই শিক্ষার চাহিদা মিটাবার জন্যেই এই পাঠশালা ও মক্তবগুলি ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছিল। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণতঃ লিখন পঠন ও অঙ্কই শিক্ষা দেওয়া হত।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আবার নতুন করে সনন্দ দেওয়া হয়, তখন দেশের শিক্ষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করবারও আদেশ হয়। তদনুসারে ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে নানা প্রকার তত্ত্বানুসন্ধানে নিরত হন। এই তদন্তের যে ফলাফলগুলি লিপিবদ্ধ করা হয় তা থেকেই আমরা তৎকালীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একটি মূল্যবান তথ্যপূর্ণ বিবরণ পাই। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা—এই তিন প্রদেশে শিক্ষাসংক্রান্ত যে সব তদন্ত করা হয়, সেগুলির মধ্যে বাংলায় লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত উইলিয়াম অ্যাডামের বিবরণীই সুলিখিত ও ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর থেকে আমরা তদনীন্তন ভারতের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুন্দর চিত্র পাই। অ্যাডাম তথ্যনিরূপণের কার্য পর্যালোচনা না করে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ জেলার কাজই পরীক্ষা করেছিলেন।

অ্যাডামের লিখিত বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে তখন ভারতের বড় বড় গ্রামে ও শহরেই এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অবস্থিত ছিল। এগুলির ছাত্র সংখ্যা প্রায় ১২ থেকে ২০ পর্যন্ত হ'ত। প্রাতঃকালে কোনও ছায়াশীতল গাছের তলায় অথবা কোনও ধনী-গৃহের বারান্দায় বা চণ্ডীমণ্ডপেই এই পাঠশালাগুলি বসত। শিক্ষকদের মধ্যে বেশীর ভাগই কায়স্থ জাতীয় ছিলেন। ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণেতর যে কোনও জাতি থেকেও তাঁরা নিযুক্ত হতেন। এই পাঠশালাগুলিতে লিখন, পঠন, পত্র লিখন, সাধারণ গণিত ও কৃষিকার্য বা ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত হিসাবাদি শিক্ষা দেওয়া হ'ত। পাঠ্য পুস্তকাদি বিশেষ ব্যবহৃত হ'ত না এবং হলেও সেগুলি মোটেই ছোটদের পড়বার উপযুক্ত ছিল না। সাধারণতঃ ছাত্রদের নিকট থেকে কোনও বেতন নেওয়া হ'ত না। তারা শিক্ষককে যে উপঢৌকনাদি দিত তার মূল্য গড়ে মাসিক ৪।৫ টাকার বেশী হ'ত না। শিক্ষকগণ প্রধানতঃ চাষবাস, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির দ্বারাই সংসার চালাতেন। সকল জাতির ছেলেরাই এখানে শিক্ষা লাভ করতে পারত। তাদের বয়স প্রায় ৫।৬ থেকে ১৬ পর্যন্ত হত। এই পাঠশালাগুলিতে নৈতিক শিক্ষা দেবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এই প্রাথমিক শিক্ষার চারটি স্তর ছিল। প্রথম স্তরে ছাত্রদের মাটির বা বালির উপরে কাঠি দিয়ে বর্ণমালার অক্ষরগুলির আকার গঠন করতে বলা হ'ত। শিক্ষার এই স্তরে পাঠশালায় তাদের প্রথম দশদিন এই রকম অক্ষর গঠনে কাটত। দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষক তালপাতায় সুন্দর হস্তাক্ষরে বড় বড় করে লিখে দিয়ে ছেলেদের সেই লেখার উপরে কাঠ কয়লার কালি দিয়ে লোহা বা শরের কলমে দাগ বুলাতে বলতেন। তারা এই ভাবে গুরুমশায়ের লেখার উপরে দিনের পর দিন দাগ বুলিয়ে যেত যতদিন পর্যন্ত না অক্ষরগুলির আকার ও গঠন সম্বন্ধে তাদের মনে একটি সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাত। তার পর তারা অন্য একটি পাতায় আদর্শ না দেখেই সেই অক্ষরগুলি লিখতে অভ্যেস করত। তারা এই রকম করে যুক্তাক্ষরগুলিও লিখতে শিখে সেগুলি মুখে উচ্চারণ করতে শিখত এবং স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ যোগে বাক্যগঠনও করত। তৃতীয় স্তরে ছাত্রদের তালপাতার বদলে কলাপাতা ব্যবহার করতে দেওয়া হ'ত। এই সময়ে তারা সহজ সহজ চিঠিপত্র লিখতে, শব্দের সাহায্যে বাক্য গঠন করতে এবং লিখিত ও কথ্য ভাষার তারতম্য নির্ণয় করতে শিখত। তাদের যোগ-বিয়োগঘটিত পাটিগণিতের সাধারণ নিয়মগুলিও শেখান হ'ত। প্রতিদিন সকালে পাঠশালার সকল ছাত্রেরা

একত্রে সমস্বরে নামতা মুখস্থ বলত। এর পর ছেলেরা ব্যবসাবাণিজ্য ও কৃষিবিষয়ক হিসাবাদিও শিখত। শিক্ষার চতুর্থ স্তরে ছাত্রদের কঠিনতর হিসাবাদি ও উচ্চতর গাণিতিক নিয়মগুলি শেখান হ'ত। তারা ব্যবসায়-সংক্রান্ত চিঠিপত্রাদি, দরখাস্ত ও দলিল-দস্তাবেজ লিখনও শিখত। শেষ বছরে তাদের লিখবার জন্যে কাগজ ব্যবহার করতে দেওয়া হ'ত। ছেলেরা এক বছর ধরে কাগজে লেখা অভ্যেস করবার পরে তাদের অপরের সাহায্য ছাড়া মনসামঙ্গল, রামায়ণ ইত্যাদি বাংলা বইগুলিও পড়তে দেওয়া হ'ত। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, ছাত্রদের পড়তে শেখাবার আগেই লিখতে শেখান হ'ত। সর্বদা তাদের ব্যক্তিগত ভাবেই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। একমাত্র সকলে সমস্বরে নামতা মুখস্থ বলা ছাড়া আর কোনও যৌথ কাজই তাদের করতে দেওয়া হত না। অপেক্ষাকৃত বড় ও অগ্রসর ছাত্রদের মধ্যে থেকেই 'সর্দার পোড়ো' বা মনিটার নির্বাচিত হ'ত। শিক্ষকতার কাজে শিক্ষকদের সাহায্য করাই ছিল এই সর্দার পোড়োদের কাজ।

উইলিয়াম ওয়ার্ডের লিখিত বিবরণী থেকেও আমরা তখনকার বাংলার পাঠশালাগুলির একটি অনুরূপ চিত্র দেখতে পাই। তিনি বলেছেন, তখন বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেক বড় গ্রামেই এই রকম পাঠশালা ছিল। ছেলেদের প্রথমেই বর্ণমালার অক্ষরগুলি লিখতে শেখান হ'ত। এইরূপ লিখনের মাধ্যমেই তাদের অক্ষর পরিচয় ঘটত। লিখবার সময়ে তারা অক্ষরগুলি মুখে উচ্চারণ করতে শিখত না। তারা প্রথমে মাটিতে লিখত, পরে লোহার বা শরের কলমে তালপাতায় ও কলাপাতায় লেখা অভ্যেস করত। তারা সরল অক্ষর লিখতে শিখবার পরে যুক্তাক্ষরগুলি লিখতে আরম্ভ করত। এই ভাবে ক্রমে তারা সাধারণ নামবাচক শব্দগুলিও লিখতে শিখত। পরে তারা সংখ্যা লিখতে শুরু করত। দিনে দু'বার করে পাঠশালার সকল ছাত্রদেরই উঠে দাঁড়িয়ে সর্দার পোড়োর সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে ধারাপাত মুখস্থ বলতে হত। তারা একশ পর্যন্ত নামতা মুখস্থ করে মিশ্রযোগ, বিয়োগ, গুণ, ও টাকা আনা, কড়া গণ্ডা ও মণ সের ছটাক ইত্যাদি ঘটিত লঘুকরণাদিও শিখত এবং কলাপাতায় সহজ সহজ অঙ্ক কষত। শেষে বড় এবং অগ্রসর ছাত্রদের সাধারণ চিঠিপত্র দলিল ইত্যাদিও লিখতে শিখানো হ'ত। ছেলেরা সাধারণতঃ খুব ভোরে পাঠশালায় এসে নটা-দশটা পর্যন্ত থাকত। তার পর তারা মধ্যাহ্ন ভোজনাদি সেরে আবার বিকাল তিনটে আন্দাজ সময়ে পাঠশালায় আসত। সন্ধ্যেবেলায় অন্ধকার হতেই তারা বাড়ী ফিরে যেত। গুরুমশায়রা বেত বা ছড়ি মেরে ছাত্রদের শাসন করতেন। যে সব ছেলেরা পাঠশালা থেকে পালাতে চেষ্টা করত তাদের এক পায়ে দু হাতে দুটো ভারী ইট নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ত, অথবা হাত লম্বা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হ'ত। শিক্ষকদের মধ্যে বেশীর ভাগই সৎশূদ্র জাতীয় ছিলেন। কদাচিৎ কেউ কেউ ব্রাহ্মণও হতেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যে শিক্ষাকমিশন নিযুক্ত হয় তার বিবরণী থেকেও জানা যায় বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পরবর্তীকালের পাঠশালাগুলিও কতকটা এই ধরনের ছিল। প্রত্যহ সকাল প্রায় ছটা আন্দাজ সময়ে গুরুমশায় গ্রামের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করে বেড়াতেন। অনেক ক্ষেত্রে পাঠশালায় যাবার জন্যে পড়ুয়াদের পীড়াপীড়ি করতে হ'ত। আবার কখনও কখনও পিতা বা অভিভাবকদের ও ছাত্রদের সম্বন্ধে শিক্ষক মশায়কে কিছু উপদেশ নির্দেশ দেবার থাকত। তাঁরা কেউ কেউ ছেলেদের অবাধ্যতা সম্বন্ধে অভিযোগ জানিয়ে গুরুমশায়কে তক্ষুনি তাদের শাস্তি দিতে অনুরোধ করতেন। এই রকম করে প্রায় প্রতিদিনই শিক্ষকের কিছু না কিছু সময় নষ্ট হ'ত। পাঠশালা বসবার পরেও ছাত্রদের প্রথম আধ ঘণ্টা কেটে যেত—সূর্যস্তবে, সরস্বতী, গণপতি বন্দনা ইত্যাদিতে। তার পর যে সব ছেলেরা অল্প অল্প লিখতে শিখেছে তাদের অক্ষরলেখা এক এক টুকরো কাগজ দিয়ে অক্ষরগুলির উপর শুকনো কলম দিয়ে দাগ বুলাতে বলা হ'ত। এইরূপ কাজের উদ্দেশ্য এই যে, ছেলেরা এর দ্বারা স্বাধীনভাবে আঙুল ও হাতের কব্জি চালনা করতে শিখবে এবং অক্ষরগুলির আকার ও গঠনের একটি পেশীগত স্মৃতি তাদের মনের মধ্যে গেঁথে যাবে। এই রকম করে লিখিত অক্ষরগুলির উপরে কিছুদিন ধরে দাগ বুলানো অভ্যেস করে ছেলেরা লিখতে আরম্ভ করত। ছোট ছোট ছেলেদের—যারা সবেমাত্র পাঠশালায় ভর্তি হয়েছে—কয়েক দিন ধরে শুধু অপেক্ষাকৃত বড় ও অগ্রসর ছাত্রদের এই সব কার্যকলাপ মনোযোগপূর্বক দেখতেই দেওয়া হ'ত। তার পর একটি বড় ছাত্রকে তাদের ভার নিতে বলা হ'ত। গুরুমশায় সাধারণতঃ দু-একটি অগ্রসর ছাত্রের উপরে অথবা যাদের কয়েক দিনের মধ্যেই শিক্ষা সমাপ্ত হবে এমন কয়েকটি ছেলের উপরেই তাঁর সমস্ত মনোযোগ নিয়োগ করতেন। যখন কোনও একটি ছোট ঘরে বা বারান্দায় সকল

পড়ুয়ারা একত্র হয়ে সমস্বরে চিৎকার করে পাঠাভ্যাস করত তখন তাদের বিচিত্র কণ্ঠনিঃসৃত সেই মিশ্র কলরোল অবর্ণনীয়।

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এই পাঠশালাগুলিকে 'পাইয়াল' বিদ্যালয় বলা হ'ত। 'পাইয়াল' শব্দটির অর্থ একপ্রকার বেঞ্চ বা বসবার উচ্চ আসন। দক্ষিণ ভারতের এই পাইয়ালগুলি সাধারণতঃ ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে, অতিথি অভ্যাগতদের বসাবার জন্যেই নির্মিত হ'ত। এগুলি প্রায়ই প্রস্থে তিন ফুট চওড়া ও উচ্চতায় তিন ফুট উঁচু করে তৈরি হত। গ্রীষ্মকালে রাত্রিতে এগুলির উপর শয়ন করাও চলত এবং অন্যান্য অনেক কাজেই এগুলি ব্যবহৃত হত। পাঠশালাগুলির জন্যেও এইপ্রকার কতগুলি 'পাইয়ালে'রই ব্যবস্থা করা হ'ত। ছাত্রেরা এগুলির উপরেই বসত। সামনে একটি উচ্চ আসনে শিক্ষকের বসবার স্থান নির্দিষ্ট হ'ত। মধ্যে ছেলেদের যাতায়াতের যথেষ্ট জায়গা থাকত। এই 'পাইয়াল' বিদ্যালয়গুলিতেও অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত লিখন, পঠন ও পাটিগণিতের সাধারণ নিয়মগুলিই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এখানে ছেলেদের অনেক সময় সুন্দর অথচ দুর্বোধ্য কঠিন ভাষায় লিখিত কবিতাদি মুখস্থ করতে ও বুঝতেই কেটে যেত। ছাত্রসংখ্যা গড়ে প্রায় একুশ হ'ত। কয়েকটি ছোট ছোট ব্ল্যাকবোর্ড, বালিবিছানো মাটি ও লিখবার জন্যে কিছু পাতা ছাড়া অন্য কোনও শিক্ষা-সরঞ্জাম থাকত না। শিক্ষকগণ সাধারণতঃ ব্রাহ্মণই হতেন। কঠোর বেত্রাঘাতের দ্বারাই বিদ্যালয়ের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা হ'ত। দুরন্ত ছেলেদের অথবা যে সব ছাত্রেরা বিদ্যালয় থেকে পালাতে চেষ্টা করত তাদের শাস্তিস্বরূপ নানাপ্রকার দৈহিক যন্ত্রণা দেবার রীতিও প্রচলিত ছিল। যখন পাঠশালায় কোনও নতুন ছাত্র ভর্তি হ'ত তখন শিক্ষক অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে তার বাড়ীতে আসতেন। ছেলের পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকগণ তাঁর হাতেই তাকে সঁপে দিতেন। এই উপলক্ষে কিছু ধর্মানুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হ'ত। শিক্ষক তাঁর ভাবী ছাত্রকে দিয়ে বর্ণমালার অক্ষরগুলি তিনবার উচ্চারণ করাতেন, গণপতির একটি বন্দনাগানও তাকে দিয়ে গাওয়াতেন এবং একটি সমতল চালের পাত্রে বিষ্ণু বা শিবের নামও তার হাত ধরে লেখাতেন। ধনী ছাত্রদের পিতার নিকট থেকে শিক্ষক মাসিক ১৫৲ থেকে ২০৲ টাকা পর্যন্ত বেতন গ্রহণ করতেন। দরিদ্র ছাত্রেরা তাঁকে মাসিক ৫৲ থেকে ১০৲ টাকা পর্যন্ত বেতন বা মাসহারা দিত। এ ছাড়া ছেলেরা বিশেষ কোনও পর্ব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষেও তাঁকে কিছু কিছু পার্বণী দিত। ছাত্রদের লিখন, পঠন ও অঙ্কই শেখান হ'ত। তাদের তামিল বা তেলেগু ভাষায় লিখিত চার-পাঁচখানি সাহিত্যপুস্তকও পড়তে হ'ত। তাদের নৈতিক শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যেই এই বইগুলি পড়ান হ'ত। পঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগে লিখন শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ছেলেরা বর্ণমালা আরম্ভ করেই লিখতে সুরু করত। তারা বালির উপর আঙুল দিয়ে অক্ষর গঠন করে অক্ষর চিনতে শিখত। পরে তারা ব্ল্যাকবোর্ডে বা স্লেটে পেন্সিল দিয়ে লিখত। শেষে তারা পাতা বা কাগজের উপর লোহা বা শরের কলম দিয়ে লেখা অভ্যেস করত। কৃষি বা ব্যবসায় সংক্রান্ত হিসাবাদি, হুণ্ডি ও দলিলপত্রাদি লিখন এবং মাতৃভাষায় লিখিত হস্তলিপি ইত্যাদি পঠনও তাদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। সাধারণতঃ পাঁচ বছর বয়সেই ছেলেরা পড়া আরম্ভ করত। প্রতিদিন সকাল ছ'টার সময় পাঠশালার কাজ আরম্ভ হ'ত। বিকালে ছাত্রেরা তার পরের দিনকার পাঠটি স্লেটে লিখে এনে শিক্ষককে দেখাত। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী সেটি সংশোধন করে দিতেন এবং সমস্ত পাঠটি ছাত্রকে দু'তিন বার তাঁর নিকট পড়ে শোনাতে বলতেন। পরে ছাত্র বাড়ী গিয়ে সেটি মুখস্থ করে পরদিন সেটি আবার শিক্ষককে আবৃত্তি করে শোনাত।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে এইপ্রকার প্রাথমিক শিক্ষাই প্রচলিত ছিল। স্থানবিশেষে পাঠশালাগুলির সামান্য কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হলেও সেগুলির ধারা প্রায় এইরকম ছিল। এগুলির সঙ্গে সঙ্গে যে টোল-চতুষ্পাঠি-গুলি ছিল সেগুলির শিক্ষাপদ্ধতি বা শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে পাঠশালার শিক্ষার কোন মিলই ছিল না। পাঠশালাগুলি সাধারণের, বিশেষ করে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্যেই প্রবর্তিত হয়েছিল। টোল-চতুষ্পাঠিতে বেদ-বেদান্ত, উচ্চাঙ্গ সংস্কৃত, কাব্য, ব্যাকরণ, ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদিই শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং দ্বিজজাতীয় উচ্চতর তিন বর্ণের ছাত্রেরাই এইগুলিতে শিক্ষালাভের অধিকারী ছিল। কিন্তু মুসলমানদের মাদ্রাসা বা উচ্চতর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে মক্তব বা প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। মক্তবগুলিতে পারসিক ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম ছিল। অ্যাডাম হিন্দু পাঠশালা ও মুসলমান মক্তবগুলির একটি তুলনামূলক বিবরণ দিয়ে বলেন যে, মক্তবগুলির অধিকাংশ শিক্ষকই মুসলমান ছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আরবদেশীয় মুসলমানও ছিলেন। তাঁদের মাসিক বেতন ৫।৭ টাকার

ছিল না। মোটামুটি, বাংলা ও হিন্দী শিক্ষকদের চেয়ে তাঁদের বিদ্যা ও গুণবত্তা বেশীই ছিল। সাধারণতঃ মক্তবগুলিতে প্রাথমিক ব্যাকরণ, চিঠিপত্রাদি লিখন এবং জনপ্রিয় গল্প ও কবিতাদিই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। কখনও কখনও কিছু কিছু ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা এবং অলঙ্কার বিদ্যাও (rhetoric) শেখান হ'ত। সাদির গুলিস্তান এই মক্তবগুলির একটি জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক ছিল। ছাত্রদের কোরাণেরও কিছু কিছু অংশ মুখস্থ করান হ'ত। সুতরাং মক্তবগুলিতে ধর্মশিক্ষারও কিছু ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পাঠশালাগুলির সঙ্গে ধর্মের আদৌ সম্পর্ক ছিল না। এগুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে বাণিজ্যিক শিক্ষাই দেওয়া হ'ত। মক্তবগুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার রীতি প্রচলিত ছিল না। সেখানে পাণ্ডিত্যপূর্ণ পারসিক ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়া হ'ত এবং সাহিত্য ও ভাষাশিক্ষার উপরেই বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হ'ত। ছেলেদের লিখন শিক্ষা দেবার পূর্বে পঠনই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তখনকার দিনে ছাপানো বই বিশেষ না থাকাতে হাতে-লেখা পুস্তকাদিই অধিক ব্যবহৃত হ'ত। ছাত্রদের সুন্দর হস্তাক্ষর লিখন শিক্ষা দেবার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হ'ত। কোনও কোনও মক্তবে কিছু কিছু আরবী ভাষাও শেখান হ'ত, যাতে করে কোরাণ পড়া সহজ হয়। কতগুলি পাঠশালায় বাংলা এবং পারসিক উভয় ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হ'ত। এই ভাষা রাজভাষা (Court language) হওয়াতে অনেক হিন্দু ছাত্রেরাও এই ভাষা শিখত। তাতে করে তাদের রাজসরকারে কাজ পাওয়ার সুবিধা হ'ত। কখনও কখনও ছেলেদের পাঠশালায় না পাঠিয়ে গৃহেই তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ত। তারা গৃহশিক্ষকের নিকট অথবা পিতার নিকট লিখতে-পড়তে শিখত। সাধারণতঃ পাঁচ বছর বয়সেই তাদের 'হাতেখড়ি' হ'ত। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন খুব কমই ছিল। তারা কেউ পাঠশালায় যেতই না। জমিদার-কন্যাগণ কখনও কখনও গৃহেই পিতা বা গৃহশিক্ষকের নিকট কিছু কিছু লেখাপড়া শিখতেন। অ্যাডাম ও উইলিয়াম ওয়ার্ডের লিখিত বৃত্তান্ত থেকে বলা যায় মাদ্রাজের লোকসংখ্যার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির লোকসংখ্যার এক-অষ্টমাংশ এবং বাংলার লোকসংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ পাঠশালায় শিক্ষা-লাভ করত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষতঃ বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলায় এইপ্রকার দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই শিক্ষা এদেশে কবে এবং কিরূপে প্রবর্তিত হয়েছিল তা সঠিক জানা যায় না। সম্ভবতঃ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শিক্ষার আয়োজনের তাগিদ থেকেই পাঠশালাগুলির উদ্ভব। পূর্বে তথাকথিত নিম্নতর জাতি-গুলির শিক্ষার অধিকার মেনে নেওয়া হয় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে বৌদ্ধযুগে সকল জাতির শিক্ষাদানের ও শিক্ষালাভের সার্বভৌম দাবীটি স্বীকৃত হয়েছিল। বিশেষ করে মহাযান বৌদ্ধধর্ম যে সকল শিক্ষার্থীদের পক্ষে গৃহধর্ম বিসর্জন দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নি, তাদেরও পারত্রিক কল্যাণের আশ্বাস দিয়ে বৌদ্ধবিহারে জ্ঞানানুশীলনে রত হতে অনুমতি দিয়েছিল। এতে করে জনসাধারণের শিক্ষার পথটি আরও বেশী সুগম হয়ে যায় এবং এই সময় থেকেই বৌদ্ধমঠগুলিতে ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান-চর্চা প্রবর্তিত হয়। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পর্বতগাত্রে ও স্তম্ভগাত্রে যে উপদেশাবলী উৎকীর্ণ হয় তা সাধারণের বোধগম্য করবার জন্যে কথ্যভাষাতেই লিখিত। এ থেকেই বোঝা যায় অশোকের সময়ের পূর্বেই দেশের জনসাধারণের মধ্যে লিখন-পঠনের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল।

হিন্দু পাঠশালাগুলির উপর মুসলমান শাসনেরও কিছু কিছু প্রভাব লক্ষিত হয়। অ্যাডামের লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন হিন্দু পাঠশালাগুলিতে ছাত্রদের শুভঙ্করের আর্যাগুলিও শিখতে হ'ত। এই আর্যাগুলি পারসিক শব্দবহুল এবং এগুলিতে মুসলমান রীতিনীতিরও কিছু আভাস পাওয়া যায়। এর দ্বারা মুসলমান শাসনের প্রভাবই সূচিত হয়।

হিন্দু পাঠশালাগুলি যে আদৌ ধর্মভিত্তিক নয়, সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সাধারণতঃ নিম্নোক্ত চারটি উপায়েই এই পাঠশালাগুলি স্থাপিত হ'ত:

(১) গ্রামের পুরোহিতগণ কখনও কখনও তাঁদের যজমানদের সন্তানদের শিক্ষার ভারও গ্রহণ করতেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা অনেক সময়ে পাঠশালাদিও স্থাপন করতেন। মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তির আয় থেকেই শিক্ষকদের ভরণপোষণ চলত। তাঁরা পাঠশালার ছাত্রদের কাছ থেকেও কিছু ভেট বা উপহারাদি পেতেন। তারা কখনও কখনও তাঁদের কিছু অর্থ সাহায্যও করত। কিন্তু অ্যাডাম বলেন, বাংলা দেশের অধিকাংশ পাঠশালা-গুলির সঙ্গেই মন্দির বা পুরোহিতদের কোনও সম্পর্ক ছিল না। সেগুলি মন্দিরের কাছাকাছি কোনও বাড়ীতেও অবস্থিত ছিল না। ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ তথাকথিত অতি নীচ জাতীয়ও ছিল। (২) কখনও বা গ্রামের

জমিদার বা অপর বিত্তশালী ব্যক্তিদের বদান্যতায় ও অর্থানুকূল্যেও এই পাঠশালাগুলি গড়ে উঠত। তাঁরা নিজ সন্তানদের শিক্ষার জন্যে যে শিক্ষক নিযুক্ত করতেন গ্রামের অন্যান্য বালকদেরও তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করতে বাধা দিতেন না। তাঁদের গৃহের বারান্দায়, চণ্ডীমণ্ডপে বা অন্য কোনও গৃহে এই পাঠশালাগুলি অবস্থিত হ'ত। (৩) কখনও কখনও যে কোনও জাতীয় কোনও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির চেষ্টায় ও উদ্যোগেও এই পাঠশালাগুলি প্রতিষ্ঠিত হ'ত। তিনি কয়েকজন ছাত্র জোগাড় করেই একটি পাঠশালা খুলতেন। শহরবাসী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রয়োজনই অনেক পাঠশালা স্থাপনের কারণ। এই পাঠশালাগুলিতে সকল জাতির ছাত্রেরাই প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। (৪) কোনও কোনও ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যমে 'মহাজনি' বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হ'ত। এখানে তাঁদের ছেলেরা লিখন পঠন ও ব্যবসায় সংক্রান্ত হিসাবাদি শিক্ষা করে ভবিষ্যতে ব্যবসায় পরিচালনা-কার্যের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠত।

শিক্ষকদের দক্ষতা ও যোগ্যতার উপরেই পাঠশালাগুলির শিক্ষা পদ্ধতির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সম্পূর্ণ নির্ভর করত। ইউরোপীয় আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় এই পাঠশালাগুলির শিক্ষার মান অনেকাংশেই নিকৃষ্ট ছিল। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপনের মূলে কোনও উচ্চ ভাব বা আদর্শও ছিল না। বালকদের ব্যবসায় পরিচালনার উপযোগী শিক্ষা দেওয়াই এই পাঠশালাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাদের নৈতিক বা মানসিক উৎকর্ষসাধন করা, তাদের চরিত্র গঠন করা তাদের সৌন্দর্যবোধ জাগান, তাদের অন্তর্নিহিত প্রসুপ্ত শক্তি ও বৃত্তিগুলির পরিস্ফুরণ ইত্যাদি এই শিক্ষার লক্ষ্য ছিল না। ছাত্রদের শিক্ষা দেবার চেয়ে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা দেবার প্রয়াসই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হ'ত। কতগুলি নিয়ম-সূত্রাদি মুখস্থ করার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হ'ত। পারসিক বিদ্যালয়গুলিতে কিছু কিছু সাহিত্যও পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সেগুলিতেও ছাত্রদের সাহিত্যানুরাগ বাড়াবার কোনও প্রচেষ্টাই হ'ত না। পাঠশালাগুলিতে ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা কদাচিৎ দেখা যেত। কোনও কোনও পাঠশালায় ছাত্রদের সরস্বতী বন্দনাদি শিক্ষা দেওয়া হ'ত। ছেলেরা সকলে প্রতিদিন সেটি সমস্বরে আবৃত্তি করত। আবার কখনও কখনও গুরুমশায়রা ছাত্রদের পৌরাণিক কাহিনী ইত্যাদিও গল্পচ্ছলে শোনাতেন।

এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করবার ব্যবস্থাও আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। অধিকাংশক্ষেত্রেই শিক্ষককে জীবিকার জন্য ছাত্রদের অভিভাবকদের বদান্যতা ও অর্থানুকূল্যের উপরেই নির্ভর করতে হ'ত। সেজন্যে তাঁরা তাঁদের তোষামোদ ও সন্তুষ্ট করতেই বেশী ব্যগ্র হতেন এবং ছাত্রদের শাসন করবারও তাঁদের বিশেষ স্বাধীনতা থাকত না। ছাত্রেরাও যে সব সময়ে খুব শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র ও বিনীত হ'ত তাও নয়। তারা সুযোগ পেলেই গুরুমশায়কে বিরক্ত ও উত্ত্যক্ত করতে ছাড়ত না। তারা কৌতুক করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে নানা উপায়ে জব্দ করে আমোদ অনুভব করত। গুরুমশায়ের তামাকের সঙ্গে লংকার গুঁড়ো মিশিয়ে দিয়ে অথবা তাঁর আসনের তলায় কুলের কাঁটা ইত্যাদি রেখে ছেলেরা মজা দেখত। শাস্তির ব্যবস্থাটিও তেমনি কঠোর ছিল। ছেলেরা কোনও দোষ করলে তাদের আধ ঘণ্টাখানেক পিঠ কুঁজো করে মাটির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকতে বলা হ'ত ও তাদের ঘাড় ও পিঠে ভারী লাঠি চাপিয়ে দেওয়া হ'ত। লাঠি পড়ে গেলেই তাদের বেত মারা হত। কখনও বা মাথা নিচু করে তাদের শরীরটা কোনও গাছের ডাল থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ত। আবার কখনও কখনও কাঁটা, বিড়াল ইত্যাদি সমেত কোনও ছেলেকে একটি ছালায় পুরে তাকে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে বলা হ'ত অথবা নাকে খৎ দিতে দিতে তাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে বলা হ'ত। ছাত্রেরা বিশেষ গুরুতর অপরাধ না করলে এই সব শাস্তি তাদের দেওয়া হ'ত না। তারা শাস্তির ভয়েই দুষ্টুমি করতে ক্ষান্ত হ'ত।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি থাকলেও এর কতগুলি ভাল দিকও ছিল যেগুলি মোটেই উপেক্ষনীয় নয়। ছেলেদের ব্যক্তিগত ভাবে শিক্ষা দেবার রীতি থাকাতে তারা নিজ নিজ প্রয়োজন ও ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠে অগ্রসর হতে সক্ষম হ'ত। শিক্ষকদের পক্ষেও মেধাহীন, অনগ্রসর ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হ'ত। বিশেষ করে ছোট ছোট বিদ্যালয়ে—যেখানে ছাত্রসংখ্যা খুব কম সেখানে—এইরূপ ব্যবস্থায় তারা খুবই উপকৃত হ'ত। 'সর্দার পোড়ো' বা মনিটার প্রথারও কতগুলি বিশেষ সুবিধা ছিল। এতে করে শুধু যে শিক্ষকদেরই সাহায্য হ'ত তা নয়, ছাত্রদেরও বিদ্যার পরীক্ষা হ'ত ও তাদের দায়িত্ববোধ জন্মাত। তারা তাদের অধীত বিদ্যা কাজে লাগাবারও সুযোগ পেত। গুরুমশায়দের বিদ্যা, বুদ্ধি, সব সময় খুব বেশী না থাকলেও

পাঠশালাগুলির কাজ মোটামুটি মন্দ হ'ত না। শিক্ষকগণও মোটের উপর পরিশ্রমী ও কর্মনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁরা যেটুকু শেখাতেন তা যত্ন নিয়েই শেখাতে চেষ্টা করতেন। এই পাঠশালাগুলি ছাত্রদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। তাদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনগুলির প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রেখেই এইগুলির শিক্ষাসূচী প্রস্তুত করা হ'ত। আধুনিক শিক্ষার মানদণ্ডে বিচার করলে হয় ত কতগুলি শিক্ষাদান প্রণালী নিতান্তই যে কোন মান্ধাতার আমলের বলে মনে হবে। কিন্তু কতগুলি প্রণালী আবার সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান সম্মত এবং আধুনিক শিক্ষানীতি সমর্থিত। মণ্টেসরী শিক্ষাপদ্ধতিতেও শিশুদের পঠনের আগে লিখনই শিক্ষা দেবার রীতি আছে। পাঠশালার লিখন শিক্ষা দেবার পদ্ধতিটিও কতকটা মণ্টেসরী প্রণালীরই অনুরূপ। এই দুই প্রণালীর মূল নীতি একই। মণ্টেসরী শিক্ষা পদ্ধতিতে কার্ডের উপরে সাঁটা শিরীষ কাগজে তৈরী অক্ষরগুলির উপর অথবা অক্ষরগুলির খাঁজে খাঁজে অনবরত আঙ্গুল বুলাবার ফলে শিশুদের মনে সেগুলির আকার ও গঠনের পেশীগত স্মৃতি (muscular memory) গেঁথে যায়। পাঠশালাগুলিতেও শিশুদের বালির উপর কাঠি দিয়ে অথবা আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে অক্ষর শিখিয়ে ও পাতায় বা কাগজে লিখিত গুরুমশায়ের হস্তাক্ষরের উপরে শরের কলমে দাগ বুলাতে দিয়ে তাদের পেশীগত স্মৃতির মাধ্যমেই অক্ষর চেনাবার প্রচেষ্টা হয়। পাঠশালাগুলিতে শুভংকরের নিয়ম অনুযায়ী হিসাব শেখাবার যে সুন্দর পদ্ধতিটি প্রচলিত ছিল তার পুনঃ প্রচলন এখনকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও হওয়া দরকার। নিয়মগুলি ছন্দোবদ্ধ আর্যায় সংরক্ষিত হওয়াতে ছেলেমেয়েদের পক্ষে সেগুলি মনে রাখাও সহজ।

ভারতে ইংরেজ শাসন কায়েম হবার পরে দেশের বিভিন্ন প্রদেশে উন্নত ধরনের আধুনিক শিক্ষানীতিসম্মত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হ'ল। ফলে কতগুলি পাঠশালা উঠে গেল এবং সেগুলির স্থানে আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হ'ল। আবার কতগুলি পুরাতন পাঠশালাই আধুনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হ'ল। এখনও কোনও কোনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সেকালের পাঠশালাগুলির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

জলছবি

শ্রীঅর্ণব সেন

সতর্ক পায়ে ঘরে ঢুকল সুনীল। ঘরে আলো ছিল না। অথচ তখনও বেশ অন্ধকার ছিল। শেষ রাত্রের হাওয়াটাও বেশ ঠাণ্ডা। সুনীল চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এবার কাকে ডাকবে? সুদর্শনা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? মাসীমা? কিন্তু ঘুম কি আসবে ওদের চোখে? যাওয়ার আগেও সুনীল দেখে গেছে সুদর্শনা জানলার কাছে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। হ্যাঁ, সুদর্শনা ওর বাবাকে ভালবাসত নিশ্চয়। কিন্তু মাসীমা স্থির হয়েই বসেছিলেন তাঁর স্বামীর মৃতদেহের পাশে। ওরা যখন তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল তখনও তিনি চুপ করেছিলেন। নিশ্চয় গভীর ব্যথা পেয়েছেন উনি। কতই বা বয়েস হয়েছিল ওঁর স্বামীর? পঞ্চাশেরও বেশ নীচে। এই কি মারা যাওয়ার বয়েস? তবু মৃত্যু আসে। বাধা দেওয়া যায় না। সুদর্শনার ভিজে চোখের করুণ আর্তিতেও সে থমকে দাঁড়াতে জানে না। মাসীমার নিথর নিস্তব্ধ আবেদনেও সে সাড়া দেবে না।

নিজের আত্মীয় এরা নয়। তবু পাশের বাড়ীর বাসিন্দা। দু'বছরের আলাপে তাই এরা মাসীমা আর মেসোমশাই। আর সুদর্শনা। সে?

সুদর্শনা কি ঘুমিয়ে পড়েছে? সুনীল চেয়ারে বসল। একটু শব্দ হ'ল। চেয়ার নাড়িয়ে একটু শব্দ করল সুনীল ইচ্ছে করেই। ওরা কেউ জেগে থাকলে নিশ্চয় সংকেতটা বুঝতে পারবে।

ঘরের পর্দা সরিয়ে সুদর্শনা এল। সুইচ টিপে আলোটা জ্বালল। চোখ ধাঁধিয়ে গেল। এতক্ষণের ঠাণ্ডা ফিকে অন্ধকারটা এক মুহূর্তে সরে গেল। হঠাৎ আলোর ঔজ্জ্বল্য বিরক্তিকর মনে হ'ল। সুনীল চোখ বন্ধ করল। আবার চোখ খুলল।

সুদর্শনা দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। ওর এলোমেলো শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে ক্লান্তি জড়ানো। ওর দু'চোখে কান্নার আভাস। ফুলোফুলো দুটি চোখের পাতা। অল্প লাল দুটি চোখ। খোলা চুল ছড়িয়ে পড়েছে ওর পিঠ বেয়ে, গলার পাশ দিয়ে বুকের ওপর।

সুনীল সুদর্শনার দিকে চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তার পর বলল, 'আমরা ফিরে এসেছি কিছুক্ষণ হ'ল। ওরা সবাই চলে গেল। মাসীমা কোথায়?'

'এতক্ষণে ফিরলেন? আসুন, ভেতরে মা অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।'

সুনীল সুদর্শনার পেছন পেছন ঢুকল বাড়ীর ভেতর। নিস্তব্ধ নির্জন বাড়ী। আলোগুলো শুধু শুধুই জ্বলছে। বারান্দাটা কি ভীষণ নির্জন! কেউ নেই। কেমন যেন অসহ্য লাগছে এমন নির্জনতা। কেউ নেই কোথাও, শুধু সুনীল আর সুদর্শনা। সুদর্শনা এখন কি ভাবছে? ওর হাঁটার ভঙ্গীটা কি আশ্চর্য মন্থর!

'মা, সুনীলদা এসেছেন।'

অনুপমা দেবী তখনও চুপচাপ বসেছিলেন মেঝের ওপর। নিথর পাথরের মত বসেই ছিলেন।

সুনীলকে দেখে তিনি চোখ তুললেন।

'তুমি ফিরে এসেছ? সত্যি, আমার জন্যে তুমি অনেক কষ্ট করলে সুনীল? তুমি না থাকলে কি যে করতাম!'

'না না, সেকি কথা! কি এমন করেছি মাসীমা আপনাদের জন্যে।'

অনুপমা দেবী সুনীলের মুখের দিকে চাইলেন। সুনীল দেখল, না তিনি কাঁদেন নি। তাঁর সমস্ত শোক তাঁকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। তাঁর চোখের জলটুকুও শুষে নিয়েছে নিঃশেষে। আজ থেকে তিনি বিধবা। তাঁর মাথায় আর সিঁদুর থাকবে না। এবার থেকে সাদা ধুতিতে তিনি নিজেকে ঢেকে রাখবেন। শুভ্র স্নিগ্ধ সাদা রঙ। রিক্ততার প্রতীক। তাঁর স্বামী যদি না মারা যেতেন তা হলে এ সব কিছুই হ'ত না। আশ্চর্য, এক-জনের জন্যে আর একজনের জীবনও শূন্য হয়ে যায়। এইটুকুই বিস্ময়কর। অথচ অনুপমা দেবীকে বার্ধক্য এখনও স্পর্শ করে নি। তাঁর যৌবনের শেষ সময়ে তিনি তাঁর স্বামীকে হারালেন। এখন বৈধব্যই মেনে নিতে হবে। বার্ধক্যে বৈধব্য সহ্য করা যায়। কিন্তু অনুপমা দেবী তো এখনও বার্ধক্যে পা দেন নি। তাঁর জীবনের পরিপূর্ণতার পথে এ যেন একটা হঠাৎ গতি।

অনুপমা দেবী বললেন, 'সুনীল, তুমি কাছে একটু বসবে?' আশ্চর্য করুণ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। যেন আবেদনের মত, আর্তির মত।

সুনীল মেঝের ওপর বসল তাঁর পাশে। সুদর্শনা দাঁড়িয়েছিল।

অনুপমা দেবী বললেন, 'তুমি এখান থেকে যাও সুদর্শনা। একটু একলা থাকতে দাও আমাদের।'

সুদর্শনা চলে গেল। সুনীল মাথা নীচু করে বসেছিল।

অনুপমা দেবী বললেন, 'জান সুনীল, আমি জীবনে কোনদিন শান্তি পেলাম না পুরোপুরি। যখনই একটু শান্তি পেতে চেয়েছি, তখনই গভীরতম দুঃখ এসেছে আমার জীবনে। কাকে দোষ দেব বলতে পার? হয়ত এ আমার অদৃষ্ট!'

সুনীল অনুপমা দেবীর কথার উত্তর দিতে পারল না। কি উত্তর দেবে? দেওয়ারই বা কি আছে? শুধু শুধু মামুলী কতকগুলো সান্ত্বনার বুলি উচ্চারণ করে লাভ কি? ঘরটা স্তব্ধ, নির্জন। একজনের নিশ্বাসের শব্দ অন্যজন শুনতে পায়। একজনের নিঃশব্দ কান্নার আর্তি অন্যজন অনুভব করতে পারে। ঘরের কম পাওয়ারের আলোটা চোখে অসহ্য ঠেকছে না। বরং ফিকে নীল আলোর নীচে অনুপমা দেবীকে আশ্চর্য রহস্যঘেরা মনে হচ্ছে। তিনি যেন কোন্ অশরীরী আলো দিয়ে ঘেরা। কেন এমন মনে হয়?

'মাসীমা, আপনি সারারাত এখানেই বসে থাকবেন? ভোর হয়ে এল যে।'

অনুপমা দেবী বললেন, 'সুনীল, শুধু একদিনই তো; এতে আমার কষ্ট নেই। একদিন অন্ততঃ ওঁর জন্যে এটুকু আমি সইতে পারব।'

আবার নিঝুম স্তব্ধতা নামল ঘরের ভেতর। সুনীল বসে রইল অনুপমা দেবীর পাশে। সুদর্শনা একা আছে পাশের ঘরে। ওকে একটু সান্ত্বনা দিতে পারলে ভাল হ'ত। বেচারী ছেলেমানুষ, নরম মন ওর। অথচ ওর কাছে এখন যাওয়ার উপায় নেই।

'সুনীল, তোমার কথা আমরা ভুলব না। তুমি আমাদের কাছে আসবে তো মাঝে মাঝে?'

'নিশ্চয় আসব, মাসীমা।'

'সুনীল, তুমি ছিলে বলেই আমি আজ অনেকটা সান্ত্বনা পেলাম। তুমি এবার বাড়ী যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও গে।'

'দরকার নেই।'

অনুপমা দেবী সুনীলের পিঠে হাত রাখলেন।

'তুমি আমার কথা শুনবে না? লক্ষ্মীছেলে যাও, একটু ঘুমিয়ে নাও গে। না হলে অসুখ করবে যে।' আশ্চর্য করুণ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। একে উপেক্ষা করা যায় না, এ অনুরোধ তুচ্ছ করা যায় না।

সুনীল উঠে দাঁড়াল।

'আমি আসি, তা হলে মাসীমা।'

আবার সেই বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল সুনীল। ওই তো সুদর্শনা এখনও বসে রয়েছে জানলার ধারে। ওকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত কেউ নেই। ও একা, বড় বেশি একা। কি ভাবছে ও জানলার পাশে বসে? মানুষের মন কি দুর্বোধ্য নয়? সুনীল হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল দরজার সামনে। সুদর্শনা মুখ ফেরাল।

'আপনি চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, তুমি একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতে সুদর্শনা।'

'ঘুম আসবে না।'

'তা হলেও একটু বিশ্রাম করে নেওয়া উচিত। দেখ মৃত্যু তো আছেই। তুমি কি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারবে? আমরা সকলেই বড় বেশি অসহায়।'

'অসহায়?' কান্নার মত শোনাল সুদর্শনার কণ্ঠস্বর। 'সুদর্শনা যাও, একটু ঘুমোও গে। শুধু শুধু ভেবে লাভ কি? এখন তো আর কিছু নেই।'

'আপনি চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, আবার আসব।'

সুনীল এগিয়ে গেল বাইরের দরজার দিকে। সুদর্শনা সুনীলের সঙ্গে সঙ্গে এল দরজা পর্যন্ত। সুনীল চলে গেল। সুদর্শনা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল খোলা দরজার পাল্লার গায়ে হেলান দিয়ে। তার পর আবার ফিরে এল ক্লান্ত মন্থর পায়ে ঘরের দিকে।

অনুপমা দেবীর স্বামীর শ্রাদ্ধে আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই এসেছিলেন। তবু সুনীলের ওপরই অনেকটা দায়িত্ব পড়েছিল। খুব একটা ঘটা করে শ্রাদ্ধ করার ইচ্ছে অনুপমা দেবীর ছিল না। তবু যতটুকু প্রয়োজন তা শেষ পর্যন্ত করতেই হ'ল। শ্রাদ্ধ শেষ হওয়ার পর আত্মীয়স্বজনরা আবার ফিরে গেলেন। অনুপমা দেবী আর সুদর্শনা ছাড়া বাড়ীতে কেউ রইল না। কার কাছেই বা যাবেন? স্বামী খুব একটা টাকা-পয়সা রেখে যান নি। তবে কোনরকমে চলে যাবে দু'জনের। আর সুদর্শনাও চলে যাবে বিয়ের পর। সুদর্শনার বিয়ের সময়ও হয়ে এসেছে। তার পর অনুপমা দেবী একলা। তাছাড়া আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে কোনদিনই তেমন যোগা-

যোগ ছিল না। আজই বা শুধু শুধু তাদের ওপর নির্ভর করতে যাবেন কেন?

তবে এ বাড়ীটা ছেড়ে দেবেন। এত বড় বাড়ীটা ভাড়া নিয়ে আর কোন লাভ নেই। সুনীলকে বলে একটা ছোট বাড়ী নেবেন। ঠিক করাও হয়ে গেছে বাড়ী। এখান থেকে বাড়ীটা একটু দূরে পড়বে অবশ্য। তবে কি এমন দূর?

বড় বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে ছোট বাড়ীতে এসে ওঠার পরই অনুপমা দেবী সুনীলকে বলেছিলেন, 'সুনীল, তুমি রোজ আসবে ত? বাড়ীটা দূরে হ'ল তোমাদের বাড়ী থেকে। তাবলে মাসীমাকে ভুলে যেও না যেন।'

সুনীল বলেছিল, 'তা কি হয় মাসীমা? কি এমন দূর এটা আমাদের বাড়ী থেকে। রোজ আসব দেখবেন।'

রোজ, হ্যা রোজই যেতে ভাল লাগে। বিকেলের দিকে হাটতে হাটতে সুদর্শনার কাছে যেতে ভাল লাগে। ছাট্ট বাড়ীর সামনে একটু ফুলবাগান। লতাজড়ানো গেট। তার নিচে দিয়ে এগিয়ে যায় সুনীল। একটু এগিয়েই বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসেথাকা সুদর্শনাকে দেখা যায়। এপাশ থেকে দেখা যায় শুধু ওর চুলের গুচ্ছ আর গালের একপাশ। ওর সামনেই একটা খালি বেতের চেয়ার থাকে। সেখানে সুনীল বসে পড়ে। সুদর্শনা বলে, 'আজ কিন্তু আপনার দেরী হয়ে গেছে। মা অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে। আপনার জন্যে আজ এক নতুন খাবারের এক্‌সপেরিমেণ্ট করছেন মা।'

সুনীল বলে, 'তার মানে, আমার ওপর দিয়ে এক্‌সপেরিমেণ্ট?'

সুদর্শনা হেসে বলে, 'নিশ্চয়। আপনি খেয়ে বলবেন কিরকম হয়েছে'

সেদিনও সুনীল এসেছিল বিকেলের দিকে। সুদর্শনা তখন ওর রক্তগোলাপের গাছটা নিয়ে ব্যস্ত। ফুলটা কাঁচি দিয়ে কাটতে যাবে এমন সময় সুনীল চেঁচিয়ে উঠল, 'ওকি তুলছ কেন?'

সুদর্শনা থমকে দাঁড়াল কাঁচি হাতে।

'কেন? তুলব না?'

সুনীল বলল, 'তোল, কিন্তু গাছেই ত ভাল ছিল। কার জন্যে-তুলছ?'

অল্প লাল হ'ল সুদর্শনার গাল। ও মাথা নিচু করল। গোলাপগাছের একটা পাতা ছিঁড়ল।

'না, এমনি তুলছি।' ফুলটা সযত্নে কেটে নিল সুদর্শনা। তার পর ও হেঁটে গেল ঘাসের ওপর দিয়ে। ওর শাড়ির পাড় ঘাস ছুঁয়ে গেল। সুনীল দাঁড়িয়ে রইল।

'আসুন, ঘরে বসবেন চলুন।' সুদর্শনা ডাকল ঘাড় ফিরিয়ে। ওর এলো-খোঁপা দুলে উঠল। কানের দুল ঝিকমিক্ করল। ও সুনীলের চোখে চোখ মেলাল এক মুহূর্তের জন্যে। আবার চোখ নামিয়ে নিল।

ওরা দু'জনে ঘরে ঢুকল। অনুপমা দেবী ঘরে বসে-ছিলেন। 'চল সুনীল, ছাতে বসিগে আমরা। এস।'

অনুপমা দেবীর সঙ্গে ছাতের সিঁড়ি বেয়ে উঠছিল সুনীল। অনুপমা দেবী বললেন, 'সুনীল তোমার শরীরটা একটু রোগা লাগছে আমার চোখে। একটু নিয়মে থাক।'

সুনীল হাসল। 'রোগা দেখা মা আর মাসীমাদের স্বভাব। কই, অন্যজনে ত বলে না এসব।'

অনুপমা দেবী হাসলেন। 'অন্যজনের চোখ নেই আমাদের মত, তাই বলে না।'

ছাতের একপাশে দেওয়ালের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন অনুপমা দেবী। সুদর্শনা ওদিকে দাঁড়িয়েছিল। অপরাহ্নের লাল মেঘের দিকে চেয়েছিল বুঝি সুদর্শনা। এমন করুণ সন্ধ্যেবেলায় ওর মনে কি স্বপ্নের জাল বোনা হচ্ছিল না? ওই যে দূরের বটগাছটার মাথায় পাখীরা উড়ে এসে বসছে সেই পাখী ওড়া দেখে সুদর্শনার কি কিছু মনে হয় নি? সুনীল মাঝে মাঝে দেখছিল সেই পাখী ওড়া। কতদূর থেকে ওই পাখীগুলো এখানে উড়ে আসে? দমকা হাওয়া এসে সুদর্শনার চুল উড়িয়ে দিল। চোখের পাতা কাঁপাল। সুদর্শনা শিউরে উঠল, কেঁপে উঠল। একবার চাইল সুনীলের দিকে। অনুপমা দেবী কি যেন ভাবছিলেন।

হঠাৎ সুদর্শনার দিকে চেয়ে বললেন, 'সুদর্শনা, এবার তুমি নিচে যাও, সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তোমার আবার পড়াশুনা আছে।'

সুদর্শনা বলল, 'আর একটু পরে যাব মা।'

'না না, এখুনি যাও, তুমি বেশী রাত পর্যন্ত জাগতে পার না মোটেই। পড়াশুনা কিচ্ছু হচ্ছে না।'

সুদর্শনা চলে গেল নিচে। যাওয়ার সময় একবার সুনীলের দিকে চেয়েছিল। কিন্তু সুনীলের দিক থেকে কিছু করবার উপায় ছিল না।

অনুপমা দেবী সুনীলের কাছে সরে এলেন।

'জান সুনীল, এই সময়টা আমার খুব ভাল লাগে। সন্ধ্যেবেলার আলোছায়ার আবছা অন্ধকারটা আমার ভারী ভাল লাগে। ছোটবেলায়ও আমিও সুদর্শনার মত চুপচাপ ছাতে বসে থাকতাম। তবে কেউ বাধা

দিত না আমায়। আমি ইচ্ছে করেই সুদর্শনাকে এখান থেকে সরিয়ে দিলাম। ওর ভালর জন্যেই।'

অনুপমা দেবী চুপ করলেন অল্পক্ষণ।

'জান সুনীল, অল্প বয়েসে এই একা একা বসে চিন্তা করাটা বড় মারাত্মক। তুমি এসব বুঝবে না। সন্ধ্যেবেলার অবসন্ন ক্লান্ত রূপটা বড় বেশী প্রভাব বিস্তার করে মনের ওপর। এর ফল ভাল হয় না।'

অনুপমা দেবী সুনীলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখ ঘিরে বৈধব্যের শান্ত স্নিগ্ধতা। তবু সন্ধ্যেবেলার আকাশের ধূসর রং তাঁর চোখে-মুখে আশ্চর্য স্বপ্ন মাখিয়ে দিয়েছে। সুদর্শনার দুটি চোখের ভাব যেন তাঁর চোখে মিলেছে। তিনিও একদিন সুদর্শনার মত ছিলেন। তিনিও কি এমনি ছাতে নির্জন সন্ধ্যেবেলার আকাশের লাল মেঘের দিকে চেয়ে স্বপ্ন এঁকেছিলেন? তবে আজও তিনি আকাশের দিকে চাইতে পারেন। নিজের মনকে শূন্যের অন্তহীন বিবর্ণতার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারেন। অনুপমা দেবী সুনীলের চোখের দিকে চেয়েছিলেন একদৃষ্টে। সে চোখে কি ছিল? সুনীল বুঝতে চেষ্টা করল। স্নেহ? কিন্তু অমন স্বপ্নরাগ মাখানো চোখে কি শুধু স্নেহই থাকতে পারে? তবে? না না, অন্যকিছু কল্পনা করা যায় না। তা অসম্ভব। মনের ভুল। অবসর সময়ের বিকৃত চিন্তা মাত্র। ছি, ছি। একি ভাবছে ও!

'সুনীল, তুমি রোজ আমার কাছে আস তাই আমি একটু শান্তি পাই। তোমাকে দেখলে আমার পুরনো মন জেগে ওঠে।'

আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে বললেন অনুপমা দেবী। তাঁর গলার স্বর বাতাসের সঙ্গে মিশে রহস্যময় মনে হয়। অপরাহ্নের আবছা অন্ধকারে তিনিও যেন গভীর রহস্যে ঘেরা। সুনীল তাঁকে বুঝতে পারে না। তাঁর মনকে অনুভব করতে পারে না।

'চল, চল, আমরা নিচে যাই। আমার আবার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

সুদর্শনার জন্মদিনে সুনীল নিয়ে গিয়েছিল কিছু বই আর সন্দেশ। বইগুলো পেয়ে সুদর্শনা খুশি হ'ল। অনেক ভেবে কিনতে হয়েছে ওর পছন্দমত বই। একটা শাড়ি ইচ্ছে করলে দেওয়া যেত। কিন্তু সে ভাল লাগে না। বই-ই ভাল। বই অনেক ছোট হয়েও অনেককিছু বলতে পারে। ছোট ছোট অক্ষরগুলো অনেক কিছু বোঝাতে পারে, ওদের অনেক মানেও হয়। অন্তত সুদর্শনার মনে ওরা খুসির জোয়ার জাগাতে পারে।

রাতেও খাওয়ার নেমন্তন্ন ছিল। তাই গল্প করার অনেক সময় পাওয়া গেল। মাসিমা রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। তাই সুনীল সুদর্শনার সঙ্গে গল্প করছিল ওর ঘরে বসে বসে। তবে একটু পরেই অনুপমা দেবী এলেন। সুনীলকে রান্নাঘরে নিয়ে গেলেন। সুদর্শনাও ওর সঙ্গে গেল মাকে সাহায্য করার জন্যে।

অনুপমা দেবীর সামনে সুদর্শনা কেমন যেন নিঝুম হয়ে বসে থাকে। কথা বলতে পারে না বেশি। বড় বেশি লাজুক হয়ে ওঠে। আর সব কথা অনুপমা দেবীর সামনে বলাও যায় না। সুদর্শনা আর সুনীল দুজনে একা একা বসে যে কথা বলে তা কি অনুপমা দেবীর সামনে বসে বলা যায়? সুদর্শনাও একটু পরে চলে গেল। ওর কলেজের ক'জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। তাদের সঙ্গে গল্প করতে ও চলে গেল।

সুনীল ভেবেছিল সুদর্শনা আসবে একবার। কিন্তু এল না।

অনেক দেরী হয়ে গেল। খেয়ে উঠতে উঠতেই বেশ রাত হয়ে গেল। সুনীল বাড়ি যেতে চাইছিল খাওয়ার পরেই।

অনুপমা দেবী বললেন, 'এত রাতে ফিরবে কি করে? এখানে থেকে যাও। ওঁরা ত জানেনই তুমি এখানে এসেছ। নিশ্চয় চিন্তা করবেন না তোমার জন্যে।'

সুনীল বলল, 'না না, আমি চলে যাই।'

'তা হয় না সুনীল। এত রাতে আর বাড়ি ফিরতে যেও না। এখুনি বৃষ্টি আসতে পারে। মেঘ করেছে আকাশে। অনেকটা রাস্তা ত।'

রাতে শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু চিন্তাই সুনীলের মনে এল। সুদর্শনাকে আজ যেন অপরূপ মনে হচ্ছিল। ওর আয়ত দুটি চোখের পাতায় যেন স্বপ্ন জড়ান ছিল। ওর লালচে ঠোঁটের মৃদু হাসি মেশান কথায় কি আশ্চর্য সম্মোহন-মন্ত্র মাখান। মনকে অবশ করে দেয়। হৃদয়ে অপরূপ সুর তোলে। ও আজ কি রঙের শাড়ি পরেছিল? খোঁপায় কোন ফুলের মালা জড়িয়েছিল? কিসের যেন একটা মিষ্টি গন্ধ ওর শরীরে আজ মেশান ছিল। সেই স্নিগ্ধ নরম গন্ধটুকু এখনও অনুভব করে নেওয়া যায়।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে গেল। কে পাখা নিয়ে বাতাস করছিল? ঘুমের মধ্যে প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেনি সুনীল। তার পর তন্দ্রাটুকুও কেটে গেল।

'মাসিমা, আপনি বাতাস করছেন? এত রাত পর্যন্ত জেগে আছেন এখানে?'

'হ্যাঁ', মৃদুস্বরে বললেন অনুপমা দেবী, 'তোমার গরম হচ্ছিল নিশ্চয়। বেশ গরম পড়েছে, তাই হাওয়া করছি।'

'না, না, মাসিমা আপনি শুতে যান। ছি, ছি, আপনি আমার জন্য এত রাত পর্যন্ত জেগে আছেন।'

'কি হয়েছে তাতে? রাত জাগা আমার অভ্যেস আছে। তুমি ঘুমোও।'

অনুপমা দেবী বাতাস করতে লাগলেন পাখা দিয়ে। সুনীলের চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে দিলেন। সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন কপালে। চুলগুলো থাক থাক করে দিলেন।

'মাসিমা, আপনি কেন কষ্ট করছেন আমার জন্যে? আমার কোন অসুবিধে হয় নি। আপনি যান।'

'সুনীল, লক্ষ্মীটি চুপ কর। তুমি ঘুমোও।'

সুনীল দেখল কোন উপায় নেই। বাধা দেওয়া যাবে না। ও চোখ বুজল, কিন্তু ঘুম এল না। কেন অনুপমা দেবী এমন করেন? এটা কি বাড়াবাড়ি নয়? সুদর্শনা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। ছি, ছি, অনুপমা দেবীকে এই ভাবে দেখলে ও ভাববে কি! না, না, এটা ভাল লাগে না। এত যত বিরক্তিকর। এর একটা [illegible] করতে হবে কাল সকালে। এ কি করছেন অনুপমা দেবী!

সুনীল ভেবেছিল ঘুম আসবে না। তবু এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকাল বেলা অনুপমা দেবী সুনীলকে বললেন, 'সুনীল তুমি কাল দুপুরে একবার আমার কাছে আসতে পারবে?'

'আমার অফিস আছে যে কাল দুপুরে।'

'ছুটি নিয়েই এস। ভীষণ দরকার আছে। তুমি একটা দিন আমার জন্যে ছুটি নাও। বল, আসবে তো? তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার।'

'আসব।'

সুনীল বাড়ী ফিরে গেল। কিন্তু ওর সমস্ত মন চিন্তায় ছেয়ে গেল। কি এমন কথা বলবেন অনুপমা দেবী যার জন্যে দুপুরবেলা ছুটি নিয়ে ওঁর বাড়ীতে যেতে হবে? কাল রাতের ঘটনাটা নিয়েই হয় ত কিছু বলবেন। কিংবা সুদর্শনাকে নিয়ে? হতেও পারে! কিংবা অন্য কিছু? কোন অবিশ্বাস্য কিছু? কে জানে! কি এমন কথা। সুদর্শনা কি থাকবে সে সময়ে? অনুপমাদেবীকে সত্যিই চেনা গেল না। কি এক দুর্বোধ্য রহস্যঘেরা ভদ্রমহিলা। যিনি মায়ের মত স্নেহপ্রবণ, আবার যাঁর চোখে বিমুগ্ধা যৌবনবতী নারীর ভাব ফুটে ওঠে। কেন এমন হয়? কেন তিনি মাঝে মাঝে সুনীলের দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকেন? কি এর মানে? না, না, এ হয়ত বোঝার ভুল। হয়ত মনের ভুল বিভ্রান্তি। কিংবা বিকলন? ছি, ছি, চিন্তা করা যায় না। কিন্তু অস্বীকার করা যায় না। আশ্চর্য জটিল মানুষের মন। কেন এত জটিল? তাকে মুঠো করে ধরা যায় না?

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দুপুরবেলা সুনীল গেল অনুপমা দেবীর কাছে। অনুপমা দেবী বসেছিলেন একটা বেতের চেয়ারে। তার সামনে আর একটা চেয়ার খালি পড়েছিল। আগে থেকেই তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন।

'বস সুনীল, আমি আসছি।'

একটু পরেই এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে এলেন অনুপমা দেবী।

'এ কি, এই ত একটু আগে খেয়ে উঠেছি!'

'তাতে কি হয়েছে?' হাসলেন অনুপমা দেবী, 'গরমে অনেকটা রাস্তা হেঁটে এলে, একটু ঠাণ্ডা হও।'

সুনীল বলল, 'কেন ডেকেছেন আমাকে?'

অনুপমা দেবী বললেন, 'তুমি বড় ব্যস্ত হচ্ছ। বলব, একটু অপেক্ষা কর। বলব বলেই তোমাকে ডেকেছি এই সময়ে। সুদর্শনা কলেজে গেছে। কেউ নেই এখন। অনেক কিছুই বলব তোমাকে। কিন্তু তার আগে কথা দাও তুমি কিছু মনে করবে না। আমাকে ভুল বুঝবে না।'

'না, ভুল বুঝব কেন? বলুন আপনি।' কাঁপা গলায় বলল সুনীল।

'বলব?'

'হ্যাঁ, বলুন আমি সবকিছু শুনতে চাই।'

'শোন, তোমাকে আমি বলবার জন্যেই আজ ডেকেছি। অনেক ভেবে তবে ডেকেছি। তোমাকে আমি একটু বেশী স্নেহ করি, ভালবাসি। তাই তোমাকে কিছু বলতে চাই। তুমি হয়ত মাঝে মাঝে আমাকে ভুল বুঝেছ, তার জন্য হয়ত আমিই দায়ী অনেকখানি।'

থামলেন অনুপমা দেবী। বেতের চেয়ারের হাতলের ওপর নখ দিয়ে দাগ কাটলেন মাথা নিচু করে।

'বলুন, চুপ করলেন কেন?'

'বলছি, আমাকে একটু সময় দাও। ভেবে বলতে দাও। তোমার সামনে আমি বাজে কথা বলতে চাই না, মিথ্যেও বলব না। আর তাই সঙ্কোচটুকু আমাকে কাটিয়ে উঠতে দাও।'

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন অনুপমা দেবী, 'দেখ আমাকে বলতেই হবে সবকিছু। না বলে উপায়

নেই। সুদর্শনার জন্তেই বলতে হবে। কারণ আমি ওর মা। আমি যখন ঠিক সুদর্শনার মত ছিলাম তখন আমার মন ওর মতই ছিল। ঠিক সেই বয়েসেই একজনকে আমি দেখেছিলাম। সে আমাদের বাড়ী প্রায়ই আসত। রোজই বিকেলে সে আসত, আর আমার জন্তেই সে আসত। সেই প্রথম যৌবনে আমার চোখের সামনে সে ছাড়া আর কেউ ছিল না। সেই কুমারী জীবনের নিঃসঙ্গ শূন্য দিনগুলোর কথা আমি এখনও ভুলতে পারি নি। তখন মনে হ'ত আমি বড় একা, নির্জন। সন্ধ্যে-বেলায় ছাতে বসে থাকতাম চুপচাপ। কি সুন্দর সেই দিনগুলো ছিল! তাদের আমি আর ফিরে পাব না। সেই সময়েই আমার নির্জন রিক্ত জীবনে এল সে। হ্যাঁ, তাকেও আমি কোনদিন ভুলতে পারি নি। চেষ্টা করেও পারি নি। মানুষের মন কত অসহায় তুমি বুঝবে না। কেন আমি শিবদাসকে ভুলতে পারলাম না? সেই ছোটবেলায় সুদর্শনার মত বয়েসে যাকে প্রথম দেখে-ছিলাম তাকে আমি কোনদিন ভুলতে পারি নি। হাজার চেষ্টা করেও পারি নি। নিজের সঙ্গে নিজের এই দ্বন্দ্ব কত মর্মান্তিক তা তুমি বুঝবে না। বিয়ে করেও শিবদাসকে ভুলতে পারি নি। বিয়ের পরও স্বামীকে ভালবাসতে পারি নি। কেন এমন হয়? অথচ ভুলে যাওয়া কত সহজ ছিল।'

'সুনীল, তুমি হয়ত ভাবছ এসব কথা আমি তোমাকে বলছি কেন! কিন্তু আমাকে বলতেই হবে, উপায় নেই। তোমাকে আজ এই মুহূর্তে আমার শিবদাস বলেই মনে হচ্ছে। তুমি জান না, তোমাকে আজকাল আমি ভীষণ ভয় করি। তোমাকে আমি ভয় পাই। শোন, সুদর্শনার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তোমাকে আমি এ খবরটা ইচ্ছে করেই দিই নি। ও কি, তুমি চমকে উঠলে কেন? আমি লক্ষ্য করেছি আজকাল ওকে দেখে মুগ্ধ হতে আরম্ভ করেছ। আর সুদর্শনাও তোমাকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে চাইছে। তবে এখনও তোমাদের মধ্যে নিশ্চয় কোন গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি। এখনও সময় আছে। আমি বিয়ের পরও আমার স্বামীকে ভালবাসতে পারি নি। আমার মেয়েও আর কিছুদিন পরে তার স্বামীর ঘর করতে যাবে। সেখানে গিয়েও সে যদি তার স্বামীকে ভালবাসতে না পারে, তোমার জন্তেই যদি শান্তি না পায়, আমি তাহলে সহ্য করতে পারব না। আমার নিজের জীবনে যা ঘটেছে, আমার মেয়ের জীবনে তা ঘটতে দিতে চাই না। সুনীল তুমি শিবদাস হয়ো না। তুমি তাই আর আমাদের বাড়ী এস না, কোনদিন ভুলেও এস না। আমার মেয়েকে, আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।'

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন অনুপমা দেবী।
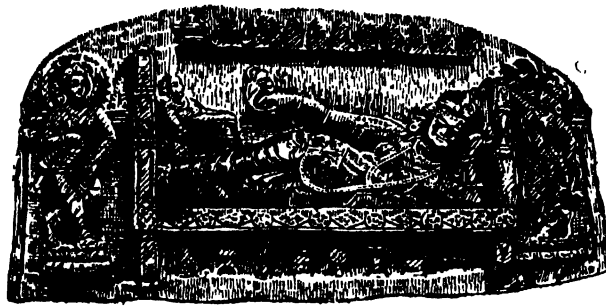
তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

২৫

মধুমতী শুনে অবাক্।

"লণ্ডনে লোককে ডেকে খাওয়ানোটা বড় বেশী আত্মীয়তা মনে করে; আর তুমি খাওয়াবে জিম্ রোপারকে? কেন?"

"জিম্ রোপারই যে আমার লণ্ডন গো?"

"মরেছে! সাহিত্যিকের পাল্লায় পড়েছে ট্যাক্সি-ড্রাইভার। ওকে তো তুমি রাজা করে ছাড়বে।"

আমরা যাচ্ছি তখন ট্রাফালগার স্কয়ারে। কথা আছে হেমরঞ্জনী এসে যাবে। ফোন করলাম হেমরঞ্জনীকে। ওর ঘাড়ে একটা ফাইল সওয়ার করেছে। ভারের চোটে পা-পেছলানো টাঙ্গার ঘোড়ার মত পথের মাঝে পা ছড়িয়ে গাড়ীর-বোম্ ঘাড়ে বেঁধে ও চোখ উল্টে পড়ে আছে ইণ্ডিয়া হাউসের টেবিলে।

বলি, "জোগীন্দর সিংকে ফোন্‌টা দাও।"

জোগীন্দর সিং প্রথমেই তাঁর অর্দ্ধনারীশ্বর সোপ্রানোতে প্রাণে মধু ঢেলে দেয়—"কি বংগালী মোস্অয়্? কি গোপ্‌ওর্?"

বলি তখন—"তুস্সী সর্দার জী পইয়া। শের্ কি বচ্চা হোন্দা? তুমি থাকতে কিনা ভাই হেমরঞ্জনী টাঙ্গার ঘোড়ার মত বোম কাঁধে করে টেবিলের ওপর জিভ বার করে বসে আছে?"

"সেকি? আমি ত দেখছি বেশ সুন্দরী একটা আসামী মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। এ সময়ে আমি যদি ফাইল কেড়ে নিই ও তো কামড়ে দেবে।"

ওদের হাসির শব্দ ফোনে শুনতে পাই।

গৌহাটি থেকে কে এক মেয়ে পড়তে এসে নিয়মের গোলমালে পড়েছে। জায়গা পায় নি কলেজে। সেই দরবার। মেয়ে কোথায় ঠিক নেই; ফাইল আছে। "টেলিগ্রামের ব্যাপার। মেয়ের ব্যাপার। বিদ্যার্থীর ব্যাপার। ও আসবে না এখন। সময় তো আছে। বল ওকে আমরা এগুচ্ছি।" বললে মধুমতী।

"মধুনম সুতোষসো—ওর ত সকাল সন্ধ্যায় মধু। তাই এড্‌জাষ্টমেণ্ট এমন সহজ। আমাদের হলে এ নিয়ে তো কুরুক্ষেত্র হ'ত। শ্রীমতীকে সিনেমার সময় দিয়ে তখন গৌহাটীর মেয়ে নিয়ে বসা? ফাঁড়া, গো ফাঁড়া!"

ওকে যা হোক, তাড়াতাড়ি করতে বলে এগুতে লাগলাম। পাড়াটা তো আগেই দেখা। মধুমতীকে বলি একটা নয়া রাস্তা দিয়ে চলা যাক।"

"যে পথ দিয়ে চল। এখন আর পথ দেখার বয়স নেই!"

"মরবে নারী উড়বে ছাই তবে নারীর গুণ গাই। জানো মধুমতী।"

"ছাই হয়েই যার শেষ তার গুণ কি গাইলে কে শুনছে গো ঠাকুর! তবে তোমার সঙ্গে বাঁধানো পথ ছাড়া চলার ফাঁড়া কেটে গেছে।"

বুক দুর দুর করে মধুমতীর কথা শুনে।

তখন ওরা সবে সিন্ধু থেকে এসেছে। পুরাণা কেল্লার মধ্যে আছে। সে যে কি থাকা! একটা দুরন্ত বিষণ্ণ সন্ধ্যায় খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি তাঁবুর বাঁশের সঙ্গে বেশীর ভাগ জিনিস টাঙ্গিয়ে নিজেরা প্যাকিং বক্সের ওপর চেপে বসে আছে। ক্রমাগতঃ বৃষ্টি পড়েছে আট ঘণ্টা। চার ধার জলে থৈ থৈ। অমন তাঁবু বোধ হয় পাঁচ-সাতশো। তার মধ্যে বিশাল সিন্ধী কলোনী। সিন্ধী হাইস্কুলও তারই মধ্যে। সে যে কি দুর্য্যোগ!

যখন বললাম, "এ ভাবে তোমাদের ছেড়ে যাই কি করে? চল আজ আমার বাড়ী।"

শক্ত হয়ে হেমরঞ্জনী বলেছিল, "যদি এই তিন হাজার সিন্ধীর বাসের ব্যবস্থা করতে পার তবেই আমি যাব। করাচী থেকে এতটা পথ—"

সে সব কথা বলার অবসর এ নয়। কিন্তু ১৯৪৭ '৪৮ আর '৪৯-এর সেই ভয়ঙ্কর সমাজের জীবন্ত চিত্র এঁকে রাখার মত জোলা বা বাল্‌জাক্ আমাদের দেশে নেই। সেই সন্ধ্যার কথা মধুমতী ভোলে নি। তার পর অনেক মধুর সন্ধ্যা কেটেছে। মধুমতীর সুন্দর কোয়ার্টার হয়েছে। এখন সে লণ্ডনে।

রিজেণ্ট ষ্ট্রীট থেকে কীংগ্‌সোয়ে আর পল্-মল্, কক্‌স্-পার ষ্ট্রীট আর নর্দাম্বারল্যাণ্ড এভেন্যুর মধ্যে পিকাডেলী, কভেণ্ট্রি, ডুয়ারিলেন, শাফ্‌ট্‌স্‌বেরি—অঞ্চল। তোফা

অঞ্চল। লণ্ডনের শ্যামবাজার। সিনেমা-থিয়েটার-নাচঘর আর জলসাঘরে ছয়লাপ, কেবল নিউস সিনেমাই এইটুকু জায়গায় আটখানা, এমনি সিনেমা কুড়িটা গুণে আর গুণি নি। আটাশটা থিয়েটার হল আর কনসার্ট হল গুণেছি! সেই পিকাডেলি অঞ্চল ঘুরে চলেছি যে মার্কেটের পথে।

যে মার্কেটে অনেকগুলি পারিশাসের দোকান। আর বিরাট বিরাট বাড়ীর তলায় ফলের, সব্জীর আড়তি দোকান। এখানেই একদিন দেখেছিলাম সেই বাক্স-ভাঙ্গা আপেলের ঘটনা।

মধুমতীকেও সে ঘটনা বলি। লণ্ডনের পথে পথে বিনা উদ্দেশ্যে দেখব না, দেখব না করে যত ঘুরেছি, কত সব বিচিত্র কাহিনী দেখেছি। আমার সময় নেই, লণ্ডন সমাজে, আপা লণ্ডন সমাজে, কোথাও নাক গলাতে পারি নি। পথের খবর তাই নিয়েছি অনেক। পথে পথে নাটক দেখেছি বহু। লণ্ডনের পার্কে বক্তৃতা দিয়ে ওষুধ বিক্রী করতে দেখেছি; ম্যাজিক দেখিয়ে অদ্ভুত শক্তি বাড়ানোর দাওয়াইয়ের গুণগান শুনেছি; নানা রংয়ের পাথরের গুণাগুণ শুনেছি; ব্যাণ্ড-বাজিয়ে ভিক্ষের বাক্স হাতে করে যেতে দেখেছি; বিপন্ন নেশাখোর বুড়ো মাঝিকে নিজের দুঃখ দৈন্যের বর্ণনায় চোখের জলে ভেসে যেতে দেখেছি; গির্জার দ্বালের গায়ে ব্যালে নাচের মনোহরণ লজ্জাকরণ বিজ্ঞাপন চাপকানো দেখেছি; ষ্টেশনের কোণে অ্যাসফাল্টের গায়ে খড়ির দাগ কেটে ঘুঁটি খেলতে দেখেছি; লণ্ডনের পথে ঝগড়া দেখেছি, মারামারি দেখেছি। দেখেছি দৈনিক-মাসিক কাগজের ষ্টলে লোক নেই, লোকে কাগজ নিচ্ছে, পয়সা রেখে যাচ্ছে। সিগারেট দেশলাই বিক্রীর জন্য মানুষ নেই, মেশিন আছে। পয়সা ঢুকিয়ে টানো। প্যাকেট এসে যাবে হাতে। সাধারণ চা, কফি, দুধ, কেক, বিস্কুটের দোকানে পয়সার লেনদেনে অদ্ভুত রকম নির্ভরতা। সবার ওপরে দেখেছি মানুষের পায়ে গতি, পেশীতে আত্মনির্ভরতা, কণ্ঠে নিঃশব্দতা, ব্যবহারে সমীচীনতা, কথায়-বার্তায় বিনয় ও ভদ্রতা। লণ্ডনকে মনে থাকবে তার ভীড়ের জন্য, তার খিজ্রিপনার জন্য, তার পরিস্কৃতির জন্য তার তৎপরতার জন্য। লণ্ডনের পথে প্যারীর গাছ নেই; প্যারীর পথে লণ্ডনের প্রাণ নেই। লণ্ডনের পথে রোদ ঝল্‌মল্ করে না; প্যারীর পথে জনস্রোত বয়ে যায় না। ছাড়ার সময় প্যারী ডাকে —"আবার এস", ঢোকার সময় লণ্ডন বলে, "এতদিন আস নি কেন?" প্যারীকে জানি দিনে, চিনি রাতে; লণ্ডনকে চিনি দিনে, জানার কথায় হার মানি। লণ্ডনের সম্পন্ন পাড়ায় জাঁক আছে জমক নেই। প্যারীর সম্পন্ন পাড়া জমকালো যত, জাঁক তত নয়। লণ্ডন শাঁসে ভারী, আর ভারে মন্থর, গম্ভীর। প্যারী পাঁপড়ি আর খোলসে লঘু। আর সেই লঘুতায় উচ্ছল। বর্ষায়, কাদায়, বরফে —লণ্ডনের প্রাণবায়ু শীতল হয় না, বরং তেজে ছোটে। রোদে, বাতাসে, হিমেও প্যারীতে শীত ঘোচে না যতক্ষণ না শ্যাম্পেন খায়। লণ্ডন বীয়ারে মাতাল, প্যারী শ্যাম্পেনে বেতাল। লণ্ডনের খোশমেজাজের মৌতাত পর্দানশীন; প্যারীর খুশ্‌দিনের হুল্লোড় পথের দরবারে। পথে পথে ঘুরে ঘুরে দুটো নগরীকে জেনেছি যেন দুই নাগরীর মত।

লণ্ডন প্যাভিলিয়নে দেখাচ্ছে শ'-এর জোয়ান্ অবার্ক। অথচ ভীড়ও নেই কিছুই নেই। টিকিট নিয়ে গিয়ে বসে পড়ি। তখন শো'র মাঝামাঝি। মধুমতী বলে, "ঘাবড়ো না। যখন ইচ্ছে এস, যখন ইচ্ছে যাও। ঐ এক টিকিটে বসে থাকতে চাও সারাদিন সন্ধ্যা কাটিয়ে রাত একটায় বাড়ী ফেরো। শো কেবল চলতেই থাকবে না থেমে।"

সত্যিই তাই হ'ল। শো শেষ হয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ল। বসেই রইলাম। দেখতে দেখতে যখন ফের ঐ জায়গা অবধি এল (যেখানে আমরা এসে ঢুকেছিলাম) তখন আমরা যেতে পারতাম। কিন্তু দেখলাম আবার শেষ পর্যন্ত। এর মধ্যে হেমরঞ্জনীও এসে পড়েছে।

ইংরেজের ইতিহাসে পরধনকে আত্মসাৎ করার ব্যাপারে লণ্ডনের অবদান যথেষ্ট। কিন্তু খাঁটি ইংরেজ, যারা ইংলণ্ডকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ইংলণ্ডের সাহিত্য, ধর্ম, শিল্পকলা বাঁচিয়ে রেখেছে, যে ইংলণ্ড জনকে ম্যাগনা কার্টা লিখিয়েছে, চার্লসের গলা কেটেছে, চার্টিষ্টদের সাহায্য করে পার্লামেণ্টের মত স্বচ্ছন্দ একটা প্রতিষ্ঠান গড়েছে, সে ইংলণ্ডের বাস এই সব ফার্মে থাকে। নেপোলিয়নের কণ্টিনেণ্টাল সিষ্টেমকে যারা হারিয়েছে, ডানকার্কের পরেও যারা দমে যায় নি—সেই অদ্ভুত জাতির বাস এই সব গাঁয়ে।

লণ্ডন থেকে ক্রয়ডন্, এপসম্ পর্যন্ত সবটাই আমার চোখে লণ্ডন বলেই বোধ হ'ল। যে অর্থে বেহালা কলকাতার শহরতলি, এমন কি যে অর্থে হাওড়া কলকাতার শহরতলি, সে অর্থে এ সব অঞ্চল 'লণ্ডন' নয়। এদের সংগঠন, পরিস্কৃতি, সজ্জা, বিলাস সবই প্রথম শ্রেণীর নগরীর মত। বাসে হাওড়া থেকে শিবপুর

বট্যানিকালের স্বর্গে পৌঁছতে গেলে আজও নরককুণ্ড পরিক্রমা করে যেতে হয়! তেমনটি নেই এ সব শহরগুলিতে। দক্ষিণে আর সমুদ্রের ধারে হওয়ায় রোদের বাহার থাকে অনেক দেরী অবধি। সন্ধ্যা হয় বেশ ধীরে ধীরে। রাত ন'টায় রজনী মোটে বালিকা।

আমার কাঁদা ছিল খানিক হাঁটতে হবে, অন্ততঃ দু'তিনখানা গ্রাম। রষ্টকোষ্ট একটা ছোট ষ্টেশনে নেমে গেল। সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলাম বাসের। বাসে করে এলডার শটের একটু আগে নেমে এলাম। বেলা তখন সাড়ে ন'টা হবে। একটা ইনে ঢুকে চা খেয়ে নিলাম। রষ্টকোষ্ট অবশ্য রাজী গাড়ী করে যেতে। সাত মাইল পথ। আমি বলি হেঁটে যাব।

ভালই বলেছিলাম। বড় ইচ্ছা ছিল ইংলণ্ডের জাত চাষার সঙ্গে আলাপ করি। বিলাতী ফার্মে বার্ণ-হাউসের গন্ধ শুঁকি। বিলেতের ক্ষেতে বসে ফল খাই।

তেমন চাষা বিলেতে না থাকলেও নগরকে ও নাগরিককে সভীত সম্ভ্রম দেখানো আছে। নতুন মানুষ দেখলে হাঁ করে চেয়ে দেখা আছে; নিজের শক্তি-সামর্থ্যের ওপর আস্থা আছে। কৃষি-বিভাগের ওপর এদের সত্যিকার ভরসা আছে, গ্রামের বোর্ডের ওপর জোর আছে।

ডিক নভেন্ তার ফার্ম দেখাচ্ছিল। ওর নিজের মদ-চোলায়ের কারখানা আছে। হপের বাগানে বিশাল বিশাল ঝুড়ি। বহুলোক নীরবে কাজ করছে। ওরই মধ্যে তরুণীরা যথেষ্ট রস পাচ্ছে নতুন দেখে। যে সব তরুণদের সঙ্গে ওদের মনের মিল, কাজের ভাণ করে তাদের কাছে ঘেঁষে আমাকে দেখিয়ে অদ্ভুত কোন কথা বলে হাসিতে ফেটে পড়ছে। কিন্তু প্রকৃত সম্পদ দেখলাম ভেড়ার। বিশাল বিশাল ডাউন্‌স্—অর্থাৎ ঢল্-খাওয়া জমীর মাথায় চাষ, পাশে পাশে চরবার জায়গা। গ্রামবৃদ্ধদের খুব খবরদারি এই সব চারণ ভূমির ওপর। কারণ কেন্ট আর হ্যাম্পশায়ারের একটি বড় সম্পত্তি এই সব ভেড়া। এ অঞ্চলের ভেড়াই নাকি অষ্ট্রেলিয়ায় আমদানী করে অষ্ট্রেলিয়ান ভেড়ার উন্নতি হয়েছে।

আমরা ক্ষেতের ধার ধরে ধরে হাঁটতে লাগলাম। বেলা বারটা আন্দাজ একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে চলেছি। হঠাৎ মনে হ'ল একটা বাড়ীতে দলে দলে লোক চলেছে খুব সাজগোজ করে।

আমি রষ্টকোষ্টকে বলি—"মনে হচ্ছে কি যেন কিছু একটা ব্যাপার আছে ওখানে। আপত্তি আছে যদি ওখানে যাই?"

হাসে রষ্টকোষ্ট। "ওরা এত দেরী করে চার্চ থেকে ফিরছে, অথচ আজ রোববার নয়। মানে কোন বিশেষ ব্যাপারে ওরা চার্চে গিয়েছে। সাজগোজও যথেষ্ট। বিয়ে নয়। ব্রাইড নেই। ব্যাপটিজম্ কি? না কারুর জন্মতিথি?"

জায়গাটা হঠাৎ যেন বন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দিগন্ত রেখায় যেদিকে দেখি ঘাসে ঢাকা উঁচু নীচু জমী। টিবি যদিও নয়, তবু ঢেউগুলি বড় বড়। দুই ঢেউয়ের মাঝে মাঝে শাদা শাদা ভেড়ার পাল। পাল ত পাল, শত শত। সবুজের বনাত হঠাৎ শাদা-শাদা হয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঝোঁপঝাড়; ছোট্ট ছোট্ট কুলের আকার, রংয়ে ফালসার মত। বেড়ায় কাঁটা-ভর্তি ঝোঁপঝাড়। রষ্টকষ্ট মাঝে মাঝে নীচু হচ্ছে আর দু'একটা ফল কুড়িয়ে কুড়িয়ে আমায় দিচ্ছে। দূরে দূরে হঠাৎ একটা বড় ওক বা আখরোট গাছ। ছায়ার কালো দাগ বিছান রোদের চকচকে গায়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আগাগোড়া জনবসতির চিহ্ন নেই। কেবল ঘাসের মাঝ দিয়ে দিয়ে পায়ে চলার পথ। কোন কোন ঢালু জমীর উঁচুর দিকে কাঠ-ঘেরাও করা ভেড়া থাকার আস্তানা। ভেড়ার পালও আছে, কুকুরও আছে। হাতে বাঁকা লাঠি নিয়ে কেউ হয় ত গাছের ছায়ায় অপেক্ষা করছে। আমি দেখছি না।

এর মধ্যে লম্বা মত বাড়ীটা খড় আর টালি দিয়ে ছাওয়া। গায়ে গায়ে সব লতাকুঞ্জ। অনেকটা ঘিরে বেড়া বাঁধা। নিঃসন্দেহ কোন কৃষকের বাড়ী হবে। যদি যাই, কি আতিথেয়তা দেখায়—পরখ করার লোভ দুরন্ত হয়ে উঠল। মনে পড়ে তিব্বতের পথে হিমালয়ের জঠরে গ্রামে, বিহারে মধুবনী জেলার মধুয়াপুর গ্রামে, শাজাহাঁপুর জেলার পুরকাজী গাঁয়ে হঠাৎ দিন গুজরান করার সে সব আতিথেয়তার কথা, যার ইতিহাস ফা-হি-য়ান হুয়েন্ চাং, বাতুতা, মার্কো পোলো লিখে গেছে। বাড়ীর কাছাকাছি যেতেই জোর গলার গানও শুনতে পাওয়া গেল। রষ্টকোষ্টই প্রথমে ঢুকল। আমি বাইরেই অপেক্ষা করি।

এক মিনিটের মধ্যেই বাইরে এল বেঁটেমত একটি লোক; এত সামান্য, এত অল্প যে লণ্ডনে কেউ চেয়ে দেখত না। কিন্তু এই জনহীন প্রান্তরের সীমায় দাঁড়িয়ে ওকে অবহেলা করা দুঃসাধ্য।

হাত বাড়িয়ে দেয়—"আমি জিমি পার। উপস্থিত

অত্যন্ত ব্যস্ত। আমার বৃদ্ধ বয়সের প্রথম ও একমাত্র সন্তানের—এটা তৃতীয় জন্মোৎসব। বন্ধুদের নিয়ে স্ফূর্তি করার সময়। আজ আশীর্বাদের মত বন্ধু সমাগম যত হয় তত ভাল। গরীবের ঘরের খানাপিনা রোজই এক রকম। তার ব্যতিক্রম কবেই বা হয়। তবু যদি এক-দিন বাড়ীর সেঁকা রুটির সঙ্গে পিঠে আর টাটকা মধু থেকে চোলানো সুরা পাওয়া যায়—ক্ষতি কি দু'একজন বাড়তি হলে; গরীবের ঘরের সাদা খানা যদি খেতে আপত্তি না থাকে চলে আসুন। রষ্টকোষ্টকে জানি না ওর দিদিকে জানি। খুব জন্তু পোষেন। আমাদের এ অঞ্চলে মিস রষ্টকোষ্টকে সব চাষী জানে—পশুর ডাক্তারী করতে অমন ওস্তাদনী আর নেই। রষ্টকোষ্টের বাবাকে চাচা বলতাম। চলে আসুন।"

ছোট্ট কপাল ভর্তি রাশি রাশি দাগ। গাল ভর্তি হলদে রঙের দাড়ি, গোঁফজোড়া খুব জোরাল। মাথায় পুরোপুরি টাক না হলেও ঘাড়ের চুল ছাড়া চুল নেই। ছোট্ট চোখের ভেতর গভীর নীল একজোড়া চোখে স্বাস্থ্য-ভরা চাহনি। পরণে হাল্কা খয়েরী রঙের পুরাণ তবে ভালো ধোলাই করা সার্জের স্যুট থেকে ন্যাপথালিনের গন্ধ বেরুচ্ছে। তিন পিস স্যুটের কোটের বুকের বোতাম ঘরে গোঁজা একটা টকটকে লাল গোলাপ কুঁড়ি। পায়ে কিন্তু ভারীজুতা—তবে পালিশ করা। বড় বড় দুটো কুকুর আমার গা শুঁকছে। ঠেলা দিয়ে খোলা যায় এমন কাঠের ফালির গেট। তার গায়ে গায়ে সূর্যমুখীর গাছ। পরে পরে অনেক ফুলের গাছ। একটা জড়ানো লতা ভর্তি লাল লাল ফুলের থর ছেয়ে আছে। সারা বাগানময় প্রজাপতি আর মৌমাছি ভর্তি। মাচায় লাউ আর কুমড়ো হয়ে আছে। একটা ধার পুরো বরবটীতে ভর্তি। একটা গাছ লেবুতে ছেয়ে আছে। দূরে একটা আলাদা বাড়ী মত দেখে বুঝলাম ওটা গোয়াল। গরু নেই। বোধ করি চরতে গেছে।

রষ্টকোষ্ট চোখ টিপে জানাল "মদে চুর হয়ে আছে আমাদের জিমি পার। মদে চুর, তবে মদে টং হয়ে নেই।"

আমি ঘরটায় ঢুকে স্তব্ধ হয়ে সব নিরীক্ষণ করছি। নাচ যাতে বন্ধ না হয় তাই চুপি চুপি একটা ধারে বসেছি। জিমি রোপারের শরীরে আঁট আছে। হাতের আঙুলগুলো বেঁটে, আঙুলের ডগাগুলো চওড়া চওড়া, গাঁটগুলো শক্ত আর জোরালো। কাটা দাড়িগুলো যে কেন অত কটা বুঝতে দেরী হয় না ওর দাঁতে টেপা পাইপে নজর পড়লে। কিন্তু মিসেস রোপার লম্বায় চওড়ায় জবরদস্ত মহিলা। একটু থলথলে ভাব। দেখলে মনে হয় জিমিকে কোলে নিয়ে দোল্ দিতে পারে। পায়ের গোছগুলো মোটা। পা দু'খানার মাংস জুতোর ফিতে ছাপিয়ে মোজা ফেটে বেরুচ্ছে। চোখ অসম্ভব রকম কটা আর মসৃণ যেন হৃদয় অবধি দেখা যায়। হাসিতে ভরা মুখ। মাথায় বাঁধা একটা নীল সিল্কের রুমাল; পরণে লেশকাটা একটা সাদা ধবধবে অর্গাণ্ডির গাউন। মিসেস রোপার তাজা রস এক গ্লাস এনে দিলেন। আমি এক গ্লাস, রষ্টকোষ্টও এক গ্লাস। যদিও অন্যান্য চোখ আমাদের দিকে চাইছে, নাচ চলছে পুরো দমে। হাত বাজিয়ে বাজিয়ে আর মাউথ অর্গান বাজিয়ে একদল গান গেয়ে চলেছে জোরসে—

No harm in a round of ale ho
A tankard of bubbling ale
No harm no harm to trip a dance
Dance to a merry tale !
My Jenny O, my Jenny O, my Jenny
Queen of ale
We dance to merry meorure,
And dance to a merry tale
My Jonny, my Jenny, my Jenny···

ঘুরে ঘুরে ঐ একই লাইন, একই শব্দগুলো কেবল গাইছে, আর নাচছে, আর নাচছে।

সেই অবকাশে আমি ঘরটা দেখতে লাগলাম। নাচের ঘর মোটেই নয়। একধারে লম্বা টেবিল। ছুতোরগিরি করার টেবিলটা আজই এখানে পাতা হয়েছে। অন্য ধারেও ছোট ছোট নানা সাইজের টেবিল জড়ো করে লম্বা লাইন করা। একটা দিকে একটা বড় চুল্লী। আগুন না থাকলেও কাঠ সাজানো আছে। তার ওপর আংটায় ঝুলছে একটা পাত্র। ম্যাণ্টল্‌পীসের ওপর দু' একখানা ছবি। একটা পাত্রে কয়েকটা ফুল। ঘরটা আসলে ফসল জমা করার ঘর। তিন-চারটে চক্‌চকে কাস্তে একটা কোণে। দেয়ালের সঙ্গে কাৎ-করা লম্বা লম্বা ডাণ্ডার মাথায় নানা রকমে বাঁকানো আঁকশীগুলোও চক্‌চক্ করছে। ম্যাণ্টল্‌পীসের ওপর সাজানো বাতিদানে দিনের বেলাতেও মোমবাতি জ্বলেছে। পার্টি হলে মোম-বাতি জ্বলবেই। এক কোণে গাদা করা ব্যাগের ওপর ব্যাগ সারি সারি রাখা। ঘরের ঐ দিকটাতে দুটো বিড়াল খেলা করছে।

ঘরে সব-সমেত বাইশটি লোক। আমরা দু'জন আর জিমি-পার্‌-রা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া বাকি আঠার জনের

কৌতুক
ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

পল্লীবালা
ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

দণ্ডকারণ্যে লক্ষ্মীনগর গ্রামে কীর্ত্তন-কথার মহড়া চলিতেছে
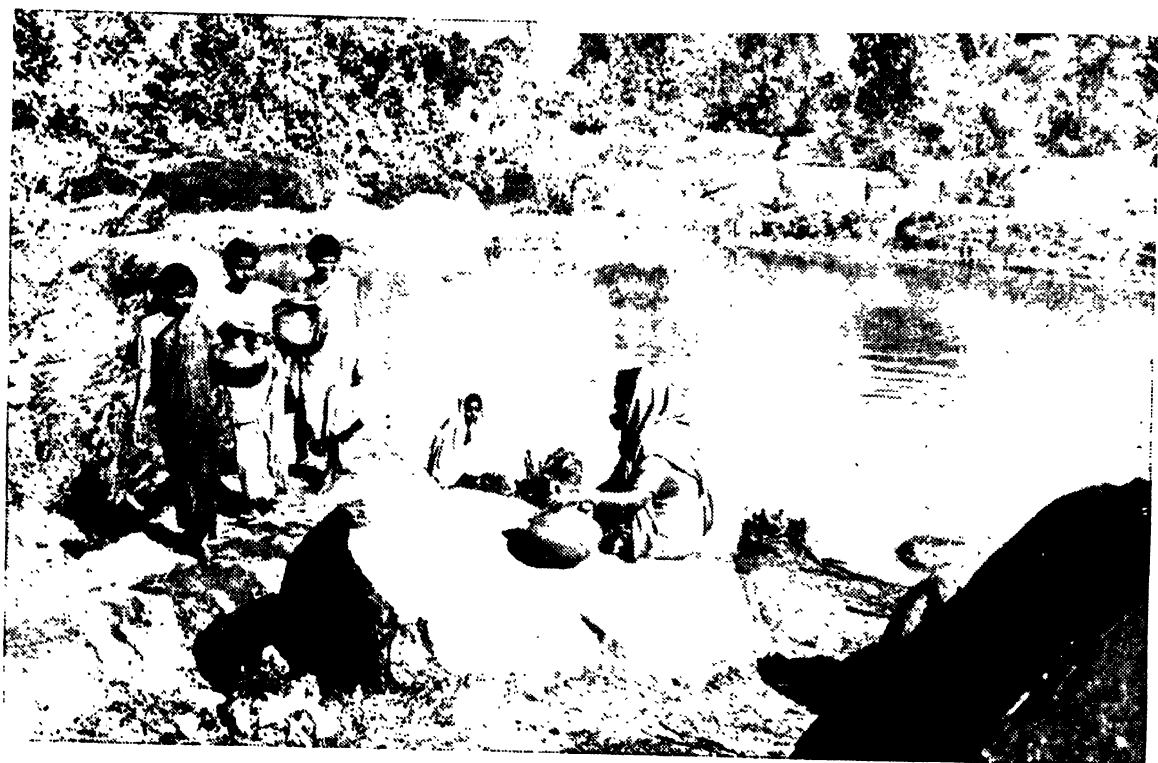
দণ্ডকারণ্যে দুর্গাকুণ্ড হইতে মেয়েরা জল লইয়া যাইতেছে

মধ্যে পাঁচটি স্ত্রীলোক। পাঁচজনই নাচছে। পাঁচটি পুরুষও অবশ্য নাচছে। চারজন একটা টেবিলে বসে মদ খাচ্ছে। বিরাটকায় একটা পোর্সেলিনের সাদা জাগ্‌, মুখটা ছোট। তার ভেতরে মদ। ওদের হাতে বড় বড় পাত্র। সব ক'টাই ধাতুর—বোধ হয় পেতলের ওপর কলাই করা। চারজন বাজাচ্ছে আর গাইছে। এ চারজনও মাঝে মাঝে গেয়ে উঠছে।

বেশ লাগছে সবটা চেয়ে চেয়ে দেখতে। যারা মদ খাচ্ছিল একজন পারসন-হিবার্ট, একজন হুইল্‌রাইট জ্যাকসন, একজন ডেয়ারিম্যান অসওয়াল্ড ও একজন জার্নিম্যান ইলাইজা। এদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখি কিছু বুঝছি না। বষ্টকোষ্টই সমস্ত ব্যাপারটা সামলাচ্ছে। মাখন, রুটি, কেক—প্লাম পুডিং আর ফল খেলাম রাশি রাশি। ক্ষিধেও পেয়েছিল। ওরা নাচতে বলল। জানি না নাচতে। বষ্টকোষ্ট নাচল। আমি শেষ অবধি একটা গান গাইলাম। ওরা মহা খুশী। "ঝর ঝর বায়ু বহে বেগে, চারিদিক ছায় মেঘে" খুব দ্রুত লয়ে গেয়ে ওদের নাচিয়ে ছাড়লাম। খানিক বাদে ফিডলার ছোকরাও বাজাতে লাগল ঠিক, মাউথ অর্গ্যানও মাঝে মাঝে ঠিক সুরে ফুঁক মারছিল। হাতের তাল ত ঠিকই ছিল। মজা হ'ল যখন পুরুষরা—যারা বসে ছিল তারাও যোগ দিয়ে সুরু করল—"হাইয়ো, হাইয়ো হাঁ-ই-য়ো-ও-ও" নাচের পর—অর্থাৎ গানের পর খুব একটা হৈ চৈ। মেয়েরা এসে ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল হাত।

এক ঘণ্টা সময় যে কি চমৎকার কাটল।

পথে নেমে বষ্টকোষ্টকে বলি "ইংলণ্ড দেখলাম বষ্টকোষ্ট। যে ইংলণ্ড ভালবাসি সেই ইংলণ্ড দেখলাম।"

"ভালবাস ইংলণ্ডকে? তুমি? তোমার ত হাড় অবধি ইংরেজ বিদ্বেষ!"

হঠাৎ যেন মুষড়ে যাই। এ কথা ত একটুও সত্য নয়। ইংরেজ বিদ্বেষ আছে? সে কোন্‌ ইংরেজ? যে ইংরেজ আমাদের আতিথেয়তার সুযোগে আমাদের ঠকিয়েছে, ভদ্রতা আর ব্যবসায়ের আবডালে আমাদের লুঠেছে,—যারা আমাদের হীন প্রতিপন্ন করেছে, স্যাভেজ বলেছে, তাঁবে-তে রেখে ধমক দিয়ে অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে, সে ইংরেজকে জন্ম থেকে ঘৃণা করেছি। সত্য। কিন্তু ইংলণ্ডের শত শত চাষা, নাবিক, শ্রমিক, মজদুর, ইংলণ্ডের শত শত শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, মনীষী—ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট, ইংলণ্ডের সহিষ্ণুতা, ইংলণ্ডের নিয়মানুবর্ত্তিতা, রীতি-প্রীতি, প্রথা-পূজা—এসব তো খুবই ভালবাসি। ইংলণ্ডের শক্ত সমাজকে চিরদিন শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যে দম্ভ গান্ধীকে বলে naked fakir, ভারতীয় সাহিত্য দর্শনকে নগণ্য বলে উপহাস করে, যে দম্ভ জালিয়ানওয়ালাবাগের জল্লাদকে পুরস্কৃত করে, তাকে ভালবাসি নি। কিন্তু ইংলণ্ড নইলে হেষ্টিংসের বিচার হ'ত না, ক্লাইভকে আত্মহত্যা করতে হ'ত না—ইংলণ্ড নইলে ভারতের স্বাধীনতা বিনা রক্তপাতে সম্ভব হ'ত না।

বষ্টকোষ্টকে শেষ অবধি বলতে হ'ল—"গোড়ায় ভুল করেছি আমরা তোমাদের দেশে প্রেস নিয়ে গিয়ে; আর আজও ভুল করছি অক্সফোর্ডে আরও বেশী ভারতীয় প্রফেসর না এনে।"

শেষের কথায় বষ্টকোষ্ট আমায় একটু ল্যাং মারল। বুঝি। ওটা বষ্টকোষ্টের নষ্টামী।

বষ্টকোষ্টের বোন যত একা বলা গেছিল তত একা নয়। বাড়ীটি একটি হাসপাতাল। তবে পশুর হাসপাতাল।

বষ্টকোষ্টের চেয়ে অন্ততঃ আট বছরের বড়ো। দেখতে মনে হয় দশ-বারো বছরের বড়ো। গ্রামের পথ ছেড়ে বড় রাস্তায় পড়েই আমরা বাসে এ্যালডারশটে এসে পৌঁছলাম। এ্যালডারশটে বিখ্যাত সেনানিবাস আছে। আর আছে উইনচেষ্টারে সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলণ্ডের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়।

উইলিয়াম অব ওয়াইকেন্‌হাম ১৩৮৭-তে এখানে স্থাপনদের প্রথম কলেজ করেন। ক্যাথলিকদের খুব রোয়াব ছিল। আজও ক্যাথলিকরাই প্রধান। সেই প্রসিদ্ধ পাব্লিক স্কুল দেখার ইচ্ছে হতে পারত। কিন্তু বষ্টকোষ্টের বোনের সঙ্গ একটুও ছাড়তে তখন ইচ্ছে হ'ল না। জীবনে যে দু-চারটি বিচিত্র চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে এই মহিলাটি তার অন্যতম। ক্রমশঃ

শান্তিনিকেতন-আশ্রম ও রবীন্দ্রনাথ

ডক্টর শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের প্রাণকেন্দ্র; সুতরাং তাঁকে পূর্ণরূপে জানতে হলে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর প্রথম যোগস্থাপনার ইতিহাস অবশ্য-জ্ঞাতব্য। এই প্রবন্ধে শান্তিনিকেতন-আশ্রমের গোড়ার কথা ও কবির সঙ্গে এর সংযোগ-সংঘটনের বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে।

১২৬৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তপঃসাধনায় হিমালয়-অঞ্চলে গমন করেন। সেখানে পার্বত্যনদীর গতিবেগ লক্ষ্য করায় হঠাৎ তাঁর মনে এক বিরাট্ পরিবর্তন আসে। তিনি বুঝলেন, নদী যেমন উঁচু স্থান ত্যাগ করে সমতলে নেমে আসছে জীবের কল্যাণের জন্য তেমনি তাঁর পক্ষেও কেবল নিজের আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য জনসমাজের স্বার্থ ত্যাগ করে উর্ধ্বে হিমালয়ের নির্জন স্থানে বাস করা অন্যায় হবে। তিনি যে সত্য লাভ করেছিলেন, তা প্রচার করার নির্দেশ যেন পেলেন ঈশ্বরের কাছ থেকে। ফিরে এলেন তিনি নিচে অর্থাৎ সংসারের মধ্যে। তখন তাঁর বয়স ৪১ বৎসর।

এই সময় মহর্ষি পারিবারিক ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে নির্জন স্থানে গিয়ে পরমাত্মার স্মরণমননে বিশেষ শান্তিলাভ করতেন। এই সূত্রে বীরভূমের সুপ্রসিদ্ধ রায়পুর গ্রামের জমিদার ভুবনমোহন সিংহের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ভুবনবাবুর সাদর আহ্বানে মহর্ষিকে একাধিকবার রায়পুরে আসতে হয়েছিল। বোলপুর দিয়ে রায়পুরে যাতায়াতকালে বোলপুরের উত্তরদিক্‌বর্তী দিগন্তপ্রসারী প্রান্তরভূমি মহর্ষিকে আকৃষ্ট করে। অনন্ত আকাশের সঙ্গে এই ভূভাগের সর্বত্র মিলনদৃশ্য সাধকের মনে অচিন্তনীয় ভাবের সঞ্চার করল। এই সীমাহীন প্রান্তরের উন্মুক্ত আকাশতলই নির্জন তপস্যার উপযুক্ত স্থান বলে তিনি মনে করলেন। প্রান্তরের মধ্যে মাত্র দুটি ছাতিমগাছ ছিল; সেইখানেই মহর্ষি সাধনায় বসে স্থানের মাহাত্ম্য সম্যক্ উপলব্ধি করলেন। সাধনার জন্য এই জায়গাটি তিনি কিনে নিলেন ভুবনবাবুর ছেলেদের কাছ থেকে। স্থায়ী বাসগৃহ নির্মাণের পরিকল্পনায় প্রথমে একতলা, পরে দোতলা পাকাবাড়ী তৈরী হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গে নানা ফলবান্ ও ছায়াশীতল তরু রোপিত হয়। ধীরে ধীরে স্থানটি আম, কাঁঠাল, নারকেল, দেবদারু, বকুল, ইত্যাদি গাছে ভরে উঠল, আর নানা ফুলের সম্ভার তাকে করল সুন্দরতর। মরুভূমির মত কাঁকরের ঊষরভূমি হয়ে উঠল রসময় ও আনন্দময়। স্থানটিকে 'শান্তিনিকেতন' নাম দিয়ে মহর্ষি পরম পরিতৃপ্ত হলেন।

পূর্বোক্ত ছাতিমগাছের নিচে মহর্ষি একটি বেদী তৈরী করলেন উপাসনার জন্য। শ্বেত প্রস্তরের ঐ বেদী উদ্যানবাটিকার মধ্যে সাধনস্থানে পরিণত হ'ল। এই কাজে যখন মাটি খোঁড়া হয়, তখন নরমুণ্ডাস্থি পাওয়া গিয়েছিল। কেউ কেউ বলে, এখানে ছিল ডাকাতের আড্ডা; আবার কারও কারও মত, এটা ছিল তান্ত্রিক সাধনার পীঠস্থান। মহর্ষির শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে একবার ডাকাতিও হয়; তবে ডাকাতদলের সর্দার শেষে মহর্ষির ব্যক্তিত্বের কাছে হার মেনে ডাকাতি ছেড়ে দেয়, আর তাঁরই সেবায় আত্মনিয়োগ করে।

বোলপুর কলকাতা থেকে মাত্র ১০০ মাইল দূরবর্তী। যাতায়াতের পক্ষে অনুকূল হওয়ায় মহর্ষি প্রায়ই শান্তিনিকেতনে এসে থাকতেন; তাঁর সঙ্গে ছেলেদের মধ্যেও কেউ কেউ আসতেন; কিন্তু মহর্ষির নিঃসঙ্গতা কেটে যেত রায়পুরবাসী শ্রীকণ্ঠ সিংহের সঙ্গলাভে। ইনি ছিলেন একজন সুগায়ক ও সংগীতশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ; সুতরাং তাঁর শ্রীকণ্ঠ নাম সার্থক। এঁর অবস্থানে শান্ত ও নির্জন শান্তিনিকেতন সর্বদাই ঝংকৃত হয়ে উঠত; কিন্তু প্রকৃতির এই স্বভাবসুন্দর স্থানটিও মহর্ষির প্রব্রজ্যানুরাগকে বাধা দিতে পারে নি। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, সমুদ্র, ইত্যাদির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-উপভোগে পরমাত্মায় সমাহিত হওয়ার ইচ্ছায় তিনি বেরিয়ে পড়লেন শান্তিনিকেতন থেকে। এই সময় তিনি কখনও অমৃতসরে, কখনও সিমলা বা মুসৌরি পাহাড়ে গিয়ে থাকতেন; আবার কখনও বৈষয়িক ব্যাপার ও ব্রাহ্মসমাজের কাজে শিলাইদহ, সাজাদপুর, কালীগ্রাম ও কলকাতায় আসতেন। ১২৯০ সালে জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যু সংবাদে মহর্ষি মুসৌরি-যাত্রা ত্যাগ করে শোকাচ্ছন্ন পরিবারকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কলকাতার পথে শান্তিনিকেতনে

নেমেছিলেন। এই আসাই তাঁর শেষ, আর কখনও মহর্ষি শান্তিনিকেতনে আসেন নি।

মহর্ষির অনুপস্থিতিতে শান্তিনিকেতন দিন দিন শ্রীভ্রষ্ট হতে থাকে, গাছপালা শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করল। নির্দেশের অভাবে মালীরা আশ্রমের সৌন্দর্য-রক্ষায় উদাসীন হয়ে পড়ল। এই সময় ১২৯০ সালের জ্যৈষ্ঠের দিকে মহর্ষির জনৈক অনুরাগী অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় চিকিৎসাব্যবসায় উপলক্ষে বোলপুরে আসেন। মহর্ষির সান্নিধ্যলাভ ও শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গপ্রাপ্তিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য কিন্তু মহর্ষি আশ্রমে না আসায় অঘোরবাবুর সে আশা সফল হ'ল না, তবে মহর্ষির একাধিক বার সদলবলে তিনি আশ্রমে এসে প্রাণে অপূর্ব শান্তিলাভ করতেন।

এই সময় অঘোরবাবু কয়েক জনের সাহায্যে বোলপুরে 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে মাঝে মাঝে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, সাধারণ সমাজের নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, প্রভৃতি অনেকে এসে ধর্মোপদেশ দিতেন। এই সভার প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতন আশ্রমে। এই অনুষ্ঠান উদ্যাপনে বোলপুর প্রার্থনা-সমাজ মহর্ষির কাছ থেকে কোন অনুমতি নেন নি এই ভেবে যে, তাঁরই অনুমোদিত ধর্মসভা শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত হলে তাঁর আনন্দেরই কারণ হবে। এইভাবে অঘোরবাবু ও কয়েকজন উৎসাহী ভক্তের প্রচেষ্টায় শান্তিনিকেতনে মাঝে মাঝে উপাসনা ও উৎসব হতে থাকে, কিন্তু তখন পর্যন্ত অঘোরবাবুর সঙ্গে মহর্ষির সাক্ষাৎ আলাপ বা পত্রবিনিময় হয়নি।

বোলপুরের নিকটবর্তী মোহনপুর গ্রামের অধিবাসী রামনাথ সামন্তের সঙ্গে মহর্ষির বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ১২৯৩ সালে মহর্ষির অসুস্থতার সময় রামনাথ বাবু কলকাতায় ছিলেন। সেইসময় তিনি অঘোরবাবুর কথা, বোলপুর প্রার্থনা-সমাজ, আশ্রমে উক্ত সমাজের বার্ষিক উৎসবানুষ্ঠান, আশ্রমের দুর্দশা ইত্যাদি বিষয়ে নানা কথা বলেন। ফলে, মহর্ষি অঘোরবাবুকে কলকাতায় ডেকে পাঠান। ১২৯৪ সালের শ্রাবণের শেষে মহর্ষির সঙ্গে অঘোরবাবুর সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের ফলে মহর্ষি বুঝতে পারলেন, শান্তিনিকেতনে তাঁর যাওয়া আসার অভাবে আশ্রমের দুর্দশা উপস্থিত। এই সময় থেকে তাঁর চিন্তা হল, কি ভাবে আশ্রমকে বাঁচান যায়। শেষে তিনজন ট্রাষ্টীর হাতে ১,৮০০৲ টাকার সম্পত্তি দিয়ে আশ্রম রক্ষার সুব্যবস্থা করলেন। শান্তিনিকেতন হ'ল নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার মঠ, আর আশ্রমের প্রত্যক্ষ দেখা-শুনার ভার পড়ল অঘোরবাবুর উপর। অঘোরবাবু সানন্দে এই ভার গ্রহণ করলেন।

মহর্ষির ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প ছিল, এর ইঙ্গিত পাওয়া যায় ডীডের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন,, 'এই ট্রাষ্টের উদ্দিষ্ট আশ্রমধর্মের উন্নতির জন্য ট্রাষ্টীগণ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় ও পুস্তকালয় সংস্থাপন, অতিথি-সৎকার ও তজ্জন্য আবশ্যক হইলে উপযুক্ত গৃহনির্মাণ ও স্থাবর, অস্থাবর বস্তু ক্রয় করিতে পারিবেন

মহর্ষিদেবের পরামর্শে ও অঘোরবাবুর সুপরিচালনায় কিছুদিনের মধ্যে আশ্রম পূর্বশ্রী ফিরে পেল। ১২৯৫ সালের ৮ঠা কার্তিক আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে এক সভার অনুষ্ঠান করা হয়। এই সভায় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ উপাসনার আচার্যের কাজ করেছিলেন। সাপ্তাহিক উপাসনার পরিকল্পনায় ১২৯৫ সালের ৯ই কার্তিক, বুধবার আশ্রমে প্রথম সাপ্তাহিক উপাসনা সম্পন্ন হয়, এই অনুষ্ঠানে অঘোরবাবু আচার্যের কাজ করেন। আদি ব্রহ্মসমাজের বিধান অনুসারে উপাসনার যাবতীয় কাজ সুসম্পন্ন হয়।

কোন সময় রবীন্দ্রনাথ নিজের সন্তানদের লেখা-পড়ার বিষয়ে চিন্তাকুল হয়ে পড়েন। বিদ্যালয়ে 'শিক্ষার নামে যে বিভীষিকা তিনি অনুভব করেছিলেন নিজের অভিজ্ঞতায়, তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার ছেলে-মেয়েদের ব্যাপারে, এই দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি তিনজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিলাইদহে বিদ্যালয় খুললেন। সেই সময় থেকেই নানা আলোচনা চলতে লাগল শিক্ষা সম্বন্ধে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মনুষ্যত্বের সর্বপ্রকার বিকাশের প্রাণকেন্দ্র না হলে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ। এ বিষয়ে নানা চিন্তা ও আলোচনার ফলে তিনি বুঝতে পারলেন, প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্যাশ্রমই উপযুক্ত শিক্ষা-দানের ক্ষেত্র। তাঁর আরও মনে হল এ বিষয়ে শান্তিনিকেতনই উপযুক্ত স্থান। এই সংকল্পের কথা মহর্ষিকে জানালে তিনি সানন্দে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিলেন। ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' প্রতিষ্ঠিত হ'ল, পরে এর নাম রাখা হয় 'ব্রহ্মবিদ্যালয়'। নামকরণেই বোঝা যায়, এখানকার শিক্ষা ছিল সাধনার সঙ্গে যুক্ত এবং সব সাধনার উপরে ছিল 'ব্রহ্মের সাধনা, ভূমার সাধনা'। 'পারিপার্শ্বিকের জটিলতা, আবিলতা, অসম্পূর্ণতা থেকে' এই বিদ্যালয়কে পবিত্রাণ করার আকাঙ্ক্ষা ছিল কবিগুরুর মনে। তিনি মনে করতেন, স্কুল একটি যন্ত্র মাত্র, তার মধ্যে প্রাণের

সাড়া নেই। 'মানব শিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা' এতে হতেই পারে না। তাই এই শিক্ষার জন্য আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্র জীবনের সজীব ভূমিকা। গুরুকে কেন্দ্র করেই তপোবনের সত্তা, আর সেই গুরু হচ্ছেন নিতান্ত সক্রিয় ও 'মনুষ্যত্বের লক্ষ্যসাধনে তিনি প্রবৃত্ত'। শিষ্যদের চিত্ত গতিশীল করাই গুরুর সাধনার অন্যতম মুখ্য কর্তব্য। অনুক্ষণ গুরুর সান্নিধ্যলাভেই শিষ্যদের চিত্তে আসে নানা প্রেরণা। 'নিত্য জাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটাই আশ্রমের শিক্ষার সব চেয়ে মূল্যবান্ উপাদান। গুরুর মন প্রতিমুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ দেওয়ার আনন্দেই নিজের সত্যতা সপ্রমাণ করে। যেমন যথার্থ ঐশ্বর্যের পরিচয় ত্যাগের স্বাভাবিকতায়।'

বিদ্যানুশীলন পণ্য উৎপাদনের সমতুল নয়। আধুনিক যন্ত্রযোগে ভূরি ভূরি পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু 'শিক্ষা ব্যাপারটা ভূরি উৎপাদনের যান্ত্রিক চেষ্টায় নীরস নৈর্ব্যক্তিক প্রণালীতে মানুষের মনকে পীড়িত করবেই'। আশ্রমের শিক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সুতরাং এখানকার শিক্ষা 'সেই শিক্ষার কারখানাঘর হবে না'। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে অন্তরের যোগস্থাপনে যে জ্ঞান ও আনন্দের সৃষ্টি, তাতে 'উভয় পক্ষেরই আনন্দ'। 'মনের সঙ্গে মিলতে থাকলে' মন আপনিই খুশিতে ভরে ওঠে। 'সেই খুশি সৃজনশক্তিশীল। আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির দান।' যাঁরা কেবল কর্তব্য করতে চান, তাঁদের মধ্যে এই খুশি থাকতে পারে না। সুতরাং তাঁদের পথ অন্য। উপযুক্ত পাত্রে ধন দান না করলে যেমন সে ধনের সার্থকতা আসে না, তেমনি জ্ঞান বিতরণের উপযুক্ত পাত্র অভাবে জ্ঞানীও অসার্থক। প্রাচীনকালে এই রীতিই ছিল যে, জ্ঞানী নিজেই জ্ঞানবিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, নতুবা তাঁর পাওয়াটা অসম্পূর্ণ থেকে যেত। 'গুরুশিষ্যের মধ্যে এই পরস্পরসাপেক্ষ সহজ সম্বন্ধকেই' রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাদানের 'প্রধান মাধ্যস্থ' বলে জেনেছিলেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ গুরুর অন্যতম প্রধান গুণ সম্বন্ধে বলেছেন যে, 'গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, তা হলে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্যে নয়, উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিগত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। যিনি জাতশিক্ষক, ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটা আপনি ছুটে আসে।' গুরুর হৃদয় অফুরন্ত 'কাঁচা হাসি'র সম্ভারে পূর্ণ হয়ে থাকবে আর ছেলেরাও তাদের স্বশ্রেণী বলে তাঁর কাছে আসবে ছুটে। আজকাল আমাদের গুরুরা অযথার্থ প্রবীণতা নিয়ে ছেলেদের সামনে আসেন, আর ছেলেরা তাঁকে 'প্রাগৈতিহাসিক মহাকায় প্রাণী' ভেবে বিহ্বল ও আড়ষ্ট হয়ে পড়ে।

প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেদের সংস্থাপনা রবীন্দ্রনাথের কাছে অতি গুরুতর বিষয় ছিল। 'ছেলেরা বিশ্বপ্রকৃতির অত্যন্ত কাছের সামগ্রী। আরামকেদারায় তারা আরাম চায় না, গাছের ডালে তারা চায় ছুটি।' প্রকৃতির মধ্যে যে 'আদিম প্রাণের বেগ' তাতেই শিশুরা গতিশীল হয়ে ওঠে; প্রকৃতির সেই প্রাণের বেগ শিশুদের প্রাণেও 'গতিসঞ্চার' করে দেয়। 'অভ্যাসের দ্বারা অভিভূত হবার আগেই' ছেলেরা ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে 'কৃত্রিমতার জাল থেকে।' বড়দের শাসনে তাদের এই গতিকে রুদ্ধ করা যায় না। অরণ্যবাসী ঋষিকুলের মনেও এই 'চিরকালের ছেলে' সঞ্জীবিত হয়েছিল: তার ফলেই আমরা শুনি 'যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্'—'যা কিছু সমস্তই প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পিত হচ্ছে।' এই হচ্ছে সর্বকালীয় শিশুরকথা।

প্রাচীন ঋষির আশ্রমের দিকে তাকালে জানা যায়, ছেলেরা কেবল 'প্রাণায়ামের ফাঁকে ফাঁকে সামমন্ত্রই আবৃত্তি করত না; গোষ্ঠে গোচারণ, যজ্ঞকাষ্ঠ আহরণ, অতিথি-সেবা, গাভী-দোহন, ইত্যাদি ছিল আশ্রম ছেলে-মেয়েদের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। সকলের সম্মিলিত কর্ম-সমবায়ে আশ্রম হয়ে উঠত প্রাণবান্। রবীন্দ্রনাথও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদের এই ভাবেই গড়তে চেয়েছিলেন এবং আজও তার গতিধারায় পলি পড়ে নি। আশ্রমের জীবনযাত্রা যাতে একান্ত সহজ ও সরল হয়, তার দিকে রবীন্দ্রনাথের ছিল সূক্ষ্ম দৃষ্টি। অযথা জীবনকে উপকরণ প্রাচুর্যে ভারী করে তোলার পক্ষপাতী তিনি কোনদিনই ছিলেন না। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে সৃষ্টির আনন্দকে সুন্দর করে তোলার সদিচ্ছা এবং তার সঙ্গে 'সাধারণের সুখ, স্বাস্থ্য, সুবিধা-বিধানের কর্তব্যে' ছেলেমেয়েরা যাতে আনন্দ লাভ করে, এই ইচ্ছাই রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন।

আশ্রমের নানা কাজে ও ব্যবস্থায় ছাত্রদের কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিভিন্ন বিষয়ে তারাই যাতে সমস্ত পরিচালনা করতে পারে, এই আত্ম-কর্তৃত্ববোধ ছেলেমেয়েদের মনে তিনি জাগিয়ে দিয়ে-ছিলেন। 'ত্রুটি সংশোধনের দায় নিজে গ্রহণ করার উদ্যম যাদের আছে, খুঁত খুঁত করার কাপুরুষতায়'

তাদের আসে ধিক্কার। আশ্রমের নানা সমস্যা-সমাধানের ভার ছেলেমেয়েরাই পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন 'পরিপূর্ণ ভাবে বেঁচে থাকবার শিক্ষা'। কেবল বই পড়ে, পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষার প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতা অর্জন করায় আসল শিক্ষা হয় না। এতে জগৎ অধিকার করা যায় না, কতকগুলি উপাধি অধিকার করা যায় মাত্র। আশ্রমের ছাত্ররা হবে অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ, তাদের কাজ চলবে সবদাই অনুসন্ধানে, নূতন নূতন পরীক্ষায় ও নানা সংগ্রহে। এই সমস্ত জিজ্ঞাসু ছাত্রদের জন্য রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সেই সমস্ত শিক্ষক 'যাঁদের দৃষ্টি বইয়ের সীমানা পেরিয়ে গেছে, যাঁরা চক্ষুষ্মান, যাঁরা সন্ধানী, যাঁরা বিশ্বকুতূহলী, যাদের আনন্দ প্রত্যক্ষ জ্ঞানে এবং সেই জ্ঞানের বিষয়বিস্তারে যাদের প্রেরণাশক্তি সহযোগীমণ্ডল সৃষ্টি করে তুলতে পারে।' কেবল এই সমস্ত গুণ থাকলেই তিনি আদর্শ শিক্ষক হতে পারবেন না, যদি না তাঁর মধ্যে থাকে অপার ধৈর্য ও স্বাভাবিক স্নেহ। ছাত্রদের উপর দণ্ড বা নির্যাতনকে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন শিক্ষক তারই অযোগ্যতা।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেন জনকয়েক ছাত্র নিয়ে। তাঁর সহকর্মী ছিলেন দুইজন—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও তার খ্রীষ্টান ছাত্র রেবা চাঁদ। এঁরা ছিলেন সন্ন্যাসী, সুতরাং অর্থের ভাবনা কবিকে ভাবতে হয় নি। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয় ... ছিল কবির লেখার মধ্য দিয়ে। সদ্য-প্রকাশিত নৈবেদ্যের কবিতাগুলি উপাধ্যায়ের বড় প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত "Twentieth Century" পত্রিকায় তিনি রবীন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন। কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে আশ্রম-বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা জানতে পেরে উপাধ্যায় কয়েকজন ছাত্র ও শিষ্য নিয়ে আশ্রমের কাজে লেগে গেলেন নিজের থেকেই। এরপর বাংলার ... জগদানন্দ রায়, অজিত চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেন, প্রভৃতি আশ্রমসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এঁরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন আশ্রমের সৃষ্টিকার্যে।

'এই আশ্রম-বিদ্যালয়ের সুদূর আরম্ভকালের প্রথম সংরচন, তার দুঃখ, তার আনন্দ, তার অভাব, তার পূর্ণতার' সামান্যই আভাস রইল এই প্রবন্ধে। ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ আশ্রম-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের যে উপদেশ দেন, তাই উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধের উপসংহার করছি।

'অনেককাল পূর্বে আমাদের এই দেশ, এই ভারতবর্ষ, সকল বিষয়ে বড় ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কি হলে আপনাদের বড় মনে করতেন? আজকাল আমাদের মনে তাঁদের সেই বড় ভাবটি নেই বলেই ধনকেই আমরা বড় হবার উপায় মনে করি, ধনীকেই আমরা বলি বড় মানুষ! তাঁরা তা বলতেন না। তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে যাঁরা বড় ছিলেন, সেই ব্রাহ্মণরা ধনকে তুচ্ছ করতেন। তাঁদের বেশভূষা, বিলাসিতা কিছুই ছিল না। অথচ বড় বড় রাজারা এসে তাঁদের কাছে মাথা নত করতেন।... সত্যকে সব চেয়ে বড় জানতেন—মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নীচু করেন নি। সত্য কি তাই জানবার জন্যে সমস্ত জীবন তাঁরা কঠিন তপস্যা করতেন—কেবল আমোদ-প্রমোদ করেই জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁরা সকলের মঙ্গলের জন্যে, ভালর জন্যে চিন্তা করতেন। কার কি করা উচিত সেইটা সকলে তাঁদের কাছে জানতে আসত। কিসে ঘরের লোকের মঙ্গল হয়, তাই জানবার জন্যে গৃহস্থ লোকেরা তাঁদের কাছে আসত, কিসে প্রজাদের ভাল হয় তাই পরামর্শ নেবার জন্যে রাজারা তাঁদের কাছে আসত। পৃথিবীর সকলের ভালর জন্যে তাঁরা সমস্ত আমোদ-প্রমোদ, সমস্ত বিলাসিতা ত্যাগ করে চিন্তা করতেন। কিন্তু তখন কি কেবল ব্রাহ্মণ-ঋষিরাই ছিলেন? তা নয়। রাজারাও ছিলেন, রাজার সৈন্যসামন্তও ছিল। রাজ্যের প্রয়োজনে তাঁদের যুদ্ধবিগ্রহ করতে হ'ত। কিন্তু যুদ্ধের সময় তাঁরা ধর্ম ভুলতেন না। শরণাপন্নকে বধ করতেন না।... সৈন্যে সৈন্যেই যুদ্ধ চলত, কিন্তু শত্রুপক্ষের লোক দেশের নিরীহ প্রজাদের ঘরদুয়োর জ্বালিয়ে দিতেন না। ...ছেলেরা যখন বড় হ'ত তখন রাজা আপনার সম্পত্তি, টাকাকড়ি, রাজত্ব ছেলের হাতে দিয়ে সত্য জানবার জন্যে, ঈশ্বরের প্রতি মন দেবার জন্যে বনে চলে যেতেন। রাজ্যেশ্বর রাজা ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দীনহীনের মত সমস্ত ছেড়ে চলে যেতেন। গৃহস্থদেরও ঐ রকম নিয়ম ছিল। যখন জ্যেষ্ঠ পুত্র বড় হয়ে উঠত তখন তারই হাতে সমস্ত সংসার দিয়ে তাঁরা দরিদ্রবেশে তপস্যা করতে চলে যেতেন। তখন যাঁরা বাণিজ্য করতেন, তাঁদেরও ধর্মপথে, সত্যপথে চলতে হ'ত। কাউকে ঠকানো, অন্যায় সুদ নেওয়া, কৃপণের মত সমস্ত ধন কেবল নিজের জন্যই জড়ো করে রাখা, এ তাঁদের দ্বারা হ'ত না। সেই তখনকার ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরা যে শিক্ষা, যে ব্রত অবলম্বন করে বড় হয়ে উঠেছিলেন, বীর হয়ে উঠেছিলেন, সেই শিক্ষা, সেই ব্রত গ্রহণ করবার জন্যেই তোমাদের এই নির্জন আশ্রমের মধ্যে আমি আহ্বান করেছি। তোমরা আমার কাছে এসেছ—আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্য-

বাক্য, তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব—আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল, সেই ক্ষমতা দান করুন। তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না, মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে, কথা থেকে, কাজ থেকে দূর করে দেবে, সর্বদা জগতের সকল স্থানেই মনে ও বাইরে এক ঈশ্বর আছেন এইটা নিশ্চয় জেনে আনন্দমনে সকল দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে। কর্তব্য কর্ম প্রাণপণে করবে, সংসারের উন্নতি ধর্মপথে থেকে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ্ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে; তোমরা সকলের ভাল করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভাল হবে।'

—০—

একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত থাকাই সকল হিন্দুর সহজ, সাধারণ অবস্থা। এজন্য হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্রে সকল হিন্দুকেই একান্নবর্ত্তী পরিবারভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়—যতক্ষণ তিনি অবিসম্বাদিতভাবে প্রমাণ না করিতে পারেন যে, তিনি বা তাঁহারা পৃথগন্ন হইয়াছেন। স্বর্গেও হিন্দুরা আলাদা থাকা কল্পনা করিতে পারেন না. এজন্য সপিণ্ডকরণের সময় মৃতের, তাঁহার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের সহিত পিণ্ড একত্রীকরণ করা হয়। ইঁহাদের কাহাকেও জলদান করিলে অপরে তাহার অংশভাগী হয়েন।

ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, মুসলমানদের মধ্যেও এইরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা প্রবলভাবে ছিল এবং এখনও আছে। কলিকাতা হাইকোর্টে ইং ১৮৭০-১৮৮০ সনের বহু মোকদ্দমায় লোকাচার বা প্রথা হিসাবে ইহা মুসলমানদের মধ্যে আছে ও শরিকদের উপর বাধ্যকর এইরূপ তর্ক বা সওয়াল দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ হইবার দুইটি প্রধান কারণ:—(১) বেশীর ভাগ মুসলমানই (পাঞ্জাবে শতকরা ৮৫ ভাগ, বাংলায় শতকরা ৯৯ ভাগ) ধর্ম্মান্তরিত হিন্দুর বংশধর। বিদেশী রক্ত খুবই কম আছে। এজন্য তাঁহারা পূর্ব্বের আচার-ব্যবহার মানিয়া আসিতেছেন। আর (২) বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান, মুসলমানদের মধ্যে ইং ১৯২১ সনের হিসাব অনুযায়ী শতকরা ৮৬ জন কৃষিজীবী।

ইং ১৯২১ সনের বাংলার সেন্সাস রিপোর্টের ২য় খণ্ড ৩৬২ পৃঃ

মোট মুসলমান:—২৫,৪৮৬,১২৪

"Ordinary Cultivators"

সাধারণ কৃষিজীবি:—১৯ ৭২১ ৮৫১

"Farm Labourers"

কৃসি-মজুর:— ২,২১০,০৫০

২১,৯৩১,৯০১

(শতকরা ৮৬·০৫)

কৃষিপ্রধান সমাজে অর্থনৈতিক কারণে, চাষের সুবিধার জন্য, আবশ্যকীয় লোকবল বেশী হইবে বলিয়া একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথার উপযোগিতা খুব বেশী।

নানা কারণে একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা বা পৃথগন্ন হয়। জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে বিশেষ করিয়া ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথগন্ন বা আলাদা হওয়াটা খুবই নিন্দার ছিল; এখনও লোকে খুব ভাল চক্ষে দেখে না। কিন্তু এই পৃথগন্ন হওয়াটা যুগ-যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে। আগেও লোকে পৃথগন্ন হইত, এখনও হয়। গৌতম তাঁহার সংহিতায় ব্যবস্থা দিয়াছেন যে:—

"ঊর্দ্ধ পিতুঃ পুত্রারিকৃথং ভজেয়ন। নিবৃত্তে রজসি মাতৃ জীবতি চেচ্ছতি সর্ব্বং বা পূর্ব্বজস্তেবয়ান্ বিভৃয়াৎ। পূর্ব্বদ্বিভাগে তু ধর্ম্ম বৃদ্ধি।" (২৯শ অধ্যায় ১।২।৩)

অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর পুত্রেরা ধন-সম্পত্তি ভাগ করিয়া লইবেন।...এইরূপ বিভাগে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়।

গৌতমের মতে পিতার মৃত্যুর পর এক সংসারে থাকা অপেক্ষা ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা হওয়া ভাল। মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কানের মতে গৌতম হইতেছেন খ্রীঃ পূঃ ৬০০-৪০০-র লোক। (তৎপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড. ১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।)

তাঁহার এই বিধান থাকা সত্ত্বেও পূর্ব্বকালে ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা হওয়াটা ছিল ব্যতিক্রম। সাধারণতঃ ভাইয়ে ভাইয়ে তাঁহাদের স্ব স্ব স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া একান্নবর্ত্তী থাকিতেন। কিন্তু এখন পৃথগন্ন হওয়াটাই প্রায় নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকে যে সহজেই পৃথগন্ন হইতেছে ইহাই অনেক সুধীগণের ধারণা। পূর্ব্বেও (শত বৎসর পূর্ব্বে) লোকে পৃথগন্ন হইত; এখনও হয়। পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন পৃথগন্ন হওয়ার হারটা খুব বেশী বলিয়া সকলেরই ধারণা। কত বেশী বা কত দ্রুত একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইতেছে তাহার কোনও মাপ বা মাপকাঠি নাই। এই মাপকাঠি বাহির করিবার চেষ্টায় নিম্নে পরিবেশিত তথ্যগুলি আমাদের নজরে আসে। আমরা শুধু তথ্যগুলি সাজাইয়া দিলাম; আমাদের বক্তব্যেরও কিছু কিছু ইঙ্গিত দিলাম। এই অল্প তথ্যের ভিত্তিতে আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসি নাই, আসাটা সমীচীন হইবে না বলিয়া মনে করি। সুধী পাঠকগণ যদি আরও আবশ্যকীয় (relevant) তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন ত ভাল হয়।

বুকানন হ্যামিল্টন সাহেব ইং ১৮০৯-১০ সনে পূর্ণিয়া জেলা সম্বন্ধে একটি বিশদ বিবরণী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকারের কাছে পেশ করেন। তাঁহার সময়ের পূর্ণিয়া বা পুরনিয়ার আয়তন ৬,৩৪০ বর্গমাইল। তাঁহার পুরনিয়া জেলার মধ্যে বর্ত্তমান মালদহ জেলার অনেকাংশ ছিল। ইং ১৯৩১ সনে এই সব জেলার আয়তন নিম্নের মতন হইতেছে। যথা:

	আয়তন	লোকসংখ্যা
পূর্ণিয়া	৪৯৭২ বর্গমাইল	২১,৮৬,৫৪৩ জন
মালদহ	১,৭৬৪ ,,	১০,৫৩,৭৬৬ ,,
মোট:	৬,৭৩৬ ,,	৩২,৪০,৩০৯ ,,

এই অঞ্চলের বেশীর ভাগ লোকই বাংলা ভাষাভাষী বা ভাঙ্গা বাংলা ভাষাভাষী। এবং এখানকার হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই দায়ভাগ শাসিত। কেবলমাত্র কোশীর (পূর্ব্বেকার কোশীর) পশ্চিমের লোকেরা মিতাক্ষরা শাসিত।

তিনি তাঁহার রিপোর্টের ৫৯৭-৫৯৮ পৃষ্ঠায় যে হিসাব দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ৩,৩২,০৯২টি বাড়ীতে ১৪,২৯,১১১ জন লোক আছে। বাড়ী প্রতি গড়ে ৪·৩০ জন। আবার ৬০০ হইতে ৬০৩ পৃষ্ঠায় যে হিসাব দিয়াছেন, তাহার হিসাব কষিলে দেখা যায় যে, ৪,৮৫,৫৫৯টি বাড়ীতে ২৯,১৪,৭৭০ জন। গড়ে বাড়ী প্রতি ৬·০৭ জন করিয়া লোক। আমরা এই দুইটি হিসাবের, বিশেষ করিয়া বাড়ীপ্রতি গড় লোকের, পার্থক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারি নাই। তাঁহার শেষোক্ত হিসাবটি নিম্নে দিলাম। ৩য় কলমের জনসংখ্যা আমরা কষিয়া দিয়াছি।

প্রতি পরিবারে প্রায়—জন	সমগ্র জেলায় পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা
২০০ জন	৩	৬০০
১০০ ,,	৬	৬০০
৫০-৬০ ,,	২৩	১,২৬৫
৪০ ,,	৬	২৪০
৩০ ,,	৬	১৮০
২৫ ,,	১৩১	৩,২৭৫
২০ ,,	৬৯৬	১৩,৯২০
১৫ ,,	৮,০৫৩	১,২০,৭৯৫
১২ ,,	৮,৪৯১	১,০১,৮৯২
১০ ,,	৩১,৪৮৯	৩,১৪,৮৯০
৮ ,,	৪১,৬৫০	৩,৩৩,২০০
৭ ,,	৫৩,৮৭৬	৩,৭৫,৭৩২
৬ ,,	৬৯,৮৭০	৪,১৯,২২০
৫ ,,	১,৬০,১৯৭	৮,০০,৯৮৫
৪ ,,	১,০৭,৭৭৫	৪,৩১,১০০
৩ ,,	৭,০৮৭	২১,২৬১
অভাবগ্রস্ত ভিখারী	৭,১৪০	৭,১৪০
সর্ব্ব মোট:	৪,৮৫,৫৫৯	২৯,১৪,৭৭০

বুকানন হ্যামিল্টন সাহেব তাঁহার রিপোর্টের ১৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মুসলমানদের অনুপাত হইতেছে শতকরা ৪৩ জন ও তাহাদের সংখ্যা হইতেছে ১২,৪৩,০০০ জন। এই হিসাব হইতে সমগ্র পুরনিয়ার লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৮,৯০,৭০০ জন। আমাদের কষা হিসাবের খুব কাছাকাছি শতকরা ১-এ হইতেছে ২৮,৯০৭ জন।

আর আমাদের কথা হিসাব ও বুকানন হ্যামিল্টনের মুসলমানদের অনুপাত হইতে প্রাপ্ত হিসাবের পার্থক্য হইতেছে ২৪.০৭০ জন। শতকরা ১-এর কম।

উপরোক্ত তালিকা হইতে প্রতি বাড়ীতে গড়ে ৬·০৭ জন করিয়া লোক হয়। অভাবগ্রস্ত ভিখারী, ফকির ইত্যাদি বাদ দিলে গড়ে হয় ৬·০৮ জন করিয়া।

সংখ্যাগুরু মান বা Mode হইতেছে ৫ জন করিয়া পরিবারের লোকসংখ্যা। আর Medium বা মাধ্যম মান পরিবারের লোকসংখ্যা হইতেছে ৫ জন ৬ জনের মধ্যে।

নিজে ও নিজের ছেলেমেয়েকে ধরিয়া পরিবারের জনসংখ্যা যদি ৬·০৭ জন ধরি ত অন্যায় হইবে না। এইরূপ পরিবারকে single unit পরিবার বলিয়া সমাজতাত্ত্বিকগণ ধরেন। সমস্ত পরিবারের মধ্যে ৩, ৪, ৫ ও ৬ জন করিয়া পরিবারের জনসংখ্যা এইরূপ পরিবারের অর্থাৎ single unit family-র অনুপাত হইতেছে শতকরা ৭২ জন। শতকরা ২৮টি পরিবারকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে একান্নবর্ত্তী পরিবারের কোঠায় ফেলা যায়। যদি ৬·০৭ × ২ জন = ১২·১৪ জন করিয়া পরিবারপ্রতি লোক বা তাহার ঊর্দ্ধ পরিবারপ্রতি লোক আছে এইরূপ পরিবারকে multi-unit একান্নবর্ত্তী পরিবার ধরি, তাহা হইলে এইরূপ একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনুপাত হইতেছে শতকরা ১·৪২। অর্থাৎ দেড় শত বৎসর আগে সম্পূর্ণ একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনুপাত খুবই কম, শতকরা দেড়েরও কম। যদি মুসলমানদের মধ্যে কোনও পরিবারই একান্নবর্ত্তী পরিবার নহে এইরূপ ধরি (যদিও এইরূপ ধরিয়া লওয়াটা অন্যায় হইবে) তাহা হইলেও হিন্দুদের মধ্যে সম্পূর্ণ একান্নবর্ত্তী পরিবারের অনুপাত শতকরা ১·৪২ × ১০০/৪৩ = ৩·৩ এর বেশী হইবে না। আর ৬ জনের বেশী পরিবারপ্রতি লোক এইরূপ পরিবারের গড় লোকসংখ্যা হইতেছে ৯·৫ জন করিয়া। মোটামুটি বুঝা যায় যে, একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা চালু থাকিলেও তাহার অনুপাত খুব ব্যাপক বা বেশী নহে।
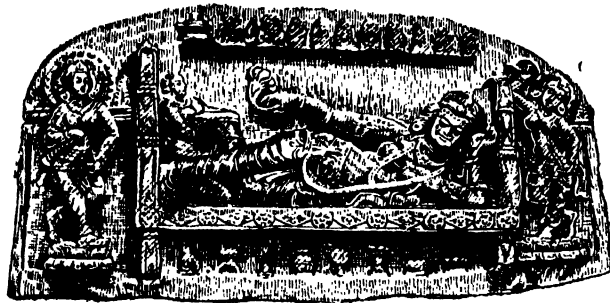
বলেন্দ্রনাথের রচনা সাহিত্য

অধ্যাপক শ্রীঅলোক রায়

ল্যামের লেখা পড়ে স্কুলের একজন মাস্টারমশাই তাঁকে প্রবন্ধ লেখা শেখাতে চেয়েছিলেন, কারণ ল্যাম তাঁর লেখাকে 'এসে' নামে অভিহিত করলেও, সেগুলি যথাবিহিত 'প্রবন্ধ', অর্থাৎ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যে 'এসে' লিখতে দেওয়া হয়, তার বিচারে অচল। আসলে ল্যাম 'প্রবন্ধ' লিখতেন না, তাঁর লেখাকে বলতে পারি 'ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ' বা 'রচনা'। প্রবন্ধের মধ্যে যে প্রকৃষ্ট বন্ধন প্রয়োজনীয়, 'রচনা'র ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতিই স্বাভাবিক। প্রবন্ধের মধ্যে আমরা চাই যুক্তিনির্ভর তথ্য এবং তত্ত্বের সমাবেশ, সেখানে যে মন্তব্যগুলি করা হবে তার একটা 'লজিক্যাল সিকোয়েন্স' থাকবে। অন্যদিকে 'রচনা'য় আপন মনের কথা বলে যাবার অবারিত সুযোগ, জনমনের ভাষায় বলতে পারি 'এ লুজ স্যালি অফ দি মাইণ্ড'। কিন্তু বলাই বাহুল্য 'রচনা' যেখানে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন হয়ে উঠেছে, যা শুধু লেখককে নয়, আরও দশজন পাঠককে আনন্দ দিচ্ছে—তার মধ্যে শুধুই এলোমেলো, আবোল-তাবোল প্রলাপ থাকতে পারে না। 'রচনা'র মধ্যে তাই থাকে ভাবগত অন্বয়—নৈয়ায়িকের তর্কবুদ্ধি নয়, রসিকের রসদৃষ্টিই সেখানে দেয় 'ইমোশন্যাল সিকোয়েন্স'।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৮৯৯) যা লিখেছেন তার মধ্যে প্রবন্ধের লক্ষণের থেকে 'রচনা'র লক্ষণই প্রাধান্য পেয়েছে। বলেন্দ্রনাথের মনের গঠনই ছিল 'রচনা'-শিল্পীর অনুকূল। টুকরো ছবি, একটা অভিজ্ঞতা, হারিয়ে ফিরে পাওয়া কোন স্মৃতি—এইই তাঁর মনে চিন্তার একটি বিশেষ ধারা সৃষ্টি করেছে, অথবা কোথাও তিনি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন নিজের অনুভূতিকে। সাধারণতঃ তাঁর লেখার বিষয় থেকে একটা জিনিষ লক্ষ্য করি, তা হ'ল তিনি তাঁর ভাল-লাগাকেই প্রকাশ করেছেন সর্বত্র। সংস্কৃত কোন কাব্যের চিত্র, অতীতের স্মৃতিভরা স্থাপত্য, প্রাচীন বাংলার কয়েকজন কবি, অথবা আনন্দ-বেদনার ঢেউ তোলা কয়েকটি অনুভূতি—যা কিছু তাঁর ভাল লেগেছে তাইই তিনি বলতে চেয়েছেন। নিজের ভাষায়, নিজের চোখে, নিজের মনে এই ভাল লাগা। এই জন্যই এই সব 'রচনা'গুলি ব্যক্তিমনের স্পর্শ পেয়েছে, এবং একে 'ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ' বলেছি। লেখক নিজে উপস্থিত, নিজের অনুভূতি নিয়ে। এই মন্ময়তাই 'রচনা' সাহিত্যের অন্যতম লক্ষণ।

গীতি-কবিতার সঙ্গে 'রচনা'র এক হিসেবে আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। গীতি-কবিতায় যেমন প্রাথমিক আবেগ এবং সেই সঙ্গে অল্পবিস্তর কল্পনার বিস্তার প্রয়োজন, 'রচনা'তেও তেমনি তার সাক্ষাৎ পাই। সেই আবেগ বা অনুভূতি থেকেই বিচিত্র ধারায় চিন্তাগুলি ছড়িয়ে পড়ে। গীতি-কবিতার মত 'রচনা'তেও। কিন্তু গীতি-কবিতার মত 'রচনা' সব সময়েই আবেগসর্বস্ব হয় না। বলেন্দ্রনাথ গীতি-কবি ছিলেন, তার সাক্ষ্য দিচ্ছে 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী' কাব্যগ্রন্থ দুটি। কিন্তু তাঁর লেখা কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় যদি নাও থাকত, তবু বুঝতে পারতাম যে তিনি কবি-মনের অধিকারী,—আসলে তাঁর 'রচনা'গুলির অধিকাংশই আবেগপ্রধান—যেমন 'গোধূলি ও সন্ধ্যা' বা 'জানালার ধারে' বা 'নীরবে' বা 'সূর্যাস্ত ও সন্ধ্যা' 'রচনা'গুলি গীতি-কবির মন দিয়েই লেখা। তাঁর 'অশ্রুজল', 'সন্ধ্যা', 'ঊষা ও সন্ধ্যা' গদ্যরচনাগুলি আসলে ঐ বিষয়েই লেখা কতকগুলি কবিতার পরিবর্ধিত রূপায়ণ। (তারিখ মিলিয়ে দেখলেই এই বিন্যাস রীতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।)

প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ হওয়া অসম্ভব নয়, বিশেষ করে প্রস্তাব বা নিবন্ধের আকার দীর্ঘ হওয়াই স্বাভাবিক। 'রচনা' আকারে সংক্ষিপ্ত। আগেকার দিনে ইংরেজ অনেক সমালোচক যাঁরা 'রচনা' সাহিত্যের পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁরা 'রচনা'র প্রতি ঈষৎ অবজ্ঞা দেখিয়ে বলতেন যে, এই সংক্ষিপ্ততা হ'ল বক্তব্য বিষয়ের অভাব। কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্তিপ্রসূত তা সহজেই বোঝা যায়। সার্থক রচনাকে একটি নিটোল মুক্তার সঙ্গেই তুলনা দেওয়া যায়। কারণ বক্তব্যবিষয় সেখানে একটা আশ্চর্য সংহতি লাভ করে—গীতি-কবিতায় যে আবেগ তিনটি পংক্তিতে ছড়িয়ে পড়তে চায়, সার্থক 'রচনা'-শিল্পী সেই আবেগকে একটি শব্দে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন।

'রচনা'র আকার দৃঢ়পিণদ্ধ। অন্যদিকে 'রচনা'কারের পক্ষে 'প্রবন্ধ'কারের ব্যাখ্যাপ্রবণতা সাজে না। রচনায় ইঙ্গিত বেশী। একটি চিত্রকল্প ব্যঞ্জিত করে অনেকগুলি ভাব। 'রচনা' পড়ে শেষ করার পর তাই মনে হয় 'শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

অবশ্য বলেন্দ্রনাথের সব 'রচনা'গুলি এ রকম সুগঠিত নয়। 'সখ্য' বা 'যশোদা' প্রভৃতিতে তিনি কিছু পুনরুক্তি করেছেন, আবেগকে বিলম্বিত লয়ে অনেকগুলি পাতায় সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু সেই বিস্তার বাগ্-বাহুল্যে পরিণত হয় নি কোথাও। এবং এই দৈর্ঘ্যে আমাদের বিরক্তির সঞ্চার করে না কখনও। কারণ আবেগ যদিও সংক্ষিপ্ত, কিন্তু বলেন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় দৈন্য নেই, তাই এসেছে অজস্র উজ্জ্বল উপমা এবং উদাহরণ; একটি চরিত্রকে স্পষ্ট করে আঁকবার জন্য আর একটি চরিত্রের সঙ্গে তুলনা—সেই সব তুলনা কখনও সাদৃশ্যবাচক, কখনও বৈসাদৃশ্যের সাহায্যেই একের বৈশিষ্ট্যকে ভাস্বর করে তোলা হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের মন আবদ্ধ হয়ে থাকে নি একটিমাত্র ভাবকল্পনার মধ্যে। প্রদীপের আলোকসজ্জায় এই 'রচনা'গুলি দীপ্ত, একটি মাত্র প্রদীপ নয়—অজস্র প্রদীপের মালা—প্রথম প্রদীপ থেকেই অগ্নিসঞ্চার করে অন্যগুলি একের পর এক জ্বলে উঠেছে। একই বিষয় নিয়ে অনেকগুলি 'রচনা' গড়ে ওঠারও আসল আন্তর-স্বরূপ এই।

'রচনা' সাহিত্য ব্যক্তিনিষ্ঠ হলে, 'প্রবন্ধ' হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠ। সেইজন্য প্রবন্ধের মধ্যে অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গীই প্রাধান্যলাভ করে। সেখানেও যে নিজের কথা কখনও এসে যায় না তা নয়, কিন্তু প্রবন্ধকার সদাসবদা সচেতন থাকেন যে, তাঁর দায়িত্ব হ'ল একটি বিশেষ তথ্য বা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করা। তাই প্রবন্ধের মধ্যে সর্বদাই তাঁকে তর্ক করতে হয়, বিরোধীপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করতে হয়, এবং তার পর একে একে স্বপক্ষে যুক্তির অবতারণা করতে হয়। ফলে উদ্দেশ্যের কথা ভুলতে পারেন না মুহূর্তের জন্য। অন্যদিকে রচনাকার ত চান নিজের ভাল-মন্দ লাগাকে প্রকাশ করতে। তাই তিনি নিজের 'ইমপ্রেশন'টি জানিয়ে দায়িত্বমুক্ত। প্রবন্ধ-লেখক সব সময়েই চান তাঁর প্রবন্ধের সাহায্যে পাঠককে স্বমতে আনবেন। রচনাকারের সে উদ্দেশ্য নেই। কোন রচনা পড়ে মতে মিলুক বা না মিলুক, খুশী হয়ে উঠতে কোন বাধা নেই। বলেন্দ্রনাথ যখন পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য-সাহিত্যে 'পশুপ্রীতি'র তুলনা করে বলেন 'সংস্কৃত কাব্যের সর্বত্রই জীবজগতের প্রতি এই উদার সহানুভূতি দেখা দেয়—এবং ইহাতে ভারতবর্ষেরই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়'—তখন এই অসতর্ক এবং আবেগযুক্ত উক্তির প্রতিবাদ করার কথা আমরা ভাবি না, কারণ আমরা জানি বলেন্দ্রনাথ এখানে তথ্য হিসেবে ঐ উক্তি করেন নি, তাঁর নিজের সুগভীর পশুপ্রীতিই এখানে তাঁকে ঐ সাধারণ মন্তব্যটি করতে বাধ্য করেছে।

বক্তৃতার মধ্যেও আবেগের প্রকাশ হয়, অসংবদ্ধ কথা কিংবা অসতর্ক মন্তব্য সেখানেও প্রায়ই এসে থাকে। কিন্তু বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে বক্তার মনে সম্মুখস্থ বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর কথা সর্বদা জাগরূক থাকে, আর সেখানেও থাকে একটি বিশেষ মতকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। বক্তৃতার ভাষার মধ্যেই একটি সোচ্চার উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গি ফুটে ওঠে। কিন্তু রচনা সে রকম বারোয়ারি জিনিস নয়। এখানে একান্ত নিভৃতে লেখক এবং পাঠকের হৃদয় সংবাদ। রবার্ট লিণ্ডের ভাষায় 'Most of us think of the ideal essay as a kind of private rather than of public talk. The talk of the critics is usually as public as if they are addressing us from a platform.' পাঠক যেন রচনা পড়তে পড়তে একথা কখনও মনে না করে যে এ শুধু তার জন্যে লেখা হয় নি—যে অগণিত ভিড়ের দিকে তাকিয়ে এগুলি লেখা হয়েছে, সে তার ভেতরে নগণ্য একজন মাত্র; পরন্তু সে যেন সব সময় এই কথাটিই অনুভব করে যে, লেখক যা কিছু বলছেন তা শুধু তার মুখ চেয়ে তার জন্যই বলছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু যেমন করে একটি নিভৃত মুহূর্তে অপর বন্ধুর কাছে নিজের অন্তরের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কথা-গুলি অকপটে ব্যক্ত করে দেয়, 'রচনা'কারও তেমন করে পাঠকের কাছে আপন হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেন। রচনার প্রধান উপাদানই এই হৃদয়ের সংবাদ। তথ্য, তত্ত্ব ও পাণ্ডিত্যের চাপে এই হৃদয়ের সংবাদটি ব্যাহত হবারই সম্ভাবনা—এই জন্যই এই সকল জিনিষ সর্বদা 'রচনা'র রসের পরিপূরক না হয়ে বরঞ্চ সময়ে সময়ে রসভঙ্গেরই কারণ হয়ে থাকে।

বলেন্দ্রনাথের 'দুজনায়' কিংবা 'বিরহ' কিংবা 'বোলতা ও মধ্যাহ্ন' এই জাতীয় অন্তরঙ্গ 'রচনা'। এখানে লেখকের অকপট আত্মপ্রকাশই বড় হয়েছে। কিন্তু এই আত্ম-প্রকাশের মধ্যে অহমিকার প্রচণ্ডতা নেই। আমরা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখতে পাই, যেখানেই কোন 'অহং', তার উগ্রমূর্তি নিয়ে আমাদের কাছে নিজেকে জাহির করতে আসে, আমরা হয় করি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নয়ত করি তাকে অবজ্ঞা এবং উপেক্ষা; কিন্তু সেই

'অহং'কেই আমরা আদর করে বরণ করে নিই আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে যখন সে আসে আমাদের কাছে আত্মীয় বেশে —সহৃদয় বন্ধুর বেশে। রচনার ভেতরে রয়েছে আত্মনিবেদন, আত্মম্ভরিতা নয়; অনুরাগে, সারল্যে অকপটতায় এবং অমায়িকতায় লেখক এখানে হয়ে ওঠেন স্নিগ্ধ প্রীতিভাজন। রচনার একটা প্রধান গুণ তাই গভীর সহানুভূতি। লেখক অতি দূরে একটি অভ্রভেদী মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে অবজ্ঞা এবং তাচ্ছিল্যভরে ডেকে কথা বলেন না —আমাদের সমস্তরে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ রেখে মনের কথা খুলে বলেন। রচনার ভেতর দিয়ে লেখক যত কোন যুগের সমাজ, সাহিত্য, নীতি-ধর্ম, প্রভৃতি সমালোচনা করতে পারেন, বিদ্রূপও করতে পারেন, কিন্তু সব জিনিসই তিক্ত হয়ে যাবে যদি এদের পেছনে না থাকে লেখকের সমবেদনাবিদ্ধ চিত্ত। এই প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের তিনটি বিতর্কমূলক রচনার কথা স্মরণ করতে পারি —'স্ত্রী ও পুরুষ', 'মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ' এবং 'অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ', —এগুলি প্রায় প্রবন্ধের ধার ঘেঁষে গেছে, এবং সার্থক 'রচনা' বলে অভিহিত করাও হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু তবু লেখকের সহৃদয় দৃষ্টিভঙ্গি এবং আপাতলঘু বাচনভঙ্গি এগুলিকে একটি বিশেষ আবহাওয়া দিয়েছে, যা 'রচনা'রই সমধর্মী।

বেকন 'রচনা'কে 'dispersed meditations' বলেছেন। এখানে বলা ভালো যে 'রচনা'র মধ্যে বেকন কথিত শিথিলবদ্ধ চিন্তা থাকলেও, তার মধ্যে এমন একটি অখণ্ড ভাবদৃষ্টি বর্তমান থাকে, যা সহজগতিতে অজস্রধারা হয়ে গড়িয়ে পড়া ও ছড়িয়ে পড়া চিন্তা ও বাক্যের ধারাগুলিকে একটা সামঞ্জস্য এবং মেরুদণ্ড দান করে— আর এই সংহতিই 'রচনা' সাহিত্যকে দান করে আপাত অসংলগ্নতার মধ্যে একটি গভীরতর অর্থ। উদাহরণস্বরূপ বলেন্দ্রনাথের 'স্মৃতি ও কবিতা' রচনাটি বিশ্লেষণ করে দেখাতে পারি। রচনাটিতে তেরটি অনুচ্ছেদ আছে। ১। বস্তু থেকে স্মৃতির জন্ম। স্মৃতি থেকে কবিতার জন্ম, ২। বস্তুকে সামনে রেখে কবিতা লেখা কেন সম্ভব নয়, ৩। কবিতার 'বস্তু' এবং ইন্দ্রিয়গোচর 'বস্তু'র পার্থক্য, ৪। কবিতার উদ্দেশ্য ভাবনির্ভরতা, ৫। কল্পনা কবিতা রচনা করে. কল্পনার স্মৃতি আছে সুতরাং স্মৃতিই কবিতা রচনা করে, ৬। প্রথম উচ্ছ্বাস কাব্য হতে পারে না. ৭। কাব্যে কল্পনার সংযম প্রয়োজন, স্মৃতিই সংযম. ৮। স্মৃতিই বস্তুকে সুন্দরতর করে তোলে. ৯। বস্তুগত অভিজ্ঞতা নয়, স্মৃতিগত ভাবই কাব্যে রূপ লাভ করে, ১০। কবিতার প্রাণ স্বাভাবিকতা, ১১। স্মৃতির অভিব্যক্তি মাত্রেই কাব্য নয়, ১২। কবিতা কাকে বলে— কাব্য রসাত্মক বাক্য, ১৩। ব্যতিক্রম স্থল বাদ দিয়ে সাধারণ নিয়মে কবিতা রচনা হয় স্মৃতিতে। স্মৃতিকে এই জন্য কবি বললে খুব অত্যুক্তি হয় না। এতগুলি অনুচ্ছেদে ভাববস্তুর বিচিত্র বিন্যাস পদ্ধতিটি পরীক্ষা করলে আমরা দেখব যে, যদিও বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য তিনি বিভিন্ন পথ দিয়ে অগ্রসর হয়েছেন, কিন্তু সব পথগুলিই একটি বিশেষ লক্ষ্যে এসে মিশেছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে এই অসংলগ্ন বিন্যাসপদ্ধতিটি এলোমেলো মনে হলেও, আসলে ভাবদৃষ্টির সংহতি কোথাও ব্যাহত হয় নি। সুন্দর 'রচনা'র এই প্রয়োজনীয় লক্ষণটি বলেন্দ্রনাথের লেখায় অতি সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

বলেন্দ্রনাথের যে রচনাগুলিকে সাধারণতঃ সমালোচনা বা প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে, যেমন, 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা', 'উত্তরচরিত', 'মৃচ্ছকটিক' বা 'মেঘদূত' —এইবার সেগুলিকে আমরা বিশ্লেষণ করে তাদের সাহিত্যধর্ম (অর্থাৎ শ্রেণীবিচার) আবিষ্কারের চেষ্টা করব। বলেন্দ্রনাথ সাহিত্যরসিক ব্যক্তি ছিলেন এবং বিশেষত সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে তাঁর অনুরাগ একান্ত স্পষ্ট। তিনি এ বিষয়ে যা কিছু লিখেছেন তার মধ্যে রসিকের রসাস্বাদনই মুখ্য হয়ে উঠেছে, প্রবন্ধ-লেখকের তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা কোথাও স্থান পায় নি। যেমন উত্তরচরিত কিংবা মৃচ্ছকটিক সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখা, দুটি সার্থক প্রবন্ধ সমালোচনার সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের উক্ত বিষয়ে লেখা রচনা দুটির তুলনা করলেই প্রবন্ধ এবং রচনা সাহিত্যের পার্থক্য প্রকটতর হবে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে যেমন কাব্যটির কথা-বস্তু বিশ্লেষণ করে তার কাব্যত্ব দেখিয়েছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ কাব্যের কয়েকটি সার্বভৌম লক্ষণও নির্দেশ করেছেন এবং স্পষ্টই বোঝা যায়, কাব্যবিচারের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব কয়েকটি ধ্যান-ধারণার প্রতিষ্ঠা করাই প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও 'মৃচ্ছকটিকে'র কাহিনী অংশের রসাস্বাদন করেছেন, কিন্তু নাটকের প্রধান দুটি চরিত্র বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যে 'সাত্ত্বিক এবং রাজস, হিন্দু আর্য এবং ইউরোপীয় আর্য, এতদুভয়ের যে চিত্তাদর্শ সম্বন্ধীয় মৌলিক ভেদ' এবং 'সমালোচ্য মৃচ্ছকটিক নাটক হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের সাত্ত্বিক ঐতিহাসিক লক্ষণ' নির্দেশ করার প্রতিই যে লেখকের আগ্রহ বেশি তা স্পষ্ট বোঝা যায়। অন্য দিকে বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা দুটিতে কোন তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত করা হয় নি, তিনি কাব্য এবং নাটকের কতকগুলি সুন্দর চিত্র নিজের তুলিতে

পুনরঙ্কন করেছেন, পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করেন নি কোথাও। প্রিয়নাথ সেন এই রচনাগুলির সম্বন্ধে অতি ন্যায্য মন্তব্য করেছেন—'লেখার ভিতর বুদ্ধির কোন প্যাঁচ নাই—পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোন প্রয়াস নাই—চকচকে কথা বা কল্পনা লইয়া খেলা নাই। কেবল কাব্য বা কলা সৌন্দর্যে মুগ্ধ তন্ময় হৃদয়ের বিভোরতা আছে।' বলা বাহুল্য, এটি প্রবন্ধের লক্ষণ নয়, 'রচনা' সাহিত্যের লক্ষণ।

আর একটি জিনিস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বলেন্দ্রনাথ যখনই সাহিত্য বিচার করেছেন তখন তার মধ্যে কাব্যমূল্য ছাড়া আর কোন তত্ত্ব, বিশেষ করে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দিকে কদাচ মনোযোগ দেন নি। উমা, যশোদা এবং রাধা চরিত্র ('রাধা এবং যশোদা'), রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর', গীতগোবিন্দ ('জয়দেব') প্রভৃতির বিষয়ে আলোচনায় সত্যই তিনি সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিকতা বর্জন করেছেন। আজ থেকে ষাট-সত্তর বছর আগে বাংলা সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে এই সহজ দৃষ্টি একান্ত বিরল ছিল। গভীর তত্ত্ববহুল ধর্মরস অনুসন্ধিৎসু মন নিয়েই প্রবন্ধ লেখা সে যুগে সহজ এবং স্বাভাবিক বিবেচিত হ'ত—তারই মধ্যে বলেন্দ্রনাথের এই আপাত-লঘু কাব্যরসপিপাসু মনের পরিচয়যুক্ত রচনাগুলি সব দিক্ থেকেই স্মরণীয়; বাংলা 'রচনা' সাহিত্যের সৃষ্টি তথা সমালোচনা সাহিত্যে সহজমনের এবং মুক্ত দৃষ্টির প্রবেশ এই প্রথম ঘটল।

অবশ্য বলেন্দ্রনাথের শেষের দিকের কতকগুলি লেখায় একটি তত্ত্ব কথা বলার বিশেষ প্রবণতা যে কখনো কখনো দেখা দেয় নি এমন নয়। প্রথম দিকে তিনি সুন্দরকে নিয়েই তৃপ্ত ছিলেন। তার পর তাঁর মনে জাগল সত্য এবং শিবের জিজ্ঞাসা। তখন শুধু আর সৌন্দর্য-দৃষ্টি নয়, শুভবুদ্ধিই প্রবল হ'ল। (বলেন্দ্রনাথের 'শিবসুন্দর' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।) আমাদের দেশের সামাজিক প্রথাগুলি নতুন করে আবার ভাল লাগল, কিন্তু এ ভাল লাগার সঙ্গে সংস্কৃত কাব্য ভাল লাগার একটা মৌল পার্থক্য বর্তমান। 'নিমন্ত্রণসভা', বা 'গৃহকোণ' বা 'শুভ উৎসব'—এর সবগুলির মধ্যেই তিনি বাঙালী সমাজ-ব্যবস্থার কতকগুলি পুরণো প্রথার পুনঃপ্রচলন করতে চেয়েছেন। এখানে অহৈতুকী সৌন্দর্য ধ্যান নয়, সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতিষ্ঠাই এখানে কবির লক্ষ্য। এবং সেই লক্ষ্য এত প্রকট যে, এগুলিকে আমরা সার্থক 'রচনা' না বলে প্রবন্ধের লক্ষণাক্রান্ত, বলারই পক্ষপাতী।

কিন্তু বলেন্দ্র-মানসের বিবর্তনের যে বিশেষ ধারাটির কথা উল্লেখ করলাম, তার সপক্ষে প্রমাণ মাত্র ঐ কয়েকটি প্রবন্ধ। কারণ তাঁর শেষ জীবনের লেখা 'দিল্লীর চিত্রশালিকা', 'প্রাচীন উড়িষ্যা', 'কনারক' এবং 'নীরবে'—সার্থকতম 'রচনা' সাহিত্যের নিদর্শন। এগুলির মধ্যে সৌন্দর্য-মুগ্ধ চিত্তের অতীত সঞ্চারণ এবং চলে যাওয়া দিনগুলির জন্য বুকভরা দীর্ঘনিঃশ্বাসে গীতিকবিতাসুলভ স্বানুভাবাত্মক মনের প্রকাশ ঘটেছে। এখানেও তিনি চিত্র এঁকেছেন, কিন্তু হৃদয়ের রঙে আঁকা সে চিত্র। আকারে দীর্ঘ নয়, উচ্ছ্বাস কোথাও বাহুল্যে পরিণত হয় নি, একটি রেখাও অপ্রয়োজনীয় নয়। অন্যদিকে চিত্রগুলি যদিও বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন দিক্ থেকে আঁকা, তবু তার মধ্যে একটি বিশেষ ভাবৈক্য আছে, যাতে আমাদের মনে সেগুলি একটি সম্পূর্ণ অখণ্ড অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

বলেন্দ্রনাথ মাত্র উনত্রিশ বছর বেঁচেছেন। এমন কিছু বেশি লেখেন নি—তার মধ্যেও মাত্র একমুঠো 'রচনা'। কিন্তু একমুঠো হলেও তা স্বর্ণমুষ্টির দান। এই 'রচনা'গুলি শুধু বাংলা সাহিত্যেই উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হবে, তাই নয়। অনুভূতির সততায়, কল্পনার বৈচিত্র্যে এবং প্রকাশের ঔজ্জ্বল্যে বিশ্বসাহিত্যেও শ্রেষ্ঠ 'রচনা'-গুলির সঙ্গে তুলিত হবার যোগ্যতা রাখে। লেখকের মনের ভাল-লাগা যেখানে পাঠক-মনে সঞ্চারিত হয় সেখানেই লেখার সার্থকতা। বলেন্দ্রনাথ যেখানেই তাঁর ভাল-লাগা আমাদের মনে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন সেখানেই তিনি সার্থক। সেখানেই তিনি স্মরণীয়॥

—০—

প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ

শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে সকল সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলন দেখা দিয়াছিল, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে এক হিসাবে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৈপ্লবিক বলা চলে। যে সামাজিক সংস্কারের বিনাশ সাধন এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল, আজ এক শত বৎসর পরেও আমাদের সমাজ সেই সংস্কারের প্রভাব হইতে মুক্ত হয় নাই, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত বিধবা বিবাহের সংখ্যা ভারতীয় হিন্দু সমাজে আজও নগণ্য বলা চলে। কিন্তু বিধবা বিবাহের বিরোধী সংস্কার ভারতীয় হিন্দু সমাজে বহুদিন বদ্ধমূল হইলেও একেবারে প্রাচীন যুগে এই সংস্কারের বিরোধী একটি মনোভাবও সক্রিয়রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং মধ্যযুগে মুসলমান রাজত্বকালেও হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয় নাই। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাসাগর-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগেও হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য একাধিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্দোলনের মত সুগঠিত ও ব্যাপক রূপ তাহারা ধারণ করে নাই। প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সব আন্দোলনের একটি ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লেখকের উদ্দেশ্য।

স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ১৮৭০ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'ভারতে হিন্দু জাতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' বিষয়ক এক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতের হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। মৃত ব্যক্তির চিতায় অগ্নি-সংযোগের পূর্ব্বে তাহার বিধবা পত্নীকে চিতা হইতে নামাইয়া লওয়া হইত ও পরে মৃত ব্যক্তির ভ্রাতা বা অন্য কোন আত্মীয়ের সহিত তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করা হইত। যে ব্যক্তি বিধবাকে বিবাহ করিত তাহাকে বলা হইত 'দিধিষু' এবং যে বিধবার এইরূপ দ্বিতীয়বার বিবাহ হইত তাহার নাম হইত 'পুনর্ভবা'। 'তৈত্তিরীয় আরণ্যকের' ষষ্ঠ-প্রপাঠক, প্রথম অনুবাকে এই বিষয়ে একটি মন্ত্র আছে যাহার অর্থ হইতেছে—"হে নারী, তুমি যাহার পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছ তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। জীবিতের জগতে তুমি ফিরিয়া আইস এবং এমন কোন লোককে পতিত্বে বরণ কর যে পূর্ব্বে বিবাহিতা মহিলাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে ও তোমার পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক।" 'ঋগ্বেদে'র পঞ্চম কাণ্ড, দশম প্রপাঠকেও অনুরূপ একটি মন্ত্র আছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' বলা হইয়াছে যে, এক নারীর একই সময়ে একাধিক-পতি থাকিতে পারে না; পরোক্ষভাবে ইহাও নারীর পত্যন্তর গ্রহণ স্বীকার করে বলা যাইতে পারে,—একই সময়ে না হইলেও বিভিন্ন সময়ে। 'অথর্ব্ববেদে'র নবম কাণ্ড, বিংশতি প্রপাঠকের একটি শ্লোকে বিধবা বিবাহের স্পষ্ট সমর্থন রহিয়াছে এবং একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের সাহায্যে দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী যে স্ত্রীর সহিত স্বর্গবাস করিবার অধিকারী হইতে পারে সে কথাও বলা হইয়াছে। বৈদিক যুগে নারীদের বিবাহ নিতান্ত অল্প বয়সে হইত না; সুতরাং বিধবা বিবাহের এই সমর্থন যে কেবলমাত্র বালবিধবাদের পক্ষে প্রযোজ্য এ কথা মনে করা সমীচীন হইবে না। 'রামায়ণে' সুগ্রীব ও বিভীষণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবাকে বিবাহ করার কাহিনী এবং 'মহাভারতে' অর্জ্জুনের সহিত নাগরাজের বিধবা কন্যা উলুপীর বিবাহ ও দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ংবরের ঘটনাও এই কথাই প্রমাণ করে যে মহাকাব্যের যুগে বিধবা বিবাহ সম্পূর্ণ অপ্রচলিত ছিল না। স্মৃতি ও পুরাণের যুগে আসিয়াও আমরা বিধবা বিবাহের যথেষ্ট শাস্ত্রীয় সমর্থন পাই। 'বিষ্ণু সংহিতা'র পঞ্চদশ অধ্যায়ে ও 'বশিষ্ঠ সংহিতা'র সপ্তদশ অধ্যায়ে অক্ষতযোনি বিধবার বিবাহ সমর্থন করা হইয়াছে। 'নারদ সংহিতা'র দ্বাদশ বিবাদপদে বলা হইয়াছে যে কোনো নারীর পতি মৃত, ক্লীব, সন্ন্যাসী, সমাজচ্যুত বা নিঃসন্ধান হইলে সেই নারী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। বিভিন্ন বর্ণের নারীরা নিঃসন্ধান পতির জন্য কত বৎসর অপেক্ষা করিতে বাধ্য তাহাও স্পষ্ট ভাবে বলা হইয়াছে। 'যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা'য় সকল প্রকার বিধবার বিবাহ সমর্থন করা হইয়াছে ও বলা হইয়াছে যে কোন মৃত ব্যক্তির ঋণ তাহার বিধবা পত্নীকে যে বিবাহ করিবে সেই পরিশোধ করিতে বাধ্য। 'পরাশর সংহিতা'য়

—যাহা নাকি কলিযুগের জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত, সুস্পষ্ট ভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারীর পত্যন্তর গ্রহণের সমর্থন আছে এবং 'পরাশর সংহিতা'র চতুর্থ অধ্যায়ের একটি শ্লোককে ভিত্তি করিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রীয় যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াছেন। অবশ্য ইহার ঠিক পরের শ্লোকেই বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য পালন যে মহাপুণ্যের কার্য্য এবং মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণ যে আরও পুণ্যের সে কথাও বলা হইয়াছে। 'অন্যে পরে কা কথা' রক্ষণশীলচূড়ামণি মনুই স্বয়ং স্বামীসহবাস হয় নাই এরূপ বিধবার পুনরায় বিবাহের আদেশ দিয়াছেন। অন্য প্রকার বিধবার বিবাহ তিনি সমর্থন না করিলেও তাঁহার সময়ে এরূপ বিবাহ যে হইত তাহার প্রমাণ তাঁহার শাস্ত্রেই রহিয়াছে (মনু, ৯:১৭৫-৯:১৭৬)। ঐরূপ বিবাহের ফলে জাত সন্তানকে 'পৌনর্ভব' বলা হইত এবং পৌনর্ভব সন্তান পিতার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশের উত্তরাধিকারী হইতেন। 'ব্রহ্ম পুরাণ', 'অগ্নিপুরাণ' এবং 'মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে'ও অক্ষত-যোনি বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত বলা হইয়াছে। 'পদ্ম পুরাণে' বারাণসীর এক রাজকন্যার অন্ততঃ কুড়িবার বিবাহের কথা বলা হইয়াছে, তবে খুব সম্ভব এই দৃষ্টান্তটি কাল্পনিক। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রেও গ্রহ নক্ষত্রের কিরূপ সমাবেশে পুরুষের পুনর্ভবা কন্যার সহিত বিবাহ সম্ভব হয় তাহা বলা হইয়াছে। সমাজে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত না থাকিলে জ্যোতিষকারগণ নিশ্চয় এই ব্যাপার লইয়া চিন্তা করিতেন না। উপরের প্রমাণগুলি হইতে মনে হয় যে অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ সমাজের উচ্চ স্তরেও একেবারে অপ্রচলিত ছিল না, যদিও মনুর বিধান অনুযায়ী বিধবার পক্ষে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালনই সাধারণ নিয়ম ছিল। খ্রীষ্টীয় ১০১৪ সালে লিখিত একটি জৈন গ্রন্থেও কোন এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এইরূপ বিবাহের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আল-বেরুণীর 'ভারত বিবরণ' পাঠে মনে হয় সমাজে তখন বিধবা বিবাহ প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছিল।১

ভারতে মুসলমান রাজত্বের যুগে বিধবাবিবাহ সমাজের উচ্চস্তরে অপ্রচলিত ও নিন্দনীয় হইয়া পড়ে, এমন কি উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরাও হিন্দুদের দেখাদেখি এইরূপ বিবাহ বর্জ্জন করিবার চেষ্টা করেন। কথিত আছে যে, ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক সৈয়দ আহ্‌মদ মুসলমানগণের এইরূপ কুসংস্কার দূর করিবার জন্য দিল্লীতে এক রাত্রে পাঁচশত মুসলমান বিধবার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। কিন্তু হিন্দু-সমাজের কোন কোন অংশে এইরূপ বিবাহ কোন-দিনই একেবারে লোপ পায় নাই। গুজরাটের 'মন বাণিয়া'গণ (বর্ত্তমানে মালবের অধিবাসী) এবং 'মারু' বা যোধপুরী ব্রাহ্মণগণ নিজেদের সমাজে বরাবর বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত রাখিয়াছেন।2 পশ্চিম-ভারতে বিধবাবিবাহকে গান্ধর্ব্ববিবাহ বা 'নট্‌রা' বলা হয়। দাক্ষিণাত্যে মারাঠা দেশের ক্ষত্রিয় সমাজে ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এইরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য বৃদ্ধির সঙ্গে ইহা লোপ পাইয়াছে।3 Crooke সাহেব লিখিয়াছেন যে, সংযুক্ত প্রদেশে (বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশে) উচ্চতম বর্ণগুলি ভিন্ন সমাজের অন্যান্য সকল বর্ণের মধ্যেই বিধবাবিবাহ অল্পবিস্তর প্রচলিত আছে, যদিও সেখানে ব্রাহ্মণপ্রভাব এত অধিক যে এইরূপ বিবাহ বিশেষ সামাজিক মর্য্যাদা লাভ করে না এবং সাধারণ বিবাহের কোন অনুষ্ঠানই এইরূপ বিবাহে পালন করা হয় না। যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত আছে তাহারা ইহা বর্জ্জন করিলে সমাজে অধিকতর মর্য্যাদা পায়।4 উড়িষ্যার কোন কোন অংশে বিধবা ভ্রাতৃবধূর সহিত দেবরের বিবাহ সুপ্রচলিত। জাঠ এবং ভারতের কোন কোন আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেও এইরূপ বিবাহের কথা স্যার্ জর্জ্জ ক্যাম্পবেল তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিবারের বিধবাকে পারিবারিক সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় এবং সহজে তাহাকে পরিবারের বাহিরে বিবাহ করিতে দেওয়া হয় না।5 সমাজের উচ্চ বর্ণের নেতারা সময়ে সময়ে বিধবা-

---

১। পাঠান যুগের হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন সম্বন্ধে নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য

(a) J. Muir. *Original Sanskrit Texts*. Vol. V. Sec. XXIII. (6).

(b) C. Y. Chintamani. ed. *Indian Social Reform*, Part I. Dr. R. G. Bhandarkar's article on "Social History of India".

(c) [illegible]

(d) P. N. Bose. *A History of Hindu Civilization During British Rule*, Vol. II, Bk. 1, Ch. 2.

2. L. Wilkinson. *An Introduction to An Essay on the Second Marriage of Widows*, Pp. 1-6.

3. *Marriage of Hindu Widows*, published by Pathare Reform Association, Bombay, p. 20.

4. Crooke. *The North-West Provinces of India*, p. 229.

5. Sir G. Campbell, *Memoirs of My Indian Career*, Vol. I Pp. 82-83.

বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন এইরূপ নিদর্শনও যে মধ্যযুগের ইতিহাসে একেবারে পাওয়া যায় না তাহা নহে। মুঘল আমলে জয়পুরের রাজা জয়সিংহ, কোটার রাণা জালিম সিংহ এবং পেশোয়ার দরবারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পরশুরাম ভাও-এর প্রচেষ্টা এই প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। জয়সিংহের প্রচেষ্টা তাঁহার বিধবা মাতার বিরোধিতায় এবং পরশুরাম ভাও-এর প্রচেষ্টা তাঁহার পত্নীর বিরূপ মনোভাবের জন্য ব্যর্থ হইয়া যায়। বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে ১৮৩৭ সালে বরগিরি-নিবাসী এক তেলেগু ব্রাহ্মণ বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহা প্রথম বোম্বাই শহরে প্রকাশিত হয় ও সেখানকার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মুম্বাই দর্পণে' ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে জৈন সম্প্রদায়ের নেতা বাবা পদ্মনজী বিধবাবিবাহ বিষয়ে দুইটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ১৮৪১ সালে নাগপুরের এক সম্ভ্রান্ত মারাঠা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বিধবা-বিবাহ সমর্থনের চেষ্টা করেন। ১৮৫৩ সালে পুণায় রঘুনাথ জনার্দ্দন নামে এক ব্রাহ্মণ চিমাবাই নামে এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার প্রথমা পত্নী তখনো জীবিত থাকায় এই বিবাহ সমাজসংস্কারগণের মনঃপূত হয় নাই।6 বাংলা দেশে বিধবাবিবাহ আন্দোলন সাফল্য-লাভ করিবার পরে বিষ্ণু শাস্ত্রীর নেতৃত্বে দাক্ষিণাত্যেও এই আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে।

বাংলাদেশে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য প্রথম ব্যাপক আন্দোলন আরম্ভ হয় অবশ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নেতৃত্বে, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কোনক্রমেই এই বিষয়ে পথিকৃৎ বলা চলে না। মধ্যযুগেই চৈতন্যের অনুবর্ত্তী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবাবিবাহের প্রচলন হইয়াছিল।7 অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজ যখন ঘোরতর কুসংস্কারের জালে আচ্ছন্ন তখনো ঢাকার রাজা রাজবল্লভ উচ্চবর্ণের বাঙালী হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁহার এক সভাপণ্ডিত ও নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার জন্য শেষ পর্য্যন্ত এই প্রচেষ্টা পণ্ড হইয়া যায়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার প্রধান কারণ ছিল ধর্ম্মীয় সংস্কার নহে, রাজবল্লভের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত ও জাতিগত বিদ্বেষ।8 রাজা রামমোহন রায় তাঁহার "Ancient Rights of Females" নামক গ্রন্থে (১৮২২) হিন্দু বিধবাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী বিশদ-ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া স্বামীর সম্পত্তিতে তাঁহাদের উত্তরাধিকার দাবী করেন।9 রামমোহন প্রকাশ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য কোন চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না, কিন্তু তাঁহার বিলাতযাত্রার পর এদেশে সহসা প্রবল জনরব উঠে যে, তিনি হিন্দু বিধবাদের বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতেই ইংলণ্ডে গিয়াছেন।10 ১৮৩৫ সালের ১৪ই ও ২১শে মার্চ্চ তারিখের 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় শান্তিপুর ও চুঁচুড়া-নিবাসী কয়েকজন ভদ্রলোকের স্বাক্ষরিত দুইটি আবেদন পত্র প্রকাশিত হয়।

পত্রলেখকদের বিভিন্ন দাবীর মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলনও অন্যতম প্রধান দাবী ছিল। খুব সম্ভব এই পত্র দুইটির পশ্চাতে কোন রামমোহন-শিষ্যের অনুপ্রেরণা ছিল। ১৮৩৭ সালের ২৯শে এপ্রিল "জ্ঞানান্বেষণ" পত্রিকায় এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, বাবু মতিলাল শীল, বাবু রাধামাধব মল্লিক প্রমুখ কলিকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক এদেশে স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ প্রচলনের ব্যাপারে উৎসাহ দিবার জন্য একটি সভা আহ্বান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। "হরকরা", "ক্যুরিয়ার", "ইংলিশম্যান", "রিফর্ম্মার" ও "সমাচার দর্পণ" পত্রিকার সম্পাদকগণও বিধবাবিবাহের পক্ষে স্ব স্ব অভিমত জ্ঞাপন করেন।11 "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" এবং "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে ও পত্রে আমরা এই আন্দোলনেরই অনুবর্ত্তন লক্ষ্য করি। সরকারের সাহায্য ব্যতিরেকে এ দেশে বিধবাবিবাহ পুনঃপ্রবর্ত্তন করা সম্ভব নহে এই ধারণা ক্রমশঃই সমাজ-সংস্কারকদিগের মনে বদ্ধমূল হইতে থাকে।12 কৃষ্ণনগরের মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সাফল্যলাভ

---

6 C. Y. Chintamani, *op. cit.*, W M Kalhatkar's article on "Widow Remarriage".

7 *The Calcutta Review*, 1855, Vol XXV Article on "Marriage of Hindu Widows".

৮ চণ্ডীচরণ [illegible]

9 Rammohun Roy, *Brief Remarks regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females*, Pp. 6-7.

10 *The Calcutta Review*, op cit, p 359.

১১। ব্রজেন্দ্রনাথ [illegible], সংবাদপত্রে সেকালের কথা (তৃতীয় সংস্করণ), দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ [illegible] ৫৮ [illegible] ৬৩--৬৪।

12. K K Datta, *Education and Social Amelioration of Women in Pre-Mutiny India*, Chapter on Widow Marriage

করিয়া বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করেন, কিন্তু এই চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়া যায়। বাবু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় ও বারাসত-নিবাসী কালীকৃষ্ণ মিত্র কর্তৃক পরিচালিত কৃষ্ণনগরের নব্যসম্প্রদায় বিধবাবিবাহ প্রবর্ত্তনের জন্য ঠিক এই সময়েই এক আন্দোলন সৃষ্টি করেন, কিন্তু বীরনগর (উলা) নিবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের বিরোধিতায় এই আন্দোলন ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া পড়ে। বিদ্যাসাগরের হস্তক্ষেপের প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে বহুবাজার-নিবাসী নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যান্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সহযোগিতায় সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হ'ন।১৩ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ লইয়া 'ধর্ম্মসভা' ও 'তত্ত্ববোধিনীসভা'র সহিত কিছুকাল পত্রালাপ করেন, কিন্তু এই পত্রালাপে বিশেষ কোন সুফল হয় নাই।14 বিদ্যাসাগরের আন্দোলন আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কলিকাতার পটলডাঙ্গা নিবাসী শ্যামাচরণ দাস নিজের বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার জন্য কয়েকজন স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে এক ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করেন। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা শেষ মুহূর্ত্তে এই ব্যবস্থাপত্র প্রত্যাহার করিয়া শ্যামাচরণ দাসকে কন্যার বিবাহ দান হইতে নিবৃত্ত করেন।15 এই সময়েই রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে আহূত এক বিচারসভায় বহু পণ্ডিতের সম্মুখে বিধবা বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া পণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্নকে বিচারে পরাজিত করেন এবং রাজবাটী হইতে এক জোড়া শাল পুরস্কার লাভ করেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন ঐ পুরস্কারপ্রাপ্ত শাল গায়ে দিয়াই বিধবা বিবাহের বিপক্ষীয়দের সহায়তা করেন।১৬ বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবা বিবাহ-বিষয়ক প্রথম পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বিদ্যারত্ন ও তাঁহার অনুগামী পণ্ডিতদের কার্য্যকলাপের তীব্র নিন্দা করেন।

এই ভাবে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতেই বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা চলিতেছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ই প্রথম এই ব্যাপার লইয়া এক দেশব্যাপী আন্দোলনের সূচনা করেন এবং বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে প্রবল জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। তাঁহার বিভিন্ন সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনগুলির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টাই যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও বৈপ্লবিক সম্ভাবনাযুক্ত সে বিষয়ে তাঁহার নিজেরও কোন সন্দেহ ছিল না। ইহাকেই তিনি তাঁহার "জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম" বলিয়া মনে করিতেন।১৭ সতীদাহ নিবারণে রামমোহনের ন্যায় বিধবাবিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বহু শাস্ত্রীয় যুক্তি ও তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের সমর্থন আছে বলিয়াই যে তিনি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন তাহা নহে। উৎপীড়িত ও অসহায় জনের প্রতি যে নিবিড় সহানুভূতি ও মানব জীবনের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ তাঁহার অন্তরের স্বাভাবিক গুণ ছিল তাহাই তাঁহাকে এই আন্দোলনে যোগদান করিতে প্রেরণা দিয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা হিন্দু বিধবাদের প্রশংসায় শাস্ত্র যতই মুখর হউক না কেন, সমাজে অসংখ্য বালবিধবার অস্তিত্ব প্রাকৃতিক নিয়মেই নানা প্রকার দুর্নীতি ও ব্যভিচারের সৃষ্টি করিতেছিল এ কথা বিদ্যাসাগর মহাশয় ভালভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা বিবাহ আন্দোলন প্রধানতঃ এই সকল হতভাগিনী বালবিধবাদের দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিবার উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত হইয়াছিল।১৮ বিধবা বিবাহ বিষয়ক পুস্তকগুলিতে শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তিন কেবল তাঁহার দেশাচার-বিমূঢ় দেশবাসীর কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—বলা বাহুল্য, দেশবাসী আজও তাঁহার কথায় বিশেষ কর্ণপাত করে নাই।

১৩। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৮ম অধ্যায়।

14. *The Calcutta Review. op. cit.*

15. Sitanath Tattvabhusan. *Social Reform In Bengal.* Pp. 73-74.

১৬। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ ৫ অধ্যায়।

১৭। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী সমাজ, পৃ. [illegible]

১৮। ঐ পৃঃ ১৬।

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

১৯১০ সনেই সোনারং কেন্দ্রের উপর গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ নজর পড়ে। স্কুল বোর্ডিংয়ের উপর নজর রাখবার জন্য অনেক গোয়েন্দা নিযুক্ত হ'ল। সোনারং এবং তার আশে-পাশের গ্রামে ইংরেজ-ভক্ত পরিবারের সাহায্য চাইল সরকারপক্ষ। এদের মধ্যে ছিল, যারা সরকারী চাকুরী করে বা সরকারী চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করে গ্রামে বসবাস করছে। স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য না পেলেও কিছু কিছু লোকের ব্যক্তিগত সাহায্য সরকার পেয়েছিল। জনসেবা ও জন-হিতকর কার্যের মাধ্যমে সমিতির সভ্যরা জনপ্রিয় ছিল। সুতরাং জনসাধারণের সোনারং স্কুল বোর্ডিয়ের উপর খুব ভাল ধারণা ছিল। সুতরাং স্কুলটাকেই ধ্বংস করবার জন্য সরকারী কর্মচারীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ'ল।

গ্রামের দফাদার, ডাক-পিওন প্রভৃতির সাহায্যে নানা অজুহাতে স্কুল বোর্ডিংয়ের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমন হ'ল যে ডাক-পিওন স্কুল বোর্ডিংয়ে ঢুকেই অভদ্র আচরণ ও কুৎসিত গালাগালি শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটা মাটিতে ফেলে দিয়ে এমন ভাবে চিৎকার করতে লাগল যেন তাকে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্ররা মিলে মারধোর করছে এবং ব্যাগটা লুটে নিয়েছে। পূর্ব থেকেই পুলিশ নিকটেই ছিল। পুলিশ ছুটে এসে বোর্ডিংয়ে প্রবেশ করে সবাইকে গ্রেপ্তার করতে সুরু করল। রবীন্দ্রমোহন সেন এবং আরও কয়েকজন পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে পালিয়ে গেল। বাকী সবাই গ্রেপ্তার হ'ল। তাদের মধ্যে ছিলেন—নরেন্দ্র-মোহন সেন, দীগেন্দ্র মুখোটি, রমেশ আচার্য, প্রিয়নাথ আচার্য প্রভৃতি।

মোকদ্দমা চলতে লাগল। নরেনবাবু ও আরও কয়েকজনের জামীন মঞ্জুর হয়েছিল। পরিণামে রমেশ আচার্য, দীগেন মুখোটি প্রভৃতি কয়েকজনের সাজা হয়। নরেনবাবু প্রভৃতি কয়েকজন মুক্তিলাভ করে।

জামীন পেয়ে বাইরে এসেই নরেনবাবু আমাকে বললেন, "এবার সমিতির সংগঠন ঠিক রাখা এবং পরি-চালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আপনার। আমি আর বাইরে থাকতে পারব না। বাইরে থাকলেও নিজ হাতে ভার রাখব না। আপনিই চালিয়ে যেতে থাকুন। আমি যথাশক্তি কাজ করতে থাকব এবং সর্বসময়ে সুপরামর্শ দিব।"

আমাদের সোনারং কেন্দ্র ভেঙ্গে গেল। সমিতির কেন্দ্র পুনরায় ঢাকা সহরেই স্থাপিত হ'ল। নরেনবাবুদের বাড়ির উপর গোয়েন্দা পুলিশের কড়া নজর পড়ল। তবে বাড়িতে প্রবেশপথ একাধিক থাকার ফলে আমাদের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হয়ে গেল না। আমি তখন রাঙ্গার দেউড়ী অঞ্চলে আমার ভগ্নিপতি মনোরঞ্জনবাবুর বাসায় থাকি। সেইটাই কেন্দ্ররূপে পরিণত হ'ল।

ঢাকা দক্ষিণ মৈশন্ডির ভূতের বাড়ি যে অর্থে সমিতির কেন্দ্র ছিল, তার 'পর সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার পর যেভাবে সোনারং ন্যাশনেল স্কুল বোর্ডিং প্রায় অর্দ্ধ গোপন কেন্দ্র হয়েছিল, সোনারং বোর্ডিং ভেঙ্গে যাওয়ার পর সে ভাবের কেন্দ্র আর গঠন করিনি। সমিতির গৃহত্যাগী বা পলাতক সভ্যদের জন্য মাঝে মাঝে বাড়ি ভাড়া করা হ'ত। কিন্তু তা এত গোপন রাখা হ'ত যে সেগুলি ঠিক কেন্দ্ররূপে গণ্য হতে পারে নি। যত দূর সম্ভব গুপ্ত আড্ডা পরিহার করে সমিতির যে সমস্ত সর্বক্ষণের কর্মী যারা ঢাকাতে যাতায়াত করত এবং কিছু দিন থাকতে বাধ্য হত, তাদেরকে নানা বাড়িতে ছড়িয়ে রাখা হ'ত। যেমন—আমাদের, নরেনবাবুদের, ডাক্তার মোহিনী দাশের এবং মনোরঞ্জনবাবুদের বাড়ি।

এ ছাড়াও ঢাকায় মাহুতটুলীর মণীন্দ্র রায়ের বাড়ি আমাদের সমিতির একটা বিশেষ আড্ডাস্থল ছিল। পলাতক গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা প্রাপ্ত, গৃহত্যাগী সর্বক্ষণের কর্মী এবং বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এ বাড়িতে আসতেন। তার পিতৃদেব বোধহয় সরকারী কর্মচারী ছিলেন। সে বাড়ির ছেলেমেয়ে প্রায় সকলেই সমিতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। কাজেই এটাও সমিতির একটা কেন্দ্রমত ছিল। মণীন্দ্র রায় নিজে সে সময় সমিতির নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে ছিলেন। সমিতির জন্য অস্ত্র সংগ্রহ, কার্যোপযোগী করে সংগোপনে রাখা এবং সারাই করা প্রভৃতি অতি দায়িত্ব-পূর্ণ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

ঢাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়

ছিলেন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য। তিনি ছিলেন সেই জাতীয় সভ্য শ্রেণীভুক্ত যাদের পরিচয় সাধারণ সভ্যরা জানতে পারত না। কেন না যারা অস্ত্রশস্ত্র নিজের বাড়িতে বা তত্ত্বাবধানে রাখতেন, যাদের বাড়ি ছিল গুপ্ত আশ্রয়স্থল এবং যাদের নামে চিঠিপত্র আসত—সে সমস্ত সভ্যের নাম ও পরিচয় সাধারণ সভ্যদের কাছে গোপন থাকত।

কবিরাজ মহাশয় আমাদের অস্ত্রশস্ত্রের তত্ত্বাবধান ও গোপনে রাখবার ব্যবস্থা করতেন। অস্ত্রশস্ত্র কোথায় রাখা হয় তা সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদেরও জানাতেন না। এমন কি আমিও বহুদিন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করিনি অস্ত্রশস্ত্র কোথায় থাকে। শুধু প্রয়োজন মত বলতাম অতগুলি বন্দুক, রিভলবার, কার্তুজ দিতে হবে। কবিরাজ মহাশয় সেগুলি যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিতেন। এইরূপ অস্ত্র-হস্তান্তর সাধারণত কোন বাড়িতে করতাম না। রাত্রের অন্ধকারে সহরেরই কোন নির্জন রাস্তায়, বড় গাছের নীচে বা খালের নির্জন ঘাটে এমনি অস্ত্র-হস্তান্তর করা হ'ত। কেউ এমন কি খুব বিশিষ্ট বিশ্বাসী নেতৃবর্গও জানতে চাইত না এসব কোথায় থাকে। প্রথমে শুধু নরেনবাবু, প্রফুল্ল কবিরাজ ও মনীন্দ্র রায় জানতেন। নরেনবাবু পরে আমায় জানিয়ে রাখলেন।

আমাদের সমিতির একটা বিশেষ নিয়ম ছিল যে অস্ত্রশস্ত্র যার নিকট বা তত্ত্বাবধানে থাকবে তিনি বা আর কেউ ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন না। অস্ত্র স্থানান্তর করা ও ব্যবহারের অনুমতি দানের ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল একমাত্র প্রধান পরিচালকের উপর। তার অনুমতি ছাড়া একটা কার্তুজও কেউ ব্যবহার করতে পারত না।

ঢাকা ছাড়া নোয়াখালী জেলাতেও সমিতির অস্ত্রশস্ত্র নিরাপদে রাখবার একটা কেন্দ্র ছিল। নোয়াখালীতে আমাদের কয়েকজন খুব বিশ্বাসভাজন গৃহী সভ্য ছিলেন। তারা অনেকেই চাকুরী করে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সাধারণ গৃহস্থের জীবনযাপন করতেন। অথচ সমিতির কাজের জন্য সর্বপ্রকার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকতেন। এঁরা অত্যন্ত নিরীহ ভদ্র ও শান্ত গৃহস্থ মানুষ হলেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রাপ্ত সভ্যকে আশ্রয় দেওয়া এবং অস্ত্রশস্ত্র নিজের কাছে রাখবার মত বিপজ্জনক কাজ করতে ভীত হতেন না। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ কাহিলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে গৃহী হলেও বহু গৃহত্যাগী সভ্য তার নির্দেশে পরিচালিত হত। সমস্ত জেলার ভারই তার উপর ন্যস্ত ছিল।

সোনারং কেন্দ্র ভাঙ্গার কথায় ফিরে এসে আর একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। কেননা তার সঙ্গে সঙ্গেই একই রাত্রিতে তিন বাড়ী আক্রমণ করে তিন গোয়েন্দাকে হত্যা করা হয় সোনারং ও রাউৎভোগ গ্রামে। এর মধ্যে রাউৎভোগের মনোমোহন দে ছিল সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী। সমিতি সংক্রান্ত অনেক বিষয় সে জানত এবং অনেককে চিনত। সুতরাং তাকে হত্যা করার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর উপরই এই ভার ন্যস্ত হয়।

সোনারং কেন্দ্র ভেঙ্গে যাওয়ার পর ঢাকায় কেন্দ্র স্থাপিত হলে আমরা তৎকালোপযোগী করে সমিতিকে পুনর্গঠন করতে মনোনিবেশ করলাম। প্রকৃতপক্ষে নানা বাধা-বিপত্তির দরুণ পূর্বের ন্যায় সমিতি সুশৃঙ্খল ভাবে গঠিত হতে পারে নি। সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিনবাবু গ্রেপ্তার হলেন। প্রকাশ্য সমিতির সভ্যদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল। বিশৃঙ্খল হয়ে নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ল। নিদারুণ অর্থাভাবে গৃহত্যাগী সভ্যগণ অনাহারে অর্ধাহারে দিনযাপন করতে বাধ্য হ'ল। প্রকাশ্য সমিতিতে যারা সকলের অগ্রভাগে এগিয়ে এসেছিল তাদের অনেকে বিপদের সঙ্কেত পেয়ে পিছিয়ে পড়ল। এই সমস্ত কারণে কিছুদিন আর সমিতি সুশৃঙ্খল ভাবে পুনর্গঠিত হতে পারে নি। তবে যতই ক্ষীণ হউক না কেন প্রত্যেক জেলার সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক অবশ্যই ছিল।

পুনর্গঠনের কাজে মনোনিবেশ করে কর্মনীতি স্থির করতে গিয়ে তৎকালীন অবস্থা বিচার অবশ্যম্ভাবী। সমিতির কাজ প্রকাশ্য ভাবে করা চলবে না, অথচ সম্পূর্ণ গুপ্তভাবে কাজ চালিয়ে গেলে দেশের জনগণের সঙ্গে সমিতির সংযোগ রক্ষা কঠিন হয়ে পড়বে। সুতরাং এমনভাবে ব্যবস্থা করতে হবে যাতে গুপ্ত-সমিতির নিরাপত্তাও রক্ষিত হয় অথচ আগামী বিপ্লবের জন্য সমগ্র দেশের জনগণের প্রস্তুতিও দ্রুত অগ্রসর হয়। সুতরাং প্রকাশ্য এবং গুপ্ত এই দু'রূপেই আমাদিগকে কাজ করতে হবে। তবে প্রকাশ্য কার্যের পশ্চাতে যে গুপ্ত-সমিতির পরিচালনা আছে তা যেন পুলিশ টের না পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু দেশের অবস্থা তখন এমন হয়েছিল যে, পাড়ায় একটা বই পড়ার জন্য লাইব্রেরী খুললেও পুলিশের দৃষ্টি পড়ত। পুলিশ সন্ধান করত সেই সমস্ত ছেলেদের যারা স্কুলে, কলেজে, পার্কে, ব্রহ্মচর্য-সচ্চরিত্র রাখা, পরোপকার এবং ধর্মের কথা আলোচনা করে। পুলিশ ধরে নিত এই সব ছেলে বিপ্লবী সমিতির সভ্য না হলেও শীঘ্রই হয়ে যাবে।

সুতরাং কাজ কঠিন হলেও স্থির করলাম যে, আসল

রূপ গোপন রেখে আমরা এমন ভাবে চলব যাতে দেশের লোকের চিত্ত জয় এবং তাদের সহানুভূতি লাভ করতে পারি। কেউ গ্রেপ্তার হলে যেন স্থানীয় লোক অনুভব করে যে একজন সৎ, হিতৈষী ও নিঃস্বার্থ লোক জেলে গেল! কোন ঘৃণিত অপরাধ এদের দ্বারা সম্ভব নয়, এরা যা করে পরের ভালর জন্যই করে। পরাধীনতা শৃঙ্খল হতে মুক্ত হওয়ার জন্য যখন সরকার-বিরোধী কাজ করে গ্রেপ্তার হয় তখন তার প্রচারের (propaganda) একটা দিক্ আছে। সরকারের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ে। যখন সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যমের ন্যায় (Conspiracy to wage war against the King Emperor, and to deprive his Majesty of the Sovereignty of British India—Penal Code) গালভরা নামের অভিযোগে নানা জেলায় বহু লোক গ্রেপ্তার হত এবং বহু বাড়ী খানাতল্লাসী হত তখন দেশব্যাপী আমাদের কথাও ছড়িয়ে পড়ত। দেশের লোকের মনে আশা জাগত যে যুবকেরা এমন শক্তিধর হচ্ছে যার ফলে বিদেশী রাজশক্তি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

প্রকাশ্যে সমিতির কাজ, প্রচার ও প্রসার বন্ধ হওয়ার পর আমরা ভাবলাম কর্মের মাধ্যমে প্রচার (propaganda by deeds)-এরও একটা পথ আছে। যে সব পথ এজন্য নির্দিষ্ট হল তা সংক্ষেপে বলতে গেলে এমনি দাঁড়ায়—

মাঝে মাঝে এমন সশস্ত্র কাজ করতে হবে যাতে আমাদের অস্তিত্ব দেশের লোকের কাছে জাজ্বল্যমান থাকে এবং তাদের প্রাণে আশারও সঞ্চার হয়। আমাদের জেল, ফাঁসি, দ্বীপান্তর এবং দণ্ডভোগের দ্বারাও দেশের জনগণের মধ্যে অনেক কাজ হবে বলে আমরা স্থির করলাম।

আমাদের কর্মীরা যে যেখানে থাকবে সেখানকার স্থানীয় যুবকদের দ্বারা ধর্ম, সেবা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। এ সব করে আমরা দেশের সমস্যা সমাধান করতে পারব তা মনে করতাম না। কিন্তু এ-দ্বারা স্থানীয় যুবকদের মনে মহৎ কাজ এবং পরহিতে আত্মোৎসর্গ করবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হত। আমাদের কর্মীরাও জনপ্রিয় হয়ে উঠত। আর একটা কথা, এ সমস্ত কাজ করে চিত্ত নির্মল না হলে বিপ্লব-মন্ত্র গ্রহণ করবার যোগ্যতা লাভ করবে না।

স্থানীয় ধর্মমূলক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও উৎসবগুলির মধ্যে আমাদের কর্মীরা যোগ দিবে। এ ভাবে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে গিয়ে জনচিত্তের অগ্রগতির প্রেরণামূলক কাজগুলির উপর জোর দিতে পারবে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, কথকতা এবং যে সমস্ত পূজায় দুষ্কৃতিকারীর ধ্বংস ও ধর্মের জয় হয়, যেমন দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের চিত্ত উদ্বোধিত করবার চেষ্টা আমাদের কর্মীরা করবে।

জনসেবামূলক সমস্ত কাজই আমাদের কর্মীরা আন্তরিক ভাবে করবে। বিশেষ যোগ উপলক্ষে, স্নানযাত্রায় স্থানীয় যুবকদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা গ্রহণ করবে। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারী দেখা দিলে রোগী-পরিচর্যা করবে। গ্রাম্য রাস্তা ঘাট, জলাশয় প্রভৃতি নির্মাণ ও সংস্কার কার্যে সাহায্য করবে এবং জনস্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখবে।

স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নতি বিধান, নূতন বিদ্যালয় স্থাপন, অবৈতনিক ও নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্যে আমাদের কর্মীরা শুধু অগ্রসরই হয়ে আসবে না, সবই নিঃস্বার্থভাবে করবে। কিন্তু স্থানীয় কোন দলাদলির মধ্যে জড়িত হতে পারবে না।

স্থানীয় লোকেরা যাতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জনহিতকর কাজ করতে পারে এবং বিপদে আপদে আত্মরক্ষার যোগ্যতা অর্জন করে, সেদিকে আমাদের কর্মীরা দৃষ্টি রাখবে।

আমাদের কর্মীদের এ কয়টি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন ছিল—কৃষিকার্য, গোপালন, প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid) এবং সাধারণ মিস্ত্রীর কাজ। কর্মীদের যত বিভিন্ন প্রকারের কাজ জানা থাকবে ততই তারা বিভিন্ন জীবিকা নির্বাহে নিযুক্ত স্থানীয় লোকের সঙ্গে পুরোপুরি জড়িত হতে পারবে।

স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত কর্মীর এ কয়টি কাজ বিশেষ করে করতে হবে—(১) স্থানীয় যুবকগণকে সমিতির সভ্য করে একটি সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তী দল গঠন ও (২) নানা ভাবে জনসাধারণকে সংঘবদ্ধ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলা।

সমিতিকে সুগঠিত করে শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিচালনার জন্য জেলা সংগঠন পরিকল্পনা (District Organisation Scheme) তৈরী করে নিয়মাবলী স্থির করি। সেকালে এগুলি যে ভাবে তৈরী হয়েছিল এতদিন পরে পুরোপুরি ঠিক সে ভাবে লিখতে না পারলেও মোটামুটি ভাবেই লিখছি।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে তথাকার সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করে সে অনুযায়ী সমিতির কর্মসূচী তৈরী করতে হবে।

প্রত্যেক প্রদেশ জেলা অনুযায়ী এবং প্রতি জেলা আবার মহকুমা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম হিসাবে বিভক্ত করে নিতে হবে। অর্থাৎ সমিতির শাখাগুলিও সরকারী প্রশাসনিক রীতিতে বিভক্ত হবে। তবে স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে কোথাও কোথাও বদল করতে হবে।

প্রধানতঃ জেলাই একক (unit) হিসেবে গণ্য হ'ত। জেলার কর্মকর্তার প্রশাসনিক নাম হ'ত জেলার ভারপ্রাপ্ত সংগঠক (District Organiser-in-charge of the District)। তাকে নিযুক্ত, বদলী বা কর্মচ্যুত করার অধিকার কেবলমাত্র প্রধান কেন্দ্রের।

জেলা সংগঠক সম্পূর্ণরূপে প্রধান কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করবেন এবং সমস্ত কার্যের জন্য প্রধান কেন্দ্রের নিকট দায়ী থাকবেন।

জেলার সমিতি সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা জেলা সংগঠকের আদেশে চলবে এবং জেলার ভিতরে সবাইকে তার নির্দেশ মেনে নিতে হবে।

প্রধান কেন্দ্র থেকে কেউ কোন বিশেষ কাজের ভার নিয়ে জেলায় গেলে তিনি সেখানে নির্দিষ্ট কাজ স্বাধীন ভাবেই করতে পারবেন এবং জেলা সংগঠক তাকে সবভাবে সাহায্য করবেন। কিন্তু আগন্তুকের জেলার মধ্যে চলাফেরা কার সঙ্গে মিশবেন, কাকে বিশ্বাস করবেন প্রভৃতি ব্যাপারে অর্থাৎ, কেন্দ্র নির্দিষ্ট কার্যটি ছাড়া তিনি জেলা সংগঠকের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবেন।

জেলা সংগঠকের একজন সহকারী থাকবে। এরা দুজনে একত্রে কোন বিপদজনক কাজে যেতে পারবেন না। কারণ দুজন একসঙ্গে বিপন্ন হলে সমিতির বিশেষ ক্ষতি হবে।

জেলা সংগঠক নিজ জেলায় হত্যা, ডাকাতি, অস্ত্র সংগ্রহ বা ব্যবহার প্রভৃতি কোন বলপ্রয়োগের কাজ করতে বা করাতে পারবেন না। সবপ্রকার বলপ্রয়োগের কাজ একমাত্র প্রধান কেন্দ্রের নির্দেশানুযায়ী সংঘটিত হবে।

এক জেলা অপর কোন জেলার সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক, চিঠিপত্র লেখা, যাতায়াত করতে পারবেন না। একমাত্র প্রধান পরিচালকই জেলাগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করবেন।

এক জেলা থেকে অপর কোন জেলায় চিঠিপত্র লিখতে হলে, জেলা সংগঠক সে চিঠি প্রধান কেন্দ্রে পাঠাবেন। প্রধান কেন্দ্র থেকে তা নির্দিষ্ট জেলার ভারপ্রাপ্ত সংগঠকের কাছে যাবে। অবশ্য বিশেষ কোন জরুরী অবস্থা বিবেচনা করে এ সমস্ত নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারবে। জেলার ভিতরকার উপশাখাগুলির চিঠিপত্রও জেলা সংগঠক এ নিয়মে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

কোন কর্মী যদি কোন জেলার বাসস্থান পরিত্যাগ করে চলে যান তবে তার নতুন জায়গার জন্য পরিচয়-পত্র প্রধান কেন্দ্রে পাঠাতে হবে এবং সময়মত তা যথাস্থানে চলে যাবে।

নবাগত ব্যক্তির পরিচয়-পর্ব শেষ করার পর সমিতিভুক্ত হয়ে গেলে সে আর তার পূর্বের জেলার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে বা চিঠিপত্র লিখতে পারবে না। কোন বিশেষ কারণে কারুর কাছে চিঠি লিখতে হলে তা স্থানীয় গ্রুপ বা ব্যাচ্ নেতার হাতে দিতে হবে। পরে সে চিঠি প্রধান কেন্দ্রের মারফৎ যথাস্থানে যাবে।

কোন সভ্য এক জেলার সমিতি সংক্রান্ত খবর অন্য জেলায় পাঠাতে পারবেন না।

জেলা সংগঠকের তত্ত্বাবধানে যদি কোন অস্ত্রশস্ত্র থাকে তবে তা তিনি প্রধান কেন্দ্রের আদেশ ভিন্ন ব্যবহার কিংবা নতুন অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারবেন না।

যার নামে চিঠিপত্র আসবে তিনি যেন কোনপ্রকারে পুলিসের সন্দেহভাজন না হন। তিনি রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সঙ্গে মিশবেন না বা তিনি এমন কোন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেও যোগ দিবেন না যেখানে তার লোকের কাছে বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ সমস্ত নিয়ম তাদের বেলাতেও প্রযোজ্য যাদের নিকট অস্ত্রশস্ত্র বা সমিতি সংক্রান্ত কাগজপত্র থাকবে। এ ছাড়াও এ সমস্ত ব্যক্তি কোনপ্রকার বলপ্রয়োগের কাজে বা বিপদ্জনক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করবে না। এদেরকে সাধারণত সমিতির অন্য কোন কাজে নিযুক্ত করা যাবে না। এরা হবেন বিনীত নম্র স্বভাবের এবং সর্বদা হাঙ্গামা এড়িয়ে চলবেন। তাছাড়া সমিতির সাধারণ সভ্যদের কাছেও তারা অপরিচিত থাকবেন।

যার নামে চিঠিপত্র আসবে তার কাছে অস্ত্রশস্ত্র বা সমিতি সংক্রান্ত কাগজপত্র থাকবে না; কিংবা গৃহত্যাগী ও গ্রেপ্তারী-পরোয়ানা প্রাপ্ত পলাতক কেহ বাস করবে না। এসব বাধানিষেধ তাদের বেলাতেও প্রযোজ্য হবে যাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বা সমিতি-সংক্রান্ত কাগজপত্র থাকবে। তবে এদের নামে কোন চিঠিপত্র আসতে পারবে না। মোটকথা এই যে চিঠি, কাগজপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র বিভিন্ন লোকের কাছে থাকবে।

যার নামে চিঠি আসবে তিনি তাঁর নিজের নামের

কোন চিঠিই খুলে পড়বেন না। তিনি সমস্তই পরিচালকের হাতে দিবেন।

প্রধান বা জেলা পরিচালক নিজের লেখা চিঠিপত্র হয় নিজেই ডাকবাক্সে ফেলবেন নয়ত কোন একজন বিশেষ লোকদ্বারা ফেলাবেন। কারণ পত্রের উপরে লেখা ঠিকানা অনাবশ্যক অপর কাউকে জানান হবে না।

পত্র পড়া হলে তা অবিলম্বে পুড়িয়ে বা অন্যকোন ভাবে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করতে হবে। চিঠিপত্র বা সমিতির প্ররোচনামূলক কাগজপত্র পোড়ালেই নিরাপদ হয় না। পোড়া কাগজ গুড়ো করে কিংবা জলে ভিজিয়ে নষ্ট করতে হবে। কারণ পোড়া কাগজও আস্ত থাকলে তা পড়া যায়।

সাধারণতঃ ব্লটিং কাগজ বা প্যাড ব্যবহার করা চলবে না। এমনি কাগজের কোন অংশ দ্বারা ব্লট করা হলে সে অংশ পুড়িয়ে বা অন্য কোনপ্রকারে নষ্ট করে ফেলতে হবে। কেননা, এমনি কাগজ পড়ে পুলিস অনেক ব্যাপার জানতে পেরেছিল এবং অনেককে গ্রেপ্তারও করেছিল।

কেন্দ্রের প্রধান পরিচালক বা পরিচালকদের মধ্যে কেউ জেলার কার্য পরিদর্শনের জন্য এলে জেলা সংগঠক তাঁর থাকবার এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন এবং জেলা সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় তাঁকে জানাবেন। সমিতির উপযুক্ত সভ্যদের ক্রমান্বয়ে প্রধান পরিচালকের নিকট উপস্থিত করে পরিচয় করিয়ে দিবেন। এ ছাড়াও কেন্দ্রের পরিচালক যদি অন্য কাহারও সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন তবে জেলা সংগঠক তাঁকে কেন্দ্র পরিচালকের নিকট উপস্থিত করবেন। বিনা প্রয়োজনে বা বিনা অনুমতিতে আলাপের সময় অপর কোন লোক উপস্থিত থাকতে পারবে না।

জেলা সংগঠক এক জেলা থেকে অপর জেলায় বদলী বা অন্য কোন কার্যে নিযুক্ত হলে পূর্ব জেলার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না বা কোন চিঠিপত্র লিখতে পারবেন না। প্রয়োজন বোধে চিঠিপত্র প্রধান কেন্দ্রের মারফৎ লিখবেন।

সমিতির সভ্যগণ পরস্পরের নিকট ব্যক্তিগত বা বন্ধুভাবে কোন চিঠি লিখতে পারবে না। কারণ অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গেছে যে এমনি চিঠিপত্রের সূত্র ধরে এক জেলায় গ্রেপ্তারের ঢেউ অপর অনেক জেলাতেও পৌঁচেছে।

শ্রেণীগত বিভাগে ব্যাচ (batch)-ই হবে সর্বনিম্ন। একক কোন ব্যাচেই পাঁচজনের বেশী সভ্য থাকবে না। পাঁচজনের বেশী হলে আর একটি ব্যাচ সৃষ্টি করতে হবে।

প্রত্যেক ব্যাচের সভ্যগণ ব্যাচ-পরিচালকের নির্দেশানুযায়ী চলবেন।

প্রত্যেক ব্যাচ-নেতা তাঁর অধীনস্থ সভ্যদের সমস্ত খবর রাখবেন। সমিতির কাজ ছাড়াও বাকী সময় তাদের কি ভাবে অতিবাহিত হয় তা নেতার নিকট অজ্ঞাত থাকবে না। নেতার নিকট সভ্যদের কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকবে না।

সমিতির কাজ, গৃহের কাজ বা প্রকাশ্য কারণ ছাড়া যদি কোন সভ্যের অসঙ্গতিসূচক অভ্যাস লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ যখন-তখন বাড়ীর বাহিরে চলে যায়, বেশী রাত্রে বাড়ী ফেরে, লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয় এবং স্কুলে অনুপস্থিত হতে শুরু করে তবে ব্যাচ-নেতা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবেন। সভ্যগণ কোন অবাঞ্ছনীয় লোকের সঙ্গে না মেশেন সেদিকে নেতার দৃষ্টি রাখতে হবে।

প্রথমে একজন সভ্যশ্রেণীভুক্ত হলেই কাজ শুরু হ'ল। এই সভ্য আর একজন সভ্য সংগ্রহ করবে। পরে এই দু'জন মিলে আরও সভ্য সংগ্রহ করবে। এই সভ্যদের মধ্যে কারুর সভ্য সংগ্রহ ক্ষমতা প্রতিপন্ন হলে তাকে প্রথম ব্যাচ থেকে আলাদা করে আর একটা ব্যাচ তৈরী করার অধিকার দিতে হবে। এ ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি ব্যাচের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সমস্ত সংগঠনই বর্ধিত আকার ধারণ করবে।

সমিতির কার্যে পদোন্নতি কেবল ধাপে ধাপেই হবে এমন কোন কথা নেই। প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণ থাকলে সভ্যকে যে কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করা যাবে।

জেলা সংগঠক প্রতি তিন মাস অন্তর জেলার কাজ-কর্ম, জেলা সম্বন্ধে নানা তথ্য এবং নতুন কোন প্রস্তাব থাকলে তা লিপিবদ্ধ করে ত্রৈমাসিক বিবরণী হিসাবে প্রধান কেন্দ্রে পাঠাবেন। এই বিবরণীগুলি এত সুন্দর ও তথ্যপূর্ণ হত যে, কেবলমাত্র এগুলির উপর নির্ভর করেই প্রধান কেন্দ্র থেকে কার্য পরিচালনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ জেলায় পাঠান সম্ভব হত।

আমার হাতে যখন সমিতির সংগাঠনিক পরিচালনার দায়িত্ব আসে তখনও আমি অধিকাংশ জেলায় পদার্পণই করি নি, নিজে গিয়ে জেলার কার্য পরিদর্শন করি নি। বহু লোকের সঙ্গে পরিচিতও হই নি। অথাপি এই সমস্ত ত্রৈমাসিক বিবরণী পাঠ করেই সুচারুরূপে কার্য নির্বাহ করতে ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে সমর্থ হয়েছি।

এ সমস্ত ত্রৈমাসিক বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ থাকত :

জেলা সংগঠকের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মানচিত্র ও তার ভু-সংস্থান। জলপথ ষ্টীমার লাইনসহ, স্থলপথ রেল লাইন সহ, টেলিগ্রাফ লাইন, বন-অরণ্য, জলাভূমি, পুল এবং সাঁকো।

ডাকঘর, ষ্টীমার ও রেল ষ্টেশন, থানা ও অন্যান্য পুলিশ ফাঁড়ি।

সাইকেল, মোটর, নৌকা, মোটর বোট, গরুর গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীর মোট সংখ্যা।

জনগণের মনোভাব। সরকারের প্রতি সহানুভূতি-শীল ও বিরুদ্ধবাদীদের মোটামুটি হিসাব।

গুপ্তচর ও সরকার পক্ষভুক্ত লোকের নাম ও পরিচয়।

বে-সরকারী জনগণের নিকট লাইসেন্স প্রাপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র থাকলে তাদের সংখ্যা এবং মালিকদের নাম ও ঠিকানা।

সরকারী অস্ত্রাগার বা অস্ত্রশালা থাকলে তার বর্ণনা এবং অস্ত্রের সংখ্যা।

বে-সরকারী কারুর কাছে লাইসেন্স বিহীন অস্ত্রশস্ত্র থাকলে তার খোঁজ-খবর।

রাজকোষ সম্বন্ধীয় খবরাখবর।

ধনীর সংখ্যা ও তাদের অর্থের আনুমানিক পরিমাণ।

ধর্মমন্দির থাকলে তার সংখ্যা ও নাম।

পণ্ডিত বাড়ী থাকলে তার অবস্থান।

খেয়াঘাটের সংখ্যা ও অবস্থান বর্ণনা।

জনসাধারণের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় ও আর্থিক অবস্থা।

প্রধান উৎপন্ন ফসল কি এবং তার পরিমাণ।

লোহার কারখানার সংখ্যা ও অবস্থান।

কোন প্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান থাকলে তার বর্ণনা।

জেলাবোর্ড নিয়ন্ত্রিত রাস্তা। জনসাধারণের পায়ে চলা রাস্তার প্রধান কোনগুলি। এবং এমনি জল ও স্থলপথের বিশেষ বিশেষ ল্যাণ্ডমার্কগুলির বর্ণনা। ব্যবসায় কেন্দ্র, বন্দর ও জেলার প্রচলিত ব্যবসাগুলি কি কি।

সমিতির সভ্য সংখ্যা। কতজন এবং কে কে নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী বলে স্বীকৃত। যে যে সভ্য গৃহত্যাগ করতে প্রস্তুত সে সে সভ্যের নাম।

দায়িত্বপূর্ণ কাজের উপযুক্ত সভ্যদের নাম।

সমিতির বিরোধীদের নাম ও বর্ণনা।

সমিতির সভ্যদের মধ্যে কার কার অভিভাবক বা আত্মীয় সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। এবং অভিভাবক-দের মধ্যে পুলিশ অফিসার থাকলে তার নাম।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ও বর্ণনা। শিক্ষকদের মধ্যে কেহ গুপ্তচর থাকলে তাদের নাম।

সেবাসমিতি বা সে জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান থাকলে তার বর্ণনা। জনসাধারণের পাঠাগার বা হাসপাতাল থাকলে তাদের সংখ্যা ও বর্ণনা।

পায়ে হাঁটা বা জলপথে বা অন্য কোন উপায়ে জেলার বাইরে দ্রুত যাওয়া বা আসার উপায় বা পথগুলি ও তাদের বর্ণনা।

জেলার স্বাস্থ্য, কোন কোন রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী এবং তাদের প্রতিকারের জন্য সরকারী বা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে কিনা।

এই ত গেল ত্রৈমাসিক বিবরণীর মোটামুটি বিষয়বস্তু। জেলা সংগঠকের এ ছাড়াও দৃষ্টি রাখতে হত সমিতির বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র চলছে কিনা বা কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করছে কিনা। টের পাওয়া মাত্র জানিয়ে দিয়ে তাদের নির্দেশমত জেলা সংগঠক প্রতিকারে যত্নবান হবেন।

ক্রমশঃ

সমান্তরাল

শ্রীসুধীর চক্রবর্ত্তী

যতবার দেশে যাই, যেন কোন প্রাক্তন প্রহর
ফিরে আসে। বংশলতিকার মত ক্রমিক তালিকা
উনবিংশ শতাব্দীর পৈতৃক বাড়ির সিঁড়ি। স্মৃতি।
চিলেকোঠা ছাদে উঠে প্রতিবারই লিখে রেখে আসি
নখক্ষতে নামাবলী। সাবেক কালের সেই বাসি
গন্ধ ঝাপটায় চামচিকে। শ্লথদন্ত মহাকৃতি
সরীসৃপ যেন এই বাড়ি। আর প্রাঙ্গণ-পালিকা
এক বাগ্দী বউ হাসে। তার পরে জ্বালার শহর।

দেশ থেকে যতবার এ শহরে ফের আসি ফিরে
কি-যেন বিষণ্ণবোধ বুকে ঠেকে। কি-এক দহন
সহস্রাক্ষ শোকের মতন আমাকে জ্বালায়। কাঁদি।
বিষাদ বৃক্ষের মূলে জল ঢেলে অযোনিসম্ভবা
জাতিস্মর শোক আমি বুকে নিই। রাত্রি সমুদ্ভবা
সূর্য পুনর্জন্ম পায়। তবু কান্না অনন্ত অনাদি
অন্তর্ময়। তারপরে হে ঈশ্বর, নির্জনে সহন
করি সব জ্বালা। মিশে যাই পঞ্চাশ লক্ষের ভীড়ে

—০—

সময়ের অন্ধকারে

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

বকের মত কি শুভ্র মেঘমায়া ইন্দ্রনীলে ছড়িয়ে আশ্বিন
এসেছে; আঁচলে নম্র শেফালি পদ্মের গন্ধ; মাঠের শিয়রে
ধানের সবুজ শীষে হাওয়ার মধুর সুর বাজায়; অঝোরে
ঝরে কি আশ্চর্য স্বপ্ন আশ্বিনের ছায়াপথে। তথাপি সে দিন

যে স্বপ্ন জড়ালে বাহু শ্রাবণী আকাশে তাকে পেলে কি? বোঝ না
সময়ের অন্ধকারে অঞ্জলি দিয়েছ যাকে সে কি আর আসে—
ভোরের শিশিরবিন্দু দেখো দেখি পাও নাকি দিনান্তের ঘাসে!
পেলে কি? পাবে না জানি হলুদ রৌদ্রের মাঠে। হয় তো বা বোনা

হবে না হবে না এই আশ্বিনেরও স্বপ্ন কলি অঘ্রাণের মাঠে।
পেছনে তাকাও কেন? পেছনে মৃত্যুর দৃশ্য, নেমে আসবে ভয়।
প্রেতায়িত স্মৃতিশিল্পে বিদীর্ণ হয়ো না আর, অশান্ত হৃদয়
দৃশ্যায়িত লগ্নভ্রষ্ট করো না হাত রেখে ওই স্মৃতির কপাটে।

আশ্বিনের মত দেখবে হেমন্তে শীতে ও গ্রীষ্মে বসন্তে বর্ষায়
কত না স্বপ্নের শস্য ঋতুতে ঋতুতে ফলে, আবার শুকায়।

—০—

স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

চার

শোভনা কিছু বললে না। শুধু তার মুখের লৌকিকতার হাসিটা ইচ্ছে করেই মুছে দিলে।

নিখিল বক্সীর চোখে তা না পড়বারই কথা। পড়লেও তার গলার স্বর কি বলার ভঙ্গি বদলাল না।

নামটা জানিয়েই যেন সে অন্তরঙ্গতার দাবী পাকা করে ফেলেছে এমনি অসঙ্কোচে নিখিল তখন বলে চলেছে—আমার মাকে ত দেখেছেন। বয়স কত বলতে পারেন?

অত্যাচার করবার আবদার থেকে মার বয়স কত জিজ্ঞাসার এই অসংলগ্ন প্রলাপে শোভনার মুখে একটু বুঝি ভ্রূকুটি ফুটে উঠেছিল। সেটা এবার নিখিল বক্সীর দৃষ্টি এড়াল না।

হেসে বললে—কি আবোলতাবোল বকছি ভাবছেন ত? আসলে এটা হচ্ছে ভূমিকা, বুঝছেন। অত্যাচারটা কি রকম তা বোঝাতে হবে ত? শুনুন, মার আমার বয়স ষাট। আমি হলাম অষ্টম গর্ভের সন্তান…

হঠাৎ শোভনার মুখের চেহারা লক্ষ্য করেই বোধহয় বক্তৃতা মাঝপথে থামিয়ে গম্ভীর হয়ে নিখিল বললে—থাক্ ভূমিকা। আপনার ছুঁচসুতো আছে?

শুধু নিখিল বক্সীর বলার ভঙ্গিতেই নয়, অতখানি ভণিতার পর এই অপ্রত্যাশিত পরিণতিতেও শোভনা হেসে ফেললে।

তার পর কৌতুক-প্রসন্ন মুখে না বলে পারলে না.—আছে। কিন্তু ছুঁচ সুতোর সঙ্গে আপনার মার বয়সের কি সম্পর্ক?

বুঝতে পারলেন না? নিখিল আবার উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল—মাকে এই গুণধর ছেলের জন্যে কি করতে হয় দেখেছেন ত? অষ্টম গর্ভের সন্তান হয়ে—আর কিছু না পারি একটা কীর্তি রেখে যাচ্ছি। বুড়ী মাকে এমন দাসী বাঁদীর মত খাটাতে আর কোন স্বনামধন্য পুরুষ পেরেছেন বলে ইতিহাসে জানা নেই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে একটা। চাকরানী থেকে রাঁধুনীগিরি মা মরে মরে হাতড়ে হাতড়ে সব করেন, শুধু চোখ দুটো একেবারে গিয়ে ওই সেলাইয়ের কাজটা ওঁকে দিয়ে আর হয় না। আমার আবার এমন বেয়াড়া সখ যে জামায় কাপড়ে সেলাই না হলে পরতে ভালো লাগে না।…

ভদ্রলোকের কথার স্রোত আবার এমন প্রবল হয়ে উঠবে জানলে শোভনা অসতর্ক হয়ে ওই সামান্য কৌতুক-টুকু নিশ্চয় প্রকাশ করত না। এখন নিজের ভুল শোধরাতে তাড়াতাড়ি কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললে—আপনি দাঁড়ান, আমি ছুঁচসুতো এনে দিচ্ছি।

ঘরের ভেতর গিয়ে ছুঁচসুতো যে ছোট টিনের বাক্সে থাকে সেটা খুঁজতে একটু দেরী হ'ল। এ ক'দিন ঘর সংসারের কোন কিছুতে মনই দিতে পারেনি। জিনিস-পত্র সব অগোছালো হয়েই আছে।

ছুঁচসুতোর বাক্সটা শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়াবার পর শোভনা কিন্তু অবাক্।

নিখিল বক্সী সেখানে নেই।

ভদ্রলোক গেল কোথায়?

এমনিতেই ভদ্রলোকের কথাবার্তা, ধরনধারণ অদ্ভুত লেগেছিল, এখন যেন তার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ আছে বলে সন্দেহ হ'ল।

পাগলামি যদি না হয় তা হলে অত ভণিতা করে ছুঁচসুতো চাওয়ার পর তা না নিয়েই চলে যাওয়া কি ধরনের রসিকতা?

জানা নেই শোনা নেই অপরিচিতা একজন ভদ্র-মহিলার সঙ্গে এরকম রসিকতা নেহাৎ বর্বর ছাড়া কেউ করতে পারে?

শোভনার একবার মনে হ'ল ছুঁচসুতোর বাক্সটা নিয়ে সোজা নিখিল বক্সীদের ঘরেই গিয়ে চড়াও হয়। গিয়ে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে, এ অভদ্র রসিকতার মানে কি?

কিন্তু সকালের যে প্রসন্নতা ইতিমধ্যেই খানিকটা অকারণে নষ্ট হয়েছে তা আর সে সম্পূর্ণভাবে হারাতে চায় না।

বাক্সটা নিয়ে ঘরের দিকে ফিরতে না ফিরতেই কিন্তু নিখিল বক্সী আবার এসে হাজির। মুখে তার সকৌতুক হাসি, হাতে একটি জামা।

আকস্মিক অন্তর্ধানের কৈফিয়ৎটা প্রথমেই সে দিয়ে

নিলে, এই জামাটা আনতে গেছলাম। দুটো হাতা ধরে সেটা টান করে তুলে নিখিল তারপর বললে, ছেঁড়া দেখতে পাচ্ছেন?

শোভনা জবাব দিল না। কিন্তু তার মৌন গাম্ভীর্যেও নিখিল এখন আর দমবার নয়। হেসে বললে, পেলেন না ত? আমাদের মত ভাগ্যবানদের জামা কোথায় ছেঁড়ে জানেন? পকেট দুটোয়। পকেট গড়ের মাঠ হলে কি হয়, ওইটের উপরই নিয়তির প্রথম টান। আর ছেঁড়া পকেট সেলাই করা যে কি শক্ত!

এই নিন ছুঁচসুতো! শোভনা বাক্সটা খুলে নিখিলের দিকে বাড়িয়ে ধরলে। তার মুখ যেমন গম্ভীর তেমনি গলার স্বর।

আমি নেব! নিখিল যেন হতভম্ব—আমি নিয়ে কি করব?

কি করবেন তা আমি কি করে জানব! আপনি ত ছুঁচসুতোই চাইলেন শোভনার গলায় বিরক্তিরই আভাস।

কিন্তু নিখিল যেন তাতে নির্বিকার, হ্যাঁ চাইলাম, কিন্তু সে কি নিজে সেলাই করব বলে? ওই ছেঁড়া পকেট সেলাই করা আমার কর্ম!

শোভনার অবিবেচনায় নিখিলই যেন ক্ষুণ্ণ।

বলার ভঙ্গিতে অস্বস্তি বিরক্তির মধ্যেই শোভনার হাসি পেল। গলাটা তবু একটু কঠিন রেখেই বললে, সেলাইটা কি আমায় করতে হবে বলছেন?

তা ছাড়া কি! নিখিল অকুণ্ঠিত, একটু অন্যায় আব্দার হচ্ছে মনে করতে পারেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একটু ক্ষমাঘেন্না করে নেবেন এই বুঝে যে, বুড়ী মাকেই যে খাটিয়ে খাটিয়ে হাড় কালি করে দিতে পারে তার বিচার-বিবেচনা আর কত হবে!

আচ্ছা, জামাটা তাহলে রেখে যান। বিকেলে নেবেন।

কথা আর না বাড়াতে দেবার জন্যে জামাটা একরকম নিজেই টেনে নিয়ে শোভনা ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকে ইচ্ছে করেই দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিলে।

ছেলেবেলা মার সঙ্গে অনেকবার যাত্রা দেখতে যাবার কথা মনে আছে শোভনার।

জনা, সুরথ উদ্ধার, এমন একটা দুটো পালার নামও ভোলে নি এখনো। অত্যন্ত করুণ পালা। মনে আছে মা সারাক্ষণ যাত্রা দেখতে দেখতে কেঁদে ভাসাতেন। কিন্তু সেই করুণ পালার মাঝখানেও হঠাৎ আচমকা দু' একজন ভাঁড় এসে খানিকক্ষণ হাসিয়ে লুটোপুটি খাইয়ে যেত। অবান্তর অর্থহীন হাসি। কিন্তু ভালো লাগত।

সকালের নিখিল বক্সীর ব্যাপারটাও তেমনি তার জীবনে একান্ত অবান্তর অসংলগ্ন হলেও খুব খারাপ লাগে না ভাবতে।

সকালে শোভনা আশুবাবুর জন্যে রান্না করেছে। খেয়েছেও অবশ্য সেখানেই। আশুবাবু তাঁর সঙ্গেই বসতে বলেছিলেন। শোভনা সে কথা শোনে নি। তাঁকে খাইয়ে তারপর বসেছে খেতে।

অস্বস্তি লেগেছে একটু, আশুবাবু নিজে এসে বসে থাকার দরুণ। আশুবাবু অবশ্য খাওয়ান নিয়ে বাড়াবাড়ি কিছু করেন নি। বাড়াবাড়ি করা তাঁর যে স্বভাব নয় এটুকু অন্ততঃ এখানে আসার পর সামান্য পরিচয় যা হয়েছে তাতেই বুঝেছে। আশুবাবু তাকে যতটা সম্ভব সহজ হতে দেবার জন্যেই বসে থেকেছেন মনে হয়েছে। তাকে ঠিক রাঁধুনী হিসেবে নেবার অনুগ্রহ যে এটা নয় তা বোঝানোও তাঁর কতকটা উদ্দেশ্য বোধ হয়। বেশী কথা তিনি বলেন নি। সামান্য দু' চারটে কথা যা বলেছেন তাতে একটা ইঙ্গিত কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শোভনাকে রান্নার ভার দেওয়ার এই ব্যবস্থাটা দু'এক দিনের সাময়িক ব্যাপার নয়, আশুবাবু এটা পাকা বলেই ধরে নিতে চান।

এক সময়ে অবান্তর ভাবেই ঘুরিয়ে কথাটা বলেছেন, রান্না তোমার ভালো মা, কিন্তু আজ যেমন নেমন্তন্ন খাওয়ালে তা রোজ রোজ খাওয়ালে এ মরা পেটে সইবে না। হিতে বিপরীত হয়ে দু'দিনেই টেঁসে যাব।

নেহাৎ কথার উত্তর দেওয়া দরকার বলেই শোভনা বলেছে, আজ এমন কিছু ত রাঁধি নি!

মধুর হোটেলে খেয়ে যার দিন কাটে এই রান্নাই তার কাছে ভুরিভোজ! আশুবাবু একটু হেসে বলেছেন, আর একটু হাতটান করতে হবে, বুঝেছ?

আর একবার অমনি অকারণে বলেছেন, মধুর রান্নার ভয়ে আমিষ ত ছেড়েই দিয়েছি কতকাল। স্বাদই ভুলে গেছি বলতে গেলে।

আপনি কি মাছ-মাংস খান? আশুবাবুর ঘরে রান্নার যা সাজ-সরঞ্জাম দেখেছে, তাই থেকেই একটু অবাক্ হয়ে শোভনা প্রশ্ন করেছে।

খাব না কেন? আমি কি সন্ন্যাসী! তুমি রেঁধেই দেখো না। বলে আশুবাবু খাওয়ার শেষের দিকে হঠাৎ উঠে গেছেন।

শোভনা কৃতজ্ঞ হয়েছে সন্দেহ নেই। বর্তমানের

সবচেয়ে কঠিন সমস্যার এমন সহজ মীমাংসা সে কল্পনা করতেও পারে নি। ভাগ্যের নির্মম আঘাতের সঙ্গে এই অপ্রত্যাশিত করুণাটুকু যেন অযৌক্তিক ভাবে মেশানো।

আশুবাবুর কথায়-বার্তায় ও ধরন-ধারণে বোঝা গেছে যে খাওয়া-থাকার ভাবনাটা এখনকার মত অন্ততঃ সে ভুলেই থাকতে পারে। মাত্র পাঁচ টাকা যার সংসারে সম্বল তার পক্ষে এটা কম কথা নয়।

কিন্তু এই মীমাংসাই কি যথেষ্ট?

আশুবাবু তাঁর অনুগ্রহ বুঝতে দিতে চান না একথা ঠিক। তাঁর নিজের প্রয়োজনের অজুহাত দিয়ে তিনি এ অহেতুক দয়া ঢেকে রাখতে ক্রটি করবেন না, কিন্তু তবু শোভনা নিশ্চিন্তভাবে পরিতৃপ্ত হতে পারছে না কেন?

কেন মনে হচ্ছে ভাগ্যের এই অপ্রত্যাশিত করুণার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ পরিহাসই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। তার ভাঙা নৌকো অকূল সমুদ্রে ভাসিয়েও ভাগ্য যেন কাছির দড়ি দিয়ে তীরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। জীবনের এত বড় কঠিন পরীক্ষায় এমন সহজ সমাধান মেনে নিলে তার সত্তাকেই যেন অসম্মান করা হয়।

নিখিল বক্সীর জামাটা দুপুরে ঘরে বসে সেলাই করতে করতে শোভনা এলোমেলো ভাবে এই সব কথাই ভাবছিল।

নিখিল বক্সীর কথাটা মনে পড়লে এখন একটু কৌতুক বোধই হয়।

কিন্তু মানুষটা সত্যিই শুধু হাস্যাস্পদ কি?

কথার বাঁধুনি নেই, ধরন-ধারণ সপ্রতিভ হওয়া সত্ত্বেও অদ্ভুত, কিন্তু সবসুদ্ধ জড়িয়ে কোথায় যেন কি একটা দুর্বোধ কিছু আছে।

চেহারাটাই কেমন খাপছাড়া। নিতান্ত রোগা লম্বা কিন্তু দুর্বল মনে হয় না। মুখখানা কুড়ুলের মত লম্বাটে ছুঁচলো। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে তা আরও বিশ্রীই দেখিয়েছে। তবু মানুষটার ভাঁড়ামীর ধরন ও বেয়াড়াপনা সত্ত্বেও তেমন বিরক্ত হয়ে যেন থাকা যায় না। বরং একটু সহানুভূতিই জাগে।

সেটা কি অবস্থার মিলের জন্যেই?

ভদ্রলোকের আর্থিক অবস্থা তার মত না হোক বিশেষ যে ভালো তা মনে হয় না। কথায় কথায় কি একটা রাত্রের কাজের কথা যেন বলেছিলেন। সে কাজটাও গেছে বলেই মনে হ'ল। মার কথা থেকে থেকে তোলার মধ্যে কোথায় যেন একটা আত্মগ্লানিই আছে।

ওই কয়েক মুহূর্তের চেনা মানুষটার সম্বন্ধে এত কথা ভাবছে দেখে শোভনা নিজেই হঠাৎ অবাক্ হয়।

না, মানুষটা সম্বন্ধে সত্যিই এমন কোন কৌতূহল তার ত নেই। এ বোধহয় শূন্য মনের একটা বিলাস। কিংবা মনটা শূন্য রাখবার জন্যেই নিজের অজ্ঞাতে একটা চেষ্টা।

সকালের সে প্রসন্নতা অনেক আগেই কেটে গেছে বটে কিন্তু সমস্ত ভাবনা স্বাভাবিক ভাবে যেদিকে গড়িয়ে যেতে চায় সেদিকে সে যেতে দেবে না।

সকালের প্রসন্নতা আসলে শারীরিক, সে বোঝে। কিন্তু শারীরিক প্রসন্নতার দামই বা কম কি?

তাইতে সন্তুষ্ট থাকতে পারলে ত জীবনের বেশীর ভাগ সমস্যা মিটে যায়।

কোথায় কার লেখায় পশুদের প্রশস্তির কথা যেন পড়েছিল। কোন কবিতাতেই বোধ হয়। পশুদের মনের বালাই নেই বললেই হয়। কিন্তু তাতে এমন কি লোকসান?

মানুষ মনের রাজ্যে পৌঁছে খুব বেশী জিতেছে কি? মনের বাসনা মেটাতে ঝামেলা পোহাতেই ত অস্থির।

এ সবও উদ্ভট ভাবনা সন্দেহ নেই। মনের বালাই আছে বলেই মনের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ।

তবু উদ্ভট ভাবনাও এখন ভালো। পশুদের প্রশস্তির সেই কবিতাটা কার এখন মনে পড়ছে না। আশ্চর্য লাগে ভাবতে যে সে এককালে কবিতা পড়ত।

শুধু কবিতা পড়ত কেন, প্রথম কলেজে ঢুকে কলেজের কাগজে একটা গল্পও লিখে ফেলেছিল।

অধ্যাপকেরা কেউ কেউ প্রশংসা করেছিলেন।

কি সে গল্পটা। কিছু কিছু মনে পড়ছে। মনে পড়ে হাসিও পায়। তখন ধারণা হয়েছিল, খুব একটা সাহসিক আধুনিক গল্প লিখে ফেলেছে।

ভাষার দোষক্রটি যা থাক, গল্পের বিষয়টির জোরাল কিছু আছে বলে মনে মনে একটু অহঙ্কার ছিল।

কি ছিল গল্পটায়?

না, একেবারে অসামাজিক দুর্দান্ত কিছু নয়। তবে তখনকার সদ্য কলেজে ওঠা মেয়ের ধারণায় বেশ অসাধারণ একটি মেয়ের গল্প।

সকলের মতের বিরুদ্ধে, ভুল করে একজন চরিত্রহীন প্রতারককে বিয়ে করে, স্বামীর সত্যকার পরিচয় পাবার পর নিজেই যে স্বামীকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করতে সাহায্য করেছিল এমন একটি মেয়ের কাহিনী। প্রেমের চেয়েও জীবনের সত্য বড় এইরকম একটা কথা সে গল্পে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলবার চেষ্টা করেছিল।

সে কথার দাম এখনও তার কাছে কিছু আছে কি!

অমন কাটাছাঁটা সত্য ধরে থাকতে জীবন দেয় কই!

ঘরটা অন্ধকার হয়ে এসেছে এই বিকেলেই। বাইরে হঠাৎ বৃষ্টি নেমেছে।

জামাটার সেলাই শেষ করে তুলে রাখতে যাচ্ছে এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। দরজা ভেজানই ছিল।

কে? বলে সাড়া দিতেই দরজাটা একটু ঠেলে নিখিল বক্সীকেই উঁকি দিতে দেখা গেল।

আসব?

এক পা যে ভেতরে বাড়িয়েই দিয়েছে ইতিমধ্যে, তাকে আসুন ছাড়া আর কি বলা যায় এখন।

আপনার জামাটা সেলাই হয়ে গেছে। নিয়ে যান! শোভনা জামাটা নিখিলের হাতে তুলে দিলে।

নিখিলের কিন্তু নড়বার নাম নেই। ঘরের এদিক্ ওদিক্ চেয়ে বললে, বলে ত দিলেন, নিয়ে যান। এখন যাই কি করে? কিরকম বৃষ্টি দেখেছেন ত। এটুকু আসতেই ত ভিজে গেলাম।

নিখিল বক্সী ভিজে গেছে সত্যি। বাইরে বৃষ্টিটা বেশ জোরেই পড়ছে।

শোভনা অবশ্য বলতে পারত, ভিজে আসতে যখন পেরেছেন তখন যেতে আপত্তি কিসের?

কিন্তু কথার রূঢ়তাটা একটু মোলায়েম করেই বললে, -ভিজে তাহলে এলেন কেন? একটু পরে এলেই পারতেন?

যা উচিত তা কি সব সময়ে পারা যায়?—নিখিলের ধরনধারণে ঘর ছেড়ে যাবার কোন লক্ষণ নেই। এদিক্ ওদিকে আর একবার চোখ বুলিয়ে প্রশংসার সুরে বললে,—আপনি ত ঘরসংসার বেশ সংক্ষেপ করে নিয়েছেন দেখছি। একেবারে streamlined যাকে বলে। আজকালকার যুগে এই না হলে চলে? আর আমার মার ঘরে গিয়ে দেখুন না একবার। আমার জন্মের আগে থেকে যেখানে যা ছিল তার কিছু মা ফেলতে রাজি নয়। ঘরটি আমাদের পরিবারের ঐতিহাসিক যাদুঘর বলতে পারেন। এদিকে সেকেলে চকমেলানো দালান যে চোরকুঠুরি হয়ে এসেছে, মার সে খেয়াল নেই। জিনিসপত্রের জ্বালায় আমাদেরই ঘরে আর জায়গা হয় না।

নিখিলের সঙ্গে এই অবান্তর আলাপ দীর্ঘ করার বাসনা শোভনার নেই। সে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে একরকম নীরস কণ্ঠেই বললে,—বৃষ্টিটা একটু কমেছে বোধহয়। উড়ো মেঘের বৃষ্টি।

নিখিল বক্সীর কাছে এ ইঙ্গিত ব্যর্থ। শেষের এই অসতর্কভাবে বলা কথাটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট।

ওই উড়ো মেঘের বৃষ্টি নিয়েই ত মুশকিল। বুঝেছেন? কখন আসবে যাবে কিছু ঠিক নেই। অবশ্য এক হিসেবে সমস্ত পৃথিবীটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত হলেও ভাল লাগত না। আচমকা সব কিছু হয় বলেই আমাদের মত ভাগ্যবানেরা তবু জীবনে একটু রসকষ খুঁজে পায়। এই দেখুন না···

শোভনা মাঝপথেই বাধা দিয়ে বললে—আপনার জামাটা ঠিক সেলাই হয়েছে ত? দেখেছেন?

ও, জামাটা?—নিখিল একবার জামাটার দিকে চোখ বুলিয়ে বললে—হ্যাঁ, ও ঠিক আছে। ও পকেট ত কিছু রাখবার জন্যে নয়, শুধু মাঝে মাঝে নিজের হাত গলাবার জন্যে। তবে বুঝেছেন কি না, আজ এ জামাটা না হলেই চলত না। জামা তা বলে আমার এই একটি মনে করবেন না। দস্তুর মত আরও দুটি আছে। একটি রীতিমত গিলে করা, পরে বেরুলে কে না বলবে ভদ্রলোক। তবে সেটি ত আর যখন তখন ব্যবহার করা যায় না? আর একটি ধোপার বাড়ি থেকে আর ফিরছে না। ধোপা বোধ হয় বাকি মজুরীর দরুণ সেটা বাজেয়াপ্তই করে নিয়েছে এতদিনে। সুতরাং এই জামাটি দিয়েই আজ অসাধ্যসাধন করতে হবে। এটি আবার আমার অত্যন্ত পয়া জামা, জানেন? প্রথম পরে গেলে একেবারে নির্ঘাৎ বাজি মাৎ, কাজ একটা জুটে যাবেই তা সে একবেলারই হোক বা এক মাসের···

হঠাৎ নিজেই বক্তৃতা থামিয়ে নিখিল শোভনার উৎসাহহীন মুখের দিকে চেয়ে বললে—এই দেখুন, নিজের মনের উচ্ছ্বাসে আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম।

আসল কথা ত জামাটা—শোভনা না বলে পারলনা।

না, না, জামা হবে কেন? জামাটা ত একটা ছুতো।

ছুতো!—শোভনা রাগবে, না অবাক্ হবে বুঝতে পারল না।

না, মানে মিথ্যে ছুতো নয়, সত্যিই জামাটা সেলাই না করলে চলত না আজ। আর মা সেলাই করতে পারেন না তাও যেমন সত্যি, ঘরে ছুঁচসুতো নেই তাও তেমনি। আমি অবশ্য আপনার কাছে ছুঁচসুতো নিয়ে কোন রকম ফোঁড় সেলাই দিতে পারতাম।···

আপনার আসল কথাটা কি?—শোভনার গলা বেশ কঠিন।

এই দেখুন! আপনি যেন সাংঘাতিক কিছু ভাবছেন মনে হচ্ছে। সাংঘাতিক-টাংঘাতিক কিছুই নয়। সামান্য আমার একটু কৌতূহল।· মা বলছিলেন, আপনার

স্বামীকে নাকি অনেক দিন ধরে দেখছেন না। তিনি বাইরে কোথাও গেছেন বুঝি?

নিখিল উত্তরের জন্যে থামলে শোভনা সত্যিই বিপদে পড়ত, কিন্তু সে এক নিঃশ্বাসে বলে চলল—এতদিন ত দিনের বেলা কারুর খোঁজখবর নিতে পারি নি। তাই ভাবছিলাম, তিনি এলে একটু আলাপ করতাম। তিনি আসছেন কবে?

জানি না।—শোভনার উত্তর দিতে দেরী হ'ল না।

জানেন না! বাঃ! তা এখন তিনি আছেন কোথায়?

বেশ খানিকটা নীরবতার পর শোভনার কঠিন গলার জবাব এল—জানি না।

ক্রমশঃ

বিশ্বরূপ

শ্রীদিলীপকুমার রায়

শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার লিখেছিলেন যে, একাদশ অধ্যায়ে গীতার বিশ্বরূপদর্শনে অর্জুনের স্তবের প্রেরণা অধিমানস (Overmental) লোক থেকে নেমেছিল। একথা বুঝতে পারি বা না পারি, এটুকু বললে অত্যুক্তি হবে না যে বিশ্বসাহিত্যেও এ আশ্চর্য স্তবটির জুড়ি নেই। কয়েক বৎসর আগে আমি এ স্তবটির সাতটি মাত্র শ্লোকের অনুবাদ করে অনামায়ে প্রকাশ করি। পরে ভাবুক মনীষী শ্রীমৎ অনির্বাণ লিখেছিলেন যে, এ-ছন্দে আমার সমস্ত স্তবটিই তর্জমা করা উচিত ছিল। বহু বৎসর প্রেরণার পথ চেয়ে থেকে সেই যে প্রেরণা নামল—অমনি একদিনেই আমি এই আটাশটি শ্লোকের অনুবাদ করি পুণায় হরিকৃষ্ণমন্দিরে। শ্রীমৎ অনির্বাণ উৎসাহ দিয়েছিলেন, এ-ঋণ স্বীকার করে শুধু এ-তর্জমার ছন্দ সম্বন্ধে দু'একটি কথা সংক্ষেপে বলব :

মাত্রাবৃত্ত ছন্দ চালু হবার পর থেকে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ত্রিমাত্রিক কদমে বড় কেউ আর কবিতা লেখেন না, কি গান বাঁধেন না। কিন্তু আমার মনে হয় এই মাত্রাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ওজঃশক্তি ও কল্লোল মাত্রাত্রিক মাত্রাবৃত্তের চেয়ে অনেক বেশী গভীর। তার কারণ সুবোধ্য : অক্ষরবৃত্ত ছন্দে শব্দসংঘাতে ওজঃশক্তি সহজেই জেগে ওঠে। মাত্রাবৃত্তের স্বভাব লালিত্য, এই জন্যেই মাত্রাবৃত্তে অমিত্রাক্ষর তেমন তৃপ্তি দিতে পারে না।

এই গেল পয়লা নম্বর। দোসরা নম্বর—শুধু এইটুকু বলা যে আমি এ-স্তবটির তর্জমা যথাসাধ্য মূলানুগ করেছি বলে, কিন্তু মূল স্তবের একটি শব্দেরই পুনঃপুনঃ প্রয়োগ সাধ্যমত বর্জন করেছি—বাংলা ও ইংরেজী কাব্যে এ-ধরণের পুনরুক্তি তৃপ্তিকর হয় না বলেই।

তিন : অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কখনও কখনও মাত্রাবৃত্ত উচ্চারণভঙ্গি সমর্থনীয় ব'লে দু'এক জায়গায় এ-ভঙ্গির প্রবর্তন করেছি ; যথা, ২৫ শ্লোকে দংষ্ট্রাকরাল ছয়মাত্রা, অন্যত্র সর্বত্র পাঁচমাত্রা—অক্ষরবৃত্তে যেমন হওয়ার কথা। ৪৩ শ্লোকে "পূজ্যতম" সম্পর্কেও এই কথা।

চার : এ-স্তবটি মূল সুরে গাওয়া যায় গতিভঙ্গির সাদৃশ্য থাকার দরুন। এই জন্যেই আরও এ-ছন্দটি আমার প্রিয়।

বিশ্বরূপদর্শনে-বিহ্বল অর্জুন কৃষ্ণের প্রতি :

১৫

নিরখি তোমার দেহে দেবদেব, নিখিল প্রাণী ও দেবতাগণে,
দিব্য ঋষিবৃন্দ, ভয়াল ভুজঙ্গ, প্রজাপতি ব্রহ্মা কমলাসনে!

১৬

অগণ্য আনন, উরস নয়ন, বাহু ও চরণ—যেদিকে চাই
দেখি বিশ্বেশ্বর, তব বিশ্বরূপ—আদি অন্ত মধ্য যাহার নাই!

১৭

হে কিরীটী, গদাচক্রধারী ! তেজ দুর্বিষহ তব— মার্তণ্ডপ্রভ,
যেদিকেই আঁখি ফিরাই হে, দেখি—অমিতাভ বহ্নিবৈভব তব !

১৮

তুমি পরব্রহ্ম, চিরবেদিতব্য, অখিলের শেষ আশ্রয় জানি,
সনাতন তুমি, শাশ্বত ধর্মের ধারক, মহান্ পুরুষ মানি !

১৯

অনাদিমধ্যান্ত, অগণিতবাহু, প্রদীপ্ত-অনলানন—অপার
তেজ যার দহে বিশ্ব— যে অনন্তবীর্য —চন্দ্রসূর্য লোচন যার,

২০

সে-অদ্বৈত তুমি ব্যাপ্ত জলে স্থলে অন্তরীক্ষে দিকে দিকে অশেষ !
এ-অচিন্ত্য উগ্র আবির্ভাবে তব ক্লিষ্ট ত্রিভুবন, হে ত্রিলোকেশ !

২১

দেবগণ তব মাঝে লীয়মান, কেহ কৃতাঞ্জলি প্রার্থনা করে,
মহর্ষি ও সিদ্ধবৃন্দ শান্তিপাঠ সহ গায় স্তব ঝংকৃত স্বরে !

২২

রুদ্রাদিত্য বসু মরুৎ গন্ধর্ব অশ্বিনীকুমার যক্ষ অসুর
সিদ্ধসাধ্যপিতৃগণ দেখে চেয়ে সবিস্ময়ে তব ব্যাপ্তি সুদূর !

২৩

বহুমুখনেত্রবাহু-উরুপাদ, বহূদর, বহুদংষ্ট্রাকরাল
রূপ দেখি তব ব্যথিত ত্রিলোক, ব্যথিত আমিও হে মহাকাল !

২৪

নভঃস্পর্শী দীপ্র বহুবর্ণ তব ব্যাদিত আনন, বিশাল আঁখি
হেরি' আমি কম্প্র উৎকণ্ঠায় কৃষ্ণ, চরণে তোমার শরণ মাগি ।

২৫

কালাগ্নিসন্নিভ দংষ্ট্রাকরাল মুখ দেখি' তব উপজে ত্রাস,
দিশাহারা আমি অশান্ত, আকুল—প্রসীদ, দেবেশ, জগন্নিবাস !

২৬

নৃপতিগণের সহ ধৃতরাষ্ট্রসুত, ভীষ্ম, দ্রোণ, রাধেয় আর
আমাদের মহাশূরগণ উন্মাবেগে ঝাঁপ দেয় মুখে তোমার !

২৭

ব্যাদিত বদনে তোমার করাল দশনে বিলগ্ন দুলিছে দেখি
তাহাদের কারো কারো বিচূর্ণিত শির—ভয়ানক দৃশ্য এ কি !

২৮

খর অম্বুবাহী বৃন্দ নদনদী সিন্ধুবুকে যথা নির্বাণ লভে,
ধরিত্রীর বীরবৃন্দ হয় তব প্রোজ্জ্বলন্ত মুখে বিলীন সবে !

২৯

প্রদীপ্ত শিখায় মহাবেগে ধায় পতঙ্গ যেমন মরণতরে,
আননে তোমার তেমনিই মৃত্যুমুখী এ-ব্রহ্মাণ্ড প্রবেশ করে ।

দীপ্ত গ্রসমান রসনায় বিষ্ণু! চরাচর তুমি করো লেহন,
উগ্র বহ্নিতেজ প্লাবনে তোমার নিখিল ভুবন করো দহন!

৩১

করো হে প্রকাশ কেবা তুমি রুদ্র? প্রণাম! প্রসীদ, করুণাময়!
জানাও তোমার আদিম স্বরূপ, জানি না কিছুই, দাও অভয়।

* * * * * *

৩৬

তোমার কীর্তির স্তবে নাথ, ভক্তিবিমুগ্ধ স্বতঃই তিন ভুবন,
দৈত্যেরা শঙ্কায় দিকে দিকে ধায়, সিদ্ধগণ সবে নমে চরণ।

৩৭

নমিবে তোমারে কে না মহাত্মন্!—স্বয়ম্ভুবো উর্ধ্বে যার বিলাস!
সদসৎ-পারে পরাৎপর যে অনন্ত, দেবেশ, জগন্নিবাস!

৩৮

তুমি আদিদেব, পুরাণ পুরুষ—হে অনন্তরূপ, বিশ্বনিধান!
জ্ঞানী, জ্ঞেয়, নিত্যধাম তুমি—রাজ্যে ব্যাপি চলাচল নিরবসান!

৩৯

বায়ু অগ্নি তুমি—বরুণ শশাঙ্ক প্রজাপতি প্রপিতামহ তুমি।
সহস্র প্রণাম নমো নমো—বার বার হে তোমার চরণ চুমি।

৪০

প্রণমি সম্মুখে, প্রণমি পিছনে, নমো নমো সর্বদিকে তোমার,
হে অনন্তবীর্য, অমিতবিক্রম, সর্বব্যাপী, বিশ্বভুবনাধার!

৪১

সখা ভ্রমে "সখা কৃষ্ণ" বলি ডাকি—আহারে বিহারে এক শয়নে,
একাসনে হাসি-প্রগলভতা যা করেছি প্রণয়ে তোমার সনে,

৪২

একান্তে কি সভামাঝে ভুলে তব মানের হানি যে করেছি হায়,
না জানি' তোমার মহিমা—অপার! ক্ষমিও সে-অপরাধ কৃপায়।

৪৩

এ-চরাচরের পিতা তুমি—আদিগুরু, গরীয়ান্, পূজ্যতম,
অসমোর্দ্ধ, চির-অমিতপ্রভাব ত্রিভুবনে তুমি, হে নিরুপম!

৪৪

হে বরেণ্য! তাই নমি নতশিরে প্রার্থি—ক্ষমি' দিও তব প্রসাদ,
পিতা, সখা, প্রিয় ক্ষমে যথা পুত্র, সখা ও প্রিয়ার শতাপরাধ।

৪৫

এ-অদৃষ্টপূর্ব মহাকায় হেরি হরিষে বিষাদ—জাগিছে ত্রাস
কৃতার্থ এ-প্রাণে: দাও দেখা তাই—প্রসীদ দেবেশ, জগন্নিবাস!

৪৬

তোমার মুকুট গদাচক্রধারী চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিতে সাধ!
হে সহস্রবাহু বিশ্বমূর্তি! হও আবির্ভূত সেই রূপে শ্রীনাথ!

স্বাদেশিকতায় রবীন্দ্রনাথ

শ্রীরণজিৎ ভট্টাচার্য

আমরা যে যুগে বাস করিতেছি জাতির মানসলোকে তাহা রবীন্দ্রযুগ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। ঋষি ও সত্যদ্রষ্টা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট্‌ ব্যক্তিত্বময় জীবনাদর্শ নানা রূপে নানা ভাবে নানা শাখাপ্রশাখায় এ যুগের সমস্ত চিন্তা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করিয়া রাখিয়াছে। কাব্য, সাহিত্য, নাটক, দর্শন, ধর্মনীতি, শিক্ষা, রাজনীতি —কোথায় না তাঁহার ভাস্বর প্রতিভার স্পর্শ পড়িয়াছে! তাই রবীন্দ্রনাথকে আমরা বলি, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ; বিশ্বপ্রেমিক ও মহামানবের পূজারী বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে আমরা গর্ব অনুভব করিয়া থাকি।

কিন্তু এ কথা ভুলিয়া গেলে চলিবে না—রবীন্দ্রনাথ সর্বাগ্রে স্বদেশ- ও স্বজাতি-প্রেমিক। তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র, তাঁহার সমস্ত কাব্যপ্রবাহের গঙ্গোত্রী ছিল এই স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম। এ সম্পর্কে বলা যায়,—'যুগে যুগে খোলস পরিবর্তন করিলেও পরাধীন আত্মনির্ভরতাহীন দেশের জন্য একটি দুশ্চিন্তাবোধ ও কল্যাণ সাধনের আগ্রহ রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম রচনা হইতে তাঁহার জীবনের প্রায় শেষ রচনা পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। একটা গভীর দেশাত্মবোধ ফল্গুর মত কবির অন্তরের গভীর গহনে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাঁহার জীবন ও কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি। কিন্তু যে মাতৃভূমির স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছেন তাহা বাংলার নয়—ভারতবর্ষের। ভারতের সার্বিক বেদনা, ভারতবাসীর নিঃস্ব রিক্ত জীবনের ছবি বারে বারে তিনি অনুভূতির চক্ষু মেলিয়া দেখিয়াছেন—"ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র,—কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়া-জীর্ণ প্লীহা রোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহাই যথার্থ দেখা।" এমনি বেদনার মধ্য দিয়াই কবি স্বদেশকে দেখিয়াছেন। এমনি অনুভূতি দিয়াই রিক্ত-সর্বস্ব ভারতের উদ্দেশে তিনি অজস্র গান কবিতা ও রচনার অর্ঘ্য উজাড় করিয়া দিয়াছেন। তাঁর জীবিতকালে ও পরে অনেক শক্তিমান্‌ কবি সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের কাহারও লেখনী দিয়া 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী' বা 'জনগণমনঅধিনায়ক' বাহির হয় নাই।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথ এক অটল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন। অবশ্য এই যে বিপুল স্বাদেশিকতাবোধ, ইহা তাঁহার জন্মসূত্রে পাওয়া। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার স্বদেশপ্রেমিকতার দৃষ্টান্তস্থল। যে সময় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার আবর্তে বাঙালীরা আপন মাতৃভাষাকেও ঠেলিয়া দিয়াছিল সেই সময়েও ঠাকুর পরিবারে নিয়মিত মাতৃভাষার চর্চা হইয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন—"স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকল প্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছিল।"

কবির এই স্বদেশপ্রেম সাধারণ্যে প্রকাশ পাইল ১৮৭৫ সালে। সেই সময় কলিকাতায় পার্শীবাগানে নবম বার্ষিক হিন্দুমেলা বসিয়াছে। তখনকার শিক্ষিত বাঙালীদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানই ছিল এই হিন্দুমেলা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হইবার আঠারো বৎসর আগে ১৮৬৭ সালে বাংলাদেশে এমনি করিয়া দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার কাজ সুরু হইয়াছিল। হিন্দুমেলার এই নবম বার্ষিক অধিবেশনে চৌদ্দ বছরের কিশোর রবীন্দ্রনাথ শত শত জনসাধারণের সামনে উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন:

"ঝংকারিয়া বীণা কবিবর গায়,—
কেন রে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস? হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে?

* * * * *

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন
পাইবে হায় রে নূতন জীবন,
ভারত ভস্মে আগুন জ্বালিয়া
আর কি কখনো দিবে রে জ্যোতি?"

কিশোর বয়সেই দেশের পরাধীনতা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে। তাঁহার কবি-মন ইহার প্রতিকারের সন্ধানে

থাকিয়া থাকিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই আকুতি হইতেই এই বৎসরই তাঁহার বিখ্যাত গানের জন্মলাভ সম্ভব হইয়াছে—

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, সহস্র প্রলয়
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।"

হিন্দুমেলার কর্মপন্থার মধ্যে ব্রিটিশ-শাসন-বিরোধী কিছু ছিল না। প্রধানতঃ স্বদেশী-শিল্পের পুনরুজ্জীবন এবং দেশবাসীর অন্তরে স্বদেশী ভাব জাগ্রত করাই ইহার লক্ষ্য ছিল। এই জাগরণমুখর পরিবেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-জীবন আরম্ভ হইল। হিন্দুমেলার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ বাংলার পথে-প্রান্তরে তখন যে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় ভাবের আবির্ভাব ধীরে ধীরে দেখা যাইতেছিল, কিশোর রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটু একটু করিয়া তাহার প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি ভারতবর্ষকে, ভারতবাসীকে ভালবাসিতে শিখিলেন, আপন বলিয়া জীবনে গ্রহণ করিতে শিখিলেন। এ কথা স্বীকার করিয়া কবি তাঁহার 'জীবনস্মৃতি'তে বলিয়াছেন—"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলে যে একটি মেলার সৃষ্টি হয় ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে ভক্তির সঙ্গে উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম।"

রবীন্দ্রনাথ যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, বাংলাদেশে তখন 'বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ'। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সাহিত্যিক ছিলেন না, বাংলার চিন্তা ও ভাব-জগতে তিনি একটা বিপ্লব আনিয়াছিলেন। এক কথায় তিনি ছিলেন একটা নবযুগের স্রষ্টা—নবীন বাঙালী জাতির পথপ্রদর্শক। আমাদের সমাজ ও সভ্যতা যখন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে বিপর্যস্ত হইতে বসিয়াছিল তখন জাতিকে এই বিকৃত ভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা আরম্ভ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রাজনারায়ণ বসু ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁহাদের কার্যে নিজেদের নিয়োজিত করিতে আগাইয়া আসেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জাতিকে নূতন করিয়া বাঁচিবার দীক্ষা দিয়া গেলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তিনি জাতি ও সমাজকে প্রাচীন জড়তা ও সংস্কারবাদের বদ্ধতা হইতে মুক্তি দিয়া একটা নব চেতনার প্রবাহ সৃষ্টি করিলেন। তাঁহার এই ভাস্বর প্রতিভার প্রভাব দেশের জাতীয় আন্দোলন ও স্বাদেশিকতার উপর যথেষ্ট পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই ভাবধারার যাঁহারা ছিলেন উত্তরসূরী রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অন্যতম। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য শিষ্য। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নহে, আত্মশক্তির সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ্য উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার তাঁহার আবাল্য বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করিয়াছিল যে, ভিক্ষা দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন দুঃস্বপ্ন মাত্র। সংগ্রামের পথই স্বাধীনতার পথ। কুসুমাস্তীর্ণ পথে স্বাধীনতার আনাগোনা নাই; জীবন তুচ্ছ করিয়া তাহার পথ বুকের রক্তে রাঙাইয়া দিতে হইবে। তবেই স্বাধীনতার বিজয়-রথের চাকা মহোল্লাসে গড়াইয়া চলিবে। তাই বিভিন্ন ভাবে বারে বারে তিনি দেশজননীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন। কখনও বলিয়াছেন:

"......দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অমোঘ শরগুলি
তোমার অক্ষয় তূণ।"

কখনও বা আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে বলিয়াছেন:

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ!
তোমারি তরে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।"

সতেরো বৎসর বয়সে কবি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। নূতন দেশ—তাহার পরিবেশ, সমাজ, সংকীর্ণতামুক্ত উদার দৃষ্টিকোণ, এ সমস্তই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু তারুণ্যের চপলতার মধ্যেও তিনি এই বৈদেশিক সভ্যতার মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া যান নাই। মুহূর্তের জন্যও তিনি ভোলেন নাই যে, তিনি বাঙালী—ভারতবাসী।

"যেখানে এসেছি আমি, নহি সেথাকার,
দরিদ্র সন্তান আমি দীনা ধরণীর,
জন্মাবধি যা পেয়েছি সুখদুখভার,
বহুভাগ্য বলি তাই করিয়াছি স্থির।"

এমনি করিয়াই দেশজননীর প্রতি গভীর প্রেম তাঁহার অন্তর-বাহিরকে একাকার করিয়া দিয়াছিল।

বিলাত হইতে যখন রবীন্দ্রনাথ ফিরিলেন তখনও তাঁহার অঙ্গ হইতে স্বদেশী পোশাক ঘুচিয়া যাইতে পারে নাই। অথচ সেই সময় আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ অন্ধের মত ইংরেজের অনুকরণ করিয়া চলিতেছিলেন। গৃহসজ্জায়, আসবাবপত্রে, পোশাক-পরিচ্ছদে বিলাতী-দ্রব্যের সমারোহের অন্ত ছিল না। মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ চুপ করিয়া থাকিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতামুগ্ধ শিক্ষিত সমাজকে তীব্র ভাষায় তিনি বলিয়াছিলেন:

"কে তুমি ফিরিছ পরি প্রভুদের সাজ,
ছদ্মবেশে বাড়ে না কি চতুর্গুণ লাজ?
পরবস্ত্র অঙ্গে তব হয়ে অধিষ্ঠান
তোমারেই করিছে না নিত্য অপমান?
* * * * *
সর্বাঙ্গে লাঞ্ছনা বহি এ কি অহংকার!
তব কাছে জীর্ণ চীর জেনো অলংকার!"

ইহার পর কবি ধীরে ধীরে নিজেকে কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। ১৮৮৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসে তিনি যোগ দেন এবং 'মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি করেন। এই সময় হইতে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে স্বদেশীভাবের বন্যা বহিয়া গিয়াছিল। 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি অজস্র স্বদেশী ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত এবং কবিতা রচনা করিয়াছেন। সেই স্বদেশী যুগের উদায় জাতির ভাব ও চিন্তা পরিচালনার রজ্জু প্রধানতঃ তাঁহারই হাতে কেমন করিয়া যেন চলিয়া গিয়াছিল। লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট্ সভা হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিখ্যাত 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ পাঠ করিয়া নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ব্যর্থতা ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেন—"রাজদ্বারে নিবেদনের থালা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কেবলমাত্র কাঁদুনীর সুরে 'কিছু দাও, কিছু দাও' করিয়া প্রার্থনা করিলে কিছু পাইব না। গুরুতর দুঃখকে শিরে বহন করিয়া কারাদণ্ডে অবিচল থাকিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার পূর্বে বাহুবলে উহা আমাদের অর্জন করিতে হইবে।"

এই অনুপ্রেরণাতেই কবি তখন অনাগত সংগ্রামীকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন:

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।"

কলিকাতায় তখন সাবিত্রী লাইব্রেরী নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহার উদ্যোগে মাঝে মাঝে স্বদেশী সভা হইত। রবীন্দ্রনাথ ইহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। দেশের যুবকগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইবার জন্য সেখানে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ চিন্তানায়কগণ বক্তৃতা করিতেন। এই সভাতেই কবি তাঁহার বিখ্যাত 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে জাতিগঠনের নূতন পরিকল্পনা কবি তাঁহার দেশকে উপহার দিলেন। এই পরিকল্পনা গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

১৯০৪ সালে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পালের উদ্যোগে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্র-নায়ক শিবাজীর আদর্শই ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ —রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শিবাজী-উৎসব' কবিতায় ইহা ব্যক্ত করিয়া শিবাজীর উদ্দেশে বলিলেন—

"সেদিন শুনিনি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি লব।
কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব।
ধ্বজা করি উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী বসন—
দরিদ্রের বল
'এক ধর্মরাজ্য হবে এ ভারতে' এ মহাবচন
করিব সম্বল।"

ইহার পরই বাংলা দেশে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের অপচেষ্টার প্রতিবাদে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ঢেউ আসিয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এক নূতন চেতনায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তরুণ আন্দোলনকারীদের প্রেরণা জাগাইতে তাঁহার এ সময়কার স্বদেশী গানগুলির অবদানের তুলনা নাই। তিনি লিখিলেন—

"অমর মরণ রক্তচরণ
নাচিছে সগৌরবে।
সময় হয়েছে নিকট এখন
বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।"

বাঁধন-ছেঁড়ার দলকে তিনি বাঁধিতে চাহিলেন একতার বন্ধনে। তিনি তাদের কণ্ঠে গানের বাণী তুলিয়া দিলেন—

"বাঙালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙালীর ঘরে যত ভাই-বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান্।"

বাংলার পথে পথে শতকণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"নব-বৎসরে করিলাম পণ
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে তোমার চরণে
হে ভারত, লব শিক্ষা।"

স্বদেশী-আন্দোলন এমনি করিয়া রবীন্দ্রনাথের দানে পুষ্ট হইয়াছে, বড় হইয়াছে। বক্তৃতা ও প্রবন্ধ ছাড়াও অসংখ্য সঙ্গীত জাতীয় আন্দোলনে উদ্দীপনা ও প্রাণসঞ্চার করিয়াছিল। স্বদেশী-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় শিক্ষা-

আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলন হইতেও পিছাইয়া যান নাই। তিনি বার বার ভারতের জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করিয়া শিক্ষানীতি প্রবর্তনের দাবী জানাইয়াছেন। তাঁহার মনের গতি তপোবন সভ্যতার দিকে ছুটিয়াছিল। তাই আজিকার পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে কঠোর কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

"হে নব সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী
দাও সেই তপোবন পুণ্য ছায়ারাশি
গ্লানিহীন দিনগুলি—সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান।"

শিক্ষা-সংস্কারের এই পিপাসা তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের আশ্রম-সভ্যতা ও তপোবন তাঁহার মনের প্রত্যন্ত দেশকে সত্য শিব ও সুন্দরের এক স্বপ্নাবেশে ভরিয়া দিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনের গতি ফিরিয়া গেল। তাঁর জীবনে চিন্তায় দর্শনে এই স্বপ্ন ধীরে ধীরে বাস্তব মূর্তি লইয়া প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তিনি কংগ্রেস ও প্রকাশ্য আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বিখ্যাত 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় তাঁহার নূতন রূপ নূতন চিন্তা মূর্ত হইয়া উঠিল—

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়।

× × ×

কি গাহিবে, কি শুনাবে। বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি।"

এই আদর্শের প্রেরণাতেই কবি তাঁর জীবনের গতিপথ ফিরাইয়া দিলেন। নিজেকে ছড়াইয়া দিলেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমে। শুধু বিদ্যাচর্চার জন্য নয়—জীবন গড়ার কাজ, মানুষ তৈরির কাজের কথাই তাঁর কাছে একমাত্র সত্য হইয়া দেখা দিল। সমাজের বিকৃত ব্যবস্থার ফলে সাধারণ মানুষের বিধ্বস্ত দৈন্যক্লিষ্ট রূপ তাঁকে ব্যথিত করিয়াছিল প্রথম জীবন হইতেই। এই তাঁর ভারতের জনগণ! এই নিরন্ন অশিক্ষিত নরনারীকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য তিনি তরুণ সমাজকে আহ্বান জানাইলেন :

"এই- সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই- সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্নবুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।"

শুধু পরকে ডাকিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। আপনার অন্তরেও এই আহ্বান পাঠাইয়া দিলেন। নিজের গণ্ডী-ঘেরা বৈশিষ্ট্য-দীপ্ত জীবনের সীমা ছাড়াইয়া নিজেকে বিশ্ব-জীবনের মাঝে ছড়াইয়া দিলেন :

"কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

এই বিশ্বাসের ছবি রবীন্দ্রনাথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইয়াছেন। পবিত্র সুন্দর পরিপূর্ণ মানবতার আদর্শের অনুসন্ধানে তাঁহার সাধনা প্রাচীন ভারতের আত্মিক সাধনার স্তরে স্তরে ছুটিয়া ফিরিয়াছে। এই আদর্শ অবশেষে তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তখনই তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলিয়াছেন, "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।" অরণ্যের মধ্যেই ভারতের শাশ্বত সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। এই আদর্শের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হইলেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণই আদর্শ মানব এবং ইহা তপোবন-সভ্যতার অবদান। কবি শান্তিনিকেতনে চলিয়া আসিলেন, প্রতিষ্ঠা করিলেন ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের। নূতন যুগের তপোবন-সভ্যতার বীজ সেই দিন বপন হইয়া গেল। নূতন করিয়া মানুষ গড়িবার ইতিহাস সুরু হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার চূড়ান্ত অধ্যায়ের সূচনা হইল। ইহারই সর্বশেষ রূপ বিশ্বভারতী। স্বদেশের মানুষ গড়ার সাধনার মধ্য দিয়া কবির মনে বিশ্বমানবতার আদর্শ জন্মলাভ করিল। "হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে।" কবি শান্তিনিকেতনের নূতন তপোবন হইতে বিশ্বমানবকে আহ্বান জানাইলেন। ভারতের মধ্যে সারা বিশ্বকে মিলাইবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা সার্থক করিয়া তুলিলেন।

জীবনের সুরু হইতেই রবীন্দ্রনাথের হৃদয় স্বাদেশিকতায় পূর্ণ। এই স্বাদেশিতার ক্ষেত্রে তাঁহার জীবনে দুইটি খাতের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি এক দিকে

যেমন সংগ্রামী অন্য দিকে তেমনি গঠনশীল। তাঁর চিন্তায় তাঁর রচনায় সংগ্রামের সুর বারে বারে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। অন্য দিকে কাজের ক্ষেত্রে তাঁহার গঠনমূলক সৃষ্টিও ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠা সম্ভব হইয়াছে। এই প্রেরণাতেই ১৯১৪ সনে তিনি শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই মধ্য দিয়া চলিয়াছিল তাঁহার গ্রাম-উদ্যোগের সাধনা। শালিসী, ধর্মগোলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কুটীর-শিল্প, ব্রতী-আন্দোলন, সমস্ত কাজের মধ্যেই তিনি তাঁহার 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে পরিকল্পিত নয়া সমাজের সুরু করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহারই মধ্যে ১৯১৯ সনে তাঁহার লেখনীতে আবার অগ্নিবর্ষণ আরম্ভ হইয়া গেল। কুখ্যাত রাউলাট আইনের প্রতিবাদে জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত বিরাট্ জনসভায় ব্রিটিশ সরকার নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড করিয়া বসিল। সারা ভারতবর্ষ এই বর্বরতার প্রতিবাদ জানাইল। রবীন্দ্রনাথ কঠোরতম ভাষায় রাজপ্রতিনিধি চেম্‌স্‌ফোর্ডের নিকট চিঠি লিখিয়া ব্রিটিশের দেওয়া উপাধি নাইটহুড প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "The time has come when badges of honouer make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I, for my part, wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of my countrymen who, for their so-colled insignificance, are liable to suffer degradation not fit for human beings."

এই আমাদের স্বদেশ-প্রেমিক মানব-প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ। সব্যসাচীর মত কখনও তিনি অসিহাতে সংগ্রামের পথে নামিয়াছেন, কখনও গঠনকর্মের বাঁশী বাজাইয়া জ্যোতির্ময় প্রেরণার মত দেশের অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়াছেন। কিন্তু জীবনের অপরাহ্নে আসিয়া তাঁহাকে এক বিচিত্র অনুভূতিতে পাইয়া বসিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, সাধারণ অশিক্ষিত মানুষের কাছে তিনি আজও কুহেলীর মত অস্পষ্ট হইয়া রহিলেন। তাহারা বুঝিতে চাহিল না তাঁহার জীবন-দর্শনকে। দূর হইতে শুধু অবাক্ আতঙ্কে তাহারা রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার পানে চাহিয়া রহিল। কবির মনস্তাপের অবধি রহিল না। এক সূক্ষ্ম বেদনাবোধ তাঁহার শেষ জীবনে তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। চারিদিকের অজ্ঞ জনসাধারণের দিকে চাহিয়া তাঁহাকে বলিতে হইয়াছিল :

"পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।"

দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি তাঁহার প্রেম গভীর ছিল বলিয়াই এই ট্রাজেডি তাঁহার মনকে অভিভূত করিয়া দিয়াছিল। নিজের মধ্যে যাহাকে খুঁজিয়া পান নাই সেই অনাগত কবিকে বাহিরের নূতন প্রাণশক্তির কাছে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। ডাক দিয়াছেন :

"এস কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক্ মনের
মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার ;
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।"

১৩৪৮ সালে তাঁহার শেষ জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে কবি 'সভ্যতার সঙ্কট' নামে দেশবাসীর নিকট যে বাণী প্রচার করেন, স্বদেশ জাতি ও মানুষের কল্যাণের কথাই তাহাতে স্থান পাইয়াছে। আপনার স্বদেশের জন্য উদ্বেগ-বোধের বাণী এই তাঁহার শেষ। তিনি বলিয়া গিয়াছেন "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত-সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে, কি লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে! একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কি বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে!··· আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে, অপেক্ষা করে থাকব সভ্যতার দৈববাণী নিয়ে সে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই।···মহাপ্রলয়ের পরে, বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। ···মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি। প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ্ নয়, তার প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে —নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে,

অধর্মে-নৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি।
ততঃ অপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

সাহিত্যে আত্মজীবনীর স্থান

শ্রীরেজাউল করীম

সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন লেখক বলেছেন: "Literature is interpretation of life as life shapes itself in the mind of the interpreter". —অর্থাৎ সাহিত্য হচ্ছে জীবনের ব্যাখ্যা, কিন্তু এ ব্যাখ্যা সর্ব্বজন স্বীকৃত ব্যাখ্যা নয়। যিনি ব্যাখ্যা করবেন তাঁর কাছে জীবনটা যে ভাবে রূপ ধরে ফুটে উঠেছে, সেই জীবনের ব্যাখ্যাই হচ্ছে সাহিত্য। সকলের কাছে জীবনটা একই ভাবে রূপ ধরে ফুটে উঠে না। সেই জন্য জীবনের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য নানা জনের কাছে নানারকম হয়ে ফুটে উঠে। কাব্য, উপন্যাস, নাটক এই সবের মাধ্যমে জীবনের ব্যাখ্যা করা চলে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের এবং কবিদের রচনা কেবল রসের ও সৌন্দর্য্যের বস্তু নয়, তাদের রচনার মধ্যে আছে তাদের বিচিত্র জীবনের ব্যাখ্যা। ইতিহাসও একপ্রকার জীবন-ব্যাখ্যা। অতীতের মানব-সমাজের গৌরবপূর্ণ কর্ম্মের বিবরণ পাওয়া যাবে ইতিহাসে। রাজা, মন্ত্রী, সভাসদ, সেনাপতি এদের কাহিনী নিয়ে ইতিহাস। রাজ্যের উত্থান পতন, তার বিলাস, তার ত্রুটি বিচ্যুতি, তার সাহিত্য দর্শন, শিল্প, কলা এ সবও ইতিহাসের সামগ্রী। ইতিহাস থেকে আমরা বহু শিক্ষার বিষয় পেয়ে থাকি। যে কোন একটি দেশের ও যুগের ইতিহাস থেকে মানুষের সাহস, নিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও কার্যদক্ষতার পরিচয় পাই। মহাপুরুষদের জীবনী ও সাহিত্যপুস্তক থেকেও আমরা বহু মহামানবের সঙ্গে পরিচিত হই। জ্ঞান ও আদর্শের দিক দিয়ে এসবের বিশেষ মূল্য আছে।

জীবন-চরিত সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু সব জীবন-চরিত একই রূপ নয়। কোন কোন জীবনী-লেখক তাঁর "হিরোকে" (Hero) অতি-মানব রূপে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। "হিরোর" দোষ-ত্রুটির দিকে একেবারেই লক্ষ্য করেন নি। একচোখা দৃষ্টি নিয়ে লেখা হয়েছে বলে এসব রচনার মূল্য খুব কম। আবার এমন অনেক জীবনী-লেখক আছেন যারা তাঁদের "হিরো"র পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁকেছেন, একেবারে চিত্রকরের মত সবদিক দিয়ে নিখুঁত। বিখ্যাত জীবনী-লেখক বস্‌ওয়েল (Boswell) তাঁর "হিরো" ডাক্তার জনসনের একখানা জীবনী লিখেছেন। জীবনচরিত সাহিত্যে এমন সার্থক সৃষ্টি খুব কম আছে। বস্‌ওয়েলের এই গ্রন্থে আছে চমকপ্রদ ঘটনা "হিরোর" দোষ-ত্রুটি, সমাজ-জীবনের বিবিধ ঘটনা। আর আছে সমসাময়িক যুগের বহু সুধীর পরিচয়। জীবন-চরিত যদি লিখতে হয় তবে এমনি করে লেখাই উচিত। আমাদের দেশে সাম্প্রতিক কালে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে জীবন-চরিত লিখেছেন, তা নানাদিক দিয়ে অপূর্ব্ব। বাংলা সাহিত্যে এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত খুব বেশী লেখা হয় নি।

জীবন-চরিত সাহিত্যের আর একটি শাখা হচ্ছে আত্মজীবনী। এ আত্মজীবনী রাম, শ্যাম, যদু, হরির নয়। এ হচ্ছে মহামানবের আত্মজীবনী। দেশের অনেক প্রথিতযশা সুধী ও সজ্জন ব্যক্তি তাঁদের আত্মজীবনী লিখেছেন। তাঁরা অখ্যাত লোক হলে হয়ত এসব আত্মজীবনীর বিশেষ কোন মূল্য থাকত না। কিন্তু এসব লোককে কেন্দ্র করে জাতির ইতিহাসের বহু অধ্যায় আবর্তিত হয়েছে সেজন্য জাতির ইতিহাস জানতে হলে তাঁদের জীবন-কথাও জানা দরকার। এসব আত্মজীবনীর অনেকগুলি সাহিত্যের পর্য্যায়ভুক্ত হয়েছে। কেননা এসব গ্রন্থে আছে সাহিত্যের কতকগুলি বিশিষ্ট গুণাবলী। এঁদের অনেকে উচ্চশ্রেণীর শিল্পী। তাই তাঁদের আত্ম-জীবনী রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সেজন্য প্রত্যেক পাঠকের চিত্তবিনোদন করতে সমর্থ। লেখকগণ এসব আত্ম-জীবনীতে নিজের কথাই বেশী বলেছেন। কিন্তু তাঁরা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্তপ্রতীক। তাঁরা ব্যক্তি হলেও সমগ্র জাতি বা যুগের প্রতিনিধি। এঁদের এক-জনকে জানলে একটা যুগের ইতিহাসটাই জানা যায়। যুগের ছবি, যুগের বিশিষ্ট ব্যক্তি, যুগের চিন্তাধারা, ঘটনাপ্রবাহ, মোটকথা যুগের সমগ্র পরিচয় এক একটি আত্মজীবনীতে ফুটে উঠেছে। ইতিহাস অপেক্ষাও তা ঘটনা-বহুল, উপন্যাস অপেক্ষাও চমকপ্রদ এবং কবিতা অপেক্ষাও অধিকতর লিরিক গুণবিশিষ্ট এই সব আত্মজীবনী। এতে পাওয়া যাবে একাধারে ইতিহাস, কাব্য ও দর্শন। ইতিহাস ও জীবন-চরিতের মতই এই সব আত্মজীবনী সত্যনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক। এসব আত্মজীবনীর ভাষা যেমন প্রাণস্পর্শী ভাবও তেমনি উন্নত। যেমন তেমন

করে নিজের জীবনের ঘটনাবলী বলে গেলেই চলবে না। এই বলার মধ্যে চাই শিল্পজ্ঞান। আত্মজীবনীতে চাই কবির কল্পনা ও ভাববিলাস, শিল্পের সংগঠন শক্তি, ঐতিহাসিকের সত্যদৃষ্টি, দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টি, প্রফেটের স্বপ্ন ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি; আর চাই চিত্রকরের সত্যনিষ্ঠা। আত্মজীবনী লেখা হয় হৃদয়ের ভাষায়, আর হৃদয়ের ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় এত সুন্দর হৃদয়স্পর্শী রচনা হতে পারে না। আত্মজীবনী সেই হৃদয়ের ভাষা যে হৃদয়ে একজন লিরিক কবি বিরাজমান। যখন কোন মহামানব তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর নিজের ও নিজের যুগের একটি সত্য পূর্ণাঙ্গ সুস্পষ্ট ছবি আঁকেন, তখন তিনি হাজার হাজার পাঠকের চিত্ত জয় করে ফেলেন। তিনি পাঠকের অন্তরকে ভালবাসা আনন্দ ও প্রীতির ভাবে ভরে তোলেন। পৃথিবীতে নানা ভাষায় আত্মজীবনী আছে। বিভিন্ন ভাষার অনেকগুলির অনুবাদ হয়েছে। বাজে উপন্যাস অপেক্ষা আত্মজীবনী পাঠককে অধিকতর আনন্দ দিতে পারে।

একজন মহামানবের আত্মজীবনী পাঠ করলে আমরা বহু শিক্ষা লাভ করতে পারি। যে ছোট্ট ছেলেটী মায়ের কোলে বসে খেলা করছে, সে যে একজন মহামানব হবে পৃথিবীতে অশেষ কীর্ত্তি রেখে যাবে তা তখন কেউ বুঝতে পারে না। যে শিশু যখন কীর্ত্তিমান পুরুষ হয়ে উঠে, তখন তার ছেলেবেলাকার অনেক কথা লোকে ভুলে যায়। কিন্তু তিনি যদি কোন আত্মজীবনী লিখে থাকেন তবে অনেক অজ্ঞাত কথা লোকচক্ষুর গোচরে আসে। এসব ছোট ছোট ঘটনা তাঁর জীবনের উপর বহু বিষয়ে আলোকপাত করে। আত্মজীবনীর লেখক আমাদের সামনে বহু অজ্ঞাত বিষয় উদ্ঘাটিত করেন। আত্মজীবনী পড়ে আমরা জানতে পারি একজন মানুষ কেমন করে নিজের গৃহের পরিবেশের প্রভাবে ভবিষ্যতে বিরাট পুরুষ হ'তে পেরেছেন। শুধু তাঁর গৃহের প্রভাব নয়, তাঁর যুগের প্রভাব, তাঁর বন্ধুর প্রভাব, পাঠ্য বিষয়ের প্রভাব এসবও মানুষ গড়তে সাহায্য করে। আত্মজীবনীতে এগুলির খবর পাওয়া যায়। বড় বড় লোকের তো বটে, অপেক্ষাকৃত অখ্যাত লোকের আত্মজীবনী পড়লে অতীতের বহু বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ইতিহাসে লেখা নাই এমন সব অজ্ঞাত অখ্যাত লোকের সান্নিধ্য পাই। আমরা এই সব আত্মজীবনী থেকে বিগত যুগের বহু লোকের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় লাভ করি, অনেক বিষয়ে আমাদের ঔৎসুক্য তৃপ্ত হয়। আত্মজীবনী সমসাময়িক সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতির উপরও বহু আলোকপাত করে। কোন বিখ্যাত লেখক, কবি, শিল্পীকে ভাল করে বুঝতে হলে, তাঁদের জীবনের ব্যাখ্যা বুঝতে হলে; তাঁদের আত্মজীবনী পড়া খুব দরকার। আত্মজীবনী পাঠ করলে পাঠকের সৃজনী-শক্তি উদ্দীপিত হয়। ইতস্ততঃ ছড়ান নানা প্রকার সঙ্কেত থেকে আমরা বহু অজ্ঞাত বিষয় জানতে পারি। টুকরা টুকরা ঘটনা থেকে একটা গোটা কাহিনী উদ্ধার করতে পারি। আত্মজীবনী থেকে ধৈর্য্য দয়া ভালবাসা ও নানাবিধ সৎ গুণ লাভ করাও সম্ভব। সুতরাং কাহারও আত্মজীবনীকে অবহেলা করা উচিত নয়।

পৃথিবীতে বহু ভাষায় বহু আত্মজীবনী আছে। সেগুলি যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি উপদেশপূর্ণ। কতকগুলি আত্ম-জীবনী, সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কয়েকটি বিখ্যাত আত্ম-জীবনীর পরিচয় দিব।

প্রথমে ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবনের কথা ধরা যাক। তিনি রোমের পতন যুগের বিখ্যাত ইতিহাস পুস্তকের লেখক। তাঁর "The decline and fall of the Roman Empire" গ্রন্থটি এক যুগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। উক্ত ইতিহাস গ্রন্থটি রচনার পর গীবন তাঁর একটি আত্ম-জীবনী লেখেন। তাঁর এই আত্মজীবনীতে সে যুগের বহু বিষয়ের উল্লেখ আছে। গীবন গোঁড়া ও রক্ষণশীল খ্রীষ্টান ছিলেন না। রক্ষণশীল সমাজে জন্মগ্রহণ করেও কেন এবং কি ভাবে তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদার হয়ে পড়লেন, কি কি পুস্তক কোন কোন ব্যক্তির সান্নিধ্য ও কোন কোন বিশিষ্ট চিন্তাধারা গীবনের মতবাদ গড়তে সাহায্য করেছে—এ সব কথা তাঁর জীবনীতে পাওয়া যাবে। দীর্ঘ দিন ধরে বহু পরিশ্রম করে যখন তিনি রোমের পতনের ইতিহাস রচনা করেন, তখন তাঁর মনে বহু ভাবের উদয় হয়েছে। রোমের বিরাট গ্রন্থের সর্ব্বশেষ পৃষ্ঠা লেখা যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি অত্যন্ত আরাম বোধ করলেন। তখন তাঁর মনে হ'ল যেন জীবন থেকে একটা গুরু দায়িত্বের বোঝা নেমে গেল। গীবন আত্ম-জীবনীতে লিখেছেন, তখন জ্যোৎস্নার রাত। চতুর্দ্দিকে নীরব, নিথর। এই শান্ত পরিবেশের মধ্যে তাঁর লেখনী অক্লান্ত ভাবে লিখে চলেছে। শেষে, শেষ-শব্দটি লেখা হ'ল। তিনি এক গেলাস শীতল জল পান করলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনে হ'ল এতদিন রোম ছিল তাঁর প্রিয় বন্ধু। আজ রোমের ইতিহাস শেষ করে মনে হ'ল যে তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধুর সঙ্গ থেকে চির-বিদায় গ্রহণ করলেন। এই অনুভূতি গীবনের ইতিহাস

প্রীতি ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দেয়। বস্তুতঃ আত্মজীবনী-সাহিত্যে গীবনের গ্রন্থ অমর হয়ে থাকবে।

ওয়ার্ডস ওয়ার্থ একজন বিখ্যাত ইংরাজ কবি। তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থের নাম "দি প্রেলিউড" "Prelude।" প্রচলিত অর্থে এ গ্রন্থকে আত্মজীবনী বলা চলে না। কিন্তু আসলে এটা কবিরই আত্মজীবনী। এই কাব্য গ্রন্থে কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ নিজের জীবনের ইতিহাস বিশেষতঃ তাঁর কবিত্ব শক্তি বিকাশের ইতিহাস তাঁর অনবদ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এতে আমরা জানতে পারি কেমন করে তার ছেলেবেলায় তিনি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত আত্মাকে আবিষ্কার করেন। সুকুমার বাল্যকাল থেকেই প্রকৃতির গভীর আবেদন তাঁর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তাঁর শিশু-মনের নিকট প্রকৃতি একটি জীবন্ত প্রাণীর মতই তাঁর জন্য অপেক্ষা করত। তিনি প্রকৃতির নিকট থেকে একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি ও চেতনা লাভ করেছেন। জ্ঞাত জগতের বাহিরে আবরণের অন্তরালে একটি সজীব সচেতন আত্মা বিরাজমান। কবি যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট ও দিশেহারা হয়ে পড়েছেন, তখন সেই আত্মা তাঁকে সাবধান করে দেয়। কবিকে সৎপথে নিয়ে যায়।

ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের "প্রেলিউডে" আছে উচ্চ শ্রেণীর কবিতা আর সেই সঙ্গে আছে সত্যপথের পথিকের জীবন-জিজ্ঞাসা। বর্ত্তমান যুগের দিশেহারা মানুষ ওয়ার্ডস ওয়ার্থের এই অপূর্ব্ব কাব্যগ্রন্থ থেকে বহু বিষয়ে পথের নির্দ্দেশ পাবে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সভাপতি বেনজামিন ফ্রাঙ্কলীনের আত্মজীবনীও একটা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বেনজামিন সামান্য অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে একেবারে আমেরিকার সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর বাল্যকাল অতিকষ্টে অতিবাহিত হয়েছিল। প্রথম বয়সে একেবারে লেখাপড়া জানতেন না। তার পর সামান্য কাজের মধ্যে অবসর সময়ে প্রভূত বিদ্যাচর্চ্চা করেছিলেন। আমাদের এই গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রত্যেক যুবকের উচিত বেনজামিন ফ্রাঙ্কলীনের আত্মজীবনী পাঠ করা। স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রত্যেক যুবকের সামনে সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যতের দ্বার খুলে দিয়েছে—বেনজামিনের আত্মজীবনী পড়লে তারা পথের নির্দ্দেশ পাবে আশা করতে পারি।

ফ্রান্সের বিপ্লবী লেখক রুশোর আত্মজীবনী একটি অদ্ভুত গ্রন্থ। রুশো ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম পূর্ব্বগামী। সেই দিক দিয়ে তাঁর আত্মজীবনীতে তৎকালীন ফরাসী সমাজের পটভূমিকার পরিচয় পাওয়া যাবে। রুশোর আত্মজীবনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নিজের দোষ ত্রুটি কিছুই গোপন করেন নি। তার নিজের জীবনকে তিনি নিখুঁত ভাবে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছেন। তাঁর দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা, তাঁর পরীক্ষা ও প্রলোভন এই সবের মধ্যে কেমন করে তিনি একটি আদর্শ ধরে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁর বিপ্লবী মনের উৎস কোথায় এ সব কথা রুশো এমন সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করেছেন যে, কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাসও তার কাছে দাঁড়াতে পারে না।

জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী আর একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এর সাহিত্যিক মূল্য খুব কম নয়। মিল ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তি। কেমন করে তাঁর পিতার তত্ত্বাবধানে মিলের দার্শনিক জীবনের বিকাশ হয়েছে, মিল তার অনবদ্য ভাষায় সে সমস্ত কথা ব্যক্ত করেছেন।

মিল ছিলেন জড়বাদী দার্শনিক। তিনি Hedonism বা সুখবাদকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলে মনে করতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন স্বাধীন চিন্তা ও মেয়েদের স্বাধীনতার সমর্থক। একজন পিতা কেমন করে তার সন্তানকে একটি সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শ সামনে রেখে গড়ে তুলতে পারে তার বিবরণ পাওয়া যাবে মিলের আত্মজীবনীতে। বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ হওয়া খুবই দরকার।

আমাদের সমসাময়িক যুগে কয়েকটি বিখ্যাত আত্মজীবনী লিখিত হয়েছে। তার মধ্যে হিটলারের "মাইন কাম্ফ" বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় মহাসমরের নিরপেক্ষ ইতিহাস জানতে হলে কেবল চার্চিলের যুদ্ধের ইতিহাস পড়লে চলবে না, হিটলারের আত্মজীবনীও পড়তে হবে। পাশ্চাত্য দেশে আরও বহু আত্মজীবনী আছে। এই প্রবন্ধে মাত্র কয়েকটির কথা উল্লেখ করা গেল।

এবার আমাদের দেশের কয়েকজন ব্যক্তির আত্মজীবনীর কথা উল্লেখ করে প্রবন্ধ শেষ করব। প্রথমেই শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনীর কথাই বলা যাক। তিনি ছিলেন একটি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবের দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হলেন। তার পর ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে নিজের আদর্শ অনুসরণ করে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। কেমন করে তার মন প্রচলিত ধর্ম্ম ব্যবস্থার উপর বিদ্রোহী হয়ে উঠল সে বিবরণ অত্যন্ত চমকপ্রদ। যে যুগে ব্রাহ্ম মতবাদ দেশের সম্মুখে এক নূতন চিন্তাধারা, এক নূতন বিচার পদ্ধতি এনে দিয়েছিল। আজ এ সব কথা বহু লোকে

ভুলে গেছে। তরুণরা ত জানেই না। শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মজীবনী পড়লে ভারতের বিপ্লবী যুগের বিস্মৃত প্রায় ঘটনা আবার নূতন করে চোখের সামনে ভেসে উঠবে। সে যুগের ব্রাহ্ম সমাজের নেতাদের সুদৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা আদর্শবাদ ও আদর্শের জন্য আত্মত্যাগ এ সবের অপূর্ব্ব কাহিনী আমরা জানতে পারব শাস্ত্রী মহাশয়ের আত্মজীবনী থেকে।

কবি নবীনচন্দ্র সেনের আত্মজীবনী আর একদিক দিয়ে মূল্যবান। তিনি সরকারী কর্ম্মচারী ছিলেন। আবার সরকারী কার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে কাব্য রচনা করতেন। নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কি ভাবে তাঁর কবি-প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই আত্মজীবনীতে। সে যুগের ইংরেজদের আমলে স্বদেশভক্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের বহুবিধ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হত। "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য রচনার জন্য নবীনচন্দ্রের পদোন্নতি হয় নি। পূর্ব্ববঙ্গের তদানীন্তন গবর্ণরের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের সাক্ষাৎকারের সময় যে সব কথা হয়েছিল তার নিখুঁত বিবরণ আমরা পাব এই আত্মজীবনী থেকে। গবর্ণর রাগান্বিত হয়ে তাকে বলেছিলেন যে, "আমি কিছুতেই ভুলব না যে তুমি পলাশীর যুদ্ধ কাব্যের লেখক।" তদুত্তরে নবীনচন্দ্র কেমন করে মাথা উঁচু করে সাহেবের দরবার থেকে চলে এসেছিলেন। সে রোমাঞ্চকর কাহিনী সকলের পাঠ করা উচিত। দুঃখের কথা যে আজকাল নবীনচন্দ্রের আত্মজীবনী কেউ বড় একটা পড়ে না। কিন্তু এর মধ্যে সে যুগের বহু কথা জানতে পারা যাবে। এর সাহিত্যিক মূল্যও যথেষ্ট।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "জীবন স্মৃতি" আত্মজীবনী সাহিত্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করেছে। যদিও এতে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের কথা বলা হয় নি। এতে আমরা পাই কবির প্রথম জীবনের টুকরা টুকরা কথা। ওয়ার্ডস ওয়ার্থের "প্রেলিউডের" মত জীবন স্মৃতির অধিকাংশ পৃষ্ঠা কবির কাব্য প্রতিভার ক্রম বিকাশের কথাতেই ভরা। নানা স্থানে "মানুষ ও প্রকৃতি" কি ভাবে কবির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তার নিখুঁত পরিচয় আছে এই জীবন স্মৃতিতে। কবির পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতি, তাঁর মাতা, ভ্রাতা, তাঁর গৃহ ও চতুর্দ্দিকের পরিবেশ তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা তাঁর স্বভাব চরিত্র তাঁর অনুরাগ, তাঁর বিরাগ, এ সব খবর দিতে পারে এই জীবন স্মৃতি। অপরের লেখা জীবন-চরিতে এ সব কথা সেরূপ ভাবে ফুটে উঠতে পারে না। বস্তুতঃ "জীবন স্মৃতি" পড়লে মনে হয় যেন সত্যই একজন উদীয়মান কবির কোন কাব্যগ্রন্থ পড়ছি। কবি যে ভবিষ্যতে অনেক বড় হবেন তার সুনিশ্চিত আভাস পাওয়া যাবে জীবন-স্মৃতিতে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে জীবন-স্মৃতি পড়া একান্ত দরকার।

গান্ধীজী, জহরলাল নেহরু ও নেতাজীর আত্মজীবনীও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু বিচিত্র কাহিনী এঁদের আত্মজীবনী থেকে পাওয়া যাবে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনীও কম মূল্যবান নয়। এঁদের আত্ম-জীবনী জাতির প্রাণে নূতন প্রেরণা যোগাবে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক আরও বহু আত্মজীবনী লিখিত হয়েছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে সব গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা গেল না।

সাহিত্যে আত্মজীবনী একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। একটা সুলিখিত আত্মজীবনী মৃতপ্রায় জাতির মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে। এ সব আত্মজীবনী ভবিষ্যৎ যুগের জন্য সত্যিকার মানুষ গঠনে সাহায্য করতে পারে। আত্মজীবনীতে আমরা পাই একটা বিরাট প্রতিভাবান মানুষের সাহস কার্য্যোৎসাহ ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয়। আত্মজীবনী জাতিকে কর্ত্তব্য, স্বদেশপ্রেম, সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা দেয়। ভাল ভাবে লিখিত আত্মজীবনী কেবলমাত্র বিশুদ্ধ শিল্পকার্য্যই নয়। এ গ্রন্থ অতীতের বড় বড় মানুষকে সত্যকার ভাবে জানবার ও বুঝবার দর্পণস্বরূপ।
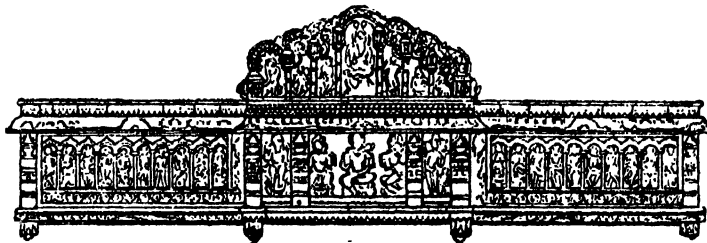
নীল কক্ষ

অধ্যাপক শ্রীরবি গুপ্ত

[শুধু শিল্পী নন—নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান শিল্পী—প্রসপের মেরিমে—Prosper Merime—জন্ম তাঁর ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর প্রধান গুণ—জাতি হিসেবে ফরাসী-মানসের যে গুণ—মাত্রাবোধ—Sobriete, একটি চরিত্রের বর্ণনা অন্যের হাতে যেখানে তিন পাতা, একটি মাত্র বিশেষ ভঙ্গির মধ্যে ফুটে উঠবে তাঁর হাতে—যা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। চাতুর্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন তিনি অকৃপণ-হাতে মাধুর্যও। অতি সামান্য ঘটনাও যোগ্য-হাতে কি পরিণতি লাভ করতে পারে মেরিমে তার অনমুকরণীয় দৃষ্টান্ত।]

একটি তরুণ যুবক ষ্টেশনের প্রবেশ-পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল—দেখে মনে হয় যেন বেশ একটু চঞ্চল। চোখে নীল চশমা। প্রতি মুহূর্তে তার পকেট থেকে রুমালটি বের করে নাকের উপর ধরছিল, যদিও তার সর্দি হয় নি মোটেই। বাঁ হাতে তার একটি কালো ব্যাগ যার ভেতর ছিল. পরে আমরা জানতে পেরেছি, ঘরে পরবার রেশমী পোশাক আর টার্কিশ পাজামা।

বার বার সে প্রধান প্রবেশ-পথের দিকে গিয়ে রাস্তার দিকে দেখছিল আর পকেট থেকে ঘড়িটা বের করে ষ্টেশনের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিল। ট্রেন ছাড়বার এখনও এক ঘণ্টা দেরী। এমন লোক অনেক আছেন যাঁরা শঙ্কিত, পাছে দেরী হয়ে যায়। যাদের তাড়া তাদের জন্য নয় এই ট্রেনটি। প্রথম শ্রেণীর কামরা খুবই কম। ষ্টেশন-কর্মীদের তখনও মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় হয় নি কাজের শেষে তাদের গ্রাম্য আবাসে ফিরে গিয়ে। যাত্রীদের ভিড় আরম্ভ হ'ল। পারীর একজন নাগরিক এদের চালচলন দেখে ধরে ফেলবে যে এরা শহরতলীর ক্ষুদে বণিক অথবা কৃষক। যা হউক, যখনই কোন স্ত্রীলোক প্রবেশ করছিল অথবা কোন গাড়ী থামছিল নীল চশমাধারী তরুণটির হৃৎপিণ্ড বেলুনের মত ফুলে উঠছিল। হাঁটু দুটি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। ব্যাগটি হাত থেকে পড়ে আর কি, আর নাক থেকে চশমা। অর্থাৎ তার অবস্থা এক কথায় সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ।

পরিস্থিতি হয়ে উঠল শোচনীয় যখন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আবির্ভূত হ'ল পাশের ছোট দরজা দিয়ে, যেখানে সর্বদা নজর রাখা হয় না, একটি তরুণী—কালো পরিচ্ছদে ঢাকা, মুখের ওপর একটি পুরু ওড়না, হাতে একটি খয়েরী চামড়ার ব্যাগ, যার ভেতর রয়েছে, পরে আমরা জানতে পেরেছি, ঘরে ব্যবহার করবার জন্য অদ্ভুত সুন্দর পোশাক আর এক জোড়া সার্টিনের চাপলি। তরুণ আর তরুণীটি ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে পরস্পরের সম্মুখীন হতে লাগল কেউ কারো দিকে না তাকিয়ে। তারা মিলিত হযে দু'জন দু'জনার হাত ধরে রইল কিছুক্ষণ বাকহীন—হৃৎপিণ্ড দ্রুত-সঞ্চালিত দ্রুত-নিঃশ্বাসের উত্থানে পতনে—এমন একটি তীব্র আবেগের কবলে তারা যার জন্য একজন দার্শনিককে এক শ' বছর আয়ু দিতে আমি প্রস্তুত।

যখন তাদের কথা বলবার শক্তি ফিরে এল :

—লেওঁ, বললে তরুণীটি (বলতে ভুলে গেছি, তার বয়স কম আর বেশ সুন্দরী) লেওঁ, কি ভাগ্যি! এই নীল চশমায় তোমাকে চিনতে পারা অসম্ভব।

—কি ভাগ্যি, বললে লেওঁ, এই ওড়নায় তোমায় চেনা অসম্ভব।

—কি ভাগ্যি, বললে আবার মেয়েটি, এস শীগগীর আমরা জায়গা নি। যদি গাড়ী চলে যেত আমাদের না নিয়েই!...মেয়েটি যুবকের একটি হাত তুলে নিল তার হাতে, জড়িয়ে ধরল একটু জোরেই। সন্দেহের কিছু নেই। আমি এখন ক্লারা আর তার স্বামীর সঙ্গে রয়েছি, চলেছি তার দেশের বাড়ীতে যেখানে কাল জানাব আমার বিদায় সম্ভাষণ...আর একটু হেসে মাথা নীচু করে মেয়েটি আবার সুরু করল, ক্লারা বেরিয়ে পড়েছে ঘণ্টাখানেক হ'ল আর কাল,...তার সঙ্গে শেষ-নৃত্যের পর...(তার হাতে একটু চাপ দিল আবার) কাল সকালে সে আমাকে ছেড়ে দেবে ষ্টেশনে যেখানে আমি পাব উরম্যুলকে যাকে আমি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি আমার পিসীর বাড়ীতে। ওঃ! আমি আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। এস টিকিট কাটা যাক। আমাদের কেউ চিনতে পারবে না, অসম্ভব! হোটেলে যদি কেউ আমাদের নাম জিজ্ঞেস করে? ঐ যাঃ, ভুলে গেছি!

—মঁশিয়ে দুরু ও মাদাম দুরু।

—ওঃ! না, দুরু না, আমাদের বাড়ীতে একটি মুচ থাকত তার নাম ছিল দুরু!

—তা হ'লে দুমো!…

—দুমো।

—বেশ ভাল, কিন্তু আমাদের কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না।

ঘণ্টা বাজতেই যাত্রীশালার দরজা খুলল। ওড়নায় সাবধানে ঢাকা তরুণীটি তার বন্ধুকে নিয়ে একটি প্রথম-শ্রেণীর কামরায় উঠল। ঘণ্টা বেজে উঠল দ্বিতীয়বার, কামরার দরজাটিও বন্ধ করে দেওয়া হ'ল।

—আমরা একা—উভয়ে সানন্দে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে একটি লোক, বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, সর্বাঙ্গ কালো পরিচ্ছদে ঢাকা, গম্ভীর ও ক্লান্ত, সেই কামরায় উঠে একটি কোণ দখল করল।

প্রণয়ীযুগল তাদের অস্বস্তিকর সঙ্গীর কাছ থেকে যতদূরে সম্ভব সরে গিয়ে সাবধান হয়ে নীচু স্বরে কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করল।

—মঁশিয়ে বললে, যাত্রীটি একই ভাষায়—সম্পূর্ণ নির্ভুল ইংরেজী উচ্চারণে—আপনাদের গোপনে যদি কিছু বলবার থাকে তা হলে ইংরেজীতে না বললেই ভাল আমার সামনে। আমি ইংরেজ। নিরুপায় হয়েই বিরক্ত করছি—পাশের কামরায় একটিমাত্র লোক—একটিমাত্র লোকের সহযাত্রী হওয়া আমার নিয়ম-বিরুদ্ধ। আর লোকটি দেখতেও জুডাসের মত, এটাকে টানতে পারে—তাঁর ভ্রমণের ব্যাগটিকে নির্দেশ করলেন ওটি সামনে বসবার আসনে আগেই রেখেছিলেন।

—আসল কথা আমি ঘুমোব না—পড়ব।

বাস্তবিকপক্ষে তিনি আন্তরিক চেষ্টার ত্রুটি করলেন না ঘুমোতে! তিনি ব্যাগটি খুলে একটি আরামদায়ক টুপী বের করে মাথায় দিলেন আর কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে থেকে নিতান্ত বিরক্ত হয়েই চোখ খুললেন। ব্যাগ থেকে বের করলেন তাঁর চশমা আর একখানি গ্রীক বই। অবশেষে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন। ব্যাগ থেকে বইটি বের করতে তাড়াতাড়িতে রাখা অনেকগুলো জিনিস ওলোট-পালট করতে হ'ল। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ইংরেজ ব্যাঙ্কের একতাড়া নোটও তিনি ব্যাগের তলদেশ থেকে বের করলেন। সেগুলো আবার পুরে রাখবার আগে যুবকটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ন…শহরে এগুলো ভাঙানো যাবে ত? সম্ভবতঃ, এটা ইংলণ্ডের পথেই। ন…শহরেই চলেছিল তরুণ-তরুণীটি। ন…শহরে আছে একটি ছোট হোটেল—বেশ পরিষ্কার। কিন্তু এখানে শনিবার বিকেল ছাড়া কেউ বড় একটা আসে না। হোটেলের ঘরগুলো সুন্দর, মালিক আর তার লোকজনদের অপরিচ্ছন্ন হবার পক্ষে প্যারী থেকে যথেষ্ট দূরে নয়। যুবকটি যাকে আমরা লেও নামে সম্বোধন করেছি কিছুদিন আগে একবার এসেছিল—কিন্তু নীল চশমা ছাড়া। তার বর্ণনা বান্ধবীর মনে জাগিয়ে দিয়েছিল হোটেলটি পরিদর্শন করবার বাসনা।

সেদিন তরুণীটির মনের অবস্থা ছিল এমনি যে কারা-কক্ষের প্রাচীরও তার কাছে মনে হতে পারত পরম আকর্ষণীয় যদি লেও থাকত সঙ্গে।

আমাদের গাড়ী চলেছে অবিরাম। ইংরেজটি পড়ে চলেছেন তাঁর গ্রীকগ্রন্থ সংলাপরত সঙ্গীদের দিকে মাথা না তুলে।

সম্ভবত আমার পাঠকেরা বিস্মিত হবেন না শুনে যে এরা প্রেমিক—শব্দটির অর্থগত সমস্ত শক্তি দিয়েই। আর অনুশোচনার বিষয় এরা বিবাহিত নয়। না হবার কারণও ছিল। ন…শহরে এসে তারা পৌছল। প্রথমে নামল ইংরেজটি। লেও যখন তার বান্ধবীকে সাহায্য করছিল নামতে পাশের কামরা থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের ওপর ছুটে এল একটি লোক—বিবর্ণ, প্রায় হোলদে, কোটরগত রক্তস্ফুট চোখ, দাড়ি সযত্নে কামানো নয়—অপরাধীদের সবগুলো চিহ্ন বর্তমান। তার পরিচ্ছদ পরিষ্কার, কিন্তু ছিন্ন। তার ওপরের জামাটি পূর্বে ছিল ভাল এখন পিঠ আর কনুইয়ের কাছে ধূসর। গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা পাছে ভেতরের পোশাক দেখা যায়—যা আরও ছিন্ন। সে এগিয়ে গেল ইংরেজ ভদ্রলোকটির কাছে, বললে খুব বিনীত কণ্ঠে:

—কাকা…!

—চলে যাও এখান থেকে—হতভাগা, রাগে তার ধূসর চোখ দুটি জ্বলে উঠল। ষ্টেশন থেকে বেরুবার জন্য তিনি পা বাড়ালেন।

—আমাকে নিরাশ করবেন না—বললে সে, বিনীত কিন্তু ভীতিপ্রদ কণ্ঠে।

—অনুগ্রহ করে আমার ব্যাগটা একটু দেখবেন। লেওর পায়ের কাছেই রেখে বললে ইংরেজ ভদ্রলোকটি। তৎক্ষণাৎ তিনি লোকটির হাত ধরে নিয়ে গেলেন যেখানে তাদের কেউ শুনতে পাবে না। মনে হ'ল যেন রুঢ়কণ্ঠে তাকে কি বললেন আর পকেট থেকে কিছু কাগজ বের করে ভাঁজ করে তার হাতে পুরে দিলেন যে তাকে কাকা

বলে সম্বোধন করেছিল। লোকটি তৎক্ষণাৎ ধন্যবাদ না দিয়েই অদৃশ্য হ'ল।

ন···শহরে একটিই হোটেল। আশ্চর্যের কিছু নেই যদি এই কাহিনীর সব ব্যক্তিই সেখানে মিলিত হন। ফ্রান্সে হোটেলের শ্রেষ্ঠ কক্ষটি অবধারিতরূপে হবে তার, যার সৌভাগ্যবশতঃ থাকবে বাহুলগ্ন একটি তরুণী। কেননা সারা ইউরোপে আমরা সবচাইতে বিনয়ী।

লেঁও যে ঘরটা পেল সেটা সব চাইতে ভাল, কিন্তু দুঃসাহসের পরিচয় দেওয়া হবে যদি কেউ এ থেকে ধরে নেয় সেটা অপূর্ব। একটা খাট আর নানা পর্দা 'তিসকে' আর 'পিরমে'র যাদু-বিদ্যার বিভিন্ন ছবিতে চিত্রিত। দেয়ালগুলো রঙিন কাগজে মোড়া তাতে আঁকা রয়েছে নেপল্‌সের নানা প্রাকৃতিক দৃশ্য আর বহু লোকের ছবি। কর্মহীন খেয়ালী যাত্রীরা সংযোগ করে দিয়েছে পাইপ আর গোঁফ, কি ছেলের কি মেয়ের মুখে। ছবিগুলোর আকাশ আর সমুদ্র পেন্সিলে লেখা গদ্যে ও পদ্যে নানা রকম বোকামিতে পূর্ণ। নীচে কতগুলো ছবি টাঙান: লুই ফিলিপ, আধ্যাত্মিক বাণীদানরত মতিকে ১৮৩০ শতাব্দীর জুলি আর সেন্ট প্র্যু'র প্রথম সাক্ষাৎ মুখের প্রতীক্ষা আর অনুতাপ ডুক্র্যুফের অনুসরণে। এই ঘরটির নাম নীল কক্ষ কারণ চিমনীর ডাইনে ও বামে উল্লেখের ভেলভেটের যে দুটি কৌচ—ঐ রঙের। কিন্তু বহু বছর হ'ল ওগুলো ছাইরঙা কাপড়ের আবরণে ঢাকা পড়ে রয়েছে লাল ফিতেয় জড়ান।

হোটেলের ঝি-চাকরেরা নতুন আগন্তুকযুগলের কাছে ছুটে এল কি চাই জানতে। লেঁও, প্রেম তার সাধারণ জ্ঞান লোপ করে নি, গিয়ে ঢুকল রান্নাঘরে। একটু নিজনে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করাতে তাকে অলঙ্কার-শাস্ত্রের সমস্ত জ্ঞান নিয়োগ করতে হ'ল আর কিছু উৎকোচ। কিন্তু তার ভয় হ'ল শুনে যে প্রধান খাবার ঘরে অর্থাৎ তার পাশের ঘরে তৃতীয় বিভাগের অশ্বারোহী সেনাপতিরা তৃতীয় বিভাগের পদাতিক সেনাপতিদের গ্রহণ করতে মিলিত হবে—ভারে আনুষ্ঠানিক বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। হোটেল-কর্তা ভগবানের নামে শপথ করে বলল যে, ফরাসী সৈন্যদের স্বভাবগত আনন্দোচ্ছ্বাস ছাড়া এই অফিসাররা মাধুর্য আর বিবেচনার জন্য বিখ্যাত সারা শহরে। পাশের ঘরে মাদামের কোন অসুবিধেই হবে না কেননা, তারা মধ্যরাতেই টেবিল ছেড়ে উঠে পড়বেন। কেউ তাদের কোনরকম অসুবিধার সৃষ্টি করবে না এই নিশ্চয়তা নিয়ে লেঁও নীল কক্ষে ফিরে এল। তার নজরে পড়ল পাশের ঘরটিই দখল করেছেন ইংরেজ ভদ্রলোকটি। দরজা খোলা। গ্লাস ও বোতলে সজ্জিত টেবিলের সামনে বসে তিনি—দৃষ্টিনিবদ্ধ ওপরের দিকে, যেন কতগুলো মাছি গুণছেন সেখানে।

"পারিপার্শ্বিকে কি আসে যায়"—মনে মনে বলল লেঁও। ইংরেজ ভদ্রলোকটি এখনি হবে অচেতন আর মধ্যরাত্রির আগেই অফিসাররা নেবে বিদায়।

ঘরে ঢুকে তার প্রথম কাজ হ'ল নিশ্চিন্ত হওয়া যে দরজাজানালাগুলো ভাল করে বন্ধ করা আর খিল লাগান। ইংরেজ ভদ্রলোকের দিকে দুটো দরজা। দেয়াল চওড়া। অফিসারদের দিকে একটু পাতলা কিন্তু দরজায় ছিটকিনি, তালা দুই-ই আছে। যাই হোক, গাড়ীর সার্সির থেকে কৌতূহলের বিরুদ্ধে এটা ঢের বড় বাধা। এমন অনেক লোক আছে যারা মনে করে ঘোড়ারগাড়ীর ভেতর বসে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন।

নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট কল্পনা: দুটি প্রেমিক হৃদয় মিলনের আনন্দে পূর্ণতম—যারা মিলিত হয়েছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর—ঈর্ষা আর কৌতূহল থেকে বহুদূরে। অতীত বেদনার কাহিনী পরস্পরকে জানাতে পেরেছে—পেয়েছে পূর্ণ মিলনের স্বাদ। কিন্তু শয়তানের কাছে সব সময়েই উপস্থিত সুখের পেয়ালায় তেতো মিশিয়ে দেবার উপায়।

জনসন লিখেছেন—তিনিই প্রথম নন যে, কেউ বলতে পারে না নিজের সম্বন্ধে "আমি আজ সুখী হব।" যে সত্যটি অতীতের দার্শনিকেরা জানতেন কিন্তু মৃত্যুশীল কোন কোন মানুষ উপেক্ষা করে বিশেষ করে প্রেমিকারা।

রাত্রে সামান্য খাবার পর দ্রব্যগুলো কর্মচারীদের ভোজনোৎসব থেকে সরাল, লেঁও আর তার বান্ধবীর হ'ল যন্ত্রণার একশেষ। পাশের ঘরে মহাশয়দের চলেছে সরব বাগ্‌বিনিময়—বিভিন্ন রণকৌশল সম্বন্ধে। এখানে তার উল্লেখ করা চলবে না।

চলছিল আজগুবি গল্প একের পর এক আর মাঝে মাঝে উচ্চহাস্য—আমাদের প্রণয়ীযুগল তাতে অংশগ্রহণ না করে পারছিল না। লেঁওর বান্ধবী অমিশুক নয়। কতগুলো জিনিস আছে যা কেউ বলতে চায় না যাকে ভালবাসে তার সঙ্গে যখন কথাবলায় রত। পরিস্থিতি ক্রমেই বিভ্রান্তিজনক হয়ে উঠতে লাগল। অফিসারদের জন্য যখন শেষের ভোজ্য দিতে যাবে লেঁও ভাবলে যে নীচে রান্নাঘরে গিয়ে বলে দেয় পাশের ঘরে একজন মহিলা রয়েছে অসুস্থ—গোলমাল একটু কম হলেই ভাল হয়। হোটেলের ম্যানেজার ভোজনসভায় এসে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন যে, কি বলবেন ভেবে পেলেন না। লেঁও

যখন খবর পাঠাল তাকে অফিসারদের বিষয়ে—একজন মহিলাকর্মী এসে তাকে বলল, কর্মচারীদের জন্য কিছু সাম্পাইন চাই—আর একজন ইংরেজ ভদ্রমহিলার জন্য কিছু পোর্তো। আমি বলেছি : "পোর্তো নেই"—যোগ করলে মহিলা-কর্মীটি। আচ্ছা বোকা তুমি। আমার এখানে সব রকমের পানীয়ই আছে। আমি দিচ্ছি বের করে। বোতলগুলো আর পাত্রগুলো দাও। একমুহূর্তে পোর্তো তৈরী করে ম্যানেজার প্রধান হলঘরে উপস্থিত হলেন আর লেওঁর সংবাদ তাদের জানালেন। সংবাদটি প্রথমে একটি প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি করল। একজনের গলা সবাইকে ছাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল : কি ধরনের স্ত্রীলোক আমাদের পাশের ঘরে রয়েছে? নিস্তব্ধতা এল নেমে। উত্তর দিল ম্যানেজার : সত্যি মঁশিয়ে, আমি বেশী কিছু জানি নে। তিনি খুব সুন্দরী আর লাজুক। মারীজান বলছে যে তার আঙুলে রয়েছে বিয়ের আংটি। সম্ভবতঃ তিনি বিবাহিতা এখানে এসেছেন একটু আমোদ করতে, যেমন হামেশাই হয়ে থাকে।

স্ত্রীলোক! জানাল চল্লিশটি কণ্ঠস্বর; তাকে আমাদের সঙ্গে পান করতে হবে। আমরা তার দীর্ঘজীবনের জন্য পান করব দাম্পত্য-নিয়মাবলী তার স্বামীকে শিখিয়ে দেব।

এমন সময় শোনা গেল জুতোর শব্দ—আমাদের প্রণয়ীযুগল ভয়ে শিউরে উঠল এই ভেবে যে, সৈন্যরা তাদের ঘরে এসে হানা দেবে। কিন্তু হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর শোনা গেল যাতে সব নিমেষে হ'ল স্তব্ধ। নিশ্চয়ই যিনি কথা বলছিলেন তিনি একজন নেতা। তিনি অফিসারদের তিরস্কার করলেন তাদের ঔদ্ধত্যের জন্য, তিনি তাদের আদেশ করলেন বসতে আর কথাবার্তা বলতে অহুচ্চস্বরে ভদ্রভাবে। পরে কতগুলো কথা যোগ করলেন এত আস্তে যে নীল কক্ষের থেকে কিছুই শোনা গেল না। কথাগুলো সবাই শুনল মন দিয়ে, কিন্তু চাপাহাসির গুঞ্জন বাদ দিয়ে নয়। অফিসারদের কক্ষ এর পর থেকে হ'ল আগের চেয়ে অনেক নীরব আর আমাদের প্রণয়ীযুগল জানাল আশীর্বাদ নিয়মের স্বাস্থ্যের সাম্রাজ্যকে আর আরম্ভ করল আবার অসতর্ক বাগ্‌বিনিময়। কিন্তু এত বাধা-বিপত্তির পর সূক্ষ্ম-আবেগের সূত্রটি পুনরায় সংযোগ করতে সময়ের প্রয়োজন বোধ করলে তারা যাকে ছিন্ন করে দিয়েছিল উৎকণ্ঠা, পথের ক্লান্তি, বিশেষ করে পাশের ঘরের অমার্জিত হৈ-হুল্লোড়। তাদের বয়েসে জিনিসটি খুব কঠিন নয়, তাদের রোমাঞ্চকর বাধা-বিপত্তিগুলো ভুলে যেতে দেরী হ'ল না, শুধু অবশ্যম্ভাবী পরিণতির চিন্তা ছাড়া।

তারা ভাবল সৈন্যদের মধ্যে গোলমাল সব মিটে গেছে। হায়! একটু বিরতিমাত্র! অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে যখন তারা এই বাস্তব জগৎ থেকে বহু দূরে, বেজে উঠল সমস্ত বাদ্যযন্ত্রে ফরাসী সৈন্যের পরিচিত 'গৎ' : "বিজয় আমাদের!" এ ঝড়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার উপায়? কৃপার্থী, অসহায় প্রণয়ীযুগল।

না, অতটা দয়া করবার প্রয়োজন নেই তাদের, কারণ অবশেষে অফিসারেরা ঘর পরিত্যাগ করলেন, নীল কক্ষের সামনে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন তলোয়ার আর জুতোর শব্দে সজোরে জানিয়ে :

"—শুভরাত্রি, হে নব-পরিণীতা!"

তার পর সমস্ত শব্দ থেমে গেল। একটু ভুল বলছি, ইংরেজের ঘর থেকে বেরিয়ে এল :—হয়, আর এক বোতল 'পোর্তো' এখানে। ন···শহরের নীরবতা অবশেষে হ'ল অখণ্ড। মধুর রজনী, চন্দ্রপূর্ণ। স্মরণাতীত-কাল থেকে প্রেমিকহৃদয়কে উৎফুল্ল করেছে আমাদের উপগ্রহটি। লেওঁ আর তার বান্ধবী খুলে দিল বাগানের দিকের জানালাটি আর বুক ভরে নিল সুগন্ধীফুল-আমোদিত মুক্ত সমীরণ।

তারা সেখানে দাঁড়িয়ে রইল না তবু অনেকক্ষণ ধরে। একটি লোক ঘুরে বেড়াচ্ছিল বাগানে—মাথাটি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হাত দুটি আড়াআড়িভাবে রাখা। ঠোঁটের ফাঁকে একটি সিগারেট। লেওঁ চিনতে পারল ইংরেজ ভদ্রলোকটির ভ্রাতুষ্পুত্রকে, সেই ইংরেজ ভদ্রলোক 'পোর্তো'র ওপর যার একটু দুর্বলতা আছে।

সবিশেষ বর্ণনা দেওয়া আমার পছন্দ নয়; আর তা ছাড়া আমার পাঠকেরা যা সহজেই কল্পনা করে নিতে পারেন তা আমি বলতে বাধ্য নই অথবা প্রতি মুহূর্তে যা ঘটল ন···শহরের হোটেলটিতে। আমি বলব বরং যে মোমবাতিটি জ্বলছিল নীল কক্ষে আগুনহীন চুল্লীর ওপর সেটি ক্ষয় হয়ে গিয়েছিল অর্ধেকেরও বেশী যখন ইংরেজ ভদ্রলোকটির ঘরে—এতক্ষণ ছিল নিস্তব্ধ—একটি অদ্ভুত শব্দ শোনা গেল। কতকটা একটা ভারী দেহ পড়ে গেলে যেমন হয়। এই শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত হ'ল একটি অপরিচিত শব্দ, যেন একটা কিছু ভেঙে গেল। তার পর একটু গোঙানি—কয়েকটি অস্পষ্ট কথা অভিসম্পাতের মত। নীল কক্ষের তরুণ-তরুণী দুটি উঠল শিউরে। হয়ত তারা জেগে হঠাৎ উঠে বসেছিল। এই শব্দ, অজ্ঞাত যার কারণ, দু'জনের মনেই করল একটা শঙ্কাময় ছায়াপাত। একজন সমর্থ যুবকের পক্ষে বাগানের প্রাচীন ডিঙিয়ে জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকার চেয়ে সহজতর কাজ আর কি

হতে পারে! আর বিশেষ করে সে যদি হয়ে থাকে ভগ্নোৎসাহ। তা ছাড়া যে সেই হোটেলেরই বাসিন্দা—রাত্রে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ...যত...সম্ভবত... নিঃসন্দেহে সে জানত তার বাবার কালো থলেটিতে রয়েছে বেশ একটা মোটা টাকার অঙ্ক। এই নিঃশব্দ আঘাত যেন কোনো ভারী একটা ভারী কিছু পড়! এই সুস্পষ্ট ...! এই ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত! আর তার পর মিলিয়ে যাওয়া পায়ের শব্দ লোকটিকে দেখে মনে হয় খুনে বিশ্বস্ত লোকজন ভর্তি হোটেলে কেউ খুন করবে না। ইংরেজ ভদ্রলোকটি বুদ্ধিমানের মতই দরজায় ... রেখেছিলেন—চারদিকে গোলমালের জন্য। এখন তিনি থাকেন মধ্যেই আনেন নি। তিনি চান নি বাংলো ... হাতে নিয়ে ওদের মাঝখানে যেতে এমন লোক ... কাজ কি ... আমি এত খুশী।

এ সব সে ভাবছিল নিজের মনে মনে তার চিন্তার মধ্যে তা নিশ্চয় কিন্তু বিবরণ আমি দেব না, ...গুলো তার মনে আসছে ... ভাবে অসংলগ্ন। ... তার দৃষ্টি ... না। রক্ষ আর ইংরেজ ভদ্রলোকটির ... দ... ও র।

ফ্রাঁসের দরজাগুলো ভাল বন্ধ হয় না। দুটো পাল্লার মাঝে ফাঁক ছিল প্রায় দু' সেন্টিমিটার। এই ফাঁকের ভেতর দিয়ে হঠাৎ দেখা গেল অস্পষ্ট কালো মত কি একটা চ্যাপ্টা ছুরির-ফলার মত কতকটা—কারণ, ধারটা মোমের আলোয় দেখাচ্ছিল যেন একটি সরুরেখা—খুব উজ্জ্বল। এটা গড়িয়ে গেল ধীরে ধীরে দরজা থেকে কিছু দূরে অযত্নে ফেলে-রাখা নীল সাটিনের তৈরী স্যাণ্ডেলের দিকে—এটা কি কোনো জাতীয় কোন পোকা? না, এটা পোকা নয়। কেননা এর নির্দিষ্ট কোন আকার নেই। দুটো কি তিনটে খয়েরী রেখা প্রত্যেকটির পাশে একটি করে কালো দাগ ঘরের ভেতর এসে পড়েছে। তাদের গতি বেড়ে উঠল ঢালু মেঝের ওপর। বেগে গড়িয়ে প্রায় স্পর্শ করল ক্ষুদ্র স্যাণ্ডেলটি আর সন্দেহ নেই! এটা একটা তরলীয় পদার্থ—মোমের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল এর রং—রক্ত! আর যখন অসাড় লেণ্ড দেখছিল এই ভয়ঙ্কর রেখাগুলো তরুণীটি ছিল নিশ্চিন্ত-নিদ্রামগ্না তার ছন্দোময় নিঃশ্বাস উষ্ণ করে রেখেছিল তার প্রণয়ীর গলা আর কাঁধ।

ন শহরের হোটেলে এসেই নৈশ-ভোজন-তালিকা-নির্দেশে যে যত্ন নিয়েছিল লেণ্ড তা প্রমাণ করে ভাল করেই যে তার মাথাটি বেশ পরিষ্কার—বুদ্ধি বেশ উঁচু দরের...অধিকন্তু সে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। এ ক্ষেত্রে তার স্বভাবের ব্যতিক্রম হ'ল না। কোন সাড়াশব্দ না করে তার সমস্ত বুদ্ধি নিয়োগ করল এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে একটা উপায়ের চিন্তায়। আমার মনে হয় অধিকাংশ পাঠকেরা বিশেষ করে মেয়েরা ইতিমধ্যে বিচলিত—দুঃসাহসী হয়ে উঠেছেন, দোষারোপ করবেন লেণ্ডর স্বভাবের ওপর তার নিশ্চেষ্টতার ওপর, আমাকে বলবেন, তার উচিৎ ছিল ইংরেজ ভদ্রলোকটির ঘরে ছুটে গিয়ে খুনীকে বাধা দেওয়া অন্তত ঘণ্টা বাজিয়ে হোটেলের লোকজনদের জাগিয়ে দেওয়া। এর উত্তরে আমি বলব যে, ফ্রান্সের হোটেলে ঘণ্টা রয়েছে শুধু ঘরের শোভার জন্য আর তাদের সংযোগসূত্র কোন প্রকার যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নয়। আমি বলছি আরও সবিনয়ে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে যে ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে কাছে খুন হতে দেওয়া যদি বর্বরতা হয়, ইংরেজ ভদ্রলোকটির জন্য মেয়েটিকে হারান প্রশংসনীয় নয়, যে আপনার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে রয়েছে। লেণ্ড যদি একটা চেঁচামেচি তুলে হোটেলটিকে জাগিয়ে দিত—কি ঘটত? দারোগা-পুলিশ হানা দিত সন্দেহে। কি কি দেখেছে বা শুনেছে তা জিজ্ঞেস করবার আগে, তাদের পেশানুসারে—ঔৎসুক্যের শেষ এদের কোন সীমা—প্রশ্নেই আরম্ভ করত: আপনার নাম? সঙ্গের কাগজপত্র? আর মহিলাটি কে? দু'জনে এক সঙ্গে হোটেলে করছেনই বা কি? আপনাদের আদালতে হাজির হয়ে বলতে হবে যে, এই মাসে রাত্রি অত ঘটিকায় এই এই ঘটনার আপনারা সাক্ষী।

বস্তুতঃ পুলিশে খবর দেবার কথাই তার মনে হয়েছিল প্রথমে। কখনও কখনও জীবনে এমন ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে বিবেকের বিচার সমস্যাপূর্ণ। একজন অপরিচিত ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটুক, অথবা যাকে ভালবাসি তার অসম্মান হোক—কি তাকে হারাই—কোনটি শ্রেয়তর? এ রকম একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে নিশ্চয়ই কেউ চান না ...চতুর শিরোমণিও নন।

তার অবস্থার অন্য সবাই সম্ভবতঃ যা করত লেণ্ড-ও তাই করল। সে নিশ্চল হয়ে রইল। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ নীল পাদুকার ওপর—যেখানে লাল স্রোতের ধারা এসে মিলেছে—লেণ্ড পড়ে রইল অনেকক্ষণ মুগ্ধের মত—ঠাণ্ডা ঘামে তার কপাল ভিজে উঠল। আর তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। অসংখ্য চিন্তা আর অসংলগ্ন ভয়ঙ্কর ছবি তার মনে ভিড় করে এল। একটি কণ্ঠস্বর প্রতিমুহূর্তে তার ভেতরে বলতে লাগল, "এক ঘণ্টার মধ্যেই সব জানাজানি হয়ে যাবে। আর এ তোমারই দোষ!" এ অবস্থায় কি করা যেতে পারে এ কথা

ভাবতে ভাবতে অবশেষে সে একটু আশার আলো দেখতে পেল। অবশেষে বলে উঠল : যদি আমরা এই অভিশপ্ত হোটেল সব কিছু প্রকাশ হবার আগেই পরিত্যাগ করি তা হলে হয়ত আমাদের সব চিহ্নও মুছে যাবে। কেউ এখানে আমাদের চেনে না। সবাই এখানে আমাকে দেখেছে চশমা চোখে আর তোমাকে ওড়নার আড়ালে। এখান থেকে ষ্টেশন দু'পা। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা নগরের শহর থেকে অনেক দূরে চলে যেতে পারব। অনেকক্ষণ ধরে 'টাইম টেবিল' দেখার ফলে তার মনে পড়ল আটটার সময় প্যারিসের একটি ট্রেন আছে। অনতিবিলম্বেই পারী শহরের জনসমুদ্রে মিলিয়ে যেতে পারবে। যেখানে লুকিয়ে আছে অন্যান্য শত শত অপরাধী সেখানে দু'টি নিরপরাধীকে কে খুঁজে বের করবে? কিন্তু আটটার আগে কি ইংরেজ ভদ্রলোকটির ঘরে কেউ ঢুকবে না? সমস্ত প্রশ্নটি সেখানে।

কিন্তু এ ছাড়া গত্যন্তর নেই দেখে সে দুঃসাহসিক চেষ্টা করল ঝেড়ে ফেলতে দেহমন থেকে অবসন্নতার ভাবটি যা অনেকক্ষণ থেকেই তাকে অধিকার করে রয়েছিল। একটু নড়তেই তার তরুণী সঙ্গিনীটি জেগে উঠল। হতবুদ্ধি হয়ে আঁকড়ে ধরল তাকে। ঠাণ্ডা গায়ের ছোঁয়া লাগতেই অস্ফুষ্ট চিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে :

"কি হয়েছে তোমার?" মেয়েটির প্রশ্নে উৎকণ্ঠা, তোমার কপাল পাথরের মত ঠাণ্ডা।

—"কিছু না"—স্খলিতকণ্ঠে উত্তর দিলে ছেলেটি : একটা শব্দ শুনলাম পাশের ঘরে।

নিজেকে তার হাত থেকে মুক্ত করে নিয়ে প্রথমে নীল স্যাণ্ডেলটি সরিয়ে রাখল। একটি চেয়ার এনে দুটো ঘরের মাঝের দরজার সামনে রাখল। যাতে মেয়েটি না দেখতে পায় ভয়ঙ্কর তরল পদার্থটি যা—গড়ান বন্ধ করে কার্পেটের ওপর মস্ত বড় একটা ছোপ তৈরী করেছিল। বারান্দার দিকে দরজাটা সে একটু ফাঁক করল। চেষ্টা করল সন্তর্পণে কোন শব্দ পাওয়া যায় কি না শুনতে। ইংরেজের ঘরের দিকে এগিয়ে যাবারও একটু সাহস হ'ল। ঘরটি বন্ধ ছিল। হোটেলে তখন অনেকেই জেগে উঠেছে। বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে চারদিক্। উঠোনে হোটেলের সহিসরা ঘোড়াগুলো বের করে ডলাইমলাই আরম্ভ করে দিয়েছিল। তেতলা থেকে নামছিল একজন অফিসার জুতোয় পেরেকের শব্দ তুলে। সে তদারক করতে যাচ্ছিল এই চিত্তাকর্ষক কাজটির—মানুষের চেয়ে ঘোড়ার পক্ষেই বেশী আরামদায়ক—যার বিশেষ নাম হ'ল "ডলাইমলাই"।

লেণ্ড ফিরে এলো নীল কক্ষে। ভালোবাসা যতকিছু উপায় স্থির করতে পারে—লেণ্ড ধীরে ধীরে ভেঙে ভেঙে জানাল তার সঙ্গিনীটিকে—তাদের অবস্থা।

এখানে থাকা বিপদ; হঠাৎ চলে যাওয়াও বিপদ। দুর্ঘটনাটি না প্রকাশ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আরও বিপদ। বলাবাহুল্য খবরটি সঞ্চার করল ভয়ের, তার পর অশ্রুপাত—পাগলের মত কথা। কতবার যে হতভাগ্য দু'টি জড়িয়ে ধরল পরস্পরকে এই বলে যে, "ক্ষমা করো আমায়, ক্ষমা করো"। প্রত্যেকে মনে করল সে নিজে বেশী অপরাধী। তারা শপথ করল একসঙ্গে মরবে। মেয়েটির মনে সন্দেহমাত্র ছিল না বিচারে ইংরেজ ভদ্রলোকটি হত্যার জন্য তাদের দায়ী করা হবে। তারা নিশ্চিত ছিল না যে, বিচারের কাঠগড়ায় তাদের আবার আলিঙ্গনবদ্ধ হতে দেবে। জড়িয়ে ধরল তারা পরস্পরকে —শ্বাসরোধকর আলিঙ্গন—তার পর অশ্রুস্নান। অবশেষে নানারকম অসম্ভব কথা—প্রিয় ও হৃদয়বিদারক ভাষণের পর সহস্র চুম্বনের মধ্যে তারা স্থির করল আটটার ট্রেনে চলে যাওয়াই সব চাইতে ভালো। কিন্তু আরও দু'টি ভয়ঙ্কর ঘণ্টা তাদের কাটাতে হবে। বারান্দায় প্রত্যেকটি পায়ের শব্দে তাদের সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠছে। জুতোর প্রত্যেকটি শব্দ তাদের ঘোষণা করছিল পুলিসের আগমন, তাদের স্বল্প মালপত্র মুহূর্তে গোছান হয়ে গেল। মেয়েটি তার নীল পাদুকা চেয়েছিল চিমনির আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে কিন্তু লেণ্ড সেটা তুলে নিল তোষকের কাপড়ে মুছে একটি চুমু খেয়ে পকেটে রেখে দিল। অবাক হ'ল সে স্যাণ্ডেলে ভ্যানিলার গন্ধ পেয়ে। তার বান্ধবীটি ব্যবহার করত ওজেনি সুগন্ধ।

হোটেলে সবাই জেগে উঠেছে। শোনা যেতে লাগল হোটেলের চাকরেরা হাসাহাসি করছে। ঝিয়েরা গান করছে। সৈন্যরা তাদের অফিসারদের পোশাকে বুরুশ চালাচ্ছে। সাতটা বাজল। লেণ্ড অনুরোধ করল মেয়েটিকে একটু কফি খেয়ে নিতে। কিন্তু সে উত্তর দিল, "গলা দিয়ে নামবে না, চেষ্টা করতে গেলে বিষম খেয়ে মারা পড়ব।"

লেণ্ড এঁটে নিল তার নীল চশমা চোখে, নীচে নেমে এলো মিটিয়ে দিতে বিল। হোটেলের মালিক চাইল ক্ষমা যে শব্দ হয়েছিল তার জন্য, যার কারণ তখন পর্যন্ত তার জানা ছিল না কারণ ম-ম অফিসাররা বরাবরই ছিল অতি শান্ত। লেণ্ড তাকে আশ্বস্ত করে বলল যে সে

কোনো শব্দই শোনে নি। আর বেশ ভালো করে ঘুম হয়েছিল। আপনার পাশের ঘরের লোকটি, বলে চলল হোটেলওয়ালা, নিশ্চয়ই আপনার অসুবিধার কারণ হয় নি। তিনি খুব সাড়াশব্দ করেন না। আমি বাজী রেখে বলছি, তিনি এখনো গভীর ঘুমে মগ্ন। লেওঁ কাউন্টারে ভর দিয়ে দাঁড়াল যাতে না পড়ে যায়। মেয়েটি একই পথ অনুসরণ করতে গিয়ে তার হাত দু'টি জড়িয়ে ধরল চোখের সামনে ওড়নাটি আরো টেনে দিয়ে।

—একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—আবার আরম্ভ করল হৃদয়হীন হোটেলওয়ালা। তার সব সময়েই সব চেয়ে দামী মালের প্রয়োজন। চমৎকার অদ্ভুত লোক—কিন্তু সব ইংরেজই তার মত নয়। এখানে একটি ছিল একেবারে হাড়কিপ্টে—সব কিছুই তার কাছে মহার্ঘ—ঘরদোর, খাবারদাবার। সে চেয়েছিল তার একশ' পঁচিশ ফ্রাঙ্কের বিল মিটিয়ে দিতে ওদের ব্যাঙ্কের হিসেবে—পাঁচ পাউণ্ডের নোট দিয়ে, তা-ই যদি ঠিক হয়ে থাকে। দেখুন, মঁশিয়ে, এ সব বিষয়ে নিশ্চয়ই আপনার জ্ঞান আছে; কারণ, আমি আপনাকে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে শুনেছি। এটা কি ঠিক—বলতে বলতে সে বের করল একটি পাঁচ পাউণ্ডের ব্যাঙ্কনোট একটি কোণে একটুখানি দাগ যার কারণ বুঝতে লেওঁর একটুও দেরী হ'ল না।

—আমার মনে ঠিকই হয়েছে—বললে অস্ফুট কণ্ঠে।

—ও! আপনাদের অনেক সময় আছে—ট্রেন ছাড়ে আটটায়—বরং দেরীই হয়—একটু বসে জিড়িয়ে নিন—মাদাম আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

এ সময় বিপুলকায় ঝি প্রবেশ করল।

—শিগগীর একটু গরম জল—ইংরেজ ভদ্রলোকটির চায়ের জন্য—তিনি তার বোতলটি ভেঙে ফেলেছেন—সমস্ত ঘর ভেসে যাচ্ছে! কথা ক'টি শুনে লেওঁ একটি চেয়ারে বসে পড়ল, তার বান্ধবীটিও। তাদের ভীষণ ইচ্ছে হ'ল হেসে উঠতে, বেশ অসুবিধেই হ'ল তা না করতে পেরে।

মেয়েটি সানন্দে চেপে ধরল ছেলেটির হাত।

—নিশ্চয়ই আমরা দু'টোর ট্রেনের আগে যাচ্ছি না। মধ্যাহ্ন-ভোজনটা যেন বিশেষ রকমের হয়।

গল্পের মত গল্প

শ্রীবিমল মিত্র

খুব তাড়াতাড়ি একটা গল্প লিখে দিতে হবে হুকুম হয়েছিল। যত কম সময়ে আর যত কম আয়তনে সম্ভব। কিন্তু গল্প হ'ল ঠিক ফলের মতন। বহুদিন ধরে রোদ আর বাতাস লেগে লেগে তাতে রং ধরবে। ভেতরে রস জমবে। রঙে রসে ঠিক যখন টল্‌টল্ করবে, তখনই বোঁটা থেকে খসে পড়বার লগ্ন তার। তার এক মিনিট আগেও না, আবার এক মিনিট পরে হলেও চলবে না। লগ্ন পার হয়ে গেলেই সে-গল্প বিস্বাদ ঠেকবে। এই-ই হ'ল গল্প লেখার নিয়ম।

কিন্তু সব সময়ে লগ্নের জন্যে অপেক্ষা করাও সম্ভব নয় আমাদের।

আর তা ছাড়া তখন অন্য কাজও ছিল। কলকাতা থেকে অনেক দূরে বোম্বাইতে তখন আছি। চলচ্চিত্র-শিল্পের মধ্যে যে-বিভাগটা সাহিত্যের, আমি তখন সেই সাহিত্যের বিভাগের একটা কাজে ভীষণ ব্যস্ত। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত সেই কাজটা নিয়েই থাকি। তাড়াতাড়ি কাজটা শেষ করে কলকাতায় ফিরে আসব। ফিরে আসবার জন্যে ছটফট্ করছি, এমন সময় হুকুমটা এল।

ভাবলাম—কোথায় গল্প পাই? সকালবেলায় যে-ট্রেনটা আন্ধেরী স্টেশন ছেড়ে বান্দ্রায় গিয়ে থামে, আবার সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসে আন্ধেরীতে, নিয়ম করে ইঞ্চি মেপে প্রত্যেক দিনের কাজটা করে, তার মধ্যে গল্প কোথায়? সকালবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে অফিসে যায় যারা, আবার ফিরে আসে বাড়িতে, এসে খাওয়া-দাওয়া করে রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তাদের মধ্যেই বা গল্প কোথায়? জীবনের সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটা কঠিন নিয়মের শৃঙ্খলের শাসনে যে-মানুষ বড় হ'ল, চাকরি করল, বিয়ে করল, সন্তানের জন্ম দিলে আর তারপর একদিন যথারীতি বুড়ো বয়েসে মারা গেল, তার মধ্যে বৈচিত্র্য কোথায় যে তাকে নিয়ে গল্প লিখব?

শেষ পর্য্যন্ত ঠিক করলাম উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের কাছেই যাব।

উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব বুড়ো মানুষ। আমি যে কোম্পানীর কাজ করছিলাম, সেই কোম্পানীরই আর্ট ডাইরেক্টর উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব। আগে বরোদার নেটিভ স্টেটে হাউস্-ডেকরেটারের কাজ করেছেন। কোন্ ঘর কি ভাবে সাজালে ভাল দেখাবে, এ-সব উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের ত নখদর্পণে। ভাইস্‌রয় কিম্বা গভর্ণর স্টেটে বেড়াতে কি শিকার করতে এলে উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের মত লোকের দরকার। খাঁটি ইংরেজ। কিন্তু ইংরেজের গোঁড়ামিটা নেই সাহেবের চরিত্রে।

অনেক দিন ষ্টুডিওতে বসে বসে গল্প করেছি উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের সঙ্গে। ড্রয়িং-রুমের সেট্ সাজানো হচ্ছে। য়্যাসিস্‌ট্যাণ্টরাই সব কিছু করছে। হঠাৎ উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব এসে সেটে ঢুকলেন। তারপর দেয়ালের গায়ে একটা ছবি টাঙিয়ে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ড্রয়িং-রুমের চেহারাটা আমূল পাল্‌টে গেল। ছবি হবার আগে পর্য্যন্ত স্যুটিং-এর আগে উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব নিজের অফিস-ঘরে রং-তুলি-সেটস্কোয়ার নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। কারও সঙ্গে কথা বলতেন না। ষ্টুডিওর মালিক মুখার্জি সাহেবও বিরক্ত করতেন না উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবকে। সে ক'দিন সাহেব খুব ব্যস্ত, খুব গম্ভীর, খুব চিন্তিত। তারপর যেদিন থেকে সেট পড়ল সেদিন থেকে আবার হাসিখুশী, আবার প্রাণখোলা, আবার হাসিগল্প নিয়ে মেতে আছেন।

পালি হিল রোডের বাড়ীতে ঢুকতেই আমাকে দেখতে পেয়েছেন সাহেব। রবিবার। ষ্টুডিও বন্ধ। সামনে বাগান। আর বাগানের ভেতর পর্য্যন্ত একটা ঢাকা গাড়ি-বারান্দা। সেই গাড়ি-বারান্দাতেই সোফা-কোচ সব সাজানো।

আমাকে দেখেই উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব দাঁড়িয়ে উঠলেন। বললেন—কি খবর রাইটার? কি মনে করে?

দেখলাম চারপাশে গাদা গাদা বই ছড়ানো। মোটা মোটা ইংরেজী বই সব। কয়েক ভলিউম্ "য়্যারেবিয়ান নাইট্‌স্"। তখন মুখার্জি সাহেব 'আরব-কা সওদাগর' ছবি তুলবেন ঠিক করেছেন। সেই সম্বন্ধেই পড়াশোনা করছেন সাহেব।

বললাম—বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি মিস্টার উইল্‌কিন্‌স্—

সাহেব বললেন—বোস, বোস, কি বিপদ্ বল ত?

উইল্‌কিন্‌স্ সাহেব বুড়ো হলেও বেশ জোয়ান চেহারার মানুষ। বয়েস পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে। জীবনের বেশীর ভাগটাই ইণ্ডিয়াতে কাটিয়েছেন।

সাহেব প্রায়ই বলতেন—এবারে দেশে ফিরে যাব, এবার রিটায়ার করে সেখানেই গিয়ে রেস্ট্‌ নেব—

আর সত্যিই টাকাকড়িরও অভাব ছিল না সাহেবের। —ছেলেরা বড় হয়েছে। দুই ছেলে। তারা নাকি আফ্রিকা না অষ্ট্রেলিয়া কোথায় চাকরি করছে। এ-বয়েসে এখানে চাকরি করা পোষায় না। নেটিভ স্টেটে থাকবার সময়েই প্রচুর টাকা উপায় করেছেন। এখানে, এই বোম্বের সিনেমা-কোম্পানী থেকেও মাসে প্রায় দু'হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছেন। অথচ খরচ তেমন কিছু নেই।

আমি বলতাম—আপনি এখনও কেন এখানে পড়ে আছেন সাহেব?

সাহেব কিছু কথা বলতেন না। শুধু হাসতেন। আর সিগারেট টানতেন। যখন হাসতেন তখন তাঁর হাসির হা-হা শব্দে ঘর একেবারে ফেটে যাবে মনে হ'ত। কোনও ইংরেজকে কখনও অমন করে হাসতে দেখিনি।

মুখার্জি সাহেব বলতেন—অনেক কষ্টে সাহেবকে চাকরি নিতে রাজি করিয়েছি। ও কি চাকরি করতে চায়?

মুখার্জি সাহেব একবার যখন বরোদায় গিয়েছিলেন স্যুটিং করতে, সেই সময়েই সেখানে পরিচয় হয়েছিল উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের সঙ্গে। দেখলেন, ভারি গুণী লোক। অমন একজন আর্ট ডাইরেক্টর থাকলে কোম্পানীর ছবির নাম হবে। এক বছর ইণ্ডিয়ায় থাকবার পর ইণ্ডিয়ার সব কিছু ভাল করে দেখে নিয়েছেন। ইণ্ডিয়ার নাড়ী-নক্ষত্র পর্য্যন্ত চিনে ফেলেছেন। গ্রাম, শহর, মন্দির, মসজিদ, মানুষ-জন, সমাজ-ব্যবস্থা, বিয়ে-সাদি, সমস্ত কিছু। কি দিয়ে গ্রামের লোক ভাত খায়, বিয়ের সময় হিন্দু-মুসলমান মেয়েরা কি সাড়ি পরে—কেমন করে পরে, সমস্ত জানা। প্যালেস থেকে সুরু করে ভিলেজ-হাট পর্য্যন্ত সব দেখা। সুতরাং অমন গুণী লোককে দু'হাজার টাকা মাইনে দিতে মুখার্জি সাহেবের আটকায়নি।

সাহেব আবার বললেন—কি বিপদ্ হ'ল আবার তোমার, রাইটার? স্টোরি আটকে গেছে?

বললাম—না, তা নয়, একটা স্টোরি চাই আমার—শর্ট স্টোরি—

—শর্ট স্টোরি কি হবে? ম্যাগাজিনের জন্যে?

বললাম—হ্যাঁ, মাথায় কিচ্ছু আসছে না, এদিকে জোর তাগাদা এসেছে, স্টোরি দিতেই হবে—

—কিন্তু আমি স্টোরি কোথায় পাব? আমি ত তোমায় হেল্প করতে পারব না, আমি ত স্টোরি রাইটারও নই—

বললাম—না, আপনি ত অনেক দেখেছেন, অনেক ঘুরেছেন—অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে আপনার জীবনে—

—অভিজ্ঞতা? এক্‌স্‌পিরিয়েন্স?

বললাম—নিজের না হোক, পরের। ফার্স্ট হ্যাণ্ড না হোক, সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড! এমন কাহিনী যা নিয়ে আমি একদিনের মধ্যে স্টোরি লিখতে পারি। আজকে রবি-বার, আজকে ছুটির দিন, আজকের মধ্যেই শেষ করে ফেলতে হবে, নইলে আমারও বিপদ্, এডিটারেরও বিপদ্—

সাহেব আবার সেইরকম হা হা করে হাসতে লাগলেন। তার পর হাসি থামিয়ে বললেন—এত লোক থাকতে তুমি আমার কাছে এলে কেন রাইটার? তোমার কি করে মনে হ'ল যে আমি তোমায় হেল্প করতে পারব?

বললাম—কি জানি, আমার মনে হ'ল যেন আপনার কাছে এলে কিছু সুরাহা হবে—

—তুমি আমার লাইফ নিয়ে লিখবে?

বললাম—তাও লিখতে পারি—

সাহেব বললেন—কিন্তু আমার লাইফে ত লেখবার মত কোনও স্টোরি নেই—

বললাম—ভাবুন না, একটু ত বলেই হয়ত একটা স্টোরি বেরিয়ে আসবে।

সাহেব বললেন,—না, রাইটার আমার লাইফে যেসব স্টোরি আছে, সে রকম স্টোরি তোমার জীবনেও আছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোকের যা লাইফ আমারও তাই। আমি একদিন জন্মেছি, লেখাপড়া করেছি, তার পর বড় হয়ে চাকরি করেছি, আর মাঝখানে বিয়ে হয়েছে, ছেলে হয়েছে—এই-ই সব, আর কিছু নেই আমার জীবনে—

—তাহলে অন্য কারও লাইফ! কোনও বন্ধু বা কোনও বান্ধবী।

সাহেব হেসে বললেন—না, রাইটার, আমার কোনও বান্ধবী নেই জীবনে। আমার স্ত্রীই আমার প্রথম ফ্রেণ্ড—

—এ বড় আশ্চর্য ত! শুনেছি আপনাদের দেশে সকলেরই গার্ল-ফ্রেণ্ড থাকে!

সাহেব বললেন—তা থাকে কারো কারো, কিন্তু আমার ছিল না। আর বলতে গেলে আমার কোনও ফ্রেণ্ডই ছিল না। ছোট বেলায় বাবা মারা গিয়েছিল,

বিধবা মা আর একটা বিয়ে করলে। করে আমায় পাঠিয়ে দিলে বোর্ডিং-এ। আমি অনেক বয়েস পর্যন্ত সেই বোর্ডিং-এই মানুষ হয়েছি—

বললাম—কিন্তু এই প্রফেসনে এলেন কি করে?

এই হাউস্-ডেকরেটিং-এর বিদ্যে আয়ত্ত করেছিলেন এক কাকার কাছে। তিনি প্যারিসের একজন ফ্যাশন্ কিং ছিলেন। কাকা ছিলেন আর্টিস্ট। অয়েল-পেন্টিং করতেন, ওয়াল-পেন্টিং করতেন, পোর্ট্রেট স্টাডি করতেন। অনেক কাজের মানুষ ছিলেন তিনি। ভাইপো সঙ্গে সঙ্গে থেকে দেখে দেখে সব শিখেছিল। ইণ্ডিয়া থেকে বড় বড় রাজা-মহারাজারা প্যারিসে গেলে কাকার সঙ্গে দেখা করত। সেখানেই বরোদার গাইকোয়াড়ের সঙ্গে পরিচয়। আর সেই পরিচয়ের সূত্র ধরেই ইণ্ডিয়ায় আসা।

বরোদার সে জীবনে কোনও বৈচিত্র্যই ছিল না। গাইকোয়াড়ের মোটা মাইনে, সুন্দর কোয়ার্টার, আর নিজের পছন্দ মত চাকরি—এর চেয়ে সুখের আর কি আছে? সুখের মধ্যে দিয়েই জীবন কেটে গেছে, যৌবন কেটে গেছে, বার্দ্ধক্য কেটে যাচ্ছিল উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের। তার পর এই ফিল্‌ম্-কোম্পানীর মিস্টার মুখার্জি গিয়েছিলেন শুটিং করতে, তখনই এখানে চলে এসেছেন।

—কিন্তু এখানে এই ফিল্‌ম্-কোম্পানীতেই বা এলেন কেন? ফিল্‌ম্-কোম্পানীর কাজ কখনও করেছেন আগে?

সাহেব বললেন—না রাইটার, জীবনে কখনও ফিল্‌ম্-কোম্পানীতে চাকরি করব তা কল্পনাই করতে পারি নি—মিস্টার মুখার্জি পীড়াপীড়ি না করলে এ-প্রফেসনে আমার আসাই হ'ত না—

—এখানে কেমন লাগছে আপনার?

সাহেব বললেন—ভালই—

—দেশের কথা মনে পড়ে না? দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না আপনার?

সাহেব বললেন—ইণ্ডিয়াই আমার দেশ হয়ে গেছে রাইটার—এখান থেকে যদি রিটায়ার করি ত ইণ্ডিয়াতেই সেট্‌ল্ করব আমি—

জিজ্ঞেস করলাম—দেশের কোনও লোকের কথা মনেই পড়ে না আপনার? কাকার কথা কি মা'র কথা?

সাহেব বললেন—না রাইটার, না। কাকা মারা গেছে আজ কুড়ি বছর আগে। আর মা? মা বেঁচে আছে কি না তাও জানি না। মা'র সঙ্গে কোনও সম্পর্কই নেই গোড়া থেকে।

আমি আরও অনেক প্রশ্ন করলাম। কিন্তু কোনও সুরাহা হ'ল না। উইল্‌কিন্‌স্ সাহেবের জীবনে কোনও গল্প পেলাম না। সকলের জীবনে কি গল্প থাকে?

হতাশ হয়েই বসে ছিলাম। ভাবছিলাম, আর কার কাছেই বা যাব? কে-ই বা তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বলবে! এত তাড়াতাড়ি আর কে আমায় সাহায্য করতে পারবে?

সাহেব বোধ হয় আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন—আমি তোমায় হেল্প করতে পারলে খুশী হতাম রাইটার, কিন্তু আমি আর কি করতে পারি বল?

আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম—আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট করে গেলাম মিছিমিছি, আমায় ক্ষমা করবেন—

সাহেব বললেন—না না, তুমি চলে যাচ্ছ কেন, বোস না, আমার তো কোনও কাজ নেই এখন!

—কিন্তু আপনি যে 'আরব-কা সওদাগর' ছবির কাজ করছেন এখন, দেখতে পাচ্ছি—

সাহেব বললেন—ও কিছু না, ও কিছু না—এ-কাজ পরে হলেও চলবে। মুশকিল হচ্ছে কি, আমি মোটে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমার তো কোনও কাজ নেই, ছেলেরাও বড় হয়ে গেছে, একটা কিছু কাজ নিয়ে ব্যস্ত না-থাকতে পারলে খারাপ লাগে।

তারপর একটু থেমে বললেন—তুমি চা খেয়ে যাও, বোস—

বললাম—চা আমি খাই না সাহেব—

—তা হোক, একদিন খেলে দোষ হয় না। তুমি দু'দিন পরেই কলকাতায় ফিরে যাবে, তোমার সঙ্গে আর আমার জীবনে দেখা হবে না হয়ত!

তা সত্যি! হয়ত বোম্বাইতে আর কখনও আসাই হবে না। একটা উপন্যাসের চিত্রস্বত্ব বিক্রী করেছিলাম মিস্টার মুখার্জিকে। সেই উপন্যাসের চিত্রনাট্য করার ব্যাপারেই যা আসতে হয়েছে। তার পর ছবি যা হবে, তা আমিই জানি। এ চিত্রনাট্যের হয়ত সবখানিই বাদ চলে যাবে শুটিং-এর সময়। এ-রাজ্যের নিয়ম-কানুন সেইরকমই। তবু এ-অপরাধ আমাদের জেনে-শুনেই করতে হয়। কারণ, এই চিত্রনাট্যের অর্থের বিনিময়ে আরও কয়েক বছর লড়াই করতে পারব। আরও উপন্যাস-গল্প লেখবার অবসর পাব।

চা এল। উইল্‌কিন্‌স্‌ সাহেবের চাপরাশি এসে ট্রে সাজিয়ে চা দিয়ে গেল।

চা খেতে খেতে সাহেব বললেন—বোম্বাই তোমার কেমন লাগল রাইটার?

কিন্তু সাহেবের সময় নষ্ট করছি মনে করে আমি জোর করেই শেষকালে উঠে দাঁড়ালাম। উইল্‌কিন্‌স্‌ সাহেবও আমার সঙ্গে উঠছিলেন আমায় বিদায় দিতে। দরজা পর্য্যন্ত তখন এসে পড়েছি। হঠাৎ সাহেবের যেন একটা কথা মনে পড়ে গেল। বললে রাইটার, একটা জিনিস তোমাকে দেখানো হয় নি, এস, আর একটু বস, তোমাকে দেখাই—

সুতরাং আবার যেতে হ'ল। আবার সোফায় গিয়ে বসলাম।

সাহেব চাপরাশিকে ডাকলেন। বললেন—ট্রাঙ্কটা খুলে আমার য়্যাল্‌বামটা বার করে দে তো—

কোথায় ট্রাঙ্ক। আর কোথায় য়্যাল্‌বাম। কিছুই জানত না চাপরাশি। সাহেব শেষকালে নিজেই উঠলেন।

বললেন—তুমি একটু বোস রাইটার, আমি য়্যাল্‌বামটা নিয়ে আসি। আমার ছোটবেলার অনেক ফোটো আছে সেটাতে, মনে আছে—

কবেকার কোন্‌ যুগের তোলা সব ফোটোগ্রাফ। সাহেবের তখন তিন-চার কি বড়জোর পাঁচ বছর বয়েস। যখন লণ্ডনের বোর্ডিং-হাউসে থাকত, তখনকার তোলা। বহুকাল সে য়্যাল্‌বামে হাত দেওয়া হয় নি। কোন্‌ মান্ধাতার আমলের এক ট্রাঙ্কে বোঝাই করা ছিল নানা কাগজপত্র। তারই এক কোণে য়্যাল্‌বামটা রাখা ছিল এতদিন। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে অতীত জীবনের কথা হয়ত সব মনে পড়ে গেছে সাহেবের।

ঘরের ভেতরে চেয়ে দেখলাম। বাইরের বারান্দা থেকে দেখা গেল, ভেতরের হল-ঘরের মধ্যে উইল্‌কিন্‌স্‌ সাহেবের বুড়ী মা একটা খাটের ওপর শুয়ে আছে। গায়ের চামড়া সব কুঁচকে গেছে। একেবারে অথর্ব মানুষ।

বুড়ী ছেলেকে বললে—কি খুঁজছ?

সাহেব বললে—আমার একটা য়্যাল্‌বাম ছিল এই ট্রাঙ্কের মধ্যে—

—কিসের য়্যাল্‌বাম?

—সে তুমি জান না, আমার ছোট বয়েসের ছবি আছে তাতে—

—কিন্তু এখন হঠাৎ সেগুলোর কি দরকার পড়ল?

বুড়ীকে মনে হ'ল যেন খুব অসুস্থ। মাঝে মাঝে কাশছে খুব। আর ছেলের হঠাৎ এই ব্যস্ততা দেখে খুব বিরক্ত হয়েছে।

—তা এখন সেই য়্যাল্‌বাম না দেখলে চলবে না?

ছেলে সে কথার কোনও উত্তর দিলে না। ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে সব নানারকম জঞ্জাল বার করলে। তার পর একটা ময়লা ধুলো-লাগা য়্যাল্‌বাম বার করে বললে, পেয়েছি সেটা—

বলে সাহেব আমার কাছে নিয়ে এল।

আমি বললাম—য়্যাল্‌বামটা এখনি আনবার কি দরকার ছিল?

সাহেব আমার পাশে বসে য়্যাল্‌বামটা নাড়তে-চাড়তে বললেন—না, না, তোমার কথায় আমার হঠাৎ এই য়্যাল্‌বামটার কথা মনে পড়ে গেল কিনা, তাই নিয়ে এলাম। এটা দেখলে আমার সেই পুরণো দিনের কথাগুলো আবার মনে পড়ে যাবে সব—

য়্যাল্‌বামটার চেহারা দেখে মনে হ'ল যেন ওটাতে তিরিশ-চল্লিশ বছর আর সাহেবের হাত পড়ে নি।

সাহেব বললেন—কত বছর পরে যে আবার এটাতে হাত পড়ল তা আমার নিজেরও মনে নেই—সেই লণ্ডন থেকে আসবার সময় এই ট্রাঙ্কের ভেতরে পুরে রেখে-ছিলাম, আর এ-সব কখনও খোলবার দরকার হয় নি—

—এই দেখ, এই আমার মায়ের ছবি।

—এই দেখ, আমি তখন কিরকম দেখতে ছিলাম।

—এই দেখ, এই আমার ক্লাসের ছেলেরা। একবার পিক্‌নিক্‌ করতে গিয়েছিলাম, সেই সময় তোলা হয়েছিল এই ছবিটা।

সাহেব এক-একটা পাতা খুলছেন আর যেন তাঁর জীবনের এক-একটা অতীত অধ্যায় চোখের সামনে নতুন করে জেগে উঠছে। তিনি যেন নতুন করে আবার বাঁচছেন. নতুন করে নিজের জীবন-পরিক্রমা করছেন। নতুন করে নিজেকে চিনছেন, জানছেন, বুঝছেন।

ঘরের ভেতরে সাহেবের মার দিকে চেয়ে দেখলাম। প্রায় আশী বছরের বুড়ী। বিছানা থেকে উঠে কোথায় যেন আস্তে আস্তে গেলেন। একেবারে প্রায়-অথর্ব বুড়ী। ভাল করে হাঁটতেও পারেন না। আবার খানিক পরে অতি কষ্টে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন।

সাহেব তখনও আমায় ফোটোগুলো দেখিয়ে চলেছেন। একটার পর একটা। সংখ্যায় খুব বেশি ছবি নয়। মোটা মোটা পিচবোর্ডে অতি যত্নে ফোটোগ্রাফগুলো আঁটা।

জিজ্ঞেস করলাম—এতদিন বুঝি এগুলো আর দেখেন নি—

সাহেব তখনও একমনে দেখছেন। আমার কথা যেন কানে গেল না।

হঠাৎ য়্যাল্‌বামের ভেতর থেকে একটা চিঠি বেরোল। একটা ঠিকানা লেখা খাম। খামটা আঁটা। ভেতরে হয়ত চিঠিও ছিল। সাহেব খামটা হাতে তুলে নিয়ে এক মনে কি যেন দেখতে লাগলেন। দেখলাম, একটা মেয়ের নাম তার ওপর লেখা। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম, সাহেবের নিজের চিঠি। অন্য কেউ সাহেবকে লিখেছিল। চিঠিটা পড়া হয় নি। কিন্তু না, তা নয়। চিঠিটা লেখা হয়েছে কোনও একটি মেয়েকে। খামের ওপর স্ট্যাম্প লাগান। মধ্যেখানে স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে একজন মহিলার নাম—কোন্ এক মিসেস্ সুসি ওয়াট্‌সন। ক্যানাডা। আরও কি সব লম্বা ঠিকানা।

জিজ্ঞেস করলাম—চিঠিটা বুঝি আপনারই লেখা, মিস্টার উইল্‌কিন্‌স্?

সাহেব এক মনে নামটা পড়ছেন। আর খামটার ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে দেখছেন।

আবার জিজ্ঞেস করলাম—চিঠিটা ডাকে ফেলতে ভুলে গিয়েছিলেন বুঝি?

সাহেব সে কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ খামটা ছিঁড়ে ফেললেন। তার পর ভেতরের চিঠিটা পড়তে লাগলেন। কতদিন আগেকার লেখা চিঠি! নিজেরই হাতের লেখা চিঠি নিজেই পড়ছেন! সাহেবের মুখখানার দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখতে দেখতে মুখখানার চেহারা যেন আস্তে আস্তে বদলে গেল। বড় গম্ভীর দেখাতে লাগল সাহেবকে। বড় অচেনা। যেন এক অচেনা লোকের পাশে বসে আছি।

বললাম—আমি এবার উঠি মিস্টার উইল্‌কিন্‌স্—

সাহেব সে-কথারও কোনও উত্তর দিলেন না। সমস্ত শরীরটা যেন তার কাঁপতে লাগল থর থর করে। কে সুসি ওয়াট্‌সন্? কাকে লিখেছিলেন এ-চিঠি? কেনই বা এ-চিঠি ডাকে ফেলেন নি?

সাহেব হঠাৎ চিঠিটা নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। তার পর চাপরাশিকে ডাকলেন চিৎকার করে—রতন—

—হুজুর?

—এ চিঠি এখানে কোত্থেকে এল?

—কি চিঠি হুজুর?

—এ চিঠি ফেলা হয় নি কেন? ডাকে দেওয়া হয়নি কেন? আমি ডাকে ফেলতে দিয়েছিলাম তোকে, কেন দিস্‌নি তুই ডাকে? এ জরুরী চিঠি, এখানে এমনিই পড়ে আছে? তোর খেয়াল নেই কোনও দিকে?

কোথাকার কার চিঠি, কাকে ফেলতে দিয়েছিলেন, কিম্বা হয়ত ডাকে ফেল্‌তে দেওয়াও হয় নি—কিম্বা হয়ত নিজের ব্যস্ততার জন্যে চিঠিটা রেখে দিয়েছিলেন এই য়্যাল্‌বামের ভেতর, তার পর আর মনে পড়ে নি চিঠিটার কথা। তার পর চিঠিও ফেলা হয় নি, আর চিঠির উত্তরও আসে নি।

—কার চিঠি সাহেব? কাকে লিখেছিলেন?

সাহেব কিন্তু তখনও চিৎকার করে বকছেন চাপরাশিকে। চাপরাশি হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। সে হয়ত তখন চাকরিতেই ছিল না। সে হয়ত তখন জন্মায়ই নি। সে হয়ত তখন চিনতোই না সাহেবকে। আর সাহেবও তখন হয়ত ইণ্ডিয়ায় আসে নি।

—বেরোও স্কাউণ্ড্রেল, আমার বাড়ি থেকে। বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও—

সাহেবের বুড়ী মা চিৎকার শুনে টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এল। বললে—কি হয়েছে? কিসের চিঠি? কে পোস্ট করে নি? কবেকার চিঠি?

সাহেব চিৎকার করে বাড়ি যেন কাঁপিয়ে দিতে লাগল।

—নো, নো, আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট, আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট এনিবাড়ি—ইউ গেট্ আউট্, ইউ স্কাউণ্ড্রেল; রাস্কেল···

তার পর সেদিন যে কাণ্ড সুরু হ'ল সেখানে, তা আমার মত একজন বাইরের লোকের পক্ষে বসে বসে দেখা আর সম্ভব নয়। আমি গিয়েছিলাম গল্পের খোঁজে, গিয়ে হঠাৎ কি এক অশান্তির সৃষ্টি করলাম। নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হতে লাগল। আমি না এলে ত এই পুরোণ কথার প্রসঙ্গ উত্থাপনও হ'ত না। এই অ্যাল্‌বামের কথাও মনে পড়ত না, আর অ্যাল্‌বামের ভেতর থেকে এই চিঠিও বেরোত না। চিঠির ভেতর কি লেখা আছে, তাও তখন বুঝতে পারছি না।

আর সাহেব তখন তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছেন। ফুলের ভাস্ তুলে নিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলছেন। দেয়ালের জানালায় ঘুঁসি মেরে কাচ ভেঙে ফেললেন। লাথি মারতে লাগলেন চেয়ার টেবিল কোচ-সোফার ওপর। নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলেন। আর সাহেবের চাপরাশি রতন আর বুড়ী মা ভয়ে ভয়ে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল।

আমি নিঃশব্দে সেইখান থেকে সরে হোটেলে ফিরে এলাম সেদিন।

কিন্তু সেইদিন সন্ধ্যেবেলাই হঠাৎ খবর পেলাম, সাহেব আত্মহত্যা করেছে।

নিজের রিভলবার নিজেই নিজের ওপর ব্যবহার করেছে।

মিস্টার মুখার্জি হঠাৎ টেলিফোন করলেন হোটেলে। বললেন—খবর শুনেছেন? মিস্টার উইল্‌কিন্‌স্‌ সুইসাইড করেছেন? আকাশ থেকে পড়েছিলাম আমি খবরটা শুনে। বললাম—সে কি?

মিস্টায় মুখার্জি বললেন—হ্যাঁ, আপনি ত সকালে তাঁর বাড়ীতে গিযেছিলেন শুনছি, তখনও কিছু টের পান নি?

বললাম—সুইসাইড করবার মত ত কিছু ঘটে নি। কে আপনাকে খবরটা দিলে?

মিস্টার মুখার্জি বললেন—মিসেস উইল্‌কিন্‌স আমাকে টেলিফোন করেছিলেন—আপনি এখনি চলে আসুন, একসঙ্গে যাব। পুলিসকেও খবর দেওয়া হয়েছে—

অদ্ভুত কাণ্ড। মিস্টার উইল্‌কিন্‌সের মত গুণী আর্ট ডাইরেক্টর আর পাবেন না মিস্টার মুখার্জি। এমন গুণী লোকের সহযোগিতা পেয়ে মিস্টার মুখার্জির কোম্পানী অনেক প্রফিট করেছে। সেদিন সাহেবের বাড়ীতে গিয়ে দেখি স্টুডিওর অনেক লোকই খবর পেয়ে হাজির হয়েছে সেখানে। বোম্বাইয়ের বহু গুণীই উইল্‌কিন্‌স সাহেবের ভক্ত। মিস্টার উইল্‌কিন্‌সের মত লোকের এই অপমৃত্যু অনেককেই শোকার্ত করেছে। অনেকেই তাঁর অভাব বোধ করছে মনে প্রাণে।

সাহেবের চাপরাশিকে পুলিস নানা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে। উইল্‌কিন্‌স সাহেবের বুড়ী মাও খুব বিচলিত। তাঁকেও প্রশ্ন করছে সবাই। কেউ-ই কোনও হদিস দিতে পারছে না।

—তোমার সাহেব তোমাকে এই চিঠি ডাকে ফেলতে দিয়েছিল কখনও?

—না হুজুর, ও-চিঠি আমি কখনও দেখি নি।

বুড়ী মাকেও জিজ্ঞেস করা হ'ল—আপনি এই সুসি ওয়াট্‌সন্‌কে চেনেন?

বুড়ী-মা বললেন—না—

পুলিস তখন বাড়ীর ভেতর থেকে সেই অ্যাল্‌বামটা বার করলে। তার ভেতর থেকে আরও অনেক চিঠি পত্র বেরোল। আরও অনেক দলিল। আরও অনেক ছবি। যে ট্রাঙ্কের ভেতর কখনও কেউ হাত দেয় নি, সেই ট্রাঙ্ক থেকেই উইল্‌কিন্‌স সাহেবের জীবনের সমস্ত অতীত তথ্য উদ্‌ঘাটিত করবার চেষ্টা হতে লাগল।

তার পর যথারীতি মিস্টার উইল্‌কিন্‌স-এর সৎকারও হয়ে গেল একদিন। মিস্টার মুখার্জি কোম্পানীর হয়ে সাহেবের মৃতদেহের ওপর ফুলের মালা দিলেন। সেদিন ফুলে-ফুলে একেবারে ঢেকে গিয়েছিল উইল্‌কিন্‌স্‌ সাহেবের নশ্বর দেহটা।

আমি মিস্টার মুখার্জিকে জিজ্ঞেস করলাম—সাহেবের বুড়ী-মা'র কি হবে মিস্টার মুখার্জি?

মিস্টার মুখার্জি বললেন—সাহেবের মা? সাহেবের মা তো নেই—সাহেবের মাকে কোথায় দেখলেন আপনি?

—মা নয় তো ও বুড়ী মেমসাহেব কে?

—ও তো উইলকিন্‌স্‌ সাহেবের বউ।

—বউ!

আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। অত বুড়ী বউ! সাহেবের বয়েস যদি ষাট হয় তো বুড়ীর বয়েস তো প্রায় আশী হবে।

মিস্টার মুখার্জি বললেন—সাহেবের চেয়ে কুড়ি বছরের বড় যে ওর বউ।

—কেন? এত বুড়ীকে বিয়ে করেছিলেন কেন?

সে এক ইতিহাসই বটে! তখন বরোদার হাউস্‌-ডেকরেটার উইল্‌কিন্‌স্‌ সাহেব। তখনই দুটি ছেলেকে রেখে সাহেবের বউ সাহেবকে ছেড়ে চলে যায়। দুটি ছেলেকে তখন দেখবার জন্যে নার্স রাখা হ'ল এই মেম-সাহেবকে। ছেলেরা এই নার্সের কাছে মায়ের মতন আদর পেয়েছে। ছেলেরাই এই নার্সকে 'মাম্মি' বলে ডাকত। তাই কৃতজ্ঞতার জন্যে আর ছেলেদের মুখের দিকে চেয়েই সাহেব বিয়ে করে ফেলেছিলেন এঁকে।

—বিয়ে করেছিলেন কত বয়েসে?

মিস্টার মুখার্জি বললেন—তখন সাহেবের বয়েস পঁয়ত্রিশ আর মেমসাহেবের বয়েস পঞ্চান্ন।

বললাম—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার তো!

মিস্টার মুখার্জি বললেন—তার পর থেকে এই সাহেবই বরাবর মেমসাহেবকে নার্স করে এসেছেন নিজের হাতে। ছেলেরা বড় হয়ে চাকরি করতে বিদেশে চলে গেছে, আর সাহেব মেমসাহেবকে অসুখে-বিসুখে নিজের হাতে সেবা করেছে। অসুখের সময় নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছে, চাকর-বাকর থাকা সত্ত্বেও নিজে বাথরুমে গিয়ে চান করিয়ে দিয়েছে। নিজের বাপ-মাকেও লোকে এমন করে সেবা করতে পারে না। অনেকদিন সাহেবের মনে হয়েছে লণ্ডনে ফিরে যাবে। লণ্ডনে গিয়ে শেষ-জীবনটা শান্তিতে কাটাবে। কিন্তু

মেমসাহেবের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই আর যাওয়া হয় নি—পাছে এতদূর জার্ণি করতে বুড়ো মানুষের কষ্ট হয়, সেই ভয়েই এই ইণ্ডিয়ায় পড়ে থেকেছে—

মিস্টার মুখার্জির ছবির কাজ প্রায় তখন শেষ করে এনেছিলাম। সেদিন সে-গল্প আর গোলমালের মধ্যে আমার লেখা হয় নি। না হোক, মিস্টার উইলকিন্সের গল্পটা পাওয়াও তো একটা লাভ। মিস্টার উইল্‌কিন্সের গল্পের মতই বা ক'টা গল্প পাওয়া যায় এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে।

কিন্তু তখনও কি জানি, আরও অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে?

দিন কয়েক পরেই মিস্টার উইল্‌কিন্সের দুটি ছেলে একদিন বোম্বাই-এর ষ্টুডিওতে এসে হাজির। বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই ইণ্ডিয়ায় এসেছে। এখানকার সব ব্যবস্থাও একটা করে যাবে তারা। বাবার এই অপঘাত মৃত্যুতে তারা খুবই শোক পেয়েছে। চমৎকার চেহারা ছেলে দুটির।

বললে—এখানকার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলেছি—আজই চলে যাচ্ছি আমরা—

জিজ্ঞেস করলাম—তোমাদের মাম্মিকেও নিয়ে যাবে তো তোমরা?

—মাম্মি যেতে চাইছে না। কিন্তু এখানে বাবা নেই, একলা থাকবেই বা কি করে?

তারপর হঠাৎ একটা প্রশ্ন করে ফেললাম। কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলাম না।

জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, সেই চিঠিটার কথা কিছু জান? সেই যে চিঠিটা পোস্ট করা হয় নি? যে চিঠিটা পড়ে তোমার বাবা অত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন?

ছেলেরা বললে—ওই চিঠিটা বাবা লিখেছিলেন আমার মাকে—

—কোন্ মাকে?

—আমাদের আগেকার মাকে। মা আবার ফিরে আসতে চেয়েছিলেন আমাদের কাছে, বাবাও রাজি হয়ে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু নিজের মনের ভুলে চিঠিটা পোস্ট করতে ভুলে গিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন চিঠি পোস্ট করা হয়েছে। মাও ভেবেছিল, বাবা বুঝি মাকে ক্ষমা করেন নি। আর বাবাও ভেবেছিলেন, মা হয়ত তার মত বদ্‌লিয়েছে—তাই তখন এই মাম্মিকে বিয়ে করে ফেলেছিলেন। সেই খবর পেয়ে মা-ও আর বাবাকে চিঠি লেখেনি কখনও—

—এ সব কথা তোমরা কোত্থেকে জানলে?

—মার কাছ থেকে।

—কোন্ মা?

—আমার সেই আগেকার মা। বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে মা এবার আমাদের সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ায় এসে দেখা করেছে। এখন মা আমাদের সঙ্গেই আছে। মা-ও বিধবা। মাকেও আমাদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ায় আসতে বলেছিলাম, কিন্তু মা এল না।

তার পর চলে যাচ্ছিল ছেলেরা। যাবার সময় বললে—আগে আমাদের এক মা ছিল, এখন দু'জন হ'ল—

—দু'জন?

—হ্যাঁ এই মা'কেও ত অষ্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাচ্ছি। আগেকার মা-ও এখন থেকে আমাদের কাছেই থাকবে। তারও দেখা-শোনা করবার কেউ নেই। তারও খুব অসুস্থ শরীর—

বললাম—আর একটা কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু মনে করো না, তোমাদের আগেকার মা'র নামটা জানতে ইচ্ছে করছে, বলবে?

—কেন? বলব না কেন? মা'র নাম বলতে আর আপত্তি কিসের?

তার পর একটু থেমে বললে—মা আমাদের বাড়ী থেকে চলে গিয়ে ক্যানাডায় একজনকে বিয়ে করেছিল—মিস্টার ওয়াট্‌সন্ তাঁর নাম। মা'র নাম লুসি ওয়াট্‌সন্—

—•—

রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী

প্রবাসীতে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনার সূচী ॥ পূর্বানুবৃত্তি

শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীপার্থ বসু

এই সূচীতে উল্লিখিত রচনাগুলি পরে রবীন্দ্রনাথের কোন্ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, রচনার নামোল্লেখের পর তাহার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেগুলি এখনও রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, সেগুলি 'অপ্রকাশিত' বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের যতগুলি গানের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে সবই গীতবিতান তিন খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে; সেগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের নির্দেশ স্বতন্ত্র দেওয়া হইল না; গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ও গীতালির ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। ছোটগল্পগুলির অধিকাংশ গল্পগুচ্ছের অন্তর্গত, তাহারও গ্রন্থাকারে প্রকাশ-নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। অধিকাংশ স্বরলিপিও স্বরবিতানে সংকলিত হইয়াছে।

এইরূপ তালিকায় ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিয়া যাইবার প্রভূত সম্ভাবনা; কেহ যদি কোনো ভ্রম লক্ষ্য করেন তবে তাহা সংকলয়িতাদের গোচরীভূত করিলে তাঁহারা বিশেষ কৃতজ্ঞ হইবেন।

১৩৩৩

বৈশাখ

প্রবাসী

'আশীর্বাদ ও স্বস্তিবাচন'-সংগ্রহে মুদ্রিত

পরিশেষ

পূর্ব্ববঙ্গে বক্তৃতা

[১] ময়মনসিংহ ম্যুনিসিপ্যালিটির অভিনন্দনের উত্তরে

[২] ময়মনসিংহ জনসাধারণের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর

[৩] আনন্দমোহন কলেজের ছাত্রগণের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর: 'শিক্ষার ক্ষেত্র'

অপ্রকাশিত

আর্টের অর্থ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুবাদ। 'বাঁশরী' ফাল্গুন ১৩৩২ হইতে পুনর্মুদ্রিত।

অপ্রকাশিত

সাহিত্যসম্মিলন

রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩, 'সাহিত্যের পথে'র পরিশিষ্ট। বর্তমানে স্বতন্ত্র 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থেও সংকলিত।

জ্যৈষ্ঠ

জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী ॥ পত্র-পরিচয়

চিঠিপত্র ৬

জন্মোৎসবের দিনে

পরিশেষ, 'দিনাবসান'

আষাঢ়

বৈকালী

(১) চপল তব নবীন আঁখি দুটি
(২) নূপুর বেজে যায়
(৩) তুমি কি এসেছ
(৪) জানি তোমার অজানা নাহি গো

গান

জন্মদিনে

জন্মোৎসব উপলক্ষে [শান্তিনিকেতনে] প্রদত্ত বক্তৃতা। ২৫ বৈশাখ ১৩৩৩

শান্তিনিকেতন, ১৩৪২ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ ৬৪২) রচনাটির প্রধান অংশ মুদ্রিত। এই সংস্করণ এখন প্রচলিত নাই। বক্তৃতাটি এই সংখ্যা প্রবাসীতে পুনর্মুদ্রিত হইল।

ধর্ম্ম ও জড়তা

শান্তিনিকেতন মন্দিরে ভাষণ। ৮ বৈশাখ ১৩৩৩

অপ্রকাশিত

শ্রাবণ

বৈকালী

(১) শেষ বেলাকার শেষের গানে
(২) পাতার ভেলা ভাসাই
(৩) তপস্বিনী হে ধরণী
(৪) বিরস দিন বিরল কাজ
(৫) বিনা সাজে সাজি
(৬) আমার লতার প্রথম মুকুল
(৭) আমার প্রাণে গভীর গোপন

(৮) কি ফুল ঝরিল
(৯) এ পথে আমি যে গেছি বার বার
গান
"ভিক্ষা"
ভারতী জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ হইতে পুনর্মুদ্রিত
বিশ্বভারতী

ভাদ্র

বৈকালী
(১) অনেক কথা যাও যে ব'লে
(২) লিখন তোমার ধুলায়
(৩) দে পড়ে দে আমায় তোরা
(৪) কাঁদার সময় অল্প ওরে
(৫) কি পাই নি তারি
(৬) সেই ভালো সেই ভালো
(৭) এবার এল সময় রে তোর
(৮) কেন রে এতই যাবার ত্বরা
(৯) আধেক ঘুমে নয়ন চুমে
গান

আশ্বিন

বৈকালী
(১) দিন পরে যায় দিন
(২) বনে যদি ফুটল কুসুম
(৩) এসো আমার ঘরে
(৪) নিশীথে কী কয়ে গেল
(৫) তার মানালে
গান

কার্তিক

বৈকালী
(১) বাঁধন-ছেঁড়ার সাধন
(২) পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে
(৩) আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ
(৪) হে মহাজীবন হে মহামরণ
(৫) মরণসাগরপারে
গান
[গান ও] স্বরলিপি। 'বেদনায় ভরে গিয়েছে'
স্বরলিপি শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার

অগ্রহায়ণ

"সুন্দরম্" [পত্র]
অনঙ্গমোহন রায়কে লিখিত। ২৮ আষাঢ় ১৩১৬।
পৃ ১৯৮ দ্রষ্টব্য
অপ্রকাশিত

পৌষ

কবির খেয়াল
পূরবীর পাণ্ডুলিপিতে কাটাকুটি-অলংকরণের আট-খানি প্রতিলিপি

মাঘ

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী
জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত
চিঠিপত্র ৬
প্রথম কবিতাটি ('জগদীশচন্দ্র বসু') কল্পনা গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত।
প্রবাসের চিঠি
'আগামী সোমবারে অর্থাৎ পশু…আমাদের বিদ্যা-লয়ের এই একটি বিশেষত্ব আছে'
দীপিকা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৩৩ হইতে পুনর্মুদ্রিত
অপ্রকাশিত
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মৃত্যুতে শান্তিনিকেতনে শোক-প্রকাশসভায় বক্তৃতা। ১ পৌষ ১৩৩৩
রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪, কালান্তর গ্রন্থের 'সংযোজন।'
বর্তমানে স্বতন্ত্র কালান্তর গ্রন্থেও সংকলিত।

ফাল্গুন

উদ্ধৃত
পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারির অপ্রকাশিতপূর্ব অংশ
যাত্রী
রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী
চিঠিপত্র ৬
ঢাকা মুসলিম হলে অভিভাষণ
অভিযান ভাদ্র ১৩৩৩ হইতে উদ্ধৃত
অপ্রকাশিত

চৈত্র

রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী
চিঠিপত্র ৬
প্রবাসের চিঠি
'তোমার চিঠিতে জয়দেবের মেলার বিবরণ পড়ে'
দীপিকা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৩৩ হইতে পুনর্মুদ্রিত
অপ্রকাশিত

ক্রমশঃ

জন্মদিনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্ধুগণ, আমি নানা দেশে নানা উপলক্ষ্যে সমাদর লাভ করেছি—কিন্তু আপনাদের কাছে সত্য করেই বলতে পারি, আমি এখনও এই সমাদরে অভ্যস্ত হয়ে যাই নি, প্রত্যেকবার এতে আমি সংকোচ অনুভব ক'রে থাকি। আজ আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে, যাঁদের আমার প্রতি প্রীতি অকৃত্রিম, তাঁদের মধ্যেই আছি এবং তাঁদের এই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদনে আমার গভীর তৃপ্তিও আছে। তৎসত্ত্বেও আমার দীনতা এই উপলক্ষ্যে অনুভব না ক'রে থাকতে পারি না।

মানুষের ভিতরে সৃষ্টি করার একটা ইচ্ছা আছে, সে উপলক্ষ্য খোঁজে সৃষ্টি করবার জন্য। ভালোবাসা হচ্ছে সৃষ্টির মূলশক্তি। তাই আমাদের শাস্ত্রে বলে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। মানুষ যাকে ভালোবাসে তার উপরে আপনার রচনা-শক্তিকে খাটাতে চায়, তাকে নানা ভূষণে সাজায়, নানা গুণের তাতে আরোপ করে, তার সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তার মানসমূর্তিকে সুন্দর ক'রে, সম্পূর্ণ ক'রে, নিজের আনন্দকে প্রকাশ করে। এ থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবার শক্তি কারও নেই। বিশেষ ভাবে কাউকে যখন শ্রদ্ধা করি, তখন আপন কল্পনা দিয়ে তাকে আপনার অন্তরের সামগ্রী ক'রে নিতে চাই। মায়ের মন সন্তানকে সহজেই সুন্দর করেই জানে, মা তবু তাকে নানা ভূষণে সাজাতে ছাড়ে না। মায়ের আনন্দ শিশুর মধ্যে বিশেষ প্রকাশ খোঁজে। এ হ'ল মানুষের স্বভাব। এইজন্য মানুষ সৃষ্টি করার যে উপলক্ষ্য ইচ্ছা করে, তাকে স্বীকার করা উচিত শ্রদ্ধারই সঙ্গে।

মানুষের মনে উৎকর্ষের যে আদর্শ আছে তার প্রতি তার প্রীতি। তাকে মানুষ মূর্তিমান ক'রে দেখতে ইচ্ছা করে। মানুষের সেই ইচ্ছাকে পাত্ররূপে বহন করবার শক্তি আমার আছে কি না, কালেতে তার প্রমাণ হবে। অনেক দেবমূর্তি মানুষ গড়ে, যা ক্ষণকালের জন্য, তার পরেই তার বিসর্জন। আমার ক্ষেত্রেও যদি তাই হয়, তাতেই বা দোষ কি? ভক্তি যেখানে পৌঁছচ্ছে, আমি তার নীচে। মাটির সম্মুখে মানুষ প্রণাম করে, কিন্তু ভক্তি মাটিকে নয়, দেবতাকে। মাটি যেমন ক'রে ভক্তের ভক্তিকে গ্রহণ করে, আমিও তেমনি ক'রেই আপনাদের শ্রদ্ধা-নৈবেদ্য গ্রহণ করব। তাই সংকোচ পরিহার ক'রে এখানে এসেছি।

আনন্দের শঙ্খধ্বনি মানুষের জন্মকালে বেজে ওঠে। প্রত্যেক জন্মের মধ্যে আনন্দময় একটি মহৎ প্রত্যাশা আছে। মানুষের চিরকালের যে আকাঙ্ক্ষা তাই পূর্ণ হবে, যুগযুগান্তের এই প্রত্যাশা বারে বারে নবজাত শিশু বহন ক'রে আনে। আমাদের ভিতর যা কিছু অসম্পূর্ণ তাই সম্পূর্ণ হবে, এই সম্ভাব্যতা তার মধ্যে আছে। কিন্তু আজ আমার জন্মদিন, তেমন নূতন জন্মদিন নয়, নূতন প্রত্যাশা জাগাবার সম্ভাবনা তার আর নেই। আমার কর্ম প্রায় শেষ হয়ে গেছে। যদি কোনও আনন্দ দিয়ে থাকি, কোনও সান্ত্বনা এনে থাকি, তবে সে দেওয়া হয়ে গেছে, সামনে আর কিছু নেই।

কিন্তু মন তো বলে না, সকল প্রত্যাশার প্রান্তে এসেছি। এখন কি কেবলই পুরাতন, অভ্যাসের দ্বারা বাধা, সংস্কারের দ্বারা কঠিন, নিত্য ব্যবহারের দ্বারা অসাড়? এখনও জীবনে অভাবনীয় কি কিছু নেই? তা তো বলতে পারি নে। অজানার ডাকে এখনও প্রাণ সাড়া দেয়, নূতনের ভাষা এখনও বুঝতে পারি।

বিশ্বমানুষ বারে বারে যেমন শিশু হয়ে জন্মায়, তেমনি প্রত্যেক মানুষ বারে বারে শিশু হয়ে না জন্মালে বিশ্বের দেওয়া-নেওয়া তার কাছে শুদ্ধ হয়ে যায়। বারম্বার সীমাভাঙার দ্বারা, আপনার মধ্যে যে অসীম আছে তাকে পাই। প্রাচীন বয়সের দুর্গের পাষাণভিত্তির মাঝখানে আজ যে বাসা বেঁধেছে, সে আমি কেউ নয়। আমি কবি, একটি পরম সম্পদ বহন ক'রে এনেছিলুম। কি আনন্দ ছিল আমার সঙ্গে আমার চারিদিকের যোগে। আমার সেই ঘরের সামনে নারিকেল বৃক্ষের শ্রেণী, শরতের আলোতে তার পল্লবের ঝালর ঝলোমলো; শিশিরসিক্ত তৃণাগ্রগুলির 'পরে প্রভাতসূর্যের কিরণ বীণাতন্ত্রীতে সুরবালকের আঙুলের স্পন্দনের মতো। এই শ্যামলা ধরণী, এই নদী, প্রান্তর, অরণ্যের মধ্যে আমার বিধাতা আমাকে অন্তরঙ্গতার অধিকার দিয়েছেন, এর মধ্যে নগ্ন শিশু হয়ে এসেছিলুম। আজও যখন দৈবীবীণা অনাহতসুরে আকাশে বাজে, তখন সেদিন-কার সেই শিশু জেগে ওঠে, শিশু জেগে উঠে বলতে

চায় কিছু, সব কথা বলে উঠতে পারে না। আজ আমার জন্মদিন, সেই কবির জন্মদিন, প্রবীণের না। আমি কিছু কর্ম করেছি, সেবা করেছি, কিছু ত্যাগ করেছি—কিন্তু সে বড় কিছু নয়। সকলের চেয়ে যে বড় দান, সে আপনিই আপনাকে দেয়। পুষ্পের গন্ধ প্রকাশ পেলে বাতাস ভরে ওঠে; সে গন্ধ ফুলের অন্তর থেকে আপনি প্রবাহিত। ভাণ্ডার থেকে তাকে চাবি খুলে আনতে হয় না। সে তার সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। সেই রকমের সত্যদান যদি আমার কিছু থাকে, আনন্দলোকে যার সহজ অনুভূতি, যার মধ্যে ক্লান্তি নেই, ছুটির দাবি নেই, বেতন প্রার্থনা নেই, সমস্ত বিশ্বের সেই জিনিস পাথরের মূলে উৎসের মত আমার মধ্য দিয়ে যদি উৎসারিত হয়ে থাকে, তবে তাই রইল। তা ছাড়া বাইরের গড়া জিনিসের, ইঁট-কাঠের ইমারতের, নিয়মের বাঁধা প্রতিষ্ঠানের কালের হাতে নিস্তার নেই।—ফুল প্রতি বসন্তে ফিরে ফিরে আসে, তার মধ্যে ক্ষতি নেই—সে বিশ্বের সহজ সামগ্রী। আমার কাজের মধ্যেও সত্যের যদি সুন্দর রূপ কিছু আপনি দেখা দিয়ে থাকে, তবে ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্ধানের মধ্য দিয়েও সে থাকবে। অনেক কিছু আছে যা জীর্ণ হয়ে যাবে, বাকি কিছু রইল ভাবীকাল যা তুলে নেবে। তা হোক; কি থাকবে, কি না থাকবে তা ভাববারও দরকার নেই। দরকার আপনাকে পাওয়া, বারে বারে নূতন করে পাওয়া। আজ সেই অপর্যাপ্ত নূতনকে অনুভব করছি। যাঁর হুকুম নিয়ে এসেছি, একদিন তিনি যে বাণী আমার প্রাণে সঞ্চার করে দিয়েছেন, দেখছি আজও তা শেষ হয় নি, অথচ দিন শেষ হয়ে এল। ভিতরকার যে প্রকাশ অসমাপ্ত রয়ে গেল, রাত্রির অন্ধকারেই কি তার একান্ত অবসান? হয়ত প্রত্যূষ এসেছে বা, আর এক জন্মের জন্য পাথেয় আজ হয়ত এসে পৌঁছল। এই কথা চিন্তা ক'রে আপনাদের সকলকে আমার নমস্কার জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করি।*

* ১৩৩৩ সালের পচিশে বৈশাখ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তাঁহার বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীযুক্ত সন্তোষচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক অনুলিখিত এবং কবির দ্বারা সংশোধিত। প্রবাসী, ১৩৩৩ আষাঢ়।

জীবন-পিয়াসা—শ্রীনির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির—৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২। মূল্য—৮৲

এই বইখানি আর্ভিংষ্টোন রচিত Lust for Life নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। এই বইটিতে উনবিংশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইম্‌প্রেশনিষ্ট চিত্রকর ভিন্‌সেণ্ট্ ভ্যান্ গকের জীবনকাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ফ্রান্সে একদল চিত্রকর গতানুগতিক শিল্প-পদ্ধতিকে আমূল পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের অভিযান চলেছিল বর্ণসম্পাতের মধ্যে অভিনবত্বের সঞ্চার করবার জন্ম। পূর্বকালের চিত্রকরের দল অনেক যত্নে বর্ণমিশ্রণের কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন। একটি অমিশ্র রং-এর পাশে তাঁরা আরেকটি অমিশ্র রং চালাতেন না। এই বর্ণ-দ্বন্দ্বের-প্রয়োগ-পদ্ধতি ছিল রীতিমত দুরূহ। কিন্তু তরুণ চিত্রকরের দল এই রং ঢালার নিয়মকে একেবারেই অস্বীকার করলেন। তাঁদের ভাণ্ডার হতে ধূসর ও গাঢ় রং একেবারেই নির্বাসিত হল, তার স্থান অধিকার করল হলুদ, কমলা, সিঁদুর, ভায়োলেট, লাল, নীল, সবুজ ও মরকত মণির বর্ণ। এর কারণ শিল্পীদের মতে রং বস্তুর গুণ নয়, আলোর রামধনুলীলা!

বলাবাহুল্য যে, প্রথম দিকে এইসব চিত্রকরের দল তখনকার কালের সমালোচকদের ও জনসাধারণের দ্বারা বিশেষভাবে অনাদৃত হয়। তার পর সারাজীবনব্যাপী সংগ্রামের পর প্রাণ, স্বাস্থ্য, দুঃখ, বেদনা ও দারিদ্র্যের বিনিময়ে তারা সফলতার সিংহতোরণে উপনীত হয়। ১৮৭৪ সনে একটি চিত্র ক্লদ্‌মোনে (Claude Monet) কর্তৃক অঙ্কিত হবার পর এই শিল্পীর দল ইম্‌প্রেশনিষ্ট নামে আখ্যায়িত হলেন। আজ অবধি তাঁদের এই নাম চলে আসছে।

আর্ভিংষ্টোন তাঁর গ্রন্থে ভিন্‌সেণ্টের জীবন-দ্বন্দ্ব বর্ণনা করেছেন। এই ভুলপথে পরিচালিত অসাধারণ প্রতিভাবান্ শিল্পীর সারাজীবনের ঘটনা উপন্যাসের মতই বিচিত্র। পৃথিবীতে প্রাণকণিকা জন্মগ্রহণ করেছে এক আকস্মিক ঘটনার ফলে, জন্ম, বংশরক্ষা ও মৃত্যু ছাড়া তার প্রায় অন্য কোন ক্রিয়া ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই হীন ও তুচ্ছ প্রাণের ধারা এক অপরূপ জীবন-স্রোতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাস ঘাঁটলে যুগে যুগে প্রাণ-নির্ঝরিণীর অপরূপ লীলা আমাদের অভিভূত করে তোলে। বিপুলা প্রকৃতির বুকে মানুষ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, কিন্তু তার জীবন আকাশের নীলিমার মত মহান্, অনন্ত বিস্তৃতির মধ্যে সে পূর্ণসাধক!

ভিন্‌সেণ্ট জন্ম-অনুসন্ধানী। এই জীবনের সমস্ত রহস্য সে জানতে চায়। নিজের উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সে খুঁজে চলে। চলতি পথের বিভিন্ন দিক্ হতে তার আহ্বান আসে, কখনও ধর্মযাজকরূপে, কখনও ছবির দোকানের সেল্‌স্‌ম্যানরূপে, কখনও বা ভবঘুরেরূপে। কিন্তু কোনটাই যেন তার মনোমত নয়। জীবনের যত কোলাহল, সবই যেন ছায়ার আল্‌পনায় হারিয়ে গিয়েছে। তিমিরময় বিপুল আবরণে বিশ্বের চেতনা আবরিত। এই আঁধার-সরণিতে ভিন্‌সেণ্ট তার প্রতিভার দীপ জ্বেলে চলতে চায়, হয়ত তামস-দিগন্তের ওপারে এক সর্পমণিজ্বলা অপরূপ কল্পপুরীর অভিমুখে তার যাত্রা!

যৌবন দেহের প্রতিটি কণিকায় নব প্রেরণা জাগিয়ে তোলে; বনের বসন্তের সাথে সাথে মনের উদ্যোগেও বাসন্তী সমারোহ জাগে। কোন্ অজানা রাজকুমারের সোনার কাঠির মায়া-চুম্বনের মত এর প্রভাব অন্তরের সুপ্তশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। এই অনুভূতির প্রকাশ ঘটে কর্ম-প্রেরণায়। ভিন্‌সেণ্টও তার জীবনে এই কর্মস্রোতের প্রবাহ অনুভব করে, কিন্তু তা ব্যক্ত করবার মত উপযুক্ত মাধ্যম কোথায়?

অনেকটা আকস্মিকভাবে বর্ষার আকাশে মেঘমেদুর সমারোহের মত সে মুহূর্তের মুকুরে জীবনের প্রতিফলন দেখতে পায়। চিত্রকলাই তার প্রকৃত জীবনের ক্ষেত্র। এতদিন সে মরীচিকার স্বর্ণনেশায় বিভ্রান্ত হয়েছে। জীবনকে সে নবীন ভাবে গড়ে তোলবার ব্রত গ্রহণ করে। কিন্তু শিল্পীদের জীবনপথ পুষ্পসমাচ্ছন্ন নয়। গতানুগতিক বাণিজ্যিক-ধারা গ্রহণ না করলে অর্থাগম সম্ভব নয়, ভিন্‌সেণ্টের সমস্ত শিল্পীসত্তা বিদ্রোহ করে। তার পর শুরু হয় এক বন্য জীবনযাত্রা। এর কোথাও আছে একনিষ্ঠ সাধনা, কোনখানে আছে অর্থহীন অসংযম। চতুর্দিকের প্রতিকূলতার মধ্যে তার জীবননদী বয়ে চলেছে স্বভাবতঃই আঁকাবাঁকা হয়ে। দুঃসহ দারিদ্র্যের মরুভূমির মধ্যে ব্যর্থ প্রেমের মরীচিকায় সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তবুও শিল্পকে ছাড়তে পারেনি।

বরিনেজের কয়লা-খনির কুলীদের কাছে সে পুনরাগত যীশুখ্রীষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। মত্ততাকে নিজের পথে শিক্ষা দিতে গিয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ষ্টারটিগ আর ডিবক তার ব্যবহারে হতাশ হয়েছে; একমাত্র তৎকালীন শিল্পী উইসেন ব্রাকই তার মধ্যে কিছু সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন। তার এই রুক্ষজীবনের মধ্যে প্রেমও আছে; উরসুলা, কেভস, ক্রিষ্টিন, মার্গট, র‍্যাসেল তার জীবনে আবির্ভূত হয়েছে। কোথাও বা আঘাত, কোথাও প্রত্যাখ্যান, আবার কোথাও বঞ্চনা লাভ হয়েছে।

নিদারুণ হতাশার মুহূর্তে ভিন্‌সেণ্টের সম্বল ছিল তার অদম্য কর্ম-ক্ষমতা। ফ্রান্সের তরুণ সমাজের সঙ্গে পরিচয় হবার পর তার জীবনে এক নতুন বিপ্লব ঘটল। রং ঢালার নতুন কৌশলকে সে আয়ত্ত করল। জর্জেস সিউরাত, ফ্রাঙ্ক সেজান, পল গগ্যাঁ, হেন্‌রি লোত্রেক, এমিল জোলা, মোপাসাঁ, শার্ল বোদেলের প্রভৃতি তরুণ ফ্রান্সের স্পর্ধিত রূপের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তার জীবনের গতি অন্য পথে চলতে লাগল। ভিন্‌সেণ্টের নিদ্রিত রং মাতাল সুধাপাগল মন সজাগ হয়ে উঠল, জগৎও পেল তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান।

কিন্তু এর পরও বাকী জীবন সে শান্তি লাভ করতে পারেনি। জীবনের মর্মমূল থেকে উৎসারিত এক চেতনাস্রোত তাকে স্থির হয়ে থাকতে দেয়নি। তার জীবনপথে যারা আঘাত দেবার জন্য এসেছে, যারা তাকে সহানুভূতি দেখাবার জন্য বরণ করেছে, সবাই ঝরাপাতার মত ঝরে গিয়েছে। উন্মাদাগারে যাবার পর, এমন কি রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করবার পূর্ব মুহূর্তেও তার মনে যা সবচেয়ে উগ্র হয়ে উঠেছে, তার নাম জীবন-তৃষ্ণা! শিখাহীন দাবানলের মত এই অনুভূতি তার জীবন-তরুকে দগ্ধ করেছে। ভিন্‌সেণ্টের জীবন আলোচনা করলে গভীর বেদনার সঙ্গে একটি সত্য উপলব্ধি করতে পারি। সংযমের যে

শিলাটি প্রতিভা ও সৌন্দর্য-ঝর্ণার স্রোতকে সঙ্কল্প করে রেখেছে, তা বিনষ্ট হলে কোন সুফল ফলে না। ভিনসেণ্টের প্রতিভা বিকাশের জন্য সংযমের সবচেয়ে সহজ পথটাই খুঁজে পায়নি। একবার এক নির্জন প্রান্তরে তার স্বপ্ন-চৈতন্যলোকের প্রতিক্রিয়ারূপে যে তরুণীর আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই ভিনসেণ্টের জীবন-তৃষ্ণা! সুতরাং দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হবে যে, ত্যাগ ও নিষ্ঠার সৌন্দর্য উদ্দাম ভোগস্পৃহার দ্বারা বিড়ম্বিত হয়েছে।

এই গ্রন্থটিতে ধৈর্য, সংযম ও সহানুভূতির প্রতীক ভিনসেণ্টের বলিষ্ঠ সাহোদর থিয়োর চরিত্র সুন্দর ভাবে ফুটেছে।

সবশেষে বাংলা অনুবাদের প্রশংসা করতে হয়। নির্মলবাবু সু-অনুবাদকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, কিন্তু এই গ্রন্থে তাঁর শক্তির আরও বিকাশ ঘটেছে। এত চমৎকার ও জীবন্ত অনুবাদ নির্মলবাবু আর কখনও করেননি বলেই মনে হয়।

শ্রীবিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

কাজল—রমেশচন্দ্র সেন। শতাব্দী গ্রন্থ ভবন ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য ছয় টাকা।

পল্লীগ্রামের গরিব গৃহস্থ ঘরের মেয়ে কাজল। বাল বিধবা সে থাকে বিধিনিষেধের গণ্ডী ঘর এক জগতে—অথচ চারিধারে জীবন উপভোগের উচ্ছল স্রোত। স্বভাবধর্ম বশে তার মনে জাগে আলো হাওয়া সৌরভের তৃষ্ণা, সে মুক্তি চায় পীড়ন থেকে। একদিন সে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরে এসে দাঁড়াল, কিন্তু ভুল পদক্ষেপের ফলে তার সামনে পড়ল অন্ধকার সুড়ঙ্গ পথ। সে পথ থেকে ফিরে আসা কঠিন। অতএব জীবনান্ত কাল পর্যন্ত পথভ্রষ্টা মেয়েটি সেই অন্ধকারেই রয়ে গেল। সংক্ষেপে এই হলো কাহিনী!

পতিতা জীবন নিয়ে গল্প রচনা বাংলা সাহিত্যে নূতন নয়। এই ধরনের কাহিনী চয়নে হৃদয়াবেগের আতিশয্য কিংবা সমাজসংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গি লেখনীকে প্রভাবিত করে থাকে। তাতে গল্পের আপাত-মনোরম সমাধান হয় বটে, রক্তমাংসের মানুষকে নিয়ে বাস্তব পারিপার্শ্বিক গড়ে ওঠে না। আলোচ্য উপন্যাসটি এই ধরনের ভাবালুতা বা আদর্শবাদ থেকে আশ্চর্যভাবে মুক্ত। কাহিনীটি অন্ধকারের। মূল চরিত্রটি কঠিন বাস্তবের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উপস্থাপিত। সামান্য পরিমিতি-বোধের অভাবে এই চিত্রণে রুচিবিকার ঘটা স্বাভাবিক। যে হেতু ফটোগ্রাফি পর্ণগ্রাফি হবে না— অথচ রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হবে, এ সাধনা দুরূহ। গল্পটির সর্বাংশে রয়েছে সঙ্গতি রক্ষার দুরূহ চেষ্টা। এই চেষ্টা কি পরিমাণে সার্থক হয়েছে সে বিচার ভিন্ন-রুচির পাঠকের উপর নির্ভর করছে। কেননা, আলোচ্য গল্পটির মান নির্ণয়ে রুচির প্রশ্নটি স্বাভাবিক ভাবেই আসবে। এর একটি কারণ হয়তো ক্লেদ-পঙ্কিল পারিপার্শ্বিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ও অতি দ্রুত ঘটনার সমাবেশ। পড়তে পড়তে মনে হবে, অন্ধকার জগৎটাকে সম্পূর্ণভাবে অনাবৃত করার আগ্রহে কোন তুচ্ছ ঘটনাই বাদ দেওয়া হয়নি। কঠিন বাস্তবকেই যথাযথ আঁকতে চেয়েছেন লেখক— কোন চরিত্রের মনোগহনে প্রবেশ করার শ্রম তিনি স্বীকার করেন নি। আরও মনে হবে, মূল চরিত্রটির বহিরঙ্গ পরিবেশ যে পরিমাণে উন্মুক্ত হয়েছে, অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রটি সেই পরিমাণে অনুদ্‌ঘাটিত রয়ে গেছে। রুচিভেদে অনুমানের কথা যাই হোক, মূল চরিত্রটি যে খর্ব হয়নি এটি সব শ্রেণীর পাঠকই স্বীকার করবেন। পতিতা নারীর অন্তর্জ্বালার তাপটুকু তার ক্রমাবনতির প্রতিটি স্তরে দেহপণ্যের বিকিকিনিতে, অর্থ উপার্জন ও অপব্যয়ের উগ্র লালসা ও আনন্দে, সুরাপানোন্মত্ততায়, জুয়ার নেশায়— সঞ্চারিত করেছেন লেখক। সেই তাপ পাঠকের মনে এসে লাগে বলেই কাহিনীটি মূল্যহীন হয়নি।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান—ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এম. এ., ডি. ফিল্.। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪।২।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য - পাঁচ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

বাংলা ভাষায় নানা সময়ে নানা প্রয়োজনে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠক্রমানুযায়ী লিখিত ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক। জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করার উদ্দেশ্যেও মাঝে মাঝে কিছু কিছু পুস্তক ও আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু নিছক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা বা গবেষণামূলক রচনা বাংলায় দুর্লভ। সম্মিলিতভাবে এই তিন শ্রেণীর রচনার কালানুক্রমিক ধারাবাহিক বিবরণ ও সাহিত্যিক মূল্যবিচার আলোচ্য গ্রন্থের উপজীব্য। এ জাতীয় গ্রন্থ বাংলায় এই প্রথম। গ্রন্থখানি সুলিখিত ও সুপাঠ্য, প্রতি পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও প্রচুর পরিশ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থের আলোচনা তিন পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে উদ্ভব যুগ বা হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে অক্ষয়কুমার দত্তের পূর্ব পর্যন্ত ইউরোপীয় লেখকদের আমলের কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্বে গঠনযুগ বা অক্ষয়কুমার দত্ত ও তৎকালীন যুগ প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্ত হইতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর পূর্ব পর্যন্ত কালের আলোচনা করা হইয়াছে। আধুনিক যুগ বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও আধুনিক কালের আলোচনা উপলক্ষ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হইতে জগদানন্দ রায়ের সময় পর্যন্ত লেখকদের রচনার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। কারিগরী বিজ্ঞান অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্প বিজ্ঞান সম্পর্কে পরিশিষ্টে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত শ্রীনারায়ণ সান্যালের 'বাস্তুবিজ্ঞান' পুস্তকেও ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ক গ্রন্থের একটি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সেই বিবরণের সহিত আলোচ্য গ্রন্থের বিবরণের অনেক জায়গায় বেশ মিল এবং কোথাও কোথাও কিছু অমিল দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা-ভাষায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার সুব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ প্রণয়নের চেষ্টা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। তাহার আংশিক পরিচয় গ্রন্থমধ্যে প্রসঙ্গত উল্লিখিত হইয়াছে। এই চেষ্টার প্রাচীনতম নিদর্শন শিক্ষাবিভাগের কার্যবিবরণের মধ্যে পাওয়া যায়। ইংরাজি শব্দের অনুবাদ করিতে যাইয়া এক-একজন এক-এক রকম অনুবাদ করায় যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই—গণিতাদি বিজ্ঞানের শব্দের অনুবাদে অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও তাঁহারা পছন্দ করেন নাই। ১৮৭১ সালে এই অসঙ্গতির দিকে তাঁহারা 'অনুবাদ সমিতি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে এই সমিতি কি কাজ করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা দরকার। আলোচ্য গ্রন্থে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। আশা করি, ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে গ্রন্থকারের নিকট হইতে যথাসম্ভব বিবরণ পাওয়া যাইবে।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

আমারি আঙিনা দিয়া—সরিৎশেখর মজুমদার, অটো-প্রিণ্ট এ্যাণ্ড পাবলিসিটি হাউস, ৪৯, বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য—তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ভিকি বাম-এর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'মেন নেভার নো'র অনুবাদ। অনুবাদ হইলেও মূল গ্রন্থের সুর ও মর্মকথা কোথাও ব্যাহত হয় নাই। অনুবাদ করার কৃতিত্ব এইখানেই। প্রতিটি শব্দের ভাষান্তর করিলেই অনুবাদ হয় না। এইজন্যই অধিকাংশ অনুবাদ-গ্রন্থ অপাঠ্য হয়। ভিকি বাম-এর 'গ্র্যাণ্ড হোটেল'-এর নাম লেখিকার নামকেও ছাপাইয়া গিয়াছে। এই খ্যাতি হইতেই লেখিকার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্তিকির চরিত্র বৈচিত্র্যময়। এই বিচিত্রতাই তাঁর উপন্যাসগুলিকে বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানির গল্পাংশ অতি সামান্য, কিন্তু গল্পটুকুই ইহার প্রধান কথা নয়- মনোবিশ্লেষণই ইহার মর্মকথা। ঈভলীন ও ফ্রাঙ্ককে লইয়াই ঘটনা। ড্রস্ত কুর্ত ও মেরীয়ান্নে যেন এই ঘটনাকে সাহায্য করিতেই আসিয়াছে। সব চেয়ে বড় কথা, এই যে মনোবিশ্লেষণ প্রত্যেকটি চরিত্রকে অনুসরণ করিয়াছে। আবার তাহার চরিত্রগুলিকেও দেখানো হইয়াছে, আপন আপন পরিবেশের অনুরূপ। ধনী আমেরিকান ব্যবসায়ী ফ্রাঙ্ক -যাহার মনে কোনো দাগই কাটে না, তাহাকে ভালবাসিতে গিয়া ঈভলীন ঠকিল এবং এই ভালবাসাই তার কাল হইল, শেষে মৃত্যু দিয়া তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল।

ড্রস্ত কুর্ত-এর এই জিজ্ঞাসাটি বড় সুন্দর কেন সে প্যারিসে গেল? শেষে কোনো কারণই যখন খুঁজিয়া পাইল না তখন বলিল-- "একজন আর একজন সম্বন্ধে এক বর্ণও জানতে পারে না। এইটেই আসল কথা।"

এই গ্রন্থের এইটিই প্রতিপাদ্য বিষয়। এইজন্যই এ-গ্রন্থের নাম হইয়াছে 'মেন নেভার নো।' অনুবাদে অনুরূপ নাম রাখাই উচিত ছিল, বর্ত্তমান নামকরণটি ভাল হয় নাই। অনুবাদক 'সৈনিক'-এ প্রকাশিত 'কেই বা জানে' নামটি ব্যবহার করিলেই ভাল করিতেন।

আমাদের দেশে অনুবাদ সাহিত্যের প্রয়োজন অনেকখানি। সেদিক দিয়া সরিৎশেখরের মতো মিষ্টহাতের আবশ্যককে অস্বীকার করা যায় না। গ্রন্থখানি নিজগুণেই বিক্রয়ের অঙ্ক বাড়াইতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস।

মধুপর্ণ—তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, আত্তেনির, ২৩৮ বি, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৯। দাম দুটাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। সকল গল্পগুলিই রচনা-পারিপাট্যে সুন্দর। লেখকের ভাষার উপর দখল আছে। তবে ছোট গল্পের যে টেক্‌নিক তাহা সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। যদিও 'নাগর' গল্পটি ইহার ব্যতিক্রম। নূতন লেখক হিসাবে ইঁহার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে বইখানির প্রচ্ছদপট।

গৌতম সেন

কল্যাণের পথে—শ্রীবিজয়কান্ত রায় চৌধুরী। প্রজ্ঞাশ্রী। ৮/১, ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭। মূল্য ২৲।

লেখক ইন্দ্রিয়সংযমের মধ্য দিয়ে চিত্তের বিকাশ সাধনের পথ নির্দেশ করেছেন এবং দেশী ও বিদেশী মনীষীদের উক্তিদ্বারা আপন বক্তব্য সমর্থন ও পরিস্ফুট করেছেন। আত্মোন্নতিকামী সকলের পক্ষেই তাঁর উপদেশ প্রণিধানযোগ্য।

মেদিনীমঙ্গল—শ্রীগোরাচাঁদ গিরি। প্রকাশক শ্রীবিবেকানন্দ রায় বি. এ। ৪৯, সুবাগান পার্ক রোড, পোঃ হাওড়া। মূল্য - ২·৫০।

পদ্যে মেদিনীপুরের ইতিহাস। সাহিত্যরসের জন্য নয়, সংক্ষেপে মেদিনীপুরের গৌরব-কথা জানবার আগ্রহে হয়ত অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ বই পড়বেন। প্রত্যেক জেলা ও প্রদেশের ইতিহাস আমাদের জানা উচিত, তবে তাকে যেন সমগ্র জাতীয় ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করে দেখতে না ভুলি।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বঙ্কিম জিজ্ঞাসা—শ্রীতপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক সুখভারতী, কলকাতা-১৪, মূল্য ৩·২৫।

আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচেতনা, জীবনচেতনা, শিল্পচেতনা ও সমাজচেতনার বিশ্লেষক আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন প্রথম চারটি অধ্যায়ে। য়ুরোপীয় নব্য মানবতাবাদ ছিল এবং কঁতের গ্রন্থসরণী বাহিয়া বঙ্কিম-মানসকে প্রভাবিত করিয়াছিল, ইহা অবিসংবাদিত সত্য। প্রত্যক্ষবাদের প্রভাব-পরিমণ্ডল বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন, সমাজ ও শিল্পচেতনাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং তাঁহার ধর্মচেতনার উপরে ইহার প্রভাব পরোক্ষ। বঙ্কিম-চিন্তা পাণ্ডিত্যসিদ্ধ হইলেও কোথাও কোথাও তর্কশাস্ত্রীয় সঙ্গতির অভাব ঘটায় তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি সত্যসন্ধী হইতে পারে নাই। তাহারা স্ববিরোধ দোষদুষ্ট হইয়াছে। উদাহরণ দিই: 'পরিপূর্ণতার স্বভাবকে বঙ্কিম বলেছেন মনুষ্যত্ব। পরিপূর্ণতার আকাঙ্খাকে বঙ্কিম বলেছেন ধর্মচেতনা।' (পৃঃ ৪) গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্রের 'মনুষ্যত্ব' এবং 'ধর্মচেতনা'র সংজ্ঞা হইতে তাঁহার আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন কিন্তু এই সংজ্ঞা দুইটির অন্তর্নিহিত দুর্বলতাটুকু বিশ্লেষণ করিয়া দেখান নাই। কঁতকথিত প্রত্যক্ষবাদের প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র মনুষ্যত্বের সংজ্ঞা দিয়াছেন। আমরা কী ইহাই বুঝিব যে ধর্মচেতনা মনুষ্যত্ব লাভের সোপান মাত্র? মনুষ্যত্বের প্রাক্-অভাব এবং তজ্জনিত সুতীব্র আকাঙ্খাই ধর্মচেতনার জনক। অন্যপথে পরিপূর্ণতার স্বভাবকে মনুষ্যত্ব আখ্যা দিলে দেবোচিত পূর্ণ মহিমাকে অতিপ্রাকৃত বলা যাইতে পারে না। প্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃতের ভেদ লুপ্ত হয়। রাসলীলার শ্রীকৃষ্ণ প্রাকৃত অথবা অতিপ্রাকৃত এই আলোচনা নিরর্থক হইয়া পড়ে। রাসলীলাকে নীতিসম্মত প্রতিপন্ন করার সকল প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গ্রন্থকার বঙ্কিম-তত্ত্বালোচনার এই সূক্ষ্ম পরিণতির কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। অবশ্য ইহার জন্য গ্রন্থের মূল্যহ্রাস ঘটে নাই।

গ্রন্থকার মার্জিত ভাষায় বঙ্কিমী ধর্মচেতনার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্মচেতনা হইতে জীবনচেতনা, জীবনচেতনা হইতে শিল্পচেতনা ও সমাজ-চেতনার উন্মেষ গ্রন্থকার নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। শিল্পচেতনা ও সমাজচেতনার উৎস হইল জীবনচেতনার গভীরে। সেই জীবনচেতনা আবার ধর্মচেতনা হইতে আগত। গ্রন্থকার গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে ('বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরী') বলিতেছেন: "পাশ্চাত্ত্যের Humanism-কে বঙ্কিম অস্বীকার করেন নি, কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বকে তিনি একটি ধর্ম-চেতনার মধ্যে দিয়ে দেখেছেন পরিপূর্ণতার ভূমিকায় দেখেছেন।" ১০৩ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের এই উক্তিটি পূর্বোল্লিখিত চতুর্থ পৃষ্ঠার উক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে পারিতেছে না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও এ কথা বলিতে হইবে যে অধ্যাপকপ্রবরের গ্রন্থখানি বঙ্কিম-সাহিত্যের অন্যতম মূল্যবান্ সংযোজন। আমরা তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থও আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। তাঁহার নিকট হইতে বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রত্যাশা অল্প নহে।

শ্রীসুধীরকুমার নন্দী

দেশ-বিদেশের কথা

সেবায়তন আশ্রমে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব

ঝাড়গ্রাম সেবায়তনে সৎসঙ্গমিশন প্রজ্ঞামন্দির, বহুমুখী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিল্প বিদ্যালয়, বুনিয়াদী বিদ্যালয়, বি. টি. কলেজ ও আরোগ্যভবন প্রভৃতি আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের সহযোগিতায় রবীন্দ্রশত-

সেবায়তন আশ্রমে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব

বার্ষিকী উৎসব মহাসমারোহে ও উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শতবার শঙ্খধ্বনি, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, কবিগুরু প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ, সঙ্গীত ও নাটকাভিনয় দ্বারা আশ্রমে একটি স্বর্গীয় আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল ও সর্বত্রই যেন কবিগুরুর সান্নিধ্য অনুভূত হইতেছিল। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন আচার্য্য স্বামী সত্যানন্দ গিরিজী মহারাজ।

'সাহিত্যতীর্থে' রবীন্দ্র শতবর্ষোৎসব

'সাহিত্যতীর্থ' অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন ও রবীন্দ্র শত-বর্ষোৎসব গত পয়লা বৈশাখ নববর্ষের বৈকালে ৬৭ পাথুরিয়াঘাট ষ্ট্রীটে মল্লিক বাড়ির সভাগৃহে মনোজ্ঞ পরিবেশে উদ্বোধন করেন কবি শ্রীসজনীকান্ত দাস। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ। সভার প্রারম্ভে 'সাহিত্যতীর্থ' এর পক্ষে শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক ঘোষণা করেন যে, প্রতি বৎসর এক একজন রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণামূলক ভাবে লিখিত ভাষণ পাঠ করিবেন। তাঁহাদের সামান্য সম্মান দক্ষিণা দানের আয়োজন হইতেছে। কবি শ্রীনরেন্দ্র দেব, প্রমুখ অনেকেই রবীন্দ্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপক কবিতা পাঠ করেন। শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'রবীন্দ্রনাথের মানবিকতা' বিষয়ে ও ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত 'রবীন্দ্র সাহিত্যে নারীর মর্যাদা' বিষয়ে আলোচনা করেন। সুলেখিকা শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী, রাজা রাও, শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, হাসির গানের শ্রীনলিনীকান্ত সরকার তাঁহাদের দেখা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলেন। বেদ গান করেন বাণীকণ্ঠ শ্রীনির্মলচন্দ্র বড়াল ও শ্রীসুনীল বড়াল। ললিতকলা কেন্দ্রও রবীন্দ্র সংগীত সমবেতভাবে পরিবেশন করেন।

বিবেকানন্দ বিদ্যাভবনের উদ্বোধন

বিগত ১০ই মার্চ দমদমের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত নয়াপট্টি রোডে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের পরিচালনায় মহিলাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত

সাহিত্যতীর্থ অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন ও রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষোৎসবে উদ্বোধনী ভাষণরত শ্রীসজনীকান্ত দাস। পার্শ্বে উপবিষ্ট সভাপতি ডঃ কালিদাস নাগ, রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্র দেব

একটি আবাসিক কলেজের উদ্বোধন করেন। বিদ্যায়তনটির নামকরণ হইয়াছে—বিবেকানন্দ বিদ্যাভবন। আগামী জুলাই মাসে এই আবাসিক বিদ্যায়তনে তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স চালু করা হইবে।

দমদম নিবাসী মহানুভব শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় যশোহর রোডের সন্নিকটস্থ তেত্রিশ বিঘা সমন্বিত এই ভূখণ্ডটি রামকৃষ্ণ সারদা মিশনকে দান করেন।

নির্মীয়মান বিদ্যায়তনটির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পরিচয় প্রদানকালে রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা বলেন যে, পরিকল্পিত বিদ্যায়তনটিতে প্রাচীন গুরুকুল প্রথার আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যুগোপযোগী শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করা হইবে। এই মহদুদ্দেশ্যের রূপায়ণকল্পে মাননীয়া সম্পাদিকা যথাযোগ্য সরকারী সহায়তার আবেদন জানান। প্রধান অতিথি রাজ্য সরকারের শিক্ষাসচিব তাঁহার ভাষণে রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের এই মহতী প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করেন।

বিদুষী ৺সুরজা দেব্যার কাশীপ্রাপ্তি

পূর্ব ময়মনসিংহের মৃগা জমিদারী ষ্টেটের রাজপণ্ডিত বংশীয় প্রসিদ্ধ সপ্তশতী চণ্ডী সঙ্কলক ৺রমানাথ চক্রবর্তীর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুরজা দেবী ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে কলিকাতার বিখ্যাত "শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রমে" শিক্ষালাভার্থ আসেন। এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীগৌরীপুরী মাতাজীর শিক্ষাদীক্ষায় ধন্যা হইয়া কুমারী প্রেমাদেবী দীর্ঘ সাত বৎসর অতিবাহিত করিয়া ৺কাশীধামস্থ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের সহিত পরিণীতা হন। আদর্শ গৃহিণী রূপে তিনি স্বামীর প্রতিষ্ঠিত সাবান তৈরীর ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করিয়া সাফল্যের সহিত পরিচালনা করেন। ১৩৪৪ বাংলার ফাল্গুনী অমানিশায় তাঁহার গুরুমাতৃকার তিরোধান ঘটিলে "আবাল্য তপস্বিনী বাঙালী মেয়ে—শ্রীশ্রীগৌরীমা" নামক গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করেন। প্রথমে উহা অধুনা-লুপ্ত সাপ্তাহিক "ভারতে" প্রকাশিত হয় এবং পরে শ্রীগুরু লাইব্রেরী কতৃক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া সুলিখিত সচিত্র তাপস জীবনী বঙ্গ-ভারতীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে।

বিদুষী সুরজা দেব্যা

বর্ষকাল পূর্বে স্বামীহারা হইয়া গত মহাবিষুব সংক্রান্তিতে রাত্রি ১০টায় পুণ্য ৺কাশীধামে শিবগতিলাভ করিয়া তিনি ধন্যা হইয়াছেন। তিনি দুই কন্যা এক পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ ললিতা ঘোষ

ডাঃ ললিতা ঘোষ ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২৪ পরগণার প্রসিদ্ধ গ্রাম গরিফার ৺প্রসন্নকুমার রায়ের তৃতীয় কন্যা ও এরিয়ান্স ক্লাবের ইণ্টারনাশানাল ফুটবলার কানাইলাল ঘোষের পত্নী।

শিশুকাল হইতে স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি গৃহেই পাঠাভ্যাস করেন এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নিজের মন্দ স্বাস্থ্যই তাঁহাকে চিকিৎসক হইবার প্রেরণা দেয়। সেই কারণে বেথুন কলেজ হইতে ১৯২৭ সালে প্রথম বিভাগে আই. এস. সি. পাস করিয়া তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। এবং ১৯৩৪ সালে এম. বি. ডিগ্রী লাভ করেন ও পরে গাইনোকলজি বিশেষজ্ঞ হন।

ডাঃ ললিতা ঘোষই মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম. বি ডিগ্রি প্রাপ্ত প্রথম হিন্দুমহিলা। কলেজ-জীবনে তিনি 'স্বর্ণময়ী' ও 'ডাফরিণ' স্কলারশিপ ও ভাইসরয়ের রৌপ্য-পদক লাভ করেন।

এম. বি. ডিগ্রি লাভের পর তিনি চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে

হাউস সার্জ্জেন হন। পরে চুঁচুড়ার ইমামবাড়ী সদর হাসপাতালের মহিলা বিভাগের লেডি সুপারিনটেন-ডেণ্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বালী জুটমিল পরিচালিত মেটারনিটি হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার রূপে যোগদান করেন। ইহার পর ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তিনি ভারতীয় রেডক্রেশ হুগলী জেলা শাখা দ্বারা পরিচালিত "King George V Silver Jubilee Maternity and child welfare centre," প্রতিষ্ঠানটির ভার গ্রহণ করেন।

তথায় সংযুক্ত থাকাকালীন অসুস্থ হইয়া কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি হন এবং সেইস্থানেই ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সালে মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অতিশয় জনপ্রিয়তার জন্য তাঁহার নশ্বর দেহের শেষকৃত্য হুগলী ঘুঁটিবাজারস্থ শ্মশানে সম্পন্ন করা হয়।

ডাঃ ললিতা ঘোষের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনি যখনই যে প্রতিষ্ঠানের ভার লইয়াছিলেন তখনই তাহার সর্ব্ববিষয়ক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। চুঁচুড়ার "মাতৃভবন ও শিশুমঙ্গল" টিকে তিনি শুধু নব ভাবে গড়িয়া দিয়াই যান নাই—উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টাও করিতেছিলেন।

তিনি হুগলী ঘুঁটিয়াবাজারস্থ "বিনোদিনী গার্লস হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে" কিছুকাল স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার ভার প্রাপ্ত হন। পরে হুগ্‌লী উইমেনস কলেজের মেডিক্যাল অফিসার ও অবৈতনিক ফার্ষ্ট এইড লেকচারার হইয়াছিলেন। ইহা ছাড়াও ডাঃ ঘোষ কৃষ্টি-পরিষদ, মহিলা-সমিতি প্রভৃতি বহু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

ডাঃ ললিতা ঘোষ

মৃত্যুকালে তিনি বৃদ্ধমাতা, পাঁচভ্রাতা ও দুই ভগিনী রাখিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত চিত্র-পরিচালক প্রফুল্ল রায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কংগ্রেসকর্মী ও সমাজসেবিকা সন্তোষকুমারী দেবী তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী।
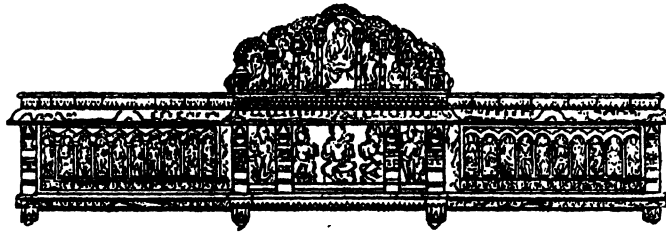
প্রবাসী পুরস্কার-প্রতিযোগিতার প্রথম দফা ফলাফল

গল্প

প্রথম পুরস্কার—"সেই ছেলেটা", শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ১০০৲

দ্বিতীয় পুরস্কার—"আকাশের সীমানা", শ্রীপ্রফুল্ল সরকার ৭৫৲

তৃতীয় পুরস্কার—(যদিও একটি গল্পকে দেওয়া হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল)

"জন্মকথা", সম্বুদ্ধ ৫০৲
"স্তূপ", শ্রীসুশীল সিংহ ৫০৲
"মাকড়সা", শ্রীআভা পাকড়াশী ৫০৲
"পদ্মমধু", শ্রীরাণু ভৌমিক ৫০৲

এ ছাড়া, বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দক্ষিণামূল্য দিয়ে নিম্নলিখিত গল্পগুলি প্রবাসীতে ছাপতে পেলে আমরা খুশী হব, এবং লেখক-লেখিকাদের সম্মতিপত্রের প্রতীক্ষা করব।

(গল্পের নামের আদ্যাক্ষরানুক্রমিক)

"আর এক অপরাহ্ণ", শ্রীকবিতা সিংহ
"উত্তরণ", শ্রীমায়া বসু
"কলঙ্কী চাঁদ", শ্রীপ্রফুল্লকুমার মৌলিক
"কানাই লাটের গল্প", শ্রীঅজিত চট্টোপাধ্যায়
"কাল শত্তুর", শ্রীপঙ্কজভূষণ সেন
"কুবীর পঞ্চায়েত", জুলফিকার
"ছাড়পত্র", শ্রীরমেশ পুরকায়স্থ
"তারার ভাষা", শ্রীসংযুক্তা মিত্র
"ত্রিঝঞ্ঝা", শ্রীশিশিরকুমার দাস
"ত্বরণ", শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়
"শিমফুলের গন্ধ", শ্রীসুরজিৎ মুখোপাধ্যায়
"প্রাণের ঠাকুর", শ্রীশৈলেশ বসু
"রবীন্দ্র শতবার্ষিকী", শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

প্রতিযোগিতার জন্যে পাঠানো প্রায় সাড়ে ছয় শ' গল্পের মধ্যে প্রকাশযোগ্য গল্প আরও অনেক ছিল, কিন্তু আমাদের স্থানাভাব।

যেসব লেখক-লেখিকাদের গল্প আমরা গ্রহণ করতে পারলাম না, তাঁদের মধ্যে যাঁরা ডাকটিকিট পাঠিয়েছেন তাঁরা তাঁদের গল্পের পাণ্ডুলিপি অনতিবিলম্বে ফেরত পাবেন। অন্যরা যদি পাণ্ডুলিপি ফেরত চান ত উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠাবেন অথবা আমাদের চিঠি লিখলে কোন্ ঠিকানায় কবে এসে পাণ্ডুলিপি নিয়ে যেতে পারবেন, তা আমরা জানিয়ে দেব।

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ ১ম খণ্ড | ভাদ্র, ১৩৬৮ | ৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলা

তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে পশ্চিম বাংলার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে ২৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই রাজ্যের সরকারী পরিকল্পনায় ৩৪১ কোটি টাকার মত প্রয়োজন। এখন সরকারী মুখপাত্র বলিতেছেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনার অঙ্কের হিসাব দেখিলে মনে হয় উক্ত পরিকল্পনার কোনও কাটছাঁট করা প্রয়োজন হইবে না। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় হলদিয়া বন্দর ও ফরাক্কায় গঙ্গার বাঁধ স্থান পাইয়াছে সুতরাং উহা রাজ্য সরকারের কার্য্যাবলীর মধ্যে আসিবে না। তবে ঐ দু'টিতে যথাক্রমে ৭ কোটি ও ২৫ কোটি টাকা মাত্র বরাদ্দ করা হইয়াছে সুতরাং কতদিনে উহাদের কাজ কতটা অগ্রসর হইবে তাহা বলা যায় না। যে যে বিভিন্ন খাতে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহা এইভাবে দেখান হইয়াছে, যথা :

১। কৃষি পর্য্যায়ে—	লক্ষ টাকা হিসাবে
কৃষিজাত উপাদান	১,৬৩৪
ছোট সেচকাজে	১,০৩২
জমি সংরক্ষণ	৪৬৬
পশুপালন	৪১১
দুগ্ধ ও ডেয়ারী	৬০০
অরণ্য রক্ষণ	২৩৪
মৎস্য চাষ	২০৫
গুদাম, বিক্রয় ব্যবস্থা ও শস্যভাণ্ডার	৪৩
মোট	৪,৬২৫

২। সমাজ উন্নয়ন ও সমবায়ে—	
সমবায়	১৬৫
সমাজ উন্নয়ন	১,২৩৯
পঞ্চায়েত	১৯৭
মোট	১,৬০১

৩। সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি পর্য্যায়ে—	
সেচকার্য্যে	১,৮৯২
বন্যা নিয়ন্ত্রণ	৫১৫
শক্তি উৎপাদন	৩,৭৩৬
মোট	৬,১৪৩

৪। শিল্প ও খনির কাজে—	
বড় ও ছোট শিল্পগঠনে	১,২০৪
খনিজ উৎপাদনে	৯২
কুটিরশিল্প ও গ্রাম উদ্যোগ	৯৯৭
মোট	২,২৯৩

খত	লক্ষ টাকা হিসাবে
৫। পরিবহন ও পথঘাটের ব্যাপারে—	
রাস্তা তৈয়ারী	১,৮০০
জনপথবাহী পরিবহন	১০০
বন্দর ও পোতাশ্রয়	—
অন্য পরিবহন	৩৩
টুরিস্ট পর্য্যায়	১৭
মোট	১,৯৫০

৬। সমাজসেবা—

সাধারণ শিক্ষা ও কৃষ্টিপ্রকরণ	২,৩৬৭
যান্ত্রিক শিক্ষা, ইত্যাদি	৬১৮
স্বাস্থ্য	১,৯৮০
গৃহ নির্ম্মাণ	১,৩৭২
অনুন্নত কল্যাণ (অনুন্নত শ্রেণীদের উন্নয়ন)	২৫০
সমাজ কল্যাণ	৩৪০
শ্রমিক ও শ্রমজীবি	৩৪৬
সমবায় (সাধারণের সহযোগিতায়)	(?)
মোট	৭,২৭৩

৭। বিবিধ—

স্টাটিষ্টিক্স্	২৩
প্রচার ও সংবাদ সংগ্রহ	৪০
বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা ও সংগঠন	—
রাজ্য সরকারের পুঁজিনিয়োগ	১,০০০
অন্যান্য	৫৩
মোট	১,১১৬

অনুমান করা হইতেছে যে, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন পশ্চিম বাংলার সম্পর্কে কোনও সুনির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টানেন নাই। রাজ্য সরকার পরিকল্পনাকালীন পাঁচ বৎসরে কি পরিমাণ অর্থ এই রাজ্যে সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহার উপরই কেন্দ্রীয় বরাদ্দের পরিমাণ নির্ভর করিবে।

এখন এই পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদিগের অবস্থার কিভাবে উন্নয়ন হইতে পারে তাহার বিচার করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশনের মতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে "জাতীয় আয়" বর্ত্তমান অপেক্ষা ৩০ শতাংশ ও মাথাপিছু আয় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। একথাও বলা হইয়াছে যে, প্রথম দুইটি পরিকল্পনার ১০ বৎসরে "জাতীয় আয়" ৪২ শতাংশ ও মাথাপিছু আয় ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বলা বাহুল্য এই সকল আয়বৃদ্ধির অঙ্ক সম্পূর্ণ লোকঠকানো সংখ্যাতত্ত্বের যাদুগরি। প্রকৃতপক্ষে এই সকল বৃদ্ধির অঙ্ক সঠিক পরীক্ষায় দাঁড়ায় না—অর্থাৎ ধোপে টেঁকে না। কেন তাহা বলিতেছি।

জাতীয় আয়বৃদ্ধি, সহজ বুদ্ধিতে তাহাকেই বলে যাহা জাতির কৃষিজাত, শিল্পজাত, খনিজাত, ইত্যাদি উৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রকৃতমূল্যের পরিমাণের উপর নির্দ্ধারিত। ঐ সকল দ্রব্যের পরিমাণ বা তাহার মূল্যের অঙ্কে যদি কিছু ভুয়া অঙ্কযুক্ত থাকে তবে সেই তথ্যটা দাঁড়ায় মেকি। পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই যে সকল ক্ষেত্রে আয়বৃদ্ধি হয় তাহাও ঠিক নয়। আয়বৃদ্ধি তাহাকেই বলা যাইতে পারে যখন উৎপন্ন দ্রব্য আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের হিসাবে পড়তায় আসে। ১ মণ চিনির আন্তর্জ্জাতিক মূল্য নিম্নসীমায় ২৷৷০ ডলার অর্থাৎ ১২ টাকা ও উচ্চসীমায় ৪ ডলার ১০ সেন্ট, (প্রতি পাউণ্ড ৩ সেন্ট হইতে ৫ সেন্ট, ৮২ পাউণ্ডে মণ হিসাবে) অর্থাৎ প্রায় ২০ টাকা। এখন চিনির উৎপাদন বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কি খরচে? আমরা দেখিতেছি যে, ১২৷৷০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জ্জনের জন্য ৫৷৷০ কোটি টাকা গুনাগার দিয়া তবে সে চিনি রপ্তানী করা যাইতে পারে। যাহার অর্থ গরীব ভারতীয় জনসাধারণকে শোষণ করিয়া আখচাষী মহাশয় ও মিলমালিক মহাশয়কে সন্তুষ্ট করিয়া তবে ঐ রপ্তানী সম্ভব।

আবার ঐ "আয়বৃদ্ধির" অঙ্কে যদি উৎপন্ন চিনির মূল্য মণকরা ২৫ বা ৩০ টাকা ধরা হইয়া থাকে তবে ত ঐ অঙ্কের সবকিছুই জাল! এবং যে কথা চিনির বেলায় সেই কথাই লৌহ, ইস্পাত, ইত্যাদি সব কিছুতেই খাটে। অর্থাৎ লোকসানের কারবারে উৎপাদনের পরিমাণ যাহাই হউক তাহাকে আয়বৃদ্ধির সহায়ক বলা যায় না, উহা অসহায় ভারতবাসীদের জন্য সৃষ্ট লোকঠকানর কল বলা চলে।

মাথাপিছু আয়ের ব্যাপার ত আরও চমৎকার—বিশেষে বাঙ্গালীর ক্ষেত্রে। আগে যে কেরাণীর বা স্কুলশিক্ষকের ৫০ টাকা মাহিনা ছিল, তিনি দশ মণ বালাম চালের মূল্য পাইতেন। আজ তাঁহার বেতন ও মাগ্‌গি ভাতা যদি ১২৫ টাকাও হয় তবে তাহাতে ছয়-সাত মণের অধিক মোটা চালও আসে না। সাত মণ চালের সংস্থান হইলেও সেখানে "আয়বৃদ্ধি" প্রকৃতপক্ষে আয়হ্রাস —এবং শতকরা ৩০ ভাগ!

পরিকল্পনা কমিশন যে একথা বুঝেন নাই তাহা নহে। সেই জন্যই তাঁহারা বলিয়াছেন যে, "তৃতীয় পরিকল্পনার সূচনাতেই পণ্যের পাইকারী মূল্য এবং জীবনযাত্রার ব্যয় উচ্চে থাকায়, মুদ্রাস্ফীতির চাপ (অর্থাৎ চুরি ও লুটের চাপ) যাহাতে বৃদ্ধি না পায় তাহার ব্যবস্থা করা এবং মুদ্রাস্ফীতির ফলে যে শ্রেণীর লোকেরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, বিশেষে বেতনভোগী শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান অক্ষত থাকার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।"

একথাও বলা বাহুল্য যে, কমিশনের এই উক্তি মনোগত পাপের স্বীকৃতি মাত্র। ব্যবস্থা কিছুই হইবে না তাহাও নিশ্চয়, কেননা তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অহেতুক মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য কমিশন অতিরিক্ত কর সংগ্রহ, পরিকল্পনা বহির্ভূত শিল্পে ঋণদান নিয়ন্ত্রণ ও আপৎকালীন প্রয়োজনে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য মজুতের সুপারিশ করিয়াছেন।

ধন্য কমিশনের ব্যবস্থা! একসঙ্গে ঘুষখোর "কর" আদায়কারীর সুযোগ, চুণাপুঁটিদের কারবারে "ঋণদান নিয়ন্ত্রণের" নামে পেটমোটা মুনাফাবাজদিগের আরও উদরস্ফীতি এবং এই ব্যবস্থায় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় অবশ্যম্ভাবী মূল্যস্ফীতির ফলে, খাদ্যের অভাবে যে "আপৎকাল" আসিবে তাহার জন্য পূর্বাহ্ণেই প্রস্তুতি!

এই সম্পর্কে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা যোজনায় পশ্চিমবঙ্গে কৃষির বিষয়ে ১৩ কোটি ১৮ লক্ষ, সমাজ উন্নয়ন ও সমবায় বিষয়ে ১১ কোটি, সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তির দরুন ৩২ কোটি ২৭ লক্ষ, শিল্প ও খনির খাতে ২৯ কোটি ২ লক্ষ, পরিবহন ও সংযোগ পথের জন্য ১৬ কোটি ৮০ লক্ষ, সমাজসেবায় ৫২ কোটি ৬২ লক্ষ এবং অন্যান্য ব্যাপারে ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ ছিল। এই ব্যবস্থার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের অবস্থার উন্নতি কতটুকু এবং অবনতি কি পরিমাণ হইয়াছে তাহা ত আমরা সকলেই হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছি।

কমিশন হলদিয়া বন্দর ও গঙ্গার উপর ফরাক্কা বাঁধকে কেন্দ্রীয় কার্য্যক্রমের মধ্যে ফেলিয়াছেন। যদি কেহ মনে করেন যে, ঐ কাজ দুইটি অত্যাবশ্যক জ্ঞানে পরিকল্পনা কমিশন উহা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় ফেলিয়াছেন, তবে তিনি ভুল বুঝিবেন। আসলে মৎলব খারাপ, কেননা কমিশন নিজেই জানাইয়াছেন যে, বন্দর ও গঙ্গার বাঁধ নির্মাণ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই সঙ্গেই জোর গলায় বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করার জন্যই এই দুইটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

তার পর বলা হইয়াছে যে, হলদিয়া বন্দর নির্মাণে ২৫ কোটি টাকা লাগিবে, কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় মাত্র ৭ কোটি টাকা ঐ বাবদ বরাদ্দ করা হইয়াছে, কেননা ঐ সম্পর্কের অধিকাংশ কাজই চতুর্থ যোজনাকালেই হইবে। গঙ্গার বাঁধেও মাত্র ২৫ কোটি টাকা তৃতীয় যোজনায় ধরা হইয়াছে কেননা উহাও নয় বৎসরে নির্মিত হইবে—অর্থাৎ চতুর্থ যোজনাকালে।

ইহার অর্থ এই। টালবাহানা করিয়া এই দুইটি কাজ একযুগ ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, এখন আর ঠেকাইয়া রাখা অসম্ভব, অতএব ঐ দুটিকে আরও দশ বৎসরের মত "ঢিমে তেতালায়" চালাইবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিজ হাতেই লইয়াছেন। তাহাতেও যদি কলিকাতার—তথা পশ্চিম বাংলার—তথা বাঙ্গালীর—সর্ব্বনাশ না হয়, তবে অন্য পন্থা দেখা যাইবে। ততদিনে কলিকাতা বন্দরের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটা উচিত, কেননা উহার নাভিশ্বাস এখনই উঠিয়াছে। একথাও শোনা গিয়াছে যে, বিহার সরকার অজয় নদ নিয়ন্ত্রণে বাধা দেওয়ায় ফরাক্কা বাঁধের কাজে দেরি হইতেছে, কেননা অজয় নদের বালিতেই ভাগীরথী মজিতেছে।

এখন দেখা যাউক তৃতীয় যোজনায় বাঙ্গালীর প্রধান সমস্যাগুলির কি সমাধান হইতে পারে।

কৃষিপর্য্যায়ে এইমাত্র হইতে পারে যে, শস্যের ঘাটতি কিছুদিনের জন্য কমিতে পারে। তবে তাহা একদিকে নির্ভর করিবে বরাদ্দ টাকার যথাযথ ব্যবহারে ও অন্যদিকে পরিবার নিয়ন্ত্রণে। এখন জমি অনুর্ব্বর কিন্তু বাঙ্গালীর পরিবার—শত্রুর মুখে ছাই দিয়া—তাহা নয়। কিন্তু এদেশে নূতন চাষ-আবাদের জমি নাই বলিলেই চলে, সুতরাং নূতন চাষে বেকার সমস্যা পূরণের কোনই সম্ভাবনা নাই।

সমবায়, পঞ্চায়েৎ ও সমাজ উন্নয়ন ত লোক দেখান টাকার খেলা। এতাবৎ ইহাতে সুফল ফলনের কোনও চিহ্নমাত্র দেখা যায় নাই, সুতরাং ভবিষ্যতের কোনও সমস্যা ইহাতে পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ।

সেচ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে বাঙ্গালীর সমস্যা-পূরণ এতাবৎ কিছু বিশেষ হয় নাই, তবে দেশের অধিকারিবর্গের ও কর্ম্মীদিগের নেতৃবর্গের যদি চৈতন্যের উদয় হয় তবে অনেক কিছুই সম্ভব হইতে পারে। এবিষয়ে যুবশক্তির শিক্ষা, চালনা ও যোজনা—এই তিনের অভাবে এবং অধিকারিবর্গের ভুল-ভ্রান্তি ও স্বজন-পোষণের উৎসাহেই বাঙ্গালীর ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিতেছে। সে বিষয়ে ব্যবস্থা না হইলে ঐ ৬১ কোটি টাকা ভস্মে ঘৃতাহুতিই হইবে।

শিল্প ও বাণিজ্য ব্যাপারে, তথা খনি-খাদানে বাঙ্গালী ত "গতগৌরব হৃত-আসন"। অধিকারিবর্গের চৈতন্য দিতে না পারিলে এই টাকায় বাঙ্গালীর কোনও উপকার হইবে না।

পরিবহন ও সংযোগপথ ইত্যাদি ত ভিন্নপ্রদেশীয়দের অধিকারেই আছে। এখানে উন্নতি হইলে দেশের পথ-ঘাট সুগম হইবে সত্য—বাঙ্গালীর কড়ি দিয়ে পথচলার জন্য, আর কোনও কাজে নয়।

সমাজসেবার খাতে সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও ব্যবহারিক এবং যান্ত্রিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গৃহ নির্ম্মাণ, এবং সেই সঙ্গে সমাজ-কল্যাণ আছে। এইগুলিই বাঙ্গালীর সমস্যাপূরণের প্রধান উপায়, এবং বর্ত্তমানে এইগুলিতেই অর্থের অপব্যবহার ও অব্যবস্থাই দেখা যাইতেছে—অধিকারিবর্গের অবহেলার ফলে। সেই অবহেলার ফলভোগ যাহাতে তাঁহাদের করিতে হয় তাহার ব্যবস্থাই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, নহিলে কোনও সমস্যারই পূরণ হইবে না।

সবশেষে স্টাটিষ্টিক্স্, সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচার ইত্যাদি। এগুলি দলগত স্বার্থরক্ষার উপাদান। সাধারণের কোনও উপকারে ইহা এতদিনে আসে নাই—পরের কথা পরে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা প্রকরণ

ভারতের সর্ব্বত্রই শিক্ষার বিষয়ে সরকারী অবহেলা চলিয়া আসিতেছে। ব্রিটিশ আমলে ঐ অবহেলার কারণ সম্পর্কে আমাদের নেতৃবৃন্দ বলিতেন যে, উহা আমাদের জাতিকে অন্ধকারে রাখিয়াছে দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময় শোনা গিয়াছিল যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের কর্ণধার-বর্গ তাঁহাদের মনপ্রাণ নিয়োজিত করিবেন। কাজের বেলায় দেখা গেল যে, ঐ সকল প্রতিশ্রুতিই মিথ্যা। অবশ্য অন্য অনেক বিষয়েও "কথা এক কাজ অন্য" ঘটিয়াছে, কিন্তু যে ভাবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কাজ বিগত ১৪ বৎসর চলিয়াছে তাহা নিতান্তই নৈরাশ্য-জনক। কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে শিক্ষার মন্ত্রী প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে দলীয় বিচারে নিযুক্ত হইয়াছে। সকল ক্ষেত্রে যোগ্য লোক আসে নাই, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। যেখানে কোন শিক্ষামন্ত্রী নিজের কাজে উৎসাহ দেখাইয়াছেন, সেখানে তিনি পদে পদে বাধা পাইয়াছেন—এমন কি নিজ দপ্তরের সচিবগণের নিকটে।

পশ্চিমবঙ্গে এই অবহেলার ফল নিদারুণ হইয়াছে। কেননা বাঙ্গালীর জাতি-গঠনের প্রধান উপাদান শিক্ষা। এই শিক্ষারই কারণে বাঙ্গালী ভারতে (ও বিশ্বজগতে) একদিন নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং ঐ শিক্ষাদীক্ষারই গুণে বাঙ্গালী শিক্ষক, চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী, ইঞ্জিনীয়র, ভূতত্ত্ববিদ্, যন্ত্রকৌশলবিদ্, দক্ষ কারিগর ইত্যাদি নানারূপে ভারতের প্রগতির অভিযানে, কৃতিত্ব ও পারদর্শিতার কারণে, শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাইয়াছিল।

আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে গতানুগতিক ভাব দেখা দিয়াছে, যাহাতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎও অন্ধকার হইয়াছে। বেকার সমস্যার মূল কারণ যে কয়টি তাহার মধ্যে যথার্থ কার্য্যোপযোগী শিক্ষার অভাবই প্রধানতম। ইহা আমরা সকলেই জানি যে, উচ্চশিক্ষা লাভ সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা তাহার জন্য যে মানসিক ও চারিত্রিক একাগ্রতা প্রয়োজন, তাহা অধিকাংশেরই থাকে না। কেন থাকে না তাহা এখন মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার বিচার এখানে আমরা করিতে চাহি না। শুধু মাত্র এই কথা বলা প্রয়োজন যে, যে শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি তত্ত্ব ও তথ্য জ্ঞানের উচ্চ সোপানে উঠিতে অসমর্থ সে যে ছাত্র হিসাবে অযোগ্য এ কথা ঠিক নয়। তাহাকে অন্য পথে চালিত করিলে সে শিক্ষিত ও কুশলী হইয়া জীবনে সাফল্য লাভ করিতে পারে। এ কথার প্রমাণ অসংখ্য ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে এবং এই জন্যই বিদেশে শিক্ষাবিদ্‌গণ তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের অল্প বয়সেই পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া তাহাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথ নির্ণয় করিতে বেশ কিছুদিন যাবৎ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা পরীক্ষায় বুঝিতে পারেন যে, শিক্ষার্থীর মানসিক চিন্তা ও স্পৃহা শিক্ষার কোন্ পথে সহজে চলিতে চাহে। এবং শিক্ষার প্রথম দিকের ভিত্তি স্থাপিত হইলে পরেই—অর্থাৎ স্কুলের শিক্ষা শেষ হইলেই—তাহাকে সেই পথে যথাযথ ভাবে চালিত করা হয়। যে যন্ত্রকৌশল বা যন্ত্র চালনায় দক্ষ হইতে পারে তাহাকে দর্শন শাস্ত্রে শিক্ষা দেওয়ার বৃথা চেষ্টায়, বা যাহার ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের বিষয়ে স্পৃহা তাহাকে ফলিত রসায়নে জ্ঞান দানের বিফল প্রয়াসে ব্যর্থ হইতে দেওয়া হয় না।

আমাদের দেশে এ বিষয়ে নানা বাধা আছে। সর্ব্ব প্রথমে আছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দারিদ্র্য ও অভাব। কারিগরি শিক্ষা, যন্ত্রকৌশল শিক্ষা, ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদির নানা স্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে লক্ষ লক্ষ ছেলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দক্ষতা অর্জ্জন করিয়া নিজের জীবনের পথ ঠিক করিতে সমর্থ হইত। বিদেশে ঐ ভাবে শিক্ষিত কোটি কোটি লোক নিজের সংস্থান ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এদেশে এত-দিনে কর্ত্তৃপক্ষের এ বিষয়ে চক্ষু ফিরিয়াছে। কেননা শিক্ষিত ও দক্ষ কর্ম্মী ও তাহাদের চালনার জন্য উচ্চ-শিক্ষিত ইঞ্জিনীয়ার ভিন্ন প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাপ্রসূত অনেক কিছুই ব্যাহত হইতেছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় তাহা আরও ব্যর্থ হইতে পারে এই বিষয়ে কর্ত্তাদের এত-দিনে চৈতন্যের উদয় হইয়াছে। ঐ কারণেই তৃতীয়

যোজনায় ষোলটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ স্থাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় তাহার একটিকেও বসান হইবে না।

অবশ্য শোনা যায় যে, কারিগরি শিক্ষার বিষয়ে পশ্চিম বাংলার রাজ্য সরকার চেষ্টিত। তবে সে চেষ্টা কতটা ব্যাপক ও কি ভাবে তাহার যোজনা হইবে, সে বিষয়ে কোন কিছুই এখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই রাজ্য সরকারের তৃতীয় যোজনায় শিক্ষা প্রকরণে কি পরিকল্পনা আছে তাহা না জানিলে কিছুই বিচার করা সম্ভব নহে। তবে একথা নিঃসন্দেহ যে, ডাঃ রায়ের বেকার সমস্যা সমাধানের পর্য্যায়ে যে যে কাজের গোড়াপত্তন হইয়াছে এবং হইবে শোনা যায়, সেগুলিতে অন্য রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান হইতেছে ও হইবে—বাংলা থাকিবে যে তিমিরে, সেই তিমিরে !

পশ্চিম বাংলার মফঃস্বল

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য একটি বিরাট পরিকল্পনার কথা প্রকাশিত হয়। কলিকাতা নগরের আশেপাশে, বিশেষে দক্ষিণ অঞ্চলে, ৫০,০০০ একর জমি বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুই-তিন শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া নূতন শহরের পত্তন করিবেন এবং সেই শহরে বাণিজ্যকেন্দ্র, কলকারখানা, ইত্যাদিতে কর্ম্মস্থলেরও সংস্থান করিবেন, এই ছিল উহার উদ্দেশ্য। খরচের টাকা জোগাড়ের বিষয়ে দুই-তিনটি বিদেশী গৌরীসেনের নামও উল্লেখ করা হয়। পরে জানা যায় যে, তাঁহারা এ বিষয়ে ততটা উৎসাহী নহেন।

ডাঃ রায় নাকি এই কলিকাতা উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু টাকা বিদেশ হইতে পাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই খবর সম্প্রতি শোনা যাইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিম বাংলার জন্য পূর্ণ চাহিদার টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দিতে প্রস্তুত একথাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে—তবে ঐ দু'টি সংবাদই "শোনা কথা"। সে যাহাই হউক, কলিকাতা উন্নয়ন ও কলিকাতার কল-কারখানার সম্প্রসারণ, ইহা পশ্চিম বাংলা সরকারের পূর্ব্বকল্পিত নক্সা মতনই হইবে মনে হয়।

একথা কিন্তু কেহই বলেন নাই যে, তৃতীয় পরিকল্পনার মেয়াদে পশ্চিম বাংলার মফঃস্বল অঞ্চলের নগর ও গণ্ড-গ্রামগুলির দুরবস্থার প্রতিকার কিছু করা হইবে কি না। কলিকাতার বাহিরে পশ্চিম বাংলার যে কোন-কিছু আছে, সে বিষয়ে আমাদের কর্ণধারবর্গের কথাবার্ত্তায় বা কাজে কিছু প্রকাশ পায় না। দৈনিক সংবাদপত্রেও সেই অবহেলা, তবে মাঝে মাঝে মফঃস্বলের সংবাদ কিছু দেওয়া হয়—সেটা না হইলে সারকুলেশন যায়—কিন্তু তাহাও চটকদার বা চমকপ্রদ সংবাদ মাত্র। মফঃস্বলের বার্ত্তাবহ কয়েকটি কাগজ আছে এবং সেগুলিতেই সেই সকল অঞ্চলের খবর কিছু থাকে, কিন্তু সেগুলিতে সংবাদ সংগ্রহের ব্যবস্থা বিশেষ আছে মনে হয় না এবং স্থানীয় সমস্যাবলীর চিত্রণও সুচিন্তিতভাবে করা হয় না।

যদি তৃতীয় পরিকল্পনার বিরাট তহবিলের কিছু অংশ ও বিদেশী গৌরীসেনমণ্ডলীর টাকার কিছু অংশ যথাযথভাবে মফঃস্বলে দেওয়া হয় তবে পশ্চিম বাংলার সন্তানেরা বাঁচে, কলিকাতামুখী জনপ্রবাহে কিছু মন্দা পড়ে এবং বেশ কিছু বাঙ্গালী পরিবার কলিকাতা-নরক-কুণ্ডের বাহিরে থাকিয়াও কলিকাতার কর্ম্মস্থলে যাতায়াত করিতে পারে। কলিকাতার ঘনবসতি অঞ্চলের চাপ কিছু কমে ও উন্নয়নও সম্ভব হয়।

মেদিনীপুর ও খড়্গপুরের মধ্যে বেশ অনেকখানি পতিত জমি আছে, যাহা কর্ম্মকেন্দ্র, কল-কারখানা ও শহর গঠনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। খড়্গপুর তিনটি বিশাল রেলপথের যোগস্থল। কয়লার খনিঅঞ্চল উহার সহিত বড় রেললাইনে যুক্ত এবং হীরাকুড ও ডি-ভি-সি, এই দুই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রই ঐখান হইতে কিছু অসম্ভব দূর নহে। জল সরবরাহ ও শ্রমিক সংস্থান হিসাবেও উহা ভাল। অথচ ঐ অঞ্চল অবহেলিত।

বাঁকুড়া জেলার অনেক অঞ্চল, স্বাস্থ্য, জমি, কয়লা চালান, বিদ্যুৎ সরবরাহ হিসাবে ভাল। সেখানের অনেক ছোট শহর ও বড় গ্রাম সহজেই উন্নীত করা যায় এবং সেখানে কর্ম্ম-সংস্থানের ব্যবস্থাও সহজেই হয়।

বর্দ্ধমানের শুধু খনিঅঞ্চলে সম্প্রতি বিশাল সম্প্রসারণ হইতেছে এবং তাহারই মুখে, দুর্গাপুরে, পশ্চিম বাংলা সরকার উদ্যোগী হইয়া কিছু করিয়াছেন—অবশ্য সেই কাজ সরকারী কাজ বলিয়া লোকসানেই চলিতেছে। বর্দ্ধমানের পূর্ব্বাঞ্চল ও হুগলী জেলার অধিকাংশই এতদিন অবহেলিত ছিল। সম্প্রতি সেখানে যাইবার পথঘাট তৈরীর আয়োজন হইতেছে এবং দুইটি ছোট সেতুও নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু নূতন শহর বসাইতে বা ব্যাণ্ডেল বিদ্যুৎকেন্দ্র ছাড়া অন্য কোন কল-কারখানা বা কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠান গঠনের কোনও উদ্যোগের কথা আমরা জানি না। দুর্গাপুর কোক আভন্ এবং ব্যাণ্ডেল বিদ্যুৎকেন্দ্র অবশ্য কলিকাতা নগরেরই জন্য স্থাপিত, উহাতে স্থানীয়

লোকের উপকার করার কোনই আভাস আমরা পাই নাই।

মফঃস্বলের বার্ত্তাবহ যে সকল স্থানীয় সংবাদপত্র তাঁহারা সম্মিলিতভাবে এ বিষয়ে আন্দোলন করুন, যাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনার যথাযথ অংশ স্থানীয় লোকের অবস্থা-উন্নয়নে ব্যবহৃত হয়। নহিলে ছিটেফোঁটাও মফঃস্বলে পৌঁছাইবে না, সবকিছুই টানিয়া লইবে কলিকাতা এবং "উন্নয়ন" হইবে সেই কলিকাতাস্থ চৌরচক্র ও তস্করমণ্ডলীগুলির যাহারা স্ফীতোদর হইয়াছে পশ্চিম বাংলার সন্তানদিগের রক্তশোষণে।

নির্ব্বাচনের সময় আগাইয়া আসিতেছে সুতরাং নানা প্রকারের ভাঁওতা, নানা মহাশয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই দিবেন। মফঃস্বলের প্রতিনিধি সাজিয়া যাঁহারা গত পাঁচ বৎসর বিরাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের কাজের হিসাব এখনই চাওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়েও মফঃস্বলের সাংবাদিকদিগের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার

পৃথিবীর ইতিহাসে সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইবার পরে জগৎ-সভ্যতার বিশেষ অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে একথা কোন চিন্তাশীল পণ্ডিত বলিবেন বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না। যদিও কখন কখন সংবাদপত্রে এমনভাবে সাজাইয়া সংবাদ ও মত প্রচার হইয়া থাকে যাহাতে মানবমনে নানান বিকারের সৃষ্টি হয় ও সেই কারণে মানব-সভ্যতার হানি কোথাও কোথাও হইয়া যায়। কিন্তু এই অপবাদ শুধু সংবাদপত্রের প্রচারকার্য্য সম্বন্ধেই খাটে এবং অপরাপর সভ্যতার অঙ্গ ও অবয়বগুলিতে আরোপ করা চলে না, এ কথাও সত্য নহে। অর্থাৎ ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, কৃষ্টি, প্রভৃতি বিভিন্নক্ষেত্রে মানুষ যাহা করে অথবা যেভাবে মনোভাব প্রকাশের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে, তাহাতে যে সর্ব্বদাই মানব-সভ্যতার আদর্শগুলি পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হয়, তাহা নহে। ধর্ম্মের নামে বহু যুদ্ধবিগ্রহ, অত্যাচার, অনাচার ইতিহাসে ঘটিয়াছে ও এখনও ঘটিতেছে। সেইজন্য ধর্ম্ম বড়ই একটা ঘৃণ্য প্রতিষ্ঠান একথা কে বলিবে? রাষ্ট্র বরাবরই অত্যাচার, অনাচার ও অরাজকতার প্রধান আশ্রয়কেন্দ্র ইহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য; কিন্তু সেইজন্য রাষ্ট্রগুলিকে বিশেষভাবে দমন করা প্রয়োজন একথাও কোন মহাপুরুষ বলেন নাই। কৃষ্টি, অর্থাৎ ধরা যাউক, সাহিত্য, সঙ্গীত, নাট্য, চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, নৃত্য, প্রভৃতি মানব-অনুভূতি ও মনোভাব প্রকাশের যে সকল উপায় সমাজে সতত ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাহার ভিতর দিয়াও সভ্যতার হানি ও অকল্যাণকর অনেক কিছু ঘটিতে পারে; কিন্তু সেইজন্য এই সকল উপায়ে প্রেরণার প্রকাশ আইন-বিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা উচিত মনে হয় না। গীতা পাঠ এক সময় ব্রিটিশ সরকার বাংলা দেশে বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অনেক নাটক অভিনয় রোধ করাও তাঁহাদিগের দ্বারা হইয়াছিল। যথা "মেবার পতন"। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠ" সমাজের অমঙ্গলকর বলিয়া ইংরেজ সরকার বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ইহা ব্রিটিশও মানিয়া লইয়াছিলেন যে, ঐ প্রকার বিধান মানব-সভ্যতাবিরুদ্ধ; কেননা অন্যায়ের প্রতিবাদ যেভাবেই হউক না কেন তাহা সমাজের উন্নতিই করে; অবনতির কারণ কদাপি হয় না। সংবাদপত্রে ব্যক্তি, গণ্ডি, দল, রাষ্ট্রীয় "পার্টি", প্রভৃতির নিন্দা ও সমালোচনাও অধিক স্থলেই সামাজিক মঙ্গলেরই হেতু হয় বলিয়া আমাদিগের ধারণা।

বর্ত্তমানে যে থাকিয়া থাকিয়া ভারতের স্বাধীন সরকারের তরফ হইতে ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার সংবাদপত্রগুলির উপর নিন্দারোপ করিবার চেষ্টা করা হইতেছে, সেই সকল নিন্দাবাদ জনসাধারণ হেয় বলিয়া মনে করেন। কারণ বস্তুতঃ যে সকল অন্যায়, অত্যাচার, অরাজকতার বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে আন্দোলন করা হয় সেই সকল অনাচারের মূলে রহিয়াছে ভারত সরকারের নিজের অক্ষমতা, অন্যায় প্রচেষ্টা ও অপকর্ম্মের সহায়তা "পলিসি"। ভারত সরকার অন্যায়ের সাফাই গাহিলে সংবাদপত্রগুলি তাহার ধুয়া ধরিবে এই আশা কখনও সফল হইতে পারে না। ভারত সরকার সাধারণের অর্থে বহু মিথ্যা প্রচার করিতে দিয়া থাকেন এবং সাধারণের অর্থে অনেক বিলিব্যবস্থা করিয়া থাকেন যাহার ফলে শেষ অবধি সাধারণের অমঙ্গল ও ক্ষতি হয়। সুতরাং প্রচারের সত্যতা ও সামাজিক বা জাতীয় আদর্শের সহায়কতা বিচার করিয়া যদি পুস্তক, পুস্তিকা মুদ্রণ ও আকাশবাণী "ছড়ান" হয় তাহা হইলে "মিনিষ্ট্রি অফ ইনফরমেশন" বন্ধ করিয়া দেওয়াই ভারত সরকারের কর্ত্তব্য। এবং সকল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ভুলভ্রান্তিতে পূর্ণ হওয়ার কারণে সেই সকল পরিকল্পনার কথাও ভারত সরকারের চাপিয়া যাওয়া উচিত। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজে যে সকল বাণী উচ্চারণ করিয়া ভারতের ও পৃথিবীর অপরাপর দেশের সাধারণকে জ্ঞানদান করিবার চেষ্টা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন, সেই সকল বাণীর অধিকাংশই না বলিলেই জগতের ও ভারতের অধিক উপকার হয়। সাধারণভাবে বলিতে হইলে বলা যায় যে, প্রদেশ ও

কেন্দ্রীয় সরকারের মতামতের বেশীর ভাগই সমাজ-হিতকর নহে; এবং সেই কারণে সংবাদপত্রের প্রচার সংশোধন বা বন্ধ না করিয়া তাঁহাদিগের উচিত নিজেদের কথা ও কার্য্যের স্রোতে বাঁধ বাঁধিয়া সমাজ সংরক্ষণের সাহায্য করা। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কার্য্য-কলাপ যে সর্ব্বক্ষেত্রে ন্যায়ের ও জাতীয় উন্নতির দিক্ দিয়া খুব সুবিধাজনক, একথা তাঁহাদিগের অতি বড় চাটুকার-গণও হলফ করিয়া বলিতে পারিবেন না। এবং যে সকল সমাজধ্বংসকারী দুষ্কর্ম রাষ্ট্রের নামে ভারতবর্ষে করা হয় তাহার হিসাব করিলে কোনও সরকারের প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা থাকিবে না।

ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের, সংবাদপত্র-গুলির বেশীর ভাগই ভারত অথবা প্রদেশ গবর্ণমেণ্টের তারিফ নিয়মিতভাবে করিয়া থাকেন। ইহার কারণ, না করিলে সংবাদপত্রের মালিকদিগের প্রতি সরকারী নেকনজর আর থাকিবে না, কাগজ আমদানীর "পারমিট", "ভাইপো"দিগের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠা, সরকারী বিজ্ঞাপন, প্রভৃতি জুটিবে না। এমতাবস্থাতেও যে সংবাদপত্রগুলি কখন কখন গবর্ণমেণ্টের "পলিসি" ও গবর্ণমেণ্টকৃত দুষ্কর্মের নিন্দাবাদ করেন তাহাতে প্রমাণ হয় যে, অনাচারের মাত্রা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া এমন হইয়া দাঁড়ায় যখন চাটুকারগণও নিজেদের সুবিধার কথা ভুলিয়া সত্যকথা বলিয়া ফেলেন। সংবাদপত্রের লেখক-গণ মানুষ, এবং মানুষের দোষ-গুণ তাঁহাদিগের মধ্যে থাকাই স্বাভাবিক! এইজন্য যখন তাঁহারা স্বজাতীয় নারীদিগের অবমাননা ও স্বদেশবাসীর ঘরজ্বালান ও তাঁহাদিগের উপর ডাকাতি, মারপিট, লুঠ ও হত্যাকাণ্ড দেখেন তখন তাঁহারা কিছুটা উত্তেজিত হইয়া পড়েন। ইহা স্বাভাবিক এবং উত্তেজনার আবেগে যদি তাঁহারা অঙ্ক কসিয়া ও ন্যায়-অন্যায়ের মাত্রা নিক্তির ওজনে মাপিয়া না লেখেন; তাহাতে তাঁহারা মহা সমাজদ্রোহী একথা বলা চলে না। উত্তেজনার কারণ আছে কি না এবং সেই কারণগুলির মূলে কাহার অপরাধ রহিয়াছে ও কাহার দ্বারা অপরাধের প্রশ্রয়দান হইয়াছে তাহার বিচার প্রথমে হওয়া প্রয়োজন। যদি উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ থাকে তাহা হইলে দেশ-নেতাদিগের উচিত প্রকৃত অপরাধী ও দোষীর শাস্তিবিধান। কষ্টকল্পিত সমাজ-সংস্কার ও রাষ্ট্র-সংরক্ষণ নীতি আওড়াইয়া ক্রমাগত অন্যায়ের প্রশ্রয় দিয়া চলিলে সমাজ ও রাষ্ট্রনেতাগণকে অবশেষে জাতি তাঁহাদিগের উচ্চস্থান হইতে অপসারণ করিতে বাধ্য হইবে। রাষ্ট্রনেতা ও রাজকর্মচারীদিগের সত্যকার দেশভক্তি ও সমাজসেবার আগ্রহ নাই বলিলেই চলে। স্বার্থান্বেষণ, ব্যক্তিগত লাভ, প্রভৃতি ক্ষুদ্র চেষ্টাতেই তাঁহারা পূর্ণরূপে আসক্ত। এই অবস্থায় তাঁহাদিগের পক্ষে সাধারণের অথবা সংবাদপত্রের লেখকদিগের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া সময় নষ্ট করা শোভা পায় না। নিজেদের স্বভাব ও চরিত্র প্রথমে উন্নত করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই কথা নির্ব্বিচারে সকল দেশ-নেতার সম্বন্ধেই খাটে। তাঁহারা সকলেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিচালিত বলিলে, অতি সহজে একটা শতকরা নিরানব্বই ভাগ সত্য কথা বলা হইয়া যায়। কম্বলের রোঁয়া বাছাই কিম্বা ঠগ বাছিতে গাঁ উজাড় করিয়া পরিশ্রম বৃদ্ধির কোন সার্থকতা নাই। একাধারে যদি সকল "দেশনেতা" অবসর গ্রহণ করিয়া বনবাসে চলিয়া যান, তাহা হইলে ভারতের, তথা সকল প্রদেশের, বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা হইতে পারে। অ

গোপালগঞ্জ ও গোরেশ্বর

গোপালগঞ্জ ও গোরেশ্বরের "অনুসন্ধান" হইতে আমরা বর্ত্তমান ভারত ও পাকিস্থানের আদর্শবাদ ও রীতিনীতির বিষয়ে নূতন জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি। গোপালগঞ্জে দেখা গিয়াছে যে, সংখ্যালঘিষ্ঠ ও অসহায় নরনারীর উপর অত্যাচার করা ও গুণ্ডাদিগকে করিতে দেওয়া মুসলমান ধর্ম্ম অনুসারে ইসলামীয় কার্য্য। আমাদিগের ধারণা ছিল, মুসলমান ও বিশেষ করিয়া জেনারেল আয়ুব খান পুরুষোচিত বীরধর্ম্মে বিশ্বাসী এবং তাঁহাদিগের রাজ্যে অন্ততঃ দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ঘটিবে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, আমাদিগের বিশ্বাস ভুল। তাঁহারা অর্থাৎ আয়ুব খানের যুগের পাকিস্থানীরা পূর্ব্বের সুরাবর্দ্দীদিগের ন্যায়ই গুণ্ডাবাজী ও অধর্ম্মে বিশ্বাসী। যেরূপ ভাবে গোপালগঞ্জে হিন্দুদিগের উপর

অত্যাচার করা হইয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয় না যে, আয়ুব খানের বিদেশে গিয়া নীতিকথা বলিবার কোন অধিকার আছে। গোরেশ্বরের রিপোর্ট পাঠ করিলেও আর এক মহাপুরুষের সম্বন্ধে ঐ জাতীয় ধারণাই হয়। এই মহাপুরুষ বেদবেদান্ত, বৌদ্ধদর্শন ও গান্ধীবাদ শেষ করিয়া টলষ্টয় প্রভৃতি ইউরোপীয় মহাজনদিগের প্রভাবে পড়িয়া বিশ্বের সর্ব্বত্র নীতিবাদ প্রচার করিয়া বেড়াইয়া থাকেন। কোন দূরদেশে কোন অন্যায় ঘটিলেই ইনি একটা না একটা বাণী উচ্চারণ করিয়া তাহা অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সাহায্যে সর্ব্বদেশবাসীকে বিতরণ করেন। কিন্তু তাঁহার নিজের রাজত্বে লুঠ, ঘর জ্বালান, নারীধর্ষণ, প্রভৃতি তাঁহার নিজের দলের লোক ও ভাড়া-করা গুণ্ডা দিয়া করা হইয়া থাকে ও তিনি তখন চীনদেশের তিন বানরের অনুকরণে "খারাপ জিনিস দেখো না—খারাপ কথা শুনো না—খারাপ কথা ব'লো না" পন্থায় মুখ-কান-চোখ বন্ধ করিয়া কঙ্গো-লাওস-বিজের্টা-কুবায়েত চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকেন। নীতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনেতাদিগের নির্বীর্য্য অক্ষমতা দেখিয়া আমরা ক্রমশঃ বিশ্বমানবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া উঠিতেছি।

অ

শ্রীঅমিতাভ চৌধুরী

ভারতীয় সংবাদপত্রে বহু অন্যায় পূর্ণ প্রমাণের সহিত প্রকাশ করিয়া রাষ্ট্রীয় বিলি-ব্যবস্থার শুদ্ধি সাধনের সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া শ্রীঅমিতাভ চৌধুরীকে ফিলিপাইনের ম্যাগসেসে পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। এই পুরস্কার প্রায় ৫০,০০০৲ টাকা প্রমাণ ও ইহা সাংবাদিক হিসাবে যাঁহারা বিশেষ ভাবে কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হন তাঁহাদিগকেই দেওয়া হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত অমিতাভ চৌধুরী বাংলার সংবাদপত্রের লেখক ও পরিচালকদিগের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, এবং প্রমাণ করিয়াছেন যে, পণ্ডিত নেহরুর সমালোচনা বাংলার সংবাদপত্রের উপরে উগ্র হইয়া উঠিলেও জগতের বিচারে 'বাংলার মর্য্যাদা সংবাদ-প্রচার ক্ষেত্রে উর্দ্ধেই আছে।

অ

গান্ধীবাদ শিক্ষা

যদিও মহাত্মা গান্ধীকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সর্ব্বপ্রধান প্রচারক বলিয়া ভারতে কংগ্রেসকর্ম্মীরা বলিয়া থাকেন এবং মহাত্মা গান্ধীর নাম শুনিলেই সকলে জোড়হস্তে প্রণামের অভিনয় করেন; তাহা হইলেও বর্ত্তমান ভারতে গান্ধীজীর আদর্শ ও তিনি ভারতবর্ষের মানবকে যেরূপ ভাবে আত্মগঠন করিতে বলিয়াছিলেন, সে সকল আদর্শ ও জীবনযাত্রা পদ্ধতির কোনও স্থান নাই বলিলেই চলে। এই কারণে, যে কথা উঠিয়াছে গান্ধীবাদ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য, তাহা হইতে দুইটি তথ্য উদ্ধার করা যায়। প্রথম, যে গান্ধীবাদ জাতীয় জীবন হইতে অপসৃত করা হইয়াছে ও উক্ত আদর্শ, মত বা নীতি বর্ত্তমানে কলেজে পাঠের বিষয় না করিয়া দিলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের নরনারী গান্ধীজী কি ছিলেন ও কি শিখাইয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইবে। এই কথাটি গান্ধীজীর মানসপুত্রদিগের পক্ষে অতিবড় নিন্দার কথা। তাঁহারা যে গান্ধীজীকে ভাঙ্গাইয়া খাইয়াছেন ও খাইতেছেন সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু তাঁহারা যে কতটা নির্লজ্জ ও অকৃতজ্ঞ সে কথা এখন বুঝা যাইতেছে। ভারতকে একটা নকল মার্কিন বা ফাঁকির রুশীয় রঙে রাঙাইয়া জগতের নিকট খাড়া করিবার জন্য কংগ্রেসকর্ম্মিগণই দায়ী। প্রয়োজন মত এই সকল নির্লজ্জ ব্যক্তিরা উপনিষদ্‌, বেদ, বুদ্ধবাদ, ভক্তিযোগ অথবা গান্ধীবাদ আওড়াইয়াও টাকা ধার করিতে কখন কখন বিদেশে গিয়া ভারতীয় কৃষ্টির বিজ্ঞাপন করিতে কুণ্ঠা অনুভব করেন না। গান্ধীবাদ যদি সকলে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে এই সকল উদ্দেশ্যমূলক প্রচারকার্য্যে বাধা পড়িবে এই আশঙ্কায় তাঁহারা গান্ধীবাদ জাগ্রত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। দ্বিতীয় তথ্য সুতরাং এই দাঁড়াইয়াছে যে, গান্ধীবাদের মধ্যে এখনও রস আছে ও তাহা নিঙড়াইলে কিছু লাভের আশাও আছে। জয় হিন্দ্‌।

অ

রুশে "সত্যযুগের" পরিকল্পনা

কয়েকদিন পূর্ব্বে পৃথিবীর সকল সংবাদপত্রে বৃহৎ অক্ষরে ক্রমাগত একটি সংবাদ প্রচার করা হয়; তাহা হইল রুশ দেশের এক পরিকল্পনার কথা, যাহাতে কুড়ি বৎসর পরে রুশ দেশে সকলে বিনা মূল্যে খাইতে, বাসস্থান লাভ করিতে ও অপর অনেক কিছু পাইবে। সংবাদটির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, রুশ দেশের মানবকে আর খাটিয়া খাইতে হইবে না; সে দেশের আর্থিক উন্নতি উৎপাদন-প্রাচুর্য্যে এতই উচ্চ স্তরে উঠিয়া যাইবে যে, কাহারও কোন দ্রব্য-সামগ্রীই ক্রয় করিয়া লইতে হইবে না। পৃথিবীর সকল দেশের অল্পবুদ্ধি লোকের মনে এই সংবাদ শ্রবণে রুশের প্রতি একটা প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইবে বলিয়া সংবাদ-প্রচারকদিগের

ধারণা এবং এই ধারণা ভুলও নহে। কিন্তু পূর্ব্বের বহু সোভিয়েট প্রচারিত কথার মতই এই সংবাদের যথার্থ অর্থ প্রচারকদিগের বিজ্ঞপ্তির তুলনায় বিশ্বমানবের নিকট ততটা আশার বাণী নহে, যতটা জগৎকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। প্রায় ৫০ বৎসর গত হইয়াছে, সে সময় দেশে-বিদেশে ভারতীয় "কুলি" চালান করার একটা ব্যবসার চলন হইয়াছিল। হাজার হাজার গরীব শ্রমিক-দিগকে আড়কাটিগণ ফুসলাইয়া সুদূর আসাম, সিংহল, ত্রিনিদাদ, প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিত। এই সকল অসহায় শ্রমিকগণ "বিনামূল্যে" সব কিছু পাইত। কর্ম্ম-স্থলে বাসস্থান অর্থাৎ কুকুরের বাসেরও অযোগ্য গৃহাদি, বিনা ভাড়ায় তাহারা পাইত। দোকান হইতে খাদ্য-বস্তুও তাহারা পয়সা না দিয়া "হিসাবে" পাইত। ঔষধ ইত্যাদি ও বস্ত্রও ঐভাবে পাওয়া যাইত। এই সকল কর্ম্মীরা "বিনামূল্যে" জীবনযাত্রার সকল "সম্ভার" পাইয়া দেখিত তাহাদিগের হস্তে নগদ কিছুই আসিতেছে না এবং বৎসরের পর বৎসর ভীষণ পরিশ্রম করিয়া ইহারা দেহপাত করিত, কিন্তু দেশে আর কখনও ফিরিয়া আসিতে পারিত না। সম্ভার যদি তিন অবস্থা হয় তাহা হইলে "মাগ্‌নার" কয় অবস্থা হয় তাহা অর্থনীতিবিদ্-দিগের বিচার্য্য।

শুধু যে কুলিদিগকেই এইরূপে বিনামূল্যে জীবনযাত্রার সকল বস্তু দেওয়া হইত, তাহা নহে। ইউরোপের "সভ্য" দেশগুলিতেও "পেমেণ্ট ইন কাইণ্ড," অর্থাৎ চলিত-মুদ্রার পরিবর্ত্তে বিভিন্ন বস্তুতে বেতন দিবার রীতি ছিল। এই প্রকার বিভিন্ন বস্তু সরবরাহ করিয়া বেতন হইতে সকল কিছুর খরচ কাটিয়া লইয়া শ্রমিকদিগকে বঞ্চনা করা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল এবং শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজসংস্কারের ফলে পরে আইন করিয়া এই প্রকারে বেতন দেওয়া রোধ করা হয়। "ট্রাক অ্যাক্ট" বা শুধু নগদে বেতন দিবার আইন করিয়া শ্রমিক ঠকান শেষ অবধি বন্ধ করা হয়। সুতরাং নানান প্রকার দ্রব্য "বিনামূল্যে" পাইলেই যে, শ্রমিকদিগের প্রতি ন্যায়ের শেষ কথা বলা হইয়া যায়, এ বিশ্বাস ভুল। আমাদিগের দেশে বহু কারখানাতে বিনা ভাড়ায় বাসগৃহ অথবা "কোয়ার্টার" দেওয়া হয়। তাহাতে যে শ্রমিকদিগের প্রতি একটা মহা ধর্ম্মকার্য্য করা হয় তাহা নহে। সেই কারণে একথা বলা যায় যে, রুশ দেশে যদি বিনা ভাড়ায় বাসস্থান দিবার ব্যবস্থা করা হয় তাহা দ্বারা একথা প্রমাণ হইবে না যে, রুশীয় শ্রমিক বা জনসাধারণকে রুশ রাষ্ট্র "শোষণ" অথবা "এক্সপ্লয়েট" করিতেছে না। বিনামূল্যে খাদ্যবস্তু সরবরাহ করা সম্বন্ধেও ঐ এক কথাই খাটে। আমাদের দেশেও যদি শ্রমিকগণ রুশীয় শ্রমিকের ন্যায় কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকেন, উপরওয়ালাদিগের নির্দ্ধারিত বেতনে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও "ক্যান্টিনে" বিনামূল্যে খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। শ্রমের মূল্যদান ব্যবস্থার সকল অঙ্গের পূর্ণ ব্যবচ্ছেদ না করা পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারে না যে, শ্রমিকের প্রতি ন্যায় করা হইতেছে কিনা।

রুশীয় প্রচারের পূর্ণতর বিবরণ কোন কোন সংবাদ-পত্রে বাহির করা হইয়াছে এবং তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ঠিক সত্যযুগের অবতারণা রুশ দেশে হইতেছে না। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে রুশ দেশে যাহা যাহা ঘটিবে তাহা নিম্নে দেখান হইল। ইহা মস্কো হইতে ৩০শে জুলাই প্রচার করা হইয়াছে।

১। বিনামূল্যে সকল চিকিৎসার ব্যবস্থা।

২। বিনামূল্যে সকল বালক-বালিকাদিগের পাঠের ব্যবস্থা।

৩। যাহারা শ্রমের অযোগ্য তাহাদিগের ভরণ-পোষণের পূর্ণ আয়োজন।

৪। বিনামূল্যে বাসস্থান ও বিভিন্নরূপ সঙ্ঘসেবার ব্যবস্থা।

৫। যাতায়াতের যানবাহনের ভাড়া লাগিবে না।

৬। ফ্যাক্টরী, অপরাপর প্রতিষ্ঠান ও সমষ্টিগত চাষ-বাসের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে খাইবার ব্যবস্থা।

৭। রাজকর উঠাইয়া দেওয়া ও সকল দ্রব্যের মূল্য হ্রাস করা।

৮। এবং ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিকল্পনার পূর্ণতা-লব্ধ হইলে পরে গ্যাস ও জল সরবরাহ এবং গৃহাদি গরম করিবার ব্যবস্থা বিনামূল্যে হইবে।

কম্যুনিষ্টদিগের প্রচারিত "সর্ব্বোচ্চ জীবনযাত্রা প্রণালী" উপরের বর্ণনা হইতে প্রমাণ হয় না। কারণ ঐ সকল ব্যবস্থার মধ্যে ১, ২, ৩, ধারার সুবিধাগুলি ইউরোপ আমেরিকার বহু দেশেই বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি ২০ বৎসর পরে দেওয়া হইবে বলার অর্থ যে, বর্ত্তমানে রুশ দেশে এই সুবিধাগুলি নাই। সকল দেশেই সেনাদলের জন্য বিনা-মূল্যে সকল ব্যবস্থা করা হয়। সৈন্যগণ খাওয়া, কাপড়, ঔষধ, মদ্য, জুতা, বাসস্থান, প্রভৃতি সকল কিছুই বিনামূল্যে পাইয়া থাকে। তাহা দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, সৈন্য-দিগের জীবনযাত্রা প্রণালী সর্ব্বোচ্চ ধরণের। এই কারণে এই রুশীয় "প্রপ্যাগাণ্ডা" বা উদ্দেশ্যমূলক বিজ্ঞপ্তির কোন বিশেষ মূল্য আমরা ধরিতেছি না।

রুশ দেশে বিনামূল্যে যাহা কুড়ি বৎসর পরে দেওয়া হইবে সেই সকল দ্রব্য সকলকে "যথেচ্ছ" লইতে দেওয়া হইবে বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ বিনামূল্যে দেওয়াটা এক প্রকার কঠোর ভোগ নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র হইয়া দেখা দিবে। অতি আবশ্যক ভোগ্যবস্তু কেহ আর ইচ্ছামত ক্রয় করিয়া লইতে পারিবে না বলিয়া মনে হয়। শুধু যেটুকু বিনামূল্যে পাইবে সেটুকুই ব্যক্তিবিশেষের ভোগে লাগিবে এবং বিনামূল্যে পাওয়া জিনিসের সরেশ-নিরেশ বিচার অধিকার কাহারও থাকিবে না বলিয়া মনে হয়। সুতরাং এই বিনামূল্যে পাওয়াটা অতি-প্রয়োজনীয় বহু বস্তু ইচ্ছামত পাওয়ার পথে একটা মহা অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে বলিয়াই ধরিতে হইবে।

শ্রম ও তাহার মূল্য বিচারক্ষেত্রে শ্রমিকের শুধু এই কথাই ভাবিতে হইবে যে, সামাজিক বিলিব্যবস্থার যন্ত্র চালিত রাখিয়া তাহার শ্রমলব্ধ ঐশ্বর্য্যের তাহার প্রাপ্য ন্যায্য অংশ তাহাকে দেওয়া হইতেছে কিনা। যদি তাহাকে তাহার প্রাপ্য অংশ না দিয়া সেই ঐশ্বর্য্যটুকু "সামাজিক ভাবে" ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে শ্রমিকের সেই সামাজিক ভাবে ব্যবহারের ভিতরের রীতিনীতি বিচার করিবার অধিকার থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় অধিকার শ্রমিকের ব্যক্তিগত ভাবে কতটা থাকে তাহা দ্বারাই বিচার করা হইবে যে, শ্রমিকের প্রতি ন্যায় করা হইতেছে কি না। তাহাকে যদি মুখবন্ধ করিয়া সকল "সামাজিক" ব্যবস্থা মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, শ্রমিকের প্রতি ন্যায় করা হইতেছে না; এমন কি তাহাকে "শোষণ" করা হইতেছে একথাও বলা চলিবে। "সামাজিক ভাবে" শ্রমিক শোষণ অসম্ভব এ কথা বলা চলে না। কারণ আমাদিগের "রাষ্ট্রীয় পরিবহন" বা "লৌহবর্ত্ম যান" পরিচালনা কার্য্যে শ্রমিকগণ সর্ব্বদাই ন্যায্য বেতন ও কার্য্যব্যবস্থার অধিকারী হয়, এ কথা কে বলিবে? অর্থাৎ ব্যবসা, বাণিজ্য, কারখানা প্রভৃতিকে রাষ্ট্রীয় কারবার করিয়া দিলেই শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ পূর্ণ ধর্ম্ম ও ন্যায়ের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে, একথা কোন্ সাহসে বলিতে পারি? জীবনবীমা ব্যবসায় ভারতে রাষ্ট্র-করায়ত্ত করিয়া "সামাজিক ভাবে" বীমাকর্ম্মীদিগের উপর কি "প্রাইভেট" যুগের তুলনায় অধিক ন্যায় করা হইয়াছে? টাটা কর্ম্মীদিগের তুলনায় কি হিন্দুস্থান ষ্টীলের কর্ম্মীদিগের অবস্থা অনেক অধিক উন্নত? অ

জাতীয় সমস্যা-প্রবাহ

ভারত স্বাধীন হইবার সময় হইতেই ভারতের যে সকল জাতীয় সমস্যা আমাদিগের জীবন নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছিল, সে সমস্যাগুলির উপর আরও ভয়াবহ বহু সমস্যার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল সমস্যার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও দুর্ব্বিষহ সমস্যা হইল ভারত বিভাগ ও প্রায় এক কোটি লোকের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া উদ্বাস্তু অবস্থা প্রাপ্তি। এই সকল লোকের মধ্যে কিছু কিছু লোক জীবন রক্ষা করিবার জন্য কোন উপায়ে অপর স্থলে নিজেদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া লইয়া দিন কাটাইতেছেন এবং অনেকে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছেন। দুই-দশ জন হয়ত ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া কিছু উন্নতিও করিতে পারিয়াছেন, কিন্তু, সাধারণতঃ বলিতে গেলে এই উদ্বাস্তুদিগের অবস্থা বাস্তু হইতে বিতাড়িত লোকেদের স্বভাবতঃ যেরূপ কষ্টের হয় সেইরূপই হইয়াছে। ভারত সরকার উদ্বাস্তুদিগের পুনর্ব্বাসনের জন্য বহু শত কোটি টাকা ব্যয় করিয়া এই সকল ব্যক্তির বিশেষ উপকার করিতে সক্ষম হন নাই এবং নিজেদের অক্ষমতা ও কার্য্যে অসফলতার জন্য উদ্বাস্তুদিগকেই দোষী নির্দ্ধারিত করিয়া মিথ্যা ও অন্যায় প্রচারের দ্বারা নিজেদের পাপ আরও বাড়াইয়া তুলিয়া জগতের নিকট ভারতের মাথা আরও নীচু করিয়া দিয়াছেন। দুই-তিনটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা করিয়া ভারতের সকল বাসিন্দার উপার্জ্জনের একটা ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল অংশ রাজকর হিসাবে আদায় করিয়া সেই অর্থে বহুবিধ "সংগঠন" কার্য্য করিয়াও ভারত সরকার ভারতের উদ্বাস্তু বা অপরাপর ব্যক্তিদিগের জীবনযাত্রা কিছুমাত্র সুখময় করিয়া তুলিতে সক্ষম হন নাই। আধুনিক জগতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে মানুষ আর পূর্ব্বের ন্যায় সহজে মরিতে পারে না। ম্যালেরিয়া, প্লেগ, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, কালাজ্বর, ডিপথেরিয়া, রক্ত বিষাক্ত হইয়া মৃত্যু, প্রভৃতি বহুবিধ অকাল মৃত্যুর কারণ আজকাল সহজে নিবারিত করা যায়। অ্যান্টিবায়োটিক্ ও সাল্ফা ঔষধগুলি জগতের সর্ব্বত্র মৃত্যুর হার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে কমাইয়া দিয়াছে। ভারত সরকার এই মৃত্যুহার লাঘব নিজেদের উৎকৃষ্ট সমাজসেবা ও শাসনপদ্ধতির ফল বলিয়া ঘুরাইয়া প্রচার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। সকল বস্তুর মূল্য চতুর্গুণ বা ততোধিক হইয়া যাওয়ায় ভারতে মুদ্রিত অর্থের পরিমাণ বহুগুণ হইয়া গিয়াছে। ৩০৲ টাকা বেতনের স্থলে ১৫০৲ টাকা বেতন পাইয়াও মানুষ পূর্ব্বের ন্যায় খাইতে পরিতে পাইতেছে না। কিন্তু ভারত সরকারের মতে আমাদিগের জাতীয় অর্থনীতি বিশেষ প্রগতিশীল ও আমরা ক্রমশঃ মহা

ঐশ্বর্য্যশালী হইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই প্রচারের মূলে যে মিথ্যা রহিয়াছে তাহা কেহ বলিতে চাহেন না; কারণ মিথ্যা ক্রমাগত বলিয়া চলিলে তাহা কোনও না কোনও সময়ে সত্য হইয়া দাঁড়াইবে এইরূপ একটি আশা সরকারী মনের গোপন কোণে পুষিয়া রাখা হইয়াছে।

আমাদের জাতীয় জীবনের যে সকল সমস্যা ব্রিটিশ আমলে ছিল সেই সকল সমস্যার কোনও সমাধান ত বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট করিতে সক্ষম হনই নাই, উপরন্তু বহু নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিয়া ভারতবাসীর অবস্থা আরও দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অর্দ্ধাহারে বাস, গৃহহীনতা, চিকিৎসার অভাব, বস্ত্রের অভাব, বেকার জীবন, প্রভৃতি বহু অভাব ভারতের বক্ষে জগদ্দল পাথরের মতই চাপিয়া বসিয়া আছে এবং স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত সরকারের অতিবুদ্ধির ফলে ছোট বড় আরও বহু পাথর তাহার উপরে আসিয়া জমা হইয়াছে। যথা—হিন্দী রাষ্ট্রভাষা করিয়া সেই সূত্রে হিন্দুস্থানীদিগের প্রভাব রাষ্ট্রের উপর বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ভাষামূলক ঝগড়ার সৃষ্টি। এই দুর্নীতির প্রসারের ফলে ভারত আজ ভাঙ্গিয়া বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যাইতে বসিয়াছে। পণ্ডিত নেহরু কখন "পাঞ্জাবী ভাষা এক মহাবলশালী জাতির বিশিষ্ট-রূপে উন্নত ভাষা" বলিয়া কিছু পাঞ্জাবীকে খুশী করিতে-ছেন, আবার তাঁহার সরকারী ইস্তাহারে পাঞ্জাবী ভাষাকে হিন্দীর সহিত এক বলিয়া প্রচার করিতেছেন। বাংলার বহু জেলা বিহারের সহিত সংযুক্ত রাখিয়া সেই সকল জেলার বাসিন্দাদিগকে নিজ মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া হিন্দী অবলম্বন করিতে বাধ্য করা হইতেছে এবং অপরাপর বাংলা-ভাষাভাষী জেলার লোকেদের আসামী বলিয়া প্রচার করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। এই ভাষা বিপ্লবের মূলে রহিয়াছে হিন্দী ও হিন্দী ভাষাভাষীকে ভারতবর্ষের প্রধান ভাষা ও প্রধান জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার আকাজ্ক্ষা। হিন্দী-ভাষাভাষীগণ নিজেদের কৃষ্টি ও জীবনধারা উন্নত না করিয়া শুধু সংখ্যা ও ঘোষণার সাহায্যে ভারত-বিজয়ে লাগিয়াছেন। অপর জাতিরা ভাষার সহিত ভাষাভাষীর আচার-ব্যবহার পাছে আসিয়া স্কন্ধে আরোহণ করে, এই ভয়ে অস্থির। ইহার উপর রহিয়াছে পাকিস্থান। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের সংযুক্ত প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক কলহের ফলে পাকিস্থানের আবির্ভাব হয়। বর্ত্তমানে পাকিস্থান, অর্থাৎ ভারতীয় মুসলীম শক্তি, মার্কিন ও ব্রিটিশ সাহায্যে বলবান্ হইয়া উঠিয়া ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে মুসলমান বাদশাহির পুনঃ-প্রতিষ্ঠার অপেক্ষায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিতেছে। ভারতে যদি কখন রাষ্ট্রীয় দুর্দ্দিন আগত হয় কোন কারণে, তাহা হইলে পাকিস্থান সর্ব্বাগ্রে ইসলামের সংরক্ষণ হেতু ভারতের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভারত দখল করিয়া লইতে দ্বিধা বা বিলম্ব করিবে না। চীন ও ঐ ভাবে ভারতের প্রায় ২০০০—২০০০০ বর্গ মাইল দখল করিয়া বসিয়া আছে এবং ভারত সরকার সে বিষয়ে কিছু করিতে পারিতেছেন না। ভারত-অবমাননায় আরও রহিয়াছে পর্ত্তুগাল, সাউথ আফ্রিকা, প্রভৃতি অপরাপর দেশ। ভারত সরকার নিজ বিশ্বমৈত্রীর পন্থা অবলম্বনে সর্ব্বক্ষেত্রেই অপমান ও আঘাত সহ্য করিয়া চলিতেছেন। শুধু নিজের দেশে কখন কখন প্রয়োজন ও সাহস হইলে সাধারণের উপর লাঠি, গুলী, ইত্যাদি চালাইয়া নিজ হৃতগৌরব রাজ-শক্তিকে জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। সুবুদ্ধি জাতীয়তাবাদ, দেশাত্মবোধ, প্রভৃতি ভারত সরকারের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত। কারসাজি, হঠকারিতা, শঠতা ও সস্তার চালাকি আজ সর্ব্বত্র পূর্ণশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। অ

নূতন আইনের পরিকল্পনা

ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে আইন করিয়া ভাষা, জাতি, ধর্ম্ম, ইত্যাদি অবলম্বনে পরস্পরকে কথায় বা লিখিত ভাবে আক্রমণ করা নিবারণ চেষ্টা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই আইন হইয়া যাইলে কেহ আর অপরের ভাষা বা জাতি কিংবা ধর্ম্ম-বিদ্বেষের কথা বলিতে বা লিখিতে পারিবে না। বলিলে বা লিখিলে তিন বৎসর পর্য্যন্ত জেল হইতে পারিবে। কিন্তু এই আইনে জোর জুলুম বা "পলিসি" করিয়া কোন কোন স্থানের অধিবাসীদিগকে নিজ মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া অপর ভাষা শিখিতে বাধ্য করিলে সেই কারণে কাহারও সাজার ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ ধরা যাউক, যে বিহার অথবা আসামে (সিংভুম, ধানবাদ, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, কাছাড়, ইত্যাদি জেলায়) যদি বঙ্গ-ভাষাভাষীদিগকে শিক্ষা, ব্যবসা, চাকুরি, প্রভৃতি বিষয়ে বিঘ্নের সৃষ্টি করিয়া কেহ আসামী কিংবা হিন্দী শিখিতে বাধ্য করে ও বাংলা ভাষা শিক্ষার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে, তাহা হইলে সেই বা সেই-সকল ব্যক্তির কোনও সাজা হইবে না। কিন্তু যদি কেহ নিজ ভাষা বা নিজ ভাষাভাষীর ন্যায্য অধিকার দাবী করিয়া হিন্দী বা আসামী ভাষার প্রচলনের বিরুদ্ধে কিছু বলে বা লেখে তাহা হইলে তাহার জেল হইতে পারিবে।

ভারত গবর্ণমেণ্ট যে ব্রিটিশের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া ব্রিটিশ "পলিসি", অর্থাৎ দুর্নীতি, জাগ্রত ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া চলিতেছেন এই দুর্নামের মূলে অনেকটা সত্য রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রনীতির জন্য আজ ভারতে সর্ব্বত্র আগুন লাগিয়াছে ও যে দুর্নীতির মূলে রহিয়াছেন কিছু সংখ্যক কংগ্রেস দলের নেতাগণ, যাঁহাদিগের ভাষা ভাঙ্গাইয়া খাওয়া ব্যতীত অপর কোন শক্তি নাই; সেই ভাষা-বিশেষকে প্রতিষ্ঠিত করার অপরাধে কাহারও সাজা ত হইবেই না বরং অনেক অপরাধী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন বলিয়াই মনে হয়। একটা আইন করিয়া ন্যায্য কথা বলা বন্ধ করিয়া দিলেই জাতীয় ভেদবাদ বন্ধ হইয়া যাইবে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। বরং এই কথাই সকলে মনে করিবেন যে, এই আইন করিবার মূলে দল-বিশেষের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টাই রহিয়াছে ও এই আইন এমন করিয়াই প্রয়োগ করা হইবে যাহাতে "কনষ্টিটিউশনের" মত প্রকাশ করিবার পূর্ণ অধিকার, যাহা সকল ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্তর্গত করিয়া লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই অধিকার খর্ব্ব করা হইবে। ভাষা, ধর্ম্ম বা জাতি লইয়া ঝগড়া করা অথবা জাতি, ধর্ম্ম অথবা ভাষার দিক্ হইতে পরস্পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা সত্য সত্যই জাতীয়তা, দেশাত্মবোধ ও দেশভক্তিকে বিনাশ করিয়া ভারতীয় মানবকে ক্ষুদ্রচেতা, ক্ষুদ্রবুদ্ধি ও ক্ষুদ্রস্বার্থান্বেষী করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই সকলের মূলে প্রধানতঃ রহিয়াছে রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও সে চেষ্টার অঙ্গ হিসাবে কয়েকটি গণ্ডি ও দলের ব্যক্তিদিগের ভারতে নিজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার ষড়যন্ত্র। এই যে দল পাকাইয়া নিজ-প্রদেশের ও অপর প্রদেশের জনসাধারণের উপর প্রভাব ও প্রভুত্ব বিস্তারের কল্পনা ইহা যাহাদিগের মস্তিষ্কজাত তাহাদিগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে অপসারিত না করিলে ভারতের ঐক্য ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া অদূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইবে। একথা সকলেই জানেন এবং এই জাতীয়তা-ধ্বংসকারী পাপ ও বিষের বিরুদ্ধে কেহ সংগ্রাম করিতে সাহস করেন না অথবা ক্ষুদ্র সুবিধার খাতিরে সংগ্রামেচ্ছাকে দমন করিয়া রাখেন। বর্ত্তমান মুখ ও লেখনী বন্ধ আইন করিয়া এই বিশেষ দল ও গণ্ডির লোকেরাই তাহাদিগের বিরুদ্ধ পক্ষকে দাবাইবার চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, যদি সত্য সত্যই ভারত সরকার জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষা অবলম্বনে জাতীয়তা-বিনাশী কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবার জন্যই তৎপর হইতে চাহেন তাহা হইলে প্রথমতঃ ঐ সকল ক্ষেত্রে যে সকল অন্যায় কায়েমী হইয়া বসিয়াছে সেই সকল অন্যায় নিবারণ করা প্রয়োজন। উক্ত অন্যায়গুলিকে বজায় রাখিয়া ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রচার সুচিন্তিত পন্থানুসরণের লক্ষণ নহে। সুতরাং আমাদের উচিত হইবে ঐ আইন যাহাতে না হইতে পারে সেই চেষ্টা করা।

যে সকল গণ্ডি ও দলের কথা উপরে বলা হইয়াছে সেই সকল গণ্ডি ও দল জনসাধারণের দ্বারা গঠিত নহে। জাতি-বিশেষের ও গোষ্ঠী-বিশেষের ব্যক্তিরাই ঐ দল-গুলিতে প্রধান স্থান দখল করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের পরিবার ও বন্ধুগণের সুবিধার জন্যই রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্র হইতে দূর করিয়া দিলে তাঁহাদিগের নিজ নিজ দেশের ও সকল গরীবের উপকারই হইবে। কারণ ভারতে দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাবের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সকল দলপতিদিগের চেষ্টার অভাবেই তাহাদিগের দেশে সাধারণ লোকের অবস্থা এতটা খারাপ। নিজ-দেশবাসীদিগের প্রতি সহানুভূতিও এই সকল স্বার্থপর ষড়যন্ত্রকারীদিগের মধ্যে দেখা যায় না। কারণ, তাঁহারা একথা ব্রিটিশের নিকটেই শিখিয়াছেন যে, "প্রজা"দিগকে অশিক্ষিত ও অভাবগ্রস্ত করিয়া রাখিলে অন্যায় ভাবে রাজত্ব চালনা সহজ হয়। বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, আমেদাবাদ, প্রভৃতি দেশে অন্যায় ভাবে প্রভুত্বজারি করা সহজ নহে—কারণ সেই সকল দেশের জনসাধারণ ততটা নিরক্ষর ও গরীব নহে। উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মধ্যপ্রদেশের কিংবা আসামের জনসাধারণ বিশেষ করিয়া অশিক্ষিত ও রাষ্ট্রীয় অধিকারবোধহীন। এই কারণে ঐ সকল প্রদেশের সাধারণকে ব্যবহার করিয়া ব্যক্তিবিশেষ অথবা গণ্ডিবিশেষের নিজ উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। বাংলায় বৈদ্য অথবা কায়স্থ জাতি কিংবা ব্রাহ্মণদিগের বিশেষ করিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব নহে। কারণ বাঙালীরা জাগ্রত জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত। তাহারা ধাক্কা খাইয়া আত্মরক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া জাতি, ভাষা ও ধর্ম্মের কথা তুলিয়া আন্দোলন কখন কখন করে। বাংলায় হিন্দী ভাষাভাষী বহু লক্ষ লোক নির্ব্বিবাদে বাস করে ও মুসলমানও দাঙ্গাহাঙ্গামা করিবার পরেও নিরাপদে এই প্রদেশে রহিয়াছে। একটা নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিলেই পৃথিবীর সকল লোকে বুঝিতে পারে যে, ভারতের জাতীয়তার শত্রু কে বা কাহারা। ন্যায়-বিরুদ্ধ আইন প্রণয়ন করিয়া জাতিকে রক্ষা করা যায় না।

অ

রবীন্দ্র-প্রতিভার দিগ্‌দর্শন

শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বতোমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে নানা বিদগ্ধ ব্যক্তি নানা কথা বলছেন, বিভিন্ন প্রবন্ধে ও ভাষণে, বিভিন্ন দিক্ থেকে, তাঁর সাহিত্য ও ব্যক্তিত্বের সমালোচনা করে। সামগ্রিক ভাবে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রবন্ধ বিশদ হয়ে পড়ে, অথচ আংশিক ভাবে আলোচনায় একদেশদর্শিতার জন্য ভুল ধারণা হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই কথা চিন্তা করে বক্তব্যের ভারসাম্য যথাসাধ্য বজায় রেখে আমি দু'-চারটি কথা বলা উচিত মনে করছি।

তাঁকে মহাকবি, বিশ্বকবি, মহামানব, প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন, তিনি যুগপৎ কবি এবং ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি—আবার কেউ বা কবির নিজের বিনয়বচন উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, তিনি ব্রহ্মবিদ্ বা মরমিয়া সাধক নন, তিনি তাঁর স্বীকৃতি এবং স্বয়ংকৃত কথিতি অনুসারে শুধু কবিমাত্র। কেহ এমন কথাও বলেছেন যে, গীতাঞ্জলিতে কবি কাব্য হিসাবে অধোগতির পথে চলেছেন! জানি না সমালোচক হয়ত নিজের মানসিক বিকারবশতঃ ঊর্দ্ধকেই অধঃ এবং অধোদিককেই ঊর্দ্ধ বলে ভ্রম করেছেন, কারণ মহাকাশ সম্পর্কে এগুলি আপেক্ষিক শব্দ মাত্র।

ব্রহ্মবিদ্ রবীন্দ্রনাথ

ব্রহ্মবিদ্ সম্বন্ধে শ্রুতি বলেছেন যে, ব্রহ্মতত্ত্ব "অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্," তাই উপনিষদে দেখি একজন মুনি-বালক অন্য একজন মুনি-বালককে দেখে জিজ্ঞাসা করছেন—"ব্রহ্মবিদ্ ইব সৌম্য প্রতিভাসি"—হে সৌম্য, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছ, ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের আলেখ্যের দিকে চেয়ে আমাদের যা মনে হয়েছে তা তাঁরই ভাষায় বলা যায়, যেন সে এক জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়।' তাঁর উপলব্ধিমূলক রচনাগুলি পড়েও আমাদের মনে হয়েছে যে, তিনি যুগপৎ ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি এবং রাজর্ষি।

তিনি ব্রহ্মর্ষি, 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'-এর উপাসনায়, এবং 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' তৎস্বরূপ সেই অখণ্ড ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বারা। শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞের যে লক্ষণ আমরা পাই তাতে কবি যে ব্রহ্মবিদ্ ছিলেন, প্রত্যক্ষ ব্রহ্মোপলব্ধি যে তাঁর হয়েছিল সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না।

ভূমার আত্যন্তিক সুখস্পর্শ, ব্রহ্মের আনন্দরূপ অমৃতের আস্বাদ তিনি শুধু যে পেয়েছিলেন তাই নয়, তাঁর মত এমন করে অক্ষরের মাধ্যমে অক্ষর-ব্রহ্মের পরিচয়, আর কোনো ব্রহ্মবিদ্ কবি, পৌরাণিক যুগের পর অদ্যাপি দিয়ে যেতে পেরেছেন বলে আমরা অবগত নই। তাই তিনি জাতীয় স্তর থেকে অতি সহজেই সার্বভৌম স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন। তাই তিনি বর্জনের কবি ছিলেন না—ছিলেন গ্রহণের বা অর্জনের কবি। 'আমি সব নিতে চাই' এবং আপনাকে জগতের সম্মুখে মেলে ধরতে চাই, এই ছিল তাঁর অন্তরের কথা। এ নেওয়া কার জন্য এবং কিসের জন্য? 'আদানং হি বিসর্গায় সতাং বারিমুচামিব', মেঘের মতই তাঁর জল আহরণ, মেঘের মতই নিঃশেষে বর্ষণ বা বিসর্জন করবার জন্য। তিনি যা কিছু গ্রহণ করেছেন তা সুদসমেত পরিবেশন করে পরিশোধ করে গেছেন পূর্বসূরীদের ঋণ, তা ছাড়া কে না জানে তাঁর স্বকীয় মৌলিক দান কত অপরিমেয় এবং অপর্যাপ্ত।

সমন্বয়বাদী রবীন্দ্রনাথ

বেদান্তের সূত্রে পাই, 'তত্তু সমন্বয়াৎ' (১।১।৪) রবীন্দ্রনাথ ছিলেন স্বয়ং মূর্তিমান সমন্বয়। মানব-সংস্কৃতির সমন্বয় (Synthesis of Culture) এবং ধর্মমতের সমন্বয় (Syncretism of Faith) ছিল তাঁর জগদ্দর্শনের বা জীবনদর্শনের বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর বিশ্বভারতী রচনার মূলমন্ত্র। যেখানে Rudyard Kipling বলেছিলেন: "East is East and West is West and ne'er the twain shall meet," অর্থাৎ স্পষ্টাক্ষরে ভাবজগতে ও সাহিত্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে Apartheid-এর অনতিক্রমণীয় ভেদবাদ প্রচার করেছিলেন—সেখানে অভেদবাদী রবীন্দ্রনাথ "যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্", এই উদার সংকল্পে বিশ্বভারতী রচনা করে গেছেন। এবং "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে", তাঁর মাতৃভূমির মুক্তিস্নানের অভিষেক-ঘট পূর্ণ করে রেখে গিয়েছেন।

জীব এবং ঈশ্বরকে অতি সহজে তিনি তাঁর কাব্যে

স্থান বিনিময় করিয়েছেন। 'এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—এ কথা তাঁর শ্রুতির উদ্ধৃতি মাত্র নয়, এ কথা তাঁর স্বকীয় গভীর উপলব্ধির কথা, তাই তিনি বলতে পেরেছেন—'আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে'। বলেছেন—'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর তুমি তাই এসেছ নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে"। তাঁর ঈশ্বর শুধু মহিমান্বিত জগদীশ্বর বা Lord God ন'ন, তিনি দীনবন্ধু এবং প্রতিজীবের দহরাকাশ-নিবাসী ক্ষেত্রজ্ঞ। তাঁর ঈশ্বর যুগপৎ immanent বা সর্বানুস্যূত এবং transcendent বা সর্বাতিগ। 'যস্য জগৎ শরীরম্',—জগৎ যাঁহার শরীর। তাই রবীন্দ্রনাথ শঙ্করের জগৎ-মিথ্যাবাদ বা বিবর্তবাদ গ্রহণ করেন নি। তিনি বৈষ্ণব দর্শনের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং স্রষ্টার লীলাকৈবল্যবাদ গ্রহণ করেছেন, একথা আমি আমার 'বৈষ্ণব ভাবধারা ও রবীন্দ্রনাথ' ('প্রবাসী'—মাঘ ১৩৬৩) নামক প্রবন্ধে বিশদ করে বলেছি।

ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলকে লিখিত পত্রে (১৬ই কার্তিক ১৩১৮) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"বৈষ্ণব সাহিত্য এবং উপনিষৎ বিমিশ্রিত হইয়া আমার মনের হাওয়া তৈরি করিয়াছে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন যেমন মেশে, তেমনি করিয়াই তাহারা মিশিয়াছে।"

তিনি দেবর্ষি,—যেহেতু দেবর্ষি নারদের মত দেবলোক নরলোকের মধ্যে অর্থাৎ ভাবজগৎ ও বস্তুজগতের মধ্যে 'ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা' করেছেন অবলীলাক্রমে। তাই তিনি মন্ত্রোচ্চারণবৎ কবি-সত্যের (Poetic Truth) পরম এবং চরম সত্যটি বলতে পেরেছেন—

"সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা, তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি—
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"
(ভাষা ও ছন্দ)

তাঁর জৈবসত্তা দীপ্তিমন্ত দেবত্বে উন্নীত মানবসত্তা,—তাঁর কবিচিত্ত ঋষিচেতনার দ্বারা উদ্ভাসিত, তাই তিনি দেবর্ষি।

তিনি রাজর্ষি,—যেহেতু তিনি গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম-যোগী। বৈরাগ্য-সাধনের মুক্তি তাঁহার নহে। 'যজ্ঞ দান তপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ' (১৮।৫ গীতা) তিনি বর্তমানযুগে প্রাক্তনযুগের জনকাদির প্রতীক। তাঁর সেই রূপ আমরা দেখেছি তাঁর জমিদারীতে, তাঁর বিশ্ব-ভারতীতে, শ্রীনিকেতনে এবং অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে। তিনি কাব্য, সাহিত্য এবং দর্শনের মধ্যেই ফুরিয়ে যান নি, তিনি ধ্যান ধারণায় সমাহিত হয়েই থাকেন নি, তিনি নিজের সুখ শান্তি এবং অবসর বিনোদন বিসর্জন দিয়ে নরদেবতার সেবা করেছেন। গীতার 'নহি কশ্চিৎ ক্ষণ-মপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম-কৃৎ'—এই সত্য উপলব্ধি করে, তিনি কর্মের পত্রপুষ্প দ্বারাই কর্ম-প্রেরয়িতা পরব্রহ্মের পূজা করেছেন এবং সে পূজার নির্মাল্যও 'যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ' বলে তৎপ্রীত্যর্থেই বিনিয়োগ করেছেন। তিনি নিঃশেষে নিজের প্রাণ দান করে গেছেন, এবং তাঁর সে দান সাহিত্য দর্শন সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভাণ্ডারে অক্ষয়-পদবী লাভ করেছে।

সীমার মাঝে অসীমকে, রূপের মাঝে অরূপ এবং অপরূপকে, ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্তকে এমন করে আর কেউ দেখতে বা দেখাতে পেরেছেন বলে আমরা জানি না।

'শ্রেয়' এবং 'প্রেয়' পরস্পর বিরোধী তা আমরা কঠোপনিষদেই পেয়েছি।

"শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্।
তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ॥
শ্রেয়োহি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে।
প্রেয়োমন্দো যোগক্ষেমাদ্বৃণীতে।"

অর্থাৎ শ্রেয় আর প্রেয় মানুষকে আশ্রয় করে। ধীর ব্যক্তি বিচার করিয়া ইহাদের পৃথক্ বলিয়া জানেন। জ্ঞানী প্রেয় ত্যাগ করিয়া শ্রেয়কে গ্রহণ করেন। অল্প-বুদ্ধি ব্যক্তি আপাত মনোরম প্রেয়কেই বরণ করেন। কিন্তু এই আপাত বিরোধী বস্তুদ্বয়কে তিনি মিলিয়েছেন। যদিও তার মিলনসূত্রও সেই উপনিষদ্ থেকেই তিনি আবিষ্কার করেছেন। উপনিষদে 'প্রিয়' বলেই ব্রহ্মকে উপাসনা করবার উপদেশ আছে।

"প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ,
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।"

আত্মা সকল হতে প্রিয় এবং অন্তরতর। তাই 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি'র পথ ছেড়ে তিনি ঐ প্রিয় আত্মার 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' মুক্তির স্বাদ লাভের জন্য অনুরাগের পথেরই পথিক হয়েছেন। দেবতাকে প্রিয় এবং প্রিয়কে দেবতা করার মন্ত্র তিনি, বৈষ্ণব পদাবলীর পন্থায়, তাঁর কাব্যের মাধ্যমে প্রচার করেছেন। চির-সুন্দরের পথেই, প্রিয়মিলনার্থী হয়ে তিনি শ্রীমতীরাধার মতই অভিসারিণী হয়েছেন,—মানস লোকে,—ভাবময় দেহে।

তিনি তাঁর সাকার নিরাকার উপাসনা প্রবন্ধে নিরাকার উপাসনার উপর অধিক যুক্তিমত্তা প্রদর্শন করেও

স্বীকার করেছেন যে নিরাকার ব্রহ্ম ভক্তিতে জমে জলের মত সান্দ্রঘন রূপ পরিগ্রহ করেন এবং শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামপ্রসাদের নাম উল্লেখ করে তাঁদের উপাসনার পন্থা সমর্থন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের বহুবিধ সাধনা ও বহুধর্মমতের সমন্বয় সাধনা সম্বন্ধেও তিনি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেছেন তাঁকে—

"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।"

যুক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ

"যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং" এই তাঁর আদর্শ ছিল এবং যুক্তি বিচার অবলম্বন করে নিজেকে সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে তিনি মুক্ত রেখেছিলেন। কারণ,

'যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।'

তাই তিনি বেদান্তের অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শঙ্করের বিবর্তবাদ বা জগৎ-স্বপ্নবাদ গ্রহণ করেন নি।

তিনি বুদ্ধদেবের নীতি শান্তি অহিংসা ও প্রেম গ্রহণ করেছিলেন। সর্বভূতে সমান মৈত্রী ভাবে অধিষ্ঠান বা 'ব্রহ্ম বিহার' গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর অক্রোধ, অহিংসা, দয়া, ক্ষমা ও প্রেমের সাধনা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনের জটিল হেঁয়ালি ও শূন্যবাদের মধ্যে যেতে চাননি।

ভক্তিবাদী রবীন্দ্রনাথ

তিনি বৈষ্ণব-দর্শনের রাগমার্গের পদাবলী প্রদর্শিত প্রেমভক্তি গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু তার মূর্তিপূজা ও ভাবোন্মত্ততা গ্রহণ করেন নি। তাঁর গীতাঞ্জলি ও ব্রহ্ম সঙ্গীত, প্রভৃতি পাঠে মনে হয় যে তাঁর উপাস্য—তাঁর দয়িত—কবিজনোচিত আদর্শে সাবয়ব কিন্তু নিরাকার। তাঁর বাঁশি থাকতে পারে—অসি থাকতে পারে—সর্ব অবয়বে সকল কিছু ভূষণ থাকতে পারে কিন্তু তাঁর ইয়ত্তা নাই, এতাবত্তা নাই, কোনও বিশেষ আকারও নাই। গোবিন্দ বিগ্রহের বিগ্রহত্ব বর্জন করে ব্রহ্মসংহিতার ভাষায় বলা যায়—

"অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি
পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি
আনন্দ চিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।"

তাঁর দেবতা এবং দেবালয় সবই প্রেম দিয়ে গড়া, তাই তিনি প্রতিবাদ করে বলেন—

"ভগবান্ চান প্রেম দিয়ে তাঁর গড়া হবে দেবালয়
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে ইঁট পাথরের জয়।"

রবীন্দ্র প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও বিশ্বরূপ

রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোনো কবির রচনা যুগপৎ 'আনন্দ বেদনারসে' এত সমুচ্ছল' এবং সমুদ্রের মত এত সমুদ্বেল ও তরঙ্গায়িত হতে আমরা দেখিনি। জ্ঞান প্রেম এবং কর্মের এমন সমন্বয় এবং এমন সুসমঞ্জস সর্বতোমুখী প্রকাশ-মুখর প্রতিভাও ইতিপূর্বে আর দেখিনি। ইংরাজ কবি বলেছেন :—'A true poet must be a true poe n,—' রবীন্দ্রনাথ আকৃতি এবং প্রকৃতিতে যেন একটি অনির্বচনীয় অনিন্দ্যসুন্দর ছন্দোবদ্ধ কবিতা। তাঁর বাক্যে কাব্যে সাহিত্যে সঙ্গীতে কোথাও কোনও অ-সুর অসচ্ছন্দ নেই। তিনি প্রার্থনা করে ছিলেন—"আমারে কর তোমার বীণা"—সুরভারতী তাঁর সে প্রার্থনা পূর্ণ করে, একটি একটি করে পুরাণো তার খুলে তাঁর সেতারখানি নূতন করে বেঁধে তুলেছেন।

তিনি একদিকে যেমন সর্বাঙ্গসুন্দর কবি—অন্যদিকে তেমনি তিনি পরিবেশন করেছেন সর্বতোভদ্র রস—অশেষ কল্যাণময় অসীম তাৎপর্যময় এবং অগাধ আনন্দময় রস।

তিনি অশুচি কখনো উচ্চারণ করেন নি এবং পাপকে কখনও প্রশ্রয় দেন নি। নর-নারীর যৌন প্রেম সম্বন্ধে তিনি অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ তত্ত্বদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন—বলেছেন—"প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়—লোভের কাছে স্থূল মাংস।" বলেছেন "আসক্তি তাকে (প্রেমের বস্তুকে) সমগ্র থেকে উৎপাটন করে নিজের সীমার মধ্যে বাঁধে, তার পরে তোলা ফুলের মত অল্পক্ষণেই সে ম্লান হয়।" তাই "রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী—রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত—সেইখানেই তাঁর সত্য প্রকাশ।"

তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভাকে আমরা যুগপৎ 'বহ্নি-ভানু-শশি-সন্নিভ' বলে অভিনন্দন করতে পারি। বহ্নির মত তিনি অন্যায়কে, পাপকে, অপবিত্রতাকে দগ্ধ করেন, সূর্যের মত তিনি অজ্ঞান এবং কুসংস্কারের অন্ধকারকে দূর করেন এবং চন্দ্রের মত স্নিগ্ধ কৌমুদী বিকিরণ করে তিনি আমাদের অন্তরকে আনন্দে আহ্লাদে পরিপ্লুত করেন।

তাঁর বিশ্বতোমুখী প্রতিভায় প্রভাবিত এবং তাঁর আলোকে উদ্ভাসিত আমাদের চিন্তাজগৎ, ভাবজগৎ, সাহিত্যজগৎ এবং সঙ্গীতজগৎ। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব, ভারতবর্ষের শীর্ষে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয়ের মত। তাঁর প্রতিভা বহু উত্তুঙ্গ শিখর সমন্বিত, শুভ্রতুষার কিরীটী নগাধিরাজ হিমালয়ের মত। তার বিকাশ যেমন বিশ্বতোমুখী, উচ্চতাও তেমনি আকাশস্পর্ধী।

তিনি অজস্র রূপ ও রীতি, নব নব আঙ্গিক ও প্রকাশ ভঙ্গী নিয়ে বাংলার সাহিত্যগগনে যুগস্রষ্টির নূতন সূর্যের রূপে সমুদিত হলেন এবং অশীতি বর্ষ ধরে তাঁর প্রতিভার সহস্রাংশু ভূগোলের উভয় গোলার্ধে বিকীর্ণ করলেন—সমান ভাবে, অকৃপণ ভাবে এবং অম্লান ভাবে। তাঁর এই আনন্দ এবং অমৃত, আলোক এবং পুলক পরিবেশনের প্রসঙ্গে তাঁরই কবিতা মনে পড়ে—যেন :—

চঞ্চল পুলকরাশি কোন স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্মে আসি লাগে!

প্রকৃত পক্ষে বাংলার সাহিত্যাকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলে যেন আমরা রবীন্দ্র-প্রতিভার বিশ্বরূপ দর্শন করি—মনে হয় "দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।" বাংলা সাহিত্যের সমস্ত দিক্ তাঁর দক্ষিণ-হস্তের দানে, তাঁর সারস্বত সৃষ্টিতে পরিপূর্ণ।

Apolloর মুখে Shelley বলিয়েছেন—

"I am the eye with which the universe
Beholds itself and knows itself divine."

এবং Dryden, Shakespeare সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন যে—সেক্ষপীয়র ছিলেন—

A man, so various and versatile—that he seemed to be not one man but all mankind's epitome."

এই উভয় উক্তিই রবীন্দ্রনাথে পরম সার্থকতা লাভ করেছে।

মিলনের কবি রবীন্দ্রনাথ

তিনি যুগন্ধর পুরুষ, জনগণের পথপ্রদর্শক নেতা নিয়ন্তা এবং নায়ক। স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্যবচ্ছিন্ন বঙ্গদেশকে তিনি রাখীবন্ধন দ্বারা একতাবদ্ধ করেছেন। তিনি জাতির কণ্ঠে তাঁর জনগণ-মনের ছন্দে ছন্দিত এবং মহতী আশা ও আকাঙ্ক্ষার হৃৎস্পন্দনে স্পন্দিত জাতীয় সঙ্গীত দান করতে পেরেছেন। তিনি যে শুধু পশ্চিমের ভেদবাদের প্রতিবাদ করেছিলেন তাই নয়—তাঁর অপরিসীম অধ্যবসায় ও আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন বলিষ্ঠ সাধনার বলে—ভেদবাদী পরাক্রমশালী পাশ্চাত্ত্যের ব্যাঘ্রকে ও অভেদবাদী শান্তিকামী প্রাচ্যের—বলীবর্দকে—অর্থাৎ কিপ্লিং কথিত 'West' এবং 'East'কে তাঁর বিশ্বভারতীর সার্বভৌম সম্মিলনে একত্র করে—এক ঘাটে জল খাইয়েছিলেন—তাঁর ভারততীর্থের সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

প্রেমের এবং আনন্দের অবাধ আদান-প্রদানের মিলন-মন্ত্র তিনি গান করেছেন, তাই বলতে পেরেছেন 'পূরব পশ্চিম আসে, তব সিংহাসন পাশে, প্রেমহার হয় গাঁথা।' সেখানে উদার আতিথ্যে সকলেই আমন্ত্রিত—'দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।'

কবির যাদু ও কাব্যের ইন্দ্রজাল

কাব্যকলালক্ষ্মী কবির লেখনীতে তাঁর সোনার কাঠিটি ছুঁইয়ে দিয়েছেন, যার স্পর্শে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের শুষ্ক কাষ্ঠ, তার ইন্দ্রজাল-বলে ফলে ফুলে স্বাদে ও সৌরভে সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ রূপে রসোত্তীর্ণ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। যার সুষমায় আনন্দিত এবং মুগ্ধ হয়ে, ভট্টি কাব্যের ভাষায় স্বতঃ বলে উঠতে হয়—

ন তজ্জলং যন্ন সুচারুপঙ্কজং
ন পঙ্কজং তদ্ যদলীনষট্পদম্।
ন ষট্পদোঽসৌ ন জুগুঞ্জ যঃ কলং
ন গুঞ্জনং তন্ন জহার যন্মনঃ॥

অর্থাৎ এমন কোন বিষয় ছিল না যাকে তিনি তাঁর সূর্যালোকে পঙ্কজের মত ফুটিয়ে তোলেন নি, এমন প্রস্ফুটিত পদ্ম ছিল না যাতে ভ্রমর এসে বসে নি, এমন ভ্রমর ছিল না যে, আনন্দে তার স্তুতিগানে গুঞ্জরণ করে নি এবং এমন ভাবে তারা গুঞ্জরণ করে নি যাতে শ্রোতা মাত্রেই মুগ্ধ না হয়।

রাজসভা বহিঃপ্রান্তে কাব্যলক্ষ্মীর স্বেচ্ছাবন্দী দাস হয়ে—তাঁর নিভৃত প্রসাধনে :—

"প্রতিসন্ধ্যাবেলা, অশোকের রক্তকান্তে
চিত্রি পদতল, চরণ-অঙ্গুলি-প্রান্তে
লেশমাত্র রেণু, চুম্বিয়া মুছিয়া নিয়া,—"

যে পুরস্কার কবি মানসলোকে লাভ করেছেন—তাই তাঁর কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ লাভ এবং রসসিদ্ধির পরাকাষ্ঠা, 'নোবেল'-পারিতোষিকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ।

মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ

মানবতার (Humanism) আদর্শে তিনি এতই বড়, মানবত্বের মধ্যে দেবত্বকে তিনি এতই সত্য করে পেয়েছেন যে, তিনি সহজেই বিনয়ে এবং দৈন্যে দীনের হতেও দীন হতে পেরেছেন। তাঁর ভগবান্‌কেও তিনি টেনে এনেছেন দীনের সঙ্গী দীনবন্ধু রূপে :

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হ'তে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে—সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।"

নিজে নির্বাচন করে নিয়েছেন 'স্বর্গভূমি' বলে সেই ধূলাময় ভূমিকেই, বলেছেন—

"বিশ্বজনের পায়ের তলায় ধূলাময় যে ভূমি,
সেই ত স্বর্গভূমি—
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি,
ওগো সেই ত আমার তুমি।"

তাঁর অন্তর ছিল আন্তর্জাতিক উপাদানে গঠিত এবং তাঁর প্রকৃতি বিশ্বমৈত্রীর রসে অভিষিক্ত। বিরোধ ছিল তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। তিনি ছিলেন মিলনের এবং সংগঠনের কবি, সমন্বয় এবং সমাহারের কবি। তিনি সর্বজনীন—সর্বভূতানুভূতিসম্পন্ন সার্বভৌমপ্রেমের দরদী কবি,—তাই তিনি বিশ্বকবি। সব ঠাঁই তাঁর ঘর, সব ঘরে তাঁর পরমাত্মীয়, সব জাতিই তাঁর স্বজাতি, এবং একজন্মেই তিনি দেশ-দেশান্তরে গিয়ে বহুজন্মের সাধ মিটিয়ে নিয়েছেন। তিনি দ্বাদশবার পৃথিবী পর্যটন করেছেন।

ক্ষুদ্রের ভিতর দিয়ে বৃহৎকে, অল্পের ভিতর দিয়ে ভূমাকে পাবার আকুলতা নিয়ে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পর তারই গতিবেগ এবং মিলনের পিপাসা নিয়ে মহাসাগর সঙ্গমে ছুটে চলেছেন, বলেছেন—

"আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।"

তিনি যুগপৎ ব্যষ্টি-নরের কবি এবং সমষ্টি-নারায়ণের কবি, তাই—

"হেথায় দাঁড়ায়ে দু'বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে
উদারছন্দে পরমানন্দে বন্দনা করি তাঁরে।"

ব'লে, বেদব্যাসের মত একই সঙ্গে 'নর-নারায়ণ' এবং 'নরোত্তম'কে বন্দনা করেছেন।

'নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্'—মহাভারতের এই ব্যাসোক্ত মানব-বন্দনার যে অর্থ আমার মনে প্রতিভাত হয়েছে তা এই। ইহাতে 'নর'-অর্থে বুঝি সকল সাধারণ নরনারী। 'নারায়ণ' অর্থে (নর + ষ্ণায়ন) নরস্যাপত্যং বা সেই নরনারীর পুত্র কন্যা রূপ ভবন্ এবং ভাবী বংশধরগণ, এবং 'নরোত্তম' অর্থে গীতার পুরুষোত্তম (=Ideal Man) বা শ্রীভগবান্ যিনি বাইবেলের মতে মানুষকে নিজের মত করে সৃষ্টি করেছেন, "God made man in His own image, in His own image did He make Man."

আমাদের পুরুষোত্তমবাদ অন্যধর্মের ঈশ্বরবাদ। এ ছাড়াও আমরা ঈশ্বরকে বা সেই অদ্বয়তত্ত্বকে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মারূপেও দেখি। ব্রহ্মরূপে তিনি সর্বব্যাপী 'সর্বানুভূঃ' এবং পরমাত্মারূপে প্রাণশক্তিমান সকল জীবাত্মার সমষ্টি, "ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব'—(গীতা)।

জাতীয়তাবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

কূপমণ্ডূকের মত অহংসর্বস্ব আত্মম্ভরি এবং আক্রমণশীল জাতীয়তাবাদ (aggressive Nationalism বা Jingoism) তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। অথচ তিনি স্বদেশপ্রেমে প্রথমতঃ জাতীয় কবি, পরে সার্বভৌমপ্রেমে আন্তর্জাতিক কবি বলে পরিচিত হন। তিনি বলেন, "পশ্চিমদিকের উপর আড়ি করলেই যে পূর্বদিক্‌টাকে বেশী করে পাওয়া যায়, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না, বরঞ্চ ঠিক এর উল্টো।"

রবীন্দ্রনাথ মানবতার সাম্যবাদের উপর নূতন সমন্বয়বাদের ভিত্তি স্থাপন করেন, এবং তাহা পরমহংসদেবের —'যত মত তত পথ'-রূপ ধর্ম-সমন্বয়ের উদার মতবাদের সঙ্গে তুলনীয়। তবে পরমহংসদেবের ভিত্তি আধ্যাত্মিক ধর্ম, রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি মানবতার সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 'মানুষের ধর্ম'। তাহারই উপর তিনি নিখিল নর-নারীর মিলনতীর্থ রচনার পরিকল্পনা করেন তাঁর 'ভারততীর্থে'।

মহিম্নস্তোত্রের ভাষায় বলা যায়, 'নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব' অর্থাৎ সকল নরনারীর একমাত্র গম্য তুমিই, যেমন সকল তটিনীর গম্যস্থান একই মহাসমুদ্র। তাই এ-তীর্থ সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর। মহাভারতের, তথা মহামানবের, এবং সেজন্য মহাসাগরের মতই সকল প্রবাহের মিলন-তীর্থ।

বিশ্বপ্রকৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

তিনি 'বহ্বী-প্রজা-সৃজমান-স্বরূপা' বিশ্বপ্রকৃতির কুলপুরোহিত এবং মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁর 'প্রকাশ' কবিতায় তিনি প্রকৃতির নিগূঢ় রহস্য নিপুণ ভাবে করেছেন উদ্‌ঘাটন এবং পরে অসংখ্য কবিতায় বিচিত্ররূপে তা প্রকাশ করে গেছেন। তাই তিনি বলতে পেরেছেন—'অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে'। তৃপ্তি এবং তৃষ্ণা, আনন্দ এবং বেদনার স্বর্গীয় আকৃতি রূপ পরমা অতৃপ্তি (divine discontent) তাঁকে নিত্য নব নব সৃষ্টির প্রেরণা ও প্রারিপ্সুতা দান করেছে, তাঁর প্রতিভাকে দেহের বয়সের অনুপাতে স্থবির হতে দেয় নি, তাঁর কাব্যপ্রতিভা তাঁর উর্বশীর মতই অনন্ত-যৌবনা হয়ে থাকতে পেরেছে।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা

আমাদের সমাজে নারীর স্থান, মান এবং মর্যাদার কথা চিন্তা করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে নারীকে সহমরণের চিতাগ্নি থেকে রক্ষা করেছেন রাজা রামমোহন। তাকে বাল-বৈধব্যের তুষাগ্নির তিলে তিলে দহন থেকে রক্ষা করেছেন বিদ্যাসাগর: কিন্তু তার পরেও নারী প্রাণে বেঁচে থাকলেও সমাজ-শরীরে যেন অহল্যার মত পাষাণ-প্রতিমা হয়ে বেঁচেই ছিল মাত্র। তার দেহে সচেতন স্পর্শ-কাতরতা সঞ্চার করলেন—আশার স্বপ্ন দেখালেন এবং স্বাধীনতা দান করে, আনন্দের খোরাক জোগালেন—যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই তাঁর নারীর চিত্রে পাই:

"শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী,
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।"—(মানসী)

তিনি কবি এবং স্রষ্টা হয়ে তাকে 'সোনার উপমা' দিয়ে 'নূতন মহিমা' দিয়ে 'বর্ণ'-'গন্ধ'-'ভূষণ'-দিয়ে, 'সিন্ধু হতে মুক্তা' এবং 'খনি হতে সোনা' দিয়ে 'লজ্জা দিয়ে সজ্জা দিয়ে'—'আবরণ' এবং আভরণ দিয়ে এই মর্মর প্রতিমায় নূতন প্রাণ এবং নূতন চৈতন্য সঞ্চার করেছেন—যার ফলে দেখতে পাই:

"পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা
অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।"

এই কল্পনা সমাজের বিভিন্ন স্তরে বাস্তব রূপ লাভ করেছে, কবির সঞ্চারিত শক্তিতে বাঁচার মত বেঁচে থাকবার এবং বাঁচিয়ে তোলবার প্রদীপ্ত বাসনায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ন্যাকড়ার পোঁটলার মত নারীকে জাগ্রত এবং স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'সবলা' কবিতায় নারীকে তিনি সবলার রূপ দিয়েছেন। অবলা এবং সরলা নারীকে সাধনার পথ দেখিয়ে বলেছেন—

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা?"

তার মুখ দিয়ে বলেছেন:

"আমারে রেখো না বাক্যহীনা,
রক্তে মোর জাগে রুদ্র-বীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোন্নত মুহূর্তের 'পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে, নির্বারিত স্রোতে!
যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয়।"

তিনি 'আশা দিয়ে, ভাষা দিয়ে তাহে ভালবাসা দিয়ে'—গড়ে তুলেছেন তাঁর 'মানসী প্রতিমা'কে। তাই আজ 'নারী' সমাজ-জীবনের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে গৌরবময় অধিকার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে, স্বকীয় শিক্ষায় ও সাধনায়, যোগ্যতায় ও মর্যাদায় আপন শক্তি ও অনির্বচনীয় মাধুর্য সঞ্চার করে।

প্রেমের কবিতায় কবির উভয়লিঙ্গত্ব

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা সম্পর্কে এবং সাহিত্যে তাঁর যৌন মনোভাব সম্পর্কে ফ্রয়েডের কামবাদ বা libido theory-র আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক।

নরের যে নারীর প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি-প্রবণতা বা প্রেম (কান্তা প্রেম) এবং নারীর যে নরের প্রতি তদনুরূপ আকর্ষণ বা প্রেম (কান্ত প্রেম), যাকে বৈষ্ণব দার্শনিকরা মধুর রস বা আদি রস বলে ধরেছেন, তাকেই ফ্রয়েডও সর্বরসের মূল রস বলে ধরেছেন। বৈষ্ণব দার্শনিকরা প্রেমের পাঁচটি প্রকার বা স্তরভেদ বর্ণনা করেছেন যথা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর। আরও বলেছেন যে "আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। এক দুই তিন ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে॥ এই মত মধুরে সব ভাব সমাহার। অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার॥" এ থেকে দেখা যাবে যে ফ্রয়েডের চার শত বৎসর পূর্বে চৈতন্যচরিতামৃতে এই মধুর রসতত্ত্ব অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তারও বহু শত বৎসর পূর্বে আমরা ব্রহ্মসংহিতায় পাই:

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ৫ অ ৫১॥

অর্থাৎ আনন্দচিন্ময়রসস্বরূপতা হেতু, যিনি প্রাণীদিগের মনে প্রতিফলিত হয়ে, স্মরভাব বা কামভাব ধারণ করে, প্রতিপ্রাণীর মনে কামভাব দ্বারা সর্বদা সকল ভুবন জয় করছেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি। এ থেকে দেখা যাবে, এই কামতত্ত্ব ও পুরুষ-প্রকৃতি মিলিত অর্ধনারীশ্বরতত্ত্ব ভারতবর্ষে প্রাচীনতম কাল থেকেই পরিচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রমণী' কবিতায় লিখেছেন: "যে ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক—আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ, * * * হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে, চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।"

এর গোড়ার কথা বৃহঃউপনিষদে পাই—

"স একাকী নৈব রেমে।"

তাই দেবী-ভাগবত বলেন—

"যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভুব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্ধাঙ্গং বামার্ধং প্রকৃতিঃ স্মৃতা ॥"

৯ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায়।

ফ্রয়েড প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকরা নিতান্তই সাম্প্রতিক। একথা স্বয়ং ফ্রয়েডকেই শ্রদ্ধাস্পদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলে এসেছেন। (পশ্চিমের যাত্রী পৃঃ ৪০ দ্রষ্টব্য।)

ভারতের ঋষিদের সঙ্গে ফ্রয়েডের পার্থক্য এই যে, ভারত এই তত্ত্বকেই উৎকৃষ্টতম আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গীভূত করেছেন।

পুরুষোত্তম শ্রীভগবানে এই কামবৃত্তি (libido) নিবেদন করে, তার ঊর্ধ্বপাতন (sublimation) সাধন করে, তাকে প্রেমে পরিণত করে তদ্দ্বারা রাগমার্গের সাধকেরা মরমী সাধনা বা mysticism-এর পথে অগ্রসর হন। কিন্তু ফ্রয়েড তাঁর অদূরদর্শী মনন চিন্তনের দ্বারা, চোখ বুজলে শুধু অন্ধকার ব্যতীত আর কোন তত্ত্বই উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে মৃত্যুর অর্থ জীবনদীপের নির্বাণ এবং তাতেই জীবজীবনের একান্ত পরিসমাপ্তি।

বৈষ্ণব সাধকগণ, রবীন্দ্রনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, প্রভৃতি পরবর্তী মরমী সাধকগণ, তথা খ্রীশ্চান মিষ্টিক ও মুসলিম সুফী সাধকগণ সকলেই প্রায় একই পথের পথিক। নারদ ভক্তিসূত্রেও পাই—"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ং তস্মিন্নেব করণীয়ম্",—অর্থাৎ মনের এবং মানসিক বৃত্তিসমূহের মোড় ফিরিয়ে কামক্রোধাভিমানাদি সকল বৃত্তিকেই ভগবন্মুখী করতে হবে, তাহলেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

সকল আনন্দ সকল মাধুর্যই তাঁর—তাই শ্রুতি তাঁকে বলেছেন "মধুব্রহ্ম"। এই সাধনার মূল কথাটি বৈরাগ্য সাধনা নয়, সবকিছু থেকে বিরক্ত হয়ে ঈশ্বরে অনুরক্ত হওয়া নয়, সকল কিছু সংসারের ভোগ্যবস্তুর আসক্তির মধ্যে ঈশ্বরের মাধুর্য অনুভব ক'রে ঈশ্বরানুরাগের পুষ্টিসাধন করা এবং তাঁকে নিবেদন করে প্রসাদ পাওয়া,—ঈশোপনিষদ্ যাকে বলেছেন—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ।" রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"প্রদীপের মত, সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।"

ব্রাউনিংও বলেছেন—

"Where pleasure is, there is God."

যৌন আসক্তিকে ঈশ্বরের প্রতি পরমাসক্তিতে পরিণত করার জন্যই ভক্তেরা প্রার্থনা করেন—

যুবতীনাং যথা যুনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা
সা প্রীতির্ভবতান্নাথ ত্বয়ি জন্মনি জন্মনি।

যৌনমানস সম্বন্ধে রবীন্দ্রকাব্যে আরও কিছু বলবার আছে। তাঁর কবি-প্রতিভা উভয়লিঙ্গ (hermaphrodite) অর্থাৎ যুগপৎ স্ত্রীভাব এবং পুরুষভাবে ভাবিত হয়ে ঠিক তত্তদ্‌ভাবে নিজেকে প্রকাশ করবার সমান শক্তি বা সামর্থ্য রাখে। যখন তিনি নারীর প্রতি 'পুরুষের উক্তি'কে রূপ দিয়েছেন তখন যেমন দেখা যায় তিনি ষোল আনা পুরুষত্বের অধিকারী, তেমনি যখন অপরপক্ষে তিনি পুরুষের প্রতি নারীর উক্তিকে রূপ দিয়েছেন তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে নারীত্বসত্তায় সাযুজ্য লাভ করেছেন। তাঁর 'বধূ' 'ব্যক্তপ্রেম', 'গুপ্তপ্রেম', 'দুর্বোধ', প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায় এই প্রমাণের সার্থক নিদর্শন মেলে। এই উভয় লিঙ্গত্ব রবীন্দ্র-প্রতিভার এক বিস্ময়কর বিশেষত্ব।

গীতাঞ্জলিতে তাঁর ঈশ্বর "রসঘন আনন্দ স্বরূপ"—Supremest Delight, Dulce Amore বা Sweetest Love. "এই রস হতেই রাস শব্দ যেখানে রসের, প্রেমের প্রপূর্তি (acme)"—(হীরেন্দ্রনাথ দত্ত)

'স এষ রসানাং রসতমঃ'—(ছান্দোগ্য ১।১।২-৩)

এই প্রেমলীলায় ভগবান্ 'রমণ'—ভক্ত 'রমণী'। ভগবান-'পিতম্' বা প্রিয়তম। সুফিদিগের ভাষায় ভক্ত আসিক্ (Lover) এবং ভগবান্ মাসুক (Beloved), 'মাসুকের' সহিত 'আসিক্' এর আসনাই বা প্রেম করাই আমাদের চরম বা পরম পুরুষার্থ। খ্রীশ্চান মিষ্টিক কার্ডিন্যাল এফ. ডব্লিউ নিউম্যান বলেছেন—

'If thy soul is to go on to higher spiritual blessedness it must become woman,—yes, however manly you may be among men'. রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—"আমার মাঝারে রয়েছে কেগো সে কোন্ বিরহিণী নারী"।

সেজন্য ঠাকুর নরোত্তম দাস বলেছেন—'ছাড়িয়া পুরুষ দেহ কবে বা প্রকৃতি হব'। কারণ এই প্রেমরাজ্যে শ্রীভগবান্ একাই পুরুষ, বাকী সব প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলিতে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি ভাব প্রাপ্ত হয়েছেন অর্থাৎ

পূর্ণার্থেই প্রকৃতিস্থ হয়েছেন বলা যেতে পারে। নিজের অন্তরের 'বিরহিণী'র সঙ্গে তাঁর প্রশ্নোত্তর শুনুন—

"কহিলাম তারে তুমি চাও কারে ওগো বিরহিণী নারী,
সে কহিল আমি যারে চাই তার নাম না কহিতে পারি।"

মনোহারিণী নায়িকা

তাঁর আর একটি অদ্ভুত সৃষ্টি তাঁর মনোহারিণী নায়িকা। এই বিদেশিনী মধুর-হাসিনী একান্ত রহস্যময়ী নারী,—জীবনের সংশয়ময় পরিবেশে আশার মতই স্বপ্নময়ী ইঙ্গিতময়ী এবং অস্পষ্টভাষিণী। দিক্‌চক্রবালের মত সে দূর থেকে প্রলুব্ধ করে, হাতছানি দেয় এবং তাকে অনুসরণ করলে মায়াবিনী হাস্যেলাস্যে নানা বিলাস প্রকাশ করে Tempts from far, but as I follow flies!

কাব্যলক্ষ্মীর আবির্ভাব

কবি কাব্যলক্ষ্মীর পথ চেয়ে ছিলেন—কবে কোন ফাল্গুনে, তাঁর 'কনকাঞ্চল আবরণ' ও 'নবচম্পক আভরণে' সজ্জিত হয়ে আসবার প্রতীক্ষায় কিন্তু তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব হয়েছে 'জলভরা বরষায়'। এমনি হয়ে থাকে, আশাতীত ধনকে শুধু আশার আহ্বানে,—প্রতীক্ষার মূল্যেই পাওয়া যায় না। শ্রুতিবাক্য বদলে নিয়ে যদি বলা যেত—"যমেবৈষা বৃণুতে তেন লভ্যা"—তাহলে হয়ত কিছুটা ঠিক বলা হ'ত। এই আবির্ভাবের কথা মহাকবির নিজের ভাষাতেই বলা ভাল,—

"দৈবে যাহারে সহসা বুঝায়,
সে ছাড়া সে কেহ বুঝে না কভু।"

এই 'দৈব' আর কিছুই নয় দৈবী ইচ্ছামাত্র।

শিশুসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

শিশুদের প্রসঙ্গে মহাকবির অনন্ত প্রশ্রয়। বাইবেল শিশুদের জন্য স্বর্গরাজ্যের দ্বার অবারিত রেখেছেন। মহাকবি নিজেই চিরশিশু তাই বলেছেন,—

"কেশে আমার পাক ধরেছে বটে,
তাহার পরে দৃষ্টি হান কেন?
পাড়ার যত ছেলে এবং বুড়ো
আমি সবার একবয়সী জেনো।"

শিশুদের জন্য তাঁর দ্বারও সর্বদা অপাবৃত। পরম এবং চরম জ্ঞানলাভ করে আমাদের দেশের পরমহংসকল্প জ্ঞানীগণ দ্বিতীয় শৈশবকে আশ্রয় করেন। ইহা তাঁহাদের বালক ভাব। তাঁরা বলেন—'জ্ঞানে ব্রহ্মের পাই না সীমা, বুদ্ধি করে যায় না জানা—অর্থাৎ 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ', তাই শ্রুতি বলেন—

"তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ"
বৃহঃ ৩।৫।১

শিশুর খেলা ধুলাবালি নিয়ে, তুচ্ছ তৃণ নিয়ে। মহাকবিরও দেখি "তুচ্ছের 'পরে তৃষিত দৃষ্টি।" তাই তাঁর লেখায় পাই—

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন,
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন,—
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে 'ভাল আছো ভাই'!

অথবা—

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করে বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু,—
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

তিনি বলেন, প্রবীণ এবং প্রধানের দল থেকে খেলার ওস্তাদ তাঁকে ছুটি দিয়েছেন—তিনি মাটির তলে ছোটদের দলে ছেলেদের দলে স্বেচ্ছায় ভর্তি হয়েছেন। বলেছেন—"আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,—তবু শিশির-টুকুরে ধরা দিতে পারি, বাসিতে পারি যে ভালো।" তিনি শিশুর কাছে শিশু হয়েই ধরা দিয়েছেন। তাঁর 'জন্মকথা' কবিতাটিতে বাৎসল্য রসের কচি করপুটে মধুর রসের বৃহৎ রসাল ফলটি অতি কৌশলে এবং অসামান্য প্রতিভাবলে মানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন এবং এই প্রকার সমাধান আর কোনও কবির প্রতিভায় সম্ভব হয় নি।

রবীন্দ্রকাব্য শাশ্বতিক

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ঐশ্বর্য এবং মাধুর্য শাশ্বত কালের—কবি কীট্‌স্-এর ভাষায়:

"A thing of Beauty is a joy for ever
Its loveliness increases, it will never
Pass into nothingness"—(Endymion)

'পড়া পুঁথিসম' অথবা দ্বিতীয় বার বলা গল্পের মত

(like a twice told tale) রবীন্দ্রনাথের কাব্য নীরস হবার নয়, ফুরোবার নয়—

"নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।"

মাটির কুটিরে রবীন্দ্রনাথ

তিনি নিজে যত বড়, যত মহৎ ছিলেন, ঠিক তত সহজেই তিনি ছোটদের সঙ্গে, শিশুদের সঙ্গে, এমন কি নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক বাউল ও সাঁওতাল প্রভৃতিদের সঙ্গে মিশতে পারতেন একান্ত সরল মনে এবং অবাধে। তিনি লিখেছেন :—

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে
তিনিই মধ্যম যিনি রহেন তফাতে।

এ কথা তাঁর নিজের সম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে সত্য এবং সার্থক। তিনি ইদানীং অট্টালিকা বর্জন করে মাটির কুটিরে থাকতে ভালবাসতেন। শান্তিনিকেতনের 'উত্তরায়ণ' অট্টালিকা বিশেষ। তার উত্তর দিকে একটি ছোট মাটির বাড়ী, তার নাম শ্যামলী; তার ছাদ শুদ্ধ মাটির, এই মাটির কুটিরে তিনি বহুদিন ছিলেন পরম আনন্দে। তিনি এর সম্বন্ধেই লিখেছেন :—

"আমার শেষবেলাকার ঘরখানি, বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে, তার নাম দেবো শ্যামলী, ও যখন পড়বে ভেঙে সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,—মাটির কোলে মিশবে মাটি।" তিনি মাটিকে ভালবাসতেন, তাই বলেছেন : "হে পৃথিবী দিও তোমার মাটির ফোঁটার একটি তিলক আমার কপালে।"

শ্যামলীর কথা তুললাম এই প্রসঙ্গে যে, তিনি যেমন 'মহতো মহীয়ান্' ছিলেন তেমনি অপর দিকে নিজেকে 'অণোরণীয়ান' এবং তৃণাদপি সুনীচ মনে করতে পারতেন; তাই তিনি বলেছেন :—

ধূলির ধূলি আমি এসেছি ধূলি 'পরে,
জেনেছি ভাই বলে জগৎ চরাচরে।

জীবন-দেবতা

তাঁর 'জীবন-দেবতাকে', তাঁর অন্তরের ভাবধারার প্রেরয়িতাকে তিনি সব সময়ে মনে মনে এবং চোখে চোখে রেখেছিলেন। তাঁর প্রদত্ত শক্তিই তাঁর গান করবার 'গায়ত্রী' শক্তি এবং ধ্যান করবার সাবিত্রী শক্তি—তিনি বুদ্ধিবৃত্তির প্রচোদয়িতা বা প্রেরয়িতা একথা তিনি নানা-ভাবে নানা প্রবন্ধে নিবন্ধে বলে গেছেন তাঁর পিতৃদেব কর্তৃক গায়ত্রী দীক্ষার পর, তাঁর ব্রহ্মোপলব্ধির পর থেকেই। 'হৃদা মনীষা মনসাভিকপ্তু'—তাঁর উদ্দেশেই তিনি বলেছেন :

হে চিরপুরাণো চিরকাল মোরে গড়িছ নূতন করিয়া,
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর, রবে চিরদিন ধরিয়া।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি

তিনি বিশ্বকবি যেহেতু তিনি সমগ্র পৃথিবীর বৃহত্তর মানব-পরিবারের সকল সুখ-দুঃখের স্পন্দন, নিজের অন্তরের রেডিও যন্ত্রের তরঙ্গ প্রভাবে জানতে বুঝতে এবং সর্বান্তঃকরণে অনুভব করতে পারতেন, তাই বলেছেন :

"মনে হয় যেন জানি
সেই অকথিত বাণী
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।"

তাই তিনি বলতে পেরেছেন :

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার উঠে যত ধ্বনি
আমার বাঁশীর সুরে সাড়া তার জাগিবে অমনি।"

রবীন্দ্রনাথের চক্ষে মৃত্যু

সব্যসাচীর মত তিনি সাহিত্যের বহু কঠিন লক্ষ্য বহু-বার ভেদ করেছেন কিন্তু তাঁর শেষ-'মার' ওস্তাদের মার দেখি তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের পরিণয়ে। 'ধূসর গোধূলি লগ্নে' এবং 'জন্মদিনে' এমন কি ভানুসিংহের পদে মরণের সঙ্গে শ্যামের তুলনায় তার আভাস পাওয়া যায়। বরবধূর মত হয়েছে এদের উভয়ের মিলন :—

"আজ আসিয়াছে কাছে,
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা সম
একমন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।"

অথবা :—

"ধূসর গোধূলি-লগ্নে সহসা দেখিনু একদিন
মৃত্যুর দক্ষিণ বাহু জীবনের কণ্ঠে বিজড়িত
রক্তসূত্রগাছি দিয়ে বাঁধা, চিনিলাম তখনি দোঁহারে,
দেখিলাম, নিতেছে যৌতুক বরের চরমদান মরণের বধূ,—
দক্ষিণ বাহুতে বহি চলিয়াছে যুগান্তের পানে।"

ত্রিধারার সমন্বয়

রবীন্দ্রনাথ একাধারে পর্যবেক্ষণকারী বৈজ্ঞানিক, চিন্তাশীল মনস্বী, ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ বৈদান্তিক অথচ তাঁর ভিতরের সমগ্র মানুষটি ধূলির আসনে বসে ভূমাকে ধ্যান-চোখে দেখবার জন্য একান্ত লালায়িত।

এ যেন পবিত্র বিল্বপত্রের মত তিনটি বিভিন্নমুখী পাতা একই বৃন্তে এসে মিলিত হয়েছে, জ্ঞান প্রেম এবং কর্মের

ত্রিধারা যেন মিলিত হয়েছে এক পুণ্যময় ত্রিবেণীসঙ্গমে। তাঁর মহীয়সী প্রতিভার ইন্দ্রজাল পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ-মাত্রেই অভিনব সৃষ্টির মাধুর্যরসে নিষিক্ত করে।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব

আজকাল একটি কথা প্রায়ই শোনা যায় যে, অমুক সাহিত্যিক বা কবি নাকি রবীন্দ্র-প্রভাবান্বিত এবং অমুক সাহিত্যিক বা কবি নাকি রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত। এই প্রসঙ্গে আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যিক মাত্রই রবীন্দ্র-প্রভাবান্বিত, কেউ বেশী কেউ কম। সত্যেন্দ্র-নাথ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন, "তত্ত্বের নিথরে যেবা বিথারিল রসের পাথার, নমস্কার তাঁরে নমস্কার"। রবীন্দ্র-সাহিত্যের রসের ভোগবতী অলকানন্দা এবং মন্দাকিনী ধারায় যে সাহিত্যিক অবগাহন-স্নান করেছেন, যিনি সে ধারা যতটুকু পান করেছেন তিনি সেই পরিমাণে সার্থক এবং ধন্য হয়েছেন।

বিদ্যা যাঁকে বিনয়রূপ অলঙ্কারে ভূষিত করেছে, এবং বিবেক যাঁকে কপটতাবর্জিত করেছে, তিনি নম্রচিত্তে কৃতজ্ঞতার সহিত মহাকবির প্রভাব স্বীকার করেন। অবিদ্যা যাঁর চিত্তকে অহমিকায় আপ্লাত এবং উদ্ধত করেছে, তিনি কৃতঘ্নতাবশতঃ তা অস্বীকার করে আত্ম-প্রবঞ্চনা করেন মাত্র।

পূর্বেই বলেছি যে, রবি-প্রতিভায় প্রভাবিত আলোকিত এবং উদ্ভাসিত আমাদের চিন্তাজগৎ, ভাব-জগৎ, কল্পনাজগৎ এবং সঙ্গীতজগৎ। এই কথা যেন আমরা চিন্তা করি এবং শ্রদ্ধার সহিত উপলব্ধি করি। তা হলে যা আমরা অহঙ্কারের অন্ধতায় আজও পাই নি বলে বঞ্চিত আছি, তা অকপটে স্বীকার করে নিতে এবং পেতে পারব এবং পেয়ে ধন্য হতে পারব। নইলে কবির অন্তরের যে পরম আকূতি—"গ্রহণ করেছো যত ঋণী তত করেছো আমায়"—বলে আমাদের অন্তরের দ্বারে করাঘাত করে ফিরছে,—'অত্যন্ত ঘুর পথে দেশের লোকের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশের অবারিত অধিকার লাভ করা গেল',—বলে অভিমান প্রকাশ করছে,—তাকে উপেক্ষা করে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। ফলে আমরা তো ব্যর্থ হবই, মহাকবির দানসাগরের রস-পরিবেশনও সম্পূর্ণ সার্থক হবে না।

রবীন্দ্রনাথের জীবন উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যে সমান ভাগে বিভক্ত এবং ব্যাপ্ত হয়ে আছে। মহীয়সী কবি সরোজিনী নাইডুর ভাষায় "Rabindranath is Time's contribution to Eternity." এই মহাজীবন উভয় শতাব্দীর সাধনার দান মহাকালের করকমলে।
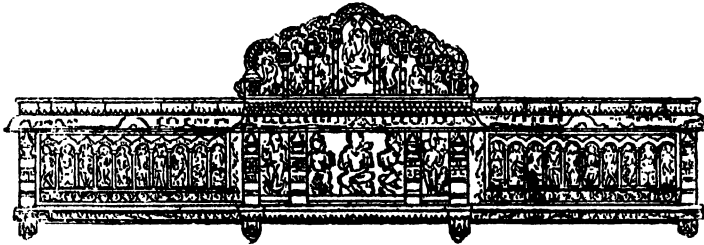
সেই ছেলেটা

(প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

শ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী

দিল্লীর বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র। কুইন্‌স্ পার্কের মাঝে জায়গাটা।

চারদিকে লোক যাওয়া-আসা করছে, বসেও আছে। তিনটি মেয়ে শিক্ষাকেন্দ্রের বাড়ীটার কাছে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল। শীতের সকাল, রোদ্দুরটা ভালই লাগছিল।

তাদের আলোচ্য বিষয়টি হ'ল, দু'একটা চাকরি খালি হয়েছে—বয়স্ক মেয়েদের শিক্ষা বিভাগে। মেয়ে চাই। মাহিনা এখন ৫০৲ ক'রে। পরে পাকা চাকরি হ'লে ৮০৲ হবে, কোয়ার্টার পাবে। উন্নতির আশাও থাকবে। গুণপণা বা বিদ্যাবুদ্ধি ম্যাট্রিক হ'লেই চলবে আপাততঃ। স্কুল বা পাঠশালা বসে দুপুরে ঘণ্টা তিনেক ক'রে—সেলিমগড়ে, বিল্লিমারম্-এ, খাড়িবাউড়ীতে, কারালবাগে, বাল্মীকি মন্দিরের হরিজন কলোনীতে বা অন্যত্র যেখানে লোক পড়াতে হবে। ছাত্রীদের ১৪ বছরের ওপর থেকে ৬০।৭০।৮০ বছর বয়স অবধি চলতে পারে। ১৪ বছরের নিচে বয়স চলবে না।

দাঁড়িয়ে ছিল বরুণা গুপ্ত, সুজাতা মিত্র আর রাজকুমারী (ক্ষেত্রী) মেহেরা—তিনজনই ম্যাট্রিক পাস ক'রে কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী।

চাকরিটায় ভারি সুবিধা। সকালে কলেজ ক'রে দুপুরে ১টার পর বয়স্কদের স্কুলে—'পহেলী কিতাব' আর 'দুসরী কিতাব' আর নামতা পড়ান—(প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ আর নামতা)। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রীর কাছে ত এ পড়ান 'ডাল-ভাতের' চেয়েও সোজা।

এতেই মাস গেলে ৫০টি টাকা। এরা তিনজনেই দরখাস্ত দিয়েছে। আরও কত জন দিয়েছে ওরা জানে না। তবে মনে হয় ওরাই ক'জন দিয়েছে। সকলে ত খবরও জানে না, আর সকলের ত সময়-সুযোগও হয় না।

এরা তিনজনেই ইন্দ্রপ্রস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। চেনাশোনা আছে।

বরুণা জিজ্ঞাসা করলে রাজকে আর সুজাতাকে—'তোরাও কি এখানেই দরখাস্ত দিয়েছিস্?'

সুজাতা বললে, 'হ্যাঁ, গুপ্তর আপিসে।'

রাজকুমারীরই বয়স সবচেয়ে কম। সে বললে, 'আমিও ত এখানেই দিলাম। সেদিন আমার কাকা দিয়ে গেছেন। কিন্তু গুপ্তজী কি বাঙালী? তোমাদের কেউ আপনার লোক হন কি? বরুণা বিবিজীও ত গুপ্ত? তা হলে, তোমাদেরই চাকরি হবে; তাতে এবারে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছ তোমরা।'

সুজাতা হাসলে, বললে, 'না, গুপ্তজী বাঙালী নন। ইউ. পি-র লোক বোধ হয়। লোকটিকে কেমন যেন লাগল। টেবিলের ওপর পা তুলে বসে দাঁত খুঁটছিলেন। আমরা ক'জন মেয়ে ঘরে ঢুকলাম নানা কাজে। আমার হাতে দরখাস্ত ছিল, দিলাম। তা যেমন ব'সে ছিলেন তেমনিই ব'সে রইলেন। দরখাস্ত দেখে বললেন, আপ বাঙ্গালী? কোন্ দেশে থাকেন? বললাম, হ্যাঁ, আমি বাঙালী। বহুদিন দিল্লীতে আছি। পড়াশুনা দিল্লীতেই করেছি, হিন্দীও জানি। ভদ্রলোক বললেন, আপকি হিন্দী জোবান ত অচ্ছি নেহি' (আপনার হিন্দী উচ্চারণ ভাল নয়)। সবিনয়ে বললাম, হ্যাঁ আমি ত বাঙালী, কাজেই তা হ'তে পারে। কিন্তু হিন্দী পড়াতে পারব। হিন্দীতেই পাস করেছি, এখানেই ইন্দ্রপ্রস্থ স্কুল থেকে।'

সুজাতা হাসতে লাগল। বললে, 'আমাদের কাজ পাবার ভরসা নেই। রাজ পাঞ্জাবী, তাতে উদ্বাস্তুও। তুমি পেলেও পেতে পার।'

রাজ অন্য মনে বাগানের ফুলের কেয়ারীর দিকে চেয়েছিল। চোখে যেন জল। একটু ম্লান ভাবে বন্ধুদের দিকে চেয়ে বললে, 'এই চাকরিটা পেলে আমার কলেজে পড়া হবে, নইলে বাবা আর পড়াতে পারবেন না। কোনও রকমে ভর্তি হয়েছি বটে—কিন্তু বই, কলেজের মাহিনা, নানা খরচের জন্য বাড়ীতে কারুর মত নেই পড়ার। আমাদের ত সব ফেলে পালিয়ে আসতে হয়েছে। এখন খুবই অসুবিধা।'

বরুণা বললে, 'তোমার মা কি বলেন? ঐ অসুবিধার জন্যেই পড়া আরও দরকার।'

রাজ আরও ম্লান হয়ে গেল। বললে, 'মা নেই—মা থাকলে…।'

বন্ধুরা বললে, 'আহা। তা হলে বাড়ীতে কে আছে?'

'অনেক লোক। বাবা, ঠাকুমা, কাকারা, কাকীরা, তাদের ছেলেমেয়ে, আমার ভাই-বোনেরা, সবাই আছে।'

ওরা কেন্দ্রের আপিসে ঢুকল। সেখানকার প্রধানার কাছে শুনল, দু'তিন দিনের মধ্যে খবর পাবে। দরখাস্তের জবাব। দু'টো কাজ খালি আছে।

২

এবং জানুয়ারীর গোড়াতেই রাজকুমারী আর অন্য একটি মেয়ে কাজ পেয়ে গেল।

সুজাতা ও বরুণা রাজের হাসিমুখ দেখে খুব খুশী হ'ল। রাজ পেল 'বিল্লিমারম্' গলিতে একটি ছোট্ট কেন্দ্রে কাজ।

সকলেই নানা জায়গার অধিবাসিনী হ'লেও কুইন্‌স্ পার্কে কর্মসূত্রে আসা-যাওয়া করে।

কাজের শেষে পার্কের ওদিকের গেটে বাস্ স্ট্যাণ্ডে যায়। এক সঙ্গে বাড়ীর দিকের বাসে ওঠে। বাগানে বেড়ায়। চিনেবাদাম কিনে খায়। চাঁদ্‌নীচকের ঘণ্টা-ওয়ালার দোকানের প্রসিদ্ধ 'ডালমোট্'ও খায়। দই-বড়া খায়। ভালমন্দ যা খুশি খায়।

বাস্ স্ট্যাণ্ডের আশে পাশে বাগানের ঝোপেঝাড়ের পাশে অসংখ্য ভিখিরী থাকে নানারকম ধরনের।

সেদিন ওরা বাগানে রোদ্দুরে ব'সে বাদাম খেয়ে বাসের দিকের গেটে এল।

সহসা একটা ভিখিরী মেয়ে একটি ছেলের হাত ধ'রে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল, 'বিবি, কুছ দে।' ছেলেটা হাত পাতল না, মা-র ওড়না ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মা হাত পাতল।

বরুণা বললে সুজাতাকে, তোর কাছে খুজরো আছে? তা হ'লে দু'টো পয়সা দিয়ে দে। আমার খুজরো নেই।'

রাজ বাদাম ছাড়াতে ছাড়াতে আসছিল একটু পিছনে।

সুজাতা থলে থেকে ব্যাগ বের করল।

বরুণার হাতে পয়সা দিল, নিজেও দুটা নিল।

ভিখিরী মেয়েটি পয়সা নিল। এবারে রাজ এসে পৌঁছেছে। তাকে দেখে বললে, 'বিবি, তুঁহু দে কুছ।' (তুইও কিছু দে।) 'সেলাওয়ার কামিজ' দেখে স্বদেশিনী ব'লে একটু হেসে বললে, 'কুছ ওড়নে-কা দে বিবি' (গায়ের কাপড়)।

রাজও পয়সা বের করছিল 'ওড়নেকা কুছ' শুনে একটু হাসল। 'শোনো কথা! তোর জন্যে যেন ওড়না নিয়ে আমরা এখানে এসেছি।'

তার পর ছেলেটিকে দেখে বললে, 'মুঙফলি (চিনে-বাদাম) খাবি? এই নে।' নিজের ওড়নার আঁচল থেকে ছেলেটির হাতে দিতে গেল।

সুজাতা হাসল, 'ও চাইছে 'চুন্‌নী' (ওড়না) আর রাজ দিচ্ছে মুঙফলি (বাদাম)!'

ভিখারিণী চিনেবাদাম নিতে এগিয়ে এল। তার পর হঠাৎ বললে, 'বিবি, তোর ঘর কোথা?'

রাজ আবার হাসল…'আমার ঘর সেলিমগড়, তুই যাবি সেখানে? ওড়না নিতে?' ঠাট্টার সুরে বলল।

ভিখারিণী বললে, 'না তোর পিণ্ড্ (দেশ) কোথায় —জিজ্ঞেস করছি।'

রাজ বললে, 'আমার দেশ লাহোর। তোরও কি লাহোরে দেশ?'

বরুণা আর সুজাতা এবারে একসঙ্গে হেসে বলে উঠল, 'ওরে রাজ, তুই ওর দেশের লোক কি না জানতে চায়, কি মুশকিল। আমরা বাঙালী তাই পয়সা দিয়েই খালাস পেয়েছি।'

ভিখারিণী একটু থমকে গিয়ে যেন নিজের মনেই বললে, 'আ রাজ? তোর নাম রাজ? লাহোর তোর দেশ?'

রাজকুমারী হেসে উঠল, 'হ্যাঁ, রাজকুমারী। তা তোর কি হ'ল? নে পয়সা, আয়—'

ভিখারিণী ওড়না পেতে চিনেবাদাম নিতে বা পয়সা নিতে এগিয়ে আর এল না! আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল ছেলের হাত ধ'রে। একবার যেন বললে, 'আ মেরি রাজ!'

ওদিকে বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে, গন্তব্য পথের নম্বর মাথায়। রাজ বললে, 'কি হ'ল? নে পয়সা?'

সুজাতা বরুণা ডাকলে, বললে, 'রাজ আয়, আমাদের বাস্ এল।'

কিন্তু ভিখারিণী কোথায়? সহসা কোন্ ঝোপের আড়ালে চ'লে গেছে। আর দেখা গেল না। পয়সা নিতে এল না আর।

ওরা অবাক্ হয়ে গেল তিন জনেই।

বরুণা বললে, 'ও তোকে চেনে নাকি? 'রাজ' বললে যেন?'

সুজাতা বললে, 'হ্যাঁ শুনলাম 'রাজ' রাজ বললে যেন।'

পয়সা হাতে একটু চুপ ক'রে থেকে রাজ বললে, 'কি জানি তোরা নাম ধ'রে ডাকলি, তাই হয়ত শুনে ও রাজ বললে।'

আর দাঁড়াবার সময় নেই। সকলে বাসে উঠে পড়ল।

৩

রাজের বাড়ী কারালবাগে উদ্বাস্তু কলোনীতে। সেলিমগড়ে নয়।

বাড়ী ফিরে অনেক কাজ তার। আটা মাখতে হবে। তুন্দুরে রুটি হবে। উঠানের কোণে মুখভাঙা জালার মত প্রকাণ্ড তুন্দুরে ঘুঁটের আগুন জেলে দিয়ে সে ওড়না-কামিজ বদ্‌লে রান্নাঘরে আটা মাখতে এল। সন্ধ্যেবেলাতেই সব খাওয়া হয়ে যায়, ওদের পাঞ্জাবীদের। এক্ষুণি ভাইরা, বোনেরা, ঠাকুমা খাবে। তার পর বাবা-কাকারাও খেতে আসবে। দেখলে, মেজ খুড়ীমা 'মাই-কী দাল' (মাষ কলাই) রান্না ক'রে রেখেছিল, আটাও মেখেছে।

ওকে দেখে সে নিজের অন্যকাজে গেল ছেলেমেয়ে দেখতে।

রাজ আটার থালা নিয়ে উঠানে তুন্দুরের পাশে দাঁড়াল। তার পর এক-একটা মোটা মোটা রুটির তাল হাতে ক'রে তুন্দুরের গায়ে চেপটে লাগিয়ে দিতে লাগল। সেগুলি উনানের গরম গায়ে সেঁকা হয়ে আগুনে প'ড়ে যায়। আর সে চিমটেতে, নয়ত হাতে নেকড়া জড়িয়ে তুলে নেয়।

আড়াই সের আটার রুটি সেঁকা হ'ল। থালার মধ্যে নেকড়া জড়িয়ে সেগুলো গরমে রাখল, পরে ঘি মাখাবে। পাঞ্জাবে ঘি-এ বা মাখনে ডুবিয়ে তুলত। এখানে আর সেদিন নেই।

ভাই-বোনেরা খেতে এল। রুটি ডাল আচার আর দুধ দিয়ে খাওয়া হ'ল। দাদী বাবা কাকারা খেয়ে নিল।

দেখতে দেখতে শীতের রাত ঘনিয়ে অন্ধকার হয়ে গেছে। পাঞ্জাবী পাড়ার লোকদের খাওয়া সেরে বেড়ানোর বা জিরোনোর সময় তখন।

সবারই খাওয়া শেষ হয়েছে। রাজ আর কাকীরা দু'জনে খেতে বসল। সেজ কাকী বললে, তোর মুখটা আজ ভারি শুকনো লাগছে। আর রুটিও তো কম নিয়েছিস্ দেখছি। কেন, অসুখ করেছে?

রাজ একখানা রুটিই নিয়ে বসেছিল। ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললে, না, অসুখ করে নি। তবে ভাল লাগছে না যেন।

ছোট খুড়ী বললে, 'আজ তা হলে শুয়ে পড়গে শীগ্‌গির ক'রে। আমি বাসনগুলো মেজে রাখব।'

পালা ক'রে ভাগে ভাগে কাজ করে সবাই। তবে ওরই ভাই-বোন নিয়ে কাজ বেশী পড়ে।

শীতের রাত। সকলেরই ছোট ছোট খাটিয়াতে বিছানা। দিল্লীর শীত, লেপ-কম্বল নিয়ে সব ভাই-বোন ঠাকুমা বাবা একটা ঘরেই শুয়েছে।

'সেলাওয়ার' কামিজ-ওড়না ছেড়ে রেখে ছোট-জামা আর 'কাছেড়া' বা পাজামা প'রে রাজও নিজের খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল।

নিরালোক নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার ঘর, কোনদিকের একটা জানলার ফাঁক থেকে রাস্তার একটু আলোর চিলতে এসে পড়েছে।

রাজ সেইদিকে চেয়ে রইল।

এতক্ষণে ওর হাতের কর্মচক্র থেমেছে। মন যেন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে এক জায়গায়। সেটা কোন্ জায়গা?...মন জানে, সেটা কোথায়। রাজও জানে, কোথায়। কিন্তু রাজের গলা থেকে ঠোঁট দু'খানা অবধি যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল হঠাৎ। ভাবতে ইচ্ছে করছে না সেই জায়গাটির কথা।

তা হলে কি উঠে জল খাবে? যদি ভাবনাটা ন'ড়ে যায়? উঠল, জল খেল। ঘুমের মাঝে ঠাকুমা বললে, 'কে, রাজ?'

এবারে শুয়ে পড়ল আবার। আজ আর শীত করছে না। ঘরটা যেন সব গরম হয়ে গেছে।

গরম হোক, শীত হোক, তেষ্টা পাক, গলা শুকোক, কিন্তু সেই জায়গাটা আর রাজের মনের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায় না।

রাজ বালিশে শুকনো মুখ গুঁজে যেন কাঁদতে চাইলে। কিন্তু কান্না এল না।

অশ্রুহীন মুদিত চোখের সামনে ভেসে এল কুইন্‌স্ পার্কের সেই জায়গা ও সেই ভিখারিণী...। ছেঁড়া বিবর্ণ ওড়না, ময়লা জামা সেলাওয়ার পরা, বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে 'আ রাজ? 'মেরি রাজ' বলে পিছন দিকে সরে-যাওয়া সেই ভিখারিণী।

হ্যাঁ, রাজ চিনেছে তাকে। তার নাম বলাতেই যেন মনে হয় চিনতে পেরেছিল সে কে। প্রথমটা বুঝতে পারে নি।

এবারে চোখে জল এল। রাজ নিঃশব্দে নিঃশ্বাসের মত শব্দহীন গলায় বললে, 'মা'। হ্যাঁ মা-ই তো যেন।

এবারে ঝর্‌ঝর্ ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

৪

আর চোখের জলের সাগরে প্রতিবিম্বের মত ফুটে উঠতে লাগল সেই '৪৬ সালের লাহোরের দুর্যোগের দুর্দিনের ছবি।

অনেক রাত্রি তখন। কত রাত্রি কে জানে? সব ঘুমিয়েছে ঘরে ঘরে কাকারা ঠাকুমা। মা-র ঘরে মা বাবা ভাই-বোন ওরা সব।

সহসা এক কাকা ডাকলেন ত্রস্ত শঙ্কিত স্বরে—ঘরে ধাক্কা দিয়ে, 'ওঠ ওঠ সব, শীগ্‌গির ওঠ। মুসলমানরা এদিকে আসছে।'

বাবা-মা উঠলেন। ঠাকুমা কাকীরা বাড়ীসুদ্ধ সব যে যেখানে ছিল, মস্ত বাড়ী বাগান কত দাসদাসী লোক-জন, সব একে একে জেগে উঠে নিঃশব্দে সভয়ে বাইরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াল একত্র হয়ে।

খবর দিতে পুলিসের লোক এসেছে। তিন-চারখানা ট্রাকও এসেছে। এই রাত্রেই লাহোরের সীমানা ছাড়িয়ে যেতে পারলে বাঁচতে পারে। না হ'লে তাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই। 'যার যা দরকারী জিনিস, টাকা-কড়ি গহনা নিতে পার নিয়ে নাও।' আরও বললে, 'বেশীক্ষণ সময় নেই। বাইরে আলো জেলো না, কথা ব'লো না, দেরী ক'রো না।' 'জানানা'দের ইজ্জৎ, প্রাণ বাঁচাতে তারা পারবে তাড়াতাড়ি ক'রলে। নইলে খোদা জানেন, কি হবে।

আতঙ্কে অভিভূত ঠাকুমা থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপতে লাগল। তাকে বাবা আর কাকারা ধ'রে ধ'রে নিয়ে এসে খোলা ট্রাকের ওপর বসিয়ে দিলেন। সেখানেও রাস্তায় অসংখ্য লোক জমেছে, সকলেই গাড়ীতে ওঠবার জন্য ব্যাকুল। ঠাণ্ডা কন্‌কনে শীতের রাত্রি। পৌষের না মাঘের রাত্রি। পথের সবাই ভূতের ছায়ার মত নিঃশব্দে মিনতি-ভরা মুখে চেয়ে আছে পুলিসদের দিকে। যদি তাদেরও নেয়!

পুলিসরা বললে, 'আমরা সারারাত ধ'রে সকলকে যত পারব অমৃতসরের সীমান্তে পৌঁছে দিয়ে আসব। কিন্তু আগে কিছু বুড়ো মানুষ আর বাচ্চাদের, মেয়েদের দলদের দিয়ে আসি। পরে অন্য সবাইকে নেব। তাই হুকুম আছে।'

'ওঠ ওঠ' করতে করতে কাকারা কে ওকে গাড়ীতে তুলে দিলেন। কাকীরাও উঠে বসেছে। ছোট ছোট ভাই-বোনেরা ভয়ে শীতে কাঁদতেও যেন ভুলে গেছে। ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ চোখে চেয়ে ব'সে আছে।

বাবা কাকারা সব উঠলেন।

পুলিস বললে, 'গাড়ী ছাড়ছি।'

সহসা বুড়ী ঠাকুমা বললে, 'সবাই এসেছে? বিবি? বড়ি বিবি কোথায় হ্যা'? (অর্থাৎ বড়বৌ।)

বাবা বললেন, 'উঠেছে সব। ওঠে নি? ভিড় আর অন্ধকারে দেখা যায় না মানুষ।'

সহসা এক কাকা বললেন, 'না, আসেন নি বিবিজী। দেখছি না ত।' অন্ধকারে এক খুড়ীও বললে, 'হ্যাঁ, তিনি ওপরের ঘরে কি আনতে গিয়েছিলেন।' অন্য এক কাকা ডাকলেন, বিবিজী? সাড়া নেই।

বাবা পুলিসকে বললেন, 'দাঁড়াও একটুখানি, তাকে ডেকে আনি।'

সহসা দূরের মোড়ের কাছে মশালের জোর আলো দেখা গেল। আর 'আল্লা হো আকবর' শোনা গেল।

পুলিস হাত ধ'রে নিলে। বললে, 'আর নহে বাবা না। তিনি পরের গাড়ীতে আসবেন। হয়ত বা অন্য গাড়ীতে উঠেছেন। শীঘ্র গাড়ী ছাড়। ওরা এক্ষুণি এসে পড়লে আমি কারুকে বাঁচাতে পারব না। তুমিও মরে যাবে নামলেই।'

বাবা অস্থিরভাবে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লাফিয়ে পড়তে গেলেন।

কিন্তু পুলিসরা তাঁকে জোর ক'রে ধ'রে রেখে ড্রাইভারকে জোরে গাড়ী চালিয়ে দিতে বললে। বললে, 'আপনার জন্যে এত লোক বিপদে পড়বে! বিবিজী এতক্ষণে নিশ্চয় অন্য গাড়ীতে উঠে গেছেন। সর্ডারে গিয়ে খুঁজে নেবেন।'

যে সব রাস্তায় আলো সব জায়গায় নেই, গলি-ঘুঁজি দিয়ে অন্ধকার সেই সব রাস্তায় আতঙ্কে প্রাণভয়ে ভীত নিঃশব্দ মানুষদের নিয়ে তিন-চারখানা ট্রাক অন্ধকার নরকের পথের ভুতুড়ে গাড়ীর মত চলতে লাগল। সারি-সারি পায়ে-চলা অসংখ্য নিঃশব্দ মানুষও চলেছে সেই সব পথে। কারুর মুখে কথা নেই, কেউ কারুকে দেখতে পাচ্ছে না। কারুর মনে আর কোন ভাবনা-চিন্তাই নেই, কোনক্রমে অমৃতসরের সীমানায় থানা-গ্রামে পৌঁছন ছাড়া। অনন্তকালের পিতৃলোকের বাসকরা দেশ, কত নিদ্রিত সুপ্ত স্বজন বন্ধু, যারা এখনও পথে বেরিয়ে আসে নি, ঠিক জানে না ব্যাপারটা; তারা ছাড়া ধনধান্য ঘর-বাড়ী ঐশ্বর্য সম্পদ্‌ চিরকালের বাস-নিবাস স্বদেশ ছেড়ে সকলেই পথে বেরিয়ে পড়েছে—দীনদরিদ্র ভিখারী থেকে ধনী শেঠ প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার অবধি। এত কথা তখন রাজ ভাবতে জানত না। পরে ভেবেছে, পরে দেখেছে তাদের। পরে জেনেছে। নরক কেমন কেউ জানে না, রাজও জানে না। কিন্তু যমযন্ত্রণার ভয়ই যদি নরকের ভয় হয়, সেই আতঙ্কময় অন্ধকারময় নরকের

পথের সহসা শেষ হ'ল। দম বন্ধ ক'রে ছোটা ট্রাকগুলি একেবারে সীমান্তে এসে খানা-গ্রামে দম ফেলল যেন।

কে কি ভাবছিল কেউই জানে না। রাজের কোলের ওপর ছোট দু'টি ভাইবোন নেতিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা-র কথা কেউ জিজ্ঞাসা করে নি। কাঁদে নি। তাকে ডাকে নি। তারাও কি ভয় পেয়েছিল? কিসের ভয়? রাজও কিছুই ভাবে নি। অস্পষ্ট ভাবনা—আজকে স্পষ্ট হয়েছে। সেদিন কিছু ছিল না। দশ-এগার মাত্র বয়স তখন।

শুধু দাদী কাঁদছিল ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে। কাকীদের সঙ্গে দু-একটা কথাও বলছিল। শুনতে পেয়েছিল রাজ —'কি আনতে হ্য (বৌ) ওপরে গিয়েছিল? 'জেওর জেওরাত' (গহনাপত্র) সোনা মতি?...হায় হায়!...কি হবে সে সব—যদি 'জান' আর 'ইজ্জৎ' চলে যায়!...এমন বেহিসাব আক্কেল কেমন করে হ'ল!'

কাকা ধমক দিলেন 'চুপ কর'। পরের গাড়ীতে হয়ত আসছেন।'

বাবা পাথরের মত বসে ছিলেন। পুলিসটা বাবার কাছ ছাড়ে নি।

দু'ঘণ্টার জায়গা এক ঘণ্টায় গাড়ী এসে পৌঁছেছিল। একে একে সব গাড়ী থামল। প্রাইভেট গাড়ীও ছিল সামনে পিছনে ক'খানা। লোকেরা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে নাবল—ঘুমন্ত শিশু বালক-বালিকাদের হাত ধ'রে—কোলে নিয়ে। জিনিসপত্র প্রায় কিছুই নেই। একবস্ত্রে অর্থাৎ যা পরেছিল তাই জড়িয়ে সব চ'লে এসেছে।

বাবা নাবলেন সবারি আগে। ওদের কারুর দিকে তাকালেন না। কিছু বললেন না। শুধু অন্য গাড়ী-গুলির কাছে গিয়ে দেখতে লাগলেন। তার পর ডাকতে লাগলেন, 'বিবি, বিবি, বিবি তুমি কি এসেছ এখানে?'

কেউ সাড়া দিল না। কাকারা নেবেছেন, তাদেরও নাবিয়েছেন। ট্রাকগুলো এখুনি ফিরে যাবে আরও বিপন্ন পলাতক যাত্রী আনতে। তখনও তারা ভরা আকাশ। রাত্রি শেষ হয় নি। গাড়ীগুলো যাত্রী নাবিয়ে পথে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বাবা কাকারা যাত্রীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডাকতে লাগলেন, 'বিবিজী' 'বিবিজী' ব'লে। ঘোম্‌টা দেওয়া, মাথায় ওড়না দেওয়া, শাল জড়ানো চেহারা মেয়েদের যাকেই দেখেন বাবা তাকেই সামনে গিয়ে দেখেন। যেন মনে করেন সেই বুঝি বিবিজী, ওদের মা। তারা অচেনা মুখে পিছন ফিরে তাঁর দিকে চায়।

তিনি অপ্রস্তুত হয়ে মাপ চেয়ে আবার অন্য মেয়েদের দিকে যান। ঠাকুমাও ভাঙা গলায় 'বৌটি' (বউ) বলে ডাকেন। কাকারা 'জিঠানী জী' (জ্যেষ্ঠানী) 'হো জিঠানীজী,' বলে ডাকেন। কেউ 'আ হো' (হ্যাঁ) 'এই যে' এখানে বলে সাড়া দেয় না।

যাত্রীরা একে একে সবাই যে যেখানে পারল গ্রামের মাঝে সহরের পথে চ'লে গেল। ভোর হয়ে এল। ওরা ছোটরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপতে লাগল। কাকারা জোরে জোরে 'বিবিজী' 'বিবিজী' ব'লে ডাকতে ডাকতে গ্রামের বাইরে জঙ্গল ক্ষেত সব দিকে ঘুরতে লাগলেন। ভাবেন, যদি অন্ধকারে এসে থাকেন—পথ আর মানুষ চিনতে না পেরে গ্রামে কি অন্যদিকে চ'লে গিয়ে থাকেন।

যদিও মনে জানছিলেন সবাই, যে, তিনি আসেন নি। আসতে পারেন নি। মা-র গাড়ীতে ওঠা হয় নি। এখানে পথ ভোলেন নি। চিরকালের মত লাহোরেই রয়ে গেছেন। হারিয়ে গেছেন। সেই বাড়ী থেকে বেরুতে পারেন নি আর। বিপদে পড়েছেন।

কিন্তু মনকে মন মিথ্যা আশাময় সান্ত্বনা দেয়। আছে সে, আছে। আসবে। হয় ত আসবে সে পরের গাড়ীতে।

পরের গাড়ী এল। আরও কত গাড়ী, হাঁটা লোক এল। সারা সকাল—সারা দিন ধ'রে কত লোক এল, চেনা—অচেনা। বাবা উদ্‌ভ্রান্ত মুখে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, পথে মা-র মত দেখতে সুন্দর চেহারা দামী জামা-কাপড় পরা কারুকে দেখেছে কি না? কেউ কি হেঁটে আসছে সে রকম?

কাকারাও সারাদিন খুঁজে খুঁজে বেড়ালেন...। ক্রমে আর যাত্রী আসা কমে এল। লোক-মুখে শোনা গেল সেখানে মহল্লায় মহল্লায়, পাড়ায় পাড়ায়, আগুন লাগানো লুটপাট সুরু হয়ে গেছে। মেয়েরা অপমানের ভয়ে কেউ কুয়োয় পড়েছে। নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। বিষ খেয়েছে। অন্য রকমে মরেছে। আর যারা তা পারে নি, তাদের 'লুটেরা'রা ধ'রে নিয়ে গিয়েছে...।

রাজের চোখ এখন শুকনো। আর জল নেই। চুপি চুপি যেন নিজের মনকে ও না জানিয়ে ভাবে, তা হলে কি মা-ও পালাতে পারে নি—মরতে পারে নি? বেঁচে রয়েছে?

আবার চকিতভাবে ভাবে, না, তার হয়ত ভুল হয়েছে। ও মা নয়, অন্য কেউ। এমন ত এক রকম দেখতে হয়। আর এ ত রোগা, মা-র মত ফরসাও নয়, মোটাসোটা সুন্দর দেখতেও নয়। আর ঐ ছেলেটি? ...মা-র সঙ্গে ছেলেটি কেন? কার ছেলে? নাঃ! নিশ্চয়ই ও মা নয় তাহলে।

মনটায় যেন একটু ভাল লাগল, 'তাকে' মা নয় ভাবতে। কি ক'রে মা হ'তে পারে যখন ঐ ছেলেটা রয়েছে। এবারে রাজ ঘুমিয়ে পড়ল।

সহসা যেন দেখল, লাহোরের সেই বাড়ী, সব ভাই-বোন সকালে খেতে বসেছে। ইস্কুলের তাড়া সকলেরই। মা রুটি পরোটা আচার দুধ নিয়ে সকলকে ভাগ ক'রে দিচ্ছেন। আর হাসছেন, গল্প করছেন। সাদা সেলাওয়ার, রঙীন রেশমের জামা, হাল্কা ফিকে নীল রঙের 'চুন্নী' (ওড়না) পরা।

ওরা সকলেই খাচ্ছে। কিন্তু···কিন্তু মা-র কাছে মা-র হাঁটু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে কে একটা ছেলে। সে ত ওর ছোট ভাই নয়? কে ওটা? সেই ছেলেটা কি? সেইটেই তো যেন!

কিরকম গলা শুকিয়ে ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখল, অনেক বেলা হয়েছে, কেউ ঘরে নেই।

কাকী ডাকছে, 'রাজ, ওঠ, বেলা হয়েছে।'

৫

কারালবাগের বাস্ এসে থামল চাঁদনীচকের দিকে। রাজ 'বিল্লিমারম্'-এর স্কুলের দিকে তখনই গেল না। এখনও বাকী ছাত্রী সবাই আসে নি জানে। সংসারের কাজ সেরে তারা আসে।

সে কুইন্স্ পার্কের ভেতরে ঢুকল। শীতের রৌদ্রে অনেক লোক বেঞ্চিতে ব'সে, ঘাসে ব'সে রোদ পোয়াচ্ছে। ঝোপঝাড়ের দিকে ভিখারী-ভিখারিণীরাও ছেলেমেয়ে ছেঁড়া নেকড়া জড়িয়ে নোংরা থালা ঘটি বাটিতে ভিক্ষালব্ধ রুটি মুড়ি অন্য খাবার নিয়ে—কেউ বা গেলাসে চা নিয়ে খাচ্ছে। কারুর খাওয়া হয়ে গেছে, ছেলেমেয়ের মাথা নিয়ে বসেছে উকুন বাছতে। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরিপূর্ণ শুব্ধ দুপুর।

রাজ চেয়ে চেয়ে দেখে তাদের। স্বপ্নটাও মনে আছে। ভিখারিণীকে সে আজ খুঁজে বার করবে। কাল বন্ধুরাও ছিল, আর ঠিক বুঝতেও প্রথমটা পারে নি বটে। তা আজও মনে সন্দেহ আছে, মা না হতেও ত পারে? আর হয় যদি?...নাঃ, সেকথা ভাবতে মন চায় না। তবু ভাল ক'রে আজ দেখে বাড়ী ফিরবে, স্কুলে যাবে।

না! সেই ভিখারিণী কোথাও নেই। আর সেই ছেলেটাও তো নেই! তা হ'লে আর কোথাও ভিক্ষা করতে গেছে। বোধ হয় আসবে সন্ধ্যার দিকে। যেমন সেদিন দেখছিল। ফেরার সময়ে দেখতে পাবে নিশ্চয়।

তবে আজ আর অন্য সঙ্গিনীদের সঙ্গে সে আসবে না। তা হ'লে কথা কইতে পারবে তার সঙ্গে।

সকাল সকাল স্কুলের পড়ানো সেরে সে আবার ফিরল। তখনো বরুণা সুজাতাদের দলের কেউ বাগানের দিকে এসে পৌঁছয় নি। বোধ হয় কেন্দ্রের ক্লাস হয় নি। কলেজ সেরে তারা বয়স্ক কেন্দ্রে আসে সেলাইয়ের, বোনার কাজে।

বিকাল শেষ হয়ে এল। ভিখারীর দলও ভিক্ষা চেয়ে বেড়াল। ঠাণ্ডা পড়বার আগেই অনেকে ফিরে গেল প্রতিদিনের মত।

কিন্তু সেই ভিখারিণী মেয়েটি নেই, আসে নি।

তা হ'লে কোনো দূর জায়গায় ভিক্ষা করতে গেছে।

সহসা পিছন থেকে বন্ধুরা এসে ডাকল, 'এই রাজ, কি করছিস ওই নোংরা ঝোপের কাছে? আয় একটু "জলজিরা" ফুচকা খাই।'

রাজ চমকে পিছন ফিরে তাকাল হঠাৎ তাদের ডাকায়।

তারা হেসেই আকুল, 'কি রে, ভয় পেয়েছিস? যেন ভূত দেখলি?'

সেও হাসল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে 'জলজিরা' কচুরী (ফুচকা) খেল। গল্প করল শুক্‌নো শুক্‌নো মুখে, অন্যমনস্ক ভাবে।

তার পর বাসে উঠল। সেদিন গেল, তার পরদিনও গেল। তার পরের দিনও ওই ভাবেই সে খুঁজল। কিন্তু সেই ভিখারিণী আর তার সেই ছেলেটাকে কোথাও দেখা গেল না।

তা হলে কি দরিয়াগঞ্জের মন্দিরগুলোর কাছে ভিক্ষা করতে গেছে? অথবা কেল্লার কাছে প্যারেড ময়দানের সামনের 'সাউজী' 'গোপালজী'র মন্দিরের কাছে যায় ভিক্ষা করতে? সেখানে সন্ধ্যেবেলা কথকতা হয়, অনেক মেয়ে আসে। মিষ্টির দোকানীরাও বেশ ভিক্ষা দেয়, রুটি পয়সা, ইত্যাদি।

ঘুরে ঘুরে রাজের মুখ শুকিয়ে সরু লম্বা হয়ে যায়। ক্ষেত্রী মেয়ের অত উজ্জ্বল রং, সে রং রোদ-পোড়া রাঙা হয়ে উঠেছে।

কাকীরা ভাবে, চাকরি আর পড়া দু'য়ের খাটুনি। আর বাড়ীরও কাজ তো কম নয়। যেদিন রুটি না করে, সাবান কাচে, ইস্ত্রি করে। চরকায় সুতোও কাটতে হয় মাঝে মাঝে। পুরণো তুলো জমেছে অনেক, সেগুলোর সুতো থেকে 'খেস' বা সুজনী তৈরী হবে। রাজের কাজের শেষ নেই।

এবং রাত্রে ঐ ভাবনা যেন ঘুমের আড়ালেও মনে জেগে থাকে। কিন্তু এখন যেন ওর মনে আর একটা সন্দেহ উঁকি মারে। তা হলে নিশ্চয় সে মা। তাই আর এ পথে আসে না, আর সেই জন্যেই সেদিন ভিক্ষে না নিয়েই চ'লে গিয়েছিল।

রাজের নিজেকে যেন অপরাধিনী মনে হয় ভিখারিণীটার পরিচয় না নেওয়ার জন্য। কেন সেদিন তার 'রাজ' বলা শুনেও ও এগিয়ে যায় নি? সঙ্গিনীদের জেনে ফেলার ভয়ে অথবা কিসের সঙ্কোচে? ওই ছেলেটার জন্যে? না মা মরে গেছে বলেছিল বন্ধুদের, সেই জন্যে? অন্যকিছু সম্পর্কও তো বলতে পারত?

রাজ বিনিদ্র চোখে শুয়ে শুয়ে ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড়-পরা ভিখারিণীর মুখটা স্পষ্ট ক'রে মনে করবার চেষ্টা করে। চোখে জল আসে। আবার কখন ঘুমিয়ে প'ড়ে সহসা আচমকা জেগে ওঠে। মনে হয়, কি অন্যায় ক'রে ফেলেছে যেন। কখনও আর সে ভুল শুধরানো যাবে না। কিন্তু···।

৬

সেদিন একটা শনিবারের বিকাল। রাজ তেমনি আগে এসেছে, এদিক্-ওদিক্ ঘুরছে।

সহসা পিছন থেকে তার কাঁধে হাত রাখল কে। ফিরে চেয়ে দেখল বরুণা।

বরুণা বললে, 'তোর কি হয়েছে রাজ—কেবলই ঘুরে ঘুরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াস্ আজকাল। বাড়ীতে কিছু হয়েছে? না কোন কিছু দরকার পড়েছে? চল্, একটু ওই ঘাসে বসি।'

রাজ শুকনো মুখে ঘাসে বসে। বরুণা বলে, 'খাবি কিছু?'

সে বললে, 'না, এবারে বাড়ী যাই।'

বরুণা বললে, 'একটু পরে যাব। সুজাতা আসুক। তার আগে তুই বল্ ত, কেন একলা যেন ভিখারী-পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস। সেদিন দরিয়াগঞ্জে দেখলাম মন্দিরের সামনে। তার আগে কেল্লার ময়দানের সামনেও দেখেছি। কি হয়েছে বল্ তুই। কারুকে খুঁজছিস্ কি?'

এবারে রাজের চোখে জল এসে পড়ল। আত্মীয় বা আপনজন কেউ নয় বটে, কিন্তু ওরা ওকে ভালবাসে, স্কুল থেকে চেনা-জানা। এক ক্লাসে পড়া বন্ধু। হয়ত ঠিক একথা বলা যায়। ওরা তো আপনার লোক নয় তাই বলা যায়। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। শুধু ফোঁটা জল এসে পড়ল চোখে।

বরুণা তার পিঠের ওপর হাত রেখে বললে, 'কি হয়েছে বল্ তুই। আমি কারুকে বলব না। বাড়ীতে গোলমাল হয়েছে?'

রাজ চোখ মুছে বললে, 'না, আজ নয়, পরে বলব।'

বরুণা বললে, 'কারুকে খুঁজছিস?'

রাজ ঘাড় নাড়লে।

'কাল থেকে আমিও তোর সঙ্গে যাব, একলা একলা ভিখিরী পাড়ায় ঘুরে বেড়াস্ নি।'

এবারও রাজ শুধু ঘাড় নাড়লে।

সুজাতা এসে পড়ল, দু'জনেই চুপ করল।

পর দিন আবার বরুণা এসে রাজকে ধরল।

বললে, 'আজ কোথায় যাবি?'

রাজ বললে একটু ভেবে, 'চল্, বিড়লা মন্দিরের দিকে যাই। তার পর তোদের কালীবাড়ীর কাছে যাব।'

তার পর দিন যমুনার তীর, তার পর হনুমানজীর মন্দির, যেখানে মনে হয় সেখানে যায়, ছোট ছেলে সঙ্গে ভিখিরী মেয়ে দেখলে চকিত হয়ে এগিয়ে যায়, তার পর বিমনা ভাবে ফিরে আসে।

দিল্লীর মন্দির-পাড়া, ভিখারী-পল্লী যেন আর বাকি রইল না।

সন্ধ্যাবেলা দু'জনে ফিরে এসে কোনদিন কুইন্স্ পার্কের কোনখানে, কোনদিন 'আজমল খাঁ' বাজারের দিকের প্রকাণ্ড পার্কে ব'সে পড়ে ক্লান্ত ভাবে।

ক'দিন গেল। এবারে সহসা বরুণা জিজ্ঞাসা করলে একদিন, 'রাজ, তুই কি সেই ভিখিরী মেয়েটাকে খুঁজছিস? যে তোকে 'রাজ' ব'লে ডাকল—আর ভিক্ষে নিল না?'

রাজ হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে নিল। কিছু বলতে পারল না।

বরুণা তার একটা হাত নিজের হাতে জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'সেই মেয়েটাই ত? সে কি কেউ হয় তোর রাজ? এক মাস হয়ে গেল, তাকেই খুঁজছিস ত? তাই না?'

রাজ মুখ গুঁজেই ঘাড় নাড়লে।

বরুণা বললে, 'কে সে? আমাকে বল্, আমি কারুকে বলব না।'

রাজ তেমনি ভাবেই মুখ না তুলে খুব আস্তে মৃদু স্বরে অনেকক্ষণ পরে বললে, 'মা'।

যে কথা কোন আপনার জনকে আজ অবধি বলে নি। বাপকে নয়। কাকাদের ভাইবোনদের নয়—আজ বিদেশিনী বান্ধবীকে না ব'লে যেন আর পারছিল না।

বরুণা স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'মা?' একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'মা ত তোর নেই বলেছিলি?'

সে তেমনি ভাবেই মুখ নীচু ক'রে বললে, 'ঠিক কথা বলি নি। ও আমার মা। সেদিন প্রথম ও দূরে ছিল আর আমিও তোদের অনেক পিছনে আসছিলাম, চিনতে পারি নি। পরে যখন ভিক্ষা নিতে এগিয়ে এসে বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করলে, তখনও ত বুঝতে পারি নি। খুব রোগা আর কালো হয়ে গেছে। খুব ভালো দেখতে ছিল আগে। তার পর যখন তোমরা রাজ ব'লে ডাকলে, আর ও অবাক্ হয়ে যেন খুব আস্তে বললে, 'আ মেরি রাজ! মেরি বিবি' বলতে বলতে পেছিয়ে গেল, আর ভিক্ষে নিল না। তখন একটু সন্দেহ হ'ল যেন। তখন আমাদের বাস্ এসে গেছে। আর আমরা দাঁড়ালাম না, সেও আর ত এগিয়ে এল না···। রাত্রে বাড়ীতে গিয়ে যেন সব স্পষ্ট মনে পড়ল।'

বরুণা বললে, 'কিন্তু মা কি লাহোর থেকে তখন তোদের আসে নি?'

রাজ মুখ তুলল। বললে, 'মা কি গহনাপত্র আনতে বাড়ীর ভিতর গিয়েছিলেন, আর আসতে পারেন নি। লোকেরা ভয়ে গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল। তার পর আমরা ধ'রে নিয়েছিলাম, মা মারাই গেছেন দাঙ্গার সময়ে··।'

'তা সেদিন কেন তখুনি বললি নে? তাহলে ত বাড়ী নিয়ে যেতে পারতিস্?'

রাজ চুপ ক'রে রইল।

সহসা বরুণা যেন সন্দিগ্ধ ভাবে কি ভাবে। বললে, 'আর ঐ ছেলেটা? ওটা কে তোর? তোর ভাই?'

রাজ মাথা নাড়ল। শুধু বললে, 'আমার ভাই নয়।'

এবারে যেন কি একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল বরুণার কাছে। বরুণা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তুমি বোধ হয় ঠিক চিনতে পার নি রাজ। তোমার মা ও নয়।'

রাজ সে কথার জবাব দিল না। আর মনে মনে বরুণাও যেন জানে তার কথা ঠিক নয়।···

কিন্তু বরুণা আবার বললে, 'তুই তখন কত ছোট ছিলি—তোর কি আর মনে আছে মাকে? তোর নিশ্চয় ভুল হয়েছে। আর মা হ'লে ত চিনতে পেরে এগিয়ে আসত···।'

এবারে রাজ বললে, 'চিনতে পেরেছিল ব'লেই বোধ হয় আর এগিয়ে এল না।'

দু'জনেই যেন মনে মনে বুঝতে পারল কেন এগিয়ে এল না।

শীতের সন্ধ্যা। বাগান খালি হয়ে এসেছে। অন্ধকারও ঘনিয়ে এসেছে। গেটের ওপারে বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে কয়েকটা। ওরাও বাগান থেকে বেরুল। নিজেদের বাস্ দেখে দেখে উঠে পড়ল।

নাববার সময় বরুণা বললে, 'আচ্ছা কাল আবার খুঁজব।' তার পর সান্ত্বনার ভাবে বললে, 'কিন্তু ও তোর মা নিশ্চয়ই নয়।'

রাজ শীর্ণ মুখে হাসল একটু। তার মন জানে, সে তার মা। আর জানে, তার খোঁজ আর কোনদিনই পাওয়া যাবে না...। কেন যে পাওয়া যাবে না তাও যেন মন জানে।

রাজ বাড়ী ফিরল। কাজকর্ম সেরে শুতে কত রাত্রি হ'ল। তার পর নিঃশব্দে নিজের খাটিয়াতে শুয়ে পড়ল। নিশুতি ঘর। পাড়া শহর ও ঘুমিয়ে পড়েছে যেন।

তার ঘুম আসে না। চোখের সামনে ভেসে আসে জীর্ণ মলিন সেলাওয়ার কামিজ পরা ছেঁড়া চুন্নী (ওড়না) মাথায়, দীন মিনতি-ভরা মুখ, ভিখারীর মতই শীর্ণ একটি ছোট ছেলের হাত ধরা সেই ভিখারিণীর। কতদিন ভিক্ষা করছে সে? কতদিন ভিক্ষা ক'রে তার মুখের হাসি কথা এমন ভিখারীর মত হয়েছে!···

কেনই বা ভিক্ষা করতে আরম্ভ করল? তার বাপের বাড়ী, রাজের মামার বাড়ীর সবাই ত কত বড় লোক। এখনও মা-র বাব মা আছে। ভাইবোনও আছে কতজন। শ্বশুরবাড়ীতে এদিকেও ত ওরা ছিল! কেন খোঁজ ক'রে আসে নি? নিজের বাপের বাড়ীর ঠিকানা ত জানে সে। লুধিয়ানায় তাদের বাড়ী খুব বড় বংশ।

'কেন'র কথা—আর সে ভাবতে পারে না। সমস্ত ভাবনা যেন জটিল হয়ে ওঠে তার তরুণ মনের পক্ষে। মনে হয়, বাবাকে বা কাকাদের কারুকে বলে এই কথা। কিন্তু তাঁরা যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন আগে বলে নি?

কি বলবে সে? চিনতে পারে নি ঠিক? না···কি?

মনে পড়ে যায় সেই ছেলেটাকে। কি বলত ছেলেটার কথা? ছেলেটা কার? মা-র কি? মা কি আসতে পারত? তাহলে লুকিয়ে পড়ল কেন?

তা হলে ও কি মা নয়?···তাই হবে। তাই বোধ হয়। রাজ বেশ আশ্বস্ত হয় যেন মনে মনে।

কিন্তু তার মনের কোন্ অতলে শীর্ণ মলিন মুখ, জীর্ণ বিবর্ণ বেশ-বাস, দীন করুণ নেত্র একটি ভিখারিণী নারী একটি ছোট ছেলের হাত ধ'রে স্থির হয়ে তার দিকে চেয়ে থাকে কুইন্স্ পার্কের ঝোপের সামনে।

যে তার মা। আর ছেলেটা তার ভাই নয়।

রামানুজমতে সাধন ও ধর্মতত্ত্ব

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

পূর্বে (চৈত্র ১৩৬৭) রামানুজমতানুসারে পঞ্চ সাধনের বিষয় কিছু সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এই সংখ্যায় রামানুজের ঈশ্বরপ্রসাদবাদ ও ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে অল্প কিছু বলা হচ্ছে।

ঈশ্বর-প্রসাদ

অন্যান্য বৈষ্ণব বৈদান্তিকদের ন্যায়, রামানুজও ঈশ্বর-প্রসাদকেই মুক্তির চরম সাধন বলে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ, জ্ঞান, ধ্যান প্রমুখ অন্যান্য সাধনাবলী মুমুক্ষুর পক্ষে অত্যাবশ্যক নিশ্চয়ই, কিন্তু পরিশেষে, তিনি ঈশ্বরকৃপালাভ করতে না পারলে সবই ব্যর্থ হয়। এই কৃপা অবশ্য যথেচ্ছ অকারণ, নির্হেতুক কৃপা নহে, ন্যায়ধর্মানুগ, সকারণ সহেতুক কৃপা। অর্থাৎ, এই কৃপালাভের জন্য মুমুক্ষুকে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করতে হয়, নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, উপাসনা প্রমুখ অত্যাবশ্যক সাধনাবলীর যথাযথ সম্পাদন করে, পরমেশ্বরের নিকট তাঁকে তাঁর স্বীয় যোগ্যতা প্রমাণিত করতে হয় এই সকল দুরূহ কার্যের মাধ্যমে। একমাত্র তখনই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ধন মোক্ষ লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হন। একমাত্র তখনই মুমুক্ষুর প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় প্রীত পরমেশ্বর তাঁর নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশিত করেন—এরই নাম 'সাক্ষাৎকার', এরই নাম মুক্তি। এরূপে ভগবৎ-প্রসাদ ব্যতীত, ক্ষুদ্র জীবের পক্ষে, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার অসম্ভব। অতএব, রামানুজের মতে, সাধন প্রণালী নিম্নলিখিতরূপ—

নিষ্কাম কর্ম—জ্ঞান—ভক্তি বা ধ্যান—ভগবৎ-প্রসাদ—সাক্ষাৎকার—মুক্তি।

রামানুজ তাঁর "শ্রীভাষ্যে" (১-১-১) কঠোপনিষদের ও মুণ্ডকোপনিষদের সেই সুবিখ্যাত শ্লোক—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" (কঠ ২-২৩, মুণ্ডক ৩-২-৩) উদ্ধৃত করে বলছেন—

"অনেন কেবল-শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানামাত্মপ্রাপ্ত্যুপায়তামুক্ত্বা, 'যমেবৈষ আত্মা বৃণুতে, তেনৈব লভ্য' ইত্যুক্তম্। প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি, যস্যায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স এবাস্য প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং প্রিয়তম আত্মানং প্রাপ্নোতি, তথা স্বয়মেব ভগবান্ প্রযতত ইতি ভগবতৈবোক্তম্।...অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা স্মৃতিঃ স্মর্যমাণাত্যর্থ স্বয়মপ্যত্যর্থ প্রিয়া যস্য, স এব পরমাত্মনা বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্মনেত্যুক্তং ভবতি।"

অর্থাৎ, কেবলমাত্র শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আত্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষলাভের উপায় নয়, যাঁকে পরমাত্মা স্বয়ং বরণ করেন, তিনিই কেবল পরমাত্মাকে লাভ করেন, কিন্তু পরমাত্মা কেবল তাঁকেই বরণ করেন যিনি তাঁর প্রিয়তম; এবং তিনিই পরমাত্মার প্রিয়তম যাঁর নিকট পরমাত্মাই প্রিয়তম। যাতে এই প্রিয়তম জন পরমাত্মা লাভ করতে পারেন, সেজন্য স্বয়ং পরমাত্মাই প্রযত্ন করেন। সুতরাং যিনি অতিপ্রিয় পরমাত্মার ধ্যানকেই অতিপ্রিয় বস্তু বলে জীবনে গ্রহণ করেন, একমাত্র তিনিই পরমাত্মার বরণীয় হন, একমাত্র তিনিই পরমাত্মাকে লাভ করেন।

একতত্ত্ববাদী অদ্বৈতবেদান্ত ব্যতীত একেশ্বরবাদী অন্যান্য বেদান্ত সম্প্রদায়েরা সকলেই ঈশ্বরকৃপাবাদ বা Theory of Grace স্বীকার করেছেন। বলা বাহুল্য যে, অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরকৃপাবাদের শাশ্বত স্থান নেই, যেহেতু পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ত জীবই স্বয়ং ব্রহ্ম। অপর পক্ষে, সাধারণ ধর্মের দিক্ থেকে বা একেশ্বরবাদের দিক্ থেকে, ঈশ্বরকৃপাবাদ অতি স্বাভাবিক।

পুনরায় এই ঈশ্বরকৃপাবাদের দু'টি রূপ আমরা জগতের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে দেখতে পাই, যথা: সাধারণ ঈশ্বর কৃপাবাদ এবং ঈশ্বর-হস্তক্ষেপবাদ (Theory of Grace; and Theory of Special Grace or Intervention)। ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি কর্মবাদ, সেজন্য এই দর্শনে সাধারণ ঈশ্বরকৃপাবাদই কেবল স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু খ্রীশ্চীয়ান ও ইসলামীয় দর্শনে ভারতীয় অর্থে কর্মবাদ গ্রহণ করা হয় না বলে, ঐ সব দর্শনে বিশেষ ঈশ্বরকৃপাবাদ বা ঈশ্বর-হস্তক্ষেপবাদ স্বীকৃত হয়েছে।

এরূপে ভারতীয় দর্শনের মতে, ঈশ্বরকৃপা মোক্ষের চরম সাধন বা উপায় হ'লেও, এই কৃপা মুমুক্ষুর নিজের কর্মসাপেক্ষ। অর্থাৎ মুমুক্ষুর নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান প্রমুখ সাধনানুসারেই পরমেশ্বর তাঁকে কৃপা

এবং ম' ান করেন। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ভারতীয় মতে, কর্মবাদানুসারে, প্রত্যেক জীবই স্বীয় কৃতকর্মের ফলভোগ করে—স্বয়ং ভগবানও এক্ষেত্রে শক্তিহীন, কারণ তিনিও কোনো কর্মের যথোপযুক্ত ফলের বিন্দুমাত্রও ব্যত্যয় বা ব্যতিক্রম ঘটাতে পারেন না। যেমন, কোনো পাপকাজ করে ফেলে, পাপী ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করলে, পরমকরুণাময়ও তাকে সেই পাপকাজের যথোপযুক্ত, অবশ্যম্ভাবী ফল থেকে রক্ষা করতে পারেন না, সেই কৃতকর্মের ফল তাকে আজ না হয় কাল, এই জন্মে না হয় জন্মান্তরে পেতে হবেই হবে, আর অন্য কোনো উপায় নেই। এরূপে ভারতীয় দর্শনের মতে, একবার একটি কাজ করা হয়ে গেলে পরে, তার আর কোনোদিনই, কোনো ক্রমেই, কোনো রূপেই পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম সম্পূর্ণ অসম্ভব—পরের অনুতাপ, নবসংকল্প, ক্ষমাভিক্ষা, পুণ্যকর্ম, সাধনা, প্রার্থনা, ঈশ্বরকৃপা কোনো কিছুই আগের কৃতকর্মের ন্যায্য ফলকে বিনষ্ট বা পরিবর্তিত করতে পারে না। ঈশ্বরের দু'টি রূপ বা দিক্—ন্যায়বিচারকরূপ ভীষণ দিক, এবং পরম করুণাময়রূপ কোমল দিক। এ স্থলে প্রশ্ন এই যে: প্রথম দিকটি দ্বিতীয় দিক দ্বারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হতে পারে কি না। ভারতীয় দর্শনের উত্তর এই যে—তা হতে পারে না, করুণা দ্বারা ন্যায়ের অমোঘ বিধানের অন্যথা হতে পারে না; সর্বশক্তিমান্ ও পরমকরুণাময় ঈশ্বর কোনো কৃতকর্মের ফলের উপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করে তা পরিবর্তন করতে অসমর্থ। এবং এই অসমর্থতা তাঁর শক্তিহীনতা প্রমাণ করে না,—কারণ, তিনি স্বয়ং ন্যায়স্বরূপ, স্বরূপের বিরুদ্ধ আচরণ করা কারও পক্ষেই ত সম্ভবপর নয়, এবং সম্ভবপর না হলে তা শক্তিহীনতারও পরিচায়ক নয়। সেজন্য, ভারতীয় দর্শনের যে একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়সমূহ সাধারণ ঈশ্বরকৃপাবাদ স্বীকার করেন, তাঁরা কর্মবাদানুগ ভাবেই তা স্বীকার করেন, কারণ, ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি যে কর্মবাদ, তার বিরোধী কোনো মত একমাত্র চার্বাক দর্শন ব্যতীত অন্য কোনো দার্শনিক মতবাদে গ্রহণীয় হতে পারে না।

কিন্তু খ্রীশ্চীয়ান ও ইস্লামীয় মতবাদে, ভারতীয় কর্মবাদের স্থান না থাকাতে, তাঁরা অনায়াসে বিশেষ ঈশ্বরকৃপাবাদ বা ঈশ্বর-হস্তক্ষেপবাদ সমর্থন করতে পারেন। তাঁদের মতে, সর্বশক্তিমান্ ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব। সেজন্য, তাঁর ন্যায়বিচারকের দিকটি পরমকরুণাময় দিকটির দ্বারা প্রভাবিত ও অভিভূত হতে পারে। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে কর্মফলের ব্যত্যয় ঘটাতে পারেন, পাপীকে কৃত পাপকর্মের ফলভোগ থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিতে পারেন, পুণ্যবানকে কৃত পুণ্যকর্মের যে ন্যায্য ফল, তার চেয়ে বহুগুণে অধিক ফল দান করতে পারেন। অর্থাৎ, এক কথায়, তিনি কর্মবাদের বা ন্যায়বিচারের অমোঘ বিধানে হস্তক্ষেপ করে, দয়া দ্বারা ন্যায়কে কোমল করে, কৃতকর্মের উপযুক্ত, ন্যায্য ফল প্রসবের ক্ষেত্রে বাধাদান করতে পারেন। সুতরাং, এই মতানুসারে, অনুতাপ, মার্জনাভিক্ষা, শুভ নবসংকল্প, প্রার্থনা, পুণ্যকর্ম প্রভৃতির প্রভাবে, অথবা এমন কি, অকারণেই বিগলিত-হৃদয়, পরমকরুণাময় ঈশ্বর জীবকে কৃপাদানে ধন্য করতে পারেন। যেমন, পবিত্র কোরাণে বলা আছে যে, সাধারণতঃ, ন্যায়ধর্মানুসারে, আল্লা পুণ্যবানদেরই মস্তকে কৃপাবারি বর্ষণ করেন। কিন্তু, তাঁদের মহিমার কথা বিবেচনা করে, পরমকরুণাময় ঈশ্বর তাঁদের ন্যায্য দাবী ও প্রাপ্যের বহুগুণ অধিক সুফল তাঁদের সস্নেহে দান করেন। তিনি, পুনরায়, পাপীদেরও পাপকর্মের কুফল বহুলাংশে মাপ ও মকুব করে দিতে পারেন। এরূপে তিনি পুণ্যবানদের স্বর্গ থেকে উচ্চতর স্বর্গে, এবং পাপীদের নরক থেকে স্বর্গে নিয়ে যেতেও পারেন অনায়াসে। সুতরাং, এই মতে, ঈশ্বরের কৃপা জীবের কর্মানুসারী নয়। সেজন্য এই কৃপা জীবের কর্মানুগ পুরস্কার নয়, ঈশ্বরের দানই মাত্র; এতে তার কোনোরূপ দাবী নেই, এ ঈশ্বরের দয়াই মাত্র। খ্রীশ্চীয়ান মতেও, ঈশ্বরপুত্র যিশু জীবের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, তার উদ্ধারের জন্য ধরাতলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেজন্য, এই মতেও, ভগবৎ-প্রসাদ জীবের কর্মানুসারী নয়।

যা হোক্, এস্থলে সমস্যা হ'ল এই যে, ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতকল্পে ঈশ্বরকৃপাবাদের স্থান কোথায়? যদি একবার কর্মবাদকেই ভারতীয় দর্শনের মূলগত তত্ত্ব বলে গ্রহণ করা হয়, তা হলে পুনরায় ঈশ্বরকৃপাবাদ ত এই দর্শনে স্বীকৃত হতেই পারে না। কারণ, জীব স্বীয় কর্মবলেই, সাধনফলেই মুক্তির অধিকারী হবে—ঈশ্বর-কৃপার তার প্রয়োজন কি? ঈশ্বরের দিক থেকে কোনোরূপ কৃপা বা করুণার প্রশ্নই এস্থলে উঠে না। জীব কর্ম করবে, তার ফল পাবে; জীব সাধনাবলী যথাযথ সম্পাদন করবে, তার অমোঘ ফলস্বরূপ ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ও মুক্তিলাভ করবে। সুতরাং মুক্তি জীবের ন্যায্য দাবী, পরমেশ্বরের দয়ার দান নয়। পরমেশ্বর কৃপা করে, অশেষকরুণাভরে নিজেকে জীবের নিকট প্রকাশিত করছেন না—এ যে তাঁকে কর্মবাদানুসারে করতে হবেই হবে—তিনি অধিকারী জীবকে স্বীয় দর্শনদান করতে

বাধ্য। সুতরাং, মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরকৃপাবাদ যুক্তিসঙ্গত নয়।

কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে কোনো অসঙ্গতি এই মতবাদে নেই। পূর্বেই বহুবার বলা হয়েছে যে, কর্মবাদ ভারতীয় দর্শনের মূলীভূত তত্ত্ব, এবং তার অন্যান্য সমস্ত তত্ত্বই সেই প্রধান তত্ত্বানুসারেই প্রপঞ্চিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও, কর্মবাদকেই প্রধান বলে গ্রহণ করে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বরের কৃপা জীবের কর্মানুসারী, এবং মুমুক্ষুর সাধন-প্রচেষ্টায় প্রীত হয়েই ভগবান্ তাঁকে কৃপাদান এবং স্বীয় সাক্ষাৎকারে ধন্য করেন।

বস্তুতঃ, এক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার ও মুক্তি জীবের কর্মানুগ বা কর্মের ফল বলে, এ তার ন্যায্য দাবী নিশ্চয়ই, কারো দয়ার দান নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মের দিক্ থেকে, ঈশ্বর ও জীবের প্রকৃত সম্বন্ধটি সুপরিস্ফুট করবার জন্যই, ভারতীয় একেশ্বরবাদিগণ এই ঈশ্বর-কৃপাবাদের অবতারণা করেছেন। জীবেশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে, ধর্মের দিক্ থেকে, ভারতে দু'টি প্রকারভেদ দেখা যায়: একটি হ'ল ভয়ের, দূরের সম্বন্ধ; অন্যটি হ'ল প্রীতির, নিকটের সম্বন্ধ। প্রথমটির উপমা হ'ল: রাজা-প্রজা, গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র; দ্বিতীয়টির উপমা হ'ল: মাতা-পুত্র, পতি-পত্নী, দুই সখা। প্রথম দিক থেকে বলা চলে যে, যেস্থলে পূজ্য-পূজক, নিয়ামক-নিয়ম্য, আশ্রয়-আশ্রিত সম্পর্ক, সেস্থলে দাবীর অপেক্ষা ভিক্ষাই অধিক শোভন। যাঁরা আমাদের অশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র, যাঁদের আমরা আমাদের অপেক্ষা সর্বাংশে উচ্চতর ও গরীয়ান্ বলে মনে করি, তাঁদের কাছে আমরা সরবে দাবী পেশ করতেই পারি না, বরং নতমস্তকে তাঁদের কাছে ভিক্ষা যাচঞা করি। যেমন, শিষ্য গুরুর কাছে রক্তচক্ষে, ভীমগর্জনে জ্ঞান দাবী করবে—এ তার চিন্তারও অতীত। উপরন্তু সে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁর পাদপ্রান্তে বসে, সেই জ্ঞান সবিনয়ে প্রার্থনা করে। একই ভাবে, পুত্রও পিতার কাছে ভরণ-পোষণ, সম্পত্তি, অন্যান্য সমস্ত সুষ্ঠু ব্যবস্থাদির জন্য সরোষ দাবী উপস্থাপিত করে না, তাঁর আশ্রয় ও পরিচালনা সম্ভ্রমসহকারে প্রার্থনা করে। দেশের রাজা যখন সত্যই দেশপালক ও প্রজারঞ্জক ছিলেন, সেই সত্যযুগে প্রজার কোনো আইনগত দাবী-দাওয়া ছিল না রাজার উপর, কাতর প্রার্থনাই কেবল ছিল। একই ভাবে, জীবের মুক্তিতে পূর্ণতম দাবী থাকলেও, সে তা ভিক্ষাই করে নেয় সেই সর্বশক্তিমান্, সর্বপূজ্য, ভূমা মহান্ "মহতো মহীয়ান্", পরম প্রভুর নিকট। দ্বিতীয় দিক্ থেকে, এই তথ্যটি স্পষ্টতর। যাঁদের মধ্যে মধুরতম, নিকটতম, প্রীতির সম্পর্ক, তাঁদের মধ্যে শুষ্ক দাবী-দাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। মাতার কাছে পুত্র, পতির কাছে পত্নী, সখার কাছে সখা কবে কোন্ দাবী উপস্থাপিত করেন? বরং, যা নিজেদের অতি ন্যায্য অধিকার বলে তাঁরা জানেন, তাও ত তাঁরা স্বেচ্ছায়, সানন্দে হাত পেতে চেয়ে নেন প্রেমাস্পদের কাছ থেকে।

বস্তুতঃ, যেখানে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও প্রীতি বিরাজ করছে, সেখানে দাবী, অধিকার প্রভৃতির স্থান নেই। কারণ, এগুলির মধ্যে বাধ্যবাধকতার, ঔদ্ধত্যের, বিরোধের, সংগ্রামের, বলপ্রয়োগের, রুক্ষতার ও কঠোরতার যে আভাস পাওয়া যায়, তা সর্বাংশেই শ্রদ্ধা ও প্রীতিমূলক সম্বন্ধের বিরোধী। 'দাবী' কথাটি ব্যবহার করলেই মনে হয় যে, আমরা যেন অনিচ্ছুক কোনো খাতকের কাছ থেকে, উদ্ধত ভাবে, বলপ্রয়োগ করে আমাদের সব পাওনা আদায় করে নিচ্ছি; এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের যেন রুক্ষ, কঠোর খাতক-পাওনাদারের সম্পর্কই মাত্র, প্রাণের সুমধুর সম্পর্ক নয়। সেজন্য কর্মবাদবিশ্বাসী হয়েও বৈদান্তিকেরাও যে, মোক্ষকে দাবীর বস্তু করে তোলেন নি, তা অতি সুবুদ্ধিপ্রসূত। আমাদের দিক্ থেকে কর্মানুসারে, সাধনানুসারে আমাদের যা ন্যায্য দাবী, তা আমরা দাবী বলে পেশ না করে, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে, সবিনয়ে ও সানন্দে, স্বেচ্ছায় তুলে দিচ্ছি সেই ন্যায়স্বরূপ, করুণাময় পরমেশ্বরের হাতে; আবার মাথা নীচু করে, হাত পেতে তা চেয়ে নিচ্ছি তাঁরই স্নেহের উপহার বলে। পরমেশ্বরের দিক্ থেকে, তিনি কর্মের অমোঘ শক্তির তাড়নায় কেবল বাধ্য হয়েই নয়, দাবী পূর্ণ করতে হবে বলেই অনিচ্ছায় নয়; কিন্তু স্বেচ্ছায়, সস্নেহে, সাগ্রহে, সানন্দে জীবকে প্রিয়তমরূপে বরণ করে নিচ্ছেন, আহ্বান করে নিচ্ছেন তাঁকে তাঁর অমৃতলোকে, প্রকাশিত করছেন তার কাছে তাঁর ভাস্বরস্বরূপ, অঝোরে বর্ষণ করছেন তার মস্তকে তাঁর করুণার পুষ্পবৃষ্টি। এই ত হ'ল মুক্তি, এই ত হ'ল পরমানন্দময়-ব্রাহ্মী-স্থিতি—দাবী পূরণের রুদ্রমূর্তিতে নয়, স্নেহসুকোমল দানের অনির্বচনীয় মধুরিমাতেই তার প্রকাশ! কর্মবাদমূলক ভারতীয় ঈশ্বরকৃপাবাদের এইটিই হ'ল মূল কথা!

ধর্মতত্ত্ব

রামানুজের মতবাদ একেশ্বরবাদ বা Monotheism হলেও, তিনি প্রধানতঃ ছিলেন দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ব-প্রচারক নন। শঙ্করের অদ্বৈতবাদে পারমার্থিক দিক্ থেকে

সাধারণ অর্থে গৃহীত 'ধর্মের' স্থান নেই; এবং সেজন্য রামানুজ ধর্মতত্ত্বকে ব্যবহারিক তত্ত্বের স্তর থেকে পারমার্থিক তত্ত্বের স্তরে উন্নীত করেছিলেন, সত্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, রামানুজের মতবাদ বহুলাংশে দর্শনমূলক, এবং দার্শনিক যুক্তিতর্কই এর প্রধানতম উপজীব্য। সেজন্য রামানুজের প্রধানতম, প্রকৃষ্টতম ও বৃহত্তম গ্রন্থ "শ্রীভাষ্যে" আদ্যোপান্ত দর্শনমূলক—ধর্মতত্ত্বের কোনো আলোচনা এতে নেই। তাঁর ক্ষুদ্রতর গ্রন্থ "বেদান্তসার" এবং "বেদান্তদীপও" সম্পূর্ণরূপে দর্শনমূলক। নিম্বার্কের ন্যায় রামানুজও দর্শন ও ধর্মের অযথা সংমিশ্রণ থেকে স্বীয় রচনাকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ধর্মের দিক্ থেকে, রামানুজের ব্রহ্ম বিষ্ণু নারায়ণ বা পুরুষোত্তম। "শ্রীভাষ্যে" এই নামগুলির উল্লেখ থাকলেও, সাম্প্রদায়িক ধর্মের বিষয় আর অন্য কিছু নেই। এই বিষয়ে আমরা পরবর্তী আচার্যবৃন্দের গ্রন্থ, শ্রীনিবাস দাস বিরচিত সুবিখ্যাত "যতীন্দ্র-মত-দীপিকা" প্রভৃতি থেকে জানতে পারি। যেমন, লোকাচার্য তাঁর "তত্ত্বত্রয়ে" বলেছেন যে, বৈকুণ্ঠে-শ্রী, ভূ ও লীলাদেবী সহ নারায়ণ সেবাই পরম পুরুষার্থ।

"যতীন্দ্র-মত-দীপিকায়" ঈশ্বরের পঞ্চপ্রকার ভেদের উল্লেখ আছে (পৃঃ ৮৩)। যথা (১) "পর" বা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ, পরব্রহ্ম, পরবাসুদেব, নারায়ণ রূপ—এটি হ'ল তাঁর বৈকুণ্ঠনিবাসী, শ্রী-ভূ-লীলাসমন্বিত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তি। (২) "ব্যূহ" বা ঐ "পরের" চারটি রূপ—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। সৃষ্টি প্রভৃতির জন্য ও ভক্তগণের উপাসনার সুবিধার্থে "পর" এই "ব্যূহ" রূপ ধারণ করেন! (৩) "বিভব" বা মৎস্য-কূর্ম-প্রমুখ দশাবতার রূপ। (৪) "অন্তর্যামী" বা জীবের হৃদয়স্থিত ঈশ্বর রূপ। (৫) "আচার্যাবতার", ঈশ্বরের বিভিন্ন বিগ্রহ বা প্রতিমা-রূপ।

অবতারবাদ

ধর্মের দিক থেকে বৈদান্তিকগণ সকলেই পরব্রহ্মের বিভিন্নরূপপরিগ্রহ স্বীকার করেছেন। এই হল ভারতের সুবিখ্যাত "অবতারবাদ।" এই বহু সমালোচিত অবতারবাদের মূল কথা কেবল এই যে, দর্শনের দিক্ থেকে যিনি অরূপ, ধর্মের দিক থেকে তাঁকেই রূপের মধ্যে পাবার আকুতি জাগে, এবং তারই পূর্ণতম তৃপ্তি এই অবতারবাদে। একদিকে ঈশ্বর অরূপ, বিশ্বাতীত, অন্যদিকে তিনি বিশ্বরূপ, বিশ্বলীন। যেমন, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে, ঈশ্বরের অরূপত্ব ও বিশ্বরূপত্বের বিষয় অতি সুন্দর ভাবে বলা আছে—

"ন সদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা হৃদিস্থং মনসা য এন
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" (৪-২০)।

অর্থাৎ, তাঁর দর্শনযোগ্য রূপ নেই, কেহ তাঁকে চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না। যাঁরা হৃদয় ও মন দ্বারা তাঁকে হৃদয়স্থিত বলে জানেন, তাঁরা অমৃতত্ব লাভ করেন।

এই ভাবে, পরমেশ্বর রূপাতীত, দর্শনাতীত বিশ্বাতীত।

কিন্তু অন্যদিকে তিনিই পুনরায় সমগ্র দৃশ্য জগৎরূপে পরিদৃশ্যমান—

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত
বিশ্বতস্পাৎ।" (৩-৩)
"সর্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশয়ঃ।" (৩-১১)
"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (-১৪)
"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃশ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" (৩ ১৬)
"তদেবাগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্বায়ুস্তদু চন্দ্রমাঃ
তদেব শুক্রং তদ্ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ।" (৪-২)
"ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥" (৪-৩)

অর্থাৎ, তাঁর চক্ষু সর্বত্র, মুখ সর্বত্র, বাহু সর্বত্র, পদ সর্বত্র। তিনি সমস্ত মুখ, সমস্ত মস্তক, সমস্ত গ্রীবাযুক্ত। তিনি সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পাদ পুরুষ। তাঁর হস্ত পদ সর্বত্র, তাঁর চক্ষু, মস্তক ও মুখ সর্বত্র। তাঁর কর্ণ সর্বত্র।

তিনিই অগ্নি, সূর্য, বায়ু, চন্দ্র; তিনিই জ্যোতি, ব্রহ্মা, প্রজাপতি।

তিনিই স্ত্রী, তিনিই পুরুষ; তিনিই কুমার, তিনি কুমারী; তিনিই জরাগ্রস্ত দণ্ডধারী, তিনি বিশ্বতোমুখ হয়ে জাত হন।

তিনিই নীল পতঙ্গ, লোহিতচক্ষু শুকাদি, মেঘ, ঋতু, নদনদী, সমুদ্র। (৪-৪)।

এই ভাবে, পরমেশ্বর বিশ্বরূপ, দর্শনযোগ্য ও বিশ্বলীন।

এই বিশ্বরূপবাদের স্বাভাবিক, ন্যায়ানুগ (logical) পরিণতিই হল অবতারবাদ। যদি পরমেশ্বর বিশ্বরূপ হন, যদি বিশ্ব তাঁর মূর্তরূপ, প্রকাশ, বা পরিণতি হয়,

তাহলে বিশ্বের প্রতিটি বস্তুই তাঁর প্রত্যক্ষ মূর্তি বা অবতার। কারণ, একই নিরংশ, অখণ্ড, অবিভাজ্য, পূর্ণ ব্রহ্মই বিশ্বচরাচরের প্রতি অণু-পরমাণুতে, প্রতি তৃণগুল্মে, প্রতি কীট-পতঙ্গে, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতি বস্তুতে সমান ভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, পাত্রের তারতম্য ভেদে, একই রবিরশ্মি যেমন হীরক ও কয়লার উপর সমান ভাবে প্রতিফলিত হলেও, কেবল হীরকই সেই রশ্মি গ্রহণ ও ধারণ করে, তা স্ফুরণ করে, প্রকৃষ্ট ভাবে প্রকাশ করে, কয়লা নয়—তেমনি পাত্রভেদে পরমেশ্বরের পূর্ণ স্বরূপও কেবলমাত্র দু' একজন ক্ষণজন্মা, সত্যদ্রষ্টা, ভক্ত বা সাধকই মাত্র পূর্ণরূপে প্রকটিত করতে পারেন। তাঁরাই হলেন এই বিশেষ অর্থে "অবতার", তাঁরাই হলেন নরদেহী নারায়ণ। যে জীবসত্তা ব্রহ্মসত্তাকে পূর্ণতম ভাবে গ্রহণ, ধারণ ও প্রতিফলন করতে পেরেছে, সেই জীবসত্তা আর কেবল জীবত্বের গণ্ডিতেই আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না, কিন্তু সেই মুহূর্তেই উন্নীত হয়ে যায় ব্রহ্মসত্তায়, একীভূত হয়ে যায় সেই ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে। সেজন্যই, অবতারকে গ্রহণ করা হয় স্বয়ং ঈশ্বররূপেই, ঈশ্বরের দূতরূপেই কেবল নয়, তাঁর মূর্ত প্রতিচ্ছবিরূপেই। পূর্ণ ব্রহ্ম অপূর্ণ জীবে কি করে অবতরণ করবেন, পবিত্র ব্রহ্ম অপবিত্র দেহে কি করে রূপ ধারণ করবেন—সেই সব সমস্যা-সমাধানের প্রশ্ন সেজন্য এক্ষেত্রে নেই।

ভারতের পরবর্তী যুগের প্রতিমা পূজার মধ্যে যে তত্ত্ব নিহিত হয়ে আছে, অবতারবাদের মধ্যেও ঠিক তাই। প্রতিমাকে পূজা করা হয় মৃৎপিণ্ড বা ধাতুখণ্ড জ্ঞানে নয়, স্বয়ং ভগবান জ্ঞানে। একই ভাবে, অবতারকেও পূজা করা হয় মানুষ জ্ঞানে নয়, স্বয়ং ভগবান জ্ঞানে।

বস্তুতঃ, দর্শনের দিক্ থেকে প্রয়োজন না হলেও, ধর্মের দিক থেকে সাধারণ প্রত্যক্ষগোচর প্রতীক হয়ত মানুষের আবশ্যক হয়। কারণ, ধর্মের মূল কথা হ'ল ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দর্শনের নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় সম্বন্ধ এ নয়, এ হল শ্রদ্ধা ও প্রীতি অর্পণের সম্পর্ক, হৃদয়ের আদান প্রদানের সম্পর্ক, এবং এই আদান প্রদান ব্যক্তিরই উপর নির্ভরশীল। সেজন্য সেই ব্যক্তিকে কেবল মানসিক ভাব মাত্রেই পর্যবসিত না করে, স্থূল, দৃশ্যরূপে কাছে পাবার আকাঙ্ক্ষা অস্বাভাবিক নয়।

প্রকৃতপক্ষে, মহামানবেরা আমাদের নিকট এক অপার্থিব অমরলোকের বার্তা বহন করেই আবির্ভূত হন। তাঁরা নরদেহধারী হলেও তাঁদের কার্যকলাপ সাধারণ মানুষের মত নয়, তাঁরা জড়জগদ্বাসী হলেও, জড়াভিভূত নন। আমরা এইটুকুই যখন স্বীকার করি, তখনই ত আমরা ক্ষুদ্র জীবত্বের গণ্ডি ভেদ করে দেবত্ব আরোপ করি তাঁদের সত্তায়; এবং এরূপ আরোপই হল অবতারবাদের মূল কথা।

রামানুজ শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে ভক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন অতি জোরের সঙ্গে। কিন্তু তাঁর অন্তরের প্রবৃত্তি ছিল প্রধানতঃ জ্ঞানবাদের দিকেই। সেজন্য তাঁর ভক্তিও জ্ঞানমূলক, এবং জীবেশ্বরের মধ্যে শ্রদ্ধাঙ্গ, সম্ভ্রমসঙ্কুল, ভয়মিশ্রিত ভক্তির উপরই তিনি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থাৎ, তার ভক্তি মাধুর্যপ্রধানা নয়। শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানবাদের বিরুদ্ধে শুদ্ধবিচারমূলক যুক্তি তর্ক উত্থাপন করতে করতে, তাঁর নিজের মনের সুরটিও বাঁধা হয়ে গিয়েছিল সেই তানে। সেজন্য তিনি শঙ্করের প্রধানতম সমালোচক হলেও, তাঁর স্বীয় মতবাদের সমগ্র ভাবটিই জ্ঞানবাদগন্ধী—পরবর্তী ভক্তিবাদের মধুর রসের আমেজ তাতে একেবারেই নেই।

সে নহি

সে নহি

শ্রীচাণক্য সেন

ছয়

দেববাণীর ঘরের মস্ত জানলা দিয়ে বাসন্তী দেবী আকাশের পানে তাকিয়ে ছিলেন। শীতের নীল আকাশ, সূর্যের তাপে উজ্জ্বল ; ইতস্ততঃ খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘের খেয়াল-খুশি সঞ্চরণ। দূরে গাছপালার সবুজের ঊর্ধ্বে বাদশাহ হুমায়ুনের কবরের শীর্ষ-গম্বুজ। সকালে উঠে বাসন্তী দেবী স্নান সেরে পূজো করেছেন ; মোটা সাদা মিলের শাড়ী পরেছেন দেববাণীর অনুরোধে। গরম জলে স্নান করতে চান নি, কিন্তু সেখানেও দেববাণীর অনুরোধ এড়াতে পারেন নি। "এখন তুমি আমার হাতে," জোর গলায় বলেছে দেববাণী ; "অনেকদিন তুমি যা বলেছ আমরা করেছি। এখন আমি যা বলব, তুমি করবে।"

"মোটামুটি মানলাম," হেসেছেন বাসন্তী দেবী। "কিন্তু তুইও যেমন মাঝে-মধ্যে আমার অবাধ্য হয়েছিস, আমারও তেমনি অবাধ্য হবার অধিকার নিশ্চয় থাকবে।"

মুখখানা হঠাৎ ম্লান হয়েছে দেববাণীর। "সে তুমি ঠিক মত শাসন করতে পার নি ব'লে," সামলে নিয়েছে পরক্ষণেই। "আমার শাসন বেশী কড়া। অবাধ্য হ'লে চলবে না।"

কাজে বেরিয়ে গেছে দেববাণী। বাসন্তী দেবী পূজো সেরে গায়ে পশমী র‍্যাপার জড়িয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। কন্‌কনে শীতের হাওয়া বইছে। যা একটু ক'রে আসছে তাতে হাড় কেঁপে উঠছে। এ শীতের মাদকতা আছে, ভাবছেন বাসন্তী দেবী। চকচকে আকাশে দিগন্ত-বিস্তৃত নীলের পানে তাকিয়ে মন তাঁর কোন্ উদাস অতীতে চ'লে গেছে। ইতিহাসের কত রহস্যময় স্বাক্ষর বহন ক'রে আছে দিল্লীর পথের ধুলা, বাতাস। দূরে ঐ সমাধি-মন্দিরে হুমায়ুনের স্মৃতি। তারও হাজার হাজার বছর আগে মহাভারতের যুগ পদচিহ্ন রেখে গেছে দিল্লীর মাটিতে। কত সাম্রাজ্য, কত রাজা, কত রাজধানী আজ নিশ্চিহ্ন। এই সুবিস্তীর্ণ মানব ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখলে কত ক্ষুদ্র, কত অর্থহীন লাগে আমাদের জীবন! যেন অনন্ত-প্রবাহিনী মহানদীর একবিন্দু জল এক-এক মানুষ। অথচ কত জটিল, কত রহস্যময়, সমস্যা-সংকুল আমাদের প্রত্যেকের জীবন। কত বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত প্রতি জীবনের এক এক শাখা-নদী। কত কূলে কূলে ঢেউ তুলে অজানা-অচেনা পথে অবিশ্রান্ত তার গতি। অথচ এমন শক্তি মানুষের অজানাকে জানবার, অচেনাকে চেনবার, বিচিত্রকে গ্রহণ করবার যে, মনেই যেন হয় না, জীবন চলেছে এক নব কূল ছাপিয়ে। মনে হয় যেন এক-টানা চ'লে এসেছি, থামি নি, বসি নি, ভাবি নি ; শুধু দেহ কখন জরাগ্রস্ত হয়েছে, মন ক্লান্ত। ভাগ্যিস মানুষকে সর্বদা অতীতের বোঝা বইতে হয় না, তাই সে বর্তমানের রাস্তা ধ'রে ভবিষ্যতে পা বাড়াতে সাহস পায়। ভাগ্যিস মানুষ ভোলে ; তা নইলে স্মৃতির অলঙ্ঘনীয় পাহাড় দাঁড়াত তার যাত্রাপথ অবরোধ ক'রে।

আজ এই শীতের রোদ-চকচকে কর্মহীন সকালে ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাসন্তী দেবী নিজের জীবনের অতীতকে যেন চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ দেখতে পেলেন। বড় বিস্ময় লাগল তাঁর। কি বিরাট্ পরিবর্তনের বিন্যাস চারদিকে! কত যুগ, কত কাল এর মধ্যে গলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কত বিপ্লব, কত বন্যা, কত প্লাবন ভেঙেছে, গড়েছে এই যুগযুগান্তের অলিখিত ইতিহাসকে। যে দেববাণী একটু আগে গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে গেল গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপনের তদ্বিরে, সে কি আমারই রক্তে-মাংসে গড়া পেটে-ধরা মেয়ে? মনের মধ্যে আর একটা শূন্য স্থানে যার জন্যে ব্যথা বেজে উঠল, সে আজ অনেক, অনেক দূরে অজানা-অচেনা পরিবেশে অধ্যয়ন করছে, সেই দেবযানীও কি আমারই দেহের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল? ভাবতে কেমন অস্থির লাগে। আজ যে ষাট বছরের বৃদ্ধা এক অপরিচিত বিদেশীর গৃহে আমন্ত্রিত অতিথি, যে স্বাধীন ভারতের রাজধানীর নব-নির্মিত পোশাকী কলোনীর ফ্যাশন-দুরস্ত বাড়ীর বিরাট্ জানলা দিয়ে আজ এই শীতের সকালে ভারতবর্ষের সু-প্রাচীন ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, সে কি আমি? সে কোন্ আমি?

কাল রাত্রে দেববাণীর সঙ্গে অতীতের কথা হচ্ছিল। সে বলছিল, "মা, তোমার নতুন-নতুন লাগছে না?"

"কেন রে? আমি কি এতই পুরাণো হয়ে গেছি যে নতুনের আস্বাদও পেতে পারিনে?" তিনি কৌতুক করেছিলেন।

"ভেবে দেখ ত মা," দেববাণীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর, "কি বিচিত্র বিস্ময়কর আমাদের জীবন? যখন হাতিবাগানের ফ্ল্যাটে আমরা ছিলাম তখন কি একদিনও ভেবেছি আমার জীবনের পরিণতি এমন হবে?"

এক সঙ্গে এক খাটে শুয়েছিলেন তিনি ও দেববাণী। বাসন্তী দেবী দেববাণীর মাথায় মৃদু হাত বুলিয়ে বললেন, "পরিণতি কোথায় দেখলি? সবে ত তোর জীবন শুরু।"

"পরিণতির পথে পা বাড়িয়েছি ত?"

"ভগবান্ করুন, পথ তার দীর্ঘ হোক, প্রশস্ত হোক।"

"তোমার কথা ভেবে আরও অবাক্ লাগে আমার, মা", দেববাণী বলল। "তুমি কোথায় জীবন শুরু করেছিলে, জীবন কোথায় তোমায় টেনে এনেছে! একটা জীবনে এত বিরাট্ পরিবর্ত্তনের মিছিল ভাবা যায় না, মা। অথচ তুমি কেমন সহজ গতিতে চ'লে এসেছ, চলেছ আর বেড়েছ। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, তুমি পারলে কি ক'রে?"

দেববাণীর মাথায় হাত রেখে বাসন্তী দেবী বলেছেন, "বাণী, কি ক'রে পেরেছি তা আমি নিজেও জানিনে। তবে এটুকু জানি যে, এদেশের মেয়েদের জীবনে যে বিপ্লব ঘ'টে গেছে, পুরুষদের জীবনে তার অর্ধেকও ঘটে নি। আমরা যেমন ক'রে সবদিক্ সামলে পরিবর্ত্তনের বন্যা হজম করেছি, পুরুষরা তা পারে নি।"

"মা, তোমরা যা পেরেছ, আমরাও তা পারছি না।"

"তোদের সমস্যা অনেক জটিল রে বাণী।"

"তোমাদেরও কম জটিল ছিল না, মা। তোমরা সবদিক্ সামলাতে পেরেছ। তাই তোমাদের মধ্যে পূর্ণতা আছে, অন্তত পূর্ণতার ছোঁওয়া লেগেছে। আমরা সবদিক্ সামলাতে পারছি না। তাই আমাদের জীবনে, অনেক পেয়েও, শূন্যের বোঝা।"

"আমরা অনেক সামলেছি তার কারণ ছিল। আমাদের সমাজ ছিল, শাসন ছিল। যৌথ একান্নবর্তী পরিবারের ভাল-মন্দ বাধা-নিষেধের বর্ম ছিল। খানিকটা আদর্শবাদ, অনেকখানি দৃঢ়-বদ্ধ নীতিবোধ ছিল। আজ সে-সব কিছু নেই। সমাজ নেই। একান্নবর্তী পরিবার নেই। শাসন, বাধা-নিষেধ নেই। জীবন বহির্মুখী হয়েছে; তার দাবী ও দায়িত্ব, তৃষ্ণা ও চাহিদা অন্য রূপ নিয়েছে। নীতি-বোধ পালটে গেছে। যেখানে তাদের সামলে রাখতে পারে এমন অবস্থা নেই, সেখানে তারা সবদিক্ সামলাবে কি ক'রে?"

কিছুক্ষণ দু'জনে নীরব। নীরবতা ভঙ্গ ক'রে দেববাণী হঠাৎ প্রশ্ন ক'রল: "মা, একটা কথা খুব জানতে ইচ্ছে করে। বলবে?"

"কি কথা?"

"বলতে সংকোচ হচ্ছে, মা। অপরাধ নিও না।"

"বল।"

"বাবাকে তুমি ভালবাসতে?"

সহজে বাসন্তী দেবীর মুখে কথা এল না। এ কি অসঙ্গত আশ্চর্য প্রশ্ন মেয়ের মুখে। কিন্তু বাসন্তী দেবী বুঝলেন, জবাব তাঁকে দিতে হবে।

"তার আগে, ভালবাসা কাকে বলে বুঝিয়ে দে।"

"না, মা। ভালবাসা কি তুমি খুব ভাল ক'রে জান।"

"সন্দেহ হয় জানি কি না। তোদের মত নিশ্চয় জানি নে। ভালবাসাও যুগে যুগে বদলায়।"

"তোমাদের যুগের মাপেই বল না কেন?"

"তোর বাবা বেশিদিন বেঁচে থাকেন নি। দেবযানীর যখন পাঁচ বছর তখন তাঁর মৃত্যু হ'ল। তোর তখন সাত। তাঁর বয়স তখন পঁয়ত্রিশ বছর, আমার সাতাশ। সে আজ চৌত্রিশ বছর আগের কথা। সব মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে স্বামী হিসেবে তিনি সুখী ছিলেন। স্ত্রী হিসেবে আমি অসুখী ছিলাম না।"

"তার মানে তুমি বাবাকে ভালবাসতে পার নি।"

বাসন্তী দেবী নীরব রইলেন।

"তবু তোমরা সুখী ছিলে," দেববাণী একটু পরে বলল। "তোমাদের জীবনে ছন্দপতন হয় নি। স্ত্রীর সব কর্তব্য তুমি পালন করেছ; স্বামীর কর্তব্যের অবহেলা তিনি করেন নি। জীবনের আগুন তোমরা পাও নি, কিন্তু মৃদু উত্তাপে পরিতৃপ্ত থেকেছ। একেই আমি বলি সবদিক্ সামলে চলা! আমাদের জীবনে তা সম্ভব নয়।"

বাসন্তী দেবী বুঝলেন দেববাণীর অন্তরে দ্বন্দ্ব। এমন কোন সমস্যার সামনে সে দাঁড়িয়েছে যার সমাধান সহজ নয়। তাই মার জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন মিলিয়ে দেখছে। প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে, নিজের জীবনের প্রশ্ন।

দেববাণী ব'লে উঠল, "মা, আরও একটা প্রশ্ন আছে।"

"বল।"

"তুমি কি কোনও দিন কাউকে ভালবাস নি?"

বাসন্তী দেবী চুপ ক'রে রইলেন।

দেববাণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর বুকে আঘাত করছে। দীর্ঘকাল বিদেশে কাটিয়ে যে-দেববাণী মাতৃক্রোড়ে সংক্ষিপ্ত কালের জন্যে ফিরে এসেছে তাকে যেন তিনি পুরোপুরি চেনেন না। ও কি আমার সেই দেববাণী? যাকে নিজের হাতে মানুষ করেছি, নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা নিয়ে যাকে একদিন গড়তে চেয়েছিলাম? যে আমার অনেক আনন্দ, অনেক বেদনা? যাকে নিবিড় বন্ধনেও বাঁধতে পারি নি, যার মধ্যে বিদ্রোহের দাবানল জ্বলছে তার খবরটুকু পর্যন্ত আমার জানা ছিল না? দশ বছর অজানা পরিবেশে কত কঠিন সমস্যার সঙ্গে নিঃসঙ্গ সংগ্রামে আজ ওর মন কত বদলেছে; ওর আকাঙ্ক্ষা নতুন পাখা নিয়েছে, সংশয় নতুন অর্থ গ্রহণ করেছে। আমি ওর মা, কিন্তু আজ এই বিদেশী গৃহের অপরিচিত শয্যায় অন্ধকার শীতের রাত্রে ও আমাকে শুধু মা ব'লে জানছে না। আমি ওর কাছে অন্য কালের নারী। এ কালের মেয়ে দেববাণী অন্য কালের মেয়ে বাসন্তীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বৃদ্ধ-মাতৃত্বে পরিণত জননীকে নয়। সে বুঝতে চায়, বাসন্তীর জীবন-ধারার মধ্যে তার সংশয়ের মীমাংসার ইশারা আছে কি না। যে কথা কোনও দিন কারুর সঙ্গে হয় নি, আজ ওকে তা বলতে হবে। না বললে, ও ভাববে, মা, তুমি আমায় দিলে না। দিলে না তোমার পূর্ণ পরিচয়। ভুলে গেলে, আমি শুধু তোমার মেয়ে দেববাণী নই; আমি নারী। নারীর সমস্যা নিয়ে তোমার কাছে দাঁড়ালাম, তুমি মাতৃত্বের পর্দা তুলে আড়ালে চ'লে গেলে।

অন্ধকার ঘরে বাসন্তী দেবীর মনে হ'ল, কালের ব্যবধান ঘুচে গেছে, যুগযুগান্তরের সঙ্গে গেছে মিশে। লেপের নীচে মা ও মেয়ের সংলগ্ন দেহ উত্তাপের আরামে বিগলিত; কিন্তু দু'টি নারীচিত্তে প্রচণ্ড প্রলয়ের মৌন গর্জন!

অন্ধকার ভেদ ক'রে বাসন্তী দেবীর স্তব্ধ, অসহায়, কণ্ঠ বেজে উঠল।

"বাণী," তিনি মৃদুস্বরে বললেন, "বড় বিপদে ফেললি তুই আমায়। আমার মেয়ে তুই, কিন্তু তোকে যেন আমি আর চিনি নে। কোনওদিন তোকে আমি ভাল ক'রে চিনি নি, তাই বুঝি অত বেশি তুই আমাকে আকর্ষণ করেছিস। দেবযানীকে আমি পুরোপুরি চিনি, তাকে নিয়ে কোন সমস্যা হয় নি আমার। তুই বড় হ'লে আমার মনে ভয় হ'ল, তোকে বেঁধে রাখতে পারব না। তোর মধ্যে আমার যৌবনের ছায়া দেখতে পেতাম। বার বার অলক্ষিতে তোর মুখ থেকে, চোখ থেকে, দেহ থেকে আর একটা মেয়ে আমার পানে উঁকি মেরে মুহূর্তের ঝিলিকে ব'লে যেত, চিনতে পার? এ তোমার মেয়ে নয়, এ তুমিই। চমকে যেতাম। রাতের পর রাত চিন্তায় ঘুম আসত না। যে আমিকে চিরদিন শাসনে রেখেছিলাম, সে যে এমন লুকিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে তোর মধ্যে বাসা বাঁধবে তা কি কখনও জানতাম?"

"আমি কিন্তু জানতে পেরেছিলাম, মা, তোমার ভয়ের কারণ," দেববাণী আস্তে আস্তে বলল। "আমি জানতাম।"

যেন শুনতে পেলেন না বাসন্তী দেবী; ব'লে চললেন, "যুগে যুগে মানুষের আকাঙ্ক্ষা, বাসনা বদলে যায়। আমার পক্ষে যে সংযম, যে আত্মশাসন সম্ভব হয়েছে, তোর দ্বারা তা হবে না, এই ছিল আমার ভয়।"

"একদিন তোমার ভয় বাস্তবে পরিণত হ'ল।"

"তুই প্রশ্ন করছিলি, আমি কাউকে কোনওদিন ভালবেসেছি কিনা। বেসেছিলাম, সে যে কতকাল আগে তার পরিমাপ নেই। গ্রামে পাশাপাশি বাড়ীর প্রায় সমবয়সী দু'টি ছেলেমেয়ে। ছোট্টবেলা থেকে এক সঙ্গে খেলে, বেড়ায়, চলে। গ্রাম্য সম্পর্কে দু-পরিবারে নিকট-বন্ধন। একদিন যে এই আশৈশব সখ্য ভালবাসায় ফুটে উঠবে তা কি তারাই কোনওদিন ভাবতে পেরেছিল?"

রুদ্ধনিঃশ্বাসে দেববাণী শুনল। মা-র কথা নয়। বাসন্তীর কথা। অন্য কালের একটি মেয়ের জবানবন্দী।

"সে ছিল প্রথম স্বদেশীর যুগ। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পরে সন্ত্রাসবাদের প্রথম প্রকাশের যুগ। বাংলার প্রাণ-কেন্দ্র কলকাতা থেকে অনেক দূরে আমাদের গ্রাম; কিন্তু সে যুগের বহ্নিবন্যা আমাদেরও পুড়িয়েছিল; গ্রামে গ্রামে চাপা উত্তেজনা। যুবকের দল একদিকে দেহমন-গঠনে হঠাৎ মনোযোগী, অন্যদিকে স্বদেশীর নেশায় তপ্ত-রুধির। সে ছিল আশ্চর্য আদর্শবাদের যুগ। বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ। সে যুগে যে বাস করে নি তার ধারণা হবে না, কি এক অভিনব আদর্শে বাংলার ছেলেদের চিত্ত সেদিন উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিল। যুবকেরা গোপনে দল গঠন করত, গোপনে চলত তাদের দেশের পূজা। বাছা বাছা যুবকদের ডাক পড়ত ঢাকায়, কলকাতায়, সন্ত্রাসবাদে আত্মবলির জন্যে। এমনি একদিন ডাক পড়ল, যার কথা বলছি, তার।"

জোরে নিঃশ্বাস নিলেন বাসন্তী দেবী। দেববাণী বুঝল, বলতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। যেন উদ্বেল সমুদ্রের

উত্তুঙ্গ তরঙ্গ অতিক্রম ক'রে অতীতের স্মৃতি-দ্বীপের দিকে পাড়ি দিয়েছেন বাসন্তী দেবী।

"একদিন সে হঠাৎ গ্রাম ছেড়ে চ'লে গেল। গেল রাত্রে, যাবার আগে সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ীতে বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'ল তার। দরজা বন্ধ ক'রে ঘণ্টা দুই ওরা কি সব আলোচনা করল; আমি কৌতূহল চেপে রইলাম বাধ্য হয়ে। যখন দরজা খুলে সে বেরিয়ে এল, মুখ তার ভীষণ গম্ভীর। বাবাকেও দেখলাম, ভয়ানক গম্ভীর, বড় বিষণ্ণ। বুঝলাম, প্রশ্ন ক'রে জবাব পাওয়া যাবে না। যাবার আগে সে আমায় কাছে ডাকল। বলল, বাসন্তী, আমি আজই রাত্রে কোথাও যাচ্ছি।

"কোথায় যাচ্ছ, প্রশ্ন করা বৃথা, তাই শুধু জিজ্ঞেস করলাম, কবে আসবে? সামান্য হেসে সে বলল, জানি না।

"একদল সন্ত্রাসবাদী ধরা পড়েছিল কিছুদিন আগে। দলের একজন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ধরিয়ে দিয়েছিল। তখন নিয়ম ছিল বিশ্বাসহন্তার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। যে ভীরু বিশ্বাস ভেঙেছিল, মৃত্যুভয়ে শহর থেকে পালিয়ে আমাদের পাশের গ্রামে নিজের বাড়ীতে সে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। পুলিস পাহারা থাকত সে বাড়ীতে রাত্রিদিন। আমরা শুনতাম ছেলেরা বলছে, তার দিন শেষ হয়ে এসেছে।

"আমার মনে বড় ব্যথা লাগত। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। আদর্শের আগুনে পুড়েছিল, তাই স্বদেশীতে যোগ দিয়েছিল। শেষ পরীক্ষায় উৎরোয় নি। ভেঙে পড়েছে। মনে হ'ত, এ দুর্বলতা ক্ষমার অযোগ্য নয়। তাকে হত্যা করলে মায়ের কি হবে, ভাবতে চোখে জল আসত। মা দিনরাত তাকে ঘিরে থাকে, মুহূর্তের আড়াল করে না। কিন্তু ছেলেরা আমার দুর্বলতায় হাসত। এমনি ক'রে অগ্নিযুগের দল-গঠন চলে না। বিশ্বাসঘাতকের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। ভীরুর স্থান নেই অগ্নিযুগে।

"আট দিন পরে সে ফিরে এল। নিদারুণ গাম্ভীর্যে সে তখন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বাবার সঙ্গে আরও গোপন কথাবার্তা চলল। বাবাকে জীবনে আমি অত গম্ভীর, অত নিরানন্দ দেখি নি। কয়েকবার তাকে প্রশ্ন করতে গিয়ে নিষ্ঠুর দেওয়ালে ধাক্কা খেলাম। বুঝলাম, কোনও আসন্ন ভয়ংকর কাজে তার আহ্বান এসেছে। কিন্তু সে যে কি ভয়ংকর তা অনুমান করারও সাধ্য আমার ছিল না।

"ক'দিন পরেই সব জানাজানি হয়ে গেল। বিশ্বাসহন্তা যুবকটি সর্বদা সতর্ক পাহারায় বাস করে। বাড়ীর আশেপাশে রজনীর অন্ধকারে প্রতিদিন অজ্ঞাত মানুষের ভয়াল পদধ্বনি। তাকে লক্ষ্য ক'রে আর্ত অনুনয়ে রোজ তার মা বলেন, ওর যত অপরাধই হয়ে থাকুক, ও আমার একমাত্র ছেলে, তোমরা ওর প্রাণ নিও না। প্রত্যুত্তরে অন্ধকার থেকে চাপা বিদ্রূপের কর্কশ হাসি তীক্ষ্ণ তীরের মত ছুটে আসে।"

কিছুক্ষণ বাসন্তী দেবী চুপ ক'রে রইলেন। শীতল রজনীর গম্ভীর অন্ধকারে দেববাণী তাঁর চাপা ব্যথার শাণিত শ্বাস-প্রশ্বাস শুনতে পেল। কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু এই বাঙ্ময় মৌন ভাঙতে সাহস হ'ল না।

"মানুষের মনে যখন জিঘাংসার প্রলয় ওঠে, বাণী, তার ভয়াল ভয়ংকর চেহারা বাইরে থেকে আমরা কতটুকু বুঝতে পারি? মানুষ মানুষকে মারে, এ তো কেবল ঘটনা বা দুর্ঘটনা নয়, মানুষের হীনতম প্রকাশ! তাকে যতই না আমরা বীরত্বের, দেশপ্রেমের মহিমা দিয়ে সাজাই, এ নৃশংসতার ক্ষমা নেই।" বাসন্তী দেবী গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। "একদিন রাত্রে সে ছেলেটি আহারের পর রান্নাঘরের ছাতনাতলায় মুখ ধুতে গেল। রোজ সে ঘরেই মুখ ধোয়। দু'দিন বাড়ীর আশেপাশে রাত্রিতে বিভীষিকাময় পদধ্বনি শোনা যায় নি, তাই বুঝি তার ভয় কাটল; মা-র আপত্তি অগ্রাহ্য ক'রে বাইরের অন্ধকারে মুখ ধুতে গেল। হঠাৎ আমগাছের আড়াল থেকে দু'বার বারুদের হুংকার। একটি গুলি তার বুক ভেদ করল। আর্তনাদ ক'রে মুহূর্তে সে শেষ হয়ে গেল।

"এ ঘটনার কিছুই আমরা জানতাম না। শুধু দেখলাম, অনেক রাত্রি অবধি বাবা জেগে জেগে বই পড়ছেন। লণ্ঠনের আলোয় তাঁর গম্ভীর মুখ দেখে শুতে যাবার সময় আমার কেমন ভয় করছিল। আমার কেমন অস্বস্তি লাগল, ঘুম এল না। রাত নিশুতি হলে হঠাৎ দরজায় মৃদু করাঘাতে উঠে বসলাম। বাবা দরজা খুলে দিয়েছেন। চাপা স্বরে যে ক'টি কথা উচ্চারিত হ'ল তাতেই বুঝলাম, কে এল এত গভীর রাতে। উঠে পড়লাম, কিন্তু ও-ঘরে যেতে সাহস হ'ল না। শুনতে পেলাম বাবা ও তার কথাবার্তা:

'কি হ'ল?'

"ঠিক আছে।"

'পেরেছ?'

'হুঁ।'

'কোন্ পথে এলে?'

'খাল পেরিয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে।'

'পুলিস?'

'খুঁজছে।'

'কতক্ষণ সময় আছে?'

'ঘণ্টা দুই।'

'তাহলে খেয়ে নাও। নৌকো তৈরী আছে।'

"রুদ্ধনিঃশ্বাস, লুপ্তবুদ্ধি আমি নিঃসাড় হয়ে শুয়ে রইলাম। ও কিছু একটা ভয়ংকর কাজ ক'রে এসেছে বুঝলাম, তাই এখুনি পালাবে। কি করেছে, কোথায় পালাবে প্রশ্নগুলি মনের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগল। একটু পরে আমার ঘরের দরজায় মৃদু শব্দ হ'ল। বাবা আস্তে আস্তে ডাকলেন, বাসন্তী!

'উঠে এসে দরজা খুললাম।'

'ঘুমোও নি?'

'না।'

'এসো আমার ঘরে।'

"ঘরে ঢুকে দেখি পাথরের মত নিশ্চল সে দাঁড়িয়ে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখের দৃষ্টি চিন্তায় আচ্ছন্ন। বাবা বললেন, 'খাবার আছে?' নিঃশব্দে আমি বেরিয়ে গেলাম। ক্ষীর, মুড়ি, নারকেল, আম নিয়ে যখন ফিরে এলাম, সে আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য হাসল। নিঃসহায় করুণ হাসি। বাবা বললেন, 'খেয়ে নাও।' সে খেল। অভিভূত আমি তার আহার দাঁড়িয়ে দেখলাম। বাবা বললেন, 'তুমি ঘণ্টাখানেক শুয়ে নাও।'

"বাবার ঘরে বড় ইজি-চেয়ারে তৎক্ষণাৎ সে শুয়ে পড়ল।

"ঘরে গিয়ে ঠায় ব'সে রইলাম। চিরদিন সে গম্ভীর, স্বল্পবাক্, কিন্তু আজ যেন তার সব কথা ফুরিয়ে গেছে। যেন সে নিজেই একেবারে নিঃশেষ। কিছুক্ষণ পর বাবা আবার আমার ঘরে এলেন। বললেন, 'বাসন্তী, আজকের ঘটনা যেন কেউ না জানে।' দাঁতে দাঁত চেপে বললাম, 'জানবে না।' বাবা বললেন, 'ছোট একজনের মত বিছানা, খান দুই ধুতি, আমার একটা কামিজ সতরঞ্চিতে বেঁধে দাও।' গলা দিয়ে প্রশ্ন বেরিয়ে আসতে চাইল, ও কোথা যাচ্ছে? কি করেছে? কিন্তু প্রশ্ন বৃথা। উত্তর পাওয়া যাবেই না। বাবা রাগ করবেন।

"বিছানা বেঁধে বাবার ঘরে এসে দেখি ইজি-চেয়ারে সে নিশ্চিন্তে নিদ্রিত। নির্মল মুখে অব্যক্ত বেদনা জমাট হয়ে আছে।

"বাবা তাকে ডেকে তুললেন।

'এবার তোমার খাবার সময় হ'ল।'

"চট ক'রে তৈরি হ'ল সে।

"বাইরে সামান্য পদশব্দে চকিত হয়ে বাবা দরজা খুললেন। 'রতন মাঝি এসে গেছে।' একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললেন, 'বেশী দেরী ক'রো না।' ব'লে, বাইরে চ'লে গেলেন।

"কিছুক্ষণ আমার মুখে কথা এল না। সেও নীরব, নিশ্চল। কিন্তু আমি বুঝলাম, এ মুহূর্ত জীবনে আর আসবে না। প্রশ্ন করলাম:

'কি করেছ?'

'খুন।'

"নিঃশ্বাস আটকে গেল আমার। তবু বললাম, 'কাকে?'

'বিশ্বাস-ঘাতককে।'

'তুমি খুন করলে?'

'করতে হ'ল।'

'কোথায় পালাচ্ছ?'

'জানি না।'

'তার পর।'

'তার পর আর কি?'

'এবার তোমার ফাঁসি হবে, জান?'

'হতে পারে।'

"চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল বুঝি গড়িয়ে পড়ছিল। হঠাৎ মনে হ'ল গাল জ্বলছে। বললাম, 'আমি?' সে নীরব রইল। বাইরে থেকে বাবা তাকে ডাকলেন। এক পা এগিয়ে গিয়ে সে দাঁড়াল। কি যেন বলতে গিয়ে বলল না। আমি তাকে গড় হয়ে প্রণাম করলাম। মাথায় সে হাত রাখল। উঠে দাঁড়াতে বলল, 'যাই।' দরজা অবধি এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়াল। বলল, 'জীবনে হেরো না, বাসন্তী।'

"সেই তার শেষ কথা। পালাবার পথে সে ধরা পড়ল। তিন মাস পরে তার ফাঁসি হয়ে গেল।"

দেববাণী মা-র বুকে মাথা লুকিয়ে শুয়ে রয়েছে। নিথর, নিস্তব্ধ অন্ধকার ভেদ ক'রে ছুটন্ত রেলগাড়ীর সুতীব্র শব্দ শোনা গেল। জীবনও ও-রকম চলছে। অতীত দূরে গেলে বর্তমানের বুক দিয়ে, ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ ক'রে, এক-একটা বড় ঘটনায় কিছুক্ষণ থেমে, রেলগাড়ী যেমন থামে ষ্টেশনে। দেববাণী জানে, মা যাঁর নাম একবারও উচ্চারণ করলেন না, দেববাণী তাঁকে দেখে নি, তবু জানে। এ রোমাঞ্চ কাহিনী সে আগেও শুনেছে,

মা-ই বলেছেন। বড় হবার পর দেববাণীর মনে হয়েছে এ কাহিনী ও তার নায়কের জন্যে মা-র মনে বুঝি বিশেষ দুর্বলতা সঞ্চিত; মনে পড়েছে, বলতে বলতে মা-র গলা কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজ সে এক্ষুণি যা শুনল, সে ত মার গল্প নয়, বাসন্তীর জীবন-কাহিনী। চৌদ্দ বছরের বাসন্তী, বাংলার নবযুগে মাতৃ-মন্ত্রের আগুনে জ্বলে-ওঠা নগণ্য গ্রামের অগ্নি-দীক্ষিত পরিবারের নব-যৌবনা চতুর্দশী বাসন্তী, দেববাণীর চোখের সামনে অন্ধকারে ভেসে এসে দাঁড়াল। চমকে উঠল দেববাণী। ও যে আমি, এ যে আমি!

দেববাণীর মনে পড়ল, সে-ও ভালবেসেছিল। ভালবাসায় ভেসে গিয়েছিল। সেকালের বাসন্তী অত কঠিন সংযমে নিজকে বেঁধেছিল ব'লেই, একালের বাসন্তীর একটুও সংযম রইল না। আমি একেবারে ভেসে গেলাম। কারুর বাধা মানলাম না, কোনদিকে চাইলাম না। অথচ কেউ কি কোনও দিন ভেবেছিল, মা, আমি অমন ভেসে যেতে পারি? তুমি ত ভাবই নি, আমি নিজেও কি কখনও ভেবেছি? ছোটবেলা থেকে সবাই বলেছে আমি গম্ভীর, দুরন্ত। যে বয়সে মেয়েদের মন প্রথম রঙিন হয়, আমার মনে কোন রং-এর দাগ লাগে নি। জীবনকে বড় রহস্যময় মনে হয়েছে, বুদ্ধি হবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছে অনেক কিছু আমার জন্যে পথের প্রান্তে অপেক্ষা করছে। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখে এসেছি, কি নিদারুণ কষ্টে একমাত্র আত্মবলে তুমি আমাদের দু'বোনকে মানুষ করছ, শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, নালিশ নেই, তুমি সদা-হাস্যময়ী, সর্বদা তোমার কৌতুক, তুমি লোহার মত শক্ত, নবনীর মত নরম। চাকরি করেছ আমাদের মানুষ করার জন্যে, এমন ভাবে রেখেছ, গড়েছ আমাদের, দারিদ্র্য আমরা জানতে পারি নি। যখন যা দরকার সব পেয়েছি, দরকারের বেশীও। জ্ঞান-বুদ্ধি হবার সঙ্গে, তাই, একমাত্র সংকল্প ছিল বড় হব, অনেক কিছু করব, তোমার সব অভাব মেটাব, বুক তোমার গর্বে ভ'রে দেব। বুঝতাম, পুত্রের অভাবে তুমি দুঃখ পেতে, মাঝে মাঝে বলতে আমাদের বিয়ে হয়ে গেলে তোমাকে দেখবার কেউ থাকবে না। মন আমার তৈরি হয়ে গিয়েছিল, আমি নির্বোধের মত জানতাম, বিয়ে আমি করব না, সারাজীবন তোমার পাশে থাকব। পড়ব, পড়াব। গবেষণা ক'রে ডক্টরেট পাব, সুন্দর বড় সাজান ফ্ল্যাটে আমার নিজস্ব লেবরেটরী থাকবে; দেয়াল-ঘেঁষা আলমারীতে বই। দেবযানীর বিয়ে হবে। তোমাকে নিয়ে থাকব আমি। কিন্তু মা, আমি নিজেকে কি একটুও জানতাম? তুমিও কি আমায় জানতে? হয়ত তোমার ভয় ছিল, তাই দেখতাম মাঝে মাঝে তুমি কি দুর্বোধ্য জিজ্ঞাসায়, গোপন সন্ধানে আমার পানে তাকিয়ে থাকতে। কলেজে পড়ার সময় বাড়ীতে ছেলেরা সব আসত, দু'চার জন নবীন 'অধ্যাপকও; বড় ইচ্ছে ছিল তোমার, তাদের মধ্যে কারুর সঙ্গে আমার ভাব হোক। কোনও দিন সে হয় নি, সহপাঠীদের যে অনায়াসে আমি ছোট ভাই ক'রে নিতাম, অধ্যাপকদের মনের ধারে কাছে ধরা পড়তাম না, তুমি তাতে দুঃখ পেতে। তোমার সাবধানী প্রশ্ন, সন্ধানী দৃষ্টি আমি বুঝতে পারতাম। মজা লাগত। তখন কি ভেবেছি, মা, তুমি আমায় দেখে আশ্বস্ত হতে না; ভয় পেতে? ভয় পেতে, আমি কিছু একটা ভয়ঙ্কর হঠাৎ না ক'রে বসি। তোমার চোখে ভয়ের ছায়া দেখতে পেতাম, বুঝতাম না।

একদিন তোমার ভয় বাস্তব হ'ল। ভয়ংকর ভীষণ কিছু ক'রে বসলাম মা। সেদিন আমার বয়স কত ছিল? উনিশ? উনিশের দেববাণী ভেসে গেল ভালবাসার বন্যায়। চতুর্দশী বাসন্তীর সংযম কেন সে উত্তরাধিকারে পায় নি, মা? সর্বনাশের সঙ্গে তার প্রেম হ'ল। বিভীষিকার সৌন্দর্যে সে সম্মোহিত হ'ল। ঝড়ের মধ্যে দেখল, শুধু বিদ্যুতের ঝলকানি। প্লাবনের তাণ্ডব সঙ্গীতই শুধু শুনতে পেল। দেববাণী বিদ্রোহী হ'ল। তোমরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও তাকে ধ'রে রাখতে পারলে না। সে বেরিয়ে গেল।

বাসন্তী দেবী ফিরে গিয়েছিলেন অগ্নিযুগের বাংলার অখ্যাত তাঁর পিতৃপুরুষের গ্রামে। দেববাণী ফিরে গেল আগুনে পোড়া কলকাতা সহরে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন। সে আগুনে ভারতবর্ষের কোন শহর যদি জ্ব'লে গিয়ে থাকে, তার নাম কলকাতা। জাপানী বোমায় নয়, মার্কিন-ইংরেজের জয়-দাবীর দাপটে। কলকাতার পথে পথে হাজার হাজার নিরন্ন ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদ, মৃত্যু; অন্যদিকে, বহু কুপথে মহানগরীর দ্রুত আত্ম-অপচয়। দেববাণী ছাত্রকালে এ দাহনের বিশেষ কিছু জানতে পারে নি। অধ্যয়নে নিমগ্ন তার কুমারী মনকে সযত্নে মা কেমন ক'রে এ বিরাট্ মহাবহ্নির দহন থেকে আড়াল ক'রে রেখেছিলেন? শুধু রাতের পর রাত বুভুক্ষু মানুষের অন্ন-প্রার্থনার আর্তনাদ তার নিদ্রা হরণ করেছে, দু'গ্রাস ভাত মুখে দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে আর্তনাদ রোজ রাত্রে গলির মধ্যে, বাড়ীর সদর দরজায় সে শুনতে পেত, শুনে আর খেতে পারত না, ছুটে গিয়ে আহার্য বিলিয়ে দিত কঙ্কালসার নারী, পুরুষ, শিশুকে। মা রাগও করতে

পারতেন না। কলেজ থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে খাইয়ে দিতেন পেট ভ'রে। নিজে যে তিনি প্রায়ই অর্ধাহারী থাকতেন, দেববাণী দেবযানী তা জানত। মহাযুদ্ধের নিষ্ঠুর চেহারার এ ছাড়া অন্য পরিচয় তারা পায় নি। বাসার কাছে দু'দিন জাপানী বোমা পড়েছিল; ভাবতে অবাক্ লাগে, দু'বোন ও মা, কেউ তারা বিশেষ ভয় পায় নি। কলকাতার বাইরে যাবার স্থান তাদের ছিল না, যাবার কথাও ওঠে নি। তাই বোধ করি মা তাদের ভয় পেতে দেন নি। বোমার আতংক কৌতুকে তুচ্ছ করেছেন।

দেববাণী ভাবল, মা, চৌদ্দ বছরের বাসন্তীকে ধ'রে রাখবার অনেক কিছু ছিল। প্রিয়তমকে হারিয়ে তাই সে ভেঙে পড়েনি। বিয়ে করেছে, জননী হয়েছে, জীবনে জিতেছে। তাকে ধ'রে রাখবার জন্যে অগ্নিযুগের বঙ্গদেশ ছিল, বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন; স্বদেশী-যুগের মাতৃমন্ত্র ছিল; সমাজ ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কলকাতায় উনিশ বছরের দেববাণীকে ধ'রে রাখবার জন্যে ছিলে শুধু তুমি আর দেবযানী। আর কিছু নয়। তোমাদের সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গমাতা তখন অন্নহীনা, ধর্ষিতা; সমাজ ঘুস আর চুরির বিষে জর্জরিত; নীতির শাসন, আদর্শের বাঁধ চূর্ণ। দেববাণী তাই ভেসে গেল। মহতের টানে নয়। আদর্শের বন্যায় নয়। নর্দমার প্লাবনে।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে বাসন্তী দেবী আবার বললেন, "বাণী, মেয়েদের ভালবাসা বড় দুঃখের। ভালবেসে পুরুষ উল্লসিত হয়, নারী নিস্তব্ধ। নারীর প্রেম নিঃশেষ পরিপূর্ণ বিলিয়ে দেওয়া। ঠিক জানি না, মনে হয় এ সৌভাগ্য বেশির ভাগ মেয়ের জীবনে আসে না। প্রেমের স্বল্প দাবী মেটান কঠিন নয়। তোর বাবার দাবী পরিমিত ছিল। বেশিদিন তিনি বাঁচেন নি। কিন্তু যতদিন ছিলেন, বিবাহিত জীবন নিয়ে তাঁর কোন নালিশ ছিল না। তাঁর প্রথম সন্তান হিসেবে একথা তোর জানা দরকার।"

"মা," দেববাণী দৃঢ় বিশ্বাসে বলল, "তোমাকে নিয়ে কারুর নালিশ থাকতে পারে না।"

"ক'টা বছরের বা কথা, বাণী", বাসন্তী দেবী আবার স্মৃতিচারণে নিমগ্ন হ'লেন, "পঞ্চাশ বছরও হয় নি। কি আশ্চর্য বদলে গেল দেশ, কাল, পাত্র, মানুষের জীবন। আমাদের জন্ম গ্রামে, শৈশব থেকে প্রথম যৌবন পর্যন্ত একেবারে গ্রামীণ। চল্লিশ বছর শহরে কাটিয়েও আমি আসলে গ্রাম্য। আমার চেতনার যেটুকু কালের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে চির-সজীব, তাতে এখনও সেই গ্রাম্য-জীবন ভিড় ক'রে আছে। চোখ বুঁজলে দেখতে পাই পদ্মা নদীর চকচকে রূপালি বালুতট, কাশবনের ফুলের সঙ্গে আকাশের সাদা মেঘ এক হয়ে গেছে। জেলেরা মাছ ধরছে, নদীবক্ষ থেকে ভেসে আসছে ভাটিয়ালির সুর। দেখতে পাই, ঘন-গভীর আমবাগান, দীর্ঘপত্র জামরুল গাছের নীচে পাটি পেতে গ্রীষ্মের দুপুরে নিদ্রিত আমার বাবা। বর্ষার স্পর্শে কদমফুল ফুটেছে, গন্ধে বাড়ীঘর ভরপুর। দুপুরে জানলার ধারে ব'সে তাকিয়ে আছি উদাসীন নীল আকাশে—দূরে আকাশ ছুঁয়েছে বাঁশবন, বকুল গাছে ডাকছে কত পাখী, সন্ধ্যে না হতেই কামিনী ফুটে উঠল স্তবকে স্তবকে। সকাল থেকে প্রজারা আসছে বাবার কাছে নানা কাজে, এমন কেউ নেই যার সঙ্গে না আছে স্নেহের টান, মাটির স্নেহ। বিপদে আপদে, রোগে অভাবে, তাদের একমাত্র সহায় বাবা; তেমনই উৎসবে, আনন্দে, পূজা-পার্বণে প্রধান অতিথি বাবা। বাবার চতুর্দিকে আমরাও তাঁর মহিমার অংশীদার। গ্রাম আমাদের জীবনকে দায়িত্বশীল করেছিল। আমি শুধু বাসন্তী নই, আমি বাবার মেয়ে। এ পরিচয়ের দাবী মেটাতে আমাদের সর্বদা সতর্ক থাকতে হ'ত। কলকাতা নামে বিরাট্ রহস্যময় শহর একটা ছিল জানতাম, অনেক দূরে; গ্রামকে সে তখনও গ্রাস করে নি, গ্রামের জীবন তখনও ভরপুর। কিন্তু সে পরিপূর্ণতা কি তাড়াতাড়িই না ফুরিয়ে গেল! বিয়ের তিন বছর পরে তোর বাবা আমাকে কলকাতা নিয়ে আসেন। সে কলকাতার সঙ্গে আজকের শহরের কোন তুলনা হয় না। তার পর কি দ্রুতগতিতে চলল পট-পরিবর্তন! আমাদের গ্রামীণ চেতনার ওপর নিদারুণ জুলুম চালিয়ে কাল বদলাতে লাগল; বিন্দুমাত্র করুণা নেই পুরাতনের জন্যে। কোথায় গেল অগ্নিযুগ, মাতৃ-পূজা! কোথায় গেল বিবেকানন্দ-অরবিন্দ-বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা দেশ? ঝগড়া-বিবাদ দাঙ্গা-বিরোধে মানুষগুলি সব বদলে গেল। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে আমরা যে সম্প্রীতি-শান্তির আস্বাদ পেয়েছি, তোরা তার কিছুই পেলি না। দু' দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘ'টে গেল চোখের ওপর; দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, সংঘাতের শেষে দেশ পর্যন্ত দু'ভাগ হয়ে গেল। যে-গ্রামীণ চেতনায় এখনও আমাদের চিত্ত পরিপূর্ণ, সে গ্রাম হয়ে গেল বিদেশ। আজ দেখ, জীবনের সায়াহ্নে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি। যে দু'টি মেয়েকে মানুষ করবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বিধবা হবার পর স্বামীর জন্যে শোকের সময় পর্যন্ত পাই নি, তাদের সঙ্গে আমার

জীবনের তুলনা করলে ভাবি, ওরা কি আমারই গর্ভে জন্ম নিয়েছিল? একটা জীবনে কি এত বিচিত্র পরিবর্তন সম্ভব? আমি এখনও গ্রামীণ; তুই ত পৃথিবীর চেতনা নিয়ে বিশ্ব-নাগরিক। দেবযানীর মত অমন নরম মেয়েটা একা একা কোন্ সাত সমুদ্র ছাড়িয়ে বিদেশে প'ড়ে আছে জীবনের তাগিদে। বিয়ে ক'রেও তুই সুখ পেলি না, একমাত্র সন্তানকে কোথায় পরদেশে ফেলে রেখে কিসের নেশায় ঘুরে বেড়াচ্ছিস দেশে দেশে। মা হয়েও তোদের আমি বুঝতে পারি নে, চিনতে পারি নে।"

"আমরা কিন্তু তোমাকে ঠিক বুঝি, মা।" দেববাণীর স্বর গভীর হ'ল। "যুগ বদলেছে, আমরা কক্ষচ্যুত তারার মত কে কোথায় ছিটকে পড়েছি। পৃথিবী বড় ছোট হয়ে গেছে। কলকাতা দূরে ছিল তাই তোমরা গ্রামীণ ছিলে। আজ বাংলা দেশে গ্রামীণ আর কেউ নেই। সবাই শহুরে। এখন এ দেশে আমরা হ'তে চলছি ভারতবাসী। পুরোপুরি আমরা আর বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, পঞ্জাবী পর্যন্ত নই। আমাদের সত্তার কিছুটা ভারতবাসী হয়ে গেছে। ভবিষ্যতে আরও হবে। তেমনই, ঘটনাচক্রে, আমরা কেউ কেউ বিশ্বচক্রে জড়িয়ে পড়েছি। দেশে দেশে মানুষের জন্যে শত শত দ্বার খুলে গেছে। রাশিয়া পর্যন্ত সবাইকে ডাকছে, এস, আমাদের কৃতিত্ব দেখে যাও। তোমার দু'টি মেয়ে নতুন যুগের বিশ্ব-নাগরিকতার আস্বাদ যদি পেয়ে থাকে, তুমি গর্ব করবে না? আমরা যখন যেখানেই থাকি, মা, আমাদের মন প'ড়ে থাকে তোমার কাছে। রাত্রিতে সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে নাবিক যেমন ধ্রুবতারার পানে বার বার তাকায়, জীবন-সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে আমরাও তেমনি তোমার দিকে কেবল তাকিয়ে দেখি। তুমি যা পেরেছ, ক'জন পৃথিবীতে তা পারে? বিদেশে তোমার কথা যাদের বলেছি তারা অবাক্ হয়েছে। আজ যে আইরীণের বাড়ীতে তুমি অতিথি, তার কারণ তোমাকে দেখবার ওর দারুণ আকাঙ্ক্ষা। তোমার কথা শুনে আইরীণ বলেছিল, উনি তোমার একার মা নয়, বাণী। উনি সবাকার মা।"

বাসন্তী দেবী লজ্জা পেলেন। বললেন, "থাম্। তোর সঙ্গে আমার অন্য কথা আছে।"

"বল।"

"তোর সব প্রশ্নের জবাব দিয়েছি। এবার আমার প্রশ্নের জবাব দে।"

"প্রশ্ন কর।"

"কলকাতায় ত থাকলিই না। তোর সঙ্গে কথাই হ'ল না।"

"বল না, কি তোমার জানবার আছে।"

"খুলে বলবি?"

"বলব।"

"দশ-এগারো বছর বিদেশে কাটালি।" বাসন্তী দেবী একটু ইতস্ততঃ করলেন। তার পর জোর ক'রে ব'লে ফেললেন। "তোর জীবনে কোন পুরুষ আসে নি।"

খানিক দেরী ক'রে দেববাণী জবাব দিল। "য়ুরোপ-আমেরিকায় বাস করলে, মা, খোলাখুলি কথাবার্তা বলা অভ্যেস হয়ে যায়। তোমার প্রশ্নের উত্তর সোজাসুজি দি। কোন পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক আমার হয় নি।"

বাসন্তী দেবী নিশ্চিন্ত হলেন, দেববাণী বুঝল।

"তোর পেছনে লাগে নি?"

"এক-আধটু। উৎসাহ না দেখালে ওদেশী পুরুষরা জ্বালাতন করে না। কেন করবে? ওরা ত বঞ্চিত জীবন কাটায় না! একজনকে না পেলে আরও অনেককে ওরা পায়। জ্বালাতন করে বরং এদেশী ছেলেরা। ভাবে, বিদেশে গিয়ে সবাই লাগাম-হীন হতে চায়। তবে, ওদের দৃষ্টি প্রধানত শ্বেতাঙ্গিনীদের দিকে।"

"তোর একা একা লাগে না?"

"একা লাগবার সময় পেলাম কৈ? তা ছাড়া, বন্ধু-বান্ধবীর ত অভাব নেই।"

বাসন্তী দেবী নীরব হলেন। দেববাণী তাঁর আসল প্রশ্নের জন্যে তৈরী হ'ল।

"হিমাদ্রি?"

"এখন ভিয়েনায়। ভাল আছে।"

হেসে ফেললেন বাসন্তী দেবী।

"তা জানি। হিমাদ্রিকে তুই ভালবাসিস না কেন?"

"কে বললে ভালবাসি না?"

"ভালবাসিস?"

"খুব।"

"তামাসা রাখ্। তুই ওকে বিয়ে করছিস না কেন?"

"জীবনে একবার নিজের উদ্যোগে বিয়ে করেছিলাম। পস্তেছি। ও কাজ দ্বিতীয়বার করব না। এবার যদি বিয়ে করি, তুমি বিয়ে দেবে।"

"মস্করার কথা নয়, বাণী। তুই অনেক নাম করেছিস, বড় হয়েছিস। কিন্তু, সেকেলে আমি, আমার মন ভরে না। আমার মন চায়, তোদের সংসারী দেখি। স্বামী-পুত্র নিয়ে ঘর করছিস, আরও দশটা বাঙ্গালী মেয়ের মত;

নাতি-নাতনীরা তাদের দিদিমাকে ঘিরে আছে, রূপকথা শুনছে।...” গলা ধ’রে এল বাসন্তী দেবীর।

“জানি মা।” মৃদুকণ্ঠে দেববাণী বলল। “কিন্তু এ আনন্দ আমি তোমাকে আর দিতে পারলাম না। দেবযানী ফিরে এলে ওকে বিয়ে দিও।”

“হিমাদ্রি তোকে ভালবাসে,” সে কথায় কান না দিয়ে বাসন্তী দেবী বললেন, “সে আমাকে যে-সব পত্র দেয়, তাতে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারি, সে তোকে ভালবাসে।”

“হয়ত বাসে।”

“তোকে সে বিয়ের প্রস্তাব করে নি?”

“হিমাদ্রি করবে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব?”

“করে নি?”

“ও বরং তোমার কাছে করবে। যা ভেতো ভীরু বাঙ্গালী।”

“কৈ? আমার কাছে ত বিয়ের প্রস্তাব করে নি। চিঠিতে শুধু তোর কথাই থাকে, বুঝতে পারি তোকে কত ভালবাসে। কিন্তু বিয়ে করতে চায়, এমন কিছু ত লেখে নি!”

“তবেই দেখ মা। ওর ইচ্ছে নেই। তুমি যাতে আমার সব খবর পাও তাই নিয়মিত চিঠি লেখে। আমার চিঠি লেখার আলস্য জানে কিনা, তাই।”

“পাছে তুই রাজী না হোস্ নিশ্চয় এ ভয়ে হিমাদ্রি বিয়ের প্রস্তাব করে নি।”

“কিন্তু, ও না করলে আমি রাজী হই কোন্ সুযোগে?”

“তুই আবার মস্করা করছিস।” ক্ষুণ্ণ হলেন বাসন্তী দেবী। “তোর বাকী জীবনটা কি এমনি ভাবেই কাটবে?”

“আমি তো বেশ আছি, মা।” দেববাণী দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপল।

“কি জানি কেমন আছিস!” উদাস কণ্ঠে বললেন বাসন্তী দেবী। “তোদের বুঝতে পারি নে। একটা ভুলের বোঝা সারা জীবন টেনে যাওয়ার কোনও মানে নেই, দেববাণী।”

“বোঝা না নামলে তাকে নামানো যায় না, মা।” চুপি চুপি বলল দেববাণী।” তোমার মেয়ে দু’বার বিয়ে করুক তুমি কি তাই চাও। অল্প বয়সে তো তুমিও বিধবা হয়েছিলে।”

“বোকার মত কথা বলিস নে, বাণী।” উষ্ণ হলেন বাসন্তী দেবী। “আমার সঙ্গে তোর তুলনা হয় না। আমি ভুল বিয়ে করি নি। স্বামীর মৃত্যু আর স্বামী ত্যাগ এক কথা নয়। তাছাড়া, দিনকাল বদলে গেছে। অনেক কিছুই তোরা করছিস যা আমরা ভাবতে পারি নি।”

“আমার মনটা বেশ সেকেলে, মা।”

“তুই হিমাদ্রির জীবনটা কেন নষ্ট করছিস?”

“আমি কেন নষ্ট করতে যাব?”

“সত্য কঠিন হলে আমরা তাকে এড়াবার চেষ্টা করি।”

দেববাণী চুপ ক’রে গেল। যে দ্বন্দ্ব তার মনকে অহরহ নিষ্পেষণ করছে, মা-কে তা বলার সময় আসে নি। দ্বন্দ্ব তার একার নয়। হিমাদ্রিরও। দীর্ঘকালের বন্ধুর পথে ওরা আজ অনেক কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে। তুমি আমার কত কাছে এসে গেছ হিমাদ্রি, বোধ হয় তুমিও জান না। উপকারী পথদ্রষ্টার ভূমিকায় বিধাতার রহস্যময় নির্দেশে অযাচিত ভাবে আমার জীবনের চরমতম দুর্দিনে তুমি আবির্ভূত হয়েছিলে। আমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে তোমার স্বতঃপ্রসারিত বন্ধুত্ব যতখানি করেছে, তার তুলনা হয় না। এত দিয়েও কোনদিন কোন প্রতিদান চাও নি হিমাদ্রি, তাই তোমাকে প্রথম আমি শ্রদ্ধা করেছি, সে-শ্রদ্ধায় কিছু জ্বালাও ছিল। তোমার কাছে হাত পেতে অনেক নিয়েছি; নিতে গিয়ে লজ্জায় মাথা নত হয়েছে; অসহায় দৈন্য তীব্র বিদ্রূপ করেছে। মানুষ সব বোঝা বইতে পারে, চির-কৃতজ্ঞতার বোঝা বইতে পারে না। তুমি আমাকে চির-কৃতজ্ঞ ক’রে রেখেছিলে, তাই তোমাকে উপকারী বন্ধু জেনেও কাছের মানুষ মনে করতে পারি নি। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছে তুমি ঐশ্বর্যবান্, আমি দীন; তুমি শক্ত, আমি দুর্বল; তুমি নিশ্চিন্ত পাথেয় অর্জন ক’রে সুস্থির, আমি পথের সন্ধানে অস্থির। তোমার মহত্ত্ব আমায় মুগ্ধ করেছে, সে মহত্ত্বের কাছে আমি কেমন ছোট হয়ে গেছি। তাই তোমাকে কাছের মানুষ মনে করতে পারি নি।

পারি নি, যতদিন না তোমার দৈন্য আমার কাছে ধরা প’ড়ে গেছে। একদিন যখন তুমি আর মহৎ রইলে না, নীচে নেমে এলে, তোমার আর্ত দীনতা নিরাবরণ হয়ে ধরা পড়ল আমার কাছে, তুমি আপন হ’লে, কাছের মানুষ হ’লে। আমার বিস্মিত বিহ্বলতা তোমাকে চাবুক মারল, ভাবলে, আমি রুষ্ট হয়েছি, বুঝলে না কত দীর্ঘকাল তোমার এই নগ্ন মানুষ-মূর্তির অপেক্ষায় কেটেছে আমার দিন রজনী। আমায় বুঝতে না পেরে তুমি অনেক দূরে পালালে, দূরে গিয়ে নিকটতর হ’লে।

কোনও দিন হিমাদ্রি তুমি কিছু চাও নি; এবার পুরোপুরি সবটুকু চাইলে। যাকে অভাবহীন মনে ক’রে

আতঙ্কিত হয়েছিলাম সেও যে চরম বুভুক্ষায় কাতর, তা কি কখনও ভেবেছিলাম? তোমার নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য যে কঠোর কামনার ছদ্মবেশ, তা কি আগে বুঝতে পেরেছি? তুমি বলেছিলে, 'যে প্রতিমা আমি নিজের হাতে গড়েছি তা আমার, আর কারুর নয়,' আর আমি বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে দেখছিলাম তোমার প্রসন্নমসৃণ-ললাটে নীল শিরা দপ্ দপ্ করছে, ওষ্ঠাধরে কামনার বক্র ইঙ্গিত, চোখে তোমার ঈর্ষ্যায় রক্তিম। তুষারাবৃত মৌন-গম্ভীর পবিত্র শুভ্র হিমাদ্রি হঠাৎ আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠল; আমার দেহে পুলক লাগল। তোমাকে কি বলেছিলাম আজ মনে করতে পারছি না। শুধু মনে আছে, তোমার আত্মপ্রকাশের মহামুহূর্তে আমাকে সযত্নে আত্মগোপন করতে হয়েছিল। আমি জানতাম, তুমি পালাবে, নিজের পরিচয়ে ভয় পেয়ে পালাবে। চেয়েওছিলাম, তুমি চ'লে যাও। তুমি দূরে না গেলে তোমার এই নতুন উন্মোচন আমি সহ্য করতে পারতাম না। মন ঠিক করার আগেই ধরা প'ড়ে যেতাম। তাতে আমাদের ক্ষতি হ'ত হিমাদ্রি।

মন ঠিক করা যে এত কঠিন তাও কি জানতাম? তুমি চাইছ; তোমাকে দিয়ে নিশ্চিহ্ন হবার পরিতৃপ্তি আমার কত দিনের স্বপ্ন, রজনীর কামনা। কিন্তু আমার কতটুকু আর আমি আছি, হিমাদ্রি? তুমি সেদিন কেন আস নি, যেদিন আমার দেবার অফুরন্ত সম্পদ্ ছিল; দিতে চেয়ে দেবার মত কাউকে না পেয়ে আমি যেদিন বর্ষা-মেঘের মত একা হয়ে গিয়েছিলাম? যেদিন দস্যু এসে আমায় লুট করল, সেদিন কোথায় ছিলে তুমি হিমাদ্রি? যে প্রতিষ্ঠার সৌধ দেখে আজ তুমি পরিতুষ্ট, জান ত তার ভিত্তি দস্যুর হাতে লাঞ্ছিত? তুমি ত জান না হিমাদ্রি, তোমার প্রতিমার দেহে পশুর অত্যাচার নির্মম চিহ্ন রেখে গেছে। তোমার প্রতিমার গৌরবটুকুই তুমি জান, লজ্জার খবর রাখ কি? হিমাদ্রি, তুমি কি ভেবে দেখেছ তোমার 'প্রতিমা' জননী? সে শুধু একজন পুরুষের ঘরই করে নি, তার সন্তান পেটে ধরেছে? সে সন্তান আজ সব বুঝতে শিখেছে, জানতে শিখেছে। মা-ই তার পৃথিবীতে একমাত্র সম্বল। বাপের কথা ভুলেও সে একবার মুখে আনে না, কিন্তু আমি জানি, সে তাকে ভোলে নি। পিতৃ-পরিচয়ে বঞ্চিত হবার জন্যে মনে মনে মাকে সে অপরাধী ক'রে রেখেছে! দেবকুমার ছাড়া দেববাণী নেই, হিমাদ্রি; দেববাণীর যদি আজ কোনও আসল পরিচয় থাকে, সে মা। যে মা-কে ছাড়া দেবকুমার কাউকে জানে না, যে মা তাকে পিতৃ-পরিচয়ে বঞ্চিত করেছে, তাকে অন্য একজন পুরুষের স্ত্রী-রূপে সে যদি সইতে না পারে? মা-র স্বামী বাবা নয়, এ নিদারুণ দুঃখ সে যদি বইতে না পারে?

না, হিমাদ্রি, তোমাকে আমি দিতে পারব না। আমার দেবার কিছু নেই। দিতে দিতে নিঃস্ব হয়ে গেছি।

নীরব অশ্রু চাপতে গিয়ে দেববাণী নিথর নিস্পন্দ হ'ল। বাসন্তী দেবী ভাবলেন, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। বার বার তাঁর মনে একই কথা ঘুরে বেড়াল। এত গুরু-গম্ভীর বিষয় দেববাণীর কাছে অমন হাল্কা হ'ল কি ক'রে? বার বার তিনি বললেন, তোকে চিনতে পারি নি, বাণী, তোকে বুঝতে পারি নি।

আজ শীতল সকালে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে মেয়ের কথা আবার ভাবছিলেন বাসন্তী দেবী। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথাও। মা হবার মত অসহায় দুঃখ আর নেই। যে সন্তানকে পেটে ধ'রে, জন্ম দিয়ে, অসহায় শৈশব থেকে তিল তিল যত্নে মানুষ করতে হয়, একদিন তার পল্লবিত জীবন বিস্ময়কর অপরিচিতের রূপ ধরে। তার নাগাল মেলে না, সে এগিয়ে যায় রহস্যময় পথে, জননীর মন ক্লান্ত নৈরাশ্যে বৃথা তার পিছু নেয়। দুস্তর কালের ব্যবধান একদা একান্ত সন্নিকটকে নিষ্ঠুর দূরত্বে দুর্বোধ্য ক'রে রাখে। এ ক্ষেত্রে হয়ত জননীর কর্তব্য সন্তানকে জীবনযাপনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া, কিন্তু কোন্ মা সে শুভ্র ঔদাসীন্য অর্জন করতে পারে? বাসন্তী দেবী অল্প বয়সে মা হারিয়েছিলেন; বাবার কাছেই তাঁর শৈশব ও প্রথম যৌবন কেটেছে। জীবন-প্রবাহের দুরপনেয় গতিস্রোতে মা-কে যে তাঁর আঘাত করতে হয় নি তা ভেবে এত ব্যথাতেও একটু তৃপ্তি পেলেন।

তাঁর গ্রামীণ বাল্যকাল ও প্রথম যৌবনের সমস্ত স্মৃতির উপর যাঁর প্রভাব সুবিস্তৃত, সেই বাবার কথা মনে পড়ল বাসন্তী দেবীর। পঞ্চাশখানা গ্রামে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল। বিশাল বলিষ্ঠ দেহ, বাবরি চুল পিঠ পর্যন্ত প্রলম্বিত; আয়ত নয়নে সিংহের প্রতাপ। অমন বলশালী পুরুষ সচরাচর দেখা যেত না। ছোট তালুকদার হ'লেও বিশ্বম্ভর চৌধুরীর প্রতাপ সেকালে কিংবদন্তীর রূপ নিয়েছিল। দশ-বিশখানা গ্রামে মুঘল-বংশজাত মুসলমান জমিদারের অত্যাচার চ'লে আসছিল বহু বছর; সে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিশ্বম্ভর চৌধুরী হিন্দু-মুসলমানের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। সেকালে রাজার শাসন গ্রামে ছিল শিথিল, সে শূন্যস্থান আঠার আনা পূর্ণ হ'ত জমিদারের অত্যাচারে। বিশ্বম্ভর চৌধুরী

যখন জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন একমাত্র বাহুবল ও ন্যায়বুদ্ধি সম্বল ক'রে, অনেক খণ্ড যুদ্ধ লড়তে হ'ল তাঁকে জমিদারের লাঠিয়াল, পেয়াদা ও ভাড়াটে গুণ্ডাদের সঙ্গে। এক একটা খণ্ড যুদ্ধে বিজয় তাঁর প্রতিপত্তি বাড়াল, অনুগত ভক্তদের দল পুষ্ট করল; কালে তিনি সে অঞ্চলের সর্বাধিক জনপ্রিয় নেতার সম্মানে বৃত হ'লেন। বাসন্তী দেবীর মনে আছে, কি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-ভক্তি পেতেন তিনি গ্রাম্য মানুষের কাছে, কেমন ক'রে এক-ডাকে শত শত লোক এসে হাজির হ'ত লাঠি হাতে, দুপুর রাতের অন্ধকারে জমিদার বাড়ীর অন্দর-মহলের মুসলমান কর্মচারী খবর দিয়ে যেত আসন্ন বিপদের।

সাত বারে এন্‌ট্রান্স পাশ করেছিলেন বিশ্বম্ভর চৌধুরী। কিন্তু ইংরেজী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। নেপোলিয়নের জীবনী, গিবনের রোম্যান সাম্রাজ্যের ইতিহাস, ভিক্টর হুগো ও টলস্টয়ের উপন্যাস প্রিয়পাঠ্য ছিল বিশ্বম্ভর চৌধুরীর। বাবার কাছে ব'সে বাসন্তী শুনত এ সব বই থেকে সুদীর্ঘ আবৃত্তি। বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল, যেমন ছিল আলিপুর কোর্টে অরবিন্দের বিচারে চিত্তরঞ্জনের ভাষণ। নেহাৎ আদর্শের টানে তিনি স্বদেশীতে যোগ দিয়েছিলেন। বীরচিত্ত বলিষ্ঠ তাঁর মন দেশমাতৃপূজায় আত্মবলির মন্ত্র সহজে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের ভয়ঙ্কর নৃশংসতা কখনও পূর্ণ অনুমোদন করে নি। যাঁর কাহিনী দেব-বাণীকে বলতে গিয়ে বাসন্তী দেবী নাম উল্লেখে বিরত থেকেছেন, সেই একান্ত স্নেহের যুবকটির প্রাণান্ত হবার পর বিশ্বম্ভর চৌধুরী আর স্বদেশী করেন নি। তাঁর একমাত্র পুত্র, বাসন্তী দেবীর একমাত্র ভাই, চল্লিশ বছর বয়সে হঠাৎ মারা গেলে সংসারে তিনি একেবারে উদাসীন হয়ে গেলেন। বাসন্তী দেবীর বিবাহের পাঁচ বছর পরে ঘটল এ দুর্ঘটনা; বিশ্বম্ভর চৌধুরী বাকি জীবন কাশীধামে কাটিয়ে পরিণত বয়সে মারা গেলেন।

বাবার কাছে মানুষ হয়ে বাসন্তীর চরিত্রে যে দু'টো গুণ সবচেয়ে দানা বেঁধেছিল তা সাহস ও সংযম। নির্ভীক দুঃসাহসী দুর্জয় পিতার কন্যা বাসন্তীকেও ভয়কে জয় করতে হয়েছিল। বাবার কাছে দেহচর্যার বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল বাসন্তী, দেহ ছিল তার সুগঠিত, বলিষ্ঠ। সুন্দরী ছিল না বাসন্তী; কৃষ্ণ বর্ণ, চওড়া তেজস্বী চোয়াল, প্রশস্ত ললাট, সুগঠিত চিবুক, ছোট ছোট বুদ্ধি-দৃপ্ত চোখে তাকে সুন্দর দেখাত না, আকর্ষণীয় দেখাত। দৃঢ়-চরিত্রের ব্যঞ্জনা ছিল তার মুখে। বাবার সর্বকালান সঙ্গিনী সে, বিপদে নির্ভয়, সঙ্কটে নিরাতঙ্ক। বিশ্বম্ভর চৌধুরী সযত্নে তাঁকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। স্কুলে না গিয়েও সে শুধু ভাল বাংলাই শেখে নি, ইংরেজীও কিছু শিখেছিল। গীতা, উপনিষদ্ পড়েছিল, বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও রচনা পাঠ করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের সব উপন্যাস ও প্রবন্ধও পাঠ করেছিল। সবচেয়ে বড় শিক্ষা সে পেয়েছিল পিতার জীবন ও চরিত্র থেকে। পরের জীবনে চরম দুর্দিনে এ শিক্ষাই বাসন্তী দেবীর ছিল প্রধান সম্বল।

যাঁর সঙ্গে তার বিয়ে হ'ল, বাসন্তী তাঁকে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করল। ইংরেজ বণিকদের জাহাজী দপ্তরে তিনি কাজ করতেন; বিয়ের তিন বছর পরে বাসন্তী কলকাতায় এল। জন্ম হ'ল দেববাণীর, দেবযানীর। তার পর হঠাৎ স্বামী মারা গেলেন। অকুল পাথারে পড়ল উনিশ বছরের বাসন্তী। পিতৃকুলে তখন কেউ নেই। মৃত বড় ভাই-এর একমাত্র ছেলে মামা বাড়ী থেকে পড়ছে। গ্রামে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে পরের দাক্ষিণ্যের আশ্রয় নিলে দু' কন্যার জীবন অন্ধকার। এ দুঃসময়ে যে দুঃসাহসে বাসন্তী জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'ল তা পিতার কাছে পাওয়া উত্তরাধিকার। স্বামীর সামান্য সঞ্চিত অর্থ নিপুণ সুবুদ্ধিতে বাসন্তী দু'টি ইংরেজ বণিকচালিত কোম্পানীর শেয়ারে বিনিয়োগ করল। সরোজ-নলিনী-বিদ্যালয়ে ট্রেনিং নিয়ে কর্পোরেশন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেল। নিজের সবটুকু শক্তি নিযুক্ত করল মেয়েদের জীবন গঠনে। যাতে নিরানন্দ পরিবারের জীবন-রোধী আবহাওয়া তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশকে ব্যাহত না করে সেজন্য বাসন্তী নিজের দুঃখ ভুলে, বা লুকিয়ে রেখে, হাস্যে-কৌতুকে-আনন্দে রাত্রিদিন মুখর হ'ল। ছোটবেলা থেকে পিতার কাছে নিঃসংস্কার হবার শিক্ষা সে পেয়েছিল। অসঙ্কোচে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে স্বদেশী-যুগের নব-দীক্ষিত ছেলেদের সঙ্গে সে মিশত; গভীর অন্ধকার রাত্রে বাবা যখন বলতেন, 'অচেনা পায়ের শব্দ কানে আসছে, বাসন্তী, যা ত মা, বাইরে একবারটি ঘুরে আয়,' লাঠি নিয়ে নির্ভয়ে সে যেত বেরিয়ে। মেয়েদের সঙ্গে সেই বাসন্তী আবার নতুন ক'রে জীবন সুরু করল। তাদের মতই সে হাস্যময়ী; কৌতুকে উচ্ছল; তাদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চলল তার আত্ম-শিক্ষা। সাতাশ বছর বয়সে বাসন্তী ম্যাট্রিকুলেশন পাস করল; পঁয়ত্রিশ বছরে ইণ্টারমিডিয়েট। অসামান্য বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা নিয়ে পাস করার চেয়ে শিখল সে অনেক বেশী। মেয়েদের সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে নিজেও সঙ্গীত-শাস্ত্রে মনোনিবেশ করল; কেউ প্রশ্ন ক'রলে বলত, নইলে ওরা শিখছে কি না বুঝব কেমন ক'রে? মেয়েদের সঙ্গে বিজ্ঞান পড়ল এক-

আধটু বাড়ীতে ব'সে, যাতে অন্তত সাধারণ বৈজ্ঞানিক সংলাপে মূর্খের ভূমিকা না গ্রহণ করতে হয়। দেবযানী যখন ডাক্তারী পড়তে গেল, মানুষের কঙ্কাল ও অস্থি নিয়ে তার চেয়ে বাসন্তীর উৎসাহ বেশী।

বাসন্তী দেবী ভাবছিলেন, বাসন্তীর সে কাল আনন্দেই কেটেছিল। দু'টি সুস্থ সবল সুরুচি সুবুদ্ধি বালিকার সঙ্গে জীবন মিলিয়ে বাসন্তীও যেন নতুন ভাবে নতুন রং-এ আর একবার গ'ড়ে উঠছিল। স্বামীর অভাব ব্যথা দিয়েছে, বিহ্বল করে নি। বৈধব্যকে শাস্তি মনে হয় নি, সংযমের অবিরাম পরীক্ষা মনে হয়েছে, যাতে উত্তীর্ণ হবার আনন্দটুকুও কম লাভ নয়। অন্তরের কোন নিভৃত কন্দরে মাঝে মাঝে একটি স্নিগ্ধ-গম্ভীর সুকুমার যুবকের মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে; বাসন্তী তাকে বলেছে, তুমি দেশের জন্যে প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছ, আমিও, দেখ, কত শুদ্ধ-সংযত জীবনযাপন করছি। সংসারের কদর্য কোলাহলে তাকে যে বেশী জড়িয়ে পড়তে হয় নি, স্বামীর কাছে অন্তরের শূন্য ধরা পড়বার মত দীর্ঘ বিবাহিত জীবন যে তাকে যাপন করতে হয় নি, শুদ্ধাচার কৃচ্ছ্র-সাধন, আত্মসংযম ও আত্মশিক্ষার মধ্যে বছরগুলি যে তার কাটছে, তাতে সে মোটামুটি তৃপ্ত ছিল। অনেক আশা নিয়ে মেয়েদের মানুষ করছিল বাসন্তী, অনেক অনুচ্চারিত অশান্ত, মৃদু-ঝঙ্কৃত স্বপ্নে।

যৌবনে পা দিয়ে দেববাণী ও দেবযানী আলাদা পথের কথা হ'ল। দেববাণী সুস্থ, সবল, সুগঠিত; দেবযানী নিরোগ হলেও কৃশ, নরম, কোমল। দেববাণী গম্ভীর, চিন্তাশীল, স্বল্পবাক্; দেবযানী কৌতুকময়ী, রঙ্গিনী, চটুল। দেববাণীর আকর্ষণ বৃহতের দিকে, দেবযানীর সার্থকের দিকে। বাসন্তীর অসীম বিস্ময় ওদের দেখে। ওদের মনের সবটুকু রহস্য লোভীর মত তার কাম্য, ওরা পৃথিবীর চেয়ে বিরাট, জীবনের চেয়ে দুর্জ্ঞেয়। দু'জনেই কলেজে বিজ্ঞান পড়ে, কিন্তু দেববাণীর লক্ষ্য বৈজ্ঞানিকের আজন্ম সাধনা; দেবযানীর ডাক্তার হয়ে আশু প্রতিষ্ঠা। বাসন্তী তাদের বন্ধু-সংগ্রহে বাধা দেয় নি, মেয়েদের রুচি ও নিষ্ঠার ওপর বিশ্বাস তার দৃঢ়। বাড়ীতে কয়েকটি ছেলেমেয়ে যেত আসত, তাদের প্রত্যেককে কত স্নেহে বাসন্তী আপন ক'রে নিয়েছিল। তার বয়স বাড়ছিল, দেহের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ছিল; চুলে পাক ধরল একদিন; বাসন্তী নিজের অজ্ঞাতেই বাসন্তী দেবী হ'ল। সেদিকে তার নজর নেই। বিকাশমান জীবনের বিচিত্র বিস্ময় তাকে বিহ্বল ক'রে রেখেছিল।

দেববাণী রসায়নে অনার্স নিয়ে চতুর্থ বর্ষে উঠল; দেবযানী গেল মেডিকেল কলেজে। এবার বাসন্তী দেবীর মনে প্রথম সন্দেহের ছায়া নামল। ছোট্ট সে ছায়া, মানুষের হাতের চেয়ে বড় নয়, তবু আতঙ্কিত হলেন বাসন্তী দেবী। একদিন হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, দেববাণী সত্যি বড় হয়েছে। দেহে তার সুসজ্জিত যৌবন-শ্রী। কিন্তু দেহের চেয়েও মনে সে বেড়েছে বেশী। তার আশৈশব গাম্ভীর্যে মিশেছে কেমন এক অভিনব ঔদাসীন্য; জীবনকে সে যেন হঠাৎ যথেষ্ট ভালবাসছে না। বাসন্তী দেবীর মনে হ'ল, দেববাণীর গাম্ভীর্য ওপরের আবরণ; নগ্ন অন্তরে সে আলোড়িত, বিক্ষুব্ধ।

জীবনে প্রথম ভয় পেলেন বাসন্তী দেবী।

মেয়েদের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বে লজ্জা, সঙ্কোচের আবরণ ছিল না। কিন্তু দেববাণীকে প্রশ্ন ক'রে সংশয় মিটল না বাসন্তী দেবীর; বাড়ল। বুঝলেন, দেববাণী নিজেই জানে না কোন্ ঝড়ে সে উদ্বেলিত; শুধু জানে তার, অতল অন্তরে সমুদ্রের গর্জন।

পুরুষহীন সংসারে অন্তরঙ্গতম পুরুষ আত্মীয় ছিল বাসন্তী দেবীর ভাইপো, গৌতম। পিতৃবংশের একক প্রদীপ। গৌতম হস্টেলে থেকে কলেজে পড়ে, দেবযানীর সমবয়সী, দু-বোনের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। হাস্য-চঞ্চল রঙ্গ-রস-প্রিয় গৌতম এ বাড়ীর বাসিন্দা না হ'লেও সংসারের একজন। সপ্তাহ-শেষ সাধারণত এ গৃহে কাটায়, সে এলে বাড়ীর আনন্দিত আবহাওয়া অধিকতর হাল্কা হয়ে ওঠে।

বাসন্তী দেবী গৌতমের শরণাপন্ন হ'লেন।

"বাণীর মধ্যে নতুন কিছু দেখতে পাস্, গৌতম?"

"পাই, পিসীমা।"

"কি, বল্ ত?" উৎসুক হলেন বাসন্তী দেবী।

"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্খানে।"

"তুই-ও রঙ্গ-রস করবি?" চিন্তাকুল বাসন্তী দেবী চিৎকার ক'রে উঠলেন।

"সে কি পিসীমা!" বিস্মিত হ'ল গৌতম। "তুমি যে ভয়ানক সীরিয়স হয়ে উঠলে। এমন ত তোমাকে কখনও দেখি নি!"

"বাণীর কি যেন হয়েছে, গৌতম।" সামলে নিলেন বাসন্তী দেবী নিজেকে। "আমি জানি, ওর মনে ঝড় বইছে।"

"বইতে দাও।"

"কিন্তু কিসের ঝড় তা ত জানি না।"

"এ বয়সে মনে ঝড় বয়েই থাকে, পিসীমা। সে ঝড়ের

সংবাদ আবহাওয়া দপ্তর জানতে পারে না। তা নিয়ে তোমার ভাবিত হবার কারণ নেই, পিসীমা।''

"কারণ আছে, গৌতম। বাণী সহজ মেয়ে নয়।"

"অত্যন্ত কঠিন।"

"তোর কি মনে হয় কাউকে ভালবেসেছে?"

"কে? বাণীদি? কে সে সৌভাগ্যবান্ পুরুষসিংহ, পিসীমা? আমি ত জানি, বাণীদির সন্ধ্যা এখনও প্রদীপ-হীনা। কিন্তু, জান ত, 'কে বোঝে কাহার মন! অবোধ হিয়া, দিতে পেরেছিল বাণী নিঃশেষিয়া'…"

"থাম্, থাম্।" বাসন্তী দেবী হেসে ফেললেন। "তোর কাব্যচর্চা বন্ধ রাখ্।"

"রাখলাম।"

"বাণীর কিছু একটা হয়েছে।"

"নিশ্চয় হয়েছে।"

"কি ক'রে জানলি, তুই?" আবার উৎসুক হলেন বাসন্তী দেবী।

"তুমি যখন বলছ। তুমি ত মিথ্যে বল না।"

"কিন্তু কি হয়েছে তা যে জানি নে।"

"বাণীদিকে জিজ্ঞেস করেছ?"

"করেছি। কিছু বলে না।"

"এই না-বলা বাণীর ধন-যামিনী মাঝে, তাহলে, পথ কোথা, পিসীমা?"

"তুই ওকে জিজ্ঞেস কর্।"

"করতে পারি। কিন্তু যা তোমাকে বলে নি, তা আমায় কেন, ভগবান্‌কেও বলবে না।"

"কি জানি? শত হ'লেও আমি মা। বয়সের, কালের, বিচারের ব্যবধান।"

"কৈ? এসব ত কখনও জানতে পারি নি?"

"মা হবার বড় দুঃখ রে, গৌতম। সন্তানরা তার কোন খবর রাখে না।"

বাসন্তী দেবীর গলা ধ'রে এল। বিস্মিত হ'ল গৌতম। পিসীমার বুকে যে ব্যথার সুর বাজে, আগে কোনও দিন সে টের পায় নি।

সেদিনই রাত্রে বাণীকে পাকড়াও করতে গেল গৌতম। বাণী রেডিওর কাছে ব'সে বেহালা শুনছিল। গৌতম এসে পাশে বসল। দেখল, বাণী ডুবে গেছে সুরের সমুদ্রে। 'দেশ' বাজছে বেহালার করুণ তারে। বাণী দেশ-দেশান্তর পেরিয়ে কোন্ ব্যথার জগতে চ'লে গেছে; চোখে দু'ফোঁটা অশ্রু, মুখ অব্যক্ত বেদনায় বর্ষা-সন্ধ্যার পদ্মকুঁড়ির মত আবেগে আস্থির।

চুপ ক'রে বসে রইল গৌতম। বাণী তাকে লক্ষ্য করল না। এক সময় সে উঠে গেল।

বাসন্তী দেবী সেলাই করছিলেন।

"পিসীমা!" গৌতম এসে পাশে বসল।

কল বন্ধ ক'রে জিজ্ঞাসু চোখে চাইলেন বাসন্তী দেবী।

"বাণীদির ব্যাধি বুঝলাম।"

"কি রে?"

"সুর।"

"সুর?"

"ওকে সুরের অসুরে ধরেছে।"

"তার মানে?"

"ব্যস্। ঐ পর্যন্ত। আর আমি কিছু বলব না। সাবধান হ'য়ো।"

"ব্যাপারটাই বুঝলাম না, সাবধান হ'ব কি ক'রে?"

"বুঝবে, শীগগির বুঝবে। দেবযানী কিছু বলেনি?"

"না!"

"ও মরা মানুষের কঙ্কাল আর তাজা ছোকরাদের জঞ্জাল নিয়ে এত ব্যস্ত, অন্যদিকে তাকিয়েও বুঝি দেখে না।"

গৌতমের কথা বিস্ময়কর লেগেছিল। কিন্তু অচিরে তার নির্মম সত্যতা বাসন্তী দেবী টের পেলেন। তখন সুরের অসুর দেববাণীকে গ্রাস করেছে, রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করে। যে-দেববাণীকে কেউ ধরতে পারে নি, সে বুঝি এমনি গ্রাসিত হবারই অপেক্ষায় বসেছিল। কোনও হিল্লোলে যে দোলে নি, প্রভঞ্জনে উৎপাটিত হ'ল। বাসন্তী দেবী কিছুতেই তাকে বাঁধতে পারলেন না। জেনে, বুঝে, মৃত্যুর মধ্যে জীবন-জ্বালায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার সেই উন্মত্ত প্রেমের ভয়াল হিংস্রতা আজও বাসন্তী দেবীকে ভয় পাইয়ে দেয়। তিনি যে কঠিন সংযমে নব-যৌবন কালের প্রথম ভালবাসার উত্তাপ হজম করে-ছিলেন, কোন্ ঐতিহাসিক পথে আত্মজার জীবনে তার এমন দুঃসহ অদম্য পরিণতি? এ প্রশ্নের জবাব বাসন্তী দেবী আজও পান নি।

মসৃণ মেঝেয় বিদেশী উপানৎ অপরিচিত লঘু শব্দ তুলতে বাসন্তী দেবীর অতীত-চারণ ক্ষান্ত হ'ল। মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন আইরীণ।

"এস, ঘরে এস," সহাস্যে এগিয়ে এলেন বাসন্তী দেবী। বারান্দা পেরিয়ে আইরীণ ঘরে এল। চেক-কাটা সার্জের ফ্রক পরেছে আইরীণ, চুল শিথিল, ওষ্ঠাধর অরক্তিম। পায়ে মোজা নেই, সবল মাংসল পা হাঁটু

করল। যখনই আমি বলতাম, বাণী, তুই চ'লে আয়, ও উত্তর দিত, আর কিছুদিন দেখি মা। হয় ত পারব।"

"তাই নাকি?"

"ওকে নিয়ে আমাদের সবার কত উচ্চাশা ছিল। তারও চেয়ে উঁচু ছিল ওর নিজের জীবন-স্বপ্ন। সে সব ধূলিসাৎ ক'রে একটা দানবের কু-পথ জীবনকে সু-পথে ফিরিয়ে আনবার অসম্ভব সাধনায় বছরের পর বছর কাটিয়ে দিল। ওর মুখে তখন তাকাবার শক্তি ছিল না আমাদের। পৃথিবীর সমস্ত ব্যথা, যন্ত্রণা ওর মুখে জ'মে উঠত; তবু হার মানতে চায় নি বাণী। হার মানল যখন ওর ছেলের জীবন সংশয়াপন্ন, আর তখনও সে লোক কুৎসিত জীবনের বিকৃত নেশায় উন্মত্ত। সব কথা তোমাকে বলা যায় না, ব'লে লাভও নেই; কিন্তু সন্তানকে বাঁচাবার দায় না থাকলে বাণী সে নরক ছাড়ত না, ওখানেই প'চে মরত।"

"বাণী ওর কথা কিছু কিছু আমায় বলেছে। আপনার মুখে শুনতে ভাল লাগছে; অনেক কিছু, যা আগে বুঝি নি, এখন বুঝতে পারছি।"

"আমাদের দেশে মেয়েদের প্রধান আদর্শ স্বামীর ঘর আলোকিত করা। নারী-জীবনের চরম বিকাশ বলতে আমরা তাই বুঝি। আজ মেয়েদের জীবনে অন্য অনেক সুযোগ এসেছে। তারা কর্ম-জীবনে আনন্দ, সম্মান, প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। তথাপি, প্রাচীন দেশ আমাদের, পুরাতন ভাবধারা সহজে হার মানতে চায় না। স্বামী-বর্জিতা নারী আমাদের সমাজে এখনও সম্মান পায় না। বাণী যতই বড় হোক না কেন, যত সম্মানই পাক না কেন দেশে-বিদেশে, ও যে স্বামীকে ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে এ লজ্জা ওর ঘুচবে না; নিজের কাছেই ঘুচবে না।"

"আমার কিন্তু তা মনে হয় না," আইরীণ সতর্ক নিশ্বাসে ধীরে ধীরে বলল। "মাপ করবেন, আপনার মেয়েকে বোধ হয় আপনি নিজের মন দিয়ে বিচার করছেন। আমার ধারণা, আপনার ভুল হচ্ছে। বাণী তার ভুল-বিবাহের লজ্জা কাটিয়ে উঠেছে, আমার বিশ্বাস। প্রথম ওর সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব হ'ল, বিয়ে নিয়ে ওর লজ্জাই শুধু ছিল না, ভয়ও ছিল অনেক। মরণাপন্ন ছেলেকে নিয়ে যখন বাণী আপনার কাছে ফিরে এল, স্বামীকে ত্যাগ করবার সংকল্প তখনও তার ছিল না। সে লোকটা অমন ভয়ংকর ভাবে ওর সর্বনাশ করতে না এলে ত্যাগ হয়ত বাণী করত না। ওর কথায় তাই তা আমার মনে হয়েছে। ছেলে সেরে উঠলে ওর মনে হ'ল, নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা সবার আগে প্রয়োজন। আপনার চেষ্টায় তা সম্ভবও হ'ল। সমস্ত বিপদ্ থেকে আড়াল ক'রে রাখলেন আপনি ওকে, প্রায় জোর ক'রে পড়া শুরু করিয়ে দিলেন। তখনও ও ভাবে নি, স্বামীকে ডিভোর্স করবে। কিন্তু সে লোকটা ভয় পেয়ে গেল। ভাবল, বাণী তার সকল কু-কাজের কথা সবাইকে ব'লে দেবে, আর আপনারা হয় ত পুলিশেই খবর পৌঁছে দেবেন। তখন মরিয়া হয়ে সে বাণীর পেছনে লাগল। সে সব ভয়ংকর বীভৎস কাহিনী আমি ওরই কাছে শুনেছি। তার ক্রূর নিষ্ঠুর নীচ আক্রমণ বাণীর আত্ম-প্রতিষ্ঠার সংকল্পকে দৃঢ় করল; আপনি আশ্চর্য সাহস ও সংকল্প নিয়ে ওর পেছনে দাঁড়ালেন। এর আগে পর্যন্ত বাণী স্বামীকে ঘৃণা করে নি, এবার করল। স্বামীর অনেক দোস ছিল, কিন্তু তার গুণও ছিল। তার অসামান্য সঙ্গীত-প্রতিভা বাণীকে শত দুঃখে, শত ব্যথায়ও টানত, তার বলিষ্ঠ দেহের জান্তব তেজে মাদকতা ছিল; তার সর্বনাশা জীবনের কুটিল অন্ধকারে কিছু লজ্জাজনক আকর্ষণও ছিল। এ ব্যথার টান, এ আকর্ষণ দেববাণী কাটিয়ে উঠতে পারত না, যদি সে-লোকটা ওর বেঁচে ওঠবার মরিয়া প্রচেষ্টার ওপর অমন হিংস্রতা নিয়ে ঝাঁপিয়ে না পড়ত। তার নৃশংস উৎপীড়ন দেববাণীর শেষ মোহটুকু ছিন্ন করল। এবার তার বুক ভ'রে গেল ভয় ও ঘৃণায়। যতদিন দেববাণী কলকাতায় ছিল, তার বিশ্ববিদ্যালয়ে সসম্মানে পরীক্ষা-পাস ও গবেষণায় সিদ্ধি-লাভ, কলেজে চাকরি ও উন্নততর গবেষণার বছরগুলি, যার মধ্যে সে মুক্তি পেল স্বামীর কবল থেকেই শুধু নয়, স্বকৃত মহাভুলের কবল থেকেও, ততদিন এ ভয় ও ঘৃণা তাকে ঘিরে রেখেছিল।"

বাসন্তী দেবী অখণ্ড মনোনিবেশে আইরীণের কথা শুনে গেলেন।

"বিদেশে গিয়ে দু'টোই তার প্রায় কেটে গেছে। ঘৃণা কেটেছে, আমি নিশ্চয় ক'রে জানি—ওর মন আবার নির্মল, শুভ্র হয়েছে। ভয় সবটা গেছে কিনা জানি নে, তবে অনেকখানি না গেলে ভারতবর্ষে আবার ও ফিরে আসত না। আমার মনে হয়, সে বিবাহের প্রভাব ওর মন থেকে স'রে গেছে। মুক্তি পেয়েছে দেববাণী।"

বাসন্তী দেবী খুশি চেপে বললেন, "হয়ত ওকে আমার চেয়ে তুমি ভাল বুঝতে পার…"

"আমি বিদেশী মেয়ে, তাই অনেক কথা আমাকে ও প্রাণ খুলে বলতে পারে যা নিজের কাউকে বলতে ওর বাধে। দশ বছর বিদেশে থেকে ওর মন, মনন বদলে গেছে। আগেকার অনেক কিছু সংস্কার, বাধা-নিষেধ

কেটে গেছে ওর। জীবনকে অনেক বড় পরিবেশে, বড় তাৎপর্যে দেখতে শিখেছে।"

"তোমার কি মনে হয়, আইরীণ, ওর বাকী জীবন এমনি কাটবে?" সাবধানে বললেন বাসন্তী দেবী।

"অর্থাৎ আবার ও বিয়ে করবে কিনা? এ প্রশ্ন আমি অনেকবার করেছি। ঠিক জবাব পাই নি।"

বাসন্তী দেবীর ইচ্ছে হ'ল হিমাদ্রির কথা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু সংকোচ লাগল। আইরীণ নিজেই সে প্রসঙ্গ আনে কিনা তার অপেক্ষায় রইলেন।

একটু থেমে আইরীণ নিজেই বলল, "বিয়ে করবার লোক ওর আছে। কিন্তু ও নিজের মনে সংশয় কাটে নি।"

"কিসের সংশয়?"

"এ কালের সংশয়। যে সংশয়ে আমাদের প্রত্যেকের মন বিদ্ধ।"

"কি সে?"

"নিজেকে না-জানার সংশয়। কি চাই, কতখানি চাই, কোথায় যাচ্ছি, না-জানার সংশয়। দেববাণীর মনে তিনটে সত্তায় সংঘাত চলছে।"

'কিসের সংঘাত?" বাসন্তী দেবী শূন্যগর্ভ প্রশ্ন করলেন।

"দেববাণী বৈজ্ঞানিক। দেববাণী নারী। দেববাণী মা। এ তিন সত্তার সংঘাত। যতদিন এ সংঘাত না মিটবে, বিজ্ঞান ও মাতৃত্ব ছাপিয়ে নারীর দাবী প্রতিষ্ঠা পাবে, ততদিন, আমার ধারণা ওর জীবন এমনি চলবে।"

ক্রমশঃ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

(স্মৃতিচারণ)

শ্রীদিলীপকুমার রায়

ছেলেবেলায় নানা বইয়েই পড়তাম গুরু-শিষ্যের মহৎ সম্বন্ধ ও পবিত্র সার্থকতা সম্বন্ধে কত যে ভাল ভাল কথা! বিদ্বানদের মুখেও শুনতাম—বিশেষ ক'রে পিতৃদেবের ব্রাহ্মবন্ধুদের মুখে—যে, শিক্ষকেরাই জাতির মেরুদণ্ড, তাঁদের বিদ্যার আলোয়ই ছাত্রেরা পথ চলে, উপদেশের হাওয়া থেকে আহরণ করে জ্ঞানের নিঃশ্বাসবায়ু—এই ধরনের সে কি চমৎকার চমৎকার বাণী! কিন্তু হায় রে বাস্তব! কার্যক্ষেত্রে দেখতাম জীবনের বিপরীত এজাহার: ছাত্রেরা শিক্ষকদের ছায়া মাড়াতেও নারাজ, তথা শিক্ষকেরা ছাত্রদের "নোট্স্" ও পরীক্ষার খাতায় নম্বর দিয়েই খালাস—কাকস্য পরিবেদনা! কেবল ভাগ্যবশে আমার জীবনে মাত্র দু'টি শিক্ষকের সঙ্গে সত্যিকার হৃদয়ের যোগসূত্র গ'ড়ে উঠেছিল—অর্থাৎ যাঁদের স্নেহকে স্নেহ ব'লে চিনতে পেরে ভরসা জাগত প্রাণে, আনন্দ—প্রাণে, কৃতজ্ঞতা—হৃদয়ে। এঁদের মধ্যে একজনের কথা আজ বলব।

তাঁর নাম কে না জানে? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নাইট (স্যর), এফ. আর. এস., বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাতা, গান্ধীজির বঙ্গীয় প্রতিনিধি, রবীন্দ্রনাথের বন্ধু, স্যর জগদীশচন্দ্র বসুর দোসর, রসায়নের নানা গ্রন্থের প্রণেতা, দরিদ্র ছাত্রদের পরম ভরসা, চা-বিলাসীদের মহা-অরি, চরকার সর্বার্থসাধিকা বাণীর মহাচারণ, বাঙালীকে বাণিজ্যমুখী করার অদ্বিতীয় উপদেষ্টা···কত বলব? প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ ক'রে প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস-সি.-র দুরন্ত রসায়নশাস্ত্রের চাপে নাকের জলে, চোখের জলে হবার দুর্লগ্নে প্রায়ই শুনতাম স্যর-এর কত যে গুণকীর্তন তাঁর বহু অনুরাগী শিক্ষক তথা ভক্ত ছাত্রের কাছে: শিবতুল্য, উদারচরিত, ছাত্র-অন্ত-প্রাণ, প্রাতঃস্মরণীয়, দাতাকর্ণ, বালব্রহ্মচারী, মহাপণ্ডিত, নিরভিমান, ক্ষণজন্মা শিশুসরল···।

আই. এস-সি. ক্লাসে ভর্তি হ'তে না হ'তে পরিতাপে আমি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছি, মাথায় হাত দিয়ে ভাবছি—কেন মরতে বিজ্ঞানের মহলে অনধিকার প্রবেশ করতে গেলাম—এমন সময়ে এক সতীর্থ—তাঁর নাম মনে পড়ছে না, বলা যাক্ সুশীল,—আমাকে নিয়ে গেলেন স্যর-এর কাছে পেশ করতে। বললেন, "তাঁর ছোঁয়াচে তোমার মনে জাগবে রসায়নের প্রতি প্রেম হে! যেমন সাধুর ছোঁয়াচে জাগে ভগবানের প্রতি ভক্তি।"

বন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণী আধা-আধি সফল হয়েছিল: স্যর-এর মধুর স্নেহ পেয়ে ব্যবহারিক (practical) রসায়ন না হোক পুঁথিগত (theoretical) রসায়নে কিছু-কিঞ্চিৎ রস পেয়েছিলাম বৈ কি যার সুফলের কথা বলেছি

পর্যন্ত অনাবৃত। অবাক্ হয়ে দেখছিল সে দেববাণীর মাকে। স্নানান্তের শুদ্ধ-নির্মল দেহে অপূর্ব প্রশান্তি দেখে মুগ্ধ হচ্ছিল। আমন্ত্রণ পেয়ে আইরীণ চেয়ারে বসল। বাসন্তী দেবী তাঁর পানে তাকিয়ে সস্নেহে মৃদু হাসলেন।

"বাণী বেরিয়ে গেছে?"

"অনেকক্ষণ।"

"কখন ফিরবে?"

"একেবারে বিকেলে।"

"আজও ওর য়ুনিভারসিটিতে বক্তৃতা আছে, না?"

"আজকেই শেষ বক্তৃতা।"

"আপনার একা-একা লাগছে নিশ্চয়।"

"আমি বুড়ো মানুষ, আমার আবার একা-একা কি?"

"নতুন শহর, জানা-শোনা কেউ নেই, একা-একা লাগবে না?"

"বহুদিন তো একা আছি, মা। দুই মেয়ে, দু'জনেই থাকে অনেক দূরে। একটি মাত্র নাতি, তাকেও কাছে পাই নে। একা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। ভালই লাগে।"

"ভাল লাগে?" বিশ্বাস করল না আইরীণ।

"লাগে। জীবনে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব থাকলে একাকিত্বের সমস্যা। না থাকলে, একা জীবন মন্দ নয়। তা ছাড়া, মানুষ আসলে নিঃসঙ্গ। নিজের মধ্যে সে একাই।"

"এ তো আপনাদের ভারতীয় দর্শন। মাঝে-মধ্যে দু'একটা কথা শুনতে পাই। বুঝতে পারি নে।" হাসল আইরীণ। "আমার কিন্তু একা থাকতে একটুও ভাল লাগে না।"

"তুমি কেন একা থাকবে, মা? তোমার বয়সে একা-একা ভাল না লাগবারই কথা।"

"কিন্তু বাণীকে তো দেখেছি আমেরিকায়! সে দিব্যি একা থাকত। কোনও কষ্ট হ'ত না। নিজেকে নিয়ে তার একটুও সমস্যা ছিল না।"

"ওর যে একা না থেকে উপায় ছিল না।"

"কেন থাকবে না? ইচ্ছে করলেই একাকিত্ব ঘুচিয়ে দিতে পারত বাণী। আমাদের দেশে ওর অনেক স্তাবক ছিল।"

"ও কি কারুর সঙ্গে মিশত না?"

"খুব মিশত। কিন্তু ওপর ওপর। কাজের, জীবন-যাত্রার প্রয়োজনে যতটুকু না মিশলে নয়। তার পরে বাণী আর বিজ্ঞান।"

"তোমাদের সঙ্গে তো মিশত খুব। প্রতি চিঠিতেই তোমাদের কথা লিখত।"

"হ্যাঁ। আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল।" একটু থেমে বলল, "বাণীর মত মেয়ে আমি আর দেখি নি।"

বাসন্তী দেবী নারবে হাসলেন।

"প্রথম প্রথম ওকে আমার আশ্চর্য লাগত। জীবনকে এমন নীরস ক'রে একটি যুবতী মেয়ে কি ভাবে গ্রহণ করতে পারে ভেবে পেতাম না। ফ্ল্যাট আর লেবরেটরী, কলেজ আর লাইব্রেরী, এ ছাড়া ওর জীবনে আর কিছু ছিল না। পাথরের মত শক্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে ও কেবল সাধনা ক'রে যাচ্ছিল মাসের পর মাস। ছেলেরা কত সাধত, একদিন কারুর সঙ্গে কোন আনন্দে যোগ দিতে দেখি নি। কোনও দিন আমাদের সঙ্গে পর্যন্ত একটা সিনেমায় যায় নি। একমাত্র বছরে দুটো-একটা কনসার্টে আমরা ওকে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম।"

"সঙ্গীত ওর বড় প্রিয়।"

"তা কি জানি না? কিন্তু ওর মধ্যে আশ্চর্য ছেলে-মানুষি ছিল। আমাদের কাছে মাঝে-মধ্যে দু'একটা দিন কাটাত। তখন ওর সঙ্গে আমার ছেলেমেয়ের খেলা দেখলে মনে হ'ত, ওদেরই মত বাণীও একটি শিশু।"

বাসন্তী দেবী হাসলেন।

"একমাত্র যার সঙ্গে ও কখনো-সখনো বার হ'ত, সে হিমাদ্রি।"

বাসন্তী দেবী উৎসুক হ'লেন।

"কিন্তু হিমাদ্রি তো পুরুষ নয়, পর্বত। অমন গম্ভীর মানুষ জীবনে দেখি নি। তালি দেওয়া প্যান্ট, বোতাম-হীন কোট, ফিতে-খোলা জুতা: এই ছিল হিমাদ্রির পরিচয়।" হেসে গড়িয়ে পড়ল আইরীণ। "মাথায় এক ঝাঁক চুল, বোধহয় তিন মাসে একবার কাটত। বড় বড় চোখে পুরু কাচের চশমা। এই হ'ল হিমাদ্রি। আর এক সাধক।"

"দেববাণীর বড় উপকারী বন্ধু।"

"জানি। প্রথম দিন ওকে দেখে রীতিমত ভয় পেয়েছিলাম। বাণীকে বললাম, এই অদ্ভুত ভিখিরীকে কোথা থেকে ধ'রে আনলে? দেববাণী এমন ভাব দেখাল যেন আমি মহাপাপ করেছি। পরে ওর কাছে সব শুনলাম।"

"হিমাদ্রি বড় ভাল ছেলে।"

"আর একটু কম ভাল হ'লে খুশী হতাম।"

বাসন্তী দেবীর ইচ্ছে হ'ল আইরীণের কাছ থেকে যতটুকু পারেন দেববাণীর কথা জেনে নেন। কিন্তু

সম্মানে বাধল। সংলাপের গতির সঙ্গে সতর্ক পা ফেললেন।

আইরীণ বলল, "আমরা যারা অনেক পেয়ে অভ্যস্ত, অনেক আরাম, অনেক সুযোগ আমাদের জীবন-সংগ্রামকে শিথিল করেছে। যারা এখনও সামান্য পেয়েছে, অনেক পেতে চায়, পাবার জন্যে তারা যে কত কষ্ট স্বীকার করে, আমরা বুঝতে পারি নে। আমার স্বামী আফ্রিকায় ছিলেন কয়েক মাস। তিনি দেখেছেন শুধু স্কুলে পড়বার অদম্য আগ্রহ নিগ্রো যুবকদের পাঁচ শ' হাজার মাইল পথ হাঁটায়।"

নীরব বাসন্তী দেবীর দৃষ্টিতে উৎসাহিত মনোযোগ লক্ষ্য ক'রে আইরীণ বলল, "কিন্তু আমাদের ঠাকুর্দাদের জীবন অন্যরকম ছিল। আমার ঠাকুর্দার বয়স তিরাশি, তখনও শক্ত সমর্থ, সোজা। নিজের ফার্ম আছে টেক্সাস রাজ্যে, সেখানে থাকেন। তাঁকে দেববাণীর গল্প বলেছিলাম। মন দিয়ে শুনে বার্ধক্যের আকর্ষণীয় উদাস হাসি হেসে বললেন, এখন তোমরা জীবনের সবটুকু সুবিধে হাতের কাছে সাজানো পাচ্ছ, তাই অবাক্ লাগছে। আমাদের সময়েও জীবন দোকানের শো-কেসে সাজানো এমন ফরমাসী উপভোগ ছিল না। জীবন ছিল বীরভোগ্য, তাকে ল'ড়ে জয় করতে হ'ত।" একটু থেমে আইরীণ বলল, "আমার ঠাকুর্দার বাবা গরীব ছিলেন; ছোট্ট দোকানের আয়ে সংসার চলত। বাল্যকালে ঠাকুর্দাকে দোকান দেখবার ভার নিতে হ'ল। সারাদিন দোকান দেখে রাত্রে নিজে নিজে পড়াশোনা করতেন। একদিন দেখা গেল তিনি নিখোঁজ। তিনশ' মাইল হেঁটে অন্য শহরে গিয়ে উঠলেন। রাত্রে হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ নিয়ে দিনে স্কুলে ভর্তি হ'লেন। স্কুলে এত ভাল রেকর্ড দেখালেন, তাঁকে বৃত্তি দেওয়া হ'ল। এমনি ক'রে স্কুল পেরিয়ে কলেজ, তার পর হার্ভার্ড ল' স্কুলে আইন পাশ ক'রে ডিস্ট্রিক্ট এ্যাটর্নী হয়েছিলেন। সবাই খুব সম্মান করেন তাঁকে এখনও।"

"তোমার বাবা কোথায় আছেন?"

"বাবা ওয়াশিংটনে সরকারী কাজ করেন। ইঞ্জিনীয়র তিনি। আমার একটি ভাই আছে, বব—রবার্ট। সে ফরেন সার্ভিসে। এখন হাভানায়।"

"সে কোন্ দেশ?"

"দক্ষিণ আমেরিকায় কুবা দেশ আছে, আমাদের দেশের কাছাকাছি। তার রাজধানী হাভানা।"

"তোমার মা-র কথা ত বললে না?"

"আমার মা থাকেন নিউ ইয়র্কে। বাবার সঙ্গে অনেক বছর আগে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তিনি আবার বিয়ে করেছেন। বাবা অবশ্য আর বিয়ে করেন নি।"

"তোমার ভাই বিয়ে করেছেন?"

"ওরও একই অবস্থা। আমাদের দেশে বেশ কম বয়সে বিয়ে করার রীতি। তাই বোধহয় অনেক বিয়ে ভেঙে যায়। বব একুশ বছরে বিয়ে করেছিল। ছাব্বিশ বছরে ওদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।"

"সন্তান হয়েছিল?"

"না।" একটু হেসে আইরীণ বলল, "দেখছেন তো, আমাদের পরিবারে বিয়ে টেঁকে না। কেবল আমারই টিঁকে আছে।"

"তুমি তো খুব লক্ষ্মী মেয়ে। তোমার বিয়ে জীবন-ভোর টিঁকবে।"

"অবশ্য লক্ষ্মী মেয়েদের বিয়েও ভেঙে যায়।" আইরীণ নিজের মনে বলল, "কেন যায়, কেউ বলতে পারে না। বলে না। প্রেম ফুরিয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম না থাকলে সে বিয়ে ভাঙ্গবেই।"

"আমাদের দেশে ভাঙ্গে না।"

"কেন? দেববাণীর ত ভেঙ্গে গেছে।" সরল ভাবে বলল আইরীণ।

"বাণীর বিয়েটা অন্য ব্যাপার।" কণ্ঠস্বর সামান্য কঠিন হ'ল বাসন্তী দেবীর।

"অন্য ব্যাপার কেন?"

"ওকে আমি বিয়ে ব'লেই মানি নি কোনও দিন।"

"আপনি না মানলেও বাণী মেনেছিল," আইরীণের স্বর শুকনো শোনাল। "ওর একটি ছেলেও আছে।"

"কি তুমি শুনেছ জানি নে," পাথুরে গলায় বললেন বাসন্তী দেবী। "একটা দুষ্ট লোক নির্বোধ সরল পেয়ে বাণীকে সম্মোহিত করেছিল।"

"সঙ্গীতে।"

"সঙ্গীত না হাতী। বাণী কোনও পুরুষের নিকট সান্নিধ্যে তার আগে আসে নি। কোন পুরুষের দাগ পড়ে নি ওর মনে। সমবয়সীরা বলত, পুরুষ বাণীকে বিকর্ষণ করে। এমন সময় হঠাৎ এ লোকটা ওকে সম্মোহিত করল। বাণীর সঙ্গে তার রুচির, কৃষ্টির, শিক্ষার, পরিবেশের, মূল্যবোধের কোন মিল ছিল না। ওর ভাগ্যের দুর্বিপাক, তাই অমন মারাত্মক ভুল ও ক'রে বসল। অবশ্য ভুল ভাঙ্গতে দেরী লাগল না। বছর না যেতেই বাণী বুঝল নরকে পা দিয়েছে ও। তবু পাঁচ বছর তাকে সুপথে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা

গলা জড়িয়ে ধ'রে চক্ষের নিমেষে লাফিয়ে উঠে দু'পা লতিয়ে আমার কটিবেষ্টন ক'রে বৃদ্ধ শিশু ঝোঝুল্যমান আমার বুকে। এ একটুও বাড়িয়ে বলছি না—তা ছাড়া এ ধরনের অঘটন চেষ্টা ক'রে কল্পনা করা কঠিন। শুধু কি তাই? ক্লাসসুদ্ধ ছেলে হলুধ্বনি দিয়ে হেসে উঠল। একজন ছাত্র হেসে ব'লে উঠল চেঁচিয়ে: "স্যর, ভাগ্যে দিলীপ মুগুর ভাঁজে,'প্যারালাল বার' করে তাই আপনার ভার বইতে পারল।" আমি হেসে পিঠ পিঠ উত্তর দিলাম (তখন আমার সাহস এসে গেছে ত, ফার্ষ্ট হ'য়ে) "স্যর জ্ঞানেই ভারি, দেহে ফেদার ওয়েট। মুগুর না করলেও বইতে পারতাম।" অমনি রসিক স্যর হেসে জবাব দিলেন: "ভুল করলে দিলীপ, জ্ঞানী ভারী কোথায়? শাস্ত্রে আছে: 'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া'—কি না অজ্ঞান যে সে তিন মণ দশ সের, জ্ঞানী যে সে শোলার মতন। হা হা হা!" ক্লাসের সে কি হাসির হররা! এ ছবিটি কি ভুলবার?

সত্যি, আজও স্যরের কথা ভাবতে মন আর্দ্র হয়ে ওঠে: কি সরল সহজিয়াই না ছিলেন তিনি! বলতে ইচ্ছা হ'ত তাঁকে একটি গানের অস্থায়ী ভেঁজে: "তোমার তুলনা তুমি", ছাত্রদের এমন স্নেহ করতে পারে ক'জন? সংস্কৃত তিনি ভালই জানতেন, বলতেন কথায় কথায়: "সর্বত্রং জয়মন্বিষ্যেৎ পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"—সর্বত্রই জয় চাইবে, কেবল পুত্র ও শিষ্যের হাতে পরাজয়।

এই সময়ে মাঝে মাঝে যেতাম সায়েন্স কলেজে তাঁর কাছে—তাঁকে গান শোনাতে তথা তাঁর সঙ্গে গল্পালাপ করতে। একবার শরৎচন্দ্রকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেই যথা পূর্বং তথা পরম্—বিরাট হলঘর: একটি খাটিয়া, একটি টেবিল, আরও দু'চারটি ছোটখাটো আসবাব মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে ঘরটি প্রায় শূন্যই মনে হ'ত—যেন বাসের জন্যে নয়, পান্থশালা। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা হ'ত কখনো কখনো। একদিন তাঁকে আমি বলেছিলাম: "জানেন শরৎদা, স্যরের মত একজন বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক যে এভাবে কৃচ্ছ্রসাধক সন্ন্যাসীর মত দীনবেশে রিক্ত ঘরে দিনের-পর দিন এমন পরমানন্দে কাটাতে পারেন, এ আমি চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারতাম না।"

সত্যিই বিশ্বাস করার কথা নয়—আরও এই জন্যে যে, স্যরের মাসিক আয় ছিল প্রচুর: বেঙ্গল কেমিক্যাল, বই বিক্রি, মোটা মাইনে, সর্বসাকুল্যে তিন চার হাজারের কম নয়। (আর পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে তিন হাজার এখনকার দশ বারো হাজারের সামিল—মনে রাখা চাই।) কাজেই এ-বিপুল আয়ে তিনি সে যুগে রাজার হালেই থাকতে পারতেন। কিন্তু "স্বভাবস্তু প্রবর্ততে" ত? কাজেই এ স্বভাবে দাতাকর্ণ তথা সন্ন্যাসী পারবেন না দান ছেড়ে আত্মসুখসর্বস্বতাকে বরণ ক'রে বিলাসে গা ঢেলে দিতে। শরৎচন্দ্র প্রায়ই বলতেন: "স্যরকে দেখে সব আগে মনে হয় বিদ্যাসাগরের কথা—দয়ার সংযমের অবতার—আর দেখ: জ্ঞানের উদয়ে সরলতার আলো ছড়িয়ে পড়ে কেমন সহজে!"

আমার মনে নেই সেদিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে স্যরের কি কি কথা হয়েছিল—কেবল একটি কথা ছাড়া। স্যর বলেছিলেন: "শরৎবাবু, আপনার লেখার আমি এত ভক্ত কেন জানেন? কারণ, আপনার সৃষ্ট চরিত্র প্রত্যেকটি রক্তে মাংসে গড়া মানুষ—পড়ে আবার ওঠে। প্রলোভনে যারা কোনদিন টলে নি তারা ত পাথর, পাথর, পাথর। উঁম্?" শরৎচন্দ্র হেসে উত্তর করেছিলেন: "বাস্তববাদের—রিয়্যালিসমের—এইই তো প্রাণের কথা।" হ্যাঁ, আর একটি কথা মনে পড়েছে, শরৎচন্দ্র তাঁকে বলেছিলেন হেসে: "দিলীপ বলেছে আমাকে তার সতীর্থ দীর্ঘশিখীর দুরবস্থার কথা। আপনি জানেন নিশ্চয়ই, ওর বাবা টিকি নিয়ে কী ঠাট্টা তামাসাই করতেন—যাও না মন্টু, স্যরকে শুনিয়ে দাও সেই 'হয়েছি হিন্দু' গানের টিকি-মাহাত্ম্য।" আমি খুশী হয়ে ধ'রে দিলাম:
(আহা) কী মধুর টিকি আর্যঋষি কী বানিয়েছিলেন কল্ গো!
(ও সে)আপনার ঘাড়ে আপনিই বাড়ে(অথচ)চতুর্বর্গ ফল গো!
(আহা) এমন কম্র, এমন নম্র, আছে গোপনে পিছনে ঝুলিয়ে!
(অথচ সে)সব একদম করিবে হজম (কী) বিষম হজমিগুলি এ!

আমার জীবনের নানা অর্থে নানা লাভ হয়েছে, কিন্তু একটি মস্ত লাভ হয়েছে মহাজনদের পাশাপাশি দেখা: দ্বিজেন্দ্রলাল-গিরিশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ, রাসেল-রোলাঁ, গান্ধীজি-আবদুল গফ্ফর খাঁ, দেশবন্ধু-সুভাষ···ইত্যাদি। আমি ভাগবতের একটি কথায় চিরদিনই বিশ্বাস ক'রে এসেছি যে, মহৎ প্রেরণা আমাদের অন্তরে বীজের মতন উপ্ত হয়ে থাকলেও অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে মহাজনদেরই সংস্পর্শে। আজও মনে পড়ে—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাতের কথা। ইতিপূর্বে আমি লিখেছি এ সম্বন্ধে, তা থেকে উদ্ধৃত করি—স্মৃতিচারণে এটুকুও উৎকীর্ণ রেখে যাওয়া মন্দ কি? উদ্ধৃতিটি দিচ্ছি একটি প্রবন্ধ থেকে—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুরোধে লিখেছিলাম:

"রবীন্দ্রনাথ এসেছেন প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যসদনে, শরৎচন্দ্রও সেদিন উপস্থিত। বঙ্গ সাহিত্যের সূর্য চন্দ্র

একই আকাশের আসরে—যেন পূর্ণিমার পরের দিন সূর্যোদয় লগ্নে।

"শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা'র প্রসঙ্গ উঠল। রবীন্দ্রনাথ বললেন: 'শরৎ, তুমি আমাদের সমাজকে দেখ ভিতর থেকে। আমি দেখেছি খানিকটা বাইরে থেকেই বলব—আমার যৌবনে ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজ খানিকটা একঘরে ক'রেই রেখেছিল তো? তাই তোমার ভৈরবী জাতীয় সম্প্রদায় আমি দেখি নি ব'লেই আরও খুশী হয়েছি যে, এ-ধরনের চরিত্রকে নিয়েও তুমি সার্থক গল্প গাঁথতে পেরেছ। কেবল মুস্কিল এই যে, তোমার ভৈরবীকে দেখলে গানের সুরে 'বড় বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে' বলতে ইচ্ছে হ'লেও মনে হয় গল্প নাটক নভেলে তো বিভীষিকাই জাগবার কথা—অন্তত নাম শুনলে।'

"শরৎদা হেসে বলেছিলেন: 'ভৈরবী নামটা শুনলে মন 'ও বাবা!' ব'লে ওঠে মানি। কিন্তু আমার ভৈরবী তো কপালকুণ্ডলার কাপালিকের মতন ভয় দেখায় না—ভালোই বাসায়।'"

রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্যটি আমার আজও মনে আছে আরও এই জন্যেই যে, কথামৃতে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কথা পড়লেও আমাদের সমাজের যে স্তরে ভৈরবী ভৈরব তান্ত্রিক কাপালিকদের যাওয়া-আসা সে সমাজের সঙ্গে আমাদের মতন ইঙ্গবঙ্গদের সত্যিই কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু অবান্তর ছেড়ে প্রাসঙ্গিকের কোঠায় ফিরি।

প্রফুল্লচন্দ্র শরৎচন্দ্রের সম্বন্ধে প্রায়ই আমার কাছে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতেন। যতদূর মনে পড়ে শরৎচন্দ্রকে প্রথম আমিই তাঁর কাছে নিয়ে যাই তাঁর অনুরোধে। তবে এ ধরনের খুঁটিনাটিতে স্মৃতিবিভ্রম হওয়া বিচিত্র নয় তাই শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে প্রফুল্লচন্দ্র কী ভাবে উজিয়ে উঠতেন সে প্রসঙ্গ রেখে বলি আর একটা কথা যা স্মৃতিপটে আজো জ্বল্ জ্বল্ করছে।

শরৎচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি নানা বিষয়েই সম্পূর্ণ আলাদা ছিল, কে না জানে? কেবল এক জায়গায় ওঁদের গভীর মিল ছিল: হিন্দুধর্মের আচারপন্থী শুচি-বাইয়ের বিরোধী ছিলেন দু'জনেই। শরৎচন্দ্র "বামুনের মেয়ে"তে লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন, তাঁর মন্তব্য—গল্পে। প্রফুল্লচন্দ্র আচারের বিরুদ্ধে অভিযান করতেন আমাদের শাস্ত্র ঘেঁটে দেখিয়ে যে, আমাদের মুনি-ঋষিরা ধর্ম ও আচারকে গুলিয়ে ফেলতেন না—তাঁরা যথার্থ জ্ঞানী ছিলেন ব'লেই। আমার কাছে তিনিই প্রথম বলেন, সত্যকাম ও জাবালীর কথা। বলেন: "ছান্দোগ্যে দেখতে পাবে দিলীপ, সত্যকে তাঁরা কি দাম দিতেন। সত্যকাম গৌতমকে এসে বলল, 'দীক্ষা দিন'। গৌতম বললেন, 'তোমার কি গোত্র?' সত্যকাম মাকে শুধিয়ে ফিরে এসে অকপটে সত্য বলল: 'মা নানা লোকের পরিচারিকা ছিলেন তাই বলতে পারলেন না কে আমার পিতা'। গৌতম আশীর্বাদ ক'রে তাকে দীক্ষা দিলেন এই ব'লে যে, জারজ হয়েও যে সত্য কথা বলতে ভয় পায় না সেই তো যথার্থ ব্রাহ্মণ।" বলতে বলতে স্বর উজিয়ে উঠেছিলেন সেদিন, বলেছিলেন: "এই জন্যেই মহাভারত রামায়ণ উপনিষদ্ পড়তে পড়তে আমার মন এত খুশী হয়ে ওঠে দিলীপ! আমরা প্রায়ই বলি: 'We are proud of our ancestors!' আমার মনে প্রশ্ন জাগে: 'But are they proud of us, their worthy successors?' তাই তো আমি এত চড়াও হয়ে বলতে চাই তাঁদের উদারতার কথা—শুধু দেখাতে, আমরা আজ কি হয়ে পড়েছি—আচার শুচিবাই জাত ছোঁওয়াছুঁয়ি মেনে। এই দেখ না কেন, আমরা ঘড়ি ঘড়ি কি সদর্পেই না বলি: 'গোমাতা! আহা, কি ভাব রে! আমাদের মুনি-ঋষিরা কি মাতৃভক্ত ছিলেন!' কিন্তু বেদ ও বৃহদারণ্যকে গোমাংস খাওয়ারও বিধি আছে। মহাভারতেও দেখতে পাবে আমাদের মুনি-ঋষিরা আহারের শুদ্ধতা নিয়ে এত গলাবাজি করতেন না, তাই তাঁরা শুধু যে মাংসাহারের বিধান দিয়েছিলেন তাই নয়, ঘোষণা ক'রে গেছেন বড় গলা ক'রেই—গোমাংস পরিবেশন ক'রে বিখ্যাত ভক্তরাজা রন্তিদেব কি দারুণ যশস্বী হয়েছিলেন! না দিলীপ, এতে ভয় পাওয়ার কি আছে? নিরামিষ খাও, আমি বুঝি, কিন্তু অমুক মাংস খেলে যদি নরকে না যাই তবে তমুক মাংস খেলে নরকে যেতে হবে কেন? বিবেকানন্দ কি মিথ্যে বলেছেন—আমাদের ধর্ম গিয়ে ঠেকেছে শেষটায় ঐ ভাতের হাঁড়িতে, শুচিবাইয়ে touch-me-not-ism-এ? গান্ধীজিকে আমি এত ভক্তি করি তিনি নিজেকে হরিজন ব'লে থাকেন ব'লে।"

(স্বর-এর কাছে শুনে সেদিন বাড়ী ফিরেই তাঁর নির্দেশে মহাভারত বনপর্ব খুলে পেয়েছিলাম: স্বয়ং মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন (১৭৬ অধ্যায়) যে, শুধু যে মৃগপক্ষী অন্নের মতনই মানুষের খাদ্য তাই নয়, বিখ্যাত ভক্ত রন্তিদেব রাজার রান্নাঘরে প্রত্যহ দু'হাজার গরুকে পাক ক'রে সেই মাংসের সঙ্গে অন্ন পরিবেশন ক'রে তাঁর অতুল কীর্তি হয়েছিল। শ্লোক তিনটি এই:

যথাস্থানে—আগে তাঁর সঙ্গে আমার শুভদৃষ্টির প্রসঙ্গটি সেরে নিই। তাঁকে আমরা সবাই "স্তর" বলতাম, এ নিবন্ধেও সেই অভিধাই কায়েম হোক।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯১৪ কি ১৫ সনেই হবে—আমার সুশীল-সতীর্থ আমাকে নিয়ে গেলেন স্তর-এর কাছে। তিনি এবং আরো অনেকে স্তর-এর গুণগানে আত্মহারা হতেন ঘড়ি ঘড়ি, তবে আমার মনে সবচেয়ে গেঁথে গিয়েছিল তাঁদের একটি কথা: যে, স্তর ছাত্র-অন্ত-প্রাণ—পূর্বজন্মের বহু সুকৃতি থাকলে তবেই সে ধন্য ছাত্র তাঁকে শিক্ষকরূপে পায়—তিনি ছাত্রকে তাঁর সরল প্রেমে ভুলিয়ে দিতে পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অশুস্তি দুর্ভোগ।

ভাগবতে আছে গোপীরা চোখে দেখার আগেই কৃষ্ণকে ভালবেসেছিল তাঁর বাঁশি শুনে। লোকমুখে স্তর-এর অজস্র গুণকীর্তন আমার কানে এমনি বাঁশির সুর হয়েই বেজে উঠেছিল—তাঁকে দেখবার আগেই বরণ করেছিলাম স্বতঃস্ফূর্ত পূর্বরাগে। অথ, দুরুদুরু-বক্ষে গেলাম সায়েন্স কলেজে এই "ক্ষণজন্মা"কে দেখতে।

সুশীল আলাপ করিয়ে দিতেই স্তর আমাকে কাছে টেনে এনে বললেন: "অ্যাঁ! বলো কি? ডি. এল. রায়ের কুল-তিলক—তার উপর শিবরাত্রির সলতে—হা হা হা! তোমার কথা তাঁর জীবনীতে পড়েছি হে—আমিও শুনেছি তোমার গুণগান। তুমি নাকি চমৎকার গাইতে পার। আর কথাটি নয়, ধ'রে দাও তাঁর গান।"

সুশীল হেসে বলল, "দম নিতে দিন ওকে। ও এসেছে আপনাকে দর্শন করতে—"

স্তর হেসে ব'লে উঠলেন, "কে কাকে দর্শন করে that is the question, উঁম্?" ব'লেই আমার দিকে চেয়ে: "দাঁড়াও দিলীপ, দেখি নয়ন ভ'রে—হা হা হা।"

(তিনি কথায় কথায় "উঁম্" ব'লে জিজ্ঞাসু ভঙ্গিতে মাথা নাড়তেন এমন ভঙ্গিতে যে আজও ভুলতে পারি নি। তবে উঁম্ উচ্চারণ করতেন জিভ দিয়ে নয়—মুখ বন্ধ ক'রে অনুনাসিক উঁ প্রশ্ন করলে যে স্বরটি বেরোয় সেইটিই ছিল তাঁর মুদ্রাদোষ, যেমন শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর ছিল "বুঝেছেন্?")

তার পর উঠল পিতৃদেবের প্রসঙ্গ। স্তর বললেন, "তাঁর স্বদেশী গান আমাদের দেশে সবাইকে কি ভাবে মাতিয়ে তুলত দিলীপ, উঃ! এমন ওজস্—force—উঁম্? যত্র তত্র মেলে না হে। গাও তাঁর ঐ গানটি—না, আর দেরি নয়—আমার কি যে ভাল লাগে—তাঁর ঐ

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ—
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ!

কিম্বা তাঁর ঐ—

সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চ শির!
উঠ বীরজায়া বাঁধো কুন্তল, মুছ এ-অশ্রুনীর।

শুনলে আমার বৃদ্ধ রক্তও গরম হয়ে ওঠে, কি বল সুশীল, উঁম্? বাংলা ভাষার মধ্যে যে এত তেজ গা-ঢাকা হয়ে ছিল কে জানত? এক হেমচন্দ্র জাগিয়েছিলেন এ আগুন"—ব'লেই ধ'রে দিলেন:

"চীন ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান—তারাও স্বাধীন
তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান—ভারত শুধুই
ঘুমায়ে রয়?"

(এখানে ব'লে রাখি ফের—এ-সব তাঁর মুখের কথার হুবহু উদ্ধৃতি নয়—তা ছাড়া আমি নিজের ভাষায়ই বলছি তাঁর নানা মন্তব্য, নানা সময়ের নানা কথা এখানেই বসাচ্ছি শুধু তাঁর যে-ছবিটি আমার চোখে ফুটে ওঠে তার রং রেখা সংক্ষেপে ফোটাতে। স্মৃতিচারণ ঠিক ইতিহাস নয়, তার মূল লক্ষ্য ছবি আঁকা।)

আমি মুগ্ধ হয়ে তাঁকে শুধালাম: "কোন্ গানটি গাইব?"

স্তর বললেন, "অধিকন্তু ন দোষায়—দুটোই গাও। না, তিনটে—'আবার তোরা মানুষ হ' গানটিও শুনবই শুনব। জানো দিলীপ, আমি প্রায়ই বলি এই গানটিই হ'ল ডি. এল. রায়-এর প্রধান বাণী—message, কি বল সুশীল—উঁম্? কারণ মানুষই দেশকে গড়ে—আমাদের দেশের আজ এ-দুরবস্থা কেন? সত্যিকার মানুষ এত কম ব'লে, নয় কি? উঁম্?"

আমি আনন্দে বিহ্বল হয়ে গানের পর গান গেয়েছিলাম মনে আছে—যদিও কি কি গান, মনে করতে পারছি না।

হ্যাঁ, আর একটি কথা মনে পড়ছে। স্তর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি "তরী হেথা বাঁধব না গো আজকে সাঁঝে" গানটি জানি কিনা। আমি "না" বলেছিলাম একটু অবাক্ হয়েই বলব। কারণ এ-গানটি সে সময়ে খুব জনপ্রিয় হলেও আমার তেমন ভাল লাগত না, মনে হ'ত বড় বেশি উচ্ছ্বাসী—সেন্টিমেন্টাল।

বিপত্নীক স্বামী স্ত্রীর দেহ যে-শ্মশানে দাহ করেছিলেন সেখানে নৌকা ভিড়োতে চান নি—স্ত্রী তাঁর কি অপরূপা ছিল সেই বর্ণনায়ই কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। (শরৎচন্দ্র একবার এ গানটির সম্বন্ধে আমার বিরূপ মন্তব্য শুনে বলেছিলেন: "কিন্তু মন্টু, এ তোমার অন্যায়—স্ত্রী হ'লে

বুঝতে যদি তার পরে কখনো বিধবা হয়ে তাকে নিজে দাহ করতে—হো হো হো!")

স্যর সেদিন আর একজন মহাবরেণ্য কবির প্রসঙ্গে এমনি উছিয়ে উঠেছিলেন। তিনি শেক্সপীয়র। বলেছিলেন: "আমি কতবারই যে পড়ি ওঁর নাটক দিলীপ, আর বলি শেক্সপীয়র শেল্‌ফে মজুদ থাকলে আর কোন বই না থাকলেও চলে। অমুক বলেছিলেন (নামটা ভুলে গেছি, কার্লাইল কি?) ঠিকই: 'শেক্সপীয়রের নাটক থাকতে আর কোন বই পড়ার কি দরকার—অগুন্তিবার তাঁর নাটকগুলিই পড় না'।"

সন্ন্যাসীদের মধ্যে বার বার শুনেছি ঠিক এই কথাটিই গীতা ও ভাগবত সম্বন্ধে।

প্রফুল্লচন্দ্রের প্রসঙ্গে প্রথমেই এই তিনটি দৃষ্টান্ত দিলাম তাঁর চরিত্রের তিনটি দিক্‌ দেখাতে। অর্থাৎ আজো ওঁর কথা মনে করার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্মৃতিচক্ষে ফুটে ওঠে তাঁর এই তিনটি বিভিন্ন রূপ—তিনি সহজেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন দেশভক্তিতে, কারুণ্যে ও নাটকীয় ভাবাবেগে।

ধর্ম তিনি মানতেন কি না নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি না, তবে আচার আদৌ মানতেন না। না, কম বলা হ'ল, তিনি প্রায়ই বলতেন আচার, ছুঁৎমার্গ ও জাতিভেদ এই ত্রিশূলেই আমাদের বিঁধে মেরেছে। বিশেষ ক'রে শুচিবাই-বর্গীয় কুসংস্কারকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা ছিল তাঁর একটি প্রধান আমোদ। মনে আছে প্রেসিডেন্সী কলেজে আমার এক সতীর্থের কথা। তার টিকি ছিল মস্ত—তাই নাম দেওয়া যাক্‌ "দীর্ঘশিখী।" স্যর প্রায়ই তাকে নিশানা ক'রে ব্যঙ্গবাণ ছুঁড়তেন। একবার করেছিলেন এক কাণ্ড! আমরা ক্লাসে এসে বসতেই তিনি বাঁ হাতে একটি হাড় ও ডান হাতে একটি পাত্রে কিছু ভস্ম নিয়ে দীর্ঘশিখাকে ডেকে বললেন: "তুমি সায়েন্সে বিশ্বাস কর নিশ্চয়ই, নইলে বি. এস-সি পড়ছ কেনই বা? তাই শোনো বলি—এই যে হাড় এ হ'ল ওঁ শ্রীরামপক্ষীর ঠ্যাং। আর এই যে ভস্ম এ হ'ল ঐ পক্ষীরই হাড়-পুড়িয়ে-যাওয়া ভস্ম। এই দেখ, আমি এই ভস্ম মুখে দিলাম। আমার জাত গেল, না রইল? উঁম্‌?"

দীর্ঘশিখীর মুখ লাল হয়ে উঠল: "এ কি রকম ঠাট্টা স্যর?"

স্যর হো হো ক'রে হেসে তার পিঠ চাপড়ে বলেন: "রাগই পুরুষের লক্ষণ, কি বল? উঁম্‌? তবে এ আমার ঠাট্টা নয়—হাটে জলজ্যান্ত সত্যের হাঁড়ি ভাঙা। আমার জাত যায় নি বোঝাতেই এ ডিমন্‌স্ট্রেশন্‌। অর্থাৎ হাড় পুড়োলে সে oxidized হয়ে একেবারে একটি আলাদা জিনিস হয়ে যায়, কি না—Calcium carbonate" (ক্যাল্‌সিয়াম না কি বলেছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না, তবে ঐ ধরনেরই একটা কথা।)

দীর্ঘশিখী ক্লাসের সকলের হাসিতে বিব্রত হয়ে গুম্‌ হয়ে গেল। স্যর হেসে বললেন: "অত রাগ কেন? সায়েন্স যদি পড়তেই চাও তবে সায়েন্স থেকে যা শিখবার আছে তা শিখতে আপত্তি করলে চলবে কেন? উঁম্‌? সায়েন্সের একটি মস্ত কাজ হ'ল বস্তু বিচার ক'রে মনকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা—অন্তত খানিকটা। তাই এ-ভস্ম খেলে তোমারও জাত যেত না, পরখ ক'রেই দেখ না কেন? উঁম্‌?" আবার ক্লাসে হাসির হর্‌রা পড়ে গেল। দীর্ঘশিখী ত রেগে আগুন! পরে আমাকে বলেছিল: "এ কি রকম শিক্ষক? আমাদের পড়াতে এসেছেন—পড়ান। জাত তুলে কথা কইবেন কেন?"

আই. এস-সি. পাস করার পরের ঘটনা এটি—যখন আমি স্যরের রসায়ন ক্লাসে সবে ভর্তি হয়েছি। ইতিপূর্বে আই. এস-সি-তে দু'বছর রসায়ন শাস্ত্র পড়তে আমার সত্যি কান্না আসত—এ কথা আমার স্মৃতিধারা দ্বিতীয় পর্বে ফলাও ক'রেই লিখেছি। কিন্তু স্যরের কাছে রসায়ন পড়তে পড়তে দেখি অবাক্‌ কাণ্ড—রসায়নে একটু একটু রস পাচ্ছি বৈ কি! ফলে তৃতীয় বার্ষিকী কলেজ পরীক্ষায় একশোর মধ্যে ৭৭ পেয়ে প্রথম হলাম। (ব'লে রাখি—এ অসাধ্য সাধন করেছিলাম আমি শুধু স্যরের প্রিয়পাত্র হ'তে। পরের বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বি. এস-সি.-তে এই রসায়নেই আমি ফেল করি—১৯১৭ সনে।) স্যরের সে কি আনন্দ—ভুলব কি কোনদিন? চতুর্থ বার্ষিকী ক্লাসে উত্তীর্ণ হয়ে ছুটির পরে তাঁর ক্লাসে প্রথম ঢুকেই সে কি কাণ্ড! আমি কোন পরীক্ষায়ই আর কখনও প্রথম হই নি (বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ঐ একবারই ছিঁড়েছিল) তাই হয়ত স্যরের সেদিনকার হুলুধ্বনি আজও আমার কানে বাজে।

হুলুধ্বনি ব'লে হুলুধ্বনি! স্যর আমাকে (তখন আরও অনেক ছাত্রকেই) স্নেহ-আলিঙ্গন করেছেন একাধিকবার, কিন্তু সেদিন করলেন এক কাণ্ড! আমরা ক্লাসে ঢুকতেই স্যর চেঁচিয়ে আমাকে "প্রথম" ব'লে অভিনন্দিত ক'রে কাছে ডেকে আমার খাতার একটি পাতা খুলে সবাইকে ঝাণ্ডার মতন নেড়ে দেখালেন সগর্বে: "দেখ হে, দেখ সবাই! আমাদের দিলীপ শুধু ফার্স্ট হয় নি, কি রকম মোক্ষম রিটর্ট ও বুনসেন বার্ণার এঁকেছে দেখ চেয়ে! ব্রাভো!" ব'লেই খাতা রেখে দু'হাতে আমার
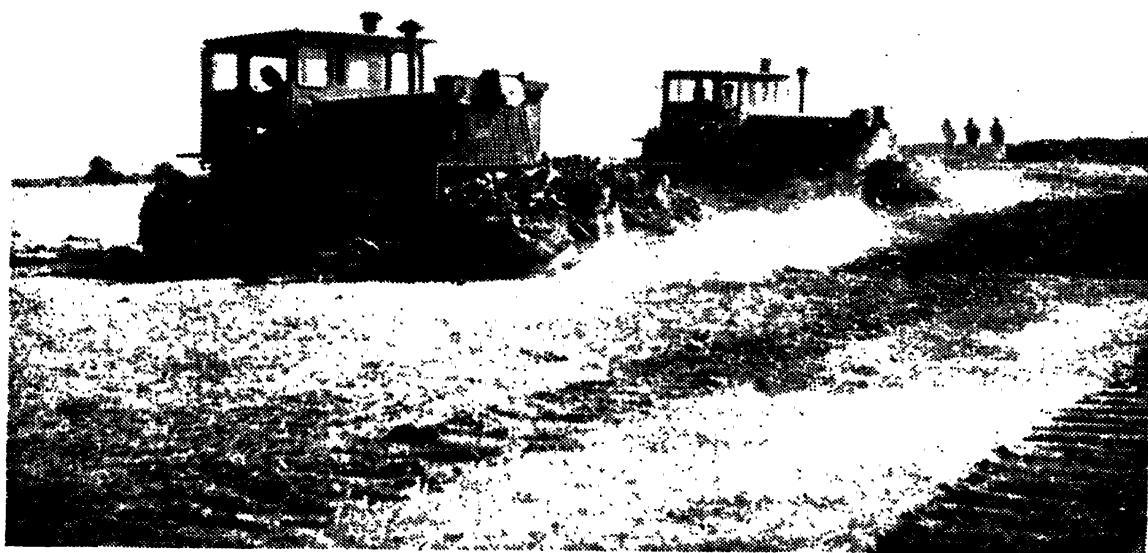
খবর শুনছি
ফটো : শ্রীআনন্দ মুখোপাধ্যায়

মেদিনীপুরে সোভিয়েট ট্রাক্টর

ওষধো বীরুধশ্চৈব পশবো মৃগপক্ষিণঃ।
অন্নাদ্যভূতা লোকস্য ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ॥ (৬)
রাজ্ঞো মহানসে পূর্বং রন্তিদেবস্য বৈ দ্বিজ!
অহন্যহনি পচ্যেতে দ্বে সহস্রে গবাং তথা॥ (৮)
সমাংসং দদতে হ্যন্নং রন্তিদেবস্য নিত্যশঃ।
অতুলা কীর্তিরভবন্ নৃপস্য দ্বিজসত্তম!॥ (৯)

এ প্রসঙ্গটা এত ক'রে বললাম শুধু মনে আছে বলেই নয়, স্যর-এর মুখে এসব কথা শুনে আমার আবাল্য আচারবিমুখতা জোর পেত ব'লেও বটে। এ সম্পর্কে তাঁর একটা কথা আজও কানে বাজে, তিনি বলেছিলেন শরৎচন্দ্রকে: "শরৎবাবু! আপনার পল্লীসমাজ প'ড়ে আমি সবপ্রথম আপনাকে ভালোবেসে ফেলি। আর কেন জানেন? যে, আমরা যে ঘোর তামসিক হয়ে পড়েছি এ কথা আপনি চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন ঐ বইটিতে। আমাদের সমাজের কী যে দুরবস্থা শরৎবাবু, ভাবতেও হাঁফিয়ে উঠি, সত্যি বলছি। কেবল মুস্কিল কী জানেন? যে, আমি হিন্দুদের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এ ধরনের কথা বললেই লোকে বলবে বেটা কালাপাহাড়, ব্রেহ্ম—তাই নিন্দে করছে পবিত্র সনাতন হিন্দু সমাজকে। ঠিক যেমন আমি চা-খাওয়ার বিরুদ্ধে দাপাদাপি ক'রে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াই ব'লে সম্ভবত আপনারাও বলেন নিজেদের মধ্যে: উনি ডিস্‌পেপটিক তো, তাই চা সয় না ওঁর ধাতে—হা হা হা।"

ফিরবার পথে শরৎচন্দ্র মুগ্ধ হয়ে আমাকে বলেছিলেন, "না দেখলে বিশ্বাস হয় না মণ্ট! ঠিক যেন ষাট বছরের শিশু—কী বল তুমি?"

কিন্তু শুধু শিশুসারল্যই বা বলি কেন? তাঁর গুণ ছিল কি একটা? "গুণাকর" উপাধিই দিতে হয় তাঁকে। কেবল তাঁর আর একটি গুণের কথা এখানে বলি—যেটি আমার চোখে পড়েছিল, বিশেষ ক'রে কটকে।

কটকে আমি যাই এক খদ্দর কনফারেন্সে। স্যর তখন গান্ধীজির চরকা নিয়ে বিষম মেতে উঠেছেন। আমি তাঁর ও সুভাষের প্রভাবে পড়ে খদ্দর পরছি তখন—যদিও খদ্দর পরতে ভালো লাগত না একটুও—আরও বারীনদার কাছে শোনার পরে যে শ্রীঅরবিন্দ খদ্দর-হুজুককে ছেলেমানুষি মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথও ছিলেন খদ্দর-বিরোধী। এ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের একটি পরিহাসের কথা ভুলব না কোনদিনও। তিনি আমাকে বরাবরই স্নেহ করতেন, কিন্তু আমার চাদর পরা দেখতে পারতেন না। একদিন বলেছিলেন: "তোমার এ দুর্মতি দেখে দিলীপ আমার কি হয় বলব? কান্না আসে ঠিক সেই নাপিতের মত যে গৌরাঙ্গের চাঁচর কেশ মুড়িয়ে দিতে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিল। তাই ব'লে ভেবে ব'স না যেন যে তুমি গৌরাঙ্গ অবতার—হা হা হা।" কিন্তু যা বলছিলাম।

কটকে স্যর ছিলেন প্রেসিডেন্ট খদ্দর প্রচারিণী সভার। আমরা উঠেছিলাম সেখানকার জমিদার শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ী। মস্ত বাড়ীতে শুধু আরামে নয়, পরমানন্দে ছিলাম—স্যরের সঙ্গে নানা হাসিঠাট্টায় দিন কাটত ব'লে। এমন সদানন্দ বৃদ্ধ ক'জনই বা দেখেছি! শীর্ণকায়, খেতে পারেন না কিছুই, কিন্তু কি উৎসাহ, প্রাণশক্তি, উচ্ছলতা! এই সূত্রে আরও চোখে পড়েছিল, সাধারণ মানুষকে তিনি কি সহজে কাছে টানতে পারতেন! তাঁর প্রতি তাদের ভক্তি ছিল গভীর, কিন্তু তিনি ভুলেও চাইতেন না তাদের ভক্তিভাজন হয়ে তাদের দূরে রাখতে। Standing on one's dignity বলতে যে মনোবৃত্তি বোঝায়, স্যরের স্বভাব নিত্যই চলত তার উল্টোমুখে—দীনহীন বেশে বিনা প্রসাধনে তিনি যে আসত তার সঙ্গেই আলাপ জুড়ে দিতেন যেন কতকালের আলাপ! স্যর জগদীশচন্দ্র ছিলেন যেমন গম্ভীরাত্মা, স্যর প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন তেমনি প্রফুল্লাত্মা। নামটি তাঁকে মানিয়েছিল বৈ কি।

কিন্তু যা বলতে কটকের প্রসঙ্গের অবতারণা: কটকে আমার বিশেষ ক'রে চোখে পড়েছিল তাঁর একটি গুণ: তিনি সব কিছুই অত্যন্ত নিবিড় ভাবে অনুভব করতেন। এ গুণটি প্রাণশক্তির প্রায় নিত্য সহচারী। সংসারে দিনগত পাপক্ষয় ক'রে চ'লেই বেশির ভাগ মানুষ তুষ্ট থাকে। খুব কম মানুষই প্রাণের চতুর্দোলায় উধাও হয় উৎসাহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে। এ-জাতীয় মানুষ ভুল করে প্রচুর, ঠকেও কম না, কিন্তু তবু স্বভাব ত—কথায় কথায় উজিয়ে না উঠে পারে না—মহাপ্রাণদের অনুভবশক্তির ধার ও ভার দুই-ই অসামান্য হয়ে থাকে ব'লে। এ সম্পর্কে আর একটি কথা মনে হয়।

যাঁরা চিরদিন সংযত ও জিতেন্দ্রিয় জীবনযাপন ক'রে এসেছেন তাঁদের সচরাচর দু'রকম পরিণতি হয়: এক, অপরের দোষত্রুটি স্খলন দেখলে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা; দুই, সংযমের ফলে অন্তরে আবেগের তেজ ও দীপ্তি সংহত হয়ে ওঠা—অনুভব-শক্তি নিবিড় হয়ে ওঠা—যাকে ইংরাজীতে বলে intensity of feeling. সংযমের এই পরিণতিটি যেমন সুন্দর তেমনি সৃজনশীল—creative—ও বলদা। প্রফুল্লচন্দ্র দেহে ক্ষীণ হ'লেও এই আন্তর-শক্তিতে

আশ্চর্য সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন বহুদিনের সংযম ও ব্রহ্মচর্যের তপস্যায়। ফলে তিনি যাই ধরতেন একবার—আঁকড়ে ধরতেন তাঁর চিরতরুণ উৎসাহের প্রতি তন্তু দিয়ে। প্রশংসা করতে হবে ত ওঠো তার গুণকীর্তনে উজিয়ে, বল—"শেক্সপীয়রের বই শেল্‌ফে থাকলে আর বইয়েই কি দরকার?" "চরকার সুতো কাটলে নিরন্ন অন্ন পাবে—" মহাত্মা গান্ধী বলতেন—অতএব হও তাঁর মন্ত্রশিষ্য, সব ছেড়ে অষ্টপ্রহর কাটো চতুর্বর্গদাত্রী চরকার সুতো। চা খাওয়া খারাপ ত চালাও তার বিরুদ্ধে অশ্রান্ত অভিযান—প্রবন্ধে, ভাষণে, আলাপে, টিট্‌কারিতে। —"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" ত বাঙালীকে উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে উস্কে দাও ব্যবসার দিকে, বল মাড়োয়ারী হ'তে। আচারনিষ্ঠতা, ছুৎমার্গ মন্দ ত কলেজে পড়াবার সময়ও রামপক্ষীর হাড়ের পাশে তার ভস্ম রেখে বোঝাতে সুরু কর, এ-ভস্ম যখন অ-পক্ষী তখন মুখে দিতে দোষ কি? সায়েন্স পড়া ভাল—ত কোন ছাত্র রসায়নে তৃতীয় বার্ষিকী পরীক্ষায় প্রথম হলে দোল তার কণ্ঠলগ্ন হয়ে। অনুভব শক্তির নিবিড়তা সাধনে সিদ্ধিলাভ না করলে আবেগের কি প্রেমের এ-পরিণতি হওয়া অসম্ভব।

এই জন্যেই ত তাঁকে দেখে আরও অবাক্‌ লাগত তাঁর চরিত্রের দু'টি স্ববিরোধী প্রবণতা দেখে: একদিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রবীণ জ্ঞানী—যা ধরেন মোক্ষম-ধরেন বজ্র-আঁটুনী। অন্যদিকে ভোলা মহেশ্বর, দিলখোলা, অনাসক্ত—সত্যিই ষাট বছরের শিশু! মনে পড়ে ১৯২০ না ২১ সনে স্যরের সঙ্গে লণ্ডনে হল্যাণ্ড রোডে একটি বাসায় এক সঙ্গে থাকা। সু নামে তাঁর একটি ছাত্র তাঁর তদারক করত। সে প্রায়ই স্যরের "নানা কাণ্ডকারখানা"র কথা বলতে বলতে হেসে কুটি কুটি হ'ত। এখানে কেবল একটি কাণ্ডের কথা বলি।

সু বলল: জানেন দিলীপবাবু, আজ সকালে এক টুপির দোকানে টুপি কিনতে গিয়ে স্যরের সে কি কাণ্ড! স্যর ত, জানেনই, প্রায়ই ছাতাটি বগলে ক'রে পথ চলেন, তাই টুপির দোকানে উনিও চলেছেন, বগলদাবায় ছাতাও চলেছে parallel to the floor! কাজেই আশ্চর্য কি যে ওঁর ছাতার সামনের বাঁটের দিকটার ধাক্কায় হঠাৎ দমাস্‌ শব্দে এক গঙ্গা টুপি মাটিতে লুটোবে ছত্রাকার হয়ে? ওরা 'হাঁ হাঁ' ক'রে ছুটে আসতেই স্যর চম্‌কে লাফিয়ে বিদ্যুদ্বেগে ঘুরে দাঁড়াতেই এবার ছাতার তলার দিক্‌কার গোড়ালির ধাক্কায় আর একটি আলনা তুমুল শব্দে ছড়িয়ে পড়ল। মেজেটা হয়ে দাঁড়াল একেবারে টুপির সমুদ্র। হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড! দোকানীরা, খদ্দেররা, রাস্তার পথিকেরা—সবাই এল ছুটে। আমি তাদের ঠাণ্ডা করি—স্যর পি. সি. রায়, এফ. আর. এস. ইত্যাদি ব'লে। একটার জায়গায় দু'টি টুপি কিনতে হ'ল, একটি আমার জন্যে—আমার দরকার না থাকলেও। তখন একটি স্থূলকায়া দিদিমা বললেন গভীর স্নেহে: Funny old child! Why does he carry his umbrella like that—inside a shop?" থেমে সু আর্দ্রকণ্ঠে বলে: "সত্যি দিলীপবাবু, স্যরের সে ত্রস্ত মুখ-চোখ যদি দেখতেন—মায়া হ'ত আপনারও, মনে পড়ত মা যশোদার ভয়ে কৃষ্ণের সেই ভয়ে-কাঁপা—চোখের জলে সেই বুক ভেসে যাওয়া আর কাজলের কালিতে সারা মুখে কালো ছাপ—আপনিই সেদিন স্যর-এর কাছে বর্ণনা করেছিলেন না?"

(ভাগবতের শ্লোকটি শুনে স্যর সেদিন লণ্ডনে চায়ের টেবিলে খুব হেসেছিলেন হাততালি দিয়ে, তাই উদ্ধৃত করলামই বা:

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্‌
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জন-সম্ভ্রমাক্ষম্‌।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্‌বিভেতি।

দশ পনের বৎসর পরে আমি এর অনুবাদ করেছিলাম "ভাগবতী কথা"য়:

হৃদয়ে জাগে নাথ আমার—তব সেই জননী ভয়ে
দুটি ভীত নয়ন,
করিয়া অপরাধ লভিবে আজ কোন্‌ শাস্তি ভাবি,
ম্লান নত আনন!
কী ছবি অপরূপ! অশ্রুসাথে কালো কাজল
মিশি ঝরে! ভয়ও যারে
নিয়ত করে ভয়—তার ভয়ের ভান! এ লীলা
ভাবিতেও মন যে হারে!)

মেম দিদিমার "funny old child" কথাটি প্রায়ই মনে পড়ত স্যর-এর নানা কাণ্ড দেখে। আর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দেব।

লণ্ডনে একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে, সেখানে ফি রবিবার কয়েকজন ধার্মিক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী গিয়ে বসেন, উপাসনা ও গান হয়। একবার কি একটা উৎসবে লণ্ডনের ক্রমওয়েল ছাত্রাবাসের তদানীন্তন পরিদর্শক তথা হাই কমিশনার এন. সি. সেন মহোদয় আমাকে নিমন্ত্রণ করেন গান গাইতে। আমি তখন স্যর-এর সঙ্গে হল্যাণ্ড রোডের বাসায় ঘরকন্না করি। আমার উপর ভার ছিল তাঁকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার। (স্যর

পারতপক্ষে কখনও ট্যাক্সি ডাকতেন না, কেউ ডাকতেও সাহস করত না, কারণ তিনি প্রায়ই আমাদের লেকচার দিতেন—লণ্ডনে এসে বিলাসে "বাপের টাকা" না ওড়াতে। বলতেন প্রায়ই : "A penny saved is a penny gained, কি বলো হে? উঁম্?") অগত্যা আমি তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গুটি গুটি একটি ফুটপাথে দাঁড়িয়েছি। একটি বাস সেখানে এসে থামতেই আমি ঈষৎ উচ্চস্বরে ব'লে উঠেছি : "সাবধান, স্যর!" আর যাবে কোথা? স্যর আমাকে চাপাস্বরে ভর্ৎসনা করলেন "শ্-শ্! এদিকে অত জোরে কথা বলে?" আমি সে সময়ে সত্যই একটু জোরে কথা বলতাম ব'লে সুভাষও আমাকে প্রায়ই টুকত, তাই ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে স্যরকে নিয়ে বাসে উঠে বসেছি সবেমাত্র—এমন সময়ে এক ইংরেজ মহিলা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে টুপি খুলে তাঁকে আমার জায়গা ছেড়ে দিতেই স্যর শিশুর মতনই আহ্লাদে আটখানা, বললেন তারস্বরে : "That's right my boy, chivalry, chivalry!" সঙ্গে সঙ্গে বাসশুদ্ধু লোকের চোখ পড়ল তাঁর দিকে—দু'একটি মহিলা ত মুখে রুমাল দিয়ে হেসে কুটি কুটি। কিন্তু স্যর-এর ভ্রূক্ষেপও নেই—সবাই চেয়ে থাকা সত্ত্বেও আমার সঙ্গে তারস্বরেই সমানে গল্প ক'রে চললেন—তিনি ব'সে আর আমি দাঁড়িয়ে—বিচিত্র চিত্রটি কল্পনীয়। আজও চোখের সামনে ভাসে তাঁর সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ গলাবন্ধ কোট, খাঁজহীন ধূসর রঙের ঝোলা পেণ্টুলুন—আর মাঝে মাঝে টুপি খুলে উস্কোখুস্কো চুলের মধ্যে অন্যমনস্ক হাত চালানো। মায়া করে সত্যিই! সে কি ভুলবার?

সু-র কাছে স্যর এর আরও কয়েকটি এই জাতীয় হাস্যোদ্দীপক কীর্তিকলাপের কাহিনী শুনেছিলাম—কী ভাবে তিনি পারিসে ফরাসী বলতে বলতে অন্যমনস্ক হয়ে হঠাৎ ইংরেজী কথা মিশিয়ে ফেলতেন; কী ভাবে একবার সেখানে একটি বড় হোটেলের স্নানাগারে ঢুকে আর বেরুতে পারেন নি—যে হোটেলে বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে একটি ডিনার দিয়ে সম্মান দেখাতে জুটেছিল। ডিনারের টেবিলে সবাই ব'সে, কিন্তু যার জন্যে ডিনার সেই মাননীয় অতিথিটিই অদৃশ্য। তবে সু তার ক্লায়েণ্টকে জানত ত, নক্ষত্রবেগে বাথরুমের দিকে ছুটতেই শুনতে পেলো তাঁর কণ্ঠ : "আঃ, কী জ্বালায়ই পড়েছি—দোর বন্ধ হয় কিন্তু আর খোলে না ছাই!" "শুধু চিচিং ফাঁকটি বলেন নি স্যর"—বলল সু হেসে—"তবে বলতে পারতেন বৈ কি—হা হা হা!"

এ ধরনের কাহিনী শুনে আমরা নিজেদের মধ্যে হাসতে হাসতে সত্যি গড়িয়ে পড়তাম। কিন্তু এমন ছাত্র কেউ ছিল না লণ্ডনে, এসব কাহিনী শুনে যার মন ভিজে না উঠত, এ-অসামান্য কর্ম-জ্ঞান-দানবীরের একান্ত নিঃসঙ্গতা তথা নাবালক নিঃসহায়তার কথা ভেবে। মহৎ মানুষ প্রায় সবাই নিঃসঙ্গ নিসাথী। শ্রীঅরবিন্দ সাবিত্রীতে অকারণ লেখেন নি : "He who is too great must lonely live." ভাগবতে আছে শুকদেব কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলছেন : যেসব রূপসী রাণীদের হাবভাব কুহক কটাক্ষে স্বয়ং শিবের হাত থেকেও ধনুক খ'সে পড়ে সেই তিলোত্তমাদের সঙ্গে সহবাস ক'রেও যার মন কখনও এতটুকু চঞ্চল হয় নি, এ-হেন চির-অসঙ্গ অবতারীকেও মূঢ় মানুষ নিজের মত মানবধর্মী ভাবে—তিনি মানুষ সেজে মানুষের চালে চলেন ব'লে। প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন না কৃষ্ণ বুদ্ধ খ্রীষ্টের মতন বাণীবাহ অতিমানব; ছিলেন না সক্রেটিস, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথের মতন লোকোত্তর প্রতিভাধর; ছিলেন না নিউটন, গালিলিও, আইন্‌ষ্টাইনের মতন যুগপ্রবর্তক বৈজ্ঞানিক। কিন্তু মানুষ কী হয়ে ওঠে নি বা দিতে পারে নি তার বিচারে তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না—সে কী হয়ে উঠেছে বা দিতে পেরেছে সেই নিকষেই তাকে কষতে হবে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন শুধু শিক্ষকের, আচার্যের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নয়—সব জড়িয়ে তিনি এমন একটি আশ্চর্য আদর্শবাদীরূপে ফুটেছিলেন, এত গুণের সমাবেশে তাঁর মহান্ চরিত্র মঞ্জুল তথা মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছিল, যে তাঁর সম্বন্ধে বলা যায়—ইংরেজ কবির ভাষায়—to be loved he needs only to be seen! তাই ত তিনি তাঁর জীবদ্দশায়ই সমগ্র ভারতে একটি বরেণ্য মনীষী, প্রেমিক দানবীর তথা সংসারী সন্ন্যাসী ব'লে গণ্য হয়েছিলেন। তাঁকে সন্ন্যাসী উপাধি দেওয়ার জন্যে আমাদের মামুলিপন্থী ধার্মিকেরা হয়ত আমার প্রতি অপ্রসন্ন হবেন। কিন্তু সর্ববিধ বিলাসকে বিদায় দিয়ে, নির্বিচল নিষ্ঠায় স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ ক'রে, নিজের হাজার হাজার টাকা মাসিক আয়ের সাড়ে পনের আনা পরার্থে দান ক'রে, ক্ষীণ স্বাস্থ্য সত্ত্বেও দিনের পর দিন "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" আদর্শের ডাকে যিনি আকুমার ব্রহ্মচারী থেকে হাসিমুখে নিরন্তর শ্রমস্বীকার ক'রে গেছেন শুধু অন্তরের তাগিদে—তাঁকে প্রেমিক সন্ন্যাসী উপাধি দিলে কি অতিশয়োক্তি হ'তে পারে কখনও? আমার মনে পড়ে—উত্তরবঙ্গ-বন্যাত্রাণ সমিতিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করার পরে সুভাষ তাঁর কথা বলতে বলতে কি রকম উজিয়ে উঠত। তাঁর

দীপ্ত দৃষ্টান্তে ও সরলতায় সে সত্যি সত্যি এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে, প্রায়ই বলত তাঁর নাম ক'রে : "এই-ই ত ভারতের আদর্শ : plain living and high thinking —শঙ্করাচার্যের বাণী : 'জাগর্তি কো বা?—সদসৎ-বিবেকী'।" আমি শুধু আর একটু জুড়ে দেব : জ্ঞানের সঙ্গে দানের রাজযোটক তথা—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়—Make of thy way a daily pilgrimage : তোমার জীবন হোক প্রাত্যহিক তীর্থযাত্রাব্রত।

আমি জানি, তাঁর নানা ভক্ত তাঁকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তাঁর পুণ্য জীবনের স্পর্শে ধন্য হয়েছেন। প্রতি মহাজনেরই নানা গুণ নানা ভাবে নানা লোকের মন টানে—না টেনে পারে না ব'লে। আমি শুধু আমার ক্ষুদ্র সাধ্যমত যতটা পারি গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি—আমি আমার নিজের পথচলায় কি ভাবে তাঁর কাছ থেকে পাথেয় আহরণ করেছি, তাঁর অনাবিল স্নেহাশীষ আমাকে কেন এত মুগ্ধ করেছে, তাঁর কোন্ কোন্ কীর্তি আমাকে নিত্য প্রেরণা দিয়েছে। আমার কাছে তিনি চিরদিন প্রণম্য থাকবেন আরও এই জন্যে যে, তাঁর মধ্যে আমি দেখেছিলাম একটি সনাতন ভারতীয় প্রবণতার অপরূপ বিকাশ : প্রবৃত্তির জগতে বসবাস ক'রে নিবৃত্তির পথে চলতে পারা, সবার মধ্যে থেকেও অনাসক্ত থাকা—মরমিয়াদের ভাষায় : "জৈসে. জলমে কমল অম্লে"—জলের মধ্যে পদ্ম যেমন নির্লিপ্ত থাকে। কারুর কাছে কিছু না চেয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর নিজেকে ও নিজের যা-কিছু পরার্থে এমন উজাড় ক'রে বিলিয়ে যাওয়া দু'হাতে—এ-ও যে পারে সে আপনি পারে। আর সেই বলতে পারে বড় গলা ক'রে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

আপনা ভুলি সহজ সুখে ভরুক তব হিয়া,
পথিক, তব পথের ধন পথেরে যাও দিয়া।

বলেছি, স্যর-এর সঙ্গে ভগবান্ নিয়ে কখনও আলোচনা হয় নি। ইচ্ছা যে হয় নি এমন কথা বলতে পারি না, তবে আমি জানতাম ত যে আমি ষোল আনা প্রতীক-পূজারী, গুরুকৃষ্ণবৈষ্ণবপন্থী এবং তিনি বিজ্ঞানের উপাসক তথা ব্রাহ্ম, তাই ঘা খাবার ভয়ে আমার কাছে যা সবচেয়ে আদরণীয়—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান্—সে-প্রসঙ্গ সাবধানেই এড়িয়ে গেছি। স্বভাবে আমি অভিমানী, স্নেহবিলাসী ও প্রশংসাপ্রিয়—তাই আমার গানে ও সঙ্গে যে তিনি আনন্দ পেতেন ও আমাকে আন্তরিক ভালবাসতেন সেই আত্মগৌরবকে মিথ্যে তর্কাতর্কির আঁধিতে ঝাপসা হতে দিতে চাইতাম না। তবে এটুকু বলতে পারি জোর করেই যে, তাঁকে দেখে কোনদিনই আমার মনে হয় নি যে, এ-হেন মহাজন শূন্যবাদী নাস্তিক হ'তে পারে। শেষ জীবনে গান্ধীজির সংস্পর্শে এসে তিনি চরকার চারণ হয়ে উঠেছিলেন—এ-হুজুগে প্রথমদিকে আমি সাড়া দিলেও শেষে বুঝেছিলাম যে, চরকাবাদ এ-যুগে চলবে না—চলতে পারে না ব'লে। কিন্তু সে-আলোচনা এ-স্মৃতিচিত্রে অবান্তর। তাই আমি এ-স্মৃতিতর্পণের শেষে শুধু আমার একটি অনুমানের উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হব : যে, আমার মনে হ'ত বরাবরই যে গান্ধীজির শুধু সমাজসংস্কারক-রূপটিই তাঁর মন টানে নি, আস্তিকরূপটিও তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। একথার স্বপক্ষে কেবল একটিমাত্র প্রমাণ আমি পেশ করতে পারি : আমার মুখে তিনি খুব ভালবাসতেন অতুলপ্রসাদের কয়েকটি ভক্তিসঙ্গীত শুনতে—বিশেষ ক'রে তাঁর একটি বাউল : "যদি তোর হৃদ্‌যমুনা হ'ল রে উছল রে ভোলা"—এবং এর কয়েকটি চরণে আর্দ্রকণ্ঠে "আহা আহা" ক'রে মাথা নাড়তেন :

"যে আসে মনের দুখে, যে আসে ফুল্ল মুখে,
টেনে নে সবায় বুকে—তোর থাক্‌না চোখে জল রে ভোলা
জীবনের হাটে আসি বাজা তুই বাজা বাঁশি,
থাক্ সেথা বেচাকেনার দারুণ কোলাহল রে ভোলা!
অরূপের রূপের খেলা চুপ ক'রে দেখ দু'বেলা,
কাছে তোর এলে কুরূপ, মুখ ফিরিয়ে চল্ রে ভোলা!"

—•—

ব্রজরাজ

শ্রীশান্তা দেবী

অধ্যাপক ভবনাথ বাবুর কোচিং ক্লাশে সাড়া পড়ে গেছে। সেকেলে বৃদ্ধ হঠাৎ মত পরিবর্তন করলেন কেন? অনেক দিনই তিনি বাড়ীতে ছেলে পড়ান; অঙ্কের অধ্যাপক, মানুষটা নিজেও অঙ্কের মতই শুষ্ক এবং নিখুঁৎ নিয়মনিষ্ঠ। পুরুষ অধ্যাপক, গোটা পাঁচেক ছেলেকেই পড়ান। তাতে আবার বি. এস্-সি. ক্লাশের ছেলে, কচি ছেলে নয়। সবাই জানে ভবনাথবাবু এর মধ্যে মেয়েছেলে ঢোকানো পছন্দ করেন না একেবারেই। কিন্তু প্রমীলার বাবা নাছোড়বান্দা। তিনি বলেন, "আজকালকার ঐ সব ছোকরা প্রফেসারদের কাছে আমি সন্ধ্যাবেলা মেয়ে পড়াতে পাঠাব না। আপনি মশায়, বয়স্ক অভিজ্ঞ শিক্ষক, অঙ্কের ক্লাশে গানও শেখান না, কবিতাও আবৃত্তি করেন না; আপনার কাছে মেয়ে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে হাওয়া খেতে গড়ের মাঠে চলে যাওয়া যায়। আপনাকে প্রমীলার ভার নিতেই হবে। তিন মাস পরেই ত পরীক্ষা, এইটুকু পার ক'রে দিন, তখন আর অপনাকে জ্বালাতে আসব না। মেয়েটারও অঙ্কে মাথা আছে, ফেল ক'রে বসবে না।"

ভবনাথবাবু বারকতক 'না' 'না' করলেন। কিন্তু তাঁর আপত্তি প্রমীলার বাবা গ্রাহ্যই করলেন না। পর দিন সন্ধ্যার সময় প্রমীলা এবং তার বইখাতা সবশুদ্ধ নিয়ে এসে ভবনাথবাবুর দরজায় কড়া নাড়তে লাগলেন। ভবনাথ তখন ছাত্রদের নিয়ে ব্যস্ত, বললেন, "দেখ ত হে ব্রজরাজ, কে আবার অসময়ে কড়া নাড়ছে! কত বার বলে দিয়েছি সাড়ে পাঁচটার থেকে সাতটা আমার পড়াবার সময়? তবু এই সময় কেন বিরক্ত করতে আসে?"

ব্রজরাজ লম্বা ছিপ্‌ছিপে হাসিখুশী সুদর্শন ছেলে। ভবনাথবাবুর প্রিয় ছাত্র, পড়াশুনায় খুব ভাল। তড়াক্ ক'রে তক্তপোশ থেকে নেমে পড়েই নীচে চলে গেল। দোতলার উপর ভবনাথবাবুর পড়বার এবং পড়াবার ঘর এইটি। আসবাব বিশেষ কিছু নেই। একটি দেয়াল-আলমারীতে এক আলমারী অঙ্কশাস্ত্র ও কেমিষ্ট্রি-ফিজিক্সের বই; একটি বড় তক্তপোশে সতরঞ্চি পাতা এবং একটি ছোট তক্তপোশে সতরঞ্চির উপর লাল শালুমোড়া একটি তাকিয়া। বড় তক্তায় বসে ছেলেরা, ছোটটিতে ভবনাথ স্বয়ং। অন্দরের সঙ্গে এ ঘরের কোনো যোগ নেই।

ব্রজরাজ নীচে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখে আনতদৃষ্টি একটি অল্পবয়স্কা মেয়ের সঙ্গে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মেয়ে! ব্রজরাজের ত চক্ষুস্থির! কিন্তু বেশী কথা বলবার ত সময় নেই। পড়ার সময় নষ্ট করলে মাষ্টারমশায় ক্ষেপে যাবেন। সে বললে, "মাষ্টার মশায় এখন ত পড়াচ্ছেন।"

ভদ্রলোক বললেন, "আমরা পড়ার জন্যেই এসেছি। খেলা করতে আসিনি।"

কি বলবে ব্রজরাজ? বললে, "আচ্ছা, উপরে আসুন।" প্রমীলাকে দেখে ভবনাথও একটু বিড়ম্বনায় পড়লেন। এখন তর্ক করতে গেলে সময় নষ্ট হবে। পরে কথা বলা যাবে এখন। আপাতত বসুক ত মেয়েটা। বললেন, "বোসো মা, আমার এই তক্তাতেই বোসো। আর ত জায়গা নেই। ওহে, তোমরা কাজ সুরু কর। কাল যে ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের কথা বললাম, আজ দেখাও দেখি কতটা সড়গড় হলে।"

ছেলেরা খাতা খুলে কাজ সুরু করতেই প্রমীলা বললে, "আমি শুধু শুধু বসে থাকব কেন? আমিও করি।"

ভবনাথ আমৃতা আমৃতা ক'রে বললেন, "দেখি হে ব্রজ, তোমার খাতাখানা একবার।"

ব্রজর খাতা প্রমীলার হাতে দিয়ে ভবনাথ বললেন, "তুমি পারবে এটা?"

উৎফুল্ল মুখে প্রমীলা বললে, "হয়ত পারতে পারি।"

কিছুক্ষণ নীরবে সকলের কাজ চল্‌ল। ব্রজরাজ ও প্রমীলা খাতা হাতে উঠে দাঁড়াল। ভবনাথ দেখে বললেন, "দু'জনেরই ঠিক হয়েছে। তুমি দেখছি গুণবতী মেয়ে। গল্পগাছা না ক'রে মন দিয়ে পড় যদি, ভাল রেজাল্ট করতে পারবে।"

আর চারটি ছাত্রই মিনিট পাঁচেক দেরী ক'রে বস্‌ল। তাও প্রথম দু'জনের অঙ্ক ভুল, শেষ দু'জনের অঙ্ক ঠিক। কি ব'লে আর ভবনাথ প্রমীলাকে ফিরিয়ে দেন? নূতন

মেয়ে ঘরে পা দিয়েই সবার সেরা হয়ে দাঁড়াল। সাতটা পর্য্যন্ত কাজ ক'রে যাবার সময় প্রমীলা বললে, "আমি তবে কাল থেকে নিয়মিত আসব ত, মাষ্টার মশাই?"

মাষ্টার মশাই বললেন, "মেয়েদের আমি পড়াই না এখানে। তা---তিনটে মাস ত? আচ্ছা---দেব পড়িয়ে কোনো রকমে। তোমার কাজ দেখে ছেলেগুলোরও কিছু উন্নতি হতে পারে।"

ভবনাথবাবুর কথা শুনে ব্রজরাজ ছাড়া আর কোন ছেলেই অবশ্য খুশী হ'ল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একজন বললে, "ওঃ ভারী ত না মেয়ে! অমন ঢের দেখেছি। মাষ্টারকে খুশী না করলে ক্লাসে নেবে না, তাই বাড়ী থেকে সারাদিন ধরে সব মুখস্থ ক'রে এসেছে। আমরা পয়সা দিয়ে পড়ি, অত খাটতে যাব কেন? মাষ্টারকে খাটিয়ে পাশ ক'রে নেব।"

ব্রজরাজ বললে, "তাই নিস। তবে মাষ্টারের কষা অঙ্কগুলো জামার আস্তিনে ভরে পরীক্ষার হলে যাস নে যেন।"

ব্রজরাজকে ভবনাথ বিনা বেতনেই পড়াতেন, তাই অন্য ছেলেদের তার উপর একটা আক্রোশ ছিল। সুযোগ পেলেই তারা ঠেস দিয়ে কথা বলে।

প্রতুল বললে, "থাক্, তোমাকে আর ফোড়ন দিতে হবে না। স্ত্রীজাতি দেখলেই তোমার হৃদয়-সিন্ধু উথলে ওঠে ত। তার উপর আবার বিদুষী নারী। আমার বাবা ওসব নেই। দূর থেকে নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

ব্রজরাজ বললে. "শট্ অপ্।"

অল্প একটু দুলে দুলে ব্রজরাজ নিজের বাড়ীর দিকে চ'লে গেল। ব্রজরাজ কথা বলতে বলতে নিজের মাথার ঘন চুলগুলো মাঝে মাঝে দু'হাতে পিছন দিকে ঠেলে দেয়। হাঁটার মধ্যেও তার একটা দোলা আছে। মেয়েরা বলে—মুদ্রা দোষ, ছেলেরা বলে—মেয়েদের নজরে পড়বার চেষ্টা। ব্রজরাজ বলে, এ তার একটা একান্ত নিজস্ব ধরন, ওটা চেষ্টাকৃত নয়।

প্রমীলাকে বাঙালী মতে বা ভারতীয় মতে সুন্দরী বলা যায় না, কারণ তার রংটা গৌরবর্ণ নয়, নব দূর্ব্বাদল শ্যাম, যা বহু পুরাকালে সৌন্দর্য্যেরই লক্ষণ ছিল। ভুরু দুটি সরু বাঁকা, ঠোঁট দুটি পাতলা, চোখ তীক্ষ্ণ অথচ সলজ্জ হাসিতে মধুর। বেশভূষায় তার পারিপাট্য আছে, কখনও সে লাটকরা কাপড় পরে না, মনে হয় এইমাত্র ইস্ত্রী ক'রে এনেছে কাপড়চোপড়, মাথার চুল সর্ব্বদা সুবিন্যস্ত, একগাছি চুলও এদিক থেকে ওদিকে নড়ে যায় না, যতক্ষণই না সে ইস্কুল-কলেজে ঘুরুক। এক হাতে চুড়ি আর এক হাতে রিষ্টওয়াচ ছাড়া আর অন্য গহনা তার পছন্দ নয়।

ভবনাথবাবুকে সে ভয় করত, তা না হলে ঢালা জরিপাড়ের জমকালো শাড়ী পরে কোচিং ক্লাশে আসতে তার আপত্তি ছিল না। এই রকম কাপড়েই তাকে মানায় সে জানে। কিন্তু সে বোঝে একলা মেয়ে পাঁচটা ছেলের সঙ্গে পড়ে, তার উপর যদি আবার চটকদার পোশাক-আশাক করে, তাহলে মাষ্টার মশায়ের মুখে কি না কি একটা কড়া কথা শুনতে হবে। তার চেয়ে সাধারণ রঙীন কাপড় পরাই ভাল। মাষ্টার মশায় অবশ্য কিছু বলতেন না। কিন্তু প্রতুল আর বিমল মন্তব্য করতে ছাড়ত না। ক্লাশ শেষ হয়ে প্রমীলা চোখের অন্তরালে গেলেই প্রতুল চোখ মট্‌কে বলত, "দেখলি রে, রোজ রোজ নূতন নূতন শাড়ী পরা চাই। একখানা কাপড় দু'দিন পরে না।"

বিমল বলত, "কেনই বা পরবে? বড়লোকের মেয়ে, টাকার ত অভাব নেই। পড়াশুনা ক'রেই কি আর প্রাণের সব সখ মেটে? পাঁচটা ছেলের মাথা ঘোরাতে পারলে তবে না জীবন সার্থক!"

প্রতুলও সে কথা সত্য বলেই মানত। তার নজর আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সাত দিন না যেতেই সে একটা আবিষ্কার ক'রে বসল, বললে, "ওরে বিমলে,তোর কথাই ফলল রে, আর কারুর মাথা ঘুরুক্ বা না ঘুরুক্ বেজার মাথা ঠিক ঘুরেছে। এরই মধ্যে খাতা চালাচালি সুরু হয়ে গিয়েছে।"

বিমল বলল, "কম ত সাহস নয়! ভবনাথ মাষ্টারের বাড়ী খাতা চালাচালি?"

প্রতুল বললে, "বাড়ীতে কেন হবে? কাল যে শ্রীমতী গাড়ী ক'রে এসেছিলেন। বেজা গাড়ীর মধ্যে ঝুপ করে খাতাটা ফেলে দিলে। শ্রীমতী শুধু হাসিভরা চোখ দুটি তুলে ধরলেন।"

বিমল বলল, "বেজার মাথা ঘোরে বটে, তবে ওর মাথাটা গোবরপোরা নয়। গাড়ী আর শাড়ীর পিছনে যে একটা বিরাট্ বাড়ী আছে তার হিসাবটা ও নির্ভুল ভাবেই করেছে। প্রমীলাকে হাতাতে পারলে যে একটা মোটা অঙ্ক পকেটে আসবে তা কি আর গণিতবিদ্যাবিৎ জানেন না?"

পরদিন প্রমীলা গাড়ীতে এল না। যাবার সময়ও গাড়ী দেখা গেল না। যেদিন গাড়ী আসে সেদিন যতক্ষণ প্রমীলা নীচে না চ'লে যায় ততক্ষণ ভবনাথবাবু ঘর ছেড়ে বার হন না। আজ ভদ্রলোক আটক পড়লেন কিছুক্ষণের জন্য। ছেলেরাই অগত্যা একে একে ঘর ছেড়ে বাড়ীর পথে রওনা হ'ল। যখন চার জন চ'লে গেছে অবশেষে ব্রজনাথ উঠছে তখন প্রমীলা বললে, "আজ বোধ হয় গাড়ী আর আসবে না। আপনি আর আমার জন্যে কতক্ষণ ব'সে থাকবেন মাষ্টার মশাই? আমি নিজেই যাবার চেষ্টা দেখি।"

ব্রজরাজের প্রায় পিছন পিছনই প্রমীলা নামল। রাস্তায় এগিয়ে দেখল ব্রজরাজ তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। প্রমীলাই এগিয়ে গিয়ে গম্ভীর সুরে বললে, "দেখুন, আমার গাড়ীতে বই খাতা ফেলবেন না। আর নিতান্তই যদি বই দেবার দরকার থাকে, মাষ্টার মশায়ের হাতে দিলেই ত পারেন। তাঁর কাছেই ত বইটা আমি দিয়েছিলাম।"

হেসে ব্রজরাজ বললে, "আপনি তাঁকে দিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু আমার দরকার ছিল আপনাকেই দেওয়া। মাষ্টার মশায়কে দিলে কি আপনি আমার সঙ্গে এইখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতেন?"

প্রমীলা মুখটা টিপে গম্ভীর হতে চেষ্টা করেও ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে, বললে, "আমি কথা বলবার জন্যে ত ম'রে যাচ্ছিলাম না। আমার কোন দরকার ছিল না।"

ব্রজরাজ হেসে বললে, "সে ত আমি জানিই। কিন্তু আপনার দরকারেই কি সবাইকে চলতে হবে? আমার কি কোন দরকার থাকতে পারে না? আপনার মত বিদুষী মেয়ের সঙ্গে একটু পরিচয় করতে কি আমার ইচ্ছা করে না?"

প্রমীলা একটু ব্যস্ততা দেখিয়ে বললে, "তাই ব'লে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে আড্ডা দেব নাকি? আমরা যা সেকেলে বাড়ীর মেয়ে!"

ব্রজরাজ তাড়াতাড়ি হাতজোড় ক'রে বললে, "অপরাধ নেবেন না, অমন ত সবাই কথা বলে। অনুমতি দিন, আমি না হয় আপনার বাড়ীতে গিয়ে কথা বলব। একটা খুব দরকারী নূতন বই আপনার জন্যে নিয়ে যাব দেখবেন। আর সেই সঙ্গে আপনার লাইব্রেরীটাও দেখে আসব। পরীক্ষার সময় একটু যদি উপকার করেন তাতে ক্ষতি কি? সহপাঠী ত এখন!"

প্রমীলা একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে, "আচ্ছা, যাবেন একদিন। কোচিং ক্লাশের ঠিক আগেই যাবেন। সেই সময়টাতেই সুবিধা। অন্য সময় বড় লোকের ভিড় বাড়ীতে। সময় অবশ্য বেশী পাবেন না। পৌনে পাঁচটা থেকে সওয়া পাঁচটা। তার আগে ত কলেজ থেকে ফিরে মুখ-হাত ধুই আর সওয়া পাঁচটাতেই আবার এখানে আসবার জন্যে বেরোতে হয়।"

ব্রজরাজ হেসে বললে, "আধ ঘণ্টা আধ ঘণ্টাই সই। সকলের ভাগ্য ত 'অতি বর্ষা সম' নামে না। ছিটেফোঁটা যা পাব তাই মাথায় ক'রে নেব।"

প্রমীলা বললে, "বাব্বাঃ, আপনি যা হোক্ ফ্ল্যাটার করতে পারেন। আমার মস্তিষ্কটা ভাগ্যিস একেবারেই ফাঁক নয়, নইলে ভাবতাম হয়ত বা আমি মাদামকুরী-টুরী কেউ হ'ব।"

ব্রজরাজ বললে, "কোনদিন যে হবেন না এমন কথা কে বলতে পারে? আপনারই কি আর মনের অন্তরালে ওরকম কোন একটা ক্ষুদ্র আশা নেই?"

প্রমীলা বললে, "তেমন তেমন দেশে জন্মাতে পারলে আশা হয়ত একটু-আধটু উপর দিকে হাত বাড়াত। কিন্তু এইরকম দেশে আর এইরকম বাড়ীতে জন্মিয়ে বি. এস-সি. পর্য্যন্ত পড়ছি এই আমার পরম ভাগ্য। এর চেয়ে বেশী আশা কি আর করতে পারব? ভাল কথা, আমাদের বাড়ীতে গেলে কেউ যদি কিছু জিজ্ঞাসা করে ত বলবেন যে, প্রমীলার সঙ্গে পড়েন এবং তাকে একটা দরকারী বই দিতে এসেছেন। আমি যাই, উপর থেকে কে যেন খড়খড়ি তুলে দেখছে।"

প্রমীলা চট্ করে চলে গেল। ব্রজরাজ দ্বিতীয় প্রশ্ন করবার সময় না পেয়ে সজোরে একবার বলল, "কালই আসব।"

প্রমীলাদের বাড়ীটা সত্যই টাকাওয়ালা লোকের ব'লে বোঝা যায়। দরজা থেকে সিঁড়ি পর্য্যন্ত সবটাই মার্বল করা। সদর দরজার পাশেই একটা নাতিবৃহৎ ঘর, তাতে শুধু দু'টা চওড়া বেঞ্চ পাতা; খালি গায়ে একজন সরকার মত ব্যক্তি বাংলা খবরের কাগজ হাতে ক'রে বেঞ্চে বসে আছেন। ব্রজরাজ কোন্‌দিকে যাবে বুঝতে না পেরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "প্রমীলা দেবীকে একটা দরকারী বই দিতে এসেছি⋯"

ব্রজরাজের কথা শেষ হবার আগেই দরজার কাছে প্রমীলার আবির্ভাব চোখে পড়ল। প্রমীলা বললে, "উপরে আসুন।"

উপরে যাবার সিঁড়ির মুখেই মস্ত বড় রান্নাঘর দেখা

যায়। উচ্চকণ্ঠে গল্প করতে করতে দু'টি ঝি সেখানে বসে প্রচুর জল ঢেলে মশলা ও ডাল বাঁটতে ব্যস্ত। তারা সকৌতুক দৃষ্টিতে একবার ব্রজরাজকে দেখে নিল। তার পর হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে মাথার ময়লা কাপড়টা একটু কপালের দিকে নামিয়ে দিল।

উপরের ঘরটি সেকেলে দামী আসবাবে সজ্জিত। তাছাড়া দুই-তিনটি মেহগিনি কাঠের আলমারীতে নানা রকম বই সাজান। কিন্তু দরজায় পর্দার বালাই নেই, স্নানের ঘর, কলতলা সবই চোখে পড়ে। তবু ব্রজরাজ খানিকটা বিস্মিত না হয়ে পারল না। এত বড় বারান্দা, এত চওড়া সিঁড়ি, এত দামী আসবাব দেখবে সে আশা করে নি। তাদের বাড়ীতে আড়াই ফুট চওড়া বারান্দার কোলে দশ-বারো ফুট লম্বা দু'খানি ঘর নিয়ে তারা পাঁচ ভাইবোন পিতামাতার সঙ্গে দিন কাটায়। নীচে একটা রান্নাঘর আর ভাঁড়ার আছে, দিনের বেলাও আলো জ্বেলে কোনরকমে সেখানে কাজ চলে। তার তুলনায় প্রমীলার এ বাড়ী ত স্বর্গ। কিন্তু স্বর্গ হলে কি হয়? ঝি-রূপিণী অপ্সরী কিন্নরীরা দরজার পাশে এসে এত বার বার উঁকি দিতে লাগলেন যে, ব্রজরাজের মুখ দিয়ে কথা বেরোনই দায় হ'ল। প্রমীলা অবস্থা সঙ্কট দেখে দু'টি ঝিকে খাতা-পেন্সিল ও গরম সিঙ্গাড়া কিনতে আলাদা আলাদা দোকানে যাবার হুকুম দিয়ে বিদায় ক'রে দিল। ভাবছিল বলে, "তোমরা সরে যাও এখান থেকে।" কিন্তু তা বললে ঝি-রা ভাবত নিশ্চয় এখানে একটা সমাজ-বিগর্হিত ব্যাপার হচ্ছে।

ব্রজরাজ বই দেওয়া ও বই দেখার পর্ব সমাপনের পর অনাবশ্যক কথায় বেশী সময় নষ্ট না ক'রে বললে, "আচ্ছা, কলেজপাড়ার কাফেতে একদিন এক পেয়ালা কফি আমার সঙ্গে খেলে কি হয়? সময়টা ভাল কাটত।"

প্রমীলা মৃদু হেসে বললে, "হয় না কিছুই। তবে বাবা রাগ করেন। ওসব আধুনিকতা তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়।"

ব্রজ বললে, "বাবার বুঝি খুব বাধ্য আপনি?"

প্রমীলা বললে, "হ্যাঁ, বাধ্য বই কি! বাবা আমার জন্যে সব করেন, আমি পরিবর্তে শুধু তাঁর বাধ্য হই। এটুকুও কি তাঁর পাওনা নয়? দেনা-পাওনার একটা নিয়ম ত আছে।"

ব্রজ সহাস্যে বললে, "নিতান্ত ছেলেমানুষ আপনি। একুশ বছর বয়স ত হয় নি, কি ক'রে আর সাবালকত্ব দেখাবেন?"

নাবালিকা সাজবার চেষ্টা না ক'রে প্রমীলা অনায়াসেই বললে, "না, বয়স ঠিকই হয়েছে আমার, কিন্তু বয়সের যোগ্যতাটা হয় নি। নিজের পায়ে ত দাঁড়াই নি। তা ছাড়া বাপ-মায়ের একটা সম্মান ত আছে। সেটা ত রাখতে হবে। তাঁদের ভালবাসারও দাবী আছে।"

ব্রজরাজ বললে, "আপনার কথাগুলো ভুল এমন বলতে পারি না। তবে কি জানেন? আমাদেরও ত যুগধর্ম মেনে চলার একটা অধিকার আছে। ঘরে-বাইরে কোথাও যদি আমাদের দু'টো কথা বলবার উপায় না থাকে তাহলে এত কষ্ট ক'রে আমাদের স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতাটা জাগিয়ে তোলা হচ্ছে কেন? মেয়েদের সকাল সকাল পুঁটলি বেঁধে পার করার প্রথাটা তাহলে সর্ব্বত্রই চালু রাখা উচিত ছিল।"

প্রমীলা বললে, "ও কথাটা যে আমি একেবারেই ভাবি না তা নয়। তবে আপাতত অঙ্ক শাস্ত্র নিয়ে এত ব্যস্ত আছি যে, নিজের অধিকারের বা মতামতের কথা মনে করবার সময় পাই না। পরীক্ষাটা হয়ে যাক্, হয়ত দেখবেন আমিও—'আমাদের দাবী মান্‌তে হবে' ব'লে কোনো একটা স্বাধীনতার মিছিলে যোগ দিয়ে চলেছি।"

ব্রজরাজ হেসে বললে, "না, না, ঠাট্টা নয়। পরীক্ষার পর আপনাকে আমার দুই-একটা নিমন্ত্রণ রাখতেই হবে। আর তার আগে অন্য একটা অনুরোধও করছি। এ যুগে অত 'আপনি আজ্ঞে' চলে না তা ত জানেন। সমবয়সীরা পরস্পরকে নাম ধরেই ডাকে, 'তুমি' ব'লে। আমরা কেন তা করব না? এতে ত আর বাবার মতের কথা উঠছে না। আপনার মত হ'লেই হয়।"

প্রমীলার গাল দু'টি একটু লাল হয়ে উঠল। সে মৃদু হেসে বললে, "আচ্ছা, আপনি সুরু করুন, দেখি আমিও পেরে উঠি কিনা।"

ব্রজ বললে, "পারতেই হবে। তাছাড়া এই রবিবার কোনো একজন বান্ধবীর নাম করে চল না একটা ভাল সিনেমা দেখে আসি দু'জনে। বন্ধু বললে জেওার ভুল হবে না, কেউ প্রশ্নও করবে না। অনেক দূরে যাব, অত দূরে তোমার বাড়ীর কেউ গিয়ে হাজির হবে না। ঠিক যাচ্ছ ত?"

প্রমীলা বললে, "ভাল ক'রে ভেবে দেখি।"

প্রমীলাদের পরীক্ষা আগতপ্রায়। ব্রজরাজ আবার একদিন সেই পুরানো পথের ধারে দাঁড়িয়েই বললে, "প্রমীলা, এবার ত চোখের দেখাও বন্ধ হয়ে যাবে। কোনো ছল-ছুতো ক'রেও তোমাদের বাড়ী যাবার ব্যবস্থা

হবে না। বই-খাতার প্রয়োজন ত ফুরিয়ে গেছে। তোমাকে অন্য একটা উপায় করতে হবে।"

প্রমীলার গলার স্বরে আগের মত ঠাট্টার ভাব নেই। সে একটু চিন্তিত ও গম্ভীর সুরেই বলল, "না, না, আমাদের বাড়ীতে গিয়ে কাজ নেই। আমার এক মাসী আছেন, তিনি ঠিক আমার বাবার মত নন। আমি তাঁর বাড়ীর ঠিকানা তোমাকে দেব। পরীক্ষা শেষ হবার পর আমি তাঁর বাড়ী যাব। সেখানে তুমি এস।"

ব্রজরাজ বললে, "বাঁচালে। কত কথা বলবার আছে, কিন্তু তোমাদের কণ্ঠরোধ আইনের চোটে আমার নিশ্বাসও প্রায় রুদ্ধ হয়ে এল। কি এমন মহাপাপ মানুষের সঙ্গে দু'টো কথা বলায় বা একবার দেখা করায় যে তুমি অমন বিশ বাঁও জলে পড়ে যাও?"

আজও উপরের খড়খড়ি তোলার শব্দে প্রমীলা তাড়াতাড়ি চলে গেল।

মাসীর বাড়ী বেশী দূর নয়। বাড়ীটি নির্জ্জনও বটে। ব্রজরাজ শুনেছিল মাসী বিধবা। ছোট্ট বাড়ী, আগাগোড়া আয়নার মত ঝক্‌ঝক্ করছে, ঘরের মেঝেতে সবুজ মোজেইক, তার পাড় হলুদে; দরজার পর্দাও সবুজে হলুদে পাড় দেওয়া। সামনের ঘরে নীচু নীচু বসবার চৌকিতে হলদে সবুজ ও লালচে গদি পাতা। দেয়ালের গায়ের তাকে মাটির ও কাঠের গ্রাম্য খেলনা। চৌকির সামনে নীচু কাঠের টেবলের উপর কাঁসার গোল ঘটিতে সবুজ পাতার মধ্যে দুই-চারটি সাদা ফুল। ঘরে একটি মাত্র ছবি, সাঁওতাল তরুণীর রেখাঙ্কণ চিত্র, বেশ বড় ক'রে আঁকা। ব্রজরাজের মনে হ'ল এ ঘরটি যেন শুধু দেখবার জন্য, এ ঘরে কারুর পায়ের ধুলো পড়লে বাড়ীটা কেঁদে উঠবে।

সে দরজার সামনে ধূলামাখা জুতা পায়ে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছিল। সহসা একটি সুন্দরী নারীমূর্ত্তি ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হলেন। ধপধপে সাদা শাড়ীতে সরু জরির পাড় ঘুরে ঘুরে দীর্ঘ তনুটি বেষ্টন ক'রে উঠেছে! মেয়েটির হাতে পেটা সোনার মোটা দু'টি বালা, গলায় চিকৃচিকে একটি হার বুকের মাঝখান পর্য্যন্ত নেমে একটি চৌকা সোনার পদক ধ'রে রেখেছে। চোখের কোণে একটু কাজল ছাড়া প্রসাধনে আর কোনো ধার-করা রং চট্ ক'রে বোঝা যায় না। মেয়েটিকে দেখলে মনে হয়, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত মোম দিয়ে পালিশ করা।

ব্রজরাজকে দেখেই তিনি বললেন, "এস, এস, ঘরে এসে বোস। প্রমীলা এখুনি এল বলে।"

ব্রজরাজ লজ্জিত মুখ ক'রে বললে, "আমি কার কাছে এসেছি আপনি জানেন নাকি?"

মেয়েটি হেসে বললে, "তা আর জানি না? নইলে আমার বাড়ী তোমার পায়ের ধুলো পড়বে কেন?

ব্রজরাজ বললে, "কি যে বলেন? আপনার এই মন্দিরের দরজায় দাঁড়াতে পাওয়াও আমার পরম ভাগ্য। আমার এই কুলির মত বেশভূষায় এখানে ঢুকে বসাই একটা অপরাধ। কিন্তু উপায় ত নেই, না ঢুকলে ফিরে যেতে হয় সব ধুলা সঙ্গে ক'রে।"

মেয়েটি বললে, "আমি প্রমীলার মাসি। আমার বাড়ী নিজের বাড়ী মনে করে আসবে, বসবে, যা খুসী করবে, তবে না আপনার মনে করছ বুঝব? প্রমীলাকে আমি এতটুকু থেকে দেখছি, ও কখনও কোনো জিনিসে আমার কাছে সঙ্কোচ করে না। ভাল লাগলে ভাল বলে, মন্দ লাগলেও বলতে ভয় পায় না। আমি রাগ করলেও গ্রাহ্য করে না, আদর করলেও মূর্চ্ছা যায় না। আমি তাই, ঐ রকমই সকলের কাছে চাই।"

ব্রজরাজ খুশী হয়ে বললে, "আচ্ছা, আপনি যখন অভয় দিলেন তখন আমিও যা খুশি ক'রে যাব কিন্তু। আপাতত সাহস ক'রে ঢুকে আরাম ক'রে বসি। কিন্তু আপনাকে আমি মাসী বলব না। আপনি ত ছেলে মানুষ।"

মেয়েটি বললে, "আচ্ছা, না হয় বাণীদি বোলো। নিজেকে ছেলে মানুষ ভাবতে কার না ভাল লাগে? অবস্থাচক্রে মাসী-পিসী হয়ে বসে আছি, সেটা ত এড়ান যায় না।"

ব্রজরাজ বললে, "আমাদের দেশ ব'লেই যত উদ্ভট নিয়ম। ইউরোপের মেয়েরা যতদিন বেঁচে থাকে নিজেদের বুড়ো হতে দেয় না। আর আপনাদের বয়সে ত তারা বালিকা। সুইম স্যুট প'রে সমুদ্রে স্নান করছে, স্ল্যাক্স্ প'রে বরফের উপরে স্কেট করছে, ব্যাক্‌লেস পোশাক প'রে রাত তিনটে পর্য্যন্ত দৈত নৃত্য করছে। আপনারা ত ভাবতেও ভয় পান।"

বাণীর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় হাল্কা সোনালী রঙের শাড়ী প'রে দীর্ঘ বেণী ঝুলিয়ে প্রমীলা এসে ঘরে ঢুকল, মুখে সেই সলজ্জ হাসি।

বাণী বললে, "তুই এসেছিস্? তোর বন্ধুর সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে তুলেছিলাম। সে ত রাত তিনটে

পর্য্যন্ত তোর সঙ্গে নৃত্য করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।"

প্রমীলা বাণীর কাঁধটা ধ'রে একটা ধাক্কা দিয়ে বললে, "মাসী, এতও গল্প বানাতে পার। আমি কোনো দিন নাচি না কি যে যত বাজে গল্প রটাচ্ছ?"

ব্রজ একটু লজ্জার ভান করে বললে, "না না, আমি ইউরোপের মেয়েদের কথা বলছিলাম। তোমার কথা হচ্ছিল না। তুমি যে সনাতনপন্থী তা কি আর আমি জানি না।"

বাণী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আমি একটু চা নিয়ে আসি তোমরা বোসো।"

প্রমীলা ব্রজরাজকে বললে, "এ দেশের মেয়েদের বুঝি আর মনে ধরছে না, তাই ইউরোপের মেয়েদের ধ্যানে মশগুল হয়ে উঠছ? ক'দিনই বা চোখের আড়াল হয়েছি?"

ব্রজরাজ অভিমানের স্বরে বললে, "সুযোগ যখন পেয়েছ এক ধা দিয়ে নাও। আমি এত দূর দৌড়ে এলাম কি ইউরোপীয়াদের সন্ধানে? তোমারই জন্যে এম. এস-সি-র সিলেবাস সংগ্রহ ক'রে আনলাম। তোমার বাবা অন্য মতলবে আছেন বলে তুমি ত ভয় পাচ্ছিলে। বছর দুই এম. এস-সি পড়বে ব'লে কাটিয়ে দাও, কিছুদিন ত রেহাই পাবে। আমিও ত পড়ছি। কাজেই তোমার কোনো অসুবিধা হবে না। দেখবে কেমন ওবিডিয়েণ্ট সারভেণ্টের মত যা বল তাই ক'রে যাব।"

প্রমীলা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, "পড়বই ত ভাবছি। বাবাকে জপাচ্ছিও খুব। কিন্তু দু' বছর ত কম সময় নয়। তার মধ্যে কত কি ঘটে যেতে পারে।"

ব্রজরাজ যেন অন্যমনস্ক ভাবে প্রমীলার হাতের উপর আঙুলের টোকা দিতে দিতে বললে, "আমরা ঘটতে দেব কেন, প্রমীলা? ঘটা না ঘটা অন্যের হাতে যদি সম্পূর্ণ ছেড়ে দাও, তবে আর এত প্ল্যান ক'রে কি লাভ? দুটো বছর সময় নাও, নিজে যা ঘটাতে চাও মনে মনে ভাল ক'রে ঠিক ক'রে ফেল। আমি ত পাশেই রয়েছি।"

ব্রজরাজ প্রমীলার বেণীটা মুহূর্ত্তের জন্য হাল্কাভাবে একটু স্পর্শ ক'রে চোখ তুলে চকিতে একবার প্রমীলার চোখের মধ্যে তাকাল।

ছোট একটা কাঠের ট্রেতে চা, সন্দেশ, বিস্কুট ও ফল নিয়ে বাণী ঘরে ঢুকল। নীচু টেবিলে খাবারগুলি নামিয়ে সে ব্রজরাজের চৌকিটাতেই তার পাশে ব'সে পড়ল। বাণীর আঁচলটা ব্রজর গায়ের উপর পড়ল, সেদিকে সে দৃষ্টি দিলে না। পেয়ালাতে চা ঢালতে ঢালতে বললে, "আগে এক পেয়ালা চা খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নাও, তার পর শুকনো জিনিস ধীরে ধীরে খেও এখন। চায়ে ক' চামচ চিনি দেব বল।"

ব্রজরাজ বললে, "আপনার হাতের চা, এক চামচও যদি চিনি না দেন, মিষ্টি লাগবে। না হলে হয়ত দু' চামচই চাইতাম।"

প্রমীলা বললে, "মাসী, শুধুই চা দাও, দেখি কেমন ওর মিষ্টি লাগে।"

বাণী বললে, "তাই কি আর পারি, ভাই? ও আমাকে খুশী করবার জন্যে অমন মিষ্টি কথা বললে, আর আমি তার শোধ নেব তেতো চা খাইয়ে? এই কি উচিত মূল্য?"

ব্রজ বললে, "দেখলে ত বাণীদি! প্রমীলা বড় কঞ্জুস। হাত তুলে কোন জিনিস দিতে পারে না। কথা বলবে তাও ওজন ক'রে, হাসবে তাও শব্দ হবে না। আরও অনেক কিছু কার্পণ্য ওর আছে, প্রথম দিনেই আমি তোমায় সব ব'লে দেব না।"

বাণী সজোরে হেসে উঠে বললে, "উজাড় ক'রে দিবি, প্রমী। হাত গুটিয়ে থাকলে পাবিও ছিটেফোঁটা মাত্র।"

প্রমীলা বললে, "ডুবুরীরা অতল সমুদ্রে তলিয়ে রত্ন আহরণ করে। মুক্তা বালির চড়ায় এসে প'ড়ে থাকে না।"

ব্রজরাজ বললে, "দেখলে ত! ফোঁস্ ক'রে উঠেছে।"

বাণী বললে, "না, প্রমীই ঠিক বলেছে। অনায়াসে যা পাওয়া যায়, মানুষ তার মূল্য বোঝে না। তবু লোভী মানুষ দুর্লভ হতে পারে না।"

ব্রজ বললে, "তোমাদের ওসব কাব্য আমি বুঝি না। ভাল জিনিস দেবার থাকলে অনায়াসে দেবে, নেবার ইচ্ছা থাকলে অনায়াসেই নেবে, এই হচ্ছে সাধারণ মানুষের মত কাজ।"

নানা কথার খেলায় সন্ধ্যাটা কেটে গেল। ছুটিটায় কতরকম ফূর্ত্তি করা যায় তার কল্পনা-জল্পনা প্রচুরই হ'ল। সিনেমা, পিক্‌নিক্, বাণীর বাড়ীর চা, কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে তাই নিয়ে এমন তর্ক বেধে গেল যেন ওটা স্থির হওয়ার উপরই তাদের জীবনমরণ নির্ভর করছে। কে বলবে আজই ব্রজরাজ এ বাড়ীতে পা দিয়েছে।

প্রমীলাও বাণীকে দলে পেয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হয়েছে। এখন আর চারিদিকে তাকিয়ে কথা বলতে হবে না। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ব্রজর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে না। বাণীর সঙ্গে সে ত সর্ব্বত্রই যেতে

পারে। বাবা কিছুই বলবেন না। অনেকদিন পরে আজ মনটা তার খুশিতে তাই কাণায় কাণায় ভরে উঠেছে।

রাত হচ্ছে দেখে ব্রজ বললে, "এবার উঠি বাণীদি, অনেকদিন এমন আনন্দে সন্ধ্যাযাপন করি নি। সারা রাত এই সন্ধ্যার স্বপ্ন দেখব।"

বাণী ফুলের ঘটি থেকে সাদা ফুলের থোকাটা তুলে তার হাতে দিয়ে বললে, "এই ফুলগুলি মাথার কাছে রেখ, ভাই। সুগন্ধে তোমার স্বপ্ন মধুময় হবে।"

প্রমীলা বললে, "মাসী, এতও জান! তবে বাপু, এ তোমার বেণাবনে মুক্তো ছড়ানো।"

বাণী বললে, "তা কেন? তোমাদের আনন্দে কি আমার আনন্দ নেই? চল, এখন তোমাদের গাড়ী ক'রে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমারও একটু ড্রাইভিং হবে।"

গাড়ীতে উঠে বাণী বললে, "কে ভিতরে বসবে বল। দু'জনকে ত সামনে নিতে পারব না।"

ব্রজরাজ এক লাফে বাণীর পাশে উঠে বসে বললে, "বাণীদি আমি একটু ড্রাইভিং শিখতে চাই। প্রমীলা, প্লীজ কিছু মনে ক'রো না।"

বাণী বললে, "প্রমী, তোকেও কাল শেখাব দেখিস।"

মহা উৎসাহে কিছুদিন পালা ক'রে গাড়ী চালানো শেখা হতে লাগল। প্রমীলার চেয়ে ব্রজরই উৎসাহ বেশী। গাড়ীতে ঘুরতে ঘুরতে এক-একদিন রাত হয়ে যেত। বাণী ব্রজরাজকে আগে নামিয়ে দিয়ে প্রমীলাকে পরে দিয়ে আসত। রাত্রিতে নদীর ধারে গাড়ী চালাতে চালাতে ব্রজ বলত, "এমন রাতে আর বন্ধ ঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করে না। চল না বাণীদি, আমরা একদিন মুনলাইট পিক্‌নিক্ করে আসি। প্রতিদিনই কেন ন'টা বাজলে বাড়ী ফিরতে হবে? এত আলো ত চোখ বুজে ঘুমোবার জন্য নয়।"

বার বার শুনে একদিন বাণী বললে, "আচ্ছা চল, একটা জায়গা ঠিক কর।"

ব্রজরাজের এক বন্ধুর বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ী ছিল। ঠিক হ'ল সেইখানে যাওয়া হবে। ওরাও যাবে বন্ধুর দলের সঙ্গে। সকলের সঙ্গে সকলের অবশ্য আলাপ নেই। সেখানে গিয়ে আলাপ ক'রে দেবে। কিন্তু ফিরতে রাত হবে অনেক। একটা ত বাজবেই, দু'টোও বাজতে পারে। ব্রজর তবু জেদ চেপে গেল সে যাবেই। প্রমীলা কি করবে ভেবে পায় না।

শেষ মুহূর্তে সে বললে, "অত রাত ক'রে বাড়ী ফিরলে কোন না কোন কারণে বাবা সন্দেহ করবেনই, ভীষণ জেরা করবেন। আমার ভয় করে, আমি যাব না।"

ব্রজর মুখটা ম্লান হয়ে গেল। প্রমীলা বললে, "তোমাদের কি যেতেই হবে? তবে তোমরাই দু'জনে যাও।"

বাণী একটু ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু ব্রজ বললে, "তুমি চল লক্ষ্মীটি। কাউকে না নিয়ে গেলে ওদের কাছে আমার মুখ থাকবে না।"

পরদিন প্রমীলাকে গল্প বলার পালা। সে 'না' বলবামাত্র তাকে ফেলে ওরা দু'জন চলে গেল তাতে ত তার অভিমান হবারই কথা। বাণী অভিমান ভাঙাতে চেষ্টা না করলে বড় নিষ্ঠুর দেখায়।

তাদের জ্যোৎস্না-বিহারের গল্প শুনে প্রমীলা বললে, "আর ওরকম পাগলের কারখানায় যেও না। আজ এখানে আসবার আগেই প্রতুলের সঙ্গে আমার দেখা হ'ল। সেও নাকি গিয়েছিল। সে বললে, আলোর চেয়ে অন্ধকার খুঁজতেই সবাই ব্যস্ত এবং খাদ্যের চেয়ে পানীয়ের উপরই ঝোঁক তাদের বেশী। সত্যি বাপু, সারারাত ধরে এ রকম হুল্লোড় বড় বাড়াবাড়ি। আমাদের সন্ধ্যারাতের চায়ের আড্ডা এর চেয়ে ঢের ভাল।"

ব্রজ বললে, "ভাল হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে এমন থ্রিল নেই। মানুষের প্রাণটা যখন উছলে উঠেছে তখন তারা একটু-আধটু পাগলামি না করলেই বরং অস্বাভাবিক। আমার খুব ভাল লেগেছিল। প্রতুলটা মূর্ত্তিমান্ রসভঙ্গের মত এসে জুটেছিল। না হলে আরও ভাল হ'ত। আমাদের মাষ্টার মশায়ের আদর্শ ছাত্রদের আমি চাই নি সেখানে। এমনিতে ত কথা বলে না, আবার তোমায় এসে লাগিয়েছে!"

বাণীর মুখটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল, কিন্তু সে কিছু বললে না। তার মনে যেন কি একটা বেসুর বাজছিল, সেটা সে প্রকাশ করতে চায় না।

কখন উচ্ছ্বসিত কখন স্তিমিত হলেও এমনি করেই আনন্দে তাদের দিন কাটছিল। কিন্তু প্রমীলার মনের শান্তিটা যেন একটা অপরিস্ফুট আঘাতে চঞ্চল হয়ে উঠছে। মনের ভিতরে কি একটা বেদনা থেকে থেকে খচ্‌খচ্ করে ওঠে।

তার বাবার সদাজাগ্রত দৃষ্টি এবং কড়া পাহারার মধ্যে ব্রজরাজের সঙ্গে দেখাশোনা করা তার পক্ষে সহজ

ছেল না। প্রয়োজনও ছিল না এক সময়। ব্রজই তাকে নানাভাবে নিজের দিকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করে নিয়েছে। মনটায় এখন তার আর অন্য চিন্তা বেশী নেই। এই সময় বাণী যদি তার সহায় না হ'ত ব্রজকে চোখের দেখাও সে দেখতে পেত না। বাণীর কাছে সে ঋণী। এই দৈনিক আনন্দের খোরাক সেই ত জুগিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু দিলে কি হবে? এই ত্রয়ীর মিলন ত প্রমীলা চায় নি। পথেঘাটে দোকানে সিনেমায় যেখানেই সে আগে ব্রজর সঙ্গ ক্ষণিকের জন্যও পেত, কষ্ট অর্জ্জিত হলেও সেটুকু ছিল তার একান্ত নিজস্ব। এখন তার অনায়াসলভ্য দীর্ঘ সান্ধ্য উৎসবেও নিজস্ব সময় নেই বললেই হয়। বাণী যদি বা তাদের দু'জনকে একটু আলাদা ছেড়ে দিতে চেষ্টা করে, ব্রজর উৎসাহে তাও মাটি হয়। ব্রজ তখনই বাণীকে ধরে রাখবার জন্যে মহা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বাণী বয়সে সকলের চেয়ে বড়, তার উপর সে প্রমীলার চেয়ে অনেক আধুনিকা। সে যেমন চট করে ব্রজর হাত ধরে টান দেয়, গুম্ করে পিঠে কিল বসায়, হাসির তরঙ্গে তরঙ্গে সমস্ত ঘরটা যেমন হাসিয়ে তোলে, প্রমীলা এত দিনেও তা পেরে ওঠে নি। প্রমীলারই মিথ্যা সঙ্কোচ কি? সে কেন শামুকের খোলার মত নিজের ভিতর নিজে গুটিয়ে যেতে থাকে? শুধু কি বাণীর চেয়ে বয়সে ছোট বলে?

বাণী ত প্রমীলার জন্যই ব্রজকে আদর করে বাড়ীতে ডেকে এনেছিল। বাণীর আর দোষ কি? সে যা অনায়াসে সহজে করে প্রমীলা তা পারে না, সেটা কি বাণীর দোষ? বাণী হয়ত এখনও ব্রজকে তেমনি স্নেহের চক্ষেই দেখে। প্রমীলার মনটা দোলায়িত হয়। কি জানি? প্রমীলা বুঝতে পারে না বোধ হয়।

কিন্তু ব্রজরাজ? সে কি প্রমীলাকে ভুলে যাচ্ছে না? তার কি একটুও প্রমীলাকে একলা সঙ্গ দিতে ইচ্ছা করে না? প্রমীলাকে কত কথা বলবার ছিল যার, তার সব কথাই অকস্মাৎ ফুরিয়ে যাচ্ছে কেন? না, না, ফুরিয়ে যায় নি, কথার গতি অন্যদিকে ফিরে গিয়েছে। প্রমীলা ত মাঝে মাঝে ব্রজকে না জানিয়ে আচম্কা বাণীর বাড়ী বিকালে গিয়ে দেখেছে, ব্রজ মহা আনন্দেই সেখানে বসে আছে। মনে ত হয় না সে প্রমীলার অপেক্ষায় এসে বসে ছিল। বাণীর সামনে জিজ্ঞাসা করতেও লজ্জা করে। বাণী কি ভাববে তাকে?

অভিমানে চোখে জল আসে। প্রমীলা যাবে না ত আর বাণীর বাড়ী। বাণী বা ব্রজর কোন খবর নেবারও চেষ্টা করবে না। কিন্তু কই?' সাত দিন কেটে গেল, তাতেও ত দু'জনের একজনও প্রমীলাকে ডেকে পাঠাল না, কোন কৈফিয়ৎ কেউ দিল না! এইরকম করেই কি প্রমীলার দিন যাবে? যদি ব্রজ তাকে ভুলে গিয়ে থাকে, যদি বাণাই তার মন হরণ করে থাকে,তবে প্রমীলা মূর্খের মত মাথা কুটবে না ওই মিথ্যা স্বপ্নের পিছনে। কিন্তু স্বপ্নটা সত্য কি মিথ্যা যেমন করে হোক একবার কি জেনে নিতে চেষ্টা করবে না? না হলে দাঁড়াবে কোন্ ভিত্তির উপর? প্রমীলা চোখের জল ফেলে, আবার নিজেই নিজেকে ধিক্কার দেয়।

শেষ পর্য্যন্ত প্রমীলা চুপ করে থাকতে পারল না। ব্রজরাজের কাছে সে যেতে পারে না। তার অভিমানে বাধে। নিজের গৃহ রচনার জন্য নিজেকে সে সস্তা করবে না। সে শুধু বাণীর কাছে যাবে একবার। ব্রজ যদি বাণীকেই বরণ করে থাকে তবে সেইটুকু শুধু সে শুনে আসবে। বাণীর শূন্য জীবন যদি ব্রজ পূর্ণ করতে পারে প্রমীলা ঈর্ষা করবে না। উচ্ছিষ্ট কেড়ে আনতে সে চায় না।

সকাল বেলাই প্রমীলা বেরিয়ে গেল। এই সময় বাণীর বাড়ী অন্য কেউ থাকবে না। নিভৃতে তাকে পাবে সে।

বাণীর ঘরের দরজা খোলা। এলোচুলে সে খাটের উপর বসে আছে। পাশে একটা সেলাই পড়ে রয়েছে। প্রমীলাকে দেখে ক্ষীণ একটা হাসি তার ঠোঁটের কোণে দেখা দিল। কিন্তু তার দৃষ্টি কেমন শোকার্ত্ত। প্রমীলার মুখে বেশী কথা বেরোল না। সে শুধু ডাকল, "মাসী।"

বাণী যেন চম্কে উঠল, বললে, "মাসী বলিস্ নে। আমি কি মাসীর কাজ করেছি? আমাকে ভুলে যা, ঐ সব দিনগুলো ভুলে যা। জীবনটাকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে তুই এখনও পারবি।"

প্রমীলা বললে, "যাই করে থাক, আমার কোনো রাগ নেই, মাসী, তোমার উপর। তোমার জীবন যদি সুখের হয় তাই হোক্। ওকেও আমার কিছু বলবার নেই। আমি শুধু দুঃখ পাই যে তুমি আমায় নিজে থেকে বললে না কেন?"

বাণী বললে, "বলতে পারি নি রে; বলতে কি কেউ পারে? আর আজ ত বলবারও কিছু নেই। শুধু এইটুকু দেখে নে—"

বাণীর বালিশের তলায় একটা চিঠি চাপা ছিল। সেটা সে প্রমীলার হাতে তুলে দিল। ব্রজ লিখেছে—

"বাণী, আমি বিদেশে পড়তে চলে যাচ্ছি। তুমি বিস্মিত হোয়ো না। আমি ঋণী, গত সাত বৎসর আমি যাঁর দয়াতে পড়াশুনা করেছি সেই ভবনাথ বাবুর কন্যাকে বিবাহ করে আমি সস্ত্রীক দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি অপরাধী।"

প্রমীলার চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ল। কি জানি হয়ত এমনি আর একখানা চিঠি বাড়ীতে তার জন্যেও অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু এমন চিঠি পাওয়ার চেয়ে তাকে ব্রজ সম্পূর্ণ ভুলে গেলেই প্রমীলা কৃতজ্ঞ হবে।

—০—

বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

এই জেলা সংগঠন পরিকল্পনা এবং ত্রৈমাসিক বিবরণীর বিষয় নির্বাচন ইত্যাদির রচনায় যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে নরেনবাবু প্রধান নেতা হিসেবে ত ছিলেনই সহকারী হিসেবে সংঘ পরিচালনার দায়িত্ব থাকায় আমাকেও অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। এতদ্ভিন্ন রমেশ আচার্য, রমেশ চৌধুরী ও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী প্রভৃতি আরও অনেকে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

এর কিছুদিন পরে সমিতির কিছু কিছু সভ্যের মধ্যে কাজকর্মে শৈথিল্য, আগ্রহহীনতা, চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করে স্থির করলাম যে, পুরোণো নতুন সকল সভ্যকেই পুনরায় 'প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আরও স্থির হ'ল যে, পুরাতন সভ্যদের গোপনে সুযোগ দেওয়া হবে এই যে, ইচ্ছা করলে তাঁরা সমিতি ছেড়ে দিতে পারেন। এতে তাদের সমিতির লোকের কাছে কোন প্রকার মর্যাদা হানি হবে না। তাঁরা সমিতি থেকে ধীরে ধীরে সরে পড়তে পারেন। যে কয়জন পুরাতন লোককে মনে করলাম যে, তারা আর বৈপ্লবীক জীবনযাপন করতে পারবে না, অন্তর থেকে তাঁরা দূরে সরে পড়ছেন, ভিতরে দুর্বলতা এসে পড়ছে, চক্ষুলজ্জায় সম্পর্ক পরিত্যাগ করতে পারছেন না, নিজেদের সংসারের শোচনীয় অবস্থা দেখে বা সাংসারিক জীবন যাপনের ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠছে—এমনি সভ্যদের বিশেষ করে বললাম। লোক মারফত না বলিয়ে আমরাই তাদেরকে সব বললাম। পুরোণো সভ্যদের মধ্যে যাদের মনে কোন প্রকার দুর্বলতা আসেনি তাঁরা সানন্দে আমাদের প্রস্তাব শুনলেন। কোন প্রকার মনক্ষুণ্ণ বা দোষ গ্রহণ করেন নি।

অবশ্য কেউ কেউ খুব মনক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবং আমাদের এ প্রস্তাবে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল। প্রিয়নাথ আচার্যের কথা বিশেষ করে মনে আছে। ইনিই পরে বিশ্বাসঘাতক হয়েছিলেন। ইনিই বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিলেন। যদিও প্রথম আমরা তার মধ্যে দুর্বলতা লক্ষ্য করেই তার নিকটে প্রস্তাব করে ছিলাম, তবে সে যে এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করবে তা ভাবতে পারিনি।

এই জেলা সংগঠন পরিকল্পনা রূপায়ণ করবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াত করে বা বিবরণী পাঠ করে এবং নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির করতে লাগলাম কাকে কোন্ জেলার ভারপ্রাপ্ত করা যায়।

সে সময় রমেশ আচার্য কেবল সোনারং মোকদ্দমায় দণ্ডভোগান্তে মুক্তিলাভ করে বাইরে এসেছেন। তাকেই বরিশাল জেলার ভার দিয়ে পাঠান হ'ল। তখন সেখানকার আভ্যন্তরীণ জটিলতার দরুণ, বিশেষত তখন সেখানে কেউ কেউ পুরাতন সভ্য কাজ করছিলেন, এক-জন প্রথম শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে বরিশাল জেলার ভারপ্রাপ্ত পরিচালকরূপে পাঠান প্রয়োজনীয় ছিল। সুতরাং রমেশ আচার্যের মত উপযুক্ত লোক প্রেরিত হলেন। বিশেষ ভাবে মনে আছে সে সময় যতীন রায় (ফেগু রায়) এর মত পুরাতন কর্মী সেখানে কাজ কর-ছিলেন। তিনি সাহস, ত্যাগ, নিষ্ঠা ও নিরহঙ্কার ব্যবহারে কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত জেলার পরিচিত হয়ে গেলেন। বরিশাল জেলায় তার মত প্রসিদ্ধি আর কেউ লাভ করতে পারেনি। বাস্তবিক পক্ষে তিনি একটা

রূপকথার মানুষ (legendary figure) হয়ে পড়েছিলেন। একদিকে যেমন জেলার লোক তার নামে গর্ব বোধ করত, অপর পক্ষে দুষ্কৃতকারীদের তেমনি হৃৎকম্পও হ'ত।

রমণীমোহন দাস ময়মনসিংহ জেলার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক হলেন। তিনি ছিলেন সমিতির একজন পুরাতন বিশ্বাসী দায়িত্বশীল সভ্য। বাইরে থেকে তিনি ছিলেন সাধারণ সংসারী লোক। ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদারী সরকারে সামান্য চাকুরি করতেন। কাজেই আর্থিক স্বচ্ছলতা একেবারেই ছিল না। ইংরেজি লেখাপড়াও খুব ভাল জানতেন না। কিন্তু তার দক্ষতা, দায়িত্বজ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠার জন্য তাকে এত বড় একটা জেলার ভারপ্রাপ্ত পরিচালক করা হয়েছিল এবং এজন্য সমিতির বহু সভ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী বিদ্বান, বড় চাকুরে এবং অবস্থাপন্ন লোকও রমণীবাবুকে মান্য করতেন।

আমি ময়মনসিংহ সমিতির কার্য পরিদর্শন করতে গিয়ে গৌরীপুরেও যাই। অবস্থা পরিদৃষ্টে বুঝতে পারলাম যে, রমণীবাবুর মনোনয়ন যথোপযুক্তই হয়েছে। তাহার প্রধান সহকারী হয়েছিলেন পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

এ প্রসঙ্গে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলে রাখা দরকার। তখন তার বয়স খুব কম। দাড়ি গোঁফের রেখাও দেখা দেয় নি। খুব নীচু ক্লাস থেকেই লেখাপড়া শেষ হয়েছিল। অবশ্য এমনিতে তিনি লেখাপড়া খুব জানতেন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা, দক্ষতা, ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা এমনিই পর্যায়ের ছিল যে, অপেক্ষাকৃত বয়সে, বিদ্যায়, অবস্থায় বড় সভ্য পূর্ণ চক্রবর্তীর আদেশ বিনা দ্বিধায় পালন করত। বিশেষ করে সমিতির সভ্য সংগ্রহের ও সভ্যগণকে সমিতির শৃঙ্খলার মধ্যে টেনে আনবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। পরে তার দক্ষতার জন্য মালদহ জেলার ভার দিয়ে পাঠান হয়। সেখানে তার সাফল্যের জন্য কুমিল্লার মত জেলায় পাঠাই। পরে সে ঢাকারও ভার পেয়েছিল।

প্রথম অবস্থায় কুমিল্লায় ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ছিলেন সারদা চক্রবর্তী। তার পরেই পূর্ণ চক্রবর্তী ভার গ্রহণ করে।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ কাহিলীর কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তিনি জমিদারী সরকারে চাকুরি করতেন এবং সংসারী লোক ছিলেন। তাঁর উপরই ছিল নোয়াখালী জেলার পরিচালনার ভার। তিনি অত্যন্ত উপযুক্ত ও দায়িত্বশীল সভ্য ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বহু গৃহত্যাগী সভ্য তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকত, এবং তিনি অস্ত্রশস্ত্রের দেখাশুনা করতেন।

চট্টগ্রাম জেলায় প্রথম বিপ্লবী চন্দ্রশেখর দেই ছিলেন ঐ জেলার প্রথম পরিচালক। সোনারং কেন্দ্র ভেঙ্গে যাওয়ার পরই তাঁর নিয়োগ। তার পর প্রিয়নাথ আচার্য এ জেলার পরিচালক হন কিছুদিনের জন্য।

চন্দ্রশেখর দে-র পরে চট্টগ্রামের ভার গ্রহণ করেন সিলেটের নগেন্দ্রনাথ দত্ত। পরে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত মনে করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঢাকা কেন্দ্রে আনা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে উত্তর ভারতে পাঠান হয়। প্রথম যুদ্ধের সময় উত্তর ভারতে যে বিপ্লবায়োজন হয় তাতে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হন। পরে বাণারসী ষড়যন্ত্র মামলায় (Benaras conspiracy case) শচীন সান্যাল প্রভৃতির সঙ্গে গ্রেপ্তার হন এবং কারাদণ্ড হয়। বন্দী অবস্থায় আগ্রা জেলে তাঁর মৃত্যু হয়। নগেনবাবু আমাদের মধ্যে একটু বেশী বয়স্ক ছিলেন। তিনি ছিলেন বিবাহিত। আমাদের গ্রেপ্তারের পর নিজের দক্ষতা ও বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিরহংকারী। অপেক্ষাকৃত বয়োকনিষ্ঠ, অল্প শিক্ষিত সভ্যের নেতৃত্ব মেনে চলতেও তিনি কখনও দ্বিধা করতেন না। তিনি প্রথমদিকে ছিলেন সিলেট জেলার ভারপ্রাপ্ত। তার পর সে জেলার ভার পান রমেশচন্দ্র চৌধুরী।

রমেশবাবু ময়মনসিংহ জেলার এক শিক্ষিত সম্মানী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই বিপ্লবী আদর্শ গ্রহণ করেন। পরে গৃহত্যাগ করে সমিতির কাজে সোনারং আসেন। রবীন্দ্রমোহন সেনও একই তারিখে গৃহত্যাগ করে সোনারং আসেন। তাদের দলীয় নাম রাখা হয় যথাক্রমে পরিতোষ ও ভবতোষ। সিলেট জেলা ছাড়াও সুর্মা উপত্যকা এবং আসামের অন্যান্য জায়গায় সমিতি বিস্তারের অধিকার রমেশবাবুকে দেওয়া হয়েছিল।

রমেশবাবু খুব বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান কর্মী ছিলেন। নেতৃত্বের গুণ ছিল অনেক। এবং সমিতির উচ্চতম নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন তিনি।

সিলেট থেকে তাকে আনা হয় কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহের জন্য। তার স্থলাভিষিক্ত হন লালমোহন দে। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হওয়ার পর রমেশবাবুর উপর সমস্ত পূর্ববঙ্গের ভার অর্পণ করে আমি কলকাতায় চলে আসি। প্রত্যক্ষভাবে পূর্ববঙ্গের ভার

থাকলেও তিনি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে একজন দায়িত্বশীল নেতারূপে পরিচালিত হয়েছিলেন।

নোয়াখালী জেলায় ফেনী মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হয়ে সীতানাথ দাস স্থানীয় স্কুল শিক্ষক হিসেবে অবস্থান করেন, মানুষ এবং কর্মী হিসেবে তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা। সমিতির কাজে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা প্রবল ছিল।

নারায়ণগঞ্জ সমিতিতে তিনি আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ, অনেক বেশী বিদ্বান ও সভ্য হিসেবে ছিলেন আমার সিনিয়র। সমিতিরও তিনি ছিলেন একজন শ্রদ্ধেয় নেতা। কিন্তু যখন ঘটনাচক্রে সমিতি পরিচালনার ভার আমার হাতে আসে তখন আমার নির্দেশে কাজ করতে তিনি এতটুকু দ্বিধা করেন নি। তিনি আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতেন, তাকে আমি করতাম 'আপনি' বলে। তার মর্যাদা রক্ষা করেই নির্দেশ দিতাম।

এ প্রসঙ্গে আমার একটা ব্যক্তিগত কথা না বলে পারছি না। আমি যখন সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব পাই তখন আমি অনেকের চাইতে বয়সে ছোট। সুতরাং পরিচালনা ক্ষেত্রে একটা নীতি অনুসরণ করতাম। কাকেও কোন আদেশ দিতে হলে তার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তারই মুখ থেকে কথাটা বার করতাম যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে, কাজটা তিনি নিজের বিবেচনা মতই করছেন, কারুর আদেশ পালন হিসেবে নয়। আমার আদেশ কারুর পক্ষে পীড়াদায়ক এবং মর্যাদা-হানিকর না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতাম। আমি যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র সভ্যদের পরিচালক হয়েছিলাম তখন আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। সমস্ত ছাত্র সভ্য এমন কি এম-এ, এম-এস-সি শ্রেণীর ছাত্ররা আমার নির্দেশে কাজ করতে দ্বিধা করে নি। এ রকম দৃষ্টান্ত সমিতির অনেক শাখাতেই দেখা গিয়েছিল।

•

উত্তরবঙ্গে সমিতির অবস্থা বড়ই বিশৃঙ্খল ছিল। এক রকম অস্তিত্বই লোপ পাওয়ার উপক্রম হ'ল। সুতরাং আমরা যখন একজন উপযুক্ত লোককে সেখানে পাঠাবার কথা ভাবছি তখন এমন একটা ঘটনা ঘটে, যার ফলে ত্রৈলোক্যবাবুর পূর্ববঙ্গে অবস্থিতি নিরাপদ রইল না। ফলে তাকেই উত্তরবঙ্গের ভার দিয়ে পাঠান হ'ল। ঘটনাটা এই—

সমিতির কাজ যখন পূর্ণোদ্যমে চলতে আরম্ভ করেছে সমিতির প্রধান কেন্দ্র ঢাকা শহরে সমিতির প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গিয়েছে, তখন আমরা অনুভব করলাম যে, সরকার অনুশীলন-সমিতির পুনর্জাগরণের কথা বুঝতে পেরেছে এবং আমাদের সমস্ত খবরাখবর জানবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গিয়েছে। ঢাকার নদীর ধারে করোনেশন পার্কে সমিতির একটা বড় সভ্য সংগ্রহের স্থান ছিল। সময় সময় এমন হত যে, করোনেশন পার্ক ও নদীর ধারের ভ্রমণের রাস্তা বাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধ এ অধিকাংশ লোকই সমিতির সভ্য হয়ে পড়ত। পার্কে নজর রাখবার জন্য তখনকার বড় গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর উমেশ চন্দ নিজে আসতে লাগলেন। প্রতিকারের জন্য আমরা প্রথমে স্থির করলাম যে, চন্দকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করাই হবে সমিতির মঙ্গল। কিন্তু সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে বুঝলাম যে, গোয়েন্দা কর্মচারী বড় অফিসার হলেই যে আমাদের পক্ষে বেশী অনিষ্টকর হয় তা নয়; আমাদের খবর যে বেশী সংগ্রহ করেছে এবং করতে পারে, আমাদের অনেককে যে চিনে রেখেছে, সমিতির নিরাপত্তার জন্য সকলের আগে তাকেই সরান কর্তব্য। তখন স্থির হ'ল যে, গোয়েন্দা রতীলাল রায়কেই প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। সে সমিতির পেছনে লেগেছিল, বহু লোককে চিনত—নাম না জানলেও মুখ চিনত।

স্থির হ'ল এ কার্যের জন্য ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বীরেন চ্যাটার্জি এবং আমার নিযুক্ত হওয়া। নেতা হিসেবে ত্রৈলোক্যবাবু প্রথমে গুলী করবেন, তার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমিও গুলী করব। বীরেন চ্যাটার্জি আমাদের প্রহরায় থাকবেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় রতিলাল যখন উমেশ চন্দের কাছে রিপোর্ট দাখিল করে চন্দের বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে তখন আমরা আক্রমণ করলাম। কথা ছিল কেদারেশ্বর সেন আমাদের জন্য এক জায়গায় অপেক্ষা করবে। কার্য-সমাধা করে সে স্থানে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তার হাতে সমর্পণ করে নিজেদের জায়গায় চলে যাব। আমি তখন ঢাকা কলেজের মিনার্ভা হোষ্টেলে থাকি। রতিলাল নিহত হয় ১৯১২ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর।

কার্য সমাধা হওয়ার পর এত হৈচৈ পড়ে গেল এবং আমাদের ধরবার জন্য অনুসরণকারীর দল এত প্রবল হয়ে উঠল যে, আমরা পূর্ব নির্দিষ্ট দিকে যেতে পারলাম না। অন্য পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে একটা অন্ধ গলির মধ্যে প্রবেশ করলাম। সেখান থেকে ফিরে অন্যদিকে গেলাম। পরে এমন অবস্থা হ'ল যে, আমরা আর কোন দিকে অগ্রসর হওয়ার উপায় দেখলাম না। তখন সুবিধে মনে করে আমরা ঢুকে পড়লাম আমার খুল্লতাত আদিত্য গাঙ্গুলীর বাসা পানী-টোলায়। বাড়ীর ভিতর ঢুকে পিছনের দিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। এমনি সময়

আমার কাকীমা ক্ষীরোদাসুন্দরী দেবী 'কে', 'কে' আওয়াজ করে একেবারে আমাদের নিকটে এসে গেলেন। তিনি খুব সাহসী ছিলেন, কেননা অমনি অবস্থায় স্ত্রীলোক ত দূরের কথা পুরুষও অন্ধকারে লোক দেখলে ভয় পেত। কাকীমা আমাদের একেবারে সামনে এসে পুনরায় বললেন—কে তোমরা। আমি তার কাছে এগিয়ে এসে বললাম—"কাকীমা, আমি। ব্যাপার ত বাইরের গোলমাল শুনেই বুঝতে পারছেন। আমরা এখানে একটু সময় অপেক্ষা করে চলে যাব। আপনি এই রিভলবার ও কার্তুজগুলি সাবধানে রেখে দিন। আজ যদি পারি ভালই, নইলে কাল এসে নিয়ে যাব।" কাকীমা একটুও দ্বিধা না করে বললেন—"দে, সবগুলি আমার হাতে দে। কোন ভয় নেই। আমি সব ঠিক-ভাবে রাখব। এখন আর কোথায় যাবি, এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে থেকে যা।" আমারা থাকতে রাজী না হয়ে চলে গেলাম। আমার আবার হোষ্টেলে হাজিরা ঠিক রাখতে হবে।

পরদিন ভোরবেলা ত্রৈলোক্যবাবু রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছিলেন তখন আগের দিনের হত্যাকাণ্ডের অনুসরণ-কারী দলের জেলা পুলিশ সুপার, বহু পুলিশ কর্মচারীর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। উমেশ চন্দ ত্রৈলোক্যবাবুকে দেখিয়ে পুলিশ সুপারকে ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুপার সুলিভান সাহেব ত্রৈলোক্যবাবুকে গ্রেপ্তার করল। এই উপলক্ষে ঢাকার উকিল মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুলিশ সুপার ডেকে নিয়ে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেন ও ভয় দেখান।

ত্রৈলোক্যবাবুর নামে ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার পরোয়ানা ছিল। কিন্তু তখন এই মোকদ্দমা শেষ হয়ে গিয়েছে। আবার নতুন করে মোকদ্দমা চালান সরকার পছন্দ করল না। তিনি ১০৯ ধারায় অভিযুক্ত হলেন। কিন্তু অন্য মোকদ্দমায় পলাতক ফেরারী বিধায় ১০৯ ধারায় মোকদ্দমা চলে না। সুতরাং ত্রৈলোক্যবাবু জেল থেকে খালাস পেলেন। মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উত্তরবঙ্গে চলে গেলেন। এই হ'ল ত্রৈলোক্যবাবুকে উত্তরবঙ্গে পাঠানর সংক্ষিপ্ত ঘটনা।

ত্রৈলোক্যবাবু সমস্ত উত্তরবঙ্গ একবার পরিদর্শন করে নাটোরের উকিল শ্রীশ চক্রবর্তীর বাসায় থাকা স্থির করলেন। নাটোরকে কেন্দ্র করেই তিনি কাজ সুরু করলেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কাজ করবার জন্য আরও সংগঠক পাঠানো স্থির হয়।

মালদহ জেলায় পাঠান হয় পূর্ণ চক্রবর্তীকে। সেখানকার পুরাতন সভ্যরা কেহ কেহ সহানুভূতি দেখালেন। নিয়ম ছিল যেখানেই যাকে পাঠান হ'ক না কেন তাকে লোক দেখান একটা জীবিকা-নির্বাহের কাজে নিযুক্ত হতে হবে। লোকচক্ষে সন্দেহ এড়াবার জন্যই এ ব্যবস্থা। পূর্ণ চক্রবর্তী এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে তার ছেলের গৃহশিক্ষকরূপে থাকবার স্থান পেল। কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে, ছাত্রটির বিদ্যা পূর্ণ চক্রবর্তীর চাইতে বেশী। তদুপরি পড়াবার সময় অভিভাবকটি কাছেই বসে বিশ্রাম করতেন। বেগতিক দেখে পূর্ণ চক্রবর্তী ছাত্রটিকেই সমিতির আদর্শে অনুপ্রাণিত করে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করে নিল। তার পর যেদিন যা পড়ান হবে তা পূর্ব থেকেই স্থির হয়ে থাকত—শিক্ষক-ছাত্র উভয়ের পরামর্শক্রমে। পাঠ্য বিষয়টা পূর্ণ চক্রবর্তী আগেই একটু দেখে রাখত। পূর্ণবাবু নিজে স্কুল-কলেজে না পড়লেও নিজ গুণে তার চেয়ে বিদ্বান ছাত্রকে বহুদিন অভিভাবকের সামনে কৃতিত্বের সঙ্গে পড়িয়ে গেলেন।

সমিতির কার্যে মালদহে পূর্ণ চক্রবর্তীর কৃতিত্বের জন্য পরে তাকে কুমিল্লায় জেলা সংগঠক করে পাঠান হয়। মালদহে পূর্ণ চক্রবর্তীর স্থলাভিষিক্ত হয় সতীশ পাকরাশী।

পাবনা জেলায় সমিতির কাজ করবার জন্য কুমিল্লার পুলিন গুপ্তকে পাঠান হয়।

রংপুর জেলার কুড়িগ্রামে কাজ চালাবার জন্য পাঠান হয় ফরিদপুরের নিবারণ পালকে।

দিনাজপুর জেলা সংগঠক করা হয় সেখানকার অশ্বিনী মাষ্টার মহাশয়কে। তার কৌলিক উপাধি ভুলে গিয়েছি।

ফরিদপুর জেলায় অনুশীলন সমিতির কাজ প্রথম থেকেই ভাল চলছিল। পুলিনবাবুর বাড়ীই ছিল দক্ষিণ-বিক্রমপুরের (মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত) লোনসিং গ্রামে। পালং অঞ্চল ছিল সকল বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর। সমিতির প্রথম যুগের বিশিষ্ট সভ্য বীরেন সেনগুপ্তের পরিশ্রমে ও নিষ্ঠার ফলে ঐ অঞ্চলে সমিতির প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমিতির বহু বিশিষ্ট কর্মীর বাড়ী ছিল ঐ অঞ্চলে। আমি যে সময়ের কথা বলছি তখন মাদারীপুর মহকুমার পালং অঞ্চলের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন আশুতোষ কাহিলী, জীবন ঠাকুরতা। কেদারেশ্বর সেনের বাড়ী ঐ অঞ্চলে হলেও বাল্যাবধি তিনি ঢাকা শহরে কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সমিতির নেতৃবর্গের অন্যতম হয়েছিলেন। আশুতোষ কাহিলীকে গৃহত্যাগ করিয়ে কুমিল্লা জিলার ভিতরে কাজ

করবার জন্য পাঠান হয়। পরে তিনি ময়মনসিং জেলার ভারপ্রাপ্ত সংগঠক হয়ে যান।

ফরিদপুর শহর, সদর মহকুমা ও রাজবাড়ী মহকুমার সঙ্গে মাদারীপুর মহকুমার যাতায়াতের অসুবিধার জন্য সমস্ত ফরিদপুর জেলাকে একক জেলা সংগঠক-এর নেতৃত্বে পরিচালনায় অসুবিধা ছিল। ফরিদপুর শহরের দিকে প্রধান কর্মী ছিলেন রমেশ দাশগুপ্ত ও নিবারণচন্দ্র পাল। পরিচালনার ভার অর্পিত হয়েছিল রমেশ দাশগুপ্তর উপর। ফরিদপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা যদুনাথ পাল মহাশয় সমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক সভ্য ছিলেন।

আমি যে সময়ের কথা বলছি তখনকার প্রথম দিকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় চাঁদপুর ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষক হয়ে সেখানকার কাজের ভার নিয়েছিলেন। ছাত্র হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাঁর দেশের বাড়ী, বিক্রমপুরের অন্তর্গত স্বর্ণগ্রাম (কামারখাড়া), আমাদের সমিতির একটা বিশেষ আশ্রয়স্থল ছিল। সমিতির গৃহত্যাগী এবং গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রাপ্ত পলাতক অনেক কর্মী গিয়ে সে বাড়ীতে বাস করত।

ক্রমশঃ

—০—

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

ফ্লীট গ্রাম। আমাদের দেশের গ্রাম আর এসব গ্রামে অশেষ পার্থক্য। মনে পড়ে ত্রিশ বছর আগে একবার দেরাদুনে গিয়ে মনে হয়েছিল সারা শহরটা যেন সাজানো। ইংরেজদের গ্রামের চেহারা দেখে গ্রাম বলা যায় না। বলতে হয় ছবি। ওদের জমিতে বাড়তি বা ফালতু নেই। বাজে গাছও যেমন নেই গাছের অযত্নও তেমনি অভাবিত। উপ্‌চে পড়ছে যেমন নধর গরুর গা দিয়ে পিছল তেজস্বিতা, তেমনি ভেড়ার পালের বাহারে ঝক্‌ঝক্‌ করছে সবুজের বনাত। নতুন পাখী অনেক। প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে পাখীদের আসা-যাওয়ার জন্য, থাকা-খাওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা আছে। শীতের ক'মাসে যখন সবদিক শাদা, জীবনের সাড়া আকাশে বাতাসে নেই তখন মানুষ চাইছে কখন আসবে বসন্তকাল। আমাদের দেশের দুরন্ত আগুনক্ষরা গরমের পর বর্ষার দিনের গীত-বন্দনায় কবিরা যেমন মুখর, তেমনি ইংরেজ কবি এই শীত-ফুরোনো বসন্তকালকে কত বিচিত্র বন্দনায় চিত্রিত করেছে; ইংরেজ গৃহস্থ আদর করেছে বসন্তের সাথী এই সব পাখীদের। পশু-পাখী ভালোবাসে ইংরেজরা যে প্রাণের আনন্দে তার গোড়া পত্তন এই গ্রামে।

তবু ফ্লীট গ্রাম নয় পুরোপুরি। পোষ্টাপিস আছে, পুলিসের ফাঁড়ি আছে, যদিও পোষ্টমাষ্টার আর জিম রোপার হয়ত এক গ্লাসের দোস্ত, আর মে-পোলের দিনে নাচতে গিয়ে ওরা দুজনে জড়াজড়ি করে নাচবে। জানি না কোনদিন আলাদিনের প্রদীপের মত ক্লাস-লেস্ সোসাইটি গড়ে উঠবে কি না, কিন্তু ইংরেজের গ্রামে ক্লাস্‌লেসনেসের এ্যামিবা আছে।

সন্ধ্যার সময়েই রষ্টকোষ্টের দিদি খেতে দিলেন। আদর করে দিলেন ওঁর তৈরি পুডিং। গ্রামে মেয়েরা নিজেরাই জ্যাম করে; মধুর ব্যবস্থা রাখে, চীজ-পুডিং এ সব নিজেরা করে। তবে মোটামুটি খাওয়াকে ওরা বড় করে দেখলেও রান্নাটাকে ওরা হ্রস্ব করে নিয়েছে। রোম্যানদের মত অষ্টাহব্যাপী ভোজন ওরা করে না। মোটামুটি সেদ্ধই ওদের রান্না। বাকীটা স্বাদের ব্যাপার, টেবিলে বসেই করে নিতে হয়। আমি সেদ্ধ খেতে এমনিতেই ভালোবাসি। তার ওপর আগে থেকে তৈরি ছিলাম বলে খাঁটি ইংরেজ রান্না হওয়া সত্ত্বেও চম্‌কে যাই নি।

রষ্টকোষ্টের বাড়ী পৈত্রিক। এককালে বাড়ীটা বড়ই ছিল। সুবৃহৎ বার্ণ হাউসটা এখন একটা পশুশালা। এবং এই পশুশালা নিয়েই রষ্টকোষ্টের দিদির গল্প।

রষ্টকোষ্টের দিদির বিয়ে হয় নি। রষ্টকোষ্ট নিজে লম্বা। রষ্টকোষ্টের দিদিও লম্বা। এককালে যে খুবই সুন্দরী ছিলেন বেশ বোঝা যায়। লাবণ্য জিনিসটা ত

রূপ নয়। রূপ খুঁটিয়ে দেখা যায়। অনেক সময়ে মাপা যায়। মেপে মেপে ভিনাস্‌-ডি-মেলোর আকারে হুবহু আর একটা গড়ন গড়া যায়। কিন্তু পাথরের গায়ে যে লাবণ্য ফুটিয়েছেন শিল্পী সেটা বাটালির মাথায় আনা বড়ই কঠিন।

সেই লাবণ্য দিয়ে মোড়া রষ্টকোষ্টের দিদির চেহারা ওর নাম এল্‌সী। রষ্টকোষ্ট এল্‌সী বলে ডাকলেও আমি 'দিদি' বলে 'ডেকেছি। 'দিদি' ডাকটা ওর ভারি মিষ্টি লেগেছিল। বয়স তখন পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে কিন্তু সোনালী চুলের প্যাঁচ প্রায় তিন-চার পাক হবে, আর বিশেষ বড় এবং মোটা কাঁটার সাহায্যে তাকে আটকে রাখতে হয়েছে। সোজা করে টেনে চুল বাঁধা বলে বড় চওড়া কপালটা দেখা যায়। তার তলায় নীল-চক্‌চকে নীল তারা বড় বড় চোখের শাদার মধ্যে—যেন ভেসে আসছে। চোখের ভারী পাতায় যেন ঘুম জড়িয়ে আছে। ঠোঁট পাৎলা হ'লেও তলার ঠোঁটটা ঈষৎ উল্টানো, আর চিবুকটার মাঝামাঝি যেন একটু টেপা। সারা চেহারাটায় শান্তি নেই। প্রকাণ্ড সর্বনাশ ঝড়ের বুক থেকে ছেঁড়া একখানা হৃৎবিদ্যুৎ মেঘের মত সেই চেহারার উদ্‌ভ্রান্ত সহজতা আমায় ভাবিয়েছিল অনেকক্ষণ। অনেক দিন, অনেক রাত 'দিদির' সেই বিশাল দৃষ্টির বিশাল শূন্যতা আমায় জাগিয়ে দিয়েছে। রষ্টকোষ্টের বাবা কড়া প্রেসবিটেরিয়ান। এ বিষয়ে ওদের ভারি গর্ব ছিল। দিদি পড়তেন গ্রামের প্রেসবিটেরিয়ান স্কুলে। স্কুলেই দিদির সঙ্গে প্রথম ভাব হয় অস্কার ক্লেগরের। ক্লেগাররা আইরিশ। যদিও প্রায় তিন পুরুষ ক্লেগাররা সাদাম্পটনে বাস করে, ওদের অহঙ্কার ছিল ওরা শত সহস্র অত্যাচারেও রোম্যান ক্যাথলিক চার্চ বদলায় নি।

রোম্যান ক্যাথলিক গোঁড়ার সঙ্গে গোঁড়া প্রেসবিটেরিয়ানের মিল আমসত্ত্বের চাটনিতে রশুনের ফোড়নের মত ভয়ঙ্কর। বাল্যকালের সেই প্রীতির গোড়াপত্তনে বাবা অস্কারকে এমন ধমকে দেন যে, অস্কার অদ্ভুত আনন্দ পেত গোপনে দিদির সঙ্গে দেখা করতে লুকিয়ে লুকিয়ে প্লাম্‌, সেদ্ধ আলু বা একটুকরো চকোলেট ওকে দিতে। পয়সা বাঁচিয়ে ওকে রিবন কিনে দিতে, বা মেলার সময়ে একই সময়ে জিপ্‌সীদের চালান হবি হর্সে এক দোলায় চক্কর খেতে।

সাদাম্পটনের ব্যবসায়ী এসেছিল আলডার শটে ব্যবসা করতে। কাটা কাপড়ের ব্যবসা ওদের। মেয়েদের টুকিটাকি জিনিস্‌ আর কাটা কাপড় নিয়ে আলডার শট থেকে এ গাঁ ও গাঁ ঘুরে বেড়ান। কিন্তু অস্কার ছিল একেবারে কবি। গাড়ী নিয়ে মালপত্র বেচে ফিরতে ফিরতে ওর দেরী হ'ত অনেক; কিন্তু গুনলে দেখা যেত পয়সা বেশী আনেনি। অনেকগুলো জানোয়ারের বাচ্চা জুটিয়ে এনেছে। ছেলেবেলা থেকে পশু আর পাখী সংগ্রহ করাই অস্কারের রোগ। আর এই থেকেই দিদির সঙ্গে ওর ভাব। ওর বাবা সাদাম্পটনে ফিরে গেলেন "ফ্যাট্‌ আগলি প্রেসবিটেরিয়ান গার্ল"য়ের হাত থেকে অস্কারকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু অস্কারের বয়স যখন আঠারো, যখন ওর সামনে উইনচেষ্টারের গ্রাজুয়েশন চিক্‌চিক্‌ করছে, তখনও ও একটা ছোট্টো ক্যাপিবারা কিনে দিদিকে পাঠাতে ভোলেনি। ধীরে ধীরে রষ্টকোষ্টদের বার্ণে খাঁচার পর খাঁচা ভরে উঠতে লাগল।

অস্কারের গ্রাজুয়েশন শেষ হবার আগেই অস্কারের বাবা অস্কারকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করাতে চাইলেন যে,"ফ্যাট রষ্টকোষ্ট পার্ভাশন্‌"কে ও আর কোনদিন মনেও করবে না। অস্কারের সঙ্গে সেই তার বাপের বিভেদ হ'ল। অস্কার হারিয়ে গেল। অথচ প্রতি বছর র‍্যাস্কের মারফৎ একটি পার্শেল পেত দিদি। তাতে কোন না কোন পাখী বা পশু শাবক পেত দিদি। ফলে গাঁ ভরতি পাণিপ্রার্থী থাকা সত্ত্বেও দিদি বিয়ে করলেন না। তার বার্ণ বড় হতে থাকলেন। দিদির বিচিত্র পশুশালা বাড়তে লাগল। শেষে যখন একদিন এল ছোট্ট একটা হিপোর বাচ্চা, তখন রষ্টকোষ্ট নিজে আফ্রিকার কয়েকটি কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে।

রষ্টকোষ্টের বিজ্ঞাপনের জন্যই হোক্‌, যে কোন কারণেই হোক্‌ অস্কার ফিরে এসেছিল একদিন। তখন রষ্টকোষ্টের বাবা মা কেউ বেঁচে নেই। অস্কার সাদাম্পটনে যায়ই নি। সোজা এসে উঠেছে এল্‌সীর কাছে। এল্‌সী তখন থেকেই বুঝেছে অস্কারের মাথায় গোল বেধেছে। মানুষ ভালবাসে না। তার চেহারা রোগা হয়ে গিয়েছে, অদ্ভুত কালো হয়ে গিয়েছে। বয়স যেন কয়েক কুড়ি বছর এগিয়ে গিয়েছে। রষ্টকোষ্ট যখন লণ্ডন থেকে এসে এই ভগ্নস্তূপ চাক্ষুষ করল, আর কিছুর জন্য নয়, এল্‌সীর জন্য সে খুবই দুঃখ পেল, কিন্তু সে দুঃখ না জানিয়েও সে আর এল্‌সী দু'জনে মিলে অস্কারের সেই আশ্চর্য নেশাকে সমৃদ্ধ করে তোলার ব্রততে হাত লাগাল।

রষ্টকোষ্টের বাবা জমিজমা রেখে গিয়েছিলেন। কিছু কিছু বেচে দিয়ে অস্কারের জন্য পশুশালা হ'ল। পশুপাখী পোষা একমাত্র নেশা অস্কারের। তা থেকে রোজগার কিছু নেই, বরং কর্তৃপক্ষের দাবী মেটাতে নানা রকমের

খাঁচা, ঘর করতে হয়, নানা ট্যাক্স দিতে হয়। নানান্ ধরনের খাদ্য জোগাড় করতে হয়। রষ্টকোষ্ট ত বাইরে বাইরে থাকত; এল্‌সীকেই এই সব ভোগ পোয়াতে হ'ত। এল্‌সী সবই সহ্য করত। ক্রমশঃ এল্‌সীর এ সব ভালও লাগতে লাগল। অস্কারের নেশায় এল্‌সী যোগ দিল।

দুর্ঘটনাটি কি করে ঘটেছিল জানা নেই। অস্কারের অতি প্রিয় একটি জানোয়ার ছিল—অসিল্‌ট্। আমেরিকার পানামা থেকে নিয়ে আমাজোন পর্যন্ত বন ছাড়া অসিলট বড় কোথাও পাওয়া যায় না। বেশ বড় বন-বেড়ালের মত, গায়ে চিতার মত দাগ, দেখতে চমৎকার। খুব পোষ মানে। অসিল্‌টটা মাংস খেতে ভালবাসত। অস্কার নিজে বসে থেকে মাংস টুক্‌রা করে করে ওকে প্লেটে ছুঁড়ে দিত। ও বাড়ীতে লোকজন এলেও বসার ঘরে মেঝেয় কার্পেটে অসিল্‌ট্ বসে থাকত। অস্কার ওর গায়ে হাত বোলাত। ও গর্ গর্ করে গলায় শব্দ তুলে আদর জানাত। এদৃশ্য অনেকেই দেখেছে।

সাধারণতঃ এল্‌সী অস্কারকে একা বাড়ী রেখে যেত না। কিন্তু ক্লীট থেকে কিছু দূরে উইনচেষ্টারের পথে মস্ত একটা পশুমেলা হয় বছরে একবার। এল্‌সীর ভেড়ার পাল বড় বেশী বেড়েছে। ও কিছু ভেড়া বেচতে চায়। কয়েকটি ভাল পাখীও বেচবে। সাহস করে সব কাজটা গাঁয়ের লোককে না দিয়ে একটা বেলার জন্য ও চলে গেছে। দু'দিন আগে ভেড়ার দল নিয়ে ওদের গাঁয়ের লোকেরা চলে গেছে। ও মেলার দিন সকালে বাসে করে পৌঁছে যাবে মেলায়। তাই গেল। ফিরে এল বিকেলেই। চা খাবার সময়েরও আগে।

এসে দেখে অস্কার মাটিতে পড়ে। অসিল্‌টটা অস্কারের হাতখানা প্রায় খেয়ে ফেলেছে। সঙ্গে সঙ্গে দুরজা বন্ধ করে বাইরে এসে লোকজন ডেকে অসিলটটাকে মেরে ফেলে দেয় এল্‌সী নিজে।

তার পর থেকে বাইশ বছর কেটে গেছে। সে পশুশালা প্রায়ই নেই। তবু অস্কার যেন মন্ত্র দিয়ে বিবশ করে গেছে এল্‌সীকে। গাঁয়ে যত পশু-পাখীর রোগ হোক, আসে-পাশের গাঁয়েও যদি কোথাও কোন পশু-পাখীর রোগ হয়, এল্‌সীর ডাক পড়ে। এল্‌সী বলে, "অস্কার তার পাগলামী আমায় দিয়ে গেছে।"

পরদিন সকালে যখন বাসের ধারে এসে বাস থামিয়ে লণ্ডনের নাম করে যাত্রা করি, এল্‌সী পথ অবধি এগিয়ে দিয়ে গেল। সেই দীর্ঘ দেহে রোদ পড়েছে, চুল বাঁধা রুমালে। পরণে হাল্কা নীল গাউন। চোখে উদ্‌ভ্রান্ত একটা দৃষ্টি।

বললাম, "দিদি, তোমায় মনে থাকবে।"

এল্‌সী বললে, "জানি গল্প লিখবে। যদি লেখই, গল্প লিখ না। যেটুকু জেনে গেলে তাই লিখ।"

"অনেকটাই অজানা রয়ে গেল বুঝি?" আমি প্রায় ভাঙাকরা ভাষায় জিজ্ঞাসা করি।

"আমিই কি জানি ছাই যে, সব বলব। জানতে দিল কৈ। জানার বয়সটা ত জঙ্গলে জঙ্গলেই কাটাল। সবই ত অজানা। গল্পের ক্লাইমেক্সই ত অজানা। খালি কাঠামো নিয়ে কি গল্প হয়? লোকে বুঝবে কেন, অস্কার আমার কে ছিল।"

লোকে হয়ত সত্যিই বুঝবে না। কিন্তু আমি ঠিক যেমনটি দেখেছিলাম না বলে পারছি না। ইংলণ্ডের আশ্চর্য নয় এলসী-অস্কার। পৃথিবীটারও আশ্চর্য নয়। কেবল জীবনে এমন তহবিল তছরূপ হয়ে যায় আর তবু এলসীরা এমন হাসিখুশী দিয়ে জীবনকে স্বাগত জানায় এটা জানানো দরকার।

এর পর লণ্ডন বিদায়ের বাঁশী বাজিয়ে দিল। মধুমতী একটা পুরো দিন তার কাছে আমায় আটকে রাখল।

২৭

লণ্ডনে ফিরে আর কিছু যেন ভাল লাগছে না। দুপুরে আবার গেছি জিম রোপারের কাফেতে। জিম রোপারের আশায় বসে আছি। থেকে থেকে এলসীর মুখ, বাড়ীর ধারের পশুশালা, আর সেই অদ্ভুত কাহিনী মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বার্ণ-হাউসে সেই ভরা সকালটা, পথের ধারে মেষের পাল, কুকুরগুলো, আর বিলিতি রাখালের উদাসীন চেহারা। গ্রামাঞ্চলের শান্ত পরিবেশ সর্বত্র আছে; বিশেষ করে ভাল লেগেছিল এদের গ্রামের ধারে ধারে ইন্ আর পার্লার। পার্লারে খাবার পাওয়া যাবে, শোবার পাওয়া যাবে না। ইনে তারও ব্যবস্থা আছে, তবে সেটা ঘরোয়া ব্যবস্থা। মাঝে মাঝে হঠাৎ এমন এক একটা পথের বাঁকে পড়া যায় মনে হয় কারুর বাগানে ঢুকে পড়েছি এত ফুল।

সে-সব স্মৃতির কাছে লণ্ডনের জম-জমাট ব্যস্ততা যেন আর ভাল লাগছে না। সমস্ত দিন মধুমতীর সঙ্গে গল্প করে কাটিয়েছি; সন্ধ্যায় হেমরজনীকে নিয়ে সিনেমা দেখে এসেছি তিনজনাতেই। কিন্তু যেন আর একবার জিম রোপার বা রষ্টকোষ্টকে দরকার। দুপুরে ইণ্ডিয়া হাউসে

যেতেই হেমরজনী বলল যে, রষ্টকোষ্ট খোঁজ নিয়েছে। ওকে কাজে যেতে হয়েছে ডার্টমুর। তবে আমার যাবার দিনে ও ওয়াটার্লু টার্মিনাসে উপস্থিত থাকবে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখনও লণ্ডনে দু'দিন থাকার ইচ্ছে। ইচ্ছে কেন, থাকতেই হবে। পরের বৃহস্পতিবারে প্লেনে সীট পেয়েছি। এমনিতে আগেই চলে যেতাম। কিন্তু বি-ও-এ-সিতেই আমায় যেতে হবে। আমি নেমে নেমে দেখতে দেখতে যাব। ওতেই আমার সুবিধা। দু'টো দিন লণ্ডনে যেন কাটে না। লণ্ডন ত আর আমার সঙ্গে আড্ডা দেবে না। লোক নৈলে লণ্ডনও শ্মশান।

তাই জিম রোপারের খোঁজ। এর মধ্যে অবশ্য দু'চারটে ফালতু জিনিস দেখে এসেছি। গাইডবুক ত পকেটে আছেই। ফালতু সময় পেলেই ঘুরে এসেছি। বেকার স্ট্রীট ধরে মাদাম তুসোঁর বিচিত্র পুতুল-ঘর দেখে এসেছি। লণ্ডনে যারা নতুন এসেছে দেখবে বলে তাদের বুদ্ধু বানাবার এ একটি গ্রাম-যন্ত্র।

পুরীর স্বর্গদ্বারের পথে একটা সাইনবোর্ড দেখি "নরক-দর্শন"। ভাবলাম ওর পরেই ত সশরীরে পাত্র পাত্র পীযূষ-পান আর পারিজাতের কুঁড়ি বাটনহোলে গুঁজে কল্পতরুর ডাঁশা ফল চিবুতে পারা যাবে। দৈবাৎ যদি ঘৃতাচী বা মিশ্রকেশীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তাও নেহাৎ অসঙ্গ হবে না। এক আনা দক্ষিণা দিয়ে ঢুকে পড়ি। গিয়ে দেখি কুমোরটুলীর পেছনদিকের খোলার বাড়ীর গায়ে গোবরের গাদা আর ঘুঁটের বাহারের মধ্যে বিরাজমান নানা ভঙ্গীর দেব-দৈত্যদের হাড় বার-করা চেহারাগুলোর অবিমিশ্র একটা প্রদর্শনী। যমের পরণে ওয়াছেল মোল্লার শার্ট, চিত্রগুপ্তের দাড়ির মধ্যে মাকড়সা জাল বুনছে; গো-হত্যাকারীর জিভ যে সাঁড়াশী দিয়ে টানা হচ্ছে তার একটা দাঁত নেই; যে কড়াইতে কুলটা নারীকে চড়ানো হয়েছে তার গায়ে লেবেল আঁটা "পল্ ব্রাদার্স" "গৃহলক্ষ্মী কড়াই", একটা নরক-ফেরৎ বুড়ো এক তাল কাদা নিয়ে যমের মোষের ভাঙ্গা-শিং জোড়া দিচ্ছে, একটা দৈত্যের ল্যাজ থেকে খড়ের পাকানো দড়ি বেরিয়ে পড়েছে, চড়ুই পাখী তা থেকে খড় বার করে নিয়ে যাচ্ছে, মিথ্যে কথা বলার পাপে যে ভদ্রলোককে শূলে চড়ানো হচ্ছে, তার চশমাটা বেঁধে দিচ্ছেন একটি বৃদ্ধা মহিলা, বলছেন—"ও কারিগর, যমের মোষের শিং নিয়েই চোপর দিন কাটালে, আর এ মেয়েটার ফাটা বুকটা জোড়া দেবে কখন?" চেয়ে দেখি বেশ্যা মেয়েদের মধ্যে একজনার স্তনটা খসে পড়ে গেছে। তার ভেতরের গর্তে পাখীতে বাসা করার চেষ্টা করছে।

আর মাদাম তুসোঁও সেই বস্তু। কাদা নয়, ওয়াকস্-মোম, আর পুতুলগুলোর কারিগরি প্রায় নিখুঁত। ভগবান থেকে ধনবান পর্যন্ত যেমন একদিকে, রাজা-রাজড়া থেকে ডাকাত-খুনে তেমনি অন্যদিকে। নেপোলিয়ন, হিটলার, ব্রাডম্যান্, পণ্ডিত নেহরু, ফ্লরেন্স নাইটিংগেল, শেকস্পীয়র, চার্চিল আর কুইন ভিক্টোরিয়া সকলেই আছে, পোশাকে-আশাকে একেবারে নিখুঁত। এর মধ্যেও পলিটিক্স আছে। মিউনিক প্যাক্টের সময়ে হিটলার আর মুসোলিনী ছিল ওপর তলায়, বাকিংহাম প্যালেসের কাছাকাছি। এখন তারা নীচের তলায় "হরার চেম্বার"-এ আছে দুনিয়ার প্রখ্যাত খুনেদের সঙ্গে একসঙ্গে। বিশ্রী লেগেছিল লণ্ডনের মত সভ্য জায়গায় এই পুতুল নিয়ে খেলা, আর তার পেছনে বিলিতি অহঙ্কারের উলঙ্গ আরতি। নেহরুকে চেহারায় পোশাকে আশাকে নেহরুকে যে জীব করে রাখা হয়েছে, গান্ধীর গায়ে এত গাঢ় আলকাতরা মাখিয়ে এমন বিচিত্র ভাবে "নেকেড ফকির" করা হয়েছে, দেখে মনে হয় এদের শাদামীর না আছে রুচি, না লজ্জা-সরম। আশ্চর্য ইণ্ডিয়া হাউসের কর্তা-গিন্নীরা এ দুটি পুতুল সরিয়ে নিতে বলেন না। যারা পুতুল পূজো করে না তাদের পুতুলের মন্দির দেখে বড়ই চটে গিয়েছিলাম।

পরদিন আর বার হইনি। সকালে রষ্টকোষ্ট আর রোপারের টেলিফোন পেয়েছি। মধুমতী লাউয়ের ঘণ্ট আর কপির ডালনা করেছে। হেমরজনী আফিস যায়নি, সারা সকাল লণ্ডনের গল্পই করেছি।

"ক'দিনই বা রইলে, কেবল ঘুরলে", বলে মধুমতা। "ভাল লেগেছে লণ্ডন?"

"খুব ভাল লাগল। ক'দিনের মধ্যে আলাপ হ'ল অনেকের সঙ্গে।"

ওয়াটার্লু যেতে হবে চারটেয়। রোপার এসে গেছে ঠিক সময়ে। গাড়ীতে এয়ার টার্মিনালে রষ্টকোষ্ট আর বাওয়ার্স।

রষ্টকোষ্ট অনেকগুলো সাদা গোলাপ এনেছে। বাওয়ার্স দু'টো চকোলেট এনেছে।

আমার সঙ্গে জিনিসপত্র কিছুই বাড়েনি। তবু ওজন করে বলে বেশী, ভারী ফ্যাসাদে পড়লাম। বললাম, "বরাবরই এই ওজনে এলাম বেশী কেন?"

রষ্টকোষ্ট কি যেন বলল। ওরাও ছেড়ে দিল। আমি দেখছি হেমরজনী কার সঙ্গে দারুণ গল্প জমিয়েছে।

এয়ার পোর্টে বা এয়ার টার্মিনালে আলাপ পরিচয় হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

হঠাৎ দেখি মাথায় মস্ত সাদা পাগড়ী, গায়ে সাদা মেরজাই ধুতীবাঁধা এক দিব্যকান্তি বামটীর বুড়ো। মিথিলা বা মথুরায় না হয়ে লণ্ডনে, এই যা। গায়ে একটা এণ্ডীর চাদর বগলের তলা দিয়ে এনে কাঁধে জড়ান।

হেমরজনী এনে বললে,—"নাও, ইনিও ত্রিনিদাদের যাত্রী, ত্রিনিদাদেই বাড়ী।"

"দিব্যি হিন্দী বলছেন ত? ত্রিনিদাদেই বাড়ী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি করা হয়?"

"লোক ঠকাই। রাম নাম করি আর ফুর্তি করি। দেশ ঘুরে এলাম, ভালই হ'ল আপনাকে পেলাম। পথে না মাছ-মাংস খাইয়ে দেয়।"

দেখতে দেখতে হেমরজনী আরেকজন ধরে আনে। "এই নাও আরেকজন। রেভারেণ্ড মোতিলাল। কানার লোক। মিশন থেকে যাচ্ছেন ত্রিনিদাদ, ব্রিটিশ গায়ানা।"

যেন মাছ ধরছে টপ্ টপ্ করে হেমরজনী!

ওদের সঙ্গে প্লেনে গল্পো বলব। এখন রষ্টকোষ্ট, রোপার আর বাওয়ার্সের সঙ্গে কথা বলি।

দেখি বাওয়ার্স নেই।

রোপার বলে, "ও ত চকোলেট দিয়েই চলে গেছে। একটু দেরী করে নি। ওর কথা ভেব না। এবার যখন লণ্ডনে আসবে মদ খাওয়া শিখে এস। তা নৈলে বাওয়ার্সকে বেশীক্ষণ পাবে না।"

রষ্টকোষ্টও হেসে ওঠে।

হঠাৎ বি.ও.এ.সির পোশাক-পরা একটি ভদ্রলোক এসে বলে "দেখুন ত পার্সটা কি আপনার?"

সর্বনাশ! ওজন নিয়ে ঝামেলা যখন চলছিল তখনই পার্স টা ফেলে এসেছিলাম।

"অনেকক্ষণ থেকে খুঁজছি। আপনার ফোটোটা পার্সে ছিল তাই রক্ষা।"

খুশী হয়ে কিছু দিতে চাইলাম। নিল না। যখন বাস ছাড়ল এরোড্রোমে যাবে, তখন হেমরজনী বুকে জড়িয়ে ধরল। মধুমতী শুধু চেয়ে রইল—চোখে জল ভরে।

রষ্টকোষ্ট বলল—"দেখা হলে চিনব, দেখা না হলে চিঠি দেব না। দিদিকে নিয়ে ভারতবর্ষে যাব। তখন তোমায় দরকার হবে।"

এবারে চলি আরও পশ্চিমে। লণ্ডন আর নেই, লণ্ডনের শহরতলীও ঝাপসা হয়ে এল।

ক্রমশঃ

একটুর অভাবে

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

ট্রাঙ্ক নয়, সুটকেস নয়, স্রেফ পুঁটলী।

এই পুঁটলী নিয়েই সেই পাঠানকোট থেকে কলকাতায় এসেছেন বিধুমাসী। এসেছেন ছেলের বাসা থেকে বোনপোর বাসায়। চ'লে এসেছেন একলাই। অনেক দিন কলকাতার আত্মীয়দের দেখেন নি, তাই একবার আসতে 'মন হয়েছে'। অন্ততঃ চিঠিতে সেই কথাই জানিয়েছিলেন বিধুমাসী।

সুকুমার ওঁর আপন বোনপো নয়, খুড়তুতো বোনপো, তা হোক জগতে কে আপন, কে পর? যে যাকে ভালবাসে সেই আপন, যে যাকে ভালবাসে না, গ্রাহ্য করে না, সেই পর। বিধুমাসী চিরটাকাল খুড়তুতো দাদাদের বাড়ী কাটালেন কী সুবাদে? ওই ভালবাসা। খুড়ো-খুড়ী অসহায় বিধবা মেয়েটাকে ভালবেসে বাড়ীতে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ব'লেই না?

ছেলেবেলায় সুকুমার বেশীর ভাগ সময় মামার বাড়ী থাকতে ভালবাসত, আর সেই থাকার সূত্রেই বিধুমাসীর ভারী ন্যাওটা ছিল সে। তাঁর কাছে নাইবে, তাঁর কাছে খাবে, তাঁর কাছে গল্প শুনে ঘুমোবে।

'নাও, এখন সেই ধার শোধ করো।'

চাপা চাপা ব্যঙ্গস্বরে বলল স্বপ্না, 'ওনাকে খাওয়াও, নাখাও, থাকতে দাও।'

'আহা উনি কি থাকতে এসেছেন?' সুকুমার বলে, 'দু'চারদিন বৈ ত না?'

'ওই আনন্দেই থাকো। আমি তোমায় ব'লে রাখছি, উনি এখন সহজে নড়বেন না। এখন ওঁর অবস্থা ফিরেছে, ছেলে কম্বলের ব্যবসা ক'রে 'লাল' হয়েছে, এসব গুজবে তুমি বিশ্বাস করতে পারো, আমি করি নি।'

কথাটা সত্যি, সুকুমারের মামাতো ভাইরা এসব গল্প তুললে সুকুমার সহজেই বিশ্বাস করেছিল, স্বপ্না করে নি। বলেছিল, 'দেখে এসেছেন কেউ পাঠানকোটে গিয়ে?'

তা' অবশ্য কেউই দেখে আসে নি।

'যত রটে তত বটে নয়। ও কথা বিশ্বাস করতে নেই।' বলেছিল স্বপ্না।

আজও সেই কথাই বলে। 'শোনা কথা বিশ্বাস করতে নেই। দেখ তার প্রমাণ। অবস্থা ফিরলে কেউ ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলী সম্বল ক'রে হাজার মাইল পথ পাড়ি দেয়? আর কোথাও এসে দুদিন থাকতে চাইলে এত নরম হয়ে চিঠি লেখে? চিঠি দেখেই আমি বলেছিলাম—'

স্বপ্নার এ কথাটাও ঠিক। সুকুমারের তখনই ভেবে দেখা উচিত ছিল, অবস্থা ফিরলে কে কবে নরম থাকে? কি দায় নরম থাকবার?

নাঃ, সত্যিই বোকামী হয়ে গেছে।

শুনলেই হ'ত তখন স্বপ্নার পরামর্শ। চিঠির মুসাবিদা পর্য্যন্ত ক'রে দিয়েছিল স্বপ্না, 'ঝিয়ের অসুখ, চাকর ছেড়ে গেছে, ঠাকুর দেশে যাব যাব করছে, তা ছাড়া স্বপ্নার শরীর খুব খারাপ, এমন অবস্থায় বিধুমাসীকে যথোপযুক্ত আদরযত্ন করা সম্ভব হবে না। আর না পারলে আক্ষেপের শেষ থাকবে না সুকুমারের পক্ষে। অতএব বিধুমাসী আসাটা আপাততঃ স্থগিত রাখুন, এ দিকটা সামলে নিজেই নেমন্তন্ন ক'রে চিঠি লিখবে সুকুমার।

কিন্তু চিঠিটা নিজের হাতে লিখতে কেমন বাধল সুকুমারের। কথাগুলো বড্ড ডাহা মিথ্যে যে! এখন ভেবে দেখা যাচ্ছে, সংসার করতে গেলে অত বিবেকের মুখ চাওয়া চলে না।

ওই ময়লা-পুঁটলীর অধিকারিণী এখন কতদিন চেপে ব'সে থাকবেন কে জানে? এই ফিটফাট ছিমছাম্ সাজানো গোছানো বাড়ী সুকুমারের, এখানে বিধুমাসীদের মত মানুষের উপস্থিতি যেন ছন্দপতন। হয়তো চোখের সামনে কোথায় না কোথায় একখানা ময়লা গামছা শুকোতে দিয়ে বসবেন, হয়তো পান খেয়ে হাতের চুণ পালিশ-করা দরজার পিঠেই মুছে রাখবেন, হয়তো বা আরও কিছু কিম্ভূত করবেন। তা ছাড়া—সুকুমার নয়, স্বপ্না ভাবে সেটা—'সেকেলে মানুষ, খাওয়া-দাওয়া অবশ্যই বেশ ইয়ে, আর বিধবা মানুষকে রাত্রে লুচি না হোক পরোটাও দিতে হবে এক গোছা! তা ছাড়া দশমী দ্বাদশী আছে, বার ব্রত আছে।'

যত রকম অসুবিধে হবে বিধুমাসীর অবস্থানকালে, তার সমস্তই ভেবে নেয়—স্বপ্না, বিধুমাসী এসে দাঁড়ানর

সঙ্গে সঙ্গেই ভেবে নেয়। সর্ব্বোপরি হচ্ছে শোভনতার প্রশ্ন। স্বপ্নার কত বান্ধবী আসে, তাদের সামনে তো একবস্ত্রে ঘুরে বেড়াবেন বিধুমাসী—ওই মোটাসোটা কালোকোলো দেহখানি নিয়ে? বারণ করতে তো পারা যাবে না। কে জানে, হয়তো পাঁচজনের সামনেই নিতান্ত অন্তরঙ্গতায় স্বপ্নাকে 'বৌমা' 'বৌমা' ক'রে আপ্যায়িত করবেন, গ্রাম্য গ্রাম্য ভাষায় ওদের সঙ্গেই গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে আসবেন। বুড়ীদের তো কোন হুঁশপর্ব্ব থাকে না।

অথচ এ সবের কিছুই হ'ত না, যদি সুকুমার একটু চক্ষুলজ্জার মায়া ত্যাগ করত!

'কি আর করা!' সুকুমার বলে, 'এসে পড়েছেন যখন! এখন ওঁর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা কর।'

স্বপ্না মুচকে হাসে।

বিধুমাসী পোঁটলা-পুঁটলী নামিয়ে চান করতে গেছেন, এই সময় কথাবার্ত্তা কয়ে নেওয়াই ভাল।

'চান ক'রে এসে একটু শরবৎ-টরবৎ ত খাবেন?'

অপ্রতিভ ভাবে প্রশ্ন করে সুকুমার, 'নয় তো জিগ্যেস ক'রে দেখ ছেলের বাসায় পাঠান-মুলুকে গিয়ে চা-টা খাওয়া অভ্যাস হয়েছে কি না।'

স্বপ্না আবার মুচকে হেসে বলে, 'ভাবছ কেন, সবই জিগ্যেস করব। ছেলের বাসায় থেকে রাবড়ী আর রাজভোগ দিয়ে জল খাওয়া অভ্যাস হয়েছে কিনা, শরবৎটা শুধু মিশ্রীরই চলবে না বাদাম পেস্তার চাই?'

'তাই কি বলছি আমি! হাল যা দেখছি, তাতে বিশ্বাস হচ্ছে না, অমলটা বিশেষ কিছু আয় উন্নতি করেছে।'

'সেই কথাই বলছি। থেকে ত যাবেন বেশ কিছু দিন বোঝাই যাচ্ছে, গোড়া থেকেই সাদামাঠা চাল দেখান ভাল, এখন আদর দেখাতে গেলে সমানে খরচ টানতে পারবে না।'

'যা বোঝ।' ব'লে চলে যায় সুকুমার।

মামার বাড়ীতে বিধুমাসীর পোস্ট্‌টা ঝিয়েদের থেকে খুব বেশী উঁচু ছিল না। একা তিনজনের খাটুনী খাটতেন তিনি। খুড়ো-খুড়ী জায়গা দিয়েছিলেন, সম্মান দিয়ে ছিলেন, খুড়তুতো ভাইরা জায়গাটা কেড়ে নেয় নি, তবে সম্মানটা আর দিয়ে উঠতে পারে নি। যাক গে, ও তো চিরাচরিত ঘটনা। চন্দ্র-সূর্য্যের মত স্বাভাবিক। আশ্রিতা আশ্রিতাই।

এখন সুকুমারের আশ্রয়টাকে বিধুমাসীর বেশী ভাল লেগে না গেলেই হ'ল।

সাংসারিক জ্ঞান স্বপ্নারই বেশী, ঠিকই বলেছে সে, বেশী আদরযত্ন দেখানটা সঙ্গত নয়, পেয়ে বসবেন।

স্নান ক'রে এসে এক পাথরবাটি চা আর দুটো দানাদার সহযোগে জল খেয়ে পা ছড়িয়ে ব'সে কথাটা পাড়লেন বিধুমাসী, 'তোমার না একটি বিয়ের যুগ্যি বোন ছিল বৌমা?'

স্বপ্না এ প্রশ্নের কারণ না বুঝতে পেরে ভুরু কুঁচকে বলে, 'ছিল ত। কেন কি হয়েছে?'

'হয় নি কিছু',—বিধুমাসী সহাস্যে বলেন, 'বিয়ে হয়ে যায় নি ত?'

'না।'

'তা বেশ!' হৃষ্ট স্বরে বলেন বিধুমাসী, 'দেখতে কেমন?'

'আমার থেকে ফর্সা। কিন্তু জানতে চাইছেন কেন?'

'আর কেন!' বিধুমাসী আবার হেসে ওঠেন, 'চোরের মন ভাঙা বেড়ায়। ছেলের ত মেঘে মেঘে বেলা গেল মন্দ নয়, এবার তাকে ঘরবাসী করবার জন্যে মন অস্থির হয়ে উঠেছে। এইবার তবে খুলে বলি বৌমা, ঐ জন্যেই আমার আসা। সেই পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে ত আর কনে জুটবে না। তা একটি সম্বন্ধ আমি ওখানে থেকেই পেয়ে এসেছি, মেয়ের বোন ভগ্নীপতি থাকে ওখানে, তারাই ঠিকানা দিয়েছে, চিঠিতে কথাবার্ত্তা কয়েছে, সে মেয়ে দেখব; তবে তোমার বোনটিকেও একবার দেখবার ইচ্ছে—'

স্বপ্না স্তম্ভিত হয়ে তাকায়। কি সীমাহীন বোকামী! ধৃষ্টতা আর দুঃসাহসের বহর বটে একখানা! তবু 'বার্স্ট্' করে না সে, ভেবে নেয় দুঃসাহসের জন্মদাতাই ত বোধহীনতা। এঁর কাছে আর কি আশা করা যায়? তাই মুচকে হেসে বলে, 'আপনা-আপনির মধ্যে বিয়ে হওয়া কি ভাল?'

'আহা, এক ঘরে দুই কুটুম ত হচ্ছে না, আমার সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক তোমাদের যাই হোক, 'দেশ্‌তা' ত লতায় পাতায় সম্বন্ধ, ওতে দোষ নেই।'

স্বপ্না পূর্ব্বস্বরেই বলে, 'না, দোষ আর কি? তা কি যেন পাশ অমল ঠাকুরপো?'

'পাশ! পাশ আর বাছা করতে পেল কই বৌমা? সেই যা একটা পাশ। তার পর ঘরে ব'সে কত পড়া পড়ল, কিন্তু একজামিনের জমা দেবার টাকা ত জোগাড় হ'ল না। সেই আক্ষেপে দেশ-ভুঁই ছেড়ে—'

আর সহ্য করা শক্ত।

স্বপ্না বলে, 'যে মেয়ের সন্ধান পেয়ে এসেছেন সেখানেই দেখুন মাসীমা। আমার বোনের এক সৃষ্টিছাড়া গোঁ, সে বলে 'লোকের কাছে বড় মুখ ক'রে বলতে পারা যাবে এমন বর না হলে আবার বিয়ে!' নিজে এম. এ. পাশ ত?'

বিধুমাসীর বুঝি নির্ব্বুদ্ধিতার পার নেই, তাই নিতান্ত সহজে বলেন, 'তা ও মেয়েও শুনেছি অনেক সব পাশটাশ করা।'

'বোধ করি এপাশ ওপাশ' অস্ফুটে এই মন্তব্যটুকু ক'রে সুকুমারকে স্বপ্না জানাতে যায় তার বিধুমাসীর চাঁদ চাওয়া সাধের পরিমাণ।

স্বপ্নার বোনের সঙ্গে ওঁর ম্যাট্রিক পাশ ছেলের বিয়ের স্বপ্ন দেখছেন উনি! আশ্চর্য্য, মানুষ কেনই এত বোকা হয়!

'রাত্রে আপনি কি খান মাসীমা?'

অমায়িক প্রশ্ন করে স্বপ্না, 'মুড়ি না শুধু দুধ মিষ্টি?'

'খাওয়ার আবার ঠিকঠাক! তুমিও যেমন বৌমা! জন্মভোর ত পরের সংসারে কেটেছে, এখনই না হয় নিজের সংসার। যা তোমার সুবিধে হবে দিও।'

'সুবিধে-অসুবিধে কিছু নয়, তবে কি না আমাদের ত মাছ-মাংসর হেঁসেল, দু'বেলা যদি ঠাকুরের ঘাড়ে আবার ওই আলাদার হাঙ্গামা চাপানো হয়, ঠিক পালাবে।'

'সর্ব্বনাশ!' বিধুমাসী—হাঁ হাঁ ক'রে ওঠেন, 'কিছু দরকার নেই। ওই মুড়ি-টুড়িই—'

মুড়ির বরাদ্দই বাহাল হয়। সুকুমারকে গিয়ে জানায় স্বপ্না, বলছেন, 'মুড়ি খাবেন।' সংসারী মানুষ স্বপ্না, এটুকুতে তার বিবেকে বাধে না।

বোধ-বুদ্ধিহীন মানুষটা পরদিন আর এক কথা পাড়েন, 'তুমিও চল না বৌমা।'

'আমি, কোথায়?'

'ওই মেয়েটাকে দেখতে। যতই হোক আমরা হলাম বুড়োহাবড়া, তোমাদের হ'ল গিয়ে আধুনিক চোখ।'

নাঃ, অসহ্য। সত্যিই অসহ্য। নির্ব্বুদ্ধিতার সীমা থাকবে না মানুষের? কতই আর ক্ষমা করা যায় অবোধ ব'লে, নির্ব্বোধ ব'লে? তাই ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব'লে ওঠে স্বপ্না, 'যখন তখন যেখানে সেখানে যাওয়া আমার অভ্যাস নেই মাসীমা।'

বিধুমাসীমা থতমত খেয়ে বলেন, 'তবে থাক্, তবে থাক্। জায়গা কেমন তা' ত জানি না, তবে সুকু বলছিল, যা ঠিকানা সে নাকি রাজ-অট্টালিকা। নামকরা লোকের বাড়ী।'

সুকুমারের কাছে গিয়ে ছুরির ধারে-ধারালো হাসিতে ফেটে পড়ে স্বপ্না। 'কি গো, শুনলাম নাকি রাজ-অট্টালিকায় ভাইয়ের কনে দেখতে যাচ্ছ?'

সুকুমার মাথা নেড়ে বলে, 'ঠিকানাটা' তাই বটে। বিরাট্ বাড়ী, কর্ত্তা অ্যাডভোকেট, তবে মেয়ে কার তা' জানি না। উনিও বলতে পারলেন না। চিরদিনের অবোধ তো?'

'তবু তারও একটা লিমিট থাকে। আমাকে বলছিলেন, মেয়ে দেখতে যেতে।'

'তা গেলে আর কি হয়েছে?'

'কি বললে?' স্বপ্না ঠিকরে ওঠে, 'তুমি নইলে আর এমন কথা বলবে কে? ওই মাসীরই বোনপো তো! মেয়ে খুব সম্ভব উকিল সাহেবের রাঁধুনীর, অথবা গলায় পড়া উদ্বাস্তু আত্মীয়ের!'

'তা জানি না।'

'ওটুকু জানবার জন্যে খুব বেশী বুদ্ধি খরচ করতে হয় না।' যাক, দয়া ক'রে আর আমায় অনুরোধ করতে এসো না।'

না, এর পর আর অনুরোধ করবার সাহস হয় না সুকুমারের, মাসীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু মাসী-বোনপো যখন ফেরেন তখন দু'জনের মুখে কেন দু'রঙের খেলা?

মাসীর কালো রং। মুখ খুশীর আভায় উজ্জ্বল, বোনপোর গৌর মুখ যেন কি এক আঘাতে কালো।

সুকুমার কিছু বলার আগেই বিধুমাসী উচ্ছ্বসিত আনন্দে ফেটে পড়েন, 'দেখে এলাম বৌমা, খাসা মেয়ে। গানও গাইল খাসা। বাপ-মা-ও বেশ, কোনও দেমাক্-অহঙ্কার নেই।'

স্বপ্না অমায়িক অমায়িক মুখে বলে, 'দেমাক্-অহঙ্কার করবার মতন খুব বুঝি বড়লোক?'

বিধুমাসী সহাস্যে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'সে-সব কথা সুকুই বলতে পারবে। বাড়ী তো ঝক্‌মকাচ্ছে। দোরে দারোয়ান, দু'খানা গাড়ী।'

স্বপ্না চোখে ভুরুতে বিশেষ একটা ভঙ্গি ক'রে সুকুমারের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মেয়ে কার?'

'কর্ত্তারই।' গম্ভীর ভাবে বলে সুকুমার।

কর্ত্তারই!

· ভুরু দুটো আর কত কোঁচকাবে স্বপ্না।

'তাই নাকি?'

'হুঁ।'

'বোধ করি কোন রকম ডিফেকটিভ?'

'না। মোটেই না। বি-এ অনার্স, এম-এর জন্যে তৈরি হচ্ছে।'

'ব্যাপারটা কি?'

'দেখতেই পাবে। টাকায় সবই হয়।'

বিধুমাসী এই মৃদু কথোপকথন বোঝেন না, আপন আনন্দে ব'লে চলেন, 'অমলের সঙ্গে আমি কথা কয়ে এসেছি, মেয়ে পছন্দ হ'লে একেবারে পাকা-দেখা সেরে যাব। আশীর্ব্বাদী গহনা তোরা দেখে শুনে কিনে দে তবে বাবা। এতে আর বৌমা 'না' করা চলবে না তোমার, তা বলে দিচ্ছি। বুড়ীর পছন্দে কাজ হবে না।' জড়োয়া সেট নাকি তাই, তা না হয়—'

স্বপ্না ওই আনন্দোদ্ভাসিত নীরেট মুখটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, 'গহনার টাকা কি আপনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন নাকি?'

বিধুমাসী পা দু'টো ছড়িয়ে ব'সে পরম সন্তোষে সেই পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন, 'তা না ত কি? এনেছি তিন-চার হাজার টাকা। নইলে আর ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলী বেঁধে পুঁটলীবুড়ী হয়ে আসি? দেখে চোর-ডাকাতে সন্দ করতে পারবে না সঙ্গে কিছু আছে। সুটকেস তোরঙ্গ দেখলে বুড়ীকে ফাঁসিয়ে নিয়ে ভাগতে কতক্ষণ? অমন ক'রে একলা কি আসতে দেয় অমল? বলে, 'সঙ্গে লোক দিই, ফাস্‌টো কেলাশে যাও।' আমি এক ধমকে চুপ ক'রে দিইছি, 'থাম তুই। বলে জন্ম গেল ছেলে ধ'রে, আজ বলছে ডান! তুই লাখোপতি হয়েছিস, তুই ফ্যাসান করগে যা, আমি যা ছিলাম তাই আছি। কি বলিস রে সুকু, ঠিক বলি নি?' হা হা ক'রে হেসে উঠে বক্তব্যের উপসংহার করেন বিধুমাসী, 'শুনিয়ে দিলাম ছোঁড়াকে, সুকু আমার তার সেই গরীব বিধুমাসীকেই চেনে, তাকেই প্রাণতুল্য দেখেছে চিরটাকাল। তা ছোঁড়া শাসিয়ে রেখেছে, তিনটি দিনের ছুটি, তার বেশী থাকতে পাবে না কলকাতায়। একলা থাকতে পারে না, বুঝলে বৌমা, তাতেই ত বিয়ে বিয়ে ক'রে ক্ষেপেছি।'

তার পর?

তার পরের ঘটনা একেবারে অভাবিত।

বিধুমাসীকে থতমত আর সুকুমারকে সচকিত ক'রে দিয়ে স্বপ্না আবদার জড়ানো স্বরে ব'লে ওঠে, 'তিনদিনের ছুটি বললে ত চলবে না মাসীমা। আমার বোনটিকে না দেখিয়ে ছাড়ব নাকি?'

বিধুমাসী হতভম্ব ভাবে বলেন, 'তোমার বোন। তোমার বোন যে সেই কি সব—'

'রেখে দিন ওসব কথা—' সমস্ত বাধা নস্যাৎ ক'রে দিয়ে বলে স্বপ্না, 'ছেলে-মেয়েরা ত বলে অমন কত কি, সেই কথা আর মানলে চলে না।'

কিন্তু স্বপ্নার ওই হাস্যোজ্জ্বল কথাটিকেও নস্যাৎ করবার লোক আছে। সে তার গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর ক'রে বলে, 'আর দেখাদেখির প্রশ্ন নেই। এখানে কথা দেওয়া হয়ে গেছে। কাল পাকা দেখা!'

'কাল পাকা দেখা!'

'হ্যাঁ, কাল রাত্তিরের গাড়ীতেই ফিরতে হবে যে বিধুমাসীকে।'

হ্যাঁ, পরদিন রাত্তিরের গাড়ীতেই ফিরলেন বিধুমাসী। স্টেশনে তুলে দিতে এল স্বপ্না সুকুমার। যাত্রাকালে স্বপ্নার হাত ধ'রে চোখের জল মুছলেন বিধুমাসী। 'দু'টো দিন বড় আনন্দে কাটল মা। ছেড়ে যেতে আর ইচ্ছে হচ্ছে না। যাই হোক এই পই পই ক'রে বলে যাচ্ছি, অমলের বিয়েতে যেতে হবে। তোমরা গিয়ে না দাঁড়ালে বিয়েবাড়ীই মিথ্যে। বিয়ের দিন স্থির হলেই ভাড়ার টাকা পাঠিয়ে দেব। উঁহু- নেব না বললে শুনব না, এ এ হ'ল গে বিয়ের খরচ। আর দেখ বৌমা', বিধুমাসী আঁচলের তলা থেকে একটা জিনিস বার ক'রে বলেন, 'সাহস ক'রে বলতে পারি নি কাল থেকে, আজ গাড়ীতে ওঠবার সময় বলি, কথা এড়াতে পারবে না। অমলের বৌয়ের পাকা-দেখার গহনা কিনতে গিয়ে বড্ড পছন্দ হ'ল, এইটি আমি তোমার জন্যে কিনে ফেলেছি, পরতে হবে।'

এক ছড়া ভারী-সারী সোনার হার নিয়ে স্বপ্নার গলায় পরিয়ে দেন বিধুমাসী।

'এ কি মাসীমা, এ আমি—না, না।'

'না' করতে পাবে না বৌমা, আগেই বলেছি,' বিধুমাসী সজল চোখে বলেন, 'বিয়ের সময় সুকুর বৌয়ের মুখ দেখেছি আমি একটা টিনের সিঁদুর কৌটো দিয়ে, এ দুঃখু কি ম'লেও যাবে? তা সিঁদুর তোমার অক্ষয় হোক মা, এটুকুও নিতে হবে।'

ট্রেন ছেড়ে দিতেই স্বপ্না রোষকশায়িত লোচনে ব'লে ওঠে,'খুকুর সঙ্গে অমল ঠাকুরপোর বিয়েটায় তুমিই বাগড়া

দিলে! বেশী ধরাধরি করলে 'না' করতে পারতেন না উনি।'

সুকুমার শুধু একবার চোখ তুলে তাকাল।

প্লাটফর্মটা পার হতে হতে স্বপ্না আবার ব'লে ওঠে, 'অমল ঠাকুরপোর বিয়েতে ভালমত একটা কিছু দিতে হবে।'

সুকুমার আর একবার তাকাল।

'কি! খালি খালি অমন তাকাচ্ছ মানে?' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে স্বপ্না, 'এমন ভাব করছ যেন আমি কি এক চুরির আসামী। এটি করলেন ত উনিই। সঙ্গে ওই একটা পুঁটলী-ফুটলী না এনে সুটকেস বাক্স আনলে ত এমনটা হ'ত না।'

সুকুমারের আগে আগেই পা চালিয়ে এগিয়ে যায় স্বপ্না, রাগে গম্‌গম্‌ করতে করতে।

শুধুই কি সুকুমারের ওপর রাগ?

রাগ নিজের ওপর নয়? নয় ভাগ্যের ওপর?

অনবরতই যে চোখের সামনে ছায়া ফেলছে পাথর বাটিতে চারটি মুড়ির ওপর শুকনো একখানি চম্‌চম্‌।··· ছায়া ফেলছে একখানা আলো-ঝল্‌সানো জড়োয়া নেক্‌লেস!

—০—

মৃত্যুঞ্জয়ী দীনেশ মজুমদার

শ্রীকমলা দাশগুপ্ত

১৯২৮ সন। রামমোহন রায় রোডের একটি তিনতলা বাড়ীর ছাদে লাঠিখেলা শেখাচ্ছেন দীনেশ মজুমদার। শরীর তাঁর খেলোয়াড়ের মতই বলিষ্ঠ। লাঠি ঘোরানর মধ্য দিয়েই তাঁর মনের ভাষা প্রকাশ পাচ্ছিল, ভাষা ফুটে উঠেছিল তাঁর বড় বড় দু'টো চোখে। মুখে তিনি নিজে থেকে কাউকে কিছু বলছেন না।

সেদিন কিন্তু এই গম্ভীর মানুষটিকে শুধু মাষ্টারমশাই রূপেই দেখেছিলাম। আমরা ছাত্রীসংঘের কর্মীরা অপটু হাতে তাঁর লাঠির প্যাঁচ শিখতে গিয়ে শতবার শত ভুল ক'রে হেসে মরেছি, হাত.ব্যথা হয়ে গেছে, ধৈর্য হারিয়েছি। তিনি কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্রই নন—তাঁর হাতে ছিল অফুরান শক্তি এবং ভঙ্গিতে ছিল শিক্ষকের দৃঢ়তা।

১৯০৭ সনের মে মাসে (বাংলা ১৩১৪, ৫ই জ্যৈষ্ঠ) দীনেশ মজুমদার জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাটে তাঁদের পৈতৃক বসতবাটিতে। পিতা পূর্ণচন্দ্র মজুমদার, মাতা বিনোদিনী দেবী।

ছয় বছর বয়সের সময় যখন দীনেশের পিতৃবিয়োগ হয়, বিধবা মায়ের সঙ্গে তিনিও নিরামিষ খেতে থাকেন। মায়ের প্রতি ছিল তাঁর গভীরতম আকর্ষণ। মা বলতেন, তুই আমার সাত্ত্বিক ছেলে, তুই-ই আমার মুখাগ্নি করিস্‌। হায় রে! মায়ের কাতর প্রাণের ব্যর্থ কামনা!

বসিরহাট স্কুল থেকে ১৯২৪ সনে ম্যাট্রিক পাস ক'রে তিনি চ'লে আসেন কলকাতার সিটি কলেজে আই. এস-সি. পড়তে। সেই সময় তাঁকে যোগাভ্যাস করতে দেখা যেত। একটা ধর্মভাব তাঁর মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ১৯২৮ সনে তিনি বি. এস-সি. পাস ক'রে ইউনিভার্সিটিতে ল' পড়ছিলেন। সেই সময়ই তিনি ছাত্রীসংঘের মেয়েদের লাঠিখেলা শেখাতেন। ছাত্রীসংঘের সম্পাদিকা কল্যাণী দাস নিজেও সেখানে লাঠিখেলার ছাত্রী ছিলেন।

আই. এস-সি. পড়বার সময় দীনেশ সিমলা ব্যায়াম সমিতিতে যোগদান ক'রে লাঠি ও ছোরা খেলা শিখতে থাকেন। ওরই মধ্যে এক সময় কখন তাঁর বন্ধু অনুজা সেনের মাধ্যমে তিনি বিপ্লবী যুগান্তর দলের সংস্পর্শে আসেন এবং ধীরে ধীরে এই দলের সক্রিয় এবং বিশ্বস্ত কর্মী হয়ে ওঠেন।

চোখের সামনে কোনো অন্যায় ঘটতে দেখলে তেজস্বী এই তরুণ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করতে ছুটতেন। একবার একটি অসহায় বিধবার সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে আত্মসাৎ

করবার অপরাধে একজন লোককে দীনেশ সদর রাস্তায় বহু লোকের সামনে প্রহার ক'রে উচিত শিক্ষা দেন।

হরিশপুর গ্রামে একবার অগ্নিকাণ্ড হয়। আগুনের শিখা দেখে দীনেশ ছুটে গেছেন আগুন নিভিয়ে দিতে। প্রাণের ভয় তিনি করেন নি। আর একবার প্রতিমা বিসর্জনের দিনে বাজনায় বাধা দিতে গিয়েছিল একদল লোক, দীনেশ লাঠি হাতে সদলবলে ছুটলেন নির্বিঘ্নে বিসর্জনের শোভাযাত্রা অগ্রসর করিয়ে নিয়ে যেতে।

বিপ্লবী দলের-টি. বি. রোগী যখন রক্তবমি করছেন, দীনেশ এবং তাঁর বন্ধু অনুজা সারারাত জেগে তাঁর সেবা করেছেন। মধুর স্বভাব তাঁকে সকলের প্রিয়পাত্র ক'রে তুলেছে।

প্রতিটি কাজে তাঁর নিষ্ঠা সুবিদিত হয়ে উঠেছিল। সহজেই তাঁকে দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেওয়া হ'ত। দীনেশকে সেই সময় বিপ্লবীদলের পক্ষ থেকে শুধু কলকাতায় নয়, বগুড়া এবং ২৪ পরগণার সোনারপুর, কোদালিয়া, মাহিনগর, প্রভৃতি স্থানেও লাঠি ও ছোরা খেলা শেখাতে পাঠান হয়েছিল! অথচ পুলিশের খাতায় তাঁর নাম ছিল না! নিঃশব্দ ছিল তাঁর কর্মধারা।

আমাদের সেই লাঠিখেলার দিনগুলিকে ঘিরে বিরাজ করছিল ১৯২৮ সনের কলকাতা কংগ্রেসের উত্তপ্ত আবহাওয়া। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে জোয়ার এসেছিল জাতীয় জাগরণের। যুবশক্তি অস্থির।

আমার সত্তাও চঞ্চল। লাঠিখেলার মাষ্টারমশাইটি যেন নির্ভরযোগ্য, যেন তাঁকে মনের উথাল-পাথাল করা কথাগুলি বলা যায়। অবশেষে একদিন তাঁকে ব'লেই ফেললাম এবং সন্ধান চাইলাম দেশের স্বাধীনতা আনবার পথের। সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে মাষ্টারমশাই বললেন, আচ্ছা, কাল আপনাকে আমার একজন শ্রদ্ধেয় দাদার কাছে নিয়ে যাব, আজ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, বাড়ী যান। দু'জনেই কিন্তু তখন আমরা ইউনিভার্সিটির বিদ্যার্থী, সমবয়সী। একজন পথের সন্ধানী, অপরজন পথপ্রদর্শক।

পর দিন উপস্থিত হয়ে দেখি দীনেশ জ্বরে কাতর এবং না খেয়ে ক্লান্ত। আমার ভিতরের তাগিদ যতই বেপরোয়া হয়ে ঠেলে উঠুক না কেন, তবু কিন্তু লজ্জিত হলাম। বললাম, আজ থাক্। স্বল্পভাষী এবং গম্ভীর সেই মাষ্টারমশাই কিন্তু এবার হেসে ফেললেন। একেবারে রাস্তায় নেমে এসে বললেন, চলুন বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্। জ্বর আবার একটা বাধা নাকি?

বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌সে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি তাঁর শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক দাদা রসিকলাল দাসের সঙ্গে। ইতিহাস মন্থন করা বৈপ্লবিক উত্থান ও ঘটনা-পুঞ্জের আলোচনা এবং তার চুলচেরা বিশ্লেষণ সেদিন যেন একটা নতুন জগৎকে সামনে নিয়ে এল। সেদিন সেখানে যত কথা আলোচনা হয়েছিল তাতে বিপ্লবের সবল রেখাগুলি আমার মনের নতুন স্লেটে দাগ কেটে কেটে ব'সে চলেছিল। আলোচনা হতে থাকে দিনের পর দিন। তাঁরা যেন এক একটি প্রচণ্ড শক্তির স্তম্ভ, কোথাও ফাঁপা নয়, ফাঁক নেই।

নতুন কর্মীকে বিপ্লবী দলভুক্ত ক'রে নেবার জন্য তাঁদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, কিন্তু আতিশয্য ছিল না, মিথ্যা প্রলোভন ছিল না, ঘন কুয়াশার অস্পষ্টতা দিয়ে আচ্ছন্ন করবার প্রচেষ্টা ছিল না। নিজেদের যুগান্তর দলের শক্তি ও কার্যাবলী সম্বন্ধে একেবারে শূন্য অঙ্ক বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার কাছ থেকে দাবী করে-ছিলেন সর্বস্বপণ। অনুভব করেছিলাম, তাঁরা নিজেরাই সর্বস্বপণ ক'রে ব'সে আছেন ব'লে অন্যদেরও অমনি ক'রে আহ্বান করেন। বিদেশীর অপমান ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুঝতে যুঝতে যখন সকলে মিলে তাঁরা নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়ে যেতে থাকবেন তখন তাঁদের যে অস্থিচূর্ণ জমা হতে থাকবে, দুরন্ত সমুদ্রের তলায় তাই দিয়ে তিলে তিলে গ'ড়ে উঠতে থাকবে স্বাধীন ভারতের ভিত্তিভূমি। ওঁরা যেন প্রচণ্ড তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের তলার প্রবালরাজি। অনুভব করেছিলাম আমিও, নিজের অস্থিটুকু ওঁদেরই সঙ্গে চূর্ণ না ক'রে, ডুবিয়ে না দিয়ে থাকতে পারব না।

অবশেষে সত্যই একদিন ওঁদের মধ্যে এসে গেলাম। সনটা মনে পড়ে ১৯২৯। ১৯৩০ সনে চলেছিল কংগ্রেসের লবণ আইন অমান্যের প্রচণ্ড আলোড়ন। গান্ধীজী স্বয়ং হাত ধ'রে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। বিপ্লবী আন্দোলনও চলেছিল পাশাপাশি। ১৯৩০ সন থেকে কয়েক বছর পর্যন্ত বাংলার বিপ্লবীরা নির্মমভাবে যে আত্মবিলুপ্তির পথে ছুটে চলেছিলেন তা দিয়ে বুঝি স্বর্গ কিনে নেবার প্রবালও সঞ্চিত হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গেছে, জালালাবাদ পাহাড়ে এবং চট্টগ্রামের নানা স্থানে বিদ্যুৎগতিতে ঘটে গেছে খণ্ড বিপ্লব। দীনেশ বলেন, চট্টগ্রামের ঐ বহ্ন্যুৎসব সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে দেখবেন। বিপ্লবী কাজের তাগিদে আমাকে তখন থাকতে হয়েছিল গড়পাড় রোডে পুণ্যাশ্রমের হস্টেলে।

বিধবা মায়ের সাত্ত্বিক ছেলে দীনেশ শুধু নিরামিষই খেতেন না, তিনি ধূমপানেও অনভ্যস্ত ছিলেন। একদিন

দীনেশ হস্টেলে এসে বলেন, জানেন আমি আজকাল সিগারেট খাচ্ছি? কারণ জিজ্ঞেস করলে হেসে বলেন, অন্যদিন হবে সে কথা। নানা কথার পর যাবার সময় বলেন, বহুদূর চ'লে যাচ্ছি, হয়ত আর দেখা হবে না। আমার শত প্রশ্নেও তাঁর মুখ দিয়ে দ্বিতীয় উত্তর আর বের হ'ল না। লাঠিখেলার সেই দৃঢ়সংকল্প মাস্টার-মশাই। আমার সেদিন মতিভ্রম ঘটেছিল। কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না তাঁর রহস্যময় কথাবার্তা। "বহু দূর চ'লে যাচ্ছি" ব'লে দীনেশ আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, আমি কিন্তু তাঁকে বিদায় দেই নি।—

দুর্দণ্ড অত্যাচারী স্যার চার্লস্ টেগার্ট্ ছিল তখন বাংলার পুলিস কমিশনার। ইংরেজ শাসনের প্রতিনিধি এই পুলিস কমিশনার বর্বরতার চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছিল পরাধীন অসহায় জাতির বুকের উপর দিয়ে। দেশ-প্রেমিক বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার ক'রে দালান্দা হাউসে নিয়ে গিয়ে পিছনে হাতকড়া বেঁধে বেদম প্রহার করতে করতে অজ্ঞান ক'রে ফেলেছে। অসংখ্যবার ওঠবোস করিয়েছে, কমোডের মলমূত্র মাথায় ঢালিয়ে দিয়েছে, মলদ্বারে রুল ঢুকিয়ে জখম ক'রে দিয়েছে—তার অত্যাচারের সীমা ছিল না।

টেগার্টের বেঁচে থাকাটাই ছিল তখন বিপ্লবীদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। চারটি যুবকের উপর ভার পড়েছিল টেগার্ট্কে চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্য—দীনেশ মজুমদার, অনুজা সেন, অতুল সেন ও শৈলেন নিয়োগী।

১৯৩০ সনের ২৫শে আগস্ট ডালহাউসি স্কোয়ারে দ্বিপ্রহরের সময় টেগার্টের গাড়ীকে লক্ষ্য ক'রে দীনেশ প্রথমে বোমা ছোঁড়েন। গাড়ীটা থেমে যায়। দ্বিতীয় বোমা অনুজা নিক্ষেপ করেন। অনুজার বোমা গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পূর্বেই ফেটে যায় এবং সেখানেই অনুজা নিহত হন। দীনেশও সেই বোমার টুকরায় গুরুতর ভাবে আহত হন। ইতিমধ্যে দীনেশ টেগার্ট্কে রিভলভার দিয়ে গুলী করতে চেষ্টা করেন। গুলী গাড়ীর কাঁচে গিয়ে আঘাত করে। টেগার্ট্ও গাড়ীর ভিতর থেকে উল্টে গুলী করে। তাতে কেউ আহত হয় নি। বিদ্যুৎ-গতিতে টেগার্টের গাড়ী প্রস্থান করে।

বোমার টুকরায় আহত দীনেশ বেশী দূর দৌড়াতে পারেন নাই। অল্প কিছুদূর যেতেই তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। অতুল সেন এবং শৈলেন নিয়োগী গ্রেপ্তার হন নাই।

দীনেশকে প্রেসিডেন্সী জেলের হাসপাতালের মধ্যে সেগ্রিগেটেড ওয়ার্ডে আলাদা রাখা হয়। সে সময়ে বহু রাজবন্দী বা ডেটিনিউ প্রেসিডেন্সী জেলের অন্য ওয়ার্ডে ছিলেন।

দীনেশকে জেল কর্তৃপক্ষ বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা সত্ত্বেও রাজবন্দীরা তাঁর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক রেখে চলতেন। তাঁকে খাবার পাঠাতেন। কিন্তু দীনেশ খাবার নিতে চাইতেন না, কথা বলতে সঙ্কুচিত হতেন, তাঁর চোখ ছলছল্ করত। টেগার্ট্ জীবিত আছে এবং তিনি সফল হন নাই, এ দুঃখ তাঁকে গভীর পীড়া দিয়ে চলেছিল।

দীনেশ মজুমদারের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ হয় এবং মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়।

বন্দী দীনেশের হৃদয়ে আগুন জ্বলছিল। ক্রমেই তিনি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন। নিজেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে—এই দৃঢ় পণ তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলে-ছিল। সেই উদ্দেশ্যে তিনি জেল থেকে পলায়ন করবেন স্থির করেন।

মেদিনীপুর জেলের মধ্যে অবস্থিত দীনেশ মজুমদার, শচীন করগুপ্ত এবং সুশীল দাশগুপ্তের সঙ্গে বাইরের পলাতক নলিনী দাসের সংযোগ স্থাপিত হয়। নলিনী দাস ১৯৩১ সনের ৬ই নবেম্বর হিজলী বন্দীশিবির থেকে পলায়ন করেন।

বিশাল মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের বিরাট্ প্রাচীর সর্বাপেক্ষা উঁচু। শহরটা দূরে এবং জেলখানাটা জঙ্গলা জায়গায় অবস্থিত।

তারিখ ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩২ সন। দীনেশ মজুমদার, সুশীল দাশগুপ্ত এবং শচীন করগুপ্ত সন্ধ্যার গুণতিতে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে রইলেন ওয়ার্ডের বাইরে ধোপার উনুনের গর্তের মধ্যে। একটু রাত হ'লে তাঁরা গর্ত থেকে বেরোলেন। খানিকটা ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে যে-দিকে বেশী জঙ্গল সেদিকে এগোলেন প্রাচীরের এপাশ দিয়ে। তার পর এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালেন তিন দুর্ধর্ষ বন্ধু। বাঁশের সাহায্যে লোহার একটা হুক্ তাঁরা প্রাচীরের উপর দিকে আট্‌কে দেন। লোহার হুকের দুই দিকে কতগুলি কাপড় বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তিনজনের মধ্যে মজবুত-দেহী দীনেশ মজুমদার সর্বশেষে প্রাচীরের উপরে ওঠেন এবং লোহার হুক্ সহ কাপড়-চোপড় নীচে ফেলে দিয়ে ঐ বিরাট্ উঁচু প্রাচীর থেকে ওপিঠে লাফিয়ে নীচে পড়েন এবং আঘাত পান। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করবারও সময় ছিল না। পালাবার সময় কাপড়শুদ্ধ লোহার হুক্‌টা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে তাঁরা তিনজনেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যান।

পরদিন সিপাইরা যখন জানল যে, জেলের গুণতি ঠিক নেই, বন্দীরা পালিয়েছে, ততক্ষণে পলাতকেরা ট্রেনে উঠে কলকাতায় পৌঁছে গেছেন।

কলকাতায় আসার কয়েকদিন বাদেই সুশীল দাশগুপ্ত গ্রেপ্তার হন।

সেই ফেব্রুয়ারী মাসেরই একেবারে শেষের দিকে একটি দিনের জন্য দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন। বসেছিলেন তিনি দমদমে একটি ছোট-ঘরে। কেমন ক'রে যেন তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, বীণা-দাসের গবর্ণর জ্যাকসনকে গুলী করার মধ্যে আমি জড়িত আছি।* তিনি কথাটা তোলা সত্ত্বেও আমি নির্বাক্ রইলাম, যেন আমি কিছুই জানি না। তাঁদেরই শেখানো ডিসিপ্লিন সেদিন আমার মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছিল।

তার পর তিনি বললেন, বন্ধুরা তাঁকে চীনে গিয়ে অথবা জাপানে গিয়ে রাসবিহারী বোসের সঙ্গে যোগদান ক'রে ভারতের বিপ্লবকে অগ্রসর ক'রে দিতে পরামর্শ দিচ্ছেন। কিন্তু সে কথা তাঁর মনঃপূত হয় নি। তিনি মনে করেন ভারতবর্ষেই বিপ্লবী কাজের অন্ত নেই, এখানে থেকেই তিনি বিপ্লবের কাজ ক'রে যেতে থাকবেন। এ বিসয়ে আমার মত তিনি জানতে চাইলেন। আমার মনে হ'ল, তাঁর যাতে তৃপ্তি হয় তাই হোক। বিপ্লবের দুর্বার স্রোত যদি তিনি এনে ফেলতে পারেন যাতে বিদেশী শাসনযন্ত্র টলমল্ ক'রে কেঁপে উঠবে, যাতে পরাধীনতার লৌহশৃঙ্খল খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে, একমাত্র তাহলেই আসবে তাঁর সান্ত্বনা। অন্য কিছুতে তাঁর আনন্দ নেই, শান্তি নেই। বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরলাম। ভেবেছিলাম আবার দেখা হবে, তাঁর সঙ্গে আবার কাজ করব। দেখা কিন্তু আর কোনোদিন হ'ল না,—সব কথাই আমার বলতে বাকী রয়ে গেল। দুই-একদিনের মধ্যেই আমাকে পুলিস গ্রেপ্তার ক'রে জেলে নিয়ে যায়।

আরম্ভ হয়েছিল দীনেশের দুর্যোগময় পলাতক জীবন-যাত্রা। প্রথমদিকে তিনি এবং শচীন করগুপ্ত রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, প্রভৃতি স্থানে পলাতক থাকেন। হিজলী বন্দীশিবির থেকে পলাতক নলিনী দাসও মাঝে মাঝে এখানে থাকতেন এবং পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত। সর্বদাই তাঁদের যোগাযোগ ছিল।

পুরুলিয়া থাকার সময় দীনেশ একবার ঝরিয়ার কয়লার খনিতে খনিমজুর সেজে কাজ করছিলেন। কিন্তু মজুর হয়েও তিনি বিড়ি খেতে পারতেন না। তার উপর ছিল মেয়ে মজুরদের মাথায় কয়লার ঝুড়ি তুলে দেবার সময় সঙ্কোচ ও দূরত্ব রাখবার প্রচেষ্টা। ফলে স্থানীয় মজুরদের মনে সন্দেহ জাগে যে, এই মানুষ তো খনির মজুর নয়, এ মানুষ অন্য কিছু। দীনেশের আর খনির কাজে আত্মগোপন ক'রে থাকা সম্ভব হ'ল না।

এই সময় দীনেশ কখনও পুরুলিয়ার ওদিকে নানা স্থানে, কখনও কলকাতায় পলাতক হয়ে ফিরছিলেন। তাঁর পলাতকজীবন অবিশ্রান্ত কর্মময় ছিল। সে সময় পরিচালকহীনভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাঁরা বাইরে ছিলেন তাঁদের অনেককে একত্রিত ক'রে পুনর্গঠন ও কর্ম পরিচালনায় সচেষ্ট হন দীনেশ মজুমদার।

ওয়াট্‌সন ছিলেন স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের সম্পাদক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরক্ষার মুখপত্র এবং তাদের স্বার্থের প্রতিনিধি এই সংবাদপত্র প্রচার করত যে, বিপ্লবীদের দেয়ালের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলী ক'রে হত্যা করা উচিত। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুস্লিম বিচ্ছেদের আবহাওয়া এবং তাদের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টির আবহাওয়া এই কাগজখানা প্রচার ক'রে চলেছিল। বিপ্লবীদের মনে হ'ত, এই কাগজের সম্পাদককে সরিয়ে দিতে পারলে বিটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার একটা মুখ্যযন্ত্রে আঘাত লাগবে।

১৯৩০ সনে ডালহাউসি স্কোয়ারে টেগার্ট্‌কে আক্রমণ করবার সময় দীনেশ মজুমদার ও অনুজা সেনের সহযোগী ছিলেন অতুল সেন। তিনি গ্রেপ্তার হন নাই। কিন্তু টেগার্ট্‌কে আক্রমণ করার ব্যর্থতায় অতুল সেন ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরছিলেন। তিনি ছিলেন সেই ধরনের বিপ্লবী যিনি নির্দেশ আসামাত্র নিজের জীবন নিষ্পেষণ ক'রে দিতে সদা প্রস্তুত। যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে তাঁর বন্ধু ও সহপাঠী সুনীল চ্যাটার্জি জানতেন অতুল সেনের মনের অবস্থা। পরামর্শ বৈঠক হয় দীনেশ মজুমদার ও সুনীল চ্যাটার্জির মধ্যে এবং স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের সম্পাদককে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাঁরা।

১৯৩২ সনের ৫ই জুন স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের আপিসে ঢুকছিলেন সম্পাদক ওয়াট্‌সন্। প্রধান ফটক পার হয়ে তাঁর গাড়ীর গতি মন্থর হয়ে এসেছিল। অতুল সেন দ্রুত এসে ওয়াট্‌সনের গাড়ীর ফুটবোর্ডের উপর দাঁড়িয়ে গুলী ছুঁড়লেন। কিন্তু গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ল। সকলে ছুটে এল তাঁকে ধ'রে ফেলতে। শরীর তাঁর শত্রুর হাতে পড়েছিল। তিনি কিন্তু ইতিমধ্যে পোটাসিয়াম সাইনাইড

* লেখিকার "রক্তের অক্ষরে" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

খেয়ে নিজের অস্থিটুকু চূর্ণ ক'রে অজানা সমুদ্রের অনন্ত গভীরের দিকে প্রবাহিত ক'রে দিয়েছিলেন।

১৯৩২ সনের ২৮শে সেপ্টেম্বর ওয়াট্‌সন্‌কে দ্বিতীয়বার হত্যার চেষ্টা করতে যান অনিল ভাদুড়ী, মণি লাহিড়ী, বীরেন রায়, প্রভৃতি। এবারেও ব্যর্থ হয়ে পোটাসিয়াম সাইনাইড খেয়ে প্রাণ আহুতি দিলেন অনিল ভাদুড়ী এবং মণি লাহিড়ী। তরুণ তাজা প্রাণগুলি হাসতে হাসতে বলি হয়ে চলেছিল। ব্যর্থতার মধ্যে সার্থকতার এই করুণ কাহিনীগুলিকে চেনেন শুধু সেদিনের বিপ্লবীরা।

অনিল ভাদুড়ী বিধবা মায়ের সঙ্গে মামার সংসারে কোনপ্রকারে দিনযাপন করতেন। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর তাঁকে একটা গাঁজার দোকানে বসিয়ে দেওয়া হয়। ষোল-সতর বছরের জোয়ান ছেলেকে আহ্বান করেছিল স্বাধীনতার সংগ্রাম-সমুদ্র। মণি লাহিড়ী ছিলেন অবস্থাপন্ন সংসারে পিতামাতার অতি আদরের সন্তান। নবম শ্রেণীর ছাত্র পনর-ষোল বছর বয়সে ছিলেন প্রাণ-প্রাচুর্যে ঝল্‌মল্‌।

ওয়াট্‌সন্‌কে আক্রমণ করবার ষড়যন্ত্রের মামলায় সুনীল চ্যাটার্জির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয়, প্রমোদ বসুর দশ বৎসর। দীনেশ মজুমদার গ্রেপ্তার হন নাই।

কল্যাণী দাস আইন অমান্য আন্দোলনের কারাদণ্ড ভোগ শেষ ক'রে ১৯৩২ সনের শেষের দিকে মুক্তি পান। কল্যাণী দাস এবং তাঁর সঙ্গে সুলতা কর, আভা দে, সুহাসিনী দত্ত, শান্তিসুধা ঘোষ, প্রভাতনলিনী দেবী, লীলা কাম্‌লে, প্রভৃতি মহিলাবৃন্দ এবার যোগদান করেন বিপ্লবী দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে। মহিলা কর্মীগণ পলাতক বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ রক্ষা, বে-আইনী জিনিস গোপন রাখা, নারী-কর্মীদের সংগঠন করা, ইত্যাদি কাজ দীনেশ মজুমদারের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে করতেন।

দীনেশ চ'লে যান চন্দননগর। নলিনী দাসও সেখানে গেলেন। উভয়েই সেখানে একত্রে পলাতক ছিলেন। ওয়াট্‌সন্‌ মামলার পলাতক বীরেন রায়ও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। ইতিমধ্যে পলাতক শচীন করগুপ্ত ১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে চুঁচুড়াতে গ্রেপ্তার হয়ে যান।

১৯৩৩ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারী বেলা তিনটার সময় চন্দননগরের ফরাসী পুলিস দীনেশ মজুমদারদের চন্দন-নগরের বাড়ী ঘিরে ফেলে। হাতে যা টাকা ছিল পলাতকেরা তিনজনে তা ভাগ ক'রে নিয়ে রিভলভার হাতে গুলী করতে করতে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁরা তার-কাঁটার বেড়া ডিঙ্গিয়ে ছুটে চললেন। ফরাসী পুলিস প্রথমে গুলী করে নি, তারা ভেবেছিল তার-কাঁটার বেড়ার কাছে এঁদের ধ'রে ফেলতে পারবে। বীরেন রায় বেড়ার ধারেই গ্রেপ্তার হন। দীনেশ ও নলিনী ছুটতে লাগলেন। পুলিস এই ব'লে তাঁদের ধাওয়া করল, "এদের ধর, এরা চোর ডাকাত।" গুলী করতে করতে পলাতকেরা ছুটলেন। চন্দননগরের বাইরে যাতে এঁরা পালিয়ে যেতে না পারেন সেজন্য চন্দননগর পুলিস-ফাঁড়িতে খবর চ'লে গেল। বিপ্লবীদের গুলীর সামনে পুলিস তাঁদের ধরতে পারছিল না। চন্দননগরের ফরাসী পুলিস কমিশনার কুইন্‌স্‌ (কুঁই) জিপ, মোটর-সাইকেল এবং দুইজন সার্জেন্ট নিয়ে এঁদের গ্রেপ্তার করতে এগিয়ে আসেন। পশ্চাতে ধাবমান কুইনস্‌ বিপ্লবীদের গুলীর রেঞ্জের মধ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দীনেশ ও নলিনী গুলী করেন। ফলে পরদিন ২৬শে ফেব্রুয়ারী কুইন্‌স্‌-এর মৃত্যু হয়। তাঁর অনুচরবৃন্দ যখন গুলীর পর আহত কুইন্‌স্‌কে নিয়ে ব্যস্ত তখন বিপ্লবীরা পালাতে লাগলেন। ওদিকে কলকাতা পুলিসের সাদা পোষাক গোয়েন্দারা ছুটে আসতে লাগল। সামনের একটা ফাঁড়ি থেকে রাইফেল নিয়ে পুলিস বেরিয়ে এল। নলিনী দাস ফিরে দাঁড়িয়ে পুলিসদের লক্ষ্য ক'রে গুলী ছুঁড়তে থাকেন। কয়েকজন আহত হয়। ইতিমধ্যে দীনেশ পালিয়ে গেলেন। দীনেশের সঙ্গে নলিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, দীনেশ কোথায় যাবেন? তিনি গায়ের জামা-কাপড় ফেলে দিয়ে কৌপীন-পরা সাধু সেজে নিলেন এবং গাঁজাখোর সাধুদের আড্ডায় গঙ্গার তীরে ব'সে গেলেন। জীবনে যিনি সিগারেট-বিড়ি খেতে অভ্যস্ত নন তিনি গাঁজা খেলেন। ফলে তিনি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েন যে, পরে চিকিৎসা দ্বারা তাঁকে নিরাময় করতে হয়। গাঁজা খেয়ে গাঁজাখোর সাধুদের সঙ্গে তিনি গঙ্গার এপারে এসে যান।

এবার শহরের দিকে আর একটু এগিয়ে এলেন দীনেশ। একটা ঘোড়ার আস্তাবলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি। কয়েকদিন পর্যন্ত বন্ধুবান্ধব বা টাকা-পয়সার কোনো ব্যবস্থাই তিনি করতে পারেন নি। ঘোড়ার দানা যে ছোলা তাই খেয়ে তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হ'ত। তার পর কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

কলকাতার পুলিস তখন সহস্র সন্ধানী চক্ষু মেলে দীনেশকে খুঁজছিল। এ স্থান তাঁর পক্ষে তখন অত্যন্ত বিপদ্‌সঙ্কুল। তিনি অদৃষ্টকে পরিহাস করতে করতে ছুটে চলেছিলেন। বিপদের বাহুপাশও ক্রমেই নিবিড় হয়ে তাঁর কণ্ঠদেশকে জড়িয়ে ধরতে পিছন পিছন ছুটে

আসছিল। অসমসাহসী বিপ্লবীর জীবনমরণের ঘোড়-দৌড় চলেছিল। দীনেশের বন্ধু নারায়ণ ব্যানার্জি ও তাঁর স্ত্রী কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ১৩৬।৪এ নম্বরের বাড়ীটা ভাড়া ক'রে দীনেশকে আশ্রয় দিলেন।

স্থির হয়ে শুধু পলাতক জীবন কাটাবার কথা দীনেশের নয়। বিপ্লবী পরিকল্পনাগুলি কাজে পরিণত করতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন বহু অর্থের। এত অর্থ কোথায় পাওয়া যায়? অন্য উপায় না পেয়ে রাজ-নৈতিক কাজের প্রয়োজনে গ্রীণ্‌ডলে ব্যাঙ্ক থেকে জাল চেক দ্বারা অর্থ তুলে আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৩৩ সনের এপ্রিল মাসে উক্ত ব্যাঙ্ক থেকে মোট সাতাশ হাজার টাকা তুলে আনা হয়। কয়েক মাস পর্যন্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ কিছু জানতেই পারেন নাই।

১৯৩৩ সনের ডিসেম্বর মাসে যখন ঘটনাটা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয় তখন সন্দেহবশে পুলিস মহিলা ও পুরুষ অনেক বিপ্লবী কর্মীকে নানা স্থান থেকে গ্রেপ্তার করতে থাকে। কিন্তু শুধু গ্রীণ্‌ডলে ব্যাঙ্কের কর্মচারী, দীনেশের বন্ধু কানাই ব্যানার্জির বিরুদ্ধেই মামলা রুজু করা হয়। আইনতঃ যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করতে না পারায় সরকার অবশেষে মামলাই প্রত্যাহার ক'রে নেয় এবং কানাই ব্যানার্জিকেও এই মামলা থেকে মুক্তি দিয়ে বিনা বিচারে দীর্ঘকাল রাজবন্দী করে রাখে।

এই টাকা তোলার কাজের সঙ্গে অন্য যে-কজন কর্মী জড়িত ছিলেন তাঁদের কথা পুলিস জানতেই পারে নি। টাকাটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনার পর যে-সব বিপ্লবী মহিলা কর্মীর হেপাজতে সুরক্ষিত ছিল তাঁদের কথাও পুলিস জানতে পারে নি এবং টাকারও কোন সন্ধান পায় নি। কিন্তু এই সম্পর্কে সন্দেহবশে পুলিস কয়েকজন মহিলা কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। তাঁদের মধ্যে কাউকে অন্তরীণ, কাউকে বহিষ্কার এবং কাউকে রাজবন্দী ক'রে রাখে।

অর্থও হাতে এসেছিল—বিপ্লবী পরিকল্পনাও প্রস্তুত হচ্ছিল। মাসখানেকও যায় নি। দীনেশের চরমবন্ধু এবার দীনেশের কণ্ঠবন্ধন একেবারে দৃঢ় ক'রে ধরবার জন্য পাল্লা দিয়ে দৌড়ে এল। পুলিস তাঁদের অবস্থান জানতে পারল। ১৯৩৩ সনের ২২শে মে প্রত্যুষে সাড়ে তিনটায় পুলিস সদলবলে বাড়ীটা ঘিরে ফেলল।

ঐ বাড়ীটা কয়েকটা ব্লকে বিভক্ত ছিল। চার তলার একটি ব্লকে তখন পলাতক দীনেশ মজুমদার, নলিনী দাস এবং জগদানন্দ মুখার্জি অবস্থান করছিলেন।

পুলিসের আগমনবার্তা টের পাওয়া মাত্র দীনেশ, নলিনী এবং জগদানন্দ তিনজনেই গুলী ছুঁড়তে থাকেন। পুলিস ও বিপ্লবী উভয়পক্ষে গুলী চলে এবং খণ্ডযুদ্ধ হয়। যতক্ষণ বিপ্লবীরা যুদ্ধ করেছেন তাঁদের হাতে ছিল গুলীর গর্জন, মুখে ছিল বন্দেমাতরম্‌, স্বাধীন ভারত কি জয় ধ্বনি।

দীনেশ ও জগদানন্দ সেখানেই আহত হ'ন। গুলী করতে করতে গুলী ফুরিয়ে যাবার পর আহত অবস্থায় তাঁরা গ্রেপ্তার হন। নলিনী দাস ছাদে উঠে অন্যবাড়ীর ছাদে চ'লে যান এবং সেখান থেকেই তিনি গুলী করতে থাকেন। তিনিও গুলী ফুরিয়ে যাবার পর আহত অবস্থায় সেখানে গ্রেপ্তার হন।

বিপ্লবীদের গুলী বুকে বিদ্ধ হয়ে পুলিস সাব ইন্সপেক্টার গুরুতর ভাবে আহত হয়।

স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচার বসেছিল। সরকারী দৃষ্টিতে দীনেশ মজুমদারের অপরাধের পশ্চাৎপটে ছিল, টেগার্ট্‌কে আক্রমণের অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বন্দী অবস্থায় মেদিনীপুর জেল থেকে পলায়ন, ফরাসী পুলিস কমিশনার কুইন্‌স্‌কে হত্যা, স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজের সম্পাদক ওয়াট্‌সন্‌কে আক্রমণের ষড়যন্ত্র, গ্রীণ্‌ডলে ব্যাঙ্কের অর্থ অপসারণ এবং অবশেষে অস্ত্র হাতে খণ্ড যুদ্ধ করতে গিয়ে পুলিস সাব ইন্সপেক্টারকে গুলীর আঘাতে আহত করা।

প্রথম এবং শেষটি ব্যতীত অন্য কোনো অপরাধের প্রমাণ উপস্থিত করতে সরকার পারে নাই।

১৯৩৩ সনের ১১ই অক্টোবর স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারক রায় দিয়েছিলেন, যে-আসামী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত থাকাকালীন অবস্থায় পুলিস ইন্স-পেক্টরকে গুলী ক'রে গুরুতরভাবে আহত করে সে-আসামী চরম দণ্ডের যোগ্য। দীনেশের পক্ষে অপরাধের গুরুত্ব হ্রাসমূলক কোনোই ক্ষেত্র তাঁরা পান নাই। অতএব তাঁরা এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন যে, "চরমদণ্ডবিধান ব্যতীত ন্যায় বিচারের মর্যাদা রক্ষিত হবে না।" তাঁরা দীনেশ মজুমদারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার নির্দেশ দেন। নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখার্জিকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত করা হয়।

সেদিনের বিপ্লবীরা দেশকে ভালবেসে জন্মভুমির দাসত্বশৃঙ্খল ছিন্ন করতে গিয়ে চরমমূল্য দিতে প্রস্তুত হয়ে চলেছিলেন।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল। ১৯৩৪ সনের ১০ই জুন। ভোর রাত্রি। মৃত্যু এসে দীনেশকে ডাক দিল—"জাগো,

প্রভাত হ'ল তোমার রাতি।" চিরকালের শান্ত সংযত দীনেশ তাঁর দুরন্ত জীবনের চন্দ্র সূর্য বাতি-দু'টো নিবিয়ে দিতে অগ্রসর হলেন।

ফাঁসীর পূর্বে শেষ দেখা করতে দেওয়া হয় নি তাঁর আত্মীয়স্বজন বা দুঃখিনী মায়ের সঙ্গে। তাঁর পুণ্য দেহটুকুও তাঁদের দেওয়া হয় নি।

মহিলা রাজবন্দীগণ তখন হিজলী জেলে। কল্যাণী দাস এবং আমিও তখন সেখানে। জেলের মধ্যে সেন্সার করা খবরের কাগজ আসত। বিপ্লবীদের খবরগুলি থাকত কালি দিয়ে লেপা অথবা কাঁচি দিয়ে কাটা। কিন্তু সব বাধা ঠেলে পার হয়ে হিজলী বন্দীনিবাসেও এসে পৌঁছায় দীনেশের ফাঁসীর সংবাদ। মনে পড়তে লাগল, ১৯২৮-২৯ সনে আমার জীবনের সন্ধিক্ষণের কথা। সেই দীনেশ এবং তাঁর শ্রদ্ধেয় দাদা। আমাকে ঘিরে, আমার সহস্র দিক্ ঘিরে মথিত হয়ে উঠেছিল বিপ্লবের বিপুল আলোড়ন, অনুভব করেছিলাম এক মহান্ জাগরণ। ছবির মত একে একে ভেসে উঠতে লাগল কত দিনের কত আলোচনা, কত বিশ্লেষণ, কত সম্ভাবনা, কত দাবী।

—কি দিবে? সর্বস্ব পণ?

—সর্বস্ব পণ।

তাঁরা নিজেরা সর্বস্ব পণ রেখে জীবনের সঙ্গে মরণ খেলা খেলছিলেন।

পরাধীন ভারতের সংগ্রাম-সমুদ্র সেদিন ফুলে ফুলে গর্জে গর্জে উঠছিল। আহ্বান করছিল তাজা তরুণদের। সে মহা গর্জনে সাড়া দিয়ে সেদিন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সর্বস্বপণ করা, আত্মভোলা দীনেশ মজুমদার, ঝাঁপ দিয়েছিলেন অমনি ক'রে আরও কত ক্ষ্যাপা তরুণ।

আজকের স্বাধীন ভারতবর্ষের ভিত্তি এই সব প্রবাল রাশির অস্থিচূর্ণ দিয়েই কি গ'ড়ে উঠল না?

—•—

বিস্মৃতপ্রায় কবিঃ দেবেন্দ্রনাথ সেন

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

যদিচ বাংলা কবিতার উৎসে ও প্রাণপ্রবাহে লিরিকের প্রাধান্য প্রচলিত, তথাপি লিরিক বলতে যদি বুঝি, যে কবিতায় একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ সংক্ষেপে ও অনায়াস-সিদ্ধিতে স্পন্দিত, তা হলে প্রাক-রবীন্দ্র বাংলা কবিতায় তার নির্ভুল আস্বাদন প্রায়শই অসম্ভব। এমন কি কবি বিহারীলাল, চতুর্দশপদীর কবি মধুসূদন অথবা বৈষ্ণবকবি —এঁদের কবিতাবলী আপাতত লিরিক লক্ষণাক্রান্ত মনে হলেও, পরিণামে দেখা যায় কোন না কোন কারণে তারা সার্থক লিরিকে অনুত্তীর্ণ। বিহারীলালের কবিতায় লিরিকের যে প্রবলতম সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা আবার ভাবালু mysticismয়ের রহস্যে আবৃত। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ভাবনায় বিশ্বাসী হয়েও তাঁর নির্দ্বন্দ্ব অনুভব চেতনায় লিরিকের খণ্ডছিন্ন একমুখী আবেগ ধর্ম, বিশুদ্ধ অর্থে অনুপস্থিত। তদুপরি তাঁর কবিতায় রয়ে গেছে লিরিক বিরোধী অবয়ব শৈথিল্য ও সর্গবিভাগ।

আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গ লিরিক নয়, রবীন্দ্র সমসাময়িক কোন একজন বিস্মৃতপ্রায় কবি, দেবেন্দ্রনাথ সেন। তবে দেবেন্দ্রনাথের কবিতা প্রসঙ্গে এলে স্বভাবত প্রথমে মনে আসে ভাব বিষয়বস্তু ও গঠন নৈপুণ্যের দিক থেকে তাঁর কবিতার সহজ অথচ অনবদ্য লিরিক ব্যঞ্জনা, যা তাঁর পূর্ববর্তীদের কবিতায় কখনও দৃষ্ট হয়েছে বলে আমার জানা নেই। গভীর ভাবের অধিকারী না হলেও দেবেন্দ্রনাথের কবিতার একমুখী প্রেমব্যাকুল আবেগ সংযত ও পরিচ্ছন্ন অঙ্গসৌষ্ঠবে খাঁটি লিরিকাশ্রয়ী।

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় তিনি প্রেমের কবি। তাঁর আত্মহারা সৌন্দর্য অনুভূতি রূপজপ্রেমে বীজমন্ত্রের মত সক্রিয়:—

'চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারী আমি—
রূপের পূজারী।
সারাসন্ধ্যা সারানিশি রূপ বৃন্দাবনে বসি
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি।
অধরে রঙ্গের হাস বিদ্যুতের পরকাশ,
কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী;
বাসন্তী ওড়োনা-সাজে প্রকৃতি-রাধিকা নাচে,
চরণে ঘুঙুর বাজে আনন্দে ঝঙ্কারি।'

ওই রূপজ সৌন্দর্য শক্তির সবিশেষ উৎসাহ বাঙালীর

স্নিগ্ধ গার্হস্থ্য দাম্পত্য প্রেমে উজ্জ্বল। উজ্জ্বল অথচ তীব্রতায় ঝাঁঝালো নয়, তা বর্ষণসিক্ত ফুলের মৃদু সৌরভের মত কোমল, প্রিয়ার সমস্ত দেহ মনের আকর্ষণে বিবশ, তৃপ্তিতে বিভোর। এ-স্বাদ বাংলা কবিতায় একেবারে নতুন, একেবারে সতেজ :

ঘোমটা খুলিবে নাক? থাক তবে বসি।
আমি করি কাব্য পাঠ, যামিনী জাগিয়া!
একি! একি! চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি?
খোঁপা চাহে ফুলগুলি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
আমি দিব? কাজ নাই—পরশে আমার,
(আমি গো চঞ্চল বড়!) খুলিবে কবরী!
কুন্তলের ফুলদানি, আহা মরি মরি!
চাঁপাগুলি ফিরে পেয়ে, হাসিছে আবার!
এমন সুন্দর পান কে গো সেজেছিল?
হাসিছ? তোমার কীর্তি? এ বড় অন্যায়!
তব ওষ্ঠ এত লাল! পানের বাটায়,
আমা লাগি ভিন্ন পান কে বল আনিল।
'যাও—যাও'—সে কি কথা? ধরি দুটি কর,
আমিও রাঙ্গিয়া লই আপন অধর!

চতুর্দশপদীটির মধ্যে লঘু কথোপকথনের ঢঙে ফুটে উঠেছে সলাজ বাসনা জড়িত যে মৃদু গুঞ্জন, তা দেবেন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতার উষ্ণ হৃৎস্পন্দন। প্রেমিক হৃদয়ের অকৃপণ সারল্যে যে মায়াময় আবহাওয়া নির্মিত, তা সহাস্য সৌন্দর্য তৃপ্তিতে মধুর, অনাবিল :

যাদুকরি, তুই এলি—
অমনি দিলাম ফেলি
টীকা ভাষ্য ;—তোর ওই চন্দ্রদীপিকায়
বিদ্যাপতি মেঘদূত সব বুঝা যায়।

প্রিয়ার নিরালা সান্নিধ্যে উৎসুক হৃদয়াবেগ, মদির কণ্ঠস্বর কয়েকটিমাত্র পংক্তিতে নিখুঁত ভাবে ধরা দিয়েছে :

নয়নে নয়নে কথা ভাল নাহি লাগে—
আধ গ্রাস জল যেন নিদাঘের কালে!
চারিদিকে গুরুজন ; চল অন্তরালে ;
দোঁহার হিয়ার মাঝে কি অতৃপ্তি জাগে!
... ...
ছাদে চলো ; মুক্ত বায়ু ; অদূরে তটিনী ;
দ্রৌপদীর শাড়ী সমা সচন্দ্রা যামিনী!

দেবেন্দ্রনাথের সৎসাহসী সুস্থ প্রেম-চেতনা মনের বাতায়ন অতিক্রম করে দেহবোধের দরজায় অনেক সময় গিয়ে আছড়ে পড়েছে :

দাও তবে প্রাণভরা শেষ উপহার,
সুধা হলাহল ওই চুম্বন তোমার।

প্রণয়, প্রশ্রয় ও ব্যাকুল মিনতি মিশ্রিত হয়ে কোথাও আবার ভেসে ওঠে আত্মসমর্পণে অকপট এক অন্তরঙ্গতা :

ফেলিয়া দিয়েছি বাসি মালতীর মালা—
চম্পক-অঙ্গুলিগুলি ঘুরায়ে ঘুরায়ে,
গাঁথিছ বকুল হার বিনায়ে বিনায়ে।
শেষ না হইতে মালা, ওই দেখ, বালা,
তোমার-অলক-গুচ্ছ হয়েছে উতলা!
মালা গাঁথা হলো শেষ, পাইবে সম্পদ,
তাই বুঝি উরসের যুগ্ম কোকনদ,
সরসে নলিনী সম হয়েছে চঞ্চলা?
আমিও কুসুম সখি ; সারাটি যামিনী,
সঞ্চিয়াছি তব লাগি, রূপ ও সৌরভ!
... ...
চিকনিয়া গাঁথিতেছ বকুলের মালা :—
আমারেও ওই সাথে গেঁথে ফেল বালা!

নির্লিপ্ত আসক্তি ব্যতিরেকে বিশুদ্ধ কবিতার জন্ম অসম্ভব—উপরি উদ্ধৃত সার্থক অংশটি যদি এই স্বীকৃত কাব্যবোধের ব্যতিক্রম হয়, তা হলে এ-ব্যতিক্রম দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় সুপ্রচুর। তার পরিচয় এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়, দুর্মর প্রলোভনে দু'টি মাত্র কবিতার অংশ উদ্ধৃত করলাম :

তোমার ও ওষ্ঠ দুটি বাসন্তী যামিনী জাগি
পাতিয়াছে ফুলশয্যা বল গো কাহার লাগি?
দাও দাও একটি চুম্বন।
নব বধূ আত্মা মোর লাজুক লাজুক ঘোর
চক্ষু বুজি মাথা গুঁজি করিবে শয়ন।
নিশীথে, উজ্জ্বলরূপে হয় দিবা-ভুল :
দিবসে, শর্বরী ঘোর, এলাইলে চুল!

অনাড়ম্বর স্বচ্ছ নিরাভরণ ভাষায় কবির অরুদ্ধ আত্মহারা আবেগ যে ব্যঞ্জনাঘন যাদুমন্ত্রে ধ্বনিত, যা সময়ের ব্যবধি অতিক্রম করে আজও আমাদের মনে অসামান্য সাড়া তোলে, তৎকালীন বাংলা কবিতায় খুব সহজলভ্য ছিল না। জানতে ইচ্ছে হয়, এ-যাদুবিদ্যা কতটা অনায়াসসিদ্ধ আর কতটা চর্চালব্ধ। কারণ, এ-যাদুমন্ত্রের স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও, অনেক সময় অবিবেকী শব্দ বিন্যাসের চোরাবালি থেকে সমগ্র কবিতা রক্ষা করতে পারেন নি। তাঁর কবিতায় 'আর্টের সংযম নাই, কিন্তু অসংযমের আর্ট আছে—।' প্রসঙ্গত অবশ্য স্বীকার্য, ভাষা ব্যবহারে তাঁর চারিত্রিক মিতব্যয়িতা শরীরের রক্ত-স্রোতের মত কাব্যকৃতিতে চিরদিন প্রবাহিত।

প্রেমের কবিতা রচনায়, পূর্বেই বলেছি দেবেন্দ্রনাথের সিদ্ধি সর্বাধিক। তার পর উল্লেখ্য তাঁর প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা। নৈসর্গিক বস্তুতে তাঁর অনুরাগ প্রীতির সহজ নিদর্শন একাধিক কাব্যগ্রন্থের নামকরণে,—অশোকগুচ্ছ, শেফালীগুচ্ছ, পারিজাতগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ। প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'ফুলবালা'। প্রেমের কবিতার মত এখানেও তিনি তুমুল Sensuous, তার উজ্জ্বলতম পরিচয় বহন করছে 'বৈশাখ' কবিতাটি। চিত্রল বর্ণনায় কবিতার রূপকটি নিবিড় ইন্দ্রিয় চেতনায় উপস্থিত :

কপালে কঙ্কণ হানি, মুক্ত করি চুল
বাসন্তী যামিনী আহা, কাঁদিয়া আকুল!
স্বামী তার, 'চৈত্রমাস', অনঙ্গের মত,
দক্ষিণে ঈষৎ হেলি, জানু করি নত,
কার তপ ভাঙিবারে করিছে প্রয়াস?
রুদ্রের মূরতি ওযে!—এ কি সর্বনাশ!
ভস্ম হ'ল চৈত্রমাস! হয়ে অনাথিনী,
মুছিল সিন্দুর-বিন্দু, বাসন্তী-যামিনী!
শাল্মলীর পুষ্পরাশি পড়িল মরিয়া!
পাপিয়া বসন্ত রাজ্যে গেল পালাইয়া!
প্রজাপতি লুকাইল করবীর শিরে,—
ভিজিল শিরিষ-পুষ্প নয়নের নীরে!

সব শেষে একথা বলতেই হয় যে, কবির এ-রূপতৃষ্ণা অন্ধ আবেগে কখনও কখনও ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ। তার ইন্দ্রিয় চেতনায় যে পরিমাণ মাদকতার প্রাবল্য সেই পরিমাণ সজ্ঞানতার অভাব; ভাব কল্পনা যতটা আবেগ-বিহ্বল ততোধিক বস্তুজ্ঞানবিমুখ। তিনি তৃপ্তিতে বিভোর, আত্মহারা, অগভীর। যে অতৃপ্তিতে কবি-চেতনা গভীরতামুখী হয়, মহৎ কবিতার জন্ম নেয়, সে বস্তুটি তাঁর মধ্যে ছিল না। ফলত, অসময়ে তাঁর কবি-ক্ষমতা নিম্নমুখী, মন্থর। 'গোলাপগুচ্ছ'-এর পর থেকে বিশীর্ণ কল্পনা, স্তিমিত ভাবাবেগ ভক্তি-আশ্রয়ী। দেবেন্দ্র-নাথ প্রকৃত যৌবনের কবি। এখানে তিনি বেমানান, অসহায়। কবিক্ষমতার মূল্যায়নে এ পর্যায়ের অভ্যাসবশে লেখা বিবর্ণ কবিতাগুলো ব্যবহৃত হ'লে তাঁর উপর অবিচার করবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

রবীন্দ্রনাথের সমকালবর্তী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থ দেবেন্দ্রনাথকে উৎসর্গীত ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'উর্মিলা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'ইহাতে স্থানে স্থানে কল্পনার খাঁটি রত্ন বসান হইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে এ কাব্যখানির সুখ্যাতি করিতে পারি, ইত্যাদি। ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সান্নিধ্যে এলেও রবীন্দ্রকাব্যের দুর্নিবার অনুকরণ-আকর্ষণ থেকে তাঁর কবিতা সম্পূর্ণ বিমুক্ত এবং রবীন্দ্রনাথকে দূরে সরিয়ে নিলে তৎকালীন বাংলা কবিদের মধ্যে তাঁর স্থান সর্ব-প্রথম। বাংলা কবিতায় আলোচনা সূত্রে প্রভাত মুখো-পাধ্যায় একদা কবিকে বলেছিলেন, 'রবিবাবুর পর আর যে সমস্ত কবি আছেন, তাঁদের মধ্যে আপনাকে খুব উচ্চ আসন দিই। তাঁদের অনেকের কাব্যই রবিবাবুর সুরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, আপনার কাব্যে সেটি নাই; আপনার কাব্যের মধ্যে আপনার নিজের কণ্ঠস্বরটি বেশ স্পষ্ট—আর, সে স্বরটি বড় মিষ্টি, বড় পবিত্র।' দেবেন্দ্র নাথের সব কবিতা বনেদী অক্ষরবৃত্তপয়ারে লেখা।' ওই মামুলি খাপি ছন্দে তিনি যে নতুন ধ্বনি ও ভঙ্গির স্ফূর্তির দেখিয়েছেন তা তখনকার বাংলা কবিতায় খুব সহজলভ্য ছিল না।

পরবর্তী বাংলা কবিতার গতি প্রবাহে দেবেন্দ্রনাথের যে প্রভাব তাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। মোহিত-লালের 'নারীস্তোত্র' কবিতাটি রচনার উৎসস্থল যে দেবেন্দ্রনাথের 'নারী-মঙ্গল', 'দুহিতা মঙ্গল শঙ্খ' কবিতা দুটি তাতে আর সন্দেহ কি! মোহিতলালের দেহবোধ চিন্তা, এমন কি শব্দ সম্ভার ও শব্দ ব্যবহার যথেষ্ট পরিমাণে দেবেন্দ্রনাথ থেকে সংকলিত। অপরাজিতা দেবীর কথোপকথন ঢঙে লেখা কবিতায় ও কিরণধন চট্টো-পাধ্যায়ের বিখ্যাত 'আব্দারের আধ ঘণ্টা' কবিতাটিতে তাঁর উপস্থিতি বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। তিরিশের অন্যতম কবি অজিত দত্তের "কুসুমের মাস"য়ের অনেক কবিতায় তাঁর ছাযাপাত সন্ধান খুব কঠিন কি? মোহিত-লাল, অজিত দত্ত প্রমুখ কবিদের পরিণত কবিতায় এ-ছায়া বিস্তার স্মরণ করিয়ে দেয়, এ-বিস্মৃতপ্রায় কবি বাংলা কবিতায় একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

দেবেন্দ্রনাথ যে সময় কবিতা রচনা করেছেন তার পর সুদীর্ঘ অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত। বাংলা কবিতায় অনেক পালা বদলের ঢেউ বয়ে গেছে; form, diction, idiom মাত্র নয়, বস্তুত, কবিতার সমগ্র চরিত্রই স্বাভাবিক প্রাণ-প্রবাহের তাড়নায় কত পরিবর্তিত; সেই সংগে পাঠকের রুচি ও উপলব্ধির জগতও আজ ভিন্ন। তথাপি যে যুগে ইংরেজ কবি কীটসের কবিতা আজও অনুভূতির তলদেশ স্পর্শ করে, যদি বলি তার আভাস দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় বর্তমান, তা হ'লে কি সত্যের অপলাপ হয়!

পৃথিবীর আবহাওয়া কি বদ্‌লাচ্ছে ?

কয়েক বৎসর যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় আবহাওয়ার অল্পবিস্তর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ আছে কি না অনুসন্ধান ক'রে দেখবার জন্যে ইউনাইটেড ষ্টেটস্ সরকার এক কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটিতে ছিলেন আমেরিকার কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় পরমাণুবিৎ বৈজ্ঞানিক। তাঁরা নানাপ্রকার গবেষণা ক'রে এই দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে পৃথিবীর আবহাওয়ার কোনো বৈলক্ষণ্য হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু আবহাওয়া অনেক জায়গাতেই বদ্‌লাচ্ছে। কেন বদ্‌লাচ্ছে ?

রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে বহু সহস্র বর্গমাইল পরিমিত জমি, যা আগে বরফ ঢাকা থাকত, এখন আর তা থাকে না। গ্রীনল্যাণ্ডের উপরদিককার হিমশিলাবৃত অংশ ক্রমশঃ সংকীর্ণতর হচ্ছে। আইস্‌ল্যাণ্ডের তুষারক্ষেত্র গলে গিয়ে বিস্তীর্ণ তৃণভূমির উদ্ভব হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত উষ্ণজলের মাছ কড্, আগে গ্রীনল্যাণ্ডের লোকেরা দেখতেই পেত না, এখন কড্ মাছ তাদের প্রধান আহার্য। উত্তর মেরু অঞ্চলে খরগোসদের বংশবৃদ্ধি হয়েছে, অথচ মাত্র ৫০ বছর আগে সেখানে তাদের অস্তিত্বও ছিল না। আগে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উত্তরদিকে অনেক জায়গায় গাছ জন্মাত না, এখন জন্মাচ্ছে। ব্রিটেনের শীত আর আগের মত প্রচণ্ড নয়; লণ্ডনের ছেলেমেয়েরা শুনে অবাক্ হয়ে যাবে যে, ১০০ বছর আগে টেম্‌স্ নদীর জল প্রায়শঃই শীতকালে জমে বরফ হয়ে যেত।

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের অবস্থাও প্রায় একই প্রকার। বরফের আস্তরণ মুক্ত বহু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হয়েছে কুইন্ মড্ ল্যাণ্ডে।

আবহবিদ্‌দের বিশ্বাস, মেরু অঞ্চলের ক্রমিক উষ্ণতার ফলে বরফ গলে গিয়ে পৃথিবীর নানা জায়গায় বর্ষার প্রকোপ বৃদ্ধি করেছে। তাঁদের মতে, এখনও বহু বৎসর ধ'রে শীতকাল হবে অপেক্ষাকৃত গরম আর গ্রীষ্মকালে হবে অধিকতর বর্ষণ।

জ্যোতির্বিদ্‌রা কিন্তু বলছেন, পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজতে হবে পৃথিবীর বাইরে। সম্ভবতঃ পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্য্যোত্তাপ আগের অপেক্ষা এখন বেশী ক'রে পড়ছে। সূর্য্যোত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ইতিপূর্ব্বেও বহুবার পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটতে দেখা গেছে। এই হ্রাসবৃদ্ধির একটা কারণ, যে-মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথ, তার কোথাও কোথাও সূর্য্যোত্তাপ আত্মসাৎকারী উল্কারেণু খুব বেশী পরিমাণে ছড়িয়ে আছে, কোথাও কোথাও তারা কম।

অন্যদিকে অনেক পদার্থবিদ্‌রা মনে করেন, আভ্যন্তরীণ স্পন্দনের ফলে সূর্য্যের নিজের উত্তাপেরই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে!

অন্য একদল বৈজ্ঞানিক এই মত প্রকাশ করেন, যে বিগত ৫০ বৎসরে পৃথিবীর কলকারখানা, রেল, ষ্টীমার ইত্যাদিতে এত কয়লা পুড়েছে যে, আমাদের বায়ুমণ্ডলে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এখন ১,৫০,০০০ টন বেশী। সূর্য্যরশ্মি কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডের ভিতর দিয়ে বিনা বাধায় প্রবেশ করতে পায়, অপরদিকে পৃথিবীর ক্ষীণজ্যোতি তাপরশ্মিগুলিকেও কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড আত্মসাৎ ক'রে নেয়। এইভাবে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরগুলি ক্রমশঃ উষ্ণ হতে উষ্ণতর হয়ে চলেছে এবং চলতে থাকবে, যতদিন বায়ুতে কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আমরা বৃদ্ধি করতে থাকব।

নিদ্রা ও জাগরণ।

বিজ্ঞান বলছে, আপনি যখন ঘুমোন, কখনোই পুরোপুরি ঘুমোন না এবং জেগে থাকা অবস্থাতেও কখনোই পুরোপুরি জেগে থাকেন না।

কুম্ভকর্ণের মত ঘুম, হনুমানের এক লম্ফে সমুদ্র পার হওয়ার মত নিতান্তই গল্পকথা।

ধরে নেওয়া যাক্, আপনার খুব সুনিদ্রা হয়, আর আপনি আরামে ঘুমোচ্ছেন। পাশের ঘরে ছেলেরা রেডিওটাকে সপ্তমে চড়িয়ে আধুনিক বাংলা গান শুনছে, যে গান অনেক চেষ্টাতেও এখনো আপনার ধাতস্থ হয় নি; কিন্তু আপনার ঘুমের বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত তাতে হ'ল না। পথের নেড়ি কুত্তাগুলো প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, আপনার হুঁশ নেই। একটা লরী চ'লে গেল বাড়ী কাঁপিয়ে প্রচণ্ড শব্দ ক'রে, তাতেও আপনার ঘুম ভাঙল না। কিন্তু আপনার বিছানার কাছে এসে কেউ যদি আপনার নাম ধ'রে মৃদুকণ্ঠেও ডাকে, আপনার ঘুম ছুটে যাবে।

আপনার ধারণা, আপনি যখন ঘুমোন, আপনার মনের সব ক'টা দরজা বন্ধ থাকে, কিন্তু তা আসলে ঠিক নয়। আপনার জরুরী প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারে এমন অন্তত দু'টো-একটা দরজা প্রকৃতি দেবী দয়াপরবশ হয়ে খুলে রেখে দেন। মা যখন সমস্ত দিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহ নিয়ে অঘোরে ঘুমোন, তাঁর পাশে শোয়া শিশুর ক্ষীণতম কান্নার শব্দটি এমনই এক খোলা দরজায় তাঁর নিদ্রার-মধ্যেও-বিনিদ্র মনে গিয়ে পৌঁছায়।

যে অসাড় অবস্থাকে ডাক্তাররা Coma ব'লে থাকেন, একমাত্র তাতেই চেতনার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে, আর ঘটে মৃত্যুতে।

পরিপূর্ণ সচেতন অবস্থাও আপনার জীবনে খুব বেশী সময়ের জন্য আসে না। আপনি অনেক কাজই কিছুমাত্র না ভেবে, কেবল অভ্যাস বশে করেন। যখন দন্ত ধাবন করেন, দাড়ি কামান, দাঁত বা দাড়ির কথা একেবারেই আপনি ভাবেন না। হয়ত অন্য কিছু ভাবেন, কিংবা কিছুই ভাবেন না। খবরের কাগজটা মোটামুটি মন দিয়ে পড়েন, কিন্তু কাগজের অনেকগুলো জায়গায় কেবল চোখ বুলোন, আধ জাগ্রত আধ ঘুমন্ত অবস্থায়। সারাদিন এমনিধারা অনেক কিছুই আপনি ক'রে যান, যার জন্যে মনের বিশেষ কিছু সচেতনতার আপনার প্রয়োজন হয় না।

বিজ্ঞান বলছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ১৫।১৬ মিনিট সময় মাত্র আপনি

এমন অবস্থায় থাকেন যেটাকে পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থা বলা যেতে পারে।

আপনার ঘুম আর অচেতনতা যে এক কথা নয় তার আর এক প্রমাণ, যে, খুব সম্ভবতঃ আপনি স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন মানেই চিন্তা, এবং মনটা খানিকটা সক্রিয় না থাকলে আপনি চিন্তা করতেও পারবেন না, স্বপ্নও দেখবেন না। Coma-র অবস্থায় কেউ স্বপ্ন দেখে না।

স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁরা বলছেন, আমাদের শতকরা আশীটি স্বপ্ন কোনো-না-কোনো রকম দুঃস্বপ্ন। ভয়, দুঃখ, রাগ, উদ্বেগ এইগুলি নিয়েই মানুষের মন ঘুমের মধ্যেও সক্রিয় হয়ে থাকে বেশী।

আপনি হয়ত বলবেন, আপনি স্বপ্ন দেখেন না, কিন্তু সেটাও আপনার ভুল ধারণা। হিপনটিজমের সাহায্যে বিজ্ঞান প্রমাণ করে দেবে, আপনি প্রচুর স্বপ্ন দেখেন, কেবল সকালে উঠে সেগুলিকে মনে আনতে পারেন না।

আমরা ঘুমোই কেন? কি হয় না ঘুমোলে?

মহাভারতকার বলেছেন, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন নিদ্রাকে জয় করেছিলেন। অর্জ্জুনের সশরীরে অমরাবতীতে যাবার মত এটা নিছক গল্প কথা কিন্তু না হতেও পারে।

এ বিষয়ে প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, আমাদের দৈহিক স্বাস্থ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের পক্ষে নিদ্রা ঠিক ততটাই প্রয়োজনীয় নয়, যতটা আমরা মনে করি। দশদিন দশরাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় যাপন করার পরেও একজন বৈজ্ঞানিক কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করেন নি, তাঁর রক্তের চাপ, নাড়ীর গতি, শরীরের তাপ, পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপলব্ধি, সমস্তই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সুস্থ ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ মনের দিক থেকে তিনি ভেঙে পড়তে লাগলেন। এই ধরনের পরীক্ষাধীন অনেকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন দেখা গেল। তাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, আমাদের মনকে মস্তিষ্ককে সুস্থ এবং কর্মক্ষম রাখবার জন্যেই নিদ্রার প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বলছে, যোগবলে কেউ কেউ চিত্তবৃত্তিকে একেবারে বশে আনতে পারেন, যাতে কোনো অবস্থাতেই তাঁর বৈলক্ষণ্য কিছু ঘটে না। সেরকম যোগসিদ্ধ ব্যক্তি যদি কেউ থাকেন, নিদ্রাকে জয় করা হয়ত তাঁর পক্ষে অসম্ভব নাও হতে পারে। হয়ত অর্জ্জুন সেইরকম যোগসিদ্ধ পুরুষই ছিলেন।

স. চ.

প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাণী

১৯০১ সনে এক বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদল সাইবেরিয়ার আরণ্য

ইগুয়ানোডন

অঞ্চলে বেরেসকোভা নদীর অভিমুখে যাত্রা করে। এই অভিযাত্রীদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল একটি ম্যামথ খুঁজে পাওয়া।

আস্ত কোনো জীবন্ত ম্যামথ পাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি কেননা এই অতিকায় লোমশ প্রাণীদের শেষ বংশধর লোপ পেয়ে গিয়েছিল বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই। তাঁরা যা পেলেন সেটি হচ্ছে তুষারে জমে যাওয়া একটি ম্যামথের মৃতদেহ। এই মৃতদেহটি আবিষ্কার করতে তাঁদের খুব বেগ পেতে হয় নি। তাঁরা দেখলেন, তুষার সমাধির ভিতরে প্রাণীটির মৃতদেহ আশ্চর্য্যজনকভাবে সুরক্ষিত যেন তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে একটি অতিকায় রেফ্রিজারেটারের মধ্যে।

এই আবিষ্কারটি সহজ হয়ে থাকা সত্ত্বেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এর পর থেকেই ম্যামথদের সম্বন্ধে সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবৃত্তির পথ সুগম হয়।

অক

মৃতদেহটিকে ভালো ক'রে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারেন, প্রাণীটি যখন বেঁচে ছিল তখন তার সারা গা ছিল লাল-পশমী লোমে ঢাকা আর দাঁত দুটো ছিল দশ ফুট লম্বা। ওদের রক্ত বিশ্লেষণ ক'রে প্রমাণিত হ'ল যে, ম্যামথের নিকটতম জ্ঞাতি হচ্ছে ভারতীয় হাতী।

শেষ পর্য্যন্ত এই প্রাণীটির চামড়া এবং কঙ্কাল (তখনকার) পিটার্সবার্গে নিয়ে গিয়ে একটি মিউজিয়ামে রাখার ব্যবস্থা করা হ'ল

য যুগে ম্যামথরা বেপরোয়াভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করত …নীরা তাকে বলেন প্লেস্টোসিন যুগ —এক লক্ষ বছর আগে এর … এবং এই যুগের অবসান হয় দশ হাজার বছর আগে (৮০০০ খ্রীষ্ট …)।

…মন একদিন ছিল যখন ম্যামথ এবং মানুষ একত্রে বাস করত এই …। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আদিম শিকারীরা এই …র প্রাণীদের শিকার ক'রে তাদের মাংস আহার করত। এবং … যে ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে গেল এইটেই হচ্ছে তার আসল …

আরও অতীত যুগে ফিরে গেলে এমন আরও অনেক প্রাগৈতিহাসিক …র সন্ধান পাওয়া যায় যাদের এখন আর অস্তিত্বই নেই। অন্যান্য …রা টিকে আছে, পরিবর্তন হয়েছে শুধু তাদের আকৃতির। দৃষ্টান্ত- … বলা যায়, সত্তর লক্ষ বছর আগেকার টেরিয়ারের (কুকুরপ্রকৃতি …বিশেষ) মত আকৃতিবিশিষ্ট ইয়োহিপ্পাসের কথা, ধীরে ধীরে যারা … হয়েছে আজকের দিনের ঘোড়ায়।

…ইনোসর-এর কথা আমরা অনেকেই শুনেছি। প্রত্যেক বড় …ক ইতিহাসের মিউজিয়মে ডাইনোসরের হাড় আছে। তা ছাড়া …দের কতকগুলি নিরীহ প্রজাতির (Species) দেহাবশেষ। যেমন

ডোডো
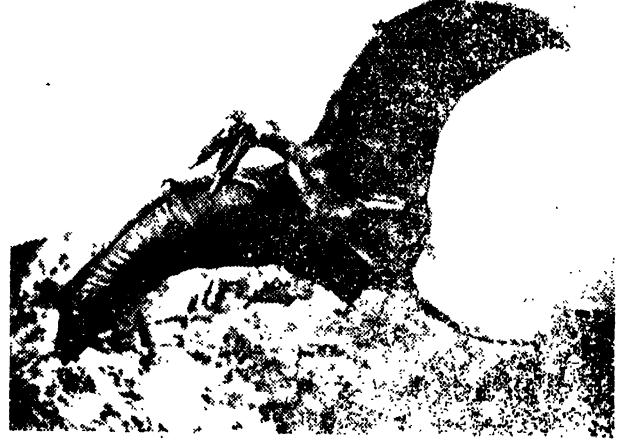
…ইগুয়ানোডন, যার প্রত্যেক পায়ে তিনটি ক'রে আঙুল। আর …দের প্রাণীসমূহের মধ্যে আছে পঞ্চাশ ফুট লম্বা এবং ছয় ইঞ্চি দাঁত-… ভীষণদর্শন ট্রাইনোসরাস। পেছনের পা-গুলির ওপর ভর দিয়ে …ভাবে এরা চলাফেরা করত যেন এরাই ছিল এই দুনিয়ার মালিক। …দের বুদ্ধিবৃত্তি তেমন প্রখর ছিল না।

পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ডাইনোসররা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় সত্তর থেকে আশী লক্ষ বছর আগে। এদের বিলুপ্তির জন্যে মানুষ কিন্তু মোটেই দায়ী নয়। পৃথিবীর ক্রমপরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি ব'লেই তারা ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে গেছে।

সেই অতীত প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চ'লে আসা যাক প্লেস্টোসিন যুগে। ইয়োরোপের বেশীর ভাগ জায়গাই ছিল তখন তুষারে ঢাকা। সে প্রায় লক্ষ বছর আগেকার কথা, ম্যামথ, ম্যাস্টোডন প্রভৃতি অতিকায় প্রাণীরা তখন পৃথিবীতে বাস করত, আর ছিল স্মিলোডন অর্থাৎ তরবারির মত বাঁকানো দাঁতওয়ালা বাঘ।

এই সকল এবং আরও কোনো কোনো প্রাণী বহুকাল হ'ল নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে এমন সব প্রাণীর কথা জানা গেছে, যারা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্যন্ত বেঁচে ছিল, কিন্তু মানুষ নির্বিচারে হত্যা করে তাদের বংশ লোপ করেছে।

ডোডো ছিল মরিশাস দ্বীপের বাসিন্দা একজাতীয় কদাকার পাখী। এরা উড়তে পারত না, আত্মরক্ষার ক্ষমতাও এদের ছিল না। তা সত্ত্বেও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে এরা টি'কে ছিল তার কারণ হচ্ছে এই যে, স্বাভাবিক শত্রুদের এলাকা থেকে দূরে একটি দ্বীপে গিয়ে এরা বসতি স্থাপন করেছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়াকার দিকে পর্তুগীজ সমুদ্র-যাত্রীরা মরিশাস আবিষ্কার করল আর সঙ্গে সঙ্গেই ডোডোদের দুর্দিন ঘনিয়ে এল, কতকগুলি পাখীকে পাঠানো হ'ল ইয়োরোপে, সেখানে পৌছবার কিছুকাল পরেই তারা মারে গেল, অবশিষ্টদেরকে পর্যটকরা নির্বিচারে মেরে ফেলতে লাগল। ক্রমে ডোডো হয়ে দাঁড়াল দুষ্প্রাপ্য প্রাণী এবং অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

নিশ্চিতভাবে যতদূর জানা যায় ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে অন্ততঃপক্ষে একটি ডোডো জীবিত ছিল। এটিই হচ্ছে ডোডোদের শেষ বংশধর।

ডোডোদের চেয়েও শোচনীয় হচ্ছে বিরাটকায় অক পাখীদের দুর্ভাগ্য। এরাও উড়তে পারত না। প্রধানতঃ এদের শিকার করা হ'ত খাদ্যের জন্য। শেষ পর্যন্ত এরা আইসল্যাণ্ড থেকে পনের মাইল দূরবর্তী একটি

স্তব্ধ প্রহর

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

পাঁচ

পরের মুহূর্তটা একান্ত অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারত।

আর কেউ হ'লে শোভনার গলার স্বরে ও বলার ধরনেই ব্যাপারটার মধ্যে একটা গোলযোগ অনুমান ক'রে নিত বোধ হয়।

কিন্তু নিখিল বক্সী সে ধার দিয়েই গেল না।

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললে, ও, একটু রাগারাগির পালা চলছে বুঝি! দেখুন আমার কাছে পর্যন্ত ধরা প'ড়ে গেলেন! কিন্তু ভদ্রলোককে না জেনেই তাঁর হয়ে একটু ওকালতি না ক'রে পারছি না। তাঁর ক্যান্‌ভাসার গোছের কোন টহলদারী চাকরি ব'লেই মনে হচ্ছে। তাতে সব সময়ে খবরাখবর নেওয়া-দেওয়া কি শক্ত তা ত আপনি বুঝবেন না। আরে, আমি নিজে যে ও কাজও করেছি কিছুদিন। ভুক্তভোগী হিসেবে তাই জানি। এ ত আর আমরা-চোমরাদের টুর-প্রোগ্রাম নয়। একচুল এদিক্-ওদিক্ নড়-চড় হবে না।…

শোভনা অস্বস্তিতে শুধু নয়, কতকটা অধৈর্যে ও ক্ষোভেই বাধা দিয়ে একবার বলবার চেষ্টা করলে,—আপনি ভুল করছেন…

কিন্তু নিখিলের তখন নিজের কথাই পাঁচ-কাহন। বাধাটা গ্রাহ্য না ক'রেই ব'লে চলল, ভুল করব কেন? কিচ্ছু ভুল করি নি। চাকরিটা কি তাই না-হয় জানি না, কিন্তু ঘোরাফেরার চাকরি ত বটে। সুতরাং অমন চিঠির গোলমাল এক-আধবার হয়-ই।

শোভনা আর প্রতিবাদ না জানিয়ে নিখিলের ধারণাটাকেই প্রশ্রয় দেওয়া এক্ষেত্রে যুক্তিযুক্ত মনে করলে। একটু ম্লান হেসে বললে, আপনি যা বুঝতে চান বুঝুন, কিন্তু ও প্রসঙ্গ এখন থাক।

থাকবে কেন? নিখিল বক্সী নাছোড়বান্দা,—ব্যাপারটা কি জানেন! আপনারা, এ যুগের মেয়েরা, গাছেরও খেতে চান, তলারও কুড়োতে। এদিকে স্বাধীন — আবার পরাধীনতার সুবিধেগুলোও ষোল আনা আদায় ক'রে ছাড়বেন।

শোভনা অবশ্য বলতে পারত কঠিন হয়ে, আপনার সঙ্গে মাত্র আজ সকালে আলাপ নিখিলবাবু, এ সব কথা আলোচনা ক'রে আপনি একটু বেশী অনধিকার চর্চা করছেন না কি?

কিন্তু মনে এলেও মুখে তা বলতে পারল না। তার বদলে নিখিল বক্সীর কথাটারই খোঁচ ধ'রে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে, পরাধীনতার সুবিধেটা কি বস্তু! একটু যেন উল্টো কথা শুনছি।

উল্টো নয়, সোজা সত্য। শুধু আমাদের দেখার দোষে উল্টো। পরাধীনতারই ত যত কিছু সুবিধে, যত দায় সব স্বাধীনতার। পরাধীন সেজে মেয়েরা কি সুবিধে ভোগ করতেন জানেন না! ভরণ-পোষণ ত বটেই, তা ছাড়া বিবেকের বালাই যাদের একটু-আধটু ছিল তাদের কাছ থেকে এক রকম নৈতিক জুলুমের জিজিয়া। আহা, ওরা অবলা, আহা, ওরা বন্দিনী অসহায়। সুতরাং সব কিছুতে ষোল আনার ওপর আঠার আনা আস্কারা দাও। আমার মতে এ যুগের স্বাধীনের সঙ্গে স্বাধীনার বিয়ে তাই অন্য রকম বোঝাপড়ার ওপর হওয়া উচিত। প্রত্যেকের বেলা আলাদা চুক্তি, শুধু কয়েকটা সামাজিক নিয়মকানুন মানলেই হ'ল।…

নিখিল নিজেই তার পর হো হো ক'রে হেসে উঠল—আমাকে চিনে ফেলেছেন এতক্ষণে বোধ হয়। একবার সুরু করলে আর থামতে পারি না। কোথা থেকে কোথায় যে চ'লে যাই।—আচ্ছা, বৃষ্টিটা সত্যিই থেমেছে। চলি।

নিখিল সত্যিই আর একটি কথাও না বাড়িয়ে চ'লে গেল। যেমন আচমকা এলোমেলো কথা বলার ধরন, তেমনি আসা-যাওয়া সব কিছু।

যাবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়েও যায় নি।

দরজা দিয়ে বৃষ্টি-ধোয়া আকাশটা দেখা যাচ্ছে, এ বাড়ীর ভাঙা দেওয়ালের ওধারে ক'টা নারকেল গাছ আর দূরের একটা মন্দিরের চূড়ার মাথায়।

মনটা এই আকাশের মতই প্রসন্ন ক'রে রাখতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু পারা যাচ্ছে কই।

নিখিল বক্সী শুধু ঘরের দরজাটা নয়, আরেকটা দরজাও আবার খুলে দিয়ে গেছে। চেষ্টা ক'রেও সেদিক্ থেকে মন ফেরানো যাচ্ছে না।

এ যুগের বিবাহ-বন্ধন অন্য রকম হওয়া উচিত ?

কি রকম ?

ছু'জন মানুষের ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক ব্যর্থ কি সার্থক হয় শুধু কি বন্ধনের দোষে-গুণে ?

যত শক্ত ক'রেই বাঁধ, কি যত আলগাই দাও, সে সবই অবান্তর।

আইন সর্ত চুক্তি বুঝে কেউ ভালবাসে না, সে-সব বন্ধনের শাসনে ভালবাসাকে জীইয়ে রাখাও যায় না।

নিখিল বক্সীর জীবনের তেমন কোন অভিজ্ঞতা আছে ব'লে মনে হয় না। পুঁথি-পড়া ভাবনা নাড়াচাড়া করাই বোধ হয় বিলাস। তবু ওর সঙ্গে একদিন তর্ক করতে ইচ্ছে করে।

তর্ক অবশ্য নিজেরই সঙ্গে। তবু একটা উপলক্ষ্য এক-এক সময়ে দরকার হয়।

কিন্তু তর্ক ক'রে লাভ কি ? নিজেই মনে ক'রে অবাক্ হয় যে, একদিন কোন তর্ক ত তার জীবনে ছিল না! জীবন যখন সত্যিই বয়ে চলেছিল তখন প্রশ্ন বা তর্ক ওঠবার কোন অবকাশই ত হয় নি। আজ জীবন হঠাৎ থেমেছে ব'লেই যেন এত সব বিচার-বিতর্ক শ্যাওলার মত জাগছে।

দুঃখ সেদিন ছিল, অভাব, অভিযোগ, আঘাত। কিন্তু জীবন নিজের বেগে সব তুচ্ছ ক'রে গেছে।

দুঃখের সঙ্গে পরিচয় তার ত অতি ছোট বয়সেই।

সেই মামুলি ইতিহাস। বাবা অকালে মারা গেলেন অনেক দিন রোগে ভুগে ভুগে। পুঁজি-পাটা যা ছিল বাবার চিকিৎসাতেই সব তখন ফুরিয়ে গেছে।

শহরের অপেক্ষাকৃত ভদ্র-পাড়ার বড় রাস্তার ধার ছেড়ে গলির ভেতর বাড়ী বদল করতে হয়েছিল প্রথম। শোভনা তখন কতটুকু আর। আর সকলের কি রকম লেগেছিল জানে না, কিন্তু তার নিজের ত মজাই লেগেছিল মনে আছে। বড় রাস্তার ধারে ব'লে আগের বাড়ী থেকে বেরোনো সম্বন্ধে কড়াকড়ি ছিল—পাছে গাড়ী-ঘোড়া চাপা পড়ে। গলির বাড়ীতে সে রকম কোন শাসন নেই। নিজের খুশিতে যখন সুবিধে ঘুরে এস। সেই ট্রাম লাইন পর্যন্ত না গেলেই হ'ল।

ট্রাম লাইন পর্যন্তও একদিন গেছল একা একা সাহস ক'রে।

সেইখানেই বড় মামা ধ'রে ফেলেছিলেন। তার পর বাড়ীতে এনে কি বকুনি মা-কে। মেয়েটাকে একেবারে ইল্লুতে হাঘরের মেয়ে ক'রে ছাড়ছ। আজ ওই ছেঁড়া ময়লা ফ্রক প'রে ভিখিরীদের মেয়ের মত দেখি ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ ক'রে সেই ট্রাম লাইনের ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারুর কাছে যে হাত পাতে নি তারই বা ঠিক কি ?

মা গম্ভীর হবার ভান ক'রে বলেছিলেন, হ্যাঁ রে, হাত পেতেছিলি নাকি ? কই, দেখি কত পেলি ?

মা'র কথার ওই ধরন চিরকাল। তাতে হাসি পাওয়াই উচিত। কিন্তু বড় মামা তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠেছিলেন। রেগে বলেছিলেন, দোষ ত তোর ! মায়ের শিক্ষা না থাকলে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় ? আমার আর কি বল না ! ভাগনীর জন্যে ত আমার মুখে আর চুণ-কালি পড়বে না, কিন্তু ছ'-আনির মজুমদার বংশের নাম যে রসাতলে যাচ্ছে !

বকুনিটা এখনও যে প্রায় মুখস্থ আছে তার কারণ ওই বকুনিরই একটু হেরফের ফ্রক ছেড়ে শাড়ী পরা পর্যন্ত কতবার যে শুনেছে তার হিসেব নেই। বড় মামার আর্তনাদই ছিল ওই এক ভয় নিয়ে—ছ'-আনির মজুমদার বংশের নাম ডুববে।

একটা কিছু খুঁত পেলেই ওই কথাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতেন।

মা ঠাট্টা ক'রে হাল্কা ক'রে দিলেও প্রথমবারের বকুনিতে সত্যি ভয় পেয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন বাদে তার কাছেও এটা হাসির ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

বড় মামা বকুনি সুরু করতেই মনে আছে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, ছ'-আনি মানে কি বড় মামা ? মজুমদারদের শুধু ছ'-আনা পয়সা ছিল ?

তা ত বলবি-ই রে হতভাগী ! বড় মামার রাগটা প্রায় কাঁদুনি হয়ে উঠেছিল, নিজের বংশের কিছু ত আর জানলি নে। আর জানবি-ই বা কি ক'রে ? সে রবরবার দিনে ত আর আসবার ভাগ্যি করিস্ নি। মজুমদারদের দরজায় হাতী বাঁধা থাকত, বুঝেছিস !

তার পর সে দরজা ভেঙে হাতী ভেতরে ঢুকল আর মজুমদাররা বেরিয়ে এল, জায়গা না পেয়ে, না দাদা ? মা তাঁর নিজস্ব ধরনের চিম্‌টিটুকু কেটে মুখ টিপে হেসে-ছিলেন।

বড় মামা হতাশ ভাবে হাত নেড়ে বলেছিলেন, মজুমদার বাড়ীর বৌ হয়ে তুই-ই যদি অমন ঠাট্টা করিস্ সুরো, তাহলে তোর মেয়ের এমন হাঘরে হালচাল হবে না কেন ? আরে, আমি ত আর বানিয়ে কিছু বলছি না ! জামজুড়িতে মজুমদারদের গড়-বাড়ী দেখে এখনও লোকে হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এই আমাদের বংশই ছিল আখ্‌খুটে হাঘরে। না-চাল না-চুলো। নিজের বংশ ব'লে ত আর বাড়িয়ে বলতে পারব না ? মজুমদার

বাড়ীতে মেয়ে দিতে পেরে আমরা বর্তে গিয়েছিলাম, বুঝেছিস্!

যাব, একবার নিয়ে যাব তোকে সে গড়-বাড়ী দেখাতে—বড় মামা শোভনাকেই লোভ দেখিয়েছিলেন তার পর।

একটু আতর-টাতর মেখে যেও দাদা। বড় নাকি বাদুড়-চামচিকের গন্ধ—ব'লে মা আর সেখানে দাঁড়ান নি।

বড় মামা শোভনাকেই সালিশ মেনেছিলেন নিরুপায় হয়ে—শুনলি, তোর মা'র কথা শুনলি! নিজের শ্বশুর-বাড়া নিয়ে এমন ঠাট্টা-মস্করা কোন মেয়ে করে! আরে, আজই না হয় তারা প'ড়ে গেছে। কিন্তু তারা রাজা ছিল, বুঝেছিস্, রাজা!

এ ধরনের মজার বকাবকি তাদের বাড়ীতে অনেকবার হয়েছে। বড় মামা সত্যিই ছিলেন নেহাৎ সাদাসিধে ভালমানুষ। নিজের চেয়ে ভগ্নীপতির বংশ-মর্যাদাই তাঁর কাছে সব। তাই নিয়েই তাঁর যত মাথা-ব্যথা।

মাথাব্যথার কারণ শোভনাই বেশীর ভাগ হয়েছে অবশ্য।

ছেলেবেলাতেই মা'র আলগা শাসনে যেখানে-সেখানে যখন-তখন ঘুরে বেড়ানো তার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মা সত্যিই কখনও এ নিয়ে রাগ করেন নি তাঁর শাসনের ধরনই ছিল আলাদা। বড় মামাই মদার বাড়ীর মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে হা-হুতাশ করতেন মাঝে মাঝে।

কিন্তু বড় মামাও শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করেছিলেন।

তখন সে গলির বাড়ীও ছেড়ে তাদের শহরতলির নোংরা ঘিঞ্জি পাড়ায় উঠে যেতে হয়েছে। পাকা ছাদের বদলে টিনের চালা। সেখানেও চালানো দায় হয়েছে মা'র। শোভনা তখন বড় হয়ে বুঝতে শিখেছে। বুঝেছে কিন্তু সে নিজের থেকেই। মা তাকে কোনদিন কিছু বলেন নি। তাঁর তা স্বভাবই নয়। তাঁর চিরকাল সেই সদাপ্রসন্ন মুখ, সেই সব কথায় নির্দোষ চিমটি কাটা স্বভাব।

শোভনা তখন স্কুলে পড়ছে। স্কুলের বেড়া পার হ'তে আর বেশী দেরীও নেই। অত অভাব-অনটনের ভেতরও মা তাকে স্কুল থেকে ছাড়ান নি। বড় মামারও সে ইচ্ছে ছিল না। তবু তিনিও একদিন নিরুপায় হয়ে বলেছেন, ভাবছিলাম কি জানিস সুরো, শোভা আর স্কুলে যদি না যায় ত ক্ষতিটা কি? বাড়ী থেকেও ত প'ড়ে পরীক্ষা দেওয়া যায়।

শোভনা ঘরের ভেতর থেকে পড়া থামিয়ে বারান্দার দিকে কান খাড়া ক'রে রেখেছিল মা'র উত্তরের জন্যে। মা ও বড় মামা বাইরের বারান্দায় ব'সেই কথা বলছিলেন। একটি ঘর আর বারান্দা নিয়েই তাদের বাসা।

মা'র উত্তর দিতে একটু দেরী হয়েছিল; কিন্তু শেষে তাঁর সেই নিজস্ব ধরনে বলেছিলেন, বাড়ীতে থেকে পড়লে বিঘ্ন বড় বেশী হয়ে যাবে দাদা! তখনও মেয়েকে সামলানো দায় হবে:

বড় মামা আর কিছু বলেন নি।

তাঁর অবশ্য উদ্বিগ্ন হবার কারণ ছিল। বাবার মৃত্যুর পর জীবনবীমা থেকে মা কিছু পেয়েছিলেন। তাই দিয়েই তাদের চ'লে এসেছে কোন রকমে। একটা আশা ছিল, দেশের জমিজমা সম্পত্তির ভাগ বিক্রী ক'রে কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু পাঁচ শরিকের ঝগড়ায় মামলা-মকদ্দমায় সে আশা আর সফল হয় নি। বড় মামার নিজের একপাল ছেলেপুলের সংসার। একটি মাত্র বোন অত্যন্ত আদরের ব'লে যতখানি সম্ভব তার সব দায় আদায় সামলাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজে থেকে সাহায্য করবার ক্ষমতা নেই। ক্ষমতা থাকলেও মা তা গ্রহণ করতেন না নিশ্চয়। বাবার মৃত্যুর পর বড় মামার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেন নি। নিজে আলাদা হয়ে থেকেছেন সমস্ত অসুবিধে সত্ত্বেও। বোনের মন মেজাজ বুঝে বড় মামাও একবারের বেশী অনুরোধ করেন নি।

সেই বড় মামা হঠাৎ মারা যাওয়ার পরই সত্যিকার অকূলপাথার কাকে বলে তারা বুঝল। শোভনা স্কুলের পড়া শেষ ক'রে তখন কলেজে সবে ঢুকেছে। সে কলেজে পড়া তাকে ছাড়তে হ'ল; শহরতলির সে বাসার ভাড়া গোনাও আর সম্ভব হ'ল না। উঠে আসতে হ'ল সেই আধা-বস্তির পাঁচ ভাড়াটের এজমালি বাসায়, যেখান থেকে তার জীবনের অপ্রত্যাশিত নতুন বাঁক সুরু।

মা কি এবার ভেঙে পড়েছিলেন?

না, এতটুকু না। ভাগ্য যত নির্মম হয়েছে মা'র সেই প্রচ্ছন্ন কৌতুকের উৎস তত যেন উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

পাড়া-পড়শীরা কেউ হয়ত এসে বলেছে, হ্যাঁগা, এবার মেয়ের বিয়ে দিলে হয় না!

মা গম্ভীর হয়ে বলেছেন, তা হয় বই কি দিদি। দিলেই ত হয়। শুধু রেয়াই পছন্দ হয় না যে!

কেউ বুঝে হেসেছে। কেউ না বুঝে মনে মনে বিরক্ত হয়েছে।

আগেকার দিন কি গাঁ দেশ হলে হয়ত কথা উঠত, নিন্দে রটত। কিন্তু সে-সব কিছু অন্ততঃ হয় নি। এই আধাবস্তির পাড়ায় রসাল পরচর্চা হয় না এমন নয়, কিন্তু আইবুড়ো মেয়ের বয়স তার বিষয়ের মধ্যে বড় একটা পড়ে না।

অভাবের সত্যিকার গ্লানি ও জ্বালা যে কি, তখনই প্রথম বুঝতে হয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত যেমন ক'রে হোক তাকে অনেকখানি আড়ালেই রাখা হয়েছে। রেখেছে অবশ্য মা আর বড় মামা। বড় মামাই বুঝি বেশী। সেই সাদাসিধে ভালমানুষ সংসারের সঙ্গে যুঝবার অনুপযুক্ত বড় মামা। যিনি নিজের একপাল ছেলেপুলের সংসার কোন রকমে চালিয়েও বোনের দায় ঘাড়ে নেবার সময় ক'রে নিয়েছেন। যোগ্যতার অভাবে বুদ্ধির দোষে হয়ত অনেক ভুলই করেছেন, মামলা-মকদ্দমায় পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু শোভনা কি তার মা'র গায়ে আঁচটি যাতে না লাগে তার চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।

বড় মামার মৃত্যুর পর শোভনাকেই সব কিছুর দায় নিতে হয়েছে। বাবার জীবন-বীমা থেকে পাওয়া টাকা পোষ্টাপিসে জমা ছিল। তারই আসল আর সুদ ভাঙিয়ে ভাঙিয়ে এতদিন চলত। শোভনা খবর নিতে গিয়ে জেনেছে, যে-তলানিটুকু তার অবশিষ্ট আছে তা দিয়ে তাদের মা-মেয়ের হু'টো মাসের নুন ভাত বড় জোর জুটতে পারে। অবাক্ কিন্তু তাতে হয় নি, অবাক্ হয়েছে বড় মামার এমন আশ্চর্য ভাবে এই সময়টিতেই মারা যাওয়ায়। তিনি যেন আর এ করুণ প্রহসন টানতে পারবেন না বুঝেই নিজের যবনিকা ফেলবার সময়টা নিজেই বেছে নিয়েছিলেন।

শোভনা প্রথমে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল বটে, কিন্তু মা'র মত শক্ত না থাক, হতাশায় ভেঙেও ত পড়ে নি। বরং কেমন একটা উত্তেজনাই অনুভব করেছে এই পাহাড়-প্রমাণ দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়তে হবে ব'লে।

তা ছাড়া তার জীবনে তখনই আর এক ঢেউ দোলা দিতে সুরু করেছে।

অনুপমের সঙ্গে তখনই তার পরিচয়।

শোভনার হঠাৎ চমক ভাঙে। আশুবাবুর চাকর মধু এসে ডাকছে।

সত্যিই ত! অনেক আগেই তার ওঠা উচিত ছিল। লজ্জিত হয়ে সে তাড়াতাড়ি আশুবাবুর ঘরের দিকে যায়।

কিন্তু যেতে যেতে তার মন কেমন যেন বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। ভাগ্যের এই অনুগ্রহটুকুতে কৃতজ্ঞতার বদলে যেন জ্বালাই ধরে মনে।

কোন রকমে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার এই সুবিধাটুকু পেয়েই সে কি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবে?

ক্রমশঃ

সূর্য
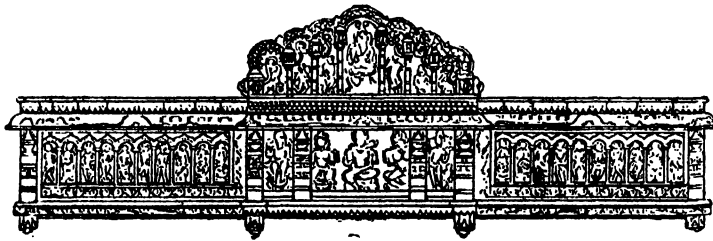
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন মানুষ সর্বপ্রথমে যা দে'খে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল তা হ'ল আকাশ ও পৃথিবী। অনন্ত রহস্যে ভরা এই বিশ্বপ্রকৃতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল মানুষের বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির সামনে। মানুষ অবাক্ হয়ে দেখল, রাত্রিশেষে পূবের আকাশ ক্রমশ লাল হয়ে ওঠে, আর প্রকৃতির বুক থেকে অন্ধকারের কালো আবরণ ধীরে ধীরে স'রে যায়। একটু পরেই দেখা যায়, অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় দিক্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করে প্রকাণ্ড একটা লাল রঙের থালার মতো সূর্য দেখা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে শান্তসমাহিত পৃথিবীর বুকে জেগে ওঠে প্রাণের সাড়া, সমগ্র বনভূমি পাখীর কাকলীতে মুখরিত হয়ে ওঠে। অন্ধকারের মাঝে এই যে আলোর প্রকাশ, যা থেকে এক মুহূর্তে পৃথিবীর সব-কিছুই সুন্দর ও প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে তা দেখে মানুষের মনে অপূর্ব বিস্ময় জাগা, অপূর্ব পুলকের সঞ্চার হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন হওয়ার এটাই সবচেয়ে উপযুক্ত মুহূর্ত।

সূর্যই আমাদের জীবন ও কর্মের প্রেরণাদাতা। সূর্যের অফুরন্ত তেজ-শক্তিকে আশ্রয় করেই পৃথিবী হয়েছে শস্য-শ্যামলা, ফুলে-ফলে ভরা, দিকে দিকে জেগে উঠেছে প্রাণের স্পন্দন। সূর্য-রশ্মির সংস্পর্শে এসে পৃথিবী কলুষমুক্ত হয়, আমাদের দেহমন পবিত্র হয়। বাস্তবিক যুগ যুগ ধ'রে সূর্য আমাদের প্রভূত আলোক এবং তাপ-শক্তি দান করছে ব'লেই আমাদের প্রাণের স্পন্দন বজায় রয়েছে। সূর্যের অভাবে এই পৃথিবীর কি দশা হবে তা ভাবতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এই শস্য-শ্যামলা সুন্দর পৃথিবী অন্ধকার, তুহিন-শীতল, জনপ্রাণিহীন মরুভূমিতে পরিণত হবে। প্রাচীন ঋষিগণ এ কথা সহজেই উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তাঁরা সূর্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করতেন। তাঁদের মন্ত্র ছিল "ওঁ জবাকুসুম
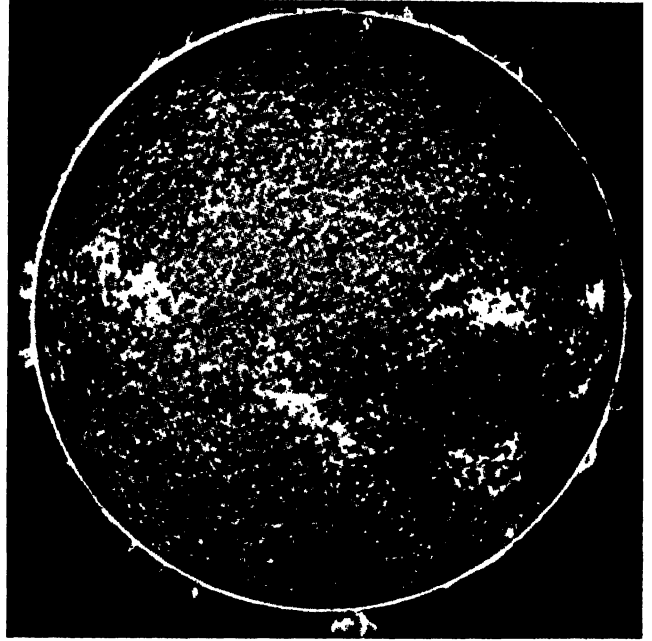
সূর্যপৃষ্ঠের আলোক চিত্র

সংকাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্"। এ ছাড়া প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণকে যে ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতে হয় তাতে আছে "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"। আমরা সেসব সবিতার বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি, যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন।

রাতের আকাশে যা সবচেয়ে সহজে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল তা হ'ল চাঁদ। সূর্য অস্তমিত হ'লে, গোধূলির সোনাকে সরিয়ে জ্যোৎস্নার হীরা ঝরতে থাকে, লক্ষ-কোটি তারার মুক্তা ফুটে ওঠে। নীলাম্বরীর আঁচল চুঁইয়ে আলো ঝরে ঝির ঝির! উঁচু পাহাড়ের চূড়া
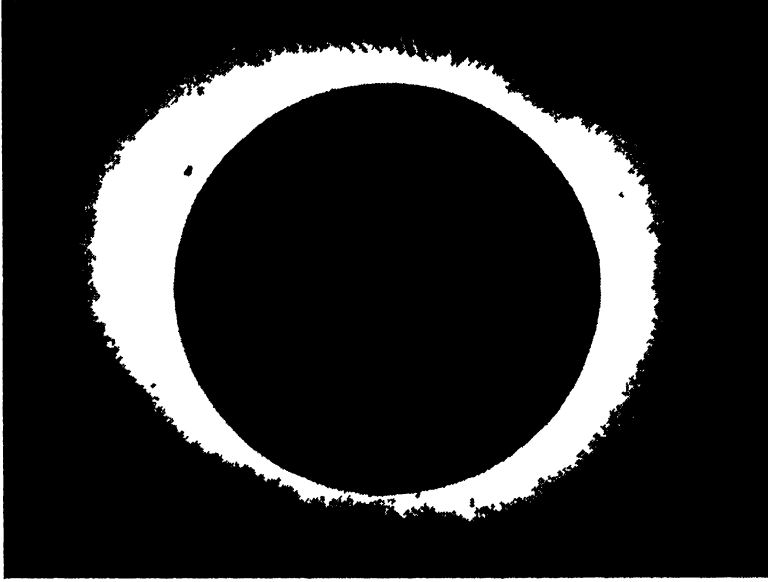
ছটামণ্ডল

নদ-নদী, বন-উপবন, সব যেন অপরূপ এক কিরণরেখায় ঝলমল করতে থাকে। চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমগ্র পৃথিবীর বরতনু যেন এক মোহময় মাদকতায় ভ'রে ওঠে!

বৈদিক ঋষিগণ ব্রহ্মের যে বিরাট্ রূপ বর্ণনা করেছেন, সূর্য ও চন্দ্রকে তাঁর দুটি চক্ষুরূপে কল্পনা করেছেন—"অগ্নির্মূর্ধা চক্ষুষি চন্দ্রসূর্যৌ"। এই পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু প্রকাশিত, তাই আমরা দেখতে পাই এই দু'টি চক্ষুর সাহায্যে।

রহস্যময় এই প্রকৃতি। তাই একদিকে দেখতে পাই প্রখর রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিবা-দ্বিপ্রহর, আর একদিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় ভরা মোহময় রাত। এ দু'য়ের মধ্যে কত প্রভেদ! একের চোখ-ঝলসানো রুদ্র রূপ, অন্যটির মনোমুগ্ধকর শান্তস্নিগ্ধ মূর্তি। চাঁদের রূপ গরব করবার মত, এটা ঠিক, কিন্তু এজন্য সূর্যের দান কম নয়! সূর্য যদি তার অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সব সময় প্রচুর সূর্যকিরণ বিলিয়ে না দিত, তবে কোথায় থাকত চাঁদের এমন রূপের গরব? অন্ধকার কালো আকাশে সে ঘুরে বেড়াত ঠিকই, কিন্তু মর্ত্যের মানুষের কাছে তার এই সুন্দর স্নিগ্ধ রূপ অপ্রকাশিত থেকে যেত, চিরকালের মত। এজন্য হিন্দুদের কাছে চাঁদের চেয়ে সূর্যই অধিকতর বরণীয়।

সূর্যের স্বরূপ কি, তাই এখন আলোচনা করা যাক। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, যেখানে পৃথিবীর ব্যাস প্রায় ৮,০০০ মাইল সেখানে সূর্যের ব্যাস প্রায় ৮,৬৪,০০০ মাইল। এই হিসেবে পৃথিবীর পরিধি হ'ল প্রায় ২৫,০০০ মাইল, আর সূর্যের পরিধি প্রায় ২৭,০০,০০০ মাইল। এতে সূর্যের আয়তন দাঁড়ায় পৃথিবীর প্রায় তের লক্ষ গুণ। ধরা যাক, একটা রেল গাড়িতে চেপে সমস্ত পৃথিবীটা একবার ঘুরে আসতে লাগল সাড়ে চৌত্রিশ দিন, তা হলে সেভাবে সূর্যের উপর দিয়ে ঘুরে আসতে লাগবে প্রায় দশ বছর চার মাস। এতেই বোঝা যাবে পৃথিবীর তুলনায় সূর্য কত বড়। আবার সূর্যের ওজনও (ভর) নেহাৎ কম নয়, ২ × ১০^৩৩ গ্রাম (পৃথিবীর ওজন ৬ × ১০^২৭ গ্রাম)। অর্থাৎ সূর্য পৃথিবীর প্রায় তিন লক্ষ ত্রিশ হাজার গুণ ভারি। পৃথিবীর মত সূর্যও সব জিনিসকে আকর্ষণ করছে, কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে সূ বহু গুণ ভারি ব'লে তার আকর্ষণী শক্তিও অনেক প্রবল বিজ্ঞানীর হিসাবে পৃথিবীতে যা এক মণ ভারি তাই সূ প্রায় ২৭ মণ ভারি ব'লে মনে হবে।

নানারূপ পরীক্ষার ফলে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছেন যে, সূর্য একটি জ্বলন্ত গ্যাস পিণ্ড। এর কোথাও কঠিন বা তরল পদার্থের অস্তিত্ব নেই। পৃথিবীতে যেমন বা মণ্ডল আছে সূর্যের চারিদিকেও তেমনি একটি গ্যাসের আবরণ রয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল শীতল ব'লে নিস্ত কিন্তু সূর্যের এই আবরণটি ভয়ংকর উত্তপ্ত, সর্বদাই জ্বল ব'লে মনে হয়। সূর্যকে মোটামুটি তিনটি মণ্ডলে ভা
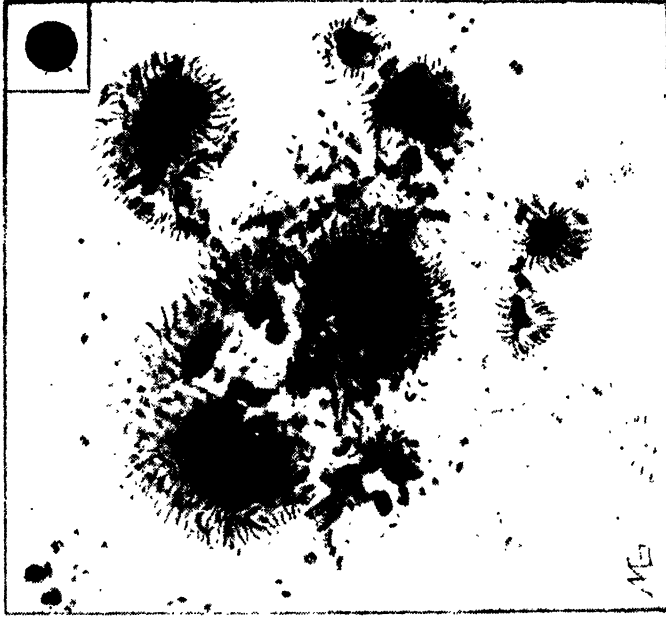
সৌরকলঙ্ক

করা হয়েছে—আলোকমণ্ডল, বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল।

খালি চোখে আমরা সূর্যের যে অত্যুজ্জ্বল আলোকময় অংশ দেখতে পাই, তাকে আলোকমণ্ডল (photo sphere) বলা হয়। এর সকল অংশ কিন্তু সমান উজ্জ্বল ব'লে মনে হয় না—মধ্য ভাগ প্রান্তদেশ অপেক্ষা বেশি উজ্জ্বল দেখায়।

রঙিন কাঁচে ঢাকা দূরবীণের সাহায্যে সূর্যের উজ্জ্বল গায়ে অনেক কালো কালো দাগ দেখা যায়, ওগুলো সৌরকলঙ্ক (Sun-spots)। এগুলি এক-একটি বিরাট্ গহ্বর, এদের কোনটি এত বড় যে হু'তিনটি পৃথিবী অনায়াসে তার মধ্যে তলিয়ে যাবে। সৌরকলঙ্ক পরীক্ষা ক'রে বোঝা গেছে যে, পৃথিবীর মত সূর্যও নিজের মেরুদণ্ডের উপর পাক খাচ্ছে। কিন্তু সূর্যের সকল অংশের ঘুরবার বেগ সমান নয়। নিরক্ষরেখার উপরস্থ অংশ ২৪ দিন ১৬ ঘণ্টায় একবার ঘুরে আসে কিন্তু মেরুপ্রদেশস্থ অংশের ঘুরতে লাগে প্রায় ৩৪ দিন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সূর্য ঘনীভূত পদার্থ নয়—অতি উত্তপ্ত গ্যাসের সমুদ্র বিশেষ।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্য-পৃষ্ঠে মাঝে মাঝে ভয়ংকর ঘূর্ণবাতের সৃষ্টি হলে অথবা অত্যুচ্চ তাপমাত্রায় অভ্যন্তরস্থ গ্যাসরাশির প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলে এইরূপ কলঙ্কের সৃষ্টি হয়। এই জ্বলন্ত গ্যাসরাশি অলোকমণ্ডল ভেদ ক'রে উপরে উঠে আসাতে তার উষ্ণতা হঠাৎ কমে যায়, এর ফলে অত্যুজ্জ্বল আলোকমণ্ডলের তুলনায় তাকে অপেক্ষাকৃত নিষ্প্রভ ও কালো দেখায়। একটা এক হাজার ওয়াট বৈদ্যুতিক বাতির পাশে একটি মোমবাতিকে যেমন দেখায় অনেকটা সেরকম। সূর্য গোলকের মেরু অঞ্চলে এদের সৃষ্টি হয়, তার পর এরা ক্রমশ নিরক্ষরেখার দিকে স'রে এসে মিলিয়ে যায়। সাধারণত ১১ বছর পর পর এদের সংখ্যা অত্যন্ত বেড়ে যায়। যে-বছর সৌরকলঙ্কের সংখ্যা বেশি হয় সেবার ভূ-পৃষ্ঠে গ্রীষ্মের তীব্রতা বাড়ে, বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধতম প্রদেশ তড়িৎভাবাপন্ন হয় এবং পৃথিবীতে চুম্বক-ঝড়ের প্রকোপ দেখা দেয়। এর ফলে তড়িৎ সরবরাহ, টেলিগ্রাফ, বেতার, প্রভৃতি কাজে বিঘ্ন ঘটে।

আলোকমণ্ডলের বাইরের অংশকে বিশোষণমণ্ডল (Reversing layer) বলা হয়। সূর্যের আলো যখন এই মণ্ডলের ভেতর দিয়ে আসে তখন সেখানকার উত্তপ্ত গ্যাসরাশি নিজ নিজ বর্ণালীর আলো সূর্যালোক থেকে শোষণ ক'রে নেয়। একটি প্রিজ্‌ম্ বা ত্রিপার্শ্ব কাচের ভিতর দিয়ে সূর্য-রশ্মি পাঠালে তা সাতটি বর্ণে ভাগ হয়ে যায়, এর নাম বর্ণালী (spectrum)। কিন্তু বর্ণালীবীক্ষণ

সূর্যপৃষ্ঠের একটি অংশ

তরল পদার্থের মতো টগবগ ক'রে ফুটছে। বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-সংকুল সমুদ্রের সঙ্গেই শুধু এর তুলনা চলে। যেখানে ক্যাল্‌সিয়াম অথবা হাইড্রোজেন বাষ্প অপেক্ষাকৃত উত্তপ্ত সেখান থেকে অপেক্ষাকৃত বেশিমাত্রায় তেজঃশক্তি নিঃসৃত হয়, তাই সে জায়গা অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল দেখায়। আর যেখানে উষ্ণতা কম, সে জায়গা নিষ্প্রভ দেখায়। সূর্যপৃষ্ঠের আলোকচিত্রে এরূপ যেসব উজ্জ্বল এবং নিষ্প্রভ দাগ দেখা যায়, তাদের সৌর-বুদ্‌বুদ্‌ flocculi) বলা হয়। সৌর-বুদ্‌বুদ্‌ ক্ষণস্থায়ী, দেখা যাওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে মিলিয়ে যায়। সময় সময় এর মাঝে সৌর-কলঙ্কও বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়।
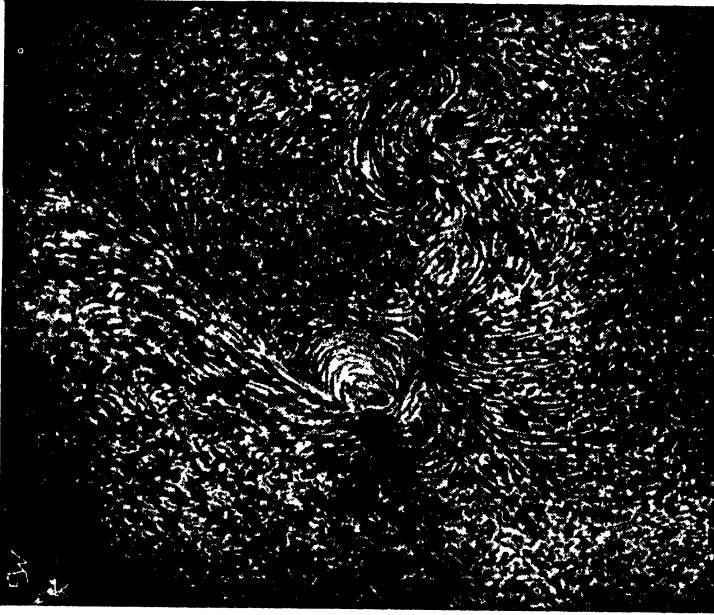
যন্ত্র সাহায্যে সৌর-বর্ণালী পরীক্ষা করলে তা নিরবচ্ছিন্ন মনে হয় না, মাঝে মাঝে অনেক কালো রেখা দেখা যায়। এদের ফ্রনহফার রেখা (Fraunhofer lines) বলা হয়। এসব কালো দাগ বিশ্লেষণ ক'রে দেখা গেছে যে সূর্যও পৃথিবীর মতো হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হিলিয়াম, কার্বন, সোনা, রূপা, লোহা, নিকেল, সোডিয়াম, ক্যাল্‌সিয়াম, প্রভৃতি উপাদানে গঠিত।

পৃথিবীর বাইরে যেমন বায়ুমণ্ডল আছে, সূর্যের চারদিকেও তেমনি জলন্ত গ্যাসের আবরণ আছে। এর নাম বর্ণমণ্ডল (Chromosphere)। এর বিস্তৃতি ৭।৮ হাজার মাইল। সূর্যের তীব্র আলোকে এর অস্তিত্ব বোঝা যায় না। পূর্ণ সূর্য-গ্রহণের সময় চন্দ্র সূর্যের আলোকমণ্ডল ঢেকে ফেলে, তাই শুধু তখনই বর্ণমণ্ডল দেখা সম্ভব হয়।

উত্তপ্ত ক্যাল্‌সিয়াম অথবা হাইড্রোজেন বাষ্প থেকে যে আলো পাওয়া যায়, শুধু সেই আলোটুকু সংগ্রহ ক'রে সূর্যের আলোকচিত্র গ্রহণ করলে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। মনে হয়, সূর্য-পৃষ্ঠে জলন্ত গ্যাসরাশি যেন উত্তপ্ত

ক্যাল্‌সিয়াম-আলোকে গৃহীত আলোকচিত্র স্থূল ও অস্পষ্ট। সে তুলনায় হাইড্রোজেন-আলোকে গৃহীত আলোকচিত্র অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় কখন কখন আর একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায়। মাঝে মাঝে এক-একটি প্রচণ্ড লেলিহান রক্তবর্ণ অগ্নিশিখা সূর্য-পৃষ্ঠের ঊর্ধ্বদেশে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এরই নাম সৌরশিখা (Solar prominence)। সৌরশিখা বর্ণমণ্ডল থেকে উঠে আসে এবং কোন কোন সময় দশ লক্ষ মাইল দূর অবধি ছড়িয়ে পড়ে। অধিকাংশ সৌরশিখারই উৎপত্তি হয় সক্রিয় কলঙ্ক থেকে।

পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য-পৃষ্ঠ সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়লে বর্ণমণ্ডলের চারদিকে যে তীব্র আলোকছটা দেখা যায়, তাকেই ছটামণ্ডল (Corona) বলা হয়। ইহা প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল অবধি বিস্তৃত থাকে। সূর্যের বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত গ্যাসীয় অণুগুলির সাহায্যে সূর্যালোকের বিচ্ছুরণ (scattering) হয় ব'লে এরূপ দেখা যায়। এ দৃশ্য সত্যই অপূর্ব। এ দৃশ্য দেখবার জন্য তাই বিজ্ঞানীরা ভিড় করেন সেই সব দেশে যেখান থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

—•—

পাখীদের দাম্পত্য-জীবন

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

পৃথিবীতে দু'পেয়ে প্রাণীর কথা বললেই মানুষ এবং পাখীর কথা মনে পড়ে। তা হলেও পাখীদের সংগে আমাদের কোন মিল নেই। পাখীদের নানা রঙের ঝুঁটি, লেজ আছে, পাখীরা গান গাইতে পারে—আর আমরা? আমরাও গান গাইতে পারি বটে, আর সুকণ্ঠীদের বলা হয়ে থাকে 'নাইটিংগেল', কোকিলকণ্ঠী ইত্যাদি। এ ব্যাপারে তুলনা করতে গেলে পাখীদের সংগে আমরা সমগোত্রীয়। কিন্তু অন্য বিষয়ে? আর তেমন কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না বললেই চলে। কিন্তু মিল আছে বৈকি। মানুষের প্রেম, ভালবাসা বা দাম্পত্য-জীবনের সংগে পাখীদের আশ্চর্যরকম মিল আছে। ওদের দাম্পত্য-জীবনের গভীরতা বা প্রেমে বিশ্বস্ততা নিয়ে তুলনা করলে পাখীদের কাছে আমাদের লজ্জায় মাথা নীচু করতে হবে।

যাদের কথা আমরা বুঝি না, যাদের নগণ্য প্রাণী বলে মনে করি তারাও প্রেমে পড়ে? রামায়ণে জটায়ু পাখীর কথা পড়ে আমরা অবাক হয়ে যাই পাখীর কর্তব্য-নিষ্ঠায়। যদিও তা গল্পমাত্র তবুও বিশ্বাস করতেই যেন ভাল লাগে। পাখীদের কার্যকলাপ আমাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হতে পারে, তবে পক্ষীতত্ত্ববিশারদেরা ওদের ভাব, ভাষা বুঝতে পারেন তা বলা বাহুল্য।

পাখীরা শুধু প্রেমে পড়ে তাই নয়, আমাদের মত বাগ্‌দত্ত হওয়া বা ইংরেজীতে যাকে বলে 'এনগেজড্‌' হবার প্রথাও আছে। দাম্পত্য-জীবনে অনেকে জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত একে অন্যকে ছেড়ে যায় না। আবার অনেকে অতি আধুনিক-আধুনিকাদের মত। পুরুষ-পাখীর জীবনের বসন্তকাল শেষ হলেই স্ত্রী-পাখীরা বিবাহ বিচ্ছেদ করে চলে যায়। দালানে যে-সব চড়ুই পাখী থাকে তাদের মধ্যেই সাধারণতঃ এ-ধরনের বিবাহ বিচ্ছেদ দেখা যায়।

জীবনের এক বিশেষ সময়ে ছেলেমেয়েরা পরস্পরকে দেখলেই প্রেমে পড়ে। যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'লভ্‌ এ্যাট ফার্ষ্ট সাইট'। এরকম প্রেম বা ভালবাসা পাখীদের বেলাতেও হয়। রাজহাঁসেরা একটু বেশী আবেগপ্রবণ। পথ দিয়ে চলতে চলতে কোন রাজ-হংসীকে দেখে ভাল লাগল ত আর কথা নেই। অমনি বিবাহের প্রস্তাব। চার চোখের প্রথম মিলনের ভালবাসা বা অনেকদিন দেখাশোনার ফলে জাত ভালবাসা—যে কোন অবস্থাতেই এরা যখন বিবাহের জন্য প্রতিশ্রুত হয় তখন তারা খুব জোরে সংর্ষ চীৎকার করে ওঠে, যেন তাদের দুটি হৃদয় মুহূর্তেই এক হয়ে গেল। এদের জীবনে বিবাহ স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। এদের প্রেম, ভালবাসার শেষ পরিণতি বিবাহে। বিবাহের পর আজীবন এরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। এমন কি মৃত্যুও এদের মধ্যেকার বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারে না। পতি-হীনা রাজহংসী বা স্ত্রী-হারা রাজহাঁস আজীবন একাকী থাকে। দ্বিতীয় বার পাণিগ্রহণ করে নিজেদের সুপবিত্র দাম্পত্য-জীবনের স্মৃতিকে ম্লান করে না।

অনেক পাখী আবার তাদের শৈশবের প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে বিবাহ করে সারা জীবন সুখে কাটিয়ে দেয়। এক ধরনের দাড়িওয়ালা পাখী আছে, তাদের ইংরেজী নাম 'টিট্‌'। এরা পরস্পর যৌনমিলনে আবদ্ধ হবার পুরো নয় মাস আগে বাগ্‌বদ্ধ হয়। পুরুষ টিট্‌ পাখীদের কালো লেজ আর ছুঁচলো দাড়ি থাকে। এগুলি দেখতে বেশ বাহারের। চেহারার জৌলুস দেখিয়ে এরা স্ত্রী-পাখীদের মন ভোলাতে চেষ্টা করে। পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত হবার আগেই পুরুষেরা আত্মসচেতনতা লাভ করে। জৈবিক তাড়নায় সে সব সময়তেই তার বিপরীত-ধর্মীর কাছে এসে নিজেকে জাহির করতে প্রয়াসী হয়।

মুখচোরা ছেলের কাছে মেয়েদের সংগে আলাপ জমানো যেমন সমস্যা, পাখীদের মধ্যেও স্ত্রী-পুরুষের প্রথম আলাপ হওয়া তেমন এক সমস্যা। কি করে পরস্পর আলাপে আবদ্ধ হবে তাই নিয়ে এদের বিষম চিন্তা।

পেঙ্গুইন পাখীদের কথাতেই আসা যাক। একটি পুরুষ পেঙ্গুইন মনে মনে কোন সঙ্গিনী নির্বাচন করলে তার কাছে গিয়ে প্রেম নিবেদন করতে বেশ বিপদে পড়ে। সে একটি সুদর্শনা এবং তার পছন্দমত একটি স্ত্রী পেঙ্গুইনের কাছে একটা সুন্দর নুড়ি, অথবা একটি সুন্দর পালক উপহার নিয়ে গিয়ে তাকে শুভেচ্ছা জানায়।

পেঙ্গুইনদের সৌন্দর্যবোধ আছে। এই উপহার প্রেম-উপহারের মত। যদি এই অযাচিত প্রেম উপহার দেখে স্ত্রী-পেঙ্গুইনের মনে প্রেমভাব না জাগে তা হলেই মুস্কিল। সে অত্যন্ত তাচ্ছিল্য সহকারে প্রত্যাখ্যান তো করেই উপরন্ত অনেক সময় সেই বেহায়া পুরুষকে ঠুকরে দেয়। কোন স্ত্রী-পেঙ্গুইনের কাছ থেকে এই ঠোকর খাওয়া ওদের কাছে সত্যিই বিশেষ অপমানকর।

যদি সেই স্ত্রী-পাখীটি তার উপহার সাগ্রহে গ্রহণ করে তা হলেই তার মন ময়ূরীর মত নেচে ওঠে আর বুঝতে পারে তার প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয় নি। এর পর ক্রমাগত ভাবে চলে প্রেমগুঞ্জন আর মান-অভিমানের পালা। পেঙ্গুইনের প্রেম অস্থায়ী। মাত্র এক বৎসরের জন্য এরা ঘর বাঁধে। বাচ্চা প্রসব করার পরে পেঙ্গুইনেরা দলে দলে বেরিয়ে পড়ে দক্ষিণ সাগরের দিকে সঙ্গীহারা হয়ে। বছর ঘুরে এলে পুরনো দম্পতীদের আবার মিলন হওয়া প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে যতদিন এদের বিবাহিত জীবন কাটে ততদিন এরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর দু'জনেই নতুন নতুন সঙ্গী খুঁজে নেয়।

সাধারণ মানুষের মত একশ্রেণীর পেঙ্গুইন-দম্পতী অত্যন্ত নির্মলভাবে তাদের জীবন কাটায়, অনেকে আবার দিনরাত ঝগড়া-বিবাদ করে দাম্পত্য-জীবনকে অসুখী করে তোলে।

প্রেম নিবেদন ব্যাপারে পাখীরা কোন বাধা বৈষম্য স্বীকার করতে চায় না। চিড়িয়াখানায় একটি পুরুষ উটপাখীকে মুরগীর পিছু পিছু ঘুরতে দেখা গেছে। নানাভাবে সে মুরগীটির মনোরঞ্জন করতে চেষ্টা করত। যেমন করেই হোক সে তাকে তার প্রেম জানাবেই। সবশেষে সে হঠাৎ মাটিতে শুয়ে পড়ে এদিক-ওদিক গড়াতে থাকে আর পালকগুলিকে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলে। এভাবে সে তার ভাবী প্রণয়িনীর মনস্তুষ্টি করে।

চিল, ঈগল ইত্যাদি কয়েক শ্রেণীর পাখীদের প্রেম-করা বেশ লোমহর্ষকর। ভাবতেও শিউরে উঠতে হয় কি ভাবে কোন জীবন্ত প্রাণী এদের মত মহাশূন্যে লম্বমান হয়ে নিশ্চলভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে।

একজোড়া চিল আকাশে অনেক উঁচুতে উঠে একে অন্যের পায়ের থাবা আঁকড়ে ধরে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়। লম্বালম্বিভাবে ঐ অবস্থায় তারা কয়েক সেকেণ্ড থাকতে পারে। মানুষ আয়নায় তার প্রতিবিম্ব দেখে। সে জানে সে দেখতে কেমন। নিজের চেহারা সম্বন্ধে মানুষ অত্যন্ত সচেতন। পাখীরাও ঠিক এমনি সচেতন। তবে নিজের সম্বন্ধে নয়, অন্যের বেলাতে। সাধারণতঃ সম-শ্রেণীর পাখীরা এক সংগে বাস করে। একে অন্যকে দেখে বুঝতে পারে যে, সে তার নিজের গোত্রীয় কিনা। কিন্তু চিড়িয়াখানাতে এসব বিশেষ ব্যবস্থা থাকে না।

চিড়িয়াখানাতে দেখা গেছে যে, এক স্ত্রী রাজহংসী ভিন দেশের এক পুরুষ মোরগকে দেখে খুব মুগ্ধ হয়ে গভীরভাবে প্রেমে পড়েছে। ভালবাসার সংগে সংগেই এল চিরাচরিত হিংসা। প্রেমমুগ্ধ এই রাজহংসী মোরগটিকে কোন সময় কোন মুরগীর কাছে যেতে দেয় নি। কোন মুরগী যদি প্রণয়েচ্ছু হয়ে ঐ মোরগটির কাছে আসত তা হলে রাজহংসীটিও সন্দেহের বশবর্তী হয়ে মুরগীটিকে তৎক্ষণাৎ তাড়িয়ে দিত। তবে সে নিজেও খুব বিশ্বস্তা ছিল। কারণ অনেক বার বহু রাজহাঁস তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে এসেছে কিন্তু সে তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে নি।

প্রেম পাখীদের উন্মাদ করে তোলে। আর পাখীরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। বুদ্ধিবৃত্তি এদের অনেকটা কম বলে এদের উন্মাদনাও বেশী।

১০০° বা ১০১° ডিগ্রী জ্বরে আমাদের মন অত্যন্ত বেশী সচেতন থাকে। সময়ের জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর হয়ে ওঠে। কিন্তু পাখীদের সেরকম কিছুই হয় না। চড়ুই পাখীর দেহের উত্তাপ ১১১° ডিগ্রী, মুরগীর ১০৪° ডিগ্রী। কিন্তু এ অবস্থাতেও সুস্থিরভাবে এরা দিন কাটিয়ে যায়। পৃথিবীতে পাখীদের রক্ত সবচেয়ে উত্তপ্ত, বোধ হয় সে জন্য এদের প্রেম-ভালবাসাও এত উন্মাদনাময় যে, আমরা কল্পনা করতেও পারি না।

বক পাখী তাদের ঘর বাঁধবার আগে মধুনিশি পালন করে। দু'জনে বেড়িয়ে পড়ে কোন পছন্দসই জায়গার উদ্দেশে। মধুনিশি পালনের উদ্দেশ্য চিরন্তন। মানুষের মত তারাও পরস্পর পরস্পরকে কাছে পেয়ে বুঝতে চেষ্টা করে, মানসিক আবেগের দিক থেকে তাদের বৈশিষ্ট্য সমশ্রেণীর কিনা তারও যাচাই হয়ে যায়। তার পরে এরা পরিবার বাড়ানোর কথা ভাবে।

বক পাখীদের মধুনিশি পালনের সময় অল্প। নিজেদের আবেগ বা উন্মাদনার অভিব্যক্তির জন্য তারা প্রায়ই এরকম মধুনিশি যাপন করে। সে সময়ে এঁরা প্রায় উন্মাদ হয়ে যায়। পাগলের মত হাত-পা ছুঁড়তে থাকে, ডানা কামড়ায়, গলা জড়িয়ে ধরে আর ভীষণ চীৎকার করে। প্রতি বছরই বকেরা মধুনিশি যাপন করবার জন্য ভিন্ন জায়গাতে যায়। বুড়ো হয়ে গেলেও এদের দাম্পত্য-

জীবনে একদিনের জন্যও অবহেলা বা নীরসতা আসে না। আশ্চর্য এই যে, বেশীর ভাগ মানুষের জীবনে বুড়ো বয়সে হতাশা বা বিরসতা আসেই। অষ্ট্রেলিয়ার প্রেমিক-পাখীদের সমস্ত জীবনটাই মধুনিশি। তারা কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও একে অন্যকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তাদের কাছে পারস্পরিক বিচ্ছেদ মানেই মৃত্যু।

কিন্তু সবার উপর টেক্কা দিয়েছে নিউজিল্যাণ্ডের কাকেরা। এদের ভাবপ্রবণতার কথা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। স্বামী বা স্ত্রী কেউ একা খাবার খায় না। সব সময় দু'জনে সমানভাবে ভাগ করে খায়। পুরুষ কাক তার শক্ত ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে গাছের বাকল ভেদ করে। বাকলের নীচে থাকে পোকা। ঐ পোকাগুলি এদের খাদ্য। পুরুষেরা বাকল ফুটো করেই খালাস। পোকা তোলা তাদের সাধ্যের বাইরে। স্ত্রী কাকের ঠোঁট বেশ লম্বা এবং সরু। লম্বা ঠোঁট দিয়ে তারা পোকা তুলে আনে। তারপর দু'জনে ভাগ করে আহার্য গ্রহণ করে। পুরুষেরা যেমন পোকা তুলতে পারে না, তেমনি কাকেরাও বাকল ফুটো করতে পারে না। কাজেই খাবার সংগ্রহ করতে হলে দু'য়ের সক্রিয় সাহায্য প্রয়োজন। জীবন ধারণের জন্য স্ত্রী পুরুষের যৌথ পরিশ্রম করা দেখে মাঝে মাঝে ভুলে যেতে হয় ওরা পাখী, মানুষ নয়।

এক ধরনের পাখী আছে যারা সুন্দর গান করতে পারে আর তাদের লেজ দেখতে অনেকটা বীণা বাদ্য-যন্ত্রের মত। তাই এদের বলা হয় বীণা বীণ পাখী বা (লায়ার বার্ড) এরা মাসের পর মাস ঝোঁপের মধ্যে কোন ঢিবির উপর বসে গান গায় আর সবাইকে তার গুণপণা দেখাতে চেষ্টা করে। কিন্তু কেন? কারণ সনাতন। পুরুষ পাখীটি বোঝে যে কোন গাছের মগডালে বসে আছে কোন সঙ্গিনী। অদৃশ্য সেই সঙ্গিনীকে উদ্দেশ করে পুরুষ পাখীটি নানা কসরত করে বোঝাতে চেষ্টা করে যে সমস্ত জায়গার মালিক একমাত্র সে এবং সে কত সুন্দর।

তবে মাঝে মাঝে যে ঝামেলা আসে না তা নয়। কয়েকজন পুরুষ দলপতি হবার জন্য মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তখনই শুরু হয় বিবাদ। প্রতিযোগিতায় যে জয়ী হবে সে হবে সেই এলাকার নায়ক। তখন থেকেই সে তার ভাবী স্ত্রীর প্রতি নজর রাখতে থাকবে। স্ত্রীর বয়স তখন অল্প থাকে—যতদিন না পর্য্যন্ত স্ত্রীটি পূর্ণাঙ্গত্ব প্রাপ্ত হবে ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষ নায়কটি বেশ ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করবে, শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে প্রেম নিবেদন বা রসালাপ করতে হবে ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে নচেৎ সমস্ত পরিশ্রম বিফল হবে।

যতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী তার হবু স্বামীকে চোখে দেখতে এবং তার গান শুনতে পায় ততদিন পর্য্যন্ত তার পেটের মধ্যে ডিম বড় হতে থাকে।

জন্ম হতে কোন স্ত্রী কবুতরকে সম্পূর্ণ একাকী রাখলে সে ডিম পাড়ে না। তবে যদি সে কখনও পুরুষ কবুতরকে দেখে অথবা তার ঘাড়ে যদি কোন পুরুষ ঠোকর দেয় তাহলেই সে ডিম পাড়ে।

বাওয়ার বার্ড নামে এক জাতীয় পাখী আছে। পুরুষ পাখীরা খুব সুন্দর গান গাইতে পারে কিন্তু তাদের রংয়ের জৌলুস নেই। তাই তাদের দুর্দশার সীমা থাকে না। তার উপর আবার পুরুষ পাখারা সংখ্যায় স্ত্রীদের থেকে অনেক বেশী। কাজেই বিবাহ বা মিলনের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে খুব প্রতিযোগিতা চলে। পুরুষদের মধ্যে যারা আগে সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় তারা সর্ব্বাগ্রে স্ত্রী পাখী-দের সঙ্গে মিলিত হতে পারে। পুরুষ পাখীরা নানা রকমের ঘাস ও ডালপালা দিয়ে সুন্দর বাসা তৈরী করে। তার পর পাকা ফল, চোখ ঝলসানো রংয়ের পাতা দিয়ে ঘর সাজায়। পুরুষেরা সর্ব্বদাই এমনভাবে ঘর সাজাতে চেষ্টা করে যাতে তার প্রণয়িণী মুগ্ধ হয়ে ডিম পাড়ে ঐ বাসার মধ্যে। যতক্ষণ ধরে পুরুষটি বাসা তৈরী করে ততক্ষণ প্রণয়িণীটি তার প্রণয়ীর কর্ম্মকুশলতা গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করে।

প্রণয়ীর প্রেমে মুগ্ধ হলে সে মিলন-কুঞ্জে প্রবেশ করে। তার পর সে তার নিজের বাসায় উড়ে চলে যায়। এ বাসা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব। এখানে আর কারও প্রবেশের অধিকার নেই। সেখানে গিয়ে সে ডিম পাড়ে ও ডিমে তা দেয়। বাচ্চারা হাঁটতে শিখলেই স্ত্রী পাখীটি তার স্বামীর কাছে ফিরে গিয়ে পূর্ণ পরিবার গড়ে তোলে।

সমস্ত শ্রেণীর পাখীরা যে সুদৃঢ় দাম্পত্য জীবন যাপন করবে তার কোন স্থিরতা নেই। অনেকে আছে সুখের দিনের দম্পতী। এক শ্রেণীর পুরুষ ঘুঘু পাখী আছে যাদের ইংরেজীতে বলা হয় Cooing dove, তারা পাখী-দের মধ্যে ডন যুয়ান গোছের। শুধু মজা আর আনন্দ লুটেই এদের তৃপ্তি। এরা তাদের প্রাণমাতান ডাকে কোন মেয়ে পাখীকে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে। যে মুহূর্ত্তে সে বুঝতে পারল যে স্ত্রী পাখীটি তার কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে সেই মুহূর্ত্তে সে তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য সঙ্গিনীকে জয় করতে বেরয়।

ব্যর্থ প্রেমিক পুরুষ পাখীরা তাদের ভাগ্যকে নির্ব্বিবাদে মেনে নেয়। পুং রবিন পাখীরা প্রথমে গান করে তাদের এলাকায় নিজের একক প্রাধান্যের কথা জানাতে চেষ্টা করে। পরে আবার ভিন্ন সুরে গান গেয়ে কোন সঙ্গিনী ছাড়া হয়ে বিরসচিত্তে গাছের মগডালে বসে বিরহের গান গায় আর অপেক্ষা করে কখন কোন্ পরিবারে পুরুষ রবিন মারা গেল। কোন পরিবারে দুর্ঘটনা হেতু কোন পুরুষ মারা গেলে বিরহী অকৃতদার রবীন তৎক্ষণাৎ সেই মৃতের স্থান দখল করে নেয়।

পাখাদের যৌন-জীবন আরম্ভ করার কাজে স্ত্রীপাখীদের প্রভাব যে কতখানি তা বলা বাহুল্য। 'রাফ্' নামে এক জাতীয় পাখীদের বিবাহ আমাদের পৌরাণিক্ কালের স্বয়ম্বর প্রথার কথা মনে করিয়ে দেয়। বসন্ত সমাগমে সমস্ত পুরুষ পাখীরা সর্ব্বজনীন মিলন ক্ষেত্রে এসে জমায়েত হয়। তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করবার পর প্রত্যেকে নিজের জন্য সামান্য জায়গা নির্দ্দিষ্ট করে রাখে। এ জায়গার মধ্যে অন্য কারও প্রবেশ একেবারে নিষিদ্ধ। এই অবস্থাতে তারা ক্রমাগত বিরহ যন্ত্রণা প্রকাশ করে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে আর অধীর উত্তেজনা প্রকাশ করে। উত্তেজনার ফলে অনেকে হতচেতনও হয়ে পড়ে। একদিন ভোরে 'রীভ' নামে একদল স্ত্রী-পাখী দল বেঁধে সেখানে আসে। তখন প্রত্যেকটি পুরুষ 'রাফ' পাখী তাদের সুন্দর পালক পেঁজা তুলোর মত উড়িয়ে দিয়ে তাদের প্রেমোন্মাদনার বার্ত্তা জানাতে যত্নবান হয়, ঘাড় নুইয়ে প্রেমের প্রতিদান ভিক্ষা করে আর শেষে নিশ্চুপ হয়ে নিজের গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে।

নবাগতা এই স্ত্রী 'রীভ' পাখীরা ভদ্র পুরুষ-'রাফ্' পাখীর সারির মধ্য দিয়ে খুসীমত ভ্রমণ করে, তার মধ্যে কাউকে ঠোঁট দিয়ে আলতভাবে স্পর্শ করে জানিয়ে দেয় যে, সে তাকে মনোনীত করেছে। তার পরে তাদেরই খুসীমত সময়ে তাদের ইঙ্গিতে পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলনে আবদ্ধ হয়।

এ যেন স্বয়ম্বর সভার গল্প. আগেকার দিনের কথা বলি কেন, আজকালও কি আমাদের মধ্যে এ রকম ঘটনা দেখতে পাই না ?

এতক্ষণ যাদের নিয়ে আলোচনা করা হ'ল তাদের মধ্যে কেউ বা সাবিত্রী-দময়ন্তী চরিত্রের, কেউ বা পরীক্ষিত ভার্য্যা সুশোভনার মত, অনেকে আবার আলট্রা মডার্ণ সোসাইটির বাসিন্দা।

এদের দাম্পত্যজীবনেও সুখ আছে, দুঃখ আছে, মান-অভিমান আছে। এদের জীবনেও আনন্দের ঝরণাধারা বয়ে চলে।

ঘন ঘোর বরষায়

শ্রীসীতা দেবী

এক-একজন মানুষের জীবনে এক একটা ঋতুর প্রাধান্য দেখা যায় সময় সময়। শর্ব্বরীর জীবনে বর্ষা ঋতুটাই যেন সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিত। সে ছিল যাকে বলে 'বাদুলে' মেয়ে। শ্রাবণের ঘোর অন্ধকার, বর্ষণমুখর রাত্রে তার জন্ম। ঝম্‌ঝম্ ক'রে জল ঝরছে, কড়্‌কড়্ ক'রে বাজ পড়ছে। রাস্তা-ঘাট ত জলে জলময়। তার মধ্যে নবীন অতিথি নিজের আগমনের সূচনা জানালেন। শর্ব্বরী যখন বেশ বড় হয়ে গেছে, তখনও তার মা থেকে থেকে সেই রাতের "আথান্তরে"র বর্ণনা করতেন। সে কি কম ব্যাপার, ঐ রকম রাত্রে ধাত্রী ডাকা, শর্ব্বরীর মামার বাড়ীতে খবর দেওয়া, আর ওষুধপত্র আনা। নিতান্ত বাড়ীর কর্ত্তা খুব শক্ত-সমর্থ মানুষ ছিলেন, তাই সব দিক্ রক্ষা হয় শেষ পর্য্যন্ত।

শিশুর চেহারায়ও বর্ষার ছাপ ছিল। রং শ্যামলা; চিক্কণ শ্যামল। গায়ে হাত দিলে মনে হ'ত যেন নীল মখমলের উপর হাত বোলান হচ্ছে। মাথায় থোকা থোকা কোঁকড়া কাল চুল। খুব মোটা-সোটা নধর সুন্দর দেহ। দেখে খুশী হবার মত মেয়ে। তার আগের দু'টিই ছেলে, কাজেই এটি মেয়ে হওয়ায় কেউ খুশী বই অখুশী হ'ল না।

মেয়ে আদরে সোহাগেই মানুষ হ'তে লাগল। স্বাস্থ্য হ'ল বেশ ভাল। মা'কে ভোগাল না বিশেষ কিছু। কি নাম হবে তাই নিয়ে নানা কল্পনা-জল্পনা চলতে লাগল। কেউ বলল, "শ্রবণা", কেউ "শ্যামলী", কেউ বা "শর্ব্বরী"। শিশুকালে সব ক'টা নামই পরে পরে ব'লে নামের অধিকারিণী খুব আত্মপ্রসাদ লাভ করত। কিন্তু চার-পাঁচ বছর বয়স হতেই যখন তাকে স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দেওয়ার জন্য মা-বাবা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তখন মেয়ে নিজের নাম বেছে নিল শর্ব্বরী।

শর্ব্বরী বড় হ'তে লাগল। ছোট্ট শিশুকালে তাকে যারা দেখেছিলেন সবাই বলতেন, "এ মেয়ের চেহারা কোথাও কিছু বদ্‌লাল না। সেই রং, সেই মুখ-চোখ, সেই চুল।"

শ্যামাঙ্গী মেয়ে, কিন্তু সুন্দরী মেয়ে। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার মত দেহ। মাথার চুলের রাশ প্রাবৃটের মেঘসম্ভারকে মনে পড়িয়ে দেয়। দুই চোখ আকাশের তারার মত উজ্জ্বল।

পড়াশুনায় মেয়ে বেশ ভাল। ছবি আঁকতে পারে সুন্দর। মোটের উপর গর্ব্ব অনুভব করবার মত মেয়ে বটে। তবে স্বভাবটা নিয়ে মেয়ের মায়ের মনে ভাবনা ছিল। বাঙালীর সংসারে মেয়েমানুষের এত তেজের কেউ কি মর্য্যাদা দেবে? মেয়ে একেবারে কারও কথা শুনতে পারে না যে? বাপকে যে অত ভালবাসে, তিনিও যদি একটু ধমকের সুরে কথা বলেন, তাহলে কান্নার বদলে মেয়ের মুখ একেবারে প্রলয়-গম্ভীর হয়ে ওঠে। অভিমান করে না, একেবারে যেন সকলের কাছ থেকে লক্ষ যোজন দূরে স'রে যায়। যিনি ধমক দিয়েছেন, তাঁকেই শেষে হাজার রকম তোষামোদ ক'রে শর্ব্বরীর সঙ্গে মিটমাট্ করতে হয়।

মেয়ে বড় হতে লাগল, কিন্তু স্বভাব বদ্‌লাল না। মা বলতেন, "মেয়েমানুষের এত ঘাড় শক্ত ভাল নয়। আমাদের একটু নীচু হতেই হয়, একটু মানিয়ে চলতেই হয়, না হ'লে কি সংসার চলে?"

শর্ব্বরী বলত, "অন্যায়ের কাছে নীচু হব কেন?"

মা বলতেন, "ও রে, নীচু হয়েও জেতা যায়। নিজের লোকের কাছে অপমান হয় না তাতে।" শর্ব্বরীর কথাটা মোটেই মনে ধরত না।

স্কুলের পড়া ত শেষ হয়ে এল। মায়ের ইচ্ছা, এবার দেখে শুনে একটি ভাল বিয়ে দিয়ে দেন। শর্ব্বরীর বাবার শরীর ভাল যাচ্ছে না, হয়ত অসময়েই কাজ থেকে অবসর নিতে হবে। ছেলেদের এখনও তৈরি হয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে দেরি আছে।

কিন্তু অত সাত তাড়াতাড়ি একমাত্র মেয়েকে বিদায় দিতে বাপের মন চাইল না। বাল্যবিবাহের পক্ষপাতীও তিনি ছিলেন না।

শর্ব্বরী ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজে ঢুকল। মেয়েদের পক্ষে একটু নূতন ধরণের পাঠ্য বিষয় বেছে নিল। সহপাঠিনীরা বলল, "তুই কি ডাক্তার হ'তে চাস্ নাকি রে? অত Physics, Chemistry প'ড়ে কি হবে?"

শর্ব্বরী বলল, "ইচ্ছে করে।"

আই. এস-সি-ই পড়তে লাগল। বাবার এতে খুব সম্মতি ছিল, দুই দাদা ঠাট্টা করতে লাগল। মা পড়াশুনা বেশী করেন নি, তিনি ভালমন্দ কিছু বললেন না। তবে থেকে থেকে রান্নাবান্না, ঘরের কাজকর্ম্ম শেখাবার জন্যে মেয়েকে জোর করতে লাগলেন। বললেন, "যতই বিদুষী হও, ঘর সংসার ত করবে? তখন এই সবই বেশী কাজে লাগবে।"

শর্ব্বরী বলল, "কেন, ঘর সংসার না ক'রে কি থাকা যায় না?"

মা বললেন, "শোন কথা! আমরা কি মেম সাহেব নাকি? আমি বেঁচে থাকতে ওসব হচ্ছে না।"

বিয়ে করতেই হ'ল শেষ পর্য্যন্ত। অবশ্য শর্ব্বরীর অমতে কিছু হ'ল না। শর্ব্বরীর বাবার শরীর ক্রমে ক্রমে এতটাই খারাপ হয়ে পড়ল, যে তিনিও শেষে স্ত্রীর মতে মত দিতে বাধ্য হ'লেন। ছেলে দুজনের এখনও পড়া শেষ হয় নি। তাদের উপর এখনই কিছু ভরসা নেই। কলকাতার শহরে বাসা বাড়ীতে থাকেন। দেশে সামান্য বিষয়-সম্পত্তি ও নড়বড়ে বাড়ী একটা আছে বটে, কিন্তু তার থেকে উনি পান না কিছুই। সব দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনে দখল করে ব'সে আছে। এতদিন তাদের কিছুই বলেন নি, এখন কি বলবেন?

বাড়ীর সকলেই খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়ল। শর্ব্বরী মা'কে বলল, "আরো যদি পাঁচ-ছ'টা বছর পরে বাবা retire করতেন ত, ততদিনে আমি ডাক্তার হয়ে বেরোতাম, কোন ভাবনাই আর থাকত না।"

মা বললেন, "পাঁচ-ছ'টা বছর কম সময় না কি রে? ততদিন যদি চালান যেত, তা হলে ত তোমার দুই দাদাই তৈরি হয়ে বেরোত, তোমার ডাক্তারী করতে আর হ'ত না।"

শর্ব্বরী বলল, "তুমি বড় সেকেলে, মা। মেয়েদের জীবনে রান্না করা আর কাঁথা কাচা ছাড়া বুঝি আর কিছু তুমি কল্পনা করতে পার না?"

মা বললেন, "নিজে ত তাই-ই করেছি সারাজীবন, অসুখীও কিছু হইনি। তাই মনে হয় মেয়েদের এই ভাল।"

বিয়ের কথা এবার ভালভাবেই উঠল। আত্মীয়-স্বজনকে বলা হ'ল, ঘটক-ঘটকীও এক-আধটি আসা যাওয়া সুরু করল।

শর্ব্বরী বলল, "আমাকে নিয়ে গরু-ঘোড়ার মত যার তার সামনে দাঁড় করাতে পারবে না, তা ব'লে দিচ্ছি।"

মা বললেন, "শোন একবার! না দেখে কি কেউ কনে পছন্দ করে?"

"দেখুক না। আমি ত অসূর্য্যম্পশ্যা নই? সিনেমায় দেখতে পারে, কলেজে দেখতে পারে, গড়ের মাঠে দেখতে পারে। মোট কথা সং সেজে মুখ দেখাতে আমি কারও সামনে দাঁড়াতে পারব না।"

মা জানতেন, মেয়ের যে কথা সেই কাজ। তাকে সনাতন প্রথামত দেখান যাবে না। অতএব শর্ব্বরীর কথামত তাকে দেখান যেতে পারে কিনা, তারই চেষ্টা করতে লাগলেন।

মেয়ে ফরসা নয় এবং তার বাবার অঢেল টাকা নেই, সুতরাং সম্বন্ধ যে গাদা গাদা আসতে লাগল এমন নয়। তবে একেবারে এল না, তাও নয়।

মায়ে-বাপে কথা হ'তে লাগল। বাবা বললেন, "বোসদের বাড়ীর ঐ পাত্রটি কি রকম মনে হচ্ছে তোমার?"

মা বললেন, "আর ত সব ভাল, কিন্তু বয়স বড় বেশী!"

বাবা বললেন, "একেবারে তৈরি বর চাও যে? তাতে বয়েস ত একটু বেশী হবেই?"

মা বললেন, "শবুর যদি মনে না ধরে?"

বাবা বললেন, "মেয়ের বয়স আঠার, ছেলের বয়স পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ, এ এমন আর একটা কি বেমানান? এ ত আকৃছারই হ'ত আগে?"

মা বললেন, "ব'লে দেখি। আচ্ছা, এত বয়স অবধি বিয়ে করেনি কেন?"

"কে জানে? অত খবর ত পাই নি। অনেকে প্রথম বয়সে বিয়ে করতে চায় না। এরও সেই রকম কিছু খোট ছিল বোধ হয়।"

মা জিজ্ঞাসা করলেন, "দোজবরে না ত? ছেলে-পিলে না থাকলে অনেকে প্রথম বিয়ের কথা চেপেই যায়।"

বাবা বললেন, "শুনিনি ত সে রকম কিছু। আচ্ছা, খোঁজ করব।"

শর্ব্বরীর এদিকে পরীক্ষা এসে পড়েছে। পাত্রটি তাকে দেখতে চায়। সিনেমায় গিয়ে তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট করার মত তার অবসর নেই। স্থির হ'ল বালীগঞ্জের লেকের ধারে তারা সবাই বেড়াতে যাবে। বরের বাড়ী ঐ পাড়ায়, সেও এসে বেড়িয়ে যাবে, কনে দেখে যাবে।

শর্ব্বরী বেশী সাজগোজ করতেও রাজী হ'ল না।

যেটুকু না করলে নয়, সেইটুকু ক'রেই বেরোল মা আর দাদাদের সঙ্গে।

বর যথাকালেই এলেন। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা, রং ফরসা নয়। একটু যেন ভাটা প'ড়ে এসেছে, চাল-চলন মন্থর হয়ে পড়েছে। মাথার চুল স্বল্প, খুব সাবধানে আঁচড়ান। মা বা মেয়ে কারও পছন্দ হ'ল না। কি ব'লে একে বিদায় করা যায়, ভাবতে ভাবতে মা বাড়ী ফিরে এলেন।

শর্ব্বরী ঘরে ঢুকেই ছোড়দাকে বলল, "আহা কি বরই দেখালে! ঐ টাকপড়া, ভুঁড়িওয়ালা বরকে আমি বিয়ে করব না।"

দাদার নিজেরও বর পছন্দ হয় নি, বলল, "বলছি মা'কে। বরং ওকে শ্বশুর ভাবা যায়, বর ভাবা যায় না।"

বরের বাড়ীর থেকে খবর এল যে, মেয়ে তাঁদের একেবারেই যে অপছন্দ তা নয়, তবে রং বড় ময়লা। তাঁরা ফরসা মেয়েই খুঁজছিলেন, তবে পণ যদি আরও হাজার দেড়েক বাড়িয়ে দেওয়া যায়, তা হলে তাঁরা বিবেচনা ক'রে দেখতে পারেন।

আর বেশী পণ দেবার তাঁদের সাধ্য নেই ব'লে ঘটককে বিদায় ক'রে দেওয়া হ'ল। শর্ব্বরী নিশ্চিন্ত মনে আবার বই-খাতা সামনে ছড়িয়ে পড়তে বসল।

দ্বিতীয় প্রস্তাব এল দু'চার দিনের মধ্যেই। এবারে আর ঘটক-ঘটকীর মারফতে নয়, প্রস্তাব আনলেন এক বন্ধুপত্নী।

ছেলে অল্পবয়স্ক, মেয়ের সঙ্গে ভালই মানাবে। এনজিনিয়ারীং পড়ছে, সামনেই final পরীক্ষা। তবে ছেলের মা বড় অসুস্থ, ঘর-সংসার দেখবার কেউ নেই। অন্য ছেলেমেয়েরা সব ছোট ছোট, বড় মেয়ে যেটি ছেলের পরেই, সে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী চ'লে গেছে। সুতরাং এখনই ছেলের বিয়ে না দিলেই নয়। তবে আর কয়েক দিন পরেই শর্ব্বরীর পরীক্ষা, সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে।

শর্ব্বরীর মা বললেন, "তৈরি ছেলের সঙ্গেই দেব ভাবছিলাম ভাই। এ ত এখনও শেষ পরীক্ষা দেয়নি। পাশ করবে, চাকরি পাবে তবে ত? আমার ত দেখছ অবস্থা, কর্ত্তা যদি এখনই কাজ থেকে অবসর নেন, তাহলে আমার ত আর উপায় থাকবে না মেয়ে-জামাইকে সাহায্য করবার?"

বন্ধুপত্নী বললেন, "তোমার কিছু করতে হবে না গো। অবস্থা ওদের এমন কিছু খারাপ নয়। বরের বাবা এখনও কাজ করেন, করবেনও এখনও চার-পাঁচ বছর। তার মধ্যে ছেলে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে, পড়াশুনোয় খুবই ভাল, তোমরা খবর নিয়ে দেখতে পার। ভারি ভাল স্বভাবের ছেলে, আজকালকার দিনে এমন দেখা যায় না। আর খাঁইও ওদের বেশী না, ডানাকাটা পরীও চায় না ওরা।"

গৃহিণী বললেন "দেখি কর্ত্তাকে ব'লে। তা মেয়ে দেখবে ত? সে আবার আছে এক হাঙ্গাম।"

"সে হাঙ্গামও খুব বেশী নেই। আমার ভাল ক'রে দেখা মেয়ে তাই শুনেই ছেলের মা খুশী। খুব ভাল স্বাস্থ্য চায়, সেটা তোমার মেয়ের আছেই শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে। ঘটা ক'রে মেয়ে দেখতে চায় না ওরা। পার ত একখানা ভাল ফোটোগ্রাফ্ দিও, চুল খুলে তোলা। তবে বর যদি একবার আড়ালে-আব্ডালে দেখতে চায়, তার ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে।"

শর্ব্বরীর মা বললেন, "হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা ত করতেই হবে। একেবারে কেউ কাউকে চোখেও দেখল না, বিয়ে হয়ে গেল, এ আমিও চাই না। হাজার হোক, বড় হয়েছে ত দু'জনে? এর পরে পছন্দ যদি না হয় তাহলে মা-বাপকেই দুষবে।"

শর্ব্বরীর বাবা সব শুনে আপত্তির কিছু দেখলেন না! ঐ এক যে, ছেলে এখনও তৈরি হয় নি! তা একটা না একটা খুঁৎ ত থাকবেই। তাঁদের নিজের দিকটাও ত একেবারে দোষত্রুটিহীন নয়? মেয়ে ফরসা নয়, এবং তাঁরাও অজস্রধারে সোনারূপো ঢেলে দিতে পারবেন না। শর্ব্বরীর দুই দাদাকে ব'লে দেওয়া হ'ল, পাত্রটির একটু খোঁজখবর করতে। কাছেরই এক পাড়ায় তারা থাকে।

ছেলেদের রিপোর্ট শীঘ্রই এল। বেশ প্রিয়দর্শন ছেলে। পরিচিত মহলে বেশ সুনাম আছে, পড়াশুনোয় সত্যিই খুব ভাল। এই ছেলেই পাস ক'রে ভাল চাকরিতে ঢুকলে তার দাম হবে দশ-পনের হাজার। এইসব নানা কথা ভেবে-চিন্তে শর্ব্বরীর বাবা মত দিয়েই দিলেন।

শর্ব্বরীর পরীক্ষা তখন প্রায় ঘাড়ের উপরে এসে পৌঁছেছে। তবু একদিন তাকে এরই মধ্যে সময় ক'রে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পার্কে বেড়াতে যেতে হ'ল। এবারে কি জানি কেন নিজেরই একটু সাজতে ইচ্ছা করল।

ছোড়দা দরজার বাইরে থেকে হেঁকে বলল, "অত ঘটা ক'রে সাজতে হবে না ঠাকরুণ। এটা একেবারেই

unofficial ব্যাপার। এদিকে মেঘ জমেছে কি রকম দেখেছ? কালবৈশাখী এল ব'লে।"

দাদাদের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল শর্ব্বরী। মা আজ আর সঙ্গে গেলেন না।

আকাশ সত্যই মেঘে ঢেকে এসেছিল। বিদ্যুৎ চমকাতে আরম্ভ করল মাঝে মাঝে। বড়দা বলল,"আচ্ছা বাদুলে মেয়ে বাপু তুই। যা করতে যাব তোকে নিয়ে তাতেই ঝড়বৃষ্টি এসে যাবে।"

মেঘলা দিন হওয়া সত্ত্বেও বাগানে লোকের ভীড় কম নয়। ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে শর্ব্বরী বলল, "বাব্বাঃ, এমন দিনে আধুনিকাদের মত slacks প'রে বেরুতে হয়। দিশী পোষাক অচল একেবারে।"

ছোড়দা বলল, "তা হোক, শাড়ীর আঁচল আর চুল উড়ে বেশ কাব্যিক দেখাচ্ছে।"

শর্ব্বরী বলল, "আহা, নিজের হ'ত এই দশা তখন বুঝতে পারতে।"

বাগানে লোকের ভীড়ে একটা মানুষকেও চিনে বার করা শক্ত। বোনকে সঙ্গে নিয়ে অমন গরুখোঁজা করাও যায় না। বড়দা বলল, "তুই বোস ত এই ইমারতের সিঁড়িতে। আমরা ভাবী বোনাইকে ধ'রে আন্‌ছি।"

শর্ব্বরী ব'সেই পড়ল। ঝড় এল ব'লে, মেঘের রাশ যেন ক্রুদ্ধ সিংহের জটার মত ফুলে উঠছে। আর তার ঘুরতে ভাল লাগছে না, বেশীক্ষণ ব'সে সময় নষ্ট করতেও ইচ্ছা করছে না। সে চওড়া সিঁড়িগুলোর কয়েক ধাপ উঠে বসল। পিছনে তাকিয়ে দেখল, বড় হলের সদর দরজাটা খোলাই আছে। লোক ঢুকেছে বোধ হয় ভিতরে। জোরে ঝড়বৃষ্টি এলে ছুটে ভিতরে ঢুকে যাওয়া যাবে।

বাতাসের বেগ ক্রমেই বাড়ছে, ঝড়ের শব্দ ক্রমে তীব্রতর হয়ে এগিয়ে আসছে। দাদাদু'টো গেল কোথায়? মুচ্‌কে হেসে নিজের মনে বলল, "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।"

হঠাৎ একটি যুবক চলতে চলতে ঠিক সিঁড়ির নীচে এসে দাঁড়িয়ে গেল। শর্ব্বরী একটু বিস্মিত হ'ল। এই নাকি? কিন্তু শর্ব্বরীকে সে চেনে নাকি? তাহলে আবার দেখতে চেয়েছে কেন?

কিন্তু ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখবার লোভ সামলাতে পারল না, তাকালই সোজাসুজি। মেঘলা আকাশের তলায় ভালই ত দেখাচ্ছে। দাদারা বলেছিল প্রিয়দর্শন, সত্যিই প্রিয়দর্শন। কিন্তু এ যদি না হয়?

ছেলেটি বলল, "আপনি কি একেবারে একলা এসেছেন?"

শর্ব্বরী বলল, "আপনি আমাকে চেনেন নাকি? আমি ত কই আগে দেখিনি আপনাকে?"

ছেলেটি বলল, "আমি প্রিয়ব্রত মিত্র। আজ আমার এখানে আসার কথাটা শুনেছেন নিশ্চয়ই?"

শর্ব্বরী এবার একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। বলল, "শুনেছি ত। আমি একলা আসিনি, দাদারা ছিল সঙ্গে। কোন্‌দিকে গেছে বুঝতে পারছি না।"

প্রিয়ব্রত বলল, "এসে পড়বে এখনি। যা জোরে বৃষ্টি আসছে। চলুন, ভিতরে ঢুকে দাঁড়ান যাক। এখানে আর কোথাও ত shelter নেই।"

দু'জনে তাড়াতাড়ি হলের দরজার ভিতরে ঢুকে দাঁড়াল। ঘোর গর্জ্জনে বৃষ্টি নেমে এল, এমন ভীষণ-ভাবে বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল যে, আকাশটা যেন এখনই ছিঁড়ে পড়বে।

শর্ব্বরী বলল, "কি হবে? দাদারা একেবারে ভিজে যাবে ত!"

প্রিয়ব্রত বলল, "কি আর হবে? এখনই এসে পড়বেন। একটু ভিজলে পুরুষমানুষের কিছু হয় না। আমি ত সারা বর্ষাকালটাই ভিজি। আর যে লাইনে গিয়েছি তাতে রোদবৃষ্টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে চলতে হয়।"

শর্ব্বরী হাসল, কিছু বলল না। ভাবল, "বেশ ব্যাপার হ'ল যাহোক। সত্যি, দাদাদু'টো গেল কোথায়?" কিন্তু দাদারা অনুপস্থিত থাকায় খুব যে তার অস্বাচ্ছন্দ্য লাগছে, তা ত মনে হচ্ছে না!

প্রিয়ব্রত বলল, "পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে কবে আপনার?"

শর্ব্বরী বলল, "এই ত সামনের সোমবারে।"

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল, "কেমন preparation হ'ল?"

শর্ব্বরী বলল, "হয়েছে মোটামুটি একরকম।"

আবার মিনিট দুই-তিন দুজনেই চুপচাপ। প্রিয়ব্রত বলল, "আপনি হয়ত অবাক্ হচ্ছেন ভেবে যে আমি কি ক'রে আপনাকে চিনলাম। আমি প্রায় একই পাড়ায় থাকি ত? পথে-ঘাটে দেখেছি, পরিচয়ও জেনেছি। তবে আজ হঠাৎ এখানে আপনাকে একলা আবিষ্কারটা দৈবক্রমে হয়ে গেল। আমার কথা ছিল এক বৌদিকে নিয়ে আসবার, তা বেছে বেছে আজকেই তিনি জ্বরে পড়লেন। এ appointment ত miss করা যায় না,

একলাই চ'লে এলাম। বৃষ্টি এসে পড়ছে দেখে আশ্রয় নেবার জন্যেই এদিকে এসেছিলাম। ঐ বোধ হয় আপনার দাদারা আসছেন।"

বেশ ভালমতে ভিজে দুই ভাই এসে উপস্থিত হ'ল। বোনকে বলল, "বাদুলে লোক নিয়ে এলে এই দশাই হয়।"

প্রিয়ব্রতের দিকে ফিরে শর্ব্বরীর ছোড়দা বলল, "যাক, আপনার কাজ ত হাসিল হয়ে গেছে দেখছি। খুঁজে বার করলেন কি ক'রে?"

প্রিয়ব্রত বলল, "দেখেছি দু'চারবার এর আগে। কিন্তু এখন ত বাড়ী ফিরতে হয়। যা ভিজেছেন।"

দাদারা বলল, "বৃষ্টি না ধরলে যাওয়া যাবে না। শর্ব্বরীও ভিজে যাবে।"

আরো মিনিট দশ-বারো দাঁড়াতে হ'ল। শর্ব্বরী চুপ ক'রেই রইল। প্রিয়ব্রত আর ওর দাদারাই কথা বলল। তার পর বৃষ্টি থামল। প্রিয়ব্রত চ'লে গেল ট্রামে। শর্ব্বরীরা ট্যাক্সি ধ'রে বাড়ী ফিরল।

ট্যাক্সিতে ব'সে ছোড়দা জিজ্ঞাসা করল, "কি রে, এ বর কেমন লাগল? এর ত ভুঁড়িও নেই, টাকও নেই। ভালই দেখতে।"

বড়দা উপস্থিত থাকাতে শর্ব্বরী কোন উত্তর দিতে পারল না। তবে বাড়ী গিয়ে জানাল যে, চেহারা দেখে তার কিছু অপছন্দ হয়নি।

বাড়ীর লোকেরা তৈরি হ'তে লাগলেন বিয়ের জন্যে আর মেয়ে তৈরি হ'তে লাগল পরীক্ষার জন্যে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে একটা সদ্য-পরিচিত মুখ বড় গোলমাল বাধাতে লাগল তার মনে। অবাক্ হয়ে ভাবতে লাগল, আমার মত কাঠখোট্টার মনে এত রস এল কোথা থেকে? এই নাকি love at first sight?

প্রিয়ব্রতেরও যে কনে ভয়ানক রকম পছন্দ হয়ে গেছে তা জানতে দেরি হ'ল না, এ বাড়ীর লোকদের।

পরীক্ষা হয়ে গেল। শর্ব্বরীর খালি মনে হ'তে লাগল, এত যদি উন্মনা না থাকত, তাহলে আরো ভাল দিতে পারত। যাই হোক, মোটামুটি ভালই দিয়েছে। বি. এস্-সিটা পড়তে পারবে কি না কে জানে? আর ত দেখা হবে না প্রিয়ব্রতের সঙ্গে বিয়ের আগে? তাহলে তাকে দিয়ে কথা দিইয়ে নিত।

বিয়ের দিন এসে পড়ল। এই একমাত্র মেয়ে, সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ ক'রে বসলেন শর্ব্বরীর বাবা। মা প্রায় গায়ের সব গহনা খুলে মেয়ের গা সাজান গহনা গড়িয়ে দিলেন। কাপড়-চোপড় জিনিষপত্রেও কিছু কার্পণ্য করলেন না। বরপক্ষীয়েরা বোধহয় খুঁত ধরবার কিছু পেল না, কোনরকম বিরূপ মন্তব্য শোনা গেল না।

বর্ষাকালের বিয়ে, ঝড়বৃষ্টি হ'লও খানিকটা। লোক-জন ভিজল, দু'চারজন আছাড় খেল। একটু বিশৃঙ্খলা হ'ল, তবে মোটামুটি উৎরে গেল একরকম ক'রে। শুভদৃষ্টির সময় বরকনে সহাস্যমুখেই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখল।

বাসরঘর যখন নীরব হ'ল অনেকরাত্রে, তখন শর্ব্বরী বলল, "আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?"

প্রিয়ব্রত বলল, "নিশ্চয়, একটা কেন, একশ'টা কথা জিজ্ঞাসা কর না।"

শর্ব্বরী বলল, "পড়াশুনোটা continue করতে পারব ত?"

প্রিয়ব্রত বলল, "অবিশ্যি। না পারবার কি হেতু?"

শর্ব্বরী বলল, "কথা দিচ্ছেন ত?"

প্রিয়ব্রত বলল, "আমার দিক্ থেকে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না, একথা দিতে পারি। অবস্থা গতিকে যদি বাধার সৃষ্টি হয়, তাহলে দুজনে মিলে সে বাধা দূর করার চেষ্টা করতে হবে।"

পরদিন চোখ মুছতে মুছতে শর্ব্বরী বরের সঙ্গে নিজের নতুন ঘরে গিয়ে উঠ্ল। এঁদের অবস্থা যেন তার বাপের বাড়ীর থেকে একটু খারাপই মনে হ'ল। তবে কয়েকটা দিন অভাব-অনটন কিছু বোঝা গেল না। বিয়ের সময় সমস্ত সংসারটাই যেন একটা স্বচ্ছলতার মুখোস প'রে থাকে, সে মুখোস খুলতে দেরি হয় কয়েকদিন।

গরীব বা বড়মানুষ এ সব দিকে বিশেষ নজর দিল না শর্ব্বরী। মনের মত মানুষ জীবনে পাওয়ার আনন্দটাই তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখল কিছুদিন। প্রিয়-ব্রতর চেহারাটাই শুধু সুন্দর ছিল না, তার কথাবার্ত্তাও সুন্দর, ব্যবহারও সুন্দর।

গোল বাধল শাশুড়ীকে নিয়ে এবং কিছু পরিমাণে শ্বশুরকে নিয়েও। একজন অতিশয় কটুভাষিণী ও প্রভুত্বপরায়ণ, আর একজন অতি স্ত্রৈণ এবং ব্যক্তিত্ব-বিহীন। গৃহিণীই যে এ বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা তা বুঝতে দেরী হ'ল না শর্ব্বরীর। তিনি যা রায় দেবেন তাই সবাইকে মেনে নিতে হবে, এর বিরুদ্ধে কোথাও আপীল নেই। কর্ত্তা টুঁ শব্দ করেন না। অনেক ঠেকে শিখেছেন যে, বোবার শত্রু নেই। প্রিয়ব্রত মাঝে মাঝে আপত্তি জানায় বেশী অন্যায় কিছু দেখলে, তবে মা এত চীৎকার করেন যে, সেও বিরক্ত হয়ে চুপ ক'রে যায়। মায়ের

রক্তের চাপ অত্যন্ত বেশী, তাঁর সঙ্গে বেশীক্ষণ তর্ক করা চলে না।

প্রথম কয়েকদিন অবশ্য শর্ব্বরীর সঙ্গে শাশুড়ীর কোন বিবাদ হয় নি। সপ্তাহখানেক পরে, বিয়ের উপলক্ষ্যে রাখা অতিরিক্ত ঝিটি যখন চ'লে গেল তখনই বাধল। একটি মাত্র চাকর, সে রান্না করে, বাজার করে এবং বাসন ধুয়ে দেয়। এর বেশী কোন এতটুকু কাজও সে করে না। অথচ সংসারে মানুষ ত অনেকগুলি এবং তাদের অনেক রকম কাজ। কর্ত্তা-গৃহিণী বাদে তাঁদের পাঁচটি ছেলেমেয়ে। প্রিয়ব্রতই বড়, সর্ব্বকনিষ্ঠটি দশ-এগার বৎসরের। অন্য তিনটি নানা বয়সের এবং নানা স্বভাবের। সব কিছুই এলোমেলো। সময়ে কেউ উঠতে চায় না, স্নান করতে চায় না, খেতে চায় না। স্কুল-কলেজে যাবার দিন যদি বা কাজে কোন শৃঙ্খলা থাকে, ছুটির দিন ত একটা চড়িভাতির ব্যাপার হয়ে ওঠে সংসারটা। কেউ বিছানা ছাড়বে না, চা খাবে না এক সঙ্গে। কলের জল চ'লে যাবে, কেউ স্নান করতে যাবে না এবং আট জন মানুষ আট সময়ে খেতে চাইবে। শর্ব্বরীর এ রকম বিশৃঙ্খলা দেখা সাত জন্মে অভ্যাস ছিল না, সে ত একেবারে থ হয়ে গেল। এত অপরিচ্ছন্নতাও সে কোনদিন দেখেনি, তার মা অতিশয় সুগৃহিণীই ছিলেন।

সমস্ত বাড়ী পরিষ্কার করা, সকলের ছাড়া কাপড় কাচা, সকলকে সকাল-বিকাল চা-জলখাবার দেওয়া, এ ত বাঁধা-ধরা কাজ হ'ল শর্ব্বরীর। এর উপরে ফাই-ফরমাশ ত লেগেই থাকত। শ্বশুর-শাশুড়ী দু'জনেই কিছু পরিমাণে রুগ্ন, তাঁদের সেবা-শুশ্রূষার কাজও কিছু কিছু ছিল। সমস্ত দিন একটানা কাজ ক'রে ক'রে শর্ব্বরী যেন হাঁপিয়ে উঠত। অলস প্রকৃতির মানুষ সে ছিল না, কাজ করতে আপত্তি অনুভব করত না। তবে এত নোংরা ঘাঁটা সারাদিন তার ভাল লাগত না। ঘরদোর পরিষ্কার রাখার চেষ্টা সে কয়েক দিন পরে ছেড়েই দিল, বুঝল জন্মাবধি যারা চূড়ান্ত অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে মানুষ, তাদের সংশোধন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ, সেটা শর্ব্বরীর দ্বারা হবে না। ঘর পরিষ্কার হচ্ছে কি হচ্ছে না, সেটা কেউ গ্রাহ্যও করে না, কাজেই এ ক্ষেত্রে বউয়ের অবহেলাটা কারও চোখেই পড়ল না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোন এক সময় যেমন-তেমন ক'রে ঘরগুলোতে একবার ঝাঁটা চালিয়ে দিলেই হ'ল। নিজের ঘরখানা এবং বাইরের যে ঘরে কর্ত্তা শোন এবং বসেন, এই দুটোই সে ভাল ক'রে পরিষ্কার করত। সেগুলিও পরিপাটি রাখা শক্ত ছিল, তবে গম্ভীরপ্রকৃতি বউদিদিটিকে ননদ-দেবররা একটু সমীহ ক'রে চলত, তাই কাজটা একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে নি।

প্রিয়ব্রতের তখন পরীক্ষা একেবারে সামনে এসে পড়েছে। খুব বেশী মনোযোগ সে স্ত্রীর দিকে দিতে পারত না। রাত্রে ছাড়া তাদের কথা বলবার সময় হ'ত না। দিনে অবশ্য তার যে দেখা একেবারেই পাওয়া যেত না তা নয়, তবে বউয়ের স্বামীর সঙ্গে কথা বলাটা শাশুড়ী দেখতে পারতেন না। কথা না বলা সত্ত্বেও প্রায়ই মন্তব্য করতেন যে, পরীক্ষার বছর বিয়ে দিয়ে তিনি ভাল করেন নি। হয়ত এর ফলে ছেলে ফেল ক'রে বসবে। শর্ব্বরী শুনে মনে মনে জ্ব'লে যেত। ভাবত, এতই পরীক্ষার ভাবনা যদি ত বিয়ে দিতে গিয়েছিলে কেন সাত তাড়াতাড়ি? সেদিকে ত নিজের আরামের ব্যাঘাত সইতে পারলে না! বাস্তবিকই সে ভেবে পেত না, এই দারুণ বিশৃঙ্খলার সংসার কি ক'রে চলত যখন সে আসে নি। একদিন প্রিয়ব্রতকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের সংসারটি ত ছোট নয় এবং মা ঐ রকম অসুস্থ। চলত কি ক'রে আমি যখন আসি নি?"

প্রিয়ব্রত বলল, "সে যা চলত তা তুমি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবে না।"

শর্ব্বরী বলল, "আচ্ছা, আর একটি কথা বলি। পরীক্ষার ফল ত এখনও আমার বেরোয় নি, তবে অতিরিক্ত অহঙ্কার না ক'রেও বলা যেতে পারে যে, পাস আমি করবই। কিন্তু কলেজে ভর্ত্তি হব কি ক'রে, পড়ব কি ক'রে? এমন কাজের চাপ যে নিঃশ্বাস ফেলতেই ত পাই না?"

প্রিয়ব্রত কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তার পর দুই হাত ধ'রে স্ত্রীকে নিজের বুকের কাছে টেনে এনে বলল, "তুমি কি খুব রাগ করবে আর disappointed হবে যদি এ বছরই ভর্ত্তি হওয়া না হয়?"

শর্ব্বরী একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকাল, তার পর বলল, "না রাগ করব না, তবে disappointed হব খানিকটা। এ বছর তাহলে পড়া হবে না?"

প্রিয়ব্রত বলল, "হবে ব'লে ত মনে হচ্ছে না। মা ত আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন দেখছি। সব কাজই তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁকে কিছু বলতেও ত পারছি না। বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলাম পাস করার আগেই, নিতান্তই তাঁর কাজের বোঝা হাল্কা করার জন্যে। এখন কি করে বলি একথা তাঁকে। আমারই বিবেচনায় ভুল হয়েছিল। চাকরি-বাকরি হবার আগে বিয়ে করা ঠিক

হয় নি। উপার্জ্জন ভাল থাকলে সব কিছুরই ভাল ব্যবস্থা করা যেত। শর্ব্বরী, তুমি আমার উপর রাগ করছ না ত?"

শর্ব্বরী বলল, "না, তোমার উপর রাগ করি নি। নিজের উপর খানিকটা রাগ হচ্ছে, মানুষ না হয়েই বিয়ে করার জন্যে। বাবা-মা খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন ঠিকই, তবে আমি শক্ত হয়ে থাকলে তাঁরা জোর করতেন না। জন্মাবধি কখনও তাঁরা আমাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে বাধ্য করেন নি।"

প্রিয়ব্রত বলল, "আমাদের বাড়ীতে তোমার খুব কষ্ট হবে, বুঝতেই পারছি। এখানে কারও স্বাধীন ইচ্ছার কোন মূল্য নেই। তার উপর তুমি পরের মেয়ে, বউ, তোমার দিকটা এঁরা ত দেখারই দরকার বোধ করবেন না।"

শর্ব্বরী ম্লান হাসি হেসে বলল, "খুব ভয় দেখাচ্ছ যা হোক।"

প্রিয়ব্রত তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "অল্প কিছুদিন হয়ত কষ্ট সহ্য করতে হবে শর্ব্বরী। এক বছরের বেশী নয়। তার পর তোমার ইচ্ছামত তুমি থাকবে। কারও বাড়ী ঝি-গিরি তোমায় করতে হবে না। পারবে না?"

শর্ব্বরী বলল, "পারব ব'লে ত মনে হচ্ছে। অন্ততঃ ঝি-গিরি করার ভয়ে তোমার কাছ থেকে আমি পালাব না।"

প্রিয়ব্রত তার মাথাটা বুকে চেপে ধ'রে বলল, "এতটা মূল্য আমার আছে তোমার কাছে?"

শর্ব্বরী হেসে বলল, "তোমার কি মনে হয়? দেখ, যতবার মনে হয় যে বাবা-মা'রা আর একটু খোঁজ-খবর নিয়ে আমার বিয়ে দিলে পারতেন, ততবার মনকে ধিক্কার দিই। এ দিকের কোন ত্রুটি দেখে তাঁরা যদি এখানে আমার বিয়ে না দিতেন, তাহলে ত আমি তোমাকে পেতাম না।"

অতঃপর কথাবার্ত্তাটা অন্যখাতে চ'লে গেল।

কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই শাশুড়ীর ব্যবহার শর্ব্বরীর অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। গালাগালি শোনা তার জীবনে এই প্রথম। চুপ ক'রেই রইল, তবে এমন অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর হয়ে গেল যে, শাশুড়ীও হঠাৎ চুপ ক'রে নিজের ঘরে চ'লে গেলেন, সেখানে ব'সে অবশ্য গজ গজ্ করতে লাগলেন। প্রিয়ব্রত বাড়ী ছিল না। শর্ব্বরী রাত্রে তাকে এ বিষয়ে কিছুই বলল না। অল্পদিন পরে তার পরীক্ষা, এখন তার মন যাতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে এমন কিছু তাকে শোনান উচিত নয়। কপাল-ক্রমে সেই ক'টা দিন শাশুড়ীও একটু চুপচাপ রইলেন, হয়ত বা ইচ্ছা ক'রেই।

পরীক্ষা প্রিয়ব্রত ভালই দিল। শোবার সময় বলল, "যাক্, এখন পাস ক'রে একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পারলেই হয়। তার পর জীবনটা গুছিয়ে নেবার কাজে লাগতে হবে।"

তার চুলের ভিতর আঙুল চালাতে চালাতে শর্ব্বরী বলল, "দেখ, কপালে আবার নূতন সমস্যা কিছু লেখা আছে কি না।"

পরদিন সকালে উঠে শর্ব্বরী দেখল, তার শরীরটা ভাল লাগছে না। কিন্তু আর কেউ যখন কিছু করবে না, তখন সকালের সব কাজ সে কোনক্রমে সেরে ফেলল। তার পর একগাদা ময়লা কাপড় কাচার পালা। কিছুতেই তার আর হাত উঠছিল না ঐ নোংরাগুলো ঘাঁটতে, মনটা খালি পিছিয়ে যাচ্ছিল।

শাশুড়ী দু'চারবার এসে ঘুরে গেলেন। তার পর বললেন, "কি, কাপড়গুলো কি প'ড়েই থাকবে নাকি?"

শর্ব্বরী বলল, "কাচব এখন স্নানের সময়।"

শাশুড়ী খ্যাক্ ক'রে উঠলেন, "কেন, বড়মানুষের মেয়ের ঘেন্না করছে নাকি, ছাড়া কাপড় ছুঁতে? কাপড় কেচে স্নান ক'রে শুদ্ধ হতে হবে?"

দুই চোখে ঘৃণা নিয়ে শর্ব্বরী শাশুড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখল, কথা বলল না। প্রিয়ব্রত সেই সময় এসে বাড়ীতে ঢুকল। মায়ের কথা সে শুনতেই পেয়েছিল বোধ হয়।

ছেলেকে দেখে মা হন্ হন্ ক'রে নিজের ঘরের দিকে চললেন। বলতে বলতে গেলেন, "কাল থেকে যার যার কাপড় সে সে নিজে কাচবে। ওসব বিবিদের দ্বারা হবে না।"

শর্ব্বরীর কাছে এসে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল, "শরীর ভাল নেই নাকি শর্ব্বরী?"

শর্ব্বরী বলল, "খুব ভাল নেই। তবে কাজ আমি ক'রে দিচ্ছি।"

বেশী কথা বলার দিনের বেলা সুযোগ ছিল না। শাশুড়ী রুগ্ন ব'লে একটু সকাল-সকাল শুয়ে পড়তেন। শর্ব্বরীও তাড়াতাড়ি ক'রে কাজ সেরে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। আজ গিয়ে দেখল, প্রিয়ব্রত আগেই এসে শুয়ে পড়েছে। শর্ব্বরীকে দেখে বলল, "দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও, আমি আর বাইরে যাব না।"

শর্ব্বরী দরজা বন্ধ ক'রে এসে বিছানায় বসল।

প্রিয়ব্রত তার হাত ধ'রে বলল, "আমাকে পাওয়ার আনন্দটাও আর তোমায় সান্ত্বনা দিচ্ছে না, না শর্ব্বরী ?"

শর্ব্বরী তার মাথাটা কোলে নিয়ে বলল, "এখন পর্য্যন্ত বোধ হয় দিচ্ছে।"

প্রিয়ব্রত বলল, "পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না ?"

শর্ব্বরী সংক্ষেপে বলল, "না।"

প্রিয়ব্রত বলল, "আগে যা বলেছি, তাই আবার বলা ছাড়া আর কি বলতে পারি ? একটা চাকরি আমার হওয়া অবধি কোনমতে ধৈর্য্য ধ'রে থাক।"

শর্ব্বরী বলল, "চেষ্টা ত করছি, তার বেশী আর কি করব বল ?"

শর্ব্বরীর পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গিয়েছিল এর মধ্যে। সে ভাল করেই পাস করেছিল। তবে এ নিয়ে এ বাড়ীতে কেউ আনন্দ প্রকাশ করে নি, এক প্রিয়ব্রত ছাড়া।

তার নিজের পরীক্ষার ফল কাগজে বেরোবার আগেই প্রিয়ব্রত তলে তলে খোঁজ-খবর নিয়ে জেনে গেল যে, সেও ভাল করেই উত্তীর্ণ হয়েছে। নানা জায়গায় কাজের সন্ধান করতে লাগল। অনেক জায়গায় সোজা আবেদনপত্রও পাঠাল।

প্রিয়ব্রত এখন সারাদিনই প্রায় বাড়ী থাকে। এতে তার মা একটু অসুবিধা বোধ করেন। বউকে বকা-ঝকাটা ছেলের সামনে করতে চান না। এই বড়ছেলে, এরই উপর নির্ভর করতে হবে, যখন কর্ত্তার আয় অর্দ্ধেক হয়ে যাবে। ছেলেটা চিরকাল ঠোঁটকাটা, মায়ের উপর ভক্তিশ্রদ্ধা কম। এখন যদি বউয়ের দিকে ভিড়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করে, তাহলে মান থাকবে না তাঁর। বউও আস্কারা পেয়ে যাবে। বউ-ছেলে দিনের বেলা ব'সে ব'সে গল্প করে এ তিনি একেবারে চান না। কিন্তু তাহলে নিজেকে জেগে ব'সে থাকতে হয় সারাদিন পাহারা দিয়ে। সেটা পারেন না, দুপুরে বেশ ঘণ্টা দুই-তিন না ঘুমোলে তাঁর চলেই না। বউ তখন কি করে কে জানে ?

চাকরির কপাল প্রিয়ব্রতের ভালই ছিল। পরীক্ষার ফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই ছোটখাট কাজ একটা তার জুটে গেল। তবে এর থেকে ভাল কাজ হবার বেশ সম্ভাবনা রইল। কিন্তু কাজটা কলকাতার বাইরে।

বাড়ীর আর সবাই খুশী, শুধু খুশী হ'ল না শর্ব্বরী। এইবার বুঝি তাকে একলা পড়তে হয়। জীবনে এখন তার একমাত্র আনন্দ, স্বামীর সান্নিধ্য আর সাহচর্য্য, তাও কি বিরূপ ভাগ্য এবার ছিনিয়ে নেবে ?

প্রিয়ব্রতকে শোবার ঘরে ঢুকতে দেখেই শর্ব্বরী কেঁদে ফেলল। ব্যস্ত হয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে প্রিয়ব্রত বলল, "কি হয়েছে শর্ব্বরী ? আবার মা গোলমাল করেছেন ?"

শর্ব্বরী বলল, "মায়ের কথায় আমি কোনদিন কাঁদি ?"

প্রিয়ব্রত বলল, "তা ত কাঁদ না। তবে কি হ'ল ? আমি চ'লে যাচ্ছি ব'লে ?"

শর্ব্বরী চোখ মুছতে মুছতে বলল, "ওটা কি খুবই ছোট জিনিস তোমার কাছে ?"

প্রিয়ব্রতের মুখটা অত্যন্ত ম্লান হয়ে গেল। বলল, "ছোট জিনিস নয়, অত্যন্ত বড় জিনিস। কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে এ কষ্ট আমাদের সহ্য করতে হবে। ভাল চাকরিটা যদি আমার লেগে যায়, তাহলে কোন সমস্যাই আর থাকবে না। মায়ের জন্যে housekeeper রেখে দিয়ে আমি তোমাকে নিয়ে চ'লে যাব। কারও কোন কথা শুনব না। আমার মুখ চেয়ে এ দুঃখটা তুমি সহ্য কর শর্ব্বরী। এতটা তোমার কাছে চাওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু তুমি কতখানি ভালবাস আমাকে তা আমি জানি। সেই সাহসেই এই অনুরোধ করতে পারছি।"

শর্ব্বরী প্রিয়ব্রতের বুকে মাথা রেখে চুপ ক'রে রইল।

দিনকয়েকের মধ্যেই প্রিয়ব্রত চ'লে গেল। শর্ব্বরীর চোখে জগৎটা ভয়ানক অন্ধকার লাগতে লাগল। সব কিছু একেবারে বিস্বাদ হয়ে গেল তার কাছে। ত্রিসংসারে কোথাও যেন কোন রস নেই। এ কি নিদারুণ কারাগারে বন্দী হয়েছে সে ?

প্রিয়ব্রতও নূতন জায়গায় গিয়ে একেবারে মুষড়ে পড়ল। কাউকে চেনে না, নিরন্তর কাজ ক'রে যাওয়া ছাড়া সময় কাটাবার আর কোন উপায় তার নেই। সহকর্ম্মীরা বেশীর ভাগই তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়, ঘোরতর সংসারী, তাদের সঙ্গে মন খুলে গল্প করা যায় না। অতি ফাজিল দু'চারটা যুবক আছে, তাদের সাহচর্য্য প্রিয়ব্রতের পছন্দ হয় না।

নিজে রোজ চিঠি লেখে। শর্ব্বরীর চিঠি কিন্তু খুবই কম পায়। বুঝতেই পারে, মা বাধা দিচ্ছেন। মনটা তার আরও উতলা হয়ে ওঠে। কতদিন সহ্য করবে শর্ব্বরী ? সে ত সাধারণ হিন্দুঘরের মেয়ের মত নয় ? যে রুদ্রতেজের ঝলক্ তার চোখে মাঝে মাঝে দেখা দেয়, সেটা স্মরণ ক'রে ক্রমেই প্রিয়ব্রতের মন আশঙ্কায় ভ'রে উঠতে লাগল।

হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত দু'খানা চিঠি একসঙ্গে তার

হাতে এসে পড়ল। শর্ব্বরীর লেখাটাই সে আগে খুলল। শর্ব্বরী সোজাসুজি লিখেছে কোন সম্বোধন না ক'রে—

"তুমি হয়ত খুবই রাগ করবে, খুবই দুঃখ পাবে, কিন্তু যা করলাম, তা করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। আমি তোমাদের বাড়ী ছেড়ে এসেছি। এত অপমান সহ্য ক'রে আমি থাকতে পারলাম না। পারা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি তাহলে আর মানুষ থাকতাম না। এতখানি অন্যায় সহ্য করা আমি মানুষের আত্মার অপমান ব'লে মনে করি।

আমি নিজে মানুষ হয়ে নিই, তার পর আবার তোমার কাছে ফিরে যাব এই আশা নিয়েই আমি এসেছি। কিন্তু তুমি যদি আমায় ক্ষমা আর না কর, তাহলে তোমায় আমি দোষ দেব না। তুমি যেখানে আমাকে রেখে গিয়েছিলে, সেখানেই থাকা আমার উচিত ছিল, যতই কষ্ট হোক, যতই অপমান হোক, এটা তুমি ভাবতে পার। হিন্দু বাঙালীর সংসারে অধিকাংশ মানুষই তাই ভাবে, এমন কি আমার মাও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু এটা আমি ভাবতে পারলাম না। আমি আগে মানুষ, তার পরে আমি স্ত্রী। কাজেই মানুষের অধিকার বজায় রাখবার জন্যে আমাকে শ্বশুর-বাড়ীর আশ্রয় ত্যাগ করতে হ'ল।

আর কি লিখব? একটু ক্ষমার চক্ষে দেখতে চেষ্টা ক'রো আমাকে। আমি বি. এস্-সি ও বি. টি. পাস ক'রে আবার তোমার কাছে যাব, এই স্থির করেছি। তবে শেষ কথা বলার মালিক তুমি। তুমি যা বলবে, তাই হবে।

শর্ব্বরী।

মায়ের চিঠি আবোল-তাবোল বকুনিতে ভরা। পড়তে ইচ্ছা করে না তবু ব্যাপার কি জানবার জন্য পড়তে হ'ল প্রিয়ব্রতকে।

কল্যাণীয়েষু,

এই চিঠি পেয়ে তুমি অবাক্ হবে। জীবনে এমন কাণ্ড দেখ নি, কানেও এমন কথা শোনো নি। তোমার বউ রাগ ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেছে। কারও কথা শুনল না, এই ঘোর বর্ষায় রাস্তায় এক হাঁটু জলের মধ্যে দিয়ে তেজ দেখিয়ে ফর্‌ফর্ ক'রে চ'লে গেল। আমার কথা শুনল না, তোমার বাবার কথা শুনল না। সে কি রকম মনীমুখো জান ত, জোর গলায় ধমক সুদ্ধ একটা দিল না। দেবব্রতকে বললাম গিয়ে টেনে আনতে ত সে ছেলেও তেমনি, নড়ল না। আমি ত অত বৃষ্টিতে বেরোতে পারলাম না, শেষে নিমুনি হয়ে মরব কি? তোমার শ্বশুর-শাশুড়ীও তেমনি, তাদের ওস্‌কানি না পেলে কি আর ঐটুকু মেয়ের অত সাহস হয়? তারা মেয়েকে আর পাঠায় নি, নিজেরাও আসে নি মাপ চাইতে। আমি বাপু এই উগ্রচণ্ডা রক্ষেকালী বউ নিয়ে ঘর করতে পারব না। তুমি বুদ্ধিমান্ ছেলে, ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখবে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, এত তেজ! এ বউ আবার ঘরে নিতে আছে? তুমি যাওয়া অবধি অত্যন্ত বেয়াড়া হয়ে উঠেছিল, একেবারে কথা শুনতে চাইত না। সেদিন সকালে একটু শাসন করতে গিয়েছিলাম, এই আমার অপরাধ। তা বউ-ঝিকে ত মানুষ শাসন ক'রেই থাকে?

তোমার যা ইচ্ছা করতে পার, কিন্তু আমি ও বউকে ত্যাগ করাই স্থির করেছি। আশা করি কুশলে আছ।

ইতি

আশীর্ব্বাদিকা তোমার মা।

নিজের মাথাটা দুই হাতে চেপে ধ'রে প্রিয়ব্রত অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। রাগে মাথাটা যেন ফেটে পড়তে চাইছে। এই তার মা? মানুষ নামের একেবারে অযোগ্য। অথচ এরই কাছে তার জন্মের ঋণ; এরই গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করেছে, এরই স্তনদুগ্ধে পালিত হয়েছে। জীবন থেকে একে বাদ দেওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব?

আর শর্ব্বরী? মনটা দারুণ অভিমানে তার অন্ধকার হয়ে উঠল। সত্যই সে প্রিয়ব্রতকে বড় ভালবেসেছিল। কিন্তু সে ভালবাসার ক্ষমতা তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারল না? চ'লে গেল সে নিজের ইচ্ছামত? একবার প্রিয়ব্রতকে জানালও না? সে নিজে হ'লে এ অবস্থায় কি করত, তা প্রিয়ব্রত ভাবলও না। স্বামীর প্রতি অচল ভালবাসা রক্ষা করা সর্ব্বক্ষেত্রে মেয়েদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, এই শুনেছে চিরকাল। নিজের অজ্ঞাতসারেই এই ধারণাটা তার অভিমানের আগুনে আরও যেন ইন্ধন জোগাতে লাগল।

দিনটা ছিল শনিবার। একবার তাকে কলকাতায় গিয়ে ঘুরে আসতে হবে কয়েক ঘণ্টার জন্য। নিজের চোখে দেখে আসবে, নিজের কানে শুনে আসবে।

রবিবার সকালের দিকে তাকে কলকাতায় দেখা গেল নিজেদের বাড়ীতে। সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু নেই। মুখের উপর কে যেন কালি মেরে দিয়েছে, চুল বোধ হয় দু'দিন আঁচড়ায়নি।

মা তাকে দেখে আবার বক্‌বক্ করতে সুরু করলেন।

প্রিয়ব্রতের বাবা বললেন, "ছেলেকে বসতে দাও, চা খেতে দাও, তার পর যা বলবার বলবে।"

প্রিয়ব্রত বলল, "কিছুর দরকার নেই আমার। আমি শুধু নিজের কানে শুনে যেতে এসেছি যে কি ঘটেছিল। শর্ব্বরী বাড়ী ছাড়ল কেন?"

মা কিছু বলবার আগে বোন শুভ্রা বলল, "মায়ের মুখে মুখে জবাব দিয়েছিল ব'লে মা তার চুলের মুঠি ধ'রে মারতে গিয়েছিল।"

প্রিয়ব্রতের মুখ কাল হয়ে উঠল। মায়ের দিকে আর ফিরে না তাকিয়ে সে বেরিয়ে চলল। হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প'ড়ে জিজ্ঞাসা করল, "তার জিনিসপত্র কি হ'ল?"

তার বাবা বললেন, "ওঁর সব জিনিসপত্র, গহনাগাটি আমি প্যাক্ করিয়ে তাঁর বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। ওঁরা অন্ততঃ জানুন যে, আমরা চোর নই।"

মা হাউমাউ ক'রে চেঁচাতে লাগলেন। প্রিয়ব্রত অন্নাত অভুক্ত বেরিয়ে চ'লে গেল।

শর্ব্বরীদের বাড়ী যখন পৌঁছল, তখন সে স্নান করতে যাচ্ছে। প্রিয়ব্রতের আগমন-সংবাদ পেয়ে ম্লানমুখে ঘরে এসে ঢুকল।

প্রিয়ব্রত নীরবে তার মুখের দিকে তাকাল। শর্ব্বরী জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি ভয়ানক রাগ করেছ আমার উপরে? আমাকে ফিরে যেতে বল?"

প্রিয়ব্রত বলল, "আমার সে অধিকার নেই। তোমাকে ফিরে যেতে বলতে আমি পারি না। যেখানে দায়িত্ব নিতে পারি নি, কর্ত্তব্য করতে পারি নি, সেখানে অধিকার খলাতে যাব না।"

শর্ব্বরী নীরব হয়ে রইল কিছুক্ষণ, তার পর বলল, "যা তাহলে ঠিক করেছি, তাই করব।"

প্রিয়ব্রত বলল, "তাই করাই উচিত। নিজের বুদ্ধিতেই চলা তোমার ভাল, কারণ আর কারও পরামর্শে তুমি চলতে পারবে না।"

শর্ব্বরীর মুখ আরও ম্লান হয়ে গেল। সে বলল "আমায় ক্ষমা করতে পারলে না তাহলে?

প্রিয়ব্রত একটু হাসবার চেষ্টা করল, বলল, "তা ত আমি বলিনি শর্ব্বরী? আমি বলতে চাইছি যে, অপরাধ নেবার বা ক্ষমা করবার অধিকার আমার নেই। সত্যিই আগে তুমি মানুষ, তার পর তুমি স্ত্রী। তোমার পথ তুমি বেছে নিয়েছ, আমার পথও আমি বেছে নিয়েছি। দু'টো পথ আর এক গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে কিনা তা সময়ে বোঝা যাবে। আমি যাই এখন! যদি প্রয়োজন হয়, খবর দিও।"

আর শর্ব্বরীর দিকে না তাকিয়ে সে চ'লে গেল। শর্ব্বরী পাথরের মূর্ত্তির মত ব'সে রইল।

(২)

বর্দ্ধমান শহরটা অতীত এবং বর্ত্তমানে মিশান। এখানে মোগল আমলের সৌধ যেমন আছে, একেবারে হাল ফ্যাশনের বাড়ীঘরও তেমনি আছে। আধুনিক শহর, মধ্যযুগের শহর যেন গলাগলি ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাঘাট নানারকম, আধুনিক শহরের সুখ-সুবিধা যেমন আছে, অতীতের অ-সুখ অসুবিধাও নানা জায়গায় আছে।

শহরের মাঝামাঝি জায়গায় একটি নূতন দোতলা বাড়া। বাড়ীটি বড় নয়, মাঝারিও ঠিক বলা যায় না, তবে একেবারে ছোট নয়। নীচের তলায় দুখানা ঘর, একটা বড় একটা মাঝারি। তা ছাড়া বাথরুম আছে, চাকরের ঘর আছে, রান্নাঘর আছে। দোতলায় একটা বড় ঘর, আর একটি বেশ ছোট ঘর ছাদের কিছু অংশ ঢাকা, কিছু অংশ খোলা। বাথরুম উপরেও আছে। বাড়ীর অধিবাসী তিনটি মানুষ। গৃহস্বামিনী শর্ব্বরী। আমরা শেষ যখন তাকে দেখেছি তার পর বছর তিন-চার কেটে গেছে। এখানে সে এখন মেয়েদের এক স্কুলের অধ্যক্ষা। সঙ্গে থাকে একজন দারোয়ান, আর প্রৌঢ়া ঝি কৌশল্যা।

শর্ব্বরী দেখতে প্রায় আগের মতই আছে, তবে আরও গম্ভীর হয়ে গেছে, একটু রোগাও হয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সে কলকাতায় আর বেশীদিন থাকেনি। দেখল, মা-বাবা তাকে নিয়ে বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছেন। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে ঠিক জবাব-দিহি করতে পারছেন না তার উপস্থিতির জন্যে। শর্ব্বরী তাঁদের অব্যাহতি দিল। লক্ষ্ণৌএ তাঁদের এক আত্মীয়া থাকতেন, গহনাগাটি খানিকটা বিক্রী ক'রে টাকা সংগ্রহ ক'রে তাঁর কাছে চ'লে গেল।

তারপরে বি. এস্-সি. পাস করেছে, ট্রেনিং পাস করেছে। ফিরে এসেছে কলকাতায়। এখানে ভাল চাকরি পেয়ে এসে বাসা নিয়ে রয়েছে। বাইরের থেকে দেখলে ত মনে হয় সে ভালই আছে।

প্রিয়ব্রতদের খবর মধ্যে মধ্যে সে পায়। খুব বিশদ খবর নয়, মোটামুটি খবর। তার শ্বশুর রিটায়ার করেছেন, শাশুড়ী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে প'ড়ে আছেন। ননদের বিয়ে হয়ে গেছে, প্রিয়ব্রতর পরের ভাই দেবব্রতর

বিয়ে হয়ে গেছে। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করেছে সে। দরিদ্রের মেয়ে, তারা টাকাপয়সা কিছু দিতে পারে নি, তবে কথা দিয়েছে, মেয়ে শাশুড়ীর সেবা করবে, ঘর-সংসার দেখবে। প্রিয়ব্রত আসানসোলের কাছে কোথায় ভাল কাজ করে, জায়গাটার নাম শর্ব্বরী জানে না। দুজনের আর দেখা হয়নি, চিঠিপত্রের যোগাযোগও নেই। সঙ্কোচ আর অভিমানের প্রাচীরটা ক্রমেই যেন উঁচু হয়ে উঠছে দু'জনের মধ্যে। শর্ব্বরীর জীবন বড় একলার, কোথাও যেন কোন অবলম্বন তার নেই। তবু স্বাধীন থাকার গর্ব্বে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। প্রয়োজন ছাড়া কারও সঙ্গে মেশে না।

সংসার এত ছোট যে তাকে কিছু দেখতে হয় না। আয়া কৌশল্যাটা সব দেখে, সব করে। বাইরের কাজ-কর্ম্ম করে দারোয়ান রামনরেশ। দাদারা এসে মাঝে মাঝে দেখে যায়।

বর্ষাকাল, বেশ ঘন ঘোর বর্ষা। সূর্য্যের মুখ দেখবার জো নেই, অনবরত চলেছে মেঘ আর বৃষ্টি আর তীক্ষ্ণ বাদলা হাওয়া।

শর্ব্বরী নীচের বসবার ঘরে ব'সে চিঠি লিখছে। এই ঘরটি তার বসবার ঘর এবং অফিস ঘর দুইই। কৌশল্যা এসে বলল, "দিদিমণি, আমার এদিক্‌কার কাজ সারা হয়ে গেছে। এখন যদি টাকা দাও ত বাজার ঘুরে আসি। কবে কি ঘটে ঠিক নেই, যা বর্ষা নেমেছে।

শর্ব্বরী বলল, "ঘটবে আবার কি? বর্ষা ত প্রতি বছর হয়।"

কৌশল্যা বলল, "মানুষের দুর্গতিও ত প্রতি বছরের। এই খবর এল ব'লে, বান এসেছে, গ্রাম ভেসে যাচ্ছে। গাঁয়ের লোক সব হুড়মুড় ক'রে সহরে এসে জুটবে। ভলানটিয়ার বাবুরা নিয়ে আসবে, সরকার থেকে নিয়ে আসবে, সন্ন্যাসীরা নিয়ে আসবে। তখন দেখবে তামাসা। আমি এইদিকের মানুষ, আমি ত সব দেখছি। স্কুল-কলেজ সব বন্ধ, ওরা সব জায়গা জুড়ে বসবে। ইষ্টিসানেও তিল ফেলবার জায়গা থাকবে না। তারপর শহরেও জল ঢুকতে সুরু করবে, তখন ত হাটবাজারও বন্ধ। তাই সময় থাকতে সাবধান হওয়া। একমাসের সব জিনিষ কিনে ঘরে রাখতে হবে।"

শর্ব্বরী বলল, "এই না কি-সব সেদিন কিন্‌লি?"

কৌশল্যা বলল, "সে আর কতটুকু? শুধু চাল-ডালটা কিনেছি। এখনও ভাঁড়ারের বাকি সব জিনিষ কিনব, কয়লা কিনব, কাঠ কিনব, কেরসিন্ কিনব, মোমবাতি কিনব। লণ্ঠন একটা মাত্তর আছে বাড়ীতে, আরও দু'টো রাখা ভাল। ইলেক্‌ট্রিরিও খারাপ হয়ে যায় এই বানের সময় মাঝে মাঝে।"

শর্ব্বরী বলল, "বাব্বাঃ, এ যেন যুদ্ধের সময় নগর অবরোধ। কেনো বাপু তোমার যা ইচ্ছে। কথা না শুনে পরে পস্তাতে চাই না আমি। চল, টাকা দিচ্ছি।"

বেশ কিছু টাকা নিয়ে কৌশল্যা চ'লে গেল এবং ঘণ্টা দুই পরে দু'টো রিক্‌শ বোঝাই ক'রে জিনিসপত্র নিয়ে ফিরে এল। দোতলার ছোট ঘরটা দেখতে দেখতে গুদাম ঘরে পরিণত হ'ল।

কৌশল্যার কথার সত্যতা পরদিনই প্রমাণ হ'ল। কাগজেও পড়ল শর্ব্বরী, লোকমুখেও শুনল, দামোদরে প্রবল বান এসেছে। চারিদিকের গ্রাম জলমগ্ন হচ্ছে, অসহায় লোকরা পালাচ্ছে, ডুবে মরছে, ঘরবাড়ী পড়ছে, গরুবাছুর ভেসে যাচ্ছে। বর্দ্ধমান শহরের দিকেও বন্যার জল এসে এগিয়ে আসছে।

কৌশল্যা বলল, "দেখলে ত গা দিদিমণি। এখন ক'দিন চলবে এই হাড় জ্বালাতন তা কে জানে? ওষুধ-বিষুদ না হয় কিছু জোগাড় ক'রে রাখ। কাপড়-চোপড়ের দরকার থাকে ত তাও কেনো।"

শর্ব্বরী বলল, "কাপড়-চোপড়, বিছানা-মাদুর এক বছরের মত আছে, কি তারও বেশী আছে। ওসব কিনতে হবে না। ওষুধ কিছু কিনলে হ'ত, কিন্তু ও বিষয়ে আমি জানি বা কি? যা হোক, পেটের অসুখের আর সর্দ্দি জ্বরের ওষুধটা জানি, রামনরেশকে পাঠাচ্ছি ডিস্‌পেনসারিতে।"

সারাদিন শহরে বন্যার আলোচনাই চলতে লাগল। বৃষ্টি থামে নি, জল আরও বাড়ছে। দুর্গত গ্রামবাসীর দল এবারে শহরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করল। স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ক'রে এদের স্থান করা হ'তে লাগল। আত্মীয়বন্ধুর ঘরে কিছুর স্থান হ'ল। বাকিরা অস্থায়ী চালাঘরে, তাঁবুতে, যেখানে পারল, ছাগল-গরুর মত গাদাগাদি ক'রে কোনমতে আশ্রয় নিল।

শহরের রাস্তাঘাটেও অল্প অল্প জল দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। দরিদ্র অধিবাসীরা শঙ্কিত হ'তে আরম্ভ করেছে, কিন্তু কোথায় বা যাবে তারা? পাছে হাট-বাজার বন্ধ হয় এ ভয় আরও বেশী, মানুষ ত তা হলে না খেয়ে মরবে। তরিতরকারি ত আনত গ্রামের লোকে, তারা সর্ব্বহারা এখন, শহরের লোককে খাবার কে জোগাবে? জল আস্তে আস্তে বাড়ছে। শহরের নীচু দিকগুলি ডুবতে আরম্ভ করেছে। ব্যাপার দেখে শর্ব্বরীও একটু ব্যস্ত হ'য়ে পড়ল। এখনই খুব বেশী

বিপদ্ হয়ত হবে না, কিন্তু কলকাতায় ব'সে তার মা খুব ভয় পাবেন। একলা থাকে মেয়ে, যতই কেননা শক্ত হোক, ছেলেমানুষ মেয়ে ত? মাকে আশ্বস্ত ক'রে একখানা চিঠি লিখতে বসল সে।

বেলা দুপুর প্রায়, কিন্তু চারিদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার। দিবানিদ্রা শর্ব্বরীর আসে না, তবু ছুটির দিন। চিঠি শেষ ক'রে শুয়ে শুয়ে একখানা বই পড়বার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু মনটা বারে বারে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে।

কৌশল্যা এই সময় ঘরে ঢুকল, হাতে একটা মাঝারি গোছের তোলা উনুন। শর্ব্বরীকে বলল, "উনুনটা কিনে রাখলাম। নীচের রান্না ঘরটার ত ভিত উঁচু না, সহজেই জল ঢুকতে পারে। তখন উপরেই রেঁধেবেড়ে দু'টো মুখে দিতে হবে ত?"

শর্ব্বরী উত্তরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় নীচে সদর দরজায় কে যেন সজোরে কড়া নাড়ল।

কৌশল্যা বলল, "এখন আবার কে এল?"

দারোয়ান উপরে উঠে এসে খবর দিল যে একজন ভদ্রলোক শর্ব্বরীর সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। শর্ব্বরী একটু বিস্মিত হ'ল, এমন সময় কে আসবে তার কাছে? চটি পায়ে নীচে নেমে গেল।

একজন অপরিচিত ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। শর্ব্বরীকে দেখে নমস্কার ক'রে বলল, "আপনি শর্ব্বরী মিত্র? এ বাড়ী আপনার?"

শর্ব্বরী প্রতিনমস্কার ক'রে বলল, "হ্যাঁ, আমারই বাড়ী। কিন্তু আপনি কোথা থেকে আসছেন, আমি ত চিনলাম না?"

যুবক বলল, "আমি একটা flood রিলিফ কমিটি থেকে আসছি। নাম আমার সুব্রত রায়। আপনাকে অনুরোধ করতে এসেছি, আপনি যদি দয়া ক'রে নীচের এই বড় ঘরখানি ছেড়ে দেন কয়েকদিনের জন্যে। শুধু কয়েকজন মহিলা আর বাচ্চাকাচ্চা কয়েকটা থাকবে। ঘর দেওয়া ছাড়া আর কিছু আপনাকে করতে হবে না, দেখাশোনা, খাওয়ান-দাওয়ান সব আমরা করব।"

শর্ব্বরী একটু চিন্তা ক'রে বলল, "আর কোথাও কি জায়গা নেই?"

ছেলেটি বলল, "যাদের আনতে চাইছি, তাঁরা ঐ রকম গাদাগাদি ক'রে থাকতে অভ্যস্ত নন, বড় ঘরের মেয়ে। এমনিতেই বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। অসুস্থ হ'তেও দেরি হবে না, ভাল জায়গা না পেলে। সাত-আট দিনের বেশী দরকার হবে না।"

শর্ব্বরী বলল, "নিয়েই আসুন তা হ'লে। আমি ঘর খালি করার ব্যবস্থা করছি।"

ছেলেটি নমস্কার ক'রে চ'লে গেল। শর্ব্বরী কৌশল্যাকে ডেকে বলল, "তোমার ভবিষ্যৎবাণীই খাটল। বানের জলও শহরে ঢুকেছে, আর বানে-ভাসা মানুষও এসে ঘরে ঢুকবার ব্যবস্থা করেছে। ঘর খালি কর এখন।"

সব শুনে কৌশল্যা, রামনরেশ আর শর্ব্বরী নিজে, তিন জনেই ঘর খালি করতে লেগে গেল। ঘণ্টা দুই কেটে গেল তাদের এই কাজে। তার পর আশ্রয়-প্রার্থিনীরা এসে পড়ল। যতদূর নৌকায় আসা যায় তারা আসে। তার পর রিক্‌শ, ঘোড়ার গাড়ী, ঠেলা-গাড়ী, গরুর গাড়ী যা জোটে তাই সম্বল। রাস্তা দিয়ে সব দলে দলে আসছে। পুরুষরা অনেকে হেঁটেই আসছে জলকাদা ভেঙ্গে। সামান্য পোঁটলা-পুঁটলি ছাড়া বেশী কিছু আনতে অধিকাংশ লোকই পারে নি। দামোদরই তাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করেছে। শর্ব্বরী আর কৌশল্যা বেরিয়ে এসে সিঁড়ির উপরে দাঁড়াল। একটা ঘোড়ার গাড়ী আর একটা গরুর গাড়ী তার দরজার সামনে থামল। দু'টোই স্ত্রীলোক ও কাচ্চাবাচ্চাতে ভর্ত্তি। পোঁটলা-পুঁটলি বেশ কিছু রয়েছে। ভলান্টিয়ার ছেলের দল জিনিষপত্র ও বাচ্চাদের নামিয়ে ফেলল, মেয়েরা নিজেরাই নামল।

হঠাৎ শর্ব্বরী ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। একটা ছই দেওয়া গরুর গাড়ীর ভিতর থেকে ছেলেরা ও কাকে নামিয়ে আনছে? প্রায় চলচ্ছক্তিহীনা এক প্রৌঢ়া, মাথার চুল শাদা হয়ে এসেছে, মুখ দিয়ে অনর্গল কথা বেরুচ্ছে, কিঞ্চিৎ জড়িত ভাবে। সাহায্য ছাড়া হাঁটা-চলা করার ক্ষমতা যে নেই তা দেখলেই বোঝা যায়। এ ত প্রিয়ব্রতের মা। শর্ব্বরীর শাশুড়ী!

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ছেড়ে সে স'রে দাঁড়াল যাতে মহিলা প্রথমেই তাকে দেখতে না পান। নিজেকে সামলে নিতে তার একটু সময় লাগবে। কিন্তু এ কি ক'রে সম্ভব হ'ল? কলকাতা ভবানীপুর থেকে ইনি এখানে এসে পড়লেন কি ক'রে? কোথায় গেল তাঁর স্বামী, তাঁর ছেলে-পিলে?

ছেলেরা ততক্ষণ আশ্রয়ার্থী মেয়েগুলিকে বিছানা-টিছানা পেতে বসিয়ে দিচ্ছে। খাবার-দাবার সঙ্গে কিছু কিছু এনেছে, তাই দিয়ে বাচ্চাদের কান্না থামান হচ্ছে। বেশীর ভাগ মেয়েরা চুপ ক'রেই আছে, নিজেদের দুর্ভাগ্যের ভার তাদের মনের উপর এমন চেপে বসেছে যে, কথা বলার সব ইচ্ছে তাদের চ'লে গিয়েছে। কেউ

কেউ ছেলে-পিলের সঙ্গে দু'একটা কথা বলছে। জিনিস-পত্র কারও সঙ্গে খুব বেশী কিছু নেই। কাপড়-চোপড় দু'চারখানা। পাতবার শতরঞ্চ, বালিশ এই সব। ছোট চামড়ার ব্যাগে ক'রে দামী জিনিসও কেউ কেউ এনেছে।

যে ছেলেটি প্রথম এসেছিল শর্ব্বরীর সঙ্গে কথা বলতে, সেই সুব্রতকে এক পাশে ডেকে আনল শর্ব্বরী। জিজ্ঞাসা করল, "ঐ বৃদ্ধা মহিলাকে আপনারা পেলেন কোথায়?"

সুব্রত বলল, "সে এক মহা উৎপাত। এই কাছেরই জলমগ্ন গ্রাম থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছি। এঁর বাপের বাড়ী সেখানে, এক ভাই গৃহকর্ত্তা। জল ভয়াবহ রকম বাড়ছে দেখে বউ ও ছেলেপিলেদের নিয়ে বাড়ীর দুই যুবক পুত্র সকালে বেরিয়েছেন। কথা ছিল তাদের রেখে এসে বুড়োবুড়ী ও অস্থাবর সম্পত্তি যতটা পারেন উদ্ধার করবেন, কিন্তু তাঁরা আর ফেরেন নি। আমরা ওখানে গিয়ে দেখি, এঁরা ভীষণ চেঁচামেচি করছেন, জল প্রায় ঘরে ঢুকে পড়েছে। নিয়ে এলাম তাই। বৃদ্ধকে তাঁবুতেই রেখেছি। এঁকে আনলাম এখানে, তাতেও খুশী নন, খালি চেঁচাচ্ছেন আর গাল দিচ্ছেন পরিবারের যে যেখানে আছে সবাইকে। আপনি কি চেনেন এঁকে?"

শর্ব্বরী বলল, "চিনি।"

সুব্রত বলল, "তাহলে কথা ব'লে দেখুন না, যদি থামাতে পারেন।"

শর্ব্বরী একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবল, তার পর বলল, "আচ্ছা যাচ্ছি। উপর থেকে ঘুরে আসি একটু।"

উপরে গিয়ে কৌশল্যাকে বলল, "এদিকে ত এক কাণ্ড বেধেছে।"

"কি হয়েছে দিদিমণি?"

শর্ব্বরী বলল, "ঐ মেয়েগুলির মধ্যে ত আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ এসে জুটেছেন। বাপের বাড়ী এসেছিলেন বেড়াতে। এখন এই দশা। আমার ত উচিত দেখা-শোনা করা, দুরবস্থায় পড়েছেন।"

কৌশল্যা বলল, "তা ত বটেই। অসময়ে আত্মীয়-স্বজনই ত দেখে। তা নিয়ে এস উপরের ছোট ঘরে। ক্যাম্পখাট পেতে বিছানা ক'রে দিই, ও ঘর ত প্রায় খালিই প'ড়ে থাকে।"

শর্ব্বরী বলল, "তাই কর। আমি নীচে গিয়ে বলছি।"

একতলায় নেমে দেখল, ওর শাশুড়ী তখনও কার উদ্দেশে গালাগালি করছেন। কাছে গেল, বলল, "মা শুনছেন?"

চমকে উঠে প্রৌঢ়া বললেন, "কে গা বাছা তুমি?"

শর্ব্বরী বলল, "আমি শর্ব্বরী। এটা আমারই বাড়ী। আপনি এখানে এত লোকের মধ্যে শান্তিতে থাকতে পারবেন না। উপরে আপনাকে আলাদা ঘর দিচ্ছি। সেইখানে শোবেন চলুন।"

বিস্ময়ে মহিলার কণ্ঠরোধই হয়ে গেল প্রায়। একটু পরে বললেন, "শেষে তোমার আশ্রয়ে এসে পড়লাম? এই ভগবানের বিচার? তা নিয়ে চল। আর কলকাতায় একটা খবর দাও, তারা ভেবে মরছে এতক্ষণ। আর প্রিয়কেও একটা খবর দাও, সেও ত এই দিকে থাকে। আমাকে দুই-একদিনের মধ্যে দেখতে আসবার কথা ছিল।"

কৌশল্যা ততক্ষণে বিছানা পেতে ঘর ঠিক্‌ঠাক্ ক'রে দিয়েছে। ছেলেরা আবার ধরাধরি ক'রে ভদ্রমহিলাকে উপরে নিয়ে এল। পরিষ্কার ঘরে ভাল বিছানার শুয়ে তাঁর বকুনিটা একটু থামল। কাপড়-চোপড় আনতে পারেন নি, শর্ব্বরী নিজের কাপড় পরিয়ে তাঁর ভিজে কাপড় ছাড়িয়ে দিল। বলল, "কতক্ষণ না খেয়ে আছেন?"

প্রিয়ব্রতের মা বলেন, "চিঁড়ে-মুড়ি ছাড়া আর কিছু কি জুটেছে? বউ দু'টো ত পালিয়ে গেল।"

শর্ব্বরী জিজ্ঞাসা করল, "রাত্রে কি খান?"

"ভাতই ত খাই। কিন্তু সে সব পরে হবে। তুমি কলকাতায় খবর দাও আর প্রিয়কে খবর দাও। একটা কাগজ-পেন্সিল দাও, আমি তার ঠিকানা লিখে দিচ্ছি, ও সব আমি বলতে পারি না।"

শর্ব্বরী কাগজ-পেন্সিল নিয়ে এল। প্রিয়ব্রত সত্যই কাছেই থাকে, অথচ তার মধ্যে আর শর্ব্বরীর মধ্যে কি দুস্তর পারাবার।

দুটো টেলিগ্রাম লিখে সে রামনরেশকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল। তার পর উপরের ঘরে এসে চুপ ক'রে ব'সে রইল অনেকক্ষণ। কৌশল্যা উপরেই ঢাকা ছাদে তোলা উনুন নিয়ে রান্না করতে বসল। নীচের চেঁচামেচি তার পছন্দ হচ্ছিল না। শীগ্‌গির যে এ গোলমালের অবসান হবে এমন কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। জল আরও বেড়েছে, শর্ব্বরীর বাড়ীর সামনে বেশ জল, সিঁড়ি দু' একটা ডুবেছে। নীচের অনাহূত অতিথিরা ডাল-ভাত খাচ্ছে। শর্ব্বরীরা তবু তার সঙ্গে একটা ভাজা আর আলু কুমড়োর তরকারি খেল। শাশুড়ী নাক সিঁটকে বললেন, "মিঠে কুমড়ো আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না তা ত জান বৌমা, এটা রাঁধতে দিলে কেন?"

কৌশল্যা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, "ঠাকরুণ ভাঙেন

তবু মচ্‌কান না।” জোর গলায় বলল, “এখন কি আর বাজারে কিছু পাওয়া যাচ্ছে গো, যে পাঁচ ব্যঞ্জন রেঁধে দেব? ডিম খাও যদি ত দিতে পারি।”

প্রিয়ব্রতর মা অপছন্দ তরকারি দিয়েই ভাত সাবাড় করলেন এক থালা। বললেন, “না বাপু এখন অবধি ত খাই নি। তা যা বিপদে পড়েছি, জাতধর্ম্ম থাকলে হয়। কাল হয় ত ডিমই খেতে হবে।”

কাজকর্ম্ম সেরে, খাওয়া-দাওয়া সেরে, মেঝেতে বিছানা পেতে কৌশল্যা ঘুমিয়ে গেল। শর্ব্বরীর শাশুড়ী গত দু' তিন দিন দুর্যোগে আর ভয়ে খেতেও পান নি, ঘুমোতেও পারেন নি। আজ নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলেন। একমাত্র শর্ব্বরীই সারারাত নানার চিন্তায় ঘুমতে পারল না। হয় ত প্রিয়ব্রত কাল আসবে। দীর্ঘ চার বছর তাকে সে চোখেও দেখেনি। বন্যাস্রোত আবার এই বিচ্ছিন্ন মানুষ দু'টিকে এক জায়গায় টেনে আনবে নাকি?

সকালেও জল কিছু কমেছে মনে হ'ল না। এবারে গোয়ালা ব'লে গেল, বিকাল থেকে সে দুধ দিতে পারবে না। গরুবাছুর নিয়ে সে উঁচু জমির সন্ধানে চলেছে, এখানে থাকলে সব ডুবে যাবে। রামনরেশ আর কৌশল্যা দুজনে বাজার ঘুরতে বেরোল। কৌশল্যা তরকারি কিছু পেল, আর দু'চারটে ডিম। রামনরেশ খানিক অড়হর ডাল এবং গোটা দুই জমা দুধের টিন নিয়ে এল। এই সব দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ভাগ্যে ভাঁড়ারের জিনিষ সব কৌশল্যা আগেই সঞ্চয় করে-ছিল।

কিছু চিঠিপত্র আছে কি-না খোঁজ নিতে শর্ব্বরী নীচে নেমেছিল। ফিরে এসে প্রথম সিঁড়িতে পদার্পণ করতে না করতে তার সামনে এসে দাঁড়াল প্রিয়ব্রত।

শর্ব্বরী একবার তাকাল সেই অতিপ্রিয় মুখের দিকে, তার পরই চোখ নামিয়ে নিল।

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসা করল, “মা কোথায় শর্ব্বরী?”

শর্ব্বরী বলল, “চল উপরে।”

প্রিয়ব্রত শর্ব্বরীর সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠে এল। তার মা তাকে দেখেই হাউমাউ ক'রে কান্না জুড়লেন। এ কি বিপদে তিনি পড়েছেন! শেষে বড় বউয়ের আশ্রয়ে এসে তাঁকে পড়তে হ'ল? ভাইপোগুলো যে এমন অমানুষ, বউ দুটো যে এমন পাজী, তা কি তিনি জানতেন? তা হলে কি বাপের বাড়ীর ছায়া মাড়ান?

প্রিয়ব্রত বলল, “তারা কোথায় কোন্ বিপদের মধ্যে পড়েছে তা জানও না, অথচ গাল পাড়তে বসেছ? তুমি মন্দটা আছ কি? অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট ভাল আছ ওরা তোমায় নিয়ে ব'সে থেকে সবশুদ্ধ ডুবে গেলেই খুব ভাল হ'ত?”

মা বললেন, “একে তুই ভাল থাকা বলিস্?” শর্ব্বরী বুঝল তার সম্বন্ধে অভিযোগ করার জন্যে মায়ের জিভ উস্‌খুস্ করছে, কিন্তু তার সামনে বলেন কি ক'রে?

প্রিয়ব্রত বলল, “যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা। এর চেয়ে ভাল এখন আর কি হবে?”

মা গলা উঁচু ক'রে বললেন, “আমি কবে যাব এখান থেকে বল্?”

প্রিয়ব্রত বলল, “ট্রেন চলাচল সুরু না হলে যাবে কি ক'রে? এখন অবধি ত লাইন ডুবে যাওয়ারই কথা শুনছি। আর তুমি যাবে বা কোথায়? কোথাওই ত তোমার সুবিধা হচ্ছে না।”

মা কপালে একটা চড় মেরে বললেন, “সব আমার কপাল। অভাগা যে দিকে যায়, সাগর শুখায়ে যায়। তুই বাবা আমায় নিয়ে চল্, তোর কাছেই থাকব আমি।”

প্রিয়ব্রত বলল, “আমার একলা বাড়ীতে তোমাকে কে দেখবে? আমি ত প্রায় সারাদিন বাইরে থাকি।”

মা চীৎকার ক'রে বললেন, “তবে আমাকে বানের জলে ফেলে দে। জগতে আমার জায়গা নেই।”

প্রিয়ব্রত বলল, “অনর্থক চেঁচিয়ে হবে কি? চুপ কর। আমি দেখছি কি করতে পারি।”

প্রিয়ব্রত মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। শর্ব্বরী তার পিছন পিছন বেরিয়ে, নিজের ঘরের দরজাটা খুলে বলল, “এইখানে এস।”

প্রিয়ব্রত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। বলল, “আবার আমরা তোমাকে বিপদে ফেললাম।”

শর্ব্বরী শুষ্ক মুখে ব'সে ছিল, নীচু গলায় বলল, “বিপদ আর কি? সবাই যে রকম বিপদে পড়েছে তার চেয়ে বেশী কি?”

প্রিয়ব্রত বলল, “এখনি মাকে সরাবার ত কোন উপায় দেখি না। কলকাতায় দেবব্রতর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বনে না, সে নাকি ওঁকে মানে না, অপমান করে। নিজের বাপের বাড়ী এসেও সুবিধা হ'ল না। আমার কাছে কি ক'রে থাকবেন? কে তাকে দেখবে? শেষে উঠলেন এসে তোমার ঘরে। ভাগ্যের পরিহাস! যে-তোমাকে ওঁর জন্যে ঘর ছাড়তে হয়েছিল।”

শর্ব্বরী বলল, “আমি সে সব কিছু মনে রাখি নি। দেখলে ত, নীচে অনেকগুলি মেয়েই আশ্রয় নিয়েছেন।

তাদের যেমন থাকতে দিয়েছি, এঁকেও সেই রকম দিয়েছি।"

প্রিয়ব্রত একটু হাসল। বলল, "নিজেকে ভুলিয়ে লাভ কি শর্ব্বরী? তুমি জানই ত, এঁর জন্যে তোমাকে ঢের বেশী করতে হচ্ছে। যে মানুষের সঙ্গে প্রাণের কোন যোগ নেই, যার সম্বন্ধে মনে বিদ্বেষ থাকা কিছুই অসম্ভব নয়, তার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য করা বড় কঠিন।"

শর্ব্বরী চুপ করে রইল। প্রিয়ব্রতও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, "আমাকে একেবারে পাথরের মানুষ ভাবছ, না শর্ব্বরী?"

শর্ব্বরী তার দিকে না তাকিয়েই বলল, "তা কেন মনে করব?"

"চার বছর পরে তোমার সঙ্গে দেখা। কিন্তু আজে বাজে কথা ছাড়া কিছু ত বলছি না।"

শর্ব্বরী বলল, "এখন যে এই বিষয়গুলিই ঠিক করা দরকার।"

প্রিয়ব্রত বলল, "এটা নিতান্তই সাময়িক ব্যাপার। কিন্তু যেটা চিরদিনের সমস্যা দুটো মানুষের জীবনের তার ত কোন সমাধান হ'ল না? এই চার বছরের ভিতর একবারও আমাকে মনে পড়েনি? খোঁজ ত একবারও কর নি।"

শর্ব্বরী বলল, "মনে প্রতি মুহূর্ত্তেই পড়েছে, কিন্তু সাহস করিনি কোনও খোঁজ নেবার। ভেবেছি যে তুমি যখন একেবারে চুপ ক'রে আছ, তখন হয় আমায় ভুলে গেছ, নয় আমাকে ক্ষমা করতে পারনি।" এইবার শর্ব্বরীর চোখ দিয়ে জল গড়াতে আরম্ভ করল।

প্রিয়ব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে শর্ব্বরীর পাশে বসল খাটের উপর। তার দুটো হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, "নিজে প্রতি মুহূর্ত্তে মনে করেছ অথচ ভাবলে যে আমি ভুলে গেছি? তুমিই শুধু রক্তমাংসের মানুষ আর আমি পাষাণ? ছিলে ত আমার কাছে এক বছর প্রায়, এই পরিচয়ই পেয়েছ?"

শর্ব্বরী এবার মাথাটা রাখল তার বুকের উপর। বলল, "কোন সাড়া পাইনি কেন তবে?"

"অভিমান বড় বেশী হয়েছিল। ভেবেছিলাম আমার ভালবাসাকে যথেষ্ট মূল্য দিলে না তুমি।"

শর্ব্বরী বলল, "অল্প বয়সের নির্ব্বুদ্ধিতায় যা করেছি তা ভুলে যাও।"

প্রিয়ব্রত তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে বলল, "এখন হলে কি করতে? অপমান সয়েই থাকতে?"

শর্ব্বরী অশ্রুজলের ভিতর দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "অপমান সইতাম না, কিন্তু তোমায় ফেলে পালাতাম না, তোমার কাছেই পালিয়ে যেতাম।"

প্রিয়ব্রত বলল, "সেই হলেই ঠিক হ'ত! এখন তা হতে পারে না?"

শর্ব্বরী বলল, "হতে পারবে না কেন? তাই হবে।"

প্রিয়ব্রত বলল, "উৎপাত কিছু হবে না, ভেবো না। শুনছ ত মায়ের আবদার, তিনি আমার কাছে থাকতে চান। 'না' বলব কি ক'রে?"

শর্ব্বরী বলল, "'না' ব'লো না। নিয়েই চল। আমি কর্ত্তব্য যা তা করব।"

"পারবে ত? মনে হবে না ত যে একবার মুক্তি পেয়েও আবার ফাঁদে পা দিলে?"

শর্ব্বরী বলল, "না, তা ভাবব না। এ রকম মহাশূন্যের মধ্যে যে মুক্তি, তা আমার জন্যে নয়। জীবনকে পূর্ণ ক'রে রাখতে হলে যে-সম্পদ্ দরকার, তার দাম দিতে হবে ত?"

প্রিয়ব্রত নীরবে শর্ব্বরীর মাথায় হাত বুলোতে লাগল। খানিক পরে বলল, "ভাল ক'রে ভেবে যেও শর্ব্বরী। শেষে আবার মনে না হয়, কাঞ্চন ভেবে কাঁচ পেয়েছ। সংসারে দুঃখ, বিপদ্, অভাব, মনান্তর সবই ত আছে?"

শর্ব্বরী বলল, "চার বছর ধ'রে ত ভাবলাম। এতেও কি আর কাঁচ আর কাঞ্চনের তফাৎ বুঝিনি?"

বাইরে থেকে কৌশল্যা বলল, "ও দিদিমণি, কি রান্না হবে? আজও যে কুমড়োর তরকারি করতে হবে?"

শর্ব্বরী বলল, "না খেয়ে থাকার চেয়ে ত ভাল?"

নন্দা-মন্দার দেশে—শুভঙ্কর। প্রবর্তক পাবলিসার্স, ৬১, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৪৲

হিন্দুর কল্পনায় যুগযুগান্তর ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে একটি রাজ্য। সে রাজ্যে আছে নন্দন কানন, পারিজাত ফুল, আছে অলকানন্দা বা মন্দাকিনী নদী। সেখানে বাস করেন দেব, যক্ষ, মুনিঋষি, কিন্নর-গন্ধর্বের দল। সে রাজ্যের চারিদিকে ছড়ানো অসংখ্য তীর্থভূমি। দেবতাত্মা হিমালয়ই সেই স্বর্গভূমি। পুরাণ মহাভারতের যুগ থেকে দেখা যায় এই পথে মুমুক্ষু মানুষের আনাগোনা। পথ দুর্গম, নিসর্গ শোভা অনুপম, প্রতি পদক্ষেপে অনিশ্চিত জীবনের ইঙ্গিত তবু ওই পথ-চারণার প্রলোভন যুগ যুগ ধরে আকর্ষণ করছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে, যাঁরা মুমুক্ষু নন। ঈশ্বরবিশ্বাসী, নাস্তিক, প্রকৃতি-রূপ-পাগল, বিজ্ঞানী, সাধক, জ্ঞানী এবং নিরক্ষর সব মানুষের কৌতূহল সমানভাবে জাগিয়ে রেখেছে এই পথ। বুঝি 'চরণ বৈ মধু বিন্দতি' মন্ত্রটিই এই উৎসাহ উৎসের মূলে সক্রিয়।

অমৃত আনন্দ লাভের তপস্যাই হল মনের ধর্ম আর তার সহজ উপায় রয়েছে গতির মধ্যে। একদা হিমগিরি বিগলিত জলধারা গঙ্গোত্তরীতে এসে ত্রিধাবিভক্ত হয়ে তিনটি নদীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। প্রথম ধারাটি স্বর্গের নদী অলকানন্দা বা মন্দাকিনী নামে খ্যাত, দ্বিতীয়টি মর্ত্যপ্রবাহিনী জাহ্নবী, শেষ ধারাটির নাম ভোগবতী পাতালের নদী! মর্ত্যের মানুষ স্বর্গচারণ মানসে যেইমাত্র স্বর্গদ্বার পার হয়ে ঊর্দ্ধমুখী হয়... অমনই অলকানন্দা আর মন্দাকিনী তার সঙ্গ নেয়, চলতে চলতে এক সময়ে পাতাল গঙ্গার সাক্ষাতও মেলে। নন্দা-মন্দার দু'পারে তুষার, বিরাট গিরিশিখর, অরণ্য, পাহাড়ের জটলা, তরঙ্গায়িত শ্যামল ক্ষেত্র আর মাথার উপর নীলের চন্দ্রাতপ অপ্রস্ত অবারিত দিকমণ্ডল। এমন পরিবেশ মানুষের ভাবসত্তাকে উদ্দীপিত করে অনায়াসে। কল্পনা অনুভূতির রসে বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে এক অংখ্য শক্তির মহিমায় চিত্ত হয় অভিভূত। হয়তো বা এই কারণেই এই পথ আস্ত ও নাস্তি বাদীর মনে সমান ভাবেই প্রভাব বিস্তার করে। এই রাজ্য খানিকটা স্পষ্ট, বেশীর ভাগ ছায়া-কুয়াশায় মেশানো তুষার-বৃষ্টি-রৌদ্রের আলোছায়ায় বিচিত্রিত। এই রাজ্যের যেমন সীমা নেই পথেরও তেমন শেষ নেই। একটি গিরিচূড়ায় পৌঁছতে না পৌঁছতে আর একটি ঊর্দ্ধশ্রেয়ী পথ এসে সামনে, মেঘলোককে ধরি ধরি করেও ধরা যায় না। সামনে পিছনে আর দু'পাশের প্রকৃতি অনবরত রূপ বদল করে—সংযাত্রী দলও মমতা বন্ধনের স্পর্শ দিতে না দিতেই দূরে সরে যায়। সর্বত্রই একটা গতির বেগ—অবিরত চলার ছন্দে স্পন্দিত হচ্ছে। এই যে অল্পক্ষণের জন্য পাওয়া মিলন এবং বিচ্ছেদভারহীন পাওয়া, এইটাই বুঝি জীবনের প্রকৃত সঙ্গ—অল্পক্ষণের সম্পদ—আনন্দ। এই আনন্দকে প্রকাশ করার তাগিদে পদযাত্রার ছন্দটিকে যাঁরা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন অনায়াসে তাঁদের রচনাই সার্থক। ব্রহ্মপুরীর এই পথ, নদী, গিরিমণ্ডল, দেবমন্দির প্রভৃতির বর্ণনা এযাবৎ বহু ভ্রমণ কাহিনীতে সার্থক রূপ নিয়েছে, আলোচ্য ভ্রমণ কাহিনীটি সেই তালিকা পরিপুষ্ট করবে নিঃসন্দেহ। লেখক তাঁর পাঠককে অনায়াসে ভ্রমণানন্দের ভোজ্যে পরিতুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন প্রণীত, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক ১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৫৲, পৃষ্ঠা ১৮৮।

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইতেছে। নানাভাবে বিশ্বকবির প্রতিভা ও তাঁহার অবদানসমূহ সুধীগণ আলোচনা করিতেছেন, তিনি ছিলেন একাধারে ঋষি, কবি দার্শনিক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গানের রাজা, চিত্রশিল্পী এবং সর্বোপরি বিশ্বমানবের দরদী বন্ধু। এক মহামনস্বী ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা। চিন্তা ও মনন জগতের এই অতুলনীয় মহাপুরুষ আবার ছিলেন মহাকর্মবীর এবং শিক্ষাব্রতী। শিক্ষা জগতে তাঁহার সাধনার নিদর্শন অমর হইয়া 'শান্তিনিকেতন' রূপে আজ ভারতকে পৃথিবীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে।

দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ১৮৮৩ সনের লেখাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় মতামত ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার জন্য ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সংকল্প ও সাধনা, ইংরেজী ভাষার যোগে যে নববিদ্যা দেশে প্রবেশ করিয়াছে তাহাকে মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করিয়া 'বঙ্গ সাহিত্যের সর্বাঙ্গীন বিকাশ' ছিল তাঁহার লক্ষ্য। 'সাধনা'য় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ১২৯৯, ১৩০০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যে মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, ১৯১২ সনের 'জীবন-স্মৃতি'তে কিম্বা ১৩৩৭ সনের 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে তাহাই সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়াছে। বাঙ্গালার শিক্ষা নিম্নতম হইতে উচ্চতম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে হইবে ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন ও সুদৃঢ় অভিমত এবং এইজন্য বোলপুরে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং পরে ঐ স্থানে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের 'বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়' আজও স্বাধীন ভারতে বাস্তবে পরিণত হইল না, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের আর কি আছে?

বিশ্বভারতীর প্রধান অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন সাতটি প্রবন্ধে (বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী প্রসঙ্গ, শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষাসমস্যা, শিক্ষার মুক্তি, ভাষার মুক্তি, সাহিত্যের মুক্তি) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-চিন্তা ও শিক্ষা-সাধনার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পাঠক মাত্রেই রবীন্দ্রমানসের সহিত পরিচিত ও উপকৃত হইবেন। এরূপ তথ্যপূর্ণ সময়োপযোগী গ্রন্থের বিপুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

দর্শন-চারিত্র্য—ডক্টর সুধীরকুমার নন্দী। প্রকাশক—অশোক পুস্তকালয়, কলকাতা-৯, মূল্য—তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। রাষ্ট্রদর্শন, নীতিদর্শন, বর্ণদর্শন, শিক্ষাদর্শন, মনোবিদ্যা ও পরাবিদ্যার বিভিন্ন সমস্যা উপরোক্ত দশটি অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। দর্শনের স্বভাব ও প্রকৃতি সম্বন্ধীয় বিশদ আলোচনা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার মহাদার্শনিক হোয়াইট হেডের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া যথার্থই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মানব-মনের বিস্ময়ই সকল দর্শনের উৎস। দর্শন পঠন-পাঠনে এই বিস্ময়ের নিরসন হয় না, তবে ইহার সহায়তায় বিশ্বের বিরাটত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মায়। আমাদের সহনশীলতা ও অনুভূতির শুদ্ধি ঘটে। ইংরাজী 'ফিলজফি' শব্দটি আমাদের 'দর্শন' শব্দটির প্রতিশব্দ নহে। 'ফিলজফি'র স্বরূপ লক্ষণ হইল জ্ঞানানুরাগ। এই লক্ষণ স্বীকার করিলে বিজ্ঞান হইতে দর্শনকে পৃথক করা দুরূহ হইয়া পড়ে। এই কারণেই ব্যয়সাপেক্ষ দৃষ্টবাদীর দল (Logical Positivist) এমন ভবিষ্যৎবাণীও করিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে 'দর্শন' বলিয়া কোন শাস্ত্রের অস্তিত্ব থাকিবে না। গ্রন্থকার আলোচ্য অধ্যায়ে পরম নিষ্ঠার সহিত প্লেটো হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যয়সাপেক্ষ দৃষ্টিবাদ পর্যন্ত প্রধান প্রধান দর্শন মতের আলোচনা করিয়া দর্শনের স্বভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন।

রাষ্ট্রদর্শন বিষয়ক দুইটি প্রবন্ধে গ্রন্থকার অত্যন্ত নিপুণতার সহিত ইয়োরোপীয় এবং এশীয় রাষ্ট্রদর্শনে হেগেল এবং মার্ক্সের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই দুইটি অধ্যায় পাঠ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, কিভাবে হেগেলীয় মৌল চিন্তার কাঠামোটি মার্ক্সীয় দর্শনের কাঠামো প্রস্তুতিতে সাহায্য করিয়াছে এবং হেগেল এবং মার্ক্সের দর্শন কিভাবে সমগ্র সভ্যজগতের রাষ্ট্রদর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে। জর্জ এডওয়ার্ড মুর আধুনিক দর্শনশাস্ত্রীদের অগ্রগণ্য। মুরের শ্রেয়োবাদের মৌল এবং পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থখানির মূল্য বহুলাংশে বৃদ্ধি করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুবাদ এবং ইয়োরোপীয় মনুষ্যত্ববাদের তুলনামূলক আলোচনা পঞ্চম অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই আলোচনা নিপুণ বিশ্লেষণ এবং গভীর পাণ্ডিত্যের দ্বারা চিহ্নিত। শিক্ষাদর্শন শীর্ষক অধ্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের প্রয়োগ সম্বন্ধীয় সমস্যা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথের দর্শন আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থের ইতি করিয়াছেন।

আমরা এই মূল্যবান্ গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীগৌতম সেন

স-কারের সম্মিলন—শ্রীকেশবলাল দাস। মনোমোহিনী প্রেস, বনগাঁ, ২৪ পরগণা। মূল্য—টা ১.২৫।

বহুদিন পূর্বে ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'ক-কারের অহংকার' লিখিয়াছিলেন। তার অনুকরণ ও অনুসরণ অনেক হয়েছিল। বর্তমান লেখক কলেজ-জীবনে ললিত বাবুর ছাত্র ছিলেন। 'ক-কারের অহংকার' না পড়িলেও 'স-কারের সম্মিলন' লেখকের কল্পনা তখনই তাঁর মনে এসেছিল। তাঁর দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন এবার সফল হ'ল। 'স'বর্ণ যুক্ত শব্দের উল্লেখ এবং অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা বইখানিকে সুখপাঠ্য

রৌদ্রধারা—শ্রীমতী কনক মুখোপাধ্যায়। প্রতিশ্রুতি, ২৩,১,৩ রমানাথ কবিরাজ লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য ২৲।

আধুনিক সমাজের দুঃখ, বেদনা, হাহাকারের প্রতিধ্বনি বেজেছে কবিতাগুলিতে। কিন্তু হতাশা নয়, নব প্রভাতের আশার বাণীও কবি শুনিয়েছেন। ভঙ্গী-সর্বস্ব নয়, অকৃত্রিম হৃদয়ভাবের প্রকাশ বলে' এ কাব্য সহজে পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ করে।

জাহাজ ঘাটা—শ্রীশোভাময়। বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। মূল্য ৭৫ নয়া পয়সা।

ভাব আছে, কিন্তু তা রসমূর্তি গ্রহণ করেনি। কবিতার গীতি-সুর বা চিত্রকল্প কিছুই দেখা দেয়নি; বর্ণনা বিবরণ মাত্র হয়েছে।

ভারততীর্থ—শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। বিচিত্রা। ৩ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২৲।

অনায়াস-পাঠ্য ভ্রমণ কাহিনী। 'কাবেরী নদীর তীরে' আর 'পঞ্চনদের তীরে' বেড়াতে গিয়ে লেখক যা যা দেখেছেন তা বন্ধু মহলে গল্পের ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। যাঁরা ঐ সব জায়গায় যাননি, তাঁর কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বনে যদি ফুটল কুসুম—শ্রীপ্রতিভা বসু। প্রকাশচন্দ্র সাহা। গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য ৪.৫০।

উপন্যাস। অর্থ জীবনে পরমার্থ নয় স্নেহ, মায়া, দয়া ও ভালবাসা অনেক বড় বস্তু ইহাই পুস্তকের মূল বিষয় বস্তু। সহজ ও সুন্দর ভাষায় বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়া গল্পটি শেষ করিয়াছেন শ্রীযুক্তা বসু।

অর্থের প্রতি অত্যধিক আসক্তি মানুষকে যে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতে পারে তাহাও যেমন দারুকেশ্বরের চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে আবার তারই অমানুষিক ব্যবহারে অভাব এবং অনটনের জ্বালায় যখন তার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু ঘটিল তখন দারুকেশ্বরের সুপ্ত পিতৃত্ব লোভীর মত ছুটিয়া আসিয়া মৃত পুত্রের শতচ্ছিন্ন ময়লা গেঞ্জিটা মেলিয়া ধরিয়া তার ঘাণ লওয়া ও তাহা পাগলের মত বুকে চাপিয়া ধরিয়া আর্তনাদ করিবার দৃশ্যটিও চমৎকার ফুটিয়াছে। শেষ পর্যন্ত দারুকেশ্বর মরিলেন, কিন্তু মরিবার পূর্বে যে অর্থ পিতা-পুত্রের মধ্যে সহজ সম্পর্ক গড়িয়া উঠিবার পথে অন্তরায় ছিল তাহা বিধবা পুত্রবধূকে দান করিয়া গেলেন।

লেখিকা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিতা ও সুপ্রতিষ্ঠিতা। সমালোচ্য পুস্তকখানি তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

মৌন মুখর—শ্রীঅজিত গঙ্গোপাধ্যায়। অটো প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস, ৪৯, বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা-৬। মূল্য—২.০০।

নাটক। নাট্যকার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ইতিপূর্বে বহু নাটক লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তাঁর "থানা থেকে আসছি" ও "নচিকেতা" উল্লেখযোগ্য। সমালোচ্য নাটকটি একখানি প্রহসন। আনাতোল ফ্রাঁস অনুপ্রাণিত কিন্তু ঘটনা বিন্যাসে কিংবা নাটকীয় সংঘাতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বোবা স্ত্রী স্বামীর একান্ত আগ্রহে ও যত্নে চিকিৎসকের সুচিকিৎসায় ফিরিয়া পাইলেন ভাষা, কিন্তু কথা বলিতে সুরু করিয়া তিনি এমনই

মুখর হইয়া উঠিলেন যে, স্বামী অতিষ্ঠ হইয়া পুনরায় তাহার পূর্ব্বাবস্থা কামনা করিলেন, কিন্তু ডাক্তার ভাষাহীনের কণ্ঠে ভাষা যোগাইতে সক্ষম হইলেও পূর্ব্বাবস্থায় ফিরাইয়া লইতে জানেন না, শেষে স্বামী বেচারী আপন শ্রবণ শক্তি বিলোপ করিয়া স্ত্রীর অনর্গল কথা বলার হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন।

এই ঘটনাটিই প্রচুর হাস্যরসের সাহায্যে সুন্দর ভাবে পরিবেশন করা হইয়াছে।

নাটকটি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

জালালাবাদের যুদ্ধ—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য। শোভনা প্রেস পাব্লিকেশন্‌স, ১৬ নং সৈয়দ আমির আলি এভেনিউ, কলিকাতা-১৭। মূল্য তিন টাকা।

মহানায়ক সূর্য্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সেনাপতি লোকনাথ এবং তাঁর অনুগামী গণেশ, উপেন, অম্বিকা প্রমুখ মাতৃভূমির বীর সন্তানগণ ১৯৩০ সনে ২২শে এপ্রিল তারিখে গোধূলিকালে চট্টলের পার্ব্বত্য ভূমিতে নূতন হলদীঘাট রচনা করে দেশাত্মবোধের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, চিরকাল তা মুক্তিসন্ধানী মানুষের মনে অপূর্ব্ব প্রেরণার সঞ্চার করবে! নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন প্রমুখ দ্বাদশ শহীদ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যান্য বহু সৈনিকের রক্তে রঞ্জিত জালালাবাদ ভারতের মুক্তি-সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাদপীঠরূপে পরিগণিত।

এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে উপজীব্য করে কবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য 'জালালাবাদের যুদ্ধ' অভিধাযুক্ত মহাকাব্যখানি রচনা করেছেন। বিদগ্ধ কাব্য-সমালোচকদের মতে সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার যুগ শেষ হয়ে গেছে। মহাকাব্যের প্রতি সাম্প্রতিক কালের পাঠকদের আর অনুরাগ নেই। এমত অবস্থায় একাদশ সর্গে সম্পূর্ণ একখানি মহাকাব্য রচনা করে লেখক যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্যে তাঁকে মনে মনে সাধুবাদ দিয়েছি। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনেই তাঁর স্বকীয় এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধ-কাহিনী এই মহাকাব্যের বহিরঙ্গ মাত্র। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানবতাবাদে বিশ্বাসী বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য্য সেন নব মহাভারত রচনায় যে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, কবি তার পরিপূর্ণ স্বরূপটি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই সংগ্রামের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছেন তিনি ভারতের আত্মিক মহিমাকে। পূর্ব্বাভাষে তিনি বলেছেন,—"ভারতের বিপ্লব-সাধনার ঐতিহাসিক সিদ্ধি—'জালালাবাদের যুদ্ধ'—এই জালালাবাদের অমর মহিমা কেবল স্বদেশ-প্রেম নয়, এই যুদ্ধ ধারণ করে আছে ভারতের জাগ্রত আত্মার প্রকাশ রূপ।"

কবির ধ্যাননেত্রের সামনে ভাবী ভারতের এই আত্মিক মহিমা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে পরিপূর্ণ মহিমায়। তাই সুরু থেকেই উচ্চগ্রামে বাঁধা এই মহাকাব্যের সুর। পড়তে পড়তে মুগ্ধ হতে হয় এর উদাত্ত-গম্ভীর ধ্বনি-মাধুর্য্যে এবং আত্মোপলব্ধি ও গভীর মননসঞ্জাত ভাবৈশ্বর্যে। রণক্ষেত্রের মহামৃত্যুর নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে কবির কল্পনানেত্রের সমক্ষে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নবজীবনের অরুণোদয়ের পূর্ব্বাভাষ। তাই উদাত্ত কণ্ঠে তিনি গেয়ে ওঠেন:

'শত সহস্র তারার মরণে সূর্য্য জীবন ধরে,
মহামৃত্যুতে কোথায় ধ্বংস—মহাপ্রাণ সঞ্চারে
মহাজীবনের অমৃত-মন্ত্রে গেয়ে
নবপ্রভাতের উদয়-তীর্থে আলোকে উঠিছে ছেয়ে,
নাই নাই ভয় জীবনের জয় উদয় অচলে চেয়ে
ওই ওই দেখ জীবন সূর্য্য করিছে রশ্মিপাত॥"

এই দীপ্ত আদর্শবাদের সুর মহাকাব্যখানির মধ্যে আগাগোড়া অনুস্যূত। শেষ সর্গটি বাস্তবিকই অপূর্ব্ব, পংক্তিতে পংক্তিতে যেন অমৃতধারা ঝরে পড়ছে। রণকোলাহল শান্ত হয়েছে, জালালাবাদ পাহাড়ে গভীর নিস্তব্ধতা আর তারই মধ্যে যেন এক বৈরাগী উচ্চারণ করে চলেছেন শান্তির ললিতবাণী শুনতে শুনতে গভীর প্রশান্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠে।

সাম্প্রতিক কালের কাব্যবিচারে 'জালালাবাদের যুদ্ধ' মহাকাব্যের স্থান কোথায় নির্দ্ধারিত হবে জানি না। কিন্তু এর মধ্যে ভাব ও সুরের দিক দিয়ে এমন একটা বিশেষত্ব আছে যা খাঁটি কাব্যানুরাগীর হৃদয়কে যে গভীরভাবে স্পর্শ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

'খবন্ধু দত্ত

বিলাতের চিঠি

কেভিন্ ও'সালিভান্

হরেকরকম বিদ্ঘুটে, বিচিত্র নিয়মধারায় ও অনুষ্ঠানে আপ্লুত এই দেশ! এর মধ্যে, বেশীর ভাগগুলিই 'নির্দ্দোষ' ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু—'রাজ-কবি' নামক আনুষ্ঠানিক পদটিকে, অদ্ভুত, বিচিত্র, বিদ্ঘুটে নিশ্চয়ই বলব—অথচ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ব'লে মেনে নিতে বোধ হয় পারব না!

আমাদের রাণী এলিজাবেথের ভারত ও পাকিস্তান সফর থেকে ফেরার পর লিখিত, কবি জন্ মেসফিল্ডের কাব্যিক উচ্ছ্বাসটি না পড়লে আপনারা ব্যাপারটা উপলব্ধি করতেই পারবেন না। আমাদের 'রাষ্ট্রীয়-কবি'দের মধ্যে সত্যি উঁচুদরের কবি আমরা খুব অল্পই পেয়েছি—টেনিসন্‌কেই শুধু সাম্প্রতিকদের মধ্যে কবি হিসাবে মাননীয় ধরা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিক কারণে লিখিত কোন 'পদ্য'কে কি কখনও দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছা করে? প্রথম রাণী এলিজাবেথের সভায় কোন ভাড়া-করা কবি রাখার প্রয়োজন হয় নি। এমনিতেই তাঁর গুণগান কত কবিকণ্ঠে শোনা গেছে—জগৎ-বিখ্যাত-কাব্যে তাঁকে 'গ্লোরিয়ানা' নামে বিভূষিত ক'রে, কবির [illegible] [illegible]ালে সুসজ্জিত ক'রে তাঁকে অপূর্ব্ব ক'রে জেগেছিল। তাঁ[illegible]। তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী কোন রাজার বহু শব্দের উল্লে করেছে কি আ[illegible]স সৌভাগ্য ঘটেছে?

যাক্, সেসব দিনের কথা। বর্ত্তমানে আমাদে: আছেন এক 'রাজ-কবি'। তিনি প্রতি বছর যৎকিঞ্চি একটি দক্ষিণা পেয়ে থাকেন আর তার সঙ্গে পা: কট্‌সওয়ার্লড্ প্রদেশে একটি চমৎকার বাড়ী। (তা: বদলে তাঁর কাব্যিক প্রেরণাকে খাটাতে হয় দেশের দশের ও এ যুগের কাজে!) এই উপাধি দিয়ে তাঁবে সমাজে খাড়া করা হয়—যুগের পূজনীয় কবি হিসাবে কবিতা লেখারও কটু 'হাত' থাকলেই হ'ল আর তা: সঙ্গে খানিকটা সাহিত্য-রুচি! প্রতিভা বা প্রেরণা: ধার-কাছ দিয়েও তাঁর যাবার দরকার নেই—শেষকাে টেনিসনের মত অপ্রস্তুত হতে হবে?

বুঝতেই পারছেন যে এদেশে আমাদের রাষ্ট্রীয় কবিকে আমরা বিশেষ আমল দিই না। কিন্তু, প্রা[illegible] এইরকমই আরেকটি আনুষ্ঠানিক উপাধি আমাদের কাে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হচ্ছে অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের কাব্য-সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদ তবে ম্যাথিউ আরনল্ডের আগে যাঁরা যাঁরা এই আসনে বসতে সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের কাউকেই আমর মনে রাখবার চেষ্টা করি নি। আর মনে রাখবই ব কেন? অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বেশীর ভাগট ধ'রে অক্সফোর্ডে যাঁরা যাঁরা এই অধ্যাপনার নামে আধি পত্য করেছেন—এক শ্রদ্ধেয় ওয়ালার বাদে—তাঁরা কেউ আধ-ঘুমন্ত পাদ্রী-জাতীয়, কেউ বা বৈশিষ্ট্যবিহীন সাদাসিধে মানুষ, আরও কেউ বা দুর্দ্দান্ত দুষ্টু লোক!

সম্প্রতি পাঁচ বছর কাল অধ্যাপনার পর মিঃ অডেন

বিদায় নিলেন। নতুন কে নির্ব্বাচিত হবেন তাই নিয়ে চারিদিকে সাড়া প'ড়ে গেল। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ভোট নেওয়া হ'ল—নির্ব্বাচনপ্রার্থী ছিলেন কবি রবার্ট গ্রেভ্‌স, শ্রীমতী হেলেন গার্ডনার, শ্রীমতী ইনিড্‌ স্টারকী ও একদম শেষ মুহূর্ত্তে ডাঃ লিভিস্। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে যেমনভাবে নির্ব্বাচনী যুদ্ধ চালান হয়—এটিও ঠিক সেইভাবেই চলল। দলাদলি সুরু হ'ল, আরম্ভ হ'ল প্রতিটি দলের প্রতি অন্য দলেদের বক্রোক্তি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ। বাইরের লোকেদের মধ্যে যাঁরা পড়ুয়া মানুষ, যাঁরা খবরের কাগজ মারফৎ এর খানিকটা রস উপভোগ করতে পারলেন। কলেজের ছাত্রমহলে চলল তুমুল তর্ক-বিতর্ক, জল্পনা-কল্পনা। সবচেয়ে জটিল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল—কাব্য সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়ার যোগ্যতা কার বেশী, কবির না সমালোচকের? তার থেকেই আরও দু'একটা কথা উঠল—অধ্যাপনার গুরুদায়িত্ব খামখেয়ালী কবিদের ঘাড়ে চাপান যায় কি? কিম্বা, নামকরা সমালোচকেরা তাঁদের আসল বক্তব্য বিষয় অনেক দিনই ব'লে ফেলেছেন—নতুন কিছু বলবার মত কি আর কেউ আছেন?

এই বিশেষ আসনটির গুরুত্ব বাড়িয়ে তুলেছিলেন দু'টি প্রখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাথিউ আরনল্ড ও তার পরে এ সি ব্র্যাড্‌লি। এঁদের পাশে দাঁড়াবার মত নিষ্ঠাবান সাধক নব্যযুগে আছেন একমাত্র ডাঃ লিভিস্। ডাঃ হেলেন গার্ডনারের ভক্তসংখ্যা কিন্তু অনেক বেশী—তার বক্তৃতা দেবার কায়দা আরও বেশী লোককে মুগ্ধ করে। তাছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে তার মতামত অক্সফোর্ডের প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। ডাঃ ইনিড্‌ স্টারকী ছাত্রমহলে আরও প্রিয়। তিনি সাধারণ মেয়েলী চলন-বলনে বিশ্বাস করেন না—উগ্র রঙের ট্রাউসার পরিহিতা, চঞ্চল প্রাণবন্ত এই মানুষটিকে প্রায়ই দেখা

যায 'বিষাব' পানেব আড্ডায ব'সে বোদেলেয়াব, ব্যাঁবো আওড়াচ্ছেন, আব সঙ্গে সঙ্গে চলছে গেলাস! গত দু'টি নির্ব্বাচনে ওঁব প্রতাপ ছিল দুর্দ্দান্ত। ওঁবই চেষ্টায ডে লুইস্ এবং অডেন অধ্যাপনায নিযুক্ত হযেছিলেন। সে তুলনায ববার্ট গ্রেভ্স্‌কে একটি বহস্য হিসাবে ধবা যেতে পাবে। তাঁব সম্বন্ধে অনেকেই দো-মনা ছিলেন—কিন্তু তাঁব হাতে ছিল একটি বিবাট্ অস্ত্র। ইংলণ্ডেব নব্য সাহিত্য-জগতে সমালোচকেব সংখ্যা বড্ড বেশী বেড়ে উঠছিল—সে জাযগায তিনি হলেন একাধাবে কবি এবং পণ্ডিত। তাঁব পূর্ব্ববর্ত্তী দু'জনেই ছিলেন কবি, এবং যেহেতু অডেন অধ্যাপক হিসাবে খুবই নাম কবে ফেলেছিলেন, অনেকেই ধ'বে নিলেন যে, মিঃ গ্রেভ্স্‌ও তাঁব পদানুসবণ কববেন।

গত পাঁচ বছব ধ'বে মিঃ অডেন, অক্সফোর্ড কাব্য-সাহিত্যেব একজন আদর্শ অধ্যাপক হিসাবে বিবাজ কবছিলেন। তাঁব বক্তৃতা সভায ভিড় হ'ত অসম্ভব এবং তাঁব ভাবণগুলি হ'ত জ্ঞানগর্ভ অথচ বসে ভবপুব। অক্সফোর্ডেব গুরুস্থানীযদেব মধ্যে তাঁব কাছেই ছিল ভক্ত ও ছাত্রদেব অবাধ গতি। বোজ সকালে কাডেনা কাফেতে তিনি চেলাদেব নিযে সভা জমাতেন, নযত তাঁব ঘবে হানা দিত যত ছেলে-ছোকবা কবিবা—কোটের পকেটে কাব্য ঠাসা! তিনি যেমন কথা বলতেন তেমনি অন্যদেব কথাও মন দিযে শুনতেন। অন্যান্য বিচক্ষণ কবিদেবও সে সভায প্রায়ই দেখা যেত—বিদেশী কবি গিন্‌স্‌বার্গ এবং কর্সো এদেশে এলেই আলাপ কবতে আসতেন। আমাব ত মনে হয, কাব্য-বস উপভোগ কবতে শিখতে হলে একমাত্র এই উপাযেই লাভবান্ হওযা যায। অডেনেব কাঠখোট্টা, গাল-ভাঙ্গা মুখটি, তাঁব গভীব পাণ্ডিত্য, তাঁব খেযালী আমোদ-প্রিয মন এবং উদাব চিন্তাধাবা—অক্সফোর্ডেব নবীন কবিদেব চিন্তায ও বাক্যে যেন শাশ্বতভাবে জড়িয়ে ছিল। তিনি ছিলেন গাম্ভীর্য্যে, সবসতায, কর্ম্মক্ষেত্রে ও গল্পেব আড্ডায—তাদেব মনেব মত গুরু।

শেষ পর্য্যন্ত মিঃ গ্রেভ্স্ অতি সহজেই জযলাভ

করলেন। এই নির্ব্বাচনটির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা প্রায় অসম্ভব। এম-এ ডিগ্রীধারী যে কেউ ভোট দিতে পারেন—সুতরাং সারা দেশে ত্রিশ হাজার লোক ভোট-দানের উপযুক্ত ধরা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌মিলান যখন চান্‌সেলার পদে নির্ব্বাচিত হলেন—অক্সফোর্ডগামী ট্রেনগুলি পৌঁছাল একেবারে ভোটদানকারীতে ঠাসা! সেদিনের নির্ব্বাচনটি একটা বিরাট্ অনুষ্ঠানের মত হয়ে দাঁড়াল! গ্রেভসের বেলা কিন্তু সব জড়িয়ে ৬৫৮টি ভোট মাত্র গোনা গেল—তার প্রায় অর্দ্ধেকই গেল রবার্ট গ্রেভ্‌সের ভাগে! ডাঃ গার্ডনার পেলেন দ্বিতীয় স্থান—যদিও ডাঃ লিভিস্ মাত্র একটি ভোট তাঁর থেকে কম পান। সবশেষে শ্রীমতী ইনিড স্টারকী—ফরাসী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ ব'লেই কমসংখ্যক ভোট পেলেন, ধরা যায়।

রবার্ট গ্রেভ্‌স্ বিষয়ে আমরা এখন অবধি বিশেষ কিছু জানি না। তবে তিনি কবি অডেনের মত ছাত্র-সমাজে জনপ্রিয় হবেন ব'লে মনে হয় না। গুজব শুনছি, তিনি তাঁর ইস্পিয়ার বাড়ীতেই বেশী সময়টা কাটাবেন—অক্সফোর্ডে আসবেন শুধু আমাদের বরাদ্দ, বাৎসরিক তিনটি ভাষণ দিতে। দেখা যাক্, কি দাঁড়ায় শেষ পর্য্যন্ত!

ডাঃ লিভিস্ নির্ব্বাচিত হলে আমরা খুব অবাক্ই হতাম। অক্সফোর্ডের ইংরেজী-সাহিত্য বিভাগটি—'ঘরানা' হিসাবে কিছুটা অদ্ভুত। আমি নিজে কেম্ব্রিজ-পন্থী ব'লে বলছি—তাঁদের যেন বিশিষ্ট আদর্শ বা পন্থা ব'লে কিছু হাতে ধরা যায় না। তাঁদের মধ্যে একই যোগে বিরাজ করছেন কঠিন, নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিতলোক ও খেয়ালী আরামপ্রিয় মানুষ, যাঁদের কাছে সাহিত্য-সাধনা একটা শখের খেলা মাত্র। ডাঃ লিভিসের সানুনাসিক কণ্ঠের বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গ তাঁদের কানে কেমন ঠেকত, ভাবতে কৌতুক হয়! ডাঃ লিভিস্ কিন্তু বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ হতেন ব'লে মনে হয় না। তাঁর প্রধান আদর্শই ত হ'ল অসত্য ও নিকৃষ্টতার বিরুদ্ধে দাঁড়ান। সব বক্তব্যের মধ্যেই তাঁর একটি কথা বার বার মাথা খাড়া ক'রে দাঁড়ায়—দ্বন্দ্ব; লড়াই। তিনি বলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে পরম শ্রেয় ও চরম সত্যকে পেতে ও ধ'রে রাখতে হলে—বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার সংঘর্ষে যেমন প্রচণ্ড শক্তি সঞ্চার ক'রে লড়তে হয়—ঠিক তেমন নিষ্ঠা ও শক্তি নিয়ে আমাদেরও লড়তে হবে।

যাই হোক্, এই অধ্যাপনার পদটির প্রতি এই মহারথীদের আগ্রহ জেগেছে জেনেই আমাদের তৃপ্তি লাগে। এই আসনটি প্রতিষ্ঠা করেন সার হেনরী বার্ক্‌হেড্। সপ্তদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় পদ্য লিখে তিনি কিছু নাম করেছিলেন—গ্রীক ও ল্যাটিনের প্রতি শ্রদ্ধা সে যুগে তাঁদের জন্যই পুনর্জাগরিত হ'ল। সার বার্কহেডের অগাধ সম্পত্তির প্রায় সম্পূর্ণটাই এই আসন প্রতিষ্ঠার নামে তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন। আত্মীয়-স্বজনের ভাগ্যে কয়টি খুচরো আনা-পয়সা বাকী ছিল মাত্র। এত উৎসাহ সত্ত্বেও আসনটির আসল রূপ বহুকাল ছাই-চাপা আগুনের মত ধুক্ ধুক্ ক'রে জলছিল। কিন্তু এখন দেখুন, গত যুগের আরনল্ড, ব্র্যাড্‌লিকে বাদ দিয়েও আজ আছেন ডে-লুইস, অডেন এবং সবচেয়ে নূতন, গ্রেভ্‌স্।

'রাষ্ট্রীয়-কবি' নামে পর পর দাঁড়ালেন মিঃ ব্রিজেস্ ও কবি মেসফিল্ড! ধরা যাক্, এর পরে দাঁড়াবেন জন বেট্‌জেমান!

এই দুই দলের কবিদের তুলনা করাতেই বেশ আমোদ পাওয়া যায়।

আশা করছি রবার্ট গ্রেভ্‌স্ শীঘ্রই এসে ইংলণ্ডে পৌঁছাবেন। এদেশের বসন্তকাল অপরূপ! এমনকি মেডিটেরেনিয়ান-দেশগুলিও এ সময়ে আমাদের কাছে হার মানে। সাহিত্যিক দিক্ দিয়ে এবং অন্যান্য সকল দিক্ দিয়েই বসন্তকাল আমাদের পরম বরণীয়। প্রতি বছরেই যেন একটা আশ্চর্য্য নতুন খবরের মত বসন্তকাল আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। কত আশা, কত আনন্দ, সে আপনারা ধারণাই করতে পারবেন না! ফাগুন হাওয়ার তালে তালে দুলে ড্যাফোডিল্ ফুলগুলি সুন্দর হয়ে উঠল। আমাদের এই দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোন্‌টি আরও সুন্দর, আরও কাব্য-রসে ভরপুর বুঝতেই পারছেন! আমাদের এখানে কাব্য-সাহিত্যের অধ্যা-পকের দরকার নেই। আর শুধু আমাদের কেন—সামনের দুই মাস কারুরই প্রয়োজন হবে না ব'লে আমার বিশ্বাস! ডে-লুইসের ভাষায় বলি—'এ কিসের রসে কিসের আনন্দে সবকিছু মেতে উঠল!'

ক

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

থবন্ধু দত্ত

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬১শ ভাগ
১ম খণ্ড | আশ্বিন, ১৩৬৮ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলায় খাদ্যাভাব

যাঁহারা খাদ্যবিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের মতে মানুষের খাদ্যে প্রধানতঃ তিন প্রকার পদার্থ প্রয়োজনীয়। প্রথম যাহাতে শরীরের পেশী ইত্যাদিতে শক্তি সঞ্চার করে, যথা, শ্বেতসার (starch) ও অন্য শর্করা উৎপাদনের উপকরণ। এই শ্রেণীতে চাউল, গম, ইত্যাদি শস্য পড়ে। দ্বিতীয়তঃ যাহাতে শরীরের রক্তমাংস, অস্থি, ইত্যাদি গঠিত হয়, যথা, প্রোটিনপূর্ণ খাদ্য। তৃতীয়তঃ যাহাতে শরীরকে রোগমুক্ত ও ক্ষয় হইতে রক্ষা করে, যথা, দুগ্ধ, মৎস্য, মাংস, ইত্যাদি। জীববিজ্ঞান, শরীর গঠন ও রক্ষার বিষয় আজকাল শিক্ষার নিম্নতম স্তর হইতে দেওয়া হয়—যদিও সে শিক্ষার কারণ ও ব্যবহার অল্প লোকেই জানে—সুতরাং এ দীর্ঘ সন্দর্ভ লেখার প্রয়োজন নাই।

বাঙালীর খাদ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর পুষ্টিকর পদার্থ আসিত প্রধানতঃ দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মৎস্য হইতে। হিতোপদেশের "স্বচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেন" বাঙালীর "দগ্ধোদরের" পূর্ত্তি কখনও হয় নাই এবং হওয়াও দুরূহ। ঐ জাতীয় জৈবপদার্থ গ্রহণের ফলেই বোধ হয় বাঙালীর বুদ্ধি তীক্ষ্ণধার ও সরস হয় এবং মস্তিষ্ক ব্যবহারে সে ক্ষিপ্র ও সজীব হয়। মাছভাত শুধু বাঙালী সধবারই সৌভাগ্য লক্ষণ নহে, উহা তাঁহাদের [illegible]ন-সন্ততির, বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তি-সামর্থ্যের সঞ্চারক ও অ[illegible] প্রয়োজনীয় খাদ্য। উহার অভাব অর্থাৎ খ[illegible] ও [illegible]াছভাতের অভাব বাঙালীর জাতীয় নিরাশ্যের ও বিপর্য্যয়ের লক্ষণ।

আজ মাছের বাজারে হাহাকার—দুধ ও দুগ্ধজাত পদার্থ ত সাধারণ গৃহস্থের সংসারে দুগ্ধপোষ্য শিশু ছাড়া কেহ দেখেই না এবং সাধারণ ঘরের শিশুও যাহা পায় তাহা পর্য্যাপ্ত নয়, অতি সামান্য মাত্র। বাংলা দেশে বনজঙ্গল ও ঘাসেভরা প্রান্তর যতদিন ছিল ততদিন বাংলায় দুধ দই ঘি, ছানা ক্ষীরের অভাব ছিল না। আমরা শৈশবে দেখিয়াছি দুগ্ধবতী গাই দিনে ছয় সাত সের দুধ দিতে সমর্থ। ব্রিটিশ আমলের শাসকদিগের শোষণ নীতি অনুযায়ী বনজঙ্গল নির্দ্দয়ভাবে—ও অতি নির্ব্বোধের মত—কাটিয়া ব্রিটিশ রেল কোম্পানীর ও ব্রিটিশ কয়লা খনির কাঠের চাহিদা পূরণ করা হয়। তার পর যাহা ছিল তাহাও শেষ হয় দুই মহাযুদ্ধের কাঠের ও যুদ্ধসম্ভার ও সেনানিবাস স্থাপনের তাড়নায়। এখন আছে সে সকল অঞ্চলে শুধু গভীর ক্ষত ও খোয়াইয়ে ভাঙা ঊষর ও অনুর্ব্বর প্রান্তর, ধুলা বালি ও কাঁকরে ভরা। গোচারণ ভূমির উর্ব্বর অংশ যেটুকু ছিল তাহাও চাষীর দাবীতে শস্যের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সেখানে ফসল কাটিবার পরে মাত্র কয়মাস কিছু ঘাস ও আগাছা দেখা যায় এবং তাহাই খাইয়া চাষী গৃহস্থের অস্থিচর্ম্ম-সার গরু বলদ কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু সামান্য কিছু খড় ও আরও কম পরিমাণে ঘাস ও আগাছায় গরুর দুধ আসে কি প্রকারে? পূর্ব্বেকার দিনে গরু তৈলবীজের খইল, কলাই কুলথ খেঁসারী, ইত্যাদি দাল পাইত প্রচুর পরিমাণে। আজ সে সবই ভিন্ন প্রদেশের অর্থপিশাচ কালোবাজারী এবং তাহাদের বাঙালী অনুচর ও সহযোগীদের আওতায় পড়িয়াছে।

এবং বাঙালীর দুধভাত এখন স্বপ্নের কুহকের অন্তর্গত হইয়াছে।

বাকী ছিল মাছ। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পাকা রুই দশ আনা সেরে কাটা মাছ হিসাবে পাওয়া যাইত, ছোট মাছ, চিংড়ি, ইত্যাদি আরও অনেক কম দামে। স্বাধীনতার পর সেই দর চড়িয়া ক্রমে তিন, সাড়ে তিন টাকায়—অর্থাৎ পাঁচ ছয় গুণ অধিক—দাঁড়ায়। আজকার দিনের অন্য সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর তুলনায় এই মূল্য বৃদ্ধিই (শতকরা ৫০০।৬০০) অত্যধিক। কিন্তু তাহাতেও আমাদের দেশের মুনাফাবাজ ডাকাইতদিগের উদরপূর্ত্তী হয় না। বাঙালীর খ্যাতি আছে যে, সে খাদ্যাভাবে মরিবে কিন্তু লুটতরাজ বা দাঙ্গা করিবে না। এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁহারা বিক্ষোভ করান তাঁহাদের জীবনযাত্রার প্রধান সম্বলই হইল জিনিসের দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্যতা—কেননা তাহাতেই সাধারণ জন বিক্ষুব্ধ হয় সহজে। সুতরাং কালোবাজারীরাই তাঁহাদের সহায়ক বন্ধু। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিলে ত সকল বিক্ষোভের প্রধান আকরই নষ্ট ও নির্ম্মূল হইবে।

সুতরাং মাছের পাইকার মহাশয়গণ নির্বিবাদে ও নিঃসঙ্কোচে, দাম চড়াইয়া আকাশে তুলিতে লাগিলেন। আমাদের সদাশয় কর্তৃপক্ষ ধ্যানস্থ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করা যায়। আমাদের সংবিধানে চোরের ও দুষ্কৃতকারীর রক্ষার্থ সকল কিছু আছে কিন্তু "পরিত্রাণায় সাধূনাম্" কোনও কিছুই নাই, সাধু সজ্জনের শুধু রক্তমোক্ষণ দ্বারা মোক্ষলাভের ব্যবস্থা করা আছে মাত্র!

যাহাই হউক, মাছের বাজারে ক্রেতাদিগের বয়কট আরম্ভ করিলেন ক্রেতাদের মধ্যে অনেক উদ্যোগী লোকে মিলিয়া। এমন বিনায়াসে প্রাপ্ত সুযোগ মাঠে মারা যায় দেখিয়া বিক্ষোভকারী মহাশয়গণও জুটিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারেরও ধ্যানভঙ্গ ঘটিল।

তার পর হইল পাইকারদিগের সঙ্গে ভদ্রলোকের চুক্তি। তাহার ফল কি হইবে তা ত বুঝাই যাইতেছে। আমাদের মনে শুধু একটি প্রশ্ন জাগে। এইরূপ মুনাফাবাজও যদি ভদ্রলোক হয় তবে বাংলার জনসাধারণ—যেমন আমরা—কোন্ শ্রেণীর?

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা-সমস্যা

দীর্ঘদিন যাবৎ এই প্রদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার নানা সমস্যা নানা পর্য্যায়ে আলোচিত হইতেছে। সম্প্রতি এই প্রদেশের আনুমানিক পঁয়ত্রিশ হাজার শিক্ষক এক কর্ম্মবিরতির সিদ্ধান্ত উপস্থিত করেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১১ই সেপ্টেম্বর হইতে ঐ কর্ম্মবিরতি আরম্ভ করার প্রস্তাব ছিল। সম্প্রতি কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার পর ঐ প্রস্তাব ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইয়াছে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের শিক্ষক ও শিক্ষা বিষয়ক "গুরুত্বপূর্ণ" ঘোষণার বিবেচনার জন্যই ঐ কর্ম্মবিরতির প্রস্তাব স্থগিত রাখার কথা বলেন।

সম্পাদক বলেন যে, শিক্ষক সমিতির পক্ষ হইতে মূল যে চারিটি দাবী উত্থাপিত করা হইয়াছে তাহা এই:

(১) সমন্বয় কমিটি, (২) চাকরির নিরাপত্তা কমিটি স্থাপন, (৩) বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বেতন বোর্ড অথবা বেতন কমিটি গঠন, ও (৪) মধ্যশিক্ষার ক্ষেত্রে একটি স্বয়ংশাসিত বোর্ড স্থাপন।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সম্পাদকের মতে কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার ফলাফল বিশেষ সন্তোষজনক না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা শান্তিপূর্ণ মীমাংসার আশায় এই কর্ম্মবিরতির সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিতেছেন।

অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীবামনদাস মণ্ডল বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের পক্ষ হইতে কয়েকজন সদস্য ৮ই সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সহিত আলোচনায় সন্তোষজনক মীমাংসার আশ্বাস লাভ করিয়াছেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের মতে ধর্ম্মঘটের ব্যবস্থা অত্যন্ত অশোভন হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ বিষয়ে নিম্নরূপ বিবৃতি দিয়াছেন:

"গত ২৩শে মার্চ্চ ৫টি বিষয়ে আমার সঙ্গে আলোচনার জন্য নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি আমার নিকট এক পত্র প্রেরণ করেন। ৬ই জুন আমি এ-বি-টি-এর প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমি পশ্চিমবঙ্গ প্রধান শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদিগের সহিতও সাক্ষাৎ করি এবং তাঁহারাও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করেন। ৮ই সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় আমি পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের সহিত অনুরূপ শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। আমার সহিত আলোচনায় এ-বি-টি-এ ৫টি বিষয় উল্লেখ করেন:

"(১) শিক্ষায় বিভিন্ন পর্য্যায়ের [illegible] গঠন:

"তাঁহাদের ২রা মে-র পত্রের উত্তরে আ[illegible]

[illegible] বন্ধু দত্ত

জানাই যে, বিশিষ্ট এবং নিঃস্বার্থ শিক্ষাবিদ্‌দের বিভিন্ন কমিটি শিক্ষার বিভিন্ন পর্য্যয়ের সমন্বয়-সাধন সম্পর্কে বিবেচনা করিয়াছেন। ১৯৪৮-৪৯ সনের স্কুল শিক্ষা পুনর্গঠন কমিটি ১৯৫২-৫৩ সনের মুদালিয়র কমিশন. ১৯৪৮-৪৯ সনের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এদিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহাদের বিভিন্ন সুপারিশ করিয়াছেন। বিরোধী দলের যে সমস্ত সদস্য শুক্রবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আলোচনায় আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিভিন্ন পর্য্যায়ে কি কি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের পরে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্ত্তন। একমাত্র এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার বিভিন্ন পর্য্যায়ের বিষয়সমূহের সমন্বয়-সাধন সম্পর্কে পুনর্ব্বিবেচনা প্রয়োজন এবং যদি সমন্বয়ের অভাব থাকে অথবা উন্নয়নের সুযোগ থাকে তাহা করা দরকার। আমি মনে করি, এই বিষয়ে বিবেচনার জন্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের লইয়া একটি কমিটি গঠন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। এই কমিটিতে বিভিন্ন শিক্ষা সমিতির দুই-একজন করিয়া প্রতিনিধি লওয়া যাইতে পারে। তাঁহাদের কোন ভোটাধিকার থাকিবে না, বিশেষজ্ঞ হিসাবে মতামত জ্ঞাপন তাঁহাদের কাজ হইবে।

"(২) শুক্রবার বিরোধী দলের সদস্যদের সহিত আমি স্বয়ংশাসিত একটি ডিমোক্রাটিক বোর্ড গঠন সম্পর্কেও আলোচনা করিয়াছি। প্রস্তাবানুযায়ী ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি হইবেন। আমি তাঁহাদের জানাইয়া দিয়াছি যে, বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের নির্দ্দেশ জানিবার পরে এইরূপ কোন স্বয়ংশাসিত বোর্ড গঠনের ইচ্ছা শিক্ষা বিভাগ কিংবা গবর্ণমেণ্টের নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সম্পর্কে আলোচনার সময়ে একথা সুস্পষ্টভাবেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আমার মনে হয় এ সম্পর্কে বোঝাপড়ার কোন প্রশ্ন উঠে না, বোর্ড উপদেষ্টা বোর্ড হইবে কি না এ প্রশ্নও উঠে না। এ বিষয়ে তীব্র মতভেদের দরুণ আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ [illegible] সাধারণ নির্ব্বাচন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত মুলতুবী হউক। সমগ্র বিষয়টি তখন বিবেচনা করা [illegible]

[illegible] অ[illegible]ভস কমিটি গঠন সম্পর্কেও আমাদের মধ্যে [illegible] প্রতিনিধিদের নিকট আমি [illegible] যে, একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। কমিটি আপীল কমিটি হইবে। বেসরকারী বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় করিলে কমিটি এই সংক্রান্ত অভিযোগ বিচার করিবেন। মধ্যশিক্ষা আইনে একটি আপীল কমিটি গঠনের কথা আছে। আমি বলিয়াছি যে, মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ পুনর্গঠনে এই কমিটির ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

"বেসরকারী সাহায্য না-পাওয়া বিদ্যালয়সমূহ যখন সাহায্যের জন্য আবেদন করিবে, এবং এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক যখন কোন সাহায্যপ্রাপ্ত বা সরকারী বিদ্যালয়ে আসিবেন, তখন শিক্ষকদের পূর্ব্ব-পরিচয় নির্ণয় সম্পর্কেও প্রস্তাব হইয়াছে। আমি তাঁহাদের বলিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ এ সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। বেসরকারী বিদ্যালয়ে এই পূর্ব্ব-পরিচয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ না-ও করা হইতে পারে।

"(৪) শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কেও আলোচনা হয়। বেসরকারী মাধ্যমিক বোর্ডের শিক্ষকদের জন্য একটি বেতন-বোর্ড গঠন সম্পর্কে আমি একমত হইতে পারি নাই। প্রতিনিধিদের আমি জানাইয়াছি যে, শিক্ষকদের বর্দ্ধিত বেতন দিবার জন্য বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমরা সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছি। কিন্তু সরকারী বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের বেতন সম্পর্কে বেতন কমিটির সুপারিশের পরে আমরা এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা প্রয়োজন মনে করিতেছি। এক্ষণে আমরা মনে করিতেছি যে, শিক্ষকদের মানোন্নয়নকল্পে এজন্য তৃতীয় যোজনার নির্দ্ধারিত বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরিকল্পনায় বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে জানানো হইয়াছে। আমরা আশা করিতেছি যে, আমরা প্রয়োজনীয় পরিমাণ সাহায্য পাইব। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে এ সম্পর্কে এবং সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্পর্কে আমি এক সুনির্দ্দিষ্ট বিবৃতি দিব বলিয়া জানাইতেছি।

"পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্কুল বোর্ড সমিতির প্রেসিডেণ্ট শ্রীঅতুল্য ঘোষের পত্রের উত্তরে আমি জানাইয়াছি যে, শহরে ও পল্লী অঞ্চলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনে পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণমেণ্ট সম্মত এবং প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনও বৃদ্ধি করিতে হইবে। ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক শিশুদের বিনাব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হইবে, সংবিধানের এই বিধানই কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা হইবে। সংবিধানে যদিও ৬ হইতে ১৪ বৎসর বয়স উল্লেখ আছে, ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমানে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিবেচনা করা

হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে এজন্য তৃতীয় যোজনায় বরাদ্দ অর্থ অপেক্ষা আরও অধিক অর্থ প্রয়োজন। এজন্য এই খাতে আরও আর্থিক সাহায্যের জন্য আমরা ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জানাইয়াছি।"

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-সমস্যা এখন অতি সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। এ প্রদেশের শিক্ষার মান কিরূপ দ্রুত অবনত হইতেছে তাহা ধারণারও অতীত। অতি সত্বর এই সমস্যার সমাধান না হইলে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। এই শিক্ষার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে মাধ্যমিক স্তর হইতে এবং তাহার প্রধান কারণ ঐ স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদিগের সাংসারিক অবস্থার বিপর্য্যয়, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। কয়েকটি রাজনৈতিক দল এই সুযোগে বিক্ষোভ চালাইতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে দলটি দেশাত্মবোধশূন্য ও শুধুমাত্র রাষ্ট্রবিপর্য্যয় দ্বারা দেশকে বিদেশীর দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে চাহেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে কিছু বলা বৃথা। কিন্তু অন্যদের চিন্তা করা উচিত যে, ছাত্র-বিক্ষোভে শুধু ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের মতে শিক্ষক ও শিক্ষিকাদিগের দাবী-দাওয়ার অধিকাংশই ন্যায়সঙ্গত। একদিকে কৃচ্ছ্রসাধন ও অন্নচিন্তা এবং অন্যদিকে শিক্ষার্থীদিগের বিদ্যাদান ও চরিত্রগঠন—এই দুই বিপরীত ব্যাপারে সামঞ্জস্য রাখা নিতান্তই অসম্ভব ব্যাপার আজিকার দিনে। এবং দেশের প্রগতি ও সংহতি যাঁহাদের কার্য্যক্রমের উপর নির্ভর করে তাঁহারা এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তিত ও অবহিত নহেন তাহাও দেখা যাইতেছে। নহিলে এই বিষয়ের উপর বহু পূর্ব্বেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়া যথাযথ ভাবে শিক্ষা-সমস্যার সমাধানের ব্যবস্থা হইতে পারিত।

কিন্তু অন্যদিকেও কথা আছে। আমাদের দেশে এখন দেখা যাইতেছে যে, দাবীর সঙ্গে সঙ্গে যে দায়িত্ব আছে সে কথা আমরা সকল ক্ষেত্রেই ভুলিয়া যাই। একদল রাজনৈতিক ভাগ্যান্বেষী আছেন যাঁহারা নিজের ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থপূর্ত্তির জন্য সাধারণকে বুঝাইতেছেন যে, দায়িত্বের ভার সম্পূর্ণই কর্ত্তৃপক্ষের, সাধারণজনের আছে শুধু দাবী!

বলা বাহুল্য, ইহা জাতীয় অধোগতি ও ধ্বংসের বীজমন্ত্র। "আমাদের দাবী মানতে হবে" ইহা খুব সহজ ও গালভরা শ্লোগান, কিন্তু সেই দাবীর পিছনে কি দায়িত্বের ভার আছে সে কথা কে বলে? এই যে সম্প্রতি শহরের নানা বিদ্যালয়ে, কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের "শিক্ষা দাও, শিক্ষা দাও" শিরোনামাযুক্ত পোষ্টারের ছড়াছড়ি হইল এবং সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর দল বিধান সভার দিকে "অভিযান" করিল, ইহার পিছনে কে বা কাহারা ছিলেন ও আছেন সে কথা সহজেই বুঝা যায়। তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি এইরূপে কি ভাবে হইতে পারে তাহা প্রশ্ন করিলে কোনও সদুত্তর পাওয়া যাইবে কি?

শিক্ষক ও শিক্ষিকা ক্লিষ্ট হইয়া বিক্ষোভের আশ্রয় লইয়াছেন, একথা তবুও বুঝা যায়। কিন্তু এইভাবে লেখাপড়া হইতে ছাড়াইয়া অপরিণত-মস্তিষ্ক কিশোর-কিশোরীদিগের অধোগতির পথে টানিয়া আনা, ইহার সমর্থন যদি কোনও শিক্ষক বা শিক্ষিকা করেন, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদেরই শিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, কেননা শিক্ষার আঙ্গিক দায়িত্বজ্ঞান। এবং ছাত্র-ছাত্রীদিগের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাঁহারা নিজেদের দায়িত্ব কি সেকথা বুঝিতে অক্ষম, তাঁহারা শিক্ষাব্রত গ্রহণের দায়িত্ব লইবেন কেমনে?

ভারতে পাকিস্থানী অনুপ্রবেশ

সম্প্রতি লোকসভায় পাকিস্থানীদিগের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। আনন্দবাজার পত্রিকা তাহার নিম্নে উদ্ধৃত বিবরণ দিয়াছেন। এ বিষয়ে সরকারী পক্ষ যে ভাবে এড়াইয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের কাছে বিশেষ শুভ লক্ষণ মনে হইতেছে না। দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ সজাগ থাকিলে শ্রাদ্ধ এতদূর গড়াইত না।

"ভারতে পাকিস্থানীদের ব্যাপক সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন শ্রীপ্রকাশ বীর শাস্ত্রী। তিনি বলেন যে, গত দশ বৎসরে অন্তত আট লক্ষ পাকিস্থানী আসামে প্রবেশ করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে। তাহারা এই রাজ্যের সর্ব্বত্র অনুপ্রবেশ করিয়াছে, তবে তিনটি জেলায় তাহাদের সংখ্যা খুবই বেশী। এই তিনটি জেলা হইল—কামরূপ, দারাং ও নওগাঁ। তাহারা এমনভাবে বসতি করিয়াছে, যাহার ফলে তাহারা খুব সহজেই নির্ব্বাচনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

"শ্রী শাস্ত্রী বলেন যে, ভারতের একটি রাজ্যে এইভাবে পাকিস্থানীদের সংহতি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ভারত সরকারের দৃষ্টি অবিলম্বে ইহার প্রতি উচিত। ভারত-পাকিস্থানের বর্ত্তমান সম্পর্ক প্রেক্ষিতে দেখিলে মনে হয় যে, পাকিস্থানী

অনুপ্রবেশ এমনই অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা যে-কোন দিন ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে।

"শ্রী শাস্ত্রী সরকার-প্রদত্ত পরিসংখ্যান উল্লেখ করিয়া দেখান যে, ভারতে পাকিস্থানীদের সংখ্যা ক্রমবর্দ্ধমান। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ছাড়পত্রের মেয়াদ বহুদিন হইল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

"তিনি বলেন যে, দেশে ১৮৮টি ভারতবিরোধী কার্য্যের সহিত পাকিস্থানীরা যুক্ত ছিল। উত্তর প্রদেশে বেআইনী ভাবে রক্ষিত ১৫,০০০ পাউণ্ড বারুদ এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত। এদিকে মাদ্রাজে পাকিস্থানী বালকেরা অবৈতনিক শিক্ষালাভ করিতেছে। কাশ্মীরে অনেকগুলি অন্তর্ঘাতী কার্য্যের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

"বিতর্কের উত্তর প্রদানকালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী শ্রী বি এন দাতার বলেন যে, গত দশ বৎসরে আসামের জনসংখ্যা শতকরা ৩৪·৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এইরূপ বৃদ্ধি অস্বাভাবিক। তবে পাকিস্থানী অনুপ্রবেশই এজন্য দায়ী—একথার সমর্থন অথবা প্রতিবাদ কোনটিই তিনি করিবেন না, কারণ বিষয়টি সম্পর্কে এখন তদন্ত ও বিবেচনা চলিতেছে।

"শ্রী দাতার আরও বলেন যে, সরকার সমস্যা সম্পর্কে সচেতন আছেন এবং প্রয়োজন হইলে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনে দ্বিধা করা হইবে না, কারণ আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার গুরুত্ব সম্ভাব্য বহিরাক্রমণের জন্য প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।"

কম্যুনিষ্ট পার্টির "গোপন দলিল"

বিগত ২৮শে আগষ্ট আনন্দবাজার পত্রিকা নিম্নস্থ সংবাদ পরিবেশন করেন। ইহার কোনও প্রতিবাদ আমাদের চক্ষে পড়ে নাই। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া আমরা উদ্ধৃত করিলাম:

"হায়দরাবাদ, ২৭শে আগষ্ট—ন্যাশনাল মার্ক্সিস্ট এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া আজ ভারত-চীন সীমান্ত-বিরোধ সম্পর্কে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কয়েকটি গোপন দলিল প্রকাশ করিয়াছেন। দাবী করা হইয়াছে—'এই সব গোপন দলিল ইতিপূর্ব্বে ভারতে প্রকাশিত হয় নাই।'

"এসোসিয়েশনের প্রাথমিক বৈঠক আজ এখানে সুরু হ[illegible]

[illegible] দলিল[illegible]চনা করেন শ্রী বি টি রনদিভে, ১৯৫৯ [illegible]৩শে সেপ্টেম্বর। ঐ সময় কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভায় উহা পেশ করা হয়।

"এই দলিলে নূতন করিয়া ঘোষণা করা হয় যে, চীনের সহিত সীমান্ত-বিরোধের ব্যাপারে ভারতের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য নয় এবং চীনের দ্বারা কোন চরম আক্রমণ সংঘটিত হয় নাই।

"সীমান্ত-বিরোধে কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি কি হওয়া উচিত—সেই সম্পর্কে শ্রীরনদিভে চারটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করেন। যথা (১) ম্যাকমোহন লাইনকে পুরাপুরি অগ্রাহ্য করা। এজন্য যুক্তির অভাব হইবে না। তবে, 'চীনের নীতির সহিত ইহার ষোল আনা সামঞ্জস্য থাকিবে বটে, তবে আমাদের এই নীতি গ্রহণ কেহ পছন্দ করিবে কি না আমি জানি না। ইহার ফলে পার্টি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে, ভারত-চীন মৈত্রীর ক্ষতি হইতে পারে—ফলে পার্টির কাজ-কর্ম্মের পথে বাধা আসিতে পারে।' (২) 'জাতীয়তাবাদীদের যাহা মুখরোচক শুধু সেইসব কথা বলিয়া এবং আক্রমণের মোকাবিলা করিতে আমরা পিছপাও নই এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া' নেহরুর লেজুড় হইয়া থাকা। (৩) কোনরকম ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে না যাওয়া। এবং (৪) নীতিগতভাবে কিছুই কবুল না করার কৌশল অবলম্বন।

"দলিলে এই কৌশলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রহিয়াছে। শ্রীরনদিভে মনে করেন যে, তাঁহার এই বাস্তব কর্ম্মপন্থা চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও আমাদের নিজেদের পক্ষেরই নীতিভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনেকখানি সাহায্য করিবে।

"উপসংহারে শ্রীরনদিভে বলেন, 'ভবিষ্যতেও আমাদের এইরূপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হইতে হইবে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমাদের এমন কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে যাহা লোকের মনকে বুঝ দিলেও বস্তুত কিছুই কবুল করিবে না।'

"অপর একটি দলিল (৬নং) হইল চীন-ভারত সীমান্ত-বিরোধ সংক্রান্ত একটি সংক্ষিপ্ত নোট। এই নোটে ভারতের বিরুদ্ধে এবং চীনের পক্ষে ওকালতি করা হইয়াছে এবং চীন সরকার ভারতের বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি পেশ করেন সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"নোটে বলা হইয়াছে—ভারত বেআইনী ভাবে 'নেফা' অঞ্চল দখল করিয়া আছে। চীনের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলটি ব্যবহার করাই ভারতের উদ্দেশ্য। আধা স্বাধীন সিকিম, ভুটান ইত্যাদি রাজ্যকে সাহায্য দিয়া, ঐসব রাজ্যের অগ্রগতি বন্ধ করিয়া সীমান্ত এলাকায় সর্ব্বদা উত্তেজনা

জিয়াইয়া রাখার (উত্তর সীমান্তে রাশিয়া যেমন রাখিত) পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী 'নীতি'ই ভারত অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে।

"একটি চৈনিক সংবাদ সরবরাহ সংস্থার ১৯৫৯ সনের ১০ই সেপ্টেম্বরের একটি সংবাদের দোহাই দিয়া এই নোটে লাদক সম্পর্কে চীনের দাবী সমর্থন করা হইয়াছে।"

বাঙালী ও কেন্দ্রীয় সরকারী চাকরি

ভূতত্ত্ব বিষয়ে জরিপ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' এক শতাব্দীর উপর কলিকাতায় ছিল। সম্প্রতি বিকেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থায় এই দপ্তরেরও নানাপ্রকার নূতন অদলবদল চলিতেছে। সেই সম্পর্কে কলিকাতা অফিসের অনেক কর্ম্মচারীকে ভিন্ন রাজ্যে যাইতে হইতেছে। এই বিষয়ে "আনন্দ-বাজার পত্রিকায়" একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে যাহার কিছু অংশ আমরা নীচে দিলাম:

"জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার সাধারণ কর্ম্মচারী-দের সুখের নীড় ভাঙ্গিয়াছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদিগকে আত্মীয় পরিজনবর্গের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া দূরে বিভিন্ন রাজ্যে চলিয়া যাইতে হইতেছে।

"সংবাদ লইয়া জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব অনুযায়ী ঐ দপ্তরের প্রায় তিনশত কর্ম্মী সম্প্রতি কলিকাতা হইতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে পয়লা সেপ্টেম্বর কাজে যোগ দিতে হইবে। প্রকাশ, ঐ সব কর্ম্মীকে হায়দরাবাদ, রাজস্থান, লক্ষ্ণৌ, পাটনা, ভুবনেশ্বর, শিলং, প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে।

"এইরূপ গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যায়, বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরিত কর্ম্মীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষ নাকি তেমন মাথা ঘামাইতেছেন না। 'কোথায় থাকিব স্যার' কোন কোন নিরুপায় কর্ম্মচারীর এইরূপ ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তরে কর্ত্তৃপক্ষ নাকি 'সে খুঁজিয়া পাতিয়া লও' এই ধরনের মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

"সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, অতঃপর ঐ দপ্তরে বাঙালীর চাকুরীর পাটও একরূপ উঠিয়া গেল। কারণ বিভিন্ন রাজ্যের আঞ্চলিক দপ্তরগুলিতে সেই সেই রাজ্যের অধিবাসীদেরই নিশ্চিত অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। কলিকাতায় যে স্বল্পসংখ্যক চাকুরী অবশিষ্ট থাকিতেছে তাহার বেশীর ভাগই হয়ত অবাঙালীর ভাগ্যে জুটিবে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল আশঙ্কা করেন।"

এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার আছে বলিয়াই আমরা উপরের অংশগুলি উদ্ধৃত করিলাম। প্রথমেই বলি যে, যদি কর্ম্মীদের বাসস্থান বা তাহাদের ছেলেমেয়ে-দের পড়াশুনা সম্পর্কে সরকার উদাসীন থাকেন তবে সেটা অত্যন্তই অন্যায়। এরূপ বেবন্দোবস্ত হইলে শুধু কর্ম্মীদের কষ্ট নয়, তাহাদের কাজেও গোলমাল হইতে বাধ্য। যাঁহাদের ঔদাসীন্যে এরূপ অব্যবস্থা হয় তাঁহাদের নিকট জবাবদিহি করান নিশ্চয়ই প্রয়োজন।

অন্যদিকে আমরা দেখি যে কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইলেই বাঙালী কর্ম্মীদের নিকট হইতে নানাপ্রকার অনুযোগ অভিযোগ আসে এবং সংবাদপত্রে তাহা ছাপা হয়, যাহার মধ্যে অনেক কিছুই অবান্তর, যেমন এই রিপোর্টেও আছে। রিপোর্টেই বলা হইয়াছে যে, ঐ দপ্তরে "বাঙালীর চাকরীর পাটও একরূপ উঠিয়া গেল।" বাঙালী ইদানিং এইরূপ 'ঘরমুখো' হওয়ায় যে তাহার চাকরী জোটে না একথার কি কিছুটা সত্য নয়?

নূতন আইন সংস্কৃতি

ভারতবর্ষের জনসাধারণ যাহাতে আর পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এই মহাজাতির মধ্যে ভাষা, জাতি, প্রদেশ অথবা অপর কোন বিভিন্নতা অবলম্বন করিয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন এক ধারার একটা নূতন সংস্কৃতির ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। এই সংস্কৃতির পরে, উক্ত আইন অনুসারে, যদি কেহ কোন ভাষা, জাতি, প্রদেশ বা অপর ভাবে বর্ণিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন, লেখেন বা অন্য কোন ভাবে সেই সম্প্রদায়কে অপরের নিকট হেয়, ঘৃণ্য বা অপাংক্তেয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। অতঃপর তাহা হইলে আর কাহারও নিন্দা করা চলিবে না। যদি কোন বিশেষ ভাষাভাষী বা প্রদেশবাসী ব্যক্তিরা সমষ্টিগত ভাবে কোন নিন্দনীয় আচরণে নিযুক্ত হন তাহা হইলেও সেই সকল ব্যক্তির প্রতি ভারতের অপর সাধারণের ঘৃণা বা আক্রোশ জাগ্রত করা দণ্ডনীয় হইবে। ধরা যাউক, কোন বিশেষ জাতীয় লোকেরা সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে দল বাঁধিয়া অপর কোন জাতীয় লোকদের গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া, তাহাদিগের সম্পত্তি নষ্ট করিয়া বা তাহাদিগের সমাজের নারী[illegible] অত্যাচার করিয়া নিজেদের কোন মতলব হাসিল [illegible] চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই আইন

পূর্ব্বে উক্ত জাতীয় দুর্বৃত্তদিগের নিন্দা ও তাহাদিগকে সায়েস্তা করিতে অপর সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা অপরাধ বলিয়া প্রমাণ হইত না। কিন্তু এই আইন সংস্কৃতির পরে আর সে প্রকার প্রচার কথায়, কার্য্যে বা লেখায় করা চলিবে না। অতি মহাপাপও যদি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তি একত্র হইয়া করিতে থাকে তাহা হইলে তাহাদিগের বিরুদ্ধে কিছু বলা এখন হইতে বে-আইনী হইল। অর্থাৎ সকল বাঙ্গালীরা যদি একত্র হইয়া মাড়বার দেশে দলে দলে প্রবেশ করিয়া মাড়বারীদিগকে বেকার ও হৃতসম্পদ্ করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে মাড়বারীগণের আর বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে কিছু বলা আইন-সম্মত হইবে না। অথবা নয়াদিল্লীর নয়া হিন্দী যদি অশুদ্ধ বা অর্থহীন বলিয়া কাহারও মনে হয় তাহা হইলে এই আইনটিকে বাঁচাইয়া চলিতে হইলে সে কথা বলা চলিবে না; কারণ বলিলে, হিন্দী যাঁহাদিগের ভাষা তাঁহাদিগের প্রতি অপরের বন্ধুতার ও প্রীতির হানি হইতে পারে।

অতএব এই নূতন রূপে সংস্কৃত আইন অনুসারে শুধু যে অন্যায় ভাবে অপর কাহাকেও লোক-চক্ষে হেয় ও দূষণীয় বলিয়া প্রতীয়মান করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ধার্য্য হইবে তাহা নহে; সাম্প্রদায়িক ভাবে যে যাহা কিছুই করুক না কেন, সে কার্য্যের জনসমক্ষে সমালোচনা করা কঠিন হইবে। কেননা সমষ্টিগত ভাবে বা সাম্প্রদায়িক ভাবে যদি বহুসংখ্যক লোকে কোন পাপ করে তাহা হইলে সে সাম্প্রদায়িক পাপের বিরুদ্ধে কিছু বলিলে তাহাতে পাপী-সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা হইবে; এবং তাহাতে আইন ভঙ্গ করা হইবে। ইংরেজীতে বলে, There is safety in numbers, অর্থাৎ, সংখ্যা-বাহুল্য সকল কিছুকেই নিরাপত্তা দান করিতে পারে। বহুসংখ্যক লোক একত্রে অপরাধ করিলে তাহার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। বিশেষ করিয়া যদি সেই সকল অপরাধীগণ এক ভাষা-ভাষী বা এক প্রদেশবাসী হয়।

আত্মরক্ষা ও শত্রু দমন

সকল মানবের একটা আত্মরক্ষা ও শত্রু দমনের অধিকার আছে। সে অধিকার যদি সাক্ষাৎ ও প্রকাশ্য ভাবে মানুষকে ভোগ করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই সে অধিকার গোপনে নিজ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে নিযুক্ত হয়। অর্থাৎ ব্যক্তি যদি ব্যক্তির উপর কোন প্রকার আক্রমণ করে তাহা হইলে ব্যক্তির আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণের অধিকার সর্ব্বদাই থাকে। আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত যে অধিকার আইনত গ্রাহ্য হয় তাহা যথেষ্ট। কোন ব্যক্তিকে কেহ গালি দিলে, উত্তরে গালি দেওয়া আইনত গ্রাহ্য হয়। কেহ কাহাকে প্রহার করিলে প্রহারকারীকে প্রহার করা বে-আইনী হয় না। কাহারও গৃহে কেহ অগ্নিসংযোগ করিতে আসিলে বা লুঠতরাজ কিংবা আঘাত ও প্রাণনাশ চেষ্টা করিলে আক্রমিত ব্যক্তির আইনে পূর্ণ অধিকার আছে নিজেকে সর্ব্ববিধ উপায়ে বাঁচাইবার চেষ্টা করিবার। কেহ কাহারও পাকা ধানে অগ্নি সংযোগ অথবা অপর উপায়ে তাহার ক্ষতি করিতে যাইলে, তাহার বিরুদ্ধেও আত্মরক্ষা ও নিজ অধিকার সংরক্ষণের চেষ্টা করিতে সকল ব্যক্তিই পারেন। অর্থাৎ, ব্যক্তিগত অধিকার সংরক্ষণের জন্য ব্যক্তি, ব্যক্তিকে নিন্দাবাদ, অপবাদ, আঘাত, আক্রমণ, এমন কি মারাত্মক ভাবে আক্রমণ করিলেও অবস্থানুসারে সকল কিছুই আইনসঙ্গত হইয়া থাকে। যদি এক ভাষাভাষী বা এক জাতির কিংবা এক দেশবাসী ব্যক্তিগণ দলবদ্ধ ভাবে আক্রমণ-প্রত্যাক্রমণ কিংবা পরস্পরের নিন্দাবাদ করিতে থাকেন তাহা হইলেও সেই জাতীয় দ্বন্দ্ব বা কলহ সাম্প্রদায়িক বলিয়া ধার্য্য হইবে না এবং আইনের দিক্ দিয়া ততটা দোষাবহও প্রমাণ হইবে না। কিন্তু যদি কোন কারণে বিভিন্ন ভাষা, জাতি বা প্রদেশের কথা উঠিয়া পড়ে এবং কলহে নিযুক্ত দুই দলের লোকেরা বিভিন্ন ভাষাভাষী, দেশবাসী কিংবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হয় তাহা হইলেই মহা গোলযোগের সূত্রপাত হইবে। কেহ আর কাহারও বিরুদ্ধে কিছু বলিলেই আইন ভঙ্গ হইবে। অর্থাৎ বাঙ্গালী বাঙ্গালীতে পরস্পরকে যথেচ্ছা গালাগালি করিয়া "ইহাকে মার!" "উহাকে

মার !” বা “ইহার সকল কিছুই দোষ” বা “উহার সকল কিছুই ঘৃণ্য” বলিয়া কথায় বা লেখায় প্রচার করিলে দোষ হইবে না। কিন্তু যদি বলা যায় “জামপুরীয়ারা বড় চোর ও ঠগ, তাহারা ঘৃতে ডালডা মিশ্রণ করিয়া নরহত্যার তুল্য পাপ করিতেছে।” অথবা “গন্ধর্ব্বদিগকে বিতাড়িত করা উচিত, কেননা তাহারা শতকরা বার্ষিক দুইশত টাকা সুদ আদায় করে।” কিংবা “রামাসি ভাষাভাষীদিগকে দেখিলেই প্রহার করিয়া দূর করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য ; কেননা তাহারা সুবিধা পাইলেই অপরের গলায় ফাঁসি লাগাইতে চেষ্টা করে।” তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক প্রীতির হানি করিবার জন্য সাজা হইবে। অর্থাৎ দলবদ্ধ ভাবে কিংবা ভাষা-জাতি-সম্প্রদায়-ভিত্তিক ভাবে অপরের বিরুদ্ধে অন্যায় আক্রমণ চালান দোষাবহ হইবে না, যদি না সে আক্রমণ কথা, লেখা বা অপর ভাবে প্রকট হইয়া উঠে। প্রচ্ছন্ন ও গোপন আক্রমণ, চাকুরি হইতে বিতাড়ন, ব্যবসা নষ্ট করিয়া দেওয়া, নানাভাবে “পেটে মারা” যদি সাম্প্রদায়িক ভাবেও চালান হয় তাহা হইলেও যতক্ষণ তাহা কথায়-লেখায় প্রচার করা না হইবে ততক্ষণ সকল দুষ্কর্ম্মই আইন-সঙ্গত হইবে। অর্থাৎ এই যে মুখ ও লেখনী বন্ধ আইন হইল ; ইহার ফলে হঠাৎ ভারতের কলহে নিযুক্ত সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল ভাবে ভালবাসা জাগ্রত হইয়া দেখা দিবে তাহা মনে হয় না। ক্রোধ ও কলহ ব্যক্ত হইতে না পারিয়া এবং বিদ্বেষ জমিয়া গুরুভার হইয়া উঠিয়া পরে আরও প্রবল ও ভয়ানক রূপ ধারণ করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই আইন প্রণয়ন করিয়া ভারত সরকারের অভিলাষ পূর্ণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কলহের কারণ কি তাহা প্রথমে দেখা আবশ্যক এবং সেই কারণ দূর হইলেই কলহও আর থাকিবে না। কলহের কারণ যদি থাকিয়া যায় তাহা হইলে আইন করিয়া বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে না দিলেই সে সমস্যা দূর হইবে না। কারণ বিদ্বেষ অন্য ভাবে প্রকাশিত হইবে নিশ্চয়ই ; এবং তাহা কথিত বা লিখিত রূপ ত্যাগ করিয়া আরও কোন ভীষণতর রূপ ধারণ করিবে।

অ

সাম্প্রদায়িক কলহের কারণ কি ?

ভারতবর্ষে যে সকল সম্প্রদায় আজকাল পরস্পর-বিরোধী হইয়া উঠিতেছে এবং যাহাদিগের বিদ্বেষ ও কলহের জন্য ভারতীয় মহাজাতির কৃষ্টি, সভ্যতা ও আদর্শবাদ ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতেছে, সেই সকল সম্প্রদায়গুলি কি জাতীয় ? ভাষা, জাতি কিংবা অপর কোন দিক্ দিয়া তাহাদিগের স্বরূপ কতটা সত্যকার, সে কথা বিচার করা আজ প্রয়োজন হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে যে সকল সম্প্রদায় ছিল তাহারা ঠিক ভৌগোলিক ভাবে বিভাজ্য ছিল না। অর্থাৎ পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, বিহারী, প্রভৃতি নামে অভিহিত জাতি বা সম্প্রদায় প্রাচীন ভারতে ছিল না। হিন্দী ভাষাভাষী বা হিন্দুস্থানী জাতিও কোন ছিল না। বর্ত্তমানে হিন্দী বলিয়া যে ভাষা চলিত হইতেছে বা যাহা রাষ্ট্রভাষা বলিয়া চালাইবার বিশেষ চেষ্টা সর্ব্বত্র করা হইতেছে ; পূর্ব্বে সে ভাষার কোন অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হয় না। যদি বা ছিল তাহা হইলে অতি অল্প লোকেই সে ভাষা ব্যবহার করিত। মাগধী, মৈথিলী, ভোজপুরী, প্রভৃতি বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন ভাষাকে আজ হিন্দী বলিয়া চালান হইতেছে। এমন কি পাঞ্জাবী ভাষা, যাহার হিন্দীর সহিত সম্বন্ধ অতি দূরের, তাহাকেও হিন্দী জাতীয় ভাষা বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিতেছেন বর্ত্তমান উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, দিল্লী, পাঞ্জাব, ইত্যাদি স্থানে প্রাচীনকালে বহু জাতির বাস ছিল। তাহারা বহু-রাজত্বের প্রজা ছিল ও তাহাদিগের ইতিহাস সভ্যতা, মিত্রতা অথবা শত্রুতা বহুরূপী ছিল। এখন শুনা যাইতেছে যে, হিন্দী ভাষাভাষী লোকের সংখ্যা ১৫ অথবা ২০ কোটি, সে কথাও সম্পূর্ণরূপে অসত্য ; কারণ বহু বিভিন্ন ভাষাকে এখন হিন্দী বলিয়া আখ্যাত করা হইতেছে এবং বহু জাতিকে হিন্দুস্থানী বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইতেছে। বাঙ্গালী বা পাঞ্জাবী নামের মধ্যেও ঐভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকদের এক বলিয়া ধরিয়া লইবার কথা উঠিতে পারে ; যদিও হিন্দী বা হিন্দুস্থানী লইয়া যতটা মিথ্যা প্রচার হইতেছে বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী বা গুজরাটী নামের অন্তরালে ততটা মিথ্যা রাখিবার

স্থান হয় না। আগ্রা ও ছাপরার ভাষা ও মানুষের রীতি-নীতি, চাল-চলনের যে পার্থক্য; বাঁকুড়া ও ঢাকার মধ্যে সে পার্থক্য নাই। সে যাহা হউক, এই যে সকল নূতন নূতন ভাষা বা প্রদেশ ভিত্তিক সম্প্রদায় আজকাল গঠিত হইয়া উঠিতেছে; এই সকল সম্প্রদায় পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় অথবা অর্থনৈতিক ইতিহাসে লক্ষিত হয় না। ইহাদিগের সৃষ্টি হইয়াছে কংগ্রেস প্রবর্ত্তিত প্রদেশ-বহুল ভারতবর্ষে। এই প্রদেশগুলির সৃষ্টি হইয়াছে নামেমাত্র ব্রিটিশ শাসনের ফলে। কারণ ব্রিটিশ শাসনকালে প্রদেশগুলির নিজস্ব ভাব ও অধিকারবোধ এত প্রবল ও প্রকট ছিল না। বিভিন্ন প্রদেশের লাটেরা অথবা রাজকর্ম্মচারীগণ প্রাদেশিক অধিকার লইয়া লড়ালড়ি করিতেন না; এবং প্রদেশের ভিতরে সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘু উপ-সম্প্রদায় বলিয়া কিছু দেখা যাইত না। বিহারের বাঙ্গালী অথবা পাঞ্জাবের হিন্দুস্থানী বলিয়া কোনও উৎপীড়িত অথবা বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত গণ্ডিও ব্রিটিশ ভারতে ছিল না। কংগ্রেস শাসনে ও কংগ্রেস দলের দেশভক্ত নেতাদিগের আগ্রহের ফলেই ক্রমশঃ প্রদেশগুলি উৎকটভাবে নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। এবং প্রদেশের ভিতরেও বিভিন্ন দলের মধ্যে জোরাল দলের স্বার্থই প্রাদেশিক স্বার্থ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যত ভিন্ন ভিন্ন দলের স্বার্থ জীবন্ত হইয়া পরমাংসভুক্ শ্বাপদের ন্যায় ইতস্ততঃ গতিশীল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সকল স্বার্থের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, শুধু কংগ্রেসের নেতাদিগের ও তাঁহাদিগের অনুচরবৃন্দের লোভ ও অপরাপর রিপুসেবার তাড়নামাত্র। প্রত্যেকটি প্রদেশে বহু রাজকর্ম্মচারীর ও শাসন বিভাগের সৃষ্টি ও ভিন্ন ভিন্ন বাস্তব বা কল্পিত রাজকার্য্য সাধনের ব্যবস্থার ফলে শুধু দেখা যায় যে, সাক্ষাৎ-কর্ম্মী জনসাধারণের স্কন্ধে ক্রমাগত নিষ্কর্ম্মা নেতা, উপনেতা, কর্ম্মচারী, সহ-কর্ম্মচারীগণ চড়িয়া বসিয়া তাহাদিগের শ্রমলব্ধ ভোগ্যবস্তুর অধিকাংশ নিজেদের ভোগে লাগাইতেছেন। উৎপাদন কার্য্য যাহারা চালাইতেছে তাহাদিগের প্রাপ্য অংশ ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে এবং যাহারা শুধু কর্ম্মের অভিনয় করে তাহারাই পূর্ণতরভাবে নিজেদের সুবিধা করিয়া লইতেছে।

সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা তাহা হইলে মূলতঃ ইতিহাস, জাতীয়তা, ভাষা, কৃষ্টি, সভ্যতা, প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ-বর্জ্জিত। যাহা বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া চলিতেছে তাহার মূলে কংগ্রেসী লোভ ও লাভ ব্যতীত অপর কিছু আমরা দেখিতে পাই না। যদি ভারতবর্ষকে আমরা তাহার হৃতগৌরব পুনরায় ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করি তাহা হইলে প্রথমত প্রয়োজন নিষ্কর্ম্মা নেতা, উপনেতা, কর্ম্মচারী, সহ-কর্ম্মচারী, প্রভৃতি সমাজদ্রোহী ও সাধারণের অনিষ্টকারী নিষ্কর্ম্মা পরশ্রমজীবীদিগকে উচ্চপদ হইতে সরাইয়া যথাস্থানে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা। অর্থাৎ সমাজের অনুকূল কার্য্য কিছু না করিয়া পূর্ণমাত্রায় নিজেদের সুবিধামত ভোগদখলের ব্যবস্থা করিয়া লওয়া বন্ধ না করিলে, তথাকথিত সাম্প্রদায়িক বা প্রাদেশিক অধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব-কলহ কখনও বন্ধ করা সম্ভব হইবে না। সকল ব্যক্তি যখন দেখিবে, শুধু বাক্য অথবা আদর্শ বিক্রয় করিয়া কিংবা চাল চালিয়া আর ঐশ্বর্য্যলাভ সম্ভব নহে, তখনই ভারতের হারান সভ্যতা আবার ফিরিয়া আসিবে।

অ

বিশ্বশান্তির কথা

পৃথিবীর রাষ্ট্রীয় অবস্থা কতদূর অবনতির পথে নামিয়া গিয়াছে তাহার প্রমাণ বেলগ্রেডের জাতিসঙ্ঘের মিলিত শান্তি-প্রচেষ্টার মধ্যে পাওয়া যায়। এই শান্তিসভার সভ্য যাঁহারা, তাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে কোন দলের সহিত যুক্ত নহেন। অর্থাৎ তাঁহারা মার খাইলেও পুনর্ব্বার মার খাইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শুধু ইন্দোনেশিয়া, ইউ. এ. আর ও যুগোস্লাভিয়া কিছুটা স্বাভাবিক মানবোচিত প্রত্যাক্রমণ ইচ্ছা পোষণ করেন স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করেন না। ভারত সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধর্ম্মের অভিনয় করিতে ভালবাসেন; অর্থাৎ ভারতের ৪০ কোটি গরীব ও অশিক্ষিত জনসাধারণ নহে, তাহাদিগের রাষ্ট্রীয় নেতাগণ। ভারতে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও পারস্পরিক সদ্ভাব যত হ্রাস পাইতেছে এই প্রেমধর্ম্মের অভিনয় আন্তর্জ্জাতিক আসরে ততই প্রবল ও প্রকট হইয়া উঠিতেছে। বেলগ্রেডে কে কাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া সভা করিয়া বিশ্বশান্তির জন্য চেষ্টা করিতে বলিয়াছে, তাহা আমাদিগের জানা নাই। আধুনিক জগতে স্বয়ং নিমন্ত্রিত ও স্বয়ং নির্ব্বাচিত জাতীয় প্রতিনিধিদিগের আবির্ভাব অবিরল যত্রতত্র হইয়া থাকে। তাঁহাদিগের জল্পনা-কল্পনাকে বিশ্বমানব তাঁহাদিগের নিজ নিজ দেশের সাধারণের ইচ্ছা বলিয়া

মানিয়া লইতে বাধ্য হইবেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, কিন্তু এই সকল প্রতিভূগণ কোন দেশের কোন জাতীয় বিধানসভাতে কোন কথার আলোচনা করিয়া অন্যত্র গিয়া জাতীয়ভাবে কথা বলিবার অধিকার চাহিয়া লওয়া কদাপি প্রয়োজন মনে করেন না। এই সকল উচ্চ স্তরের আন্তর্জ্জাতিক বৈঠকগুলির পিছনে বিশ্বের জনমত সেই কারণে থাকে না, এবং সেই সকল বৈঠকের কথারও কোন মূল্য হয় না। বেলগ্রেডের আসরে উচ্চারিত মতামতে আমেরিকা, রাশিয়া অথবা অপর কোন মহা-দেশের নেতা মহলে বিশেষ সাড়া পড়িয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের শুধু বহু লক্ষ টাকা অপব্যয় হইবে, তজ্জন্য অধিক ট্যাক্স দিতে হইবে।

অ

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জন্ম হয়। তিনি ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া জেনারেল এসেম্বলী ইন্‌ষ্টিটিউশনে (পরে স্কটিশচার্চ্চেজ কলেজে) যোগদান করেন। তিনি গণিত, দর্শন, বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ন্যায় ও তর্কশাস্ত্র প্রভৃতিতে ছাত্র অবস্থাতেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। মনোবিদ্যার বিভিন্ন শাখাপ্রশাখাতে গমন করিয়া তিনি শিশু, পশু ও অসুস্থচিত্ত মানবের মনোবৃত্তি বিচার করিতে তৎপর হইয়াছিলেন; এবং তিনি প্রাচীন গ্রীস, রোম, মিশর, চীন, প্রভৃতির কৃষ্টি ও শিল্পকলার চর্চ্চাতেও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ইণ্টার-মিডিয়েট ক্লাসে তিনি পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নের অনুশীলনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, এবং পরে এম-এ ক্লাসে তিনি জীববিদ্যা ও ভূতত্ত্ব পাঠ আরম্ভ করেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বি-এ পরীক্ষা সসম্মানে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন ও জেনারেল এসেম্বলীতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরে তিনি সিটি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং আরও পরে নাগপুরের মরীস কলেজের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। কুচবিহার কলেজে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান অধ্যাপকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সেইখানেই থাকিয়া যান এবং সেইখান হইতেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের কিং জর্জ্জ দি ফিফ্‌থ অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তিনি এই কার্য্য করেন ও তৎপরে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হইয়া সেই স্থলে গমন করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন ও সেই বৎসরেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে "নাইট" উপাধিতে বিভূষিত করেন। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা তাঁহার যৌবনকালেই সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে এবং তাঁহাকে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দেই প্রাচ্যবিদ্যার আন্তর্জ্জাতিক মহাসভায় রোমে আমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে তিনি সকলকে নিজ জ্ঞানে মুগ্ধ করিয়া আসেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে আমন্ত্রিত হন ও সেইখানে সর্ব্বজাতির মিলিত মহা-সভায় তিনি "জাতি-সকলের উদ্ভব" সম্বন্ধে এক বিশেষ জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের জ্ঞান ছিল গভীর ও সীমাহীন। তিনি বহু ভাষা ও বহু বিদ্যার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার নিকটে শত শত ছাত্র প্রেরণালাভ করিয়া জ্ঞানের আসরে যশ অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতীয় কৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ বলিলে অত্যুক্তি হইত না এবং প্রতীচ্যের জ্ঞানের ভাণ্ডারও তাঁহার নিকট অবারিত-দ্বার ছিল। ভারতীয় হিন্দু জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অতি গভীরই ছিল এবং বহু ছাত্র, বন্ধু ও ভক্তজন তাঁহার নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়া নিজ নিজ অনুসন্ধিৎসার ক্ষেত্রে খ্যাতনামা হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি নিজে পাঠে ও বিচারে সময় অতিবাহিত করিয়া অন্তরে জ্ঞানের পূর্ণতা উপলব্ধি করিয়া তৃপ্ত হইতেন। পুস্তক লিখিয়া অথবা বক্তৃতা দিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিবার ইচ্ছা তাঁহার হইত না। এই কারণে তাঁহার মৃত্যুর সহিত তাঁহার মনের সেই অনন্ত বিদ্যার সম্পদ্ আমরা জাতীয় ভাবে হারাইয়াছি। কিন্তু তিনি যে বর্ত্তমান যুগের এক অতিমানব ছিলেন এ কথা শত শত পণ্ডিতের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। মানব জাতির জ্ঞান ও বিদ্যার যে কোন শাখাতেই তিনি মনঃসংযোগ করিয়াছেন, তাহার পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গভীরতম স্তরে পৌঁছাইতে তাঁহার অল্প সময়ই লাগিত। আমরা যৌবনে দেখিয়াছি যে, তিনি সকল উচ্চ পরীক্ষাতেই বহু বিষয়ে প্রশ্নপত্র নির্দ্দেশ কার্য্য অলৌকিক শক্তির দ্বারা সুসম্পন্ন করিতেন। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের তুল্য অপর কোনও পণ্ডিত আমরা স্বদেশ বা বিদেশে আর দেখি নাই। তাঁহার মনের ভিতরে যে কত ভাষা, কত বিদ্যা, কত বিষয়ের ব্যাখ্যান সুশৃঙ্খল ভাবে সাজান ছিল; তাহা পূর্ণ বিবরণ কে আর দিবে? ঐ প্রকার পাণ্ডিত্য হয়ত প্রাচীন ভারতে কিংবা মধ্যযুগের ইউরোপে কখন কখন দেখা গিয়াছে। আধুনিক "বিশেষজ্ঞ"দিগের সসীম দৃষ্টির বিস্তারের তুলনা

হইতে পারে না। বিশ্বের কোন প্রান্তই তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে ছিল না। তাঁহার জ্ঞানচক্ষু অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডের শেষ প্রান্ত অবধি যেখানে যাহা আছে সকল কিছুই পূর্ণরূপে দেখিতে পারিত। এবং সেই দর্শনের মধ্যে পূর্ণ বোধ ছিল।

অ

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর বিজয়চন্দ্র মজুমদারের শতবার্ষিকী জন্মদিন। তিনি যৌবনে শিক্ষকতা করিতে করিতে আইন পাঠ করিয়া আইনজ্ঞের কার্য্যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এই জাতীয় কার্য্যে তিনি উড়িষ্যার আদিবাসীদিগের নিবাসভুমি বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে গমন করিবার সুবিধা লাভ করেন ও ক্রমশঃ ভারতের ঐ সকল প্রাচীনতম অধিবাসীদিগের রীতিনীতি, চাল-চলন, ভাষা, সভ্যতা, প্রভৃতির চর্চ্চায় মন নিয়োগ করেন। মনোবিদ্যা ও তাহার সাহিত্য সম্পর্কিত বিজ্ঞান সমুচয়ের অনুশীলনেও তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। পরে তিনি যখন অধ্যাপনাকার্য্যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত হন তখন তিনি নৃতত্ত্ববিদ্ বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্বে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন ও আদিমজাতিদিগের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিজয়চন্দ্র যে অনন্যসাধারণ সুনামের অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার রসবোধের জন্যই হইয়াছিল। এই রসবোধ তাঁহার প্রথম জীবনে সুচয়ন-বিলাসী ছিল ও তিনি অসাধারণের সন্ধানে দূরদূরান্তরে মনকে ঘুরাইয়া আনি-তেন। পরে যখন তিনি অকালে অন্ধ হইয়া গেলেন তখন এই রসবোধ এক অপূর্ব্ব গভীরতা আহরণ করিয়া সুনিবিড় উপলব্ধির আনন্দে তাঁহার কষ্টক্লান্ত মনে শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়াছিল। বিজয়চন্দ্র এই কঠোর মানসিক সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়াও সুন্দরের অনুভূতি হারান নাই। তাঁহার এই সময়ের রচনাবলী এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতা লাভ করিয়া তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্য্যবোধকে জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অন্ধ কবি বিজয়চন্দ্র মানস চক্ষে বিশ্বের সকল আকার ও বর্ণকে অন্তরে টানিয়া লইয়া সেই রঙে যে ভাষার চিত্র অঙ্কন করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে সহজলভ্য নহে। তিনি সঙ্গীতও রচনা করিয়ছিলেন অনেকগুলি, এবং সেই সকল সঙ্গীত এখনও কোথাও কোথাও শুনা যায়। পাণ্ডিত্য ও সুকৃষ্টির আকর এই অন্ধ কবি বাংলার সেই যুগের লোক, যে যুগে জন্মিয়াছিলেন রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র, নীলরতন ও রামানন্দ। তিনি বঙ্গ সভ্যতা ও কৃষ্টির এক মহারথী ছিলেন।

অ

অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বিগত ৯ই ভাদ্র (ইং ২৬শে আগষ্ট) শনিবার রাত্রে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পরলোকগমন করেন। বিগত ১১ই জুন তাঁহার ৭৮ বৎসর পূর্ণ হয় কিন্তু বয়স হিসাবে তাঁহার স্বাস্থ্য কিছুদিন পূর্ব্বেও ভালই ছিল। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার শরীর খারাপ হয় এবং তিনি নিজেকে অশক্ত বোধ করিতে থাকেন এবং শেষ পর্য্যন্ত আন্ত্রিক রক্ত ক্ষরণের দরুণ তাঁহার জীবনের শেষ হয়।

বাঙালীর আয়ুকাল হিসাবে তিনি দীর্ঘজীবন উপভোগ করিয়া গিয়াছেন এবং সে বিষয়ে কিছু বলিবার নাই। কিন্তু সেই জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি যেরূপ অক্লান্ত ভাবে সাহিত্য-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমূলক নানা কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই কর্ম্মময় জীবনের অবসানে এরূপ ক্ষতি হইল যাহার পূরণ সহজ নহে। অন্যদিকে যাঁহারা তাঁহার পরিচিত বন্ধুগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন তাঁহাদের সকলেই এই সদালাপী ও রসিক বন্ধুর আকস্মিক অন্তর্ধানে নিজেদের বিশেষ অভাবগ্রস্ত মনে করিতেছেন। তাঁহার অন্তরঙ্গদিগের অনেকেই তাঁহার পূর্ব্বেই আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছেন কিন্তু তিনি প্রাচীন, নবীন, প্রবীণ ও অর্ব্বাচীন সকলের সঙ্গেই সহজ ও সরল ভাবে মিশিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার বন্ধুগোষ্ঠী সুদূরবিস্তৃত ও ব্যাপক ছিল।

শিক্ষাদীক্ষায় তিনি ছিলেন বৈজ্ঞানিক, কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁহার মন ও মানসের বিস্তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির

ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারিত হয়। বঙ্গসাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত চেষ্টিত ছিলেন এবং তাঁহার রচিত বিজ্ঞান-বিষয়ক অনেক প্রবন্ধ বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি বহু সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং প্রত্যেকটিতেই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ও বুদ্ধি বিচারের প্রখরতার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

ছাত্রের গৌরবে তিনি প্রাচীন গুরুদেরই মত বিশেষ আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিতেন। দীর্ঘদিনের অধ্যাপনায় তিনি অসংখ্য ছাত্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং কি ভাবে তিনি তাঁহাদের সহিত যোগ রাখিতেন সে বিষয়ে তাঁহার কৃতী ছাত্র ও প্রখ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার শিশিরকুমার মিত্রের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে আমরা পাই যে, তিনি অধ্যাপনা ছাড়ার পরও ছাত্রদের সঙ্গে যোগ রাখিতেন এবং পুরাণো ছাত্রদের তিনি অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্রদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করিতে চেষ্টিত থাকিতেন, শুধু পাঠের পুস্তক পড়াইয়াই নিজ কর্ত্তব্য শেষ করিতেন না। ডাঃ মিত্র বলেন যে, এই গুণ তিনি তাঁহার গুরু আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন।

চরিত্র মাধুর্য্যের গুণে তাঁহার মন শেষ দিন পর্য্যন্ত সরস, সতেজ ও নবীন ছিল। তাঁহার সহিত পাঁচ মিনিট কথা বলিলে মনে হইত যেন নিজের মনও স্নিগ্ধ ও "তাজা" হইল। তাঁহার অভাব অনুভব বহুলোকেই বহুদিন করিবে।

ডাঃ সুবোধ মিত্র

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ও কলিকাতা চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ সুবোধ মিত্র গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর ভিয়েনায় পরলোকগমন করিয়াছেন।

ধাত্রীবিদ্যা এবং স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলনে কো-চেয়ারম্যান হিসাবে যোগদানের জন্য ডাঃ মিত্র সস্ত্রীক ভিয়েনায় যান। কিন্তু সেখানে পৌঁছিয়া তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের লডার ক্লিনিকে স্থানান্তরিত করা হয়।

ডাঃ মিত্রের জন্ম হইয়াছিল ১৮৯৬ সনের ১লা নবেম্বর, যশোহর জেলার অন্তর্গত নড়াইলে। তিনি নড়াইল কলেজিয়েট স্কুলে, পরে কলিকাতার বহুবাজার ও বেঙ্গলী হাইস্কুলে এবং বঙ্গবাসী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ হইতে এম. বি পাস করিয়া মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে বার্লিনে গিয়া তিনি দুই বৎসরে এম. ডি. এবং এক বৎসরে এডিনবরা হইতে এফ-আর-সি-এস হন। তিনি বার্লিনে ডাঃ ফ্রাঙ্কের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

ডাঃ মিত্র চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিসাবে যোগ দিয়া ক্রমে ক্রমে উহার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, প্রধান সার্জ্জন এবং ডিরেক্টর হন।

বিশ্বের সুপরিচিত স্ত্রীরোগ-বিশেষজ্ঞদের অন্যতমরূপে ডাঃ মিত্র খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্ভাবিত বিশেষ এক ধরণের অস্ত্রোপচার পদ্ধতি বিশেষজ্ঞ মহলে 'মিত্র-অপারেশন' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

এই দেশে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে গবেষণা কার্য্যে তাঁহার বিভিন্নমুখী অবদান ও কর্ম্ম-প্রচেষ্টা সর্ব্বজনবিদিত। একথা আজ অস্বীকার করিলে চলিবে না, তাঁহারই প্রাণপণ চেষ্টার ফলে কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

১৯৬০ সনের অক্টোবর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য-পদে নিযুক্ত হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষার জন্য ইউনিভার্সিটি কলেজ অব মেডিসিন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

গত আগষ্ট মাসে কলিকাতার কলেজগুলিতে ছাত্র-ভর্ত্তি সমস্যার সমাধানকল্পে ছাত্রদের তিনি অনেক আশ্বাসের কথা শুনাইয়াছিলেন। ভিয়েনা হইতে ফিরিয়া সেই সব কাজে হাত দিবেন বলিয়াছিলেন। ছাত্রদের দুর্ভাগ্য, তাঁহার আরব্ধ কাজ আর শেষ করিয়া যাইতে পারিলেন না।

আমরা আশা করিব, পরবর্ত্তী উপাচার্য্য যিনি আসিবেন, তিনি ডাঃ মিত্রের পরিকল্পনাকে সার্থক করিয়া তুলিবেন।

রামানুজ-বেদান্তের বৈশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ

ডক্টর রমা চৌধুরী

রামানুজ ছিলেন দর্শনের দিক্ থেকে একেশ্বরবাদ বা ভেদাভেদবাদ, ও ধর্মের দিক্ থেকে ভক্তিবাদের পুরোধা। সেজন্য পুরোধার দোষগুণ সবই তাঁর মধ্যে সুস্পষ্ট। পুরোধার প্রধানতম গুণ হ'ল এই যে, তিনি নব-পথিকৃৎ : মোহনিদ্রাগ্রস্ত জনসাধারণকে তিনিই ত দেন আগাছা জঙ্গল সরিয়ে এক অজ্ঞাত নূতন, শুভ পথের প্রথম সন্ধান জীর্ণ পতনোন্মুখ হর্ম্যকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, এক নব অট্টালিকা নির্মাণের প্রেরণা। কিন্তু পুরোধার প্রধানতম দোষ হ'ল যে, আগাছা সরাবার, ধ্বংসাবশেষ ভাঙার কাজে তিনি এরূপ ব্যস্ত থাকেন যে, নূতন বীজ-বপনের, নব সৌধরচনার সমান শুভকার্যে সমান মনোনিবেশ তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয় না। রামানুজ-দর্শনেও ঠিক একই ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। তাঁর প্রধান কার্য ছিল শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন। ভারতের তথা জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ন্যায়বিশারদ দার্শনিক শঙ্কর : যিনি কেবলমাত্র যুক্তিবলেই জগতের দুরূহতম, নিগূঢ়তম দার্শনিক মতবাদ, একতত্ত্ববাদ, স্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন—ন্যায়ানুমোদিত তর্ক-প্রণালী দ্বারা প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জীবজগৎকে 'মিথ্যা মায়া' বলে উড়িয়ে দেওয়া কম সাহস বা কৃতিত্বের কথা নয়। সেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তর্ককুশল, জ্ঞানী-শ্রেষ্ঠের বিরুদ্ধে যিনি প্রথম খড়্গধারণ করতে সাহসী হয়েছিলেন, তাঁরও অপূর্ব ধীশক্তি, ও তর্ক-কুশলতার বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। সেজন্য রামানুজের "শ্রীভাষ্য" আমাদের মুগ্ধ ও চমৎকৃত করে। শঙ্করের প্রথম ও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রামানুজের তুলনায়, চন্দ্রের তুলনায় খদ্যোতের মত, আর অন্যান্য সমস্ত প্রতিবাদীরাও, পরিম্লান হয়ে গেছেন। দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ স্বাভাবিক ও শাশ্বত। সেজন্য রামানুজ শঙ্করের মতবাদ সত্যই খণ্ডন করতে পেরেছেন কি না—সে বিষয়ে চিরকাল দ্বি-মত থাকবে। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত হবেন যে, শঙ্করের মতবাদের বিরুদ্ধে রামানুজপ্রদত্ত যুক্তির চেয়ে শ্রেয়ঃ যুক্তি আর চিন্তা করা যায় না। সেজন্য পরবর্তী যুগের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন-প্রচেষ্টা বহুলাংশে রামানুজীয় যুক্তিতর্কের পুনরাবৃত্তিই মাত্র। রামানুজের অপূর্ব-জ্ঞান, মনীষা, চিন্তাশক্তি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, তর্ক-কুশলতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-প্রণালী সত্যই জগতে অতুলনীয়। তিনিই Monotheistic Vedanta বা একেশ্বরবাদী বেদান্ত-সম্প্রদায়ের প্রাতঃস্মরণীয় প্রতিষ্ঠাতা। কারণ, তাঁর "শ্রীভাষ্য" রচিত না হলে, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, একতত্ত্ববাদ ও শুদ্ধজ্ঞান-বাদের প্রচণ্ড আতপে ভেদাভেদবাদ, একেশ্বরবাদ ও ভক্তিবাদের কোমল বীজটি যেত নিমেষে নিঃশেষে শুকিয়ে, আর কারো সাধ্য হ'ত না সেই প্রখর উত্তাপকে রোধ করবার! স্বয়ং শ্রী বা দেবী সরস্বতীর আশীর্বাদপূত এই "শ্রীভাষ্য" প্রথম এনে দিয়েছিল ভক্তির সুশীতল ছায়া দর্শনের শুদ্ধজ্ঞানমূলক চোখ ধাঁধাঁনো উত্তপ্ত ক্ষেত্রে; কেবলমাত্র শুষ্ক-বিচারের মরুবালি ভেদ করে, ভক্তি-ভাগীরথীর সঞ্জীবনী ধারা তিনিই ত করেছিলেন প্রথম প্রবাহিত। সেজন্য তিনিই ভারতের অপূর্ব ভক্তিবাদের প্রকৃত জনকরূপে চিরনমস্য ও বিশ্ববন্দ্য।

অবশ্য, আমরা একথা এই সঙ্গে বলব যে, শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে প্রকৃতিগত বিরোধ নেই, স্তরগত বিভেদ আছে মাত্র। অর্থাৎ, শঙ্করের ব্যবহারিক স্তর ও রামানুজের পারমার্থিক স্তর এক ও অভিন্ন। কেবল, শঙ্করের মতে, এই একেশ্বরবাদ, ভেদাভেদবাদ ও ভক্তিবাদের ব্যবহারিক স্তর অতিক্রম করেও একতত্ত্ব-বাদের, অভেদবাদের ও জ্ঞানবাদের পারমার্থিকস্তরে উপনীত হওয়া আবশ্যক ও সম্ভব ; রামানুজের মতে, তা আবশ্যকও নয়, সম্ভবও নয়। সে যা হোক, যাঁরা একেশ্বরবাদ, ভেদাভেদবাদ ও ভক্তিবাদকেই শাশ্বত ও পারমার্থিক সত্য বলে গ্রহণেচ্ছু, তাঁদেরই একটি পূর্ণাঙ্গ, যুক্তিসম্মত, দার্শনিক পন্থার সন্ধান দিয়েছেন রামানুজ সর্বপ্রথম।

রামানুজ-বেদান্তের destructive বা ধ্বংসমূলাত্মক দিকটির ন্যায়, তাঁর constructive বা গঠনমূলাত্মক দিকটিও বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাসে কম গৌরব ও আদরের বস্তু নয়, যদিও যা পূর্বেই বলা হয়েছে, স্বভাবতই, তাঁর দর্শনের দ্বিতীয় দিকটি প্রথম দিকটি থেকে অনেকাংশে ম্লান। তার কারণও পূর্বে বলা হয়েছে। প্রথমতঃ, শঙ্কর, তথা অদ্বৈত-মতবাদ খণ্ডনই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বলে, স্বীয় স্বতন্ত্র মতবাদ প্রপঞ্চনায় তিনি তুল্য মনোনিবেশ করতে পারেন নি। দ্বিতীয়তঃ,

শঙ্কর-মতবাদ খণ্ডনের কার্যে আজীবন ব্যাপৃত থাকতে থাকতে তিনি নিজেও যেন সেই মতবাদেরই ভাবরাশিতে নিষ্ণাত হয়ে গিয়েছিলেন—এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই অদ্বৈতমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সেজন্য, দর্শনের ক্ষেত্রে, তিনি অদ্বৈতমত খণ্ডনের দিক্ থেকে, 'অভেদের' বিরুদ্ধে বারংবার 'ভেদের' উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও, পুনরায় স্বমত স্থাপনের দিক্ থেকে, তিনি 'অভেদকেই' যেন প্রাধান্য দিয়েছেন অধিক! বস্তুতঃ, প্রথম ধ্বংসাত্মক দিক্ থেকে, তিনি যে 'অভেদের' বিরুদ্ধবাদী, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকলেও, দ্বিতীয় গঠনাত্মক দিক্ থেকে, তিনি 'অভেদ' ও 'ভেদের' মধ্যে ঠিক কোন্ সম্বন্ধটি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেন,—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁরা বলেন যে, এই মূলীভূত বিষয়ে রামানুজের মতের স্থিরতা নেই, এবং তিনি নিজেও এ বিষয়ে নিঃসন্দিহান নন। অবশ্য, রামানুজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যতা আমরা স্বীকার করি না। তবে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, রামানুজ বিভিন্ন স্থানে, আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে এই সমস্যার সমাধান করেছেন বলে, তাঁর প্রকৃত মত সম্বন্ধে প্রথমে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। সে যা হোক, পরিশেষে,ভেদ ও অভেদের প্রকৃত সম্বন্ধ সম্বন্ধে রামানুজের কি মত, তা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এবং সেই মতের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলা হবে নিম্বার্কবেদান্ত আলোচনাকালে। শঙ্করের বিরুদ্ধবাদীরূপে রামানুজ কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করে; 'ভেদ' ও 'অভেদ' দুই স্বীকার করেছেন; অথচ, পরিশেষে 'ভেদ' অপেক্ষা 'অভেদকেই' দান করেছেন উচ্চতর, শ্রেয়ঃ আসন অযৌক্তিক ভাবে। এইটিই হ'ল শঙ্করের প্রভাবের অবশ্যম্ভাবী ফল।

একই ভাবে, যা পূর্বেই বলা হয়েছে, ধর্মের ক্ষেত্রেও শঙ্করের শুদ্ধ জ্ঞানবাদ সম্পূর্ণ বর্জন করলেও, রামানুজের ভক্তিবাদ জ্ঞানমূলক, ঐশ্বর্যপ্রধান—রসমূলক, মাধুর্যপ্রধান নয়। যে রসাবেশ, ভাবাবেশ, প্রেমোন্মাদনা, হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রভৃতি ভক্তিবাদের মূল কথা, তার চিহ্নমাত্র নেই রামানুজ-বেদান্তে। বস্তুতঃ, তিনি ভক্তিকে মানসিক ভাব বলেই গ্রহণ না করে, তাকে পরিণত করেছেন জ্ঞানমূলক স্থির ধ্যানে, ধ্রুবা স্মৃতিতে, বেদনে, অনবরত চিন্তনে—অর্থাৎ, জ্ঞানেরই একটি বিশিষ্ট প্রকৃষ্ট অবস্থায়।

"যতীন্দ্র-মত-দীপিকা" এ বিষয়ে পরিষ্কার করে বলছেন—

"জ্ঞান-বিশেষ-ভূতয়োর্ভক্তি-প্রপত্ত্যো স্বরূপং কিঞ্চিদুচ্যতে—ভক্তি-প্রপত্তিভ্যাং প্রসন্ন ঈশ্বর এব মোক্ষং দদাতি। অতস্তয়োরেব মোক্ষোপায়ত্বম্।" (পৃঃ ৬১)

অর্থাৎ মোক্ষের উপায় ভক্তি ও প্রপত্তি "জ্ঞান-বিশেষ ভূত", বা জ্ঞানেরই বিশেষ অবস্থা। এই মতানুসারে, এমন কি, প্রপত্তিও জ্ঞানমূলক। সুতরাং রামানুজীয়া ভক্তি ও ধর্মতত্ত্ব emotional, নয়, wholly intellectual—আবেগময় নয়, পরিপূর্ণ ভাবে জ্ঞানমূলক। এটিও তাঁর শঙ্কর প্রভাবের অমোঘ ফল। অদ্বৈতবেদান্তের ছিদ্রান্বেষী রামানুজ একমনপ্রাণে, একাগ্রচিত্তে অদ্বৈত-মতবাদের কথা ভাবতে ভাবতে, যেন অজ্ঞাতসারে হয়ে গিয়েছিলেন সমগ্র মনপ্রাণে অদ্বৈতময়।

সেদিক্ থেকে ছিলেন রামানুজের পরবর্তী নিম্বার্ক অধিক সৌভাগ্যবান্। অদ্বৈত-মতবাদের আগাছা পরিষ্কার ও অট্টালিকা ধ্বংসের কার্যটি তাঁকে একেবারেই করতে হয় নি রামানুজের কৃপায়। সেজন্য তিনি প্রথম দিনটি থেকেই, সোজাসুজি নূতন বীজ বপনের, নবসৌধ নির্মাণের কার্যে লেগে যেতে পেরেছিলেন নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে একমনপ্রাণে, অবহিত চিত্তে। ফলে একেশ্বরবাদী, বেদান্ত সম্প্রদায়ের দর্শনের দিক্ থেকে যে মূলভিত্তি ভেদাভেদবাদ, এবং ধর্মের দিক্ থেকে যে মূলভিত্তি ভক্তিবাদ,…তা দুই তাঁর মতবাদে রূপ পেয়েছে পূর্ণতর, প্রকৃষ্টতর ভাবে। 'ভেদ', ও 'অভেদ'কে সমপর্য্যায়ভুক্ত করে, এবং 'ভক্তি'কে মধুরস সিঞ্চিত করে, তিনি একেশ্বরবাদী বেদান্ত সম্প্রদায়ের স্থিরভিত্তি সংস্থাপিত করেন। একথা নিম্বার্ক-দর্শনের আলোচনাকালে বলা হবে।

—০—

আকাশের সীমানা

(প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার-প্রাপ্ত গল্প)

শ্রীপ্রফুল্ল সরকার

একটি আকস্মিক ঘটনা ছাড়া তাঁর সঙ্গে আমার কোন রকম যোগাযোগ হওয়াটা একেবারে অসম্ভব ছিল। উপমা দিয়ে বলতে গেলে, তাঁর আর আমার জীবনের মধ্যে প্রায় দুই মেরু-প্রান্তের ব্যবধান।

আমার ঘোরা-ফেরার পরিধি ছিল মাটির নীচে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে, বিকৃত, লুব্ধ, বেপরোয়া জীবনের অসংখ্য কানা-গলির এধারে-ওধারে। আর তাঁর লক্ষ্য ছিল খোলা আকাশ, যে-আকাশের কোন সীমানা নেই, যা দেশ-কাল-ধর্ম-সংস্কারের গণ্ডিতে বাঁধা পড়ে খণ্ডিত হয় না।

আমি দমদমের কান্তিনাথ গাঙ্গুলীর কথা বল্‌ছি।

সে-বছর কলকাতা বন্দরে দূর-প্রাচ্যগামী কোন জাহাজে রপ্তানীর জন্যে অপেক্ষমান কাঁচা চামড়ার বড় বড় পুলিন্দার ভেতর প্রায় বিশ মণ আফিম ধরা পড়ে। এই সূত্রে শহরের কয়েকজন চীনাম্যান্ গ্রেপ্তার হয়, তার মধ্যে দু'একজন লক্ষপতি ব্যবসাদারও ছিল।

এখনও আমার মনে আছে, প্রায় বিশ-পঁচিশ দিন আমরা দিনে যত্র-তত্র যা-হোক কিছু খেয়ে নিতাম, আর শলা-পরামর্শ, তল্লাসী, গ্রেপ্তার এই সব নানান্ ঝক্কায়, কোন রাত্রিতেই আমরা ঘুমোবার সময় পেতাম না। সে এক ছন্নছাড়া জীবন। আমাদের গৃহিণীরা অবশ্য এই কয়দিনের অপ্রত্যাশিত বাধা-বন্ধনহীন ছুটি বোধ হয় বেশ আনন্দেই কাটিয়েছিলেন।

এই সময় আমাদের নার্ভ-নিচয় এম্‌নি উচ্চ টানায় বাঁধা থাকৃত যে, সময় সময় আমাদের অজ্ঞাতেই আমরা ডন্ কুইক্‌সোটীয় পরিস্থিতির উদ্ভব করে ফেলতাম। এই উদ্দাম অভিযানের মধ্যে ঐটুকুই ছিল মরূদ্যান।

আমার মনে আছে, একদিন তখন মধ্য-রাত্রি অতি-ক্রান্ত হয়ে গেছে। আমরা আফিস ঘরে বাতি নিবিয়ে দড়া-চূড়া সমেত যতটুকু পারা যায় একটু ঘুমের গৌর-চন্দ্রিকা করছিলাম। হঠাৎ খবর এল এক বহুপ্রার্থিত ফেরারীর। তখনই চীনাপাড়ার এক কুখ্যাত আড্ডায় তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে আমরা তৈরী হয়ে গেলাম। আমাদের দল-নেতার পাঁচদিনের ক্ষুরের সংস্পর্শ রহিত মুখ তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী হয়ে ওঠায় তাঁকে অতি সামান্য সময়ের মধ্যে এর প্রতিকারে উদ্যোগী হতে হয়। তাঁর এটাচি কেসের মধ্যেই সরঞ্জাম ছিল। আমাদের গতিবিধি প্রায়শই অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে হওয়ার দরুণ অন্ধকারটাই যেন স্বাভাবিক নিয়ম বলে ধরা হয়ে গিয়ে-ছিল। ঘরে বৈদ্যুতিক বাতি থাকা সত্ত্বেও আলোর সুইচটি অন্ করার মত সামান্য কথা কারও মনেই ওঠে নি। একজন সাম্‌নে আয়না ধরলেন, আর দু'জন দু'দিক্ থেকে বড় টর্চের আলো ফেললেন। তিনি যৎ-সামান্য রক্তপাতের মধ্যে অতি ত্বরিত গতিতে মুখের অবাঞ্ছনীয় উদ্গামগুলি কোন রকমে সাফ ক'রে ফেললেন। সামান্য চিরাচরিত ব্যবস্থাগুলির দিকে তখন আমাদের পরম ঔদাসীন্য। সমস্ত নার্ভতন্ত্র তখন এই মন্ত্রগুপ্তি, ত্বরিত তল্লাস, উচ্চকিত গোপন অপেক্ষা, লক্ষ্যের দিকে একাগ্র শ্যেনদৃষ্টি, আচমকা গ্রেপ্তার এই সব চড়া সুরে বাঁধা ছিল।

দু'একজন ছাড়া সব প্রার্থিত আসামীই প্রায় গ্রেপ্তার হ'ল। নানা স্থানে তল্লাসী করে চীনা ভাষায় লেখা চার-পাঁচ শ'র ওপর চিঠিপত্র, দরকারী দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া গেল।

প্রাথমিক পর্ব শেষ করে আমরা তথ্যানুসন্ধানের দ্বিতীয় পর্বে এসে পড়লাম।

চীনা ভাষায় লেখা সেই বিরাট্ ডকুমেন্টের স্তূপের অর্থোদ্ধার একান্ত এবং যত শীঘ্র সম্ভব, দরকার। আর তার ভার পড়ল আমার ওপর। একজন সহকর্মীও পেলাম। চীনা ভাষার সেই নানান্ চিত্র-বিচিত্র অক্ষর-গুলির দিকে আমরা নিরুপায় হয়ে চেয়ে থাকতাম। মনে হ'ত, আমাদের দিকে তাকিয়ে সারি সারি অদ্ভুত মুখের সব অক্ষরগুলি যেন চোখ টিপে হাস্‌ছে।

প্রথম ছুট্‌লাম কলকাতা য়ুনিভার্সিটিতে চীনা ভাষা বিভাগে। পরিচয়, উদ্দেশ্য, প্রভৃতি মুখবন্ধ হয়ে গেলে সেখানকার কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে প্রথম কান্তিবাবুর নাম শুনলাম, এবং তাঁর ঠিকানাও পেলাম।

শুনলাম, ইনি ভারত-সরকারের বৃত্তি নিয়ে চীন ঘুরে এসেছেন।

একদিন মধ্যাহ্নের একটু পরেই আমাদের জীপ ছুটল দমদমের রাস্তায়। এরোড্রোম্ পার হয়েও বেশ অনেকখানি পথ আমাদের যেতে হ'ল।

অনেক খুঁজে খুঁজে জহর-কলোনির শেষ প্রান্তে আমরা বিশ্ব-ভারত-মৈত্রী সঙ্ঘের কার্যালয়ে এলাম।

আমরা প্রথমেই অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়লাম। মনে মনে আমাদের ধারণাও হ'ল যে, বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের এড়িয়ে ত গেলেন-ই, এবং উপরি-হিসাবে বোধ হয় বেশ মোটা রকমের একটা গ্রাম্য রসিকতা করতেও ভোলেন নি।

বিশ্ব-ভারত-মৈত্রী সঙ্ঘের নাম শুনেই আপনা আপনি আমাদের একটা সম্ভ্রমপূর্ণ ধারণা গ'ড়ে উঠেছিল। এবং সে-যে এই, এখন তার বাইরের কাঠামোটা দেখে প্রথম আমরা বিশ্বাস ক'রে উঠতে পারছিলাম না।

সামনে হাত দশেক প্রস্থে ও ত্রিশ চল্লিশ হাত দৈর্ঘ্যে খোলা জায়গা, কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা, একটা ছোট বাখারির গেট। তার পরেই সাড়ে ছ'ফুট প্রমাণ উঁচু প্যাতা-ছাওয়া মাটির ঘর, মাটির নিচু বারান্দা। পিছনে বোধ হয় এমনি আর একটা ঘর। উত্তরে, পূবে, পশ্চিমে বিস্তৃত মাঠ, বাঁশবন। ঘরের দরজা বাঁশের সরু সরু চটা কেয়ারি করে বুনন দেওয়া, দুটো জানলায়ও তাই। হাতের কারুকার্য করা পর্দা ঝুলছে। উল্লেখযোগ্য শুধু সামনের গাঁদা ও ডালিয়া ফুলের রাশ।

সেই অপরিসর মাটির বারান্দার ওপর একটা পুরানো ময়লা মাদুরের ওপর ব'সে একটি শীর্ণ, চশমা-পরা, গৌরবর্ণ ভদ্রলোক একটি ছোট চৌকির ওপর কাগজপত্র রেখে কঞ্চির কলমে কি যেন লিখছিলেন। আমরা বাঁশের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে ভিতরে গিয়ে ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেইটিই বিশ্ব-ভারত-মৈত্রী সঙ্ঘ কি না। ভদ্রলোক তাঁর উচ্চশক্তিবিশিষ্ট চশমার কাঁচটি আমাদের দিকে তুলে বললেন, হ্যাঁ সেইটিই ঐ সঙ্ঘ এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম এবং কান্তিবাবু আছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলাম।

আমরা আরও অবাক্ হলাম যখন বললেন, তিনিই কান্তিবাবু।

এবার ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি ছোটখাট মানুষটি, দাড়ি-গোঁফে তাঁর ছোট মুখটি অনেকখানি ঢাকা। পরণে মিলের আটহাতি কি ন'হাতি আধময়লা একখানা মোটা ধুতি, গায়েও তেমনি আধময়লা একটা মোটা খদ্দরের চাদর। তিনি আমাদের পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন, এবং আমাদের গায়ে দামী গরম স্যুট দেখে কোথায় যে বসতে দেবেন, ভেবেই সারা হয়ে পড়লেন। শেষকালে ঐ জীর্ণ মাদুরের প্রায় অর্দ্ধেকটা নিজে হাতে ঝেড়ে দিয়ে সসঙ্কোচে বসতে বললেন। আমরা দু'জনেই কুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করলেও তাঁর সঙ্কোচের ভাবটা কাটল না।

চীনা-লেখা কাগজগুলি তাঁকে দিলাম। তিনি দেখতে লাগলেন। আর ফাঁকে ফাঁকে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ও আলাপচারী, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের মনে হ'ল যেন আমরা পরস্পর দীর্ঘকাল পরিচিত। তিনি অনর্গল কথা ব'লে চলেছেন। ধীরে ধীরে আমাদের মন তাঁর প্রতি সম্ভ্রমে ভ'রে উঠল।

পিকিং-এ তখন যুগবদলের সময়। সেই সময় তাঁরা মুদ্রাস্ফীতির কি সাংঘাতিক সঙ্কটে পড়েছিলেন, বলে চললেন, সে কী ইন্ফ্লেশন্, না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল। আমরা বাজারে যেতাম, আর পেছনে পেছনে আর এক গাড়ীতে বস্তা বোঝাই নোট আর নোট। লাখ, দু'লাখ সব সামান্য সামান্য জিনিষের দাম। আলু কিনবেন, দিন পঞ্চাশ হাজার ইয়ুয়ান। একটা ডিম কিনবেন, লাখ দু'লাখ দিন। গরম মোজা কিনবেন, দিন কোটি খানেক। হাসতে হাসতে বললেন, সে এক আমীরি ব্যাপার, বুঝলেন, লাখের নীচে কথা নেই।

দু-একটি কাগজের অর্থোদ্ধার হ'ল। বাকী সব রেখে দিলেন।

একটি মহিলা এই সময় প্রায় দশ-বারোটি নানা বয়সের ছেলেমেয়ে সঙ্গে নিয়ে বাইরে থেকে এলেন। কান্তিবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার স্ত্রী, লীলা। ছেলেমেয়েদের দেখিয়ে বললেন, আর এরা আমার সঙ্ঘের ছেলেমেয়ে। কান্তিবাবু আমাদেরও পরিচয় করিয়ে দিলেন, এঁরা আবগারী বিভাগের অফিসার। কতকগুলি চীনা-লেখা পড়াতে এসেছেন।

আমরা নমস্কার করলাম, তিনিও ছোট একটি নমস্কার করলেন।

এমন অপূর্ব রূপ আমি এর আগে দেখি নি। ঠিক দেবীপ্রতিমার মুখের মত তাঁর মুখের ডৌল। এত ফর্সা রঙ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাঁর পরণে ঘরে-

কাচা লালপেড়ে শাড়ী, সাদা কাপড়ের ব্লাউজ, শীতের জন্যে একটা মোটা খদ্দরের চাদর গায়ে বেড় দেওয়া! হাতে লোহা শাঁখা ছাড়া কোন স্বর্ণাভরণ নেই।

মৃদু হেসে বললেন, আপনারা কাজ করুন, কেমন? ব'লে ভিতর দিকে চ'লে গেলেন।

শীতের বেলা অপরাহ্নের দিকে চ'লে পড়েছে। কিছুক্ষণ পরে বেশ অন্ধকার হয়ে এল। গল্প আর থামে না। তাঁর স্ত্রী ভিতর থেকে একটি হারিকেন জ্বালিয়ে আনলেন। বললেন, গল্পই ত ক'রে যাচ্ছ। এবার এঁদের কিছু খেতে দিই।

কান্তিবাবু মহাব্যস্ত হয়ে পড়লেন, তাই ত, তাই ত। আমার একবারও মনে পড়ে নি। বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

আমরা বললাম, তাতে কি হয়েছে, আপনার গল্প শুনে আমাদের ভারি ভালো লাগছে। ব্যস্ত হবেন না।

কান্তিবাবু বললেন, তাই কি হয়, আপনারা কত কষ্ট ক'রে কতদূর থেকে এসেছেন। যাও লীলা, যা আছে এঁদের দাও।

তার পর খুব লজ্জিত হয়ে বললেন, চায়ের কোন ব্যবস্থা নেই, আপনাদের বোধ হয় খুব অসুবিধে হবে।

বললাম, কিছুমাত্র না, আপনি মিছিমিছি বিব্রত হচ্ছেন।

লীলা দেবী তৎক্ষণে ভিতরে চ'লে গেছেন। খানিকক্ষণ পরে তিনি দু'টি পাত্রের ওপর দু'টি ক'রে মুড়ির নাড়ু এনে দিলেন। দু'টি কলাইয়ের গ্লাসে জল দিলেন।

কান্তিবাবু বললেন, খেয়ে নিন। তার পর স্ত্রীর দিকে চেয়ে বললেন, চা ত হবে না, তার চেয়ে এঁদের একটু দুধ খাইয়ে দাও না।

আমরা ততক্ষণে অনভ্যস্ত গুড়-মাখানো মুড়ির নাড়ু চিবোচ্ছি। আমরা হাত নেড়ে প্রবল আপত্তি করলাম। কান্তিবাবু নিরস্ত হলেন না। নিজেই ভিতর থেকে একগ্লাস দুধ নিয়ে এলেন, তার পর ষ্টোভ জ্বালিয়ে নিজেই দুধ গরম করতে লাগলেন।

কান্তিবাবু বললেন, কই, খেয়ে নিন, ফেলে রাখবেন না। আমার স্ত্রীর নিজের হাতে তৈরি।

বললাম, আপনারটা কই?

তিনি বললেন, আমি সেই রাত্রিতে একবার খাই।

আমরা দুধ খেতে লাগলাম। তখন কি জানতাম যে, তাঁর রাতের একমাত্র সম্বল ঐ দুধটুকু দিয়ে তিনি সেদিন অতিথি-সৎকার করেছিলেন?

লীলা দেবী আমাদের সামনে বসলেন। দেখলাম, তাঁর সুগৌর হাত দু'টিতে নীল শিরা জেগে উঠেছে। আভরণহীন, প্রসাধনহীন তাঁর মুখটি রুক্ষ লাগছে। কিন্তু তাঁর চোখ দু'টি যেন দু'টি স্নিগ্ধ আলোর বিন্দু। তাঁর বয়েস কত হবে—পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি নয়।

কান্তিবাবু ব'লে চলেছেন, আমাদের এই সঙ্ঘ দেখবেন, আমরা কত বড় ক'রে গ'ড়ে তুলব। পঞ্চাশ বিঘে জায়গা পড়ে আছে। ঐখানে সারি সারি ছেলে-মেয়েদের হষ্টেল, ঐ ওপাশে মিউজিয়াম, ওখানে উঠবে প্রকাণ্ড আটচালা, ওখানে পৃথিবীর সব ভাষা শেখানো হবে।

কান্তিবাবু তাঁর স্বপ্নের কথা বলে চলেছেন, কাল আপনাদের দেখাব, চীন থেকে বহু ছবি, বহু মূর্তি আমি সংগ্রহ করে এনেছি।

সেদিন সন্ধ্যার অনেক পরে আমরা চলে এলাম। কাগজ-পত্রগুলি কিছু কিছু তাঁর কাছেই রেখে এলাম। কান্তিবাবু আমাদের সঙ্গে সেই গ্রাম্য পথ ধরে অনেকখানি এলেন আমাদের গাড়ী পর্যন্ত। তার পর তাঁর কাছ থেকে আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

পরের দিন দুপুর বেলা আমরা আবার গেলাম। তিনি আমাদের কাগজগুলিই দেখছিলেন। কয়েকটি আমরা ইংরেজিতে অনুবাদ করে নিলাম।

আজ তিনি তাঁর সঙ্ঘ আমাদের ঘুরিয়ে নিয়ে দেখালেন। সামনের ঘরটিতে তাঁর আফিস, বাসস্থান একসঙ্গে সব। ঘরের মধ্যে ছোট ছোট তক্তপোশ। একেবারে আসবাবহীন। তার পেছনের চালাঘরে সঙ্ঘের ক্লাস বসে। মাটির ওপর মাদুর, খেজুর-তালপাতার চাটাইয়ের ওপর ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সবাই বসেন, অধ্যাপনা চলে। বিদ্যালয়-পাঠ্য অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে পড়ান হয় চীনা ভাষা, ফরাসী ভাষা, জার্মান ভাষা। যার যেটা ইচ্ছে শেখে। সমস্তটাই একেবারে অবৈতনিক। ছাত্রছাত্রীদের বয়েস সব ষোলর মধ্যে।

সামনের ঘরের ভিতর দিয়ে আর একটি মাটির বারান্দা, সেখানে এঁদের স্বামী স্ত্রী আর কয়টি অনাথ ছাত্রছাত্রীদের জন্যে রান্না হয়। লীলাদেবীই রাঁধেন, আবার ইংরেজী, ফরাসী, চীনা ভাষা পড়ান।

তার পর তিনি আমাদের পিছন দিকের একটা দরমা-ঘেরা ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে কত ছবি, কত মূর্তি এদিক্-ওদিক্ ঠাসা হয়ে পড়ে আছে।

একটা চীনা ছবিতে একটা বড় গাছের তলায় রাখাল

বসে আছে, আর দূরে একপাল গরু চরছে। পশ্চাৎপটে পাহাড়ের আভাস দেখা যাচ্ছে।

আর একটা ছবিতে একটি নদীর ধারে চিকণ বাঁশ গাছের ঝাড়, বাঁশ গাছের লম্বা সরু পাতাগুলি নদীর জলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। পাশে একটা নৌকা, তাতে একজন চীনা-মাঝি ব'সে ব'সে ঘুমোচ্ছে। আরও কত ছবি। সবগুলিই মূল চিত্র।

কান্তিবাবু ছবিগুলি ব্যাখ্যা ক'রে চললেন। চীনা-শিল্পীদের কথা-প্রসঙ্গে বললেন, চীনা-আঁকিয়েরা সারা-জীবন ধ'রে একই ধরণের ছবি আঁকে। যে এই রাখাল, গাছ, গরুর পাল, দূরে পাহাড় এই ছবি আঁকছে, জীবনভর সে শুধু এই ছবিই আঁকবে। এমনি ক'রে ক্রমে ক্রমে তার হাত পাকবে। ছবি খুলবে, জীবন্ত হবে। এত নিষ্ঠা খুব কম জাতের শিল্পীদের মধ্যে আছে। পাশের ফাঁকা জায়গাটা দেখিয়ে বললেন, এইখানে সারি সারি গেষ্ট-হাউস্ উঠবে। পৃথিবীর সব দেশ থেকে অতিথিরা আসবে, আলাপ-আলোচনা চলবে, ভাবের আদান-প্রদান হবে। কেমন হবে সে বলুন?

আমরা পেশায় কঠিন বাস্তববাদী, তাঁর স্বপ্নের দৌড়ের সঙ্গে সত্যি সত্যিই আমরা পাল্লা দিতে পারছিলাম না। তবু উৎসাহের সঙ্গে বললাম, সে ত বেশ হবে।

লীলা দেবী সেদিনও আমাদের মুড়ির নাড়ু দিলেন। দু' গ্লাস দুধ দিলেন।

এর মধ্যে একদিন আমার আফিস-কামরায় আমার সাংবাদিক-বন্ধু মহেশ ভঞ্জর সঙ্গে গল্পগুজব করছিলাম। কথা প্রসঙ্গে কান্তিবাবুর কথা বললাম।

ভঞ্জ বললে, কে? কান্তি গাঙ্গুলী, চাইনিজ্ স্কলারের কথা বলছ?

বললাম, হ্যাঁ।

ভঞ্জ বললে, আরে, ওকে বিলক্ষণ জানি। আমরা একই বছরে য়ুনিভার্সিটির ছাত্র ছিলাম—উনিশ শ' ছ'চল্লিশে। তখনই ও চীনা ভাষা শিখছিল। ও ত য়ুনিভার্সিটিতেও চীনা ভাষা পড়ায়। তোমার সঙ্গে কি ক'রে আলাপ হ'ল?

ভঞ্জকে সব বললাম। তার বিশ্ব-ভারত-মৈত্রী সঙ্ঘের কথাও বললাম।

ভঞ্জ বললে, বদ্ধ পাগল। ওর স্ত্রী লিলিকেও দেখলে নাকি ওখানে?

বললাম, ওঁর স্ত্রীর নাম ত বললেন লীলা, তাঁকে ত ওখানেই দেখলাম।

ভঞ্জ বললে, ঐ হ'ল, আমরা ওকে লিলি অব্ দি ভ্যালি বলতাম। শি ইজ্ এ পারফেক্ট বিউটি, বাট্ শি মেড্ এ রং চয়েস্। শি ম্যারেড্ এ ম্যানিয়াক্।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, কেন?

ভঞ্জ বললে, কেন? তুমি জান লিলি কার মেয়ে? ডাঃ জ্ঞান ঘোষালের মেয়ে। খাঁটি মেম সাহেবের মত ওর চাল-চলন ছিল। বব্‌ড্ চুল, রুজ-লিপষ্টিক্ ছাড়া সূর্যদেবও বোধ হয় কোনদিন ওর মুখ দেখতে পায় নি। দেমাকে আমাদের কারও দিকে চাইত না পর্যন্ত।

বিস্মিত হয়ে বললাম, সে কি? এ অঘটন ঘটল কেমন ক'রে?

ভঞ্জ বললে, ম্যাজিক। ডেস্‌ডিমনা কেন মজল ওথে-লোকে দেখে? অবিশ্যি কান্তি ইজ এ জিনিয়াস্, কিন্তু ঐ পাগল, বদ্ধ পাগল।

বললাম, ভঞ্জ, তুমি যে একবারে রূপকথা বানাচ্ছ। ব্যাপারটা খুলে বল ত হে। যোগাযোগটা ঘটল কেমন ক'রে?

ভঞ্জ বললে, আমরাও ত প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি। আমাদের চক্ষু ত ব্রহ্মতালুতে উঠে গিয়েছিল। হোয়াট্ এ ফল্! শেষকালে লিলি—কান্তি দাড়ি-গোঁফে কোনদিন হাত দিত না। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম, শ্রীযোগানন্দ দাড়ি। লিলির কি খেয়াল হ'ল, ও চীনে ভাষা শিখতে গেল। কিন্তু ও বড় কঠিন চিজ, দন্তস্ফুট করা কি চাট্টিখানি কথা। কিন্তু মেয়েদের অহঙ্কার ত—সহজে কি বেঁকুতে চায়! বেগতিক দেখে ভূতলে নামতে হ'ল। কান্তির কাছে মাঝে মাঝে নোট-ফোট চেয়ে নিত। তাও ভাব দেখাত যেন কান্তিকে খুব কেতাথো ক'রে দিচ্ছে। এমনি চলছিল। একদিন বলা নেই, কওয়া নেই, দম্ ক'রে ওর মেসের সেই নরকের মধ্যে গিয়ে হাজির। জাষ্ট্ ইমাজিন্? চারদিকে ছড়ান বই-খাতা, অগোছালো আধ-ময়লা বিছানা, দোয়াত উল্টে-যাওয়া কালির দাগ, বালিশের ওয়াড়ের স্থান নিয়েছে পুরণো খবরের কাগজ। এ রেক্ অব্ এ ইয়ংম্যান্। কান্তি আমাকে পরে বলেছিল, লিলির সে কি ঠোঁট উল্টে ঘেন্না দেখানো, চোখ রাঙ্গিয়ে ধম্‌কে বললে, আপনি এত ডার্টি কেন? ব'লে গট্‌গট্ ক'রে বেরিয়ে গেল। আর কান্তি হতভম্ব হয়ে তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল।

পরের দিন ক্লাস শেষ হয়ে গেলে কান্তিকে ডেকে বললে, শুনুন, আপনি কি আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হ'তে পারেন না। আমি কাল আপনার ওখানে যাচ্ছি আবার,

আমি সব টিপ টপ দেখতে চাই। বড়লোকের মেয়ে জানত না ত কান্তির আর্থিক অবস্থার কথা, স্কলারশিপ, টিউশনি, দু'একটা পত্রিকায় টুকটাক্ লিখে-টিকে ওর দিন চলে। যাই হোক, কান্তি ত এই অভিনব জাঁদরেল গার্জেনের ভয়ে যথাসম্ভব মেসের ঘরটা সাফ-সোফ ক'রে রাখলে। রাজেন্দ্রাণী ঠিক গিয়ে হাজির। কি তাঁর খেয়াল হ'ল, কান্তির সাংসারিক খবর নিলেন, তার ভবিষ্যতের লক্ষ্য কি, এ সব কথাবার্তা হ'ল। কান্তি চিরকালই ভাল বক্তিমে করতে পারে। ওর ঐ বিশ্ব-ভারত-মৈত্রীর ভূত ওর কাঁধে তখন বছর দুই বেশ জোর ক'রে ভর করেছে। ও প্রাণ-খুলে ব'লে গেল। রাজেন্দ্রাণী শুনে বললেন, সো ইন্টারেষ্টিং!

ভঞ্জ থেমে বললে, ওঃ, অনেক বক্ বক্ করলাম। গলা শুকিয়ে উঠেছে, চা খাওয়াও দেখি।

বললাম, চা না কফি, কি খাবে? জানতাম ভঞ্জ কফি ভালবাসে।

ভঞ্জ বললে, বেশ, কফিই আনাও।

আমি বেল টিপে বেয়ারাকে কফি আনতে বললাম।

ভঞ্জ বললে, তার পর তোমাদের মামলার আর কি খবর-টবর, কিছু দাও কাগজের জন্যে।

বললাম, এখন আর কোন খবর নয় ব্রাদার, এখন মন্ত্রগুপ্তির সময়। সবুর কর না, পরে খবরে ভাসিয়ে দেব।

বেয়ারা পটে ক'রে কফি নিয়ে এল। তার পর দু'টি পেয়ালায় ঢেলে আমাদের সামনে রেখে দিল। কফি শেষ ক'রে ভঞ্জ একটা মোটা চুরুট ধরালে। আমি টানলাম কড়া 'বৃ'-নস্য।

বললাম, তার পর কান্তি-লিলি উপাখ্যানের উপসংহারটুকু বল।

ভঞ্জ বললে, তুমি খুব ইন্টারেষ্টেড দেখা যাচ্ছে?

বললাম, এমনি গল্প প্রায়ই মামুলী, কিন্তু এঁদের আমি নিজে চোখে দেখেছি ব'লেই বিশেষ কৌতূহল হচ্ছে।

ভঞ্জ বললে, তার পর কান্তি সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে পিকিং গেল।

আর লিলি? জিজ্ঞাসা করলাম।

সে রইল কলকাতায়, চীনা ক্লাসে লেগে রইল, প্রথম চোটে পাশ করতে পারে নি। দেশে তখন স্বাধীনতা এসে পুরণো হতে চলেছে। ওদের সোসাইটি আগেও যেমন ছিল তখনও ঠিক তেমনি চলছিল—পার্টি, আউটিং, সি-বিচ, না হয় সিমলা-আলমোড়ায় বায়ু পরিবর্তন।

বললাম, বুঝলাম, তা বিয়েটা হ'ল কি ক'রে তাই বল। তুমি যে গল্প-লিখিয়েদের মত বেঁকিয়ে-চুরিয়ে টিপে টিপে খবর ছাড়ছ। জান ত আমরা পুলিশের জাত-ভাই। আমরা ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচে আগ্রহী।

ভঞ্জ বললে, পিকিংয়ের মেয়াদ শেষ ক'রে যেদিন কান্তি আর অন্য ছাত্ররা দমদমে প্লেন থেকে নামল, তখন সবার বাড়ী থেকে আত্মীয়-স্বজনরা এসেছেন রিসিভ করতে। কান্তির ত কাকস্য পরিবেদনা! হঠাৎ কান্তি দেখলে, দূর থেকে ভিড়ের মধ্যে লিলি হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে। কান্তির পক্ষে এ একেবারে দুরাশা। লিলি আগে থেকেই খবর রেখেছিল এবং একলাই এসেছিল নিজে ড্রাইভ ক'রে। তার পর কান্তিকে উঠিয়ে নিয়ে তার মেসে নামিয়ে দিলে, লিলিও গেল সঙ্গে সঙ্গে। আনন্দের আতিশয্যে, যদিও একটু ভয়ে ভয়ে, কান্তি সেদিন নাকি লিলিকে দুই বড় বড় রাজভোগ খাইয়ে দিয়েছিল। লিলি আপত্তি করে নি।

বললাম, তার পর।

ভঞ্জ বললে, তার পরের খুঁটিনাটি খবর আমি জানি না। কান্তি কোন এক মামার মৃত্যুর পর অনেক নগদ টাকা পায়। আর সে সমস্ত টাকা দিয়ে দমদমে গাঁয়ের দিকে বেশ খানিকটা জায়গা কেনে তার ঐ বিশ্ব-ভারত-মৈত্রী সঙ্ঘের জন্যে। কিছুদিন পরে য়ুনিভার্সিটির কাজটাও পেয়ে যায়। লিলি দু'এক দিন এই দমদমেও এসেছে, আমিও গেছি দু'একবার। তখন একটা খ'ড়ো চালা তুলেছে। গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা বিনা পয়সায় পড়বার জন্যে জুটল, দু'একজন বাপ-মা-মরা অনাথ বাস্তুহারা ছেলেমেয়েও ওখানে থাকত, খেত, পড়ত। গাঁয়ের আশে-পাশে দু'একজন আদর্শবাদী লোকও ত আছে? তারাও ছেলেমেয়েদের পাঠাত।

বললাম, খরচ চলত কোথা থেকে?

ভঞ্জ বললে, য়ুনিভার্সিটি থেকে যা পেত, আর মাঝে মাঝে বাইরের কাগজেও দু'একটা লেখা-টেখা পাঠাত, তাতেও বেশ মোটা কিছু পেত, আর সব ঢালত ঐ সঙ্ঘের পেছনে। শেষের দিকে লিলি ঘন ঘন দমদমে আসা-যাওয়া করতে লাগল। বাঁশের বন, মাটির ঘর, চারদিকে ধু ধু করছে খোলা মাঠ, পুকুর, বুনো গাছে বুনো ফুল, এদের মধ্যে লিলি বিদেশী পর্যটকের মত ঘুরে বেড়াত। আর ল্যাজ-ঝোলা টুনটুনি, দোয়েল, টিয়া, বনঘুঘু, হরিয়াল, মাছরাঙা, বুলবুলির ভিড়ের দিকে সে অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকত।

বললাম, থামলে কেন? তার পর—

ভঞ্জ বললে, কথাটা ক্রমে কেমন ক'রে জানাজানি হয়ে গেল। লিলির মা জাঁদরেল সোসাইটি লেডি, খুব বড় এক মিলিটারী অফিসারের সঙ্গে লিলির তখন বিয়ের কথাবার্তা একেবারে পাকা। মা ত লিলিকে আটকালেন, তাকে চোখে চোখে রাখলেন। অনেক দিন লিলি আর দমদমে আসে নি। পাগলা কান্তির একদিন মনে কি খেয়াল হ'ল কে জানে, সটান গিয়ে হাজির লিলিদের এল্‌গিন্ রোডের বাড়ীতে। উদ্দেশ্য লিলির খবর নেবে, অসুখ-বিসুখ করল না কি। আর পড়বি ত পড়্ একবারে লিলির মায়ের সামনাসামনি। তার ঐ দাড়ি, মোটা কাপড়, গুণচট চাদর দেখে ভদ্রমহিলা একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। ডার্টি, ভ্যাগাবণ্ড, লোফার, ইত্যাদি, ইত্যাদি গাল দিয়ে কান্তিকে ত একেবারে নাস্তানাবুদ। লিলি মাঝে এসে না পড়লে ভদ্রমহিলা কান্তিকে বোধ হয় দারোয়ান দিয়ে অপমান করতেন সেদিন। কান্তি নিঃশব্দে ফিরে এল।

বললাম, গল্প ত বেশ জমিয়ে তুলেছ দেখছি, জাত-সাংবাদিক কিনা।

ভঞ্জ হেসে বললে, জানতাম পুলিসের লোক অনেক গল্প এমনিই পায়, তা বানানো গল্পের চেয়ে হাজার গুণে লোমহর্ষক। কিন্তু না, দেখছি তোমরাও কম গল্পখোর নও।

হেসে বললাম, এ এমন গল্প যা কখনও পুরণো হয় না। বুকের মধ্যে সটান রক্তে এসে দোলা লাগিয়ে দেয়, ব্রাদার। তার পর—

ছাই-দানে চুরোটের ছাই ঝেড়ে ভঞ্জ আরম্ভ করলে, তার পর আশ্চর্যের! আশ্চর্য, লিলি করলে বিদ্রোহ। ওর বাবা-মাকে বললে, কান্তিকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না। ওর মা তো সোফায় ব'সে ব'সেই ফিট্ হয়ে গেলেন; ওর বাবা খুব ব্যস্ত ডাক্তার, তাঁকে একলা পাওয়াই মুশকিল। লিলিকে বললেন, পরে ব'লো শুনব। ব'লে বেরিয়ে গেলেন। আমরাও ভাবি নি ঘটনা এতদূর গড়াবে। ভাবতাম, এ ওর খেয়াল, নিঃসঙ্গ অসহায়ের ওপর করুণা। ঝাঁঝালো অভিজাত-জীবনের কৃত্রিম বদ্ধতা, আড়ষ্টতা থেকে পাড়াগাঁর উদার মাঠ আর খোলা হাওয়ার ক্ষণিক আকর্ষণ, তার বেশি নয়। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কোথায় যে এত হৃদয়-তাপ সঞ্চিত হচ্ছিল তা কেউ জানে না, ধারণাও করতে পারে নি। কান্তিও টের পায় নি। কান্তি তার বড় বড় পরিকল্পনার কথা বলত, আর ও চুপ ক'রে শুনত। আকর্ষণ-বিকর্ষণ যা বল তা শুধু এই। তার পর বাড়ীর চাপ, বাঁধন যখন অসহ্য ভাবে চেপে বসতে লাগল, লিলি একদিন সটান বাসে ক'রে পায়ে হেঁটে কান্তির আশ্রমে এসে হাজির। কোন ভনিতা না করে বললে, আজ থেকে তোমার কাজের আর তোমার জীবনের অর্ধেক ভার নিতে আমি এলাম, ব্যবস্থা কর। কান্তি তখন কি একটা গাছের চারা পুঁতছিল। বিদ্বান্ হলে হবে কি, ওটা একেবারে ভোঁতারাম, সে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে তার লজ্জায় লাল-হওয়া মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার এই বিভ্রান্ত মুখ দেখে তার লজ্জায় লাল-হওয়া মুখ এবার রাগে লাল হয়ে উঠল। ঝাঁঝিয়ে বললে, বুঝতে পাচ্ছ না? আমি এখানে থাকতে এলাম, আর ফিরে যাব না। বুঝলে, যা-যা করবার কর। কান্তি পড়ল আকাশ থেকে, সে হঠাৎ তোৎলা হয়ে গেল—তা—তা—তুমি—সে কি করে—এই ঘর—এই—লিলি তার তোৎলামির ওপর ঝঙ্কার দিয়ে বলল, থাম, আমায় কচি খুকী পেয়েছ। বোঝাচ্ছ? জান, আমার বাইশ বছর বয়েস, তোমার চেয়ে কম বুদ্ধি ধরি না। তার পর নরম হয়ে বললে, রাত্তিরে কি খাওয়াবে তাই বল! সেই রাত্তিরে ডাঃ ঘোষাল সেই অজ পাড়াগাঁয়ে কান্তির ওখানে যান। কান্তিকে তিনি একটি কথাও বলেন নি। মেয়েকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বললেন যে, এরকম ক'রে আসতে নেই, তার ইচ্ছায় আর কেউ বাধা দেবে না, তিনি কথা দিলেন। সেই রাত্রিতে লিলি বাপের সঙ্গে ফিরে গেল। তার পর দিন-কুড়ি পরে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। আমি আর কান্তির দু'জন বন্ধু সে বিয়ের সাক্ষী হলাম। ডাঃ ঘোষাল সময় পেলে মাঝে মাঝে আসতেন। কান্তির সঙ্ঘ গড়বার জন্যে তিনি অর্থসাহায্যও করতে চেয়েছিলেন। কান্তিও নেয় নি, লিলিও নিতে দেয় নি। ওর মা বললেন, তিনি অমন মেয়ের আর মুখদর্শন করবেন না। তাঁর উচ্চ আভিজাত্যবোধে কঠিন ঘা লেগেছিল। তিনি ওর পরের বোন শর্মিলাকে এখন চোখে চোখে রেখে মনের মত ক'রে গড়ে তুলছেন। তাঁর প্রফেশনের জন্যে ডাঃ ঘোষালের জীবনে বিচিত্র জন-সংযোগ ঘটেছিল, তিনি সমস্ত ব্যাপারটা মেনে নেওয়া দুঃসাধ্য মনে করেন নি। কারণ, তিনি নিজে আপ্রাণ সংগ্রাম করে একেবারে মাটি থেকে ওপরে উঠেছিলেন।

বললাম, তোমরা কান্তিবাবুর ওখানে আর যেতে-টেতে না?

ভঞ্জ বললে, হ্যাঁ, এক বছর পর্যন্ত আমাদের যোগা-যোগ ঠিকই ছিল। তার মধ্যে ওরা উৎসাহ ক'রে আর দু'টো চালাঘরও তুলেছিল। আর লিলির যা পরিবর্তন

হতে লাগল, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হ'ত না। তার পর আমরা আমাদের কাজ আর নতুন সংসার নিয়ে এমনিই ব্যস্ত হয়ে পড়লাম যে, আস্তে আস্তে যোগাযোগটা কখন একবারে আলগা হয়ে গেল। আজ তিন বছর তাদের কোন খবরই জানি না, এই তোমার কাছে আজ শুনলাম।

বললাম, আচ্ছা কান্তিবাবু ত তিন-চারটে ভাষা জানেন?

ভঞ্জ বললে, শুধু জানা নয়, ভালভাবেই জানে।

তা হলে উনি সহজেই ত ফরেন্ সার্ভিসে খুব ভাল চাকরি পেতে পারেন। এই স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্যের মধ্যে কি পাবেন? আমি বললাম।

ভঞ্জ বললে, আমরা ওকে কত বলেছিলাম। ও বলে চাকরি ত সবাই করে, সেটা আর বড় কথা কি? সবাই যদি চাকরি করবে, ত আর সব ভাববে কে?

বললাম, দেশের গবর্ণমেণ্ট ভাববে। আর তাছাড়া চাকরি যদি নাই করতে চান, গবর্ণমেণ্ট এড্ নিয়ে ত তাঁর সঙ্ঘ গড়ে তুলতে পারেন। এ সব ব্যাপারে এড্ পাওয়াও ত খুব শক্ত নয়।

ভঞ্জ বললে, না, সে ও চাইবেও না, নেবেও না। ওর ভয় গবর্ণমেণ্টের লোকেদের সঙ্গে ওর মতের মিলও হবে না। আর গবর্ণমেণ্ট তার ষ্টীম-রোলার চালিয়ে যা বানাতে চাইবে তাও ও চায় না। ও যা গড়বে, নিজে গড়বে, নিজের পরিকল্পনার মত।

বললাম, তা হলে এভাবে সে কি কোনদিন সম্ভব হবে? জনসাধারণের কাছে ডোনেশনও ত নিতে পারেন?

ভঞ্জ বললে, সে চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু কে দেবে টাকা? বেশির ভাগ লোক ত ভাববে পাগলামি। টাকা কি আর লোকে সহজে ছাড়ে? সে যাক্, তুমি কান্তির ওখানে আর যাবে না কি?

বললাম, হ্যাঁ, আমাদের কাজ এখনও শেষ হয় নি।

ভঞ্জ বললে, তা হলে আমার কথা ব'লো। ব'লো সময় পেলে আমি একদিন যাব।

বেয়ারাকে অফিস বন্ধ করতে ব'লে আমিও ভঞ্জর সঙ্গে উঠলাম। সেইদিন সন্ধ্যায় চৌরঙ্গীতে একজন গুপ্তচরের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল।

এর পর দু'একদিন অন্তর অন্তর আরও বার সাতেক আমি সেই দমদমে জহর-কলোনির শেষপ্রান্তে কান্তি গাঙ্গুলির বিশ্ব-ভারত-মৈত্রী সঙ্ঘে গিয়েছিলাম।

চীনা ছাপার অক্ষর পড়া এবং বোঝা যত সহজ, হাতের লেখা পড়া তত সহজ হচ্ছিল না। কথ্যভাষায় লেখা দেশজ ইডিয়ম্ ও সঙ্কেত বাক্যের মর্মোদ্ধারও তত সুগম হয় নি। বিলম্ব হচ্ছিল। কখনও বা অতসীকাচ, কখনও বা চীনা-ইংরাজী অভিধান প্রায়ই ব্যবহার করতে হচ্ছিল। শেষ কতকগুলি চিঠি যা ক্যান্টন অঞ্চলীয় হরফ ও ভাষায় লেখা ছিল, কান্তিবাবু সেগুলির অর্থোদ্ধার করতে পারলেন না। শান্তিনিকেতনে চীনাভবনের অধ্যাপক শ্রীথান্-য়ুন্-সানের কাছে ঐ কাগজগুলি নিয়ে যাবার উপদেশ দিলেন।

এই সাত দিন আমি যেন এক নতুন চোখ, নতুন মন নিয়ে এই সঙ্ঘের পরিবেশকে, কান্তিবাবুকে, লীলা দেবীকে দেখছিলাম। যতক্ষণ আমি ওখানে থাকতাম, আমার একটা মন থাকত কাজের দিকে, আর একটা মন থাকত ওঁদের দু'জনকে ঘিরে। স্বল্প দিনের আলাপ হলেও কান্তিবাবুর সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক আপনিই গড়ে উঠেছিল। লীলা দেবীকে দেখতাম, ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন, সাধারণ স্কুলপাঠ্য ইংরাজী, বাংলা, স্বাস্থ্য, ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-পরিচয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি, কখনও ছোট ছোট দলে ভাগ-করা ছেলেমেয়েদের চীনা ভাষার পাঠ দিচ্ছেন, কখনও বা ফরাসী ভাষার। দেখতাম, আর একটা অভিনব আবেগে আমার মন ভ'রে উঠত।

এই মাটির ঘরের চালায়, চারদিকের এই আগাছা বনজঙ্গলের মধ্যে এদের এই অতি সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রায়, কিছুদিন আগেও, একটা হা-হা করা সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যের রুক্ষ-মলিন মূর্তি ছাড়া আর কিছু দেখতে পেতাম না। আজ যেন তুচ্ছাতিতুচ্ছ সব-কিছুর মধ্যে অদৃশ্য এক মহৈশ্বর্যের আভাস দেখতে পেলাম।

এদের আসল রূপকে আড়াল ক'রে একটা অভ্যস্ত চিন্তার স্থূল পর্দা ঝুলছিল, ভঞ্জ সেই পর্দাটা উঠিয়ে দিয়ে গেল। দেখলাম, আলো-ঝলমল মঞ্চে জীবনের এক মহা নাটক দৃশ্যের পর দৃশ্যে উন্মোচিত হচ্ছে। এরা দু'জন সেই নাটকের নায়ক-নায়িকা।

আজ মনে হ'ল, লীলাকে ছাড়া এই সঙ্ঘ, এই সুস্থ পরিকল্পনা যেন ভাবা যায় না। রূপকথায় যেমন সোনার কাঠির ছোঁয়ায়, মৃত অচেতন প্রাণ পেত, লীলা যেন নিজেই সেই সোনার কাঠি যার স্পর্শে অতি সাধারণ দীনহীন উপকরণগুলি প্রাণের ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

লীলার নিরাভরণ দরিদ্র বেশবাস দেখতাম আর মনে হ'ত, অতুল সম্পদ্, আধুনিক অজস্র ভোগবিলাসের মধ্যে

যে বুদ্ধিমতী রূপসী মেয়েটি আজন্ম মানুষ হয়ে উঠেছে, সে কেন সব ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় এই দারিদ্র্যের মধ্যে এল, দিনের পর দিন এই বৈচিত্র্যহীন স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর মত নিস্তরঙ্গ জীবন বেছে নিল? সে কি শুধু কান্তিবাবুকে ভালবেসে, না কান্তিবাবুকে জড়িয়ে যে আকাশমুখী স্বপ্ন আর আদর্শ, তাকে ভালবেসে? এ কি বৈচিত্র্য-বিলাসী কোন আধুনিক মেয়ের খেয়াল? এ কি তার আত্মপ্রেম, নিজের উজ্জ্বল গৌরবময় প্রকাশ আর খ্যাতি যার জীবনে সবচেয়ে প্রিয়? কান্তিবাবু শুধু উপলক্ষ্য মাত্র? কিন্তু সে প্রকাশ, সে খ্যাতি তার নিজের উচ্চ সমাজের মধ্যে থেকে ত আরও সহজলভ্য হ'ত। এই একরোখা, প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী মেয়েটির অন্তরের অন্তরতম কথাটি কে বলতে পারে?

মনে হ'ত, যদি এর শেষটুকু জানতে পারতাম!

কিন্তু এদের সঙ্গে আমার জীবনের ক্ষীণ যোগসূত্রও নেই। আমার কর্মস্রোত আমায় কোথায় টেনে নিয়ে যাবে, এদের সঙ্গে জীবনে হয়ত আর কোনও দিন দেখা হবে না। তবু বিচিত্র ঘটনাসূত্রে এদের সঙ্গে এই কয়েক দিনের আলাপ আমার জীবনে স্মরণীয় হয়ে রইল।

কাগজপত্র স্যুটকেসে ভ'রে বিদায় নিয়ে উঠলাম। কান্তিবাবু, লীলাদেবী দু'জনেই বললেন, আনন্দবাবু, এদিকে এলে আবার আসবেন, ভুলবেন না।

বললাম, নিশ্চয় আসব। আপনাদের বিরক্ত করলাম অনেক, কিছু মনে করবেন না।

কান্তিবাবু বললেন, এ যে উল্টোচাপ দিচ্ছেন রায় মশায়। বরং আজেবাজে গল্প ক'রে আপনার কত মূল্যবান্ সময় নষ্ট করেছি। ভাল কথা, শান্তিনিকেতনে কবে যাচ্ছেন?

বললাম, দু'এক দিনের মধ্যেই।

আজও কান্তিবাবু আমার গাড়ী পর্যন্ত এলেন।

চলে এলাম। কলকাতা তার কর্মব্যস্ত ওই বিশাল বাহু দিয়ে সমস্ত স্বপ্ন-আচ্ছন্নতা থেকে আমায় আবার সবলে টেনে নিল।

পৃথিবীর চিরাচরিত অনিবার্য নিয়মে আমি কান্তিবাবুদের কথা প্রায় ভুলে গিয়েছিলাম। এবং দীর্ঘ দু' বছরের মধ্যে তাদের কথা মাঝে মাঝে মনে হলেও শহরের বাইরে দূর দমদমের গ্রাম্য অঞ্চলে যাবার সময় আমার হয়ে ওঠে নি।

মাঝে মাঝে মনে হ'ত, গুণগ্রাহী সহৃদয় কোন বদান্য দেশবাসীর বা কান্তিবাবুর বন্ধুমণ্ডলীর সাহায্যে তাদের সঙ্ঘ দিন দিন বড় হয়ে গ'ড়ে উঠছে। হয়ত কোন প্রাচ্য-প্রেমিক আমেরিকান্ লক্ষপতি বা ভারত-প্রেমিক ইংরেজ, অথবা জার্মান, ফরাসী বা চীন-রাশিয়ার কোন গুণগ্রাহী বন্ধু হয়ত লীলা আর কান্তির সাধনায় মুগ্ধ হয়ে তাদের স্বপ্নকে সফল করবার সহায়তা করেছে ও করছে। ভারতের বহু জায়গা থেকে ছাত্র-ছাত্রী আসছে। দমদমের সেই অখ্যাত গ্রাম অঞ্চল এক নতুন কর্মচাঞ্চল্যে, সংস্কৃতি ও মৈত্রীর মহিমায় দিনের পর দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। হয়ত একদিন খবরের কাগজ, কি কোন সাময়িক পত্রিকায় তার বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হবে। তখন হয়ত আমার মতো এক নগণ্য ব্যক্তিকে তাঁরা চিনতেই পারবেন না। লীলা যা চেয়েছিল, হয়ত তাই সফল হয়ে উঠবে এবার। সারা পৃথিবীর রাজধানীতে রাজধানীতে বিশ্বপ্রেমিক সংস্কৃতিবান্‌দের সমাজের মধ্যে সে মধ্যমণির মতো ঘুরে বেড়াবে। তার রাজেন্দ্রাণীর মতো রূপ আর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, তার দারিদ্র্যের মধ্যে তপস্বিনীর মতো সাধনা দেশে দেশে অগণিত বন্ধুজনকে আকৃষ্ট করছে। মনে মনে বলতাম, আহা তাই হোক্, তাদের স্বপ্ন, তাদের সাধনা সফল হোক্।

কিছুদিন পরে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দোতালার লম্বা বারান্দায় হঠাৎ কান্তিবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাঁকে একেবারে চেনাই যায় না। আমার ঊর্ধ্বতন অফিসারের সঙ্গে দেখা ক'রে আমি কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে ফিরছিলাম। হঠাৎ তিনি একেবারে আমার সামনে এসে পথ আটকিয়ে ব'লে উঠলেন, কি মিঃ শার্লক্ হোম্‌স্, চিনতে পারলেন না?

আমি অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি দেখে বললেন, আমি কান্তি গাঙ্গুলি।

আমি অপ্রস্তুত হয়ে তাঁকে নমস্কার করলাম।

সত্যিই তাঁকে চেনা যায় না। তাঁর পরণে দামী সার্জের স্যুট, মাথায় ততোধিক দামী সুদৃশ্য ফেল্ট হ্যাট্। আমি তখনও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছি দেখে তিনি নিজের গালে হাত বুলিয়ে হেসে বললেন, দাড়ি-গোঁফের কথা ভাবছেন? লীলা কিছুতেই ছাড়লে না, কি করি আর—

বললাম, আপনাকে বেশ দেখাচ্ছে। তা এখানে?

কান্তিবাবু বললেন, আমি আমেরিকা যাচ্ছি। ট্যুরিং লেক্‌চারের একটা কাজ পেয়ে গেছি, বেশ কয়েক বছরের জন্যে। পাসপোর্টের হাঙ্গামা মেটাতে এসেছি।

আমি উল্লসিত হয়ে বললাম, ভারি আনন্দের কথা। আপনার অনেক আগেই যাওয়া উচিত ছিল। কবে যাচ্ছেন?

কান্তিবাবু বললেন, দিন দশেকের মধ্যেই রওনা হব। প্রথম যাচ্ছি বোষ্টনে।

বললাম, লীলাদেবী নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন?

কান্তিবাবু বললেন, না, আমি একাই যাচ্ছি। দু'জনেই গেলে আমাদের সঙ্ঘ দেখবে কে? আমাদের ছাত্রছাত্রীও কিছু বেড়েছে। যাবেন একদিন। আরও দু'টো চালাঘর উঠেছে। আমাদের মিউজিয়ম খোলা হয়েছে, তার একটা ঘরে। যাবেন একদিন, দেখেশুনে আসবেন, লীলা খুব খুশী হবে।

কান্তিবাবু বলতে বলতে খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন।

আমি তখন অন্য আর এক কথা ভাবছিলাম। তাঁদের সঙ্ঘের যে ক্রমোন্নতির কথা তিনি খুশী হয়ে বলছিলেন, তার কোনটাই আমি মন দিয়ে শুনি নি পর্যন্ত। প্রথমটা কান্তিবাবুকে দেখে, তাঁর কথা শুনে আমার যে পরিমাণ আনন্দ হয়েছিল, কেন জানি না হঠাৎ সে আনন্দ যেন একেবারে নিভে গেল।

কান্তিবাবু হেসে বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত।

পথ চলতে চলতে আমি ভাবছিলাম। কান্তিবাবুকে হঠাৎ মনে হ'ল, আদর্শের মুখোসধারী ঘোরতর স্বার্থপর জনৈক অতি সাধারণ ব্যক্তি। তিনি নিজে উজ্জ্বল জীবনের দিকে চলেছেন, নতুন দেশে দেশে, নতুন পরিবেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে, নতুন খ্যাতি-প্রতিপত্তির লোভে। আর লীলা পিছনে পড়ে রইল অবহেলিত, পরিত্যক্তের মত। অখ্যাত পল্লীর অন্ধকারে, কতকগুলি নগণ্য খড়ের চালার মধ্যে বৈচিত্র্যহীন কাজে দিনগত-পাপ-ক্ষয় করা ছাড়া তার জীবনে আর কি রইল? কতকগুলি গ্রাম্য ছেলেমেয়েরা ঐ চীনা ভাষা, ফরাসী কি জার্মান ভাষা শিখে কি করবে? কতদিন তারা ঐ সঙ্ঘে টি'কে থাকবে? মনে হ'ল, ঐ সঙ্ঘ একটা বিরাট্ পাষাণের মত লীলার জীবনকে পিষে গুঁড়িয়ে এক নীরস শুষ্ক ব্যর্থ পরিণামের অন্ধকারে নিক্ষেপ ক'রে দেবে। সমস্ত সঙ্ঘের আদর্শ, পরিকল্পনা আজ মনে হ'ল এক অবাস্তব, নিরর্থক ধোঁয়ার মূর্তির মত, এক ঘোরতর কালাতিক্রমণ। একটা সুন্দর জীবন আমি দেখতে পেলাম ধীরে ধীরে শুকনো পাতার মতো ঝ'রে যাচ্ছে। দেহের ন্যূনতম উপযোগী খাদ্যের সংস্থান নেই, আনন্দের কোন উপকরণ নেই, একা একা ঐ হতশ্রী অন্ধকার আবেষ্টনের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম, লীলার শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে। তার চোখ নিষ্প্রভ, তার মুখে জীবনের আলো জ্বলছে না। এই জীবন কি লীলা চেয়েছিল?

আমি কান্তিবাবুকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছিলাম না। ভাবছিলাম, লীলা এখনও কেন বিদ্রোহ করছে না। এই বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পড়বার এখনও কি সময় হয় নি?

তার পর মামলার আরও তথ্যানুসন্ধানের জন্যে সিঙ্গাপুর, হংকং, জাকার্তা, প্রভৃতি স্থানে মাস তিনেক কাটিয়ে আমি কলকাতায় ফিরে এলাম।

প্রবাসে কর্মব্যস্ত দিনগুলির মধ্যেও লীলাদেবীর কথা মাঝে মাঝে মনে হ'ত, আর একটা অদ্ভুত বেদনা বোধ করতাম। দেশে ফিরে এসেই আমি ঠিক করলাম, একদিন দমদম যাব, লীলাদেবীকে দেখে আসব।

কিন্তু তার আগে যা আমি কখনও করি নি, তাই করতে লাগলাম। আমার পরিচিত ধনী বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বারংবার হাঁটাহাঁটি ক'রে মাস ছয়েকের মধ্যে আমি প্রায় আড়াই হাজার টাকার মত চাঁদা তুলে ফেললাম। আর আমার নিজের সামান্য সঞ্চয় থেকেও পাঁচশো টাকা ওর সঙ্গে যোগ করে দিলাম। বৈঠকখানা-বক্তৃতায় আমি যে এত ধুরন্ধর তা আমার আগে জানা ছিল না।

জটিল এক চিন্তার তাড়না আমাকে তখন এই কাজে প্রবৃত্ত করিয়েছিল। কান্তিবাবুর সঙ্ঘের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ওপর আমার আর কোনও মোহ বা অনুরাগ ছিল না। যখন আমি প্রত্যাখ্যাত হয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় টাকার জন্যে সন্ধ্যায়-সকালে ঘুরেছি তখন শুধু এই মনে হ'ত যে, এ কাজ আমি করছি, যতখানি পারি, একটা মর্মান্তিক আত্মহত্যাকে রোধ করবার জন্যে। ত্যাগের নামে, একটা অবাস্তব আদর্শ-বাদের নামে এক ঘোরতর আত্মহনন হচ্ছে, আমি যতটা পারি তা রোধ করব।

কিন্তু জীবনের আরও এক বড় বিস্ময় যে দমদমের ঐ মাটির চালার বারান্দায় আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল, তা আমি তখন কল্পনাও করতে পারি নি।

সেদিন কি একটা ছুটির দিন ছিল। আমি দুপুরের একটু পরে শ্যামবাজারের মোড় থেকে দমদমের বাস ধরলাম।

তার পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমি জহর-কলোনীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রায় তিন বছর হয়ে গেল আমি আর এদিকে আসি নি। দেখলাম অনেক পরি-বর্তন হয়েছে। একটা চওড়া পাকা রাস্তা কলোনীকে দু'ভাগ করে দিয়ে ভিতর দিকে চলে গিয়েছে। এদিকে-

ওদিকে অনেক কোঠাবাড়ী উঠেছে। সবচেয়ে চোখে পড়ল, কলোনীর রাস্তার মুখেই একটা বড় সাইন-বোর্ডে বিশ্ব-ভারত-মৈত্রী সঙ্ঘের নাম আর পাশে তীর চিহ্ন দিয়ে পথের নির্দেশ।

শুধু একটা নাম, কালো রঙের বোর্ডের ওপর সাদা রঙের অক্ষরে. যেন একগুচ্ছ নতুন তারার মত আমার নানা মিশ্র-ভাবনার আকাশ-পটে একে একে জ্বলে উঠল। প্রত্যেক অক্ষরটিতে আমি যেন লীলার উজ্জ্বল মুখ দেখতে পেলাম।

দ্রুত পা চালিয়ে আমি সঙ্ঘের একবারে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়ালাম। প্রথমটা মনে হ'ল আমি স্বপ্ন দেখছি। আমার বিস্ময়ের আর শেষ নেই।

সঙ্ঘের সামনেটা ঠিক তেমনিই আছে। কান্তিবাবু সেই মাটির বারান্দায় তাঁর সেই আগের মত দাড়ি-গোঁফ সমেত একটা খাতায় কি লিখছেন, সামনে-পাশে অনেক-গুলো বই খোলা, বাতাসে পাতা উড়ছে। আর তার পাশে লীলা আর একটি বই দেখে দেখে কি বলে যাচ্ছেন। লীলা আরও সুন্দর হয়েছে। তার সারা মুখের ওপর সুখ আর আনন্দের এক উজ্জ্বল আভা ঝলমল্ করছে।

প্রথমটা তাঁরা আমায় দেখতে পান নি। তার পর দু'জনের চোখই একসঙ্গে আমার ওপর পড়ল, দু'জনেই সোল্লাসে আমায় সে যে কি প্রীতিভরা অভ্যর্থনা জানালেন তার বর্ণনার ভাষা নেই।

এক মুহূর্তেই তাঁরা মাঝের তিনটে বছরের ফাঁক শূন্যে উড়িয়ে দিলেন। যেন আমি কাল পরশুও এখানে এসেছিলাম।

তাঁর সামনের ছড়ানো কাগজ, খাতাপত্র দেখিয়ে কান্তিবাবু বললেন, আপনি শুনে খুব খুশী হবেন, একটা বড় কাজ হাতে নিয়েছিলাম, প্রায় শেষ ক'রে এনেছি। সভ্যতার সমন্বয় নিয়ে কতকগুলি ধারাবাহিক বই আমরা দু'জনে মিলে লিখছি। চীন-ভারত নিয়ে এখন লেগেছি। আমাদের চরকের সঙ্গে চীনের কোন্ হুং-এর যে কি অদ্ভুত মিল পেয়েছি শুনলে আপনি অবাক্ হবেন। এঁরা দু'জন পৃথিবীর ভেসজবিজ্ঞানের গোড়াপত্তন করেছিলেন। এই একটুখানি শুনুন—ব'লে তিনি তাঁর সামনের খাতা থেকে পড়তে যাচ্ছিলেন।

লীলাদেবী কান্তিবাবুকে থামিয়ে বললেন, থাক, এখন থাক। উনি কতদিন পরে এলেন? তুমি যদি এখনই ওই সব আরম্ভ কর, তা হলে আর বোধ করি কখনও আসবেন না, কি বলেন আনন্দবাবু? তাঁর মুখ মিষ্টি হাসিতে ভ'রে উঠল।

কান্তিবাবু লজ্জিত হয়ে বললেন, সত্যিই তো, সত্যিই তো। তার পর আনন্দবাবু, আপনি এতদিন আসেন নি কেন তাই বলুন? তিনি সকৌতুকে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

এঁরাই কথা ব'লে চলেছেন। আমার মনে যে কত জিজ্ঞাসা জমে উঠেছে, তার কতটুকু এঁরা জানেন?

বললাম, কবে ফিরলেন? এরই মধ্যে চলে এলেন?

কান্তিবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, কোথা থেকে ফিরব? আমি ত কোথাও যাই নি?

বললাম, সে কি? সেই রাইটার্স বিল্ডিং-এ আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল—আপনি আমেরিকা যান নি?

কান্তিবাবু হেসে বললেন, না, শেষ পর্যন্ত যাওয়া আমি নাকচ ক'রে দিলাম। লীলাকে দেখিয়ে বললেন, এঁর পাল্লায় পড়ে দিনকতক সে কি সাহেব সাজা, সে কি দুর্ভোগ, বুঝলেন? শেষকালে ভাবলাম, আমি এখান থেকে, বাঙ্গলার এই অজ পাড়াগাঁর কোণ থেকে আমার যা বলবার আমি পৃথিবীর সকলকে বলব। কি বলেন? ভাল না?

আমি লীলাদেবীর মুখের দিকে চাইলাম। সেখানে এক সলজ্জ আনন্দের আলোছায়ার লুকোচুরি দেখলাম।

ভাবলাম, কান্তিবাবুর এই বিরল-প্রাপ্য সুযোগ অবহেলায় ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে এই দুই অদ্ভুত দম্পতির মনের বিচিত্র সূক্ষ্ম টানা-পোড়েন নীরবে প্রাণের স্বর্ণজরি বুনে চলেছিল।

আমার লজ্জা হ'ল যে, এ নিয়ে মনে মনে কান্তিবাবুকে একদিন আমি কত নিন্দে-মন্দ করেছি।

লীলা বললে, চলুন আনন্দবাবু, আমরা কত কি করেছি দেখবেন চলুন।

কান্তিবাবু বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ লীলা, ওঁকে সব দেখাও, আজ আর সহজে ছাড়ছি না। আমি এই বই খাতাপত্তর গুটিয়ে এক্ষুণি যাচ্ছি।

লীলাদেবী আমায় সঙ্ঘের ভেতর দিকে নিয়ে গেলেন। দেখলাম বন-জঙ্গল পরিষ্কার ক'রে সেখানে প্রায় বিশ-পঁচিশটি একই ধরনের চালাঘর উঠেছে। মাঝখানে সবুজ দুর্বা-ঘাসে-ভরা বিস্তৃত লন, চারপাশে গাঁদা, গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা আলো ক'রে ফুটে আছে। সেই পরিষ্কার লনের ওপর এক জাপানী বৃদ্ধ ভদ্রলোক, আর তাঁর পাশে এক জাপানী মহিলা, তিনিও বৃদ্ধা, বসে আছেন। বোধ হয় স্বামী-স্ত্রী। আর বছর দুয়েকের অপূর্ব

সুকুমার একটি শিশু সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সামনে তার ছোট্ট দু'টি পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরে টানছে। বোধ হয় বসে থাকাটা তার মনঃপূত হচ্ছে না। আর বৃদ্ধ হেসে হেসে তাকে কি বোঝাতে চাইছে।

লীলাকে দেখে জাপানী ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বলে উঠলেন, দেখ ম্যাডাম্, তোমার বাচ্চাটি একটি ক্ষুদে যাদুকর, আমায় ভুলিয়ে নিয়ে কোথায় যেতে চায়, ওকে জিজ্ঞাসা কর ত?

লীলাকে দেখে ছেলেটি তার কচি মুখ ভ'রে এক অপরূপ হাসি হাসল।

লীলা হেসে বললে, তোমাদের দুজনের মধ্যে আমি নেই। পার ত মিসেস্ নাকামুরাকে মধ্যস্থ মানো।

বৃদ্ধা হেসে বললেন, বেটি, ও কি আমায় ছেড়ে কথা কয় ভেবেছ? একটু আগেই আমার হাতে ওর কচি দাঁত বসিয়ে দিয়েছে।

আমি মুগ্ধ হয়ে শিশুটির দিকে চেয়ে আছি।

বললাম, আপনার ছেলে?

লীলা সলজ্জ হেসে বললেন, হ্যাঁ। এঁরা জাপান থেকে এসে আজ তিন মাস হ'ল এখানে আছেন। এঁদের দু'টি ছেলে হিরোসিমাতে এটম্ বোমায় মারা পড়ে। জাপানের তোরিগোএর পত্রিকায় ওঁর প্রবন্ধ পড়ে ওঁরা দিল্লী হয়ে এখানে এসেছেন। আমাদের সঙ্ঘের আইডিয়া ওঁদের খুব ভাল লেগেছে। ওঁরা মস্ত ধনী, টাকা দিয়ে ওঁরা জাপান-ভবন তৈরী ক'রে দেবেন।

আসুন, আর একজনের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। লীলা বললেন।

একটা চালার বারান্দায় একজন ইংরেজ ভদ্রলোক একটি সতরঞ্চের উপর বসে কি লিখছিলেন। লীলাকে দেখে সানন্দ অভ্যর্থনা জানালেন।

পরিচয় আদান-প্রদান হ'ল। দেখলাম, তাঁর একটি হাত আর পা নকল।

লীলাদেবী পরে বললেন, মিঃ আর্থার মরিস্ গত মহাযুদ্ধে একটি হাত আর পা হারিয়েছেন। তখন ইনি যুবক। ইংলণ্ডের যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের ইনি এক-জন অগ্রণী নেতা। ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান্ পত্রিকায় কান্তিবাবুর প্রবন্ধ পড়ে ইনিও এখানে এসেছেন যোগা-যোগ স্থাপন করবার জন্যে। এঁদের আন্দোলন সম্পূর্ণ মানবিক ভিত্তির ওপর, রাজনীতির কোন দ্বন্দ্ব বা সম্বন্ধ নেই। আমাদের সঙ্গে ওঁদের সকলের মিল এইখানে।

কান্তিবাবু এতক্ষণে এসে পড়লেন। তিনি স্ফুরন্ত উৎসাহে চারদিকে নিয়ে গেলেন। কয়েকটি ঘরে আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, দিল্লী থেকে কয়েকজন বন্ধু এসে রয়েছেন। কান্তিবাবু তাঁদের সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দিলেন।

পূর্বদিকে অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা হলঘরের ইঁটের কাঠামো অর্ধসমাপ্ত হয়ে রয়েছে।

কান্তিবাবু বললেন, এখানে আমাদের সম্মেলন-ভবন তৈরী হচ্ছে।

বললাম, এমনি অর্ধেক হয়ে পড়ে আছে কেন? টাকার জন্যে?

কান্তিবাবু বললেন, তাই বটে, কিন্তু হয়ে যাবে আনন্দবাবু, টাকার জন্যে কিছুই আটকায় না। ও ঠিক হয়ে যাবে দেখবেন। কান্তিবাবুর মুখে সেই সর্বজয়ী আশা আর স্বপ্নের উজ্জ্বল আভা, প্রথম দিন যেমন দেখে-ছিলাম আজও ঠিক তেমনি অম্লান।

ভাবছিলাম, টাকাটা কখন কি ব'লে ওঁদের দেব। তার পর যাবার সময় হ'ল। কান্তিবাবুর হাতে টাকাটা তুলে দিলাম। সব বললামও।

কান্তিবাবু যেন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়লেন। লীলার সামনেই দু'হাত দিয়ে তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অন্তরের এমন উষ্ণ স্পর্শ জীবনে খুব কমই পেয়েছি।

ওঁরা দু'জনেই আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিলেন। আমি নিরস্ত করলাম। যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, কান্তিবাবু, সঙ্ঘের আজ সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য-দেখলাম।

অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে কান্তিবাবু বললেন, কি সে আনন্দবাবু?

সে একটুখানি, একটি কচি শিশু, হেসে বললাম।

কান্তিবাবু শশব্যস্ত হয়ে বললেন, আপনারও হাতে কামড়ে দিয়েছে নাকি? ভারি দুষ্টু!

হেসে বললাম, হাতে নয়, একেবারে বুকে।

বিদায় নিয়ে চ'লে এলাম।

লীলা বললেন, আবার আসবেন। আসছে ফাল্গুনে দেশবিদেশ থেকে প্রতিনিধিরা আসছেন। আমাদের সব প্রদেশ থেকেও বন্ধুরা আসবেন, আসা চাই-ই, ভুলবেন না।

বললাম, ভুলব না।

পাকা রাস্তায় বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কত মিশ্র ভাবনা মনের মধ্যে ভিড় করে আসছিল। দূরে কোথায় লাউড স্পীকারে মাতালের বীভৎস চীৎকারের মত রক্-এন্-রোলের সুরে বাংলা গানের রেকর্ড বাজ-

ছিল। দম্‌দম্‌ এরোড্রোম থেকে গর্জন করতে করতে বিরাট্‌ এরোপ্লেনগুলো দিক্‌দিগন্তরে উড়ে যাচ্ছে।

মহেশ ভগুর কণ্ঠস্বর কাণের কাছে বাজছিল, পাগল—বদ্ধ পাগল! শি মেড এ রং চয়েস্‌, শি ম্যারেড এ ম্যানিয়াক্‌!

পাগল ওরা নিঃসন্দেহে। আকাশের সীমানার মতো অন্তহীন স্বপ্ন আর আশা, ও ত পাগলামিরই নামান্তর। চারদিকের ভগ্ন, বিকৃত, শতচ্ছিন্ন জীবনের ভিড় আর হট্টগোলের মধ্যে, জগত-জোড়া হিংসা, লোভ, শক্তিমত্ততার মধ্যেও স্বপ্নের আয়ু কতটুকু! এ স্বপ্ন ত আরও কত পাগল কত যুগ-যুগান্তর ধ'রে দেখে এসেছে। কোথায় আজ তারা? তবু মনে হ'ল, আকাশের সীমানার মতো এ স্বপ্নেরও বুঝি শেষ নেই। যা শূন্য তা-ই বুঝি অনন্ত। যুগ-যুগান্তরের পাগলামি তাই বুঝি আর পারাপারের পথ খুঁজে পায় না।

আমার দার্শনিক চিন্তায় ছেদ পড়ল। দূর থেকে দৈত্যের দুই ক্রুদ্ধ চোখের মত গর্জমান্‌ বাসের মাথায় লাল আলো দেখতে পেলাম।

হঠাৎ চাবুকের মত সপাং ক'রে একটা চিন্তার ঘা ঠিক একেবারে বুকের মাঝখানে এসে লাগল।

কিন্তু আমি ত পাগল নই, তবে আমার মূল্যবান্‌ সময় নষ্ট ক'রে দোরে দোরে ঘুরে কতকগুলো স্বার্থসর্বস্ব লোকের অনিচ্ছুক হাত থেকে কেন অতগুলো টাকা চেয়ে চেয়ে এনেছিলাম? কাকে দেব ব'লে? ঐ মহান্‌ আদর্শের বেদীতে, না কান্তিবাবুকে, না লালাকে?

আমি মনকে স্তব্ধ ক'রে দিলাম। বললাম, উত্তর দিয়ো না। আমার আকাশ আছে, তার সীমানাও আছে।

রাজপুতানার চারণ জাতি

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো

"দিল্লী দরগহ অম্ব ফল, ঊঁচা ঘণা অপার।
চারণ লকৃখো চারণাঁ, ডাল নবাঁবনহার॥"
[চারণ দুরাসাকৃত দোহা]

১

সম্রাট্ আকবরের শোভাযাত্রা একদিন দিল্লীর [ফতেপুর সিক্রীর ?] রাজপথ ধরিয়া চলিয়াছে। পথে যাচক ফকির ও দর্শনার্থীর ভিড়। দরবারে মুরব্বী না থাকিলে কেহ বাদশাহর কাছে প্রকাশ্য দরবারে কোন প্রার্থনা অভিযোগ জানাইতে পারে না ; গরীবের ইহাই সুযোগ। ভিড়ের মধ্য হইতে একজন চারণ হাত তুলিয়া সম্রাট্‌কে আশীর্ব্বাদ জানাইল, চারণের হাতে একটি পুঁটলী। অনুমতি পাইয়া চারণ ঐ পুঁটলী শাহান্‌শাহকে নজর পেশ করিল। পুঁটলী খুলিয়া সম্রাট্ কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং চারণকে অন্যদিন দেখা করিবার আদেশ দিলেন।

সম্রাট্ চারণকে ডাকাইয়া গোপনে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, তুমি আমার "ধুনী" কেমন করিয়া দেখিলে ? সবিস্তার ঠিক ঠিক বল।

চারণ বলিল, আমার নাম, লকৃখা [প্রচলিত লাখা] নিবাস যোধপুর, মহারাজের "পোতপাল" [দ্বারস্থ] চারণ। আমি বদরীনাথ যাত্রায় গিয়াছিলাম। পথে ডুলী [ছাঁকা] ছিঁড়িয়া নীচে পড়িয়া গেলাম, চোট সামান্য লাগিয়াছিল। নিকটেই পায়ে-হাঁটা পথের চিহ্ন দেখা গেল। ঐ "পগদণ্ডী" ধরিয়া চলিতে চলিতে যেখানে পথ শেষ হইয়াছে সেখানে দেখিলাম চারিটা ধুনী জ্বলিতেছে, তিনটার কাছে তিন "অতীত" [অতি বৃদ্ধযোগী] ধুনী পোহাইতেছেন। তিন মূর্ত্তিকে দণ্ডবত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম চতুর্থ মহাত্মা যাঁহার ধুনী জ্বলিতেছে তিনি কোথায় ? মূর্ত্তিত্রয় বলিলেন, তুই কে ? এইখানে কেমন্ করিয়া আসিলি ? তোর দেশ কোথায় ? আমি বলিলাম, দিল্লী মণ্ডলে আমার নিবাস। তাঁহারা বলিলেন, ঐ মহাত্মা ত দিল্লীতেই রাজত্ব করিতেছেন ! আমি নিবেদন করিলাম, মহামান্য অষ্টোত্তর-শতশ্রী সম্রাট্ আকবর শাহ বর্ত্তমানে দিল্লীতে রাজত্ব করিতেছেন, সেখানে কোন "অতীত" নাই। মহাত্মা বলিলেন, হাঁ হাঁ ঐ আকবরই ত এই ধুনীর "অতীত", ওঁর সঙ্গে তোর দেখা হবে ? আমি বলিলাম, মহারাজ ! বাদশাহর কাছে আমাকে কে যাইতে দিবে ? মহাত্মার চিঠি ও আলা হজরতের ধুনীর "ভস্মী" লইয়া আমি দিল্লী আসিয়াছি।১

ইহার পর চারণ ও জাতিস্মর বাদশাহর মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হইল জনশ্রুতিও শুনে নাই ; তবে লাখা নামক এক চারণ ছিল, তিনি আকবরের প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং আকবর তাঁহাকে বরণ-পত্‌সাহ অর্থাৎ চারণ-সম্রাট উপাধি দিয়াছিলেন—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। আঢ়া শাখার প্রসিদ্ধ চারণ দুরসা সমস্ত চারণ জাতির কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির অর্ঘ্য লাখাকে নিবেদন করিয়াছেন। প্রবন্ধের শিরোনামায় উদ্ধৃত দুরসার দোহায় বলা হইয়াছে—

দিল্লীর দরগার [দরবারের অনুগ্রহ-রূপী বৃক্ষের]

১। এই গল্প বিশ্বাস করা না করা পাঠকের মর্জ্জি ; কিন্তু এই গল্পে আকবরের উদারতা এবং চারণ-চরিত্রে তড়িত-বুদ্ধি ও ধাপ্পাবাজীর যে ছায়া পড়িয়াছে উহাকে পাশ কাটাইয়া যাওয়া মুস্কিল। [দ্রঃ মুণ্ডলেরী গ্রন্থ, নাগরী প্রচারিণী সংস্করণ, পৃঃ ২৫২]

আকবর সম্বন্ধে হিন্দুস্থানে আর একটি গল্প আছে, যথা দরিদ্র্যপীড়িত এক ব্রাহ্মণ পরজন্মে দিল্লীশ্বর হওয়ার কামনা করিয়া প্রয়াগ তীর্থে কাম্য-কূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পর জন্মে তিনি আকবর বাদশাহ হইয়াছিলেন। ছোট কালে আমি মা'র কাছে এই গল্প শুনিয়াছিলাম এবং চল্লিশের পরে আমি এই গল্পই উর্দ্দু ইতিহাস (শমসুল্ উলামা হোসেন আজাদ প্রণীত) দরবার-ই-আকবরী গ্রন্থে পড়িয়াছি। আমার মা নিশ্চয়ই বাবার কাছে (আমরা বাবাজী বলিতাম) শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু বাবা কোথায় পড়িলেন কিংবা কার কাছে শুনিলেন ? রাস্তার ছেঁড়া কাগজ কুড়াইয়া পড়ার বাতিক থাকিলেও তিনি আমাদের মত ইতিহাস পড়েন নাই, বংশের কুলপঞ্জিকা লিখিয়াছেন। দেড় বৎসর বয়স হইতে যে পিতামহী তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিলেন তাঁহার কাছে জমিদারীর চিঠা, খতিয়ান ছাড়া কিছুই ছিল না ; সুতরাং লোকের মুখে মগের মুল্লুকে যাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি হিন্দু জাতি রক্ষা করিয়াছে, তাঁহাকে অবতার, যোগী যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করিবার হেতু সে যুগে নিশ্চয়ই ছিল।

আম্রফল অতি উচ্চ শাখায় ফলিয়া থাকে। চারণ জাতির জন্য ঐ ডাল চারণ লাখাই নোয়াইয়া ধরিয়া ছিলেন।

২

চারণ বলিতেই বাঙ্গালী পাঠকের প্রাণে "চারণের অগ্নিবীণা" বাজিয়া উঠে; পাঠ্যাবস্থায় আমাদের কানেও ঐ "অগ্নিবীণা" বাজিয়াছে। সম্প্রতি জানিতে পারিয়াছি চারণ কস্মিনকালে বীণা, বেহালা কিংবা অন্য কোন বাদ্যযন্ত্র স্পর্শ করে না, গান গাহিয়া ভিক্ষা করা চারণের পেশা নহে। চারণ অপেক্ষা সামাজিক মর্য্যাদায় নিকৃষ্ট ভাট [হালে "বন্দীজন"] সম্প্রদায় বাদ্যযন্ত্র সহযোগে যজমানের বংশকীর্ত্তি আবৃত্তি করে, যাহারা ঢোল বাজায় তাহাদিগকে ঢোলী বলে। রাজপুতের বংশাবলী এবং ইতিবৃত্ত ভাটেরাই রক্ষা করিয়া থাকে এবং যাচক হিসাবে দান পাইয়া থাকে। ভাটের গদ্যে লিখিত ও অলিখিত ইতিবৃত্তকে খ্যাত বা বার্ত্তা বলা হয়। ভাটের মধ্যে এক সম্প্রদায়কে রাণী-মংগা বলা হয়, যেহেতু তাঁহারা রাণী এবং "ঠাকুরাণী" [সামন্ত-গৃহিণী]গণের পিতৃ-মাতৃকুলের বংশ পরিচয় রক্ষা করে, এবং ইহা শুনাইয়া উঁহাদের নিকট ভিক্ষা দাবী করিয়া থাকে। চারণ প্রাচীন সুত-মাগধের ন্যায় স্তুতিপাঠক, ছন্দোবদ্ধ যশ বর্ণনা ইহাদের কাজ। চারণের রচনাকে কবিত্ কিংবা গীত বলা হয়। কবিত্ ও গীতে কথা অল্প, অলঙ্কারই (বিশেষতঃ অতিশয়োক্তি এবং বক্রোক্তি) প্রধান; এইগুলি গান (song) নয়, অগ্নিগর্ভ গাথা, গীতের ছন্দে আবৃত্তির (declamation) উপযোগী। এই গীত অনেকটা প্রাক্-ইসলাম যুগের পৌত্তলিক আরব-কবিতার মত। বাদশাহী দরবারে নকীব যেমন বাদশাহ সিংহাসন মঞ্চে পদার্পণ করিতেই তৈমুর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পুরুষের নাম তার-স্বরে ঘোষণা করিত, রাজপুত দরবারেও প্রত্যেক সর্দ্দারের সহগামী চারণ সংক্ষেপে প্রভুর "যশ" বর্ণনা করিত, যথা, শক্তাবত কুল-প্রধানের বন্দনা—

দুনা দাতার, চোগুণা জুঝার
খোরাসানী মুলতানীরা২ অগ্‌গল।

[দানে দ্বিগুণ যুদ্ধে চতুর্গুণ খোরাসানী-মুলতানীর অর্গল স্বরূপ…]

রাজপুতানায় সামাজিক নাচ গানের আসরে চারণ এবং ভাট সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না। বাংলা দেশের "নট" জাতি অপেক্ষাও সমাজে হেয় "ডোম" এবং তাহাদের স্ত্রীলোক "ডোম্‌নী" বিবাহাদি উপলক্ষ্যে, উৎসবে কিংবা শরাবের মজলিসে বাজনা বাজাইয়া গান গায়, আদিরস পরিবেশন করে। চারণ ও ভাটের "গীত" অভিজাত কুলের ভব্য সম্মেলনে রৌদ্র ও বীর রস পরিবেশনের জন্য রচিত হইয়া থাকে।

চারণ জাতি রাজস্থানের সমাজে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। চারণ ব্রাহ্মণত্ব কিংবা ক্ষত্রিয়ত্ব দাবী করে না, চারণ উভয় বর্ণের মধ্যে ব্যবধান সংকীর্ণতর করিয়াছে, চারণ গুণ ও স্বভাবে ব্রাহ্মণ, কর্ম্মে ক্ষত্রিয়, আচার-ব্যবহারে, অশনে-বসনে সর্ব্বসংস্কারমুক্ত রাজপুত। ব্রাহ্মণের পুরোহিত নিজের ভাগিনা কিংবা দৌহিত্র, মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের গুরু; কিন্তু রাজপুতের মত চারণের গুরু এবং পুরোহিতও ব্রাহ্মণ শ্রেণীর; এবং ক্রিয়াকর্ম্ম ব্রাহ্মণের দ্বারা করাইতে হয়। ব্রাহ্মণ এবং চারণ দুই জাতিই যাচক, দান গ্রহণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ব্রাহ্মণ সকলের পূজ্য এবং সকলের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। চারণ জীবিকার জন্য একমাত্র ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতেই "ত্যাগ" দাবী করিতে পারে, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্রের দান চারণ গ্রহণ করে না, যেহেতু চারণ ভিক্ষাজীবি নয়। রাজপুত ব্রাহ্মণকে যাহা দিয়া থাকে উহাকে দান (charity) বলে; চারণকে বিবাহাদিতে যাহা দিতে হয় উহাকে ত্যাগ (surrender) বলে। চারণ যে মহাদান পায় 'লক্ষ-প্রসাদ' (দেবতাকে নিবেদন), ভিক্ষা নহে। চারণ রাজপুতের মতই কুলাভিমানী, কিন্তু রাজপুতের কুলবৈর প্রবণতা ও জিঘাংসা চারণের নাই। চারণ রাজপুতের নিকট যাহা চায় উহা না দিলে রক্তপাত হয়; সেই রক্ত যাচকের, দাতার নয়; চারণ শাকাহারী না হইলেও

২। মিথ্যাভাষণ না হইলে কবিতা হয় না স্তুতিও হয় না। ঐতিহাসিক অসত্য (heresy) উদ্ভাবনের ব্যাপারে ভাট চারণের জুড়ি নাই; উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইতেও উহাদের বিবেকে বাধে না।

হলদীঘাটের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পশ্চাৎ অপসরণের সময় মহারাণা প্রতাপকে প্রাণের ভয়ে পলাইতে হয় নাই; তাঁহার ঘোড়া "চেটক" [বাং: চৈতক!] খাদ লাফাইয়া মরে নাই, ভ্রাতা শক্ত সিংহের কোন খোরাসানী-মুলতানী পশ্চাদ্ধাবনকারীকে বধ করিবার সুযোগ হয় নাই। যুদ্ধে যিনি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই হিন্দুবিদ্বেষী ঐতিহাসিক বদায়ূনী লিখিয়াছেন, ঐ দিন বিকালে মোগল সেনা এত পরিশ্রান্ত ও ভয়ার্ত হইয়াছিল যে, তাহারা ঘাটির ঐ পারে যাইতে সাহস করে নাই। (ওঝা, রাজপুতানেকা ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৭৫৪)। টডের [illegible] না বর্ত্তমানে অচল; কিন্তু মেবার দরবারে ভাট চারণের ধাপ্পাই দাম পাইয়া থাকে।

অহিংসাবাদী; কিন্তু যজমানের জন্য যুদ্ধ করে, যজমানকে অন্যায় রক্তপাত হইতে উপদেশের দ্বারা নিবৃত্ত করাইতে না পারিলে নিজের বুকে নিজেই ছোরা বসাইতে দ্বিধা করে না। চারণ উত্তম ক্ষত্রিয়ের স্তাবক, কিন্তু নিন্দার দ্বারা অধম ক্ষত্রিয়ের শাস্তিদাতা। শত্রুর তরবারি মাথা কাটিতে পারে, নত করিতে পারে না; কিন্তু চারণের রুষ্টা সরস্বতী মান হরণ করিয়া পুত্রপৌত্রাদির মাথাও কাটাইতে পারেন। এই ভয়ে দুর্দ্দান্ত রাজপুত স্বেচ্ছায় চারণের হাতে চাবুক খাইয়া নিজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, এমন উদাহরণও পাওয়া যায়। মারবাড়ের "মোটা রাজ।" উদয়সিংহ রাঠোর একদা চারণ লাখার শরণাপন্ন হইয়া চারণের রোষবহ্নি শান্ত করিয়াছিলেন।

৩

সম্রাট্ আকবর মারবাড় জয় করিয়া রাও মালদেবের সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য পুত্র উদয়সিংহকে যোধপুরের গদীতে বসাইয়াছিলেন এবং সেলিমের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন; ইনিই সম্রাট্ শাহজাহানের মাতামহ, ইতিহাসে "মোটা রাজ।" নামে প্রসিদ্ধ। মোগলের অধীনতা স্বীকার এবং মুসলমানকে কন্যাদান করিয়া রাজপুত নৃপতিগণের নৈতিক অবনতি ও ধর্ম্মে উদাসীনতার প্রথম দৃষ্টান্ত এই "মোটা রাজ।" উদয়সিংহ।

মারবাড়ে উদয়সিংহের পূর্ব্বজগণ অনেক ভূমি নিষ্কর দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিয়াছিলেন। মোগল দরবারে ঠাট বজায় রাখিবার খরচ অনেক, যুদ্ধবিগ্রহে রাজকোষ শূন্য; সুতরাং উদয়সিংহ এই সমস্ত নিষ্করভূমি যাচকগণের নিকট হইতে বাজেয়াপ্ত করিয়া খাস দখল লইতে আরম্ভ করিলেন। এই সমস্ত যাচককে লোকে শ্রদ্ধা করিয়া "ষড়দর্শন"৩ (রাজস্থানী খটদর্শন) বলিত; বুদ্ধিমানেরা বলিত "খটব্রণ" অর্থাৎ ছয় ব্রণ; যথা—ব্রাহ্মণ, চারণ, যতি (জৈন সাধু), মঠধারী হিন্দুসন্ন্যাসী, শ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দিরসমূহের ক্ষত্রিয় সেবাইত এবং মুসলমান ফকির। রাজ্যে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল, চারণ জাতির নেতৃত্বে এই সমস্ত লোক সত্যাগ্রহ ঘোষণা করিয়া কয়েক হাজার সত্যাগ্রহী আউবা নামক গ্রামে এক শিবমন্দিরকে ঘিরিয়া ডেরা ফেলিল। ছয়দিন উপবাস করিয়াও আপোষ মীমাংসার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সত্যাগ্রহীগণ আত্মঘাতী হইবার সঙ্কল্প করিল। রাঠোর গোপালদাস চম্পাবত প্রভৃতি সর্দ্দারগণ উদয়সিংহকে বুঝাইতে গিয়া অপমানিত হইলেন। তিনি রাগিয়া বলিলেন, ধূর্ত্ত তোমরাই উস্কানি দিয়া যাহা করাইয়াছ উহার ফলভোগ কর। তখন উদয়সিংহের গদী চম্পাবত বীদাবত কুলের বর্শাফলকে ধৃত রাঠোর রাজলক্ষ্মীর পাদপীঠ নহে; উহা মোগলের অনুগ্রহ-প্রসাদ, দিল্লীর মসনদের পাশবালিশ।৪

যাহা হৌক, অবশেষে উদয়সিংহ ভেদনীতি প্রয়োগ করিয়া চারণদিগের ধর্ণা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বারহঠ অখৈরাজ চারণকে আদেশ করিলেন, ধর্ণায় গিয়া ঘোষণা করিবে যাহারা অন্যের প্ররোচনায় অপরাধ করিয়াছে তাহারা অপরাধীগণের সঙ্গ ত্যাগ করিলে নিজ নিজ ভূমি ফেরত পাইবে, তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া তামাশা দেখুক। অখৈরাজ এরূপ হীন দৌত্যে স্বজাতির নিকট যাইতে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে মহারাজা তাঁহাকে যাইতে বাধ্য করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দরাম ঢোলীকে পাঠাইলেন।

সেইদিন সত্যাগ্রহী শিবিরে মহা ধুমধাম্। অম্বাদেবীর প্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজার আয়োজন চলিয়াছে; অখৈরাজকে পাইয়া চারণকুল দ্বিগুণ উৎসাহিত হইল, সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া প্রশংসাবাদ করিতে লাগিল। ডেরা হইতে অখৈরাজ ও গোবিন্দরাম আর ফিরিল না। উদয়সিংহ রাগান্ধ হইয়া অখৈরাজের কাছে "কাটার" (তলোয়ার) পাঠাইয়া দিলেন। সত্যাগ্রহীগণ নিজ নিজ কাটার দেবীর সম্মুখে রাখিয়া যথাবিধি রণবাদ্যসহযোগে হোম ও অস্ত্রপূজা করিল, অস্ত্রে দেবীর আবাহন হইল। পূজার পরে ছয়দিনের উপবাসী সত্যাগ্রহীগণ দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিল, পংক্তিতে একজন সদ্যবিবাহিত বর বসিয়াছিল। তাহার বাপ খেড়িয়া শাখার বুঢ়া নামক চারণ ভোজনপ্রিয় ছিল, উপবাস সহ্য করিতে না পারিয়া সে ধর্ণা হইতে পলাইয়া গিয়াছিল। ঐ দিন তাহার পুত্র বিবাহ করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। পিতার ভীরুতায় লজ্জিত হইয়া পুত্র নববধূকে ঘরে ফেলিয়া মরণ যাত্রা করিল। পরিবেশনকারীগণের মধ্যে একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল, দুলহার (বর) সামনে দুইখানা পাত দাও, বাপের জন্য একখানা বাড়ী লইয়া যাইবে! চারণের ক্রোধ আছে, প্রতিশোধ লওয়ার শক্তি আছে, কিন্তু

৩। বংশভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ, ২২৭৭, পাদটীকা

• আউবার ধর্ণার জন্য দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃঃ ২২৭৭-৮০।

৪। মোটারাজার বংশধর মহারাজা অভয় সিংহের পুত্র রামসিংহ তাঁহার হিতৈষী চম্পাবত সর্দ্দারকে বলিয়াছিলেন আপনার মুখখানা যত কম দেখা যায় ভাল। চম্পাবত সজোরে নিজের ঢাল মহারাজার সামনে ছুঁড়িয়া উল্টা করিয়া বলিলেন, যুবক, তুমি রাঠোরকে অপমান করিয়াছ; রাঠোর এই মারবাড়কে এমন করিয়াই উলট-পালট করিতে পারে।

চারণের পক্ষে বৈর নিষিদ্ধ। চারণ অস্ত্রের দ্বারা পরের উপর প্রতিশোধ লইতে পারে না, নিজের উপর চালাইতে পারে।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঢোল দামামার রণবাদ্য বাজিল, নানাবিধ রাগসহযোগে দেবীর ছন্দোবদ্ধ স্তুতি পাঠ হইল। গোবিন্দ ঢুলীর উপর ভার দেওয়া হইল শিব-মন্দিরের ছাদে জাগিয়া থাকিয়া সূর্য্য আধা আধি উঠিলে সে সকলকে মরণ সঙ্কেত জ্ঞাপন করিবে। পরের দিন গোবিন্দের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ সত্যাগ্রহীগণকে মৃত্যুর আহ্বান জানাইল। যে বীভৎস দৃশ্য দেখিবার ভয়ে গোবিন্দ সর্ব্বপ্রথম আত্মহত্যা করিয়াছিল উহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। উন্মত্তের মত হাজার হাজার চারণ নিজের অস্ত্রে নিজের দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া মরিল। বুঢ়া চারণের বীরপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিল, কাটারের এই প্রথম চোট্ পিতার প্রায়শ্চিত্ত; দ্বিতীয় চোট্, জ্ঞাতিঋণ হইতে আমার মুক্তি—এই বলিয়া দুইবার পেটে কাটার চালাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। প্রকৃত বীরত্বের পুরস্কার কাহার প্রাপ্য? ঢোলীর? চারণের না রাজপুতের?

আউবার সত্যাগ্রহের পর চারণ-হত্যার পাপস্পর্শের ভয়ে মারবাড়ের প্রজা কয়েক বৎসর উদয়সিংহের নাম মুখে আনে নাই, রাজার মুখ দেখিবার ভয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়াছে, ভাট চারণ তাঁহার কুকীর্ত্তি ইতিহাসে অক্ষয় করিয়া গিয়াছে। যোধপুর রাজ্যের চারণ লাখা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেশত্যাগ করিয়া মথুরায় ঘর-বাড়ী করিয়াছিলেন এবং জায়গীরদারের মত ঠাকুরালি ঠাটে থাকিতেন। তিনি শপথ করিয়াছিলেন উদয়সিংহের মুখ দেখিবেন না, যোধপুরেও পদার্পণ করিবেন না। উদয়সিংহ তীর্থযাত্রার জন্য মথুরা গিয়াছিলেন; আসল উদ্দেশ্য ছিল কোনপ্রকারে লাখার ক্রোধ শান্ত করিয়া দেশত্যাগী চারণগণকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা। মহারাজা উপযাচক হইয়া উপর্য্যুপরি তিনদিন লাখার সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন লাখা বাহিরে আসিলেন না। চতুর্থ দিন মহারাজা আবার উপস্থিত হইলেন। এইবার গৃহিণীর কড়া হিতোপদেশে দিশাহারা হইয়া বৃদ্ধ চারণ শপথ ভুলিয়া গেলেন। উদয়সিংহ চারণ, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদিকে ভূমি প্রত্যর্পণ করিলেন। লাখা চারণের বংশজ লাখাবত চারণ মারবাড়ে এখনও নিষ্করজমি ভোগ করিতেছে।

৫। ঢোলী ভাট জাতির এক সম্প্রদায়, উহার অপর নাম জাঙ্গরা অর্থাৎ সাহসী-লড়িয়া যুদ্ধের বাজনায় উহারা সম্ভবতঃ ঢোল বাজাইয়া যোদ্ধাদিগের বংশকীর্ত্তি গান করিত।

৪

মারবাড়বাসী ভাট ব্রজলাল "ঢোলী"[৫] আকবর বাদশাহের মজলিসে চারণের দাপট ও জাতের বড়াই সহ্য করিতে না পারিয়া চারণ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কুল—কুলমগুল[৬] নামক হাস্যরসাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়া দরবারে পেশ করিয়াছিল। ব্রজলালের বিদ্যা বেশী ছিল না, ব্যঙ্গ এবং নিন্দায় কিন্তু নিপুণ ছিল। ব্রজলালের গ্রন্থবিচারের সময় চারণগণের ডাক পড়িল। চারণেরা ভাটের নিন্দার জবাব দিতে পারিল না, মজলিসে চারণের মাথা হেঁট হইল। চারণ লাখা তাঁহার কুলগুরু জয়সলমীর রাজ্যের অন্তর্গত জাজিয়াঁ গ্রাম নিবাসী পণ্ডিত গঙ্গারামকে দরবারে আনাইয়া ভাটদিগকে বিচারে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিত গঙ্গারাম সম্রাট্ আকবরের নিকট প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রন্থ শিব-রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া চারণ জাতির উৎপত্তি সিদ্ধ করিলেন; ভাট কোন জবাব দিতে পারিল না, তাহারা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইল। সম্রাট গঙ্গারামের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া উজ্জয়িনীর নিকট তাঁহাকে ৫২ হাজার বিঘা জায়গীর দিয়াছিলেন।[৭]

আউবা গ্রামের বারহঠ চারণ মহামহোপাধ্যায় মুরারিদানজী বর্ত্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চারণ জাতির তৎকালীন কুলগুরু শক্তিদানজীর (গঙ্গারামের বংশজ) নিকট প্রাপ্ত এক পরোয়ানার প্রতিলিপি পণ্ডিত গুলেরীকে দিয়াছিলেন। উহার গুলেরীকৃত সঠিক হিন্দী অনুবাদের মর্ম্মার্থ:[৮]

৬। কুল, বরণ, চারণ একার্থবাচক শব্দ।

৭। দ্রঃ গুলেরী গ্রন্থ (না. প্র. সভা), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৫৪-২৬২।

দরবারী ইতিহাসে নাম না থাকিলেও চারণ লাখা নিঃসন্দেহে আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। লাখা-র বংশ লাখাবত চারণ এখনও মারবাড়ে বিভিন্ন জায়গায় বর্ত্তমান। উহাদের প্রধান ঠিকানা মেড়তা পরগণার ঠহলা গ্রাম। চারণ লাখার নামে দুইখানা পাট্টা ঠহলা গ্রামে পাওয়া গিয়াছে, তারিখ যথাক্রমে বিক্রম সম্বত ১৬৫৮ এবং ১৬৭২। উহার মধ্যে লাখার পুত্র নরহরদাস এবং গিরিধরের নাম আছে। একখানা পাট্টার দাতা উদয়সিংহের পুত্র দলপতসিংহ, দ্বিতীয় পাট্টার দাতা মহারাজ কুমার সুরসিংহ এবং গজসিংহ।

উজ্জয়িনীতে চারণদিগের কুলগুরু গঙ্গারামের বংশধর শক্তিদানজীর বাড়ীতে পরলোকগত পণ্ডিত চন্দ্রধর শর্ম্মা গুলেরী ঐতিহাসিক দলিল অনেক দেখিয়াছিলেন, এবং কয়েকখানির নকল লইয়াছিলেন (পৃঃ ২৫২ পাদটীকা)। পণ্ডিত গুলেরী প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মুন্সী দেবীপ্রসাদজীর নিকট হইতে লাখা সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছিলেন উহা লিখিয়াছেন।

৮। পরোয়ানার চারি কোণে চারিটা গোল মোহরের মধ্যে লেখা আছে—(॥ শ্রী ॥ শ্রীদীলীপত পাতসাহজী শ্রী ১০৮ শ্রী অকবর সাহজী বংদে দবাগীর বারহঠ লখা)।

লিখ্যতাম্ (লীষাবর্তা) শ্রীলখোজী তথা সমস্ত বিসোত্রা (১২০ গোত্রীয়) চারণ-বরণ প্রধান, জয় শ্রীজী মাতাজী৯ বাচণপূর্ব্বক···আগ্রা-সিংহাসনাসীন অষ্টোত্তর-শতশ্রী শ্রীআকবর সাহজীর হুজুরে দরীখানায় (দেওয়ান-ই-আম) ভাট চারণদিগের কুল সম্বন্ধে নিন্দা করিয়াছিল (নিন্দক কীধৈ) সমস্ত রাজা মহারাজা ঐখানে উপস্থিত ছিলেন······উজ্জয়িনী পরগণায় বায়ান্ন হাজার বিঘা জমি পাতসাহজীর নিকট হইতে তাম্রপত্র লিখাইয়া গুরু গঙ্গারামজীকে দেওয়া হইয়াছে।···ইহা ব্যতীত গুরু এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি উত্তরাধিকারীগণকে প্রত্যেক চারণ বিবাহ উপলক্ষ্যে সাড়ে সতর টাকা (?) দান (ত্যাগ) দিবেক।···(চারণদিগের যাচক) মোতিসরকে যাহা দেওয়া হয় উহার দ্বিগুণ কুলগুরু গঙ্গারামজীর পুত্র-পৌত্রগণ পাইবেক···ইতি সম্বত ১৬৪১ (খ্রীঃ ১৫৮৫); পঞ্চোলী পান্নালাল কর্ত্তৃক বারহঠজীর (লাখার) হুকুমে আগ্রা শহরে সমস্ত পঞ্চায়ৎগণের সম্মুখে সম্মতিক্রমে লিখিত।

৫

চারণ জাতি যেমন যজমান ক্ষত্রিয়ের যাচক, এবং ক্ষত্রিয়ের দানের উপর তাহার ন্যায্য দাবী আছে, তেমন যজমান হিসাবে চারণের উপর নিম্নলিখিত সাত-কুলের১০ ন্যায্য দাবী এবং বিবাহাদি ব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট পাওনা আছে যথা:

(১) কুলগুরু (আদিগুরু উজ্জয়িনীবাসী পণ্ডিত গঙ্গারামের বংশজগণ)। চারণ যেমন ক্ষত্রিয়ের "অযাচক" অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতির নিকট চারণের যাচনা নিষিদ্ধ, তেমন এই গুরুবংশ চারণ জাতির "অযাচক"। চারণ ভিন্ন অন্য জাতির নিকট হইতে এই বংশের দান গ্রহণ নিষিদ্ধ।

(২) পুরোহিত—চারণদিগের প্রত্যেক শাখার বিভিন্ন পুরুষানুক্রমিক পুরোহিত আছে। গুজর-গৌড়, দাহিমা, ঔদীচ্য, সনাঢ্য, ইত্যাদি সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ চারণ জাতির পৌরোহিত্য করেন; ধর্ম্মকার্য্যে, জন্ম বিবাহাদির সময় দান পাইয়া থাকেন, যাহাকে "দাপা" বলে। পুরোহিতেরা চারণের "উদক-ডহোলী" (জল এবং ঘৃতপক্বান্ন?) খাইয়া থাকে।

(৩) মোতীসর—এই জাতি ঝালা, খিচী, পড়িহার, ইত্যাদি রাজপুত বংশীয়। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সংসার ধর্ম্ম এবং ক্ষত্রিয় বৃত্তি ত্যাগ করিয়া চারণ জাতির কুল-দেবী আবর দেবীর উপাসক হইয়াছিল। দেবী উহা-দিগকে "মোতীসর" অর্থাৎ মুক্তালহরী নাম দিয়াছিলেন। উহাদিগের বংশধরগণ ক্ষত্রিয় জাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া চারণ জাতির যাচক হইয়াছিল। দেবী মোতীসরকে বর দিয়াছিলেন, তোমাদের বংশধরগণ লেখাপড়া শিক্ষা না করিয়া কবিতা রচনা করিতে পারিবে, এবং যে হাকরা সমুদ্র-কে১১ আমি শুখাইয়া ফেলিয়াছি ঐ সমুদ্র যে পর্য্যন্ত পিছে সরিয়া না আসে ততদিন তোমাদের বংশ অক্ষয় থাকিবে।

যেমন রাজপুতের স্তাবক চারণ জাতি, সেরূপ চারণের স্তুতিপাঠক ও বংশাবলী-রক্ষক এই মোতীসর সম্প্রদায়।

কোন চারণকে উচ্চ প্রশংসা করিয়া কিছু আদায় করিবার সম্ভাবনা থাকিলে মোতীসর তাঁহাকে বলে, "অবরী কা কেড়" অর্থাৎ অবরী-মাতার সন্তান।১২

(৪) "রাও"-ভাট—ইহারা ভাট জাতির চণ্ডীসা শাখার এক বংশ। রাও-ভাট সম্প্রদায় চারণ এবং রাঠোর রাজপুতের আশ্রিত যাচক, এবং এই দুই জাতি হইতে দাতব্য পাইয়া থাকে। যোধপুরে চারণদের মত রাও-ভাটের "শাসন" অর্থাৎ মৌরসী নিষ্কর গ্রাম (ধর্ম্মোত্তর) আছে।

(৫) "রাবল"-ব্রাহ্মণ—নাগেই (নাগিনী?) শক্তি-মাতার দৈবাদেশে ইহারা ব্রাহ্মণ-সমাজ ত্যাগ করিয়া মদ্য, মাংস ভোজন আরম্ভ করিয়াছিল, এবং চারণ জাতির আশ্রিত যাচক রূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

(৬) বীরমপোতা ঢোলী—কোন কোন স্থানে ইহা-দিগকে ধোলা বলা হয়। সাধারণ ঢোলী জাতের মধ্যে বীরমপোতা ঢোলী কিঞ্চিৎ কুলীন এবং মানে বড়।

(৭) ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মারবাড় রাজ্যের আউবা গ্রামে চারণ ও অন্যান্য যাচক সম্প্রদায়ের যে ধর্ণা হইয়াছিল উহাতে গোইন্দ ঢোলী (গোবিন্দ) প্রাণদান করিয়া সুরলোকপ্রাপ্ত হইয়াছিল। মহারাজা উদয়সিংহ

৯। এই মাতাজী চারণকুলে ভগবতীর অবতার শ্রীকরণীজী। চারণেরা ইঁহাকে বুআজী বলে। হিন্দু পরস্পরকে সর্ব্বসাধারণ "রাম, রামজী" বলিয়া অভিবাদন করে। চারণেরা কিন্তু "জয় মাতাজী কী" বলিয়া থাকে। করণীজীর মন্দির রাজপুতানার একটি বিখ্যাত তীর্থস্থান (দ্রঃ গুলেরী গ্রন্থ, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৫৭, পাদটীকা)।

১০। দ্রষ্টব্য—বংশভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ৮০-৮১।

১১। এই নামের সমুদ্র কোথায়? সিন্ধুর এক উপনদীর নিম্নাংশকে হাকরা বলা হইত। প্রাচীন মানচিত্র দ্রষ্টব্য।

১২। দ্রঃ গুলেরী প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৪২।

রাঠোরের এই নাগরা-বাদক ঢোলী নিঃস্বার্থভাবে ধর্ণার সামিল হইয়া ভাবের আবেগে সকলের আগে নিজের গলা নিজে কাটিয়াছিল। হিন্দুর ভীষ্মতর্পণের মত চারণ জাতির শ্রদ্ধার দান মধ্যযুগে গোবিন্দের বংশধরগণ পাইয়াছিল এবং অধ্যাবধি পাইতেছে। ইহা চারণ জাতির উদার অনুপম বীর-পূজা।১৩

৬

অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মত চারণ জাতির ধর্ম্ম পাঁচ-মিশালী। চারণদিগের "পোষাকী" ধর্ম্ম পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম; কিন্তু অধিকতর জনপ্রিয় আটপৌরে ধর্ম্ম তান্ত্রিক শক্তি উপাসনা।১৪

চারণগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, চারণ জাতির আদি উপাস্য দেবতা "বিষ্ণু"; কেহ কেহ বলেন, মহাভারতোক্ত ভীষ্মপর্ব্ব, অধ্যায় ২৩ "শক্তি" (Divine Energy, যাঁহাকে বলা হইয়াছে—"তুষ্টিঃ, পুষ্টিধৃতি-দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্য বিবর্ধিনী।" যাহা হোক্ চারণ বৈষ্ণব হইলেও নিরামিষাশী নহেন, যেহেতু প্রভাস তীর্থে যদু-কুলের বনভোজনের সময় শ্রীকৃষ্ণ শাকাহারী অক্রুর প্রভৃতি বৃদ্ধগণের পংক্তিতে বসেন নাই; যে পংক্তিতে বসিয়াছিলেন ঐ পংক্তিতে "মরিচ ও লশুণ সহযোগে ভর্জ্জিত মহিষশিশু" পরিবেশন করা হইয়াছিল—প্রমাণ হরিবংশ! চারণদের মধ্যে সচরাচর কণ্ঠি-তিলকধারী দেখা যায় না। উহাদের প্রত্যেক শাখার উপাস্য মাতা আছেন। "মাতা"-র সিন্দুররঞ্জিত প্রতীক্ এক ঝাঁপিতে প্রত্যেক বাড়ীতে রাখা হয়। গৃহদেবতা রূপে ইনিই প্রথম পূজা পাইয়া থাকেন।

মধ্যযুগে চারণ জাতির আচরিত ধর্ম্ম প্রকৃতই তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, দীপ্তি এবং "সূর্য্যচন্দ্রবিবর্দ্ধনকারী" ছিল। চারণ স্বল্পে সন্তুষ্ট ছিল এবং স্তুতিদ্বারা ক্ষত্রিয় যজমানের তুষ্টি-পুষ্টি-দীপ্তি বর্দ্ধন করিত। ধৃতি ও তেজ চারণের চরিত্রে বিলক্ষণ ছিল। চারণ ধৃতির দ্বারা রাজপুত সমাজের ধারক হইয়াছিল; সূর্য্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের কীর্ত্তি ও দীপ্তি চারণের গাথায় ভাস্বর হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালী এবং সেকালে চারণের ঘরেই ভগবতীর আবির্ভাব ও অবতারের কথা শুনা যায়। নাগেহী মাতা এবং করণীজী মাতা চারণ ও রাজপুত উভয় জাতির বিশেষ পূজ্যা। সঙ্কটের সময় রাজপুত শক্তিমাতার পূজারিণীগণের কাছে ভবিষ্যৎ বাণীর জন্য ধর্ণা দিতেন।

করণীজী সম্বত ১৪৪৪ (খ্রীঃ আনুমানিক ১৩৮৭) মারবাড়ের খাপ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত দেস্‌ণোক১৫ গ্রামে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। সিদ্ধিলাভের পর করণীজী-মাতার অলৌকিক শক্তির খ্যাতি বিকনীর ও জয়সল-মীরের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সময়ে বীদাবত রাঠোর এবং পুগলের (বর্ত্তমান বিকানীর রাজ্যের অন্তর্গত) ভট্টি বংশের বৈর চরমে উঠিয়াছিল। যখন এই বিবাদে রাঠোর ও ভট্টি নির্ম্মূল হইবার উপক্রম, তখন সুযোগ বুঝিয়া মরুভূমির অপর পার হইতে সিন্ধু-দেশের মুসলমানগণ পশ্চিম রাজপুতনায় হানা দিতেছিল। করণীজী-মাতা বিবদমান রাঠোর এবং ভট্টিকুলের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া রাজপুতকুলকে সমূহ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন১৬।

বিকানীরের রাও জৈত্‌সী দেস্‌ণোক্ গ্রামে, যেখানে মাতা করণীজীর দেহরক্ষা হইয়াছিল, ঐখানে করণীজীর সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ মন্দির এখনও বিদ্যমান। অভিষেকের পর বিকানীরের প্রত্যেক রাজা মাতাজীর সমাধির উপর সোনার ছাতা উৎসর্গ করিয়া থাকেন১৭। দেস্‌ণোকের মন্দিরে চুহার (ইঁদুরের) রাজত্ব, চারণেরা সেবাইত এবং ইঁদুরের পাহারাদার! সমস্ত নাটমন্দির [জগমোহন], ভিতরে আসল মন্দির এমন কি প্রতিমা পর্য্যন্ত ইঁদুরে সর্ব্বদা ঢাকা থাকে। দর্শনার্থীগণের পায়ে, গলায়, মাথায় উঠিয়া ইঁদুর খেলা করে। ইঁদুরের জন্য প্রত্যহ বাজরা শস্যের রসদ বরাদ্দ আছে। ইঁদুরকে মারা দূরের কথা, তাড়াইলেও মহাপাপ হয়। যদি কাহারও অনবধানতার জন্য ইঁদুর মারা যায় তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে মন্দিরে সোনার ইঁদুর চড়াইয়া দেবীর ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে হয়। মূষিক জাতির আহার নিদ্রা, মলত্যাগ, বংশবৃদ্ধি ও ক্রীড়াকৌতুকাদি সর্ব্ব কার্য্যই মন্দিরের ভিতর। স্তূপাকৃতি ইঁদুর লাদির গন্ধে নাকে কাপড় দেওয়াও নিষিদ্ধ। ইঁদুরের লোভে বিড়াল মন্দিরে হানা দেয়; কিন্তু সজাগ দশ-বার জন চারণ

১৩। পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। যাচকগণের এই বিবরণ বংশ-ভাস্কর (দ্বিতীয় ভাগ, ভূমিকা পৃঃ ৮০-৮১) হইতে অনুবাদ করা হইয়াছে।

১৪। পণ্ডিত গুলেরীর মতে চারণেরা শাক্ত, ভগবতী ইহাদের কুলদেবী। দ্রঃ গুলেরী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৫৭ পাদটীকা।

১৫। দেস্‌ণোক্ বিকানীর ষ্টেশনের আগের ষ্টেশন।

১৬। দ্রষ্টব্য, বংশভাস্কর ভাগ ২, ভূমিকা পৃঃ ৬৫।

১৭। ঐ পৃ ৮২।

প্রহরীর মোটা লাঠির ভয়ে পলাইয়া যায়, কিংবা আঘাতে মারা পড়ে। মন্দিরের মূষিক অক্ষৌহিণীকে আদর করিয়া বলা হয় "করণীজীরা কাবা"১৮। অর্থাৎ করণীজীর লুঠেরা; সুতরাং ভক্তকে মূষিকের দাবী মিটাইতে হইবে, উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে! বিকানীরের মূষিক মাতাজীর মন্দিরে তীর্থযাত্রা করে, কিন্তু কোনটা ফিরিয়া যায় না।

যাহা হোক করণী মাতা মূষিককে মন্দিরে প্রতিপালন করিয়া ঐ দেশকে ছয় "ই্তি"র মধ্যে এক "ইতি" (calamity) বা ব্যাপক উপদ্রবের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শলভ বা পঙ্গপালের উপদ্রব বিকানীরে প্রায় প্রতি বৎসর হয়; কিন্তু ঐ দেশে মূষিকের ব্যাপক উপদ্রবে দুর্ভিক্ষ ঘটে নাই।

৭

করণজীর "কাবা" (লুঠেরা) কেবল উহার আশ্রিত মূষিক নহে; সমগ্র চারণ জাতিই মাতাজীর কৃপাপাত্র "কাবা", যাহারা অহিংস উপায়ে রাজস্থানের ছোট বড় রাজপুত মাত্রকে লুট করিয়াছে, এবং এখনও করিতেছে। চারণ যাচকের উপদ্রব যজমান বাড়ীতে বিবাহের সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং উপভোগ্যও বটে। কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কায়, চারণের জ্বালায় বোধ হয় সেকালে রাজপুত সমাজে গোপনে সদ্যজাত কন্যাসন্তানকে বধ করার কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। রাজপুত অতি গরীব হইলেও বিবাহের সময় দায়ে পড়িয়া চারণের কাছে তাহাকে দাতাকর্ণ হইতে হয়, না হইলে মান থাকে না। যজমান বাড়ীতে বিবাহে চারণ যেরকম উপদ্রব করে, চারণ বাড়ীর বিবাহে চারণের যাচক মোতীসর সম্প্রদায়ও অনুরূপ উপদ্রব করে; না করিলে বিবাহের আনন্দই অপূর্ণ থাকে। চারণ হাত জোড় করিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া ভিক্ষা কিংবা দান প্রার্থনা করে না, চোখ রাঙ্গাইয়া হট্টগোল করিয়া জঙ্গী মেজাজে তাহার নেগ দাবী করে। নেগের পরিমাণ চারণের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। উহা লইয়া দুই পক্ষে বচসা হয়, কৃত্রিম ঝগড়া হয়; কিন্তু রাজপুত রাগ করিতে পারিবেন না, বলপ্রয়োগ না করিয়া তাঁহাকে হাসিতে হইবে। চারণের প্রধান অস্ত্র নিজের রক্তপাত ঘটাইবার ভয় প্রদর্শন; উহাতেই রাজপুত চারণ-কাবার কাছে কাবু হইয়া পড়ে। রাজবাড়ীতে এবং বড় বড় ঠিকানার ঠাকুরগণের বাড়ীতে তাঁহাদের দ্বারস্থ চারণ ব্যতীত রবাহূত চারণেরা আসিয়াও ভিড় জমায়। যজমানের উপর জুলুম করিবার অধিকার থাকে একমাত্র বারহঠ বা দ্বারস্থ চারণের। অন্যান্য চারণের জুলুম হইতে যজমানকে বাঁচাইবার দায়িত্ব বারহঠ চারণের; তবে সকলকেই কিছু কিছু দেওয়াইতে হয়, নতুবা যজমান ও দ্বারস্থ চারণের নিন্দা রটিয়া যায়।

রাজপুতানার চারণ বাঁকুড়া জিলার ব্রাহ্মণ নয়, যাঁহাদের সম্বন্ধে প্রবাদ আছে—বিচারের বেলায় সকলের পিছে, বিদায়ের বেলা সকলের আগে। দ্বারস্থ বারহঠ চারণ বিবাহে "নেগ" আদায় করিবার সময় যেমন সকলের অগ্রণী, যুদ্ধের সময় দুর্গতোরণ খুলিয়া শত্রুর প্রথম আঘাত বুক পাতিয়া লইয়া প্রাণ দিতেও তেমনই পুরোগামী। চারণ যুদ্ধ ব্যবসায়ী নয়, যুদ্ধে চারণ অবধ্য; কিন্তু চারণ সর্ব্বদা যুদ্ধে তাহার যজমানের পার্শ্বেই থাকে, যজমানের শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করে।

চারণদিগের মধ্যে বারহঠ চারণের সম্মান অধিক, দায়িত্বও গুরুতর। বাংলাদেশের রাজা ও জমিদারগণের যেমন সেকালে দ্বারস্থ পুরোহিত ও পণ্ডিত থাকিত সেইরূপ রাজপুতানায় রাজা ও ঠাকুরদের দ্বারস্থ পুরোহিত ও চারণ এখনও আছে, কিন্তু পঁচিশ বৎসর পরে থাকিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। পাণ্ডবকুলের পুরোহিত ধৌম্যের ন্যায় রাজপুতের পুরোহিত যজমানের সহিত মধ্যযুগে নির্ব্বাসন ক্লেশ ভোগ করিয়াছে, অধিকন্তু যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিয়াছে। ডিঙ্গল বারহঠ ও দ্বারহঠ একার্থবাচক শব্দ, বারহঠকে পোতপালও বলা হয়। "পোত" সংস্কৃত প্রতৌলী শব্দের অপভ্রংশ—যাহার অর্থ গোপুর [দুর্গের প্রধান ফাটকের সংলগ্ন সুরক্ষিত বুরুজ (Tower)]। রাজপুত স্বগোত্র অপেক্ষা অন্যকে অধিক বিশ্বাস করিয়া থাকে, যেহেতু জ্ঞাতির সমান যেমন মিত্র নাই, জ্ঞাতি অপেক্ষা বড় শত্রুও নাই [মহাভারত শান্তিপর্ব্ব]। ক্ষত্রিয় রাজ্যলোভী, কিন্তু চারণ জাতির ঐ দোষ ছিল না, বিশ্বাসঘাতক চারণের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই জন্য চারণকে হয়ত কোনকালে গোপুর-রক্ষক বা পোতপাল নিযুক্ত করা হইত। যে রাজপুতের দুর্গ নাই তাহার বাড়ীর সদর দরজাই প্রতৌলী বা পোত; ঐখানে দাঁড়াইয়া যে চারণের ত্যাগ দাবী করিবার অধিকার তাহাকেই যজমানের

১৮। দ্রষ্টব্য গুলেরী প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৫৭ পাদটীকা। যে সমস্ত আভীর প্রভৃতি দস্যুজাতি অর্জ্জুনকে পরাজিত করিয়া যদুনারী হরণ করিয়াছিল। তাহাদের বংশধর বুক ফুলাইয়া লাঠির জোরে দ্বারকাযাত্রী আর্য্যসন্তানগণের নিকট হইতে এখনও দান (Black mail) আদায় করে! ইহাদিগকে সম্মানার্থে কাবা (পূজ্য ডাকাত) বলা হয়।

বারহঠ বা পোতপাল বলে। যেখানে দুর্গ আছে সেখানে ফাটকের উপর-তলা বারহঠের সরকারী বাসস্থান; কেহ কেহ ফাটকের সামনে তাঁবু ফেলিয়াও মাতব্বরি করিত। কালক্রমে ফাটকে পাহারা দেওয়ার কাজ রাজপুত যোদ্ধাই করিত; তবুও চারণের পোতপাল নাম রহিয়া গেল। উনবিংশ শতাব্দীতে এক বিদ্রোহী ঠাকুরকে দমন করিবার জন্য যোধপুরের মহারাজা সিপাহী ও তোপখানা পাঠাইয়াছিলেন। তোপের মুখে দুর্গের ফাটক টিকিবে না দেখিয়া বিদ্রোহী সামন্ত বাহিরে সন্মুখ-যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তুমুল গোলাবর্ষণের মধ্যে ফাটক খুলিবে কে? পোতপাল চারণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল, এই ফাটকে দাঁড়াইয়া আমি বরপক্ষের নিকট হইতে "নেগ" আদায় করিয়াছি, আমি ছাড়া ফাটক কে খুলিবে? পোতপাল ফাটক খুলিয়া বাহির হইতেই গোলা লাগিয়া ধরাশায়ী হইল।১৯

৮

চারণ জাতির মধ্যে সোদা চারণ শিশোদিয়া কুলের, রোহড়িয়া চারণ রাঠোর কুলের, এবং সিরোহার দেবড়া চৌহান বংশের বারহঠ দুরসাবত শাখার চারণই হইয়া থাকে। বারহঠ নির্ব্বাচনের সহিত এই সমস্ত কুলের ইতিহাস জড়িত আছে। মিবাড়ের ইতিহাসে সোদা বারহঠ সাহস আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমে অতুলনীয় ছিল। সোদা বারহঠ না হইলে শিশোদিয়া বংশ আলাউদ্দীনের চিতোর অধিকারের পর চিতোর পুনরুদ্ধার করিতে পারিতেন না, মিবাড়ের ইতিহাস হইতে হয়ত শিশোদিয়া চিরবিদায় লইতেন।

মহারাণা হম্মীর চিতোর উদ্ধারের জন্য বারবার চেষ্টা করিয়াও যখন বিফলমনোরথ হইলেন, সেনাবল ও অর্থ নিঃশেষ হইল তখন তিনি হতাবশিষ্ট অনুচরবর্গকে লইয়া পদব্রজে দ্বারকা যাত্রা করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে মহারাণা কাঠিয়াবারে গিরণার (প্রাচীন রৈবতক) দুর্গের নিকট দেথা গোত্রীয় চারণ বারুর নিবাস খোর গ্রামে রাত্রি যাপনের জন্য বারুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বারুর মাতা বরবড়ী ভগবতীর অবতার এবং অলৌকিক শক্তিসম্পন্না বলিয়া ঐ সময়ে প্রসিদ্ধা হইয়াছিলেন। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি চারণী মাতাকে বলিলেন দ্বারকায় শরীর ত্যাগ করিবার জন্যই যাইতেছেন। চারণী মাতা তাঁহাকে শরীর ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, তুমি চিতোরে ফিরিয়া যাও, চিতোর তোমার অধিকারে আসিবে। হম্মীর ইহা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি জানাইলেন, তাঁহার কাছে একটা ঘোড়াও অবশিষ্ট নাই, যোদ্ধা নাই, যুদ্ধ-সামগ্রী নাই; এই অবস্থায় চিতোর রাজ্য উদ্ধার করা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তিনি বলিলেন, আমার পুত্র বারু পাঁচ শত ঘোড়া তোমাকে ঠিক সময়ে পৌঁছাইয়া দিবে। ইতিমধ্যে তুমি দেশে রাজপুত জমা কর, বিবাহের কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে বিবাহ করিও, চিতোর রাজ্য পাইলে ঘোড়ার দাম দিতে পার, না হয় ঘোড়া আমি ভেট দিলাম জানিবে। হম্মীর মিবাড়ের কৈলবারা পরগণায় পৌঁছিবার পর বারু পাঁচ শত ঘোড়া লইয়া আসিল এবং তিনি জালোরের রাও মালদেব সোনগরা চৌহানের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য জালোরে চলিলেন। বিবাহের পর স্ত্রীর নিকট হইতে হম্মীর জানিতে পারিলেন স্ত্রী পূর্ব্বেই বিধবা হইয়াছিল, তাঁহার পিতা ছল করিয়া এই বিবাহ দিয়াছেন। স্ত্রীর পরামর্শে হম্মীর শ্বশুরের বিশ্বস্ত অমাত্য মৌজীরামকে হাত করিলেন। একদিন শিকার খেলিবার ভান করিয়া তিনি জালোর হইতে দ্রুত চিতোরের দিকে চলিলেন এবং মৌজীরামকেও সঙ্গে লইলেন। ইহার পরে একদিন আধারাতে চিতোরের দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইয়া মৌজীরাম হাঁক দিল ফাটক খোল। মৌজীরামের গলার স্বর চিনিতে পারিয়া মানসিংহের দ্বাররক্ষী ফাটক খুলিয়া দিল, চিতোরের দুর্গ-প্রাকারে আবার শিশোদিয়ার বিজয়পতাকা উড়িল।

চারণী মাতার উপকার স্মরণ করিয়া মহারাণা হম্মীর বারুকে শিশোদিয়া বংশের পোতপালরূপে গ্রহণ করিলেন এবং সওদাগরী করিয়া চিতোর রাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া বারুর গোত্রের নূতন নাম রাখিলেন সোদা। মহারাণা হম্মীর সোদা বারহঠ বারুকে বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা আয়ের উদক-আঘাট২০ এবং

১৯। দ্রষ্টব্য গুলেরী, প্রথম ভাগ, পৃঃ ২৬৩ পাদটীকা।

২০। যে সমস্ত জমি চারণকে পুরুষানুক্রমিক সর্ত্তে দেওয়া হয় উহাকে উদক-আঘাট বা সংক্ষেপে উদক্ বলে।

যজমান দানের সময় কুশ ও জল হাতে লইয়া বলিবেন—তুভ্যমহং সংপ্রদদে ইদং ন মম। তাম্রপত্রে উদক্ শব্দের সহিত আঘাট শব্দ (আঘাট সীমায়াম্) লেখা থাকে। তাম্রপত্রের নিম্নাংশে গরুড় পুরাণোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিত হয়—

স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যে হরন্তি বসুন্ধরাম্।
তে নরা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥

লাখপসাব২১ করিয়া আঁতরী গ্রাম দিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি চারণী মাতা বরুবড়ীকে খোর গ্রাম হইতে চিতোরে আনাইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহার চিতার উপর মন্দির তৈয়ার করাইয়াছিলেন। বরুবড়ী মাতার আসল নাম ছিল অন্নপূর্ণা; এই জন্য এই মন্দির অন্নপূর্ণার মন্দির নামে চিতোরে অদ্যাবধি প্রসিদ্ধ।

মহারাণা হম্মীরের পুত্র মহারাণা ক্ষেত্রসিংহ (খেতা) গৈণোলীর ভূ-স্বামী হাড়া চৌহান লালসিংহের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য বুন্দী গিয়াছিলেন। বরযাত্রী দলের মধ্যে বৃদ্ধ বারহঠ বারুও ছিলেন। লালসিংহ বারুকে দান গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেও বারু দান প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, বারু অপ্রতিগ্রহ ব্রত গ্রহণ করিয়া অযাচক হইয়াছিলেন; সুতরাং মিবাড়ের মহারাণা ব্যতীত অন্য ক্ষত্রিয়ের দান লইলে তাঁহার ব্রতভঙ্গ হয়। লালসিংহের জিদ চড়িয়া গেল। কোন পরামর্শ করিবার অছিলায় বারুকে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া বলিলেন, হয় আমার দান গ্রহণ কর, নতুবা অপমানিত হইবে। বারু ইহা শুনিয়া নিজের গলায় কাটার হানিয়া মৃত্যু বরণ করিলেন (বিঃ ১৪৩৯ = খ্রীঃ ১৩৮২)। কিছুদিন পরে যুদ্ধ-সজ্জা করিয়া বারুর বৈর প্রতিশোধের নিমিত্ত ক্ষেত্রসিংহ বুন্দী আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের আঘাতে জামাতা ও শ্বশুর দুই-জনই একত্র স্বর্গবাসী হইলেন।

৯

একদিন মহারাণা করণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার জগৎসিংহ অশ্বারোহণে সানুচর উদয়পুরের কিসনপোল দরওয়াজার বাহিরে খরগোস শিকার করিতে চলিয়াছেন। শহরের ফাটক অতিক্রম করিবার পর একজন অশ্বারোহী রাজপুত অলক্ষ্যে কুমারের অনুসরণ করিতেছিল। সুযোগ পাইয়া ঐ রাজপুত কুমারের সম্মুখীন হইয়া হুঙ্কার ছাড়িল—এই

উদক-দত্তভূমির সীমার মধ্যে যদি কাহারও চাকরান্ জমি কিংবা জায়গীর থাকে উহার উপর গ্রহীতার পূর্ণ অধিকার হয়, উদক্ আঘাট বাসী সমস্ত প্রজা গ্রহীতার শাসনাধীন হয়। এই জন্য এই ভূমিকে শাসনও বলে। (দ্রষ্টব্য বংশভাস্কর, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা পৃঃ ৭৩-৭৪)

২১। লাখ পসাব (Lakh Pasav) শব্দ সংস্কৃত লক্ষ-প্রসাদ শব্দের অপভ্রংশ। লক্ষ-প্রসাদে এক লক্ষ মুদ্রা বা বস্তু বুঝায় না; লক্ষ বহু অর্থ-বাচক। ইহা একটি মহাদান, ইহাতে হাতী ঘোড়া তৈজস পত্রাদি ব্যতীত একটি গ্রাম নিশ্চয়ই হওয়া চাই। অতি প্রসিদ্ধ চারণ কবিগণকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই দান দেওয়া হইত।

বারহঠ বারুর আত্মবলিদান অতি শোকাবহ।

লও আমার ভাইয়ের মৃত্যুর পরিশোধ! এমন সময় নিমেষ মধ্যে আততায়ী রাজপুতের ছিন্ন বাহু অসিসহ ভূপতিত হইল, কুমার রক্ষা পাইলেন। কুমার তাঁহার প্রাণরক্ষাকারীর মুখ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু হাঙ্গামার পর তাঁহাকে কোথায়ও খুঁজিয়া পাইলেন না।

মহারাণা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হুকুম দিলেন রাজধানীতে উপস্থিত সমস্ত জায়গীরদারগণ নিজ নিজ ফৌজ লইয়া মহলের চত্বরে মুজরার (Review) জন্য হাজির হউক।

বাটরড়া ঠিকানার জায়গীরদার ভোপতরাম (মহারাণা প্রতাপের পুত্র সহসমলের পুত্র) যখন জমায়েত (Contingent) হইয়া চত্বরে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন কুমার এক অশ্বারোহীকে সনাক্ত করিয়া বলিলেন, এই অশ্বারোহী হত্যাকারীর হাত কাটিয়াছিল। এই অশ্বারোহী দধ্বাড়িয়া শাখার চারণ ক্ষেমরাজ। ক্ষেমরাজ সন্দেহবশতঃ যে রাজপুতকে অনুসরণ করিয়াছিল সে কচ্ছবাহ কুলের নরুকা শাখার রাজপুত। কুমার জগৎসিংহ তাহার ভাইয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিলেন এবং ভ্রাতার রক্তের প্রতিশোধ লওয়ার জন্য সে উদয়পুরে আসিয়াছিল।

মহারাণা করণ চারণ ক্ষেমরাজকে বলিলেন, আজ হইতে তুমি আমার চতুর্থ পুত্র। রাজ্যারোহণের পর জগৎসিংহ "ভাই ক্ষেমরাজ"-কে সত্তর হাজার টাকা আয়ের জায়গীর দিয়াছিলেন, ক্ষেমরাজের কন্যার বিবাহে সমস্ত অন্তঃপুরসহ ক্ষেমরাজের বাড়ীতে ১৫ দিন আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহারাণা রাজসিংহ ক্ষেমকরণকে "কাকো" (কাকা) ডাকিতেন।

জগৎসিংহের তাম্রশাসন বর্ত্তমানে ক্ষেমপুরের ঠাকুর চিমনসিংহ দধ্বাড়িয়ার (ক্ষেমরাজের বংশধর) কাছেই আছে।

আওরঙ্গজেবের বাহিনী উদয়পুর পৌঁছিবার পূর্ব্বে মহারাণা রাজসিংহ আরাবলী পর্ব্বতের দুর্গম অঞ্চলে পশ্চাৎ অপসরণ করিয়াছিলেন। সোদা বারহঠ নরু রাজধানীতে থাকিয়া মহারাণাকে শত্রুর গতিবিধির সংবাদ দিতেন এবং রসদ ইত্যাদি পাঠাইতেন। মহারাণা কোথায় আছেন উহা নরু ব্যতীত আর কেহ জানিত না। একদিন নরু ঘোড়ায় চড়িয়া মহারাণার কাছে চলিয়াছেন এমন সময় "বড়ীপোল" অর্থাৎ প্রধান তোরণের কাছে এক ব্যক্তি ঠাট্টা করিয়া বলিল, বারহঠজী, তুমিই ত এই দরজায় বড় ঝগড়া-ঝাঁটি করিয়া "নেগ" আদায় করিতে! এখন এই দরজা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়াছ? এই কথা

শুনিবামাত্র নরু ঘোড়া হইতে নামিয়া গেলেন এবং নিজের পরিবার-কুটুম্ব সকলকে মহারাণার নিকট পাঠাইয়া দিয়া ঐখানেই বসিয়া গেলেন। এক্কাতাজ খাঁ এবং রুহুল্লা খাঁ যখন মন্দির মূর্ত্তি ইত্যাদি ধ্বংস করিবার জন্য আসিয়া পড়িল তখন বারহঠ নরু বিশ-পঁচিশজন অনুচর লইয়া জগদীশের মন্দিরের সম্মুখে বহু শত্রু বধ করিয়া সানুচর বীরগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নরুর প্রশংসাসূচক একগীত এখনও লোকের মুখে শুনা যায়। ইহার মর্ম্মার্থ—প্রতোলী-পাল বরণের অনুষ্ঠানে মহারাণা যে হরিদ্রা-রঞ্জিত অক্ষতের দ্বারা (আতপ চাউল) নরুর পাদ-পূজা করিয়াছিলেন উহার হরিদ্রাভা উজ্জ্বলতর করিয়া (আখা পীলা করে উজলা) সোদা চারণ নেগের ঋণশোধ স্বরূপ কলম-কে (কলমা পাঠক মুসলমান) খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলেন। সোদা (নরু) উদয়পুরের আজরাইল (যমরাজ), তিনি ম্লেচ্ছভার লাঘব করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

তাঁতিয়া তোপীর কি ফাঁসী হয়েছিল?

শ্রীঅমল সেন

সিপাহী যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক তাঁতিয়া তোপী। তাঁর পলাতক-জীবন উপন্যাসের কাহিনীর মত বিচিত্র, সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। একা নয়, সসৈন্যে তিনি অর্দ্ধ-ভারত উল্কার বেগে মন্থন ক'রে বেড়িয়েছেন। স্থান থেকে স্থানান্তরে তিনি ইংরেজের চোখে ধূলি দিয়ে দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। বহু জায়গায় তাঁকে বহুবার ইংরেজ সৈন্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং সব জায়গায় তাঁকে যুদ্ধ করে নিজের পথ করে নিতে হয়েছিল। কোন কোন স্থানে তিনি ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিবেষ্টিত ও অবরুদ্ধ হয়েছেন, পালাবার পথ নেই—কিন্তু অপূর্ব কৌশলের সঙ্গে পথ করে নিয়ে তিনি পালিয়ে গেছেন।

শিশুপাঠ্য ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে সব ইতিহাসেই আমরা এতদিন পড়ে এসেছি, ইংরেজের কাছে ধরা পড়ে তাঁতিয়া তোপী ফাঁসীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। আমরা জনসাধারণও এতদিন নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করেছি—"১৮৫৯ সনের ১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যায় গোয়ালিয়র থেকে পাঁচ মাইল দূরে শিপ্রাতে তাঁর ফাঁসী হয়েছিল।" ইংরেজের লেখা দলিল-পত্রেও অবশ্য এই কাহিনীই লেখা আছে।

...আর আছে তাঁতিয়া তোপীর একান্ত বিশ্বাসভাজন অনুচর মানসিংহের বিশ্বাসঘাতকতার গল্প। সব ঐতিহাসিকই একবাক্যে বলেছেন,মানসিংহ বিশ্বাসঘাতক। বিশ্বাসঘাতকতা করে সে তাঁতিয়া তোপীকে ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

একজন সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক লিখেছেন—

"৭ই এপ্রিল। সময়—গভীর রাত্রি।

গভীর নিশীথে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে এক গুপ্তস্থানে তাঁতিয়া তোপী ঘুমিয়েছিলেন। সেই সময় স্বার্থপর মানসিংহ ইংরেজ সৈন্য নিয়ে ঘুমন্ত অবস্থাতেই তাঁকে বন্দী করেন।"

কিন্তু সত্যই কি তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসী হয়েছিল?

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে যে সব নব নব ঐতিহাসিক রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তাতে, এতদিন যেসব ঘটনা আমরা সত্য ও অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে এসেছি, সেই বিশ্বাসের ভিত্তিমূল শিথিল হয়েছে। তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসীর কাহিনীও এমনি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই কাহিনী এতদিন আমরা যেমন বিনা সন্দেহে সত্য বলে বিশ্বাস করে এসেছি, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আমরা মানসিংহের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী নির্বিচারে সত্য বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু সম্প্রতি ইতিহাসের অনেক নতুন রহস্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বিষয়টি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেখবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তার ফলে হয়ত সংশয়াতীত-রূপে প্রমাণিত হবে, ১৮৫৯ সনের ১৮ই এপ্রিল শিপ্রীতে

যাকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল সে তাঁতিয়া তোপী নয়, অন্য কেউ।...এবং, যে মানসিংহ "পরম বিশ্বাসঘাতক" বলে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হয়ে রয়েছেন তিনিও হয়ত অন্যায় অপবাদ থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

কে এই মানসিংহ?

ইনি ছিলেন রাজস্থানের একজন জায়গীরদার। গোয়ালিয়রের মহারাজা জয়াজি রাও সিন্ধে এঁর জায়গীরের খানিকটা অংশ আত্মসাৎ করায় ইনি গোয়ালিয়র দরবারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন এবং দশহাজার সৈন্য নিয়ে সিন্ধের সৈন্যদলকে পরাজিত করে বাউরী দুর্গ দখল করে নিলেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সঙ্গে যদিও মানসিংহের কোনই শত্রুতা ছিল না তথাপি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ব্রিটিশের "সম্মানিত বন্ধু" সিন্ধের সাহায্য করতে এগিয়ে এল। ইংরেজ সেনাপতির সঙ্গে মানসিংহের সংঘর্ষ বাধল। দুর্গ আক্রান্ত হলে ২৩শে আগষ্ট রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন করে তিনি তাঁর পিতৃব্য অজিত সিংহকে সঙ্গে নিয়ে নিবিড় বনভূমির মধ্য দিয়ে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে মিলিত হলেন। সেই থেকে মানসিংহ তাঁতিয়ার যোগ্য নির্ভীক এবং একান্ত বিশ্বস্ত সহচররূপে বরাবর তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

তাঁতিয়া তোপী মরণপণ করে অক্লান্ত ভাবে অদম্য সাহসের সঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। এক এক জায়গায় তিনি ও তাঁর সৈন্যদল ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছেন, পালাবার পথ নেই, কিন্তু অসামান্য সাহস ও অপূর্ব চতুরতার সঙ্গে পথ করে নিয়ে শত্রুর চোখে ধুলি দিয়ে তিনি পালিয়ে গেছেন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর মৃত্যুর পরে বিদ্রোহের আগুন স্তিমিত হয়ে এসেছিল, বলতে গেলে তাঁতিয়া একাই তখন বিদ্রোহের রক্ত-মশাল জ্বালিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু এই ভাবে কতদিন আর ঘোরা যায়? সঙ্গীরা ক্লান্ত, বন্ধুদের উৎসাহ উদ্দীপনা নিঃশেষিত হয়ে এসেছে, বিদ্রোহের শ্রেষ্ঠ নেতাগণ একে একে তাঁতিয়াকে ছেড়ে যেতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা অনেকেই তাঁতিয়াকে পরিত্যাগ করে আশ্রয়লাভের আশায় নেপালের দিকে রওনা হলেন। পাঁচ-সাত হাজার অনুচরও তাঁদের সঙ্গ নিল। বান্দার নবাব অদৃশ্য হলেন। ঘোর বিপদের দিনে রাও সাহেবও তাঁতিয়াকে পরিত্যাগ করলেন।

যেসব বিদ্রোহীরা আশ্রয় পাবার আশা করে নেপালে গিয়েছিলেন তাঁদের আশা শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হ'ল। নেপালের শাসনকর্তা জঙ্ বাহাদুরের সহানুভূতি আকর্ষণের তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁদের জানিয়ে দিলেন ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁর বন্ধু, ব্রিটিশের শত্রুদের তিনি কোন সাহায্য করবেন না।

বিদ্রোহীরা নিরুপায় হয়ে নেপাল রাজ্যের নানাস্থানে ঘুরে বেড়ালেন—চিতোয়ান, ভুতোয়ান ও নয়াকোট। কিন্তু কোথাও তাঁরা আশ্রয় পেলেন না। দুঃখ-দুর্দশার আর অন্ত রইল না। অনাহারে এবং আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেকে মারা গেলেন। নেপাল গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহীদের ধরবার জন্য সৈন্য লেলিয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেণীমাধব ও শাহারাণপুরের জনপ্রিয় নেতা দবীর জঙ্ বাহাদুর প্রভৃতি অনেকে মৃত্যুবরণ করলেন। জওলাপ্রসাদ প্রভৃতি আর যেসব বিদ্রোহী নেতা বন্দী হয়েছিলেন নেপাল গবর্ণমেণ্ট তাঁদের ইংরেজের হাতে সমর্পণ করলেন। ১৮৬০ সালের ৩রা মে কানপুরে সতীচৌরা ঘাটের কাছে জওলাপ্রসাদকে ফাঁসী দেওয়া হ'ল। গোণ্ডার দেবীবক্স, খয়রাবাদের চাকলাদার হরপ্রসাদ, বিশোয়ার গোলাব সিং নেপালের কোন্ জায়গায় কি অবস্থায় মারা গেছেন জানা যায় না। অক্টোবর মাসে আজিমুল্লার মৃত্যু হ'ল। তরাইয়ের ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে বালা সাহেব, এবং বহু ঐতিহাসিক বলেন, বালা সাহেবের ভাই সিপাহী যুদ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা নানা সাহেবও মারা যান।

১৮৫৭ সালের এই মহাবিদ্রোহের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়িকা বেগম হজরৎ মহল তাঁর শেষজীবন নেপালেই অতিবাহিত করেন। এই বীরাঙ্গনা সম্পর্কে রাসেল বলেছেন—"সমগ্র অযোধ্যাকে তিনিই বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। আমাদের বিরুদ্ধে তিনি আমরণ সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন।"

একে একে সবাই তাঁতিয়াকে ছেড়ে গেলেও মানসিংহ তাঁকে ত্যাগ করেন নি—তিনিই রইলেন তাঁতিয়া তোপীর একমাত্র সহচর।

নর্মদার উত্তর দিকে যাবার পথ তাঁতিয়ার সামনে অবরুদ্ধ। তিনি দক্ষিণদিক্ অভিমুখে যাবেন স্থির করলেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতিরা তাঁর চারদিকে তখন বেড়াজাল রচনা করেছে—নদী পার হবার ঘাট, নিবিড় অরণ্যের প্রান্তসীমা, জনপূর্ণ নগর ও গ্রাম, যেখানে যেখানে তাঁতিয়ার যাবার সম্ভাবনা, ইংরেজ সে সব জায়গাই অবরোধ করবার ব্যবস্থা করে তাঁকে ধরবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হ'ল। তাঁতিয়া তোপী নর্মদা নদী পার হলেন। সেখান থেকে

তিনি বরোদা রাজ্যের দিকে রওনা হলেন। ইচ্ছা ছিল, উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবার। কিন্তু মেজর সাওয়ার তাতে বাধা দিলেন।

জাওরা-আলীপুরে পরাজিত হবার পরে তাঁতিয়া এবং রাও সাহেব রাজপুতানা যাত্রা করলেন।

দেশীয় রাজ্যগুলির সৈন্যদের বিদ্রোহের কাজে লাগাবার কথা তাঁতিয়ার মনে উদয় হ'ল। তাদের বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে হবে। তারাই তাঁতিয়ার শেষ আশা-ভরসা হয়ে দাঁড়াল এবং তাঁর সে আশা একেবারে নিরর্থক হ'ল না। তিনি চম্বল নদী পার হয়ে জয়পুর অভিমুখে রওনা হলেন। ইংরেজ সেনাপতি রবার্টস কিন্তু তাঁতিয়ার গন্তব্যস্থল কোন্ দিকে হতে পারে তা আগে থেকেই আন্দাজ করে রেখেছিলেন। তিনি পথরোধ করে দাঁড়ালেন। তাঁতিয়া তোপী তাঁর গতি পরিবর্তন করে টঙ্কের দিকে অভিযান করলেন। টঙ্কের নবাব দুর্গদ্বার বন্ধ করে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরসহ দুর্গের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করলেন, কিন্তু তাঁর সমগ্র সৈন্যদল তাঁতিয়ার সঙ্গে এসে যোগ দিল।

কর্ণেল হোমের কাছে বাধা পেয়ে তাঁতিয়া তোপী বুন্দির দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে মেবারে প্রবেশ করলেন। আগষ্ট মাসে ভিলওয়ারার নিকটে সেনাপতি রবার্টসের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি কাঁকরাউলির দিকে পলায়ন করলেন। কিন্তু রবার্টস তাঁকে অনুসরণ করে এসে বানাস নদীর তীরে আবার যুদ্ধ করে তাঁকে হারিয়ে দিল।

বারে বারে এমনিভাবে বাধা পেয়ে এবং বার বার পরাজিত হয়েও তাঁতিয়া তোপীর মনের বল এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হ'ল না। উত্তাল তরঙ্গসংকুল চম্বল নদী, তীব্র তার খরস্রোত। অতি বড় সাহসীও সে নদী সাঁতার দিয়ে পার হতে ভয় পায়। কিন্তু তাঁতিয়া তোপী সেই দুরন্ত নদী অনায়াসে সাঁতরে পার হলেন এবং ক্ষুদ্র পাহাড়ী রাজ্য ঝালাওয়ারের রাজধানী ঝালরাপত্তনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সে রাজ্যের সৈন্যরা সাগ্রহে ও সানন্দে বিদ্রোহীদের সঙ্গে এসে যোগ দিল। তাঁতিয়া তোপী রাজার নিকট প্রচুর অর্থ দাবী করলেন। রাজা পালাবার মতলব করেছিলেন, এবং পালালেনও, কিন্তু পালাবার আগে তাঁতিয়া তোপীকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে যেতে হ'ল।

তাঁতিয়া তোপী এবং রাও সাহেব তখন ইন্দোর থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে রয়েছেন, কিন্তু সেখানেই না থেমে যদি তাঁরা গোয়ালিয়র আক্রমণ করে সেখানকার সৈন্যদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তুলে দলে টানতেন তা হলে বৃটিশের কাছে নিশ্চয় তা এক গুরুতর সঙ্কটরূপে দেখা দিত। তাঁতিয়ার এই ভুল চাল ও শৈথিল্যের সুযোগ নিতে ব্রিটিশ সেনাপতিরা বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করল না। ইন্দোর অবরোধ করার উদ্দেশ্যে উজ্জয়িনী অভিমুখে একদল ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হ'ল। বিওয়ারার কাছাকাছি এক জায়গায় ইংরেজ সেনাপতি মিচেল ১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁতিয়াকে আক্রমণ করল। তাঁতিয়া তোপী পরাজিত হলেন।

মিচেলের কাছে পরাজিত হয়ে তাঁতিয়া তাঁর সৈন্যদল দু'ভাগে ভাগ করলেন এবং তার পরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্ররূপে বুন্দেলখণ্ড মনোনীত করলেন। তিনি নিজে একদল সৈন্য নিয়ে চান্দোরীর দুর্গ অধিকার করবার জন্য অভিযান করলেন, বাকি সৈন্যদের নিয়ে রাও সাহেব ঝাঁসী রওনা হলেন, কিন্তু তাঁতিয়া চান্দোরীর দুর্গ অধিকার করতে না পেরে বেতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে পৌঁছবার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিন্তু সেখানেও মিচেল তাঁকে অনুসরণ করতে ছাড়ল না এবং ১০ই সেপ্টেম্বর মংরৌলিতে তাঁকে পরাজিত ক'রল। কিন্তু এই পরাজয় তাঁকে দমাতে পারল না। তাঁতিয়া তোপী নর্মদা পার হয়ে বর্তমান মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করলেন।

তাঁতিয়া অবশ্য বুঝেছিলেন, বেশীদিন তিনি শত্রুকে এড়িয়ে চলতে সক্ষম হবেন না। ১৮৫৮ সালের জুলাই মাসে মধ্যপ্রদেশ থেকে তিনি দ্রুতগতিতে রাজপুতানার দিকে ধাওয়া করলেন, রাজপুতানা থেকে গেলেন বুন্দেলখণ্ড, সেখান থেকে আবার মধ্যপ্রদেশ। মধ্যপ্রদেশ থেকে বরোদা অভিমুখে রওনা হলেন কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের তাড়া খেয়ে আবার তিনি রাজপুতানায় গেলেন। উল্কার বেগে তিনি ঘুরে বেড়ালেন। চম্বল, বেতোয়া এবং নর্মদা নদী বারবার তাঁর পথরোধ করেছে, বারবার তিনি সেসব নদী সাঁতরে পার হয়েছেন। নিবিড় অরণ্য, দুরারোহ পর্বত বারবার তাঁকে বাধা দিয়েছে—বারবার তিনি তা অতিক্রম ক'রে চ'লে গিয়েছেন। কিন্তু বাধা যেমন তিনি অনেক পেয়েছেন সাহায্যও তেমনি তিনি বহু পেয়েছেন। জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন তাঁকে সর্বদা রক্ষা-কবচের মত ঘিরে রাখত, কৃষকরা ছিল তাঁর পরম বন্ধু,—শুধু তাই নয়, আদিবাসী লোকেরাও তাঁকে ভালবাসত, সাহায্য করত।

কিন্তু তিনি দাক্ষিণাত্যে গেলেন না কেন? তিনি কি নানা সাহেবের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন? এ প্রশ্নের

জবাব আর কোনদিন পাওয়া যাবে না, কারণ এ সম্পর্কে তাঁতিয়া ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বাক্।

নতুন বছর ১৮৫৯ সাল সুরু হ'ল। তাঁতিয়া কোটা রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। মানসিংহ এখানেই তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দিলেন। পাওরি দুর্গ মানসিংহ অধিকার করেছিলেন, কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি নেপিয়ার তা তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। মানসিংহ জঙ্গলে এসে আশ্রয় নেন।

তাঁতিয়া তোপীর মাড়ওয়ার রাজ্যে প্রবেশ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মেজর হোম্‌স্ সে পথও অবরোধ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন।

সিকারের যুদ্ধে বিপর্যস্ত হবার পরে তাঁতিয়া তোপী, রাও সাহেব এবং ফিরোজ শাহ্ পরস্পর আলাদা হয়ে যাবেন স্থির করলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত থাকলে শত্রুকে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা কোন নির্জন পাহাড়ে বা নিবিড় অরণ্যে আত্মগোপন ক'রে থাকতে সমর্থ হবেন। কিন্তু তিনজন এক সঙ্গে থাকলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। এই জন্যে তাঁতিয়া সম্ভবতঃ তাঁর সঙ্গীদের নিজের নিজের আত্মগোপন করার আস্তানা খুঁজে নিতে বলেছিলেন। কারণ ব্রিটিশের সঙ্গে এই অসমান যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। তিনজন অনুচরসহ তিনটি ঘোড়া ও একটি টাট্টু ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে তাঁতিয়া তোপী পেরণের জঙ্গলে মানসিংহের রক্ষণাবেক্ষণে আত্মগোপন ক'রে থাকবার উদ্দেশ্যে রাও সাহেবের শিবির থেকে বের হলেন।

যুদ্ধের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ ক'রে তাঁতিয়া পেরণের জঙ্গলে প্রবেশ করেন। রণক্লান্ত এই মারাঠা বীরের তখন একান্ত নির্ভরযোগ্য বন্ধু হিসাবে একমাত্র মানসিংহই সঙ্গী।

ইংরেজ সেনাপতি নেপিয়ার তাঁতিয়াকে বন্দী করবার এক নতুন মতলব ঠিক ক'রে অশ্বারোহী সৈন্যদলের অধিনায়ক মেজর মীডের উপরে স্বীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। সরাইমাওর ঠাকুর সাহেব নারায়ণ সিং মেজর মীডের এই কাজের প্রধান সহায়ক হলেন। তিনি সংবাদ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এলেন তাঁতিয়া তোপী মানসিংহের সঙ্গে পেরণের জঙ্গলে অবস্থান করছে।

মেজর মীড নারায়ণ সিং এবং মানসিংহের দেওয়ানের সহায়তায় মানসিংহের পরিবারের স্ত্রীলোকদের বন্দী করলেন। তিনি আশা করেছিলেন, মানসিংহ নিজের পরিবারের স্ত্রীলোকদের সম্ভ্রম ও প্রাণ রক্ষার জন্য নিশ্চয়ই ইংরেজের কাছে ধরা দেবেন। তাঁর এ অনুমান বৃথা হ'ল না। ২রা এপ্রিল মানসিংহ ব্রিটিশ শিবিরে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে হাতে পেয়েই মীড চাপ দিতে লাগলেন। ভয় ও প্রলোভন দেখিয়ে নিজের মতলব হাঁসিল করার চেষ্টা করলেন।

ঐতিহাসিক কে এবং ম্যালসন বলেন—(এঁরা তখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন)—"মীড মানসিংহের সাহায্য চেয়ে জানালেন, তিনি যদি মীডের কথামত কাজ করেন তবে তাঁর সম্বন্ধে সুবিচার করা হবে, তাঁর জায়গীরও তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকা ক'রে তাঁতিয়াকে ধরিয়ে দিতে সম্মত হলেন।"

ভারতীয় ঐতিহাসিকরাও সকলে এই কথারই সমর্থন করেছেন, "তাঁতিয়া যখন যুদ্ধের আশা ত্যাগ ক'রে পেরণের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করেন, সঙ্গে তখন তাঁর সঙ্গী মানসিংহ। পরিশ্রান্ত মারাঠা বীরের একমাত্র ভরসা তখন মানসিংহ। এই সময়ে পরম বিশ্বাসঘাতক মানসিংহ তাঁতিয়া তোপীকে ধরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সেনাপতি মেজর মীডের কাছে গেলেন। শুধু তাঁতিয়াকেই নয়, নিজের সম্পত্তি ফিরে পাবার আশায় মানসিংহ নিজের আত্মীয় ও বন্ধু অনেককে ধরিয়ে দেবার জন্য মীডের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন।"

"৭ই এপ্রিল। গভীর রাত। চারদিক্ নিস্তব্ধ। মানসিংহ তাঁতিয়ার গুপ্ত আবাসে এসে উপস্থিত হলেন। ইংরেজের সিপাহীরা দূরে থেকে তাঁকে অনুসরণ ক'রল, তাঁতিয়া তোপী তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত। তিনি বন্দী হলেন। কোর্ট মার্শাল ক'রে তাঁর বিচার হ'ল এবং ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল শিপ্রীতে তাঁকে ফাঁসী দেওয়া হ'ল।"

তাঁতিয়া তোপীর আত্মীয়-স্বজন আজও অনেকে বেঁচে আছেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণ লক্ষ্মণ রাও তোপী ও গঙ্গা বাঈ এখনও ব্রহ্মাবর্তে (বিঠুর) বাস করছেন। বিঠুর কানপুর থেকে দশ মাইল দূরে গঙ্গার তীরে অবস্থিত। ১৮৫৭'র গণজাগরণের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল এই বিঠুর বা ব্রহ্মাবর্ত।

তাঁতিয়া তোপীর মৃত্যু সম্পর্কে নারায়ণ লক্ষ্মণ রাও তোপী এবং গঙ্গা বাঈ কি বলেন, আমরা সর্বপ্রথম তাই আলোচনা ক'রে দেখতে চাই, কারণ তাঁদের বক্তব্য যুক্তি সহ কিনা আগে তা বিচার ক'রে সমগ্র ঘটনা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পর্যালোচনা ক'রে দেখবার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয়েছে। শ্রী এস. বি. হার্দিকর তাঁদের সঙ্গে

সাক্ষাৎ ক'রে তাঁতিয়া তোপীর মৃত্যু সম্পর্কে ব্যক্তিগত-ভাবে আলাপ-আলোচনা ক'রে যেসব নতুন তথ্য জানতে পেরেছেন, ভারতের ইতিহাসের উপর তা নতুন আলোক সম্পাত ক'রবে। তাঁরা দু'জনেই বলেছেন, ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল শিপ্রীতে যে লোকটাকে ইংরেজেরা ফাঁসী দিয়েছিল—তিনি তাঁতিয়া তোপী নন।

কানপুরে নানা সাহেবের সৈন্যদল পরাজিত হবার পরে তোপী-পরিবারের লোকেরা ভিন্দ্ নামক স্থানে ইংরেজের হাতে বন্দী হয়ে গোয়ালিয়র দুর্গে অন্তরীণ ছিলেন। ১৮৫৯ সালের ২৭শে এপ্রিল তাঁরা মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে তাঁতিয়া তোপীর পিতা পাণ্ডুরঙ্গ রাও সপরিবারে ব্রহ্মাবর্তে ফিরে গিয়ে দেখতে পান, তাঁর বাড়ীঘরের চিহ্নও নেই, ইংরেজরা সব পুড়িয়ে দিয়েছে। এই-ই সব নয়, ইংরেজের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে ব্রহ্মাবর্তের অধিবাসীরা তোপী-পরিবারের লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভয় পেল।

গ্রামে ফিরে এসে পাণ্ডুরঙ্গ রাও দেখলেন,মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, ক্ষুধা নিবৃত্তির ব্যবস্থা নেই, অস্ত্র নেই, বিপদে সাহায্য করবে এমন বন্ধু নেই। তিনি সম্পূর্ণ নিঃসহায় ও নিঃসম্বল। এই সংকট মুহূর্তে বৈরাগীর ছদ্মবেশে তাঁতিয়া এসে উপস্থিত হলেন ব্রহ্মাবর্তে। পিতার হাতে কিছু অর্থ দিয়ে আবার নিরুদ্দেশ হলেন। তাঁতিয়ার পিতা সেই অর্থ দিয়ে ঘরবাড়ী তৈরি করালেন এবং খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিস কিনলেন। এমনি ভাবে প্রায়ই তাঁতিয়া তোপী ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হতেন, পিতাকে টাকা-পয়সা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যেতেন।

তাঁতিয়া তোপীর মাতা-পিতা উভয়েই ১৮৬২ সালে কাশীধামে মারা যান। তাঁদের মৃত্যুকালে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে তাঁতিয়া তাঁদের মৃত্যুশয্যা পাশে উপস্থিত ছিলেন।

তাঁতিয়ার কাকার মেয়ে দুর্গা বাঈর ১৮৬১ সালে খাদিকর-পরিবারে বিয়ে হয়। তাঁতিয়া এই বিয়ের সময় ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন এবং বিয়ের সব ব্যয়ভারও তিনিই বহন করেছিলেন।

তাঁতিয়া তোপীর বৈমাত্রেয় ভাই রামকৃষ্ণ পাণ্ডুরঙ্গ রাও তাঁর সহোদর ভাই সদাশিব পাণ্ডুরঙ্গ রাও'র নিকট তাঁতিয়ার মৃত্যুসংবাদ জানিয়ে একখানা চিঠি লিখে-ছিলেন। সদাশিব তখনও ব্রহ্মাবর্তে বাস করছিলেন। রামকৃষ্ণ পাণ্ডুরঙ্গ রাও পরবর্তী জীবনে বরোদায় বাস করতেন। তাঁতিয়ার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সমগ্র তোপী-পরিবার যথারীতি অশৌচ পালন করেছিল এবং এখন থেকে ৪৫।৫০ বছর আগে রামচন্দ্র লক্ষ্মণ তোপী গোয়ালিয়রে তাঁতিয়া তোপীর শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছিলেন। আগেই বলেছি, তাঁতিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মণ রাও তোপী আজও বেঁচে আছেন, তাঁর বয়স এখন ৮৫৭ বৎসর, সুতরাং ৪৯ বছর আগে তিনি আট বছর বয়স্ক বালক ছিলেন, এ সব ঘটনা পরিষ্কার ভাবে তাঁর মনে থাকার কথা নয়—কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, খুব ছোটবেলার হলেও এ সব ঘটনা অস্পষ্ট ভাবে আজও তাঁর মনে আছে। তাঁতিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্রী গঙ্গাবাঈর বয়স এখন ৭৪ বৎসর, তখন তিনি ২৯ বৎসর বয়স্কা তরুণী ছিলেন। তাঁতিয়া তোপীর মৃত্যুর খবর পেয়ে তাঁরা যে অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছিলেন তা এখনও বেশ স্পষ্ট মনে আছে, আবেগকম্পিত কণ্ঠে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বৃদ্ধা এই কথাগুলি ব'লেছেন।

রামকৃষ্ণ পাণ্ডুরঙ্গ রাও ১৮৬২ সালে জীবিকার সন্ধানে আবার যখন বরোদায় যান তখন তাঁকে বন্দী ক'রে সহকারী রেসিডেন্টের কাছে হাজির করা হ'ল। তাঁতিয়া তোপী সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল। সেই অগণিত প্রশ্নের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব-পূর্ণ একটি প্রশ্ন ছিল :—তাঁতিয়া তোপী এখন কোথায় আছে? এই সাক্ষাৎকারের এক বিবরণ সহকারী রেসিডেন্ট বম্বেতে রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

এই একটি ঘটনা থেকে নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় যে, ১৮৬২ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহে রামকৃষ্ণ তোপীকে এই সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

এখন কথা এই, প্রচলিত ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী আমরা জানি, ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল তাঁতিয়া তোপীকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। অথচ এখানে দেখি, তাঁতিয়া তোপীর তথাকথিত ফাঁসীতে মৃত্যুর আড়াই বছর পরে এক পদস্থ ও দায়িত্বশীল ইংরেজ কর্মচারী রাম-কৃষ্ণ তোপীকে এরকম একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল। এ ঘটনাটি কি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নয়?

এই একটি ঘটনা থেকেই সংশয়াতীতরূপে প্রমাণিত হয়, ইংরেজরা শিপ্রীতে তাঁতিয়া তোপী পরিচয়ে যে লোকটিকে ফাঁসী দিয়েছিল,সে ব্যক্তি সত্য সত্যই তাঁতিয়া তোপী কি না এ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টেরও যথেষ্টই সন্দেহ ছিল।

রামকৃষ্ণ তোপী এই প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছিলেন তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রশ্নের সরল জবাব হতে

পারত—আড়াই বছর আগে তাঁকে তোমরা ফাঁসী দিয়েছ, আজ এ অবান্তর প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? কিন্তু রামকৃষ্ণ তোপী তা না বলে জবাব দিলেন—"তিনি কোথায় আছেন জানি না। যেদিন তিনি আমাদের কাছ হতে চলে গেছেন সেদিনের পর থেকে তাঁর সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয় নি, তাঁর কোন খবরই আমরা জানি না।"

১৮৫৯ সালের আগষ্ট মাসে রামকৃষ্ণ তোপী ইংরেজের ছাউনী থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিবারের অন্য সকলকেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। যে তারিখে তাঁতিয়া তোপীকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে, সেই তারিখের ঠিক চার মাস এগার দিন পরে রামকৃষ্ণ সপরিবারে মুক্তি পেলেন। মুক্তি পেয়ে ব্রহ্মাবর্তে গিয়ে দু'বছর বাস করেছিলেন। পরে ১৯৬২ সালে আবার তিনি জীবিকার সন্ধানে বরোদায় যান।

তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসী সত্যি হলে পরে তাঁর আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের লোকদের নিশ্চয়ই সে খবর দীর্ঘকাল অজানা থাকত না। এই ঘটনা থেকেও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসীতে প্রাণ বিসর্জনের কাহিনী তাঁর আত্মীয়-পরিজনরা কোনদিনই বিশ্বাস করে নি।

এ ছাড়া আরও একটি ঘটনায় তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসীর কাহিনীর সত্যতা অগ্রাহ্য করার স্বপক্ষে বিরাট সমর্থন পাওয়া যায়। ১৮৬৩-৬৪ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গভর্ণমেণ্ট সিপাহী যুদ্ধের কয়েকজন বিদ্রোহীকে গ্রেফ্‌তার করার জন্য এক পরওয়ানা জারী করেন। বর্তমান উত্তর প্রদেশ তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিদ্রোহীদের সহজে যাতে চিনতে পারা যায় সেই জন্য পরওয়ানায় তাদের সকলের চেহারার অবিকল বিবরণ দেওয়া ছিল, এ ছাড়া বার জন বিদ্রোহীর নামের একটি তালিকাও ঘোষণা করা হয়েছিল। সেই তালিকায় তাঁতিয়া তোপীর নাম ত ছিলই, এ ছাড়া আর যাদের নাম ছিল তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন নানাসাহেব, পেশোয়া বালা সাহেব, রাও সাহেব এবং আজিমুল্লা খাঁ। এটা কি খুবই আশ্চর্য-জনক ও কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার নয় যে, তাঁতিয়ার ফাঁসীর সংবাদ ঘোষিত হবার তিন বছর পরে যে প্রদেশে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র অবস্থিত ছিল সেই প্রদেশেরই গভর্ণ-মেণ্টের গ্রেফ্তারী পরওয়ানায় অন্যান্য বিদ্রোহীদের নামের সঙ্গে তাঁতিয়া তোপার নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল?

তাঁতিয়া তোপীর গ্রেফতার ও বিচার-পর্বের যে নাটক অভিনীত হয়েছিল তাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ঐতিহাসিক হিসাবে কে এবং ম্যালেসনের স্থান যদিও খুব উঁচুতে নয় এবং তাঁদের পরিবেশিত তথ্য খুব নির্ভরযোগ্যও নয়, তথাপি তার যৎসামান্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যে ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে তাঁতিয়াকে ফাঁসীর রজ্জু গলায় পরতে হয়েছিল, তাঁরা শুধু সেই ঘটনার বিবরণ দিয়েই ক্ষান্ত হন নি—স্যার হিউ রোজের পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এসে যিনি ভারতীয় কেন্দ্রীয় স্থলবাহিনীর সেনা-পতিত্ব গ্রহণ করলেন সেই রবার্ট নেপিয়ারের স্বচ্ছ মাথা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও তিনি যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। দীর্ঘ নয় মাস পর্যন্ত তাঁতিয়া তোপীর পশ্চাদ্ধাবন করে পর পর কয়েকজন ব্রিটিশ সেনাপতি যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তাই দেখে নেপিয়ারের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে-ছিল- সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাঁতিয়ার ক্ষমতা খর্ব করা সম্ভব হতে পারে। তিনি এক নতুন পদ্ধতিতে কাজ আরম্ভ করবেন ঠিক করলেন। তাঁর এই কাজে সাহায্যের জন্য একজন চতুর লোক প্রয়োজন, যে তাঁতিয়া তোপীকে ধরিয়ে দিতে সমর্থ হবে। মানসিংহকে এই কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে হ'ল।

দীর্ঘকাল অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত থেকে তাঁতিয়ার বন্ধুরা ক্লান্ত হলেন, তাঁদের উৎসাহ নিঃশেষিত হ'ল—একে একে সকলেই তাঁতিয়াকে ছেড়ে চলে গেল। গেল না শুধু একজন, তাঁর অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর মান-সিংহ। কিন্তু তাঁতিয়ার দুর্দিনের সঙ্গী ও বিশ্বস্ত অনুচরই যে একদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে ধরিয়ে দেবে, তাঁতিয়া নিশ্চয় কোনদিন তা কল্পনা করেন নি। আমরাও সহজে বিশ্বাস করতে পারি না।

সদা সতর্ক এবং সুচতুর তাঁতিয়া তোপী যে এমন সহজে নেপিয়ার ও মীডের ফাঁদে পা দিলেন, এটা কি করে সম্ভব হতে পারে? তা ছাড়া, আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই যে, ইংরেজের কাছে যে লোক ধরা দিয়েছে, তাঁতিয়া কি করে তাকে বিশ্বাস করলেন? আদালতে দাঁড়িয়ে তাঁতিয়া যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, কে এবং ম্যালেসন তা উদ্ধৃত করেছেন। সেই জবানবন্দীতে তাঁতিয়া তোপী বলেছিলেন—"মীডের কাছে আত্মসমর্পণ করার আগে মানসিংহ আমার সঙ্গে পরামর্শ করেছিল।" এই ঐতিহাসিকদ্বয় আরও বলেন, "তাঁতিয়া ভাল করেই জানতেন মানসিংহ ইংরেজের কাছে ধরা দিয়েছে, তথাপি সব জেনেশুনেও তিনি বিনা দ্বিধায় মানসিংহকে বিশ্বাস

করেছিলেন, এমন কি, মানসিংহের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য তাঁর একজন বিশ্বস্ত অনুচরকে সংবাদবাহকরূপে মীডের শিবিরে পাঠিয়েছিলেন।"

সুতরাং বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তাঁতিয়া তোপী ভালরূপ জানতেন, মানসিংহ ব্রিটিশ সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি তার উপরে এতটা বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এ খুবই বিস্ময়কর। তাঁতিয়ার গুপ্তচর ব্যবস্থা ছিল অতি চমৎকার—বুদ্ধিমান্ সুযোগ্য গুপ্তচরেরা তাঁর অধীনে কাজ করত এবং ব্রিটিশ ছাউনীতে কখন কি ঘটে প্রতি মুহূর্তে তাঁর কাছে এসে তার খবর পৌঁছাত। তথাপি সব জেনেশুনেও তিনি ব্রিটিশের ফাঁদে ধরা দিলেন—এ ঘটনা কি মনে সন্দেহের উদ্রেক করে না?

আমরা যদি সবগুলি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করে দেখি তা হলে সমগ্র দৃশ্যপটই বদলে যাবে। তাঁতিয়া তোপী এবং মানসিংহ উভয়েই অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন, নেপিয়ার এবং মেজর মীডের ফাঁদে সহজেই ধরা দিতে রাজী হয়ে তাঁরা ইংরেজের কৌশল দিয়েই ইংরেজকে যে ধোঁকা দিয়েছিলেন তাও কি একেবারে অসম্ভব? মানসিংহ যাতে বিশ্বাসঘাতকতা করতে রাজী হয় তার জন্য মীড মানসিংহের পরিবারের স্ত্রীলোকদের বন্দী করে নিয়ে তাদের উপর এমন অত্যাচার করলেন যার জন্য মানসিংহের উপর চাপ দিতে তাঁরা বাধ্য হলেন।

শুধু পরিবারের লোকদের জীবনরক্ষার জন্যই নয়, পরন্তু বিশ্বাসঘাতকতা করা থেকে মানসিংহকেও বাঁচাবার জন্য যদি তাঁরা এই মতলব করে থাকেন আমরা বিস্মিত হব না। অবস্থাবিপর্যয়ে পড়ে যদি তাঁরা একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির করে থাকেন যে, তাঁদের মধ্য থেকে একজন সহকর্মী তাঁতিয়া তোপী সেজে ইংরেজের হাতে ধরা দেবে, তা হলে সেই পরিকল্পনা যে খুবই সময়োচিত হয়েছিল তা স্বীকার করতেই হবে। এর ফলে অন্ততঃ সামান্য কিছু কালের জন্যও তাঁতিয়ার জীবন নিরাপদ্ হতে পেরেছিল।

তাঁতিয়ার তিনজন অন্তরঙ্গ সহচর এই সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিল—রাম রাও, নারায়ণ এবং গোবিন্দ। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে তারা ছিল তাঁতিয়ার পাচক এবং সহিস। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তারাও ছিল তাঁতিয়ার বিদ্রোহী সহচর। শুধু পাচক এবং সহিস হলে অনিবার্য বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু-দেবতার পদধ্বনি শুনতে শুনতে তারা ছায়ার মত অনুক্ষণ তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াত না। এই তিনজন সঙ্গীর মধ্যে একজন ছিল, যার চেহারার সঙ্গে তাঁতিয়া তোপীর চেহারার যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল এবং তাকে তাঁতিয়া সাজিয়ে চালানো খুবই সম্ভবপর ছিল—সেই লোকটি নিশ্চয়ই নেতার জীবন রক্ষার জন্য তাঁতিয়া তোপীর ভূমিকা অভিনয় করে প্রাণ বিসর্জন দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিল। বাংলা দেশে বিপ্লব আন্দোলনের যুগে এমন ঘটনার আরো প্রমাণ আমরা পেয়েছি।

বিচারশালার কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁতিয়ার দেওয়া শেষ জবানবন্দীর মধ্যে এমন কতগুলি কথা আছে যা স্বতঃই মনে সংশয় জাগিয়ে তোলে। তাঁতিয়ার সর্বক্ষণের সঙ্গী একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত অনুচর যারা ছিল, যারা তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের সব খবর জানত, তাদের মধ্য থেকে যে কেউ অনায়াসে এই জবানবন্দী দিতে পারত—দেওয়া সম্ভবপর। এই জবানবন্দী তাঁতিয়ার বিদ্রোহী জীবনের সমস্ত কাজের যে একটি নিখুঁত ও ঘটনাবহুল বিবরণ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁতিয়ার জবানবন্দীতে তাঁর বিদ্রোহী জীবনের যে উত্তাপ-উষ্ণতা ও ভাবাবেগ থাকা একান্ত স্বাভাবিক বলে মনে হয়, এর মধ্যে কোথাও তার বাষ্পও টের পাই না; গলিত তুষার স্রোতের মত শুধুই কতগুলি ঘটনার হিমশীতল স্রোত যেন এই জবানবন্দীর মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। তাঁতিয়ার মত একজন দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী যে এই জবানবন্দী দিয়েছেন, সে কথা বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারি না।

মানসিংহের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তাঁর মধ্যেও একজন প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবীর সাক্ষাৎ মেলে। পেরণের জঙ্গলে এসে তিনি যখন তাঁতিয়ার সঙ্গে দেখা করলেন, তখন তিনি তাঁতিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"আপনি আপনার সৈন্যদলকে ত্যাগ করে এলেন?" যাঁর অন্তরে তাঁতিয়ার জীবনের নিরাপত্তার জন্য এত চিন্তা, এত উদ্বেগ, সেই বিপ্লবী মাত্র সামান্য কয়েকটি দিনের ব্যবধানে এতবড় একটা বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করবেন—এ কি খুবই অস্বাভাবিক নয়? এমন যে হয় না, তা বলি না। কিন্তু মানসিংহের চরিত্র আগাগোড়া পর্যালোচনা করে দেখলে তাঁর মত একজন বিপ্লবীর পক্ষে এ কাজ করা খুবই অসম্ভব মনে হয়।

আমরা আরও দেখতে পাই, মীডের শিবিরে বন্দী থাকা অবস্থায় মানসিংহ নিজের পিতৃব্য অজিত সিংহকে বন্দী করার জন্য মীডকে প্ররোচিত করছেন। অজিত সিংহের গুপ্ত আবাসে যখন মানসিংহ ইংরেজ সৈন্যদের

সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত, তখন দেখলেন তিনি সেখানে নেই। ইংরেজ সৈন্য পৌঁছাবার আগেই তিনি পলায়ন করেছেন। এও কি খুবই সম্ভব নয় যে, মানসিংহ আগে থেকেই পিতৃব্যকে সতর্ক করে সংকেত পাঠিয়েছিলেন? একজন খাঁটি বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকা মানসিংহ এমন নিখুঁতভাবে অভিনয় করেছিলেন যে, ইতিহাসে তাঁর সেই বিশ্বাসঘাতকের পরিচয়ই সত্য ও অপরিমোচনীয় হয়ে রয়েছে।

এও বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখার বিষয়—চারদিক্ থেকে ঘিরে ফেলে গুপ্ত বাসস্থান থেকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত তাঁতিয়া তোপীকে যখন অকস্মাৎ প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে তোলা হয় তখন মানসিংহও সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তাঁতিয়া তোপী তাঁর জবানবন্দীতে কোথাও এতবড় একজন বিশ্বাসঘাতক মানসিংহের বিরুদ্ধে কিন্তু একটি কথাও বলেন নি। এমন কি "বিশ্বাসঘাতকের" প্রতি তিনি একবার ক্রুদ্ধদৃষ্টি পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করেন নি। যদি তিনি তা করতেন তবে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সেকথা উল্লেখ করতে নিশ্চয়ই বিস্মৃত হতেন না। এ ছাড়া তাঁতিয়ার জবানবন্দীতে কোথাও মানসিংহের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে একটিও কথা নেই। এ থেকে বুঝে নিতে পারা যায় যে, এই ঘটনার অন্তরালে গভীর রহস্যজনক আরও কোন ব্যাপার ছিল।

এ ছাড়া আরও একটি ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁতিয়া তোপী বলে যে লোকটিকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে সে বাস্তবিকই তাঁতিয়া তোপী কি না এ সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মনেও ঘোরতর সন্দেহ এবং সংশয় ছিল। মানসিংহ দ্বারা যে তারা ভয়ানক ভাবে প্রতারিত হয়েছেন এ কথাও তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন। তা যদি না হয় তবে ইংরেজরা মানসিংহকে তার জায়গীর ফিরিয়ে দেবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করল না কেন? কেন মানসিংহের জায়গীর তারা ফিরিয়ে দিল না?

এই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হয়। প্রশ্ন হ'ল—ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি ঠিক বুঝতেই পেরেছিলেন যে, মানসিংহ তাঁদের প্রতারণা করেছে তা হলে প্রতারণার দায়ে মানসিংহকে অভিযুক্ত করে আদালতে তাঁর বিচার করলেন না কেন? কেনই বা এমন একটা সাংঘাতিক ব্যাপার সমগ্র জগতের কাছ থেকে গোপন করে রাখলেন? রাখলেন, কারণ, প্রতারণার দায়ে যদি তাঁরা মানসিংহকে অভিযুক্ত করে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন বিচারের জন্য, অথবা সত্য ঘটনা যদি তাঁরা জগতের কাছে প্রকাশ করে দিতেন তবে তাঁদের নিজেদের পক্ষেও তা মোটেই গৌরবের বিষয় হ'ত না—উপরন্তু এই ব্যাপার নিয়ে ইংলণ্ডে ত বটেই, সারা জগতে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমালোচনার তুমুল ঝড় উঠত। প্রকৃত অপরাধীর বদলে একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে ভুলবশতঃ তাঁরা ফাঁসী দিয়েছেন এ কথা জানাজানি হলে সমস্ত জগৎ কি তাঁদের ধিক্কার দিত না?

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নীরবতা অবলম্বনের এ ছাড়াও একটা বড় কারণ ছিল—তাঁতিয়া তোপী মরে নি, সে বেঁচে আছে এ খবর প্রকাশ পেলে ও বাইরে প্রচারিত হলে বিপ্লবের যে আগুন প্রায় নিভু নিভু হয়ে এসেছে তা আবার দাউ দাউ করে লেলিহান শিখা মেলে জ্বলে উঠবে। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট আশঙ্কা করেছিল, সে আগুন পূর্ণ তেজে জ্বলে উঠে প্রবল আকার ধারণ করে আবার তা সমগ্র ভারতের আকাশ ছেয়ে ফেলবে। ইংরেজের সাধ্য থাকবে না তা নেভাবার। এই সব কারণেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়েছিল।

এই সব কারণেই মানসিংহ তাঁতিয়া তোপীকে ধরিয়ে দেবার মত এতবড় একটা বিরাট্ কাজ করেও ইংরেজের কাছ থেকে কোন ইনাম পায় নি, ইংরেজ তার জায়গীর ফিরিয়ে দেয় নি। মানসিংহ ইংরেজের সঙ্গে যে শঠতা করেছিলেন তার জন্য এ ছাড়া আর কোনও শাস্তি তিনি পান নি।

সুতরাং ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল শিপ্রীতে তাঁতিয়া তোপীর ফাঁসী হয় নি বলে যে সিদ্ধান্তে আমরা এসে পৌঁছেছি তা যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তাঁতিয়া তোপীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মণ রাও তোপীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হ'ল—"তাঁতিয়া তোপীর পরিবর্তে কাকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল" তিনি তখন তাঁর বাল্যজীবনের একটি কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী বললেন। তিনি বাল্যকালে গোয়ালিয়রে জনকগঞ্জ বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। সেই বিদ্যালয়ের অধীক্ষকের নাম ছিল রঘুনাথ রাও ভগৎ। একদিন তিনি নারায়ণ লক্ষ্মণ রাও তোপীকে অফিস-ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে তাদের পরিবার সম্পর্কে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। অবশেষে বললেন—"বৎস, যে ব্যক্তিকে শিপ্রীতে ফাঁসী দেওয়া হয়েছে তিনি তোমার পিতৃব্য তাঁতিয়া তোপী নন—তিনি আমার পিতামহ নারায়ণ রাও।"

ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত রহস্য এমনি চমকপ্রদ ভাবে উদ্‌ঘাটিত হ'ল। আমি সেখানেই এই ব্যাপারটার যবনিকা না টেনে দিয়ে গোয়ালিয়রে গিয়ে এ সম্পর্কে খোঁজখবর করতে আরম্ভ করলাম। আমার এক বন্ধুর ভগৎ পরিবারের সঙ্গে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনি একদিন এসে একটি খবর দিয়ে আমাকে চমকে দিলেন—রঘুনাথ ভগৎ-এর পিতামহের নাম ছিল নারায়ণ রাও।

পেরণের জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকার সময়ে তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে যে তিনজন সহচর ছিলেন তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল নারায়ণ রাও। সম্ভবত এই নারায়ণ রাও এবং রঘুনাথ রাও ভগৎ-এর পিতামহ নারায়ণ রাও ভগৎ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। দলের নেতা তাঁতিয়া তোপীর জীবন রক্ষার জন্য সম্ভবত নারায়ণ রাও ভগৎই ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

সৌরশক্তির রহস্য

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ

সূর্যকেই আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ব'লে মনে হয়। তবে আকাশে সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আরও অনেক আছে, তাদের বলা হয় নক্ষত্র। কিন্তু তারা রয়েছে সূর্যের চেয়ে আরও অনেক দূরে, তাই তাদের এত ছোট দেখায়।

সূর্য যেন একটা বিশাল আগুনের কুণ্ডের মত দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। যুগ যুগ ধ'রে এ থেকে প্রচণ্ড তাপ এবং চোখ-ঝলসান আলো বেরুচ্ছে। এর কোন বিরাম নেই। একটা জ্বলন্ত উনানের পাশে দাঁড়ালে বেশ তাপ লাগবে, একটু দূরে গেলেই তাপ আর বোঝা যাবে না। এই জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ডটি পৃথিবী থেকে প্রায় ন' কোটি ঊনত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে আছে তাই রক্ষে, খুব কাছে থাকলে এই পৃথিবী জ্বলে, পুড়ে শেষ হয়ে যেত।

গ্রীষ্মকালে দুপুরে ঘরে থেকেই গরমে ছট্‌ফট্‌ করতে হয়, একবার রোদে দাঁড়ালেই বোঝা যাবে কি রকম অসম্ভব গরম! সূর্য থেকে এত দূরে থাকা সত্ত্বেও এতটা তাপ পাওয়া যাচ্ছে, এ থেকেই বোঝা যাবে সূর্যের তাপটা কেমন ভয়ংকর! জ্বলন্ত সূর্য থেকে যে প্রচণ্ড তাপ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তার অতি সামান্য অংশ (প্রায় ২৩ কোটি ভাগের ১ ভাগ) এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়, কিন্তু এতটুকুই কি ভয়ংকর তার হিসেব বিজ্ঞানী করেছেন—সমস্ত পৃথিবীর উপর একসঙ্গে যে তাপ এসে পৌঁছায় তা যদি এক জায়গায় জমা হ'ত তা হলে দশ লক্ষ মণ জল এক মিনিটের মধ্যেই টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে উঠত। পূর্ণিমার রাতে চাঁদ থেকে যে পরিমাণ আলো পাওয়া যায়, সূর্যের আলো তার প্রায় ছ' লক্ষ গুণ উজ্জ্বল।

সূর্য থেকে যে অবিরাম তেজ-রশ্মির বিকিরণ চলছে তার কারণ, সূর্য ভয়ংকর উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে। বিজ্ঞানীরা হিসেব ক'রে দেখেছেন যে, সূর্য-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী, আর সূর্যের অভ্যন্তরের তাপমাত্রা প্রায় দু' কোটি ডিগ্রী। বিজ্ঞানীরা আরও হিসেব করে দেখেছেন যে, সূর্য থেকে বছরে প্রায় ১.২×১০^{৪১} আর্গস্‌ পরিমাণ তেজশক্তি বিকীর্ণ হয়। বিজ্ঞানীদের মতে সূর্যের সম্ভাব্য বয়স হ'ল প্রায় ৩০০ কোটি বছর। কাজেই সূর্যের সৃষ্টি থেকে আজ অবধি প্রায় ৩.৬×১০^{৫০} আর্গস্‌ পরিমাণ শক্তি বিকীর্ণ হয়েছে।

সূর্যের এই অফুরন্ত তেজ-শক্তির উৎস কি তাই এখন আলোচনা করা যাক্‌। আগে রাসায়নিকের মতে পদার্থ ছিল অবিনশ্বর; অপরদিকে পদার্থবিদ্‌ বলতেন শক্তির বিনাশ নেই। কিন্তু পদার্থ ও শক্তির যোগসূত্র সে যুগে কারও জানা ছিল না। ১৯০৫ সালে বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনষ্টাইন তাঁর সুবিখ্যাত 'আপেক্ষিক তত্ত্ব' (Theory of relativity) প্রকাশ করেন। এর একটি মূল সূত্র অনুসারে তিনি সর্বপ্রথম জানালেন যে, পদার্থ থেকে শক্তিতে এবং শক্তি থেকে পদার্থে রূপান্তর হওয়া সম্ভব। এর মূল কথা হ'ল, জড় ও শক্তির সমষ্টিগত অবিনশ্বরতা, অর্থাৎ এই বিশ্বে যা কিছু পরিবর্তন হবে তাতে জড় ও শক্তির সমষ্টির কোন পরিবর্তন হবে না; চিরকাল যা ছিল তাই থাকবে, তাদের পরস্পরের রূপান্তর ঘটতে পারবে মাত্র। মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইন বলেছেন, পদার্থ ও শক্তির নিবিড় সম্পর্ক একটি সূত্রকোণে প্রকাশ করা যায়:

$E = m c^2 \times 0{\cdot}24 \times 10^{-7}$ ক্যালরি

এখানে, E = শক্তির পরিমাপ (ক্যালরি); m = পদার্থের ভর (গ্র্যাম); c = আলোর গতিবেগ = 3×10^{10} সেন্টি-মিটার/সেকেণ্ড।

বর্তমান কালের নানারূপ পরীক্ষার ফলে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, পদার্থ শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে নানা ভাবে। আর গণিতের হিসেব অনুসারে সামান্য পরিমাণ পদার্থ থেকে যে তেজ-শক্তি উৎপন্ন হয় তার পরিমাপ অত্যন্ত ভয়ংকর। এই মতবাদের সত্যতা সম্পর্কে চরম পরীক্ষা হয়ে গেছে 'পরমাণু-বোমা' ও 'হাই-ড্রোজেন বোমা'র আবিষ্কারে।

মৌলিক পদার্থের যে সব ক্ষুদ্রতম কণা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে, তাদের বলা হয় পরমাণু (Atom)। হাইড্রোজেন পরমাণুর মাঝখানে আছে একটি পজেটিভ বা ধনাত্মক কণা, প্রোটন, আর তাকে কেন্দ্র ক'রে অবিশ্রান্ত ঘুরে চলেছে একটি নেগেটিভ বা বা ঋণাত্মক কণা, ইলেকট্রন। প্রোটনের ভর (mass) প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান, আর ইলেকট্রনের ভর হাইড্রোজেন পরমাণুর ১৮৫০ ভাগের সমান। অন্যান্য পরমাণু গঠনে প্রোটন ও ইলেকট্রন ছাড়া আর এক প্রকার কণা অংশ গ্রহণ করে, তার নাম নিউট্রন। নিউট্রন কণা নিস্তড়িৎ (neutral) কিন্তু তার ভর প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান। এর প্রধান কাজ হ'ল পরমাণুর ভর বাড়ান। পরমাণুর কেন্দ্রকে (Nucleus) থাকে প্রোটন ও নিউট্রন কণা, আর বহির্ভাগে থাকে ইলেকট্রন কণা। যে-কোন পরমাণুতে প্রোটন ও ইলেকট্রন সংখ্যা সমান থাকে; কারণ তা ছাড়া বিদ্যুৎসাম্য বজায় থাকতে পারে না।

নানা প্রকার গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন কণার সমাবেশেই একটি নিউট্রন কণা গঠিত। কিন্তু একটি হাইড্রোজেন পরমাণুও ত তা হলে একই ভাবে গঠিত। তা ঠিক, কিন্তু এখানে পার্থক্য এই যে, নিউট্রনের মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রন পরস্পরের খুব কাছাকাছি রয়েছে; আর হাইড্রোজেন পরমাণুর বেলায় তাদের মধ্যে যে ব্যবধান এক্ষেত্রে ব্যবধান তার লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

পরমাণুর উপাদান	তড়িতের পরিমাপ	ভর
প্রোটন	+ ১	১
ইলেকট্রন	− ১	১।১৮৫০
নিউট্রন	০	১

এই নিয়মে গঠিত হলে সকল পরমাণুর ভরই পূর্ণ-সংখ্যার, অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরই পূর্ণ সংখ্যার, অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর এক ধরলে তার পূর্ণ গুণক হওয়া, উচিত ছিল। কিন্তু পরীক্ষার ফলে প্রমাণিত হ'ল যে, পরমাণুর গঠন ব্যাপারে 'দুই আর দুইয়ে চার' গণিতের এই মূল নীতিটি খাটে না। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। হাইড্রোজেন পরমাণুর সঠিক ভর ১·০০৮১। হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকে আছে দু'টি প্রোটন ও দু'টি নিউট্রন। আর এই কেন্দ্রকের বহির্ভাগে আছে দু'টী ইলেকট্রন। গণিতের নিয়ম অনুসারে হিলিয়াম পরমাণুর ভর হওয়া উচিত ছিল ১·০০৮১ × ৪ = ৪·০৩২৪। কিন্তু পরীক্ষার ফলে এর প্রকৃত ভর পাওয়া গেল ৪·০০৩৮। এখন প্রশ্ন—হারিয়ে-যাওয়া ভরটুকুর কি হ'ল? আইনষ্টাইনের মতবাদ এর সমাধান ক'রে দিল। হিলিয়ামের যে ভরটুকুর হিসেব পাওয়া যায় নি সেই পরিমাণ পদার্থ নিশ্চয়ই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, একাধিক পরমাণুর সংযোগে যখন নূতন পরমাণুর সৃষ্টি হয় তখন খানিকটা পদার্থের বিলোপ হতে পারে। আর তা যদি হয়, তবে সেই পরিমাণ পদার্থ নিশ্চয়ই রূপান্তরিত হবে প্রচণ্ড শক্তিতে। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'সম্মিলন প্রক্রিয়া' (Fusion process)। বিজ্ঞানীদের মতে এই জাতীয় বিক্রিয়াই হ'ল সূর্যের অফুরন্ত তেজ-শক্তির প্রাণস্বরূপ। তাই সুদীর্ঘকাল ধ'রে এত আলো এবং তাপ বিলিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সূর্য আজও নিভে যায় নি!

সূর্যে হাইড্রোজেন আছে শতকরা ৩৫ ভাগ, আর হিলিয়াম ৪০ ভাগ। সে তুলনায় ভারি মৌলিক পদার্থ-গুলির পরিমাণ খুবই কম। হাইড্রোজেনের বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে যখন হিলিয়াম পরমাণুর সৃষ্টি হয় তখন খানিকটা পদার্থ লয় পায়। সেই পদার্থটুকু রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। কিন্তু প্রশ্ন, সূর্যের অভ্যন্তরে এইরূপ বিক্রিয়া ক্রমাগত সংঘটিত হয়ে চলেছে কি ক'রে?

গ্যাসের পরমাণু কখনও স্থির থাকে না, সর্বদা চারদিকে ছুটাছুটি করতে থাকে। এরূপ চঞ্চল গতি-সম্পন্ন অনেকগুলি পরমাণু একত্রে থাকলে যে তারা সতত পরস্পরকে আঘাত করবে এবং বিলিয়ার্ডের বলের মত নানাদিকে ছিটকে যাবে, একথা সহজেই অনুমেয়। এ ক্ষেত্রে পরমাণুগুলির গতিবেগ কম হওয়ায় আঘাতের তীব্রতা বেশী নয়। কাজেই এরূপ আঘাতের ফলে পরমাণুর কোন পরিবর্তন হতে পারে না। কিন্তু যদি কোন প্রকারে পরমাণুর গতিবেগ অসম্ভব রকম বাড়ানো যায় তাহলে এরূপ সংঘাতের ফলে পরমাণুর অভ্যন্তরে

পরিবর্তন ঘটা বিচিত্র নয়। আমাদের জানা আছে, গ্যাসকে উত্তপ্ত করলে পরমাণুর গতিবেগ বাড়তে থাকে। সূর্যের মধ্যে উত্তাপের মাত্রা কল্পনাতীত। সেখানে পরমাণুগুলি অতি ভয়ঙ্কর বেগে ছুটাছুটি করছে; কাজেই তাদের মধ্যে পরস্পর সংঘাতের ফলে যে এরূপ সম্মিলন-প্রক্রিয়া ঘটতে পারে, এ কথা সহজেই অনুমান করা যায়।

বিজ্ঞানীরা কল্পনা করেন, সূর্যের অতি শৈশবে কোন এক সময় অনেকখানি গ্যাসীয় পদার্থ পুঞ্জীভূত হয়। মহাকর্ষের নিয়ম অনুসারে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হবার ফলে তার উষ্ণতা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। এ ভাবে প্রচণ্ড উত্তপ্ত পদার্থ আরও ঘনীভূত হ'তে হ'তে উষ্ণতা বেড়ে ক্রমে দু' লক্ষ ডিগ্রীতে পৌঁছাল। এরূপ প্রচণ্ড উষ্ণতায় কোন পরমাণুই স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না; তাদের ইলেকট্রন কেন্দ্রক (Nucleus) থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বন্ধনমুক্ত এই সব পরমাণু কেন্দ্রকগুলির মধ্যে তখন সংঘাত সুরু হয় এবং তাপমাত্রা ক্রমশঃ আরও বাড়তে থাকে। এই ভাবে সূর্যের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন হাইড্রোজেন পরমাণুর সম্মিলনের ফলে তৈরি হয় ডয়-টেরিয়াম (হাইড্রোজেনের ভারি সমপদ)। দুটো ডয়-টেরিয়াম মিলে তৈরি করে হিলিয়াম। এই ভাবে সূর্যের অভ্যন্তরে পরমাণু-বোমার মত বিস্ফোরণ ঘটছে অবিরত, আর এই প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত পদার্থের বিলোপ হয়ে তা থেকে প্রচুর শক্তি জন্মাচ্ছে। সুদীর্ঘকাল ধ'রে এই প্রক্রিয়া চলার ফলে ক্রমে সূর্যের উষ্ণতা দাঁড়িয়েছে প্রায় দু' কোটি ডিগ্রী। এই হ'ল সূর্যের বর্তমান অবস্থা।

কিন্তু এখানেও একটা সমস্যা দেখা দিল। সূর্যের কেন্দ্র থেকে যত উপর দিকে যাওয়া যায় সূর্যের তাপমাত্রা তত কমে যেতে থাকে। আগেই বলেছি, সূর্যের বহির্ভাগের উষ্ণতা প্রায় ৬০০০ ডিগ্রী। বিজ্ঞানীদের মতে এত কম তাপমাত্রায় এ ধরণের বিক্রিয়া না-ও ঘটতে পারে। তাই তাঁরা বললেন যে, সূর্য যে শুধু এই ভাবেই তার শক্তির সবটুকু আহরণ করছে তা নয়, কোন ভারি পরমাণুর কেন্দ্রক (Nucleus) হয়ত হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকে-কেন্দ্রকে সংযোগ-ক্রিয়ায় বিশেষভাবে সহায়তা করছে। বিজ্ঞানী বেথের মতে কার্বন (অঙ্গার) পরমাণুর কেন্দ্রক এ কাজে চমৎকার সাহায্য করতে পারে। পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, সূর্যে কার্বনের পরিমাণ শতকরা মাত্র এক ভাগ। কিন্তু বিজ্ঞানী বেথে বললেন, সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটি ঘ'টে যাবার পর কার্বন পরমাণু আবার ফিরে পাওয়া যায়। কাজেই সূর্যের মধ্যে কার্বনের পরিমাণ খুব কম থাকলেও এই বিক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। এই মতবাদ সৌরদেহের কার্বন-চক্র (Carbon cycle) নামে পরিচিত এবং বর্তমানে একেই সৌরশক্তির উৎস সম্পর্কে সবচেয়ে সম্ভাব্য মতবাদ ব'লে মেনে নেওয়া হয়েছে।

এই বিক্রিয়ার ফলে মোট চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু খরচ হয়, আর তার বদলে পাওয়া যায় একটি হিলিয়াম পরমাণু। বিজ্ঞানীর সূক্ষ্ম হিসেবে দেখা যায় যে, হিলিয়াম যতটুকু তৈরি হয় তার ভর চারটি হাইড্রোজেনের মোট ভর থেকে একটু কম। আইনষ্টাইনের নিয়ম অনুসারে এই ভাবে উদ্ভূত শক্তির পরিমাপ $৫৫·৪৩ \times ১০^{১০}$ ক্যালরি। প্রায় ৭৭ টন কয়লা পুড়িয়ে এই পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যেতে পারে।

বোঝা গেল, সূর্যের এই বিশাল চুল্লীটি অনির্বাপিত রাখতে হাইড্রোজেনে ইন্ধনের কাজ করছে কিন্তু যত দিন যাচ্ছে হাইড্রোজেনের পরিমাণ ধীরে ধীরে তত কমে আসছে। এই ভাবে যখন সবটুকু হাইড্রোজেন খরচ হয়ে যাবে তখন এক অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে। হাইড্রোজেনের অভাবে কোন বিক্রিয়া আর সম্ভব হবে না ব'লে নূতন ক'রে আর শক্তিরও সৃষ্টি হবে না। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে তাপ বিকিরণ ক'রে ক'রে প্রচণ্ড উত্তপ্ত সূর্য ক্রমশঃ শীতল হতে থাকবে। শেষে একদিন তাপ হারিয়ে সূর্য হিমশীতল জ্যোতিহীন একটি জড়পিণ্ডে পরিণত হবে। আর সূর্য যদি নিভে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বুকেও নেমে আসবে ঘোর দুর্দিন; মানুষ এবং অন্যান্য জীবের শেষ অস্তিত্বটুকুও সেদিন নিঃশেষে মুছে যাবে পৃথিবীর বুক থেকে! কিন্তু সেদিন যে কবে আসবে তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। একের পিঠে ক্রমাগত শূন্য বসিয়ে একটা সংখ্যা হয়ত নির্ণয় করা যাবে, কিন্তু তার পরিমাপ কি তা আন্দাজ করতে গেলেই আমাদের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। কাজেই এ নিয়ে এখন থেকেই দুর্ভাবনায় দিন কাটাবার কোন প্রয়োজন নেই।

—•—

জন্মকথা

[প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প]

'সম্বুদ্ধ'

বনবাসের দ্বাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঋষিগণের সহিত পরামর্শ-ক্রমে স্থির হইয়াছে, অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর কাল পাণ্ডবগণ বিভিন্ন বেশে মৎস্যরাজ বিরাটের পুরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।

যাত্রার সমস্ত আয়োজন সুসম্পন্ন, এমন সময়ে অর্জুন অকস্মাৎ বাঁকিয়া বসিলেন। তিনি কহিলেন, হে অগ্রজ, বিষয়-রহিত ঋষিগণের সহিত নিরন্তর সংসর্গের ফলে আপনার বিষয়-বুদ্ধি সম্যক্ বিলুপ্ত হইয়াছে। নচেৎ এইরূপ একটা অবাস্তব পরিকল্পনাকে বরণীয় মনে করিতে পারিতেন না।

ভীম কহিলেন, অর্জুন, সংযত হও। অগ্রজ আমাদিগের নমস্য। তাঁহার প্রতি বা তাঁহার সম্পর্কে নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করিও না।

অর্জুন কহিলেন, বর্ণনা-মাত্রই নিন্দাবাদ নহে। নিজের ভুলের কথা অপরের মুখেই শ্রবণ করিতে হয়। পরুষ বোধ হইলেও সে বাক্য সর্বথা নিরর্থক না হইতে পারে।

ভীম কহিলেন, তুমি মাত্রা লঙ্ঘন করিতেছ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আহা, কলহ কেন কর। বৎস অর্জুন, আমরা বহুবিধ চিন্তা ও আলোচনার অন্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। তৎকালে তুমি এ বিষয়ে কোন আপত্তি প্রকাশ কর নাই। এখন শেষ মুহূর্তে অকস্মাৎ বিরোধিতা কেন করিতেছ?

অর্জুন কহিলেন, দেব, পূর্বে সম্যক্ প্রণিধান করিয়া দেখি নাই। আপনি সকলের জ্যেষ্ঠ, শিরোমণি, অশেষ শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার ভাজন। আপনার বাক্য বলিয়াই ইহাকে নিঃসংশয়ে মানিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে ভাবিয়া দেখিতেছি, এই পরিকল্পনা বহুল দোষদুষ্ট। বিশেষত আমার পক্ষে।

—কিরূপ, বুঝাইয়া বল।

—বলিতেছি। আপনি ব্রাহ্মণ-চরিত্র, ব্রাহ্মণবেশে আপনাকে চমৎকার মানায়। রাজা বিরাটের দ্যূত-সহচর রূপে আপনি একান্তে ও নিভৃতে বাস করিবেন, আপনার পরিচয় লইয়া কেহ কৌতূহলী হইবে না। মধ্যম রন্ধনপটু, ভোজন-বিলাসী ও মল্লক্রীড়াসক্ত। সূপশালায় তিনি সহজে এবং সানন্দে আত্মগোপন করিবেন, কর্তব্যাবকাশে যেটুকু অবসর, তাহা রাজপুরবাসী মাগধ সূপকারগণের সহিত মল্লক্রীড়ায় অতিবাহিত করিবেন। কিন্তু আমি? আমি কি প্রকারে সকলের অলক্ষ্য হইব?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তুমি অন্তঃপুরে আশ্রয় লইবে, স্ত্রীবেশে। রাজ-অন্তঃপুরে এমন কে আছে যে তোমাকে চিনিয়া ফেলিবে?

—যে কোন ব্যক্তি। আত্মশ্লাঘা করি না, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, পাণ্ডবকুলে আমি সমধিক তেজঃপুঞ্জ-কান্তি। আমার ইতরবেশধারণ, অনলশিখাকে ধূম্রাবৃত করিবার ন্যায় বৃথা চেষ্টায় পর্যবসিত হয়। পাঞ্চালীর স্বয়ংবর-সভায় তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন। আপনারা সকলে ব্রাহ্মণবেশে অক্লেশে চলিয়া গেলেন, অথচ আমি সভাস্থলে প্রবেশ করিবামাত্র আমার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, 'কেবা দ্বিজ মনসিজ' বলিয়া সমগ্র সভা চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্বয়ংবর সভাতে নানা দিগ্‌দেশাগত রাজা ও রাজপুত্রগণ সমবেত হইয়াছিলেন, সেইখানেই আমার এই দশা। রাজান্তঃপুরে, নারীগণমধ্যে, আমার পরিচয় কয় মুহূর্ত গোপন থাকিবে? আমার এই অমিততেজোব্যঞ্জক বীরবপু, ইহার পরিচয় নিঃশেষে লুপ্ত করিবে কোন্ শাড়ি, কোন্ কাঁচুলি?

যুধিষ্ঠির দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে কহিলেন, তাহা বটে।

অর্জুন কহিলেন, অপি চ, সেই অন্তঃপুরে দেবী দ্রৌপদীও বাস করিবেন। কারণে বা অকারণে, উভয়ে সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নহে; হয়ত বা ঘটনাক্রমে দীর্ঘ সাহচর্যও ঘটিবে। কোন অসতর্ক মুহূর্তে, কোন অনবধান কার্যোপলক্ষে, যদি দেবী অকস্মাৎ আত্মবিস্মৃতা হন, আমাকে স্বনামে সম্বোধন করিয়া ফেলেন?

দ্রৌপদী কহিলেন, আমি যদি তরলোদরী হইতাম, তাহা হইলে বহুকালই বহু অনর্থ ঘটিত। বহুজনের বহু গোপন কথা আমার অন্তরে সঞ্চিত আছে। আমাকে লইয়া ভাবিতে হইবে না।

অর্জুন কহিলেন, বেশ। কিন্তু আমার এই রূপ, এই সুরোচিত আকৃতি, অন্তঃপুরিকার স্বল্প বসনে সম্যক্ আবৃত থাকিবে না। অদৃষ্টদোষে আমার চেহারাটি রমণীমনোমোহন—যেখানে গিয়াছি, সেইখানেই আমাকে দেখিয়া নারীকুলে চিত্তচাঞ্চল্য উদ্রিক্ত হইয়াছে। বিরাটের অন্তঃপুরে যদি কোন অন্তঃপুরিকা আমাকে দেখিয়া অকস্মাৎ চঞ্চলা হন, তখনও কি দেবী অচঞ্চলা থাকিতে পারিবেন?

দ্রৌপদী কহিলেন, শুধু তাহারা কেন। চঞ্চল হইবার বিদ্যা তোমারও কম জানা নাই। তুমি কৃষ্ণসখা, চিরদিন ঘাটে ঘাটে তোমার প্রণয়িনী জুটিয়াছে। চিত্রাঙ্গদা, উলূপী, সুভদ্রা—কাহাকে লইয়া কবে কলহ-কোন্দল করিয়াছি? না হয় সেই সপত্নী-বাহিনীতে আরও কিঞ্চিৎ জনবাহুল্য ঘটিবে। তাহাতে আমার কি ক্ষতি-বৃদ্ধি?

ব্যাস কহিলেন, সাধু, বৎসে! অপরিহার্যকে অম্লান মুখে স্বীকার করিয়া লওয়াই পরম নারীধর্ম।

অর্জুন কহিলেন, ধন্য হইলাম। কিন্তু তথাপি সংশয় আছে। কোন রাজান্তঃপুরিকা যদি আমার প্রতি আকৃষ্টা হন, রাজার তাহা সম্যক্ পছন্দ না হইতে পারে। সুভদ্রাকে লইয়া কষ্টে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। রাজাবরোধ হইতে সেরূপ পলায়ন তত সহজ হইবে না। রাজশ্যালক ও রাজসেনাপতি মহাবল কীচক স্বয়ং রাজার অন্তঃপুররক্ষক; তুল্যবলশালী ঊনশত ভ্রাতার সহিত সে অন্তঃপুরে প্রহরা দেয়। তাহাদিগের মহাবাহুর মহাকিল মধ্যমের সহ্য হইতে পারে, আমার মুহূর্তেক সহ্য হইবে না, অচিরাৎ মরিয়া যাইব।

অর্জুন তাঁহাদিগকে বিনয়-রহিত ও বিনয়-বোধ-রাহিত্যের মূল হেতু বলিয়াছেন বলিয়া উপস্থিত ঋষিগণ সক্রোধে নীরব হইয়া ছিলেন। এবার মহর্ষি গালবের ধৈর্য-চ্যুতি ঘটিল। তিনি কহিলেন, তোমার দম্ভ অসহ্য। অনেকা অপরিণতবুদ্ধি গোপকন্যা বা জনদুষ্ট অপূর্বদৃষ্টার্যযুবকা অনার্যকন্যাকে মোহিত করিয়াছিলে বলিয়া কি তোমার ধারণা, নারীমাত্রই তোমাকে দেখিবামাত্র প্রেমে পড়ে? বিরাট ক্ষত্রিয় রাজা। তাহার অন্তঃপুরবাসিনী নারীগণ নানাবিধ আর্যপুরুষ ও নবযৌবন রাজপুত্রকে সতত দেখিয়া থাকেন।

অর্জুন কহিলেন, দেব, অপরাধ লইবেন না। কেবল মনুষ্য-কুমারী নহে। ইন্দ্রলোকপ্রবাসকালে আমাকে দেখিয়া স্বয়ং অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা উর্বশী স্বতঃ মদনাহতা হইয়াছিলেন, উপযাচিকা হইয়াছিলেন। নেহাৎ আমি কঠিন বালক, নচেৎ সমূহ কেলেঙ্কারি ঘটিতে পারিত। অতএব আমার শঙ্কিত হইবার কারণ আছে। দগ্ধগৃহ ঋষভ সিন্দুরবর্ণ মেঘাবলোকনে ভীত হয়।

ভীম কহিলেন, তুমি একেবারেই স্থানকাল বিস্মৃত হইয়াছ। পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ, পরমশ্রদ্ধেয় ঋষিবর্গ, মহামতি ব্যাসদেব এস্থলে উপস্থিত। তুমি কোথায় কোন্ লীলা করিয়াছ, তাহার কাহিনী ইহাদিগের সমক্ষে এমন অম্লানবদনে বলিয়া যাইতেছ? তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।

অর্জুন কহিলেন, সেইজন্যই ত বলিতেছি। ভবিষ্যতে আরও লজ্জার সম্ভাবনাকে পরিহার করিতে চাহি। অগ্রজের নিকটে আমার গোপনীয় কিছুই নাই—গোপনতা পাপবৃত্তির সহচর। ব্যাসদেব ত্রিকালজ্ঞ, তিনি আমাদিগের জীবনীকারও হইবেন। তাঁহার নিকটে গুপ্ত বা গোপনীয় কি আছে?

ব্যাস কহিলেন, তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না বৎস। আমি সমস্তই অবগত আছি।

ঋষিপ্রমুখ গালব কহিলেন, আমরাও।

ঊর্ধ্ব গগনে একটি জ্যোতির্বলয় দৃষ্ট হইল। ক্রমে নিকটবর্তী হইল, দিব্য আলোকপ্রভায় দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হইল। সৌরভে পবন পরিপূর্ণ হইল। একটি অপরূপ লাবণ্যবতী নারীমূর্তি ভূতলে অবতীর্ণা হইলেন। কৃতাঞ্জলিপুটে ব্যাসদেবকে প্রণাম করিলেন। নম্রভঙ্গিতে যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিলেন।

ব্যাস কহিলেন, আইস, বৎসে। তোমার কথাই হইতেছিল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দেব, কে ইনি?

ব্যাস কহিলেন, ইনি উর্বশী। মহারাজ পুরুরবার প্রিয়তমা, কুরুবংশের জননী।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পিতামহী, প্রণাম করি।

উর্বশী কহিলেন, পিতামহী সম্বোধন করিও না, আমি চিরযৌবনা। অর্জুন, আমি আসিয়াছি।

অর্জুন কৃতাঞ্জলি। নিঃশব্দে মস্তক অবনমিত করিলেন।

উর্বশী কহিলেন, বলিয়াছিলাম, একদিন তুমি আমাকে স্মরণ করিবে, আবার দুইজনে দেখা হইবে। আজ তুমি স্মরণ করিয়াছ। আমিও তাই আসিয়াছি।

ঋষিগণ বক্রনেত্রে পরস্পরের দিকে তাকাইলেন।

উর্বশী কহিলেন, বৎস, অযথা লজ্জিত হইও না। শুন, সেদিন আমি উপযাচিকা হইয়াছিলাম, তুমি ব্রত-

রাষ্ট্রপতি হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলে, পৌত্রী তাঁহাকে 'আরতির' দ্বারা অভ্যর্থনা করিতেছেন

নিষ্ঠাভরে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলে, আমি সেই অপরাধীর দণ্ডবিধান করিয়াছিলাম, তুমি পৌরুষ রহিত হইবে। অভিশাপ নহে, অভিশাপের আবরণে সে আমার আশীর্বাদ। তোমার সেই শাপভোগের কাল আরম্ভ হইল। অদ্য হইতে বৎসরকাল তুমি নপুংসকে পরিণত হইবে। নপুংসকরূপে অনায়াসে রাজান্তঃপুরে কাল অতিবাহিত করিবে। অজ্ঞাতবাস অন্তে তোমারও শাপ-ভোগের বৎসরকাল উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।

যুধিষ্ঠিরের মুখ হর্ষোদ্দীপ্ত হইল। ব্যাস স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিলেন।

অবরুদ্ধকণ্ঠ কষ্টে মুক্ত করিয়া অর্জুন কহিলেন, শিরোধার্য। কিন্তু দেবি, নপুংসকরূপে রাজান্তঃপুরে আমি কোন্ বৃত্তি লইয়া থাকিব?

উর্বশী কহিলেন, শিক্ষয়িত্রী। রাজকন্যা, রাজবধূ-দিগকে তুমি নৃত্য ও গীত শিক্ষা দিবে। তুমি সে বিদ্যায় পারদর্শী।

অর্জুন কহিলেন, তবেই হইয়াছে। দেবি, অপরাধ লইবেন না। রাজান্তঃপুরিকারা কি বস্তু হয় তাহা আপনার জানা নাই।

উর্বশী কহিলেন, কেন?

অর্জুন কহিলেন, আমার গুরু, গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন। আমি জানি উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় সংগীত। তাহা বিশেষ কৃচ্ছ্রসাধন-সাপেক্ষ। রাজপুরার আহ্লাদিনীগণ ক্লেশ-স্বীকারে অভ্যস্তা নহে। তাহারা স্বরসাধনা করিবে না, সুর ও তালের বিশুদ্ধতা আয়ত্ত করিবে না। স্বরগ্রাম অভ্যস্ত হইবার পূর্বেই তাহারা পূর্ণাঙ্গ গীত গাহিবার জন্য অধীরা হইবে, তাহাদিগের মাতা ও পিতৃষ্বসাগণ তাহাদিগকে সমর্থন করিবেন। ফলে যে অদ্ভুত রাগিণীকুলের সৃষ্টি হইবে, তাহার দায়িত্ব ও দুর্নাম সমস্তই অর্শাইবে গুরুর উপরে। এতবড় শাস্তিটা আমাকে দিবেন?

উর্বশী কহিলেন, কথা যথার্থ। কিন্তু তাহা ভাবিয়া তুমি চিন্তিত হইও না। এই আহ্লাদিনীগণের প্রকৃতি ও কার্যক্রম সকলেরই সুবিদিত। ইহাদিগের কার্য বা অকার্যের জন্য দায়িত্ব কাহারও উপরেই অর্শায় না। তোমার প্রয়োজন কালাতিবাহন, দিনগত পাপক্ষয়মাত্র করিবে। তাহার অতিরিক্ত কর্তব্য তোমার নাই।

অর্জুন কহিলেন, তথাপি দ্বিধার হেতু আছে। আমি জানি বীরোচিত সংগীত। তাহারা তাহাতে অনধি-কারিণী। তাহারা চাহিবে ইনাইয়া-বিনাইয়া' প্রেম-ঘটিত ন্যাকামির গান গাইতে। 'হে প্রিয়তম' বলিয়া গান আমার মুখে আসিবে না। 'হে প্রিয়তমে' বলিয়া গাহিতে গেলে আমার অদৃষ্টে লগুড়প্রহার।

উর্বশী কহিলেন, তুমি বৃথা শঙ্কিত হইতেছ। ক্লীবদেহ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তোমার মন এবং চেতনাতেও ক্লীবত্ব স্বতঃ সঞ্চারিত হইবে। অতএব তখন 'হে প্রিয়তম' উক্তি অতি সহজ ও স্বাভাবিক আবেগেই তোমার মুখে ফুটিয়া উঠিবে; তুমি যাহাকে 'ন্যাকামি' বলিয়া অভিহিত করিলে, বাচনভঙ্গির সেই মনোরম ও মোলায়েম স্পর্শটিও স্বতঃই তোমার কণ্ঠে অবতীর্ণ হইবে। হে সব্যসাচী, তুমি কেন মিথ্যা মোহগ্রস্ত হইতেছ। মাভৈঃ বলিয়া লাগিয়া যাও, দেখিবে সংসারে কোন কার্যই মানবের অসাধ্য নহে। এই ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য ত্যাগ কর, হে পরন্তপ, নবীনতর কর্মজীবনে জাগিয়া উঠ। তোমার মঙ্গল হউক, তোমার মাধ্যমে জগতেরও মঙ্গল সাধিত হউক।

উর্বশী অন্তর্হিতা হইলেন।

অর্জুন বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন। দেখিলেন, ব্যাস যুধিষ্ঠিরাদির একাগ্র দৃষ্টি তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ।

ব্যাস কহিলেন, বৎস, এখনও কেন তোমার দ্বিধা?

অর্জুন নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, না, আর দ্বিধা নাই। কিন্তু দেব, তবুও একটি প্রশ্ন আমার মনে জাগিতেছে। অনুমতি পাইলে নিবেদন করি।

ব্যাস কহিলেন, অসংকোচে। বল বৎস, কি তোমার প্রশ্ন।

অর্জুন কহিলেন, দেবী উর্বশীর বরে নারীসুলভ স্বর ও ভঙ্গি যদি সত্যই আমার কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়, তবে আর আমার চিন্তার কিছু থাকে না। কিন্তু আমার সেই বিকৃত নির্দেশ ও তাহাদের খণ্ডিত সাধনার মিলনে যে ভগ্ন-রাগিণীকুলের জন্ম হইবে, তাহাদের গোত্র-পরিচয় কোথাও থাকিবে না। আমার ক্লীবত্ব ক্ষণিকের; সেই রাগিণীগুলিরও কি আয়ুষ্কাল ক্ষণস্থায়ীমাত্র হইবে? অথবা কি আমার ক্লীবত্বের অবসানেও সেই হিজ্‌ড়োচিত সঙ্গীতগুলিও জগতে টিঁকিয়া থাকিবে, চিরকাল ধরিয়া পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইবে, শুদ্ধ সঙ্গীতের মূলোচ্ছেদ করিয়া চিরাগত রাগ ও রাগিণী-গণকে পৃথিবী হইতে অনাদরে নির্বাসিত করিয়া রাখিবে, এবং সেই অপজাত সঙ্গীতের উদ্ভাবক বলিয়া আমার নাম যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ জগতে ধিকৃত হইতে থাকিবে?

ব্যাস কহিলেন, বৎস, অত কঠিন-কঠিন ভাষা বলিতে নাই। জগৎ মায়ামাত্র, সকলেই ক্ষণিক কালের। তুমিও চিরস্থায়ী নহ, আমিও নহি। বিশেষ একটি আঙ্গিকের

প্রবর্তক বলিয়া তোমার নাম যদি অমরত্ব লাভ করে, তোমার মানসসৃষ্টি সেই নবতর গীতধারা যদি চিরকাল প্রবাহিত থাকে, তোমার তাহাতে দুঃখের কি আছে?

অর্জুন উত্তেজিত হইয়া কি বলিতে গেলেন, তার পর হঠাৎ থামিয়া গেলেন। তাঁহার দেহতরুর পল্লবে পল্লবে, হিল্লোলে হিল্লোলে একটি থরথর কম্পন জাগিয়া উঠিল; সমগ্র চেতনা ব্যাপিয়া একটি অজ্ঞাত পুলক-শিহরণ, একটি অভূতপূর্ব তীব্র বেদনা খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে মস্তক অর্ধ উত্তোলিত করিলেন, মিহি ও মধুর স্বরে কহিলেন, দেব, তাহা হইলে আমার সেই গীতি-কন্যারা জগতে অমর হইবে?

ব্যাস কহিলেন, নিঃসন্দেহে। বৎস, মানুষ মর, ধ্বনি অমর, কারণ নাদই ব্রহ্ম, তাহার বিনাশ নাই। হে অর্জুন, তুমি জানিতেছ না, কিন্তু আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেছি, আগামী কালের তরুণ-মনের জন্য কি অপরূপ সম্পদ্ তুমি সৃষ্টি করিতে যাইতেছ।

বৎস, শাস্ত্রীয় মার্গসঙ্গীত দুরূহ—বিশেষ অধিকার ও সমূহ সাধনা ব্যতীত তাহাকে কেহ আয়ত্ত করিতে পারে না। ফলে, সাধারণ জনতা চিরকালই তাহার রস পানে বঞ্চিত রহিয়া আসিয়াছে। চিরবঞ্চিত মানব-মনের, ভাবব্যাকুল তরুণ-চিত্তের সেই চিরসঞ্চিত তৃষ্ণার জাহ্নবীধারাকে তুমিই মর্ত্যে আনয়ন করিবে। তোমার প্রবর্তিত এই নব সঙ্গীত-ধারায়—স্বরগ্রাম সাধনার কৃচ্ছ্র তপস্যার, বা আঙ্গিকজ্ঞানের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিবে না। অনায়াসে অভ্যস্ত বলিয়াই সে সঙ্গীত সর্বজনের কণ্ঠে সমানে আয়ত্ত হইবে; যাবৎ সৃষ্টি, তাবৎ তাহার বিনাশ বা বিলোপ হইবে না।

হে ফাল্গুনী, জীবন ও যৌবন নশ্বর; কিন্তু বোকামি ও ন্যাকামি চিরন্তন, অবিনশ্বর। এই গীতের তাহাই হইবে প্রাণশক্তি। ইহার রচনা করিবার জন্য রাগিণী-ধ্যান, ভাব বা ভাষাজ্ঞান, কিছুরই প্রয়োজন হইবে না; শুধু পুষ্প, মাল্য, কণ্টক, কণ্ঠ, কর, বিদায় বেলা, ইত্যাদি গুটিকতক সুলভ শব্দের পৌনঃপুনিক প্রয়োগ। ইহা অক্লেশে রচিত হইয়া যাইবে। অশিক্ষিতপটু কবিকুলের পক্ষে ইহা পরমা ঋদ্ধি বলিয়া গণ্য হইবে—সকলেই গীতকার, সকলেই সুরস্রষ্টা, সকলেই গায়ক। সহজ ও সুলভ বলিয়া ইহা সার্বজনীন।

অপি চ, এই সঙ্গীত সর্বকালের সর্বজনের প্রাণের কথা ব্যক্ত করিবে; শ্রবণমাত্র প্রত্যেক শ্রোতা ও শ্রোত্রীর মনে হইবে, এই গীতে বিশেষ ভাবে তাহাকেই উদ্দেশ করা হইতেছে। এই সঙ্গীত মূলতঃ তুম্যারাম্যাত্মক; যে কথা মুখে বলিবার সাহস নাই তাহা এই গীতের মধ্য দিয়া ঘোষণ ও শ্রবণ করিয়া তাহারা আত্মতৃপ্তি সাধন করিবে; চিত্তবৃত্তির অবদমনসঞ্জাত মনঃবিক্ষোভ ও তজ্জাত বুদ্ধিবিকৃতিরূপ ব্যাধির ইহা টীকাস্বরূপ হইবে।

এই সঙ্গীত সার্বজনীন ও সর্বকালীন; তাই সর্বদা এবং সর্বত্র ইহা আধুনিক, অত্যাধুনিক, প্রাধুনিক, প্রভৃতি নামে পরিচিত হইবে।

হে সব্যসাচী, কেবল তরুণ-তরুণী নহে। যাহার চিত্তে তারুণ্য, সেই তরুণ—এই গীত সকলের। কেবল মানব নহে, রাজা চিত্রসেনের কুলাঙ্গার গন্ধর্বকুলও অচিরাৎ এই সঙ্গীত অভ্যাস করিয়া লইবে। অদৃশ্য কণ্ঠের সেই সুখশ্রাব্য গীতধারা আকাশে-বাতাসে অনুক্ষণ ভাসিয়া বেড়াইবে; গায়ককে কেহ দেখিতে পাইবে না, অথচ অশরীরী সঙ্গীতে মুগ্ধ হইবে, দিক্-সঙ্গীত, অন্তরীক্ষ-গীতি, আকাশবাণী, ইত্যাদি নামে তাহাকে আখ্যাত করিবে। এই সঙ্গীত অলৌকিক, অপৌরুষেয়, অমোঘ। এই প্রাচীন-মোহ-মূঢ় জগতে নবতর অবদানের ভিত্তি স্থাপন কর, চিরাগত সুরজগতে তোমার বিপ্লবী পদক্ষেপের বলিষ্ঠ স্বাক্ষর রাখিয়া যাও।

বৎস, দ্বিধা করিও না, সময় স্বল্প। বিলম্ব করিও না, লাগিয়া যাও।

বৃহন্নলা প্রণাম করিয়া কহিলেন, যথা আজ্ঞা দেব।
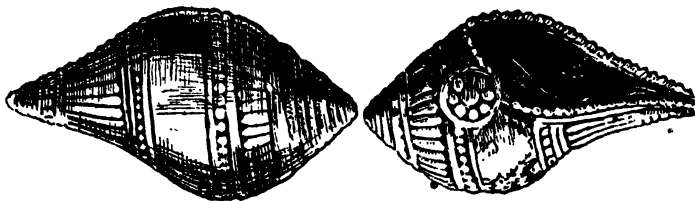
ফা-হিয়েনের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত

অনুবাদক—শ্রীরবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

[পঞ্জাব হইতে বৈশালী। আনন্দের দেহত্যাগ।][১]

পঞ্জাব

নদী অতিক্রম করিয়া তীর্থযাত্রীরা যে দেশে প্রবেশ করিলেন, তাহার নাম পে-টু (পঞ্জাব)। এই দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম পূর্ণগৌরবে বিদ্যমান ছিল এবং এখানে হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরাই বাস করিতেন। সম-ধর্ম্মাবলম্বী চৈনিক পরিব্রাজককে দেখিয়া এই সকল ভিক্ষুরা তাঁহার প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—"সীমান্তবর্ত্তী দেশের (চীন দেশের) লোকেরা কি করিয়া সন্ন্যাসী হইতে শিখিল এবং কেমন করিয়াই বা আমাদের ধর্ম্মের জন্য বুদ্ধের অনুশাসনের অনুসন্ধানে এত দূর হইতে চলিয়া আসিল?" তাঁহারা পরিব্রাজকদিগকে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য দ্বারা সাহায্য করিলেন এবং ধর্ম্মীয় বিধান অনুসারেই তাঁহাদের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

মথুরা

এই স্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা একটার পর একটা করিয়া বৌদ্ধমঠ অতিক্রম করিয়া যাইতে লাগিলেন। ঐ সকল মঠে যে সকল ভিক্ষু বাস করিতেন, তাঁহাদের সমষ্টিকে নিযুত সংখ্যায় গণনা করিতে হয়। এই সকল স্থান অতিক্রম করিয়া তাঁহারা মা-তাউ-লো (মথুরা) দেশে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা পু-না (যমুনা) নদীর তীর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই নদীর উভয় তীরে ২০টি মঠ ছিল। ঐ সকল মঠে তিন সহস্র ভিক্ষু বাস করিতেন। এই দেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম সগৌরবে বিদ্যমান ছিল।

ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মান

বালুকাময় মরুভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের প্রত্যেকটি দেশে নৃপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিবার সময় রাজারা তাঁহাদের রাজ-মুকুট খুলিয়া রাখিতেন এবং স্বহস্তে ভিক্ষুদিগকে খাদ্যাদি দান করিতেন। রাজার আত্মীয়বর্গ এবং মন্ত্রীরাও রাজার অনুকরণ করিতেন। এইরূপ দানকার্য্য সম্পাদনের পর ভিক্ষুদলপতির সম্মুখে একখানা কার্পেট বিছানো হইত এবং রাজা স্বয়ং তাহাতে বসিতেন। ভিক্ষুসঙ্ঘের সম্মুখে সিংহাসন বা ঐ শ্রেণীর উচ্চ আসনে বসিবার মত ধৃষ্টতা কোন রাজাই প্রদর্শন করিতেন না। বুদ্ধের জীবদ্দশায় নৃপতিরা যে নিয়মে এবং যে পদ্ধতিতে দানাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন, এই সময় পর্য্যন্ত সকল রাজাই সেই নিয়ম ও পদ্ধতির অনুকরণ করিয়া চলিতেন।

মধ্যরাজ্য

এই দেশের সমগ্র দক্ষিণ দিক্ ব্যাপিয়া যে রাজ্যটি অবস্থিত, তাহার নাম মধ্যরাজ্য। ইহা নাতিশীতোষ্ণ এবং কদাপি এই রাজ্যে তুষার বা হিমানী সম্প্রপাত হয় না। এই দেশের লোকসংখ্যা অগণিত এবং সকল অধিবাসীই সুখী। তাহাদিগকে নিজ বাড়ীঘর রেজেষ্ট্রী করাইতে কিংবা কোন শাসকের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয় না। কেবলমাত্র যাহারা রাজকীয় ভূমি ভোগদখল করে, তাহাদিগকেই শস্যের অংশ দান করিতে হয়। তাহারা নিজ ইচ্ছানুসারে যে কোন স্থানে বাস করিতে বা ঐ স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে।

রাজদণ্ড

রাজা অপরাধীদিগকে দণ্ড দান করেন বটে, কিন্তু কাহাকেও শারীরিক দণ্ড দান করেন না। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে লঘু অথবা গুরুদণ্ড দান করা হয়। পুনঃ পুনঃ রাজদ্রোহ প্রভৃতি অতিগুরুতর অপরাধ করিলে অপরাধীর দক্ষিণহস্ত কাটিয়া দেওয়া হয়। রাজার শরীর-রক্ষী ও পার্শ্বচরেরা রীতিমত বেতন পায়। সমগ্র রাজ্য মধ্যে কোথাও কেহ প্রাণিবধ, মদ্যপান কিংবা পেঁয়াজ বা রসুন ভক্ষণ করে না। কেবলমাত্র চণ্ডালদের মধ্যেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

চণ্ডাল

যে সকল লোক নিজেদের দুর্ব্বৃত্ততার জন্য লোকালয়ের বাহিরে বাস করিতে বাধ্য হইত, তাহারাই চণ্ডাল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। কোন চণ্ডাল নগরী কিংবা বাজারের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলে তাহাকে একটি কাঠের বাদ্য

[১] ভূমিকাসহ প্রথম খণ্ড ভারতবর্ষ (ফাল্গুন, ১৩৬৬) পত্রিকায় এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রবাসীতে (মাঘ, ১৩৬৭) প্রকাশিত হইয়াছে।

বাজাইতে হইত। উদ্দেশ্য—এই বাদ্যধ্বনি শুনিয়া অন্যান্য লোক চণ্ডাল সংস্পর্শ এড়াইবার জন্য সরিয়া দাঁড়াইবে।

লোকচরিত্র

এই দেশে কেহ শূকর অথবা মোরগ পালিত না এবং জীবন্ত গবাদি জন্তুও বিক্রয় করিত না। বাজারে কোন মাংস বা মদের দোকান ছিল না। দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয়ে মূল্য রূপে হস্তিদন্ত প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। কেবলমাত্র চণ্ডালেরা মৎস্য ও পশুপক্ষী শিকার করিয়া তাহাদের মাংস বিক্রয় করিত।

বুদ্ধের পরিনির্ব্বাণের পর হইতে বিভিন্ন দেশের রাজা ও সঙ্গতিশালী বৈশ্যেরা যাজকদের জন্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। তাঁহারা ধাতুর পাতে দানপত্র লিখিয়া ভিক্ষুদিগকে জমি, বাড়ী, ফুল ও ফলের বাগান, ইত্যাদি দান করিতেন। ভিক্ষুরা পুরুষানুক্রমে উহা ভোগদখল করিতে থাকিতেন এবং পরবর্ত্তীকালের নৃপতিগণও ঐ সকল দানপত্রের নির্দ্দেশ অমান্য করিতেন না।

অতিথি-সৎকার

ভিক্ষুদের কর্ত্তব্য ছিল—ধর্ম্ম-সঙ্গত-কার্য্য-সম্পাদন, সূত্রের আবৃত্তি ও তপস্যা। কোন বৈদেশিক ভিক্ষুর সমাগমে মঠবাসীরা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা-সহকারে গ্রহণ-করতঃ বস্ত্র, ভিক্ষাপাত্র, পাদোদক, অভ্যঙ্গের তৈল এবং তরল (দুগ্ধাদি) খাদ্য দান করিতেন। অসময়ে অন্নাদি খাদ্য সংগ্রহ করা আয়াসসাধ্য ছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁহারা আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিতেন—কত বৎসর যাবৎ তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন? অতঃপর তাঁহার জন্য একটি শয়নকক্ষ নির্দ্দিষ্ট করিয়া মঠের নিয়মানুযায়ী অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইত।

যেখানেই ভিক্ষুরা দলবদ্ধভাবে বাস করিতেন, সেখানেই তাঁহারা শারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন এবং আনন্দের উদ্দেশ্যে এক একটি পৃথক্ স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া অভিধর্ম্ম, বিনয় এবং সূত্রের উদ্দেশ্যেও স্তূপসমূহ নির্ম্মাণ করিতেন। যে সকল পরিবারের লোকদের দৈব-আশীর্ব্বাদ লাভ অভিপ্রেত হইত, তাঁহারা বার্ষিক ছুটির এক মাস পরে ভিক্ষুদিগকে বিবিধ দ্রব্য দান করিয়া তাঁহাদের জল-যোগের জন্য তরল খাদ্য প্রদান করিতেন। সকল ভিক্ষুই সভাক্ষেত্রে মিলিত হইয়া ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেন এবং তাহার পর শারিপুত্রের স্তূপে নানা জাতীয় পুষ্প ও ধূপাদির সহিত অন্যান্য সামগ্রী নিবেদন করা হইত। সারারাত্রি প্রদীপ জ্বলিত এবং বিশেষজ্ঞ গায়ক ও বাদক-গণ সারারাত্রি ধরিয়া গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান করিতেন।

শারিপুত্র

শারিপুত্র যখন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তখন তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গিয়া নিজ কুলত্যাগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহাত্মা মুগলন এবং মহামতি কাশ্যপও অনুরূপ অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ভিক্ষুণীরাই অধিকাংশ সময়ে আনন্দের স্তূপে উপহার প্রদান করিতেন, কারণ নারীরা যাহাতে কুলত্যাগ করিয়া মঠে আসিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনিই (আনন্দ) ভগবান্ তথা-গতকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভিক্ষুণীরা প্রধানতঃ রাহুলের উদ্দেশ্যেই অর্চ্চনা করিতেন। অভিধর্ম্মের আচার্য্যেরা অভিধর্ম্মস্তূপে এবং বিনয়ের আচার্য্যেরা বিনয় স্তূপে উপহার দিতেন। প্রতি বৎসরই এইরূপ অর্চ্চনা হইত এবং প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যই এক-একটি বিশেষ দিন নির্দ্দিষ্ট থাকিত। মহাযানপন্থী ভিক্ষুগণ প্রজ্ঞাপারমিতা, মঞ্জুশ্রী এবং কোয়ান-শে-ইন্-এর (অবলোকিতেশ্বর) অর্চ্চনা করিতেন।

ভিক্ষুরা তাঁহাদের বার্ষিক প্রাপ্য গ্রহণ করিবার পর বৈশ্য সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবং ব্রাহ্মণগণ সকলে বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনয়ন করিয়া ভিক্ষুদের মধ্যে বণ্টন করিতেন। বুদ্ধের নির্ব্বাণলাভের সময় হইতে পবিত্র সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পুরুষ-পরম্পরায় একই প্রকার উৎসব, ধর্ম্ম ও আচার চলিয়া আসিতেছিল এবং কদাপি ইহা বিঘ্নিত হয় নাই।

যে স্থানে পরিব্রাজকেরা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছিলেন, তথা হইতে দক্ষিণদিকের সমুদ্রের দূরত্ব ছিল ৪০ অথবা ৫০ সহস্র লি এবং এই সমগ্র ভূখণ্ডই ছিল সমতল। নির্ঝরিণীসঙ্কুল বৃহৎ পর্ব্বতমালা কোথাও ছিল না; ছিল শুধু সমতল-প্রবাহিণী তটিনীর স্বচ্ছ পয়োধারা।

সাঙ্কাশ্য বুদ্ধের স্বর্গারোহণ

এই স্থান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে ১৮ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা সাঙ্কাশ্য নামক রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গে আরোহণের পর এই রাজ্যেই অবতরণ করিয়া তাঁহার জননীর হিতার্থে তিন মাস ধরিয়া এখানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি স্বকীয় লোকাতীত শক্তিবলে তাঁহার শিষ্যদিগকে না জানাইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিন মাস পূর্ণ হওয়ার সাত দিন পূর্ব্বে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হন।[২]

২। নির্জ্জনে তপস্যা করিবার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণে বুদ্ধদেব গোপনে তিন মাস আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই সম্ভবতঃ বুদ্ধের ভক্তগণ তাঁহার ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গে আরোহণ ও তথা হইতে অবতরণের গল্পটি রচনা করিয়াছেন।

দিব্যদৃষ্টিবলে তথাগতকে দর্শন করিয়া মহামতি অনুরুদ্ধ মহাত্মা মুগলনকে বলেন—"আপনি কি তথাগতকে বন্দনা করিবার জন্য যাইবেন?" মুগলন তৎক্ষণাৎ যাইয়া বুদ্ধের চরণে মস্তক রাখিয়া তাঁহার বন্দনা করেন। অতঃপর তাঁহারা পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে বুদ্ধ মুগলনকে বলিলেন—"আজ হইতে ৭ দিন পরে আমি জম্বুদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিব।" এই কথা শুনিয়া মুগলন ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে ৮টি রাজ্যের নৃপতিরা, মন্ত্রিগণ ও প্রজাপুঞ্জ দীর্ঘকাল বুদ্ধকে না দেখিয়া তাঁহার দর্শনের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আকাশপানে চাহিয়া রহিয়াছিলেন। এই রাজ্যের আকাশে মেঘমালাও যেন ভগবান্ তথাগতের দর্শনের জন্যই সম্মিলিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

উৎপলা

এই সময়ে ভিক্ষুণী উৎপলা ভাবিতে লাগিলেন -"আজ রাজা, মন্ত্রী ও প্রজাগণ সকলেই বুদ্ধের দর্শনলাভ করিবে। আমি একজন অবলা, কেমন করিয়া আমি সকলের আগে তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারি?" বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ লোকাতীত শক্তিবলে তাহাকে রাজচক্রবর্ত্তীর আকৃতি দান করিলেন এবং সেও সকলের আদিতে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারিল ৩

সোপানমালা

বুদ্ধ যখন ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ করেন, তখন মূল্যবান্ ধাতুনির্ম্মিত তিনটি সোপানমালার আবির্ভাব হইয়াছিল। বুদ্ধ ইহাদের মধ্যবর্ত্তী সোপানমালা অবলম্বন করিয়া নামিতে লাগিলেন। ইহা ছিল সপ্তধাতু নির্ম্মিত। তাঁহার ডানদিকে রজত সোপানমালা অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মলোকাধিপতি অবতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে ছিল একটি শ্বেত চামর। দেবরাজ শক্র বামদিকের বিশুদ্ধ সুবর্ণ-নির্ম্মিত সোপানমালা অবলম্বনে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি ধারণ করিয়াছিলেন সপ্তধাতু নির্ম্মিত একটি ছত্র। বুদ্ধের অবতরণ কালে অসংখ্য দেবতা তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তিনি ভূমিতে পদক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে সোপানমালাও অন্তর্হিত হইল। কেবলমাত্র সর্ব্বনিম্নস্থিত সাতটি সোপান তখনও দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।৪

পীত নির্ঝরিণী

পরবর্ত্তীকালে রাজা অশোক এই সকল সোপানের নিম্নসীমা দেখিবার জন্য খনক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা খুঁড়িতে খুঁড়িতে ভূগর্ভস্থ পীত নির্ঝরিণীতে পৌঁছিল, কিন্তু সোপানমালার শেষসীমা দেখিতে পাইল না।৫ এই ঘটনায় রাজার ভক্তি ও বিশ্বাস দৃঢ়তর হইল এবং তিনি সোপানশ্রেণীর উপর একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।৬

সিংহের গর্জ্জন

বিহারমধ্যে মধ্যবর্ত্তী সোপানশ্রেণীর ঠিক উপরে ১৬

৩। প্রকৃত কথাটি সম্ভবতঃ এই যে, রাজারা যে স্থানে মিলিত হইয়া বুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; ভিক্ষুণী উৎপলা সেখান হইতে আরও সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে বুদ্ধের দর্শনলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

৪। এই উপাখ্যানটি একটি রূপক। বুদ্ধ ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ আরোহণ করিয়াছিলেন বলিতে আমরা বুঝিতেছি, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনটি সোপানমালা বলিতে বুঝিতেছি ধর্ম্মাচরণের তিনটি বিভিন্ন পথ। শ্বেত সোপানমালা এবং শ্বেত চামর ব্যবহারকারী ব্রহ্মা বেদের জ্ঞানকাণ্ডের এবং স্বর্ণসোপান-ছত্র-ব্যবহারকারী দেবরাজ ইন্দ্র বেদের কর্ম্মকাণ্ডের প্রতীক। বুদ্ধ মধ্যবর্ত্তী সোপানমালা অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিতে বুঝিতেছি তিনি ধর্ম্মপ্রচারে একটি মধ্যবর্ত্তী পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনুসরণকারী অসংখ্য দেবতা বলিতে বুঝিতেছি, হিন্দুসম্প্রদায়ের অসংখ্য পূজাপার্ব্বণ।

রূপকটির তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধের ধর্ম্মপ্রচারের ফলে হিন্দুদের অসংখ্য ক্রিয়াকাণ্ড বন্ধ হইয়া গিয়াছিল; অথবা এইগুলি বৌদ্ধরূপ ধারণ করিয়া বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সর্ব্বনিম্নস্থিত ৭টি সোপানের অস্তিত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, এত করিয়াও হিন্দুদের যজ্ঞাদি বৈদিক-ক্রিয়া একেবারে বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। যজ্ঞের সাতটি বিভিন্ন অঙ্গ আছে বলিয়া তাহার এক নাম সপ্ততন্তু; অবশিষ্ট সোপানগুলির এই সাত সংখ্যা ও এই সপ্তাঙ্গ-বিশিষ্ট যজ্ঞকেই স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

৫। এই সিঁড়িগুলি সম্ভবতঃ অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রাজা বা ধনবান্ ব্যক্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অশোকের লোকেরা মাটি খুঁড়িয়া কিছু নীচে নামিতেই জল উঠিতে লাগিল। এই স্থানে ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকা পীতাভ ছিল বলিয়া কর্দ্দমাক্ত জলও পীতাভ হইল।

৬। স্বর্গ হইতে স্বর্ণনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী পৃথিবীতে অবতরণ করিল এবং তাহাদের ৭টি ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল এই গল্পটি নেহাৎ অবাস্তব। এই গল্পের পশ্চাতে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা সম্ভবতঃ নিম্নপ্রকার হিন্দুদের যাগযজ্ঞ (সপ্ততন্তু) সমূহ বিলোপ করিবার জন্য অশোক যখন তাঁহার সমুদয় রাজশক্তি প্রয়োগ করিয়াও সফলকাম হইলেন না, তখন তাঁহার মনে আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য এক নূতন পরিকল্পনার উদ্ভব হইল। সপ্ততন্তু বা সপ্তাবয়ব যজ্ঞের প্রতীকরূপে তিনি ৭টি সোনার সোপান প্রস্তুত করাইয়া তাহার উপর এক প্রকাণ্ড বৌদ্ধমঠ নির্ম্মাণ করিলেন। হিন্দুধর্ম্মের মেরুদণ্ডস্বরূপ যাগযজ্ঞের বিনাশসাধনে সমর্থ না হইলেও সেই সকল যাগযজ্ঞের অন্ততঃ একটি প্রতীককে যে তিনি মঠের নিম্নভাগে নিষ্পিষ্ট করিতে পারিয়াছেন, ইহাই ছিল তাঁহার আত্মপ্রসাদের হেতু।

হাত উচ্চ এক বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইল। বিহারের পশ্চাতে তিনি একটি লৌহস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। ইহার উচ্চতা ছিল প্রায় ৫০ হাত এবং ইহার উপরে স্থাপিত ছিল একটি সিংহ। স্তম্ভের মধ্যে চারিপার্শ্বে চারিটি বুদ্ধমূর্ত্তি সন্নিবেশিত হইল। ইহারা স্তম্ভের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইলেও ইহাদের মধ্য হইতে উজ্জ্বল রত্নকিরণ চারিদিকে বিকীর্ণ হইত। পরবর্ত্তীকালে কিছুসংখ্যক ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী লোক এইস্থানে ভিক্ষুদের বসতি সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া তর্কে প্রবৃত্ত হয়। ভিক্ষুরা উপযুক্ত যুক্তি দেখাইতে না পারায় বাজি রাখা হয় যে, এখানে যদি ভিক্ষুদের বাস করিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে কোন অলৌকিক ঘটনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইবে। এইরূপ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভশীর্ষস্থিত সিংহমূর্ত্তিটি ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠে এবং ইহা দ্বারা ভিক্ষুদের দাবী সমর্থিত হয়। এই ঘটনা দর্শনে বিরুদ্ধবাদীরা ভীত হয় এবং নতি স্বীকার-পূর্ব্বক প্রস্থান করে।[৭]

তিন মাস স্বর্গীয় আহার্য্য ভক্ষণের ফলে বুদ্ধের দেহ হইতে একপ্রকার দিব্য সুগন্ধ বাহির হইতে থাকে। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়া স্নান করেন। যে স্থানে তিনি স্নান করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে তথায় একটি স্নানাগার নির্ম্মিত হয়। এই স্নানাগারটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। যে স্থানে ভিক্ষুণী উৎপলা সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধের বন্দনা করেন, বর্ত্তমানে তথায় একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব তাঁহার জীবদ্দশায় যে সকল স্থানে কেশবপন ও নখচ্ছেদন করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেক স্থানেই স্তূপসমূহ শোভা পাইতেছে। শাক্যমুনি বুদ্ধ এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অপর তিনজন বুদ্ধ যে সকল স্থানে উপবেশন বা ভ্রমণ করিয়াছিলেন, ঐ সকল স্থানেও স্তূপ এবং তাঁহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে। যে স্থানে দেবরাজ শক্র এবং ব্রহ্ম-লোকাধিপতির সহিত বুদ্ধ অবতরণ করিয়াছিলেন, তথায় একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।[৮]

দানপতি নাগ

এইস্থানে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের সংখ্যা হাজারখানেক হইবে। তাঁহারা একই ভাণ্ডার হইতে খাদ্য গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহাযানের এবং অন্যেরা হীন-যানের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের আবাসস্থানের নিকটে একটি শ্বেতকর্ণ নাগ দানপতির[৯] পদ গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীদিগকে খাদ্যাদি উপকরণ দান করে। এই নাগের প্রভাবে যথাকালে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হইয়া প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়, কদাপি দৈবদুর্য্যোগ ঘটে না। ইহারই ফলে ভিক্ষুরা সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহারা একটি নাগমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে নাগের উপবেশনের নিমিত্ত কার্পেট বস্ত্র বিছাইয়া রাখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নাগের সেবার জন্য বিবিধ পুষ্টিকর দ্রব্যও উপহাররূপে প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রত্যহ তিনজন ভিক্ষু ঐ মন্দিরে গিয়া ভোজন করিয়া থাকেন।

নাগ-মন্দির

গ্রীষ্মাবসানে এই দানপতি নাগ নিজ আকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া একটি ক্ষুদ্র সর্পের আকার ধারণ করেন। এই ক্ষুদ্র সর্পের কর্ণের কাছে শ্বেত চিহ্ন বিদ্যমান। নাগকে চিনিবামাত্র ভিক্ষুরা নবনীতপূর্ণ তাম্রপাত্রে তাহাকে রাখিয়া প্রত্যেক ভিক্ষুর পার্শ্ব দিয়া তাহাকে লইয়া ঘুরিয়া আসেন। মনে হয় যেন নাগও ভিক্ষুদিগকে অভিবাদন করিতেছে। এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাগটি অদৃশ্য হইয়া যায়।[১০] এইভাবে প্রতি বৎসর এক-বার করিয়া এই নাগ দেখা দিয়া থাকে।

৭। এই গল্পটি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অপর ধর্ম্মাবলম্বী (হিন্দু)-দের সহিত তর্কে শ্রমণদের পরাজয় ঘটে, অর্থাৎ এখানকার জমিতে যে তাঁহা-দের স্বত্ব ছিল না, দলিলপত্রের সাহায্যে অপর ধর্ম্মাবলম্বীরা তাহা প্রমাণ করিয়া দেয়। তখন কূটকৌশল অবলম্বন করিয়া শ্রমণেরা দৈবশক্তির দোহাই দেন এবং বাজি রাখেন। অতঃপর তাঁহাদের নিজেদের প্রতি দৈবের আনুকূল্য বুঝাইবার উদ্দেশ্যে শ্রমণেরা স্তম্ভশীর্ষস্থিত সিংহমূর্ত্তির মুখে গোপনে কোনরূপ যন্ত্র সংযোগ করিয়া শব্দ সৃষ্টি করেন। ইহাকেই তাঁহারা অলৌকিক ঘটনা বলিয়া চালাইয়া দেন; রাজশক্তি বৌদ্ধদের পক্ষে থাকায় অসহায় অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে (হিন্দুদিগকে) নিজেদের ন্যায্য স্বত্ব ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়।

৮। তিন মাস আত্মগোপনের পর বুদ্ধ যে স্থানে প্রথম দর্শন দেন, সেখানেই শ্রমণেরা একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া উল্লিখিত গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন।

৯। যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে ভিক্ষুদিগকে প্রভূত পরিমাণে অন্নবস্ত্রাদি উপকরণ দান করিয়া থাকেন তাঁহাকে দানপতি বলে।

১০। খুব সম্ভব স্থানীয় লোকেরা সর্পপূজক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তাহারা বিশ্বাস করিত ক্ষেত্রাধিপতি কোন নাগরাজের অনুগ্রহেই তাহা-দের ক্ষেত্রে উত্তম ফসল ফলিয়া থাকে। শ্রমণেরাও জনসাধারণের এই বিশ্বাসকে সম্মান দিতেন এবং তাহারই ফলে জনসাধারণ তাঁহাদের অন্নবস্ত্র জোগাইত। শ্বেতকর্ণ নাগ বলিতে এমন একশ্রেণীর সর্পকে বুঝাইতেছে যাহাদের কর্ণের স্থানে একটি শ্বেত চিহ্ন বিদ্যমান। এই শ্রেণীর সর্প সম্ভবতঃ তেমন বিষাক্ত নহে। গ্রীষ্মাবসানে এই জাতীয় সাপেরই একটি বাচ্চা আনিয়া মন্দিরে স্থাপনকরতঃ তাহার পূজা ও সেবার ব্যবস্থা করা হইত। • অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলেই সাপের বাচ্চাটিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত প্রতি বৎসর এই ভাবে নূতন নূতন সাপের বাচ্চা আনিয়া উৎসবের অনুষ্ঠান করা হইত।

মহাস্তূপ

এই দেশের ভূমি অতিশয় উর্ব্বর এবং জনগণের সুখ ও সমৃদ্ধি অতুলনীয়। অন্য দেশের লোক এই দেশে আসিলে এখানকার অধিবাসীরা আগ্রহসহকারে তাঁহাদিগকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকেন। মঠের উত্তর-পশ্চিমদিকে পঞ্চাশ যোজন দূরে 'মহাস্তূপ' (The Great Heap) নামে আর একটি বিহার আছে। মহাস্তূপ ছিল একটি দুর্ব্বৃত্ত দানবের নাম। বুদ্ধ ইহাকে বশীভূত করেন।১১ এবং পরবর্ত্তী কালে এই স্থানে উক্ত বিহারটি নির্ম্মিত হয়। বিহার নির্ম্মাণের পর যখন উহা একজন অর্হৎকে দান করা হইতেছিল, তখন ঐ দানবারির কয়েক বিন্দু ভূমিতে পতিত হয়।

অক্ষয় বারিবিন্দু

অদ্যাপি ঐ বারিবিন্দুসমূহ একইভাবে অবস্থান করিতেছে। যতবার যতভাবেই ঐগুলিকে মুছিয়া দেওয়া হউক না কেন, তাহাদের পুনরাবির্ভাব ঘটে এবং কিছুতেই তাহাদের বিলুপ্তি হয় না।১২

উপদেবতা

এই স্থানে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত একটি স্তূপও আছে। একজন উপদেবতা সর্ব্বদাই এই স্তূপে বারিসিঞ্চন করিয়া থাকেন।১৩ এবং এই উদ্দেশ্যে কদাপি কোন মানুষের কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় না। এক সময়ে একজন দুষ্টবুদ্ধি নৃপতি বলেন—"আমি একটি বিপুল সেনাবাহিনীসহ এই স্তূপ বেষ্টন করিয়া থাকিব এবং যতদিন ধূলাবালি জমিয়া স্তূপটি ময়লা হইয়া না যায়, ততদিন স্থানত্যাগ করিব না।" রাজা এইরূপ করিলে উপদেবতা এক প্রবল ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করেন এবং ইহা দ্বারা স্তূপের সমুদয় ধূলাবালি পরিষ্কার করিয়া দেন।১৪ এই স্থানে একশতটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ আছে। কোন লোক এইগুলিকে গণনা করিতে আরম্ভ করিলে সারাদিন গণিয়াও সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে না। কিন্তু যদি সে প্রত্যেকটি স্তূপ গণনা করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পার্শ্বে একজন মানুষ দাঁড় করাইয়া রাখে, কেবলমাত্র তাহা হইলেই স্তূপগুলির নির্ভুল সংখ্যা নির্ণয় করিতে সমর্থ হয়।১৫

এখানকার একটি বিশিষ্ট মঠে সম্ভবতঃ ৬০০ কি ৭০০ জন ভিক্ষু বাস করেন। এই মঠের অভ্যন্তরে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ প্রত্যহ খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।১৬ তাঁহার নির্ব্বাণ ক্ষেত্রটি গাড়ীর চাকার মত আয়তন বিশিষ্ট। যদিও ইহা তৃণাচ্ছাদিত ভূমির অন্তর্গত তথাপি এই স্থানটিতে কদাপি তৃণ জন্মে না। যে ভূমির উপর তিনি কাপড় শুকাইতেন, তাহাতেও তৃণ জন্মিতে দেখা যায় না।১৭

কান্যকুব্জ

গ্রীষ্মাবসানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ফা-হিয়েন নাগ বিহারে অবস্থান করিলেন এবং অতঃপর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সাত যোজন পথ অতিক্রম করিয়া কান্যকুব্জ নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই নগরীটি গঙ্গাতটে অবস্থিত। এখানে দুইটি মঠ আছে। এই সকল মঠের বাসিন্দারা সকলেই হীনযানপন্থী। পশ্চিমদিকে নগরী হইতে ৬।৭ লি দূরে গঙ্গানদীর উত্তর তীরে একটি স্থানে বুদ্ধ তাঁহার শিষ্যদের নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বুদ্ধ যে সকল বিষয় বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহাদের একটি হইল—"জীবনের তিক্ততা ও আড়ম্বর অস্থায়ী এবং অনিশ্চিত," এবং আর একটি—"দেহ জলের বুদ্বুদ বা ফেনার মত।" এই স্থানে একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

১১। সম্ভবতঃ এখানে দানবের ন্যায় আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট একজন সর্দ্দার বাস করিত; প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি তাহার মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। অবশেষে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে আলাপ-আলোচনার সুযোগ ঘটিলে সে তাঁহার ব্যক্তিত্বে অভিভূত হয় এবং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই লোকটির আকৃতিগত বিশালতাই সম্ভবতঃ তাহার মহাস্তূপ নামের কারণ।

১২। সম্ভবতঃ এখানে একটি চন্দ্রকান্ত মণি পুঁতিয়া রাখা হইয়াছে। চন্দ্রকিরণ সংস্পর্শে অথবা চন্দ্রকিরণের মত স্নিগ্ধ কোন কৃত্রিম আলোকের সংস্পর্শে এই মণিটির উপর সর্ব্বদাই বারিবিন্দুসমূহ উৎপন্ন হয়।

১৩। সম্ভবতঃ এই স্থানটিতে সর্ব্বদা বৃষ্টিপাত হইত এবং ইহাকেই জনসাধারণ উপদেবতার কার্য্য মনে করিত।

১৪। এই স্থানের অধিবাসীরা সম্ভবতঃ ঝড়বৃষ্টিকে উপদেবতার কার্য্য মনে করিত। প্রত্যহ উপদেবতা স্তূপটি ধৌত করিয়া দেন—এইরূপ শুনিয়া অবিশ্বাসী নৃপতি স্বয়ং ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তখন সম্ভবতঃ ঝটিকা-প্রবাহের সময় ছিল। রাজার উপস্থিতিকালে বৃষ্টি হয় নাই বটে, তবে হঠাৎ এক প্রবল ঝটিকার সৃষ্টি হওয়ায় স্তূপের উপরিস্থিত ধূলাবালি উড়িয়া গিয়া স্তূপটি পরিষ্কার হইয়া যায়, এই ঝটিকাটিকেও জনসাধারণ উপদেবতার কার্য্য বলিয়াই মনে করিয়াছে।

১৫। এই স্থানটিতে অসংখ্য স্তূপ এমন বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত ছিল যে, কেহ এইগুলিকে গণিতে আরম্ভ করিলে কোনটা গণিয়াছে আর কোনটা গণে নাই ঠিক করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হইত। প্রত্যেক স্তূপের পার্শ্বে এক-একজন লোক দাঁড়াইলে তখন আর এইরূপ ভুল হইত না।

১৬। প্রত্যেকবুদ্ধের উদ্দেশ্যে খাদ্য নিবেদন করা হইত। (প্রত্যেক—যিনি বিশেষ ভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন)

১৭। সম্ভবতঃ কোন কৃত্রিম উপায়ে (ভূমিতে বালুকা নিক্ষেপ ইত্যাদির ফলে) উক্ত ভূখণ্ডের উর্ব্বরাশক্তি নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

আ-লি

গঙ্গানদী অতিক্রমপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে তিন যোজন পথ অতিক্রম করিয়া পর্য্যটকেরা আ-লি১৮ নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ যেস্থানে ধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যেখানে উপবেশন এবং যেখানে যেখানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকটি স্থান এই গ্রামে চিহ্নিত আছে এবং ঐসকল স্থানে স্তূপও নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

সাকেত

এখান হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে তিন যোজন পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা শা-চি (সাকেত) রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী হইতে দক্ষিণ দ্বার দিয়া বহির্গত হইলে দেখা যায় রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে সপ্ত-হস্ত পরিমিত উইলো বৃক্ষটি আজও অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বিরাজ করিতেছে।

দন্তকাষ্ঠের গল্প

বুদ্ধ দন্তধাবনের সময় যে উইলো বৃক্ষের শাখাটি চর্ব্বণ করিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা তৎক্ষণাৎ সাত হাত উচ্চ একটি উইলো বৃক্ষে পরিণত হয় এবং অদ্যাপি একই অবস্থায় বিদ্যমান আছে। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া কখনও এই বৃক্ষটিকে কাটিয়া ফেলিয়াছেন; কখনও বা ইহাকে তুলিয়া নিয়া দূরদেশে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছেন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই বৃক্ষটি পুনরায় পূর্ব্বেরই মত একই স্থানে একই অবস্থায় দৃষ্ট হইয়াছে।১৯ যে স্থানে চারিজন বুদ্ধ এক-সঙ্গে ভ্রমণ ও উপবেশন করিয়াছিলেন তাহাও এই রাজ্যেই অবস্থিত। ঐ স্থানের উপরেও স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

শ্রাবস্তী

এই স্থান হইতে দক্ষিণদিকে ৮ যোজন পথ অতিক্রম করিয়া পর্য্যটকেরা কোশল রাজ্যের শ্রাবস্তী নগরে উপস্থিত হইলেন। এই নগরীর লোকসংখ্যা অতি অল্প। সর্ব্বসাকুল্যে কিঞ্চিদধিক দুই শত পরিবার হইবে। এই নগরী ছিল রাজা প্রসেনজিতের রাজধানী। মহাপ্রজা-পতির প্রাচীন মঠটি এখানেই অবস্থিত। শ্রেষ্ঠীপ্রধান সুদত্তের রচিত কূপ এবং তাঁহার গৃহের প্রাচীরগুলির ধ্বংসাবশেষ এখানে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। বিখ্যাত অঙ্গুলি-মাল্য২০ এখানেই অর্হৎ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরি-নির্ব্বাণের পর তদীয় দেহটি এখানেই ভস্মীভূত করা হইয়াছিল।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি স্থানের উপর স্তূপ নির্ম্মিত হইয়া-ছিল এবং অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান আছে। ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষ্যা ও ঘৃণাপূর্ণ অন্তরে এইগুলি ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে এমন ঝটিকা ও বজ্রপাত আরম্ভ হইল যে, শেষ পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের অভিপ্রায় পূর্ণ করিতে সমর্থ হয় নাই।২১

জেতবন বিহার

নগরীর দক্ষিণ দ্বার দিয়া বহির্গত হইলে ১২০০ পদ দূরে অবস্থিত শ্রেষ্ঠীপ্রধান সুদত্তের নির্ম্মিত দক্ষিণমুখী বিহারটি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অর্গল উন্মুক্ত হইলে দেখা যায়—ইহার অভ্যন্তরে উভয় পার্শ্বে দুইটি পাষাণ স্তম্ভ অবস্থিত আছে। বামদিকের স্তম্ভটির উপরে রহিয়াছে একটি চক্র এবং ডানদিকের উপরে আছে একটি ষাঁড়ের মূর্ত্তি। মন্দিরের বাম ও দক্ষিণ উভয় দিকেই রহিয়াছে স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ জলপূর্ণ পুষ্করিণীসমূহ, সমৃদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী এবং

১৮। চীনা ভাষায় আ-লি শব্দের অর্থ 'অরণ্য,' সম্ভবতঃ এই গ্রামটি অরণ্য মধ্যে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে ইহার অস্তিত্ব আছে কিনা, এবং থাকিলেই বা বর্ত্তমানে ইহার নাম কি, তাহা জানা যায় না।

১৯। ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদের পবিত্র উইলো বৃক্ষটি যথার্থই নষ্ট করিয়া ফেলিতেন কিনা ইহা বিচার্য্য বিষয়। প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থের কোন কোনটিতে হিন্দু মাত্রকেই ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ কোন কোন হিন্দু সময় বিশেষে উইলো বৃক্ষটির বিনাশ-সাধন করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধরা সঙ্গে সঙ্গে নূতন বৃক্ষের চারা আনিয়া তথায় পুনরায় রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধের দন্তকাষ্ঠের স্মৃতি-রক্ষার্থে তাঁহার শিষ্যেরা প্রথমেই একটা ৭ হাত উচ্চ উইলো বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। চর্ব্বিত দন্তকাষ্ঠখণ্ডটি সঙ্গে সঙ্গে ৭ হাত উচ্চ হওয়ার গল্পটি নেহাৎই কাল্পনিক।

২০। অধ্যাপক James Legge বলেন অঙ্গুলিমাল্য শব্দে একটি ধর্ম্মোন্মাদ শৈব সম্প্রদায়কে বুঝায়। ইহারা নাকি নরহত্যাকে ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করিত। আমরা কিন্তু এইরূপ মনে করিবার মত কোন উপযুক্ত প্রমাণ পাই নাই। যাহা হউক, James Legge-র মতে উল্লিখিত অঙ্গুলিমাল্য সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট নেতা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ অর্হত্বলাভ করিয়াছিলেন। এই অঙ্গুলিমাল্যই সম্ভবতঃ বিখ্যাত 'থেরা গাথা' গ্রন্থের রচয়িতা।

২১। বৌদ্ধ নৃপতিগণের হিন্দুবিদ্বেষের ফলে মধ্যে মধ্যে হিন্দুরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেন। সম্রাট্ অশোকের সময়েও যে এই ভাবে হিন্দু বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। আলোচ্য স্তূপগুলির পার্শ্বেও সম্ভবতঃ হিন্দু জনসাধারণ এবং বৌদ্ধ রাজসৈন্যের মধ্যে সজ্ঘর্ষ হইয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের সময়ে ঝটিকা ও ধূলাবৃষ্টি হিন্দুদের প্রতিকূল হওয়ায় যুদ্ধে হিন্দুদেরই পরাজয় ঘটিয়াছিল। অশোকের জ্যেষ্ঠপুত্র কুনালের সৈন্যদলের সঙ্গে যখন হিন্দু-জনসাধারণের সজ্ঘর্ষ হয়, তখনও এইরূপ প্রতিকূল ঝটিকাই ধূলাবৃষ্টি দ্বারা হিন্দুদের দৃষ্টিশক্তি অবরোধ করিয়া তাহাদের পরাজয়ের কারণ হইয়াছিল। এখানে ব্রাহ্মণ শব্দটি হিন্দু অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

নানাজাতীয় অসংখ্য সুগন্ধি কুসুম। এই সবগুলির সংমিশ্রণেই রচিত হইয়াছে—জেতবন বিহার।

বুদ্ধ ও তাঁহার মূর্ত্তি

বুদ্ধ যখন ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বর্গে গিয়া তাঁহার জননীর মঙ্গলার্থে ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তখন সুদীর্ঘ ৯০ দিন তাঁহার অনুপস্থিত কালে প্রসেনজিৎ তাঁহার দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় গোশীর্ষ চন্দনের দ্বারা বুদ্ধের একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বুদ্ধ সর্ব্বদা যে স্থানে বসিতেন, সেই স্থানেই এই মূর্ত্তিটিকে স্থাপন করা হয়। প্রত্যাবর্ত্তনের পর বুদ্ধ যখন বিহারে প্রবেশ করেন, তখন এই মূর্ত্তিটি সরিয়া যায় এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। বুদ্ধ তাহাকে বলেন—"নিজ স্থানে ফিরিয়া যাও। আমার নির্ব্বাণ লাভের পর তুমি আমার চারি শ্রেণীর শিষ্যগণের জন্য কাজ করিবে।" এই কথা শুনিয়া মূর্ত্তিটি যথাস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে।২২ বুদ্ধের মূর্ত্তিগুলির মধ্যে ইহাই প্রাচীনতম এবং পরবর্ত্তীকালের শিল্পীরা ইহারই অনুকরণে অন্যান্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে। অতঃপর বুদ্ধ এখান হইতে সরিয়া গিয়া দক্ষিণদিকের একটি ক্ষুদ্র বিহারে বাস করিতে থাকেন। পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট বিহার হইতে এই বিহারের দূরত্ব ছিল ২০ পদ পরিমিত।

প্রথমে জেতবন বিহারটি সপ্ততল-বিশিষ্ট ছিল। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলির রাজারা এবং জনসাধারণ এখানে বিবিধ উপহার প্রদান করিতেন, ইহার উপর রেশমের চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দিতেন, পুষ্পবর্ষণ করিতেন এবং সুগন্ধি ধূপ ও প্রদীপ জ্বালাইয়া দিতেন। ঐ সকল প্রদীপের আলোয় বিহারটি রাত্রিতেও দিনের মতই আলোকিত থাকিত। দিনের পর দিন এইরূপ করা হইত। কখনও ইহার বিরতি ঘটিত না।

২২। প্রায় ৩ মাস অজ্ঞাতবাসের পর বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তী নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার ভক্তেরা একটি শোভাযাত্রাসহ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ, ঐ শোভাযাত্রার পুরোভাগে চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তিটি স্থাপন করা হইয়াছিল। বুদ্ধ নিজেই যেখানে উপস্থিত সেখানে তাঁহার মূর্ত্তিটিকে শোভাযাত্রাসহ লইয়া আসা তিনি পছন্দ করেন নাই। এই সময়ে বুদ্ধ তাঁহার মূর্ত্তিটিকে যথাস্থানে লইয়া যাইবার জন্য নির্দ্দেশ দেন। এই ঘোষণাটিকেই উল্লিখিত প্রকার রূপ দান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

—০—

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও বাংলা সাহিত্য

শ্রীরণজিৎকুমার সেন

বাংলার জাতীয়-জীবনের এক যুগসন্ধিক্ষণ তখন। পাশ্চাত্ত্যের ভাবধারায় বাঙালী জীবন ও বাংলা সাহিত্য তখন যেমন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়ে উঠছিল, তেমনি সেই প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে প্রাচ্যভাবের প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ-পরিকর হয়ে উঠছিলেন এদেশের পণ্ডিত ব্যক্তিরা। এই সময়ে বিশেষ ভাবে তাঁদের প্রচেষ্টার ফলেই বাংলা গদ্য সাহিত্য শক্তিশালিনী ও সকল প্রকার ভাবপ্রকাশের উপযোগী হয়ে উঠছিল। তবু সন্দেহ নেই যে, পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফলে বাংলা ভাষা তখন এদেশীয় নতুন অলোক প্রাপ্ত যুবাদের কাছে এক রকম উপেক্ষণীয়ই ছিল। স্কুলের ছাত্রাবস্থায় এ সময়ে কালীপ্রসন্ন একটি বাংলা বক্তৃতার জন্য বহু পদস্থ ব্যক্তির কাছে তিরস্কৃত হন। অথচ এই একই সময়ে রামকৃষ্ণ পরমহংস যেমন ধর্মসাধনায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনি রাষ্ট্রিক অনুশীলনে জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন ঘোষের পিতা শিবনাথ ছিলেন এই ভাবাদর্শের মানুষ। পাছে কালীপ্রসন্ন ইংরেজী শিখে ধর্মভ্রষ্ট হন, এজন্য তিনি ছেলেকে ইংরেজী পড়তে দেবেন না ব'লে স্থির ক'রে ফার্সী-মক্তবে ভর্তি ক'রে দেন। কিন্তু যুগ-পরিবর্তনের প্রভাবে ইংরেজী শিক্ষা তাঁর বন্ধ থাকে নি। যদিও শৈশবেই তিনি 'পন্দেনামা'র বয়াৎ, কীর্তিবাসের পয়ার, প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করেছিলেন, কিন্তু উত্তরকালে ইংরেজী ভাষার সংস্পর্শে আসতেও তাঁর দেরী হয় নি। বরিশালে জ্যেষ্ঠতাত শম্ভুনাথের কাছে গিয়ে পাদ্রীদের স্কুলে ভর্তি হন তিনি। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে কালীপ্রসন্নের জীবিতকালে তাঁর যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়, তা অংশতঃ এখানে উল্লেখনীয়।—

—"...কালীপ্রসন্ন যে বৎসর এন্ট্রান্স ক্লাসে উঠিলেন, সেই বৎসর তাঁহার বুদ্ধি বিগড়াইল। তিনি দীনবন্ধু গোস্বামী নামক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণের নিকট মুগ্ধবোধ,

রঘুবংশ ও মেঘদূত এবং শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক আর একটি পণ্ডিতের নিকট ভট্টি পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং পাঠ্যপুস্তক উপেক্ষা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষায় পুনরুদ্দীপ্ত উৎসাহে ডুবিয়া গেলেন। আট-নয় মাসে সংস্কৃতে তাঁহার ভাল প্রবেশ হইল, এবং এই সময়ে তাঁহার রচিত দু'একটি বাংলা প্রবন্ধ পণ্ডিতদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিল। কিন্তু কলেজের শিক্ষা এক প্রকার মাটি হইয়া গেল। ঐ সময়ে ঢাকা কলেজে Lewis Society নামে একটি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সমিতি ছিল।...কালীপ্রসন্ন সেই সভায় তাঁহার তের বৎসর বয়সের সময় 'পদার্থবিদ্যা অনুশীলনের ফল' এবং 'বন্ধুতা না হৃদয়-বন্ধন' এই নামে দুইটি দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া খুব বেশী প্রশংসা পাইয়াছিলেন।...কিন্তু কলেজে রীতিমত অধ্যয়ন করিলেন না বলিয়া তাঁহার অভিভাবকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে কটু তিরস্কার করিলেন। এই তিরস্কার তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি কিছুকাল পরেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন এবং...ইংরেজী শিখিতে লাগিলেন। সে সময় কলিকাতায় বাংলা সাহিত্যের প্রতি লোকের তেমন অনুরাগ ছিল না।...কালীপ্রসন্ন সাময়িক স্রোতে প্রবাহিত হইয়া ইংরেজী অধ্যয়নেই একেবারে ডুবিয়া গেলেন, এবং কয়েক বৎসরকাল ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান এবং ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিহাস বা থিয়লজি প্রভৃতি গ্রন্থরাশি পাঠ করিয়া ইংরেজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন।

"তাঁহার বয়স যখন সবে বিশ বৎসর, সেই সময় তিনি ইংরেজী-বক্তা বলিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম আরম্ভ ভবানীপুরে। সে সময়ে ভবানীপুরে একটি সুপরিচিত সাহিত্য-সভা ছিল।..ভবানীপুরস্থ বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে কালীপ্রসন্ন সেখানে 'The Christianity of Christ and the Christianity of the Church' অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্ম ও প্রচলিত খ্রীষ্টধর্ম্ম এই দুইয়ের পার্থক্য বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গ তিন ঘণ্টাকাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ উপবিষ্ট ছিলেন...বক্তৃতার পর... মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে নিকটে আসিয়া কালীপ্রসন্নকে গাঢ় আলিঙ্গন ও ললাটে চুম্বনদানে কৃতার্থ করিলেন। আর রেভারেণ্ড ডল্‌ও (Dall) তাঁহাকে নানারূপ প্রিয়বাক্যে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপদেশ দিলেন। একদিন ডল সাহেবের একটি কথায় তাঁহার জীবনের স্রোতে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। ডল সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, 'দেখ কালীপ্রসন্ন, ইংরেজী আমাদিগের বস্তু। উহা তোমাদিগের মাতৃভাষা নহে। তোমরা ইংরেজীর জন্য যত কেন পরিশ্রম না কর, উহা কখনও তোমাদিগের নাম মুদ্রায় মুদ্রিত হইয়া পৃথিবীতে প্রচলিত হইবে না। যদি স্বদেশের জন্য প্রকৃত কিছু কার্য্য করিতে চাও, তাহা হইলে আপনার মাতৃভাষার সেবা কর।' পৃথিবীর যে সকল মহাত্মা মানব জাতিকে হাসাইয়া কিম্বা কাঁদাইয়া জাতীয় জীবন-স্রোতে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মাতৃভাষার সেবা করিয়াছেন।"

ডল সাহেবের কথাগুলি কালীপ্রসন্নের মনে বিশেষ ভাবে রেখাপাত করল। এ সময় থেকে কি ভাবে বাংলা সাহিত্যকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ ক'রে তোলা যায়, তার জন্য সক্রিয় ভাবে কাজে লাগলেন তিনি। তাঁর লেখনীস্পর্শে একদিকে যেমন প্রবন্ধ-সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, তেমনি কাব্যসাহিত্যও নানা আঙ্গিকে প্রকাশ পেতে লাগল। নানা বৈচিত্র্যে তিনি প্রবন্ধসাহিত্যকে ক্রমে ভ'রে তুললেন। তাঁর সমাজবিষয়ক দৃষ্টি ছিল সুদূরপ্রসারী; অধঃপতিত বাঙালী জাতির পারিবারিক জীবনকে তিনি মরমী দৃষ্টিতে অবলোকন ক'রে তাকে সাহিত্যে রূপায়িত ক'রে তোলেন। সেই রূপায়ন অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত রূপায়ন। সরকারী চাকরি-জীবনে ক্লার্ক অফ দি কোর্ট পদে নিযুক্ত হয়েও প্রতিদিন অধ্যয়নেই তিনি অধিক সময় অতিবাহিত করতেন। সেই অধ্যয়নের প্রথম ফল 'নারী জাতি-বিষয়ক প্রস্তাব' ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন অষ্টমবর্ষীয় বালক। গঙ্গা-ভাগীরথাকে কেন্দ্র ক'রে একদা পশ্চিমবঙ্গে যে রেণেসাঁসের সৃষ্টি হয়, তাকে শীতলক্ষা-বুড়িগঙ্গার বুকের উপর দিয়ে পূর্ববঙ্গে বহিয়ে দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন। পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম-সমাজের তিনি একজন পরম হিতৈষী ছিলেন। ১২৭৬ সালে ব্রাহ্ম-যুবকবৃন্দের উদ্যোগে ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ শুভসাধিনী' নামে এক-পয়সা মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শোনা যায়, কালীপ্রসন্ন এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, বৎসরাধিককালের মধ্যেই এই পত্রিকার বিলুপ্তি ঘটে। 'বান্ধব' প্রকাশিত হ'লে তার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক-লিখিত 'অবতরণিকা'য় বলা হয়:

—"বান্ধব আজ হইতে বঙ্গীয় বিদ্যানুরাগীদিগের অনুরাগের ভিখারী হইয়া রহিল। ইহার ভবিষ্যৎ ও ভরসা তাঁহাদিগের হস্তে। ইহা অবশ্যই, অনুগত সুহৃজ্জনের ন্যায় সতত সাবধান থাকিয়া, নানাবিধ বিষয়ের প্রসঙ্গে পাঠক-সমাজের মনোমোদনে যত্নশীল হইবে, বাংলার প্রতি যাহাতে বাঙালীর অনুরাগ বৃদ্ধি

পায় এবং স্বদেশ বলিয়া যাহাতে দেশীয়দিগের মনে মমতার সঞ্চার হয়, অবশ্যই তদর্থ ইহার নিয়ত চেষ্টা থাকিবে; কি পরিমাণে কৃতকার্য হইবে, তাহা বলা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। মনুষ্যের ইচ্ছা ও আশা যে গগনে উড্ডীন হয়, ক্ষমতা তাহার অর্ধপথে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় কি না, সন্দেহের বিষয়।"…

ঢাকায় থাকাকালেই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে কালীপ্রসন্ন 'বান্ধব' মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' ব্যতীত তৎকালে এ রকম একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র লোকের কল্পনাতীত ছিল। 'বান্ধব' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে লেখেন :

"ইহা একখানি উৎকৃষ্ট মাসিকপত্র।…আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে অন্য কোন পত্রাপেক্ষা লঘু বলিয়া আমাদিগের বোধ হইল না। রচনা অতি সুন্দর এবং লেখকদিগের চিন্তাশক্তি অসামান্য। ইহা যে বাংলায় একখানি সর্বোৎকৃষ্ট পত্রমধ্যে গণ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সংশয় নাই।"

১২৮২ সালে 'বঙ্গদর্শন' যখন বন্ধ হয়, তখনও বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন :

—"যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্য্যদর্শন, প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে। অতএব বঙ্গদর্শন রাখিবার আর প্রয়োজন নাই।"

তাঁর বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে ভাওয়ালরাজ বৃদ্ধ কালীনারায়ণ রায় তাঁকে প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য কালীপ্রসন্নকে রাজকর্মে নিয়োগ করেন। এ সময়ে তাঁর উদ্যোগে জয়দেবপুরে 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩০১ সালে তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বিশিষ্ট সদস্য হিসেবে যোগদান করেন এবং ক্রমে তিনি পরিষদের সহকারী সভাপতিপদ লাভ করেন। ১৩০৬ সালে কলকাতায় 'সাহিত্য সম্মেলন'-এর জন্ম হলে তিনি তার স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত রাষ্ট্রক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কালীপ্রসন্ন ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি সমান বক্তৃতা করতে অভ্যস্ত ছিলেন'। ১৩১০ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আমন্ত্রণে ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে 'বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি'-সম্পর্কে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তা বিদগ্ধ-সমাজে বিশেষ উদ্দীপনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করে। তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিত সমাজ কালীপ্রসন্নকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে তিনি 'রায়বাহাদুর' ও 'সি-আই-ই' উপাধিতেও ভূষিত হয়েছিলেন এবং কর্মজীবনে তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্য ও সদর লোকাল বোর্ডের সভাপতিও নির্বাচিত হন। তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেন, তা হচ্ছে—(১) নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, (২) সমাজ-শোধনী, (৩) সঙ্গীতমঞ্জরী, (৪) প্রভাত-চিন্তা, (৫) ভ্রান্তিবিনোদ, (৬) নিভৃত চিন্তা, (৭) প্রমোদ লহরী, (৮) ভক্তির জয়, (৯) নিশীথ চিন্তা, (১০) মা না মহাশক্তি, (১১) জানকীর অগ্নিপরীক্ষা, (১২) ছায়াদর্শন। এতদ্ব্যতীত শিশু-পাঠ্য পুস্তক, যথা —(ক) কোমল কবিতা, (খ) বর্ণপাঠ, (গ) আদর্শ, (ঘ) ভারতবর্ষের ইতিহাস, এবং (ঙ) সুপ্রভাত।

কালীপ্রসন্নের জীবনব্রত ছিল বঙ্গসাহিত্যে শুদ্ধি এবং সৌন্দর্যের একত্র সমাবেশ করা। এই সত্য ও সুন্দরের পূজারী ছিলেন তিনি। তাঁর এই শুদ্ধির ক্ষেত্র ছিল বিদ্যাসাগরের আর সৌন্দর্য্যের ক্ষেত্র ছিল ইংরেজীনবীশ বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, প্রভৃতির। মাতৃভূমি বঙ্গভূমি ও মাতৃভাষা বঙ্গভাষার তিনি যে কত বড় সাধক ছিলেন, তা 'সাহিত্য-সম্মেলন' সম্পাদক দুর্গাদাস লাহিড়ীকে লিখিত তাঁর একটি পত্রের প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছে। পত্রের একাংশে তিনি লেখেন—

—…"বাঙ্গালা ভাষা যেমন আপনার, তেমন আমার এবং সেইরূপ আমাদিগের প্রত্যেকেরই মাতৃস্বরূপা। বিখ্যাত দার্শনিক অগস্ত কোন্ সমগ্র মানব-জাতিকে একটি মনঃকল্পিত দেবতা জ্ঞানে ধ্যান ও আরাধনা করিতে উপদেশ করিয়াছেন। আমার মনঃকল্পিত দেবতা মাতৃরূপিণী বঙ্গভাষা। আমি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল বঙ্গভাষাকে মনে মনে মা বলিয়া ডাকিয়াছি—মা বলিয়া ভালবাসিয়াছি এবং মাতৃজ্ঞানে—আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের পরিমাণে পূজা করিয়াছি। আর, যাঁহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও মায়ের সুসন্তান মনে করিয়া ভ্রাতৃসম্ভাষণে সম্মান করিয়াছি।"

আগষ্ট্ কোম্‌ত্ (অগস্ত্ কোম্), মিল, স্পেন্সার, প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীর তিনি ছিলেন ভক্ত পাঠক। পরোক্ষে তাঁকে তাঁদের রচনাবলী নানাভাবে প্রভাবিতও করেছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের সার সিদ্ধান্ত যে মানবহৃদয়ের অনন্তমুখী আশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুকূলভাবে জড়িত, 'নিভৃত চিন্তা'য় তাকে তিনি সুললিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এর সমগ্র আলোচনাই গভীর চিন্তাশীলতার দ্যোতক। Conservation of energy—

কোন কিছুরই বিনাশ নেই, শুধু রূপান্তর হয় মাত্র; 'ঐহিক অমরতা' প্রবন্ধে তাই তিনি বলেছেন: 'পৃথিবীর এক দৃশ্য সূতিকাগৃহ, আর এক দৃশ্য শ্মশান।' 'অশ্রুজল'-এ বলেছেন: 'যার চক্ষু দয়ার অশ্রুতে সিক্ত হয়, তিনি দেবতার মধ্যে দেবতা।' 'বিরাট্ পুরুষ'-এ তিনি 'সমবেত জীবন'কে বিরাট্ পুরুষার্থে ব্যবহার করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি বৈদিক ঋষি ও আগষ্ট্ কোম্‌তের মতের একটা স্থির মীমাংসায় এসেছেন। সৃষ্টি-বিজ্ঞান, বিবর্তনবাদ, জন্মান্তরবাদ ও পরমার্থবাদ, প্রভৃতি বিষয়গুলিই 'নিভৃত চিন্তা'র আধার। তাঁর 'ছায়া-দর্শন' (The Philosophy of Apparitions) আর একখানি অদ্ভুত গ্রন্থ। মৃত্যুর পর মানুষের কি গতি হয়—এইটেই মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন; এই প্রশ্নেরই আলোচনা ও সমাধানের ইঙ্গিতে 'ছায়া-দর্শন' রচিত। তিনি দেখিয়েছেন—সমাজের কোথাও পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, কোথাও প্রেত-পিশাচের বাসযোগ্য অন্ধকার। কোথাও শঙ্করাচার্য অথবা চ্যানিং পার্কার ও কার্লাইলের মত সমুচ্চশীর্ষ সরল-হৃদয় সাধুজনের প্রেমালাপ, কোথাও বা ছলনাময়ী প্রীতির বা প্রেমগন্ধি ছলনার সেই একপ্রকার ঘৃণার্হ আলাপ। 'ছায়া-দর্শন'-এ এর অভাব নেই। অন্যদিকে 'মা না মহাশক্তি' গ্রন্থে তিনি যেমন বাঙালীর শক্তিপূজার বিজ্ঞান-সম্মত ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি 'বঙ্গীয় নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থে তিনি বঙ্গীয় নারীজাতির দুর্গতি বর্ণনা ক'রে নারীর সর্ববিধ অধিকার সমর্থন করেছেন। 'জানকীর অগ্নিপরীক্ষা'য় সীতার দৈহিক অগ্নিপরীক্ষার সম্ভাব্যতার সপক্ষে বিদেশী কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ ক'রে কালীপ্রসন্ন দেখিয়েছেন—সীতার আত্মিক পরীক্ষার ন্যায় দৈহিক পরীক্ষাও সত্য ও সম্ভব ছিল। এতদ্ব্যতীত হাস্যরসাত্মক রচনাতেও তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। তবে কখনও কখনও তাঁর হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ-গুলি গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছে এবং তিনি এমন অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন—যা বুঝতে বেশ একাগ্রতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। এই জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে 'ষট্‌কারক', 'কারারুদ্ধ ধর্ম্ম', 'দেবতার বাহন', প্রভৃতি প্রাঞ্জল হাসির উপাদানে সার্থক।

বহু ইংরেজী শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ প্রবর্তন কালী-প্রসন্নের আর এক অদ্ভুত কীর্তি। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। বাংলা সাহিত্য এ সময়ে রবির কিরণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আপন চিন্তায় নিমগ্ন থেকে কারুর প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কালীপ্রসন্ন বঙ্গসাহিত্যে যে সম্পদ্ পরিবেশন ক'রে গেছেন তা অতুলনীয়।

তিনি শুধু প্রবন্ধ সাহিত্যই রচনা করেন নি, সেই সঙ্গে প্রচুর কবিতা ও গানও রচনা ক'রে গেছেন। বিশেষ ক'রে শিশুদের উদ্দেশে রচিত তাঁর কবিতাগুলি অনবদ্য। যেমন:

'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।'…

অথবা—

'ছুটেছে নদীর জল ছল-ছল কল-কল,
সারি গেয়ে দাঁড়ী নেয়ে বেয়ে যায় তরী।
বদর বদর বলে দাঁড় ফেলে সবে মিলে,
পিছনে বসেছে মাঝি হাতে হাল ধরি।'…

কিম্বা—

'হুস্ হাস্ হুস্ হাস ঘর্ ঘর্ রবে
শিকল গাঁথিয়া সারি, চলেছে রেলের গাড়ী,
দূরে থেকে দু'কাতারে দেখিতেছে সবে।'…

এরকম অজস্র ছন্দবদ্ধ কাব্য রচনা ক'রে শিশু-মনে তিনি শুধু আনন্দ-পরিবেশনই করেন নি, সেই সঙ্গে শিশুদের নীতিশিক্ষাও দিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর এমন বাঙালী শিশু কমই আছে—যে পড়েনি: 'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর।' বাংলার জনপ্রিয় শিশু-কাব্যের এটি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

তেমনি সঙ্গীত রচনাতেও একইরকম সিদ্ধহস্ত ছিলেন কালীপ্রসন্ন। তাঁর রচিত 'সঙ্গীত মঞ্জরী' তৎকালীন বাংলার একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। সঙ্গীতে তিনি সসীম চিত্তে অসীমের স্তব রচনা করেছেন। তাঁর অধিকাংশ গানই ছিল প্রকৃতি, মন ও ভগবদ্বিষয়ক। যেমন—

'শান্তি যদি চাও রে মন, কর তাঁর অন্বেষণ।
কোথা শান্তি বিনে সেই চিরশান্তি-নিকেতন?'…

অথবা—

'প্রাত সময়, জাগ রে হৃদয়, স্মর রে জগতারণে।
চেয়ে দেখ নিশি যায় যায় যায়,
সরোজ-বান্ধব সমুদিত প্রায়,
ঝলসিছে নব নীল নীরদ, দেখ রে স্নিগ্ধ গগনে॥'…

কিংবা—

'চিরদিন কাহারও হে সমান না যায়।
আজি স্বর্ণসিংহাসনে, কালিকে ধরায়॥
আজি আনন্দ হিল্লোল, কালি অশ্রু অবিরল,
প্রভাতে কুসুমদল, যেন সুখে ঢল-ঢল,
সন্ধ্যা হইতে দেখ, দলিত ধূলায়॥
তেমনি জীব-জীবন বহিতেছে অনুক্ষণ,
এই হাসি, এই কান্না, হায় হায় হায়॥

আর মায়ামুগ্ধ মন, এখনও মেল নয়ন,
ভাসিবি রে কত আর জোয়ার ভাঁটায়।
স্থির শান্তি যদি চাও, তাঁয় প্রাণ সঁপে দাও ;
শাশ্বত কল্যাণ সুখ যাঁহার কৃপায়॥'

এরকম অজস্র সঙ্গীতে কালীপ্রসন্নের ভাবমুগ্ধ ভগবদাশ্রয়ী মনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি যেমন সেকালের ভাবপ্রবক্তা, তেমনি একালেরও মানসিকতার আংশিক উদ্বোধক। তাঁকে প্রদত্ত 'বিদ্যা-সাগর' উপাধি উপযুক্তই হয়েছিল।

—০—

স্তূপ

(প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত গল্প)

শ্রীসুশীল সিংহ

যেতেই হবে।

—কি চেহারা দেখেছিস? আলবৎ। ইয়াঃ—

দু'জনে তালুর ওপর জিভ ঠেকিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করল। দুমড়ে-যাওয়া হ্যাণ্ডবিলটা ভাল ক'রে মেলে তার ওপর যেন ঝুকে পড়ল দু'জন। দু'জন। এই কলকারখানা-ঘেরা শহরটার নামকরা ডাক্তারের ছেলে শুভেন্দু আর রেল পাড়ার কমার্শিয়াল সেকশনের জনৈক রানিং ষ্টাফের বড় ছেলে মৃণাল। দুজনেরই বয়স চোদ্দ থেকে ষোলোর মধ্যে। সহপাঠী। তারা দু'জন।

হ্যাণ্ডবিলটা আকারে এক্সারসাইজ বুকের পাতার মত। তবে চওড়ায় খানিকটা ছোট। দু'পিঠই ছাপা। এক-দিকে দু'জন লোকের ছবি। দাঁড়ান। পায়ে জুতো। যে সব জুতো পথে-ঘাটে মানুষের পায়ে থাকে তেমন নয়। পায়ের পাতা ঢেকে গোড়ালির সামান্য উঁচুতে যেন কামড়ে ধরেছে। সেখান থেকে গোটা পা খোলা। উরুও। জাঙিয়া প'রে আছে। নাভি দেখা যায়। দু'জনেরই দু'হাতের কব্জীতে চামড়ার বন্ধনী। শরীরের বাকি সবটাই অনাবৃত। গোটা শরীরে—ইঃ, কি চেহারা রে! ঘাড়, গলা, বুক, হাত, পেট, উরু, পায়ের ডিম যেন মাংসের স্তূপ হয়ে আছে। এদের ছবি মাঝে মাঝে কলকাতার সবগুলো দৈনিকের বিজ্ঞাপনের পাতায় দেখা যায়। ছবি দু'টোর গা থেকেই যেন একটা বুনো ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে লাগছে। দু'টো বাঘের লড়াই হবে আজ। বাঘ? সামান্য, তুচ্ছ বাঘ। দৈত্য নয়, বাঘ নয়, মানুষও নয়। সভ্যতার ছেঁড়া গেঞ্জী-ঢাকা পাঁজরের তলায়, মনের একেবারে নীচের কোঠায় ঘুলঘুলির অন্ধকারে আলোছায়ায়, যেসব জান্তব, বিকট, অসম্ভব ইচ্ছা খাবার পায় না। ওদের লড়াই তারই প্রতিনিধি। কত যে লোক হবে সে খেলা দেখতে। টিকিট পাওয়া একটা সমস্যা। এখুনি হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই—লাইন দিয়ে ব'সে আছে কতজনা। লাইনে ফালতু ইট দিয়ে জায়গা রেখেছে। চেনা বন্ধু-বান্ধব, ইয়ার বক্সী এলে ইট তুলে সেই জায়গায় দাঁড়াবে। 'দুনিয়াকা সবসে বড়া পহলবান।' হ্যাণ্ডবিলটার যে পিঠে ছবি সেদিকে ইংরেজীতে টিকিটের হার লেখা আছে। দশ থেকে আড়াই টাকা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরের আসন। সওয়া টাকার আসনও আছে বটে তবে সেটাতে লোফার, লুচ্চা, কোচুয়ান ছাড়া অন্য কেউ নাকি যেতে পারে না। অন্ততঃ শুভেন্দুর মত তাই। অগত্যা মৃণালেরও। হ্যাণ্ডবিলটার অন্য পিঠে ছবি নেই। তার জায়গাও নেই। কেন না প্রথমে হিন্দী, তার পর উর্দ্দু ও সব নীচে বাংলায় টিকিটের হার ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য লেখা আছে।

দু'টি কিশোর। যেতেই হবে তাদের। এবং এখুনি। টিকিট ত পথ চেয়ে ব'সে থাকবে না। দুনিয়ার দু'জন সেরা—কি বলে যেন—তাদেরই পাশে বার্ণপুরের মাঠে লড়ে চ'লে যাবে আর তারা তা দেখবে না? অসম্ভব। কোনমতেই এতটা পিছিয়ে থাকা যেতে পারে না। অথচ মৃণালের মনে দ্বিধা আছে। এই ত মাত্র দুপুর দেড়টা। টিফিন হ'ল। আধ ঘণ্টা পরে আবার স্কুল বসবে। ক্লাসে থাকবে না। খোঁজ হবেই। তার পর···তার পর ···কোথাকার জল যে কোথা দিয়ে কোথায় গড়াবে তার ঠিক কি। মা-কে কোন ভয় নেই। কিন্তু রাতজাগার চাকরি ক'রে ক'রে বাবার মেজাজটা এমন খিটখিটে

হয়েছে, মারলে লাগে ত? কথাটা বলাও চলে না শুভেন্দুকে।

—শনি-রোববারে করতে পারত না?

—যাঃ, যাঃ, সবজান্তার মত শুভেন্দু বলল, শনি-রোববারে কলকাতার বাইরে যেতে পারে ওরা? নে, চ—।

—একটা কাজ করবি?

—কি?

- তুই এগিয়ে যা, আমি একটু পরে

—ডরপুঁক কোথাকার, আমায় আগে বললেই পারতিস্, এই ব'লে শুভেন্দু ঘৃণার ভঙ্গি করল। তার পকেটে দেশলাইর বাক্সটা খর্খর্ ক'রে বাজল। অন্য সময় হলে মৃণাল বলত, 'রুমাল দে।' এখন কিছুই বলল না।

ফেব্রুয়ারী মাস। ফাল্গুনের শেষের দিক্। বেলা এখনও যথেষ্ট বড় হয় নি। সওয়া ছ'টায় স্কুরু। দেখতে না দেখতে রাত গভীর হয়ে যাবে। শুভেন্দু আমাকে ডরপুঁক বলেছে। এবার পরীক্ষার হল্-এ আমি ওকে খাতা দেখিয়েছিলাম। অবশ্য ও'ও আমাকে সাহায্য করেছিল। ও কোশ্চেন জানত। জ্যামিতির একটা এক্সট্রা যে কাগজে টুকে এনেছিল সেটা আমায় দিয়েছিল। ওটা না করলেই পারতাম। না করলে পঞ্চাশ পেতাম। ছাপ্পান্ন পেয়েছি। আমার হাত ভয়ঙ্কর কাঁপছিল। বুকের মধ্যে গুর গুর ক'রে কি সব যেন ভেঙে পড়ছিল। আমি পরীক্ষা দিতে আসার সময় মা, ঠাকুমা আর ভগবান্কে প্রণাম করে এসেছিলাম। আমি ধরা পড়ি নি। তবু ও আমায় ডরপুঁক বলল। ডরপুঁক শব্দ তৎসম নয়, তদ্ভবও নয়। ব্যাকরণ পড়তে বেশ ভাল লাগে। "তৎসম শব্দ কাহাকে বলে?" প্রশ্নটা এবার এসেছিল কিনা মনে পড়ছে না।... স্কুল থেকে পাশ করার পর শুভেন্দু চারটি ট্যাক্সীর লাইসেন্স জোগাড় করবে। দুটো ওর। দুটো আমার। ট্যাক্সীতে অনেক পয়সা।... ক্লাস সিক্সে আমি ফার্ষ্ট হয়েছিলাম। তখন বাবার অসুখ করেছিল। সেই সময় ডাক্তারবাবুর গাড়ীতে শুভেন্দু একদিন আমাদের বাড়ীতে এসেছিল। ডাক্তারবাবু সেদিন ভিজিট নেন নি। সেভেনে উঠে আমি থার্ড হয়েছিলাম। ফাইভে সেকেণ্ড। আর কখনও কিছু হতে পারি নি। আমাদের বাড়ীতে একটা বেড়াল আছে। আমি ফার্ষ্ট হয়েছিলাম। বেড়ালের ভাগ্যে একবার শিকে ছিঁড়েছিল।

টিফিন শেষ হবার আগেই ক্লাস থেকে বই-খাতাগুলো উঠিয়ে আনল শুভেন্দু। তার পর রাস্তা। একটা সাইকেল মেরামতির দোকানে শুভেন্দু তাদের দুজনার বই-খাতাগুলো জমা ক'রে দিল। হাতে বই-খাতা নিয়ে পাঁচজনের সামনে সব কিছু ইচ্ছামত করা যায় না। সবাই যেন কেমন ক'রে দেখে। বিশেষ ক'রে সিগারেট ধরালে। 'সিগারেট' বাক্সটা কি? তদ্ভব? ওটা ত আমাদের দেশে আগে ছিল না। ক্লাসে পণ্ডিত মশাই বলেন, 'ও রে, ভাষার সঙ্গে জাতির নাড়ীর যোগ। ভাষার শব্দ যদি বদলায়, তবে জানবি জাতিও বদলাচ্ছে।'...ডরপুঁক। সিগারেট।

হাঁকতে হাঁকতে বাস্টা দাঁড়াল। বি. এন. আর—কোটকাছারী, রাধানগর, এই সব ব'লে লোকটা চেঁচাতে লাগল। ড্রাইভার অকারণে পরপর আট দশবার ভেঁপু বাজিয়ে দিল। তার পর ছেড়ে দিল। জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে নিয়ে শুভেন্দু পা-দানিতে ঝোলার বন্দোবস্ত ক'রে নিয়েছে। আইন বাঁচাচ্ছে। লোকের চাপে ঝাঁকুনিতে, মৃণাল বেশ খানিকটা ভেতরে চ'লে গেছে। সেই অবস্থায় শুভেন্দু সাড়া নিল। ডাকল, পার্টনার—

সাড়া দিল মৃণাল, ইয়েস বস্।

হাতে বই-খাতা নেই। তবু দু'চার জন হাঁ ক'রে চেয়ে রইল তার দিকে। হাসল।

বন্ধুকে এই ভাবে ডাকা ও সাড়া দেওয়ার পদ্ধতিটা ওরা এক নামকরা হিন্দী ছবির পকেটমার নায়ককে দেখে শিখেছে। তুলে নিয়েছে।

পাঁচ বছর আগে মৃণাল যখন ক্লাস সিক্সে পড়ে তখন ওর বাবার প্রথম অসুখ করল। রাত্ জাগার চাকরি। শরীরের ওপর দিয়ে দিনের পর দিন কেবল অনিয়ম গেছে। বিন্দু বিন্দু ক'রে জমে-ওঠা রোগ যেদিন দেখা দিল তখন যমে মানুষে টানাটানি। এমনি শুনতে পেট ব্যথা। সে যে কি ভয়ঙ্কর ব্যথা, চোখে না দেখলে বোঝান যায় না। ডাক্তারবাবু যখন খানিকটা সামলাতে পারলেন তখন মৃণালের দিকে তাঁর চোখ পড়ল। ডাক্তারবাবু বললেন, ফাইভ থেকে সেকেণ্ড হয়ে উঠেছ তুমি? বাঃ। এইবার ফার্ষ্ট হবে।

মৃণালের কিছু বলার ছিল না।

ডাক্তারবাবুই বললেন, শুভেন্দুকে চেন না?

মৃণাল একটু ভাবল। বুঝতে পেরেছে। রোজ টিফিনে যার বাড়ী থেকে একটা চাকর খাবার নিয়ে আসে অথচ যে কিছুতেই খেতে চায় না, সেই ছেলেটা। মৃণাল ঘাড় নাড়ল।

—ভাব নেই তোমাদের ?

—আছে, মৃণাল বলল।

—ছেলেটি কে ডাক্তারবাবু ? ক্ষীণ গলায় জানতে চাইল মৃণালের বাবা।

—আমার ছেলে, একগাল হেসে জবাব দিলেন শুভেন্দুর বাবা।

—ও তাই নাকি ? মৃণালের বাবাও খুশী খুশী মুখে হাসল।

পরদিন ডাক্তারবাবুর গাড়ীতে শুভেন্দুও বেড়াতে এল। সেই প্রথম। গোলগাল, আদুরে আদুরে চেহারা। মাথার চুল পাতা ক'রে আঁচড়ান। মা তার জন্যে তাড়াতাড়ি চারটে রসোগোল্লা আনাল। সে খেল না। বাড়ীর বেড়াল, গুলি, এই সব নিয়ে সে খানিকটা লাফালাফি করল।

নাতি আর তার বন্ধুদের আদর ক'রে 'বিদ্যেসাগর' বলা মৃণালের ঠাকুমার অভ্যাস। বড় নাতি ভাল পড়াশোনা করে। পাঁচজনে ভাল ছেলে বলে। বোধ হয় সেইজন্য কিংবা কেন তিনিই জানেন, 'বিদ্যেসাগর' ব'লে ডাকতে তাঁর খুব ভাল লাগে। শুভেন্দুকেও ডাকলেন। আর তাকেও বললেন, 'বিদ্যেসাগর বলত, সাতপুরু মাটি তুলে ফেলে তবে এদেশে আবার মানুষ তৈরি করতে হবে। তার পর যে আরও না-হক্ তিনপুরু মাটি জমল রে ! হাঁ দাদু দশপুরু মাটি তুলে মানুষ তৈরি করতে পারবি ত ?

এমন খাপছাড়া কথা শুভেন্দু জীবনে কোনদিন শোনে নি। মানে বুঝল না। কানে কানে বলার মত মৃণাল পাশ থেকে বলেছিল, ঠাকুমাকে পেন্নাম কর।

মাথা নীচু ক'রে পায়ে হাত দিতেই ঠাকুমা তার কপালে চুমো খেয়ে বলেছিলেন, বেঁচে থাকো ভাই। মানুষ হও।

এরপর মৃণালও গিয়েছিল ওদের বাড়ীতে। বসার ঘরের কোণে কাচের বাক্সয়-রাখা জলে লাল নীল মাছ আর শ্যাওলা দেখতে দেখতে তার পা যেন আটকে গিয়েছিল মেঝের ওপর। সে অবশ্য কার্পেট বাঁচিয়েই দাঁড়িয়েছিল। মাছগুলো আরো অনেক, অনেকক্ষণ দেখতে খুব, খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তার। লাল বা নীল যে কোন একটা মাছকে হাতের তেলোয় নেবার জন্যে খুব লোভ হচ্ছিল। পাছে শুভেন্দু তাকে বোকা ভাবে তাই সে মুখ ফুটে বলতে পারে নি। বেশীক্ষণ দাঁড়াতেও পারে নি। উপরে ছিলেন শুভেন্দুর মা। শ্বেত পাথরের থালায় ফল মিষ্টি সাজিয়ে তিনি ব'সে থেকে একটি একটি করে দু'জনকে খাওয়ালেন। শুভেন্দু নাকি অন্যদিন খেতে চায় না। মৃণাল লক্ষীছেলে। এইসব তিনি বারবার বললেন।

তার পর দু'জনেই দু'জনার বাড়ীতে কত কতবার গেছে। এখন আর কেউই বড় একটা যায় না। বাড়ীতে ভাল লাগে না। রাস্তায় বেশ খোলামেলা। কোন পরোয়া নেই। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়।' পদ্যটার ব্যাখ্যা খুব সহজ।

বাস্‌টা দাঁড়াল। ওরা পৌঁছে গেছে। নিজেকে একটা ঝাঁকি দিয়ে মৃণালই এবার আগে ডাকল, পার্টনার।

—ইয়েস বস্, সাড়া দিল শুভেন্দু।

ওরা দু'জন পাশাপাশি হাঁটছে। মৃণালও ধরিয়েছে এখন। দু'জনের হাতেই সিগারেট। দু'টি কিশোর। ওরা দু'জন। ··ডরপুঁক। সিগারেট।

দু'টি কিশোর। ওরা দু'জন।

মাঠ। টিন দিয়ে ঘেরা। কোন কোন জায়গায় টিন কেটে দু'টো হাত ঢোকার মত ফোকর করা হয়েছে। কাউণ্টার। সবে সওয়া দু'টো। আড়াই টাকার কাউণ্টারে ইতিমধ্যে মানুষ আর ইঁট মিলিয়ে একাশী জন দাঁড়িয়ে গেছে। শুভেন্দু গুণল।

—কত আছে ছাড়্, শুভেন্দু বলল।

—এক টাকা বারো আনা, এই ব'লে মৃণাল সেটা বন্ধুর হাতে দিল। বাকীটা শুভেন্দু দেবে।

এখন আর স্কুলের কথা মনে পড়ছে না। কোন দ্বিধা নেই। ভয় ত নেই-ই। জায়গাটার আবহাওয়াই অন্য রকম। সে আবহাওয়া সব ভুলিয়েছে। যে দু'টো ছবি হ্যাণ্ডবিলে ছাপা আছে সেটা দু'টো প্রমাণ মাপের ক'রে এঁকে দাঁড় করান আছে। সকলের চোখ পড়তে বাধ্য। কি প্রকাণ্ড, অমানুষিক, ভয়ঙ্কর চেহারা রে বাবা। যা বলেছে, সাধনা করলে তবে এমন চেহারা হয়। আচ্ছা, কোন বাঙালীর ('ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা,' লাইনে দাঁড়িয়ে বেসুরে গুণগুণ করার চেষ্টা করছিল একজন, গানটা হালফিলের একটা সিনেমায় নিয়েছে) এমন চেহারা নেই ? আছেই ত ? তারা অবশ্য এই সব লড়ে না। সে থাকৃগে। এই ছবিদু'টো দেখেই ত হৃৎকম্প হয়। যখন লড়বে তখন যে কি অবস্থা হবে কে জানে। দু'জনের উচ্চতা ছ' ফিটের বেশী। ওজন লেখা আছে চার মণের বেশী। সর্ব্বনাশ।

খায় কি রাক্ষসগুলো?

মাঠের বাইরে যত প্রবেশেচ্ছু দর্শনার্থী এসেছে তারা এই সব গল্প করছে। আইসক্রীম, (এই সময় এই সব খাওয়া খারাপ, মৃণালের মা বলে) চানাচুর, ফুচকা, আলুকাবলি খুব বিক্রী হচ্ছে। এর আগে আর কে কে এই মাঠে ল'ড়ে গেছে সেই সব গল্প হচ্ছে। অবাঙালীর সংখ্যাই বেশী। তবে পড়ুয়া বাঙালী ছেলে অনেকেই এসেছে। কলেজের চেয়ে স্কুলের ছেলেই যেন বেশী। অনেকের হাতেই বই। পাঁচজনে দেখবেই ত। বুদ্ধ কোথাকার! বই নিয়ে আসতে হয়? বুদ্ধু!

একজন লোক মাতব্বরের মত অনেক ভেতরের খবর শোনাচ্ছে। পহলবানদের ভেতরের খবর। আজ যারা লড়বে তাদের একজন সকালে জলখাবার খায় দু' ডজন ডিম সেদ্ধ, এক ডজন স্যানডুইচ আর দু' বোতল রাম্।

—স্যানডুইচের হিন্দী কি করেছে জানিস্ ত? এক বন্ধু জানতে চাইল আর একজনের কাছে। দু'জনেই বোধ হয় কলেজে পড়ে।

—কি?

—বালুডাকিনী।

—মানে? ভাগ্।

দু'জনেই হেসে উঠল।

—রাম কিরে? মৃণাল জানতে চাইল শুভেন্দুর কাছে।

—কি রাম?

—ওই যে বলল, সকালবেলায় জলখাবারের সঙ্গে দু' বোতল খায়।

—গুল্ দিচ্ছে লোকটা। দু' বোতল খেলে আর বাবা বলতে হবে না। ফ্ল্যাট্।

—মদ নাকি?

—তবে কি?

—তুই জানলি কি ক'রে?

—বাবার শোবার ঘরে আলমারিতে আছে। বাবা খায়, শুভেন্দু ঠোঁট টিপে হাসল।

—হ্যাঃ।

—কেন?

—তোদের বাড়ীতে যে মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান আসেন।

—এলেই বা। চেয়ারম্যান জ্যাঠাও ত খায়।

—ভাগ।

—আমি নিজের চোখে দেখেছি।

সবই যেন বুঝেছে এইভাবে মৃণাল বলল, সকালে উঠেই দু' বোতল? ইস্—

—হতেও পারে, শুভেন্দু সায় দিল।

—হিম্মৎ আছে, মৃণাল বলল।

এইভাবে এই সামান্য সময়ের মধ্যে অনেক নতুন শব্দ ওরা মনে ও মুখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল। বুদ্ধু। গুল্। ফ্ল্যাট। হিম্মৎ। রাম্···এই সব।

এই শব্দগুলোর একটা নিজস্ব প্রতিক্রিয়া আছে। এরকম কথা কে ক'টা বলতে পারে, বানাতে পারে, কার ভাঁড়ার কত বড় তা বোঝাবার জন্যে আজকাল বাঙালী কিশোরেরাও নিজেদের অজান্তে এই নিয়ে প্রতিযোগিতা চালায়। স্কুলের পণ্ডিতমশাইর বড় শুচিবাই আছে। তিনি বলেন, "জাতটা ভেতরে-বাইরে মরছে। ভাষাটাই বদ্‌লে যাচ্ছে।"···হঠাৎ দূর থেকে আসা একজনকে দেখে দু'জনেরই পণ্ডিতমশাই ব'লে ভ্রম হয়েছিল।

শুভেন্দু ডাকল, পার্টনার—

—ইয়েস বস্।

—'গুলাবী রুমাল' বইটা ত তিনবার দেখেছ। তাতে সেই মাতালটা 'জগৎমে এক নাম হ্যায় রাম' গাইছিল আর দেখাচ্ছিল মনে আছে?

—ঠিক ত?

—তবে এত ভাল ছেলে সাজছ কেন চাঁদ!

দূরে একজন বুড়ী গোবর কুড়োচ্ছে আর মাঝে মাঝে লোকজনের দিকে চাইছে। ও বোধ হয় রোজই দুপুরে গোবর তোলে। অন্যদিন ত লোক থাকে না। বুড়ী হলেই যেন দেখতে অনেকটা একরকম হয়ে যায়। বাড়ীর পিছন দিকে ঠাকুমা ঘাসের উপর ঘুঁটে দেয়। ছোট ভাইগুলো সেগুলো মাড়িয়ে দিলে ঠাকুমা খুব রাগ করে। ঠাকুমা ঘুঁটে দেয় ব'লে আগে শুভেন্দুর সামনে মৃণালের লজ্জা করত। ঘুঁটে দেয় ব'লে ঠাকুমার ওপর বাবা কোন কোনদিন রাগ করে।

দু'জন। ওরা দু'জন।

বিকেল পাঁচটা বাজার আগেই জায়গাটা লোকে লোকে ছেয়ে গেল। সওয়া পাঁচটায় 'কাউন্টার খুলবে। সিঁ সিঁ—ক'রে সিটি মারছে অনেকে। লাল আর সবুজ শাড়ি প'রে সিল্কের জামা গায়ে, ঠোঁটে আল্‌তা, ছাইরঙ মুখ, দু'টো মেয়ে এসেছে। লুঙি আর ময়লা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে, মোটা জুলপির একটা লোক ওই মেয়ে দু'টোর সামনে হাতে ক'রে নিজের গা

চুলকোচ্ছে আর কি বলছে। মেয়ে দুটো হাসতে হাসতে নিজেদের গায়ে গায়ে ঢ'লে পড়ছে। কথা বলার সময় লোকটার কাঁধে ফেলে-রাখা নীল কালো ডোরাকাটা মফ্লারটা মাটিতে প'ড়ে গেল। একটা মেয়ে ঝুঁকে সেটা তুলতে গেল। তোলবার সময় তার আঁচল মাটিতে লোটাল। বুকে খালি সিল্কের জামা। লোকটা নিজের পায়ে ক'রে আঁচলটা চেপে ধ'রেই ছেড়ে দিল। আর একটু দূরে দু'জন এ্যাংলো ছোকরার মাঝখানে একটা এ্যাংলো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনে তার দু'টি হাত ধ'রে আছে।

সিঁ—ই—ই—

মুহুর্মুহু সিটি পড়ছে। জায়গাটা লোকে গিজ্‌গিজ্ করছে। আড়াই টাকার লাইনে ভিড় সবচেয়ে বেশী। বিশৃঙ্খলাও। পাঁচ-ছয়জন পুলিশ এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মজা দেখছে। জন পঞ্চাশ লোক ঠেলেঠুলে লাইন ভেঙে ওদের আগে দাঁড়িয়ে গেল। শুভেন্দু আর মৃণাল সহপাঠী মহলে যেমন বুক চিতিয়ে চলে এখন সেভাবে দাঁড়াতে পারল না। বাধ্য হয়ে পিছিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দু'একজন কলেজের ছোকরা লাইনে দাঁড়িয়ে মুখে মুখে গুণ্ডা শাসাতে লাগল। চারদিকে চারমিনারের মড়া পোড়া গন্ধ।

ওরা দু'জন। দু'টি কিশোর।···'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে', শিস দিল কেউ। এ গানটিও সিনেমায় নিয়েছে।

কাউণ্টার খুলল। লাইন বজায় রইল মিনিট পনর। তার পর ভেঙে গেল। মানুষের একটা বিরাট্ দলা ভীমরুলের চাকের মত কাউণ্টারে ঠ্যালা দিতে লাগল। মাথায় খাটো একটা লোক তার কালো ফুলপ্যাণ্ট খুলে সঙ্গীর হাতে দিল। জামাও। আণ্ডার প্যাণ্ট আর গেঞ্জী গায়ে। তার সঙ্গী পকেটে শিশিতে ক'রে সরষের তেল এনেছিল। জামা প্যাণ্ট খুলে লোকটা দু'হাতের কনুই পর্য্যন্ত জবজবে ক'রে সেই তেল মাখল। একটা পাঁচ টাকার নোট হাতের মুঠিতে রেখে একধার থেকে টিন চেপে চাপ দিতে দিতে এগুতে লাগল। লোকটা এগিয়ে যাচ্ছে। তার খাটো মাথার ঝাঁকড়া লালচে চুলের ওপর কারা যেন ঘুঁসি মারল। দু'টো টিকিট ক'রে তবে লোকটা বার হয়ে এল। টিনের কাউণ্টারে তার হাত কেটে গেছে। রক্ত। হাঁপাচ্ছে। চোখ মুখ জলজল্ করছে তবু। বিশ্রী একটা গাল দিয়ে প্যাণ্টে পা ঢোকাল। তার সঙ্গী একটা বিড়ি বার ক'রে এর ঠোঁটে গুঁজে দিল। আগুন দিল।

—ব্যাগ? আমার ব্যাগ? কে যেন চীৎকার করল।

—ঘটনাটা সম্পূর্ণ কানে ওঠার আগেই একজন আর একজনকে মা তুলে গাল দিল। তার পর সেখানে এক লহমায় এমন সব শব্দের ছোঁড়াছুঁড়ি হতে লাগল যা কোথাও লেখা নেই। একজন লোকের হাত এই ভিড়ের মধ্যে ব্লেডে কেটে গেছে। আড়াই টাকার টিকিট বিক্রি বন্ধ হ'ল। মারপিট সুরু হয়েছে।

—দূর্, বাড়ী চ, মৃণাল বলল।

—দাঁড়া, ব্ল্যাকে টিকিট নেব।

আড়াই টাকার টিকিট সাড়ে তিনে প্রকাশ্যে গুণ্ডারা বিক্রী করছে। টিকিট বিক্রী সুরু হওয়ার আগেই ওরা অর্দ্ধেক পেয়ে ব'সে থাকে। শুভেন্দুর কাছে সব মিলিয়ে কিছু কম সাত টাকা। হোক। যে কোন গুণ্ডাকে একটু বুঝিয়ে—স্কুলের পড়ুয়া সেই কথাটা চুপি চুপি জানিয়ে—সাত টাকার কিছু কম দিয়েই দু'টো টিকিট পেতে হবে। খেলা শেষ হলে চার মাইল হেঁটে বাড়ী ফিরতে হবে। তাই সই। এখন গুণ্ডার কাছে নতজানু হতে হলেও টিকিট পাওয়া দরকার।···('সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।)···

শুভেন্দুর ভাগ্য বরাবরই ভালো। সে চেনে না, কিন্তু ঝাঁকড়া চুলের এই লোকটা ডাক্তারবাবুর ছেলেকে চেনে। মিউনিসিপ্যালিটির ব্যাপার নিয়ে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে এই সহরের অনেকের যোগাযোগ আছে। এই লোকটিও তাঁর অনুগৃহীত। ন্যায্য দামে দু'টি টিকিট পেয়ে গেল তারা। মাঠের ভেতর পা দেওয়ার আগে মৃণালের মনে হ'ল, অনেক আগে স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। মিছিমিছি এত আগে আসা। স্কুল ক'রে বাড়ীতে বই রেখে, নিশ্চিন্তে চ'লে আসতে পারত তারা। আগে এসে ত কোন কাজ হ'ল না।

কথাটা মৃণাল মুখে বলতে পারল না।···সিগারেট। ডরপুঁক।

ওরা দু'জনে হাসতে হাসতে কাঠের গ্যালারীতে জায়গা খুঁজতে লাগল।

ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সওয়া ছ'টায় খেলা সুরু করার জন্যে সেই ছবির দু'জন লোক জ্যান্ত হয়ে সকলের সামনে এল। সঙ্গে রেফারী। মাঠের মাঝখানে কাঠের পাটার যথেষ্ট বড় মঞ্চ করা হয়েছে। তার ওপর ওরা লড়বে। সেই মঞ্চের চারদিকে যুৎসই বেড়া দেওয়া আছে। বেড়ার' গাঁথনি লোহার। তাতে আট দশ ইঞ্চি ফাঁক রেখে তার টানা। লোক দু'টি এসে দাঁড়াতেই সব লোক হাততালি

দিতে লাগল। কি উল্লাস সকলের। যেন মানুষের মুক্তিদাতারা এসে দাঁড়িয়েছে। চারটে ফ্লাড লাইট দিয়েছে। তীব্র আলো দু'জনের ইস্পাত-শরীরে যেন ঠিক্‌রে পড়ছে। লোক দু'টো হাসছে কি না কে জানে। যাকে হাসা বলে, ওই রকম শরীরে ত অসম্ভব। প্রথমে রেফারীর সঙ্গে, তার পর দু'জনে দু'জনার সঙ্গে হাতে হাত মেলাল। রেফারীর পায়ে কেড্‌স্‌, মোজা, হাফ শার্ট, হাফ প্যান্ট। হাতে হুইস্‌ল্‌। তার চেহারাটাও চেয়ে দেখার মত।

চোখের পলকে লড়াই সুরু হয়ে গেল। জাঙিয়া-পরা দু'জন বীভৎস লোক পরস্পরকে আক্রমণ করল। ভীষণ শব্দ হ'ল কাঠের পাটার ওপর। একজন আর একজনের বুকের ওপর চেপে বসে তার নাকের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে পড় পড় ক'রে টানতে লাগল। গোঁ গোঁ ক'রে ভীষণ শব্দ হচ্ছে। নীচের লোকটা গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে নিজের ডান পা-টা টেনে ওপরে-বসা লোকটির কাঁধের ওপর কোনরকমে রাখল। আর একটা পা-কে কোন-মতে টেনে দু'পা দিয়ে সে বুকের ওপর-বসা লোকটার বুকের ওপর ভীষণ লাথি মারল। লোকটা ছিটকে ফেন্সিংএর তারের ওপর পড়ল। সে উঠে দাঁড়াবার আগেই লাথি মারল যে লোকটা, সে এগিয়ে এসে একে ধরল। ধ'রে সে এর শরীরটাকে ফেন্সিংএর তারে গুঁজে তার আর লোকটাকে পাকে পাকে জড়াতে লাগল।

এই অবস্থায় এক রাউণ্ড শেষ হয়ে গেল। ক'মিনিটে এক রাউণ্ড শেষ হচ্ছে তা শুভেন্দু বা মৃণাল বুঝতে পারল না। চার বা পাঁচ মিনিট। শোনা গেল যে আট দশ রাউণ্ড খেলা হবে। এর মাঝে বিশ্রাম ব'লে কিছু নেই। দু'জনের দু'টো আলাদা নাম আছে। কিন্তু ওরা আলাদা ক'রে চিনতে পারছে না। একজন ওপরে। একজন নীচে। হেরেও হারছে না কেউ। দেখতে দেখতে মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। বুক ওঠা-নামা করে। হাততালি পড়ছে খুব। ওরাও দিচ্ছে।

যারা লড়ছে তাদের দু'জনের মনে একটুও মায়াদয়া নেই। যেন কত যুগের শত্রু দু'জনে। এতদিন একজন আর একজনকে খুঁজে পায়নি ব'লে শক্তি সঞ্চয় করেছে আর ফুঁসেছে। আজ যদি পারে তবে ছেঁচে, ছিঁড়ে, টুকরো টুকরো ক'রে খায়। একবার ওদের চোখের সামনে একজন আর-একজনের দু' পা ধ'রে মাথার ওপর তুলে তিন পাক ঘুরিয়ে ধাঁই ক'রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। না, কিছুই হ'ল না। যাকে ফেলল সে উঠল। দাঁড়াল মাথা উঁচু ক'রে। চারদিকে চীৎকার হতে লাগল, "সাবাস, সাবাস বাহাদুর পহল্‌বান জাহাঙ্গীর। সাবাস, সাবাস —"

শেষ রাউণ্ড চলার সময় একজন আর একজনকে নীচে ফেলেছে। ফেলে ডান পায়ের হাঁটু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে গলা। অন্য পায়ে চাপ দিয়ে নীচের লোকটার বাঁ পা-টাকে যেন মঞ্চের সঙ্গে গেঁথে রেখে দিয়েছে। আর নিজের দু' হাত দিয়ে নীচের লোকটার ডান পা-টাকে মাথার দিকে টানছে। টানতে টানতে দু'পায়ের মাঝখানে একটা বড় ধনুকের ব্যবধান ক'রে ফেলেছে। সেই অবস্থাতেও নীচের লোকটা দম ছাড়ে নি। হারে নি। বলির জানোয়ারের মত পায়ের মাঝে তার গলা আটকে গেছে। তবু সে তার দুই হাত দিয়ে ওপরে-বসা লোকটার মাথাটা টেনে নামিয়ে কাঠের ওপর ঘ'ষে দিচ্ছে। ঠিক তখনই শুভেন্দু চিমটি কেটে মৃণালের দৃষ্টিকে অন্যদিকে টানল। মৃণাল দেখল যে, খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে যে লোকটার মাফলার প'ড়ে গিয়েছিল আর যে মেয়েটা সেটা কুড়িয়ে দিয়েছিল, একটু দূরে তারা ব'সে আছে। ওদের চারপাশের লোকজন এক চোখ ওদের ওপর রেখেছে। ওরা তা খেয়াল করছে না। মেয়েটার কোমর জড়িয়ে লোকটার হাত। একটু পরেই মেয়েটা তার দুই হাত দিয়ে লোকটার বুকে গুম গুম ক'রে কিল মারল। অনেকেই তখন ওদের দেখছে। লোকটা ছেড়ে দিয়ে হাসছে।

শুভেন্দু ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে বলল, র‍্যাণ্ডী, দেখলি ত?

নিষিদ্ধ, কর্কশ শব্দটা এতদিন শোনা ছিল। আর এখন কানের গোড়ায় যখন শুভেন্দু সেই শব্দটা উচ্চারণ করল তখন বুকের মধ্যে ছ্যাঁক্‌ ক'রে উঠে কান লাল হয়ে গেল।

দুটি কিশোর। ওরা দু'জন।

খেলা শেষ হয়ে গেল। এদের মধ্যে হারজিতের মীমাংসা বড় একটা হয় না। আজও হ'ল না। অটোগ্রাফ নেওয়ার খাতাখানা কিম্বা স্কুলের রাফখাতাটাও পকেটে ক'রে আনে নি ব'লে শুভেন্দু এতক্ষণে একবার চুক্‌ চুক্‌ ক'রে আফশোষ করল। ওর অটোগ্রাফ খাতায় সাতজন আধুনিক-সঙ্গীতশিল্পী আর একজন কৌতুক-শিল্পীর নাম সই আছে। গতবার সরস্বতী পূজার সময় ওদের পাড়ায় যে গানের জলসা হ'ল তখন শুভেন্দু খাতাটা করেছে। আবার যদি হয়, মৃণালও একটা খাতা করবে ঠিক করেছে। খাতাটা আনলে আজ এদের দু'জনের সইও নেওয়া যেত। পাঁচজনকে দেখানর মত।

এখন মৃণাল একা।

বাড়ীর পথে এগুতে এগুতে মৃণালের হাত-পা যেন ভয়ে সিঁটিয়ে আসছিল।

একবার বাড়ীতে অনুমতি না নিয়ে সন্ধ্যার শো'তে সিনেমা দেখে বাড়ীতে ফিরেই কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ না দিয়ে বলতে সুরু করেছিল, জান মা, আজ রাস্তায় একটা ট্রাক একটা লোককে থেঁৎলে দিল।

সেই কল্পিত দুর্ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে মৃণাল চোখে-মুখে এমন একটা ভঙ্গি ফুটিয়েছিল যে, সেদিকে চেয়ে মৃণালের মা বলেছিল, সে কি রে?

—হ্যাঁ, লোকটা অনেক দূর দিয়ে যাচ্ছিল, তবুও।

আজ আবার তেমন কোন ঘটনা বানিয়ে বলা যায় কি না ভাবতে ভাবতে মৃণাল তাদের রেল পাড়ায় ঢুকে পড়ল। বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই দেখে বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে। তখনো ডিউটির প্যাণ্ট পরনে। কোট খুলেছে। বাবা লাইনে বার হয়েছিল। তিন দিন পর বাড়ী এসেছে।

—কোথায় গিয়েছিলি?

থতমত খেয়ে মৃণাল কোন উত্তর দিতে পারল না। যে কোন মিথ্যে কথা মুখে জোগাল না। মাথা নীচু ক'রে বাড়ীর মধ্যে ঢুকল। ভেবেছিল কোনমতে হাত-মুখ ধুয়ে বই নিয়ে ব'সে যাবে।

—দাঁড়াও।

মৃণাল দেখল তার বাবার মুখ-চোখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ভীষণ।

—কোথায় গিয়েছিলে স্কুল থেকে?

নিশ্চয়ই মেজ ভাইটা স্কুল থেকে ফিরে কিছু একটা ব'লে দিয়েছে। আর তাই নিয়ে মা যখন নিজের মনে গজর গজর করছিল তখনই বাবা ডিউটি থেকে ফিরেছে।

—বই কোথায়?

মৃণাল একটা উত্তরও করতে পারল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবার টের পেল যে, তার জামা-প্যাণ্ট দিয়ে বিড়ি সিগারেটের তীব্র গন্ধ ছাড়ছে।

প্রথমে বেল্ট দিয়ে তার পর মাছ ধরার ছিপ দিয়ে সপাং সপাং ক'রে তিন দিন পরে তেতেপুড়ে বাড়ী-আসা কমার্সিয়াল সেক্শনের রাণিং ষ্টাফ 'আর. ব্যানার্জ্জী' তার ছেলেকে শাসন করতে লাগল। ভীষণ রাগে হিংস্র হয়ে উঠেছে বাবা। মারতে মারতে বাবার চোখ ফেটে জল বার হয়ে এসেছে। থামছে না তবু। গজরাচ্ছে, আমি রাত জেগে রক্ত জল ক'রে পয়সা আনি। এই জন্যে? সন্ধ্যেবেলায় মাষ্টার রেখেছি। কোন্ চুলোয় গিয়েছিলি তুই, বল্।

—পঞ্চাশ জায়গায় যাবার পয়সা তুই পাস কোথায়? কোথায় পাস পয়সা? বল্।

মৃণাল বলতে পারত শুভেন্দুর কথা। কিন্তু সেটা সম্মানজনক নয়। তা ছাড়া সেও ত কিছু দিয়েছে। তিনটে ছোট ছোট ভাইবোন দূরে বোবার মত দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুমা একবার বাবাকে আটকাতে, থামাতে চেয়েছিল। পারে নি। এখন বোধ হয় কাঁদছে। মা-ও কাঁদছে। দরজাটা হাট ক'রে খোলা। পথ চলতে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে একটা লোক বোধ হয় এইদিকে দেখছে। এতক্ষণ মৃণাল ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার ডুক্‌রে কেঁদে উঠল, আর কখনো করব না। আর মের না।

—খুন ক'রে ফেলব আমি।

আরও কঠিন হয়ে উঠল তার বাবা। আরও নির্ম্মম। ছিপের আগাটা ভেঙে গেল পিঠের উপর। তবুও নিস্তার নেই।

আর থাকতে না পেরে মৃণাল আর তার বাবার মাঝখানে মৃণালের মা এসে দাঁড়াল। তাকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে বাবার দু'টি হাত কোনমতে ধ'রে মুখোমুখী বলল, তাই ব'লে এমন চোরের মার মারবে?

—স'রে যাও বলছি, বাবা হুঙ্কার দিল মা-কে, স'রে যাও। চোরকে চোরের মতই মারতে হয়। তোমার ছেলে চোর হয়েছে। চোর। কোথায় পয়সা পায় ও বলুক।

এ কথারও কোন উত্তর ছিল না মৃণালের। কিন্তু তার আগেই তার মা ফুঁসে উঠল, ছেলে বুঝি একা আমার? তাই চোর! তুমি নিজে কি কর? কথাটা বলার আগে মৃণালের মা জানত না, স্বপ্নেও ভাবে নি ঠিক এই কথাটা সে জীবনে কোনদিন বলবে। গাছ থেকে খসে-পড়া পাতা, ছুঁড়ে-দেওয়া তীর, আর বলা কথা কোনদিন ফেরে না। কথার পিঠে কথা তখন পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে-নামা চাঙ চাঙ পাথরের মত নেমে আসছে।

মৃণালের বাবা—কি বললে?

মৃণালের মা—চিরকাল, রোজ, তিন চার পাঁচ টাকা ঘুষ আনো না তুমি?

—তোমার বাবা কিন্তু সেটা জেনেই আমায় আদরের জামাই করেছিলেন, বলতে বলতে যেন হাঁপিয়ে উঠল মৃণালের বাবা। গলা আটকে গেল। মা'র পিছনে দাঁড়িয়ে খুব অস্পষ্ট ভাবে মৃণাল শুনতে পেল তার বাবা

মা-কে বলছে, চুরির টাকায় কেনা শাড়ি গয়না প'রে ত তুমি চিরকাল বেশ হেসে পাড়া বেড়াতে পারলে। কি ক'রে পারলে? তুমি ত বাজারের নও,—বরফ-ঠাণ্ডা গলায় ক্ষুরের ধারের মত আলগোছে কথাটা বাবা বসিয়ে দিল।

যেন ওরা মৃণালের বাবা নয়। মা নয়। তীব্র ঘৃণা আর আক্রোশের প্রতিমূর্ত্তি।

—কি বললে তুমি আমায়?

এই ব'লে মৃণালের মা কাঁপতে কাঁপতে মেঝেয় লুটিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আর তিনটে ভাই-বোনও কাঁদতে লাগল। ঘরটা এক লহমায় পাল্টে গেল। যেন অজস্র গিরগিটি, সাপ, পোকামাকড় ঘরটায় হিল্ হিল্ ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে। ঘরটা নরক হয়ে গেছে।

মৃণালের সাত বছরের ছোট ভাইটা কাঁদতে কাঁদতে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল।

বাইরে থেকে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

এশিয়া-আফ্রিকার নারী-জাগরণ

শ্রীতপতী মুখোপাধ্যায়

পৃথিবীর ইতিহাসের গত একশত বৎসরের ইতিহাস সমগ্র বিশ্বের নারী-জাগরণের অধ্যায়। পুরাতনীর খাতায় যে সব দেশের নারীকে বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, যুদ্ধক্ষেত্রে বা রাজনীতিক্ষেত্রে মহীয়সী হ'তে দেখা গিয়েছে তাঁদের সংখ্যা খুবই কম ও তাঁদের গৌরব-কাহিনী বিক্ষিপ্ত ও বিরল।

মনীষী প্লেটো নারীর সমাধিকার সম্বন্ধে যা বলেছেন, তাতে তৎকালীন গ্রীস দেশে বিশেষ ফল হয় নি। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের "Subjection of Women" প্রবন্ধ নারী-জাগরণের বিশেষ সহায়তা করেছে। ভারতবর্ষের রাজা রামমোহনের কণ্ঠে প্রথম উচ্চারিত হয়েছে সর্ব্বক্ষেত্রে সর্ব্ববিষয়ে নারীকে মনুষ্যত্বের অধিকারে বঞ্চিত করার বিরুদ্ধে বজ্র নির্ঘোষ।

স্বাধীন ভারতবর্ষ তার সংবিধানে নারীকে সমানাধিকার দিয়েছে, বঞ্চিত করে নি লেখার হরফে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সেই অধিকার নারী কি সম্পূর্ণভাবে পেয়েছে? শিক্ষালাভে, জ্ঞানলাভে, দেশের কল্যাণ-কার্য্যে সে কি আজও তার পূর্ণ অধিকার সহজে, স্বাভাবিক ভাবে ও আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছে?

আমাদের মহিলা-মন্ত্রী, মহিলা-দেশপালিকা, মহিলা-নেত্রীদের উদাহরণ দিয়ে খুশী হয়ে থাকবার উপায় নেই, কেননা দেখতে হবে সাধারণ নারী কতটা পাচ্ছে শিক্ষার সুযোগ ও কর্ম্মের সুবিধা।

শিক্ষাক্ষেত্রেই দেখুন। ১৯৫৬-৫৭ সনে, মাধ্যমিক শিক্ষালাভ করার সুযোগ পেয়েছে ৩৭,৭২,৯০৩ বালক। তার তুলনায় বালিকা শিক্ষাব্রতী কেবলমাত্র ৯,২৫,৫৮৪।

আরও দেখা গেছে যে, ১৪ থেকে ১৭ বৎসর বয়স্কা মেয়েদের সংখ্যা ১২ লক্ষ।* তার মধ্যে কেবল শতকরা ৩ জন বালিকা শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, এটা কি আমাদের পক্ষে কম অগৌরবের কথা?

আজ শিক্ষিত ও সুধী সমাজের প্রচেষ্টা ও প্রসন্ন দৃষ্টি চাই এই সব সমস্যা সমাধানের জন্যে, আর চাই মেয়েদের সম্মিলিত প্রয়াস।

আনন্দের বিষয় যে, এই প্রচেষ্টা আজ কেবল কয়েকটি উচ্চ-শিক্ষিতা নারীর মধ্যেই বন্দী নেই—সকল বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং দু'টি মহাদেশে মোহনিদ্রা-ভাঙ্গা রাজকন্যার মত জেগে আজ উঠেছে—এশিয়া ও আফ্রিকার নারী।

দুই মহাদেশেই সামাজিক অসাম্য দিয়ে বন্দী ছিল নারী। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, "তার (দেশের নারীর) বুদ্ধি, তার সংস্কার, তার আচরণ নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সুযোগ পায় নি। সমস্ত দেশ জুড়ে দেখতে পাই, এই মোহমুগ্ধতার ক্ষতি কত সর্ব্বনেশে, এর বিপুলভার বহন ক'রে উন্নতির পথে এগিয়ে চলা দুঃসাধ্য।...এদিকে পৃথিবীর সকল দেশেই মেয়েরা আপন ব্যক্তিগত সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে আসছে।...আধুনিক এশিয়াতে তার লক্ষণ পাই। তার প্রধান কারণ যে, এই সীমানা ভাঙ্গার যুগ এসে পড়েছে।"

সত্যই—পৃথিবীর দূরত্বের সীমা, ভাষার ও ধর্ম্মের

*সংখ্যাগুলি "National Committee on Women's Education, 1959"-এর রিপোর্ট হতে নেওয়া।

ভিন্নতার সীমা যে কতটা ভেঙ্গে গেছে, এশিয়া ও আফ্রিকার সাধারণ নারী যে আজ বিশ্বমৈত্রীর পথে কতটা এগিয়েছে, তাদের সমস্যাগুলি যে মূলতঃ এক ও সমাধানের পথও এক, তা প্রথম উপলব্ধি করলাম সিংহলে অনুষ্ঠিত সর্ব্ব প্রথম "এশিয়া-আফ্রিকা নারী সম্মেলনে" যখন ভারতবর্ষের দশজন প্রতিনিধির একজন হিসাবে নিমন্ত্রিত হয়ে গেলাম।

লোকসংখ্যার দিক্ দিয়ে দেখলে, পৃথিবীর ২০৪ কোটি মানুষের বেশীর ভাগই এই দুই মহাদেশে সন্নিবিষ্ট। দুই মহাদেশই প্রাচীন সভ্যতার গৌরবের অধিকারী। এবং বর্ত্তমানের আর্থনীতিক মাপকাঠিতে এই দুই মহাদেশই "Economically underdeveloped areas" ব'লে অভিহিত। নূতন স্বাধীনতার গুরুভারে এরা দু'টিই ভারাক্রান্ত ও গর্ব্বিত। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম, জীবনধারা, আদর্শবাদ ও আচার-বিচার যেমন দু'টি মহাদেশে পৃথক্, তেমনি এক অন্তর্নিহিত, গূঢ়, রহস্যময় সৌহার্দ্যে এরা আবদ্ধ। দুই মহাদেশেই নূতন যুগ, নূতন পাওয়া স্বাধীনতার সঙ্গে এসেছে নারী-জাগরণ।

সিংহলের সাগর-মেখলা, শ্যামাঞ্চলা কলম্বো শহরে আমরা সম্মিলিত হলাম—এশিয়া ও আফ্রিকার উনিশটি দেশের প্রতিনিধি। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিদলের নেত্রী ছিলেন কেন্দ্রীয় সহমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন। হাওয়াই জাহাজ যখন সাগর পাড়ি দিচ্ছে তখন একজন বললেন, "মনে আছে পুরাণ-কাহিনী? এই পথেই ত পুষ্পক রথে অপহৃতা সীতাকে নিয়ে গিয়েছিল লঙ্কার রাজা রাবণ—আর একই আকাশপথে হয়ত আজ আমরা এতগুলি ভারতীয় মহিলা চলেছি, এবার লঙ্কার মুখ্যমন্ত্রীর নিমন্ত্রণে!"

এশিয়া-আফ্রিকার নারী সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়ক। মনে আছে, তখন শ্রীমতী বন্দর-নায়কের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল "সিংহল বৌদ্ধ-নারী কেন্দ্রে", ও বিস্মিত লাগে ভাবলে যে, সেই শ্রীমতী শান্ত লাজুক মেয়েটির জীবনধারা স্বামীর অপঘাতমৃত্যুর আঘাতে এমনি বদলে গেল যে, তিনি আজ দেশের শাসনকার্য্য হাতে নিয়ে হয়েছেন পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম নারী-প্রধানমন্ত্রী।

সিংহলে মুখ্য আলোচ্য বস্তুগুলি ভাগ করা হয়েছিল এমন সুচারুভাবে যে, সামাজিক কোন সমস্যা যেন বাদ না পড়ে।

শিক্ষা-সমস্যা, স্বাস্থ্য-সমস্যা, নারীর নাগরিক দায়িত্ব, পতিতা-উদ্ধার ও পতিতা-বৃত্তি নিবারণের উপায়, নারী-শ্রমিকের সমস্যা, নারী-কর্ম্মীর মঙ্গলার্থ আইন ও তার আলোচনা। আদর্শবাদে প্রভেদ সত্ত্বেও এশিয়া ও আফ্রিকার নারীদের মৈত্রী চিরস্থায়ী রাখার ব্যবস্থা—এই ছিল আলোচ্য বস্তু দশদিনব্যাপী সভায়।

ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, বর্ম্মা, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম, জাপান, চীন, মিশর, ইরাণ, ইরাক, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, শ্যাম, টুনীসীয়া, তুরস্ক, ঘানা ও উগাণ্ডার প্রতিনিধিদল আলোচনা সভায়ও মৈত্রী-বন্ধনে দেখালেন যে, সাধারণ নারীর সামাজিক সমস্যায় ও সামাজিক কল্যাণ-প্রচেষ্টায় যে মূলতঃ ঐক্য আছে তাকে জাতীয় বা আদর্শবাদী প্রভেদ বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। বিশ্বমৈত্রীর পথে এ দুর্দ্দিনে যদি কেউ পৃথিবীকে আশা দিতে পারে তা মায়ের জাত, নারীর একতা ও কল্যাণ-প্রচেষ্টায়।

এই দুই মহাদেশের মেয়েরাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ঘরের কোণে ছিলেন আবদ্ধ এবং এখনও সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামে গ্রামে মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের তুলনায় বহু পিছিয়ে আছে, দরিদ্র ও রোগগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ভয়প্রদ, ও জনসংখ্যা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের অভাবে খাদ্য উৎপাদন শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে, শিশু-মৃত্যুর হার না কমা সত্ত্বেও। দু'টিই কৃষি-প্রধান মহাদেশ, নতুন ক'রে Industrialization পরখ করতে সুরু করেছে। দু' দেশেই জনাকীর্ণ শহরে বেকার-সমস্যা ও নবশিক্ষিত নারীদের ন্যায্য চাকরির প্রয়োজন ও দাবী।

পার্থক্যও আছে। ভারতবর্ষে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের ভোট দেবার যে অধিকার আছে, আফগানিস্থান, ইথিওপিয়া, কম্বোজ, ইরাণ ও ইরাকে এখনও মেয়েদের সে অধিকার নেই। যখন ১৯৫৮-এ আফগানিস্থান গিয়ে-ছিলাম তখনও সেখানকার নারী আব্রু ছাড়া বেরুতে পারতেন না। গত বৎসর থেকে কেবল সরকার বে-আব্রু নারীকে লোক-চক্ষুর সামনে আসার অধিকার দিয়েছে।

গত মহাযুদ্ধের পর দুই মহাদেশেই আরও একটি সমস্যা এসেছে, সেটি Industrialization-কে আশ্রয় ক'রেই এসেছে। সেটি হ'চ্ছে একান্নবর্ত্তী পরিবারের ভাঙ্গন ও সেটির সূত্র ধ'রে যত সমস্যা, তা নারীকেই বেশী আঘাত করে। দুই মহাদেশের অনেক স্থানেই নারী-কর্ম্মীকে সমান গুরুত্বের কাজের জন্যে সমান বেতন দেওয়া হয় না। দুই মহাদেশেই সমাজের লজ্জা পতিতার উদ্ধারের কাজ চলেছে, কিন্তু তাদের বিকৃত জীবনকে সুস্থ ক'রে তোলার পথে আর্থনীতিক ও সামাজিক বাধা খুবই। কেবলমাত্র আইন পাশ ক'রে তাদের বৃত্তিকে বে-আইনী

ব'লে ক্ষান্ত হলে যে চলবে না, এ বিষয়ে সরকারের চাইতে সমাজ-সেবিকা নারীর দলই বেশী সচেতন। কবিগুরু যে বলেছিলেন, "আজ সর্ব্বত্র মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে, বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে, এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে, নইলে তাদের লজ্জা, তাদের অকৃতার্থতা"—একথা আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য ব'লে মনে করে নবযুগের মেয়ে।

এই চেতনায় আজ মেয়েরা উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত, সংস্কারাচ্ছন্ন কুয়াশাকে তারা আশার ও জ্ঞানের আলো দিয়ে দূর করতে চায়। কন্যা চায় পুত্রের সঙ্গে যেমন সমানাধিকার, তেমনি বহন করতে চায় সমান কর্ত্তব্যের গুরুভার, আর গৃহলক্ষ্মী আজ হতে চায় সমাজ-লক্ষ্মী, যার কল্যাণ হস্ত, জীবপালিনী বুদ্ধি। সেবাব্রত, কেবল ঘরের মানুষদের নয়, বিশ্বের লোককে রক্ষা ও পালন করতে নিয়োজিত হবে। একথা আজ আর রূপকথা নয়; এ প্রত্যক্ষ সত্য।

এশিয়া ও আফ্রিকার নারী আজ মোহনিদ্রা-ভাঙ্গা রাজকন্যার মত জেগে উঠেছে।

যতীন্দ্রমোহন রায়

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

দেশবরেণ্য, বিশেষ করিয়া উত্তরবঙ্গের বিপ্লবী নেতা, আজ না হয় যতীন্দ্রমোহন বলিয়া দূরে রাখিতেছি। কিন্তু তিনি ছিলেন আমাদের যতীনদা। ছোট-বড়, স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু-মুসলমান সকলেরই তিনি অতি আপনার জন ছিলেন। বিপদে-আপদে তিনি সকলের সঙ্গেই মেলা-মেশা করিতেন। আমরা যে গণসংযোগের কথা বলি, তিনি সর্বদা সেই গণসংযোগের সাধনা করিতেন। তিনি বগুড়ায় গণমঙ্গল প্রতিষ্ঠাও করিয়াছিলেন, জীবনব্যাপী সাধনায় সে একটা বাহিরের রূপ। প্রথম জীবনে শিক্ষক ছিলেন, সারাজীবন তাঁহার ছিল শিক্ষকের দায়িত্ব, শিক্ষকের মর্যাদা। তিনি জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখেন নাই, সমগ্রভাবে দেখিতে ও বুঝিতে চাহিয়াছিলেন। তরুণ বয়সে দেশমাতৃকার নিকটে আত্মবলি দিয়াছিলেন, সারাজীবন দেশই ছিল তাঁহার আরাধ্য দেবতা।

জীবনে আমার একবারই কারাবাসের সৌভাগ্য হইয়াছিল, তা ১৯৪২-৪৩ সনে। এ দিক্ দিয়া আমি মোটেই কুলীন নহি। আর সে সময়ে কারাবাসের কঠোরতা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। অবশ্য বন্দীদশা মাত্রই দুর্দশা। কিন্তু বহু সাধু পুরুষের সঙ্গ কারাবাসকে তীর্থবাস করিয়া তুলিয়াছিল। যাঁহাদের সঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলাম, যতীনদা ছিলেন তাঁহাদের এক-জন। পূর্বে তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, সূত্রপাত যত দূর মনে পড়ে ১৯২০ সন হইতে। তাহারও বহু পূর্বে তাঁহার নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু রঙ্গপুর কলেজে কাজ করিবার সময় তাঁহার প্রথম দেখা পাই। সান্তাহারে যখন রঙ্গপুর কলেজের কয়েকটি ছাত্র ও সামান্য কিছু চাঁদা লইয়া আমার পরমবন্ধু সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বন্যাপীড়িত দেশবাসীর সাহায্য প্রচেষ্টা দেখিতে যাই তখন দেখি, যতীনদা তাঁহার সহকর্মীদের লইয়া সেখানে হাজির। ছেলেদের লইয়া কুচকাওয়াজ করিতেছেন; স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মঠ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে যাইতে-ছেন। এতদিনের মধ্যেও কিন্তু যতীনদা আমাকে কখনও 'তুমি' বলিতেন না। আমি অনুযোগ করিলেও বলিতেন যে, যখন যেটা আসে তাহাই চলুক।

কিন্তু তিনি ছিলেন বাস্তবিকই অগ্রজের মত, স্নেহও যেমন পাইয়াছিলাম, সহানুভূতিও যেমন পাইয়াছিলাম, তেমনি পরের বিহ্বলতা ও চিত্তের দুর্বলতার পরিচয়ে তাঁহার কঠোর ভর্ৎসনাও বেশ মনে পড়ে।

যাক সে কথা; যোগ্যতর লেখনী তাঁহার জীবনকথা লিপিবদ্ধ করিলে দেশের একটা কাজ করা হইবে। আমি এখানে তাঁহার একটা দিক্ উল্লেখ করিতে চাই। বৃদ্ধ বয়সেও একদিকে তিনি যেমন Renan-এর যীশুচরিত পড়িতে ভালবাসিতেন, পূর্বে অধীত ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আবার পড়িতে ভালবাসিতেন, তেমনি কারা-বাসে তাঁহার কবিতা লেখার অভ্যাস দেখিয়াছিলাম। একদিকে কঠোর, অন্যদিকে কত সরস। জেলখানায় কবিতা আমরা অনেকেই লিখি, জনৈক শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু সেখানে একটু অবসর পাইয়া এবং রাজনৈতিক কার্য হইতে বাধ্যতামূলক বিরতি ভোগ করার সুযোগে হোমিওপ্যাথি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা করিতেন, কেহ বা চর্চা করিতেন নাট্যশাস্ত্রের। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা মিটাইবার জন্য তিনি প্রাণদান করেন, অহিংসাব্রতী

শচীন্দ্রনাথ সেদিন আমাদের মধ্যে ছিলেন। সেই সময়ে অনুবাদ করিতেন ও কবিতা রচনা করিতেন। শচীন্দ্রনাথের একক ভাবে পদচারণ এখনও চোখের সামনে ভাসিতেছে।

যতীনদার কবিতা আমি আমার খাতায় কিছু কিছু নকল করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিছু ছিল তাঁহার নিজস্ব দৃপ্তভঙ্গিতে লেখা। কিছু অপেক্ষাকৃত সহজ শব্দে রচিত, কিছু পুরাণো গানও ছিল।

তাঁহার সংগ্রহ হইতে তিনটি গান প্রথমে দিয়া আরম্ভ করি।

১

আমার হাকলা যাতি ভয় করে, আইস গুরু দুইজনেতে
যাই পারে।
কারে নিয়ে যাই ভবপারে ॥
আমার দেহ ছিল শ্মশানের সমান,
তুমি তাতে মন্তর দিয়ে করলে ফুল বাগান,
আমার সেই বাগানে ফুল ফুটেছে রে,
অধর চাঁদ বিরাজ করে,
আইস গুরু দুইজনেতে যাই পারে ॥

ইহা তাঁহার পুরাতন গানের সংগ্রহ হইতে নেওয়া। এইরূপ আর একটি—

২

সামাল মাঝি এই পারাবারে।
বড় বান ডেকেছে সাগরে ॥
এবার নূতন বিপদ্ ভারি, আমি তাই ভেবে মরি,
কত বড় বড় নেয়ে যাতে হাল ছেড়ে ডুবে মরে—
সামাল মাঝি এই পারাবারে ॥

এই দু'টির রচয়িতা কে তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই। কিন্তু বিখ্যাত পাগলা কানাইয়ের (?) একটি গান তাঁহার প্রিয় ছিল—

৩

ক্যান বা ভবে বেঁচে রইলাম
মরণ হ'ল না।
আমার বন্ধু চল্লে গেছে অক্রুর মণির রথে চড়ে গো—
রথের চাকার তলে পড়ে মরতাম,
বন্ধু কেন বললে না—
আমায় কেন বললে না।
আমরা সব সখি-আবার বনফুল তুলি।
আমার ফুলের মালা বাসি হ'ল।
আমি কারে দিব বল না।
বন পুড়িলে সবাই দেখে।
মনের আগুন কেউ না দেখে।
আমার ভিতরে লেগ্যাছে আগুন,
বাহিরে জল ঢেল না।

যাঁহার কর্মজীবন পল্লীর মধ্যে বেশীর ভাগ কাটিয়াছিল, তাঁহার যে এই সব পল্লীগীতির জন্য প্রীতি থাকিবে, তাঁহার মধ্যে শিক্ষককে জাগাইয়া তুলিয়া সংগ্রহকার করিবে, তাহা অবশ্য আশা করা যায়। কিন্তু যাঁহার ধর্মভাব গুপ্ত ছিল, এমন কি যাঁহার সঙ্গীরা কখনও বা তাঁহাকে অনীশ্বরবাদী বলিয়া মনে করিত, তাঁহার লেখনী হইতে এই কবিতাও বাহির হইয়াছিল, ইহা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

৪

আলো কর জীবনের হেতু তুমি ধ্রুব জ্যোতি
পরম মঙ্গল।
দেখাও তোমারে মোরে, শিখাও কি এ জগতে
সুন্দর সুফল।
জ্ঞানদীপ্ত কর মোরে, দাও শান্তি সুধা ধারা
জ্ঞানজ নির্মল।
পবিত্রতা পুণ্যজ্যোতি নিত্য বস্তু চিরাব্যয়
আশীর্বাদ বল।
তোমারি করুণাবলে উঠিলাম ছাড়ি নিদ্রা
অর্ধমৃত ভাব।
জাগিয়া পাইব যাহা তোমারি উদ্দেশে যেন
করি তাহা লাভ।
সংশয় কুতর্ক দ্বিধা দ্বন্দ্ব যদি জাগে মনে,
হে দীনশরণ!
আন্দোলিত ক্ষীণ হৃদি অন্ধকারে পায় যেন
তব দরশন।

প্রাতঃকালীন প্রার্থনা হিসাবে এই কবিতাটি বাস্তবিকই কোনও পাঠ্যপুস্তকে স্থান পাইয়াছিল কি না জানি না। কিন্তু পাইলে বেমানান হইত না। অনুরূপ আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করি, শুনিয়াছিলাম, বহুপূর্বে আলিপুর প্রেসিডেন্সী জেলে থাকার সময়ে তিনি ইহা রচনা করেন।

৫

আমি তোমারি আশে এসে বসে আছি
ঝঞ্ঝা-ভয়াল ভবনদীকূলে।
তুমি আনিছ তরণী, মথিয়া ঝঞ্ঝা,
অন্ধ অনাথে লবে না কি তুলে?

আমি এপারে ঘুরেছি কত ঘরে ঘরে,
আমারে খেদায়ে দিয়েছে দূর দূর করে,
আমি তবু বার বার দুয়ারে দুয়ারে
ফিরেছি তোমার শ্রীচরণ ভুলে।
শুভশোভাহীন সকল শূন্যে
কে বা দেবে ঠাঁই কিসের জন্যে,
আমি কার মুখে চাই কোথায় দাঁড়াই,
তুমি বিনে ঠাঁই কে দেবে বাতুলে॥
অনাদি যুগের আদিম অন্ধ,
আঁধার প্রাকারে পাবে কি রন্ধ্র,
ভুবনমোহন মুরতি তোমার
হেরিতে কি তার এ আঁখি তুলে॥

এখানে ত ভগবানে নির্ভর প্রতি ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু যে সংশয়, নিজের যে অসহায় অবস্থা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অপেক্ষা আবেগের দৃঢ়তা স্পষ্ট হইয়াছে নীচের এই গানটিতে—

৬

আমি তোমার কাছেই যাব।
তুমি মার ধর বক ঝক তোমার কাছেই রব॥
মারলে তুমি, তোমার কাছেই করব আমি নালিশ।
(আর) দ্বন্দ্বভরা মন্দগুলোর ডাকব না কো নালিশ॥
তোমার যা খুশি তা করো, তাতে কথাটি না কব।
তুমি না খেতে দাও করব উপোস খেতে দাও তো খাব
তুমি হাসাও, হাসি; কাঁদাও, কাঁদি। যা বল তাই করি;
তোমার ইঙ্গিতে যাই সাথে সাথে, আপনা পাসরি।
তুমি যদি মার, মরি। তুমি রাখলে জীবন ধরি।
আমি রোজ দু'বেলা বসে নিরালা তোমারি গুণ গাব।
তারা মন্দে ভাবে ভাল, মন্দে সন্দেহ না করে।
তারা দোস দেখালে মুখ খিঁচিয়ে মারতে আসে তেড়ে।
তারা হেজুক মজুক গলুক পচুক ফিরে না তাকাব।
আমি তোমার কাছেই যাব॥

বিপ্লবীর জীবন আদর্শবাদের জীবন, নিঃসঙ্গ হইয়া বাঁশীর সুরে আত্মহারা হইয়া তিনি চলেন, সে চলার বিরাম নাই। সে ডাকেরও শেষ নাই। যতীনদা তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গিতে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন—

৭

এই হাতড়ে হাঁটা আঁধার পথে ঐ
যেন দূর দুরান্তে কাঁদে রে কার বাঁশী!
তার কি হয়েছে, কেন বা কাঁদে সে,
শুনে মন যে হয় উদাসী,
আমার প্রাণ যেন উল্লাসী রে॥
যেন সেই কাঁদনের নাইক অবসান,
যেন অকুল অথৈ দুখে দুখী অন্তরের আনচান।
যেন সবকে সে চায় কাউকে না পেয়ে
কাঁদে সব কিছুর পিয়াসী রে—
যেন আমারও পিয়াসী।
আমার ভাঙ্গা পরাণ উল্লাসে আটখান—
ও তার বাঁশী যেন আমারও লাগি গায়
সারাদিন গান—
তারে এই বুঝি এই হারিয়ে গুলিয়ে ফেলি রে,
শুনে কাঁদি দিবানিশি রে!
একা আঁধার পথে বসি।

দমদম বন্দীনিবাসে আসার অল্পদিন পূর্বে তিনি একটি গান রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃতঘেঁষা শব্দ বর্জন করিয়া, চলতি কথায় যে ভাব বেশী সুন্দর করিয়া ফোটানো যায় তাহা দেখাইয়া, যেমন—'নজর পছন্দ' কথাটি। 'সাধু-ভাষায়' বলিলে ইহার মৌলিক জোর থাকিবে না।

যেমন করেছ আমায় সেই ভাল।
আমি নাই বা হলেম জমকাল॥
নজর পছন্দে তোমার হওয়ালে যে-টি হওয়ার,
আমার সবার মত সবখানি না,
তাতেই কি এল গেল॥
তিলে তিলে পলে পলে প্রাণ দিয়ে গড়েছ তুলে,
সে যেমনই প্রাণ হোক না আমার,
তোমার প্রাণেই প্রাণ পেল॥

যতীনদার আর একটি গান দিয়া এই প্রসঙ্গের শেষ করিব। ইহাও আত্মসমর্পণের ভাবে ভরপুর—

আমি যা চেয়েছি সব দিয়েছ মা গো।
তবে জিদ করে ভুল চাওয়া পেয়ে উল্‌টে করি রাগ ও॥
আবার—রাগ করি কি বৃথাই হেন,
ভুল চাওয়া শিখালি কেন।
কেন মনটিকে লেলিয়ে বলিস, মিছের পিছে লাগো?
চাওয়ার মত চাইতে শেখা শিখিস নি কপালে লেখা।
(তাই) ভুলের দোহাই দিয়ে চাপাও
ভাগ্যে লেখা ভাগ-ও।
(এবার) চাইতে শেখার শেষের শিক্ষা,
দে মা মোরে এ শেষ ভিক্ষা,
আমার সব পাওয়াকে পুণ্য করে ধন্য হৃদে জাগো॥

যতীনদার মধ্যে স্কুল-মাষ্টারী প্রবৃত্তি বিলক্ষণ ছিল, তাঁহার ঝোলায় যদি অভিধান একখানি পাওয়া যাইত, তাহাতে আশ্চর্যের কিছু হইত না, কিন্তু তাঁহার লেখায় কোথাও পল্লীর চলতি শব্দ বর্জন করিবার চেষ্টা ছিল না।

এ বিষয়ে তিনি অস্পৃশ্যতা বর্জন করিয়াই চলিতেন। পল্লী-জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল, কর্মীদের সকল দুঃসাহসের তিনি সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ যে সর্বদা আরও উর্ধ্বে থাকিত, তাঁহার দূর-প্রসারী গতির কিছু পরিচয় কি এই কয়টি কবিতা ও গানে পাওয়া যাইবে? ১৮৮৩ সনে তাঁহার জন্ম, ১৯৫০ সনে তাঁহার দেহাবসান। তাঁহার মত আয়ু পাইয়া যখন নিজের জীবনের বিচার করিতে যাই তখন এই উদার আত্ম-ভোলা দেশহিতে সমর্পিতপ্রাণ দেশনেতার নীরবতা, সরসতা ও যশোবিমুখতা যেন বিশেষ ভাবে দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। ভাবি, তিনি কোথায়, আর আমরা কোথায়!

মরা নদী

শ্রীকরুণাময় বসু

এ জীবন মরা নদী,
তাই যদি,
তবে কেন অতল তলায়
একটি মেয়ের মুখ আজো দেখা যায়
জলের ছায়ায়।
শ্যাওলায় ঢাকা মোর মন,
ঝিরি ঝিরি স্রোত তবু চলে অকারণ,
তবু দেখে চাঁদের স্বপন,
শ্যাওলায় ঢাকা মোর মন।

এ জীবনে ছিল একদিন
গহন বনের মায়া, শ্রাবণ নবীন,
আকাশেতে ছলছল চাঁদ;
জোনাকির ঝিকিমিকি, নীলজলে প্রবালের বাঁধ,
তুমি আমি ছিনু বসে, ভুলি নাই সেই আস্বাদ!
আকাশেতে জেগেছিল ছলছল চাঁদ।

জানি একদিন
ছিনু দোঁহে, দুজনার হৃদয় নবীন:
অনেক নক্ষত্র ছিল বসন্ত আকাশে,
তুমি ছিলে পাশে।
ঘুমন্ত মল্লিকা বন ফুলের দোলায়
জেগে উঠে নিজেকে ভোলায়;

চাঁদ যেন জ্যোৎস্না-তরীতে
এনেছিল কিছু মধু, রেখে গেল মল্লিকা কুঁড়িতে।
চাঁদ রেখে গেল মন,
তাই বুঝি বনে বনে ভ্রমরের উতলা গুঞ্জন।

বলেছিনু সেইক্ষণে,
তুমি যদি হাতে মোর হাতখানি রাখো,
এ হৃদয় পার হয়ে চলে যাবে
পৃথিবীর যতো আছে ভাঙা চোরা সাঁকো,
পার হবে অনন্ত জীবন,
যদি দাও এতটুকু মন।

বলেছিলে তুমি, তবে যাই,
সব গেছে, স্মৃতি যতো ম্লান হয়ে গেছে,
সে কথাটি তবু ভুলি নাই,
বলেছিলে, তবে চলে যাই।

মনে পড়ে আজো অবিকল
এক ফোঁটা নয়নের জল
জমেছিল নয়নের কোণে;
আজি ভেবে দেখি মনে
সেই জল স্রোত হয়ে গেছে,
হয়ে গেছে নদী,
এপারে রয়েছি আমি, বাঁকা স্রোত
চলে গেছে ওপার অবধি।

—০—

মরুমায়া

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সম্মুখে মোর সেই অজয়ের ধূসর বালুচর—
বিকানীর ও যশল্মীর কি গড়লে হোথা ঘর ?
সাহারা ও গোবি
ওই যে তাদের ছবি,
প্রচণ্ড প্রতপ্ত ভূমির কেউ তারা নয় পর।

২

মনে পড়ায় ভয়াল, মরুতীর্থ সে হিংলাজ—
তপ্ত বালির তলে মিঠে তরমুজের সমাজ।
ঠিক দুকুরে বয়—
সেই 'লু' ভীতিময়,
কোথা 'পুগল', পুষ্কর এবং গোয়ালিয়র গড় ?

৩

ঘরে বসেই দেখি—লভি মরুর আনন্দ—
ছবি ঘোরে চোখের কাছে নাই তাতে সন্দ।
শুনি আচম্বিত—
'মারু'র প্রলয় গীত,
পেতে পারি হয় তো 'টোলার' উষ্ট্রেরও খপর।

৪

প্রেম যে অমর—অমর প্রেমের অমৃত সঙ্গীত—
যুগে যুগে পাতে নূতন বৃন্দাবনের ভিত।
নিশীথ রাতের বায়
ঝুলন সে ঝুলায়
মরুর আগুন মেরুর তুহিন করে একত্তর।

* শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগোর মরুবধূ পাঠান্তে।

হে উজ্জ্বলা

শ্রীসুধীর চক্রবর্তী

এ সব দিন এ সব রাত নিবিড়তম রাতে
হে উজ্জ্বলা, তোমার ভীরু হাতে
সঁপে দিলাম। বলে এলাম : আজ
নদীর জলে স্বর্ণরেখার স্রোতস্বিনী কাজ
থামুক তবে। করুণ অমানিশা
হে উজ্জ্বলা, পূর্ণ করুক তোমার প্রেমের তৃষা।

হে উজ্জ্বলা, তোমার ভীরু হাতে
অনেক ফুল কাঁকন হয়ে ঝঞ্ঝনা সংঘাতে
কাঁদিয়েছিল একদা এক যুবার কোমল চোখ।
প্রেমের নয়, প্রাণের নয়, জ্বালার নির্মোক
অঙ্গে অঙ্গে ফাঁসের মত জ্বালা :
হে উজ্জ্বলা, তোমার নাম ছিল আমার মালা।

প্রেমের নয়, প্রাণের নয়, জ্বালার নির্মোক
জাগিয়েছিল একদা এক শোক
আমার মনে হাহাকারের তীব্র জাগরণে
নিহিত সেই গভীর শোক দীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে
ফুটিয়েছিল বাঁচার লোভ সৌরভে আকুল
হে উজ্জ্বলা, তোমার প্রেম শুকনো চাঁপাফুল।

নিহিত সেই গভীরশোক দীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে
তোমার রূপ তোমার কথা মল্লিকার বনে
প্রথম কলি ফুটিয়ে দিত। নদীর কানে কানে
এখনও সেই প্রথম কলি স্রোতের কলগানে
কী চঞ্চল দুর্নিবার। আমিও বেঁচে আছি :
হে উজ্জ্বলা, তুমিই শুধু ক্ষয়ের কাছাকাছি।

হে উজ্জ্বলা, তোমার প্রেম শুকনো চাঁপাফুল
গন্ধ আছে বর্ণ নেই স্বপ্নহীন ভুল।
অনেকদিন বিগত হ'ল কঠিন হ'ল মনে-রাখার নেশা
এখন আমার মনে শুধুই অন্যের অন্বেষা।
সে সব দিন সে সব রাত সান্দ্র এই রাতে
হে উজ্জ্বলা, সঁপে দিলাম স্মৃতির ভীরু হাতে।

তিন সাগর

শ্রীব্রজমাধব ভট্টাচার্য

২৮

আইল অব ওয়াইট পার হয়ে গেলো। তার পর আয়র্লাণ্ডের তীর দেখা যাচ্ছে। আকাশে ঝক্ ঝক্ করছে রোদ। আমরা যাচ্ছি আরও পশ্চিমে। রেভারেণ্ড মোতিলালকে ঘাঁটাবার সুযোগ পাই নি। সেই পণ্ডিত সোহনলাল এয়ার হষ্টেস্‌কে অনুরোধ জানিয়ে আমার পাশের ভদ্রমহিলার স্থানটা নিল। আমি খুব খুশী হলাম না। তবু ত্রিনিদাদের লোক বলে ভাবলাম কিছু জেনে শুনে নেওয়া যাক।

ত্রিনিদাদে কেবল ভারতীয়েরা বা হিন্দুরাই আছে তা নয়, রীতিমত পুরুৎগিরি আছে। পণ্ডিত সোহনলাল কেন, অনেক ভারতীয়কে দেখেছি ভারত সম্বন্ধে অদ্ভুত মায়া। সে পরিচয় দেবার সময় পরে আসবে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে ভারতীয় উপনিবেশের পত্তনের কাহিনী অদ্ভুত রকমের রোমাঞ্চকতায় ভরতি। আজকাল ওয়েষ্ট ইণ্ডীয়ান সাহিত্যিকরা এ সব গল্প একটু-আধটু লিখছে; কিন্তু এ কাহিনী লেখার জন্য চাই বালজাক্, ডষ্টয়ভস্কি, হেমিংঙ্‌ওয়ে। তার এখনও ঢের দেরি।

জিলা বসতি থেকে সোহনলাল এসেছিল ত্রিনিদাদে। তখন ওর বয়স ষোল। বাপের তৃতীয় পুত্র। চাষবাস করে বাপ। জাতে কুরমী। বসতি ছেড়ে গোণ্ডায় গেছে চাচার সাদিতে। হাতে কাঁচা পয়সা আছে প্রায় চার পাঁচ আনা। গাড়ী চড়তে পেয়ে খুব ভাল লেগেছে। ইয়ার্ডে একটা গাড়ী পড়ে আছে। কৌতূহলী হয়ে তাতে চড়ে বসেছে। সামনে কুলিরা কাজ করছে। রেলের লাইন পাতছে। কয়লা-পোড়া সোঁদা সোঁদা গন্ধ আসছে ইঞ্জিন থেকে। অত লোহা, কাঠ, কয়লা, ধোঁয়া—একসঙ্গে দেখে ওর অবাক্ লাগছে। মাঝে মাঝে কোথাও ইঞ্জিনের বাঁশী বেজে উঠেছে 'কু-উ-উ।' কিশোর সোহনলালের মন উদাস হয়ে ভেসে যায় বাঁশীর সুরে। মাঝে মাঝে 'ঝম্' করে একটা শব্দ হয়। ইঞ্জিন সান্টিং করছে মালগাড়ী। ঝির ঝিরে বাতাস দেয়। বিয়ের রাতে ঘুম হয় নি। সোহনলাল গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়ে। লম্বা ঘুম, গভীর ঘুম। সে ঘুমের মধ্যে ইঞ্জিন কু করছে, গাড়ী ঝম্ ঝম্ করে শব্দ করছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশকে কালো করে দিচ্ছে। বিয়ের বরযাত্র ঢোলক বাজাচ্ছে, বাঁশী বাজাচ্ছে। ভাঁড়েরা নাচছে। ঘুম ভাঙ্গল যখন টিকিট-কলেক্টর এসে টিকিট চাইল।

হকচকিয়ে উঠে, ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল ও। এমন অবস্থায় পড়ে নি কখনও। পাশে একজন ভদ্র পোষাক-পরা জোয়ান লোক হেসে বলল, "ঘুমিয়ে পড়েছে। বেচারী! আমি দাম দিচ্ছি। ওকে গোরখপুরের টিকিট দিন।"

"কিন্তু বস্তীতে যে আমার বাড়ী—"

"বস্তী? কোন গাঁ? ও তুমি মোহনপ্রসাদের ছেলে? বেশ বেশ। মোহনপ্রসাদকে আমি খুব জানি। আমি বস্তী পৌঁছে দেব।"

তার পরে ওকে মিষ্টি খেতে দেয়, জল খেতে দেয়। তার পরে লম্বা ঘুম আবার। এবার জেগে দেখে একেবারে কলকাতা শহর। মোহনপ্রসাদের বন্ধুর তখন খুব দরাজ হাত। জামা-কাপড় কিনে দিচ্ছে, কলকাতা দেখাচ্ছে। একটি গাদি লোক আসা-যাওয়া করছে। প্যারেলালের কত সম্মান। লোকটার নাম প্যারেলালই ছিল।

সকলেই গল্প করছে 'শ্রীনাম' তীর্থের কথা। সমুদ্দুরের পথ। সেখানেও রেল লাইন পাতা হচ্ছে। আর দিন গেলে বারো আনা মজুরি! বস্তী আর গোণ্ডায় মজুর পায় তিন আনা, চার আনা, বড় জোর ছ আনা। বাড়ী পাবে, সস্তায় খাবার পাবে। পাঁচ বছর মেয়াদ। কাজ হলে বাড়ী ফিরে আসবে। কত টাকা জমবে।

সোহনলালের মন কেমন করে মায়ের জন্য। বাবার কাছে মার খায়, ঝড়ে, জলে, রোদে মাঠে কাজ করার কথা ভাবে। আবার মনে হয় তেঁতুল গাছের ডালে বাঁধা দোলনার কথা। কুলুঙ্গীতে রাখা লাটাইয়ের কথা। লাটাইটা সদ্য বানিয়েছে। আবার মনে হয় রেল লাইন, ইঞ্জিনের শব্দ, সায়েবদের সঙ্গে কাজ, নিজেদের টাকা, ঘর-বাড়ী।

সোহনলাল বলে "বাবার মত"

"আরে, আরে! মোহনলালের মত? আমিই ত আছি। মোহনলাল বারণ করবে কি? তবে তুই এদিকে সইটই করে দে। আমি মোহনলালের মত আনিয়ে নেব।"

লেখাপড়া জানে না সোহনলাল। মোহনলালের চিঠি আনিয়ে তাকে শুনিয়ে দিতে বেগ পেতে হয় নি। সকলের সঙ্গে শ্রীনাম তীর্থে ও-ও চলে এল। কেবল বয়সটা ষোলর জায়গায় আঠার লিখিয়ে নিল।

শ্রীনাম যে সুরিনাম, আর সুরিনাম যে ভারত থেকে সতের হাজার মাইল এ জানত কে তখন। ওদের জাহাজ ত্রিনিদাদে আসতে ও মহা কান্নাকাটি সুরু করে দেয়। ওকে ত্রিনিদাদেই নামানো হয় বটে, তবে বেত যা খেয়েছিল তা এখনও তার মনে আছে।

আমি বিস্মিত হয়ে এ কাহিনী শুনছি। ও একটু আসতেই জিজ্ঞাসা করি "পাঁচ বছর পরে চলে এলে না কেন পণ্ডিত?"

"কেন?—সেখানে দুঃখে শোকে পাগলের মত হলাম। কিছু বলতে গেলেই মার খেতে হ'ত। সর্দার ছিল কুলি-সর্দার। হপ্তায় কাজ দিত না। না খেয়ে ভিক্ষে করতে হ'ত। নেশা করা শিখলাম। খুব মদ খেতাম। ঢের মদ। অঢেল মদ। কাজ ছিল আখের ক্ষেতে। সেখানে ছুঁড়িরাও কাজ করত। একটার শেষ অবধি পেট হয়ে গেল। আমায় দায়ী করল। বিয়ে করতে বাধ্য হলাম। সেই সংসার ছেড়ে আর নড়ি কি করে। সরকার থেকে জমি পেলাম। ছেলেরা বড় হ'ল। নিজে আর বস্তী ভুলতে পারি না। আজ এতদিনে বস্তী গেলাম। থাকতে পারলাম কৈ? ঘোর মায়া। আবার ফিরে চলেছি।"

"কিন্তু কুরমী-সোহনলাল পণ্ডিত-সোহনলাল কি করে হ'ল বললে না ত?"

এবার সোহনলাল লজ্জিত হ'ল—"বলতে লজ্জা করে। এ এক পাপ। ভারত থেকে সদ্য এসেছিলাম। হিন্দী জানতাম। তুলসীদাস, সুরসাগর, প্রেমসাগর কণ্ঠস্থ ছিল। সত্যনারায়ণ পূজা, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ভারতে কেমন হয় সব বোঝাতাম। সকলেই আমাকে ভারি শ্রদ্ধা করত। যাকে বিয়ে করলাম সে দূরের মেয়ে। চাকরি ছাড়ার পর থেকে ত যজমানিই করি। এবার গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিয়ে সব বলে এসেছি। আর এ কাজ করব না।"

আমি বলি, "ভয় পাও কেন ভাই? তুমিই ব্রাহ্মণ। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রেরা ত এ সব দেশে আসাই নিষেধ করে দিয়েছিলেন। তোমরা যদি জ্বালিয়ে না রাখতে এ বাতি নিভে যেত। সবই খ্রীষ্টান হয়ে যেত। ত্রিনিদাদে রামায়ণ গান হয় তোমাদেরই চেষ্টায় ভাই। কোন পাপ কর নি।"

সোহনলাল যেন গদ গদ হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে ডিনার খাবার সময় এল। নিষ্কলুষ আকাশ-পথে ভাইকিঙ্গ চলেছে। এটা বি. ডব্লিউ. আই.-এর প্লেন। বি. ও. এ. সি-রই অন্য শাখা। ব্যবস্থা সুঠাম, বনেদী।

কিন্তু কি যে ফ্যাসাদ। সূর্য ডোবার নামটি নেই। রাত ন'টা বেজে গেছে ঘড়িতে। এত রোদ যে পর্দা টেনে দিলাম জানলায়। সোহনলাল ঘুম দিচ্ছে।

বুঝছি পথ চলেছে উত্তর গোলার্দ্ধের পঞ্চাশ অক্ষ-রেখার সমান্তরালে। জুন মাসে এখানে সূর্যাস্ত হবে দেরীতে। তবু রাত ১১টা পর্যন্ত রোদ দেখব এ আশা করি নি।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি আমিও। খুব শীত শীত করতে লাগল। হাল্কা হাল্কা নরম নরম নীল কম্বল এনে দেন এয়ার-হষ্টেস্। গায়ে চাপা দিয়ে শুই। এক লাফে অতলান্তিক পার হচ্ছি। পাঁচ-ছ'শ মাইলের মধ্যেই গ্রীনল্যাণ্ডের ল্যাপচা আর এস্কিমোরা থাকে। শীত লাগছে ঠিকই, কিন্তু মনে আরও কথা কেঁপে যায়।

এরোপ্লেন আবিষ্কার হ'ল ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এ্যালকক্ আর হুইটন্-ব্রাউন্ প্রথম অতলান্তিক পার হলেন। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে আয়র্ল্যাণ্ড। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বি. ও. এ. সি. কোম্পানীর পত্তন। এখন ১৯৫৭—তবুও অতলান্তিক পার হবার অক্ষরেখাটি বদলায় নি।

আমরা নামছি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডে। বিশাল সেণ্ট-লরেন্স নদীর মুখে কোয়েবেক শহর। নায়াগ্রার জল এসে পড়ছে এই সেণ্টলরেন্স উপসাগরে। গ্যাণ্ডার শহর এই সেণ্টলরেন্সের মুখে। আগে জানা ছিল না এখান দিয়ে যাব। এসে অনেক চেষ্টা করলাম যাতে অন্ততঃ এ ফ্লাইটটা নাকচ করে পরের ফ্লাইট দেয়। হ'ল না। অন্ততঃ কোয়েবেক দেখে আসতাম। হ'ল না। গ্যাণ্ডারের এয়ারড্রোম খুব বিখ্যাত। শহরে প্রায় চার হাজার লোক থাকে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গ্যাণ্ডার ছেড়ে ভোর পাঁচটায় এসে পৌঁছলাম আশ্চর্য সুন্দর এক দ্বীপে—বীরমুদায়।

প্লেন এখানে থেমে গেল। এয়ার-হষ্টেস্ চারদিন

এখানে ছুটি কাটাবেন, সেই খুশীতে অস্থির। যে প্লেনে আমরা যাব সেটা আসতে দেরী আছে। আমরা এগিয়ে যাই কাপ্তেনের কাছে। যখন থাকতেই হবে পাঁচ ঘণ্টা, কেনই বা না শহর দেখব আমরা।

আমার প্রাতঃকৃত্য সারা। নাইবার ততো তাগিদ নেই। কিন্তু এই প্রথম এমন একটা জায়গায় এলাম যেখানকার চেহারাটি আমার একেবারে অজানা। অজানা না বলে বলা ভালো যে, সব জানা ছাপিয়ে গেল।

কোরাল দ্বীপ আর লণ্ডন—এ ত স্বপ্নে দেখা চিত্র। কত পড়েছি, কত স্বপ্ন দেখেছি। সায়গলের গলার গান—"স্বপন দেখি প্রবাল দ্বীপে সাত মহলা বাড়ী"

মহাকবির তাসের দেশের গান—

"নীল সাগরের তীরে সেদ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গেরা।"

সেই নীল সাগর, সেই প্রবালদ্বীপ, সেই লণ্ডন—লণ্ডনের পর লণ্ডন। ভেতরের জল কত স্থির, কত সুন্দর। দূরে দূরে শৈলও আছে, চূড়াও আছে। শাদা পাখা মেলে মেলে গাং-চিল ঘুরছে, ছোঁ মেরে মাছ নিয়ে কাৎ হয়ে ডানায় ভর করে গোল চক্কর কেটে উড়ে যাচ্ছে।

এ দৃশ্যে কোন ভেজাল নেই। এ ইউরোপ নয়, এশিয়া নয়, এ নিশ্চয় নবতর দেশ—অন্য সাগর, অন্য প্রান্তর।

এর জল ডাকছে। সাঁতার কাটব না এ জলে, হয় কখনও'।

"কি রেভারেণ্ড? নামবে জলে?"

রেভারেণ্ড মতিলাল সঙ্গে সঙ্গে আছেন।

সোহনলাল বলে, "রেভারেণ্ড ত দু'জন। একজন খৃষ্ট রেভারেণ্ড, একজন কৃষ্ট রেভারেণ্ড। নাইতে ত চাই। বদলাব কাপড় কই।"

সে এক ফ্যাসাদ আছে বটে। সবই ত কোম্পানীর কাছে। ও ত এখন পাওয়া যাবে না। খৃষ্ট রেভারেণ্ড ত হাসি দিয়েই সাঁতার কাটলেন। আমি ঝটপট আচকান প্রভৃতি খুলে মাত্র জাঙ্গিয়া পড়ে ঝাঁপালাম সমুদ্রে। সোহনলালকে বলি, "আর কেন পণ্ডিত। মোটা মোটা শাদা ধব্‌ধবে বালির পাহাড়ের ভাঁজে কাপড়খানা ছাড়। একটা দু'টা করবীর ডাল ভেঙ্গে নিয়ে বাবা আদম সেজে নেমে এস জলে।"

পণ্ডিত আর তা সাহস করে না। ধুতি পরেই নেমে আসে জলে।

এয়ারোড্রোম সংলগ্ন সমুদ্র। সহর দূরে। এ সমুদ্রে ঢেউ নেই। দূরে বলয়ের মত কোরাল রীফের বেড়। বেড়ের ওপর ওপর গাছপালার আলপনা-আঁকা জ্রর মত দেখা যায়। রীফের মাঝে মাঝে ফাঁক। তা দিয়ে জাহাজ আসা-যাওয়া করে। রীফের বাইরে উদ্দাম স্রোত, বিরাট বিরাট ঢেউ, দুই মহাদেশের ঢেউ।

স্নান সেরে উঠি। সোহনলালকে বলি, "ভাই কাপড় এখানে শুকতে দাও। পরে থাক মাথায় বাঁধা ঐ গামছার ফালি। শুকিয়ে যাবে দেখতে দেখতে।"

তিন ভারতীয় বসে নানা গল্পগুজব করছি। হঠাৎ বাস দাঁড়ায়। "সহর চল, সহর চল।"

"আমি যে গামছা পরে?" সোহনলাল চেঁচায়।

"তা হোক্ গে। রেভারেণ্ডদের উলঙ্গতা সংসারীদের পোষাকের চেয়েও বেশী মান্য। চলে এস পণ্ডিত।"

মতিলাল হাসতে থাকে।

সোহনলাল কাঁদ কাঁদ। "না-না—আমি যাব।"

আমি বলি, "গোপীদের মত মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়াও। লজ্জা ঢেকে দিচ্ছি।"

আচকান খুলে ওকে পরিয়ে দিয়ে বলি, "চল। তলায় কি আছে কে দেখছে? আগে ভাগে গিয়ে বাসে বসলে তোমার তলা দেখছে কে?"

তাই হ'ল। আমি খালি শার্ট গায়ে চললাম। সোহনলাল গামছার ওপরে আচকান পরে বাসে বসল।

বাস ভরে গেল সুন্দর মুখে, সুন্দরতর সোনালী চুলে, আর চমৎকার সুন্দর একটা ঝকঝকে সকালে।

করবী আর জবা আর হলদে পাতা-বাহারের ভিড় কেটে বাস চলল।

সমাপ্ত
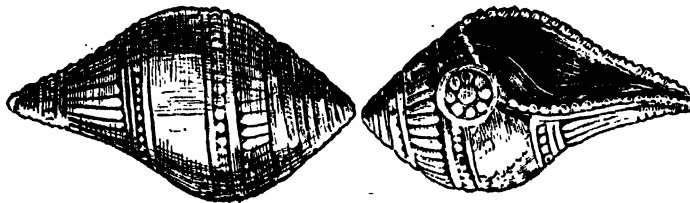
বিপ্লবীর জীবন-দর্শন

প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে ১৯১১-১২ সনে মণীন্দ্র রায় এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। বেশ কিছু সংগ্রহও হয়েছিল। বিশেষ কয়েক শ্রেণীর গেজেটেড অফিসার, এমনকি অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ পর্যন্ত বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয় করতে পারতেন। এই সমস্ত অফিসার-দের নাম সংগ্রহ করে, তাদের নামে অস্ত্র আনা সম্ভব কিনা তার খোঁজ-খবর নিয়ে কর্তব্য স্থির করতাম। নির্দিষ্ট ব্যক্তি ছুটিতে বাইরে আছেন কিনা এ খবরটা আমাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন হ'ত। পরে তার নাম সই করে কলকাতার কোন আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রেতার দোকানে অর্ডার দিতাম। ঢাকা থেকেই সাধারণতঃ এ কাজ করা হ'ত। ঠিকানা দিতাম ঢাকার কোন হোষ্টেলের, যেখানে হোষ্টেলবাসীদের মধ্যে আমাদের সভ্য ছিল। ডাক-পিয়নের দিকে তারা সবিশেষ দৃষ্টি রাখত। নির্দিষ্ট নামে অর্ডারী দোকান থেকে চিঠি এলেই তারা অন্যের হাতে পড়বার আগেই চিঠি হস্তগত করত। নতুবা বিপদের সম্ভাবনা।

অস্ত্র-পার্শেল আসার খবর দিয়ে চিঠি এলে সমস্যা দাঁড়াত তা পোষ্ট-অফিস থেকে যথাস্থানে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসা। পূর্বেই কোন খবর পেয়ে পুলিস আমা-দিগকে ধরবার জন্য ফাঁদ পেতে আছে কিনা, সাদা পোষাকে পুলিস পোষ্ট-অফিসের মধ্যে লুকিয়ে আছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হ'ত।

আর একটা সমস্যা ছিল। একজন প্রৌঢ় বা বয়স্ক অফিসারের মত যোগ্য চেহারাওয়ালা লোকের প্রয়োজন হ'ত—বড় অফিসার বলে পরিচয় দিয়ে মাল খালাস করবার জন্য। আমরা অনেকেই বয়সে—অন্তত চেহারায় এত ছেলেমানুষ ছিলাম যে, আমাদের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হ'ত না।

মণীন্দ্র রায়ের এই প্ল্যান আমাকেই অনেক বার কার্যে পরিণত করতে হয়েছে। এ ভাবে আমরা সেকালের নাম করা অস্ত্র মশা পিস্তল (Mauser Pistol) কয়েকটা সংগ্রহ করেছি। উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করে আমাকেই অনেকবার এ কাজ করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের সভ্য শ্রীযুত হেমেন্দ্র রায়ের কথা মনে পড়ছে। তিনি বোধ হয় তখন এম. এস-সির ষষ্ঠবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র কিংবা পাস করে গবেষণা কার্যে লিপ্ত আছেন। আমি তখন মাত্র আই-এ পড়ি। হেমেন্দ্রবাবুকে গিয়ে যখন বললাম, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সেজে জেনারেল পোষ্ট-অফিসে যেতে হবে, তিনি যেতে স্বীকৃত হলেন না। আমি অপর একজন লোক ঠিক করে পোষ্ট-অফিসে উপস্থিত হয়ে আশ্চর্যের সঙ্গে দেখলাম হেমেন্দ্রবাবু যথা-সময়ে পোষ্ট-অফিসে উপস্থিত হয়েছেন।

হেমেন্দ্রবাবু পরে বরিশাল রসায়নের সিনিয়র অধ্যাপক হয়েছিলেন। এ ঘটনা উল্লেখ করলাম বিশেষ করে এই কারণে যে, উচ্চশিক্ষিত লোক, শত আপত্তি থাকলেও বিপদ্‌জনক কাজে অগ্রসর হতেন একজন বয়ো-কনিষ্ঠ নীচু শ্রেণীর ছাত্রের নির্দেশে। সমিতির নিয়মানু-বর্তিতা এমনই ছিল।

১৯১১ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার খবর পেয়ে দেশের কংগ্রেস রাজনৈতিক মহলে আনন্দ কোলাহল উঠল। তখন কংগ্রেস থেকে বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, অশ্বিনীকুমার দত্ত, খাপার্দে, মুঞ্জে, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপত রায় প্রভৃতি বিতাড়িত হয়েছেন। কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে নরমপন্থীদের কুক্ষিগত। ফিরোজশা মেটা, গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কংগ্রেস পরিচালনা করেন। এঁদের চেষ্টার ফলে চরমপন্থীদল কংগ্রেসের বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। সুরাটে কংগ্রেস অধিবেশন ভেঙে যাওয়ার পরই এ ব্যবস্থা হয়েছিল।

নরমপন্থী নেতারা সর্বদাই ইংরেজের সঙ্গে আপোষের জন্য উদ্‌গ্রীব থাকতেন। ইংরেজের ন্যায়পরায়ণতার (British Justice) উপর ছিল এদের গভীর বিশ্বাস। এদেরকে এদেশে যুক্তিতর্ক দ্বারা বোঝাতে পারলে এবং প্রয়োজন মত ইংলণ্ডে গিয়ে ইংরেজকে ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করালে নিশ্চয়ই তাদের ন্যায়বুদ্ধি জাগ্রত হবে এবং আমাদের উপর সুবিচার করবে। এই ছিল তাদের আন্তরিক বিশ্বাস।

এমনি মানসিক পরিপ্রেক্ষিতে যখন বঙ্গভঙ্গ রদ হ'ল, ভারত সচিব লর্ড মরলির সেটেলড্ ফ্যাক্ট (settled

fact) আনসেটেলড (unsettled) হ'ল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চ্যালেঞ্জ "পাকা ব্যবস্থা রদ করব—(We shall unsettle the settled fact)" জয়যুক্ত হ'ল, তখন দেশে শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়ার মত একটা অবস্থা হ'ল। ইংরেজের প্রতি প্রীতির সঞ্চার হ'ল। আমার মনে আছে যখন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা এলেন তখন সমস্ত শহরে প্ল্যাকার্ড পড়েছিল—'লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলার মুক্তিদাতা' (Lord Hardinge—Savior of Bengal)। আমরা যা চেয়েছিলাম তা যেন পেলাম এমনি একটা তুষ্টির ভাব এল।

চারদিকের অবস্থা পরিদৃষ্টে নরেনবাবু, ত্রৈলোক্যবাবু, আমি ও আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয়রা আমাদের কর্তব্য স্থির করবার জন্য আলোচনা আরম্ভ করলাম। এ আলোচনা প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে হয় নি। অতি গোপনে পার্কে বা কারুর বাড়ীতে বসে হয়েছে। আমরা ভাবলাম—দেশের মধ্যে একটা আত্মতুষ্টি এবং শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হলে স্বাধীনতা সংগ্রাম ব্যাহত হবে, অগ্রগতি রুদ্ধ হবে। আমরা চাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস, পূর্ণ স্বাধীনতা। মন থেকে অসন্তোষ বিদূরিত হলে মূল আদর্শের প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকবে না। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের খুব অনিষ্ট হবে। পৃথিবীর লোক মনে করবে—ভারতবর্ষে কোন অসন্তোষ নেই, ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনই চায়—উচ্ছেদ কামনা করে না। জার্মানীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে যে শক্তি গড়ে উঠছিল তার বিশেষ ক্ষতি হবে। প্রমাণিত হবে যে, ভারতবাসী ব্রিটিশকেই চায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষ, মিশর, আয়ারল্যাণ্ড, ও অন্যান্য জায়গায় যে অসন্তোষ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল তাই ব্রিটিশ শক্তির একটা দুর্বলতা। এটাই ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে শক্তিগোষ্ঠীর একটা ভরসা। এই সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে আমরা স্থির করলাম যে, এ সময় কতকগুলি হত্যাকাণ্ড করতে হবে নানা জায়গায় যাতে করে ইংরেজ সরকারও ধরপাকর ও অত্যাচার এমন ভাবে করবে যার ফলে অন্তত পৃথিবীর কাছে এ কথাটা প্রমাণিত হবে যে, ভারতবাসী সুখী হয় নি, তারা ইংরেজকে স্বীকার করতে চায় না।

অবশ্য সাধারণত আমরা একটা নীতি অনুসরণ করতাম। কেবল মাত্র চাঞ্চল্য সৃষ্টির জন্যই আমরা বলপ্রয়োগ করতাম না। শুধু ব্যক্তিগত বলপ্রয়োগ দ্বারা ব্রিটিশ-শক্তি বিতাড়িত করতে পারব এ কথা আমরা বিশ্বাস করতাম না। ব্রিটিশ রাজত্ব যদি কায়েম থাকে তবে একজন শাসনকর্তা নিহত হলে তারা শত শত শাসক পাঠাতে পারবে। আমরা বলপ্রয়োগ করতাম সমিতির শক্তি বৃদ্ধি ও রক্ষার জন্য। সমিতির কার্যে অর্থ-সংগ্রহের জন্যও অনেক সময় বাধ্য হয়ে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছি। সমিতির অগ্রগতির পথের কণ্টক—যেমন, বিশ্বাসঘাতক, গোয়েন্দাদের মধ্যে যারা সমিতির অনেক সংবাদ জেনে ফেলেছে, অনেক লোককে চিনেছে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া কর্তব্য মনে করতাম। বঙ্গ-ভঙ্গ রদের পর যে দূষিত আবহাওয়া সৃষ্টি হ'ল তা বিদূরিত করবার জন্য সমিতির অনিষ্টকারীদের সরিয়ে দেওয়া এবং স্বদেশে ও বিদেশে রাজনৈতিক ফলপ্রসূ হয়, এ দু' কারণেই আমরা বলপ্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত করলাম।

তখন চন্দননগরে শ্রীমতিলাল রায়, রাসবিহারী বসু, শ্রীশ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়েছে। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থা হয়। বোমা নিক্ষেপ করেন বসন্ত বিশ্বাস। লর্ড হার্ডিঞ্জ তখন খুব জনপ্রিয় বড়লাট। তার উপর আমাদের কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না। তার জনপ্রিয়তার উপর আঘাত করে পৃথিবীর কাছে এ কথাটাই প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, আমরা ব্রিটিশ শাসন চাই না। এ কারণেই দিল্লীতে তার রাজকীয় প্রবেশানুষ্ঠানের (State Entry) শোভাযাত্রার উপর লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা দ্বারা আঘাত করা হয়। এ বোমায় ব্যবহৃত বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরী করে দেন শ্রীসুরেশ দত্ত এবং তার সহকারীরূপে ছিলেন শ্রীমণীন্দ্র নায়েক। বোমার খোলটি (Shell) তৈরী করেন অনুশীলন সমিতির অমৃত হাজরা। তিনি শশাঙ্ক নামে সমিতির লোকের কাছে পরিচিত ছিলেন। রাসবিহারীবাবুকে নেতৃত্বে অনুপ্রাণিত করেন শ্রীমতি-লাল রায়।

পূর্ববঙ্গের নামজাদা পুলিশ-ইন্‌স্পেক্টর মনোমোহন ঘোষ বরিশাল শহরে কাজ করতেন। শ্রীযুত ত্রৈলোক্য-নাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এবং বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও স্থানীয় এক ব্যক্তির সহায়তায় মনোমোহন ঘোষকে গুলী করে হত্যা করা হয়। এ সমস্ত কার্যে যিনি নেতা হবেন তাঁকেই প্রথম আঘাত করতে হবে। কেননা, প্রথম আঘাত কার্যকরী না হলে সমস্তই পণ্ড হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং ধীর, স্থির, অচঞ্চল এবং পূর্ব-অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন নেতাই প্রথম আঘাত হানবে এই ছিল রীতি।

এই কার্যের কিছুদিনের মধ্যেই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কুমিল্লায় গোয়েন্দা দেবেন্দ্র ঘোষ নিহত হয়।

সেকালে তীর্থক্ষেত্রগুলি অনাচার-অত্যাচারের লীলা-ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। চরমে উঠেছিল তীর্থের মোহান্তদের অত্যাচার। সব রকম অন্যায়ই এরা করত লোকের ধর্ম-বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে। ধর্মভীরু গৃহস্থ স্ত্রীলোকও এদের কবলে পড়লে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করতে পারত না।

চন্দ্রনাথ তীর্থের প্রধান পাণ্ডা অধিকারী মহাশয় ছিলেন অনুশীলন-সমিতির একজন প্রধান সমর্থক এবং গৃহী-সভ্য। সমিতির গৃহত্যাগী সভ্যরা অনেক সময় তার কাছে গিয়ে থাকত। চট্টগ্রামের 'জ্যোতি' পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক কালীশঙ্করবাবুও সমিতির একজন প্রধান গৃহী-সভ্য ছিলেন। তিনিও এই তীর্থ-পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তখন আমাদের একটা পরিকল্পনা হয় চন্দ্রনাথ-সীতাকুণ্ডের তীর্থের সমস্ত কর্তৃত্বভার সমিতির হাতে আনার জন্য। তাতে একদিকে যেমন তীর্থের অনাচার-অত্যাচার বন্ধ হবে, অপরদিকে অত বড় তীর্থস্থান এবং তার বিপুল অর্থ-ভাণ্ডার করায়ত্ত হলে নানাপ্রকার জনহিতকর কার্য দ্বারা দেশের ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের উপরও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিক থেকেও লাভ হবে এই যে, একটা পাহাড়-অঞ্চলের উপর আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। এজন্য কোন যুবক সভ্যকে মোহান্তর প্রধান চেলা বা শিষ্য করা যায় কি না সে চেষ্টা করতে লাগলাম। কেননা, মোহান্তর মৃত্যুর পর তার নির্দিষ্ট চেলাই সাধারণত মোহান্ত পদে বৃত হয়। মোহন্তরা থাকত অকৃতদার, সুতরাং বংশগত উত্তরাধিকার স্থির হত না।

সে সময় চন্দ্রনাথ-তীর্থের মোহান্ত ছিল যতীন্দ্র বল। তার অত্যাচার ক্রমে চরমে উঠল। ধর্মপরায়ণ জনগণ একেবারে আতঙ্ক হয়ে উঠল। তখন তাকে পৃথিবী থেকে অপসারণ করাই স্থির হ'ল। কালীশঙ্কর বাবুই এ কথা বিশেষ করে বললেন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ও চন্দ্রশেখর দে সীতাকুণ্ডে গিয়ে যতীন্দ্র বলকে গুলী করে হত্যা করে।

ঢাকার অত্যাচারী পুলিস অফিসার বঙ্কিম চৌধুরীকে ঢাকাতেই হত্যা করা স্থির হয়। কিন্তু সে হঠাৎ ময়মনসিং বদলি হয়ে যায়। সেখানে গিয়েও সমিতি ধ্বংসের কার্যে পূর্ণোদ্যমে লেগে যায়। তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা হয়। কলকাতা থেকে ঢাকায় কয়েকটা বোমা আনা হয়েছে। এগুলির বিস্ফোরক দ্রব্যও তৈরি করেন সুরেশ দত্ত এবং তার সহকারী মণীন্দ্র নায়েক আর খোলটা করেন অমৃত হাজরা। এগুলি নিরাপদে রাখবার জন্য প্রফুল্ল ঘোষের বাসস্থানে গচ্ছিত হ'ল। ইনিই হলেন পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, কংগ্রেস নেতা এবং স্বাধীন বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছিলেন সমিতির সভ্য। তিনি তখন থাকতেন সেকালের প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা অফিসার শরৎশশী দত্তর বাড়ীতে তার ছেলেদের গৃহশিক্ষকরূপে। বোমা রাখা গোয়েন্দা ইন্সপেক্টরের বাড়ীতেই সব চাইতে নিরাপদ মনে করলাম। এরই একটি বোমা নিয়ে ত্রৈলোক্যবাবু, অমৃতলাল সরকার এবং স্থানীয় একজন বঙ্কিম চৌধুরীর গৃহে গিয়ে তাকে হত্যা করে। বোমা নিক্ষেপ করেন ত্রৈলোক্যবাবু।

নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নগেন্দ্র রায় ও হেমেন্দ্র রায় দু'ভাই প্রথমে অনুশীলন-সমিতির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সভ্য হয়েছিল। পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে ব্রিটিশ পুলিসের সঙ্গে যোগ দেয়। সরকার এ দু'ভাইকে অগণিত পুলিস দিয়ে ঘেরাও করে রাখত। সমিতির তরফ থেকেও তাদেরকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার কয়েকবার চেষ্টা করা হয়। একবারের চেষ্টার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কার্যের নেতৃত্ব ত্রৈলোক্যবাবুকে দেওয়া যাবে না। কারণ ত্রৈলোক্যবাবু এ দু'ভাইয়ের নিকট বিশেষ ভাবে পরিচিত। গুলী করার পূর্বে দেখে ফেললে বিপদের সম্ভাবনা। সুতরাং আমরা স্থির করি যে, ওদের সশস্ত্র পুলিস প্রহরীসমেতই হত্যা করতে হবে। তখন তারা থাকত তাদের গ্রামের বাড়ীতে। এদিকে গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্য সতীশ পাকড়াশী ও দু'একজন সহকারী সহ নিযুক্ত হয়। কিছু অস্ত্রশস্ত্রও পাঠান হয়েছিল। আমরা যথাস্থানে উপস্থিত হলে সতীশ পাকড়াশী আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে স্থির হয়।

পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের দল নারায়ণগঞ্জের মোক্তার অশ্বিনী ঘোষালের বাসায় সমবেত হ'ল। তিনি ছিলেন আমাদের দলের বিশিষ্ট সভ্য এবং নারায়ণগঞ্জের সমিতি-পরিচালক। শশধরবাবু (আসল নাম রাজেন্দ্র দত্ত। তার নামে বাররা ডাকাতির জন্য ওয়ারেন্ট ছিল। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়), ললিত বাররী, বীরেন চ্যাটার্জি, সতীশ দাশগুপ্ত (পরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সত্যানন্দ) মনীন্দ্র রায়, অমৃত সরকার, রমেশ চৌধুরী, নগেন সরকার, আমি এবং আরও কয়েকজন দিগেন মুখোটির নেতৃত্বে আমরা নারায়ণগঞ্জ থেকে লাখাপুর

গ্রামারে রওনা হব স্থির হ'ল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সংবাদ পাওয়া গেল যে, সতীশ পাকড়াশী ও আর একজন রিভলবার সহ ধরা পড়েছে। সেখানে এমন গোলমাল হয়েছে যে, পুলিস বিপদ আশঙ্কা করে খুব সতর্ক হয়েছে। সুতরাং এ প্রচেষ্টা শেষ মুহূর্তে পরিত্যক্ত হয়।

সে সময় বিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে গুপ্তচরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কয়েকজন প্রধান শিক্ষক পর্যন্ত দেশ-দ্রোহাত্মক দুষ্কার্যে রত হয়েছিল। আমরা দু'একজন শিক্ষককে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন মনে করলাম। জামালপুরের হেড মাষ্টারকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার চেষ্টা হয়। একবার আমি, মণীন্দ্র রায় ও প্রিয়নাথ রায় চেষ্টা করি। প্রিয়নাথ রায় হেড মাষ্টারকে অনুসরণ করে ঢাকায় আসি ও আমরা কার্যে লিপ্ত হই। কিন্তু তখন সফলকাম হতে পারি নি। হেড মাষ্টার পরে মালদহ বদলি হয়ে যান। সেখানেই তখনকার জেলা পরিচালক সতীশ পাকড়াশীর ব্যবস্থায় সমিতির নির্দেশে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

জামালপুরের অন্তর্গত পিঙ্গলাতে একটা ডাকাতি করা স্থির হয়। এজন্য সরজমিনে খোঁজখবর নেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য রবীন্দ্র সেন, যোগেন্দ্র চক্রবর্তী ও আর একজন সেখানে যান। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে সন্দেহ-বশত তারা গ্রেপ্তার হন। অন্য কোন মকদ্দমা চালান যায় না দেখে সরকার তাদেরকে ১০৯ ধারায় চালান করে এবং এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তখন পর্যন্ত ডিফেন্স এ্যাক্ট (Defence Act), সিকিউরিটি এ্যাক্ট (Security Act) প্রভৃতি বিনা বিচারে লোককে জেলে প্রেরণের ব্যবস্থা হয় নি। ১০৯, ১১০ ধারায় লোককে এমনি অবস্থায় জেলে পাঠাত। এগুলিও প্রায় বিনা বিচারের সামিল ছিল। সাক্ষী প্রমাণের বিশেষ প্রয়োজন হ'ত না। কারাবাসান্তে রবীন্দ্র সেন কলকাতায় গিয়ে লোক-দেখান ভাবে কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমিতির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবেই কাজ করতে থাকেন।

ময়মনসিংহের অন্তর্গত কুলিয়ারচর বাজার একটা বড় বন্দর। দিগেন মুখোটির নেতৃত্বে এ বন্দর লুট করা হয়। আরও যারা যোগ দিয়েছিলেন—সতীশ দাসগুপ্ত, নগেন সরকার (পরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সহজানন্দ), ললিত বাররা, বীরেন চ্যাটার্জি, অমৃত সরকার প্রভৃতি আরও অনেকে। নারায়ণগঞ্জের মোক্তার অশ্বিনী ঘোষালের বাড়িতে একত্রিত হয়েই এ অভিযানে রওনা হয়েছিলেন কর্মীরা। এ অভিযোগে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে—

প্রত্যেক ডাকাতির পরিকল্পনায় আক্রমণ, ফিরে আসা সব কিছুরই সময় নির্ধারিত করা হ'ত। কেননা ঘড়ি ধরে কাজ না করলে বিপদের আশঙ্কা থাকে। কুলিয়ারচর বন্দরের অভিযানে যখন সবেমাত্র সমস্ত লোহার সিন্দুক ভাঙ্গা শেষ হয়েছে, প্রচুর অর্থ যখন প্রায় হস্তগত, এমনি সময়ে নায়ক দিগেন মুখোটি পশ্চাৎ-অপসরণের জন্য একত্রিত হওয়ার সঙ্কেতসূচক বিউগল ধ্বনি করলেন। যদিও পরিকল্পনা অনুযায়ীই এমনি নির্দেশ, কিন্তু আর সকলে আরও কয়েক মিনিট সময় দাবী করলেন এই যুক্তিতে, যে এত অর্থ একসঙ্গে আর কোথাও পাওয়া যায় নি এবং একটু সময় পেলেই তা হস্তগত হবে। অনেকে সিন্দুক পরিত্যাগ করে ফল্ ইন্ করতে ইতস্তত কর-ছিলেন। তখন দিগেন মুখোটি তার নির্দেশ পুনরায় ঘোষণা করে জানিয়ে দিলেন যে, আদেশ লঙ্ঘনকারীকে গুলী করে হত্যা করা হবে। এই হুকুম দিয়ে তিনি একজন বন্দুকধারীর নিকট থেকে নিজের হাতে বন্দুক নিয়ে তাক করে সকলকে সতর্ক করে দিলেন। এর পরে সকলেই বিনা দ্বিধায় পশ্চাৎ-অপসরণের জন্য এসে লাইন-বদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন।

ফিরে এসে পরে দিগেন মুখোটির নামে কেন্দ্রে অভি-যোগ করা হ'ল এই বলে যে,তার অন্যায় বিবেচনার ফলে এতগুলি টাকা হাতে এসেও ছেড়ে দেওয়া হ'ল। অভি-যোগ পেয়ে নরেনবাবু আমার এবং অপর কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে অনুসন্ধান সুরু করলেন। আমরা উভয় পক্ষের সাক্ষী প্রমাণ এবং বক্তব্য শুনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, দিগেন মুখোটির আদেশ পালন করতে ইতঃস্তত করে সকলে ঘোরতর অন্যায় কার্য করেছে। এ জন্য তাদের সতর্ক করে দেওয়া হ'ল। দিগেন মুখোটিকেও জানান হ'ল যে, আরও কিছু সময় দিলে যখন কোন ক্ষতি হ'ত না সেমতাবস্থায় তিনি খুবই অবিবেচনার কার্য করেছেন। এও স্থির করা হ'ল যে, ভবিষ্যতে তাকে আর এমনি গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে পাঠান হবে না।

পূর্বনির্দিষ্ট সময়মাফিক কাজ করতে গিয়ে আমাদের ফিরে আসার আর একটি কাহিনী উল্লেখ না করে পারছি না। ঘটনাটা এমনি—মানিকগঞ্জ মহকুমায় একটা ডাকাতির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তখনও ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী পূর্ববঙ্গ পরিত্যাগ করে উত্তরবঙ্গে চলে যান নি। দিগেন মুখোটি কারাদণ্ড ভোগ করে সদ্য সদ্য ঢাকা জেল থেকে বাইরে এসেছেন। স্থির হয়েছিল যে, সবাই যার যার নির্দিষ্ট স্থান থেকে নানা পথে অগ্রসর হয়ে মানিকগঞ্জ এসে মিলিত হবে। এবং সেখান থেকে আক্রমণের জন্য

রওনা হতে হবে। দিগেন মুখোটির উপরই ছিল নেতৃত্ব।

এ কার্যের জন্য একটি বড় ঘাসি নৌকো (সরু লম্বা নৌকো, এগুলি খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়), এবং দুটি ছোট নৌকোর ব্যবস্থা হয়। ডাকাতি করা হবে ঘাসি নৌকোয় গিয়ে। ফিরবার পথে নিরাপদ স্থানে রক্ষিত ঐ ছোট নৌকোয় অস্ত্রশস্ত্র ও লুণ্ঠিত মালপত্র তুলে দিয়ে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিতে হবে। ঘাসি নৌকোয় কিছুই রাখা হবে না—একটা কার্তুজও নয়, যাতে খানাতল্লাসী হলে সন্দেহ উদ্রেক না করে।

আমি আর দিগেন মুখোটি ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ ষ্টীমারে রওনা হয়ে সন্ধ্যাবেলা দাহসারা ষ্টেশনে নামলাম। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, ললিত বাররী প্রভৃতি মাঝির পোষাকে আমাদের নিকটে এসে মালপত্র ধরে টানাটানি সুরু করে দিল। "আসুন বাবু, আমার নৌকোয় আসুন ; কতদূর যাবেন ; কত ভাড়া দেবেন।" এমনি কিছুক্ষণ ভাড়া নিয়ে কথা কাটাকাটির পর গিয়ে নৌকোয় উঠলাম।

নদী তখন বর্ষার। একেবারে ভরপুর। কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই বীরেন চ্যাটার্জি গান ধরল "ভেদা মাছে কাদা খায়, পুঁটি মাছে পানসী বায়, পোটকা শালা পেট ফুলাইয়া···মরি হায় হায় রে" ইত্যাদি। নদীর ভেতরে কিছুদূর থেকে এমনি সাংকেতিক গান হ'ল। কিছুদূর এগিয়ে আমরা একটা বড় নৌকোয় উঠলাম। তাতে আগেই অনেকে বসা ছিল। দিগেনবাবু সব জিনিসপত্র মিলিয়ে দেখে নিলেন। যাদের আসবার কথা ছিল তারা সবাই এল কিনা তাও মেলালেন। তারপর নৌকো অপর পারে গিয়ে একটা খালের মধ্যে প্রবেশ করল।

খালের জলে তখন প্রবল ভাটা। কাজেই আমাদের নৌকো সেই উজান ঠেলে যখন নির্দিষ্ট বাড়ির কাছে এল তখন ঘড়ি খুলে দেখা গেল যে, আমাদের পৌঁছতে আধ-ঘণ্টারও বেশী দেরি হয়ে গিয়েছে। কার্য সমাধা করে ফিরতে ফিরতে আবার খালে জোয়ার এসে যাবে। এবং আবার আমাদের সেই উজান বেয়েই নদীতে আসতে হবে। তাড়াতাড়ি তা করা সম্ভব হবে না। সুতরাং সময়ের হিসেব করে দিগেনবাবু ফিরবার হুকুম দিলেন। এত খরচ এবং হাঙ্গামা করে এতদূর এসে কোন কিছু না করেই প্রত্যাগমনের আদেশে অনেকে মনক্ষুণ্ণ হ'ল। কিন্তু বুঝিয়ে বলায় সবাই অবশ্য ফিরবার যৌক্তিকতা স্বীকার করে নিল।

নারায়নগঞ্জের অন্তর্গত পালাম গ্রাম বহু লক্ষপতি ধনীর বাসস্থান হিসেবে খুব প্রসিদ্ধ। অধিকাংশই ব্যবসায়ী, কিছু জমিদারও ছিল। নামেই গ্রাম, আসলে শহরের মতই পাকা বাড়ি, প্রাসাদ ও ঘনবসতি। গ্রামের ভিতর দিয়ে একটাই মাত্র প্রবেশ পথ। প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই বন্দুক ছিল। গ্রাম্য ডাকঘরের সঙ্গে তারঘরও যুক্ত ছিল। বৈদ্যেরবাজার থানা খুব নিকটে এবং নারায়ণগঞ্জ শহরও খুব দূরে নয়। সাইকেল কিংবা পায়ে হেঁটে নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা যায়। কেবল এক জায়গায় ব্রহ্মপুত্র নদ (যেখানে খুব সরু) খেয়া নৌকোয় পার হতে হয়।

সুতরাং এ গ্রামে অভিযান খুবই বিপদ্‌জনক। সামান্য ভুল ত্রুটিতে ভীষণ অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা। সমস্ত ভাল ভাবে দেখেশুনে আসবার জন্য নরেন্দ্রমোহন সেন ও আমি পালাম গিয়ে ঘুরে-ফিরে সমস্ত দেখে এলাম। ফিরে এসে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা করে পরিকল্পনা স্থির করা হ'ল এবং ত্রৈলোক্যবাবুই এর পরিচালনা কার্যে নিযুক্ত হলেন।

ঠিক হয়েছিল যে, নৌকোপথে গিয়ে ডাকাতি সমাধা করে কিছু লোক পায়ে হেঁটে আসবে আর বাকী সবাই নৌকোয় নারায়ণগঞ্জ আসবে। কাইখার টেক নামক স্থানে (যেখানে ব্রহ্মপুত্র নদ খেয়ায় পার হতে হয়) দু'জন লোক রিভলবার নিয়ে পাহারায় থাকবে, যাতে ডাকাতির খবর নিয়ে কেউ আমাদের আগে নারায়ণগঞ্জ না আসতে পারে। ডাকাতির খবর টেলি করে না জানাতে পারে এজন্য নির্দিষ্ট স্থানে টেলিগ্রাফ লাইন কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। গ্রাম থেকে সংবাদ নিয়ে যাতে কেউ বেরুতে না পারে সে জন্য গ্রাম থেকে বাইরে যাবার রাস্তায় রিভলবার হাতে লোক রাখা স্থির হয়।

১৯১২ সনের ১০ জুলাই তারিখে এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য সমাধা করা হয়। ডাকাতির সময় গ্রাম-বাসীদের তরফ থেকে প্রবল প্রতিরোধ হয়। উভয়পক্ষই বন্দুক চালিয়েছিল। কিন্তু প্রতিরোধকারীরা গুলির আঘাতে আহত হয়ে নিরস্ত হয়। পরে সব কাজই নির্বিঘ্নে সমাধা হয়। অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন, ত্রৈলোক্যবাবু, আমি, বীরেন চ্যাটার্জি, কৃষ্ট সাহা, ভুবন বসু, ময়মনসিংহ ধানহাটার জমিদার প্রিয়নাথ রায়, অমৃত সরকার, ললিত বাররী, ক্ষীরোদ ঘোষ এবং আরও অনেকে।

এ ব্যাপারে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ডাকাতির পরদিন কৃষ্ট সাহা ও ভুবন বসু নারায়ণগঞ্জ শহরের অন্তর্গত একটা খালের মধ্যে নৌকো ফেলে এসে

নারায়ণগঞ্জে আমাদের বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করে। এভাবে নৌকো ফেলে আসা গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হ'ত। কেননা, খালি নৌকো লোকের ক্রমে পুলিসের সন্দেহের কারণ হয়ে আসল ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়তে পারে। বিনা অনুমতিতে এবং বিশেষ জরুরী কারণ ছাড়া নৌকো ফেলে আসায় এরা দু'জনই পদচ্যুত হয় এবং সমিতির সক্রিয় কার্যক্রম থেকে সরিয়ে এদের নিজ নিজ গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তখনকার দিনে সমিতিতে এমনি কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ছিল।

কৃষ্ট সাহা বলপ্রয়োগ সংক্রান্ত কার্যে খুবই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। সুতরাং পরে তাকে আবার সক্রিয় কার্যে গ্রহণ করা হয়। পরে কৃষ্ট সাহা অনেক বলপ্রয়োগ কার্যে অংশ গ্রহণ করে বিশেষ সুনাম অর্জন করে। কিন্তু গ্রেপ্তারের পর পুলিসের কাছে সমস্ত স্বীকারোক্তি করে বিশ্বাসঘাতকের পর্যায়ে পড়েছিল।

পালাম ডাকাতি উপলক্ষে আর একটি ব্যাপারও উল্লেখ না করে পারছি না। তাড়াতাড়িতে বাধ্য হয়ে নারায়ণগঞ্জের এক বাসায় একজন বিশিষ্ট সক্রিয় অংশ-গ্রহণকারী কর্মীর গৃহে কিছু লুণ্ঠিত মালপত্র রাখা হয়েছিল। খবর পাওয়া গেল যে, সে ব্যক্তি ব্যাগ খুলে মালপত্র দেখেছিল। এ অপরাধে তাকেও পদচ্যুত করা হয়। ক্রমশঃ

রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা

শ্রীসতীশ রায়

আমি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। এ এক গৌরবপূর্ণ বিশেষ অধিকার। প্রায় দশ বৎসর তাঁর সাহচর্যে কাটিয়েছি শান্তিনিকেতন আশ্রমে তাঁর শিষ্য হয়ে। গুরুদেবের চরণপ্রান্তে ব'সে তাঁর জীবন-সাধনাকে বুঝবার চেষ্টা করেছি। তাঁকে জেনেছি বললে গর্ব্ব করা হয়। তা বলতে বোধ হয় কেউ-ই পারেন না। এমনই মনি-রত্নসম্ভব সমুদ্রের মত অনন্ত ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব। এমনই বিভিন্নমুখীন্ ছিল তাঁর সৃজন-প্রতিভা।

বেদের ঋষি ভগবান সম্বন্ধে বলেছেন,

আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আঁধারের পারে
জ্যোতির্ম্ময়। তাঁরে জেনে তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পার, অন্য পথ নাই।

এ বাণী যদি রবীন্দ্রনাথের প্রতি আরোপ করি তা হলে কিছু বেশী বলা হয় না। 'রঘুপতি রামে'র মত 'মানবেরে দেব পীঠস্থানে' তুলি তা হলে Blasphemy হয় না। কারণ পূর্ণতার আদর্শই ত দেবতা। তিনি ছিলেন আঁধারের পারে সেই জ্যোতির্ম্ময় মহান্ত পুরুষ। মৃত্যুকে লঙ্ঘন করবার স্পর্দ্ধা রাখে তাঁর জীবন-সাধনা।

একটি সুরম্য প্রাকৃতিক আবেষ্টনের মধ্যে আপনারা বাস করছেন, কলকাতা-প্রবাসীর দেখলে ঈর্ষা হয়। বিচিত্র পর্ব্বতমালা বেষ্টিত, শাল-মহুয়ার বনরাজিপূর্ণ অপূর্ব্ব নিসর্গ দৃশ্যমণ্ডিত স্বর্ণ-বালু-মেখলা-পরা সুবর্ণরেখার স্নেহধারায় সিক্ত সবুজ উপত্যকার কোলে সৌন্দর্য্যময়ী ঘাটশীলা! পাহাড়-বন-জঙ্গল-নদীর সুষমা দিয়ে তৈরী আপনাদের বাসভূমি। আপনারা ভাগ্যবান্, কিন্তু এ সৌন্দর্য্য আপনাদের কিছু সৃষ্টি করতে হয় নি—এ প্রকৃতির স্বহস্তের দান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সাধন-ভূমি শান্তিনিকেতনকে করেছিলেন নতুন ক'রে সৃষ্টি! প্রকৃতির রুক্ষ শূন্যতাকে তিনি করেছিলেন আনন্দ-রসে পূর্ণ। বোলপুরের বন্ধুর প্রান্তরে তিনি রচনা করেছিলেন সৌন্দর্য্যের নন্দন-ভূমি। তিনি পেয়েছিলেন একখানা সাদা কাগজ, তাতে তিনি এঁকেছিলেন রূপছবি! যেমন তিনি জীবনকে পেয়েছিলেন আমাদেরই মত রিক্ত—তাঁকে তিনি রূপ দিয়েছেন কাব্যময় সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিতে।

কাব্য জিনিসটা কি? কি থাকলে সম্পদটি লভ্য হয়?, নানা মুনির নানা মত। তা বলতে গিয়ে আপনাদের ধৈর্য্যকে ক্লান্ত করব না। শুধু প্রাচীন সংস্কৃত কবি দণ্ডী যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করি। তিনি বলেছেন, এই সম্পদটি লাভ করতে গেলে চাই মুখ্যত তিনটি জিনিস। 'অলৌকিকী চ প্রতিভা, শ্রুতঞ্চবহুনির্ম্মলম্,

অমন্দশ্চাভিযোগশ্চ কারণং কাব্যসম্পদ্।' নব নব উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি চাই যা নাকি সাধারণের মধ্যে সুলভ নয়, যা ঐশ্বরিক ; চাই সুনির্ম্মল জ্ঞান, আর চাই অশ্রান্তভাবে লেগে থাকা। বিদেশী আলঙ্কারিকরাও তৃতীয় কথাটি বলেছেন, 'To take infinite pains'। কথাটি ছোট বটে তবু ফেল্‌না নয়। কিন্তু ঘসে-মেজে রবীন্দ্রনাথ হওয়া যায় না, ভেতরে ঐশ্বরিক দান থাকা চাই।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই ঈশ্বর-দত্ত কাব্যপ্রতিভার অধিকারী। সাহিত্য-শিল্পের যে বিভাগকে তিনি ছুঁয়েছেন তাকে তিনি সোনা করে দিয়েছেন। আর সাহিত্য-শিল্পের এমন কোন বিভাগ নেই, যা তাঁর অক্লান্ত লেখনী স্পর্শ করে নি। বিশ্ব-সাহিত্য-ভাণ্ডারে তাঁর যা দান তা আজ সব সাহিত্যিকদের সমস্ত দানকে ছাপিয়ে উঠেছে শুধু ভারে নয়, ধারেও। এমন গভীর-ভাবে জীবনকে কেহ কখনও দেখে নি, এমন মধুর ক'রে কেহ কখনও ব'লে নি। Nobel Prize পেয়ে তিনি বিশ্বে পরিচিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু নোবেল প্রাইজকে তিনি করেছেন গৌরবান্বিত। বিশ্বের অন্যান্য লেখকেরা যাঁরা এই গৌরবের অধিকারী হয়েছেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের শ্রেণীর নয়। বস্তুতঃ, সাহিত্য-রচনার ব্যাপক ক্ষেত্রে তাঁর কোন শ্রেণী নেই, তিনি অদ্বিতীয়। চিন্তা ও ভাব জগতের এমন এক উচ্চ কোটিতে রবীন্দ্রনাথ বিরাজ করেন যেখানে প্রণাম জানাতে হলেও 'তোমা কাছে নত হতে গেলে যে উর্দ্ধে উঠিতে হয়' তা অনেক উঁচুতে। —ভারতবর্ষের প্রাচীন অধ্যাত্ম-সাধনার তুঙ্গ হিমালয়ে। সুকবি সজনীকান্ত দাস তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় সত্যই বলেছেন,

'হিমালয়
চিনিতে চেয়েছি, বুঝিতে চেয়েছি, ধরিতে চেয়েছি তারে
আজিও তাহার পাই নাই পরিচয়।'

রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা'

আমার মনে হয় এ তাঁরই আত্ম-নিরীক্ষা। 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' রবীন্দ্রনাথের ধ্যানের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর কাব্যে রূপ নিয়েছে। এই ভাব-সমন্বয়ে সর্ব্ব-কালের, সর্ব্ব-দেশের সাধনাকে পাই—একের মধ্যে অনেককে। তাঁর কাব্য একটি cultural conquest। যেন দিগ্বিজয়ী কবি সম্রাটকে সর্ব্ব-কাল, সর্ব্ব-দেশ রাজকর জুগিয়েছে। কিন্তু বিশ্বের ভাবসুধা যখন আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর অন্তরের বকযন্ত্রে চোলাই হয়ে পরিশ্রুত কাব্যরূপে তখন সে সৃষ্টিতে শুধু রয়েছেন তিনি—অন্য কেহ কোথায়ও নেই।

তাঁর কাব্যে তিনি কবি তিনি সৌন্দর্য্য-রসিক কিন্তু তাত্ত্বিক নয় ; একথা যেন আমরা না ভুলি। আমরা কাব্যে খুঁজতে যাই তত্ত্ব ; এর মত মূঢ়তা আর কিছু নেই। ইমার্সন বলেছেন, 'চোখ যদি দেখবার জন্যে তৈরী হয়ে থাকে তবে সৌন্দর্য্যের অস্তিত্বের দাবীও সমর্থনীয়।' সৌন্দর্য্য-সমাবেশের জন্য কঙ্কাল চাই অবশ্য ; তত্ত্ব হচ্ছে সেই কঙ্কাল ; যেমন ফুলটি ফোটার জন্য চাই বৃন্ত। কিন্তু কবির দৃষ্টি থাকে ফুলের গঠন আর তার সৌন্দর্য্যের দিকে ; ফুলের বর্ণ ও সৌরভের দিকে যেমন তাঁর মন থাকে সজাগ। কারণ পুষ্প-সৌন্দর্য্য ক্ষণ-ভঙ্গুর অথচ চিরন্তন তাই ত কাব্যের বিষয়। নিজের মনে ডুব দিয়ে যাঁরা পরের মনের কথা বলেন তাঁদের আমরা বলি সাহিত্যিক, কবি। জীবনের লীলার দিকটা আমরা বেশী করে দেখি—মূল্যও দিয়ে থাকি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টি ছিল তাঁর জীবন-সাধন অন্তর্গত রত। যদিও মুখ্যত তিনি কবি তবু এই সৃজন-প্রতিভা তাঁর জীবন-বিকাশের একটি দিক মাত্র—সমগ্র রবীন্দ্রনাথ নয়। সমুদ্রের তরঙ্গ-লীলাকে যেমন আমরা সমুদ্র বলি না তার আর একটি নাম রত্নাকর। রজনীর জ্যোৎস্না বিকাশই রজনী নয়—অসংখ্য গ্রহ তারকার মণি-মাণিক্যের দ্যোতনা তার মধ্যে।

আমাদের গুরুদেব যেমন রবীন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর মানস-গুরু ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন বাংলার জাতীয় জীবন-জাগরণের প্রথম হোতা। বিধির বিধানে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই তিনি কর্ম্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত হয়েছিলেন। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মাথায় তুলে নিয়েছিলেন তাঁর আরব্ধ, অসমাপ্ত কর্ম্মভার—জাতিকে জড় নিদ্রা থেকে জাগাবার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় এবং সগৌরবে।

'নৈবেদ্যে'র ৫৯ সংখ্যক কবিতায় দেখি—

'আমরা কোথায় আছি, কোথায় সুদূরে
দীপহীন জীর্ণ ভিত্তি অবসাদপুরে
ভগ্ন গৃহে, সহস্রের ভ্রূকুটির নীচে
কুব্জ পৃষ্ঠে নত শিরে, সহস্রের পিছে
চলিয়াছি প্রভুত্বের তর্জ্জনী-সংকেতে
কটাক্ষে কাঁপিয়া লইয়াছি শির পেতে
সহস্র শাসন শাস্ত্র।'

এ বেদনা, এমন ক্ষোভ কবিকে পীড়িত করেছিল। সেই

জন্যে পূর্ব্বে বলা হয়েছে তাঁর সাহিত্য রচনা জীবন-সাধনার অন্তর্গত ব্রত।

রবীন্দ্রকাব্য জ্ঞানের ও প্রেমের হোমাগ্নি; আনন্দের ও উৎসাহের দীপাবলী। রবীন্দ্রনাথের জীবন-ঘরের অনেক জান্‌লা দরজা খোলা ছিল বিশ্বের সব কিছুর সঙ্গে আদান-প্রদানের জন্যে। তাঁর ছিল পূর্ণতার সাধনা। নিজেকে তিনি পেতে চাইতেন সমগ্রভাবে। তাঁর আত্মার আকুল আর্ত্তি গুরুগোবিন্দের মুখে—'আপনার মাঝে আপনারে আমি পূর্ণ দেখিব কবে?' কিন্তু এ 'স্বর্গসাধন' স্বার্থপর বা আত্মকেন্দ্রী নয়। তার উদ্দেশ্য 'আমার জীবনে লভিয়া জীবন জাগরে সকল দেশ।'

পরিপূর্ণ মানবিকতার বিকাশ ছিল তাঁর লক্ষ্য। আমাদের দেশের সাধকেরা চেয়েছেন মুক্তি, নির্ব্বাণ—তাঁরা জীবন-বিরাগী। কবি রবীন্দ্রনাথ মুক্তি চান নি তিনি ছিলেন জীবন-অনুরাগী। আশা ও আনন্দের আবেগে পূর্ণ মৃত্যুহীন গানে তিনি মর্ত্তজীবনকে মহিমান্বিত করেছিলেন। বাস্তবিক এই দেশ 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যার দেশ।' 'নলিনী দলগত জলমতি তরলম্' জীবনের দেশ। যে দেশে 'সন্ধ্যাভ্র বিভ্রমনিভো বিভবো ভবে অস্মিন'—'প্রাণাস্তৃণাগ্র জলবিন্দু চল স্বভাবাঃ' যে দেশে 'ইহ সংসার দুঃখালয়ঃ অশাশ্বত' সেই দেশে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব চরম আশ্চর্য্যকর; বিধাতার পরম অনুগ্রহ।

মর্ত্ত্য-জীবনের দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অভিযোগের আক্ষেপ তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। নীলকণ্ঠের মত সংসারের সমস্ত ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট-অভাব-অভিযোগ-বিয়োগ-ব্যথার বিষকে নিঃশেষে পান করে তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন আনন্দ-অমৃত! তাঁর কথা ছিল, যে জীবনকে আমরা আকস্মিক অসম্পূর্ণ ভাবে পেলাম তাকে পরিপূর্ণ করে পেতে হবে। প্রেমে ত্যাগে সার্থক করতে হবে; সেবায় সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল করতে হবে, সঙ্গীতে, কবিতায়, শিল্পে, সাহিত্যে সরস করতে হবে; ধর্ম্মে আদর্শবাদে তাকে করতে হবে গরীয়ান।

এক কথায় আমাদের পশুস্তর থেকে উঠতে সচেষ্ট হতে হবে। আমাদের মধ্যে যে বনমানুষের হাড় আছে তাকে সাধনার দ্বারা মানুষের হাড়ে রূপান্তরিত করতে হবে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত,' এই ছিল তাঁর জীবনের মূল-মন্ত্র। কিন্তু এ জাগরণ-মন্ত্র জীবনরস বিমুখের নয়, এ প্রেমিকের, এ জীবনরসের রসিকের, সৌন্দর্য্যসন্ন্যাসী কবির, বিশ্বজগতে ঈশ্বর-সৃষ্ট যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর যিনি নির্দ্দেশক বা 'ব্যাখ্যাকারী', প্রকৃতির আনন্দযজ্ঞের রস-ভোজসভায় যিনি প্রধান অতিথি, যিনি সেই যজ্ঞেশ্বরের প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথের পরিণত জীবনের কাব্য 'নৈবেদ্যে' এই বোধনমন্ত্র এই মূল সুরটি বেজে উঠেছিল 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়'।

তাঁর এই জীবন-দর্শনে উগ্র-মৌলিকতা নেই। ভারতের ঐতিহ্যই এর অবলম্বন। মধ্য যুগের ভারতীয় সাধক কবীর বলেছেন, 'কান না রুধই, আঁখ না মুদই সুন্দর রূপ হস হস দেখই!' দেবতাকে দেখবার জন্যে কান রুদ্ধ করতে হয় না, আঁখিও মুদতে হয় না, হাসতে হাসতেই তাঁর সৌন্দর্য্যকে দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-কাব্য হয়েছে স্তরে স্তরে বিকশিত। ফুটেছে যেন একটি বিচিত্র ফুল। সাধকেরা যেমন রুদ্রাক্ষ বীজের মালা জপ করেন, কবি তেমনি জীবনের প্রত্যেকটি দিন মালা জপ করার মত সেই সৌন্দর্য্যময়ের সাধনা করে গেছেন অক্লান্ত ভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে। বৎসরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে একটি দিনও সেই সাহিত্য-সাধনার বোধ করি বিরাম ছিল না।

রচনাবলীর কবিতাগুলির নীচে যে তারিখ দেওয়া আছে তা থেকে খানিকটা বোঝা যায়। তা ছাড়া অন্যান্য সাহিত্য-সৃষ্টি ত ছিলই। এ এক পরম বিস্ময়!

ব্রহ্মার কাছে অমর হবার বরলাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন কঠোর সাধনা করেছেন এবং এই তপস্যায় সিদ্ধিলাভও তাঁর হয়েছে।

সে নহি

সে নহি
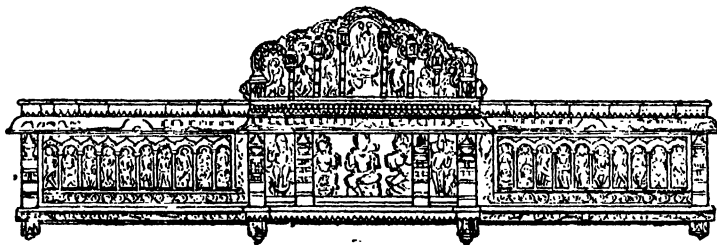
শ্রীচাণক্য সেন

৭

গাড়ী ফটক পেরিয়ে রাস্তায় নেমে পায়ের মৃদু চাপে ত্বরিৎ-গতি হয়ে কিছুক্ষণ চলল, দেববাণী বা সরোজা কেউ কথা কইল না। দেববাণীর দৃষ্টি সড়কে, সরোজার রাস্তা-ঘর-বাড়ী-মানুষ-আকাশ-মিলিত অর্থহীন শূন্যে।

এক সময় সরোজা তীক্ষ্ণ চাপা হেসে উঠল। বলল, "আপনি নিজের ইচ্ছের দড়িতে অন্যকে বাঁধতে এত উৎসুক কেন?"

দেববাণী মৃদু হাস্যে জবাব দিল, "ইচ্ছে নামক শক্তি ব্যবহারে ধারাল হয়। অনেক বছর হয়ে গেছে, ইচ্ছে ছাড়া জীবন-গাড়ি চালাবার অন্য তেল নেই আমার। তাই এ বস্তুর ব্যবহারে খানিকটা এক্সপার্ট হয়েছি।"

"আপনার আত্মবিশ্বাস দেখলে রাগ হয়।"

"ভুল বললেন। আশ্চর্য লাগে।"

"তা লাগে। কিন্তু রাগও হয়।"

"বিশ্বাস কথাটা আমরা বড় সহজে ব্যবহার করি। যেমন, বলি 'বন্ধু'। দু'দিনের আলাপ, বলি, আমার বন্ধু। তেমনই, বিশ্বাস। ভেবে দেখুন, জীবনে আমরা সত্যিকারের কিসে বিশ্বাস করি!"

"আপনি আর কিছুতে না করুন, নিজের ক্ষমতায় নিশ্চয় করেন।"

"ক্ষমতায় নয়। ওখানে আপনার ভুল হ'ল। বিশ্বাস করি নিজের আন্তরিকতায়।"

"আন্তরিকতা!" সাপের গর্জনের মত হেসে উঠল সরোজা। "সে কেমন জিনিস? কোন্ যাদুঘরে পাওয়া যায়?"

দেববাণী সোজা তাকাল পার্শ্ববর্তিনীর চোখে। সে আয়তলোচন জলছে। দেববাণীর স্নিগ্ধ স্নেহস্মিত চোখের ওপর সে জলন্ত দৃষ্টি তির্যক্ পতিত হ'ল। নড়ল না, কাঁপল না একটুও।

দেববাণী বলল, "আপনাকে কোথায় নামিয়ে দেব?"

"কোথাও না।"

"সে কি?" দেববাণী হেসে ফেলল।

"আপনাকে তুলে নিতে বলি নি। নামাতেও বলব না।"

স্নেহে গ'লে গেল দেববাণীর স্বর। "তুমি বড় ছেলে-মানুষ, সরোজা। চল একটু কফি খাওয়া যাক। তার পর দেখব তুমি কোথায় যাবে, কখন যাবে, কেন যাবে।"

কনট প্লেসে গাড়ী থামাল দেববাণী আম্বাসাডর রেস্তোরাঁর সামনে। দু'জনে ঢুকল ভেতরে। অপরাহ্নে জনবিরল রেস্তোরাঁ। দু-দশ জন পুরুষ-স্ত্রীলোক, যুবক-যুবতী চা-কফি পান করছে। ওরা এক কোণে টেবিলে বসল। বেয়ারা এসে সেলাম করতে, বলল, "কফি।"

"ঠাণ্ডা না গরম?"

"ঠাণ্ডা।"

"আমি ঠাণ্ডা কফি ভালবাসি নে," বলল সরোজা।

দেববাণী তাকাল তার মুখে। মুচকি হাসল। "আজ না ভালবেসেই খাও।"

কফি আসতে একটু দেরী হ'ল। সরোজা নীরব, কিন্তু দেববাণীর মনে হ'ল, নিস্পৃহ নয়। অন্তত তার বিরক্ত উদাস ভাব কেটে গেছে অনেকখানি। সে যে দৃষ্টিতে অদূরে উপবিষ্ট তিনটি কলেজ-পড়া তরুণীর দিকে তাকাচ্ছে তার মধ্যে ধারাবাহিক ক্লান্তি নেই: বরং ধিকি ধিকি জীবন-লিপ্সা আছে।

দেববাণী বলল, "তুমি কি করছ আজকাল?"

চকিত হ'ল সরোজা। "জীবন-ধারণ।"

"সে তো সবাই করে। এটুকু বয়সে এ ধরণের বুড়ো কথা তোমার বলা উচিত নয়।"

"বয়স আমার কম নয়।"

"তিন কুড়ি দশ?"

"বছরের মাপে বয়স ধরা পড়ে না। আপনাকে এখনও পঁচিশ বছরের খুকি মনে হয়।"

"আর তোমাকে?"

"আমার অনেক বয়স।"

সরোজার কণ্ঠে পুরাতন ক্লান্তির আভাস পেয়ে দেববাণী এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করল।

"শুনেছি তুমি সংবাদপত্রে কাজ করছ?"

"ভুল শুনেছেন।"

"করছ না?"

"ওকে কাজ বলে না।"

"লিখছ তো?"

"একটু একটু।"

"কি বিষয়ে?"

"সোসাইটি!"

"সর্বনাশ। আমাদের দেশের সংবাদপত্রেও ভেজালের আমদানী হয়েছে নাকি?"

"আমার কাজ এই বিচিত্র রাজধানী শহরে ঘুরপাক সামাজিক জীবনে রথী-মহারথীদের চলন-বলন-বচন জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করা। নামী বিদেশিনীর কাছে ভারত কত বিস্ময়কর, আমরা কত মহান্, পৃথিবীর শান্তি, স্থিতি, প্রগতিতে কত বিরাট্ আমাদের অবদান, সেই অপূর্ব উদ্দীপক ভারতস্তুতিকথা আমাকে সংগ্রহ করতে হয়। বিচারশক্তিহীন পাঠককুল তাই প'ড়ে প্রতিদিন নিজেদের পিঠ চাপড়ায়। শাসকগণ সে প্রশংসাপত্র বুকে ঝুলিয়ে গর্বে আত্মপ্রসাদে বিস্ফারিত হন। ক্যাথারিন মেয়োকে গান্ধী বলেছিলেন ড্রেন ইন্‌স্পেক্টর। সরোজা ধর্মরাজ চলমান্ ভারতবর্ষের ট্রেন ইন্‌স্পেক্টর।"

"মন্দ কি? সব বড় বড় জায়গায় নিশ্চয় খুব খাতির তোমার!"

"খুব।" সরোজার ওষ্ঠ-তরঙ্গে বিদ্রূপ নেচে উঠল।

"তোমাকে ত বিশেষ উদ্ভাসিত মনে হচ্ছে না।"

"উদ্ভাসিত?" এমন ভাবে উচ্চারণ করল সরোজা, যেন সে গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে।

"সোসাইটি সর্বত্রই কৃত্রিম হয়ে থাকে। ওটা সভ্যতার অঙ্গাভরণ।"

"আমাদের সভ্যতা নেই, তাই অঙ্গাভরণ এত বেশি।"

"বল কি? কত প্রাচীন আমাদের সভ্যতা!"

"এত প্রাচীন যে তাকে আর চেনা যায় না। হারাপ্পা বা নালন্দা নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যায়, জীবন কাটান যায় না।"

"প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তির ওপর নবীন সভ্যতা গ'ড়ে উঠছে না?"

"আপনি দেখছি পলিটিশিয়নদের মত কথা বলছেন! মা'র পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে পার্লামেন্টে দাঁড়াবেন নাকি?"

দেববাণী হেসে উঠল, "রক্ষে কর। রাজনীতিকে আমার বড় ভয়। একবর্ণ বুঝি নে।"

"সেই রাজার গল্প জানেন ত? তাঁতী তাঁকে কোনও বস্ত্র না পরিয়ে বলল, আপনি মহার্ঘ সজ্জায় সুশোভিত। উলঙ্গ রাজা সবাইকে প্রশ্ন করেন, কেমন দেখছ আমার অঙ্গাভরণ? সবাই শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে বিগলিত আনুগত্যে বলে, চমৎকার।"

"তার মানে?"

"আমাদেরও সেই অবস্থা। কিছু নেই, অথচ তারস্বরে সবাই বলছে, সব আছে। শ্লোগান জিনিসটা এমন মহিমাময় মিথ্যে যে, আওড়াতে আওড়াতে সে ঈশ্বরের মত অপ্রমাণিত সত্য হয়ে যায়।"

"কোনও জিনিসই পুরো মিথ্যে নয়, সরোজা।"

"দেখুন, আমার এ সব চোখ-ঠারানো পিঠ-চাপড়ানো দর্শন একেবারে ভাল লাগে না।" সাপের মত গর্জে উঠল সরোজা। "আমরা অস্থি-মজ্জায় অসৎ, তাই সব কিছুর মধ্যে গোঁজামিল খুঁজে বার করি। আত্মতৃপ্তিতে আমরা অবিজিত। কোন কিছুই একেবারে মিথ্যে নয়? সুতরাং মিথ্যেও একেবারে মিথ্যে নয়, চোরাকারবার একেবারে অসৎ নয়, লোক-ঠকানো পুরো অন্যায় নয়। সুতরাং সব চলে, সব চলবে। এই হ'ল আমাদের জীবনদর্শন। অথচ আমাদের রাষ্ট্র-প্রতীকে বিঘোষিত হয়েছে, সত্যমেব জয়তে! নেলসনের শেষ সিগন্যাল!"

কফি এল। কফি ঢালতে ঢালতে দেববাণী ভাবল, কেন, কোন্ বিষে এই সুদর্শনা মানিনী মেয়েটির কুমারী মন এমন জর্জরিত হয়ে গেছে? ওর মা'র অন্তরে যে বিষণ্ণ সদাশয়তা, ক্লান্ত দাক্ষিণ্য, সযত্ন সহানুভূতি, ওর মনে কেন তার এমন অভাব? অথচ কি আশ্চর্য ক্ষুরধার ওর মন, কি গভীর স্পর্শকাতর!

কফিতে চুমুক দিয়ে দেববাণী বলল, "আমার গবেষণাগার স্থাপনে তুমি সাহায্য করবে?"

"না।"

"কেন নয়?"

"গবেষণাগার স্থাপন করা আপনার হবে না।"

চমকে উঠল দেববাণী। "সে কি? কেন হবে না? হতেই হবে।" ব্যাকুল হ'ল সে।

"হবে না। এই এক জায়গায় আপনার ইচ্ছে পরাস্ত হবে।" প্রতিশোধের আনন্দে হঠাৎ খুশী হ'ল সরোজা।

সামলে নিল দেববাণী নিজেকে।

"তুমি ভুল করছ। গবেষণাগার হবেই।"

"হলে ত ভালই।

"তা হলে তুমি সাহায্য করবে?"

"না।"

"কেন ?"

"আমার সাহায্যে আপনার প্রয়োজন নেই। আপনার গবেষণাগারে আমার প্রয়োজন নেই।"

"তোমার-আমার পারস্পরিক প্রয়োজন হতে পারে।"

"পারে না।"

"এত নিশ্চিত হ'চ্ছ কি করে ? তোমার জীবনে যে সমস্যা জ'মে পাথর, তা গলবার দিনের অস্থিরতায় আমাকে তোমার প্রয়োজন হতেও পারে।"

"আমার জীবনে কোনও সমস্যা নেই।" সংক্ষিপ্ত নীরবতার পর সরোজা আবার বলল, "অনুগ্রহ ক'রে আমার জীবন নিয়ে অনধিকারচর্চা নাই বা করলেন ?"

অন্য সময়, অন্য কারুর মুখে এ-ধরনের কথাবার্তায় দেববাণী রাগত। আজ তার রাগ হ'ল না। একে ত সাবিত্রী আম্মার কাতর মিনতির কর্তব্য-নির্দেশ; তা ছাড়া রহস্য-লিপ্সিত সরোজার আকর্ষণ। মৃদু হেসে সে বলল, "একেবারে অনধিকার নয়।"

"অর্থাৎ মা আপনাকে আমার 'গার্জেন' করিয়েছেন ?"

সরোজা কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল। দেববাণীর প্রতিবাদ-ইঙ্গিত অগ্রাহ্য ক'রে এক নিঃশ্বাসে সে ব'লে গেল, "মা'র কোনও অধিকার নেই আমার পেছনে আপনাকে লাগিয়ে দেবার। আমার পঁচিশ বছর বয়স, আমি পূর্ণ স্বাধীন। মা-কে বলবেন, তিনি নিজের জীবন সামলাতে পারেন নি, আমার জীবন নিয়ে তাঁকে ঘাঁটা-ঘাঁটি করতে হবে না। করলে তিনিই আঘাত পাবেন। আপনাকেও বলছি, আপনার কি যথেষ্ট কাজকর্ম নেই যে আপনি আমার পেছনে লেগে রয়েছেন ? শুনেছিলাম আপনি ব্যস্ত বড় বড় কাজ নিয়ে, ও-সব কি মা'র প্রোপাগাণ্ডা মাত্র ?"

সরোজার নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হ'ল, চোখ জ্ব'লে উঠল, রুদ্ধ, কুপিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে বুক উঠল, নামল।

দেববাণী কম বিস্মিত হ'ল না। বিস্ময় গোপন না ক'রে বলল, "এত উত্তেজিত হলে কেন ?

"হব না ? উনি কেন আমায় একা ছেড়ে দেন না ? কেন আমাকে নিয়ে ওঁর মাথাব্যথা ? উনি জানেন আমার জন্যে কিছু ওঁর করার নেই, যা করতে পারেন—আমাকে একা থাকতে দেওয়া—তা কিছুতে করবেন না। মা জানেন, তিনি যা দিতে পারেন তার কিছু আমি চাই নে; আমি যা চাই তা তিনি দিতে পারেন না। কারণ আমি কিছুই চাই নে। উনি কেন আমায় নিজের মনে থাকতে দেবেন না ? কেন আমাকে নির্বুদ্ধি পেট-মোটা, ডবল-চিবুক এম. পি-দের মধ্যে ডাকবেন, কেন আপনার সঙ্গে পরিচয় করাবেন, কেন পার্টিতে নিয়ে যাবেন ? আমি ত ওঁর কোনও ক্ষতি করি নি !"

"তিনি মা যে !" দেববাণী আস্তে উচ্চারণ করল। এত আস্তে, এত সন্তর্পণে, শরৎ-রাতে শিশির পড়ার মত, যে সরোজা হঠাৎ থেমে গেল। তাকিয়ে রইল দেববাণীর চোখে।

নরম মাটির সন্ধান পেয়ে দেববাণী উৎসাহিত হ'ল।

"বড় ভাল তোমার মা। বড় স্নেহপরায়ণ, সহানুভূতিশীল।"

তিক্ত হাসি দেখা দিল সরোজার ওষ্ঠাধরে। "মা এত ভালো যে ঠিক বাস্তব নন।"

"এ কথা কেন বলছ ?"

"আপনাকে সবাই খুব বুদ্ধিমতী বলে ! অথচ আপনি দেখছি লোক চেনেন না।"

"সব কিছু কি কেউ চিনতে পারে ?"

"মা হচ্ছেন সেই দুর্ভাগাদের দলে যারা কল্পনাকে মনে করে বাস্তব, কল্পনার পরাজয় কিছুতে মানতে চায় না, যাদের আলেয়ার পেছনে ছুটবার শক্তি, ধৈর্য অসামান্য। তাঁরা এত আদর্শ-অন্ধ যে,আদর্শ কখন যে প'চে গ'লে ভূত হয়ে গেছে, দেখতে পান না। চতুর্দিকে পঙ্কের মধ্যে তাঁরা কেবল পঙ্কজ খুঁজে বেড়ান। সেজন্যেই মা'র সর্বদা একটা 'কজ' বা 'ক্রেজ' চাই। কিছু একটা নিয়ে সব সময় তিনি লড়বেন। যতদিন ইংরেজ ছিল, মা-দের ভাবনা ছিল না। ইংরেজ চ'লে গিয়ে মহা বিপদ্ হয়েছে। লড়বার আর কিছু নেই। অনেক কিছু নিয়ে লড়তে গিয়ে দেখেছেন, সংগ্রাম অচল। তবু হাল ছাড়বেন না। হালে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে বেশ মিইয়ে গিয়ে-ছিলেন। এমন সময় এলেন আপনি। ঈশ্বর-প্রেরিত 'কজ' পাওয়া গেল। এখন আপনার রিসার্চ সেণ্টার নিয়ে মেতে উঠেছেন। যাঁর সঙ্গে দেখা তাকেই একবার বলা চাই। তাতে আপনার বা সেণ্টার-প্রজেক্টের সাহায্য না হলে ক্ষতি নেই। মা'র আত্মতৃপ্তি হলেই যথেষ্ট।"

"না, না। তুমি ঠিক বলছ না। ওঁর প্রতি বড় অন্যায় করছ।"

"আপনি জানেন না। আপনার মত আরও অনেকের অনেক 'কজ' নিয়ে মা লড়াই করেছেন। প্রায় সবগুলো হেরেছেন, জিতেছেন দু'চারটে। কিন্তু পরাজয়গুলি তিনি একেবারে ভুলে গেছেন, যেন তারা ঘটে নি কোনও দিন। শুধু মনে রেখেছেন ছোটখাট জিৎগুলিকে। এতে কেবল নিজেকেই ঠকান নি, অন্যদেরও। অথচ এই ঠকাবার ব্যাপারটা ওঁর একটুও মনে নেই।

শুধু তাই নয়, যাঁরা ওঁর সব ব্যাপারে অবিরাম হস্তক্ষেপে বিরক্ত, তাঁদের প্রকৃত মনোভাব মা দেখেও দেখতে পান না। বার বার প্রতিহত হয়েও বিশ্বাস করেন, সবাই তাঁর কথা শোনে, মানে, গ্রহণ করে।"

"কিন্তু সবাই ত ওঁকে শ্রদ্ধা করে।" দেববাণীর বুকে কেমন একটা ব্যথা জ'মে উঠল।

"করুণা করে। আমার মনে হয় না, ভারতবর্ষের লোকেরা কাউকে, কোনও কিছুকে শ্রদ্ধা করে।"

দেববাণী শঙ্কিত চোখে তাকাতে সরোজা আবার বলল, "শ্রদ্ধায় পাহাড় টলে না, বরফ গলে না। গলে ক্ষমতায়। পৃথিবীতে যাদের হাতে ক্ষমতা, 'পাওয়ার,' তাদের ক'জনে শ্রদ্ধা করে? বরং তাদের অধিকাংশকেই দস্তুর মত অশ্রদ্ধা করে সবাই, তবু তাদের মানতে হয়। যার হাতে ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতা ছাড়া আর কিছু শ্রদ্ধা করে না। তেজ তেজকে মানে, বল বলকে। যে সব কারণে মা একদা শ্রদ্ধা পেতেন আজ তার প্রভাব মিটে গেছে। মা আশ্চর্য সাহসে একদিন সামাজিক বিদ্রোহ করেছিলেন; সেদিন অনেকের শ্রদ্ধা তিনি পেয়েছিলেন। আজ সে বিদ্রোহ অর্থহীন, সবাই তা করছে, বা করতে পারে, করলে কেউ ভ্রূকুটি পর্যন্ত হানবে না। মা গান্ধীর আন্দোলনে যোগ দিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। আজ গোটা গান্ধীবাদই অশ্রদ্ধেয়, জেলে যাওয়ার জলে জীবনের চিঁড়ে ভেজে না। মা সৎ, সহানুভূতিশীল, উদার,—এর কোনটাই বর্তমানের ভারতীয় রাজনীতি বাজারে চলতি মুদ্রা নয়। মাকে কেউ শ্রদ্ধা করে না, কিন্তু মা সর্বদা ভাবেন সবাই তাঁকে সকালে-সন্ধ্যায় প্রণাম করে।"

"কিন্তু আমার রিসার্চ সেণ্টার ব্যাপারে তাঁর প্রচেষ্টা খুব কার্যকরী হয়েছে।"

"ও আপনার কল্পনা। কল্পনা-বিলাসও সংক্রামক ব্যাধি। যদি কিছু হয়ে থাকে, মা'র জন্যে নয়, মা সত্ত্বেও।"

"তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি নে।"

"আপনার খুশি। আমি, আপনার মত, আমার ইচ্ছা, ধারণা, বিশ্বাস অন্যের ওপর চাপাতে চাই নে।"

"তুমি কেন বলছিলে রিসার্চ সেণ্টার হবে না?"

"দিব্যদৃষ্টি।"

"কাজ কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে গেছে।"

"পৌঁছুতে কতক্ষণ?"

"তুমি ভীষণ অন্ধকারবাদী।"

"মা'র মত অন্ধ আলোকবাদী হতে চাই নে।"

দেববাণী নিজের মনেই বলল, "রিসার্চ সেণ্টার না হলে একজন মনে খুব দুঃখ পাবে।"

"আপনার বয়-ফ্রেণ্ড?" সরোজার ঠোঁটে বক্রহাসি।

"আমার বন্ধু।"

"আপনি তাঁকে বিয়ে করবেন?"

চমকে উঠেই হেসে ফেলল দেববাণী: "তোমার সাহস ত কম নয়?"

"সাহসের কি দেখলেন?"

"তোমার মাও এ প্রশ্ন আমায় করেন নি।"

"তার মানে মা'র আপনার সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহল নেই।"

"তোমার আছে?"

"বর্তমানের জন্যে একটু আছে।"

"কেন?"

"আপনাকে দেখে মজা লাগছে।"

"মজা?"

"খুব। আপনি হচ্ছেন ব্যতিক্রম। সচরাচর থেকে আলাদা।"

"তুমিও ত তাই।"

"আমি? আমি আলাদা নই। আমি একা। আলাদাদেরও একটা জাত থাকে। একার কোনও জাত নেই।"

হঠাৎ সরোজা উঠল। "দয়া ক'রে মনে রাখবেন, আমি একাই থাকতে চাই।"

"কোথায় যাচ্ছ?" দেববাণীও উঠল।

"আমার গতিবিধির সংবাদ কাউকে দেবার অভ্যেস নেই।"

"তোমাকে পৌঁছে দি।"

"একই কারণে, দরকার নেই।"

"তুমি একদিন আমার ফ্ল্যাটে এস।"

"ধন্যবাদ।"

দ্রুত পদক্ষেপে সরোজা বেরিয়ে গেল। হিল-তোলা জুতোর খট্-খট্ আওয়াজে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সবার চোখে মুহূর্তের বিস্ময় জাগিয়ে সে নিষ্ক্রান্ত হ'ল। দেববাণীর দৃষ্টি তার অপস্রিয়মান সুঠাম-ছন্দিত দেহকে দরজা পর্যন্ত অনুসরণ করল।

দেববাণী বিদায় নেবার পর সাবিত্রী আম্মা ক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিলেন। তাঁর মনে তৃপ্তি ও বেদনা একসঙ্গে মিলে-মিশে বিচরণ করছিল। দেববাণীকে কয়েকজন বিশিষ্ট এম. পি.-র সঙ্গে পরিচিত করিয়ে তিনি

তৃপ্তি বোধ করলেন ; এ পরিচয় দেববাণীর উদ্যোগকে সার্থকতার পথে এগিয়ে দেবে ভাবতে তাঁর ভাল লাগল। কিন্তু এ ভাল লাগায় কেমন একটা অপূর্ণতা র'য়ে গেল, যা সাবিত্রী আম্মাকে গোপনে পীড়া দিতে লাগল। এই ধরনের মৃদু পীড়ন সর্বদা আজকাল অস্তিত্বের অভ্যন্তরে তিনি অনুভব করেন। কেবল মনে হয়, আমার কিছু করার নেই, দেবার নেই, পাবার নেই। আমি ফুরিয়ে গেছি। কালের কঠিন নির্দয় মাপে আমি অতিরিক্ত। আমি আর কিছু সাধন করি না। সকলে আমাকে সহন করে মাত্র।

দিবানিদ্রার অভ্যাস নেই, তবু আজ সাবিত্রী আম্মার চোখ ক্লান্তিতে বুজে এল। নিজেকে বার বার তিনি সান্ত্বনা দিতে চাইলেন, না, তুমি ফুরিয়ে যাও নি, এখনও তুমি আছ, দেশের, সমাজের, মানুষের প্রয়োজনে আছ। এই ত পরম নিঃস্বার্থে, সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে একটি সৎসাহসী গঠন-প্রয়াসী মেয়েকে সাহায্য করতে তুমি এগিয়ে এসেছ, তোমার চেষ্টায় তার কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। কিন্তু, চোখ বুজে, সাবিত্রী আম্মা স্বতঃ-উচ্চারিত সান্ত্বনা-গুঞ্জনের মধ্যে নিবিড় কাণ পেতে সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, এ মিথ্যা প্রবোধ তাঁর জীবন-সন্ধ্যার করুণ দারিদ্র্য, মলিন শূন্যতাকে ঢেকে রাখবার দুর্বল প্রয়াস মাত্র। মনে হ'ল, বজ্রাঘাতে নিহত তাল-গাছ যেমন নগ্ন নিষ্প্রয়োজনের আর্ত প্রতীকের মত আকাশের দিকে অন্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, আমিও তেমনি তাকিয়ে আছি ভারতবর্ষের দিকে, আমার দীনতা, শূন্যতা কারুর চোখ এড়াতে পারছে না।

অথচ, মুদিত চোখের অন্ধকার পর্দায় স্মৃতির ক্ষিপ্র-চলমান ছায়াছবি দেখতে দেখতে সাবিত্রী আম্মার মনে হ'ল, আমি ত এমন ছিলাম না! অনেক বছর আগে, যখন প্রথম যৌবনের জলন্ত দাবীর চাপে বিদ্রোহী হলাম, তখন থেকে, এই ত সেদিন পর্যন্ত, জীবনের প্রতি প্রহর অর্থপূর্ণ ছিল। বেঁচে থাকার শিহরণ লাগত প্রতিদিনের জীবনে, দুঃখে, শোকে, সুখে-আনন্দে, বিপদে, বিরোধে, সংগ্রামে, জয়ে-পরাজয়ে। জীবনের পীন আস্বাদে মাদকতা ছিল,—হোক না পাত্র-ভরা পীযুষ বা গরল। প্রগল্ভা খরস্রোতা নদীর সতেজ প্রবাহ তাকে ক্লেদ-কালিমার স্পর্শ থেকে মুক্ত করে। তেমনি জীবন যখন চলে, গায়ে তার দাগ লাগে না। বহু প্রতিলোম লক্ষ্যের দানে এক সঙ্গে সে হাত বাড়ায় ; কখনও একেবারে শূন্য হাতে ফিরে আসে না। কিন্তু জীবন যখন নিশ্চল, গতিহীন, লক্ষ্য আয়ত্ত, অথবা অপ্রতীক্ষ্য, বেঁচে থাকার উত্তাপ যখন নিঃশেষ, তখনকার ক্লান্ত বিষণ্ণ ক্লীব অবসর দীনতার নির্দয় উপহাস।

নিশ্চল জীবনের স্থবির সত্তার গভীর অন্তর্দেশে সাবিত্রী আম্মার তাই মনে হয়, কে যেন তাঁকে বার বার পরিহাস করে।

এই গুপ্ত পরিহাসকদের বিদ্রূপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সাবিত্রী আম্মার অন্যতম প্রধান সমস্যা। তাঁকে মানতে চান না তিনি। মানতে চান না, তিনি প্রয়োজনের অতিরিক্ত। যেখানে যেটুকু সুযোগ পান, নিজেকে প্রয়োজনীয় ক'রে তুলতে তাঁর চেষ্টা আরও বেড়ে যায়। লোক-সভার কাজে তিনি অখণ্ড মনোনিবেশ করেন ; বিতর্কে, কমিটিতে আলোচনায়, অর্থপূর্ণ অংশ গ্রহণে তাঁর চেষ্টার ক্রটি হয় না। অনেক সময় তাঁর পরিশ্রম ব্যর্থ হয় না দেখা যায়। অনিচ্ছুক মন্ত্রীদের কৃপণ ভাণ্ডার থেকে মূল্যবান্ অনেক তথ্য তিনি আশ্চর্য দৃঢ়তা ও কৌশলের সঙ্গে টেনে বার করেন। নির্ভীক ও নির্লোভ ব'লে প্রয়োজন মত মন্ত্রীদের হতবুদ্ধি করতে, মুশকিলে ফেলতে সঙ্কোচ সংশয় তিনি বোধ করেন না। যে-সব বিল বা সরকারী নীতিতে তাঁর উৎসাহ, বিতর্কের সময় অনেক ক্ষেত্রে তিনি সদস্যদের সমবেত মনোযোগ অর্জন করেন ; মন্ত্রীরা তাঁর বক্তব্য শুধু সতর্ক হয়ে শোনেন না, বিচার ক'রেও দেখেন। সিলেক্ট কমিটিতে শাসক দলের সদস্যা হয়েও সাবিত্রী আম্মা বেশীর ভাগ সময় বিরোধী দলের সহকর্মীদেরও অবাক্ ক'রে দেন সরকারী খসড়ার দোষ-গুণ বিচারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, তিনি শেষ পর্যন্ত বিরুদ্ধ মত, মিনিট অব্ ডিসেণ্ট, লিখতে ব'সে গেছেন। যদি কারুর কোন সমস্যা তাঁর কাছে সাহায্যের উপযুক্ত মনে হয়, মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের দরবারে বারম্বার তিনি যাতায়াত করেন। সাবিত্রী আম্মা চান, লোকেরা আসুক তাঁর কাছে তাদের সমস্যা, প্রার্থনা, নালিশ নিয়ে। যার মধ্যে ন্যায় নেই তার সপক্ষে তিনি কদাপি কথা বলেন না। কিছু ন্যায় আছে বুঝতে পারলে সংগ্রামের প্রাচীন আকাঙ্ক্ষা তাঁর মধ্যে চট ক'রে জেগে ওঠে। ভাষা, প্রদেশ, ক্ষেত্র, ধর্ম কোনও সঙ্কীর্ণতার অধীন তিনি নন। সুতরাং তাঁর কাছে লোক আসে ; নানা অঞ্চলের, ভাষার, ধর্মের লোক। দু'দিন কেউ না এলে উদ্বিগ্ন হন সাবিত্রী আম্মা। নিজের অভ্যন্তরে গুপ্ত পরিহাসকদের চাপা বিদ্রূপাত্মক হাসি শুনতে পান! বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে।

অথচ সাবিত্রী আম্মা জানেন, রাজনৈতিক মহলে তাঁর স্বকীয় স্থান কিছু নেই। তিনি দলনেত্রী নন, ক্ষমতার ক্ষীণতম কেন্দ্র-বিন্দুও নন। তাঁর চতুর্দিকে বিগলিত আনুগত্যের বৃত্ত তৈরী হয় না। একদা, যেন কত যুগ আগে, কোন উদ্দীপ্ত প্রেরণার তাপে, তিনি কিছু কাজ

করেছিলেন; তার স্মৃতি যাঁদের মন থেকে এখনও একেবারে মুছে যায় নি, তাঁদের কেউ কেউ সাবিত্রী আম্মাকে জীবনের অপরাহ্নে আত্ম-তৃপ্তির সুযোগ দেবার উদার উদ্দেশ্যে পার্লামেণ্টে নির্বাচিত করেছেন। সাবিত্রী আম্মা জানেন, এ ঔদার্যের মধ্যে পুরাতন স্মৃতি, স্তিমিত শ্রদ্ধার সঙ্গে আরও এক পদার্থের সংমিশ্রণ, তার নাম দয়া। যদি নির্বাচনে টিকেট তিনি না পান, নালিশ করতে পারবেন, অভিমান, এমন কি ভিক্ষার পথও খোলা থাকবে; দাবী করতে পারবেন না। হয়ত করুণা-পরবশ উচ্চপদস্থ কারুর চেষ্টায় রাজ্য-সভায় মনোনীত আসনের একটি তাঁর জুটে যাবে। তাতে জীবন আরও দরিদ্র হবে, পরিহাসকদের বিদ্রূপ যাবে বেড়ে।

সাবিত্রী আম্মা বোঝেন, রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তাঁর মূল্য ল্যাইসেন্স-পর্যায়ের ওপরে নয়। তাঁরা তাঁকে সময় সময় প্রশ্রয় দেন, খাতির করেন, অন্তত দেখান; কিন্তু মৃদু-মন্দ শুনিয়েও দেন যে, তিনি অযথা, অপ্রয়োজনে, তাঁদের পেছনে লাগেন। যখন সাবিত্রী আম্মা তাঁর অধিকাংশ সাহায্য-প্রার্থীর 'কেস' নিয়ে বার বার তদ্বির ক'রেও ব্যর্থ হন, পরিহাসকদের বিদ্রূপ তীক্ষ্ণতর হয়, তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন, অসহায় শিশুর মত সান্ত্বনা খোঁজেন। সান্ত্বনা পাবার একমাত্র উপায় আত্ম-প্রপঞ্চের জাল বোনা।

বার্ধক্যের শূন্যতা, সাবিত্রী আম্মা বোঝেন, শতগুণ বর্ধিত হয়েছে পারিবারিক ব্যর্থতার কারণে। স্বামীর সঙ্গে বহু বছর তাঁর যে সম্পর্ক তা সুশীতল সহ-অবস্থানের বেশী নয়। বহুদিন আগে, রাজনীতির উত্তেজনায় সাড়া দেবার সঙ্গে সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে মতান্তর সুরু হয়; অনুক্ত কারণে মনান্তর তারও আগে আরম্ভ হয়েছিল। মন ও মতের ব্যবধান এমন নিঃশব্দে দু'জনের মধ্যে অন্ধকারের দেওয়াল তুলে দিল যে, সাবিত্রী আম্মারও স্মরণ নেই কখন তার প্রথম গোপন পদসঞ্চার, কি ক'রে তার ব্যাপক বিস্তৃতি। এ নিয়ে কোনও দিন কুশ্রী কলহ তাঁদের হয় নি; শুধু একই দূরে-টানা শক্তির সমান চাপে দু'জনে সমান পারস্পরিক ব্যবধানে স'রে গেছেন। মহীশূর ডোরেইস্বামী ধর্মরাজ ও সাবিত্রী আম্মার মধ্যে মিলিত-জীবনের উত্তাপ ফুরিয়ে গেছে; কিন্তু বিচ্ছেদের প্রয়োজন তাঁরা বোধ করেন নি। বন্ধন যদি কঠিন না হয়, বিচ্ছেদের দরকার হয় না।

মহীশূর ডোরেইস্বামী ধর্মরাজ মাদ্রাজ শহরের আড়িয়ার অঞ্চলে অ্যানি বেসান্ত প্রতিষ্ঠিত থিয়োসোফি-ক্যাল সোসাইটিতে বাস করেন, কদাচিৎ কখনও দিল্লীতে তাঁকে আসতে হয়। সাবিত্রী আম্মার বাসভবনের দ্বিতীয় কক্ষে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট পালঙ্ক রয়েছে; বছরে একবার সামান্য ক'দিনের বেশি সে পালঙ্কে ধর্মরাজের চুয়াত্তর বছরের কৃষ্ণকায় পক্বকেশ দেহ বিশ্রাম করে না। সে সংক্ষিপ্ত অবস্থানে সাবিত্রী আম্মা তাঁকে সম্মানিত অতিথির মত যত্ন করেন; ধর্মরাজের অধ্যাত্মিকতা, সাবিত্রী আম্মার এম-পি-জীবন নিয়ে আলোচনাও হয়ে থাকে। শুধু যা হয় না তা দু'জনের পারস্পরিক জীবন নিয়ে। একদিন দু'টি নদী এসে যে মোহনায় মিশেছিল তা গেছে শুকিয়ে। বহুদিন তারা ভিন্ন-গতি। একে অন্যকে প্রশ্ন করবার কিছু নেই।

গত শতাব্দীর শেষদিকে সাবিত্রী আম্মা মাদুরাই শহরের যে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলেন তাঁরা ছিলেন স্মার্ত শ্রেণীর বিষ্ণু ও শিব উভয়ের উপাসক, অতএব অপেক্ষাকৃত উদার মতাবলম্বী। তাঁরা যেমন তাঞ্জোরে নটরাজ-মন্দিরে পূজা দিতেন, তেমনি শ্রীরঙ্গমের বিষ্ণু-মন্দিরে। মাদুরাই-র মীনাক্ষী-মন্দিরের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ ছিল, কিন্তু কাঞ্চীভরমে গিয়ে বছরে একবার তাঁরা শিব-কাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চী উভয় কাঞ্চীতে পুণ্যার্জন করতেন। সাবিত্রী আম্মার বাল্যকাল কেটেছিল মীনাক্ষী-মন্দিরের প্রভাবে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে মন্দিরে আসতে হ'ত। চার গোপুরম্ ও বিভিন্ন মণ্ডপমে অসংখ্য দেবদেবী মূর্তির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। দক্ষিণ গোপুরমের প্রশস্ত দ্বারপথে প্রবেশ ক'রে সহস্র-স্তম্ভ গণেশ-মণ্ডপম্ প্রদক্ষিণ করে, আশ্চর্য ভাস্কর্য জীবন্ত-প্রায় বিরাট্ প্রতিমূর্তিগুলি বিস্মিত-বিহ্বল চোখে দেখতে দেখতে বালিকা সাবিত্রী উপস্থিত হ'ত মীনাক্ষীর মন্দিরে, অপলকে তাকিয়ে থাকত মীন-নয়না শিবপ্রিয়ার চোখে, যেখানে, তার মনে হ'ত, পৃথিবীর সমস্ত রহস্য ঘনীভূত। সে চোখে সাবিত্রী দেখতে পেত বহুদূরের অব্যক্ত আকুতি। তার বুক কাঁপত, পা অবশ হয়ে আসত। সুন্দরেশ্বরের সঙ্গে মীনাক্ষীর বিবাহের রমণীয় কাহিনী সাবিত্রীর আদ্যোপান্ত জানা ছিল; কিন্তু যে মীনাক্ষীকে প্রতি সন্ধ্যায় প্রাণ ভ'রে সে দেখত, সে কারুর ঘরণী নয়, প্রেয়সী নয়। তাঁর চোখে সমুদ্র-মৎস্যকন্যার অতল আহ্বান, বলিষ্ঠ ঋজু তাঁর দেহে উন্মত্ত বীচিমালার সঙ্গে সংগ্রামের তেজ, ওষ্ঠাধরের বিলোল-বিহ্বল হাস্যে নিলম্বিত রহস্য। বালিকা সাবিত্রী প্রতি সন্ধ্যায় যুঁই ফুলের মালা নিয়ে যেত মীনাক্ষী-মন্দিরে; পুরোহিতদের মধ্যে একজন সে মালা গ্রহণ করতেন। সাবিত্রীর তাতে তৃপ্তি হ'ত না, ইচ্ছে হ'ত নিজের হাতে

মীণাক্ষীর গলায় মালা পরিয়ে দেবার সময় নিকট হ'তে তাঁর অস্থির-করা চোখের সবটুকু দেখে নেয়।

বারো ভাই-বোনের কনিষ্ঠা সাবিত্রী। একমাত্র মা ছাড়া সকলে তাকে অতিশয় স্নেহ করতেন। সাবিত্রীর যখন জন্ম হ'ল, পিতা মাদুরাই রামসুব্রাহ্মনিয়মের বয়স তখন মধ্যপঞ্চাশ উত্তীর্ণ। সন্তানের পর সন্তান প্রসব ক'রে জননী রাজমের দেহ ভেঙ্গে গিয়েছিল; সাবিত্রী পেটে আসতেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দ্বাদশ বার মাতৃত্বের মাশুল দেবার মত বয়স তাঁর নেই। সাবিত্রীকে গর্ভে ধারণ ক'রে তিনি শয্যা নিয়েছিলেন; নিজের অন্তঃস্থলে বাড়ন্ত সজীব বস্তুর সঙ্গে সে-অবস্থায় তাঁর বিরোধের সূত্রপাত। নির্দিষ্ট সময়ের মাসখানেক আগে মৃত্যুর মুখোমুখি হ'য়ে তাকে জন্ম দিয়ে তিনি যখন জানতে পারলেন সে তাঁর নবম কন্যা, তখন সে বিরোধ চরমে উঠল। সাবিত্রীর আড়াই বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু। আড়াই বছর শেষতম সন্তানের সঙ্গে তাঁর দৈহিক সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। দুগ্ধশূন্য বিশুষ্ক স্তনে সাবিত্রীর প্রথম জৈব তৃষ্ণা মেটাবার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সাবিত্রী যে তাঁকে মৃত্যুর নিশ্চিত গহ্বরে ঠেলে দিল, সে অপরাধ তিনি ক্ষমা করতে পারেন নি। সংসারের অনিবার্য বিধবা পিসীদের হাতে সাবিত্রী বেঁচে রইল, তিনি এক-পা এক-পা ক'রে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন। মেয়েদের মধ্যে সে যে সবচেয়ে সুন্দরী তাতেও তিনি নরম হন নি।

রামসুব্রাহ্মনিয়ম ধার্মিক, পণ্ডিত মানুষ। জিলা-আদালতে ওকালতি ক'রে বিশেষ পসার হয় নি, কিন্তু সৎ ও পণ্ডিত ব'লে তাঁর সম্মান আছে। ছোট-খাট গোল-গাল মানুষটির স্নেহ সাবিত্রী আম্মার বাল্য-কৈশোরের একমাত্র সম্পদ্। সন্তান-স্নেহের উচ্ছ্বাস সেকালে অশালীন ছিল, তথাপি সাবিত্রী সম্বন্ধে দুর্বলতা রামসুব্রাহ্মনিয়ম প্রকাশ না ক'রে পারতেন না। হয়ত অকৃত অপরাধে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হবার জন্যে পিতৃস্নেহ সে বেশি পেয়েছিল। জন্মাবার পরেই রামসুব্রাহ্মনিয়ম কনিষ্ঠা কন্যার জন্ম-পত্রিকা তৈরি করিয়েছিলেন। জ্যোতিষী তাঁকে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, কন্যা সুলক্ষণা নয়। বৈধব্যের যোগ আছে। অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে আরও বলেছিলেন, তার চেয়ে খারাপ সম্ভাবনাও আছে।

কলঙ্কের? আতঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলেন রামসুব্রাহ্মনিয়ম।

জ্যোতিষী জবাব দেন নি। শুধু এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, দশ বছরের মধ্যেই যেন বিয়ে হয়। প্রতি বৎসর জন্মদিনে হোম করতে হবে।

রামসুব্রাহ্মনিয়মও আর প্রশ্ন করেন নি। বোধ হয় মনে মনে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন, জন্মপত্রিকা সত্য হ'লে, বেশি দিনের আয়ু তাঁরও আর নেই।

বৈধব্য-যোগের সতর্ক বাণী স্মরণ ক'রে রাম-সুব্রাহ্মনিয়ম কন্যার নাম রাখলেন সাবিত্রী।

বাল্যের যে প্রথম-স্মৃতি সাবিত্রী আম্মার আজও মনে আছে সে তাঁর বাবার। মনের অনেকখানি জুড়ে আছে। ছোট মানুষটির কণ্ঠস্বর আশ্চর্য উদাত্ত। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে দিবসের কাজকর্ম থেকে রাত্রির অব্যাহতি পেয়ে, স্নানান্তে তিনি বেদ-উপনিষদ-রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদ্গীতা পাঠ করতেন। প্রতিবেশী-আত্মীয় প্রতি-দিন কেউ না কেউ শুনতে আসতেন সে উদাত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সমস্ত ঘর কেঁপে উঠত। ছয় বছরের সাবিত্রী বাবার অনতিদূরে ব'সে সে ধ্বনি শুনত। ছোটবেলায় যে শ্লোকটি তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, আজকার বার্দ্ধক্যেও সেটি তাঁর প্রিয়। জীবন যে কি বিচিত্র রহস্য, সব নিয়ম-কানুন-বিধি-বিধানের বাইরে, সমুদ্রের চেয়ে বিরাট্, মহাকাশের চেয়ে উঁচু, পাহাড়ের চেয়ে কঠিন, কুসুমের চেয়ে নরম, মৃত্যুর চেয়ে অন্ধকার, মিলনের চেয়ে আলোকময়, বেদের মহাকবিরা তা বুঝতে পেরেছিলেন। আজও, জীবনের বিচিত্র-বিহ্বল আলোড়নে হতবুদ্ধি, বিড়ম্বিত সাবিত্রী আম্মা মনে মনে বার বার আবৃত্তি করেন: কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্র বোচৎ, কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। এ সৃষ্টি কি, কোথায় এর আরম্ভ, কে জানে, কে বলতে পারে? জ্যোতির্ময় দেবগণও হয়ত আদি-কাহিনীর খবর রাখেন না। এমন কি, যিনি পরম ব্যোমে অধিষ্ঠিত, তিনিও হয়ত জানেন না: যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্, তুসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।

দশ বছরের মাঝামাঝি পৌঁছতে রামসুব্রাহ্মনিয়ম সাবিত্রীর বিয়ে দিলেন। তিন পুত্রকে তিনি উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা দিলেও সেকালে দক্ষিণ-ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন না থাকায় সাবিত্রীর বিদ্যাভ্যাস গৃহে সমাপ্ত হ'ল। পণ্ডিত রেখে তিনি সাবিত্রীকে তামিল ও সংস্কৃত শেখালেন, সামান্য ইংরেজীও। নিজের কাছে কাছে রেখে গল্পে-কাহিনীতে শাস্ত্র শেখালেন। ছোটবেলা থেকে সাবিত্রীর জানবার বুঝবার, নতুন কিছু করবার সুতীক্ষ্ণ আগ্রহে রামসুব্রাহ্মনিয়ম বিস্মিত হতেন। দুঃখও পেতেন। বড় মেয়েরা চিরপ্রথামত যে-যার বিবাহিত

জীবন যাপন করছে। রামসুব্রাহ্মনিয়ম অ্যানি বেসান্তের থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হয়ে ইণ্ডিয়ান হোম রুল লীগে যোগ দিয়েছিলেন। কখনও কখনও তাঁর মনে হ'ত, উপযুক্ত সুযোগ, শিক্ষা পেলে এই সুন্দরী, সদা-চঞ্চল, রহস্যময়ী মেয়েটা বোধ হয় অনেক কিছু বুঝতে পারত, জানতে, করতে পারত। পরক্ষণে মনে পড়ত জ্যোতিষীর অযুক্ত সাবধানবাণী। কি জানি মেয়েটার জীবনে কি অমঙ্গল লেখা রয়েছে!

অর্ধশতাব্দী পূর্বে তামিলনাদে বাল্য-বিবাহ নিয়ম ছিল। মেয়েদের সাত-আট বছরে বিয়ে হয়ে যেত, কিম্বা আরও কম বয়সে। সে তুলনায় সাবিত্রীর দশ বছরের কুমারী জীবন রামসুব্রাহ্মনিয়মের উদার-মনোভাব সূচনা করে। দশ বছরে দেহে সাবিত্রী খুব না বাড়লেও মনে বেড়েছিল অনেকখানি। মাতৃহীন সংসারে, পিসীদের অস্তিত্ব সত্ত্বেও, বেশ কিছু কাজ তাকে করতে হ'ত। বাবার অনেক ব্যক্তিগত কাজকর্ম সে নিজের হাতে করত। রামসুব্রাহ্মনিয়ম তাকে কাছে কাছে রাখতেন; তার মনের আধ্যাত্মিক একটা ভিত্তি গ'ড়ে দেবার চেষ্টা করতেন। অনেক সময় তার অতি-সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপতেন।

আট মেয়ের বিয়ে দিতে রামসুব্রাহ্মনিয়মের উদ্বৃত্ত অর্থ নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তামিল ব্রাহ্মণ সমাজে মেয়ের বিয়ে মানে মেয়ের-বাপের সর্বনাশ। সাবিত্রীকে ভাল ক'রে মনোমত পাত্রে অর্পণ করার সঙ্গতি রামসুব্রাহ্মনিয়মের ছিল না। অথচ বোনদের মধ্যে সে সবচেয়ে সুন্দরী; বাবার অন্তরে তার স্থান স্বতন্ত্র। রামসুব্রাহ্মনিয়ম এমন একটি পরিবারের খোঁজ করছিলেন যেখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প-ব্যয়ে পছন্দমত পাত্র মিলতে পারে। খোঁজ ক'রে তিনি যখন প্রায় হতাশ, এদিকে সাবিত্রী দশ বছরের মধ্যস্থলে উপনীতা, তখন বিধাতা প্রসন্ন হলেন। পাত্র মিলল। কন্যা রজস্বলা হবার আগেই তাকে বিয়ে দিতে হবে; কুমারীর রজোদর্শন হলে তখনকার দিনে তার বিবাহের পথ সহজ ছিল না।

তিরুভালুর শহরে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে সাবিত্রীর বিবাহ হ'ল। ছেলেটির বয়স একুশ, সুদর্শন না হলেও বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল। বি-এ পাশ ক'রে মাদ্রাজ সরকারে চাকরি করে, মাদ্রাজে থাকে। রামসুব্রাহ্মনিয়ম ভেবে খুশী হলেন, সাবিত্রী স্বামীর সঙ্গে মাদ্রাজে বাস করবে, তিরুভালুরের মত ক্ষুদ্র শহরের নীচু-নজর সমাজে তার জীবন কাটবে না। মাদুরাই—অর্থাৎ "সুন্দরী" মাদ্রাজের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ শহর; অনেকাংশে রাজধানীর চেয়েও তার গৌরব বেশি।

সেকালে তামিল ব্রাহ্মণদের বিবাহ পাঁচ দিন ধ'রে চলত। এ পাঁচ দিনব্যাপী মঙ্গলোৎসবের নাম আঙ্গিনাড়-কল্যাণম্। বরপক্ষের জন্যে কন্যা-গৃহের একই সারিতে সামান্য ব্যবধানে আলাদা বাড়ী ঠিক করা হ'ল। রামসুব্রাহ্মনিয়মের বাড়ী বিবাহের উপযুক্ত মাঙ্গলিক কায়দায় সাজান হ'ল। বাইরের দ্বারপথে দেবদারু-পত্রে গেট তৈরী হ'ল। গেটের দুধারে ফলবতী দুই পূর্ণ কদলীবৃক্ষ। আম্রপল্লবে ঢাকা মঙ্গল-কলস; তার ওপর সবুজ সশীষ নারিকেল। সবুজ আম্রপত্রের লাইন বাঁধা হ'ল সরু দড়ি দিয়ে। বাড়ীর ভেতরকার অঙ্গনে বিবাহ-বাসর। চতুঃস্তম্ভ অনতিপরিসর চত্বরের মধ্যস্থলে মাটি ও গোবর নির্মিত হোম-বেদী। চত্বরের প্রতি স্তম্ভের সঙ্গে এক একটি কদলী-কাণ্ড বাঁধা হ'ল। চারদিকে দড়ি টানিয়ে তাতে আম্রপত্র ও যুঁই ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হ'ল। সমস্ত আঙ্গিনায় পুরু ক'রে গোবর লেপা। অঙ্গনে নানা-বর্ণের কোলম্, আলপনা।

উৎসবের শুরুতে 'নিশিতাসম্'। অর্থাৎ চুক্তিপত্র পাঠ ক'রে বিবাহকে নিশ্চিত করা। উভয় পক্ষ সমবেত হ'ল সুসজ্জিত বিবাহ-বাসরে। সুব্রাহ্মনিয়ম কম্পিত কণ্ঠে 'লগ্নপত্রিকা' পাঠ করলেন। প্রাচীন কায়দায় রচিত দান-পত্র। পরমকরুণাময় সুন্দরেশ্বরের অপার কৃপায় আমার কনিষ্ঠা কন্যা সাবিত্রীকে তোমাদের হাতে সঁপে দিতে পারলাম। লগ্নপত্রিকায় সাবিত্রীর কুল-ইতিহাস, পিতৃপুরুষ-পরিচয়, রূপ ও গুণ বর্ণনা। তার সঙ্গে বরেরও। লগ্নপত্রিকা পাঠের পর যৌতুকাদি দেওয়া হ'ল, বরপক্ষ নগদ তিন হাজার টাকা ও দেড়শ' ভরি সোনা দাবী করেছিল। টাকা বরের পিতা গ্রহণ করলেন। গহনা বড় রূপোর থালিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। কণ্ঠের জন্যে তিরুমঙ্গলী ও চাঙ্গলি, কোমরে ওড়িয়ালম্, হাতে নানা প্যাটার্ণের বালাই, কানের জন্যে ওলে, দু'নাকে হীরের মুকুত্তি, পায়ে পরবার কলুসু, পায়ের আঙুলে নাট্টি। ভারী গহনা, রকমে কম, সংখ্যায় অনেক। বরপক্ষের বৃদ্ধরা নেড়ে-চেড়ে দেখলেন দেড়শ' ভরির বেশিই হবে। ওজন করিয়ে নেবার মত নীচু-দৃষ্টি বরের পিতার নেই, তাঁরা জানিয়ে দিলেন। বাপ যা যৌতুক দেয় সবটা মেয়ের প্রাপ্য। টাকা নববধূর নামে ব্যাঙ্কে থাকবে। গহনার আসল মালিকও সে। ঠকালে বাপ মেয়েকেই ঠকাবেন আর ধর্মকে।

সাবিত্রীর হাতে 'মারুদানী' লাগান হয়েছে (বাংলা

দেশের গায়ে হলুদের মত) যাতে সকলে একদৃষ্টিতে তাকে চিনতে পারে। 'মঙ্গলস্নানমে'র পর তাকে প্রথম স্বামী-দর্শনে যাবার জন্যে তৈরী করা হ'ল। এমন সময় বরযাত্রীদের অস্থায়ী নিবাসে উৎসবের অঙ্গস্বরূপ একটি ঘটনা ঘটল। বর নগ্নদেহে ছাতা বগলে ক'রে 'পরদেশী-কোলম্' অর্থাৎ কাশীযাত্রা করল। পেছনে নিকটতম আত্মীয়, বন্ধুদের ব্যর্থ মিনতি। রামসুব্রাহ্মনিয়ম তৈরী ছিলেন। ত্রস্তপদে ভাবী জামাতার গতিরোধ করলেন। পুরোহিতগণের মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে বরকে লক্ষ্য ক'রে তিনি সানুনয়ে বললেন, এই অল্প বয়সে, প্রথম যৌবনে, কেন তুমি কাশীযাত্রা করছ? আমার সুন্দরী সর্বগুণ-সমন্বিতা কন্যা সাবিত্রীকে তোমার স্ত্রী-রূপে অর্পণ করছি, সে তোমার গৃহে কল্যাণ, শ্রী, সমৃদ্ধি আনবে, তোমার জীবন পরিপূর্ণ করবে। অতএব কাশীযাত্রায় বিরত হও। আমার কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক'রে গার্হস্থ্যধর্ম পালন কর।

বলা বাহুল্য, বর নিরস্ত হ'ল। এবার তাকে নিয়ে আসা হ'ল বিবাহ-বাসরে। এখন যে উৎসব তার নাম 'জনবাসম্'। রামসুব্রাহ্মনিয়ম একগাদা খড়ের ওপর বসলেন। তাঁর কোলে বসান হ'ল বধূবেশী সাবিত্রীকে। অন্যদিকে বর। পুরোহিতগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলেন। বর বধূকে দেখল। সাবিত্রী মাথা নীচু ক'রে রইল। অভিভাবকগণ তাকে অন্তত একবার সম্মুখে-স্থাপিত বড় আয়নায় তাকাতে আদেশ দিলেন, যার বুকে তার স্বামীর প্রতিচ্ছবি। সাবিত্রী সবাইকে অবাক্ ক'রে সহজ-সরল দৃষ্টিতে আয়নায় চেয়ে দেখল। আবছা, অস্পষ্ট এক পুরুষ-মূর্তি ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়ল না। সে আবার তাকাল। এবার দেখতে পেল মুণ্ডিত-মস্তক কৃশকায় কৃষ্ণবর্ণ একটি তরুণ যুবক মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছে। কামান মাথার মধ্যস্থলে নাতিবৃহৎ 'কুড়ুমাই'; নগ্নদেহে শুভ্র 'পুনল'। তার মুখ না দেখতে পেয়ে সাবিত্রীর তৃপ্তি হ'ল না। আয়না ত্যাগ ক'রে এবার সে সোজা তাকাল যুবকের মুখে। বৃদ্ধরা রুদ্ধশ্বাস হলেন, বৃদ্ধারা হা হা ক'রে উঠলেন, পুরোহিতরা স্তম্ভিত হয়ে মন্ত্র পাঠ বন্ধ করলেন। বিব্রত রামসুব্রাহ্মনিয়ম ধমকে উঠলেন। তখন সাবিত্রীর খেয়াল হ'ল অনুচিত সে কিছু ক'রে ফেলেছে। লজ্জায় দুঃখে মাটির সঙ্গে মিশে গেল সে।

দু'পাঁচ মিনিট পরে গোলমাল অনেকখানি ক্ষান্ত হ'ল। বরের ভগিনী সাবিত্রীর গলায় তিন-লহর 'মঙ্গলসূত্রম্' পরিয়ে দিল। বিবাহের আসল অনুষ্ঠান। পুরোহিত-গণ মন্ত্রপাঠ করলেন। সাবিত্রী বরের সঙ্গে সপ্তপদী হ'ল, দু'জনে একসঙ্গে অরুন্ধতী নক্ষত্র দর্শন করল। দেড় ঘণ্টায় বিবাহের এই প্রধান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার নিয়ম। তাই এর নাম নালাংগু।

কুমারী সাবিত্রী স্ত্রী হ'ল। ছিল মাদুরাই রামসুব্রাহ-মনিয়মের কনিষ্ঠা কন্যা। হ'ল ত্তিরুভালুর রামনাথম্ কৃষ্ণস্বামীর তৃতীয়া পুত্রবধূ। ত্তিরুভালুর কৃষ্ণস্বামী সুন্দরমের পত্নী।

এর পরেও তিন দিন ধ'রে বিবাহ উৎসব চলল। 'আশীর্বাদম্' ও 'পালিকাই' হয়ে পঞ্চম দিনে উৎসব শেষ হ'লে বরপক্ষ বিদায় নিলেন। সাবিত্রী রয়ে গেল পিতৃ-গৃহে। রজস্বলা হবার পর তার 'তেরাক্কী' হবে। 'শান্তি কল্যাণম্' অনুষ্ঠান ক'রে সে যাবে পতিগৃহে।

তিপান্ন বছরের ব্যবধানেও সাবিত্রী আম্মার সে উৎসবের কথা পরিষ্কার মনে আছে। সুদীর্ঘ অতীতের ঘটনাবহুল ইতিহাসের অলিখিত পাতা দ্রুত উলটিয়ে অলস অবসরে কল্পনার পথে বার বার তিনি দশ বছরের বালিকা বধূ সাবিত্রীর কাছে ফিরে যেতে চান। অনেক সময় যাত্রা তাঁর ব্যাহত হয়। দেখেন, রাস্তা নেই, অথবা অতীতের অন্য কোনও ঘটনা হঠাৎ মনে এসে জুড়ে বসে। কিন্তু মাঝে-মধ্যে এখনও রাস্তা তিনি পান, সেই বিগত শতাব্দীর শেষ প্রান্তের মাদুরাই, মীনাক্ষী-মূর্তির দিকে অপলকদৃষ্টি ছোট একটি মেয়ে, একদিন মহাসমারোহে তার বিবাহ।

বিবাহ কথাটা মনে উঠতে হাসি পায় সাবিত্রী আম্মার —পরবর্তী জীবনে বারম্বার তাঁকে শুনতে হয়েছিল, বিবাহ-বাসরে নির্লজ্জ স্পর্ধার সঙ্গে বরের মুখে তাকাবার মুহূর্তে অপদেবতার অভিশাপ তাঁর ওপর নেমে এসেছিল।

সাবিত্রী আম্মা মাঝে মাঝে বিবাহ-বাসরের সাবিত্রীকে খুঁজে বার ক'রে প্রশ্ন করেন, "এমন অসভ্য, বেহায়ার মত তাকিয়েছিলে কেন?"

উত্তর শুনতে পায়, আয়নায় দেখতে পেলাম না যে।

প্রশ্ন করেন, দেখবার এমন নির্লজ্জ তাড়া ছিল কিসের? সবুর সইল না।

শুনতে পান, সবাই বললে, দেখ, তাকিয়ে দেখ। দেখতে গেলাম, অমনি সবাই হায় হায় ক'রে উঠল।

প্রশ্ন করেন, দেখতে গিয়েই ত সর্বনাশ করলে।

শুনতে পান, মোটেই নয়। দেখেছিলাম ব'লেই ত তুমি আজও একটু মনে করতে পার।

ঠিক মনে করতে পারেন না সাবিত্রী আম্মা। স্মৃতির

আয়নায় যেটুকু আবছা ছবি অনেক কষ্টে আনতে পারেন, তার মধ্যেও কল্পনার ভেজাল।

বিবাহের পর পিতৃগৃহে বৎসরাধিক কাল সাবিত্রার ভালুই কাটল। নববিবাহিতা কন্যাকে পিসীমারা আদর-যত্নে রাখলেন; শ্বশুরবাড়ীর জন্যে তৈরী করতে লাগলেন —বিয়ের পাঁচ দিন যুবক স্বামার সঙ্গে কয়েকবার সাবিত্রীর সাক্ষাৎ হয়েছে, অথচ কোন বাক্যালাপ হয় নি, যার সঙ্গে একত্র সে পুরোহিত-উচ্চারিত মন্ত্র পাঠ করেছে, সপ্তপদী হয়েছে, বহুবিধ স্ত্রী-আচারে বারম্বার যার অঙ্গ তার দেহ স্পর্শ করেছে, যার সঙ্গে বেশ কিছুটা হেঁটে মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম করতে হয়েছে, একত্র খেতে হয়েছে মীনাক্ষী-মন্দিরে, তার স্মৃতি সাবিত্রীকে অবর্ণনীয় কমনীয়তায় আরও সুন্দর ক'রে তুলেছিল। দৈনন্দিন জীবনের আনাচে-কানাচে আশ্চর্য বিস্ময়কর আনন্দের অপূর্ব অনুভূতিতে সাবিত্রীর অন্তর উদ্বেলিত হ'ত। সে লোকটি কে, কেমন, না জেনেও, অপরিচয়ের দূরত্ব আপনা হতেই অনেকখানি অপসৃত হয়েছিল। সাবিত্রী সংগোপনে নিজেকে স্ত্রী-ভূমিকার জন্যে তৈরী করেছিল। সন্ধ্যায় মীনাক্ষী-মন্দিরে সুন্দরেশ্বরের মূর্তির পানে তাকিয়ে দেহে তার পুলক লাগত; মীনাক্ষীর বিলোলবিহ্বল হাসির রহস্য তার কাছে অনেকখানি খুলে যেত।

রামসুব্রাহ্মনিয়ম এ কন্যাকে শ্বশুরবাড়া পাঠাবার আগে বিবাহিত জীবনের ন্যায়-নীতি সযত্নে শেখাতে শুরু করলেন। প্রতি রাত্রে সাবিত্রীকে কাছে ডেকে তিনি শাস্ত্র পাঠ করতেন; স্বামী ও শ্বশুরালয়ের প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য বুঝিয়ে দিতেন। মহাভারতের সাবিত্রী সত্যবান্ কাহিনী বার বার তিনি কেন পাঠ করতেন সে দিনের অনেক পরে সাবিত্রী তা বুঝতে পেরেছিল। তখন বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বাবার ছোটখাট গোলগাল শরীরের দিকে তাকিয়ে (মুখের পানে তাকাতে তার লজ্জা হ'ত) সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনত, মহাভারতের সাবিত্রী বলবীর্যশালী শতপুত্র বরলাভের বর পেয়ে যমকে পুনরায় বলছেন, "হে মানদ, যে বর তুমি আমাকে দিয়েছ তা আমার পুণ্যবলেই সম্ভব হয়েছে: সেই পুণ্যবলে আমি আবার বর ভিক্ষা করছি, সত্যবান্ জীবনলাভ করুন, পতি বিনা আমি মৃতুতুল্যা। পতিহীন হয়ে কোনও সুখ আমি চাই নে, স্বর্গ চাই নে, প্রিয়বস্তু চাই নে, জীবন চাই নে। তুমি আমায় শতপুত্রের বর দিয়েছ, অথচ আমার স্বামীকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছ। তোমার নিজের বাক্যকে সত্যেপরিণত করতে হলে সত্যবানের বেঁচে ওঠা দরকার —সেই বর আমি তোমার কাছে চাচ্ছি।" বাবা যখন সংস্কৃত শ্লোক পাঠ ক'রে সাবিত্রীর শেস বর কামনা বুঝিয়ে দিতেন, গৌর মুখখানা তার উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, যমের শেষ উত্তর নিজেই মনে মনে সে আবৃত্তি করত, সাবিত্রী, তোমার পতিকে মুক্তি দিলাম, ইনি নীরোগ, বলবান্ ও সফলকাম হবেন, চার শত বৎসর তোমার সঙ্গে জীবিত থাকবেন, যজ্ঞ ও ধর্মকার্য ক'রে যশস্বী হবেন।

তিপ্পান্ন বছর আগে তামিলনাদে দ্রাবিড় সংস্কৃতি ও দর্শনের চর্চা বেশি ছিল না; সংস্কৃত চর্চারই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু তামিল ভাষাও ছিল সংস্কৃতবহুল। রামসুব্রাহ্মনিয়ম দ্রাবিড় দর্শনেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। 'কুরল' অর্থাৎ দু'লাইনের কবিতায় যে বিরাট্ প্রাচীন দ্রাবিড় সাহিত্য তালপাতার পুঁথিতে বন্দী, তার অনেকগুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। 'থিরুকুরল' তাঁর ভাল পড়া ছিল, মনুসংহিতার মতই তিনি তাকে শ্রদ্ধা করতেন। থিরুকুরল কোনও ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়; দ্রাবিড় সাধক ও সমাজনেতাদের জ্ঞানের নির্য্যাস। দু'লাইনের এক-একটি কণিকায় জীবনবেদের সহজ সরল নির্দেশ। রাজা থেকে সাধারণ মানুষ, প্রত্যেকের নীতি, ন্যায়, জীবন-বিধান থিরুকুরলে বর্ণিত। রামসুব্রাহ্মনিয়ম সাবিত্রীর কাছে নিয়মিত থিরুকুরল পাঠ করতেন; ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন তার তাৎপর্য।

থিরুকুরলের যে অংশে স্ত্রী-ধর্ম, প্রেম, ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, ইত্যাদি গার্হস্থ্য-জীবনের নিত্যকার কর্তব্য নির্দেশিত, রামসুব্রাহ্মনিয়ম সেগুলি সাবিত্রীকে বিশেষ ক'রে শোনাতেন। কবিতা আবৃত্তি ক'রে বুঝিয়ে দিতেন; যে নারী সুগৃহিণী, যে স্বামীর সম্পত্তিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে, সেই সার্থক স্ত্রী: সুগৃহিণী না হ'লে তার অন্য সমস্ত গুণ ব্যর্থ; স্ত্রী যদি ধর্মপ্রাণ', গুণান্বিতা হয়, স্বামীর কোনও অভাব থাকে না; স্ত্রী নির্গুণ, অধার্মিক হ'লে স্বামীর ভাগ্য সর্বদা অপ্রসন্ন। একটু থেমে রামসুব্রাহ্মনিয়ম পাঠ করতেন: 'পেন্নিন পেরেন্তাকা ইয়াওলা কাপ্পু, ইন্নম তিন্ময় উণ্ডাহ্পেরিন'—স্ত্রী যদি স্থিরবুদ্ধি ও সতী হয় তার চেয়ে বড় গুণ আর তার দরকার নেই। প্রেম সম্বন্ধে কন্যাকে শিক্ষা দিতেন রামসুব্রাহ্মনিয়ম (আজ সাবিত্রী আম্মার সে কথা স্মরণে হাসি পায়) থিরুকুরল থেকে। পবিত্র প্রেম কোনও বাধা মানে না। প্রেমের অভাব মানুষকে নিঃস্ব, স্বার্থপর করে। ভালবাসলে মনে হয় তোমার অস্থিগুলি পর্যন্ত অন্যের। পবিত্র প্রেম সুস্থ কামনার সৃষ্টি করে। প্রেমজাত সুস্থ কাম স্বামী-স্ত্রীর জীবনে নির্মল, সুস্থির বন্ধুত্ব এনে দেয়। জীবনের পূর্ণ আস্বাদ পেতে হ'লে প্রেম চাই। কেননা,

আনৃবিন্ ওয়াঝিয়াড্ উয়র বিলাই, আঘদ্ ইলারকৃ এনবু তোল পোর্ত্তউড়াম্বু: শরীরে যে আত্মার বাস, তিনি আসেন প্রেমের পথে: যার অন্তরে প্রেম নেই, তার দেহ আত্মাহীন, অস্থি-চর্মসার।

সাবিত্রী আম্মার এখনও রামসুব্রাহ্মনিয়মের সন্ধ্যা-দীপালোকিত মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দেখতে পান, ব্যথিত দৃষ্টিতে বাবা তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। সাবিত্রী আম্মার চোখ জ্বালা করে।

বিবাহের তের মাস পরে সাবিত্রী রজস্বলা হ'ল। কোট্টায়মে শ্বশুরবাড়ী খবর গেল। রামসুব্রাহ্মনিয়ম সাবিত্রীর পতিগৃহ-যাত্রার জন্যে তৈরী হ'লেন। কিছুদিন তিনি ভুগছেন; শরীর ভেঙ্গে আসছিল। এবার তিনি নিশ্চিন্ত হবার আশু সম্ভাবনায় সুখী হ'লেন।

সাবিত্রীর দেহে অপূর্ব পরিবর্তন এল। গৌরবর্ণ সোনালী আভায় হেম। আয়ত কালো চোখে নারীত্বের রহস্য ছায়া ফেলল। দেহ পূর্ণতার ছোঁওয়া পেল। গতি ছন্দোময়, মন্দ-তাল হ'ল। তারও বেশী পরিবর্তন এল তার মনে। একদিকে গাঢ় শান্তি, অন্যদিকে জটিল অস্থিরতা; দীর্ঘ-প্রতীক্ষা-শেষের ব্যাকুলতার সঙ্গে আরও অনেক প্রতীক্ষার উদাস প্রস্তুতি।

এই সময় সাবিত্রীর পতি-গৃহে যাত্রার ঠিক আট দিন আগে, মাদ্রাজ থেকে তিরুভালুর ফিরবার পথে, ট্রেন-দুর্ঘটনায় সুন্দরম্ নিহত হ'ল।

সাবিত্রী আম্মা এখনও স্মৃতির পর্দায়, জীবনের অন্ধকারে, হাতড়ে বেড়ান; যেমন বেড়িয়েছিলেন তিপ্পান্ন বছর আগে, এ দুর্জ্ঞেয় রহস্যের দুর্ভেদ্য নীরবতা ভেদ করবার ব্যর্থ প্রয়াসে। বুঝতে পারেন না, এ রকম কেন হ'ল, কি প্রয়োজন ছিল, না হলে কার কি বিরাট ক্ষতি হ'ত। বারো বছরের একটি মেয়ের জীবনে নির্দয় ভূ-কম্প বিধান ক'রে বিধাতার কোন্ মহান্ উদ্দেশ্য সাধিত হ'ল? যে স্বামীকে সাবিত্রী দশ ভাগ মানুষ ও নব্বুই ভাগ কল্পনা দিয়ে তের মাস ধ'রে গোপন যত্নে গ'ড়ে তুলেছিল, তার মৃত্যু-সংবাদে সেই সুদূর অতীতে সে যেমন নিশ্চল, নির্বুদ্ধি, নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল, আজও সে দুর্ঘটনার কথা মনে হ'লে সাবিত্রী আম্মা প্রায় তাই হয়ে যান। তাঁর তেষট্টি বছরের দেহ-মনের গোপনতম গুহায় চরম-কঠিন দুর্ভাগ্যের হঠাৎ আক্রমণে নির্দারুণ আহত বারো বছরের সদ্য-বিধবা সাবিত্রী এখনও বেঁচে আছে। পরবর্তী জীবনের বিচিত্র ঘটনা-বহুলতা তাকে সরাতে বা লুপ্ত করতে পারে নি। তার কাছে যমরাজ কোনওদিন এসে দাঁড়ান নি, কোনও বর-ভিক্ষার সুযোগ সে পায় নি।

এর পরের কয়েক বছর একটানা অন্ধকার। সাবিত্রী আম্মা সে কথা ভাবলে আজও শিউরে ওঠেন। বিবাহ ও 'তেরাক্কী'র মাঝখানে স্বামীর মৃত্যু কন্যার দুর্ভাগ্যের চরম প্রমাণ। এমনিতেই সেকালে তামিল সমাজে বিধবার কোন সম্মান ছিল না; সাবিত্রী, তার ওপর, মূর্তিমতী দুর্ভাগ্য। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা জানিয়ে দিলেন, এ বিধবাকে ঘরে নেবার কোনও ইচ্ছে তাঁদের নেই। শুধু তাই নয়, একজন ব্রাহ্মণের হাতে যৌতুক-স্বরূপ রামসুব্রাহ্মনিয়ম যে তিন হাজার টাকা দিয়েছিলেন তাও ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। পিতৃদত্ত গহনা সাবিত্রীর সঙ্গেই ছিল। রোগক্লিষ্ট রামসুব্রাহ্মনিয়ম পর্যন্ত বীতরাগ হয়ে উঠলেন। কখনও তিনি সাবিত্রীকে কাছে ডাকতেন না, সে কাছে এলেও নির্বাক্ থাকতেন। তার দিকে চেয়েও দেখতেন না। পিসীদের কাছে দিনরাত সাবিত্রী দুর্ভাগ্যের জন্যে গালমন্দ শুনত। বিধবা হবার সঙ্গে সঙ্গে তার চুল কেটে ছোট ক'রে দেওয়া হয়েছিল; থান কাপড় পরতে হ'ত; গায়ে জামা পরতে দেওয়া হ'ত না। একবেলা আহার করত সে; মাসে অন্তত চার-পাঁচ দিন উপবাস।

এক বছর পর রামসুব্রাহ্মনিয়ম মারা গেলেন। সাবিত্রীর চোখে যেটুকু সামান্য আলো ছিল তাও এবার নিবল।

পিতার শ্রাদ্ধাদি কর্ম উপলক্ষ্যে দু' ভাই মাদুরাই এল। একজন বোম্বাই থেকে, অন্য জন কলকাতা। ক্রিয়াকর্ম শেষ হ'লে দু'জনকে একদিন অপরাহ্নে একত্র দেখতে পেয়ে সাবিত্রী এসে কাছে দাঁড়াল।

"আমার কিছু কথা আছে আপনাদের সঙ্গে।"

দুই ভাই বিস্মিত জিজ্ঞাসায় তার মুখের দিকে তাকাল।

"আমার জীবন কি এমনি কাটবে?"

হঠাৎ তাদের মুখে কথা জোগাল না। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বড় ভাই বলল, "উপায় কি?"

"এমনি আমি জীবন কাটাতে পারব না।" সাবিত্রীর কণ্ঠস্বর মৃদু হলেও তাতে দৃঢ়তার সুস্পষ্ট ঝংকার ছিল।

"না পেরে কি করবে? পারতেই হবে," বড় ভাই বলল।

"অসম্ভব।" সাবিত্রীর চোখে মরুর অনন্ত শূন্যতা।

"তার মানে?" বড় ভাই এবার রেগে উঠল। "তার মানে কি? তোমার দুর্ভাগ্যের জন্যে তুমিই দায়ী।

যতটা করা সম্ভব বাবা তোমার জন্যে সব ক'রে গেছেন। এখন আর কিছু করার নেই।"

সাবিত্রী আস্তে জবাব দিল, "আছে।"

"আছে? কি আছে? কোথায় আছে?"

"আমি পড়ব।"

"পড়বে?" আশ্চর্য হ'ল বড় ভাই। "এটা কি কলকাতা পেয়েছ? এ মাদ্রাজ! এখানে স্ত্রী-শিক্ষার চল নেই। তাছাড়া, তুমি কোথায় পড়বে, কেমন ক'রে পড়বে?"

"তা জানি না। কিন্তু পড়তে আমাকে হবেই। শুধু তাই নয়। আমি চাকরি করব।"

ছোট ভাই এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। কলকাতায় তখন স্ত্রী-শিক্ষা বেশ প্রচলিত; সমাজসংস্কারও অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তার প্রভাব সে একেবারে এড়াতে পারে নি। কিন্তু সাবিত্রী চাকরি করবে এমন দুঃসাহসী প্রস্তাব সেও কল্পনা করতে পারে নি। দু'জনেই এবার একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল। ওসব উদ্ভট অকল্যাণকর কথাবার্তা সাবিত্রী কদাচ যেন না উচ্চারণ করে। তার মাথায় শয়তানের বাস। দুর্ভাগ্য তার চিরসহচর। যদি সে কঠিন ভাবে নিজেকে শাসন না করে তাহলে সে সমস্ত পরিবারের মুখে কালি দেবে। তার পরিণাম ভয়ংকর হবে। পরিবারের নাম ডোবালে তারা চুপ ক'রে থাকবে না। কঠোর শাস্তি পেতে হবে সাবিত্রীকে।

এত ধমকে, শাসানিতে সাবিত্রী ভয় পেল না।

"বাবা আমার নামে তিন হাজার টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন। সেটা কি আছে?"

টাকা! কিসের টাকা?—দু'ভাই একসঙ্গে অবাক্ হ'ল—এসব কথা তাকে কে বলেছে? বাবা কোনও টাকা তার নামে রাখেন নি।

"রেখেছিলেন," সাবিত্রী বলল। "আমি জানি। তা কি আছে?"

"তোমার নামে কোনও টাকা নেই।"

"আমার গহনা?"

"তাতে তোমার কোন অধিকার নেই।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সাবিত্রী। রাগল না, কাঁদল না, কাঁপল না।

তার পর বলল, "আমার টাকা, গহনা, সব আপনারা মেরে দিয়েছেন। আমি ওসব কিছু চাই নে। ও ছাড়াই আমার চলবে। আপনারা দু'জনেই এ সপ্তাহে চ'লে যাচ্ছেন। আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি, এ ভাবে আমি বাঁচব না। আমি পড়ব। কাজ করব।"

ব'লে, যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করল।

এ ঘটনায় বাড়ীতে তুমুল ঝড় উঠল। তার নিষ্ঠুর তাড়না সাবিত্রী নীরবে বহন করল। সে ঝড়ের কুৎসিত হাওয়া প্রতিবেশী, আত্মীয়মহলে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। তাতেও সাবিত্রী বিচলিত হ'ল না।

প্রথমে বড় ভাই বোম্বাই রওয়ানা হ'ল।

দু'দিন পর ছোট ভাই কলকাতা যাবে। যাত্রার আগের দিন সে সাবিত্রীকে ডেকে বলল, "তোমার মৎলব কি?"

"পড়ব। কাজ করব।"

"কোথায় পড়বি?"

"ভাবছি।"

"এখানে কিন্তু হবে না।"

"জানি।"

"কলকাতা যাবি?"

চুপ ক'রে রইল সাবিত্রী।

"ওখানে মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে।"

"আপনি নিয়ে যাবেন?"

"তোর বৌঠানকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখি।"

"তিনি রাজী হবেন না।"

"সেখানেই তো বিপদ্। নইলে—"

"দরকার নেই। আমি নিজেই কিছু একটা করব।"

"কি করবি?" অগ্রজের কণ্ঠে আতঙ্ক।

"পড়ার ব্যবস্থা।"

"বিপদে পড়বি।"

"এর চেয়ে বড় বিপদে পড়ব না।"

ভাই চুপ ক'রে গেল। সাবিত্রী চ'লে যাচ্ছিল, সে ডাকল।

"শোন্।"

সাবিত্রী দাঁড়াল।

"বাবা তোর নামে তিন হাজার টাকা ঠিকই রেখেছিলেন।"

সাবিত্রী কিছু বলল না।

"সে টাকা তুই পাবি নে।"

"আপনারা মেরে দিয়েছেন," দাঁতে দাঁত চেপে আস্তে বলল সাবিত্রী।

"আমি তোকে কিছু টাকা দিতে পারি।"

"কত?"

"শ' খানেক।"

সাবিত্রী বলল, "চাই নে।"

রাত্রের ট্রেন ধ'রে বার বছরের সাবিত্রী যখন মাদ্রাজ শহরে পৌছল তখন সবেমাত্র প্রভাত হয়েছে। স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ল সে। বুক কাঁপছে। কিন্তু মুখে শঙ্কা বা ভয়ের চিহ্ন নেই।

সন্দেহের চোখে গাড়োয়ান তাকে দেখছিল। গন্তব্য-স্থান জানতে চাইলে।

স্থিরকণ্ঠে সাবিত্রী বলল, "আডিয়ার।"

স্টেশন থেকে অনেকখানি দূর। ছায়াশীতল মাদ্রাজ শহরের রাজপথে চলল ঘোড়ার গাড়ী; অদূরে সমুদ্রের গর্জন। নিজের বুকের মধ্যে আরও বিরাট্ সমুদ্র উন্মত্ত তাণ্ডবে নাচছে, সাবিত্রী বঙ্গোপসাগরের গর্জন শুনতে পেল না। মাউন্ট রোড ধ'রে গাড়ী চলেছে, পথের যেন আর শেষ নেই। যেন এক যুগ পরে আডিয়ার নদী পার হবার আগে গাড়োয়ান প্রশ্ন করল, কোথায় যাবেন?

সাবিত্রী শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিল, এ্যানি বেসান্তের কাছে।

গাড়ী এসে থামল থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির উদ্যান-ঘেরা বাড়ীর দরজায়। সাবিত্রী গাড়োয়ানকে প্রাপ্যের চেয়ে বেশি টাকা দিল।

প্রভাতের সূর্য তখন বাগানের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশ ঘন নীল। নীরব উদ্যানে পাখীর সমবেত কূজন। সাবিত্রী বুকের কাঁপুনি দু'বাহুর চাপে বন্ধ করতে চাইল। বিবশ পা কিছুতেই টেনে দরজার ভেতর নিতে পারল না। দরজার সামনে বাঁধান কালভার্টে ব'সে পড়ল।

বুড়ো এক মালী কাজ করছিল বাগানে। সে এসে দাঁড়াল পাশে। অনেকক্ষণ অগোপন কৌতূহলে সাবিত্রীকে সে দেখল। তারপর প্রশ্ন করল, কি চাই।

"অ্যানি বেসান্তকে," ভয়ে ভয়ে বলল সাবিত্রী।

বুড়ো কি যেন বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। সাবিত্রী তার দৃষ্টিপথ অনুসরণ ক'রে দেখতে পেল অপূর্ব সুন্দরী শ্বেতচর্মা বৃদ্ধা দরজার দিকে এগিয়ে আসছেন। মাথার চুল সাদা, পরণে ঝুল ঝুল গাউন, চোখে চশমা। সঙ্গে তাঁর একুশ-বাইশ বছরের একটি যুবক।

বুড়ো মালী চটপট বাগানে অন্তর্হিত হ'ল।

অ্যানি বেসান্ত দরজার সামনে এসে তাকে দেখতে পেলেন। সাবিত্রী কাঁপতে কাঁপতে তাঁর সম্মুখে নিজেকে টেনে আনল।

"কে তুমি?" মিষ্টি গলায় শুধালেন অ্যানি বেসান্ত।

"আমার নাম সাবিত্রী।" যেটুকু ইংরেজী বাবার কাছে শিখেছিল তার প্রথম ব্যবহার করল সাবিত্রী।

"কি চাও তুমি?"

এবার তামিল ভাষায় সাবিত্রী ব'লে গেল, "আমি মাদুরাই থেকে আপনার কাছে এসেছি। আমার স্বামী মারা গেছেন। আমি বিধবা। আমার বাবা নেই। ভাইদের ঘরে আমার স্থান নেই। আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই।"

অ্যানি বেসান্ত ছেলেটির দিকে তাকালেন। সে ইংরেজীতে তাঁকে কি সব বলল।

অ্যানি বেসান্ত প্রশ্ন করলেন, "তুমি কি করতে চাও?"

সাবিত্রী নিজেই এবার বলতে পারল, "আমি পড়তে চাই।"

অ্যানি বেসান্ত গম্ভীর হলেন। চিন্তা করলেন। সাবিত্রী আর্ত প্রতীক্ষায় তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। বাছুর যেমন তাকিয়ে থাকে গোয়ালার দিকে, যার হাতে মা তার বন্দী।

অ্যানি বেসান্ত ছেলেটিকে বললেন, "ধর্মরাজ, একে ভেতরে নিয়ে যাও। পরে আমি ওর সব কথা শুনব। স্নান সেরে, আহার ক'রে ও এখন বিশ্রাম করুক।"

যুবকটি সাবিত্রীকে বলল, "আমার সঙ্গে এসো।"

নম্র পদে, ক্লান্ত দেহে, তপ্ত অন্তরে সাবিত্রী নতুন জীবনে পা দিল।

ক্রমশঃ

রবীন্দ্রতাল

শ্রীযুক্ত প্রবাসী সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু।

মান্যবরেষু,

আপনার পত্রিকার গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়ের "রবীন্দ্রতাল" নামক প্রবন্ধটিতে তিনি লিখিয়াছেন, "ভারতীয় সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অবদান তাঁর নূতন তাল রচনা। তবলা ও পাখোয়াজের জন্য তিনি কয়েকটি অভূতপূর্ব তাল সৃষ্টি করে গিয়েছেন— তাদের নূতন নামও দিয়েছেন তিনি।"

কিন্তু তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারিতেছি না। আশা করি, আপনার পত্রিকায় আমার নিম্নের বক্তব্য প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন :

১। দক্ষিণ ভারতীয় ও বাংলা দেশের কীর্তনের তালগুলিকে বাদ দিয়াও দেখিতে পাই যে, প্রবন্ধকার মহাশয় বর্ণিত তালগুলির অনুরূপ ছন্দযুক্ত তাল উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতেও প্রচলিত ছিল—অবশ্য অন্য নামে। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে কীর্তনের সুরের প্রভূত প্রভাব সত্ত্বেও কীর্তনে ব্যবহৃত অসংখ্য ও বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ তালের মধ্যে কেবলমাত্র 'লোফা' (তবলার 'দাদরা') এবং চঞ্চুপুট (তবলার 'কাহারবা') ব্যতীত অন্য কোনও তাল ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া জানি না। ইহা সত্যই বিস্ময়কর। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, একই মাত্রা সংখ্যার বিভিন্ন পদবিভাগ যুক্ত বিভিন্ন নামের তালের পরিচয় প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রে পাওয়া যায়। নিম্নে প্রবন্ধকার মহাশয় বর্ণিত তালগুলির নামের পার্শ্বে অনুরূপ ছন্দযুক্ত প্রাচীন তালসমূহের নাম দেওয়া হইল :

রবীন্দ্রনাথের "নূতন সৃষ্ট" বলিয়া কথিত তাল	পদ বিভাগ	প্রাচীন তালের নাম
ষষ্ঠী	২।৪ মাত্রা	কায়েদ
রূপকড়া	৩।২।৩ মাত্রা	অহং
নবতাল	৩।২।২।২ মাত্রা	নওহকুকা
ঝম্পক	৩.২।৩।২ মাত্রা	ঝম্পা
একাদশী	৩।২।২।৪ মাত্রা	শঙ্কর
নবপঞ্চক	২।৪।৪।৪।৪ মাত্রা	সরস্বতী

২ (ক)। প্রবন্ধকার মহাশয় বর্ণিত ঠেকাসমূহের রচনা ও বাণী নির্বাচন সম্পর্কেও আমার বক্তব্য আছে। দশ মাত্রাযুক্ত ঝম্পক তাল যখন ৫(৩+২)+৫(৩+২) সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তখন এই তালটির ঠেকায় "খুলি মুদি" করিয়া প্রথম মাত্রায় 'সম' এবং ষষ্ঠ মাত্রায় একটি ফাঁক দেখানো উচিত। তাহাতে ঠেকার চালটি বুঝিবার সুবিধা হয়, অধিকন্তু তাহা আমাদের প্রচলিত সংস্কারের অনুগামীও হয়। তাঁহার বর্ণিত অন্য তাল কয়টি অযুগ্ম সংখ্যা যুক্ত অথবা যুগ্ম সংখ্যার বিষমপদী বলিয়া উহাদের মধ্যে "ফাঁক" অথবা "খুলি মুদির" ভিন্ন ভিন্ন অংশ না থাকিলেও উহাদের চলন বুঝিতে অসুবিধা হয় না। এই তালগুলির ইহাই অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

২ (খ)। পাখোয়াজে ব্যবহৃত ঠেকাসমূহ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, "তেটেকতা গদিঘেনে" যে ঠেকায় যুক্ত হইয়াছে, উহাই ঐ ঠেকার সর্বশেষ বাণী। অবশ্য ২।১টি স্বল্প-ব্যবহৃত বা অপ্রচলিত তালের ঠেকায় ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রবন্ধকার মহাশয় "তেটেকতা গদিঘেনে"র পরও একটি ক্ষেত্রে "ধাগে তেটে" এবং অন্যত্র "ধাগে তেটে তাগে তেটে" ব্যবহার করিয়াছেন। আমার বিবেচনায় ইহাতে ঠেকার সাবলীলতা ও গাম্ভীর্য ব্যাহত হইয়াছে। অধিকন্তু ঠেকাগুলির ভিত্তিও সুদৃঢ় হয় নাই। বাণী নিবাচন প্রসঙ্গে আমি 'রূপকড়া' তালের ঠেকা সম্পর্কেও জানাই যে, বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব সঙ্গীতাধ্যাপক পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় রচিত "রূপকড়া"র ঠেকা, যাহা ১৩৩৭ বাং সালের সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা পত্রিকায় ফাল্গুন সংখ্যায় স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রকাশ করেন, তাহা ব্যবহৃত না হইয়া তৎপরিবর্তে একটি উদ্ভট ঠেকা বর্তমান প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। জানি না ঐ প্রবন্ধে বর্ণিত ঠেকাসমূহ কে রচনা করিয়াছেন। প্রবন্ধকার মহাশয় যদি দয়া করিয়া রচয়িতার নামটি জানান সুখী হইব।

৩। 'ঝম্পক' তালের যে "গদের" উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে উহার রচনাভঙ্গি দেখিয়া উহা কোন তবলাশিল্পীর রচিত বলিয়া মনে হয় না। কারণ উহাতে "গদ"-এর সাধারণ সংজ্ঞা পর্যন্ত লঙ্ঘিত হইয়াছে।

৪। প্রবন্ধকার মহাশয় বোলগুলি প্রকাশ করার জন্য কোন প্রকার 'মাত্রালিপি'র অনুসরণ করেন নাই, যাহার ফলে ঐ 'গদ'-এর বাণীগুলির ওজন বোধগম্য হয় নাই। যদিও ঐ বোল কাহারও কোন কাজে লাগার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। কারণ, অপ্রিয় হইলেও বলিতে হয়—উহাকে কোন প্রকার "বোল" আখ্যা দিতে পারা যায় না। দ্বিতীয়ত—রবীন্দ্র-সঙ্গীতে গদ, রেলা বা অন্যান্য অলঙ্কার-পূর্ণ তবলার বোল বাজাইবার সুযোগ নাই বা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কারণ, বোল বাজাইয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বাণীর মাধুর্য হানি ও রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটাইতে যে কোন বাঙ্গালী তবলাশিল্পীর রুচিতে আঘাত লাগিবে।

পরিশেষে প্রবন্ধকার মহাশয় বর্ণিত ঠেকাগুলির পরিবর্তে আমি কয়েকটি ঠেকার উল্লেখ করিতেছি। এই বিশেষ ছন্দের তালগুলি যেমন প্রচলিত কয়েকটি তাল হইতে ২।১ মাত্রা কম বা বেশী করিয়া রচিত হইয়াছে—আমার রচিত ঠেকাগুলি তেমনই ইহাদের নিকটবর্তী মাত্রা সংখ্যাযুক্ত প্রচলিত তাল ভাঙ্গিয়াই করা হইয়াছে। উহা বাজাইতেও অসুবিধা হয় না—করণ উহাদের বন্দেজ আছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা এই ঠেকাগুলি সংস্কার বিমুক্ত হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন—ইহাই আমার আন্তরিক অনুরোধ।

১। রূপকুড়া (৩+২+৩)
+ ২ ৩
ধা | তৃক | ধি ॥ ধাগি | তৃক ॥ তি | তি | না ॥
(পণ্ডিত ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় রচিত)

২। ঝম্পক (৩+২+৩+২)
+ ২ ০ ৩
ধি | ধি | না ॥ ধি | না ॥ তি | তি | না ॥ ধি | না ॥
(ঝাঁপতালের বিপরীত মাত্রাবিন্যাসে গঠিত)

৩। নবতাল (৩+২+২+২)
+ ২ ৩ ৪
ধিন্ | ধিন্ | ধা ॥ কৎ | তিন্ ॥ ধাগে | তেরেকেটে ॥ ধিন্ | ধাধা ॥
(একতাল-এর ঠেকার দ্বিতীয় গদস্থ "ধা | তিন্ | না | " বাদ দিয়া)

৪। একাদশী (৩+২+২+৪) (ক)
+ ২ ৩ ৪
ধা | দিন্ | তা ॥ কৎ | তাগে ॥ দিন্ | তা ॥ তেটে | কতা | গদি | ঘেনে ॥
(চৌতাল-এর প্রথম মাত্রাস্থ "ধা" বাণী বাদ দিয়া)

অথবা

+ ২ ৩ ৪
(খ) ধি | ধি | না ॥ ধি | না ॥ কৎ | তিন্ ॥ ধাগে | তেরেকেটে | ধিন্ | ধাধা ॥
(ঝম্পক-এর প্রথম ৫ মাত্রার সঙ্গে একতাল-এর শেষার্দ্ধের ৬ মাত্রা যুক্ত করিয়া)

নমস্কারান্তে নিবেদন—ইতি, ভবদীয়
শ্রীহরিভূষণ বসু

প্রতিবাদের উত্তর

অসামান্য রবীন্দ্রতাল সম্পর্কে আমার সামান্য রচনা যে প্রতিবাদক মহাশয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে, তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ।

প্রথম অনুচ্ছেদে প্রতিবাদক মহাশয় "রবীন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্ট বলিয়া কথিত তালে"র অনুরূপ ছন্দযুক্ত প্রাচীন তালসমূহের নাম উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ ছন্দবিশিষ্ট তালের অস্তিত্বই রবীন্দ্রনাথের তালসৃজনী প্রতিভাকে অস্বীকার করতে প্রতিবাদক মহাশয়কে কেমন করে উদ্বুদ্ধ করল তা বুঝতে পারলাম না। তোটক ছন্দ ত কত প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান। কিন্তু সেই ছন্দে যে প্রাচীন কবিগণ কাব্য রচনা করেছেন তাঁরা পরবর্তীকালের কবিদের তোটক ছন্দ অবলম্বনের অধিকার কেড়ে নিতে পারেন নি। তাল, তালের ছন্দ, তালের বাণী সব ত এক নয়।

২ (খ) অনুচ্ছেদে প্রতিবাদক মহাশয় রবীন্দ্রতালের ঠেকা কে রচনা করেছেন তা জানতে চেয়েছেন। ঠেকাগুলি শ্রীযুক্তা শেফালিকা শেঠ রচিত 'সঙ্গীত শাস্ত্রকণা'য় নিবদ্ধ হয়েছে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমাজে গ্রন্থটি বহুল-প্রচারিত। ঠেকাগুলি রবীন্দ্রনাথের রচিত বলেই

আমাদের বিশ্বাস। ইহার সহিত প্রতিবাদক মহাশয়ের পরিচয় নেই, তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। "বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি?"

নবতাল ও একাদশী তালের সমালোচনা করতে গিয়ে প্রতিবাদক মহাশয় বলেছেন, 'তেটেকতা গতিঘেনে' প্রত্যেক ঠেকার সর্বশেষ বাণী। রবীন্দ্রতালে 'তেটেকতা গদিঘেনে' পরে নবতালে 'ধাগে তেটে' ও একাদশীতে 'ধাগে তেটে ধগে তেটে' (ধাগে তেটে, তাগে তেটে নয়।) প্রয়োগের বিশেষ নিন্দা করেছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে তিনি দেখতে পেতেন সঙ্গীতাচার্য দুর্গাচরণ বিশ্বাস বর্ণিত শ্রীশেখর নন্দন প্রভৃতি তালে 'তেটেকতা গদিঘেনে'র পরেও বাণী রয়েছে। যথা—

শ্রীশেখর—১১ মাত্রা ৬ তাল ৫ ফাঁক।

	২	৩	০	৪	০	৫
ঠেকা—	ধাধি	থুন্না	কত্তাকে	থুন্না	তেটেকতা	গদিঘেনে

০	০	৬	০	৩	২
কতাকতা	গদিঘেনে	তেটেকতা	গদিঘেনে	তেটেকতা।	ধা

নন্দন—৫ মাত্রা ৩ তাল ২ ফাঁক।

২	৩	০	১	০	২
ধাদিন্	কেটেতাক	তেটেকতা	গদিঘেনে	তেটেকেটে।	ধা

অতএব কারো পক্ষে 'রবীন্দ্রতালে' 'তেটেকতা গদিঘেনে'র পরে বাণী দেখতে পেয়ে বিস্মিত হওয়ার কারণ বুঝতে পারি নি।

২ (ক) ও ৩ অনুচ্ছেদে প্রতিবাদক মহাশয় বাণী প্রকাশের প্রচলিত রীতির অল্প অনুসরণ না দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তার জন্য দুঃখিত।

৪র্থ অনুচ্ছেদে প্রতিবাদক মহাশয় কয়টি নূতন তালের ঠেকা রচনা করে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অভাবনীয় তালসৃজনী প্রতিভার সঙ্গে অন্য কারো তুলনা করতে যাওয়া হাস্যকর। তবে একটা কথা না বলে বক্তব্য শেষ করতে পারা যাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্ট তালের যে সকল নামকরণ করেছেন সে নামগুলি প্রতিবাদক মহাশয় নিঃসঙ্কোচে স্বরচিত তালের নাম হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁর সে অধিকার আছে কি না তা বিচারের ভার পাঠকদের উপর রইল।

শ্রীস্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

পরিক্রমা

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

অন্ধ গলির গুহাবাস ছেড়ে মাঝে মাঝে প্রেম-বিহঙ্গমা
উড়ে যেতে চাও, কোন সে উদাস স্মৃতির আকাশ-পরিক্রমা
লক্ষ্য তোমার ? জানি না, মানি না মুক্তির অভিলাষ
আজীবন শুধু পাঁজর-কাঁপানো ফেলেছি দীর্ঘশ্বাস !

ভুলে গেছি তুমি চেয়েছিলে কিনা মুক্ত জীবন আকাশচারী
কৈলাস-বৈকুণ্ঠ-মানস সরসী বুকের তীর্থ বারি,
চেয়েছিলে কিনা মহাশ্বেতার সুমেরু তুষার পুষ্পলোকে
সুরভি-মদির মত্ত আবেশ সোমপায়ী লঘু নেশার ঝোঁকে ।

অন্ধ গলির দেয়ালে দেয়ালে রুদ্ধ গতির পালক খসা
হে বিহঙ্গমা, স্বপ্নের একি দৈন্য দশা !
অজানা আকাশে মহাপলায়ন লক্ষ্য কোরে
বৃথা যেতে চাও রুক্ষ উদাস আগ্নেয় শ্বাসে বক্ষ ভ'রে !

এখানে মৃত্যু, এখানে ধ্বংস, নক্তন্দিব ব্যর্থ আশা
এখানে করাল দারিদ্র্যে মহানাগরিক প্রাণ কর্মনাশা !
প্রচণ্ড ঝড় যদি ওঠে তার ঝাপ্টা লাগেনা গলির বুকে
এখানে বাতাস খিন্নকণ্ঠ মাথা খুঁড়ে মরে পাংশু মুখে ।

চমকায় বুকে রাঙা বিদ্যুৎ পরিভাষা তার হয় নি লেখা,
উদয় অস্ত এখানে মৌন অনশনে শুধু ধৈর্য শেখা
কি করুণ এই সহিষ্ণুতার শান্তি নীতি
ভাঙা ডানা মেলে হে বিহঙ্গমা পারো কি শোনাতে ঝড়ের গীতি ?

ব্যথায় অন্ধ অবুঝ আকাশে বিরত মানস-পরিক্রমা
দিগন্তে কোন স্বর্ণরেখার সন্ধান দেবে বিহঙ্গমা ?
হারানো প্রেমের প্রতিমার নীলকণ্ঠ-আকাশে আত্মহারা
অসীম রোদনে মনিময় দ্যুতি বিকিরণ করে একটি তারা ।

স্মরণ লোকের অনন্যা সেই তারাটির নাম অশ্রু-স্বাতী
কবি-হৃদয়ের শুক্তির বুকে মুক্তাকলাপে জ্বালায় বাতি !
হে বিহঙ্গমা তুমি জানো তার পলায়নী প্রেম পৃথিবী ছেড়ে
বহু বহু দিন বিদায় নিয়েছে এ তনুমনের শান্তি কেড়ে ।

তবু কেন এই যুগোত্তীর্ণ ধূসর আকাশে পরিক্রমা ?
রাত কেটে যায়, দিন কেটে যায়, জীবনে ঘনায় তামসী অমা ।
মূক বেদনায় তবু চেয়ে থাকি সেই ভাস্বতী তারার দিকে
তোমারি ছিন্ন পালকে বুকের রক্তে ব্যথার কাব্য লিখে ।

অরুন্ধতী

শ্রীশান্তি পাল

হেমন্ত এসেছে দ্বারে,—ডাক্ দেয় আজি,
পরিপক্ক হৈমীশস্য বাতাসেতে দোলে —
সপ্তপর্ণতল শূন্য, রিক্ত ফুলসাজি,
লোধ্রের পরাগ ঝরে কানন-কুন্তলে ।
ছিন্ন মালতীর মালা গড়াগড়ি যায়—
বাজে না কঙ্কণ—কাঞ্চী সান্ধ্য-সরোবরে
অধর-পল্লব টিপি অলক্তক পায়
আর কেহ নাহি আসে গ্রামপথ ধ'রে ।

এই ছাতিমের তল্ বড়ো ভালোবাসি—
এর মাটি, ফুল-ফল, এরি লতাপাতা,
একখানি ক্ষুদ্র মুখ, অশ্রু আর হাসি,
মেদুরমল্লিকাবলী স্বর্ণসূত্রে গাঁথা ।
কোথায় লুকাল সেই মুগ্ধ বনাঙ্গনা,
বিরহ-বিধুর বুকে কে দিবে সান্ত্বনা ?

মনে পড়ে একদিন, অপরাহ্ন-বেলা—
সহসা হেরিয়া মেঘ পশ্চিম-আকাশে
ক'য়েছিল কানে মোর—'করি অবহেলা,
যেয়োনাক' প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে ।
নদী-পথ-যাত্রী একা—রূপসার বাঁকে,
ঝটিকা-আবর্তে পড়ি' ক্ষুদ্র তরীখানি
নিমজ্জিত হ'ল হায় !— পড়িয়া বিপাকে
কোন্ কূলে উঠেছিনু তুমি জানো রাণী ।

সহস্র তারায় ঢাকা সেই গ্রামখানি
শ্যামশস্পে আবরিত কপোতাক্ষ তীরে—
সর্ব্ব-রস-সার যারে তীর্থ ব'লে মানি,
সপ্তঋষি সন্ধ্যা-স্নানে নামে যার নীরে ।
কোথা অরুন্ধতী মোর ? ডাকি নাম ধ'রে
প্রতিধ্বনি ফিরে আসে 'হা—হা' রবে ওরে

আমার ব্যাঘ্র শিকার

শ্রীসুধীরচন্দ্র রাহা

ঘটনাটি সত্য। এই ঘটনার কাহিনী আজকের নয়—অন্ততঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। তখন আমার বয়স পনের কি ষোল—মালদহ শহরে হাই স্কুলে পড়ি। এখন মালদহ শহরের বহু উন্নতি হইয়াছে। ইলেকট্রিক আলো, পিচের রাস্তা, কলেজ, অনেক স্কুল, সিনেমা প্রভৃতিতে শহর এখন জমজমাট আর জনসংখ্যাও যথেষ্ট। তখন এইরকম ছিল না—কিন্তু খাঁটি-সুখ ছিল। সে যাহা হউক, এখন আমার ব্যাঘ্র শিকারের কথাই বলি।

প্রাণী জগতের মধ্যে বাঘ যে ভীষণ হিংস্র আর সাংঘাতিক জানোয়ার, এ কথা কাউকে না বলিলেও চলে। কিন্তু তখন কেন যে আমার ঐ হিংস্র জন্তুটি শিকার করার দিকে খেয়াল হইয়াছিল, তাহা জানি না। তবে মনে হয়, সেই সময় কোন এক শিকারী গৌড় হইতে মস্ত এক বাঘ শিকার করিয়া শহরে আনিয়াছিল। সেই শিকারী রাতারাতি বিখ্যাত হইয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই শিকারীর নাম আর স্মরণ নাই। বোধ করি আমার অজ্ঞাত মনে ঐ শিকারীর মত রাতারাতি বিখ্যাত হইবার বাসনায় আমারও ব্যাঘ্র শিকার করিবার দুর্নিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু ইচ্ছা হইলেই ত বাঘ শিকার করা যায় না। বাঘ শিকার করা যে কত দুঃসাধ্য ব্যাপার, সে সম্বন্ধে তখন আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। ভাবিয়াছিলাম, বনে যাইলেই বাঘকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিতে পাইব—আর আমি গুলী ছুঁড়িয়া এক গুলীতেই খতম করিব। সে যাই হউক, আমার বেশ মনে আছে, ঐ বাঘ শিকার করিবার খেয়াল চাপার জন্য স্কুলের পড়া-শুনা দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য দিতে পারি নাই। শুধু আমার দিনরাতের একমাত্র চিন্তা ছিল বাঘ শিকারের কথা। মনে মনে স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছিলাম। মালদহ শহর হইতে গৌড় প্রায় কুড়ি-বাইশ মাইল। তখন শহরে মোটর বা মোটর বাস ছিল না। হয় হাঁটিয়া যাইতে হইবে অথবা সাইকেলে যাইতে হইবে। সাইকেল যোগাড় করা শক্ত নয় আর সাইকেলে যাওয়াই সবচেয়ে সুবিধা। কিন্তু একা একা ত শিকার হয় না—অন্ততঃ তিন-চার জন সঙ্গী দরকার। বেশী সঙ্গী যোগাড় করিতে যাইলে পাছে লোক জানাজানি হয়, সে ভয়ও ছিল। বন্দুক পাওয়ার কোন অসুবিধা ছিল না। আমারই সহপাঠী রমাপ্রসাদের দাদার বন্দুক ছিল। আমার লক্ষ্য ছিল সেই বন্দুকটির উপর। রমাকে শিকারের লোভ ও ভালমন্দ খাওয়ার লোভ দেখাইয়া তাতাইয়া তাতাইয়া ঠিক করিতে পারিব, সে বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

আর একটি সঙ্গীকে আমার লইতেই হইয়াছিল—সে অক্ষয়। অক্ষয় আমার পাড়ার ছেলে। সেও আমাদের স্কুলে পড়িত। কয়েক বৎসর হইতে ষষ্ঠ শ্রেণীতে বেশ কায়েম ভাবে আছে। দেখিয়া মনে হয় অনন্ত কাল সে ঐ শ্রেণীতেই থাকিতে ইচ্ছুক। সারা শীতকাল একটা পা পর্য্যন্ত লম্বা অলষ্টার সর্ব্বক্ষণ গায়ে দিয়া থাকিত, স্নান করিত কিনা সন্দেহ। শীতের ভয়ে বোধ করি সপ্তাহে একদিন স্নান করিত। সকাল হইলেই বাড়ী হইতে সেই মার্কামারা অলষ্টার গায়ে চাপাইয়া আর একজোড়া ছেঁড়া চটি—চটর-পটর করিতে করিতে সারা পাড়া টহল দিত। পাড়ার প্রতি বাড়ীতে পাতান মাসী-পিসির অভাব ছিল না। যে-কোন একটি বাড়ীতে ঢুকিয়া মাসিমা বলিয়া হাঁক দিয়া অক্ষয় রোয়াকে বসিত। তাহার জন্য বরাদ্দ—চা মুড়ি বা রুটি ঠিক করাই থাকিত। সেগুলি খাইতে খাইতে এটা-সেটা গল্প করিয়া নানা সংবাদ সরবরাহ করিয়া ও সংগ্রহ করিয়া উঠিয়া পড়িত। বেশীক্ষণ এক বাড়ীতে থাকিবার সময় কোথায়। এখনও বহু বাড়ীতে তাহাকে হাজিরা দিতে হইবে। কাহার বিবাহ হইতেছে, কাহার অন্নপ্রাশন, কাহার বৌভাত হইবে এসবগুলি না জানিলে নয়। তাহার নিমন্ত্রণ হউক আর না হউক, কোন কিছু যায় আসে না। অক্ষয় অবশ্যই সেখানে হাজির হইবে।

এই অক্ষয়কে আমার হাত না করিলেই চলিবে না। কারণ, আমার এই শিকার করার ব্যাপারটা চাপা থাকিবে না। একটু কানে যাইলেই সে আমার সমস্ত প্লান বানচাল করিয়া দিবে। তাই অক্ষয়কে খানকয় সিঙ্গাড়া আর গোটাকয় রসগোল্লা খাওয়াইয়া আমার গুপ্ত কথা ব্যক্ত করিলাম।

সমস্ত শুনিয়া অক্ষয় বলিল, হুঁ। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা থাকবে।

বললাম, ভয় নেই। দোকান থেকে লুচি-মিষ্টি নেব। দু'খানা সাইকেল থাকবে—একটায় তুই আর রমা। আর আমি একটায়। কারণ, আমি তেমন ভাল সাইক্লিষ্ট নই। তোকে শুদ্ধ নিয়ে যদি সাইকেল চালাই তবে নিঘ্যাৎ একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে—

গম্ভীর হইয়া অক্ষয় বলিল, তা নয় হ'ল। বাঘকে দেখা পাওয়া যাবে কোথায়?

বলিলাম, বাঃ কেন বনে। বাঘ ত বনেই থাকে—

—হুঁ। তা জানি। বাঘ বনেই থাকে—কিন্তু আমাদের মেরে ফেলবে না ত। বাঘকে বিশ্বাস নেই ভাই। হেই করলে যায় না, বরং হালুম করে ঘাড়ে এসে পড়ে।

নিজের বীরত্বে আমার সেদিন আঘাত লাগিয়াছিল। তাই একটু বোধ করি ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বলিয়াছিলাম—হাঁদারাম। আমি তবে বন্দুক হাতে কি জন্যে থাকব। খেলেই হ'ল, আবদার নাকি! তার আগে বাছাধনকে যমের বাড়ী পাঠাব না। একটা গুলী যদি ব্রহ্মতালুতে ঢোকে, তবে আর দাঁত খিঁচোতে হবে না। সে যাক্ আসল কথা হচ্ছে, এ ব্যাপার যেন দশ কান না হয়—

অক্ষয় বলিল, রামচন্দর। সে ভয় নেই। কিন্তু এর আগে কি বাঘ মেরেছিস্।

অবাক হইয়া বলিলাম, কে আমি? উঁহুঃ, বাঘ কেন, বলে এ পর্য্যন্ত একটা পাখীই মারি নি। কিন্তু আমার মনে হয় কি জানিস অকা। বাঘ মারা কিচ্ছু নয়—কিন্তু পাখী মারাই শক্ত। আরে বাঘ ত মরবার জন্যেই সৃষ্টি। শিকারীরা হামেসাই মারে, গুলী ছুঁড়ল কি মরল কিন্তু বাপু পাখী মারা শক্ত। কারণ পাখীর পাখা আছে, বাঘের নেই। পাখা ফুড়ুৎ করে উড়ে পালাতে পারে, বাঘ পারে না। পাখীর দেহ ছোট্ট,বন্দুক তাক্ করা কঠিন। কিন্তু বাঘ মস্ত জানোয়ার, দশাসই চেহারা, ঘাড়ে-গর্দ্দানে ঠাসা—বেশ মোটাসোটা। যেমন তেমন করে বন্দুক ছুঁড়লেই গুলী খাবেই—আর গুলী খেলেই নিঘ্যাৎ মৃত্যু। আমাদের দেখে যদি দাঁত বের করে হালুম করে তবে ঐ হালুম করাই তার শেষ কথা হবে। একটা মাত্র গুলা, ও বাবা হজমিগুলী খেলে ট্যা-ফ্যা করতে হবে না। ভবনদী পার করে ছাড়বে—যাকে বলে কম্য কিলিয়ার। কিন্তু একটা কথা সব সময় স্মরণ রাখবি। বাঘ যদি ডাকে, সেই ডাক শুনে যেন চোঁচা দৌড় মারিস্‌নে। সে বড় বিশ্রী। মানুষ হ'ল সব প্রাণীর শ্রেষ্ঠ—কেমন কিনা। আরে চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। নইলে বাঘ আর মানুষে তফাৎ কোথায়? বাঘও হিংসুক আর মানুষও হিংসুক। কেন, আমাদের ক্লাসের ফটুকে-কে দেখিস নি?, কি রকম হিংসুটে—ঠিক বাঘের মত। তাই বলছি, খবর্দ্দার সটকাবিনে। পড়িস নি সেই ভালুক আর দুই বন্ধুর কথা। বিপদের মধ্যে বন্ধুকে ফেলে লম্বা দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। তা করলে ধর্ম্মে সইবে না কিন্তু তা বলে দিচ্ছি। মা সরস্বতীর কিরে যা অকা—তিন সত্যি কর যে পালাব না—

অক্ষয় বলিল, তিন সত্যি করছি। আমি তাই কি পালাতে পারি—বাঃ, আমার একটা ধর্ম্মজ্ঞান নেই। কিন্তু ভাই, শুধু লুচি রসগোল্লা নিলে হবে না—গোটাকয় ডিম ভেজে নিলে মন্দ হ'ত না। আমার বাপু শিকারে-টিকারে গেলে ভারী ক্ষিদে লাগে। আর এক কথা, বাঘ ব্যাটা মলে তার ফটো নেওয়া দরকার। ব্যাটার বুকে পা দিয়ে একটা পোজ নিয়ে ফটো তুলতে হবে—তাই বলছিলাম।

অক্ষয়কে অভয় দিয়া বলিলাম, সব হবে—

জ্ঞানচাঁদ। মালদা শহরের মকদুমপুরে তখনকার দিনে ভারী সরেস খাবার বানাইত জ্ঞানচাঁদ হালুইকর। হাঁ, সন্দেশ বানাইবার হাত একখানা বটে। জ্ঞানচাঁদের রসগোল্লার কথা মনে হইলে এখনও জিভে জল আসে। অমন রসগোল্লা আর কোথাও খাই নি। শুধুই কি রসগোল্লা! পানতোয়া, রসকদম্ব, বরফি-খাজা সবই যেন অদ্ভুত স্বাদ। সেই জ্ঞানচাঁদের দোকানে সন্ধ্যাবেলায় রমাপ্রসাদকে তুলিলাম। বড় বড় রাজভোগ, রসকদম্ব আর রসগোল্লা দিয়া রমাপ্রসাদের মনকে মাখনের মতন নরম করিয়া ফেলিলাম। কারণ রমাপ্রসাদই যে মূলাধার। বন্দুক, গুলী, সাইকেল সবই ত ওর হাতে। বন্দুকটি রমাপ্রসাদের নয়। ওটি ওর দাদা বামাপ্রসাদের। কিন্তু বামবাবু বড় কঠিন লোক। সেই ভারী ভারী মুখ আর ঠোঁটের উপর পুষ্ট গোঁপ জোড়াটি তখনকার দিনে ছেলেদের বিভীষিকা ছিল। বামবাবুর নিকট কে বন্দুক চাহিবে। রমার সহিত ঠিক হইল মোড়ের অশ্বত্থগাছের আড়ালে সে প্রতীক্ষা করিবে। ভোর হইতেই অক্ষয় চুপি চুপি আসিয়া ডাকিল আমিও সজাগ ছিলাম। খাবার প্রভৃতি লইয়া সকলের অলক্ষ্যে বাহির হইলাম। তিন জনে যখন সাইকেলে চাপিলাম তখন প্রায় ফরসা হয় হয়।

অক্ষয় বলিল, যাই বলিস—একটা কিন্তু ভুল হ'ল। একজন ফটোগ্রাফার সঙ্গে নিলে ভাল হ'ত।

অবাক হইয়া বলিলাম, কেন, ফটোগ্রাফার কি বাঘ মারত?

না। কিন্তু বাঘের—মানে জ্যান্ত বাঘের ফটো নিত। বাঘ যখন তেড়েমেরে দাঁত খিঁচিয়ে আসত তখন খ্যাঁচ করে একটা ফটো নিত। জ্যান্ত তেড়িয়া বাঘের কে কবে ফটো নিতে পেরেছে?

অবশেষে আমরা আসিলাম। বেলা বোধ করি এগারটা হইবে। শীতের দিনেও সমস্ত জামা-গেঞ্জি ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। সাইকেল হইতে নামিয়া আমরা একটা দীঘির তীরে বসিলাম। হাত মুখ ধুইয়া আকণ্ঠ জলপান করিলাম।

অক্ষয় বলিল, বের কর খাবার। ক্ষিদেয় মাইরি পেট বাপান্ত করছে। খেয়ে গায়ের জোর বাড়িয়ে তবে ত শিকার। তাও আবার পাখী-পুকলি নয়—একেবারে দি রয়েল টাইগার!

অক্ষয় আবার বলিল, খুব ভুল হয়ে গেল। ছোট-কাকার একখানা শিকারের বই ছিল। সঙ্গে আনলে বড় কাজে লাগত।

বলিলাম, আরে শিকারের বই দিয়ে কি শিকার হয় নাকি? আগে বাঘ মারি তার পর আমরাও শিকারের বই লিখব।

অক্ষয় বলিল, তা নয়। মানে বইখানা পড়ে জ্ঞান লাভ হ'ত। বাঘকে ঘায়েল করার অনেক ফন্দি-ফান্দা ওই বইটাতে আছে। সেই সব পড়ে সহজে বেটাকে কাৎ করা যেত আর কি।

আমরা খাওয়া সুরু করিলাম। খাওয়ার পর সামান্য বিশ্রাম। আমগাছের ছায়ায় শীতের স্বল্প রোদে বোধ করি ঘুম ঘুম ভাব আসিয়াছিল। এক সময় তন্দ্রা ভাঙিলে দেখি, বেলা যে আর নাই। অক্ষয়, রমা দুইজনেই নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। ঠেলাঠেলি করিয়া উহাদের উঠাইয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। কোথাও কোন লোকজন নাই, মাঠে কোনও ফসল নাই। গাছে গাছে বুনো কুল পাকিয়া রহিয়াছে। মাঠের ওধারে আম আর কুলগাছের জঙ্গল। কোথাও একটা মানুষের মুখ দেখা যায় না, গলার স্বর শোনা যায় না। ইতস্তত: গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ, কোথাও গড়, জঙ্গল-ঘেরা শুকনো পরিখা।

রমা বলিল, এদিকে বেলা যায়। সন্ধ্যের মধ্যেই ফেরা চাই—দাদা ফিরে আসার আগে। কিন্তু এখন কোথায় বাঘ? এলি শিকারে কিন্তু দিলি ঘুম। এখন একটা ঘুঘু মেরে চল বাড়ী ফিরি, কাজ নেই বাঘ মারা—

বন্দুকটি হাতে লইয়া বলিলাম, চুপ। চ আরও বনের ভেতরে ঢোকা যাক্। যখন এসেছি এস্পার-ওস্পার করব—চ—চ—। আমি উহাদের একরকম ঠেলিয়া ঠেলিয়া সরু পায়ে-চলা পথে চলিতে লাগিলাম। তাহার পর আর পথ নাই—শুধু বন, ঘন অরণ্য। নানান্ আগাছা জড়াজড়ি করিয়া, ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দ্দিক ভারী শান্ত নিস্তব্ধ। বনের ভিতর ইহারই মধ্যে অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে—সূর্য্যের যৎসামান্য আলো, গাছপালার ফাঁক দিয়া সামান্য বনে ঢুকিয়াছে। হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক দূর আসিয়াছি, বন আরও ঘন, আরও গভীর। পাখী পর্য্যন্ত নাই—নাই কোন শব্দ শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা ঝিঁ ঝিঁ শব্দ শোনা যাইতেছে। আমাদের কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। বার বার মনে হইতে লাগিল, এখনি বুঝি বজ্রের মত আওয়াজ করিয়া বাঘ লাফ দিয়া ঘাড়ে পড়িবে।

হঠাৎ অক্ষয় বলিল, চুপ ঐ বাঘ—

আমাদের বুক ধ্বক্ করিয়া উঠিল। একটা ভয়ে পিছাইয়া আসিলাম। অক্ষয় যে স্থানটি দেখাইল তাহা কুলগাছের ঝোপ। অনেকগুলি কুলগাছ এক সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তলাটি পরিচ্ছন্ন। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিলাম। হাঁ বাঘ শুইয়া আছে গভীর নিদ্রামগ্ন।

রমা তখন গুটি গুটি পিছু হটিতেছে ভয়ে তার মুখ ফ্যাকাসে, মনে হয় ও এখুনি অজ্ঞান হইয়া যাইবে। ভয় কি আমিই কম পাইয়াছি। কিন্তু রমা পালাইলে শিকার কি করিয়া করিব। ইতিপূর্ব্বে বন্দুক কখনও ধরি নাই। কিভাবে নিশানা করিতে হয়—ঘোড়া টানিতে হয় কিছুই জানি না। আমি রমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—বাঃ পালালে নিস্তার নেই। বরং একাতেই, বাঘের পোয়া বারো। টপ করে গিলে ফেলবে। এখন ঘোড়া টানব কি করে দেখা—

রমা বলিল, গুলী হলেই কিন্তু বাঘ লাফ দেবে।

বলিলাম—লাফ দেয় নাকি? দেয় দেবে তখন দেখব।

অক্ষয় চুপি চুপি বলিল, উঁহুঃ সময় দেবে না। বাঘ যখন অ্যাঁঃ অ্যাঁঃ ক'রে দুই থাবা উঁচিয়ে উঠবে—তখনই তো ফিট্ হয়ে যাবি। আচ্ছা দাঁড়া আমি এক মন্তর জানি। মুখবন্ধনী মন্তর। বাঘ আর হাঁ করতে পারবে না। আমায় এক মুঠো ধুলো লইয়া, কতকক্ষণ বিড় বিড় করিয়া কি বলিয়া, সেই ধুলা বাঘের দিকে উড়াইয়া দিল।

—নে লাগা এখন। আমি বন্দুক তুলিয়া, চোখ বন্ধ

করিয়া ঘোড়া টানিলাম। বিকট আওয়াজ করিয়া গুলি ছুটিল। বন কাঁপিল—গাছের পাখিরা ভয়ে উড়িয়া গেল। কিন্তু বাঘ কোথায়? ভাবিয়াছিলাম—বাঘ লাফ দিবে—কিন্তু তাহার সাড়া নাই কেন? এক গুলী খাইয়াই কাবার হইল নাকি? তাকাইয়া দেখি, বাঘ তেমনি ভাবে শুইয়া আছে।

অক্ষয় বলিল, দেখলি বাছাধনের আর চেঁচাবার ক্ষমতা হয় নি—মন্ত্রের গুণ দেখ। একটু দাঁড়া একটা ঢিল মেরে দেখি সত্যি মরেছে না বেঁচে আছে। অক্ষয় ঢিল সজোরে ছুড়িল। নাঃ—বাঘ নড়িল না।

অবাক্ হইলাম। এ কি রকম ব্যাপার! ব্যাটা এক গুলীতেই অক্কা পাইল। না করিল হালুম—না করিল্ হুলুম। আমরা এক পা এক পা করিয়া আগাইয়া বাঘের খুব কাছে আসিলাম।

অনেকক্ষণ ভাল ভাবে দেখিয়া, রমা হোঃ হোঃ করিয়া হাসিয়া বলিল, আরে বাঘ কোথায়? এ যে দেখছি মস্ত এক কাঠের গুঁড়ী। গাছপালার ভেতর দিয়ে রোদ কাঠের উপর পড়ে, মনে হচ্ছিল গায়ের চাকা চাকা গোল দাগ--এ যে জলজ্যান্ত একটা মোনা কাঠের গুঁড়ি। আমি তাই ত বলি--

অক্ষয় কোন কথা বলিল না—আর কি কথা বলিবে. তাহার মুখবন্ধনী মন্ত্রের গুণে বাঘ কাঠ হইয়া গিয়াছে: কিন্তু আমাদের এইবার সত্যকারের ভয় হইল।

কোথায় রাস্তা? কোন্ দিকে যাইব। বাড়ী ফিরিবার কথা মনে হইল। সন্ধ্যা হইয়াছে, চারিদিক অন্ধকার কোন্‌দিক যাইব, ঠিক ঠিকানা নাই। সত্যকারের বাঘ এইবার বাহির হইবে। পরেশ মাষ্টার এতক্ষণ পড়াইতে আসিয়াছেন। রমার দাদার ভারী কঠিন মুখখানার কথা মনে হইল। কিন্তু আমরা কোথায় চলিয়াছি? হঠাৎ সেই ঘন জঙ্গলের মধ্য হইতে দু'টি লোক বাহির হইয়া আসিল। তাহারা আমাদের দেখিয়া অবাক্ হইয়া বলিল, বাবুরা এখানে কি করছেন।

সংক্ষেপে সব কথা বলিতেই তাহারা বলিল, কি সর্ব্বনাশ আর দেরী নয়—চলুন—চলুন। বাঘে এই সেদিনও মানুষ মেরেছে আপনারা এসেছেন শিকার করতে। শিগ্রি পা চালান, এ জায়গা ভারী খারাপ—

সেদিন অনেক রাত্রে বহু কষ্টে বাড়ী ফিরিয়াছিলাম। কিন্তু ফিরিবার পর যা হইয়াছিল—তা আরও ভয়ঙ্কর। বাঘ শিকার করিবার খেয়াল সেইখানেই শেষ। নাক-কান বার বার মলিয়াছিলাম।

স্তব্ধ প্রহর
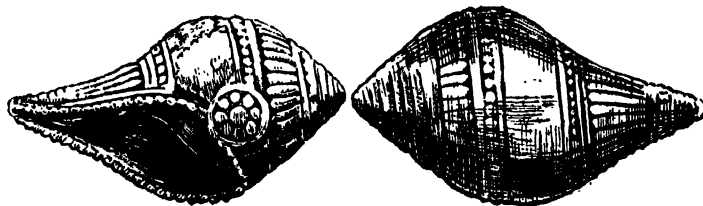
শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

৬

নিখিল বক্সী তার ঘরের অবস্থা বাড়িয়ে বলে নি।

দু'টি মাত্র ঘর। দু'টি অবশ্য গুণতিতে, নইলে একটি মাঝারি আকারের ঘরের পাশে আরেকটি গাধাবোটের সঙ্গে লাগাও ডিঙ্গি মাত্র। গাধাবোটের মতই বড় ঘরটি বোঝাই। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্তই বলা যেত। তবে সেকেলে বাড়ী ব'লে ছাদ বেশ উঁচু। উপরদিকে কিছু ফাঁক তাই আছে।

নিখিল জিনিসপত্র সমেত মাকে বড় ঘরটিই ছেড়ে দিয়েছে। নিজে ছোট ঘরটিতেই থাকে। এ ঘরটিও খুব যে ফাঁকা তা নয়। তবে মা'র ঘর যদি অতীতের স্মৃতি হয়, নিখিলের নিজের ঘর বর্তমানের বিশৃঙ্খলা।

বিশৃঙ্খলা বই কাগজ পত্রেরই বেশী। পুরাণো গাদা গাদা ইংরেজী পত্রিকা আর ফুটপাথের সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বইয়ের দোকানের বই এলোমেলো ভাবে মেঝে থেকে ছোট কেরাসিন কাঠের টেবিল, মায় নেয়ারের খাটিয়ার ওপর পর্যন্ত ছড়ান।

নিখিল শোভনার ঘর থেকে এসে নিজের ঘরে ঢুকে এক পাশের ছোট আলনাটায় শোভনাকে দিয়ে সেলাই করিয়ে আনা জামাটা রেখে বিছানাতেই শুয়ে প'ড়ে অনেকক্ষণ ক'টা বই-কাগজ খাপছাড়া ভাবে নাড়াচাড়া করেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরে ঘনিয়ে আসার পর সে উঠে প'ড়ে জামাটা গায়ে দিতে গিয়ে কি যেন ভাবে, তার পর সেটা হাতে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের দরমা দিয়ে ঘেরা বারান্দার ফালির সামনে গিয়ে ডাকে, মা শুনছ?

দরমা দিয়ে ঘেরা বারান্দার অংশটুকুই মা'র রান্নাঘর। ভেতর থেকে একটা হ্যারিকেনের আলো দেখা যায়। মা এই রান্নাঘরটুকুর যথাসাধ্য শুচিতা বজায় রাখবার যে চেষ্টা করেন নিখিলের পরের কথাতেই তা বোঝা যায়।

শীগ্‌গির এসো মা। নইলে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ব। নিখিল একটু চেঁচিয়েই কথাটা জানায়।

বয়সের দরুণ মা কানে একটু কম শোনেন? কিন্তু রান্নাঘরে ঢোকবার কথা তাঁর ঠিক কানে যায়।

উনুনে কি একটা কড়ায় চাপিয়েছিলেন। সেটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে বলেন, এই যে যাচ্ছি বাবা। এখুনি যাচ্ছি। রান্নাঘরে বাসি কাপড়ে যেন ঢুকিস নি।

মা বেরিয়ে আসার পর দরকারী কথাটা আপাতত স্থগিত রেখে নিখিল বলে, আচ্ছা মা, আমি তোমার সবে-ধন মাণিক, একটা মাত্র ছেলে। আমি রান্নাঘরে ঢুকলে তোমার সব যদি অশুদ্ধ হয়ে যায় তাহলে অমন শুদ্ধ থেকে লাভ কি?

মা একটু হাসেন মাত্র। বোঝা যায় ছেলের এ ধরণের দুষ্টুমি অভিযোগ নতুন নয়।

কিন্তু আজ যেন নিখিল কথাটাকে হাসি-ঠাট্টার ভেতরেই শেষ করতে চায় না, বলে,—চুপ ক'রে রইলে কেন? বলো। ধর, তুমি ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে পুণ্যি ক'রে স্বর্গে গেলে, আর সেখানে তোমায় একেবারে গঙ্গাজলে-ধোয়া গোবরমাটি-লেপা একটি পবিত্র কুঁড়ে ঘরে থাকতে দিল। কিন্তু সেখানে আমায় যদি ঢুকতে না দেয়, সে স্বর্গে থেকে কোন্ সুখ পাবে তুমি?

মা হেসে বলেন, তুই কি দরকারী কথা বলবি বল্, আমি রান্না নামিয়ে এসেছি।

তবু নিখিল নাছোড়বান্দা। এটাও দরকারী কথা মা। আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাওয়া দরকার। হয় তুমি ছোঁয়াছুঁয়ি ছাড়ো, নয় আমায় ছাড়ো। তুমি যে ভাবছ, মা না থাকলে তোমার হতভাগা ছেলে একেবারে অকুলপাথারে, তা কিন্তু নয়। এই দেখ, জামাটা কি রকম সেলাই করিয়ে এনেছি, দেখেছ!

নিখিল এইবার হাসতে হাসতে জামাটা তুলে দেখায়।

তা বেশ করেছিস। মা নিজের কাজে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে বলেন, তোর এই ত দরকারী কথা!

উঁহু, উঁহু, দাঁড়াও। নিখিল বাধা দেয়।

ছেলের এ ধরণের পাগলামি মা'র জানা। নিরুপায় হয়ে তিনি বলেন, আচ্ছা, দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু ওদিকে উনুন যে জ্ব'লে যাচ্ছে। রান্নাবান্না শেষ করতে হবে না?

কি যজ্ঞির রান্না করছ মা? বাজার থেকে কি এনেছি তা ত জানি। ওই কুমড়ো বেগুন ত আর তোমার

পুদিনার জোরেও পোলাও কালিয়া হয়ে উঠবে না? হ্যাঁ, শোন, কই, কে সেলাই ক'রে দিয়েছে ত জিজ্ঞাসা করলে না?

মা'রও এতক্ষণে কথাটা খেয়াল হয়। একটু কৌতূহল ভরেই জিজ্ঞাসা করেন—কে দিল, কে?

তুমিই বল না ভেবে!

মাকে বেশী ভাবতে হয় না। একটু পরেই বলেন, ও ঘরের ওই বৌটি? ওই শোভনা?

বলার সময় চোখে-মুখে একটু অপ্রসন্নতার ভ্রুকুটিও বুঝি ফুটে ওঠে।

হ্যাঁ। নিখিল হাসে।—তোমার যেন খুব পছন্দ হ'ল না মনে হচ্ছে?

না, সেলাই ক'রে দিয়েছে ভালই ত।—মা তাঁর মনের কি একটা সংশয় যেন লুকোতে পারেন না,—কিন্তু মেয়েটি কেমন যেন...

মা'র কথার মাঝখানেই নিখিল বলে, অদ্ভুত ত? আমারও ঠিক তাই মনে হ'ল। তাই তোমায় জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

আমি কি কিছু জানি বাবা, যে, আমায় জিজ্ঞাসা করছিস্। কিন্তু মেয়েটির কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপার আছে ব'লে মনে হয়। ওর সঙ্গে মেলামেশা তাই না করাই ভাল।

হুঁ, তাহলেই তোমার সোনার চাঁদ ছেলের গায়ে কলঙ্ক প'ড়ে যাবে! হেসে উঠে নিখিল আবার জিজ্ঞাসা করে—ওঁর স্বামীকে তুমি ত দেখেছ মা?

হ্যাঁ, প্রথম দু'চার দিন দেখেছিলাম, তার পর আর ত বহুদিন আসে নি। মা নিজের মনের ভাবটা স্পষ্ট করবার চেষ্টায় বলেন, মেয়েটি কিন্তু ভদ্র, লেখাপড়া-জানা ব'লেই মনে হয়।

তুমি তাহলে আলাপ সালাপ করেছ! নিখিল হাসে।

হ্যাঁ, প্রথম দিকে করেছিলাম। কিন্তু মেয়েটি দেখলাম মেলামেশা পছন্দ করে না, দূরে দূরে থাকতে চায়। তাই আর চেষ্টা করি নি।

হুঁ, ব'লে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে নিখিল নিজের ঘরের দিকে চ'লে যায়।

মা ছাড়া পেয়ে রান্নাঘরেই গিয়ে ঢোকেন, তবে একটু চিন্তিত মুখে।

আশুবাবুর কোন কিছুতে আতিশয্য বড় একটা এ পর্যন্ত শোভনা দেখে নি। কিন্তু আজ রান্নার ব্যাপারে যেটুকু অতিরিক্ত ব্যবস্থা তিনি করেছেন, শোভনার তাতে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হয়।

মধুকে দিয়ে বিকালের বাজার তিনি ইতিমধ্যেই করিয়ে আনিয়েছেন। সে বাজার শুধু তরিতরকারীর নয়, তার মধ্যে আমিষও আছে। প্রথমে অবশ্য শোভনা সে কথা জানতে পারে নি।

মধু ডেকে নিয়ে আসবার পর আশুবাবুর সঙ্গে তার দু'চারটে কথা হয়েছে মাত্র। আশুবাবু কোথায় কি কাজে বেরিয়ে যাবার জন্যে তখন প্রস্তুত।

তাকে দেখে সস্নেহ স্মিতমুখে বলেছেন, বুড়োকে কি ভুলেই গেছলে নাকি! বাজার-টাজার সব ওঘরে আছে। আর কিছু দরকার-টরকার হয় ত আনিয়ে নিও। এই টাকা দু'টো রাখ।

আশুবাবু দু'টো টাকা এগিয়ে ধরেছেন। কিন্তু শোভনা তা নিতে চায় নি। বলেছে, না, টাকার কি দরকার। ভাঁড়ারে কি আছে না আছে আমি ত দেখেছি। কিছু লাগবে না।

তবু রাখলে দোষ কি? দু' টাকা নিয়ে তুমি যদি পালিয়ে যাও, যাবে। ব'লে হেসে আশুবাবু টাকাটা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

টাকাটা নিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ হয়েছিল। রান্নাঘরে এসে বাজারের থলিতে মাছ দেখে সত্যি খারাপ লেগেছে। অনুগ্রহের চেহারাটা বড় স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এর চেয়ে মাইনে-নেওয়া রাঁধুনীর কাজও বুঝি ভাল ছিল। তাহলে কাজটুকু ছাড়া আর কোন বাধ্যবাধকতা থাকত না। থাকত না অনুগ্রহের ঋণ কৃতজ্ঞতায় শোধ করবার অস্বস্তি।

আশুবাবু থাকলে হয়ত সত্যিই একটু অনুযোগ করত এই মাছের ব্যাপার নিয়ে।

কিন্তু তাই বুঝেই আশুবাবু কাজের ছুতোয় বেরিয়ে গেছেন কি না কে জানে।

রান্নার কাজকর্ম করতে শোভনার কিন্তু ভালই লাগে। মনটাকে ব্যাপৃত রাখার এ সুযোগেরও একটা দাম আছে।

আশুবাবুকে সন্তুষ্ট করতে নয়, নিজেকেই সম্পূর্ণ ভাবে কাজে তন্ময় করবার জন্যে শোভনা একটু নতুন ভাবে দু'একটা পদ রান্নার চেষ্টা করে।

কিন্তু সম্পূর্ণ তন্ময়তা কি সম্ভব? তার পক্ষে অন্ততঃ নয়।

বর্তমানই অদৃশ্য সূত্রে অতীতের স্মৃতিকে টেনে আনে।

মধু বাজার থেকে কই মাছ কিনে এনেছে। মনে

পড়ে, কই মাছ কোটা তার কাছে একটা বিভীষিকা ছিল। মা কোনদিন এ সব করতে দেন নি। কিন্তু নিজের সংসারে এসে প্রথম এই কই মাছ কোটা নিয়েই কি হুলুস্থুল ব্যাপার।

অনুপমকে মৃদু ভর্ৎসনা করেছিল প্রথমে—বাজারে আর মাছ পেলে না!

পাব না কেন? অনুপম একটু বিস্মিত হয়ে বলেছিল, কিন্তু কই মাছ ভাল ব'লে ত আনলাম।

ভাল ত বুঝলাম। কিন্তু এখন জ্যান্ত কই মাছ মারবে কে? ও আমার দ্বারা হবে না।

কই মাছ মারা কি শক্ত নাকি? কখনও কই মাছ আগে কোটো নি? অনুপম সত্যিই অবাক্।

না, কুটি নি। মা কি এ সব করতে দিয়েছে কখনও? খুব ত বাহাদুরী হচ্ছে, কই মাছ কোটা শক্ত নাকি ব'লে। দেখি, মারো না কই মাছগুলো। এস।

আমি? অনুপমেরই কিন্তু মুখ শুকিয়ে গেছল।

হ্যাঁ তুমি! অনুপমের মুখের চেহারা দেখে হেসে ফেলে বলেছিল শোভনা, বেটাছেলে হয়ে ক'টা কই মাছ মারতে পার না।

অগত্যা অনুপম এগিয়ে এসেছিল তার পৌরুষ প্রমাণ করতে।

দু'জনে মিলে কই মাছ মারা নিয়ে রস্তুরমত একটা কুরুক্ষেত্র ব্যাপার তার পর। দু'জনেই সমান আনাড়ি। কিন্তু শোভনা অনুপমকেই বকাবকি করেছে আগাগোড়া। তারই দোষ ধ'রে খুনসুটির ঝগড়া করেছে। সেই ঝগড়া করাটাই একটা আনন্দ।

অনুপম নয়, কই মাছগুলো শেষ পর্যন্ত মেরেছিল শোভনাই। নির্মম ভাবে আছড়ে আছড়ে মেরেছিল। মা এই ভাবে মারতেন মনে প'ড়ে গিয়েছিল তখন।

অনুপম নিশ্চেষ্ট দর্শক মাত্র তখন। দেখতে দেখতেই সে একটু হেসে বলেছিল, তোমরা আমাদের চেয়ে নিষ্ঠুর।

হ্যাঁ,—শোভনাও হাসতে হাসতে বলেছিল মাছ কুটতে কুটতে, পরের ঘাড় দিয়ে পাপ বরিয়ে নিতে পারলে সবাই অমন পুণ্যাত্মা হতে পারে। মারবার বেলা আমার নিষ্ঠুরতা, আর খাবার বেলা দয়াটা তোমার'!

কি অর্থহীন অথচ মধুর কথা কাটাকাটি। দিনগুলো এই সব তুচ্ছ চাঞ্চল্যেই উচ্ছল পরিপূর্ণ।

মাছ কুটতে কুটতেই একটু অন্যমনস্কতায় সেদিন একটা আঙুলও কেটে গিয়েছিল হঠাৎ।

রক্ত পড়েছিল টস্ টস্ ক'রে। অনুপম রক্ত দেখে কেমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল মনে আছে।

তখন মাছ কোটা ছেড়ে জল দিয়ে কাটাটা ধুচ্ছে।

অনুপম সেদিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে ধরাগলায় বলেছিল, ও কি, রক্ত বন্ধ হচ্ছে না যে!

বন্ধ হচ্ছে না ত হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছ কি! শোভনা হাসিমুখেই ঝঙ্কার দিয়েছিল, একটা ন্যাকড়ার ফালি টালি নিয়ে আসতে পার না, আর একটু আইডিন যদি পাও।

অনুপম ব্যস্ত হয়েই ঘরের ভেতরে গেছল, কিন্তু অনেকক্ষণ আর ফিরে আসে নি।

শোভনাই কাটা জায়গাটা অন্য হাতের আঙুল দিয়ে চেপে ধ'রে ঘরে ঢুকে বলেছিল, একটু ন্যাকড়ার ফালি আনতে যে বুড়ো হয়ে গেলে। কি, করছ কি সবকিছু হাঁটকে তছনছ ক'রে!

অনুপম অসহায় ভাবে বলেছিল, খুঁজে পাচ্ছি না যে।

পাবেও না এ জন্মে! শোভনাই রাগ ক'রে গিয়ে বাঁ হাতে একটা তোরঙ্গের ডালা খুলে ছেঁড়া কাপড় বার ক'রে দিয়ে বলেছিল, নাও, একটা ফালি এখন ছেঁড়। তা পারবে ত!

অনুপম তাও ঠিকমত পারে নি। ফালিটা মস্ত চওড়া ক'রে ছিঁড়েছিল।

শোভনা ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল, ও ফালি দিয়ে কি আমি গলায় ফাঁস দেব! একটা ফালি ছিঁড়তেও পার না, অকর্মার ধাড়ি।

অনুপম কাঁচুমাচু মুখে আবার চওড়া ফালিটা দু'ভাগ করেছিল ছিঁড়ে।

শোভনার মুখে রাগের ভ্রূকুটি, কিন্তু মনে কি গভীর ভালবাসার আকুলতাই উথলে উঠেছিল এই অসহায় কুণ্ঠিত মানুষটার ওপর।

টিঞ্চার-আয়োডিন একটু কোথা থেকে শোভনাই খুঁজে বার করেছিল তার পর, আর শোভনার ধমক খেতে খেতে অনুপম অপটু হাতে যথাসাধ্য ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়েছিল কাটা জায়গাটা।

আঙুল কাটার সামান্য ঘটনাটাই সেদিন বিশেষ হয়ে উঠেছিল যেন অর্থময়তায়।

আঙুল কাটার ব্যাপারটার কি ওই দিনেই শেষ?

না, একটু পরিশিষ্টও ছিল। সেই পরিশিষ্টটুকুও না মনে ক'রে পারে না। মনে করলে এখনও কেমন একটু অবাক্ লাগে।

দিন দু'য়েক বাদে শোভনা ব্যাণ্ডেজটা খুলে ফেলেছিল কাজের অসুবিধের জন্যে। কাটা জায়গাটা

তখনও একেবারে জুড়ে যায় নি। অনুপমকে খেতে বসিয়ে ভুলে হাতে ক'রেই পাতে নুন দিতে গিয়ে ঘা-টা চিড়বিড়িয়ে ওঠায় নুনটা ফেলে দিয়ে অস্ফুট চীৎকার ক'রে উঠেছিল।

অনুপম পাত থেকে মুখ তুলে অবাক্ হয়ে বলেছিল—কি, হ'ল কি?

কি আবার হ'ল?—শোভনা হেসে বলেছিল—জ্বালা করে উঠল দেখতে পাচ্ছ না?

কেন?—নির্বোধের মত প্রশ্ন করেছিল অনুপম।

এমনি।—ব'লে ঝঙ্কার দিয়ে শোভনা নুন দেবার চামচ খুঁজতে উঠে গিয়েছিল। ফিরে এসে নুন দিতে দিতে বলেছিল, অভিমান ক'রে—আঙুলটা সেদিন কেটে গেল তাও মনে নেই?

ও হ্যাঁ, তাই ত!—অনুপম যে ভাবে কথাটা বলেছিল তাতে সত্যিই তার মনে ছিল না ব'লে সন্দেহ হয়েছিল।

শোভনা আর কিছু বলে নি কিন্তু অবাক্ হয়েছিল, ব্যথাও পেয়েছিল একটু।

সামান্য ব্যাপার। ভুলে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু এমন নয়। কিন্তু অনুপমের আঙুল কাটলে সে কি এমন ভুলে যেতে পারত?

অনুপম কোনদিন তাকে অবহেলা করে নি, আঘাতও দেয় নি। কিন্তু তার সব কিছুই যেন ভাসাভাসা।

সে নিজেও যেন আলগা মূলহীন একটা সত্তা। একটু দোলা লাগলেই ভেসে যাবে।

ভালবাসা দিয়ে, মমতা দিয়ে এই দুর্বল শিথিল মানুষটাকে একটা দৃঢ় ভিত্তিতে বেঁধে রাখাও তাই একটা উত্তেজনা মনে হয়েছে সেদিন, একটা গোপন গর্ব।

কিন্তু কেন পারল না?

পারে নি-ই বা কই। হাসপাতালে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তার নোঙর খুলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কোন আভাসই ত ছিল না।

তার সেই অসুখের সূত্রপাতের দিনগুলিতে অনুপমের বরং একটু পরিবর্তনই দেখেছে। অনুপম চিন্তিত হয়ে উঠেছে। বেশ একটু ব্যাকুল।

তখন রোজই প্রায় বিকেলে জ্বর আসে। কাশিটা সারতে চায় না।

শোভনা অনুপমকে কিছু বলেনি প্রথমে। বলার প্রয়োজনও মনে করে নি। কিন্তু নিজের মনে তার সন্দেহ হয়েছে তখন থেকেই একটু। সে অজ্ঞ-অশিক্ষিত নয়। নিজের জ্বর ও কাশির কয়েকটা লক্ষণ তার ভালো লাগে নি।

অনুপমকে কিছু না ব'লে নিজে লুকিয়ে একদিন একটা কাশির ওষুধ কিনে এনেছে।

অনুপম অন্যমনস্ক। কিন্তু কিছুদিন বাদে একদিন শিশিটা তারও নজরে পড়েছে, উদ্বিগ্ন হয়েই জিজ্ঞাসা করেছে—তুমি এ ওষুধটা খাচ্ছ নাকি?

খাচ্ছি ত!—শোভনা হেসেছে।

কিন্তু কাশিটা কই সারছে না ত?

ধন্বন্তরি নাকি? যে এক ফোঁটাতেই সেরে যাবে? শোভনা হাল্কা ভাবে কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু অনুপম তাতে আশ্বস্ত হয় নি। আশ্বস্ত যে হয় নি তার পরের দিন বোঝা গেছে।

সকালবেলা কাজে বেরুবার আগে সে হঠাৎ শোভনাকে তৈরি হয়ে নিতে বলেছে বেরুবার জন্যে।

শোভনা অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে—আমি আবার কোথায় বেরুব এই সকালবেলায়। পাগল হলে নাকি?

না, না, চল না? দরকার আছে—অনুপম তার পক্ষে যেটুকু সম্ভব জোর দিয়ে বলেছে।

কি দরকার শুনি?—শোভনা তখনও সত্যিই বুঝতে পারেনি। বলেছে—বায়স্কোপের টিকিট করেছ নাকি? তাই বা কি ক'রে হবে? আজ ত রোববার নয়।

তখন মাঝে মাঝে রবিবার সকালবেলা তারা দু'জনে ছবি দেখতে যেত বটে।

অত কথার দরকার কি? চলই না। দেখতেই ত পাবে কোথায় নিয়ে যাই।—অনুপম জেদ করেছে এবার।

অনুপমের জেদটা তার চরিত্রের পক্ষে অস্বাভাবিকই মনে হয়েছে শোভনার। ভালো লেগেছে অনুপমের এই পীড়াপীড়ি, তবু একটু ওজর তুলেছে অনুপমের আরো একটু সাধাসাধিই যেন উপভোগ করবার জন্যে। বলেছে—কিন্তু এখন বেরুলে ঘরসংসারের কাজগুলো কি ক'রে হবে শুনি? আজ কি হরিমটর নাকি?

হ্যাঁ, তাই। দোহাই আর দেরি করো না। অনুপম সত্যি কাতর হয়েছে।

অনুপম তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছে দেখাতে এটা সত্যিই শোভনা ভাবতে পারে নি।

ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে ভয়ের কথা কিছু বলেন নি। অন্ততঃ তার সামনে নয়।

শোভনার ডাক্তারের কাছে আসার 'পর বেশ একটু ভয়ই হয়েছিল। নিজের মনে যে সন্দেহ তার কিছুদিন ধরে উঁকি দিচ্ছে তাই সত্য ব'লে প্রমাণ হবার ভয়। খুব

খারাপই লেগেছিল ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করাতে। এর চেয়ে সংশয়ের অন্ধকারে থাকাই যেন ভাল ছিল।

কিন্তু ঠিক উল্টো মনের ভাব হয়েছে ডাক্তারের সামান্য একটু সহাস্য আশ্বাসে। সংশয় কেটে গিয়ে একটা অতিরিক্ত নিশ্চিন্ততা এসেছে নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে।

ডাক্তার মুখে তাকে বলেছেন, কিছু ভাবনার নেই। দু'দিনে সুস্থ হয়ে উঠবেন। ক'দিন শুধু একটু সাবধানে থাকতে হবে।

সুস্থ হয়ে ওঠার বিশ্বাসে সে সাবধান থাকাটা পর্যন্ত অবহেলা করেছে। নিজের মনের গোপন আশঙ্কাকে অস্বীকার করবার আগ্রহেই যেন এই অতিরিক্ত তাচ্ছিল্য। ডাক্তার যে ওষুধ দিয়েছিলেন, দু'দিন খেয়ে আর খায় নি। বলেছিলেন বুঝি রক্ত পরীক্ষার কথা অনুপমকে। ওসব বড়লোকের জন্যে, ব'লে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

তার পর মাঝরাত্রে সেদিন কাশতে কাশতে ঘুম থেকে উঠে ব'সে সেই সমস্ত শরীর অবশ ক'রে দেওয়া আবিষ্কার! কাশি চাপতে মুখে আঁচলটাই চাপা দিয়েছিল। আঁচলটা সরিয়ে নেবার পর তাতে যেন কিসের দাগ!

ঘরের কোণে পলতে নামিয়ে-রাখা হারিকেনের মিটমিটে আলোয় দাগটা ভাল ক'রে দেখা যায় নি। কিন্তু শোভনার বুঝতে যেন কিছু আর বাকি থাকে নি।

অনুপম পাশের বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। শোভনা সন্তর্পণে বিছানা থেকে নেমেছে। নামতে গিয়ে ভেতরের আতঙ্কে শরীর-মনের কেমন একটা অবশতায় ট'লে পড়েছে পাশের জলের কুঁজো-রাখা চৌকিটার ওপর। কুঁজোটা পড়ে নি। ধ'রে ফেলেছিল সময় মত। কিন্তু গেলাসটা ঠন্ ঠন্ ক'রে বেজে উঠেছিল। শোভনা সভয়ে তাকিয়েছিল অনুপমের দিকে। অনুপম জাগে নি।

শোভনা ধীরে ধীরে হারিকেনটা নিয়ে পাশের ছোট ভাঁড়ার ঘরটায় গিয়ে পলতেটা তুলে দিয়ে আঁচলটা ভাল ক'রে দেখেছিল।

দেখে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল বুকের ভেতর একটা হিম-শীতল ধারার স্পর্শে। আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই তখন।

কতক্ষণ যে নিস্পন্দ আচ্ছন্ন হয়ে ব'সে ছিল মনে নেই। নিস্পন্দ শুধু দেহে, মনে তখন তার সব কিছু ওলট-পালট-করা ঝড় চলেছে।

সেই রাত্রেই সে প্রথম মৃত্যুকে উপলব্ধি করেছিল তার জীবনে, মৃত্যুকে তার অর্থহীন বিচারহীন নিষ্ঠুরতার দিক্ থেকেই চিনেছিল নিজের হৃদয়-বিদীর্ণ-করা তীব্র জ্বালাময় বিদ্যুৎছটায়।

সে যন্ত্রণা যেন এখনও স্মরণ করলে অসহ্য মনে হয়। শোভনা মনটাকে জোর ক'রে বর্তমানে ফিরিয়ে আনল।

রান্না মোটামুটি হয়ে গেছে। এখন আশুবাবু ফিরে এলেই তাঁর জন্যে ভাতটুকু ফুটিয়ে নিতে পারে।

আশুবাবু তাঁর বহুদিনের অভ্যাসের ব্যতিক্রম ক'রে রাত্রে মিষ্টি ফলমূলের বদলে ভাত খাবেন ব'লে গেছেন। এ ব্যতিক্রম তারই জন্যে,—শোভনা বোঝে। আর সেই জন্যেই তার আরো অস্বস্তি। যত নিঃস্বার্থ উদারতা এ ব্যতিক্রমের পেছনে থাক না কেন, যার জন্যে এ ব্যতিক্রম, তাকে কিছু দাম এর জন্যে দিতে হয়ই। কি সে দাম?

নার্স চিত্রা

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

কে বলবে চিত্রা Untrained নার্স, নার্সিং-এ সে Trained নার্সকেও হার মানায়, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি-ঘন্টা ধ'রে সে নিজের ডিউটি ক'রে যায়, হাসপাতালের ইউনিফর্ম্ম প'রে এ ওয়ার্ডে সে ওয়ার্ডে ঘুরে, মুখের মৃদুহাসি আর মিষ্টি ব্যবহারে সব রোগিণীরা মুগ্ধ। ডিউটি মুক্ত হবার পর স্নান করে সে যখন সাদা সালোয়ার আর প্রিন্টেড কামিজ প'রে সামনে দাঁড়ায়, তখন গালে একটু গোলাপী আভার, আর বব্‌করা চুলের ফর্সা-তন্বী চিত্রাকে দেখে লোকে বলবে, বাঃ বেশ ত দেখতে! হাসি-খুশী চিত্রাকে দেখে সবাই ভাবে সে বেশ সুখী, কিন্তু তার গহন মনের কোণে যে দুর্জ্জয় ব্যথা লুকিয়ে আছে সে আর কেউ না জানলেও আমি জানি।

আজ মাসখানেক ধরে আমি হাসপাতালে শয্যাশায়ী। আছাড় খেয়ে পা ভেঙেছি, প্যারিসপ্লাষ্টার লাগান পা। চিত্রাই দিনরাত আমার সেবাযত্ন করে, দারুণ যন্ত্রণায় সে-ই আমার সাথী, মিষ্টি ব্যবহারে সে আমার অনেকখানি মন কেড়ে নিয়েছে। নানা রকম কথায় হাসি-গল্পে সে আমার শরীরের ব্যথা ভোলাবার চেষ্টা করে।

বর্ষার বারিধারার সঙ্গে মানুষের মনের এক নিবিড় সংযোগ আছে কবিরা যে এ কথা ব'লে থাকেন তা মিথ্যে নয়। তাই এক বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যায় চিত্রা কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠল, মনে হ'ল তার মুখখানা যেন বড় বিষণ্ণ। আমি বললাম, চিত্রা তোমার আজ কি হ'ল, এত গম্ভীর কেন? সে ম্লান হেসে আমার চুল বাঁধতে বাঁধতে বললে, কই কিছু ত হয় নি।

বললাম, না চিত্রা, তুমি যতই হাসি-খুশী ভাব দেখাও না কেন, আমার সব সময় মনে হয় তোমার মনে একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে। আচ্ছা, যদিও মনে হয় তোমার বয়স খুব বেশী হয় নি, তবু বিয়ে করার পক্ষে যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তুমি এত সুন্দর ইচ্ছে করলেই ত বেশ ভাল বিয়ে হতে পারে। চিত্রা নিঃশব্দে চুল বেঁধে উঠে দাঁড়াল, বললে, দিদি আর একদিন তোমায় সব বলব, আজকের দিনটা আমায় মাপ কর।

পরদিন চিত্রা এক ফাঁকে আমাকে একটা ছোট বই এনে দিল, আমি তাড়াতাড়ি সেটা খুলে পাতা উল্টাতে লাগলাম, দেখলাম সেটা চিত্রার ডায়েরী, একটা পাতায় লেখা আছে :

"সব কথা সবাইকে খুলে বলা চলে না, কিন্তু যখন বুকের ব্যথা অসহ্য হয় তখন কাউকে না বলেও থাকতে পারি নে। ডায়েরী, তুমি, তুমি আমার সুখ-দুঃখের নির্ব্বাক্ সাথী, তোমার পাতায় পাতায় নিঃসঙ্কোচে আমার হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করতে পারি। জানি তুমি বোবা, কাউকে কিছু বলতে পারবে না।

আমি যখন উনিশ বছরে পা দিয়েছি তখন বিকাশের সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল, সেদিনটা ছিল ১লা জুলাই, তাই ত আজও ১লা জুলাইকে ভুলতে পারি নে। বিয়ের সময় বিকাশ দেখতে ভারি সুন্দর ছিল। এখন বিকাশ মোটা হয়ে গেছে। হবে না কেন বয়সও ত প্রায় চল্লিশের কাছে এসেছে। তরুণ সুদর্শন যুবক বিকাশকে এক দৃষ্টিতেই ভালবেসে ফেললাম। যাকে অগ্নিসাক্ষী করে গ্রহণ করলাম, তাকে পরিপূর্ণ ভাবে দেহমন দান করলাম। দু'জনে দু'জনাতে বিভোর হয়ে রইলাম। হায়, কি সুখের দিনই না গিয়েছে। আমার বিয়ের দু' বছর আগেই মা মারা গিয়েছিলেন। ইলা ছিল আমার সবার ছোট বোন, আমার চেয়ে নয় বছরের ছোট, তাকে আমিই স্নেহে-যত্নে আগলে রাখতাম। ইলার নাক, চোখ ভাল হলে কি হবে, রংটা বড় ময়লা ছিল, আমার পাশে দাঁড়ালে আমার বোন বলে মনে হ'ত না। বিকাশ মাঝে মাঝে ওকে ক্ষেপাত, ইলা গায়ের রংটা সরবাটা, বাদামবাটা মেখে ফর্সা কর, নইলে আমার মত সুন্দর বর পাবে না, ইলা চটেমটে ঘর ছেড়ে পালাত।

আমাদের সুখের দিনগুলো স্বপ্নের মত কাটতে লাগল। ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে দু'চারদিনের জন্যও বাইরে গেলে তার অদর্শনে আমার দিনগুলো যেন শূন্য মনে হ'ত। বছর দু'য়েক পরে আমার কোলে টুকটুকে একটি মেয়ে এল, কি সুন্দর শিশু, ধব্‌ধবে রং, মাথাভরা কালো চুল, যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়। বিকাশ বললে, চিত্রা, মেয়ে তোমার মতই সুন্দরী হয়েছে। আমি বলি, না মেয়ে তোমার সুন্দর চেহারা পেয়েছে। সেই ছোট শিশুটিকে নিয়ে হাসি কৌতুকের মধ্যে আমাদের প্রেম

আরও নিবিড় হয়ে উঠল। বিকাশ আদর করে মেয়ের নাম রাখল, উষা।

তার পর আড়াই বছর বাদে আর একটি মেয়ের জন্ম হ'ল, দেখলাম বিকাশ যেন বিশেষ খুশী নয়। এমনই অদৃষ্ট দু'বছর ঘুরতে না ঘুরতে তৃতীয় মেয়ের জন্ম হ'ল। বিকাশ দস্তুরমত চটে গেল, বললে, এ সব কি চিত্রা, একটা ছেলে বিয়োতে পারলে না, কেবল মেয়ের পর মেয়েই আসছে। জান, আমাদের পরিবারে ছেলের সংখ্যা কম, আমি ছেলে চাই।

একটা অপরিসীম লজ্জা আমাকে পেয়ে বসল, বিকাশ এটা বুঝতে পারে না যে, আমিও ত একটা ছেলে চাই, কিন্তু চাইলেই ত আর পাব না, ভগবান্ যদি না দেন। একদিন হঠাৎ দু'বছরের মেয়েটা শক্ত অসুখে পড়ল, প্রবল জ্বর কাশি, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম, বেশীদিন মেয়েটা বাঁচল না, আর দিন-সাতেক পরে পেটের অসুখে কোলের মেয়েটাও মারা গেল। উপর্য্যুপরি দু'টো নিদারুণ আঘাতে আমার মন ভেঙ্গে গেল, আমি শয্যাশায়ী হলাম।

এতদিন বিকাশের ভালবাসায় আমি বিভোর হয়েছিলাম, কিন্তু আজকাল যেন বিকাশের প্রেমে ভাঁটা পড়েছে, কেমন উড়ু উড়ু ভাব, মন খুলে সেভাবে আদর-সোহাগ করে না; মনে প্রবল অভিমান আর দুঃখ হ'ল, কেন বিকাশের এ পরিবর্ত্তন। আয়নাটা হাতে নিয়ে দেখলাম, একটু রোগা আর ফ্যাকাশে হয়ে গেছি, কিন্তু আমার মুখের শ্রী ত নষ্ট হয় নি। একদিন বিকাশ এসে আমার কাছে বসল, হঠাৎ আমি তার হাতটা ধ'রে বললাম, বিকাশ, তুমি আর আমাকে ভালবাসনা কেন, আমি কি দোষ করেছি বলো? বিকাশ আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললে, যত সব বাজে ভাবনা, ভাল করে ওষুধপত্র খাও, সেরে উঠ শিগ্‌গির। আমার মনে হয়, তোমার ছোট বোন ইলাকে এনে যদি কিছুদিন রাখ তবে তোমার মনটা ভাল থাকবে ওর সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে, আর তাছাড়া উষাকেও যত্ন করতে পারবে। আমি কাজকর্ম্মে বাইরে বাইরে থাকি। তাই তোমার ভাল লাগে না, একা থেকে থেকে যত সব বাজে ভাবনা কর।

আমি বললাম, সত্যি, এটা ভাল কথা, কালই তুমি গিয়ে ইলাকে নিয়ে এস। বোন এল, তাকে দেখে খুশী হয়ে উঠলাম, ষোল বছরে পা দিয়েছে—নিটোল স্বাস্থ্য, শ্যামল দেহে একটা শ্রী ফুটে উঠেছে। ইলা উষাকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, বলে দিদি মেয়েটা কি সুন্দর হয়েছে, তোমার চেয়েও বেশী সুন্দর। উষাও "মাসী মাসী" ব'লে ইলার গলা জড়িয়ে ধরল।

ইলা আর উষাকে কেন্দ্র করে আবার আমাদের আসর জমতে লাগল। হারানো দিনগুলি যেন আবার ফিরে পেলাম। বেশ কয়েক মাস কেটে গেছে। ইলা একদিন বললে, দিদি এবার বাড়ী যাই, অনেক দিন ত রয়ে গেলাম। আমি বললাম, দেখ্ ইলা, তুই থাকতে আমার দিনগুলো ভাল কেটেছে। কিন্তু তোকে আবার ফিরে আসতে হবে। মাস দুয়েকের ভিতর আবার আর একটি শিশু ত আমার কোলে আসবে। নানা ভাবনায় আজকাল মন বিচলিত থাকে। মনে মনে ভগবানকে ডাকি, হে ভগবান্, এবার একটি পুত্রসন্তান দাও, স্বামীর মুখে হাসি ফুটুক্।

ইলা চ'লে যাবে একথা শুনেই যেন স্বামীর মুখ কালো হয়ে উঠল। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ জাগল, খুব লক্ষ্য ক'রে দেখলাম ইলাকে দেখলেই বিকাশ খুশী হয়ে উঠে। যতক্ষণ বাড়ী থাকে নানা ছলছুতো ক'রে ইলাকে কাছে ডাকে। ইলারও দেখছি আমার কাছে বসতে বেশী ভাল লাগে না। সারাক্ষণ বিকাশের কাছে কাছেই ঘুরে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে মাথাটা যেন কেমন ঝিমঝিম্ করে উঠল, নাকমুখ জ্বালা করতে লাগল, কলতলায় গিয়ে মাথাটা ধুয়ে এলাম।

দু' তিনদিন পরের কথা। আমার মাথায় কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে চোখ বুজে পড়ে আছি, ওরা বোধ হয় ভেবেছে আমি শুয়ে আছি। শুনলাম বিকাশ অতি মিষ্টি স্বরে ডাকলে, ইলা শুনে যাও। ইলা ও ঘরে যেতেই বিকাশ বললে, ইলা তুমি নাকি কাল চলে যেতে চাও? আমি কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম। দেখতে পেলাম বিকাশ এক হাতে ইলার কোমর জড়িয়ে আর এক হাতে ইলার মুখখানা তুলে বলছে, ইলা আমাকে ফেলে যেও না। আমি তোমায় ভালবাসি। আমার শরীরে যেন কে আগুন ধরিয়ে দিল। রাগে বিতৃষ্ণায় সমস্ত শরীর থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, মনে হ'ল মাথায় যেন কে লোহার হাতুড়ি ছুঁড়ে মারল। 'মাগো' বলে জ্ঞান হারালাম। তার পর আর কিছু জানি নে।

কতদিন যে আমার তন্দ্রার মত কেটেছে বলতে পারি নে। চোখ খুলেছি, নানা ধরনের লোক দেখেছি, ওষুধ খেয়েছি, কিন্তু কি কিছুই বুঝতে পারি নি। একদিন শরীরটা আশ্চর্য্যরকম হাল্কা বোধ হ'ল। চোখ খুলে চেয়ে দেখলাম, একি এ ত আমার ঘর নয়, আমি তবে কোথায়?

অবাক্ হয়ে চারদিক চাইতে লাগলাম। বিভ্রান্ত হয়ে

গেলাম। পুরাণো স্মৃতি মনে করতে অনেক চেষ্টা করলাম, হঠাৎ মনে হ'ল আমার উষা, উষারাণী কোথায়? বিকাশ কোথায়? ইলার কথা মনে হতেই হঠাৎ যেন আমার সমস্ত স্নায়ু সচল সক্রিয় হয়ে উঠল। হাঁ, মনে পড়ছে, সেই দুপুরে ওদের অস্বাভাবিক কথাবার্ত্তা শুনে আমার মাথাটা কেমন করে উঠেছিল, আর কিছু ত মনে করতে পারি নে। অনেক ভাবতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। এমন সময় একটি বয়স্কা মহিলা ঘরে ঢুকতেই আমি অস্থির ভাবে বললাম, আমি কোথায় আছি বলতে পারেন?

মহিলাটি বললেন, ব্যস্ত হয়ো না মা, আমি নার্স। তুমি হাসপাতালে আছ। হাসপাতাল! আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, কেন, আমার কি হয়েছে? নার্স বললে, কিছু হয় নি মা, তুমি সুস্থ হলে আমি সব বলব। এখন কিছু বলতে ডাক্তারের মানা আছে, এই ওষুধটা খেয়ে নাও দিকিন। আমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

দশ-বারো দিন কেটে গেল, আমি এখন ডাক্তারের আদেশ মত চলাফিরা করি। ডাক্তার একদিন বললেন, এবার আপনি সুস্থ হয়েছেন, বাড়ী যেতে পারবেন। আপনার স্বামীকে চিঠি লেখা হয়েছে। আমি সেই বর্ষিয়সী নার্সকে ধরে বললাম, আমার কি হয়েছে খুলে বলতে। নার্স বললে, আমি নাকি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যাই। মাথায় ও শরীরে খুব চোট লেগেছিল, দু'দিন পরে আমার পেটের সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। আমি চমকে উঠে বললাম, সেকি, তবে আমি এ সন্তানও হারালাম।

নার্স বলতে লাগল, আট মাসের সুন্দর ছোট্ট মেয়ে ছিল শিশুটি। আমি ডুকরে কেঁদে উঠলাম, হায় ভগবান্ একে একে সব সন্তান নিয়ে যাচ্ছ। নার্স সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, মা অধীর হয়ো না, বেঁচে থাকলে আরও সন্তান পাবে। তুমি যমের দুয়ার থেকে ফিরে এসেছ। যে-কোন কারণেই হোক, তোমার স্মৃতি-শক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাই তোমাকে এই হাসপাতালে এনে রাখা হয়। তুমি যে এ ভাবে সম্পূর্ণ আরোগ্য হবে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল।

পরদিনই বিকাশ এসে উপস্থিত হ'ল আমাকে নিয়ে যেতে। এতদিন পর তাকে দেখে আমার মুখ-চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বিকাশ বললে, চিত্রা, তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। বিকাশের মুখে-চোখে আনন্দের আভা দেখে আমার মন খুশীতে ভরে উঠল। বাড়ী পৌঁছতেই উষা 'মা মণি, মা মণি' ব'লে ছুটে এল। আঃ, কি শান্তি, এতদিন পর আমার উষাকে বুকে নিয়ে যেন আমার প্রাণটা জুড়োল। উষার হাত ধ'রে আমি বহু দিন পর আবার আমার সংসার ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। বাঃ বাড়ী-ঘর ত বেশ সাজান-গোছান। আমি বললাম, উষামণি বাড়ী-ঘর কে সুন্দর ক'রে সাজিয়েছে?

উষা খুশী মুখে বললে, কেন, ছোট মা। আমি অবাক্ হয়ে বললাম, ছোট মা, ছোট মা কে রে?

চল তোমায় দেখাচ্ছি, ব'লে টেনে রান্না ঘরে নিয়ে এল, দেখতে পেলাম এক কোণায় বসে ইলা রান্না করছে, কপালে কুঙ্কুম-কোঁটা সিঁথিতে ডগ্‌ডগে সিন্দূর। আমি অবাক্ হয়ে বললাম, ইলা তুই এখানে? একি তোর বিয়ে হয়ে গেছে? কবে হ'ল, কোথায় হ'ল, জানাস্‌নি কেন?

ইলা মুখ তুলল না, ঘাড় গুঁজে ব'সে রইল, আর উষা ব'লে উঠল, এই ত আমার ছোট মা মণি। আমার মাথায় বাজ পড়ল, মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, বিকাশ এসে তাড়াতাড়ি আমায় ধ'রে বলল, তুমি অসুস্থ চলো ওঘরে বসবে। আমি বললাম, বিকাশ, এসব কি শুনছি? বিকাশ এক রকম টেনে ওঘরে এনে আমাকে খাটে বসাল। আমার একটা হাত ধরে বললে, চিত্রা আমায় ক্ষমা কর। ইলাকে বিয়ে না করে উপায় ছিল না। তুমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে, মাথার গোলমাল হয়েছিল, হাসপাতালে তিন মাস ছিলে, ডাক্তাররা তোমার স্বাভাবিক স্মৃতিশক্তি ফিরে আসবে বলে ভরসা করতে পারেন নি। উষাকে বা কে দেখে, সংসার বা কে চালায়? তখন শ্বশুর মশায় মানে তোমার বাবা এসে বললেন, বিকাশ, অন্য মেয়ে বিয়ে করার চেয়ে তুমি ইলাকেই বিয়ে কর, ইলা নিজের মাসী; উষাকে আদর-যত্নে মানুষ করবে। বাধ্য হয়ে আমাকে তাই করতে হ'ল। ইলা তোমার ছোট বোন তুমিই তাকে মানুষ করেছ, এখনও ইলা তোমার ছোট বোন হয়েই থাকবে, তোমার সংসার তুমি হাতে তুলে নাও। ইলা ব'লে বিকাশ ডাকতেই ইলা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল, বললে, দিদি আমি তোমার ছোট বোন, মাপ কর।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না, অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, তোমরা চলে যাও, আজকের দিনটা আমায় একা থাকতে দাও। ওরা চ'লে গেলে আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় লুটিয়ে পড়লাম, অসহ্য দুঃখে আমার বুকটা ভেঙ্গে যেতে লাগল। সেদিন কিছু খেলাম না। ওদের ডাকাডাকিতেও দরজা খুললাম না। সারা

দিন ভাবলাম, নিজের মনকে অনেক ক'রে বোঝালাম; ভাবলাম, সমস্ত পৃথিবীতেই দুই বিয়ে করেছে এমন লোক বহু আছে। যাক সব সহ্য করেই আমাকে এখানে থাকতে হবে আমার উষার বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত। তার পর না হয় কোন তীর্থস্থানে গিয়ে বসবাস করব। পরের দিন দরজা খুলে স্বাভাবিক ভাবে সংসার করতে লেগে গেলাম। তা দেখে বিকাশ আর ইলা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

দু' চারদিন আমার কাটল, কিন্তু কি যে হ'ল আমার, ইলা আর বিকাশকে একত্র দেখলেই মনটা বিষিয়ে উঠে, আর যখন কোন সময় হঠাৎ নজরে পড়ে যে বিকাশ ইলাকে নিয়ে আদর-সোহাগ করছে আমার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মাথায় উঠে যায়, কাণ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে, নিজেকে সামলে চুপ ক'রে থাকা কঠিন হয়, ছুটে চ'লে যাই সেখান থেকে। তার পর ক্রমে ক্রমে এমন হ'ল ওরাও আমার সামনে স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করতে পারে না, আমিও পরিনে। সময় সময় আমার মনে হয়, থালা ঘটি বাটি সব ছুঁড়ে আছড়ে ফেলে দি। বিকাশ আমার সঙ্গে মিষ্টি কথা বলতে এলে খেঁকিয়ে উঠি, মাস দুয়েক এই অসহ্য জীবনযাত্রা কাটালাম কিন্তু দিন রাত মুক্তির উপায় ভাবতে লাগলাম, কারণ এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব। আমার উষাকে ছেড়ে চলে যেতে বুক ফেটে যায়। কিন্তু তার মঙ্গলের জন্যই তাকে তার বাপের কাছে রাখতে হবে। একদিন বিকাশ অফিসে চ'লে যাবার পর আমি আমার দু'চারখানা কাপড়চোপড় আর বাপের দেওয়া দু'চারখানা গয়নাগাঁটি নিয়ে ইলার অগোচরে বাড়ী ছেড়ে রওয়ানা হলাম।

বাড়ীতে একটা চিঠি ছেড়ে এলাম, আমার জন্যে ভেবো না, আমি নিরাপদ আশ্রয়ে যাচ্ছি, পরে খবর দেব।

এই হাসপাতালেই আমি অসুস্থ হয়ে এসেছিলাম। আর ডাক্তার চৌধুরীর চিকিৎসায় আরোগ্য হয়েছিলাম। এই ডাক্তার সাহেবকে দেখে মনে হ'ল আমার মৃত পিতাকেই যেন ফিরে পেয়েছি। আমি তাঁর কাছে কেঁদে পড়লাম। সরল ভাবে একে একে সব কথা খুলে বললাম।

তিনি বললেন, ঘর ছেড়েছ মা ভালই করেছ, কিন্তু বাকী জীবনটা কাটাবে কি করে? লেখাপড়া শিখেছ কিছু?

লজ্জায় মাথা নুইয়ে বললাম অতি অল্প লেখাপড়া শিখেছি, অষ্টম শ্রেণী অবধি।

—ডাক্তার সাহেব ভুরু কুঁচকে কি ভাবতে লাগলেন, শেষে বললেন, তুমি নার্সিংয়ের কাজ করতে পারবে ত? মনে রেখো সেবার মধ্যে ঘৃণা তাচ্ছিল্যের ভাব থাকলে ভাল নার্স হওয়া যায় না। আমি ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করে বললাম, আপনি আমার বাবা, আমি যদিও নার্সিং পরীক্ষা পাস করি নি বা কিছুই জানি নে, তবু জানবেন, আমি প্রাণপণে আমার কর্ত্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে করে যাব, শুধু আমি নিরাপদ ভদ্র আশ্রয় চাই। সেই থেকে আমি এই "হাসপাতালেই আছি।"

আমি তন্ময় হয়ে চিত্রার ডায়েরীটা পড়ে যাচ্ছিলাম, এ পর্য্যন্ত পড়ে দেখি এর পর শুধু শূন্য পাতা, যেন ওরই শূন্য হৃদয়ের ছবি। পাতা উল্টাতে উল্টাতে আবার লেখা পাওয়া গেল।

কয়েকটা পাতায় হিজিবিজি কাটার পর লেখা সুরু হয়েছে "মন যখন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে, তখন মানুষ চায় প্রিয়জনের কাছে দুঃখের কথা ব'লে বুকটা একটু হাল্কা করে নিতে, বুকে পাষাণ চাপা থাকলে মানুষ পাগল হয়ে যায়। কিন্তু হে ভগবান, কার কাছে আমি আমার হৃদয়ভার খুলে লাঘব করি, কে আমার আত্মজন? না না, কেউ নেই, বিশাল সংসারে আমি একেবারেই একা, আমার এই দুঃসহ লজ্জা, এই পরাজয় কাউকে বলবার নয়। ডায়েরী, বন্ধু, প্রিয়তম, তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব, তাই তোমার বুকে আমার অশ্রুবিন্দু ঝরিয়ে আমার বুকের ব্যথা লিখে যাই:

পাঁচ বছর কেটে গেল হাসপাতালে রোগিণীদের সুখদুঃখের সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়ে রেখেছি। আমি untrained নার্স, তবু ডাক্তারবাবু আমার কাজে খুশী, আর অক্লান্ত সেবাযত্নে আমি রোগিনীদের প্রিয় সখী, কত রোগিণী ঘাঁটলাম, কিন্তু কই আমার মত একটাও ত পোড়াকপালী দেখতে পেলাম না। কত তরুণী, প্রৌঢ়া আসে দুরন্ত রোগ নিয়ে, দেখতে আসে তাদের স্বামী ছেলে মেয়েরা। কত তরুণকে দেখেছি আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে তরুণী স্ত্রীকে এই ত রোগ ভাল হয়ে যাচ্ছে, আর দু'চার দিনের মধ্যেই তোমাকে নিয়ে যাব, জান ত শূন্য গৃহে আমার কি অবস্থা। দেখেছি তাদের প্রণয়মুগ্ধ দৃষ্টি বিনিময়। দেখেছি প্রৌঢ় স্বামী প্রৌঢ়া গিন্নীর হাতখানা ধ'রে বলছে, ওগো শিগ্‌গির ভাল হয়ে উঠো, আর কতদিন হাসপাতালে পড়ে থাকবে, তোমাকে ছেড়ে আমার যে একা আর ভাল লা[illegible] প্রৌঢ়ার

মুখ স্বামীপ্রেমে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এই পাঁচ বছর ধ'রে এমনি কত তরুণীর,কত প্রৌঢ়ার প্রেমের কাহিনী শুনেছি, দেখেছি, আর আমার ভিতরটা হাহাকার ক'রে উঠেছে, এদের মত আমারও ত সব আছে, তবে কেন ভাগ্য-দোষে আজ আমি রিক্তা ?

পাঁচ বছর দিনরাত সংগ্রাম করেও মনকে বশে আনতে পারলাম না, একদিন ডাক্তারবাবুর কাছে ছুটি চাইলাম দু'মাসের জন্য বাড়ী যাব। বাড়ীতে গিয়ে দেখি সংসারের বহু পরিবর্তন ঘটেছে, ইলার কোল আলো-করা দু'টি ফুটফুটে মেয়ে দেড় বছরের ছোট বড় আবার ইলার সন্তান সম্ভাবনা, তার স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। উষা আমাকে দেখে অভিমানে মুখ ফিরিয়ে রাখল, কাছে যেতেই আমার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, মা মণি আমাকে ফেলে কেন চলে গেছলে ? কি উত্তর দেব ? মাতাকন্যার চোখের জল অঝোরে ঝরতে লাগল, দেখলাম এই পাঁচ বছরের উষা অনেকটা বড় হয়েছে, মুখখানা বড় মিষ্টি, মনে মনে আশীর্ব্বাদ করি মেয়ে আমার চিরসুখী হোক্।

সন্ধ্যায় বিকাশ বাড়ী ফিরে আমাকে দেখে খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, এগিয়ে এসে আমার হাত ধ'রে বললে এই যে চিত্রা এসে গেছ, আমি জানতাম তুমি একদিন ফিরে আসবেই। অনেকদিন পর স্বামীর হস্ত-স্পর্শে শরীর শিউরে উঠল, তার সপ্রেম দৃষ্টিতে মন বিহ্বল হয়ে উঠল পলকের জন্য, পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে অন্য কথা সুরু ক'রে দিলাম।

বহুদিন পর দিনগুলো ভালই কাটছে, উষা আর ছোট বাচ্চা দু'টাকে নিয়েই সারাদিন আমি থাকি। বিকাশ মাঝে মাঝে বলে, বেশ খেলার জিনিস পেয়েছ দেখছি, আমি তবু মৃদু হাসি। বাড়ীতে একটা ঘর আমার আলাদা ক'রে নিয়েছি, তাতে আমি, উষা, আর বাচ্চা দুটো থাকি, সেখানে আর কারও প্রবেশ নিষেধ।

কয়েকটা দিন নূতনত্বের ভিতর দিয়েই কাটল, কিন্তু তার পর দেখলাম শুধু সংসারের নয়, ইলার মনেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আমি যে তার দিদি, মা-মরা ইলাকে নিজ হাতে মানুষ করেছি, তা সে ভুলে গেছে, সপত্নীর সম্পর্কটাই সে বড় করে দেখছে। বুঝতে পারছি সে ভয় পেয়েছে। এখন ইলা আমাকে হিংসা করে, নানা ভাবে জানাতে চায় এ সংসারে আমার অনধিকার প্রবেশ হয়েছে। আমার স্নিগ্ধ কমনীয় কান্তির কাছে সে এখন স্বাস্থ্যহীনা, শ্রীহীনা ইলা। হ্যাঁ, পারি আমি প্রতিশোধ [illegible] বিজয়িনীর মত আবার আমি স্বামীর হৃদয় অনায়াসেই দখল করতে পারি, কারণ আমার যৌবন-চঞ্চল সেই স্বামীর দৃষ্টিকে বিচলিত ক'রে তুলেছে, বুঝতে পারি তার ক্ষুধিত চোখের দৃষ্টি আর চালচলন থেকে। আমার মনে ভীষণ সংগ্রাম চলতে লাগল। একবার মনে হয় আকণ্ঠভরে, অমৃত পান করি, আমার স্বামী, আমার মেয়ে সবকে নিয়ে আবার সুখনীড় গ'ড়ে তুলি। আর এক মন বলে, ছিঃ তুই পরাজয় স্বীকার করবি জীবন-দেবতার কাছে ? হে ভগবান্, শক্তি দাও। আমি কোন্‌দিকে পা রাখি ?

চার-পাঁচ দিন পরের কথা, আমি ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বিগত-দিনের বহু স্মৃতি মনকে চঞ্চল ক'রে তুলছে এমন সময় হঠাৎ আয়নায় বিকাশের ছায়া চোখে পড়ল। বিকাশ এসে আমার কাছে দাঁড়াল। বব্-করা চুলের নীচে আমার ঘাড়ে হাত বুলাতে বুলাতে বললে, আঃ কি সুন্দর লাগে চিত্রা তোমার ঐ মরাল-গ্রীবার উপর কালো বব্-করা চুল! বলতে না বলতে হঠাৎ চোখের পলকে আমাকে জড়িয়ে বুকে চেপে উষ্ণচুম্বন দিতে লাগল— বহুদিন, বহুদিন পর বিকাশের প্রেমালিঙ্গনে আমি বিহ্বল হয়ে গেলাম। আমার বর্ত্তমান তিক্ত নিঃসঙ্গ জীবন ভুলে অতীতের মদিরাময় জগতে চ'লে গেলাম ক্ষণিকের জন্য। হঠাৎ চেতনা এল, ছিঃ বলে একছুটে তার হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে নিজের কামরায় গিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দিলাম। বিছানায় লুটিয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলাম, না, না এ জীবন আমার নয়, এ অমৃতভাণ্ড আমার নয়। ইলা আমার প্রতি অবিচার করেছে। সে আমার দুঃসময়ে সুযোগ বুঝে তার যৌবনের ছোবল মেরে আমার স্থান দখল করেছে, কিন্তু আমি তা করতে পারি নে। একটা কাগজে লিখলাম—ইলা আমার মা-মরা ছোট বোন, তাকে আমি মানুষ করেছি, আর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ-ধন তাকে দান করেছি। সে দান আমি ফিরিয়ে নিতে পারি নে। আর বিকাশ তোমাকে আমি এ জীবনে ক্ষমা করতে পারব না। পনের বছর আগে যখন তুমি আমার জীবনে অতিথি হয়ে এসেছিলে, তখন তুমি ছিলে আমার চোখে আদর্শ স্বামী, উন্নত-চরিত্র প্রেমিক। আর আজ, আজ তুমি অনেক নীচে নেমে গেছ। আজও আমি তোমাকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে গভীর ভাবে ভালবাসি, কিন্তু শ্রদ্ধা করি নে। সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি তোমাকে. আজ তুমি আমার কেউ নয়, তোমার সংস্পর্শে আমার আর থাকা অসম্ভব, জীবনে আমার খোঁজ করো না।

(সায়েন্স এণ্ড কাল্চারের সৌজন্যে)

সর্ নীলরতন সরকার

এই চিঠিখানা লিখে আবার পালিয়ে এলাম এই হাসপাতালে ডাক্তার পিতার আশ্রয়ে।

ডায়েরী বন্ধু, প্রিয়তম, তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব। তাই তোমার বুকে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়ে আমার বুকভাঙা ব্যথা লিখে গেলাম। এই বিশাল সংসারে আমি একা, একেবারে একা। আমার এই দুঃসহ লজ্জা, এই পরাজয় কাউকে বলবার নয়, আজ থেকে তোমার বুকে লিখবার আর কিছু নেই, এখানেই যবনিকা শেষ।"

পড়া শেষ হ'ল। খাতাখানা হাতে নিয়ে চোখ বুজে ভাবছিলাম, কি মর্ম্মভেদী দুঃখ নিয়ে চিত্রা হাসিমুখে তার দিনগুলো কাটাচ্ছে। কখন চিত্রা নিঃশব্দে এসে ডায়েরীখানা ধ'রে সরিয়ে রাখবার চেষ্টা করছে বুঝে উঠতে পারি নি। হঠাৎ টুং ক'রে আওয়াজ হতেই চোখ খুলে দেখতে পেলাম চিত্রা মিষ্টি সুরে বলছে, দিদি কখন আপনার স্বামী মিঃ চক্রবর্ত্তী ভিজিটিং আওয়ারে এসে ব'সে আছেন। আমি শুধু হতবুদ্ধির মত চিত্রার হাসিমুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

ডাক্তার নীলরতন সরকার

শ্রীসুধীরকুমার লাহিড়ী

(প্রবাসী ১৩৫০, আষাঢ় হইতে পুনর্মুদ্রিত)

গত ১৮ই মে ডাক্তার নীলরতন সরকারের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে দেশবাসী কেবল যে তাঁহার ন্যায় একজন বিজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা হইতে বঞ্চিত হইল তাহা নহে, দেশ একজন প্রখ্যাত এবং সুযোগ্য কর্ম্মী হারাইল। তিনি বিরাশি বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। এই দীর্ঘজীবনে তিনি যে শুধু চিকিৎসা ক্ষেত্রেই খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, দেশের বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে উৎসাহের সহিত নিজেকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রসারে, কি শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগের বহুমুখী উন্নতিকল্পে, কি শিল্পের উন্নতি ও বিস্তারে কি সামাজিক উন্নতি-বিধানে, কি স্বাদেশিকতায়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বান্তঃকরণে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার মৃত্যুতে, দেশের কর্ম-জীবন হইতে তাঁহার ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির তিরোধান হওয়াতে অপূরণীয় ক্ষতি হইল।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে নীলরতন জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁহাকে কঠোর দৈন্য ও দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, অনম্যতা, অসীম ধৈর্য, অক্লান্ত অধ্যবসায় বলে ও জীবনের উচ্চাদর্শের প্রেরণায় জীবনদ্বন্দ্বে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে প্রবেশ করেন। সেখানকার পাঠ সফলতার সহিত সমাপ্ত হইলে তিনি কলেজে ভর্তি হইয়া এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর তিনি কিছুদিন একটি এণ্ট্রান্স স্কুলে প্রধান শিক্ষকের এবং পরে একটি কলিজিয়েট স্কুলে শিক্ষকের পদে কার্য করেন। অবশেষে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্মানের সহিত এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি কলিকাতা মেয়ো হাসপাতালে হাউস সার্জেনের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য করিতে করিতে তিনি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এম-এ এবং তৎপরে এম-ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীনভাবে কলিকাতায় চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সুযোগ্য ও বিচক্ষণ চিকিৎসক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই খ্যাতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জনপ্রিয় এবং অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন চিকিৎসক বলিয়া তাঁহার যশ ব্যাপ্ত হইয়া

পড়ে। ভারতে প্রথম বে-সরকারী মেডিক্যাল কলেজ হিসাবে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ যাঁহাদের যত্ন ও চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁহাদের মধ্যে নীলরতন সরকার অন্যতম। যাহাতে ভারতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের শিক্ষা আরও উচ্চতর বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং ভারতীয়গণ যাহাতে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের গবেষণার সুযোগ লাভ করিতে পারে তাহার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পাঠ্য-তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে, যাহাতে চিকিৎসাক্ষেত্রে ভারতের সুযোগ-সুবিধা এবং ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করা হয়, তাহার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাহা ছাড়া যাহাতে প্রত্যেক চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও ছাত্রগণ গবেষণা করিবার সুযোগ পান তাহার জন্যও তিনি যত্নবান ছিলেন। তিনি কলিকাতার বহু প্রধান বে-সরকারী হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং অনেক প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। বর্তমানে যে আমরা দেখিতে পাই ভারতীয় চিকিৎসকগণ ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ব্রিটিশ সদস্যদের সমকক্ষ, ইহা প্রধানতঃ ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীর প্রচেষ্টা, উদ্যম ও সৎসাহসের ফলে হইয়াছে।

নীলরতন সরকার বোধ হয় প্রথম ভারতীয় চিকিৎসক যিনি তাঁহার অসামান্য চিকিৎসা-নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসকের নিকট প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। তিনি যখন ইংরেজী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ যান তখন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এল-এলডি এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডি-সি-এল উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও ইউরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসকগণ স্মৃতির উদ্দেশে গভীর আন্তরিকতা পূর্ণ ও আবেগময়ী ভাষায় তাঁহার অক্লান্ত সেবা ও শ্রেষ্ঠতার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সৈন্য-বিভাগের টিউবারকিউলেসিস্ সেকসনের অধ্যক্ষ মিষ্টার এসমণ্ড, আর, লঙ্ এক বিবৃতিতে বলেন যে, চিকিৎসক হিসাবে সর্ নীলরতন সরকারের খ্যাতি ছিল পৃথিবী-ব্যাপী; প্রতি মহাদেশেই চিকিৎসা-ব্যবসায়ীগণ তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং দেশবাসীগণের প্রতি তাঁহার অক্লান্ত সেবা ও আন্তরিকতার জন্য তিনি তাহাদের নিকট গভীর শ্রদ্ধা ও প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রসার ও উন্নতির জন্য সর্ নীলরতন সর্বাপেক্ষা অগ্রণী ছিলেন। বিশেষতঃ যক্ষ্মা-প্রতিকারের গবেষণার কার্যে তিনিই পথ-প্রদর্শক ছিলেন।

চিকিৎসক হিসাবে নীলরতন সরকার অসাধারণ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু 'অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, শিল্প, সামাজিক ও ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাঁহার দান স্মরণীয়। দেশের শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষার উন্নতি-বিধানে তিনি আজীবন ব্রতী ছিলেন। শিক্ষাবিস্তার না হইলে, জাতির উন্নতি সম্ভব নয় এবং অন্যান্য উন্নত দেশের সহিত আমাদিগকেও সমান অধিকার লাভ করিতে হইলে তাঁহার মতে, প্রথমে আমাদিগকে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত হইতে হইবে। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের কার্যে নিজেকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইংরেজী ১৮৯৩ সনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হন। পরে তিনি সিণ্ডিকেটের প্রভাবশালী সভ্য হিসাবে, পোষ্টগ্রাজুয়েট ডিপার্টমেণ্ট অব আর্টস্ ও সায়েন্সের সভাপতি হিসাবে, ভাইস-চেন্সেলর হিসাবে, বিভিন্ন কমিটি, বোর্ড ও ফ্যাকালটির সভ্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসরের জন্য প্রাদেশিক আইন-সভার সদস্যও ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। যখনই এই প্রদেশে শিক্ষা বিস্তারের পথে বাধা সৃষ্টি করিতে সরকার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই সর্ নীলরতন সরকারী কার্যের প্রতিবাদ করিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের সংগঠন কার্যে সর্ নীলরতন যথাশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রতিষ্ঠায় নীলরতনের প্রচেষ্টা গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে। এই প্রতিষ্ঠানটি পরে ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন-এর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং একটি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পরিণত হয়। ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব এডুকেশন ও বিশ্বভারতীর কার্যাবলীর প্রতি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অনুরক্ত ও আগ্রহশীল ছিলেন।

বাংলা দেশে শিল্পপ্রসারে ও শিল্পোন্নতির কার্যে নীলরতন বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেকেই হয়ত জানেন না যে, শিল্প বিস্তারের জন্য তিনি ব্যবসায় করিতে গিয়া প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শিল্পোন্নতির বিষয়ে সামান্য মাত্রও হতাশ হন নাই। ভারতীয় জাতীয়

মহাসভার সহিত তিনি দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলন ও বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সময় এবং যখনই গবর্ণমেণ্ট ভারতের জাতীয় অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীয় অধিকার ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন, তখনই নীলরতন স্পষ্ট ভাষায় সরকারের কার্যের নিন্দা করিয়া তাহার প্রতিবাদ করেন। যাহাতে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হয়, যাহাতে জীবনের বিভিন্ন স্তরে ভারতবাসীগণ অন্যান্য উন্নত দেশবাসীদের সহিত সমান মর্যাদা লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৭ সনে তিনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। জীবনের প্রথম ভাগেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। পরে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হন। এইরূপে তিনি সভাপতি, সদস্য বা সভ্য হিসাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত থাকিয়া জীবনের শেষ মুহূর্তপর্যন্ত দেশের মঙ্গলসাধন করিয়া গিয়াছেন।

অতি সামান্য অবস্থার মধ্যে স্যর্ নীলরতনের জীবন সূত্রপাত হইলেও তিনি অসামান্য সাফল্য ও অতুলনীয় খ্যাতি প্রতিপত্তি ও যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁহার শৈশবের সরল স্বভাব ও অকপট চরিত্রের মাধুর্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। রোগীগণ তাঁহার সুমিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। তাঁহার চিকিৎসায় তাঁহারা বিশ্বাস ও আশা ফিরিয়া পাইতেন। দরিদ্রের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি সুবিদিত; বন্ধুবর্গের প্রতি সৌজন্য ও শ্রদ্ধা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। এমন কি যাঁহাদের সহিত তাঁহার মতের মিল হইত না তাঁহাদের কার্যের বা মতের প্রতিবাদ করিবার সময় যাহাতে কাহারও অন্তরে বা চিন্তায় আঘাত লাগে, এরূপ কঠোর ভাষা তিনি ব্যবহার করিতেন না। নিজেকে তিনি কখনও বড় বলিয়া মনে করিতেন না। নীলরতনের গৌরবময় জীবন, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, পরনিন্দাবিমুখ নম্র ও মধুর স্বভাব, অকপট দেশপ্রেম, অক্লান্ত দেশসেবা এবং উচ্চাদর্শের সহিত অসাধারণ ধীশক্তি ও নৈতিক গুণ-সকল দেশের যুবকদের নিকট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হইয়া থাকিবে।*

* আগামী ১লা অক্টোবর ১৯৬১ তারিখে কলিকাতায় নীলরতন সরকারের শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান হইবে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে মহাজাতি সদনে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন সাতদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করিবেন। প্রথম ও অপরাপর দিবসে ডাঃ জিবরাজ মেহতা, শ্রীহুমায়ুন কবীর ও ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় প্রভৃতি বহু স্বনামধন্য জননেতাগণ অনুষ্ঠানে যোগদান করিবেন।

এই অনুষ্ঠান যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেইজন্য ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্তকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। কমিটি এই উপলক্ষ্যে কয়েকটি ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছেন। যেমন: (ক) নীলরতন সরকারের নামে একটি ট্রাষ্ট ফাণ্ড খোলা হইবে।

(খ) ১লা অক্টোবর হইতে সপ্তাহব্যাপী মহাজাতি-সদনে শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

(গ) ডঃ নীলরতন সরকারের জীবন-চরিত প্রকাশ করা হইবে।

কমিটি সর্বসাধারণকে এই কমিটির সদস্য হইতে এবং এই ফাণ্ডে মুক্তহস্তে দান করিতে সাদরে আহ্বান জানাইতেছে।

—০—

রক্তাক্ত স্বপ্ন

শ্রীসুনীলকুমার নন্দী

আবছা কুয়াশামাখা রাত্রির অথই নীল পথে ঘুরে ঘুরে
কোথায় এলাম আমি,—সময়ের স্তূপ ঠেলে ধূসরাভ দেশে
বিমুগ্ধ সৃষ্টির সৌধে শিল্পীর নিপুণ স্পর্শ দেখি। তবু শেষে
সব কারুশিল্প মুছে শিল্পীর অপূর্ণ স্বপ্ন সমুদ্রের সুরে

ভেসে ভেসে আসে শুনি ;—আমার হৃদয় তোলে উতরোল ঢেউ
তাদের হৃদয় হয়ে। পথের ইশারা ভোলে যাযাবর মন।
রাত্রির শিয়রে কাঁপা ধূসর পৃথিবী থেকে আবার কখন
অস্ফুট বেদনাকলি বুকে নিয়ে পথে নামি। এখন কি কেউ

ঘুম ভেঙে জেগে আছে রাত্রির গহন নীলে আমার মতন!
বুকভরা আয়োজনে এমন একটি প্রাণ কোথাও পাব না
এ ধু ধু রাত্রির মাঠে, যেখানে ছড়ানো যায় মনের বাসনা?
ধূসর পৃথিবী থেকে তা হ'লে রক্তাক্ত স্বপ্ন এনে অকারণ

গানের কোরকে ভরে কি হবে কবন্ধ এই রাত্রির বাতাসে
ভাসিয়ে! না না না থাক আমার ঘনিষ্ঠতম নির্জন আকাশে।

—০—

চাঁদে গিয়ে কি দেখব ?

বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, মানুষ আর এক দশকের মধ্যেই কিংবা তারও আগে চাঁদে গিয়ে পৌছবে। চাঁদে যাবার জন্যে আজ যারা আগ্রহী হয়ে উঠেছে, এই প্রশ্ন তাদের মনে জাগছে যে, চাঁদে গিয়ে কি দেখব ?

চন্দ্রলোকযাত্রী রকেটের গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল। হিসেব ক'রে দেখা গেছে, রকেটে ক'রে মহাকাশে আমাদের পৃথিবীর এই নিকটতম প্রতিবেশীর কাছে পৌছতে তেরো ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না।

গোড়ায় এ কথাটা বলা দরকার যে, পৃথিবীর চেয়ে চাঁদের বয়স অনেক বেশী। এই উপগ্রহটি এখন মহাকাশে যেখানে আছে, একদা তার চেয়ে আমাদের অনেক নিকটে ছিল। এ হ'ল তখনকার কথা যখন আমাদের এই পৃথিবী ছিল ঘূর্ণমান জ্বলন্ত গ্যাসের পিণ্ড। চাঁদে কখনো কোনো-না-কোনো আকারে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কিনা এখনো তা আমরা জানতে পারি নি, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, চাঁদ এখন জীবশূন্য একটি মৃত উপগ্রহ।

চাঁদে গিয়ে মানুষ কিন্তু কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা পাবে। চাঁদের ব্যাস মাত্র ২,২০০ মাইল আমাদের পৃথিবীর ব্যাসের এক চতুর্থাংশের চেয়ে কিছু বেশী। কাজেই চন্দ্রলোকে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধান এবং জরীপ ইত্যাদি কাজ হবে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। তার উপর এর ১৫ লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত যে দিকটা আমরা দেখতে পাই তার শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ অঞ্চলের মানচিত্র তো নিখুঁতভাবে তৈরি করাই আছে।

প্রথম যে দুঃসাহসী মহাকাশ-যাত্রীরা রকেটসহ চাঁদে গিয়ে নামবে, কি অভিজ্ঞতা হবে তাদের ? চন্দ্রলোকে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই এই অনুভূতি হবে যে, তাদের দেহ অত্যন্ত হাল্‌কা হয়ে গেছে। চাঁদের মহাকর্ষীয় টান (gravitational pull) পৃথিবীর মহাকর্ষীয় টানের এক ষষ্ঠমাংশ মাত্র। কাজেই ওখানে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ এবং যাবতীয় বস্তুর ওজন হয়ে যাবে তাদের পার্থিব ওজনের ছয় ভাগের এক ভাগ। সাধারণ ভাবে পা ফেলে হাঁটা অপেক্ষা লঘুভাবে লাফিয়ে চলাই সেখানে হবে স্বাভাবিক। ওখানকার স্বাভাবিক গতি হবে ভেসে চলার মত।

মাথার উপরকার রাতের আকাশকে দেখাবে মসীকৃষ্ণ, কিন্তু তারাগুলি দীপ্তি পাবে অপরিসীম ঔজ্জ্বল্যে। ওখানে জলীয় বাষ্প, বাতাস, কুয়াশা, মেঘ ইত্যাদি না থাকায় আকাশে অনেক—অনেক বেশী তারা দেখতে পাওয়া যাবে—পৃথিবী থেকে সেই সকল অগণিত ছোট ছোট তারা খালি চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, বৃহত্তম দূরবীক্ষণের সাহায্যেই শুধু সেগুলি দৃষ্টিগোচর হয়।

পৃথিবীকে দেখাবে আকাশের উচ্চ স্থানে প্রকাণ্ড, দীপ্তিমান, মেঘখচিত একটি জ্যোতিপদার্থের মত। মনে হবে এর আয়তন, পৃথিবী থেকে চাঁদকে যত বড় দেখায় তার চেয়ে চারগুণ বেশী। মেরুপ্রদেশের তুষার-কিরীটগুলি ঝক্‌ঝক্‌ করবে, নিয়ত পরিবর্তনশীল ধূসর এবং সাদা কুহেলী-বন্ধনীর ভিতর দিয়ে অনন্ত-প্রসারিত নীলাভ সমুদ্রের বুকে বসানো হলদে-পীত মহাদেশগুলির তটসীমান্তের রেখাগুলি সুস্পষ্টরূপে চোখে পড়বে।

রকেট-যাত্রীরা যেখানে নামবে সেই স্থানটুকু উত্তপ্ত করা হবে কৃত্রিম উপায়ে। তার বাইরেই প্রচণ্ড শীত। থার্মোমিটারে দেখা যাবে সেখানকার তাপাঙ্ক হয়তো শূন্যেরও ২০০ ডিগ্রি নীচে।

ক্রমে রাত্রি শেষ হবে। ধীরে ধীরে ঘন নীল রঙের লম্বা লম্বা ছায়া ফেলে দিকচক্রবালের ওপরে উঠে আসবে প্রকাণ্ড এবং প্রচণ্ড দীপ্তিমান সূর্য্য। আর তখনই মাত্র সুস্পষ্টরূপে নজরে পড়বে চন্দ্রলোকের বিচিত্র দৃশ্য: এখানে দাঁড়িয়ে আছে উন্নত পর্ব্বতমালা, ওখানে এক একটি সূক্ষ্মাগ্র গিরিচূড়া অভ্রভেদ ক'রে উঠেছে উচ্চতা হয়তো চব্বিশ হাজার ফুট। চারদিকে পাথুরে দেয়ালে ঘেরা আগ্নেয়গিরির চওড়া মুখ। সবকিছুই সম্ভবতঃ এক প্রকার সূক্ষ্ম ধূসর লাভা-সঞ্জাত ধূলিকণায় আবৃত।

শব্দমুখর এই গ্রহের যে সকল যাত্রী চন্দ্রলোকে গিয়ে পৌছবে, ওখানকার পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্য তাদের মনে একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির সৃষ্টি করবে। শব্দতরঙ্গকে চালিত ক'রে নিয়ে যাওয়ার মত বাতাস এবং আবহাওয়া তো চাঁদে নেই। তার মানেই হচ্ছে এই যে, স্বাভাবিক কথাবার্তা বলা ওখানে অসম্ভব। যে সকল লোক প্রথম চাঁদে যাবে তাদের পরস্পরের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে হবে বেতারের মাধ্যমে। সে এক আজব দেশ। সেখানে না আছে মৃদু হাওয়া, না আছে বৃষ্টি কিংবা তুষার অথবা কুয়াশা। হাওয়ার অভাবে উনুনে রান্না করা সেখানে সম্ভবপর হবে না।

এখন, সূর্য্য যতই উপরে উঠতে থাকবে, থার্মোমিটারের উত্তাপও ততই দ্রুত বাড়তে সুরু করবে। গরম হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদের চেহারাও যেন বদলে যায়। দীর্ঘ ছায়াগুলি ক্ষুদ্রতর হয়ে আসে, এবং তখনই ফুটে ওঠে এর শৈলমালার আসল রূপ ও রং। তারা তখন আর ধূসর-কালো অথবা পীতবর্ণ দেখায় না, বহুবিচিত্র বর্ণসমন্বয়ে তাদের যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয় বাস্তবিকই বুঝি তার তুলনা নেই।

ক্রমে সূর্য্য আরো উপরে উঠতে থাকে, মাথার ঠিক ওপরে পৃথিবীকে তখন দেখায় অর্দ্ধচন্দ্রের মত। চাঁদের পিঠ তখন রীতিমত তেতে উঠেছে, উত্তাপ শেষ পর্য্যন্ত ২১৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটকেও ছাড়িয়ে যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চন্দ্রপৃষ্ঠের মাত্র কয়েক ইঞ্চি নীচেকার স্থান তখনো হিমশীতল। কেননা চাঁদ সূর্য্য-থেকে-পাওয়া প্রায় সবটুকু আলোই ফিরিয়ে দেয়, এর কিছুমাত্রও আত্মসাৎ করে না বললেই চলে।

প্রথম চাঁদে-যাওয়া মানুষ যারা তারা প্রধানতঃ হবে তথ্যানুসন্ধানী।

তাঁদের সেখানে পাঠানো হবে চন্দ্রলোকের অবস্থা সম্পর্কে বিবিধ তথ্য-সংগ্রহের জন্যে। সেখানে কোনো স্থানে তারা হয়তো এমন জীবাশ্ম আবিষ্কার করবে যার থেকে প্রমাণিত হবে যে, চাঁদও এক সময় আমাদের এই বসুন্ধরার মতই ছিল জীবধাত্রী। এমন কি তারা এমন কোনো অদ্ভুত, অপার্থিব, শৈবালসদৃশ উদ্ভিজ্জের সন্ধান পেতে পারে, এখনো যা চাঁদের রুক্ষ পিঠের নীচে প্রাণের প্রবাহকে বাঁচিয়ে রেখেছে। চাঁদে আছে একটি বিরাট ফাঁপা কেন্দ্রস্থল এবং এটা নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা গেছে যে, এর নীচেকার দিকের প্রথম কুড়ি থেকে ত্রিশ মাইল পর্যন্ত ঘনসন্নিবিষ্ট গুহাসমূহ এবং অসংখ্য সুড়ঙ্গে পরিপূর্ণ।

খুব সম্ভব, উল্কাবৃষ্টি এবং ভয়াবহ, পরিবর্তনশীল তাপমাত্রার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপযোগী ঐ গভীর গহ্বরেই স্থাপিত হবে চন্দ্রলোকের প্রথম ঘাঁটিসমূহ, মাটির নীচে তৈরী হবে অনেকগুলি হাল্কা কেবিন। এগুলিতে নারী-কর্মী পর্যন্ত নিয়োগ করা যেতে পারে, কেননা কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক গড়ন এমন যে তারা পুরুষজাতি অপেক্ষা অধিকতর সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে মহাকাশের পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

পারমাণবিক শক্তি ও পৃথিবীর রূপান্তর

পারমাণবিক শক্তির আবিষ্কারের ফলে আজ পৃথিবীতে একটা বড় রকমের ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মানুষ আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত প্রকার শক্তির অধিকারী হয়েছে তার মধ্যে এটিই হচ্ছে প্রচণ্ডতম। এটি এমন একটি শক্তি যা আজকের দিনে যারা বেঁচে আছে তাদের প্রত্যেকের জীবনকে এবং আজও যারা জন্মায় নি তাদেরও সবাইকার জীবনকে প্রভাবিত করবে।

অনেকে কিন্তু আজও পারমাণবিক শক্তিকে শুধু ধ্বংসাত্মক কার্যের সঙ্গেই সম্পর্কিত বলে মনে করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের মনে পড়ে হিরোশিমা ও নাগাসাকির ভয়াবহ ধ্বংসলীলা অথবা বিকিনি এবং সাহারা মরুভূমিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের কথা।

কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, পারমাণবিক শক্তির যত প্রকার ব্যবহার হতে পারে, পরমাণু-বোমা তন্মধ্যে গৌণ স্থান অধিকার করে আছে মাত্র।

এমন দিন অচিরেই আসবে যখন আমাদের রান্নাবান্না হবে পারমাণবিক শক্তির দ্বারা, শীতপ্রধান দেশে এর সাহায্যে ঘর গরম রাখা হবে। সমুদ্রে জাহাজ চালাবে এ পারমাণবিক শক্তি আর এরই দ্বারা আকাশে চালিত হবে বিমান।

ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গৃহে এবং শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্যে পাঁচটি নিউক্লিয়ার প্লান্ট-এ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে, ছটির নির্মাণকার্য চলছে, এবং আরো আঠারোটি প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

পারমাণবিক শক্তির কথা সাধারণ মানুষ জানতে পারল এই সেদিন মাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। কিন্তু এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানের সূচনা করেন একজন জার্মান বিজ্ঞানী, মার্টিন হেইনরিখ ক্লাপ্রথ, আজ থেকে ১৭২ বছর আগে—১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে। বোহেমিয়ার জাচিমোভ-এ (এখন যে অঞ্চলটি চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত) রূপার খনিগুলিতে যখন আকরিক (ore) সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হচ্ছিলেন তখন প্রথম তিনি য়ুরেনিয়ামকে সনাক্ত করতে সক্ষম হন। যাই হোক, মার্টিন হেইনরিখ ক্লাপ্রথ য়ুরেনিয়ামের সন্ধান পেলেন বটে কিন্তু এ নিয়ে আর কেউই তখন মাথা ঘামান নি। অবশেষে অধ্যাপক এলবার্ট আইনস্টাইন ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে, খুব সম্ভব জার্মানী পারমাণবিক বোমা তৈরির জন্য কাজ করে চলছে, তখন অনেকেরই টনক নড়ল। হঠাৎ পৃথিবী জুড়ে য়ুরেনিয়ামের জন্য রব উঠল। এর চাহিদা হল ধ্বংসাত্মক কাজের জন্যেই। সংঘবদ্ধভাবে য়ুরেনিয়াম আকরিকের (Uranium ore) সন্ধান চলতে লাগল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন প্রত্যেক নূতন আবিষ্কার থেকে ব্যবহার্য আকরিকের জন্য ৩৫,০০০ ডলার বোনাস দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, অষ্ট্রেলিয়ান গবর্ণমেণ্ট একটি বড় আবিষ্কারের জন্যে বোনাস হিসেবে দিলেন ২৪,০০০ পাউণ্ড। দুই বৎসরের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাটমিক এনার্জি কমিশন যা বোনাস দিলেন তার পরিমাণ পাঁচ লক্ষ ডলার।

এই সময়ে জ্যাক হোয়াইট নামে বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানী জনৈক অষ্ট্রেলিয়ান 'রাম জাঙ্গল' (Rum jungle) নামক কোনো একস্থানের চতুষ্পার্শ্বে কাজ করছিলেন। হলদে রংওয়ালা কতকগুলো গণ্ডশৈল (rock) তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। প্রথমে এর উপর তিনি কোনো গুরুত্ব আরোপ করেন নি, কিন্তু কিছুকাল পরে একটি সরকারী পুস্তিকায় যখন য়ুরেনিয়াম নামক জাফরানী রঙের এক প্রকার খনিজ দ্রব্যের রঙিন ফটোগ্রাফ দেখলেন তখন তাঁর মনে বিশেষ কৌতূহল এবং উৎসাহের সঞ্চার হল।

কালবিলম্ব না করে আবার তিনি ফিরে এলেন তাঁর আবিষ্কার-স্থলে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করে সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গেই এই আবিষ্কারের জন্যে তাঁকে বোনাস দেওয়া হল এক হাজার পাউণ্ড। পরে যখন তাঁর এই আবিষ্কার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হল তখন সর্ব্বোচ্চ বোনাস হিসেবে সরকার তাঁকে দিলেন ২৫,০০০ পাউণ্ড।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত য়ুরেনিয়াম আহরণ করা হত দক্ষিণ আফ্রিকার উইট ওয়াটারস্রেণ্ড এবং অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেটের সোনার খনিগুলিতে। কিন্তু ঐ সকল খনি থেকে যে স্বল্পপরিমাণ য়ুরেনিয়াম পাওয়া যেত তাতে ব্যবসায়ের দিক দিয়ে বিশেষ লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সোনা আহরণের জন্যে এই পদার্থ খনি থেকে তুলতেই হত। কাজেই য়ুরেনিয়াম প্ল্যান্টসমূহ স্থাপন করা হল।

যে সকল খনিজ দ্রব্যে য়ুরেনিয়াম অথবা তার সঙ্গে নিকটসম্পর্কযুক্ত মৌল পদার্থ (allied element) থোরিয়াম বর্তমান সেগুলি থেকে এক প্রকার রশ্মি বিকীর্ণ হয়। এই রশ্মি চোখে দেখা যায় না, কিংব অনুভব করাও যায় না, কিন্তু এক প্রকার যন্ত্র-সাহায্যে তা ধরা পড়ে এবং তার পরিমাপও করা যায়।

নানা জটিল বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার পরে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন করা হ য়ুরেনিয়াম ২৩৫ এবং প্লুটোনিয়াম। এই উভয় মৌল পদার্থই বিভাজনী (fissionable)। এদের পরমাণুগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভেঙে যায় এবং এদে এমন ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে যার দরুন পরমাণু-বোমা বিস্ফোরণ সম্ভবপর হয়। কিন্তু শুধু ধ্বংসাত্মক কার্যেই নয়, শিল্পোন্ন ইত্যাদি গঠনমূলক কাজেও এই পারমাণবিক শক্তি প্রয়োগের ব্যব করা যেতে পারে।

খনি থেকে য়ুরেনিয়াম আহরণ করার পর থেকে পরিশ্রুত ক পর্যন্ত নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়। এই সমস্ত প্রক্রিয়া ফল হল রেডিও আইসোটোপ। এগুলি হচ্ছে সংখ্যাতীত অতিক্ষুদ্র সা উত্তপ্ত পদার্থ। এই রেডিও আইসোটোপগুলির মূল্য এত বেশী হিসাব করে তার পরিমাপ করা যায় না।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল ক্ষুদ্র অণুর (molecules) দৌলতে মার্কি

যুক্তরাষ্ট্রের শিল্প-ক্ষেত্রে পাঁচ শত লক্ষ ডলার বেঁচে যায়। ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থার আরো উৎকর্ষ সাধিত হবে এবং বিশেষজ্ঞেরা হিসেব করে দেখেছেন যে, ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র আমেরিকাতেই বার্ষিক সঞ্চয় পাঁচ হাজার মিলিয়ন ডলারকে ছাড়িয়ে যাবে।

অতি ক্ষুদ্র টুকরো টুকরো শ্বেত পদার্থ এই রেডিও আইসোটোপগুলো হচ্ছে সাংঘাতিক জিনিস। এরা এমন সব পরমাণু যাদের করা হয়েছে তেজস্ক্রিয়। রেডিও আইসোটোপ যে রশ্মি বিকিরণ করে তা দেখা যায় না, কিন্তু যন্ত্রে খুব অনায়াসেই ধরা পড়ে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রেডিও আইসোটোপের ব্যবহারের ফলে কত যে সুবিধে হয়েছে তা ব'লে শেষ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক্ ব্রেন টিউমারের কথা। আগেকার দিনে কোনো রোগীর ব্রেন টিউমার মস্তিষ্কের কোথায় হয়েছে তার হদিস পেতে হ'লে চিকিৎসকের পক্ষে আন্দাজের ওপর অস্ত্রোপচার করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আজ রেডিও আইসোটোপের সাহায্যে, টিউমারটি ঠিক কোথায় আছে চিকিৎসক তা নির্ভুলভাবে জানতে পারেন এবং যখন তিনি অস্ত্রোপচার করেন তখন সরাসরি সেটির উপরেই করেন। শিল্পের ক্ষেত্রেও রেডিও আইসোটোপ বহুভাবে ব্যবহৃত হয়।

য়ুরেনিয়াম পাওয়া যায় দুটি খনিজ দ্রব্যে—পীচব্লেণ্ড এবং কারনোটাইট-৭। পীচব্লেণ্ড হচ্ছে এক প্রকার কালো রঙের আকরিক। এতে আছে য়ুরেনিয়াম অক্সাইড। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এক টন পীচব্লেণ্ড থেকে সাত অথবা আট পাউণ্ড পর্যন্ত এবং কখনো কখনো তার চেয়েও বেশী য়ুরেনিয়াম পাওয়া যায়।

য়ুরেনিয়াম ধাতু খুব মূল্যবান পদার্থ। এক কিউবিক ইঞ্চি পরিমাণ এই পদার্থের ওজন হচ্ছে ঠিক এগারো আউন্সের চেয়ে একটু কম। বারো আউন্স য়ুরেনিয়াম ধাতু থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হবে তা হবে সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে ব্যবহৃত কয়লা থেকে উৎপাদিত ৩৬,০০০,০০০ আউন্স শক্তির সমান।

য়ুরেনিয়াম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ জনৈক ইংরেজ বলেন যে, দশ টন আকরিক থেকে স্বাভাবিক য়ুরেনিয়াম পাওয়া যায় ত্রিশ পাউণ্ড এবং ঐ পাউণ্ড য়ুরেনিয়াম থেকে U-235 পাওয়া যেতে পারে সওয়া তিন আউন্স মাত্র। সারা পৃথিবীতে আজ এই শেষোক্ত পদার্থটির চাহিদা খুব বেশী।

আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে শক্তিসম্পন্ন পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে য়ুরেনিয়াম। পারমাণবিক শক্তির পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যে সারা দুনিয়ার বৈজ্ঞানিকেরা আজ একাগ্র নিষ্ঠায় কাজ করে চলেছেন। এমন দিন অচিরেই আসবে যখন জ্বালানি সরবরাহকারীকে ডেকে পাঠানো হবে কয়লা অথবা তেলের জন্যে নয়, এক দলা য়ুরেনিয়াম যোগান দেবার জন্যে।

তাপ এবং আগুনের জন্যে আজ প্রধানতঃ আমাদের নির্ভর করতে হয় কয়লার ওপর, কিন্তু অনতিদূর ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজনীয় উত্তাপ, আলো, এঞ্জিন ইত্যাদি চালানোর শক্তি সবকিছুই সরবরাহ হবে এ্যাটমিক রিএ্যাক্টার বা পারমাণবিক চুল্লী থেকে। শল্যবিদ্যায় (Surgery) পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের ফলে বহু মানুষের প্রাণরক্ষা হবে, কৃষিক্ষেত্রে এর প্রয়োগের দরুণ খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পরমাণু-বোমা একদিন যেমন যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল তেমনি য়ুরেনিয়ামের যাদুশক্তির প্রভাবে আজকের পৃথিবীর রূপ বদলে যাচ্ছে।

ন. ভ.

হৃদ্‌ঘটিকা

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, ক'টা বেজেছে মশাই? এই ঘড়িটি দেখে তার উত্তর দিতে পারবেন না; কিন্তু তিনতলার সিঁড়ি উঠতে উঠতে, কিংবা অফিসের কাজে ক্লান্তি বোধ হতে থাকলে, কিংবা খানাপিনার সময়, নিজে বুঝতে পারবেন আপনার হৃৎস্পন্দন মিনিটে কতবার ক'রে হচ্ছে। যদি আপনার ডাক্তার ব'লে থাকেন, আপনার হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়

হৃদ্‌ঘটিকা

এমন কিছু করা আপনার অনুচিত, তাহলে এই ঘড়িটি আপনার খুবই কাজে লাগবে। কিন্তু এদেশে সময় জানবার ঘড়িই কিনতে পাওয়া আজকাল দুষ্কর, এই ঘড়িটির সন্ধান করতে এখনই যেন বাজারে বেরুবেন না।

ইয়েতি-ইতি

ইয়েতির কি ইতি হয়ে গেল?

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা কর্ণেল ওয়াডেলের একটি বইয়ে নিজের পদচিহ্নের বর্ণনা নিয়ে পাশ্চাত্ত্য সভ্যজগতে ইয়েতির (yeti) প্রথম আবির্ভাব।

তার পর কোনো একটি অনাবিষ্কৃত দ্বিপদ জন্তুর এই পদচিহ্নের দেখা মিলেছে বারবার। কর্ণেল হাওয়ার্ড বারী যেখানে দেখেছেন ১৯২১ সালে, তার থেকে ৮০ মাইল দূরে, সিকিমের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, আবার দেখেছেন ক্যাপ্‌টেন হাণ্ট, পরে স্যার জন হাণ্ট্ ১৯৩৭ সালে। ১৯৫১ সালে এরিক শিপ টন এই পদচিহ্নের পরিষ্কার একটি ফোটোগ্রাফ তোলেন। ১৯৫৪ সালে বিলাতী সংবাদপত্র ডেলী মেল্-এর আয়োজিত হিমালয় অভিযানে যারা ছিলেন, তাঁরাও এই পদচিহ্ন দেখেছেন ব'লে সাক্ষ্য দেন।

পাঁচ-আঙুল-ওয়ালা একফুট লম্বা পায়ের এই ছাপ অনেকটাই মানুষের পায়ের ছাপের মত।

ইয়েতির পায়ের দাগ

১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে আলেক্সেয়ার ক্র্যাম নামক এক গিরি-আরোহী শিকারী ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে দাবী করতে থাকেন যে, ইয়েতিকে তিনি চাক্ষুষ করে এসেছেন। জন্তুটির শরীর কালো বা গাঢ় বাদামী রঙের রোঁয়ায় ঢাকা, তার মুখের রঙ শাদা, কানদুটো গোলাকার মাথার সঙ্গে চাপা। পাঁচ ফুটের মত লম্বা এই জন্তুটির গড়ন ছিপ্‌ছিপে।

ইয়েতির পক্ষ নিয়ে বলা যায় যে, তার অস্তিত্বে হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। কেউ অবিশ্বাস করছে শুনলে এরা অত্যন্ত অবাক হয়ে যায়।

ইয়েতির মাথার চামড়া

অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে এভারেষ্ট বিজয়ী স্যর এডমণ্ড হিলারী, অ্যারোজন দুর্দ্ধর্ষ গিরি-আরোহী সহচর নিয়ে আঁতি-পাঁতি করে খুঁজেও ইয়েতির পাত্তা পাননি। তার মাথার খুলির চামড়া বলে প্রচারিত চামড়া বড় আয়াসে সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে প্রতিপন্ন করাতে পারেননি যে, সেটা আদৌ কোনো জীবের মাথার চামড়া। তাঁদের অনেকের মতে ওটা কোনো জীবের পিঠের চামড়া, যাকে গড়েপিটে টুপীর মত আকৃতি দেওয়া হয়েছে। আজ কেউ কেউ বলছেন, তা যদি বা হয়ও ঠিক ঐ রকম লোমওয়ালা পিঠের চামড়া কোনো জন্তুর আছে বলেও আমাদের জানা নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, চামড়াটা ইয়েতির।

আজ ... সাম্প্রতিক সংবাদ, একদল গিরি-আরোহীর নেতা আর
মোভ-এ (এখন ... বলেছেন ইয়েতি বলে কল্পিত জীবের মত কোনো
খনিগুলিতে যখন ... 'হিমমানব' ব'লে যাকে এতদিন মনে করা হত,
'তখন প্রথম তিনি ঘুরেনি ... এই জল্পনা-কল্পনা চলত, সে আসলে 'ব্রাউন
মার্টিন হেইনরিখ ক্রাপ্রথ যুগে
আর কেউই তখন মাথা ঘ...
করতে হিমালয় শীর্ষ থেকে নেমে না এলে

এইখানে বোধহয় তার ইতিই হয়ে গেল। ভাল লাগছে না ভাবতে। অনেকেরই ভাল লাগবে না।

এখন প্রশ্ন হল যাকে নিয়ে প্রায় শতাব্দীকাল ধরে মানুষের এত জল্পনা-কল্পনা, যার সন্ধান পাবার জন্যে মানুষের এত আগ্রহ, এত শ্রম ও অর্থ ব্যয়-সাপেক্ষ অভিযানের পর অভিযান, তার নামকরণ Abominable Snowman বা ঘৃণিত হিমমানব কে করেছিল, কেন করেছিল?

ইয়েতি নামটি এসেছে, নেপালী ইয়েহ্ তেহ্ থেকে, যার অর্থ, পার্ব্বত্য জন্তু।

স. চ.

বন্ধ্যাত্ব নিবারণ

বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছ্রতার যুগে বন্ধ্যাত্ব নিবারণের আলোচনায় অনেকেই হয়ত হাসিবেন। কিন্তু সন্তানের পিতা-মাতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা দম্পতি মাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ছাড়াও যদি দম্পতি বহুকাল সন্তানের জনক-জননী না হন, তবে তাঁহাদের মনে নানারূপ আশঙ্কা জন্মে যাহা দাম্পত্য-জীবনে মোটেই শান্তিপ্রদ হয় না।

দাম্পত্য জীবনের সুরুতে অনেকেই দু-তিনটি সন্তান নিয়া সুখের সংসার রচনা করিবেন এরূপ স্বপ্ন দেখেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও যৌন-সম্পর্কে কোনও অস্বাভাবিকতা না থাকা সত্ত্বেও সন্তান হয় না। প্রথমতঃ তাঁহারা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট থাকেন। কিন্তু বছরের পর বছর চলিয়া গেলেও যখন তাঁহারা সন্তানের মুখ দেখেন না তখন ভীতি ও নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহাদের মন অধিকার করিয়া বসে। কালক্রমে এই অবস্থার জন্য উভয়ে উভয়কে দায়ী মনে করেন। গোড়ার দিকে বিরোধটা থাকে মনের ভিতরে চাপা; ক্রমে তাহা মুখর হইয়া দাম্পত্য-জীবনের সকল সুখ ও শান্তি নষ্ট করিয়া দেয়।

তাহা হইলে দেখা যায় যে, এই বন্ধ্যাত্বের জন্য সমাজ একটা জটিল অবস্থার সম্মুখীন হয়, সমাজ-হিতৈষিগণ যাহা অবহেলা করিতে পারেন না। বহুদিন হইতেই এই সমস্যা প্রবীণ চিকিৎসকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। বহু বৎসরের গবেষণার ফলে আজ তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত বলিতে সক্ষম যে, যে সকল দম্পতি সন্তানের মুখ দেখিবার আশা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ চল্লিশটি ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্ব মোচন সম্ভব। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবস্থা আরো আশাপ্রদ হইবে।

যুগ-যুগান্ত ধরিয়া মানুষ সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছে, বন্ধ্যাত্বের কারণ বহুকাল নির্ণীত হয় নাই।

কিন্তু গবেষণা ক্রমাগতই চলিয়াছে। গত দশ বৎসরের মধ্যে এই গবেষণা সন্তান-লাভেচ্ছু নর-নারীর জীবনে এক যুগান্তর আনিয়াছে। আজ বৈজ্ঞানিকগণ নিঃসংশয়ে পাঁচটি উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছেন যাহা অবলম্বন করিলে সন্তানহীন নিরানন্দ গৃহ শিশুর কলহাস্যে মুখরিত হইবে। উপায় পাঁচটি এই:

মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে আন্তর্জাতিক বন্ধ্যাত্ব নিবারণ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা Dr. Weisman একটি উপায় আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। আবিষ্কারটির নাম 'ফার্টিলো-প্যাক' (Fertilo. pak); ইহা অতি সূক্ষ্ম আবরণে নিহিত ফেনাময় রাবারের প্রস্তুত একটি নমনীয় অবরোধ। ৮ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত অবরোধটি একটি

যন্ত্র কার্য্য করিবে যাহাতে শুক্রকীট ডিম্বাণুর সহিত অতি স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে থাকিবে ও পরস্পর মিলিত হইবার সুযোগ পাইবে। Dr. Weisman শতাধিক হতাশ নারীর উপর তাঁহার এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করিয়া খুব সুফল পাইয়াছেন। এই সকল নারী পূর্ব্বে বহু উপায় অবলম্বন করিয়াও বিফল হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন দশ বৎসরের বিবাহিত জীবনেও বন্ধ্যাত্ব মুক্ত হইতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় উপায়ঃ— কোনও কোনও স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষে ডিম্বাণুগুলি খাম-খেয়ালীভাবে সক্রিয় হয়; আবার কাহারও কাহারও তাহা মোটেই সক্রিয় হয় না। ইহাও একটি গুরুতর সমস্যা।

বর্ত্তমান চিকিৎসকদের মতে স্ত্রীলোকের ডিম্বাণু সক্রিয় হয় মস্তিষ্কে অবস্থিত pituitary gland নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থির নির্দ্দেশে। এই গ্রন্থিটিই মানবদেহের সমগ্র গ্রন্থিনিচয়ের প্রভুস্থানীয়; সকল গ্রন্থিই ইহার আজ্ঞাবহ। Pituitary গ্রন্থি যদি Hormone নামে একপ্রকার তেজোবর্দ্ধক রস নিঃসরণ না করে তবে স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষে যথেষ্ট পরিমাণে তেজঃসঞ্চার হইবে না যাহার ফলে কোষ ছাড়িয়া ডিম্বাণু বাহির হইয়া আসিতে পারে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে pituitary নিজেও একটু ঢিলা স্বভাবের হয় আবার কখনও কখনও ডিম্বকোষ ও নিজের শক্তির অভাবে pituitary-র আজ্ঞা পালনে সক্ষম হয় না, এমনকি pituitary-র নির্দ্দেশ বুঝিবার মতো শক্তিটুকু তাহার থাকে না। কাজেই ডিম্বকোষ যাহাতে pituitary গ্রন্থির সহিত যোগসূত্র সুদৃঢ় ও অব্যাহত রাখিয়া ঠিকভাবে তাহার আজ্ঞা পালন করিতে পারে তাহার পাকাপাকি ব্যবস্থার প্রয়োজন। এখানে আমরা পাইয়াছি ফিলাডেলফিয়ার Jefferson Medical College-এর Dr Abraham Rakoff কে যিনি এরূপ স্থলে রঞ্জন-রশ্মির (X-Ray) চিকিৎসা প্রবর্ত্তন করিয়া লোককে এক নূতন পথ দেখাইয়াছেন। রঞ্জন-রশ্মি সম্পাতে তিন সপ্তাহের মধ্যেই ডিম্বকোষ যথেষ্ট তেজঃসঞ্চয় করিয়া pituitray-র সহিত যোগসূত্র সুদৃঢ় করিয়া লইতে পারে; তাহার পরে কোষ হইতে ডিম্বাণু নিঃসরণ খুবই সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

তৃতীয় উপায়ঃ Steroid গোষ্ঠী-ভুক্ত পদার্থের ব্যবহারে অনেক সময় ডিম্বকোষ সহজে সক্রিয় হইতে দেখা গিয়াছে। যদিও এই ব্যবস্থা রঞ্জনরশ্মির মতো তত ফলপ্রসূ এখনও হয় নাই তথাপি Harvard Medical School-এর স্ত্রীরোগ বিদ্যার অধ্যাপক Dr John Rock সম্প্রতি কয়েকজন বন্ধ্যা নারীর উপর এই পদার্থের প্রয়োগে আশাপ্রদ সুফল পাইয়াছেন। রঞ্জন-রশ্মি প্রয়োগ করা হয় সোজা-সুজি ডিম্বকোষে, steroid গোষ্ঠীর ক্রিয়া হয় pituitory গ্রন্থির মাধ্যমে।

চতুর্থ উপায়ঃ—রঞ্জন-রশ্মি ও steroid উভয় চিকিৎসাই বন্ধ্যা-নারীর গর্ভ-সঞ্চারে যথেষ্ট সহায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু যে নারী গর্ভবতী হইয়াও সন্তানের জননী হইতে পারেন না চিকিৎসকগণ তাঁহার জন্য কি ব্যবস্থা করিবেন? হবু-হবু অবস্থায় আসিয়াও মা পুনঃ পুনঃ নিরাশ হন। গর্ভপাত হইয়া তাঁহার সমস্ত আশা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার কাহিনী বড়ই করুণ। গর্ভপাতের সমগ্র তথ্য এখনও সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয় নাই। তবে চিকিৎসকগণ মনে করেন গর্ভাশয়ের আস্তরে কোনও প্রকার ত্রুটির জন্যই ইহা ঘটিয়া থাকে—যে আস্তরের আশ্রয়ে থাকিয়া সক্রিয় ডিম্বাণুটি ক্রমে ক্রমে পূর্ণাবয়ব লাভ করে।

সাধারণতঃ যে সকল রাসায়নিক পদার্থে শোণিতবিন্দু গঠিত তাহাই গর্ভাশয়ের আস্তরটিকে সুস্থ রাখে যাহাতে সে তার নিজের কাজ সুষ্ঠুভাবে অর্থাৎ সজীব সক্রিয় ডিম্বাণুটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারে। ঐ সকল রাসায়নিক উপাদানের কোনোটিতে যদি ঘাটতি পড়ে তবেই হয় মুশকিল। আস্তর আর তার নিজের কাজ ঠিক মতো করিতে পারে না। ফলে ডিম্বাণুটি কক্ষচ্যুত হইয়া ভাসিয়া চলিয়া যায়। এই অবস্থার প্রতিরোধের জন্যও steroid গোষ্ঠীতে একটি নূতন দ্রব্য বাহির হইয়াছে যাহা এরূপ ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী হইতেছে। গবেষকদের বিশ্বাস, এই ঔষধ যে গর্ভিণীর দেহে কোনো নব-শক্তির সঞ্চার করে তাহা নয়, কিন্তু যে ভাবেই হউক, গর্ভাশয়ের আস্তরটিকে সুস্থ রাখে।

পঞ্চম উপায়ঃ—দৈহিক কারণে যেমন নারী বন্ধ্যা হইতে পারেন মানসিক কারণও এই ব্যাপারে তেমনই উপেক্ষনীয় নয়। বন্ধ্যা-নারীদের বিষয়ে গবেষণার ফলে দেখা গিয়াছে অর্দ্ধেক ক্ষেত্রে মানসিক গোলযোগই তাঁহাদের বন্ধ্যাত্বের মূল কারণ।

প্রশ্ন হইতে পারে, মানসিক কারণে কেমন করিয়া নারী বন্ধ্যা হইতে পারেন? চিকিৎসকগণ এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম। কিন্তু তাঁহারা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেন যে মানসিক কারণে অনেক সময় দৈহিক বিকৃতি ঘটিয়া থাকে। ভাবপ্রবণতার আতিশয্যের দরুণ মানুষের হাত-কাঁপা রোগ হইতে দেখা গিয়াছে। একই কারণে মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাস হ্রস্ব হইয়া থাকে। মনের বিরোধ হইতে লোকের পাকাশয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে। এ যদি সম্ভব হয়, তবে মানসিক কারণে বন্ধ্যাত্ব কেন সম্ভব হইবে না?

তবেই দেখা যাইতেছে যে, কখনও কখনও বন্ধ্যাত্বের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া চিকিৎসককে মনস্তত্ত্বের আশ্রয়ও লইতে হয় এবং তাহার চিকিৎসাও হয় মনস্তত্ত্বেরই ভিত্তিতে (psychotherapy)। এ অবস্থায় চিকিৎসককে খুব সহানুভূতির সহিত চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। দরদের সহিত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া যদি সঠিক জানিতে পারা যায় যে, নারীর বন্ধ্যাত্বের মূলে রহিয়াছে মানসিক কারণ, তবে চিকিৎসাও সহজসাধ্য হইবে।

শেষের কথা এই—অনিচ্ছার বন্ধ্যাত্ব সমাজে একটি জটিল সমস্যা; তবে আশার কথা এই, সমস্যাটির সমাধানের জন্য চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না। হয়ত শীঘ্রই এমন দিন আসিতেছে যেদিন সন্তান-বুভুক্ষু দম্পতিকে আর নিঃসন্তান থাকিতে হইবে না।

হ-প-মু

প্রকারী স্খলিত ফল। তাতে উন্মাদনা আছে, মত্ততা আছে; কিন্তু উন্মাদনার মত্ততা সনেট ফর্মের নৈর্ব্যক্তিক গঠনে সংহত।

বাংলা সনেটের সম্পূর্ণাঙ্গ চেহারা দেখার লোভ ছিল। মধুসূদন দত্ত থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত বাংলা সনেটের সেই রূপ ঝক্‌ঝক্ করছে। কোন প্যাটার্ণ পোয়েট্রির এমন স্বতন্ত্র সংকলন বাংলা দেশে আগে হয়নি। তাই এই সংকলনের সম্পাদক ও প্রকাশককে আমরা ধন্যবাদ জানাই। তাঁরা যে প্রেমের কবিতা বা হাসির কবিতার চোরা-গলিতে পা না দিয়ে সনেট সংকলন করেছেন, তার মধ্য দিয়ে একটি প্রয়োজনীয় সময়োচিত কাজ করেছেন। জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাঁর দীর্ঘ ভূমিকায় দেখিয়ে দিয়েছেন বাংলা সনেটের বিভিন্ন কবি কিভাবে শেকসপীরীয়, মিলটনিক, বা ফরাসী রীতির সাধনা করেছেন। তেমনি তিনি দেখিয়েছেন, কোন কোন কবি সনেট আদৌ লেখেননি আবার কারোর কারোর সনেটেই সমধিক স্ফূর্তি। সনেটের ফর্ম সম্পর্কে তিনি বেশ তীক্ষ্ণ সচেতন।

কিন্তু ভূমিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি বক্তব্যের সঙ্গে আমার বিরোধিতা আছে। প্রথমেই আপত্তি জানাই ভূমিকার প্রথম পংক্তিতে- 'সনেট ছোট কবিতা, কিন্তু উজ্জ্বল কবিকৃতি।' এখানে 'কিন্তু' মানে কি? ছোট কবিতা কি উজ্জ্বল কবিকৃতি হ'তে পারে না? বোধ হয় বললে ভাল হ'ত, সনেট ছোট কবিতা এবং উজ্জ্বল কবিকৃতি। এর পরের বাক্যে জীবেন্দ্রবাবু লিখেছেন, 'দীর্ঘ গীতিকবিতায় যে ভাবের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ, চতুর্দশ পদার সংযত ও সংহত রূপের মধ্যে তাকে ফুটিয়ে তোলা সহজ নয়।' এখানেও একই প্রশ্ন, গীতিকবিতার আগে 'দীর্ঘ' বিশেষণটি কেন? ক্ষুদ্র গীতিকবিতার সঙ্গে সনেটের কি তাহলে পার্থক্য নেই? ফলত গীতিকবিতার দীর্ঘ হওয়াটাই বড় কথা নয়; সনেটের সঙ্গে তার বিসংগতিই বিচার্য। এরপর জীবেন্দ্রবাবু লক্ষ্য করেছেন, 'তাঁর (মাইকেলের) চতুর্দশপদী কবিতাগুলিতে কবিত্বের রসস্পর্শ খুবই কম।' এ মন্তব্য খুবই সাহসিক কিন্তু কোন ব্যাখ্যা না থাকায় অস্বস্তিকর। আমাদের দিক থেকে প্রশ্ন হ'ল, কবিত্বের রসস্পর্শহানি ব্যাপারটা কি? শিল্পসিদ্ধির অভাব? **Significant Form** এ পরিণত না হওয়া?

আমাদের পক্ষে আরেকটি অস্বস্তিকর মন্তব্য -'রবীন্দ্রনাথ কখনই শিল্পসচেতন কবি ছিলেন না।' শিল্পসচেতন কবি হিসাবে উদাহরণ দিয়েছেন ভারতচন্দ্র ও মধুসূদন। শিল্পচেতনার দিক থেকে ভারতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের তুলনা কি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ? রবীন্দ্রনাথের শিল্প তাঁর সদা-জাগ্রত সচেতনার শিল্প। যিনি নৈবেদ্য-গীতাঞ্জলি, ক্ষণিকা-বলাকা, পূরবী-মহুয়া, শিশুভোলানাথ-বনবাসী, শেষ সপ্তক-বীথিকা পাশাপাশি লিখে গেছেন তাঁর মত শিল্পসচেতন কবি আমাদের সাহিত্যে আর কে আছেন?

ভূমিকায় শুধু উল্লেখ মাত্র আছে যে, মধুসূদন য়ুরোপ থেকে সনেট ফর্ম এদেশে এনেছেন। কিন্তু কেন এনেছেন তার যুক্তি লেখক দেননি। উনিশ শতকের বেশীর ভাগ শিল্পরূপ কেন বিদেশনীত তার কারণ দেখালে সনেট রচনার একটি রেনেশাঁস পটভূমি আমরা পেতে পারতাম। জীবেন্দ্রবাবু লক্ষ্য করবেন, শুধু কাব্য নাটক ও উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা সংগীতেও এই সময় যে টপ্পা, খেয়াল বা ধ্রুপদ চর্চা তার কোনটাই বঙ্গজ নয়, অন্য প্রাদেশীয়। ফলত, এই শতকে একটা কথা বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, আবহমান প্রবাহিত ফর্ম আর নতুন ভাবনাকে ধরা যাচ্ছে না। তাই বাইরে থেকে ফর্ম আমদানি। সনেটের ক্ষেত্রেও তাই। উনিশ শতকের চরিত্র লক্ষণের সঙ্গে সনেটের ভাবাঙ্গিকের অপূর্ব মিল। তার একদিকে আবেগের উৎসার আরেকদিকে সুনীতির বন্ধন।

একশো একুশটা সনেট নির্বাচন ক'রে বাংলা সনেট সংকলিত হয়েছে।

নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদকদ্বয় মোটামুটি দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু কবিদের কালক্রমের দিক থেকে সাজানোর ব্যাপারে শুদ্ধতা পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। তার চেয়েও অস্বস্তিকর 'সংযোজন' নামে একটি অধ্যায়; যাতে প্রিয়নাথ সেন একটিমাত্র সনেটের সাহায্যে স্মৃতিমাত্রে পরিণত হয়েছেন। সংযোজন পর্যায়ের অনিবার্যতা সম্পর্কে সম্পাদকীয় কোন বক্তব্য না থাকায় বিভ্রান্ত বোধ করেছি।

কিন্তু সম্পাদকদ্বয় প্রশংসা পাবেন কয়েকজন অজ্ঞাত ও অল্পখ্যাত প্রাচীন কবির (?) সনেটের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধন করিয়ে দিয়ে। এই সূত্রেই মনে হ'ল, যাঁরা প্রতিষ্ঠিত কবি তাঁরা অনেক সময়েই ভাল সনেট লিখিয়ে নন; আবার অনেক অল্পখ্যাত কবি সনেট রচনায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের প্রয়াস সার্থকতর হ'ত যদি আধুনিক পত্রপত্রিকা [গত দশবছরের] ঘেঁটে সাম্প্রতিক কালের আরো অধিক কবিদের উৎকৃষ্ট সনেট প্রকাশ করতেন, যা কিঞ্চিৎ অধ্যবসায়ে সম্ভব ছিল।

জীবেন্দ্রবাবু ভূমিকায় জানিয়েছেন: 'সংকলনের যে রূপ দাঁড়িয়েছে, তাতে আমি পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট নই।' এ আমারও বক্তব্য। তার কারণ নানাভাবে এতক্ষণ বলেছি! তবে মূল কারণ বোধ হয় এ-সংকলনে বড় বেশি আকাডেমিক গন্ধ। সনেটের রূপবন্ধ সম্পর্কে একদেশদর্শিতা কতকগুলি ভাল সনেটের প্রবেশাধিকারের বাধা হয়েছে।

এই সংকলনের 'ছাপা বাঁধাই ভাল' গোছের দায়সারা প্রশংসাপত্র দিতে ইচ্ছে হয় না। আশ্চর্য এর গ্রন্থসজ্জা। প্রচ্ছদপটে খালেদ চৌধুরীর পরিমিত বোধের চিহ্ন নিখুঁত বিন্যাসে।

সুধীর চক্রবর্তী

সামবেদ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কৃত প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ, বিস্তৃত ভূমিকা এবং পরিশিষ্ট সমন্বিত। বেলুড়, শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র হইতে প্রকাশিত। মূল্য— আড়াই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে স্বামীজী গ্রন্থারম্ভে অবতরণিকায় সামবেদ ও তৎসংশ্লিষ্ট শাখা ও সাহিত্যের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্বামীজীর সমস্ত অনুক্রমণিকা এবং অবতরণিকায়ই তাঁহার কঠিন পরিশ্রম এবং প্রচুর গ্রন্থানুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। গুণবিষ্ণু, ভবদেব, রামনাথ, প্রভৃতি যে সকল প্রাচীন বাঙ্গালী বেদ-ব্যাখ্যাতা সামবেদীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, অবতরণিকায় তাঁহাদের কৃতির বিবরণ আছে।

অনুবাদাংশে দুইটি অধ্যায়ে সামবেদের আগ্নেয় পর্ব ও ইন্দ্র পর্ব স্থান পাইয়াছে। অনুবাদ সায়নভাষ্য অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। অনুবাদক স্বয়ং বলিয়াছেন—"অনুবাদ এত আক্ষরিক করিয়াছি যে, উহা পড়িলে মূল সামবেদ পঠিত হইবে। উক্ত অর্থে ইহাকে বাংলা সামবেদ বলা যাইতে পারে। সামবেদের বহু শব্দ অনুবাদে রক্ষিত হইয়াছে।"

এই স্বল্পকায় অনুবাদের সঙ্গেও স্বামীজী চারিটি পরিশিষ্ট যোগ করিয়া দিয়াছেন—বেদ ও বেদার্থ, গজেন্দ্র মোক্ষণ, গিল্‌গিটে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ এবং সিংহলী প্রবাদ। প্রথম পরিশিষ্টে বেদের স্বরূপ, বেদার্থ জ্ঞানের উপায়, সামবেদীয় ভাষ্য ও ব্যাখ্যার পরিচয়, প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু অপর তিনটি পরিশিষ্ট বেদার্থ বিচারে তেমন উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয় না। যাহা হউক, বাংলা ভাষায় বৈদিক সাহিত্য প্রচার করিয়া স্বামীজী বেদানুরাগী বাঙালী সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই কার্যে তিনি আরও অগ্রসর হইবেন এইরূপ আশা পোষণ করিব।

শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচা[র্য]

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত। সাহিত্য সংসদ। ৩২ এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। দাম—পনর টাকা।

সমালোচক ও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে আমাদের দেশের ধর্মকর্ম আচার অনুষ্ঠানের যথোচিত বিচার বিশ্লেষণ এখন পর্যন্ত হয় নাই। বিশেষ করিয়া তন্ত্র ও তন্ত্রানুষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও নিতান্ত অস্পষ্ট। শাক্তধর্ম আমাদের অপরিচিত না হইলেও ইহার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অস্পষ্টতাচ্ছন্ন ও বিকৃত। যথোপযুক্ত আলোচনার অভাবই এই অবস্থার জন্য দায়ী সন্দেহ নাই। বিশেষ আনন্দের কথা অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয় এই অভাব অপনোদনে যত্নবান হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি শক্তিদেবীর ও তাঁহার কতিপয় রূপের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন। বেদ, পুরাণ, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এ সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা এই আলোচনার উপাদান জোগাইয়াছে। এই গ্রন্থের বিশেষ আকর্ষণীয় ও মূল্যবান অংশ হইতেছে প্রাদেশিক ভাষায় রচিত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত শক্তিবিষয়ক সাহিত্যের বিস্তৃত আলোচনা। এই উপলক্ষে বাংলা মঙ্গলকাব্য ও শাক্ত সঙ্গীত এবং ওড়িয়া, মৈথিলী, অসমীয়া ও হিন্দী ভাষার শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত ও অন্যান্য গ্রন্থের আলোচনা করা হইয়াছে। এরূপ আলোচনা বোধহয় এই প্রথম। হরগৌরী বিষয়ক সঙ্গীতে হরগৌরীর গার্হস্থ্য জীবন বর্ণনায় সর্বত্র যে একটা ঐক্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বিশেষ লক্ষণীয়। প্রাচীন অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ করিয়া সংস্কৃত উদ্ভট কবিতায় অনুরূপ ঐক্যের নিদর্শন কাহিনীর ব্যাপক সমাদরের সাক্ষ্য বহন করে। সংস্কৃত সূক্তিগ্রন্থগুলি হইতে এ সম্পর্কে প্রচুর দৃষ্টান্ত আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। দেবীর উগ্ররূপের অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কাহিনী বিষয়ে কিন্তু এরূপ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। উড়িষ্যার সারলা দাসের চণ্ডীপুরাণ ও দশমগুরু গুরুগোবিন্দ সিংহের চণ্ডীগীতি কাহিনীর বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকারের মতে 'চণ্ডীকাহিনী' বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক কাহিনীর সহিত জড়িত হওয়ার ফলে এই বৈচিত্র্যের সৃষ্টি। দেবীপূজার ইতিহাসে যুগে যুগে নানা ভাবধারার সংমিশ্রণের আভাস আলোচ্য গ্রন্থের 'দেবীর বিচিত্র ইতিহাস' পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। তন্ত্রসাহিত্যে উল্লিখিত তথা ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত দেবীর অগণিত রূপের পূজার বিবরণ সংগৃহীত আলোচিত হইলে এ সম্বন্ধে আরও তথ্য উদ্ঘাটিত হইতে পারিবে বলি[য়া] আশা করা যায়।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

সম্পাদক—শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র দাস, প্রবাসী প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ১২০।২ আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা